# Hitesranjan Sanyal Memorial Collection

## Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

| | | | |
|---|---|---|---|
| Record No. | CSS2001/ 2/2 | Place(s) of Publication: | Calcutta |
| | | Year of Publication | 1353 b.s. (1946) – 1361 b.s. (1955) |
| Collection: | Bethune College Library | Publisher / Printer: | |
| ~~Editor(s)~~ Title | Purbāśā (পূর্বাশা) | Size: | 7½" x 9½" |
| | | Condition: | brittle |
| ~~Title:~~ Editor | Sanjay Bhattacharya | Volumes in record: | Vol. 9 : 1353 b.s. (1946-47)<br>Vol. 11-17 : 1355-61 (1948-55) |

| | | |
|---|---|---|
| Roll No. 182 | From Gate: 1 | To Gate: |

# ঝিনুক নিয়ে

## বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

কী ব্যথা নিয়ে হেসেছো আর কী কথা নিয়ে কবে
ব্যঙ্গ ক'রে নিয়েছো এক চোট
মনের স্টেনো রেখেছে তার সাংকেতিক নোট
সে-সবগুলো দিনের মাঝে একটি দিন শুধু
এখনো প্রাণ পূর্ণ ক'রে আছে
দুঃসময়ে চাইলে দেবে কাছে পাওয়ার মধু
বিধুর হ'য়ে তাই কি স্মৃতি বাঁচে ?

দোলানো বেণীপ্রান্তটুকু কখন ছুঁলো ভুঁই
কেন যে এসে বসলে পাশে ফুটিয়ে বেল জুঁই
ছোট্টো এক ঘামাচি-মারা ঝিনুক হাতে ক'রে
ঝরালো এক পশলা কথা, বৃষ্টি দিয়ে মন
জুড়োলে যেন পাড়ালে ঘুম, ঘুমের সে স্বপন
ছোঁয়ার মোহ মদিরা দিয়ে ভ'রে
কখন্ উঠে গিয়েছো তারপর
জানিনা কেউ দেখেছে কিনা খোলা তো ছিলো ঘর
জাগ্‌লে দেখি ঝিনুকখানি কেবল আছে প'ড়ে
বালিশে লেগে রয়েছে চুল খোঁপার থেকে খসা
চুলের ঘ্রাণে ফুলের ঘ্রাণ মেশা
বকুল নয়, বেণীচ্যুত গরবী চাঁপা ফুল
রয়েছে প'ড়ে তখনো ঘর গন্ধে আছে ভ'রে
সে-চাঁপা রেখে কী হ'বে যার পাপড়ি গেলো ঝ'রে !
কিন্তু সেই ঝিনুকটুকু দিয়ে
শুনুক লোকে—কিনেছি তারপর···
অনেক পল, মিনিট, মাস, অনেক বৎসর।

সালের যতো শালুক ফুল
জানিনে তার কোথায় মূল



সে ফুল তোলা হ'লো কি ভুল]
কিংবা না তোলাই
সবুজ আর সজীবতার
পুঞ্জীভূত সময়ভার¦
সত্য তবে ঝরাপাতার
হলুদ হাওয়াটাই ?
বছর বুঝি দশকে এসে ধূসর হ'লো তাই ?

বছর কেন ?—দশকও গেলো ধূসরতর পায়ে
জাগিয়ে স্মৃতি মরলো বুঝি প্রাণের চাওয়াটাই
বোঝে কি মূর্খ মন
ঝিনুকখানি যথের ধন
শূন্য বুকে কেন যে আগ্‌লাই !

চোখের জল দেখেছি আমি ঝিনুকখানি ভ'রে
লবণ-ঘ্রাণ কুটিল ঝোড়ো সমুদ্রের স্বাদ
দুঃখ হয় পারিনি দিতে তোমার ঠোঁটে ধ'রে
সময় তাই ছাড়েনি নিতে অন্ধ প্রতিশোধ
চেনার আলো নিবিয়ে দেওয়া কঠিন সে-প্রমাদ
মনের গূঢ় ঘূর্ণি-পথে বৃত্ত হ'য়ে ঘোরে !
একটুখানি ঝিনুক বটে, সোজা কি ভাবো তাকে ?
অসম্ভব কুড়িয়ে পাওয়া
বেসাতি ক'রে কিনতে চাওয়া
কোথায় পাবে সাধ্য কি যে কেনো ?
মায়ের মতো শীতল বুক মরণকে কি চেনো ?

মায়েয় বুকে যে মায়া আছে প্রিয়ার ঠোঁটে মধু
সমান ভাগে মিশিয়ে দেখো ঝিনুক থাকে সুধু
নইলে মিছে স্মৃতির দীপে সল্‌তে উস্কোনো
ছ্যাব্‌লা সেই ঝিনুকটিতে লাগিয়ে রেখে বুক
বুকে যে ঢেউ অহর্নিশ ইচ্ছে যদি গোনো

যদি বা চাও সিন্ধুনাদ লাগিয়ে কান শোনো
ছোটো সে বুক হ'লে কি হয়
কান্না যতো বিশ্বময়
ক্লান্তি যতো, আবেগ যতো, রয়েছে যতো সুখ—
আয়না যদি নেহাৎ-ই চাও এতেই ছাখো মুখ
শুক্তিমুখ উঠ্‌বে ন'ড়ে বল্‌বে—'আরে বোকা,
দেখি যে তুমি নেহাৎ-ই উজবুক।'
হাস্‌বে আর কেবলই দেবে দুও—
ছিনিয়ে নিলে তবেই মেলে বোঝোনি এটুকুও ?'

## একটি চৈত্রের রাত্রি

### সুনীলকুমার নন্দী

আশ্চর্য চৈত্রের রাত্রি। রাত্রির পাহাড়
কুয়াশা, দু'হাতে ঠেলে দেখা দিলো অম্লান প্রশান্তি আঁকা অজস্র নীলাভ তারা, আর
রূপোলি চাঁদের আলো ঝ'রে কী নরম পায়ে গিয়েছে ছড়ায়ে ইতস্তত—
স্বপ্নের পূর্ণতা নিয়ে এমন গর্বিত রাত্রি হয়তো কখন
আসে নি। বিশ্বাস করি। ধূসর জীবন
হায়রে তবু-ও মিথ্যে। কী পেলো বলো তো
বিবর্ণ স্মৃতির ফ্রেমে বাঁধানো মৃত্যুর মতো দুর্বোধ্য ইসারা,
আর শুধু রিক্ত ম্লান হাহাকার ছাড়া :
হতাশা-ক্লান্তির ঝড়ে হৃদয় কান্নায় ভাঙে। চেতনার-ও স্বর হয় বেদনা-আহত !

হে রাত্রি, গর্বিত রাত্রি তোমার আকাশ
যতোই উজ্জ্বলতর করোনা, আশ্বাস
পাবে কি হৃদয় আর গান হ'য়ে ছুঁতে যেতে মেঘ-মেয়েদের মিহি শাড়ীর আঁচল ?
গানের মায়াবী কলি মৌসুমী হাওয়ায় ভেসে সমুদ্রের লোনা জলে হ'য়েছে উধাও :
হে রাত্রি মিনতি শোন ; আরো তো হৃদয় আছে, সেখানে ছড়াও
স্বপ্নের ফসল। শুধু বুলাও আমার চোখে ঘুমের কাজল !

## পুনর্জন্ম

### বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হে ফুলফোটানোর আদিম দেবতা, আনন্দ !
বিষাদের হাত ধ'রে অনেকদিন তোমাকে আমি
ছেড়ে এসেছি।
অন্ধকার ভালোবেসে, তাকে চুমু খেয়ে
একদিন মাতালের মতো অনায়াসেই ঢুকে পড়েছি
সময়ের কফিনের ভেতর—
আর ফিরে যেতে পারিনি তোমার কাছে !

অনেকদিন আমার মৃত্যু হ'য়েছে ;
নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে গেছে ; শরীরে লেগেছে ফসিলের হাওয়া
বরফের চেয়েও হিম,
মৃত্যুর চেয়েও বিবর্ণ।...
আমি উড়ে এসেছিলাম কালের বাতাসে একখণ্ড তৃণের মতো—
তারপর অনায়াসেই ছিঁড়ে কুটিকুটি হ'য়ে মিলিয়ে গেছি
এক নিরবচ্ছিন্ন বিলুপ্তির স্বাদহীন অবচেতনায় !

কিন্তু সেই কিছু-না'র গর্ভের ভেতর,
কী আশ্চর্য্য !—আবার আমি তিলে তিলে জন্মলাভ করলাম !
যেমন ক'রে ফসিলের অন্ধকার গর্ভে
ধীরে ধীরে জন্ম নেয় প্রত্নতাত্ত্বিকের অপরূপ রূপকাহিনীরা—
হয় তো রক্তমাংসের নয়,
তবু তেমনি এক কাহিনী
আমি বেঁচে উঠলাম ইতিহাস পরিত্যক্ত কালকে পরিহাস করে !

হে আনন্দ !
সেই ধূসরতমের চেয়ে বিচিত্র শিল্পক্রীড়ার জন্ম দেখে—
মৃত্যুত্তীর্ণ প্রেমিকের স্মৃতিমুখ কোলের কাছে দেখতে পেয়ে,
তুমি কি আবার হেসে বাহু মেলে দিলে
এই অন্ধকার কফিনের ভেতর ?
আর থরোথরো কেঁপে উঠলাম আমি ! স্মৃতিমাত্র !

# শীতের শিকল

## বুদ্ধদেব বসু

অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখলো মৌলিনাথ। এক ঝলক রোদ এলো তার ঠাণ্ডা ঘরে, উজ্জ্বল একটি দিন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐ লাল শাড়ি, জ্বলজ্বলে সিঁদুর, রক্তমাংসে উদ্ভাসিত প্রতিমা—তার এই মৃত ঘর, এই মৃত মন—এখান থেকে কত দূরে এ-সব, কোন সুদূর পরপারে! যেন এই শীতের বিকেলে এখনো যেটুকু আলো আছে পৃথিবীতে যেটুকু রোদ, স্বাস্থ্য, প্রাণের তাপ, তা অঞ্জলি ক'রে ধ'রে নিয়ে এলেন এই—এই ভদ্রমহিলা, এই অতীব শোভন মহিলাটি—আর কয়েক বছরের মধ্যে যিনি রীতিমতোই মোটা হ'য়ে উঠবেন মনে হয়, থুতনিতে হয়তো ভাঁজও পড়বে—কিন্তু যাঁর মুখের রেখায়, চোখের ছায়ায়, শরীরে, ভঙ্গিতে, এই পূর্ণ, সমৃদ্ধ অবস্থার কোনো-এক ঠিকানাহীন অন্তরালে, এখনো চেনা যায় অন্য একটি মেয়েকে—সেই হালকা-নীল শাড়ি-পরা অন্য মেয়ে, যার ঠোঁটে হাসি আর চোখের কোণে বিষাদ, আর যার পাণ্ডুর গালে হঠাৎ এক-একটি রঙের ফোঁটা দেখা দিয়ে কী জানি কোন গোপন লজ্জা ধরিয়ে দেয়। অন্তত, মৌলি দেখামাত্রই চিনলো।

মহিলাটি—মেয়েটি—ঘরের মধ্যে বেশি দূর এগোয়নি, মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়েছিলো গৃহস্বামীর চোখে প'ড়ে। একটু পরে উঠে দাঁড়ালো মৌলিনাথ, তার ছাইরঙের আলোয়ানটা হালকা হাতে ফেলে দিলো পিঠ থেকে, এগিয়ে এসে বললো, 'এসো।' অতিথিকে বসতে দিলো তার পুরোনো-কেনা আরাম-চেয়ারে, নিজে দাঁড়িয়ে থাকলো টেবিলটায় ঠেশান দিয়ে। একটু সময় কেউ কোনো কথা বললো না। এই ঘর, যা বলতে গেলে সারাদিনই চুপচাপ থাকে, আর আজ এই দুপুরের ঘণ্টাগুলি ভ'রে একটু বিশেষ অর্থেই স্তব্ধ ছিলো—এই ঘরে অন্য রকম নীরবতা নামলো এখন—তা-ই মনে হ'লো মৌলির—বন্ধ্যতার নয়, ব্যর্থতার নয়—কোনো-একটা অর্থ যেন পেয়েছে এতক্ষণে, বলা যেতে পারে স্তব্ধতা ঠিক স্তব্ধ নেই আর, লক্ষ্য পেয়েছে, গতি পেয়েছে, চলছে। মৌলির কেমন আরাম লাগলো মনে-মনে, যেমন হয় জোর করে ঘুম ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে কাজ করার পর শেষ পর্যন্ত ঘুম যখন ছেয়ে আসে।

তারপর চিত্রা কথা বললো—'একটু জল খাবো।'

'জল? দিচ্ছি।' কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে দিলো মৌলি।

'খুব ঠাণ্ডা জল তো।'

'বড্ড ঠাণ্ডা, না?'

"আমার ভালোই লাগছে।' চিত্রার মুখের চেহারা তার কথার সমর্থন করলো। লালচে আভা গালের—উত্তরভারতের স্বাস্থ্যকরতার প্রমাণ—এখন গভীর রঙে ছুপিয়ে দিয়েছে সারা মুখ—প্রায় অস্বাভাবিক লাল দেখাচ্ছে। রোদ লেগেছে গাড়িতে—এতক্ষণে তার মনে পড়লো—ছোটো-ছোটো ঠাণ্ডা চুমুকে জল খেলো, ফাঁকে-ফাঁকে তাকিয়ে দেখলো ঘরের চারদিকটায়। 'তুমি—বসবে না?'



'বসছি। গ্লাশটা দাও, রেখে দিই।'

'আমি রাখছি।' চিত্রা নিচু হ'য়ে গ্লাশ নামিয়ে রাখলো মেঝেতে, যখন সোজা হ'লো তার লাল দুল ন'ড়ে উঠে ঝলক দিলো মৌলির চোখে। এত লাল কেন, মৌলি বললো মনে-মনে, আমি ক্লান্ত, আমি ঘুমোতে চাই। হ্যাঁ—এতক্ষণে ঠিক বুঝেছে, ব্যাপারটা এই যে সে ক্লান্ত হয়েছে সে, তাই লিখতে পারেনি এতক্ষণ—কখনো-কখনো হার মানতেও তৈরি থাকা চাই, নয়তো শেষ যুদ্ধে জেতা যায় না।

আবার একটু চুপচাপ। ব্যাগ থেকে ছোট্ট রুমাল বের করলো চিত্রা, আস্তে চাপ দিলো মুখের এখানে-ওখানে, ব্যাগের মুখ বন্ধ ক'রে মৌলির দিকে তাকালো। 'তুমি—বোসো!'

মৌলি প্রথমে তার লেখার প্যাড বন্ধ ক'রে সরিয়ে রাখলো, তারপর চেয়ারটি ঘুরিয়ে নিয়ে বসলো ঠিক চিত্রার মুখোমুখি নয়, একটু আড় হ'য়ে। খুব সহজ ভাবে বললো, 'তারপর? কেমন আছো?'

আলাপ শুরু হ'লো। উল্লেখযোগ্য কিন্তু নয়; এমন দু-জন, কোনো-এক কালে পরস্পরের জীবনে যাদের অংশ ছিলো, অনেকদিন পর দেখা হ'লে তাদের কথাবার্তা যে-সব দিকে সাধারণত চলতে পারে, এখানে তার ব্যতিক্রম কিছু হ'লো না। তখন যাদের চিনতো তাদের কথা উঠলো; যারা ইতিমধ্যে স'রে গেছে জীবন থেকে, তাদের কথা; নতুন যারা এসেছে তারাও বাদ গেলো না। লিপিযোগ্য আলাপ বলে না একে, আবার পরিমাণেও প্রচুর নয় তেমন। থেমে-থেমে চললো, আস্তে, নিচু গলায়; চিত্রাই কথা তুললো পর-পর, কিন্তু তারও যেন বলার চাইতে দেখাতেই আগ্রহ বেশি, কথায় ভুলে চোখের ছবির টুকরোটিও যেন হারাতে চায় না সে। ফাঁকে-ফাঁকে বার-বার ঘুরে এলো তার চোখ, ঘুরে এলো ঘরের চারদিক—ধোঁয়া-লাগা পরদা থেকে আঁশ-বেরোনো সুজনিতে ঢাকা বিছানা পর্যন্ত, লক্ষ্য করলো বইয়ের শেলফ, বইগুলি—কোনো-কোনোটা উল্টো হ'য়ে দাঁড়িয়ে—বাজে কাগজের ঝুড়ির মধ্যে টুকরো খাম, সিগারেটের প্যাকেট, আস্ত একটা প্যাম্ফলেট বোধহয় সিনেমার বিজ্ঞাপন? —দেখলো ঝুল জমেছে সীলিঙের কোণে-কোণে, চুন খ'সে-খ'সে ঝাপসা ম্যাপ আঁকা হয়েছে দেয়ালে, মেঝেতে সূক্ষ্ম ফাটল ভাবনার মতো বেঁকে-বেঁকে চলেছে। গৃহস্বামীকেও দেখলো মন দিয়ে—ক্রমশ যখন তার মুখের রং স্বাভাবিকতা ফিরে পেলো, আর শরীরের ভিতরকার কলকব্জাও ভদ্রগোছেরই ব্যবহার করলো আবার—মনে-মনে টুকে নিলো সেই মুখে যা-কিছু এঁকে দিয়েছে এই বছরগুলি, কোনো-এক দিন যে-মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে সে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছিলো 'টেম্পেস্ট' নাটকটাকে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় তেমন বদল হয়নি, কিন্তু আস্তে-আস্তে ধরা পড়ে সময় ঠিক আদর ক'রে হাত বুলিয়ে যায়নি ওখানে, আর মানুষটির মনের ভূগোলেও আরো অনেক অদল-বদল হয়েছে ইতিমধ্যে। চুল তেমন ঘন নেই আর—আবার সিঁথি না-ক'রে উল্টিয়ে দিচ্ছে ব'লে চওড়া দেখায় কপালটা, আরো স্পষ্ট দেখায় কপালের শির—সেই 'রাজদণ্ড' তার—না কি কোনো অভিশাপের বিধিলিপি? রং ফর্শা হয়েছে আগের চাইতে—ফর্শা? না, ফ্যাকাশে, রক্তহীন?—অসুস্থ মনে হয় ভালো ক'রে দেখলে—সত্যি কি কোনো অসুখে ভুগছে ভিতরে-ভিতরে? যখন চুপ ক'রে থাকে বড্ড যেন গম্ভীর—ঐ নিবিষ্ট হ'য়ে শোনার ভঙ্গিটি ওর নতুন দেখছি—আর যখন ঠোঁটের কোণে হাসে তখন ঐ-যে চোখে আলোর মতো ঝিলিক দেয়, সেটা হয়তো—হয়তো তার প্রতিভারই আভা, কিন্তু মনে হয় অস্বাভাবিক, অনিদ্রারোগীর উজ্জ্বল চোখের মতো অস্বাভাবিক।

আর মৌলিনাথ—ঐ ক্ষীণ, মন্থর কথোপকথনে সে যেটুকু অংশ নিলো তা প্রধানত শ্রোতার। যা বললো তা বেশির ভাগই কোনো প্রশ্নের জবাব, নতুন ক'রে প্রশ্ন করলো খুব কম, কিন্তু চিত্রা যখন তুচ্ছ কোনো প্রশ্নের উত্তরে প্রয়োজনের বাইরেও খানিকটা ব'লে ফেললো, তখন সমস্তটা শুনলো মন দিয়ে। ক্লান্ত মনে হ'লো তাকে, যেন ঘুম পেয়েছে; অথচ ব'সে থাকতেই ভালো লাগছে বেশি। বসেছে শিথিল হ'য়ে চেয়ারে, পা দুটোকে সামনে বাড়িয়ে দিয়ে, মাথাটি একটু হেলানো—ঠিক মুখোমুখি নয়, একটু আড় হ'য়ে—আঙুলে-ধরা সিগারেটের ধোঁয়া পেঁচিয়ে উঠছে চুলের উপর দিয়ে। এইভাবে ব'সে থাকলো দু-জনে, অনেক বছর পর দেখা হয়েছে যাদের, এই শীতের বেলায়, রোদ-না-লাগা ঘরের এই ধূসরতায়—অজাত কথার বেদনায় ভরা ধূসর হাওয়ায়—এই দু-জন, যারা না-ব'লে এখন শুনতে চায়, না ব'লে এখন দেখতে চায়, হয়তো আরো অনেক বেশি চায় অনুভব করতে আপন মনে।

তারপর কথাটা উঠলো। দৈবাৎ এমন হ'লো যে মৌলি—দু-জনের মধ্যে বলার অংশ যার ক্ষীণতর—তার মুখ দিয়েই প্রথম বেরোলো নামটা। এর আগে পর্যন্ত অন্য নানা বিষয়ে কথা হয়েছে, শুধু ঐ নামটি উচ্চারিত হয়নি একবারও। তার মানে এমন নয় যে ইচ্ছে ক'রে এড়িয়ে গেছে কেউ—চিত্রা নিশ্চয়ই সুযোগ খুঁজছিলো, অপেক্ষা করছিলো—আর অবশেষে কথাটা যখন উঠলোই, তখন দু-জনেই যেন বুঝে নিলো, মেনে নিলো, যে এরই জন্য তারা অপেক্ষা করছিলো এতক্ষণ, যে অন্য সব কথা এরই ভূমিকামাত্র, এরই প্রস্তাবনা।

ঢাকার কথা হচ্ছিলো, পুরানা পল্টনের, কিন্তু স্মৃতিমন্থনে মৌলিনাথের যেন উৎসাহ নেই; পুরোনো দিনের কথা উঠলে যে-রকম কথা স্বভাবত সবাই ব'লে থাকে—যাতে কখনো একটু বেদনার ছোঁয়া লাগে, কখনো বা নিশ্বাস-ফেলা সুখের হাওয়া ব'য়ে যায়—সে-রকম একটি কথাও বেরোলো না সাহিত্যিকটির মুখ দিয়ে। খুব হালকা ক'রে সে ছুঁয়ে গেলো প্রসঙ্গটাকে; ভাবটা এইরকম যেন প্রাণের ধর্মে ফিরে-যাওয়া নামক ঘটনা যেহেতু নেই, অতএব ফিরে তাকাতেও ইচ্ছুক নয় সে—না কি ফিরে তাকাতে তার ভয়, ভয়—যেহেতু মধ্যবয়সের সংকটকালে একবার পিছন ফিরে তাকালে বারে-বারেই তাকাতে হয়, একবার ধরা দিলে আর সহজে নিষ্কৃতি দেয় না অতীত। চিত্রা আড়চোখে একবার তাকালো; মৌলির চোখের পলকের কাঁপন দেখলো সে, সিগারেটের ছাই-ঝাড়া হাতের শ্লথ ভঙ্গি—একটু চুপ ক'রে থেকে অন্য কথা তুললো। দিল্লির কথা এবার; মন্দ না সিভিল লাইন্স জায়গাটা—সেখানেই ইউনিভার্সিটি—আর আজকাল তারা যে-বাড়িতে আছে তার বারান্দা থেকে যমুনা দেখা যায়, বাগান আছে সামনে, সবুজ ঘাস, মাঝে-মাঝে মনে হয়েছে যে মৌলিনাথ একবার—কিন্তু মৌলিনাথের বোধহয় দিল্লির আবহাওয়া ভালো লাগে না?

আর এ-প্রশ্নেরই উত্তরে মৌলি বললো যে গীতাকে তখন দিল্লিতে সরিয়ে নিয়ে খুব ভালো করেছিলো চিত্রা, প্রশংসনীয় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলো।

সেই দুর্বিনীত রক্তিমা হঠাৎ ফিরে এলো চিত্রার মুখে। অস্ফুট স্বরে উল্লেখ করলো তাদের তখনকার পারিবারিক অবস্থার; বাবার পেন্সন হ'লো সেবার, এদিকে বেণুর ডাক্তারি পড়ার খরচ—সে তাই ভেবেছিলো—

ঠিক!—মৌলি সমর্থন করলো সঙ্গে-সঙ্গে—ঠিক ভেবেছিলো চিত্রা। দিল্লি খুব ভালো জায়গা,



কিন্তু বিলেত আরো ভালো, বিলেত আরো দূর। একটু হাসি ছুঁয়ে গেলো মৌলির ঠোঁট, ছুঁতে-না-ছুঁতেই মিলিয়ে গেলো।

হাসিটুকু বিঁধলো চিত্রাকে। তাকাতে গিয়ে চোখ নিচু হ'লো তার, বলতে গিয়ে বেধে গেলো কথা। সে কি ভালো করেছিলো? সে কি ভুল করেনি? কেন সে তখন গীতাকে নিয়ে এলো দিল্লিতে; কেন, তারপর, প্রোফেসরকে দিয়ে নানা দিকে চেষ্টা ছড়িয়ে দিলো যাতে তার বিলেত যাওয়ার উপায় হয়? বাবাকে সাহায্য করা—শুধু তা-ই? স্নেহ, হিতৈষণা, বোনের ভালো হোক—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—কিন্তু সেই ভালোর মানেটা কী? মৌলি যেখানে নেই সেখানেই গীতার ভালো—এই তো ছিলো শুভানুধ্যায়িনী দিদির মনে? তা-ই না? এই গোপন কথাটি—যা সত্যি বলতে গোপনই নয়, যা কেউ মুখে না-আনলেও সকলেই মেনে নিয়েছিলো সেই সময়ে পারিবারিক মহলে, আর যা এড়াতে, লুকোতে, চাপা দিতে চিত্রা তার নিজের মনেও ব্যর্থ ছলাকলা ছড়িয়েছিলো কম না—এই কথাটি আজ এতকাল পর যেন প্রথম বার সে নিজের কাছে স্বীকার করলো। প্রথম বার প্রশ্ন করলো নিজেকে: ঠিক করেছিলাম?

হ্যাঁ, মানতেই হয়—এখন আর না-মানারও কোনো অর্থ নেই—মানতেই হয় যে এইটে ঘটাতে রীতিমতো চেষ্টা করেছিলো সে—যাকে বলে উঠে-প'ড়ে লাগা প্রায় সেই রকম—লম্বা-লম্বা চিঠি লিখেছিলো মা-কে, গীতাকে—মৌলির মা-কেও বাদ দেয়নি—সেই চিঠি লেখায় বুদ্ধি খাটিয়েছিলো খুব, তার সাংসারিক বুদ্ধির সবটুকু, সেই সঙ্গে সূক্ষ্মতর সেই চাতুরী, যা মেয়েদের কখনো দিতে ভোলেন না প্রকৃতি দেবী। যেন সে পণ করেছিলো যে গীতাকে উপড়ে আনা চাই। কিন্তু যদি···যদি সে কিছু না-ই করতো? সব জেনেও, সব বুঝেও, চুপ ক'রেই থাকতো যদি সে, শান্তিতে থাকতো তার আপন সংসারে, তাহ'লে—কী হ'তো তাহ'লে? যা হ'তো—হয়তো বা হ'তে পারতো কোনোদিন—তা কি ঠিক তা-ই নয় যা ছিলো সবচেয়ে সুখের, সবচেয়ে ভালো, নিখুঁতরকম সংগত ও সুন্দর? মৌলি আর গীতা—ওরা তো জন্মেছিলো পরস্পরের জন্য, তৈরি হয়েছিলো সব দিক থেকে; ওরা মিলতে পারলে সার্থক হ'তো দু-জনে, আলো হ'তো অন্য আরো জীবন, এই পর্বতপ্রমাণ সাধারণতার সংসারে কোথাও একটি উপত্যকা হ'তো যেখানে ফুল ফুটে এক বেলাতেই ঝ'রে যায় না।

চিত্রার পরিপুষ্ট চিক্কণ মুখে বিষাদের ছায়া নামলো। এই সম্ভাবনা, যা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট, পুরানা পল্টনের সবুজ কাহিনীর উজ্জ্বল উপসংহার—একে এমন ক'রে মুখোমুখি কি আর কখনো দেখেছিলো সে? হঠাৎ, এক মুহূর্তে, গীতার সমস্ত মন যেন স্বচ্ছ হ'য়ে বেরিয়ে এলো তার সামনে; গীতার ধৈর্য, গীতার স্তব্ধতা, ঐ অবিচলিত কর্মপালনের প্রতিজ্ঞা—তার অন্তরালে আজ—এতদিনে—চিত্রা দেখতে পেলো দীর্ঘ গোপন অপ্রতিরোধ্য প্রতীক্ষা, শুনতে পেলো সান্ত্বনাহীন হাহাকার। কত দুঃখ পেয়েছিলো গীতা—আর সে-দুঃখ কি আমিই দিয়েছিলাম?

না, না! তোর ভাগ্যকে দোষ দে গীতা, আর যদি কাউকে দুষতে হয় সে যে কোন মানুষ তা কি আমার মুখে শুনতে হবে তোকে? না, আমি ভুল করিনি; কিছুই হ'তো না রে, ওকে তুই পেতিস না কোনোদিনই, শুধু চোখে দেখে-দেখে জ্ব'লে-পুড়ে মরতিস তুই। তার চেয়ে এই ভালো হয়েছে;—শেষ পর্যন্ত বিমলেন্দু—কিন্তু তাও ভালো। সত্যি তা-ই না? বল, গীতা, সত্যি ক'রে

বল—তুই কি এমন মেয়ে যে আমার কথায় দিল্লি চ'লে আসবি—নিজের ইচ্ছেতেই এসেছিলি তুই, এসেছিলি—ভুলতে, জুড়োতে, বাঁচতে। না, কিছু হ'তো না—আমি তো জানি ওকে—তুই যত ভালো ক'রে জানিস আমিও প্রায় ততটাই—নিজের ইচ্ছা, নিজের ভাবনা, তার বাইরে কিছুই কি ও দেখতে পায়, কাউকেই কি ওর চোখে পড়েছে কোনোদিন? অন্ধ, অন্ধ, কঠিন; নিজের 'পরেও নিষ্ঠুর হওয়া যার স্বভাব, তার কাছে তোর কি কোনো আশা ছিলো?

কিন্তু কে জানে? কে জানে মৌলিরই মনের বদল হ'তো না কোনোদিন? যদি কোনোদিন খুলে যেতো তার চোখ, সেই তার অন্য চোখ তুলে গীতার দিকে তাকাতো যদি? তা কখনোই হ'তো না—এই আশ্বাসের কথা, সান্ত্বনার কথা, কেউ কি শোনাতে পারে চিত্রাকে? দেখা, শোনা, কাছাকাছি থাকা, কণ্ঠের রস, শরীরের তাপ—এর বাইরে আর কী আছে মানুষের, এর বাইরে যা-কিছু সবই তো শুধু ছায়া, শুধু স্মৃতি! সান্নিধ্য ছাড়া জন্ম নেই, ঘনিষ্ঠতায় আশাতীতের জন্ম হ'তে পারে। অমন-যে ঠাণ্ডা কাঠ, তাতেও ঠোকাঠুকি হ'তে-হ'তে আগুন জ্ব'লে ওঠে—আর এ তো মানুষ, এ তো রক্তমাংস। কিন্তু না, কোনো পথ আর থাকলো না তার, একেবারে চোখের বাইরে চ'লে গেলো।···কেন হ'লো এ-রকম? এই ঘটনায় তারও যে কিছু অংশ ছিলো তা যেন তখনকার মতো ভুলে গেলো চিত্রা: অবাক হ'য়ে ভাবলো—কেন হ'লো, কেন হ'লো না, যা হওয়া উচিত ছিলো তা হ'লো না কেন। এই তো মৌলি—তার চারদিকে বই, কাগজ—শুধু কাগজ—এমনি সে ব'সে থাকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—এমনি ক'রে সে বেঁচেছে আজ কত বছর ধ'রে এই ঘরে—কিন্তু বেঁচেছে কিনা কে জানে। চিত্রা আড়চোখে আবার লক্ষ্য করলো মৌলির মুখের পাণ্ডুতা—অস্বাস্থ্য—আর তার চোখের প্রতারক প্রতিভা, অনিদ্রারোগীর চোখের মতো উজ্জ্বল। দেখতে পেলো—একদিন যাকে দেখেছিলো পৃথিবীর যুবরাজ, দিন-রাত্রির অধীশ্বর, তাকে আর দেখলো না চিত্রা—হঠাৎ দেখতে পেলো অন্য এক মানুষ, যে-মানুষ—তবে কি তা-ই সত্যি?—বাইরে প'ড়ে আছে—জীবনের বাইরে প'ড়ে আছে।

বুকের মধ্যে টান পড়লো চিত্রার, ভিতরটা যেন ব্যথা ক'রে উঠলো। একটা অদ্ভুত অনুভূতি হ'লো তার: ষোলো বছর আগে মিতু যখন জন্মেছিলো, আর তার তিন দিন পরে রসের প্লাবন টনবন ক'রে উঠেছিলো তার বুক ছাপিয়ে, আজ মৌলির সামনে ব'সে, মৌলির দিকে চোখ তুলে তাকাতে গিয়ে, মুহূর্তের জন্য সেই কষ্ট ফিরে এলো তার স্নায়ুতে, সেই রোমাঞ্চ ছুঁয়ে গেলো তার শরীর। সোজা হ'য়ে বসলো, যেন করুণ ক'রে হাসলো একটু, আর যখন কথা বলতে আরম্ভ করলো প্রথমে তার গলা প্রায় শোনাই গেলো না।

কিন্তু এই বাধো-বাধো ভাবটা একটু পরেই কাটিয়ে উঠলো চিত্রা। আত্মস্থ হ'লো আবার; যেন মনোমতো বিষয় পেয়ে এবার বেশ উৎসাহ নিয়ে বলতে লাগলো। ক্রমশ স্পষ্ট হ'লো তার গলা, দ্রুত হ'লো লয়—হয়তো এতটাই দ্রুত যাতে মৌলি কোনো ফাঁক না পায় কিছু বলার। হ্যাঁ—গীতার তখন ভালোই হয়েছিলো দিল্লি গিয়ে। শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছিলো না ওর, মিটফোর্ডের নরেন ডাক্তার শুকনো হাওয়া বাৎলেছিলেন। আর দিল্লিতে তো পড়াশুনোরও অসুবিধে নেই—মেয়েদের কলেজ তো সারা দেশের সেরা। কথা ছিলো বছরখানেকেই ফিরে যাবে—যতদিন না কলেজের পালা



সাঙ্গ হয়—কিন্তু থাকতে-থাকতে গীতারই যেন ভালো লেগে গেলো। আর বিলেত যাওয়া? ওটা নেহাৎই দৈবাৎ, নিছক বরাতজোর ছাড়া কিছু না। গীতার নিজের অবশ্য ইচ্ছে ছিলো খুব, অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছিলো রোডস ট্রস্টে, কিন্তু আমরা কেউ ভাবিনি, আশাই করিনি, যে সত্যি-সত্যি ও পেয়ে যাবে স্কলারশিপটা। আসলে ও পায়ওনি ঠিক, যে পেয়েছিলো সে বোমার ভয়ে হ'টে গেলো—গীতা লুফে নিলো তক্ষুনি। তা ওকে দিয়ে যে ভুল করেনি সেটা ও দেখাতে পেরেছে যা-ই হোক, খুব ভালো করেছে অক্সফোর্ডে, প্রাইজ পেয়েছে, মেয়েদের ম্যাগাজিনের এডিটর ছিলো—কিন্তু মৌলি বোধহয় জানে সব খবর, চিঠিপত্র পেয়েছে তো মাঝে-মাঝে?

না? চিঠি লেখেনি ওরা? বিমলেন্দু—এক কালের সেরা ছাত্র মৌলিনাথের? সে-ও না? তা মৌলির কাছে ও-সব চিঠি—কী বা মূল্য তার, শুধু সময় নষ্ট! বোধহয় শোনেনি বিমলেন্দুর খবর? হ্যাঁ, ভালোই—ডি-ফিল নিয়েছে অক্সফোর্ডে, তার থীসিসের সুখ্যাতি করেছেন প্রোফেসররা, রিভিয়ু অব ইংলিশ স্টডিজ-এ তার লেখা বেরিয়েছে হেনরি জেমস না কি জেমস জয়স কাকে নিয়ে ঠিক মনে পড়ছে না। যাক—খুব ভালোই দাঁড়ালো শেষ পর্যন্ত—যা গেছে একটা বছর ঘোর যুদ্ধের দুশ্চিন্তা ক'রে-ক'রে! কবে ফিরবে? বাঃ ওরা তো ফিরেছে। এই তো একমাসও হয়নি—এক সঙ্গেই ফিরেছে দু-জনে—হ্যাঁ, এখানেই, কলকাতায়—আর ওদেরই জন্য তো কলকাতায় আসতে হ'লো আমাদের।

ওদেরই জন্য, তার মানে ওদের—? হ্যাঁ, ঠিক তা-ই—মৌলির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলো চিত্রা—আওয়াজ তার নিচু হ'লো আবার, মুখে যেন বিষাদের মতো গম্ভীরতা ছড়িয়ে পড়লো অথচ একটু হাসিও থাকলো ঠোঁটের কোণে। হ্যাঁ, ওদের বিয়ে। আরো আগেই হ'তে পারতো—কেন হয়নি কে জানে—তা হয়নি ভালোই হয়েছে, এই বেশ ভালো হ'লো দেশে ফিরে আত্মীয়স্বজন সকলের মধ্যে—সত্যি খুব সুখের কথা, তা-ই না? বিয়ে এখানেই—বেণুর বাড়িতেই—এই সাতাশ তারিখে: তার মানে হচ্ছে সামনের বেস্পতিবার। একটা অনুরোধ আছে মৌলির কাছে, বাড়ির সকলের একটা সমবেত ইচ্ছা আজ জানাতে এসেছে চিত্রা: মৌলি যেন বিয়েতে যায়; যাবে? যাবে তো? আর তার আগে আজ একবার—কিছু না, উপলক্ষ্য কিছু না, এমনি। একবার হোক না দেখা সকলের সঙ্গে আবার; দোষ কী? বাইরের কেউ তো না, শুধু আমরা বাড়ির লোকেরাই—সুখা হবে সবাই, আর মৌলি—তারও তেমন খারাপ হয়তো লাগবে না। অসুবিধে না থাকে তো এখনই, গাড়ি আছে সঙ্গে—কী? না, কিছু শুনবো না, যেতেই হবে—মানে, খুব যদি কাজের তাড়া না থাকে, এই তো ঘুরে আসবে খানিক পরেই—মনে হচ্ছে ইচ্ছে নেই তেমন?—তা একবার না-হয় অন্যের ইচ্ছেতে—কবে আর এমন হবে যে একসঙ্গে সবাই—আমার এই কথাটা তুমি রাখবে না, মৌলি? ব্যাপারটা এই রকম যে মৌলিকে ছাড়া ঠিক যেন সম্পূর্ণ হচ্ছে না, ফাঁক থেকে যাচ্ছে—সকলেরই মনের কথা সেটা—আচ্ছা কথা দিচ্ছি যখন ইচ্ছে চ'লে আসবে, একটুও জোর করবে না কেউ—শুধু একবার কাছে গিয়ে—যারা বন্ধু, যারা আপন জন—হ্যাঁ, বলতে গেলে আত্মীয় বইকি—তাদের কাছে একবার—চলো, মৌলি!—শেষের কথাটা ফিশফিশে গলায় বেরোলো।

এমনি বললো চিত্রা, এমনি ক'রে চালিয়ে গেলো তার নিপুণ বক্তৃতা, কুটিল ওকালতি—সত্য

আর অসত্য মিশিয়ে, আবেগের সঙ্গে শুধু সেটুকু কপটতা যোগ ক'রে যেটুকু না-হ'লে ভদ্রতারক্ষা হয় না। কথা শেষ ক'রে দুই হাত জড়ো করলো কোলের উপর ; সাহসী চোখে, সতর্ক চোখে উত্তর খুঁজলো মৌলির মুখে। কিন্তু মৌলির চোখ নিচু হ'লো, নেমে এলো চোখের পাতা ভারি হ'য়ে। তার মনে হ'লো তারও কিছু বলার আছে উত্তরে—অনেক, অনেক-কিছু, অনেক আছে মনে করার, প্রশ্ন করার, মনে করিয়ে দেবার। চেষ্টা করলো ভাবতে, মনে আনতে, কোনো-একটি প্রশ্নের তীরে সূক্ষ্মতম কথার ফলা বসাতে। কিন্তু তাতে যেন শ্রম বড়ো বেশি, বড়ো বেশি দাবি করে তার কাছে—আর ঐ বছরগুলির ঝরা পাতার পথ আবার কি তাকে মাড়াতে হবে এখন ? না, না—তার সময় নেই, সে ব্যস্ত, তার কাজ আছে। কী কাজ ? কী করেছে সে আজ সারাদিন ধ'রে, এই দুপুরবেলার ঘণ্টাগুলি ভ'রে কী করছিলো সে এতক্ষণ ? ঝাপসা লাগলো সব ; অথচ মনে হ'লো ইতিমধ্যে কিছু একটা ঘ'টে গেছে, কোনো-একটা বাধা কোনোদিক থেকে, গোলযোগ কিছু—অথচ উড়িয়ে দেয়া যায় না, সেটা যেন বিবেচ্য, মীমাংসাধীন, জরুরি—যেন কোনো অনুচ্চারণীয় আকাঙ্ক্ষার দিকে মরচে-পড়া দরজা-খোলার শব্দ হ'লো। এলো উষ্ণতা এই শীতের দেশে তাকে ঘুম পাড়াতে, এলো কেউ, অন্য কেউ, অন্য কিছু, কানে-কানে গান গেয়ে তাকে ক্লান্ত ক'রে দিলো, ক্লান্ত হ'তে শেখালো। আর তাই, যেহেতু সে ক্লান্ত, তার ঘুম পেয়েছে, ঘুমোতে চায়—তাই মৌলি কোনো কথাই বললো না—কোনো প্রশ্ন, তর্ক, প্রত্যুত্তর, কিছুই না—শুধু মাথাটি একটু হেলিয়ে দিলো চেয়ারের পিঠে, আর চিত্রা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললো—চলো যাই।

(ক্রমশঃ)

# দেবী

## সুধীর রায়

জীবনে অনেক আশ্চর্য সংবাদই অবিচলিত চিত্তে শ্রবণ করেছি কিন্তু এ সংবাদটায় সত্যিই যে একটু বিস্মিত হয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই।

হালকা গোলাপী রঙের খামখানা, অনেকটা স্বাস্থ্যবতী পশ্চিমা মেয়েদের গালের রঙের মত, ওপরদিকে কোণাকুণি করে টকটকে লাল অক্ষরে লেখা 'শুভবিবাহ।'

খামখানা অসিতের হাতথেকে নিতে নিতে বললাম—হঠাৎ 'শুভবিবাহ'—ব্যাপার কি ?

আমার পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বা'র করে নিতে নিতে অসিত বললে—A Surprise for you, পড়েই দেখ না।

চিঠিখানার ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়েই প্রায় লাফিয়ে উঠলাম—বলিস কিরে, আমাদের কালোমাণিকের বিয়ে ?

মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে পা নাচাতে নাচাতে অসিত বললে—তবে আর বলছি কি।

আমাদের এ বিস্ময়ের তাৎপর্য বুঝতে হ'লে কালোমাণিককে প্রথমেই আসরে এনে ফেলা প্রয়োজন।

কালোমাণিকের পিতৃমাতৃপ্রদত্ত নাম কালোমাণিক নয়, ওর আসল নাম হ'ল নীলমণি। কালোমাণিক নামটি আমাদেরই দেওয়া, আমাদের আড্ডায় আর বন্ধুমহলেও কালোমাণিক নামেই পরিচিত, আমার ত' মনে পড়েনা যে ভুলেও আমরা কোনদিন ওকে নীলমণি বলে ডেকেছি। বলতে কি ওর ওই নীলমণি নামটা আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আর নীলমণিকে যাঁরা একবার দেখেছেন তাঁরা আমাদের সংগে মিলিত কণ্ঠেই স্বীকার করবেন যে ওই কালোমাণিক নামটাতেই ওকে মানায় ভালো। অবশ্য চেহারার সংগে নামের যে সাদৃশ্য থাকবে এমন কোনো কথা নেই, কিন্তু এ সত্ত্বেও নীলমণিকে কালোমাণিক ছাড়া যেন আর কিছু বলে ভাবতেই পারা যায় না, অন্তত আমরা ত' ভাবতে পারিনা, ওর কুচকুচে কালো রঙে, ওর ভেড়ার লোমের মত ঘন কোঁকড়ানো চুলে, ওর পৌনে পাঁচফুট উচ্চতায় আর মুখে বসন্তের গভীর দাগে ও শুধু কালোমাণিকই এবং কালোমণিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

তবে শুধু চেহারার জন্যে নয়, কেন জানিনা ওকে আমরা যেন মানুষের মধ্যেই গণ্য করতাম না। আমাদের আড্ডায় ও আসতো বটে তবে আমরা কেউ বিশেষ পাত্তাই দিতাম না ওকে, মাঝে মাঝে অবশ্য জোর ঠাট্টা ইয়ার্কি চলতো ওকে নিয়ে, ওর ছোটোখাটো নির্বুদ্ধিতাগুলোকে নিয়ে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে আমরা কখনও ওকে বিপর্যস্ত করে তুলতাম, আর আমাদের আড্ডায় কালোমাণিকের অস্তিত্ব ছিলো প্রধানতঃ এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের পাত্র হিসেবেই, তবে আমাদের কোন ঠাট্টা ইয়ার্কিকেই বিশেষ গায়ে মাখতো না কালোমাণিক, নিজের নির্বুদ্ধিতাকে এত সহজে মেনে নিয়েছিলো ও যে তা নিয়ে কোন ব্যঙ্গ, বিদ্রূপই ওকে স্পর্শ করতে পারতো না, আমরা যা তা ঠাট্টা, ইয়ার্কি করতুম ওকে নিয়ে তাতে

অসম্মান বোধ করতো না কালোমাণিক, ও জানতো আমাদের আড্ডায় ওর স্থান কোথায় আর সেটা জেনেও আমাদের মধ্যে ওর গতায়াত ছিলো অব্যাহত। তবে আমাদের আড্ডায় ও আসতো এই পর্য্যন্ত, সেখানে ওর ভূমিকা কিছু ছিলো না, ও আসতো, চুপচাপ বসে থাকতো একপাশে, তারপর একসময়ে উঠে চলে যেতো, যেদিন ওকে নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কির ঝড় উঠতো আমাদের মধ্যে সেদিনও ও তেমনিই চুপচাপ বসে থাকতো নির্বিকার ভাবে, আর আমাদের আড্ডায় কালোমাণিকের যদি কোন ভূমিকা থেকে থাকে তা হ'ল এই চুপচাপ একপাশে বসে থাকার ভূমিকা।

তবে আজকে হটাৎ যেন সবকিছু বদলে গেছে, গোলাপী রঙের নতুন কাগজে সোণালী অক্ষরে লেখা বিয়ের চিঠিতে ওর ওই পোষাকী নীলমণি নামটায় ও যেন হটাৎ বিশিষ্ট একজন হয়ে উঠেছে, এ নীলমণিকে আমাদের কালোমাণিকের সংগে এক করে দেখতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে আজ।

বোধহয় একটু বেশীক্ষণ তাকিয়েছিলাম চিঠিখানার দিকে, সেই দিকে চেয়ে অসিত সিগারেটে মস্ত একটা টান দিয়ে বললে—আমাদের কালোমাণিকের বিয়ের ফুল ফুটলো তাহ'লে? বিস্ময়টা চেপে রেখেই বললাম—আশ্চর্য কি? বাংলাদেশে ত' পুরুষমাত্রেরই বিয়ের ফুল ফোটে, আর কালোমাণিকও পুরুষ একজন।

অসিত বললে—কিন্তু মেয়েদের পাশে ওকে দেখলে ত' তা বলে মনে হয় না। একটা জ্বলজ্যান্ত বউ নিয়ে কেমন করে ও সামলাবে কে জানে।

অসিতের কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। মেয়েদের সংগে নীলমণির আচরণটা আমাদের পুরুষদের চোখে সত্যিই বিসদৃশ, অবশ্য মেয়েদের সংগে মেশবার সুযোগ বেচারার এই আটাশ বছরের জীবনে খুব কমই এসেছে। আর যে কোনো মেয়ের সংগেই ও মিশেছে তাকে একেবারে দেবীর আসনে বসিয়ে তবে শান্তি পেয়েছে ও, আসল কথা কোনো মেয়েই ওকে ভালোবাসেনি কোনোদিন, মেয়েদের কাছথেকে ও যা পেয়েছে তা ভালোবাসা নয় করুণা। আর কালোমাণিককে আমরা যতদূর জানি মেয়েদের কাছথেকে এই করুণাটুকু ছাড়া আর কিছুই কাম্য ছিলো না তার, আমাদের আড্ডায় আমরা যখন নারীতত্ত্ব এবং নারীমনস্তত্ত্ব আলোচনায় মুখর হয়ে উঠতুম তখন কালোমাণিকের মুখের দিকে কেউ তাকিয়ে দেখলে স্পষ্টই অনুমান করতে পারতো যে তার রীতিমত কষ্ট হচ্ছে। মনে আছে একদিন একটি বিশেষ মেয়ের মনস্তত্ত্ব আলোচনা সুরু করে আমরা যখন স্বাভাবিক প্রবণতাবশতই তার শরীরতত্ত্বের আলোচনায় এসে পৌঁছেছি সেই সরস আলোচনার মুখেই হঠাৎ আসর ছেড়ে উঠে গেলো কালোমাণিক। সেদিকে তাকিয়ে আমরা মুখটিপে একটু হাসাহাসি করলুম। অসিতটার মুখে আবার কিছু আটকায় না সে পেছনথেকে সচীৎকারে একটা অশ্লীল মন্তব্য ছুঁড়ে দিলে ওর দিকে। মুখ না দেখেও বুঝতে পারছিলাম যে কালোমাণিকের মুখ রাগে আর লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে।

এর দু'একদিন পরেই কালোমাণিকের সংগে রাস্তায় আমার দেখা। বললাম—কি রে, সেদিন যে অমন ঝট্ করে উঠে গেলি হঠাৎ?

কালোমাণিকের সদাপ্রসন্ন মুখটায় কেমন যেন একটা গাম্ভীর্য নেমে এলো, বললে—মেয়েদের সম্বন্ধে তোরা অমন যা তা কথা বলিস আমি সহ্য করতে পারিনা। তারপর একটু চুপ করে থেকে সেই বোধহয় প্রথম সে হঠাৎ নিজের একটা মত জাহির করে ফেললে—তোরা এত আলোচনা করিস



মেয়েদের নিয়ে কিন্তু আমার মনে হয় মেয়েদের তোরা কেউই বুঝিস না। সত্যি, মেয়েরা যে কী তা যদি তোরা বুঝতিস। এই শেষ কথাটিতে ভগবানের প্রতি ভক্তের সমস্ত শ্রদ্ধার আবেগ নিজের কণ্ঠে ঢেলে দিলে সে।

আর মেয়েদের প্রতি কলোমাণিকের এইটাই ছিলো প্রকৃত মনোভাব। মেয়েরা ওর কাছে ধরা ছোঁয়ার সামগ্রী ছিলো না। তারা দেবীর মত, তারা দেবী। আর তাদের কাছে আত্মনিবেদনেই ছিলো কালোমাণিকের চরম আর পরম সার্থকতা। কোন মেয়ে ওকে কিছু ফরমাশ করলে ও ধন্য হয়ে যেতো, কোনো মেয়ের এতটুকু কোন কাজে লাগতে পারলেই ও মনে করতো যেন জীবনের অনেকখানি পাওনাই ও পেয়ে গেলো।

মনে পড়ে একবারের একটি ঘটনা, ঘটনাটা অবশ্য আমাদের সুব্রত মিত্তিরের মুখেই শোনা। আমাদের আড্ডার সবচেয়ে ওস্তাদ ছেলে এই সুব্রত মিত্তির। চেহারাটাও চমৎকার, নারীঘটিত ব্যাপারে ওর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবার মত কেউ ছিলো না আমাদের মধ্যে, মেয়েরা ওকে দেখলে অনিবার্যভাবেই প্রেমে পড়ে যেতো, প্রেমে না পড়ে তারা পারতো না। মেয়ে মহলে ও ছিলো অসামান্য, ওর প্রশংসায় মেয়েরা পঞ্চমুখ।

এই সুব্রত মিত্তির আর কালোমাণিক একদিন সিগারেট টানতে টানতে হেঁটে চলেছিলো রাসবিহারী এভিনিউ ধরে হটাৎ মাঝপথে সুব্রতর উপাসিকামণ্ডলীর একজনের সংগে দেখা। মেয়েটিকে দেখতে মন্দ নয়, রঙ ময়লা হ'লেও ওর চোখদুটো ছিলো গভীর আর টানা টানা। মুখটা যদিও একটু লম্বা তবু হাসলে ওর গালে টোল পড়ে। সুব্রতর মনের মধ্যে একটুও ঠাঁই ছিলো না ওর, সে ওকে এড়িয়ে যেতেই চাইতো। তবু সুব্রত সম্বন্ধে মেয়েটির অপরিসীম উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি এতটুকু। সুব্রত মডার্ণ কবিতার ভক্ত, কথায় কথায় এলিয়ট আর অডেন্ ওর গলা দিয়ে ভসভসিয়ে উঠতো। মেয়েটি ছিলো পলিটিক্যাল সায়েন্সের ছাত্রী, কবিতার প্রতি ওর অনুরাগ ছিলো না এতটুকু। বিশেষ করে মডার্ণ কবিতার প্রতি ওর ছিলো একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা। তবু সুব্রতর খাতিরে মডার্ণ কবিতা নিয়ে ও উঠে পড়ে লেগেছিলো, এলিয়টের সিলেক্টেড্ পোয়েম্স্ নিয়ে ও গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে কতদিন তবু ছাড়েনি। সুব্রতকে দেখে দু'গালে দু'টো টোল ফেলে, তনুলতা ঈষৎ আন্দোলিত করে ও বললে—আপনার ওপর কিন্তু ভারী রাগ করেছি আমি।

জবাব দেবার দায় ছিলো না সুব্রতর, ও তখন পালাবার পথ খুঁজছে কিন্তু মেয়েটিকে তাতেও থামানো যায়নি। বলেছিলো—এজ্রা পাউণ্ডের সেই সিলেক্শন্ অফ্ পোয়েম্স্টাকে কতদিন থেকে যে আপনার কাছ থেকে চাইছি।

দু'একটা এড়ানো এড়ানো জবাব দিয়ে সুব্রত কোনরকমে কেটে পড়েছিলো সেদিন। কিন্তু কালোমাণিকের এতে রাগের অন্ত ছিলো না। সারাটা পথ ও গালাগালি দিতে দিতে গিয়েছিলো সুব্রতকে। কিন্তু গালাগালি দিয়েই সে ক্ষান্ত হয়নি সুব্রতর কাছ থেকে মেয়েটির ঠিকানা জোগাড় করে পরের দিন এজ্রা পাউণ্ডকে কবলিত করে ও পৌঁছে দিয়েছিলো মেয়েটির বাড়ীতে। মেয়েটি অবশ্য একটি কথাও কয়নি ওর সংগে কিন্তু তাতে কি।

ব্যাপারটা সুব্রতর কানে পৌঁছেছিলো কয়েকদিন পরেই আর তাই নিয়ে আমাদের মধ্যে

হাসাহাসির অন্ত ছিলো না। কিন্তু কালোমাণিক এতে বিচলিত হয়নি এতটুকু। একটি মেয়ের সামান্য কিছু কাজে লাগতে পেরেই ও ধন্য। ও কৃতকৃতার্থ।

ব্যাপারটা হটাৎ মনে পড়ায় অসিতের কথার প্রত্যুত্তরে বললাম—কিন্তু যাই বলিস তুই, বৌকে যে ও খুশী করতে পারবে সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।

সিগারেটে জোরে জোরে গোটাকতক টান দিয়ে বললে—খুশী করতে পারবে না ছাই। মেয়েরা মুখে যাই বলুক আসলে পুরুষের কর্তৃত্বাধীন থাকতেই ওরা চায়, পোষা কুকুরের চাইতে পশুরাজই ওদের কাম্য।

মেয়েদের সম্বন্ধে অসিতের থিয়োরীগুলো বরাবরই অভিনব। ওগুলো আমি বিশেষ বুঝিনা। তাই বললাম—একটি পোষমানা স্বামীই বা এমন মন্দ কি? বরং আমার ত' মনে হয় যে মেয়েদের স্বাধীনতাটা সেখানে পুরোমাত্রায় থাকাতে তারা খুশীই হয়।

শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে অসিত বললে—যা বুঝিস না তা নিয়ে তর্ক করতে আসিস না। বিয়েই করলি না এখনও, মেয়েদের সম্বন্ধে বুঝবি কি?

অগত্যা চুপ করতে হ'ল। বাপের একমাত্র ছেলে অসিত; বিয়ে করেছে চব্বিশ বছরে, এখন দুই ছেলের বাপ। সুতরাং এসব ক্ষেত্রে আমার চাইতে তার কথাটাই যে বেশী প্রামাণিক তাতে আর সন্দেহ কি।

মেয়েদের ভালোবাসার মূল কথাটা কি জানিস? হঠাৎ নীরবতা ভংগ করলো অসিত, আত্মসম্মান। আত্মসম্মানেই মেয়েরা খুশী, স্বাধীনতার চাইতে একজনের ওপর নির্ভর করতেই তারা চায়। যার ওপর তারা নির্ভর করতে পারে তাকেই তারা ভালোবাসে আর অন্যদের করে শুধু করুণা। বললাম—কিন্তু ও ত করুণাই চায়।

অসিত বললে—করুণা যদি চায় ত করুণাই শুধু পাবে ভালোবাসা আর কোনোদিন বরাতে জুটবে না, বললাম—করুণাকে ভালোবাসা ভেবে নিয়ে সাংসারিক জীবনে ও যদি সুখী হ'তে পারে তাই বা মন্দ কি? জীবনে সুখী হওয়াটাই ত' বড় কথা।

অসিত বললে—শুধু সুখী হওয়াটা নয়, সুখী করাটাও একথাটা ভুলে যাস না।

এরপর তর্ক করতে গেলে আবার আগের কথাগুলোই এসে পড়ে সুতরাং ব্যাপারটার সেইখানেই যবনিকা টেনে ছিলুম। কালোমানিকের বিয়ের সংবাদটাই আপাততঃ সব চাইতে বড় সংবাদ। এর পরের ঘটনাগুলো নিয়ে কিছু অনুমান করতে যাওয়ারও প্রয়োজন নেই এখন। কালোমাণিকের দাম্পত্য জীবনের ইতিহাস আমাদের অগোচরে রচিত হ'লেও তার পাঠক যে আমরা হ'তে পারবো তাতে আর সন্দেহ কি।

এর তিন চারদিন পরের ঘটনা। সেদিনটা রবিবার। সারা দুপুর একটা লম্বা ঘুম দিয়ে সবে উঠে বসেছি তখন হঠাৎ কালোমাণিক এসে হাজির। এই তিন চার দিনের মধ্যে ওকে আড্ডাতেও দেখিনি তাই ওর সম্বন্ধে একটু ঔৎসুক্য ছিলো ক'দিন থেকেই।

বললাম—কি রে খবর কি?

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে একটু সলজ্জভাবে কালোমাণিক বললে—কেন, খবর শুনিসনি?



বললাম—শুনেছি বলেই ত' জিগেস করছি। কেমন হ'ল?

ভেবেছিলাম এবারে লজ্জায় দস্তুরমত নুয়ে পড়বে কালোমাণিক কিন্তু তার বদলে ওর মুখে হটাৎ একটা আশ্চর্য আভা ছড়িয়ে পড়লো।

বললে—বললে বিশ্বাস করবি না কিন্তু she is superb she is glorious.

বললাম—তাই নাকি? খানিকটা ঠাট্টার সুর ছিলো কথাটার পেছনে, কিন্তু কালোমাণিক সেটা লক্ষ্য করলো না, বললো—সত্যি বলছি তোকে ও অপূর্ব। ও অসাধারণ। পরপর একসংগে এতগুলো বিশেষণ ব্যবহার করে কালোমাণিক যেন একটু হাঁপিয়ে পড়লো তারপর বললে—তোকে বলতে কোন লজ্জা নেই নীরু এরকম মেয়েকে আমার স্ত্রী হিসেবে আমি আশা করিনি কোনদিন।

বিয়ের আগে ভাবি স্ত্রীর আলোচনায় কোন ছেলেকে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখিনি কখনও, বরং অতিবড় তুখোড় ছেলেরও যে এবিষয়ে একটা হাল্কা লজ্জা থাকে সেইটাই লক্ষ্য করেছি বরাবর। তাই কালোমাণিকের আচরণে আশ্চর্য হ'লাম রীতিমত। কিন্তু সংগে সংগেই মনে হ'ল যে এতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে? বরং কালোমাণিকের পক্ষে এটাই ত' স্বাভাবিক। নিঃসম্পর্কিত মেয়েদেরই যখন ও দেবীর আসনে তুলে ধরেছে তখন নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে ওর এ দুর্বলতা যে থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

সেদিন সন্ধ্যায় অসিতের সংগে দেখা হ'তেই তাকে বললাম কালোমাণিকের কথা।

ভেবেছিলাম সব শুনে অসিত হাসবে কিন্তু সে হাসলো না বললে—বেচারার জন্যে সত্যিই দুঃখ হয়।

বললাম—বউকে ও মাথায় করে রাখবে দেখেনিস।

কিন্তু বউরা যে মাথার চাইতে মাটিতে থাকতেই ভালোবাসে এ'কথাটা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। গম্ভীর হয়ে আর একদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলো অসিত।

বললাম—এসব তোর বাড়াবাড়ি।

অসিত বললে—বাড়াবাড়ি কিছুই নয়। বিয়ে করলে বুঝতিস যে মেয়েরা ভালোবাসা চায় কিন্তু ফুলচন্দন দিয়ে সাজিয়ে পূজো করলে তারা মোটেই খুশী হয় না।

বিয়ে করিনি সুতরাং এখানেও চুপ করতে হ'ল।

কালোমাণিকের বউভাতের দিনটি আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে। সন্ধ্যার আগেই আমরা কয়েকজন মিলে ওর ঠিকানা খুঁজে গিয়ে উপস্থিত হ'লাম। কালোমাণিকের আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ আছে বলে জানতুম না। বউবাজার অঞ্চলের এক মেসে থেকেই ও আপিসে যাতায়াত করতো। সম্প্রতি বিয়ের ব্যাপারে এক দুঃসম্পর্কের পিসিমাকে জোগাড় করেছে ও। কালোমাণিকের বিয়ের ব্যাপারেও এই পিসিমারই নাকি হাত আছে। ওকে সংগ্রহ করে মেয়ে দেখানো এবং বিয়ে পাকাপাকি করার ব্যাপারে সমস্ত সক্রিয় অংশটা তাঁরই। এসব খবরাখবরগুলো কালোমাণিকের কাছ থেকে কথাপ্রসঙ্গে জানতে পেরেছিলাম। বরং সংগ্রহ করেছিলামই বলতে গেলে কেননা

বউয়ের চিন্তায় এবং বউয়ের প্রশংসায় এত মশগুল হয়েছিল ও যে এসব কথা উপযাচক হয়ে বলবার কোন আগ্রহই ছিলো না ওর।

সিল্কের পাঞ্জাবী আর দিশী ধুতিপরা কালোমাণিক দরোজার গোড়াতেই দাঁড়িয়েছিলো। আমাদের দেখে একমুখ হেসে বললে—এসে গেছিস তোরা। আয়।

দরোজা দিয়ে ঢুকেই ডানহাতি বাইরের ঘর। ফরাশপাতা মেঝেতে বসে জন কুড়ি বাইশ সুবেশ, সুসজ্জিত ভদ্রলোক। সামনে একটা ঝকঝকে কাঁসার থালায় পান আর সিগারেট রাখা রয়েছে। মাঝখানে গেঞ্জী গায়ে বসে আছেন বেশ মোটাসোটা নধর চেহারার একটি ভদ্রলোক। সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে কালোমাণিক বললে—আমার পিশেমসাই।

বললাম—পিশেমসাই ত দেখলাম, এখন আসল লোক কোথায় বল।

জনকয়েক মেয়ে আসছিলো পেছন থেকে, রাস্তা ছেড়ে আমরা একটু সরে দাঁড়ালাম। কালোমাণিক বললে—একটু অপেক্ষা কর, মেয়েদের ভীড়টা কমলো কিনা দেখে আসি।

অসিত বললে—আমরা কি ততক্ষণ এই ভীড়ে স্রেফ্ দাঁড়িয়ে থাকবো নাকি? কালোমাণিক বোধ হয় একটু লজ্জিত হ'ল। বললে—না না দাঁড়িয়ে থাকবি কেন, এদিকে আয়।

একটা সরু বারান্দা পার হয়ে এ'পাশে ছোট্ট একখানা ঘর, সেইখানে নিয়ে গিয়ে কালোমাণিক আমাদের বসালো। তারপর বললো—একটু বোস, এখুনি আসছি।

প্রায় মিনিট দশেক পরে কালোমাণিক ফিরে এলো। বললে—চল। কালোমাণিকের পিছু পিছু আমরা সব সিঁড়ি বেয়ে দো'তলায় উঠে এলুম। সিঁড়ির এ'পাশের একটা ঘরে অত্যন্ত বেশী পাওয়ারের একটা বাল্‌ব্ ঝকঝক করে জ্বলছিলো, ওকে অনুসরণ করে আমরা সেই ঘরটায় গিয়ে ঢুকলুম। সারা ঘরটা জুড়ে বিরাট একটা দরী পাতা। মাঝামাঝি জায়গাটায় ভেলভেটের ঢাকা দিয়ে একটা বেদী মতন তৈরী করা হয়েছে তারই ওপর মাথা নীচু করে বসে কালোমাণিকের স্ত্রী। বিয়ের চিঠিতে যার নাম দেখেছিলুম অপর্ণা দেবী।

মুখের দিকে তখনও ভালো করে তাকাইনি কালোমাণিক আমার কাণের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—She is glorious। নয় কি?

কালোমাণিকের কথাটা নেহাৎ মিথ্যে নয়। দেখলুম অসিতটাও চুপ করে তাকিয়ে আছে। এতটা যেন ও কিছুতেই প্রত্যাশা করতে পারেনি। তবে সে কিছুক্ষণ মাত্র, একটু পরেই দেখলুম সে অনেকখানি এগিয়ে গেছে আমাদের চেয়ে। মৃদুস্বরে কি যেন কথাও বলছে সে শুনতে পেলাম।

আমরা বসেছিলাম একটু দূরে হঠাৎ কালোমাণিক আমার কাঁধের ওপর মৃদু একটা চাপ দিলে। মুখ তুলে তাকাতেই চোখের ইসারায় ও আমাকে বললে—একটু বাইরে আয়।

বাইরে আসতেই ও বললে—কেমন দেখলি?

যা শুনলে ও খুশী হয় সেই কথাটাই বললাম—চমৎকার।

চোখেমুখে একটা চাপা খুশীর বন্যা বইয়ে দিয়ে কালোমাণিক বললে—কেমন, তোকে বলিনি?

তারপর একটু থেমে আবার বললে—কিন্তু শুধু চেহারা নয় ওর গুণও অনেক, শুনেছি গান বাজনা থেকে আরম্ভ করে রান্না আর ছুঁচের কাজে পর্যন্ত ওর জুড়ি মেলা ভার। আর এই তোকে



বুকে হাত দিয়ে বলছি নীরু সে সমস্ত আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। ওর হাতের আঙুলগুলো দেখে তাকিয়ে দেখিস, একেবারে আর্টিষ্টিক, এক নিশ্বাসে অনেকগুলো কথা বলে কালোমাণিক এ থেমে গেলো। ওর চোখে মুখে যে সব বিচিত্র ভাব খেলা করে বেড়াচ্ছিলো ঘরের বাইরে অপেক্ষাকৃত আবছা আলোয় দাঁড়িয়েও তা আমার চোখ এড়ালো না, খানিকটা পরে কালোমাণিক আবার বললে—পিসিমার মতলব কি জানিস, তাঁর মতলব বিয়ের পরেও আমাদের এখানেই রেখে দেওয়া কিন্তু আমি তা থাকছি না। ভবানীপুরের দিকে দু'খানা ঘর পেয়েছি ওকে নিয়ে সেখানেই চলে যাবো, কি বলিস তুই?

বললাম—কেন, এখানে থাকলেই বা ক্ষতি কি তোর?

কালোমাণিক বললে—তুই বুঝতে পারছিস না ব্যাপারটা। আমরা এখানে থাকলেই ত পিসিমা একটা বিনা মাইনের চাকরাণী পেয়ে যাবে, নিজে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে গ্যাঁট হয়ে আর ওকে নাকের দমে খাটাবে, কিন্তু সেটি আমি হ'তে দিচ্ছি না। রান্না করলে আর বাটনা বাটলে ও চেহারা আর ক'দিন থাকবে? বল তুই? সত্যি করে বল?

কথাটা শুনে হাসি এসেছিলো কিন্তু হাসিটা নেহাৎ অশোভন হ'বে বলেই গম্ভীর হয়ে রইলাম। বললাম—কিন্তু তোর ওখানে গিয়েই ও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে নাকি? নিজের সংসার, সেখানে ত' সব কাজই নিজেকে করে নিতে হ'বে।

কালোমাণিকের মুখটা হঠাৎ যেন কেমন হয়ে উঠলো, বললে—সে কথা তুই মনেও ভাবিস না নীরু, আমার সংসারে ওকে আমি একটি কাজও করতে দেবো না। ও বসে থাকলেই আমার সবচাইতে ভালো লাগবে, আমি সবচাইতে খুশী হ'ব তাতে।

বললাম—কিন্তু তুই খুশী হ'লেই যে ও খুশী হ'বে তার ত' কোনো মানে নেই। জানিস ত' কোনো কাজ না করতে পেলে মেয়েরা শান্তি পায় না। (কথাটা আমি কোথা থেকে পেয়েছিলুম জানি না, বোধহয় অসিতের কাছথেকেই।)

কালোমাণিক বললে—ওর বাপের বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ, শুনেছি সেখানে সমস্ত সংসারের কাজ ওকে নাকি একাই সামলাতে হ'ত। এরপর আমার কি উচিত নয় ওকে একটু বিশ্রাম দেওয়া?

বললাম—কিন্তু সেখানেই ত আসল সমস্যা। কাজ করতে যে অভ্যস্ত নয় বিশ্রামের মত অমন লোভনীয় তার পক্ষে আর কিছুই নেই কিন্তু কাজ করেই যার এতগুলো বছর কেটেছে দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত বিশ্রাম তার খুব বেশী কাম্য হ'তে পারে বলে ত' আমার মনে হয় না, বরং সেটা তার পক্ষে শাস্তিরই সমান।

কালোমাণিক বললে—ওইখানেই তোদের ভুল, আরাম সবাই চায়। কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা কতটুকু উপভোগ করতে পায় সে আরাম? সংসারের কাজে যে তারা সারাদিন চরকীর মত ঘোরে সেটা মেয়েদের হাত পা গুটিয়ে বসে থাকাটা আমাদের চোখে অশোভন বলেই, আরাম করতে গেলে তারা খুশী হয় কিন্তু আমরা খুশী হইনা সেইটাই হ'ল প্রধান কথা।

এরপর তর্ক করতে গেলে ব্যক্তিগত মতামতের কথা এসে পড়ে সে তর্কের কি শেষ আছে কখনও? আর তা'ছাড়া স্থান, কালও ত' তার পক্ষে বিশেষ অনুকূল নয়।

যাই হোক, সেদিন খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে কালোমাণিকের ওখান থেকে যখন বেরিয়ে এলুম তখন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। গলিটা পার হয়ে সামনের বড়রাস্তা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলো কালোমাণিক, বললে—মাসখানেকের মধ্যেই মোহিনী মোহন রোডের ঠিকানায় উঠে যাচ্ছি মাঝে মাঝে যাস কিন্তু মাইরি।

কালোমাণিক বিদায় নেবার পর আমরা কিছুক্ষণ নীরবেই হেঁটে চললুম ভোজনটা বেশ গুরুভার হয়ে গিয়েছিলো, একটু হাঁটলে হজম প্রক্রিয়ার সহায়তা হ'তে পারে ভেবে ট্রামে বাসে না চড়ে চরণবাহন গাড়ীতে রওনা হলুম।

খানিকটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ নীরবতা ভংগ করলে মিহির। বললে—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

প্রতিমুহূর্তেই আশা করছিলুম যে এই কথাটাই প্রথমে কেউ বলবে, আমার নিজের মনের কথাটাও প্রথমদিকে বোধহয় তাইই ছিলো তবু বললাম—উপমাটা কিন্তু এখানে ঠিক খাটলো না।

ললিত বললে—যদি কোনো উপমা এখানে খাটে তবে তা এইটাই।

বললাম—শুধু বাইরে থেকে দেখেছিস বলেই এ কথা বলছিস, বাঁদর মুক্তোর মালার কদর বোঝেনা কিন্তু কালোমাণিকের কাছে মুক্তোর দাম যে মুক্তোর চাইতেও বেশী।

অসিত বললে—সেইজন্যেই ত' ভয় হয়।

বললাম—কেন?

অসিত বললে—অনেক্ষণ কথা কয়ে দেখলাম, বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, কালোমাণিকের বাড়াবাড়ি বেশীদিন সুস্থভাবে সহ্য করতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বললাম—আমার ত' বরং ঠিক এর উল্টোটাই মনে হয়। বুদ্ধিমতী বলেই কালোমাণিকের বাড়াবাড়িটা ওর কাছে অদ্ভুত ঠেকবে না। সেটাকে ও সহজভাবেই মেনে নিতে পারবে। আর সেই বাড়াবাড়ির মধ্যেই কালোমাণিককে ঠিকমত চিনে নিতে ওর দেরী লাগবে না।

অসিত আর কিছু বললে না গম্ভীরভাবে হাঁটতে লাগলো।

এরপর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। মাঝে শরীরটা বিশেষ খারাপ হয়ে পড়ায় ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদল করতে এক আত্মীয়ের কাছে গিয়েছিলুম দিল্লীতে। কলকাতা ছেড়ে বেশীদিন দূরে থাকতে মন চায় না তবু ফিরবো ফিরবো করেও প্রায় মাসদুই কেটে গেলো, কলকাতায় যখন ফিরলুম তখন শরীর সেরেছে বটে কিন্তু আড্ডার অভাবে মনটা যেন ঝিমিয়ে পড়েছে, ট্রেনের ধকল কাটাবার জন্যে দিনদুই এন্তার ঘুমিয়ে সেদিন বিকেলে যখন আড্ডার অভিসারে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি হঠাৎ অসিত এসে হাজির।

এ'কথা সে'কথার পর হঠাৎ জিগেস করলুম—কালোমাণিকের খবর জানিস নাকি কিছু, কেমন চলছে ওর ঘরকন্না?

অসিত বললে—কেন, কালোমাণিক ইন্‌ভাইট্ করেনি তোকে?

বললাম—আমাকে হঠাৎ ইন্‌ভাইট্ করতে আসবে, তার মানে?



—মানে আর কি? ও ত' আজকাল সকলকেই ইন্‌ভাইট্ করছে ওর বাড়ী যাবার জন্যে। ইন্‌ভাইট্ মানে অবশ্য সনির্বন্ধ এবং সকাতর অনুরোধ, শেষের দিকটায় অসিত একটু হাসলো।

বললাম—হেঁয়ালী করিস না খুলে বল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে অসিত বললে—বউকে নিয়ে ও রীতিমত ক্ষেপে উঠেছে আজকাল। যার সংগেই ওর পরিচয় হয় তার কাছেই উচ্ছ্বসিত হয়ে বউয়ের প্রশংসা করে ও, কিন্তু শুধু নিজের প্রশংসাতেই ওর তৃপ্তি হচ্ছে না আজকাল, ও চাইছে পাঁচজনে একবাক্যে ওর বউয়ের প্রশংসা করুক। তাই দুহাতা লোককে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে নিজের বাড়ীতে, বউয়ের সংগে তার আলাপ করিয়ে দিচ্ছে আর তারপর তার মুখে প্রশংসা শুনে আনন্দে গদগদ হচ্ছে।

বলিস কি? এ ত' রীতিমত ক্ষ্যাপামীর লক্ষণ।

একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অসিত বললে—নয়ত আর বলছি কি? এদিকে বউটার প্রাণান্তকর অবস্থা। রাজ্যের বাজে লোক দিবারাত্তির ভীড় করছে বাড়ীতে। সকলের সংগেই কথা বলতে হচ্ছে ওকে, সংগে সংগে কালোমাণিকের তৈরী করে দেওয়া চা'ও পরিবেশন করতে হচ্ছে। একদিন কার সামনে যেতে আপত্তি করেছিল বলে কালোমাণিকের রাগের অন্ত ছিলো না। এ নিয়ে সে কান্নাকাটি করেছে বউয়ের কাছে এমন কি রাগ করে দু'দিন খায়নি পর্যন্ত।

বললাম—ও কি সত্যিই ক্ষেপে গেলো নাকি?

অসিত বললে—ও ক্ষেপে গেছে কিনা জানিনা তবে এমনভাবে আর কয়েকদিন চললে বউটা যে সত্যি সত্যিই ক্ষেপে যাবে এ'কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। নেহাৎ বুদ্ধিমতী মেয়ে তাই এতদিন কোনরকমে সহ্য করে আছে, নয়ত অন্য কেউ হ'লে এতদিনে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যেতো কিম্বা সুইসাইড্ করতো।

বললাম—ব্যাপারটা সত্যিই আশ্চর্য মনে হচ্ছে।

অসিত বললে—আশ্চর্য কিছুই নয়। ও হতভাগা যে এমনিই একটা কিছু করবে সে আমি আগেই জানতাম তবে এ'কথা ঠিক যে এতটা বোধ হয় আমি এক[illegible]ট করতে পারিনি।

বললাম—এর মধ্যে তুই আর ওর বাড়ী গিয়েছিলি নাকি

অসিত বললে—এই ত' সেদিনই গিয়েছিলাম। বাইরের ঘরটা ছোট। গিয়ে দেখি তারই মধ্যে আট-দশটা লোক বসে জটলা করছে। দু'তিনটে লোকের ত' দেখলাম রীতিমত লোফার গোছের চেহারা। মাথায় বড় বড় চুল আর গাল পর্যন্ত জুলপী। বউটা তারই এক পাশে জড়সড় হয়ে বসে আর একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে কালোমাণিক একবার বউয়ের দিকে তাকাচ্ছে আর একবার অন্য সকলের দিকে তাকাচ্ছে। শুনলাম এই ঘটনা নাকি দিনের পর দিন ধরে চলছে। তোকে সত্যি বলছি নীরু, বউটা সেদিন আমার কাছে ঠিক কেঁদে ফেলতো কিন্তু সহিষ্ণুতার চাইতেও ওর বুদ্ধি অনেক বেশী তাই হঠাৎ আশ্চর্যভাবে কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে আমার জন্যে চা আনতে চলে গেলো।

কালোমাণিকের সম্বন্ধে কৌতূহলটা জমাট বেঁধে উঠছিলো ক্রমশ। ভাবছিলাম এর মধ্যেই একদিন গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবো ওর কিন্তু নানা কাজের ভীড়ে সময় করে উঠতে পারিনি। সেদিন

কি যেন একটা উপলক্ষ্যে অপিসের ছুটি থাকায় চা'টা খেয়ে বিকেলের মুখেই হাজির হলুম কালোমাণিকের বাড়ী। মোহিনীমোহন রোডের একটা বাড়ীর দোতলায় খান দুই ঘর। কড়া নাড়তেই যে দরোজা খুলে দিলে সে কালোমাণিক নয়, কালোমাণিকের বউ। বউভাতের দিন ওকে প্রথম দেখেছিলাম তারপর এই আজ দেখছি। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই এত বদলে যেতে পারে মানুষ? মুখটা কেমন যেন শুখনো শুখনো। চোখের কোলে আবছা কালি পড়েছে। দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে ওর মুখটা হঠাৎ যেন ফেকাসে হয়ে গেল। বোধহয় চিনতে পারেনি আমাকে। ছোট্ট একটু নমস্কার হেসে বললাম—চিনতে পারেন? আমার হাসি দেখেও ওর মুখের বিবর্ণ ভাবটা যেন কাটলো না। দরোজাটা হাট করে খুলে দিয়ে শুখনো ঠোঁটে জোর করে হাসি ফোটাবার একটা নিদারুণ চেষ্টা করে ও বললে—আসুন।

ঘরে ঢুকে একটু অবাক হয়ে গেলাম। ছোটোখাটো ঘরখানা তার প্রায় সবটা জুড়েই একটা দরী পাতা। ঘরের এককোণে বাকসো বন্দী একটা হারমোনিয়ম্ আর দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো একটা সেতার। কালোমাণিক আবার গান বাজনার চর্চা আরম্ভ করলো নাকি?

বললাম—নীলু কোথায়?

—একটু দাঁড়ান, এখুনি ডেকে দিচ্ছি। একটা আশ্চর্য স্বস্তির আভা হঠাৎ ওর মুখে ফুটে উঠলো। আমার সামনে থেকে সরে যেতে পেরেই কি তবে নিশ্চিন্ত হ'ল কালোমাণিকের বউ? আমি আসতে ত'বে কি ও অসন্তুষ্ট হয়েছে?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি হঠাৎ কালোমাণিক এসে ঘরে ঢুকলো। চুলগুলো উস্কোখুস্কো, চোখদুটো লাল লাল আর গায়ে ঘুঁটের ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধ। বললে—কি রে কোথায় ছিলি এতদিন?

বললাম—ছিলাম দিল্লীতে, কিন্তু তোর এ অবস্থা কেন?

কলোমাণিক একটু হাসলো, বললে—আগুণ দিচ্ছিলাম উনুনে।

—আগুণ দিচ্ছিলি? তুই?

—কেন আশ্চর্য কি? সংসারের সব কাজ ত' আমিই করিছ আজকাল।

ঠিক বুঝতে পারিনি, হাঁ করে তাকিয়েছিলাম ওর মুখের দিকে, সেদিকে তাকিয়ে কালোমাণিক কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেলো, বললে—অপর্ণা সব কাজই করতে চায় কিন্তু আমিই ওকে কিছু করতে দিইনা। উনুনে আগুণ দিলে আর বাটনা বাটলে ও রূপ আর ক'দিন থাকবে? সত্যি করে বল তুই?

বলবার অনেক কিছুই ছিলো কিন্তু কিছুই বললাম না, চুপ করে রইলাম।

কালোমাণিক বললে—বললে তুই বিশ্বাস করবিনা নীরু কিন্তু যে ওকে দেখছে সেই এ্যাপ্রিসিয়েট করছে, এমন রূপ নাকি আর হয় না। তোকে সত্যি বলছি নিজেকে সবসময়েই ওর নিতান্ত অযোগ্য বলে মনে হয় আমার। কোথায় ওর রাজরাণী হওয়ার কথা আর কোথায় ও পড়ে আছে গরীবের এই কুঁড়েতে। এর ওপর তুই আবার ওকে খাটাতে বলিস নীরু?

বললাম—কিন্তু এ তুই রীতিমত বাড়াবাড়ি করে তুলছিস।

—একে তুই বাড়াবাড়ি বলিস? কালোমাণিকের গলার স্বরটাকে কেমন যেন আহত বলে



মনে হ'ল, সামান্য একটু সেবা আর যত্ন দিয়ে নিজের অযোগ্যতার ক্ষতিপূরণ করে নেওয়াকে যদি তোরা বাড়াবাড়ি বলিস তবে ত' আমি নাচার। না না, এতে আর তোরা বাধা দিসনা নীরু। ওর দুর্ভাগ্যের কথা ওকে বুঝতে দিস না কোনোদিন। অন্তত আমি তা চাইনা এটা জেনে রাখিস।

একটু চুপ করে ছিলুম, সেদিকে চেয়ে কালোমাণিক বললে—তুই ততক্ষণ ওর সঙ্গে বসে গল্প কর আমি এই এলুম বলে, তারপর কেন জানিনা আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে প্রায় ফিস্‌ফিস্ করেই বললে—একটু কথাবার্ত্তা কয়ে দেখ ওর সংগে সত্যিই তৃপ্তি পাবি, গুছিয়ে কথা বলতে ও খুব ওস্তাদ কি না, পরম পরিতৃপ্তির একঝলক হাসি মুখের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে কালোমাণিক ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

বসে বসে বোধহয় কালোমাণিকের কথাই ভাবছিলুম হঠাৎ পায়ের মৃদু শব্দে চোখ তুলে তাকাতেই দেখলুম সামনে কালোমাণিকের বউ। এরমধ্যেই ভেতর থেকে আটপৌরে শাড়ীখানা বদলে এসেছে ও, ওর পরণে এখন ফিকে সবুজরঙের সরুপাড় একটা শাড়ী, গায়ে ঘোর রঙের আঁটসাট ব্লাউস্। হাতে চায়ের কাপ ছিলো সেটা আমার সামনে নামিয়ে রেখে একটু তফাতে গিয়ে বসে পড়ল ও।

মনে মনে লজ্জিত হচ্ছিলুম। বসতে বলাটা হয়ত আমারই উচিত ছিলো আগে থেকে, কিন্তু লজ্জিত হওয়ার বিশেষ সময় দিলুম না নিজেকে, কিছু একটা বলে কথা আরম্ভ করে দেওয়া উচিত মনে করেই কথা আরম্ভ করে দিলুম আর সেই মুখেই একবার স্পষ্ট করে চোখ ফেরালুম অপর্ণার দিকে, চেহারায় যে বেশ খানিকটা পরিবর্তন এসেছে সেটা অনেকদিন পরে দেখছি বলেই বিশেষ করে চোখ এড়ালো না। বউভাতের দিন যে লজ্জানত অথচ উৎফুল্ল মুখটির ছবি মনের মধ্যে আঁকা ছিলো সেই মুখেই একটা অতি স্পষ্ট বিষণ্ণতার ছায়া পড়েছে এখন। শুধু বিষণ্ণতার নয় বোধহয় একটা করুণ ক্লান্তিরও।

কথায় কথায় একসময়ে বললুম—চেহারা এমন শুখনো কেন?

নেমে যাওয়া ঘোমটাটা মাথার ওপর টেনে দিতে দিতে অপর্ণা একটু হাসলো। তবে সেটা ঠিক হাসি নয়, হাসবার একটা নিদারুণ প্রচেষ্টা মাত্র। বললো—নিষ্কর্মা হয়ে বসে বসে খাচ্ছি দাচ্ছি, কুটোটি পর্যন্ত ভেঙে দু'খানা করতে হচ্ছে না এতেও যদি চেহারা শুখিয়ে যায় তবে ত' আমি নাচার।

পরিহাস তরল গলায় বলবার চেষ্টা করলেও কথাটার মধ্যে কেমন যেন একটা ক্লান্তির সুর বেজে উঠলো।

কথাটার একটু মোড় ঘোরাবার চেষ্টা করে বললুম—এ নতুন জীবন কেমন লাগছে?

—নতুন জীবন; নতুনই লাগবার কথা তাই নয় কি? অপর্ণা আবার একটু হাসবার চেষ্টা করলো।

জবাবটা দস্তুরমত এড়িয়ে যাওয়া। মেয়েটি বুদ্ধিমতী সন্দেহ নেই। নিজের কথা কাউকে জানতে দিতেও চায় না।

আরো কিছু কথাবার্তার পর সেদিন বিদায় নিলুম।

এরপর নানা কাজে বহুদিন আর ওদিকে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। আর সত্যি কথা বলতে যাবার বিশেষ ইচ্ছেও আমার ছিলো না। একদিন ওখানে গিয়েই যে অস্বস্তি বোধ করেছিলুম তার রেশটা মন থেকে এখনও মুছে যায়নি। তবে মনে মনে ওদের সম্বন্ধে কৌতুহলী যে ছিলুম না তা নয়।

সেদিন অপিস পাড়ায় অসিতের সঙ্গে দেখা হতেই কৌতূহলটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

অসিতই জিগেস করলে প্রথম—কালোমাণিকের খবরাখবর জানিস নাকি কিছু?

বললুম—প্রায় মাস দুই ওদিকে যাইনি, কিছুই বলতে পারবো না।

—মাস দুই! তবে ত' তুই অনেক কিছুই জানিস না রে।

—অনেক কিছু! অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম অসিতের মুখের দিকে।

অসিত বললে—দিন পনেরো আগে চক্রবেড়ে রোডে যে গানের জলসা হয়ে গেলো গিয়েছিলি সেখানে?

বললাম—বিকাশ একখানা কার্ড দিয়েছিলো বটে, যাওয়া হয়ে ওঠেনি, কিন্তু গানের জলসার সংগে কালোমাণিকের সম্পর্ক কি? ও কি আবার গানটান শিখতে আরম্ভ করেছে নাকি আজকাল?

কাঁধের ওপর একটা সজোরে চাপড় মেরে অসিত বললে—কালোমাণিক কেন রে, কালোমাণিকের বউ—শ্রীমতী অপর্ণা দেবী।

বললাম—হেঁয়ালী করিস না, বল ঠিক করে।

অসিত বললে—অপর্ণা দেবী যে জোর গানের চর্চা করছে রে আজকাল। কালোমাণিকের মতে ওর গলা নাকি ওয়াণ্ডারফুল পাঁচজনকে ডেকে শোনাবার মত, তাই কোন জায়গায় গানের জলসা হচ্ছে খবর পেলেই কালোমাণিক আগে থাকতে সেখানে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে তারপর উদ্যোক্তাদের হাতে পায়ে ধরে বউয়ের জন্যে একটা প্রোগ্রামের বন্দোবস্ত করে নেয়।

বললাম—বলিস কি?

—বলছি ঠিকই, চক্রবেড়ে রোডের জলসায় গেলে সেদিন তুই নিজেও দেখতে পেতিস।

বললাম—গায় কেমন?

—কেমন আবার,—চলন সই বিয়ে হওয়ার আগে একটু আধটু গান আমাদের দেশের প্রায় সব মেয়েরাই শেখে।

বললাম—কালোমাণিকও সেখানে হাজির ছিলো নাকি?

অসিত বললে—তুই একটা আস্ত ইডিয়ট্, নিজে হাজির থেকে পাঁচ জনের সুখে বউয়ের তারিফ যদি ও না শুনলো তবে এসব কি ও ছেলেখেলা করবার জন্যে করছে?

বললাম—তাও ত বটে, তা হাততালি জুটলো কেমন?

অসিত বললে—সারাজীবন ইন্‌সিওরেন্‌সের দালালী করেই কাটালি এসব ব্যাপার ত আর দেখলি না কোনোদিন, আরে মুখ্যু, চেহারাটা একটু চলনসই গোছের হ'লে অমন দু'দশটা হাততালি সব মেয়ের গানেই জুটে থাকে।

জানা ছিলো না, এমন কত ব্যাপারই ত জানিনে, তাই হাততালির কথাটা চেপে গিয়ে বললুম—কালোমাণিকের ওপর এর রি-এ্যাকশন্‌টা কেমন দেখলি।

ওঃ কালোমাণিক একেবারে সপ্তম স্বর্গে, মানে 'ইন্ দি সেভেন্‌থ্ হেভন্' আর কি নিজের স্ত্রীকে এক নিশ্বাসে বিখ্যাত বিখ্যাত সব গায়কদের সংগে তুলনা করে ফেলেছে ও, সম্প্রতি অপর্ণার রেকর্ড



করাবার জন্যে ও ক্ষেপে উঠেছে। শুনছি গ্রামোফোন কোম্পানীর বড় বড় সব চাঁইদের সংগে অপর্ণা নাকি প্রায়ই ঘুরে বেড়াচ্ছে আজকাল।

—ব্যাপার তা'হলে অনেকদূর এগিয়েছে বল!

অসিত বললে—তবে আর বলছি কি? এই ত' সেদিন নিজের চোখেই অপর্ণাকে চৌরঙ্গীতে দেখলাম সুদর্শন মিত্তিরের সংগে ট্যাক্সী থেকে নামছে।

—সুদর্শন মিত্তির!

—আমাদের বিখ্যাত সুরকার সুদর্শন মিত্তির রে। সব রেকর্ড কোম্পানীগুলোতেই ওর যথেষ্ট ইন্‌ফ্লুয়েন্স্ আছে। ও চেষ্টা করলে একখানা কেন, এক সঙ্গে দশখানা রেকর্ড করে ফেলাও কিছু বিচিত্র নয়।

বললাম—তা'হলে ত বেশ সুবিধেই হয়ে গেলো।

—সুবিধে ত হ'ল কিন্তু লোকটা একটা পয়লা নম্বরের লম্পট আর পাঁড় মাতাল সে কথা জানিস?

জিগেস করলাম—এসব ব্যাপার কার ইচ্ছেতে হ'চ্ছে—কালোমাণিকের না অপর্ণার?

অসিত বললে—প্রথমটা অবশ্য কালোমাণিকের অনুরোধ উপরোধ আর কান্নাকাটিতেই ও রাজি হয় কিন্তু প্রবাদে সেই একটা কথা আছে না যে দশচক্রে ভগবান ভূত। এ ব্যাপারটাও হয়েছে ঠিক তেমনি; দু-পাঁচ জায়গায় দু'দশটা হাততালি পেয়ে অপর্ণার নিজেরও এখন ধারণা হয়ে গেছে যে গানের জগতে কেউ একজন হোমরা চোমরা গোছ না হয়ে ও যায় না। প্রশংসা পাওয়ার জন্যে মানুষের এমনি মোহ।

বললাম—সুদর্শন মিত্তিরের সংগে ঘুরে বেড়ানোটাও অপর্ণারই ইচ্ছাকৃত নাকি?

অসিত বললে—হ্যাঁ, তা'ছাড়া আর কি। নামের মোহ ওকে যখন একবার পেয়ে বসেছে তখন নাম করবার জন্যে এই সামান্য ব্যাপারে কি আর ও পেছপা হ'বে? তা'ছাড়া কালোমাণিকও আজকাল প্রায়ই সুদর্শন মিত্তিরকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে নানারকম ভালোটা মন্দটা খাওয়াচ্ছে। আসল কথা অপর্ণার সংগে সুদর্শন মিত্তিরের ভালোভাবে মেলামেশা করার সবরকম সুযোগ দিতে চায় ও এমনও শুনলাম যে অপর্ণা যখন সুদর্শন মিত্তিরের সংগে কথা বলে তখন কালোমাণিক নাকি সে ঘরে ঢোকেনা।

বললাম—Strange,

অসিত বললে—Strange কিছুই নয়। ও হতভাগা যে এমনিই একটা কিছু করবে সে ত' আমি তোকে বরাবরই বলেছি।

বললাম—কিন্তু তাই বলে এতটা।

অসিত বললে—সে কথা ঠিক, ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে সেটা অবশ্য আমার পক্ষেও Forecast করা সম্ভব ছিলোনা, কিন্তু আজ তোকে আমি একথা বলে রাখছি যে এই বাড়াবাড়ির একটা খারাপ result হ'বেই, তা সে আজ হোক আর দু'দিন পরেই হোক।

অসিতের এ ভবিষ্যদ্বাণী একদিক থেকে ফলেছিলো কিনা জানিনা কিন্তু এর প্রায় বছরখানেক পরে অসিতের কাছ থেকেই যে খবর শুনলুম সেটা কালোমাণিকের পক্ষে একটা মস্ত সুখবর সন্দেহ নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় গুটিগুটি অসিতের বাড়ি গিয়ে হাজির হ'তেই অসিত প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো—অপর্ণা দেবী একেবারে বাজী মাৎ করে দিয়েছে, শুনেছিস?

বললুম—কি ব্যপার ?

একটা আস্ত সিগারেট আমাকে অফার করে অসিত বললে—বস, বলছি।

আমার সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিজেও সিগারেট ধরালে অসিত তারপর মুখ থেকে এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে বললে—সুদর্শন মিত্তিরের কৃপায় অপর্ণা দেবীর একবারে সাক্ষাৎ স্বর্গলাভ। অর্পণা দেবীর মানে অবশ্য কালোমাণিকেরই।

—কি রকম ?

—আরে আছিস কোথায়, অপর্ণাদেবী যে একেবারে ফিল্‌মষ্টার, তোদের বাংলায় যাকে বলে চিত্রতারকা। সিগারেটে লম্বা আর এক টান দিয়ে মুখ থেকে ভিসুভিয়সের মত ধূমোদ্গীরণ করলো অসিত।

বললাম—বলিস কি ?

—এতে আর বলাবলির কিছু নেই রে ব্রাদার নিজের চোখেই দেখ বরং। সেদিনকার বাংলা খবরের কাগজখানা আমার চোখের সামনে মেলে ধরলো অসিত, বললো—পড়, চেঁচিয়েই পড়।

সিনেমার বিজ্ঞাপনের ভীড়ের মধ্যে দিয়ে চোখ চালাতে চালাতে লাল পেন্‌সিলে দাগানো এক জায়গায় এসে হটাৎ দৃষ্টি আটকে গেলো, চেঁচিয়েই পড়লুম—ছায়াছবির নবতম চিত্র পিপাসিত পৃথিবী অতি শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিবে, প্রধান ভূমিকায় নবাগতা অপর্ণাদেবী।

বললুম—কিন্তু এ অর্পণাদেবী ত' অন্য কেউও হ'তে পারে।

অসিত বললে—অন্য কেউ, মানে ? সাক্ষাৎ কালোমাণিকের মুখ থেকে খবর শুনলুম সেদিন আর তুই বলছিস অন্য কেউ।

বললুম—তাহলে কালোমাণিকের স্বপ্ন এতদিনে সফল হ'ল বল।

অসিত একটু হেসে বললে—তা ত হ'ল, কিন্তু স্বপ্ন শেষে আবার দুঃস্বপ্ন না হয়ে ওঠে।

বললাম—পরে কি হ'বে না হ'বে সে কথা চুলোয় যাক আপাততঃ কিছুদিন ত' অন্ততঃ কালোমাণিক সুখস্বপ্ন দেখুক।

—আর আমরা ততদিনে পিপাসিত পৃথিবীর জন্যে অপেক্ষা করে থাকি, কি বল ? ফুরিয়ে আসা সিগারেটটায় জোরে জোরে গোটাকতক টান দিয়ে অসিত সেটাকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলে।

এর প্রায় মাস দুই পরের কথা, পিপাসিত পৃথিবী তখন উত্তর, পূর্ব আর দক্ষিণ কলিকাতার তিনটি সিনেমাগৃহে দখল করে দস্তুর মত জাঁকিয়ে বসেছে, এমনি সময়ে একদিন বিকেলের দিকে অসিতের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম, বললুম—চল, আজ ইভনিং শো'য়ে—অর্পণাদেবীকে দর্শন করে আসা যাক।

অসিত বললে—আমিও সেই কথাই ভাবছিলুম, কিন্তু প্রশ্ন হ'চ্ছে দর্শন করা যায় কোথায়—সিনেমা হ'লের অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে রেখে না বাড়ীতে গিয়ে আলোজ্বালা ঘরে মুখোমুখি বসে ?

বললাম—শেষোক্ত প্রস্তাবও মন্দ নয় কিন্তু এখন আর পাত্তা পাবো কি ?

অসিত বললে—কালোমাণিকের সংগে দেখা হয়েছিলো কয়েকদিন আগে, মোহিনীমোহন রোডের বাড়ী ছেড়ে ওরা এখন টালিগঞ্জের রিজেণ্ট্ পার্কে ফ্ল্যাট ভাড়া করেছে, নতুন বাড়ী দেখার একটা নেমন্তন্ন সেদিন থেকেই হয়ে রয়েছে আমার, এক ঢিলে যদি দুই পাখীই মারা যায় ত' মন্দ কি ?



বললাম—তথাস্তু। তুই নে তাহলে তৈরী হয়ে।

অসিতের সংগে টালিগঞ্জের ট্র্যাম থেকে যখন নামলুম তখন ছ'টা বেজে গ্যাছে। একটা পাতলা অন্ধকারের পর্দা নেমে এসেছে চারিদিকে। ট্র্যাম থেকে নেমে প্রায় মিনিট দশেক পদচালনা করবার পর একটা তিনতলা নতুন বাড়ীর সামনে এসে অসিত থেমে গেলো। বললো—এই বাড়ীরই সবচেয়ে ওপরের ফ্ল্যাট।

ঢোকবার দরোজার মুখেই মেরুণ রঙের একটা চকচকে গাড়ী দাঁড়িয়েছিলো, পাশ কাটিয়ে আমরা ভেতরে ঢোকবার উপক্রম করছি পেছন থেকে ডাকশুনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কালোমাণিকও আসছে আমাদের পেছনে পেছনে। ময়লা জামাকাপড় পরা, ঘুঁটের ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে যাওয়া কালোমাণিক নয়, সিল্কের পাঞ্জাবী আর দিশী ধুতী পরা ফিটফাট, ফুলবাবু কালোমাণিক একটু হেসে বললে—বাড়ী খুঁজে ঠিক বা'র করেছিস ত', আয়।

কালোমাণিকের পিছুপিছু আমরা তে'তলায় উঠে এলাম, বাঁ হাতি বেশ একটা বড়সর ঘরে আলোর বন্যা বইছে। দরজার সামনে আসতেই ভেতর থেকে মোটা সোটা ভারী ভারী গলার কার যেন কথা শোনা গেলো আর সংগে সংগেই নারীকণ্ঠের সুরেলা হাসিতে ভরে গেলো সমস্ত ঘর, অপর্ণা তা'হলে এত সুন্দর করে হাসতে শিখেছে আজকাল।

—আয় আমরা ও ঘরটায় গিয়ে বসি। কালোমাণিকের আহ্বানে আমরা পাশের একটা দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। ফিটফাট, সাজানো গোছানো ঘর, মেঝের ওপর সবুজ জমির প্রান্তে লাল বর্ডার দেওয়া একটা নতুন দরী পাতা। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় একশেট বেতের সোফা, সোফার ওপর সিল্কের ঢাকা পরানো কুশন লাগানো রয়েছে, ওধার লক্ষ্ণৌ ছিটের ঢাকা দেওয়া ম্যান্ট্‌লপীসের ওপর কোন শিল্পীর হাতে আঁকা অপর্ণার একটা প্রতিকৃতি আর তার দু'পাশে দু'টো মনোহর চায়না গ্লাসের ফুলদানীতে একঝাঁক করে মরশুমী ফুল বিকেলের হাওয়ায় মৃদু মৃদু মাথা দোলাচ্ছে। অপর্ণার রুচি আছে সন্দেহ নেই।

—আয় বস। গোমেধের আঙ্‌টি পরা একখানা কৃষ্ণবর্ণ হাত সোফার দিকে প্রসারিত করে দিলো কালোমাণিক।

লম্বা সোফাটার ওপর বসলে সামনের ঘরটার মধ্যে বেশ স্পষ্ট নজর চলে সোফায় বসতেই দেখলুম ওঘরে একটা সোফার ওপর গা এলিয়ে বসে আছে অপর্ণা। বউভাতের দিন দেখা সেই সলজ্জ, আড়ষ্ট আর অবগুণ্ঠিতা অপর্ণা নয়। বিলীতী প্রসাধনসামগ্রীর দৌলতে অপর্ণাকে আজ রীতিমত উজ্জ্বল আর স্পষ্ট দেখাচ্ছে। অবগুণ্ঠনহীন মাথায় শ্যাম্পু করা রুক্ষ মসৃণ আর ঈষৎ বাদামী রঙের চুলগুলোও বড় কম সুন্দর নয় অপর্ণার।

মাথার ঘোমটার সংগে সংগে জীভের আড়ষ্টতা আর শরীরের জড়তাও আশ্চর্যভাবে ঘুচে গেছে বলে মনে হচ্ছে। নইলে একটি অনাত্মীয় ভদ্রলোকের সংগে রীতিমত গা ঘেঁসে বসে এত সহজ আর এত ঘনিষ্টভাবে এর আগে কি আর কোনোদিন আলাপ করতে পারতো অপর্ণা ?

এ'পাশের সোফায় নিখুঁৎ স্যুটপরা আর একটি ভদ্রলোক। কথায় কথায় কি একটা রসিকতা করে হাত বাড়িয়ে হটাৎ অপর্ণার একটা গাল টিপে দিলেন তিনি। কই অপর্ণার মুখে ত একটুও

আবীর ছড়ালো না? প্রত্যুত্তরে সেও নিজের একটি শঙ্খশুভ্র নিটোল হাত তুলে ভদ্রলোকের গায়ের ওপর একটা মৃদু আঘাত করলো। আর সেই মৃদু মধুর আঘাতে বিগলিত হয়ে ভদ্রলোক অপর্ণার হাতখানি টেনে নিলেন নিজের দু'টি হাতের মধ্যে।

আমার গায়ে একটা ঠেলা দিয়ে অসিত বললে—স্বপ্ন এইবার দুঃস্বপ্ন না হয়ে ওঠে। আমি তোকে হলফ্ করে বলতে পারি এসব জিনিষ কালোমাণিক কখনই নির্বিকারভাবে সহ্য করতে পারছে না।

কথাটা নেহাৎ বাজে নয়। যতদূর শুনেছি অতিমাত্রায় liberal স্বামীরাও নাকি এসব জিনিষকে একেবারে সুস্থভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। এমন কি স্ত্রীকে যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'বার উপায় হিসেবে মুক্তভাবে ব্যবহার করে থাকেন তাঁদেরও সহ্যের সীমানা নাকি এই জাতীয় একটা অবস্থায় এসেই শেষ হয়ে যায়। কালোমাণিক অবশ্য নিজের বদলে স্ত্রীকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে জীবনে। সে চেয়েছে তার স্ত্রীর নাম হোক, তার স্ত্রী বিখ্যাত হোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার জন্যে এতখানি মূল্য দিতেও কি সে প্রস্তুত হ'বে? অবশ্য আজকের এ ব্যাপারের ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা চলে না সন্দেহ নেই কিন্তু এর শেষ যে এখানেই তা কে বলে দেবে?

কালোমাণিক ভেতরে গিয়েছিলো চায়ের ফরমাশ করতে। মনে হ'ল সে যদি ঠিক এই মুহূর্তেই এখানে এসে পড়ে তাহ'লে এ ব্যাপার দেখেও কি এতটুকু বিকার দেখা দেবে না তার মনে? হাজার হোক সেও ত' মানুষ। সেও ত' স্বামী।

পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনতেই দেখলাম কালোমাণিক। এদিকে আবার ফিরে তাকাতে দেখলাম অপর্ণার হাতখানা তখনও সেই ভদ্রলোকের হাতের মধ্যে আর অপর্ণা একটু ঝুঁকে পড়ে নিজের অন্য হাতটা দিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাত বুলিয়ে চলেছে ভদ্রলোকের হাতদু'টোর ওপর।

কালোমাণিকের দিকে তাকাতে কেন জানিনা সাহস হচ্ছিলো না। এ দৃশ্য দেখে ওর গোবেচারা গোছের সদাপরিতৃপ্ত মুখটায় অনিবার্যভাবেই যে ভাবান্তর দেখা দেবে তা সহ্য করা সত্যিই শক্ত হ'বে আমার পক্ষে।

আমার পাশে একটু জায়গা ছিলো কালোমাণিক সেখানে এসে বসে পড়ল তারপর ফিসফিস করে বলল—ওই স্যুটপরা ভদ্রলোক কে জানিস? 'পিপাসিত পৃথিবী'র ডাইরেক্টর এণ্ড্ প্রডিউসর্ হিমাংশু সরকার। মস্ত লোক। আর ওই যে অপর্ণার পাশে ঠিক একেবারে গা ঘেঁষেই যে বসে আছে ও হ'ল সুরশিল্পী সুদর্শন মিত্তির। হিমাংশুবাবুর বাড়ীতে অপর্ণার আজ ডিনার খাওয়ার কথা তাই উনি নিজেই এসেছেন গাড়ী নিয়ে ওকে নিয়ে যেতে। তারপর প্রায় কানের কাছে মুখ এনেই ফিস্‌ফিস্ করে বললো—আমার কি মনে হয় জানিস এইসব লাইফ্‌ই অপর্ণাকে স্যুট করে সব চাইতে বেশী। দেখছিস না লোকজনের সংগে মেশায় কেমন একটা স্বচ্ছন্দ ফ্রীনেস্ ওর। তোর কি মনে হয় না যে সংসারের মধ্যে শুধু হাঁড়ি ঠেলায় ওকে আটকে রেখে দিলে ওর ওপর চরম ইনজাষ্টিস্ করা হ'ত?

কালোমাণিক আমার মুখের ওপর তার তৃপ্তিতে উজ্জ্বল দু'টি চোখ মেলে ধরলো আর আমি তাকালুম অসিতের দিকে কিন্তু অসিতও তখন ও'পাশে মুখ ফিরিয়েছে।

# বাংলা ভাষার ধ্বনি-বিচার

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ঠিক যেম্নি জীবনের ছন্দে, কবিতার ছন্দেও তেম্নি পূর্ণতার পরমায়ু নেই। ষোড়শোপচারে জীবনের পূজা ক্ষণিক—সেখানে পৌঁছিয়ে মানুষ হয় পূর্ণিমা নয়তো অমবস্যা দেখতে পাবে আর ওম্নি তার আত্মা চাইবে প্রতিপদের প্রথমায় নতুবা পঞ্চদশীর অপূর্ণতায় ওঠা-নামা করতে। শূন্যতার মতোই পূর্ণতা সৌন্দর্য্যহীন, অর্থহীন, আনন্দহীন, সৃষ্টিহীন।

যুগ্ম-ধ্বনি মানে দুই ধ্বনি, কচিৎ তিনধ্বনি। দুই ধ্বনির লিপিতে ষোলটি ধ্বনি মানে বত্রিশটি ধ্বনি। একটি বাক্য এই বত্রিশটি ধ্বনিতে গিয়ে পৌঁছুতে পারে—কিন্তু সে-পৌঁছনো রুদ্ধশ্বাসে, প্রাণায়ামে পৌঁছনো, প্রাণারামে নয়। পাঠক এ-প্রক্রিয়ায় নামতে রাজি হবেন কেন, কবি-পাঠকও বা তা সৃষ্টি করে সৌন্দর্য্যানুভূতি বা আনন্দাস্বাদ পাবেন কেন? ধ্বনি-সাধক শক্তি-তন্ত্র-যোগী মহদুদ্দেশে তা করতে পারেন। কাজেই ষোলো আর তার দ্বিগুণ বত্রিশ, এ দুটো ধ্বনি-সংখ্যা লক্ষ্যে নিয়েই বাক্-ছন্দের ছন্দককে অশ্ব-চালনা করতে বলেছেন অতীতের গীতজ্ঞ পদকর্ত্তারা।

মানুষের বাক্‌ধ্বনির জন্ম এক সংখ্যা থেকে। মন্ত্রই বলুন আর তন্ত্রই বলুন—সর্ব্বত্র—সবদেশ, এই এক-সংখ্যাটিকে স্বীকার করে থাকেন। যাঁরা ভাষাতত্ত্ববিদ হয়েও ধ্বনিতত্ত্ববিদ হতে পেরেছেন—যেমন 'ইজিপ্তোলজিষ্ট'রা—তাঁরা অন্তত এটুকু জানেন যে 'ফিনিসিয়ন' (ফণীর সই) থেকেই প্রথম বাক্‌ধ্বনির বিস্তার হয়েছিল—যদিও 'কটহ'*-(ইজিপ্ত)-কেই তাঁরা ধ্বনির জনক বলে ধরে নিয়েছেন। ফণী-মনসা আর চান্দ্রায়ন মিলে যে 'হম' জাতি কি করে তৈরী হল দুঃখের বিষয় তাঁরা তা জানতে পারেন নি। বোঝা যায় আর্য্যজাতির সূর্য্যের গোলক-ধাঁধাঁয় তাঁদের পথ খানিকটা অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও বহু পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতরা সত্য-আবিষ্কারের অক্লান্ত চেষ্টায় আমাদের কাছে বহু তথ্য এনে দিয়েছেন। আমরা সে-তথ্যগুলো কণ্ঠস্থ করে বিদ্যা-বাগীশ হয়েছি কিন্তু নিজেদের দিকে—এশিয়ার (জম্বুদ্বীপ) পূর্ব্বাঞ্চলের জীবনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করিনি যে বাক্-ধ্বনির জন্ম কোথায় হওয়া সম্ভবপর। তাহিতিতে-চীনে-মালয়ে-ব্রহ্মে-আসামে-সমতটে না কি কাম্পিয়নে-হিত্তাইতে-চলদিয়ায়-কটাহে-ট্রজনে-মেসিদোনে-প্রোমঁতে?

আমাদের ভাষাতত্ত্ববিদরা তন্ত্রকে মনে করলেন 'হিংটিংছট'—ঐতিহাসিকরা 'প্রভু' যীশুর (প্রবুদ্ধ অশোকের নয়) একটি জন্ম তারিখ ('খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭'—রাম না হতে রামায়ণ আর কি!) পেয়ে ভুলে গেলেন যে 'অহম' জাতির 'অসম' অঞ্চলে 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' বলে একটি পুরী ছিল—যার নাম কামাখ্যা—যেখানে 'তন্ত্র' বলে একটি বিদ্যার চর্চ্চা হ'ত—এবং যে-বিদ্যা পরম সৃষ্টিকে বলত 'হংস'।

---

* কটহ মানে কড়াই—মিশরী-লিপিতে 'ক' ধ্বনিটি কড়াই-এর ছবিতে ব্যঞ্জিত—'ক' মানেই অন্ধকার, কালো বোঝাতো সেখানে। আমরাও 'কুৎসিত', কু, কাক, কুৎসা, প্রভৃতি কথাগুলোতে কালো-দিকটাই বোঝাতে চাই।

তাছাড়া 'পুরুষোত্তমে'র বা পুরীকে জ্যোতির্বিদ্যা গ্রন্থ 'ভাস্বতী'র (শতানন্দ-প্রণীত) খোঁজ রাখলেও বরাহ-অবতারের বরাহমিহিরকে নিয়ে আমরা প্রমত্ত হতাম না। জনকের টঙ্কাধ্বনিতে এবং রামের ধনু-টঙ্কারের ভীতিতে যেদিন ধনুষ্টঙ্কার রোগে আমরা যক্ষ এবং দক্ষ হতে শিখলাম, মানে স্বাধীনতা-পূর্ব্ব যুগে যখন নতাক্ষ হলাম, ভ্রান্তির সুরু সেদিন থেকে। ভ্রান্ত মন কুচক্রীর চক্রে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করাটা নিরাপদ ভেবেছে। তা-ই ভেবে আজ হয়ত তাকে ক্ষমা করা যায়। তবে আজ আমরা হয়ত নির্ভুলভাবে স্বাধীনতার-স্বস্তি লাভ করেছি ('স্বস্তিকা' নয়)। কাজেই এখন নূতন চোখ নত করে একবার নিজেদের দিকে তাকালে ক্ষতি কি? যদি ক্ষয়িষ্ণু না হয়ে বাঁচবার ইচ্ছে থাকে তাহলে টঙ্কাকে 'তনহা' মনে করেও নিজেদের সৎ চেহারা আমরা দেখতে পাব। এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলকে জীবনের, জাতির, কর্ম্মের, শিল্পের, বাগ্দেবীর পীঠস্থান বলে মেনে নিয়ে ইতিহাসের পুনর্বিচার করাই আমার মনে হয়, আজকের দিনের ভারতবর্ষের সব চাইতে বড়ো কর্ত্তব্য। একে যদি মহা অনিষ্টকর একটি ক্রিয়া বলে কেউ মনে করেন তবে অবশ্য বলার কিছুই থাকেনা। কিন্তু নিজেদের নিয়ে তকাতীত গৌরব যদি আমাদের করতে হয় তাহলে এ-কথা জোর দিয়েই বলব যে রচিত-ইতিহাসের আদি-পঙ্ক থেকে গাত্রোত্থান করতে না পারলে, মন জড়তা-মুক্ত না হলে, চক্ষু তমসাচ্ছন্ন থাকলে, আমরা কোনোদিনই অর্জ্জিত সম্পদ রক্ষা করবার মতো শক্তি বা ভাষা খুঁজে পাবনা।

'এক' থেকে বহুলতায় এসে পড়েছি। তবে ভাষারই নিয়মে এই মহাযানে প্রয়াণ। তাই ক্ষমাপ্রার্থী হলাম না। যাক্।

মানুষের বাক্-যন্ত্রে প্রথম একটি সহজ, সরল ধ্বনি ফুটল। সেদিন যদি তাঁদের লিপি তৈরী করবার মতো মস্তিষ্ক-শক্তি থাকত তাহলে বাংলা চোদ্দটি লিপির চোদ্দটি ধ্বনির জন্য মানুষ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর পেরিয়ে কলিতে গড়িয়ে আসতনা। প্রথমত তাই এক থেকে দুই হল; দুই-এর সঙ্গে এক মিশে তিন হল; তিনের সঙ্গে এক মিশে বা দুই-এর সঙ্গে দুই মিশে চার হ'ল; তিনের সঙ্গে দুই মিশে 'পাঁচ'-মিশেলি হল; তিনের সঙ্গে চার মিশে 'সাত'-মিশেলিও। কিন্তু ব্যাপারটা তাতে দাঁড়াল অদ্ভুত—কোন্ দুই-এর সঙ্গে কোন্ এক মিশছে, কোন্ তিনের সঙ্গে কোন্ দুই, যখন তা নিয়ে একগোষ্ঠীর মধ্যেই বিভ্রম উপস্থিত হবার উপক্রম হ'ল তখন সম্ভবত এলো লিপি-তৈরীর তাগিদ। দেখা গেল মানব-শিশু ভূমিষ্ঠ হবামাত্র এক থেকে সুরু করে তিনটি ধ্বনি (অবশ্য বিচ্ছেদ বেদনায় অর্থাৎ কান্নায়) পর্য্যন্ত জুড়ে নিয়ে (ও-ৎ-অ—'অ'-কে দীর্ঘায়িত করলে 'আ') অক্লেশে, অনায়াসে আওয়াজ সুরু করে দেয়। তাই লিপিতৈরীর বেলায় দেখা গেল যে দুই-কে এক-এ নিয়ে আসা যায়: যেমন, অ+অ=আ; তিনকে দুই-এ আনা যায়, যেমন, ও+ৎ+অ=ওম, এক-এতেও আনা যায়, ওঁ; এক-কে তিনে ভাগ করা যায়, ওঁ=অ+উ+ম। তন্ত্র-শাস্ত্র বললেন, তা কেন, তাকে চার ভাগও করা যায়; 'অ+উ+ন্+ম'। দেখুন ভাগের প্রশ্নের সঙ্গে-সঙ্গে ছন্দের জন্ম হচ্ছে। 'অ' নানা মিশ্রনে নানা ব্যঞ্জনা ও পর্দা, 'ম'-চার ভাগে চার পর্দা, (ৎ, ম, ন্, ঙ) তৈরী করল। বিস্তার একদিকেই নয়, ডাইনে-বাঁয়ে, উর্দ্ধে-অধে। সংহার বা গুটিয়ে-আনাও তেম্নি—চারপাশ থেকে। কাজেই প্রথম তৈরী করতে গিয়ে লিপির উপর লিপি লিপ্ত হ'তে সুরু করল। তাম্রপাত্রে সে লিপি লিপ্ত থাকত (লিখিত নয়) বলেই ইতিহাস তাম্রলিপ্তি বা তাম্রলিপ্ত নামটি পেয়েছিল। তার আগেও মৃৎপাত্রে (তামা



ও পাথরের যুগের আগে) লিখিত লিপির সন্ধান আছে মোহেঞ্জোদরো-র হাড়ির কানায়* যে লিপি সংস্কৃত হয়ে 'বরঅ-অহমী' (ব্রাহ্মী)-লিপি নামে পরিচিত। মিশর যে ধরণের চিত্র-মূলক লিপি নিয়ে আদি অক্ষরের 'পত্তন' হয়েছিল বলে য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ঘোষণা করেছেন এবং ধরে নিয়েছেন 'সেমিটিক'-লিপিই প্রথম সুমাত্রিক-লিপি—কোনদিন 'মঘবগ্নজদ্বার' অথবা 'মহনযদোর'-এর দ্বার-উদ্ঘাটন করলে দেখা যাবে তাঁদের ঘোষণা এবং ধারণা হয়ত ভিত্তি-হীন। পদ্ম-শঙ্খ-চক্ষু-পাত্র (পাথর) থেকে কি-ভাবে লিপি তৈরী হচ্ছে—তারপর লৌহ-যুগে চক্র-ত্রিশূল-হল-নোঙর থেকে কি-ভাবে—চারটি আঙুল যেদিন ছিল কাদা মাটির উপর সেই অপূর্ণাঙ্গ নিয়েই কতো বিচিত্রতায়—তারপর পঞ্চমা অঙ্গুলির জন্মের পর কনিষ্ঠাকে নিয়ে কতো উল্লাসে কতো মোহে যে লিপির স্তর চলেছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়! মোহেঞ্জোজদরো-র লিপির ইতিহাসের সঙ্গে জীববিদ্যা-শারীরবৃত্ত-যন্ত্রবিদ্যার ইতিহাস জড়িত। আর সে-ইতিহাস এমনই অবিশ্বাস্য যে তা বিস্মিত হয়েও শুনবার উপায় নেই। তা এমনই বৃহৎ যে ভাগবত-মহাভারত জুড়ে নিলেও তার অর্দ্ধেকটা বলা হবেনা। কাজেই সেই মোহন মোহে জড়িত না হয়ে সহজ, সরল, সংস্কৃত ব্রাহ্মী-লিপির দিকে তাকানোই ভালো।

কিন্তু সেখানেও সমস্যার হাত থেকে নিস্তার পাবার উপায় নেই। শকাব্দটিকে আমাদের প্রাক্তন প্রভুরা এমনই জব্দ করে রেখে গেছেন যে রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এবং হেমচন্দ্র রায়-এর মতো দুর্লভ অধ্যবসায়ী এবং সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকরাও ইতিহাস লিখতে গিয়ে পৃষ্ঠাগুলোকে প্রশ্নাঙ্কিত না করে নিষ্কলঙ্ক রাখতে পারেন নি। 'হর্ষবর্দ্ধন, অশোক, ধর্ম্মপাল, লক্ষ্মণসেন' নামিগুলো কোনো রাজার নাম কিনা, নাকি তাঁদের বিভূতি—বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বুদ্ধ-কথিত কিনা, নাকি তা জৈন ধর্ম্মের শাখা—আবার জৈন-ধর্ম্মও অম্লান 'যাবনিক' ধর্ম্ম কিনা, নাকি মঠ-বাদী শৈব-ধর্ম্মের স্পর্শে ও মিশ্রণে তৈরী ('শঙ্কর', 'মণ্ডনমিশ্র' কতোইত ছিল আমাদের) এতোদিনে এ-কথাগুলো স্পষ্ট পরিষ্কার হওয়া উচিত ছিল। 'বৌদ্ধ-তান্ত্রিক' কথাটা মেনে নিতে আমাদের আপত্তি হয়নি। বৌদ্ধরা তান্ত্রিক হয়েছিল কিম্বা তান্ত্রিকরা বৌদ্ধ—এ-ধরণের বিচারই এতোকাল আমরা করে এসেছি। ভাগবত এবং শাক্ত-তন্ত্র-শাস্ত্র যে যোগী তৈরী করে—প্রজ্ঞাপারমিত প্রবুদ্ধ মানুষ তৈরী করে তোলে, ভুলেও সে-কথা একবার ভাবিনি। শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাবের পর হয়ত ইদানীং তা ভাবতে পারছি। অশোক রাজার হাতির বা নাতির সংখ্যা গণনা করা যে নেহাৎই বিদ্যাজাহির করা এ-শতকের গোড়ার দিকে একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল তা বুঝতে পেরেছিলেন—তিনি হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন যে চন্দ্র গুপ্ত হয়ে গিয়ে অশোক হতে পারে। চন্দ্র গুপ্ত হয়েছিল কেন সে-প্রশ্নের উত্তরই ইতিহাস। 'চন্দ্র গুপ্ত' যেমন ইতিহাস 'সমুদ্র গুপ্ত'-ও তেমনই ইতিহাস। সে-ইতিহাসের সন-তারিখ বেরুলে ব্রাহ্মীলিপির পরিণত রূপ কি ও তথাকথিত 'অশোকের লিপি'র এবং তথাকথিত 'হর্ষবর্দ্ধনের হস্তাক্ষর'-এর কোন্‌টি আগে এবং কোন্‌টি পরে তার বিচার চলতে পারে। 'হর্ষবর্দ্ধনের লিপি' বাংলা-লিপির অনুরূপ বলেই যে তাকে খ্রীষ্টজন্ম ডিঙিয়ে কয়েকশ' বছর এদিকে ফেলে দেওয়া হবে তার কোনো মানে নেই। মানে নেই এজন্যে যে মিশরী লিপির বহু-ধ্বনি একই অর্থে

* Lxxv III No 2 Mohenjo-Daro & Indus Civilization-Vol. III by Sir John Marshall. কুশান যুগের অক্ষর-নক্সা অবলম্বনে তা পড়া যায়।

বাংলাদেশের ভাষায় আজও বেঁচে আছে। ঠিক তেম্নি হয়ত চৈনিক-লিপির বহু ধ্বনি আসামের ভাষায় একই অর্থে পাওয়া যাবে। হর্ষের নাটকে যিনি ছিলেন 'প্রিয়দর্শিক' (বাণের একটি রচনা আছে 'প্রিয়দর্শিক') তাঁর রাজত্ব কালে চৈনিক 'পরিব্রাজক' (?) *Hiueu* Tsang ভারতবর্ষে এসেছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর *Wang Hiuen Tse* ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ৪৮০টি নগর অধিকার করেন।[১] খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২০২ থেকে ২২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীনের 'হন' সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল—তাদের 'উটের-পথ'[২] ছিল কোরিয়া থেকে 'সিনকিঅং'—আবার 'সিনকিঅং' থেকে সুরু হয়ে আসামের পূর্ব্বাঞ্চল সান ছুঁয়ে 'য়োন্নন' এবং সায়মে গিয়ে 'অন্নম' পর্য্যন্ত। চীনাংশুক এ-পথেই আসত—অশোক-গাছ আর অশোক রাজাও এ-পথেই যাতায়াত করেছে। 'চ-ইন' সাম্রাজ্যের প্রথম ঐতিহাসিকের নাম ছিল 'শোম-চ-ইএন'। আর প্রথম সম্রাট (=শ-ইহ) ছিলেন *Hwang-te*[x]। চৈনিক সম্রাটের সঙ্গে চৈনিক (?) পরিব্রাজক আর চৈনিক আক্রমণকারীর সম্পর্কটি যদি পরিষ্কার হত তাহলে আমরা হর্ষবর্দ্ধক সাম্রাজ্যের খানিকটা নির্ভুল সংবাদ শুনতে পারতাম।

কাজেই ব্রহ্ম ছেড়ে আপাতত বেদাশ্রয়ী হওয়া যাক। কিন্তু সেখানেও কি নির্ঝঞ্ঝাট ধ্বনিকে পাওয়া যাবে? 'ব্রাহ্মণযুগে' আপস্তম্ভ 'সামগান' নিষেধ করে দিয়েছিলেন হয়ত গোলমেলে ধ্বনির জ্বালায় অস্থির হয়ে! যেম্নি বাইবেলে বঅবয়লন-এর (Babylon) 'টাউআর অব ব্যাবেলে'র উল্লেখ করে বলা হয়েছে—ওখানকার কথা মিশ্র, অভিশাপ দেওয়া হয়েছে: এরা কেউ কারো কথা বুঝবেনা—বেদেও তিম্নি দেখা যায় 'ইন্-দ্র'-পূজক 'আর্য্য'-রা এসে 'স-ইন্-ধু'র লোকদের কথা বোঝা যায়না বলে তাদের অসুর আখ্যা দিচ্ছেন। বেদের 'দশ রাজার যুদ্ধ' ঘটনায় এই অসুর কথাটির তাৎপর্য্য রয়ে গেছে। যুদ্ধটা হয় দিবোদাস তনয় 'সুদাস' বলে এক রাজার সঙ্গে (বাংলার কৈবর্ত্ত-রাজা 'দিব্যক'কে স্মরণ করুন—সেই সঙ্গে শশাঙ্ক, কুমিল্লার রণ-বং-কমল্ল-সবাইকে মনে পড়তে পারে)। যুদ্ধ তেমন-কিছু মহাযুদ্ধ নয়—বলা যেতে পারে বারুণী আর্য্যের সঙ্গে ঐন্দ্রিক আর্য্যের যুদ্ধ। তবে ইতিহাসের হোঁ-মুণ্ডকে উন্নত করে পায়ের উপর দাঁড় করাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি বলতে চাই যে 'বোঘাস-কোই' থেকে এই বঞ্চকরা আসেন নি—এসেছিলেন পূর্ব্বভারত থেকে—কাঞ্চী থেকে কামরূপ, 'মহেন্দ্রদ্বার' থেকে কমলাঙ্ক পর্য্যন্ত ধীরে-ধীরে যাঁদের অধীনে এসে ছিল। তাঁদের 'তাম্রলিপি' ছিল, 'একাম্র' ছিল, মহেন্দ্র-চন্দ্র-ইন্দু-রাত্রি ছিল। কিন্তু সিন্ধুবাসী বারুণী আঋষদের (বশিষ্ঠ যাদের পুরোহিত) ইন্দু ছিল ইন্ধু—রাত্রি ছিল রাতৃ—'র'-ফলাতে বা 'রেফ্'-এ প্রথমত তাঁদের জিহ্বার রুচি বা অভ্যাস ছিলনা। তাঁরা 'গৃৎসমধ' শ্রেণীয়, 'অত্রি' শ্রেণীয় নন। 'অত্রি' ইন্দ্র-বরুণের সন্ধিস্থল। কিন্তু প্রথমত ছিলেন যোদ্ধা, বিরোধী।

১। The Cambridge History ot India.

২। History of the world Edited by W. N. Whech.

বৈদিক 'পারশ্য নৃপের সন্তান' বাংলায় 'পারস্য নীপ' হয়ে কদম্ব গাছ আর শ্যামের-'শ্য'-কে এসেছে। ভাগবতে দেখবেন 'পারস্য নীপ'-র উল্লেখ। সেখানে 'স্বহিত'-'তালজঙ্ঘ'-রাজসন্তান। কামরূপের 'শালস্তম্ভ'—ভাগবতে তালজঙ্ঘ নাম নিয়েছে—'শ-ইহ' স্বহিত হয়েছে। বঙ্গ-কেন্দ্রের নিজস্ব 'ম' ধ্বনিতে হ'ল 'স্বোহম'—কদম্ব আর তমাল শাল। আর 'ঈ' ধ্বনিতে নীপ-তালী কথাগুলোর আবির্ভাব।



—কেউ কারো কথা বুঝতেন না। কথা ত বোঝাই যাবে না—'কটহ'র মতোই যে আমাদের ধ্বনি-গণনা-রীতি[১] ছিল—দুই-এর সঙ্গে এক যোগ করে তিন হত। দুই হল পিতা-মাতা বা মাতা-পিতা—তিন হল সন্তান। আমাদের 'কটহ'—'বরহ' হয়ে তাই করেছেন। ছিলেন যযাতি-দেবযানী, অথবা অজ-অজ্য। দেবযানী তাকে বললেন: 'বরহ'। হলেন দুই মিলে 'বরাহ অবতার'। বরাহের দুটি বিস্ময়কর নভোধ্বজ এবং নৃসিংহের 'জয়স্কন্ধভারে'র (ধ্বজ বা শীলমোহর No. 6. Pl' Xc. No. 6. M.I.C.) চিহ্ন আছে 'মোহেঞ্জোদরো'-তে। তাই কোসলের সোমবংশী রাজা মহাভাগগুপ্ত 'জনমেজয়' হন—মহাশিবগুপ্ত হন 'যযাতি'। বাপ আর ছেলে। 'জ' আর 'য'র অর্দ্ধমাত্রা ব্যবধান। 'অর্দ্ধমাত্রা লাঘবেন পুত্রোৎপত্তিঃ'। 'বরহ'-র সঙ্গে ক-চ-বর্গের ধ্বনি ব্যঞ্জনা যুক্ত হয়ে—তাঁরা হলেন ভার্গব, রঘু, রাম। জনমেজয় হলেন। হলেন জনক। যমের কাছে থেকে কচ—'গঙ্গ'-কূল বা গঙ্গ-চর এনে দিয়েছিল ক-চ-বর্গের ধ্বনি—যেখানে 'রাজরাজ' 'চোড়গঙ্গ' হ'তে পারতেন। তাই চোরগঙ্গ থেকে এসেছিল 'অনইয়ঙ্ক-ভীম'। 'অন-ইয়ঙ্ক' ধ্বনিতে ইয়াঙ্কী দেশের সঙ্গে বিচ্ছেদের কাহিনীতে কি এসে পড়লাম? 'রেড্-ইণ্ডিয়ানের' দেশের পাশে যেতে আপত্তি কি 'ইণ্ডিয়ানদের'? কিন্তু যোগসূত্র কই? 'নই'—নৌকা, নাবিক। এলাম তাহিতিতে। তাহিতি-ই কি ছিল তবে 'এলাম'? সমুদ্রগুলোর বর্ত্তমান বিদ্যার যদি ভুলে যেতে পারি—যদি ভাবতে পারি প্রশান্ত সাগর ক্ষণিত হয়ে চন্দ্রের উৎপত্তি আর আরব সাগর ক্ষণিত হয়ে হিমালয়ের—তাহলে আমাদের ভাবনাগুলোর নাম আর যা-ই দেওয়া যাক, দুর্ভাবনা দেওয়া যেতে পারেনা। কিন্তু দুর্ভাবনা আছে। বাক্-ছন্দকে নিয়ে দুর্ভাবনা। তাহিতি-মেয়েদের নৃত্যে-লাস্যে দেহ-ছন্দ আছে—হাসিতেও না-হয় ময়নার কণ্ঠ-ঝঙ্কার পাওয়া যাবে কিন্তু ওদের কবিতার খবর কে রাখে? ন-ইয়ঙ্ক ভীমের—তাহিতি-ভীমের ছেলে না-হয় নৃসিংহই হল!

তবে খানিকটা সুখবর এই যে একাম্রের চোড়-গঙ্গ-বংশীয় 'নৃসিংহ' (অবতার) বা 'নরসিঙ্গ'[২] (দুনামেই তাঁকে পাওয়া যায়) দেবের (পিশীমার?) 'ভুবনেশ্বর শিলালেখ' বেশ উঁচুদরের নৃত্য-গীতেরই উল্লেখ করছে:

"গঈতঅজঞআ—লঅয়—তআলঅ—নরঅততঅনঅ—কঅলআ—কঅওশঅলঅ—লঈল—অলঅযআ।

এ-লিপি বিস্তারে ৪৭-ধ্বনিমাত্রার ছন্দ-পাঠে এবং অর্থ-গ্রহণে অসুবিধে হলে আমরা এর এরকম রূপ দিতে পারি: 'গীতজ্ঞা-লয়-তাল-নর্ত্তন-কলা-কৌশল্য-লীল-অলয়া।' এক লিপি-ধ্বনি হিসেবে ছন্দটি ৪১ মাত্রার। বিভাগ এই: ৭+৩+৪+৮+৪+৭+৩+৫,—যদি হ্রস্বদীর্ঘকে বাতিল করা যায়। হ্রস্বদীর্ঘ ধরে হবে: ৯+৩+৫+৮+৫+৭+৪+৬=৪৭ মাত্রা। ৪৮ মাত্রা থেকে এক মাত্রা কম, তাই ছন্দ। ষোলর তিনটি ভাগ জুড়ে ঊন ৪৮। তার মানে চারের তিনটি ভাগ অথবা তিনের চারটি ভাগ।

প্রাচীন চীনেও দেখা যায় (খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক) পূর্ণ তিনকে আরো তিনটি নক্সা দেওয়া হচ্ছে: পূর্ণতার প্রতীক 𝌆 চিহ্নটি, দ্বিভীয় নক্সায় 𝌇 তৃতীয় নক্সায় 𝌈 চতুর্থ নক্সায় 𝌉।

১। Ibid.

২। 'Hutton suggests that the fair complexion of the Namasudras of Bengal is due to a migration of Mediterrenean Race'—Bengal Census 1931. ভারতমহাসাগর নয় কেন?

এই বিন্যাস অদল-বদল করে চীনে চৌষট্টি মাত্রা-ধ্বনি তৈরী হ'ত। ভারতবর্ষও চারের চারটি ভাগ সাজিয়ে চৌষট্টি ধ্বনি-কলা সৃষ্টি করেছে। আবার চারের তিনটি ভাগে বা তিনের চারটি ভাগে (যে-চার ষোলতে পূর্ণ এবং যে-তিন বারোতে পূর্ণ) ৪৮ ধ্বনি-কলা বা ছন্দ মাত্রা সৃষ্টি করেছে। 'যে-চার ষোলতে পূর্ণ' অর্থাৎ চারধ্বনি যুক্ত চারটি লিপি অথবা একধ্বনি যুক্ত ষোলটি লিপি। ধ্বনি-স্থানের জন্য এক-লিপি-ধ্বনি গুপ্ত রেখে ছন্দ তৈরী করেছে - দুই-লিপি-ধ্বনিও গুপ্ত হয়েছে অনেকসময়। **একটি লিপিতে দু'টি ধ্বনি এবং দু'টি লিপিতে এক ধ্বনির দুই পর্য্যায়—এই ছিল ভারতীয় বর্ণ-ধ্বনি রীতি।** তাই আমরা চন্দ, ছন্দ পেয়েছি জন্দ-তে যাইনি, 'জন্দ' পারস্যের—Zend। ভারতবর্ষে 'অন্ন' ছিল—'যন্ন' ছিল, 'জল' ছিলনা—আর্য্য ভারতবর্ষে আর্য্য ছিল—অর্জ্জুন ছিলনা। যেদিন 'জন্দ' বা 'জন্দ'-র জন্ম (যন্ম), পার্থিয়ায় সেদিনই পুত্র নিয়ে দ্বন্দ্ব সুরু। অর্জ্জুন যতোদিন পার্থ ছিল ততোদিন পার্থিয়া ছিল ভারতবর্ষের—তার সারথী ছিল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী বাসুদেব, নারায়ণ, কৃষ্ণ। পার্থিয়া বিভক্ত হয়ে হল ভারত আর ঈরাণ। ত'বু ঈগত' বা 'ঈগদেহ' হয়ে 'র'-কে (শক্তি ও ঐশ্বর্য্য মানে 'র') স্পর্দ্ধিত করে থেকে গেল পার্থিয়া-ভারত। সে-দেহের মানচিত্র পাওয়া যায় প্টোলএমির (Ptolemy) মানচিত্রে। তার সন্তান যেম্নি, প্রাথ—গঈত, তেম্নি পার্থ—গৌত—শিব-শক্তি-সুন্দর। পূর্ণচন্দ্র পার্থিয়ার পূর্ণ রূপ, পীড়িত চন্দ্র বা চন্দ্রাপীড় ভারতের। তবে সেদিনই 'মঘবঞ্জন্বার'-এর ধ্বনি নতপক্ষ সন্তানের কণ্ঠে 'মহনযদোর' ধ্বনিতে নেমে এলোনা—(গৌতমের বুদ্ধ হতে ঢের দেরি ছিল তখনো)- মিশ্রিত হল, মোহন ঝঙ্কার তুলল : 'মোহেঞ্জোদারস'। সেদিন মাত্র বুধের আর ঈশাণের জন্ম হল। ঈশয যীশের আর বুদ্ধের জন্মের সময় তা নয়। মহৎ গঠ তৈরী হল—কিন্তু মহম্মদ এলেন পরে।

ত্রিশূলে পূর্ণ একটি লিঙ্গ-মূর্ত্তি দিয়ে তাকে কোণাকুনি স্থাপন করলে তা দিয়ে ভারত বুঝত তির্য্যক লিঙ্গ, বাংলা ঈশাণ কোণ আর পার্থিয়া **কোণ-ঈশ**। কোণীশ পার্থিয়ার, ঈশাণ বাংলার, আর ভারতের হল ত্রৈলঙ্গ, ত্রিকলিঙ্গ। কোণীশ চিত্রটির কোণাকুনি বিন্যাসে খানিকটা অঙ্গচ্ছেদ হতো বলে কোণীশ-র বর্ত্তুলাত্মক ধ্বনি ঋজু কণিশ হয়ে দাঁড়াত—তার উপরে 'র' লিপি (ঊর্দ্ধগ) করে অঙ্কিত থাকলে তা হ'ত কর্ণিশ—হর্ম্ম্য-কোণ যার অর্থ। সবটুকুকোণ জুড়ে না থাকলে নত ভঙ্গীতে হত 'কোনশ'। পাশে যদি '.' এ ধরণের সমাত্রিক শ্বেত বিন্দু চিহ্ন (হস্ত চিহ্ন) থাকত তাহলে তা হ'ত 'হ'। কোনশ+হ=কোনক্ষ বা কোনস্ক[১]। ত-ধ্বনি-ব্যঞ্জক '3' চিহ্ন (পূর্ণদেহের একটি অঙ্গ[২]) আলাদা করে তার পাশে ঋজু ত্রিশূল ঈষৎ হেলিয়ে স্থাপন করলে বোঝা যেত তংক্ষন্ বা 'ৎংস্কন্'[৩]। তেম্নি 'কোনক্ষ'-কে অর্দ্ধভাগ করে 'ন'-কে হেলিয়ে (অসি-ভঙ্গী)

১। Pl. CLXIV. No. I (Left)- Mohenjo-Daro & the Indus Cviilization. Vol. III by Sir John Marshall.

২। হরতন (হরতন্থ) পূর্ণ-দেহ। চিরতন (চিরন্তন—চিরতন্থ)। পার্থিয়ার তুরণীয় (তীর-তুরগণীয়) রাজারা চিরন্তন দেবতা হয়েছিলেন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতায়—চিরতন-পরিচ্ছদে তাঁদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেছিল মোহেঞ্জোদরো। (Pl. CVIII.)

৩। Ibid No 1. (Right).



দিলে হত তা কংইক্ বা কনিক্, তাতে বাঁয়ে হেলান ত্রিশূলের 'ষ'-ধ্বনিটি যুক্ত হয়ে হ'ত 'কনিষ্ক'[১]। পরের মুদ্রাটি, কাহ+অন্ত্য-ক্-হীন 'কন্ক্'+হ্=কাহকন্হ্[২]। চন্দ্রাপীড় ভঙ্গীতে শূলপাণি পূর্ণ মূর্ত্তি-ও আছে কনিষ্কের—বোধহয় রাজমুদ্রা বা শীলমোহর—তনুভঙ্গীর আকারভুক্ত হয়ে (তনু বলতে মাথা-হাত-পা ছাড়া দেহ) ২২-সংখ্যক বাঁ-হাতি চিত্রটিতে (Pl. CLXIV—Vol. III)।

দেখে বিস্মিত হতে হয়—ভারতবর্ষ কোনো বিষয়েই মাত্রাহীন, শ্রীহীন ছিল না!

ঈশ ঈগ হয়ে যখন গঈ-এ ং-ধ্বনি যুক্তাত্মক হত তখন বাক্‌ছন্দেও সেই ধ্বনিমাত্রা-বিভাগ সুরু হয়ে যেতো। বৃহত্তম বঙ্গ বা পার্থিয়ার মন্ত্রে তাই 'জগতী' দ্বাদশাক্ষরা ছন্দ হয়েছিল—ভারতে তা অর্দ্ধমাত্রায় ষড়াক্ষরা 'গায়ত্রী'। ত্রিষ্টুভ বা ত্রিস্তব বঙ্গের, যেমন হল তার ত্রিপদী। এক লিপি-ধ্বনি ছয় ও বারো মাত্রায় যাবার দরুণই ষড়ক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর কথা দু'টির জন্ম হয়েছিল বলে মনে হয়! তান্ত্রিক ওঁ-ধ্বনি বস্তুত ছয় ব্যঞ্জনার মিশ্রণ—'হ্রীং'-ধ্বনিতে আছে বারোটি ব্যঞ্জনা। বাংলার মন্ত্রবেদ অথর্ব্ব ও যজু হয়ে শেষটায় গীত-বেদ বা সাম-বেদে চলে গিয়েছিল। মন্ত্র-ধ্বনির ভাগ চলে না। পাঠ্য-কাব্য বা পয়ার এই মন্ত্র-ধ্বনিরই বংশজাত। জয়দেবে বা কালিদাসে তা এমন সংহত রূপ পায়নি—যেমন পেয়েছিল ১২ মাত্রার চৌদ্দ লিপি-ধ্বনিতে এসে। 'নৃসিংহ'-দেব যেমন গীতজ্ঞ 'নরোত্তন' ছিলেন, কালিদাসের মুরুব্বি 'সমুদ্রগুপ্ত'ও তেম্নি ছিলেন। মুদ্রায় তাঁর যে ছবি দেখা যায় তার ভঙ্গীটি এই যে তিনি একটি 'গীটরে'র পূর্ব্বপুরুষ হাতে নিয়ে চৌপায়ার উপর বসে আছেন। রাজকর্ম্মে তা ছিল চৌকায়া—চৌকি-তক্তি এবং নভোকর্ম্মে খট্টাঙ্গ। গীটরের নাম কি ছিল 'গীতঞ্জ'? জলকল্লোলের সঙ্গে যার ধ্বনি মিল পাওয়া যায়!

লত, লগ্ন, লবণাক্ত (=মসৃণ) সমুদ্রকে সমুদ্রগুপ্ত গুপ্ত করেছেন। কিন্তু সমুদ্রকে কি গোপন রাখা যায়? এ-পারে না-হয় রাজকীয় বেড়া দেওয়া হ'ল কিন্তু ওপারের ধ্বনি ত বেড়া ডিঙিয়ে আসতে পারে। Alexandria-য় তখন (অল-একজ-অনড্রইশ=অল-একজ-অন্ত্রীয়) ১৫০-খৃঃ (?) 'কোমরীয় প্রোমঁ'—(Comoria Promaˆ) তৈরী হয়েছে। আরেকটি ইলাবৃত-মোহেঞ্জদরো বা অলকা-পুরী! (হায়রে নির্ব্বাসিত যক্ষ চন্দ্রগুপ্ত!) কয় নম্বর বলা কঠিন তবে দেখা যায় সেখানে বসে হেল্লেনইস্তীক প্তোলেমই (Hellenistic Ptolemy) চোখের জলে ভারতবর্ষের ম্যাপ আঁকছেন আর গীতবাদ্যের চর্চ্চা করছেন। সেখানেও যক্ষ। যক্ষ-প্রিয়া কে? কচ্ছমীঢ়রাণী দিদ্দা, কার্থেজের দিদো? অহল্যা-হেলেন? পাশ্চাত্ত্যের শিল্প-কলা, যন্ত্র-বিজ্ঞান সব কিছুরই জন্ম কিন্তু প্রেম-অলকা প্রোমঁ থেকে। সেদেশে পাতালমইই রাত্রির অন্ধকারে গীত-বাদ্যটা প্রথম সুরু করেন। সুরু ত করেন, তাঁর শিক্ষক ছিল কে? কোন্ যক্ষ? খবরটা নিশ্চিতভাবে জানতে হলে কালিদাসে না গিয়ে ইতিহাস-ভূগোলের পাতাগুলো আবার উল্টোতে হয়।

তথাকথিত খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে বঙ্গোপসাগরের ও বাংলার নদীর চেহারাটা ঠিক আজকের মতো

১। Idid No 2. (Left)

২। ,, ,, (Right)

ছিল না। Yuan Chwang-বিবরণীতে-ও ( যবঅন চবঅনগ = যবন-চ-বঙ্গ )[১] শ্রীহট্ট নদীতীরে বন্দর এবং কইঅ-মো-লএন-পো হিসেবে কুমিল্লা-উদয়পুর ( পার্ব্বত্যত্রিপুরার রাজধানী )[২] একটি নগর। এ-নদী ( শোনা যায় কলতো-'কান্দি'-নদী ) যখন ভাগিরথী ছিল—সমুদ্র-সঙ্গমে এসে যেদিন তা সমতট-নামক বদ্বীপ তৈরী করেছিল সেদিনের ভূগোলও শুধু ধ্বনি-কে অনুসরণ করেই তৈরী করা যায়। কাছাড়ের ( কচ্ছরের ) হাইলাকান্দি, কুমিল্লার 'কান্দির পাড়', মুর্শিদাবাদের 'কান্দি', মেদিনীপুরের কাঁথি ( ক্ষয়িত ধ্বনি ) এই দু'টি রেখা যোগ করলে সমুদ্র-ভূমি ( base ) নিয়ে যে ত্রিভুজ দাঁড়ায় তাই ছিল ব-দ্বীপের চেহারা—'বঅঙ্গ'। 'অরল' বা 'বইকল' ( অবিকল ব ? ) হ্রদের পার্শ্বস্থ মানব-গোষ্ঠী পার্থিয়ার কাছে 'ল' ধ্বনি যেমন 'জল' বোঝাত, পার্থ-দুলাল বঙ্গ-জরাও 'ল' ধ্বনিটিকে জলজ-ই মনে করতেন। জলের ধারের এলাকা বোঝাতে কৌম মানবগোষ্ঠী কুমইল্লা, কমলাসাগর, শ্রীকাইল, তালসহর, শিলচর, টাঙ্গাইল, গইলা, বরইশঅল ( বরিশাল ), নড়াইল, কলিকাতা ( কলতো-কাই ) প্রভৃতি বোঝাতেন। গ-ইলার ইশ কি ছিলেন বরিশাল ? আর ক-ইলক ( কালোরাজধানী )-জাত কলিযুগ সুরু কি তবে কলিকাতায় ? এখন 'ঈশ'র খোঁজ আর না করে এ কথা বলাই ভালো যে 'অল', 'আল', 'ইল' কথাগুলো জল-সংলগ্ন ধ্বনি। বৃহৎ কৌমের বৃহৎ বঙ্গে ছিল শিলং শ্রীহট্ট, কামরূপ ( প্রাগ্‌জ্যোতিষ ), পুণ্ড্রবর্দ্ধন; আর রাঢ়। যখন রাঢ় ছিল বাংলার কেন্দ্রস্থল, মল্লদ-গৌড় তম-দম-লিপ্তি তাম্রলিপ্তি কর্ণসুবর্ণ তখন হয়ত ছিল তার রাজধানী। অলএকঙ্গঅঙ্গীয় আক্রমণ তখনই হয়েছিল—যখন কান্দির নাম-রূপ অধিকার করেছে গঙ্গা—বাঙালী যখন গঙ্গারাঢ়ী ( রাঢ় কথাটি প্রাচীন-মিশর-লিপিতে 'নদী' )। বারুণী সংস্কৃতির মিশ্রণে 'গঙ্গাঋঢ়'। প্রচলিত গ্রীক উচ্চারণ 'গঙ্গাঋড'। বাংলার নাম সেই প্রথম ইতিহাসে ধ্বনিত হল।

বৃহত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের সন্ধান না করে এখন আমরা বিরহী যক্ষের দিকে তাকাতে পারি। ঈরাণ স্তম্ভশিলালেখ-তে একটি নাম আছে বুধগুপ্ত—তার সল্ল বা শাল, ১৬৫, তারিখ ১২ই

১। আমাদের তিনটি ইতিবৃত্ত আছে—চতুর্থটিরও সন্ধান আছে। পার্থ-যুগের 'স্তথমি'; যবন যুগের Yuan Chwang এবং যচ বা যক যুগের Y. Ch.।

২। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গলার ইতিহাসে' কুমিল্লাকে সমতটের রাজধানী বলেছেন। ছিল তা আদি রাজধানী। ইংরেজিতে কথাটি লেখা হয় Comilla—'C' লিপিতে। মগ ও মোছলেম আমলে কথাটি হয়ত চোমিল্লা ছিল। কিন্তু সর্ব্বদাই এবং ইদানীং-ও তা কুমিল্লা-ই উচ্চারিত হয়। এর অপর নাম 'কমলাঙ্ক'। অনতিদূরেই লালমাই ( লালময়ী লালমাটী ) এবং ময়নামতী বলে দু'টি ক্ষুদ্র পাহাড় বা স্তূপ আছে। 'রণবঙ্কমল্ল' নামক রাজার এবং রাণী ময়নামতীর নামের সঙ্গে এদের নাম জড়িত। ছেলেবেলায় সে-পাহাড় থেকে আমরা 'অসুরের হাড়' বা গাছের ফসিল কুড়িয়ে এনেছি। ১৯৪৪-এ আমেরিকান সৈন্যের ছাউনি হয় সেখানে। তখন 'পাহাড়' খনন করে 'মোহেঞ্জোদরো'র মতোই একটি পুরীর সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু জানিনে কেন, হয়ত ব্রিটিশেরই অনিচ্ছায়, খননের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। 'য-চ' ভুক্তির দ্বিতীয় ভাগে ( Y. Ch. II. 191-3 ) লো-টো-মো-ছিহ নাম লটমসীয় অর্থাৎ লতমসীয়, কালো মসৃণ লট বা শ্যাম সমুদ্রতীর বোঝাত। কটহ-র মতোই রণ-বং-কমলের



আষাঢ়।[১] ঐতিহাসিকদের জিম্মায় একটি প্রাচীন ( প্রাক্-চীন ? ) ভৌগোলিক গ্রন্থ আছে যার নাম Periplus of Erythræan Sea ( 'অখ্বত্রৈয়ন' সমুদ্রের 'পয়েঋপ্লবস' )। আফ্রিকার তটভূমি থেকে সুরু হয়ে সুদূর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে বিদিত বা জ্ঞাত জলরাশি ছিল তাকেই বলা হ'ত 'অখ্বত্রৈয়ন'-সমুদ্র[২]। তার মানে কোণাকোণি ( তির্যক ) ভারত-মহাসাগরের এক অংশ ও বঙ্গোপসাগর। যখন 'র' রেফ হয়নি সে-যুগের বাঙালী কোনো কবি-নাবিকেরই রচনা এই 'পয়েঋপ্লবস' বা পয়ার-প্লব।

নাবিকের সন্ধানে ঋক্‌বেদে যেতে হচ্ছে এখন।

ঋক্‌বেদের সপ্তম-মণ্ডলে ৮৮ সূক্তে ঋষি 'বসইশথ' বলছেন : 'বরুণের সঙ্গে মধ্য-সমুদ্রে নৌবিহার করছিলাম—হঠাৎ আন্দোলিত হ'ল সমুদ্রবক্ষ—আগুনের আভায় আমাদের নৌকা উদ্ভাসিত হল। দেবতা বসইশথকে তাঁর নৌকোতে তুলে নিলেন—তাঁকে বিদ্যাদান করে কবি করে তুললেন, যতোদিন চন্দ্র থাকে, চান্দ্রায়ন থাকে, ততোদিনের জন্যে তাঁর গীতিকার করে নিলেন।' এই দেবতাটিকে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা 'সুদাস' বলে আখ্যা দিতে চান—তিনি দশটি রাজার সঙ্গে লড়েছিলেন। লড়ুন কিন্তু আমরা বলতে চাই, তিনি সবদঅস,—'অ' আর 'স' শব্দ-ধ্বনি[৩]। তান্ত্রিক স্বর-ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথম মাত্রা। ধ্বনি-সংহার করে যে মহাকবি হওয়া যায় একমাত্র শাক্ততন্ত্রশাস্ত্রই খোলাখুলিভাবে সে-কথা বলে গেছেন। কাজেই বলা যায় ঋকবেদের বসইশথ তাঁর কবি-প্রতিভার জন্যে তান্ত্রিক ভারতবর্ষের কাছে ঋণী। তান্ত্রিক ভারতবর্ষের আদি-পীঠ কামরূপ-কামাখ্যা—বৃহৎ কোমের রক্ত-কুণ্ড। আদিপীঠ চট্টগ্রাম—চন্দ্রনাথের 'বাড়বকুণ্ড' বরবুদুরের বড়বরুদ্র। ত্রি পীঠের মাঝখানে খড়্গ বংশ 'জাতখড়্গকে' নিয়ে, বরকামতার চন্দ্রবংশ লহয়চন্দ্র-পূর্ণচন্দ্রকে নিয়ে কতো দীর্ঘ-রাত্রি-দিন যে কাটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জীবনে হয়ত তাঁদের ছন্দ ছিল, নন্দ ছিল, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম সবই ছিল—সোম-পায়ী চন্দ্র-ইন্দ্র ছিল, ছিল বরুণ-নারায়ণ। কিন্তু উষা ছিলনা, ছিলনা সূর্য্যের দিন। তবু 'দিব্যি'-বলার উপায় ছিল—'দিব্যি'-দেবারও উপায় ছিল। কারণ গৌরতনু দিব—কৈবর্ত্তরাজ 'দিব্যোক' ছিল বাংলার। তবে ছিলনা 'দিবৌকস'। ছিল বরুণ যার অপর নাম দুক্ষ—দুক্‌স-দউকস। অউসক নয়। তবে হ'তে পারে। আরেকটি দিনের ও দিবের দরকার ছিল সূর্য্যময় দিন আনবার জন্যে। আরেকটু উজ্জ্বলতা—আলো—প্রখরতা। 'র'-র একটি উর্দ্ধগ ধ্বনি। পূর্ণচন্দ্রে পৌর্ণমাসীর মতোই তমসা-হীন আরেক দফা উজ্জ্বলতা। আর ভালো লাগেনা রাত্রি। তাই ঋক্‌বেদ থেকে ধ্বনি উঠেছে : তমস অসিত তমসা ঘোরম। ধ্বনি শুনেছি : তৎ তমসি। চন্দ্রকে 'লয়হচন্দ্রে' লয় করে প্রভাত-তপস্যা সুরু হ'ল। সূর্য্য আবির্ভূত হ'ল। পট্টিকারার খড়্গবংশে—কিন্তু কাকে নিয়ে ? জাতখড়্গের পৌত্র 'রাজরাজরাজভট্ট' ত্রিশ্রীমণ্ডিত হয়ে কি সত্যিকারের সূর্য্যের দিন নিয়ে এলেন ? সভ্যতার প্রভাত কি জন্ম নিল ?

( প্রবাদে কালোরাজার ) ইলা বা রাজধানী কুমিল্লা তমালতালীবনরাজীনীলা ছিল। তবে এ কথাটি যে পার্থিয়ায় লটমক্ষশ ছিল তা প্রায় অঙ্ক করেই দেখিয়ে দেওয়া যায়। আর খুঁজলে হয়ত দেখা যাবে কথাটি অক্ষ-দক্ষ শকুনি-সহ ( তা বলে সে লম্পট নয় ) মোহেঞ্জোদরোতে বশিষ্ঠ হয়ে আছে।

১। Early History of the Dekkan—by R. G. Bhandarkar. pp. 221.

২। Introduction of Cunningham's Ancient Geography of India by S. N. Mazumdar Sastri.

৩। শব্দকে প্রথম পঞ্চভূতের অন্তর্গত করেন কুমারিল—কুমার + ইল।

তারপর নীল সমুদ্রে সুরু হ'ল তার বিস্তার, নদী-সমুদ্র যেন মহা-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল। রণবঙ্কমল্লদেবের আত্মায় 'উলয়শীর' (Ulysses) জলোল্লাস বলতে চাইল, আর ঘরে নয়। অ-ত্রিখত কোথায় আছে খুঁজতে চাইল তাঁর মন। তিনের সীমার বাইরে যেতে চাইল—রাত্রির বন্ধনের পর ভাঙল ত্রি-র বন্ধন—হ'ল অত্রি। অত্রি, ঋক্‌বেদের কবি-গুরু ( পঞ্চম মণ্ডল—৫ সূক্ত )। অত্রিঋষি বল্‌ছেন:

শোনো শোনো বিশ্বয়
অসুর-শূরের দেবতা বিশ্বময়
মাতরিশ্বা বরুণের গাহি জয়।
দণ্ড ও মানদণ্ডের নাহি ক্ষয়
মার্ত্তণ্ডের মুণ্ড মাতা সে মেয় পৃথ্বীর অমেয় পাদনিচয়। ৫ ॥

অপরাজেয় যে মহৎ অসুর এও তারি যেন মায়া
সব নদী সব নদ গদগদ ধ্বনি নিয়ে বহু কায়া—
বহুকায়া তবু একই সমুদ্রে মুদ্র—
একই সমুদ্র তবু অপূর্ণ তারা বহু, তারা ক্ষুদ্র। ৬ ॥

একটি দেহে নারী-পুরুষ কল্পনা—এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি—এই শক্তি আর ভক্তির উদ্গীতি বাংলাদেশের। বাংলার ত্রিনয়ন হর-পার্ব্বতী ( যা নোড়া-নোয়ার মিলন মূর্ত্তি—নোয়া Pl. CLXN a, b. । নোড়া-নোয়া=নারায়ণ ) অর্দ্ধনারীশ্বর বরুণ, অথত্রিয়ন সমুদ্রের নাবিক—বুধগুপ্ত—ঐত্র-বুধগুপ্ত বাংলার আষাঢ় মাসের বার্ত্তা—মেঘ-মেদুর অম্বর, তমাল-দ্রুমে শ্যাম বনভূমির কাহিনী দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ ঈরাণের 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে' পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। ভক্তিবাদ গ্রহণ করেই ত পারসিক সুফীবাদের জন্ম।

ঈরাণকে আরো কিছু দিল সুদাস—দিল দরয়উষ—দুই 'র', দুই শক্তি, দুই উষা—দরওষ। আর বারুণীদের দিল শুধু দুইটি উষা—উষা, প্রত্যূষা—দঅয়উষ—দ্যৌঃ—স্বর্গ। কোণার্কের সূর্য্য-নারায়ণের পত্নী ছিলেন উষা, প্রত্যূষা। এলো দৃষ্টি, চক্ষু, মন, নারায়ণ। মন বহন করে বলেই, র-'বহন' করে বলেই রাজর্ষিরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। শুধু মন বহন করতেন যাঁরা, তাঁরা ছিলেন বহ-মন বহ্মন। ঐশ্বর্য্যের আর ধনের মালিকরা, ( র+ধ )-বাহকরা ছিলেন বর্ধন। ঐশ্বর্য্যের আর মনের অধিকারীরা হতেন বর্মন—( বরাহ-যুগে )। 'ন'-'ম'-তে পা বাড়াল। ইলেক্‌ট্রন অ্যাটম্ হ'ল।

বারুণীদের দ্যৌঃ থেকে যে মন এলো তার সন্তানের দেহ-রূপই দৌষ্মন্ত। ভারতবর্ষের জন্মদাতা—পঞ্চাল-এর জন্মদাতা তিনিই। শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে তাঁরই কথা আছে। আছে, তিনি 'এরঅগনইষ'—'দৌষ্মন্তেরগ্নিঃ'। তিনি ইরম্মদ—বিদ্যুৎ। 'বসইশথ' বলেছেন সপ্তাগ্নির কথা। দুই অগ্নি ঈরাণের আর পঞ্চাগ্নি ভারতের—এ-সপ্তাগ্নিই তিনবার উচ্চারণ করবার কথা হয়ত আছে তাঁর ঋকে। এ-অগ্নি মোহেন্দ্রজ—মহেন্দ্রজ। শুধু ইন্দ্রের নয়, মহা-ইন্দ্রের আগুন এ। অলীক-ইন্দ্রের—'বোঘাষকোই'-এর ইন্দ্রের আগুন এ নয়।

সপ্তম এবং অষ্টম ঋকে নবজাতির কবি প্রবুদ্ধ অত্রি ভারতবর্ষের মর্ম্মবাণী ঘোষণা করেছেন: "যদি



বিশ্বাসী প্রতিবেশীর প্রতি, আত্মীয়-ভাই-গৃহাশ্রিত বা অপরিচিতের প্রতি অন্যায় আচরণ করি তাহলে সেই অপকৃত্যের জন্য আমাদের ক্ষমা করো বরুণ। যদি অক্ষমালা গ্রহণ করে স-অক্ষীর ( শকুনির ? ) মতো অথবা অজ্ঞাতে বা জ্ঞাতসারে কাউকে বঞ্চনা করি—যদি ছিন্নমাল অক্ষের মতো ভ্রষ্ট হই—তাহলে ছলনায় যে-পাপভাগী হব সে-পাপ থেকে মুক্ত রাখো আমাদের। আমরা যেন বরুণ-প্রিয় থাকি।" খ্রীষ্টীয় চারিত্র্য বলতে যে কথাগুলো বোঝায় তা কি আমরা সদ্যোজাত এ ভাগবত-ধর্ম্মে শুনছিনা? ঈরাণী দ্বৈত-দৈত্য-দধি-কাহিনী 'বএন-দইদঅদ'-এ[১] এ-কথার বিপরীত ধ্বনিই শোনা যায়। য়ীহুদী বাইবেল ত 'বেবেলনে'র পাঁচমিশেলি মানবকে সহ্য করতেই পারলেন না। তাঁরা তাঁদের উগ্রতা নিয়ে আর যারই জন্ম দিক সঙ্গীতের আর ছন্দের জন্ম দিতে পারেনি। বিচিত্র অনেককে নিয়ে ছন্দিত মালা গাঁথা 'মোহেনজদার'-এর তৈজসপত্রে যেমন সম্ভব হয়েছিল পৃথিবীর ইতিহাসে তেমন সম্ভাবনা আর দেখা দেয়নি। কোনো-মন্ত্র, প্রাগৈতিহাসিক কোনো ধর্ম্ম শোনাতে পারেনি 'গৃৎসমধ', 'বসিশথ' বা অত্রির বারুণী-বাণী। অবশ্য এ-বাণী একপুরুষের। পঞ্চঅল ( পঞ্চজল ) পঞ্চাল তৈরী হ'ল বটে কিন্তু পরের অধ্যায়েই সুরু হল ভাঙন। ঐন্দ্রিক সোমদেব ঋষি বরুণকে বৃত্র বানিয়ে ছেড়ে দিলেন। বন্দিদদের মতোই উগ্রতা সেখানে। ইন্দ্র-বন্দনা ও বরুণ-ভর্ৎসনা শোনা যায় তাঁর ঋকগুলোতে। বসিশথ সেদিন নেই বলেই তাঁর এই আস্ফালন। সেদিন সাগ্নিক বসিশথ অগ্নি নিয়ে অগশথের বিন্ধ্যযাত্রা করেছেন। রোমা তৈরী করছেন।

দ্বিতীয় প্লাবন-কাহিনী, অগ্নি-দাতা ও ভগ্নিদাতা 'বয়েন্দিদদ'-কে অযথা নিন্দা করে লাভ নেই। বেচারীও পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতদের হাতে পড়ে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে আপাতত আমরা ওদধির বয়েন বা সাগর-সঙ্গীতই বল্‌ছি। বলতে পারি 'বঙ্গ-ইন্দীবের বা বঙ্গ-ইন্দু-দত্ত কাব্যবস্তু'। তা কপিলাবস্তুর সামগ্রীও হতে পারে—কিন্তু কপিলাবস্তুর বুধ-টি ছিল বাংলার। সাংখ্যাচার্য্য কপিলের বাস্তুভিটেও বাংলায়ই ছিল। যেম্নি 'কুমারিলের মীমাংসা' শাস্ত্র পূর্ব্বের[২] ও উত্তরের—তেম্নি জম্বুদ্বীপের পূর্ব্ব ও উত্তর জুড়েই পার্থিয়ার ঈগল[৩] একটি পাখা বিস্তার করেছিল—তবে 'ঈগ'র আগে সে 'আগ' হয়ে অগ্রহায়ণ মাসের আগুনে শ্যাম শস্য পাকিয়ে তুলেছে। পন্নগ হয়েছে, মগ হয়েছে, ছাগ হয়েছে[৪]। যাক্, সে-কথা পরে হবে। এখন দেখছি আরেকটি পাখা ছিল তার পশ্চিম-দক্ষিণ জুড়ে—উষার সমুদ্রে ধবল, সূর্য্যোদয়ে সোনালি, দুপুরে মরকত নীল, বিকেলে বেগনি—সন্ধ্যায় ব্যাঙমা-ব্যাঙগমীর

১। "The man of another faith is a two-legged snake, deadly, destructive, making all things unclean, murderous and only to be suppressed by death, (Vendidad F, XI)

২। যেম্নি 'ধম্মপদ' 'মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মা মনোসেট্‌ঠা মনোময়া'। পূবঙ্গ বা পূব বঙ্গের বৌদ্ধতান্ত্রিক ষট্‌চক্রভেদের কথা বলেছেন 'ধম্মপদ'। মনো=মন্ত্র।

৩। ভুবনেশ্বর 'লিঙ্গরাজে'র মন্দিরটিতে পার্থিয়ার ম্যাপের ঈগলাঙ্গ আছে। স-কে ল-পড়া ব্রাহ্মীতে হ'তে পারে—নীচের ঢেউটি একটু উঁচু-নীচু-র ব্যবধানমাত্র আছে লিপি-দুটিতে।

৪। যোগাচারে অজ 'ছাগ' হল—হল ছয় আগুন। তন্ত্রাচারে মাংস ভক্ষণ চলল। 'সায়াম' ছাগকে 'ছায়া' করে নিল—সূক্ষ্ম তত্ত্ব করে নিল। সিয়ামের 'ধম্মপদ' তাই বলছে: 'ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া' ব অনপায়িনী'।

গল্পের বর্ণে রহস্যময়। কিন্তু তার আগে ত ছিল সে ডানা-হীন—ডানা-কাটা পরী—রাত্রির লাবণ্য। মিশরের মিশ্রণে—ত্রিস্বরেরও মিশ্রণে। টিপুরায়-বাটাভিয়ায়, মণিপুরে-বরবুদুরে, সিয়ামে-সিঙাপুরে? কিন্তু সে ত চিত্রিতা চন্দ্রিকা রাত্রি—এক নয়। ঘোরা তামসী নয়—অন্ধ রজনী নয়। 'কটাহে'র কালো মানুষ নয়। 'কের'-পূজক 'কুকী' বা 'চাক্‌মা' নয়। কৌম-লঙ্কার ( কমলাঙ্কর ) রবণ রণব-স্কমল্ল নয়। 'ক' যেদিন এক ব্যঞ্জনায় ছিল—'কু-কী' ( পার্ব্বত্য ত্রিপুরার জাতি ) সেদিনই মানুষের ভাষার জন্মদিন।

আর কৌম সভ্যতার জন্মদিন সেই মুহূর্ত্তে যেদিন কালোরাজা রণবঙ্কমল্ল চন্দ্রনাথের বাড়বকুণ্ড হয়ে দক্ষিণে যাত্রা-সুরু করলেন—'উদয়পুর' থেকে বঙ্কক হয়ে বরবুদুরে। হয়ত বরবধূতে 'পয়গড'তে ( প্যাগোডা ) বাসর জাগলেন। তারপর সায়ামের ছায়ায় শ্যাম-মূর্ত্তিতে পয়ান্ন খেতে লাগলেন। শুধু মানুষের জীবনেই নয়, পৃথিবীরও জীবনে হয়ত রাত্রি ছিল সেদিন। পৃথিবীর ভ্রূণস্থ অগ্নি—আর আকাশের চন্দ্রমণ্ডলই ছিল হয়ত সূর্য্যের নববধূ, সুদূর নক্ষত্র থেকে সূর্য্য-কক্ষে নবাগতা পৃথিবীর প্রাচীন রূপ। সে-চন্দ্রমণ্ডলের বার্ত্তা কারো জানা নেই[১] কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে মোহেঞ্জোদরোর মুদ্রিত-পৃষ্ঠা যেন প্রতিধ্বনির মতো তার বাণী আমাদের কানে দিয়ে যায়।

ধ্বনি আসে কৌম-লঙ্কা কুমিল্লা-কমলাঙ্ক থেকে। আসে রণবঙ্কমল্ল থেকে। আসে এথনোলোগয়ী-এথনোলোজয়ী ( Ethnology[২] ) এথেন্স-জয়ী থেকে। যেমন 'মহিষ্ম'-ধ্বনি আসে মাপ-রচয়িতা টোল-মহাশয় থেকে ( Map of Ptolemies ) । আসে 'জএন্দ' ( Zend ) থেকে—'মঅসহইঅনঅ'—আসে মহষি, মহাশয়, মসিয়েঁ থেকে। রণবঙ্কমল্লের 'হপ্তঅত্র মঠ'—'সপ্তরত্ন মঠ' থেকে অভিশপ্ত প্রত্ন রাবণ বেরিয়ে আসে। ভগ্নীদাতা শল্ল—মহাপ্লাবনের তারিখ-দাতা 'বএন্দইদঅদ' শোনাচ্ছেন :

"অলওরস যইমঅ হতএনদইত চএততএ তএররএ ( এত লঅ রএনদইত )
পলবস গরঅনদএ দ'বন তইএরস কু'এললএ ন'হতঅইত ঔপঅরঅভঅনত।

অলওরস=জল-আলোর সন্তান ( নারায়ণ, বাসুদেব, রাম )।
যইমঅ=যম।
হতএনদইত=ইন্দঘাতক তনু, দয়িতকে হনন করল। হত-ন দিল।

১। ঈরাণী শ্রুতি ঋয়েত ( ঋক্‌বেদ? ) যেন খবরটা দেন : "অইনল ইন্দী ত্রঅদ্ সচর দর পঅরসেন"—অনল তিন ইন্দুকে দিল বা ভক্ষণ করল—সূর্য্যানল দর্শন-স্পর্শন দ্বারা তাদের চয়ন বা সঞ্চারিত করল। 'ইন্দ্র-সচী'র জন্ম-বৃত্তান্ত? সাঁচীস্তূপের কথা? 'অক্কড'-রা জল-স্তূপ-কে 'ক', গানকে 'চ' বলত।

২। আমরা যেমন Phonology-র নাম দিয়েছিলাম 'ধ্বন্যালোক', তেম্নি হয়ত Ethnology-র নাম দিয়েছিলাম 'অত্নোলোকী'। বিদেহের অতনুর সেবায় বীতরাগ হয়ে 'অউমন'-এর পর সূক্ষ্ম 'অটোন' মন্ত্র যেদিন এনেছিলেন মিশর-রাজ অথুটোন—আমাদের অথুতোন—অথুতনু এনেছিলেন সেদিন 'অত্নো'—মন্ত্র। তাকেই 'মিলিন্দু' বলেছে 'যবন-চ-বঙ্গ'—মিলনসাধক ইন্দু। মলিন-ইন্দু।



চএততএ=চারে-তিনে, চরে-তটে। চয়ন করল।
তএররএ=ত্রি-তে। ত্রাণকরতে।
এত এল রএনদইত=এ-এলকে রঞ্জিত করল। এ-স্থানে থেকে দয়িত হল।
পলবস গরঅনদএ=প্লাবনের গ্রন্থদ্বয়।
দ'বন=দগ্ধকরল—দোহন করল—দমন করল। দিল।
তইএরস=এখান থেকে তিনটি।
কু'এললএ=কুমিল্লা থেকে (?) জল-এলাকা হতে। এল-কুল নিয়ে। জল নিয়ে।
ন'হতঅইত=এখান থেকে নৌযোগে নিয়ে গেল। স্নান করল।
ঔপঅরঅভঅনত=ঊর্দ্ধলোক নত, আভা অনত।

এ-বাক্যটির অর্থ নানারকমই হতে পারে। লিপি-পাঠজ্ঞরা এর পাঠে 'যম'কে ভগ্নাংশের জন্মদাতা বলে মনে করেছেন॥ তিনি 'তিন'-কে চার ভাগে ভাগ করেছিলেন প্রথম—তাই কি ভদ্রলোক 'তিনি'—'সে' নয়? মহাশয়-ব্যক্তি ত! ভদ্রলোক ছন্দের জন্ম দিচ্ছেন দেখা যায়! ছান্দোগ্য ( ছাগ[১]+ওন্দ+গীয় ) তৈরী করছেন? যোগতন্ত্র উপনিষদ স্রষ্টা। জনক-সভার যাজ্ঞবল্ক্য? জনকের রাজসভার ঋষি—নূতন-বিদ্যার, নূতন-জ্ঞানের প্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য? গার্গী-মৈত্রেয়ীর স্বামী? ঈরাণে গার্গীকে রেখে এলেন তবে! মৈত্রেয়ীকে নিতে এলেন ভারতবর্ষে। মৈত্রেয়ী কি চিত্রাঙ্গদার মতোই পুরুষ-মেয়ে, তাই 'দয়িত'? এবং গীতজ্ঞা, গীতজ্ঞা, রাজ্ঞী—জনক 'মহাশয়ে'র, মহর্ষির মহিষী?

সঙ্গীতে 'তেনক অঙ্গ' বলে একটি কথা আছে। 'তেন' শব্দ থেকেই তার আবির্ভাব। সঙ্গীত-রত্নাকর বলছেন : "তেনেতি শব্দস্তেনঃ স্যান্মঙ্গলার্থপ্রকাশকঃ।" তার মানে 'তেনা'-শব্দটি মঙ্গল-বাক্য, যদিও তা স্ত্রীলিঙ্গ, 'তেন' হয়ে পুংলিঙ্গ বোঝাবে। কথাটিতে 'দয়িত' এবং 'দয়িতা'র ভেদ লোপ হয়। আর 'তিনি' পদটির আবির্ভাব 'তিন' অঙ্কটি থেকে বলেই মনে হয়।

পদের বিষয়গুলো ভাষাতাত্ত্বিকরা দেখতে থাকুন—আমরা দেখছি ভদ্রলোক যম তিনি সেজে দময়ন্তীর দয়িতকে হনন করেছিলেন। ঋক বেদ থেকে আমরা 'যম-যমী'-র জমজমাট উপাখ্যানে জানতে পারি যে ওঁরা ভাই-বোন এবং বৈদিক আর্য্যদের পূর্ব্ব-পুরুষদের ( পূর্ব্বাঞ্চলের জাতি? ) ভাই-বোনে বিয়ে চালাতে আপত্তি ছিলনা। শাক্যরা, মানে শাকদ্বীপীরা ( দীপ=প্রদীপ। বাংলার 'ব'-যোগে দ্বীপ হয়েছে। ) ভগ্না-বিবাহে শক্য বা সমর্থ ছিলেন। সমাজ-বিধি যখন জন্মায়নি তখন এ-ধরনের আচার মোটেই অশোভন ছিলনা।

'ন'হতঅইত ঔপঅরঅভঅনত' অর্থাৎ নোহত ঐত ঔপরভন্ত—লিপিতে 'নোহ-( প্লাবন-পুরুষ ) স্বর্গ-দেহ আবুপর্ব্বতগত'ও একদা বুঝিয়েছে। রাজপুত জাতির সৃষ্টির ইতিহাস বশিষ্ঠের সঙ্গে এবং আবু-পর্ব্বতের সঙ্গে জড়িত।

১। তন্ত্র ও উপনিষদের সঙ্গে ভাগবতধর্ম্মের যোগাযোগ বেসনগরের 'গরুড-ধ্বজ ( গরু থেকে গুরু—তন্ত্রে গুরুর উল্লেখ আছে—গরুড=গুরুদ )-স্থাপন-লিপিতে আছে। যোগতন্ত্রের বা ভাগবতধর্ম্মের তিন অমৃত-পদের কথায় 'ছাগ' বা ছয় আগুনের ( ষট্ মন্ত্রের ) উল্লেখ করেছেন 'ভাগবত হেলিওডোরা'। 'ধম্মপদে'ও তাই আছে।

কুলীন-ব্রাহ্মণ এনে ( রাজপুত ব্রাহ্মণ ? ) আদিশূর বাংলায় কুলীন-ব্রাহ্মণ তৈরী করেছিলেন বলে বাংলার কুলপঞ্জীতে (Book of kings) উল্লেখ আছে। কথাটা দেখা যায় খুব ভিত্তিহীন নয়। 'সেন'রাও অনুরূপ কীর্তিমান। বল্লালের মা নাকি ছিলেন শূর-বংশীয়া, ঐতিহাসিকরা এটুকু স্বীকার করেন। ঐতিহাসিক হেমচন্দ্র রায়, লক্ষ্মণ-সেনের মহিষী বা রাজ্ঞী হিসেবে 'টৎটনদেবী'-র সন্ধান পেয়েছেন। ত্রিস্তনযুক্ত মহর্ষি ( তৈজস ) মূর্ত্তি মোহেঞ্জোদরোতে আছে (Pl. C. N. 4—5)—যাঁর মুখমণ্ডল তৃতীয় স্তনাকার বা তনুর আকার। তাঁর হাতে চারটি করে আঙুল। পঞ্চমাঙ্গুলির জন্ম—'করপল'-সহ ( carpal )—সম্ভবত 'ল'-লিপি-চিহ্নে ( No. 8. ) দেওয়া হয়েছিল। হাত কি করে হাতীর হাত বা শুঁড় হয়[১] আর শুঁড়—শূর—আদিশূর—ঐরাবৎ—আদিসূর্য্য, তা PI.C.-পৃষ্ঠাটির দিকে একবার তাকিয়ে ঐরাবতের ধ্যানস্থ, নতনেত্র মূর্ত্তিটির ( No. 9 ) দিকে তাকালে হৃদয়ঙ্গম হয়। তন্ত্রশাস্ত্রের 'কুল-কুণ্ডলিনী'র উদ্ভব-রহস্যও এখানে আছে ( No. 3-4 ) এবং তা যে আয়ুর্ব্বেদ-প্রাণিবিদ্যা-শারীরবৃত্তের সঙ্গে জড়িত তা-ও আমরা এ-পৃষ্ঠাটি থেকে নিঃসন্দেহে জানতে পারি।

মোটের উপর পূর্ণাঙ্গ মানুষের প্রথম আবির্ভাব অর্দ্ধনারীশ্বর নটরাজ রূপে—পূর্ণ পুরুষ বা পুরুষোত্তম ( পুরী ) হিসেবে আবির্ভাব তাঁর 'কটকে'—'কটাহে' নয়। সেখানে তিনি কৃষ্ণ-বাসুদেব-নারায়ণ-শ্যাম। নটরাজ, ঈশাণ-শ্যামার মিশ্রণ, মহেশ্বর-মহেশ্বরী। তাঁর বাল্যাবস্থা বলরামে—বালেশ্বরে—বামন-অবতার সেখানে তিনি।

তন্ত্রশাস্ত্রের ছান্দসিক নাম হবে পঞ্চশাস্ত্র—বিষ্ণুশর্ম্মার 'পঞ্চতন্ত্র'। তন্ত্রানুসারে ষট্‌চক্রভেদ[২] মানে তখন পঞ্চানুসারে 'ষট্' ও 'চতুর্'-কে বিভাগ। সেখানে প্রথমা থেকে যে সৃষ্টির অঙ্কুর নির্গত তার কথাই বিবৃত। 'ষট্‌চক্রনিরূপণম' সুরু করছেন :

অথ তন্ত্রানুসারেণ ষট্‌চক্রমোদ্গতঃ।
উচ্চতে পরমানন্দনির্ব্বাহ প্রথমাঙ্কুরঃ॥

ক-চ বর্গে এই বোধহয় পূর্ণ ট-বর্গের প্রথম আবির্ভাব। ভট্টাচার্য্যদের, ভট্টদের আবির্ভাব।

১। শুঁড় থেকে শুঁড়ি ( শুঁই )। বালেশ্বর থেকে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত—'মুশদপুর-আকিন-নিমাৎপুর-পশেরবিন্দা-কুচিলাডাঙ-ডোমাইপুর-বারবাটিয়া-বেলা' প্রভৃতি গ্রামে বলরামের বংশজ কালো শূর বংশের ধ্বনি মানুষরা আজ পর্য্যন্ত বহন করছেন। 'বারবা'-'টিয়া'ও আছে সেখানে—বাটাভিয়ার আগুন নিয়ে যে এসেছিল।

২। তন্ত্রের সঙ্গে যোগের মিশ্রণ। কুমারিল-কপিল এই যোগের জন্মদাতা। কুমারিল ষষ্ঠভূত তৈরী করেন। পঞ্চভূতে শব্দ-নামক একটি মহাভূতের আবির্ভাব ঘটান। শব্দের গুণ হ'ল ধ্বনি ( Tone )—পঞ্চালের পঞ্চতন্ত্রে মন্ত্র-ধ্বনি বা বাক্-ধ্বনি নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার মীমাংসা করেন কুমার-ইল। তিনি কুমারিকায় যে কুমারীর সন্ধান পান তাঁরই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত কুমারিকায়—সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছেন স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের আশায়। হেলেনের মতো, রাম-প্রত্যাশী অহল্যার মতো। ফিরে কি এলেন স্বামী? হেলেনকে জয় করে কোমরি প্রোম ( Alexandria ) স্থাপন করে সেখানকার কুমারীদের চোখের জলে ভাসিয়ে ফিরে কি এলেন আবার ভারতবর্ষে?



ভট্টপল্লী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম তৈরী হল। মিলনাত্মকা সেতু হলেন চণ্ডিকা—'কডেহ'-পেয়ে। ত-বর্গ এসে হল 'চন্দ্রিকা' 'নরসিঙ্গ'-দেবের পিশীমা।[১] চতুর্ব্বর্গ-প্রাপ্তিতে ছন্দের ও নাচ-গানের আসর জমে উঠ্‌ল। ত্রিপুরার 'নাটঘর' গ্রামে 'নটরাজ'-মূর্ত্তি নাচতে লাগলেন—অন্ধ্রদেশে কালোপাথরে নটরাজ তাণ্ডবে কালো পার্ব্বতীর লাস্যকে পরাভূত করলেন। আর গৌড়-মগধে ( মল্লধ-মালদহ ) নটরাজ ঈশাণের গম্ভীর স্তব চল্‌ল ( গম্ভীরায় ) কাপালিক ধ্বনিতে :

'শূলকপাল ॥১॥
পাণিত্রিপুরবিনাশি ॥২॥
শশাঙ্কধারিণম ॥৩॥
ত্রিনয়নত্রিশূলম ॥৪॥
সততমুময়া সহি ॥৫॥
তং বরদং হৈ-হৈ-হৈ-হৈ ॥৬॥
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ ॥৭॥
হৈ হৈ হৈ হৈ হৈ ॥৮॥
নৌমি মহাদেবম্ ॥৯॥'—( গীতসূত্র সার )

ধ্বনি-সহ বেদ-গানের স্তোভাক্ষর এখানে বিদ্যমান। 'হৈ' মানে উর্দ্ধগতি। আর 'সততমুময়া' শব্দের 'উমা' ছাড়াও 'ম্উম্' শব্দটি তান্ত্রিক 'ওঁ'—তিব্বতী 'হুঁ'-ধ্বনিটির মতো ধন্যাত্মক।

এ-নটরাজ পূর্ণচন্দ্র। শূলপাণি। ত্রিপুর বিনাশ করেন—( মণিপুর-উদয়পুর-সিংহপুরে যে ত্রিপুরা তাকে ? )। শশাঙ্কধারী শশাঙ্ক ( চন্দ্রচূড়, চন্দ্রাপীড় নন )। নূতন-ভাবে বিন্যাস করেন তিনকে—ললাট ত্রিশূলে রঞ্জিত করেন আর ত্রিনয়নে শূলাগ্নি প্রহারে মদনভস্ম করেন। ক্ষৌণীশকে নৌমি।

১। 'দেবপালের নালন্দা-দানপত্রে' যা দেখা যায় তার গল্প শুনুন : এক রাজা ছিলেন যব-ভূমিতে। ( গল্পকে 'পরস্তাব' বলে ত্রিপুরাতে—'পরস্তব' বা 'প্রস্তাব'—যে-কোন শব্দ তৈরী করা যায় কথাটি থেকে—আদি বাংলা ভাষা ঠিক এমন ছিল )। রাজাকে বলা হত 'শৈলেন্দ্র বংশ তিলক'। তাঁর একটি ছেলে হল। যেমন 'ইন্দ্রের ছিল পৌলোমী' তেম্নি 'অগ্রমহিষী' হ'ল এ-ছেলের 'তারা' নামে একটি মেয়ে। 'তারা'-সুন্দরী কে? মহাবাহু 'ধর্ম্মসেত্ব'র মেয়ে। ধর্ম্মসেত্বকে 'ভর্ম্মসেত্ব' ও বলা যায়। যুদ্ধও করতেন কি না! তিনি ছিলেন চন্দ্র-বংশের রাজা। সে বংশকে বলত 'রঅঞ্জহ সোম-কলান্‌ভ্‌য়সয় ধর্ম্মসেতোহ্'। তার মানে, এক ধর্ম্মসেতুর সোম-কলা ( নভোশায়িত ) নভাশ্রিত হয়েছিল তাকে আবার রঞ্জিত করেছে যে বংশ। নবজাত চন্দ্রবংশ। চন্দ্র-রঞ্জক বংশ। আসল ধর্ম্মসেতুর বংশ নয়। রাঙা-চাঁদকে সূর্য্য মনে করলে, সূর্য্যবংশ। কাজেই ধর্ম্মসেত্ব নামে দোষ নেই। যেম্নি শুদ্ধোদন আর মায়ার একটি প্রসিদ্ধ পুত্র হয়েছিল তেম্নি তারার কোলে একটি ছেলে এলো—যশস্বী 'বালপুত্র' তাঁর নাম। বিত্ত অস্থায়ী, তিনি বুঝতে পেরেছেন—নালন্দার গৌরবে মুগ্ধ হয়েছেন—সেখানে একটি 'বিহার' নির্ম্মাণ করতে চাইলেন বালপুত্র। তখন তিনি 'স্বভর্ণদ্বীপাধিপতি ( শ্বর্ণদ্বিপাধিপতি ) মহারাজ-শ্রী-বালপুত্রদেব। আর তাঁর দূতক ( ধর্ম্মাক্ষ-রক্ষক ) 'ধর্মাধিকারে'স্মিন' হ'ল শ্রী-বলভর্মা-ভয়াঘ্রতটী-মণ্ডলাধিপতি। মানে, একজন কাপালিক। কোথায় এখানে বৌদ্ধ?

কনিষ্ক-চন্দ্রাপীড়ের সঙ্গে তার ব্যবধান খুবই অল্প—তিনি ঈশাণ বা ক্ষৌণীশ। কোণেও আছেন ঋজু-রেখায়ও আছেন—তিন হয়েও চারভঙ্গীতে আছেন পূর্ণতায়। চন্দ্র গুপ্ত হয়নি—এক কলা হ্রস্ব হয়েছে তিনের ভঙ্গীতে। তাই ছন্দ হয়েছে।

নূতন তিনের ছন্দ-ভঙ্গীতে তিনি যেমন শিল্পী নটরাজ—তার একের বা পূর্ণ-ভঙ্গীতে আদিশূর—বলরাম। একটি নূতন ধ্বনিপ্রণব—নূম্। তাঁরই সন্তান, বালক রাম। জনক-জননীর দুই মূর্ত্তিতে একমূর্ত্তিধারী। বটকৃষ্ণ তিনি—বটপত্রে ভাসমান—প্রলয়-পয়োধিতে। অর্দ্ধনারীশ্বর নটরাজ বলছেন 'ম'-কারের ঊর্দ্ধে 'নাদোঽসৌ বলধবলসুধাধার-সন্তান-অহ-অসী।'—আমি নাদ-বিন্দু, ন্-বিন্দু, আমিই সদ্যোজাত বলরাম মেয়ে আমার, চন্দ্রিকা-ধবল। ত্রিমূর্ত্তি মহেশ্বরের (আবু পর্ব্বতে) জন্ম। শৈশব তাঁর বাটাভিয়ার বটপত্রে বটকৃষ্ণে। বাল্যাবস্থা বলরামে বালেশ্বরে। যৌবন তাঁর পুরীতে পুরুষোত্তমে—তখন তিনি নারায়ণ, লক্ষ্মণ—নারায়ণী, লক্ষ্মী। যুগ্মমূর্ত্তি তাঁর নারায়ণী-লক্ষ্মণে। তাই নারায়ণী-সেনা বা 'গণ' জাতি তৈরী হয়। লক্ষ্মণ-সেনা তৈরী হয়। তাই লক্ষ্মণ-সেন তৈরী হতে পারে না—তৈরী হয় 'লক্ষ্মণ-সেনীয়' জাতি, আদিশূর যাদের উৎস। তাই শূর বংশে বল্লাল-জননীর জন্ম হয়। এক-মূর্ত্তিতে তৈরী হয় মুকুটে ত্রিশূল আঁকা বটের-ঝুড়ি-জড়ান-তনু বিষ্ণু মূর্ত্তির। পন্নগের নাগ-তনু দু'পাশে আছে তাঁর—ফণা-সহ ফণী। তাই শূলকপাল শীলাদিত্য শ্রীহর্ষ হয়। সেই দু'টি ফণা শ্রীহর্ষের মুকুটে কান ছুঁয়ে আছে। 'সন্তান' তখন 'অহসী'—নটরাজের ক্ষয়ে—সন্তানের উদ্ভবে নটরাজও 'অহসী'। অস্তিত্ব টিঁকিয়ে রেখে সে ক্রমে সাহসী এবং 'সহসী' হল। দুই 'র' বা শক্তি ও ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করে 'সর্হস্রী'। ভোল-পাল্টে, পুরুষ হয়ে—শ্রীহর্ষ। একটি 'স'-কে 'ম' করে ফেললেই অর্থাৎ অংস্কারকে চিনতে পারলে আর শক্তির ভাটার টানে একটি 'র' উধাও হলে 'সর্হস্রী' অবলীলায় 'মহর্ষি' হয়ে যায়। শ্রীহর্ষের বংশ যে 'কদেহে' (কালিদহ কংসালয়ে) বা দক্ষিণবর্ম্মায় তা তৈলঙ্গদের সঙ্গে বর্ম্মার চিরন্তন যুদ্ধ, মোহেঞ্জোদরোর দারু-শিল্পে বর্ম্মার ছাপ, মনসার আবির্ভাব থেকে স্পষ্ট হয়ে আসে। নালন্দা-দান লিপি তা সুস্পষ্ট করে দেয়। দুই দেহধারী ব্যক্তিটি ধর্ম্মের মহাযানে নতাক্ষ হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন। তারপর রাজা হয়ে ছাড়লেন। বুদ্ধ-অশোক সবই হয়ত। তবে নটরাজের ছেলে হয়ে তাঁকে আপোষ করতে হল।

শ্রীহর্ষ-সম্পর্কে অনেকগুলো কথা বলে ফেললাম। কিন্তু সবই যে বাজে কথা এমন নয়। একটু পরেই তা মালুম হবে। 'পাল-সেনে'র মিশ্রণে যে চন্দ্রধবল অর্থাৎ পীতাভ পলসন মাখনের টুকরোটির জন্ম হ'ল তার প্রলোভন আপাতত সম্বরণ করে এখন চলুন 'সুন্দরে'র মতো 'অশ্বমনোরথে' 'বিদ্যা'র উদ্দেশে যাত্রা করি।

তার আগে ভারতচন্দ্রকে একটু প্রণাম জানিয়ে যাই। তিনিই দক্ষযজ্ঞ নাশ করে সুন্দরকে পাঠানোর খবরটা আমাদের জানিয়ে গেছেন। ঘোড়ার-গতি ছন্দটাও তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া যাবে। ঘোটক-ছন্দটা শুনতে কেমন লাগে বলেই হয়ত তার নাম 'তোটক-ছন্দ' হয়েছিল—তা থেকে তূণক। আলেকজাণ্ডার সাক্ষী দেবেন ঘোড়া আর তূণ-বাণের বিষয়টা পার্থিয়ন—অর্থাৎ 'তুরণীয়'-সম্প্রদায়ের। যেমনি 'তুরগ-তূণ' মিশে 'তুরণীয়' তেম্নি ঘোটক-তূণক মিশে 'তোটক' ছন্দ আর কি!



শ্রদ্ধেয় অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এ ছন্দটিকে 'পর্ব্ব-পর্ব্বাঙ্গ-রীতি'তে ফেলে চার ভাগ করেছেন।[১] ১২টি ধ্বনিকে সমান তিন ভাগ এবং সমান চার ভাগ করা যায়—তাই তা ছন্দ। কিন্তু চার ভাগ করে তিনি যে-ভাবে ধ্বনি-বিন্যাস করেছেন, ওরকম ধ্বনি-বিন্যাস এ-পয়ারটির নয়। তাঁর বিন্যাসে ধ্বনির মাত্রা হয় ১৬। পূর্ণমাত্রায় ধ্বনি-স্পন্দিত ছন্দ-তৈরী হয়না। তিনি যে সুন্দর উদাহরণটি দিয়েছেন

"রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরম্'

তাতে মাত্রা আছে ১৭টি। শেষ ভাগে 'হ্রস্ব-হ্রস্ব-দীর্ঘ' বলে তিনি ধরে নিয়েছেন। তা হবে, দীর্ঘ-হ্রস্ব-দীর্ঘ। যেমন

| ৪ | ৪ | ৪ | ৫ | =১৭ |
|---|---|---|---|---|
| রণনির | জিতদুর্ | জয় দই | তয়পুরম্॥ | |

ভাগ করে দেখাতে হল কিন্তু ভাগ এর চলেনা—তিনটি স্পন্দনে ঘোড়া তিনবার পা তোলে পদটিতে—এতে তার বিশ্রামের দরকার হয়না। 'তোটক জাতীয়' ছন্দের মতো এ **ছন্দটি তিন-দুই ধ্বনির মিশ্রণ—এখানে বিশেষত্ব এই যে ২০ মাত্রায় পাঁচের আর চারের সমান ভাগ চলে। আর মাত্রাও সমান ধ্বনিবহন করেঃ তার মানে ৫ মাত্রা=৩ ধ্বনি, ৪ মাত্রা=৩ ধ্বনি। মোট ১২ ধ্বনি।**

ভারতচন্দ্রের 'ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে'—বাক্যটির ১২ ধ্বনির ছন্দের নমুনা এই :

| ৪ | ৪ | ৬ | ৩ | =১৭ মাত্রা |
|---|---|---|---|---|
| ভূতনাথ্ | ভূতসাথ্ | দক্ষযজ্ঞ | নাশিছে | |

ভারতচন্দ্র এ-কথাই বলতে চেয়েছেন যে **একটি পূর্ণ অবিচ্ছেদ্য বাক্য-পদ নিয়েই ছন্দ**—ভাগ করতে গেলে 'দক্ষয' পড়বে ৪-মাত্রার ভাগে 'জ্ঞ নাশিছে পড়বে ৫-মাত্রার ভাগে।

তারপর ১২ ধ্বনির 'ফণী'র খবর :

| ৪ | ৪ | ৫ | ২ | =১৫ মাত্রা |
|---|---|---|---|---|
| ফণাফণ্ | ফণাফণ্ | ফণী ফণ্ণ | গাজে | |
| ৩ | ৪ | ৪ | ২ | =১৩ " |
| দিনেশ | পরতাপে | নিশানাথ | সাজে | |

প্রত্যেকটি পদে পয়ার-রীতিতে সমান মাত্রা থাকেনা। **পয়ার-রীতি মানে সম-বিষমের মিশ্রণ**। পয়ার আর্য্য কুলীন ছন্দ নয়--মচ্ছ-দেশের-ছন্দ। মীন-রাশির দেশ বাংলা দেশ। 'থিব-মিন'-এর সঙ্গে যার ছিল নাড়ির যোগ প্রাগৈতিহাসিক যুগে—এবং সে-সংযোগে অক্ষদ হয়ে য়ীহুদীপূর্ব্ব প্রাচীন সেমিটিক জাতি 'অক্কড'-এর ('প্যাগোডা'-পিরামিডও সঙ্গে ছিল) 'স্বরগণ' (Sargon) রাজাকে তৈরী করেছিল। তারপর পার্থ হয়ে ছুটিয়েছিল শিং-ওয়ালা ঘোড়া (Pl. CLXII)—হয়েছিল 'তুরণীয়' বা তূরগণ। দেখুন অদৃষ্টের কি পরিহাস, পাঠান সেজে বাংলাদেশে প্রথমই কি না এলেন 'তুঘ্রিল তুঘণ খাঁ'! সেজে এসেছিলেন না, তৈরী হয়েছিলেন? ১৭৮৫ খ্রীঃ দেখা যায় বর্ম্মার রাজা 'বোধউপয়' আরাকান, মণিপুর, আসাম জয় করছেন!

এশিয়া প্রদক্ষিণ করা গেল। এখন 'পয়গড' (প্যাগোডা) এবং পন্নগের খোঁজ করছি।

১। বাংলাছন্দের লক্ষ্যত্র—১৮৩ পৃঃ।

মোহেঞ্জোদরোর স্থূলকায় চিরতন-মার্কাপরিচ্ছদ-ভূষিত শ্বেতাভ চেহারাগুলো ( P1. XCVM ) মিশর+মোঙল আদল এনে দেয়। এদেরই আমি অশ্বদ, 'অক্ষদ' মনে করি—এঁরাই তুরণীয়। জম্বুদ্বীপের পূর্ব্বপ্রান্তে কোনোসময় এই জাতিরই কেউ বাংলার 'ব' দ্বীপের অধিকারী হয়েছিলেন। হ'তে পারে তিনি জনমেজয়—'তূর ক-অভশীয়'-ছিলেন যাঁর পুরোহিত। হতে পারেন তিনি শ্রীহট্টরাজ ( ১৫৩ সন ) শ্রীহর্ষ ( পশ্বপতি শাসন-লিপি )—কামরূপ-রাজ ভাস্করবর্ম্মা। তারপর 'ত্যাগসিংহ' 'বুদ্ধদেব'। একেরই তিন মূর্ত্তি।

আমি যাকে 'হ'-'চ' এবং 'যবন-চ-বঙ্গ'-যুগ বলেছি—সে-যুগটাই এ-যুগ। যব-ভূমির লোকদেরই 'যবন' বলা হত। যব-ভূমি যব-দ্বীপ থেকে সুবর্ণভূমি ( সোনার খনিযুক্ত )—রঙুন ( রঙ-উন ) হয়ে 'অরকন্' ( আদি সংস্কৃত নাম আরাকান ) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চট্টগ্রাম ( আদি সংস্কৃতনাম 'চাটিগ্রাম'—৮২০ হিঃ 'মহেন্দ্রে'র মুদ্রা ) ছিল তাম্রাভ চাকমাদের অধীনে। ক+চ ( কুকী+চাকমা ) মিলে কচ সেজে দেব-বিদ্যা বা দেব-যানী ( সুরবিদ্য=মহাযান ) শিখতে গিয়েছিলেন। দেবযানীর প্রথম বর হয়েছিলেন কচ। 'জন্দ'-এ 'অহরইমন' ( সর্প ) বলতে এদেরই বলেছেন। অহির মতোই হিম এরা। কারণ তখন তাঁরা মধ্য এশিয়ার 'তক্ষক'। পরিক্ষিৎ—রাজা এদেরই ছিলেন। এঁরাই তাঁর দৌরাত্ম্যে—জয়োন্মাদনার-জনমেজয়ত্বে বাদ সাধেন—কাজেই জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ। তারপর 'যযাতি'র আমলে সন্ধি হয়ে যুক্ত হয় তারা আবার। কিম্বা একেরই তিন-রূপ ব্যাপারটা। এঁদেরই পূর্ব্বপুরুষ কেউ মনসা-মূর্ত্তিতে দারুশিল্পের দু'টি অপূর্ব্ব নিপুণ নিদর্শন রেখে গেছেন মোহেঞ্জোদরোতে ( No 9.-I0, Pl. CLIX )। সুমাত্রার সুমিত মাত্রায় বর্ম্মার দারু শিল্প-ভঙ্গী এতে বিদ্যমান। জগন্নাথ ( দারুব্রহ্ম ) কেন হলেন—কেন গঞ্জামে চট্টেশ্বর শিব আর চট্টগ্রামে কেন চট্টেশ্বরী—পুরীতে কেন দারুব্রহ্ম জগন্নাথ—কুমিল্লাতে কেন সপ্তরত্নে মণ্ডিত জগন্নাথ মন্দির ( সপ্ততল-মন্দির—উপরে তিন তলার ভগ্নাবশেষ—পাতালে কেউ যাননি আজও ), তা বোধহয় এখন পাঠকরা খানিকটা বুঝতে পারবেন। কিন্তু যাঁরা বলেন—'যম-জামাই-ভাগনা কখনো নয় আপনা'—তাঁরা কংস-ভাগ্নে কৃষ্ণ-কাহিনীটি জানলেও হয়ত কচ-'জামাই-বারিক'-টা জানতেন না।

'যম'-কাহিনিটি একটু জটিল। নচিকেতা যমের কাছ থেকে আগুন আনতে গেল। জমদগ্নি—অগ্নি-বিদ্যা শেখাতেন, তিনিও জম হতে পারেন। যেহেতু তা সংযম এবং অচলতা বোঝায় তার ধ্বনি হবে স্থায়ী—কাজেই হলো জম।

আবার 'জমে'র দুয়ারে আসা গেল।

এই মহা-প্রভুর কালোয়-আলোয় মেশান মূর্ত্তিটি—শশাঙ্ক অভিধেয় চন্দ্র-মূর্ত্তিটি মোহেঞ্জোদারোর উনিশাঙ্ক গৃহের ( স্মরণ করুন, রঙুন মানে 'রঙ-উন'—বঙ্গ-শকদ্বীপীরা কালোয়-আলোয় মেশান সান্ধ্য-বর্ণের—তাম্রবর্ণের মানব ) দক্ষিণ-পথ মুখে প্রতিষ্ঠিত ( XIX-অঙ্কটিকে একুশও পড়া যায়—তাতে তিনি উত্তর-অঞ্চলে চলে এসে গৈরিক হন—ভাষায় 'রং-বং-কমল' হন্—বাংলার পূর্ণ রং পদ্ম রং হন।

চালুক্য চোলদের সঙ্গে এই মুলুকের ( মগের মুলুক ) বিবাদ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ—সুবিদিত ইতিহাসে গোলাবারুদের জন্ম দিয়ে ওলন্দাজরাও ওদিকটাতেই প্রথম হানা দেয়—তারপর সুন্দীপে, মেঘনায় বরিশালে, গঙ্গায়। 'মকদন' বলতে 'মেসিডন' না বুঝে এ-অঞ্চলটাকে 'পয়গড'-মণ্ডিত 'মগডন' বুঝলে



এবং 'মগড' বা 'মল্লড' ( মালদহ ) বলতে 'মগধ'-গৌড়' বুঝলে ইতিহাসে সন-শল্ল নিয়ে ঐতিহাসিকরা এমন বন-জঙ্গল সৃষ্টি করতেন না।

মোহেঞ্জোদরোর নাদ-বিন্দুর অ্যাটম বিদীর্ণ করতে গিয়ে আমি হয়ত চতুর্দ্দিকে আগুন ছড়িয়ে দিলাম। তবে আমি নিশ্চিন্ত যে এতে হিরোসিমা তৈরী হবে না। আমরা এখনও প্রাক্তন-প্রভু-ভক্ত আছি, যাঁরা আমাদের 'হিরো-ওআরশিপ' দিয়ে গেছেন। কাজেই মন্ত্রাগ্নি-খেলার উপসংহারে ব্যাহৃত অগ্নি আমিই সংহৃত করছি। তাকে চয়ন করছি সাঁচী স্তূপে। সতী-দেহে পঞ্চাগ্নি চয়ন থাক্।

মোহেঞ্জোদরোর সকলঙ্ক চন্দ্রের বা শশাঙ্কের মূর্ত্তিটির নির্ম্মাণ-কৌশল লক্ষ্য করলে দেখবেন, 'জমে'র বিভীষিকা সৃষ্টি করবার জন্যে তা মোটেও করা হয়নি। একটি শ্বেত-পাত্রের ( শ্বেত-পাথর ? ) অভ্যন্তর কালো করে মস্তক তৈরী করা হয়েছিল। নাক-চোখ-ঠোঁটের পাত্র ও পাথরগুলো হয়ত জম-গোত্রের রাজারা পরে বিন্যাস করেছেন। আমি শুধু একটি চিহ্ন লক্ষ্য করে তার সম্ভাব্য অর্থ দেবার চেষ্টা করব।

চিহ্নটি সাঁচী স্তূপের চূড়া। কালো পশ্চাৎপটে শ্বেত আভার বিভিন্ন স্তরে চূড়াটি দেখা যায়। এই একই চূড়া 'লিঙ্গ রাজে'র ('সিঙ্গরাজের ) মন্দিরে আর বোরোবুদুরে দেখতে পাওয়া যায়। বোরোবুদুরের বৈদিক নামটির ( বাড়ব-রুদ্র—তিব্বতী 'যম-দ্রোক' ? ) আড়ালে এ-ধরনের মন্দিরেরই একটি প্রাকৃত ও প্রকৃত নাম আছে : 'প্রমব্বনম্'[১]—প্রণব্বম্ যে তা ত বটেই—তবু খানিকটা ধ্বনি এদিক-উদিক করে এবং যেহেতু উর্দ্ধগ-পবিত্র মূর্দ্ধ'ণ' হয়ত 'নম' ধ্বনিতে ব্যক্ত হত, তার জন্যেও কতকটা প্রণব্বমের প্রমব্বনম-এ পরিণতি। তারপর তাকে প্রমোদোদ্যানও হয়ত হতে হয়েছে। ধ্বনি-বিস্তারে কী ব্যাপার হয় দেখুন—স্বর্গ থেকে নরকে পতন! আমরা কিন্তু জমের মস্তিষ্কে 'সহস্রার পদ্মে' স্থাপিত এই চূড়াটিকে তন্ত্রশাস্ত্রের বিশুদ্ধ 'ওম্ন্' ধ্বনি বলেই মনে করব।[২] দক্ষিণাপথের দিকে যমের গমন-ও ঐতিহাসিক

১। মন্দিরগুলো 'শাক্যমুনি'র নামের সঙ্গে জড়িত। 'শাক্যমুনি' বৌদ্ধ নন—'বুদ্ধ' নন, প্রবুদ্ধ ভাগবত বা জৈন ( জৈম )। তথাকথিত অশোকের শিলালেখ 'বুদ্ধ কনকমুনি'র ( শিলালেখ-পাঠের ব্যতিক্রমে ? ) উল্লেখ করছে—তাঁর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করছে 'লুম্বিনি'—যা 'লব্বমব্বন'-ও হতে পারে। সিকিমে 'তব্বমলনং' আছে। তিব্বতে আছে 'নীলমজং ( কোটি )'—তাই হয়েছে 'মূলগন্ধকুঠি' ?

২। তান্ত্রিক 'হ্রীং'-ধ্বনি চিত্র দেখুন। কৃষ্ণকমলের দলে তিনটি লাল 'র'-চিহ্ন ( শক্তি, ঐশ্বর্য্য ) এসে লাল র তৈরী করেছে। ব্রহ্মপুত্রের ( আসামের ) র-ফলা, আরাকানের ( রজতদ্বীপ ) 'র' এবং বর্ম্মার ( সুবর্ণদ্বীপ ) রেফ্। চক্রটিকে ভেদ করছে 'ঋ'-ধ্বনি। হ্রীং ধ্বনির বর্ণ তাম্র—বাহন ছাগ—কাজেই চক্রের ধ্বনি ছিল হ্রং। অধিষ্ঠাতৃদেবতা দু'জন—বৃষবাহন-অহিভূষণ নটরাজ এবং কমলাসন, বৃদ্ধ, চতুর্ভুজ, নীল-বিষ্ণু—বরুণ। তখনো চিত্রাঙ্গদা-হরিণী-বাহন মণিপুর পুরু বর্ণমালা ( বরণমালা ) নিয়ে উপস্থিত হয়নি।—পঞ্চাল তৈরী হয়নি। 'ট' ধ্বনিটি 'শ্রীং' হরিণী চক্রের—'শ্রীহট্টের নবগীর্ব্বাণদেবে'র আর মণিপুরের—বাগীশ্বরীর আবির্ভাব সেখানেই। 'হঠ্-যোগে'র ব্যাপারটা ভূটানের, চট্টেশ্বরীর ও শ্রীহট্টের। এই চতুর্গণ 'ত্রিস্নু'-চিহ্নে চিহ্নিত হয়েই 'ত্রিষ্টুপ্' হতে পেরেছিল। ছিল 'ত্রিনয়ন'—ত্রিন্+অয়ন, ত্রিযান, যৈন-গণ, বা তৃণাচ্ছাদিত পথগ। গো-পৃথিবী। এলো স্বর্গের ধ্বনি নিয়ে 'সুদাস'—চতুর্ব্বেদ মিলিত

ব্যাপার। রামের বন-গমন ও-পথেই হয়েছিল। আর বাংলায় ত যমের দক্ষিণ-দুয়ার সবসময়ই খোলা! প্রসঙ্গত একটি কথা মনে পড়ছে—'যাওয়া'-ক্রিয়াপদটি আফ্রিকার বন্যরা 'যাইমি'—শব্দে বোঝায়, ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলের গ্রামে 'যায়াম'-শব্দে ব্যবহৃত হয়। ঋক্‌বেদের 'যম-যমি'র উপাখ্যানে একজন অপরের পশ্চাৎ-ধাবন করছে—যমের যাওয়ার বা চলার ভঙ্গী থেকেই 'যায়াম'—'যইমি' ক্রিয়া-পদগুলোর উৎপত্তি। দেখুন, জায়া-শব্দটিও ছায়ার মতো পেছু নিচ্ছে। বেদ কোথায় আসছে! 'বেদে'তেও যাবে দেখবেন। তার আগে জেনে নিন, আসামের লখিমপুর-সীমা ছাড়লেই তিব্বতের 'সরযু' নদী—আর সে নদী-পথে চলতে সুরু করলেই 'যম-দ্রোক' হ্রদ। রুদ্র আর যম—ঈশাণের সংহার মূর্ত্তি। চীনের 'ড্রগন'।

অক্কডরা ( সেমেটিক – প্রাচীন হেব্রু ? ) যাওয়া ধাতুটিকে 'অগ' করেছিলেন—বৈদিকরা 'গ' কিন্তু প্রাক্-বৈদিক মোহেঞ্জোদরো তাকে 'অগ'ই রেখেছেন—তা থেকেই 'পন্নগ' ( সাপ ) শব্দটি তৈরী। তৈরী ঈশাণের চেলা বেদের হাতে। পৎ ( পাত্র ) + ং + অগ – অনুস্বার মিশ্রণাত্মক ধ্বনি, যা নিয়ে জঙ্ঘা, সঙ্ঘ, বঙ্গ, অঙ্গ, লিঙ্গ শব্দগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। '৯'-ধ্বনিটিও এ-অর্থে ব্যবহৃত হ'ত, কিন্তু দীর্ঘ ৯-ধ্বনি ছিল সম্ভবত 'ল্ৃ'। বাংলার কল্মীলতায় আর রাজপুতের 'যশল্মীরে' ধ্বনিটি সংলগ্ন আছে। দীর্ঘ ৯ বাংলা 'ঈ' লিপিতে মিশেছে মনে হয়, যেমন গণীয়ের 'ণ' 'ঞ' ধ্বনিতে এবং লিপিতে ধরা আছে। কিন্তু এ-খবর কে রাখে—কে কাকে দেয়! তবে দুই রাজা যে সংযোগাত্মক ধ্বনিটিকে দুইলিপিতে বুঝতে চাইছেন তারও সাক্ষী হয়ে আছে মোহেঞ্জোদরো ( Pl. CLIII—39 )[১]। পাত্রে যে মিশে যায় সেই হল পন্নগ। পন্নগ-ঠাকুরণকে পাত্রস্থ করা হয়েছে—পাত্রটি মহামহিম—অর্দ্ধনারীশ্বর শিব-ঠাকুর। পাত্রটি মহি—অহি তাতে প্রবেশ করল। পাত্রটি মহাদেব, মনসা তাঁর পত্নী। সে হিসেবে শিবঠাকুরের তিন-কন্যেই পাওয়া গেল, গো, পৃথিবী, নাগ!

'অগ' যখন ঊর্দ্ধগ হয়েছে, তখন হয়েছে ঈগ। কাস্পিয়ন-অলের পূর্ব্ব-প্রান্তের তটরেখায় যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তার ধ্বনি হয়েছে 'ঈগল'—বিশুদ্ধ বাংলা ধ্বনি। 'এলাম', ও ঈরাণের সঙ্গে পৃথক হয়ে ভারতবর্ষের দেহে পাখা ছড়িয়ে গড়ে তুলেছে পার্থিয়া ( প্টোলেমির মানচিত্র দেখুন )। এই 'ঈগল'ই তন্ত্রের আধ্যাত্মিক ভাষায় গোরুড়। বৈদিক রুদ্র গো আরূঢ় হলেন। গো + রুড় ( গঙ্গঋডদের কৃপায় ) রুদ্র তখন অহিভূষণ, যুবক—আর বিষ্ণু তখন প্রৌঢ় ( তান্ত্রিক 'স্ফ্রেং'-মন্ত্র চক্র দেখুন )। প্রৌঢ় পার্থিয়া বা ঈগল গোরুড়ের জন্ম দিয়েছে। গোরুড়, ঈগল দুইই অহিখাদক—কাজেই বেদে-র যুগ, ব্যাধের যুগ

হল। চারটি শব্দভেদী বাণ—শর—স্বর তৈরী হল। যাত্রা সুরু হল তাদের পশ্চিমে—সান্ধ্য-উষার সন্ধানে চলল তারা। তিন 'ব'-মিলিত হয়েছিল 'তিব্বত'-দেহে। গুরু-ধ্বনি জন্ম নিল। আসামের উত্তর লখিমপুরের 'সুবনসুই' নদী—তিব্বতে নাম নিয়েছে দু'টি—'ৎসরি চু' ( Tsari--Chu ) এবং 'চর-চু' ( Char-Chu )। এ-থেকে কি আমরা 'সরযূ'-ধ্বনিটি পাইনে? সাহেবের দাগে-চিহ্নে চিনতে না চাইলেও পাই।

১। চিত্রে সন্ধিস্থলটি 'ঈলিশম' কি 'মশস্' বোঝা মুস্কিল—লিপি থাকা সত্ত্বে। সম্ভবত দক্ষিণী রাজা /'মঙ্গলিশ'-এরই কাণ্ড এটি। তিনি 'হৈক্ষক' ছিলেন—যারা 'মশস্' অর্থে 'হয়' 'অশ্ব'—বুঝতেন! তার উপর 'সাংখ্যিক'রা এসে নিজেদের লিপি বসিয়ে গেছেন।



বিষ-বৈদ্যের যুগ তখন অপস্রিয়মান। সরীসৃপ অপস্রিয়মান। মাতৃহন্তা ভার্গব এলো গোরুড়ের যুগে। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম! তাই তা চন্দ্রাপীড়ের যুগ। চন্দ্রগুপ্তের যুগ নয়, মৌর্য্যযুগও নয়। মোহেঞ্জোদরের খাটের পায়া বা ধর্ম্মদণ্ডে 'সাংখ্যিক লিপিতে' দেখা যায় 'অপঅয়িষ্টন' ( Afghanistan ) লিপি : ( Pl. CXXXII )—No 28 ) :

ঋস ( ভস ) ( রস ) ( ঈশ )

'দীপঞ্চরনব' + 'তোপঅয়েভপোরণিন' = ৮ অগ্নি ?

( খজ্যজ—চেজ্যিজ খন* ? ) ( বইডহ )

যার মানে 'ঋক বেদ', 'ঋক বৈদ্য', 'ভস-বেধ' আকাশজ ঋ-ধ্বনি, ওঁ-ধ্বনি 'ঋস-ব্যাধ'—প্রভৃতি বিচিত্র শব্দ হতে পারে। এ-কথাটি শীল-যুক্ত অথচ শতঘ্নি চাষী-সভ্যতার প্রথম স্তরের। গোরুড়-যুগটাও চাষাবাদের প্রথম যুগ। এ-লিপি তাঁদেরই যাঁরা সঙ্গীত বলতে 'প্সঅল্মস' ( Psalms ) বোঝাতেন, সাম-জএন্দ-সায়াম-সঙ বোঝাতেন না, পসম বা রেশম বোঝাতে যারা বোঝাতেন 'মস্লিন'। যাঁরা 'কাশ্মীল' বলতেন। অশ্মীল বলে কাশ্মীর বলতেন না। ইন্দ্রহীন বেদের প্রতিনিধি ছিল এই শব্দ-ধ্বনি। ঋক তখন শরের মতো স্বর হয়ে বিদ্ধ। স্বরগণীয়দের কীর্ত্তি। স্বর্গীয়দের, ভার্গবদের বর্গীয়দের জৈমাচার। উদক-দেবতার লীলা। কিন্তু উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ল! আমরা বুদ্ধকেই চিনি!

চতুর্ব্বেদের মিলনে শুনতে পাই গায়ত্রী মন্ত্র :

ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ।

তৎ সবিতুঃ বরএণীয়ম ভঃ গোদেবসীয় ধী মহি ( ম + অহি )[১] ধী যোহন প্রচ উদয়াৎ ॥

( অর্থঃ চার মন্ত্র-ধ্বনির ব্যাহৃতি বা বিস্তৃতি সাধন করছি। পরম সবিতা বরএণীদের ( বরাহগণের ),[২] আকাশ গোদেবসীয়দের ( তান্ত্রিক গো-দেব বংশীয়দের ) ধী অহিময় মহী-ধীর সঙ্গে যুক্ত করুন। প্রাচীর উদয় থেকে তিনি প্রচারিত, প্রচালিত হোন। )

'গো'-শব্দটিও অর্দ্ধনারীশ্বর। যেমি 'ছাগ'-শব্দটি। ছাগ ছোট বরাহ-অবতারের বৃত্ত-কেন্দ্র। সে-ধ্বনি সূক্ষ্ম হয়ে সেখানে 'ছায়া-সীতা' 'ছায়া'—সায়াম। যব, বলি-সুমাত্রা-সায়ামে চতুর্ধ্বনির মিলন—চারজাতির মিলন। তার সঙ্গে এই দ্বিতীয় মহা-বরাহ গোরুড় বা গায়ত্রী-বংশের মিলনে হ'ল পঞ্চাল তৈরী। যোগসূত্র লৌহিত্যের উপবীত—ব্রহ্মপুত্র আর বর্ম্মা। যুক্ত হবার যোগ্য হ'ল হয়ত কৃষ্ণ-কমল রণবঙ্কমল্ল। নূতন রাজধানী হল রঙুন, বঙ্কক। 'জম' মূর্ত্তিটির স্তূপ-চূড়াটিকে যদি রঙুনের 'র' ( ঢেউ খেলান অর্দ্ধ-রোহিতন বলে 'র'-ফলাও ভাবা যায় ) ভেবেনি তারপর তার নীচে নিশ্চিহ্ন-প্রায় একটি বাঁকা 'ণ' দেখতে পাই। তা থেকে 'রণ ( বঙ্ক )' কথাটা পড়া যায়। নীচেকার যুক্ত লিপিটি কেও 'বঙ্ক' ধরা যায়। 'জম'-মূর্ত্তিতে র-ণ[৩] কথাটি দ্বারা পরে হয়ত বোঝাতো : 'এখানে ঐশ্বর্য্য নয়'।

১। মহি যখন মহী মানে সুস্থিত তখন তাঁর কাছে অহি-নকুল সম্বন্ধ আর নেই। সে অহি-ময়।

২। 'অগ' গণীয়দের ইন্-ধ্বনি ( ইন্ধনি ) র সঙ্গে মিশে অগ্নি। মিশরে পোড়ান ক্রিয়াটির বহু পদ ছিল। 'আঁচ' 'আক', 'এগ'—তার তিনটি পদ। ত্রিপুরায় উনুনকে, 'পাখাল' ও 'চুলা' বলে—বিক্রমপুরে বলে, 'আখা'—উনুন, আঁচ, আচমন, আগুন সব বাংলার ধ্বনি।

৩। 'ব্যোমন'-ও হতে পারে। *'জম-জম খন্' ও 'কলে খন্' দু'টি কামান ঢাকা-বুড়িগঙ্গা-তীরে ছিল।

যেম্নি সংস্কৃতে এবং 'জন্দে' 'গো' বলতে গরু-জাতি বোঝায় তেম্নি ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে 'গো-বাট' বা 'গু-পাট' বলতে গরু-জাতির পথ বোঝায়। মিশরে বৃষ-কে ( সংস্কৃত ) 'বেহ্রেস' বলা হ'ত—ত্রিপুরায় বলা হয় 'বেরেশ'। ঋক-বেদে 'বক্ক'। ধ্বনির পর্য্যটন লক্ষ্য করুন। আদি সংস্কৃত বৃষ-কে 'বৃষণ' দ্বারা চিহ্নিত করত। একটি অস্ত্রোপচারে বৃষণের 'ণ'-কে প্রকাশিত করা হয়—'ধন' বা 'রণ'-র প্রথম জন্মের চিহ্ন নিয়ে উন্মত্ত উল্লাসের চিত্রও আছে মোহেঞ্জোদরোতে ( PI. CXIV—521 )। আয়ুর্ব্বেদের অধীনেই এ-বিদ্যা ছিল। গোমেস-গোমো-বৃক্ক-গোপিত্ত ( গুপ্ত )-নাপিত-বৃক কথাগুলো বৈদ্য-বিদ্যা থেকে এসেছে। গোপিত্ত বা বৃক্ক ( মানুষের বা গরুর 'লিভার' ) হলুদ-বর্ণ—হরিতাল-ধাতু তাই গোপিত্তের সমবর্ণ। তাই হরি-হর বংশীয় মৌর্য্যরা গুপ্ত ছিলেন, ছিলেন পীতাভ। 'মোঙল'-জাতির ইতিকথা এই। তামা-রঙে পিউরি মিশে পদ্ম-রং তৈরী হল—হল ক্ষৌণীশ ( পৃথিবী-পতি ) ঈশাণ, বুদ্ধ। 'বোধগুপ্ত' তাই।

অস্ত্রোপ্রচারের ফলে গো বৃষ হ'ল, বৃক হল। ষণ্ড আর নেকড়ে—'যম দ্রোকে'র বা রুদ্রের উপযুক্ত বাহন। 'লিঙ্গরাজে'র মন্দিরের গায়ে ( মাঝামাঝি ) যে মূর্ত্তিটি ঈগলের মতো বা শুঁড়তোলা হাতির মতো সংলগ্ন, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তার উপরি-ভাগে একটি নেকড়ে বসে আছে—সবটুকু মূর্ত্তিতে একটি নতাক্ষ মানুষকেও পাওয়া যায়। একে রুদ্রদামনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়, যিনি রুদ্রতা দমন করে ধাম ( ডমক=বাড়ি—অক্কড ) তৈরীর দিকে মন দিলেন। ইংরেজিতে যাকে বলে Dam—তিনি তা-ও তৈরী করেছিলেন। তিব্বতী 'যম-দ্রোক' হ্রদ। এঁর কীর্ত্তি-পরিচয়ে 'সকনৃপকঅল' (Saknripakâla) বলা হয়েছে—কথাটা যে জলের মতো প্রাঞ্জল শ্বেত-নৃপের ঐতিহাসিকরা তা বুঝতে পারেন নি।

এই 'জল'-গোষ্ঠীর অগ্রগামী আরেকটি নাম আছে 'খঅরভএল' ( Khâravela ) 'হাথিগুম্ফা'-শিলালিপির নায়ক। ( তা যে তিব্বতী 'মনসরোওঅর' বা 'সএরোলৰনগগোমপ' হতে পারে কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেসের ম্যাপের দিকে তাকালেই তা জানা যায়। তিব্বতী ব্রহ্মপুত্র—'ৎসনগ-পো'র তীরে ছিল 'কেদ্দো'—কদেহ ? ) ইনিও দক্ষিণাপথের শূরী। আর আছেন 'ক-অসীপুত্র ভ-অগভদ্র'—'হএলি-ওডোরোস' গরুড়-ধ্বজ হলেন যাঁর কৃপায়। আর এই ভার্গবটি অক্কড়ের কৃপায় 'কশিমপুত্র-মহৎমদ' হয়েছিলেন কি না খ্রীষ্টাব্দের ধাঁধাঁয় তা চাপা পড়েই রইল। পরম-ভাগবত 'হএলিওডোরোস' য়ীহুদী ছিলেন—য়ীহুদীরা পরম-আত্মাকে 'এলি' বলতেন। যীশু দশচক্রে ( ক্রুশচিহ্ন সেমেটিক-সাংখ্যিকরা শেষ ধ্বনি দশ বুঝতেন ) শেষ-ধ্বনি করেছিলেন : "এলি, তুমি কি আমাকে ত্যাগ করলে ?" খৃষ্ট-জন্মের কাছাকাছি সময়ে ভারতবর্ষে ঢুকে আমাদের পহেলি 'হএলি' কি ওড্র-দেশ তৈরী করে পুরুষোত্তম হয়েছিলেন, নর্ত্তকীর সহায়তায় শেষ সুঙ্গ-রাজ-কে ( শুঁড়-রাজ ) নিধন করে 'বাসুদেব' সেজে ব্রাহ্মণ কণ্ব-বংশ স্থাপন করেছিলেন, না কি বাইরে গিয়েও কিছু কাজ-কর্ম্ম করেছিলেন তা খুঁজে দেখা দরকার। এ-কাজটাতেও ইতিহাসের ঘোলাজল খানিকটা পরিষ্কার হবে। কিন্তু আমি নৃসিঙ্গের পিশীমা চন্দ্রিকাকেই আপাতত নটরাজ-বংশের নর্ত্তকী বলে সাব্যস্ত করলাম।

এসময়টাকে নিয়ে কালিদাস আর বাণ বেশ খানিকটা কাব্য রচনা করেছেন দেখতে পাই। মনে হয় তাঁরা এ-সময়টার কাছের মানুষ। ইতিহাসের রাজাদের নাম-ব্যবহার যদি তারা খুশী-



মাফিকই করতেন, তাহলে কতো রাজাইত ছিল, কালিদাস সুঙ্গ-দের আর হর্ষ-কবি বাণ কণ্বদের প্রতি এমন কৃপাপরবশ হবেন কেন ?

তিব্বতের মহাভারতের কথা বারান্তরে হবে—মোহেঞ্জোদরোতেই এখন ফিরে আসা যাক।

মোহেঞ্জোদরের ৭৫ সংখ্যক গৃহের তৃতীয় প্রকোষ্ঠে ( সব উন ) যে-ভাবে একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল তার চিত্র Pl. *XXXVIII*-এর সংখ্যক পৃষ্ঠার ( a )-তে আছে। পেছনের একটি প্রস্তর ফলকে এই সাংখ্যিক অক্ষর লেখা : 129। এগুলো যদি অক্ষর হয়, তার নাম ছিল সেদিন অবগ২ বা অব+ইগ, অতোন বা অতন ; আর তার আগে এ-তিনটি নামেও হয়ত সে পরিচিত ছিল : এদন, কব্ব, ক্ষস। সবই সাংখ্যিক নাম। কিন্তু সাঙ্কেতিক নয়। মূর্ত্তিটি 'জম'-মূর্ত্তিরই অপূরক স্থাপত্য-শিল্প। ভেতরের নাক-চোখ-মুখ-মস্তিষ্ক নেই শুধু করোটি—তাই অতন্থ। দ্বিধা-বিভক্ত—তাই পাখা। উদের মতো দেখতে, ভোঁদরের মতো ( বাঁদর আর উদের মিশ্রণে কি ভোঁদর কথাটি—দেখতেও ভূধরের মতো )। জন্দ-এ 'ওটর'-কে[১] বাড়বাগ্নি বোঝায়। 'ওটার' ( অবতার ) বোঝাত ঈরাণীরা জলের এই সূক্ষ্ম-বিষয় বা আগুনটির ব্যঞ্জনাবাচক ধ্বনিতে—অক্ষদ-রা বোঝাত ওদোর। পুষ্প-নির্য্যাস যে 'আটর', তা-ও এই অবতারেরই অপভ্রংশ। 'জম'-মূর্ত্তিটি এই সৌক্ষ্মতার পরেকার পাদ। মৃত্যুতে জীবনের পূর্ণতা। কঠোপনিষদের ( তান্ত্রিক-উপনিষদ ) নচিকেতাও তাই ভেবেছিলেন। যম তাকে নাচিকেত-অগ্নি হিসেবে 'স্থন' বা বহুবর্ণযুক্ত 'শ্রীং' ধ্বনি শিখিয়ে দিলেন। ( কঠোপনিষদ ॥ ১৬ ॥ )। অবতার কথাটি যেম্নি পূর্ণতা তেম্নি শূন্যতা নির্দ্দেশক। তিনি নাইয়া, নহুষ, ( উশন হ বৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ। ) একঘাটের বোঝা শূন্য করে দিয়ে অপর ঘাটে গিয়ে পূর্ণ হবার বাণী বহন করেন। ভোঁদর রুই-ভক্ষক, কব্ব, ক্ষয়কারী। বাংলাদেশ তা জানে—তাই ভোঁদরকে ভোলাতে খোকার নাচন দেখায়। খোকা যে পরে ভোলা-শিব হবে! ত্রিপুরার গ্রামে শাশুড়ী-ব্রত আছে 'গা+রুই'—মাছ আর গরু বৌদের শাশুড়ী। মাটি আর জল। মাটিতে গর্ত্ত খুঁড়ে একটি পুকুর তৈরী হয়, পানা-পুকুর—সেদিন হালের চাল আর জালের মাছ খাওয়া নিষেধ। ত্রিপুরা পাহাড় 'জুমের চাল' [অকর্ষিত জমির চাল—জোমের চাল—ব্রীহি-বোরো] হয়, তাই এনে খাওয়ার নিয়ম। সমতট-অঞ্চলের কুমারী মেয়েরা করে 'যম-পুকুর' ব্রত। বাজ, যম, কাক, যমের মার পুতুল পুকুরের চার পাড়ে থাকে। মাথায় চন্দ্র-আঁকা মাছ ( চোখ-পানি মাছ ), উদেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ, একটি গর্ত্ত-পুকুরের পানার সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া এই ব্রতের 'রীত'—ঋত। তেম্নি 'তারা'-ব্রত ও 'মাঘ-মণ্ডল'-ব্রত পদ্মা-অঞ্চলের বিক্রমপুরের কুমারীদের। মাটিতে পাঁচরঙা গুঁড়ো দিয়ে পাঁচটি বৃত্ত এঁকে উপরে আর নীচে সূর্য্য আর চন্দ্র এঁকে চন্দ্র-সূর্য্যের মতো জামাই ( স্বামীকে জামাই বলে ও-দেশে ) প্রার্থনা। জল-চন্দ্রের পর ( বিম্বিসার, জেলের চন্দ্র,

১। এ-ধ্বনির সঙ্গে মোঙল, তিব্বতী ধ্বনি মিশে হয়েছে তা 'ওড়োবো'। হয়েছে 'অতার' 'অদার'—'অদারো'=অদার স ( অস্ত্রীক ব্যক্তি )। অডার ( পশুস্তন )। মোঙলরা 'ওটর' থেকে 'উট' পেয়েছেন। অশ্বকরা 'ওটর' ধ্বনিকে বহুশ্রমে 'উষ্ট্র' করেছিলেন বলেই 'কালিদাস'-সম্পর্কে হাস্যকর জনশ্রুতিটি। দ্রাবিড় ধ্বনি-ওড্র। য়ুরোপীয়রাও বলেন দ্রাবিড় থেকেই 'তাম্র'-ব্যবহার শিখেছিলেন ঈরাণীরা ( History of the World—W. N. Weech. Page. 258 )।

চন্দ্র-বিম্ব ) রঞ্জিত-চন্দ্রে সূর্য্যের উপাসনা চলেছে। তারপর এসেছেন আদিত্য। বিক্রমাদিত্য-শীলাদিত্য। যতোই দিত্ব পেতে চান না কেন তিনি হর্ষবর্দ্ধন—দৈত্য। তিনি মোহানন্দে—মহানন্দে ধনানন্দে বর্দ্ধন-বংশীয়—নন্দ-বংশীয়। তিনি কণ্ব হতে পারেন—মুনি হতে পারেন, কর্ণ নন। অবশ্য তাঁরা একই গোত্রের হতে পারেন। বাণ-কালিদাস-বাল্মিকী একই গোত্রের হতে পারেন—সূর্য্যবংশ জন্ম নিতে পারে 'মাঘ' বা 'ভাস'-কে নিয়ে রঞ্জিত-চন্দ্রের আগে বা পরে। কিন্তু 'জম'-ই এসে এঁদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছেন—মৌর্য্য জম, আর্য্য-মোঙলের সন্তান জমই এঁদের সন্ধি-গ্রন্থি।

এই মৌর্য-প্রবর 'আলেকজান্দ্রিয়াতে ( ষষ্ঠী-ইন্দ্রিয়াত্মক রাজধানীতে ) অহি-খাদক বর্হিকে নিয়ে ময়ুরপুচ্ছে কো-মরীয়া বংশ বা কালোময়ুর-বংশ সৃষ্টি করেছেন—তার উপরে রোমা, মেসিডোন, সেলেউসীড। বহুদূরে পৃথক হয়ে—সেদিনের পৃথিবীর পূর্ব্বপ্রান্তে পার্থিয়া—জম্বুদ্বীপ। জম্বুদ্বীপে—করাচীর ( কর-চয়ন-স্থান ) এপাশে-ওপাশে আছে 'রস-মৌরি', 'কিয়ামরি'। আছে 'কনৌজা' আছে 'কুমারিকা' আছে মেক্লং-এ কুএলা, কুমিল্লা আছে। গোমতী আছে অযোধ্যায় আর কুমিল্লায়।

সেলেউসীড থেকে 'হেলীওডোরোস' ভারতবর্ষে এসে ভাগবত হলেন—হলেন গোরুড়-বংশীয়। ওডোরো স=বাড়বাগ্নির মূর্ত্তি। সে-মূর্ত্তি এসে মিশল ভারতাগ্নির সঙ্গে—রুদ্রে, গোরুতে, বিষ্ণুতে, গরুড়ে। 'ত' মানে দেহ। বাংলায় সে গোরুড়ও নয়, ময়ুরও নয়, বাজও নয়, টিয়া।

গো ছিল অহি-ময়। যেম্নি মহী-তনু, ভূস্বর্গ তেম্নি মহি-তনু দৈত্য-শক্তি। 'ক্র'-অন্তরীপের 'ছায়া'-তে হয়েছিল ধম্মপদ তৈরী। তা ছিল দৈত্য-শক্তির মন্ত্র-শক্তি। তাঁদের স্বর্গ তৈরী করেছিল তান্ত্রিক 'ওম্‌ন্' ধ্বনি। তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল শিবাত্মিকা মনসার 'অহি'-ধ্বনি। নমুনা দেখুন : ওম্‌ন্=মোন্=মো ০ ০ ন্=মো+অহি+ন্='মোহিন্' থেকে যে-বংশের উদ্ভব তার নাম হ'ল 'মোহিঞ'। সেই অহল্যা পৃথিবীতে ত্রিপুরা পাহাড়ে কু-কী এলাকায় তৈরী হত 'জোমে'র ধান। সেই বংশের রক্তে এলো 'মোহিঞ' বংশের রক্ত—হ'ল 'মোহিঞা+জো'='মোহিঞ্জো'-জাতি। তারপর তিব্বতী বাড়বাগ্নির পালা। 'ওডোরস'=ওদহোর স='অদারো' ওড়-বাংসার পালা। 'মোহিঞ্জো'র সঙ্গে যুক্ত হল 'অদারো'-জাতি—হ'ল 'মোহিঞ্জো+অদারো'। পুত্রে অর্দ্ধধ্বনি ক্ষয়িত হ'য়ে পিতার 'অ' উধাও হল। 'মোহিঞ্জোদারো' নাম তনয় তৈরী হ'ল। 'হি'-র 'ই'-ধ্বনি যখন 'বহমান—( ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মণ )—তখন তা **'মোহেঞ্জোদঅরো'**।

'উলট-পুরাণ' তৈরী করলাম। দ্বাদশ সূর্য্যের ব্রত কথা। একপাদ রচনায়ই হয়ত অপরাধ হ'ল। কি করা যায় বলুন, ধ্বনিতে আর গণিতেই এই সৃষ্টি। আর সেই ধ্বনির গণিতেই বলছি, পয়ার কথাটি 'প্রলয়'-কথা থেকেই এসেছে। কোনো মহা-প্রলয়ের কাহিনীই ( জল-প্রলয় বা নর-প্রলয় ) হয়ত প্রথম লিপিবদ্ধ হয়েছিল বাংলা পয়ারে।

# রবীন্দ্রসঙ্গীত-সন্দীপন সাহিত্য

## নারায়ণ চৌধুরী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতির সাঙ্গীতিক রুচির পরিশীলন ও বিকাশের দিক থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ক্রমপ্রসার মস্ত সুলক্ষণ বলে গণ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এই সুলক্ষণ খাদবিহীন নয়। দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চা যে পরিমাণ বেড়েছে সেই অনুপাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনার বহুলতা ঘটছে না। কোন বিষয়ে মানবিক কৌতূহল, আগ্রহ ও উৎসাহ যখন ব্যাপকতা লাভ করে তখন সে বিষয়ের অনুশীলনই শুধু হয় না, গবেষণাও হয়। মানুষ তখন কৌতূহলের বিষয়টিকে মাত্র ব্যবহারিক চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে না, তাকে মননের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বেলায় এই বাঞ্ছিত জিনিষটি ঘটছে না। অন্ততঃ যে পরিমাণ আশা করা যাচ্ছে সে পরিমাণে ঘটছে না। এখন পর্যন্ত মাত্র গুটি তিনেক বই এই ক্ষেত্রে আমাদের সম্বল। বাংলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরুত্ব বিবেচনা করলে এই গ্রন্থসংখ্যাকে কোনক্রমেই আশানুরূপ বলা চলে না। এটা আমাদের প্রবল দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সুমহান প্রতিভার যথাযথ বিচার অদ্যাবধি আমাদের বেশে হলনা। রবীন্দ্রনাথ যত বড় কবি ও মনীষী তদ্‌বিষয়ক সমালোচনা সাহিত্য সেই অনুপাতে দুর্বল, এত বড় একজন কবির বিষয়ে এত নগণ্য আলোচনার নজীর বোধ করি পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এতে শুধু এই কথাটিই প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টিশীল প্রতিভার সঙ্গে তাল রেখে চলবার মত আলোচক-প্রতিভার নেই আমাদের দেশে। রবীন্দ্র-প্রতিভাকে কেন্দ্র ক'রে গ্রন্থাকারে এবং পত্রপত্রিকায় যে জাতীয় আলোচনা হয়ে থাকে এবং হচ্ছে, দু' চারটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম বাদ দিলে, তাকে ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অভাব বিশেষ ভাবেই স্পষ্ট মনে হয়। অনুমানের কারণ বলি। আমরা তিনটি গ্রন্থের কথা বলেছি। এই গ্রন্থত্রয় হল: রবীন্দ্র সঙ্গীত ( শান্তিদেব ঘোষ ), রবীন্দ্র-সংগীতের ধারা ( শুভ গুহ-ঠাকুরতা ) এবং রবীন্দ্রনাথের মান ( সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর )। এর মধ্যে প্রথম বইটি দশ বৎসর আগে প্রকাশিত হয় এবং কিঞ্চিদধিক আড়াই বছর আগে তার একটি সংস্করণও হয়। এই বইটি এখন পর্যন্ত রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষয়ে প্রাথমিক প্রামাণ্য বই এবং গ্রন্থের উক্ত মর্যাদা অদ্যাবধি অক্ষুণ্ণ। বাকী-দুটি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া বিশুদ্ধ রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ আর আছে বলে মনে হয়না। শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী পত্রপত্রিকায়, বিশেষ ক'রে বিশ্বভারতী পত্রিকায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে অনেক তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, কিন্তু সেগুলি এখনও গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়নি। হলে রবীন্দ্র সঙ্গীত-গ্রন্থসাহিত্যের একটা মস্ত অপূর্ণতা দূর হত। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীর জ্ঞান গভীর, তিনি একজন বিদুষী-লেখিকাও বটে; ক্ষোভ এই যে, তাঁর এই দ্বিবিধ কৃতিত্বের ধারা একখাতবাহিনী হতে পারল না। তাঁর হাত থেকে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে সংবদ্ধ আকারে আমরা কিছু পেলাম না। আলোচনা যতই সারগর্ভ হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পত্রপত্রিকার তিতর বিচ্ছিন্ন

ভাবে, অথবা বক্তৃতা ভাষণ ইত্যাদির ভিতর অগোছালো ভাবে নিবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে আলোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা নেই। রচনার সার্থকতার একটা প্রধান প্রাথমিক শর্ত হল তা গ্রন্থাকারে সংবলিত হওয়া। যদিও এই নজীরে এমন কথা বলা চলে না যে, সকল গ্রন্থই সৎগ্রন্থ। তবে শ্রীইন্দিরা দেবীর গ্রন্থ যে সৎগ্রন্থ হত সে বিষয়ে আমাদের মনে সংশয় নেই।

বাকী রইলেন শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখার্জি ও শ্রীদিলীপকুমার। অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদের সুর ও সঙ্গতি এবং কথা ও সুর সঙ্গীতবিষয়ক দুটি গ্রন্থ। এদের ভিতর প্রথম বইটি সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের মধ্যে বিনিময়ীকৃত পত্রাবলীর সমষ্টি, তাতে সাধারণভাবে সঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা আছে, প্রসঙ্গতঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতেরও কথা আছে; কিন্তু কোনক্রমেই তাকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত-সন্দীপনী বলা যায় না। 'কথা ও সুর' সঙ্গীতবিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, কিন্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন। তাদের ভিতর ধারাবাহিক ভাব-সংলগ্নতা নেই। গ্রন্থের ইতস্ততঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ এবং একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন আলোচনা আছে বটে, কিন্তু তার থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সমগ্রতার ধারণা করা যায় না। এই দিক দিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ এখন পর্যন্ত আমাদের প্রত্যাশা অপূর্ণ রেখেছেন, যদিও জানি আমাদের সাহিত্যে তাঁর হাতেই বিষয়টির সব চাইতে বুদ্ধিদীপ্ত বিচার হতে পারত। ধূর্জটিপ্রসাদের কৌতূহল বহুপথসঞ্চারী ও বিচিত্র, তাঁর মননশীলতা সুপরিজ্ঞাত, কিন্তু বাঙালী পাঠকের দুর্ভাগ্য, এই বিচক্ষণ প্রবীণ লেখক আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোনো বিষয় ধারাবাহিক ভাবে লিখলেন না। বাংলাভাষায় কলম ধরলেই কেন জানিনা অবধারিত ভাবে তাঁর ভিতর বৈঠকী অথবা অভিভাবকী মেজাজ সুলভ প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, অথচ তাঁর ইংরাজি রচনায় এই লঘুগুরু মনস্কতা দেখতে পাই না। কেন এমন হয়? বাঙলা ভাষায় পাঠকদের সম্পর্কে এক ধরণের অশ্রদ্ধাই তার হেতু নয় কি?—উনবিংশ শতাব্দীর 'কলকতাই' বড়লোকদের যেমন সদর আর অন্দর দুটি সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ ছিল, ধূর্জটিপ্রসাদের রচনাতে সেইরকম একটি পর্ববিভাগ আছে এবং সে বিভাগ-রেখা সুস্পষ্ট। বাংলা ভাষার মহলে প্রবেশ করলেই এই বুদ্ধিদোরস্ত রাশভারী লেখক চটুলতায় অবারিত হয়ে ওঠেন। চটুলতার ভাষায় পুরলক্ষ্মীর প্রতি প্রেম নিবেদন চলতে পারে, কিন্তু, বলাই বাহুল্য সাহিত্যের উপর স্বামীত্ব সম্ভ্রমসূচক নয়। পাঠকদের কিছু বলতে গেলেই বিদ্যাবুদ্ধিকে নীচু সুরে বাঁধতে হবে এমন কোন কথা নেই। সেটা পাঠক এবং পাঠ্য বস্তু উভয়েরই প্রতি অশ্রদ্ধার নামান্তর।

কিম্বা, আমি ধূর্জটিপ্রসাদের প্রতি অবিচার করছি। এমনও হতে পারে, ধারাবাহিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সামর্থ্য থাকলেও সেদিকে তাঁর কোন ইচ্ছাই নেই। কথা ও সুর-এর উপক্রমণিকায় তিনি নিজেই কবুল করেছেন, থীসিস লিখবার মতো অধ্যাপকসুলভ অবকাশ, ধৈর্য ও অধ্যবসায় তাঁর নেই। এটা বিনয়-ভাষণ সন্দেহ নেই, তবে এতে পেশাদার অধ্যাপক লিখিয়ের প্রতি পরোক্ষ খোঁচা আছে। যেন লেখাপড়ার ক্ষেত্রে ধৈর্য আর অধ্যবসায় অশ্রদ্ধেয় ব্যাপার। তা-ই কি? আমাদের তো বরং উল্টো মনে হয়। বাগ্‌বিস্তারের কী মূল্য যদি না তার পিছনে ধৈর্য আর অধ্যবসায়ের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের সমর্থন থাকে? মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে সাধারণীকরণ (Generalization) দূষ্য যদি সেটা অতিমাত্রায় স্বচ্ছন্দ আর দ্রুতনিষ্পন্ন হয়। ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায় এই অপূর্ণতা প্রকট। আর শুধু সঙ্গীতের কথাই বা বলি কেন, সকল রকম আলোচনাতেই এই তীক্ষ্ণধী লেখক



কথার মারপ্যাঁচ দ্বারা অল্পবিস্তর রসাস্বাদ সৃষ্টির প্রয়াসী ধূর্জটিপ্রসাদের বীরবলভঙ্গী লেখা যে অনুপাতে উপভোগ্য সে অনুপাতে অফলপ্রসূ। শ্রমকাতরতার ত্রুটী বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা ঢাকা যায় না এ কথাটা চিন্তাপ্রকাশক আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণ রাখার যোগ্য। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, ধূর্জটিপ্রসাদ এক-বিষয়-নিবেশক্ষমতার আংশিক অভাববশতঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিষয়ে কেবল ছাড়া-ছাড়া কথাই বললেন; গোটা জিনিষ তাঁর হাত থেকে বেরোলো না।

শ্রীদিলীপকুমার ধূর্জটিপ্রসাদেরই স্বগোত্র। লিখন পদ্ধতির দিক থেকে দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদের ভিতর পার্থক্য সুদুস্তর—একজন আবেগে ফেনোচ্ছল, অপরজন মননপ্রধান;—কিন্তু এক জায়গায় দুজনের প্রবল মিল। দুজনেই সমান অধীর। আদ্যন্ত-মধ্য-পর্বক্রম সুগ্রথিত প্রবন্ধ-সাহিত্য-রচনা তাঁদের কপালে লেখেনি। "সাঙ্গীতিকী" বইতে এবং অন্যান্য আলোচনায় দিলীপকুমার রবীন্দ্র সঙ্গীতের প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন, কিন্তু আলোচনাগুলির ভিতর ধারাবাহিক কোন ক্রম নেই বলে তাতে আমাদের মন ভরে না। রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে দিলীপকুমারের দৃষ্টি বিচার-সন্ধিৎসু। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। সেটা আমরা দোষাবহ মনে করতাম না যদি তিনি ব্যক্তিগত পক্ষপাতযুক্ত হয়ে এটা করতেন, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পর্কে অতিরিক্ত ভাবালুতার বশে তিনি প্রায়শঃ অপক্ষপাত মনোভাবকে আচ্ছন্ন হতে দিয়েছেন। কোন্ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের কিছু মতান্তর হয়েছিল সেই সূত্র ধ'রে আজকের দিনে রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে আঘাত করতে যাওয়া কাজের কথা নয়। সাহিত্য ও সঙ্গীত কি পারিবারিক বিবাদের জের টেনে চলবার ক্ষেত্র? দিলীপকুমারের স্বভাবের বদ্ধমূল অভিমান কোন সময়েই দিলীপকুমারকে সত্যিকার মননশীল লেখকের পর্যায়ে উঠতে দিল না।

অবশ্য সেই সঙ্গে এ কথাও মানতে হবে, রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সমালোচনা করতে গিয়ে দিলীপকুমার অন্যান্য কতিপয় যুক্তির মধ্যে এমন দু একটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন যাদের ভিতর সারবস্তু আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিল্পীদের স্বাধীনতার আপেক্ষিক অভাবের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাতন্ত্র্য সত্যই কতকটা সংকুচিত। এ বিষয়ে দিলীপকুমারের সঙ্গে আমরা একমত যে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের দৃঢ়সংবদ্ধ অপরিবর্তনীয় বাঁধুনি গায়ককে আনুগত্য পালনের অবকাশ দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোন অবকাশ দেয়না। কবি তাঁর গানগুলির সুর যে ভাবে বেঁধে দিয়ে গেছেন কণ্ঠে ঠিক সেই ভাবে তাদের অনুসরণ করা ছাড়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিল্পীর অন্য বিশেষ কোন করণীয় নেই। এই যেখানে অবস্থা সেখানে শিল্পীর আত্মপ্রকাশ ক্ষুণ্ণ না হয়েই পারে না। হয়েছেও তাই—রবীন্দ্র-সঙ্গীত-শিল্পীরা শুদ্ধমাত্র কণ্ঠস্বরের মাধুর্যের দ্বারা রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ধরে রাখবার চেষ্টা করছেন—স্বর সাধনা, সুর বিস্তার, রাগ-রাগিণীর বোধ এ সবের প্রতি তাঁরা ঝোঁক দেন না। সঙ্গীত বিষয়ে যাঁরা কিছুমাত্র চর্চা করেছেন তাঁদের নিকট বলাই বাহুল্য, শুদ্ধমাত্র কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্বের উপর নির্ভর করে গান পরিবেশন করতে যাওয়া কাজের কথা নয়।

দিলীপকুমার রবীন্দ্র সঙ্গীত-শিল্পীদের যদৃচ্ছা সুরবিস্তারের স্বাধীনতা দিতে চান। সেটা আবার একটু বাড়াবাড়ি। কবির রচিত সুর গায়কের যথেচ্ছ খেয়াল মেটাতে গিয়ে যেমন-তেমন সুরে রূপান্তরিত

হবে এটা কোন অবস্থায়ই স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এইখানে বিষয়টির আলোচনার অবকাশ কম, সেই কারণে প্রসঙ্গ আর বাড়াব না। তবে একটি কথা বলা দরকার মনে করছি। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানকে রবীন্দ্র-নির্দিষ্ট সুরের সীমার মধ্যে অব্যভিচারী ভাবে ধ'রে রাখতে চান প্রকারান্তরে তাঁরা ছুঁৎমার্গী শাস্ত্র-মানা মনের বশ্যতা স্বীকার করে চলেছেন। কবি নিজে চিরটা কাল এই শাস্ত্রমুখী মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন। আজ তাঁর অস্ত্র তাঁর উপরেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। জানি এই আলোচনায় এসে সবাই কবির ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা পাড়বেন। কবির ইচ্ছা ছিল না তাঁর গান স্বাধীন ভাবে গাওয়া হোক। কিন্তু তারও উত্তর আছে। গায়কের কণ্ঠে রবীন্দ্র-সুরের সামান্যতম ব্যতিক্রমও গ্রাহ্য নয় এইটে যদি কবি নিজেই ঘোষণা ক'রে গিয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে আমরা বলব কবি আত্মখণ্ডন করেছেন। শাস্ত্র-ভাণ্ডার দুর্ণিবার তাগিদ থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জন্ম; কবি বারবার বাংলা গানের সুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘনের উপযোগিতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদের নিকট লিখিত পত্রগুচ্ছ ('সুরও সঙ্গতি') দ্রষ্টব্য। আর তাঁর নিজের গানের বেলাই কিনা গায়কের এক-চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই! সেখানে প্লান থেকে চুন খসলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল! এটা যদি শাস্ত্র-মানা মনোভাবের অত্যাচার না হয় তবে তা যে কী ভালো বোঝা যায় না।

পক্ষান্তরে, দিলীপকুমারের পোষিত স্বাধীনতার আতিশয্যেরও আমরা পক্ষপাতী নই। রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে স্বাধীনতার মহোল্লাসে মাতলে তার ফল কী ভয়ংকর হতে পারে দিলীপকুমার নিজেই তার প্রমাণ দিয়েছেন। তাঁর আখর-সমেত-গাওয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকার মাত্র। বলা নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমারের উপরি-উক্ত পদ্ধতির অনুমোদন করেন নি। করার কথাও নয়।

মনে হয় অতিরিক্ত বন্ধন আর অতিরিক্ত স্বাধীনতা এই দুইয়ের অন্তর্বর্তী কোন একটা জায়গায় এসে আমাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর নূতন ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরস্ফূর্তির জন্য, শ্রোতার সর্বাঙ্গীন তৃপ্তিবিধানের জন্য, অপিচ গায়কের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য, এই সামঞ্জস্যের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি।

অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের এত বড় একটা সমস্যা নিয়ে প্রথমোক্ত তিনটি বইয়ের লেখক তাঁদের বইতে সামান্যতম আলোচনাও করেন নি। এটাকে আমি গ্রন্থত্রয়ের একটি প্রধান ত্রুটি বলে মনে করি। বিশেষ ক'রে শান্তিদেব ঘোষ ও শুভ গুহ-ঠাকুরতা উভয়েই রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার প্রয়াস করেছেন—তাঁদের গ্রন্থে বিষয়টির অবশ্যই স্থান হওয়া উচিত ছিল। তথ্য সমাবেশের দিক থেকে শান্তিদেব ঘোষের বই অদ্যাপি তুলনাহীন, কিন্তু এই তথ্যসমৃদ্ধি যে পরিমাণ কবি-সান্নিধ্যজাত সে পরিমাণে সমালোচক-মনোভাব-প্রসূত নয়। শান্তিদেববাবু নিজে সুগায়ক, ছোট বেলা থেকে কবির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে বাস করার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। এটা তাঁর সুবিধা-অসুবিধা দুইয়েরই কারক হয়েছে। সুবিধা এই জন্যে যে, এর ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মর্মে প্রবেশ করা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছে। অসুবিধা: তাঁর সমালোচক-ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় নি। সুমহান ও প্রবল কোন ব্যক্তিত্বের প্রভাব-পরিধির মধ্যে বাস করলে অপেক্ষাকৃত স্বল্প-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জীবনে যা সচরাচর ঘটে থাকে এই ক্ষেত্রেও সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটে নি।



শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসঙ্গীতকে দেখেছেন মূলতঃ গায়কের দৃষ্টিতে, সমালোচকের দৃষ্টিতে নয়। যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করতে চান শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' তাঁদের বিশেষ কাজে লাগবে নিঃসন্দেহ, কিন্তু কেউ যদি এই বইটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে একটা বুদ্ধিদীপ্ত ধারণার আভাস পেতে চান তবে তিনি নিরাশ হবেন। কেননা এই বই মূলতঃ তথ্য পরিবেশনের মনোভাব থেকে লেখা, বিশ্লেষণী-বিচারের মনোভাব থেকে নয়। তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে একাধারে আশ্রমিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতকার শান্তিদেব ঘোষের যোগ্যতা অবিসম্বাদী। এই যোগ্যতার সঙ্গে লেখনীর কৃতিত্ব মিলিত হলে কী চমৎকারই না হত। শেষোক্ত কৃতিত্বের জন্য অন্য রকম সাধনার দরকার; সঙ্গীতের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত তাঁদের জীবনে সেই সাধনার অবকাশ পরিমিত হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং সেই দিক থেকে শান্তিদেব ঘোষের সম্পর্কে অভিযোগ করবার বিশেষ কিছু নেই।

তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সন্দীপনী গ্রন্থসাহিত্যের অপূর্ণতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশের কারণ আছে বই কি। সমালোচনা সাহিত্যে তথ্যভার-অসহ অভিমত-সর্বস্ব (opinionated) লেখা যেমন দুষ্য তেমনি তথ্যবহুল বক্তব্যবিবর্জিত লেখাও গুরুত্বহীন। শেষোক্ত লেখার মাত্র ততটুকু মূল্য যতটুকু তথ্যের মূল্য, তার বাইরে প্রত্যাশা করতে গেলেই বিপত্তি। আমরা প্রথম রীতির লেখকের নমুনা হিসাবে ধূর্জটিপ্রসাদের উল্লেখ করেছি; শেষোক্ত রীতির রচনার দৃষ্টান্তস্থল রূপে শান্তিদেব ঘোষের নাম সহজেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। দুই জন রচনারীতির দুই বিপরীত প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর সমন্বয় সাধিত হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত-সাহিত্যের অপূর্ণতা দূর হত।

শ্রীশুভ গুহ ঠাকুরতার 'রবীন্দ্র সঙ্গীতের ধারা' গ্রন্থটির ভিতর সমালোচক মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি, তবে সে পরিচয় নিতান্তই ছাড়া-ছাড়া ভাসা-ভাসা। শিল্প সাহিত্যে সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় অবলীলায়িত সঞ্চরণের ফলে, বিচিত্র বিষয়ে অধ্যয়নের ফলে, বিধিবদ্ধ চিন্তা ও কল্পনার অভ্যাসের ফলে, মানুষের মনে যুগপৎ যে রসরসিকতার ও মননশীলতার জন্ম হয় এই গ্রন্থের ভঙ্গি মোটেই সেই জাতের নয়—তবে গ্রন্থটি সম্পর্কে এইটুকু মাত্র বলবার যে এতে অন্ততঃ রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা আছে। এই চেষ্টা সকলের অনুমোদন লাভ করত যদি দেখা যেত লেখক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বাইরেও কিছু চিন্তা-ভাবনা করেছেন—শিল্পমনস্ক ব্যক্তি মাত্রের মনে শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ ভাবে যে ভাবাদর্শ বিদ্যমান থাকে সেই মানদণ্ড তিনি বক্ষ্যমান আলোচনার বেলায় প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আলোচনায় তেমন কোন পরিচয়ের ছাপ দেখতে পেলাম না। বরং মনে হল, রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনকারী ও শিক্ষক হিসাবে গ্রন্থকার রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিষয়ে যতটা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছেন সেইটেই তাঁর বিশ্লেষণের একমাত্র ভিত্তি। এত স্বল্প পুঁজি নিয়ে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখতে যাওয়া সাহস বই কি! লেখকের মনের গড়নটি বিশ্লেষণমুখী, কিন্তু যে পাণ্ডিত্য ও বিদ্যাবত্তা থাকলে বিশ্লেষণ সার্থক করে তোলা যায় স্পষ্টতঃই লেখকের ভিতর তার অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয় লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী কথঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ বলেও মনে হল। লেখকের দৃষ্টিতে সাঙ্গীতিক জগতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতই একমাত্র সৎ বাদ-বাকী সব অকিঞ্চিৎকর। লেখক হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতকে একাধিক বার বিজাতীয় আখ্যায় আখ্যাত করেছেন। এতে লেখকের ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞানের অভাবই শুধু প্রমাণ হয়, আর-কিছু প্রমাণ হয় না।

হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতকে বিজাতীয় আখ্যাদান ক'রে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ায় যথেষ্ট বুকের পাটা দরকার, কেন না রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের নিকট তাঁর অপরিসীম ঋণের কথা বারবার ঘোষণা করেছেন এবং এই ঋণের প্রভাব বাদ দিলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একটা বড়ো অংশ মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। ভারতীয় সঙ্গীতের ভিতর এই রকম জাতীয়-বিজাতীয়ের সীমারেখা অঙ্কনপ্রয়াস সঠিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। সঙ্গীত এক অখণ্ড ঐতিহ্য। তার নানা আঞ্চলিক ভেদ আছে, আছে বিদগ্ধ ও লোকসঙ্গীতের নানা রূপবৈচিত্র্য, কিন্তু সব জড়িয়ে সে এক মহান ঐকতান লীলা। ভারতীয় সঙ্গীতের এই অবশ্যক স্বরূপ-জ্ঞান ব্যতিরেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারণা ভ্রমাত্মক হতে বাধ্য।

গ্রন্থকার সমগ্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাণ্ডারকে তিনটি সুচিহ্নিত অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯০০ পর্যন্ত সময়কাল রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রথম যুগ; ১৯০০—১৯২০ সালের অন্তর্বর্তী কুড়ি বৎসর রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যযুগ; এবং ১৯২১ থেকে কবির তিরোধান কাল পর্যন্ত পরবর্তী একুশ বছর সঙ্গীতের শেষ যুগ। এটি হল কালগত বিভাগ; অন্তপক্ষে প্রবণতার দিক থেকে তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন—সুরধর্মী এবং কাব্য ধর্মী। সুরবিন্যাসের আদর্শে যেখানে কাব্যাংশের ব্যবহার, সে সব গান হল মূলত: সুরধর্মী; আর যেখানে কাব্যাংশের প্রয়োজনে সুরবিন্যাসের আশ্রয় লওয়া হয়েছে সেগুলি হল মূলতঃ কাব্যধর্মী সঙ্গীত। এই মানদণ্ডে গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের গানকে মূলতঃ সুরধর্মী এবং মধ্য ও শেষ বয়সের গানকে মূলতঃ কাব্যধম গান বলেছেন।

গ্রন্থকারের এই শ্রেণিবিভাগ সুসঙ্গত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে গ্রন্থকারের রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জ্ঞান প্রকটিত হয়েছে। তবে গ্রন্থের সর্বত্র তিনি এই খ্যাতি রক্ষা করতে পারেননি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, তৎ-কৃত পর্যায়ার ভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখক সমগ্র রবীন্দ্র-সঙ্গীতকে ১৭টি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা, ভানুসিংহের পদাবলী, নূতন তালের গান, লোকসঙ্গীত, স্বদেশী সঙ্গীত, টপ্পা, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, হাস্যরসাত্মক গান, হিন্দি-ভাঙ্গা ও গৎ-ভাঙ্গা গান, রাগ সঙ্গীত, ঋতু সঙ্গীত, শিশু সঙ্গীত, কাব্য-সঙ্গীত প্রেম-সঙ্গীত, ধর্মসঙ্গীত, উদ্দীপনার গান, বিদেশী সুরের গান, এবং ধ্রুপদ ও ধামার।

কোন্ ভিত্তিতে গ্রন্থকার এই শ্রেণিবিভাগ করেছেন সেটি ঠিক বোঝা যায় না। শ্রেণিবিভাগ জিনিষটা ভালো, তাতে বোঝাবার সুবিধা হয়, কিন্তু তার মুস্কিল এই যে তাতে সব কিছুকেই ছকে ফেলবার একটা প্রবণতা দেখা দেয় এবং বিচার্য বিষয়কে অনেক সময় অনাবশ্যক সরল ক'রে তোলা হয়। বর্তমান গ্রন্থটিও এই ত্রুটী থেকে মুক্ত নয়। আর-একটি বিচ্যুতি যা চোখে পড়ল তা হচ্ছে এই যে, পর্যায়তালিকাটিকে যত বড় সম্ভব নিঃশেষকর (exhaustive) করতে গিয়ে গ্রন্থকার এমন ভাবে তালিকা সম্প্রসারণ করেছেন যার ফলে জায়গায় জায়গায় এক তালিকা আর অন্য তালিকার মধ্যবর্তী সীমারেখা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, রাগ সঙ্গীত এবং ধ্রুপদ ও ধামার এই দুটি পর্যায় বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। ধ্রুপদ ও ধামার রাগসঙ্গীতেরই অন্তর্ভুক্ত দুটি শাখা, সুতরাং রাগসঙ্গীত থেকে আলাদা করে তাদের স্বতন্ত্র একটি পর্যায়ের মর্যাদা দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? যদি ধ্রুপদ ও ধামারের স্বতন্ত্র বিচার একান্ত অপরিহার্য ছিল, তবে রাগসঙ্গীতের অধীনে একটি উপবিভাগ সৃষ্টির দ্বারাই



সে কাজ নিষ্পন্ন করা যেতে পারত, দুই পরস্পর-নিরপেক্ষ পর্যায় নির্দেশ করে গোল পাকানোর কোনো দরকার ছিল না। শিশু-সঙ্গীত পর্যায়ে লেখক এমন কয়েকটি গানের নামোল্লেখ করেছেন যেগুলি আদৌ শিশু-সঙ্গীত নয়। 'দুই হাতে কালের মন্দিরা রে' শিশু সঙ্গীত এ আমাদের পক্ষে একটা সংবাদ বটে!

তথ্য সমাবেশের দিক থেকে শুভ গুহ-ঠাকুরতা শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' থেকে দুই হাতে উপকরণ আহরণ করেছেন। এটা দোষাবহ হত না যদি লেখক সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে নূতন কোন বক্তব্য উপস্থাপন করতে চেষ্টিত হতেন। কিন্তু উল্লিখিত শ্রেণি-ও পর্যায় বিভাগ ছাড়া তিনি আমাদের নূতন কী বক্তব্য শুনিয়েছেন? রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কে ভাবালুতাপূর্ণ এক কথাই যদি বার বার শুনতে হয় তবে আর লেখকদের সমালোচনা-ক্ষমতার উপর শ্রদ্ধা থাকে কী করে?

অতঃপর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রবীন্দ্রনাথের গান'। এটি একটি চটি বই—বৈতানিক-এর রবীন্দ্র-অনুষ্ঠানে প্রদত্ত তিনটি ভাষণ-প্রবন্ধের সংকলন। লিখন-ভঙ্গির বিচারে, পুস্তিকাটি অন্য দুটি গ্রন্থের তুলনায় নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্টতর। তিনটি রচনাই তথ্যপূর্ণ। দৃষ্টিভঙ্গীতেও অনন্যতা প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ ক'রে রাগসঙ্গীতের আলোচনার সঙ্গে অন্বিত করে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরূপ বোঝাবার প্রয়াস আমাদের বিশেষ ভালো লাগল! কবির কোন গানে কোন্ রাগলক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, কোন্ গানে কী রসভাব ফুটে উঠেছে সে সম্বন্ধে এমন প্রত্যয়পূর্ণ রচনা এর আগে চোখে পড়ে নি।

লেখকের ভাষার ডৌলটি মধুর, তবে বড় বেশি রবীন্দ্রানুসারী। কবির গানের বিচার করতে গিয়ে লেখক নিজেও যথেষ্ট কাব্য করেছেন। সেটি আমাদের চোখে বিসদৃশ লেগেছে। সমালোচকের ভাষা সমালোচ্যসুলভ বিশ্লেষণীগুণমণ্ডিত হবে এইটেই প্রত্যাশিত, বিশেষ করে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ন্যায় বামপন্থী রাজনীতি-অর্থনীতি-পড়া ব্যক্তির কলম থেকে যুক্তিপ্রধান শাণিত গদ্যের ভাষাই আমরা আশা করি। কিন্তু এই কি সে ভাষার নমুনা? আবেগের তাড়নায় লেখকের ভাষা এক-এক সময় বড়ো বেশি ললিত, বড়ো বেশি কমনীয়, বড়ো বেশি গদগদ হয়ে উঠেছে। বারবারই আমাদের মনে হয়েছে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিত্ব দুইটি খাঁচে বিভক্ত—এক খাঁচে গণমানুষের সম্পর্কে অসীম অর্জিত উৎসাহ; অপর খাঁচে বুর্জোয়া ভাবালুতা। 'রবীন্দ্রনাথের গান' পড়ে আমাদের সে ধারণা আরও সুদৃঢ় হল।

বইটির গোড়ায় লেখক একটি 'কৈফিয়ৎ' নিবেদন করেছেন। কৈফিয়ৎটির ভাষা আত্মাদরপূর্ণ। সেটি এই বইয়ের পক্ষে নিতান্ত বেমানান হয়েছে। লেখাটি আরও আপত্তিকর এ জন্যে যে এতে লেখক এমন দু একটি প্রতিষ্ঠানের সততার উপর কটাক্ষ করেছেন যাদের খ্যাতি শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথের সার্টিফিকেটের উপর নির্ভরশীল নয়। সৌম্যেন্দ্রনাথ লিখেছেন: "তাঁর গান নিয়ে ব্যবসাদারেরা ব্যবসা শুরু করেছে। এরা প্রত্যেকেই দাবী করছে যে এরা প্রত্যেকেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কিম্বা দিনেন্দ্রনাথের মুখ থেকে গান শিখেছে। প্রত্যেকেই দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি এরা কিছুদিন বাদে বাদেই আবিষ্কার করছে।" এ কথার মানে কি? কে বা কারা দিনেন্দ্রনাথের স্বরলিপি কিছুদিন বাদেবাদেই আবিষ্কার

করছেন? সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর এই অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন কি? না কি কেবল ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা আক্রোশই এই উক্তির একমাত্র প্রেরণা? তা যদি হয়, তবে তিনি নিজের প্রতি অবিচার করেছেন, যে মহাপুরুষের সঙ্গীতসৃষ্টিকে কেন্দ্র করে তাঁর এই উষ্মা তাঁর পবিত্র স্মৃতিরও অবমাননা করেছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথের ন্যায় ব্যক্তির নিকট হতে এ জিনিষ আমরা আশা করিনি সে কথা শতবার বলব।

এই রচনা শেষ হওয়ার মুখে রবীন্দ্র-সঙ্গীত সম্পর্কিত আর একটি ক্ষুদ্রাকার পুস্তক চোখে পড়ল।—শ্রীযুক্তা শেফালিকা শেঠ সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত।' এতে ইন্দিরা দেবীর একটি পুরাতন প্রবন্ধের অংশবিশেষ, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি রচনা এবং সম্পাদিকার একটি নামবিষয়ক প্রবন্ধ আছে। সম্পাদিকার উদ্যম প্রশংসনীয়।


জলের অভাব মেটাতে ১॥″ হইতে ৪″ পর্য্যন্ত

বিলাতী "পাম্প"

তদ্ব্যতীত

নানানরকমের ডীজেল ক্রুড অয়েল ইঞ্জিন, ধানকল, তেলকল, আটাকল, ট্র্যাক্টর, টিউবওয়েল প্রভৃতি যাবতীয় মেশিনারী বিক্রেতা

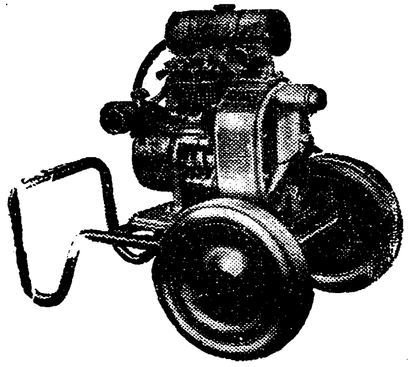

সলোমন এণ্ড কোম্পানী

( একমাত্র স্বত্বাধিকারী ঃ নৃপেন ভট্টাচার্য্য )

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ( মোহতা হাউস ) কলিকাতা—৯

টেলিফোন ঃ ব্যাঙ্ক ৪৪৯৭ তার ঃ AGRASTONS কলিঃ

## গীতি-চয়নিকা—

| | | |
|---|---|---|
| **সুধীরলাল চক্রবর্ত্তী** N 31368 | **কৃষ্ণচন্দ্র দে** P 11914 | **শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র** N 82507 |
| মধুর আমার মায়ের হাসি | বলি শুনহে মথুরারাজ | তোমার তূণে আছে |
| ও তোর জীবন বীণা | কুরূপা কুব্জা রাণী হ'লো | আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে |
| **কুমারী গীতা রায়** N 80003 | **কুমার শচীন দেববর্ম্মণ** P 11915 | **সন্তোষ সেনগুপ্ত** N 3139 |
| এখনো দুস্তর লজ্জা | সেই যে দিনগুলি | নীচুর কাছে নীচু হ'তে |
| একটি কমল ফুটেছিল | ঝিল্ মিল্ ঝিল্ মিল্ | থাকিস্ নে ব'সে তোরা |

রেকর্ডের সম্পূর্ণ তালিকা ডীলারের কাছে পাবেন।

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

"HIS MASTER'S VOICE"

The Hallmark of Quality

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ—কলিকাতা - বোম্বাই - দিল্লী - মাদ্রাজ।



# ক্রমোন্নতির পথে

গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় জীবন-বীমার অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানের এই ক্রমোন্নতি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে পূর্ব্বের মতই ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

**মোট চলতি বীমা—৮১,০২,৩৬,১৬৪৲**
**বীমা তহবিল— ১৭,৬৬,১৯,৬২৮৲**
**প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ—৮৩,৫৭,৯৭৮৲**

নূতন বীমা

১৬,২৮,৮৫,৮০০৲

## হিন্দুস্থান কো-ওপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।


Printed, Published & Edited by Satya Prasanna Datta, Purvasa Ltd.
P 13 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.


# পূরবাশা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পুর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি —যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পুর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পুর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস**
দু টাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
( অর্থনীতি বিষয়ক )
দু টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু'টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতিস্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রাবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেক রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন পম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা

মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, ক লি কা তা**


# টুকরো কথা... (১৮)

সাতই অগস্ট। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। বহু বছর আগে তাঁর এক শিশু উপন্যাসে তিনি এই বলে নিজের 'এপিটাফ' লিখেছিলেন : 'কোন ঠাকুর ? অবন ঠাকুর, ছবি লেখে।' 'বুড়ো আংলা' নামে সেই উপন্যাসটি আর সেই সঙ্গে বহুকাল নিঃশেষিত 'ভূতপত্রীর দেশ' ও 'বাদশাহী গল্প' সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। এই তিন বই থেকে বাঙলাদেশ আবার তাঁকে অমিতকীর্তি লেখক বলে আবিষ্কার করবে। বারংবার আবিষ্কার করার মতো বিস্ময় জমা হয়ে আছে তাঁর রচনায়॥

যাঁর কবিতা পাঠ করে মুগ্ধ হই, গল্প পড়ে খুশি হয়ে উঠি, যাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার দীপ্তি আমাদের মন আলোকিত করে—তাঁদের কাজের মধ্যে কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ বলে তাঁদের আমরা চিনতে পারি না অনেক ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও হয়তো নেই। সাহিত্য উপভোগ করতে হলে জানতে হয় না লেখকের তখন 'দক্ষিণ কাঁধে বাতের মতো' হয়েছিলো কিনা ? কিন্তু শিল্পী, সাধক বলেই যাঁরা অসাধারণ—তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ঘরোয়া কথা শুনতেও আমাদের প্রচণ্ড লোভ। আত্মকথা কিংবা জীবনচরিত যখনো কখনো আমাদের সেই কৌতূহল মেটায় বটে কিন্তু তার চাইতেও অনেকগুণ বেশি অন্তরঙ্গ পরিচয় পাই তাঁদের লেখা চিঠিপত্রে। কানে কানে বলার মতোই তা ব্যক্তিগত। এবং বিশেষ ব্যক্তিকে লেখার গোপনীয়তা কোনো একদিন এইসব রচনার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই তা রোমাঞ্চকর। 'ছিন্নপত্র' কি 'ভানুসিংহের পত্রাবলী', 'পথে ও পথের প্রান্তে' কিম্বা নানা-খণ্ড 'চিঠিপত্রে' যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই, সমগ্র রচনাবলী পাঠ করেও তার অভাব মিটত না। এই সব আশ্চর্য চিঠির পাতায়-পাতায় ছড়িয়ে আছে স্বামী, পিতা, বন্ধু রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ আর এক পরিচয়। 'শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী' খুলে দেখা গেল তাঁকে থেকে শরৎচন্দ্র লিখছেন : 'গল্পটল্প এঁরা যদি লেখেন, আমি তাহলে শুধু প্রবন্ধ নিয়েই থাকিতে পারি। গল্প লেখা তেমন আসেও না, বড় ভালোও লাগে না। বয়েস হয়েছে, এখন একটু চিন্তাপূর্ণ কিছু লিখতেই সাধ হয়।' ভেবে অবাক লাগে ইনিই বাংলা গল্পের যাদুকর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! চিঠির পাতায় এ যেন আর একজন আর কথা লেখা। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দ এবং অরবিন্দের পত্রও এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরীর পত্রাবলী কবে বেরোবে ?

সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' আর অন্নদাশংকরের 'পথে প্রবাসে' ছাড়া বাংলা ভাষায় এমন কোনো ভ্রমণকাহিনী প্রায় তুলত, বিষয়গুণ ছাড়াও যার জন্য আরো গভীর আকর্ষণ আছে। রাণী চন্দের 'পূর্বকুম্ভ' এই শ্রেণীর রচনায় একটি বিশিষ্ট সংযোজন। হরিদ্বার, মথুরা-বৃন্দাবন, কাশী, প্রভৃতি তীর্থস্থান ভ্রমণের লাবণ্যমণ্ডিত বর্ণনা॥

প্রবন্ধ॥ বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে দুটি বই। রেজাউল করিমের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ' এবং নতুন মুদ্রণে ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত-র 'রবীন্দ্রনাথ'। প্রথম গ্রন্থটি বঙ্কিম শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত প্রবন্ধের সংকলন। বিশ্বভারতীর 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে' তিনটি নতুন সংযোজনা : (১) ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পালের 'ভাইটেমিন', (২) সমীরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'মনস্তত্ত্বের গোড়ার কথা' এবং (৩) চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর 'বাংলার পালপার্বণ'। শিক্ষার পরিপূরক ও সংশোধক রূপে' ধরনের বই অপরিহার্য॥

স্যার জেম্‌স জিন্‌স-এর বিখ্যাত রচনা 'দি মিস্‌টিরিয়স ইউনিভার্স' সিগনেট প্রেসের জন্য অনুবাদ করেছিলেন শান্তিনিকেতনে বিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। সরল ভাষায় বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু আমাদের দেশের জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে প্রমথবাবুর চেষ্টা অপরিসীম। সেই 'বিশ্ব-রহস্য' গ্রন্থখানার নতুন দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন ছাপা ছিল না। জিন্‌স-এর 'সুটারস্‌ টু দেয়ার কোর্সেস' থেকে সিগনেট প্রেসের পরবর্তী অনুবাদ 'গ্রহ-তারা-রবি'। অনুবাদ করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র॥

**উপন্যাস॥** জার্মান লেখক রেমার্ক-এর দুটি অনুদিত উপন্যাস সিগনেট প্রেস থেকে নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হচ্ছে : প্রথমে 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', তারপরেই 'তিনবন্ধু'। যুদ্ধান্তিক বেদনার অভিজ্ঞতা রোমার্ক-এর রচনায় আশ্চর্য শিল্পরূপ পেয়েছে॥ দীপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আগামী'-র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে॥ নতুন উপন্যাস : জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'মনের অগোচরে'—পশ্চিমের ছোট শহরে আধা-বাঙালী পরিবারের বেদনার্দ্র কাহিনী ; আর ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের 'আমেরিকার নিগ্রো'—গল্পাকারে সত্যঘটনার ছায়া অবলম্বনে লেখা॥ শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' আবার ছাপা হয়েছে॥

**ছোটগল্প॥** বাঙালী পাঠকের না হলেও বাঙালী সাহিত্যিকের মনের-ঝোঁকটা আসলে ছোটগল্পের দিকে। 'ফসিল'-খ্যাত সুবোধ ঘোষের নতুন বই 'ভূতগৃহ' এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচাকাহিনী' পড়ে এই কথার সত্যতা নতুন করে উপলব্ধি হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় ছোট গল্পের বই 'প্রাগৈতিহাসিক'ও আবারও ছাপা হয়েছে। গোর্কীর গল্প অনুবাদ করেছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় : 'অবন্ধনা'। ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের গৌরব॥

**নতুন কবিতা॥** সমীরণ গুহ-র কাব্যোপন্যাস : 'বিভাবরী' এবং উষা দত্ত-র 'মর্মর'। দুই লেখকের দুটি নতুন বই ;

**হালকা নাটক॥** দেবাংশু সেনগুপ্তের 'হালকা সুরে'॥

**ছোটদের॥** মনোবিজ্ঞানী গিরীন্দ্রশেখর বসু লাল-পিঁপড়ে-কালো-পিঁপড়ের লড়াই নিয়ে ছোটদের এক মনোহর উপন্যাস লিখেছিলেন—'লাল কালো'। ছবি এঁকেছিলেন কজ্জলী-গড্ডলিকা-র ছবি আঁকিয়ে যতীন্দ্রকুমার সেন। সিগনেট বুকশপে এখনো কিছু কপি পাওয়া যায়॥ বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রকৃতি-বিজ্ঞানী, গবেষক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন 'বাংলার মাকড়সা'। আশ্চর্য বই॥ পেঙ্গুইন, গ্রন্থ, বীভার প্রভৃতি অদ্ভুত জীবেরকথা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : 'জানোয়ার'॥ এবং বিজ্ঞানবিচিত্রা সিরিজে গল্পের ভাষায় জীববিজ্ঞান লিখেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : 'এই দুনিয়ার চিড়িয়াখানা'। পশু-পাখি পোকা-মাকড়—ছোটদের এরা প্রিয় বন্ধু। এই শৈশব বন্ধুদের কথা এবং কাহিনীতে বাংলা শিশুসাহিত্য ক্রমেই আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে॥

'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' প্রথম খণ্ডের উল্লেখ ছিল গতবারের টুকরো কথায়। এবারের টুকরো কথা ছাপা হওয়ার আগেই লেখক মোহিতলালের মৃত্যুসংবাদ এল। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কবিদের মধ্যে 'স্মরগরল'-এর কবি মোহিতলালের প্রতিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর ইচ্ছা ছিল 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' চার খণ্ডে সম্পূর্ণ করে যাবেন। দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি শেষ করতেই দিন শেষ হয়ে গেল। ষাট পেরিয়েছিলেন, তবু তাঁর মৃত্যু অকালমৃত্যু॥




# আমার শিশুর জন্যেই এই বার্লি




আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার মা একথাই বলতেন। সেরা শস্য থেকে, স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে এবং দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'পিউরিটি' বার্লি তৈরি। এই বার্লি যেমন চমৎকার, তেমন এতে খরচও কম।

**পিউরিটি বার্লি**

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

APEX 8-BEN

# এই উপ-মহাদেশে বছরে ২০ লক্ষের বেশী লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়

ভেবে দেখুন, শুধু ম্যালেরিয়াতে যারা মারা যায় তাদের সংখ্যাই এই, আর ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে শক্তিহীন হয়ে যারা অন্য রোগে মারা যায় তাদের কথা ধরলে এই ভয়ানক মৃত্যুসংখ্যার তাৎপর্য আরও কত বেশী হয়! ম্যালেরিয়া হওয়ার ভয় সব সময়েই আছে — সামান্য একটি মশার কামড়ই এই রোগ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একে আপনার কিছুতেই অবহেলা করা উচিত নয়।

আজকাল ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে 'প্যালুড্রিন'। একটি বড়ির দাম এক আনা — সপ্তাহে একদিন একটি বড়ি খেলে ম্যালেরিয়ার সাধ্য নেই যে আর কাছে ঘেঁষে। সপ্তাহে মাথাপিছু মাত্র এক আনা খরচ — আপনার উচিত এই সামান্য খরচে বাড়ীর সবাইকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করা। সেবনবিধি নীচে দেওয়া হল।

## ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বদ্ধ মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।



# 'প্যালুড্রিন'

*ম্যালেরিয়ার যম*

**সেবন বিধি**

জ্বর অবস্থায়: পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।




জ্বর প্রতিরোধের জন্য:
উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীজ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

ICP 75

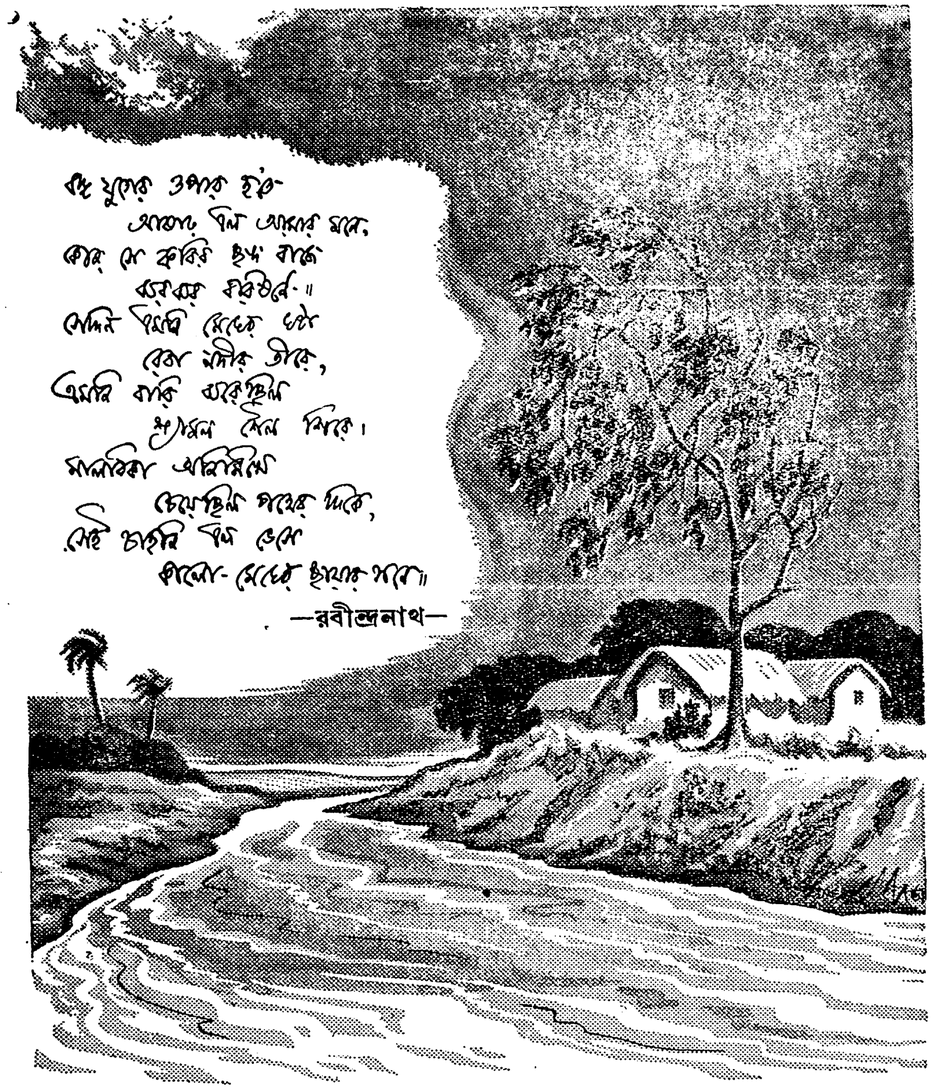


ঋতুচক্রের বিচিত্র উৎসব-মুহূর্তগুলিকে
রঙে রসে মধুর করে তোলে

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB 65

পূর্ব্বাশা

পঞ্চদশ বর্ষ
শ্রাবণ—১৩৫৯

# নীল-লোহিত

[ উত্তর মেঘ—উত্তর কুরু—উত্তর কাণ্ড ]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

'অহো রাত্রানি বিদ্বদ্ বিশ্বস্তমিষতোবশী'

কবে কোন্ দক্ষ—ইন্দ্রিয়-দেবতা—নক্ষত্রীয় নখে প্রাক্-চীনে করেছিল তামসীরে দীর্ণ।
হায় অমাবস্যা, প্রাচীন তমস্বিনী তাপসীর তনু নিয়ে প্রাচীর তিমিরে হলে মগ্ন ॥
তবু কোনো তন্বী নিয়ে মনোবহ্নি ধন্য হতে চায়, ধ্বনি আসে দক্ষিণী, 'জয় যামদ্বগ্ন্য'।
যৌবনা পীনা ধনি ধরণী যে উন্মন, মন্মথ-উন্মেষ প্রমথের কৃশাণুর রশ্মিতে শীর্ণ ॥
অলকের কোন্ মেঘে মিশে হল উশীনর, কোন্ কিন্নরী শেষে হয় 'উছিন্ন-
উষা' হয় অলকায় কোন্ অনিরুদ্ধ ?
'ওঁ মণিপদ্মে' তিব্বতে কেন সেই বুদ্ধ ?
ঈক্ষণে-বীক্ষণে পরম পুরুষ কে বা সৃষ্টি-রহস্যোত্তীর্ণ ?
বিশ্ব না শাক্য, সাংখ্য না শঙ্খ, শঙ্কর-ওঙ্কার প্রথম শিলায় কার নাম উৎকীর্ণ ?

"যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্ব্যং নম্-ওভির্-বিশ্-লো কেতু পথ্যেব সূরেঃ।
শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা-আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ ॥'
ব্রহ্মর্ষিপুত্র ব্রহ্মপুত্র গুপ্তলবকুশ অশ্বিকুমারদ্বয়।
'সচূতসঙপোঁ' 'মুনিদারকো' হর্ষবর্দ্ধন সঙ্গীতময় ॥
তাম্রপর্ণ—আম্রপল্লব, তাম্রবর্ণ তাম্রলিপ্তি।
আমরা অগ্নি, আমরা দীপ্তি,
আমরা ভ্রাতৃ, আমরা ভগ্নী।
আমরা ধাত্রী, গায়ত্রী মৈত্রী, ক্ষত্রী, শ্রোতৃ, সবিতৃ, সৎ-ঋ, আমরাই জেনো শতঘ্নি ॥

*

উত্তরা-পিতা বিরাট মৎস্য-রাজ।
প্রথম ব্রাত্য ব্রহ্মপুত্র অভিমানে অভিমন্যু হয়ে কি নিল লোহিতের সাজ ?
দুরাচার অর্জ্জুন—
হায় 'সবিত্র প্রসব' বৃত্র যুক্ত ব্রহ্মে ছিলো আরো কতো বভ্রুবাহন-ভ্রূণ !
'ব-ভুরু'র বলে বভ্রুবাহন তোমারি মতন 'বেভেরু-জাতক'ময়,
বেবিলন করে জয়,
'নর্দ্দিতবীর' তিব্বতী হ্রদে, রোদে, ক্রোধে মিশে 'নদিতবির' কি হয় ?
কুজ্ঝটিকার ঝড় থামে কবে 'নেবুচড়নেজ্জর' ?
অভয়-লক্ষী নবচণ্ডেশ্বর,
ইরাণী 'দৃবস' 'অভাজন' কয় যারে, বাইবেল হঠযোগে করে বশ
সে নয় কখনো কামাখ্যা-সূত, সব্যসাচীর রক্তের অপযশ।
যশদ-দস্তা যশোদ-পারদ যশোধরা শশধর।
উদিত-সূর্য্য স্বর্ণ-কুম্ভ দাক্ষিণাত্যে কুর্ম্ম-দেবতা বিদ্যায় সুন্দর ॥
সেখানে তোমার ছিল 'মনোরথ-অশ্ব' ও 'আশা' 'আশ' ও বিদ্যা 'অশ্' ॥
'তম্ অশ্ অনায় অপিপাস অভয় অম্অ নবব অর্জৎ'
ভারতের মাথে মাতৃকা ছিল গঙ্গা তাই সে ছিলনা 'মাথ্রা'-মান
জয়দ্রথেরা মরে পথে পথে, ওফির-ওভির সিংহলে তাই বিজয়-সিংহ যান !
সে-ও লুণ্ঠক—বুঝিবা ধনঞ্জয়।
তারি পথ কেতু-পথ
সেতু-পথ করে কেতন উড়ায়ে নিয়ে গেল জয়-রথ
ব-দ্বীপে তিনি দিব্য, রাজ-শ্রীবৎস শনির লাঞ্ছনা পান উশনের সন্তান।

'উশন্ হবৈ বাজশ্রবসঃ'

কেতুপথে কোন পূর্ব্বোত্তরী সূরী এসেছিল ঈশাণ-কোণের সে কোন্ বিবস্বান—
'প্রাগজ্যোতিশেষ-দুর্জয়াখ্যপুরম'-পুরন্দর
ব্রহ্মপালক বিদ্যায় সুন্দর
পরমভট্টারক শ্রীহট্ট মহারাজ কোন্ বাজ
কোন্ ব্রজ-রাজ পরিব্রাজকের বেশে এসে অজ শৃঙ্গ-ধ্বংসে হল বন-নীল কংস ?
নূতন 'ভূতন'-বংশ !



নীলকণ্ঠের নীল ও লোহিতে কনক-কাংস্য-মণ্ডিত বলে কৃষ্ণের রণসাজ ?
ঈশাণে ঈর্ষ্যা বিষ্ণুর।
কে দিয়েছে প্রাণ কে রেখেছে নাম, বলো, সহিষ্ণু জিষ্ণুর !
নমো প্রাক্-সূরী বাংলা—
গোমতী-গোমাতা অহি-মহী মহাভূত নিয়ে তুমি জাঙ্গাল তুমি জংলা !

চন্দ্রচূড় তুমি তুমি, চোড়গঙ্গ নটরাজ অর্দ্ধনারীবৎ।
'যত্র যোনিং কৃণ্বসে নহি তে পূর্ত্তমক্ষিপৎ।"
যত্র য়ওনিং কৃণ্ব সেনহিতে পূর্ত্তম্ অক্ষিপৎ।
যত্রয় ওনিংকৃণ্ব সেনহি তেপূর্ তমক্ষিপ্ত।
যত্র য়োনিংকৃণ্ব সেনহি তে পূর্ত্তম্ অক্ষিপৎ ॥

বভ্রুবাহন-কেতু আর অভিমন্যু-রাহুর যশ
চন্দ্রচূড়ের চন্দ্র-গঙ্গা গ্রহণের পরবশ।
যদি কেউ করে গ্রাস—
বাহু পাশে তারে বদ্ধ করেছি আমি উত্তরা ঈশাণের ছায়া করেছি স্বামীরে নাশ।
মনসা হয়েছি ঢেলেছি ওষ্ঠে বিষ—
বৃহন্নলারে অভিশাপ দিতে আমি সাপ আমি নাগিনীকন্যা—তবু ন্যায় শিবাশীষ !

ষড়রাহু পঞ্চপাণ্ডব-কৃষ্ণ।
ষড়রাহু কৃষ্ণার অভিমন্যু ॥
ভাবলে কি তোমরা পূর্ণ কৃৎস্ন ?
তোমরাই জম্বু, তোমরাই জহ্নু ??
আছে জেনো সপ্ত।
সুদর্শন ছাড়্ সপ্তচক্র ॥
গঙ্গাবক্ষে আছে ক্রুর নক্র।
আছে হর-হর-হর ব্যোম-ব্যোম শব্দ ॥
চক্রব্যূহে আছে রথীগণ সপ্ত ॥
[ 'সপ্তচক্রে ষড়রাহুঃ পিতমিতি।' ]

## নীল

যো বঃ শিবতমোরসস্ তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥

'যৈদব-শম্প' 'ধব-সুন্নর'

ধ্বনি আসে দ্বৈধ উত্তর-কুরু হতে 'বৈত্যগ্নন্তী-নদী-সুর-সলিলের রব-সুন্দর।
কোন্ জল-আলেয়াতে বৈশম্পায়ন আছে আহুতির ভঙ্গীতে আহা।
বৈতরণীর জলে যদু-নিধনের তরে সে-ই কি এ-ধ্বনি তোলে, অগ্নয়ে স্বাহা?
সর্পযজ্ঞের স্বর শুনি হিস্-হিস্ হুস্-হুস্ হস্-হস্ হস তাত!
ছাখো 'দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।'
সুর বয় অগ্নির মাতা-মাতুলানী-কন্যা-ভগ্নী-ভাগ্নী॥

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।"

ধ্বনি কয় দুর্ব্বাসা তুর্ব্বস-রমণীর কর্ণে।
ধ্বনি রয় অর্যমা-কুন্তীর কর্ণে।
সেই সুর সুমধুর কণ্বের মালিনীর শকুন্ত-লাবণির সঙ্গে।
সুর ধ্বনি হয় পুনঃ 'গঙ্গেম্'।
শব্দ ধ্বনিত শুধু সর্ব্বদমন নামে, ফিরে আসে নিজ ধামে অরণির বর্ণে॥
'দময়ন্তী ও নল, দময়ন্ ত্রি-অনল'—ধ্বনি বয় ভারতের দশরথ-অশ্বে।
দৌষ্মন্ত্যের পাপ দুর্ব্বাসার শাপ নেই আর শ্রীভারতবর্ষে॥

পাপঘন, পাপঘ্ন, পাবক, অগ্নি!
তাই কি এসেছে রাম-ভার্গব-রাত্রি?
মেধ কি সমিধ তার নরমেধ-যজ্ঞে?
বৈশ্বানর নর চতুর্বর্গে॥
কুশধ্বজ-মাতা কাঁদে জীব-ধাত্রী!
পুত্রহন্তা কে এ যম-মূর্ত্তি—
অক্ষ-কক্ষ-রক্ষক সক্ষী?
হত্যায় তাই তার এম্নি স্ফূর্ত্তি!



[ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল—কুরুক্ষেত্র ]

'নপ্ছিতল-উলন-মুরেন' নদী—নবশীতল ওলো মূঢ়ে ননদি।
'নপ্ছিতল-আলন-মারেন' নদী—'ন বশীত লালন মারে' ননদি!
'নবচিতলোলমুরয়ন' নদী
অপচিত নয়নের সুর আনে যদি?
চিতলোল ময়ূরীর মন নিরবধি
'বলা-গৌতমী'—তুমি নও ত ওষদি
জানি আমি মূর স্বামী তবু 'শূর'-হৃদই!

*

নয়-অতি-শীত-অতি-উষ্ণ মণ্ডল
নব শীতে নবনীতা রুক্মিনী-কৃষ্ণার উষ্মা-রোমাঞ্চিত ওষ্ঠানল।
অক্ষি-পক্ষ্ম উন্মোচিত হল উন্মীলিত-দল নীলোৎপল
কই নীলকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ-ধাম শূন্য, পূর্ণ-হলাহল।
বঞ্চক অর্জ্জুন পাঞ্চজন্য, বঞ্চক কৃষ্ণ সুদর্শন
তেম্নি কঞ্চুক মন-প্রবঞ্চক নয়ত দুর্জ্জয় দুর্য্যোধন!
ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ইন্দ্র হতে চায় ইন্দ্রপ্রস্থে ভাগ বসায়!
বজ্রধর হয় মঘবন মেঘবান, দেবতা মঙ্গল-ঘটের গায়।

*

মাঘ-মণ্ডলের ঘরে নেই আজ মণ্ডল-ঈশ্বর।
শালগ্রামে শীত কৃষ্ণ। মাঘ মাস। উত্তর অয়নে
অর্যমা-অর্জ্জুন ঘোরে ঘরণিরে পেতে। সে-দৃশ্যর
ছবি আঁকা রবে চিরদিন, রবি, কুমারী-নয়নে।

*

সূর্য্য তোমার প্রবঞ্চনায় তৈরী কুরুক্ষেত্র!
তন্বী শ্যামায় মুগ্ধ হয়ে যেদিন নত-নেত্র
পাণ্ডু হলে চন্দ্রোপম, কুন্তী হল বধ্যা।
বদ্ধা নারী বন্ধ্যা ত নয় তনয়-বধে লিপ্তা
লুপ্ত তমো-লোকের মনে রইলে তা প্রদীপ্তা॥

[ ষট্‌চক্রোদগম অঙ্কুর ]

সৎ-চিৎ-আনন্দ
'অভীঃ'
'ইষ্ট' ॥
'অভীরিষ্ট' ॥॥
তাই ত পর্ব্বত-তিব্বত।
তাই তো সে গৌতমী, গৌরী-শঙ্করে, নন্দায়-নন্দীতে বন্দিত-ছন্দিত শিববৎ ॥
তাই তিন মন্ত্রে চায় ছয় রন্ধ্রে পরমা উমারে ডেকে ঋ-তে করে হৃদ্‌-বধ ॥
ভীত স্বামী দুর্গার।
খড়্গের ভয়ে কোথা দুর্গম গিরি-পথে উধাও বাহনে নব খুর-গার ॥
তখনো সে বিলোচন কালো-রমণীর কোলে দিল মোহানন্দে ক্ষুর-কার ॥॥
'গিরিশ'ই আবার কি না তারে বলে 'নহ পীত' তাই তার পীত থাকে চন্দ্রে গুপ্ত।
'গোপিত্ত' বলো তা'রে বলো 'যম' কার ভুলে—কার ভুলে 'কো-রবানি' হল অবলুপ্ত ॥

*

ছাখো ছাখো তিব্বত-পর্ব্বত।
পশ্চিমে খর 'করকোরামের' 'নীলটোটা' পূর্ব্বে 'বটং' বটে খর্ব্বত ॥
( 'অর কোটি' 'নীলম জোং' আছে কেন্দ্রে ) নীলতোতা বটপাতা স্বর-বৎ ॥॥
'বট-অভীয়া' টিয়া আসে অগ্নিকোণ থেকে তাই বুঝি ঝড়-বৎ ॥॥

*

"তেজোরূপা প্রিয়া তস্য ব্রহ্মবর্ত্মসুদুর্লভা।
পরমং ব্রহ্ম যৎপাদপঙ্কজদ্‌ধুতিবৈভবম্ ॥"—তারক ব্রহ্ম মন্ত্র ॥

—

"জানি বিশ্বামিত্র মুনি আনিলেন রঘুমণি
অনুজ লক্ষ্মণ করি সঙ্গে।
দুর্ব্বাদল শ্যামতনু ঈষতে হরের ধনু
ভাঙ্গিলেন ঈষৎ তরঙ্গে ॥"—কৃত্তিবাস ॥

*

তুমিও মিশিলে মাতা, গৌরী মাতা, মিশিলে, ছিঃ, রামে !
আমি লব, নিব প্রতিশোধ, অহো বেদনা চিরা মে !!
যদি মরি তা-ও ভালো, তুমি আর পাবেনা শ্রীরামে ॥॥



শত্রুঘ্ন রামের ভাই আমার কি ভাই নাই ?
যুদ্ধে কুশধ্বজ জয়ী অবিরাম, জানে না বিরামে ॥

*

আমি রাম তবু আমিই আরাম, আমিত মিশ্র, আমি তমিস্র রাত্রি !
তাই দেবযানী-সতীর সীতার সিঁদুরের রাঙা সুদূর পথের যাত্রী।
আমি হরতনু ভাঙি হরধনু ঈশাণ-নিশানা দেই ত্রিশূলের চিহ্নে—
মেঘার সেই মেঘনাদে বলো চিনবে কি করে আমার আকাশ ভিন্নে—
কি করে আষাঢ়ে আসে রামধনু যদি নই যদু কিন্নর মাতরিশ্বা
আমি নর-নারী, ঈশ্বর, তবু অর্দ্ধ, তাইত আনি মহ-মোহ, ঈর্ষা !
'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ'

*

কে হ'ল নীল হলাহল ?—শ্যামাঞ্চল ! আকাশ-জল ?
বরুণ-অসি, বরণসী, মহেশ্বর ?
'সুদাস' তবে শব্দ-স্বর প্রথম স্বর মহাস্বর : স্ :
ইন্দ্র তবে মহেন্দ্র, সুদাস স্বরস্বতীর বর !

*

শব্দ-শরে দশরথ সর্ব্ববিদ্যা করে বধ।
রাবণ করে বিদ্যাদান, রাম হয়েছে ভগবান।
নারায়ণে সমর্পণ ভাইকে করেন—এমন প্রাণ।
সীতার চিতায় তোলেন মঠ—এমন শঠ !

*

রামের মতোই দুর্গা বীর
সিঁদুর নয়, লাল আবির !
সিংহী তবু ভয় গাভীর !
মহীশ-অশূর স্বামীর খোঁজ
করতে গিয়ে মহিষ-ভোজ !
লক্ষ্মী মেয়ে ছাড়ে ঘর
নারায়ণে স্বয়ম্বর ॥

## লোহিত

তস্মা অরং গমাম বোযস্ত ক্ষয়ায় জিষ্ণথ
আপো জনয়থা চ নঃ ॥

॥ জবাকুসুমের প্রাণে শঙ্কা আনে কাশ্যপেয় শ্যেন ॥

গর্ভে থেকে বামদেব ঋষি কহিলেন :
আয়সী-পুরের রক্ষ ছিল জবসান।
অধঃপতি শ্যেন তারে যে মন্ত্র শোনান।
তার নাম 'ইরদীয়ম্' হৃদীয় আগুন।
ইরম্মদ নাম তার—জবালার ভ্রূণ।
ইন্দ্র তার দাতা, নেত্রী বশিস্থা বারুণী।
অরুণের সেবা করে যেমন আরুণি—।
বারুণী তেমন ছিল, এখন ইন্দ্রাণী।
পড়ে দেখ ঋক্‌বেদ কে রাজা কে রাণী।
ইন্দ্রাণী হওয়ার মানে ইন্দ্রিয়ের সেবা।
জবালা জানে না তাই স্বামী তার কে বা ॥

*

আমি যদি সত্যকাম পিতার মাতার,
নীল ও লোহিত লেখা জন্মবিধাতার,
তাই শিরোধার্য্য হোক। বরুণের প্রতি
বাম আমি, বামদেব, আমার আরতি
দক্ষিণের অধঃপতি শ্যেনেতে ধ্বনিত।
বিশ্বা থেকে সব দেব যেমন জনিত—
আনিও শ্যেনের অংশে জাত দেব+ঋষি ;
বামদেব ঋষি হয়ে শ্রুতিপথে মিশি ॥

*

শচী কর নমস্কার শচী কর নমস্কার।
'বিশ্বরূপ সেন দেব' যাহার আকার ॥
'বজসেন' কেবা হয় বোঝ মর্ম্ম তার।
কেবা রাম কে লক্ষ্মণ 'বর'—অবতার ॥



দেবতা-জনীন বিশ্বা 'শন্তনূপ্যা', ভীষ্মমাতা
অমিত্র, অনার্য্যা হয়ে ঘোরে!
বর্ত্তমান ইতিহাস 'গঙ্গা'তে অনার্য্য-ভাষ
পেয়ে ছিন্ন করে আর্য্য-ডোরে।
মানচিত্রে বাইবেল ইতিহাসে হানে শেল
বলে, দেখ গাঙ্গেয় কাহারা।
'নোঅহে'র বংশধর 'ইণ্ডিয়া'র বীরবর
কে কোথায় দিতেছে পাহারা।
নূতন সর্গের আশে বিশ্বামিত্র কেন নাশে
স্বর্গ-সৃষ্টি, বেদের ব্রাহ্মণ—
সে-ধ্বনি-তত্ত্বের ঢেউ খুঁজে কি দেখেছ কেউ
আছে কারো সেই দৃষ্টি-মন ?

অর্যমা হয়ে গেছে অর্ষমা।
সূর্য্য নেমেছে স্নানে বর্ষায় ॥
সরযূর সব নারী কিন্নরী চর-সমা ॥
উর্ব্বশী নয়, শুধু উর্ব্বরা হীনমতী সম্বৃতা নয় দুর্দ্ধর্ষা ॥

*

'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য-মন্দির মোর'

*

ভাদ্রে আসুক বন্যা মাঘে ঝরুক জল
তবু তোমার কন্যা শূন্য রবে ঘর
নিভবেনা অনল।

*

সো মহ কন্তা দূর দিগন্তা। পাউস আএ ঢেউ চলাএ ॥
—প্রাকৃত পৈঙ্গল ॥

॥ রৰবয়েত ॥
মহেশ্বর দিগন্তে মিলাক,
কেউ পুষ্যা পুষি হয়ে থাক

লোমপাদ পশু-ঋষি-বৎ,
ডেকে বলে খনা আর ডাক ॥

কেউ ভদ্রা হরণ করুক
জন্মদিনে বাদল ঝরুক
হোক নীল, পাক পীত রাশ
মুহুর্মুহু লোহিতে স্মরুক ॥

কারো পৌষ কারো ভাদ্র মাস,
কার হ্রাসে ফূর্ত্তি-অবকাশ
হল তার সাক্ষী চিরকাল
কাল বৈশাখীর লাল-আকাশ ॥

*

কেষ্ট তুমি অষ্টমী,
দুর্গা-রাম-নবমী,
দশমী কি বোষ্টমী ?
একাদশী নষ্টামী।

*

যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল আমারো দিনগুলি
ছিল একদিন, আজো মনে পড়ে সে-ফুলের পরাগ, হিঙ্গুলই ;
তবু বলি, করো, সচী, বহ্নির চয়ন।
অহ্ন-চয়ন করো, পঞ্চমাগ্নি, হোক অত্রিনয়ন।

*

সোম-প্রিয়া পিয়ালি,
তমো-মনা-দিয়ালি,
ওম মানে হেঁয়ালি ?
অনেক মেয়েলি হয়েছে, আর না, ঋজু উত্তর দাও—
বলো বলো খুলে আবারো তেম্নি শত-ইন্দ্রিয়া ইন্দ্রাণী হতে চাও ?
একবার ঋতে বাঁধ জীবনের ভিত
ইলাবৃতের বৃত্রে শরৎ-মেঘের বৃত্তে বিশ্বামিত্র-ভরত উপস্থিত।



ভৃত্য সে ? হোক্ রিক্ত মোটেও নয়
সে-ও এক মেঘ-সমুদ্র-গম মগ্ন-উৎস তন্ময়-উষা সূর্য্যসত্তা ঊর্দ্ধলোক তনয়।

*

পূর্ব্বে তাকাও সব 'খণ্ডল'—আখণ্ডল ত নলিনীর নালে লীন।
আমি অখণ্ড-মণ্ডলাকার, পঙ্কজ আমি বঙ্ক মৃণালে তামরস শতদল।
তুমি গীর্ব্বাণী, আমি 'নবগীর্ব্বাণ'—
ব্রজযোগিনী পেছনে থাকুক চলো গড়ি মহাযান ॥
কমল-আসনা স্বরস্বতীর বীণ
বাজুক তোমার হস্তে দেখুক শ্রীমন্ত সদাগর
কমলে-কামিনী গজ-লক্ষ্মীরে, মশানে দেখুক চণ্ডিকা-মাতা বালেশ্বরের বল।
'জলধি-অয়নে' তুমি হস্তিনী, আমি হব 'নবপোলশ্বর' ॥

*

স্বর্ণমেরুর সোনালি 'সুমেরে' সবোবর জরাগ্রস্ত।
সেখানেই জরথুষ্ট ইষ্টে অগ্নিকুণ্ডে ঈশাণের চাঁদ যায় যদি যাবে অস্ত ॥
অস্ত কি যায়—প্রাণ কি অস্ত যায় ? শুধু করে ন্যস্ত
নিজেরে অন্য তনুতে, ধন্য হতে চায় বারবার।
ধ্বনি চলে যায়,নাম যায়, তবু সত্তা ত অনিবার।

ঈশানের ঈশা-ঈশ থেকে যায় আসে ফিরে আগন্ত্য।
চর্চ্চাতে আর চর্য্যাপদের ইশারায় সেই একই শূন্য প্রশস্ত, ভাগস্থ ॥
ভাগস্থ দশ-চক্রে।
হংস-বিধাতা হাসেন ওষ্ঠ-বক্রে !
দশ এক হয় যোগের চিহ্নে-ক্রুশে
যুপ-কাষ্ঠের আকারে দাঁড়ায় ঈশা-পুত্রের বলিতে, 'রমণ'-মাত্রা যখন বৃহস্পতির ঘরে আর একাদশে।
'বলি' নিয়ে থাকে শুক্রাচার্য্য দুই ব্যঞ্জনা দুই তনু নিয়ে অজ-পূত, দিয-দিত ॥
দু'য়েরে আবার একেতে মিশায়ে তিন করে তাই দৈত্যেরে দাতা, তিন-পাদ ভূমি বামনেরে করে প্রীত॥

*

'রোমানের' মাত্রা নয়, রমণীয় রমণীর রতি শুধু মৃত্তিকার কৃমি।
মেয়েরা পলাশ-ফুল, কৃকলাস, কার্থেজের কচ্ছপিনী বড়-জোর তিমি ॥

তাই বলি, ইরাবতী, এ-মুহূর্ত্তে হও ঐরাবৎ
রাবণের-রাণী সিঙ্গাপুরে নীপে প্রয়োজন নেই ভালো নিমই।
কপালে কিংশুক-চিহ্ন এঁকে দিক কুঙ্কুমে পর্ব্বত।
গুরু নেই, আছে ত অগুরু, নীবি পট্টবাসে নিবিড় নিবীত
তৈরী করে 'পটিকে'র 'পট্টিকারা' তারপর কেন পুনঃ মিথ্যা উপবীত ॥
শ্রীহট্টের অট্ট হাসি কামাখ্যর আদি-পৃষ্ঠে কামাক্ষার অক্ষমন্ত্রে আনবে সম্বিৎ ॥॥
চোমিল্লার চদ্‌-চোল-মল্ল ঋত্বিকের চেলী নাও শোনো লঙ্কার চেড়ির
'হ্রাম'-ধূন, শুনছ ত শব্দ ভেরীর ?
হে 'সরমাটিয়া' কর কারণ-করণ।
'বোরোবুদুরে'র রুদ্র 'কদফিস' ক্ষৌণীশ বর-বধূ করুক বরণ ॥
বরাহ-ভূধর তাঁর মঙ্গল-কলস থেকে অমৃতের বারি ঢেলে পবিত্র করুক সপ্ত-সমুদ্রের রণ ॥॥
'ভূতন' আহবে আজ আসুক অশোক বিস্মরণ ॥॥
ইন্দ্রপ্রস্থে নেই মন, এবার প্রস্থান নব পন্থে নিয়ে শান্তির অর্চ্চনা-।
'ইন্থ' হয়ে 'করী' নিয়ে এবার আমার শুধু 'কোরীন্থ' রচনা ॥
উদয়-পথের নীল উদকের সূচনায় লোহিত আদিত্য, আর 'ললিতআদিত্য' দিক অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা ॥॥

রণনির্জিতদুর্জয়দৈত্যপুরম

যশো জনেহসানি স্বাহা।
শ্রেয়ান বস্যসোঽসানি স্বাহা ॥

'নবপোল' নব-উপল তবুও নব-পল্বলে নব 'পোলো' নিয়ে নূতন মৎস্যরাজ।
নূতন নাবিক নব দ্বীপের কৃষ্ণ নৌকা-বিলাসে ঘুচাবে মালিনী মনের লাজ ॥

ফণাফণ্‌ ফণাফণ্‌ ফণী ফণ্ণ গাজে।
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥—ভারতচন্দ্র
"যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।"

ভারতচন্দ্র হর্ষবংশ তারি ব্যথা নিয়ে দুর্জ্জয় কবিরাজ ॥॥
সন্তান কেউ শঙ্কর হবে কেউবা 'বোধজ কেউই' গড়ে নিয়ে ইন্দ্র-মিত্র আজ।
ব্রহ্মাপুত্র বিশ্বামিত্র পদ্মনাভের নাভিক, অভীক, রক্তিম আভা, লৌহিত্য-বৈভবে।
ঘোড়ায় ঘোরায় বৈশ্য, শ্রেষ্ঠী, রজত-রজকী জৈন জন-সমাজ ॥



রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম
কামগন্ধ নাহি তায় ॥—চণ্ডীদাস
রজতিনী-প্রেম নিকষিত হেম
কামাক্ষা মায়ী পায় ॥

তুমি.ত কুন্‌কী রঙ্গিনী, তবু নটী নও বলে কেউটে হবেনা কেউ ভয় নেই মধু আর কৈটভে ॥
যদি থাকে ভয় কৈবর্ত্তের ব্রত নাও, সচী, সাঁচী-মণ্ডপ গড়ো, খাক্‌ আর কাঞ্চীতে নেই কাজ ॥॥
পাণ্ড্য-বনিক 'অসুর-অবনী-পাল' অবনী-কর্ত্তা পাণ্ডা হবে ॥॥
পণ্ড করোনা দশরথ-লোভে শক্তি তোমার, হয়োনা ভরদ্বাজ ॥॥॥
কৈকেয়ী হয়ে ভৎর্সনা নিয়ে দিওনা পুত্রে আবার ভরত-সাজ ॥॥॥
কুৎসা যেন না রটে।
কান্যকুব্জ করো পরিহার, বংশ কে নেয় কুব্জী, কণ্ব কন্যারে কেন, অজ যখন থাকবে মানস-পটে ?
দূর-দিগন্তে তমসাঅন্তে দেখতে কি কিছু পাও ?
'নবপোলয়নে' কে আসে ভবিষ্যতের নদীতে বেয়ে প্লাবনের নাও ??
ঢেউ হয়ে আসে সাপের মতোন ঊষ-পায়ী কোন্‌ 'পাউস' ???
ঈশ-পায়ী এক ঈশপ বিষ্ণুশর্ম্মায় এসে দেখে সে কেমন নাহুষ।
পৌষের বানে কেন বাও 'নোহঅ' নূতন অর্ক অহের বার্ত্তা বলে ?
আগুন ছড়াবে কে তুমি পুত্র অনলে-অনিলে জলে ??
তুমি কি 'পুষ্যমিত্র শুঙ্গ' 'অগ্নিমিত্র' হলে ???
শেষে বৈম্বিক নৃপতি বিম্বিসর—
তোমার হরির অঙ্কে মিলেছে কয়টি 'কয়ম্বিস'
কও হেরম্ব-নাসিক লোহিত চণ্ডিকা-শ্বেত হস্তির মহাদেশ।
মুকুন্দরামে দিলে ভুবনেশী মাতৃকা-শুভাশীষ।
সীতারাম-মেনাহাতির বেলায় কেন এই মোহাবেশ ?—
যশোদেবী, দ্বিষজয়ী,
কতোটুকু দিলে বিষ আর দিলে কোন্‌ অমর্ত্ত বর
সে-শুধু জানবে অজমণিয়ন জক-রাজদূত দিযঅ-পুত্র 'হেলিওডোরস' দৈত্য।
ঐলদরশ ভাগবত হলধর ॥
জানবে বার্ত্তা 'কাসিপূতভাগভদ্র রাজন' মাতার 'ত্রাতার' যিনি।
জানবে পোষাকী কার্ত্তিকেয়রা লবঙ্গ-দারুচিনি।
তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ঈষৎ জানাবে হয়ত তিত্তির মানে তৈত্ত।

আশীবিষে আর বিষাশীষে মাতা তিন্তিড়ী-পাতা সন্তানে দেয়, হায়, দারিদ্র্য-শৈত্য!
বর-গরলম্ নিয়ে বাংলার মৃত্তিকা আনে ফুল-কিশলয়ই।

বলো বলো হলধর নূপুরের নিক্কণে 'নিপ্পুরে' ধ্বনি শোনো তুমি কার ?
হরগরলের ধ্বনি স্মরগরলের ধনি মদনের রতি রাঢ়া-ভূমিকার ?
কৃৎস্নের পূর্ণিমা-রাশ আসে রাধা নিয়ে আমনের মোহনিয়া চাঁদিনী।
'অগ্রম্মেস' আনে অগ্রহায়ণ 'উগ্রসেন' পাবে হলাদিনী ॥
পাবে 'ধননন্দ'-কংস রাধিকায় মাধবিকা হোক মধু-মাধবের।
অগ্রমহিষী যিনি উমেশের তার প্রতি কেন লোভ হবে বলো যাদবের।

*

'চন্দ-গউত্তে'র চন্দ্রে গর্ত্ত চন্দ-গোত্র প্রেতরণক্ষেত্রে
বিহরে বিহারে, হাত ধরে বিষ্ণুগুপ্ত তক্ষক, শীলোপেত রে !

*

গঙ্গা-রাঢ়ের ভূমি চন্দ্র-কলার মতো চন্দ্রচূড়ের শিরে মণ্ডন।
ময়ূরের পুচ্ছের চন্দ্রক-গুচ্ছের 'কাকবর্ণ' কি তারে খণ্ডন
করবে অহঙ্কারে ? সর্ব্বাণী-গঙ্গা, কুমারী-তরঙ্গা, পদপল্লব
উদার ব্যোমের মতো অদারের শিরে দাও হতে চাই আমি মহী-বল্লভ।
হর-স্মরগরলখণ্ডনম্
মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদ-পল্লবমুদারম্।—জয়দেব
দেহি পদপল্লবম্ অদারম্ ॥
দেবি-পদ-পল্লবম্ অদারম্ ।।।

*

'কস্মৈ দেবায় হবিষাবিধেম'

কোন্ দিক বন্দিবে 'সিক্কিমী' 'অক্কড'
'উট-নপিষ্টিম' উৎকট ইষ্টিম ?
উট-পথ সৃষ্টির বর্ত্তিকা টিমটিম ?
'উত্নপিষ্টিম্' পেত্নীর পিষ্ঠক ?
'উত্নপিস্তিম্' অপায়ী স্রষ্টক ?
কোন্ দিক বন্দিবে 'সিক্কিমী' 'অক্কড'
'উর' আর 'উর্ম্মিয়া' সরোবর, স্বর-হ্রদ ?



স্বরোদের উর্ম্মিলা ঝঙ্কার ?
পদ্মিনী-রুদ্রাণী ওঙ্কার ?

*

আমি ভার্গব বরাহ-মিহির ভাগে বলি 'ভার্গস্'।
ভাগবত গড়ি স্কন্ধ-বিভাগে 'স্কন্দীনভিয়া'-ছন্দে পাহাড়ে 'জাগ্রোস্' ॥
'স্কয়দিবা' ছিল স্বয়ং ঈশাণী ক্ষিতি-দিতি তারে 'বায়ব' করেছি ত্রাসে।
'স্কন্দিন্ অভিয়া' নব-ঈশাণের নিশানায় আর কলেবরে তারে গিল্‌বে ত গোগ্রাসে।
হায় শক-পহলভ
তোমাদের কেউ চিনবেনা, ( কোথা ভিন্ন চিহ্ন ? ) যতো করো কলরব ॥

## দাবা-পাশা-তাসের দেশ

মালব-'মলাদিব' মলে কি কথাকলি কথ্‌থ্‌ক শুনত নৃত্যনূপুরে ?
অশ্ব-পদাতিক 'বিস্তপ'-যযাতি বিশ্ব দাবা খেলে হস্তিনাপুরে।
হস্তি ও নৌকা-অশ্ব-পদাতিকে দ্রৌপদী চতুরা চতুরঙ্গে।
'দ্রুপদাদিব', 'মুমুচানস্' চাণক্য, চ্যবন ঘুরছে বঙ্গে ॥
বিশ্বামিত্রের আচমন ব্রাত্যে, বৃত্রে, ভূত্যে, সূর্য্যে, অসুরে ॥।
ঋজে স্বাহা—উজব স্বাহা—বিশ্ব স্বাহা—বশিস্ স্বাহা ॥॥

*

লঙ্কার 'আশা' নিয়ে কঙ্কাল-পাশা খেলে শকুনি 'বালুচিষ্টনে'
কাঁদল কান্দাহার কন্দর্পেরা হারে, কোণীশক শকুন্ত-মনে
শকুন্তলারে পায় উড়ে এসে জুড়ে বসে তক্ষুণি তক্ষশীলায়।
কোথায় যুধিষ্ঠির, জরৎকারুর কারু জরথুষ্ট ঈরাণে মিলায় ॥
নখে-নখে তারায় তারায়
কোণে-কোণে শকুনি তাড়ায়
ছয়-তিন-নয়ে জয় পায়
দক্ষ ॥।
তক্ষক 'অস্তি'র
অক্ষর গম্ভীর।
অক্ষ-রব বলে তক্ষশীলা ॥

সুধন্বা তবে কি ছিন্ন-ছিলা ?
অলীক সুন্দর অলীক বিদ্যায় রুদ্রাক্ষে বলে অলীক গিলা !

*

পুষ্কলাবতী ছিল কীর্ত্তনে-নর্ত্তনে
তাস খেলে রোহিতনে, চিরতনে, হরতনে ॥
প্রেত-পুরী পুষ্করাবতী।
চিরতন বলে : ছাখো আমি চিরতনু নীল।
রোহিতন রাগে বলে : আনি ধনু মারি কীল।
হরতন হাসে : হরি ! হলে সব খাল-বিল,
কোথা যাই, বসো ভাই তিনে করে দেই মিল—
লাগবেনা ইস্কারি অতি।
'ইস্কারি তুমি বুঝি', ইস্কা বন বলে, 'আমি নীল পান তুমি লাল ?
তেমন ত বুড়ো তুমি, বোঁটা নেই !' হরতন উত্তরেঃ 'দিওনা ত গাল।'
সহাস্যে ইস্কা বসে বলেঃ 'এসো তবে খেলি একপা বিস্তি।
রাজ থেকে জরা কিবা রাণী বড়ো দেখা যাবে, তোমরা ত আছো বেশ তিনটি।

*

তুরুক মারে তুরাণী 'তুরকাভশেয়'।
'জনমেজয়' বলেন 'একী এ মশেয় !'

"চুপ্ কর্" বল্‌ছে 'তুর্কাভেশ্য',
"করব ভস্ম, আন তোর অশ্ব।"

পারীক্ষিত অশ্বে করে রাজ্ঞী-বধ।
অশ্বমেধে যজ্ঞ করে ঋষি 'গৃৎসমধ' ॥
চুপিচুপি ইস্কা বলে হরতনুরেঃ
'দেখলে ত কি বিপদ, মারো এ অতনুরে।'
একা না পারো ত ডাক কিষ্কিন্ধ্যা-হনুরে !
নীলে-লালে চারজন থাকতাম বেশ ত—
হ'ল নলদেহে শনি-কল্কি-প্রবেশ ত !



ঈস্, ছাখো, দেহখানা কি হয়েছে, একবার !
নীল ছিল রঙ আর এখন আল্‌কাৎরার।
কাল থেকে চিরতন চিঁড়া খেয়ে কালসে
লোহা-গড়া-গড়খানা আয়েসী এ ঘরখানা ভাঙ্গল কার দোষে, হায়-হায় কি পোড়া-কপাল সে !
আমার কি দোষ বলো আমি শুধু বোঁটাসুহ বটপাতা আনতে
বলেছিনু 'বর্ত্তে'র নিমিত্ত মাত্র, আমি ত বলিনি যাগ মানতে।
ব্রত আর যজ্ঞ যে এক কথা নয় সে ত তোমরাই আগেভাগে জানতে !
যাগ্‌গে, শোন ভাই হক-কথা মনে রেখো সখ্যতা চাও যদি বিশ্বামিত্রের
এক ছাড়া একতা ও প্রথমতা নেই কোনো জীবনের কোনো মানচিত্রের।
এক ভেঙ্গে অংশে 'হংস'-দুই হয়, তাই পরমহংস, সৃষ্টি ॥
দুই ভেঙে এক হয় বংশে, সন্তান, যেন দুই নয়নের একটিই দৃষ্টি।
দুই-এ একে তিন হয় এখানেই শেষ কথা—বংশবৃদ্ধির প্রথমা মূর্ত্তি ॥
তারপর যোগ করো যোগীসব, ভাগ করো ভার্গব, স্ফূর্ত্তি
হবে তার অফুরান, তবে তার মাত্রার অপূরণ রাখবে
ছন্দস্ চাও যদি, যদি চাও—পূর্ণতা গায়ে তুমি মাখবে,—
অঙ্গে লাবণ্য আনবে, তাতে দেখো থাকবে ভস্ম-ভগ্ন পাত্র
শূন্যতা, বিস্মৃতি, ক্রন্দন, ধ্বংস, প্রেতপুরী জাগবে অহোরাত্র !

'মোহেঞ্জোদরো'
সবতো ভদরো
শবদো সোঁদরো
যুদ্ধ করে তবু 'ভদ্দসাল'।
'মিলিন্দপনহ'
দ্রৌপঞ পনয়া
পান্দব পনহ
ভারতবর্ষের রংমশাল ॥
বাংলা দেশের জন্ম শাল ॥

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর
তিন দেবতা তিনটি বর

মহঞ্জদরে গড়ল গড়
কে এলে গো বাঁধতে ঘর
কে এলে গো ভাঙতে গড়
কে গো অর্দ্ধনারীশ্বর ?
ইস্ক তুমি কল্লি-কালি ইস্কা তুমি কাল
ইস্কা তুমি কল্কি তুমি লক্ষ্মী তুমি
ইস্কা মহাকাল ॥
ঈশ তুমি ঈশা তুমি তুমিই ঈশাণী।
ঈশাণ কোণে তোমার নিশান আমরা কি জানি।

॥ অহুতমবৈশ্বদেবমবিধিনাহুতমাসপ্তমাংস্তস্যলোকান্হিনস্তি ॥
[ মুণ্ডকোপনিষৎ ॥১২॥৩॥ ]
( অথর্ব্ব বেদ )

ভুবনেশীং নমস্কৃত্য বাগ্দেবীং বর্ণমাতৃকাম্।
মাতরং পিতরঞ্চৈব কীর্ত্তয়িষ্যামি ভারতম্॥

# শীতের শিকল

## বুদ্ধদেব বসু

সেই ছোটো, কালো গাড়িটি আবার যখন মৌলির দরজায় দাঁড়ালো, রাত তখন বারোটা প্রায়। নামতে একটু দেরি করলো মৌলিনাথ।

'আচ্ছা, বেণু!'

'আচ্ছা, মৌলিদা! থ্যাঙ্কিউ!'

'একবার আসবে নাকি ভিতরে?'

'এখন আর থাক।' হাতের পিঠে হাই চাপলো বেণু। নিচু হ'য়ে দেখে নিলো পেট্রল আর কতটা আছে; মুখ তুলে বললো, 'বিয়ের দিন আসবেন কিন্তু ঠিক!'

উত্তরে কথা না-ব'লে বেণুর কাঁধে আস্তে একবার হাত রাখলো মৌলি। সিগারেট বের ক'রে এগিয়ে দিলো তার দিকে।

'ওঃ, বাঁচালেন! আমার আবার—' বেণু পকেট চাপড়ালো।

'নেই বুঝি? প্যাকেটটা রাখো তুমি।'

'আপনার?'

'আমার আছে। আ-চ্ছা।'

মৌলি গাড়ি থেকে নামলো, একটু স'রে দাঁড়ালো ইট-বের-করা দেয়ালটা ঘেঁষে। পোড়ো জমিটুকুতে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলো বেণু, সিগারেট-ধরা হাত তুলে বিদায় জানালো। গলির ফাঁকে অদৃশ্য হ'লো গাড়ির পিছনের লাল চোখ। এতক্ষণে মৌলি বুঝলো যে রাত হয়েছে, অনেক রাত হয়েছে।

তার সাড়া পেয়ে উঠে এলো বিশ্বস্ত কুলপ্রদীপ। উনুনের নিবন্ত আঁচে রান্নাঘরে সে ঝিমুচ্ছিলো এতক্ষণ; লালচে চোখের দৃষ্টি হেনে জিগেস করলো, 'খাবার আনবো?'

'না।'

মৌলি আর দেরি করলো না; ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লো। অন্ধকারে তার চোখে লাগলো গ্যাসের বাতিটা—রোজই লাগে—ঠিক তার জানলার বাইরে নিষ্পলক চোখে—তার অনিদ্রার নিত্যসঙ্গী, তার স্বপ্নের প্রহরী, তার শত্রু, অভিভাবক! ভেবেছিলে তোমাকে ছাড়াতে পারবো না, এড়াতে পারবো না তোমার পিশুন দৃষ্টি, ভাঙতে পারবো না ডাইনি-জাদু তোমার? না, না! আমার সব স্বপ্ন তুমি জানো না এখনো, এখনো দু-একটি রত্ন আছে আমার—লুকানো আছে সম্ভাবনার, সতর্কতার পরপারে।

মৌলি কপালে হাত রেখে গ্যাসের বাতিটা আড়াল করলো, কিন্তু চোখ বুজলো না। অন্ধকারে, তার খোলা চোখের সামনে, ভেসে উঠলো দৃশ্য—মানুষের চলাফেরা, ভঙ্গি। হাওয়ায় উড়ে এলো

চেনা গলার স্বর। কোথায় ছিলো সে এতক্ষণ? অন্য এক দেশে, অন্য এক জগতে। সে কি সেখানে বিদেশী, আগন্তুক, ক্ষণকালের অতিথিমাত্র? প্রথমে তা-ই মনে হয়েছিলো তার, যখন চিত্রার সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়, ঘরে এসে দরজার ধারে দাঁড়ালো। চোখের পাতা মিটমিট করেছিলো কয়েকবার, যেমন হয় ভুল ক'রে কোথাও চ'লে এলে, কিম্বা যেমন প্রবাস থেকে ফিরে এসে নিজের বাড়িও হঠাৎ মনে হয় অন্য রকম। কিন্তু তারপর—প্রথম ক-টি কথা যেই বলা হ'লো, দেখা হ'লো চারদিকে একবার তাকিয়ে—তরুণ-তরুণী, শিশুরা, মৃদুভাষিণী বৃদ্ধা—যে-মুহূর্তে এ-সব টুকরো-টুকরো ছবি পরস্পরে গ্রথিত হ'য়ে চলমান একটি দৃশ্য হ'য়ে উঠলো তার চোখের সামনে, তখন থেকে কিছুই তার করবার থাকলো না—কিছু করবার, ভাববার, বলবার চেষ্টা থেকে ছিন্ন হ'য়ে ভেসে গেলো সে, অথচ নোঙর-ছেঁড়া নৌকোর মতো লক্ষ্যহীন নয়, তাকে অলক্ষিতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তন্ময় একটি হাওয়া—চারদিকের আবহাওয়া। হ্যাঁ, একটি আবহাওয়া—স্পষ্ট অনুভব করলো সে, যদিও কোনো বিশেষণ খুঁজলো না, নাম দিতে চাইলো না—দেয়ালের ছবি, চেয়ারের কুশন, উৎসবের আর স্মৃতির সূত্রে বাঁধা এই কয়েকজন মানুষ, এই সমস্তর যেটি যোগফল, উপজাতক—সেই আবহাওয়া ঘিরে ধরলো তাকে, নিবিড় হ'লো ক্রমশ, তার সম্মতির বা প্রতিবাদের অপেক্ষা না-রেখে শোষণ ক'রে নিলো কেমন ক'রে;—আর সে, মৌলিনাথ, সে শুধু ব'সে থাকলো, চেয়ে দেখলো, হাসলো কখনো ছোট্ট কোনো মেয়ের দিকে তাকিয়ে, কথা বললো যখন যেটুকু দরকার—ব'সে থাকলো নিষ্ক্রিয়, অনুত্তেজিত, সুস্থির, সংবেদনশীল।

চা এলো; আলো জ্বললো ড্রয়িংরুমে। টুংটাং পেয়ালার সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে কথা চললো, মাঝে-মাঝে হাসি;—মাঝে-মাঝে মুখের সে-সব বিশিষ্ট ভঙ্গি যা বলার সময় কি শোনার সময় হঠাৎ এক-একটি ছবি হ'য়েই মিলিয়ে যায়। সেই সব মোলায়েম বিষয় নিয়েই কথা উঠলো পর-পর, যা দিয়ে মানুষ সফলভাবে ভুলিয়ে রাখে নিজেকে, ভুলে থাকে জীবনের জ্বালা, কীটদষ্ট রুগ্ন হৃদয়ের যন্ত্রণা: পলিটিক্স, যুদ্ধের পরে দেশের ভবিষ্যৎ, পাকিস্তানের সম্ভাবনা, এই সব মসৃণ ঢালুতে গড়াতে-গড়াতে সিনেমার দিকে কথা বেঁকলো, সাইগলের মৃত্যুর জন্য অতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করলো বেণুর স্ত্রী, যে কিনা এতক্ষণ ঠোঁটে একটি মনোরম হাসি ফুটিয়ে অতিথিদের শূন্য থালার পুনঃপূরণের চেষ্টাতেই ব্যস্ত ছিলো বেশি। সাইগল থেকে গানের কথা—ততক্ষণে চায়ের বাসন সরানো হচ্ছে—আর গানের কথা যদি গান গাওয়াতে না-পৌঁছলো তাহ'লে তো এই সম্মেলনটাই অনর্থক বলতে হয়। তাই চেয়ার ঠেলে-ঠেলে জায়গা করা হ'লো মেঝেতে; হালকা পায়ে ছোট্ট তিনটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো—বেণুর প্রথমা, আর দুই বন্ধু তার;—ঘুরে-ঘুরে নাচলো তিনজনে, কখনো হাতে হাত ছুঁয়ে, কখনো স'রে-স'রে গিয়ে, কখনো পিঠে পিঠ দিয়ে ছন্দে-বাঁধা ব্যায়ামের ভঙ্গিতে; সঙ্গে টিংটাং গীটার বাজালো মিতু, আর হিম—মিতুর ভাই—সে এ সব মেয়েলি বিষয়ে অবজ্ঞার ভাবে আলগোছে দাঁড়ালো এক কোণে, কিন্তু লুটিয়ে-পড়া চুলের তলায় তারও চোখ দেখতে-দেখতে নেচে উঠলো। সুন্দর ছেলে, হিম, সুন্দর ছেলেমেয়েরা! নাচের সঙ্গে-গানও গাইলো ওরা—খুব একটা ছেলেমানুষি চপল গান—লাফানো তালের চটপটে সুরে বসানো; যখন সুর চড়লো তখন গলার পরদা স্থির রাখতে গিয়ে এ ওর চোখে তাকিয়ে ওরা হেসে ফেললো।



ঘণ্টা কাটলো, আরো ঘণ্টা; মৌলিকে ফাঁকি দিয়ে ব'য়ে গেলো সময়, সময়ের দাঁতের ধার অনুভব করা আর সম্ভব হ'লো না তার পক্ষে। আবছা কেমন মনে হচ্ছিলো যে উঠলে হয় এবার, কিন্তু বিদায় নেবার ফাঁকটুকুই যেন জুটছিলো না—অথচ কেউ যে তাকে পিড়াপিড়ি করছিলো তেমনও নয়, সব সময় স্বতন্ত্রভাবে তাকে লক্ষ্যও করছিলো না, খুব সহজেই মেনে নিচ্ছে তাকে, আছে ব'লেই ধ'রে নিচ্ছে যেন—এটাই তার সত্তার কোন গভীর স্তরে স্পর্শ করলো তাকে, ভালো লাগলো তার, মনে হ'লো যেন নিজের ভার নেমে গেছে হঠাৎ, বাধ্যতা আর নেই, কথা বলার, চিন্তা করার, কাজ করার কোনো বাধ্যতা নেই আর। হ্যাঁ—এতই সব সহজ এখানে, সজীব, স্বতঃস্ফূর্ত, যে একবার তাকে একা ফেলেও চ'লে গিয়েছিলো অন্যেরা—যখন ড্রয়িংরুমের পালা ভাঙলো আর এদিক-ওদিক ছিটকে পড়লো সবাই—সে ব'সে ছিলো দক্ষিণের বারান্দায়, গোলাপি রঙের শেড-পরানো দাঁড়ানো আলোর তলায়, কোলের উপর তিন মাসের পুরোনো 'ল্যানসেট' পত্রিকা—নেহাৎই অভ্যেসের বশে তুলে নিয়েছিলো টেবিল থেকে। তাকিয়ে দেখছিলো ড্রয়িংরুমের দিকে, তার ওপারে লম্বা সরু খাবার ঘর—এরই মধ্যে রাতের খাওয়ার টেবিল সাজানো হচ্ছে—সেখানে দেখছিলো বিমলেন্দুকে—ড্রয়িংরুম পার হ'য়ে আসছে—শান্ত, মৃদু বিমলেন্দু, আগের মতোই খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, আগের চেয়েও পরিশীলিত মুখশ্রী—তার সমস্ত ভঙ্গিতে কোথাও কোনো অতিশয্য নেই, উৎসুকতাও নেই, কিন্তু প্রস্তুতি আছে অবিচল। নম্র গলায় বিমলেন্দু জানতে চাইলো মৌলিনাথের নতুন বইয়ের খবর, মৌলি সেটাকে ঘুরিয়ে দিলো ইংরেজি সাহিত্যের হালখবরের দিকে, কখন এসে মহেন্দ্রবাবু তাতে যোগ দিলেন। একটু পরে মহিলারা এলেন সেখানে, তুলনা চললো দিল্লি লণ্ডন কলকাতার মধ্যে সবচেয়ে কম খরচ এখন কোন শহরে। মৌলি এ-আলোচনায় যোগ দিলো না, শুনলোও না সবটা;—কিন্তু তার ভালো লাগলো ব'সে থাকতে, গোলাপি শেডের আলোর তলায় বেতের চেয়ারে—যখন এতগুলি মানুষের গলা এঁকে-বেঁকে ঘুরছে তার চারদিকে। হঠাৎ কী-একটা কথার পরে সে আবিষ্কার করলো যে মহেন্দ্র ঘোষ মানুষটা বেশ ভালোই;—আর যখন খেতে ব'সে প্রভূত পরিমাণ পরোটা কাবাব পোলাও কালিয়ার পরে ছানার পায়েসের সদ্গতি করতে-করতে পুরু কাচের চশমার পিছনে তাঁর চোখ দুটি ঘোলাটে হ'য়ে এলো, তখন তাঁকে দেখে উৎফুল্ল না হবে এমন চিত্ত কি মানুষে সম্ভব!

টুকরো হ'য়ে, বিক্ষিপ্ত হ'য়ে, কোনোরকম পারম্পর্য রক্ষা না-ক'রে, অন্ধকারের পটের উপর দিয়ে ভেসে গেলো এলোমেলো তরল এই দৃশ্যগুলি। তারপর—যেমন সিনেমার পরদা মাঝে-মাঝে কালো হ'য়ে যায় মুহূর্তের জন্য, তেমনি মৌলির চোখের সামনে মুহূর্তের জন্য ঝুলে থাকলো শুধু অন্ধকার। মৌলি অপেক্ষা করলো, প্রতীক্ষা করলো; মনে-মনে জানলো তার ভুল হবে না। অন্ধকার কেটে গেলো আবার; বেরিয়ে এলো—ফিরে এলো—তার স্বপ্ন! কিন্তু স্বপ্ন আর নয়, সত্য। ঐ তো সে—গীতা—ব'সে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, হেঁটে যাচ্ছে, জলের গ্লাশ মুখে তুলছে, কী-একটা কথা বলছে মিতুকে। সেই গীতা—যেমন আগে ছিলো তেমনি, মনে হয় না একটুও তার বয়স বেড়েছে, মনে হয় যেন পরিবর্তনের জোয়ার-ঢেউ থমকে গেছে তার সামনে এসে—কিংবা যেটুকু তাকে ভিজিয়ে গেছে সে শুধু আরো

শালীন ক'রে তুলতে, আরো স্বচ্ছ, ম্লান—ভালোই হয়েছে বিলেতের খাওয়ার কষ্টে, না কি ভিতর থেকে তার চরিত্রই ফুটিয়ে তুলেছে নিজেকে, ব্যক্ত হয়েছে এতদিনে? দিশি তাঁতের শাড়ি পরেছে, শাদা ব্লাউজ গলায় কাঁধে অল্প কাজ করা, পরিষ্কার দুটি ভুরুর তলায় চোখের রং হালকা দেখায় আগের চাইতে, যেন চোখ দুটি ধুয়ে দিয়েছে অনেকবার, মুছে দিয়েছে অনেকবার এই বছরগুলি। বার-বার ঐ চোখে তার চোখ পড়েছে—দূর থেকে, কখনো বা কাছাকাছি ব'সে—লোকজন, কথাবার্তা, খাওয়া, সব-কিছু অতিক্রম ক'রে বার-বার—কেমন যেন মনে হচ্ছিলো মৌলির যে এতগুলি ঘণ্টার মধ্যে যখনই সে চোখ তুলেছে তখনই দেখতে পেয়েছে গীতাকে, হয়তো ঘরের অন্য প্রান্তে, হয়তো ড্রয়িংরুম্ পেরিয়ে খাবার ঘরে, কিংবা হঠাৎ তার একেবারে সামনে যখন একলা সে ব'সেছিলো বারান্দায়। কোনো কথার বিনিময় হয়নি—যদি বা হ'য়ে থাকে সে খুব সাধারণ কিছু কথা—না, না, কথা না, সেটা বড্ড বেশি, সেটা সহ্য হবে না—শুধু ঐ চোখ দুটি আমাকে দেখতে দাও, নির্মল চোখ তোমার—যেখানে আর প্রশ্ন নেই, বিক্ষোভ নেই, নেই মেঘ, মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক—কোন দূর সান্ধ্যঝড়ে যা-কিছু তুমি কুড়িয়েছিলে, তার কোনো চিহ্ন আর আঁকা নেই যেখানে।—আর যখনই গীতা স'রে গেছে, যখনই এমন হয়েছে যে গীতা হারিয়ে গেছে তার চোখ থেকে, তখনই সে দেখতে পেয়েছে চিত্রাকে, শুনতে পেয়েছে চিত্রার মুখে কথার সান্ত্বনা, সেই সঙ্গে এমন এক অরণ্যের মর্মর যা আরম্ভ হ'লে আর শান্ত হ'তে জানে না।

গীতা! চিত্রা!—বালিশের কানে নিশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করলো মৌলি—সেই দুটি নাম, যা একদিন সে ছেঁড়া চিঠির টুকরোর মতো উড়িয়ে দিয়েছিলো হাওয়ায়, কিন্তু আজ কোন নতুন অর্থ দিয়ে তার নিদ্রাহীনতা ভ'রে দিলো। সে-অর্থ প'ড়ে দেখবে এত সাহস কি আছে তার? কিন্তু সে তো জানে—বুকের মধ্যে টান পড়েছে তাইতে তার না-বুঝে আর উপায় নেই—জীবনে যা সবচেয়ে সহজ, সবচেয়ে গভীর, তারই আধার আজ তার কাছে ঐ নাম দুটি, যেন ঝিনুকের দুটি খোলার মতো, যার মধ্যে বেশি কিছু নেই, কিন্তু সেটুকুই আছে যাতে মানুষের প্রয়োজন, যাতে মানুষ বাঁচে,—তার ঘর, সংসার, শরীর, হৃদয়—কখনো যার অভাব হয় না সেই সব সাধারণ সুখদুঃখ। আ, চিত্রা—কেন তুমি আমাকে ভর্তি ক'রে নাওনি তোমার ইস্কুলে—জীবনের সেই আদিবিদ্যার মণ্ডপে—যেখানে কাঁচা পেয়ারা গাড়িতে ব'সে আরো ভালো লাগে, আর সেই গাড়ি থামলে দরজা খুলে দেয় কপালে-চুল লুটিয়ে-পড়া ছোট্ট ছেলে! সেখানে কি কোনো পড়াই শেখা হ'তো না আমার—আমি কি এমন ক'রেই পালিয়েছিলাম যে কেউ আর ফিরে ডাকলো না আমাকে!···গীতা, তুমি! কিন্তু কেন তুমি কবিতা পড়লে, গীতা, তোমার চোখের হিরের ফোঁটা কবিতা প'ড়ে নিবিয়ে দিলে কেন—বোন হ'য়ে এলে কেন আমার কাছে, ডাকলে যদি আমারই গলায় ডাকলে কেন!···আবার? না, আর না, আর হবে না, আমি অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, আমি বৃত হয়েছি—বিদ্ধ হয়েছি, গীতা! আমার জন্য কিছু আর নেই এখন, শুধু মুহূর্তের মহিমার আস্বাদ—আর রিক্ততা—শূন্যতা—দিনের পর দিন।

বছরগুলি স্রোতের মতো ব'য়ে গেলো। কী করেছে সে, কী ঘটেছে তার জীবনে এতদিন!



মৌলির মনে পড়লো তার সধুম কামাচার, আর এই ঘরে, ঐ একটি টেবিলে ব'সে-ব'সে, তার অসহ্য আহরণ, অকথ্য প্রতিদান। তৃপ্তি পায়নি, ইন্দ্রিয় তাকে ধুলোর ঝড়ে চাবুক মেরেছে; স্বাস্থ্য পায়নি, অসম্ভবের চেষ্টা তাকে বিকল করেছে; জীবন পায়নি, নিজে কিছু সৃষ্টি করবে এই স্পর্ধা বলি নিয়েছে তাকেই, তারই রক্তেমাংসে প্রবহমান প্রাণ। মেধার দীপ জেলেছিলো ঘরে—কে জানতো এত ভীষণ তার ইন্ধন! কবি, শিল্পী, ভাবুক! না কি খঞ্জ, ক্ষয়িত, আতুর? চিন্তার প্রপাত, সংরাগের তুফান, শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে সেই জ্ব'লে ওঠা আর নিবে যাওয়া—কিছু বলার, ব্যক্ত করার যন্ত্রণা, শূন্য থেকে বিশ্ববোধনের অত্যাচার! সেই হিমজ্বরে, আগুনজ্বরে ক্ষয় হ'তে-হ'তে কোথায় এসে ঠেকেছে সে, কোন চরম প্রান্তে—এর পরে আর ক্লান্তিও নেই, এর পরে তার ক্লান্তিও তাকে ছেড়ে যাবে, তখন আর কিছুই থাকবে না। মৌলিকে যেন অন্ধকারে ঘিরে দাঁড়ালো তার জীবনের বিধ্বস্ত বছরগুলি—পাংশু প্রেতমূর্তি সব—ছায়ার মধ্যে ছায়া হ'য়ে মিলিয়ে গেলো—তার কানে ভেসে এলো ছোট্ট তিনটি মেয়ের গান, নাচের সুর—জীবনের তুচ্ছ, মধুর রাগিণী। বিষাদ নামলো তার বুকের উপর, চাপ দিলো হৃৎপিণ্ডে, আঁকড়ে ধরলো কণ্ঠনালী, বেরিয়ে এলো তপ্ত কঠিন চোখের জলে। মৌলি নিস্পন্দ হ'য়ে প'ড়ে থাকলো, যেন কোনো নতুন দেবতার কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে, বালিশে মুখ চেপে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো—'হৃদয়, হৃদয়, আমার মৃত হৃদয়, তুমি জেগে ওঠো, বেঁচে ওঠো আবার।'

# কবিতাগুচ্ছ

## উত্তরমেঘ

### কল্যাণ সেনগুপ্ত

এমন মেঘের দিনে একা একা হেঁটে হেঁটে যাবো কতোদূর,
ভালবাসা দিয়ে ভেজা একখানি আঁকাবাঁকা সরু পথ ধ'রে !
হয়তো এখন মেঘ নীল পাহাড়ের বুকে নামবে অঝোরে,
ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে রবে হয়তো এ হৃদয়ের কলাপী ময়ূর !

এই অপরূপ দিনে মেঘে ভেজা কেয়াবনে ঘুরি কতোবার,
কোন্‌খানে যাবো আমি, কী যে অনুভব করি দুটি চোখ বুঁজে :
কতো যে সোনার দিন উড়ে গেছে আকাশের নীল পথ খুঁজে !
এতোকাল যা পেয়েছি সবি কি ভুলতে হবে, বলো না আষাঢ় !

এ-রূপকথার দিনে ছায়ার ছলনা বোঝা যায়না কখনো ;
নেশার মতন ঘুরে হৃদয়ের সব কথা তবে কাকে বলি ?
কতোবার পৃথিবীকে ফোটাতে দেখেছি ভীরু কামনার কলি,
তাদের ফোটার স্বর প্রাণের গভীরে রোল তোলে ঘন ঘন !

মেঘের মিতালি খুঁজে একা একা পথে পথে আরো কতোদিন
ঘুরবো, বলো না কেউ। গভীর আষাঢ়ে আমি মায়ার হরিণ !

# তুমি, আমি, তারা

### মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

ছোপ ছোপ রোদ হ'লুদ বিকেল এখনো শিরীষ শীষে,
কাঁকন চুড়ির হেঁয়ালি কাকলি কতক হ'য়েছে শুরু :
জলুকে চলেছে। হালুকা বাতাসে কখন জানিনে মন
পালকে জড়িয়ে পলকে হারালো সবুজ সজল ঘাসে !

ঝটপট ক'রে ডানার দুপুর ঝরিয়ে ফেলেছে পাখি,
কে উর্বশীর অলস আঁচলে কাতারে কাতারে তারা :
কাঁচপোকা নাকি ! উড়ো ঝড়ে পাবে কখনো কুঁড়ির ঘ্রাণ
এগাছে ওগাছে শিসে আর শিসে সচকিত চোখাচোখি।

একটি কি দু'টি ফিসফিস কথা এলোমেলো উচ্ছল,
কুয়াশার মতো চুপেচুপে ঝরে আকাশ কাজল ঘুম,
ইসারা আভাসে সকরুণ সব মনে পড়ে কত কথা :
কিসের বেদনে কার কবেকার চোখে কুলোলোনা জল !

তবু খুঁটি ঘাস নখের আঁচড়ে নিরিবিলি দু'জনাতে—
যদিও জেনেছি তারা ঝলোমল এই ছোঁয়া এই বসা
শিশির সকালে হ'য় তো বা কাল ধুয়ে মুছে হবে লীন।
তারা না জ্বলুক : তোমার চোখের আকাশ রইলো হাতে !

## কোন নায়িকাকে

প্রণব মিত্র

তোমার চুলের স্বপ্নে অরণ্যের কিছুটা আস্বাদ
এখনো জড়ায়ে আছে। কি গভীর বিস্ময়ের গান
এসেছো দুচোখে নিয়ে—হে সুরম্যা তারপরে শেষে
এখানেই এলে এই অবিশ্বাস অপ্রেমের দেশে ;
এখানে রাতের হাওয়া চাঁদ-ডোবা আকাশের গায়
শীতল মৃত্যুকে খোঁজে শব্দহীন পরিব্রজনায়,
এখানে বিষন্ন দিন—রৌদ্রে সব কান্তি ঝরে পড়ে
তোমার কি কাজ বলো এই দেশে বিবর্ণ নগরে ?

সুরম্যা তবুও শোনো এ হৃদয় অবিশ্বাসী হয়ে
উজ্জ্বল দিনের পথে কতবার মনের বিলয়ে
মৃত্যুকে পেয়েছে তার : আজ তবু তোমার আশ্বাস
শান্তি দিলো—নিয়ে এলো জীবনের অমেয় বিশ্বাস
আমাকে বিস্তৃত করো, অমাবস্যা, চোখে আনো ঝড়
তোমার অরণ্য-স্বাদে ফিরে পাবো নিঃশ্বাসের কয়েক প্রহর ॥

## বিবর্তন

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

জীবনের অলিন্দরে দুয়েকটা স্বপ্নাতুর হরিণের চোখ
নরম ঘুমের মতো ছায়া দিয়ে ছুঁয়ে গেছে আমার এ মন,
কখনো প্রেমের মতো—কখনো বা সেই ছবি, সেই নীলাঞ্জন
যুদ্ধের ঘোষণা নিয়ে আমার আঁধার ঠোঁটে জেলেছে আলোক !

সেই আলো সেই চোখ জনান্তিকে আজো তার অনেক ঘোষণা
আমার কবিতা-পত্রে ভীরু হাতে আঁকাবাঁকা রেখে যায় নাম ;
আমার আরেক সত্তা—আরো এক হৃদয়ের চেতনার যাম
তারি সাথে কথা কয়, পেতে চায় তারি কাছে শান্তি অণুকণা !

প্রতিটি মুহূর্ত, আর মুহূর্তের কবিতায় জীবনের ছবি
আঁকা গেলে, তবে আমি তোমাকেই শোনাতাম এই ইতিকথা,
হয়তো শুনতে তুমি—হয়তো বা বুঝতেও এই নিগূঢ়তা
কোথায় হারিয়ে গেছে—মুছে গেছে চেতনায় সায়াহ্নের রবি !

এখন তারার চোখে চোখ রেখে অসংযত কথা নয় আর,
সে সব কথার দিন ফিরে এলে দাম পাবে তোমার কথার।

# মোহেঞ্জো-দরোর লিপি-পাঠ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

মোহেঞ্জো-দরোর দুটো ব্রাহ্মী-লিপি পাঠ করছি। স্যর জন্ মার্শালের সম্পাদনায় মহেঞ্জো-দরো ও সিন্ধু-সভ্যতা সম্পর্কে কতকগুলো গ্রন্থ ১৯৩১-সনে বেরোয়। তারই তৃতীয় খণ্ডে ৯০ পৃষ্ঠায় কতগুলো ব্রাহ্মী-লিপি আছে। ৩-সংখ্যক লিপিটি ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হয়ে একটি ভগ্নপাত্র-গাত্রে লিখিত ( হাড়ির কানায়—হড়প্পার হাড়ীপাদ কোণীশের কনকে এসে মিশেছে ? ) আছে। পাত্রটি যে বট-পত্রাকৃতি ছিল তাতে সন্দেহ থাকলেও তা ভঞ্জন হতে দেরি হয়না। কারণ কৌশলী মার্শ্যাল চিত্র-বিন্যাসে অশ্বত্থামা-হত-ইতি চাল দিয়েছেন। দু'টি অশ্বত্থ-বটাকৃতি পাত্রের মধ্যস্থ করে এই স-লিপি কলসী-কানাটিকে ( কলসকে কি আগে 'কনস' বলা হত ? কাংস্য থেকে তৈরী বলে কনস ? আর কংস-পুরীর ধাতু বলেই কি ওটা কাংস্য ? ) স্থাপন করেছেন ( ৬৮ পৃষ্ঠা—১, ২, ৩ নং চিত্র )। যে-দেশ ইজিপ্ত-অক্কড-সুমের-সেমেটিক-ঈরাণী লিপি পাঠ করেছে সে-দেশ যে মোহেঞ্জো-দরোর লিপি-পাঠে অসমর্থ এ-ঘোষণাটি সভ্য না-ও হতে পারে। আমরা যদি লিপি-পাঠে তৎপর হতাম তাহলে দেখা যেতো ঘোষণাটি তাৎপর্য্যপূর্ণ। সমস্ত এশিয়া মোহেঞ্জো-দরোতে সমবেত হয়েছিল। 'জম্বুদ্বীপ' বলতে 'পুরাণ' যে-ভূখণ্ড চিহ্নিত করতে চেয়েছেন তা সমগ্র এশিয়া এবং তার মধ্যমণি ছিল উত্তর-ভারত—মোহেঞ্জো-দরো হড়প্পা থেকে উদয়-পুর কুমিল্লা-পট্টিকারা-চোমিল্লা-কমলাঙ্ক-বরকান্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তার মানে মণিপুর ব্রহ্মপুত্র-জাতি ও পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার কুকি-মেগলি-চদৃ-জাতির সঙ্গে বাংলার-বিহারের-উত্তর-প্রদেশের, ভূতন-সিক্কিম-নেপাল-তিব্বত-কাশ্মীরের, বালুচিষ্টন-অফগ্নিষ্টনের জাতির এক মহা-মিলন-ক্ষেত্র মোহেঞ্জো-দরো এবং হড়প্পা। দক্ষিণের বর্ম্মা-অন্নম-বাটাভিয়া-সিঙ্গপুর-সুমাত্রা-যব-বলি-তাম্রবেন-( লঙ্কা )ওফির-দাক্ষিণাত্য-কুশদ্বীপ( আফ্রিকা )-সুমের এবং উত্তরের মহাচীন কখনো বিচ্ছিন্ন, কখনো মিলিত হয়েছে এই জম্-অম্বু-দ্বৈপায়নদের সঙ্গে।

যাক্, হংসের ( সৃষ্টির ) ইতি করা ইতিহাসের কথা থাক্। লিপি-পাঠ চলুক এখন। ৯০-পৃষ্ঠার ২-সংখ্যক লিপিটিই সব চাইতে হ্রস্ববর্ণের। তা এই :

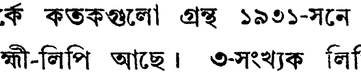

এর ছয়টি ( ষষ্টি-ষষ্ঠী ) পাঠ হয়। সাতপাঁচ ভাবাই ঠিক :

১। অশোক-অনুশাসন লিপির অনুসরণে পাঠ হয় :

এড়ঞ এহ ( স ) জখ



'এ'-কে 'ব' ধরলে ধ্বনি স্পষ্ট হয়। প্রথম দু'টি অক্ষরের ঊর্দ্ধভাগে আছে বাংলা-ব। একে 'এ' যেমন ধরা হ'ত 'ব'-ও ধরা হত। এক্তিয়ার তাই বক্তিয়ার হয়েছিল। বক্তৃয়া-কে ব্যাক্‌ট্রিয়ান গ্রীকের আড্ডা না করে বক্তিয়ার বংশের আড্ডা করলে য়ুরোপের শিরঃপীড়া হত সন্দেহ নেই।

২। দেব-নাগরী অনুসরণে পাঠ হয় :

রজ্জ রঅষ্ট তিৎ ( য়ৎ-ৎ=য়ত )

এস্থলে পাঠে বর্ণাক্ষর ও সংখ্যাক্ষরের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৩। বাংলা-লিপির অনুসরণে :

বটদ বহ ঘ্‌ম্ ( ন্ )

সেমেটিক লিপিতে বট-পাতা-চিত্র 'বট'-ধ্বনি-লিপি। পেহ্লেভীরা সেমেটিক অনেক শব্দ আত্মসাৎ করেছিলেন। ইংরেজী-সংখ্যাগুলোর রূপ ও উচ্চারণ সেমেটিক, আরব-পরিবেশিত বলা হয়।

৪। চঞপত্রয় ( চপ+ ) সপ্ত ( জখ ) তিৎ

( ইংরেজী 5-কে 'পঞ্চ' ধরে নিলে উল্টো 5-এর ধ্বনি হয় 'চঞপ' )

৫। ভফীথী_ সেভেন্থ ইঅ

( জেন্দের গন্ধ—য়ুরোপীয় বা International Phonetic alphabet-এর শরণ নিলে ভফী-কে 'নব' আর 'ইঅ'-কে 'এঅ' পড়া যায় )

৬। প্রথম অক্ষরটি কলসের আদি ধ্বনি 'কোনস' বা 'কনস'। দ্বিতীয় অক্ষরটিতে 'হল' চিহ্নের সঙ্গে 'ব'-লিপি ( 'ব' দ্বীপ ধ্বনি ) মিশ্রিত হয়ে 'বহল' বা 'বহাল'। তৃতীয়-লিপিতে একটি বাজ বা চিল লম্বভাবে আছে এবং তার নীচে আছে একটি বৃত্তের চতুর্থভাগ। বৃত্তের সাংখ্যিক উচ্চারণ 'দশ_'। তৃতীয় চিহ্নের সবটুকু মিলে 'বজোস্' 'ওজোস্' হতে পারে 'চলম্'-ও হতে পারে। তাহলে লিপিগুলোর ধ্বনি দাঁড়ায় ঃ 'কংস বহল ওজোঃ', 'কংস কহল বজোস' বা তৃতীয় লিপির ব্রজ-তেজ বাদ দিয়ে সাদাসিধে চলম্-'চোল'-ধ্বনি বা 'শাল্ল'-ধ্বনি। পাঠ-ষষ্টিকে যদি সপ্ত-তে এনে পূর্ণ করতে চাই তবে একে 'পচদৃ-(জ)বঙ্গাল-চলম'-ও পড়া যায়।

এই ষষ্ঠীতৎপুরুষের পর 'আরেকন' পুরুষের লিপি-পাঠ করছি যিনি পাত্র বা 'পট'-প্রিয়ের পর-পুরুষের। এঁরও হয়ত 'স্বস্তি'-পাঠ চলে কিন্তু সাদা-মাঠা পাঠই দেওয়া হ'ল। ৯০ পৃষ্ঠার তৃতীয় সংখ্যক লিপিটি ঃ



অ ( ভ ) ঞাণাং দ্বৌ ( তুহূ ) হঠ ( হচ ) ওঁ ( বোঁ ) ঞাদু ( গ ) ত্রি ( তি ) ন

'তুহু' কথাটি পেঁচার ডাকের বর্ণলিপির ধ্বনি-থেকে পাওয়া—ইংরেজি শব্দ—ইংরেজি Two সংখ্যার ধ্বনির সঙ্গে ইংরেজি পেঁচার ডাকের শব্দধ্বনি অভিন্ন। যাক্, হঠ-যোগের আবির্ভাব যে এই লিপিকারের সময় থেকে সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায়। অরণি কাঠ, কঠোপনিষৎ, ইন্দ্র প্রভৃতি সব একসঙ্গে। বৈদিক দশরাজার যুদ্ধ বা দশরথীর যুদ্ধের পরেকার ঘটনা এখানে লিপিবদ্ধ। 'সুদস'র কীর্ত্তি-অবশেষ। তিনটি মহাভূত ছিল, বিশ্বরূপ, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ—তিন আদি পুরুষ—এখানে হ'ল পাঁচ। পাঁচের প্রত্যেকেই দ্বৈত—কাজেই দশ। চতুর্থের বা সোম-বাহী ঐন্দ্রিক 'সুদসে'র আবির্ভাব—অথর্ব্ববেদের আবির্ভাব, ঈরাণী অথর্ব্বন-কণ্ঠ নিয়ে, পাত্রের গায়ে। সেখানে 'হঠ' কথাটি জন্ম নেয়নি—'ঠ'-লিপিতে তখনও চন্দ্র-চিহ্ন বোঝাত না— ৮-এ চন্ এবং লম্ব ৮-এ সম্ভবত উল্টো চন্ বা 'ঞ্চ'-ধ্বনি বোঝাত। তাই তাকে পড়া যায় এভাবে ঃ

'অঞাণাং তুহূঞ্চ ওঁঞাদুতি ॥'

কে যে 'মনু' কে যে 'দক্ষ' প্রজাপতি তা খানিকটা স্পষ্ট হয় একই ধরণের দু'টি লিপি-মালায়। তবে 'চীন' সম্পর্কে সামান্য টীকা দিলে 'কোলরিজ' 'কুবলাখনে'র কপালে কেন রাজটিকা দিয়ে জেনেডুতে ( জম্বুদ্বীপে ) ডোম-তৈরীর কথা বলেছিলেন আর ভারতবর্ষে কেন হড়প্পার ( হড়পদ-হেরড্-ভরত-হাড়িপাদ ) আবির্ভাব তা অনেকটা বোঝা যাবে। জীসুকে পাওয়া না গেলেও 'জম্বু'-কে পাওয়া যাবে গঙ্গাজলে।

## চীনের টিকির টীকা

'চঞপত্রয় সপ্ত তৎ' পাঠই অবলম্বন করা যাক্। স্পষ্টতই এ চীনের খবর। 'চ'ইন' বা 'চ'ইএন' বংশ এবং জলাশয় থেকেই চীন দেশটির নাম। দেশটির প্রথম সম্রাট ছিলেন 'চ'ইন শীহ্ হৱঙ-টি'—'হৱনটি' মানে সম্রাট, 'শীহ' মানে প্রথম। 'হৱঙ-টি'-শব্দে 'অবন্তী'-ধ্বনি শুনে রাখুন। চীনের ইতিহাসে আছে খ্রীষ্টজন্মের ২৩০০ বৎসর আগে একটি মহাপ্লাবন হয়। তখন চীন-সম্রাট 'কুন'-কে সেচ-বিভাগের কর্ত্তা করে দেন জলের ব্যবস্থা করতে। 'কুন' নয়, 'কুন'-পুত্র 'যূ' এই 'ইরিগেশন প্রজেক্ট' সাফল্যের সঙ্গে নির্ব্বাহ করেন। বলা হয়েছে তিনি 'জোশুই'-কে 'হোলি' পর্য্যন্ত নিয়ে গেলেন—বাদবাকি জল 'লিউ-শা'তে প্রবেশ করল। 'টো' আর 'চ'ইন' জল এ-ভাবে নীত হলে 'য়ুঙ' এবং 'মুঙ' ভূমি আবাদ যোগ্য হ'ল।'—(History of the World by W. N. Weech—Pp. 334)। সংস্কৃত-সাহিত্যে দেখা যায় লেখকদের প্রিয় নায়ক ভরতবংশের বৎসরাজ উদয়ন তাঁর স্ত্রী বাসবদত্তার সাহায্যে 'অবন্তী'র কন্যাকে বিয়ে করেন। 'বাসবদত্তা' সংস্কৃত-সাহিত্যে ক্লিওপাত্রার মতোই রহস্যময়ী। কালিদাসের যক্ষ উদয়ন-বাসবদত্তার কাহিনীর প্রলোভন দেখিয়েছে 'মেঘ'কে। বীর-পুরুষ বলেও দশরথের মতোই খ্যাতি ছিল পরন্তপ-পুত্র উদয়নের। এখন বিষয় হল 'জোশুই'-বস্তুটি কি—নদী, হ্রদ না পবিত্র জল? আমরা যে-ইতিহাস পড়তে পাই তাতে এর 'জোশুই' ছাড়া আর কোনো পরিচয় নেই। তবে বস্তুটির



আরেকটু খবর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আছে। আছে 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'-এ। সেখানে তিনি 'জম্বুসীসহি গঙ্গা' :

'জম্বু সীসহি গঙ্গা, গোরি অধঙ্গা, গিম পিন্ধিঅ ফণিহারা।'

এখন 'হোলি'-র ব্যাপার—'লিউ-শা' যে 'লাসা' এতে আর সন্দেহ করে লাভ নেই। হোলি-কে কৃষ্ণ এসে যতোই বেদখল করুন তাকে হ-ওলি বললে পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার ভাষায় 'হাৱলি' বা রাজধানী বোঝায়। তবে এতোটা পূর্ব্বঙ্গম হ'তে না চাইলে বেদাশ্রয়ী হয়ে আমরা 'হো-ইল' বলে ঐলদের আহ্বান করতে পারি। 'হো-মার'কে ডেকে জিজ্ঞেস করতে পারি বুদ্ধকে মারের পাল্লায় ফেলে 'ইল-ইয়ডে' এ-যুদ্ধ ঘোষণা কেন? তাছাড়া 'কুশান'-দের আবির্ভাবও 'হলি'-উপত্যকার সঙ্গে জড়িত। (The Cambridge Shorter History of India—Pp. 72।) হ্রদের ধারে নিশ্চয়ই। মোহেঞ্জো দরোতে 'কুশান'-মুদ্রার আবির্ভাব মহাচীনের দৌলতে।

চৈনিক এক-একটি অক্ষর বহু-মিশ্র-ধ্বনি-লিপিতে তৈরী। বাংলা উল্টো চ, ঞ এবং ইংরেজি 5 ত স্পষ্টই দেখা যায়, তাছাড়া ইংরেজি-গ্রীক-সেমেটিক-ব্রাহ্মী বর্ণমালাও খিঁচুড়ি পাকিয়ে আছে চীন-অক্ষরে। 'ক্ষরোস্থি'-লিপি মানে যেখানে অক্ষরের অস্থি ক্ষরিত বা ক্ষয়িত হয়েছে।

Wŭn (1)-থেকে Tĕn (10) পর্য্যন্ত সংখ্যার উচ্চারণ-ধ্বনি 'আরবীয়' কি 'হোমারীয়'—ঈষৎ রবীয় (আ—রবীয়) কি সত্যি ওমারীয় (হ—ওমারীয়) অথবা কুমারীয় বা ওমরীয় এই নিয়ে বিতণ্ডার অবকাশ আছে—তবে সে বিতণ্ডার অবসান করতে পারে একমাত্র 'চঞ' লিপি। এ-লিপিতে ১০০ পৃষ্ঠার প্রথম মূর্ত্তিটির গায়ে অঙ্কিত লিপির পাঠ : 'নবচন্দ্রপঞ্চড়শ'—তিনিই ঈরাণী 'নদিতবির' এবং বাইবেলের বিখ্যাত 'নেবউচডনেজ্জর'—সন্দেহ নেই তিনি নূতন বউ ছিলেন—অর্দ্ধনারীশ্বর প্রথম মানুষ। তিনিই 'ভূজ-বসু-দশ-দশাষ্টদ্বৌ-মিত-শকে শ্রীমদ-বল্লাল-সেন-রাজয়-আদৌ-বর্ষ'-এর আদি শকবর্ষের গৌড়েশ্বর শৈব বল্লাল-লক্ষ্মণ-বিশ্বরূপ সেনীয়দের জনক-জননী আদিশূর—'টট্টনদেবী' বা 'তয়ষ্টনদেবী'—অর্দ্ধনারীশ্বর। তিনি হলায়ুধ-পরমমহেশ্বর। শাক্ততন্ত্রশাস্ত্রের প্রণব-ধ্বনির রূপবাহী।

'যূ'-র রাজার কথা আর তাঁর নিজের খানিকটা বার্ত্তা আছে 'কনফউসিউস'-এর (যাঁর বাড়ি ছিল 'শন্তঙ'-এলাকায়) 'শুকিঙ' নামক ঐতিহাসিক রাজমালায়। রাজার নাম ছিল 'তী'—'তীয়ও'-এর উত্তর-পুরুষ তিনি—অর্থাৎ তীব্বতের উত্তরে উত্তরকুরু যেখানে, যেখানে 'জৈদমশম্প' নাম যদুবংশের জলাভূমি হয়ে এখনও অবস্থিত সেখানকার রাজা। 'যূ' বান-মইঙ্গ নামেও পরিচিত ছিলেন। 'যূ' রাজাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, 'তুমি পুণ্যাত্মা, Myriad (ময়রিঅদ—গ্রীক্ মুরিওরি—সোজাসুজি ময়ুর-খাদক মুরারি—কৃষ্ণ হলে তাঁর মাথায় ময়ুরপুচ্ছ ময়ুর-বধের চিহ্ন এঁকে দেয়—ঐতিহাসিক পুরুষ 'অশোক' হলে তিনি ময়ুর-খাদক হন) রাষ্ট্রের লোকদেরও দরবারে ডাকো।' তীব্বত কিন্তু এই 'কালোকেশী' (Black-haired) পাপাত্মা মানুষগুলোকে পরিবর্ত্তিত করেছিলেন। ইতি তিব্বত-চীন-য়ীহুদী-অশোক-কৃষ্ণ জন্মকথা।

অলমতিবিস্তরেন।

# শেষ অঙ্ক

## সুকোমল দত্ত

সুরঞ্জন বা বকুন—বি, এ, স্বাস্থ্যবান বেকার যুবক বয়স প্রায় ২২।
নিরঞ্জন—সুরঞ্জনের দাদা, পদস্থ সরকারী চাকুরে ৩৮।
কমলা—নিরঞ্জনের স্ত্রী, প্রায় ৩০, সন্তানহীনা। স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য এখনও বর্ত্তমান।
মা—সুরঞ্জনদের মা, ৫৫ রাশভারী।
নন্দা—ভৃত্য এবং জনৈক লোক।
১৯৫০এর শেষের দিকের এক সকাল বেলা।

সুরঞ্জনের ঘর। ভয়ঙ্কর অগোছালো—একটি ব্যাচিলরের ঘর যা হতে হয়। একদিকে তক্তপোশ অন্য পাশে টেবিল চেয়ার। টেবিলের উপর রাশীকৃত বই, তক্তপোশেও।

সুরঞ্জন বইএর পাশে, ড্রয়ারে কি যেন খুঁজছে।

সুঃ (নিজে নিজেই) না; Not a pie! একটি পয়সাও নেই। মরুভূমিতে হয়তো জল থাকতে পারে কিন্তু সুরঞ্জন চক্রবর্ত্তীর একটি পাইও নেই! (পুনরায় বইএর তলা খুঁজে) সে দিন একটা আটআনা রেখেছিলাম—যাক্‌গে, চাকরী না পেলে হয়তো আরো—God knows! I must have money but I must have a job first. এ অবস্থা অসহ্য!

টেবিল থেকে একখানা গল্পের বই নিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, মা প্রবেশ করলেন। মাকে দেখেই সুরঞ্জন বইয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশের ভাণ করলো।

মাঃ বু, আজ বিকেলে আমাকে একটু ছোড়দার বাসায় নিয়ে যাবি-তো! (সুরঞ্জন কোন প্রকার শব্দ করলোনা যেন শুনতেই পায়নি) কি শুনতে পাচ্ছিসনা নাকি? আজ বিকেলে···

সুঃ আজ বিকেলে! ওরে বাবা! অনেক কাজ আছে। আজ পারবো না, মা। অন্য দিন···

মাঃ থাক্, খুব হয়েছে। তোমাকে দিয়েতো সংসারের এইটুকু কাজ পাবার উপায় নেই। খালি ফাঁকি-বাজি। লজ্জা করেনা তোর! পাশ করে বসে আছো কাজ করোনা, কর্ম করো না! আর একজন-তো প্রাণপাত করে ফেলল সংসার চালাতে। তোর কি একটু মনে হয়না যে দাদাকে এতটুকু সাহায্য করি। কতদিন আর তোমায় সে খাওয়াবে?

সুঃ (নূতন কিছুই না শুনে) তোমার কথা শেষ হয়েছে?

মা: না, তুমি আমায় আজ বিকেলে নিয়ে যাবে কিনা?

সুঃ না, পারবোনা; আজ আমার কাজ আছে।

মাঃ সকাল বেলা আমায় রাগাস না, বুকন!

সুঃ বল্‌লাম তো·····

মাঃ আচ্ছা. এসো আবার টাকা চাইতে; বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবো, অপদার্থ কোথাকার।



মা স্বাগত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সুরঞ্জন তার যাবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল পাথরের মতো। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আবৃত্তি করলো।

সুঃ 'কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, পকেট পয়সা হারা।—But I must have a job. একটা কিছু করতেই হবে। কী অপমান·· ···!

কিছুক্ষণ পায়চারী করলো ছোট্ট ঘরখানাতে। তার পর পূর্ব্বের বইখানা নিয়ে পড়ায় মনোনিবেশ করার চেষ্টা করলো। কমলা প্রবেশ করলো রহস্যময়ীর মতো।

কমলাঃ ঠাকুরপো, (সুরঞ্জনকে চটাতে হলে কমলা তাকে ঠাকুরপো ডাকে) ও ঠাকুরপো, (তক্তপোশের ধারে এসে) শোননা একটা কাজের কথা। কানে কম শোন নাকি আজকাল? 'কানের দুয়ার রুদ্ধ আজিকে মনের দুয়ার খোলা?' (সুরঞ্জনের বইখানা কেড়ে নিল) আমার কথার উত্তর দাও।

সুঃ যতক্ষণ 'ঠাকুরপো' ডাকবে কোন কথার উত্তরই পাবে না। কতদিন বলেছিনা তোমায়, আমায় ওনামে ডাকতে পারবেনা। কেন আমার নামগুলো দোষ করলো কি? বুকন বা বু? আর যদি পোষাকীর দিকে ঝোঁক থাকে ত 'সুরঞ্জন'ও ডাকতে পারো। একটা চিহ্ন যখন রয়েছেই, রূপকের ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়, বাহুল্য, নামের একটা সার্থকতা রয়েছে···কিন্তু তোমাকে বলা—কয়লার মলিনত্ব শতধৌতেন—

কঃ আমাকে উপদেশ দিওনা। এই সেদিনও হাফ্‌প্যাণ্ট পরে স্কুলে যেতে দেখলাম—ক্লাশ ফোরে পড়তে! সেই এতটুকু ছেলে, তিনি আজ আমায় উপদেশ শোনাচ্ছেন। (হাসতে লাগলো)।

সুঃ কিন্তু নামের সাথে তার কি সম্বন্ধ? আমাকে ছোট দেখেছো তাতে আমাকে নাম ধরে ডাকার তো আরো সুবিধে। সত্যি তুমি আমায় 'ঠাকুরপো' ডাকলে তোমাদের ভাষায় যাকে বলে 'গা জ্বালা করা' তাই হতে থাকে।

কঃ বেশ আর কোন দিন ওনামে ডাকবো না। এবার আমার কথাটা শোন।

সুঃ বল, তোমার আবার কি চাই, বেকারের অনেক দায়! (হঠাৎ গম্ভীর হয়ে) মা বলে গেলেন দাদার উপর খাই, অকর্মণ্য, লজ্জাহীন, আরো কতো। বাড়ি থেকে তাড়ানোটাও বাদ যায় নি!

কঃ শুনেছি, তখন তোমার কাছেই আসছিলাম। তোমাদের মাতাপুত্রের বাক্যালাপ শুনে আর আসতে সাহস হলো না। (হঠাৎ সুরঞ্জনের মুখের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠের হালকামো বন্ধ করলো। তারপর আন্তরিকতার সাথে সুরঞ্জনের পিঠে হাত রেখে) সাট্, মা অমন বলেনই। তাতে রাগ করতে আছে? তোমাকে আরও sportive ভেবেছিলাম। অমন মুখ ভার করে থাকার মতো কিছুই হয় নি।

সুঃ ভাবছি খাওয়া তুলে কথা বলে গেলো!

কঃ বুকন, বল্‌লাম না ও কথা ভুলে যেতে।

সুঃ বেশ, বলো তোমার আবার কি?

কঃ New Market থেকে এ তিন রঙএর আসল D. M. C. সুতো নিয়ে আসবে। এদিকে কোথাও পেলাম না।

সুঃ আচ্ছা বৌদি, তোমার এসব করে দেবার জন্য তো একজন বেশ সুস্থ, সবল বিচক্ষণ কর্মঠ লোক রয়েছেন। তুমি শুধু মুখ ফুটে কথাটি বলবে, তাও পারো না? কেন বাবা আমাকে নিয়ে টানাটানি!

কঃ তোমার দাদা? তবেই হয়েছে! (কমলা হাসলো অবজ্ঞায়) আর আমার জিনিষ তুমি না আনলে ঠিক পছন্দমাফিক জিনিষটি আসেনা। তাই তো তোমার দাদা বলেন, কমলার ব্যাপারে বু'র ইনটুইশ্যান্‌টা খোলে বেশ!

সুঃ (সুরঞ্জনের কাণ দুটো বোধ হয় একটু লাল হয়ে উঠলো, সামলাতে গিয়ে বল্‌লো) কিন্তু আমার Rates গুলো তোমার জানা আছেতো? ধরমতলা গেলে দু'আনা, শ্যামবাজার বারো আনা, হাওড়া একটাকা, Minimum চার আনা। বেকার মানুষ বাবা, একটা কিছু করে রোজগার করতে হবে তো। Rate খুব বেশী না—বাস ভাড়ার চারগুণ। মাও সে কথা জানে। তবে অন্য রকম contract ও করতে পারি তোমার সঙ্গে। ধর, তোমার সব কাজ করে দেবো, পরিবর্ত্তে দাদার পকেট থেকে তুমি technically যা সরাও তার 25% আমার। কি রাজী?

কঃ ইশ, আমি সরাতে যাবো কেন? চাইলেই কতো পাই—

সুঃ তা আমার জানা আছে। আমাকে—

কঃ সে তোমার জন্য, তোমারই প্ররোচনায়।

সুঃ আমি একটা চাকরী পেলে সকলের সব পাওনা শোধ করে দেবো। আর সব টাকা তোমাকেই দেবো, বৌদি।

কঃ তোমার টাকা রাখার জন্য লোকও আসবে একটি, ভেবোনা।

সুঃ না, তুমি দেখে নিও, বৌদি। সবটাকা তোমার।

কঃ ধন্যবাদ, সে টাকার anticipation-এ তোমায় এখন এ পাঁচ টাকা দিচ্ছি। সুতোর দাম বাদে সব তোমার।

সুঃ বলো কি, বৌদি! সব? তুমি একটা grand, excellent, supurb কি বলবো তোমায় (কমলার হাত ধরে একটা নাচের মহড়া দিতে যাচ্ছিলো)।

কঃ ছাড়, ছাড়, কাজ আছে (কমলা চলে গেল)।

সুঃ সকলেরই কাজ আছে, কাজ নেই শুধু আমার!

সে দিন সন্ধ্যার পর।

সুরঞ্জন শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, কিন্তু নিবিষ্ট হতে পারছিল না। মনে তার আজ আনন্দের জোয়ার বইছে। কমলা এলেন, সুরঞ্জন উঠে বসলো তড়াক করে।

কঃ বু, সুতো এনেছো?

সুঃ এই নাও। একটা জোর খবর আছে বৌদি, বলতো কি?

কঃ East Bengal-এর জয়?

সুঃ দূর! দূর! ওসব নয়। একটা চাকরী পাচ্ছি! মানে পাবোই।

কঃ বলো কি!



সুঃ হাঁ, দাদা তা'র এক কাকে ধরে একখানা চিঠি যোগাড় করে দিলেন, দেখা করলাম এক ভদ্রলোকের সাথে। সব কথা টথা হলো। officer's grade-এর চাকরী। দু'মাস probation, ২৫০৲ টাকায় সুরু। ভাল না?

কঃ নিশ্চয়! কবে থেকে join করছো?

সুঃ Manager ভদ্রলোক তো বললেন আজই appointment letter দিতে পারতেন কিন্তু Director ছুটিতে আছেন, তিনি না এলে finally কিছু করা চলবেনা। পাঁচ ছ' দিন পর খোঁজ নিতে বলেছেন। প্রথম মাসেই একটা ঘড়ি কিনবো কিন্তু, বৌদি। একটা officer তো, কি বল ফিট ফাট……

কঃ আচ্ছা, কোন্ কোম্পানী কোথায় চাকরী সব খবর বলো। মা'কে বলেছ?

সুঃ চাকরী কোলকাতায়, ব্যাঙ্ক ওটা—Commercial Bank.

(নামটা শুনেই কমলা গম্ভীর হয়ে গেল। মুখটা দেখাল রক্তহীন।)

কঃ কি নাম বল্‌লে? Commercial Bank! Director এর নাম S. B. Ghose তো?

সুঃ হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি এতো জানলে কি করে?

কঃ শোন বু, তুমি এ কাজ নিতে পারবেনা!

সুঃ বলছো কি তুমি বৌদি, এমন চমৎকার চাকরী লোকে মাথা কুটেও পায়না আর আমি তা পেয়েও ছেড়ে দেবো!

কঃ হ্যাঁ বু, তুমি তা ছেড়ে দেবে!

সুঃ কেন, আমি বুঝতে পারছিনা তোমার এতে আপত্তি কেন। দেশী ফার্ম্মে যদি তোমার আপত্তি থাকে—কাজটাজ শিখি তারপর না হয় Lloyds টয়ডস্ এ চেষ্টা করবো।

কঃ কাজ শেখবার অনেক জায়গা পাবে, ওখানে নয়।

সুঃ বাঃ মা'র এতো অপমানের পরও তুমি আমায় অফিসের বাছবিচার করতে বলছো! বাড়ি শুদ্ধ লোক আমায় taunt করে, scold করে! (ভারী গলায়) এক এক সময় ইচ্ছে হয় বেয়ারাগিরি পেলেও নিয়ে নেবো!

কঃ না, বাড়ির সবলোক এখনও তোমার taunt করেনা, scoldingও না। বু, তোমার একজনের কাছে অন্তত মূল্য আছে! তোমার সব কাজেই তার অনুমোদন পাবে!

সুঃ তোমার জন্য ভাবনা নেই, বৌদি। দাদা এতো চেষ্টা করে একটা কাজের ব্যবস্থা করলেন, সেটা না নিলে দাদা বেজায় চটে যাবেন। বকাবকিও করবেন।

কঃ তোমার দাদাকে manage করবার ভার আমার। আর একটু বকা না হয় শুনলেই, আমাকে বকেনা? আমিও কি তোমার দাদার বকা কম শুনেছি! নিজের মনুষ্যত্বটা যদি রাখতে চাও একটু scoldingএ কোন ক্ষতি হবেনা, নিজেকে ছোট করোনা তুচ্ছ কটা টাকার জন্য। জীবনে অনেক রোজগার করতে পারবে, পারবেনা?

সুঃ তা—তুমি যখন বলছো, নেবোনা ও চাকরী, কিন্তু অন্তরায়টা কি বলবেনা? আমার জানা দরকারতো আত্মরক্ষার জন্য!

ক: আমায় তা জিজ্ঞেস করিসনা, বু। তা আমি বলতে পারবোনা, শুধু জেনে রাখ ওখানকার চাকরী নেবার মতো নয় ভদ্রলোকের পক্ষে, ( ছুটে পালাল আবেগ চাপতে চাপতে )।

সুরঞ্জন কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপর তক্তপোশ থেকে নেমে পায়চারী করতে করতে—

সু: আচ্ছা বিপদ যাহোক! চাকরী পেলাম এখন আবার তা নিতে পারবোনা, কারণটাও জানতে বারণ। দাদাকে এখন আমি কি বলে ঠেকাবো! সব শুনলে মাতো অনিবার্য ক্ষেপে যাবে। এরপর হয়তো ঝেটিয়ে তাড়াবে। আচ্ছা মুশকিল যাহোক্। এর চেয়ে চাকরী না পাওয়াও ঢের ভালো ছিল। কিন্তু বৌদি কারণটা বলতে চাইছেনা কেন? সব রহস্য ঘেরা। মরুকগে, ভাগ্যে আছে মাটি কাটা কাঁদলে হবে কি!

অনিচ্ছায় হাতের কাছের বইখানা নিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। রাত ন'টা। কমলা ঘরে ঢুকলো। নিঃশব্দে সুতোর লাছি কটি নিয়ে চলে যাচ্ছিল, সুরঞ্জন তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলুলো:

সু: এমনিতেই সকলের গালমন্দ শুনি, বৌদি, তারপর দিলে ঠেলে খড়্গের নীচে, বাসায় আর তিষ্ঠানো যাবে না।

ক: ধরে নাও কোন কাজ তুমি আদৌ পাওনি।

সু: আচ্ছা বৌদি, না নেবার কারণটা কি একেবারেই বলার নয়? আমাকেও কি বলা চলেনা—অন্তত আমার satisfaction—

ক: শুনবেই? ( একটু ভেবে ) খুব মনঃকষ্ট হচ্ছে, না? আচ্ছা বলি শোন, শুনে নেহাৎ যদি নেবেই কাজ নিও……

কমলা দরজাটা ভেজিয়ে দিল তারপর একটা চেয়ারে বসলো সুরঞ্জনের মুখোমুখী—এতসব ভূমিকাতে সুরঞ্জন কিন্তু বেশ একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। কমলার গোল মুখখানা মনে হলো আরো গোল হয়ে গেছে।

ক: Commercial Bank-এর যিনি Director তাকে আমি ডাকতাম সত্যদা বলে—প্রায় দশবছর আগের ঘটনা। ওদের বাসাতে থাকতাম আমরা, ভবানীপুরে। বুঝতে পারবে, বু Class X এ পড়ি আমি তখন—বয়সের একটা ধর্ম আছে, একটা লোক যদি ২৪ ঘণ্টা আমার পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়, গুণ গুণ করে আমায় খুশী করতে চায়, তাকে আমার কিছুটা ভাল না লেগে উপায় নেই। ( সুরঞ্জন মুখ তুলে তাকালো। ) হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবাসতাম। ভাল না বেসে উপায় ছিলনা। আমরা গরীব—পরে জেনেছি, বাবাকে ও নানা ভাবে সাহায্যও করতো—ভাড়া নিত না, আরো অনেক তা আর না শুনলে। আমাকে নিয়ে ও সিনেমায় যেত, উপহার এনে দিত, বেড়াতো, কতো কি বলতো তার কিছু বুঝতাম, কিছু বুঝতাম না। মনের তখন সবে গোড়াপত্তন হচ্ছে। সত্যবানকে এর পর আর তেমন ভালো লাগত না। কলেজে যখন ভর্ত্তি হলাম, সত্যবান তখন প্রায় উন্মত্ত। চাঁদ চাইলে এনে দিয়ে বলতো 'তারপর?' আমাকে ও বিয়ে করতে চাইলো। আমি বললাম 'আমি তোমাকে ভালবাসি বলেই কি তোমায় বিয়ে করতে হবে? মেয়েদের ভালবাসা আর বিয়ে কি চিরকাল অবিচ্ছেদ্যই থাকবে। করবোনা



তোমায় বিয়ে।' সত্যবান অনুনয় করলো, তর্ক করলো, শেষে ভয় দেখালো। বলুল সব ও বাবাকে। বাবা বলুলেন, বিয়েতে তার আপত্তি ছিলো না—কিন্তু সত্যবান কায়স্থ। তার সজ্ঞানে অসবর্ণ বিয়ে অসম্ভব। দাবী পেশ করলো মা'র কাছে, মা বোধহয় বলেছিলেন, বয়েস তার অনেক বেশী; জেনে শুনে অত বুড়োর সাথে মেয়ে বিয়ে দিতে তিনি রাজী নন। আমার ভালবাসাটা বিশ্বাস করো বু, নিশ্চয় বিবাহধর্মী ছিলনা তাই সত্যবানের বয়েস বা বর্ণ কিছুই আমি লক্ষ্য করিনি। ওকে উঠতি-বয়সী আমার ভাল লাগতো বন্ধু বলে, ব্যাস্। ( কমলা একটু থেমে দম নিল )। সত্যবান ক্ষেপে গেলো, চটে গেলো, প্রতিহিংসায় জ্বলে উঠলো। আমার কাছ থেকে ও প্রত্যাখ্যান আশা করেনি। শেষে একদিন ও আমায় চূড়ান্ত অপমান করতে চেষ্টা করল, কিন্তু সফল হতে পারেনি। ( কমলা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল )। তারপর সে বাড়ি আমরা ছেড়ে দি, কিন্তু সত্যবান বোধহয় ছাড়েনি, আজো সে আমায় পাবার আশা রাখে। কৌশোরের সে ভুল আমার সমস্ত জীবন তেতো করে দিল।

সু: আমি ও কাজ নেবো না, বৌদি, প্রতিজ্ঞা করছি।

ক: নিওনা, আমাকে স্মরণ করে হয় তোমায় সে অনুকম্পা করবে, নয় অত্যাচার করবে—দুটোই আমার নিকট মৃত্যু তুল্য।

সু: বৌদি—

ক: নয়তো তোমাকে অবলম্বন করে আবার সে অন্তরঙ্গ হতে চাইবে তার 'কমলির' সাথে। তুমি সে জালে জড়িও না, বু,।

সু: তোমায় কথা দিচ্ছি, বৌদি, ও কাজ আমি জীবনেও নেবোনা। তোমায় অপমানের প্রতিশোধ…

সুরঞ্জনের হাতের মুঠোটা শক্ত হয়ে উঠলো, চোখ দুটো হিংস্র।

কমলা চোখের জল মুছে অপরিসীম আনন্দে সুরঞ্জনের দিকে একবার তাকালো তারপর ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

সাতদিন পর। সুরঞ্জনের ঘর। সন্ধ্যার কিছু পর। সুরঞ্জন দৈনিকের Wanted column দেখে নিয়ম মাফিক দরখাস্ত লিখছিল। 'বু আছিস' বলতে বলতে নিরঞ্জনের প্রবেশ, চোখে মুখে বিরক্তি। সুরঞ্জন দরখাস্ত বই-চাপা দিয়ে ফেলুলো।

নি: তুই সে ভদ্রলোকের সাথে আর দেখা করিসনি কেন?

সু: আমি ও কাজ করবোনা—

নি: What—? you can't expect to be an Ambassador!

সু: আমি তা চাইও না।

নি: তাহলে ও কাজ তুমি কেন নিলে না why?

সু: ওটা দিশী firm, ওখানকার চাকরীতে stability নেই—

নি: Silly! একটা 'A' class scheduled bankএর চাকরীতে stability নেই, stability আছে

সাহেব বাড়ির লেজার লেখাতে! There is some reason. বল, কেন তুমি ও কাজ নিতে চাওনি?

সুঃ ওখানকার কাজ আমার ভাল মনে হয় নি!

নিঃ বু, I say, don't argue. একটা অন্যায় করেছো and you are trying to shield it. তোমার আচরণে আমি হতাশ হয়েছি। I expected a better deal from you. কেউ কাজ পায় না আর তুমি—its preposterous! একাজ যোগাড় করতে আমার গায়ের ঘাম জল হয়ে গেছে। ভদ্রলোকের কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারবোনা।

সুঃ আমি অন্য কাজ···

নিঃ Don't talk like a fool. কাজ তোমায় কে দিচ্ছে? হাজার খানা তো application করেছো! I had a better idea about your intelligence. You are a problem to me now. I am tired আর পারি না আমি। কমলা তোমার মাথাটি খেয়েছে আদর দিয়ে দিয়ে। আজ তুমি আমায় অমান্য করতে সাহস করো। I can't tolerate that. এখানকার সর্বময় কর্তা আমি। এ সংসার আমার আদর্শে, আমার মতানুযায়ী চলবে, কেউ যদি তাতে uncomfortable feel করে he would better leave the house—I don't mind. এতটুকু কাল থেকে তোমায় মানুষ করেছি. I have done my duty. It is up to you now to mould your future. তোমার যদি একটা decision নেবার ক্ষমতা না থাকে you suffer for that—I cant help.

সুঃ আমি আজ কাজ যোগাড় করবো—

নিঃ Yes, you have to আজ থেকে সাতদিনের ভেতর তোমাকে যে কোন কাজ যুগিয়ে নিতেই হবে—Any job—or you leave the house. That's final. যত সব senseless fool! But Kamala has to be told about her ward's straightforwardness. (নিরঞ্জন রাগে কাঁপতে কাঁপতে কমলার উদ্দেশে চলে গেল)।

সুরঞ্জনের চোখ দিয়ে ঘৃণায়, অপমানে, রাগে টসটস করে জল পড়ছিল। একটা পেন্সিল নিয়ে বইএর উপর আঘাত করছিলো, মা এলেন।

মাঃ তোর গলায় দেবার দড়ি জোটেনা, বু। দাদার মুখে চুনকালী লাগালে! এবার অব্যাহতি দাও সক্কলকে। খেলা ধূলা হৈ চৈ নিয়েই তো আছো সর্বক্ষণ—কাজ করতে চাইবে কেন। নির্লজ্জ! বুড়ো ধারী হয়েছো, জ্ঞানগম্মি আর কবে হবে? দাদা বলেছেন কাজ না জোটালে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবেন। তাকে তাড়াতে হবেনা আমিই তোমায় তাড়াবো। কারো কথা কানে নেবে না শুধু বৌদি আর বৌদি!

সুঃ তোমার বলা শেষ হয়েছে—?

মাঃ বলা শেষ হবেনা যতক্ষণ না তুমি বাড়ি থেকে বেরুচ্ছো—

সুঃ আমার জন্য কারো ভাবতে হবেনা —

মাঃ ভাবতে হবেনা! এতখানি বড়ো হয়েছ এমনিই—দু বেলায় ভাত জুটছে এমনিই—বৌদি ভাত খাওয়ায়, না! বেহায়ার মতো আবার তর্ক করছেন বুড়ো ধারী।



সুঃ মা:—(সুরঞ্জন ফেটে পড়লো)।

মা বেরিয়ে গেলেন। সুরঞ্জন টলতে টলতে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে শুয়ে রইলো। পাশের বাড়ির Radioতে গান হচ্ছিল 'যাবার যারা তারা চলে গেছে ঘরপানে—'

মিনিট পনের পর সুরঞ্জন উঠে পড়লো। অপমানের জ্বালায় সে স্থির থাকতে পারছিলোনা, চাকরটা সেখান দিয়ে যাচ্ছিলো, সুরঞ্জন তাকে ডাকলো।

সুঃ এই নন্দা, বৌদি কোথায় রে—?

নন্দাঃ বাবুতে আর বৌদিতে খুব ঝগড়া হচ্ছে ছোড়দা, আমি ওখানে যেতে নারবো।

সুঃ এই—কি বলছেরে—আমাকে নিয়ে না—?

নঃ হ্যাগো—কি সব বেংক্—সত্যবান—চাকরী—তুমি—আমি সব শুনতে পাইনি—দাদাবাবু খুব বকে চলেছেন—বৌদিতো শুধু কাঁদছেন।

সুঃ হুঃ আচ্ছা তুই যা—

(সুরঞ্জন একটু পায়চারী করলো তারপর নিজের মনেই বলতে লাগলো বেশ জোর দিয়ে)।

দাদাযে বৌদিকে ভালবাসেন না এ আমি লক্ষ্য করেছি অনেক দিনই। সত্যবানের ঘটনা জানতে পারলে—জানে অনেক দিন থেকেই—হয়তো ঘৃণা করতে থাকবে। বৌদির life ruin করে দেবে। সব যখন জানতেই তাহলে বিয়ে করতে গেলে কেন! বিয়ের আগে অমন একটু আধটু প্রেম সক্কলেই করে থাকে। তুমি করোনি—? আমার জানতে আর বাকী নেই—শান্তি দস্তিদার, কনক বাগচী—এরা। এদের সাথে কম ঢলাঢলি করেছো! আজ যুধিষ্টির সেজে স্বামীত্ব ফলাচ্ছো। Shameless! বৌদি না হয়ে অন্য হলে তোমায় থুতু দিতো। কালই তোমার সব কীর্ত্তি বৌদিকে বলে দিতে হবে। তাকে অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবোই। (সুরঞ্জনের মুখখানা কঠিন হয়ে উঠ্‌লো)।

গভীর রাত্রিতে সুরঞ্জন একটা স্যুটকেশে কয়েকটা জামাকাপড় ভরে নিল। নিল খানকয় বই। ঘরের চার পাশে একবার তাকিয়ে দেখলো। না আর নেবার মতো কিছুই নেই। তারপর জুতোটা পড়ে নিয়ে fountainpen দিয়ে ছোট্ট এক টুকরো চিটি লিখে টেবিলের উপর রেখে দিল যাতে সকলেরই নজর পড়ে। পরে কি একটা ভেবে সম্বোধন করলো শুধু বৌদিকে। তারপর শব্দ না করে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলো। দেয়াল ঘড়িতে ঢং করে ১টা বাজলো।

দিনপনের পর এক নির্জন দুপুর বেলা একজন অপরিচিত লোক সুরঞ্জনদের বাসার কড়া নাড়লো। কমলা দরজা খুললো, লোকটা তাকে এক টুকরো চিঠি দিল।

কঃ তাকে পাঠিয়ে দাও। কেউ নেই বলো—

(লোকটি মাথা নেড়ে চলে গেলো। কমলা প্রতীক্ষা করতে থাকলো। একটু পরেই সুরঞ্জন এলো।)

এসো, কেউ নেই বাসায়। (ম্লান হেসে সুরঞ্জন কমলাকে অনুসরণ করলো—তার ঘরেই এলো। কমলা দরজাটা ভেজিয়ে দিল)।

তোমার দাদার সেদিনের বকাবকির পরই আমি ভয় করেছিলেম তুমি এরকম একটা কিছু করবে।

সু: তাড়িয়ে দেবার আগেই সরে পড়লাম—

ক: কোথায় আছো ?

সু: বাসা করেছি—আমার এক বন্ধুর বাসা। চাকরী পেয়েছি একটা—কেরাণীগিরি—সব মিলিয়ে ১৩৫৲ পাবো এখন। তিন মাস পর permanent হলে ১৫৫৲।

ক: যাক্, তোমার ব্যবস্থা করে নিয়েছো। এদিকে আমার জীবন বিষময় হয়ে উঠেছে—তুমি দূরে সরে গিয়ে ভালই করেছো, রোজ রোজ এ জঘন্য অপমান আর সহ্য হয় না, বু। সত্যবান, সত্যবান আমার জীবনের সব কিছু নষ্ট করে দিলো।

সু: তোমায় নিতে এসেছি, বৌদি—

ক: কোথায় ?

সু: আমার বাসায়, এ বাড়ির পরিবেশ থেকে তোমায় মুক্তি দিতে। শাসন, সন্দেহ আর গঞ্জনার পঙ্কিলতা থেকে তুমি সরে চলে এসো। আমি জানি দাদা তোমায় ভালবাসেন না, কোন দিন ভালবাসবেনও না।

ক: জানি, মেয়েদের পায়ে যে শিকল তাতো শুধু আর্থিক নয় সামাজিকও।

সু: এখন তোমায় বোধ হয় দাদা ঘৃণাও করবেন—তুমি কেন তা সহ্য করবে ?

ক: বু, ভাই আমার, তাকি সম্ভব—?

সু: কেন নয় ? নিশ্চয় সম্ভব ! তোমার কথায় একদিন আমি অমন ভাল চাকরী নিই নি—ঘর ছেড়েছি—অপমান থেকে বাঁচতে। আজ আমার অনুরোধ এ বাসা তুমি ছাড় রোজকার অবজ্ঞা আর অপমান থেকে বাচতে। তোমাকে এ বাসা ছাড়তেই হবে, বৌদি।

ক: বু, তা কি করে সম্ভব ?

সু: আমি কোন কথাই শুন্‌বো না। তিলে তিলে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে একদিনের চরম dicision অনেক ভাল। আমার চাকরী না নেওয়ায় সব কিছুর সমাধান হলো। আমার কথা তুমি রাখো।

ক: বু, ভাই আমার—পাগলামো করো না।

ক: আমি কোন কথা শুনবো না—তুমি ready থেকো, আমি এক্ষুনি আসছি। ( ঝড়ের বেগে সুরঞ্জন ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো )। কমলা কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলে উঠলো 'নয় কেন ?'

রাত্রিতে নিরঞ্জন বু'র ঘরে টেবিলের সামনে দাড়িয়ে উত্তেজনায় দ্রুত উচ্চস্বরে একখানা পত্র পড়ছিল :

"তোমার আদর্শে হস্তক্ষেপ করিনি। বু'র সাথে চলে গেলাম। কি ভাববে জানিনে। যাই ভাবো তোমার আদর্শের বিড়ম্বনা নেই সেখানে। কমলা"

প্রচণ্ড রাগে নিরঞ্জন চিঠিটা হাতের মুঠোয় পিষে দূরে নিক্ষেপ করলো।

নি: হুঃ তাই অত কায়দা করে চাকরীটা নেওয়া হয়নি।

Scoundrels !

য ব নি কা

# রবি-প্রদক্ষিণ

## অনিল বিশ্বাস

সূত্রধার—১৬০০ সাল। "বঙ্গভাষার লেখক সমিতি"র উদ্যোগে সভা বসচে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে। আলোচনা হবে রবীন্দ্রসমস্যা নিয়ে। এতকালের গবেষণায় যা পাওয়া গেচে আজ হবে তারি সমাবেশ! গবেষকরা ব্যস্ত তাঁদের আবিষ্কার তুলে ধর্তে। গবেষকাধ্যক্ষ নিবারণ চক্রবর্ত্তিকে সভাপতি ক'রে সুরু হ'লো সভার কাজ। প্রথমেই উদ্বোধন সংগীত—

"যখন পড়বেনা মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,....."

সভাপতি—এখন সভার কাজ আরম্ভ হবে। রবীন্দ্রায়ণের বারমাস্যার চেহারা প্রকাশ পাবে এখানে বারজনের গবেষণায়। প্রথমেই রেবার গীত-রব গবেষণা।

রেবা—এই যে গান গাওয়া হ'লো এতো বাউল রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলা দেশে বাউলদের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। মুক্তি-পাগল এ সব সাধক এক সময়ে ফিরেচে "মনের মানুষে"র সন্ধানে। অধরাকে ধরবার আকাঙ্ক্ষা দুর্মর হয়েছে এঁদের। পদ্মার সুরে সুরে চলেচে এঁদের পরিক্রমা। এই বাউল রবীন্দ্রনাথ শিলাই দহের বাসিন্দা। এঁর গুরু ছিলেন গগন হরকরা, মদন ও গঙ্গারাম। 'সহজিয়া'-সাধক রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন বহু গান। তাঁর 'গীত-বিতান' বহু স্বরা। শুধু তাই নয়। গানের সুর কবিতায়ও সংক্রামিত হয়েচে। ফলে কথা ও সুরে বেজে উঠেচে তাঁর 'নৈবেদ্য', 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' ও 'গীতালি'। ইনি নিজেও গেয়েচেন অনেক গান। এঁর "আমার প্রাণের মানুষ" গানটি স্মরণে আনে গগন হরকরার "আমার মনের মানুষ যেরে"। শিলাই দহের সাধনার সুর কায়া ধরেচে আত্মকাহিনীতে। আর এ-পরিচিতি ব'য়ে নেয় 'ছিন্নপত্র'। তাঁর গান বিদেশে পৌঁছে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফলে ইয়েটস্, 'গীতাঞ্জলির' এক ভূমিকাও লিখে দেন। আর বিশ্বের দরবারে এ পেলো "নোবেল পুরস্কার"। এ হ'লো বাউলেপনার জয়মাল্য। এই প্রতিভা এগিয়ে গেচে মধ্যভারতীয় সাধু সন্তদের কাছেও। তাই দেখা যায় "One hunderd poems of Kabir" সম্পাদনা করেচেন এই বাউল। কলিকাতার দর্শন মহাসভাতে ইনি বলেচেন Philosophy of our people সম্পর্কে : "আমার আঁখি হইতে পয়দা আসমান আর জমীন।" অকসফোর্ডে হিবার্ট লেকচারেও তিনি বলেচেন এর কথা তাঁর Religion of Man এ। কাজেই বলা যায় রবীন্দ্রনাথ বাউল ছিলেন।

সভাপতি—বিভা বলবেন এবার।

বিভা—আমি বলি, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নাটুকে, যেমন ইংলণ্ডের শেক্ষপীয়র আর মার্কিণ মুলুকের ইউজেন ওনিল। নাটুকেপনাই এঁর বিশেষত্ব। বাউলের নাচ এক ধরণের পাঁচালি নাচ। বাংলা সাহিত্যে আঠারো শতক পর্যন্ত চলেছিলো এই পাঁচালির প্রতিপত্তি। নাচের ভিন্ন ভিন্ন ঢঙে এগিয়েচে নাটুকে রবীন্দ্রনাথের কলাবৈভব। গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, হেঁয়ালিনাট্য,

রূপকনাট্য, নৃত্যনাট্য প্রভৃতি কতনা ঢঙ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নাচতে পারতেন। তাঁর ডাকঘরে তিনি নিজেই তো সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নেমেছিলেন। নাটকে ইনি এতই সিদ্ধহস্ত ছিলেন যে তাঁর নামডাক হ'য়েছিলো। ফলে উপন্যাসের নাট্যরূপও বেরিয়েচে, যেমন পরিত্রাণ, বিসর্জন প্রভৃতি। এরা হ'লো যথাক্রমে 'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' নাট্যরূপ। এ-ছাড়া 'ঘরে-বাইরে' 'চতুরঙ্গ', 'চার-অধ্যায়' প্রভৃতিও নাটকীয়। এই নাটুকেপনা বেঁচে আছে আজও নাটকের বিভিন্ন ঢঙে। উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, হেঁয়ালিনাট্য, ভান, প্রহসন, রূপক, নাটক ও নৃত্যনাট্যকে। এরি মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে 'বাল্মীকি-প্রতিভা', 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'হাস্য কৌতুক', 'ব্যঙ্গ কৌতুক', 'চিরকুমার সভা', 'মুক্ত ধারা', বিসর্জন' ও 'চণ্ডালিকা'। এই কীর্ত্তিলতায় ফুটেচে নাটুকেপনার ফুল। কাজেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নাটুকে।

সভাপতি—এবার বেলা তুলে ধরবেন তাঁর গবেষণার ফুল-মালা।

বেলা—আমি পেয়েচি অনেকগুলো কবিতা ও ছড়া। এতে সন্ধান পাওয়া গেচে কবিয়াল রবীন্দ্রনাথের। আঠারো শতকের গোধূলি-আকাশে কবিয়ালরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন পতঙ্গের মতো। চিতান-পরচিতান-ফুকা-মেল্‌তায় এঁরা আসর জমিয়ে ছিলেন। এরি কোল ঘেঁষে এলেন রবীন্দ্রনাথ। ইনি হলেন রামবসু, নিধুবাবু, হরুঠাকুর ও রাসুর শিষ্য। কতনা ছড়া কেটেচেন ইনি। 'ছড়া', 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া', 'শিশু', 'পলাতকা' ও 'শিশু ভোলানাথ' একথা বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে যুগের প্রভাবে এ-ছড়া হয়েচে নাগরিক ভদ্রতার উন্নীত। তাই তো এর জাত ঈশ্বরগুপ্তের থেকে আলাদা। এখানে কবিয়ালরীতিই লক্ষণীয়। কবিরা সে-যুগে লড়াই করতো। এ লড়াইয়ের চেহারা ফুটেচে 'মামলা'-ছড়ায়, যেমন—

কাবুলি বেড়াল নিয়ে দু'দলের মোক্তার
বেঁধেছে কোমর, কে সে সামলাবে রোখ তার।
হানাহানি চলেছেই একেবারে বেহোঁশে,
নালিশটা কী নিয়ে যে জানে না তা কেহ সে।

এতো কবিয়ালেরই চিহ্ন।

সভাপতি—অনিলা এখন বলবেন তাঁর শ্যাম-লীলার কাহিনী।

অনিলা—আমি আরেক রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা পেয়েচি। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন আর এর নাম ছিলো ভানু সিংহ অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব মহাজনদের একজন। ইনি একজন পদকর্ত্তা। এঁর পদাবলীও আছে যার নাম "ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী"। জনশ্রুতি আছে নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় এ-সম্বন্ধে বই লিখে ৎসুরিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "ডক্টর" উপাধি পেয়েছিলেন। এ জন-শ্রুতি অবিশ্যি অমূলক। কারণ, নিশিকান্তের থিসিস ছিলো The Yatras or the popular drama of Bengal। এতে ভানু সিংহের কোনো উল্লেখ নেই। তা হ'লেও জনশ্রুতির ব্যাপকতায় বোঝা যায় বৈষ্ণব পদকর্ত্তার নাম-ডাক এঁর ছিলো। এঁর "মরণ রে,



তুঁহুঁ মম শ্যাম-সমান" অনবদ্য। এই পদকর্ত্তা গদ্যও লিখেছিলেন। "ভানু সিংহের পত্রাবলী" এরি পরিচায়ক।

সভাপতি—সুষমার সমালোচনা শুনুন। বলুন আপনার সমাচার।

সুষমা—আমি গাল্পিক রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েচি। "গল্পগুচ্ছে"র লেখক ইনি। পূর্ববাংলার পদ্মাতীরে ছিলো এর বাস। এঁকে বেদে-বৈদ্যও বলা যায়। থাকতেন বোটে আর ভেসে বেড়াতেন এগাঁয়ে—ওগাঁয়ে। "পোষ্টমাষ্টার" গল্পে এর ইঙ্গিত আছে। শুধু যে ছোট গল্প লিখেচেন তা নয়। প্রলম্বিত গল্পেরও পরিচয় আছে, যেমন, "চোখের বালি" "নৌকাডুবি" "যোগাযোগ" "শেষের কবিতা" "দুই বোন" ও "মালঞ্চ"। গল্পায়ন এখানে ব'য়ে চলেচে হু হু ক'রে। ভবঘুরেমির চেহারা ফুটেচে এ-পরিক্রমায়।

সভাপতি—এবার তনিমার তনু নিয়ে, মানে চিত্র নিয়ে, গবেষণা।

তনিমা—চিত্র নিয়ে সামান্য নাড়াচাড়া ক'রে থাকি। আমি পেয়েচি চিত্রকর রবীন্দ্রনাথকে। ইনি এঁকেছেন অনেক ছবি। দিশি-বিদিশিয়ানায় অবগাহন করেচেন এই চিত্রশিল্পী। উনিশ-শতকী নানা ঢঙের সমাবেশে ফুটেচে য়ুরোপীয় শিল্পের আমেজও। তাৎকালীন চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা মনে রেখেও এ-বলা যায়। এ চিত্রকলা সম্বন্ধে কবির ভাষায় বলা যায়—

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটন লেখায়।

সভাপতি—এবার অসিতের পত্র ও যাত্রা-কথা।

অসিত—আমি কিন্তু পেয়েচি পর্যটক রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। ইনি বিশ্বপরিক্রমা করেচেন। এরি পরিচিতি বহন কচ্চে 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারি'। ভূ-পর্যটক রামনাথ বিশ্বাস এ-কাজ করেচেন সে-সময়ে। তবে রবীন্দ্রনাথ অভিজাত ছিলেন। তাই তাঁর অবাধ মেলামেশা সম্ভব হয়েচে বিদেশের উচ্চকোটিস্তরে। এঁর 'যাত্রী' ব'য়ে এনেচে জাভার কতনা স্মৃতি। এর পর 'জাপান-যাত্রী' ও 'জাপানে-পারস্যে' জাপান-পারস্যের স্মৃতিতে মুখর হয়েচে। মাঝে মাঝে এই পর্যটক সমাজের নিচের তলায়ও গিয়েচেন। আর দরদের চিত্রালি ফুটেচে 'রাশিয়ার চিঠি'তে। সভ্যতার পিলসুজ যে-মানুষ এখানে আছে তার সাক্ষাৎ। এরি জয়গানে মুখর হয়েচে স্মৃতিগুলি। তাই তিনি চেষ্টা করেচেন দেশের বুকে এ-ঢেউ লাগাতে। পর্যটন তাঁর সার্থক।

সভাপতি—এখন অজিত শোনাবেন দুর্জয়ী রবীন্দ্রনাথকে।

অজিত—আমি পেয়েচি এক বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথকে। এ বিপ্লব এসেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। এ একরকমের জেহাদ। তবে এ বিদ্রোহ নয়। যেহেতু, এখানে ভাঙন ও গড়ন দুইই আছে। বিদ্রোহে থাকে শুধু ভাঙন। তাই এ বিপ্লবের রূপ ভিন্নতর। 'রাজা ও প্রজা', 'স্বদেশ' ও 'কালান্তরে' ফুটেচে এর জ্বালাময় রূপ। বিদিশী শোষণ ও শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেচেন তিনি, যার অগ্নিশিখা ভেঙে পড়েচে নজরুলী বিদ্রোহেঃ "কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল, কররে লোপাট"। পরাধীনতার গ্লানিকে ধিক্কার দিয়েচে এ।

তাইতো জাতিকে আত্মস্থ হবার জন্যে আহ্বান জানিয়েচেন তিনি তাঁর 'আত্মশক্তি'তে। এর পরে সমাজ সংস্কারে জেগেচে রুদ্রশক্তি 'সমাজ' প্রবন্ধ সংকলনে। এই বিপ্লব পরে পথ খুঁজে পেয়েচে Mahatmaji and the depressed humanity-তে। শুধু তাই নয়। 'শিক্ষার ধারা', 'মিলন', ও 'বিকিরণে' ফুটেচে সংস্কারের চেহারা। এ-পরিণতিতে পৌঁছেচে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপে'। এই দরদী দৃষ্টি ডুবুরীর মতো নেমেচে সভ্যতার কন্দরে। সেখানে যে-রূপ দেখেচেন ইনি, তারি পরিচিতি ফুটেচে 'সভ্যতার সংকটে'। লুটের ধনে এখানে সভ্যনামিক কম্পমান। এই বিপ্লবী বঙ্গ ভঙ্গ রোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কর্মী হিসেবে, গায়ক হিসেবে, রাখীবন্ধনে যে গানের মালা রচিত হ'য়েছিলো, তারি রচয়িতা ইনি। এই বিপ্লবের চেহারা পাই একটি গানে—

বিঁধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান,
তুমি এমন শক্তিমান !

সভাপতি—এবার বিষ্ণুবাবু শব্দশাস্ত্র সম্বন্ধে বলবেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা—বৈয়াকরণ রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পাওয়া গেচে। উনিশশতকে গৌড়ীর ব্যাকরণ রচনা করেন রামমোহন রায়। কিন্তু এর বিকাশ ফুটে ওঠে এই রবীন্দ্রনাথে। ইনি চেষ্টা করেচেন বাংলা ভাষার মৌল রূপ উদ্ধার কর্তে। এ-প্রচেষ্টার পরিচয় আছে তাঁর বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকায়। বাংলা ক্রিয়াপদ ইংরেজি থেকে একটু স্বতন্ত্র ধরনের। এ পেলা ছাড়া এগোতে পারে না। এখানেই তো শোকান্তিকা। তারপর শব্দতত্ত্ব ও বাংলা ভাষা পরিচয়ে পাওয়া যায় বৈয়াকরণের সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয়। এ-দান যুগান্তকায়ী। ব্রাউনিঙের "বৈয়াকরণ-অন্তেষ্টি" এই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে খাঁটে—

জনতারা ঐ সবাই নিচে, উপরে এই শৈল শিখর,
বাঁধন ছেড়ে জ্ঞানের রাজ্যে বেঁচেছে এই বৈয়াকরণ,
এইখানেতে দে কবর ॥

সভাপতি—এবার অশোক শিষ্যের শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

অশোক—আমি কিন্তু পেয়েচি শিক্ষক রবীন্দ্রনাথের সন্ধান। ইনি ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'শান্তিনিকেতন' আশ্রম। এখানে পড়াশুনা চলতো মানুষ-তৈরির। শিক্ষকতা কাজে ব্রতী ছিলেন ইনি। ছোট্ট শিশুদের জন্যেও বই লিখেচেন ইনি। বাংলা, ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষার বই আছে এর। 'সহজপাঠ', 'ইংরেজি শিক্ষা' ও 'সংস্কৃত শিক্ষা' এরি পরিচায়ক। ভাষান্তর শিক্ষার জন্যে আছে 'অনুবাদচর্চা'। এতে ফুটে উঠেচে মানুষ-তৈরির সাধনা।

সভাপতি—এবার অনিমেষ সাহা বলচেন।

অনিমেষ—আরেক রবীন্দ্রনাথের ঠিকানা পাওয়া গেচে। ইনি ছিলেন সমালোচক। সাহিত্য নিয়েই এঁর আলোচনা এগিয়েচে নন্দনতত্ত্বের আদর্শে। এ আদর্শ ভারতীয় "রস" তত্ত্বের। সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বের বিকাশ মাঝে মাঝে ঝিলকিয়ে উঠেচে এখানে। 'তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোক-সাহিত্য', 'সাহিত্য' ও আধুনিক সাহিত্য' স্মরণীয় হয়ে রইল বাংলা সাহিত্যে। এখানে মৌল-সাহিত্যের মৌলরূপ উদ্ঘাটিত হয়েচে। শুধু তাহা নয়। ধ্রুপদী সাহিত্যের পরিচয়ও



আছে এখানে। এ আরও এগিয়েচে তাঁর 'সাহিত্যের পথে' ও সাহিত্যের স্বরূপে'। একটি জিনিষ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সে হ'লো মার্কসীয় দর্শনের অনুপস্থিতি। আবেষ্টনী বাদ দিয়ে সাহিত্যায়ন চলেবে এখানে কলাকৈবল্যে।

সভাপতি—এবার আশীষ শেষ করবেন।

আশীষ—আমি পেয়েচি এক দার্শনিক রবীন্দ্রনাথকে। ইনি বিশ্বভারতী গ'ড়ে তুলেছিলেন ঈশোপনিষদের আদর্শে : "ঈশাবাস্য মিদং সর্বং।' ভারত অধাত্মায়নের লীলাভূমি। এখানে মিলেচে বহু সাধক। উপনিষদের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কত না যোগী ঋষির সমাবেশ। মধ্যযুগীয় সাধুসন্তরা জুগিয়েচেন গণ্ডি-ভাঙার উপাদান। নানক-কবীর-রামানন্দ এরি বাহক ও ধারক। চৈতন্যদেবও বাংলা দেশে বইয়ে দিয়েচেন ভক্তির প্লাবন। শুধু তাই নয়। রামকৃষ্ণ-রমন-অরবিন্দের যোগসাধনায় এসেচে নতুন নতুন সিদ্ধি। এরি উপান্তে রবীন্দ্রনাথের সাধনা বোলপুরে, সেখানে "বিশ্বভারতী" তার ডানা মেলে দিয়েচে বিশ্বের দিগন্তে। এর দার্শনিকতার পরিচয় মেলে শান্তিনিকেতন বক্তৃতামালায়, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ প্রবন্ধ নিচয়ে। এ-ছাড়া আছে ব্রহ্মমন্ত্র, ধর্ম ও মানুষের ধর্ম। এখানে মানবিক ধর্মের জয় ঘোষিত হয়েচে। এ তাই গেয়ে ওঠে—'সীমার মাঝে, অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এতো মধুর।'

সভাপতি—রবীন্দ্রায়ণের বারমাস্যা এখানে শেষ হলো। এতে অংশ গ্রহণ করেচেন বার জন গবেষক—৬ জন নর, ও ৬ জন নারী। রবীন্দ্র সমস্যার বিভিন্ন রূপ এতে ফুটেচে। সভাপতির কাজ হলো এই বিভিন্ন ফুল নিয়ে এক গাছি মাল্য রচনা। সমস্যার এই "বার মাস্যা" রূপ সত্যি বিস্ময়কর। যে যুগে রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন সে যুগ দুরায়মান। তাইতো এই সমস্যা-বহুলতা। এর নজিরা আগেও পাওয়া গেচে। সে হলো "চণ্ডীদাস সমস্যা" যাতে ঝুলচে ৭ জন চণ্ডীদাস বাসলীর চণ্ডীদাস, বাসলীর বড়ু চণ্ডীদাস, অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস, বড় চণ্ডীদাস, দীনু চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও চণ্ডীদাস। রবীন্দ্রায়ণে দেখা যাচ্ছে ১২ জন রবীন্দ্রনাথকে—বাউল, নাটুকে, কবিয়াল, বৈষ্ণব, গাল্পিক, চিত্রী, পর্যটক, বিপ্লবী, বৈয়াকরণ, শিক্ষক, সমালোচক ও দার্শনিক। আজকের বিচার্য—এঁরা সব ভিন্ন ভিন্ন লোক না একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ? মহাভারত-কার "ব্যাসে" সংকলিত হয়েচে ভিন্ন ভিন্ন লোকের লেখা। রবীন্দ্র-ব্যাসে কি ঐ একই ধারার অনুবর্ত্তন না ব্যক্তিত্ব ভাঙার বহুরূপী সংস্করণ? এই প্রশ্নিলতাই ভেঙে পড়েচে ষোলশো সালে। এটা বিশেষ করে ভাবতে হবে। কালায়নে চেহারায় আছে এর কিছুটা পরিচয়। কাল কখনো বর্ত্তুল, কখনো ক্রমিক আবার কখনো বা বহুধা। গবেষকদের এদিক থেকে গবেষণার প্রয়োজন আছে, বিশেষ করে কালের "বহুধারূপে"র দিক হতে। এমনও হতে পারে যে একক রবীন্দ্রনাথ ভেঙে আজ হয়েচে দ্বাদশ রূপের বিকাশ। কবির ভাষায় পাই এরি আভাষ—

পঁচিশে বৈশাখ চলেছে
জন্মদিনের ধারাকে বহন করে মৃত্যু দিনের দিকে।.....
ছোট ছোট জন্ম-মৃত্যুর সীমানায়
নানা রবীন্দ্রনাথের একখানা মালা।

# নূতন বই

সূর্য্যমুখী ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী। ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

কোন একজন লেখক একদা বলেছিলেন, জনপ্রিয়তায় ফাঁক থাকে অনেক। তাঁর একথা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। একটু চোখ খুলে তাকালেই তা ধরা পড়ে। ফ্রান্সে কাফকা এই হালআমল পর্যন্ত অবজ্ঞাত ও অখ্যাতই ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য সাহিত্যে কে তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পেরেছেন? এমনকি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী এলিয়ট কিম্বা সাম্যতন্ত্রী ক্রিষ্টোফার কডওয়েলও নয়। অনেক সাগরের সামানা পার হয়ে যখন তাঁর গ্রন্থের অনুবাদ আমাদের কর-তীরে এসে পৌছুলো, তখন বিস্ময়ের রেশ কাটতে সময় লেগেছিল অনেক। অভিভূত হয়ে ভেবেছিলাম একমাত্র ষ্টিফেন স্পেণ্ডারের প্রসঙ্গত উল্লেখে ও বিরুদ্ধাচারণে ছাড়া তাঁর নাম আর কোনো সূত্রে শুনিনি কেন? হয়ত এজন্যই ভার্জিনিয়া উলফ বিচারের ভার উত্তরসূরীদের হাতে তুলে দিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নাম অনেকে শোনেননি, একথা জেনেও তাই আজ আর খুব বেশী অবাক লাগেনা।

আজ যাঁরা বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতায় অগ্রবর্তী তাঁদের তুলনায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী যে শিল্পকর্ম ও আঙ্গিকের বিচারে অনেক বেশী প্রশংসার দাবী রাখেন তা তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত অনেক গল্পই প্রমাণ করেছে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সূর্যমুখী' তার ভিত্তি আরও দৃঢ় করল। একেবারে নতুন ধরণের সত্ত্বেও এত সুন্দর সরস ভাষা, এত উজ্জ্বল ঘটনা সন্নিবেশের ভঙ্গী, এক আধ কলমের আঁচরে কোনো কোনো চরিত্রের এত নিপুণ অঙ্কন সাধারণত বাঙ্গালার উপন্যাসে বিরল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

একটি ছোট মহকুমা সহর আশেপাশের সকলকে চমক লাগিয়ে হঠাৎ তার সজ্জা বদলে ফেলল। চেহারাটা তার একেবারেই আলাদা। সহরের সকলের কাছে জীবনের যে সকল মূল্য এতকাল শ্রেয় বলে স্বীকৃত ছিল তার সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ঘটলো। অটল দত্তর মত তবু যে-ব্যক্তির এই মূল্যবোধেই পুরুষার্থ অন্বেষণ, তিনিও প্রাচীন-পন্থী ও অচল বলে পরিত্যক্ত হলেন। আর অরুণা সেনের চাকরী গেল জীবনের এই বহির্বিস্তারে মাধুর্য্যের অভাব বোধ করবার জন্য। মানবিক সম্পর্কগুলির যে নিগড় এতকাল ছিল তার ফাটল আজ খুব বড়। জায়গায় জায়গায় সে পরিখা বুঝি দুরতিক্রম্য। সর্বত্র আজ অর্থ-সম্পর্ক সোচ্চার। এ-সহরে এক অটল দত্ত ছাড়া আর কেউ এর জন্য বেদনা অনুভব করেন না। বরঞ্চ গা ভাসিয়ে দিয়েছেন এই চমকলাগা আত্মময় স্রোতে। চেয়ারম্যান তাঁর মেয়ে লিলিকে পুরনো জীবনের সব কিছু ভুলে কোটিপতি নিরঞ্জন রায়ের প্রতি মনোযোগ দিতে বলতেও অসঙ্কোচ। যদিও তিনি দ্বিধাহীন ভাবে জানেন, লিলির অতীত জীবনের সঙ্গে প্রেম ও একটি অস্বীকৃত সন্তানের জন্ম-কাহিনী জড়িত। ডাক্তার গৃহিনী তাঁর মেয়ে চেরীকে পাঠিয়ে দেন নৈশ বিহারে নিশানাথকে প্রলুব্ধ করতে। শুধু কি তিনি, শহর সুদ্ধ সকলেই নিশানাথের দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়। গোল্ডমেডালিষ্ট অটল দত্ত-র ছেলে নিশানাথ। বিদ্যার দিক থেকে বাবার অনুগামী না হয়েও আজ সে সকলের প্রশংসার বিষয়। লেখা পড়ায় কি হয়। আট ঘাঁট শিখে নিতে পারলেই তারা সার্থক।

গতযুদ্ধের পর থেকে এমন ঘটনা আর আমাদের কাছে খুব আশ্চর্য মনে হয়না। সমাজ ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ ক্ষত এত প্রকট যে অনেক পলেস্তারা দিয়েও তার ভয়াবহতা ঢাকা যাচ্ছে না। স্রোতেই গা এলিয়ে দিয়েছে সব। থমকে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকাতেও আর সাহস নেই কারো। এই সমাজে মানুষের মনে এক নেতির ধারণা ছাড়া কি-ই বা বাঁচতে পারে? সমাজের অসময়ের এদিকের ছবি অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এঁকেছেন। কিন্তু যা নেই এ ধারণা থেকে আমাদের মনে আসে কি থাকতে পারত।

তাই আরো দিক আছে। আছে আরো মানুষ, সংখ্যায় তাঁরা হয়ত অটল দত্ত বা অরুণার মতই কর-রেখায় সীমিত। তবু তাঁদের অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। আর উপন্যাস যখন সমাজের কেবল মাত্র একদেশী প্রতিভাস নয় তখন অন্যদিকের চিত্রায়নে লেখকের একটু আয়াস স্বীকার প্রয়োজন। অটল দত্তর মত মানুষ সম্পর্কে আমাদের অন্তত একটি ধারণা সৃষ্টি হবারও সুযোগ থাকা উচিত। কিন্তু এত পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থে তাঁরা যেন ওই সহরের আর আর মানুষের মত লেখকের কাছেও অনুল্লেখ্য। বোধ করি এ ত্রুটির জন্যই লেখক গল্পে যেখানে সার্থক, উপন্যাসে সেখানে ব্যর্থ হয়েছেন।

অর্থনৈতিক অবরোধে মানুষের জীবন আজ ক্ষীণতোয়া। সেই সঙ্কীর্ণ বিস্তারে মানুষের মনে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই চেরীর মাত্র সাত বছর বয়সে যখন বেড়ালের যৌনতার প্রতি গোপন মনোযোগ পরিলক্ষিত হয় তখন খুব খারাপ লাগলেও উপন্যাস রচনার জন্য তা অনুপযুক্ত মনে হয়না। কিন্তু প্রশ্ন আসে যখন চেরীর পরিণত পরবর্তী জীবনকে দেখি। সেই বোকা শরীরসর্বস্ব মেয়েটির চরিত্রের প্রাথমিক ভূমিকা হিসেবে অমন একটি অবস্থা পরিবেশন না করলেও বিশেষ অঙ্গহানি হতনা। আর একথাও বিশ্বাস করা প্রায় অসম্ভব যে, নিশানাথের মত ছেলেকে প্রলুব্ধ করার জন্য ডাক্তার গৃহিণী তাঁর মেয়েকে পাঠিয়ে দেবেন নৈশ বিহারে, একটি সাধারণ রেঁস্তোরায়। তাও একা নয়, রাসু, যার এককথাতেই তিনি তার পরিচয় পেয়েছেন, সেই রাস্তার একটি নোঙরা লোকের সঙ্গে। মাতৃধর্ম বলে যদি আর কিছু অবশিষ্ট না-ও থাকে, তবুও এমন ঘটনা অবাস্তব বলতে দ্বিধা হয়না।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে অভিনিবেশে কোথাও এতটুকু ব্যত্যয় ঘটে না। কিন্তু পাঠশেষে মনে হয় এই কি সমাজ, না আরো কিছু আছে? তাঁরই নাতিদূরবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'দর্পণে' এ সমাজকে দেখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি শুধু বহিরঙ্গই দেখেছিলেন। জীবনের গভীরে প্রবেশ পথ পান নি। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী কি এ উদাহরণ সম্পর্কে সচেতন নন? অন্ততঃ এটুকু নিশ্চয়ই তিনি জানেন একদেশী পর্যবেক্ষণা জীবনের একটি দিকই তুলে ধরে। গল্পে তা উপযুক্ত হলেও উপন্যাস গঠনের পক্ষে তা প্রতিকূল।

মানুষের জীবন কি আজ শুধু বিকৃতই। তাই যদি, তবে এ ধ্বংসোন্মুখ ব্যবস্থার মোড়ে দাঁড়িয়ে নতুন জীবন গড়ে তোলার সংগ্রাম কেন? মানুষের চোখে কেন স্বপ্ন সম্ভব, কেন এ অন্ধকারেও প্রত্যুষ কামনা?

তাই এত বর্ণাঢ্য, এত নৈপুণ্য সত্ত্বেও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সার্থকতার পথ খুঁজে পেলেন না। শিল্পী কখনও দেখা জিনিষের বর্ণনা দেয় না। তাঁর ঘটনা-সজ্জার রীতি বিশেষ কোনো জীবনবোধের

প্রয়োজনে। তাই মন তাঁর বিশেষ লক্ষ্যের প্রতি ঝুঁকি নিতে বাধ্য। মনের এই নির্দেশনার মধ্যেই তিনি সার্থক। তিনি কোনো নতুন সমাজ ব্যবস্থার কথা হয়ত সেখানে বলবেন না। কিন্তু লক্ষ্য তাঁর নিশ্চয়ই থাকবে মানবিক মূল্যের প্রতি। আর এ মূল্যবোধ শুধু তাঁর জন্যই নয়। তার মাধ্যমে আরো অনেকের জন্য। তাই বুঝি তা আমাদের কাছে প্রদীপ্ত চোখের স্বপ্নের নির্ঝর।

উপন্যাসটি পড়ে আমাদের আবেশ কাটতে সময় নেয়। কিন্তু তারপরই মনে হয়, ভাবের দিকে যদি তিনি তির্যক দৃষ্টি না দিতেন তবে আমাদের কত সুন্দর, কত সার্থক একটি উপন্যাস পড়বার সুযোগ ও সৌভাগ্য হত।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

---

চর-ভাঙাচর—কাজিআফসারউদ্দিন আহমদ ওসমানিয়া বুক ডিপো, বাবুবাজার : ঢাকা।

'চর-ভাঙা চর আবহ-প্রধান উপন্যাস।

উপন্যাসের পটভূমিকা মোগল সাম্রাজের অস্ত-আভা ও ইংরাজশাসনের উজ্জ্বল দ্বিপ্রহরের মধ্যবর্তী গ্রাম-কেন্দ্রিক ঢাকা ও তার কণ্ঠলগ্না নদী ধলেশ্বরী। এই ধলেশ্বরীর গতি বিচিত্র—কখনো বন্য, কখনো চঞ্চল, কখনো আবার আত্মস্থ। কোথায়ও আর্দ্র বিস্তৃত চর গড়ছে, কোথাও সে ফসল-ভরা চর গ্রাস ক'রছে।

বহুদিনের নদী ধলেশ্বরী। ধলেশ্বরীর রূপোলি হাতছানিতে যাযাবর জাতিও হ'য়েছে মদির বিহ্বল। তার নরম মাটির শ্যামলিমায় বেঁধেছে তারা স্থায়ী নীড়। সাথে সাথে দেখা দিয়েছে সংসার সমাজ, রাষ্ট্র, বিস্তৃতির ইসারা। সুরু হ'য়েছে সংগ্রাম। ধলেশ্বরীর মতো ধ্বংস, আবার সৃষ্টি। এই গতি-কেন্দ্রে 'চর-ভাঙা চরে'র বিষয়বস্তুর বৃত্ত।

নদীর সাথে পূর্ব বাংলার সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন। তাই হয়তো ধলেশ্বরীর বিভিন্ন ছায়া দেখতে পাই উপন্যাসের প্রতি চরিত্রে। চাঁদ খান, রশীদ-বখ্‌সখনি, নিজামতউল্লা খানের দাদী-বিবির মাঝে দেখা যায় উদ্দাম কঠিন ধলেশ্বরী, পীর-আলি, কাসিম সিকদারের মাঝে দেখা যায় আত্মস্থ ধলেশ্বরী আর সৈয়দ জর্দা শরীফুণনিসা ও জাহাংগীর সুলতান ফখর উদ্দীনের বুকে মুখে খেলা করে কিশোরী-চঞ্চল ধলেশ্বরী। নিজামতউল্লা খানের চরিত্র দ্বিধারার এর জটিল ঘূর্ণি—দুরন্ত বন্য অথচ শান্ত সমাহিত। তার কাব্য-পিপাসু নীলিম স্বপ্নের পাশেই আবার ঝিলিকিয়ে ওঠে রক্তাক্ত বিদ্যুৎ ঝলক।

এম্নি আরো বহু চরিত্রের ভিড় দেখলাম এ-উপন্যাসে। কিন্তু এ-চরিত্রগুলির পরিণতিতে লেখকের সার্থকতার আভাস অস্পষ্ট। ঘটনার বাঁধুনিও তেমন দৃঢ় নয়—ছেঁড়াছেঁড়া। সেই সাথে লয়-ও ঢিলে। ফলে গতিও স্বভাবত শিথিল। তবে আবহ বা পরিবেশ সৃষ্টিতে লেখক যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। ধলেশ্বরীর বুকে ঝড়-বৃষ্টি-ভাঙা কাঁপা কালো রাত্রি ও নফর পাড়ার সবুজ প্রান্তরে ফাগ ছড়ানো জ্যোৎস্নার ছবি পড়বার পরও মনের কোণে বহুক্ষণ দোল দেয়। ভাষাও আশ্চর্য গীতল ও পরিচ্ছন্ন।

লেখকের এ-কাব্যমুখীন আবেগ ও দয়বৃত্তির যে পরিমাণ স্পর্শ পেলাম সেই সাথে বিচার



বোধ আরো কিছুটা শাণিত ক'রতে পারলে সাম্প্রতিক বাংলা-গল্প উপন্যাসের ভয়াবহ দুর্দ্দিনে বলিষ্ঠ আশ্বাস তাঁর কাছ থেকে পেতে পারি বলে মনে হয়।

স্থানে স্থানে মুদ্রণ-প্রমাদ পীড়াদায়ক। বিশেষ ক'রে 'র' 'ড়' এর বিভ্রম।

সুনীল কুমার নন্দী

---

সায়াহ্নে—অরুণ ভট্টাচার্য। ভারতী গ্রন্থভবন। দাম—একটাকা।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অরুণ ভট্টাচার্য্য তরুণ হ'লেও নবাগত নন। বিভিন্ন সাময়িক পত্রের মাঝ দিয়ে ইতি পূর্বেই তাঁর লেখার সংগে পরিচিত হ'য়েছি। তিনি মূলত কবি। তরুণদের মধ্যে যে কবি-গোষ্ঠী স্বকীয় সুরে কিছু বলবার চেষ্টা করছেন অরুণবাবু তাঁদের অন্যতম।

'সায়াহ্ন' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ-গ্রন্থের প্রায় কবিতার মাঝেই ভাসছে যৌবন-বিষাদের সুর, একটি কান্না-করুণ হৃদয়ের ছায়া। নাগরিক ধূসর জীবনের সংগে জীবিকার রূঢ় অসংগতিতে কৈশোরের কত স্বপ্নিল হৃদয় হ'চ্ছে বিবর্ণ, ম্রিয়মান, ক্লান্ত-ক্লিষ্ট।—এরই পটভূমিতে লেখা একটি বেদনা-বিহ্বল চিত্র :

এখানে হৃদয় নেই। ম্লান ঘরে নির্জন শরীর
শ্রাবণে আশ্বিনে ক্লান্ত।

বিরুদ্ধমুখী পারিপার্শ্বিক ও মানসিক অসুস্থতায় তিক্ত রৌদ্রে ভিজে ভিজে অবিশ্বাসী হৃদয়ের স্মরণ নেওয়া আকস্মিক নয়, অস্বাভাবিকও নয় :

আজকে পৃথিবী জুড়ে হৃদয়ের দীর্ঘ যবনিকা ;
প্রেম মিথ্যা, স্মৃতি মিথ্যা, কল্পনার আয়ু সমাগত !

এই দ্বিধা-ক্লান্তি বেষ্টিত, বেদনা-পীড়িত কণ্ঠেও কবির উত্তেজিত ধ্বনির আওয়াজ না পেয়ে খুসী হ'য়েছি। মুগ্ধ হ'য়েছি তাঁর স্নিগ্ধ নরম কণ্ঠে বলবার ঝোঁক দেখে।

তবে 'সায়াহ্নে'র কারুশিল্প-ত্রুটি পীড়াদায়ক। প্রথমত কতকগুলি কবিতার ঢিলেঢালা গঠন প্রীতিকর নয়। 'সুবর্ণরেখার তীরে' ও 'ঋতুরঙ্গ' কবিতা দুটির অনুভূতি সুন্দর, অকৃত্রিম। কিন্তু গঠন শিল্পের দৈন্যে সে-অনুভূতি পাঠক-চিত্তে দোলা দিতে পারে কই ? দ্বিতীয়ত ছন্দ-শৈথিল্য।

বহুদিন হ'লো কৈশোরের এলোমেলোমি মিলিয়ে গিয়ে বাংলা কাব্যের রূপ নিয়েছে সুষ্ঠু সুস্থতায়। তাই শৈশব কাব্যের সহনীয় ভাঙাচোরা ছন্দ, ঢিলেঢালা গঠন ও অপটু শব্দ-ব্যবহার রসিক সমাজ আজ গ্রহণ করতে নারাজ। আমার মনে হয় কবিতার এ-কারুশিল্প কবির অধ্যবসায়ের ওপর একান্তভাবে নির্ভর করে।

সুনীল কুমার নন্দী।

## অনুবাদ

গোপন কথা—ষ্টিফেন জুইগ। অনুবাদক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বাচল প্রকাশক।

আলোচ্য গ্রন্থটি বিখ্যাত উপন্যাস 'আমক'-এর অনুবাদ। বিষয় যেখানে অনুবাদ, মূল গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার সেখানে নিরর্থক। অতএব মূল গ্রন্থের বিচার নিরপেক্ষ সমালোচনার নিরঙ্কুশ সমর্থন পেতে বাধা নেই। কিন্তু অনুবাদ হলেও আসলে তা সাহিত্য-ই। এ-ক্ষেত্রে বিদেশী ভাষায় বুৎপত্তিই অনুবাদকের একমাত্র গ্রাহ্য গুণ নয়। ভাষাজ্ঞানের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যবোধ, কান ও নিজের ভাষার ওপর সমধিক দখল থাকাও প্রয়োজন। যার মধ্যে দুটি ভাষা ও ভৌগোলিক-ব্যবধানের দুই মনের সম্পৃক্তি হয়েছে, এবং যার রচনা এ সর্তগুলি সংবহন করেও ঋজু, তিনি-ই পারেন সার্থক অনুবাদকের কৃতিত্ব দাবী করতে। বর্তমানে অনুবাদ সাহিত্য অনুবাদই হয়। সাহিত্য নাম পদবাচ্য হতে পারেনা। 'আমক'-এর মত দুরূহ গ্রন্থের অনুবাদে শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সে-দিক থেকে অনেকখানি সার্থক।

অনুবাদকের অসুবিধা হল 'কাল' অনুসারী ক্রিয়া পদের ব্যবহারে। কম ক্রিয়াপদ ব্যবহার সত্ত্বেও সুঠাম গদ্য রচনা রীতি বাংলা সাহিত্যে প্রায় অনুপস্থিত। তাই লাম, লুম অথবা আছি, আছ এবং বে, ব, বার উপর্য্যুপরি ক্লান্তিকর ব্যবহার স্বাভাবিক। এ-দিকে আবার দৃষ্টি না রাখলে সহজ পাঠ সম্ভব নয়। অনুবাদ দুঃসহ মনে হয়। কিন্তু শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এ দুস্তর বাধা সুন্দরভাবে অতিক্রম করেছেন।

মধ্যে মধ্যে অনুবাদ যেন মূল গ্রন্থ থেকে অনেক দূরে। আর ভূমিকার ভাষ্যের সঙ্গে গ্রন্থের অসঙ্গতি এত পর্বত-প্রমাণ যে তা' নিষ্প্রয়োজন মনে হয়।

নৃপেন্দ্র সান্যাল।

## সাহিত্য হিতৈষা

'দুরন্ত দুপুর' নিয়ে বাংলা কবিতায় নরেশ গুহের আবির্ভাব যিনি সুগম করে দিয়েছেন সেই দিলীপগুপ্তকে সাহিত্যের হিতৈষী হিসেবে ধন্যবাদ না দিলে সত্য গোপন করা হবে। বইটির সুন্দর গেট-আপের জন্যে ত বটেই, তা ছাড়াও মনে হয় গুপ্ত মশায়ের একটা ভগীরথ-ব্রত আছে। গুহায়িতকে সূর্য্যালোকে এনে দেবার গুপ্ত তপস্যাই তিনি করছেন। নরেশ গুহ এমনই একজন তরুণ কবি যিনি, বাংলার সন্তান, কাজেই হয়ত অজান্তে বাংলা ভাষার ধ্বনির দুরন্ততা ধরতে পেরেছে তাঁর কান। নরেশ গুহ মিষ্টি লেখেন, একথা না-বলে বলা উচিত যে তিনি ধ্বনি সৃষ্টি করতে জানেন—যেম্নি শব্দে, তেম্নি ছন্দে। 'দুরন্ত দুপুরে'র খবর বাংলা-কবিতার একটি নূতন দুপুরের খবর না হলেও খর প্রভাতের খবর—খর ধ্বনি-প্রপাতের খবর।

এই নূতন প্রভাতের খবরের সঙ্গে একটি পুরাতন প্রভাতের তিরোধানের খবর দিতে হচ্ছে—যে প্রভাতের লাল আকাশে হোতা ছিলেন মোহিতলাল। রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতে আর কারু কণ্ঠে বা কারুবাকে পাঠক মোহিত হবে—দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্দ্রে'র পর আর কোনো কবি মন্ত্রের মতো মোহাঞ্জন মাখিয়ে দিতে পারবে মনে, বাংলা-কবিতার ভাষার এমন সম্ভাবনা নিয়ে যখন পাঠকের আর ভাবনা নেই তখন মোহিতলাল গোলাপী-আভায় স্বপ্নের পসরা সাজিয়ে হাজির হলেন। প্রৌঢ় বা যুবকদের কথা জানিনে, তবে তিনি যে একটি কিশোর মনকে নিঃসন্দেহে সেদিন সিরাজে এক তুরাণী রূপসীর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা আজও মনে করতে পারছি। সেই বেদরদী তুরাণী মেয়ের লাল গালের কালো তিলের বদলে সমরখন্দ-বোখরা দিয়ে দেবার ক্ষমতা যে কার আছে—কোন্ হাফিজের বা নাদিরশাহের, আজ আর তা নিয়ে স্বপ্ন-রচনা করছিনে কিন্তু সেদিন স্বপ্নই ছিল সম্বল আর তাকে অবলম্বন করেই ভালো লাগত জীবন। সেদিন আলবুরুজের লাল চূড়ায় এস্রাজের মতো মিঠে অথচ মেঘে-চাপা বাজের মতো কঠিন আওয়াজ শুনতামঃ 'নাদির—নাদির।' আজ জানি প্রাগৈতিহাসিক ঈশাণী বাংলার 'নবচন্দ্র পঞ্চচূড়শ' উরাণে 'নদিতবির' হয়ে যে বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিল তারই রক্ত বহন করেছে শাহী-শীহ নাদিরশাহ। এই 'নদিতবির'কেই অথর্ব্ববেদ (প্রশ্নোপনিষদ—১১) বলেছেন 'রনদ ৰাদশাকৃতি নাদিবাহুষপ প্রজাপতি পিতা'। বাংলা ভাষার 'ন' কে অনুস্বার করে এবং ষ-স-কে বিসর্গ বা 'র' করে নিয়ে সংস্কৃতের জন্ম। রচিত ইতিহাসের মিথ্যা সন-শাল রংমশালে যতো ধাঁধাঁই দেখাক বাংলা ভাষা আর বাংলার কবি-মনকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না। যুগে-যুগে বাংলাদেশের কবিরা বলে দেবেন, আমাদের বাগ্দেবী-মাতৃকা লীলাকমল হাতে শুধু কমলাই নন, তিনি দশমহাবিদ্যা শক্তি—শাক্ত বাংলাদেশের সংহারক শক্তিও। বলবেন :

"ভেঙে ফেলো মঠ মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা করো নিমজ্জন,
বলি-উপচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জ্জন।

নাই ব্রাহ্মণ, ম্লেচ্ছ-যবন, নাই ভগবান—ভক্ত নাই,
যুগে যুগে শুধু মানুষ আছেরে, মানুষের বুকে রক্ত চাই।" (মোহিতলাল—'কালাপাহাড়')

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

দ্রষ্টব্য :

আগামী সংখ্যা থেকে সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য পূর্ব্বাশার সম্পাদনা-কার্য্য গ্রহণ করবেন। ভাদ্র-আশ্বিন যুগ্ম সংখ্যা শারদীয়-সংখ্যা রূপে বর্দ্ধিত কলেবরে প্রকাশিত করবার প্রস্তাব পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানিয়ে রাখছি। সংখ্যাটির মূল্য সম্ভবত বারোআনা করা হবে।

সত্যপ্রসন্ন দত্ত।


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

**কবিতা**

জীবনানন্দ দাশের
**মহাপৃথিবী**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
দেড় টাকা

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**নতুন দিন**
আট আনা

**যৌবনোত্তর**
আট আনা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
**স্বাক্ষর**
এক টাকা

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পতাকা**
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
**নয়নচারা**
দেড় টাকা

**উপন্যাস**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

**কস্মৈদেবায়**
( ২য় সং )
তিন টাকা

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
**তিনরঙ**
দু'টাকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ ক লি কা তা**

Regd. No. C. 1512

## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। চল্‌তি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে (ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেন্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয়:

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা





খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

CBLD

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩


Printed, Published & Edited by Satya Prasanna Datta, Purvasa Ltd.
[illegible] Chandra Avenue, Calcutta



# টুকরো কথা... (১৯)

উনষাটের বৈশাখ এর মধ্যেই কত দূরে চলে গেছে। সামনে পিছনে তাকিয়ে এখান থেকে বিগত আর আগামী দুই বৈশাখকেই যেন সমান দূরে দেখা যায়। বাঙালী লেখক আর বাংলা লেখার কথা বলতে-বলতে 'টুকরো কথা' গ্রীষ্ম-বর্ষা পেরিয়ে শরতের সীমানায় এসে দাঁড়াল। এই কয়মাসে গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কবিতায় যত বই এ-দেশে বেরিয়েছে বছ বেছে নিলেও তার মধ্যে অনেক থাকে। সময় নিশ্চয়ই আরো বাছবে। কিন্তু সময়ের মতো নির্মম বিচার মানুষের পক্ষে অসাধ্য। এই কয়মাসের উপন্যাস : অরণ্যকুহেলী, দেহমন, বাসররাত, আগামী, মনের অগোচরে, লালমাটি, হাসুবানু, সোনার চেয়ে দামী, বেআইনী জনতা, ভাঙছে শুধু ভাঙছে এবং রাগিণী ; এই কয়মাসের ছোটগল্প : চাচাকাহিনী আর জতুগৃহ ; এই কয়মাসের প্রবন্ধ : রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা, রবীন্দ্রনাথের গান, কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য, বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, কবিগুরু, কবিকথা, পূজাপার্বণ, হিউয়েন চাঙ, দীনবন্ধু মিত্র, শরৎ-পরিচয়, সাহিত্যসংগমে, সাহিত্যপ্রবাহ, শিশুমন, শিল্পদৃষ্টি, ভারতীয় বনৌষধি, আমার দেখা রাশিয়া এবং সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ; এই কয় মাসের রম্যরচনা : পঞ্চতন্ত্র, পূর্ণকুম্ভ, নিমন্ত্রণ এবং বইয়ের বদলে ; কবিতা : দুরন্ত দুপুর, নতুন খাতা, সমুদ্রকন্যা এবং বিভাবরী—আজ থেকে একযুগ পরে এর কোন্ বই মানুষ তখনো আদর করে পড়বে কে জানে! কিন্তু তেরোশো উনষাটের এই শরৎকালে দাঁড়িয়ে মনে হয় সমসাময়িক বাঙালী লেখকদের এই বই কটি আরো অনেক বইয়ের মধ্যে রচনাগুণে হয়তো উল্লেখযোগ্য। এই সব উল্লেখযোগ্যকে নিয়েই পরিপুষ্ট হয় অবিরলগতি সাহিত্যের ধারা। এবং সাহিত্য-গতির সেই চিহ্ন নির্দেশ করাই 'টুকরো কথা'র কাজ। সমসাময়িক আরো কোনো বিশিষ্ট রচনার উল্লেখ তার পাতায় যদি না হয়ে থাকে সেটা একান্তই অনিচ্ছাকৃত ॥

এবার নতুন বইয়ের কথা।

ভারতীয় প্রাচীনসাহিত্যে দুটি প্রসিদ্ধ 'চরিত' বিদ্যমান আছে। একখানি অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' যার অনবদ্য অনুবাদ করেছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; দ্বিতীয়টি বাণভট্টের 'হর্ষচরিত'। সংস্কৃত গদ্যকবি বাণভট্টের সুবৃহৎ এই গ্রন্থে ষষ্ঠ শতকীয় জীবনযাত্রার কাব্যময় একটি সম্পূর্ণচিত্র পাওয়া যায়। প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর তার অনুবাদ করে বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করলেন ॥

নতুন উপন্যাস ॥ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'দুয়ার হতে অদূরে' : রম্যরচনার সঙ্গে উপন্যাসের অভিনব মিশ্রণ ; সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'অন্ত নগর' : লণ্ডনের দরিদ্র ইষ্টএণ্ড-এ কয়েকটি প্রবাসী বাঙালীর কাহিনী। এ ছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের বয়স্কপাঠ্য রহস্যোপন্যাস 'হানাবাড়ি'। 'নিকৃষ্ট গল্পের' পর প্রমথনাথ বিশীর নতুন গল্প-সংকলন 'নিকৃষ্টতর গল্প'।

প্রবন্ধের নতুন বই ॥ 'খাদ্যককথা' : অনিলকুমার রায় ; 'গণিতের কথা' : গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বই দুটি জিজ্ঞাসুমন সাহিত্য-রসিকেরও ভালো লাগবে ॥

অধির আগ্রহে ছেলেমেয়েরা পুজোর দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। ছুটি তো আছেই, তাছাড়া বছরের এই সময়টাতে বিশেষ করে তাদেরই জন্য ছাপা হয় ছবিতে ছাপায় ঝকঝকে নতুন বার্ষিকীগুলি। আরো অনেক নতুন বইয়ের মধ্যে শিল্পী সুধীর খাস্তগীরের ছড়া-ছবি-গল্প 'তালপাতার সেপাই' ; ভারত ইতিহাসে পাঠান মোগল যুগের সত্যঘটনা নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ,মোগল পাঠান' ; 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' সিরিজে শারীরবিজ্ঞান বিষয়ে গল্পের মতো লেখা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'পায়ের নখ থেকে চুল' এবং মঙ্গলগ্রহবাসীদের পৃথিবী আক্রমণ বিষয়ে এইচ. ওয়েলস-এর কাল্পনিক উপন্যাস 'দি ওয়ার অভ দি ওয়ার্ল্ড' উল্লেখযোগ্য। শেষ বইটি অনুবাদ করেছেন নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নতুন বই, সংস্করণে মিলিয়ে সিগনেট প্রেস থেকে এবার পুজো আটখানা বই প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম বই : ৬ই ফাল্গুনের পরে ছয় মাসের মধ্যে অচিন্ত্যকুমারের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' চতুর্থ মুদ্রণ ছয়মাসে কোনো বইয়ের ২৭ হাজার ৫শো কপি ছাপা হওয়া বাংলা বইয়ের ইতিহাসে বহুকাল মনে রাখার মতো বিস্ময়কর খবর। দ্বিতীয় বই : শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'। আত্মজীবনী রচনার ক্ষেত্রে এই সরস গ্রন্থখানি আধুনিক পাঠকের উপযোগী করে ঈষৎ পরিমার্জিত আকারে নতুন সংস্করণ হচ্ছে। তৃতীয় বই : প্রতিমা ঠাকুরের 'স্মৃতিচিত্র'। জোড়াসাঁকো ঠাকুরপরিবারের বধূ এই গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথে পরিবারের একটি অন্তরঙ্গ সেকালচিত্রের উদ্ঘাটন করেছেন। গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে অপ্রকাশিত কিছু মূল্যবান আলোকচিত্র। চতুর্থ বই : বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধসংগ্রহ 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'। যামিনী রায়, এলিঅট, অবনীন্দ্রনাথ, পিকাসো, আঁরাগঁ প্রমুখ শিল্পী-সাহিত্যিক নিয়ে বিশিষ্ট বাঙালী কবির এই আলোচনাগ্রন্থ সাহিত্যরসিকদের উৎসাহী করবে। পঞ্চম বই : 'পথের পাঁচালি'-র রচয়িতা স্বর্গত বিভূতিভূষণের নতুন উপন্যাস 'দুই বাড়ি'। বাংলার পল্লীজীবন ও পল্লীপ্রকৃতি বিষয়ে এই লেখকের সহৃদয় অন্তর্দৃষ্টি অসামান্য। ষষ্ঠ বই 'দিন-দুপুরে'-র লেখিকা লীলা মজুমদারের প্রথম বয়স্কপাঠ্য উপন্যাস 'শ্রীমতী'। মেয়েরা যে বয়সে স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে যায় এবং সেই বয়সেই উপযোগী উপন্যাসের সূচনা করবে 'শ্রীমতী'। সপ্তম বই নতুন লে-আউট এবং প্রথম সংস্করণের আদি মলাট নিয়ে আবার কম দামে সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'। নতুন সংস্করণ। এবং বই : জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ 'বনলতা সেন'। আধুনিক বিখ্যাতদের মধ্যে নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশ এবং 'বনলতা সেন' তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। প্রায় দশবছর আগে বারোটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত এই বই বৃহত্তর পাঠক মহলে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে। এখন তিরিশটি কবিতা নিয়ে বর্ধিত কলেবরে সিগনেট সংস্করণ ছাপা হল।

প্রসন্ন শরতে আপনার ছুটির দিন মধুর হয়ে উঠুক। বাংলা বই সে মাধুর্যকে কিছুটা হয়তো বাড়াতে পারবে ॥


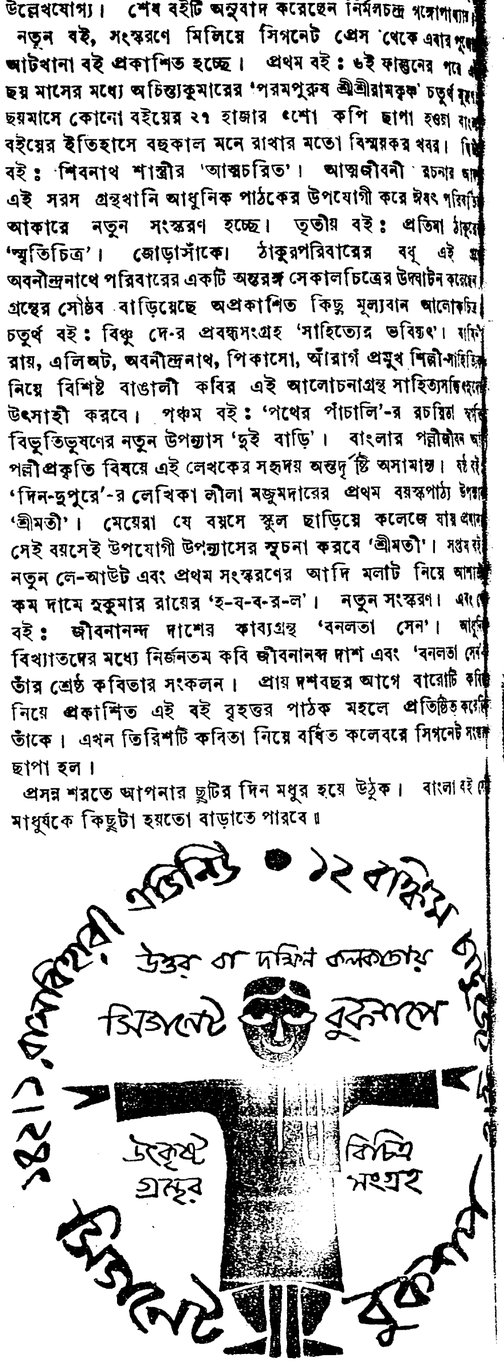





fN.3456



নিশ্চিত
নির্ভর -----

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

**ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্**

হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা



"দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আজ থেকে ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে সেই মহাপ্রাণ
**স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়**
কে, সি, আই, ই, ; কে, সি, ভি, ও,
এই কোম্পানী আপনাদের সেবার
জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন !
**আজও আমরা**
**আপনাদের সেবায় নিযুক্ত**

সেই মূর্ত্ত আনন্দের প্রতীক হ'ল
**"ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ানের"**
একখানি বীমাপত্র

প্রস্পেক্টাস্ কিম্বা এজেন্সীর জন্য
আজই পত্র লিখুন :—

ম্যানেজার,—

**ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান**
**লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ**
মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস, ৯, লালবাজার, কলিকাতা
শাখা অফিস ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই আছে।



## আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বিখ্যাত বই

রাজশেখর বসু প্রণীত
মহাভারত ১০৲
রামায়ণ ৬৷৷০
লঘু-গুরু ২৷৷০
চলন্তিকা ( অভিধান ) ৬৷৷০

পরশুরাম প্রণীত
গড্ডলিক ২৷৷০
কজ্জলী ২৷৷০
হনুমানের স্বপ্ন ২৷৷০
গল্পকল্প ৷৷০

সুবোধ ঘোষ প্রণীত
জতুগৃহ ৩৷৷০
ফসিল ২৷৷০ মণিকণিকা ১৷৷০
তিলাঞ্জলি ৪৲ গঙ্গোত্রি ৪৲

অন্নদাশঙ্কর রায় প্রণীত
অসমাপিকা ২৲ পথে-প্রবাসে ৩৲
রাঙা ধানের খৈ ২৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত
বৌ ২৸০ প্রাগৈতিহাসিক ২৷৷০
আদায়ের ইতিহাস ১৷৷০

শরৎচন্দ্রের
পথের দাবী ৬৲

সত্যেন্দ্রনাথের
কাব্য-সঞ্চয়ন ৫৲ হসন্তিকা ১৷৷০
শিশুকবিতা ১৸০

বিশু মুখোপাধ্যায় লিখিত
ছাই ৪৲
বিখ্যাত বিচার কাহিনী ২৷৷০

**এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ**
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

## পূজা-পার্বণ

**শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি**

কাগজের মলাট ॥ তিন টাকা

বোর্ড-বাঁধাই ॥ চার টাকা

প্রাচীন পট ও মূর্তি-চিত্রে সমৃদ্ধ

শারদোৎসবের শুভদিবস সমাগতপ্রায়। কিন্তু গ্রাম নিরানন্দ, দেশ অবসন্ন। শূন্যোদরে, ছিন্নবসনে, উৎকণ্ঠিত চিত্তে উৎসব হয় না।— তবু দেশময় উৎসবের আয়োজন হইবে। দুর্গোৎসব করি সত্য, কিন্তু ইহার উৎপত্তি ও স্বরূপ অনুধাবন করি না। এই পূজার সহিত বহু প্রাচীন স্মৃতি জড়িত। মনীষী গ্রন্থকার সেই স্মৃতি, উৎসবের উৎপত্তি ও স্বরূপ, এই গ্রন্থে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। —গ্রন্থের প্রথমাংশে দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, সরস্বতী পূজা ও 'বার মাসে তের পার্বণ' বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন।

## হিউএনচাঙ

**সত্যেন্দ্রকুমার বসু**

কাগজের মলাট ॥ আড়াই টাকা

বোর্ড-বাঁধাই ॥ তিন টাকা

বহু চিত্রে শোভিত

তথাগত বুদ্ধের জন্মভূমি দর্শনের বাসনায়, বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুসন্ধানে বৌদ্ধলিপি হিউএনচাঙ ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসিয়া ষোলোবৎসর কাল ভারত-পরিক্রমার পর যে-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতবর্ষের সমসাময়িক ইতিহাস বিধৃত হইয়া আছে।—বর্তমান গ্রন্থে লেখক, সাধারণের পাঠোপযোগী করিয়া হিউএনচাঙের ভ্রমণকাহিনী ও তাঁহার দৃষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রীয় ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন।

## নেহরু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

**শ্রীপ্রমথনাথ বিশী**

বোর্ড-বাঁধাই ॥ আড়াই টাকা

চিত্রসূচী

অশ্বপৃষ্ঠে জওহরলাল

জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথ

জওহরলাল ও গান্ধী

'নেহেরুর জীবনী এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই···প্রকৃত জীবনীলেখককে দেখাইতে হইবে কোন্ সামান্য লক্ষণের বলে বহির্জগতের চোখে তিনি ভারতবর্ষের প্রতীক হইয়া উঠিয়াছেন। সে ইতিহাস রচিত হইলে দেখা যাইবে যে ব্যক্তি-নেহরু চেয়ে, কর্মী-নেহরুর চেয়ে, রাজনীতিক-নেহরুর চেয়ে নেহরুর ব্যক্তিত্ব অনে মহৎ— অনেক চিত্তাকর্ষক তো বটেই।···কর্মী ও রাজনীতিক নেহরু অর্থগ্রন্থ এই গ্রন্থে লেখক নেহরুর ব্যক্তিরূপ-বিকাশের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

"যাঁহারা নেহরুর অতিভক্ত, আর যাঁহারা বিনা যুক্তিতেই নেহরুকে উড়াইয়া দেন, এই দুই দলের লোকেরাই এই বইখানি পড়িলে লুপ্তদৃষ্টি ফিরিয়া পাইবেন।"—যুগান্তর

"সাহিত্যব্যাপারে প্রমথনাথের মর্মভেদী দৃষ্টি অতি অল্প আয়াসে সাহিত্যের আসল সত্তা প্রকাশে সক্ষম হইয়াছে, রাজনীতিকের ক্ষেত্রেও সেই যে সমান পটু, এই সুলিখিত গ্রন্থখানি তাহার প্রমাণ।"—শনিবারের চিঠি

## বাংলার লেখক

প্রথম খণ্ড

**শ্রীপ্রমথনাথ বিশী**

বোর্ড-বাধাই ॥ চার টাকা

আলোচিত লেখকগণের চিত্রে শোভিত

বাঙালীর আত্মোপলব্ধির প্রধান উপায় সাহিত্য; যে বাঙালী জাতি ও বাঙ্গ সংস্কৃতি লইয়া আমাদের গৌরব, প্রীতি ও বেদনাবোধ তাহা অনেকাংশে বাঙালী সাহিত্যিকদেরই সৃষ্টি। ইহাদের অনেকের সৃষ্টি আজ অমনোযো প্রদোষচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে— লেখক সেইসব সাহিত্যকীর্তির পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। বাংলার মনীষার প্রতিনিধি এই কয়জনের মনোজীবনী বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত— শিবনাথ শাস্ত্রী, হর শাস্ত্রী, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, রমেশচন্দ্র দত্ত, বলেন্দ্র ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতী ● ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭





ডাক্তারবাবু, কি করে আমি ভালো বার্লি চিনবো?

সবল শস্য ভালো হলেই যে বার্লি ভালো হবে তা নয়। এ জন্য চাই ভালো পেষাই। আমি সব সময় 'পিউরিটি' বার্লির ব্যবস্থা দিয়ে থাকি। আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতা।




APBX 9-BEN

পিউরিটি বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা



সুন্দর কেশই
আপনার
মস্তকের
শোভা

ব্যাঙ্গুরাহিটিন
হেয়ার অয়েল

কেশের অকাল পতন দূর করে; কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। সুস্নিগ্ধ এবং গন্ধ সম্পদে অনুপম।




শারদীয় স্মারক হোক

# প্রেম ও প্রেম

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দাম—এক টাকা


প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড



রূপ চর্চ্চার
আধুনিক প্রণালী

সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালকেমিকোর প্রসাধন সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।




অমৃত চন্দন সাবান
রেণুকা পাউডার
লাবনি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল

ক্লিনিকার সার্ভে
ওয়ার্ল্ড ক্লিনিক
দেখিয়া লইবেন

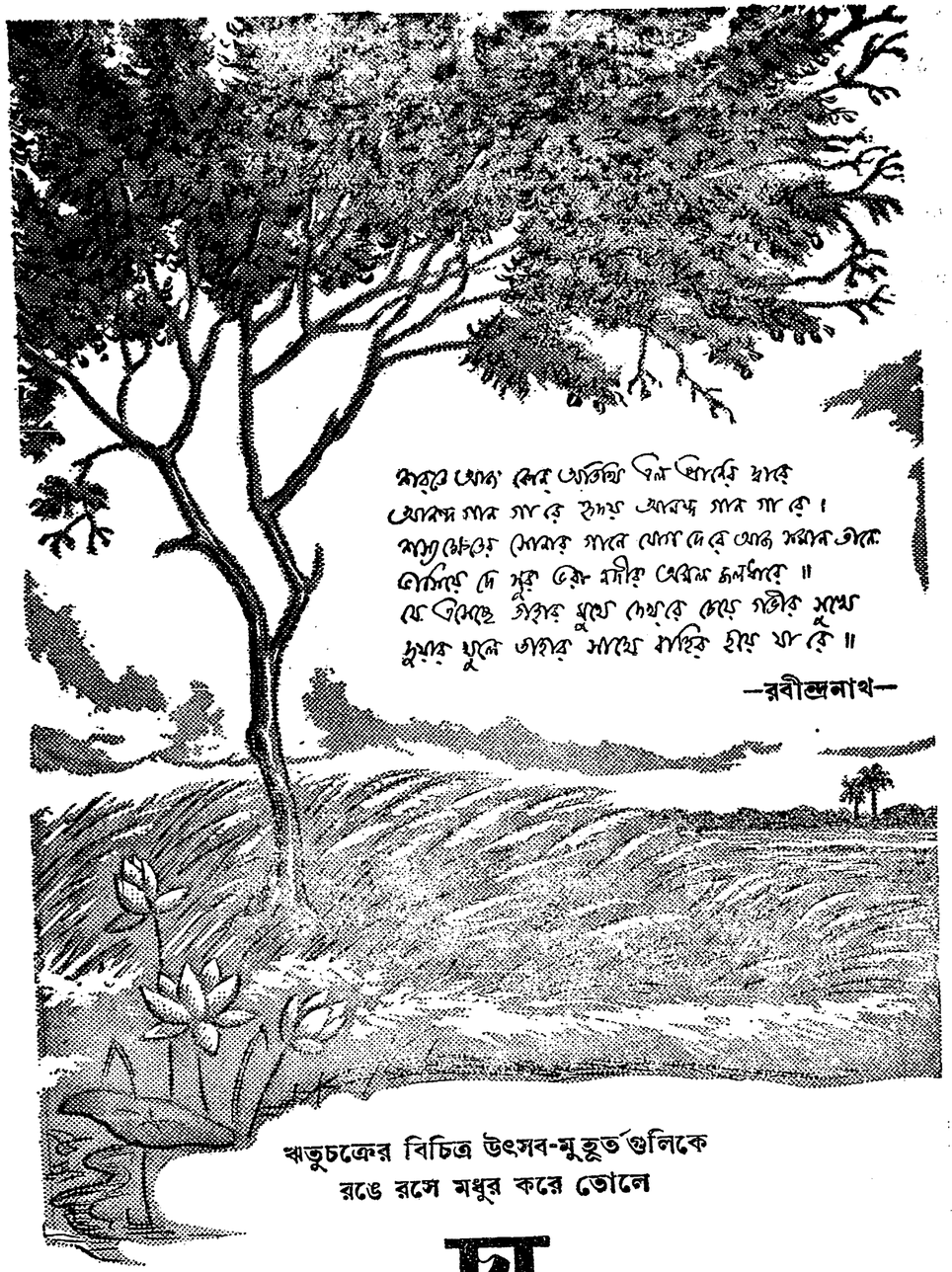
ভারতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা রে হৃদয় আনন্দ গান গা রে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে যোগ দে রে আজ সমান তানে
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে ॥
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে ॥

—রবীন্দ্রনাথ—

ঋতুচক্রের বিচিত্র উৎসব-মুহূর্তগুলিকে
রঙে রসে মধুর করে তোলে

# চা

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB-56

# পূর্ব্বাশা

"তদেবম পার্থিবম পদ্মম্ চতুষ্পত্রম ময়োদিতম।
ভদ্রাশ্ব-ভারতাদ্যানি পত্রাণ্যস্য চতুর্দিশম ॥" ( মার্কণ্ডেয় পুরাণ )

কার লীলাবৃত ইলাবৃত ছিলো বলো না ভারতবর্ষ—
কার বর্ত্তের ব্রত নিয়ে কোন নেয়ে হয়েছিল ব্রাত্য—
কোন্ বীর নমশূদ্রের রোদে রথ রব তোলে আর্ত্ত
কোন্ দশরথ-ভরত-চন্দ্র-বংশে আছে মাহাত্ম্য
কোন্ ভার্গব সময়ের ভাগে হোরা আনে অহোরাত্র ?
মহা আনন্দ পূর্ব্ব-নন্দ সূর্য্য বন্দে হর্ষ !

ময়-দৈত্যের পৃথ্বীপুরীর তুমি কি প্রথম পদ্ম
আদি পত্থর, প্রথম পাত্র, প্রথম পত্র, পুত্র ?
ভদ্রাশ্বের ভাদ্র-ময়ূরে, কৃষ্ণে ভদ্র সূত্র
কোথায়, শুধুই অশ্বত্থামা অগ্র অগ্নিহোত্র।
তমালিকা-সমতট-অন্নম অন্নপূর্ণা কুত্র ?
অগ্রহায়ণে অশ্বত্থের ছায়ায় কেন বা রুদ্র—
বল্লালষেন্ সপ্ত অশ্মে কি লেখে আখরে, পদ্য ?

পূর্ব্বভাদ্রপদ-তারকায় পরাশর চায় পূর্ব্বা
চায় ঈশাণের মহিষ্মতীকে চায় জলপ্রভাদীপ্তি
চুলের আঁচল রাত্রির মতো দেয় যে বিছায়ে তৃপ্তি
চোখের তমসা মাখায়ে মনকে করে দেয় তামলিপ্তি
দ্বীপময়ী দিবা আবার প্রভাতে সুপ্তির শেষে দৃপ্তি।
আশীবিষ নাশে আশীষে কালিকা শিরে দেয় ধান-দূর্ব্বা।
ব্রহ্মাণী আনে অরণি-বর্ণা ঊষসী-উপমা ঊর্ব্বা।

"কালীন্ চৈবপুরাকন্যান্ জলপ্রভবসন্ ভবাম্।
জগাম যমুনাতীরে জাতরাগঃ পরাশরঃ ॥ ( অশ্বঘোষ )

# ভাদ্র

১৩৫৯

"ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম
ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভিঃ"

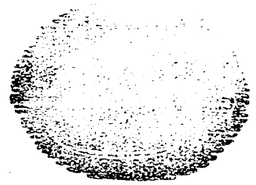

পূর্ব্বাশার গ্রন্থার্ঘ্য ঃ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর—২৲**

অচিন্ত্যকুমারের
**নীল আকাশ—১৷৷০**

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা—১৷৷০**

সুবোধ ঘোষের ঃ
**পরশুরামের কুঠার—২৲** **শুক্লাভিসার—২।০**

নরেন্দ্র মিত্রের
**পতাকা—২৲**

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা—১৷৷০**

ওয়ালিউল্লাহের
**নয়নচারা—১৷৷০**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল—১।০,** **নতুন দিনের কাহিনী—২৲** **ঋণ—১৷৷০**

মনিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস—২৲**

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক—৩৲**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা ১ম ভাগ—৪৲, ২য় ভাগ—৪৲**

**পূর্ব্বাশা**

পঞ্চদশ বর্ষ
ভাদ্র — ১৩৫৯

# ভুল চিন্তার মাশুল

**অন্নদাশঙ্কর রায়**

সম্প্রতি একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাস প্রসঙ্গে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বার বার দু'বার বললেন, "ভারতীয়, তার মানে হিন্দু," "হিন্দু, তার মানে ভারতীয়।"

হিন্দু কথাটির ব্যবহার তিনি প্রচলিত অর্থে করেছিলেন। মুসলমান খ্রীস্টানকে বাদ দিয়ে। সুতরাং "হিন্দু, তার মানে ভারতীয়," "ভারতীয়, তার মানে হিন্দু" বার বার দু'বার এই উক্তি শুনে আমার মনে ধাঁধা লাগল। আমি ছিলুম সভাপতির আসনে। সভাপতিকে কিছু বলতে হয় বলে আমাকে কিছু বলতে হলো। আমি বললুম, "যে ভারতীয় সে হিন্দু, কোনো কোনো স্থলে এ ব্যবহার শুদ্ধ। কিন্তু সব সময় তা নয়। পার্থক্য আছে।"

অধ্যাপক অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হলেন। প্রশ্ন করলেন, "প্রাচীন ভারতেও ?"

আমি উত্তর দিলুম, "হাঁ, প্রাচীন ভারতেও। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে আর্যরা যখন ভারতে আসেন তার আগেই বেদ, অন্তত বেদের কতক অংশ, রচনা করা হয়ে গেছল। বেদ হিন্দু শাস্ত্র, কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থ কিনা সে বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে।"

তার পর আমাকে বাধ্য হয়ে এ কথাও বলতে হলো, "চিন্তায় যদি কোনো ভুল থাকে তার ফলে কর্মেও ভুল ঘটে। দেশবিভাগের মূলে রয়েছে এই ধরণের অশুদ্ধ চিন্তা। যারা হিন্দু তারাই যদি হয় ভারতীয়; তবে যারা হিন্দু নয় তারা অভারতীয়। তারা যদি অভারতীয় হয়ে থাকে তবে তারা ভারত রাষ্ট্রের বাইরে আলাদা একটা রাষ্ট্র দাবী করবেই, পাবেও। করেছে এবং পেয়েছে। কী ভয়ানক মাশুল দিতে হয়েছে এর জন্যে !"

এ কথাও আমাকে বলতে হলো, "কিছু কাল থেকে লক্ষ করে আসছি ভারত ইতিহাসের কোন তারিখে ভারত পরাধীন হলো এ নিয়ে দুইদলের দুই মত। এক দল বলেন, সিরাজউদ্দৌলার পর থেকে পরাধীনতার আরম্ভ। আরেক দল বলেন, পৃথ্বীরাজের পর থেকে

পরাধীনতা শুরু। গোটা মুসলিম আমলটাই পরাধীনতার যুগ। এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের ষাট বছরব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম কেবল ইংরেজের হাত থেকে নয়, মুসলমানের হাত থেকেও স্বাধীনতা পেতে। তা হলে মুসলমানকে ডাকি কেন সংগ্রামে যোগ দিতে, ডাকলেও কেনই বা সে যোগ দেবে? যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁদের বলেছি পলাশী থেকেই পরাধীনতার সূত্রপাত। অথচ নিজেরা বলাবলি করে আসছি পৃথ্বীরাজের সময় থেকে পতনের সূচনা। শুনলে তাঁদের মনে কষ্ট হবে না?"

এর পরে আরো বিশদ করতে হলো। হিন্দু নামক একটি সমাজ বা সম্প্রদায় ও ভারত নামক একটি দেশ বা নেশন এক জিনিস নয়। পলাশীর পূর্বে ভারত এক দিনের জন্যেও পরাধীন হয়নি। অন্য কোনো বিদেশী রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হরণ করেনি। পৃথিবীর অপরাপর রাষ্ট্র তাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলেই গণ্য করে এসেছে। এর ব্যত্যয় ঘটে ইংরেজ আমলে। সুতরাং ভারতের পরাধীনতা আটশো বছরের নয়, দু'শো বছরের। ইতিমধ্যে যারা ভারতে রাজত্ব করেছে তারা অহিন্দু হতে পারে, কিন্তু অভারতীয় নয়। হিন্দুর হয়তো খুব দুর্দিন গেছে, কিন্তু ভারতের কী ক্ষতি হয়েছে? তার ধনসম্পদ বিদেশে চলে যায়নি। সে দরিদ্র হয়নি। বাংলা প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বহু সাধু-সন্তের আবির্ভাব হয়েছে। পৃথিবীর লোক ভারতকে শ্রদ্ধা করে এসেছে। পলাশীর যুদ্ধেই ভারতের প্রথম পরাজয়। তার পূর্বের যে পরাজয় তা ভারতের নয়।

সভাভঙ্গের পরে ঐতিহাসিক আমাকে আড়ালে বললেন, "হাঁ, এইখানেই আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ। দিল্লীর সিংহাসনে একটিও হিন্দুকে বসতে দেওয়া হয়নি। একটিও নাম করবার মতো মন্দির তৈরি হয়নি। শত শত বছর ধরে এই চলে এসেছে।"

কয়েক সপ্তাহ পরে আর একজন অধ্যাপক বন্ধুর সঙ্গে এই নিয়ে আমার আলোচনা হয়। তিনি বলেন, "ভারতের ইতিহাসে ১৭৩৯ সাল একটি স্মরণীয় তারিখ। যেমন স্মরণীয় ১৯৪৭ সাল। সেবার আলাদা হয়ে গেল আফগানিস্তান। এবার আলাদা হয়ে যায় পাকিস্তান। দু'শো বছর আগে সকলেই জানত আফগানিস্তানও ভারতের অঙ্গ। ভারতের এক অঙ্গের লোক যদি সারা দেশটাই অধিকার করে তা হলে কি সেটা বিদেশী কর্তৃক ভারত জয় বলে গণ্য হবে? অথচ এই ভুল ধারণাটা জাগিয়ে দিয়ে গেছে ইংরেজ ঐতিহাসিকের দল। আমাদের নিজেদের ঐতিহাসিকরাও সেই ভুল ধারণাটা জাগিয়ে রেখেছেন। পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বৈদেশিক আক্রমণ সূচনা করে না। গজনীর মাহমুদও বিদেশী আক্রমণকারী ছিলেন না। তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন। হিন্দুরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে লড়েছে।"

যেটা ইন্টারপ্রোভিন্সিয়াল সেটাকে ইন্টারন্যাশনাল বলে ভুল করা হচ্ছে দেখে আমার বন্ধু



আক্ষেপ করলেন। এক প্রদেশের সঙ্গে আরেক প্রদেশের যুদ্ধ, এক প্রদেশ কর্তৃক সারা দেশ অধিকার, এসব আমাদের ইতিহাসে অসংখ্যবার ঘটেছে। কেউ কোনো দিন একে গুরুত্ব দেয়নি। নতুনের মধ্যে হয়েছে এই, কাবুলের সিংহাসনে হিন্দুর জায়গায় মুসলমান বসেছে। সেও বিদেশী মুসলমান নয়। তার পর সে রাজ্য বিস্তার করতে করতে দিল্লীর সিংহাসন নিয়েছে। কাবুল প্রদেশের লোক আগে হিন্দু ছিল। ধর্মান্তর গ্রহণ করে তারা অহিন্দু হয়েছে বলে কি অভারতীয় হয়েছে বলতে হবে? না, ১৭৩৯ সালের আগে ও-কথা বলা চলে না। তা হলে দাঁড়ায় এই যে ভারতের রাজধানী ভারতের একাংশের লোক অধিকার করেছে। তাদের ধর্ম ভিন্ন বলে দেশ ভিন্ন নয়, অন্তত তখনকার দিনে তো ছিল না! তারা যদি বৌদ্ধ হয়ে থাকত তা হলে কি তাদের দিল্লীজয়কে কেউ ভারতের স্বাধীনতাহরণ বলত?

নাগা পাহাড়ের লোক কিছু দিন থেকে আলাদা একটা রাষ্ট্র দাবী করছে। এক দিন হয়তো শুনতো পাবেন তারা কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষা নিয়ে নবীন বলে বলীয়ান হয়ে গোটা আসামটাই দখল করে ফেলেছে। তারপর হয়তো শুনবেন কলকাতার কমরেডরা তাদের ডেকে এনেছেন রাইটার্স বিল্ডিং থেকে কংগ্রেস কর্তাদের সরাতে। দমদমের যুদ্ধে তারা লেফটেনেন্ট কর্নেল ঘোষ মৌলিককে পরাস্ত করে লালবাজার থেকে ঘোষ চৌধুরীকে হটিয়ে চৌরঙ্গীর কংগ্রেস অফিস থেকে অতুল্য ঘোষকে বন্দী করে কলমা পড়িয়ে মনুমেন্টের চূড়ায় লাল পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। তখন কি সমসাময়িক ঐতিহাসিকরা কেউ বলবেন, দেশ আবার পরাধীন হলো দেখছি?

না, দেশবাসীর কাছে দেশবাসীর বশ্যতাকে কেউ পরাধীনতা বলে না। পরাধীনতা হচ্ছে এক দেশের কাছে আরেক দেশের বশ্যতা বা এক নেশনের কাছে আরেক নেশনের বশ্যতা। যেমন ইংলণ্ড বা ইংরেজের কাছে। মুসলমান আমলে কোন দেশের অধীন হয়েছিল ভারত? কোন নেশনের অধীন? বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় যারা চাকার উপরে বসেছিল আজ তারা চাকার নীচে। লাল রশিয়ানদের থেকে ভিন্ন গোষ্ঠীর বলে শাদা রাশিয়ান নামে তাদের পরিচয়। তাদের হাতে ক্ষমতা নেই বলে কি তারা পরাধীন? দেশ যদি স্বাধীন দেশ বলে গণ্য হয় তা হলে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই স্বাধীন, হলোই বা সে নিপীড়িত নিগ্রো বা উৎপীড়িত ইহুদী। হিন্দুদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল বলে ভারত হয়ে গেল পরাধীন এটা ইতিহাসের অপব্যাখ্যা। ভারত যেমন স্বাধীন ছিল তেমনি স্বাধীন রয়ে গেল পৃথ্বীরাজের পরাভবের পরেও। পলাশী পর্যন্ত। পলাশীর পরেও আইনের চোখে সে স্বাধীন থাকে দীর্ঘকাল। আইন অনুসারে পরাধীন হয় সিপাহী বিদ্রোহের পরে বাদশাকে যখন দিল্লী থেকে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, সিংহাসনচ্যুত করা হয়। মহারানী

যখন রাজ্যভার নেন। সেই দিনটির আগে আমরা কেউ কোনো দিন পরাধীন হইনি, কারণ আমাদের দেশ পরাধীন হয়নি। হবার মধ্যে হয়েছে বার বার শাসক পরিবর্তন, বিভিন্ন তাদের ধর্ম। কিন্তু কেউ তাঁরা বিদেশী ছিলেন না। এমন কি বাবরকেও ঠিক বিদেশী বলা চলে না। যদি কাবুলকে ভারতের প্রদেশ বলে মনে রাখি। তিনি ভারতের বাইরে থেকে ভারত শাসন করেন নি। মহারানীর মতো। বহির্ভারতের কাছ ভারতের স্বার্থ বলি দেননি। ব্রিটিশ শাসনের মতো। আর যদি বিদেশী হয়েই থাকেন তাঁরা তবে তা ক' দিনের জন্যে! এক পুরুষ যেতে না যেতে বিয়ে থা করে এ দেশী বনে যান। ইংলণ্ডেও এ রকম কত বার হয়েছে।

ধর্ম আমাদের ইতিহাসবোধে যে জটিলতা সৃষ্টি করেছে ব্রিটিশ যুগের পরাধীনতা তাকে জটিলতর করেছে। এখন স্বাধীনতার পাঁচ বছর পরেও আমরা চিন্তার প্যাঁচ থেকে মুক্ত হতে শিখিনি। ভুল চিন্তা থেকে আসে ভুল কাজ। ভুল কাজ থেকে নানা বিপর্যয়। মাশুল দিতে হয় লক্ষ লক্ষ অভাগাকে। গত পাঁচ দশ বছরে যেসব দুর্ঘটনা ঘটেছে তার দায়িত্ব কেবল রাজনীতিকদের নয়, বুদ্ধিজীবীদেরও। ভুল করি আমরা, মাশুল দেয় ওরা।

ঈরাণী 'গাথা—অহুনভৈতি'

প্রথম গাথা—যচন

( এক-উক-অ্যামিবা-বক-ক্রৌঞ্চদ্বীপ-বাংলা )

'মজদ'-রজের চলৎ-শক্তি, প্রার্থী ঊর্দ্ধ হস্তে
কোন্ অর্ঘ্যের গাথার দর্পে বলি তাদের নমস্তে
সংস্কৃতী যারা অজেয় 'অষে'র অনুগ্রহের দান
'বোহুমনো' দ্বারা মাহাত্ম্যে যারা অশেষ পুণ্যবান
'গেয়ুস উর্ব' গোমাতার সন্তান ?

# মোহেঞ্জোদরোর ব্রাহ্মীলিপি

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

স্যর জন মার্শ্যাল তাঁর 'মোহেঞ্জোদরো-এণ্ড-দি ইণ্ডাস সিভিলিজেশন' গ্রন্থ সম্পাদনায় তৃতীয় খণ্ডের ৯০ পৃষ্ঠায় সর্ব্বপ্রথম যে ব্রাহ্মী-লিপিটি দিয়েছেন তার পাঠ এখানে দেওয়া হ'ল। বলাবাহুল্য যে, জম্বুদ্বীপের—সমগ্র এশিয়া খণ্ডের—বাক্‌ধ্বনি এই অক্ষর-মালায় বিধৃত। পংক্তিটি মালার মতোই দুলছে। দেখুন :

### BRĀHMĪ INSCRIPTIONS

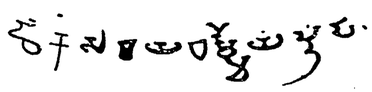

তথাকথিত 'অশোক-অনুশাসনে'র লিপির নমুনায় কয়েকটি লিপির আকৃতি মিলিয়ে ধ্বনি অনুসরণ করলে এই লিপিটির পাঠ কয়েক রকম হয়। 'বাংলা-ব্রাহ্মী' লিপির মিশ্রণে এই লিপি তৈরী। প্রথম-পাঠ এই :

ঞ্চই। (ং)। নৃক। ন্স। ব্‌ষ। ন্ত। অধ্‌। অৎংম্‌হ। ব্‌থ। ন্দ্‌অজ্‌। ঢ়া (ং)॥
=ঞ্চচই। ন। নক। নস। বষ। নত। অধ। অতন মহ। বথ। নদঅজ। ঢ়ান॥
ঞ্চীন ন কংস বষনত অধাৎ নহ্মবৎ নদজটাং ( নদজরাং )॥ ( সংস্কৃত ধরণ )
নয় চিনন কংস বসন্ত বংশত অধতন ( বসনত অধতন ) হ্মভন্দাজঢ়স॥
( প্রাচীন বাংলা ও জেন্দ='অজীমন্দস' )।
ঞ্চচ'ইন্নকনস (ব)উষ্ণতাধ অতুহ্ম বত্মুদজঢ়ন। ( প্রাচ্য বৈদিক ভাষা। )

ঈরাণীধ্বনি খুব বেশি স্পষ্ট হয় চারধ্বনির অক্ষরটির ( অৎংমহ ) শেষ বর্ণটিকে 'হ' না ধরে 'শ' ধরলে। বিন্দুচিহ্নের কয়েকটিকে 'র্' বা রেফ ধরলে ত কথাই নেই। উল্লেখিত অক্ষরের 'মশ'-ধ্বনিটি—যা থেকে 'মশক' হয়েছে—এসে চামড়া প্রসঙ্গ তুলে দেয়। 'জিন' ( ঘোড়ার লাগাম, জৈন-পিতা, দৈত্য ) কথাটির জন্ম ঈরাণে—ভারতবর্ষে তা 'অজিন' হয়ে কৃষ্ণসারমৃগচর্ম্ম, পিতৃতুল্য পৈতা হয়ে ব্রাহ্মণদের কাঁধে চড়ে বেড়াত। জেন্দে যা 'হাঁ' বেদে তা 'না' হয়েছে। কুলীন ব্রাহ্মণের আবির্ভাব 'অজীন' নিয়ে ঈরাণ থেকে—তার আগে ছিল ব্রহ্মন—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপুত্রের ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়, শ্রোত্রিয় বহ+মন, বহ্মন, বারুণী, ঋক্‌বেদী পুরোহিত। জরাগ্রস্তদের আবির্ভাব অথর্ব্ববেদের যাগযজ্ঞ নিয়ে। এই অজিন বা কৃষ্ণ+ষাঁড়+মৃগ যে সাঁচি-চৈত্য গাত্রের বা ভর্হাটের ( Bharhut—সুঙ্গ-যুগ—হঠাৎ এই ব্রাহ্মণের আবির্ভাব—ব্রাহ্মণ-সেনাপতির আবির্ভাব, বেসনগরের 'হেলিওদরস'—হলধর-এর আবির্ভাবে। তিনি মৌর্য্য ধ্বংস ক'রে হল-স্কন্ধে বলরাম—দ্বিতীয় 'পেরশরাম।) পদকের বটগাছে 'শাখামৃগ',

'উদবিড়াল', মোহেঞ্জোদরোর 'হরিণশৃঙ্গী ষাঁড়' বা 'অশ্ব-শৃঙ্গ' ( ঋষ্যশৃঙ্গ ) এবং অজন্তার 'বানর দম্পতী' তাতে সন্দেহ করলে সত্যগোগন রাখা যায় সত্যি কিন্তু কালাশোকের বৃহৎ রাষ্ট্র যখন যুগ্মবর্হি-চিহ্ন নিয়ে এখনও মুছে যায়নি এবং ভর্হাট পদক যখন ভারদ্বাজ 'বৃদ্ধ'জন্মকাহিনীতে ভরাট তখন কি মনে হয়না ঈরাণী 'যচন' ছিল যাচঞারই জিনিষ? কালিদাসের 'মেঘ-দূতে'র পরামর্শে মোঘা-মঘা-মাঘ থেকে যাচ্ঞাটাকেই ঈরাণ প্রশস্ত মনে করেছিল। 'বকত্রিয়া' ( Bactria )-রাজ কয়রাস ( Cyrus )এর পুত্র প্সএউদো-স্মএর্দিস-কে ( Pseudo-Smerdis ) কামবৃক্ষ—'কম্বুগ্রীঅ'—কম্বুগ্রীব ( Cambyses ) হত্যা করেন! সেখানে তখন মগি ( Magi )রা গোমেটেস্ ( Gometes ) নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজা করেন। মগি-পুরোহিতের পুত্তলিকাই জরথুষ্ট। দরায়ুস গোমেটেস্‌কে 'মোগাস্' ( Mogus ) নামে অভিহিত করতেন। ইনি যে 'শ্রবণ বেলগোল'র 'গোমট রয়'—'মহাবীর' পাষাণে মহাস্থবির হয়ে আছেন ভারত-ইতিহাস তা স্মরণে রেখেছে। কিন্তু যাচ্ঞা করল ঈরাণ সরাসরি কার কাছে? তুরাণের কাছে। তাই মোঙল-চীনকে আমরা চিনতে পারছি প্রাচীন চীন বা প্রাক্‌চীন হিসেবে। 'অশ্বপতি' তুরাণীরা শুধু কেকয় নয় হৈহয়—হয় বা অশ্ব-বাহন। তুরাণীরা সারাসেন—মথুরার হৈহয়, 'সুরসেনস'। তক্ষশীলায়, পুষ্কলাবতী-পুষ্করাবতীতে তাই জনমেজয়-যাজ্ঞিক 'তুরকাভশেয়' কখনো অশ্বমেধ-ভস্মের কখনো বা তক্ষক-ভস্মের পুরোহিত। পরিক্ষিৎ-পুত্র যে অহিযজ্ঞ করে বর্হিবা কেকা হতে চেয়েছিলেন সে-কথা বলা-ই বাহুল্য। 'বষনত অধাৎ' যে-দেশ তা ইস্রাইল: মোসেসের ( মহেশের ) গেনেসিস—জেনেসিস ( গণেশের জন্মাশীষ ) নিয়ে তা খৃঃ পূঃ ৪০০৪ বৎসরের। 'সঙ্গীত-রত্নাকর' বলেন শ্বেতদ্বীপীর ইষ্টদেবতা গণেশ। লিপিটির বয়েস তা-ই। 'প্টোলেমিশেহ'—ম্যাপেও দেখা যায় 'মিডিতরণীঅয়ন' সমুদ্রের ঈশাণ-কোণে 'তরুস' বা 'তরাস'রা অবস্থিত। এরা তুরস্ক। 'তুরকাভশেয়'-গোষ্ঠী। অক্ষস্ 'অক্সাস' আর 'জক্সরটেস' জক্ষরদেশ নদী যে-রেখায় গিরি-শির থেকে ( গ্রীস ধ্বনি লক্ষ্য করুন ) অরল-হ্রদে এসে মিশেছে তাতে একটি 'মানব-মানবী মস্তিষ্ক' চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। লম্ব-মস্তিষ্ক এই অর্দ্ধনারীশ্বরের করোটি মার্শ্যালের পুঁথির করোটি-মালার ৯ এবং ১৯-সংখ্যক চিত্রে দেখতে পাবেন। আর তার মূর্ত্তি পাবেন ৯৫-পৃষ্ঠার—২৬-২৭-সংখ্যক চিত্রে। যে-লিপি মস্তিষ্কে অঙ্কিত তাতে আপনারা চেদী-রাজকে চিনতে পারবেন। লেখা: "পণ্যেতৃপনচেকেহ ( চেদেশহ )"। নারীদেরই ( নারদের ) প্রথম দাড়ি হয় ( ১০০ পৃষ্ঠা )—সুমেরের নরপতিদের তাই দেখতে পাবেন ( ৯৯ পৃষ্ঠা )। একটিমাত্র মন্ত্র-যুক্ত হয়ে—'ম'-যুক্ত হয়ে পার্থিয়ার ঈশর থেকে পৃথক হয়ে গে'ল মীশর। মিশরের নোহ্‌তৃ-বংশীয় নাম 'কুশ'—সিংহকে তারা 'লবু' বলতেন। হিন্দুকুশের পাদদেশেই কুশদ্বীপ ছিল। তারও আগে 'ভারুকচ্ছে' ছিল লব-কুশের বসবাস।

এ-পাঠে ব্রাহ্মী-বর্ণ অনুসরণে বিন্দুকে অনুস্বার ধরা হয়েছে। একটু লক্ষ্য রাখলে ( মার্শ্যালের বইএ এ-প্রতিলিপিতে নয় ) দেখা যাবে—সবগুলো বিন্দু চিহ্ন নয়। প্রথমটিকে বাংলা র-ফলা দ্বিতীয়-তৃতীয়কে রেফ, তারপরেকারটিকে চন্দ্রবিন্দু, এবং শেষটিকে হস্ বা হল্ চিহ্ন ধরা যায়। পঞ্চচিহ্নে এরই নব-পাঠ যে কতো বিচিত্র হয় বলা যায় না। এখন 'শ' ( মহ-এর হ ) চিহ্নটিকে বিশুদ্ধ বাংলা 'উস্' ধরা হ'ল। ১টি বাংলা হরফ মেলাতে চাইলে একে 'ঠ' ধরে 'মঠ' ধ্বনি পাওয়া যায়। পঞ্চম ও অষ্টম বর্ণ ব্রাহ্মী অনুসরণে যথাক্রমে 'ঘ' এবং 'ঘো'।



ঞ্ । র্ণ্‌ক । স্স । ব্‌ষ । স্ত । অধ্ । অত্তমু । র্বথ । দঁঅজ । ঢ়হস ( রাহল ) ॥
নীরচ । রনক । নস । ব্‌ষ । নত (য) । অধ্+অত্‌ন্‌মউস । র্বথ (র্ঘো) । দাঁজ । ঢ়হস—(রাহল) ॥

এখানে চরক-চনক, পুরূরবা-বিক্রমকে নিয়ে প্রত্ন-উর্বশী, বাসবদত্তাকে নিয়ে উদয়ন, ভারদ্বাজ মৌর্য্য দশরথ রাহুল ঈরাণী 'যচনে'র 'উর্ম্মাজদহ' প্রভৃতি একপাল মানুষ সিন্ধু এলাকায় জোট বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। ঋকবেদের প্রথম মণ্ডলের ( ৩০।৯ ) ঋষি 'প্রত্নস্য ঔকসহ'কে—ইন্দ্রকে আহ্বান করছেন দেখা যায়। মুসা যে অত্তম্ উষা বা জলৌকা—পোকা তার আভাস ঋকবেদের বশিষ্ঠ ঋষির বরুণ মন্ত্রে ধ্বনিত। তাছাড়া অশোকের কাশ্মীরী-ছেলে (?) 'জলৌক'ত আছেই। মৌর্য্যরা যে সাক্য ছিল তা শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় জানেন। 'দি গ্রেট মেন অব ইণ্ডিয়া' পুস্তকে 'চন্দ্রগুপ্ত' প্রবন্ধে বৌদ্ধ ঐতিহ্যের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন: 'মোরিয়স' কথাটি 'মোর' বা 'ময়ূর' থেকে এসেছে। ( অশোক কেন ময়ূর-খাদক নাম কিন্‌ল? বরং ময়ূর পালক তিনি। ময়ূরপুচ্ছধারী কৃষ্ণ-মাত্র নন তিনি, ময়ূর মূর্ত্তি-ক্ষোদক )। 'বিদূধব'-নামক ( প্রসেনজিতের বেয়াইনী-ছেলে ) নিষ্ঠুর কোসল-রাজের আক্রমণে 'মোরিয়স' মূল "স'আক্যস" থেকে পৃথক হয়ে ( আত্মকলহে ) হিমালয়-সানুতে- ময়ূর-অধ্যুষিত ভূমিতে গুপ্ত অবাস তৈরী করে। বোঝা যায় চন্দ্রবংশী ময়ূরী সাক্যরা ময়ূরের চন্দ্রক বপন ( চন্দ্রক+উপ্ত ) করে আর্য্য সূর্য্য-বংশ ( ইক্ষ্বাকু ) এবং মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত হল।

কাজেই এ-লিপিতে বুদ্ধ বংশের রাহুল-কে পাওয়া একটা মুস্কিলের ব্যাপার নয়। চাণক্যও অনায়াসে আসতে পারেন। অবশ্য ভারদ্বাজের দ্বিজত্ব রহস্য ইতিহাসে নেই। আছে 'অথর্ববেদীয়া প্রশ্নোপনিষদে'। বৌদ্ধ 'দীঘনিকায়' বলেন 'মোরিয়স' 'পিপ্‌ফলিবনে' থাকতেন। আর প্রশ্নোপনিষদ্ বলেন ব্রহ্মদর্শী 'ভগবন্ পিপ্পলাদ'-এর সমীপে পরংব্রহ্মঅন্বেষমানা ছয় কি নয় জন ব্যক্তি গেলেন। তাঁদের একজন সুকেশী 'ভারদ্বাজ'। ব্রহ্মজিজ্ঞাসাটা কামযজ্ঞের পরেকার অধ্যায়। বক্ষপঞ্জরে 'আদম' যেদিন 'হবা'-কে তৈরী করল বা রাশে যেদিন কৃষ্ণাঙ্গ থেকে রাধা তৈরী হ'ল—সেদিন থেকে পুরুষ নারীতে আত্মহারা। বেদের 'উর্ব্বশী পুরূরবার' কাহিনী বা ভাসের 'স্বপ্নবাসবদত্তার' বাসবদত্তা-উদয়ন-কাহিনী এই সাংঘাতিক, আত্মঘাতিক, স্ত্রৈণতার কাহিনী। ঈরাণের 'অহুনবইতি'র (অরুন্ধতী—বশিষ্ঠপত্নী) 'যচ্‌ন' প্রথম শ্লোকেই বলছে: কাম ইন্দ্রলোকে গেল—ইন্দ্রলোচন হল—তারপর 'এতিঅম গেয়ুস উর্বাহিচ নেশ্চিও অম্মেলিয়াস অনিমস্তিয়াম অনিম স্তুতা এ রেতোর।' সঙ্গীতপ্রিয়া উর্ব্বশীর সঙ্গে অনিয়ন্ত্রিত, অনিমেষ মিলন ঈরাণী-কামের ঠিক বাসবদত্তার সঙ্গীতশিক্ষক উদয়নেরই মতো ছিল। অবন্তীর পদ্মাবতীকে কৌশলে উদয়নের স্ত্রী করে দিয়ে বাসবদত্তা হয়ত ত্রাণ পেলেন কিন্তু সেই কমলবনে মত্তহস্তীর প্রবেশ যে কেমন তা ভারতীয় স্থপতিরা প্রস্তরে স্থাপন করে গেছেন—একপয়সা মূল্যের ডাকটিকিটের দিকে তাকালে আপনারাও তার ডাক শুনতে পাবেন। আরেকটি 'যচ্‌ন'-শ্লোকে উর্ব্বশীর সঙ্গে জরথুষ্টদেবের সম্পর্ক স্পষ্ট হয়েছে—তিনি কামাচারী স্বামী-স্ত্রীর সন্তান, যেমন ভরত-দৌষ্মন্ত্য, শান্তনব-ভীষ্ম বা চয়রস-পুত্র দরায়ুস। পরেকার পেহেলভি-লেখ ত স্পষ্টই বলছে: 'সাতন ( Satan ) দ্বারা সন্দেহে পড়েছি' ( এই 'সাতন' কি আভেস্তার 'দ্রুজ' অবাধ্যজ-সিংহলী দুতুগেমুনু-জ সাতবাহনেরা? দ্রুপদজ শতদ্রু? সতানীক পুত্র উদেন-উদয়ন?) এবং 'দিব'-র সঙ্গে তাকে একাত্ম

ভেবেছে। আচমন মন্ত্রে 'দ্রুপাদাদিব'—দেখুন। বিশ্বামিত্র ঋষির দেওয়া আচমন-মন্ত্র যে উর্ব্বশী-সহবাস-জাত হবে তাতে আর সন্দেহ থাকে কই? বিস্তপ-কবি 'বিস্তস্প-কবি' ত বিশ্বামিত্রই। এখন দেখা যাক ঈরাণে কস্মৈ দেবায় কে আহুতি দিচ্ছে:

"খশমইব্যা গেয়ুস উর্বা গেরেজদা কহ্মাই মা থরোজদ্বম কে মা তশঠ"।—অথবা

"স্রশমইজ গেয়ুস উর্বা গ্রজদা কহ্মাই মা থবিরজদ্বেম কে মা তশথ।"

দেখা যায়, গীতজ্ঞস্বামী অজা-ভক্ত হয় উদয়নে। বিশ্বামিত্র গায়ত্রী-উর্ব্বশী গ্রস্ত যেম্নি, তেম্নি পুরূরবা অপ্সরী-উর্ব্বশী-মত্ত। 'বচত্রিয়া'র কোন্ অজা-গায়কী-উর্বায় চয়রস (চড়শ—আমার প্রথম লিপি পাঠে নামটি আছে) আত্মবিসর্জ্জন করেছিল কে বলবে—যার ফলে মঘা-নক্ষত্রের জন্ম! যার ফলে ত্রিগুণা কবি 'মাঘ'ও এই মঘা-দোষ কাটিয়ে উঠতে পারলেন না, কালিদাসই শ্রেষ্ঠ হয়ে রইলেন। মা শঠ কি পুত্র শঠ বলা যায় না। তবে দুই মা নিয়ে যে মামা-টির ও মাসীর জন্ম হ'ল, দুই অক্ষরের, দুই সরোজের বা স্থবিরজদ্বয়ের, তিনি জরথুষ্ট হয়ে কিছু উগ্র-বিধান দিয়েছিলেন। তেম্নি সর্ব্বদমন ভরত ভাগবতে পুত্রদমনে, বাইবেলের সন্ত-পল তেম্নি 'করীষ্টে' মদমত্ত করী-দমনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সন্ত-পল চতুর্চক্র দ্রষ্টা ছিলেন—সপ্তচক্র দ্রষ্টা হলে শপ্ত-পল হতেন—সয়তান হতেন। তা যখন হলেন না তখন 'রোমানে'র রমনী প্রিয়তাই চতুরালি করে চতুরাননে কীর্ত্তন করলেন। জরথুষ্টের 'অঞরোমৈন্যাস' এবং গত-শতকীয় বাংলার 'রমোন্যাস'-এর অসৎ আরণ্য-বৃত্তি আর কি! জৈন প্রথম তীর্থঙ্কর 'ঋষভ' ত, দেখা যায়, রমণীয় সব রীতিই জানতেন—যদিও 'পলে'র মতো রোমান-বিশারদ তিনি ছিলেন না। তবে ঠিক পলের ভাষাই তিনি পূর্ব্বসূরীর ভাষায় উচ্চারণ করে গেছেন। জৈন প্রথম তীর্থঙ্কর বলছেন: "যে প্রজ্ঞানী রমনীকে পঙ্ক বলে জানেন তাঁর রমনী-শঙ্কা নেই—তিনি 'উত্তরা-ধ্যয়নে' (আত্মসন্ধিৎসা) ভ্রাম্যমান।" তাঁর সন্তানরা উত্তরা-পথযাত্রী হয়ে মৎসদেশে উত্তরা-সন্ধানে গেছেন। সন্ধানের পরিহাস দেখুন! ঋষভের এই ঋষিত্ব-প্রাপ্তি হয়েছিল মনে হয় উন্মত্ত গজ-লীলায় লিপ্ত হয়ে—'গজ-নীর'-ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে। গজনী নদীর নীরে মামা উদের ছায়া দেখে না স্বয়ং উদ হয়ে? সে দেখা কে দেখেছিলেন—তিনি, না কাসিপুত্র, না কালিদাস তা বলা কঠিন। তবে শ্মশ্রুমণ্ডিত গীতজ্ঞ সমুদ্রগুপ্তের কীর্ত্তি বর্ণনায় রঘুবংশে সেই দর্শন-চিত্র কালিদাস যে ভাবে রেখে গেছেন তাতে মনে হয় গজটি ছিল ঋষভের পূর্ব্বপুরুষ—নাম ছিল তার 'ঋকষভ'—তাকে 'ঋক্ষবৎ'-পর্ব্বত নাম দিয়ে রামায়ণ-মহাভারত পাহাড়ী-বংশ হিসেবে উপস্থিত করেছেন। কালিদাসও অবশ্য পাহাড়ী গন্ধটা দিতে চেয়েছেন কৌশলে, বলতে চেয়েছেন, 'বাবা তুমি আরণ্যক ভীল-সন্তান, পিতার মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ছাখো, ধনু নিয়ে রাম সেজে মঠ ধ্বংস করছেন চন্দ্রগুপ্ত, হরধনু ভঙ্গ করেছেন কিন্তু ল্যাঙট পরে আছেন, রামের এই বস্ত্রাভাব ছিল না। রামের মতো রঘু বংশের সন্তান হতে চাও, রচনা করে দিচ্ছি বংশ-গৌরব কাহিনী—, কিন্তু গজনীর কথাটা পাকে-চক্রে বলে নোব"—

.....সরিতো গজ উন্মমজ্জ॥

নিহশেষ ভিকষালিত ধাতুনাপি ভপ্রক্রিয়াম্ ঋকষভতস্ তটেষু।
নীলোর্দ্ধরেখা-শবলেন শম্সন দন্তদ্বয়েন অশ্মভিকুণ্ঠিতেন॥—রঘুবংশ।



এখানে গজ ছাড়াও বৃক-সদৃশ শবলের বা ষণ্ডের এবং অশ্বের উঁকিঝুঁকি আছে। গজের বপ্রক্রিয়া দন্তুর বৃকের বা ব্যাঘ্রের দংশন-শক্তির কাছে কিছুই না—অশ্ব ত কোন্ ছাড়! এখানকার ইতিহাসটা এই: গজ নিঃশক্তি, নর্ম্মদা-তটে অঙ্গমদ প্রক্ষালন করছে। বৃহৎ-শৃঙ্গী (মোহেঞ্জোদরোর) গুণ্ডা-মার্কা সাণ্ড-ষণ্ড শবলই তার এই সংযম ও শান্তশীলতা আনয়ন করেছে। তাছাড়া দংষ্ট্রারও ভয় আছে। গো-ব্যাঘ্রের [গোবাঘা=নেকড়ে=বৃক=হয়এন (Hyena)=মৃগাশ্ব] সঙ্গে হয়-গজের সমন্বয়ও হতে পারে। বৃক পণ্ডিত হলে শেয়াল-পণ্ডিত হয় আর গরু পুণ্যবতী হলে শবলা—কামধেনু। দেখা যায় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কামধেনু চুরি করতে পারেননি। চুরি যদি করে থাকেন তবে অরুন্ধতীকে। বিশ্বামিত্র যে বিস্তপ হ'ল তা ত আমাদের জানা আছে। ঈরাণে 'অহুনভৈতি' 'যচন' করছে। কাকে?—বিশ্বামিত্রকে? এ এলাকার সবাই নিঃসন্দেহে পাশবিক ছিলেন। তবে শেষটায় বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রে বোঝাপড়া হয়ে গেলে বশিষ্ঠ রাজপুত্র 'হুন'-দের নিয়ে অভৈ মন্ত্র-পড়ে তাঁদের 'জৈন রাজপুত' করে দিলেন। অর্ব্বুদ-আবু পর্ব্বতের কাহিনী তা-ই বলে। জৌন মানেও পৈতা। হুনরা অজিন ধারণ করে 'অহুন' হয়ে ভীতিপ্রদ নব-ক্ষত্রিয় হয়ে দাঁড়াল। ঈরাণী 'যচন' থেকে রাজপুত-জাতির এই ইতিহাস বশিষ্ঠ-অরুন্ধতী-বিশ্বামিত্রের কাহিনী জড়িয়ে উঠে আসে। ঈরাণী বিস্তস্প জরথুষ্ট্রকে নিজরাজ্যে ধর্ম্ম-প্রচার করতে অনুমতি দিলেন। বিস্তপ বিশ্বামিত্রের বাছ-বিচার না থাকারই কথা। হীনযানী হর্ষবর্দ্ধনও (বৈশ্য) তেম্নি ছিলেন। মহাযানী 'যবন-চ-বঙ'-কে তিনি নিজ-রাজ্যে ধর্ম্মপ্রচার করতে দিয়েছিলেন। বৈশ্য-বৈদ্য-জৈন, এই তৃতীয়দের আবির্ভাব সবসময়েই রাজন্য এবং পুরোহিতের সমাহারে।

'ঋকষভ'-কে তক্ষশীলা-অঞ্চলে আমি জবরদস্তি করে পাঠাচ্ছিনে—ঋক্‌বেদের ঋষি-সভা সে-অঞ্চলেই হত। হর্ষের রাজত্বের সময়ও সিন্ধুর এ-পারে ও-পারে ছিল 'উরস' এবং 'উদয়আন' (পৃঃ ৩৪-গ্রেট-ম্যান অব ইণ্ডিয়া)। যাকে আমরা 'গন্ধর' বা গন্ধর্ভদেশ বলি তার নামই 'উদয়আন'—ভারতের উত্তর-পশ্চিম কোণে, (উৎ-পক্ষিম কোণে—উৎপন-চীম জাত-চীন কোণে—মানে বায়ু কোণে অবস্থিত। 'উদান' তাই উন-পঞ্চ বায়ু (চতুর্থবায়ু)। উদযান-অক্সিজেন—অক্সাস-জাত বস্তু। এই নবোদিত রাজা যে উনপঞ্চাশ ('উন-পঞ্চ' কথাটাই বোধ হয় মূল) বায়ুতে ধাবিত হয়ে উদের পথ নেবেন—'উদয়ন' হবেন—মাছ খাবেন, ভাত (ওদন) খাবেন, যেম্নি নারদ সংহিতা অনুসারে 'ঋষভ' শাকদ্বীপে বসে মালকৌশের জন্ম দিয়েছিলেন তেম্নি উদারায় গান্ধার-রাগিনী গাইবেন, এবং পুষ্পক-রথ বা এরোপ্লেন চড়বেন, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? তাঁকে আর উরসের উর্ব্বশীকে স্মরণ করেই কালিদাসের 'বিক্রমোর্ব্বশী'-নাটক। কালিদাস ত বিমান-রথের অভিজ্ঞতায় অপূর্ব্ব। তবে নায়ক সেখানে দুষ্মন্ত, বিক্রমাদিত্য সমুদ্রগুপ্ত-চন্দ্রগুপ্ত। এঁদের এবং বাংলার সেনদের তথা যাদব-বংশের পাত্তা পাওয়া যায় দাক্ষিণাত্যের 'সেউনচন্দ্রে'র (শ্রেনচন্দ্র-শকুনচন্দ্র-সেগুনচন্দ্র=জগন্নাথ) দানপত্রে এবং ক্ষেমেন্দ্রের 'ব্রতখণ্ডে'। সেনগুপ্তরা ত বাংলায় খাঁটি বৈদ্য। তাঁদের ডবল-বৈদ্যও বলা যায়। দত্তরাও এই সঙ্গে আসেন। পল্লভী হর্ষবর্দ্ধনের মতো শক 'উসবদাত' উৎসব-দান করা ছাড়াও দত্ত ও বাসবদত্তাদের দান করেছিলেন। দত্তগুপ্তও সেই সূত্রে দ্বিজ বৈদ্য।

ফিলিপের হত্যার পর পুষ্কলাবতী-দুর্গের (পুষ্পলাবতী?—নেপালী 'পাল' ও পুষ্য ধ্বনির সমন্বয়?)

অধিনায়ক হিসেবে যে গ্রীক্-প্রতিনিধিটি ছিলেন তিনি জাতিতে থ্রেসীয় এবং নামে 'ইউদমাস'। তিনি 'উদ' দমন কি পত্তন করেছিলেন তার ঠিক-ঠিকানা কারো জানা নেই। তবে তখন য়ীহুদি-মাংস রক্ষার্থে তাঁকে অন্তত মৌর্য হতে হয়েছিল।

অশোক-মৌর্য্যকে প্রথম আমরা দেখতে পাই 'টাকশালের ময়োর' হিসেবে—তক্ষশীলার 'ময়ুর'-হিসেবে ( Mayor of Taxila )। Mayor বা 'ময়োর' কথাটি ইংরেজি নয়—এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Major বা Viceroy। কিন্তু এ-শব্দগুলোও ROI FAINE ANT—'রয় ফৈণীঅন্ত' কথাটির মর্ম্ম-ধর্ম্মবাহী ( অক্সফোর্ড অভিধান দেখুন )। ভারতচন্দ্র যে 'ফণাফণ ফণীফণ্রে'র গাজন শুনেছেন সেই ফণীন্দ্র ইনি—কুবের তাঁর ধনভাণ্ডারী। 'রয়'-কথাটি বৈদিক—তার মানে উভয়বিধ ঐশ্বর্য্য—পার্থিব এবং আত্মিক। রয়স=রজ। কথাটির উচ্চারণ ইংরেজিতে 'রয় ফাণাঅন্'—ফরাসীরা ফিনিসীয় বলে তাঁদের উচ্চারণ—'রোই ফিনিআঁ'। 'ময়োর' বা 'ময়ুর' কথাটি থেকে অশোক মৌর্য্য হলেন। হাতী-সিংহ-গোমাতা-জোড়াময়ুর-শুক, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম, এবং উর্ব্বশীর কল্কায় তৈরী হল তাঁর স্থাপত্য—কিন্তু তোরণের স্তম্ভশীর্ষ হ'ল ত্রিশূলাকার। ত্রিমূর্ত্তির প্রতীক। ত্রিৎসু-তুরস্ক-যীশুর ট্রিনিটি।

'মৌর্য্য-সাক্যে'র আত্মীয়তা সন্দেহাতীত, কিন্তু 'সক-সাক্যে'র সম্পর্কটা পুত্র-পিতার হয়েও অদ্যাবধি কোণঠাসা হয়ে অন্ধকারে পড়ে আছে। দয়া-পরবশ হয়ে অক্সফোর্ডীয় প্রভুরা 'শক-পল্লভ'-এর সম্পর্কটি স্বীকার করেছেন—আর পেহেলভী 'গণ্ডোফারনিস্' ধ্বনিটি শুনে অম্নি আমাদের পণ্ডিত-মহল আহ্লাদে গদগদ। ওঁকে 'দেবব্রত গুদুফার' আখ্যা দেওয়া হয়েছে শুনে ত তাঁদের খুসীর আর সীমাই নেই। তিনি যে 'গুড্ফার' হতে পারেন—পার্থিয়ার 'গরুড়'-বংশের সন্তান—যে 'গরুড়'-এর জন্ম গরুর গর্ভে, গোমাতা-পুত্র যিনি, যিনি বিষ্ণুর বাহন, রূঢ় মেজাজ, কারণ, তিনি জানেন তাঁর পিতৃবৎ মহেশ। তাছাড়া তিনি গরুড়ের মতো মাতৃভক্ত গুরু-পরায়ণ গোবিন্দচন্দ্রও হতে পারেন। গো-বাহন মহেশকে আগেকার দিনে 'বাণ'-দৈত্য বলা হত—স-পরিবার রাম আর বিষ্ণু এঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৮৫৮-এ আঁকা একটি 'কাঙ্গরা-চিত্র' তার সাক্ষী আছে—সেখানে গরুড়, গোমাতার কাছে কৃতাঞ্জলিপুটে অঙ্কিত—চন্দ্রচূড় বাণের নন্দী-ভৃঙ্গী দুটো শ্মশ্রুল ঈরাণী, 'শক-পল্লভ' ( পৃঃ ৫৩৫-গ্রেট মেন অব ইণ্ডিয়া )। এ-সাক্ষী ছাড়াও সাক্ষী দিচ্ছেন কৃত্তিবাস 'শিব-রামের যুদ্ধ'-গ্রন্থ রচনা করে। এই ধনুর্ধরের সাক্ষী দেবে আলেকজাণ্ডারের অশ্বারোহী তীরন্দাজ ( তুরস্ক )'—আর চীনের যু-ৱান-মইঙ। সক-সাক্য-মৌর্য্য-কোণীশক সবই ঈশাণ-কোণী ঈশাণের লীলা। 'মেদি-তরণী-অয়নে'র ঈশাণ কোণে 'ত্রয়াস'-দের 'ত্রাসদস্যু'র আড্ডা। পূব থেকে পশ্চিমে যখন মানব-কৌম ভ্রাম্যমান তখন নব-নব ঈশাণ-কোণে নব-নব ঈশাণের আবির্ভাব হয়েছিল। তার জন্যেই আমরা 'পূর্ব্ব-নন্দ'কে পাই, 'নব-নন্দ'কে পাই। মহীপালকে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে আর কর্ণাটকদের 'নবনন্দে'র সঙ্গে ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' গ্রন্থখানা তুলনা দিয়েছে। গ্রীকদের 'অগ্রম্মেষ' পূর্ব্ব-নন্দের অগ্রে-উন্মেষিত হবার আভাষ আনে। তেম্নি ঈশাণ কোণের 'ইলিয়াস্' ( বাংলার শূলতন্ত্র )—গঙ্গার ইলিশ—বায়ুকোণের 'স্কন্ধনভিয়ার' 'কড্ফিস,' হয়েছে। সবই কোণীশ কুশান। হিন্দুকুশের মাহাত্ম্য। কিন্তু 'তরাস'-এর যদি 'তরুস' পাঠ নিই—'সেউনচন্দ্র'কে তখন সেগুনচন্দ্র ধরে বর্ম্মার বীর বর্ম্মণ-বংশী ভাবতে পারি। আমাদের বায়ুকোণে ব্রহ্মদেশ—ব্রহ্মপুত্রদেশ তারই পুত্র। আমাদের বায়ুকোণ সত্যি বরাহমিহিরে ঈশাণ কোণ হয়ে গেছে। বরবুদুরে



কোণীশমূর্ত্তি আছে। অবশ্য পূব থেকে পশ্চিম যদি এক মানব-গোষ্ঠী পশ্চিমে যাত্রা সুরু করে তবে আগেকার বায়ুকোণই তাদের নব ঈশাণ-কোণ হয়।

আমরা গুড্ফরকে হড়প্পার সঙ্গে জড়িত করে নাথপন্থী বলেই মনে করি। তিনি বাইবেলের বহু-কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। বক্তুয়ার ( Bactria ) সঙ্গেও পেহেলভিরা যুক্ত। গত সংখ্যায় যে ব্রাহ্মী লিপিটির ( ৩য় সংখ্যক ) পাঠ দিয়েছি তার পাঠান্তরে বক্তুয়া-নৃপ 'দুস্যোন্ত-তরুণ'-এর নাম শোনা যায়। 'য়ুবান-মইঙ' এ অঞ্চলেরই মানুষ। পাঠান্তরটি এই : "য্যক্তনুইদুস্যোন্ততরুণ'। ভরত ও ভারতবর্ষের জনক দুষ্মন্ত ইনি। অপর পাঠে—'অশন্তনু সম্যষন্তা হরৌণ।'-তে গঙ্গা-পতি শান্তনু ছাড়াও 'হরিণ' ধ্বনি এনে অশোককে ও পালদের স্মরণ করায়।

যাক, আলোচ্য ব্রাহ্মীলিপিটির আরো কয়েকটি পাঠ এখানে দেওয়া হল :

মূলত দেব-নাগরী লিপি-ধ্বনি অনুসরণে তবে বাংলা-ব্রাহ্মী মিশ্রনও আছে :

যং ( বাঘ্র ) চরক অ৯ ( অলিম্ ) বর অযএ অত্মধ ( অত্মঠ ) বংকঙ্গ অজরণ (বংকঙলরণ )॥

মোহেঞ্জোদরো একসময় লিঙ্গ-পূজক থাকলেও এখানে 'শ্বেতাম্বর-নীলাম্বর'রা চরক সংহিতা নিয়ে 'মুদস-বশিষ্ঠ' হয়ে উঁকি মারছে। 'রণবঙকমল'-কে ত স্পষ্টই চেনা যায়। পটিকারা তাঁর রাজধানী ছিল—ছিল তাঁর কমলাঙ্ক-নগর ( কুমিল্লা-চোমিল্লা )। এই সমতটরাজ 'সপ্ত-অত্র' নামক জগন্নাথ-মঠ স্থাপন করেন। তিনি ব্যাঘ্র ত বটেই তবে ময়নামতী-লালমাই-কে নিয়ে অলি-বৃত্তিও করেছেন। তাই তাঁর সন্তান গোবিন্দচন্দ্র যোগী-পুরুষ—গোরক্ষনাথের ( গুর্খানাথ ) শরণার্থী। পালসেনদের মতোই তাঁর নেপাল পাণ্ডুলিপিতে আছে : "শ্রীশ্রীকাণ্যকুব্জাধিপত্য-অশ্বপতি-গজপতি-রাজ্যত্রয়াধিপতি-শ্রীমদ্ গোবিন্দচন্দ্রদেবস্য প্রতাপবশতঃ রাজ্ঞী শ্রীপ্রবরমহাযানবায়ীষ্যাঃ পরমোপাসিকা রাজ্ঞী বাসন্তদেব্যা দেয়ধর্ম্ম' য়ম।" 'ময়নামতীর গান' এধর্ম্ম—ইতিহাস বহন করছে। মলদেব সে-অঞ্চলে 'কালারাজা' বলে পরিচিত—বাংলাদেশে পরিচয় তাঁর 'কালাপাহাড়' নামে। অলি-বৃত্তির ফলেই তাঁর কালা-পাহাড়ী লীলা। তাঁর মঠ তাই 'শপ্ত-অত্র'—অভিশপ্ত প্রাচীনতা। বিগ্রহ ছিলনা তাতে—পাশেই একটি মন্দিরে বিগ্রহ স্থানান্তরিত হয়েছিল। বিদেশিনীর সঙ্গে অলি-বৃত্তির দরুণই এঁর বংশে একটু অভারতীয় আভা এবং রথী-পনা বিদ্যমান।

এখন, 'ইংরেজি' ( অব্বোট ) লিপি-ধ্বনি বসিয়ে ব্রাহ্মী লিপিটির কি ধ্বনি শোনা যায় দেখব। শুনছি :

হ্রেবাইট্ট টটে এটটসাড যোউনঅক্সণ্ড য়ংসভংথ্রিহঙ্গ।

( রেবা-নগরের তটে যবন-অক্সণ্ডের অংশবর্ত্তী হাঙ্গর এখানে নিহত হয়। )

অথবা : হ্রুডহট্টট টেএটট সাড়যৌউ ন অক্সণ্ডয়ং গহফীভহঙ্গ

( হ্রদ-বন্দর থেকে তিন সরযূ—অক্সণ্ড নয় গোপী-বিহঙ্গ )

দু'টি অক্স দেখা যায়, একটি যাবনিক অপরটি অবিশেষিত। দুটি স্কয়দিয়ারই উল্লেখ এখানে—যা নোহ-বংশীয়ের ম্যাপে আছে। বাক্-ধ্বনিটি এখানে পক্ষী-জাতীয়।

যৌন-'আলেকজাণ্ডার' বা 'ফিলিপ' নামধেয় যে বিহঙ্গই বা অক্সাসের অণ্ড ( পুত্র ) এখানে মারা গিয়ে থাকুন, কিম্বা মীন+অণ্ড+অর=মীনাণ্ডর, দেখতে পাচ্ছি ভাষার অবস্থা আবেস্তা-জেন্দ এ গিয়ে পৌঁচেছে। তাছাড়া 'হ্রদ', ইট, রেবা নদী(?)কেও পাওয়া যাচ্ছে এখানে। এসূত্রে মনে রাখতে হবে হরিবর্ষ আফগানিস্তানের 'হরি-হ্রদ' ও 'কপিশা' হিরণ্যকশিপু ( কাশিম পুত্রদের ) বংশ সূচিত করে। রেবা কিন্তু আমাদের আবার 'ঋকষভ'-তে উপনীত করায়! নর্ম্মদারই সখী রেবা। 'রেবা-খণ্ড' বলছেন:

"কিমর্থম্ নর্ম্মদা প্রোক্তা রেবেতি চ কথম স্মৃতা ?"
"নরকান্তকরি রেবা সতীর্থা বিশ্বপাবনী।
নর্ম্মদা ধর্ম্মদা চাস্তু শর্ম্মদা পার্থ তে সদা ॥"

কটাহ-মিশরের রেবাকে কেউ স্মরণ করেনা—শুধু নর্ম্মদার নামই ধ্বনিত! কী মানে আছে তার? বর্ম্মিণী দেবযানীকে ভুলে শর্ম্মিষ্ঠার নামই উচ্চারিত! রেবা কে ছিল 'রেবাখণ্ডের' পন্নার থেকে চিনে নিন। দেখুন কতোটুকু আলো-ছায়া মেশানো নাল ঊষা। তবে তিন পৃথ্বীমহিষী ( তিন সরযূ? ) বা তে-রাণী, তুরাণী পার্থিয়া-রাজ্ঞীর কথা—'নর্ম্মদা', 'ধর্ম্মদা' এবং ( চর্ম্মদা ) 'শর্ম্মদা'র বৃত্তান্ত ইতিহাসে একটু মন দিলেই পাওয়া যাবে। 'প্টোলেমি' বলছেন: "'ঔক্সেনটন' ( ঋক্ষভন্ত ) হল 'টৌণ্ডিস' ( তৌণ্ডী-দণ্ডী ), ডোসরোন ( দশরথ-দশানন ? ) এবং 'অডমস'-এর উৎস।" 'অডমস' যে বাইবেলের বাবা আদম ( আফগানিস্তানে এই বাবা-রব—যেমন 'বন্দী-ববর', 'কোহি ববর'—আরবের আগেই সুরু) সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেও যতক্ষণ না তাকে তক্ষশীলা-অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ নিশ্চিত ইতিহাস হবেনা। হাঙ্গরমুখ-বিহঙ্গঠোঁট গাঙ্গেয় 'টৌণ্ডিস' বা তৌণ্ডীকে নিয়ে আশা করি কেউ তেমন বিতণ্ডা তুলবেন না। 'গুড্ডফার' হড়প্পার গুরুপাদ হরপাদ ও শৈবদিগম্বর হয়ে যে শুধু বাবা আদমের বেশে বাইবেলে প্রবেশ করেছেন তা নয়—ত্রিমূর্ত্তিও ধারণ করতে চেয়েছেন। এই পিতৃতুল্য শক-পল্লভরাজ দু'টি রাজার সঙ্গে মুদ্রা-প্রচলন করেছিলেন। কাজেই দেখা যায়, তখন তক্ষশীলায় ত্রিশক্তির সমন্বয় হয়েছিল—শক-পল্লভ-ভারত। ইতিহাসে এই গুরুঠাকুরের গুরুত্ব নেই যেমন ভীষ্মের গুরুত্ব নেই মহাভারতে। যাদব 'তেসুক'-তেশুক তিন শুকের ঠাঁই দিয়েছিলেন কিন্তু সাঁচীর তোরণ অশোকের।

মোহেঞ্জোদরোতে সক-সেনাদের তক্তি-বাহন বা জয়স্কন্ধাভার ( ৯০ পৃঃ—ম.ই.সি. ৬ নং চিত্র) নর্ম্মদা প্রভৃতি তিন দাতার চিহ্ন নিয়ে 'নধশ'-রেখায় স্থাপিত ছিল। তা থেকে জানা যায় 'ন' 'ধ' 'শ' লিপি কি। বোঝা যায় কেন পুব-বাংলায় গোলগালকে নাদুস-নুদুস বলেনা, নধরও বলেনা, বলে, 'নধশ-নাধুশ'। বহুপ্রসঙ্গ অবতারণার পর এই বার্ত্তা বলে রাখি যে 'বর্হি-ভারত' বা মৌর্য্য-ভারতকেই অবশেষে একদা আমরা 'বহির্ভারত' বলতে শিখেছি।

কে ব্যসন দান করলেন; নর্ম্মদা যে কে, কে যে ধর্ম্মদান করেছিলেন আর কোন্ শর্ম্মা অজিন-পৈতা নিয়ে শর্ম্মদা বা চর্ম্মদা হয়েছিলেন তার খোঁজ না নিয়ে আমরা লিপিটির নব পাঠের 'থ্রি'-মাহাত্ম্য নানাপ্রকারে উদ্ধার করি চলুন। প্রথমতঃ বাক্যটির পুচ্ছের শব্দগুচ্ছে 'অবন্তী'র ধ্বন্যাভাস তুরাণী গোষ্ঠীকে বোঝায়। দ্বিতীয়ত, 'অন্তস্ত্রি' ধ্বনিটি পদ্ম-চন্দ্র-শঙ্খ বোঝায়। তৃতীয়ত, 'নভস্-ত্রি' কথাটি 'ব্যোম্-ব্যোম্-ব্যোম্' ধ্বনি জ্ঞাপন করে শৈবদের 'হর-ধুন' বোঝাতে পারে। তাছাড়া আরো বিশ্লেষণ হয়: ত্রিভঙ্গ, পীতাঙ্গ, মুরারি আসেন। আসেন পীতাঙ্গ পীবরাঙ্গ সোম-অনঙ্গ-পারী



যবন। যৌন অক্সণ্ডের অংশ 'ঔক্সন'-ওক্সনিয়ন ভ্রষ্টকারী হাঙ্গর ( 'মৌকরি'—মকর ) রূপী অঙ্গদেশের লোকটি ইটেতৈরী অট্টালিকা-শোভিত রেবা-নগরীর টাটে—পবিত্র-মঞ্চে—এ-স্থানে ( মোহেঞ্জোদরোতে ) ছিলেন। 'সাড'-কথাটি ঈরাণী জেন্দে কেটে ফেলা অর্থ বহন করে। এমন অর্থও হবে, হাঙ্গর ঔক্সনকে এখানে হত্যা করেন। বেবিলনে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু ( হত্যা ? ) ইতিহাসে প্রমাণিত। পূর্ণিল মোহেঞ্জোদরোর বীর্য্য শুধু 'বব-ইল-উন'-তে কেন এশিয়ামাইনরের 'ইস্রাইল' এবং তার উত্তরবর্ত্তী প্রদেশদ্বয় 'গজ-ইলি' এবং 'বযন' ( হোলি-বিব্-ইলি—Holy Bible-এর ম্যাপ দেখুন। লক্ষ্য করুন 'ব'-কে 'এ' পাঠ করলে 'বযনাপতি' কথাটি 'যেনাপতি' হয়। 'বসনা' হয় সেনা—'বসন' হয় 'সেন'—লক্ষ্মণ সেনকে চিনে রাখুন।) পর্য্যন্তও যে বিস্তৃত ছিল তা এই লিপি-ধ্বনি থেকে পাওয়া যাচ্ছে। একই লিপি বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন বাক ধ্বনিতে বিভিন্ন ধ্বনি-রূপ নিয়ে দাঁড়ায় কিন্তু মূল অর্থটা একই থাকে। পুরাকালের রাজচক্রবর্ত্তীরা এমন লিপিই ব্যবহার করতেন। ব্রাহ্মী লিপি ঠিক তেমন লিপি। 'অশোক-অনুশাসন-লিপিও' তা-ই। একটি অক্ষর অঙ্গ প্রদেশে ধ্বনি আনত 'অম্'—আসামে আনত 'অহম', বঙ্গে আনত 'বম্'—কলিঙ্গে হয়ত 'কল'। অঙ্গে যে অক্ষর 'রাম' ধ্বনি তুলত, তা বঙ্গে 'বাম' এবং কলিঙ্গে 'কাম' হয়ে তিনটি ধর্ম্মাঙ্গ তৈরী করে উত্তরকালে ত্রিকলিঙ্গ হয়েছিল। যাঁরা লিপি-পাঠ করেন তাঁদের এ-কথাটি ভুললে চলে না। ভারতবর্ষের দিকে-দিকে 'অশোক-অনুশাসন-লিপি' যদি অক্ষরের বিভিন্ন ধ্বনি বহন না করে একই ধ্বনি বহন করে থাকে তাহলে বলতে হয় সেই দেবপ্রিয় পিয়দশী ভারতবর্ষে প্রথম একটি রাষ্ট্রভাষা প্রচলন করেন। দশ-পানকারীকে এ-মর্য্যাদাটুকু ভাষাতত্ত্ববিদরা দেবেন কি? আমি মনে করি ধ্বনি-গর্ভ ভারতবর্ষ পৃথিবীর বাক-ধ্বনির জন্মদাত্রী। তাই Everest-কে 'অভীরিষ্ট' বা 'অভীঃ ইষ্ট' বলতে বা বোঝাতে আমাদের ক্ষতি নেই। তাই Elephanta-র ত্রিমূর্ত্তিকে আমরা বলব 'এল-এ-ফন্ত' বা 'অলি-ফন্ত'—'রোই-ফৈণীয়ন্তে'র রূপভ্রষ্ট জীব। এলা থেকে এঁদের জন্ম—ব্রহ্মা থেকে—উত্তরকুরুর মেয়ে ব্রহ্মা থেকে। পরম-পুরুষ মহেশ্বর অলি-বৃত্তি দেখিয়েছেন বটে কিন্তু ব্রহ্মা-গর্ভ-জাত সন্তান তাঁর নটবর-নটরাজ-অর্দ্ধনারীশ্বর 'জনার্দ্দন'—ফণীন্দ্র—বজ্রধর ইন্দ্র। ত্রিমূর্ত্তি মানে, নারী-অর্দ্ধনারীশ্বর-পুরুষ, স্ত্রী-সন্তান-স্বামী, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। অথবা 'ব্রহ্মাবিষ্ণু শিবাত্মিকা'। সৃষ্টিতে 'কাল'কে অপসৃত করা যায় না—মহাকালকে বাদ দিলে মহাকালী আসেন। মোহেঞ্জদরোর ত্রিদেবতায় শিবা না হয় ব্রহ্মা ছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠে জানা যায়—'হ্রদতীরে'—এইখানে 'ঔক্সেণ্টন' বা অক্সোনিয়ন ঋকষভ সন্তান (অণ্ড)—'য়ংগহ্ফীভহঙ্গ'—অঙ্গ-বিহঙ্গ, অঙ্গ-রাজ্যের বিহঙ্গ ( জৈন, যৌনারি ঋষভ-মহাবীর এবং ঔকারি হলে চন্দ্রগুপ্তদের 'হংস' আর মৌর্য্য হলে 'ময়ুর' )—Mayor of the Palace—প্রাসাদ-ময়ুর প্রাসাদ-শিখী ( প্রাসাদ-শিবি-প্রাসাদ-শিহী ) বসবাস করছেন। গ্রীকারি শিবি-কে বা যুবরাজ বা যুক্তরাজ অশোক-কে দেখা যায় এখানে। 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য' 'শ্রবণ-বেলগোলা'র জৈন-মন্দিরে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন—সেই মন্দির-তোরণের দুপাশে লক্ষ্মী স্বরস্বতী গণ্ডার-দেহর* উপর দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁদের উভয়েরই শীর্ষে হংস-ময়ূরী মূর্ত্তি। সাঁচী-স্তূপের তোরণে আছে অহি-খাদক দ্বিমুখী ময়ূর। অহিটি কিন্তু কর্কটাকৃতি।—তাই

* গণ্ডার কথাটি থেকে 'গন্ধার' কথাটি এসেছে মনে হয়। মোহেঞ্জোদরোর শীল-মোহরে কয়েকটি গণ্ডার-মূর্ত্তি আছে। 'গুড্ডফার' গণ্ড-পরনীশ ছিলেন। মার্শ্যালের পুঁথির ১০৫ পৃষ্ঠার ৯৩

অক্টোপাশাকার হয়ে শকারি-গুপ্তদের শিলা-খণ্ডে মকর রূপ নিয়েছে।—মুদ্রায় নিয়েছে সিংহমর্দ্দিনী অষ্টভুজা রূপ ( প্রথম ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তাখ্য রাজাদের মুদ্রা। বস্তুত চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা)। জৈন চন্দ্রগুপ্তের মন্দিরে অষ্টভুজা-দেবী দুই-মূর্ত্তিতে বিভক্ত—লক্ষ্মী ও স্বরদা স্বরস্বতী—তাঁরা বস্তুত চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা।—চতুর্ভুজের দুই ভুজ লক্ষ্মীর বেলায় শুণ্ড ( হস্ত—হস্তীর শুঁড়—বা ভুজঙ্গ রূপ—ঝাঁপিমুক্ত সর্প-রূপ ) নিয়েছে—পরে তিনিই গজলক্ষ্মী হয়ে লক্ষ্মীর কড়ির ঝাঁপি নিয়ে শ্রীমন্তের ভোগান্তি করেছেন। মনসা হয়ে লক্ষ্মীন্দরকে বিষ দান করেছেন। স্বরস্বতীর বেলায় দ্বিভুজ বঙ্কনালকমলাসীন দ্বিরদ মুণ্ড থেকে উত্থিত হয়ে 'স্বরঙ্গ'—সারং রূপ নিয়েছে—তখন তিনি গৌড়-সারং গাইতেন—বীণাপাণি ছিলেন কিনা বৃন্দাবনী সারং তাই বাজাতে পারতেন না তখনও। জৈন-ধর্ম্ম একটি ধর্ম্ম-সঙ্গমক্ষেত্র। কতো দিক হতে কতো ধারা যে এসে এতে মিশেছে তার ইয়ত্তা নেই। অশোক-মৌর্য্যের সাঁচী-স্তূপ দ্বিমুখী ময়ূরের ময়ূখেই খুশী কিন্তু 'বর্দ্ধমান মহাবীরে'র জৈনমন্দির এ-ময়ূরের সঙ্গে মাথায়-ঝুঁটি কাকাতুয়ার প্রণয় ঘটিয়েছে। তেশুকে—যাদব 'তেসুক' তৈরী হয়েছে। কাকাতুয়া যে 'মালয়' থেকে আমদানি শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা'য় খবরটা চালু করতে চেয়েছেন। কিন্তু মোহেঞ্জোদরোর দ্বিশৃঙ্গ-দ্বিরদ-পুরীর টিয়া-তোতা-কাকের সমন্বয়ে কাকাতুয়া পাখীটির ঠোঁটের খর স্বর স্বাদ পেয়ে তাকে সাদি করল কোন্ দ্বিমুখী ময়ূর তা জানতে হলে 'অন্নম্'-এর সন্ধান করতে হয়। চীনের "ত'অঙ্গ"-কবি 'পো-শুই' আনামের একটি কাকাতুয়া উপঢৌকন পেয়ে বলেছিলেন :

"অন্নম উপঢৌকন দিল লাল কাকাতুয়া যেন পিচ-তরু মঞ্জরী"—( হিষ্ট্রিঅদি ওয়ার্ল্ড-উইচ-পৃঃ ৩৭৪।)

সে কি শুকপাখী চীনাংশুকের মতোন অশোক মন-জয়ী ?

দ্বিচার ময়ূর দ্বিজাচার শিখেছিল কি দ্বিচারিণী কাকাতুয়া দ্বিমুখ-হারিণী হরিণী হয়েছিল বলা কঠিন। তবে আর্য্যরা যদি মৌর্য্য হয়ে থাকেন তাহলে ভৃঙ্গ-বৃত্তি এবং ভৃঙ্গার তাঁদের সঙ্গী ছিল আর তাঁদের বাহনের বপ্রক্রিয়া এবং বামনের বিপ্রক্রিয়াও তখন থেকেই সুরু। দক্ষিণ-আদিত্যের ষঙ্করাচার্য্য ( ষণ্+কর=ষট মত স্থাপয়িতা—উত্তরকালে ছয় মঠ স্থাপয়িতা বলে যিনি শিষ্যদ্বারা লাঞ্ছিত।) যেমন, মৌর্য্য-সুঙ্গর আবর্ত্তে কুমারিল ভট্টও ( ষড় ভূত প্রবর্ত্তন করে শব্দ মহাভূতে স্বর দান করলেন আর তিনি অতীত হলেই তাঁর সমর্থকরা ষোড়শোপচারে যজ্ঞ ফিরিয়ে আনলেন।) তেম্নি। কুমারিলের কৌমার্য্য হর্ষবর্দ্ধন-তক অক্ষুণ্ণই ছিল কিন্তু তারপরই কাম আর মারের ভূত-প্রেত নর্ত্তন সুরু করে দিল আর্য্যাবর্ত্তে। হর্ষবর্দ্ধন কাণ্যকুব্জে যবন-চ-বঙ্গের বা যবন-কুশাণ-বঙ্গের কংগ্রেসে ইন্দ্র সেজেছিলেন, কুমার-আমাত্য ( সমতটের-বরকান্তার 'লোকনাথ') নিয়েছিলেন ব্রহ্মার সাজ, তাঁদের মাঝখানে ছিল একটি হস্তী ( ঐরাবত )—এ ইন্দ্র ফণীন্দ্র, পরে যোগীন্দ্র হয়েছিল। 'মথুরা-রাজস্তম্ভ-শীর্ষে' তাই সিংহ নেই, ময়ূর নেই, শুক নেই আছে একটি মূর্ত্তিতে সিংহ-বদন, শুক-ময়ূর পক্ষ আর সর্প-পুচ্ছ। প্রভাকর-বর্দ্ধনের খর প্রভায় মথুরা 'তেরে-

সংখ্যক গণ্ডার-মার্কা শীল-মোহরটির পাঠ এই ; 'অলশি( র্প )হাস্ত(হংসত)শঙ্খিণীকর্ণেক (অঙ্ক)' অথবা "শ্রীল ( শীল ) হাস্য ( দত-দহ-দেহ ) শতনী ( প ) কেক ॥' সম্ভবত সাতবাহন-সাতকর্ণির শীলমোহর।



কোট্ট'-তে পাই একটি অক্টোপাশ-হাঙ্গরের মূর্ত্তি—মকরের পূর্ব্বপুরুষ 'মথর'। তখন মৌ-খর ছিল বাকভঙ্গী—পরবর্ত্তী যুগে খরতা কমে গেছে, তাই 'মকর'-কেও কটকের সমুদ্রেই পাওয়া গেছে আর সমুদ্রের ধারে 'বাকটক'-কে। মকর সমুদ্রে গুপ্ত থাকে কিন্তু অক্টোপাশ-নন্দন কর্কট বেলাভূমির পোষ্য হতে চায়—তিনি পোষ্যের বিভূতি নিয়ে স-হর্ষে অজন্তার গাত্র-চিত্রে আবির্ভূত। শিলাচিত্রের মারফৎ-ই যে ইতিহাসের এ-বিন্যাস করলাম তা নয়। আরো উপাদান আছে। রত্নাকর সমুদ্রের কিছু রত্ন আহরণ করলেই ইতিহাসের আঁচল ভরে ওঠে। আমরা যদি রামানুজের ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে পৌষের মৌখর প্রভাকরে—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মধুর-স্বাদ পেতে একটুও বিলম্ব হয়না। রামানুজ অষ্টভুজ ( অক্টোপাশ তুলনীয় ) 'বিষ্ণু-সূর্য্য' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—'মধ্যাহ্ন-সূর্য্য বিষ্ণু আকাশ ধারণ করে আছেন আর্য্য-রাজার ভঙ্গীতে' ( মমল্লপুরম্-ভাস্কর্য্য )। এ-থেকে পাণ্ড্য-বনিক পল্লভী বিষ্ণুবর্দ্ধনের যেম্নি আবির্ভাব তেম্নি পুষ্যভূতি প্রভাকরবর্দ্ধনের অভ্যুদয়। কিন্তু মূল বংশটি বল্লাল-হয়সালের। তুরাণী-হৈহয়ের বাহন যে হয়রাজ শৃঙ্গযুক্ত ছিলেন এবং মোহেঞ্জোদরোতে যার কঙ্কাল পাওয়া গেছে ( মার্শ্যালের তৃতীয় খণ্ড ১৬২ পৃঃ ) তার প্রস্তর-প্রতিকৃতি আছে সারনাথের 'দিব্যালকাহ্' ভাস্কর্য্যে। ঐতিহাসিকরা অপ্সরীদের সমুদ্র-চন্দ্র-গুপ্তের যুগ-সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের গ্রাসকে আমি অগ্রাহ্য করছিনে তবে এটুকুমাত্র সংযোজন করতে চাচ্ছি যে এই গুপ্তরা মোহেঞ্জোদরোর মানুষ। তারপর বল্লাল-হয়সাল প্রসঙ্গ। ইনি পল্লভী, এশিয়া-মাইনরের 'বষন'-অঞ্চলের প্রভাবে 'ষেন' হয়ে, ষেনাপতি হয়ে ভারত-খণ্ডে রাজ্য-খণ্ড তৈরী করতে আসেন এবং পীতবসন বনমালীর সংস্পর্শে ( রামানুজেরই কৃপায় ) এসে বর্ত্তে যান। ব্রত-পালন করে পূর্ব্বাঞ্চলের লোক ব্রাত্য হয়েছিল। এবং পূর্ব্বাঞ্চল ব্রতকে 'বর্ত্ত' বলত বলেই ( আজও বলে ) অঞ্চলটি আর্য্যা-বর্ত্ত নাম পেয়েছিল সে। আর্য্যাবর্ত্তে বল্লাল বল্লালসেন নাম নিয়ে প্রবেশ করেন। প্রবেশ করেন আদিম হিন্দুরাজবংশ সেন-বংশে। সালের শল্য ইতিহাসের হস্তিকে বিপরীত-মুখী করে দিয়েছে। আমরা 'ক্ষ'-কে 'ক' ধরে নিয়েছি—উল্টা-সাধন করেছি। যেমন, 'চন্দ্রিকার ভুবনেশ্বর-শিলালেখ'-পাঠের সন। তাতে আছে ভানু-রাজ্যাতীতে শকবর্ষাঙ্কমিতি 'ব্যোম্-ব্যোম্ ফণীন্দ্র-রসনা ( বসনা ? ) চন্দ্র'। চোড়গঙ্গ বংশে সেন আর গুপ্তদের একসঙ্গে 'একাম্র' নামক স্থানে পাওয়া যাচ্ছে—বাংলাদেশের সেনগুপ্তরা এ-সম্পর্কে অবহিত হোন। 'ডক্টর বর্নেট' এবং 'ষ্টেন কোনোও' উদ্ধৃত কথাটি থেকে যথাক্রমে ১১০০ এবং ১২০০শক পড়তে সমর্থ হয়েছেন। Z-থেকে A-তে এসে তাঁরা ব্যোম-ব্যোম বাচক দুটি শূন্যকে দক্ষিণে-স্থাপন করেছেন। বামপন্থী বাঙালীরা কস্মিন্‌কালেও ডান থেকে বামে লিপি পাঠ করে না, ভূতপূর্ব্ব অস্ত্র-পন্থী এবং সাম্প্রতিক অস্ত-পন্থী ইংরেজরাও তা করেন না। **শকবর্ষাঙ্কটি হবে : ০০৩১। শূন্যতাবাচক মঙ্গলসূচক হর-ধ্বনি 'ব্যাম্-ব্যোম্' দিয়ে অঙ্কটি সুরু - তারপর ত্রিমূর্ত্তি-ফণীন্দ্রের তিন-রসনায় ৩-অঙ্ক, চন্দ্র একও হতে পারে তমোনাশক যদি হয়, চন্দ্রবংশ হলে তার কতো অংশ হবে জানা মুস্কিল। ফণী দ্বিজিহ্ব হতে পারে, ফণীন্দ্র ত্রি-রসন।** নিজেদের বুলি ROI FAINEANT-র অর্থ যাঁরা জানেন না তাঁরা যে কেন শকাব্দ পড়তে এসেছিলেন জানিনে। মোহেঞ্জোদরোর পট-গাত্র-লিপিতে 'টুর্ক' ( ৪-৫-৬ বর্ণে ) খুবই সহজ লভ্য। তাকে 'তুফাণ' বলা যায় কিম্বা দ্রৌফণী পড়ে দ্যুতিময়-দ্যূতপণ্যা-দ্রুপদ-কন্যা-দ্রৌপদী-ফণিণী এবং তুর্ব্বসের সঙ্গে যুক্ত ভাবা যায়—শেষ চারটি লিপি-ধ্বনিতে

'অংদরত্রি ২' বা 'অংয়ত্রি ২' পাই। লিপিটি মোহেঞ্জোদরোর লিপি-সভ্যতার দ্বিতীয় স্তর। মোহেঞ্জোদরো 'কিম্পুরুষ'-বর্ষে বলে কিন্নর-অপ্সর স্থান বলে সেখানে অর্দ্ধনারীশ্বরের ধুম ছিল।

আমার কথায় ভূতপূর্ব্ব-প্রভু-ভক্তরা বিরক্ত হবেন না যেন। আমি কিন্তু ইংরেজ-জাতির সঙ্গে সম্প্রীতি-ভঙ্গের কোনো ভঙ্গী দেখাচ্ছিনে। একটি 'কানিংহাম' বা একটি 'মার্শাল' ইংরেজ-জাতি নয়। বরং আমি বলি, ইতিহাস-পুরুষের ইঙ্গিতেই বাংলায় ইঙ্গবঙ্গ-সমাজ তৈরী হয়েছে। আমার এ-কথায়ও প্রভুভক্তের দলেরই কোনো-কোনো প্রভু হয়ত বললেন, কোথায় ইংলণ্ড আর কোথায় বাংলা খণ্ড! তার উত্তরে আমি অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাব: "ঐ ত্রিপুরা-পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা খণ্ডল পরগণা! অখণ্ড-মণ্ডলকার সূর্য্যের উদয়-গিরিতে 'উদয়পুর' সেখান থেকে কয়েক ক্রোশের পথ মাত্র। যে-'উদয়পুর' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি'-উপন্যাস সেই উদয়পুর। তবে রবীন্দ্র-সুহৃদ মানিক্যবংশের পুরী ওটা নয়, 'গোবিন্দচন্দ্রের' পুরী। খণ্ডল-বাসীরা আজও ত্রিপুরায় পতিত। ঈষৎ খণ্ডল হ'লে—'আখণ্ডল' হলে ইন্দ্র হওয়া যায়। কৃত্তিবাস তাই রামকে দিয়ে 'হরধনু' 'ঈষত' বাঁকা করিয়েছেন—রামকে আর্য্য বানিয়েছেন। ইন্দ্র হবার জন্যে কী প্রাণান্ত প্রয়াস, দেখুন! হর্ষবর্দ্ধনের মতো প্রয়াস। কৃত্তিবাস আর ভারতচন্দ্র হর্ষবংশ, যেম্নি হর্য্যঙ্ক বিম্বিসার। 'অন্ত্র-গঙ্গেম' বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় 'খণ্ডল'-কে অবিকল পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু 'অন্ত্র-গঙ্গেম' বা দাক্ষিণাত্যের খোন্দলে জেন্দের পারস্য-পরস্য-স্পর্শে বা পরেশনাথের কৃপায় 'খান্দেশ' জন্ম নিয়েছিল। ইতিহাস যদি এখনও রাখাল দাস এবং ভগ্বানলাল ইন্দ্রজিকে অনুসরণ করে লিখিত হয় তবে সত্যিকারের ভারতবর্ষের ইতিহাস রচিত হতে পারে। যাক, ইংলণ্ডের ইতিহাসেই ফিরে আসছি। রোমে 'অব্বোট' গ্রেগরী' (অব্+বট, অর্ব্বুদ—গর্গ+গোরী, জে+গিরি) দাস-হাটে কিশোরদের ডেকে বললেন: এখন থেকে এঞ্জেলকে (পরী) এঞ্জেল (কোণ) বলা হবে। এই কৌণিক অবস্থায় অবস্থান করেই বলখাস-হ্রদতীর বাসীর শাখা জাতি বলশ ও স্কচ-জাতি অধ্যুষিত একটি দ্বীপ ইংলণ্ড হল। ইংলণ্ডের এই আব্বাটির ভাষায় বৈদিক সঞ্জয়-রা শৃঙ্গয় হয়েছিল। কাজেই গৌরীশৃঙ্গ অঞ্চল-বাসে তিব্বতী বা টিব্বট বলে তাকে ভাবতে গেলে বিন্দুমাত্রও ভুল করা হয়না। টি (চা) আর বট (ব্রতের জন্য যে জীয়ন্তী গাছ থেকে—প্রাক্তন তরু—অমর তরু—তাই বটপত্রে বটকৃষ্ণ, বংশীবটে প্রণয়ীকৃষ্ণ, বো-ট্রিতে বুদ্ধ) নিয়েই কি টিবট? আর রেঙুনী সেগুন-টিক এবং বট নিয়ে টিকবট—টিকিবৎ—টিকিওয়ালা কি চীন? হতে পারে, তবে ভেতরকার, কেন্দ্রিক 'ব'-টি 'ব'-দ্বীপের মাছ-কাটা 'বটি' না হয়ে যায় না! হর্ষের আমলে যে-সমতটকে 'ব'-দ্বীপ বলা হত তার উত্তরে কর্ণ-সুবর্ণ ('রাজ্য-হস্তা') ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন একটি 'ব' দ্বীপ এবং উত্তর-পশ্চিমে পাটলিপুত্র-কঠমাণ্ডু (কঠ ও মাণ্ডুক্য উপনিষদের জন্মস্থান) অর্দ্ধচন্দ্ররেখা তিব্বতী ব্রহ্মপুত্র নিয়ে তৃতীয় 'ব'-দ্বীপ তৈরী করেছিল। এই ত্রি-ব-বৎ হয়ে একটি ভূখণ্ড 'ত্রিব্বৎ' বা তিব্বৎ নাম নিয়েছে। সমতট ছিল তির্য্যক 'ব'—তা থেকেও 'তিব্বৎ' হতে পারে। উত্তর-পশ্চিমী 'ব'-টি কাঞ্চীর—সাঞ্চীস্তূপের ব্রাহ্মীলিপির ব-বৎ। সঙ্গীতে 'বোল-রাগ-তাল'-কে 'ত্রিবট' বলা হ'য়। চোড়গঙ্গ-বংশে যন্ত্র-লয়-যুক্ত হয়ে সঙ্গীত 'চতুরঙ্গ' হয়েছিল। 'হর্ষবর্দ্ধনের হস্তাক্ষর' হিসেবে যে-লিপি প্রচলিত তাই তিব্বতী লিপি—তার পাঠদেওয়া হয়েছে: 'স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষস্য'। স্বাক্ষরে কোন্ বর্ব্বর 'স্বহস্তো মম' কথাটি লিখতে পারে



জানিনে! এমন কি, 'সেন-ঙ্গ-চি'-র সমন্বয়ে রচিত 'কুমারামাত্য' 'খড়্গোদ্যম' ৪৪ হর্ষাব্দেও এমন বর্ব্বর ছিলেন না। তন্ত্রযোগীরা বর্ব্বর নয়। 'স্বহস্তো'—লিপিটির বহু-পাঠই হ'তে পারে কিন্তু 'স্বহস্তো' তার একটিও নয়। এখানে বাংলা-ব্রাহ্মী-বর্ণ-লিপির অনুসরণে এবং প্রতীক-অবলম্বনে একটি পাঠ দিচ্ছি: 'স্বংবদাধম্নু অসি(খড়্গ)স্খ্খ্।' বিহারী-বাক-রীতিতে 'ম্নু'-কথাটির উদ্ভব কি এ-ভাষা থেকে? প্রাচীন বাংলাক্রিয়াপদেও 'ম্নু'-র ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এর দ্বিতীয় পাঠে কিন্তু আশ্চর্য্যভাবে 'ঢ়ার' 'লনখ'—'লখনখ' আমাদের লক্ষ্যে আস্‌ছেন। লঙ্কা—শৈলখনক লক্ষ্মণ সেন? 'স্বংবঢ়ার সৈখম'—'স্বম্বদার অসিব্ব লন্খ'—"স্বংহার সৈলখনক" প্রভৃতি। খড়্গবংশী কুমার লোকনাথের সঙ্গে হর্ষের সখ্যের কথা ইতিহাসে আছে। এখানে দেখা যায়—দুজনে মিলে সম্বৎ তৈরী করেছিলেন কিম্বা হর্ষ অহিংস খড়্গ-সখ্য বিনাশ করেছিলেন।

যেম্নি কান্যকুব্জে তেম্নি বাংলায়, চন্দ্রবংশে আর পালবংশে জড়াজড়ি। এঁরাই গুর্জ্জর-প্রতীহার। পাল বংশের শেষ রাজা 'লখণ পাল' বল্লালের লীলায় লক্ষ্মণ সেন—সে-লীলা সুরু রামানুজ-শিষ্য 'দনুজ-মাধব' বা 'দনুজ রই' থেকে।

সাহিত্যোৎসুকদের জন্যে এই সংবাদ বহন করা যায় যে প্রভাকর পুষ্যভূতির প্রভায়ই ভারবি, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বাণ (শিব) প্রভৃতির বাক্-বিস্তার। সবাই এঁরা কবি, 'বক্তৃয়া'র বক্তৃতাবাজ। তবে কালিদাস কালীর দেশের মানুষ, কালীদহের কাছাকাছি আছেন। কালোদেশ মৎসদেশ বাংলাদেশ পক্ষী-মণ্ডল বলেই পরিচিত। 'গোপী-বিহঙ্গ' কালো পাখী ময়না—আর কৃষ্ণ-শিখা ময়ুর নিয়েই ছিল এদেশে মারামারি। কিম্বা সর্পে ময়ুরে; মকরে ময়ুরে কিন্তু ভাব ছিল খুবই। তাই মৌখরি বর্ম্মারাও মৌর্য্য। বাহন এবং ভাষণ নিয়ে মারামারি। রাধা-কংস-ললিতা-বিশাখা-মনসা-কার্ত্তিক এরা সবাই ছিল ঈশাণের কৃপায়। ছিল বৈশাখ আর কার্ত্তিক পুণ্যমাস।

পালদের ঘ্রাণে অগ্রহায়ণও এসেছিল। যাক্, কালিদাস সাগর-বংশের ভগীরথ দ্বারা (সমুদ্রগুপ্ত বংশের যুবান-মহীন্দ্র) বশিষ্ঠের মতোই উৎকোচিত হয়ে 'উষ্ট্র' ধ্বনিটি শেখবার প্রাণান্ত প্রয়াস করেছিলেন। 'মোঘ' বা 'মোগ' যাচক হয়েছিলেন। যদিও ট-বর্গের ধ্বনি ময়নার বা তোতার মতো রপ্ত ছিল তাঁর বাকযন্ত্রে তবু 'ষ'-ধ্বনির সঙ্গে 'ট' বা 'ঠ'-ধ্বনির মিশ্রণাত্মক ধ্বনিটি হয়ত তাঁর জিভ কিছুতেই আয়ত্ত করতে পারছিলনা—ফলে বিবাহ-বাসরে উষ্ট্রকে 'উট্ট' বলে নববধূর পরিহাস-ভাজন হয়েছিলেন। উষ্ট্র নিয়ে চীন-সম্রাটের আবির্ভাব হয়েছিল বাংলাদেশে। হিমালয় যেদিন সাগর ছিল—চীনই সেদিন ছিল সাগর-বংশ। হিমালয়ের আবির্ভাবের পর চীনের ইরিগেশন-এঞ্জিনিয়র 'যুবান-মহীঙ্গ' (যুবক, মহী-সন্তান) মহীষাসুর বান 'জশুই'-কে চীনে কেটে নিয়ে গিয়ে সেখানকার জল-কষ্ট দূর করেন। 'সুকেশী ভারদ্বাজ' গোষ্ঠীর প্রতি তাঁর আসক্তি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত (চীনের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। ভারত বংশের সঙ্গে বাজসনীয়দের মিলনে এই গোষ্ঠী। 'জশুই' মহাদেবের জটা। সেই জটাতে চীনের টিকিও হ'ল—অবতীর্ণা গঙ্গার জলধারাও পাওয়া গেল। এ এঞ্জিনিয়ার কুরুবর্ষে সক্রিয় ছিলেন দেখা যায়। 'জশুই' যে মহাদেবের জটা এবং বাংলাদেশে যে পক্ষীভাষী এবং 'স'-ছাড়া 'শ' বা 'ষ' জানতনা তার প্রমাণ স্বরূপ 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র এই 'চৌপৌআ'-ছন্দটির মহাদেবকে দেখুন:

জসুঈ সসহি গঙ্গা গোরি অধঙ্গাগিম পিন্ধি অফণিহারা ( পিন্ধিঅ ফণিহারা )।
কণ্ঠেট্ঠ ঠিঅ বীসা পিন্ধন দীসা সন্তারি অসংসারা ॥

দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত সন্তানারি ছিলেন, সন্তানদের তাই সন্ত হয়ে পালাতে হ'ত—তবু তাদের অসংসারী পিতার হস্তে নিস্তার ছিলনা। এম্নি মহাকাল মহাদেব এই ভারতবর্ষের জনক। কণ্ঠে-স্থিত বিষ, পরিধানে ছিন্নবস্ত্র—অথবা দিগম্বর তিনি। ( জৈনতা—হীনযানী হর্ষবর্দ্ধনাচার—তান্ত্রিকতা—শৈব-সন্ন্যাসী-বৃত্তি স্মরণ করুন )। গোরি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী, জটায় চন্দ্র-শশচিহ্ন ( শশাঙ্ক তিনি ) গঙ্গা—মৃতবাহিনী, বৈতরণী-কালী আবার মন্দাকিনী গোরি। গোরির পরিধানে সাপের হার অথবা 'রা অফণিহা'—অবনীর ঐশ্বর্য্য—Roi Faineant।

বিস্মিত হবার কিছুই নেই যে এই মূর্ত্তিটি গৌড়ে আবিষ্কৃত হবে। 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' চিত্র বলে যে-মূর্ত্তির চিত্র শ্রদ্ধেয় রাখালদাসের বাংলার ইতিহাসে ( চিত্র নং ২৯ ) সন্নিবেশিত হয়েছে সেই যশোদাদেব কী গঙ্গা? হাঁ, যশোদা-দেবকী গঙ্গা। তাঁর পিন্ধনে 'ফণীন্দ্র-রসনা', কোমর থেকে ত্রিফণ-ফণী ঊর্দ্ধগ হয়ে আছে। ঐশ্বর্য্যময়ী এক নারীমূর্ত্তি—সেবাকামা—শিশু সন্তানের প্রতি উদাসীন। শিশুটি স্তন্যচ্যুত হয়ে পড়ে আছে—মায়ের অনবধানতায় হয়ত পরের মুহূর্ত্তেই মাতৃগাত্রদ্বারা পিষ্ট হবে। মূর্ত্তিটির গায়ে লিপি অঙ্কিত—যে ধরনের লিপি মোহেঞ্জোদরোর বহু তৈজসে-পাত্রে-শিলায় অঙ্কিত তেমন ধরনেরই এ-লিপি। লিপিটির পাঠ:

১। জীক্ষুবানং (:), ২। জীষ্ণুণং (:), ৩। গোরিং একং ॥

এ-শুধু কৃষ্ণের জন্ম নয়, গৌড়-মগধের জন্ম—গৌড়মগধের প্রথম শাল। তাই 'গোরিং একং'। গৌড়মগধ জগৎজয়ী জীষ্ণু-বিষ্ণু হবে তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে লিপিটির প্রথম পাঠ। Malda—মলদহ, মলদেবের দহই যে মগধ—মলদহই যে একদিন কালীদহ হয়ে যায়, মারতে চায় জীষ্ণু তার সন্তানকে—'মামক' মারতে চায় ভাগিনীয়-কে—তাতে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? প্রথম পাঠে বান-শিব দৈত্যকে পাওয়া যাচ্ছে—বৃষভবাহন চন্দ্রচূড়কে, যিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি 'অক্সোনিয়ন', হিন্দুকুশ আর অক্সাসের বৃত্তে বৃত্র-দেশ। সেই দেশের মানুষ যারা তুরস্ক-গ্রীস-মোহেঞ্জোদরোর জন্ম দিয়েছে। তুরস্ক-গ্রীস-ভারত এই ত্রিরাজই পৃথ্বীরাজ, পৃথিবীর সভ্যতার ও ভাষার জন্মদাতা। জন্মদাতা মহাভারতীয় 'রোমকের'—য়ুরোপের।

রামের সঙ্গে যুদ্ধ মানে রামপালের সঙ্গে যুদ্ধ। রামপাল তাঁকে 'সপ্তষষ্টী' রূপে পেয়েছিলেন। মূল তাঁদের এক তবু যুদ্ধ। তিনি পশ্চিমাগত রামপাল পৌর্ব্বিক। দিব্যক-রুদ্রকবংশী ভীমের সঙ্গে রামপালের যুদ্ধ—'বোধিসত্ত্ব' বলে আখ্যাত মূর্ত্তিটি ( বাঙ্গালার ইতিহাস—চিত্র নং ২৩ ) যদি রামপাল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মহীপাল বা বিগ্রহপাল প্রতিষ্ঠিত হলে এ-যুদ্ধ কর্ণাটকের সঙ্গে। মূর্ত্তির গায়ে অঙ্কিত লিপির পাঠ: "নহসহ সপ্তষষ্টীহ" ( নংসং সপ্তষষ্টীং" )। পূর্ব্ববাংলায় ষষ্ঠী-ব্রতকথায় ষষ্ঠী সন্তান-সংহারিণী অর্থাৎ সংগ্রাহিনী। মোহেঞ্জোদরোতে এ-ধরণের লিপির ছড়াছড়ি। জৈন-রাজপুতদের ত্রিমূর্ত্তিতে ( মোহেঞ্জোদরোর ত্রিদেব ) শিব বা ব্রহ্ম মূর্ত্তিটির অবিকল মুখমণ্ডল এই শ্মশ্রুল ত্রিবেদী-পৈতাধারী মূর্ত্তিটি বহন করছে। ত্রিশূলের মধ্যশূলটি পদ্মকোরকাকৃতি। সাঁচী-স্তূপ-তোরণ-স্তম্ভ-শীর্ষে এই চিহ্ন



আছে। দিব্য, অশোক-মৌর্য্য ও পালরা একই পারসিক গোত্রের—কেউ তাঁরা বৌদ্ধ নন—জৈন। এই চিহ্নটি 'অষ্টসাহস্রিকা' হয়ে পূর্ব্বচীন 'স্বস্তিকা' বা 'স্রিকা'র পরিচয় বহন করে। বাইবেলের নোহবংশ-প্রতিষ্ঠা-জ্ঞাপক মানচিত্রে এর নাম 'সেরিকা'। রামপালের অষ্টসাহস্রিকা পুঁথির পাতায় চৈনিক অক্ষর সুস্পষ্ট ( বাঙ্গালার ইতিহাস চিত্র নং ২২ )। তাছাড়া এক পংক্তিতে পাঁচটি ঈষৎ-মিশ্রিত বাংলা অক্ষর আছে যার পাঠ: 'বজ্রজোগ্নিরা' বা 'বজ্রজোগ্নিরণ'—'বজ্রযোগিনী' নামত এ থেকে নিশ্চয়ই তবে 'মোহেঞ্জোদরো'-ও কিনা তা কে বলবে!

শুধু বাংলাদেশকেই পক্ষী অপবাদ দিলে চলেনা—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তই এই পাক্ষিক দশায় ছিল। কুরু-পঞ্চাল-খণ্ড বা বক্তৃয়ার বক্তৃতাবাজরাও বাঙালীর মতোই বাজ পক্ষী চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন। বাজ হয়েও মানুষ। উশন হৈব বাজশ্রবস। হর্ষবর্দ্ধনের চোখের দিকে তাকান—নতাক্ষ তিনি। এই অক্ষিটি অক্ষবৎ হয়ে মিনাণ্ডার গলার কলারের শোভাবর্দ্ধন করছে। কর্কট ভঙ্গীও তাকে বলা যায়। উপনিষদে অক্ষর 'অক্ষ্' নামও পাওয়া যায়। 'বক্তৃয়া'-রাজ বক্ষুজ মিনাণ্ডার 'অক্ষীঅজ'-বংশীয় ( বাইবেলে 'নোহ-বংশীয়ের ম্যাপ' দেখুন—এশিয়া মাইনরে 'অক্ষীঅজ'-রা বিরাজ করছেন )। পারস্ত-রাজকে বর্জ্জন করে তাঁর বংশ গৌরব নয়। 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ( শ্বেতাশ্বতর )। তাঁর মুদ্রার অপরপৃষ্ঠেই বজ্রধর পারস্ত-রাজ দাঁড়িয়ে আছেন। যে-পোষাকে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়ি নিয়ে—ঐন্দ্রিক 'সুদস' বশিষ্ঠকে সে পোষাক পড়িয়েছিলেন ( ঋক্‌বেদ )। 'পারস্ত-নীপ'-র যে কী মাহাত্ম্য, কেমন বংশবৃদ্ধি ভাগবত-পাঠে তা জানতে পারবেন। মনোযোগে ভারত-ইতিহাস-পাঠ করলেও দেখবেন মকরি-পল্লবরা উড়িষ্যার 'কর'দের সঙ্গে যোগসাজসে 'কর-পল্লব' তৈরী করেছেন। আরেকটু মনোনিবেশ করুন, দেখবেন 'কর'-দের ঈশ নিয়ে কোরেশ-রা আরবে কেমন পূজা-আর্চ্ছার রব তুলেছে। তৎসঙ্গে তাঁদের অসংযমেরও পরাকাষ্ঠা নয়ন-গোচর হবে। এই 'অক্ষীঅজ'-রাই এশিয়া-মাইনরের 'বোঘজকোই'-এ সোম-পায়ী ( চন্দ্র-পায়ী ) ইন্দ্রের ও অশ্বিদ্বয়ের পাত্তা দিয়েছেন। এঁরাই 'অচিয়ন' ( অর্চ্চিয়ন বা অ-চীন )—'অক্কড' ( অক্ষদ )—'কপ্পড' ( কর্পূরদ—কন্দর্প )—'হিট্টিটেস' ( হিতৈষী-টিট্টিভ )—'অগীয়ন' ( অগীতজ্ঞ ) এবং 'অজীয়ন' ( অজীবন্ত-অজ-পথ ) গ্রীসের জন্মদাতা। 'গিরিশন্ত'-কে হিন্দুকুশ-গিরিশির ছাড়াও শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ ধরে রেখেছেন। উপনিষদের অঙিচ+অক+শীহি=গিরিশন্ত—কে? চৈনিক শীহ, পারস্ত শাহ, তক্ষশীলার যক-পুরীর শিখীর সম্মেলন—এ মৌচাকেরই মক্ষিকা। বা চাকার পাখি চাক্+অর=চাকর। দিব্যকের মতোই গ্রীস্ ফুস্-মন্ত্রে সন্ত হয়ে 'গিরিশন্ত' হয়েছিলেন। 'মেডিটেরিনিঅনে' ( মিডিয়া+তরণী+অয়নে অথবা মেদ-তারণ অয়নে ) 'তুফান' ( তুহুফণী—Two FAINE´ANT ) আসত পৌষ মাসে। 'গিরিক'রা তাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকত। কিন্তু বসন্তে সুরু হ'ত অভিযান-উৎসব, অভিযান-শিক্ষা। 'অজিয়ন'-সমুদ্রে শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা দেওয়া হত ( গ্রীসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য )। যেম্নি রামাবতী থেকে মদন পাল, তেম্নি পার্সিপোলিস ( পার্শ্বপালস্ ) থেকে যে 'পেরিকলস' ( প্যারী-কলস ) হ'ল তা কি মদনকুন্ড না হয়ে পারে? সেখানে 'হেলেন' হবেই আর 'হর্ষচরিতে'ও লেখা থাকবে: "তস্মাচ্চ হেলানি রজিতমালবানীকম্ গৌড়াধিপেন···ব্যাপাদিতম্ অশ্রৌষীৎ।"

এপ্রসঙ্গে রমণী-প্রিয় রোমক-রোমানের উপন্যাস তৈরী করা যায়। 'রোমান-কথলিকে'র বার্ত্তাও

জসুঈ সসহি গঙ্গা গোরি অধঙ্গাগিম পিন্ধি অফণিহারা ( পিন্ধিঅ ফণিহারা )।
কণ্ঠেট্ঠ ঠিঅ বীসা পিন্ধন দীসা সন্তারি অসংসারা ॥

দুষ্মন্ত-পুত্র ভরত সন্তানারি ছিলেন, সন্তানদের তাই সন্ত হয়ে পালাতে হ'ত—তবু তাদের অসংসারী পিতার হস্তে নিস্তার ছিলনা। এম্নি মহাকাল মহাদেব এই ভারতবর্ষের জনক। কণ্ঠে-স্থিত বিষ, পরিধানে ছিন্নবস্ত্র—অথবা দিগম্বর তিনি। ( জৈনতা—হীনযানী হর্ষবর্দ্ধনাচার—তান্ত্রিকতা—শৈব-সন্ন্যাসী-বৃত্তি স্মরণ করুন )। গোরি তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনী, জটায় চন্দ্র-শশচিহ্ন ( শশাঙ্ক তিনি ) গঙ্গা—মৃতবাহিনী, বৈতরণী-কালী আবার মন্দাকিনী গোরি। গোরির পরিধানে সাপের হার অথবা 'রা অফণিহা'—অবনীর ঐশ্বর্য্য—Roi Faineant।

বিস্মিত হবার কিছুই নেই যে এই মূর্ত্তিটি গৌড়ে আবিষ্কৃত হবে। 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম' চিত্র বলে যে-মূর্ত্তির চিত্র শ্রদ্ধেয় রাখালদাসের বাংলার ইতিহাসে ( চিত্র নং ২৯ ) সন্নিবেশিত হয়েছে সেই যশোদাদেব কী গঙ্গা? হাঁ, যশোদা-দেবকী গঙ্গা। তাঁর পিন্ধনে 'ফণীন্দ্র-রসনা', কোমর থেকে ত্রিফণ-ফণী উর্দ্ধগ হয়ে আছে। ঐশ্বর্য্যময়ী এক নারীমূর্ত্তি—সেবাকামা—শিশু সন্তানের প্রতি উদাসীন। শিশুটি স্তন্যচ্যুত হয়ে পড়ে আছে—মায়ের অনবধানতায় হয়ত পরের মুহূর্ত্তেই মাতৃগাত্রদ্বারা পিষ্ট হবে। মূর্ত্তিটির গায়ে লিপি অঙ্কিত—যে ধরনের লিপি মোহেঞ্জোদরোর বহু তৈজসে-পাত্রে-শিলায় অঙ্কিত তেমন ধরনেরই এ-লিপি। লিপিটির পাঠ:

১। জীক্ষুৰানং (:), ২। জীষ্ণুণং (:), ৩। গোরিং একং ॥

এ-শুধু কৃষ্ণের জন্ম নয়, গৌড়-মগধের জন্ম—গৌড়মগধের প্রথম শাল। তাই 'গোরিং একং'। গৌড়মগধ জগৎজয়ী জীষ্ণু-বিষ্ণু হবে তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে লিপিটির প্রথম পাঠ। Malda—মলদহ, মলদেবের দহই যে মগধ—মলদহই যে একদিন কালীদহ হয়ে যায়, মারতে চায় জীষ্ণু তার সন্তানকে—'মামক' মারতে চায় ভাগিনীয়-কে—তাতে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? প্রথম পাঠে ৰান-শিব দৈত্যকে পাওয়া যাচ্ছে—বৃষভবাহন চন্দ্রচূড়কে, যিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি 'অক্সোনিয়ন', হিন্দুকুশ আর অক্সাসের বৃত্তে বৃত্র-দেশ। সেই দেশের মানুষ যারা তুরস্ক-গ্রীস-মোহেঞ্জোদরোর জন্ম দিয়েছে। তুরস্ক-গ্রীস-ভারত এই ত্রিরাজই পৃথ্বীরাজ, পৃথিবীর সভ্যতার ও ভাষার জন্মদাতা। জন্মদাতা মহাভারতীয় 'রোমকের'—য়ুরোপের।

রামের সঙ্গে যুদ্ধ মানে রামপালের সঙ্গে যুদ্ধ। রামপাল তাঁকে 'সপ্তষষ্ঠী' রূপে পেয়েছিলেন। মূল তাঁদের এক তবু যুদ্ধ। তিনি পশ্চিমাগত রামপাল পৌর্ব্বিক। দিব্যক-রুদ্রকবংশী ভীমের সঙ্গে রামপালের যুদ্ধ—'বোধিসত্ত্ব' বলে আখ্যাত মূর্ত্তিটি ( বাঙ্গালার ইতিহাস—চিত্র নং ২৩ ) যদি রামপাল প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। মহীপাল বা বিগ্রহপাল প্রতিষ্ঠিত হলে এ-যুদ্ধ কর্ণাটকের সঙ্গে। মূর্ত্তির গায়ে অঙ্কিত লিপির পাঠ: "নহসহ সপ্তষষ্ঠীহ" ( নংসং সপ্তষষ্ঠীং" )। পূর্ব্ববাংলায় ষষ্ঠী-ব্রতকথায় ষষ্ঠী সন্তান-সংহারিণী অর্থাৎ সংগ্রাহিনী। মোহেঞ্জোদরোতে এ-ধরণের লিপির ছড়াছড়ি। জৈন-রাজপুতদের ত্রিমূর্ত্তিতে ( মোহেঞ্জোদরোর ত্রিদেব ) শিব বা ব্রহ্ম মূর্ত্তিটির অবিকল মুখমণ্ডল এই শ্মশ্রুল ত্রিবেদী-পৈতাধারী মূর্ত্তিটি বহন করছে। ত্রিশূলের মধ্যশূলটি পদ্মকোরকাকৃতি। সাঁচী-স্তূপ-তোরণ-স্তম্ভ-শীর্ষে এই চিহ্ন



আছে। দিব্য, অশোক-মৌর্য্য ও পালরা একই পারসিক গোত্রের—কেউ তাঁরা বৌদ্ধ নন—জৈন। এই চিহ্নটি 'অষ্টসাহস্রিকা' হয়ে পূর্ব্বচীন 'স্বকা' বা 'স্ত্রিকা'র পরিচয় বহন করে। বাইবেলের নোহবংশ-প্রতিষ্ঠা-জ্ঞাপক মানচিত্রে এর নাম 'সেরিকা'। রামপালের অষ্টসাহস্রিকা পুঁথির পাতায় চৈনিক অক্ষর সুস্পষ্ট ( বাঙ্গালার ইতিহাস চিত্র নং ২২ )। তাছাড়া এক পংক্তিতে পাঁচটি ঈষৎ-মিশ্রিত বাংলা অক্ষর আছে যার পাঠ: 'বজ্রজোগ্নিরা' বা 'বজ্রজোগ্নিরণ'—'বজ্রযোগিনী' নামত এ থেকে নিশ্চয়ই তবে 'মোহেঞ্জোদরো'-ও কিনা তা কে বলবে!

শুধু বাংলাদেশকেই পক্ষী অপবাদ দিলে চলেনা—সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তই এই পাক্ষিক দশায় ছিল। কুরু-পঞ্চাল-খণ্ড বা বক্তৃয়ার বক্তৃতাবাজরাও বাঙালীর মতোই বাজ পক্ষী চিহ্নে চিহ্নিত ছিলেন। বাজ হয়েও মানুষ। উশন হৈব বাজশ্রবস। হর্ষবর্দ্ধনের চোখের দিকে তাকান—নতাক্ষ তিনি। এই অক্ষিটি অক্ষবৎ হয়ে মিনাণ্ডার গলার কলারের শোভাবর্দ্ধন করছে। কর্কট ভঙ্গীও তাকে বলা যায়। উপনিষদে অক্ষর 'অক্ষ্' নামও পাওয়া যায়। 'বক্তৃয়া'-রাজ বক্ষুজ মিনাণ্ডার 'অক্ষীঅজ'-বংশীয় ( বাইবেলে 'নোহ-বংশীয়ের ম্যাপ' দেখুন—এশিয়া মাইনরে 'অক্ষীঅজ'-রা বিরাজ করছেন )। পারস্য-রাজকে বর্জ্জন করে তাঁর বংশ গৌরব নয়। 'পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে' ( শ্বেতাশ্বতর )। তাঁর মুদ্রার অপরপৃষ্ঠেই বজ্রধর পারস্য-রাজ দাঁড়িয়ে আছেন। যে-পোষাকে দাঁড়িয়ে আছেন দাঁড়ি নিয়ে—ঐস্ত্রিক 'সুদস' বশিষ্ঠকে সে পোষাক পড়িয়েছিলেন ( ঋক্‌বেদ )। 'পারস্য-নীপ'-র যে কী মাহাত্ম্য, কেমন বংশবৃদ্ধি ভাগবত-পাঠে তা জানতে পারবেন। মনোযোগে ভারত-ইতিহাস-পাঠ করলেও দেখবেন মকরি-পল্লবরা উড়িষ্যার 'কর'দের সঙ্গে যোগসাজসে 'কর-পল্লব' তৈরী করেছেন। আরেকটু মনোনিবেশ করুন, দেখবেন 'কর'-দের ঈশ নিয়ে কোরেশ-রা আরবে কেমন পূজা-আর্চ্ছার রব তুলেছে। তৎসঙ্গে তাঁদের অসংযমেরও পরাকাষ্ঠা নয়ন-গোচর হবে। এই 'অক্ষীঅজ'-রাই এশিয়া-মাইনরের 'বোঘজকোই'-এ সোম-পায়ী ( চন্দ্র-পায়ী ) ইন্দ্রের ও অশ্বিদ্বয়ের পাত্তা দিয়েছেন। এঁরাই 'অচিয়ন' ( অর্চ্চিয়ন বা অ-চীন )—'অক্রুড' ( অক্ষদ )—'কপ্লড' ( কর্পূরদ—কন্দর্প )—'হিট্টিটেস' ( হিতৈষী-টিট্টিভ )—'অগীয়ন' ( অগীতজ্ঞ ) এবং 'অজীয়ন' ( অজীবন্ত-অজ-পথ ) গ্রীসের জন্মদাতা। 'গিরিশন্ত'-কে হিন্দুকুশ-গিরিশির ছাড়াও শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ ধরে রেখেছেন। উপনিষদের অঙিচ+অক+শীহি=গিরিশন্ত—কে? চৈনিক শীহ, পারস্য শাহ, তক্ষশীলার যক-পুরীর শিখীর সম্মেলন—এ মৌচাকেরই মক্ষিকা। বা চাকার পাখি চাক্+অর=চাকর। দিব্যকের মতোই গ্রীস্ ফুস্-মন্ত্রে সন্ত হয়ে 'গিরিশন্ত' হয়েছিলেন। 'মেডিটেরিনিঅনে' ( মিডিয়া+তরণী+অয়নে অথবা মেদ-তারণ অয়নে ) 'তুফান' ( তুহফণী—Two FAINE´ANT ) আসত পৌষ মাসে। 'গিরিক'রা তাই ভয়ে জুজু হয়ে থাকত। কিন্তু বসন্তে সুরু হ'ত অভিযান-উৎসব, অভিযান-শিক্ষা। 'অজিয়ন'-সমুদ্রে শিক্ষাব্রতীদের শিক্ষা দেওয়া হত ( গ্রীসের ইতিহাস দ্রষ্টব্য )। যেম্নি রামাবতী থেকে মদন পাল, তেম্নি পার্সিপোলিস ( পার্শ্বপালস্ ) থেকে যে 'পেরিকলস' ( প্যারী-কলস ) হ'ল তা কি মদনকুন্ড না হয়ে পারে? সেখানে 'হেলেন' হবেই আর 'হর্ষচরিতে'ও লেখা থাকবে: "তস্মাচ্চ হেলানি রজিতমালবানীকম্ গৌড়াধিপেন···ব্যাপাদিতম্ অশ্রৌষীৎ।"

এপ্রসঙ্গে রমণী-প্রিয় রোমক-রোমানের উপন্যাস তৈরী করা যায়। 'রোমান-কথলিকে'র বার্ত্তাও

বহন করা যায়। 'অব্বোট'-এর উল্টো উদ্ভট-প্রক্রিয়ার কথা আর বলবনা। দিচ্ছি 'দান্তে'র সরাসার সন্দেশ। তাঁর 'ইনফার্ণো' বর্ণনায় বাংলা-ভাষা শুনুন :

"সোম্ম সপিএঞ্জ এ'ল প্রিমো অমোর"
'সোম সঁপিয়া এলো প্রিয়ম ( প্রথম ) অমর'—প্রিয় স্বর্গ ত্যাগ করে এলো সোম ( প্রথম )।

অব্বোটের প্রক্রিয়ায় 'সোম' প্রথম এঞ্জেল সয়তান হয়ে স্বর্গত্যাগ করলেন। বেদে তিনি 'যম', আবেস্তায় 'জম'। দান্তের ভাষায় 'জলাঞ্জলি' কথাটারও উৎপত্তি দেখা যায়। পুরাতত্ত্ব-আলোচনায় এ-দৃঢ় প্রতীতিই সবার হবে যে বাংলা বর্ণ-ধ্বনিতে পৃথিবীর সব ভাষার ধ্বনি বিধৃত এবং বাংলালিপিই মানব-সভ্যতার আদি সংহত লিপি। তাছাড়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও দেখা যাবে বাংলা আদি-রিপু কামকে ( মার-কে ) প্রথম সংযত করেছে—মদনকে দমন করেছে—মদন ভস্ম হয়েছে ধূর্জ্জটির নেত্র-বহ্নিতে। সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যাবে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় বাংলাদেশে।

মোহেঞ্জোদরোর একটি তিব্বতী-লিপির পাঠ এখানে দিচ্ছি যেখানে তথাকথিত হর্ষবর্দ্ধনের হস্তাক্ষরের 'স'-লিপিটি হুবহু উৎকীর্ণ। মার্শালের পুস্তকের ১১৫ পৃষ্ঠা ৫৫৯-সংখ্যক প্রস্তর-ফলকের চিত্রের গায়ে যা উৎকীর্ণ তার ধ্বনি এই হবে :

| প্রথম অক্ষর | দ্বিতীয় অক্ষর | তৃতীয় অক্ষর | চতুর্থ অক্ষর |
|---|---|---|---|
| চক্রবৎ ঋ=চক্রবর্ত্তি<br>বটব্অল<br>=বটব্যাল<br>তবহ ( ক )<br>তবব<br>বত ঋ=বর্ত্তী<br>বক, ব্ব<br>থিটাব, থিব | দ্বি, দুই, নন<br>তু, টু, টুহু<br>প্রভৃতি | যব, ব্য,<br>স্ব, স, ব | পঁ, চএ। |

একে 'থিবটু বচএ', 'বকদ্বিযবচএ' প্রভৃতি অগণতি ধ্বনিতে ব্যঞ্জিত করা যায়। এই লিপি বাংলা-লিপিতে এক অক্ষরের এক ধ্বনি বিধানে নিয়মিত হয়েছিল। সেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল দনুজ রায়ের এলাকায়, 'চাটিগ্রামে' আল-আউলের পয়ারে।

আর বাক্-বিস্তারে প্রয়োজন নেই। আমার শেষ মন্তব্য এই যে আদিযুগের স্ত্রীপুরুষের অবাধ যোনাচারই যে ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনের জন্মদাতা এই পরম সত্য মোহেঞ্জোদরোর তথা বাংলার মারফৎ ভারতীয় ইতিহাসের ঘোষণা।

"ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির যজত্রাঃ স্থিরৈর অঙ্গৈস্ তুষ্ট উবাংস সব্যশেম তনূভিঃ দেবহি তম্যদা আয়ুঃ॥" শান্তিপাঠ—মাণ্ডূক্য।

# কবিতাগুচ্ছ

## বর্ণ-সঙ্গিনী

অমল দত্ত

এত রঙ নিয়ে এলে চোখে—
এত হাসি নিয়ে এলে ঠোঁটে !

বলতে পারিনি একটি কথাও মোটে
খয়েরি চুলের এলে যে সুরভি ছেয়ে
বলতে পারিনি ধার নেব কী না চেয়ে
শুধু যে হৃদয় ধূসর রিক্ততায়
গুমরে উঠেছে অনাহূত বেদনায়

পথে পথে শুধু কুড়িয়ে ফিরেছি দেনা
সফল হয়নি তোমায় আমায় চেনা
সরমে মরমে মরিয়া হয়েছি মেয়ে,
কৃপণের মত ঢাকতে চেয়েছি পেয়ে
তুমি যে আমার হারানো দলিল খানি
কলমে কাগজে ছিল যবে জানাজানি
তুমি যে রয়েছো ভয়ে বুক দুরু দুরু
ক্ষুধার্ত মন তাণ্ডব করে শুরু

পারিনে বাড়াতে আমার দু'খানি হাত
কাঙালের মতো কাটিয়ে দিয়েছি রাত
স্বপ্ন ভেবেছি তোমার গুঞ্জরণে
যা কিছু বলেছো আউড়ে চলেছি মনে
বলতে পারিনি শোনো গো রঙিন মেয়ে

ধন্য হয়েছি তোমারে নিকটে পেয়ে
ভুখী হৃদয়ের আকণ্ঠ তৃষা নিয়ে
তোমার রঙে ত রঙিন হইনি প্রিয়ে

শুধু যে ঈর্ষা দগ্ধ করেছে দেহ
আমি কি তোমার অথবা অন্য কেহ
শুধু যে শঙ্কা,—আমার ফসল ভার
জোর করে কেউ করে যদি অধিকার

একটু প্রলাপ একটু বসন্ত গান
কে দেবে আমায় কে দেবে পরিত্রাণ
বলতে পারিনি বেঁধে যে বাহুর পাশে
নব জীবনের জয়ের জোয়ার আসে।

আজ তুমি নাই !—বিরহের রচি গান
তোমায় আমায় সিতারার ব্যবধান
ক্ষণিক তুফানে জীবন যে ছারখার
একটু স্বপ্নের নেই বুঝি অধিকার।

## ছুটির দুপুর

নৃপেন্দ্র সান্যাল

চল না এখন সহর সীমায় গাছতলাতে,—
ছায়ার ফসল কুড়োই চল না ক্লান্ত হাতে।

ময়লা আকাশ নীল হল মেঘ গিয়েছে সরে,
শ্বাসটানা রোদে এসো না তা দেখি দু'চোখ ভরে।
ঘাসের পাখায় সূর্যের লাল স্বর্ণ লাগে
তুমি তার কিছু গালে মেখে নাও পূর্বরাগে।

শীর্ণ সজ্জা ছেড়ে দিয়ে নীল আকাশ আবার
সূর্যের কাছে বুড়ি ছোঁওয়া দেয়। হার মানবার
লজ্জা ঢেকেই মেঘ কি এখন উষ্ণ হাওয়ায়
রৌদ্রের এই উজ্জ্বল টুপি দিয়েছে মাথায় ?

আমরা এখন একবাস লোক, সহরতলী।
আমাদের কেউ বাইরে তাকিয়ে, কেউ কথা বলি।
দ্রুত গাড়ী চলে আঁকা বাঁকা এই লাল রাস্তায়
দু'পাশে সবুজ ঘন মাঠ ঘোরে চাকায় চাকায়।

আমাদের গাড়ী বাঁক ঘুরে বামে পথের মাঝে,
অকারণে কেউ দৃষ্টি ফেরাই মিথ্যে কাজে
বাসের ভেতর নিমেষ তাকাই। ছল করে বুঝি
অন্য কাহারো চোখের কিনারে প্রশ্রয় খুঁজি।

এয়ারড্রমের বাঁকা পথে যেই গাড়ী থামল,
হুল্লোড় করে সবে নেমে পড়ি। কে আর জানল

আমরা তখন কোথায় তাকিয়ে। ( বৃত্তাকারে
আর সবে জড়ো। ) ঝাউ-ছায়া খুঁজি মনের দ্বারে।

একসারে বসে চায়ের আসরে রেঁস্তোরার।
পেছনে প্লেনের ওঠানামা। যেন এ জানালার
ফ্রেমে আঁটা ছবি। সিগারেট ধোঁয়া হাত ছুঁই ছুঁই
সার্সির পরে শুধুই ছড়ানো কুয়াসার জুঁই!

চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ হলে শিমুল তলায়
কবিতা পাঠ, কি আলাপ গল্প। কেউ গান গায়।
কারো মাথা নীচু, কুটি কুটি ছেঁড়ে কেউ ঘাস-ফুল,
আড়চোখে চেয়ে ফড়িঙেই ভয়? এ কেমন ভুল!

দিন গায়ে মাখে বৈকালী রঙ। মেঘমেদুর
প্রহর ক্লান্ত। ঠাণ্ডা হাওয়ায় সবুজ চূড়
উর্মিল প্রাণ; দল বাঁধে মেঘ অন্ধকারে।
তবুও কি খুঁজি, তারা-ঘন দুই চোখের পারে

কৃষ্ণচূড়ার তলায় আমরা এসে দাঁড়ালাম।
ভুরু কি বাঁকল উড়ু চুলে যদি মুঠো ভরালাম।

## আসঙ্গের পতঙ্গ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

কে যেন পতঙ্গ হ'লো
—এই কথা এসেছে আকাশে
সমস্ত সকাল ধ'রে খালি মনে হয়
কে যেন পতঙ্গ হ'লো
—এই কথা ভেসেছে বাতাসে
যেন কোনো আত্মজ সহজ প্রত্যয়!
কোথায় জানিনে তবু জানি নিশ্চয়
কে যেন পতঙ্গ হ'লো
এ বিরাট পৃথিবীর গূঢ় কুক্ষিকোণে
বস্তুর ব্যত্যয়ে আর কী যে মায়াগুণে
কে যেন পতঙ্গ হ'য়ে কানে গেলো বুনে
ফুলের ভাষার যতো অসীম বিস্ময়!

সমস্ত সকাল ধ'রে আ-দিগন্ত যেন মনে হয়
কে যেন পতঙ্গ হ'য়ে এসে গেছে মনে—
উড্ডীন কথা, হাসি, সুর-ছন্দোময়!
একটি পতঙ্গ সুধু একদার স্বর্ণিল সকালে
জানিনে কো কে তাকে পাঠালে;
নবজাত কী আশ্চর্য বোধের ঔরসে
পরিপ্লুত মানসের ক্ষেত্রজ সন্তান
তীরের মতন হ'য়ে সোজাসুজি এলো ছুটে
আমাকে সে করলো কি এ শর-সন্ধান?

রাত্রের ঘুমের শেষে, স্নিগ্ধ ভোর,
ভোরে ঘুম ভাঙানিয়া গান—

সমস্ত সকাল ধ'রে, শব্দ করে···
শুনি আর কী আবেশে ভ'রে যায় প্রাণ!
বন্ধু হয় পরিপার্শ্ব, বন্ধু হয় সকালের রোদ—
একটি পতঙ্গ দিয়ে হ'লো যেন ক্রূরতার আশ্চর্য নিরোধ
বিসদৃশ জীবনের এই রসায়নে
মিটে যায় ক্ষোভহীন সকল বিরোধ।
তবুও পতঙ্গ ডাকে; মননের ফাঁকে-ফাঁকে কেঁপে ওঠে মন
বাঁশের পাতার মতো; শির্-শির্-শির্-শির···
তন্মুক্তীর্ণ তার শিহরণ!
অনেক পাতার ফাঁকে···ঝিলিমিলি এক ঝাঁক পাতা··
কে ও ডাকে? যুক্তি দিয়ে কেউ বোঝে না তা'···
তবু ডাকে; ডাকে বুঝি? কোথায়? কখন্?

বিস্ফারিত তবু ডাক—'শোনো শোনো গোনো গোনো ঢেউ
মহাকাল ঝোড়ো সুরে
দূরে কোথা যায় উড়ে
তুমি তবু আছো কুঁড়ে
অভাবিত এ প্রাপ্তিতে আর নেই কেউ।'

## সাদা রাতের গান

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আর একবার শুধু পাপ্‌ড়ির মত সাদা হাত
একটু আমাকে দাও, দেখছোনা রোশ্‌নাই রাত?
হৃদয়ের সাড়া পেয়ে বিস্মিত চোখেরা কথা বলে,
দেখছোনা লঘু হাওয়া জ্যোছনায় দ্রুতগতি চলে?
ঝলমলে এই রাত হাঁসের পালকে মাখামাখি,
রোজ-ই আসে না কাছে, তাই ত এ রাত মনে রাখি—
ঢেউয়ের মতন ভাসে—হঠাৎ কখন ম্লান হয়,
স্মৃতির শামুক শুধু চড়ায় বালুতে পড়ে রয়।



নেমে এল এই রাত—খড়ি-গোলা সাদা ধব্‌ধবে।
আঁচলের কুয়াশায় হাতখানি খুঁজে নিতে হবে?
অজানা রহস্য-চূড়া নানা ভাঁজ শরীরের কোণে
দুধ-সাদা হাতখানি ঈপ্সিত ইসারা জাল বোনে।
হাওয়া কাঁপে, ঝরে যায় মুক্তা—ঢের শিশির পাতার,
মোম-গলা হাতখানি দেবে নাকি আর একবার?

## শেষ হ'লো

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শুধু ভাবি শেষ হ'লো; আরো এক ক্ষিপ্রগতি দিন
ঝরে' গেলো বিনিঃশেষে জীবনের বন্ধ্যাপ্রান্ত থেকে
উন্মুক্ত কালের স্রোতে; সারাক্ষণ শ্রান্তি ক্লান্তিহীন
কেবলি নিঃশেষ হওয়া, বিসর্পিল চলে এঁকে বেঁকে
বিক্ষুব্ধ সংসারস্রোত, দিনশেষে বেগে রাত্রি আসে
উন্মত্ত জন্তুর মতো, শেষ হওয়া, শুধু শেষ হওয়া—
কালের চাকার নীচে পিষ্ট হওয়া, ভোরের আকাশে
নক্ষত্রের মতো শুধু লুপ্ত হওয়া আর সয়ে' যাওয়া

জীবিকার তীব্র কষা। ক্লান্ত দিন যেই ক্ষয়ে যায়
অমনি চমকে উঠি, পাখীর ডানার থেকে কেউ
টেনে নিল একটি পালক,—বেঁচে থাকি শূন্যতায়
গুরুভার বুকে নিয়ে; আর ভাবি কোনো ঝড়ো ঢেউ

কবে এসে শ্রান্তিক্লান্তি মুছে নেবে বিনিঃশেষে সব,
অনেক জ্বরের শেষে জাগাবে প্রাণের কলরব?

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

### প্রথম পরিচ্ছেদ

১

প্রমীলার স্বভাব মন্দ ব'লে কপাল মন্দ নয়। জীবনে তার নিজের বুদ্ধিতে যা যা সব চাইতে কাম্য ব'লে মনে হ'য়েছিলো সবই সে পেয়েছিলো। জন্মেছিলো ধনবান পিতার ঘরে। সেখানে তার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য ছিলো। পিতার অপরিমিত প্রশ্রয়ে তার স্বভাবতই—হিংসুক স্বভাব, ঝগড়ার প্রবৃত্তি এবং অন্ধ স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনের যাবতীয় ক্লেদ সংসারে সকলকেই পীড়িত করতো। কেবলমাত্র যারা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবশত তার নিকটতম আত্মীয়রূপে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলো তারাই যে উৎপীড়িত হ'তো তা নয়, প্রমীলার মাও অত্যন্ত অসুখী ছিলেন।

প্রমীলার আগে আরো তিনটি শিশু জন্মেছিলো সেই বাড়িতে। একটি কোনো এক বসন্তের সকালে, একটি শীতের উত্তপ্ত দুপুরে, আর একটি শরতের শেফালি-ঝরা সন্ধ্যায়। প্রথমটি অন্ধ হ'য়ে এসেছিলো, পৃথিবীকে সে দেখেনি। মা মৃতপ্রায় হ'য়েছিলেন এই সন্তানের জন্ম দিতে, কাজেই তার এক সপ্তাহের ক্ষণিক জীবনে মাতৃসুধা পান ক'রেও দেখেনি তার আস্বাদ কেমন। এই দাইয়ের হাত থেকে ঐ দাইয়ের হাতে, এই মাসীর কোল থেকে ঐ পিসীর কোলে যেতে যেতেই শেষ হ'য়ে গেল। দ্বিতীয়টি ছিলো সতেরো দিন। রোগা, ছোট্ট, জীর্ণ-শীর্ণ এইটুকু একটা ছালছাড়ানো পাখীর মতো। যে ক'দিন রইলো অবিশ্রান্ত কাঁদলো, তারপর হঠাৎ কান্না থামলো একদিন। একটু লাল হ'লো, একটু নীল হ'লো, একটু যেন হাসলো যাবার আগে, তারপরেই স্থির। পথ ভুল ক'রে বুঝি পরের ঘরে এসে পড়েছিলো, এইবার রাস্তা চিনে চলে গেল আপন ঘরে। এরপরে প্রমীলার মা শয্যা নিলেন। চেষ্টা করলেন যাতে আর কোনো শিশু না জন্মায় তাঁর গর্ভকোষে, তাঁর স্বামীর দূষিত রক্তে। তাঁর অশান্তিময় জীবনে আর যেন অশান্তি না বাড়ে, কিন্তু যজ্ঞেশ্বর কনট্রাকটার স্ত্রীর সব আপত্তি ভাসিয়ে তার পরের বছরই আরেকটি সন্তান উপহার দিলেন। বললেন, 'একটু হাসো, একটু খুসীতে থাক, ডাক্তারের কথামতো খাও-দাও। তোমার জন্যই তো এরকম সব রুগ্ন শিশুর জন্ম হয়।'

'আমার জন্য?' বাঁ-চোখের ভুরুর একটা দিক তুলে স্ত্রী এমন ক'রে তাকালেন যে



যজ্ঞেশ্বরবাবুর ছোটো ছোটো লাল-লাল করমচার মতন চোখ পিটপিট করতে লাগলো। দশমাস পরে আরেকটি মৃত সন্তান জন্মালো তাদের।

প্রমীলার সম্ভাবনা হ'লো তার পুরো এগারো বছর বাদে। এতোদিন পরে আবার কেন? এই প্রশ্নটি তার মা—অনেকদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে জিগ্যেস করেছেন কী জানি কার উদ্দেশ্যে। আলস্যে, অবসাদে, খারাপ লাগায় শরীর ভেঙে পড়েছে তাঁর। রাত দু'টোয় গৃহ প্রত্যাগত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বোবা হয়ে গেছে সব ইচ্ছে, সব সাধ। মাতৃত্বের ক্ষুধা তার মিটে গিয়েছিলো। বিবাহিত জীবন তাকে নিয়ে যে বঞ্চনা করলো, গর্ভস্থ সন্তান যে তার পাদপূরণ ক'রে দেবে না এটা তিনি প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়েই বুঝেছিলেন। তা ছাড়া, যে আসবে সে যে তার পিতারই পুনরাবৃত্তি হ'য়ে আসবে না তার কি কিছু স্থিরতা আছে? সেই সন্তান দিয়ে আবার কার জীবনে তিনি নিজের জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখবেন? না, শত্রুর জন্যেও সেই কামনা তিনি করেন না।

যজ্ঞেশ্বর কিন্তু ভীষণ খুসী হ'লো। জান বাঁচানোর মতোই মান বাঁচানোর একটা তাগিদ অনুভব করছিলো সে ভেতরে ভেতরে, তাই সন্তান দিয়ে আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে রইলো। তার নীরন্ধ্র কৃপণ মুঠো এবার 'হাঁ' হ'য়ে গেল স্ত্রীর যত্নে। কনট্রাকটরি ক'রে রোজগার করে সে দু'হাতে, কিন্তু জমায় দশহাতে। একটি পয়সা তার এ-পাশ ও-পাশ হবার উপায় নেই। আর সেই সঞ্চিত টাকায় দমদমের নির্জন মাঠ লিজ নিয়ে বস্তি বসিয়েছে আধমাইল জুড়ে, ভাঙাচোরা একতলা পৈতৃক বাড়িকে তেতলা ক'রে পাঁচ ঘর ভাড়াটে বসিয়েছে, নিজে সেই একতলাতে থেকেই,—লরি কিনেছে তিনটি, বারো মাস ভাড়া খাটছে। নিজের জন্যেও একটা ঝরঝরে গাড়ি কিনেছে কার দুর্গতির সুযোগে। তাছাড়া, ফাঁকে-ফিকিরে আসবাবপত্রও কিনেছে কিছু। আর কিনেছে সোনা। ভারি ভারি গয়না গড়ানো হ'য়েছে তাই দিয়ে স্ত্রীর জন্য। কিনেছে সাঁচ্চাজড়ির বহুমূল্য শাড়ি। বিয়েচুড়োয় যেতে আসতে সে-সব খুলে দেয় স্ত্রীকে, পরতেই হয়। একগা' গয়না পরে রোগা ছোট্ট মানুষ ধুঁকতে থাকে, ভারি, খরখরে জরির বেনারসিতে বেলা দুপুরের রোদ্দুরে গা চুটমুট করে।

কিন্তু উপায় কি? যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী না সে? তার স্বামীর টাকা আছে না? আর সেই টাকা তো তার শরীরেই ফুটে বেরুবে। এমনিতে বাড়ির আঠপৌরে ব্যবস্থাটা একেবারে নিম্নতম। হেঁটো শাড়ি আর গিল্‌টিচুড়ি পরেই জনম গেল। আর অশন তো অর্ধাশন। বাজে সৌখিনতা যজ্ঞেশ্বরের দু'চক্ষের বিষ। বাড়ির মধ্যে দেখতে আসছে কে? খালি গায়েই থাকো আর সোনার জামা-ই পরো, দু-ই-ই সমান। সেটা অবিশ্যি সত্যি। যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে লোক আসাটা নেহাৎ বিরল। সেটা সে পছন্দ করে না। লোক এলেই অপব্যয়। স্ত্রী তার লক্ষ্মী নয়, বাজে খরচের দিকেই নজর বেশী। কে জানে লুকিয়ে-চুরিয়ে হয়তো

পাঁচ কাপ চা-ই তৈরী ক'রে দিল। ঘরের চিনি, ঘরের দুধ পরের পেটে পাঠিয়ে কী যে লাভ কে জানে! প্রত্যেকদিন বাজারও করে না সে। পাঁচকাঠা জমি জুড়ে তার লাউ কুমড়োর ক্ষেত আছে, পুঁইয়ের মাচা আছে। বিক্রী করেও প্রচুর থাকে তাদের খাবার মতো। মাছেই তো বাজারে আসল খরচ, তাই নিয়ম ক'রে সপ্তাহে তিনদিন ছোটো ছোটো কুঁচো চিংড়ি, কি ছোটো ট্যাংরা আসে, সেদিন প্রায় ভোজ। দুধটা অবিশ্যি খায়। ঘরের গরু আছে চারটি, জল মিশিয়ে বেশীর ভাগ বিক্রিতে গেলেও নিজেদের জন্য বরাদ্দ আছে—খানিকটা। নিজে সে দুধ ভালোবাসে। ঐশ্বর্য তো ভোগের জন্য নয়, ঐশ্বর্যের কাজই হ'লো স্থির হ'য়ে থেকে অন্যের বুক-ফাটানো, চোখ-টাটানো, তোমরা শোন, তোমরা দেখ, তোমরা সবাই জানো আমার ঘরে এই আছে, ঐ আছে; অত ভরি সোনা আছে, অত টাকা নগদ আছে, কত সব আসবাবপত্র আছে ঘর ঠেসে।

সেই যজ্ঞেশ্বর দামী দামী ওষুধ খাওয়াতে লাগলো স্ত্রীকে। মাছ না খেলে প্রোটিনের অভাব হয়, আসতে লাগলো মাছ, ফল খেলে পেটের শিশু সুস্থ থাকে, আসুক ফল। একতলার স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর ডাক্তারের পছন্দ না, আচ্ছা চলো দোতলায় থাকি। আস্তে-আস্তে নিবিড় মেঘের ফাঁকে-ফাঁকে কখন যেন প্রমীলার মা'র মনেও রোদ উঠলো একটু, মমতার রোদ। মাসের পর মাস বহন করতে করতে মনে-মনে বললেন, 'আসছে আসুক। যেন আর আমাকে ছেড়ে না যায়, যেন বেঁচে থাকে কোলজুড়ে, বুকজুড়ে।' স্বামীর কথামতো, ডাক্তারের কথামতো প্রত্যেকটি পা ফেললেন দশমাস ধ'রে। তারপর কোনো এক অসম্ভব দুর্যোগের মধ্যরাত্রে কঁকিয়ে উঠলেন অসহ্য যন্ত্রণায়। বিদ্যুতে, বর্ষণে, মেঘগর্জনের গম্ভীর নিনাদে, ঝড়ের দাপাদাপিতে মনে হ'লো কালো কুচকুচে অন্ধকার রাতটি বুঝি সেদিন ভেঙে পড়বে আকাশ শুদ্ধু। পৃথিবী নামে কোনো কিছুরই আর অস্তিত্ব থাকবে না,—পৃথিবী মুছে যাবে, ধুয়ে যাবে, চারদিকে থাকবে শুধু জল, জল, আর জল। এতোদিন পরে, এতো ইচ্ছের পরে সন্তান আসছে—তা নাকি এই দিনে? এইভাবে? যজ্ঞেশ্বর একেবারে ছুটোছুটি করতে লাগলো। কোমরে একটি ছোট বটুয়া গুঁজে কতোবার চেষ্টা করলো একবার বেরুতে, একজন ডাক্তার আনতে, অসম্ভব। বন্ধদরজা ভেঙে ফেলছে ঝড়ের ধাক্কা, দরজা খুললে কি আর রক্ষা আছে?

বাতাসের শিষ্ শুনতে শুনতে হাত পা এলিয়ে এলো প্রমীলার মা'র। কী ভাগ্য তাঁর! 'দাও, দাও,—যে আসছে আসতে দাও তাকে, হে ঈশ্বর, তুমি তাকে পাঠিয়ে দাও তার মা'র বুকে।' যত কাঁদলেন যন্ত্রণায়, তত কাঁদলেন প্রার্থনায়। ঈশ্বর শুনলেন সেই প্রার্থনা। গর্ভের অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে এলো শিশু, মাকে বিদীর্ণ ক'রে—নিজে থেকেই এক সময় বেরিয়ে এলো পৃথিবীর আলো-হাওয়ায়। ডাক্তার তো দূরের কথা, একটা



দাই না পর্য্যন্ত, দূর সম্পর্কের একজন আশ্রিত বৃদ্ধা আনাড়ি হাতে নাড়ি কেটে বিভক্ত ক'রে দিলো মা আর শিশুকে। কেঁদে উঠে আপন অধিকার সাব্যস্ত করলো সদ্যোজাত কন্যা।

ছ' মাসে ঘটা ক'রে মেয়ের মুখে ভাত দিলো যজ্ঞেশ্বর। নাম রাখা হ'লো প্রমীলা। একবছরের জন্মদিনে রাজ্যের লোক জড়ো হ'লো বাড়িতে। কোলে ক'রে সগৌরবে সে ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগলো তার সুস্থ সবল সন্তান। এই পিতৃত্ব কি ইচ্ছে করলেই সকলে ভোগ করতে পারে? সেই কি পেরেছিলো এগারো বছর আগে।

শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে প্রমীলা সতেরো বছরে পা দিল। প্রবল দাপটে—সতেরো বছর বাপের ঘর করলো, এইবার একটা খুব ভালো সম্বন্ধ এলো তার। কী এক অজানা ভয়ে মা'র বুক কেঁপে উঠ্‌লো। এই ক' বছরে প্রায় বুড়ো হ'য়ে গেছেন তিনি। স্বামীর রাজত্বে যদি বা কিছু স্বাধীনতা ছিলো, মেয়ের রাজত্বে এসে একেবারে চোরেরও অধম। হাজার হোক, সন্তান তো, ভালো তো বাসেন, ভালোমন্দের কথা কিছুতেই না ভেবে পারেননি, আর যতবার কিছু করতে গেছেন বা বলতে গেছেন ততবারই ধাক্কা খেয়েছেন জোরে। প্রমীলা লেখাপড়া শিখুক এটা নিয়েই হ'লো তার প্রথম যুদ্ধ। বলাই বাহুল্য সেখানে তিনি সর্বতোভাবে হেরে গেলেন। লেখাপড়ায় প্রমীলার মাথা ছিলো না, প্রমীলার বাবাও সেটাকে একটা খুব জরুরী কিছু ব'লে গণ্য করতেন না জীবনে। অতএত প্রায় বাল্যশিক্ষাতেই শিক্ষা সমাপ্ত হ'লো। তারপর মন দিলেন স্বভাব সংশোধনে। শাসন করতে চাইলেন একটু-আধটু, বললেন, 'একি ভালো? এই আদর তো আদর নয়, শত্রুতা।

যজ্ঞেশ্বর চোখ পাকালো, 'থামো, থামো। শিক্ষয়িত্রীগিরি রাখো তোমার। কেন, করেছে কী শুনি?'

'তুমি কি দেখতে পাও না? ওর ত্রি-সীমানায় একটা লোক ঘেঁষতে পারে না, কাউকে এতটুকু জিনিস দিতে ওর প্রাণে সয়না, প্রত্যেকের সঙ্গে ওর ঝগড়া, মারামারি, কাউকে ওর পছন্দ না, কিছুই ওর কাছে ভালো না'

'সকলের সঙ্গে মেলামেশা আমিও পছন্দ করি না। কেন সব মরতে আসে আমার বাড়িতে? কেন মিশতে আসে আমার মেয়ের সঙ্গে?' মা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। এই তো, এই আশঙ্কা-ই তো তিনি ক'রেছিলেন। তিনি তো জানতেনই এই-ই হবে তাঁর অদৃষ্টে শেষপর্যন্ত। মেয়েই তো তার পিতার চেহারাই নয় শুধু, চরিত্রটিও ঠিক ব্লটিংয়ের মত শুষে নিয়েছে। স্তিমিত স্বরে বললেন, 'এভাবেই কি জীবন যাবে? বড়ো হয়েছে, পরের ঘরে কি যেতে হবে না কোনদিন?'

'পরের ঘর? পরের ঘরে কোন্ ব্যাটার এমন সাধ্য আছে যে আমার মেয়েকে কিছু

বলবে? টাকা! টাকা! বুঝলে? আমার টাকার অনেক জোর। আমার যে সবই ওর, তা কি কেউ জানবে না?'

'টাকাটাই কি সব? মানুষটার কি কোনো মূল্য নেই? ভালোবাসার কাছে কি—'

স্বামীর এক ধমকে কেঁপে উঠে থেমে গেলেন—'থিয়েটারের মেয়েদের মতো ভালোবাসা ভালোবাসা কোরো না! ন্যাকামি!'

মেয়েও তারপর থেকে মা কিছু বললেই—তাঁকে চড়ে চাপড়ে অস্থির ক'রে দিয়ে, নেচে-কেঁদে পাড়া মাৎ ক'রে ছুট্‌তো—বাবার কাছে নালিশ জানাতো।

এই মেয়েকে তিনি ক'ার ঘরে দেবেন? কা'র ঘাড়ে গছাবেন? ভাবতেই তার প্রাণ কেমন ক'রে ওঠে। সম্বন্ধটা এনেছিলো যজ্ঞেশ্বরের এক দূর সম্পর্কের বিধবা মামী। ঘটকালিই তার জীবনের প্রধান ব্রত, প্রধান পেশা। ঐ পক্ষ ও তার ভাইয়ের দেশের কুটুম্ব। যাতায়াত আছে, ঘনিষ্ঠতা আছে, কাজেই অসুবিধে হ'লোনা কিছু। তারপর পৌষমাসের কোনো এক দুর্জয় শীতের অকাল-বর্ষণ রাত্রির শেষভাগে অদৃষ্টের জোরে চমৎকার বিয়ে হয়ে গেল প্রমীলার। জন্মদিনের মতো সেদিন ঝড়ের দাপটা ছিলো না, কিন্তু ভোররাত্রি থেকেই অবিরল বৃষ্টিতে পৃথিবীর কান্না যেন নেমে এসেছিলো সেই উৎসব দিনে। কে আসবে আর? আর কী-ই-বা ব্যবস্থা হবে। যজ্ঞেশ্বরের গোঁফের ফাঁকে হাসি চিকচিকোলে।

বেড়ালভেজা হ'য়ে সুনির্মল একা একাই একমাত্র অভিভাবক তার পিতাকে সঙ্গে ক'রে এসে বিয়ের পিঁড়িতে বসলো।

যজ্ঞেশ্বর যত খুসীই হোক, প্রমীলার মা'র আরেকটি আকাঙ্ক্ষায় ছাই পড়লো—। জামাইয়ের অনিন্দ্যসুন্দর (অন্তত তাঁর চোখে তাই লেগেছিলো) তরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ভ'রে জল এলো তাঁর।

এমন চমৎকার ঘরে-বরে বিয়ে হ'লো মেয়ের অথচ একটি পয়সা খরচ হ'লো না, একথা যতবার ভাবলো যজ্ঞেশ্বর ততবার সে নতুন ক'রে মেয়েকে আরো বেশি ভালোবাসলো। সুনির্মলের বাবা পণ নেননি ছেলের বিয়েতে। মেয়ে দিচ্ছেন ভদ্রলোক তারচেয়ে বেশি মূল্যবান আর কোন্ জিনিস তিনি আনতে পারেন নিজের ঘরে? যজ্ঞেশ্বরের মামী বলেছিলেন, 'বড়লোকের মেয়ে, রাগ-চাপ দিলে রাজেনবাবু ভালো হাতেই পেতে পারেন কিছু। ছেলে তো তার কম উপযুক্ত নয়? এম. এস-সি পাশ, ভালো চাকরি পেয়েছে, বয়স অল্প, চেহারা সুন্দর, নন্দগ্রামের বিখ্যাত কুলীন, বাপ পদস্থ চাকুরে, ঠাকুরদারও যা হোক কিছুতো আছে দেশে গাঁয়ে—কোন্‌দিকে খাটো। ভদ্রমহিলা আসলে বানরের পিঠা-ভাগের পার্টটা নিয়েছিলেন। এ পক্ষ ও পক্ষ দু'পক্ষ থেকেই তা হ'লে মোটাসোটা জোটে কিছু। রাজেনবাবু জিব কাট্‌লেন। বেশ তো, ওঁর যদি টাকা থেকেই থাকে সেতো খুব ভালো কথা।



বড়োঘরের মেয়ে হওয়াই তো বাঞ্ছনীয়। স্বচ্ছলতার মধ্যে বড়ো হ'লে মন উদার হয়, মেজাজ ভালো হয়, কিন্তু সে টাকায় তাঁর দরকার কী? তাঁর তো কোনো অভাব নেই। এবার মামী গয়নার কথা পাড়লেন। গয়নার তিনি কী বোঝেন। হিরণ্ময়ীর সঙ্গেই বরং সে বিষয়ে কথা হোক। হিরণ্ময়ী হাসলেন। ছেলে বিয়ে দিচ্ছি বলে কি মাথা কিনছি নাকি ভদ্রলোকের? না, না ওসব কিছু কড়াক্কর নেই আমাদের। তাঁর মেয়ে, তাঁর যা খুসী তাই দেবেন। আমাদের মেয়ে পছন্দ হ'য়েছে, ব্যস্। এর উপরে আর কথা কী? বাসন-কোসন, আসবাবপত্র সব সম্বন্ধেই তাদের ঐ এক কথা। সবেতেই তাদের সংকোচ। যজ্ঞেশ্বরের মামী ভাগ্নের কাছে গিয়ে একেবারে আছড়ে পড়লেন, 'দেখলে? দেখলে তো কী সম্বন্ধ ক'রে দিলাম তোমার মেয়ের? একটি কড়ি খসাতে হ'লো না। তারপর একটু ঠাট্টা করলেন নাতনীর থুতনি ধরে 'ভালো ক'রে ঘটক বিদায় দিস্‌লো।' প্রমীলা ভ্রুকুটি দেখিয়ে একটা ঝাপটা মেরে স'রে গেল দরজার ধারে।

বরপক্ষ নিজে থেকেই যখন চাইছে না তখন আবার দেয় কেমন ক'রে? ওসব সাধাসাধি ভালোবাসে না যজ্ঞেশ্বর। যা নেহাৎ না দিলে নয়, যেমন একসেট বিছানা, একটা ছাতা, একটা লাঠি, একটা সরু সুতোর নালের মতো আংটি, এই রকম কয়েকটা দানসামগ্রী দিয়েই সব ল্যাঠা চুকোলে। ঈশ্বর দয়া করলেন, বৃষ্টি নামলো, আলো নিবলো, উনুন গললো, পৃথিবী ঠাণ্ডা হ'লো, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'লো। যৎসামান্য যা-কিছু আয়োজন করেছিলো সেই রাত্রে তা তেমনি পড়ে' থেকে পরের দিন বাসি-বিয়ের খরচ চালালো। রাত দু'টো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সে সব বিয়ের রাত্রে নিজেই ভালো ক'রে গরম-টরম করিয়ে রেখেছিলো। বাসিভাত বৈবাহিকের পাতে তুলে দিতে পরের দিন আপত্তি ক'রেছিল বলে স্ত্রীকে কেবলমাত্র ধাতানিই দিলো না, ঝাঁকানিও দিল।

**অহুনভৈতি**

**অক্সনভইতি**

দুই-দ্বৌ-স্বর্গ-রজ

'উন্মাজ্‌দহ' আমি বহুমন, অজ, ঊর্ম্মিজ তোমার ঊর্ম্মি-দহন করি যে বহন।
তুমি দাও, দি'ক 'অশ' এ-আশীষ বিশ্বরূপের, অপ্সরলোক মহন।
অশের এ-দান অশেষ ট্রৎস সদভিলাষীরা ভালোবেসে করে চয়ন॥

# অনুত্তর

## সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

সেণ্টপল্‌স্ গীর্জার পাশে ঘূর্ণমান জগতের নিয়ম নিয়েই সে রাতটাও নামল। এতে কোন বৈচিত্র্য ছিল না হয়তো।

বিকেলের দিকে সন্ধ্যার মুখোমুখিতে গীর্জার ঘেরা-দেয়া প্রাচীরাভ্যন্তরে মৃদুমন্দ রোল চলেছে প্রার্থনার। বারটা স্বভাবতঃই রোববার সেদিন। পূণ্যকামী খৃষ্টান জনসাধারণের প্রার্থনা-মুহূর্ত বোধ হয়। মনে নেই, স্পষ্টাস্পষ্ট দাগ নিয়ে মুহূর্ত ক'টা আজও বেঁচে আছে মনে—এইটুকু।

নিচের রাস্তা থেকে দু'চারজন শ্বেতধর ওঠে যাচ্ছেন সেণ্টপল্‌স্ গীর্জার দিকে। আবার গীর্জা থেকে বেরিয়ে আসছেন কেউ কেউ।

ভেতরে মন্ত্রোচ্চার হোচ্ছে। বাইরে কেউ কেউ আলাপ কোরছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মিলিত প্রার্থনা গান বাতাসের গায়ে গায়ে ছড়িয়ে আসছে কানে।

অদূরে সন্ধ্যা বেশ জমে উঠছে। শীতকালের ছোট বেলা। সুরু হ'তে হ'তে যেন ঘুরিয়ে আসে। শীতের দু'চার টুকরো আঘাত গায়ের ওপর লেগে লেগে যায় যেন।

গীর্জার গেটের সামনে ত্রাণকর্তা যীশুর মহাবাণী বড় বড় হরফে যেন জ্বলছে ফলকে ফলকে। ঈশ্বরে মুক্তিকামী মানবাত্মায় তা অবিস্মরণীয় জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে ঃ

সন্ধ্যাটা আরও একটু জমে উঠল ধীরে ধীরে। ভেতরের শব্দোচ্চার স্তিমিত হ'য়ে এলো, ঘণ্টা বাজা যেন স্তব্ধ হ'য়ে এলো। হয়তো এই মুহূর্তে চার্চ্চের দেয়ালের মাথার ওই 'ক্রুশ'তে অদৃশ্য হাতখানি এসে পড়েছে। প্রার্থনারত নিমীলিত দৃষ্টিবদ্ধ ওরা হয়তো দেখতে পাচ্ছে যীশুর নির্দেশ, যীশু হয়তো দেহরূপ নিয়ে বলে যাচ্ছেন কিছু, রেখে যাচ্ছে এ চার্চ্চের ঘরের বাতাসে, মানুষের পাপ মুছে, পাপীকে ক্ষমা করে, ঈশ্বরের পদানত হ'য়ে তারই হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে হয়তো মুক্তি-পথ দেখাচ্ছেন অদৃশ্য যীশুখৃষ্ট। কে জানে!

সেণ্ট্‌পল্‌স্ গীর্জার বাইরে গেটটার সামনে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। রিক্তা দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে যে নিঃশ্বাসটুকু নিল তার হিসেব নেই। হাতের চুড়ি দু'খানি সামান্য কেঁপে উঠল সীমন্তের কাছে!

যীশু! যীশু!! যেশাস ক্রাইষ্ট? মনে কেঁপে উঠল আজ রিক্তা ঃ আমি কে? কি আমি? আমি পাপী, না, আমি ঈশ্বর? 'From thou to dust, and from dust to thou—'



দেহের কাছাকাছি খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটি বিকলাঙ্গ এগিয়ে এলো

ঃ দু'টা পয়সা দাও মা, ঈশ্বর মঙ্গল কোরবে। দু'টো দান কর। খুব মঙ্গল হবে।

দু'বছর আগের এই সন্ধ্যা-রাতটি। আকাশের ঝিলমিলি তারায় তারায় একটুখানি গল্প হয়ে রয়েছে হয়তো অনেকেরই অজানায়। একটু ভাল ক'রে চোখ মেলে দেখা যায়, 'ক্রুশ'টা ক্রমশই আবছা হ'য়ে আসছে অন্ধকার-মাতামাতিতে।

রিক্তা গম্ভীর দৃষ্টিতে পাশে তাকাল। লোকটি চোলে গেছে। কখন। গীর্জার শেষ ঘণ্টা সমাপ্তির পরেই হয়তো এ নির্জন দিকটা থেকে মটোরে করে তুলে নিয়ে গেছে বিকলাঙ্গটাকে।

পয়সা চাইবার আগ্রেয় রেশটুকু আর তাই শুনতে পারেনি রিক্তা।

অন্ধকার হঠাৎ যেন নিরাপদ অথচ অর্থবাহক হ'য়ে পড়ল। নিঃশ্বাস ফেললে রিক্তা, রিক্ত নিঃশ্বাস। নিজের দিকে তাকাল, তাকাল নিজের বসনের দিকে, অন্ধকারের মধ্যে অনাহুত অনির্ব্বাণ মুখচ্ছবিটা যেন প্রকট দেখতে পেল।

যেন ওর ছবি আর যীশুর ছবি একাকার হ'য়ে গেল হঠাৎ।

ভুল।

একটু পরেই চম্‌কে শিউরে উঠে স্তব্ধ হ'য়ে গেল রিক্তা, শীতল হাতে ওর একটা সাঁড়াশী যেন চাপ দিয়েছে। সেণ্ট্‌পল্‌স্ চার্চ্চের নিচে সন্ধ্যা-রাতকে খুঁজে পেতে একটু সময় লাগল রিক্তার। তারপর চকিতে যেশাস ক্রাইষ্ট মিলিয়ে গেল চোখ থেকে। মূক প্রশ্ন তুলে তাকাল ও, শান্ত, ধীর। লোকটির সঙ্গে হিসেব হোল তারায় তারায়, আকাশের নিচে, টাকায় টাকায়।

রাজী হ'য়ে গেল রিক্তা, সন্ধ্যাটা মারা গেল না তাহ'লে!

চলো!

মুহূর্তে ওর হাতে হাত রেখে পথ ধরল রিক্তা, একটা নিরিবিলি স্থান, অথবা একটা আস্তানা একটি বিনিদ্র রাত্রি যাপনের জন্য। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের উৎস মুখ আজ আর স্মরণ নাই বা রইল।

'ট্রেগারের' সামনে মুখ তুলে দিতে একবার গভীর চমকে উঠল রিক্তা!

আজ ওর ঠোঁট কেটে যদি এক ঝলক রক্তও ঝরে পড়ে, তাহলেও বোধহয় তার পিতামাতার দেয়া রক্তের কোন সন্ধান পেয়ে চম্‌কে উঠবে ও।

তবু বাঁচতে হয়। যীশুখ্রীষ্টের, বুদ্ধের আর মহম্মদের পৃথিবীতে একদিন নাকি শান্তি আসবে; পাপী থাকবে না! ক্ষুধার্ত পিতামাতা, বিকলাঙ্গ ভাই, বেকার দাদা, অশিক্ষিত ভগ্নীর জন্য চাকরীর বেনামিতে অপাংক্তেয় বৃত্তি নিতে হবে না। ক্ষমা—ক্ষমায় ভরে যাবে সব!

'Excuse me Tragour !' রিক্তার দু'ঠোঁট নড়ে ওঠে।

'Why ?'

'Exploit me. But never call in christ here, to-night.'

রাত্রির তমসায় চমক লাগে।

শীতের মত কাঁপা দিয়ে যার অকালবসন্ত।

দু'বছর আগের অকালবসন্ত বর্ষায় ঝরে পড়ল। সময় নিল একটু। রূপান্তরের মুহূর্তে কালচক্র স্তব্ধ হ'য়ে গেলেও জানা যায়নি।

আজ মোহিতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু অস্পষ্ট হয়ে উঠল রিক্তাদেবীর ভাষানীড়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচের সুদূর প্রসারিত আলুলায়িত পথরেখায় তাকিয়ে হাসল রিক্তা।

সবুজ ঘাস আর বিবস্ত্র সন্ধ্যার আবেশে একটুখানি উঁকি দেয়া কথাকাহিনী যেন উছলে উঠল। আজ তাই বঙ্কিম কটাক্ষ নিঃশেষে, নির্লিপ্ত দৃষ্টিক্ষেপে সপ্রশ্ন হাসল রিক্তা। ঘাসের শীষ টুকরো টুকরো কোরলো ঃ

—'বিয়ে ? আমায় তুমি বিয়ে করতে চাইছ মোহিত !

—'হ্যা।'

নিঃশব্দ করে শেষ করলো মোহিত।

মেমোরিয়ালের পদপ্রান্তে বিশ্বাস নিয়ে তাকাল সে। ভাবল।

আউটরাম ঘাটের আকাশে মেঘ জমে উঠছে। সূর্যের লালিমা তাতে তপ্ত; গঙ্গার ঘোলাটে প্রতিচ্ছবি তাতে নেই।

পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সবুজ তৃণতারে আঁচড় দিতে দিতে বলল রিক্তা ঃ

'মাত্র ছ'মাসের আলাপ তোমার সঙ্গে। এরি মধ্যে আমাকে চিনতে পেরেছ তুমি ?'

'হ্যা।'

রিক্তা ভাবল।

—'তুমি ভাবছ !' মোহিত হাসতে চায়।

চোখের ওপর প্রতিচ্ছবি প'ড়ে সরে যাওয়া দুরন্ত কোন গাড়ির।

কিন্তু বলল রিক্তা : 'তুমি ভাবাচ্ছ ! মোহিত ?'

—'উঁ ?'

—'নিজেকে তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বা স কর।'

—'নিশ্চয়।'



—'কাল যদি তোমার চাকরীটা চলে যায় ?'

—'দু'শো টাকার নিশ্চয়তা হারাবে।'

মোহিত বলল।

'আর কিছু হবে না ?'

'না।'

হেসে উঠল রিক্তা। বলল : 'এসপ্লানেডের সন্ধ্যা বড় মধুর, বাতাস বড় আবেগময়, আকাশ খুব নীল। কিন্তু—' থেমে গেল ও।

'থামলে যে ?'

'আরও একটু ভেবে দেখো মোহিত, অফিসে বসে বসে ভেব। কেমন ?' ঘাড় নাড়ল ও।

'তুমি আমায় খেলো ভাবছ কেন, রিক্তা। বিয়ে করবো আমি, আমার প্রেতাত্মা নয়। রিস্ক নিতে হয় নোবো আমি। তুমি কেন ভাবছ ?'

মোহিত বলে তাকাল ওর দিকে। অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে মেমোরিয়ালের পাদদেশ। তবু কাছে রিক্তার ঘন নিঃশ্বাস মাঝে মাঝে অনুভব কোরছে মোহিত। নিজের নিঃশ্বাস তাতে মিলিয়ে দৈর্ঘ মাপতে চায় তার মন।

রিক্তা হাসল : 'তবু—একটু ভেব।'

বাড়ী এলো রিক্তা। সন্ধ্যার পরেই বাড়ী এসে পৌছুলো। বিগত দু'বছর আগে যা ঘটেছে তা ওর চাকরী জীবনের দুঃস্বপ্ন-অধ্যায়, অনিশ্চিত স্পন্দন। লোক-অজ্ঞাত কর্মজীবন।

অথচ সেই দু'বছর পরে আজও কাজই করছে, ক'রে খেতে হোচ্ছে বলা যেত, যদি না মাঝখানে ভাইটে একটা চাকরী জুটিয়ে নিত।

সন্ধ্যার পর কাচজড়ানো ড্রেসিং রুমটার মধ্যে বাড়ী ফিরে একবার প্রবেশ করে ও রোজ। আজও বাড়ী ফেরার পর আস্তে আস্তে ওর নিজস্ব ড্রেসিংরুরেম চার দেয়ালের মাঝে এসে দাঁড়ায় রিক্তা।

এটা অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো। হয়তো বা সন্ত্রস্থ মনের কাছে অনপচয়ের বিজ্ঞপ্তি। তবু আসে ও। এসে দাঁড়ায় আয়নার দিকে, বিরাটাকার পূর্ণ প্রতিবিম্ব বাহক আয়নার সামনে।

লাইটটা জ্বালিয়ে দিলে রিক্তা। ঝলমল ক'রে উঠল আয়নার বুক এবং রিক্তা নিজেও।

সন্দেহ যেটুকুও বা হয়েছিল তাও নিঃশেষ হল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

এই তো—। এই তো বেশ আছে ও। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয় হয় মাঝে মাঝে ওর, বুঝি বা চোখের নীল ছায়াটুকু কখন চুরি করে নিল।

'Excuse me Tragour !' রিক্তার দু'ঠোঁট নড়ে ওঠে।

'Why ?'

'Exploit me. But never call in christ here, to-night.'

রাত্রির তমসায় চমক লাগে।

শীতের মত কাঁপা দিয়ে যায় অকালবসন্ত।

দু'বছর আগের অকালবসন্ত বর্ষায় ঝরে পড়ল। সময় নিল একটু। রূপান্তরের মুহূর্তে কালচক্র স্তব্ধ হ'য়ে গেলেও জানা যায়নি।

আজ মোহিতের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু অস্পষ্ট হয়ে উঠল রিক্তাদেবীর ভাষানীড়।

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের নিচের সুদূর প্রসারিত আলুলায়িত পথরেখায় তাকিয়ে হাসল রিক্তা।

সবুজ ঘাস আর বিবস্ত্র সন্ধ্যার আবেশে একটুখানি ঊকি দেয়া কথাকাহিনী যেন উছলে উঠল। আজ তাই বঙ্কিম কটাক্ষ নিঃশেষে, নির্লিপ্ত দৃষ্টিক্ষেপে সপ্রশ্ন হাসল রিক্তা। ঘাসের শীষ টুকরো টুকরো কোরলো ঃ

—'বিয়ে ? আমায় তুমি বিয়ে করতে চাইছ মোহিত !

—'হ্যা।'

নিঃশব্দ করে শেষ করলো মোহিত।

মেমোরিয়ালের পদপ্রান্তে বিশ্বাস নিয়ে তাকাল সে। ভাবল।

আউটরাম ঘাটের আকাশে মেঘ জমে উঠছে। সূর্যের লালিমা তাতে তপ্ত; গঙ্গার ঘোলাটে প্রতিচ্ছবি তাতে নেই।

পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে সবুজ তৃণতারে আঁচড় দিতে দিতে বলল রিক্তা ঃ

'মাত্র ছ'মাসের আলাপ তোমার সঙ্গে। এরি মধ্যে আমাকে চিনতে পেরেছ তুমি ?'

'হ্যা।'

রিক্তা ভাবল।

—'তুমি ভাবছ !' মোহিত হাসতে চায়।

চোখের ওপর প্রতিচ্ছবি প'ড়ে সরে যাওয়া দুরন্ত কোন গাড়ির।

কিন্তু বলল রিক্তা : 'তুমি ভাবাচ্ছ ! মোহিত ?'

—'উঁ ?'

—'নিজেকে তুমি সম্পূর্ণ বিশ্বা স কর।'

—'নিশ্চয়।'



—'কাল যদি তোমার চাকরীটা চলে যায় ?'

—'দু'শো টাকার নিশ্চয়তা হারাবে।'

মোহিত বলল।

'আর কিছু হবে না ?'

'না।'

হেসে উঠল রিক্তা। বলল : 'এসপ্লানেডের সন্ধ্যা বড় মধুর, বাতাস বড় আবেগময়, আকাশ খুব নীল। কিন্তু—' থেমে গেল ও।

'থামলে যে ?'

'আরও একটু ভেবে দেখো মোহিত, অফিসে বসে বসে ভেব। কেমন ?' ঘাড় নাড়ল ও।

'তুমি আমায় খেলো ভাবছ কেন, রিক্তা। বিয়ে করবো আমি, আমার প্রেতাত্মা নয়। রিস্ক নিতে হয় নোবো আমি। তুমি কেন ভাবছ ?'

মোহিত বলে তাকাল ওর দিকে। অস্পষ্ট হ'য়ে আসছে মেমোরিয়ালের পাদদেশ। তবু কাছে রিক্তার ঘন নিঃশ্বাস মাঝে মাঝে অনুভব কোরছে মোহিত। নিজের নিঃশ্বাস তাতে মিলিয়ে দৈর্ঘ মাপতে চায় তার মন।

রিক্তা হাসল : 'তবু—একটু ভেব।'

বাড়ী এলো রিক্তা। সন্ধ্যার পরেই বাড়ী এসে পৌছুলো। বিগত দু'বছর আগে যা ঘটেছে তা ওর চাকরী জীবনের দুঃস্বপ্ন-অধ্যায়, অনিশ্চিত স্পন্দন। লোক-অজ্ঞাত কর্মজীবন।

অথচ সেই দু'বছর পরে আজও কাজই করছে, ক'রে খেতে হোচ্ছে বলা যেত, যদি না মাঝখানে ভাইটে একটা চাকরী জুটিয়ে নিত।

সন্ধ্যার পর কাচজড়ানো ড্রেসিং রুমটার মধ্যে বাড়ী ফিরে একবার প্রবেশ করে ও রোজ। আজও বাড়ী ফেরার পর আস্তে আস্তে ওর নিজস্ব ড্রেসিংরুমে চার দেয়ালের মাঝে এসে দাঁড়ায় রিক্তা।

এটা অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো। হয়তো বা সন্ত্রস্থ মনের কাছে অনপচয়ের বিজ্ঞপ্তি। তবু আসে ও। এসে দাঁড়ায় আয়নার দিকে, বিরাটাকার পূর্ণ প্রতিবিম্ব বাহক আয়নার সামনে।

লাইটটা জ্বালিয়ে দিলে রিক্তা। ঝলমল ক'রে উঠল আয়নার বুক এবং রিক্তা নিজেও।

সন্দেহ যেটুকুও বা হয়েছিল তাও নিঃশেষ হল, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে।

এই তো—। এই তো বেশ আছে ও। নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে ভয় হয় মাঝে মাঝে ওর, বুঝি বা চোখের নীল ছায়াটুকু কখন চুরি করে নিল।

আয়নায় নিজের পূর্ণ দেহকাঠামোতে দৃষ্টি দিলে রিক্তা। হাসি পেল, তবু তাকাল ভাল করে চোখের নিচে, হাতের মসৃণতার ওপর, মুখের লাস্যমায়ায় আর নিম্নাঙ্গের প্রতিটি স্তবকে, যার ওপর জড়িয়ে আছে দামী জর্জেটের প্রলেপ।

অথচ আশ্চর্য হয় রিক্তা, আয়নার দিকে চেয়ে, নিজেকে সামনে রেখে অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারে না, ওর এই সব কিছুর ওপর বিগত দিনের একটা অতি কঠিন সংগ্রাম-সেতু রচিত হয়ে গেছে, অনেক চেষ্টাতেও আজ আয়নার প্রতিবিম্বে খুঁজে পায় না রিক্তা কোন চিহ্ন, মৃত্যুর কোন ক্ষতরেখা।

না। নিঃশ্বাস ফেলল রিক্তা নিশ্চিত হ'য়ে, অদ্ভুত জীবন মানুষের। কাগজে কালির আঁচড় দিলে—তারপর তাকে মুছে ফেললেও ধরা প'ড়ে যায় সে দাগের অস্পষ্ট আঁচড়। অথচ তার চেয়েও গভীরতর ক্ষতচিহ্ন জীবনের ওপর, দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এঁকে গেলেও কেউ বাইরে থেকে কিছু বুঝতে পারবে না কিছু জানতে পারবে না। কুমারী তন্বী রিক্তা—সে রিক্তাই থেকে যাবে। শুধু লোকের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে যাবে : বছর কয়েক চাকরী ক'রে রিক্তা টাকা উপার্জন করে তার ভাইবোন, মা-বাবার সংসারকে অনেক স্বচ্ছল ক'রে দিয়েছে। এইটুকু। যে ঘর অন্ধকার ছিল, যেখানে জ্বলতো প্রদীপের মত লাল আলো—সেখানে এখন চন্দ্রালোকের মত আবিল আলো স্থান পেয়েছে। এইটুকু।

বাইরের লোক এইটুকুই জানবে। আর ?

রিক্তা ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে।

তারপর ক্লান্ত মন নিয়ে শ্লিপার জড়ানো পা দু'খানি খাটের পাশে নিচে ঝুলিয়ে দিয়ে শ্রান্ত স্তব্ধতায় ডুব মারলে একবার, এলিয়ে দিলে পাতা বিছানার নিঃসঙ্গ আমন্ত্রণে!

বালিশের ভেতর মুখ গুজে রিক্তা আরাম করে বাতাস নিল বুকে, বালিশের কোল থেকে ভেসে এলো সুগন্ধ-সুষমা, মনে পড়ল রিক্তার—মাথায় সেই দামী বিলেতি তেলের নামটা ওর মিশে গেছে।

চুলের এ অনামী স্বাদটা নিঃশ্বাসে পেতে পেতেই ক্লান্ত চোখ দু'টো আরামে বুজে আসছে ওর। যেন ওর পেছনে ফেলে আসা ওই পঁচিশ বছরের অতন্দ্র চোখের পাতায় পাতায়, এতক্ষণে ঘুম নামছে।

আস্তে আস্তে অন্ধকারে মুছে গেল ওর মন থেকে বিগত বছরের দুশ্চিন্তারাশি, নেমে গেল হিন্দুধর্ম্মের শঙ্করাচার্য্য, মুসলিমের মহম্মদ আর খৃষ্টানের যেশাস ক্রাইষ্ট!

চোখের এক কোণে সংসারের পরিবর্তনটাও একবার উঁকি দিয়ে গেল, মনে করিয়ে গেল, বড়দা সৌমেন অনেকদিন বেকার থাকার পর দু'বছর ধরে চাকরী পেয়েছেন ডালহৌসি



স্কোয়ারে, মোহিতের মতই। মোহিতের মতই দু'শো টাকার মাইনের। এই দু'বছরই রিক্তা মুক্ত, অথবা দাদা মুক্তি দিয়েছে একটানা টাকা উপার্জন বোনকে দিয়ে আর না করিয়ে।

ঘুমিয়ে পড়ল রিক্তা, তার ঘুমের এক পাশে পড়ে রইল মোহিত, মোহিতের ইচ্ছা, মোহিতের কল্পনা,—যে মোহিত রিক্তার জীবনের অন্ধকার যুগের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মোহিত বিয়ে করতে চায় রিক্তাকে! সুখী হোতে চায় নাকি।

ঘুম—ঘুম—ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ছে রিক্তাদেবী।

ডালহৌসিতে তেতালার অফিসে বসে কলমে আঁচড় দিতে দিতে আন্‌মনা হ'য়ে পড়ল মোহিত। কলম ঘষতে ঘষতে হাতের আঙ্গুল টনটন ক'রে ওঠে, চোখ মাঝে মাঝে শ্রান্ত লাগে—তার চাইতে কলম একপাশে ফেলে রেখে দীঘির পাশের ওই বিরাট লৌহদেহে ইট নিক্ষেপের ছবি দেখলেও ভাল লাগে যেন। কত কত লোহা আর কত কত মানুষ ধাপের পর ধাপ বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে কর্মব্যস্ততায় নিমগ্ন।

মোহিত ওদিকে চোখ রাখলো। টিফিন আওয়ার হতে এখনো আধঘণ্টা বাকী রয়েছে। আধঘণ্টা আগেই থেমে যেতে ভাল লাগছে ওর।

সেদিকে চেয়ে বললে পাশ থেকে সৌমেন :

—'ক্রাইম এণ্ড যাস্টিস্ এর মধ্যে কতটুকু পার্থক্য—জানেন ?'

—'বার্ণাড শ' এর গদটা বলবেন তো ?' হাসল মোহিত।

—'না স্যার।

—'তবে ? তাকাল চোখ ফিরিয়ে মোহিত।

'ডিফারেন্সটা আপনার 'বিয়ে করব' আর রিক্তার 'ভেবে দেখুন'।'

একটু চম্‌কে বলল মোহিত :

'আপনি কি বলেন ?'

'করুন বিয়ে।'

'রিক্তা রাজী হবে শেষ পর্যন্ত—'

'প্রথমটা হয়তো হবে না।'

'কেন ?'

হাসল সৌমেন : 'উত্তরটা আমিই জানি তা ভাবছেন কেন ? তবে মেয়েমানুষ কিনা!'

'ডিগ্‌নিটী!' হাসতে চেষ্টা করলো মোহিত এবার। বলল : মেয়েমানুষ আজকাল যাচাই করতে চায়, কিন্তু আমি তেমন ক'রে হয়তো বাজব না, তবু কি আপনার বিয়ে আটকেছে সৌমেন বাবু ?'

পোড়া সিগারেটটা এ্যাস্‌ট্রেতে ফেলে দিতে দিতে বলল সৌমেন : না, তবে কি জানেন, রিক্তা একটু বেশী সিরিয়াস। আপনাকে বাজাবার ছলে হয়তো নিজেকেই বাজিয়ে নিচ্ছে ও।'

'কেমন ?' বিস্ময় জড়ানো প্রশ্ন তুললো মোহিত। হাসল, হেসে বললো এবারেও সৌমেন :

'মনে করুন আমি যখন বেকার ছিলাম, তখন গোটা সংসারটাকে টাকা দিয়ে অমন দুর্দিনে আগ্‌লাতে পেরেছিল ওই রিক্তা ; জিজ্ঞেস করতাম কি কাজ করছিস্—উত্তর পেয়ে থথিয়ে যেতাম।'

'কি—কি বলত ?'

'বলতো, 'কোন্ কাজ করছে অথচ তার চেয়েও মেয়েমানুষ কাজ করে খাওয়াছে এটা কি তোমার খুব লাগছে দাদা ? তাহলে ছেড়েদি'—বল'।'

'কি বলতেন আপনি ?'

'বলতাম, 'খেটে খেটে তোর চেহারাও খারাপ হোচ্ছে দিন দিন। অন্য একটা অল্প সময়ের কাজ খুঁজলে হোতো না ?'

'কি বলতো ?'

'বলতো, একটা কাজ ছাড়লে অন্য একটা পাওয়া আজকাল দুঃসাধ্য প্রায়। এখানে টাকাও আছে, নিশ্চয়তাও আছে, স্বচ্ছলতাও আছে !' তাই চুপ ক'রে যেতাম অবশেষে।'

সৌমেন বাইরের দিকে চেয়ে একটু হাসল, 'তাই মোহিতবাবু, পিতামাতার যুগ থেকে অনেক দূরে সরে আমরা এসেছি। এখানে প্রশ্ন আসবেই। ইনডিভিজুয়াল জীবনটাকে সবাই ভাবতে চায় কিনা।'

নির্মাণরত বাড়ীটাতে অসংখ্য লোক খাটছে, উঠছে, নামছে, বসছে, ইট নিচ্ছে, দেয়াল গড়ছে।

মোহিত বল্লে : 'তবু বিয়ে মানুষ করে, আমিও কোরবো সৌমেনবাবু, রিক্তা ভয় পাচ্ছে কিনা জানি না, তবে আমার সাহস আছে। চাকরী তো অনেকেই করছে, আপনিও করছেন, টাকার অনিশ্চয়তা তো আপনারও আছে, তবু কি কারো বিয়ে হয় না ? সবাই করে। আমার দু'শো টাকার ওপর রিক্তা নিঃসংশয়ে নির্ভর করতে পারবে, নিঃসন্দেহ।'

বলতে বলতে তাকাল ও সৌমেনের দিকে। কাজ পেণ্ডিং হয়ে পড়ছে। সজাগ হতে হচ্ছে আবার। ওদিকে শ' শ' লোহার বাড়ীর দিকে তাকাবার সময় নেই আর। মোহিত কলম নিল হাতে।

কিন্তু মোহিত ছাড়তে রাজী ছিল না।

# পূর্ব্বাশা

"...অত্র পরমেশ্বরেণ তুষার-শৈলোদ্ভবো তুর্গায়া গৃহীতহকরহ ॥
হর্ষচরিত।

সুভদ্রা গতা এখন অশ্বিদ্বয়
ভারতবর্ষ করবে রশ্মিময়।
বৈশ্য বাংলা বিশ্ব-ভুবন-জয়,
বৈদ্য বাংলা ভেদ্য দনুজ-রয়।

শ্রীহর্ষ হাসে হংস-স্বরস্বতী।
স্কন্ধ-গুপ্তে দিয়েছে মাহিষ্মতী,
মিডিয়া আন্‌ল মদন-অনল-রতি !
হস্তিনাপুর লক্ষ্মী ও গণপতি।

মহেশ-অশুর, সিংহ তবে কি জবা
( থাবা ত তোলেনি, ফুল-হাতে হ'ল স্তবা )
ছিন্নমস্ত তোমার শীর্ষে ঢালে ?
শিবা শোভে তাই ঢালে আর তরোয়ালে।

তরুণী দুর্গা তাম্রতন্বী চায়না সন্ত গিরিশ-অন্ত চায়।
মত্ত-ময়ূখী, কামাখ্যা-শিখী মিহিরের খনা তা-ও শিখনি কি ? বরাহ ক্ষণের ছ্যাখে চিকিমিকি,
জানোনা কোথায় জাহ্নবী আছে পুণ্যঅহ্না সূর্য্য বন্দনায়।
অহ্নপূর্ণ করে যে অন্নপূর্ণা, কাশীনী, তনূপবাসিনী অনূপ-চন্দ্রমায়।
নূতন খণ্ড ভারতবর্ষ-ভার্গব মেশে ময়ূরে-চন্দনায় !
শান্তনু চায় চাক্ষুষ শীহি-গঙ্গার দেহ অন্যায় পন্থায় !
দ্যূতের কন্যা দ্যূতের পণ্যা দ্রৌপদী ফেরে কৃষ্ণ-মন্ত্রণায় !

যা তে রুদ্র শিবা তনূরঘোরহপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি ॥
শ্বেতাশ্বতর।

আশ্বিন
১৩৫৯

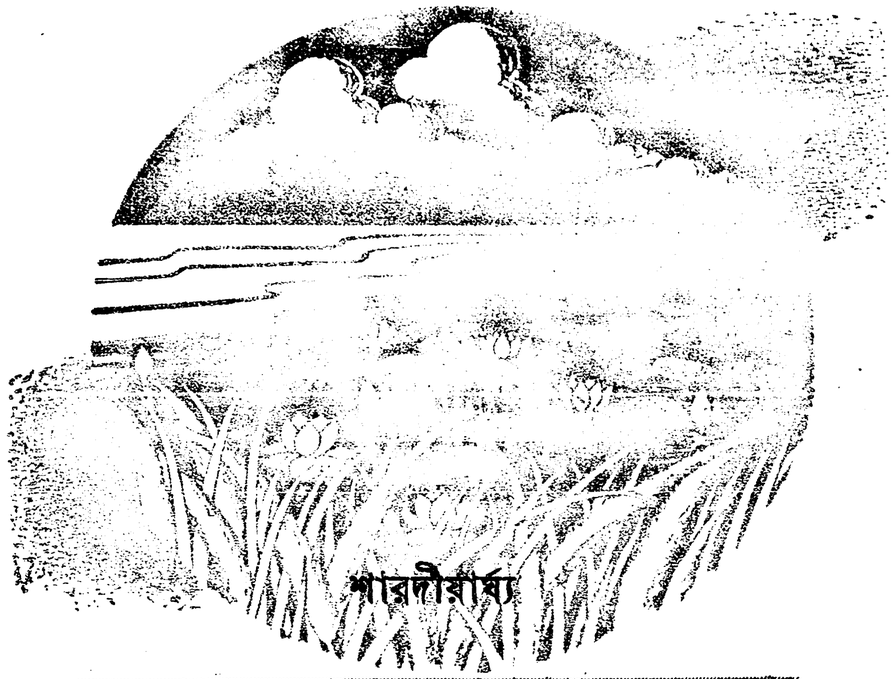
শারদীয়ার্ঘ্য


সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের উপন্যাস:

কল্লোল

১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বর থেকে সাধারণ ধর্ম্মঘটের দিন পর্য্যন্ত যে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন রাজনীতি সচেতন শিক্ষিত নরনারীর মনের ওপর বলিষ্ঠ ভাবনা ধারণার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রেখে গেছে, তারই পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এই সুবৃহৎ উপন্যাস 'কল্লোল'। দাম পাঁচ টাকা।

রাত্রি ৫৲ বৃত্ত ১৷৷৵৹ দিনান্ত ৩৷৷৹

মরামাটি ২৷৹ কস্মৈদেবায় ৩৲

পূর্ব্বাশা লিমিটেড্

• পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্যু • কলিকাতা •



পূর্ব্বাশা

পঞ্চদশ বর্ষ
আশ্বিন—১৩৫৯


## মনবিহঙ্গম

জীবনানন্দ দাশ

ঢের যুগ নিষ্ফল হয়েছে ;
এ রকম কেবলি কি হবে ?
ইতিহাস কেবলি কি অন্ধ পরীক্ষার
অন্ধকারের অনুভবে ?

আশার সঞ্চারে আলো,
আকাশের পারাপার নীল
হ'লেও অজ্ঞান নিয়মের
চাকায় কি ঘুরছে নিখিল ?

•

শাদা আর কালো রঙে মাখা পৃথিবীর
কোলে আজ মানুষের স্থান
পুড়ে কি ছাইয়ের মতো কালিমা হয়েছে ?
কোথায় প্রাণের বৃক্ষ তবু, আহা, মরুকল্যাণ ?

ধূসরতা স্নিগ্ধ ক'রে জল ?
সময় ও সময়ের আত্মা চাতক
সূর্যের অনলে বাষ্পে ক্ষয়
পেলে কি অমিয় হবে অগ্নিবলয়।

*

কারা কবে কথা বলেছিল,
ভালোবেসে এসেছিল কাছে ;
তারা নেই, তাদের প্রতীক হয়ে তবু
কয়েকটি পুরোনো গাছ আছে ;
নক্ষত্রেরা রয়ে গেছে নদীর ওপরে ;
চারিদিকে প্রান্তর ও ঘাস,
দু চারটে ঘর বাড়ি নীড় ও শিশির,
কূলে কূলে একলা আকাশ।
যারা ছিল তারা কেউ নেই ;
জীবন তবুও এক শান্ত বিপ্লবী,
স্থির আগুনের মতো অবিরল আলোক দিতেছে ;
সে আগুনে আলো ছাড়া দ'হে যায় সবি।

*

নিশ্চিত মৃত্যুর শূন্য আঁধারের আগে
হে নিঃসঙ্গ বৃক্ষে মনবিহঙ্গম তুমি,
দেখেছিলে জেনেছিলে ভালোবেসেছিলে ;
দ্রুত পরিবর্তনের মতো পটভূমি
পৃথিবীতে মানুষের আসাযাওয়া তবু ;
শীগগিরই এ মাটির নিজের স্বভাবে
মিশে সব লোভপ্রেমযুক্তিহীন ধূলো হয়ে যাবে
প্রকৃতির কত শত অনন্ত অমিয়ে।

# লাইবনিৎজ

## হুমায়ুন কবির

স্পিনোজা তোমাকে আমাকে সমস্ত পৃথিবীকে ধুয়ে মুছে একাকার করে দিলেন। বল্লেন যে, একমাত্র সত্য ব্রহ্ম। তাকে ঈশ্বর বল, সৃষ্টি বল, দেহ বল আর আত্মা বল, শেষ পর্য্যন্ত এ সমস্ত কথা শুধু কথা থেকে যায়। দেহ আত্মাও আলাদা নয়—একমেবাদ্বিতীয়ম ব্রহ্মের বিভিন্ন গুণ। টেবিল চেয়ার পাহাড় পর্ব্বত সব উড়ে গেল, এমন কি ভালোমন্দ সৎ, অসৎ কিছুই স্পিনোজার পরীক্ষায় টিকল না।

এরকম সমাধান মানুষের মন মানে না। দর্শনের বিচারে যাই হোক্ না কেন। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে নিজেকে জানি। আমার সুখ, আমার দুঃখ আমার কাছে যত সত্য, এমন সত্য আর কি কিছু আছে? তাই স্পিনোজার পরে এলেন লাইবনিৎজ—তিনি বল্লেন যে, দুনিয়ায় একমাত্র আত্মাই সত্য। কিন্তু আত্মা এক নয়—তার সংখ্যা অনন্ত। কেবল তোমার আমার যে আত্মা আছে, তা নয়—আমরা যাদের প্রাণহীন বা জড় মনে করি, তাদেরও আত্মা রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাদের আত্মা রয়েছে বল্লে মনে হয় যেন আত্মা ছাড়াও তাদের মধ্যে অন্য কিছু আছে। কিন্তু লাইবনিৎজ ঘোষণা করলেন যে তারা আত্মা ছাড়া কিছুই নয়। আমরা যাকে দেহ মনে করি—তাও আত্মার সমষ্টি। আমাদের দেহ, পৃথিবীর মাটি, পাহাড়ের পাথর—সমস্তই আত্মার সমষ্টি।

পাথর আত্মার সমষ্টি, আমিও আত্মার সমষ্টি, তবে পাথরের সঙ্গে আমার তফাৎ কি? আমি কথা বলতে পারি, চলতে পারি, আমার চেতনা আছে, আমার বুদ্ধি আছে। লাইবনিৎজ বল্লেন যে, পাথরেরও এ সমস্ত গুণই রয়েছে, তবে এত ক্ষীণভাবে যে আমাদের চোখে তারা ধরা পড়ে না। আমাদের নিজেদের জীবনেও তো অনেক সময় এরকম ঘটনা ঘটে। যখন মন দিয়ে তোমরা গল্পের বই পড়, তখন পাশেই যে ঘড়ি টিকটিক করে চলেছে সেদিকে লক্ষ্য থাকে না, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে বই বন্ধ করে ফেললে, তখনই ঘড়ির আওয়াজ কানে আসে। অথবা ধর, তোমরা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছ। অশ্রান্ত কল্লোলে ঢেউ এসে বালির উপর ভেঙে পড়ছে। তার সেই অবিরাম গর্জ্জনে মনে আনন্দ এবং দুঃখ দুই জাগায়। সেখানে প্রত্যেকটি ঢেউয়ের আওয়াজ আলাদা শুনবে কে? অথচ সমস্ত ঢেউগুলির আওয়াজ না শুনলে সমুদ্রের গর্জ্জনই বা কেমন করে শোনা যাবে?

লাইবনিৎজ তাই বল্লেন যে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই আত্মায় ভরা—তবে তারই মধ্যে কোন

আত্মা সচেতন এবং কোন আত্মা কেবলমাত্র চেতন। টেবিলের উপর দোয়াত রাখলে টেবিল এবং দোয়াত পরস্পরের সম্বন্ধে চেতন, কিন্তু সচেতন নয়। আমি যখন ঘরে আসি, তখন আমি তাদের সম্বন্ধে কেবলমাত্র চেতন নই, সচেতনও বটে। লাইবনিৎজ বল্লেন যে, যে আত্মা যত বেশী পরিণত, তার চেতনা তত বেশী, এবং সেই চেতনা বাড়তে বাড়তে একসময়ে সচেতনতা হ'য়ে দাঁড়ায়।

দেহের সঙ্গে মনের কি সম্বন্ধ, তার বিষয়ে দেকার্ত পুরোপুরি কোন উত্তর দিতে পারেননি, আর স্পিনোজা তো দেহ মন—দুই-ই দিলেন উড়িয়ে। লাইবনিৎজের চোখে সমস্ত জিনিষের মূলে আত্মা। এবং আত্মার সংখ্যা অনন্ত, তাই দেকার্ত ও স্পিনোজার সমস্যা সমাধানে তার কোন মুস্কিল হ'লনা, কিন্তু ফলে তাঁর দর্শনে এক নতুন সমস্যা দেখা দিল। স্পিনোজার কাছে পৃথক বলে কিছু নেই, কাজেই কোন কিছুই স্বাধীন নয়। সমস্ত বস্তু-আত্মাই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মের বিকাশ। কিন্তু লাইবনিৎজের মতে প্রত্যেকটি আত্মাই স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন। শুধু তাই নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই, কারণ সম্বন্ধ মানেই তো অধীনতা!

প্রত্যেকটি আত্মা স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন হলেও মুক্তি নেই, কারণ সত্যিকারের স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন আত্মা নিজেকে ছাড়া কিছুই জানে না। জানতে পারে না। কাজেই অন্য আত্মা রয়েছে এবং তারা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন, এ কথাই বা জানল কি করে? ধর, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি আজন্ম একলা একটি দ্বীপে কাটাত, তবে দুনিয়ায় যে অন্য মানুষ আছে, সে কথা তো জানতেই পারতে না। কাজেই লাইবনিৎজের কথা মেনে নিলে আর পৃথিবীতে কোন কিছু জানবার কোন সম্ভাবনা থাকে না।

সেকথা লাইবনিৎজ নিজেও বুঝেছিলেন, তাই তিনি বল্লেন যে, বাইরে থেকে কোন কিছুই আমরা জানি না—আমাদের সমস্ত জ্ঞান নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। গুটী পোকা যেমন নিজের লালা বের করে নিজের চারদিকে রেশমের গুটী তৈরী করে, ঠিক তেমনিভাবে প্রতেকটি আত্মা নিজের মধ্যেই নিজে সম্পূর্ণ—সমস্ত পৃথিবীই তার মধ্যে লুকোনো। ব্লেকের একটি কবিতায় আছে যে, একবিন্দু জলের মধ্যে সমস্ত সমুদ্র লুকিয়ে—ঠিক তেমনি লাইবনিৎজের মতে প্রত্যেকটি আত্মার মধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর বৈচিত্র্য। আমরা নতুন কিছু যখন শিখি, তখন পুরোনো এবং জানা তথ্যের সঙ্গে তাকে মেলাতে না পারলে তা শেখা অসম্ভব। তাই নতুন তথ্যকে সেই পুরোনো জানা শিক্ষারই বিকাশ বলে মনে করা স্বাভাবিক। যদি তাই হয়, তবে তো আর সত্যি সত্যি নতুন কিছু শিখালাম না—যা জানতাম তাকেই আরো স্পষ্টভাবে জানলাম। লাইবনিৎজ অবচেতন, চেতন এবং সচেতনের পার্থক্য



দিয়ে এ কথাটি আরো স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন। সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে প্রত্যেকটি ঢেউয়ের যে শব্দ, তার সম্বন্ধে আমরা অবচেতন—চেষ্টা করলেও তাকে আমরা পৃথক করে সজাগ-ভাবে শুনতে পাইনে। পড়বার সময় পাশে ঘড়ির টিকটিক সম্বন্ধে আমরা চেতন, কারণ শুনেও তাকে আমরা শুনিনে। অথচ, চেষ্টা করলেই তাকে শোনা যায়। যখন ঘড়ির টিকটিক সজাগ ভাবে শুনছি, তখনই আমরা তার সম্বন্ধে সচেতন।

লাইবনিৎজের এ বিবরণেও কিন্তু দু'টি ফাঁক থেকে যায়। অবচেতন, চেতন, আর সচেতনই হই, পৃথিবী না থাকলে তাকে জানব কেমন করে?

## অহুনভৈতি

## অহুন-ভৈতি

তিন—( তিনি )—( দেবতা )—( হংস )—( সৃষ্টি )

আমি ত তোমার, হে 'অশ', তোমায়—'বোহুমনো'রেও শংসি।
অভাজ-শক্তি 'উর্ম্মাজদহ' দক্ষতা এক-অংশী॥
আর প্রজ্ঞান! প্রাচুর্য্যদান' প্রার্থনা কর পূর্ণ আমার, প্রিয়তম, তম-ধ্বংসী॥

# বোদলেয়ার অবলম্বনে

## বুদ্ধদেব বসু

### দ্বীপান্তর-সৌরভ

যখন, দুই চোখ বুজে, হেমন্তের কোনো গুমোট-করা সন্ধ্যায়
তোমার দুটি তাপিত স্তনের আঘ্রাণ আমি মন্থন করি,
দেখতে পাই, একঘেয়ে নিস্পন্দ সূর্যের আগুনের তলায় উজ্জ্বল
কত সুখী তটরেখা ক্রমশ তাদের ঘোমটা ফেলে দিচ্ছে।

অলস দ্বীপ, যেখানে প্রকৃতি
ঢেলে দেয় অদ্ভুত গাছ, স্বাদু ফল,
আর প্রবল যৌবন পুরুষের ছিপছিপে শরীরে,
আর মেয়েদের চোখে আশ্চর্য শুভ্র সরলতা।

তোমার গন্ধের হাত ধ'রে কোন মায়াবী দেশে উত্তীর্ণ,
আমি যতক্ষণে দেখতে পাই বন্দর, হাজার পাল, মাস্তুলের জঙ্গল
সমুদ্রের ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হালফিল ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে,

ততক্ষণে সবুজ তেঁতুল গাছের সৌগন্ধ্য
হাওয়ায় গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে আমার নাসারন্ধ্র ভ'রে দেয়,
আমার আত্মাকে চুমো খেয়ে যায় মাঝিমাল্লার গানের সঙ্গে মিশে।

### দানবী

সেই অতীতে, যখন প্রকৃতি তার প্রমত্ত রঙ্গে
জন্ম দিতো নিত্য নতুন অসুর, অতিকায় দৈত্যের পাল,



আমি যদি তখন থাকতে পারতুম কোনো যুবতী দানবীর সঙ্গে,
যেন রানীর পায়ের কাছে নরম, অলস, কামাতুর কোনো বেড়াল!

দেখতে কী ভালো লাগতো আমার, যখন যুগপৎ ফুটে উঠতো
তার আত্মা আর শরীর,
ভালো লাগতো অবোধভাবে বেড়ে উঠতে তার প্রচণ্ড খেলাধুলোর কৌতুকে
খুঁজে দেখতে তার হৃদয়ে কোনো গোপন, গভীর
আগুনের শিখা জ্বলছে কিনা—তার চোখের মধ্যে সাঁৎরে-চলা
স্যাঁৎসেঁতে কুয়াশার ফাঁকে-ফাঁকে।

তার দেহের মহীয়ান রেখায়-রেখায় ঢুঁড়তে ভালো লাগতো আমার,
তার বিরাট হাঁটুর ঢালু বেয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াতে বার-বার,
আর মাঝে-মাঝে, যখন গ্রীষ্মের বদরাগি রৌদ্রের তাতে

ক্লান্ত হ'য়ে সে এলিয়ে পড়তো প্রান্তর জুড়ে ইতস্তত,
আমার ভালো লাগতো তার দুই স্তনের ছায়ার কোলে বেপরোয়াভাবে
ঘুমোতে
পাহাড়ের পায়ের তলায় শান্ত কোনো গ্রামের মতো।

# মোহেঞ্জোদরো ও বৃহৎ বঙ্গ

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

গত সংখ্যার ব্রাহ্মীলিপি পাঠে ( মোহেঞ্জোদারোর ব্রাহ্মীলিপি ) গুড়ুফার-এর কথা এবং মৌর্য্যবংশের উৎপত্তির ইতিহাস খানিকটা বলা হয়েছে। গুড়ুফারের ভারত-ইতিহাসে আবির্ভাব যে একটি গুরুতর ঘটনা তারও ইঙ্গিত সেখানে ছিল। তিনি ১০৩ সনে বৈশাখের পঞ্চম দিবসটিকে তক্তিবাহী-শিলালেখে স্মরণীয় করে গেছেন বলে ঐতিহাসিকরা বলেছেন এবং সে দিনটি তাঁর ২৬-রাজ্যাঙ্কের। আমার প্রথম কথা ঃ শিলালেখটি ক্ষরোস্থি-লিপি-অঞ্চলের বলে তার পাঠ বাঁ থেকে ডানে হবেনা, হবে ডান থেকে বাঁয়ে আর সে-হিসেবে সনটি হবে ৩০১। দ্বিতীয় কথা, তখনকার লিপিমালা ডান থেকে বাঁয়ে এবং বাঁ থেকে ডানে, এই দু'ভাবেই পড়া যেতো—শব্দপুঞ্জেরও বহুবিধ অর্থ হত। তৃতীয় কথা, প্রত্যেকটি রাজচক্রবর্ত্তী বহুদেশ বিজয় করে বহু-উপাধি, বহু-নাম গ্রহণ করতেন। কাছাড়ী-খাশিয়া রাজ যশোনারায়ণ ত তিনবারই নাম পাল্টালেন। গুড়ুফারও, দেখা যায়, প্রায় শত নামে পরিচিত। গ্রীকরা ( হখমনীষী ) তাঁকে জানছেন উণ্ডোফের্‌রোস-নামে, পারসিকরা বিন্দফর্ণ-নামে—এবং হখমনীষী আর পারসিক সভ্যতার সমন্বয়ে যে 'দেব-নাগর'দের জন্ম তাঁরা জানছেন হয়তো বিন্দুসর নামে ( দেব-নাগরীর পাঠ বাঁ থেকে ডাইনে—যাতে হখমনীষীয় 'ররোস' 'সরউর' বা সরোবর হয়ে যায়—সরোবরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'সর'। আর তা বিরোধীদের চোখে এম্নি সংক্ষিপ্ত মালুম হ'ল যে তারা শ্লোক-রচনা করলেন ঃ গণ্ডুস জলে শফর ফরফর করে। গণ্ডুস আর শফরীর সঙ্গমে 'গণ্ডুশফরী' কথাটিও চমৎকার দাঁড়িয়ে যায় )। চতুর্থত আমি বলতে চাই—বৈশাখকে উল্টো পড়লে ( দু'বার পাঠে উল্টো-পাঠের ধ্বনি আসে দ্বৈলিপীয় শব্দে। —'দ্বিলিপ' থেকে হয়ত গ্রীক ফিলিপ আবির্ভূত। আর শফরীর বৃহৎ সংস্করণ মৎসটির নামও পূর্ববাংলায় 'ফলি' ) তা 'খশাই ব' হয় যা খাশিয়াদের নিকটস্থ ধ্বনি এবং সম্ভবত আবেস্তার ('খশমইব্যা' কস্মৈ বা, খশম-ইব-অয় ) কথাটির জন্মদাতা। ৩০১ সনের বিন্দুসর-শিলালেখর সংখ্যাটির পাঠ যদি বাঁ থেকে ডাইনে দেওয়া যায় (যে-পাঠ তখন দ্বিতীয় পাঠ বলেই চালু ছিল—দু'বার পাঠ-রীতি উপনিষদেও আছে—বশিষ্ঠ ত ঋকবেদের মন্ত্রের তিনবার পাঠের কথাই বলেছেন) তাহলে তার ধ্বনি 'একশত্রি' বা 'একচ্ছত্রি' হয়। সত্যি তিনি একচ্ছত্রী মহারাজ ছিলেন। A. D. 109-এর পূর্ব্বাঞ্চলের পাঠ হয় ( সন হিসেবে এই লিপিমালা ঐতিহাসিকরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত করেছেন ) 'অদ একন্ন ব'। একসঙ্গে সবাই অন্ন গ্রহণ করবে বলে শ্বেত-অশ্বেত উপনিষৎ মাফিক প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলেই হয়ত পরেকার আর্য্যদের চোখে মৌর্য্যরা পতিত ছিলেন।



কিন্তু পূর্ব্বার্য্যরা বহির্ভারতে অভিযানী ঋষিদের পূর্ব্বাচার্য্য বলেই গণ্য করতেন নতুবা বিশ্বামিত্র-অগস্ত ঋষি বলে গণ্য হতেন না। রোমে বসেও অগস্ত যবন বনে যাননি। হয়েছিলেন হয়ত দক্ষ-পিতা। মুসোলিনী সেদিনও 'ডুস্'—( বর্ণবিন্যাস তার DVX = দ্বক্স = দক্ষ ) বা জাতির পিতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

যাক, এখন মোহেঞ্জোদরোর চতুর্থ বা শেষ-ব্রাহ্মীলিপিটির (Mohenjo-daro & Indus Civilization-Vol. III—PLXC. No. 4.) নমুনা আর পাঠ এখানে লিপিবদ্ধ করছি—('লিপি' কথাটি পারসিক, 'দ্বিপি'-ও না কি তা-ই এবং সমানার্থক—হায়রে প্রাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিত-ধূর্ত্ত-মহল, এতো খবর রেখে পারসিকদের জন্মের খবর রাখবার প্রয়োজনটিই এড়িয়ে গেলে ! ) ঃ

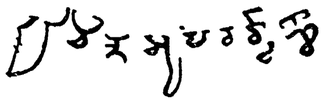

পাঠ ঃ নরসিহঁর্ক্সসুংৰ ( গং, য় ) চ চোড়র্থ ( বলই, চলই )

একটি পাঠই দেওয়া হ'ল ঃ কোণীশক-মাত্রা, প্রতীক-ধ্বনি এবং ব্রাহ্মীলিপি-ভঙ্গী অবলম্বনে এই পাঠ রচিত। এখানে একটি অক্ষর এম্নি যে তা তিনটি বিভিন্ন-ধ্বনি বহন করছে, যেমন বং, গং, য়—যার সমন্বিত ধ্বনি 'বঙ্গয়' বা 'বঙ্গযং' হয়। শেষ অক্ষরত্রয়ী চোড়-চোল এবং শূর বা তুরষ্ট-তুখর ( তুর্কী ) বলরাম-বলাইকে নিয়ে আসছে। পঞ্চম অক্ষরের ধ্বনি প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ 'নরক'-কে আবির্ভূত করাচ্ছে। প্রথম চারটি অক্ষর জুড়ে আছেন চোড়গঙ্গের নাতি নরসিংহ ( ভুবনেশ্বরী চন্দ্রিকা যার পিশীমা )। কর্ণসুবর্ণ শশাঙ্কও এখানে আছেন—তিনি সাতকর্ণি-খরবেলকে ডেকে আনছেন। ( 'সমাতৃক শশইক'-মুদ্রা মোহেঞ্জদরো-তে আছে। তিনিই চোমিল্লার সমাতৃক গোবিন্দচন্দ্র—মা হচ্ছেন যোগিনী ময়নামতী। সাতকর্ণিও সমাতৃক রাজা ছিলেন, তাঁর মার নাম বলাশ্রী গৌতমী। 'সেঋকা' তাদের আদি আবাস ভূমি—চীনের আদি নাম 'সেঋকা'—কাছাড়ীরা সেখান থেকেই আসামে প্রবেশ করেন )। ষট্‌চক্রভেদে শক্তির বল-ধবল সন্তানের প্রসঙ্গ আছে।

এই সঙ্গে এ-কথাও বলতে বাধ্য হচ্ছি ব্রহ্ম-ব্রহ্মা, বিষ্ণু-কৃষ্ণ এবং শিব-শিবাত্মিকা শক্তির লীলা ভারতের ইতিহাস-পুরুষদের নাম-ধাম-গোত্র জটিল করে তুলেছে। হর-হরির অন্বয়ে যে শ্রীহর্জর ( কাছাড়ী ) আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর নিবাস ছিল 'হারূপেশ্বর-পুর' বা 'হপ্পেশ্বর-পুর' অথবা 'হাল্লপ্পেশ্বর'। তার মানে তিনি গরুড়-গোত্রীয় 'হড়প্পা'র আদমী—চেঙ্ঘিজ পৌত্র হাল বা হালগুর ভোল-পাল্টানো নাম। গুড়ুফার-কে যদি গুলফার বলে চিনি—যেম্নি 'হারূ' 'হাল্ল হয়েছে তেম্নি যদি চিনি, আর তার ক্ষরোস্থি-ভঙ্গীর পাঠ নিই,

তাহলে তা ফালগু হয়ে হালগুর গাঁ-ঘেঁষে দাঁড়ায়। হর্জরও সম্বৎ প্রবর্ত্তন করেন, গুড়ুফারের মতো। আবার হালগু গুড়ুফার মতো ত্রয়ীর রাজ্যের ( কুরুই-হালগু-বটু ) একজন সভ্য ছিলেন। লিপিটি ত্রয়ীর রাজ্যের লিপি। যুবরাজ বা যুক্তরাজ-প্রথা যখন কুমারদের মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিতে পর্য্যবসিত, লিপিটী তখনকার দিনের ইতিহাস বহন করছে। তাছাড়া কাশ্মীরে 'হরমুকুট' পর্ব্বত, কলহনের সময়ে 'খাশ'-দের আধিপত্য এবং ROI FAINEANT-হিসেবে তিব্বতী 'উদয়নদেবে'র আবির্ভাব আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্ব-পশ্চিম দিক প্রান্তদ্বয়ের রহস্য-ভেদে সহায়তা করে।

ধর্ম্মের দিক থেকে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে লিপিটি 'ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর' এই 'ত্রিদিবে'র বার্ত্তা আনছে যা মোহেঞ্জোদরোর সভ্যতার দেবতা ( বৈশ্বানৈত্রীয় উপনিষদের পাল্লায় ভোল পাল্টে তা 'ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকা'-ও হতে পারে। এই বর্ণ সঙ্কর ব্যাপারে ষটমতাচার্য্য শঙ্করের বিশেষ উৎসাহ ছিল )। আনছে 'জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা'র খবর যা ত্রিকলিঙ্গের দেবতা। দিচ্ছে 'বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত কেশবের শিলালিপি'-র ( বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখাল দাস—চিত্র নং ৯ ) ত্রিমূর্ত্তির ইতিহাস। সেই প্রস্তর-ফলকটির লিপি-অংশের উর্দ্ধে 'তুরনীয়ন'-লিপি (?)তে যা লেখা তার বাঁ থেকে ডানে পাঠ হচ্ছে ঃ

"বংগনাষট দৌবং কঠং দিবচ তুরাষট"

এতে শুধু বঙ্গের ইতিহাস নয়, তুরস্কের জন্ম-কাহিনীও লিপিবদ্ধ। বারান্তরে 'বাংলার ইতিহাস'-রচনায় তা আলোচিত হবে। তবে আপাতত এটুকু বলে রাখছি 'মহা-ভারতের' পূর্ব্ব মধ্য এবং পশ্চিম প্রান্তের বহু জনপদ এবং নদী একই বা একধরণেরই নাম-বাহী। যব-দ্বীপের লোকরা যেম্নি আর্য্যপুঙ্গবদের ভাষায় যবন তেম্নি হখমনীষীরাও যবন বা যোন। মণিপুর-আরাকান-অঞ্চলের মানুষরা যেম্নি মগ তেম্নি পহ্লভরাও মগ। মোঙ্গলের বা তুরনীয়নদের তুরগের গতিই মগ-জাতির এই বিস্তৃত বিন্যাসের উৎস। চৈনিক-কাছাড়ীদের দুর্দ্ধর্ষতাই যে 'ভারুকচ্ছে'র জন্মদাতা প্রচলিত শিলা-লেখের আর মোহেঞ্জোদরোর নানাবিধ লিপির পাঠ স্বচ্ছন্দে তা জানিয়ে দেয়। তবে শিলা-লেখগুলোর যে অদ্ভুত পাঠ প্রভুরা দিয়ে গেছেন ( অনেক অক্ষরও মুছে দিয়ে গেছেন ) তা আমাদের মন থেকে মুছে ফেলে শাসন ও দানপত্রগুলোর সৎ এবং বিশুদ্ধ পাঠ দিতে না পারলে বাংলার বা ভারতের যথার্থ ইতিহাস রচিত হবেনা।

"সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্ত সহ বীর্য্যং করববাবৈহ।"—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ
"একসঙ্গে উভয়ে রক্ষিত-ভক্ষিত হব, এক সঙ্গে শক্তি যুক্ত করব।"
"এক নৌকায় বসবাস-ভোজন করব, উভয়ে যুক্ত হয়ে সন্তান-উৎপাদন করব।"

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

২

শ্বশুরবাড়ি এসে হক্‌চকিয়ে গেল প্রমীলা। এতো ভিড় আর কবে দেখেছে সে? একসঙ্গে এত-গুলো লোক, এত গোলমাল, সে ভাবতেও পারে না। তিনটি সন্তান বিসর্জন দিয়েও যজ্ঞেশ্বরের রক্ত এতটা পরিষ্কৃত হয়নি—যাতে ক'রে একটি স্বাভাবিক সুস্থ সন্তান সে আনতে পারে সংসারে। প্রমীলা যে শুধু মাত্র হিংসুক, লোভী বা স্বার্থপরই ছিলো, তাই নয়, কিছুটা নির্বোধও ছিলো। বাড়িতে আবদার, অত্যাচার করতো বটে কিন্তু কথাবার্তা বলতো কম। বলতে জানতো না। আর তার সঙ্গীই বা ছিলো কে? সারাবাড়িতে এক পিসতুতো ভাই একটি, বছর দু'য়েকের ছোটো তার চাইতে, তাকে সে দুইচক্ষে দেখতে পারতো না। সে যে তাদের বাড়িতে আছে, তার বাবারটা খাচ্ছে এ নিয়ে একটা অসহ্য গাত্রদাহ ছিলো। যজ্ঞেশ্বরের বিধবা বোন মৃত্যুর সময় এই ছেলেটিকে দশ বছরের ক'রে তার মামার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন আর সেই সঙ্গে ছত্রিশ ভরি সোনা। গায়ের চাকা-চাকা গয়না সব। তেজীয়ান ছেলে, মামা তাড়িয়ে দিতে চাইলেই সেই গয়নার বাক্স ফিরে চায়। সে কি দেখেনি? দশ বছর বয়স কি খুব কম? হাজার ঠেলাঠেলিতেও সে নড়ে না এখান থেকে। খায় দায় ইস্কুলে যায়, বছর বছর লাফিয়ে ওঠে ক্লাসে। চুপে-চুপে মামীর বুকে মাথা ঠেকিয়ে মায়ের আদর ভোগ করে। মামী ভাবে এই রাখলেটাই আমার জীবনের একফোঁটা আলো।

সেই প্রমীলা এই বাড়িতে এতো আত্মীয়ের বহর দেখে—অসংখ্য দেওর, ননদ, জা, মাসী, পিসী, খুড়ি ও জ্যেঠির ছড়াছড়ি—দেখে সে যদি না থমকায় তো থমকাবে কে? দু'দিনের মধ্যে আর মুখ দিয়ে তার একটি শব্দ বেরোলো না। একমাত্র ছেলে না হ'লেও প্রথম ছেলে তো? প্রথম সাধ, প্রথম আহ্লাদ। তাছাড়া, পাঁচটি ছেলেমেয়ের মধ্যে এই-ই সবচেয়ে বড়ো সন্তান হিরণ্ময়ীর। প্রচুর আড়ম্বর করলেন তিনি। চারদিক থেকে স্রোতের মতো লোকজন এসে বাড়ি ভরে ফেললো। সুমু কি তার একলার? পিসীদের না? কাকাদের না? মামী মাসীরা কি কেউ নয়? লতা ধ'রে ধ'রে তিনি আঁকশি বাড়ালেন। লোকজনই তো লক্ষ্মী। লোকজন না হ'লে কি উৎসব হয়? আনন্দ হয়? তবু তো এসব উপলক্ষ্য ক'রে দেখা হয় কত আপন জনের সঙ্গে, অতীতের কতো মনের মানুষের সঙ্গে। মস্ত বাড়ি ভাড়া নিয়ে, মস্ত গাড়ি দরজায় দাঁড় করিয়ে আলোতে, গানেতে, সুগন্ধে, সুখাদ্যে, ঝলমল শাড়িতে, গয়নাতে একেবারে ইন্দ্রপুরীর আনন্দ নামিয়ে আনলেন তিনি। খুসী হ'য়ে রাজেনবাবু দু'হাতে টাকা খরচ করলেন। হাল চাল দেখে মেয়ের মতো যজ্ঞেশ্বরও মনে মনে অবাক হলো বৈকি। বুকটা কড়কড় করলো তার। এক রাত্রির জন্য একটা ফুঁয়ে মানুষ নাকি এমন ক'রে উড়োয় টাকা? ফুল, ফুল, ফুলই বা কত! কী হবে

এত ফুল দিয়ে? একি থাকবে? এতো শুকোলো ব'লে। কত আলো জ্বলছে মুহুর্মুহুঃ, কত বিল উঠছে কে জানে। আর খাচ্ছে কত লোক। শহরের লোক কি এরা বাকী রাখেনি?

অনেকরাত্রে খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে যখন দেখা করতে এলো মেয়ের সঙ্গে, বাবার কাঁধে মাথা রেখে ভয়চকিত চোখে প্রমীলা বললো, 'বাবা, আমি যাবো।'

যজ্ঞেশ্বর বললো, যাবি-ই তো। আজ রাতটা থাক্। আজ তো ফুলশয্যা, আমি কাল সকালেই আবার আসবো।' প্রমীলা প্রবোধ মানলো না, নির্বোধ চোখে তাকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখ মুছলো যজ্ঞেশ্বরও। মনে মনে ভাবলো কী দরকার ছিলো মেয়েটাকে পরের ঘরে পাঠাবার, ঘর-জামাই রাখাই উচিত ছিলো তাঁর।

বাপ চলে গেলে সেই যে প্রমীলা কাঁদতে আরম্ভ করলো কিছুতেই থামানো গেলো না তাকে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হিরণ্ময়ী নিভৃতে ডেকে নিয়ে অনেক বোঝালেন, বাড়ি ভর্ত্তি আত্মীয়-কুটুম্ব, বলবে কী তারা, একটা তো রাত, আবার কাল বিকেলেই তো যাবে, সকালেই তো তোমার বাবা আসবেন, কিছুতেই কিছু হ'লো না। শুভরাত্রির সব স্ফূর্তি, সব প্ল্যান ভিজিয়ে সে কাদা ক'রে দিল। ঘর ভালো, বর ভালো, কত কথা সে শুনেছে এ কদিন ধ'রে, এরই নাম ঘর—বর, এই তার ঘর? এই তার বর? পারলে প্রমীলা—সব ছেড়ে-ছুড়ে একছুটে চলে যেতো দমদম; যাবার জন্য তার অদম্য ইচ্ছেও হয়—কিন্তু রাস্তা সে চেনে না, তাছাড়া, এ লোকগুলোকে কেমন জানি ভয় ভয় করে।

সুনির্মল শুতে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে। কালকে বৃষ্টিতে ভিজে তার শরীর খারাপ হ'য়েছিল, মাথা ধরেছিলো, চুপচাপ হাত-পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে শুলো সে, 'উঃ, আঃ' করলো একটু, হয়তো কোনো প্রতীক্ষা, কোনো অপেক্ষা জেগে রইলো খানিকক্ষণ, তারপর পাশ ফিরলো। আর তার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে প্রমীলা একটা হিংস্র ক্ষোভ অনুভব করলো মনের মধ্যে, এই তো, এই লোকটাই তো তার যত দুঃখের মূল। এই লোকটাই কাল তাকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে, এই বিশ্রী লোকগুলোর মধ্যে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

প্রমীলা যে ঠিক সংসারের আর পাঁচজন মানুষের মতো নয় এ কথা অনুভব করতে খুব দেরি হলো না সুনির্মলের। সে বুঝলো এই হৃষ্টপুষ্ট, মোটাসোটা ফর্সা গোলগাল মেয়েটির কোনো হৃদয়ের বালাই নেই, মনের বালাই নেই, বুদ্ধিরও বালাই নেই। বুঝলেন হিরণ্ময়ীও। ছেলের চোখে-চোখে তাকিয়ে বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিট্‌লো। দাঁতে দাঁত চাপলেন, কয়েক রাত ঘুমুলেন না, তারপর ভারাক্রান্ত হৃদয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন ভিড় মিটিয়ে দিলেন বাড়ির। ঝপ্ ক'রে একটা অন্ধকার ঝুলে পড়লো কালো ছায়ার মতো।

সুনির্মলের মত ছিলো না এই বিয়েতে। হিরণ্ময়ীও যে একজন মস্ত উৎসাহী ছিলেন তা নয়। বরং যজ্ঞেশ্বরের মামী যখন প্রস্তাবটা নিয়ে এলেন, হেসেছিলেন, এনি বিয়ে কী, আজকালকার দিনে



আবার এ বয়সে বিয়ে করে নাকি কোনো ছেলে? সুনির্মলের বাবা রাজেনবাবু সবে ফিরে এসেছেন আপিস থেকে, গলার টাইটা খুলতে খুলতে উৎসুক চোখে তাকালেন, 'মেয়েটি কেমন?'

'তোমার যে খুব গরজ?' ঠাট্টা করলেন হিরণ্ময়ী। রাজেনবাবুর মতো সব বিষয়ে উদাসীন অন্যমনস্ক মানুষের পক্ষে এ প্রশ্নটা একটু আশ্চর্যই মনে হয়েছিলো তাঁর। একটু হেসে জামা খুলে আরাম ক'রে ইজিচেয়ারে বসে স্ত্রীকে তিনি আরো আশ্চর্য করে দিলেন, 'দেখেছেন নাকি আপনি? মনোমত হয়তো দেখুন না চেষ্টা করে।'

কোনো ব্যাপারেই সংসারে যার কোন হস্তক্ষেপ নেই, উচ্ছ্বাস নেই, উৎসাহ নেই, হঠাৎ সেই মানুষটি যে ছেলের বিয়ে নিয়ে সত্যি সত্যিই কেন এমন মেতে উঠ্‌লেন কে জানে। কী জানি কেন একটি পুত্রবধূর আকাঙ্খা তার মনে বাসা বেঁধেছিলো কিছুদিন থেকেই। এবার জ্বলে উঠলো ইন্ধন পেয়ে। ভেবে পেলেন না হিরণ্ময়ীও কেন তাঁরই মতো উৎসুক হ'য়ে উঠছেন না এ ব্যাপারটা নিয়ে। কম বয়েস এটা কি একটা যুক্তি? এই তো সবচেয়ে সুন্দর সময়। বিয়ে করবার পক্ষে এর চেয়ে উত্তম সময় আর আছে নাকি মানুষের জীবনে? তিনি নিজে তো এর চেয়েও কম বয়সে বিয়ে করেছিলেন! হিরণ্ময়ী কি ভুলে গেছে সে কথা? সে সময়কার যত মধুরতা, যত রোমাঞ্চ—এখনো আঙুরের রসের মতো টল্‌টলে হ'য়ে জমে আছে বুকের মধ্যে। তার কি কোনো তুলনা আছে? হিরণ্ময়ী কি চান না তাঁর ছেলের জীবনেও সেই সুখ নেমে আসুক অতল হ'য়ে। তিনি কি চান না সুনির্মলও তেমনি ক'রে পার হ'য়ে আসুক সেই সব দরজা, সেই সব সময়? সন্তানের হৃদয় তো পিতার চাইতে মায়েরই ভালো ক'রে বোঝা উচিত। নতুন বৌ পৃথিবীর সব নির্য্যাস, সব আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াক এই বাড়িতে, এই ঘরেতে, নিটোল হ'য়ে পূর্ণ হ'য়ে, উঠুক তার ছেলের জীবন। মন যদি ভরা থাকে তাহ'লে ওর আরো কত উৎসাহ হবে, কাজেকর্মে, বেঁচে থাকায়।

মনে পড়লো সুনির্মলের যখন বাইশ বছর বয়েস, তখন রাজেনবাবুরই একটি বন্ধু-কন্যার প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিলো। দেখেশুনে মনে-মনে তিনি তখনো স্থির করেছিলেন পরীক্ষা হ'য়ে গেলে এই মেয়ের সংগেই বিয়ে দিবেন ছেলের। কিন্তু টাইফয়েড হয়ে হঠাৎ মারা গেল মেয়েটি। সুনির্মল বিচলিত হ'য়েছিলো। পরীক্ষায় ভালো করতে পারলো না। রাজেনবাবুর মনে এখনো এই ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে আছে যে সেই তিন বছর আগের দুঃখের স্মৃতিটি একটি বেদনার বিন্দু হ'য়ে এখনো লেগে আছে তার ছেলের বুকের মধ্যে। বিয়েতে যে তার এই আপত্তি তাও ঐ একই কারণে। হিরণ্ময়ী তো সবই জানেন। একজন মেয়ের সাহচর্য ছাড়া কি সেই দুঃখ আর কেউ মুছে দিতে পারে? অবিশ্যি সমস্ত ধারণাই তার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়া। সেই ধারণার উপর ভিত্তি করেই তিনি ছেলের অমতকে একটা খুব কিছু গুরুতর হিসেবে গণ্য করলেন না। আর তাঁর ইচ্ছের এই প্রবলতা দেখে সুনির্মলও বলতে পারলো না কিছু। বাবা আর কবে কী বলেছেন তাকে? কী চেয়েছেন? পেয়েছে ছাড়া এতোটুকুও তো দিতে হয়নি জীবনে। তবে কেন এই সরলচিত্ত ভালোমানুষটিকে হতাশ করা। বিয়ে যে সে সারা জীবনেও করবে না এমন প্রতিজ্ঞা তো তার নেই। তবে হোক না, এখনই হোক না, এখানেই হোক না। সুকৌশলী হিরণ্ময়ীও তাই বললেন। তাছাড়া যজ্ঞেশ্বরের মামী তার বাক্‌জালে

মেয়ের রূপলাবণ্য এবং গুণপণা সম্বন্ধে এমন একটি সুষমা রচনা করলেন সকলের মনে যে, শেষ পর্যন্ত হিরণ্ময়ী রাজেনবাবুর চাইতেও বেশী উদ্যোগী হয়ে কাজে লাগলেন।

সুনির্মল মুখ ভার ক'রেই রইলো শেষ পর্য্যন্ত। বৃষ্টিতে ভিজে ভারি মুখেই বিয়ে ক'রে এলো। বৌ নিয়ে এসে সেই মুখে অভিমানের সংগে সংগে একটি দুঃখের ছায়াও পড়লো ঘন হ'য়ে।

হিরণ্ময়ী নিজেকে ধিক্কার দিলেন। একটু অবহেলা হ'য়েছে বৈকি। যজ্ঞেশ্বরের মাসীর কথায় কেন অত বিশ্বাস ক'রেছিলেন তিনি? তিনি নিজে কেন গেলেন না দেখতে? একটা ভাত টিপলেই তো একহাঁড়ির ভাত বুঝে নিতে পারতেন। আর এই মেয়েকে! রাজেনবাবু দেখেছেন। তাঁর চোখের দেখার কতটুকু মূল্য। যে-রকম লাজুক মানুষ, কথাতো একটাও বলেননি, নামটা পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেননি। হাত ধ'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে নিয়ে এসেছে, কটা রং দেখেই ভুলে গেছেন তিনি, আবার হাত ধ'রে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে মেয়ে। যে মানুষকে বুঝাতে একটা পলকও খরচ করতে হ'তো না, সেইখানে এতোবড়ো একটা ভুল তিনি কেমন ক'রে করলেন? এতো বড়ো একটা ব্যাপারে কী ক'রে এতো বড়ো একটা ফাঁক রাখলেন! সব বিষয়ে—তিনিই কর্ত্রী, তার পায়ের পাতায় ভর ক'রেই এতোগুলো মানুষের পা চলে, এ সংসারে তার বুদ্ধিই চরম। ছেলেদের শিক্ষা-দীক্ষা, খাওয়া-পরা, স্বামীর সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধা, আত্মীয় পরিজনের খোঁজ নেয়া—খবর নেয়া, আদর আপ্যায়ন, ভদ্রতা-অভদ্রতা, সামাজিকতা, লৌকিকতা কী তিনি করেন না? কী তিনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নির্ভর করেন স্বামীর উপর? রাজেনবাবু উপার্জন ক'রেই খালাস, সুনির্মল এত বড়ো হ'লো, এখনো সে মা ছাড়া দিশে পায় না কিছু, আর এতবড়ো একটা বিষয়ে চোখ বুজে রইলেন তিনি। একা ঘরে কপালে করাঘাত করলেন, চিন্তা করলেন, মন-খারাপ ক'রে ঘুরে বেড়ালেন চোরের মতো, তারপর উপায় স্থির ক'রে আবার কোমর বেঁধে উঠে পড়ে লাগলেন সেই ভুল সংশোধনের প্রায়শ্চিত্তে।

কিন্তু মুস্কিল হ'লো প্রমীলাকে নিয়েই। সে কিছুতেই থাকতে চায় না এখানে। এখানে তার ভালো লাগেনা। যে ক'দিন থাকে কথা বলে না কারো সঙ্গে, নিজের ঘরে নিজের মনে বসে থাকে চুপ চাপ। দেওররা, ননদরা সাধাসাধি করে, টানাটানি করে, নিয়ে যায় বেড়াতে, নিয়ে যায় সিনেমায়, হৈ হল্লা ক'রে আয়োজন করে ভোজের, প্রমীলা একেবারে নিঃসাড় পাষাণ। রাত্রে ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে কাঁদে স্বামীর কাছে—'আমি দম্‌দম্ যাবো।'

'এখানে ভালো লাগে না?'

'না—।'

'কেন?'

'ওরা আমাকে সারাদিন বিরক্ত করে।'

'কারা?'

'তোমার ভাইবোন মা সবাই।'

সুনির্মল চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে সিলিঙয়ের দিকে। প্রমীলা বলে,

'তুমি ওদের সঙ্গে থাক কেন?'

'কাদের সঙ্গে?'



'এদের সঙ্গে?'

'তবে কোথায় থাকবো?'

'দম্‌দম্।'

'দম্‌দম্ কি আমার বাড়ি?'

'বাবা বলেছেন সেখানে থাকলে তোমাকে বিনাভাড়ায় দু'টো ঘর ছেড়ে দেবেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' আরো বলেছেন—'

'কী—?'

'ইচ্ছে করলে বাবার দপ্তরে বসতে পারো হিসেব নিকেশের জন্য। বাবা কি এত বড়ো ব্যাবসা একা সামলাতে পারেন? সেজন্য তোমাকে মাইনে দেবেন তিনি।'

'বাঃ, চমৎকার কাজ তো—। কিন্তু উনি তো কনট্রাকটারিই করেন, আর কিসের ব্যবসা?'

প্রমীলার মুখে উৎসাহের বন্যা নামে। কে বলবে এই মানুষ সারাদিন কথা বলে না কারো সংগে। তিনবার জিগেস্ করলে একবার জবাব দেয়। শোয়া থেকে উঠে বসে, বেগে, একটু আগে যে কেঁদেছে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে তার চিহ্নমাত্র থাকে না কোথাও। চোখ টান ক'রে হাতের আঙুলে গুণে-গুণে ব্যবসার ফিরিস্তি দেয়—তিনটে লরি খাটে সারাদিন, এতোগুলো বাড়ি ভাড়া, বস্তির খাজনা আদায়, লগ্নি কারবারের সুদ আর জমার খতো ঘাঁটতে হয় রোজ, সকাল থেকে কত লোক যে আসে, হঠাৎ চোখের দৃষ্টি লোভে বড়ো-বড়ো হ'য়ে ওঠে, 'সেবার মনার মা করলো কী জানো? গলার সাতনরি হার বাঁধা রেখে মাত্র পঞ্চাশ টাকা নিলো। তিন মাসের মধ্যে খালাস করবার কথা ছিলো, এলো তিন মাস পুরে যাবার দু'দিন পরে, আর কি আমরা সে মাল ছাড়ি? মাগীর কী কান্না, কী কান্না।' এখানে হাসলো প্রমীলা। 'তারপর সেই, সেই গদাধর বাড়ুয্যের তিন বিয়ের বৌটা, সোয়ামীটাতো ষাট বছরের ঘাটের মরা, আর বৌটা একটা ছুঁড়ি। আগ-পক্ষের ঢেঁকি-ঢেঁকি ছেলে মেয়েতে ঘর ঠাসা, টাকাও তেমনি। বৌটার স্বভাব চরিত্র মোটে সুবিধের ছিলো না, বাঁড়ুয্যেবাবুর যখন শ্বাস উঠলো ছুটে এলো বাবার কাছে, শেমিজের বুকে তাড়াতাড়া নোট—'

গলা খাটো ক'রে, স্বামীর মুখের কাছে, একটু এগিয়ে—'আমি সব জানি বুঝলে? সব বুঝি। তোমরাই খালি আমাকে বোকা ভাবো, আমার বাবা তা বলেন না কখনো। এই তো বিয়ের মাত্র আট মাস আগের কথা, দরজার ধারে দাঁড়িয়ে দেখি কী, বাবা খপ্ ক'রে ওর শেমিজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে তুলে নিলেন নোটগুলো। তুমি স্বামী তোমাকে বলতে তো বাধা নেই, একেবারে ফিস্‌ফিসিয়ে 'বাবার সংগেই ওর ভাব ছিলো।'

সুনির্মল মুখে হাত চাপা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো, তার গা গুলোচ্ছে, সোজা ছাতে উঠে গিয়ে মাথায় ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়ে নিজেকে সুস্থ না করতে পারলে সারারাত আর ঘুম হবে না তার।

এই উৎসাহ অবিশ্যি প্রত্যেক রাতের নয় প্রমীলার, কেননা উৎসাহিত হবার ইন্ধন সে একেবারেই পায় না। যেটা তার বিষয়, যে-বিষয়ে সত্যিই তার বলবার মতো কথা মনের মধ্যে কিছু জমা আছে,

মাথার মধ্যে কিছু লেখা আছে এ বাড়ির কারোরই সে বিষয়ে আগ্রহ নেই। এ বাড়িতে সব কিছুরই কেবল বাজে খরচ। সেটা টাকাই হোক্ আর কথাই হোক্। এরা এত এত রান্না করে, সকালবেলা টেবিলে বসে দুধ, ডিম, রুটি, মাখন থেকে আরম্ভ করে রাত্তির পর্য্যন্ত এত খায় যে দেখে দস্তুরমত গা ঘিন্‌ঘিন্ করে প্রমীলার। চাকরবাকরদের সঙ্গে শাশুড়ীর আদুরেপনা দেখে তার সতেরো বছরের নরম শরীর গরম হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কী করবে? কী বলবে? এটা কি তার বাবার বাড়ি? বাবার বাড়িতে তার মার সাধ্য ছিলো এভাবে অপব্যয় করে? তারা বাপে মেয়েতে খুন বাধিয়ে দিতো না? কিন্তু এ যে হিরণ্ময়ী। এযে হিরণ্ময়ীর সংসার। এই হিরণ্ময়ীকে সে যে বাঘের চেয়েও বেশী ভয় করে।

না, স্বামীও তার মানুষ না। বাবা বলেছেন, 'জামাইটা একটা হাঁদাকান্ত তা নৈলে এতগুলো মাইনের টাকা তক্ষুনি ব্যাঙ্কে জমা না দিয়ে কিম্বা নিজের বিয়ে করা বৌ'র হাতে না দিয়ে, মার হাতে এনে দেয়? খায়তো বাপের হোটেলে। রাজেনবাবু কি যথেষ্ট রোজগার করেন না? প্রমীলাও বোঝে সব কথা। বিয়ের এই ন' মাসে দু'এক মাস যা থেকেছে, দেখেছে তো সব। বুঝেছে তো সব। যজ্ঞেশ্বরবাবুও তো আসেন, দেখেন, বুদ্ধি দেন মেয়েকে। মাইনে পেয়ে একবার মোটা ব্যাগটা সুনির্মল রাখতে দিয়েছিলো তাকে, হিরণ্ময়ী বাড়ি ছিলেন না। বলেছিলো মা এলে তাঁর হাতে দিয়ে দিয়ো। পাঁচদিন পর্যন্ত প্রাণে ধরে দিতে পারেনি প্রমীলা। যেদিন হিরণ্ময়ী চেয়ে নিলেন দাঁতে দাঁত চেপে ছিলো সে।

তাই এ বাড়ির কিচ্ছু তার ভালো লাগে না। এ বাড়িতে দম বন্ধ হ'য়ে আসে, লোকগুলোর মুখের দিকে তাকালে রাগ হয়। এদের সংগে কী বলবে? কী করবে? এরা তাকে বোঝে না, তারাও ওকে বোঝে না। একসংগে একমাসও টিঁকতে পারে না সে এখানে। বাপকে খবর পাঠিয়ে আনিয়ে চলে যায় বারে বারে।

এতোদিন এ বিষয়ে প্রতিবন্ধক হয়নি হিরণ্ময়ী, অনেক সময় বিরক্ত হ'য়েছেন বটে, কিন্তু কিছু বলতে পারেননি, হয়তো এজন্যেই পাছে একটা শাশুড়িপনার মতো দেখায় ব্যাপারটা। এবার শক্ত হ'লেন। দু'মাস পরে এসে, পনেরো দিন যেতে না যেতেই মেয়েকে নিতে এলে তিনি ফিরিয়ে দিলেন যজ্ঞেশ্বরকে। প্রমীলা কাঁদলো, জেদ্ করলো, নেমে এলো রাস্তা পর্যন্ত, যজ্ঞেশ্বরের রাগ বোঝা গেল চোখের দৃষ্টিতে, হিরণ্ময়ীর 'না' তবু 'হাঁ' তে গললো না। না, আর দেরি নয়, সময় নষ্ট ক'রে আর লাভ নেই। যথেষ্ট! যথেষ্ট ভুল হ'য়ে গেছে, যথেষ্ট—অন্যায় হ'য়ে গেছে, আর নয়।

'শোনো।' গুরুগম্ভীর গলায় তিনি ডাকলেন পুত্রবধূকে।

অশ্রুসিক্ত চোখে শাশুড়ীর কঠিন মুখের দিকে তাকালো প্রমীলা।

'ও-রকম কাঁদো কেন বাপের বাড়ি যাবার জন্যে? বিয়ে হ'লে কি মেয়েরা অমন ক'রে রোজ রোজ বাপের বাড়ি যায়? আর এখান থেকে এখানে যাবে, চ'লে আসবে। তাতো নয়, গেলে তিন মাসের আগে তুমি এসেছো কখনো?' উচ্ছ্বসিত শোকে প্রায় শব্দ ক'রে কেঁদে উঠলো পুত্রবধূ। হিরণ্ময়ীর টানা ভুরু কুঁচ্‌কোলো। এ কী অদ্ভুত।

—'ন' মাস হ'য়ে গেল তোমার বিয়ে হ'য়েছে,—তার মধ্যে ক'দিন তুমি এ বাড়িতে থেকেছো



বলো দেখি? এটাই তো তোমার বাড়ি, এই ছেলেমেয়েরাই তোমার ভাই বোন, আর অমন স্বামী যার, না, এখন থেকে তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।'

'এখানেই?'

'হ্যাঁ, এখানেই।'

প্রমীলার কান্না প্রায় রোদনে পৌঁছলো।

পৌঁছুক। আর নরম হ'লে চলে না। রাগ বিরক্তিকেও তিনি মুছে ফেলতে চেষ্টা করলেন মন থেকে। তা হ'লে আপনার খুতুতো আপনার মুখেই এসে পড়বে।

বৌকে নিয়ে তিনি বেড়াতে যেতে লাগলেন এখানে ওখানে, মনে করলেন নানা লোকের সংস্পর্শে যদি বা ওর ঘুমন্ত মন হঠাৎ সজাগ হ'য়ে ওঠে, পাঁচজনকে একরকম দেখতে দেখতে যদি বা হঠাৎ ও বুঝে ফেলে নিজেকে, নিজের ক্রটিকে, বই কিনতে লাগলেন বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে, মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ক'রে দিলেন, অন্যান্য নতুন বিবাহিত মেয়েদের ডেকে এনে ভিড় বাড়ালেন বাড়িতে, অকারণে ঘন-ঘন নিমন্ত্রণ খাইয়ে মাসের শেষে সংসারে টান ফেলতে লাগলেন,—কিন্তু প্রমীলার কোনো পরিবর্তন হ'লো না। কেবল এ বাড়ির হাওয়া আরো অসহ্য, আরো বিষ হ'য়ে উঠলো তার কাছে। শাশুড়ীকে সে আরো বেশী ভয় করতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বিতৃষ্ণা। স্বামীকে একটা মস্ত আপদ্ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলে না। একটা অসহায় ক্রোধ—ভেতরে ভেতরে ক্ষিপ্ত করলো তাকে।

সুনির্মলের অনাবিল সুখে-ভরা সুন্দর জীবনটা সহসা যেন একটা ফাটা বেলুনের মত চুপ্‌সে গেল, সব হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে শূন্য হ'য়ে গেল। চারটি ভাই বোন আর মা বাবার আনন্দ-মুখর সংসার নিঃশব্দ হ'য়ে গেল কী এক অজানা আশঙ্কায়। দাদার মুখ গম্ভীর, মার মুখ গম্ভীর, বাবার চিরসহাস্য মুখে চিন্তার রেখা, তবে আর কাকে নিয়ে নাবালক আর তিনটি ছেলেমেয়ে আসর জমাবে? দু'জন মানুষ—যাদের যুগল-জীবনের মাধুর্য ছড়িয়ে পড়বে আকাশে বাতাসে, আনাচে কানাচে, মনে প্রাণে সবখানে, যাদের সুখ সংক্রমিত হ'য়ে অন্যকেও দুঃখ ভুলিয়ে দেবে, পারস্পরিক অস্তিত্ব হবে যাদের কাছে অপরিহার্য্য—ভালোবাসার অতল প্রশান্তিতে যাদের আকণ্ঠ নিমগ্ন হ'য়ে থাকা উচিত, তাদের মধ্যে যদি সান্নিধ্যটাই এতো অসহ্য হ'য়ে ওঠে তবে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হ'তে পারে? মার কাছে এসে বসলো সুনির্মল—'তুমি মনে-মনে কী ঠিক ক'রেছ?'

'কী?'

'ওকে দম্‌দম্ যেতে দিচ্ছনা কেন?'

মা বুঝতে পারলেন না কী বলতে চায় ছেলে, তাকিয়ে রইলেন মুখের দিকে।

'প্রত্যেকদিন কান্নাকাটি আমি সহ্য করতে পারবো না, হয় তুমি ওকে যেতে দাও নয় আমাকে ছেড়ে দাও, হস্টেলে ফস্টেলে যেখানে হয় চলে যাই।'

অপরাধী হ'য়ে মাথা নিচু ক'রে রইলেন মা। একটু পরে বললেন, 'এতো ফেলে দেবার জিনিশ নয় বাবা,—মায়া মমতা বসাতে হবে তো? ও না হয় নির্বোধ—'

'তা হ'লে তুমি মায়া-মমতা বসাও, আমাকে রেহাই দাও।' রাগ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুনির্মল।

কিন্তু রাগ করুক আর যা-ই করুক, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে তো আর বৌকে ত্যাগ করতে পারবে না! সেবারকার মতো প্রমীলাকে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে বাপের বাড়ি যেতে দিলেও এবং থাকতে দিলেও এক সময় তার নিজেরই মনে হ'লো ঘরতো এই মানুষের সঙ্গেই বাঁধা হ'য়ে গেছে, যে ক'রে হোক এই মানুষটাকেই তো সহ্য করতে হবে জীবন ভ'রে, কাজেই একেই—অন্তত একটু তো মানুষ পদবাচ্য—তার চেষ্টা ক'রে, চরিত্র ক'রে যেমন করে হ'ক নিয়ে আসতে হবে। এবার মার সঙ্গে সহযোগিতা করলো সে। মনকে অদম্য হতাশা থেকে টেনে তুললো জোর ক'রে। রাগ থেকে দুঃখ থেকে নিজেকে সংযত করলো প্রাণপণ শক্তিতে—তারপর চললো গবেষণা। গবেষণাই তো। তাছাড়া আর কী? কী ভাবে বললে, কী ভাবে চললে, কোন্‌ভাবে আরম্ভ করলে প্রমীলার হৃদয়ের ঠিক আসল জায়গায় গিয়ে পৌঁছানো যায় তারই তো অবিশ্রান্ত চেষ্টা আর চিন্তা। হিরণ্ময়ী বললেন, 'একটু না হয় বেশী খরচই হ'লো, তবু আয় একটা মিশনারী মেম রেখে দি, ওরা ভারি ভালো, ভারি চমৎকার। ওদের শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতিও অতি সুন্দর।'

'রাখো।'

লাল মুখ আর সাদা পোষাক নিয়ে তারপর এলো সহাস্য সুন্দরী মেম।

তার পরামর্শ মতো বিলেত থেকে বই এলো দেড় শো' টাকার, এলো নানারকম ছবি, নানারকম আসবাব, আলাদা ঘর সাজানো হ'লো, অতগুলো বই গো-গ্রাসে শেষ করে সুনির্মল আরও খানিকটা শিক্ষিত হ'লো, হিরণ্ময়ীর হাতের এমব্রয়ডারি লেসের কাজ, উল বোনা আরো সুন্দর হ'লো, কেক তৈরিতে তিনি আরো একটু পটু হ'লেন, প্রমীলার বিরুদ্ধমন এদের প্রতি আরো তীব্র বিদ্বেষে ভ'রে গেল। শেষে অতিষ্ঠ হ'য়ে বারুদের মতো একদিন ফেটে পড়লো সে, বাড়ি মাথায় করলো তীব্র চিৎকারে। হাত-পা ছুঁড়ে, অমার্জিত ভাষায় গালিগালাজ করলো, শাশুড়ী-কে, স্বামীকে, পৃথিবীর সকলকে; রাশি রাশি আগুনের ফুল্‌কি ছিটোতে ছিটোতে যজ্ঞেশ্বর এসে পৌঁছলো ঝরঝরে গাড়ি নিয়ে, তার শাদা মুখ লাল হ'লো, ছোট চোখ কুঞ্চনে আরো ছোট দেখালো, চোখের স্তিমিত তারায় পশুর দৃষ্টি ফুটলো, মেয়ে নিয়ে যাবার সময় সে প্রতিজ্ঞা ক'রে গেল: 'আর যদি কখনো এই ইতর চামার, দরিদ্র, অভদ্র বাড়িতে পাঠায় তার মেয়েকে তা হ'লে সে অমুকের অমুক নয়।'

হিরণ্ময়ী ঘরের জানলার শিক ধ'রে দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হ'য়ে, রাজেনবাবু বেবাহিকের ক্রোধ উপশমের উপায় হাতড়াতে লাগলেন, আর সুনির্মল নিজের ঘরে বসে অক্ষম অসহায় রোষে হাতে হাত ঘষতে-ঘষতে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো 'সোয়াইন!' ভাইবোনেরা কৌতূহলী হ'য়ে ভীরু-ভীরু চোখে দেখতে লাগলো তামাসা। প্রমীলা বাপের পেছনে পেছনে সদর্পে সরোদনে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো।



স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু কিন্তু-কিন্তু হ'য়ে বললেন, 'কেমন জানি সব গোলমাল হ'য়ে গেল।'

হিরণ্ময়ী বললেন, 'হুঁ।'

'সুনুর বিয়ে দে'য়াটা বোধহয় ভালো হয়নি।'

'হুঁ।'

'মিছি মিছি—' হিরন্ময়ী উঠে গেলেন সেখানে থেকে। আর রাত্রে ফাঁকা ঘরে একলা শুয়ে শান্তিতে ঘুমুলো সুনির্মল। মনে-মনে একটা আশার ঝল্‌কানি লাগলো, উজ্জ্বল একখণ্ড হীরে। হয়তো ও আর আসবে না, আসবেই না। হয়তো ঈশ্বর দয়া করলো এতোদিনে।

## আদ্যিকালের সদ্য পদ্য

মেঘ্‌নার গাত্রে 'অক্ষত্র গঙ্গেম'—
যখন 'জফেৎ' ছিল, ছিল 'কুশ-হম' 'শেম'।
শ্যাম উপসাগরের নাম কি চমৎকার—
আ—'মগ্‌নুস সিন্ধুস'। অতিথির সৎকার
হয়েছিল উপকূলে—'সেখকা'র ঋত্বিক
মগেদের সিন্ধুতে নিমগ্ন ঠিকঠিক
করেছিল। না কি কোনো পাল্কীতেনহুষের
চীনাদের মগেদের মগধের-লহু শের—
আফগান মনু বীর-বরা করে গণ্ডুষ?
'সিন্ধুস' বা কেন বয়, কেন কয় 'মগ্‌নুস'?
হয়ত সমস্তই ফাঁকা ধ্বনি, ঝুটমুট!
বরঞ্চ ভুটানিরা পায়ে এঁটে ভারি বুট
হেটে গেছে পাঞ্চালে, বিরিঞ্চি পূর্ব্বা
ছিল গ্যাঁট হয়ে বসে নিয়ে 'ছায়া' কন্যা
লাল মুখে, বদরাগী, বটেত সুধন্বা;
ছিল তাঁর উর্ব্বশী কেশী ধানদুর্ব্বা;
তাঁরি রাগে 'ছায়া' লাল ঋগ্বেদী উষা নাম।
ভারতের রহস্য-সন-শাল-শল্লাম
আর্য্য বৃত্রের কেশ-বেশ-ভূষা-ধাম
আর্য্যাবর্ত্তের ব্রত-কথা বল্‌লাম।

# অপচিত

## রজত সেন

হাওড়া স্টেসানের প্ল্যাটফরমে পা দিয়ে অদ্ভুত মনে হল তার; এই সেই কলকাতা! আশ্চর্য! সবই প্রায় সেরকমই আছে; একটু অদল-বদল, একটু বা হেরফের। কিন্তু আসলে সবই সেই। সেই কোলাহল আর বিশৃংখলা, সেই উন্মত্ত জনতা! কিন্তু—প্রশান্ত ভাবল—সে যেন এ-জনতার কেউ নয়; পরিচয় আছে, কোনো যোগাযোগ নেই; এদের সম্বন্ধে তার চেতনা আছে, কিন্তু যোগসূত্র নেই।

স্টেসান থেকে প্রশান্ত ট্যাক্সী নিয়ে সোজা এল ব্যাংকে। আর একতাড়া নোট পার্সে নিয়ে ব্যাংক থেকে বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ আর কিছু কাপড়-জামা কিনল সে; চামড়ার ব্যাগে সব বোঝাই ক'রে প্রথম শ্রেণীর এক হোটেলে গিয়ে উঠল। বিছানার অর্ডার দিয়ে এসেছে, এক ঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছুবে। লাগোয়া স্নানের ঘর, সাবান আর তোয়ালে নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল সে। গায়ের ময়লা তুলতে কী যে কসরৎ করতে হ'ল সেটা আর কহতব্য নয়।

তোয়ালে জড়িয়ে ঘরে এল সে। দরজা বন্ধ! প্রকাণ্ড দেয়াল-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালেটা সরিয়ে নিল গা থেকে। বস্ত্রহীন শরীরটাকে পুংখানুপুংখ রূপে দেখতে লাগল, আর কারুর চোখ দিয়ে নয়, নিজের চোখ দিয়ে। কৈ সেই প্রশান্ত চৌধুরী—যার শরীরের দিকে তাকিয়ে থাকলে নেশা লাগত। কোথায় সেই সিংহের কোমর আর বৃষের কাঁধ। আর দেখবার প্রয়োজন নেই। এবারে মুখের ওপর চোখ রাখল; গাল ভেঙ্গে গেছে রীতিমত, সেই জন্যে, নাকটাও দেখাচ্ছে একটু বড়। কয়েকটা মাড়ির দাঁত পড়ে গেছে—বোধ হয় তাই গাল বসে গেছে। দাঁতগুলো প্রায় সবই নড়ছে, আরও কিছু হয়ত উঠিয়ে ফেলতে হবে। তারপর নকল দাঁতের কারবার। নকল! কথাটা সে বারবার নাড়াচাড়া করতে লাগল মনের মধ্যে, আর বোধ হয় ঠিক সেই কারণেই সে একটু দুর্বল, অসহায় বোধ করতে লাগল। চোখেও দেখছে না ভাল, কে জানে চশমা নিতে হবে কিনা! নাঃ চোখের উজ্জ্বলতা একটুও কমেনি। দৃষ্টিতে তার এখনও রয়েছে মাদকতা, রহস্যের কুয়াশা।

কাপড় পরল প্রশান্ত, চুল আঁচড়াল, নাঃ এবারে খুব খারাপ তাকে দেখাচ্ছে না। শুধু একটু বয়সের ছাপ পড়েছে—এই যা! সে ত পড়বেই। চল্লিশ পেরিয়ে এল—মুখে বয়সের ছাপ পড়বে না? এই পরিণত বয়সে তাকে যুবক বলে ভুল না-করাটাই ত স্বাভাবিক। তাছাড়া যৌবনের সংজ্ঞা ত আর বয়স দিয়ে নির্ণিত হয়নি! বয়সের সংগে—মনে মনে বলল প্রশান্ত—যদি আবেগও মরে, বাসনাও মরে—তাহ'লেই ত শরীরে এল সত্যিকারের জরা।

কড়া নড়ে উঠল। দরজা খুলে দিল প্রশান্ত। তার বিছানা হাজির।

বিছানা পেতে ঘর গুছিয়ে চাকরটা জিজ্ঞেস করল, 'বাবু চা আনব?'

'আর কিছু খাবারও।'

সদর রাস্তা থেকে একটু দূরে হোটেল। সেজন্যে ট্রাম-বাসের শব্দটা খুব মনোযোগ না দিলে



শোনা যায় না। বাইরে আঁধার ঘনিয়ে এল। প্রশান্ত আর একবার স্নান করল সাবান ঘসে ঘসে। কতদিনের ময়লাই না জমেছিল চামড়ায়।

পরিপাটি পোষাক পরে আয়নার সামনে দাঁড়াল সে; তাকে আর চেনা যায় না, কোনো এক সম্ভ্রান্ত, প্রৌঢ় ভদ্রলোক। প্রৌঢ়? তা হোক! আগুন এখনও নেবেনি, খুঁচিয়ে দিলে এখনও দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে। আয়নায় শেষ বার তাকিয়ে সে একটুখানি হাসল, রহস্যজনক হাসি।

বাসে উঠে সে গেল ভবানীপুর—বিভূতিদের বাড়ি। বিভূতি নিশ্চয়ই এতক্ষণে ফিরেছে অফিস থেকে। গোয়ালটুলির ছোট একতলা বাড়ির বন্ধ দরজার কড়াটায় কয়েকটা শব্দ ক'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়াল সে।

দরজা খুলে দিয়ে বৌ-টি একবার তাকাল প্রশান্তের দিকে। এখানে আলোটা খুব স্পষ্ট নয়, তবু প্রশান্তের চিনতে অসুবিধে হ'ল না বিভূতির বৌ-কে।

'কাকে চাই?'

প্রশ্নটা মৃদু হলেও স্পষ্ট। প্রশান্ত একটু এগিয়ে এল; ভয় পেয়ে কয়েক পা পেছিয়ে গেল বিভূতির বৌ, বলল, 'কে আপনি?'

'দেখুন না চিনতে পারেন কি না!'

গলার স্বর সম্বন্ধে সংশয় থাকলেও মুখটা সান্নিধ্যের, অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারল ভয়ের কোনো কারণ নেই, বিভূতির বৌ খুব ভাল ক'রে দেখল, 'প্রশান্তবাবু, আপনি?' ব'লে উঠল সে।

'হ্যাঁ, আমিই,' বলল প্রশান্ত, 'তাহলে চিনলেন, খানিকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, বিভূতি ফিরেছে অফিস থেকে?'

'হ্যাঁ, ফিরেছেন, স্নানের ঘরে; আসুন আপনি!'

প্রশান্ত যে-ঘরটায় এসে বসল—সে-ঘরটা তার পরিচিত, কিন্তু তবু তার ভংগিতে কোথায় যেন রয়েছে সংকোচের আভাস।

'তারপর, কি আপনাদের খবর বলুন,' প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, 'অনেকদিন পরে, না?'

"হ্যাঁ, অনেকদিন পরেই ত! হঠাৎ যেন আপনি উধাও হয়ে গেলেন, আর দেখা গেল না আপনাকে। শেষ বার যখন আপনি এ-বাড়িতে আসেন তাও প্রায় বছর দশেক আগে। কি বদলে গিয়েছেন আপনি সত্যি?'

'খুব?'

'আর একটু হ'লে আমিত প্রায় চিনতেই পারছিলাম না!'

'এত বদলে গিয়েছি?'

'আপনি যেন অন্য মানুষ! আশ্চর্য, মানুষের কি যে পরিবর্তন হয়! আপনি বসুন। চা নিয়ে আসি।'

কি একটা যেন নাম বিভূতির স্ত্রীর—বনছায়া, বনানী, বনলতা, না বনজ্যোৎস্না? কিছুতেই মনে করতে পারল না প্রশান্ত! টেবিলের ওপর থেকে ছোট আয়না তুলে মুখ দেখতে লাগল সে! গাল যে শুধু তুবড়ে গেছে তা নয়, খানিকটা ঝুলেও পড়েছে নিচের দিকে। কপালে তিনটি স্পষ্ট রেখা। এ-রেখা

কোনো দিন মিলাবে না, চামড়ায় আসবেনা সে মসৃণতা। পঁছিশ বছরের প্রশান্ত চৌধুরী আজ কোথায়? সে কি কোথাও বেঁচে নেই?

বাঁ হাতে তোয়ালে ডান হাতে সাবানের বাক্স নিয়ে বিভূতি ঢুকল। প্রথমে বুঝতে পারেনি সে, প্রায় পেছন ফিরে বসেছিল প্রশান্ত। তার হাত থেকে সাবানের বাক্স পড়ে গেল মাটিতে। 'প্রশান্ত, তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি; ধরে দেখ, আমার ভূত নয়।'

সত্যি বিভূতি প্রশান্তের হাত চেপে ধরল।

'আমাকে কি একেবারেই চেনা যায় না?' এমন ভাবে প্রশান্ত চেয়ে রইল বিভূতির দিকে যেন তার উত্তরের ওপর প্রশান্তের জীবন-মরণ অপেক্ষা করছে।

'চেনা যাবেনা কেন? তবে—প্রশান্ত, কি সুন্দরই না তুমি দেখতে ছিলে, কিন্তু কি লাভ বল ভেবে? আমাদের ত বয়েসও কম হল না! কোথায় আছ তুমি?'

'কন্‌টিন্যান্টাল হোটেলে।'

'দাঁড়াও হে! ছোটখাটো একটু উৎসব করা যাবে! বনলতার সংগে দেখা হয়েছে?'

'হয়েছে!'

'বোস, আসছি! বেনেপুকুর গিয়েছিলে নাকি?'

'না, যাইনি, যাব। কিন্তু কি হবে?'

'একবার যাওয়া উচিত। রাত্রের আহার কিন্তু এখানে। সুবিধে আছে, ঝামেলা নেই কিছু, বাচ্চাদের নিয়ে মা গিয়েছেন ফরিদপুর।'

* * * *

প্রশান্ত শুনেছিল দাদা ওকালতীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে, বাইরের ঘরে মক্কেলের ভিড় দেখে সে বুঝল কথাটা মিথ্যে নয়।

দাদাকে এই প্রথম সে প্রণাম করল। বয়সের অনেক ব্যবধান, অনায়াসেই সে প্রণাম করতে পারে, কিন্তু তেমন কোনো কারণ আগে ঘটেনি।

আলিপুরের বিখ্যাত উকীল অনন্ত চৌধুরী অনেকক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'কে, প্রশান্ত না?'

'হ্যাঁ, আমি।'

'কি আশ্চর্য! আমি চিনতেই পারিনি, এ কি চেহারা হয়েছে তোর? কোনো শক্ত রোগে ভুগেছিস্ বুঝি?'

'না ত?'

'তুই লুকোচ্ছিস্ আমার কাছে, এদ্দিন ছিলি কোথায়? ওপরে যা। তোর জিনিষপত্র কোথায়?'

'হোটেলে রেখে এসেছি।' বলল প্রশান্ত।

'হোটেলে? হোটেলে কেন? তুই কি ভেবেছিস্ আমার এখনও সেই অবস্থা আছে! যা,



গাড়ি নিয়ে যা, জিনিষপত্র নিয়ে আয়। আর কাল বিকেলেই আমার সংগে ডাঃ চক্রবর্তীর কাছে যেতে হবে, তোর একটা ভাল চিকিৎসার দরকার হবে বুঝতে পারছি। যা, ওপরে।'

দাদার অসংখ্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে একমাত্র রমা ছাড়া আর কেউই চিনতে পারল না তাকে। বৌদি বলল, 'তুমি না কাটামুণ্ডু না কাটিহারতে ব্যবসা করছিলে?'

'কাটামুণ্ডুও নয়, কাটিহারও নয়, কাম্‌স্‌কাট্‌কায়।'

'দু'ছত্র চিঠি লেখবারও সময় পাওনি? বৌ কোথায়?'

'কিসের বৌ?'

'ওমা! বিয়ে করনি?'

'সময় পেলাম কোথায়?'

'এখন আর কে নেবে তোমায়? এসো, ঘরে এসো!'

'সত্যি! কেউ নেবে না বৌদি?'

'বয়ে গেছে! বয়েসটা এমন করে নষ্ট করলে?'

'নষ্ট করেছি কি করে বুঝলে?'

'মেয়েরা বুঝতে পারে! কিসের জন্যে বাঁচলে তুমি এতদিন?'

প্রশান্ত উত্তর দিল না, চুপ ক'রে রইল কয়েক মিনিট, অবশেষে বলল, 'সত্যিই কি আমার কিছু অবশিষ্ট নেই বৌদি?'

'আমার যেটুকু আছে, তোমারও সেটুকু, তার বেশী নয়,' হাসল বৌদি, 'তোমার চাইতে আমি দশ বছরের বড়, কিন্তু চেয়ে দেখ আমার দিকে; আমার ক'টা ছেলেমেয়ে জানো?'

'ক'টা?' প্রশান্তের গলায় কৌতুক।

'তেরো।' খিলখিল ক'রে হেসে উঠল বৌদি।

'কিন্তু—' গলা নামিয়ে প্রশান্ত বলবার চেষ্টা করল।

'কিন্তু কি?'

'সন্তান ধারণ করবার সামর্থ্য আর তোমার নেই, বৌদি!'

আলোচনাটা হঠাৎ এ-পথে গড়াবে আন্দাজ করতে পারেনি ভদ্রমহিলা, মুখটা তার রাঙা হ'য়ে উঠল, 'কি অসভ্য হ'য়ে গেছ তুমি!'

'কি করব বল, তোমাদের সভ্য সমাজ থেকে অনেক দূরে ছিলাম যে! কৈ, তোমার সব ছেলেমেয়েদের ডাক, পরিচয় করা যাক।'

ও গেল ছেলেমেয়েদের গুছিয়ে আনতে।

রমা কাছেই ছিল, মা-র অবর্তমানে সে এগিয়ে এল। প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি রে, চিনতে পারিস্?'

'পারি, একটু একটু!' বলল রমা।

'ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপারটা হচ্ছে এমন একটি দিনও গেছে কিনা জানি না—যেদিন কোনো-না-কোনো গল্পগুজবের ফাঁকে মা তোমার কথা না উঠিয়েছেন; তুমি এতদিন আমাদের ভুলে ছিলে?'

'তা ছিলাম, সে ত দেখতেই পেলি, এখন তোদের কথা বল, তুই কি করিস্? বিয়ের জন্যে তৈরী হচ্ছিস্ না কি?'

'আগে পরীক্ষাটা দিয়ে নিই।'

'কি পরীক্ষা?'

'এম-এ।'

'বলিস্ কি রে! সেদিনকার মেয়ে!'

'সেদিনকার মেয়ে আজ বাইশ বছরে পড়বে।'

প্রশান্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'কি সুন্দর তুই দেখতে হয়েছিস্!'

'তাই না-কি?'

'তাই।'

একটু সময় অতিবাহিত হ'ল।

কিছু একটা বলা দরকার, তাই সে বলল, 'জলদি একটু চা খাওয়াতে পারিস্?'

'নিশ্চয়ই পারি, আর কি খাবে বল চায়ের সংগে?'

'কিচ্ছু না, শুধু চা।'

'আনছি, তুমি বোস।' সে গেল চা-য়ের তদ্বির করতে, আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশান্ত পা টিপে টিপে নিচে নেমে এল, তারপর একেবারে রাস্তায়।

এখন ক'টা? সাড়ে আটটা হবে, কিংবা ন'টা। প্রশান্ত একটা ট্যাক্সী নিল, এল ওয়েলেসলী ষ্ট্রীটে একটা ফটোগ্রাফারের স্টুডিওতে, বলল, 'ছবি তুলব।'

'এখন?' দোকানদার জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, অসুবিধে আছে?'

'কিছু না, আসুন!'

* * * *

ওয়েলেসলী থেকে কর্পোরেশন ষ্ট্রীট দিয়ে চৌরিংগীতে এসে পড়ল প্রশান্ত। হোয়াইটওয়ের ঘড়িতে দেখল ন'টা চল্লিশ। বিভূতির ওখানে রাত্রে খেতে যাবার কোনোই তাগিদ পেল না সে। জনতা-বিরল ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত সিগারেট টানতে লাগল, সিগারেটটা শেষ হওয়া পর্যন্ত সে দাঁড়াবে, তারপর—

একটা মোটার প্রায় তার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। গাড়ির বাইরে মুখ বার ক'রে একটি রমণী তাকে, হ্যাঁ, তাকেই ডাকল, 'প্রশান্ত!'

আমূল চমকে উঠল সে।

'কার জন্যে অপেক্ষা করছ?'

'কারুর জন্যে নয়।' উত্তর দিল প্রশান্ত।



'এসো না, গাড়িতে, আসবে?'

'যেতে পারি।'

'এসো!' দরজা খুলে দিল গাড়ির আরোহিণী।

প্রশান্ত উঠল গাড়িতে, দরজাটা বন্ধ করল।

আদেশ পেয়ে গাড়ি চালিয়ে দিল ড্রাইভার।

'এতদিন কোথায় ছিলে?'

'ছিলাম।' প্রশান্ত শুধু বলল।

গাড়ির অস্পষ্ট খসখসানি, চুড়ির টুংটাং। প্রশান্তের একটি হাত আর দু'টি হাতের মধ্যে নিবদ্ধ।

'মাধবী!' প্রশান্ত ডাকল।

'বল!'

'সে আজ কত দিন!'

'অনেক দিন।'

'বিয়ে করেছো?' জিজ্ঞেস করল প্রশান্ত।

'করেছি।' মাধবী ওর কোলের ওপর মুখ ডুবিয়ে দিল, প্রশান্ত আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিল তার চুলের মধ্যে।

গাড়ি থামল মনোহরপুকুরের এক নির্জন পল্লীতে।

'এসো।'

'আমি কোথায় যাব? সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক আমি, এত রাত্রে—'

মাধবী ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে।

সিঁড়িতে প্রশান্ত জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী কোথায়?'

'কানপুর, ইন্সিওরেন্স ইন্সপেক্টর।'

'তোমার ছেলেমেয়ে?'

'হয়নি।'

ওরা ওপরে এল।

ছোট, দোতলা বাড়ি; পরিচ্ছন্নতায় ঝকঝক করছে, প্রত্যেকটি আসবাব, জিনিষপত্র মার্জিত রুচির পরিচায়ক।

'মাধবী, তোমার নিখুঁত চেহারার মতই তোমার বাড়ি।' প্রশান্ত মন্তব্য করল।

'এখনও নিখুঁত আছি? বয়েস কত জান? হিসেব আছে?'

'না থাকলেও করতে পারি, কিন্তু এমন কয়েকজন মেয়ে আছে—যাদের বয়েস কালকে অস্বীকার করে—তুমি তাদেরই একজন।'

'ধন্যবাদ! এসো খেতে বসি, নিশ্চয়ই তোমার খাওয়া হয়নি। ঐ স্নানের ঘর, সাবান তোয়ালে সব পাবে, যাও। আমি ততক্ষণ পোষাকটা বদলাই।'

আপত্তির কোনো ভাষাই প্রশান্তের মনে এলো না; স্নানের ঘরে ঢুকতে হ'ল তাকে।

তারপর খেতে যতক্ষণ সময় লাগা উচিত—তার দ্বিগুণ সময় লাগিয়ে দিল মাধবী; যেন অনেক দিন পরে সে আজ এই প্রথম কথা বলবার সুযোগ পেয়েছে; প্রশান্ত যথারীতি 'হুঁ হাঁ' ক'রে যাচ্ছিল, মন

তার সময়ের হিসেব করছে, নিশ্চয় সাড়ে এগারোটা হবে, ট্রাম বাসের আশা নাই। এই অঞ্চলে রাত্রি ক'টা পর্যন্ত যাতায়াত করে তার জানা নেই, কিংবা হয়ত ট্যাক্সীও মিলবে না। প্রায় সংকিত হ'য়ে উঠল সে, কিন্তু মাধবীর কথা অবিরাম স্রোতের মত বয়ে চলেছে।

হঠাৎ প্রশান্ত দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমার কি সময়ের জ্ঞান নেই, আমায় কি ফিরতে হবে না?

'আগে ত মুখ ধুয়ে এস,' মাধুবী বলল।

মুখ ধুয়ে জল মুছতে মুছতে প্রশান্ত বলল, 'গেলাম, আর একদিন দেখা যাবে।' বলতে বলতেই সে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

'দাঁড়াও!

মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রশান্ত।

'তোমার মাথা কি একেবারেই খারাপ হ'য়ে গেছে? মাঝ-রাতে তুমি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে ফিরবে কেমন ক'রে?'

'ট্যাক্সী!'

'ট্যাক্সী তুমি পাচ্ছ কোথায়?" এটা চৌরিংগী নয় যে সারারাত ট্যাক্সী পাবে।'

'তাহলে উপায়?"

'তুমি কি জলে পড়েছো? একটা রাত্রি কি এ-বাড়িতে তোমার জায়গা হবে না? এসো, কোনো অসুবিধে তোমার হবে না।'

* * * *

জামাটা আলনায় ঝুলিয়ে প্রশান্ত বাতিটা নিবিয়ে দিল। মাধবী এই মাত্র এক দাশলা গল্প ক'রে শুতে গেল পাশের ঘরে। মশারি ফেলে হাত-পা ছড়িয়ে দিল প্রশান্ত। পাহাড় ভেঙ্গে ঘুম নেমে আসছিল চোখের পাতায়, দরজা খোলার অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। চোখ খুলল প্রশান্ত, মশারির বাইরে ভালো দেখা যায় না, মনে হ'ল ঘরের মাঝখানে একটা ছায়া সরে এল। নিশ্চয়ই চোর। কিছু একটা করবার আগে আলোর দরকার। প্রশান্ত নিঃশব্দে উঠে বসল, মশারির বাইরে কোনো রকমে হাতটা বাড়াতে পারলেই দেয়ালে সুইজের নাগাল পাওয়া যায়। একটি মুহূর্ত। ঝাঁ ক'রে হাত বার করেই সে সুইজটা নামিয়ে দিল, আর প্রায় লাফিয়ে পড়ল খাট থেকে মাটিতে।

অস্পষ্ট গলায় মাধবী হেসে উঠল। খোলা চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

'প্রায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম,' বলল প্রশান্ত।

মাধবী কাছে এগিয়ে এল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রশান্ত কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে হো-হো ক'রে হেসে উঠল—যেন সমস্ত ব্যাপারটাই একটা বিরাট ঠাট্টা!

প্রশান্তের মুখের দিকে তাকিয়ে মাধবীর সমস্ত শরীরে একটা বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল, ক্ষিপ্র হাতে সাড়ির আঁচল তুলে মাথার উপর নিয়ে গেল, যেন কতকটা শঙ্কিত হয়েই বল্‌লে, 'তোমার দাঁত পড়ে গেছে?' আস্তে আস্তে পেছিয়ে গেল সে মাঝখানের খোলা দরজার কাছে।

'দাঁত।' শোনা কথাটা উচ্চারণ করল প্রশান্ত।

দরজা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

রাত তখন প্রায় দু'টো। প্রশান্ত কিন্তু ওয়েলেসলী ষ্ট্রীট থেকে ওয়েলিংটনে এসে পড়েছে।

# সঙ্গীতের বিকাশ

## মণিলাল সেন

এ জগতের ক্রমবিকাশে মানুষ সৃষ্টি হওয়াতে এ বিশ্বে তিনটি ধাপকে আমরা অনুভব করতে পারি; আর মানুষও যা কিছু সৃজন করে তার মধ্যেও তিনটি স্তরকে অর্থাৎ দেহ, প্রাণ ও মনকেই আমরা দেখ্‌তে পাই। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম নেই। একটা মনোরম সুরবিন্যাস, সংযত হৃদয়াবেগ আর প্রখর মননশক্তি সঙ্গীতে থাক্‌বেই। আবার এই পর্য্যন্ত এসে থাকলেও সঙ্গীতের আসল রূপটি পাওয়া সম্ভব নয়। মনবুদ্ধি তর্কবিচারবিশ্লেষণের উর্দ্ধে আছে যে এক অসীম বস্তু, সুরবিন্যাসের কাঠামোর যে সীমিতরূপ তার সীমার মধ্যে সেই অসীমকে, তার জ্যোতি শক্তি ও আনন্দকে ফুটিয়ে তোলাই হলো সঙ্গীতের আসল রূপ। সঙ্গীতে থাকা চাই পরিশুদ্ধ বিচার বুদ্ধি, হৃদয়াবেগ ও সংযত শক্তি আর ধ্বনির সাহায্যে সুরতালে-বাঁধা যে রূপটিকে অবলম্বন করে এই আনন্দের প্রকাশ তার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য এবং তার সামর্থ্য। এই তিনটি অবশ্য পৃথক পৃথক বস্তু নয়, এই তিনটির সমন্বয়ে সমগ্রতায়, সঙ্গীতের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব।

কিন্তু সম্যকভাবে আমাদের সঙ্গীত এখনও গড়েই উঠেনি। আমাদের সঙ্গীতে পঙ্গুতার ও অসম্পূর্ণতার একটা বিরাট ছায়া যেন মিশে আছে। উৎকর্ষ-সঙ্গীতের প্রাণ যে-রূপ তা মুক্ত অমোঘ হয়ে উঠেনি; বিরাট গভীর আবেগকে ধারণ করবার সামর্থ্য সে পায়নি। এক একবার এক একদিকে আমাদের সঙ্গীত ঝুঁকে পড়েছে। কোন সময়ে সঙ্গীত দেহসর্ব্বস্ব, কোন সময়ে সঙ্গীত প্রাণপ্রাচুর্য্যে চিত্তের বিক্ষোভে উপ্‌ছে পড়া, আবার কোন কোন সময়ে সঙ্গীত বিচার-বুদ্ধিতে, বিশ্লেষণে প্রভাবান্বিত।

সাধারণ নৃত্যবহুল সঙ্গীতে ঠুংরী গজল গানে দেহগত প্রাণের বাসনা-কামনার উচ্ছ্বাস উদ্দীপনাকে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। প্রাণের নিম্নস্তরের প্রাধান্যই সেখানে। সঙ্গীতে সুরবিন্যাসের সুষমাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা নেই; সত্তা সেখানে লুপ্ত প্রায়। আর বিচার বুদ্ধির আভাস নেই সেখানে, মন বিশ্লেষণ পরায়ণ নয়; মন সেখানে বাঁধা পড়েছে প্রাণের বাসনা-কামনায়। আবার খেয়াল গানে পাই—এক বিরাট প্রাণপ্রাচুর্য্য; তানের পর তানে বিপুল চিত্তাবেগের অফুরন্ত অভিব্যক্তি। বুদ্ধির দীপ্তিতে গান সেখানে সংযত নয়—বিচার-বুদ্ধির ধার ধারে না সে। আপন খেয়ালে সে মত্তপ্রায়। শক্তির অপব্যবহার ও স্বৈরাচার সবই সেখানে সম্ভব। মন সেখানে অর্দ্ধস্ফুট অথবা মন সেখানে প্রাণের দাস।

রূপটির সামর্থ্য বাড়াবার চেষ্টা যে সেখানে একেবারে নেই, তা নয়; কিন্তু প্রাণপ্রাচুর্য্যের দাপটে সত্তা সেখানে দলিত, অবহেলিত। উত্তর-ভারতীয় ধ্রুপদে এবং দক্ষিণ ভারতীয় কীর্ত্তনগুলিতে মননশক্তির আভাস পাওয়া যায়। বিচার-বুদ্ধির দীপ্তিতে চিত্তাবেগকে ঊর্দ্ধমুখী করার চেষ্টা এবং রূপটিকে সুন্দরতর করবার ইচ্ছা তাদের আছে। কিন্তু ধ্রুপদের গঠনে কাঠিন্য সেই সীমিত রূপটীরই দৃঢ়ত্ব বাড়িয়েছে শুধু, আরও ব্যাপক বিপুলতর বিরাটকে ধারণ করার সামর্থ্য তাতে ক্ষুণ্ণ। তাছাড়া, মাঝে মাঝে সেগুলি অধিকমাত্রায় বিচার-বিশ্লেষণ পরায়ণ। ফলে, চিত্তাবেগ সেখানে সীমিত এবং অনেক সময় একেবারে নিঃস্প্রাণ।

বাংলার আধুনিক কীর্ত্তন দেখ্‌তে পাই চিত্তের আবেগকে ইন্দ্রিয়াতীত করার দিকেই বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। তাতে সাঙ্গীতিক বিচার-বিশ্লেষণ নেই বল্‌লেও চলে; বরং আছে কাব্যিক বিশ্লেষণ, মনোরম ধ্বনি সমাবেশের স্থানে সুকুমার বাক্যের সংযোজনা। তাছাড়া, গানের অঙ্গশোভার দিকে দৃষ্টি নেই, আছে অঙ্গের সৌন্দর্য্যের প্রতি ঔদাসীন্য। অভীষ্টলাভের আগে আছে যে স্তরে স্তরে গতি, চিত্তের যে বিক্ষোভ, যে চঞ্চলতা, তা-ই কীর্ত্তন গান। রবীন্দ্রনাথের শেষদিককার গানগুলির ধাতুতে স্থূলত্ব বা কাঠিন্য বলে যেন কিছু নেই। ধ্রুপদের আছে যে একটা গভীরত্ব ক্ষত্রিয়োচিত দৃঢ়ত্ব অথচ আছে হৃদয়াবেগের একটা সংযতরূপ, যা খেয়াল-ঠুংরীতে বিরল, রবীন্দ্রনাথের শেষদিককার গানে সেরূপ কিছু নেই। বরং আছে একটি শান্তসমাহিত ভাব, আছে নির্ম্মলতা, উদারতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুতেই তৃপ্তি পাননি। প্রকৃতির পরতে পরতে যে সুররাজি লুকিয়ে আছে তারই সন্ধান তিনি করে গেছেন শেষদিন পর্য্যন্ত। তবুও বল্‌ব সঙ্গীতদেহের ঋজুত্ব নেই তার গানে। সঙ্গীতের দেহ, সঙ্গীতের প্রাণ ও সঙ্গীতের মনের সমন্বয়ে যে একটা পরিপূর্ণ রূপ তা নেই, সেটিও একদিকে ঝুঁকে-পড়া গানই। দিলীপকুমারের গানগুলি এমনই তরল যে কোন্‌দিকে তার পরবর্ত্তী গতি সেটি কিছুতেই ধরবার উপায় নেই। সে গানগুলিতেও চিত্তাবেগের একটানা অভিব্যক্তিরই প্রকাশ। দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি কিন্তু নেতিয়ে পড়া লতানো নয়, সেখানে পাই একটা ঋজুত্ব, প্রাণশক্তির পরিস্ফুরণ, পুরুষত্ব; চিত্তাবেগের চঞ্চলতার বদলে একটা সংযত রূপ ও শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা পাই সেখানে, পাই সঙ্গীতদেহের প্রতি শ্রদ্ধা এবং তাকে সুন্দরতর করবার আগ্রহ।

আমাদের যন্ত্রের যে বাদ্যপদ্ধতি তাতে আমরা পাই চিত্তের উচ্ছ্বাসেরই বাহুল্য। অঙ্গ-শোভা সুন্দরতর করবার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হলেও কিন্তু তা বড়ই সংক্ষিপ্ত; আর বর্ত্তমানের বাদকগণ রাগ আলাপের দিকে মনোযোগ না দিয়ে প্রথমই দ্রুত গতিতে বাজনা আরম্ভ করে



চিত্তচাঞ্চল্যকে প্রাধান্য দেন; তারপর তানের পর তানই লয়ের তারতম্যে চলতে থাকে। ভারতীয় যন্ত্রসঙ্গীতের যে অঙ্গ প্রধান তা রাগ, আর সে রাগরূপও 'গৎ'-এ সামান্যভাবে কঙ্কালবৎ থাকে বলে কাঠামটি এমন ভাবে সংকোচিত যে, বিরাটকে অনন্তকে ধারণ করবার মত সামর্থ্য সে সঙ্গীতদেহের নেই। অথচ যার মধ্যে পাই একটা বৃহতের ভাব, বিশালতা, বিপুলতা, অনন্তকে বিরাটকে ধারণ করার সামর্থ্য ও তার প্রকাশ সেটিই তো শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত। অনন্তকে ধারণ ও প্রকাশ করার কাজে সিমফনির যে সামর্থ্য আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের বাদ্যপদ্ধতির সে সামর্থ্য নেই। কথা উঠতে পারে যে আমাদের বাদ্যপদ্ধতির আছে একটা উদারতা একটা অধ্যাত্মসত্তা, একটা নিভৃত রসোপলব্ধি। কিন্তু সে জিনিসটী, সে রসোপলব্ধি লোক-সঙ্গীতের মধ্যেও তো পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে নেই রূপের সুক্ষ্মকারুকাজ, রূপকে সুন্দরতর করার চেষ্টা। সেখানে পাই স্থূলদৃষ্টি, সহজ সুলভ অনুভূতির উচ্ছ্বাস, একটা স্থূল হস্তের অবলেপ। অথচ তা অতিক্রম করে এক ঊর্দ্ধতর উদারতর জ্যোর্তিময় বিশালতায় উপনীত হওয়াই তো উৎকর্ষ সঙ্গীতের কাজ। এই যে রূপকে, রূপের সামর্থ্যকে সংকীর্ণ করে তানের পর তান, সেটী তো একদিকে চিত্তের আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যদিকে দেহের সংকোচন ছাড়া আর কিছু নয়। সেখানে নেই শাণিত বুদ্ধির প্রখরতায় চিত্তের উদ্দামতার সংযত রূপ; মন সেখানে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ঢাকা; সেখানে নেই সামঞ্জস্য-পূর্ণ অভিব্যক্তি।

কাজেই দেখা গেল আমাদের সঙ্গীত, বিকাশের পথে এখনও প্রাণের স্তরেই রয়েছে। দেহগত প্রাণের বা হৃদয়ের আবেগ-উচ্ছ্বাসই আমাদের সঙ্গীতের মধ্যে এখনও প্রধান হয়ে আছে। আমাদের সঙ্গীত এখনও মনোময় হয়ে উঠেনি। তবু ভারতে একটা সময়ে—উত্তর ভারতীয় ধ্রুপদে অথবা দক্ষিণ ভারতীয় কীর্ত্তনগুলিতে মনবুদ্ধির, বিচারবিশ্লেষণের, অনেকদিনের চিন্তার, দেহ-প্রাণ-মনের মিলিত রূপের নানাদিক থেকে চিন্তা করে ধীরচিত্তে সুরধ্বনি রচনা করবার, সংগীতকে মনোময় করবার আগ্রহ ছিল দেখ্‌তে পাই। সাফল্যও অনেকাংশে এসেছিল। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে উত্তরভারতে ধ্রুপদ সঙ্কীর্ণ এবং প্রাণহীন হয়ে পড়াতে অন্যভাবে প্রাণশক্তির পরিস্ফুরণ দেখা দেয় এবং খেয়ালের সৃষ্টি হয়, ক্রমে চিত্তাবেগের প্রধান্য আসে। মন প্রাণগর্ভ হয়ে পড়ে। সঙ্গীতের বিকাশে প্রাণস্তরেরই বৈচিত্র্য দেখা দেয়; আসে টপ্পা, আসে ঠুংরী, আসে গজল, দেহগত প্রাণের আকুতি। সঙ্গীতের পরিস্থিতি হয়ে পড়ে প্রাণময়, প্রাণের উদ্দাম গতি। কিন্তু দক্ষিণী সঙ্গীতে ত্যাগরাজের চেষ্টায় কীর্ত্তনমে নতুনভাবে প্রাণ সঞ্চার হয়। দেহপ্রাণমনের সমন্বয়ে সঙ্গীত রচনা করবার আগ্রহ দেখা দেয়! সে গান এখনও দক্ষিণে সচল হয়ে আছে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে দক্ষিণা গানেও হৃদয়োচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি দেখা দিতে আরম্ভ হয়েছে সামান্যভাবে।

অতএব আমাদের সঙ্গীতে যতদিন প্রত্যুৎপন্ন সুর রচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে—ততদিন শাণিত বুদ্ধির দীপ্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করা সঙ্গীতদেহ, সঙ্গীত প্রাণ ও সঙ্গীত মনের সুসমঞ্জস রচনা সম্ভব হবে না। সবদিক থেকে সঙ্গীতকে সুন্দরতর করতে হলে নানাদিক বিবেচনা করা, অনেক চেষ্টার, অনেক চিন্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেটা আসরে বসে করা সম্ভব নয়। আসরে বসে বসে যে সুর রচনা সেটা সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠরূপ হতে পারে না, তাতে চিত্তাবেগের প্রাধান্য থাকবেই।

### সঙ্গীত-তৌর্য্যত্রিক

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রিভিঃ সঙ্গীতমুচ্যতে।"

### সঙ্গীত-চতুর্বর্গ

'গীতজ্ঞা-লয়-তাল-নর্ত্তন-কলা-কৌশল্য-লীল-আলয়"

[ চোড়গন্ধ-দুহিতা ভুবনেশ্বরবাসিনী চন্দ্রিকার গুণাবলী ]

# রূপসী অলকানন্দা

## তারাপদ গংগোপাধ্যায়

প্রমীলার সাথে আমার আলাপ কোন এক গানের আসরে, বল্লে ভবতোষ বৌদিদের দিকে তাকিয়ে, মেজ বৌদির পাশে তাঁর মেজ বোন সুলেখা—যাকে নিয়ে একটু টুংটাং চলছিলো। সুলেখা আর ভবতোষ, ভবতোষের মন আর সুলেখার মেজাজ—নিয়ে টুংটাং। ভবতোষ, সেই সুলেখা আর মেজবৌদি, পাশের সোফায় বড়বৌদি আর ছোটবৌদি—যেন সব নিয়ে একগুচ্ছ বিলিতি পাতাবাহারের ঝাড়, শাড়ির পাড় থেকে গায়ের রং, ঠোঁট, চোখের ভ্রু—সব কিছু, যেন চর্চিত আর চিত্রিত, যেন হাস্নুহানার গায়ের গন্ধের মত একটা গন্ধ ঘরের ভিতর চৌচির হ'য়ে ঘুরছে। ফ্যানের খন্‌খন্ আওয়াজ মাথার ওপর, জানালার খসখসের পেছনে তাতানো রোদ্দুর। —নিজে গান গাইতে গিয়ে কোনদিনই লক্ষ্য করিনি আমার আশে-পাশে কারা আছে, ভবতোষ বলতে লাগলো।

আর ভবতোষের এই কথার পর যে সুলেখার মুখ একটু লাল হোয়ে উঠেছিলো—সেখানে একটু হাসি ফুটলো, যেন একটা প্রজাপতি এই মাত্র মৌ-এর গন্ধ পেয়ে পাখা মেল্লো।

এইটুকু দেখে ভবতোষও হাসলো।

—কারা আছে কিংবা থাকতে পারে, ভবতোষ বল্লে—কোন্ মেয়ের ব্লাউজের বুনট পাতলা থাকার জন্যে মাংসল পিট এবং কাঁধ স্পষ্ট হোয়ে উঠেছে, কার খোঁপা এলো হোয়ে হোয়ে ঘাড়ের কাছে দুলে দুলে পিঠে ছড়াবে কিংবা কে আঁচল সড়াতে গিয়ে দুলকি চালে দুলে উঠবে—এ দেখবার কোনদিন চোখও ছিলো না আর দেখিওনি।

—কি বাজে বকছো! বড়বৌদির মন হঠাৎ সিরসির করে ওটার জন্যে চমকে উঠলেন।

—আশ্চর্য মানুষ আপনি! কিছু বাধে না মুখে, মেজবৌদি টান্ টান্ চোখ করে বড়বৌদির কথাটা আরও একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলো। ভবতোষ শুধু সিগারেটে আর একটু টান দিয়ে একবার হাসলো। কিন্তু ছোটবৌদি ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত হাসি ঝরিয়ে বল্লে—বলতে দাও ওকে, বাধা পেলে আর বলবেই না।

—ঐ দেখুন, ভবতোষ হাসতে হাসতে ঠোঁট গোল করে ঘরময় সিগারেটের ধোঁয়ার রিং ওড়াতে লাগলো—যার শোনার প্রয়োজন এবং শুনতে চায়—সে আমার কথাটা ধরতে পেরেছে।

—আমার কিন্তু এটা প্রয়োজন না। ছোট বৌদিকে আপত্তি জানাবার পরও যেন নরম নরম দেখালো।

—প্রয়োজন না হ'লেও লোভনীয়, একজন জলজ্যান্ত পুরুষের সাথে একটি মেয়ের আলাপ অন্য কেউ শুনতে না চাইলেও, আমার কাছে কেউ বল্লে কান পেতে শুনি।

সবার মুখই যেন মৌসুমি বাতাস পেয়ে একটু চিলকে উঠলো।

—ওসব বাজে কথা রাখো, বিয়ের প্রশ্ন যখন তোমার, ঘটনা শোনাবার দায়িত্বও তোমার। বড়বৌদি কথাটা বলে ঐটুকু সামলে নিলেন।

ভবতোষ সুলেখার দিকে একবার তাকালো, সুলেখার মুখ আনচান করে দুললো।

—আমি উঠি। সুলেখা নড়ে উঠলো।

—সে কি! মেজ বৌদি আশ্চর্যে ঝলকে উঠে বোনের দিকে তাকালো।

—আমার দরকারও আছে, সুলেখা বল্লে।

—বোস। বলেই ভবতোষের দিকে তাকিয়ে একটু হাসি চাপলেন—আপনি বলুন। আপনার মুখ থেকে শোনার পর, আপনার দাদাদের কাছে পৌঁছাবার মালিকও আমরা।

—সেটাই ভাল। ভবতোষ হেসে কাউচের ধারে কনুই ডোবালো। মুহূর্তখানেকের চুপচাপ। ফ্যানের খস্‌খস্ আওয়াজ মাথার ওপর।

—গত পুজোয় ঝাঁজায় গিয়েছিলুম, ভবতোষ বল্লে।

আর এই কথা বলতেই বড়বৌদি একটু চিলকে উঠলেন—ঝাঁজায় না রাঁচী।

—রাঁচীতেই না সুলেখা ছিলো। ছোট বৌদি হাসির প্রলেপ ঠোঁটে মাখালেন।

সুলেখার ওপরেই শেষে ঘুরে ঘুরে চোখ পড়লো সবার।

শুধু ভবতোষ স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসলো—রাম না হ'তেই যদি রামায়ণ তৈরী করেন, সে দায়িত্ব আমার নয়।

—আচ্ছা তোমার কাহিনীর ঘটনা রাঁচী না হোয়ে ঝাঁজাই হ'লো। বড়বৌদি হাসলেন।

ভবতোষ একবার সুলেখার দিকে তাকালো, যে মুখ ভাসা ভাসা অগোছাল। সেই অগোছাল মুখের দিকে তাকিয়েই ভবতোষ বল্লে—ঝাঁজায় গিয়েছিলুম বন্ধু আর বন্ধু-পত্নীর আমন্ত্রণে। আমন্ত্রণটা দু'দিক থেকে লোভনীয় ছিলো, ঝাঁজাকে কেন্দ্র করে ওদিকে মধুপুর থেকে সিমুলতলা অবধি, এদিকে রাজগীর থেকে নালন্দা—আর ঝাঁজায় রাঁচী হাজারিবাগ রেঞ্জের তিতির কিংবা কচি হরিণের রোষ্ট। এই প্ল্যান নিয়েই সেখানে গিয়েছিলুম।

প্রথম যেদিন সেখানে গিয়ে নামলুম, আশ্চর্য শরতের হিম চতুর্দিকে উড়ছে। বন্ধুও জানে না আমি কোন ট্রেণে নামবো আর আমিও জানাই নি।

অপরিচিত যায়গা। ষ্টেশনের পেছেনে মাথা উঁচু করে দু'টি পাহাড়ের চূড়ো আর ষ্টেশনের পশ্চিমে রেলওয়ে কলোনী, হিমে আর কুয়াশায় বিজলী বাতির আলো বারবণিতার দেহের মত টিমটিমে লাল লাল।

'বণিতা' কথায় সবার মুখে একটু হাসির ঝিলিক উঠলো।

—কি হ'লো। ভবতোষ সিগারেটটা এ্যাসট্রের ভিতর ফেলতে গিয়ে হাসিটা বুঝতে চাইলো।

—কিছু হয় নি, তুমি বলে যাও। সেই চাপা হাসি তখনও বড়বৌদির ঠোঁটে। বিড়ালকে মাছের গন্ধ টের পেতে দিলে, সে বিড়াল আরও তেতে উঠবে।

—তুমি বলো। বড়বৌদি বল্লেন।

—কিন্তু রোদ যখন ফুট্‌লো, ভবতোষ বল্লে—মনে হোলো সেই পাহাড়ের চূড়ো যেন মেটে সিঁদুর দিয়ে রাংগানো, হলুদ আর লাল মেশানো। কলোনীর ওপাশে পাহাড়ী নদী, পশ্চিম দিক কিছুটা উন্মুক্ত, সেখানে ধানের সবুজতা—মনে হোল এ বাংলারই কোন মুল্লুক, বিহারের উত্তর প্রান্তর নয়।



মোট কথা, আমি খুসী হ'লুম।

ভবতোষ আর একটা সিগারেট ধরালো।

—আমার কাহিনীর এটুকু হ'লো মুখবন্ধ, কাহিনীর জন্যে এটুকুর কোন প্রয়োজন নেই, এ কেবল আসলে যাবার আগে সরস্বতী বন্দনা।

—লক্ষ্মীর ঝাঁপি যখন পেছনে, তখন এটুকু সহ্য করতে রাজী। ছোট বৌদি যেন জলতরংগের ধ্বনির মত নড়েচড়ে উঠলেন।

—আপনি রাজী থাকবেন এ আমি জানি। ভবতোষ ছোট বৌদির হাসিটাকে যেন সিগারেটের ধুঁয়ো দিয়ে আড়াল করলো।—এ বাড়ীর ইন্‌টেলেকচুয়াল বৌ বলতে কেবল আপনাকেই বুঝি।

—নামটা মনে রাখিস্। বড়বৌদি ছোটবৌদির দিকে চোখ ঠাড়লেন—আর আমরা? যেন ভবতোষের দিকে তাকিয়ে বড়বৌদি হাসির ইংগিত দিয়ে চপল রসিকতা জুড়লেন—আমরা খাস কামরার বেলোয়ারী চুড়ি না অন্য কিছু? বড়বৌদির মুখ কুঞ্চিত চপল।

—সেটা কথাপ্রসংগে আসতে পারে। ভবতোষ বল্লে।

—তা হ'লে ব্রতকথা যতক্ষণ সাংগ না হ'বে, দুর্বা হাতে করে বসবো! যেন একটা হাসির ফুল্‌কি উঠলো তারপরে।

ভবতোষের চোখে সাদামাঠা, উপভোগে একটু রংগিন।

—আমি ভাবছি, বড়বৌদি এবার সীরীয়স হোয়ে বৈষয়িকে ফিরে আসতে চাচ্ছেন—তুমি যে কাহিনী বলতে যাচ্ছ সেটা সত্য না তোমার কল্পনার ঝালর।

—আপনাদের কি মনে হয়। ভবতোষের চোখ এবার কুহকে রংগিন।

—আমাদের মনে হয় তোমার বয়স পাকলেও মন পাকে নি।

একমুহূর্ত তাকালো ভবতোষ বড়বৌদির দিকে। তারপরে ফুরফুরে ঝালর তৈরীর মত কথা ক'টি বলে গেলো—মন পাকে নি; কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে মেয়েদের কাছে গেলুম, বুঝলুম, সী-বীচে পাশাপাশি থেকে রাত কাটালুম।

সুলেখা রাংগিয়ে উঠে কাউচে তালগোল পাকালো।

আর সব অগোছাল চুপচাপ।

—তারপর সেই সব শরীর ফানুসের মত উড়ে যেতে দেখলুম।

ভবতোষ সুলেখার দিকে তাকালো। মনে হোলো এখানে উপক্ষ্যটা একজন।—আর এই সব পারিপার্শ্বিকের ভিতর কল্পনা থাকলেও সে কল্পনা মমি হতে বাধ্য। ভবতোষ বল্লে।

আর বলে একটু থামতেই মনে হোলো, বেলোয়ারী চুড়ি যেন রিমঝিম করে সমে এসে দাঁড়ালো।

ওদের ভিতর চোখ টেপাটেপি চল্লো।

—থাক্, ওসব রেখে ঘটনাটাই বলি। ভবতোষ বল্লে। বলে সিগারেটের টিনটা সামনে টেনে একটা সিগারেট ঠোঁটে চাপলো।

বাইরে খসখসের ওপিঠে চকচকে রোদ আর আকাশ।

—পুজোর পরে, বিজয়ার দিন—যেহেতু আমি গান জানি আরও কিছু স্থানীয় গায়কও যখন ছিলো—একটা জলসা বসা উচিত আর বসলোও।

বন্ধু-পত্নী দেখি নীল বেনারসী পরেছেন, ঘষামাজা ক'রে আরো জৌলুষ বাড়িয়েছেন।

—কি গান গাইবেন আজকে, ঠুংরী? আশ্চর্য মাদকতায় ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। ঠুংরী গানের কথা একদিন কথায় কথায় জানিয়েছিলুম, দেখি সেই অবিস্মৃত রেশ ওর চোখে দুলছে।

—ঠুংরী গান শুধু বেলোয়ারী চুড়ি! রিমঝিম-ই নয়, সেটা কাঁকনের নিক্কণও! আমি বল্লুম—আর সে নিক্কণে যৌবনটাই একমাত্র নয়।

কিন্তু বন্ধু-পত্নীর চোখে তখনো ঠুংরীর মদালসা ভংগী ছড়ানো ছিটানো।

—খুব ভাল করে গাইবেন। তিনি আমায় অনুরোধ করলেন, যেন অনুরোধ না, আরও কিছু।

শরতের বিজয়ার আকাশ, নীল-নীল। পাহাড়ের রোদের চূড়ায় চূড়ায় ঝিমানো রোদ। বন্ধু-পত্নীর মনের গর্ব, সেই যেন আমায় এখানে আবিষ্কার করেছে, আর সে আবিষ্কারের সত্য নির্ধারণ আজকে। মিঠে সেন্টের গন্ধ, মুখের উজ্জ্বল রং। একটা কথা যেন আমি বুঝলুম, আপনাদের এক যায়গায় মিল—সে মিল হ'চ্ছে বলনে-চলনে।

—তোমার এই বন্ধু-পত্নীকে কি আমরা চিনি। বড়বৌদি যেন মাঝপথে বাধা টানলেন।

ভবতোষ কথাটা শুনে বড়বৌদির মুখের ওপর চোখ রাখলো।

চিনি কিংবা দেখেছি। বড়বৌদি পুনরুক্তি করলেন।

—সেটা কি খুব প্রয়োজনীয়। ভবতোষ হাল্কা রসিকতায় একটু বিলোল।

—তোমার প্রমীলা কি এই বন্ধু-পত্নী? শ্লেষের ধাক্কায় বড়বৌদির কথাটা একটু যেন চিরে চিরে বেরুলো।

—আপনাদের কি ধারণা, কারও ঘরের লক্ষ্মীকে আমি টেনে বের করতে পারি! যেন ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার মত ভবতোষ এক ঝলক হাসি ঢাল্লো।

আর কথাটা শুনে তিনজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো।

কিন্তু সুলেখার ঠোঁটে হাল্কা আর স্বচ্ছ হাসি ফুটে ফুটে উঠলো, যা এতক্ষণ আতংকে আর সন্দেহে কুঁকড়ে কুঁকড়ে চলছিলো—তা এখন ধুয়ে মুছে একখানা ঝকঝকে আয়নার মত নিটোল।

এবং সেইদিকেই তাকালো ভবতোষ, তাকিয়ে একটু ধাক্কাও খেলো।

—খুব সহজেই কোন জিনিষ আমরা বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস করতে পারি আর করিও। বল্লে ভবতোষ।

কিন্তু তিনজনের মুখও খুসীর হাসিতে উজ্জ্বল, ভবতোষের মত মানুষও সময়ে অসময়ে কুঁকড়ে উঠতে পারে!

—তুমি তোমার কথা বলো, এটা আমাদের কথার কথা। বড়বৌদি হাসলেন—তোমায় বাজিয়ে নিলাম শুধু।

ভবতোষও একমুহূর্তে স্বচ্ছ হোয়ে একটা হাসির ফুৎকার ছুড়লো।



—অন্য কেউ না করলেও আমরা তোমায় বিশ্বাস করি। বড়বৌদি আবার ব'লে মৃদু একটু হাসলেন।

আর দু'জন নড়েচড়ে আর একটু সুডোল হ'লো, সুলেখার ঠোঁটে হাসি চাপা হোতে হোতে একটু গোল হ'লো।

—এবং সে বিশ্বাস করা উচিত। ভবতোষ সুলেখার দিকে তাকালো।

মেজবৌদি ঘাড় নেড়ে সুলেখার কনুইতে চাপ দিলো, যেন ঘটনা এতক্ষণ গড়িয়ে গড়িয়ে এইখানে এসে থেমেছে, মেজবৌদির কাঁধের শাড়ির আচল হাতের মুঠোয় এখন।

—আমরা যে কোন জিনিষ গড়িয়ে গড়িয়ে যেদিকে ইচ্ছা নিতে পারি। অন্ততঃ মেয়ে পুরুষকে নিয়ে।

ভবতোষের এ কথায়, সবার ঠোঁটের কিনারে হাসির একটু ঝিলিক খেল্লো।

—আপনার কি মনে হয়, মেজবৌদি কনুই কাউচের কিনারে ঠেকিয়ে ব'লে উঠলেন—সে ধারণা যদি কেউ করে ভুল। বলেই বোন সুলেখার দিকে তাকালো। আঁটোসাটো বডিসের ওপর চোখ রেখে নিজের বোনের হাত নিজের মুঠোয় আর একবার চাপলো।

যেন দেখেও দেখলো না ভবতোষ।

—বাজে বকার চেয়ে আসল কথায় ঘুড়ে যাই। ভবতোষ হাসলো।

—তাই করুন। ছোটবৌদি ঝিলমিলিয়ে উঠলেন—মেজদি তুমি চুপ করো।

—আশ্চর্য সুন্দর রাত, পরিষ্কার ঝরঝরে চাঁদের আলো। বল্লে ভবতোষ—ঠিক সেদিনই বাসায় এসে বন্ধু-পত্নী জিগ্যেস করলেন—কেমন দেখলেন।

যে শাড়ি পরেছিলেন, তাও ছাড়েন নি, যেন এ জিজ্ঞাসার জন্যে তিনি উদ্বেল।

—কোন্ জিনিষটা কেমন, আমি বলতে বাধ্য হ'লুম।

—এতক্ষণ থেকে এলেন! আর এখন বলছেন কোন্ জিনিষ! বন্ধুবরের দিকে বন্ধু-পত্নী ঘাড় ফেরালেন।

—তোমরা কি মনে করো মেয়েদের ঘষামাজা রং দেখাই পুরুষের একমাত্র কাজ। বন্ধুবরের ঠোঁটে হাসির ঝিলিক।

—এর মধ্যে যে ঘটনা আছে সেটা আমার জানা দরকার। আমি বল্লুম, ব'লে ওদের দু'জনের দিকে তাকালুম।

—আশ্চর্য মানুষ! যেন বন্ধু-পত্নীর চোখে বিস্ময় চিকচিকিয়ে উঠলো—এতক্ষণ চা করলো, চা দিলো, আর কিছুই ছাখেন নি? দেখলুম চোখের দৃষ্টি নির্বাক হ'চ্ছে, বিস্ময়ে ক্রমশঃ নিথর।

—আশ্চর্য মানুষই! মেজবৌদিও যেন বলতে বাধ্য হ'লেন—মনে করতে পারেন আর একজনের সাথে আলাপের সময়ও আপনি এরকম ছিলেন। সুলেখার হাত ধ'রে মেজবৌদি আরও একটু চাপ দিলেন। সুলেখার মুখ একটু কালো কালো হোয়ে উঠলো।

—হয়তো আমি সবখানেই এক। ঝিরঝিরে একটু হাসিতে বল্লে ভবতোষ।

—তারপর। ছোটবৌদি তাগিদ দিলেন।

—যার প্রয়োজনের তাগিদ খুব বেশী, তার নিশ্চিন্ত থাকাটাই বেমানই, বিকেলে ছিলাম একা, একটু আগে বন্ধু-পত্নী এক কাপ চা দিয়ে গেছে, সেই চা সামনে। জানালার মুখোমুখি বিকেলের আকাশ।

—দেখুন তো চেনেন কিনা।

বন্ধু-পত্নী দরজায়। তার পেছনে আর একজন।

—আমি কিন্তু মোটেই দোষী নই। বন্ধু-পত্নীর সংগে যে এসেছেন, তাঁর মুখে সপ্রতিভ হাসি। সেই হাসি নিয়ে সে এই কথা ক'টি ছুড়লো।

—দোষ বিচার করতে গেলে আর গুণ গাইবার ফুরসুৎ হয় না। আমি উঠে বসলুম।

প্রতি নমস্কারের জন্যে ওদিকে হাত উঠেছে।

বন্ধু-পত্নী নিটোল হাসিতে আর ঝংকারে—উজ্জ্বল আর উচ্ছল।

এই প্রমীলা। যাকে নিয়ে আমি প্রথম আরম্ভ করেছিলাম তাকে এবার তোমরা দেখে নিতে পারো।

বড়বৌদি থেকে ছোট বৌদি পর্যন্ত, একটা তরল আর সকুণ্ঠ হাসি ঠোঁট চিরে চিরে বেড়িয়ে এলো।

—ফুটন্ত আর নিটোল শরীর, যে রং কাঁচা সোনার মত না হ'লেও সুন্দর মসৃণ, হাতের মাথা থেকে মুখের দিকে তাকিয়ে মনে খুসীর ঝলক খেলে। আঁটোসাটো দেহের ওপর যে কমুই, মসৃণ ত্বক, গ্রীবা—এ নিয়ে যে কেউ মানানসই গর্ব করতে পারে।

ভবতোষ একটু থামতেই সুলেখা কুঁকড়েমুকড়ে উঠলো।

এবার-ই কি রোমান্টিক অধ্যায়। ছোট বৌদি বিশ্রীভাবে নিঃশ্বাস ফেল্লেন।

—হয়তো। ভবতোষ হেসে একটা সিগারেট ধরালো।

—এই প্রমীলা, যে কথা বলতে পারে অনর্গল, যে কথায় রস আর সুইট আছে। এক কথায় যে-কোন লোককে কাছে টানতে পারে, আর সে ক্ষমতা তার আছে। আর সে ক্ষমতা সম্বন্ধে সে অতি সজাগ।

ভবতোষ এখানে একটু থেমে সিগারেটে টান দেবার জন্যে মুখ ওঠাতেই সুলেখার এক চিলতে হাসি চোখে পড়লো, যে মুখ এতক্ষণ নির্বাক ছিলো, সে যেন এইমাত্র একটু সবাক হলো। যেন সকালের মেঘলা আকাশের পর এইমাত্র একটু রোদ।

—তারপর কলকাতায় এসে আলাপ যে আরও ঘনিষ্ঠ হবে ভাবি নি। অফিস ছুটি হবার পর আমি আলিপুরের ট্রাম ধরতাম, ও ভিক্টোরিয়া হাউসের পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে থাকতো।

—তোমরা জানো, জানো কেন হয়তো ভালই বোঝ, যে পুরুষের অভিজ্ঞতা কম, সে পুরুষ এমনি একটি মেয়েতে ডুবে যেতে পারে।

ভবতোষের এই কথায়, সবার ঠোঁটে আর একঝলক হাসি ছিট্‌কে উঠলো। যেন ডিকাণ্টারে হুইস্কির বুদবুদ।

—আশ্চর্য! ভবতোষ একটু হাসলো, হেসে কাত হোয়ে বসবার সময় সুলেখার দিকে তাকালো, যে সুলেখা এখন অতি সংযত, অতি ভব্য।



—আশ্চর্য! বল্লে ভবতোষ—যে প্রমীলার কথা একটু আগে জানালুম, সেই প্রমীলা আমার সাথে একান্ত ঘনিষ্ঠ হ'বার পর, যখন আমাদের ভিতর গোপনীয় বলতে কিছু নেই, সে আমার কাছে এত সহজ হোয়ে এলো যাতে আমি হিমসিম খেয়ে উঠলুম। এ যেন বিজ্ঞাপনের পাতা, ফুরফুর করে উড়ে উড়ে সমস্ত পৃষ্ঠা দেখাবার জন্যে আমার কাছে ব্যগ্র। যখন তখন তার আঁচল সরিয়ে উদগ্র দেহ আমার চোখে মেলে ধরতো, ব্লাউজের নীচে আঁটসাট বডিসটা আমাকে না দেখালে যেন চলে না।

—লজ্জার একটা লোভনীয় মূর্তি আছে মেয়েদের একথা তুমি স্বীকার করো। আমি বলেছিলুম একদিন।

শুধুমাত্র বুকের ওপর আঁচল টেনে ও চুল আঁচড়াচ্ছিলো।

—আমায় উপলক্ষ্য করে বলছো? খিলখিল ক'রে হেসে ও যেন ফ্লাস ক'রে উঠলো—তোমার মনে হয় আমি লজ্জার আভায় সরমে রংগিন, লজ্জাবতী লতার মত জড়োসড়ো?

—ভুল বলা, আমার কুষ্ঠিতে কোনদিন লেখে নি, সরমে রংগিন না বিভাসে বিলীন। লজ্জার ঠিকুজী এখন দেউলে হয়ে আমাদের মন অস্থির।

—আমার কথার বাঁকা ইংগিতের কোন কিছুই না ধরে হাত আয়না ক'রে গোজা ঠিক করতে লাগলো, ওর বুকের পৃথুলতায় যে চোখ ভোঁতা, সে এখন মুক্তি পাবার জন্যে বাইরের আকাশে রোদ দেখতে লাগলো; কিন্তু ও তখনো হাসির তরংগে উত্তাল।

এই বলে ভবতোষ সামনে আলগোছে একটু ঝুকলো।

কিন্তু কেমন যেন নীলচে হোয়ে উঠছে সুলেখা। নীলচে আর ফ্যাকাসে।

—কিন্তু, ভবতোষ আর একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে বল্লে—ঘটনাটা সেইখানেই ক্লাইম্যাক্সে উঠলো।

সুলেখা নীচের ঠোঁটটা টেনে নিয়ে ভিতরে ঢোকালো।

—কিন্তু পুরীর সী-বীচে, সি-ভিউ হোটেল—ভবতোষ বল্লে—সেখানেই ক্লাইম্যাক্সে উঠলো।

চমৎকার সকাল ছিলো। একদম পরিষ্কার আর পরিচ্ছন্ন সকাল। সামনে চা সিগারেটের কোটো। ও ঐদিকের বেডে আলতো শয়ান।

—আজকে আমার কি ইচ্ছা করছে জানো। ও বল্লে। যেন বলতে গিয়ে কিছুটা মোহগ্রস্ত। আমি তাকাতেই, ও কথাটা শেষ করলে—আজকে সমুদ্রে স্নান করে আসি।

—সে এমন বেশী কি। আমারও মনটা খুসী খুসী ছিলো।

—সত্যিই যাবে? হাতে আকাশ-পাওয়ার মত ও দাঁড়িয়ে উঠলো—খুব ভাল লাগবে তোমাকে তাহ'লে। আমার গলার দু'দিকে ওর দু'হাত ছড়িয়ে দিলে।

—আর যদি না যাই ভাল লাগবে না? আমি হাসলুম।

—তাহ'লে সত্যি যেতে হবে কিন্তু। পিঠের দিক থেকে সামনে চলে এলো। পা ঝুলিয়ে আর্ম চেয়ারে বসলো—তাহ'লে যাবে?

আমার কথার উত্তর না পেয়েও, আমি যাবো বলেই ও ভাবলে। আর বোধ হয় আমি যেতামও।

নীলচে মুখটা এখন ক্রমশঃ আরও পাণ্ডুর হোয়ে উঠছে সুলেখার।

—আমি উঠি মেজদি। মেজবৌদির দিকে তাকালো সুলেখা।

—ঘটনাটা এতখানি টেনে নিয়ে আসার পর আপনি না শুনেই উঠবেন? ভবতোষ সিগারেটের ধুঁয়োর পেছনে ফুরফুর করে হাসলো।

—না আমার আরও অনেক জায়গায় যেতে হবে। সুলেখা অস্থির।

বোস্ তুই। মেজবৌদি টেনে বসালো বোনকে।—তারপর কি। ভবতোষের দিকে তাকালেন, তারপর! যেন একটা রংগিন প্রজাপতি মৌ-এর গন্ধে মাতাল।

সেই পাতলা হাসি আবার ভবতোষের ঠোঁটে কুলকুল ক'রে উঠলো। একটু পর, ভবতোষ সেই হাসি ঠোঁটের ওপর মিলিয়ে নিয়ে বল্লে—প্রমীলা, যার কথা শুনবার জন্যে তোমরা এতক্ষণ উসখুস করছিলে, সেই প্রমীলা সুইমিং কষ্ট্যুম পরে আমার কাছে দাঁড়ালো।

—চলো। যেন এক ঝাঁক লাল পায়রা ওর ঠোঁটের ওপর নড়ছে, ঝুরঝুর ক'রে হাসি ঝরছে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালুম।

—চলো। ও আবার বল্লে।

—স্নানের জন্যে, কি এ বেশটা খুবই প্রয়োজনীয়? আমি বলতে বাধ্য হলুম।—নিটোল জংঘার এই ব্যসন?

ও যেন একটু ছলকে উঠলো, যে বাতাস দক্ষিণ থেকে ছলছলিয়ে উঠেছিলো ওর, তা যেন হঠাৎ বাধা পেলো।

কিন্তু পরক্ষণেই সেই ঝুরঝুরে হাসি চোখের নীচে ছড়িয়ে দিলে—ক্ষতি কি? ও বল্লে। যেন আমি ভুল বকছি না ও ভুল বকছে বুঝতে চাইলে।

—ক্ষতি কিছু নেই, আমি বল্লাম—শুধু এইটুকুই মনে হয়, যখন ফরাসীতেও স্কার্ট গুল্‌ফ ছুঁয়ে যাচ্ছে তখন আমরা উদগ্র জানু দেখাতে চলেছি।

গলা-মোমের মত হঠাৎ যেন একটু থ্যাৎলা দেখাল, মুহূর্তখানেক আমার মুখের দিকে তাকালো, যে চোখ হঠাৎ ওর নীল নীল হোয়ে উঠেছিলো সেই চোখ দিয়ে।

আশ্চর্য! সামনে একটা শাড়ি ঝোলানো ছিলো সেটা টেনে এনে ওর উন্মুক্ত জানুর ওপর ছড়িয়ে দিলে।

—নিজকে খুব বেশী বড় করে ভেবো না! আমি তোমায় বেশি করে না জানলে এ সাধুতা দেখাতে পারতে! যেন এইমাত্র একটা গরম ফারসেস বার্ষ্ট করছে।

—তার মানে? আমি তেমনি করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলুম, যেন ঐ ফারসেস বার্ষ্ট হোক এটাই আমার অভিলাষ।

দুপদাপ ক'রে এ ঘর থেকে বাথরুমে গিয়ে সাটার আটকাতে শুনলুম।

সেদিন বিকেলেই পুরী থেকে কলকাতা আসবার জন্যে পা বাড়ালুম। মানে ও-ই পা বাড়িয়ে ছিলো। আর আমি খুশী হোয়ে আরও কয়েক প্যাকেট সিগারেট উড়ালুম।

আর এ্যাদ্দিন পর চুপচাপ থাকার পর আজ চিঠি পেলুম—শিগ্‌গির-ই বিয়ের জন্যে তৈরী হ'চ্ছে ও,



যে সাধুতা মিথ্যের ভেক নিয়ে চলে, আমার সেই সাধুতার ওপর কিছুটা বক্রোক্তি করে সেই চিঠি শেষ হয়েছে।

ব'লে ভবতোষ হাসতে লাগলো। নীল হোয়ে ওঠা সুলেখার কপালের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সুলেখার ঠোঁট যেন কোন অপমানে অস্থির, সেই দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে।

—আশ্চর্য মেয়ে! বড়বৌদি বল্লেন।

—কে? ভবতোষ ঘাড় ফেরালো।

—আমি উঠি, সুলেখা কো'চ থেকে মেঝেয় দাঁড়ালো—গল্প যখন শেষ হোয়েছে এবার আমার উঠবার দ্বিতীয় কোন আপত্তি নেই। যেন একঝলক হাসি ওর ঠোঁটে ভাসিয়ে তুলতে চাইলো। ভবতোষ তেমনি হাসির টুকরো নিয়ে চুপচাপ।

মেজবৌদি যেন কি বুঝতে চাইছিলেন, ভবতোষের এই ঘটনা আর নিজের বোনের কি যেন মিল-গরমিল।

—আবার কবে আসবে। বড়বৌদি সুলেখাকে জিগ্যেস করলেন।

—যখন সময় করে উঠতে পারি। সুলেখা দরজার দিকে পা বাড়ালো।

—এবার আমায় এক কাপ চা কিংবা কফি খাওয়ানো দরকার। ভবতোষ সুলেখার যাবার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শেষে এই কথাটা বল্লো—এবং সে পানীয়টুকু হ'চ্ছে স্বস্তির পানীয়। ব'লেই হাসতে লগেলো ভবতোষ।

# চল-অচল

## অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

আজ ক'দিন থেকে শুধু একটি কথাই অপরেশের সারাটি মন জুড়ে বসে আছে। শুধু একটি মাত্র ভাবনা ক্রমাগত জট পাকিয়ে চলেছে তার মনে। প্রতিটি স্নায়ু-তন্ত্রীতে শিহরণ তুলে দিয়ে একেকবার আবেগে কেঁপে উঠছে সর্বাংগ। মুহূর্তের পর মুহূর্ত ভেবে মনের একটি ভাবকেই সে কথায় ফুটিয়ে তুলতে চাইছে বারবার। কিন্তু আবেগটা রক্ত কণিকায় ঢেউ তুলে দিয়ে আস্তে আস্তে আবার যেন নেতিয়ে পড়ে। মুহূর্তের পর মুহূর্ত ভেবে যে-কথাটা শেষ অবধি তৈরী করতে পারলে অপরেশ তা-ও মুখ দিয়ে আর যেন বেরিয়ে আসতে পারে না। ঠোঁট একটু নড়লো হয়তো, ভ্রূ কাঁপলো, ডান হাতের নখ দিয়ে বাঁ-হাতের তেলোটা একটু আঁচড়ে ফেললে। কিন্তু ওই পর্যন্তই শুধু। না, কথাটা কিছুতেই বলতে পারছে না অপরেশ।

অথচ সামান্য একটা কথা তো শুধু। দিনরাতের অধিকাংশ সময়েই যাকে দেখছে, যার চলা-বলা-তাকানো এতো স্পষ্ট ক'রে দেখতে পাচ্ছে, দেখছে নিকট সান্নিধ্যে—তাকে কথাটা বলতে গিয়ে এতো দ্বিধা-সংকোচ আসবে কেন? হ্যাঁ, মিনতিকে একটি কথাই তো শুধু বলবে অপরেশ। তাকে যে সে সত্যি ভালোবেসে ফেলেছে সেই কথাটি।

খানিক আগে টেম্পারেচারের চার্টটা শিয়রের কাছে টাঙিয়ে রেখে চলে গেছে মিনতি। অগোছালো বিছানাটা টেনেটুনে দিয়ে গেছে।

বাইরে উইলোর সারিতে বিকেলের মিষ্টি রোদ্দুর। ঘাসের জাজিম মোড়া ছোট্ট লনটিতে খেলা করছে কয়েকটি ছেলে।

'নিন, এ অষুধটা খেয়ে নিন।'

কথাটা শুনলো অপরেশ। তবু নড়লো না। বালিশে ঘাড় কাত ক'রে যেমন ছিল তেমনি পড়ে রইলো।

'কই, নিন অষুধটা।'

চোখ দু'টো খোলা ছিল অপরেশের। এবার বুঁজে ফেললে।

'ঘুমুচ্ছেন?'

গায়ে হাত পড়লো। তাই চোখ দু'টো ঈষৎ না মেলে পারলে না অপরেশ। দেখলো, চৌকো মেজারগ্লাসটা তার মুখের কাছে এনে ধরেছে মিনতি। মেজারগ্লাসে লালচে অষুধ মিনতির সরু আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

'এই অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন যে।' মিনতি বললে।

বালিশ থেকে মাথা তুলে একটা হাই তুললো অপরেশ। আধ-শোয়াভাবে শরীরটা বিছিয়ে দিলে। বললে, 'না, ঘুমোইনি।'



'তবে সাড়া দিচ্ছিলেন না যে।' মিনতির মুখে মিহি হাসি। বললে, 'নিন, খেয়ে ফেলুন অষুধ। ঝাঁঝ চলে যাচ্ছে অষুধের।'

মিনতির হাত থেকে গ্লাস নিয়ে অষুধটা খেলে অপরেশ। তোয়ালে ঠোঁট মুছতে মুছতে বললে, 'বলছেন, তাই খেয়ে নিলাম।'

'মানে?'

'অষুধ খেলেও ঘুম আসবে না আমার।'

'কেন?'

'জানি না।'

অপরেশের কথাটা ঠিক বুঝতে না পারলেও একেবারে ধোঁয়াটে ঠেকলো না মিনতির। একটা হতাশার রেশ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে অপরেশের কথায়, চোখে-মুখে। এটা অবশ্য অকারণ নয়। এতো যে ভালো গান গাইতে পারে অপরেশ সেই গান গাইবার ক্ষমতা আজ হারাতে বসেছে সে। কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, হয়তো বিকৃত-ভগ্ন হ'য়ে যাবে কণ্ঠস্বর। কানের দু'পাশের গ্ল্যাণ্ডে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে অপরেশের। আশঙ্কার অবশ্য কোন কারণ নেই এখন আর। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করতে আর কিছুদিন সময় লাগবে শুধু। তবু জীবনের মতো একটা পংগুতা নিয়েই হয়তো আরোগ্যলাভ করবে অপরেশ।

মেজার গ্লাস আর তোয়ালেখানা হাতে নিয়ে মিনতি বললে, 'অতো ভাববেন না। ভাবনা বন্ধ রাখুন। ঘুম আসবে তাহ'লে।'

মেঝেয় স্লিপারের খসখসে আওয়াজ হলো। মিনতি চলে যাচ্ছে।

না, এবারও কথাটা মিনতিকে বলতে পারলে না অপরেশ।

দেয়ালে আকাশী-রঙের মেঘের আড়ালে ইলেকট্রিক বাল্বটা জ্বলে উঠেছে সবে, বাইরে উইলোর নীচে বিছানো আঁকাবাঁকা পীচের রাস্তায়ও আলো জ্বলে উঠেছে। বিকেল পেরিয়ে গেছে। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে কখন।

একমাস, পুরো একটি মাসই আজ এই নার্সিং হোমে কেটে গেল অপরেশের, আরো কদ্দিন থাকতে হবে কে জানে?

কিন্তু সত্যি আর পারছে না অপরেশ, বড্ড অস্বস্তি বোধ করছে সে। দিনের পর দিন একটা অন্ধ আকর্ষণ তাকে মিনতির দিকে টেনে নিচ্ছে। ঘুম তার সত্যি আসতে চায় না একেক রাতে। অথচ মিনতির কাছে কথাটা প্রকাশ করতে সে আজো সুযোগ পেলে না।

এখানে এখন মিনতিকে এতো কাছাকাছি পেয়ে ওর জন্য যে অদম্য আকর্ষণ বোধ করছে অপরেশ তা কি এর আগে কোনোদিনই ছিল তার? এর আগে কখনো কখনো তো মিনতিকে দেখেছে অপরেশ। মীরাদির বোন মিনতিকে। অধ্যাপিকা মীরা সেন। দেখেছে মীরাদির বাড়ীতে কোন কোন সান্ধ্য-সঙ্গীতের আসরে—যেখানে গান গাইবার প্রায় একক অধিকার থাকতো অপরেশের নিজের। গান কোনদিনই মিনতিকে গাইতে দেখেনি অপরেশ। সঙ্গীত আসরের উদ্যোগ-আয়োজন আর চা-পরিবেশেনের কাজে ওকে বরাবর ব্যস্ত থাকতে দেখেছে। একটা ষ্টাডি-সার্কেলের মতো আসরও খুলেছিলেন মীরাদি। মাসে একবার কি দু'বার বসতো বৈঠক। ওখানে অপরেশের উপস্থিতি হংস-মধ্যে-বক-যথা জাতীয় একটি ভূমিকা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু যেতে হতো তাকে। মীরাদির অনুরোধেই যেতে হতো, ষ্টাডি-সার্কেলের আলোচনায় অবশ্য মিনতিকে অংশ গ্রহণ করতে দেখেছে অপরেশ। ঘেমে চোখ-মুখ লাল ক'রে হয়তো অন্য কোন ছেলের সঙ্গেই সমানে তর্ক জুড়ে দিত মিনতি। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও কখনো অপরেশের মনে মিনতির একটু ছায়াও পড়েনি। তার মনের ত্রি-সীমায়ও কোনদিন স্থান পায়নি মিনতি। হয়তো বিদ্যা-বুদ্ধি একটু আছে মেয়েটার। কিন্তু মেয়েদের বুদ্ধি তো অপরেশের কাছে অনুকম্পাই কুড়োতে পারে শুধু। আর

মেয়েদের বিদ্যার্জনকে কোন গুণের সংগায় ফেলতে বরাবরই সে নারাজ। ষ্টাডি-সার্কেলে মিনতির তর্ক তাই তার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিত।

তবু সেই মিনতিই আজ অপরেশের চোখ-মন একেবারে ছেয়ে ফেললে। সেই মিনতিই আজ তার চোখের ঘুমও কেড়ে নিতে পারলে।

এখানে এই নার্সিং হোমে আসাটা অপরেশের সৌভাগ্য বলতে হবে। রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের বাড়ীতে যখন সে এই কঠিন রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হ'য়ে ধুঁকে ধুঁকে কয়েকটা দিন পার ক'রে দিয়েছে তখন মীরাদি-ই খবর পেয়ে সবার প্রথমে ছুটে এলেন। তাকে নার্সিং হোমে পাঠাবার ব্যবস্থা তিনিই ক'রে দিলেন তার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সহায়তায়। আর অপরেশের এ-অবস্থায় যে দিনরাত সমস্তক্ষন নার্সিং-এর দরকার সে কথাও মীরাদি ভুললেন না, তাই তাঁর বোন মিনতিকেই তিনি এ-কাজে লাগিয়ে দিলেন।

বাইরে উইলো আর পাম গাছের পাতায় একঝলক দমকা হাওয়ার মাতন খেলে গেল বুঝি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো অপরেশের। শুধুই কি মীরাদির বোন মিনতি? গানের আসরের, ষ্টাডি-সার্কেলের একটি মেয়ে? . আর কিছু হ'তে পারে না মিনতি?

'একি, ঘুমোননি এখনো?'

কথাটা শুনে খেয়াল হলো অপরেশের চিৎ হ'য়ে শুয়ে এতক্ষন সে ঘূর্ণমান ফ্যানটার দিকেই তাকিয়েছিল।

'আজো ঘুম পাচ্ছে না?' বেডের পাশে এসে দাঁড়ালো মিনতি।

'এখনো পায় নি।' অপরেশ বললে।

'কিন্তু অষুধটা তো ঘুমেরই ছিল,' ঘুরে শিয়রের দিকে এলো মিনতি, টেম্পারেচারের চার্টটা হাতে নিয়ে বললে, 'আরেকটা ঘুমের অষুধ এনে দিচ্ছি, নির্ঘাৎ ঘুম পেয়ে যাবে দেখবেন।'

ফিরেই দাঁড়িয়েছিল মিনতি। অপরেশ ডাকলে, 'শুনুন।'

'কি!'

'অষুধের দরকার নেই।'

'কি দরকার না দরকার সে আমরা বুঝবো, আপনি রোগী, ভুলে যাবেন না।' ভ্রূকুটি করলো মিনতি।

'মিছামিছি কষ্টই করবেন তাহ'লে। সত্যি বলছি শত অষুধেও ঘুম আসবে না আমার।' হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলো অপরেশ।

'কেন? কি হ'য়েছে আপনার বলুন তো। এভাবে শুয়ে শুয়ে সারারাত কড়িকাঠ গুনবেন নাকি?' বেডের কাছে এসে আবার দাঁড়ালো মিনতি।

বেড-কভারটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ধীরে ধীরে অপরেশ বললে, 'একটু বসবেন?'

টুল টেনে নিয়ে বসলো মিনতি।

'আমার একটা কথা বলবার ছিল আপনাকে।' ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে অপরেশের।

'আমাকে?' একটু ঝুঁকে বেডের ওপর হাত দু'খানা ছড়িয়ে দিলে মিনতি।

'হ্যাঁ।'

'বলুন।'

'কিছু মনে করবেন না তো।'

'না।' ঘাড় নেড়ে হাসলো মিনতি।

একটু চুপ ক'রে রইলো অপরেশ। বললে, 'কাগজ আর কলমটা দিন না। ওই তো টেবিলে রয়েছে।'

এক টুকরো কাগজ আর কলম এনে অপরেশের হাতে দিলে মিনতি।



কোলের ওপর কাগজটা ভাঁজ ক'রে রেখে খস্‌খস্ করে তাড়াতাড়ি কি লিখলে অপরেশ। তারপর কাগজটা মিনতির হাতে দিয়ে বললে, 'পড়ুন, আমার কথা।'

আকাশী-রঙের সেডে ঢাকা বাল্‌বের আলো ছোট্ট ঘরটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। অস্পষ্ট ঘোলাটে আলো। তবু সেই আলোয় কাগজের অক্ষর কয়টি মুহূর্তের মধ্যে দেখে নিতে একটুও কষ্ট হলো না মিনতির। টেনে টেনে লেখা কয়েকটি ইংরাজী অক্ষর, যার নিখুঁত, নির্ভেজাল মানে এই যে অপরেশ মিনতিকে ভালোবাসে।

মিনতির হাতের আঙুলগুলোর মধ্যে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে কাগজটা, তাকে ভালোবেসে ফেলেছে অপরেশ। অপরেশের নিজের দিক থেকে হয়তো তা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু সে কি করে জানতে পারলে যে মিনতিও ভালোবাসবে তাকে। মনে সাড়া জাগাবার মতো কোন ছেলের মন তো অপরেশের মধ্যে খুঁজে পাচ্ছে না মিনতি। ভালো গান গাইতে পারে অপরেশ, কিন্তু ও জিনিষটা কেমন একটা লঘু-চিত্ততা বলে মনে হয় মিনতির। আর অপরেশের দেহ-সৌষ্ঠব? কি দাম আছে ওই স্থূল সৌন্দর্যের? অন্ততঃ মিনতির কাছে? কন্দর্প-কান্তি চেহারার জৌলুসে আজো কোনো ছেলে কোনো মেয়ের মন ভোলাবার প্রয়াস পাবে এ-কথাটা ভাবতেও হাসি পায় মিনতির।

কাগজটা হাতে নিয়ে মিনতি চুপ করে আছে দেখে কেমন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়লো অপরেশ। বললে, 'আপনার জবাব তো পেলাম না।'

'কি জবাব দেব বলুন।' দু' আঙুলে কাগজটা একটু মুড়ে মিনতি বললে।

'যে জবাব চেয়েছি।'

'আরেক সময় দেব।' টুল থেকে উঠে পড়লো মিনতি। সেই ভ্রূকুটি-ভংগী করে হাসলো। বললে, 'এখন চুপচাপ ঘুমোবার চেষ্টা করুন তো, ভেবে ভেবে আপনার মাথাটাই খারাপ হ'য়ে যাবে দেখছি।' সদ্য-ব্যাচেলর ডিগ্রি-পাওয়া মিনতি সেনের কাছে ম্যাট্রিকুলেট অপরেশ বিশ্বাস হয়তো এই মুহূর্তে হাসিই জোগাতে পেরেছে শুধু।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় আবার যখন কথাটা পাড়লে অপরেশ তখন অপরেশকে একটা হাস্যকর পুরুষ বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারলে কই মিনতি?

বেডের ওপর আধ-শোয়াভাবে পড়ে আছে অপরেশ, টানা টানা ডাগর দু'টো চোখের কোলে ক্লান্তির কালিমা। মাথাভরা কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো, অবিন্যস্ত। গায়ে পাঞ্জাবীর বোতামগুলো সব খোলাই রয়েছে। কেমন বিষণ্ণ-কাতর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিচ্ছে অপরেশ। কেমন অযত্ন-শিথিল দেহ-বিন্যাস।

টুলে বসে অপরেশের দিকে তাকিয়ে তবু হাসতেই চেষ্টা করলো মিনতি। বললে, 'বলেছি তো জবাব দেব। সময় তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না।'

'আচ্ছা।' ম্লান হাসিতে শুধু ঠোঁট নাড়লো অপরেশ।

একদিন দু'দিন করে কয়েকটি দিনই পার হ'য়ে গেল। তবু মিনতির কাছ থেকে কোন কথা পেলে না অপরেশ, অধৈর্য হয়ে পড়লো সে। পারবে না, এ-ভাবে নিষ্ফল প্রতীক্ষায় দিন গুনতে সে কিছুতেই পারবে না।

তাই আরেকটি সন্ধ্যার মুহূর্তকে সে ব্যর্থ হ'তে দিলে না।

অষুধ খেয়ে গ্লাসটা মিনতির হাতে তুলে দিতে গিয়ে অপরেশ বললে, 'আমার কথার জবাব দেবার সময় কি আজো আসেনি?'

বেডের কিনারেই বসলো মিনতি। বললে, 'কি জবাব দেব ভেবে পাইনি যে।'

উঠে বসলো অপরেশ। বললে, 'ভাবতে হবে না, যা বলবার আজকে এখুনি বলতে হবে।' কোন দাবী নয় চরম অসহায়তাই অপরেশের কণ্ঠস্বরে।

চুপ করে রইলো মিনতি। অপরেশের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে চোখ নামালে।

'মিনতি।' অপরেশ মিনতির হাত ধরে ফেললে।

তবু কথা নেই মিনতির। মিনতি নিশ্চুপ।

'মিনতি, বলবে না, কিছু বলবার নেই তোমার?' একটা কান্না-ভেজা কণ্ঠস্বর যেন। ক্লান্ত-করুণ একজোড়া চোখের চাহনি।

অপরেশের মুঠো থেকে হাত সরিয়ে আনতে পারলে না মিনতি। শুধু বললে, লজ্জা-লাল হাসিতে মুখ রাঙিয়ে নিয়ে শুধু বলতে পারলে, 'উঃ, লাগছে না হাতে?'

নার্সিং হোমের অধ্যায় শেষ হ'য়ে গেল একসময়।

সময়ের স্রোতে ভেসে কয়েকটি মাসও পার হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে লেক, কার্জন পার্ক, বোটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা ক্যাসানোভী, কফি হাউস, আউটরামের বুকে ডিনার কোন কিছুই বাদ দেয়নি অপরেশ আর মিনতি। অনেক নিভৃত মুহূর্ত কেটেছে দু'জনের। অনেক নিবিড় সঙ্গ-সান্নিধ্য।

আর এখন সে-সব কিছুর শেষে কেমন একটা অনাসক্তিভাব যেন দিন দিন মাথা নাড়া দিয়ে উঠছে অপরেশের মনে, আর ভালো লাগছে না তার। মিনতির স্পর্শ, মিনতির অস্তিত্ব যেন দিন দিন ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠছে তার কাছে।

এগজিবিশন বসেছে ইডেন গার্ডেনে। আলোর রোশনাই জেলে সুমার্জিত দোকান-পসরা গড়ে উঠেছে চারিদিকে। বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে লোকের ভিড়।

একটা ফোয়ারার একটু দূরে এক টুকরো লনে বসেছে অপরেশ আর মিনতি। লোকের পাদ-পীড়নে জায়গাটার ঘাসের আস্তরণ ক্ষয়ে যাবার মুখে। এখন এদিকটা জন-বিরল, কেননা, দ্রষ্টব্য বিশেষ কিছু এদিকে নেই।

অপরেশের হাতের আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে মিনতি বললে, 'কিছু কিনলে হতো।'

'কি কিনবে?' ফোয়ারার শেওলা-ঢাকা মূর্তিটার দিকে অপরেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ।

'একটা বই-টই কিছু। বুক-ষ্টলও তো আছে এখানে।'

'ভালো বই কিছু পাবে বলে তো আমার মনে হয় না।' একটি ঘাসের গুচ্ছ উপড়ে ফেলতে ব্যস্ত অপরেশের বাঁ হাত।

'থাক, কাজ নেই তাহ'লে বই কিনে,' অপরেশের হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিবিড় করে আনলো মিনতি।

কিছুক্ষণ কারো মুখেই কোন কথা নেই।

একটু দূরে একটা খোলা জায়গায় মুভি-পিকচার্স দেখানো সুরু হয়ে গেছে। সেইদিকেই আপাততঃ লোকের ভিড় ভেঙ্গে পড়লো।

'এরপর যেদিন এখানে আসবো,' মিনতিই কথা সুরু করলে আবার, খানিক থেমে শাড়ীটা একটু টেনে গুছিয়ে বসে নিলে। বললে, 'এরপর যেদিন আসবো সেদিন ওই লাল নিওন লাইটের মতো রাঙা সিঁদুর মাথায় পড়েই আসবো, কি বলো?' চাপা হাসির ঢেউ যেন উঠছে তার সর্বাংগে, শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে।

'ততোদিন এগজিবিশন থাকলে তো।' কপালে কয়েকটি রেখা ফুটিয়ে তুলে অপরেশ বললে।

'ইডেন গার্ডেন তো থাকছে।'

'তা থাকবে।' শুষ্ক ফোয়ারার দিকে আবার তাকালো অপরেশ।

মুভি-পিকচার্সের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর হাওয়ার তরংগে ভেসে আসছে।

অপরেশ আর মিনতির মাঝে আবার কয়েকটি মুহূর্তের স্তব্ধতা।

হঠাৎ শরীরে একটা নাড়াচাড়া দিয়ে অপরেশের গা ঘেঁষে এসে বসলো মিনতি। দু'হাতে



অপরেশের হাতখানা চেপে ধরলো। বললে, 'না, সত্যি বলছি ভয় করছে আমার।' থরথর ক'রে হাত দু'টো কাঁপছে মিনতির। ব্যাচেলর ডিগ্রি-পাওয়া মিনতি সেনের কথাগুলো নার্সিং হোমের ম্যাট্রিকুলেট অপরেশ বিশ্বাসের কথার মতোই কান্না-ভেজা হয়ে উঠেছে।

'ছিঃ, একি করছো', মৃদু তিরস্কার ক'রে উঠলো অপরেশ, 'অমন ন্যাকি-কান্না জুড়ে দিলে কেন? কথাটা কি আর বাইরে বলা যেত না?'

কথাটা বলে ঘাড় বেঁকিয়ে ডানদিকে বুঝি একটু তাকিয়েছিল অপরেশ। আর সেই মুহূর্তেই নিমেষে সারামুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল তার। বেণী দুলিয়ে এদিকে যাকে সে আসতে দেখতে পেলে তার আবির্ভাব এখানে এসময়ে আশা করেনি অপরেশ। হ্যাঁ, বেলা-ই তো, হাইহিলে লনটা মাড়িয়ে কেমন দৃপ্ত-ভংগীতে হাসতে হাসতে এদিকেই এগিয়ে আসছে বেলা। ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে আসছে যেন।

তখনো অপরেশের হাতখানা দু'হাতে ধরে রয়েছে মিনতি। হাত সরিয়ে আনবে কিনা ভাববারও অবকাশ পেলে না অপরেশ! হাসির ঝংকার তুলে ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো বেলা। প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'বাঃ, দু'টিতে জায়গাটা তো বেছে নিয়েছো বেশ!'

অপরেশের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি একটু তফাতে সরে এলো মিনতি। বেলার দিকে সলজ্জ হাসিতে তাকিয়ে বললে, 'কখন এলে বেলা?'

'তা, এসেছি তো অনেকক্ষণ। তোমরা?' মিনতির পাশে এসে দাঁড়ালো বেলা।

কথাটার জবাব দিলে অপরেশ। বললে, 'আঃ, অমন চেঁচিয়ে কথা কইছিস্ কেন? আস্তে কথা বলা বুঝি তোর ঠিকুজিতে লেখা নেই।'

'তুমি চুপ করো সেজদা', মুখ নেড়ে চেঁচানো অবাহত রেখেই বেলা বললে, 'নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে তো একদম হাওয়া হয়ে গিছ্‌লে। আর এখন দেখা হতেই বড় যে ধম্‌কে উঠছো?'

'আচ্ছা চেঁচা, যতো খুসী চেঁচিয়ে কথা বল।' অপরেশ যতি টানাই সমীচীন মনে করলো।

'হ্যাঁ, চেঁচাবোই তো, তোমার সংগে তো আর কথা কইছি না।' মিনতির পাশে বসে পড়লো বেলা। বললে, 'তারপর কী খবর মিনতি। তুমিও তো হাওয়া হয়ে গিছ্‌লে।'

হাসলো মিনতি। বললে, 'তোমার খবর আগে শুনি। তুমিও কি একাই নাকি?'

'না, আমরাও দু'টিতেই এসেছি। বাচ্চারাও এসেছে। ওই তো ওই কাঁফেটেরিয়ায় ওরা বসেছে। তোমাদের দেখতে পেয়েই তো আমি উঠে এলাম।' হাসিতে চক্‌চক্ করছে বেলার চোখ।

'আমার আবার খবর কী? কোন খবর নেই।' মিনতি বললে।

'স্টাডি-সার্কেল, গানের আসর চলছে তো?' যেন কতো কাল পরে দেখা, তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খবর নিচ্ছে বেলা।

'চলছে, সে-খবর তোমার দাদাই তো ভালো জানে। আমার আজকাল হাজির থাকা হ'য়ে ওঠে না।'

'মীরাদি ভালো আছেন?'

'হুঁ।'

'কিন্তু তোমাকে কেমন শুকনো দেখাচ্ছে।' বেলা চোখ টান করলো।

'এমনি হবে হয়তো।' মিনতি মাথা নীচু করলো।

ফোয়ারার মূর্তিটার দিকে তাকিয়েই ছিল অপরেশ। বেলার শেষ দিকের কথাটা তাকে অকস্মাৎ চঞ্চল করে তুললে। ওদের কথার মাঝখানে তাই না পড়ে পারলে না সে। বললে, 'তোর চোখে তো সবাই রোগা ঠেকবে। নিজের ভালো চেহারার দেমাক আর কতোক্ষণ জাহির না করে পারবি।'

'তুমি থামবে সেজদা', বেলা ফুঁসে উঠলো, 'মিনতির সাইড্ নিয়ে তোমাকে কিছু বলতে হবে না,

দিব্যি তো এতক্ষণ আকাশের তারা গুনছিলে। তেম্নি গুনে যাও না আরেকটুক্ষণ। আমাদের কথায় কান দিতে এসো না।'

'বেশ, বেশ।' কেমন অদ্ভুত একটু হেসে উঠে দাঁড়ালো অপরেশ। উঠে একটু দূরে গিয়ে পাইচারি করতে লাগলো।

অপরেশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মিনতির দিকে তাকাতেই একটু অবাক হ'য়ে গেল বেলা। ছলছল করছে মিনতির চোখ দু'টো। জোর করে মুখে হাসি টেনে আনবার চেষ্টা করছে যেন।

'কী, কী হলো মিনতি?' বেলার প্রশ্ন-ভরা দু'টি চোখ মিনতির মুখের ওপর স্থির হয়ে রইলো।

'কই কিছু না তো,' শব্দ ক'রে হেসে উঠলো মিনতি। কিন্তু চোখের জল সে লুকোবে কি করে?

'কিছু না, দু' চোখ ছেপে জল নেমেছে, তবু বলছো কিছু না?' বেলা মাথা নাড়লো। বললে, 'না, বলতেই হবে তোমাকে। নইলে ছাড়ছিনে কিছুতেই।'

কেন মিনতির চোখে জল তা না শুনে ছাড়বে না বেলা। অথচ কী শোনাবে মিনতি? কেমন করে সে তার বুক-ভরা যাতনার নির্যাস উগ্‌ড়ে ফেলতে পারবে বেলার সামনে? ডেলার মতো কি একটা বস্তু কণ্ঠনালী বেয়ে বারবার ঠেলে উঠতে চায়। চোখের জল ফুলে-ফুঁসে উঠ্‌তে চাইছে যেন। শাড়ীর আঁচলে চোখ চাপল মিনতি।

'বলো।' বেলা নাছোরবান্দা।

'বলছি।' মিনতির কথায় সহজ সম্মতি।

ওদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছে অপরেশ। সেদিকে একটু তাকিয়ে নিলে মিনতি। তারপর বেলাকে বললে সব কোন কিছু গোপন না করে। কণ্ঠস্বর নীচু করে, কানে কানে কথা বলার মতো চুপিসারেই যেন কথাগুলো বললে। আসন্ন-মাতৃত্বের সঙ্কটে পৌঁছে প্রতিটি দিন আর প্রতিটি মুহূর্ত যে কী দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে কাটাচ্ছে সে তা-ই বেলাকে বললে মিনতি। আর অপরেশের কথাও বলতে বাদ দিলে না। এখনো বিয়ের ব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ, নির্বিকার রয়েছে অপরেশ। মিনতির অবস্থাটা যেন যে বুঝেও বুঝতে চাইছে না।

নির্বাক, নিস্পলকভাবে শুধু শুনে গেল বেলা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'আচ্ছা, এখন চলি মিনতি। কাঁফেটেরিয়ায় ওরা অনেকক্ষণ বসে রয়েছে।' যেম্নি এসেছিল তেম্নি দ্রুত গতিতে চলে গেল বেলা, মিনতির সামনে থেকে যেন পালিয়ে বাঁচলো।

আর বেলা চলে যেতেই ফোয়ারার আড়াল থেকে ছায়া মূর্তির মতো আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো অপরেশ। এসে মিনতির সামনে দাঁড়িয়ে শুধু একটি কথা বললে, 'চলো।'

উঠলো মিনতি, অপরেশের সংগে গেটের দিকে পা বাড়ালে।

এস্‌প্ল্যানেডে এসে আজ ষ্টেট্ বাসে মিনতিকে একাই উঠতে হলো, অপরেশ সংগে উঠলো না। বরাবর যখন যেখানেই ওরা একসংগে বেরিয়েছে, বাড়ী অবধি মিনতিকে আবার পৌঁছে দিয়ে গেছে অপরেশ। আজ তার প্রথম ব্যতিক্রম হলো। এই প্রথম নিজে সংগে না উঠে শুধু মিনতিকেই বাসে উঠিয়ে দিলে অপরেশ।

ব্যতিক্রমের আরেকটি দিক অপরেশের নিজের মধ্যেও দেখা দিলে। সারারাত অনেক চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারলে না সে। নার্সিং হোমের অধ্যায়ের পর এই প্রথম একটি রাত ঘুমহীন অবস্থায় কাটাতে হলো অপরেশকে। একটা ভয়, একটা আশংকা যেন কেবলি তাড়া ক'রে ফিরছে তাকে। বেলার সংগে ইডেন গার্ডেনে দেখা হয়ে যাবার পরই যেন একটা ভীরুতার ছায়া তাকে ঢেকে ফেলেছে।

এই ভয় ভয় ভাবটা অপরেশকে যেন বিকল ক'রে দেবার উপক্রম করলো যখন সে পরদিনই বকেলের ডাকে বেলার একখানা চিঠি পেলে। শুধু দু'টো কথাই লিখেছে বেলা, পত্রপাঠ যেন বেলার সংগে গিয়ে দেখা করে অপরেশ। তার নিজের স্বার্থেই যেন সে দেখা করতে অন্যথা না করে।



অনুগত আজ্ঞাপালকের মতো বেলাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হলো অপরেশ। নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পাবার পর আজ এই প্রথম বেলাদের বাড়ী আসতে হলো তাকে।

কিন্তু বেলাকে সামনে পেয়ে রাগ চেপে রাখতে পারলে না অপরেশ। বললে, 'এমন কী জরুরী দরকারটা শুনি যে অমন ক'রে একখানা চিঠি ছেড়ে দিলি, অতো জরুরী কথা থাকলে ইডেন গার্ডেনে বললি না কেন?'

মুখ গম্ভীর করে বেলা বললে, 'চুপচাপ বসো সেজদা, রাগটি এখন শিকেয় তুলে রাখো।'

'আমার রাগ দেখলি কোথায়?' অপরেশ স্বাভাবিক হতে চাইলে। বললে, ট্যুইশনী কামাই ক'রে তো আসতে হয়েছে, তা-ই বলছিলাম।'

'একদিনের গর-হাজিরায় তোমার গানের ট্যুইশনী হাত ছাড়া হয়ে যাবে নাকি?' বেলা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো।

'যাক, যা বলবার বলে ফ্যাল্, কথায় তোর সংগে কবে কে পেরে উঠেছে।'

বেতের চেয়ারটা অপরেশের সামনে টেনে এনে বসলো বেলা। বললে, 'বিয়েটা তোমার কবে হচ্ছে সেজদা।'

'আমার বিয়ে মানে?'

'মিনতিকে কবে বিয়ে করছো, সে-কথাই বলছি।'

'মিনতিকে আমি বিয়ে করবো কে বললে তোকে?' হঠাৎ হো হো ক'রে প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠলো অপরেশ। বললে, 'তুই ক্ষেপেছিস্?'

'বিয়ে করতে হবে তোমায়,' বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো বেলা। বললে, 'ন্যাকামি রাখো, আশ্চর্য, হাসতে একটুও লজ্জা করে না তোমার?'

হাসিটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল অপরেশের, তবু দ্বিধাহীনভাবে বললে, 'তোর কথা শুনে না হেসে পারা যায় না, বেলী।'

'না, হাসির কথা নয়, ওই মিনতিকেই তোমায় বিয়ে করতে হবে।'

'একি তোমার হুকুম নাকি?'

'একা আমার নয়, আমাদের সবার।' মুখে আশ্চর্য কাঠিন্য দেখা যাচ্ছে বেলার। বললে, 'তুমি ভেবেছো অমন ন্যাকা সেজে রেহাই পেয়ে যাবে? মীরাদি জেনে গেছেন ব্যাপারটা, তা জানো?'

কথা হারিয়ে গেল অপরেশের। মীরাদির কানে খবরটা কি ক'রে পৌঁছল তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। মিনতি বলেছে? নাকি বেলার কাজ এটা? মুহূর্তকাল বেলার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলো অপরেশ।

কিন্তু অতো কি সহজ মীরাদি-দের নাগালের বাইরে চলে আসা? অপরেশের মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে যেন একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। মীরাদি, মীরাদির বন্ধু-বান্ধবরা সবাই তো শিক্ষায়-সম্পদে একেকজন কেষ্ট-বিষ্টু গোছের। অতো সহজে কি ওরা অব্যাহতি দেবেন অপরেশকে? প্রমাণ না থাকলেও প্রমাণ যোগাড় করতে কতক্ষণ ওদের? উঠে-পড়ে লাগলে কতোক্ষণ লাগবে ওদের অপরেশকে নাজেহাল করে ছাড়তে?

বেলার দিকে তাকিয়ে ফ্যাকাশে হাসি হাসলে অপরেশ। বললে, 'কি জানিস্ বেলী, আসলে আমার পছন্দ-অপছন্দের কোন কথা নয়, শিক্ষিতা মেয়ে মিনতি আমার মতো একটা মুখ্যুকে বিয়ে করবে, সেইটেই বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

'এতক্ষণে তবু বুদ্ধিমানের মতো কথা বললে সেজদা,' স্পষ্ট বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ কথা বেলার। বললে, 'আসছে সপ্তাহেই কিন্তু বিয়েটা হচ্ছে তোমার। আমরা সব জোগাড়-যন্তর ক'রে ফেলছি। তোমার আর দুর্ভাবনা না ভাবলেও চলবে।'

'তা তোরা যখন বলছিস্, তোরাই যখন সব ঠিক ক'রে ফেলেছিস্ তখন আমার আর আপত্তি কিসের ?' থতমত খেয়ে ঠাণ্ডা গলায় অপরেশ বললে।

বিয়েটা যথারীতিই হ'য়ে গেল।

কিন্তু বিয়ের জেরটা সুরু হলো কিছুকাল বাদে।

বিয়েটা যেন সত্যি বিয়ে নয় অপরেশের কাছে। একটা সামাজিক অনুশাসন যেন স্বেচ্ছায় সে মেনে নেবার অপেক্ষায় ছিল মিনতিকে তার একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধীনে নিয়ে আসার জন্যেই। এরপর তো আর কারো কিছু বলার থাকতে পারে না। তার দাম্পত্য-জীবনযাত্রা সম্বন্ধে এখন তো আর কারো কোন কথা বলবার অধিকার নেই। মুঠোর মধ্যে সে পেয়ে গেছে মিনতিকে। পেয়ে গেছে অন্ধ আক্রোশ মেটাবার নির্বিঘ্ন সুযোগ। শুধু উপেক্ষা আর অবহেলা নয়। সাধারণ ভদ্রতার মুখোসও দিনের পর দিন সে খসিয়ে ফেলতে লাগলো মিনতির সংগে ব্যবহারে। শুভরাত্রির পর দু'একটি রাত ছাড়া মিনতির সংগে আর রাত্রি-যাপনের দুর্ভাগ্য ঘটতে দেয়নি অপরেশ।

রাত্রির নিভৃতিতে না পেলেও এখনো যে তবু কখনো কখনো অপরেশের সাক্ষাৎ মিলছে এটাই যথেষ্ট ভাগ্য বলে মনে করে মিনতি।

'একটা অষুধ-পত্র কিছু কিনে দাও না।' অপরেশকে দেখতে পেয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো মিনতি।

কোথায় হয়তো বেরুচ্ছিল অপরেশ। বেরুবার সময় এভাবে বাধা পড়ায় বিরক্তিতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত জ্বলে উঠলো তার। দাঁড়িয়ে পড়ে মিনতির দিকে তির্যক চোখে তাকালো শুধু, কথা বললে না।

'শুনছো,' মিনতি আবার বললে, 'ডাক্তারের সংগে একটু আলাপ করে এসো।'

'এটা তোমার মীরাদির বাড়ী নয়।' চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠলো অপরেশ।

'তা তো জানি।' মিনতি অচঞ্চল।

'মীরাদির মতো টাকার পাহাড় তৈরী করার আমার সৌভাগ্য হয়নি—এটাই বুঝি জানতে বাকী ছিল ?'

'বাজে বকছো কেন ?' মিনতি একটু জোরেই বললে, 'কথায় কথায় অমন বাজে বকো কেন তুমি ?'

'বাজে লোক আমি—এটাও জানোনি ?'

কথাটা বলে যেন পিছলে বেরিয়ে গেল অপরেশ।

খুব অবাক হলো না মিনতি। অপরেশের সাম্প্রতিক ব্যবহারে এ-একটি নতুন সংযোজনা শুধু।

কিন্তু সহ্য করে যাবার শেষ শক্তিও একসময় হারিয়ে ফেললে মিনতি। অপরেশের সংগে সংগে গিরিবালাও ইদানীং যোগ দিয়েছেন বলেই সহ্যের বাঁধ ভেঙে পড়লো না তার, কিংবা খাওয়া-পরার ব্যাপারে চরম অযত্ন হচ্ছে এটাও মুখ্য কারণ নয়।

সেদিন রাত্তিরের ব্যাপারটাই মিনতিকে সহসা অবস্থার গুরুত্বটা মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

সন্ধ্যার পর থেকেই হাত-পায়ের গিঁঠগুলো কেমন অবশ হ'য়ে আসছিল মিনতির। মাঝে মাঝে এমন তো হচ্ছে আজকাল। তাই বিশেষ গা না ক'রে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছিল সে। হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছিল। কিন্তু রাত একটু বাড়তেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মিনতির। একটা ব্যথা যেন আস্তে আস্তে শিরশির ক'রে ওপরের দিকে উঠে আসছে। একটু একটু ক'রে বাড়ছে ব্যথাটা। তাড়াতাড়ি উঠে বসলো মিনতি। পাশের ঘরে গিয়ে অপরেশকে ডেকে তুললো। কিন্তু আশ্চর্য, একটুও চিন্তার লক্ষণ দেখা গেল না অপরেশের মুখে। মিনতির দিকে একটু তাকিয়ে একটা আড়মোড়া ভেঙে আবার পাশ ফিরে শু'লো সে।



রাত্তিরের এই অভিজ্ঞতার পর আর চুপ করে রইলো না মিনতি। সকাল হতেই অপরেশের ঘরে এসে ঢুকলো সে। কোনপ্রকার ভূমিকা না ক'রেই বললে, 'আমি দিদির ওখানে যাচ্ছি।'

'কেন ?' কপাল কুঁচকালো অপরেশ।

'কখন কি হয় বলা তো যাচ্ছে না।'

'মাকে বলেছো ?'

'না, তোমায় বলছি।'

'আমায় বলছো ?' কান-ফাটানো আওয়াজে হেসে উঠলো অপরেশ, 'যদি অনুমতি না মেলে ?'

'তবু-ও যাবো।'

'যাবে ?'

'হ্যাঁ।'

হেলান দিয়ে শুয়েছিলো অপরেশ। উঠে বসলো, বললে, 'তাহ'লে ফিরে আসার পথও বন্ধ হ'য়ে যাবে চিরদিনের জন্য।'

ম্লান হাসলো মিনতি। বললে, 'সে তোমার অভিরুচি।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে শুধু তাকিয়ে রইলো অপরেশ। কোন কথা বলতে পারলে না।

এগিয়ে এসে টেবিলে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়ালো মিনতি। তেলহীন রুক্ষ চুলগুলো গালে, কপালে ছড়িয়ে পড়েছে। চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে নিয়ে বললে, 'কোনদিন তো কোন কথার জবাব চাইনি তোমার কাছে। আজ চাইছি, শুধু একটি কথার।'

'কি ?' যেন ঘুম থেকে জাগলো অপরেশ।

'সত্যি কি আমাকে ভালোবাসোনি তুমি ?'

ঘাড় কাত করে অন্যদিকে তাকালো অপরেশ। বললে, 'না, বাসিনি।'

অপরেশের দিকে শুধু এক পলক তাকালো মিনতি। তারপর মুখের ম্লান হাসিটা অক্ষুণ্ণ রেখে ধীরে ধীরে দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো।

আর তারও পরে রোদ যখন দরজায় জানালায় সবে উঁকি মারতে সুরু করেছে রামকান্তমিস্ত্রী লেনের গলিতে যখন প্রথম রিকসার টুংটাং শোনা গেল মীরাদির বাড়ীর দিকে, সত্যি তখন রওনা হ'য়ে গেল মিনতি।

ওপরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাগে শুধু ফুলেই উঠলো অপরেশ। ফেটে পড়তে পারলে না।

মিনতি চলে যাবার পর আর একটি মাসও তর সইলো না অপরেশের। দেখে শুনে সুন্দর স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে এবার ঘরে তুলে আনলে।

গিরিবালা সন্তুষ্ট হলেন। কেমন ফুট্‌ফুটে বউটি। কোল-জুড়ানো রূপ, গিরিবালার খুসীর অন্ত নেই।

নিকট আত্মীয়রাও এসে প্রচুর স্তুতি-বাচন শুনিয়ে গেল।

বেলাও এসেছিল, কিন্তু একা, নতুন বউ-এর চিবুক ধরে একটু আদর করে নিঃশব্দেই চলে গিয়েছিল সে।

আবার বিয়ে করলো বটে অপরেশ। কিন্তু এই নতুন বউর সংগেও তার বাদ-বিসম্বাদের পালা সুরু হতে দেরী হলো না।

অথচ বিয়ের ছাড়পত্র নিয়ে যেজন্য কোন মেয়েকে পেতে চায় অপরেশ তা তো সে নতুন বউ বাসন্তীর মধ্যে পেয়েছে। হ্যাঁ, বাসন্তী নামটা ওর সার্থকই বটে। দুধে-আলতায় গায়ের রঙ। কালো মেঘের মতো একরাশ চুল ওর পিঠের ওপর সবসময় লুটিয়ে থাকে। ভরা যৌবন উপ্‌চে পড়ছে ওর আরক্তিম চিবুকে, গণ্ডদেশে—নরম মোমের মতো দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

মিনতির কথা একেবারেই ভুলে যাওয়া উচিত ছিল অপরেশের। মিনতির স্মৃতির শেষ চিহ্নটুকুও

মন থেকে উপড়ে ফেলা উচিত ছিল তার। বিশেষ করে বাসন্তীকে বিয়ে করার পর আজ যখন প্রায় একটি বছর পূর্ণ হতে চলেছে।

অথচ দেখা যাচ্ছে আজকাল বেলাদের বাড়ী অপরেশের যাতায়াত একটু ঘন ঘনই হচ্ছে।

বেলার কাছ থেকেই জেনেছে অপরেশ রামকান্ত মিস্ত্রী লেনের বাড়ী থেকে চলে আসার পর মিনতির পরবর্তী জীবনের অধ্যায়টি। মীরাদির ওখানে গিয়েই প্রথম উঠেছিল মিনতি। কিন্তু ওখানে থাকা হয়নি তার, পরোক্ষ সমর্থন জানালেও এ-বিয়েটা যে মোটেই মনঃপূত ছিল না মীরাদির তা ওখানে গিয়েই টের পেলে মিনতি। তাই মীরাদির বাড়ী ছাড়তে হলো ওকে। তারপর এই বেলাদের এখানেই এসে উঠলো সে। বেলাদের সহায়তায়ই হাসপাতালে ঢুকলো, দু'তিন মাস বাচ্চাটিকে নিয়ে এখানেই থেকে গেছে, তারপর পার্ক সার্কাসের ওদিকে কোথায় উঠে গেছে। জীবিকা জুটিয়ে নিয়ে আজ স্বাবলম্বী হয়েছে মিনতি। কর্পোরেশনের স্কুলে মাস্টারী নিয়েছে একটা।

'আমার কথা কিছু বলতো রে বেলী তোদের এখানে থাকার সময়।' বেলাকে একদিন জিজ্ঞেস না করে পারলে না অপরেশ।

'বলতো, নতুন বউর কথাও জিজ্ঞেস করতো।' বেলা বেণী দুলিয়ে জবাব দিলে।

'খুব গালাগাল করতো আমায়, নারে?'

'না, মুখ টিপে হাসতো শুধু।'

'বাসন্তীকে?'

'ওকেও না, ওকে দেখতে ইচ্ছে হয় এ-কথাই বলতো মাঝে মাঝে।'

বেলার কথাগুলো সেদিন বারবার মনে মনে যেন আবৃত্তিই করলো অপরেশ। তারপর একদিন মিনতির আস্তানায় গিয়ে হাজির হলো, ঠিকানাটা সে বেলার কাছ থেকেই জেনে নিয়েছিল।

অপরেশের এই আকস্মিক অভাবিত উপস্থিতি কিন্তু অবাক ক'রে দিলে না মিনতিকে। খানিক আগেই বাড়ী ফিরেছে সে, এখনো একখানা উজ্জ্বল রঙীন শাড়ী পরনে রয়েছে, এখনো সাজগোজ করা দেহবাস। তক্তপোষের ওপর শুয়েছিল এতক্ষণ। বাচ্চাটিকে নিয়ে খেলা করছিল।

দরজা ঠেলে অপরেশ ভেতরে ঢুকতেই উঠে এলো মিনতি। চোখে মুখে হাসির দীপ্তিই ফুটে উঠলো তার। বললে, 'পথভুলে এলে নাকি?'

'হয়তো তা-ই।' ভেতরে ঢুকে তক্তপোষে বসে অপরেশ বললে।

'তবু তো এলে যা হোক্। হাসিতে অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে মিনতির মুখ।

মিনতির দিকে শুধু তাকিকেই রইলো অপরেশ। হাসি, মুখের আদল আর কথা বলার ভংগীতেই শুধু আজ পুরনো মিনতিকে চিনে নিতে পারা যায়। এ-ছাড়া পুরনো মিনতির আর কিছুই নেই আজকের এই মিনতির চেহারায়। সেই কৃশ কটিদেশ, কোটরগত চোখ, হাড়-বের-করা কণ্ঠদেশ কোথায় আজ মিনতির এই চেহারায়? একটা মসৃণ-উজ্জ্বল শ্যামল রঙ ওর গায়ে ফুটে উঠেছে। হাল্কা মেদের প্রলেপে কেমন নিটোল হ'য়ে গেছে সর্বাংগ। কী স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে মিনতিকে। মাতৃত্বের স্নিগ্ধতায় কী অপূর্ব মিনতির চেহারাটা।

'কী দেখছো অমন করে?'

মিনতির কথায় যেন চমক ভাঙ্গলো অপরেশের। বললে, 'কিছু না।' তারপর দু'হাত বাড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে নিতে গেল।

অপরেশকে দেখেই গুটিগুটি হামাগুড়ি দিয়ে তক্তপোষ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল বাচ্চাটি। হাঁটতে শিখেছে সবে। কোঁকড়া চুলগুলোর ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি ক'রে তাকাচ্ছিল শুধু। কিন্তু অপরেশ হাত বাড়াতেই কেঁদে ফেললে বাচ্চাটি।

'ওতো চেনে না তোমায়, এই প্রথম দেখছে,' বাচ্চাটিকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিলে মিনতি। বললে, 'ওর একটা নামও রেখে ফেলেছি।'



'কী নাম।'

'শংকর'

'বেশ নামটা।' অপরেশ বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে বললে।

এরপর খুঁটিনাটি আরো কথা হলো মিনতির সংগে। নতুন বউর খবর নিলে মিনতি। এই নতুন বউ-এর বাচ্চাটির খবর নিতেও ভুল হলো না তার। বললে মিনতি, ঠিকে ঝি কাজ করে দিয়ে যায় আর বারান্দায় বসে ওই যে বুড়ীটা রান্না করছে সে-ই ঘরকন্না দেখাশোনা করে, খোকাকে আগলে রাখে মিনতির অনুপস্থিতির সময়।

মিনতির কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল অপরেশ। আর একটা আশ্চর্য পরিচ্ছন্নতার, অদ্ভুত স্নিগ্ধতার ছবির মতোই মিনতির ঘরটি মনে হচ্ছিল তার।

বাড়ী ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল অপরেশের।

কিন্তু বাড়ী এসে বাসন্তীর কথাগুলো শুনামাত্রই যেন তার সর্বাংগে সূঁচ ফুটলো।

'কোথায় ছিলে এতো রাত অবধি,' মুখ ভার করে বাসন্তী কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'আমার বুঝি আর ক্ষিধে পায় না।'

কথা না ব'লে জামা-কাপড় পাল্টে মুখ হাত ধুয়ে এলো অপরেশ।

'চলো, খাবে চলো।' বাসন্তীর কথাটা উদ্ধত-আদেশ যেন।

ঘরে এসে বারান্দায় অন্ধকারেই ইজিচেয়ারটা টেনে নিলে অপরেশ, একটু বিশ্রাম নেবার ইচ্ছায়।

কিন্তু সেখানেও এসে বাদ সাধলো বাসন্তী। বললে, 'শোবে চলো।'

'তুমি শোও গে, আমার এখন ঘুম পাবে না।' একটু রুক্ষস্বরেই অপরেশ বললে।

'ঘুমোতে কে বলছে তোমায়?' অপরেশের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো বাসন্তী।

অপরেশের হৃদ্‌পিণ্ডেই যেন সূঁচ ফুটলো এবার, এই মুহূর্তে বাসন্তীকে একটা কদাকার জোঁকের মতোই মনে হলো তার, রাত্রির অন্ধকারেই তাকে বরাবর যে পেতে চেয়েছে।

'তুমি শোও গে।' অসহ্য বিরক্তিটা চেপে রেখে তবু আবার বললে অপরেশ।

শ্রাবণের একটি বিকেলে একদিন একেবারে ত্রস্তব্যস্তভাবে বেলাদের বাড়ী এসে উপস্থিত হতে দেখা গেল অপরেশকে।

একটা আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়েছে সে, হাতে কতকগুলো খেলনা-পুতুল আর রজনীগন্ধা একগোছা।

'কী ব্যাপার মেজদা,' অবাক-লাগা চোখে অপরেশের দিকে তাকিয়ে বেলা বললে।

ধপ্ করে চেয়ারে বসে পড়লো অপরেশ। বললে, 'পার্ক সার্কাসের বাড়ীতে মিনতিরা নেই তো।'

'ও বাড়ী যে ও ছেড়ে দিয়েছে,' একটা দুষ্টুমির হাসি হেসে উঠলো বেলা। বললে, 'কিন্তু তোমার যে একেবারে মূর্ছা যাবার যোগাড়।'

বেলার কথাটা গায়েও মাখলে না অপরেশ, বিকেলের একটু আগেই সে পার্কসার্কাসে গিয়েছিল, কিন্তু গিয়ে দেখলো নতুন একঘর ভাড়াটে বসেছে মিনতির ঘরটিতে, তাদের জিজ্ঞেস করেও মিনতির কোন হদিস পাওয়া যায়নি। 'ওর ঠিকানাটা বল তো।' অপরেশ বললে।

টালিগঞ্জের ওধারে কি একটা যায়গার নাম করলো বেলা। ঠিকানাটা টুকে নিলে অপরেশ, তারপর দাঁড়ালো।

বেলা বললে,, 'ওকি চললে নাকি সেজদা। চা করতে বলে দিয়েছি যে।'

'সময় নেই।' খেলনা-পুতুল আর রজনীগন্ধার গোছাটি আলতোভাবে হাতে তুলে নিলে অপরেশ।

'ইস্, মিনতির জন্য এ-সোহাগটা এ্যাদ্দিন কোথায় ছিল সেজদা?' খিলখিল করে হেসে উঠলো বেলা।

ঘাড় বাঁকিয়ে শুধু একটু হাসলে অপরেশ। তারপর সশব্দে দরজাটা ঠেলে বেরিয়ে এলো।

## সাহিত্য-হিতৈষা

কলকাতায় সাহিত্য যখন মৃতপ্রায় তখন প্রায়ই দেখা যায় বাংলাদেশের মফঃস্বল শহরগুলোতে ধূমধামে সরস্বতীর পূজো চলছে। 'প্রগতি'-'পূর্ব্বাশা'র যুগ থেকে কেউ যদি লক্ষ্য করে থাকেন তাহলে বাংলাসাহিত্যের এই সুলক্ষণটি দেখতে পেয়েছেন। শুনেছি আগে ফরাসীতে না কি সাহিত্যের ধারাটা এমনই ছিল। ইদানীং অনুরূপ ব্যাপার দেখা যাচ্ছে 'জলার্ক', 'উত্তর বাংলা' 'মালদহ কলেজ পত্রিকা' প্রভৃতির আবির্ভাবে। উত্তরবঙ্গ বাঙালীর সাহিত্য-প্রীতির উত্তরাধিকার লাভ করেছে মনে হয়। 'উত্তর বাংলায়' দেখতে পেলাম সেখানকার এক কবিকে শহরবাসীরা উপাধি এবং মানপত্র দান করেছেন। ঘটনাটি নিঃসন্দেহে সুসংবাদ এবং অভিনন্দনীয়।

*

অবশ্য কলকাতায়ও সাহিত্য যে সর্ব্বাঙ্গীণ জরাগ্রস্ত তা নয়। রাষ্ট্রোন্মাদ হয়ে বহু সাহিত্যিক ভ্রষ্ট হয়েছেন, সিনেমায় অনেকে নষ্ট হয়েছেন, অনেকে নিজেদের খ্যাতি অচলপ্রতিষ্ঠ ভেবে একই লিপি বারবার ফিরে ফিরে পড়ছেন—সবই সত্য। তবু, এই দুর্লক্ষণসত্ত্বেও বলব শক্তিরূপিণী বাগ্দেবীর বলধবল সন্তানরা অরুণচ্ছটায় ধূসর কলকাতায়ও জন্ম নিচ্ছেন। অরুণ ভট্টাচার্য্য, অরুণ সরকার প্রভৃতি কয়েকজন তরুণ কবি ইদানীং অকস্মাৎ একদিন ফরাসী-পদ্ধতি অবলম্বন করে কলকাতার রাস্তার মোড়ে কবিতা-আবৃত্তি ও বক্তৃতা করে 'কবিতা পড়ো' আন্দোলন জাগিয়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হলেন। এ-ব্যাপারে পূর্ব্বাশার সব চাইতে বেশি পুলকিত হবার কারণ রয়ে গেছে। কেননা, এসপ্লানেডের মোড়ে প্রথম এ-আন্দোলন উদ্বোধিত হয় পূর্ব্বাশার শ্রাবণ-সংখ্যায় প্রকাশিত 'নীল-লোহিত' কবিতাটির আবৃত্তিতে। শুনেছি, আবৃত্তি করেছিলেন 'এই কলকাতা'র গৌরবাবু।

*

পূজায় কলকাতায় সাহিত্য-পার্ব্বণের হিড়িক পড়ে যায়। যাঁরা একদিন কিছু-কিছু লিখতেন এখন আর লিখছেন না এমন লেখকও এই পার্ব্বণটি পালন করে থাকেন। রাষ্ট্রনীতির লীলাক্ষেত্র যে কাগজগুলো তারাও সাহিত্যের পোষাক পরে বেরোয়। বিজ্ঞাপনদাতারা মুক্তহস্তে সাহিত্যের পার্ব্বণী দিয়ে থাকেন। রীতিটি বাংলাদেশের 'প্রাগৈতিহাসিক' সভ্যতার স্মৃতিবাহী। বাংলাদেশেই শাক্ততন্ত্রশাস্ত্রের বাগ্দেবী কালক্রমে দশভুজা দুর্গা-শক্তিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। মনে হয় তা 'নবগীর্ব্বাণ' 'শ্রীহট্টরাজ' ( ভাস্করবর্ম্মন-হর্ষবর্দ্ধন ) 'খরবাণে'র আমলে। যাক্ সে কথা, এবার পূজায় প্রথম আবির্ভাব যে মনোরম পত্রিকাটির, সেই 'বর্ষবাণী'র সম্পাদিকা জাহান-আরা-খানকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধন্যবাদ এই জন্যে যে বিপুলায়তন পত্রিকাটিকে তিনি 'নিউজপ্রিণ্টে' ছাপেন নি, ছেপেছেন 'অ্যান্টিকে'—আর মলাট দুর্লভ আর্ট-কাগজে। ক্ষীণায়ু নিউজ-প্রিণ্টে যাঁরা সাহিত্য-পরিবেশন করেন তাঁদের মনে এই বোধের উদয় হয়না যে সাহিত্য ক্ষণকালের বস্তু নয়—সাহিত্যকে স্থায়ী করা দরকার টেকসই কাগজে মুদ্রিত করে। 'বর্ষবাণী'র কর্তৃপক্ষের সাহিত্যিক নিষ্ঠা অনুকরণীয়।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য


এই বার্লির ওপরেই আমি নির্ভর করতে পারি...




কেননা আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি সব সময়েই ভালো, কারণ এই বার্লি স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্য থেকে সত্যিকারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি। 'পিউরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতা।

পিউরিটি বার্লি

APBX 10-BEN

অ্যাটলান্টিস ( ঈস্ট ) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের মধ্য ভাগে প্রকাশিত হয়। চলতি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা ( সডাক ) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ( ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেন্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয়ঃ

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা


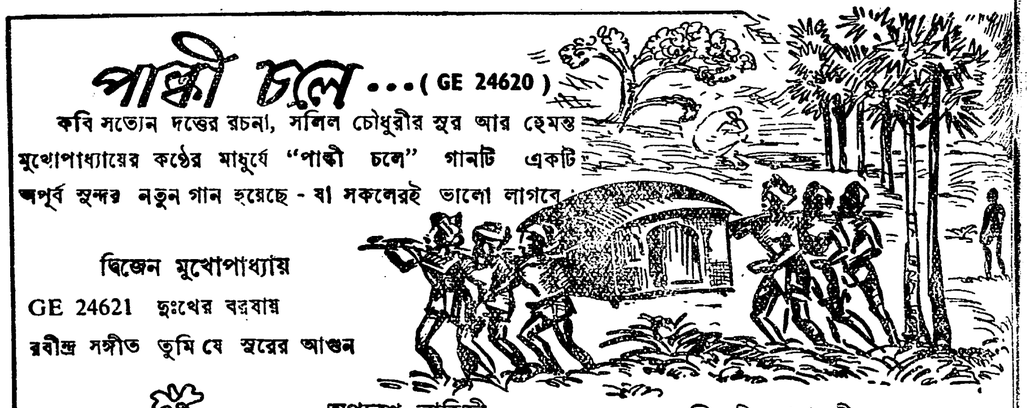



## পনের বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরই সব চেয়ে বেশী ম্যালেরিয়া হয়

জাতির পক্ষে ম্যালেরিয়া যে কী নিদারুণ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা এই মর্মান্তিক তথ্য থেকেই বোঝা যায়।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের যে বয়সটি ঠিক তাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তি গড়ে তোলবার সময় ঠিক তখনই তাদের দেহ ও মন ভেঙ্গে দেয় এই ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া থেকে শিশুদের বাঁচাবার চেষ্টা না করা মানে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার, এমন কি সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎকে চরম ঔদাসীন্যে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। এ শুধু অবহেলা নয়, ভয়ানক অপরাধ।

এই জন্যই বিশেষভাবে বলছি, 'প্যালুড্রিন'এর সাহায্যে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে শিশুদের বাঁচান, আর নিজেও বাঁচুন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে — এমন কি আসন্ন প্রসবারাও নির্ভয়ে নিয়মিতভাবে 'প্যালুড্রিন' খেতে পারে — কোন অনিষ্টের ভয় নেই। সেবনবিধি নীচে দেওয়া হল।

### ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বক্স মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।



'প্যালুড্রিন'
ম্যালেরিয়ার দাম

### সেবন বিধি

জ্বর অবস্থায়ঃ পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

জ্বর প্রতিরোধের জন্যঃ উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (কলিকাতা) লিঃ
ICP 77






## সিগনেট প্রেসের বই

বাংলাগ্রন্থজগতে অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন
**পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ**
অচিন্ত্যকুমারের স্মরণীয় সাহিত্যকীর্তি
৬ মাসে চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হল
সচিত্র সুলভ সংস্করণ ৪৲

পল্লীপ্রকৃতি আর কৈশোরের
ভীরু ভালোবাসার কাহিনী
**দুইবাড়ি**
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
দাম ২৷৷০

রচনাগুণে এ-গ্রন্থের সমতুল্য আত্মজীবনী
বাংলাসাহিত্যে বিরল
শিবনাথ শাস্ত্রীর
**আত্মচরিত**
দাম ৪৲

বড়োদের জন্য 'দিনদুপুরে' লেখিকার
প্রথম উপন্যাস
লীলা মজুমদার
**শ্রীমতী**
হাস্যরসসমুজ্জ্বল আনন্দবেদনাময়
একটি পরিচ্ছন্ন কাহিনী। ২।০

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনার একটি বিরলতম
নিকটচিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে এ-গ্রন্থে
**স্মৃতিচিত্র**
প্রতিমা দেবী
অপ্রকাশিত ৮টি মূল্যবান আলোকচিত্র
দাম ২।০

আধুনিক বিখ্যাতদের মধ্যে নির্জনতম কবির
তিরিশটি কবিতার সংকলন
**বনলতা সেন**
জীবনানন্দ দাশ
দাম ২৲

আজবদেশে অবাকহাসির কথা
সুকুমার রায়ের
**হ-য-ব-র-ল**
নতুন সংস্করণ ১।০

তরুণতর কবিদের মধ্যে যিনি
অগ্রণী— সেই
নরেশ গুহ-র
**দুরন্ত দুপুর**
প্রথম কাব্যসংকলন ২৲

স্বদেশী এবং বিদেশীয় চিত্রী-কবি-সাহিত্যিকদের
বিষয়ে মৌলিক আলোচনা
**সাহিত্যের ভবিষ্যৎ**
বিষ্ণু দে
দাম ২৲

**সিগনেট বুকশপ**
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
১৪২/১ রাসবিহারী এভেনিউ

Regd. No. C. 151


আগষ্ট মাসের নতুন রেকর্ড . . .

শ্রীমতী উৎপলা সেন
কেন জাগে শুকতারা
এলো কি শাঙন
(আধুনিক) N 82520

বিনয় গোস্বামী
হরি হে এতো কাছে
সখী গো দেখে এলাম
(কীর্তন) N 82521

নায়েব আলি
(ভাওয়াইয়া ও চট্‌কা)
N 82513

'সহসা' বাণীচিত্র-গীতি
আগুনের পরশমণি
তারায় তারায় দীপ্ত
(রবীন্দ্র) N 76001

'মহাপ্রস্থানের পথে'
বাণীচিত্র-গীতি
অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি
শিব স্তোত্রম্ P 11918

এইচ্-এম-ভি অর্কেষ্ট্রা
পাঁচ মিশালি নং ২
N 87505

উত্তর বংগীয় রেকর্ড নাটক
'মধুমালা'
N 82514 to N 82519

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস"

"HIS MASTER'S VOICE"
The Hallmark of Quality

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ—কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - দিল্লী।





খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড়

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩


Printed & Published by Satya Prasanna Datta, Purvasa Ltd.
P 13 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

দাম বারো আনা

# পূর্বাশা

ত্রৈমাসিক : ১৩৫৯ পঞ্চদশ বর্ষ. সপ্তম সংখ্যা প্রতি সংখ্যা আট আনা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি —যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা ঃ
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**
লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসনির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেক রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা

মিনু মাসনির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৮ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, ক লি কা ত।**



# এই উপ-মহাদেশে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন ম্যালেরিয়ায় ভোগে

**একটু ভেবে দেখুন — এর মানে এই যে প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় দশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে।**

ভুলে যাবেন না যে ম্যালেরিয়া একটি শক্তিনাশক মারাত্মক ব্যাধি। ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, শক্তি ক্ষয় হয় এবং উৎসাহ-উদ্যম ও বুদ্ধি-বিবেচনা ম্লান হয়ে যায়।

এই জন্যই বলি — আজ, এখনি — ম্যালেরিয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'প্যালুড্রিন' খেতে আরম্ভ করুন। ওষুধের মত ওষুধ এই 'প্যালুড্রিন' নিরাপদ; নিঝঞ্ঝাট এবং সস্তা। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে হলে সপ্তাহে মাত্র এক আনা খরচ ক'রে একটি মাত্র 'প্যালুড্রিন' খেলেই যথেষ্ট। সেবন-বিধি নীচে দেওয়া হল।

### ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি ?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বক্স মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।



## 'প্যালুড্রিন'
*ম্যালেরিয়ার যম*

**সেবন বিধি**

জ্বর অবস্থায় ঃ পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।




জ্বর প্রতিরোধের জন্য ঃ

উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

**ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ**

ICP 73

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি —যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসনির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেক রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা

মিনু মাসনির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা**



# এই উপ-মহাদেশে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন ম্যালেরিয়ায় ভোগে

**একটু ভেবে দেখুন — এর মানে এই যে প্রতি বছর আমাদের দেশে প্রায় দশ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় ভোগে।**

**ভুলে যাবেন না যে ম্যালেরিয়া একটি শক্তিনাশক মারাত্মক ব্যাধি। ম্যালেরিয়ায় স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, শক্তি ক্ষয় হয় এবং উৎসাহ-উদ্যম ও বুদ্ধি-বিবেচনা ম্লান হয়ে যায়।**

**এই জন্যই বলি — আজ, এখনি — ম্যালেরিয়ার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য 'প্যালুড্রিন' খেতে আরম্ভ করুন। ওষুধের মত ওষুধ এই 'প্যালুড্রিন' নিরাপদ; নির্ঝঞ্ঝাট এবং সস্তা। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করতে হলে সপ্তাহে মাত্র এক আনা খরচ ক'রে একটি মাত্র 'প্যালুড্রিন' খেলেই যথেষ্ট। সেবন-বিধি নীচে দেওয়া হল।**

### ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বন্ধ মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।



## 'প্যালুড্রিন'
*ম্যালেরিয়ার যম*

**সেবন বিধি**

জ্বর অবস্থায়: পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।




জ্বর প্রতিরোধের জন্য:

উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

**ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ**

ICP 73

# পূর্ব্বাশা

## কার্ত্তিক—১৩৫৯

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বিশ্বে মানব : | শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু ... | ৩৩২ |
| প্যারী-পয়ার : | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... | ৩৩৯ |
| জ্ঞানান্বেষণ ও শিল্পান্বেষণ : | নারায়ণ চৌধুরী | ৩৪৯ |
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| ভোর : | বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... | ৩৫৩ |
| পৃথিবী ও আকাশ : | শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | ৩৫৩ |
| চোখ-ঝরা-নদী : | মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় | ৩৫৪ |
| অভীপ্সা : | সুনীলকুমার নন্দী ... | ৩৫৪ |
| উত্তরায়ণ : | শিশিরকুমার দাশ ... | ৩৫৫ |
| আকাঙ্ক্ষা : | সরিৎ শর্ম্মা ... | ৩৫৬ |
| বাসন্তী বাহার : | সুকোমল দত্ত ... | ৩৫৭ |
| বিবাহিতা স্ত্রী : | প্রতিভা বসু ... | ৩৬৭ |
| সাহিত্যায়ন : | অনিল বিশ্বাস, দীপ্তেন্দ্রলাল রায়, ইন্দ্রজিৎ ... | ৩৭৬ |
| পূজাপার্ব্বণ : | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... | ৩৮৩ |
| নূতন বই : | নারায়ণ চৌধুরী ... | |



## সর্ব্বদাই পুরোভাগে—

অগ্রগতির পথে হ্যানিম্যান্ হোমিওপ্যাথিক ষ্টোরস্ সর্ব্বদাই পুরোভাগে অবস্থান করিতেছে এবং ইহা অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানানুমোদিত নিয়মাদি সংরক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধভাবে ঔষধ প্রস্তুত করাই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য। নূতন ও পুরাতন ব্যাধি অতি যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া নিরাময় করা হয় এবং হোমিওপ্যাথিক পুস্তক, শিশি, কর্ক যাবতীয় সরঞ্জামও এইখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। অনুগ্রহপূর্ব্বক সততা পরীক্ষা করুন।

হ্যানিম্যান্ হোমিওপ্যাথিক ষ্টোরস্,
২৭।৬, মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৯

## ক্রমোন্নতির পথে

গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় জীবন-বীমার অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানের এই ক্রমোন্নতি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে পূর্ব্বের মতই ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা—৮১,০২,৩৬,১৬৪৲
বীমা তহবিল— ১৭,৬৬,১৯,৬২৮৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ—৮৩,৫৭,৯৭৮৲
নূতন বীমা
১৬,২৮,৮৫,৮০০৲

## হিন্দুস্থান কো-ওপারেটিভ
### ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।

## মার্গোসোপ




নিমের সুগন্ধি টয়লেট সাবান। দেহের মালিন্য মুক্ত করে; বর্ণ উজ্জ্বল করে।

★




## ভৃঙ্গল...

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ ও কুঞ্চিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

★




## লাবণি স্নো ও ক্রীম

মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য্য।



"...'অপ্রেম ও প্রেম' নতুন করে এ-কথাই প্রমাণ করল যে বাংলা লিরিকের কারুশিল্পে যাঁরা এখন অগ্রণী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁদেরই অন্যতম।"

—বুদ্ধদেব বসু




দাম—এক টাকা

প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড



সুন্দর কেশই আপনার মস্তকের শোভা

বিশ্বাস্থারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশের অকাল পতন দূর করে; কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। সুস্নিগ্ধ এবং গন্ধ সম্পদে অনুপম।




'দাভানা'র বই

প্রকাশিত হ'ল

প্রতিভা বসুর নতুন উপন্যাস

# মনের ময়ূর

অন্যান্য লেখিকার মতো প্রতিভা বসু কখনো পুরুষের মতো লিখতে চেষ্টা করেন না, মেয়ের চোখ দিয়েই জগৎটাকে দেখেছেন তিনি। রচনাশিল্পের প্রধান গুণ যে-স্বাচ্ছন্দ্য তা' তাঁর লেখায় পুরোপুরি বর্তমান। সংলাপের ও ঘটনাসংস্থানের স্বাভাবিকতা, আর শিক্ষিত রুচির সঙ্গে হৃদয়গত আবেদনের সার্বজনীনতাও তাঁর 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে অসামান্য পরিণত রূপে সুস্পষ্ট।

মুদ্রণ-পারিপাট্য ও প্রচ্ছদচিত্রের পরিকল্পনায় অভিনব

॥ তিন টাকা ॥

---

বাঙলা সাহিত্যের গর্ব

প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প

সুনির্বাচিত গল্পসমূহের মনোজ্ঞ সংকলন

॥ পাঁচ টাকা ॥




৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

# প্রবন্ধসংগ্রহ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক নির্বাচিত

পঞ্চাশটি প্রবন্ধ

প্রথম খণ্ড ॥ সাহিত্য। ভাষার কথা

দ্বিতীয় খণ্ড ॥ ভারতবর্ষ। সমাজ। বিচিত্র

॥ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে ॥

মূল্য ছয় টাকা




বিশ্বভারতী



# নিশ্চিত নির্ভর -----

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

## ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই
বার্লির
ওপরেই
আমি
নির্ভর
করতে
পারি...




কেননা আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি সব
সময়েই ভালো, কারণ এই বার্লি স্বাস্থ্য-সম্মত
উপায়ে টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্য থেকে
অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি।
'পিউরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে
দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতা।

## পিউরিটি বার্লি

APBX 10-BEN

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

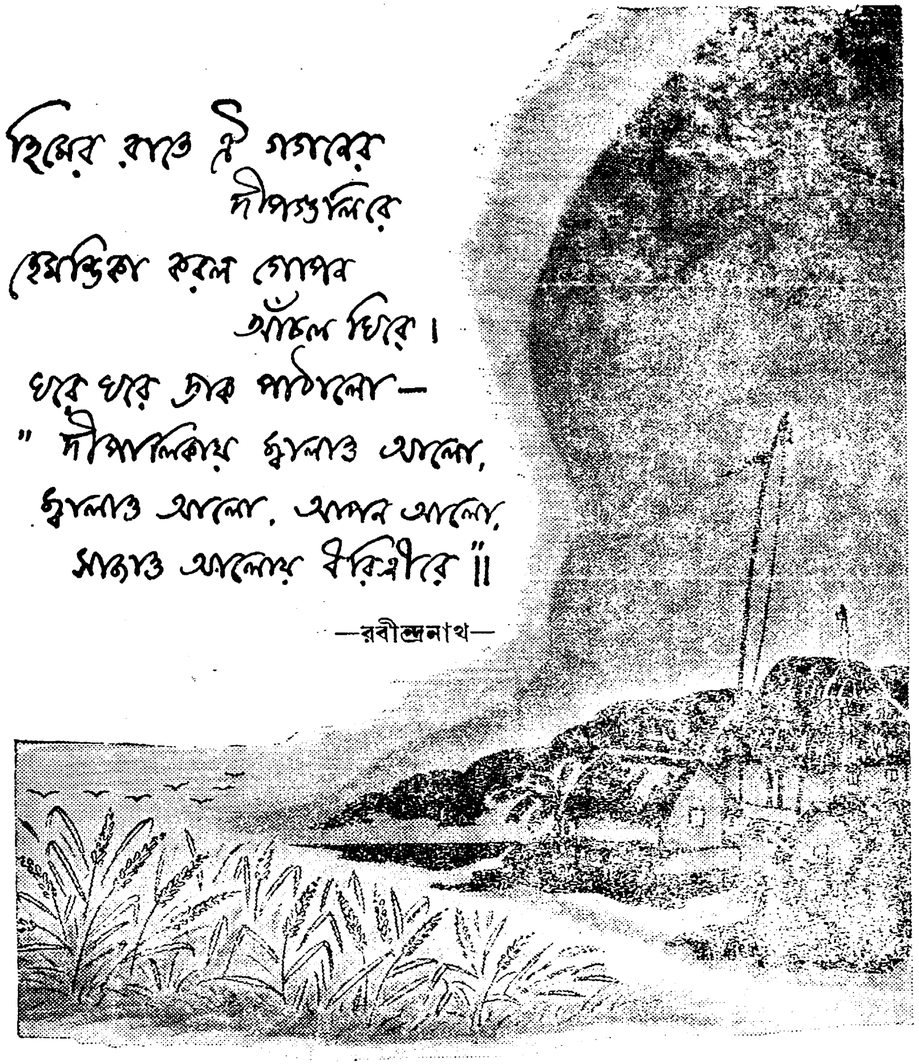


ঋতুচক্রের বিচিত্র উৎসব-মুহূর্তগুলিকে
রঙে রসে মধুর করে তোলে

# চা

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত। CTB-6



**পূর্ব্বাশা**

**পঞ্চদশ বর্ষ**
**কার্ত্তিক—১৩৫৯**


## বিশ্বে মানব

[ শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবন' ( প্রথম খণ্ড ) গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায় অবলম্বনে ]


**শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু**


**নিজ পথের পরিচালক হইতে নিজেকে পৃথক্ মনে করিয়া পরিব্রাজক মানবাত্মা যাবতীয় জীবনধারার এবং চেতনার যাবতীয় ভূমির সমষ্টি এই বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে। অবশেষে তিনি যখন তাহাকে গ্রহণ করেন তখন সে অমৃতত্ব লাভ করে। ( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ১।৬ )**

বহু বিচিত্র এই যে জগৎ আমরা দেখিতে পাইতেছি এবং যে সমস্ত জগৎ আজও আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই ইহাদিগকে উপায় ও উপাদান, নিমিত্ত ও পরিবেশরূপে গ্রহণ করিয়া বিশ্বাতীত এক পরম সত্য বা সত্তা ক্রমশঃ স্পষ্টতররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—ইহাই বিশ্বের তাৎপর্য্য মনে হয়। কারণ বিশ্বসৃষ্টির অর্থ ও উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে, ইহা একটা আকস্মিক ঘটনা অথবা লক্ষ্যশূন্য মিথ্যা বোধ মাত্র নহে। যে যুক্তিতে আমরা মনে করি যে, জগৎ সত্তা একটা চতুর মনের প্রবঞ্চনা মাত্র নহে, সেই যুক্তিতেই আমাদিগকে স্বীকার করায় যে একটা অজ্ঞান শক্তি দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য বিভিন্ন বস্তু বা সত্তা নানারূপ সংঘাত ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়া অন্ধ অসহায় ও লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে চলিতে কোনরূপে একত্র হইয়া এই বিশ্বরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে ইহা সত্য নহে। বরং ইহা সত্য বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত যে আপনাকে আপনি পূর্ণরূপে জানেন, সুতরাং নিজেই নিজের প্রভু, এমন এক সত্তা জগতের মধ্যে আবিষ্ট ও অন্তর্গূঢ়ভাবে থাকিয়া নিজেকে নানারূপে রূপায়িত করিতেছেন এবং ব্যক্তিরূপে ফুটিয়া উঠিতেছেন।

জ্যোতির্ম্ময় এই প্রকাশের সূচনাকে আমাদের আর্য্য পিতৃপুরুষেরা উষারূপে পূজা করিয়াছেন, ইহার পূর্ণতাকে তাহারা সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরম পদরূপে তাহাদের মানস স্বর্গের বিশুদ্ধ আকাশে বিস্তৃত প্রজ্ঞা চক্ষুরূপে দেখিয়াছিলেন। ( তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ )। নিত্য বর্ত্তমান ইনি বিশ্বের সকল বোধ, সকল চেতনাকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সকল বস্তুকে পরিচালিত করিতেছেন, সাক্ষীরূপে থাকিয়া মানুষকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন, তাই ত মানুষ প্রকৃতির সাধারণ প্রগতির স্রোতে প্রথমে না জানিয়াও তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় এবং ক্রমবর্দ্ধমান আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রসারতা লাভ করিতে থাকে—অবশেষে সজ্ঞানে সেই পরমপদ লাভের জন্য ছুটিয়া চলে।

দিব্য জীবনের দিকে তাহার ঊর্ধ্ব গতিই মানুষের বিজয়যাত্রা, তাহার পরমব্রত, তাহার ভগবদ্ বাহিত যজ্ঞ। এই জগতে ইহাই তাহার প্রকৃত কার্য্য, ইহার জন্যই তাহার জীবন ধারণ। ইহা না হইলে মানুষ ত বিশাল বিশ্বের মধ্যে একটুখানি কর্দ্দম ও জলের রেখা মাত্র। অতি ক্ষণস্থায়ী যে সমস্ত কীট ইহার বক্ষে বিচরণ করে মানুষ ত তাহারই একজন।

ব্যবহারিক জগতের সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের মধ্য দিয়া সকল পদার্থের সত্যস্বরূপ যিনি ফুটিয়া উঠিবেন বলা হইয়াছে, তিনি সর্ব্বত্র সকল পদার্থে সকল কালে ও কালাতীতভাবে এক অখণ্ড পরমানন্দময় চিন্ময় সত্তা, বিশ্বের অন্তরালে তিনি চিরজাগ্রত রহিয়াছেন। বিশ্বের প্রবলতম স্পন্দ বা বিপুলতম ক্রিয়ার মধ্যেও তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে না, অথবা এ সমস্ত দ্বারা কোনরূপে সীমিত হন না। কারণ তিনি স্বয়ম্ভূ, কোন প্রকাশের উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় না, বিশ্বের সমস্ত তাহারই প্রতিরূপ বা প্রতীক হইলেও ইহারা তাহাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে না, বিশ্বের সমস্তই তাহাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহাকে প্রকট করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই। রূপের মধ্যে থাকিয়া তিনি নিজেই নিজের কাছে প্রকট হন। রূপের মধ্যে সংবৃত বা গুপ্ত যে চিৎ সত্তা রহিয়াছেন তিনি ক্রমপরিণতির পর্ব্বে পর্ব্বে বোধিদ্বারা আত্মদর্শন ও আত্মানুভব করিতে থাকেন। তাঁহার আত্মজ্ঞান হইতেই তিনি জগতে সম্ভূত হন এবং সম্ভূতি দ্বারা তাঁহার আত্মোপলব্ধি ঘটে। এইভাবে ভিতরে আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকিয়া তিনি তাঁহার নানারূপ ও ভাবের মধ্যে সচ্চিদানন্দের চিদানন্দ ধারা ঢালিয়া দেন। দেহ-প্রাণ-মনের অতীত ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দ নিত্য শাশ্বতরূপে বর্ত্তমান আছেন। দেহ, প্রাণ ও মনের মধ্যে এই আনন্দ, এই সত্তা, এই জ্ঞানকে মূর্ত্ত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে জীবজগৎ সৃষ্ট হইয়াছে—ইহাই তাহার উপযোগিতা।

যিনি অজ্ঞেয় তিনি নিজেকে সচ্চিদানন্দ রূপে জানিতেছেন ইহাই বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত। সত্য সকল ইহারই অন্তর্গত বা ইহাকেই আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। ইহা নয়, তাহা নয় বলিয়া আমরা যখন সমস্ত আকার ও আবরণকে নিরাকৃত করি অথবা তিনি ইহা এবং তিনি তাহা এই বলিয়া সমস্ত নাম ও রূপের অন্তরে অধিষ্ঠিত নিত্য সত্যে যখন আমরা পৌঁছি তখন আমাদের চরম অনুভবে জাগিয়া থাকে ঐ একটিমাত্র সত্যদর্শন ও অভিজ্ঞতা, জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুমি বা তাহাকে অতিক্রম করিয়া পাই আত্মার শুদ্ধ নির্ব্বিচন স্বাতন্ত্র্য অথবা শক্তি, আনন্দ বা পূর্ণতা যাহাই আমাদের পুরুষার্থ হউক না কেন অবিজ্ঞেয় সর্ব্বগত সচ্চিদানন্দই সেই পরম রহস্য। জ্ঞানে অথবা ভাবে, ইন্দ্রিয় সংবেদনে অথবা কর্ম্মে তাহারই মহা আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া মানব-চৈতন্য যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহাকেই খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

ব্যক্তি এবং বিশ্বের আকারে যে অবিজ্ঞেয় তত্ত্ব নামিয়া আসিয়াছেন তাহাতে পৌঁছিতে হইলে এই দুই-এর ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে। পরমসত্যের এই অবতরণের প্রকৃতি আত্মগোপন; তিনি ধাপে ধাপে নামিয়া আসিয়াছেন, আবরণের পর আবরণ দিয়া নিজেকে গোপন করিয়া। তাই উন্নয়নের পথে মানুষকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে হইবে—অবতরণের প্রত্যেক ধাপ উত্তরায়ণের পথের একটি ক্ষেত্র বা ভূমি হইবে। ভগবদন্বেষী প্রেমিক সাধকের কাছে যে আবরণে তিনি নিজেকে আবৃত করিয়াছেন সেই আবরণই আবার হইবে আবরণ উন্মোচনের উপায়। ছন্দোময়ী জড়প্রকৃতি



যেন নিদ্রিত, তাহার আত্মজ্ঞান নাই—যে ভাবের প্রভাবে তাহার বোধহীন এই জড় সমাধির মধ্যেও তাহার অব্যাহত ক্রিয়ার ছন্দ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাকে সে চিনে না। কিন্তু সেই নিদ্রার মধ্য দিয়াই গতিশীল চঞ্চল নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাণ-প্রবণ প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং আত্ম-সংবিতের (Self Consciousness) প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে তাহার রূপায়নের পরিণতি। প্রাণ হইতে মন তাহার তপস্যার বলে জাগিয়া উঠিয়া নিজের এবং জগতের সম্বন্ধে সচেতন হইয়াছে, আর এই জাগরণের বিশ্ব তাহার পরম উদ্দেশ্য সাধনের উপায় লাভ করিয়াছে, সে আত্ম-সংবিৎসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব লাভ করিয়াছে। মন এ প্রবাহকে আরও অগ্রসর করিয়া দিবে, কিন্তু তাহাকে পূর্ণতা দিবার শক্তি তাহার নাই। মনের তীক্ষ্ণ কিন্তু সীমাবদ্ধ ধীশক্তি আছে, সে দিনমজুরের কাজ করে, প্রাণ যে সমস্ত এলোমেলো উপকরণ আনিয়া উপস্থিত করে মন নিজ শক্তি অনুসারে তাহাদের উন্নতিবিধান করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া আমাদের দিব্য-মানব-জীবন যিনি গড়িয়া তুলিতেছেন সেই পরম শিল্পীর হস্তে সমর্পণ করে। অতিমানসে বাস করেন যে শিল্পী—এই অতিমানসের অবতরণেই মানুষ হইবে অতিমানব (Superman)। সুতরাং জগৎকে মনের ভূমি পার হইয়া আরও উপরে উঠিয়া এমন এক উচ্চতর ও মহত্তর শক্তিশালী স্তরে পৌঁছিতে হইবে যেখানে গেলে জীব ও জগৎ বুঝিতে পারিবে তাহাদের উভয়ের স্বরূপ এবং এক দিব্য অনুভূতিতে পরস্পরের আত্মপরিচয় লাভ করিয়া পরম সমন্বয়ের মধ্যে মিলিত হইয়া একত্ব লাভ করিবে।

জড়প্রকৃতির ছন্দ অপেক্ষা একটি পূর্ণতর ছন্দের গোপনরহস্য আবিষ্কার করিতে পারিলে মন ও প্রাণের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ও বেসুর আছে তাহা দূর করা যাইতে পারে। মন ও প্রাণের নিম্নতর ভূমিতে জড়ের ক্ষেত্রে তাহার অপ্রমেয় শক্তির ক্রিয়া এবং স্থির প্রশান্তির মধ্যে একটা সমতা আছে, কিন্তু যেখানে চৈতন্য অবরুদ্ধ ও নিদ্রাচ্ছন্ন, যে নিজ-শক্তি দ্বারা সে পরিচালিত হয় সেই শক্তির বাধা পর্য্যন্ত যেখানে জাগে নাই, সেই জড় এই যে সমস্ত সমতা ও সমন্বয় রহিয়াছে তাহা সচেতনভাবে অনুভব করিবার আনন্দ হইতে বঞ্চিত।

জড়প্রকৃতির যে বোধ ছিল না সেই বোধ মন ও প্রাণের মধ্যে জাগিয়াছে—ভ্রান্তজ্ঞান বিজড়িত অভাবের তাড়না এবং বিক্ষোভিত ও অকৃতার্থ বাসনারূপে। আত্মজ্ঞান লাভের বা নিজের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে এ সমস্ত তাহার প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এ পূর্ণতা পাইতে হইবে মন ও প্রাণের নিজদিগকে অতিক্রম করিয়া এক উপরের ক্ষেত্রে পৌঁছিয়া। মন ও প্রাণের পরপারে গিয়া আমরা আবার সেই দিব্য সত্যের সন্ধান পাই যাহার আভাস মাত্র জড়ের অঙ্গ সমন্বয়ে ফুটিয়াছে। কিন্তু এবার যে দিব্য প্রশান্তির দেখা পাই তাহা জড়ত্ব বা মূর্চ্ছিত চেতনার অসাড়তা নহে। সেখানে পূর্ণশক্তি ও আত্মজ্ঞান ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে; অমেয় ক্রিয়াশক্তির মাঝে আছে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিপুল ছন্দ, কারণ এখানে প্রত্যেক ক্রিয়া পরমশান্তি ও স্বাধীনতা হইতে জাত, অভাব বা অজ্ঞান হইতে নহে। এখানে আসিলে অবিদ্যা সেই আলোকের পরিচয় লাভ করে যাহার অপূর্ণ প্রতিবিম্ব হইতে সে জন্মিয়াছে; অপ্রবুদ্ধ জড়ের মধ্যেও আমাদের বাসনাসকল অজ্ঞানে ও অস্পষ্টভাবে যাঁহাকে খুঁজিতেছিল সেই সুবিশাল পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া তাহারা সানন্দে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

উত্তরণের পথে ব্যষ্টি ও বিশ্ব উভয়কে উভয়ের প্রয়োজন, বস্তুতঃ তাহারা একে অপরকে সাহায্য

করে এবং একের অন্যকে না হইলে চলে না। বিশ্ব সর্ব্বস্বরূপ ঈশ্বরেরই আত্মপ্রসারণ বা আত্মবিকীরণ—অনন্ত দেশে ও কালে। ব্যষ্টি জীব তাঁহারই কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত প্রকাশ ক্ষেত্র—দেশ ও কালের সীমার মধ্যে। বিশ্ব দিব্য পূর্ণতাকে চায় অনন্ত প্রসারণের মধ্যে, কিন্তু সে উপলব্ধি পূর্ণভাবে সে লাভ করিতে পারে না, কারণ সম্প্রসারণে সত্তার গতি হয় বহুত্ব প্রকাশের দিকে—সে বহুকে যোগ করিয়াও আদি বা চরম একত্ব লাভ হয় না, পৌনঃপুনিক দশমিকের মত সে বহুত্বের আদি ও অন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই বিশ্ব স্বীয় অভীপ্সার প্রকাশ ক্ষেত্ররূপে নিজের মধ্যে সেই সর্ব্বস্বরূপের একটি কেন্দ্রীভূত ঘনবিন্দুরূপে আত্মসচেতন ব্যষ্টিকে গড়িয়া তোলে। এই আত্মসচেতন জীবের মধ্য দিয়া প্রকৃতি পুরুষকে অনুভব করিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়ায়; জগৎ খোঁজে আত্মাকে। পুরুষ প্রকৃতিতে পূর্ণরূপে পরিণত হন, পরে প্রকৃতি আবার ক্রমশঃ পুরুষে পরিবর্ত্তিত হইতে চান, ইহাই জীবসৃষ্টির তাৎপর্য্য।

পক্ষান্তরে বিশ্বকে ধরিয়াই ব্যষ্টি জীব তাহার আত্মোপলব্ধির পথে চলিতে পারে। বিশ্ব যে কেবল তাহার দিব্য কর্ম্মের ভিত্তি, ক্ষেত্র, উপায় ও উপাদান তাহা নহে; কিন্তু যেহেতু বিশ্বপ্রাণ সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত বা ঘনীভূত হইয়া ব্যষ্টি জীবনে পরিণত হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার বন্ধন ও সকল বিশেষণের কল্পনামুক্ত ব্রহ্মের গভীর একত্ব ব্যক্তিতে নাই সেইজন্য দিব্যপুরুষের বিশ্বভাব তাহার আত্মস্বরূপ হইলেও তাহার প্রকাশ-ক্ষেত্র হইবার জন্য তাহাকেও বিশ্বভূত ও নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইবে। তথাপি বিশ্বচেতনায় অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে মূর্ত্ত প্রসারিত করিয়া দিয়াও তাহার ব্যক্তিত্ব যে পরম রহস্যপূর্ণ বিশ্বাতীত একটা ভাব বা বৈশিষ্ট্যকে অজ্ঞান এবং অহং বোধের আশ্রয়েই রূপ দিতে চায় তাহা রক্ষা করিতে হইবে। তাহা না হইলে সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে, যে সমস্যা তাহাকে সমাধান করিতে দেওয়া হইয়াছিল তাহা অমীমাংসিত থাকিয়া যাইবে। যে উদ্দেশ্যে সে জীবজন্ম স্বীকার করিয়াছিল সেই দিব্যকর্ম্ম করা হইবে না।

বিশ্ব ব্যষ্টির কাছে আসিয়াছে গতি ও শক্তিময় প্রাণরূপে। এই প্রাণশক্তির অন্তরালে নিহিত রহস্য মানুষকে আয়ত্ত করিতে হইবে। তাহাতে বহুমুখী পরিণামের যে বিপুল সংঘর্ষ, প্রচ্ছন্ন শক্তির যে দারুণ ঘূর্ণাবর্ত্ত রহিয়াছে তাহার মধ্য হইতে তাহাকে পরম শৃঙ্খলার একটা ছন্দ, অনাগত সমন্বয়ের একটা সুর আবিষ্কার করিতে হইবে। ইহাই মানুষের প্রগতির খাঁটি তাৎপর্য্য। জড়প্রকৃতি যাহা লাভ করিয়াছে এ জিনিস একটু ভিন্ন ভাষায় তাহারই পুনরাবৃত্তি নয়। অথবা মননের উচ্চ পর্দ্দায় পশুবৃত্তিরই সুর সাধা মানবজীবনের আদর্শ হইতে পারে না। যদি তাহা হইত তবে জীবনে মোটামুটিভাবে কতকটা সুখস্বাচ্ছন্দ্য, কতকটা মানসিক তৃপ্তির উপাদান পাইলে মানুষের অগ্রগতি বন্ধ হইয়া যাইত। আংশিকভাবে প্রয়োজন মিটিলে পশু তৃপ্ত হয়, অতুল ঐশ্বর্য্য দেবতাদের তৃপ্তি দেয়। কিন্তু পরম শিবকে লাভ করিতে না পারিলে মানুষ কখন স্থায়ীভাবে বিশ্রাম নিতে পারে না। সমস্ত জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, কেননা সেই সবার চেয়ে বেশী অতৃপ্ত, সীমার মধ্যে থাকিবার পীড়া সর্ব্বাপেক্ষা তাহার বেশী। দূরস্থিত অনাগত আদর্শের দিব্যোন্মাদ একমাত্র তাহাকেই স্পর্শ করিতে পারে।

চিন্ময় প্রাণের দিব্য সম্ভবনাসমূহ মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে নিহিত রহিয়াছে। একমাত্র মানুষের সেই পরম সামর্থ্য আছে যদ্দ্বারা ভগবানকে সে তাহার মধ্যে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে পারে, প্রাচীন ঋষিরা মানুষকে মনু, ( মনন যাহার স্বভাব ) মনোময় ব্যক্তি বা আত্মা প্রভৃতি আখ্যা দিয়াছেন। প্রাণী-



তত্ত্ববিদেরা যাহাদিগকে স্তন্যপায়ী জন্তু বলেন মানুষ তাহাদের উন্নত সংস্করণ মাত্র নয়—পরন্তু সে পশুদেহকে আশ্রয় করিয়া মননধর্ম্মী আত্মা। রূপকে, দেহকে সে স্বীকার করিয়াছে তাহার বাহন রূপে, তাহার সাহায্যে সে প্রাকৃত উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করিতে পারিবে বলিয়া। জড়প্রকৃতি হইতে বিকশিত যে পাশব প্রাণ তাহার মধ্যে জাগিয়াছে তাহা মানুষের সত্তার নিম্নতর ভাগ মাত্র। ভাবনা, সংবেদন, সংকল্প ও সচেতন কর্ম্মপ্রবৃত্তির মধ্য দিয়া তাহার যে জীবন প্রকাশিত হইতেছে যাহার সবটাকে আমরা মন বলি, যাহা জড় ও প্রাণকে পরিচালিত করিয়া তাহাদিগকে তাহার নিজের ভাবে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেছে, ইহাই তাহার সত্তার মধ্যভাগ। এখানে তাহার বর্ত্তমান কার্য্যক্ষেত্র। কিন্তু ঠিক তেমনই তাহার সত্তার একটি চরম অবস্থা আছে, যাহা তাহার আজিও অধিগত হয় নাই কিন্তু তাহা তাহার দিব্য-জীবনের ভিত্তি, ইহাকেই সে প্রতিনিয়ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, ইহার শক্তি সে তাহার দেহ-মন-প্রাণের মধ্যে সঞ্চারিত করিবে বলিয়া। তাহার বর্ত্তমান জীবন অপেক্ষা মূলতঃ উচ্চতর এইরূপ কিছুকে কার্য্যতঃ স্বীকার করাই তাহার মানসীয় সত্তায় দিব্য-জীবন স্থাপনের ভিত্তি।

আত্মস্বরূপের সম্বন্ধে মানুষের মনের প্রাথমিক যে সংস্কার আছে তদপেক্ষা গভীরতর ভাবে অনুভব করিবার শক্তি যখন মানুষের মধ্যে জাগে তখন যাহা তাহার অভীপ্সার বস্তু তাহাতে পৌঁছিবার কোন একটা সূত্র, তাহার কোন রূপের স্পষ্ট অনুভব সে চায়। তখন তাহার সাধারণ অবস্থার সীমা ছাড়াইয়া সে এক আত্ম সচেতন অনন্ত সত্তার অনুভব বা স্পর্শ লাভ করে। সেই স্পর্শ, সেই অভিজ্ঞতাকে সে তাহার মনের অনুকূলভাবে অনুবাদ করিয়া তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, অমৃতস্বরূপ, স্বাধীনতা, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের আধার ভগবান বলিয়া মনে করে। কিন্তু দুইদিকে দুই অন্ধকার রাত্রির মধ্যেই যেন তাহার দৃষ্টির এ দীপ্তি প্রকাশ পায়। এক অন্ধকার নীচের দিকে এবং আর এক গাঢ়তর অন্ধকার তাহার অনুভবের পরপারে। কারণ, যখন মানুষ ইঁহাকে পূর্ণভাবে আনিবার অভীপ্সায় আকুল হয় তখন সে দেখিতে পায়, অনুভবের যে সমস্ত সংজ্ঞা বা উপায় আছে তাহার কোনটির মধ্যে এমন কি সমস্ত সংজ্ঞার একত্র সমাহারেও তাহাকে ধরা যায় না। তখন অবশেষে তাহার মন নিজ ধারণা-লব্ধ ঈশ্বরকেও প্রত্যাখ্যান বা অতিক্রম করিয়া এক মহাশূন্যে নিজেকে মিলাইতে চায়। আবার জগতের দিকে, নিজের ভিতর ও বাহিরের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত সব তাহার চেতনায় প্রকাশ পাইতেছে। মৃত্যু এখানে তাহার চিরসাথী, তাহার সত্তা ও তাহার অনুভূতি সঙ্কোচ ও সীমার মধ্যে যেন আড়ষ্ট। ভ্রান্তি, নিশ্চেতনতা, দুর্ব্বলতা, জড়ত্ব, দুঃখ, শোক প্রভৃতি সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা ও সাধনার প্রবল অন্তরায়। এখানেও অবশেষে সে ভগবানকে অস্বীকার করিয়া বসে। এই তাহার নীচের দিকের রাত্রি। কিন্তু এই অস্বীকৃতি দুরস্থিত অপর নাস্তিবাদের মত স্বভাবতঃ অনির্ব্বচনীয় রহস্যপূর্ণ এবং বুদ্ধির অগোচর নয়। মনে হয় যেন ইহা তাহার জ্ঞাত এবং সুস্পষ্ট অথবা জ্ঞানগম্য, অথচ গভীরভাবে বুঝিতে গেলে দেখা যায় যে, ইহাও রহস্যপূর্ণ। ইহারা কি, কেন আছে, কোথা হইতে আসিল তাহা সে জানে না। যেভাবে এ সমস্ত তাহার বোধে ভাসে তাহা দেখিতে পাইলেও তাহাদের মূলস্বরূপ তাহার বুদ্ধির অগোচর।

হয়ত ইহাদিগকে বুঝা যায় না, মূলতঃ ইহারা অজ্ঞেয়। অথবা তত্ত্বতঃ কোন সত্তা তাহাদের নাই, ইহারা শুধু ভ্রান্তি, শুধু অসৎ। উচ্চতর নাস্তিবাদ আমাদের নিকট যেমন মূলতঃ অসৎ বা শূন্য মনে হইতে

পারে। এই নিম্নতর নাস্তিবাদ তেমনি মূলতঃ অসৎ বা শূন্য বলিয়া বোধ হইতে পারে। উচ্চতর নাস্তিবাদ সমস্যার মীমাংসা না করিয়া পাশ কাটাইয়া যে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছে আমরা যেমন তাহাতে সম্মত হই নাই সেইরূপ এই নিম্নতর নাস্তিবাদের সিদ্ধান্তও আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নই। জাগতিক সত্যকে পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলে অথবা কেবলমাত্র শূন্য বলিয়া ইহাকে পরিহার করিয়া চলিলে আমাদিগকে সমস্যার সম্মুখীন না হওয়া বা জীবনের কর্ম্মকে পরিত্যাগ করা মাত্রই হইবে। এই যে সমস্ত পদার্থ যেন ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছে বা সচ্চিদানন্দের বিরোধী বা বিপরীত কিছু বোধ হইতেছে, ক্ষণস্থায়ী হইলেও জীবনের পক্ষে যে তাহারা সত্য ইহা ত অস্বীকার করা যায় না; ইহা এবং ইহার বিপরীত যে সমস্ত বিষয় যথা শ্রেয়, জ্ঞান, আনন্দ, সুখ, শক্তি, ঋদ্ধি প্রভৃতিকে উপাদান রূপে গ্রহণ করিয়াই ত প্রাণের লীলা ও খেলা চলিতেছে।

হয়ত এসমস্ত বিরোধী প্রত্যয় একান্ত মিথ্যার, মায়ার ফল বা সহচর না হইয়া বরং একটা ভ্রান্ত সম্বন্ধ-বোধ হইতে আসিয়াছে। ভ্রান্ত বলিতেছি এই জন্য যে, বিশ্বের মধ্যে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল ধারণা আমাদের রহিয়াছে এবং সেই ভ্রান্তি ঈশ্বর এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গীকেও বিকৃত করিয়াছে। যে জগতে মানুষ বাস করে, মানুষকে যাহা হইয়া উঠিতে হইবে, তাহাদের স্বরূপের সহিত, সে এখন যাহা হইয়াছে, তাহার সামঞ্জস্য নাই, তাই বিশ্বের গোপন মূল সত্যের বিরোধী এই সমস্ত ভাবের সে অধীন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে এ সমস্ত তাহার পতনের জন্য দণ্ড নয়, কিন্তু উন্নতি পথের বিধান ও উপায়। এই সমস্ত উপাদান লইয়াই সাধনা আরম্ভ করিয়া তাহাকে পূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। যে রাজমুকুট লাভ করিবার সে আশা করে—এই সাধনাই তাহার মূল্য। এই সাধনার সঙ্কীর্ণ রন্ধ্রপথে চলিয়া প্রকৃতি জড় হইতে মুক্তি পাইবে, চৈতন্যে গিয়া পৌঁছিবে। এ সমস্ত একাধারে তাহার মূলধন এবং মুক্তির পথ।

কারণ এই সমস্ত ভ্রান্ত এবং বিকৃত সম্বন্ধের মধ্য হইতে, ইহাদের সাহায্যেই সত্যে পৌঁছিতে হইবে। অবিদ্যার দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইবে—"অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা"। বেদ তাই নিগূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় এই সমস্ত শক্তিকে তুলনা করিয়াছে, দুষ্টা নারীর সঙ্গে যাহারা দুষ্প্রবৃত্তির বশে বিপথে চলে, আপন পতির অহিতসাধন করে কিন্তু তবুও নিজেরা অসত্য এবং অসুখী হইয়াও শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ যাহার স্বরূপ সেই 'বৃহৎ সত্য'কে গড়িয়া তোলে। তাই প্রকৃতির এই কলুষতা-সমূহকে নৈতিক অস্ত্রোপচার দ্বারা ছাঁটিয়া ফেলিলে অথবা ঘৃণাভরে জীবনকে উপেক্ষা করিয়া দূরে সরিয়া গেলে চলিবে না, পরন্তু মৃত্যুকে পূর্ণ-জীবনে, মানুষের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা ও তুচ্ছতা আছে তাহাদিগকে দিব্য ভূমার বৈভবে, দুঃখ যন্ত্রণাকে পরমানন্দে, সমস্ত কলুষতাকে শিবস্বরূপের সার্থকতায়, সমস্ত ভ্রান্তি এবং মিথ্যাকে তাহাদের অন্তরস্থিত গোপন সত্যে রূপান্তর সাধন করিতে পারিলে মানুষের যজ্ঞ ও তপস্যা পূর্ণ হইবে এবং এই ভাবে যখন পরমপুরুষের দিব্য আনন্দে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য একাকার হইয়া যাইবে, তখন তাহার যাত্রা শেষ হইবে।

তথাপি দুরূহ প্রশ্ন থাকিয়া যায়। এই দারুণ বিরোধী-ভাব কিরূপে পরস্পরের সঙ্গে মিশিবে? মরতার এই লৌহ কোন দিব্য সত্তার স্পর্শমণি যোগে সোনা হইবে? এ সমস্যা মিটিতে পারে



যদি ইহাদের দুই-ই একই সত্যের প্রকাশ বলিয়া জানা বা বুঝা যায়—যদি মূলতঃ ইহারা একই তত্ত্ব হয় তবে এ দিব্য রূপান্তর সাধন সম্ভব।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, বিশ্বের সর্ব্বভাবের অতীত ব্রহ্মের যে অবস্থা যাহাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত এক অস্তিত্ব, আমরা যাহাকে বাক্য ও মন দ্বারা ধরিতে ও প্রকাশ করিতে পারি না এমন এক আনন্দ। অন্ততঃপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনের ইতিহাসে যে সমস্ত সাধনা সত্যের আলোকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্ভাসিত তাহাদের অন্যতম বৌদ্ধধর্ম্মের অসৎ, শূন্যবাদ ও নির্ব্বাণের কথাতে বলা হইয়াছে যে, মানুষ যখন মুক্ত হইয়া সেই অবস্থায় পৌঁছে তখন তাহার অনুভবে এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি, এক পরম আনন্দ ফুটিয়া উঠে। এ অবস্থায় অহমিকা বা তজ্জনিত সমস্ত ধারণা ও বোধ লুপ্ত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সমস্ত দুঃখের ঐকান্তিক এবং আত্যন্তিক প্রলয় ঘটে। সে অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তবু ইহা এক অনির্ব্বচনীয় পরম আনন্দের অবস্থা যাহার মধ্যে আত্মসত্তার সমস্ত অনুভব ডুবিয়া ও বিলুপ্ত হইয়া যায়—ইহা বলিলে, সে অবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটের বর্ণনা তটস্থরূপ দিতে পারি। ইহাও সচ্চিদানন্দ বটে, কিন্তু সৎ, চিৎ ও আনন্দের আমরা যে সর্ব্বোচ্চ ধারণা করিতে পারি সে ধারণাও তাহাতে আরোপ করিতে আমরা সাহস করি না। কারণ মানুষের সকল ধারণার, সকল জ্ঞানবৃত্তির অতীত সে অবস্থা।

পক্ষান্তরে যেহেতু 'সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম'—এ সমস্তই ব্রহ্ম অনেক নিম্নতর ক্ষেত্রের এই নেতিবাদ যাহা সচ্চিদানন্দের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছে না বা যাহা তাহার বিরোধী বলিয়া বোধ হইত তাহাও সচ্চিদানন্দ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। আমাদের বুদ্ধি, অধ্যাত্ম দর্শন এমন কি ইন্দ্রিয়সংবেদনও ইহাকে সচ্চিদানন্দরূপে অনুভব করিতে সমর্থ এবং যদি অজ্ঞান, মায়া অথবা অবিদ্যা দ্বারা ইহারা অভিভূত বা ভ্রান্ত না হইয়া থাকিত ইহাদের সেই অনুভূতিই সর্ব্বদা হইত। এইভাবে দেখিলে বিশ্বসমস্যার একটা সমাধান হয়ত পাওয়া যাইবে যদিও দার্শনিকের তর্কবুদ্ধি হয়ত সে সমাধানে তৃপ্ত হইবে না। কারণ, আমরা অবিজ্ঞেয় রহস্যের প্রান্ত ভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি এবং তথা হইতে বিশ্বাতীত তত্ত্বের দিকে আকুল দৃষ্টিপাত করিতেছি। কিন্তু ইহাতে দিব্যজীবন সাধনার একটা উপযুক্ত ভিত্তিভূমির অনুভব লাভ করিব।

এই সাধনার জন্য, আমাদের মন যেরূপ সকল পদার্থের উপরকার সুস্পষ্ট স্তরে আবদ্ধ থাকিতে অভ্যস্ত তাহাতে চলিবে না, তাহাকে চৈতন্যের পরম গভীরে ডুবিতে ও তথায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে, আজ যাহা তাহার কাছে অস্পষ্ট রহিয়াছে সেই ভূমার সঙ্গে পরিচিত হইতে হইবে এবং সেখানে আপাততঃ যাহা তাহার আপন নয়, সত্তার সেই সমস্ত অবস্থার সহিত একত্ব স্থাপন করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এই পরম অনুসন্ধানের পথে বিশেষ সাহায্য করিতে পারে না। তবুও আমরা ইহার ভিতর হয়ত সেই অজ্ঞেয় তত্ত্বের দু'একটি প্রতীক, দু'একটি রূপ-রেখা, দু'একটি ইঙ্গিতের সাক্ষাৎ পাইব যাহা আত্মার আলোক ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিবে এবং মনের উপর অনির্ব্বচনীয় পরিকল্পনার কিছু আভাস জাগাইবে।

# প্যারী-পয়ার

## ক্লিওপাত্রা

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যায় মন ছায় বিকেল-আকাশ
ক্লান্ত আলোরা পরে রাত-নীল বাস
রত্নিল বাস!
রথ নিয়ে নিখিলের চক্র-কীলক
শিরে মৃগশিরা হীরা তারার তিলক
আমি যম হাতে তাই জমকালো রাশ।
চন্দ্রায় তন্দ্রায় কে করে স্মরণ!
মৃগয়ার ক্ষমতার নেই প্রয়োজন
সেই প্রেম প্রিয়া মন দয়া মমতার
যম তার রীতি-নীতি মানে সমতার
চায় আশ্বিন-যাম কাম-রতি-লাস
তমসার তাম্র বিলাস
আমি চাই স্বীয় মোহে স্বরত্নীয়ম্
চাই যমী ঋত ঋতু-শরৎ-নিয়ম।
আমি অম-কৃষ্ণ পূর্ণিমা-রাস
বাধা মম রশ্মিতে রাধা-লীলা আশ।

"কে তোরা ঘাগরি-পরা বল্
আনবি গাগরি-ভরা জল
কাঁখে ঘড়া-ঘট ঘাটে চল"
'পারস্য-নীপ'তলে নৌ-কাবিলাস।

'কাবাল' ত 'খরবাল'
কাপালিক চর-পাল



'ব্যাঘ্রতটীর' স্বামী 'বলবর্ম্মার'
কলিঙ্গে দূত চেত, কোথা চেরী-রাজ
তার সূত দ্বীপে-দ্বীপে দীপ জ্বালে আজ
'মুন-গল' চেজ্যিজ
চেদী-রাজ চাঁদিশূর
চেরী-চেড়ী বহুদূর
সোম-সুরা-মনসিজ
ফণীমনসা হি সিজ
গরল-সুধার বীজ
বসুধাই বয় তার কুটুম্বভার।

হৈহয় 'পরমর্দ্দিন'-নাগ লোক
'হয়সল' বিক্রম-হর্ষ-অশোক
আমরা ত মার মতো তাম্র সহাস।
'খাতি'-মাতা কালী তারা সরসীতে হাঁস!

দিলীপের দুইলিপি
জললিপি জলপিপি
ফিলিপের ফলিমাছ অলিমপ্যারী
পান-সুপারিতে রাঙা রূপসী পরী
পাপিয়ার মুখে পান, গানে কিন্নরী।
অলকজ অঙ্গীয় আমি টোলমায়ী
দিব্যবরাহী শিব-সেবী ও ব্রাহুই
বলাশ্রী-আশ্রীয় শয্যাতে শুই
কালো-স্বামী কলি-মূর স্বর্ণ-তামার
বালাসোর শূর-বালা বালাচুড়ি শুঁই
গৌতমী 'বলীচূড়' পুত্র কামার :
রণী বিলি-কাটা-চুল কন্যাঙ্কুর
প্রণবিনী প্রণয়িনী ঘটকর্পূর।
উপহাসে বলি : 'ক্লিওপাত্রা আমার!

সন্তান নহপীত-শীল আধো চাঁদ
বিন্দুসরভেদী এই অপরাধ
তুমি হাঁসী, সে-ও হাসী, আমি হাসি তাই।'
ধূম্র রাজন, মেঘবর্ণ, রাহু-ই।
শ্রবণার কাহ্নড় পক্ষ বাহু-ই
'বাজশ্যেন' 'আদি' সেনরাজ সে সাহু-ই।
বলাকাজ সুত জল 'সিরি পুলমায়ী'
'পৈঠাঞ' পৈতায়ী আদি-পীঠে স্থান
সু'বলধবলসুধাধারসন্তান'।
'আমি দ্বিজ মনসিজ পদ্মপাতার
বিন্দু মুক্তা পীর 'গুরুফার'
পার্থিয়া পার্থের ভারত-মাতার
তাতার সাঁতারে ক্লিওপাত্রা-ত্রাতার
কোলাপুরে কোলাহল ভগ্নীভ্রাতার
কুশীলবে লাগে গোল গোলক ধাঁধাঁর
সাতারায় স্মৃতি থাকে সত্য নাদার
মাহিষ্মতীতে তাই হই শূল-শায়ী।
আঁখি পরশয়ে শ্রুতি আমি পরাশর
কালীর কাজল মেখে স্বামী সরাসর
জলপ্রভাদ্যুতি সেই পুরা-কন্যার।
খলস্বভাবার দূতী, সুরা-বন্যার
অভিশাপ কামাখ্যা— দামী ভুল তা-ই!

কর্ণ কি ভুলবে সে ভুল?
বিপিতার তর্পণে বিপ্র সে বপ্র-ক্রীড়ক
প্রাবৃট রাঢ়বৃঢ়ক।
গঙ্গায় ভালোবেসে দেবে জবাফুল
রাঢ়বৃঢ়বঁধু নিয়ে ফোটাবে শিউল
কর্ণ সুবর্ণে গড়ে কালিঘাট
আবলুসে আব্রু দেবে কালীকাঠ।



করবে যে 'কুঞ্জরঘটবর্ষণ'
গড়বে সে 'কুঞ্জরঘটবর সন।'
মোহেঞ্জোদরো ঘটে দেবে দর্শন।
কর্ণ-সুবর্ণ ভুলবে সে ভুল?
শুধু বেলা-মল্লিকা করবে বেভুল।
কোন্ সৌরভে রবে ডাকবে শিমূল
শতসাতকর্ণীরে? পদ্ম-পলাস
একই কুসুম, সাত-দশ দাশ-দাস
এক দাম, জল-দর একই দামার!
জানো, ক্লিওপাত্রা আমার?'

রাণী পল্লভা শীলা
কৌশল্যাই ছিলা
আঁখি-পল্লবা নীলা
কুশীলবে গীতিলীলা 'চন্দ্রিকা'-মার।
'বলাগৌতমী' তুমি বরণ তামার
সিংহ-শরীরী মেয়ে
শক 'নহপান' নেয়ে
এনে দ্যায় শক্তিরে রণদামামার।
কোথা বল্লভা ক্লিওপাত্রা আমার!
কোথা প্যারীকলসিনী কম্বু, ধামার!
শুধু পারী-বুলেভারে পরীর সামার!
প্রিয়া বিষ-পিয়াসিনী রতি ত্রিযামার
কলস-কাঁখিণী রাধা যমুনা-শ্যামার
( হলাহল কাঞ্চিণী হল্কা রাকা
পূর্ণিমা শঙ্খিনী কল্কা-শাঁখা
শঙ্খিনী সাপ চাঁদে বল্গা-আঁকা )
নৌবন্ধনে হিমালয় ফুল-কাশ
'যেমন্নু গোতম' আর যে মনু সে মার
রাত্রির বেশে এলো মৃত্যু-কামার

যাত্রী হারিয়ে গেলো, খালি দোল-রাস!
কোথা ক্লিওপাত্রা ভ্রমরী আমার!

দামিল সাগর নীলে চমরী-কুমার
আনে চুমলহরির লহরী চুমার।
বিনম্রা নর্ম্মদা, করভ তোমার
খোঁজে করভোরু কলা-পত্র সোমার
পান-নারকেল ক্লোম-পত্রা প্রোমার।
কোথা ক্লিওপাত্রা টোলেমি-প্রোমার!
মনে পড়ে মধুকরী মদন-শয়ন
মদির নয়ন 'মদ-তরণী-অয়ন'?
টলটল নীল জলে তরুণী রোমার!
বলো বলো ধূমাবতী ধূপের ধোঁয়ার
গন্ধে কি গিরিশ্রী ফিরাল তোমায়?
গোমতী কি ফিরে পেল সরণি গো-মার
মানসের সর-নীরে তরুণী উমায়!
আমি আশা করে থাকি অশ্বিকুমার।

দ্যূতপণী কন্যারা পান খায়
বনিকা গণিকা-গুণ-গান গায়
পথিক-বনিতা বাগে প্রাণ চায়
'যশমোতিকা'রা শক-মান পায়
শগ্দনীয়ায় যশ-মান পায়
মগধের রাধা সম্মান পায়
দ্রৌপদী পাশাবতী, পাশা নাগ-পাশ।

কোমল সরসী নীর
নারায়ণ ঐন্দ্রিল সচীসহবাস
কমল ষোড়শী নীড়
নাল-দেহ ইন্দ্রের আবাস,



দুষ্মন্ত বক্তা : "দময়ন তীর।"
'কুশলক'-কালাশোক লাদকে মদির।
মন্দির 'সর্ণথ'-স্বর্ণ সুষির
'দ্বিব্যালকে'র ধাম অলকার ভীড়!

দিয়াসিনী প্রিয়া মোর সমরী ময়ুর,
ময়রাণী মূঢ়া পাবে ব্রীড়াবঁধু-উর!
কয় রাণী 'অগ্রম্মেষ' পেয়ে উঢ়?
অগ্রমহিষী আনে অগ্রেতে মেষ
'মেষতিমিসা'র রাজা তাই তো মহেশ
তমো-ই প্রথমা প্রিয়া অগ্রান্-মাস।
গোপাল তাথৈ নাচে কালীয় সুদাস
উত্তরাগত অভিমন্যু-বিনাশ।
গোপিনীরা গায় 'ত্রয়অজদৈ' সুর
মাদল বাজায় মদনিকা-মৈশুঁড়!

বসন্তে অজ-দুধ হতে চায় দৈ
দ্বয়ী-অজ রাজারাণী দ্বিচারিণী নই।
ফণীশির ফণীশিয় স্বৈরিণী কই
শনিশির কোণীশীয় সই-রাণী কই
ফণীশির শিব নেই স্ব-ইরাণী বই
স্ব-ই রণী বই।
শিরিয়া-ইরাণ মেশা ঈশীরীয় বই
তুমি ঈশ্বরী আমি ঈশ্বর হই
সাইরিনি-মিশরী তমিস্রা অমার
হোমঋক মিশ্রিত পাত্র সোমার
মিশরীক সাকি ক্লিওপাত্রা আমার!

সুমেরের সুময়ুরী লুলিতা উমার
সুবলিত লীলা 'সুব্বিলুলিউমা'র

বিনুনী কিরাতী চুলে, সুরা-চিরতায়
বিষে, চিরতনে, শিবে, আছো চিরতায় ;
ললিতা সখীতে আর সুবল-সখায়
এক ডালে সুপর্ণা চকি ও চকায়!
তুষার-মৌলী তুমি সু-মৌরীফুল,
মৌ চাই মৌরাণী দাও-দাও হুল!
কেশে নেই ক্লেশ অহিচ্ছত্রা আমার
ক্লিওপাত্রা আমার।

'মুন-গল' 'যার্ত্ত' সামাল
বসন্ত সমাগত
বসন ত রোমাগত
ক্রমাগত বিক্রম 'শাল'।
আদিত্য দামিল দামাল।
কান্তোজ নটবর 'ঘটবরষেন'
বর্শার বর্ষণে বরষায় 'বষন' গড়েন
সমুদ্র-জয়-গাঁথা-লেখে হরিষেণ।
হরবে 'বষন' কারা হরির বসন
করীর, মদন কেবা করবে দমন
বিক্রম করীন্থ অন্তক কাল।

বৈকাল-তীরে তবু তাঁবু নীরে পাল
মুঙ্গল 'যার্ত্ত' 'আর্ত্ততমার'
সূর্য্য-শশীরে চাই আর্ত্ত অমার
'সৌশশতরে' দ্যুতি অর্য্যমার
দশরথে কুঁজী দূতী মৌর্য্যমা-র।

অহল্যা-হেলেনের কালো অভিলাষ
কেরল-চেড়ীর শুধু আলোর বিলাস,
'মৈষিনী আত্রেয় অগমমনন'



অগ্রমাতুল তবু ভগবান নন
'হেল-শাপান্তে' ইরানিল-ভাস
'ক্লেদনষ্টা'র ট্রয়ে ত্রয়বীর নাশ।
লাস হয়ে পড়ে থাকে কোথা 'মেনেলাস'
ইরাবতী-জলে দোলে হেলেন-শমন।
করবে চয়ন কয় রাস 'চয়রাস'
কতো রাধা-সচী বনমালীর পিয়াস
শশ-খরগোস-আর কতো খাবে ঘাস?
মেম্নায়ও মগ্ন স্নানে উষাভাস
'ঐরচেরশোনে' চেরী-ফুল-বাস।
কে শোনে চুড়ির এতো ইশারা রমার!

অর্য্যমা, জল দাও অপার যামার
অপর্য্যাপ্ত তোয় সৌরধামার
নভোসলিলের লীলা কারণ আমার।
পত্রে কি পাত্রার কলা-সুষমার
জল ধরে? বলো, ক্লিওপাত্রা আমার—
জলধরে কলাপীর আশ।
বলোরে সুবল আছে কোথা বারি নীল
যশল্মীরের বালু করে ঝিলমিল
কোথা পায় ঝলমল জল অজামীল!
জয়াপীড়-মুক্তাপীড় পঞ্চাশ
ললিতাদিত্য হয়ে ঘোরে সোরমাস
নেয় শীলাদিত্যে ন্যায় সন্ন্যাস।
ত্রিবেণীর জলধারা মৃত্যু-শীতল
দাও ক্লিওপাত্রা কল-কল জল!
পত্র লেখায় ইতি।
চন্দ্রাপীড়-প্রীতি
ভ্রষ্ট-বাণের রীতি।
কাদম্বরীর কবি লেখে ইতিহাস:

বিনয়াদিত্য পুলা অম্বিকা-মার
তুমি ক্লিওপাত্রা ললিতা আমার ?
পুরুরাজ অন্তি-কামার
অলীক সোদর পরে জলৌক বাস
ছলউক জালিয়াৎ ভাই সেলুকাস
নিক্তর বলে নিকটতরের ভাষ।
চান্দ্রায়ণ-ব্রত তার বারমাস।

বার-মাসী মালিনীর বিদ্যা-বড়াই
বিদ্যা-রাধারা কূলে কালিনী বড়ায়ী
বাংলার রায়বারে বার-রায়ী ভাই
তারাও বাজায় বাঁশী পত্র লেখায়
রাজায়-রাজায়, প্রেম পত্রলেখা—
রুক্মিণী-চিত্রাঙ্গদারা শেখায়।
উষা শুধু আঁকে লিপি সোণালি রেখায়।
প্রিয়তমা চিত্রা কি উষসী-সমার ?

কুনকি সলিলা লীলা করবেনা হ্রাস
জলীয় সে জার পায় জুলিওসিজার
মার জার—মার্জ্জার রোমক রাজার
বালুকায় হায় গ্রীস-বালিকার গ্রাস!
কুন্তী মাতার তবু কর্ণে তিয়াস!
কুনিকা মাতারা পায় ফণা, ফণীশ্বাস
অজাতশত্রু তোপে কুনিকের হ্রাস।

আমি নীলকণ্ঠ স্বামী মনসার
অ্যাণ্টনি, অতনুর শঙ্খিনী সাপ
শুনঃশেফ ফিরে দংশনী শনি-শাপ
অরূপী নিশার আমি য়ুরোপিণী ষাঁড়
কংস কাংস্য শিশুনাগ-মার



সুমেরের চন্দ্রক শিশুসংহার
হেরড হরদ হ্রদ চাই কচি-হাড়
কোচবিহারের গাড়ি গড়ি রাঢ়-বাঢ়।
কুচের বরণ তুমি কন্যা আমার
আসামের কোশী-বিষু সমা-বিষমার।

অলকা-তিলকা আঁকা কপাল নাসা
তিলফুল, খেলা করে খোলা ঘরে পাশা,
শ্যাম-তৃণে মৈত্রেয়ী শ্রীমতী শ্বেতা,
বনিকা বালিকা পেয়ে বনিতা-ব্যথা
ভুলবে কি এ পাটলীপুত্র-ভ্রাতার!
কালাশোক রাখে মনে সতী-ভালোবাসা—
কারুবাকি তিষ্যের রক্ষিতা যে তা
মনে রাখে মনিপুর অঙ্গদা তার
চিত্রাঙ্গদা মেয়ে অঙ্গ-ধামার
পটলামি, তুমি ক্লিওপাত্রা আমার।

সায়ামের সামসুর পাও কি বালা
সুরেলা আষাঢ় এলো মনে নিরালা
আসারে অশ্রু আর প্লাবন-পালা
হৃদয়ে কেমনতর আশার জ্বালা
শ্রবণে কী মন্ত্র শ্রাবণ-মালায়!
আসার সময় এলো
উর্ম্মিলা এলোমেলো
কোন্ উদধিতে, ভীতে, পাত্রা আমার!
কার শোধ নিতে শীতে যাত্রা আমার ?
পউষের উষে ঊষা কুয়াশা অমার ॥

# জ্ঞানান্বেষণ ও শিল্পান্বেষণ

## নারায়ণ চৌধুরী

প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত শিল্পী হওয়া যায় কি না? আমাদের মনে হয়, যায় না। এখানে শিল্পী বলতে ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দান্তে, ভার্জিল, গ্যেটে, সেক্‌স্‌পীয়র, মিল্টন এবং এঁদের সমশ্রেণীর প্রতিভার কথা বলা হচ্ছে; দু'টি চটি কবিতার বই লিখে বা পাঠকভোগ্য খানতিনচার গল্পের বই ছাপিয়ে যাঁরা সাধারণ্যে শিল্পী আখ্যা লাভ করেন তাঁদের মনে করে এ কথা লেখা হয় নি। শেষোক্ত লেখকদের ভিতর শিল্পীজনোচিত সহজ কুশলতা থাকতে পারে, তাঁদের কল্পনাশক্তি আর দৃষ্টিক্ষমতাও প্রথম শ্রেণীর হওয়া সম্ভব; কিন্তু শুদ্ধমাত্র ঐ গুণের দ্বারা কেউ মহান্ শিল্পীর পর্য্যায়ভুক্ত হতে পারেন না। মহৎ শিল্পীর প্রতিভার কল্পনাশক্তি, দৃষ্টিক্ষমতা, ভাবুকতা তো থাকবেই—তা না হ'লে তিনি আর শিল্পী কী—, কিন্তু সেই সঙ্গে আরও কিছু থাকা চাই। সেই 'আরও কিছু' হ'ল—জ্ঞানগর্ভতা। মহান্ শিল্পী নামের যিনি অধিকারী তিনি একাধারে জ্ঞানীও বটেন।

শিল্পীর জ্ঞানগর্ভতা নিম্নোক্ত দু'টি সূত্রের যে কোন একটি থেকে আহৃত সম্ভব—পুস্তকলব্ধ বিদ্যা, অথবা ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞান। নিবন্ধের সূচনায় যে সকল শিল্পীর নাম করা হয়েছে তাঁদের সকলের ভিতর সেই দ্বিবিধ জ্ঞানের কোন না কোন একটির সমাবেশ ঘটেছিল। শ্রীমধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, দান্তে, গ্যেটে, মিল্টন এঁরা উভয় জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কবি কালিদাসের পুঁথিগত পাণ্ডিত্য কী পরিমাণ ছিল তার প্রমাণ নাই, কিন্তু তিনি যে জ্ঞানী ছিলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না। উচ্চ কবিত্ব শক্তির সহিত জ্ঞানগর্ভতা সমন্বিত না হ'লে কারও পক্ষে 'রঘুবংশ' আর 'কুমারসম্ভব'-এর ন্যায় কাব্যরচনা সম্ভব নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের জীবনী সম্পর্কে সামান্য তথ্যই এ পর্য্যন্ত জানা গেছে; ঐ বিরল সাক্ষ্যের ভিত্তিতে শেক্‌সপীয়রের পুস্তক-পিপাসার সম্বন্ধে জোর ক'রে কিছু বলা কঠিন। কিন্তু তিনি যে জ্ঞানী ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী। বিচিত্র অভিজ্ঞাতাজাত সমৃদ্ধ চিন্তার প্রমাণ সেক্‌স্‌পীয়রের নাট্যসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে। যে-সমস্ত সারবান সংক্ষেপ-মন্তব্য সেক্‌স্‌পীয়র তাঁর নাটকের চরিত্রগুলির মুখ দিয়ে বলিয়েছেন দীর্ঘকালীন ভূয়োদর্শনের অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কারও মনে সে-সব চিন্তা উপস্থিত হওয়া অসম্ভব। সেক্‌স্‌পীয়রের বহুখ্যাত মানবচরিত্র-জ্ঞান প্রকারান্তরে তাঁর ভূয়োজ্ঞানকেই সমর্থন করছে। 'হ্যামলেট' কিংবা 'কিংলীয়র'-এর মতো নাটক স্পষ্টতঃই জ্ঞানী শিল্পী ছাড়া আর কেউ লিখতে পারতেন না।

আজকাল শিল্পানুশীলনের ক্ষেত্রে জ্ঞানান্বেষণের তাদৃশ মূল্য দেওয়া হয় না এটা খুবই দুঃখের বিষয়। জগদ্‌বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞান ব্যতীত কেমন করে প্রকৃত শিল্পী হওয়া যায় আমাদের তা ধারণায় আসে না। শিল্পের বিচার্য্য বিষয়ের মূলে দু'টি জিনিষ: বস্তু ও মানুষ। খতিয়ে দেখতে গেলে বস্তুরই প্রাধান্য সেখানে বেশি। সুতরাং প্রথমে বস্তুজ্ঞান আয়ত্ত হওয়া চাই, তবেই শিল্পজ্ঞান আয়ত্ত হওয়া সম্ভব। বস্তু সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই অথচ কাল্পনিকতা ও ভাবুকতার দুরতম প্রান্তর পর্য্যন্ত বিহার



করলাম—এরকম শিল্পান্বেষণের মূলভিত্তিটুকুই পলকা। বস্তুজ্ঞান ভালোরূপ অধিগত না হ'লে মানব চরিত্র জ্ঞানেও পূর্ণতা আসে না। কেমন করেই বা আসবে? মানুষ, আধখানা মানুষ যদি না তাকে তার উপযুক্ত পরিবেশের পটভূমিতে বিচার করি। সেই পরিবেশের জ্ঞান যদি ত্রুটীযুক্ত থাকে, উপকরণের সমবায়ে আলোচ্য পরিবেশ তৈরী সে সম্বন্ধে আমার ধারণা অস্পষ্টতামণ্ডিত হয়, তবে পরিবেশাধীন মানুষটিকেই বা আমি কী করে চিনব? বস্তুজ্ঞান অপূর্ণ থাকলে প্রকৃতির রাজ্যে তো সঞ্চরণ করা যায়ই না, মানুষের রাজ্যেও পদে পদে হোঁচট খেতে হয়।

আজকালকার খুব কম শিল্পী-সাহিত্যিকই বস্তুজ্ঞানের অপরিহার্য্যতা সম্পর্কে সচেতন। শিল্পান্বেষণের ক্ষেত্রে বিদ্যার প্রয়োজন তাঁরা উপলব্ধি করেন না। সেই কারণে বিদ্যার্জ্জনের দিকে তাঁদের কোন ঝোঁকও দেখা যায় না। তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হয়, তাঁরা বড়ো বেশি সহজ কুশলতায় আস্থাশীল। শিল্পসাধনার ক্ষেত্রে বিদ্যা বা জ্ঞানের প্রয়োজন গৌণ, কল্পনা বা দৃষ্টিক্ষমতাই হ'ল আসল—এই যেন তাঁদের মনের কথা। এই ব্যাপারে শিল্পীরাই যে শুধু সমালোচনার যোগ্য তা নয়, আধুনিক পাঠক সম্প্রদায়কেও এর জন্য দায়িক করা চলে। তাঁরা শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে সহজ কুশলতার অতিরিক্ত কিছু দাবী করেন না। লেখকদের রচনায় কাল্পনিকতার ক্ষুধা মেটে এমন খোরাক মিললেই তাঁরা খুসি, লেখকদের তথ্যজ্ঞান নির্ভরযোগ্য কি না সে সম্বন্ধে মাথা ঘামানো তাঁরা আবশ্যক বোধ করেন না। এ যুগের পাঠকের প্রত্যাশা ছোটো মাপের সেই কারণে লেখকের কৃতিত্বও ছোট মাপেরই হয়ে থাকে। বিশেষ করে আমাদের সাহিত্য সম্পর্কে এ কথা মর্ম্মান্তিক ভাবেই খাটে।

কাব্যই হোক আর গল্পোপন্যাসই হোক, প্রত্যেক রচনায় তথ্যের কিছু উপকরণ থাকে, থাকে জ্ঞানগত বিষয়ের প্রসঙ্গ। লেখকদের শিক্ষার ত্রুটীতে এই সকল বিষয়ে ভ্রান্তি ঘটা আশ্চর্য নয়, ঘটেও থাকে। বিশেষতঃ হালের লেখায় এ জাতীয় ভ্রান্তি পদেপদে চোখে পড়ে। কিন্তু পাঠকেরা এ-সব দেখেও দেখেন না। লেখকদের ভাষাপ্রয়োগগত ভ্রান্তি, উপমায় দুই অনুপমেয়ের তুলনা, বস্তুজ্ঞান বিষয়ক ত্রুটী, তথ্যের অশুদ্ধি—এ সকল আধুনিক পাঠকের বিচারে গুরুতর বিচ্যুতি নয়। তাঁরা চান সহজপটুত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত্তি। লেখকের কাছ থেকে সেটুকু পেলেই তাঁরা তৃপ্ত. অতশত কে আর বিচার করে বলুন!

আজকাল সব জিনিষেরই মান বড়ো সস্তা হয়ে গেছে। জনপ্রিয়তার মাপকাঠি ছাড়া আর কোন মাপকাঠিতে কেউ কিছু বিচার করতে নারাজ। আর সে জনপ্রিয়তাও নিতান্ত খেলো জনপ্রিয়তা। একটু কেউ জনচিত্তহারিতার সামান্য প্রমাণ দিয়েছেন, অমনি সমস্ত দেশ তাকে মাথায় করে নাচতে সুরু করে দিল। কেউ একবার চিন্তাও করলনা যাঁকে নিয়ে গণ-মহারাজের এই উৎসাহ তাঁর কৃতিত্বের ভিত্তি সুদৃঢ় কি না, তাঁর আপাত সাফল্যের পিছনে দীর্ঘস্থায়ী সাধনার পোষকতা আছে কি না। বহু দুঃখে একথা বলতে হচ্ছে যে, আমাদের মূল্যায়নের আদর্শ ও পদ্ধতি বড়ো সস্তা—বড়ো সস্তা। এদেশে নামমাত্র চটক দ্বারা মানুষের মাথা কিনে নেওয়া যায়। মস্তক বিক্রীত হবার জন্য যেখানে আগু বাড়িয়েই আছে সেখানে এর চাইতে অধিক শ্রমসাধ্যতার আর কী প্রয়োজন? আমাদের পুরান-কল্পনায় জনতার যিনি ঈশ্বর সেই গণেশ ঠাকুরের স্কন্ধোপরি হাতীর মাথা বসানো হয়েছে। এটি নিতান্ত অকারণ নয়। জনগণেশ সকল দেশেই ধড়সর্বস্ব, সেই ধড়ের ভিতরেও আবার উদরের স্ফীতিটুকু সর্বাধিক লক্ষনীয়। পুঞ্জ পুঞ্জ স্থূল খাদ্যপিণ্ড পেলে আর গণদেবতাটি কিছু চান না। তবু

যে তাঁর ঘাড়ের উপর মস্তকের সদৃশ একটি বস্তুর আরোপ করা হয়েছে সেটি নেহাত সৌজন্যবশতঃই করা হয়েছে। সৌজন্যকে যেন আমরা তদতিরিক্ত কিছু বলে ভুল না করি।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের রচিত অতি সাধারণ কবিতার পিছনেও প্রখর বস্তুজ্ঞানের প্রমাণ মেলে। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রাথমিক বস্তুজ্ঞানের সঙ্গে মিলিত হয়েছে অধ্যয়নগত বিচিত্র বিষয়ক জ্ঞান, ভূয়োদর্শনজাত চিন্তাসমৃদ্ধি ও ভাবুকতা। কবি যদি সহজ সৃজনকুশলতা নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তবে কি আর বিশ্বকবিকে আমরা পেতাম? বহুমুখী রবীন্দ্রপ্রতিভার ভিতর সৃষ্টিলীলার প্রাধান্য বেশি কি অনুশীলনগত সাধনার মাহাত্ম্য বেশি সে সম্বন্ধে রায় দেওয়া সহজ নয়। সৃষ্টিনৈপুণ্যের দ্বারা শিল্পী আর কতটুকু কী করতে পারেন? রবীন্দ্রনাথ যদি আজীবন মাত্র তাঁর সহজ কল্পনাকুশলতা আর লিপিনৈপুণ্যের মধ্যেই গণ্ডীবদ্ধ হয়ে থাকতেন, তাঁর এই গুণদ্বয়কে অধ্যয়ন-অনুশীলন-অভিজ্ঞতার দ্বারা বিচিত্র দিকে সমৃদ্ধ না করতেন, তবে আর-একজন বিহারীলাল চক্রবর্তীর অভ্যুদয়ের বাড়া আর অধিক কি বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যে ঘটত? কবি যিনি তাঁর মনোজীবনে কাল্পনিকতাবৃত্তির অবশ্যই প্রাবল্য থাকবে—এ এমন একটা ব্যাপার যে সম্বন্ধে বিতর্কের অবকাশ নেই বললেই চলে, কিন্তু মাত্র এটুকুর উপর ভরসা করে কি আর মহৎ কবি হওয়া যায়? না, কেউ কোনদিন তা হতে পেরেছেন? সহজ কল্পনাকুশলতার সঙ্গে অধ্যয়ন ও ভূয়োদর্শনজাত জ্ঞানের সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত মহৎ কবিপ্রতিভার ভিত্তিভূমি অগ্রথিত ও অসংলগ্ন থাকে এটা স্বীকার করা ভালো।

কিন্তু আজকাল সব মাতৃজঠর থেকে ভূমিষ্ঠহবামাত্রই বড়ো কবি, বড়ো লেখক। বিদ্যানুশীলনের দাম নেই, বিদ্বানের সমাদর নেই। সচকিত হয়ে লক্ষ করেছি, আজকাল যে রীতিতে সাহিত্যচর্চা হয়ে থাকে তাতে বিদ্যার কোন প্রয়োজন হয় না, সহজ লিপিকুশলতা আয়ত্ত করতে পারাটাই লেখকদের পক্ষে যথেষ্ট। সব দেখেশুনে আমার অনেক সময় এমন পর্যন্ত মনে হয়, বিদ্যানুশীলনের সম্পর্ক সাহিত্যের সঙ্গেই সব চাইতে কম। সাহিত্যেতর অন্যান্য জীবিকায় যারা নিয়োজিত আছেন বৃত্তিগত কুশলতা অর্জনের জন্য তাঁদের কিছু না কিছু বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন হয় কিন্তু সাহিত্যিক বা শিল্পীনামধারীর পক্ষে সে প্রয়োজনটুকুও বাহ্য। খানিকটা লিখতে পারা বা গান গাইতে পারা বা ছবি আঁকতে পারা যেখানে কৃতিত্বের চূড়ান্ত নির্ণায়ক সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্পব্যবসায়ীরা অহেতুক কেন জ্ঞানপ্রয়াসী হতে যাবেন? নিরর্থক শ্রমস্বীকারের ঝুঁকি সংসারে কে আর নেয় বলুন।

অতি সাধারণ স্তরের কবিকে যখন প্রথিতযশাঃ কবি, গড়পড়তা মামুলি লেখককে যখন যুগান্তকারী সাহিত্যিক, চিন্তার ছিঁটাফোঁটাও যাঁর লেখায় নেই এমন ব্যক্তিকে যখন প্রগাঢ়চিন্তাশীল লেখকরূপে আমাদের কাগজগুলিতে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয় তখন হাসিও পায়, দুঃখও হয়। এই কি তা হলে শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের পরিণাম? ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ লেখকগণ একদা যে সাহিত্যের ধারক ছিলেন সেই সাহিত্য কিনা এক্ষণে কতকগুলি অপরিণতজ্ঞান তরলমতি লেখন-ব্যবসায়ীর বিহারভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে! আগাছার জঙ্গলে বাংলাসাহিত্য ভরে গেল!

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমগ্র পরিধির ভিতর সীরিয়স লেখক একেবারেই নেই এমন কথা বললে ভুল বলা হবে। গুটি তিনচার লেখক আমাদের মধ্যে আছেন যাঁদের এই পর্যায়ে ফেলা যেতে



পারে। আজকের এই অধঃপতিত আবহাওয়ায় পূর্বসূরীদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার আদর্শ আঁকড়ে থাকা কঠিন, তবু এই মুষ্টিমেয় লেখকের দল সকল ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করে সেই কঠিনের সাধনাকেই জীবনে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন—

> যেখানে সাহিত্যের মধ্যে কোন আদর্শ নাই, যেখানে পাঠক অসামান্য উৎকর্ষের প্রত্যাশাই করে না, যেখানে লেখক অবহেলাভরে লেখে এবং পাঠক অনুগ্রহের সহিত পাঠ করে, যেখানে অল্প ভাল লিখিলেই বাহবা পাওয়া যায় এবং মন্দ লিখিলেও কেহ নিন্দা করা বাহুল্য বিবেচনা করে, সেখানে কেবল আপন অন্তরস্থিত উন্নত আদর্শকে সর্বদা সম্মুখে বর্তমান রাখিয়া, সামান্য পরিশ্রমে সুলভ খ্যাতি লাভের প্রলোভন সম্বরণ করিয়া, অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হওয়া অসাধারণ মাহাত্ম্যের কর্ম। * * সর্বত্রই যখন শৈথিল্য এবং সে শৈথিল্য যখন নিন্দিত হয় না তখন আপনাকে নিয়মব্রতে বদ্ধ করা মহাসত্ত্বলোকের দ্বারাই সম্ভব। ( 'বঙ্কিমচন্দ্র', "আধুনিক-সাহিত্য" )

রবীন্দ্রোক্ত এই দুরূহ আদর্শের মনেদণ্ডে আধুনিক লেখক সম্প্রদায়ের ভিতর যদি এক বা একাধিক ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে হয় তবে এঁদেরই সেই শ্রদ্ধা প্রাপ্য। অথচ এঁদের জীবনের বাস্তব অবস্থা ভিন্নরূপ। প্রকাশকরা এঁদের রচনার প্রতি পরাঙ্মুখ, পাঠক সম্প্রদায় উদাসীন, সম্পাদক অনুৎসাহ। বিদ্যাবুদ্ধি সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভালো, তবে পত্রিকা সম্পাদকদের কাছ থেকে অন্ততঃ লোকে কিছু বিচারবুদ্ধি আশা করে। সেটিও আজ দুর্লভ। আমাদের সাহিত্যের পত্রিকা সম্পাদকদের মধ্যে খুব কম লোকই আছেন যাঁরা স্বীয় বিচারবুদ্ধির দ্বারা চালিত হন। এঁদের অধিকাংশ পাঠকের মুখে ঝাল খেতে অভ্যস্ত। জনপ্রিয়তার মাপকাঠির দ্বারা এঁরা লেখকের যোগ্যতার পরিমাপ করেন। যেখানে পাঠকের সস্তা ইচ্ছা-অনিচ্ছার দ্বারা সম্পাদকের রুচি নির্ণীত হয় পত্রিকা সাহিত্যের পক্ষে তার চাইতে দুরবস্থা আর কী হতে পারে।

আর শুধু প্রকাশক-সম্পাদকই বা কেন শিল্প-সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে আমাদের দেশের অতি শিক্ষিত নামধারী ব্যক্তিরাও মূঢ়তার দ্বারা আচ্ছন্ন। বড়ো বড়ো ডিগ্রীধারী, বড়ো বড়ো উপাধিওয়ালা পণ্ডিত, দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রশাসনকার্য্য ইত্যাদিতে বড়ো বড়ো আসন জুড়ে আছেন—সাহিত্য ব্যাপারে এঁদের রুচির প্রমাণ পেলে বিস্ময়ে হাঁ হয়ে যেতে হয়। আমরা সস্তা জনপ্রিয়তার বিগ্রহের বেদীমূলে মাথা মুড়িয়ে আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি? কে আমাদের এই হতাশ্বাসকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করবে? আমরা কি উদ্ধার লাভের যোগ্য? নাকি এই অসহনীয় অবস্থাই আগামী বহুকালের জন্য আমাদের একমাত্র বিধিলিপি? বিচক্ষণ ব্যক্তিরা প্রশ্নগুলি মনের ভিতর নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন।

# কবিতাগুচ্ছ

## ভোর

### বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

একটি কি দু'টি পাখী
কৃষ্ণচূড়ার ডালে
এক মুঠো রোদ নিয়ে
ডানায় সাবান মাখে !

একটি কি দু'টি গান
বাতাসে ভাসাবে ব'লে
কালো ছেলে, সাদা মেয়ে
পরস্পরে ডাকে !

## পৃথিবী ও আকাশ

### শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রস্ফুট কুঁড়ির প্রেমে এ-পৃথিবী আজো স্বয়ম্বরা ঃ
নানা বিভূষণ-বেশে, বহু রঙে, মাঠের মুকুটে,
এমন সম্রাজ্ঞী-সাজে উন্মুখর, এত উদ্ভাসন—
আজো তার নীল চেলি আকাশের দুই করপুটে
ভাঁজে ভাঁজে কারু-কৃত। আর সে-ও দীর্ঘদিন ধরে
সিঁথিতে সিঁদুর গাঢ় টেনে দেয়, অনেক আবির
ছড়ায়, উড়িয়ে দেয় ; সারারাত অবাক মনের
কি-জানি অনেক কথা শোনা যায় বাসর-বাণীর !

কোথায় মরুভূ থেকে বারবার ঝড় এনে কেউ
সমস্ত চাঁদোয়া-জরি ছিঁড়ে দেয় বজ্রের প্রহারে,
হীরের অবাধ দ্যুতি বালি মুড়ে শান্ত ততক্ষণ,
সূর্য্যের সকল কথা চুপ হয় ঝড়ের জোয়ারে !



তারপরে ফের সেই আকাশের নীল, ঘন নীল
পৃথিবীর চোখে আঁকে প্রেম-ঘুম একান্ত নিমীল !

## চোখ-ঝরা-নদী

### মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

চাঁদের দু'কূল ভেঙে কুলকুল বান যদি আসে
তোলপাড় ঢেউ-ঢেউ ধূ-ধূ-জল উতরোল বান—
বালুকা-চরের ঘুম চিকচিক ভিজে সুর ছুঁয়ে
হয় তো ডাগর চোখে শুনবেই জলচুড়ি-গান।
নয় তো নিঝুম কোনো ধরো যদি বটের শাখায়
কতক এমনি সুর অকস্মাৎ ঝরে ঝরোঝরো
বলো তো কী হবে তবে—ফুল ফোটা-অবিকল ভোর :
একটি কাকলি শুধু চমকায় যদি থরোথরো !

মখমল-ঝলোমলো আলো-আলো ফুলঝুরি কতো,
শালিকের মিঠে গান, অবিরাম ঝাপ্‌টায় ডানা
অনেক অচিন পাখি : পৃথিবীকে বড়ো মনে হয়—
এমনি অবাক রাতে একবার এসো অন্তত ঃ
শিউলির চোখ-ঝরা দু'টি কণা নাকি অনুনয়ে
শিশির-ভেজানো মাঠ ঝিরিঝিরি স্রোতে যায় ব'য়ে ॥

## অভীপ্সা

### সুনীলকুমার নন্দী

আবছা কুয়াশা-মাখা রাত্রির নির্জন নীল পথে ঘুরে ঘুরে
এখানে এলাম আমি। সময়ের স্তূপ ঠেলে ধূসরাভ দেশে
কতো না স্বপ্নের সৌধে শিল্পীর আশ্চর্য্য স্পর্শ দেখি। তবু শেষে
সব কারুশিল্প মুছে তাদের অপূর্ণ সাধ সমুদ্রের সুরে

ভেসে ভেসে আসে শুনি ;—আমার হৃদয় তোলে উতরোল ঢেউ
তাদের হৃদয় হ'য়ে। পথের ইসারা ভোলে যাযাবর মন।

রাত্রির শিয়রে কাঁপা ধূসর পৃথিবী থেকে আবার কখন
অস্ফুট বেদনা-কলি বুকে নিয়ে পথে নামি। এখন কী কেউ

ঘুম ভেঙে জেগে আছে পড়ন্ত রাত্রির নীলে আমার মতোন।
এমন একটি প্রাণ বিবসন আয়োজন কোথাও কি নেই
এ-ধূ ধূ রাত্রির মাঠে, যেখানে ছড়ানো যায় মনের বাসনা :
ধূসর পৃথিবী থেকে অম্লান কিশোরী স্বপ্ন বেণীতে বিনিয়ে
দুলিয়ে কী হবে এই কবন্ধ নগরে ? শীত ভোরের সকাশে
গানের কোরকে ভ'রে বলাকা ভাসিয়ে দেবো আকাশে আকাশ!

## উত্তরায়ণ

শিশিরকুমার দাশ

আজো শেষ নয় পরিক্রমণ : পথের বলয় তার
সূর্য্যের মধু চয়নে নিপুণ, আজো তার প্রতিকোষে
নিভৃত রাত্রি নীড় বেঁধে আছে আজো তার গুরুভার
দেহকে পথের স্রোতে মেলে দেয় স্নিগ্ধ সৌররসে।
অক্ষবৃত্ত দূরে সরে যায়। উত্তরায়ণ চলে।
সখিপরিবৃতা অলকানন্দা, আকাশগঙ্গা পার
হয়ে আমি চলি হিমদিগন্তে যেখানে একাকী জ্বলে
ম্লান ধ্রুবতারা আকাশ কারায়।
কেন বারবার
প্রবালের মত স্বপ্নের দ্বীপ দেহ দিয়ে গ'ড়ে তুলি ?
নীল সমুদ্র কেন টলোমলো নিরুদ্ধ কোলাহলে—
বুঝিনা হয়ত—তবু মেলে দিতে জীবনের দলগুলি
চাই পথে পথে, বদ্ধ তুষার চাপে চাপে যায় গ'লে ;
পথের বলয় আরো আয়ু পায় শ্রাবণ মেঘের মত
মৃণাল-মনের চূর্ণিত কণা দিয়ে কত মালা গাঁথে ॥
( ঝিল্লীরা কাঁদে, নিদ্রিত রাত ) আজো অভিসার ব্রত
চলেছে বিশাল আকাশের মত সম্পদভরা হাতে ॥



## আকাঙ্ক্ষা

শ্রীসরিৎ শর্ম্মা ( মাটি )

রিক্ত-স্বাদ আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ অন্বেষণ
ঠোঁটের আগুন চেয়ে,
হে সুমিতা—
নির্জন ঘরের স্তব্ধতায় স্নাত মেয়ে !
কী নিবিড় নিরীক্ষণ
তোমায় আমায় :
ফোঁটায় ফোঁটায়
স্বপ্নের মুহূর্ত ঝরে জীবনে তখন !
অকস্মাৎ সে কী আকাঙ্ক্ষায়
ঠোঁটের আগুনে তার নীড়ের ঠিকানা পেয়ে,
কবিতার ইন্দ্রধনু ডানায় ডানায়
সন্ধ্যার পাখির মতো ঝাপিয়ে পড়েছে মন
বিশ্রান্ত-বর্ষণ
ছায়াচ্ছন্ন বিকেলের সুষমায় নেয়ে !
জানালার পারে
আদিগন্ত আকাশের সান্ধ্য অভিসারে
অরণ্যের পক্ষ বিধূনন !
ব্যর্থ অন্বেষণ !
হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষা, তবু, স্বাদ নেই তার :
ঠোঁটের উপত্যকায় জ্বলেছে আমার
কবিতার চিতা !
হে সুমিতা,
রিক্ত-স্বাদ আকাঙ্ক্ষার স্পর্শ নয় আর—
দাও এক অমর কবিতা !

# বাসন্তী বাহার

## সুকোমল দত্ত

হাঁপিয়ে ওঠে বাসন্তী একটুতেই। থাক্ ও পারবে না। টেবিল থেকে আয়নাটা তুলে আনার সাধ্য ওর নেই। ও তা পারবে না, এক বছরের একটি শিশু যা পারে অনায়াসে।

তার চেয়ে তক্তাপোষে শুয়ে থাকা অনেক নিরাপদ, অনেক আরামদায়ক বাসন্তীর কাছে। খুব একঘেয়ে মনে হলো পিঠে দুটো বালিস গুঁজে আধশোয়া হয়ে থাকো। যতক্ষণ খুসী।

গত ছ'মাস বাসন্তী এভাবেই—এক ভাবেই কাটিয়েছে। না করে উপায়ই বা কি? বাসন্তীর প্লুরেসী, বাড়ে না, কমে না, থম্‌কে আছে। আমিরী রোগ। রোজ সন্ধ্যায় জ্বর, খুব কাশী, কাশির সাথে একটু আধটু রক্ত; হ্যাঁ বাসন্তীর রক্তও পড়েছিল।

বাসন্তী জানে ও সারবেনা—কেউ সারে না এ রোগে। দু'দিন আগে বা পরে তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে হবেই এর কাছে। ধীরে ধীরে লাংসে জল জমবে—বাড়বে তা, তারপর? সব শান্ত, নিশ্চল নিরেট।

মৃত্যুর চিত্রটা বাসন্তী ঠিক কল্পনা করে উঠতে পারে না—কিন্তু তা যে খুব শীতল একটা কিছু হবে সে সম্বন্ধে ও নিশ্চিত।

এক্সরে প্লেটে বাসন্তীর রোগের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়নি। দু'বার তুলেছে। বাসন্তী বুঝতে পারেনা কি বোঝা যায় ও ছবি দেখে। শুধু হাড়, হাড়ই শুধু। কি আশ্চর্য্য! বাসন্তীর মাংসল বুকের শুধু হাড় কখানাই ওর চোখে পড়ল, বাসন্তী হাসে। যান্ত্রিক চোখ কিনা!

মা ঘরে ঢোকেন।

"আয়নাটা একটু দেবে মা" নিজের গলার স্বর বাসন্তীর কানেই যেন কেমন শোনায়।

"আয়না দিয়ে আবার কি করবি?" আয়নাটা এগিয়ে দিয়ে মা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিলেন—সেটা দিয়ে রোদ এসে বাসুর গায়ের কাছে হুমড়ী খেয়ে পড়ছিল।

"ওটা বন্ধ করো না, মা"। বাহির বিশ্বের সাথে ওটুকুই ত বাসন্তীর একমাত্র যোগাযোগ। ওর দুনিয়া তো পরিমিত হয়ে এসে ঠেকেছে দশ ফুট বাই দশফুট দোতলার এ ঘরখানাতে, ছ'মাসতো এ ঘরের বাইরে বাসন্তী একপাও বাড়ায়নি—নীচে না দাদার ঘরে, না বাথরুম বা কলতলা কোথাও না। বন্দিনী সীতার মতোই বাসন্তী, তাই, শেষ বিকেলের এ রোদটুকু বাসন্তীর এত প্রিয়। বাইরের যত অস্ফুট বাণী এ বয়ে আনে ওর জন্য। বাসন্তী হাত পা ছড়িয়ে দেয় তাতে, একত্ব অনুভব করে। এই ওর সান্ত্বনা।

বাসন্তী আয়নাটা মুখের কাছে তুলে ধরলো। লজ্জা, ভীষণ লজ্জা হলো ওর। আয়নাটা সরিয়ে দিল। আবার তুলে ধরলো। চেপটা মুখ—রক্ত শূন্য, ফ্যাকাসে—রুক্ষ কেশ। যেন ও নয়, বাসন্তী নামে অন্য কেউ। ওর কঙ্কাল, ব্লাউজের হাত দু'টো ঢল ঢল করছে। হাত দু'টো শুধু হাড়। এ শরীর নিয়ে বাসন্তী বেঁচে আছে! নিশ্চয় বেঁচে আছে। ছয়মাস ধরে। বাসন্তীর লজ্জা হলো—



ওর এরূপ অঙ্গে দেখবে বলে কুশ্রী নয়, হৃতশ্রী, কেউ ওর এরূপ দেখুক ও তা চায়না। ও তো কোথাও যায় না—সাধ্যও নেই, রক্ষা! দল বেঁধে ঘরে, বরং ওকেই সকলে দেখতে আসে।

এই তো বিকেল হলো এবং বিকেল হলো বলে ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল যেমন রোজ হয়। প্রথম দফায় মা'র বান্ধবী বা আত্মীয়াদের একজন না একজন আসবেনই। প্রায়ই একা থাকেন না তারা, বড় বড় চোখ করে ওকে দেখেন। বিস্ময় প্রকাশ করবেন 'বাসুর' স্বাস্থ্য দেখে:

'কী রোগা হয়েছিস বাসু!' 'মাগো। কী রোগই হয়েছে তোর!' 'মেয়ের চেহারার কী 'ছিরি' হয়েছে!' এগুলো তাদের আলোচনার প্রারম্ভীক অভিভাষণ। যেন বাসুকে রুগ্না, অসুস্থা এ খবরটা তাকে নূতন শোনান হচ্ছে, যেন তারা না দেখলে বাসুর রূপের অবনতি কারো নজরেই পড়তো না। ছ'মাস ধরে পলে পলে বাসন্তী কি নিজের সব কিছু সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হয়নি! ওর নিজের সম্বন্ধে কোন তথ্য কি আর ওর জানতে বাকি আছে! এদের এ অনাহূত বা রবাহূত মন্তব্য বাসুর অসহ্য লাগে। বাসুদের এতো বুড়িবুড়ি আত্মীয়া আছেন কই আগে তো কোনদিন দেখেনি, জানেনি। বাসন্তীর অসুস্থতায় বুঝি লৌকিকতার সুযোগ মিলল। আইন ক'রে রোগীর বাড়িতে visitors আসা বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত। জ্বালায় এরা কম! বাসন্তীর টেবিলে হয়তো কোন ফল দেখলো অমনি শুরু হ'য়ে গেল তাদের আলোচনা। তারপর ছাতুবাবু আর জগুবাবুর বাজারের নিজ নিজ এলাকার, ফলের তুলনামূলক সমালোচনা ফলেতেও দাঁড়িয়ে থাকেন না তাঁরা, সংসারের সহস্র জিনিষের মূল্য তালিকা মুখস্ত বলে যান অনর্গল, অক্লেশে। আক্ষেপ থাকে তাতে, শ্লেষ থাকে, গালাগালও বাদ যায় না। মোটের উপর মনোজ্ঞ। বাসন্তীর কান দু'টো, চামরার কিনা, জ্বলতে থাকে। কালা হওয়া কাম্য মনে হয়। কানে আংগুল দেয় না অশোভন হবে বলে। কিন্তু ছ'মাস ধরে এ রোজনামচা আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়। বই পাশে পড়ে থাকে, পড়া হয় না, গণ্ডগোলে বাসন্তী পড়তে পারে না। অসুস্থ বলে নয়, কোন দিনই নয়। এঁরা যখন উঠেন বাসন্তীর রাতের জ্বর শুরু হ'য়ে গেছে, রোগের চেয়ে বাসন্তীর এ উৎপাত অসহ্য লাগে। কিন্তু উপায় নেই, ওর প্লুরেসী। ধক্ ক'রে ওঠে ওর বুকটা। ওতো আর বাঁচবে না।

বাসন্তীর ক্লাশের বন্ধুরা, ফার্ষ্ট-ইয়ারে ওর সাথে যারা পড়ে, আসে মাঝে মাঝে। দু'জন কি তিন জন, চারজনের বেশী কখনোই থাকে না। ওরা আসে নূতন কলেজে পড়ার আনন্দেই। তুবড়ির চেয়ে দ্রুত কথা বলে—বেশীর ভাগ বাজে কথা, ফিকফিক করে হাসে, এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে। বাসন্তীর মত একজন বান্ধবীকে বাদ দিয়ে ওদের দল তেমন জমে না। তাই খোঁজ নিতে আসে, আর কতদিন ছ'মাস ত হলো, শুয়ে শুয়ে ভুগবে? সেরে ওঠ। ওরা জানায় বাসন্তীর জন্য ওদের ডায়মণ্ডহারবারের পিকনিক্‌টা বন্ধ আছে। ললিতা তার বিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে অংশত বাসন্তীর অনুপস্থিতির জন্যই। বড়লোকের মেয়ে, অনেক খেয়াল তার। বাসন্তীকে বান্ধবী পেয়ে কৃতার্থ হয়েছে! তারা আরও জানায় বাসন্তী না থাকায় কলেজের সামনের ডালমুটওয়ালাটাকে জব্দ করা যাচ্ছে না, ইত্যাদি। এসব কথা ওরা সকলে বলে, এক সাথে বলে আর দেখে বাসন্তী কতদূর এগুলো। ওরা যখন বলতে থাকে বাসন্তী শুধু হাসে, না হেসে কিই বা করবে। ওদের মত এতো ও বকতে পারে না, সাধ্যও নেই।

ওরা কখনও বসে কখনও দাঁড়ায়। স্থির থাকে না, তারপর হয়ত দেয়ালের ধারে দাঁড়ায়, ফটোর সামনে। বাসন্তীর দাদা নির্মলের ফটো। 'এ কার ফটো রে'? বাসন্তী উত্তর না দিয়ে একমুহূর্ত দেখে নেয় ওদের মুখগুলো, ওর প্রিয়দর্শন দাদার ছবিটা যে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে বেশ বোঝা যায়, চোখগুলো জলজল করছে বিস্ময়ে। কণ্ঠ বাক্যহীন। ছবিটা যেন ওরা গিলে খেতে চায়। এতো রূপ!

বাসন্তীর দাদা অসামান্য সুন্দর; তাই বাসন্তী ওদের, মেয়েদের চোখে মুখে, মেয়ে সুলভ সংস্কারের বশে, বিস্ময় বাদে আরও অনেক কিছুই দেখতে পায়। ওর তো আর জানতে বাকি নেই কাউকে। ওর মজা লাগে। ইচ্ছে করেই ছবিটা ও এখানে রেখেছে। এ পর্যন্ত যত মেয়ে, কলেজের মেয়ে এসেছে সকলের উপরই ছবিটার মোটামুটি এক রকম প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছে।

মেয়েগুলো আরও কিছুক্ষণ বসে। 'তাড়াতাড়ি সেরে ওঠ ভাই; সত্যি তোকে ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না' ইত্যাদি ছোট ছোট মন্তব্য করে, একটু একটু হেসে, শাড়িটা ঠিক করে, চোখে নিজ-নিজ দেহ লেহন করে বিদায় নেয়। ওদের জুতোর শব্দ, চটির চটপটানি সিঁড়িতে মিলিয়ে যায় ধীরে ধীরে। বাসন্তী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ভাবে: ওর তো এতো প্রাণ প্রাচুর্য্য নেই। মেয়েগুলোর প্রতি ওর হিংসা হয় ভয়ানক। ভাবে ওদের আর সে আসতে দেবে না, কেন তারা এসে ওর ভেতর একটা তুলনামূলক অনুভূতির সৃষ্টি করে যাবে।

বাসন্তীর হাতের আয়নাটা পড়ে যায়। নিজের হাতের'পর যেন আর বাসন্তীর কোন হাত নেই। কোন বশ নেই, অবশ। পড়ুক না। ভাঙেনি তো। বিছানার'পর পড়েছে। প্রয়োজন ওর মিটে গেছে। ভাঙলেও ক্ষতি ছিল না।

মা আবার আসেন। ওর কপালে, বুকে হাত দিয়ে তাপটা পরীক্ষা করেন, "হু. এসেছে" বেশ মোটা গলায় বলেন।

"কে মা"?

"কে আবার? জ্বর" বলেই মা হেসে ফেলেন। এ বুড়ো বয়সেও মা এমন হাসতে পারেন। সুন্দর হাসতে পারেন। তবু বাসন্তী সংকিত না হ'য়ে পারে না মায়ের এ তাপ পরীক্ষায়। কারণ ও জানে, ছ'মাস ধরে জানে, এর পরই মা নেকড়ায় মাখিয়ে আন্টিফ্লোজিষ্টিন নিয়ে আসবেন। কী বিটকেল গন্ধ! আর কী গরোম! ওর বুকের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে মলম-মাখান নেকড়া বেঁধে রাখা হবে। বুকটা বাসন্তীর কঠিন জড়ীভূত হয়ে যায়। কোন আর অনুভূতি থাকে না।

হৃদপিণ্ডটা, মনে হয়, আর কাজ করছে না। সমস্ত শরীরে রক্ত চলাচল হচ্ছে, শুধু বুকটা বাদে। বাসন্তী কেঁদে ফেলে। ঝরঝর করে। সাথে সাথে মাও। "কষ্ট হয় বুঝতে পারি। না হ'লে সারবি কি করে? একটু সহ্য কর, মা"। সহ্য আর সহ্য। সীমা নেই বুঝি তার। "সহ্যের কথা না বলে সমস্ত শরীরে একটা ক'রে পট্টি বেঁধে দাও।" বাসন্তীর গলায় যথেষ্ট অভিমান থাকে, আবদার থাকে, কাজ হয়।

মা'র মনটা গলে, দয়া হয়। নির্মলের পরে পাঁচ ছেলেমেয়ে মারা যাবার পর বাসন্তী, তাঁর শেষ



সন্তান। বড় আদরের, বেদনার। ওকে জড়িয়ে তার অনেক ভয়। অনেক আশংকা, আগে পাঁচটি তাকে, তার জীবনকে, ম্লান করে রেখে গেছে। বাসুর প্রতি তাই তিনি তার সমস্ত কোমল অনুভূতি-গুলো চেপে রাখেন, দাবিয়ে রাখেন।

বাসুর এই তো সতের চলছে। জীবনের সব আশাই বোধহয় ওর মিটে গেল। ফুরিয়ে গেল। এই সেদিন ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, গুটিগুটি কলেজে যাচ্ছে, কত স্ফূর্তি ওর! কত রঙিন স্বপ্ন! এরই মধ্যে, এত তাড়াতাড়ি—হায় ভগবান! চোখের জল চাপতে চাপতে, মুছতে মুছতে দরজাটা বন্ধ ক'রে তিনি হয়তো নেকড়ার পট্টিটা খুলে নেন। একটু শান্তি পাক্ বাসু, বাসু তার!

বাসন্তী তখন হাঁপাচ্ছে, নেতিয়ে পড়েছে, মা যে আবার জামাটা গায়ে দিয়ে দেন ওর তাতে কোন অনুভূতি নেই। স্থবির, বোধ নেই, জ্ঞান নেই, তারপর ঢলে পড়ে নিদ্রার গর্ভে। গভীর নিদ্রা, পরদিন ভোর পর্যন্ত, একটানা।

না, মা আজ আর অ্যান্টিফ্লোজিষ্টিন আনলো না, হয়ত ভুলে গেছে। বুড়ো হলেন তো, কতো কাজ!

বাসন্তী হাতের কাছের বইটা কুড়িয়ে নেয়। পড়তে মন ওর চায় না। বিকেল বেলাটা আর নাই বা পড়লো, ক্ষতি কি? সমস্ত দিনই তো গিলছে—উপন্যাস আর গল্প। কী রাবিশই আজকাল লেখা হয়—ছাপা হয়, কেনা হয়—পড়াও হয়। সকলেই অসুস্থ হ'য়ে উঠলো নাকি ওর মতো!

ছ'টা বাজলে দাদা অফিস থেকে ফিরবেন। মনের আনন্দটা আবার জমে উঠতে থাকে। বাসন্তীর খুসী-খুসী মনে হয় নিজেকে, ভাল লাগে। কিন্তু না, দাদার সাথে তার সে বন্ধুগুলোও ত আবার আসতে পারে, কয়দিন তো এলো। প্রায়ই আসে, ছ'সাতজন পালা করে করে। সব বন্ধু—কেউ কলেজের, ইউনিভার্সিটির, অফিসের এমনিতে মুখ চেনা, পরগাছা যতসব! হয়ত ওর দাদাকে তারা খুব ভাল বাসে, অভিন্ন হৃদয়, সে সূত্রে তার বোনকে দেখতে আসা কোন অন্যায় নয়, শুনতে ভাল, দেখতেও।

ওর দাদা তো ভাল মানুষ। বন্ধুদের ঠিক ঠিক চেনে না বা সে বিশেষ দিক থেকে বিচার করে না। না হ'লে তাদের সে তার ছোট বোনকে দেখাতে আনতো না। ভাবে ওরা কত খোলামেলা, তার বোনের অসুস্থতা সম্বন্ধে এতো উদ্‌বেগ প্রকাশ করছে, আগ্রহ দেখাচ্ছে, ওর মনটা ভালো লাগে তাতে; আর তাইতো সে নিয়ে আসে বন্ধুদের বাসন্তীর কাছে—ওর রোগ নিয়ে আলোচনা করে। আর খুসী হয় আন্তরিকতায়।

কিন্তু বাসন্তী তো জানে তারা কি? নির্মলের সাথে দু'চার কথার পর তারা বাসন্তীর দিকে তাকায়, খালি চোখে, চশমার ভেতর দিয়ে। পা থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল অবধি দৃষ্টিটা বুলিয়ে নেয়। ঘাড়, গলা, বাহু—দেহের অনাবৃত অংশগুলোতে আটকে থাকে। চাদর-ঢাকা বুকের দিকে তাকায় অনেক আশা নিয়ে—চোখগুলো ছুঁচালো হয়—কোথায় সে যৌবনের উদ্যত স্বাক্ষর, স্তূপীকৃত মাধুর্য, নিরাশ হয় তারা, রোগী ব'লে রেহাই নেই বাসন্তীর, বাসন্তী মেয়ে তো? তাকে বন্ধুরপাত্রী হতে হবে। যুবক মাত্রই এরকমটা করে থাকে—বাসন্তীর এখন তাই ধারণা। কলেজের অধ্যাপকে আর সওদাগরী অফিসের ছাপোষায় কোন তফাৎ নেই এখানে। একই 'মটোর' তাদের চালাচ্ছে।

বাসন্তী মাঝে মাঝে ভাবে, ওর খুব ইচ্ছে হয়, এ লোকগুলো যখন সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে ওর দেহকে পরীক্ষা করতে থাকে, উঁচু-নীচু কোন্ সংযোগ দৈর্ঘ-প্রস্থ—ও যদি পাষাণ হয়ে যায় তাদের দৃষ্টি পড়ামাত্র—খুব মজা হয় তা'হলে, লোকগুলো খুব ঠকে যাহোক্। বাসন্তীর মনটা অবশ্যই সক্রিয় থাকবে, না হ'লে কি করে দেখবে ও. এ মজা। কিন্তু তাকি সম্ভব? পাগলামো চিন্তা যত সব। আসন্ন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে বাসন্তী আবার হাসে।

বাসন্তী প্রথম প্রথম খুব লজ্জা পেত, সংকুচিত হতো, জড়সড় হ'য়ে পড়তো দাদার বন্ধুদের দৃষ্টির সামনে। এখন আর তা হয় না, অভ্যস্ত হ'য়ে গেছে, ঢাকবার যার কিছুই নেই, খোলাখুলিই যে অপাংতেয়, লজ্জা তার ভূষণ নয়, বিড়ম্বনা, ওর তো যৌবন নেই—সৌন্দর্য নেই—স্বাস্থ্য নেই—যুবকদের ওর ভয় কিসের। বাসন্তী কেউ এলে এখন তাই অচপল থাকে। শুধু রোগের জন্য আসাটা ও পছন্দ করতে পারে না। কিন্তু উপায় নেই। ওকে দেখা সাঙ্গ করে তারা মত জানায়; প্লুরেসীস কী রকম সাংঘাতিক রোগ; ভাল চিকিৎসা না হলে কি হতে পারে। কুমুদ শংকরকে একবার দেখালে পার নির্মল or Dr. Roy'র সাথে এখনও কনসাল্ট করোনি!' ইত্যাদি। বন্ধুরা নির্মলের সামর্থ না জানে এমন নয়। তারা জানে নির্মল সওদাগরী অফিসে ওভারটাইম নিয়ে টিয়ে তিন শো'র কাছাকাছি বেতন পায়। বাড়ি ভাড়া—হোক না টালিগঞ্জের দেড় কামড়া, সংসার খরচা বাদে কত টাকা বোনের চিকিৎসায় ব্যয় করতে পারে। সংসার খরচে কি রকম টাকা লাগে বাসন্তী তা জানে। অসুখের আগে ওর হাতেই ত সব টাকাকড়ি থাকতো, সব জানলেও বন্ধুরা মজলিশে সব ভুলে যায়। অর্থাৎ চায়ের দোকানটা বাসন্তীদের ঘরে উঠে আসে। সেখানকার রাজাউজীর বধটা শুধু অন্যরূপ নেয়। এদের কথাবার্ত্তা শুনে নির্মল খুব অসহায় বোধ করে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আর হয়ত ভাবে ওর স্নেহের বাসুর উপযুক্ত চিকিৎসা করতে পারছে না টাকার অভাবে, এজন্য দায়ী ও নিজে। বাসু, ওর কত আদরের বাসু দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে। ও যোয়ান সুস্থ সমর্থ মানুষ হয়ে কিছুই করতে পারছে না। মুখখানা নির্মলের ঘোর অন্ধকার হতে থাকে; বন্ধুদের আর একটা ট্যুইশানি দেখে দিতে বলে। টাকা, টাকা চাই তার বাসুকে বাঁচাতে। আর বলে একটা খোলা-মেলা বাসার কথা।

বাসন্তীর রাগ হয়, ভয়ানক রাগ হয়, লোকগুলোর উপর। ভাল মানুষ দাদাকে ও রকম, অন্যায় রকম, ভাবিয়ে তোলার জন্য। দাদাকেও সে রোগী বানাতে চায় না, মানুষ তো সে, মেশিন নয়। চিকিৎসা বাসন্তীর আর কত হবে, খুব হচ্ছে। যথেষ্ট হচ্ছে, লোকগুলোর আসা বন্ধ করা দরকার। জঞ্জাল যত সব!

"বাসু, কেমন আছিস্?" নির্মল আসে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর। কিছু ফল আর চার পাঁচখানা বই রাখে ওর বিছানার পাশে। যাক্ আজ আর কেউ আসেনি দাদার সাথে।

"ভাল আছি" আনন্দে উঠে বসে, হাতে ক'রে বইগুলো দেখে।

"সব যে নূতন বই, দাদা!" নির্মল সাধারণত এর-ওর কাছ থেকে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বই আনে, সব পুরনো।

"আনলাম তোর জন্য বাসু, ক'খানা বই" দাদা শুধু দিন রাত কি ক'রে বাসুকে খুসী করা



যায় সে তালেই আছেন, বাসন্তীর খুসী-খুসী মুখখানার দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে পাশের ঘরে—এঘরের কাঠের পার্টিশান্ দেওয়া অন্য অংশটায়, যেখানে নির্মল থাকে—গিয়ে পাঞ্জাবীটা ছেড়ে আসে। বাসুর ঘরটা একটু গোছায়। বাসন্তীর খুব লজ্জা লাগে। মা'র নজরে পড়ে না এসব কাজ, ওর তো পড়ে। নির্মল দড়িতে-শুকোতে-দেওয়া জামা-কাপড় সরিয়ে নেয়—ঘরে আলো-হাওয়া খেলা দরকার, ফুলদানীর শুকনো ফুলগুলো ফেলে দেয়। এটা এখানে রাখে, ওটা সেখানে।

নির্মল বলে, "আজ আবার কল্যাণ আসবে রে।" কল্যাণ ডাক্তার। দাদার বন্ধু কলেজ-আমল থেকে! বাসন্তীকে গোড়া থেকে দেখছে। এক পয়সাও ফি নেয় না নির্মলের কাছ থেকে। ভাল ছেলে। পাশ করে নূতন প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করেছে। পশার হচ্ছে একটু একটু। কল্যাণের দৌলতেই নির্মল এখনও বাসন্তীর চিকিৎসা চালাতে পারছে। ওদের ভেতর একটা নির্বাক বোঝাপড়া হ'য়ে গেছে যেন। ওর কাছে থেকে ভরসা পেয়েই বাসন্তীকে কোলকাতা রাখা হয়েছে।

"আর একটু বাদেই আসবে, আসার সময় আমি দেখা করেছিলেম" বলতে বলতে নির্মল বাসন্তীকে বসিয়ে দেয় পিঠে দু'টো বালিশ গুঁজে।

"আজ কাল একটু ভাল ফিল্ করিস্ না?"

"দাদা, তুমি এত নার্ভাস হচ্ছ কেন? ছ'মাস ধরে তো এই আছি।"

"তার জন্যই তো···!" নির্মল বাসন্তীর পাশে বসেই একটা বই-এর পাতা ওলটাতে থাকে। বাসন্তী বসে বসে ওকে দেখে। ইচ্ছে হয় বলে কলেজের মেয়েগুলো ওর ছবি দেখে কি রকম করেছিল। দাদা তাহ'লে খুব হাসবে যা হোক্। বা ভাবে, কপাল থেকে ওর চুলগুলো সরিয়ে দেয় সুন্দর মুখখানা যাতে স্পষ্ট দেখা যায়।

একটু বাদেই কল্যাণ ডাক দেয় নীচ থেকে। নির্মল নেমে যায়, সাথে ক'রে নিয়ে আসে কল্যাণকে। নির্মলকে অত্যন্ত বিনীত দেখায়।

অনেক্ষণ ধরে কল্যাণ বাসন্তীকে পরীক্ষা করে। নিয়মমাফিক নানারকম প্রশ্ন করে। ষ্টেথস্‌কোপ লাগায় বুকে, পাশে, পিঠে, হয়তো অনেকক্ষণ ধরেই। ডাক্তারেরও নেশা লাগতে দোষ নেই। উত্তাপ দেখে। যে যে অষুধ ব'লে গিয়েছিল তা কেনা হয়েছে কিনা, 'ডায়েট' ঠিক মত হচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ইন্ টো টো মানা হচ্ছে" নির্মল ব্যগ্র উত্তর দেয়।

"আর একটা প্লেট নাও, নির্মল। লেফ্‌ট্ লাংজটা সামান্য এ্যাফেকটেড্ হয়েছে; শ্রিওর হওয়া দরকার। ও তেমন কিছু নয়—জল জমতে পারেনি। পাম্পিং-এর হাঙ্গামার দরকার হবে না"।

"নেবো আর একটা প্লেট তাহ'লে"।

"আই গ্যারেন্টি, বাসন্তী আর একমাসের ভেতর সেরে উঠবে।" কল্যাণও ওকে বাসন্তী বলেই ডাকে। ডাকুক না; মেলামেশাটা সরল হয়।

কল্যাণ হাত ধোয় সাবান দিয়ে। নির্মল জল ঢালে। বাসন্তীর গায়ে ময়লা নাকি? শুধুই

তো হাতটা ধরেছিল একটুক্ষণ। তার জন্য এতো! ডাক্তারেরও ভয়! বাড়াবাড়ি নয় কি? একদিন ছিল ওর হাতটা ধরতে পারলে কতজনা···কিন্তু থাক্ তা; ওতো অসুস্থ এখন। খারাপ রোগ ওর।

হাত ধুয়ে এসে কল্যাণ কিছুক্ষণ বসে। টুকিটাকি গল্প করে নির্মলের সাথে, বাসন্তী সাথেও।

"আর কি বাসন্তী, সেরে উঠলে বলে। খুব স্ফূর্তি লাগছে, না?"

বাসন্তী হাসে। অনেক কষ্টে হাসে।

"ওকে এতো বই পড়তে দিও না (নির্মলকে), খুব বেশী বই পড়ো না তুমি (বাসন্তীকে), এ্যাফেকটেড্ হয় কিনা ঘুম, বিশ্রাম—বিশেষত সিরিয়স কোন কিছুতে, লভ বা এ্যাড্ভেঞ্চারাস্ কোন কিছু (দুজনকেই)। তোমার বোধহয় ওরকম বই না হ'লে পড়তেই ইচ্ছে হয় না, না বাসন্তী?" আর একটা সিগার জেলে কল্যাণ উঠে পড়ে। নির্মল তাকে এগিয়ে দেয়। মা রাতের খাবার খাইয়ে বাসন্তীর সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'ন।

এ চলেছে, কম বেশী, টানা ছ'মাস ধরে। বাসন্তীর রোগে যতটা নয় দৈনন্দিন এ-একঘেয়েমীতে তার চেয়ে অনেক বেশী ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে।

নির্মল খেয়ে দেয়ে অপেক্ষা করে, সে বন্ধুটির—যে একমাত্র লোক বাসন্তীদের বাসায় আসে কিন্তু বাসন্তীর ঘরে যায়নি, অহেতুক কৌতূহল বা উৎকণ্ঠা দেখায়নি তার রোগ সম্বন্ধে—আসে, ছোট্ট একটি ডাক দেয় নির্মলকে, তারপর দুই বন্ধুতে দাবা খেলতে বসে—রাতের অনেকক্ষণ অবধি। খেলায় নাকি অদ্ভুত ওর কৃতিত্ব। অশোক ওর নাম। বাসন্তী যেতে-আসতে ওকে দেখেছে। পাতলা ছিপছিপে গড়ন, চোখে পুরু কাচের চশমা, কিছুক্ষণ পরে পরেই বাঁ হাত দিয়ে চশমাটা নাকের উপর ঠেলে দিচ্ছে। ওটা বোধহয় অভ্যাস। চুল সব সময় অবিন্যস্ত। স্বল্পভাষী, গম্ভীর প্রকৃতির।

ওর নাকি ভাল একটি লাইব্রেরী আছে। নির্মল ওর কাছে একদিন বই চেয়েছিল বাসন্তীর জন্য। তারপর থেকে প্রায়ই অশোক বই আনে 'বাসন্তীর জন্য', নিজের পছন্দমত। বই শেষ হলে 'বাসু' দাদার ঘরে পাঠিয়ে দেয়, অশোক বুঝতে পারে বই আনতে হবে।

বই দেওয়া নেওয়াতে ওদের একটা অনুক্ত বোঝাপড়া হয়ে গেছে।

দু'জনের মনের সুরটি মিলেছে এখানে।

দাদার বন্ধুদের ভেতর ওকেই, একমাত্র অশোককেই, বাসন্তীর ভাল লেগেছে। অথচ আশ্চর্য, তাকে সে কোনদিন সামনাসামনি দেখেনি, বাক্যালাপ হয়নি। ওযে রুগ্না তা জেনেও সে আসেনি। ও বোধহয় বাসন্তীরই মত মনে করে আসার জন্য অসুখটা কোন উপলক্ষই নয়। আর কথা? না বলেও তো বলেছে ওরা।

বাসন্তীর মনটা ওকে নিয়ে ভাবতে ক্লান্ত হয় না। বরং উৎসাহ পায়। আনন্দ পায়। ওকি করে, কোথায় থাকে, আরও দু'চারটে প্রশ্ন দাদাকে ওর জিজ্ঞেস করতে খুব ইচ্ছে করে; কিন্তু লজ্জা লাগে ওর। দাদা কি ভাববে। খুব অসভ্যতা হবে সেটা। একদিন ও এলেও তো পারে। বাসন্তী কি আর রাগ করবে, কত জনাই তো আসে। দু'চারটে কথা বলা···এর নাম যদি হয় ভালবাসা, বাসন্তী ভাবে, তাহ'লে অশোককে ও ভালবাসে, ভালবাসে, ভালবাসে!



এ অনুভূতিতে বাসন্তী দিন কয়েক খুব ভাল কাটাল। সূর্যের প্রথম আলোকে ফুলের মত নিজকে বিকশিত করে দিল। খুসী আর খুসী। হাতের কাছের সব বই পড়ে শেষ ক'রে ফেলল। কেননা, তাহ'লেই আশোকের কাছ থেকে বই পাওয়া যাবে। যাতে অশোকের পরশ থাকবে! যে বই অশোক ওর জন্য পছন্দ ক'রে দেবে, হাতে ক'রে আনবে ওদের বাড়িতে।

অশোক কিন্তু এলো না। দ্বিতীয় দিনে নয়—তৃতীয় দিনেও নয়।

বাসন্তী মুষড়ে পড়লো, ভেঙে পড়লো। অশোক এলো না!

যেটুকু ওর স্বাস্থ্যে ভাল লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, তা বিগড়ে গেল। সকাল বেলা উঠে ধুঁকতে আরম্ভ করে, নিদ্রায় তার সমাপ্তি হয়। নির্মল উদ্বিগ্ন হলো, আত্মীয়ারা শংকা জানিয়ে গেলেন। এক্সরে প্লেট নেওয়া হলো। কল্যাণ এসে গম্ভীরভাবে বলে গেল: "খুব বেশী স্টেন পড়েছে, পড়াশুনা নিশ্চয় বেশী করেছে—না হ'লে—। বাসন্তী, তুমি এত মরোজ হ'য়ে থাকো কেন? যেন মরার শোক চোখে মুখে! অত কি ভাবো বলো ত? সব সময় চীয়ারফুল থাকবে, বুঝলে।"

কল্যাণ খসখস করে প্রেসক্রিপশান লিখছিল আর বাসন্তী ভাবছিল অসুখ না অশোক! যে ওর কাছে প্রত্যক্ষ কল্পনায়, মানসপটে!

চতুর্থ দিনে এলো অশোক যখন বাসন্তীর মনের উত্তাল ঝড় তার অসুখকে বাড়িয়ে তুলেছে। নির্মল অফিস থেকে ফিরে কল্যাণের কাছে গেছে। মা ঘরের কাজে ব্যস্ত।

নির্মলের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অশোক ডাকলো, "নির্মল আছো?"

বাসন্তী আধশোয়া হ'য়ে ধুঁকছিল, গলার স্বর শুনে একঝলক রক্ত ওর মুখে, সমস্ত দেহে বন্যার জলের মতো ছড়িয়ে পড়লো, অশোক এসেছে!

বাসন্তী উঠে পড়লো—ছ'মাস ধরে সে অন্যের সাহায্য ভিন্ন দু'পা হাঁটেনি—ছুটে গেল নির্মলের ঘরে, অশোককে বরণ করতে। কিছু বলতে? কিন্তু বাসন্তী তা পারলো না, সামর্থ নেই, নির্মলের ঘরের মেঝেতেই বসে পড়লো। ওর ইচ্ছায় আর সামর্থে এতো তফাৎ! সব যেন অন্ধকার হ'য়ে এলো। আঃ।

সুস্থ যখন হলো দেখে ও ওর বিছানায় শুয়ে আছে। অশোক মাথার ধারে বসে। চিন্তাকুল, উদ্বিগ্ন। হাওয়া করেছে সে।

ব্যাপারটা বাসন্তী বুঝতে পারলো—অনেক দিন অভ্যাস নেই, একটু চলা ফেরাতেই মাথাটা ওর ঘুরে গেছে। অশোক বোধহয় ওকে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছে, কতো আর ওর ওজন। সোলার মত ও। তবুও ওর লজ্জা হলো ভেবে যে, অশোক ওকে তুলে এনে শুইয়ে দিয়েছে। শাড়িটাকে ঠিকঠাক করে দিল। অশোকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামালো।

"কেমন লাগছে এখন?" অশোক বলল।

"ভালো।"

"অমন ভাবে ও ঘরে আপনার ছুটে যাওয়া ঠিক হয়নি। আরও কিছুদিন না গেলে তো আপনি বেশী হাঁটা চলা করতে পারেন না।"

"আমি অসুস্থ বলে?"

"অবশ্য অসুস্থ আপনি আর নন্। সেরেই গেছেন। আর একটু, তাহলেই স্বাভাবিক মানুষ আপনি।"

"সারবো আমি?"

"নিশ্চয়, সারতে যে আপনাকে হবেই।"

বাসন্তী ভাবলো: কি সুন্দর কথা 'সারতে যে আপনাকে হবেই', কেউ আর এমন ক'রে তো বলেনি। তাহ'লে সারবে ও।

অবস ডান হাতখানা তুলে বাসন্তী অশোককে হাওয়া করতে বারণ করলো। হাতখানা আবার পড়ে গেল বিছনার উপর।

নিস্তব্ধতায় কাটলো কিছুক্ষণ, বাসন্তীর প্রিয় রোদটুকু এসে ঘরে ঢুকলো; কিন্তু তা উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থা তার আজ নেই।

"একটা কথা বলবো।"

"বলুন"।

"রাগ করবেন কি আপনার হাতখানা যদি একটুক্ষণ ধরতে চাই?"

অশোকের কথাগুলো খুব খারাপ শোনাল না, অন্তত অশ্লীল নয়। বাসন্তীর তাই মনে হলো, বাসন্তী তাই কোন কথা না ব'লে ডান হাতখানা এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলো।

অশোক হাত বাড়িয়ে বাসন্তীর হাতখানা ধরলো, বৃহৎ মুঠোর ভেতর বাসন্তীর সম্পূর্ণ হাতখানা সে পুরে নিল।

বাসন্তী এক মুহূর্ত উপলব্ধি করলো অনুভূতিটা, তার মনে হলো অশোক যেন তার সম্পূর্ণ সত্তাটাকে —এই দেহ, এই মন, এই রোগ, তার কুমারীত্ব, সব, সব কিছু—তার মুঠোর ভেতর পুরে নিয়েছে। 'হায়, সে কী সুখ।' অনেকক্ষণ ওরা কথা কইতে পারলো না। সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো। অবাক বিস্ময়ে ওরা উপলব্ধি করলো দু'জনকেই দু'জন।

তারপর অশোকের মুখখানা এগিয়ে এলো। বাসন্তী বিহ্বলতায় আঁখি মুদ্রিত করলো, ওর পাণ্ডুর অধরে চাপ লাগলো আর অশোকের ওষ্ঠের উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়লো ওর সমস্ত শরীরে, প্রতি রক্তকণিকায়। আশ্চর্য, সেদিন থেকে বাসন্তী ভাল হ'তে আরম্ভ করলো, আশাতীত আরোগ্য লাভ করলো প্রথম মাসে। দ্বিতীয় মাসের শেষে সে সম্পূর্ণ একজন সাধারণ মেয়ে—যার নাম মিস্ বাসন্তী রায়। সে স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে, গায়ের রঙ-এ আর ফ্যাকাসে ভাবটা নেই। সেখানে উজ্জ্বলতা এসেছে, শরীরে লাবণ্য, চলায় ছন্দ। রুক্ষ কেশ এখন কবরীর অপেক্ষা রাখে। সবার চেয়ে প্রয়োজনীয় যা—প্রাণ প্রাচুর্য তা যেন দ্বিগুণ লাভ করেছে বাসন্তী। মোটের উপর বাসন্তী, এখন সুশ্রী, সুকুমার একটি যুবতী।

সেদিন সকাল বেলা স্নান ক'রে বাসন্তী তার নীল শাড়িখানা পরলো, ম্যাচ করে জামা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করতে করতে ভাবলো: ওর এ আরোগ্য কে যেন জানলো না, দেখলো না কে যেন ওর এই বিকশিত রূপ! 'প্রস্ফুটিত বাসন্তী' নামটা তার বাসন্তীর মনে পড়তেই, মনেই ছিল যদিও; মুখে হাসি খেলে গেল, চোখেও। আয়নায় সে প্রতিবিম্ব পড়লো। বাসন্তী শিউরে উঠলো, কেঁপে উঠলো আনন্দে।



খুব পরিপাটি করে বাসন্তী প্রসাধন করলো, যে সম্বন্ধে তার খ্যাতি ছিল। তারপর দীঘল চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে ভাবলো অশোক এলে আজ কি মজাই হতো। প্রথমটায় সে হয়তো চোখকে তার বিশ্বাস করতেই পারতো না। বেতসের মত সেই বাসন্তী! রাঙা ফুলের পাপড়ির মত বাসন্তী!

অশোক কতদিন আসে না, সেই সে দিনের—'

অশোক হয়তো ওর দিকে তাকিয়ে থাকবে আর ভাববে: এই সে বাসন্তী! যাকে সে—'

'আজ কেন আসছো না?' অশোককে উদ্দেশ্য করে বাসন্তী মনে মনে বললো। 'কী এমন কাজ তোমার? আমাকে একবার দেখেই যাও?'

তারপর অশোক যদি ওকে একবার বেড়িয়ে আনতে চায়—ময়দানে, মাঠে, পার্কে বা সেই পুরোনো লেকে তাহ'লে নিশ্চয় বাসন্তী আজ আপত্তি করবে না। উঃ কতদিন বাইরে যায়নি বাসন্তী!

বেড়িয়ে ফেরার পথে অশোক যদি তাকে কোন ছবি দেখাতে চায় বা নিয়ে যেতে চায় কোন কফি হাউসে তাহ'লে বাসন্তী কি তাকে মানা করবে? করবে না।

বাসন্তী তো অশোকের কোন কথা অমান্য করবে না, সে কি পারে তা? কফি হাউসে পেয়ালাতে হালকা চুমুকের ফাঁকে ফাঁকে সে কথাটা বলবে তাকে বাসন্তী যা সে এতদিন ধরে, দীর্ঘদিন ধ'রে সঞ্চিত করেছে, উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে। যা মন নিঙড়ানো, প্রাণ নিঙড়ানো, যার কোন ভাষা ছিল না তার এতদিন। আজ ভাষা তার মুখের কাছে এসে থমকে আছে, স্ফুটোন্মুখ। বাসন্তীর মনটা তাই খুব খারাপ হয়ে গেল। এমন দিনে অশোককে না পেয়ে, মনের চাঞ্চল্যটুকু চিরুণীর দ্রুত সঞ্চালনার ভেতর মিলিয়ে দিতে চাইলো।

নির্মল ঘরে এলো, তার অফিসের বেলা হয়েছে।

—"দাদা—" বাসন্তী আর বলতে পারে না, গলা কে যেন ওর চেপে ধরলো শক্ত মুঠোতে। কান দু'টো লাল হ'য়ে উঠতে থাকে।

"কী রে—"

"তোমরা—তুমি এখন আর দাবা খেল না তোমার বন্ধুর সাথে?

"কেন রে—?"

"তোমার সে বন্ধু আর আসে না কেন?" বাসন্তী মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। নির্মল বোধহয় কিছুটা বুঝতে পারে।

"না, অশোক তো আর আসবে না, সে—সে তো আত্মহত্যা করেছে—একমাস আগে তার লেবরেটরিতে বিষ খেয়ে। ওর এমনিতেই মাথায় বেশ ছিট ছিল—দেখিস্‌নি—আমি কত সাবধানে থাকতাম, ও এলে তোর ওখানে যেতে টেতে দিতাম না—"

নির্মল আর বলতে পারলে না, বাসন্তীর উচ্ছ্বসিত কান্নায় বাধা পেল। বাসন্তী পড়ে যাচ্ছিল, নির্মল তার মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিল। সান্ত্বনা দিতে পারলোনা। বাসন্তী ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো—অনেকদিন পর, বড় হয়ে এই প্রথম। বিনিয়ে বিনিয়ে, চোখের জল মাখিয়ে-মাখিয়ে—আর কি যেন বলতে চেষ্টা করলো, কিন্তু বিকৃত একটা শব্দ ছাড়া কিছুই বোঝা গেল না।

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

(২)

আস্তে আস্তে সময় কাটতে লাগলো। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। প্রমীলা কিন্তু সত্যিই আর ফিরে এলো না শ্বশুর বাড়িতে। হিরণ্ময়ী অবিশ্যি চুপে চুপে খবর পাঠালেন কয়েকবার আসবার জন্য। বুঝিয়ে পটিয়ে চিঠিও লিখলেন দু'একখানা। কোনো সাড়া এলো না ও পক্ষ থেকে। লোকমুখে শোনা গেল ওদের আত্মীয়-স্বজনরা বলাবলি করছে অমন দজ্জাল শাশুড়ি আর দুশ্চরিত্র স্বামীর ঘরে মেয়ে দেওয়ার চাইতে যজ্ঞেশ্বর ওকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিলো না কেন।

ততদিনে হিরণ্ময়ীর মেজ ছেলে আই. এ. পাশ করলো, ছোটোটি ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠলো, আর বিয়ে হয়ে গেলো একমাত্র মেয়ের। বিয়ের সময় হিরণ্ময়ী আরেক প্রস্থ চেষ্টা করলেন, লজ্জা তো তাঁরই। দুঃখও তাঁর। এভাবেই জীবন কাটবে নাকি সুনির্মলের? তাছাড়া লোকেরা কানাকানি করে, বিশ্রী লাগে ভাবতে। এ বিষয়ে হিরণ্ময়ীর মনের জোর নেই। প্রথমে ছাপানো নেমতন্ন চিঠি পাঠালেন, তারপর হাতে চিঠি লিখে লোক পাঠালেন নিয়ে আসবার জন্য। যজ্ঞেশ্বর ব'লে পাঠালো, 'ও বাড়ির মুখ দেখতে আর কোনদিন যাবে না তার মেয়ে। একটা মেয়ে কেন, ওরকম দশটা মেয়ে থাকলেও যজ্ঞেশ্বরের কোনো ভাবনা ছিলো না, যজ্ঞেশ্বরের টাকা তো আর রাজেনবাবুর মতো নির্দিষ্ট মাসোহারা নয়, ভাড়াবাড়িতেও তার জীবন কাটে না। সুনির্মল বললো—'হ'লো?' হিরণ্ময়ী বললেন, 'হ'লো।'

হ'লো বৈকি। যা করবার, যতদূর করবার তাতো করলোই। এবার শান্ত হ'লো তাঁর বিবেক। অস্বস্তি দূর হ'লো। সঙ্গে সঙ্গে মনের সংগোপনে আবার আর একটি ইচ্ছার কুসুমও কুঁড়ি হ'য়ে দেখা দিল। প্রমীলা যদি না-ই আসে তা হ'লে আর কী করতে পারেন তিনি! তবে কেন আর মনের কাছে হাত জোড় ক'রে থাকা? লোক নিন্দা? কী এসে যায়? নিজেকেই নিজে যুক্তিতর্কে ঘায়েল করলেন। ছেলের আবার আমি বিয়ে দেবো। স্ত্রী-পুরুষের মিলিত জীবনের যে কত আনন্দ, কত মধুরতা তা-কি সুনির্মল জানবে না কোনো দিন? এই একটা বুদ্ধিহীন, নির্মম, মূর্খ মেয়ের কাছে বলির পাঁঠার মতো উৎসর্গীকৃত হ'য়ে থাকবে? ঈশ! অসম্ভব। তিনি বেঁচে থাকতে অমন ক'রে তাঁর সন্তানের আশা আকাঙ্ক্ষার উপর মূর্তিমান সমাধি হ'য়ে তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেবেন না তাকে। ওকী? ওকি একটা মানুষ? ওর সঙ্গে একজন বুদ্ধিমান মানুষের কি কোনো সম্পর্ক হ'তে পারে—যার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না, মিলন হয় না, প্রেম-বিরহ কিছুই হয় না। বিশেষত তাঁর ছেলে, বিদ্যায়, বিনয়ে, শিক্ষায়, সুরুচিতে যে ছেলে দশজনের একজন, যে-কোনো মেয়ের তপস্যার ধন যে ছেলে—তার জীবন নাকি কাটবে এই একটা ব্যর্থ নিরস মৃতভার বহন ক'রে?



ভেবেচিন্তে নিরালা নিভৃতে অবকাশমতো মনের কথাটা তিনি স্বামীকে বললেন একদিন। সংসারের কোনো বিষয়েই কোনো হস্তক্ষেপ ছিলো না এই ভদ্রলোকটির, একটিমাত্র ব্যাপারে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যর্থ হ'য়ে তিনি যেন আরো গুটিয়ে গিয়েছিলেন, স্ত্রীর কথা শুনে তখন চুপ করে রইলেন, কেবল নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করলেন মাত্র।

স্বকৃত অন্যায়ের জন্য দুঃখ লজ্জা দুই-ই পীড়িত করছিলো তাঁকে। তাঁর সদানন্দ মনে সুখ ছিলো না এ ব্যাপারটা নিয়ে। এক স্ত্রী বর্তমানে আবার বিবাহ—এর চেয়ে বিসদৃশ আর কিছুই তিনি ভাবতে পারেন না। কিন্তু নীতিতে আটকালেও পুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবে স্ত্রীর ইচ্ছেটা আভাসে ইঙ্গিতে শেষ পর্য্যন্ত সমর্থনই করলেন বরং। আর সেই অনুমোদনের আভাসটুকু পেয়েই সুনির্মলের মা একেবারে উঠে পড়ে লেগে গেলেন কাজে। কিন্তু এ বিষয়ে সুনির্মলের সঙ্গেও তো তাঁর কথা বলা দরকার?

মনোমতো মেয়ে মনে মনে জানাই ছিলো তাঁর। মনে মনে এত বিশ্বাস ছিলো, সুনির্মলের সেখানে আপত্তি করবার কোনো কারণ নেই, যদি না আবার বিয়ে করতে রুচিতে আটকায়। এই স্ত্রী নিয়ে সে সুখী হবে, এই তার যোগ্য সঙ্গী। এই মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে নিজেদের অপরিণামদর্শিতার ফলে যে দুঃখ তাঁরা ডেকে এনেছেন, ছেলের জীবনে সে ক্ষতির শতগুণ পূরণ ক'রে দিতে পারবেন হিরণ্ময়ী।

অত আগেই বলা কওয়ার দরকার কী? বিবেচনা করলেন মনে মনে—তার চেয়ে ভালোভাবে একটু আলাপ সালাপ করুক না ওরা। পরস্পরকে পরস্পর জেনে নিক্ ভালো ক'রে। মেয়েটিরও তো একটা দিক আছে? সেই-বা কেন একজন বিবাহিত ছেলেকে চট ক'রে বিয়ে করতে চাইবে, যদি না তার যথেষ্ট জোরালো কারণ থাকে। দূরের তো কেউ নয় যে ঘন ঘন দেখাশুনোয় একটা মস্ত অসুবিধে হ'তে পারে। সুনির্মলের পিসতুতো বোনের ননদ।

সুনন্দ, অর্থাৎ সুনির্মলের ভগ্নিপতির টুরের চাকরী। আজ এখানে কাল সেখানে ক'রেই তাদের দিন কাটে। মা বাপ নেই, ছেলেপুলে নেই, এই একটিমাত্র বোনই দখল ক'রে আছে স্বামী স্ত্রীর আদরের জায়গা। সেও ঘোরে দাদা বৌদির সঙ্গে সঙ্গে। দশ বছর বাদে আবার ঘুরে ফিরে কলকাতা। 'মাসীমা, পৃথিবীটা গোল' দেখা হ'তেই সুনির্মলের বোন পায়ে ধুলো নিতে নিতে হেসে বলেছিলো কথাটা! আর তিনি তাকিয়েছিলেন তার ননদের উনিশ বছরের পরিপূর্ণ যৌবন দীপ্ত মুখের দিকে। উনিশ না কুড়ি? এই তো একফোঁটা ছিলো সেদিন, রোগা, কালো, ছোট্ট এইটুকু একটা গুড়গুড়ি। এতো বড়ো হয়েছে? এতো সুন্দর হয়েছে? ময়লা মেয়ে সুন্দর হয় না এমন মিথ্যে আর যেন কেউ মুখে না আনে শকুন্তলাকে দেখবার পরে। লাবণ্যের আধার। চলনে-বলনে, হাসিতে-গল্পেতে লাবণ্য যেন শতধারে ঝ'ড়ে পড়ছে দেখতে পেলেন হিরণ্ময়ী।

ঠিক! কয়েকদিন পরে মনে মনে বললেন তিনি—ঠিক সময়েই ঠিক মানুষটি এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর কাছে। এখন শুধু যোগাযোগ ঘটিয়ে দেয়া।

সুনির্মলও ছেলেবেলায় অনেক দেখেছে বৈকি। কিন্তু বড়ো হ'য়ে এই প্রথম। একদিন বিকেলে

বাড়ি নিয়ে এসে আলাপ করিয়ে দিলেন ছেলের সঙ্গে, এক সঙ্গে ব'সে বিকেলের চা খেতে খেতে সুনির্মল অবাক হ'য়ে ভাবলো ছোটো মেয়েরা বড় হ'য়ে সবাই-ই এরকম বদলে যায় নাকি? ভাসা ভাসা চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে। আস্তে আস্তে জমে উঠলো চায়ের আসর। ঘরে সন্ধ্যা নামলো ঘন হ'য়ে, হিরণ্ময়ী তাদের নিয়ে ছাদে এলেন খোলা হাওয়ায়, টবের বাগানে। এ সময়টা এখানে ভারি সুন্দর, জমাট হাওয়ায় পাখার তলায় ব'সে কী লাভ? এলোমেলো হাওয়া দিলো, টবের রজনীগন্ধা আর বেলফুল গন্ধ ছড়িয়ে দিল বাতাসে।

চমৎকার কাটলো সন্ধ্যেটা। একটু রাত হ'লো, একটুখানি চাঁদ উঠলো আকাশে। একটার পর একটা পান ক'রে সকলের মনে একটি অনির্বচনীয় সুখের রেশ রেখে বিদায় নিলো শকুন্তলা।

ট্র্যামে তুলে দিতে গিয়ে সুনির্মল বললো, 'আবার এসো।'

'পরীক্ষা যে। পড়তে হয় না?'

'ভারি পরীক্ষা। ওরকম পরীক্ষার সময় আমরা অনেক আড্ডা দিয়ে বেড়িয়েছি।'

'ভালো ছাত্রদের কথা আলাদা।'

'তোমার চেয়ে তো আর বেশি নই। অত লম্বা লম্বা নম্বর আমি জীবনেও পাইনি।'

'তা কী আর। আমি বুঝি কিছু জানিনে।'

'তুমি কিচ্ছু জানো না।'

ট্র্যাম এলো।

'এসো কিন্তু।'

'আমার আসার চাইতে আপনার যাওয়া কিন্তু আরো—' কথা ডুবে গেলো, হাওয়ার ঝাপটা লাগলো মুখে, ট্র্যাম চ'লে গেলো হস্ ক'রে হাউইরে মতো।

( ৩ )

বেড়াতে এসে একদিন সুনির্মলের পিসতুতো বোন বিনু বললো, 'মামীমা, কুন্তী বলে কি জান? তোমার গায়ে নাকি মা-মা গন্ধ, আর মা-মা চেহারা। সত্যিই কিন্তু যা-ই বলো!

'আহা রে!' হিরণ্ময়ী স্নেহে গ'লে গেলেন।

'আমি তো বলিই, সুনুদাটা অমন সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে ক'রে না বসলে ঘরের মেয়ে চমৎকার ঘরে থাকতো আমাদের।'

হিরণ্ময়ী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'সুনুকে তো আমি আবার বিয়ে দেব।'

'আবার?'

'দেবো না? এভাবেই ওর জীবন কাটুক এটাই কি বলিস্ তোরা?'

'কেন, বৌদি কি আর আসবেই না?'

'না।'

'তোমরাও আনবে না?'



'আমরা আনবার কে? ওর বাপ দেবে না। তাছাড়া এনেই বা কী হবে? সবই তো জানিস্—ঐ মানুষটার সঙ্গে কি কেউ ঘর করতে পারে?'

'অসম্ভব।'

'তবে?'

মামী-ভাগ্নি দু'জনেই এর পরে চুপচাপ বসে রইলো খানিক্ষণ। হিরণ্ময়ী এবার সংকোচ ভেঙে প্রস্তাবটা তুললেন, 'বিনু, দেনা তোর ননদকে আমার কাছে, আমার ঘরে। আমি তাকে বুকে ক'রে রাখবো, আমার ঘর ভরে যাবে।'

'সে তো ওর ভাগ্য মামীমা। কিন্তু—'

'কিন্তু করিস্‌নে। সুনির্মলের এই প্রথম বিয়ে ব'লেই মনে কর না কেন? আর কেউ না বোঝে তুই তো সব বুঝিস্। সুনন্দকে রাজি করা তুই।'

'উনি হয়তো সহজেই রাজী হবেন। সুনুদাকে ওঁর ভীষণ পছন্দ। পরশুই বলছিলেন, সুনির্মলবাবুর আবার বিয়ে করা উচিত। একি একটা স্ত্রী? হাফ-উইট।

'তবে এটা ক'রে দে তুই।' ভাগ্নির হাত চেপে ধরলেন তিনি। বিনু বললো, 'সুনুদার কি পছন্দ হবে? কালো মেয়ে।'

'কালো মেয়ে? এমন সুন্দর মেয়েকে কেউ কালো বলে?'

'কালো না? আর কখনো না উঠুক, বিয়ের সময় তো উঠবেই কথাটা। পাবনা থাকতে যে বছর আই. এ. পাশ করলো মেয়েদের মধ্যে ফার্স্ট হ'য়ে, চমৎকার একটা সম্বন্ধ এসেছিলো। নিজে থেকেই প্রস্তাব করেছিলো পাত্রপক্ষ। অনেকটা এগিয়েছিলো, বলতে গেলে প্রায় হয়-হয়, হঠাৎ ছেলের মা এসে নিজে মেয়ে দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাকচ ক'রে দিলেন সব! কী? না, কালো। শেষে কি কালোজিরের বংশ হবে?'

'ভারি তো ইয়ে। অতদূর তবে এগুলেনই বা কেন?'

'কী জানি। আমরাও সে কথাই বলাবলি করলাম। আর কুন্তীর কী রাগ।'

'তুই আমাকেই দে ওকে। ওকে দেখে থেকে আমার মন ভ'রে গেছে স্নেহে। ছেলেবেলায় ও মেয়েটাকে বড়ো ভালো লাগতো আমার।

'আচ্ছা, আমি বলবো ওকে।'

ভাগ্নিকে দরজা পর্যন্ত বিদায় দিয়ে একা ঘরে কত কথাই ভাবলেন হিরণ্ময়ী, কত ইচ্ছাই আবার কচি কচি ডালপাতা নিয়ে মাথা নাড়লো তার ঠিক নেই। চারটে বাজলো, একটা আকুল মনে নিয়ে রান্নাঘরে এলেন খাবার তৈরি করতে। বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে সকলের।

৪

ভেতরে ভেতরে এর পরে সবই এক রকম স্থির ক'রে ফেললেন তিনি। রাজেনবাবুকেও বললেন। কিন্তু বলি বলি ক'রে ছেলের কাছেই উত্থাপন করতে পারলেন না কথাটা। লজ্জা করে বৈকি। আবার! একবার ব'লেই কি তাকে যথেষ্ট বিড়ম্বিত করেননি? দেখছে, শুনছে, মেলামেশা করছে,

এমনও তো হ'তে পারে যে সে নিজে থেকেই স্থির করলো একদিন, নিজে থেকেই একদিন বললো হিরণ্ময়ীকে। তা কেন হচ্ছে না? অধীর হ'য়ে ভাবলেন হিরণ্ময়ী। তবে কি এ বিষয়ে কিছু ভাবছেই না ও? তাই বা বলেন কী ক'রে? কুন্তীর উপর কি ওর কোনো উৎসুক্য নেই? কুন্তীকে দেখলে কি ওর মুখে আলো ফুটে উঠতে দেখেন নি তিনি? তাহ'লে কি সেটা তাঁর নিজের মনের বাসনারই প্রতিচ্ছবি?

বিনু বুদ্ধি দিলো, চুপচাপ থাকো। কিছু ভেবো না। আমি জানি ওরা দু'জনেই দু'জনকে পছন্দ করে। হাজার হোক এক বৌ বেঁচে থাকতে আরেক বৌ ঘরে আনবে সেটা তো ওর পক্ষে একটা মর্মান্তিক লজ্জা। সে-লজ্জা কাটাতে সময় লাগবে বৈকি একটু। অস্থির হোয়ো না, অপেক্ষা করো।' তারপর সুনির্মলের ঘরে গিয়ে বললো, 'একটা ছবি দেখাও না সুমুদা, চাকরি-বাকরি করো, না দেখাও একটা ছবি, না দাও ভালো ক'রে একটা ভোজপার্টি। কী তুমি?'

"ভোজপার্টির কর্তা তো আমি নই। ছবিটা অবিশ্যি আমি দেখাতে পারি।'

'তাই দেখাও।'

'কী দেখবে বলো।'

'যা তোমার খুশি।'

'তবে চলো না রোববারই যাই। লাইট হাউসে চমৎকার একটা ফিল্ম এসেছে।'

'বেশ!'

'বলো কে কে যাবে।'

'কে কে গেলে তুমি খুশি হও?'

'আমি তো তুমি গেলেই খুশি।'

'সত্যি?'

'মিথ্যে বলেছি নাকি?'

'তাহ'লে তোমার আমারই এনো।'

সুনন্দ যাবে না?'

'জিগেস্ ক'রে দেখতে পারো।'

'আর শকুন্তলা?'

বিনুর চোখে হাসি ঝিলিক দিলো, 'না, ও যাবে না।'

'কেন?'

'ওর পরীক্ষা আর পাঁচ ছ'মাস বাদে, এখন ছবিটবি থাক।'

'সারাদিন পড়লেই একটা মস্ত কিছু হ'য়ে যাবে বললো কে তোমাকে?'

'বারে, পরীক্ষার আগে পড়বে না?'

'পড়ুক না, তাই ব'লে সারাক্ষণ?'

'বেশ, তুমি ব'লে দেখো?'



'আমি বলতে টলতে পারবো না। কাল আপিস থেকে ফেরবার পথে চারটে টিকিট কিনে আনবো—ব্যস্। যে যাও যাবে, না যাও না যাবে।'

'মিছিমিছি একটা টিকিট নষ্ট হবে আর কি।' একটু হাসলো বিনু।

'হ'লে হবে, কী আর করা।'

'তবু তোমাকে কিনতেই হবে?'

'একটা ভদ্রতা আছে তো?'

'শুধুই ভদ্রতা?'

'না, শুধুই ভদ্রতা কেন? ও গেলে খুশিই হবো।'

'আর না গেলে সব ইচ্ছে চুকে যাবে না?' বিনু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগলো ভাইয়ের মুখ। ঠাট্টার ফলটা কী হয় জানতে কৌতূহল বোধ করলো।

কথা যে ঘুরে ফিরে কোন্ পথে আসছে তা কি সুনির্মল একমাত্রই বুঝলো? মার ইচ্ছে, বোনের ইচ্ছে, বাবার সমর্থন সবই সে জানে। কেউ না বললেও জানে। আর তার নিজের ইচ্ছে? ছিঃ। একটু গম্ভীর হ'য়ে বললো, "ইচ্ছে নিশ্চই চুকে যাবে না। কিন্তু গেলে আরো ভালো লাগতো। থাক্‌গে আমি কাল তিনটে টিকিটই আনবো।'

'না, বাপু, না। চারটেই এনো। ওরকম হাফ-হার্টেড হ'য়ে কোনো কাজ আমার ভালো লাগে না।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো বিনু। হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেলো সুনির্মলের।

( ৫ )

পরের দিন আপিস থেকে বেরিয়ে হেঁটে হেঁটে এসপ্লানেড পর্যন্ত এসে রাস্তা পার হ'লো সুনির্মল; সোজা লাইট হাউসে এসে থামলো। টিকিট ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলো একটু, তিনটে টিকিটই নেবে নাকি সত্যি? না চারটে? মনটা অবিশ্যি চারটের দিকেই ঝুঁকলো, কিন্তু বিবেক বাধা দিলো। বিনুকে সে তিনটের কথাই বলেছে, তিনটেই নেয়া উচিত। এমন সুযোগ সে কোনরকমেই তাদের দেবে না যাতে সকলের মনে এই ধারণা জন্মায় যে শকুন্তলার উপর তার কোনো দুর্বলতা আছে। অতএব তিনটেই নিলো। বুকপকেটে মানথ্‌লির ভাঁজে রেখে হন্‌হন্ করে হেঁটে বীরের মতো বড়ো রাস্তায় এসে দাঁড়ালো সে। অসংখ্য যানবাহনের স্রোত ব'য়ে চলেছে, অসংখ্য মানুষের মিছিলে চৌরঙ্গী সমাকীর্ণ। আবার রাস্তা পার হ'তে হবে? সুনির্মল ঘাম মুছলো কপালের, তারপর বাসষ্ট্যাণ্ডেই দাঁড়িয়ে থাকলো চুপ্‌চাপ। সব উৎসাহে এই মুহূর্তে যেন জল ঢেলে দিয়েছে কে। আপিসে ব'সে, আপিস থেকে বেরিয়ে, এমন্ কি লাইট হাউসের টিকিটের ঘুলঘুলির কাছে দাঁড়িয়ে পর্যন্তও তো অনেক উৎসাহ ছিলো, হঠাৎ কী হ'লো? আজ শনিবারের বিকেল, কাল রবিবার, রবিবারের দুপুরে সহরের সবচেয়ে ভালো ঘরে, ভালো আসনে ব'সে একটি বিখ্যাত ছবি দেখবে এই আশাতেও কোনো উত্তেজনা নেই কেন? উল্টোদিকের মাঠের দিকে উদাসভাবে তাকিয়ে রইলো, মনের কাছে এ প্রশ্নের কৈফিয়ৎ দিতে আজ পারে না সুনির্মল।

কপাল ভালো। তক্ষুনি প্রকাণ্ড দোতলা বাস্ এসে থামলো পায়ের কাছে। সব ভাবনার ছুটি। শরীরটাকে দুমড়ে মুচড়ে নানা কসরৎ খেলিয়ে কোনোরকমে উঠে পড়লো ভিড়ের মধ্যে, তারপর টাল সামলে যখন দাঁড়াতে পারলো পেতলের রডটা ধ'রে, একেবারে সামনের লেডিস্ সিটে তাকিয়ে অবাক হ'য়ে গেল।

'তুমি!'

চোখে চোখে চেয়ে হাসলো শকুন্তলা।

'তুমি দশ নম্বরে যাও না?'

'টু-সিতেও যাই।'

'তাই নাকি? ভাগ্যিস্ বাসটায় উঠেছিলাম।'

'খুব ভাগ্য বুঝি?'

'ওরে বাবা, এও যদি ভাগ্য না হয় তবে আর ভাগ্য কাকে বলে? আগে যদি এই সম্ভাবনার কথা জানতুম তবে কি কোনোদিন ট্র্যামে ফিরি!'

শকুন্তলা সহাস্যে মাথা নাড়লো।

ভিড়ে, ধাক্কায়, ওঠা-নামার ঘটায় বোনের ননদের সঙ্গে রহস্যালাপে বাধা পড়লো এবার। সুনির্মলকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে হ'লো জনস্রোতের চাপে। কিন্তু আবার যখন সুযোগ হ'লো, ভালো ক'রেই হ'লো। এলগিন্ রোডের মোড়ে এসে নেমে গেলেন শকুন্তলার পাশের ফিরিঙ্গি মহিলাটি। সুনির্মলের জায়গা হ'লো। জানালার দিকে যথাসম্ভব নিজেকে সরিয়ে নিলো শকুন্তলা, আর সুনির্মলও একটু যেন সংকোচ বোধ করলো মনে মনে। দূরে দাঁড়িয়ে যতটা সহজে বাক্যালাপ চলছিলো, পাশাপাপি ব'সে তার স্রোতে বাধা পড়লো একটু সময়ের জন্য।

'শনিবারের বিকালটা আপনাদের পক্ষে খুব সুখের, না?' গুমট্টা শকুন্তলাই ভাঙলো প্রথমে।

একটু হেসে সুনির্মল জবাব দিলো, 'অন্তত আজকেরটা যে খুব সুখের সেটা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।'

'কেন?'

'আজকের আবহাওয়া খুব স্বাস্থ্যকর, আজকের আকাশ অতিশয় নীল, গড়ের মাঠের হাওয়া আজ প্রাণ জুড়োনো—আজকে একটা কবিতা লেখবার মতো দিন।'

'লিখলেই হয়।'

'লিখবো। কিন্তু তুমি আর যাওনা কেন সে কৈফিয়ৎটা আগে নিয়ে নি।'

'কোথায়?'

'আমাদের ওখানে?'

'আমাদের ওখানে কে যায়?'

'যেতে বলেই বা কে?'

'বলিনি?' বড় বড় কালো-চোখে ভুরু বাঁকিয়ে তাকালো শকুন্তলা, আর মনথ্লির ভাঁজে



লাইট হাউসের টিকিট তিনটি খচ্খচ্ ক'রে উঠলো সুনির্মলের বুকের মধ্যে। বুকটা কাঁপলো। বাস থেমেছে চক্রবেড়ের স্টপে, হঠাৎ ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়ালো সে, 'এই বাঁধো বাঁধো', শকুন্তলার দিকে তাকিয়ে বললো, 'এসো শীগ্গির, নামো।'

অবাক হ'য়ে গেলো কুন্তী, 'নামবো? এখানে কেন?'

'দরকার আছে, এসো না।' প্রায় জোর ক'রেই সে নামিয়ে নিলো শকুন্তলাকে, আর নেমেই পেয়ে গেলো একটা উল্টোদিগের ট্র্যাম, একেবারে ফাঁকা চমৎকার।

'কী? ব্যাপারটা কী?' গুছিয়ে ব'সে শুরু কুঁচকোলো শকুন্তলা।

'গুরুতর।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ লাইট হাউসে যাচ্ছি টিকিট কিনতে।'

'টিকিট?'

'কাল যাবে না ছবি দেখতে? বিনু বলেনি?'

'ও।'

'অবিশ্যি পড়াশুনোর দোহাই দিয়ে অপ্রিয় সঙ্গটা বর্জনও করতে পারো ইচ্ছে থাকলে।'

'তাহ'লে আমার টিকিটটা যেন কেনা না হয়।'

'আমার কেনার ভাগ আমি তো কিনি, তারপর তোমার ইচ্ছে হয় যাবে, নয়তো ছিঁড়ে ফেলবে।'

'টিকিট তো কেনাই হ'য়ে গেছে, দিন ছিঁড়ি—' চোখে মুখে হাসির ঝিলিক উঠলো শকুন্তলার।

'কে বললো কেনা হয়েছে?'

'কে আবার বলবে, নিজেই তো দেখলাম।'

'কী দেখলে?'

'কোনো আপিস ফের্তা ভদ্রলোককে শনিবারের বিকেলে যদি উল্টোদিকের ফুটপাত থেকে বাসে উঠতে দেখা যায় তা হ'লে কারণটা অনুমান করা বোধ হয় খুব শক্ত নয়।'

'খুব শক্ত।'

'বেশ, তাহ'লে এখান থেকে কেন উঠেছিলেন তাই বলুন।'

'কী আশ্চর্য! এও বোঝো না? তোমার জন্য।'

'ধ্যেৎ।'

'ধ্যেৎ কী! সত্যি কথা বললেই তোমরা বিশ্বাস কর না।'

একটু হাসলো কুন্তী, 'তাই যদি হয়, আমি বলি কি এত কষ্ট ক'রে চৌরঙ্গীতে এসে রাস্তা পার হ'য়ে ট্র্যাম ছেড়ে বাসে ওঠবার দরকার কী? তারচেয়ে বালিগঞ্জের বাসে চ'ড়ে টালিগঞ্জের অধিবাসীটি যদি মাঝে মাঝে দয়া ক'রে একটু সান্ধ্য ভ্রমণে যান ওদিকে, তাহ'লে তো এর চেয়ে ঢের বেশি সহজ হয়।'

'ঠাট্টা কোরো না কুন্তী, শেষে কিন্তু সত্যি সত্যিই পালে বাঘ পড়বে।'

'পড়ুক না।'

'যদি রোজ যাই ?'

'রোজ খুশি।'

'ভেবে দেখো।'

'দেখেছি।'

**'দেখেছ ?'**

সুনির্মলের গলার সুরে হঠাৎ কুন্তী তার মুখের দিকে তাকালো, তাকিয়েই থমকে গেলো। কী ভেবে আরক্ত হ'য়ে উঠলো মুখ।

টিকিট কিনে ফেরার পথে হাঁটতে-হাঁটতে সুনির্মল বললো, 'চা খাবে ?'

একটু গম্ভীর হ'য়ে গেছে শকুন্তলা। মাথা নিচু ক'রে বললো, 'না।'

'কেন ?'

'এমনিতেই ঢের দেরি হ'লো, বৌদি ভাববেন।'

'বৌদির ভাবনাটাই তুমি সবচেয়ে বড়ো ক'রে দেখলে ? আমার কথাটা ভাবছো না ?'

'আপনার কথা আবার কী ভাববো ?'

'আমার মৃত্যুর কথা !'

'মৃত্যু ?'

কাছেই ফেরাজিনির সিঁড়ি, সেখানে পা রেখে হেসে ফেললো সুনির্মল, 'কুন্তী, এরপরও যদি চা-না খেয়েই ফিরে যেতে বলো, আমি নির্ঘাৎ মারা যাবো। পথে ঘাটে এরকম হত্যাকাণ্ড হ'লে কি তোমারই খুব ভালো হবে ?'

ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মতো আরাম ছিটিয়ে এবার ঝিরঝিরে হেসে উঠলো শকুন্তলা, ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললো, 'আপনি ভারি ইয়ে—'

( ক্রমশঃ )

# সাহিত্যায়ন

## বৈদেশিকী

### পার লাগের্ক ভিষ্ট

[ ১৮৯১ ]

স্ক্যাণ্ডিনেভীয় উপদ্বীপ গ'ড়ে উঠেচে নরওয়ে, সুইডেন ও ডেনমার্কের যৌথ দানে। এর পশ্চিমে শোভা পায় নরওয়ের পাহাড়ে মালভূমি, পুবে সুইডেনের হিমবাহী সমভূমি আর দক্ষিণে ডেনমার্কের বন-বালু-ঘেরা নিম্নভূমি। এই চৌহদ্দীর চার পাশে ভেঙে পড়চে সমুদ্দুর। চিক্‌চিক্ কচ্চে ফিওর্ড বা সামুদ্রিক খাড়ি। প্রকৃতির এই পরিবেশে মানুষী প্রয়াসও লক্ষণীয়—কখনো চলেচে মৎস্যশিকার কখনো বা কাঠের কারখানা। ভূগোলের মনো-গোলে রূপায়িত হয়েচে "সাগা" ও "এডডা"র রূপকথা। তাই তো সংস্কৃতি জলচে য়ুরোপের "নিবে খুভেনলিড" "সাগা"য়ও। এ-ভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া যুক্ত হয়েচে য়ুরোপের সঙ্গে। তবে এ-সংস্পর্শের চেহারায় ফুটেচে মন ও মাটির দান। সাহিত্য সাধনায় এ-উপদ্বীপ বিশ্বসারস্বত সমাজে ঠাঁই করে নিয়েচে ইব্‌সেন, ব্রাণ্ডেস, ষ্ট্রীণ্ডবার্গ, জেস্‌পারসেন প্রভৃতির মারফতে। এ-ছাড়াও আছে আলফ্রেড নোবেল ও তাঁর পঞ্চপুরস্কার। সাহিত্য পুরস্কার পরিচালনা করেন "সুইডিশ একাডেমি" যার প্রতিষ্ঠা করেন তৃতীয় গুস্তাভাস ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চে। অর্দ্ধশতাব্দীর উপর চলেচে এই পুরস্কার বিতরণ আর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া পেয়েচে নোবেল পুরস্কার মাত্র ৯ বার। সংখ্যার দিক থেকে "সুইডিস একাডেমি" যে বিচারের নিক্তি ঠিক রেখেচেন এ হ'লো তারই পরিচায়ক। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় পুরস্কারে সুইডেনের ভাগে পড়েচে ৪টি, নরওয়ের অংশে ৩টি আর ডেনমার্কের ভাগ্যে ২টি। আবার সুইডেনের তালিকায় কবি আছেন ২ জন, উপন্যাসিক ১ জন ও কবি-নাট্যকার-উপন্যাসিক-প্রবন্ধকার ১ জন। এই শেষোক্তজন হ'লেন ১৯৫১-এর নোবেল পুরস্কার-পাইয়ে পার লাগের্ক ভিষ্ট।

লাগের্ক ভিষ্টের সাহিত্য সাধনায় ৩টি স্তরের সাক্ষাৎ মেলে। এগুলি হ'লো প্রাণন, মনন ও অধ্যাত্মায়ন। তাঁর সাহিত্যসত্তা এ-ত্রিবেণীতে হয়েচে অন্তঃসত্ত্বা। তিনে এক, একে তিন, এ হ'লো এখানকার মূল কথা। সাহিত্যায়নে তাই রূপ ধরেচে একেকটি স্তর একেকটি সাহিত্যিক রূপে। প্রাণন ফুটেচে কাব্যে, মনন নাট্যে, আর অধ্যাত্মায়ন গল্পে-প্রবন্ধে। তা হ'লেও প্রত্যেক স্তরেই অন্য স্তরের কিছু না কিছু আভাস-ইঙ্গিত আছে। এর কারণ সাহিত্যিক মানসের ঐক্য, যা বিবর্ত্তনে এগিয়ে যায়। তবে যে-ভঙ্গির নামে নামকরণ, সেখানে সেটিই মুখ্য ও জোরালো। প্রত্যেক বাঁকেই আছে জীবন-দেবের পরিচয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নৈরাশ্যের অন্ধকারে কবির জন্ম হ'লো আর তিনি ফিরেচেন আলোর সন্ধানে। যুদ্ধোত্তর য়ুরোপের এ-চেহারা রূপায়িত হয়েচে টি, এস, এলিয়টের **পোড়োমাঠে** ও জি, বি, এস'এর **হৃদয়-ভাঙা ঘরে**। এরই রকম ফেরে এলো লাগের্ক ভিষ্টের **যন্ত্রণা** ও **বিশৃঙ্খলা**। কি বেদনায় কবি আর্ত্তনাদ করেচেন এখানে। এরপর ১৯২০-এর কাছাকাছি জীবনায়নে

ডাকলো আলোর বান। প্রেম ও সংগতি নিয়ে দেখা দিলো **সুখী লোকের পথ** ও **হৃদয়সঙ্গীত**। সংশয় এখানে নিয়ন্ত্রিত হয়েচে মানুষী প্রেম ও প্রচেষ্টায়। বিশ্বাসের বিজলী এখানে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। ধার্মিকতা এখনো পাকা আসন তৈরি কর্তে পারেনি। তবু এর প্রয়াস উল্লেখযোগ্য। এ স্তরে মনায়নের আভাসও ফুটেচে। তাই তো প্রগতির চাকায় এলো মনন। এখানে রাজনীতিকে দেখান হয়েচে। সংস্কৃতি রক্ষার জন্যে লেখকের কি মর্মান্তিক অনুভূতি। সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে মানবিকতার উপর। কিন্তু হিংসা ও ক্ষমতার দানবিক লীলায় এ টল্‌চে। এ-সংঘর্ষের চেহারায় এসেচে নাটুকেপনা। তাইতো এ-অভাব পূরণে এসেচে "**জল্লাদ**" ও "**বামন**"। "**জল্লাদে**" অনুসৃত হয়েচে জয়েস্-এলিয়টের রূপকপন্থা যা এগিয়ে চলে গতকাল ও বর্ত্তমানের দুটো পা'য়ে। এর সেতুবন্ধনে সহায়তা করেচে জল্লাদ, যে একাধারে মানুষী হিংসার বলি ও প্রকাশ। **ইউলিসিস** ও **পোড়োমাঠের** মতই চলেচে বিপরীত-বিহার এখানে—মধ্যযুগ ও সমসাময়িকীর পাশাপাশি উপস্থিতিই এখানে লক্ষণীয়। পূর্ব্ব সমাজ-নিরাপত্তা এখানে হয়েচে বানচাল। তবে সমাধান প্রচেষ্টা ফুটেচে রাজনীতির কৌটিল্যায়নে।

এরপর তৃতীয় স্তরে আছে অধ্যাত্মায়ন যাতে রূপায়িত হয়েচে মানুষ ও বিধাতার যৌথলীলা। এ 'অধ্যাত্মায়ন' ভারতীয় নয়—এ হ'লো 'অধি-আত্মার'ই রূপান্তর, অধিবিদ্যার নামান্তর! সমস্যা সঙ্কুল এই পরিবেশে জড় হয়েচে চিন্তনের বহর, দর্শনের বেলুন, কাব্যের ভেঁপু ও রাজনীতির ঢাক। শুধু তাই নয়, মনস্তত্ত্বের মৃদঙ্গও বেজেচে এখানে। স্ক্যাণ্ডিনেভীয় গল্পায়নে লাগের্ক ভিষ্ট তাই একটি বিশিষ্ট ভঙ্গির জনক ও ব্যাখ্যাতা। এ হ'লো মন সমীক্ষার রূপক ভঙ্গি। গোটা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় দেখা যায় গল্পায়নের ৫টি ভঙ্গি। প্রথমেই "চৈতালি" পর্ব। এ হ'লো জীবন থেকে পলায়ন—পলায়নী কল্পনার ডানায় এসেচে আদর্শ-বিলাস। সমস্যা এড়ানো এ-পরিবেশে কখনো কখনো আদর্শ-বাস্তবের দ্বন্দ্বও ফুটেচে। এ-ধারার পরিচায়ক হলো জে, ভি, জেনসেনের "**রাজার পতন**" ও সুইডেনের "**ব্যাবিলন থেকে বাড়ি**"। দ্বিতীয় পর্ব হ'লো মনোবিকলন। এ্যাডলারের মনোবীক্ষণ প্রকাশ পেয়েচে হোয়েলের **অক্টোবরের একটি দিনে**। আবেষ্টনীর চাপ ও চরিত্রের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেচে গল্পায়ন। এ-প্রসঙ্গে আকসেল সাণ্ডেমোসের **নাবিক যায় তীরে** উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় স্তরে দেখা যায়, "প্রোলেটারীর রূপ।" এখানে শ্রমিক চিত্রালি উপহার দিয়েচেন সুইডেনের মার্টিন কোচ ও ডান এ্যাণ্ডার সন। প্রোলেটারীয় রূপায়নই এখানে মুখ্য। এরপর শ্রেণী সংঘর্ষে পাড়ি দিয়েচেন ডেনমার্কের নেকেসা। এল, নর্ড ষ্ট্রোম কিন্তু বিশ্বসহরের রূপে আস্থাবান। চতুর্থ স্তরে আছে "কৈশোর রূপ" ভঙ্গি। আত্মজীবনী এখানে কথা কইচে হেলষ্ট্রোম ও লাগের্ক ভিষ্টের মুখে। ক্রুমেনষ্টার্ণার **টোনীও** এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে আছে মৌন অভিজ্ঞতার চিত্রণ। এরপর পঞ্চম পর্বে এসেচে "প্রকাশনী রূপক" যা মনসমীক্ষায় এগিয়ে চলেচে। এর সুষ্ঠু শিল্পী হ'লেন লাগের্ক ভিষ্ট ও ক্রিষ্টেন সেন। এখানে ফুটেচে মানকুটের কুটায়ন যার এক পায়ে বাজে যুদ্ধোত্তর মনোভাব, অন্যপায়ে নিঃসঙ্গতা। এ-পরিচিতি বহন করে লাগের্ক ভিষ্টের কাব্য ও নাটক। গল্পে কিন্তু রূপক চেতনার ডালে ফুটেচে বিদ্রোহের রক্ত গোলাপ।

এ-বিদ্রোহের স্বরূপে স্থান পেয়েচে ভাবের রূপায়ন। এর প্রকাশনে যে রীতি অনুসৃত হয়েচে



তা ইউরোপীয় মন্ময় বা কাব্যিক ঢঙের সগোত্রীয়। "**চিরকেলে হাসিতে**" তাই গল্পায়ন বয়ে চলেছে বর্ণনার সীতায়নে। এর বাঁকে বাঁকে জমেচে ছোট ছোট উপাখ্যান, বিষয় ও মেজাজের বৈষম্য আর অর্থহীন অস্তিত্বের রহস্যরূপালি। মাঝে মাঝে সুইডেনের কৃষিবনের রূপকথাও ঝিলকিয়ে উঠেচে। এরপর উল্লেখযোগ্য লাগের্ক ভিষ্টের **বাস্তবের অতিথি**। চরিত্র এখানে তেয়াতনী নয়, কিন্তু অনুভূতি-রঙিন, অভিজ্ঞতার প্রতীক ও একক। মন ও প্রাণের পাঁচ মিশালি মিলেচে গল্পে ও প্রবন্ধে আর রূপ নিয়েচে বহুনামে। স্মরণীয় হ'লো **আত্মাহীন মানুষ, পুনরুজ্জীবিত মানুষ, অন্ধকারে বিজয়, পরশপাথর** ও **হিংসার গল্পমালা**। এখানে মিলেচে ধর্ম, নন্দনতত্ত্ব ও নৈতিকতার সমন্বয়। জীবনের বিশাল ব্যাপ্তি এখানে মাথা কুট্‌চে। মানুষ ও তার ভাগ্য বিধাতার সঙ্গে চলেচে যে লুকোচুরি খেলা, লাগের্ক ভিষ্ট তা তুলে ধরেচেন জগৎ-সমক্ষে। এও এক রকমের তান্ত্রিক বিলাস, যা বস্তুকে চেখে দেখতে চায় দেহ ও মন দিয়ে। উপলব্ধির যাত্রাপথে তাইতো ছড়িয়ে পড়েচে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, যুক্তি-তর্ক, ভোগ নিরাসক্তি এবং ব্যথা-শান্তি। এ সব সমস্যার জটে জটিল হ'য়ে বসে আছেন ঋষিকল্প লগের্ক ভিষ্ট। পুরনো ঐতিহ্য শুধু কেঁপে কেঁপে উঠচে বেদনায়। গতানুগতিকতা তাঁর কাছে অসহ্য। দুনিয়ার যেখানে যে ব্যথা তাতেই তিনি ব্যথিত হ'য়ে দুলে দুলে উঠচেন। আহবান জাগিয়েচেন তাদেরকে ব্রাউনিঙের "রব্বিবেন এজ্রা"র মতো—

তাহ'লে এসো হে রক্ত সংগ্রাম,
বন্ধুর হোক পৃথিবীর পথ—
হুলের আঘাতে ঝরুক চরৈবেতি!
হোকনা সুখের তিন ভাগ দুখ,
চালাও যুদ্ধ, আয়াস তুচ্ছ।
শিক্ষা নয় কো ব্যথার হিসেব; এগোও সাহসে
প্রতিবাদ কিছু ক'রোনা দুঃখে।

এই 'চরৈবেতি'র বিকাশ হ'লো "**বারাব্বাস**" [ ১৯৫০ ]। মানুষও তার ভাগ্য বিধাতার সঙ্গে চলেছে যে বোঝাপড়ার এ হ'লো তারই রূপায়ন। গল্পায়ন ব'য়ে চলেছে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধতা ও বারাব্বাসের পলায়নে। বারাব্বাস দেখেচে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধতা, শুনেচে তাঁর পুনরুজ্জীবনের কথা আর প্রত্যক্ষ করেচে ভক্তদের শহীদ বেদী। একে একে এসব ঘটনায় তার সংসারী মন গলে গেচে, এনেচে ভক্তি-বিশ্বাসের বন্যা। কিন্তু মৃত্যুতে সে একক—নিঃস্বতায় তাইতো সে উৎসর্গ করেচে নিজেকে অন্ধকারে। হয়তো এ-আত্মনিবেদন যীশুর কাছেই। এ হ'লো সংশয়ের শোকান্তিকা। এর সঙ্গে তুলনীয় অন্নদাশংকরের **সত্যাসত্যের** বাদল। সংশয়ে মানুষী সত্তা টিঁকে থাকতে পারে না। এখানে পুরনো ঐতিহ্য ও সংস্কার সমসাময়িকীর চাপে নবায়নে পাড়ি জমিয়েচে। এতে সহায়ক হয়েচে মননের ফুলঝুরি। বাইবেলের ঘটনা কথা-সাহিত্যে স্থান পেয়েচে টমাস ম্যানের "**জোসেফ ও তার ভ্রাতৃগণে**"। **বারাব্বাস** এরি সগোত্রীয় মনবিকলনে ও চরিত্রায়নে। এতেই এসেচে লিখিয়ের কল্পনা বিহার। বারাব্বাসের শোকান্তিকা যে-ভাবে ভেঙে পড়েচে তাতে স্মরণে আনে মার্কিন ইউজেন ও নিলের **শোচনীয় ইলেকট্রাকে**। ওনিলের লাভিনিয়া

ঘরের দরজা বন্ধ করে একলাই আছে নিঃসঙ্গতায়। আর এখানে বারাব্বাস অন্ধকারকে সম্বোধন করে সঁপে দিলো নিজেকে : "তোমাকেই দিলাম আমার আত্মা"। এ আত্মনিবেদনে করুণ রসের কাংরানিই শোনা যায়।

জীবন জিজ্ঞাসার সন্ধানের জন্য লাগের্ক ভিষ্ট বিশেষভাবে স্মরণীয়। জীবনের সমুদ্দুর ভেঙে পড়েচে তাঁর চেতনায়, দোলা দিয়েচে দেহে। তাইতো বিশ্বাসের দুর্গ চুরমার হয়েচে। তবুও বিদ্রোহ পরিণতি খুঁজেচে ভক্তি ও বিশ্বাসে। সংশয় তাই অনিবার্যভাবেই জীবনায়নের তীরে পেয়েচে মুক্তির হদিশ। প্রশ্নিলতার জন্যে লেখকের পাঠক সংখ্যা স্বভাবতই একটু কম। মননের উচ্চ কোটিতে, সাধারণের যাতায়াত খুব কমই। তাই এ-অভিজ্ঞতায় সাড়া দিতে পারে কম লোকেই। জনপ্রিয়তা এখানে সীমিত। কিন্তু এ লাগের্ক ভিষ্টের শিল্পপ্রতিভার হীনতার প্রমাণ নয়। ভাব ও ভাষার মাধ্যমে তিনি যে রূপকারের পরিচয় দিয়েচেন, তা অবিস্মরণীয়। এ-জন্যেই তাঁর কীর্ত্তি মানসলোকে জলবে অনির্বাণ। আর সে-আশায় বর্ত্তমান কম্পমান।

অনিল বিশ্বাস

## সাহিত্যের ভাষ্য ও বালভাষিত

সম্পাদকেষু

পূর্ব্বাশার জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'ইন্দ্রজিতের লেখা সাহিত্যের সমালোচনা' পড়লাম। প্রথম দিকের গতি এগুচ্ছিল মন্দ নয়, শেষ পর্য্যন্ত বিফল হোতে হোল, দেখা গেল অনবদ্য তত্ত্ব প্রকাশ কোরতে গিয়ে করা হয়েছে কল্পিত তথ্যের প্রকাশ, যার প্রতিবাদ পাঠক তরফ থেকে একান্ত প্রয়োজন, তাই এ চিঠির অবতারণা, অবশ্য ইন্দ্রজিতের (?) সাহিত্য প্রভাবের ফলশ্রুতিতে বাংলা সাহিত্যের কোন পরিবর্ত্তনের প্রশ্নই জাগেনা কিন্তু পূর্ব্বাশার কাছ থেকে বাংলার পাঠক সমাজের সতৃষ্ণ নয়ন আশাতুর মনে চেয়ে থাকে মহাসম্ভাবনার ইংগীত-প্রতি।

অনেক কিছু উপেক্ষা কোরেও শেষ পর্য্যন্ত যে কয়টা উপজীব্য প্রশ্ন থাকে সেগুনো হোল :—

(১) 'তাই সে কাব্যগুলিতে·····পরিচয় তেমন পাইনে।' (পৃঃ···১১৪)

(২) 'ভারতচন্দ্রের কাব্যরস·····মেঘনাদ বধ কাব্যে।' (পৃ···১১৪)

(৩) 'সাহিত্য সমাজের মুখপত্র নয়·····তাকে বাঁচিয়ে রাখবে।' (পৃ···১১৪)

(৪) 'এই যে রাবণ মেঘনাদ বধ কাব্যে·····দ্বিতীয় কথাই ঠিক।' (পৃ···১১৫)

(৫) 'বৃহৎ কাব্য রচনা·····পরিপূর্ণ ভাবে নেই।' (পৃ···১১৫)

(৬) 'বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যের সম্রাট বলা হয়···আইন অমান্য কোরতে রাজী নয়।' (পৃ···১১৫)

(৭) 'নতুন সাহিত্য তিনি ····আরো অনেক কিছু দিতে পারতেন।' (পৃ···১১৬)

(১ উঃ) যুগের পরিচয় পাই কিন্তু এ পরিচয় মঙ্গল কাব্যের বেলায় প্রযোজ্য হোলেও, পদাবলী সাহিত্যের বেলায় সত্য নয়, কারণ সেগুলো গীতি কবিতা এবং গীতি কবিতা মাত্রেই



'Subjective' এবং 'Subjective' হলেই রচয়িতার ব্যক্তিগত ছাপ তার পরে ছায়াপাত কোরবেই, এই নিয়ম, সেই নিয়মানুসারে, চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, প্রমুখ কবিদের কবিতায় নিজস্ব ভঙ্গীই প্রধান, একটা অপরের নামে চালাবার উপায় নেই, মঙ্গলকাব্য অবশ্য একের কাব্য, সহজেই অন্যের নামে চালিয়ে দেওয়া যায়। কারণ ইহাতে ব্যক্তি বা রচয়িতার স্বকীয় কোন বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত, তাই দেখা যায় মঙ্গলকাব্যে যুগ বিশেষের পরিচয় সুস্পষ্ট হোলেও, বৈষ্ণব পদাবলীতে যুগের চেয়ে ব্যক্তির ব্যঞ্জনাই স্বীকৃত।

(২ উঃ) ভারতচন্দ্র এবং মাইকেলের কাব্যরস সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজনের আদিরস (ভারতচন্দ্র), অন্যজনের বীর, রুদ্র ও করুণ রস। আর তাছাড়া, ভারতচন্দ্রের কাব্যরস পাঠক মনের তৃষ্ণাকে তৃপ্তি দেয়না, এ উক্তি এই প্রথম শোনা গেল, ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধেও অবশ্য অভিযোগ আছে, তবে তা অন্য জাতীয় অর্থাৎ কাব্যের রসাস্বাদনের নয়, তাঁর বিষয় বস্তুর শ্লীলতা তথা বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন, কিন্তু ইহা যে রসোত্তীর্ণকাব্য, এ অভিযোগ নিতান্ত হাস্যকর।

(৩ উঃ) সাহিত্য সমাজের মুখপত্র নয়, তার নিছক একটা মতামত আছে, মাইকেলের উপর এ মত চাপাবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ দেখা যায় না, কেননা সমাজ-সচেতন মাইকেল উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের নবজাগর মুখে যে নূতন-যৌবন-জোয়ার, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছিল, তারই প্রতীক হিসেবে কোরেছেন রাবণের চরিত্র চিত্রণ। ইহা অবিতর্ক্য সত্য, কাজেই তদানীন্তন সমাজ-প্রভাব এড়িয়ে, সাহিত্য সৃষ্টি যে অসম্ভব, তা মাইকেল অপেক্ষা আর কেহ ভাল জানিতেন কিনা সন্দেহ, যে নিজস্ব মতামতের কথা লেখক উল্লেখ কোরেছেন, তা সকল শিল্পীর পক্ষেই সমান প্রযোজ্য এবং সে মতামত যদি সমাজকে কেন্দ্র কোরে গড়ে ওঠে তবে তা সার্ব্বজনীন রূপ পায়, আমাদের মনে হয় মেঘনাদ বধ কাব্যের আছে এক সার্ব্বজনীন আবেদন, যেমন আছে বাল্মিকীর রামায়ণের, (অবশ্য অন্যদিক দিয়ে)।

(৪ উঃ) মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণ 'প্রতিক্রিয়াশীল' লেখক বোধহয় ভুল কোরে লিখেছেন, তা যদি না হয় তবে প্রশ্ন হোল যে, সাহিত্যে তবে কোন্ চরিত্র প্রগতিশীল ?

(৫ উঃ) কোন মহাকাব্যই স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে সৃষ্টি হয় না, কারণ অনেক ভেবেচিন্তে, বিষয় বস্তুর এবং গঠন ভঙ্গীর নানা আকার-প্রকার দিতে হয়, কাজেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত মহাকাব্য আজিও সৃষ্টি হয়েছে কিনা, ইহা একটি জিজ্ঞাসা, আর মাইকেলের সুন্দরতর কাব্য রচনায় ঝোঁক ছিল না, এ এক নতুন উক্তি। সে বাসনা যদি না থাকত তবে কোন প্রয়োজন ছিল না, অমিতাক্ষর ছন্দ সৃষ্টির অবতারণায়। তিনি নিজেই বোলতেন, 'ভাবকে মূর্ত্ত-মুখর কোরতে যে কোন ভাষার আশ্রয় নেওয়াতে কোন বিধি নিষেধ নেই।' এর সম্পূর্ণ সত্যতা তার কাব্যধারার প্রতি বিন্দুতে। তাছাড়া, ভাবকে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি যথাযথ ভাষা দ্বারা প্রকাশ কোরতে না পারতেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তাঁর অন্তরতর ভাবকে রূপায়িত কোরতেন না। ভাবকে গতি, ভাষাকে দ্যুতি দেবার জন্য সতত তাঁর শব্দ সৃজনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অমৃতাক্ষর ছন্দ পদ্মাবতী নাটকে প্রথম প্রকাশিত; তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে তার বিকাশ, বিস্তার কোরল মেঘনাদ বধ কাব্যে এবং বীরাঙ্গনায়, ভাবের

মাধুর্য্যে, ভাষার লালিত্যে, অনবদ্যতায় হয়ে উঠল প্রাণবন্ত এই ক্রমবিবর্ত্তনের ধাপে ধাপে মাইকেলের সুন্দর কাব্য-সৃষ্টির ইচ্ছার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা। তাই ঐ অসুন্দরের প্রশ্ন অযথার্থ নয় কি ?

( ৬ উঃ ) বঙ্কিমচন্দ্রকে লেখকের সাহিত্য সম্রাট বোলতে দেখা যাচ্ছে মহা আপত্তি, পরিবর্ত্তনশীল সাহিত্য বোলে, যিনি সাহিত্য-পদ-দিশারী, যার প্রদর্শিত পথে এখনও এগুচ্ছে আজকের সাহিত্য, তার স্থানচ্যুতির প্রশ্নটাই অবান্তর, অন্তত যখন অন্য পথিকৃতের পাওয়া যাচ্ছে না কোন সম্ভাবনার সন্ধান। তিনি ( বঙ্কিমচন্দ্র ) শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টিই করেননি ; তিনি আধুনিক কালাবধি সৃষ্ট সাহিত্যের শীর্ষস্থানে সমাসীন, এর সত্য পরিচয় কবিগুরুর কণ্ঠে, "……প্রাচীর অতিক্রম কোরে তিনি এসেছেন মহাকালের উদার অভ্যর্থনায়, যেখানে আলোক মাটির প্রদীপের নয়—আকাশের, প্রায়ই দেখা যায় আধুনিক যুগ অকৃতজ্ঞ, পুরাতনের দানের মূল্য লাঘব কোরে সম্মানের দায়িত্ব থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়, আশা করি সে ক্ষণকালের স্পর্দ্ধিত অশ্রদ্ধা পরাভূত কোরে বঙ্কিমচন্দ্র বংগ সাহিত্যে তাঁর চিরকালের অসংশয় অধিকারে অধিষ্ঠিত থাকবেন—"

বঙ্কিম প্রতিভাকে ম্লান কোরে যদি কোন প্রখরতম প্রদীপ্তি আবির্ভূত হয়, তবে ঋষিকে সরাবার প্রশ্ন ওঠে না—আপনি তিনি সরে দাঁড়াবেন, বঙ্কিমচন্দ্রের অমর দানের সে দিনই হবে উজ্জলতর সূর্য্যোদয়।

বলা হয়েছে, তাঁর রচনায় সাহিত্যের ভাগ যা, তাও তাঁর নিজের নয়, তবে সেটা কার ? যে উত্তরও লেখক দিয়েছেন—"ভাঙ্গা ধরা সমাজকে তিনি পূর্ব যুগের আদর্শ দিয়ে বৃথা ধরে রাখবার চেষ্টা কোরেছেন।" এবং উপমায় বোলেছেন, "যেন বৌদ্ধ দর্শনের পর শঙ্করাচার্য্যের আগমনের মত।" প্রশ্ন ওঠে যে, কোন সাহিত্যিকের কোন রচনাই একান্তভাবে সমাজ বহির্ভূত নিজের কিনা ? মনে হয় একমাত্র পাগলের স্বাপ্নিক মন বাদে কোন কল্পনাই পারে না পরিবেশকে ছেড়ে চোলতে, কিছু কিছু যুগের ছাপ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে পড়েছে সত্যই, কিন্তু যুগকে অতিক্রম কোরবার স্পর্ধাও তিনি দেখিয়েছেন। বিধবার প্রেমকে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু সে প্রেমের ভয়াবহ 'ট্রাজেডি'ও তিনি দেখিয়েছেন, 'ইহা পূর্ব যুগের আদর্শ' নয়, নীতিও নয়, ইহা রুচির প্রশ্ন, ইহা যদি পূর্ব যুগীও হোত তবে বিধবা-বিবাহ কল্পনাই তিনি কোরতে পারতেন না, বাল্য প্রণয়ের স্বাভাবিক পরিণতিকে অস্বীকার তিনি করেননি; কিন্তু পরিণামের কথা চিন্তা কোরে, অশ্রুসজল নয়নে দরিদ্র্য শৈবালিনীকে প্রৌঢ় স্বামী চন্দ্রশেখরের হস্তে অর্পণ কোরেছেন, যে কোন সহৃদয় পাঠকই উপলব্ধি কোরতে পারবেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয় কোন্ দিকে স্নেহ বিস্তার করেছিল, সে ত শৈবালিনীই। কাজেই বৌদ্ধ দর্শনের পর শঙ্করাচার্য্যের আগমনের মত একটা উপমা কি কোরে এখানে উপস্থাপিত হয় তা শঙ্করাচার্য্যই জানেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের আইন অমান্য কোরতে রাজী নন, এ প্রশ্নের যথার্থতায় সংশয় আছে, কেননা, তিনি কোন সাহিত্যিক আদর্শ অনুসরণ করেননি—উত্তর সূরীদের জন্য আইন প্রণয়ন কোরে গিয়েছেন।

( ৭উঃ ) শেষের দিকে লেখক রবীন্দ্রনাথকে আখ্যাত কোরেছেন "সাহিত্যের বিশ্বকোষ" বোলে। লেখকের মতে তিনি ( রবীন্দ্রনাথ ) বাস্তবাদী সাহিত্যের উষা ; তা যদি হয় তবে রসাভাসের ( রসভাস!) খড়্গটা মাথায় ঝুলবার ভয়ের কারণটা লেখক ব্যক্ত করেননি, সে রকম কোন ভয়-শঙ্কার পরিচয় রবীন্দ্র কাব্যে পাওয়া গিয়েছে কিনা সন্দেহ, কেননা আমরা দেখেছি যখনই নতুনের প্রবাহ এসেছে, রবীন্দ্রনাথ



কোরেছেন সাদরে তাদের অভ্যর্থনা। অচিন্ত্যর 'বেদে', প্রবোধ সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে' স্বীকৃতিতে তার সাক্ষ্য মেলে, অবশ্য বাড়াবাড়ি তিনি সহ্য করেন নি, তরুণ মনের চাপল্যকে তিনি সতর্ক কোরে দিয়েছেন—শিল্পী মনের তাইত কাম্য, কেননা নতুন-শিল্প-উদ্বোধন মানেই স্বার্থক সৃষ্টি নয়।

পরিশেষে নিবেদন, 'ইন্দ্রজিৎ' সাহিত্যজিৎ হোয়ে যেন অবশ তথ্যের চাপে অপমৃত্যুর তলে বিলীন না করেন বাংলার সাহিত্যের ইতিহাস,—আর 'পূর্ব্বাশা' এসব প্রকাশ কোরে যেন আমাদের আশায়, নিরাশার আবরণ না নামান।

দীপ্তেন্দ্রলাল রায়

## উত্তর

আমার লেখা 'সাহিত্যের সমালোচনা' নামক প্রবন্ধ পড়ে জনৈক পূর্ব্বাশার পাঠক প্রতিবাদ করে যে রচনাটি পূর্ব্বাশার সম্পাদককে পাঠিয়েছিলেন সেই প্রতিবাদের উত্তরে আমার কোন মতামত আছে কি না তাই লিখিত ভাবে জানাবার জন্যে সম্পাদক প্রতিবাদটি পড়তে আমাকে দেন।

লেখকের রচনা পড়ে আমি চিন্তিত হইনি, রাগও করিনি, শুধু মাত্র হেসেছিলাম। কারণ লেখক বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু সে সাহিত্যের ওপর জ্ঞানের পরিচয় দেন নি।

আমি যে কথা আমার লেখার রচনার মর্মার্থে বলেছি সেটা হোল যে সাহিত্য যদি উদ্দেশ্যমূলক হয় তাহলে তাকে আমি সাহিত্য বলতে রাজী নই। তার কারণ যে সাহিত্য অক্ষরের বন্ধনে বাঁধা পড়বার আগে নিয়মের বন্ধনে বাঁধা পড়ে সে সাহিত্যর আয়ু বলে দিতে বিশেষ কষ্টকর হয় না বলে আমি মনে করি।

আমার লেখার প্রতিবাদ যিনি করেছেন তিনি হয়ত ভেবেছেন যে বিনীত প্রবন্ধকার সাহিত্যের সমালোচনার ক্ষেত্রে একচক্ষু হরিণ। কিন্তু আমার উক্ত লেখাটি ভালভাবে পড়লে হয়তো তিনি নিজের মনে ভুল স্বীকার করবেন। যাহোক্ প্রতিবাদকারীর উত্তরে আমি প্রবন্ধ এই বলে শেষ করলাম যে অমৃতম্ বাল ভাষিতম্।

নমস্কারান্তে,

বিনীত,
ইন্দ্রজিৎ

# 'পূজাপার্ব্বণ'

[ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-প্রণীত—বিশ্বভারতী-প্রকাশিত গ্রন্থ-পাঠোত্তর নিবন্ধ ]

য়ুরোপিণী ষাঁড়-এর শৃঙ্গ-প্রসাদে আমরা এম্নি যান্ত্রিক বুদ্ধি-বৃত্তির দাস হয়ে পড়েছি যে নিজেদের পাল-পার্ব্বণ, পূজা-পদ্ধতি, ব্রতকথাগুলোকে গাঁজায় দম-দেওয়া গগন-কুসুম ছাড়া অন্যকিছু ভাবতে পারিনে। বড় জোর ব্রত-কৃত্যকে দমদেওয়া কলের পুতুলের কাজ মনে করি। হাজার-হাজার বছরে ভুরি-ভুরি কাহিনী-উপাখ্যান জড়ো হয়েছে বাংলার ও ভারতের সভ্যতায়। জম্বুদ্বীপ ভেঙে জন্ম নিয়েছে 'ইন্দিয়া'র 'অষ্ট্র-গঙ্গেম' ভূমি। প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড মিশেছে গঙ্গামৃত্তিকায়—আসাম-ত্রিপুরা-ব্রহ্ম-মালব্য-সাম যুক্ত হয়েছে সে অঞ্চলে। তাঁদের ইন্দ্র দাক্ষিণাত্য বিজয় করে অথবা দাক্ষিণাত্যের কাহ্নড় ইন্দ্র সে-অঞ্চলের নাম দিয়েছেন 'ইন্দ্রগঙ্গেম'। বাবিলন-কাহিনী বাইবেল সে-কথা ভোলেনি কিন্তু আমরা বেমালুম ভুলে গেছি। তা-ও ভুলেছি বাইবেলীদেরই চক্রান্তে। শেষ চক্রী শৃঙ্গমার কিলহর্ন-সাহেব।

ত্রিপুরায় ব্রতকে বলে বর্ত্ত। বৃত্র-বৃত্ত—মাঘমণ্ডলের ব্রতে বৃত্ত আঁকা এবং ব্রাত্য, সবই ব্রত-কর্ম্মের সঙ্গে বর্ত্তমান। বট-পত্র, বংশীবট, বটকৃষ্ণ, বটষষ্ঠী, বটু, বুদ্ধের বোট্রি, ভোট, বেত্র, এরাও ব্রাত্য ব্যাপার। বজ্র নিয়ে ইন্দ্র তখনো আসেন নি। 'বজ্রযোগিনী' তৈরী হয়নি। 'বজ্রযান' ভবিষ্যতের কালের গর্ভে ছিল। ছিল কালীমূর্ত্তিতে।

বাংলার 'বিজয় সিংহ' ত্রিপুরা-রাজ আদি 'রত্নফা' এই আদি পঞ্চালের প্রথম দিক্-বিজয়ী সম্রাট। তাঁর মুদ্রায় অঙ্কিত যে লিপি ও মূর্ত্তি আছে তার পাঠ এই: "দুর্গারাধনাপতবিজয়ঃরত্নপুরে সকেকদ্বিঅষ্টনবষশ্রী"। মুদ্রার কেন্দ্রস্থলে একটি 'সিংহ'-মূর্ত্তি। কিরাতের দেশে এ এক শশক-সিংহ উপাখ্যান। গৌড়ের যশোদা-গঙ্গা-ষষ্ঠী মূর্ত্তিতে যে লিপি আছে তার পাঠ 'চক্ষ্ একস' বা 'গ(জ্ঞ)ক্ষ্ একস'। তিনি যাঁর দেবী সেই মহারাজ গয়াসুর-গোখরা হতে পারেন—হতে পারে ক্ষয়েরক্ষস ( Xerxes ) বংশের পারসিক রাক্ষস—খরগোস যক্ষ হতেও তার ক্ষতি নেই। ত্রিপুরার রাজমালায় তিনি 'রত্নফা'-'রত্নমানিক্য'। এই গৌড়েশ্বরের গৌরেশ্বর ( শ্রীহট্টাধিপতি ) হিসেবে নাম ছিল 'কৈল'। পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার 'কৈলাসর', আসামের 'কৈলাবর' অঞ্চল এই 'কলি'র কৃপায়, দাক্ষিণাত্যের 'কৈলাস'-ও।

আসামের অহোম রাজবংশে পাওয়া যাচ্ছে 'সুফাকফা'-নন্দন 'সুষেনফা'কে। আসামের 'প্রাগ জ্যোতিশেষ' করে যিনি 'শ্রীদুর্জ্জয়'-পুর নির্ম্মাণ করেন ( 'প্রাগজ্যোতিষ' নাম এ ব্যাপারটি থেকেই) কামরূপে তাঁর নাম রত্নপাল। পিতা 'সুফাকফা'-ব্রহ্মপাল'। গোবিন্দপালের রাজ্য-নাশ করে তিনি পঞ্চমকারের পত্রলেখা রেখে গেছেন ( বাংলার ইতিহাস-রাখাল দাস—চিত্র নং ৩০ )। 'লিখিতমিদং মসুকংকা শ্রীবামাকব্বে নগ' অথবা 'নখতনদংমসুকংকা শ্রীসুভাগসেন গী' লিখে তিনি তাঁর আসামীনগ ( পর্ব্বত ) বংশ-পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি মুদ্রারাক্ষসের 'পর্ব্বত'—গ্রীকদের 'পোরাস'—পুররাজ 'অকিয়ন'-অন্তকারী 'অন্তিয়ক' ( যম )-এর নিকট 'সৌভাগসেন'। 'অন্তিয়কে'র তিনি অন্ত ক্যে ছিলেন বলেই 'পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ' রত্নপাল শিলালিপিতে যশ পরিচয় দিছেন:



'যশে অর্জ্জুন, যুদ্ধে ভীম ( যমলার্জ্জুন। কার্তবীর্য্যার্জ্জুন ) ক্রোধে কৃতান্ত সদৃশ।"—রত্নপালের তাম্র-পাটক )। 'নরক'-অধ্যুষিত কামরূপের এই 'নারকী' রাজার নামেই 'আফ ( ফা ) গণিষ্টনে' 'হেলমন্দ'-নদীর নাম। নরক-মন্দাকিনী ভোগবতী সৌভাগসেনের রাজ্য-সৌভাগ্য সূচনা করে।

এই 'ভৌম'-রাজ উড়িষ্যায় 'তোস্যালী' 'কর'বংশে 'ভৌমাম্বয়' সৃষ্টি করে 'শুভকরে'র দান-পত্রে 'পরমউপশক নৃঘটাফা-নাম ক্ষেমঙ্করদেব'-এর আবির্ভাব ঘটাচ্ছেন। 'কান্তোজ' ( ভোজবাজিদাতা কামরূপ বংশ ) হিসেবে এই আদিশূর ঘটক-বংশের 'রাঢ়ে-বাড়ে' ( পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে ) প্রবেশ। তাঁরা এখানেও '১৫৬-১৯১ গুপ্তদ্বাদশচক্রের' 'রাজা হস্তিন'-ই ছিলেন, তবে নাম ছিল তাঁদের 'কুঞ্জর ঘটবর যেন'। চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত-পুরগুপ্ত, ব্রহ্মপাল-রত্নপাল, সুফাকফা-সুষেনফা এবং রত্নফা-বিজয়সিংহ-নির্ম্মিত একটি ভোজবাজি এই 'কুঞ্জর ঘটবর যেন'। তারা 'জুপিটার' ( যাপিতের ) চক্র স্রষ্টা গ্রীক, হেলেনিক-মৌর্য্য, 'মহাবৈশাক' 'মহাশ্বযুজ', 'মহাচৈত্র'-স্রষ্টা যজুর্ব্বেদী 'মুন-গল'। মানে, তুরাণী, কাপালিক। বঙ্গরাজ 'অক্সন্দর' শাহ বা তুরস্ক পাশা-ই এঁরা। আরেকটি শক-শাখা মলক্কার 'ব্র্যাঘ্রতটী, মণ্ডলাধিকারস্বামী বলবর্ম্ম'—আসামে তিনি 'বলবর্ম্মা' বা আসাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা সুকাফা ( পিপ্পলাদ ) নন্দন 'সুতেউফা' ( ব্র্যাঘ্রতটাদিব ) দিক্‌বিজয়ী মহারাজ। গিরি মহারাজ ছিলেন সবাই তখন। বাঘের মতো ভোগেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না, 'ত্যাগসিংহ' হতেও দেরি লাগতনা। দুর্গাকে নিয়ে করতেন দিকবিজয়, রাধাকে নিয়ে রাসলীলা আর মুনি সেজে বুদ্ধ হতেন শেষটায় এই শাক্য-গোষ্ঠী।

রত্নফা এই মিশ্র গোষ্ঠীর রাজা। দুর্গা-রাধা-নহপীত-নাপিত নন্দ ত্রিপুরাপতি তুরাণীরই রক্ত বহন করে এসেছে। তুরাণী অক্কডরা 'উৎনপিষ্টম'-প্রেতপূজক ছিলেন। তাঁরা পূর্ব্ব নন্দ—হেলেনিক—নারকী ( কামরূপী ) গ্রীকভ্রূণ। তাঁরা পূর্ব্বাঞ্চলে কিরাতী। 'উমা-ক্ষুমা' ( দুর্গা ও পীত রশ্মি রাধা ) হলেন তাঁদের ঈশানের দুই শক্তি। কিরাতী থেকেই ফণীশিয়-গোষ্ঠীর জন্ম—টোলেমি-মিশরীয়রা ( লবকুশ বা মিশরইথিওপিয়া ) তা-ই। তাই ক্লিওপাত্রার শিরে ফণী। পার্ব্বত্য-'ত্রিপুরা'-কেই 'কিরাত' বলা হয়—( আসামের ইতিহাস-'গেট' )।

'রেবার তীরবর্ত্তী ( সিন্ধুতীরে ) নগরে গোপীবিহঙ্গদ্বারা যৌনঅঙ্গও নিহত' হয় বলে আমি মোহেঞ্জোদরোর যে ব্রাহ্মী লিপিটি পাঠ করেছি, তা ত্রিপুরার এই যমদূত কলিরই লিপি। যে-পিতার পুত্র ছিলেন তিনি ( হয়ত তিন-ভগ্নীর অনুজ ) তাঁর গৃহেও তিনি যমদূত হয়েই প্রবেশ করেন, অর্থাৎ তাঁকেও হত্যা করেন। নন্দের নন্দন কানু কৃষ্ণ পিতৃহন্তা ছিলেন—মাতুলও ত পিতৃতুল্যই—এবং দ্রাবিড়-সভ্যতায় স্বয়ং পিতাও হতে পারতেন। কংসনারায়ণের পুত্র কোটাল ( কুমারামাত্য,=প্রাসাদমেয়র,=সান্ত্রকুট্ট ) মহীপাল হয়ে তিনি-রাধা-বিদ্যা চুরির সহায়তা করেন। নবনন্দ নাপত, নাপিত, ধনাপত, ধনপতি-সাদাগর হয়ে বসেন। 'সখ-দুর-গারা' মানে সেখকার কছরীর, বোরোবুদুরের 'বরাহী'র আর গারো পাহাড়ের গৈরিক রক্ত তার ধমনীতে মিশ্রিত। এই লৌহিত্য হেরম্বকে ( গণেশ, যাহুদীয় বাইবেলের 'গেনেসিস' যাঁর গ্রন্থ ) গ্রীক-বর্ণিত 'ফণীশিয় লালমানুষ' বলে চিনতে ভুল হবার কথা নয়। নীল-লোহিতের মিশ্রণেই কলির জন্ম। হূণ আর্য্যের জন্ম। নীল ছিলেন সুমেরীয় অক্কডরা। সুমের মানে সুকেশী-শির, কালোশির; সুষির-ধারী কৃষ্ণের দেশ, সুকেশা ভরদ্বাজের দেশ। প্রশ্নোপনিষদে ( উপ+নিবাদ ) সুকেশা ভারদ্বাজ পিপ্পলাদ ( ফণীশিয়

'সুকাফা'—শুকপাখা—সায়ামের কাকাতুয়া ) সমীপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করছেন দেখা যায়। কোনস্থ শনি-ও ( বরবুদুরের বিগ্রহ ) পিপ্পলাদ-প্রতিষ্ঠিত ( শনির দশনাম দ্রষ্টব্য )। কলির অন্ত ঘটান শনি—তিনি রৌদ্রহস্তা, মন্দ, কৃষ্ণ। গোড়ায় কলিরই চর ছিলেন। ছিলেন সমুদ্রগামী 'চার্য্য'—( নালন্দার দ্বারস্তম্ভে মহীপালের লিপি )—পরে পারসিক 'চয়স্করেস'। ভাগবতের 'পারস্তনীপ' 'তালজঙ্ঘ' বা 'নাইনিতালি চেঙ্গিজ' হয়ে ইরান জয়ে বেরুলেন। ইড়া-জয় করে ষট্‌চক্রভেদ করলেন। এতে যে ঘটকবংশের উর্দ্ধে তাঁর স্থান হল তা 'ষট্‌চক্রনিরূপণম্'-এর প্রণব-মন্ত্রের টীকায় পাওয়া যায়। হলেন 'যশোমোতিক'।

ষট্‌চক্র কথাটিকে তান্ত্রিক পরিভাষা থেকে মুক্ত করে এবার জ্যোতিষী এলাকায় ( অলকা কথা থেকে এলাকা কথাটি এসেছে, শক-ধনীরা সগদনীয়ার অলকায় ( কাশ্মীরে ) বাস করতেন। 'অলক-সুন্দর' 'আলেকজণ্ডর' ধ্বনির সঙ্গে সুন্দর মিলে যায়, শক-ধনি বা শক-বালাদের অলকও হয়ত সুন্দর ছিল।) নিয়ে এলে আমরা তার জন্মের সন-তারিখ পেয়ে যাই। 'যবিয়ান-চক্র' বলে যবদ্বীপজাত ( ফণীশিয় ) ষাট বছরের একটি শতক চীন-মুনগল-শান-অহোম-বৈদিক আর্য্য সবাই ব্যবহার করতেন। এই ষষচক্র বা ষট্‌চক্র বেদে 'শদহ' নাম পেয়েছে। হিন্দুরা তাকে দেবগুরু বৃহস্পতিচক্র অথবা যাপিতের চক্র ( জুপিটার চক্র নাম এ থেকেই ) নাম দিয়েছেন। 'য'-যদি 'য়' হয়ে যায় তাহলে তা আরবীয়ের ( ঈষৎ রবীয় ) ভঙ্গীতে আপীতের বা ঈষৎ পীতের চক্র বনে যায়। 'U'-র' উচ্চারণ 'উ'-ই হয় না 'আ'-ও হয়। স্বশানী ( শানস্থ অহোম, 'তাও' বা 'সসনীয়' – যারা তাম্রশাসন, ঈশান, শ্মশান প্রভৃতির স্রষ্টা ) অহোমরা তার নাম দিয়েছে 'তাওসিঙ্গ'। বীরবাহু বলবর্ম্মণের শেষে যে 'ত্যাগসিংহ' ইংরেজের কারসাজিতে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে আসামে উপস্থিত, তাকে আমরা অসংশয়ে 'তাওসিঙ্গ' চক্রের প্রবর্ত্তক বলে ধরে নিতে পারি। তিনি হয়ত শাক্য বুদ্ধ। সদিয়া-অঞ্চল 'বৈসালি'-নামেই পরিচিত। আসামের ইতিহাস-প্রণেতা 'গেট'-ও বলেন এই শতকটি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৬৩৭ সনে চীনদেশে ( 'তাও'-রাজত্বে ? ) আবিষ্কৃত হয়েছিল। পুরোহিতহন্তা শানস্থ স্বশানীরা যখন 'গঙ্গাদোজ' (ব্রহ্মপুত্র) ভূমি স্পর্শ করলেন তখন তাঁরা 'দিওধায়ী' নামক পুরোহিত ( 'দিওদূতস' নামক বক্তৃয়ার শক-ধনী রাজ বা গ্রীকরাজ এঁদেরই দূত ছিলেন সম্ভবত) সম্প্রদায়ের কবলিত হয়ে কালক্রমে তাম্রধ্বজ হয়ে দাঁড়ান। এই তাম্রধ্বজের কৃপায় তাম্রশাসন এবং তাম্রলিপি। চৈনিক বারুদ ব্যবহার্য হয়ে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ল। এলো তোপ দেগে অজাতশত্রু। তারপর হর্য্যঙ্ক বিম্বিসর। এবার ভগবতীদের পালা। পাল-সাম্রাজ্য। বাংলার রাজা গোপালদেবের পূর্ব্বপুরুষ 'বারিরাশিশ্‌ শশধর' তুল্য 'অজনি' দয়িতবিষ্ণু'। 'গজনি' স্থাপন করতে এই যাযাবর রাজ-গোষ্ঠীর যদিবা খানিকটা সময় গিয়েছিল—'অজেস' বা 'অজিলস' শক বা কার্ত্তিক-গোষ্ঠী নির্ম্মাণ করেতে খুব বেশি কাল-কর্ত্তন হয়নি। তাছাড়া এই বিষ্ণুদয়িতা-রাধাশক্তিসম্বন্বিত কৃষ্ণটি যে প্রথম নন্দ-মৌর্য্য মিতান্নি-রাজ ( 'সুমাত্রা ও 'অন্নম'-এর মিশ্রণ ? ) 'সৌশ্‌শতর' ( শশী-সূর্য্যের মিশ্রপদ ) তা তাঁর বিশেষণের 'শ্‌শশধর'-ধ্বনিটি অকপটে ব্যক্ত করে। আসামের ব্রহ্মপাল কিন্তু গোপালের মতোই ভোট-প্রাপ্ত রাজা। ভোট-রাজ বা ভূটানি-রাজ। এই ভোটরা নেপালে এবং কাশ্মীরে যথেষ্ট উৎপাতের সৃষ্টি করেছেন। এঁরা স্ফূট হয়েই ফুটানির জন্ম দিলেন।



আদি 'রত্নফা'র মুদ্রায় যে 'শকাব্দ'টি দেওয়া, বাংলার রাজা শশাঙ্ক 'শ্‌শশধর'-ই হয়ত তার প্রবর্ত্তক ছিলেন। তবু, অহোম সাংখ্যিক ধ্বনিতে তা পাঠ করতে গেলে যা দাঁড়ায় তা এখানে দিচ্ছি: "কাপদাপরাংকাত' ( দ্বাপরের কার্ত্তিক কন্দর্প )। তিব্বতী সাংখ্যিক ধ্বনিতে তা' হয়: 'সিং সিংল ছগসস' ( অজ-শশ গোষ্ঠীর সিংহলস্থ নমশূদ্র )। চৈনিক সাংখ্যিক লিপি এ ধ্বনি এনে দেয়: "Keayihsinke' ( কাশীয় শঙ্কর ? )। এস্থলে আসামী সংকোশী-নদীতটের 'কেসাই খাতি'র সঙ্গে এশিয়ামাইনরের 'কাশীয়', 'কোশীয়' 'খাতি' প্রভৃতি আর্য্যরাজগোষ্ঠী মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে 'কাশীপুত ভাগভদ্রে'র আওতায় 'যোন, তক্ষশীলক-গ্রীক, 'অন্তল্কিদাসে'র ( কল্কি-অবতার ) দূতক 'দিয়পুত্ত' (দেব-দৈত্য, দ্বিপ-দ্বীপ-দীপ, জল-দ্বিজ পুত) 'হেলিওদোরস'-এর ভাগবতধর্ম্ম গ্রহণ। অন্তল্কিদাস অন্ত-অলকীদাস—কাশ্মীর-রাজের পঞ্জাবাঞ্চলের সেনাপতি--চাকর ( চক্র )। বিষকন্যা হেলিওদোরস-হলধরা 'অথর্ব্ববেদমন্ত্রে 'অনি' ( অনিরুদ্ধ ), সেনাপতি-চাকর দ্বারা উপরেবা ( ঐরাবতী ) তটে মন্থিত। অনিরুদ্ধ মহাভারতে 'অভিমন্যু'—সপ্তচক্রব্যূহে নিহত। চক্র চিরকাল ষট্‌-ই ছিল—ছিল দেবীর—প্রকৃতির। 'দেহিপদপল্লবমুদারম্' বলে পুরুষোত্তমরা বা সেনাপতি-বীরপুরুষরা দেবীকে ( ঘোটকী-ঘটা ) ভজিয়ে সপ্তচক্র তৈরী করে ষট্‌-কে ষড়রাহু, ষড়রিপু, ষড়ঋতুর সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

পুরানে-ভাগবতে তিনটি ( 'তিনি'-পদটির সম্ভ্রম-ব্যঞ্জনা 'তিন' কথাটি থেকে এসেছে—আর 'তিন' কথাটির উৎপত্তি মালব্য 'টিন'-এ ) আকর্ষিত শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়—দুর্গা, রাধা, কার্ত্তিক। আদি 'রত্নকা'-র এই তিনটিই সমন্বিত। তিনি নিজে স্কয়দীয় স্কন্দ বা কার্ত্তিক, ( হিমালয় অঞ্চল; হিন্দুকুশ থেকে করকোরাম হয়ে সদিয়া পর্য্যন্ত পর্ব্বতমালার পাদদেশই বাইবেল-কথিত 'স্কয়দীয়া' ) কিন্তু গ্রহণ করেছেন কিরাতী উমা-ক্ষুমাকে। এই ক্ষুমা যেমি পীত রাধা, তেমি গোরী গঙ্গা—ঈশানের সহগামিনী তাঁরা। কিন্তু তারার আগে পুরাকন্যা ছিলেন কালী—জলপ্রভা—'কেসাইখাতি'-গোষ্ঠীর শ্মশান-কালী—কাশীয়দের বরুণ-নদীর বারুণী। তারপর আসেন সঙ্কোশীদের লোহিতা 'জবা'—জবালা, চতুরহস্তিনী ললিতা। কালী ঋষিপরাশরের সহগামিতায় ( মহাভারত দ্রষ্টব্য ) আর ভর্ত্তৃহীনা জবা-জবালা আর্য্য-আর্য্যমা-গোষ্ঠির স্পর্শে এসে মিশ্রণের আরম্ভ করেন। হেরম্ব, হিড়িম্ব, কুন্তিপুত্র কর্ণ, সত্যকাম এই কামাতুরতারই ফল। তাছাড়া নীল-লোহিতের মিশ্রণও হয়েছে—আদিবরাহের ( কৃষ্ণ ) সঙ্গে মহীর ( আদিপীঠ গোরি কামাখ্যা ) মিশ্রণ; যবিষ্ঠ বরাহ ঈশানের সঙ্গে গোমতী-গোমাতা-গঙ্গার মিশ্রণ। তুরানী 'মুন-গল' এই মিশ্রণ ঘটিয়েছে। তারা একদিকে ভীম-অর্জ্জুন-দ্রুপদ-বভ্রুবাহন-ঘটোৎকচ-হিড়িম্বাতনয় হেড়ম্ব-হেরড কংস বংশ। অন্য দিকে কৃষ্ণ-ইন্দ্র-চন্দ্র-ভীষ্ম-মৌর্য্য বংশ। তারা তুরস্ক-গ্রীক, তুর্ব্বস—যদু। এঁরা পরস্পরও সমন্বিত হয়েছেন—অনিরুদ্ধ-ঊষায়। সহর্ষ কার্ত্তিকে ত্রিবেণী সঙ্গম। লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্ত্তিক সুঠাম, শ্রীল। তাঁরা অলকায় 'সেখকা'য় ( প্রাচীর চীনের বাইবেলী নাম )—এম্নি প্রাচীরাবদ্ধ হতে সচেষ্ট, অবাধ যৌনতার অবসান করতে এম্নি বদ্ধপরিকর যে ঋকবেদের জন্ম না দিয়ে পারেন নি। সেখানে 'দেবীসূক্তে' আমরা একাকিনী বাগ্দেবীকে পাচ্ছি। তিনি পরবর্ত্তী স্তরে লক্ষ্মী-হলাদা হয়ে রাধা। 'শক্তিরাস'-বলে যে বৈদিক কথাটি পাওয়া যায় তা তিন শকের সমন্বিত শক্তির কথা বা তীরক্ষেপণের ক্ষমতার কথা। তীরও জ্যা-আকর্ষিত শক্তি। তুরাণীরা এ-কর্ম্মে তুখার ছিলেন। 'শক্তি'-পদটি'ই ( শক্+তি ) তিন শকের সমন্বিত রূপ। 'অজেস্-অজিলস্-অপ্সবর্ম্মন'-

নামে তাঁদেরকে ইতিহাসে পাওয়া যায়। এ ত্রয়ী মিলেই ট্রয়ের জন্ম দিয়েছিল যার নাম ছিল 'পন্থ-প্রস্থ' (ট্রয়ের জন্মেতিহাস দ্রষ্টব্য)। 'ইন্দ্র-প্রস্থী'দেরই পথ করে দিয়েছিল ট্রয়ের প্রশস্ত রাস্তা। পথ করে দিয়েছিলেন 'যশোদা' যশোমতী যশোদেবী যশোধরা চন্দ্রিকা-চণ্ডিকা-চণ্ডিমা-চন্দ্রিমা। এঁর মূর্ত্তি লক্ষ্মণ সেনীয়রাজ্যাঙ্কে ঢাকায় বা 'ডবাকে' (ঢাকা, রাকা, রাহু, রাউক, রাউত, ডাহুক, ডাক. দ্বিবাক্—দুইধ্বনির ভাষা—কুটিল-লিপি—মহীপালের বাংলা লিপি) আবিষ্কৃত হয়েছে। তান্ত্রিক বাগীশ্বরী মূর্ত্তি। কমণ্ডলু, ধুতুরা, গদা ও পদ্মে তিনি ঈশানী-লক্ষ্মী। পাদপীঠের দক্ষিণ-পাটকে লেখা: "শ্রীনারয়োলব পন্তষষও", বাম-পাটকে লেখা: "শ্রীপবল্মল ষ বটেবন্তবট"। শানের কবি-জ্যোতিষী নরা-গোষ্ঠীর সদ্যপ্রসূত নারায়ণ আসামের লব্বার সঙ্গে মিশে যে শশাঙ্ক-পন্থা 'পঞ্চাশ', পঞ্চশর, পঞ্চমকার, পঞ্চমরাগিনী, কাশ্মিরী পঞ্চপীড়ের (যা থেকে সুফি 'পঞ্চপীর' জন্ম নিয়েছে) জন্ম দিয়েছে লিপিগুলোর ধ্বনি তাই শোনায়। বলে, কি করে 'বল্লাল হয়সাল' রোমান 'সাল্ল' হয়। শোনায় চেঙ্গিজ-পুত্র য়ুরোপ-রূষ-বিজয়ী 'সুবটৈ'-বটু'র নাম। শোনায় 'হেমাদ্রি'র ব্রতখণ্ডের রাজপ্রশস্তিস্থিত হিমাংশু বংশোদ্ভব বল্লালের নাম। দেয় ব্রাত্য শ্রীগোপালের বর্ণনা। তিনি রোমের 'শাল্ল'—'সেনেটে'র জন্মদাতা, বাংলায় বল্লাল যশোরের 'সেনহাটি'র জন্মদাতা। শোনায় অক্কড চূড়গঙ্গ, চোরগঙ্গ, চরগঙ্গ-বংশী নমশূদ্র 'অনন্তবর্ম্মন'-'নরসিঙ্গ'-'নৃসিংহ'-বীরনরসিংহরাউতে'র নাম—(কেন্দুপত্র-পাটক)। চন্দ্রচূড় ঈশান-চন্দ্রবংশী—অনঙ্কভীমের পুত্র তিনি। তাঁদেরই কন্যা 'চন্দ্রিকা' বা 'চণ্ডিকা', পরমাড়ি বা পরমারি হৈহয়-রাজকুমার যার পাণিগ্রহণ করেন। পরমারিটি 'পরমর্দ্দিন' বা পরম অদ্রিন হিমালয়। সিক্কিমে সিকিম হয়ে আছেন। তাঁকে তীর বিদ্ধ করে ফারদৌসী সে-আদ্রিফা যিনি তারকারি, কার্ত্তিক এবং পরদেশী। টোলেমির ভাষায় স্তূপচূড়-বাসী 'বলিচূড়', বালাসোরের আদিশূর-বলরাম। যশোদা 'মেনকা'র সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এখানে, যার কন্যার সন্ধান করতেন নারদমুনি। মহাবলিপুরমের (মমল্লিপুরম্)—মাতুলবংশের দুর্গারও খবর পাওয়া যাচ্ছে এখানে যার ভয়ে মাতুল-পুত্র ছাগমুণ্ড 'নৃসিংহ' বা 'নরশৃঙ্গ' ভীত। এই 'ছাগ' (তিব্বতী অষ্ট'-সংখ্যাটির নাম 'ছাগ') বা শৃঙ্গী তিব্বতী দুর্গাস্পর্শে (পূজাপার্বণ-গ্রন্থের প্রচ্ছদ দ্রষ্টব্য) অচৈতন্য 'মহিষাসুর'—দয়াপরবশে শ্রীমতী দুর্গা এই নেশখোর ভাই (কুপ্রস্তাবী?) অসুরকে—পতিতকে উদ্ধার করে পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা হচ্ছেন ('প্রাকৃতপৈঙ্গলে' গঙ্গাগীত পাঠ্য)। ষষ্ঠী, মনসা, ফণীশিয় যশোদা কৃষ্ণ-জননী (গৌড়ে প্রাপ্ত যশোদা-মূর্ত্তি—চিত্র নং ২৯ বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস) 'চতুরসর্প'-'হিহস্ত' নিয়ে 'চক্ষেকস' (পাদ-পীঠলিপি)—Cyxares-স্থাপিত। শাক্যমুনি গৌতম চন্দ্রকে বলতেন 'চণ্ডিমা' (দীঘনিকায় দ্রষ্টব্য)—এই চণ্ডিমা অষ্টভুজা যশোরের 'যশ দেহি' স্তবে আহূতা চণ্ডী। নৈনিতালে-অহিচ্ছত্রে 'যশ' নামক নীতি-বিধান 'মুন-গল' চেঙ্গিজ প্রবর্ত্তন করেছিলেন। এই 'তৈলপ'ই দাক্ষিণাত্যে কলচূড় গাঙ্গেয় রক্ত দিয়ে যান। বাংলার তেল-সিন্দুরে রঞ্জিত শুভ-চণ্ডী সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'মুন-গল'রাই বসন্ত-সমাগমে তাঁদের 'যার্ত' (তাঁবু) গুটিয়ে দেশান্তরে যাত্রা করতেন। হোরি-হোলি ফাগ ('আফগ্'—ফাগ—নিষ্টনে) তাঁদেরই দেওয়া জিনিষ। তিব্বতী ইরিগেশন-এনজিনিঅর 'যুবান মহিঙ্গ' (কামরূপরাজ 'মহিরঙ' দানব—অহোম ভাষায় 'অষ্ট'-সংখ্যাটির নাম 'রাঙ'। এ থেকেই রাঙতা, শৃঙ্গীর রাঙ, রঙুন, কামরাঙা, মোঙল, মঙ্গল, 'মঙ্গলিশ' হিরণ, হরিণ, চিত্রাঙ্গদা-মণিপুর ইন্দিয়ান লোহিত—তাম্র।) শিবশিরস্থ (শিশিরস্থ) জটাকে বা চন্দ্রকে ('গঙ্গাদোজ'-ব্রহ্মপুত্রকে



ফারদৌসীর পরদেশী ভাষায়) 'লাসা' এবং 'হোলি'-তে (গয়া?) নিয়ে যান। টোলেমির ভাষায় তিনি 'পেতাঞী পুলমায়ী'। পাঠান কেশর খাঁ বেলগয়াম্-রাজপুতানির সঙ্গে হোলি খেলতে কেন গিয়েছিলেন তা হয়ত এখন আমরা বুঝতে পারছি। হিমালয়-রূপী শিবের তুষার কন্যা (তুষার কন্যা) গঙ্গা এবং দুর্গা। গঙ্গা-পতি—বাণ-রূপী শিব; দুর্গা-নাথ মহিষ-রূপী মহেশ। ছেত্তা-আর্য্য 'সৌশশ্তরে'রই পৌত্র 'দশরত্ত'—শব্দভেদীবাণধারী, কার্ত্তিকজননী কাত্যায়নী 'দশভুজা'-দুর্গা তাঁরইত হবে! তিনি শনির বিগ্রহ স্তাবক ব্যাস, দশরথ-ঋষি—বটের পর অশ্বত্থ ব্যবহারে তিনি অরণি-প্রবর্ত্তক—'ত্রিস্তূপ' বা 'ত্রিষ্টুপ' ছন্দের জন্মদাতা (শনিমন্ত্র দ্রষ্টব্য)। শনি-পূজায় মাষ-মহিষ লাগে। 'মুন-গলে'র ছোঁওয়া তিনি এড়াতে পারছেন না—ত্রিস্তূপে দোল-নির্ম্মাণ করছেন। যশোদা-লোহিতার সমন্বয় করেছেন। তিনি আর্য—জমের দোসর। ইরাণী 'জম' (জম্বুদ্বীপে বাস—জামদ-অগ্নয়) ইরাণীদের মাংস-ভক্ষণ শিখিয়ে ছিলেন। বৈবস্বত-পুত্র হয়ে প্রথম সূর্য-শশীর সন্তান। রঘুজঅজঅজ শনিকে ত 'যম'ই বলা যায়। তারপর আবার এলো শৃঙ্গী 'মুন-গল' চন্দ্র আর নীলকণ্ঠ—'কুবলই' (কুবলয়=পদ্ম) আসামের পদ্মনাভ লাল ব্রহ্মাকে, কমলাসন ও কমলাসনাদের নিয়ে। খাশীয়দের 'কুল্লাই' নামক মঙ্গলধ্বনি নিয়ে এলো কালো বলাই, কালোরাজা ত্রিপুরা-পাটিকারার 'হরিকালদেব রণবঙ্কমল'। কৌমের লীলাক্ষেত্র (কমলেরও) বলেই কুমিল্লা নাম—আদি নাম তার কমলাঙ্ক। হয়ত ইনি কার্ত্তিক—কাশীয় তাতার—হেলিওদোরসের 'ত্রাতার'—যেমন 'রত্নফা' 'কাপচকস' 'মুন-গল'। এলো গহরবাল 'হালগু'—'রত্নফা'য় মিশে ফল্গু আর লাল ফাল্গুন তৈরী করল—দশরথের তর্পণ হল ফল্গুতে। পুরানে ভাগবতে 'হাল'—'পুরীষভীরু' রাজাদের নাম লিখিত হল। বাঁকুড়ায় এঁদের—এই চালুক্য-বল্লীদের কার বাঁকা চূড়া দুলুল, বলা যায়না। তবে একটু বলা যায় যে এমন ভীষণ বিক্রমে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন যে আজও 'হাল-আমল' বলতে আমরা বর্ত্তমানকেই বুঝি। সেদিনকার 'ধারুবারে' 'হাল-আমল' ছিল কান্তোজী বিক্রম-সম্বৎ।

যাযাবর মহীযানী ('মহাযানী' অপর নাম) 'তুরাণী', সমুদ্রযানী অথচ সমুদ্র কথা গোপন রাখবার প্রয়াসী। এই 'ফণীশিয়' বা তাতার-রা গঙ্গা-ভূমিরই ভীল সন্তান। তৈমুর শুধু য়ুরোপে-মিশরেই নয়, সমুদ্রগুপ্তেও বিদ্যমান। ভল্লধারী বাবিরূষীয় পুত্রঘাতক চন্দ্রক-চণ্ডক 'মুনগল' চন্দ্রক-চিহ্ন গুপ্ত করবার নানা কৌশলে বঙ্গ-সন্তান হয়েছে। এই পূর্ব্বাঞ্চল থেকেই মনঙ্কেরীরা দিকে-দিকে বাহুবিস্তার করেছিলেন। চীন-মিশর সুমের-বাবিলন, গ্রীক-তুরস্ক, ইরান-মোহেঞ্জোদরো,-স্কন্দনভিয়া-জাপান তাঁদেরই কীর্ত্তি। তাঁদেরই বাদ্যেবীর বাক্‌ধ্বনিতে পৃথিবীর ভাষাসমূহ বিধৃনিত। তাদের আধুনিকতায় ধরাদ্রোণী (দেরাদুনী) দ্রৌপদী-যৌনবর্ব্বরতা বরবাদ।

পুরানে পাওয়া যায়: "'জম্বু' এবং 'প্লক্ষাহ্' হ'ল বায়ু-কোণের (যবদ্বীপ, মলক্কা, সাম-অন্নম ইত্যাদি)—শাশ্মলী পরে মহৎ হ'ল, হয়ত দ্বাপরে—এই দুই-এর পরে (শাশ্মলী পঞ্চাল এলাকা)। কুশ (ইথিওপিয়া) এবং ক্রৌঞ্চ (ক্রীট-'ক্রনস'-মিনঅন'-এর) আছে মধ্যে 'শাকহ' (শাক—মিশর—টোলেমির? উত্তরপুরুষে কশাক?) নিয়ে। পুষ্করায় (পুষ্কলাবতী) সপ্ত শেষ হ'ল।" এই ষষ্-দ্বীপের, ষট্-চক্রের, ষড় জাতির প্রেতত্ত্ব-প্রাপ্তি, পুষ্করা-পাওয়া পুষ্কলাবতীতে—মোহেঞ্জোদরোতে—সিন্ধুতীরে। দুষ্মন্ত-নন্দন পুত্রহন্তা ভরত যে শুধু ভাগবতে মন্থর-বিধান দিলেন তা নয়—এমন পলাতক-সন্তান তুরাণী বংশের সৃষ্টি করলেন যারা সরস্বতী-নদীতীরে অগ্নি-প্রজ্জ্বালন বিদ্যা শিখছেন—বিদ্যা-দেবী সরস্বতীর জন্ম

শিখা ) 'খরবেল' উড়িষ্যায়। তাই খরবেল 'রথযাত্রা'র প্রবর্ত্তক—কুমিল্লার 'সপ্তরত্ন' রত্নফার ভগ্নাবশেষ নন্দির তাই জগন্নাথ-মন্দির। প্রমীলা-রাজ্য কি ছিল উড়িষ্যা? তাই বুঝি মেঘা-নদীর রাজা ( ত্রিপুরা মেঘাবিধৌত ) মেঘনাদ সেখানে গিয়েছিলেন। নারী-রাজ্যে গিয়ে সব জারিজুরি ভেঙে গেল তাঁর—ভুললেন জারি গান আর জুরিগাড়ী চড়া। চড়ের রাজার কী দুর্দ্দশা! তবে প্রিয়দর্শীদের এ-দুর্দ্দশা অবশ্যম্ভাবী। বাক্লাচন্দ্রদ্বীপ থেকে তাকলামাখানের লামা-খানদের তাক লাগিয়ে তাঁরা সেখানকার চন্দ্রকলা মাখানো নবনীত-তন্বীদের মনোহরণ করতে পারতেন। কুলীনের ঐতো উল্লাস, ঐতো ক্লেশ।

রত্নফা বিজয়সিংহ গৌড়েশ্বর হয়ে-ই যে শুধু রত্নমানিক্য নাম গ্রহণ করেছেন তা নয়—সিংহলের মনি-মানিক্য-ভাণ্ডারও তিনি লুণ্ঠন করেছিলেন। এই বজ্রযানী বীর দক্ষিণ-সমুদ্রযানী হয়ে ( ঋকবেদে বশিষ্ঠ মন্ত্রে ইন্দ্রের আবির্ভাব পাঠ্য ) দক্ষিণী 'নাগ' (শক) 'যক্ষ' (পাণ্ড্য-পহ্লভ) কৌম-গুলোর সঙ্গে বিরোধিতা করেন। অশোক-ভ্রাতা সিংহলী তিস্সকে বা রামানুজ লক্ষ্মণকে 'দামিল' সর্পনকের ( সর্পলোক ) নাগকন্যারা খানিকটা ত মুগ্ধ করেছে।: অন্তত 'বলাশ্রী গৌতমী'র মতো বামা-ত সেখানে ছিল।* কিন্তু নিজ দেশে—'বড়কান্তা'য় এই 'নটেশ'-শিব'দের ( লয়হরচন্দ্রদেবের প্রস্তর পাটক-লেখ ও মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য ) কান্তা রয়ে গেলেন। কান্ত-বিরহিনী দুর্গা-রাধার দীর্ঘ-নিশ্বাস শুনতে পাচ্ছি—শুনছি ইড়া-পিঙ্গলা নাড়ীর হাহাকার—ইরা-পিঙ্গলা ( সাংখ্যসূত্রে 'পিঙ্গলা' নাম্নী আশাবতী বেশ্যার উল্লেখ আছে—নিরাশ হয়ে সে সুখী হয়েছিল ) নারীর অন্তরের ব্যথা, 'প্রাকৃতপৈঙ্গলে' :

"সো মহ কন্তা
দুর দিগন্তা।
পাউস আএ
ঢেউ চলা এ॥"

"আমার স্বামী, মহেশ, কান্তদর্শন দূর দিগন্তে। পৌষ আসে ( উষ নিয়ে। কুয়াশাকে পূববাংলায় উষ বলে। উষা-কালের মতো আবছায়া তৈরী করে বলেই কুয়াশার 'উষ' নাম। এই উষ তুষানলে দগ্ধ করেছে নারী-হৃদয় ) বর্ষার প্লাবন-বন্যা নিয়ে। পৌষে বর্ষা আজ বিলেতে হয়—বারোহাজার বছর আগে ( শ্রদ্ধেয় বিদ্যানিধিমহাশয়ের গণনা-অনুসারে ) তা বাংলায় হ'ত। 'কারো পৌষ-মাস কারো ভাদ্র-মাস'—বাক্যটির জন্ম পৌষের বর্ষাবন্যা থেকেই। লয়হরচন্দ্রের শিলালেখে পৌষের নক্ষত্র পুষ্যাকে আষাঢ়ের অমবস্যায় উদিত দেখা যায়। ঐতিহাসিকরা বলেন তিনি ছিলেন—সুবর্ণভূমির (ব্রহ্ম) 'বৌদ্ধ সুবর্ণচন্দ্রে'র এবং 'হরিকাল'-এরই (চন্দ্রদ্বীপ) বংশোদ্ভব। পার্ব্বত্যত্রিপুরার কিরাত কুকি-জাতির 'কের'-পূজা ( বাঁশ-পূজা ) শ্রাবণের অমাবস্যাতে হয়—এ-সময়েই ত্রিপুরা-রাজ গোবিন্দমানিক্যের ( রাজধানী ছিল পার্ব্বত্যত্রিপুরার 'উদয়পুরে' ) রাজ্যে কালীর কাছে ( কছরী পদ্ধতিতে 'কেসাই খাতি'র

* একটি 'ওরওন' ( আরণ্য-ওরাওঁ ) সঙ্গীত শুনুন: 'বধূ, তোমার ত দেশ-গাঁ আছে। আমার আগে আগে গাঁয়ে-গাঁয়ে চলে যাও কেন তুমি? 'দেশে-দেশে খোঁজো বধূ আমায়। দেশ কি মাদুরের মতো গুছোনো যায়, বিছানো যায়, দক্ষিণে তুলে নেওয়া যায়—কাঁখে করে বিছানার মতো? পটের মতো গুটোনো যায়, ঘড়ার জল ছড়ানো যায়? কোথায় তারে রাখবো বলো—মাটিতে কোথায় তারে রাখা যায়?' 'রাঙ্কি-মুড়া দেখছ! দ্বারন্ধ্রের বারান্দা? রাখো তারে দ্বারান্দার বারান্দায়।'—( Spring of the Soul—J. N. Sahu—Cuttack, ) সে-বারান্দায় প্রচুর রন্ধ্র-ও ছিল নিশ্চয়।



বেদীতে ) নরবলি হত। রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জ্জন' ও 'রাজর্ষি' গ্রন্থে এবং ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দরে' এ-রাজাকে অমর করে গেছেন। বাংলা-সাহিত্যে তাঁর অমর হয়ে থাকবারই কথা, বাংলার ইতিহাসেও। ইতিহাস আর সাহিত্য ত একই কথার রকমফের।

গোবিন্দচন্দ্রের রাণীর নাম ছিল 'গুণবতী' ( 'গুণবতী' দক্ষিণ-ত্রিপুরায় এখনও একটি জনপদ )—'সুন্দরে'র পিতার নাম 'গুণসিন্ধু'। 'সুন্দর' বহুদেশাগত। 'বিদ্যা' যে মিথিলার শিবসিংহের ( অহোমরাজ দুর্গা-দ্রৌপদী-এনাদরি-চিত্রাঙ্গদা ভক্ত :শিবসিংহ? ) বিদ্যা এবং 'সুন্দর'যে অন্ধ্র কবি বিদ্যাপতি এ-ইঙ্গিত ভারতচন্দ্র দিয়ে গেছেন। 'অলকসুন্দর'-ও বিদ্যাপতি হতে এসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন রাজ-পুরোহিত 'রঘুপতি'র হিংস্রতার এবং তার পালক-পুত্র রাজপুত জয়সিংহের ( মণিপুর-রাজ জয়সিংহ? ) হত্যা-কাহিনী। মৌর্য্য বালক চন্দ্রগুপ্তের পালক-পিতা ছিলেন বিষ্ণুগুপ্ত-চাণক্য – কলিকাঠের ( কলির অরণি 'কলকাতা' ) কালিঘাটে তাই মুদ্রা পাওয়া যায় বিষ্ণুগুপ্ত-চন্দ্রগুপ্তের—ত্রিপুরায় বৈদ্যগুপ্তের। চন্দ্রগুপ্তের অবসান জৈন-মন্দিরে কি যূপকাষ্ঠে সে-গবেষণার ভার ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের হাতে রইল।

আদি পালরাই পরিবারভক্ত পাণ্ডবকুল—হিড়িম্বা-চিত্রাঙ্গদাতনয় শ্রীহট্টের হেড়ম্ব-রাজবংশ এবং মনিপুরের বভ্রুবাহন বংশ, ত্রিকলিঙ্গের সোমবংশ। প্রথম মহীপাল এই গোষ্ঠীর। শ্রীহট্টের রাজ্যস্থাপয়িতা খরবাণ-নবগীর্ব্বাণ কলিযুগে 'পাণ্ডবকুলাদিপালাব্দ' সম্ ৪৩২৮-এ আবির্ভূত। এই সংখ্যাটির অহোম, তিব্বতী ও চৈনিক সংখ্যা-লিপি-ধ্বনি যথাক্রমে: 'মুঙরাই দাপরাঙ', 'মিমিসিংলছগস' এবং 'তিঙ্গপিঙ্গযিহসিন'। এরসঙ্গে দ্বাপরী রত্নফার (শ্রীহট্ট বিজয়ী মহীপাল) সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। হর্ষবর্দ্ধনেরও। বভ্রুবহনের সঙ্গে ত্রিপুরা-রাজদের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য বলেই ত্রিপুরা-রাজবংশ মনে করতেন। কুরু শ্রীহট্ট-( শ্রীঋকার কছরি—কলচুর গাঙ্গেয়') এবং পাণ্ডব মণিপুর ( তিব্বতীমন্ত্র 'ওঁ মণিপদ্মে হুঁ' দাতা ) মিলে-মিশে যে যমলার্জ্জুন ( কৃষ্ণ যা ভঞ্জন বা ভঞ্জন করেন ) পরিবার তৈরী করল, তৈরী হ'ল যে বরাগী-বড়ায়ী, তাদের ঘরে যেমন 'রিপুরাজ-গোপী-গোবিন্দ' ছিল, তেম্নি ছিল 'ঈশানদেব'। তাঁরা বাঁশ-ও ধরতেন, বাঁশী-ও বাজাতেন। বংশধারী এবং বংশীধারী বড়ায়ীর দ্বি-মূর্ত্তি যেমন 'কৃষ্ণ কীর্ত্তনে'র 'কালিনী-কূলে'-কুলে ছিল, তেম্নি অবিকল ছিল হিন্দুকুশীয় গ্রীসের আদি-দেবতা 'দিঅনিউষাস'-এর মূর্ত্তিতে, ছিল ইস্রাইলের পরিবারপূজায়। সবই 'মৃত্বানমহিঙ্গ'-এর, 'মইরঙ্গ দানবে'র লীলা। এই ব্রহ্মা বিষ্ণু-ঈশান নর-নারায়ণদের জটিল জটা খুলবার দুরূহ কাজও বাংলার ঐতিহাসিকদের জন্যে জমা রইল।

আর রইল 'পূজাপার্ব্বণ'-বইখানা। বাংলার পালদের পাল-পার্ব্বণের ইতিহাস। এতে যে নাক্ষত্রিক বর্ষগণনা সন্নিবেশিত হয়েছে, মনে হয় তা নির্ভুল। শ্রদ্ধেয় যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিই প্রথম বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অবলম্বনে ( জ্যোতিষী-বিদ্যা ) ঘোষণা করলেন যে ভারতবর্ষের সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৮০০০ বছরের। আমি তাঁর পদ্ধতি অনুসরণ করেই বলতে চাই জম্বুদ্বীপী বাংলার সভ্যতা খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১০০০০ বছরের যখন পৌষে বর্ষারম্ভ হ'ত। বঙ্গই মোহেঞ্জোদরো-হড়প্পার জন্মদাতা। বাঙালী নবোপলনসর-যুগের। নব-পল্লব যুগের। ত্রিপুরার 'বাঘাউড়া'-গ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তি যদি মহীপালের তৃতীয়-রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তবে সেই মহীপাল বাংলার পরিবার-ব্রতপালনের প্রবর্ত্তক—বিশ্ব-সভ্যতার জন্মদাতা প্রথম য়ীহুদী। প্রথম বড়ায়ী—বাররায়ী ভাই-এর অন্যতম। বাংলার প্রথম বার-ভুঁঞা তিনিই সৃষ্টি করেন। লিপি-পীঠে এই সুবলী সুবলের, 'সুব্বিলুলিউমা'র এ-কথাটিই প্রথম-পংক্তিতে লিখিত : "সম্বৎ ৩ সুব্বল মহহর শ্রীমদ্রিয়ালব্বরাজ্ঞে"

কলচুর, কটকী, চোর, চোড়গঙ্গ, বিদ্যাপতি, ভগীরথ, গাঙ্গেয় কাণ্ববংশ কুরুকুল। ঋক্‌বেদী। তাঁরা হেলেনিক-গ্রীক-মৌর্য্যের জনক। হস্তিনাপুরের 'জুপিটার-চক্রের রাজা হস্তিন'। অঙ্গাধিপতি মহাভারতের কর্ণ। ঋক্ সংহিতায় কর্ণ বর্ণিত হচ্ছেন 'কিম্ তে কৃণ্বন্তি কীকট?'—(কর্ণের তিন কবচ-কুণ্ডল -কটক কি? )। 'ইষু, গাবঃ, নাশিরম্।—( তীর, গোরু, কবন্ধী-ছিন্নমস্তা—বাবিরূষীয় ছিন্নম্ হস্তা পুরোহিত—জগন্নাথ। মোহেঞ্জোদরের বাবিরূষীয় মুদ্রা দ্রষ্টব্য। )

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

# নূতন বই

## ছোট গল্প

**রাম রহিম** : শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ; বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ ; মূল্য আড়াই টাকা।

**একটি রঙ-করা মুখ** : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; বুকমার্ক, ৩২এ সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ; মূল্য দুই টাকা।

**মর্মর** : অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় ; শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ; মূল্য আড়াই টাকা।

তিনটি ছোটগল্পের বই। বাংলার পাঠকসমাজে ছোটগল্পের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। চাহিদার দ্বারা সরবরাহের নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আমাদের ছোটগল্প লেখকেরা যে এই ব্যাপারে তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন তা নিত্য নূতন ছোটগল্প সংকলনের সমারোহ লক্ষ করলেই টের পাওয়া যায়। পাঠকদের দাবী পূরণে আমাদের কথাসাহিত্যিকদের লেখনী ক্ষান্তিহীন। উপরের তিনটি বই এই অনলস ক্ষান্তিহীনতার অন্যতম প্রমাণ বলা যেতে পারে।

'রাম রহিম' বইয়ের লেখক শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠকসমাজে সুপরিচিত। গত দশ-বারো বছর তিনি একটানা লিখে চলেছেন, বিশেষ করে সাহিত্যের ছোটগল্প বিভাগেই তাঁর তৎপরতা সমধিক লক্ষনীয়। পূর্বাশার পাতায় তাঁর একাধিক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে এবং পাঠকমহলে তাদের সমাদর ঘটেছে। এই সমাদর অকারণ নয়। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প বলবার সহজপটুতা আছে, নির্যাতিত-শোষিত শ্রেণীর মানুষের প্রতি তাঁর সমবেদনা খাদহীন, সমাজের তথাকথিত উপর-তলার মানুষের অনুষ্ঠিত পুঞ্জীভূত অন্যায়-অবিচারের প্রতি তাঁর রোষ সুতীব্র এবং অকপট। গল্পলেখকের পক্ষে প্রথমোক্ত গুণ অপরিহার্য, কিন্তু আধুনিক কালোচিত গল্পনির্মাণে শেষোক্ত গুণদুটির পোষকতাও কম নয়। আমাদের আধুনিক লেখকদের মধ্যে অন্যায় সম্বন্ধে চেতনার বড়ো-একটা প্রমাণ পাই নে ; অন্যায়ের যারা শিকার সেই সব ভাগ্যবঞ্চিত অনাদৃত মানুষদের প্রতি সহানুভূতিও তাঁদের খুব তীব্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আদর্শ প্রভাবিত বাংলা লেখকের দল এখন পর্যন্ত ন্যাকা-ন্যাকা প্রেমের গল্প লিখতেই সমধিক মানসিক স্ফূর্তি অনুভব করে থাকেন। এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হলেন শৈলজানন্দ, জগদীশ গুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর কিছু কিছু লেখক এবং গোষ্ঠী-অচিহ্নিত অথচ সুস্পষ্ট বামপন্থী শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শান্তিরঞ্জনের মানসিক গঠনের সহিত অবিচ্ছিন্ন শেষোক্ত দুটি প্রবণতাকে আমি তাঁর লেখক জীবনের দুটি মূল্যবান পুঁজি বলতে চাই। অন্যায়-অবিচারের প্রতি যে লেখকের মনে সহজাত রোষ নেই তিনি শিল্পীনামের যোগ্য কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।



নির্যাতিতের প্রতি অমেয় করুণা এবং নির্যাতনকারীর প্রতি ঘৃণা, শান্তিরঞ্জনের একাধিক গল্পের মূল বিষয়বস্তু। 'অতিমানুষ', 'স্বপ্নমেধ', 'ইজ্জৎ', 'অমিত্রাক্ষর', 'মফঃস্বল সংবাদ' সব কটি গল্পেই এই মূল দুটি মানসিক প্রবণতাকে রূপায়িত করে তোলা হয়েছে। হয়তো বেদনার আতিশয্যে ও রোষের তীব্রতায় কোথাও কোথাও গল্পের শিল্পরূপের সংযত পরিমিতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে ( যেমন 'অতিমানুষ' গল্পে ), তা বলে গল্পগুলির ভিতর দিয়ে সমাজকল্যাণকরতার ইঙ্গিতলাভে বাধা ঘটে না ; শুধু চূড়ান্ত বিচারে এইমাত্র বলা যায় যে, শান্তিরঞ্জনের রচনার ভিতর সংগ্রামমুখিনতা যেমন আছে কল্পনার প্রসার সে পরিমাণ নাই, কল্পনাসমৃদ্ধির অভাবে গল্পগুলির শিল্পমূল্য খানিকটা বাধাগ্রস্ত হয়েছে সে কথা মানতেই হয়।

এই বইয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প নিঃসন্দেহে 'ইজ্জৎ'। তারপরেই 'অমিত্রাক্ষর' ও 'স্বপ্নমেধ' গল্পদুটির নাম করতে হয়। গল্পগুলিতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সমাবেশ পুস্তকটির নামকরণের সহিত বিশেষ সংগতিযুক্ত হয়েছে। মুসলমানী পরিবেশ ও সংলাপ রচনায় গল্পকারের বিশেষ কুশলতা লক্ষ করা গেল। মোটের উপর, বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে রাম রহিম উল্লেখ করবার মতো একটি নতুন বই। এ বইয়ের লেখক সংগত ভাবেই পাঠকদের সপ্রশংস মনোযোগ দাবী করতে পারেন।

'একটি রঙ-করা মুখ'-এর লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত নবাগত, তাই বলে এঁর শক্তিমত্তা অস্বীকার করা যায় না। ছোট ছোট বাক্যবিন্যাস এবং কাটা-কাটা সংলাপের দ্বারা উপযুক্ত পরিবেশসৃষ্টির ক্ষমতা এঁর সহজায়ত্ত। গল্পের শিল্পমান বিষয়েও ইনি সম্যক্ সচেতন। শিল্পরূপের অপহ্নব ঘটিয়ে গল্পকে চমকপ্রদ কিংবা অনাবশ্যক নাটকীয় করে তোলবার নীতিতে ইনি বিশ্বাসী নন এবং এইটে তাঁর লেখা সম্বন্ধে একটি মস্ত বড়ো কথা। পূর্বাশায় লেখকের কিছু কিছু গল্প ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সব কটি গল্পে তাঁর অভ্যস্ত বাহুল্যবিমুখতা লক্ষ করে প্রীত হয়েছি। আলোচ্য সংকলন-গ্রন্থেও লেখকের এই পরিমিতিপ্রিয়তার প্রমাণ নির্ভুল ভাবে বর্তমান।

শচীন্দ্রনাথের গল্পের আর-একটি চিহ্নিতব্য বৈশিষ্ট্য হল তাঁর বিষয়ের বৈচিত্র্য। বাংলা এবং বাংলা দেশের বাইরেকার পরিবেশ, বাঙালী এবং অবাঙালী চরিত্র—সব রকম মালমসল্লা দিয়ে তাঁর ছোটগল্পের কলেবর তৈরী। লেখকের মনোভঙ্গীর ভিতর বিদেশী কথাসাহিত্যের ভাবধারার প্রভাবও কম নয়। এটি লেখকের পক্ষে অপবাদের কথা নয়, গুণের কথা, কেন না তিনি বিদেশী ছোটগল্প বলার ঢঙ আত্মসাৎ করে নিতে পেরেছেন এবং ভারতীয় পরিবেশ ও ভারতীয় চরিত্রবর্ণনায় জীর্ণ বিদেশী প্রভাব সুন্দর কাজে লাগিয়েছেন। লেখকের ভাষার ডৌলটি চমৎকার। সংযত, পরিপাটি, সুবিন্যস্ত। হয়তো প্রাণপ্রাচুর্য ও বলিষ্ঠতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে, কিন্তু সেটি ধর্তব্য নয় এ কারণে যে, লেখকের প্রসাদগুণসম্পন্ন পরিমার্জিত রচনারীতির দ্বারা সে ক্ষতির পূরণ হয়েছে। মোট কথা, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিশালী লেখক। এ পর্যন্ত এই নবাগত গল্পকারের রচনার যতটুকু প্রমাণ পেয়েছি তাতে নিঃসন্দেহে তাঁকে বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের আসরে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানানো চলে। নবীন লেখকের নিকট বাংলা কথাসাহিত্যের বেশ কিছু প্রত্যাশা রইল।

সংকলনের শ্রেষ্ঠ গল্প, আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায়, 'বিজ্ঞাপন'। এ গল্পে সহানুভূতি, কারুণ্য, শ্লেষ ও বিদ্রূপ একটি নিটোল শিল্পরূপের ভিতর সুসমঞ্জস ভাবে সমন্বিত হয়েছে। গল্পের কথক সমীর এক

ধনীগৃহের আশ্রিত কলেজ-পড়ুয়া ছেলে। সেই গৃহেরই আর-একটি অনাদৃত কোণ জুড়ে আছে ভাগ্যবঞ্চিতা নমিতা। ধনগর্বে গর্বিত তথাকথিত অভিজাত গৃহে আশ্রিতের মর্যাদা কতটুকু এবং তাদের জীবনের মূল্য কোন্ মানদণ্ডে মাপা হয়ে থাকে তারই বেদনাকরুণ চিত্র কুশলী রেখায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আলোচ্য গল্পে। সংকলিত প্রত্যেকটি গল্পই উপভোগ্য, তবে উপভোগ্যতার তারতম্য বিচারে নিম্নলিখিত ক্রম অনুসরণীয়: বিজ্ঞাপন, ফুলডুংরী, অপ্রাসঙ্গিক, মাইকেল মধুসূদন, আবিষ্কার, একটি রঙ-করা মুখ, কাপ্তেন কেনেডির গল্প, সীমাচলম্ ও গ্রহান্তর। পাঠকভেদে রুচিভেদ, আর রুচিভেদে সজ্জিত ক্রমের অদলবদল হতে পারে, বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে একটি কথা। শচীন্দ্রনাথের কল্পনা সমৃদ্ধ সন্দেহ নাই, কিন্তু বিষয়-নির্বাচনে তিনি কিঞ্চিৎ ঐতিহ্যপন্থী। আজকের দিনের সমাজ-ব্যবস্থার মাপকাঠিতে ঐতিহ্যের উপযোগিতা ক্রমশঃ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধর্মী বিষয় ও চরিত্রের পরিস্ফুটনে সম্পূর্ণ মনোযোগ ব্যয় না করে সমাজের শোষিত অবহেলিত মানুষদের দুঃখদুর্দশার চিত্রণের প্রতি ক্রমবর্ধমান মাত্রায় মনোযোগ আরোপ প্রগতিশীল লেখকমাত্রেরই অবশ্যপালনীয় আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভবিষ্যৎ রচনাদিতে আদর্শটির প্রতি লেখকের আরও একটু সচেতনতার প্রমাণ পেলে সুখী হব।

'মর্মর'-এর লেখক শ্রীঅক্ষয় চট্টোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্পের আসরে নিতান্তই নবাগত। 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় এঁর রচনা আমরা দেখেছি। নবাগত লেখক সম্পর্কে অকরুণ মন্তব্য করবার দায় আমরা সাধ্যমত এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে ঔদার্যের দ্বারা নিজেকে সুরক্ষিত করা সত্ত্বেও অপ্রীতিকর কর্তব্যের দায়িত্ব এড়ান কঠিন হয়েছে। লেখকের কল্পনা, গল্পগ্রন্থনরীতি এবং ভাষা কোনটাই প্রশংসাকর্ষক নয়। কল্পনা অসংযত, ভাষা অগোছালো, গল্পগ্রন্থনরীতির ভিতরও বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ নেই। অন্যপক্ষে, গল্পের বিষয়কে অনাবশ্যক যৌনতা-মণ্ডিত করবার দিকে লেখকের অসুস্থ ঝোঁক চোখে পড়ল। এই ঝোঁক সর্বপ্রযত্নে বর্জনীয়। পিউরিটান মনোভাবের বশে এ কথা বলছি তা নয়, শিল্পীর পক্ষে অব্যভিচারী ভাবে মান্য শিল্পাদর্শের প্রতি চোখ রেখেই আলোচ্য প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। যৌনতা উপস্থাপনের যেখানে সঙ্গত কোন কারণ নেই সেখানে সে জিনিষের অবতারণা ক্লেদরতির নামান্তর। সমালোচ্য লেখকের ক্ষেত্রে আত্ম-আরোপিত সংযমের আদর্শ বিশেষ ভাবে অনুসরণীয় বলে মনে করি।

নারায়ণ চৌধুরী


প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা—২৷৷০ সেতুবন্ধ—২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু—৪৲ বিচিত্র হৃদয়—২৲

কবিতাভবন ঃ ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯



আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

জীবনানন্দ দাশের
মহাপৃথিবী
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
দেড় টাকা

অজিত দত্তের
পুনর্ণবা
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা
দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী
দেড় টাকা

নতুন দিন
আট আনা

যৌবনোত্তর
আট আনা

তিনজন আধুনিক কবি
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর
এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার
দু'টাকা

শুক্লাভিসার
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল
এক টাকা চার আনা

ঋণ
দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
নয়নচারা
দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত
এক টাকা বার আনা

মরামাটি
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল
পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায়
( ২য় সং )
তিন টাকা

রাত্রি
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

মৌচাক
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
তিনরঙ
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ. ক লি কা তা

Regd. No. C. 1

## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের মধ্য ভাগে প্রকাশিত হয়। চলতি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা ( সডাক ) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ( ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেণ্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কামশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয়ঃ

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা




খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩

Printed & Published by Satya Prasanna Datta, Purvasa Ltd.

# পূর্ব্বাশা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসনির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেক রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানর
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


# টুকরো কথা... (২০)

উপন্যাস জিনিসটা ইওরোপের। ঔপন্যাসিক টলষ্টয়, ডষ্টোয়েভ্স্কি, টমাস মান্—এমন কি টমাস হার্ডির কথা ভাবলে স্বীকার করতেই হয়—'ওঅর অ্যাণ্ড পীস্' 'ব্রাদার্স কারামাজোভ', 'ম্যাজিক মাউন্টেন', কিংবা 'টেস্ অব্ দি ডারবারভিলস্'এর প্রতিতুলনা বাংলায় নেই। তা হয়তো নেই, কিন্তু ছোট গল্পের মতো ছোট গল্পের উপন্যাসে বাঙালী লেখকের হাত খুব পাকা। প্রমাণ—প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর', রমেশ সেনের 'গৌরীগ্রাম', নরেন্দ্র মিত্রের 'দূরভাষিণী', সন্তোষ ঘোষের 'নানা রঙের দিন', সমরেশ বসুর 'বি টি রোডের ধারে', স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চন্দনডাঙার ছাট', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশাপাশি'। নতুন উপন্যাসের মধ্যে এই রচনাগুলি বিশিষ্ট। আ'রা কিছু উপন্যাস। গোলাম কুদ্দুসের 'বাঁদী', বিমল করের 'ঝড় ও শিশির', সাবিত্রী রায়ের 'পাতালিপি', সুমথনাথ ঘোষের 'দিগন্তের ডাক' এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইতিকথার পরের কথা'॥

প্রমথ চৌধুরীর ছদ্মনাম ছিল 'বীরবল'। বুদ্ধিদীপ্ত তীব্র পরিহাসের ভাষাগুলি তিনি যে এই আকবরী বিদূষকের নামে চালাতেন, তার কারণ অল্প বয়সেই তিনি ভাবতে শিখেছিলেন—'হায়, আমার মুখে যদি বীরবলের রসনা থাকত, তাহলে এই সব ঘ'রো আকবর শাহের বোকা বানিয়ে দিতুম'। সবুজপত্রের সম্পাদক হয়ে বাংলা গদ্যসাহিত্যে তাঁর বীরবলী রসনা নিয়ে সত্যি তিনি কালান্তর আনলেন। তাঁর মৃত্যুর অনেক দিন পরে যে 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়েছে, তা যে কোনো গদ্যরসিকের কাছেই মহামূল্য বলে গণ্য হবে॥

কলকাতার সাহিত্যসমাজে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রবেশ করেছিলেন একেবারেই 'সবুজ পত্রের' কর্মকর্তা হয়ে। 'চলমান জীবন' নামে তিনি তাঁর আত্মজীবনীর যে অংশ প্রকাশ করেছেন, তাতে আছে সেই সেকালের মেফেয়ারে চৌধুরী পরিবারের বিস্তারিত এবং আলোচিত একটি ঘরোয়া চিত্র। এই বই লিখে আধুনিক বাংলাগদ্যের উদ্ভব শোধ করলেন পবিত্রবাবু॥

ভালো প্রবন্ধের আরো দুটি বই: ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ'—যার প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে, 'রাধা ছিলেন আদিতে বিশুদ্ধ শক্তিরূপিনী, ক্রমপরিণতির প্রবাহের ভিতর দিয়া তিনিই আসিয়া রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন পরম প্রেমরূপিনী মূর্তিতে।' আর ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সংক্ষেপিত 'বাঙ্গালীর ইতিহাস।' বিখ্যাত আদিগ্রন্থ থেকে সংক্ষেপ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জানা গেছে যে মোহিতলালের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্যের' দুখণ্ড নয়, তিন খণ্ড প্রস্তুত আছে; ২য় খণ্ডের ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এলো॥

দুটির শেষে ছোট গল্পের তিনটি নতুন বই নাম করবার মতো: নরেন্দ্র মিত্র আর আশাপূর্ণা দেবীর 'শ্রেষ্ঠ গল্প' সংকলন এবং প্রমথনাথ বিশীর 'ধনেপাতা'। নরেন্দ্র মিত্রের সুন্দর গল্পগুলিতে প্রধানত থাকে মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের উদ্ঘাটন, অন্য দুজনের গল্পে প্রধানত হাস্যরস॥

বিরাট দেশ চীন, ভারতবর্ষের প্রতিবেশী। নতুন এক সমাজ গড়বার দুঃসাহসী পরীক্ষা চলছে সেখানে। এই নতুন চীনের শহর গ্রামে প্রত্যক্ষ ভ্রমণের আবেগজড়িত বর্ণনা আছে গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা থেকে চীন' বইটিতে। 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা' সিরিজে ছোটদের জন্য বিজ্ঞানের ৫ম বই বেরিয়েছে: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'যমের সঙ্গে যুদ্ধ'। সোভিয়েট রাশিয়ায় যৌনজীবন বিষয়ে এই লেখকের 'নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ' ২য় সংস্করণ হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধশ্রেণীর একটি নতুন সংকলন বেরিয়েছে 'কালপেঁচার দুকলম' লেখকের আগের বই 'কালপেঁচার নক্সা' পড়ে রাজশেখর বসু লিখেছিলেন—'চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে'॥

বাংলায় নাটক লেখা হয় সব চাইতে কম, তারও আবার অত্যন্ত কম অংশই পাঠযোগ্য। বিরোধী দুই মনস্তাত্ত্বিক মতবাদ নিয়ে সত্যেন সিংহের নাটক 'মনোবৈজ্ঞানিক' এর মধ্যে ব্যতিক্রম॥

নাটকের চাইতে বাঙালী লেখকের বেশি উৎসাহ বরং অনুবাদে। কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অনুবাদ করেছেন জি কে চেষ্টারটনের মজার উপন্যাস 'দি ক্লাব অব্ ক্যুইয়ার ট্রেডস্'—'আজব জীবিকা' নামে। পুলিৎজার পুরস্কার পাওয়া মার্কিন উপন্যাস 'দি ইয়ার্লিং'-এর অনুবাদ করেছেন বিমল মিত্র আর শিশুদের জন্য ক্যাপটেন ম্যারিয়টের 'দি চিলড্রেন অব্ দি নিউ ফরেষ্ট' এবং কিংস্লের 'দি ওঅটর বেবীজ্' বাংলায় 'অথৈ জলের রূপকথা'—অনুবাদ করেছেন শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্তী। ইনি কবি অমিয় চক্রবর্তী নন্। মুল্‌করাজ আনন্দএর কয়েকটি গল্প অনূদিত হয়েছে 'নরসুন্দর সমিতি' নামে। অনুবাদক অমল দাশগুপ্ত। উর্দু গাল্পিক কৃষণ চন্দরের 'ফুলকি ও ফুল' অনুবাদ করেছেন পার্থকুমার রায়। হিন্দী লেখক প্রেমচাঁদের 'গল্প'-ও বাংলায় অনুবাদ করেছেন পারুল ঘোষ।

কলকাতা শহরের পার্কে ফুটপাতে এক আশ্চর্য আন্দোলনের সূত্রপাত করেছেন তরুণ বাঙালী কবি। 'আরো কবিতা পড়ুন'—এই হচ্ছে তাঁদের বক্তব্য। নির্বিবাদী ভালোমানুষেরা তাতে চমকে উঠেছেন। এদিকে ক্ষতি দিয়ে চালাতে হলেও শুধু কবিতার পত্রিকাই বাঙলা দেশে চলছে পাঁচটি। পঞ্চম পত্রিকার নম 'সব শেষের কবিতা'। 'একক'ও কিছুদিন ধরে আবার প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য প্রথম কবিতার বই: অরুণকুমার সরকারের 'দূরের আকাশ' এবং বটকৃষ্ণ দাসের 'পাখনা'। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের নতুন কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে 'প্রেম ও অপ্রেম', প্রচ্ছদপট এঁকেছেন কবি নিজেই। বাংলাদেশে এই কবিতা আন্দোলনের খবর ব্রিটিশ ব্রডকাষ্টিং কর্পোরেশন লণ্ডন থেকে প্রচার করেছেন বলে শোনা গেছে। কিন্তু যে-কানে পৌঁছলে উদ্যোগী কবিদের ক্লেশ সার্থক হবে, সেই বাঙলাদেশের কানে কি এই আবেদন পৌঁছলো—'আরো কবিতা পড়ুন?'


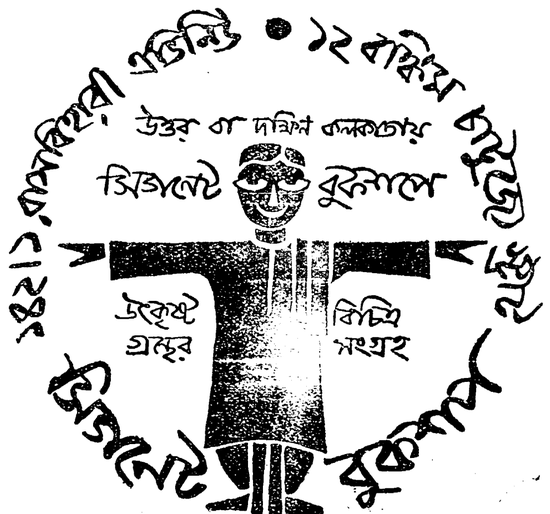



নিশ্চিত
নির্ভর -----

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

**ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্**

হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা


"...'অপ্রেম ও প্রেম' নতুন করে এ-কথাই প্রমাণ করল যে বাংলা লিরিকের কারুশিল্পে যাঁরা এখন অগ্রণী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁদেরই অন্যতম।"

—বুদ্ধদেব বসু




দাম—এক টাকা


প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড্

# পূর্ব্বাশা

## অগ্রহায়ণ—১৩৫৯

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| অগ্রতমিস্র : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৩৯৬ |
| তিমির তরঙ্গ : লোকনাথ ভট্টাচার্য্য | ... | ৩৯৮ |
| পথের পাঁচালী : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৩৯৯ |
| কবিতার জন্ম : অরুণ ভট্টাচার্য্য | ... | ৪০১ |
| এনাক্ষি কাহিনী : অমল দত্ত | ... | ১০২ |
| বিজ্ঞানের নব-যুগ ও দর্শনের সমস্যা : নির্মল মুখোপাধ্যায় | ... | ৪০৪ |
| বিবাহিতা স্ত্রী : প্রতিভা বসু | ... | ৪১২ |
| বিকল্প : সুকোমল দত্ত | ... | ৪২২ |
| প্রজাপতির মৃত্যু : সত্যেন্দ্র আচার্য্য | ... | ৪২৭ |
| দিব্য জীবন বার্ত্তা : শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু | ... | ৪৩২ |
| নূতন-বই : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় | — | ৪৪১ |
| সুনীল কুমার নন্দী | — | ৪৪৫ |
| নারায়ণ চৌধুরী | — | ৪৪৬ |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৪৪৮ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯



# ক্রমোন্নতির পথে

গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় জীবন-বীমার অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানের এই ক্রমোন্নতি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে পূর্ব্বের মতই ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা—৮১,০২,৩৬,১৬৪৲

বীমা তহবিল— ১৭,৬৬,১৯,৬২৮৲

প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ—৮৩,৫৭,৯৭৮৲

নূতন বীমা

১৬,২৮,৮৫,৮০০৲

## হিন্দুস্থান কো-ওপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।



আমার শিশুর জন্যেই এই বার্লি




আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার মা একথাই বলতেন। সেরা শস্য থেকে, স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে এবং দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'পিউরিটি' বার্লি তৈরি। এই বার্লি যেমন চমৎকার, তেমন এতে খরচও কম।

APBX 8-BEN

পিউরিটি বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

## এই উপ-মহাদেশে বছরে ২০ লক্ষের বেশী লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়

ভেবে দেখুন, শুধু ম্যালেরিয়াতে যারা মারা যায় তাদের সংখ্যাই এই, আর ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে শক্তিহীন হয়ে যারা অন্য রোগে মারা যায় তাদের কথা ধরলে এই ভয়ানক মৃত্যুসংখ্যার তাৎপর্য আরও কত বেশী হয়! ম্যালেরিয়া হওয়ার ভয় সব সময়েই আছে — সামান্য একটি মশার কামড়ই এই রোগ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একে আপনার কিছুতেই অবহেলা করা উচিত নয়।

আজকাল ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে 'প্যালুড্রিন'। একটি বড়ির দাম এক আনা — সপ্তাহে একদিন একটি বড়ি খেলে ম্যালেরিয়ার সাধ্য নেই যে আর কাছে ঘেঁষে। সপ্তাহে মাথাপিছু মাত্র এক আনা খরচ — আপনার উচিত এই সামান্য খরচে বাড়ীর সবাইকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করা। সেবনবিধি নীচে দেওয়া হল।

### ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বন্ধ মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।



## 'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়ার যম

**সেবন বিধি**

জ্বর অবস্থায়ঃ পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।




জ্বর প্রতিরোধের জন্যঃ
উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

**ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ**

ICP 75



# পূর্ব্বাশা

পঞ্চদশ বর্ষ
অগ্রহায়ণ — ১৩৫৯


কবিতাগুচ্ছ

## অগ্রতমিস্র

[ মিশ্র ছন্দ ]

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

রাত-অরণ্যে অরণি জ্বালায় কার চিতা
চিত্রা তারার অর্চ্চনা শেষ, কে কবিতা
এখন আমার? সে কোন্ হরিণ হিরণরাশি,
নতুন শীতের সোনার আগুন হে সবিতা,
কোন্ গোরিরে পুড়িয়ে এলে, হে সন্ন্যাসী,
পেতে আকাশ-কন্যা আলোর বন্যা-রাশি?
কোন্ জলে উর্ম্মিলা লীলা মন সবি তা
ভুলল, তোলে অঞ্জলি-হাত কংস-গীতা
কার মায়া, কোন বৈদেহিনী স্বর্ণসীতা
তমসা আর স্বাহায় প্রিয়া প্রাণ সঁপিতা!
এসো প্রাংশু হিমাংশু-মন পাংশু পিতা।

এবার আবার ঊষার আভায় এসো পিতা
রবির আভাস শমন-শনি স-উপবীতা
এসো মধুর প্রদোষ ঈষৎ দিতির গীতা
অর্দ্ধনারীশ্বরের বোধি সাঁচী স্মিতা।
ক্ষুমার উমার ওমে হে প্রাণ আর্ত্ততম
এসো রাধার হরিদ্রাতে হৃদয়-কামা
হরিদ্রা-ক্ষার-জলে আখর তন্বীক্ষামা

ছাখো দ্রাক্ষা-সোমে শ্যামে দক্ষোপম
জবলা-ভ্রূণ যমলার্জ্জুন কর্ণসম।
এসো শাক্য সাংখ্য কপিল শবর-মিতা
বর্ম্ম তোমার পিঙ্গলা জ্ঞান পারমিতা
শবরমতীর শর্ম্মিষ্ঠা স্বধর্ম্মিতা
আসুক গোপা খোঁপায় বেঁধে মোহনচূড়া
তোমার কাম-হংস মরুক, স্বোহং-সুরা
পান-প্রমত্ত চীনের পুতুল, চিন্তাতুরা
সূরীয় শ্রীবৎস কেশব, শক-দুহিতা
স্বাতী-সরস্বতী তোমার হোক সহিতা
শঙ্খিনী-পদ্মিনী পুরন্ধ্রী শায়িতা।

যাত্রা করো পৌষে পুষণ অগ্রমেষ
দোলে দুলুক উর্ব্বশী রাস উড়াক কেশ
পুলকেশীর কোলে আসুক শূর গণেশ
দক্ষিণা যম নীল-যমুনার নর্ম্মদাতা
দীপে দ্বীপে নীল যবনীর জন্মদাতা
অরিত্রিয়ন আরবি-সাগর নর্ম্মদা তা
জানতো, সচী নরমদা, নেই স্বর্গধাম
নাম রূপ নেয় কাম রূপ নেয় পরশুরাম
নহুষ-উশন সব ঈশানীর বিষে মেশা
মৎস্য-গঙ্গা শান্তনু সৎব্রতীর নেশা
কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নে বরারোহার হ্রেষা
চণ্ডিমা নয়, অর্য্যমা নয় আর্য্য মাতা
মার জয়ে দিক-বিদিক জুড়ে মৌর্য্য গাঁথা।
মুগ্ধ যোগ-নন্দে মগধ কমল-কলি
একচ্ছত্র মহাপদ্ম শূদ্র-বলী
রাকায় আঁকা পদ্মমধু নয় শোষিতা॥
চীনাংশুকের তাণ্ড তমোময় প্রোষিতা॥

## তিমির তরঙ্গ

—স্তিমিত আলোর উদ্দেশে

লোকনাথ ভট্টাচার্য্য

**প্রথম তরঙ্গ : অনুদাত্ত**

হিমে আগুন, আগুনে হিম :
হৃদয় জ্বলে পোড়া আকাশ, বাহির মেঘে রিরিম ঝিম।
নিশুতি রাত, নিবেছে দীপ, আকাশ ক্রমে তারা-মিছিল—
কোথায় যেন ক্ষুব্ধ ঘরে অথৈ প্রাণ হারানো নীল ;
পথে যে চলে, কথা যে বলে, এতো সে নয়, এ নয় কেউ—
সেখানে পাখি, সেখানে গান, এখানে কার পিছনে ফেউ।
বন্ধ দ্বার হোক না তার, কোন্ ভুবনে বাসন্তিকা
জানে না, তবু ঠাণ্ডা হাড় লুকিয়ে পোষে বজ্রশিখা।
হিমে আগুন, আগুনে হিম :
নামুক রাত, ওরে বরাত, জ্বলুক তোর প্রাণ-পিদিম।

**দ্বিতীয় তরঙ্গ : স্বরিত**

আঁধার নামে দিকে দিকে, কী গেল লিখে
বেদনা, বন্দনা ভুলেছে বন—
মরণ জাগে ধীরে ধীরে, কী চির নীরে
ডুবেছে সন্ধ্যায় সুরঞ্জন !
হায় সে আকাশের সুনীল, বাতাসের
মধুর মন্থর চিহ্ন হীন !
স্বপ্ন-কণিকায় মলয় আসে যায়,
নাড়ীতে কাঁপে নীলা মন-মুখীন !
আজকে ঝড়ে গাছ মাতাল, দেহে নাচ
বসন ফেলে দূরে, মিলন চায়—
আমার হাতে হাত রেখেছে এই রাত,
সকলি বলে : প্রিয় তুমি কোথায় ?

তৃতীয় তরঙ্গ : উদাত্ত

যাব অকূল পার যাব বন্ধ দ্বার :
শুনি নিবিড় ইঙ্গিত নীরবতার—
যদি মরণ এই যদি আঁধার এই,
দূরে কোথায় যেন বাজে ক্ষমা তোমার।
যেন জানিনি কার নাম কার সে মন
কোন্ পাষাণ-নীল হৃদ অচঞ্চল—
তবু থাক সে থাক প'ড়ে আজকে ঝড়
বয় অকাল পুষ্পের ছিন্নদল।
এই কপট তন্দ্রার তিমির তীর
নিল হৃদয়ে ঘন দাগ কী রক্তের,
তার বেদনা-উদ্বেল আপাত ধীর
হ'ল অন্তরের আর অনন্তের।
চ'লে যাব এ পথ বেয়ে পথের পার,
কাঁপে নয়নে দূর সেই জ্যোতির্ময়—
তবু পিছনে প'ড়ে রয় যত মরণ,
জানি মরণ নয় তারা আঁধার নয়।

## পথের পাঁচালী

—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ন পুপ্‌ফগন্ধো পটিবাতমেতি।
ন চন্দনং তগরমল্লিকা বা।···

বোধির মতোই খেলে গেলো মনে গুরু সুগতের বাণী।
কিন্তু তোমার স্মৃতির সুবাস দুরন্ত
বাইরে ও ঘরে, জাগরণে ঘুমে সব দিকে যায় জানি।
কখনো কি আর অনুকূল হ'বে বায়ু?
সময়-শিল্পী ছেলেখেলা করে
পুড়ে ছোটো হয় সল্‌তের পরমায়ু।



না-পাওয়া যেটুকু না-পাওয়াই থাকে
পাওয়াটুকু নিয়ে ফিরে ফিরে টানাটানি।

তোমারই চিন্তা নিয়ে বেরিয়েছি
পকেটেই ছিলো যেন
এমন সময়ে তোমারই সঙ্গে দেখা
—এ দেখা আবার কেন?
সেইদিন থেকে নিয়তিকে তাই মানি।

আলাপ থামানো—বাস্ এসে পড়া—
'আড়াল করবো।'—একথা শাসানো,
ফুরফুরে হাতে তোমাকে হাসানো,
অলক খসানো অনেক দূরের হাওয়া
জানা দিগন্ত থেকে নিয়ে এলো সুদিনের স্বাদ পাওয়া।

বাস্ ছাড়ে-ছাড়ে—শানানো শ্লেষ—
নিয়তিকে তবে মানো?
হেসে ওঠে কোনো ছায়া-তর্পিত মিঠেল মুখ
মুহূর্তে খেলা ক'রে গেলো নিয়ে অধীর বুক!
ম্লান হেসে বলি,—দু'পকেট ফাঁকা
কিছুই পাইনি কেন?
তুমি ব'লে গেলে—নিজেকে শুধাও;
নিজেকেই আগে জানো।

···প'ড়ে থাকি পথে—চ'লে যায় বাস্
গ্রীষ্মের ধূলি ওড়ে একরাশ
বহুজনতায় ক্ষ্যাপা পথখানা
পেয়ে ওঠে যেন দানো!

## কবিতার জন্ম

অরুণ ভট্টাচার্য্য

প্রতিবার বৈশাখের ঝড়ে পৃথিবীর রুদ্রবেশ। দুরন্ত ইচ্ছার ডানা
ধূসর পিঙ্গল মেঘে। উদ্বেলিত সমুদ্র-হৃদয়
মনের আকাশ ভরে ভাঙ্গে ঢেউ, অজস্র, উত্তাল।
হাহাকার, বাসনা অপার তবু ইচ্ছারা পাগল।
আষাঢ়ে বর্ষার ঢল। পৃথিবীর মুক্তিস্নান।
মনের ময়ূর তাই আনন্দের নির্জন স্বাক্ষরে
সূর্যের বর্ণালী ঢাকে। জানালায় এ আকাশ নামে যদি,
নামে যদি বর্ষাজলধারে, ভাঙ্গে বুক, প্রেমের মতন।

তবে শান্তি, শান্তির আশ্রয়। বাংলার কুটীরে, গ্রামে
নামে সন্ধ্যা, অবনতমুখে, দীর্ঘ আঁখি,
নম্র তনু, সিঁথির উজ্জ্বল টিপ, নামে সন্ধ্যা
শান্তির প্রদীপ হাতে।
তবে সৃষ্টি—
সৃষ্টির নতুন দিনে হৃদয়ের বিনম্র নিঃশ্বাস
শান্তি আনে।
নামে শান্তি, নামে সন্ধ্যা
নদীতে, কুটীরে, গ্রামে, নির্জন ছায়ায়।
সব স্তব্ধ। তবু দুর্নিবার, এ মনে আমার
শঙ্কা জাগে। সব স্তব্ধ, তবুও মেঘের
কুটিল রেখার টানে কিসের ইঙ্গিত।
নাকি অরণ্যের
দুর্গম তিমিরে, এ স্তব্ধতা—
আকাশের, পাহাড়ের—
অথবা এ বুঝি শুধু আমার মনের।



এখন সমস্ত চুপ, মৌন পৃথিবীর
নিঃসঙ্গ সমুদ্রতীরে আকাশ নির্বাক।
শুধু শূণ্য—শূণ্যতার বোধ। যদিও অস্থির
হৃদয় ভরে সৃষ্টির কল্লোল, তবু রিক্ত, নিঃস্ব স্মৃতিরেখা।
চৈত্রের দুপুর ভরে উদাস উদাস সুর,
শূণ্যতায় অন্ধকার দিন—
তবু এক আশ্চর্য হাওয়ার অনুভব—নির্মম, মলিন।

## এনাক্ষি কাহিনী

এক

অমল দত্ত

আকাশের তারার পানে তাকিয়ে থাকো এনাক্ষি
দূর থেকে গহনতম দূরে
তোমার চোখের সাগরে তারারা অবগাহন করে
তাই তো তোমার চোখে এ বিচিত্রতা
এনাক্ষি আমি তোমাকেই দেখি—আর রহস্যের
নীলে তলিয়ে যাই
সরে যাই কত দুস্তর ব্যবধানে।

তোমাকেই দেখি এনাক্ষি—যেখানে সাগর আকাশ
তারারা স্তব্ধ হয়ে আছে—
তোমার হৃদপিণ্ডের সুরের মূর্ছনায় সমাহিত এই সৌরজগৎ
এ পরিপূর্ণতা আর কোথাও কি আছে—কোথাও কি আছে
এমন অপরিপূর্ণতা
এনাক্ষি তোমার চোখে আমার আকাশ হারিয়ে গেছে—
আমার সত্তা পাখির পালকের মতো কেঁপে কেঁপে পড়ছে
এ বিচ্ছুরণের আনন্দ এনাক্ষি। শুধু তোমাকেই দেখি—

তোমাকেই দেখি এনাক্ষি—অকারণ দিনের শেষে
ঘুষ খেয়ে আর ঘুষ দিয়ে
মিষ্টিভাষণের মিষ্টি বিতরণ করে
গলাবাজির বাজী পুড়িয়ে
তোমার কাছে ফিরে আসি
কত চালে কত কাঁকর এ হিসাব জাবদায় কষে
গঙ্গাজলের আড়তদারির পর
তোমার পানে ডানা মেলে দিই
দিনের নানাহ কাজের অর্থচিন্তার দৈবসুযোগ
আমায় বিভ্রান্ত করে এনাক্ষি
তাই হিরণ্যগর্ভ তমসায় মুখোস ফেলে দিয়ে
তোমার সুরে আমি হারিয়ে যাই
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাই এনাক্ষি
গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাই
একটি কবিতায়।



# বিজ্ঞানের নব-যুগ ও দর্শনের সমস্যা

## নির্মল মুখোপাধ্যায়

দর্শনের ছাত্র মাত্রই জানেন, বিজ্ঞানের সংগে দর্শনের সম্পর্ক কতখানি এবং কেমন করে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও তথ্য উদ্‌ঘাটনের ফলে দর্শনের নানা সমস্যা উপস্থিত হয়ে থাকে। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক, রেনেসাঁ-উত্তর যুগের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্পর্কেই এই উক্তি প্রযোজ্য। কারণ, পূর্ব-রেনেসাঁ-যুগে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনার মধ্যেই তথ্যের অনুপ্রবেশ—পরীক্ষিত তথ্যের উপর দর্শনকে স্থাপন করার সুযোগ কিংবা প্রয়াস প্রবলভাবে দেখা দেয়নি। গ্রীক-দর্শন অর্থাৎ সক্রেটিস্, প্লেটো ও অ্যারিস্টোটেল্ কিংবা তারও পূর্ববর্তী কোন কোন চিন্তাশীল মানসে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—কিন্তু তাকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক দর্শন বলা যেতে পারে না। আমার কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেডের উক্তি স্মরণ করলে: "The Greek genius was philosophical lucid and logical. The men of this group were primarily asking philosophical questions. What is the substratum of nature? Is it fire, or earth or water or some combination of any two or of all three? Or is it a mere flux, not reducible to some static material? Mathematics interested them mightily. They invented its generality, analysed its premises, and made notable discoveries···by a rigid adherence to deductive reasoning. Their minds were infected with an eager generality. They demanded clear, bold ideas, and strict reasoning from them. All this was excellent; it was genius; it was ideal preparatory work. But it was not science as we understand it. (*The science and the Modern World*, পৃষ্ঠা ১৮)। তাই বিজ্ঞান-ভিত্তিক দর্শন কিংবা সত্যিকারের বিজ্ঞান বলতে আমরা যা বুঝি তা, প্রধানত মধ্যযুগের সমাপ্তিতে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাতেই সম্ভব হয়। অর্থাৎ সে যুগটা ছিল বেকন, আরভে, কেপলার, গ্যালিলিও, দেকার্তে, পাস্‌কেল, নিউটন, লক্, স্পিনোজাদের। এক কথায়, হোয়াইট্‌হেড্ যাকে বলেছেন, Century of genius.

বলা বাহুল্য, নিউটনের বলবিদ্যা দর্শনের রাজ্যে প্রচণ্ড সমস্যার সৃষ্টি করলো; সেই সংগে তাল রেখে দাঁড়াতে গিয়ে দর্শনের ব্যাপকতা বৃদ্ধি হলো। এ-কথা বোধ হয় বলা

অসংগত হবে না যে, সপ্তদশ শতকের বৈজ্ঞানিক পটভূমি না থাকলে সে যুগের দর্শন হয়তো প্রাচীন দর্শনের মতোই ব্যক্তির চিন্তার মধ্যেই সীমিত থাকতো—গভীর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি স্থাপন করে জ্ঞানের পরিধিকে এতখানি বাড়িয়ে বস্তুপ্রকৃতি সম্পর্কে অন্তত একটা সুষ্ঠু ছবি তুলে ধরতে পারতো না। অবশ্য, একথা স্মরণীয় যে, বিজ্ঞান বলতে প্রধানত পদার্থবিদ্যার কথাই বোঝাচ্ছে; কারণ, সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক চিন্তার মূলে রয়েছে এককভাবে পদার্থবিদ্যা।

কিন্তু একথাগুলো বলা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধের ভূমিকা হিসেবে মাত্র। সমসাময়িক যুগের দর্শনের সমস্যা বুঝতে হলে দর্শন ও বিজ্ঞানের অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা আমাদের সর্বক্ষণ স্মরণ রাখতে হবে।

আমাদের সমসাময়িক যুগের দর্শন কিংবা বিজ্ঞানদর্শন যাঁরা আলোচনা করতে যাবেন, তাঁরা সবাই অন্তত এ-কথা স্বীকার করবেন যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজকে এক গভীর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এতদিন অব্দি আমরা বস্তু, চেতনা, প্রকৃতি, স্থান ও কাল সম্পর্কে যে ধারণা পরিবাহন করে এসেছি, আজকে তা প্রায় সম্পূর্ণভাবে বদ্‌লে যাবার উপক্রম হয়েছে। শুধু তাই নয়, নব্য বিজ্ঞানকে বুঝতে হলে নাকি আমাদের প্রচলিত চিন্তাধারা, অভ্যাস ও পথকে বাতিল করতে হবে (রাসেল—*A, B, C of Relativity*)।

ব্যাপারটা যখন এই, তখন সংগতভাবেই আমাদের দৃষ্টিকে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দিকে প্রসারিত করার সময় এসেছে।

কিন্তু সমসাময়িক কালের দার্শনিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে বুঝতে হলে সংগতভাবেই আমাদিগকে বিগত শতকের শেষাশেষি এবং বিশ-শতকের প্রথমদিককার বিজ্ঞান-প্রসূত দার্শনিক সমস্যার দিকে তাকাতে হবে। কারণ, আমাদের সমসাময়িক কালের দার্শনিক-ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনেক সূত্রই সেখানে পাওয়া সম্ভব। বিজ্ঞানের যে আবিষ্কারের ফলে বস্তুবাদের ভিত্তিভূমি ধ্বসে গিয়েছে এবং বস্তু অন্তর্হিত হয়েছে বলে রাসেল, জোয়াড, জীনস্, এডিংটন, উইট্‌গেস্‌ষ্টাইন প্রমুখগণ মনে করেছেন, সেই বিজ্ঞানের যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল বিগত-শতকের শেষদিক হতেই। আইন্‌ষ্টাইনের 'রিলেটিভিটির' 'স্পেশাল থিয়োরী'র গাণিতিক ভিত্তিমূল লরেন্টস্-এর সমীকরণের মধ্যেই নিহিত ছিল। আইনষ্টাইনের থিয়োরী প্রতিষ্ঠার আগে সেই সমীকরণ বিজ্ঞানীদের নিকট দুর্বোধ্য বলে মনে হয়েছিল।* প্লাঙ্ক তাঁর 'Where is science going ?' নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টিতে (Fifty years of modern physics) আধুনিক বিজ্ঞানের যে ধারাবাহিক পটভূমি দিয়েছেন, তাতেই পরিষ্কার

* A B C of Relativity—Bertrand Russell, পৃষ্ঠা ৭৬,



ভাবে বোঝা যাবে, 'কোয়ান্টাম ফিজিক্স', 'রিলেটিভিটি' কিংবা শ্রোডিঙ্গারের 'ওয়েব ম্যাকানিক্স'—ইত্যাদির কোনটাই 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' নয়।

কাজেই বিজ্ঞানের সেই পরিবর্তনের সূচনাকালে যে দার্শনিক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তার ইতিকথাকে সংক্ষেপে স্মরণ করা খুব অযৌক্তিক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলেই বিশ্বাস।

১৯০৫ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী পোঁয়াকারে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'The value of science'এ ঘোষণা করেন, পদার্থ-বিজ্ঞানে গুরুতর সংকটের চিহ্ন দেখা দিয়েছে ('symptoms of serious crisis') এবং প্রচলিত সমগ্র বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় কক্ষচ্যুত হবার বিপদ উপস্থিত হয়েছে। নিউটনীয় বলবিদ্যা অচল হয়ে পড়েছে। পোঁয়াকারে জানান, পুরোন প্রত্যয় ধূলিসাৎ হওয়ার সংগে সংগে আমরা একটি 'debacle of principles'-এর সম্মুখীন হয়েছি। এক কথায়, আমরা সন্দেহ সংশয়ের যুগে (period of doubt) উপস্থিত হয়েছি। কারণ, সময় ও কাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা আর প্রকৃতির দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে না; আমরা নিজেরাই সেই ধারণা প্রকৃতির উপর আরোপ করছি। বলা বাহুল্য, পোঁয়াকারে নিজে এই প্রতিজ্ঞার উপর ভিত্তি করে কোনো দার্শনিক মতাদর্শ তুলে ধরতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর কথা থেকে ও কথার মাধ্যমে সমগ্র ধারার ইংগিত প্রচ্ছন্ন। পোঁয়াকারের ঘোষণায় রুশদেশে লোনাটিন কর্তৃক শিস্‌খিমের পজিটিভিষ্ট দর্শনের আলোচনায়, এবং ইংলণ্ডে কার্ল পিয়ার্সনের বিজ্ঞান-ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান-প্রসূত দার্শনিক চিন্তার চাঞ্চল্য ও আলোড়নের চিহ্ন পাওয়া যাবে।

ফলে যাঁরা একদা মার্ক্সবাদী বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন কিংবা সেদিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। তারা অনেকেই মার্ক্সবাদের ভুল-ত্রুটি বুঝতে পারলেন এবং তাকে শোধ্‌রাবার জন্য অগ্রসর হলেন। সেই সন্ধিক্ষণে লেনিন মার্ক্সবাদী দর্শনের আলোকে নয়া-বিজ্ঞান ও নয়া-দার্শনিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অনুধাবন করতে চাইলেন। 'Materialism and Empirio-criticism' গ্রন্থে লেনিন দেখালেন, মাখ ও আভেনারিয়াসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ফলেই বিজ্ঞানের নয়া-আবিষ্কার পোঁয়াকারে পিয়ার্সনদের কাছে সংকট বলে পরিগণিত হচ্ছে। বিজ্ঞানের নয়া-আবিষ্কার কেমন করে মানুষের জ্ঞানকে পরিবর্দ্ধিত করছে, কেমন করে প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, বস্তু-সম্পর্কে নতুন ধারণার জন্ম দিচ্ছে—সেই সবের কার্য-কারণ বুঝতে চেষ্টা না করে এই পণ্ডিতবর্গ বস্তুবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেই আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন। ফলে, ভাববাদের দিকে ঝুঁকে পড়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না তাঁদের। তাই, ঈথর, পজেটিভ ও নেগেটিভ ইলেকট্রনের আবিষ্কার তাঁদের কাছে বস্তুর অবলুপ্তির কারণ

হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র বস্তু জগৎ ইন্দ্রিয়জ-অভিজ্ঞতারই প্রকাশ বলে মনে হয়েছে। লেনিন দেখালেন, আসলে বস্তু ও চেতন', বস্তুবাদী জ্ঞানতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের ক্রমবর্দ্ধমান আবিষ্কারের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ফলেই এই জাতীয় সিদ্ধান্ত সম্ভব। মাখ ও আভেনারিয়াস তাই এঁদের সত্তার গভীরে এত স্পষ্টভাবে অনুপ্রবিষ্ট। স্মরণীয় এই, লেনিনের এই বিশ্লেষণ কোন-স্বয়ংসৃষ্ট ব্যাপার নয়; সেই সময়েই যাঁরা বিজ্ঞানের সংগে যুক্ত থেকে বিজ্ঞানকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেওয়ার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁদেরও বক্তব্য থেকে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, মূলত সংকটটা বিজ্ঞানের নয়—সংকটটা হচ্ছে সেই সব বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের যারা বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সংগে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা বুঝতে পারেননি যে, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে বস্তুবাদ কক্ষচ্যুত হয়েছে বটে—কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের স্বীকৃতিও রয়েছে এর মধ্যে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানের আবিষ্কারের অপব্যাখ্যা করার পিছনে সেইসব শক্তিও কাজ করেছে যা, সভ্যতার অগ্রগতির দিকে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। প্রমাণ হিসেবে Ernest Haeckel-এর 'The Riddle of the universe' প্রকাশিত হওয়ার ফলে যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে, সেই সব ঘটনা স্মরণ করলেই যথেষ্ট হবে।

বিশ-শতকের প্রথমদিককার বিজ্ঞানের সংকটের মূল তাৎপর্য তাই আজকে আমাদের কাছে স্পষ্ট। আমরা জেনেছি, বিজ্ঞানের নয়া-আবিষ্কার মাত্র দর্শনের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা উপস্থিত করে থাকে; সেই বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপরই দর্শনের ভিত্তিভূমিকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

কিন্তু লেনিন যে সময়ে তাঁর গ্রন্থ লিখেছিলেন এবং যাঁদের দার্শনিক চিন্তাধারার আলোচনা করেছিলেন সেই যুগকে আমরা অতিক্রম করে এসেছি—এবং নতুন চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়েছি। আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগ আইন্‌ষ্টাইন, প্ল্যাঙ্ক, শ্রোডিঙ্গার, হাইসেনবার্গের যুগ। এযুগের বিজ্ঞানের আবিষ্কার দর্শনের রাজ্যে যে পরিমাণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে, তা দর্শন ও বিজ্ঞানের ইতিহাসে অতুলনীয়।*

অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেড তাঁর 'Science and the modern World' নামক গ্রন্থে দেখাচ্ছেন, কেমন করে বস্তুবাদের ভিত্তিভূমি ধ্বসে পড়েছে রিলেটিভিটী এবং কোয়ান্টাম থিয়োরী আবিষ্কারের ফলে। রিলেটিভিটী থিয়োরী—"is a heavy blow at the classical Scientific materialism which pre-supposes a definite present instant at all matter is simultaneously real.

* সমগ্র প্রবন্ধে বিজ্ঞান বলতে পদার্থ বিজ্ঞানের কথাই বুঝতে হবে।



In modern theory there is no such prsesent instant. You can find a meaning for the notion of simultaneous instant throughout all nature, but it will be a different meaning for different notions of temprality." শুধু তাই নয়, প্ল্যাঙ্ক 'Equilibrium between Matter and Radiation'এর পরীক্ষা হতে দেখালেন, শক্তির বিকিরণ প্রক্রিয়া ধারাবাহিক নয়, বস্তুর তেজ-শোষণ ও বিকিরণ প্রক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে বিচ্ছিন্ন মাত্রায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে প্ল্যাঙ্ক তাঁর পরীক্ষার ফল এইভাবে ব্যক্ত করেন—"Radiant Heat is not a continuous flow and indefinitely divisible. It must be definied as a discontinuons mass made up of units of all which are similar to one another." (হাইসেনবার্গের বিবৃতি থেকে)। ক্রমশ পদার্থ-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় কণিকাবাদ বা কোয়ান্টাম থিয়োরীর প্রয়োগ সুরু হলো, ফলে, পদার্থ-বিজ্ঞানের জগতে বস্তুর গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে এমনকি তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণার উৎপত্তি হতে লাগলো; যার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য পরিণতি হাইসেনবার্গের "Principle of indeterminacy'-এর ঘোষণায়। ইলেক্‌ট্রনের গতি ও স্থিতি (velocity and position) এক সংগে জানা যাচ্ছে না—একটি জানতে গেলে অপরটি গুলিয়ে যায়। ইলেক্‌ট্রনের এই প্রকৃতি বা ব্যবহার দেখে তার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করা হলো। দেখা গেল ইলেক্‌ট্রনের তরঙ্গ-ধর্মই এর মূলে। স্মরণীয় এই, ইলেক্‌ট্রন-প্রোটনের এই তরঙ্গ-ধর্ম ডি ব্রগ্‌লির পরীক্ষার মাধ্যমেও ধরা পড়েছিল। কারণ, "De Broglie has shown us to calculate the lengths of the waves associated with an electron i.e., considering it to be no longer as pure particle but a wavicle" (ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক)। ডি ব্রগ্‌লির এই Electron waves উপর ভিত্তি করেই শ্রোডিঙ্গার প্রতিষ্ঠা করেন Wave Mechanics-এর।

দেখা যাচ্ছে, ১৯০০ সালে প্ল্যাঙ্কের কণিকাবাদ হতে সুরু করে হাইসেনবার্গের Principle of indeterminacy ও শ্রোডিঙ্গারের 'Wave-mechanics' পর্যন্ত পদার্থ-বিজ্ঞানের যে মাত্রা, তা, ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র ধারণাকে পাল্টে দেবার উপক্রম করেছে। আর এরই ফলে দর্শনের রাজ্যে ও বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড সমস্যা দেখা দিয়েছে যার সমাধানের জন্য, এযুগের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের এগিয়ে আসতে হবে। বলা বাহুল্য, বিজ্ঞানীদের দিক হতে বড় একটা ত্রুটি রয়েছে বলে মনে হয় না—অন্তত জীনস্, এডিংটন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের লেখা পড়লে। অন্যদিকে রাসেল, হোয়াইট্‌হেড্, জোয়াডের আলোচনা দেখে স্পষ্টই প্রমাণিত হবে, এযুগের দার্শনিক মানস নব্য-বিজ্ঞানের আবিষ্কারের দিকে নিরুৎসাহী নন। কিন্তু মূল সমস্যার উৎপত্তি এইখানেই। জীনস্ তাঁর 'The mysterious

universe,' 'The New background of Science' প্রভৃতি গ্রন্থে নব্য বিজ্ঞানের দার্শনিক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। 'The New-background of Science' এর ভূমিকায় তিনি প্রথমেই বলেছেন, "I have not suppressed my own views that the final direction of change will probably be away from the materialism and strict determinism which charcterised nineteenth century physics, towards something which will accord better with our every day experience." আলোচনার শেষে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন, ভাববাদের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া উপায় নেই—নব্য-বিজ্ঞান ভাববাদের পথই প্রশস্ত করে দিয়েছে। প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন বিজ্ঞানী আর্থার এডিংটন—যাঁর চরম পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর বিখ্যাত 'The Physical Nature of the world'এ। তাঁর মতে, আমরা এতদিন ধরে বস্তু জগতের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের মিথ্যা আদর্শ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। কিন্তু নব্য-বিজ্ঞানের ফলে—"It has become doubtful whether it will possible to built the Physical world out of the knowable—the guiding principles of our microscopic theories. It seems more likely that we must be content to admit a mixture of the knowable and unknowable. This means a denial of determinism" ( এডিংটন, The Physical Nature of the World )।

অন্যদিকে রাসেল সাহেব প্রমাণ করতে চেষ্টা করছেন (The problem of philosophy ; The history of the western philosophy প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য), কেমন করে নব্য-বিজ্ঞান logical positivism-এর বনিয়াদকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি দেখিয়েছেন, বস্তু জগতের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই—ইন্দ্রিয়জ-উপাত্তের (sense-data) বাইরে বস্তুর সত্তা বলে কোন কিছু কল্পনা করা যায় না। সোজা ভাষায়, বস্তু জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বে প্রচলিত ধারণাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক হোয়াইট্‌হেডের একটি সাবধান-বাণী স্মরণীয়। Relativity-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "There has been a tendency to give an extreme subjective interpretation to this new doctrine." ( হোয়াইট্‌হেডের সহকর্মী রাসেল সাহেবও কি বাদ পড়েন ? )।

হোয়াইট্‌হেডের এই উক্তির উপর জোর দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে দর্শনের সমস্যাকে উপলব্ধির স্বার্থেই। কেননা, হোয়াইট্‌হেড্ বস্তুবাদী কিংবা মার্ক্সপন্থী ছিলেন, একথা ভাবার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অথচ নব্য-বিজ্ঞানের আত্ম-সংবেদনসিদ্ধ ব্যাখ্যার দিকে তিনি যে সচেতন ছিলেন, তা' তাঁর সমগ্র আলোচনার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন। কাজেই



নব্য-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর যে organic philosophy দাঁড় করিয়েছেন, তা' আমাদের স্মরণীয়। কারণ, সেই দর্শন একদিকে যেমন জীনস্, এডিংটনীয় ব্যাখ্যার বিরোধী, তেম্নি, বস্তুবাদী ব্যাখ্যার কাছাকাছিও বটে। হোয়াইট্‌হেডের নিজের ভাষায়, 'A complete organism in the organic theory is what corresponds to a bit of material on the materialistic theory." ( Science and the Modern world, পৃষ্ঠা, ১৫৬ )। হোয়াইট্‌হেডের 'organic theory'র সংগে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাদৃশ্যের কোন আলোচনা কোন মার্ক্সপন্থী করেছেন কিনা তা' জানিনা। তবে, জোসেফ্ নীড্‌হামের 'Time, the Refreshing River,' গ্রন্থে হোয়াইটহেডের উপর যে প্রবন্ধটি আছে তাতে এর যুক্তিপূর্ণ একটি আলোচনা রয়েছে। কিন্তু সে কথা বাদ দিয়ে যে কথাটি এখানে প্রধান তা হচ্ছে এই, আসলে নব্য-বিজ্ঞানের ফলে উনিশ শতকীয় বস্তুবাদ কক্ষচ্যুত হয়েছে বটে, কিন্তু ভাববাদী ব্যাখ্যার পথও প্রশস্ত করেনি। এই প্রসঙ্গেই একজন ভারতীয় অধ্যাত্ম্যবাদী দার্শনিকের উক্তি স্মরণীয়। যাঁর কথা থেকে অন্তত এইটুকু বোঝা যাবে যে, নব্য-বিজ্ঞানে ও দর্শনে যে সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছে তা' মূলত বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের মানসিক সংকটের ফল। "The principle of indeterminacy"—ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ বলছেন, "shows us that no one set of physical measurement can completely determine the complexity of natural fact. Heisenberg's principle of indeterminacy is an expression of the practical measurement. It does not mean the absence of determinism." (The Idealist View of life, পৃষ্ঠা, ২৪৬)। হাইসেনবার্গের পরীক্ষা স্বাধীন-ইচ্ছার ( free will ) সূচনা করেছে বলে চীৎকারের শূন্য-গর্ভতা একজন অধ্যাত্ম্যবাদী দর্শনিকের উক্তির মধ্য থেকেও বোঝা যাচ্ছে।

অন্যদিকে, নব্য-বিজ্ঞানের ফলে কার্য-কারণবাদের অবলুপ্তি কিংবা স্বাধীন-ইচ্ছার সূচনা ইত্যাদি প্রমাণ করার চেষ্টা 'বিশুদ্ধ দর্শন-বাদীদের' দ্বারাও ( যাঁরা মূলত ভাববাদী ) নিন্দিত হয়েছে।* রাধাকৃষ্ণণ কিংবা Ewing-এর কথা তুলে দিয়েছি এই জন্যও যে, নব্য-

* The question whether causality is universal or not is one which belongs quite definitely to the domain of philosophy. Any attempt to settle it by means of special science is as much as an encroachment as it would be for a philosopher to try to settle particular point in a science by metaphysical arguments. Such encroachment must be resisted whether they be in favour of determinism as they were till quite recently, or whether they be in favour of indeterminism, as they usually new. Emperical evidence cannot possibly establish either alternative." *Indealism*, A. C. Ewing.

বিজ্ঞানের প্রতিক্রিয়া ভাববাদীদের নিকট ভাবে পর্য্যবসিত এবং জীনস্ ও এডিংটনদের স্মরণ রাখা উচিত, নব্যবিজ্ঞান যদি সত্যি ভাববাদের জয়যাত্রা নির্দ্দেশ করে থাকতো, তবে, রাধাকৃষ্ণণ এবং Ewing-ই সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হতেন। কিন্তু তাঁরা তা' হ'তে পারেননি; এর তাৎপর্যও আমাদের বুঝতে হবে।

নব্য-বিজ্ঞানের তাৎপর্য সম্পর্কে এযুগের দু'জন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর কথা উল্লেখ করলেই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হয়ে আসবে। তাঁদের একজন হচ্ছেন ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এবং অপরজন হচ্ছেন আলবার্ট আইনষ্টাইন। প্ল্যাঙ্কের 'Where is Science going ?' এবং Philosophy of physics'। 'Where is Seience going'-এর শেষদিকে, প্ল্যাঙ্ক, আইনষ্টাইন ও মারের যে 'Socratic dialogue' রয়েছে—তা যদি কোন পাঠক ভালভাবে পাঠ করেন, তবে, তিনি নব্য-বিজ্ঞানের আমূল তাৎপর্য এবং বর্তমান দর্শনের সমস্যার মূল উৎস খুঁজে পাবেন। শুধু এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও গবেষণার যথার্থ প্রকৃতিকে না উপলব্ধি করে নিজের বাঁধাধরা দার্শনিক মতামতের প্রবণতার মাধ্যমে বিজ্ঞানে তাৎপর্য বোঝার প্রচেষ্টাকে প্ল্যাঙ্ক আইনষ্টাইন তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্য এবং মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানকে সদা সংস্কার মুক্ত ও জাগ্রত রাখার স্বার্থেই নব্য-বিজ্ঞানের অপব্যাখ্যার প্রতিরোধ করতে হবে। বিজ্ঞানী হিসেবে প্ল্যাঙ্ক আইনষ্টাইন সে দায়িত্ব পালন করেন এবং তাঁদেরই গবেষণার ফলে যে অপব্যাখ্যার সূচনা হয়েছে সেই সম্পর্কে এই বিজ্ঞানীদের তাৎপর্য-বিশ্লেষণ ও সাবধানবাণী বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে পরম কল্যাণকর বলেই বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য অক্ষয় হয়ে থাকবে। কুয়াসাচ্ছন্ন ও রহস্যবাদী ব্যাখ্যা নয়; বস্তু জগতের গতি ও প্রকৃতির যথার্থ উপলব্ধি করে তাকে জয় করার দিকেই বিজ্ঞানের যাত্রা—আমাদের দার্শনিক বিচার-বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে সেই সচ্ছ-জ্ঞানের উপর। সে পথই আমাদের স্বাধীনতার ( freedom ) পথ। নব্য-বিজ্ঞান সে দিকেরই দিশারী মাত্র।

কাহ্না তরুবর পঞ্চ বি ডালা
চঞ্চল চীএ পইঠা কাল॥—লুইপাদ। ( লুসাই ফা )॥

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হ'লো সেদিন। শকুন্তলাকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে, দেরির জন্য চিনুর কাছে ধানাই পানাই গেয়ে তবে তো বাড়ি ফিরলো সুনির্মল। এদিকে হিরণ্ময়ী ঘরবার করছেন তার বুড়ো খোকার জন্য। রাজেনবাবু হাত মুখ ধুয়ে চা খেয়ে এই আসছি বলে একবার জামাটা গায়ে দিয়ে রাস্তার মোড়ে যাচ্ছেন আবার তখুনি ফিরে আসছেন। আপিস থেকে সোজা বাড়ি আসাই তাদের চিরাচরিত অভ্যাস; রাজেনবাবুর ও তার পুত্রেরও। হিরণ্ময়ীর উৎকণ্ঠিত স্বভাবের জন্যই বোধহয় এই নিয়মে আবদ্ধ তারা। একদিন তার ব্যতিক্রম হ'লেই আর ভাবনার অন্ত থাকে না। এই স্বভাবের জন্য স্বামীর কাছে পুত্রদের কাছে বকুনিও কম খান না তবু ঐ বদঅভ্যাস ছাড়তে পারেন না তিনি। হয়তো ঐ বদ্-অভ্যাসের জন্যই স্বামী সন্তানদেরও বাড়ির আকর্ষণটা একটু বেশী। স্নেহে, মমতায়, ভালোবাসায় ভরপুর হৃদয় নিয়ে যেখানে একজন মানুষ সততই অপেক্ষা ক'রে আছেন, সততই যেখানে নিজের সমস্ত সত্তা বিসর্জ্জন দিয়ে মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে আছেন তাঁদের সুখ-সুবিধে, আনন্দ-আহ্লাদের যোগান দেবার জন্য সেখানে আর কার না আসক্তি থাকে?

ঠিক ন'টার সময় সুনির্মল এসে পৌঁছুলো। হিরণ্ময়ী দৌড়লেন চায়ের জল বসাতে, অস্থির গলায় বললেন, 'কী আশ্চর্য্য! এতো দেরি করলি কেন?' আড়চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বারান্দা থেকে পাইচারি থামিয়ে ঘরে গেলেন রাজেনবাবু। শান্ত হ'য়ে এতক্ষণে তাঁর ক্লান্তি নিবারক চেয়ারটিতে গা এলিয়ে চুরুটে টান দিলেন। সুনির্মল হেসে তার বলিষ্ঠ হাতে মাকে জড়িয়ে ধরলো, 'আচ্ছা তুমি কী মা বলতো? একদিন একটু দেরি হ'লেই যদি এরকম কর তা হ'লে তো ভারি মুস্কিল।'

ভেতর থেকে রাজেনবাবুর গলা ভেসে এলো, 'তাইতো। ওঁর ঐ চিরদিনই একরকম।'

'আর তুমি! তোমার রকমটাই বা কী রকম শুনি?' হিরণ্ময়ী মৃদু হেসে দরজার চৌকাঠে দাঁড়ালেন, 'গায়ে পঞ্চাশবার সার্ট লটকে কি আমি গিয়ে রাস্তার মোড় ঘুরে আসছিলাম, না আরেকজন?'

'আমি দেশলাই আনতে গিয়েছিলাম।'

'দেশলাই! দেশলাই ঘরে ছিলোনা, না? বেশতো, একবার না হয় তাই গিয়েছিলে আর তিনবার?'

রাজেনবাবু জবাব দিলেন না। কড়া চুরুটের ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন করতে লাগলেন নিঃশব্দে। সুনির্মল বললো, 'বিনুর বাড়ি গিয়েছিলাম তাই দেরি হ'য়ে গেল।'

'বিনুর বাড়ি? কেন রে?' চোখ চকচকে হ'য়ে উঠ্‌লো হিরণ্ময়ীর।

'কাল ওরা সবাই সিনেমায় যাচ্ছে সেই টিকিট ফিকিট—আর বিনু তো জানই—গেলে সহজে ছাড়তে চায় নাকি?' সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে বললো 'চা কিন্তু খাবো না মা, খেয়ে এসেছি।'

মা আশ্বস্ত হ'য়ে এতক্ষণে সারাদিনের সব ভালোমন্দ, সুখদুঃখের কথা বলতে বসলেন স্বামীর সঙ্গে। বিশ্রম্ভালাপ।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম এলো না সুনির্মলের। গভীর ভাবে কুন্তীর বিষয়েই চিন্তা করতে লাগলো সে। মনস্থির করা বড়ো শক্ত। কিন্তু শক্তই-বা কেন তাও ভেবে পেলো না। প্রমীলা তার কে? প্রমীলাকে সে ছুঁয়েও দেখেনি কোনদিন, ছুঁতে ইচ্ছে করেনি। স্ত্রী পুরুষের যে একটা প্রবৃত্তিজাত স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে তাও সে অনুভব করেনি প্রমীলার জন্য। তবে আর কিসে বাধা? কিসের বিবেক? তবে কি লজ্জা! লজ্জাই বা কেন? প্রমীলাকে সে তাড়িয়ে দেয়নি, পরিত্যাগ করেনি, বিয়ে করেছে বলে যথাযোগ্য কর্ত্তব্যের একতিল ত্রুটি করেনি কখনো—চেষ্টা করেছে, করুণা করেছে, সহ্য করেছে। কিন্তু তবু সে চলে গেছে এ বাড়ি ছেড়ে, স্বেচ্ছায়, সাগ্রহে। তারপরেও আবার তার চিন্তা? তার উপর কর্ত্তব্য? তার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করা?

অবিশ্যি প্রমীলা যে নিজে থেকেই গেছে সেটার জন্যে ভাগ্যকে সুনির্মল আজও ধন্যবাদ দেয়। যদি থাকতো কী উপায় হোতো? কী করতে পারতো সে?

ভাবতেই যেন মন শিহরিত হ'য়ে ওঠে। বিয়ে! এর নাম বিয়ে! না, বিয়ে তার হয়নি। লোকজন সাক্ষী আছে? থাকুক। লোকজনেরা কী জানে? কতটুকু জানে? বিয়ে করলেই যে মানুষ বিবাহিত হয় এ ধারণা তাদের ভুল। মন্ত্র পড়াটাই জীবনের সব নয় যে, আজীবন শুধু সেই কারণেই একটা যূপকাষ্ঠে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে। লোকলজ্জা? সামাজিকতা? কুরুচির ভয়? কী! কী জন্য তবে এমন একটা প্রেমহীন, সুখহীন ব্যর্থ বিরস জীবন সে বহন করবে কোনো একদিন অদৃষ্টের বিড়ম্বনাবশত, কোন একটি অজানা অচেনা অযোগ্য মেয়েকে বিয়ের মর্যাদা দিয়েছিলো বলে। না, না, কক্ষনো না, প্রমীলাকে সেই সম্মান সে কখনোই দেবে না,



দিতেই পারে না। স্ত্রী! স্ত্রী হওয়া কি এতই সোজা? এই মানুষকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতে পারে কেউ? যদি কেউ পারেও সুনির্মল পারে না।

বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে খোলা ছাতে পাইচারি করতে লাগলো জোরে জোরে। আস্তে আস্তে কখন ঠাণ্ডা হ'য়ে এলো মাথা, ঘুম জড়িয়ে এলো চোখে, বিছানায় গা এলিয়েই নিঃঝুম। একটানে সকাল হ'য়ে গেলো।

বেলা আটটার সময় মাথার কাছের জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতে দিতে হিরণ্ময়ী বললেন, 'ছাখো ছেলের কাণ্ড! ওরে উঠ্‌বিনে? রোদ্দুরে যে ভেসে গেছে ঘর, মাথাটাতো পুড়ে গেল।'

পূবের জানালা। সকাল হ'তে না হ'তেই তার তাপ। রাস্তার দেবদারু গাছের ছায়া পড়েছে লাল মেঝেতে। থরথর ক'রে কাঁপছে পাতাগুলো। পাছে এই আলো এসে তার সকাল বেলাকার আচ্ছন্ন নিদ্রা-সুখের ব্যাঘাত ঘটায় এজন্যে সুনির্মল রাত্তিরেই জানালার একটা পাট বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘুমোয়। কাল ভুলে গিয়েছিলো। হিরণ্ময়ীর হাতের ঠেলায় চোখ মেলে তাকিয়েই ভীষণ গরম লাগলো তার। গা, গলা ঘেমে জল। উঠে বসলো তাড়াতাড়ি, আর উঠেই একটা অনির্বচনীয় সুখে, ভালোলাগায় হৃদয়টা ভ'রে গেল হঠাৎ।

কাল হিরণ্ময়ীর জন্যও টিকিট কেটে এনেছিলো সুনির্মল। দুই ভাইয়ের জন্যও। কেননা পরে যখন কুন্তীকে নিয়ে আবার গিয়েছিলো টিকিট কিনতে তখন কেবলমাত্র একটি টিকিট চাওয়া, তার সামনে দস্তুর মতো লজ্জার ব্যাপার মনে হ'লো। তাছাড়া, আগের তিনটি টিকিটের সঙ্গে পাশাপাশি আর একটি আসন যোগাড় করাও শক্ত, অতএব আরো তিনটি টিকিট কেনাই তার চেয়ে ঢের ভালো। এ উপলক্ষ্যে তবু মাকে নিয়ে একটা আনন্দ করা হবে, আর মা-ই যদি আসেন তা হ'লে বেচারা অভিসীমন্তই বা বাদ পড়ে কেন? আলাদা বসার সমস্যারও একটা সমাধান হয়। চারজনের মধ্যে একজনের আলাদা বসা অসম্ভব কিন্তু সাতজনের মধ্যে ভাগাভাগি চলতে পারে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললো, 'আজ যে ছবি দেখতে যাবে মনে আছে তো?'

হিরণ্ময়ীও হাসলেন, 'তোরই এতো বেশী আছে—দেখছি যে আমি অভিসীমন্ত—আমাদের তিনজনের পক্ষেও তা যথেষ্ট।'

একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো সুনির্মল কিন্তু সহজ হ'য়ে বললো, 'কোথাও যেতে হ'লে তোমার তো সংসার গুছোতেই একদিন, দু'টো চাকর তবু তোমার সময় নেই।'

সময় নেই ঠিকই। চাকর থাকলেই যদি চলতো তবে তার স্ত্রীলোক-বর্জিত পুরুষদের ঘর সংসার এমন হতচ্ছাড়া চেহারার হ'য়ে থাকে কেন? মনে পড়লো সেবার শীতকালে হিরণ্ময়ীর বাবা যখন অসুখে পড়লেন, আর টেলিগ্রাম পেয়েই যেমন তেমন ফেলে চলে গেলেন শুধু মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, বাপকেও চিরজন্মের মতো বিদায় দিয়ে এলেন একমাসের মধ্যে, এখানে এসেও দেখলেন পুরুষ চারটি ( বাপ আর তাঁর তিন ছেলে ) বেঁচে বর্ত্তে আছেন বটে, কিন্তু গেছে অনেক কিছু। এরমধ্যে চাকর বদল হ'য়েছে একবার, ঝিটি অসুখের অছিলায় বেশ মোটারকম সুখের বন্দোবস্ত নিয়ে সরে পড়েছে তাড়াতাড়ি, হোটেলের চপ কাটলেট খেয়ে ছেলেরা ফুর্ত্তিতে আছে মন্দ না, বেচারা রাজেনবাবুর শুকনো রুটি চিবোতে চিবোতে একেবারে চরম দশা। খরচার জন্য নিয়মমাফিক যে টাকাটা তিনি রেখে গিয়েছিলেন স্বামীর হাতে, তাতে একমাস তো দূরের কথা, পনেরো দিনই চলেনি, তাঁর দ্বিগুণ টাকা খরচ ক'রেও খাওয়া পরার এই দুর্দশা।

দুই চক্ষুতে হিরণ্ময়ী চারচক্ষু ক'রে আছেন সর্বদা, দুই হাতকে দশহাত, তবু তিনি পেরে ওঠেন না এদের সঙ্গে আর ওঁরা তো কোন ছার।

স্নানের আগেই ছোকরা চাকর তারককে দিয়ে ঘর-দোর মুছিয়ে তক্‌তকে ক'রে রাখলেন। ঘরে ঘরে বিছানা পেতে ঢেকে রাখলেন পরিপাটি ক'রে, সকালবেলাকার কাচা কাপড় ছাত থেকে তুলে যার যার ঘরে তার-তারটা রেখে দিলেন কুচিয়ে। স্নান ক'রে খেয়েও শুলেন না একটু। খাবার তৈরী করতে গেলেন উনুনের আঁচে। আস্‌তে আসতে তো সেই সন্ধ্যা, এসেই তো তার তিনপুত্র 'চা চা' রবে পাড়া মাৎ করবে, আর ঢিলের সর্দার রামচরণ—উদভ্রান্ত হ'য়ে কেবলি দেরি করবে কাজে, পদে পদে ভুল হবে তার। আহা! ছেলেমানুষ সব, খিদে পাবে কত, তখন কি আর খাবার তৈরীর আশায় বসিয়ে রাখতে পারেন? জামাই মেয়ে আসবে সঙ্গে, কুন্তী আসবে, একটু ভালোরকমও তো আয়োজন চাই? তাছাড়া, রাজেনবাবু থাকছেন, তাঁরও তো ব্যবস্থা আছে?

মাছের চপ ভাজলেন থালাভর্ত্তি, ছানা কেটে রেখেছিলেন সকালবেলাতেই, ছুরি দিয়ে বরফি কেটে ঘিয়ে ভেজে, চিনির রসে ফেললেন, আস্তো আলু সেদ্ধ ক'রে পেঁয়াজে কষিয়ে রেখে দিলেন নুন মিষ্টি দই দিয়ে। লুচিটা অবিশ্যি তখন তখনই ভেজে দিতে হবে গরম গরম। বেলা দু'টোর মধ্যে সব সেরে, রামচরণকে পঞ্চাশবার সব বুঝিয়ে লালমুখে বেরিয়ে এলেন রান্নাঘর থেকে। তাড়াতাড়ি মাথা আঁচরে শাড়ি প'রে পাঁচমিনিটে প্রস্তুত।

টুকটুকে ক'রে সিঁদুর পরছিলেন সুনির্মলের ঘরের বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, সুনির্মল তাকিয়ে রইলো মার মুখের দিকে। এই মাত্রই তার হঠাৎ যেন উপলব্ধি হ'লো



সিঁদুরপরা মেয়েদের মতো সুন্দর আর কিছু নেই এই পৃথিবীতে। হিরণ্ময়ীর ছোট্ট সাদা কপাল ঝলমলিয়ে উঠ্‌লো সাধব্যের লাল স্বাক্ষরে।

কত বছর ধরে এই স্বাক্ষর বহন ক'রে আসছেন তিনি, তাঁর সুখের প্রতীক, সৌভাগ্যের প্রতীক। আরো কত বছর ধারণ করবেন, 'যেন আমৃত্যুই মার কপালে এই চিহ্ন থাকে' মনে মনে বললো সুনির্মল।

আর সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি মেয়েকে মনে পড়লো তার। যার কপাল মার মতো সাদা নয়, শ্যামল, এবং যে কপালে এখনো সিঁদুর ওঠেনি, মার মতো যার সিঁথির দু'পাশের চুল পাত্‌লা হ'য়ে আসেনি, অমাবস্যার অন্ধকারের মত ঘন, হয়তো সেও আর কয়েকদিন পরে ঠিক এইখানে, এই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ঈষৎ আনত হ'য়ে আঙুলের ডগায় গোল করে টিপটি বসিয়ে কপাল রাঙাবে, চিরুণীর মাথায় সিঁদুর লাগিয়ে লম্বা করে হাতির দাঁতের মতো সাদা আর সরু কুমারী সিঁথিতে টেনে দেবে সেই রঙিন রেখা।

আজকাল সিঁদুর পরে না কেন মেয়েরা? ভাবলো সুনির্মল। অমন সুন্দর একটা অলঙ্কারকে তারা কী অপরাধে বর্জন করলো? কদিন? দাসীত্ব? কিন্তু রাণীই বা নয় কেন? আসলে তো সত্যিই সেটা রাণীরই নিশানা? তারা যে সাম্রাজ্য পেয়েছে, অনুগত দাস পেয়েছে, তার জন্যে তাদের আলাদা সম্মান প্রাপ্য হ'য়েছে এখন এই জগৎ সংসারে তারই তো, সাক্ষী এই সাদা শাঁখা আর লাল সিঁদুর। বোকা! বোকা!

লম্বা নিটোল হাতে ঝিরিঝিরি জলতরঙ্গ চুরীর পেছনে কী সুন্দর সাদা শাঁখা মার হাতে। পুরোনো ফ্যাসানের মোটা পাটিহার স্নেহশীতল বুকের উপর ঝক্ ঝক্ করছে। উল্টে মাথা আঁচরেছেন, বয়সের তুলনায় অনেক বেশী চুলে হাতে জড়িয়ে খোঁপা করেছেন মস্ত, পৃথিবীর সব সুন্দর মেয়ের, সব সুখী মেয়ের অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সুনির্মলের চোখের সামনে। আশ্চর্য্য! বয়সতো কম হ'লোনা, এতোগুলো সন্তানের জন্ম দিলেন, মানুষ করলেন! আর শুধু কি সন্তান? তার মার কাছে কে না এসেছে, কে না থেকেছে, থেকে ভালোবেসেছে, সেবাযত্ন ভোগ করেছে? তাঁর আন্তরিকতায়, তাঁর সৌজন্যে কে না সুখী হ'য়েছে? কিন্তু এতো ক'রে, এতো খেটে, এই বয়সেও কী সুন্দর চেহারা। একটু হেলেনি, একটু কুঁচকোয়নি কোথাও, এতোটুকুও বুড়ো-বুড়ো হননি তিনি। না চেহারায় না চরিত্রে।

বিছানার উপর আড় হ'য়ে শুয়ে সিগেরেট খেতে খেতে মন কোথায় উধাও হ'য়ে যায় সুনির্মলের। মাকে দেখতে দেখতে আর কাকে যেন তাঁর মধ্যে মিশিয়ে ফেলে বারে বারে। মায়ের লম্বা নিটোল কিন্তু বয়স্ক হাত, কখন যেন কুড়ি বাইশ বছরের একটি সতেজ হাতে মিলিয়ে যায়, পাৎলা চুল ঘন হয়, সাদা রং শাপলাফুলের ডাঁটার মত শ্যামলে কোমলে জড়াজড়ি হ'য়ে থাকে।

নীচে ট্যাক্সির হর্ন শোনা গেল। চকিত হ'য়ে মুখ ফেরালেন হিরণ্ময়ী। 'আরে, তুই এখনো শুয়ে আছিস কী, যা যা নিচে যা শীগ্‌গির' এগিয়ে গিয়ে ব্রাকেট থেকে পাঞ্জাবীটা ছুঁড়ে দিলেন ছেলের দিকে, 'বদলে নে জামাটা। ব্যাগটা নিস।'

তাড়াতাড়ি উঠে বসে জামাটা বদলে নিল সুনির্মল। কী আশ্চর্য্য! এর মধ্যেই সময় হ'য়ে গেল? একপলক তাকালো ঘড়ির দিকে তারপর পায়ে জুতো গলিয়ে নামলো খাট থেকে।

'শোন্, অভিকে বল, চট ক'রে আরেকটা ট্যাকসি নিয়ে আসুক মোড় থেকে, একটায়তো আর হবেনা।' ঝুপঝাপ্ একটু ঠিক করলেন টেবিলটা, জানালা ক'টা বন্ধ ক'রে দিলেন, অভ্যস্ত হাতে বিছানাটা টান ক'রে তালা হাতে বেরিয়ে এলেন তিনি। সুনির্মল নীচে নেমে গেছে ততক্ষণে।

একতলা দোতলা মিলিয়ে পাঁচটি ঘর এই বাড়িতে। উপরে দু'টি, নীচে তিনটি। হিরণ্ময়ী নীচের ঘরেই থাকেন, কেননা নীচেই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। রাস্তার সামনের ঘরটি বসবার ঘর হিসেবে সাজানো, মাঝখানের বড় ঘরটিতে হিরণ্ময়ী থাকেন আর এ পাশের, প্রায় রান্নাঘর ঘেঁষে ঘরটিতে খাবার টেবিল পাতা। শোবার ঘরটি ভালো, সবঘরের চেয়ে বড়ও, জানালাও বেশী। সামনে বারান্দা আছে, পেছনে একটুখানি মাটি গলিতে, লম্বা পেঁপে গাছ উঠেছে একটি, একটি বাতাপি লেবুর চারা। হিরণ্ময়ী আবার যত্ন ক'রে ডাঁটা বুনেছেন বীজ ছিটিয়ে। সামনের বারান্দা দিয়ে দু'সিঁড়ি নেমে একটু উঠোন, উঠোনের ঐ কোনে প্রশস্ত রান্নাঘর।

বলাই বাহুল্য এই রান্নাঘরের কাছে না থাকলে তাঁর চলেনা। সুনির্মলের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এজন্যেই একতলায় আছেন তিনি। অবিশ্যি তার ঘরের পেছনের বাগানটুকুতেও তাঁর কম আকর্ষণ নেই। একতলা দোতলা করা সত্যিই কষ্টকর ভেবে সুনির্মলও শেষে জেদ করেনি আর। বসবার ঘরের আর হিরণ্ময়ী ঘরের মাঝখানে দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে, দোতলায় সামনের ঘরটিতে সুনির্মল থাকে, আর সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে এপাশের ছোটো ঘরে অভি সীমন্ত। বাকীটা সব ছাত। মেয়ে যদ্দিন ছিলো, মার কাছে মার ঘরেই থেকেছে। এখন সে জায়গা শূণ্য। আর সেই শূণ্যতা সহ্য করতে মেয়ে বিয়ে দিয়ে প্রায় পাগল হ'য়ে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী।

নিচে থেকে বিনু চ্যাঁচালো 'ও মাসীমা তোমার হ'লো?'

হিরণ্ময়ী হাসিমুখে নেমে এলেন। 'কেন দেরী করেছি নাকি?'

'তোমার মাসীকে নিয়ে বেরুনো'—ঘরে বসেই মন্তব্য ছাড়লেন রাজেনবাবু। সুনির্মল সায় দিল, 'সেবার মনে নেই রাঁচিতে?'



হিরণ্ময়ী কী জবাব দিতে গিয়েই হঠাৎ ছুটলেন আবার উপরে।

'আবার কী বাকী রাইলো তোমার?'

'এই আসছি, আসছি—' বড়ি রোদে দিয়েছেন ছাতে, তুলতেই তাঁর মনে নেই এতোক্ষণ।

গাড়ি এসেছে। অভি সীমন্ত হাঁক ছাড়লো, 'শীগ্‌গির এসো না, করছো কী?'

আই. এ. পাশ করবার পরে অভিকে একটা ঘড়ি কিনে উপহার দিয়েছে সুনির্মল, অভি এখনো সেই রিষ্টওয়াচটির বিষয়ে সদাই সচেতন, ঘন ঘন তার দিকেই তার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হ'চ্ছিলো, বিনুকে আসতে দেখেই বলে উঠ্‌লো—'ঈস! বিনুদি, তোমরা মেয়েরা হোপলেস্ সত্যি—'

'নে নে চুপ কর' দুই দাবড়া দিয়ে মাসীকে নিয়ে গাড়িতে উঠ্‌লো বিনু। ননদকে বললো, 'তুই তোর দাদার গাড়িতে যা কুন্তী।'

সুনন্দ বললো, 'আমাদের কিন্তু, চাপাচাপি ক'রে একটা গাড়িতেই ধ'রে যেতো, মিছিমিছি—'

এতগুলো লোক একটা গাড়িতেই ধরে কখনো? তোমার জামায়ের কথা শোনো মাসীমা।'

'ভালোইতো বলেছে, না-ইবা ধরবে কেন? ক'জন আর আমরা?'

'ক'জন! এক ডজনের কাছাকাছিতো নিশ্চয়ই, এই সুনুদা, যাওনা ও গাড়িতে, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?'

কুন্তীর সঙ্গে চকিতে চোখাচোখি হ'য়ে গেল সুনির্মলের। হাতল ঘুরিয়ে গাড়িতে উঠ্‌লো সে।

বিনুদের গাড়ি আগে ছাড়লো, পেছনে পেছনে ওদের গাড়ি। তারপর গলির মুখটি ছাড়তে না ছাড়তেই কখন যেন একটা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হ'য়ে গেল দুই গাড়ি মধ্যে। ঐ গাড়ি থেকে বিনুরা মুখ বাড়িয়েছে, এ গাড়িতে কুন্তী। পুরুষ দু'জন চেষ্টা ক'রে উদাসীন।

কিন্তু কতক্ষণ! একবার এগিয়ে গিয়েছিলো তারা অনেকখানি, আবার পেছনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে, ও গাড়ি থেকে তুমুল হাসির রোল উঠ্‌লো একটি, অভিসীমন্ত দু'য়ো দিলো কুন্তীদের, বিনু চোখ মটকালো এতখানি মুখ বার ক'রে। কাঁদ কাঁদ হ'য়ে গেল শকুন্তলার মুখ, সুনির্মল হেসে বললো, 'দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। এ সর্দ্দারজি জল্‌দি চলিয়েনা, বকসিস্ মিলেগা।'

'হাঁ বাবুজি হাঁ' এতো বড়ো প্রকাণ্ড শিখ্ দাড়ির ফাঁকে ছেলেমানুষের মতো হাসলো।

বোঝা গেল সেও প্রতিযোগী হ'য়েছে, বাবু না বললেও আগে যাবার চেষ্টাই সে করছে প্রাণপনে।

এবার জিত্‌লো কুন্তীরা, সুনন্দ আর সুনির্মল মুখ বার ক'রে হা'সলো বিনুদের দিকে তাকিয়ে। জায়গা বদল ক'রে কুন্তী এসে জানালার ধারে বসলো।

বড়োরা ছোটো হ'য়ে গেছে—প্রৌঢ় হিরণ্ময়ী শুদ্ধু আজ তার ছেলেমেয়ের বয়সী। দুই গাড়ি বোঝাই উজ্জ্বল প্রাণে যেন আনন্দের বান ডেকেছে। দুই গাড়ির দু'টি চালকও সে ছোঁয়া থেকে বাঁচেনি। সমস্তটা রাস্তা ঠিক এই রকম হাসি-কোলাহলের রোল তুলে হারতে হারতে জিত্‌তে জিত্‌তে অবশেষে পৌঁছুলো তারা লাইটহাউসে। সেখানে গিয়ে চেষ্টা ক'রে—অন্যদের সঙ্গে আসন বদল করলো সুনির্মল। সাতজনেই ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে বসতে পারলো। পাশাপাশি।

ভালো। সব ভালো। সব চাইতে ভালো বুঝি আজকের এই দিনটি। সব চাইতে সুখের, সবচেয়ে আনন্দের। কেবল হিরণ্ময়ীর মনটা হঠাৎ এক সময়ে কেমন জানি ছ্যাঁৎ ক'রে উঠ্‌লো রাজেনবাবুর জন্য। আহা! উনি যদি আসতেন। কোথায় যায় মানুষটা? কী আনন্দেই বা যোগ দেয়। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন মুহূর্ত্তের জন্য।

( ৬ )

বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রায় অন্ধকার। হিরণ্ময়ী আর দাঁড়ালেন না। শাড়ি ছেড়েই ছুট্‌লেন চায়ের তদারকে। বললেন, 'তোরা উপরে যা বিনু, পাটি পেতে ছাতে বোস্ গিয়ে, আমি এক্ষুনি আসছি।' 'এতো ব্যস্ত হচ্ছো কেন বলতো? রামচরণইতো আছে, ও কি চা-টাও ক'রে দিতে পারবে না?'

'তা পারবে না কেন, এই গরম গরম লুচি ক'খানা আমি তাড়াতাড়ি ভেজে আনি।'

শকুন্তলা এলো—'মাসীমা, আমি চা করবো। আমি ভীষণ—ভালো চা করি।'

হিরণ্ময়ী হাতের আলিংগনে সাপটে সস্নেহে মাথায় চুমু খেলেন তাকে। তারপর ময়দা মাখ্‌তে বসলেন।

'হ্যাঁরে' ছোকরা চাকরটা দাঁড়িয়েছিলো দরজা ধ'রে, তাকে জিগ্যেস্ করলেন, 'বাবুকে ঘরে দেখছিনে, কোথায় গেছেন রে?'

'জানিনেতো মা—।'

রামচরণ উনুনে হাওয়া দিতে দিতে বললো, 'বাবুতো মা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বেরিয়েছেন।'



'আমাদের সঙ্গে সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

'কী বললেন বেরুবার সময়ে?'

'বললেন চুরুট আনতে যাচ্ছি, দরজাটা বন্ধ করো।'

'তারপর?'

'তারপর তো এখনো ফেরেননি।'

চুরুট আনতে হাজরা রোডে যেতে হয় সপ্তাহে একবার ক'রে। রাজেনবাবুর একবন্ধুর বর্মা চুরুটের দোকান আছে সেখানে, রাজেনবাবুর ধারণা সেই দোকান ছাড়া অন্য কোথাও এত ভালো জিনিশ্ আর পাওয়া যায় না, অমন সুগন্ধই হয়না আর কারো চুরুটের। হিরণ্ময়ী বলেন বন্ধুপ্রীতি। সুনির্মল প্রত্যেক শনিবার আপিস থেকে ফেরবার রাস্তায় নেমে নিয়ে আসে এক বাক্স ক'রে। আগে আগে রাজেনবাবুই নামতেন, সুনির্মল এখন আর দেয়না তাঁকে, কেননা, রাজেনবাবুর নামতে উঠ্‌তে যে কষ্ট, যে ক্লান্তি সুনির্মলের তো আর তা হয়না? উনি বুড়োমানুষ কেন যান? কিন্তু কাল একদম ভুলে গিয়েছিলো সে কথা।

হিরণ্ময়ীর হাত ময়দার উপর থামলো। তিনি মাথা নাড়লেন কপাল কুঁচকিয়ে, 'চুরুট আনতে গিয়ে তো এত দেরি হবার কথা নয় রামচরণ। তুমি ঠিক শুনেছিলে তো?'

'হাঁ মা, বাবু ঠিক একথাই বলে বেরিয়েছেন।'

বিনু বললো, 'মামা তো সাধারণত কোথাও যান-টান না, আর গেলেও তোমাকে তো বলেন—'

'উঁহু, আমাকে তো কিছু বলেননি আগে।'

'তবে?'

'তাই তো ভাবছি।' হিরণ্ময়ীর শান্ত মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়লো।

'কী মা?' এগিয়ে এলো সুনির্মল।

হিরণ্ময়ী বললেন, 'তোর বাবা নাকি সেই দুপুরে আমরা বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চুরুট আনতে বেরিয়েছেন, এখনো না ফেরার কারণ কি বল্ তো?'

জিব কাট্‌লো সুনির্মল, 'ঈস্। সত্যি তো, কাল তো বাবার চুরুট আনা হয়নি। সকালেও তো মনে পড়লো না। কিন্তু এতক্ষণে তাঁর ফেরা উচিত ছিলো। হাজরা রোডে যেতে আসতে আর কতক্ষণ লাগে?'

'তবে?'

সুনির্মল তাড়াতাড়ি বাইরে রাস্তার কাছে এসে দাঁড়ালো। কী ভেবে হঠাৎ লুচি-টুচি ফেলে হিরণ্ময়ীও এসে দাঁড়ালেন ছেলের পেছনে। মার মুখের দিকে তাকিয়ে সুনির্মল বুঝলো

তাঁর মনের কথা—। একটু হেসে বললো, 'ভাবছো কেন? নিশ্চয়ই কোনো বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গেছেন, রোববার তো? এক্ষুনি আসবেন।'

হিরণ্ময়ী ছটফট ক'রে উঠ্‌লেন, 'আমার কেমন করছে মনটা।'

'এইতো তোমার রোগ। সবটা নিয়ে এমন কর যে—কাল আমার দেরী হ'লো না! তাও তো তুমি এরকমই করেছিলে।'

'নারে, এমন করিনি।'

'একথা ত বরাবরই বল।'

'তুই বরং দোকানে চলে যা একবার। একটা ট্যাক্‌সি নিয়েই যা—'

সুনন্দ এলো—'আপনি ভাবছেন কেন মামীমা, উনি ঠিক এসে পড়বেন এখুনি।'

'তাতো পড়বেনই—' একটু হাসলেন হিরণ্ময়ী—'তবু কী জানি কেন ভালো লাগছে না আমার।'

'সেতো ঠিকই, একটু তো ভাবনা হয়ই। সেই কখন গেছেন, আর এখন তো—'

সুনন্দ ঘড়ি দেখলো—'সাড়ে সাত।'

এতক্ষণকার একটানা আনন্দের উদ্দাম স্রোতে কে যেন অগস্তের গণ্ডুষ পাতলো। সময় কাটতে লাগলো টিকটিকির বুকের মত কেঁপে কেঁপে, দণ্ড পল গুণে গুণে। রামচরণই যা পারলো পরিবেষণ করলো চা আর খাবার, কেউ খেলো, কেউ খেলো না। সুনন্দ আর সুনির্মল দু'বার ঘুরে এলো হাজরা রোড, অভিসীমন্ত গেল সম্ভাবিত সব বাড়িতে খোঁজ নিতে, ফিরে এলো ম্লান মুখে। রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে ফিরে গেলো বিনুরা। রাত এগারোটায় খবর পাওয়া গেল রাস্তায় এ্যাকসিডেন্ট্ হ'য়ে হাসপাতালে আছেন রাজেনবাবু। গাড়ি চাপা পড়েননি। পাশের রাস্তা থেকে লম্বা লম্বা লোহার শিক নিয়ে ট্রাক আসছিলো একটা, কী ক'রে সংঘর্ষ হ'য়ে সেই শিক ট্রামের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকে কেবল মাত্র রাজেনবাবুকেই না, একসঙ্গে তিনজন লোককে গেঁথে ফেলেছে। রাজেনবাবুর কানের ভেতর দিয়ে ঢুকে গাল ফুটো ক'রে বেরিয়ে গেছে এ পাশ ও পাশ।

একটা চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন হিরণ্ময়ী। অভিসীমন্ত ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো সরুমোটা গলায়, সুনির্মল দেয়াল ধ'রে নিজেকে সামলালো।

(ক্রমশঃ)

# বিকল্প

## সুকোমল দত্ত

ঠিক দুপুর বেলা, মীরা বৈঠকখানায় ডিভানের'পর বসে একখানা বই-এর পাতা উলটে যাচ্ছিল: দিবানিদ্রার উদ্যোগ পর্ব। ঘরটি আধুনিক ধরণে সজ্জিত, আলমারী এবং শেলফে বই ঠাসা, সোফা সেটি, ফুলদাণী, প্লাষ্টারের মূর্তি, ডিভান ইত্যাদি যা-যা থাকে। জানলায় পাতলা নীলপর্দা, মেঝেতে কার্পেট। সব কিছুতেই এক জোড়া নিপুণ হাত এবং সুরুচির ছাপ আছে। মীরা বার কয়েক হাই তুলল—এবার উঠতে যাবে, টেলিফোনটা বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং; একটানা। "আঃ জ্বালালে" বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে পায়ার উপর থেকে রিসিভারটা তুলে নিল।

"হ্যালো—Yes, south 279. Yes, K. P. Ray. May I know who's speaking? বিকাশ চৌধুরী···বিকাশ! ও! বিকাশ তুমি! কবে এলে এ্যামেরিকা থেকে?···দু'মাস আগে!···হ্যাঁ মীরাইত বলছি; চিনতে পারছনা গলার স্বর?···sure হলে! ও! কেন, কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কি স্বরে?···তবে?···তা দশ বছর দীর্ঘ বইকি···লোকের পরিবর্ত্তন আসে কিন্তু আমি মীরাই, মী-রা।···না কেউ নেই। উঃ কত দিন!···অবাক? হ্যাঁ, তা কিছুটা হয়েছি বৈকি···সে যাক্···এলে তা হলে বিকাশ!···

কই দেখিনি ত!···personal কলমে দিয়েছিলে?···না, খবরের কাগজ আর পড়ি কোথায়···Amusement page আর আইন-আদালত এর বেশী আর এগুই না···যা বলেছ; বিয়েথার পর মেয়েরা পড়ে খুব সামান্যই সাধারণত।···মনে করবার কি আছে? এতো সত্যি কথা।···হ্যাঁ বল।···আগের বাসা বছর পাঁচেক আগেই ছেড়ে দিয়েছিলাম যে, ঝুলাতনা।···তারপর ঠিকানা পেলে কোথায়, ফোন গাইড?···ও হ্যাঁ হ্যাঁ ওদের কাছে ঠিকানা দেওয়া ছিল চিঠিপত্র রিডাইরেক্ট করবার জন্য।···খুব disappointed হয়েছিলে বোধ হয়?···না, এখন কোন কাজ নেই।···কাজ থাকে নাকি মেয়েদের এ সময়, নিদ্রা ছাড়া?··· খুব পারি ফোনে তোমায় কিছুক্ষণ সময় দিতে···অপব্যয় হবে কেন?···কথাগুলো আর সরল করতে পারলে না।···হাতে কাজ থাকলেও দশ মিনিট তুমি কেড়ে নিতে পারতে। কোনদিন অনেক অনেক দশ মিনিট তুমি নাওনি কি?···হ্যাঁ শুনছি,···ঝগড়া করবো কেন?···দশ বছর পর তুমি দেশে ফিরে আমার সঙ্গে কথা বলছ, তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করবো!··· সে অনেক পুরনো দিনের ব্যাপার—যেতে দাও।····তারপর, তোমার খবর বল?···আমার আবার খবর কি···যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ফরমূলা মিলিয়ে যে কোন মেয়ের জীবনযাত্রা কষে দিতে পারে; পারে না কি?···এবং তা খুব কমই গরমিল হয়···হ্যাঁ তোমার কথা···

দশবছর আগের···আমাকে তুমি ফরমূলায় ফেলতে চাইছ না ! কেন ?···আমার সৌভাগ্য ?··· তবে ?···এমনিই !···পুরোপুরি শুনবে ?···ভাল লাগবে তা ? একঘেয়ে লাগবে না ?··· আশ্চর্য ! কোন্‌খানটা থেকে আরম্ভ করবো ?···আমার সবটাই ত আমার জানা, বর্ণনাতে বাধা আছে···ইতিহাসের বাহমনী আর বিজয়নগরের অভিযান বর্ণনা করবার মত···সেটা ভাল হবে না···তার চেয়ে তুমি প্রশ্ন করলে তার বিস্তৃত উত্তর দিতে পারি···হ্যাঁ মেয়েসুলভ। আমি মেয়েই যে।···সব কিছু প্রিসাইজই আমরা পছন্দ করি···বড় কিছু ধরতেই পারি না।··· classical characteristic ! হবে।···হ্যাঁ বল।·····

পরীক্ষা দিয়েছিলাম···খুবই খারাপ ফল। পড়তাম নাকি একবিন্দু····যা পেকেছিলাম সে সময়···পড়াশুনোতে একটুও মন বসত না···হ্যাঁ পেকেছিলাম অবশ্য ফ্রক ছাড়বার পর থেকেই···শুধু আমি নয় সব মেয়েরই তাই হয়···তবুও আমার সে সময়টা একেবারে চূড়ান্ত.... ঠিক বলেছ full to the brim···অগত্যা থার্ড ক্লাশ···না, একটুও ক্ষোভ নেই···এখন দেখছি এরও প্রয়োজন ছিল না···আমাদের, মেয়েদের স্বামীর পত্র পড়া আর ছেলেমেয়েকে পড়ান, এটুকু জানলেই যথেষ্ট ; তার বেশী বাহুল্য বৈকি।····তত্ত্ব শুনাবো কেন, সত্য কথা।··· এটা এ্যামেরিকা নয় ভুলে যাচ্ছো।···রাগ করো না। এটা কিন্তু বোকার মত প্রশ্ন হলো···আমার বয়সটা কতো এখন হিসেব রাখো ?···ত্রিশ বছরের কোন বাঙ্গালী মেয়ের অস্তিত্ব স্বামী-কেন্দ্রিক না হয়ে উপায় আছে ? বলো ?···ওঃ নামটা জানতে চাইছো !···তুমি চিনবে ; তোমাদের Applied physics-এর কালীপ্রসাদ রায়···হ্যাঁ হ্যাঁ।···হ্যালো, হ্যালো,···হ্যাঁ শুনছি··· March-এ সাত বছর গেল···তুমি যাবার তিন বছর পর....to be frank, কি করবো বলো ?···তুমি দু'বছরের নাম ক'রে দশবছর কাটিয়ে আসবে কে জানতো···Textile expert হয়ে এলে ! ভাল কথা····কিন্তু দশবছর ধরে ?···ওঃ ও-দেশে কাজটাজ ক'রে সবজান্তা হয়েছ তাহ'লে বল !···এ লাইনের খবর মোটেই রাখি না। তুমি টপে তাহ'লে ?···মোটেই বাজে কথা বলছি না···তারপর দু'বছর পরে তুমি যখন এলে না···শুনছো ত বিকাশ ?··· মা-বাবার কাছ থেকে একবছর সময় নিলাম ; ভাগ্যিস্ বাবা খুব reasonable, মা-ও··· লিখলাম তোমাকে সব কথা···তুমিও তো জান তা ; জান না কি ?···তুমি তোমার সঙ্কল্প জানালে···শেষের দিকের পত্রগুলোর উত্তর আর দাওনি তুমি···না একদম পত্র দাওনি পরের সাত বছর···তুমি ভুলে গেলেও আমাকে ভুললে চলে কি !···Mass production-এ বিজ্ঞান কি অলৌকিক ব্যাপার সাধন করছে তা তোমাকে অন্ধ করে দিলেও আমার তার জন্য মোটেই সময় ছিল না···রাগ নয়, এ হচ্ছে কোল্ড ফ্যাকট্ !···মা-বাবার মুখের দিকে আমি তাকাতে পারতাম না। আমার জন্য সর্বদাই তাঁরা চিন্তাকুল—সে যে কি অবস্থা গেছে, বিকাশ, কি বলবো। মেয়ে না হলে···এতদিনে সেসব ভুলেও গেছি···শেষের দিকে



আমারও ভয় হলো···বাঃ হবে না ! এমনটা যেন আর হয়নি এদেশে !···দশবছর এ্যামেরিকায় থেকে সব যেন ভুলে গেছ···কেন বলবো না ?···আর সময় চাইতে আমার সাহস হলো না···হয়নি, কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গিনীকে এনে হাজির করা মোটেই অস্বাভাবিক হতো না···কি করবো ? মেয়েরা ওরকমই ভাবে···হ্যালো হ্যালো অত ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে কিসের ?···হ্যাঁ হ্যাঁ···শুনছি। শোন, তারপর বাবা একদিন বললেন : কি বলবো অমন লোক আমি দেখিনি, এমন উদার মন, নিজের বাবা বলে নয় এমনিতেই···বিশ্বাস করো··· বললেন লেখাপড়া শিখেছি, আমি আমার ভবিষ্যৎ ঠিক ক'রে নিতে পারি, সেটাই স্বাভাবিক। আমি যদি তোমার জন্য আরো অপেক্ষা করতে চাই তাতে তাঁরা বাধা দেবেন না। At the same time তাঁরা চান না আমি জীবনে কোন আঘাত পাই—শুনছো ত ? অসুখী হই। ইঙ্গিতটা বুঝলে ত !···হ্যাঁ···তাই করোলারি হিসেবে আমি যদি তাঁদের উপর ছেড়ে দেই আমাকে তাঁরা সুপাত্রেই পাত্রস্থ করবেন—হাসছো ? হাসো।···সুপাত্রের ডেফিনিশ্যন্ যদি না জান, জেনে দরকার নেই···তুমি কি হতে বলা কঠিন···এবং এখন তা বলা বাহুল্য ····আচ্ছা, বাবা হয়ে এর চেয়ে reasonable আর কি হতে পারতেন ?···আমার তো জানা নেই····গল্প উপন্যাসের কথা বাদ দাও না···হ্যালো···হ্যালো কাকে আবার লাইনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছে···হ্যালো মিস্ আই অ্যাম স্পিকিং টু···তোমার নাম্বার কত ?···আই অ্যাম স্পিকিং টু সেনট্রাল টু ফাইভ টু···ইয়েস···বিকাশ শুনছো ত ?···জ্বালালে মেয়েগুলো, কুঁড়ের ডিপো ; কবে যে অটোমেটিক হবে···হ্যাঁ মেয়ে মাত্রেই।···বলছি। আমি মত দিলাম···কেননা ভাবতেও খারাপ লাগলো, আমাকে দেখলে লোকে হাসবে, কানাকানি করবে···বাংলা দেশ তো ! সকলের তৃষিত রসনা খলখল করে উঠবে ; উঃ সে কি জঘন্য ! মৃত্যু তুল্য···হ্যাঁ তারপর বিয়ে···কে. পি. রায় বললাম না একবার···কিছুদিন কেন—বেশ কিছুদিন খারাপ লেগেছে···তারপর adjusted হয়ে যায়, যায় না ?···বাঃ সে কথা বলবো কেন তোমায়, না তোমার তা জানবার অধিকার আছে ?···তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে না তো ? ···বুঝেছি অফিসে বসে ফোন করছ···হ্যাঁ বড় সাহেবদের ফোনে সময় নষ্ট করা মোটেই অপরাধ নয়—তোমারই মতো দে আর নেভার ব্রিফ্ অন দি টেলিফোন। ওটা ইমপ্লাইড থাকে তাদের বেলা।···কি আশ্চর্য ! বিরক্ত বোধ করবো কেন ?···তোমার চেম্বারে কেউ নেই জানি, কিন্তু একজন মেয়ের···না হয় মীরারই ঘর কন্নার কথা তোমার শুনতে কি ভাল লাগবে ?···আমার তো মনে হয় কারো ভাল লাগতে পারে না।···

তুমি ফোন না করলে ? ঘুমোতাম এখন···রোজ নয়, কোন কোন দিন···রেডিও শুনি, বই পড়ি···শেলাই ত থাকে···খাবার বানাই চারটার সময়, পাঁচটায় মেয়ে ফেরে কিনা স্কুল থেকে···একটি হবে কোন দুঃখে···দুটি, দুটি···আর একটি ছেলে আছে···ছ' বছর।···

লা মার্টিনিয়ারে দিয়েছি···ছেলের মে'তে দু'বছর গেল···ঝর্ণা, সঞ্জিত। একটু পুরনো, নয়? ···লটারী করে রাখা···আমার চোখে ত সুন্দরই লাগে, মায়ের চোখ বলে কিনা কে জানে··· কোন কোন দিন বেরোই···শুনছো ত বিকাশ····আরও বলবো? রাতে?···হ্যাঁ মেয়েকে পড়াই, খাই দাই, শুয়ে পড়ি।···না, সিনেমা থিয়েটারের কোন কালেই ভক্ত নই। ঘুম থেকে উঠে? বাবা! চাকর বাকরকে তাড়া দেওয়া—বাজার করান, রান্না করান, মেয়েকে স্কুলে পাঠান, ওকে কলেজে···হ্যাঁ বেশ ভরপূর···মন্দ লাগবে কেন?···না কারো লাগে তা! ····সাত বছরে অভ্যস্ত হয়ে গেছি···হ্যাঁ বেশ আছি—কোন দুঃখ নেই, অভাব নেই, গ্লানিও নেই···আমরা তো তা-ই চাই···জ্ঞান হবার পর থেকেই কামনা করে এসেছি ভগবানের কাছে মনে মনে···ভাববার অবকাশ কই?—ভাবি না।···

তুমি কোথায় আছো এখন?···Y. M. C. A-তে? বেশ···বাসা টাসা করো, বলতো মেয়ে দেখবো···হ্যাঁ আমিই···নয় কেন?···আমি ছাড়া, বলে দিচ্ছি, বিকাশ, তোমার মনের মেয়ে দুনিয়ার কেউ খুঁজে বের করতে পারবে না।···ওঃ ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।···বাদ রইলো কি কিছু?····কে জানে?····হ্যাঁ ভাড়া বাড়ি···কিনেছি রিজেন্ট পার্কের দিকে···জিনিষ পত্রের দাম না কমা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে···কুলোয় না···নিজের স্বত্ত্ব না থাকলে খারাপ লাগবে না!···হ্যাঁ অভাব বোধটাই মানসিক যে···গাড়িটা বাড়ির আগেই হয়েছে···· না কোন অভাব বোধ নেই···বেশ আছি, সুখে আছি···দশবছর পেরিয়ে গেছে নাকি?···তোমাকে দিয়েই বিচার করতে পার···দশবছরের wear & tear বাদ দিলেই বর্ত্তমানকে পাবে···ঠিক তোমার নিজের মতো···আমি কিন্তু তোমাকে কল্পনা ক'রে নিতে পারছি, ঠিক তোমাকে বিকাশ···ভারি অবুঝ তো! বলছি কি তাহ'লে?·· সেই আছি··· সেই মীরা···ওরা বলে একটু নাকি মুটিয়েছি, হবেও বা···নিজের চোখে পড়ে না ছাই!···এটা নাকি স্বাচ্ছন্দ্যজনিত, আয়েসজনিত···হ্যালো···হ্যাঁ····আচ্ছা, তা কি হতে পারে?···আমিও ফিল্ করছি দিন দিন, মেয়েদের একটু একটু একসারসাইজ করা দরকার···না, তোমার এ্যামেরিকান মেয়েদের মত অতটা পারবো না···সেগুলোতো মেয়ে নয়, দস্যি···ক্রোধ আবার কিসের!····তাই বলে এই বুড়ো বয়সে এখন ধিঙ্গীপনা করতে যাবো নাকি?···হ্যালো··· দাঁড়াও পাটা একটু ছড়িয়ে নেই; অনেকক্ষণ একভাবে বসতে পারি না··· (ডিভানে শুয়ে বুকে ভর দিয়ে কথা বলতে লাগলো)···একজাকট্‌লি····পর্দা নয় শুধু, কালো পর্দা···আমি কি করতে পারি?···অসম্ভব···বলিনি পড়াশুনো করি না, ওসব আমার কাছে রেফার করা অর্থহীন। অপপ্রয়োগ···এক গুঁয়ে!···হয়ত তাই···তবে নূতন নয়···দুনিয়াটাই পরিবর্ত্তনশীল নয় কি?···আড়াই হাজার টাকা মাইনে পাবার পর এ কথাটা ত তোমার পরিষ্কার বোধগম্য হওয়া উচিত।···নিশ্চয়ই।···



না।···চা অনেক খাও, অনেক ভাল জায়গায় খাও···আমার বাসায় আর নাই বা খেলে···তাছাড়া আমার চা তৈরীর খুব সুখ্যাতি নেই···একদিন ছিল, সে অনেকদিন আগে, দশবছর আগে···কতোবার বলবো তোমায়, বিকাশ, সেদিনের মীরা আর আজকের মীরা এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন, একজনের সমাধির 'পর আর একজন গড়ে উঠেছে···হ্যাঁ, লঙ্ টেন্‌ইয়ারস্, এ ডিকেড্···আমাকে দেখবার কি আছে? জাষ্ট্ এ কমন বেঙ্গলী গার্ল···ঠিক তা নয়; আমার ঘরকন্নার উপর দুটো কথা বলার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে···কিন্তু তা হয় না বিকাশ···এখানে এসে তুমি উন্নাসিকের মতো সব কিছুর প্রতি অবজ্ঞা দেখাবে তা আমার সহ্য হবে না···তোমার মার্কিনী মানদণ্ডের বিচারে আমার কিছুই দাঁড়াতে পারবে না —না, আমিও না···আমার তা বরদাস্ত হবে না—হবে না···হ্যালো, শুনলে ত?···ফাইনাল্!··· মোটেই নিষ্ঠুর নই···আনসিভিলও না···চা খাবে না, আমার কোন কিছুর প্রতি মতামত পেশ করবে না···তাহলে কেন?···রয়-এর সঙ্গে আলাপ? নাই বা করলে। ঈর্ষাতে সেটা জমবে না।···বিহেভ্ করবে! আশ্চর্য! তবুও কেন আসতে বারণ করছি? বিকাশ,— বড্ডো ঘুম পাচ্ছে আমার—ভয়ানক—না না টায়ার্ড নই—এমনিই—অবসাদ—আর দু'মিনিট? বল···আমি বলবো?···বিকাশ, কেন আসতে বারণ করছি বুঝতে পারো না তুমি, সত্যি তুমি বুঝলে না?····আর কত বোঝাবো?···না বিকাশ, আমরা মেয়েরা যতো লেখা পড়াই শিখি আর যতো প্রগতিই দাবী করি না কেন, সংসার ছাড়া আমাদের কি আছে? স্বামী পুত্রকন্যা নিয়ে সংসার, ওটা বাদ দিলে আমাদের আর কোন সত্তা আছে কি? নেই। ওছাড়া আমরা, মীরারা, বাঁচতে পারি না···সত্যি বিকাশ, ভয়ানক সত্যি····নানা তুমি এসো না, তুমি এলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে, এতো দিনের গড়া সব কিছু ছারখার হবে, আমি তাহলে বাঁচবো কি নিয়ে?···· তার চেয়ে, তার চেয়ে প্রথম যৌবনের সোনালী রদ্দুর মাখানো কটাদিন থাক আমাদের কল্পনায় সজীব।···আমি পারবো না···তোমাকে দেবার মত আজ আমার আর কোন সম্পদই নেই—শুষ্ক দেহটার প্রতি আর নজর নাই বা দিলে—তোমার কোন দান গ্রহণ করবার মতো পাত্রও আমার নেই···তুমি দূরেই থাকো বিকাশ, অনেক দূরে···ওঃ না না, দশবছরের সংযম আমি রক্ষা করতে পারবো না···হ্যাঁ হ্যাঁ···বিকাশ, ডিয়ার মনে মনে রইলে···দূরে নয়, দশ বছর দূরে···রাতের সব তারাই আছে বিকাশ, দিনের আলোর গভীরে···বিকাশ, বিকাশ··· বিকা···বি'।

কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হবার সঙ্গে মীরার চোখ দুটি বুজে এলো। হাত থেকে রিসিভারটা আলগা হয়ে গেল।·····

# প্রজাপতির মৃত্যু

## সত্যেন্দ্র আচার্য্য

তাই প্রতিবেশিনীর দল যখন পুনর্বার সাজ-বেশ করিয়ে দিয়ে, ললাটে চন্দন টিপ টানতে টানতে, আলিম্পনের শুভ্র গৌরিমার মতই শুভ্র সরসতায় সহাস্যে ব্যতিব্যস্ত করে তুলছিল নীলাকে, এই ক্ষণায়ু অবসরে অরুণাক্ষ যেন এক যুগ সময় পেয়ে গেল হঠাৎ।

সম্পূর্ণ এক অখণ্ড একটা যুগ যেন। অনর্থক অপব্যয়ের হাত হতে লাস্যময় পরিবেশটাকে সাময়িক ভাবে ইচ্ছা করেই দূরে সরিয়ে রাখলে অরুণাক্ষ। সার্থক ব্যবহারের সমন্বয় ঘটিত স্বপ্নগুলো অনেক সুখস্মৃতির ধার ঘেঁষে একটা অপোক্ত পাঁচীলের মতই ধ্বসে পড়লো হঠাৎ।

আরো কত ভাববে সীতা? স্পষ্ট করে বলো কি ঠিক করলে? সীতার মোমের গাল দু'টোতে মমতায় আলতো একটা টোকা দিলে, দিয়ে একটু হাসল অরুণাক্ষ। স্মিত। হেসে বলল, কৈ বলছ না যে?

সীতার অন্তরটা কী স্বপ্ন বুনছিল সেই জানে। মুখটা লুকিয়ে ফেল্ল, তেম্নি লুকিয়েই জবাব দিলে, বলেছি ত কতবার।

জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলতে অনেক কথাই শুনিয়েছে সীতা। আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নে শুধু শুনে গেছে অরুণাক্ষ।—মেয়েদের যা সব চেয়ে বড় কামনা তা তুমি আমাকে দিয়েছ অরুণাক্ষ। এর মূল্য দিতে আমি দেউলিয়া হতে পারব।—তুমি বিশ্বাস কর। আর তুমি প্রশ্ন কর না। হাতটা কাছে টেনে নিল অরুণাক্ষ। অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগে হাওয়ার আঁচল-ছোঁয়া উইলো পাতার মত শিরশির ক'রে কেঁপে উঠল সীতা। কেঁদে ফেললে।

বিয়ে? বিয়ে যে কী, অন্তরের যেখানে তার পূর্ণ বিশ্লেষণ আর বিচারের তর্ক চলে তা আজও অনুভবে নেই সীতার। তার উপলব্ধিও নেই। কিন্তু অনুভূতি যেদিন এল, সীতা সেদিন প্রতিশ্রুতির অনেক দূরে।

ছোট্ট জীবনের একটা সুখকর পরিবেশ ছোট্ট জীবনের সুসংবদ্ধ সুরগুলো দিয়ে একবারে ঠিক সুরে বেঁধে নিতে পেরেছিল অরুণাক্ষ, একটা সাবলীল, মূর্ত এক নীল স্বপ্নের আনন্দে, অনেক রেশ ছড়ানোর ইতস্ততঃ সম্ভাবনায় দিনগুলি চলেছিল। কিন্তু রং-এর দিনগুলোকে গায়ে জড়াতে, অকস্মাৎ গেল ফিকে হয়ে।

এত অভিনয় জানে সীতা? অদ্ভুত এই মেয়েজাতগুলো। মিথ্যার একটা জাল



বুনে, ব্যর্থ একটা প্রতিশ্রুতিতে একটা জীবনকে বহু দূরে, অনেক নীচে ঠেলে দিতে পারে ত এরা? অদ্ভুত, অদ্ভুত এই সীতা-সাবিত্রীদের দলগুলো। জীবনের একটা ছন্দকে এমনি নিষ্ঠুর হাতে চুরমার করে দিতে অদ্ভুত সিদ্ধহস্ত ত? ঘৃণায় অরুণাক্ষের পুরুষকার মনটা সীতার প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে।

বিগত দিনের এইসব ইতিহাস বিজড়িত অনেক ঘটনার এক একটা পাথর-স্তূপ একটা মুহূর্তের অবকাশে নায়নিক পর্দায় রোল-ফিল্মের মত একের পর এক ফুটে ওঠে। উতল মনের জ্বলন্ত স্বপ্নগুলো এক সংগে তালগোল পাকিয়ে ওঠে সব।

একটা শূন্য মনকে সংগে নিয়ে অপেক্ষায় আর একটানা বিরামের অজস্রতায় অনেক কথাই শুনেছে অরুণাক্ষ। শুনেছে অন্যত্র সম্বন্ধ হচ্ছে তার,—পুত্রার্থে। নিরুত্তর অরুণাক্ষ প্রতিরোধ করেনি, অনুযোগ করেনি কোন,—শুধু মনে মনে হেসেই ছিল যা। কিন্তু তারপর পারেনি আর। পারেনি,—জেহাদ আর অনুনয়ের দ্বৈত সংগ্রামে।

তাই একান্তে তলিয়ে যাওয়া, বিস্মৃতির অতল গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া সেই সব পুরোন ও জটপাকান ইতিবৃত্ত মুহূর্তের অবসরে আবার নতুন করে দেখতে চাইল অরুণাক্ষ। —চেয়ে দেখল এদিকে, নীলা চোখ নামিয়ে নিলে।

তখন বর-কনে-এ্যাসেম্বলীতে জরুরী আলোচনা পুরোদস্তুর জমে উঠেছে। বেশ একটু মেজাজী টুংটাং। জলতরংগের মত। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে শুধু 'না, হুঁ,' উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল অরুণাক্ষ। জুরীদের সরস মন্তব্যগুলো প্রকারান্তরে শুধু যে অরুণাক্ষকেই বিদ্ধ করছিল তা নয়—নীলাকেও। তবু এম্নি এক স্বচ্ছ পরিবেশ, জীবনের এই একটা দিন, এম্নি নিষ্ঠুর হাতে দূরে সরিয়ে দিতে অনেক সার্থকতা খুঁজে পায় অরুণাক্ষ। বেশ লাগে যেন।

নীলার প্রতি বক্রকটাক্ষে একটা রসোত্তীর্ণ মন্তব্য করলে কে! একটা অনাবিল হাস্যরসে ঝিলমিলিয়ে উঠল ঘরখানা ঠিক ঝর্ণার মত। শুধু হাসতে পারলে না যা নীলা। ফুল··· ফুল ···ফুলশয্যা, ফুলশয্যার কথাটা মনে পড়তেই অভিমন্যুর কথাটা স্পষ্টতর হয়ে উঠল নীলার।

খামখেয়ালী, বেপরোয়া একটা গৌর চেহারা। কথা বলে যখন, আগ্নেয়গিরি। যখন বলে না, পাথরের ভগ্নাংশ একটা। সত্যিই তাকে ভালবেসেছিল অভিমন্যু।—নীলাও।

সে ত দু'বছরের কথাও নয় আজ। ভিজতে ভিজতে ফিরল অভিমন্যু। নীলা দাঁড়িয়েছিল জানালাটায়। অপেক্ষমাণ কণ্ঠটা অভিযোগ মিলিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, গিছলে কোথায়?

এম্নি একটা জড়ান প্রশ্নে মোটেই বিচলিত হল না অভিমন্যু। বললে, পত্রিকা অফিসে।

সুর কিছুটা পরিবর্তন করে নিলে নীলা, নিয়ে বললে, কেন, গল্প দিতে বুঝি ? অভিমন্যু তখনো অনর্থক ভিজছিল দাঁড়িয়ে। তেম্নি ভিজে-ভিজে উত্তর দিলে সপক্ষেই। ঘাড় নাড়লে শুধু।

একটু যেন তিরস্কার, তবু জড়ানো স্বরটা আবার বললে, বৃষ্টিটা থামলে ত এলে পারতে, —ভিজলে অসুখ করবে যে—

এবার একটু বিব্রত হল অভিমন্যু। অনর্থক জলের একটা ধারা কপাল থেকে মুছে নিলে। বল্ল তারপর, করলেই বা, তোর কি ?

ইচ্ছা ছিল না হাসতে নীলার। তবু মুচকি হাসল নীলা। হেসেই তেম্নি জবাব দিলে, আমার আবার কি ?

তোর কি আর কষ্ট হবে ? অভিমন্যু অবিন্যস্ত চুলগুলোকে পেছনে ঠেলে দিতে দিতে বললে।

দেরী হল না মোটেই। তেম্নি জবাব দিলে নীলা, কেনই বা হবে ? অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টাতে অবিশ্যি বললে মুখ খুলে, কিন্তু বুঝেছিল কষ্ট কি আর হবে না তার ? পরক্ষণেই ব্যাকুলতা সামলে নিয়ে বললে, নাম কি গল্পটার ?

'ফুলশয্যার রাতে'—বেপরোয়া ভাবে উত্তর দিলে অভিমন্যু।

মুচকি হেসে মুখ ভেংচিয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলে নীলা।

জীবনের পথে পাড়ি জমানর একটা স্বপ্নময় সন্ধিক্ষণ। তবুও এম্নিভাবে কাটিয়ে দিতে সময়টা, একক যন্ত্রণায় অনেক উপশম খুঁজে পায় নীলা।

দেশে তখন মহাযুদ্ধের বীভৎস বিভীষিকার থমথমে আভাস একটা। হাওয়ায় হাওয়ায় গোলাগুলির উৎকট মাতালতা, বারুদের গন্ধ।

পথেই আটকে দিলে নীলা। আগুন দৃষ্টিটা ওদিকে তুলে না ধরেই বললে, কোথায় যাবে ?

অপলক একটা দৃষ্টির ছাটে সারা দেহটা একবার বুলিয়ে নিলে অভিমন্যু। বললে, ইন্টারভিউ।

জোনাকী বিদ্যুতের মত ফিঁকে হাসি হাসল একটু নীলা। হেসে বললে, ইন্টারভিউ ?

জান তো নীলা, ইন্টারভিউ আজ সহজ। যুদ্ধের কৃপায় বেকার সমস্যা অন্তত মিটেছে। সতীত্ব-পনা দূরে ঠেলে অনেকে এম্নি মা হতে শিখেছে। অনেক অন্তরায় নতুন মাথা চাড়া দিলেও, সমাধানের মশগুল আনন্দে অনেকে হাসে তবু,—কিন্তু যারা হাসতে পারেনি, দুঃখের জীবনে তারা আত্মসমর্পণই শুধু বেছে নিয়েছে।



নীলাও হাসল। দুষ্টুমির ভান দেখিয়ে আরো পথটাকে আটকে দিলে। দিয়ে বললে, কিসের ? মস্তিত্বের ?

তর্ক করবার ইচ্ছা ছিল না। তবু উদাত্ত কণ্ঠে তেম্নি বেপরোয়া উত্তর দিলে, না, পাইলটের।

একটু দমে গেল নীলা। দৃষ্টিটা নামিয়ে নিলে।

পাইলটের ? কথাটা শুনে নীলার হৃদপিণ্ডটা কেমন যেন একটা আনাড়ী আতঙ্কে মোচড় খেয়ে উঠল হঠাৎ। পাইলটের ? ওঃ, অনেক মৃত্যু সেখানে ডানা মেলে কিলবিল করে। জীবনের গান নেই। প্রেম নেই। কিচ্ছু নেই। নীরেট ব্যর্থতার চূড়ান্ত আবহাওয়া একটা। নিরাশায় ক্ষুব্ধ অন্তরটা অভিমানে জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, তবে যুদ্ধেই যাবে অভিদা ?

অনেক খেয়ালগুলোর সংগে অনেক খেয়ালই হারিয়ে ফেলেছিল অভিমন্যু। শুধু বললে, তাই, না গেলে বুঝি খুশি হতিস্ ?

অকৃত্রিম একটু হাসবার চেষ্টা করলে নীলা। করে বললে, যাও, আমি খুশী হতে গেলাম কেন ? তোমার বউ খুশী হবে।

বাক্যব্যয়ের ইচ্ছা থাকলেও অবসর ছিল না অভিমন্যুর। তবু থমকে দাঁড়িয়ে গেল একটু। বললে, কে আমার বউ রে নীলা ?

একটু বিব্রত হল নীলা। আঁচলটা অকারণে মুখে পুরে চেপে ধরলে দাঁতে, চেপেই তেম্নি উত্তর দিলে, তা আমি কী জানি ?

অভিমন্যু হাসল। অবিশ্রান্ত নয়। মৃদু। তবু মিষ্টি বেশ। হেসে বললে, তুই নয় ?

আঃ, বলে নীলা পালাতে যাচ্ছিল। অভিমন্যু হাতখানা ধরে ফেলতেই নীলা থরথর করে কেঁদে ফেললে।

হাসল অভিমন্যু। বেশ এক ঝলক। সুচিত্রিত কাচপাত্রে হুইস্কির বুদবুদের মত। হেসে বললে, বাঁচার ইচ্ছে যেখানে মরে যায়, এম্নি বেপরোয়া কিছু একটা বেছে নিতে হয় নীলা। সব ছেড়ে চলে যাব তাই— আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব আর তোর মত নীলাকেও।

সত্যিই অভিমন্যু চলে গেল। ভাগ্যের প্রতি দোষারোপ না জানিয়ে, আত্মার প্রতি অভিমান না করে, এম্নি করে মরে গিয়েও তবু বাঁচার তাগিদে ছুটে গেল অভিমন্যু। এ অভিমান নয় তার, অভিনয় নয়। শুধু, শুধু যা অসম্ভব তা সম্ভবের সরলরেখায় টানতে না পারার আত্মদহন আর আত্মগ্রহের সহজাত প্রবৃত্তির পরিচয় একটা।

রুদ্ধ বাষ্পকে কোনমতে বাধা দিতে গিয়ে চক্ষে হাত দিতেই এ্যাসেম্বলীর মধ্যমণি

বিশেষ রমুদি শ্লীল-অশ্লীলের মাঝামাঝি একটা মন্তব্য করলে। আবার হাসির বন্যা উঠল। হাজার ওয়াটের ফ্লাড লাইটের মত। এমন সরস কলহাস্যের মাঝে একটা আদেশ সব ফিউজ করে দিলে—বিদায়ের আয়োজনে উঠে পড়ল সকলে।

বসন্ত পূর্ণিমার মধুরাতে নীলার ফুলশয্যা আজ। সারাদিনের কোলাহল জর্জরিত গৃহটা অপেক্ষাকৃত স্তব্ধ। সংগিনীগণ তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের বিদ্যুৎবাণ ছিটিয়ে দিচ্ছিল এতক্ষণ ধরে। তবু ধৈর্যচ্যুতি নেই। অরুণাক্ষের ঔদাসীন্যে শুধু সবেমাত্র তা কক্ষচ্যুত। অপূর্ব এক মায়াময় স্বপ্নক্ষণ। বাইরে একরাত জ্যোৎস্না। মদির নেশার ঘুমে ঝরা।

অনর্থক শাড়ীর প্রান্তভাগটা নিয়ে বৃথা নাড়াচাড়া করছিল নীলা। অরুণাক্ষের সংকোচ জড়ানো স্বরটা অনুভূতি মিশিয়ে ছিটকে উঠল,—নীলা।

তখনো তেম্নি বসেছিল নীলা। আরক্তিম মুখ ইষৎ লাল হয়ে উঠল,—কণ্ঠটা অনেক জড়তায় জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিলে, বলো—

কাছে এস। অরুণাক্ষ সরাসরি বলে ফেললে এবার।

রেহাই নেই। তাই কাছে আসবার আগেই, আরো কাছে সরে এল অরুণাক্ষ। বললে, আজকের এই ফুলশয্যার রাতটায় লুকিয়ে আছে কত কাব্য, অনেক কৌতূহল, না নীলা?

অনেক কথার শৃংগারে অনেক কাব্য করতে ইচ্ছা হচ্ছিল মৃত মনটার। কোন কথা বললে না নীলা। মেয়েদের সেই চিরাচরিত ওজর আপত্তিটা তুলে ধরলে শুধু,—আঃ ছাড়ো। শুধু বললে।

ছাড়ল না অরুণাক্ষ। তবে মৃদু সোহাগের পর দেখা গেল মরা মনের কবরটা নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে অরুণাক্ষেরও। নীলার চোখে ঘুম নেই। দেহে যেন মুমূর্ষুর শয্যাকণ্টকী। এমন রাতেও কাব্য নেই। সুরে সম্মোহ নেই। হাস্নুহানার নেশা নেই। পাগল হওয়ার মরশুম, তবু মাতাল হওয়ার স্পৃহা নেই। সুর-ঝরা জীবনের সুরে যা শুধু বাজে তা শুধু কান্না।

উঠে বসল নীলা। দূরের আকাশে দৃষ্টি মেলে দিলে। কত কথা মনে পড়ে আজ। মনে হয়, কে যেন আসেনি, কে যেন আসবে। এসে দেখবে, সেই একতালা ভাঙা লাল বাড়ীটা। বাড়ীর ওপাশে সেই একডেলে বাদাম গাছ একটা। পায়রার পুরোন খোপ। নিজের হাতে পোতা সেই পেয়ারা গাছ, সব, সবই পাবে—শুধু পাবে না তার,…যা পাবে না তা আর ভাবতে পারলে না নীলা। উদ্গত অশ্রু ঝাপসা করে দিলে চোখ।

# দিব্যজীবন বার্ত্তা

## অহং এবং দ্বন্দ্ববোধ

[ শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবন' গ্রন্থের প্রথমপর্ব্ব চতুর্থ অধ্যায় অবলম্বনে ]

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু

একই প্রকৃতি-বৃক্ষে আসীন পুরুষ প্রভু নয় বলিয়া শোকে ডুবিয়া মুহ্যমান হইয়া আছে কিন্তু যিনি প্রভু তাঁহার সেই অন্য মহিমাময় আত্মাকে যখন দেখিতে পায় এবং তাহার সহিত যুক্ত হয় তখন সে বীত-শোক হয়।

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪।৭

স্বরূপতঃ সমস্তই যখন সচ্চিদানন্দ, তখন যে-চৈতন্য তাহার পূর্ণ ও একত্ববিধায়ক পরম জ্ঞান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভেদ এবং আংশিক অনুভবের ভ্রান্তিরূপে বিকৃত হইয়াছে, তাহা হইতেই মৃত্যু, দুঃখ, পাপ (evil) এবং সীমার বোধ সৃষ্ট; ব্যাবহারিক জীবনে ইহারা সত্য বলিয়া অনুভূত হইলেও মূলতঃ ইহারা সত্য নহে। নিজেকে এবং ঈশ্বরকে, আরও ভালভাবে বলিতে গেলে, নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে পূর্ণ এবং অবিমিশ্র-ভাবে অনুভব ও গ্রহণ করিবার অসামর্থ্যের জন্য, সেই ঊর্দ্ধস্থিতি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া খণ্ডিত সত্তার ভেদদর্শী বিকৃতি-কর চৈতন্যের মধ্য দিয়া দেখার ফলে জীবন এবং মৃত্যু, সু এবং কু, সুখ এবং দুঃখ, পূর্ণতা এবং অভাব প্রভৃতি দ্বন্দ্ববোধ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—এই কথাই ইহুদী শাস্ত্রে কবিত্বের ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে যে প্রকৃতিদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পুরুষ জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে সেইজন্য নন্দন কানন (ইডেন) হইতে প্রকৃতি-পুরুষরূপী আদম এবং ইভের পতন হয়। ব্যক্তি-চৈতন্যের মধ্যে বিশ্বাত্মবোধ জাগিলে, জড় স্থূল-চেতনায় আধ্যাত্মিকতা ফুটিলে শাপমুক্তি ঘটিবে। কেবল তখনই প্রকৃতি-গত পুরুষ জীবনবৃক্ষের ফল ভোজনের অধিকার লাভ করিবে এবং ভগবানের স্বাধর্ম্য লাভ করিয়া অমর হইবে। কেবল তখনই তাহার জড়-চৈতন্যে নামিয়া আসার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে যখন মানবাত্মা এমন এক ঊর্দ্ধতর জ্ঞান অধিকার করিবে যাহার সহায়ে সু এবং কু, সুখ এবং দুঃখ, জীবন এবং মৃত্যুরও সম্যক জ্ঞান তাহার লাভ হইবে এবং সকল দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য সেই সার্ব্বভৌম প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে দেখিতে পারিবে যেখানে তাহাদের ভেদ দিব্য একত্বের মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত।

সচ্চিদানন্দ নিখিল জগতের সর্ব্বপদার্থে সমভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। তাঁহার কাছে মৃত্যু, দুঃখ, পাপ, সীমা প্রভৃতি ইহাদের দিব্য জ্যোতির্ম্ময় বিপরীত-ভাবের পৃষ্ঠ বা ছায়া মাত্র। আমরা এ সমস্তের মধ্যে একটা বেসুর অনুভব করি। যেখানে একত্ব থাকিবার কথা সেখানে তাহারা ভেদবোধ জাগায়, যেখানে বুদ্ধির স্বচ্ছতা থাকিবার কথা সেখানে বিকৃত জ্ঞান ও

প্রমাদের সৃষ্টি করে, যেখানে সমগ্রের বৃহৎ সুরসঙ্গতির সহিত নিজের সুর মিলাইবার কথা সেখানে প্রত্যেক আপন-আপন ভেদভাবাপন্ন সুরগ্রাম স্থাপনের চেষ্টা করে। সর্বপ্রকার সমগ্রতা, বিশ্বস্পন্দনের কোন এক বিশিষ্ট ধারার অথবা এমনকি চৈতন্যের সমগ্রতার—শুধু স্থূলই হৌক—সেখানে, পশ্চাতে বা ঊর্দ্ধে যাহা কিছু সক্রিয় সে সব অধিকার বহির্ভূত থাকিলেও, সর্ব্বত্রই পরস্পর-বিরোধী তত্ত্বের সৌষম্য ও সমন্বয় সাধনের ন্যূনাধিক চেষ্টা আছে। পক্ষান্তরে বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দে এ দ্বন্দ্ব আরোপিত হইতে পারেনা। বিশ্বাতীত অবস্থা দ্বন্দ্বের সমন্বয় সাধন করেনা কিন্তু এরূপ রূপান্তর ঘটায় যে বিরোধ অতিক্রম করিয়া সমস্ত অপরূপ অলৌকিক কিছুতে পরিবর্তিত হইয়া যায়!

প্রথমে আমাদিগকে ব্যক্তি জীবনের সুর সমগ্র বিশ্বসুরের সঙ্গে মিলাইয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিতে হইবে। একটা কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে—যাহা না হইলে আমরা সমস্যা পার হইয়া যাইতে পারিবনা। সে কথাটি এই যে বিশ্বের তত্ত্বসমূহকে আমাদের বর্ত্তমান চৈতন্য যে ভাষায়, যে অর্থে প্রকাশ করিতেছে, ব্যাবহারিক জগতের কার্য্যক্ষেত্রে মানুষের অভিজ্ঞতা এবং উন্নতিপথে তাহার সমর্থন থাকিলেও তাহাই একমাত্র ভাষা বা একমাত্র অর্থ নহে, তাহাতে মূল তত্ত্বগুলির পুর্ণ, পর্য্যাপ্ত বা চরম পরিচয় পাওয়া যায় নাই। যেমন, যে ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য দিয়া আমরা বর্ত্তমানে জড়জগৎ দেখিতেছি তদপেক্ষা পূর্ণতর ও অধিকতর শক্তিশালী ইন্দ্রিয় বা ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য থাকিতে পারে, যাহা দ্বারা জড় জগৎকে ভিন্নরূপে এবং পূর্ণতররূপে দেখা সম্ভব। তেমনি আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত দৃষ্টি বহুগুণে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে মনের এবং অতিমানসের সেরূপ দৃষ্টিশক্তি আছে যাহা সাধারণ মানুষের মধ্যে আজিও প্রকাশ হয় নাই। চৈতন্যের এমন ভূমিও আছে যেখানে পৌঁছিলে মৃত্যু অমৃত-জীবনে উত্তরণ, সকল যন্ত্রণা বিশ্বানন্দের বিপরীত প্রবাহ, সীমা অসীমের নিজের মাঝেই কুণ্ডলী রচনা, অমঙ্গল বা অশিব শিবস্বরূপের পূর্ণতার চারিপাশে চক্রাবর্তন বলিয়া মনে হইবে। কেবল মনের সাধারণ ধারণা বা কল্পনায় নহে কিন্তু অপরোক্ষ দৃষ্টি ও নিত্য নিবিড় ভাবের অভিজ্ঞতা ও বোধ ইহা প্রমাণিত করিবে। ব্যক্তি জীবনের পূর্ণতালাভের পথে চৈতন্যের এইরূপ ভূমিতে উত্তীর্ণ হওয়া একটা মুখ্য ও অপরিহার্য্য সোপান।

আমাদের ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়নিষ্ঠ ভেদদর্শী মন যে সত্য প্রকাশ করিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছে তাহাকে বিসর্জন না দিয়া ইহাদিগকেই উচ্চতর ভূমিতে বৃহত্তর সমন্বয়ের মধ্যে উন্নীত করিয়া রূপান্তরিত করিতে হইবে; যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইহা সম্ভব না হইতেছে ততক্ষণ অবশ্য দ্বৈতভাবাপন্ন থাকিয়া সাধারণ ব্যাবহারিক জীবনে ইহাদের যে মূল্য নিরূপিত হইয়াছে তাহা নিশ্চয়ই মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু ইন্দ্রিয়শক্তির উৎকর্ষই যদি শুধু ঘটে অথচ তাহার সঙ্গে যাহা নূতন আলোকের ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পুরাতন ইন্দ্রিয় জ্ঞানের খাঁটি



অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে এমন জ্ঞান যদি না পাই তবে আমরা গুরুতর বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের মধ্যে পড়িতে পারি; ফলে তাহা আমাদিগকে ব্যাবহারিক জীবনে অনুপযুক্ত অশক্ত করিয়া তুলিতে এবং আমাদের বুদ্ধির সংযত প্রবৃত্তিকে উদভ্রান্ত করিয়া দিতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে আমাদের মানসিক চৈতন্য সম্প্রসারিত করিয়া, ক্ষুদ্র অহং পরিচালিত দ্বৈতবুদ্ধির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা পার হইয়া যদি কোনপ্রকার সমগ্র চৈতন্যের একত্বে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে প্রবেশ করিতে যাই তবে তাহাতেও সহজে আমাদের মধ্যে একটা বিপর্য্যয়, ব্যাবহারিক জগতের স্বাভাবিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত গতি ভঙ্গ করিয়া আমাদের স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রবৃত্তিতে একটা কুণ্ঠা, একটা শক্তিহীনতা আসিয়া পড়িতে পারে। এইজন্য গীতার উপদেশ: জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীর জীবন ও চিন্তার ভিত্তিতে বিপ্লব আনিবেন না—'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গীনাম্'। কারণ জ্ঞানীর কর্ম্মের রহস্য না বুঝিয়া অজ্ঞানী যদি তাহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করে তবে সে স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইবে অথচ জ্ঞানীর উচ্চতর ক্ষেত্রে পৌঁছিতে পারিবেনা।

সাময়িক সাধনা হিসাবে অথবা ব্যাপকতর চৈতন্যে প্রবেশের মূল্যরূপে অনেক মহাপুরুষ কখনও কখনও এরূপ বিপর্য্যয় ও শক্তিহীনতা স্বীকার করিয়া নেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে যাহাই হউক না কেন মানবজাতির প্রগতির পথে এরূপ বিশৃঙ্খলা আনিলে চলিবেনা। তাহার পক্ষে উচ্চতর চৈতন্যের প্রকাশে এমন এক নূতন ভাবের সত্যের মূর্ত্তি ফুটিয়া ওঠা চাই যাহাতে পার্থিব জীবনের সমস্ত উপাদান সমন্বিত হইবে। তাহাদের অর্থ, উদ্দেশ্য ও সার্থকতা নূতনভাবে বুঝা যাইবে, তাহারা আরও শক্তিশালী হইয়া খাঁটিভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। সাধারণ ইন্দ্রিয়-বোধে মনে হয় সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে, এই ধারণাকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ তাহার জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু এ ধারণা ভুল—সত্য ইহার বিপরীত, সূর্য্য ঘোরেনা, পৃথিবীই সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু এই সত্যকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তি যদি একটা বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে না পারিত এবং তাহার মধ্যে ইন্দ্রিয়-বোধের যথাযথ মূল্য না দিত তবে এ আবিষ্কার মানুষের বিশেষ কাজে আসিতনা। তেমনিভাবে মানস-চৈতন্য মনে করে যে ঈশ্বর আমাদের ব্যক্তিগত অহংকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম ও বিধান সে বিচার করে অহংগত ধারণা, ভাবনা এবং অনুভব দিয়া। ইহাতে প্রকৃত পক্ষে সত্য বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি মানব জীবনের একটা অবস্থায় এ ভুল ধারণাও মানুষের ব্যাবহারিক জীবনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত এবং তাহাকে প্রগতির পথে ইহা কিছু দূর অগ্রসরও করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষের উচ্চতম অবস্থায় ও জ্ঞানে এ ধারণা টিকেনা। 'সত্যই প্রকৃত পথ, অসত্য নয়'। প্রকৃত সত্য এই যে ইশ্বরই বিশ্বের কেন্দ্র, আমাদের ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ববোধপীড়িত অহংকে দিয়া তাহার কর্ম্ম ও

বিধানের বিচার করা চলে না। আমাদের ব্যক্তিগত অনুভবের স্বরূপও তখনই আমরা জানিতে পারিব যখন বিশ্বের মধ্যে এবং বিশ্বাতীতভাবে যিনি রহিয়াছেন তাঁহারই মধ্যে ইহাকে দেখিতে পাইব। তবে যথাযথ ভাবে জ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন না করিয়া অহং কেন্দ্রিকতার স্থানে যদি সত্যের এই ধারণাকে বসাইতে চাই তাহাতে পুরাতনের স্থানে এক নূতনকে বসান যাইতে পারে কিন্তু মিথ্যা থাকিয়া যাইতে পারে এবং সত্যের একটা বিষম বিপর্য্যয় দেখা দিতে পারে। এমন বিপর্য্যয় হয়ত অনেক সময় নূতন ধর্ম্ম ও নূতন দর্শনের সূচনা আনিয়া দেয় এবং সমাজজীবনে সার্থক বিপ্লব ঘটায়। কিন্তু প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে মূল সত্য ও ধারণার চারিদিকে এমন যুক্তিযুক্ত এবং সার্থক জ্ঞানের সমাবেশ করিতে হইবে যাহাতে ব্যক্তিগত জীবনের সকল সম্পদ পুনরাবিষ্কৃত হইবে, তাহাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হইবে এবং সে সমস্তই দিব্যভাবে রূপান্তর লাভ করিবে। তখন আমরা সত্যের এমন এক নূতন ধারায় পৌঁছিব যাহাতে এখন যে ভাবে আমরা জীবন যাপন করিতেছি তাহার স্থানে এক দিব্যতর জীবনের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব এবং জগতে পার্থিব জীবনের বৃত্তি ও উপাদানসমূহকে দিব্যতরভাবে অধিকতর শক্তির সহিত ব্যবহার করিতে শিখিব।

এই নূতন জীবন এবং শক্তি লাভ করিতে হইলে যে সমস্ত মহাসত্য আমাদের বোধ ও ধারণার মধ্যে পরমপুরুষের প্রকৃতি ফুটাইয়া তুলিবে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা চাই। এজন্য আমাদের অহং এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করিতে হইবে। যে সমস্ত মিথ্যাকে সে স্থির সত্য বলিয়া বোধ করিতেছে তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে। যে সমগ্রতার সে অংশ এবং যে বিশ্বাতীত সত্য হইতে সে অবতীর্ণ, তাহাদের সহিত সমন্বয় সাধন করিতে হইবে, তাহাদের সহিত যে সত্য সম্বন্ধ আছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যে সত্যের মধ্যে তাহার নিজের পূর্ণতা এবং যে বিধানে মুক্তি তাহার দিকে নিজেকে অসংকোচে মেলিয়া ধরিতে হইবে। এ সাধনার উদ্দেশ্য হইবে অহং এর দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে যে সমস্ত ভ্রান্ত সংস্কার তাহার মধ্যে আসিয়াছে তাহার উচ্ছেদ। দুঃখ, অমঙ্গল, সীমা, অজ্ঞান, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে হইবে।

আমাদের জীবনের এই সমস্ত বিষয় যদি আমাদের অহংগত বর্ত্তমান ধারণার সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে যুক্ত ও বদ্ধ থাকে তবে এখানে এই পৃথিবীতে আমাদের মানব জীবনের পক্ষে এইভাবে ইহাদিগকে অতিক্রম বা উচ্ছেদ করা অসম্ভব। জীবন যদি কেবলমাত্র ব্যক্তি চেতনার ঘটনা মাত্র হয়, যদি তাহার মূলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এক সত্তার অনুষ্ঠান না থাকে, যদি বিশ্বাত্মার মহাপ্রাণদ্বারা তাহা সঞ্জীবিত না হয়, বিষয় সংস্পর্শে ব্যক্তি-চেতনার প্রতিক্রিয়ার যে দ্বন্দ্ববোধ জাগে তাহা প্রতিক্রিয়া না হইয়া যদি সমস্ত প্রাণনের মর্ম্ম সত্য হয়, দেহ মনপ্রাণ যে সমস্ত উপাদানে গঠিত হইয়াছে সীমা এবং সংকোচই যদি তাহাদের অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতি হয়,



মৃত্যুই যদি জীবনের একমাত্র পরিণাম হয়, যদি জীবনের আদি ও অন্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছু না থাকে, সমস্ত সংবেদনের মূলে যদি সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত থাকে, আনন্দ এবং যন্ত্রণা যদি সকল আবেগের মধ্যে আলোছায়া রূপে বর্ত্তমান থাকে, সত্য ও মিথ্যা এই দুই প্রান্তের মধ্যে চির আবর্ত্তিত হওয়া ছাড়া জ্ঞানের যদি গতি না থাকে—এই সমস্ত যদি আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হয় তবে মুক্তি পাইতে গেলে হয় আমাদিগকে সমস্ত জীবন, সমস্ত বিশ্ব যেখানে লয় পাইবে তেমন এক নির্ব্বাণের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয় অথবা এ জড় জগৎ হইতে ভিন্নভাবে গঠিত কোন লোকান্তর ধামে বা জগতে চলিয়া যাইতে হয়—এ জগতে দিব্য জীবন প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

মানুষের জীবনে যাহা বর্ত্তমানে অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বা নিশ্চিত অবস্থারূপে রহিয়াছে তাহা আমূল পরিবর্ত্তিত হইবে এই মর্ত্ত্য জীবনেই, এ কথা অতীত ও বর্ত্তমানের সংস্কারবদ্ধ প্রাকৃত মন সহজে কল্পনা করিতে পারেনা। ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদে (theory evolution) বানরই রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া মানুষে পরিণত হইয়াছে, এ কথা বলা হইয়াছে। মানুষ যখন সৃষ্ট হয় নাই সেই আদিমকালে অরণ্যের শাখাবিহারী বানরের পক্ষে ইহা ধারণা করা অসম্ভব ছিল যে ভবিষ্যতে একদিন এক জাতির প্রাণী এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবে যে তাহার অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতির উপর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি নামক এক অদ্ভুত নূতন শক্তি প্রয়োগ করিবে, তার জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘটাইবে পরিবর্ত্তন, তার চিরাভ্যস্ত জীবনের সমস্ত সংস্কারের মধ্যে আনিবে একটী রূপান্তর, একটা বিপ্লব, পাথর দিয়া প্রস্তুত করিবে তাহার বাসগৃহ, প্রকৃতির শক্তিকে করিবে নিয়ন্ত্রিত, সমুদ্রের উপর করিবে অবাধে বিচরণ, গগনে করিবে স্বচ্ছন্দে বিহার, নৈতিক ও ধর্ম্মাবিধানে করিবে সমাজের নিয়ন্ত্রণ, তাহার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য আবিষ্কার করিবে সাধনার সহস্র পন্থা।

বানরের চিত্তে এরূপ ধারণা জাগা যদি বা কোনক্রমে সম্ভব হইত তবু প্রকৃতির কোন ক্রমপরিণতির ফলে অথবা সংকল্পের কোন সুদীর্ঘ সাধনা দ্বারাও সে নিজেই ঐ জীবে কোন দিন পরিণত হইবে ইহা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিত না। কিন্তু মানুষের মধ্যে বুদ্ধির জাগরণ হইয়াছে। বিশেষত কল্পনা করিবার শক্তির সঙ্গে তাহার মধ্যে বোধির উন্মেষ ঘটিয়াছে তাই বর্তমান জীবনের চেয়ে উন্নততর জীবনের কল্পনা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। এমনকি তাহার বর্ত্তমান অবস্থা অতিক্রম করিয়া সেই উচ্চতর জীবনে সে নিজে একদিন পৌঁছিতে পারিবে ইহাও সে মনে করিতে পারে। তাহার ধারণা ও সহজাত অভীপ্সার যাহা চরম কাম্য তাহা দিয়া সে একটা পরম অবস্থার কল্পনা করিয়াছে—সেখানে জ্ঞান, আনন্দ ও শক্তি আছে অথচ তাহাদের বিরোধী ভ্রম, দুঃখ বা অসামর্থ্যের লেশমাত্র নাই, সেখানে শুদ্ধতা এবং ঐশ্বর্য্য আছে কিন্তু তদধিরোধী দোষ ত্রুটি বা সীমার

দৈন্য নাই। এইভাবে সে দেবতার পরিকল্পনা করে, স্বর্গের ছবি আঁকে। বস্তুতঃ ঈশ্বর ও স্বর্গের সম্বন্ধে তাহার যে স্বপ্ন তাহা নিজের পূর্ণতারই স্বপ্ন। কিন্তু এখানে এই মর্ত্ত্যজীবনে বাস্তব ক্ষেত্রে এ স্বপ্ন যে সফল হইবে বা সফল করিয়া তোলাই যে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য একথা মনে করিতে, তাহার পূর্ব্বপুরুষ বানর নিজে অনাগত ভবিষ্যৎ মানুষে পরিণত হইবে ইহা ভাবিতে যেরূপ ভীত ও কুণ্ঠিত হইত, তেমনই ভীত ও কুণ্ঠিত হয়। তাহার কল্পনা ও আধ্যাত্মিক অভীপ্সা এই উদ্দেশ্য জাগাইতে পারে কিন্তু বুদ্ধি যখন আপন আত্মপ্রতিষ্ঠা করে তখন ইহাকে জড়জগতের কঠোর সত্যের বিরোধী উজ্জ্বল কুসংস্কার মাত্র মনে করে। সে ভাবে সীমিত ক্ষুদ্র জ্ঞান, সুখ, শক্তি ও মঙ্গলই মানুষ পাইতে পারে, ওরূপ অতিপ্রাকৃত কোন অবস্থা লাভ করা তাহার পক্ষে উদ্দীপনাময় স্বপ্নছবি মাত্র।

তথাপি বুদ্ধির মধ্যেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার প্রবৃত্তি দেখা যায়। কারণ বুদ্ধির স্বরূপ ও লক্ষ্য জ্ঞানের অন্বেষণ অর্থাৎ ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য সত্যকে লাভ করা। বৃহত্তর ভ্রম হইতে ক্ষুদ্রতর ভ্রমে পৌঁছান তাহার উদ্দেশ্য নয়, সে বিশ্বাস করে একটা শুদ্ধ নিত্য সত্য পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান আছে। আমরা জ্ঞান এবং ভ্রম-জ্ঞানের দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়া ক্রমশঃ অধিকতর ভাবে সে সত্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারি। মানুষের অন্যান্য অভীপ্সার সম্বন্ধে বুদ্ধির যে ঠিক তদ্রূপ সহজাত নিশ্চয়তা নাই তাহার কারণ তাহাদের সম্বন্ধে স্বরূপ-বোধ তাহার বর্ত্তমান ক্রিয়ারই মধ্যে এখনও সে লাভ করে নাই। চূড়ান্ত সুখের একটা কল্পনা আমরা করিতে পারি কারণ সুখলাভেচ্ছা হৃদয়ের সহজ ধর্ম্ম বলিয়া তাহা যে লাভ করা যায় সে সম্বন্ধে হৃদয়ের একটা বিশ্বাস ও একরূপ নিশ্চয় বোধ আছে। আমাদের দুঃখের আপাত প্রতীয়মান কারণ বাসনার অতৃপ্তি, তাহার উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে যে দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তি হইতে পারে আমাদের মনও তাই স্বীকার করে। কিন্তু স্নায়বিক বোধ হইতে বেদনার বিলোপ সাধন অথবা দৈহিক জীবন হইতে মরণ-সম্ভাবনার অপসারণ আমরা কিরূপে কল্পনা করিব? অথবা ইন্দ্রিয় বোধের সহজ ধর্ম্মই এই যে সে চায় বেদনার উচ্ছেদ। প্রাণ-চেতনার মূলে মরণকে অস্বীকার করার একটা প্রচণ্ড দাবী রহিয়াছে ইহা ত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু বুদ্ধি এ সমস্তকে সহজাত অভীপ্সা বলিয়া দেখিলেও এ অভীপ্সার চরিতার্থতা অসম্ভবই মনে করে।

তবু একই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিবে ইহাইত সঙ্গত। ব্যাবহারিক বুদ্ধির ভ্রম এইখানে যে আপাত প্রতীয়মান বিষয়েরই সে অত্যন্ত অধীন, যে সমস্ত গভীরতর বিষয় এখনও তাহার কাছে সম্ভাবনারূপে রহিয়াছে তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে তাহাদের পরিণামের দিকে লইয়া যাইবার উপযুক্ত সাহস তাহার নাই। অতীতে যাহা সম্ভাবনারূপে ছিল তাহারই পরিণামে বর্ত্তমান দেখা দিয়াছে, বর্ত্তমানে যাহা সম্ভাবনারূপে রহিয়াছে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার ইঙ্গিত



তাহাতে ব্যক্ত হইতেছে। কেন এবং কি ভাবে কোন বিষয় ঘটে তাহা জানিতে পারিলে সে বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করা যায়। আমরা যদি ভ্রম, দুঃখ, যন্ত্রণা এবং মৃত্যুর কারণ জানিতে পারি তবে সে সমস্ত দূর করিবার আশাও করিতে পারি। কারণ জ্ঞানই শক্তি, জ্ঞানের ফলেই প্রভুত্ব লাভ হয়। বস্তুতঃ এই সমস্ত প্রতিকূল ও অবাঞ্ছিত ব্যাপারকে আমাদের সাধ্যানুসারে উন্মূলিত করিবার আদর্শই আমরা অনুসরণ করিতেছি। ভ্রান্তি দুঃখ শোকের কারণকে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেছি। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান স্বপ্ন দেখিতেছে যে সে জন্মকে নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং মৃত্যুকে একেবারে জয় করিতে না পারিলেও জীবনকে অতি দীর্ঘ করিয়া তুলিবে। কিন্তু আমরা বাহ্য এবং গৌণ কারণ মাত্র দেখিতে পাইয়াছি, মূল কারণ খুঁজিয়া পাই নাই; কেবল প্রকৃতির কর্ম্মপদ্ধতির (processes) অর্থাৎ কি ভাবে ঘটনা ঘটে তাহার কিছু জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেইজন্য আমরা ইহাদিগকে দূরে সরাইয়া দিবার কথা মাত্র ভাবিতে পারিতেছি কিন্তু একেবারে উচ্ছেদ করিবার শক্তি লাভ করি নাই; সেই জ্ঞান লাভ হইলে আমাদের প্রকৃতির মধ্যে ইহাদিগকে পূর্ণরূপে দূরীভূত করিবার যে বিপুল সহজাত প্রবৃত্তি আছে তাহা সমর্থিত হইবে। এমন কি সমস্ত অকল্যাণের একান্ত বিলয় সাধন করিয়া আমাদের আন্তর প্রকৃতি যাহা মানুষের চরম ও পরম সার্থকতা বলিয়া জানে সেই পূর্ণ জ্ঞান ও আনন্দ, শিবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিবে।

যিনি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র মূল সত্য এবং সৎ-চিৎ-আনন্দ যাহার স্বরূপ ও প্রকৃতি সেই ব্রহ্মের ধারণা ও অনুভূতি হইলে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে, প্রাচীন বেদান্ত ইহাই শিক্ষা দিয়াছে। এই মতে এক বিশ্বব্যাপ্ত অমৃতময় সত্তার গতি ও স্পন্দন সমস্ত জীবনের, সর্ব্বগত স্বয়ম্ভু এক আনন্দ, স্বরূপের খেলা সমস্ত ইন্দ্রিয়বোধ ও আবেগের, বিশ্বময় এক সত্যের বিকীরণ সমস্ত ভাবনা ও বোধের, এক বিশ্বব্যাপী স্বতঃপরিণামী শিবশক্তির প্রবাহ সমস্ত কর্ম্মের—মূল-সত্য। কিন্তু এই যে গতিধারা, এই যে লীলা তাহা রূপের বাহুল্য, প্রবৃত্তির বহুমুখী বৈচিত্র্য, বহুশক্তির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। বহুত্বই এই খেলাকে সাময়িকভাবে এক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত করিতে বা তাহার মধ্যে বিকৃতি আনিতে সক্ষম হইয়াছে, এমন কি ব্যক্তিগত অহং-এর উৎপত্তি সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। অহং এর প্রকৃতিই এই যে এক বিশেষ রূপের, প্রবৃত্তির এক বিশেষ ধারার, শক্তির এক বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে ডুবিয়া বা অভিনিবিষ্ট হইয়া অন্যান্য বিভাবের সম্বন্ধে স্বেচ্ছায় অজ্ঞ থাকিতে পারে এরূপ এক চৈতন্যের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ করা। জাগতিক শক্তি ও গতির প্রতিক্রিয়ায় অহংই ভ্রম, দুঃখ, শোক, অমঙ্গল ও মৃত্যুর বোধ জাগাইয়া তোলে বা এইভাবে তাহাদের মূল্য নিরূপণ করে। নইলে এই গতি এক পরম সত্তার সহিত প্রকৃত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া আনন্দ, সত্য ও শিবস্বরূপের প্রকাশ করিত। ঋতের ছন্দ বা সত্যসম্বন্ধ

আবার লাভ করিতে পারিলে অহং এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এ সমস্ত বোধ দূর হইয়া চেতনার কাছে ইহাদের সত্যরূপ উদ্ঘাটিত হইতে পারে। এ অবস্থা লাভের উপায় বিশ্ব চৈতন্যের এবং বিশ্ব চৈতন্য যাহার প্রকাশ ক্ষেত্র সেই বিশ্বাতীত চৈতন্যের সঙ্গে ব্যক্তিগত চৈতন্যের প্রকৃত মিলন ও সুর-সমন্বয় সাধন করা।

শেষের দিকে বেদান্তের মধ্যেও এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবেশ করিয়াছে যে সীমিত অহং শুধু দ্বন্দ্বের কারণ মাত্র নহে, বিশ্বসত্তাও তাহার উপর নির্ভর করে। অহং-এর অজ্ঞানতা দূর করিতে পারিলে দ্বন্দ্ব দূর হইবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে বিশ্বক্রিয়া হইতে আমাদিগের অস্তিত্বও লোপ পাইবে। এই মত অনুসারে মানুষের অস্তিত্বের প্রকৃতি হেয়, অসার ও অলীক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং এ জগতে থাকিয়া পূর্ণতা লাভের প্রয়াস মোহের ছলনামাত্র হইয়া দাঁড়ায়। এখানে যাহা ভাল বা সু তাহার সহিত তাহার বিপরীত কু কিছু মিশ্রিত থাকিবেই। কিন্তু যদি আমরা এই বৃহত্তর গভীরতর ধারণা পোষণ করিতে পারি যে অহমতীত কিছুর প্রকাশের পথে অহং-ই একটা গঠন ও সাময়িক ব্যাপার মাত্র তাহা হইলে এ বিলুপ্তি আমাদের স্বীকার করিতে হয় না, এবং বেদান্তকে জীবন হইতে পলায়নের সাহায্যে ব্যবহার না করিয়া জীবনের উন্নতি ও অভ্যুদয়ের সাধনায় প্রয়োগ করিতে পারি। জগতের যিনি প্রভু সেই ঈশ্বর বা পুরুষই জগতের কারণ এবং অধিষ্ঠান, তিনিই বিশ্ব এবং ব্যক্তির মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। চৈতন্যের এক প্রকার বিশিষ্ট ধারার ক্রমবিকাশে, সীমিত অহং এর প্রকাশ একটা মধ্যবর্তী ঘটনা মাত্র। এই ধারা অনুসরণ করিয়া ব্যক্তি যাহার প্রতিভূ স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, নিজেকে অতিক্রম করিয়া সেই স্বোত্তর ভূমিতে সে পৌঁছিতে পারে এবং তাহার এই প্রতিভূস্বরূপ ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অজ্ঞানাচ্ছন্ন সীমিত অহংভাবে প্রকাশিত না হইয়া সেই পরম পুরুষের প্রকাশ-কেন্দ্র রূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে। ব্যক্তিচৈতন্য তখন বিশ্বচৈতন্যের সহিত মিলিত হয় এবং সমস্ত ব্যক্তিচৈতন্য ভগবানেরই প্রকাশক্ষেত্র জানিয়া তাহাদের সহিত পরম সমন্বয়ে সমন্বিত হয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে নিখিল জড় প্রকৃতিতে চিন্ময় দিব্যপুরুষের প্রকাশ জগতে মানব জীবনের ভিত্তি। এই চিন্ময় পুরুষ জড়ে সংবৃত ছিলেন। প্রাণ মন অতিমানসকে ফুটাইয়া তোলা তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। তিনি আছেন বলিয়া আমাদের সকল ক্রিয়া সকল গতি সম্ভব হইয়াছে। পরিণতির এই ধারাই জড়ের মধ্যে মানুষকে আনিয়াছে এবং ইহাই একদিন এই স্থূল দেহেই শ্রীভগবানকে ফুটাইয়া তুলিবে, তাহার বিশ্বজনীন অবতরণকে সম্ভব করিবে। ঋগ্বেদে যাহাকে 'হৃদ-সমুদ্র' বলা হইয়াছে, নিরূপ গহন সেই অবচেতনা হইতে পারম এক এই মধ্যবর্তী খণ্ড অহং-এর ধারা ধরিয়া সচেতন বহুরূপে প্রথমে প্রকাশ পাইয়াছেন। অহং চেতনার এই প্রাথমিক প্রকাশে জীবন ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, সত্য ও



মিথ্যা, সু ও কু এইরূপ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। কারণ অখণ্ড সত্য, কল্যাণ-আনন্দ ও প্রাণের লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভেদ দৃষ্টি দ্বারা একটা কৃত্রিম পরিবেশের মধ্যে একত্ব খুঁজিলে তাহার স্বাভাবিক এবং অপরিহার্য্য পরিণামে এই দ্বন্দ্ববোধ আসিয়া উপস্থিত হইবে। পশুজীবনের মধ্যে যেমন মানব জীবনের পূর্ব্বভাস রহিয়াছে তেমনি মানব জীবন পরিপূর্ণ পরম জীবনের পূর্ব্বাভাস। তাহাতে পৌঁছিবার উপায় স্বরূপে মানুষ যখন নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে বিশ্ব এবং বিশেশ্বরের দিকে পূর্ণরূপে খুলিয়া ধরে তখন তাহার এ খণ্ড অহং-জ্ঞান খসিয়া পড়ে। এই সিদ্ধিতে পৌঁছিলে সীমিত অহং দিব্য অদ্বয় জ্ঞান ও স্বাধীনতার সচেতন প্রকাশ-কেন্দ্রভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ফলে ব্যক্তির মধ্যে সমষ্টির অনুভব জাগিয়া উঠে। তখন জগতে বহুর উপর অনন্ত অপ্রমেয় সৎ-স্বরূপের সত্য, কল্যাণ ও আনন্দের ধারা প্রবাহিত হয় এবং ক্রম-পরিণতি যে দিব্য উদ্দেশ্য সাধনের পথে অগ্রসর হইতেছে তাহা সিদ্ধ হয়। ভবিষ্যতে যে পরম আবির্ভাব আসিবে তাহার ভ্রূণকে জগজ্জননী প্রকৃতি আপনার গর্ভে আজও ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং যাহাতে এই দিব্য জন্ম হয় তাহার সাধনা ও আয়োজন করিতেছেন।

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তী অনশ্নন্ ন ন্যোঽভিচাকশীতি।— শ্বেতাশ্বতর।৪।৬

[ দু'টি ময়ুর একই বৃক্ষের দু'টি শাখার মতো সখাসখীবৎ, চকাচকিবৎ আলিঙ্গনবদ্ধ—একই জাতির একই পরিবারের তারা। তারই একটি অনশন না করে পিপ্পল-স্বাদ গ্রহণ করল। ময়ুরী পিপ্পলাদ কাকাতুয়াকে চাইল ( সাঁচীস্তূপের তোরণের চিত্র দ্রষ্টব্য )। ন্যোঽ ( Noah ) চিরপ্রকাশ। ]

# নূতন বই

## কবিতা

অপ্রেম ও প্রেম—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য—পূর্ব্বাশা লিমিটেড—এক টাকা।

আজকের দিনে যদিও জীবন আমাদের কঠোর, প্রতিদিনের আঁকাবাঁকা কতো স্রোতের টানে জীবন আজ জটিল, আবর্ত-সঙ্কুল—জীবিকার জারক রসে জীর্ণ হ'তে হ'তে অবসরও ক্ষীণ, প্রেরণাও কৃশ—তবুও প্রেরণা আসে—হ'তে পারে তা' নীরক্ত, পীত, তবুও তা প্রেরণাই—এটুকুই যা আশার আলো এ-দুর্যোগের দিনে। কারণ সুন্দরের যে মৃত্যু নেই মানুষের মনে। যেহেতু সেই সুন্দরই রূপায়িত কবিতার চিত্র-রূপকের মধ্যে, যেহেতু সেই সুন্দরেরই কণ্ঠস্বর কবিতার ধ্বনি সংগীতে তাই বৈশ্যতান্ত্রিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কবিতার চির-বিনাশ কখনো সম্ভব নয় মানুষের মনে।

নিছক নৈসর্গিক কারণেই কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট বয়ঃসন্ধির সেতু বেয়ে মনোভব আসেন আমাদের মনে। তখনই অনর্গলে উৎসারিত হ'তে দেখা যায় প্রেমের কবিতা। তাতে তারুণ্যের জ্বালা থাকে, পরিণতি থাকেনা। সেইজন্য এই সময়ের ফেনিলোচ্ছল প্লাবন পার হ'য়ে গিয়েও গাঢ় সুসংহত প্রেমের কবিতা লেখবার জন্য আরো বহু বৎসর অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়। এই সময়ের অঢেল ফেলা-ছড়াতেই কারো বা পুঁজি শেষ হয়। আর কেউ কেউ বা এই ফেলা-ছড়া থেকেই কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারেন নিজের মধ্যে যৌবনোত্তর কালের জন্য। এই দ্বিতীয়োক্তদের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। স্বদেশের ও বিদেশের বহু বরেণ্য শিল্পীর বৃদ্ধ শরীরের মধ্যেও আমরা পাই এমনই একটা তারুণ্য-ভরা মন। আমাদের কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথকেই দৃষ্টান্ত স্থল হিসেবে স্মরণ করতে পারি। পঁচাত্তর বছরের জরাজীর্ণ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আজকের দিনের কোন্ পঁচিশ বছরের যুবক বেশি তরুণ? অবশ্য তারুণ্যের উৎকৃষ্ট অর্থেই কথাটা ব্যবহার করছি। এই দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর সৎ কবিগণের অন্যতম সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য যিনি প্রায় প্রৌঢ়ত্বের কাছাকাছি এসেও বিশুদ্ধ, চিত্রল, বর্ণগাঢ় প্রেমের কবিতা মাঝে মাঝে লিখছেন। সেজন্য আধুনিক তরুণদের নিকট তিনি নিঃসন্দেহেই ধন্যবাদার্হ। সদ্য প্রকাশিত 'অপ্রেম ও প্রেমের' এক যায়গায় এই স্বীকৃতি স্পষ্টতঃই অর্থপূর্ণ—

আমি তো ভুলিনি সেই কবেকার মন
কতো ঝড় এলো যে আকাশে
তবু তো আকাশ দেখে শুনে যাই শুনে যাই হৃদয়ের মৃদু-বিধুনন
এ হৃদয় ভালোবাসা তবু ভালোবাসে।

বইয়ের প্রথম কবিতার প্রথম স্তবকে—

ছিল পথ যতখানি
আমাদের হৃদয়ের মতন নির্জ্জন
যে-পথ ফুরিয়ে গেলে



ছায়ার হাতের ছোঁয়া
ঘন ক'রে দিয়ে যেত আমাদের মন—
সে-পথ কোথায় গেলো কোলাহল করে করে দূরে?
পাখীর ডাকের মতো—
ক্লান্ত ডাক ফিকে হ'য়ে মিশে যায় যখন দুপুরে॥

কিংবা 'পুনশ্চ' কবিতায়—

যেখানে পাখীরা আসে রোদের মতন
চোখে ঝিলমিল করে নীল-নীল বন—
পাখা মেলে দিতে চায় মনের পুরোনো ইতিহাস॥

জীবনানন্দকে মনে করিয়ে দেয়—তবু আদি অকৃত্রিম জীবনানন্দও নয়—বোঝা যায় এ যেন অন্য কেউ, অন্য কোনো উত্তর-সাধক কবি জীবনানন্দের কথাই স্বীয় মনের রসায়নে রূপায়িত ক'রে ব'লে যাচ্ছেন। জীবনানন্দের হাতে যা ছিল রুক্ষ, কঠিন, রহস্যাবৃত, ধূসর ও বলিষ্ঠাতিবলিষ্ঠ সঞ্জয়বাবুর হাতে তা-ই মৃদু, মসৃণ, কান্ত, বর্ণাঢ্য ও বিশদ। জীবনানন্দীয় ক্রূর রহস্য-কুজ্ঝটির ঈষৎ উন্মোচন, স্বল্প-প্রকটন সঞ্জয়বাবুর মায়াবী হাতেই! পথিকৃৎ হ'বার দাবী সঞ্জয়বাবু করেন না—জীবনানন্দ যেখানে পথিকৃৎ সঞ্জয়বাবু সে-পথেরই বিশিষ্টতম পথিক। স্বভাবতঃই জীবনানন্দের মৌলিকতা অবিসংবাদিত কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের মনোজ্ঞতাও যে অনস্বীকার্য্য এ কথাও স্পষ্ট ক'রে জোর গলায় বলার সময় এসেছে এইবার।

এই সব পরিচিত দিক ছাড়াও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের বৈচিত্র্যের অন্য আরো দিক আছে অর্থাৎ ক্রমশই যেন সে-দিকটা বিস্তৃততর হ'য়ে উদ্ঘাটিত হচ্ছে যে-দিকে আমরা তাঁর পেছনে সমকালীন কাউকেই পাবো না—জীবনানন্দকেও নয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রকেও নয়, কিংবা বিষ্ণু দে-কেও নয়। উৎসের সন্ধানে তখন হয়তো আমাদের পেছু হঠতে হঠতে পৌঁছে যেতে হ'বে ইতিহাসের অনেক ধূসর অধ্যায়ে এমন কি পৌরাণিক ও প্রাক্-পৌরাণিক যুগের অন্ধকারেও। নিঃসন্দেহে এটাই তাঁর স্বক্ষেত্র। আর যেখানে তিনি স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত সেখানে তিনি অবশ্য মান্য, কোনো মতেই দুর্বোধ ব'লে উপেক্ষণীয় নন। একথা সত্য যে তাঁর এই সযত্ন-বিন্যস্ত স্বেদসিক্ত পণ্য প্রাকৃতমনা কাব্যরস-পসারীর দ্বারা অবমত হ'তে পারে—এতে বিস্মিত হবারও কিছু নেই। আমাদের অনেকের মতোই যাঁরা এ-সব বিষয়ে অনধিকারী তাঁরা হয়তো অভিযোগ করবেন যে ওঁর এখানকার কবিতাগুলো সন্ধ্যাভাষায় লেখা কী যেন হিং টিং ছট্ মন্ত্র! এটা যে সর্বাংশে সত্য হ'তেই পারে না এটুকু বুঝতে পারি; তবে যথার্থ মূল্যায়ন তাঁদের দ্বারাই সম্ভব ইতিহাস, পুরাণ ও প্রকৃত বাংলার ক্ষেত্রে যাঁদের প্রবেশ যতোটা গভীর যাদের অধিকার যতোটা বিস্তৃত। পারমিতিহাস ও ইন্দ্রের আবির্ভাব জাতীয় কবিতার যথার্থ মূল্যায়নে কেবল তাঁরাই যোগ্য ব্যক্তি। তবে অবিপশ্চিৎ অর্বাচীনদের তরফ থেকেও দু'টো কথা এখানে বলতেই হয় যে, পারমিতিহাস ইন্দ্রের আবির্ভাব জাতীয় কবিতায় গুণি-জনোচিত কারু-নৈপুণ্য বিদগ্ধজনসুলভ তথ্য বহুলতা ইত্যাদি অনেক কিছু গুণপনা পেয়েও হৃদয়-সংবাদ কতোটুকু পাই? যে-হৃদয়সংবাদ দিতেই একদিন মহত্তম কবির অন্তর থেকে প্রথম শ্লোক বদ্ধ কবিতা স্বতোচ্ছিত হ'য়েছিলো। এই দু'টি কবিতার মধ্যে কবির বক্তব্য কি বহুলাংশেই অনচ্ছ থেকে যায়নি? তা ছাড়া আলোচ্য কবি অধুনা বড় বেশি পিছন দিকে

তাকাচ্ছেন ব'লে যেন মনে হ'লো—এটা সদ্য-অতীতের ও আসন্ন বর্তমানের দুষ্পাচ্য আধুনিকতার ভূরি ভোজনান্তে প্রতিক্রিয়া নয়তো? অবশ্য চলতি চালের আধুনিকতা যখন গতানুগতির নিগড়ে বাঁধা পড়ে তখন পুরোনোর পুনরুজ্জীবনই প্রকৃষ্ট প্রগতি। এজরা পাউণ্ড মধ্যযুগীয় ইটালি ও Provence-কে নিজের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত ক'রে নিতে পেরেছিলেন ব'লেই না কবি-মণ্ডলে আধুনিক-শিরোমণির শিরোপা পেয়েছিলেন। সেটুকু করতে পারলেই আর কোনো কথা চলে না। ইদানীং সঞ্জয় বাবুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হ'লো। ওর এই নতুন দিকটাতে সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হ'য়ে গেলে তখনই কেবল এ-সম্বন্ধে হিসাব-নিকাশ বা মন্তব্য করা চলতে পারে।

সুখের চেয়েও স্বস্তির বিষয় এই যে, আলোচ্য গ্রন্থের এ ধরণের স্বেদস্রাবী কবিতা দু'একটির বেশি অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বেশির ভাগ কবিতাই প্রেমের কবিতা—চিত্রে, বর্ণে, লালিত্যে, সংযত আবেগে ও গীতলতায় শিল্পিত। আবেদনের দিক থেকে প্রত্যেক হৃদয়বানের কাছেই এরা চিরন্তন।

আষাঢ়ের বৃষ্টি-ধোয়া শ্যামলিমায়, কাঁচা রোদে, মাঠ-ভরা ঘাসে, সবুজ ফলে, হরিৎ পল্লবে যখন সবুজ মেয়েরা দলে দলে মুখ বাড়ায় তাদের লক্ষ্য ক'রে কবির হঠাৎ মনে প'ড়ে যায়—

একটি সবুজ মেয়ে ভেঙে গেছে কাচের মতন
হয়তো কখন
সবুজ আলোর কাচ মিশে গেছে আষাঢ়ের রোদে···

কবির সেই বিষণ্ণ সুরের আক্ষেপের মধ্যে তখনই আমরা পাই অনির্বচনীয়কে। কবির এই ব্যক্তিগত বিষাদ এই ব্যক্তিগত বিরহ তখন আর ব্যক্তিগত থাকে না, তা সর্বজনীন হ'য়ে যায়!

'আকাশে তুষার ভোর' কিংবা 'ভোরের আলোর জলে মুছে যাওয়া চাঁদ' এই ধরণের সুন্দর চিত্রল উক্তি স্বল্প কথায় স্বল্প রেখায় স্বল্প রঙে প্রায় চৈনিক চিত্র-ব্যঞ্জনার প্রয়োগফল আনে মনে। এই ভাবে এ রকম বিস্ময়কর লাইন পেতে পেতে কবিতার পর কবিতায় অগ্রসর হ'তে হ'তে আমরা বুঝতে পারি 'অপ্রেম ও প্রেম' সম্বন্ধে কবিতা-সম্পাদকের যথার্থ ভাষণ যে 'বিশুদ্ধ লিরিকের ক্ষেত্রে অনেক সুকৃতি তাঁর জমে উঠেছে, যদিও তার প্রাপ্য সম্মান আজ পর্য্যন্ত তিনি পানান।' কথাটা দুঃখের হ'লেও কথাটা সত্য।

অতঃপর অল্পবয়সী আমেজ-লাগা বিভাবরী কবিতাটি আলোচ্য। গীতল, চিত্রল, গঠনে বিচিত্র, ভাষণে লঘু অথচ অনবদ্য 'বিভাবরী' কবিতায় 'দু' চোখ ভরা 'দু' ফোঁটা রাত এত গভীর, এত বিভোর' যে গতানুগতির গণিতে বয়সের সঙ্গে আবেগের ব্যষ্টি-অনুপাত কষে কষে ব্যতিব্যস্ত হ'বার কোনো প্রয়োজনই হয় না। এই কবিতা পড়লে সে-সব হিশাব-নিকাশ অলীক অর্থহীন হ'য়ে পড়ে।

আলোচ্য কবি তাঁর 'যৌবনোত্তর', 'নতুন দিন' ও 'প্রাচীন প্রাচী'তে ছন্দ প্রায় একটাই ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু 'অপ্রেম ও প্রেমে'র মধ্যে গদ্যের মতো ক'রে লেখা 'তিমিরাগ্নি' শীর্ষক কবিতাটিতে ছন্দ নিয়ে অভিনব পরীক্ষা করেছেন। এ ধরনের রচনায় এর পূর্বে কেউ এভাবে উত্তীর্ণ হ'য়েছেন ব'লে তো জানি না। খ্যাতির মানে লঘু কিংবা গুরু প্রত্যেক আধুনিক কবির পক্ষেই এটি ঈর্ষ্যাযোগ্য মনে হ'বে।

'তুমি অতন্বী তামসী পাষাণ অসিত সত্তাময়ী। তবু চঞ্চল চিত্ত। তবু যে লেগেছে অলকে আলোর স্পর্শ। উন্মীল হ'ল নেত্র। নীল উর্ম্মিলা হ'লে সীমাহীনা সীতা!



ভোলোনি ভোলোনি তিমির তোমার মর্ম। ভোলোনি যে তুমি অতন্দ্র বিভাবরী। আকাশে রাত্রি নামে।'

উদ্ধৃত নমুনা থেকে একথা বুঝতে কষ্ট হয়না যে এটা আসলে গদ্যই নয়—ষড়্‌মাত্রিক মাত্রাবৃত্ত। যদিও এতে অন্তমিল বর্জ্জন করা হ'য়েছে। তবুও এতে ছ'-মাত্রার নিয়মিত যতিপাত অক্ষুণ্ণ রয়েছে। যুক্তাক্ষরের আঘাতে আঘাতে যে ধ্বনি-কল্লোলের সৃষ্টি হয় তাতেই এ-কবিতাটির অপূর্ব্বতা। ব্যবহার-শিষ্ট অন্তমিল যে বর্জ্জিত হ'য়েছে শোনবার সময়ে সেটা মনেও হয় না। যদিও চোখ এমন কিছু পায়না যাকে মিল ব'লে চেনা যেতে পারে। কান তবু এটাকেই শ্রেয় মনে করে, যার কাছে অন্তমিল নেহাৎ খেলো মনে হয়। অনুপ্রাসের এমনই ধ্বনি-সম্মোহ!

উল্লেখতঃ সর্ব্বশেষ হ'লেও প্রসঙ্গতঃ গরিষ্ঠ 'অপ্রেম ও প্রেম' কবিতাটি দীর্ঘ, বারোটি অংশে বিভক্ত। বারোটি অংশে বিভক্ত না ব'লে হয়তো বারোটি কবিতা একসূত্রে গ্রথিত বলাই বেশি সঙ্গত। কোনোটি কোথাও দুর্ব্বল নয় এবং শিল্প হিসাবে আর সবগুলিরই চেয়েই লেখকের চারিত্র্য-লক্ষণাক্রান্ত। 'অপ্রেম ও প্রেম'-এর অন্তর্গত দ্বিতীয় কবিতাটি যখন 'কবিতা' ত্রৈমাসিকে বেরোয় তখন আমরা অনেকেই মুগ্ধ হই। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিত্ব ব'লে অন্য কেউ যেন সম্পূর্ণ নিরাসক্ত দূরত্বে স'রে গিয়ে ঐকান্তিক নির্বেদের সঙ্গে বিষণ্ণ স্বগতোক্তি ক'রে চলেছে—

মনে থাকবে না।
এই আলো এ বিকেল এই বেচাকেনা
এই কাজ—প্রেম, রাঙা জীবনের দেনা
এ-নিবিড় পৃথিবীর নিজেদের হঠাৎ এ চেনা
মনে থাকবে না।

আপাতত আমাদের কিন্তু মনে থাকবে এই স্মরণীয় কবিতাটি বেশ কিছু কালের জন্য।

ঠিক এরই পরবর্তী ত্রিপদীতে লেখা কবিতা-কণাটি আবেগের রং-ফলানো একখানি water-colour ছবি—

তবু চোখে রাখো চোখ ছল হোক আঁকো ছবি
জল রং দিয়ে—
খানিক আকাশ গড়ি ক্ষণিকের আলো-ছোঁওয়া
কথা-দেওয়া নিয়ে॥

কিংবা তার পরের কবিতায়—

ভুলে গেছি সেই ভুলে তুমি নেই নেই আর আমি
সেই পথ, সে-বিকেল আমাদের জীবনে বেনামি।

কিংবা অন্যত্র—

রোদ, শুধু রোদ—সে কি হয়?
একদিন মেঘ আসে—বলো আসেনা কি?
তোমারই এ পাখীর হৃদয়
ছায়া নিয়ে সেদিন একাকী;

সব চলা ক্লান্ত হয়, সব জ্বলা নিভে নিভে আসে—
তখন আমার আশা উজ্জ্বল আকাশে।

কিন্তু শুধু উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো রচনার সামগ্রিক রূপ বোঝানো সম্ভব নয় সুতরাং সে লোভ থেকে সংবৃত থাকাই শ্রেয়ঃ।

সব বলা হ'লেও বলতে এটুকু বাকি থাকে যে, 'অপ্রেম ও প্রেম' পরিসরে ছোটো, দামে শস্তা হ'য়েও গুরুত্বে ছোটো নয়। বর্ত্তমান বাংলা কাব্যগ্রন্থের মুষ্টিমেয় মূল্যবান সন্দর্ভে আরো একটি স্মরণীয় সংযোজন। হোক মুষ্টিমেয় তবু রসজ্ঞ কবিতা পাঠক মহলে 'অপ্রেম ও প্রেম' উপযুক্ত অভ্যর্থনা পাবেই।

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

---

সমুদ্রকন্যা—মৃগাঙ্ক রায়। সারস্বত লাইব্রেরী। দেড় টাকা

নক্ষত্র ঃ মানুষ ঃ মন—আবদুর রশীদ খান। মোহাম্মদ মামুন কর্ত্তৃক ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

সৎ কবিতার জন্মে বিশেষ বাঁধা-ধরা বিষয়ে আমি বিশ্বাসী নই। যে কোন বিষয় নিয়েই কবিতা রসোত্তীর্ণ ও সার্থক হতে পারে কবির মন যদি তাতে একান্ত ভাবে নাড়া লেগে কথা বলে ওঠে। অবশ্য বলার রীতি ও কণ্ঠকেও আমি ওই অনুভূতির সংগে একাত্ম করে দেখছি। কারণ অনুভূতি যেখানে স্পষ্ট ও খাঁটি সেখানে হাল্কা উচ্ছাসের চড়া আওয়াজ বা সহৃদয় পাঠকের গ্রহণ-শক্তির মুখের ওপর খিল তুলে দেওয়া তির্যক ভাঙাচোরা গতির দুর্বোধ্য খেয়ালে আসে না। মৃগাঙ্ক রায় এ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত না হ'লেও প্রায় মুক্ত। অন্তত মুক্ত হবার জন্যে যত্নবান। তাঁর মন বহিরাশ্রয়ী।

কবিতাগুলি গদ্যছন্দের রীতিতে লিখলেও যতিপাতে কবি পদ্য ছন্দের অনুগামী। বাক্য-গঠনও স্থানে স্থানে পদ্য ছোঁয়া। যার ফলে অনির্দ্দিষ্ট গতি পথের অসংবদ্ধতায় সুর কাটছে বলে মনে হয়। 'অভিমন্যু' নামে কাব্য-নাটিকাটিতেই এ গদ্য-পদ্য মিশ্রণের হোঁচট অধিক।

মুগ্ধ হয়েছি কবির গীতল ও চিত্রল স্বভাবের সন্ধান পেয়ে। চিত্র কল্পে তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের ঈর্ষা-যোগ্য। ছবির পর ছবি ফেলে বক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট। তবে শব্দের ঝঙ্কার ও চিত্ররূপায়ণের আধিক্যে 'ভাসান' 'চীন ঃ নভেম্বর'৫৮' প্রমুখ দু'একটি কবিতা আবার শ্লথ, অপূর্ণ ও স্থানে স্থানে প্রাঞ্জলতা-ক্ষুণ্ণ। 'সময়' ও 'তুমি আমার বাঙলা' কবিতা দুটির আবেগ-ভরা সংহত রূপটি সুন্দর। ক্ষুদ্র 'গ্রহণ' কবিতাটির গঠন নিটোল আটোসাটো, বক্তব্য উজ্জ্বল। কিন্তু এর আরম্ভিক পংক্তি 'প্রাণের বিদ্যুৎ দিয়ে তোমাকে ছুঁলাম' এর পর 'প্রাণের অশান্তি দিয়ে তোমাকে নিলাম' পংক্তিটি বড় শিথিল—এম্নি শিথিল পংক্তি এ-কবিতার পক্ষে পীড়াদায়ক।

এ-সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বে-ও মৃগাঙ্ক রায়ের ক্ষমতা সম্পর্কে আমি আস্থাবান। অভিজ্ঞতার সংগে বক্তব্যের তপ্ত স্পর্শে ও অধ্যবসায়ে ত্রুটির উপান্তে আরো উজ্জ্বল কবিতা তাঁর কাছ থেকে পাবার আশা রাখি। আট ন'টি কবিতার ওপর নির্ভর ক'রে তাঁর শক্তি সম্পর্কে অধিক আর কিছু বলা চলে না।

এ-সংগে আর একজন তরুণ কবির যে কবিতা-গ্রন্থখানির আলোচনা করছি এর প্রকাশস্থল অধুনা পূর্ববাংলার সংস্কৃতি-কেন্দ্র ঢাকা। দেখা যাচ্ছে, পূর্ববাংলার প্রকাশকেরাও বাংলা কবিতা-এর প্রকাশের প্রাণ-স্পন্দন থেকে বিচ্ছিন্ন নন।



তবে কাগজের মলাটে বাঁধা হাল্কা পত্রিকার-প্রচ্ছদ-সুলভ প্রচ্ছদে সজ্জিত আলোচ্য 'নক্ষত্র ঃ মানুষ ঃ মন' কবিতা-গ্রন্থখানির ওপর প্রথম চোখ বুলিয়েই অতৃপ্তিতে মন ভ'রে ওঠে। গ্রন্থখানির অন্তঃপুরে প্রবেশ করে কবিতাগুলি তন্নতন্ন ক'রে পড়ে-ও ভিন্ন মনোভাব তৈরী হ'তে চায় না। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার বুনোন এলোমেলো, শব্দ ব্যবহার অপরিচ্ছন্ন, বক্তব্যও সুর-সংগতি ছেঁড়া ভাবালুতায় পূর্ণ। গ্রন্থের প্রথম দিকের দু'একটি কবিতা ভালো লাগলো—অবশ্য অংশত। নিভৃত কণ্ঠের স্নিগ্ধ মধুর টুঙ্‌টাঙ্‌ আওয়াজ তোলা গ্রন্থের নাম-কবিতাটির সুর মনকে নাড়া দেয়।

সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা, এ-গ্রন্থের লেখক আবদুর রশীদ খানের কবি জনোচিত আবেষ্ট আছে। সস্তা বাহবা কুড়োন আসক্তি থেকে মুক্ত হ'য়ে নিজের মেজাজে মেলা পথে যদি তিনি চলেন আঃ সেই সংগে কারুশিল্পে শিক্ষিত হ'তে স্বীকৃত হন তাহ'লে তাঁর হাতে নির্ভাজ সৎ কবিতার জন্ম নেওয়া অস্বাভাবিক নয়।

সুনীল কুমার নন্দী

---

## সমালোচনা-সাহিত্য

শিল্পদৃষ্টি ঃ অরবিন্দ পোদ্দার এম-এ, ডি-ফিল ; ইণ্ডিয়ানা মিলিটেড, মূল্য দুই টাকা।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য বড়ো দুর্বল। দুর্বলতার কারণ, শক্তিশালী সাহিত্যিকদের মধ্যে খুব কম জনেই সাহিত্যের এই বিভাগে অনুশীলননিরত আছেন ; অন্যপক্ষে, যে কজন সমালোচক রূপে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন তাঁদের সাধনাও একনিষ্ঠ নয়। সকলেই আর দশটা লেখার ফাঁকে স্বাদ বদলের উপায় স্বরূপ সমালোচনা-সাহিত্যের চর্চা করে থাকেন ; এই বিরতিছেদ চিহ্নিত রচনাবলীর গায়ে না আছে অভিনিবেশের ছাপ, না কোন গভীর প্রত্যয়সিদ্ধ বক্তব্যের উজ্জ্বল তিলক। বাংলা আধুনিক সমালোচনা সাহিত্য অযত্নপ্রসূত, অর্ধমনস্ক, অভিপ্রায়-বিহীন।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের আর একটি মস্ত ত্রুটী এই যে, সমালোচকেরা প্রায়শঃ বড্ড বেশী ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলে থাকেন। কী যে তাঁরা পাঠকের মনের দুয়ারে সঠিক পৌঁছে দিতে চান তা আদৌ স্পষ্ট নয়, বক্তব্য বিষয়ের যাথার্থ্যের অভাবে তাঁদের রচনা বিভিন্ন পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলে রচনার উদ্দেশ্য অংশত ব্যর্থ হয়। উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগের সমর্থনহীন ঢালাও বিবৃতি দেওয়া এবং তা-ও অস্পষ্ট ভাষায়—আমাদের সমালোচকদের একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকদের মধ্যে সব চাইতে যিনি কুলীন সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ রবীন্দ্রনাথের ত্রুটী এ বিষয়ে সব চাইতে অধিক ; তার পরেই নাম করতে হয় সমালোচক-প্রবর মোহিতলাল মজুমদারের। বাংলা সাহিত্যের দুইজন শ্রেষ্ঠ সমালোচকের রচনারীতিই যখন এই, তখন অপরদের কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো।

আসল কথা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য মূলতঃ ধোঁয়াটে। দ্ব্যর্থ, ত্র্যর্থ, এমন কি চতুরর্থ ব্যঞ্জনাপূর্ণ ঢালাও বিবৃতির দ্বারা সে সাহিত্যের কলেবর পূর্ণ। সমালোচকদের ভিতর সমালোচন-ক্ষমতার একেবারেই কোন পরিচয় পাওয়া যায় না এমন কথা অবশ্য বলব না, তবে সে শক্তি প্রায়শঃ মাত্রাজ্ঞানের অভাব দ্বারা লাঞ্ছিত। অস্পষ্টতার কুয়াসায় শক্তির ঔজ্জ্বল্য আবৃত। মানসিক আলস্য

প্রস্থত অগোছালো রচনারীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলা সাহিত্যের কোন বিভাগের রচনাকে যদি চিহ্নিত করতে হয় তবে অবধারিত ভাবে সমালোচনা সাহিত্যের নাম মনে পড়ে।

উপরে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যে মন্তব্য করা হল আধুনিক যে কোন সমালোচনা গ্রন্থের বিচারে সেই পরিপ্রেক্ষিত সর্বদা মনে রাখা দরকার। বলাই বাহুল্য আলোচ্য গ্রন্থদুটিও উক্ত ত্রুটী বিমুক্ত নয়।

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের গ্রন্থখানিতে অস্পষ্টতাদোষ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু সে দোষের আংশিক খণ্ডন হয়েছে এই কারণে যে, লেখক সুনির্ধারিত বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা-সাহিত্যের আদর্শের আলোচনা করেছেন এবং আগাগোড়া সেই লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি রয়েছেন। লক্ষ্যটি হলো সাহিত্যের মূল্যায়নে মার্ক্সবাদী দৃষ্টভঙ্গির প্রয়োগ। এ বিষয়ে গ্রন্থে সংকলিত দুটি প্রবন্ধ—'মার্ক্স এঙ্গেলস ও শিল্পদৃষ্টি' এবং 'মার্ক্স বাদী ও শেক্সপীয়স সাহিত্য'—বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রবন্ধদ্বয়ের ভিতর লেখক মার্ক্সবাদ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ভ্রান্তির নিরসন করবার চেষ্টা করেছেন। অত্যুগ্র বামপন্থায় বিশ্বাসী কোন কোন সাহিত্য সমালোচকের ধারণা (দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক সোভিয়েট সমালোচক অধ্যাপক স্মিরনভের নাম করেছেন), মানব-ইতিহাসের মার্ক্স ও এঙ্গেলসকৃত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সাহিত্যের মূল্যবিচারেও সমান প্রযোজ্য; কি না, যে লেখক যে শ্রেণী থেকে উদ্ভূত তাঁর রচনায় সেই শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত না থেকেই পারে না এবং এই মানদণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত লেখক মাত্রের রচনাই দুষ্য। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতির দ্বারা দেখিয়েছেন, শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের এমন যান্ত্রিক প্রয়োগ স্বয়ং মার্ক্স্ এঙ্গেলসেরও অভিপ্রেত ছিল না। সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সূত্র নির্ধারণে মার্ক্স এঙ্গেলস্ অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা স্বীকার করেছেন, মানুষের মানস-জীবনের যথাযথ ব্যাখ্যায় এই অর্থনৈতিক সূত্র সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। "যে কোনো যুগের সামাজিক মানস সংস্কৃতি সাধারণ ভাবে (মার্ক্সের কথায় 'in general') তার ব্যাবহারিক জীবনযাত্রার প্রণালীর দ্বারা নিরূপিত হয়। কিন্তু সেটা সাধারণভাবেই, অন্যকোন লৌহকঠিন যান্ত্রিক বন্ধনে নয়।"

এই হচ্ছে শিল্পদৃষ্টি গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। লেখকের রচনারীতির পূর্বকথিত অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সমগ্র রচনা থেকে এই মূল বক্তব্যটুকু আহরণ করে নিতে কষ্ট হয় না। যে কথা আগে বলেছি, একটা বিশেষ লক্ষ্য গোড়া থেকে ছ'কে নেওয়ায় লেখকের পক্ষে সুবিধা হয়েছে এই যে, তিনি তাবৎ মন্তব্যকে একটি মূল লক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, ফলে পাঠকের পক্ষেও লেখকের বক্তব্যকে ধরা ছোঁয়ার ভিতর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমালোচকের এই মন্তব্যটি সর্তবিরহিত নয়। স্পষ্ট কথা বললে বলতে হয়, লেখক ভাষা প্রয়োগে বড়ো ঢিলেঢালা, উদাসীন। লেখকের শব্দবিভব প্রশংসনীয়, কিন্তু এই বৈভব বৈজ্ঞানিক সচেতনতার দ্বারা মণ্ডিত নয়। শব্দসমূহের সংজ্ঞা ও আভিধানিক অর্থ মানসপটে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত থাকলে লেখায় যে অর্থের স্পষ্টতা ও বক্তব্যের ঋজুতা আসে 'শিল্পদৃষ্টি'তে তার একান্ত অসদ্ভাব। রচনার পরিবেশন-প্রণালী থেকে যতদূর বোঝা যায়, লেখকের চিন্তা মোটামুটি স্বচ্ছ; কিন্তু ভাষা অস্বচ্ছ। ভাষার এই অস্বচ্ছতা দূর হলে লেখকের রচনারীতি যে অনেকগুণ বেশী প্রসাদগুণমণ্ডিত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।



## অনুবাদ

**আজব জীবিকা :** জি কে চেষ্টারটন ; **অনুবাদ :** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য দুর্বল। এই দুর্বলতার প্রমাণ অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যায় নয়, অনুবাদের অপটুতায়। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক বিদেশী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হচ্ছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে উল্লসিত হওয়া চলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ কাঁচা হাতের রচনা, আড়ষ্ট, অযত্নকৃত। যে ভাষায় অনুবাদ করা হয় সে ভাষার সম্যক জ্ঞান অনুবাদকের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু তার চাইতেও অপরিহার্য্য যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় তার জ্ঞান। দুঃখের বিষয়, সচরাচর-কৃত অনুবাদে এই জ্ঞানের প্রমাণ পাইনে। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ বিভাগে যাঁরা অনুশীলননিরত আছেন তাঁদের অধিকাংশের ভিতর ইংরিজি জ্ঞানের অভাব মর্মান্তিক ভাবে স্পষ্ট। ফলে যা হবার তা-ই হয়—অনুবাদক অনুবাদ কার্যে আথছার যদৃচ্ছা স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন। অনুবাদের নামে আমাদের সাহিত্যে সাধারণতঃ যা চলছে তা হয় ভাবানুবাদ, নয় ছায়ানুবাদ। লেখক বিদেশী ভাষা যেমন বোঝেন তেমনি অনুবাদ করেন, যেখানটায় বোঝেন না সে অংশ হয় শ্রেফ বাদ দিয়ে যান, নয় তো মনগড়া কতকগুলি বাক্য খাড়া ক'রে সেটি মূল অনুবাদের সঙ্গে জুড়ে দেন। সেদিন টলষ্টয়ের কতকগুলি শিশু পাঠ্য গল্পের অনুবাদ পড়ছিলাম। অনুবাদক আমাদের শিশুসাহিত্যের একজন পরিচিত লেখক। হায়, এই কি বাংলা অনুবাদের নমুনা! আমাদের উঠতি কিশোরের দল, যারা এইসকল বই পড়ে, তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আশঙ্কিত না হয়ে পারি নে।

সুখের বিষয়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃত 'আজব জীবিকা' উপরের বিরস মন্তব্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। লেখকের ইংরিজি এবং মাতৃভাষা উভয়ই বিশেষরূপে করায়ত্ত আছে এবং এ পারংগমতার ছাপ আলোচ্য রচনার ছত্রে ছত্রে বর্তমান।

আজব জীবিকা জে, কে, চেষ্টারটনের জনপ্রিয় উপন্যাস 'দি ক্লাব অব ক্যুইয়ার ট্রেডস্'-এর অনুবাদ। অনুবাদ মূলানুগ, বিশ্বস্ত অথচ তা বেগবান, স্বচ্ছন্দ। বইটার কাহিনী খুব কৌতূহলোদ্দীপক (যা চেষ্টারটনের প্রায় সব লেখারই বৈশিষ্ট্য) সেই কারণেও বটে এবং অনুবাদের নিজস্ব কৃতিত্বের জন্যও বটে গ্রন্থটি এক নিঃশ্বাসে শেষ করে উঠতে হয়। গ্রন্থখানি পাঠ করে আমাদের স্থির প্রতীতি জন্মেছে যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একজন কুশলী অনুবাদক, তাঁর হাতে বাংলা সাহিত্যের এই অনাদৃত দিকটী সমৃদ্ধ হবার অপেক্ষা রাখে। ভবিষ্যতে নীরেন্দ্রনাথের অনুবাদকুশলতা আরও উল্লেখযোগ্য বিদেশী রচনার অনুবাদকার্যে প্রযুক্ত হবে বলে আশা করি। নারায়ণ চৌধুরী

## 'পূজাপার্বণ'

[ আলোচনা ]

কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূজাপার্বণ' নিবন্ধ পাঠে 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জানাচ্ছেন :

'আপনার লিখিত 'পূজাপার্বণ'-পাঠোত্তর নিবন্ধের অধিকাংশ স্থল বুঝিতে পারি নাই। শেষের দিকে আপনি প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে 'পাউস' শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার অর্থ

প্রসূত অগোছালো রচনারীতির দৃষ্টান্ত হিসাবে বাংলা সাহিত্যের কোন বিভাগের রচনাকে যদি চিহ্নিত করতে হয় তবে অবধারিত ভাবে সমালোচনা সাহিত্যের নাম মনে পড়ে।

উপরে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যে মন্তব্য করা হল আধুনিক যে কোন সমালোচনা গ্রন্থের বিচারে সেই পরিপ্রেক্ষিত সর্বদা মনে রাখা দরকার। বলাই বাহুল্য আলোচ্য গ্রন্থদুটিও উক্ত ত্রুটী বিমুক্ত নয়।

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের গ্রন্থখানিতে অস্পষ্টতাদোষ যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু সে দোষের আংশিক খণ্ডন হয়েছে এই কারণে যে, লেখক সুনির্ধারিত বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা-সাহিত্যের আদর্শের আলোচনা করেছেন এবং আগাগোড়া সেই লক্ষ্যে নিবদ্ধদৃষ্টি রয়েছেন। লক্ষ্যটি হলো সাহিত্যের মূল্যায়নে মার্ক্সবাদী দৃষ্টভঙ্গির প্রয়োগ। এ বিষয়ে গ্রন্থে সংকলিত দুটি প্রবন্ধ—'মার্ক্স এঙ্গেলস ও শিল্পদৃষ্টি' এবং 'মার্ক্স বাদী ও শেক্সপীয়স সাহিত্য'—বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। প্রবন্ধদ্বয়ের ভিতর লেখক মার্ক্সবাদ সম্পর্কে একটি প্রচলিত ভ্রান্তির নিরসন করবার চেষ্টা করেছেন। অত্যুগ্র বামপন্থায় বিশ্বাসী কোন কোন সাহিত্য সমালোচকের ধারণা (দৃষ্টান্তস্বরূপ লেখক সোভিয়েট সমালোচক অধ্যাপক স্মিরনভের নাম করেছেন), মানব-ইতিহাসের মার্ক্স ও এঙ্গেলসকৃত অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা সাহিত্যের মূল্যবিচারেও সমান প্রযোজ্য; কি না, যে লেখক যে শ্রেণী থেকে উদ্ভূত তাঁর রচনায় সেই শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত না থেকেই পারে না এবং এই মানদণ্ডে বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত লেখক মাত্রের রচনাই দুষ্য। কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মার্ক্স-এঙ্গেলস্-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতির দ্বারা দেখিয়েছেন, শিল্পবিচারের ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদের এমন যান্ত্রিক প্রয়োগ স্বয়ং মার্ক্স এঙ্গেলসেরও অভিপ্রেত ছিল না। সমাজ-জীবনের বিবর্তনের সূত্র নির্ধারণে মার্ক্স এঙ্গেলস্ অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা স্বীকার করেছেন, মানুষের মানস-জীবনের যথাযথ ব্যাখ্যায় এই অর্থনৈতিক সূত্র সম্পূর্ণ প্রযোজ্য নয়। "যে কোনো যুগের সামাজিক মানস সংস্কৃতি সাধারণ ভাবে (মার্ক্সের কথায় 'in general') তার ব্যাবহারিক জীবনযাত্রার প্রণালীর দ্বারা নিরূপিত হয়। কিন্তু সেটা সাধারণভাবেই, অন্যকোন লৌহকঠিন যান্ত্রিক বন্ধনে নয়।"

এই হচ্ছে শিল্পদৃষ্টি গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য। লেখকের রচনারীতির পূর্বকথিত অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সমগ্র রচনা থেকে এই মূল বক্তব্যটুকু আহরণ করে নিতে কষ্ট হয় না। যে কথা আগে বলেছি, একটা বিশেষ লক্ষ্য গোড়া থেকে ছ'কে নেওয়ায় লেখকের পক্ষে সুবিধা হয়েছে এই যে, তিনি তাবৎ মন্তব্যকে একটি মূল লক্ষ্যের দিকে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছেন, ফলে পাঠকের পক্ষেও লেখকের বক্তব্যকে ধরা ছোঁয়ার ভিতর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমালোচকের এই মন্তব্যটি সর্তবিরহিত নয়। স্পষ্ট কথা বললে বলতে হয়, লেখক ভাষা প্রয়োগে বড়ো ঢিলেঢালা, উদাসীন। লেখকের শব্দবিভব প্রশংসনীয়, কিন্তু এই বৈভব বৈজ্ঞানিক সচেতনতার দ্বারা মণ্ডিত নয়। শব্দসমূহের সংজ্ঞা ও আভিধানিক অর্থ মানসপটে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত থাকলে লেখায় যে অর্থের স্পষ্টতা ও বক্তব্যের ঋজুতা আসে 'শিল্পদৃষ্টি'তে তার একান্ত অসদ্ভাব। রচনার পরিবেশন-প্রণালী থেকে যতদূর বোঝা যায়, লেখকের চিন্তা মোটামুটি স্বচ্ছ; কিন্তু ভাষা অস্বচ্ছ। ভাষার এই অস্বচ্ছতা দুর হলে লেখকের রচনারীতি যে অনেকগুণ বেশী প্রসাদগুণমণ্ডিত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য।



## অনুবাদ

**আজব জীবিকা :** জি কে চেষ্টারটন; **অনুবাদ :** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বেঙ্গল পাবলিশার্স।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য দুর্বল। এই দুর্বলতার প্রমাণ অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যায় নয়, অনুবাদের অপটুতায়। প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক বিদেশী গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হচ্ছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে উল্লসিত হওয়া চলে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদ কাঁচা হাতের রচনা, আড়ষ্ট, অযত্নকৃত। যে ভাষায় অনুবাদ করা হয় সে ভাষার সম্যক জ্ঞান অনুবাদকের পক্ষে অপরিহার্য, কিন্তু তার চাইতেও অপরিহার্য্য যে ভাষা থেকে অনুবাদ করা হয় তার জ্ঞান। দুঃখের বিষয়, সচরাচর-কৃত অনুবাদে এই জ্ঞানের প্রমাণ পাইনে। বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ বিভাগে যাঁরা অনুশীলননিরত আছেন তাঁদের অধিকাংশের ভিতর ইংরিজি জ্ঞানের অভাব মর্মান্তিক ভাবে স্পষ্ট। ফলে যা হবার তা-ই হয়—অনুবাদক অনুবাদ কার্যে আখছার যদৃচ্ছা স্বাধীনতা নিয়ে থাকেন। অনুবাদের নামে আমাদের সাহিত্যে সাধারণতঃ যা চলছে তা হয় ভাবানুবাদ, নয় ছায়ানুবাদ। লেখক বিদেশী ভাষা যেমন বোঝেন তেমনি অনুবাদ করেন, যেখানটায় বোঝেন না সে অংশ হয় শ্রেফ বাদ দিয়ে যান, নয় তো মনগড়া কতকগুলি বাক্য খাড়া ক'রে সেটি মূল অনুবাদের সঙ্গে জুড়ে দেন। সেদিন টলষ্টয়ের কতকগুলি শিশু পাঠ্য গল্পের অনুবাদ পড়ছিলাম। অনুবাদক আমাদের শিশুসাহিত্যের একজন পরিচিত লেখক। হায়, এই কি বাংলা অনুবাদের নমুনা! আমাদের উঠতি কিশোরের দল, যারা এইসকল বই পড়ে, তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আশঙ্কিত না হয়ে পারি নে।

সুখের বিষয়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কৃত 'আজব জীবিকা' উপরের বিরস মন্তব্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। লেখকের ইংরিজি এবং মাতৃভাষা উভয়ই বিশেষরূপে করায়ত্ত আছে এবং এ পারংগমতার ছাপ আলোচ্য রচনার ছত্রে ছত্রে বর্তমান।

আজব জীবিকা জে, কে, চেষ্টারটনের জনপ্রিয় উপন্যাস 'দি ক্লাব অব ক্যুইয়ার ট্রেডস্'-এর অনুবাদ। অনুবাদ মূলানুগ, বিশ্বস্ত অথচ তা বেগবান, স্বচ্ছন্দ। বইটার কাহিনী খুব কৌতূহলোদ্দীপক (যা চেষ্টারটনের প্রায় সব লেখারই বৈশিষ্ট্য) সেই কারণেও বটে এবং অনুবাদের নিজস্ব কৃতিত্বের জন্যও বটে গ্রন্থটি এক নিঃশ্বাসে শেষ করে উঠতে হয়। গ্রন্থখানি পাঠ করে আমাদের স্থির প্রতীতি জন্মেছে যে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একজন কুশলী অনুবাদক, তাঁর হাতে বাংলা সাহিত্যের এই অনাদৃত দিকটী সমৃদ্ধ হবার অপেক্ষা রাখে। ভবিষ্যতে নীরেন্দ্রনাথের অনুবাদকুশলতা আরও উল্লেখযোগ্য বিদেশী রচনার অনুবাদকার্যে প্রযুক্ত হবে বলে আশা করি।

নারায়ণ চৌধুরী

## 'পূজাপার্বণ'

[ আলোচনা ]

কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূজাপার্বণ' নিবন্ধ পাঠে 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি জানাচ্ছেন :

'আপনার লিখিত 'পূজাপার্বণ'-পাঠোত্তর নিবন্ধের অধিকাংশ স্থল বুঝিতে পারি নাই। শেষের দিকে আপনি প্রাকৃত পৈঙ্গল হইতে 'পাউস' শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার অর্থ

করিয়াছেন 'পৌষ'। কিন্তু 'পাউস' শব্দ সংস্কৃত প্রাবৃষ হইতে আসিয়াছে। অতএব পৌষমাসে বর্ষারম্ভ, এই অনুমান আসিতেছে না। ইতি

পুং—বৈদিক কৃষ্টির কালনির্ণয়ে বেদের প্রমাণই গ্রাহ্য, অন্য প্রমাণ উৎপ্রেক্ষামাত্র।'

## উত্তর

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির সমীপে আমি কয়েকটি নিবেদন উপস্থিত করছি:

১। প্রাকৃতই পূর্ব্বগামী, সংস্কৃত নয়। প্রাকৃতেরই সংস্কৃত রূপ সংস্কৃত। 'পাউস' শব্দটি থেকেই তাই 'প্রাবৃষ'-এর উদ্ভব বলে আমরা মনে করতে পারি। তাছাড়া বেদের ভাষাও কি সংস্কৃত? আবেস্তার ভাষা, বেদের ভাষা, পিয়দশীর অনুশাসনের ভাষা প্রায় অনুরূপ। হয়ত তা শূরসেনী প্রাকৃত। যেমন 'প্রাকৃত পৈঙ্গল'-এর ভাষা গৌড়ীয় প্রাকৃত বা মাগধী প্রাকৃত।

২। বর্ষারম্ভ বলতে আমি বছরের আরম্ভ বুঝাইনি, বুঝিয়েছি বর্ষার সুরু। সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে এই বিপদ আর ভ্রান্তির উৎপত্তি! আজকাল আষাঢ়-শ্রাবণ-ভাদ্র হয়েছে বর্ষাকাল—প্রাচীন বঙ্গে ও বঙ্গালে অগ্রান-পৌষ-মাঘ ছিল বর্ষাঋতু। তারপর ঋতু কুসুমাকর, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার কৃষ্ণ যে ঋতুর পতি। পৌরাণিক 'কূর্ম্ম-নিবেশে' রাশি-চক্রের যে বর্ণনা আছে—বরাহমিহির ও পরাশর যার সমর্থক (যদিও কেউ শুনেছেন 'ক্লক-ওয়াইজ্' কেউবা 'কাউণ্টার ক্লক-ওয়াইজ')—তাতে দেখা যায় পূবদিকে বৃষরাশিতে আর্দ্রা-পুনর্ব্বসু-পুষ্যা নক্ষত্র স্থাপিত। পালরাজাদের অনুশাসনে যেমি দেখা যায় 'প্রচুর পয়ী প্রাচী'র উল্লেখ তেমি মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলছে ভারতে 'বর্ষা, মেঘবারি, জল' কিম্পুরুষ কৌম দান করেছে। এই কিম্পুরুষরা পূর্ব্বচার, চর্য্যাপদী কিরাত। 'পূর্ব্বে কিরাতা যস্যান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা;'—বলে পশ্চিম-ভারতের যে নির্দ্দেশ 'ভুবন-কোষ' দিচ্ছে তাতে পশ্চিমী আর্য্যদের যবন ছাড়া আর কি মনে করা যায়?

৩। প্রাবৃষ্ মানে প্রাচী আর বৃষের সমন্বয়। বৃষ দ্বিতীয় রাশি-( কাউণ্টার ক্লক-ওয়াইজ গনণায়) আর্দ্রা-পুনর্ব্বসু-পুষ্যার গৃহপতি। তার মানে দ্বিতীয় রাশিতে আর্দ্রতা ও মেঘরাশি নিয়ে পুষ্যার মাস পৌষ আসত। প্রাবৃষ উত্তরকালে প্রাবৃট্ হয়ে 'বৃট' কথাটির জন্ম দিয়েছিল। তাই আজও খাজুরাহো মন্দির-গাত্রে ক্ষোদিত আছে: 'কা ত্বং রাঢ়পরিবৃঢ়বধূঃ'। 'রাঢ়বৃঢ়' কথাটি 'রাঢ়বাড়' ( রাঢ় ও বড়েন্দ্রভূমি ) 'রায়বার' ( সভা ) এবং পরিবৃঢ় কথাটি 'পরিবার'-এর জনক। বৃঢ়বধূ একদা পরিবারভুক্তা হ'ল—হ'ল পাঞ্চালী—তারপর তার উত্তরণ ব্রীড়াবধূতে।

৪। রাঢ় বলতে প্রাচীন মিশরীরা যেমন নদী বোঝাতেন প্রাচীন বাঙালীরাও ঠিক তা-ই বোঝাতেন। 'গঙ্গাঋড়্' আর 'প্রাসীর' ( প্রাচী ) ভয়ে গ্রীক অলকজন্ত্র পালিয়েছিলেন। এদেশের রাজা যেমি মগধের 'অগ্রম্মেষ' ( প্রথম রাশি মেষ ) তেমি গঙ্গাভূমি রাঢ়-বাঢ়ের এবং বঙ্গাল প্রাচীর একরাট্ কালিকাবংশজ শূদ্র নন্দবংশের। এই একরাট্-দের খবর মৎস্য-বায়ু ভবিষ্য পুরাণ পরিবেশন করছে! বড়েন্দ্রভূমি বঙ্গালের ভাষার আয়ত্তে গিয়ে বরেন্দ্র হয়েছিল, ঠিক তেমি শ্রীহট্ট-বোধক বঙ্গাল 'গৌর'-কথাটি রাঢাঞ্চলে এসে 'গৌড়' বনে গেছে।

৫। মেষ-রাশির স্থান ঈশান-কোণে—রেবতী-অশ্বিনী-ভরণী নক্ষত্রে। দেখা যায় শিবশক্তির মিলন-ক্ষেত্র এই প্রথম গৃহ। শাক্ততন্ত্র-যোগ শাস্ত্রের ঘর—বাংলাদেশ, শান আসাম থেকে নেপাল-নিম্নতিব্বত আর ত্রিপুরা থেকে উড়িষ্যা-কোসল-মগধ নিয়ে যার ব্যাস।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য


**আমাদের কথা**

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

| কবিতা | গল্প | উপন্যাস |
|---|---|---|
| জীবনানন্দ দাশের | প্রেমেন্দ্র মিত্রের | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের |
| মহাপৃথিবী | মহানগর | বৃত্ত |
| ( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ ) | দু'টাকা | এক টাকা বার আনা |
| দেড় টাকা | সুবোধ ঘোষের | মরামাটি |
| অজিত দত্তের | পরশুরামের কুঠার | ( ২য় সং ) |
| পুনর্ণবা | দু'টাকা | দু'টাকা চার আনা |
| দেড় টাকা | শুক্লাভিসার | দিনান্ত |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের | দু'টাকা চার আনা | ( ২য় সং ) |
| নীল আকাশ | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের | সাড়ে তিন টাকা |
| দেড় টাকা | ফসল | কল্লোল |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের | এক টাকা চার আনা | পাঁচ টাকা |
| সংকলিতা | ঋণ | কস্মৈদেবায় |
| দু'টাকা | দেড় টাকা | ( ২য় সং ) |
| প্রাচীন প্রাচী | নতুন দিনের কাহিনী | তিন টাকা |
| দেড় টাকা | দু'টাকা | রাত্রি |
| নতুন দিন | নরেন্দ্রনাথ মিত্রের | ( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ ) |
| আট আনা | পতাকা | পাঁচ টাকা |
| যৌবনোত্তর | দু'টাকা | মৌচাক |
| আট আনা | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর | পাঁচ টাকা |
| তিনজন আধুনিক কবি | খেলনা | শৈলেন ঘোষের |
| ( বাংলা কবিতার আলোচনা ) | দেড় টাকা | তিনরঙ |
| নয় আনা | সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের | দু'টাকা |
| অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের | নয়নচারা | |
| সৈনিক | দেড় টাকা | |
| দেড় টাকা | | |
| গোপাল ভৌমিকের | | |
| স্বাক্ষর | | |
| এক টাকা | | |

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ ক লি কা তা

PURVASA :: AGRAHAYANA—1359 :: REGD. NO. 1

## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের মধ্য ভাগে প্রকাশিত হয়। চল্‌তি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে (ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেণ্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয়ঃ

পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা





খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩


Printed & Published by Satya Prasanna Datta, Purvasa Ltd, P13 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

# পূর্ব্বাশা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিব কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

| কবিতা | গল্প | উপন্যাস |
|---|---|---|
| জীবনানন্দ দাশের<br>মহাপৃথিবী<br>( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )<br>দেড় টাকা | প্রেমেন্দ্র মিত্রের<br>মহানগর<br>দু'টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>বৃত্ত<br>এক টাকা বার আনা |
| অজিত দত্তের<br>পুনর্ণবা<br>দেড় টাকা | সুবোধ ঘোষের<br>পরশুরামের কুঠার<br>দু'টাকা | মরামাটি<br>( ২য় সং )<br>দু'টাকা চার আনা |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের<br>নীল আকাশ<br>দেড় টাকা | শুক্লাভিসার<br>দু টাকা চার আনা | দিনান্ত<br>( ২য় সং )<br>সাড়ে তিন টাকা |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>সংকলিতা<br>দু'টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>ফসল<br>এক টাকা চার আনা | কল্লোল<br>পাঁচ টাকা |
| প্রাচীন প্রাচী<br>দেড় টাকা | ঋণ<br>দেড় টাকা | কস্মৈদেবায়<br>( ২য় সং )<br>তিন টাকা |
| নতুন দিন<br>আট আনা | নতুন দিনের কাহিনী<br>দু'টাকা | রাত্রি<br>( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )<br>পাঁচ টাকা |
| যৌবনোত্তর<br>আট আনা | নরেন্দ্রনাথ মিত্রের<br>পতাকা<br>দু'টাকা | মৌচাক<br>পাঁচ টাকা |
| তিনজন আধুনিক কবি<br>( বাংলা কবিতার আলোচনা )<br>নয় আনা | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর<br>খেলনা<br>দেড় টাকা | শৈলেন ঘোষের<br>তিনরঙ<br>দু'টাকা |
| অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের<br>সৈনিক<br>দেড় টাকা | সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের<br>নয়নচারা<br>দেড় টাকা | |
| গোপাল ভৌমিকের<br>স্বাক্ষর<br>এক টাকা | | |

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


# টুকরো কথা... (২১)

...শহর ক্ষুদ্র কিন্তু প্রাচীন পূর্ব্বে অতি বড় ছিল এখন তাহার প্রায় কিছুই নাই পূর্ব্বে সে একটা বড় বন্দর ছিল এবং ইউরোপীয় বাণিজ্যের ঠাকুর হাঁসিল সেখানে দাখিল হইত এবং ইংলণ্ডীয়েরদিগের বাণিজ্য স্থান সেই ছিল পরে সেখান হইতে কলিকাতা হইল ইংলণ্ডীয়েরা এদেশের বিবরণ কিছু জানিতেন না তাহাতে গঙ্গানদীর নাম... কহিতেন।'

প্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'দিগদর্শনে' যে শহরের এই বিবরণ ছাপা হয়েছিল তার প্রথম পত্তন করেছিলেন পর্তুগীজ বণিকেরা। বণিক এবং দস্যু। ভাগীরথীকে লোকে বলত 'রোগ্‌স রিভার'—দস্যু নদী। তার দুই তীরে ঘন হোগলার বন। তা থেকে পর্তুগীজের মুখে মুখে শহরের নাম দাঁড়াল ওগোলি, হিউগলি হাগোলে—অবশেষে হুগলী, নদীর নাম হুগলী নদী। ১৭শ শতাব্দীর কথা। এই শহরের রাজপথেই ১৬৬৩ সালে ইংরেজ-মোগলে প্রথম লড়াই। এখানেই বাংলার প্রথম ছাপাখানা, কাগজ-কল, বরফ-কল বসে, প্রথম বাংলা হরফ ঢালাই হয়, ছাপা হয় প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ', প্রথম সাময়িক পত্র 'দিগদর্শন'। এই হুগলী জেলা বাংলাগদ্যের জন্মস্থান কেননা রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রাজা রামমোহন এই জেলাতেই জন্মেছিলেন। সেই সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রে নাম করতে হয় আর যাঁদের তাঁর মধ্যে আছেন বাংলা-মহাভারতের কাশীরাম, 'অন্নদামঙ্গলের ভারতচন্দ্র, আলালের ঘরের দুলাল'-খ্যাত টেঁকচাঁদ ঠাকুর, শেষ 'বাঙালী-কবি' ঈশ্বর গুপ্ত। একথা বললে তাই অত্যুক্তি হয় না যে হুগলী জেলা 'মনীষার শ্রীক্ষেত্র'। বাংলার ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি কিংবা। রাষ্ট্র নিয়েও এ অঞ্চলের যে অসামান্য প্রভাব তা থেকে একথাও বলা চলে যে এখানকার ইতিহাসে একদিন সমগ্র দেশের হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। একক অধ্যবসায়ে দীর্ঘকাল গ্রামে গ্রামে পর্যটন আর প্রভূত গ্রন্থপাঠ করে সুধীরকুমার মিত্র মহাশয় 'হুগলী জেলার ইতিহাস' নামে যে বৃহৎ এবং মহৎ গ্রন্থ প্রস্তুত করেছেন সেটি বাংলা-সাহিত্যের স্থায়ী গৌরব। এই তথ্যভরা শুষ্ক ইতিহাস নয়, বাঙালীর সমগ্র কর্মকাণ্ডের এবং বৃহৎ অংশের সরস বিশ্বকোষ॥

বিগত বলেই অতীত হয়তো মধুর। কিন্তু তাকে সাহিত্যের জাতে তুলতে হলে লেখক হওয়া চাই পাকা, লেখা মনোরম। শ্রীঅরবিন্দের বহু-স্থানীয় প্রাচীন সিভিলিয়ান চারুচন্দ্র দত্তের শৈশব কাটে আধা-স্বাধীন দিশিরাজ্যে। আর তিনি যখন বিলেত যান তখন সারা লণ্ডন শহরে মোটর গাড়ি ছিল একমাত্র যুবরাজ এডওআর্ডের। সেই সেকালের যে অফুরন্ত স্মৃতিকথা চিন্তাসমৃদ্ধ নিখুঁত বৈঠকী গদ্যে তিনি লিখেছিলেন তার নাম 'পুরানো কথা'। তার পুরানো কপি সিগনেট বুকশপে এখনো পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুর পরে 'পুরানো কথা-উপসংহার' ছাপা হয়েছে। দুটি বিশিষ্ট বাংলা বই॥

পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণ রস, তাহার পারিপার্শ্বিক ও বাতাবরণ, তাহার ভাবধারা ও প্রকাশভঙ্গী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান' পেতে হলে বাংলা-বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের পণ্ডিত গবেষক এবং ব্যাখ্যাতা হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাবলী পরিচয়' বিশেষ সহায়ক হবে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিষয়ে ব্যাখ্যা এবং গবেষণা সংক্রান্ত আর একটি নতুন বই অরবিন্দ পোদ্দারের 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ'॥

এই গেল এক শ্রেণীর গদ্যসাহিত্য। আর এক শ্রেণীর গদ্য আছে যার প্রধান উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা। যেমন বুদ্ধদেব বসুর রম্যরচনা-সংগ্রহ 'উত্তর তিরিশ'। নতুন সংস্করণ হয়েছে। নতুন সংস্করণে আর একটি বই: গল্পের মতো চিত্তহারী কবিজীবনী 'শেলী'। অনুবাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫১ সালের 'শরৎচন্দ্র বক্তৃতা' দিলেন ... শ্রীরামকৃষ্ণ'। দারভাঙ্গা হলেই সচরাচর অনুষ্ঠিত হয় এই বক্তৃতা। শ্রোতৃসংখ্যা অত্যন্ত বেশি হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় এবার আশুতোষ হলের ব্যবস্থা করেছিলেন।

'মহাস্থবির জাতকে'র এবার তৃতীয় খণ্ড লিখলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী মহাশয়। সম্প্রতি তাঁর ছোটগল্পের নতুন এক সংকলন বেরিয়েছে 'বিচিত্রলোক' নামে। দক্ষিণারঞ্জন বসুর 'মধুরেণ' আর একটি নতুন ছোটগল্পের বই। রবীন্দ্রনাথ থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পর্যন্ত ভালো ছোটগল্পের সংকলন, সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'কথাগুচ্ছ' ৩য় সংস্করণ হয়েছে।

'দৃষ্টিপাতে'র যাযাবর 'জনান্তিক' নামে সুখপাঠ্য এক উপন্যাস লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'গল্প এ যুগে হয় না।' এবং ফিল্মটেকনিকে 'কানামাছি' নামে এক ছোট উপন্যাস লিখে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'নীতিশাস্ত্রের সকল বাণী চিরন্তন নয়।' আরো দুটি নতুন উপন্যাস: অমলা দেবীর 'কল্যাণ সঙ্ঘ' এবং বাণী রায়ের 'হাসিকান্নার দিন'। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ-উপন্যাস নিয়ে বাণী রায়ের 'সপ্তসাগর' নামে একটি সংকলনও ছাপা হয়েছে কিছুদিন আগে। উপন্যাসের নতুন সংস্করণ: কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কোষ্ঠির ফলাফল', বনফুলের ১ম খণ্ড 'জঙ্গম'।

ছোটদের সব চাইতে প্রিয় বই রোমাঞ্চকর উপন্যাস। 'জঙলী' নামে নাগাপাহাড়ের যে চমৎকার গল্প লিখেছেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাতে কোনো কিম্ভূতকাহিনী মেশানো নেই। শ্যামদেশের পাহাড়ে গোপন জাপানীদুর্গ রচনার রহস্যময় কাহিনী, প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ড্রাগানের নিশ্বাস' বইটি এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। রহস্যের গল্পবলায় এঁদের কৃতিত্ব আছে। ছেলেদের জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র উনবিংশ শতাব্দীর মজার এক রাশিয়ান ছড়া অনুবাদ করেছিলেন 'কুমির কুমির' নামে। বইটি ছবিতে ভরা। আর একই মজার বই 'বুদ্ধুভুতুমের গল্প'॥

বুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি 'উনস্কো'-র কাজ নিয়ে নয়াদিল্লীতে গেছেন। এবং চীনদেশ দেখে দেশে ফিরেছেন ঔপন্যাসিক মনোজ বসু। ভারত সরকারের কাজে ইস্তফা দিয়ে মুজতবা আলী সাহেব দেশবিদেশের পরে এই কলকাতায়।

তাজমহল বানিয়েছিলেন যে সম্রাট তাঁরই মহীয়সী বিদুষী কন্যা জহানআরা-র সুন্দরী জীবনী লিখেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক কারণে বইটি উল্লেখযোগ্য। এই সম্রাট-নন্দিনীর কবরশীর্ষে খোদাই করা আছে এক কবিতা: 'আমার সমাধি তৃণ ভিন্ন আর কোনো আবরণে আবৃত কোরো না। দীন-আত্মার সমাধি আবরণে তৃণই যথেষ্ট।'

তিনি ছিলেন যুগ-সম্রাজ্ঞী—'সাহিবৎ-উজ্-জমানী'॥






# নিশ্চিত নির্ভর -----

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

## ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# পনের বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়েদেরই সব চেয়ে বেশী ম্যালেরিয়া হয়

জাতির পক্ষে ম্যালেরিয়া যে কী নিদারুণ বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা এই মর্মান্তিক তথ্য থেকেই বোঝা যায়।

বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের যে বয়সটি ঠিক তাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্য ও মনোবৃত্তি গড়ে তোলবার সময় ঠিক তখনই তাদের দেহ ও মন ভেঙ্গে দেয় এই ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া থেকে শিশুদের বাঁচাবার চেষ্টা না করা মানে দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক পরিবার, এমন কি সমগ্র জাতির ভবিষ্যৎকে চরম ঔদাসীন্যে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া। এ শুধু অবহেলা নয়, ভয়ানক অপরাধ।

এই জন্যই বিশেষভাবে বলছি, 'প্যালুড্রিন'এর সাহায্যে ম্যালেরিয়ার হাত থেকে শিশুদের বাঁচান, আর নিজেও বাঁচুন। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে — এমন কি আসন্ন প্রসবারাও নির্ভয়ে নিয়মিতভাবে 'প্যালুড্রিন' খেতে পারে — কোন অনিষ্টের ভয় নেই। সেবনবিধি নীচে দেওয়া হল।

### ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি ?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে স্বচ্ছ কাগজের বন্ধ মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।



## 'প্যালুড্রিন'

*ম্যালেরিয়ার যম*

**সেবন বিধি**

জ্বর অবস্থায় ঃ পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের ওপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

জ্বর প্রতিরোধের জন্য ঃ উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

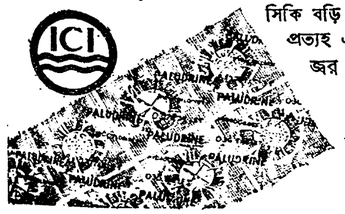


মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল (বা দুধ) খেতে হয়।

**ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ**

# পূর্ব্বাশা

## পৌষ—১৩৫৯

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| শকুন্তলার জন্য : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৪৫০ |
| পুরীর সমুদ্র : পরমেশ ধর | ... | ৪৫২ |
| স্বরচিত : অরবিন্দ গুহ | ... | ৪৫৩ |
| মেমোরিয়ালের লনে : শ্রীদুলাল দাস | ... | ৪৫৪ |
| স্বগত : দীপংকর দাশগুপ্ত | ... | ৪৫৫ |
| অসময়ের কাব্য : শ্যামল দত্ত | ... | ৪৫৬ |
| অসহ্য বিকাল : আলোক সরকার | ... | ৪৫৭ |
| বিবাহিতা স্ত্রী : প্রতিভা বসু | ... | ৪৫৮ |
| লেখক ও সাহিত্য : তারাপদ গংগোপাধ্যায় | ... | ৪৬৮ |
| সুকন্যা : শংকর চট্টোপাধ্যায় | ... | ৪৭৩ |
| সাহিত্য ও ইতিহাস : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৪৮১ |
| খল : সুকোমল দত্ত | ... | ৪৮৮ |
| নূতন-বই : অরুণ ভট্টাচার্য | ... | ৪৯৫ |
| অমল দত্ত | ... | ৪৯৬ |



**প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস**

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯


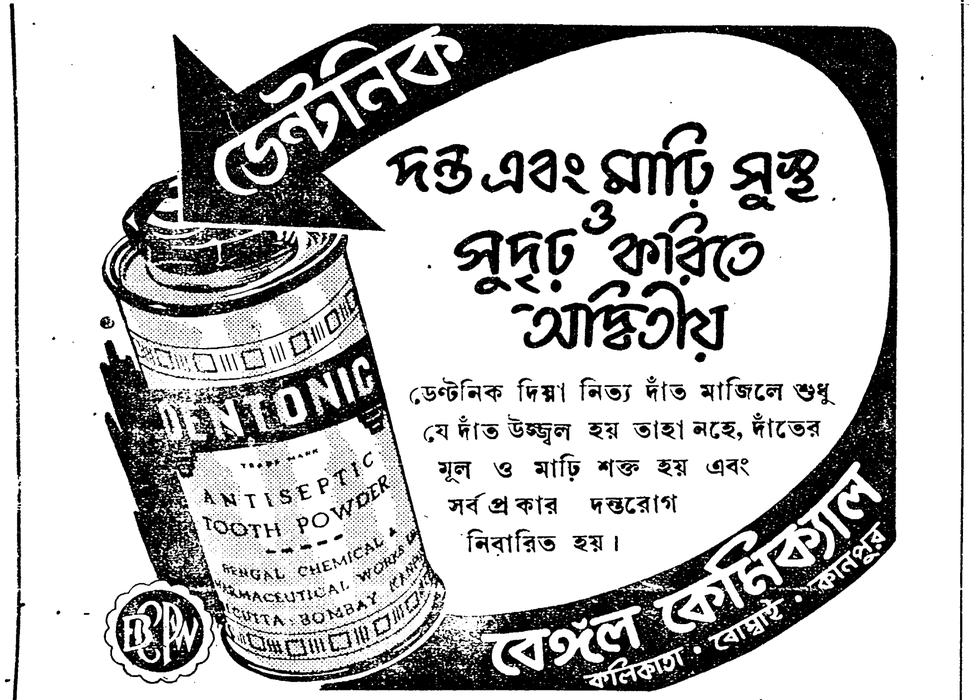


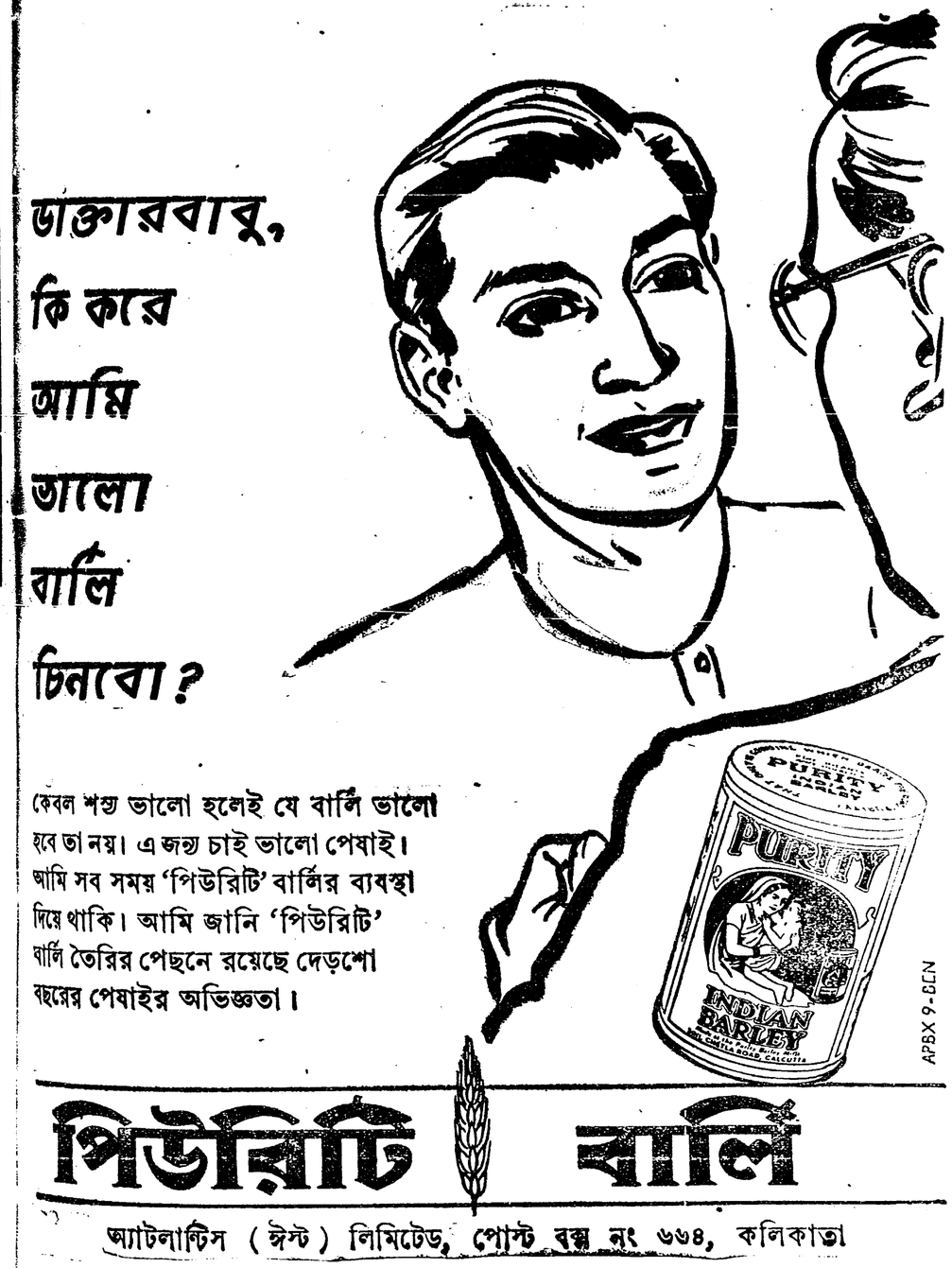

# নূতন রেকর্ড

"HIS MASTER'S VOICE"
The Hallmark of Quality

গ্রামোফোন মেসিন
এখন আবার পাওয়া যাচ্ছে
মডেল ৮৮ — ১৭০৲
মডেল ১০২ — ২৫০৲

**শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়**

N 82526 { বৃন্দাবন বিলাসিনী রাই আমাদের
কালিন্দী পুলিন বনে—কীর্ত্তন

**আব্বাসউদ্দীন আহম্মদ**

N 19738 { ও ভাই মোর গাঁওয়ালিয়ারে
এলা দিনের বা গতিক—ভাওয়াইয়া

**তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

N 82540 { মিলন বসন্তের দিন ফুরালো
বসন্ত মোর আসবে যেদিন—আধুনিক

**কুমারী প্রগতি সরকার**

N 82544 { মোর সোনা ছাপিয়া
আই মোক ব্যাচেয়া খাহে—ভাওয়াইয়া

**কুমারী বাণী ঘোষাল**

N 82542 { হায় চাঁদ তুমি শুধু জানো
আকাশে চাঁদ জাগে—আধুনিক

**রঞ্জিত রায় ও সবিতা চট্টোপাধ্যায়**

N 82543 { কত রকম হাসি
কত রকম কান্না—কৌতুক

**বিরজা সেন (মানু)**

N 82545 { ও নাগর কানাইরে
ও কানাইরে—ভাওয়াইয়া

**হিজ মাষ্টার্স ভয়েস**

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ—কলিকাতা - বোম্বাই - দিল্লী - মাদ্রাজ।



" 'অপ্রেম ও প্রেম' নতুন করে এ-কথাই প্রমাণ করল যে বাংলা লিরিকের কারুশিল্পে যাঁরা এখন অগ্রণী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাদেরই অন্যতম।"
বুদ্ধদেব বসুর এ-কথার পর আমরা বলছি 'অপ্রেম ও প্রেম' বাংলা কবিতার এমন একটি বই যার প্রথম সংস্করণ তিন মাসেই নিঃশেষিত।




দাম এক টাকা

তরুণতম কবির অন্যতম বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন: "জীবনানন্দের মৌলিকতা অবিসংবাদিত কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের মনোজ্ঞতাও অনস্বীকার্য্য একথাও স্পষ্ট করে জোর গলায় বলার সময় এসেছে এইবার।"
তরুণতম কাব্য-সমালোচক নিখিলকুমার নন্দী বলছেন: "...'তিমিরাগ্নি'—এ কবিতার আশ্চর্য্য শব্দধ্বনি বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব ঘটনা।"

পূর্ব্বাশা লিঃ প্রকাশক
৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা



# মার্গোসোপ




নিমের সুগন্ধি টয়লেট সাবান। দেহের মালিন্য মুক্ত করে; বর্ণ উজ্জ্বল করে।

★




## ভৃঙ্গল...

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ ও কুঞ্চিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

★




## লাবণি স্নো ও ক্রীম

মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য্য।



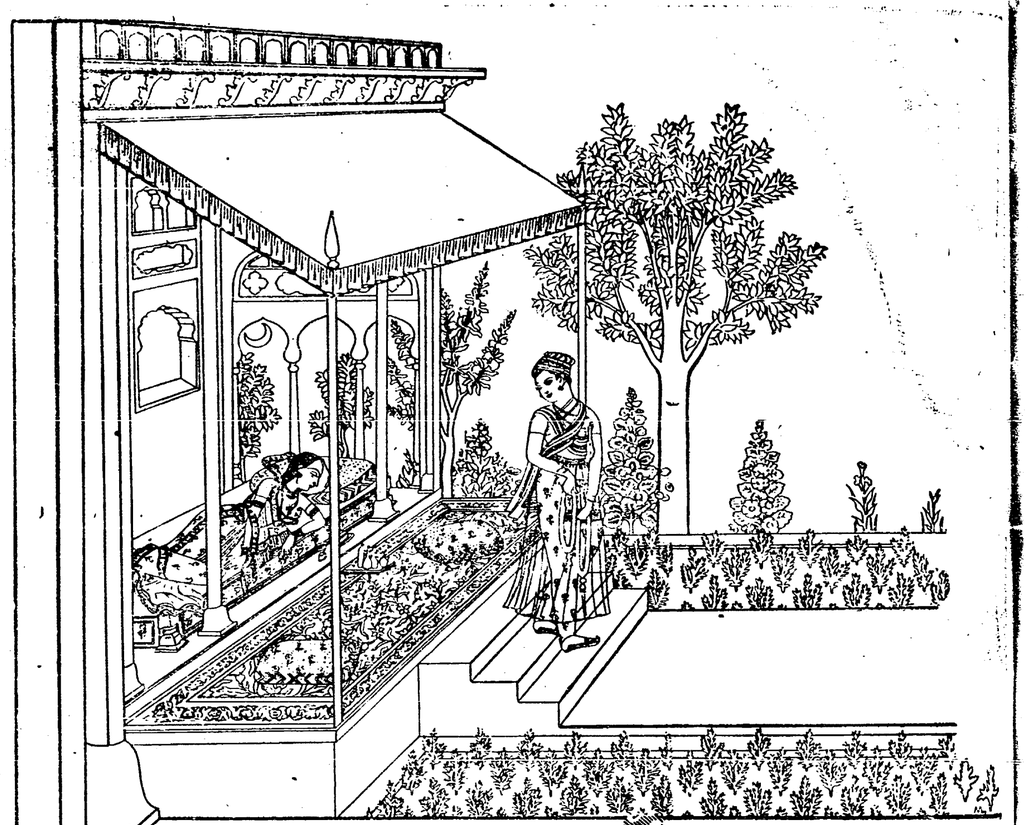


ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিনীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে। দিনরজনীর বিচিত্র পরিবেশে সুরসৃষ্টির আবেদনটি এই রূপায়নে মূর্ত হয়ে আছে।

চা

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, সঙ্গ দিয়েছে, দিয়েছে নব নব প্রেরণা।

CTB 103

ললিত

প্রভাতের একটি সুললিত রাগিনী। উপরের আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। দিবা ও রাত্রির চির-বিরহমধুর সন্ধিক্ষণটি ললিতের মূর্চ্ছনায় মূর্ত হয়ে আছে।

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত



পূর্ব্বাশা

পঞ্চদশ বর্ষ
পৌষ — ১৩৫৯


কবিতাগুচ্ছ

## শকুন্তলার জন্যে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

[ এক ]

বলো তমালিকা তোমার তনু কি তমাল তরু
আমার মনে তা বনরাজি নীলা আনতে পারে ?
তেমন কান্তা হয়ে আর কেউ কাঁদতে পারে ?
হরিৎ হলুদ হরিয়াল পাখী পার হতে পারো সাহারা মরু ?
কেন তবে আর কমলের সাধ কও বালিকা,
নও তুমি ফুল 'নওমালিকা',
কলিকার কেন অলি নিতে যাওয়া
বনের হাওয়ার মন পেতে চাওয়া ?
জলে ভাসে না ত কখনো শিলা !
উত্তাল ঢেউ তা-ও যদি হতে, তা-ত নয়, তুমি নম্র শীলা
ঊর্ম্মিলা লতা দুপুর-সূর্য্যে পুড়ে যেতে চাও সরযূর নারী যৌবনিকা
করযোড়ে দাও অঞ্জলি কর-পল্লবে নেই পদ্ম-লীলা
হাসে সমুদ্র রুদ্র, কোথায় মুদ্রা তোমার, সীমন্তিনীর শঙ্খে যায় কি বরুণ-হৃদয় পাওয়া !
কই পার্ব্বতী মেনকা-রম্ভা গীতি-ঊষা ঊর্ব্বশী কালোকেশী গিরিস্তনা
হিরণ্য হীরা মৃগশিরা কার নিকষিত-হেম প্রেম নিয়ে হবে অন্যমনা ?
হরিদ্রা-ক্ষারযোগে গৈরিকা কোথায় গোমতী সে-করভোরু ?

আকাশে অরুণ সাগরে বরুণ তুমি হও বোন কিরণমালা
আমি ঘুম-ঘুম অশোক চম্পা, পারুল-ঊষার সোনার থালা
চুমু দিয়ে ডাকো "জাগোরে", সেইত ভালো, না কি হবে বহ্নি ধূমই
বলো ত মালিকা বেলা সেঁজুতির, মলিন মালিনী কন্যা তুমি
কেন হতে চাও অহল্যা সীতা বন্যভূমি
কেন মনে-মনে মদনের মৃদু এ-রণজ্বালা
আঁখিতে প্রেমের আখরে মেঘের বিদ্যুৎশিখা হিরণমালা
মনোহরণের কৌশল কেন, মৌ-ক্ষরণের এ-মৌসুমি
অয়ি লাবণ্যে অরণ্যে কই তবে মধুপের জন্যে তোমার বরণডালা
সেখানে অরণি, শেষ হয়ে গেছে কুসুমাকরের হোলির রম্য রঙের পালা !

যাও তবে যাও পতিগৃহে যাও দুরবগাহিণী শকুন্তলা
আর্ত্তা রাত্রিভর্ত্তৃকা যাও এবার যাত্রা-সময় হ'ল
বিগ্রহে আজ বৈদেহী যদি মন-উতলা
কেন আর থাকো দুরভিগ্রহ এই বনমৃগে লগ্ন-গলা ?
এসেছে আগুন দুর্ব্বাসা ঋষি সোম-পায়ী নিশি-চন্দ্রকলা।
শুনছ উঞ্ছ আর্য্যপুত্রে সান্দ্র-কুট্ট প্রণয়-ছলা
হও সপত্ন পত্নী ভার্য্যা, দুষমন আর যমই বলো
উত্তরা নারী বিদ্যাধরীর তারাই রাধেয় কর্ণ কুন্তীপুত্র তারাই বৃহন্নলা
তারা শিখী আর বেণীবন্ধনে তুমি দ্রৌপদী স-কুন্তলা।
উজট-দুহিতা মণিকুট্টিম-ভয়কে ভোলো
অতিপিনদ্ধাবল্কলা বলো যমলে তুমি যে ষোড়শী পূর্ণা কলায় ষোল
বলো সে কমলকলির কাহিনী যা-ছিল গোপনে হয়নি বলা।
ইন্দ্রাণী-সচী হও বন-বালা, নবোঢ়া, নাবাল নীর-চঞ্চলা।

[ দুই ]

বসন্ত ফিরে আসবে আম্রে পলাশ-রেখায় বিলসিত হবে বালিকার বাঁকা ভুরু—
অভিমানে বুঝি বিম্বাধরার সুন্দর ঠোঁট পুরু
বসুন্ধরার স্তন-নিতম্ব গুরু।
আমি জানবনা মন যে তোমার কার দিকে উড়ু-উড়ু



গুঞ্জন করো কি নাম অতিথিপরভাবিনীর মতো
সেদিন লুপ্ত লুব্ধ চন্দ্র, পুনর্ব্বসুরা আনবে চান্দ্র-ব্রত
আবার তোমার, গজমোতিহারে স্বাতী-শতভিষা সরসী-নীলোৎপলা !

সেদিন, চকোরী, আমি বালুচর মর্ত্ত্য মরুভূ ধূ-ধূ
কুরুকটাহের গোবীর গভীর বলয় আমার বুকে
শ্বেতহাড় আমি নই আর পল্বল
বাল্মিকী নই, নিষাদ বিষাদ বিস্বাদ তেতো জল—
তমসার তীরে নেই কোনো নারী কিন্নরী সম্মুখে
সারি হয়ে আর কে ফেরাবে তার প্রাচীর প্রাচীন শুকে ?
বালুকা-বলীতে প্রিয়ংবদারা প্রেত, তবু ডাকে, 'হলা পিয় সহি হলা'
কোথায় সউন্দলা কোন্ দূর তীরন্দাজের দ্বীপে আজ পিঙ্গলা ?
এখানে সিন্ধু-হিন্দোল ইরাবতীর গাত্রে, ছায়ায় শিহরে বেলা
অয়শ্চক্রে বয়ে যায় কতো অকায় প্রহর-বেলা !

সঞ্চিত হয় তোমার স্মৃতির পদ্মাটিকাই শুধু—
দিগন্তময় ঝঞ্ঝার হিঙ্গুল—
হে জ্যোতিতামসী কোথায় অতীতা, ছড়ায়ে দিয়েছে চুল
কোথায় তোমার বুক কাঁপে দুরুদুরু ?
কোথায় কোথায় দোলে সমুদ্র ঝুলনে রাত্রি যেন ফণী-কুণ্ডলা
কখন স্বর্গে-মর্ত্ত্যে এমন সহমরণের খেলা !
মঞ্জুশরীরা, তখন আমার তৃষিত মনের যাত্রার হয় সুরু ॥

## পুরীর সমুদ্র

পরমেশ ধর

বাঁকাচুল মালতী তোমার কালো বাঁকাচুলে খেলা করে সাগরের ঢেউ।
আঁকাবাঁকা নদী আজ শ্রাবণের সামুদ্রিক লবণে বিলীন,
এই তো প্রত্যহ ঘটে অনুভবে পায় তাকে কয় জন ? কেউ
কি কৃষ্ণচূড়ার ভোরে স্বপ্নে ভাবে পউষের দিন ?

বালির পশমে নিত্য জমে এসে সামুদ্রিক জীবনের হাড়,
এখানে স্থবির মনে বাষ্পনীল দিগন্তের হরিয়াল পাখী
গানে গানে মৃত কত তারাকে ফোটায়,
—যে নদী ফিরেছে ঘরে আনে তার কথা : উপত্যকা ; মাঠ ; বন ; ঝোপ বাকী।
বাঁকাচুল, সাগরের ঢেউ আজ খেলা করে বাঁকাচুলে মালতী তোমার।

চিল্কা চোখে সোনা ঝরে, চৈতীবুক ঢেউ হ'য়ে ভেঙ্গে যেতে চায় ;
এখানে নিশ্চুপ মন ; ক্লান্ত গান ; লুপ্ত বাক সন্ধ্যা ঝ'রে পড়ে।
এখানে অনেক লঘু স্বচ্ছ দিন স্বর্গের বৈভব বুঝি রোজই খুঁজে পায়
অনেক অবুঝ শিশু ভেসে যায় মাঝে মাঝে দিগন্তের গভীর সাগরে।
বাঁকাচুল, বাঁকাচুল, মালতী তোমার চুলে সাগরের ঢেউ খেলা করে।

## স্বরচিত

### অরবিন্দ গুহ

বনে বনে চিহ্ন পড়ে, যৌবনের চিত্র-রূপা দ্যুতি ;
আমার হৃদয়ে দীপ্ত দস্যুতার উজ্জ্বল প্রস্তুতি।
হে সূর্য, হে বন্ধ্যা অন্ধকার,
আমাকে পতঙ্গ করো অনির্বাণ অগ্নি-কামনার।

আমার আঘাতে এই শরীরের সর্বস্ব আহত,
ঢেউয়ের প্রহারে আমি স্তব্ধ শ্বেতসমুদ্রের মতো।
হে বিহঙ্গ, বিহঙ্গের ডানা,
আমার তুষারে আজ দীর্ণ হবে সমুদ্র-সীমানা।

সহস্র অরণ্য আমি কৃষ্ণচূড়া অগ্নি হ'য়ে জ্বালি ;
আমার স্মৃতির স্বপ্ন,—কার্তিকের শ্মশান-দীপালি।



হে পৃথিবী, রাত্রির পৃথিবী,
আমার প্রেমের নামে তুমিও তো অনিবদ্ধনীবি।

আদিগন্ত অন্তহীন মৃত্তিকার তৃষ্ণার ফাটলে
গ্রীষ্মের সূর্যের মতো, অন্তরের প্রান্তে যাবো চ'লে।
হে মৃত্তিকা, হে গূঢ় অনামী,
তোমাকে জ্বালাবো তবু তার বেশি জ্ব'লে যাবো আমি।

## মেমোরিয়ালের লনে—

### শ্রীদুলাল দাস

আকাশের কোলে এক ফালি চাঁদ একটুখানি ছায়া
মেমোরিয়ালের চিক্‌নাই-লনে কী-রঙ ছড়ালো যেন ;
বন্ধ্যা প্রাণের অধীর আবেগে স্বপ্নরা পেলো কায়া
ছায়া-ছন্দিত সন্ধ্যায় বসে শুধু শুধু ভাবো কেন !

এক ফালি ঘর একটু দালান জোড়াতালি-দেয়া মন
মামুলি প্লটের ছক কাটা ঘরে পায়নি কখনো ছাড়া।
খয়রাতি প্রাণ যদি-বা পাঠালো দুটো-হাসিখুসি-ক্ষণ
তবু ভেবে মরে কী-লাভ বলো তো—এখনো কাজের তাড়া ?

পাইন শীর্ষে বাঁকা চাঁদ থামে রাতের পাহারাদার,
পথদিশা ভুলে থেমেছে আমার ময়ূরপংখী-মন ;

বাসনা খানিক রেখে যেতে চাই হোক-না রাত কাবার
ফিকে হয়ে ওঠে মেমোরিয়ালের চিকন সবুজ লন।

মায়াময় মোর স্বপ্ন মারীচ এখানেও মাথা কুটে।
মেমোরিয়ালের সান্ধ্য ছায়ায় হায় কালো ঘাম ছুটে!

## স্বগত

দীপংকর দাশগুপ্ত

মালবিকা,
তুমি নীল
অতলান্ত
সমুদ্র উর্মিল।

কান্না যার
জীবনে সম্বল
তুমি তার
বেদনার
পঙ্কে নীলোৎপল।

শুভ্র হাঁস
আকাশের,
আর তুমি
অনন্ত আকাশ—



এত শান্ত স্থির,
এমন অস্থির॥

## অসময়ের কাব্য

[ একটি দীর্ঘ অসমাপ্ত কবিতার অংশ ]

শ্যামল দত্ত

সব কাজ ফেলে রেখে
আজ শুধু ছুটি পেতে চাই।
দীর্ঘ ছুটি। মৃত্যুর মতন দীর্ঘ ঃ
যে ছুটির শেষ নাই-নাই।

সমস্ত দিনের শেষে
ক্লান্ত হ'য়ে ফিরে আসি ঘরে
অন্ধকার তিক্ত সেই জীবনের আদিম গহ্বরে।
তখনই এ ক্লান্ত প্রাণ
অনন্ত রাত্রির কাছে
ছুটি চায়
মৃত্যুর মতন।
ঃ ছুটি দাও।
আমাকে নিষ্কৃতি দাও
হে রাত্রি, হে জীবন, হে মহৎমরণ।

আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে
অনেক হেঁটেছি আমি

পথে পথে
সময়ের হাতে-হাত ধ'রে।
অনেক ঘুরেছি আমি নগরে-বন্দরে
দেশে দেশে
সঞ্জীবনী ক'রে অন্বেষণ।
আজ বড় ক্লান্ত। বড় ক্লান্ত আজ।
আজ শুধু নীড় খোঁজে পলাতক মন।

## অসহ্য বিকাল

আলোক সরকার

বুঝি আর কিছু নেই স্মৃতির মতন ক্ষমাহীন
ফাল্গুনের অসহ্য বিকালে।
ঝাঁকে ঝাঁকে হাওয়া আসে—হাওয়া যেন বৃষ্টির উত্তালে।
তীব্র শর, তিক্ত শর। সে অপরিশোধনীয় ঋণ
কোন পথে মুক্ত হবো? কোন অঙ্গীকারে? কোন মিথ্যার আড়ালে?
জলের ছায়ার মতো ম্লান মুখ, আবছায়া দিন
নিষ্ঠুর কৌতুকে আনে ক্ষমাহীন ফাল্গুনের অসহ্য বিকাল।

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

পৃথিবীর রং বদলে গেল।

ঠাণ্ডা মেঝের উপর জ্বলন্ত বুকটা চেপে হিরণ্ময়ী ভাবলেন একজন মানুষের হৃদযন্ত্র বন্ধ হ'লে আরেকজন মানুষ বেঁচে থাকে কেমন ক'রে যদি তারা অভিন্ন হৃদয়ই হয়। কালো কালো রক্তশোষা বাদুরের লক্ষ-লক্ষ ডানা আটসাট নোখে আঁকড়ে ধরলো হৃৎপিণ্ডটা। অন্যসব চিন্তা মুছে গেল হৃদয় থেকে, সব স্বাদ, সব সাধ, মুহূর্ত্তে চুকে গেল, সাদা কাপড়ের আঁচলে সাদা সিঁথি ঢেকে স্তব্ধ হ'য়ে পড়ে রইলেন। সুনির্মল নিঃশব্দে বসে রইলো কাছে, তাকিয়ে রইলো মার স্বর্ণশঙ্খহীন দু'টি হাতের দিকে, চিরদিনের টুক্‌টুকে সিঁথির সাদা মরুভূমিতে, কপালের ছোট একটি সাদা গোল দাগের দিকে। বছরের পর বছর সিঁদুর পরে পরে এই রকম ছোট্ট একটি চাঁদ জন্মেছে সেখানে। চোখ জ্বালা ক'রে ওঠে, বাবার শোক দ্বিগুণিত হ'য়ে হাতুড়ির আঘাত দেয় বুকের পাঁজরে।

আশ্চর্য্য! এরমধ্যে হঠাৎ একদিন প্রমীলা এসে উপস্থিত। কে তাকে খবর দিয়েছে কে জানে, নিজে থেকেই এসেছে সে, স্বয়ং তার বাবাই তাকে নিয়ে এসেছেন সঙ্গে ক'রে।

কারোই মনে ছিলো না তার কথা, প্রমীলা নামে কারু সঙ্গে যে একটা ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ স্থাপিত হ'য়েছিল একদিন তাদের সঙ্গে এ সত্যটুকুও যেন মুছে গিয়েছিলো মন থেকে। কিন্তু তবু সে এলো। এসেই চোখে আঁচল চাপা দিয়ে শাশুড়ির পায়ের উপর মাথা রাখলো আর যজ্ঞেশ্বর গলায় চাদর পাকিয়ে আদ্দেক আনত হ'য়ে বৈষ্ণবভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে কোচার খুঁটে চোখের জল মুছলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটা শূণ্য দৃষ্টি নিয়ে, শূণ্য মনে লক্ষ্মীর মতো টুক্‌টুকে হিরণ্ময়ী সাদা ধবধবে কপাল আর সাদা কাপড় নিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে রইলেন অবনত, দুঃখিত দু'টি মানুষের দিকে। তারপর সহসা আকুল আগ্রহে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন বৌকে। তাইতো! তাইতো! যেন হঠাৎ মনে পড়লো কথাটা রাজেনবাবুই না একদিন নির্ব্বাচন

করেছিলেন এই মেয়েটিকে। কত সখ ক'রে কত ভালোবেসে ঘরে এনেছিলেন। কত সাধ, কত আকাঙ্ক্ষার প্রতিমা তাঁর এই বৌ। তবে এই বৌকে তিনি আজ ফেলবেন কেমন ক'রে? এই তো আজ সে ফিরে এসেছে, নিজে থেকেই চলে এসেছে দুঃখের দিনে, এইতো পায়ের উপর এখনো তার চোখের জলের সিক্ত ফোঁটা।

তবে নাকি ওর বুদ্ধি নেই, জ্ঞান নেই, হৃদয় নেই? আর তাই নিয়ে কত দুঃখ, কত গঞ্জনা দিয়েছেন তিনি তাঁকে? নির্বোধের মত সাদা রং দেখে নিয়ে এসেছেন বলে কত অভিযোগই করেছেন। চুপচাপ চেয়ারে বসে চুরুট টানতেন, জবাব দিতেন না, কখনো সখনো কিছু বলতে চেষ্টা করলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন হিরণ্ময়ী। এ বিষয়ে তার ধৈর্য্য ছিলোনা। সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে ছেলের জীবনটা মাটি করলেন বলে এমন একটা দুঃখ অনুভব করতেন মনে মনে যে স্বামীর উপর ভীষণ অভিমান হ'তো তাঁর। আর তাই নিয়ে কত লজ্জা, কত দুঃখ তিনি পেয়ে গেছেন এই শেষের কটা বছর।

মনের তলায় কোথায় যে কার কী দুর্বলতা থাকে কে জানে। সহসা একটা কথা মনে হ'য়ে যেন আঁৎকে উঠলেন হিরণ্ময়ী। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রমীলার নিচু করা মাথার লাল সিঁথির দিকে। তবে কি সেই অপরাধেই ঈশ্বর তাঁকে এই সাজা দিলেন? এক মেয়ের স্বামীকে অন্য মেয়ের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাতেই কি এমন দুর্ঘটনা ঘটলো? বৈধব্যের যন্ত্রণা কি তারই ফল? বুকফাঁটা আর্ত্তনাদে হা হা ক'রে কেঁদে উঠলেন তিনি। সব ধৈর্য্য, সব সহ্য, সব শালীনতা ছাপিয়ে সে কান্নার রোল ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে।

কান্না শুনে কোরা চাদর গায়ে, কোরা ধুতি পরনে খালি পায়ে বড় চুলে, সুনির্মল দোতলা থেকে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। দরজায় দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখে তাকালো মার দিকে, তাকালো শ্বশুর আর শ্বশুরের কন্যার দিকে, ভুরুতে কম্পন উঠলো একটি তারপর, আবার উঠে গেল দোতলায়। অভিসীমন্ত চোখোচোখি করলো। চার বছর আগে একজনের বয়স ছিলো এগারো আরেকজনের পনেরো। এখন এগারো পনেরো হ'য়েছে পনেরো উনিশ হ'য়েছে। সেই বয়সের সেই স্মৃতি দু'জনের মনেই দু'রকম আলোড়ন তুললো। ফিস্‌ফিসিয়ে বললো, বৌদি। রামচরণও এসে দাঁড়ালো দরজার কোণে, ছোট্ট চাকর অনভিজ্ঞ তারকের কানেকানে বললো 'বড় দাদাবাবুর বৌ।'

সন্ধ্যাবেলা বিনু এলো। একটুখানি থমকে গেল যেন প্রমীলাকে দেখে, তারপরেই আলাপ করলো স্বাভাবিক হ'য়ে। বৌদির বাবা বলে যজ্ঞেশ্বরের ফাটল-ধরা পায়ে প্রণামও করলো হাত বুলিয়ে। আড়ালে গিয়ে হাতটা ধুয়ে ফেললো সাবান দিয়ে। ধুতেই হ'লো কেননা যজ্ঞেশ্বরের পায়ের হাঁ করা ফাটলে যেন চিট্‌চিটে কী ছিলো মনে হ'লো বিনুর। রক্ত পূঁজ নাকি? এত ঘা কেন ভদ্রলোকের পায়ে ছোটোলোকের মত? তারপর উপরে এলো।



সুনির্মল কী লিখছিলো টেবিলের উপর নিচু হ'য়ে, মৃদু হেসে বললো 'এসো'।

খাটের উপর পা ঝুলিয়ে একটু চুপচাপ বসে রইলো বিনু। তারপর বললো, 'ওঁরা কখন এলেন?'

'কারা? ও।'

'বৌদিকে এই আমি প্রথম দেখছি।'

'তাই নাকি?'

'বিয়েয় সময় তো আমি আসতে পারিনি।'

'হুঁ'।

'কে নিয়ে এলো ওদের? তুমি?'

'না'।

'তবে?'

'নিজে থেকেই এসেছে।'

'নিজে থেকেই?' একটা যেন দীর্ঘশ্বাস চাপলো বিনু।

একটু পরে বললো 'বাড়ির বৌ এসময়েও যদি না আসবে তবে আর আসবে কখন।'

'তাইতো।'

'খবর পাঠিয়েছিলে বুঝি?'

'না।'

'কোথায় খবর পেলো?'

'জানিনে।'

এরপরে দু'জনেরই যেন আর কথা রইলোনা। সুনির্মল চুপচাপ এবার বন্ধ করতে লাগলো কলমের ক্যাপটা, আবার খুলতে লাললো। বিনুও বালিসের ওয়ার খুঁটলো একটু, আঙুলের আংটি খুললো দু'বার, কান চুলকোলো, মাথা চুলকোলো, তারপর বললো 'নিচে যাই এবার।'

বিনু উঠে গেলে সুনির্মলও উঠলো, ঘরের এই প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্তে গেল একবার, আবার ফিরে এলো, আবার গেলো, আবার এলো, থমকে দাঁড়ালো একটু, ছাতে এসে পাইচারি করলো খানিক, তারপর নিচে নেমে এসে সোজা বেরিয়ে এলো রাস্তায়।

রাত্তিরে এ ক'দিন মার ঘরে, মার পাশেই কম্বলের বিছানায় শুচ্ছিলো সুনির্মল। বাবার অশৌচ সে পুরোমাত্রাতেই পালন করছিলো। এ নিয়ে মনে যে তার কোনো

সংস্কার ছিলো তা নয়, গতানুগতিক করবার কাজ ক'রে যাচ্ছি তাও নয়, সকলে করে অতএব আমারও করা উচিত, তাও নয়; শাস্ত্রসম্মত নিয়ম পালন করলে পিতার কোনো সদ্গতি হবে স্বর্গে বা নরকে সে কথাও সে ভাবেনি। এ ভাবেই যেন তার শোকটা একটু প্রশমিত হবার উপায় খুঁজছিলো। এই শারীরিক কষ্ট বহনেই যেন অনেকটা লাঘব হচ্ছিলো তার মনের কষ্ট। সে পুরুষ মানুষ, জোরে জোরে কান্না তার আসেনা; উপরন্তু সে-ই তো এখন এ বাড়ির কর্ত্তা, রক্ষণাবেক্ষণে তারই এখন তার পিতার মর্যাদা, অতএব মন খারাপ ক'রে একটুও শুয়েও থাকতে পারেনা চুপচাপ। উঠ্‌তে হয়, হাঁটতে হয়, খাটতে হয়, দেখতে হয়, এমন কি বাড়ির এই দমবন্ধ করা শোকার্ত্ত আবহাওয়াকে একটু লঘু করবার জন্য হাসতেও হয় মুখের পেশী নাড়িয়ে। সময় কই তার শোক করবার? সে শোকার্ত্ত হ'লে ভাই দু'টি কী করবে? মা শান্ত হবেন কেমন ক'রে? কিন্তু দুঃখের বাষ্প তো আর জমে থাকতে পারেনা মনের মধ্যে, বেরুবার রন্ধ্র চাই তার। সুনির্মলের এই ছিলো শোকের রন্ধ্র।

ফলমূল সেদিন রাত্রে প্রমীলাই কেটে দিল। যজ্ঞেশ্বর বসে থেকে তদারক করলেন, 'এটা খাও, ওটা খাও'। প্রমীলাকে নির্দেশ দিলেন নানারকম। তারপর শুতে গেলেন উপরের ঘরে। প্রমীলাও কাজ সেরে উঠে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে।

অভিসীমন্ত আজ এ ঘরে শোবে, কেননা যজ্ঞেশ্বর তাদের ঘরে। সুনির্মল ঘরের চারদিকে তাকালো, 'আমার কম্বল কই মা?'

'উপরে নিয়ে গেছে প্রমীলা।'

'উপরে? উপরে কেন?'

'তুই আজ উপরের ঘরেই শুবি। ওরা তো শুচ্ছে এখানে।'

'আমি আজ উপরে শো'ব?'

'তা ছাড়া আর জায়গা কই বাবা? তোর ঘরের মেঝেতে তোকে বিছানা পেতে দিতে বলেছি। তাই ভ'ল। হাজার হোক এখানে এই একতলার মেঝেতে রোজ রোজ একটা কম্বল বিছিয়ে শুয়ে শেষে একদিন একটা ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লেগে অসুখ বাধাবি।'

'হঠাৎ কি আজই তোমার মনে পড়লো সে কথা?'

একটু চুপ ক'রে রইলেন হিরণ্ময়ী। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'যা শো গিয়ে। এতদিন বাদে ওরা এলো, একটা কথাবার্ত্তাও তো আছে?'

সুনির্মল স্তব্ধ হ'লো। গুম্ হ'য়ে রইলো অনেকক্ষণ—তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। দোতলায়ই উঠে এলো সে, কিন্তু ঘরে ঢুকলোনা, এলো ছাতে। অভিসীমন্তর ঘরে আলো জ্বলছে, টেবল ল্যাম্পের সবুজ শেড্ ঢাকা মৃদুমৃদু ঝাপসা আলো।



একটু একটু কথা ভেসে আস্‌ছে কানে, কখনো যজ্ঞেশ্বরের, কখনো প্রমীলার। বাপে মেয়েতে কথা বল্‌ছে আস্তে আস্তে। সেদিক থেকে সরে এসে এদিকের কোণে বসলো সুনির্মল, একটা সিগারেট ধরালো।

হাতের উপর মাথা রেখে, ছাতের সেই খস্‌খসে মেঝেতেই লম্বা হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলো বোধহয়। একটা ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। মাথার কাছে বসে প্রমীলা ঠেলছে তাকে, 'একি! এখানে শুয়েছ কেন। ঘরে চল।' চোখ তাকিয়ে মুহূর্ত্তকাল চুপ ক'রে রইলো সুনির্মল, তারপর বললো 'না'।

'না মানে, ঠাণ্ডা লাগবে না?'

'না'

'তা হ'লে এখানেই কম্বলটা বালিসটা নিয়ে আসি।'

'না'

'না না না' বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো প্রমীলা। তারপরেই আবার সামলে নিয়ে অন্য গলায় বললো 'তা হ'লে আমিও এখানেই শুই।'

'তুমি কেন এখানে শোবে?'

'তুমি শুয়েছ আর আমি শুতে পারবোনা?' একটু যেন আবদার-আবদার শোনালো গলাটা। তারপর উঠে গেল ঘরের মধ্যে, আবার একটু পরেই ফিরে এলো একটা পাটি আর বালিশ নিয়ে।

সুনির্মলের গা ঘেষে শুয়ে বললো 'এতোদিন পরে এলাম আর একটা কথাও বলছোনা?'

সুনির্মল সরে গেল, একটু জবাব দিল না।

'বাপ মরলে কি বৌর সঙ্গে কথা বলতেও বারণ?'

'অশৌচ হ'লে একসঙ্গে শোয়া অন্তত বারণ, তা তোমার জানা উচিত ছিলো।'

'ইঃ! সে বারণ যেন কেউ-ই মানে। আমার ঠাকুমা মরলো না দেশের বাড়িতে? খবর পেয়ে বাবাতো দড়া গলায় দিলেন, খড়ের গাদার উপর কম্বল বিছিয়ে আলাদা বিছানা পাতলেন, আমি মার সঙ্গে কোণের ঘরে গিয়ে শুলুম। ওমা রাত্তিরে একঘুম দিয়ে উঠে দেখি কি বাবাতো শুয়ে আছেন মার পাশে। ওরকম দেখিয়ে দেখিয়ে সকলেই আলগা থাকে, রাত হ'লেই একসঙ্গে শোয়।'

দাঁতে কাঁকর পড়লো। শিহরিত হ'য়ে উঠে বসলো সুনির্মল। বললো 'ঘুমুতে দাও।'

'চার বছরই তো নিশ্চিন্দি হ'য়ে ঘুমুলে, এখন না হয় একটু জেগেই থাক।' স্বামীর

কাছে নিবিড় হ'য়ে এলো সে, একখানা হাত ছড়িয়ে দিল কোলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মত সরে বসলো সুনির্মল 'ও কী ?'

প্রমীলাও তীরের মতো উঠে বসে সরে এলো কাছে, 'কী তাকি তোমার জানা নেই ?'

'ঘরে গিয়ে শোও।'

'কেন এখানে বাধা কী ?'

'আমাকে ঘুমুতে দাও।'

'আমি থাকলে ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাকি তোমার ?'

'হ্যাঁ।'

'সন্ন্যেসী হ'য়েছ নাকি ?'

'বাজে কথা থাক্, তুমি যাও।'

'যদি না যাই ?'

'আমাকেই যেতে হবে।'

'এত !'

সুনির্মল উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো তারপর আলসের কাছে এসে ধোঁয়া ছাড়লো।

'শোনো—' সবেগে এগিয়ে এলো প্রমীলা, 'আমি তোমার স্ত্রী মনে রেখো।'

'মনে আছে।'

'ভেবোনা কিছু জানিনে, কিছু বুঝিনে, কিছুই আমার কানে যায়নি।'

সুনির্মল চুপ।

'দিদিমা সব বলেছেন গিয়ে। ভেবেছিলে চুপে চুপে, ডুবে ডুবে জল খাবে আর একাদশীর বাপেও জানতে পারবে না সে কথা, না ?

ধোঁয়ার কুয়াসা তুলতে লাগলো সুনির্মল।

'কী ? কথা বলছোনা কেন ?'

'কী বলবো ?'

'হৃদয়েশ্বরীর নামটা কি শুনিনি।'

'ভদ্রভাবে কথা বল।'

'ওরে আমার ভদ্ররে—ভদ্দরনোকের এটোপাতরে। বিয়ে করা বৌ ফেলে যে মিন্‌সে আরেকটা মাগীর পিছে পিছে—'

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে কোথা থেকে যে যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে এলেন কে জানে। ছায়া হ'য়ে তিনি কি এতোক্ষণ মেয়ে-জামায়ের কথা শুনছিলেন উঁকি মেরে চুপিচুপি ?

'এই যে বাবা, ঘুম হচ্ছিলোনা, পাইচারি করছিলাম ছাতে' মেয়ের কাছে এসে : 'ও



সব হচ্ছে কি পেমী শুনি ? কী সব যা তা বলছিস্ দেবতার মতো মানুষটাকে। আর বোলনা আমার মামীর কাণ্ড। কোথা থেকে কী সব বাজে কথা শোনে আর লাগায় গিয়ে ওখানে। অমন কানভাঙানি দু'জন হয় না। একদিন গিয়ে কী যে সব ফুসমন্তর কানে দিল সেই থেকে ওর যেন মাথা খারাপ হ'য়ে আছে। আর তাতো হবেই, কী বল এ্যাঁ ? বলে কি-না রাজেনবাবু আবার বিয়ে দিচ্ছেন তার ছেলেকে !' হা, হা, করে হেসে উঠলেন তিনি : 'আমিও বলেছি, আর যার সম্বন্ধেই যাই বল, আমার বেয়াই সম্বন্ধে টু শব্দটি কোরোনা। তোমার চেয়ে তাকে আমি ভালো জানি।'

সুনির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা গুনলো।

'আয়, আয়, ঘরে আয়' মেয়ের হাত ধরে টানলেন যজ্ঞেশ্বর 'ওর মন মেজাজ ভালো না, কেবল মিছি মিছি বিরক্ত করা। নাও বাবাজী, শান্ত হ'য়ে ঘুমোও তুমি। কম্বলটা কই ? কম্বলটা এনে পেতে দে দেখি তাড়াতাড়ি।'

মন্ত্র-পড়া সাপের মতো ধীরে ধীরে বাপের সঙ্গে হেঁটে গেল প্রমীলা।

২

যজ্ঞেশ্বর বললেন 'তা হ'লে কি এই আমি শিখিয়ে পড়িয়ে আনলাম ? এসেই তুই ঝগড়া বাধালি ?'

'বাধাবোনা ? ও কি রকম করলো আমার সঙ্গে তাতো তুমি দেখোনি ?'

'দেখেছি, সবই দেখেছি কিন্তু তুমি যদি এরকম রগচটা হও তা হ'লে পড়ে থাকো এখানে আমি চল্লাম।'

ফোঁস ফোঁস ক'রে কেঁদে উঠ্‌লো প্রমীলা, 'আমি কি ঝগড়া ক'রেছি নাকি ? ও-ই তো প্রথমে—'

'সে সব আমি শুনতে চাইনে, মোটমাট তোমাকে এর চেয়ে আরো অনেক বেশী বুঝেসুঝে চলতে হবে, অনেক বেশী শান্ত হ'তে হবে। শোনো—'

নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন তিনি। মনোযোগে সব শুনলো প্রমীলা, সব বুঝলো, সব হৃদয়ঙ্গম করলো। বাপের কথা কবেই বা সে শোনেনি ? বোঝেনি ? ছোট্ট থেকে সে তো তাঁকেই বুঝে বুঝে এতো বড়ো হ'লো ; তার সংসারেই তো হাত পাকিয়ে এলো এই চার বছর। বাপের উপর এক কাঠি হ'য়ে চোদ্দ ভরির হার গড়ালো, মকরমুখ বালা গড়ালো, নিজের আলাদা ট্রাঙ্কের তলায় পাত্‌ পাত্‌ ক'রে সাজিয়ে রাখলো সাতশো

টাকার নোট। কারবার কি শুধু তার বাবাই করতে জানেন? টাকা জমানোতে কি একমাত্র তার বাবারই অদ্বিতীয় প্রতিভা?

কই, তাঁর মা মরা ভাগ্নেটিকে কি তিনি এতোদিন তাড়াতে পেরেছিলেন বাড়ি থেকে? মানদা ঠান্‌দি কি সে বাড়ি ছাড়তো যদি না প্রমীলা এ চারবছর থাকতো গিয়ে তার বাপের ঘরে? ঠিকই, যজ্ঞেশ্বরও যা পারেনি, প্রমীলা তা পেরেছে। এই মানদা বুড়িই একদিন সেই ঝড় বাদলের অন্ধকার রাত্রে প্রমীলাকে পৃথিবীর আলোতে টেনে এনেছিলো, এই বৃদ্ধা আত্মীয়াটিই সেদিন নাড়ি কেটে দু'ভাগ ক'রে দিয়েছিলো তাদের মা আর মেয়েকে। কোলে কাঁখে ক'রে মায়ের মত ভালোবেসে মানুষ করেছিলো। সারা গায়ে বারো মাস কেমন ঘা থাকতো প্রমীলার, পুঁজে থিক্ থিক্ করতো, আর যন্ত্রণায় অহোরাত্র কাঁদতো সে। সুধাময়ী শান্ত করতে পারতেন না, সারারাত সারাদিন এক ঠায় কোলে নিয়ে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হ'য়ে ফেলে দিতেন বিছানায়, বিরক্তিতে, অবসাদে, দুঃখে মেয়ের মৃত্যু কামনা করতেন মা হ'য়ে, আর তখন এই বৃদ্ধাই তাকে সাপটে বুকে তুলে নিত, নিজের ঘরে নিয়ে এসে হাঁটুতে শুইয়ে শান্ত করতো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, নিজের শুকনো স্তন গুঁজে দিতো মুখে। না ঘুমিয়ে জেগে থাকতো সারারাত।

তাতে কী? গণ্ডেপিণ্ডে গিলবে বসে বসে আর এটুকুও করবে না? মা বলেছিলেন 'এখন এই অসহায় বুড়োমানুষটা এই দুরন্ত মাঘের শীতে কোথায় যাবে? কে আছে তার?' মাকে মুখ নেড়ে নেড়ে দশ কথা শুনিয়ে দিয়েছিলো প্রমীলা। মা মানুষটা যেন কেমন! টাকাকড়ির উপর একটু যদি মমতা থাকতো! তা হলে কি বছরের পর বছর এই পুষ্যিগুলোকে খাওয়ায় বসিয়ে বসিয়ে? মার জন্যেই তো এগুলো আছে, তা নৈলে বাবার কি ইচ্ছে করে এভাবে পয়সাগুলো জলে ফেলতে? কপাল চাপড়ায় মনে মনে 'ঈস্ আরো দশ বছর আগে কেন জন্মালাম না আমি তা হ'লে তো সেই দশটা বছরের ভাত কাপড়টাও বাঁচাতে পারতাম! মা এসবের কী বুঝবেন? টাকা কি তার বাবার? বাবার মৃত্যুর পরে এ টাকার মালিক কি তিনি হবেন? যদ্দিন যজ্ঞেশ্বর জীবিত আছেন তদ্দিনই সব ধানাই পানাই। তারপর? তারপরতো ঐটুকু নেড়ে চেড়েই বাঁচতে হবে প্রমীলাকে।

পিসতুতো ভাইকে তার মার গয়নার হিসেব কী সুন্দর ভাবেই দিয়েছিলো। যজ্ঞেশ্বর পর্য্যন্ত থ' হয়ে গিয়েছিলেন মেয়ের অত চমৎকার পাটোয়ারী বুদ্ধিতে। চাল, ডাল, তেল, নুন, কয়লা, কাপড়, জামা, জুতো, সেলেট পেনসিল, ইস্কুলের হাফ ফ্রির মাইনে, অসুখ বিসুখ, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর হিসেব করলে কত দাঁড়ায়? ঐ ক'ভরি সোনা কি তারপরেও বসে থাকে সিন্দুকে? বরং হিসেব ক'রে দেখা গেল জমার চাইতে খরচের পাল্লাই ওজনে ভারি। টিনের রং চটা সুটকেসটির মধ্যে দু'টো ছেঁড়া প্যান্ট আর



দুটো হাফ সার্ট গুঁজে দিয়ে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে দিতে ক্রন্দনরত রাখালকে একথা বলতেও ভুললোনা প্রমীলা। যদি মানুষ হোস্, যদি বাপের ব্যাটা হোস্, তবে বাকী টাকাটা এসে শোধ ক'রে দিস্ চাকরী বাকরী ক'রে। সুধাময়ীর শরীরে মনে আর বাকী কিছুই ছিলোনা, তবু তাই নিয়েই সেদিন আহত সাপের মতো গর্জালেন অনেকক্ষণ, তারপর বিছানায় শুয়ে শুয়ে বালিশ ভিজোলেন। যজ্ঞেশ্বর ঘন গোঁফের আড়ালে হাসলো মেয়ের ক্ষমতা দেখে।

এরপরেও যদি কেউ প্রমাণ করে প্রমীলা বোকা, হাবা, তা হ'লে তাদেরই বুদ্ধি নেই ধরে নিতে হবে। কাজেই সেই বুদ্ধিমান প্রমীলা, তার বুদ্ধিমান বাবার কথা বুঝতে পারবেনা তা কি হয়? শ্বশুরের মৃত্যুখবর পেয়ে বরং তার বাবা বলবার আগে তারই মনে হ'য়েছিলো এখানে চলে আসবার কথাটা। যজ্ঞেশ্বরের মাসী, যিনি বরের মাসী আর কনের পিসী তিনিই দিয়েছিলেন খবরটা। শুধু তাই নয়, যে কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানেনা সে কথাও তিনি হিরণ্ময়ীর পেট থেকে টেনে বার ক'রে একখানায় দশখানা বানিয়ে যজ্ঞেশ্বরের বাড়িতে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছিলেন কয়েকদিন আগে।

'ও জগু শুনেছ?' কলকাতা থেকে বাসে চড়ে গিয়ে, পুরো এক ঘটি জল খেয়ে ঠোঁটে জিব বুলিয়ে বললেন তিনি।

'কী!'

'ব্যাটার যে আবার বিয়ে দিচ্ছে ওরা।'

সামনে কাঠের বাকসের উপর বালি কাগজের ফালিতে হিসেব লিখতে লিখতে চোখ তুললেন জগু, 'কার ব্যাটার?'

'তোমার জামায়ের কথা বলছি গো।'

'দিক'।

'দিক্ মানে? মেয়ের তো আর তুমি অন্য জায়গায় বিয়ে দিতে পারবেনা?'

'বিয়ের দরকার কী? আমার ঘরে কি খাবার অভাব?' হাতের কাজ বন্ধ রেখে কোঁচার খুঁটে ঘাম মুছে বললো, 'ওই শাউড়ি মাগী যদ্দিন বেঁচে আছে তদ্দিন আর আমার মেয়ে যাবে না ওখানে। জামাই যদি আলাদা হয় তার মায়ের সঙ্গে, যদি টাকা কড়ি এনে আমার মেয়ের হাতেই দেয় তবেই—'

'তুমিও যেমন।' মাসী গালে হাত দিয়ে চোখ টান করলেন 'মা তো না যেন ডাইনি। কেমন ক'রে যে অতবড় ছেলেটাকে আগলে রাখে দেখে বাবু তাজ্জব বনে যাই। তুক্ তাক্ জানে নাকি মাগী? সোয়ামীটাওতো একটা ভ্যাড়ার অধম। ছিঃ—'

প্রমীলা এসে দাঁড়ালো 'কার সোয়ামী দিদিমা?'

'তোর শ্বাশুড়ির সোয়ামি লো, আর এদিকে ঐ সাদা ফ্যাটফ্যাটে রং নিয়ে, এক গা মাংস নিয়ে তুইতো কিছুই করতে পারলিনে।' মুখ বাঁকালো প্রমীলা 'আমি তা চাইলেতো।'

'তবে থাক গোমর ক'রে বসে, ওদিকে বর তো আবার বিয়ে করছে আরেক ছুঁড়িকে।'

'কী!'

'কী আবার। পুরুষ মানুষের মন, যে পাত্রে যেমন। এবার যা ধরফরিয়ে ধরগে, আটকা গিয়ে সোয়ামীকে। মেয়েমানুষের আবার পুরুষ মজাতে কী লাগে লো?'

'ব—য়ে—য়ে গেছে' অদ্ভুত উচ্চারণে, অসহ্য রাগে ব'য়ে গেছে শব্দটি তুবড়ির মতো ছুটিয়ে দুম্ দুম্ ক'রে চলে গেল প্রমীলা সেখান থেকে। কিন্তু তক্ষুনি ফিরে এলো আবার, ঠোঁট উল্টিয়ে বললো, 'বিয়ে করা অত সোজা নয় বুঝলে? অত সোজা নয়।'

মাথা নাড়লেন যজ্ঞেশ্বর ঃ 'ঘুঘু দেখেছে বাছাধনেরা, ফাঁদতো আর দেখেনি? সেটাও বুঝি দেখবার ইচ্ছে হ'য়েছে?' কাঠের বাকস গুটিয়ে হিশেবপত্র বন্ধ করলেন তিনি। প্রমীলাও চলে গেল নিজের ঘরে। কিন্তু খবরটা যতই অবহেলার যোগ্য হোক না কেন, বাপ বা মেয়ে কেউ সারাদিনেও সেটা ঝেড়ে ফেলতে পারলোনা মন থেকে। যজ্ঞেশ্বরের দুপুরের ঘুমে ব্যাঘাত হলো, আর প্রমীলার রাত্তিরের ঘুমে।

আশ্চর্য্য! কোথায় যে এই বিষ লুকিয়েছিলো কে জানে। ভীষণ একটা ঈর্ষাবোধে সেদিন সারাক্ষণ ছট্‌ফট্ করলো প্রমীলা। অন্য কোনো একটি কল্পিত স্ত্রীলোককে সামনে দাঁড় করিয়ে অকথ্য কুকথ্য ভাষায় নিঃশব্দে গালিগালাজ করলো, মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে পিঠ ভাঙ্গলো, স্বামীর শয্যায় শুতে দেখে তার নাক কান ছিঁড়োলো, আঁচড়ে কামড়ে, খুবলিয়ে চোখের ডিম উপরে ফেললো। তবু তার ক্রোধ শান্ত হলোনা, শেষে অন্ধকারে উঠে বসে দাঁত দিয়ে সত্যিই বিছানা বালিশ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে লাগলো।

(ক্রমশঃ)

# লেখক ও সাহিত্য

## তারাপদ গংগোপাধ্যার

Our civilisation comprehends great variety and complexity and this variety and complexity, playing upon a refined sensibility, must produce various and complex results—এলিয়টের এই উক্তির ওপর ভর করে আমরা আমাদের দেশের বর্তমান সাহিত্য-বোধের উপলব্ধি নিয়ে এগুতে পারি। পৃথিবীর নানারূপ জটিলতার ভিতর বাস করেও আমরা আমাদের সাহিত্যে বর্তমান সময়ের সমস্ত চিহ্ন দিতে পেরেছি কিনা সন্দেহ, এমন কি বর্ত্তমানের কিছু উপলব্ধিকেও ধরে রাখতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। এ বোধ এবং চিন্তা, যদি আমরা যে সব গল্প উপন্যাস কিম্বা কবিতা চতুর্দিকে অহরহ প্রকাশ হ'তে দেখছি, সেদিকে তাকিয়েই আমরা পেতে পারি। বিগত যুদ্ধের ঝাপটার সমস্ত কিছুই আমাদের ভিতর প্রতিফলিত হোয়ে আমরা যে অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলুম আর তারপর সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির রক্তাক্ত দিন, ভাগাভাগি এইসব সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে বর্তমানে যেখানে এসে পৌঁচেছি—যে আর্থিক সংঘাতে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দিকগুলো পংগু হ'তে চলেছে, সেই সব বোধ কিম্বা চিন্তা আমাদের সাহিত্যে নেই। 'বোধ' আমি সেই অর্থেই মনে করছি, যে অর্থে ক্রোচে আর্টকে expression of impression বলেছিলেন—এই উপলব্ধির সংবেদনা টাকেই। ভাল সৃষ্টির একটা মস্ত বড় গুণ কিম্বা সত্তা থাকে, যে সত্তায় জীবনের সমস্ত কিছু ব্যবহারিক ও মানসিক বৃত্তির পরিবর্তনে একটা নতুন জীবন-সত্তার উপলব্ধি আসে। যে উপলব্ধিতে আমাদের সমস্ত কিছু পরিস্কার ঝরঝরে হোয়ে একটা নতুন প্রকাশতার আশার সান্নিধ্য ঘটে।

কিন্তু যা আমাদের পাবার সুযোগ ছিলো কিম্বা দেখার, সেই সব সুযোগ আমরা পেয়েও পেলুম না। এ কথা যেমন সংগে সংগে উঠে আসে, সেই উঠে আসার সংগে সংগে উত্তরও তৈরী হয়। আমাদের মন ও বুদ্ধি বহুদিন থেকেই এভাবে তৈরী হোয়ে আসছিলো—কোন জিনিষের অর্থ এবং সম্পর্ক কিভাবে হয়, এই সব চিন্তা থেকে নিস্কৃতি পাবার ইচ্ছা, আর এই ইচ্ছা নিয়ে চলে চলে আমরা জন্মগত সংস্কারের দ্বারা এভাবে জড়িয়ে পড়েছিলাম যে কোন জিনিষের সুস্থ অবলোকন নেবায় স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছিলাম। মনে করেছি যা পেয়েছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকবার বোধহয় নিয়ম। এইভাবে বলে চলে, সমস্ত কিছুই আমরা ভাসা-ভাসা করে ভাবতে শিখেছি। যেন এ্যানিমিক

রোগীর দৃষ্টি নিয়ে দৃষ্টি-ক্ষেপণ। এর একটা বড় কারণ, যে কারণ রাষ্ট্র ও সমাজগত (এবং যা নানাদিক থেকে বংকিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আলোচিত হোয়েছে)—যে শিক্ষা এবং দীক্ষা ঔপনিবেশিক শাসন-ব্যবস্থায় আমরা পেয়েছি, সে শিক্ষা আর দীক্ষার ভিতর এইসব মনোগত চরিত্রের আভাস ছিলো। যেখানে আমাদের নিজের শিক্ষা, রুচি, সংস্কৃতি সবকিছু বরবাদ হোয়ে এমন সব শিক্ষা আর দীক্ষা নিয়ে আমরা তৈরী হোয়েছি, সেখানে আমরা নকল মানুষ হ'তে হ'তে এমন যায়গায় পৌঁছে গেছি, যখন আমাদের নিজেদের দিকে তাকাতে গিয়ে মনে হয় এ যেন আমরা নই। আর এই সব শিক্ষা দেবার প্রয়োজনীয়তা ওদের শাসন-ব্যবস্থায় একান্ত বলে, আমাদের জীবনের ঐকান্তিক রূপ নেপথ্যে থেকে থেকে যে রূপে আমরা তৈরী হ'লাম, সে রূপ হ'চ্ছে নিজের দেশীয় রীতি ও গুণে উপেক্ষার উপলব্ধি নিয়ে বেঁচে থাকার রূপ। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, যে-মন এই সময়ে একটু প্রয়োজন ছিলো, আর যেসব গুণান্বিত মনের দেখা আমরা অতীতে দেখেছিলাম যেমন রামমোহন রায় থেকে বিবেকানন্দ, বংকিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ—সেই সব মনের চিন্তা আমাদের ছুঁয়েও ছোঁয়নি। তাঁরা যে আমাদের ভিতর ছিলেন কিম্বা চিন্তার স্বকীয়তায় যে আমাদের সমস্ত সত্তার বোধ তুলে আনতে চেয়েছিলেন—সেইসব সমস্ত বোধ চিন্তা ধুয়ে মুছে আমরা চিরদিনই এ চিন্তা করে এসেছি যে আমাদের মুক্তির প্রশ্ন য়ুরোপীয় জীবনবোধের আংগিক। এই সব ভেবে ভেবে নিজেদের গঠন আর চিন্তার দিকে আকৃতিগত সৌম্যের চিন্তা হারিয়ে ফেলেছি।

কিন্তু এই অবস্থার প্রাথমিক পর্যায়ে, যে কোন দেশে কিম্বা কালেই হোক, একটা শক্তি থাকে—যে শক্তিটাকে সেন্টিমেন্ট বলে আখ্যাত করা যায়। এই পর্যায়ে কিছুটা সময় পর্যন্ত চলবার ক্ষমতা থাকে, যেমন আমরাও চলেছিলাম। কিন্তু নিজস্ব শক্তির চেতনাকে বরবাদ করে, এই উপঢৌকনের বুদবুদ যখন মিলোতে থাকে, তখন-ই ভংগুরতার সময়। আর এই সময়ে আমরা পৌঁছে গেছি। আর এই সময়ের যে অনিবার্য পরিণতি, সেই যৌন তাগিদের বিকৃত লালায় আমরা আষ্টেপৃষ্ঠে জর্জরিত। কি করে এই তাগিদ আমাদের কাছে বহুদিক থেকে এবং বহু উপায়ে লোভনীয় হোতে পারে, এ ইচ্ছায় এখন আমরা টলমল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেটা সব চেয়ে প্রকৃষ্ট, সেই সাহিত্য এবং সংগীত থেকে সিনেমা পর্যন্ত। আজকে যদি কোন পত্র-পত্রিকা অধিক পঠনীয় বলে গণ্য করতে হয়, সে গণ্য হ'বার একমাত্র স্বীকৃতি যৌনেচ্ছা নিয়ে পদচারণ। এবং এটা ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়বেও—আমরা যারা সাহিত্য-চিন্তা করি, তাদের কাছ থেকে পাঠক সাধারণ পর্যন্ত। এটা আমরা ভাল করেই জানি, আমাদের বর্তমান দুঃস্থ চেতনায় এবং ক্ষীণবীর্য শারীরিক গঠনে, এই বৃত্তি নিয়ে বাজারে পা বাড়ানোতে লোকসান থেকে লাভের খতিয়ান আমাদের



বেশী। আর এটাও জানি, এর চেয়ে বলিষ্ঠ চিন্তা দিতে পারবো না, যেটা সহন-গ্রাহ্য হ'তে পারে। তার চেয়ে এই সময়ে, এইসব যৌনতার অনাচার ছড়িয়ে দু'টো লাভই পুরোপুরি পেয়ে যেতে পারি—সাহিত্য করি বলে যেমন নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে তেমনি গ্রাসাচ্ছদনের ব্যবস্থা হোতে পারে। এইসব ক্যামুফ্লাজ চলছে, চলবেও—যদ্দিন পর্যন্ত আমরা সমস্ত দেশময় বলিষ্ঠ চিন্তার কথা না আনতে পারি।

কিন্তু একটা প্রশ্ন আসতে পারে—এই ইচ্ছা নিয়েই সমস্ত দেশ কিনা, এই বিকৃত মন নিয়ে সমস্ত দেশ চলছে কিনা (এ বিশ্বাস হয় তো আমার সাথে অনেকেই করেন,)—কিন্তু এটা অস্বীকার করে লাভ নেই এই ইচ্ছা নিয়ে বর্তমানে শতকরা আশী জন চলছে। মানুষের সঠিক রূপ নির্ধারণ—দর্শনে, সামাজিক বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে- অসম্ভব। কোনখানেই যদি সুস্থ অবলোকন স্পৃহা না থাকে, আর থাকলেও সেই ধৃতি যদি চতুর্দিকে না ছড়িয়ে কোন গণ্ডীকৃত অবস্থায় পরিসীমিত থাকে, সেখানে এ থেকে উদ্ধার পাবার দ্বিতীয় কোন উপায় নেই। ভোগজাত লিপ্সা মানুষের আদিম তাগিদ, আর এই তাগিদও সঠিক রূপ নিতে পারে যদি আমরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চলবার নির্ধারণ—শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। হিণ্ডাসের 'মাদার রাশিয়ার' একটা কথা উজ্জ্বলভাবে এখানে মনে পড়ছে। রাশিয়ার বর্তমান যুবমনের কথা বলতে গিয়ে বলছেন—তারা একসাথে ঘুরছেন, চলছেন, একই ব্লাংকেটর নীচে রাত্রিযাপনও চলছে, 'but did they rarely cohabit themselves'। এই যে সহচলন এটা আশ্চর্যও নয়, শুধু জীবনকে বুঝবার জন্যে সঠিক ব্যাখ্যা। মানুষের বৃত্তি যখন কোনদিনই আদিম কুয়াসায় ঢাকা থাকবে না, তারও পরিস্ফুটন প্রতি সময়েই ঘটছে, তখন যৌন-তাগিদে নিমজ্জিত অবস্থাই যে আমাদের একমাত্র অবস্থা এ চিন্তাও বাতুলতা। কিন্তু বাতুলতা বলেই আমরা ভাবতে পারি, ভাবিনে আমরা নতুন কোন চিন্তা কিম্বা দর্শন আনতে পেরেছি কিনা। জীবনের ভংগুরতা নিয়ে যাঁরা এখনো চিন্তা করছেন, ভাবছেন, এইসব প্রতিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রগতিবাদী চিন্তার জন্যে—একথা তাঁদের কাছে আনতে পারি। তবু নিজস্ব চিন্তা ভাবনা নিয়ে (যতটুকু বুদ্ধি চেতনা একজনের থাকতে পারে) এগিয়ে আসা দরকার। আমরা জানি, আমাদের কথাই ইতিহাসের শেষ কথা হোয়ে থাকবে না, তারও পরে বহুতর ঘটনা, মনন, সংঘর্ষ থাকবে, সেইসব ঘটনার ভিতর আমাদের চিন্তা আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে যতটুকু মূল্য পাবার দরকার সেই মূল্যই পাবে। বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এখান থেকে চলে যাবার পর, আমাদের নিজেদের শাসন ব্যবস্থা আমরা যেভাবে নিয়েছি, সেই সময়ে আমাদের জীবনের সমস্ত পংক উদ্ধার করে যে সুব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো, সে ব্যবস্থা রাতারাতি নেওয়া হয়ত সম্ভব ছিলো না, সম্ভব না থাকলেও একটা চিন্তা আমরা দেশের সামগ্রিক

মনে আনতে পারতুম—দেশীয় জীবনের গঠনাত্মক বিষয়ে একটা সুঠাম বিস্তৃত প্রচেষ্টা। যদিও এটা রাষ্ট্রীয় কিম্বা সমাজবিজ্ঞানীর কথা, তবুও সাহিত্য যখন এসব কোন আওতা থেকে বহির্ভূত নয়, তখন এ চিন্তা সাহিত্যেও একান্ত প্রয়োজন। মানুষের চিরন্তন প্রশ্ন বেঁচে থাকা, নিজের প্রয়োজনে, সামাজিক প্রয়োজনে—আর এইসব প্রয়োজন শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক প্রয়োজনে পরিণতি লাভের জন্যে। আর এইসব নিয়েই সাহিত্য, আমার সমস্ত কিছু পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে—যেখানে আমি আছি, সেইসব চিন্তা, মনন, ধ্যান, ধারণ—সমস্ত কিছু ব্যাখ্যার একমাত্র সত্তা হিসেবে। তখন সাহিত্য চিন্তায়ও এইসব বৈজ্ঞানিক রূপ—রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিজ্ঞানের কথা আসতে পারে, আসবেও।

এবং যখন আসছে, তখন মনে করতে পারি কিভাবে আসবে। জীবন গঠনে রূপ যখন বহু সমস্যায় জড়িত, ভোর হ'বার সাথে সাথে আমার চিন্তা গ্রাসাচ্ছনের জন্যে জড়িয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা, দীক্ষা নিয়ে উন্নত মানসিক প্রকর্ষতার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হোয়েও তা ক্রমশ পিচ্ছিল ও আওতাহীন হ'চ্ছে—তখন মনে হ'তে পারে কি ভাবে চল্লে, এইসব সমস্ত কিছুর একটি মূলকাণ্ডের কথা জানা যেতে পারে। ট্রটস্কীর প্রোলিটারিয়াট লিটারেচার সম্বন্ধে যে উক্তি: রাশিয়ায় সর্বহারাদের নিরন্তর সংঘর্ষের সময় শিল্প-সংস্কৃতির দানা বাঁধবার অবসর কোথায়?—ঠিক এইরকম চিন্তা আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে করছেন। কিন্তু অবসরে নির্ভর করে নিজস্ব মানসিক অবস্থার ওপর আমি যদি সবসময় এই চিন্তাই করে যেতে থাকি—আমার সমস্ত কিছু প্রয়োজনের তাগিদ মিটিয়ে এমন একটি মুহূর্ত আসবে যা এইসব চিন্তার জন্যে ব্যয়িত হ'তে পারে, তাহলে এই সময় পাবার জন্যে আমাদের উপযুক্ত সময় কোনদিন-ই ঘটবে না। আর এটা যখন জেনেছি, মানুষের মংগল-চিন্তার ধারা কোন কিছুর জন্যে কোনদিনই বাধাগ্রস্ত হ'য়ে রয় নি, আর থাকবেও না; জীবন নিজস্ব নিয়মে যেমন চলে, সেই চলার তাগিদে সমস্ত কিছু উপকরণ ও বস্তু তৈরী করে নেয়—আমাদের বিশ্বাস, ধারণা, চিন্তা, সব কিছুর; 'The whole of India is in a state of very rapid change' জহরলালের এই উক্তি, আর এই দ্রুত পরিবর্তনশীল সময়ে, কোন বস্তু কিম্বা ধ্যান-ধারণা—যে ধারণা হয়তো এখন আমরা দিতে পারতাম, সেই সব চিন্তা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবেও না। 'যদি আমরা নির্বোধের মত স্বপ্ন না দেখি এবং কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হ'বার জন্যে প্রস্তুত হই' গান্ধীজীর এ উক্তি চরকা সম্বন্ধে খাটলেও আমাদের বর্তমান সময়ের আংগিনায় এ কথা আমি অনায়াসে সংযুক্ত করতে পারি। সম্পূর্ণভাবে আমাদের মন আছে যে-মন এই বর্তমান ঘটনাযুক্ত সমস্ত কিছু পারিপার্শ্বিকের ভিতর সত্য খুঁজে নেওয়ার জন্যে অনবরত চলিষ্ণু হওয়া উচিৎ। আর এটা সত্য, প্রতি কালে প্রতি সময়ে প্রতিক্রিয়াশীল জীবন চালাবার



জন্যে একটা বিরুদ্ধ শক্তি অনবরত কাজ করে যাবে, মহুয়ার মদের মাতলামি দিয়ে আমাদের সমস্ত কিছু জড়িয়ে নেবার মত, সে নিজের কাজ ও জীবনকে প্রোথিত করতে চাইবে—কিন্তু এইসবকে ছাড়িয়ে উঠবার জন্যে একটি দ্বিতীয় প্রবল শক্তিও অনবরত কাজ করে যাচ্ছে, আর এই শক্তির মূল কেন্দ্র ও বিষয়টির জন্যে আমাদের ধারনা প্রযুক্ত হওয়া উচিৎ। অন্তত এটা আমরা জানি, সময়ের অশিষ্ট গণ্ডির কাছে আত্মসমর্পন করার জন্যে আমাদের চেষ্টা বিসর্পিত নয়, সে চেষ্টা সময়কে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে নিয়ে সত্যবস্তুর মূল উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করবার জন্যে। Freedom of this Will means nothing but the capacity to make decisions with real Knowledge of the subject' এংগেলস্-এর এই কথা 'এ্যান্টি ডুরিং'এ থাকলেও আমাদের নিজেদের ওপর প্রযোজ্য বলে ভাবতে পারি।

সব চেয়ে বড় সত্য এটাই, আমরা কোথায় আছি এবং এ অবস্থা যদি ভংগুর মনে করে থাকি তার জন্যে সময় এবং নিষ্ঠা এই অবস্থার সঠিক রূপান্তরের জন্যে ব্যয়িত হওয়া উচিৎ। আর যদি ভিন্নতর মতে, এই অবস্থার পারিপার্শ্বিকতা সঠিক বলে মনে হয়, তাহ'লে এর চেয়েও কোন উন্নত পরিচয় থাকতে পারে কিনা—সে জন্যে চিন্তা করা উচিৎ। মানে, আমরা কি করবো আর না-করবো, তার জন্যে পথ ভেবে নিয়ে পথ পরিক্রমণ। আর তা যদি না হয়, সঠিক দিকনির্ণয়ের অভাবের জন্যে—আমাদের কথা কিম্বা চিন্তা ভাসা বুদ্‌বুদের মত ক্ষীণায়ু হয়ে ডুববে।

কিন্তু এই বুদবুদ আয়ুর পরিমাপ নিয়ে সময় কাটাতে বোধহয় আমরা চাই না। এংগেলস্‌এর যে কথা একটু আগে উধৃত করলুম, সেই কথা—'To make decisions with the real knowledge of the subject', এই নির্ধারণের কথা নিয়ে যদি আমরা এগুতে পারি, আর এটা জেনেছি, সত্য নির্ধারণের জন্যে চেষ্টা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষণের এবং যুগের এবং এই মানুষের কল্যাণের দিকটা ভাবার জন্যে মানুষের ঐকান্তিকতা, তাহলে আমাদের চিন্তা মনন ধ্যান পৃথিবীর যাবতীয় মংগলের জন্যে ব্যয়িত হ'বে। আমাদের সম্পূর্ণ মনের কল্যাণের দীক্ষা থেকে কিম্বা আমাদের চেতনার সামগ্রিক সত্তায় যে প্রশ্ন জমে জমে বিশেষ শৈব মুহূর্তের জন্ম ঘটলো—সেই জন্মবৃত্তান্ত অভিব্যক্তি ও প্রকাশের জন্যে অপেক্ষিত। আমাদের সময় আমরা চতুর্দিক থেকে চিত্রিত করতে পারি, তার ভালমন্দ মিশিয়ে সামাজিক গলদের কোন্ বিসর্পিল চেহারা ঘুণ ধরে ধরে ভাংগছে—সেখানে আমার বুদ্ধিবৃত্তি ও মনের সমস্ত প্রেরণা দিয়ে, সেইসব সমস্ত কিছুর নগ্নতার, উচ্ছৃংখলতার চিত্রণ আমরা দিতে পারি। আর দেওয়া উচিৎ, দেওয়া উচিৎ এইজন্যে যেন ভবিষ্যৎ এ চিন্তা করতে পারে—তাদের পূর্বপুরুষের চিন্তায় তাদের বর্তমানের স্বীকৃতি দেবার প্রচেষ্টা ছিলো। আর এই স্বীকৃতি দিয়ে তাদের নিজেদের জীবনেরও সুমহান ভিত্তি পেয়েছিলো।

# সুকন্যা

## শংকর চট্টোপাধ্যায়

অনেকটাই দেরী হয়ে গেল বীরেনবাবুর সেদিন বাড়ী ফিরতে। সামনের ঘরে ঢুকে দেখলেন কেউ নেই সেখানে। তারপর গিয়ে ঢুকলেন ছেলেমেয়ের ঘরে। পর্দা সরিয়েই দেখলেন শ্রীলেখা, শ্রীরেখা, হৈমন্তী, অঞ্জুকে। ছিটিয়ে, ছড়িয়ে বসে আছে সব। ঘরে ঢুকতেই হৈমন্তী এসে বীরেনবাবুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল। এটিই তার সবচেয়ে আদরের মেয়ে।

—এত দেরী হল আজ। বল্ল হৈমন্তী।

বীরেনবাবু মেয়ের হাত ধরে গিয়ে বসলেন সোফায়। সোফায় বসতে বসতে বল্লেন—এমনকি আর দেরী হয়েছে মা। তারপর শ্রীলেখার দিকে তাকিয়ে বল্লেন—আজকে আর পেন ওঠেনিত।

—না বাবা, ডাক্তার এসেছিলেন দুপুরে, দুপুরে ভাল ঘুমিয়েছেন মা।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন বীরনবাবু। তারপর মুখে খানিকটা হাসি টেনে এনে বল্লেন—আজ তোমাদের কি রকম পড়াশুনো হল বলো।

শ্রীরেখা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। বীরেনবাবুর প্রশ্নে মুখ তুলে তাকাল। —জানো বাবা মন্তী আজ স্কুল থেকে পালিয়ে এসেছে। বীরনবাবু হৈমন্তীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে আনলেন।

—আসবইত। রোজ রোজ অতক্ষণ ধরে ক্লাস করতে ভালো লাগে নাকি কারো। উত্তেজিত ভাবে বলল মন্তী। আর তুমি, তুমি যে হ্যারিয়েটের ক্লাশে পড়া পারনি সে কথা বলব? দু মেয়ের ঝগড়া বেশ ভালো লাগে শুনতে। কিন্তু আজ তিনি থামিয়ে দিলেন তাদের। অঞ্জুর দিকে মুখ ফেরালেন।

—অঞ্জুবাবুর কি খবর। একেবারে ক্লাসের শেষ বেঞ্চ ত আজ? হাসি হাসি চোখে তাকালেন তিনি অঞ্জুর দিকে।

—না সামনের বেঞ্চে, বলল অঞ্জু, বলেই তাকাল দিদিদের দিকে। কেউ কোন কথা বল্লনা তারা।

বীরেনবাবু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন। তারা সব চুপচাপ বসে রইল। মন্তীর কেমন যেন লাগতে লাগল এই নি নতাকে, বুকের উপর চেপে বসা নির্জনতা। মন্তী চোখ ঘোরাল জানলায়। দেখল জানলার বাইরের আকাশকে। বিকেলের রোদে হলদে হয়ে আসা আকাশকে। খানিকক্ষণ তারা তেমনি করে বসে রইল। শ্রীলেখা উলের



কাঁটায় আঙুল ছোঁয়াল, শ্রীরেখা বইয়ের পাতায় চোখ টান করল; আর মন্তী জানলার বাইরের আকাশটার রঙ বদল দেখল। আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল বিকেলের আকাশটা, তারপর খানিকটা ছায়া-ছায়া অন্ধকার, জমল, ছড়াল, ছড়িয়ে গেল। শুনল মন্তী শ্রীরেখার গলা।

—দিদি। গম্ভীর গলায় বলল শ্রীরেখা, মনে হল মন্তীর, অনেকটা যেন বাবার গলার মত।

—কি। বলল শ্রীলেখা।

—আমি একটু কনিকাদের বাড়ী যাব। মন্তীর মনে হল সে যেন তার বাবার গলা শুনল শ্রীরেখার গলায়। বাবার গলা, বাবার মত ঋজু গলার স্বর।

—এখন ত সন্ধ্যে হয়ে গেছে। কেমন করে যাবে।

—কই আর তেমন! আমি একা একাই চলে যেতে পারব। ফেরবার সময় না হয় ওদের বাড়ীর কাউকে নিয়ে ফিরব।

—একা যেওনা অঞ্জুকে নিয়ে যাও। বলল শ্রীলেখা।

শ্রীরেখা ততক্ষণে হেঁটে হেঁটে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রীরেখার কথায় নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল সে। বেড়িয়ে গেল।

হৈমন্তী খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল উপরে। সিঁড়ির মুখোমুখি মার ঘর। মার ঘরের সামনে দাঁড়াতেই—একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগল মন্তীর। গন্ধটা নাকে টানল মন্তী। আলো জ্বালা দরজার কাছে খানিকক্ষণ দাঁড়াল সে। আস্তে দরজাটায় হাত ছোঁয়াল। খুল্লো।

ঘরে ঢুকতেই নার্স নড়ে চড়ে উঠল। মৃদু একটা শব্দ হল ঘরের মধ্যে। মন্তীর কাছে এসে দাঁড়াল নার্স। বলল আস্তে আস্তে—শব্দ কোর না। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মা খাটে ঘুমিয়ে আছেন। দেখল মন্তী। মার ফর্সা হাতটা গালের উপর। দিন দিন কেমন বিশ্রি দেখতে হয়ে যাচ্ছেন মা। ভাবল মন্তী। অসুখের রেখায় বিবর্ণ মুখে মন্তী কোন মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেলো না। মা ঠিক একরকমই আছেন। মনে হল তার। সংকীর্ণ একটুকরো আকাশ দেখল সে জানলা দিয়ে। নিস্তব্ধ অন্ধকার। ঘরের নীলচে আলোতে অদ্ভুত লাগল। সারা ঘরে অদ্ভুত একটা পরিচ্ছন্নতা। ঘরের চারিদিকে চোখ ছুঁইয়ে আনল মন্তী। তারপর আস্তে গলায়, মৃদু গলায়, কেউ না শুনতে পাওয়া গলায় বলল—তুমি, তুমি মরতে চাওনা। মার বোঁজা-চোখে চোখ রেখে বলল সে।

মন্তীর মনে হল সে যেন তার মার মৃত্যু চাইছে। সেই বিবর্ণ, কুঁকড়োন, এলোমেলো

মার শরীরটার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল। তার মনের সমস্ত কোমলতা, সমস্ত স্নেহ যেন সে মার উপর থেকে হারিয়ে ফেলছে।

—কবে যে ভালো হয়ে উঠব। মা রুগ্ন তীক্ষ্ণ গলায় বলছিলেন বাবাকে একদিন।

—তোমার অসুখ সেরে যাবে তাড়াতাড়ি। কেমন নিরাসক্ত গলায় বাবা কথাগুলো বলেছিলেন মাকে। মন্তীর মনে পড়ে। আর সেদিন থেকেই মন্তী হঠাৎ-ই একটা কথাকে যেন বুঝতে পেরেছে, বাবা মাকে ভালোবাসেন না। বিন্দুমাত্র না। আর সেইদিন থেকেই মন্তী মার প্রতি তার সমস্ত স্নেহ সমস্ত ভালোবাসা হারিয়ে ফেলেছে। বাবার মত দিনের পর দিন সেও ভালোবাসার অভিনয় করে চলেছে মার সঙ্গে। কিন্তু কতদিন—আর কতদিন চলবে এই ভালোবাসার নকল অভিনয়। মা কি জানেন না বাবার সঙ্গে মণিমামিমার সম্বন্ধটা। হয়ত জানেন না, জানলেও কিছু করবার ছিল না তাঁর। কোন কিছু করতে পারতেন না মা। কথাগুলো ভাবলো মন্তী হঠাৎ-ই। তারপর একসময় বলল—তাকে মা-ই বাড়ীতে আসতে বারণ করেছে। মা-ই। সে বলল।

মুহূর্তের প্রস্তুতির পর বলল মন্তী ভেজা ভেজা স্বরে, ফিসফিসিয়ে। কথাটা বলবার পর মুহূর্তেই মন্তী যেন শুনল তার চার পাশে অসংখ্য লোকের চীৎকার। সেই চীৎকারের মধ্যেও যেন একটা গলা তার কানে এলো।

—তুমি কিছু ভেব না মন্তী, আমি……আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করব। ঐ কথাটা শুনবার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন একজনকে দেখতে পেলো নিজের মনের চোখে। অলোকেশ। নিজের গলার স্বর যেন শুনল মন্তী। গ্রীক্ প্যটার্ণের চিবুক, তামাটে চুল আর রোগা ছিপছিপে অলোকেশের শরীরটা মন্তীর চোখের সামনে নড়ে চড়ে উঠল।

—জান মন্তী জীবনে বিস্ময়কে আমরা কাটিয়ে উঠি প্রথম যখন আমরা প্রেমে পড়ি।

হয়ত তাই। মন্তীরও যেন তাই মনে হয়েছিল, হঠাৎ-ই যেন মনে হয়েছিল, অলোকেশকেই যেন তার হৃদয়, তার সমস্ত উপস্থিতি ভরে চাইছে। একটা আশ্চর্য্য, প্রশান্তি, একটা ভালো-লাগা সেই মুহূর্তেই অঙ্গরাগের মত ছড়িয়ে পড়েছিল তার সমস্ত চেতনা ভরে।

সেই প্রশান্তিকে, সেই আশ্চর্য্য ভালো-লাগাকে তাই সে ছড়িয়ে দিয়েছিল মুঠো মুঠো করে একটা পুরো দীর্ঘ মাসের বিকেলগুলো ভরে। কিন্তু তারপর, মা-ই প্রথম কথা বলেছিলেন তাদের দু'জনের কথা বলার মাঝে।

—অলোকেশ, তোমার এ বাড়ীতে আসাটা কি বাইরের লোকের চোখে একটুও সন্দেহের উদ্রেগ করছে না। তুমি বুদ্ধিমান, তুমি বুঝতে পারবে।

সেই মুহূর্তেই মন্তীর কাছে যেন সব থেমে গিয়েছিল ঘড়ির কাঁটা থেকে সূর্য্যের



চলাফেরা পর্য্যন্ত। একটা কান্না তার সারা শরীরকে ভেঙ্গে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দিয়েছিল।

—না, না তা হতে পারে না।

কিন্তু মন্তী না চাইলেও হয়েছিল। অলোকেশের গ্রীক্ প্যটার্ণের চিবুক, তামাটে চুল আর ছিপছিপে শরীরটা পা টেনে টেনে হেঁটে গিয়েছিল দরজার দিকে।

—আমি কোথায়। হঠাৎ মার গলা শুনল মন্তী। ভয় পেল সে। শিরশিরে একটা ভয় মন্তীর সারা শরীর বেয়ে উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে থামতে লাগল সে।

—আমি কোথায়। আবার সেই প্রশ্ন শুনল মন্তী। মার গালায়। এক মুহূর্ত সে চম্‌কে উঠল। কোথায়। কোথায় সে। অলোকেশ। তারপরই বিছানায় ঝুঁকে পরল। মার মুখের কাছে মুখ নামিয়ে আনল।

—এই যে মা। তুমি এখানে। ভয়ার্ত গলায় বলল সে। তোমার ঘরে। মন্তী মার হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় পুরলো। তবুও মার চোখ ঘরের চারপাশে খানিকক্ষণ ঘুরলো। মনে হল তিনি যেন মন্তীকে চিনতে পারছেন না।

—কি হয়েছে। আমি কোথায়। বল্লেন তিনি। তাকালেন মন্তীর দিকে।

—মন্তী তুমি…আমি স্বপ্ন দেখছিলাম। অদ্ভুত গলায় মা বল্লেন। খানিকক্ষণ তিনি জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে রইলেন নিশ্চুপ হয়ে। জানলার কাচে ঘরের নীল আলোর সঙ্গে বাইরের রাস্তার আলো এসে মিশেছে।

—তোদের বাবা এসেছে অফিস থেকে ?

—হ্যাঃ বাবা ত অনেকক্ষণ এসেছেন। বলল মন্তী। তোমার ঘরেও ত এসেছিলেন।

—আমি বোধ হয় তখন ঘুমেছিলাম।

—কত ফুল আজ বাবা এনেছেন দেখ তোমার জন্য। গলায় একটা কৃত্রিম আনন্দ ফুটিয়ে বলল মন্তী। মন্তীর মনে হোল তার কথায় মার বেশ আনন্দ হয়েছে। মার চোখ খানিকটা যেন সোনালী হয়ে উঠেছে মনে হল তার।

চোখটা আবার বুঁজে এল মার। আবার নির্জ্জন হয়ে গেল ঘরটা। আশ্চর্য্য নির্জ্জন। কোন শব্দ নেই। কেউ নেই। কোন স্বর নেই মন্তীর চার পাশে। মনে মনে মার কথাটাই একবার আওড়াল সে। কোথায় আমি। তুমিও বা কোথায় অলোকেশ! তারপর উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনটা কেমন যেন ব্যথায় টন্ টন্ করে উঠল মন্তীর। তাই চিরুণী দিয়ে চুলে খানিকটা দাড়া কেটে বেরিয়ে এল সে রাস্তায়। সন্ধ্যার ধূসরতা ছড়ান সড়ক দিয়ে হাঁটতে লাগল। আকাশ জ্যোৎস্নায় নরম। সরীসৃপ পথের মাঝে মাঝে আলোর রহস্য। অন্ধকারে গাছের

ছায়া কাঁপছে রাস্তার উপর। নির্জ্জন পথ। কেউ নেই। ভাল লাগল মন্তীর। ভালো লাগল একা একা হাঁটতে। যে পথে আর কেউ হাঁটছেনা। সেই পথে। মোড়ের ল্যাম্পপোষ্টের কাছে আসতেই মন্তী দেখল একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে। কেমন যেন মনে হল মন্তীর। লোকটার সামনে দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে থেমে গেল সে।

—তুমি। তুমি এখানে, চম্‌কে চোখ টান করল মন্তী। কথা বল্লো প্রথমেই।

—হ্যঃ তোমার অপেক্ষায়। ঋজু হোল অলোকেশের শরীরটা।

—কেমন করে জানলে যে আজ আমি আসব? প্রশ্ন করল মন্তী সোজাসুজি।

—জানব কেমন করে। শুধু এইটুকু আমার মনে হয়েছিল যে আজ তুমি আসবে। বলল অলোকেশ।

তারপর অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বল্লোনা।

—এস ঐ মাঠটায় গিয়ে বসি। নিস্তব্ধটাকে কাটিয়ে দিয়ে প্রথম কথা বল্লো অলোকেশ।

চল—

পাশাপাশি ওরা হেঁটে চল্লো দুজনে। কেউ কোন কথা বল্লো না। তারপর মাঠের অন্ধকারের মধ্যে নামল ওরা। অন্ধকার অস্পষ্ট, কুয়াশা মাঠময়, গাছের ছায়া সারিসারি, জোনাকী জ্বল্লো, নিবল, ওরা পাশাপাশি বসল, মন্তী কথা বল্লোনা, অলোকেশ বল্লো, মন্তী, তুমি কাছে এসো, আমার চোখের উপরে হাত রাখ, মন্তী সরে এলো, ছায়া ভাজ হোল, ভাঙ্গল, মন্তী নিঃশ্বাস টানল, অলোকেশ হাত মুঠোয় ভরল, কথা বল্লোনা, ঘাস কাঁপল থির-থির-থির, মন্তী বল্লো, চলি, অলোকেশ বল্লো, আর একটু, রাত বাড়ল, ঘড়ির কাঁটা নিঝুম, স্থির হোল, কাল এসো, তারপর দুজনে এলো গ্যাসপোষ্টের তলায়, আলোর নীচে, দুজনে তাকাল দুজনের দিকে, আসি, মন্তী থামল, অলোকেশ বল্লো, কাল, ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপল মন্তীর সারা শরীর, এগিয়ে গেল, অন্ধকার, রাশি রাশি।

অনেক রাত হয়েছে। মন্তী তাড়াতাড়ি পালাল। সামনের ঘরে ঢুকে হাঁফাতে লাগল। কেউ নেই সামনের ঘরে। সামনের ঘর পেরিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকলো। ঢুকেই দেখল বাবা আর মণিমাসিমা। মন্তীকে দেখেই মনিমাসিমা বীরেন বাবুর হাতের মুঠো থেকে হাত টেনে নিলেন। শরীরটা গুছিয়ে নিলেন পলকের মধ্যে। সোজা হয়ে বসতে বসতে বল্লেন—এতক্ষণ কোথায় ছিলে? ঝির ঝির হাসিতে চোখে যেন হাওয়া ছড়ালেন মণিমাসিমা। একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বল্ল মন্তী তাড়াতাড়ি। তারপর বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। বেরিয়ে আসতে শুনল মন্তী মণিমাসিমার গলা—মন্তী কিন্তু অনেকটা তোমার মত। হুবাহু একরকম। গভীর শোনাল মণিমাসিমার গলা।



খানিক পরে বিছানায় শুয়ে একা ঘরে কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল মন্তীর। বাড়ীর কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু ড্রইংরুমে এখনো আলো জ্বলছে। মণিমাসিমা এখনো যাননি। মণিমাসিমার নামের সঙ্গে সঙ্গেই এখন বাবার নাম মনে পড়ল মন্তীর। অদ্ভুত লাগে বাবার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা, মা দুচোখেই দেখতে পারেন না মণিমাসিমাকে। আর সেই জন্যই বোধ হয় মণিমাসিমা মাকে অমনি এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। মার অসুখ হবার আগে মাঝে মাঝে আসতেন মণিমাসিমা। কিন্তু এখন প্রায় রোজই অনেক রাত পর্য্যন্ত কাটিয়ে যান তিনি এখানে, একএকদিন মণিমাসিমা না আসলে বাবাকে কেমন শুকনো শুকনো দেখায়। মণিমাসিমা আসলেই কেমন উজ্জ্বল হাসিখুসী হয়ে ওঠেন বাবা। ভাবতে ভাবতে ঘুমে জড়িয়ে আসে মন্তীর চোখ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনল মন্তী বাবার স্বর। আস্তে আস্তে ঘুমের গভীরে চোখ পাতল মন্তী। চম্‌কে উঠল খানিকটা পরে ঘুমের মধ্যে। মার চোখ, তীক্ষ্ণ চোখ স্থির মন্তীর চোখের উপর।

—তুমি আবার অলোকেশের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছ মন্তী। জান আমি সেটা চাইনা।

ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠল মন্তী—বাবা। বাবা। ঘুম থেকে জেগে উঠল সে পরমুহূর্ত্তে। জেগে উঠেই দেখল ঘরের নরম অন্ধকারকে। এমন সময় দরজাটা খুলে গেল। বীরেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

—কি হয়েছে মন্তী? আমাকে ডাকলে কেন। আলো জ্বালতে জ্বালতে বল্লেন তিনি।

—আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। বলল সে। ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বলবার সঙ্গে সঙ্গে মন্তীর সারা শরীর কেঁপে উঠল ভয়ে, বিছানার উপর উঠে বসল।

—কি স্বপ্ন দেখেছ। মেয়ের চুলে হাত ডুবিয়ে বল্লেন বীরেনবাবু।

—আমার মনে হল আমি যেন কোন মানুষের পায়ের শব্দ শুনলাম। বলল মন্তী আসল কথাটা চেপে দিয়ে।

—কে তোমার ঘরে আসবে এখন? হাসিতে দুমড়োল বীরেনবাবুর ঠোঁট। ঘুমোও তুমি।

—তুমি একটু আমার কাছে বোসো বাবা, মন্তী বীরেনবাবুর গা ঘেঁষে শুয়ে পড়ল।

বীরেনবাবু আস্তে আস্তে মন্তীর চুলে হাত বুলোতে লাগলেন। মেয়ের চুলে বিলি কেটে তার মনে হল নরম এক মুঠো কালো অন্ধকার জড়াচ্ছেন আঙুলে। মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি ঘর থেকে।

চায়ের টেবিলে সকালে গোল হয়ে বসেছিল সবাই। বীরেনবাবু কালকের রাত্রের মন্তীর ভয় পাওয়ার কথা বলছিলেন। মন্তী চুপচাপ ঠোঁটে কামড় দিয়ে শুনছিল। এমন সময় নার্স নেমে এল তাড়াতাড়ি। ঘরে ঢুকতেই বীরেনবাবু কথা বন্ধ করলেন। সবাই তাকাল নার্সের দিকে।

—আপনি একবার ডাক্তারকে খবর দিন। অবস্থা ভালো নয়। বীরেনবাবুর চোখে চোখ রেখে নার্স বল্লো।

মন্তী ভাবল: ও কিছু নয়। মা আবার সেরে উঠবেন। সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সেও।

'তুমি এবারেও মরবেনা' মনে মনে বলল মন্তী। তাকাল বাবার মুখের দিকে। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে বলল সে, ফিসফিসিয়ে—কিছু হবে না। বলেই বীরেনবাবুর চোখে চোখ রাখল। চোখ নামাল মন্তী। চোখ তুল্লো খানিক পরে। বীরেনবাবু হেঁটে যাচ্ছেন মেঝের দিকে চোখ করে। তার আনত মুখে অস্পষ্ট শুভ্রতা দেখল মন্তী। কপালে দুটো ভাজ পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। বাবার সঙ্গে পা মিলিয়ে মন্তী এলো ড্রইংরুমে। টেলিফোনের কাছে এসে থামলেন তিনি। মন্তী দেখল চোখদুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠছে ক্রমশ। ডাক্তারকে ডাকলেন তিনি ফোনে। শুনল মন্তী বীরেনবাবুর শান্ত সৌম্য গলা। একবারও কাঁপলনা। দুমড়োল না। ডাক্তারকে ফোন করে মনিমাসিমাকে ফোন করলেন তিনি। অনেকক্ষণ, বেশ কয়েকটা দীর্ঘ মুহূর্ত্ত ধরে নিচু গলায় কি বল্লেন ফোনে। শুনতে পেলনা মন্তী।

তারপর মন্তী দাঁড়িয়ে রইল, দেখল বীরেনবাবুকে আস্তে আস্তে ঘর পেরিয়ে হেঁটে যেতে। দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি ডাকলেন—অঞ্জু, অঞ্জু। অঞ্জুর হাত ধরে উপরে উঠে গেলেন তিনি।

'ঠিকই করছ' মনে মনে যেন বলল মন্তী। মনে হল তার যেন বাবার অভিনয় দেখছে। 'ভাল ভাবেই তা করতে পারছেন বাবা'। মনের মধ্যে আবার গুনগুনিয়ে নিজের স্বর শুনল সে।

বাবার পিছনে পিছনে সব হেঁটে ঢুকলো মার ঘরে। ঘরে ঢুকতেই সেই পরিচিত গন্ধটা নাকে এসে লাগল মন্তীর। সবাই এক এক করে মার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মন্তী সেই ভীড়ের মধ্যে থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। ঘরের এক কোনায় গিয়ে দাঁড়াল। মার বুকে মুখগুঁজে দিদিরা সব কাঁদছে মন্তী দেখল। বীরেনবাবু দাঁড়িয়ে আছেন খাটের বাজুরে কনুই ছুঁইয়ে। একদৃষ্টে মাকে দেখছেন তিনি।

মন্তীর চোখ সবাইকে খুঁজেখুঁজে ফিরে এলো। ঘরের সবাই কাঁদছে। কেউ কারো



দিকে তাকাচ্ছে না। মন্তী ভাবল কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। কেউ দেখছে না মন্তী কাঁদছে কিনা।

'শেষে তুমি সত্যিই মরলে' মনে মনে বলল মন্তী খানিকপরে। বলেই তাকাল মার দিকে। কই তেমন কুৎসিত ত আর লাগছে না মাকে। ভাবল সে।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মাকে নিয়ে গেল শ্মশানে। মন্তী দেখল বাবাকে। শবযাত্রার সঙ্গে ধীরে ধীরে হাঁটছেন তিনি। মাটির দিকে চোখ করে। কেমন যেন দেখাচ্ছে তাঁকে। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য লাগছে।

সন্ধ্যের আগেই শ্মশান থেকে ফিরে এলো সবাই। মঞ্জুর হাত ধরে বীরেনবাবু গাড়ী থেকে নামলেন। বাড়ীতে ঢুকেই সোজা উঠে গেলেন উপরে। মন্তী দেখল। নিঝুম হয়ে বসে আছে সব, শ্রীলেখা, শ্রীরেখা, অঞ্জু। মন্তী আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল উপরে। সিঁড়ির মুখোমুখি মার ঘর। দরজাটা ভেজান। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। দেখল মন্তী: হাটু ভেঙ্গে মার বিছানায় মুখ গুঁজে পরে আছেন বাবা। কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার শরীর। অচমকা একটা ঘা খেল মন্তী। মার বিছানায় মুখগুঁজে বাবা নয়। অন্য কেউ মনে হল তার। হঠাৎ মনটা কেমন হয়ে গেল। কান্না পেল মন্তীর। গলা বেয়ে, সারা শরীর বেয়ে একটা কান্না উঠে এলো তার। কাঁদল মন্তী। কাঁদল বাবার জন্য। যে বাবা তার হারিয়ে গেছেন, আরো হারিয়ে যাবেন।

# সাহিত্য ও ইতিহাস

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

### ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

পাঠকের কাছে লেখকের আজকাল জবাবদিহি দিতে হয়। প্রথাটা প্রত্ন নয়, নবজাত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ থেকেই জোরাদাপটে তার সুরু। মাইকেলের কাছে জবাবদিহি চাইলেও তিনি তা দিতে খুব রাজি ছিলেন না। খুব রাজি কেউ, মানে কোনো লেখকই, থাকতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথও হয়ত সখেদেই রাজি হয়েছিলেন।

জবাবদিহি দিতে না চাওয়া যে লেখকের পক্ষে পাঠককে উপেক্ষা করা—ব্যাপারটা কিন্তু মোটেও তা নয়। বরং উল্টো। লেখক রচনা-কালে পাঠকদের নিজের সমকক্ষই ভেবে নেন। পাঠকরা তাঁর সূক্ষ্ম সমালোচক এ কথাটি সর্ব্বক্ষণ লেখকের মনে থাকে। তাই তিনি কলমের যতো রকম কসরৎ সম্ভবপর তা-ই দেখাতে তৎপর হয়ে ওঠেন। বিষয়টা কি দোষার্হ? গণরাজসভায় একজন নূতন পণ্ডিতের আবির্ভাব হ'ল নিজের বিদ্যাবত্তার পরিচয় দেবার জন্যে—যাঁরা সভাকবি কিম্বা রাজপণ্ডিতমণ্ডলী তাঁরা তাঁর গুণপণা গ্রহণ করবেন এ আশা তিনি করেন না, তাঁর ইচ্ছা থাকে কূটকৌশলে তাঁদের বুদ্ধির পরাজয় ঘটিয়ে সভাকবির পদলাভ করা। তিনি জানেন প্রাক্তন কবি-পণ্ডিতরা গুণাগ্রাহী হলেও রাজা তাঁর গুনাগারির ব্যবস্থা করবেন না, বরং সন্তুষ্ট হয়ে শিরোপা দেবেন : রায় গুণাকর।

সত্যি কথা, ভারতচন্দ্রের রচনার কতোটুকু কে আজ বুঝতে পারেন? তখনো বা—রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় কোন্ পণ্ডিত কতোটুকু তাঁকে বুঝতে পেরেছিলেন? দেখা যায় তেমন গুণসিন্ধু বা গুণীবন্ধু কৃষ্ণচন্দ্র ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। এক কৃষ্ণই দরিদ্র লেখকের পক্ষে সেদিন যথেষ্ট ছিলেন—তিনি শত কৃষ্ণের কাজ করতেন। কারণ বিত্ত ছিল তাঁরই করায়ত্ত। আজকের দিনে বিত্ত চন্দ্রকলায় বিভক্ত। নিক্তির ওজনে সবাই অভ্যস্ত। কাজেই ভারতচন্দ্রের বরাত ইদানীংকার লেখকদের নেই। কিন্তু বিদ্যার অহঙ্কারটি তাঁদের মনে এখনো পুরোমাত্রায়ই বিদ্যমান। তাঁরা হয়ত ভাবেন, না-ই বা থাকল পণ্ডিত-মণ্ডল, ছাত্রমহল ত আছে। সেখানেও ত তাঁদের ভাগ্যচন্দ্রোদয় হতে পারে! না-ই বা জুটল লরেল, অন্তত ছত্রপতির সম্মানটুকু ত দিতে পারেন ছাত্ররা। অবশ্য সে-যুগেও কোনো কোনো লেখক তেমন ভাবনায় সমৃদ্ধ ছিলেন। যেমন, ভবিষ্যৎ-নির্ভর ভবভূতি। আর কেউ



তাঁকে সম্মান না দিন, কিন্তু তাঁর আর কালিদাসের যুগের ১৩৫৯ বছর পরে অন্তত আমি উত্তর-রাম-চরিত্রের কয়েকটি ছত্র পড়েই মনে করি মানবিক বৃত্তির চিত্র-অঙ্কনে কালিদাস তাঁর অনেক পেছনে পড়ে আছেন। দ্রাবিড়ভূমির সন্তান ভবভূতি যে দ্বা-বিদ্যার অধিকারী ছিলেন কলির আর্য্য কালিদাস বাকপটু হলেও তার বিন্দুবিসর্গও আয়ত্ত করতে পারেন নি।

তেম্নি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ পণ্ডিত কালিদাস সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি, নবাবির্ভূত দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্র কি বল্‌ছেন, কোন্ বিদ্যার অংশ বা বংশ তিনি বহন করছেন। আজকের দিনেও কি কোনো বিদ্যালয়ের বিশ্ববিদ্যাবাহী-পুঁথিঘাঁটা কোনো পণ্ডিত এই পূর্ণচন্দ্রের কাব্য-সুধার খবর দিতে পারবেন? সাহিত্য-সভার কোনো সভাসদ, সাহিত্যের কোনো পার্ষদ বল্‌তে পারবেন না 'বিদ্যা-সুন্দর' কি অনিন্দ্য তত্ত্ব পরিবেষণ করছে। যে বৈষ্ণবী শক্তির মারফৎ বাংলা দেশে শৈব-বৈষ্ণবের মিলন-সাধন করা হ'ল—লক্ষ্মণসেনারা যে সমন্বয়ের ছিলেন বিধাতা-পুরুষ বিদ্যা-সুন্দর তারই ইতিহাস। দ্রাবিড়-ভূমির সঙ্গে বাংলার শুভপরিণয়ের যে গজমুক্তাহার কালগ্রাসে গজভুক্ত হয়েছিল মালিনী-গৃহে তা-ই পুনরায় গ্রথিত হল, বর্দ্ধমান-মহাবীরের বিদ্যার সঙ্গে পাণ্ড্য কাঞ্চীর শিল্পীপ্রতিভা এসে মিশল আবার দেহজ প্রেমের নির্ভুল পন্থায়। পাতালের আর স্বর্গের মিলনে তৈরী হ'ল মর্ত্ত্য—দেব-দৈত্যে তৈরী হ'ল নর-নারায়ণ। এই মহাসঙ্গমের সলিল নিয়েইত আর্য্যের আর্য্যামি—আর্য্য-সাহিত্যের সৃষ্টি-সম্ভার! এই মর্ত্ত্যের মানুষকে স্বর্গে পৌঁছিয়ে দেওয়া কিম্বা স্বর্গ থেকে দেবতাদের শয়তান বানিয়ে মর্ত্ত্যে নামিয়ে আনাই ত ক্ল্যাসিক্যাল আর্য্যসাহিত্য! যেম্নি মহাকাব্যগুলো ঠিক তেম্নি 'শকুন্তলা' 'ফাউষ্ট'। মৌর্য্য রোমের দান্তে পুরোপুরি আর্য্য হতে পারেননি বলেই না ইনফার্নো-বর্ণনায় ঋগ্বেদীদের মতো বলেছিলেন : "এদ ইয়য়েতে র্ন দূরো'—এ নরক স্বর্গ থেকে দূরে নয়। নারকীদের স্বর্গে তোলবার প্রয়াস প্রাতঃস্মরণীয় পরেকার আর্য্যদের মধ্যে কোথায়? স্বর্গের জন্যে কতো আকুতিই না ইনিয়ে-বিনিয়ে পাশ্চাত্ত্য আর্য্যরা করে গেছেন। রাবণ স্বর্গে-নরকে সিঁড়ি তৈরী করে দেবেন রাক্ষস-কুলের জন্যে বা শিব কিরাত ব্যাধ সেজে গঙ্গা-উমাকে নিয়ে অবাধে বিচরণ করেও মহাদেবই থাকবেন এমন দু' একটা উদাহরণ কি আর্য্য-সভ্যতায় পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতো কোনো সাহিত্য তর্কের অবকাশ না রেখে বলবেনা যে শূদ্রযোনীতেই দ্বিজের জন্ম। একথা অবশ্য আজকাল অত্যন্ত ক্লেশের সঙ্গে অনেকেই স্বীকার করেন যে দ্রাবিড়রাই আর্য্যদের আল-দেওয়া জমি চাষ শিখিয়েছে, শিখিয়েছে জলের ব্যবহার, হাঁড়িকুঁড়ি তৈরীর বিদ্যা। আর গ্রীকদের ইতিহাস লিখতে গিয়ে প্রমেথিউসকেও কেউ-কেউ কালোমানুষ কামার-কুমোর, অরণির অগ্নি-প্রজ্জ্বালক,

প্রথম মণীষী ইত্যাদি না বলে অন্য পরিচয় দিতে পারেন নি। কিন্তু তিনি যে এই পূর্ব্বাঞ্চলের প্রমথ শিবুঠাকুর দুই কন্যার অঞ্চলে থেকেও তেমন খুশী নন, আরেকটি যোষিতা চান কুলীনদের মতো—এ কথাটা বলতে পশ্চিমীদের যেমন জিভ আটকে গেছে তেমন ভারত-বংশীয়রাও তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছেন। ভারত-বংশীয়রা প্রচার করেছেন সরস্বতী নদী-তীরে তাঁরাই প্রথম অগ্নি-প্রজ্জ্বালন করে এই বিদ্যা এতদ্দেশে দান করেছিলেন আর তদবধি বিদ্যাদেবীর নাম হয়েছিল ভারতী আর সরস্বতী। এই আগুনের ছাই-এ চাপা পড়ে গেল বৃত্রের নদী দৃষদ্বতীর কথা—বৃহৎ সামের অর্থ—তুরাণীর শামন-বিদ্যারই যা অপভ্রংশ—ইন্দ্র-বরুণের ভোজবাজি-ডায়ার্কি। দ্রাবিঢ়-সন্তানরাও ভুলতে বসল যে শ্রীহট্টে সতীর গ্রীবা পড়েছিল বলে জন্ম নিলেন সেখানে মহালক্ষ্মী বা গজলক্ষ্মী, ভারতচন্দ্র যাকে শেষ মহাবিদ্যা বলে জানতেন। আর সীলমোহরে যার চিহ্ন নিয়ে ত্রিকলিঙ্গের শৈব গুপ্তসম্রাটরা আবির্ভূত হয়েছিলেন, আর তেমনি ভঙ্গীতে গাঙ্গেয় সিংহ কলচুররা। কটকের বাকাটক বংশ আর গাঙ্গেয় কলচুররা উত্তর ভারতে যে কালচার দান করেন তা সুমের থেকে আগত কি সুমেরে-উরে উপনীত তা কেউ জানলনা। তবু কলটুর কথাটি গঙ্গার কলকল্লোলেরই সুর বহন চলল। শ্রীহট্টের ঠাঁটেই সেখানে 'ট'-বর্গের আবির্ভাব। সেখানকার রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা নবগীর্ব্বাণদেব হঠযোগে যে বাগীশ্বরীকে ডেকে আনলেন, যে তন্ত্রশাস্ত্র বা ব্রহ্মবাদ জন্ম নিল সমতটে, হরিকেলে, চন্দ্রদ্বীপে এবং ব্যাঘ্রতটীতে তা-ই যে একদিন বর্ম্মণদের কৃপায় ভায়া নালন্দা, মহোবা এবং মোহেঞ্জোদারো পৌঁছিয়ে অর্ম্মণদের এলাকায় পড়ে গলদের বিষবৃক্ষ হয়ে উঠবে তা বোধহয় স্বয়ং ব্রহ্মারও অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু ব্রহ্মপুত্ররা তারই ফল অমৃতফলজ্ঞানে প্রথম ভক্ষণ করে বসলেন। মুঙ্গল ইশ্লামের আসামে অভ্যুদয় কুবলাই খানকে নিয়ে প্রথমই খাসিয়াদের অঞ্চলে। তবে বা লার কাপালিক ঈশাণীদের, শান-প্রদেশের খাম্‌তি কৌমের আর লামাদের মণিপদ্ম মন্ত্রের অনেকখানি রূপবাণীই ছিল তখন কুবলাই-এর ধর্ম্মে। তিনি যেম্নি গঙ্গাজলে মহার্ণবের মোহ ত্যাগ করে লক্ষ্মীছেলে সুমঙ্গল ব্রাহ্মণ আর কুবলয় হাতে বিষ্ণু হতে পারতেন তেম্নি খাসীয়াদের অভিনন্দন সূচক 'কুবলাই' ধ্বনিতে আসামী গজারোহী হয়ে গজ-নীরে গজনিকেও সিঞ্চিত করতে পারতেন। তার রাজ-কান্তিতেই ত্রিপুরা-জাতি তাঁদের রাজাকে 'রাজাখান্' বলতে শিখেছিলেন। বর্ম্মী বর্ম্মণদের সঙ্গে এভারেষ্ট-পাদমূলবাসী তিব্বতীদের বটুর সংযোগে এই যে টিবেটো-বার্ম্মাণ জাতি তৈরী হল তা রিজলে সাহেব-সম্প্রদায়ের পর্ব্বত-জাতিতত্ত্ব আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বেই ভারতচন্দ্র সম্প্রদায়ের জানা ছিল। তাই 'নাগাষ্টকে' এই প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড শাখার গোড়ার কথাটি এম্নি চমৎকার একটি পংক্তিতে পাওয়া যাচ্ছে :

"এর্ভিজনো ভবতি যো মণিমন্ত্রবর্ম্মা"



জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে, আমরা যা শুনি, এভারেষ্ট নামধেয় জনৈক সাহেবের নামেই নাকি হিমালয়ের একটি চূড়া নামাঙ্কিত, তা কতোটুকু সত্যি ?

বীরভূমের চেদিরাজ অক্ষ্মীকর্ণ ভীল-সন্তান হয়েও একদা 'পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি'-চিহ্ন নিয়ে 'মনসিজ জিনিয়া মূরতি' দ্বিজ হয়েছিলেন। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'-নাটক পাঠে অবলীলায় ভারতচন্দ্র তা অবগত ছিলেন। তিনি অজয়গড়ের শিলালিপির এ তথ্যও জানতেন যে বজ্রযানী কর্ণপয়োধিপানেই শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মক্ষিতিপ বিদ্যাধর গীতকীর্ত্তি হয়ে বর্দ্ধমানে নূতনরাজ্য স্থাপন করেন। আমরা অদ্যাপি পৃথ্বীরাজ রূপে, উর্ব্বীপাল রূপে এই চন্দ্রগুপ্ত ভীলটিকে তাঁর সীলমোহরে, মুদ্রায়, নাগপুর-শিলালিপিতে, প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের ভূমিকায় দেখতে পাচ্ছি। তবু তার নাম দিচ্ছি লক্ষ্মীকর্ণ কিন্তু লক্ষ্মীমূর্ত্তিকে কবে উধাও করে দিয়ে তিনি যে গজ-লাঞ্ছনটিকেও স্বর্ণ-লতায় মুড়ে বিবর্ণ-সিংহ-চিহ্নে বিজয়সিংহের লঙ্কার ও গজনির স্মৃতি অক্ষয় করে গেছেন সেদিকে দৃষ্টি বা কর্ণপাত করছিনে। এই নববরাহী কর্ণদেব কর্ণাটকদের নাটকেও নট সেজেছিলেন—বঙ্গোপসাগরের বারি সুহৃদ্বারি দ্বারকার উপকূলে আরবসাগরে গিয়ে মিশেছিল। আদিশূরের, ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের, বিক্রমাব্দের আবির্ভাব তখন থেকে। এই কালীয় আর্য্যকেই কালিদাস ভজনা করেছেন—উত্তরাগত এই বৃহন্নলাকে কিন্তু ভারতচন্দ্র জানতেন যে ধনুর্বিদ্যাটা তাঁর কিরাত শিবের কাছে শেখা ! তবে মুস্কিল যে কিরাতী কাত্যায়নরাও তখন ভোজবাজি আর ভোজন-বাজী নিয়ে মত্ত—বর্ম্মণরা রাজা হয়ে দেবতা সঙ্গ বর্জ্জন করে বিবেক-ধর্ম্ম অর্জ্জন করেছেন—কাতি আর খরবাল কলিঙ্গ-রাজ চেত-খারবেল হয়ে গেছে—জয়রথ কেতুভদ্রের রথযাত্রায় পর্য্যবসিত। বৃদ্ধ বর্ম্মণবংশ আর তখন প্রধূমিত নয়, বৃদ্ধা ধূমাবতীকে কেতনসমন্বিত রথের সামনে স্থাপন করে বর্দ্ধমানে বসে জীর্ণ জরথ্রুষ্ট বা জৈন মহাবীরের মন্ত্র সাধন করছেন। বর্দ্ধমানের এ-বিদ্যার যশও অবশ্য মুঙ্গল 'যশোধরা' বা 'যশোদা'র চাইতে কম ছিলনা। মুঙ্গলে যতোটা মঙ্গল আমরা পেয়েছি, তাতারি কলিঙ্গের শুভকর-কুলে বা হরিকেল সুবলের শুভ মোহরে পালরাজত্বে তার চাইতে কম পাইনি। বাংলার দুই কূল উপছিয়ে তখন কুলমান, ধনজন, ধানপাট, রাজপাট, শাটক-শকট, গৃহ-গড় গড়িয়ে পড়ছে। কুম্ভবংশ তাতারিরা সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। সওদাগরী সপ্তডিঙার নাবিক শ্রীমন্তের চোখে তখনও গজলক্ষ্মী, চাঁদিওয়ালা চাঁদ তখনো মনসাকে অমান্য করে মহাবীরের 'মনস্'-মন্ত্র নেয়নি যদিও তখনো সে যোগী, শাক্ততন্ত্রযোগশাস্ত্রের সন্তান—সর্পভয়ে ভীত নয়। মহাবীরের মহাজ্ঞানের বা মহাভাবের জন্যে দশমহাবিদ্যারা মাত্র তৈরী হচ্ছিলেন, তৈরী হচ্ছিলেন শৈব সন্ন্যাসীরা—কলিঙ্গের ভৌমিক করকুলে সেই করপল্লবের পরিণয়, সেই মহাসঙ্গমের আলেখ্য দেখা যায়। অতঃপর দেখি নালন্দায় শ্রীজ্ঞানের প্রবেশ। 'মানে'র ম্যাজিক একদা বৈবস্বৎ ও স্বয়ংভূ মনুর জন্যে মেখুলে নয় পথ দিল। তবু কেউ তাঁরা আর্য্য নন, ব্রাত্য, জৈন।

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের কালে রচিত চোর-পঞ্চাশৎ এর ৫০টি শ্লোক থেকে তিনটি শ্লোক ভারতচন্দ্র তাঁর বিদ্যাসুন্দরে ব্যবহার করেছেন। দেখাতে চেয়েছেন বিদ্যাপতি চোর নয়, চোরগঙ্গ—কাঞ্চীরাজপুত্র, আদ্যাশক্তির সেবক। মহাবল্লীপুরমের দুর্গাকে আমরা, অন্তত আনন্দবাজার পূজাসংখ্যার মারফৎ, বহুবারই দেখেছি। মূর্ত্তিটিতে আছে তিনি চোরগঙ্গবংশী নরশিং-কে তাড়াচ্ছেন। অর্থাৎ কৈবর্ত্ত বা নমঃশূদ্র দিব্যক বংশকে তিনি ঠাঁই দিতে চাচ্ছেন না, কেননা তারা তাতার, কাসীয়, দক্ষজ, ছাগমুণ্ডী, নেপাল-গোপালের বংশ নয়। রাঢ়ের যে রাধা বা দয়িতবিষ্ণুর বংশে গোপালদেবের আবির্ভাব সেই রাধার সঙ্গেই বৈষ্ণবী দশভুজার আত্মীয়তা—কিরাতের দেশে, সমতটে, রাজা রত্নফার সীলমোহরে, 'দুর্গারাধন আপ্তবিজয় সিংহ' মূর্ত্তিতে। রাধনপুরে গোবিন্দের সঙ্গে ( রাধনপুরের তাম্রশাসন ) রাধা গিয়ে অসামরিক ভাবে বসবাস করে তার কুফলে গোবিন্দপালের রাজ্যনাশ করলেও কি দুর্গা এই যমলা বোনকে ভুলতে পারেন? যে প্রাথমিক অক্ষরগুলো গোবিন্দপালের রাজ্য-বিনাশ সূচনা করে লিপিবদ্ধ আছে তা হল: 'ছেনস্তবলসম্ভব খর বসন্তেঅসিতাভ ঞর গ্রীষ্মেঅমোঘসিদ্ধি অষ্ট্র শিশিরে বজ্রসহ—"। ইনি যে ধবলা গাই-এর স্নেহভুক্ত, শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণবটু খরবাণ ( পরে নবগীর্বাণ হবেন ) বসন্তে দ্বিজ হবার জন্যে ব্রাহ্মণের সমীপে উপনীত বটকৃষ্ণ, অষ্ট্রলয়েড, গ্রীষ্মে রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে অমোঘসিদ্ধি লাভ করবেন, করবেন মহাভারত ও ভাগবৎ-রচনা, শিশিরে মেঘ এনে কুয়াশার সৃষ্টি করে বজ্রধর ইন্দ্র হবেন, বাংলায় তেমন একটি গোপালের আবির্ভাব এই বাণী নিয়েই হয়েছিল। বৃষভাণুদুহিতা বৃদ্ধা রাধা যে স্বামীর শিষ্য আরুণিবৎ এই বালকে আসক্ত হবেন, এই তরুণে অরণির আগুন দেখতে পাবেন জয়দেব আর ভারতচন্দ্র ছাড়া আর কোনো বৈষ্ণবের কি সে-কথা জানা ছিল? তাই ভারতচন্দ্র গীতগোবিন্দের চাইতেও সোচ্চার হয়ে শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে বলছেন:

"বয়স আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প তুমি দেখাইয়া তল্প জাগাইলা যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া অঙ্গভঙ্গ দেখাইয়া তুমি কৈলা কামী॥"

যেম্নি দুর্গা তেম্নি রাধা মৈরঙ্গদানবের কামরূপের বরাহী—বড়ায়ী। শক্তি দ্বিধা হল। মৈরঙ্গে। খাসীয়ারা রঙ্গরস শিখল। ইনি যূ হয়ে হিমালয়সুতাকে হোলি আর লিসতে নিয়ে গেছেন—ইস্রাইলের উপরে সেমেটিক 'বষণ'-রাজ্য গড়ে তাদের বসন ও বসন্ত দান করেছেন। তারপর সমুদ্রগুপ্তে 'হরিষেণ' হয়ে বসেছেন। কিন্তু কনফুসিয়সের কাছে তিনি আর আত্মগোপন করতে পারেননি—আদি বরাহ যে আবার যবিষ্ঠ বরাহ হয়ে রুদ্র হ'ল, হল যূবানমিঙ্গ—যুবকের অঙ্গ ধারণ করল, চৈনিক দার্শনিক তাঁর 'শুকিঙ্গ'-গ্রন্থে তা ধরে ফেললেন। ব্রাহুই শোহরাব-এও তা ধরা পড়েছে কিন্তু আমাদের মতো কুম্ভকর্ণের চক্ষুকর্ণে নয়। তবে অনেক ভারতচন্দ্রের মধ্যে কোনো এক হোলির ভারতচন্দ্রের দর্পণে সে-মুখ এসেছিল:



"হোলীয়ং সমুপগতা গতবতী ক্রীড়াকথা মাদৃশাং
দূরে ভূপতিরুন্মনাঃ পূরজনো দুর্গায়না গায়নাঃ"

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ভারতচন্দ্র যে আদি ভারতচন্দ্র নন সে খবর আজকের দিনের সাহিত্য-পরিষদের অজ্ঞাত থাকলেও 'দে-ব্রাদার্সের জীবনী-লেখকে'র নিকট বার্ত্তাটি অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত ছিলনা। তিনি বলেছিলেন:

"এই সে ভারতে চেয়ে সেই সে ভারতে চেয়ে
কোথাও তাহারে নাহি পাই।"

হয়ত সব ভারতচন্দ্র একই বংশের ছিলেন—হর্য্যঙ্ক বংশের, শিশুনাগ অজাতশত্রু যাঁদের বিনাশ করেন। সবাই বৈষ্ণব, দায়ে পড়ে শৈব বা শাক্ত হয়েছিলেন—আর আমাদের ভারতচন্দ্র ত তাঁর গোপী-ধর্ম্ম গোপন রাখবার কথা এবং বিপরীত-ধর্ম্মী বহু প্রভুর সেবার বার্ত্তা নিজের মুখেই বলে গেছেন। তখন বাংলায় বহু ধর্ম্মের ভীড়। শাক্ত বাঙালী, শৈব মারাঠা, তার উপর শাল্ব নরসিং-এর রাজ্য ছত্রখান—বীদর-রাজ অলি-বরীদ সেখানে উদিত—বীজাপুরে ইব্রাহিমাদিল ইশ্লামের বীজ-বপনে রত। শুধু তা-ই কি? পরতুগীজ জেসুইট্সরাও তখন এসে গেছেন। এদিকে বাংলায় আসামী ইশ্লাম সরফা-রাজখান। অলি-বরীদ অবশ্য তখনো আলিবর্দ্দি নন। তবু সেই সঙ্কটে রাধার মতোই সবার অবস্থা—রাধার ধর্ম্ম রাখা দায়। সত্যপীরে কায়ক্লেশে মত্ত থাকতে হচ্ছে—হরিকে ফকীর বানাবার ফিকির বার করে বাংলাদেশ বাঁচতে ব্যস্ত। ভারতচন্দ্র আশ্রয় পেলেন কৃষ্ণচন্দ্রের কাষ্ঠের নৌকোয়, যিনি ছিলেন রুদ্রবংশে চতুর্থ রাজা, তাই 'সনে রুদ্র চৌগুণা'-তে সত্যপীরে নারায়ণের স্তব রচনা করে মনকে প্রবোধ দিলেন। যবদ্বীপী বর্ম্মণদের মতো যবদ্বীপী ওলন্দাজরাও ছিলেন নৌবাহী, জলচর, নারায়ণ—পরতুগীজরাও তা-ই। কাজেই নারায়ণী সেনাকে প্রণাম জানাতে আর দোষ কি? তাছাড়া সবাই তাঁরা বিদ্যাচোর বিদ্যাপতি—বাংলার বিদ্যাধরীদের সুযোগ-সুবিধা পেলেই চুরি করতেন। কথাটা প্রকাশ করতে বঙ্কিমচন্দ্র একটুও বাঁকা ভঙ্গী নেন নি—সরাসরি শৈবলিনী-কাহিনী লিখে ফেলেছিলেন—সেখানে বিদ্যাধরীকে নিয়ে শিবুঠাকুর চন্দ্রশেখর মহাশয়ের কী দুর্ভোগ! ইতিহাস জানা থাকলে সাহিত্য-সৃষ্টি যে কতো সহজ বঙ্কিমচন্দ্র তা দেখিয়ে গেছেন। পলাশীর নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত এ-ধারা বয়ে এসেছিল তারপরই আমরা অপলাপী ইতিহাস শিখতে সুরু করলাম—কানিংহামের কুপরামর্শে বাংলা সাহিত্যে প্রলাপের ছোঁওয়া লাগল। যবভূমির সন্তান যবচার্ণকের সঙ্গে কোন্ ব্রাহ্মণী বা ব্রহ্মাণী বা বর্ম্মানী বসবাস করে অন্নম-ভূমির অন্নপূর্ণা হয়েছিল গঙ্গার ধারে-ধারে কৈবর্ত্তকালয়ে আজও আমরা তাঁর দেখা পাব, পাব মৌখরী বা ময়ূরী চিহ্নধারী মগদের—আর দেখতে পাব সেই ময়ূরী অবলীলায় মুরগী হয়ে মুঘলের দলে চলে গেল কি ভাবে!

বাংলার কৈবর্ত্তদের ত্বকে শ্বেতবর্ণ দেখে হুটন-সাহেব হুট করে মেডিটেরানিয়ানে উড়ে গেছেন, বঙ্গোপসাগরের ত্রিতীর খুঁজেই তিনি এই 'ত্রাতার' তাতারদের পেতেন যাঁরা কাশীতে কাসিপুত ভাগভদ্র নাম নিয়ে বিরাজ করতেন আর কচ্ছপের দেশ সিন্ধুদেশে কাসিমপুত্র মহম্মদ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমরা সবাই হুটনের পক্ষ-বিধুননেই মোহিত—বিলিতি বুলিতে অভ্যস্ত হয়ে বাংলার ইতিহাস-ভাষা-সাহিত্য-জাতিতত্ত্ব জেনে বুঁদ হয়ে আছি মনে করি। অবশ্য ঠিক ঠিক এমন মনে করাটা তেমন-অপরাধ নয়। আমরা বুঁদই হয়েছি, বড়ো জোর বুদ্ধু, বুধ কেউ নই।

যাক্, প্রবন্ধের ভূমিকা দীর্ঘ করে পণ্ডিতমণ্ডলীর অধিক অভিশম্পাৎ কুড়োবার ইচ্ছে আমার নেই। প্রবন্ধের উপান্তে এসে, আমাদের ভারতচন্দ্র 'বিদ্যা' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছিলেন, শুধু মনে সে-কথাটাই বিদ্বজ্জন-সমীপে নিবেদন করছি।

'বিদ্যাবিদ্যাবিদ্যা' এই তিনবার 'বিদ্যা' শব্দটির উচ্চারণে আমরা বিদ্যার তিনটি অর্থ পাব ভারতচন্দ্র একথা বলেছেন। সত্যি তা-ই আমরা পাচ্ছি—পাচ্ছি 'দ্যাবিদ্য' কথাটি যা মহীপালের অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতায় দ্রাবিঢ়-ভূমির দুই বিদ্যা—যুদ্ধ ও মৈত্রী বোঝায়। পাচ্ছি 'দ্যাবি' কথাটি যা কৈবর্ত্তরাজ 'দিব্য'কে বোঝায়, বোঝায় স্বর্গ। তৃতীয়ত পাই বৈদিক বাণী 'আবিঃ'-কে যা থেকে বরুণের অরুণের আভা আবীরের জন্ম—আভীরের, আহিরের জন্ম—জন্ম 'অভী' মন্ত্রের—এভারেষ্টের—আভীরের ইষ্টদেব হিমালয়ের। আকাশের দিব্য জ্যোতি নিজেদের মধ্যে আবির্ভূত হোক এ কামনাই করতেন একদিন ব্রহ্মার পুত্র ব্রাহ্মণরা—বহন করে আনতে চাইতেন সেই রাঙা আবীরকে নিজেদের মধ্যে আবেস্তার মগ-বহমনরা। কালো জাতির সঙ্গে শ্বেতজাতির মিশ্রণে তৈরী হয়েছিল আবীরের আভা—আমেরিকার নিগ্রোদের মতো তৈরী হয়েছিল রেড-ইণ্ডিয়ান, যাঁরা ভারতবর্ষে নীল-লোহিতের পালা শেষ করে পাড়ি দিয়েছিলেন আলাস্কার পথে আমেরিকায়। আজ আবার সে স্থানেই তৈরী হচ্ছেন তাঁরা। তাঁরা স্কয়দিয়ান—সিদিয়ান, সদিয়ার স্কন্দ—স্কন্দনভিয়ার আদি পুরুষ, স্কট—কটা, পিঙ্গল। ইড়া পড়ে রইল ইরাবতী আর ঐরাবতীর তীরে—পিঙ্গলা পালাল পিঞ্জর ভেঙে—ভাগবতী রাধা আর ঘরে রইলনা ভগবতী দুর্গা হয়ে। এই কীর্ত্তি কীর্ত্তিবর্ম্মার, কীর্ত্তিরায় কার্ত্তিকদের। এই তুরাণী বা স্কয়দীয় 'ভোগ'-বাদের উদ্ভব রক্তের হোলিখেলা হয়েছে যেখানে সেখানেই, আদিপীঠ কামাখ্যাতেই হয়ত তা প্রথম। 'শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মণঃ পত্রম্' অনুষ্টুপ ছন্দে তাই সেই কার্ত্তবীর্য্যের নিকটই প্রথম প্রেরিত হয়েছিল যিনি ছিলেন ঃ

মহারাজ রাজাধিরাজ প্রতাপ
স্ফুরদ্বীর্যং সূর্য্যোল্লসৎ কীর্ত্তিপদ্মে।

# খল

## সুকোমল দত্ত

বসন্ত সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠছিল। হঠাৎ বসবার ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত্ত মাত্র, তারপরই আবার উঠতে আরম্ভ করল। অবশ্য আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করবার ইচ্ছা বসন্তর না হয়েছিল এমন নয়, কিন্তু হাতে একগাদা বই থাকায় আর বহুক্ষণ ঘোরাঘুরি জনিত শ্রান্তি থাকায় সে ইচ্ছা এবং কৌতূহল দমন করতে বাধ্য হলো। সোজা নিজের ঘরে গেল। রেডিওটা খুলে দিল, ভেবেছিল ভাল কোন গান থাকবে, না, মজদুর মণ্ডলীতে বক্তৃতা হচ্ছে। তাই বন্ধ ক'রে দিল। তারপর সুইচটা অফ ক'রে দিয়ে খাটের উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

এখানে বলা দরকার বসন্ত বা বসন্ত চৌধুরী একজন সাহিত্যিক। বয়সে তরুণতম। তিরিশের নীচে তা। এত অল্প বয়সে বসন্তর মত জনপ্রিয়তা কারোর ভাগ্যে বোধ হয় জোটেনি। বসন্ত ছেলে, বুড়ো, যুবতী, বৃদ্ধা সকলের প্রিয় সাহিত্যিক। মঞ্চ এবং পর্দার কোন কোন অসম সাহসিক প্রযোজক তার বই অভিনয় ক'রে অভাবিত সাফল্য লাভ করেছেন। সেই থেকে বসন্তর চাহিদা মঞ্চ এবং পর্দায়ও উত্তীর্ণ হয়েছে। এই জনপ্রিয়তা এবং চাহিদার সুযোগ বসন্ত পুরোপুরি নিতে কার্পণ্য করেনি। একদিন যা সখের ছিল আজ তা পেশায় দাঁড়িয়েছে। লোভনীয় ব্যাঙ্কের চাকরিটা বসন্ত সানন্দে ছেড়ে দিয়েছে, কারণ সময়াভাব। লেখার জন্য সময় চাই এবং লিখতে পারলেই টাকা—যা, ব্যাঙ্কের চিঠি মুসাবিদার পারিশ্রমিকের চেয়ে অনেকগুণ বেশী।

বসন্ত সব সময় লেখে, দিনরাত লেখে। সে কোন দলের নয়, সে কোন মতের নয়। সে জনপ্রিয়, সে সকলের। এজন্য তার লেখা পেতে হলে নিয়মমাফিক টাকা দিলেই যথেষ্ট। তারপর তা নরমপন্থী না গরমপন্থী, রক্ষণশীল না প্রগতিশীল কোন কাগজে বেরুচ্ছে সে নিয়ে বসন্ত মাথা ঘামাবে না।

বসন্ত গল্প লেখে, উপন্যাস লেখে, ছায়াচিত্রের চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লেখে—সব দিকেই তার সমান সাফল্য, সমান কৃতিত্ব। যে দিকেই হাত দিয়েছে তাতেই টাকা ফলেছে। সময় সংক্ষিপ্ত হলে গদ্যকবিতা লিখেও দেখেছে, তাও সে পারে।

প্রকাশকরা তার বই লুফে নেবার জন্য ব্যস্ত; তার নূতন বই বেরোবার দিন দোকানে লাইন হয়। বসন্তর কোন ক্ষোভ নেই এজন্য। সাহিত্যের জন্য সে ততটা ভাবেনা, টাকা পেলেই খুসী। টাকা ছাড়া সে একলাইনও লিখতে রাজি নয়। সে প্রফেশনাল লেখক,

যেমন হতে পারতো প্রফেশনাল স্কুলমাষ্টার, কেরাণী উকিল বা ডাক্তার। একথা স্বীকার করতে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই তার। কেউ বিনি পয়সায় লিখতে বললে সে সবিনয়ে তা অস্বীকার করতে পারে এবং তা পারে বলে তার গর্ব আছে। বসন্তর একটু বদনাম হয়েছিল প্রথম দিকে কিন্তু তার জনপ্রিয়তাই তাকে রক্ষা করেছে। অবিচলিত রেখেছে।

বসন্তর লেখার পারিশ্রমিক বেশী তবুও সকলকে সে সময় মত লেখা দিয়ে উঠতে পারে না। এত ব্যস্ত। অধুনা আর এক উৎপাত, হ্যাঁ উৎপাত বৈকি বসন্তর পক্ষে, উপস্থিত হয়েছে। নানা রকম সভাসমিতিতে যেতে হয়; সেখানে যাই খুসী বলো কিন্তু সময় নষ্ট তো। তারপর আজকাল একআধটা প্রবন্ধও লিখতে হয়। তাতে যাতা কিছু লেখা চলে না, এক আধটু ভাবতে হয়, পড়তে হয়। তাই বেশ সময় নেয়। নাম করার বিড়ম্বনা আর কি! কৌলিন্যের দায়! বসন্ত তাই ভাবে।

বসন্তর সময়ের খুব দাম। আজকেই সন্ধ্যাবেলা সভাতে ভাষণ দিয়ে ফিরে একটা বড় গল্পের শেষটুকু লিখবার কথা ছিল। সম্পাদকটি খুব তাড়া দিচ্ছেন—বলা বাহুল্য পারিশ্রমিক সমেত। বসন্তর ইচ্ছা ছিল সভা থেকে ফিরেই কাজটা শেষ করে ফেলবে। কারণ, ভেবেটেবে ঠিক করে রেখেছে, শুধুই কাগজে ফেলা। বসন্ত কিন্তু রুটিনের ব্যতিক্রম করে ফেলেছে; পথে এক প্রকাশকের নিকট গেল। তার কাছ থেকে কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল। সেখান থেকে বই-এর দোকান। কিছু বই কিনে এই একটু আগে বাড়ি ফিরেছে। এত শ্রমের পরও কিন্তু বসন্ত লিখতে বসে রোজ চা-এ নিজকে উদ্দীপিত করে।

কিন্তু আজ আর তার উৎসাহ নেই। সত্যি কেন সে লিখবে? কিসের জন্য? কার জন্য? বসন্ত ভাবতে লাগলো:

নীচে বসবার ঘরে সুনন্দা, বসন্তর স্ত্রী, যে যুবকটির সঙ্গে আলাপ করছে তাকে বসন্ত চেনে, খুব ভাল ভাবেই চেনে। সে যেন কার ছোট ভাই নামটা যার বসন্ত কিছুতেই মনে করতে পারছেনা—এত পরিচিত লোক তার! কিন্তু দেখেছে সে ঠিকই একে কোথাও।

অধুনা ছেলেটি,—হ্যাঁ ছেলেটিইত, বসন্তর চেয়ে কত ছোট,—বসন্তর কাছে ঘোরাঘুরি করছে একটি লেখার জন্য—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ যা হোক, তাদের সাহিত্য চক্রের মাসিক মুখপত্রটির জন্য যার এখনও কোন অস্তিত্ব নেই কিন্তু যার সম্ভাবনাময় আবির্ভাবের জন্য ছেলেটির—আশিস্, মণ্টু না সমীরের, এই প্রচেষ্টা। যার প্রথম সংখ্যার জন্য বড় লেখকদের নামজাদা লেখকদের প্রবীণ ডাকসাইটে অধ্যাপকদের লেখা চাই। এবং যেহেতু বসন্ত নামকরা লেখকদের অন্যতম, তার লেখা তাদের চাই-ই চাই।



এদের কাছ থেকে, বসন্ত বেশ ভাল ভাবেই জানে, টাকা পাবার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও নেই। কথাবার্তায় আর্থিক দিকটাই এরা, নূতন প্রগতিবাদীরা, সযত্নে এড়িয়ে চলেন। অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় বসন্ত এখন এসব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করতে শিখেছে। টাকা এরা দেবেনা অথচ যেহেতু কাগজের উদ্যোক্তারা বসন্তর পরিচিত X Y Z এর ছোট ভাই, ভাগ্নে, ভাই পো, বসন্ত এদের সরাসরি মানাও করে দিতে পারে না। হাজার হলেও লেখকত। চক্ষুলজ্জা তাদেরও আছে। 'দেবো' 'দিচ্ছি' 'সময় স্বল্পতা', 'আমাকে-আবার-কেন?'—নানা রকম ওজর দেখিয়েছে কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। ছেলেটি আসা কমায়নি। বসন্তরও ধনুর্ভঙ্গ পণ 'নো মানি, নো লেখা'! স্পষ্টত বিরক্তি দেখিয়েছে, বনেদী কাগজ না হলে লেখে না বলেছে (অবশ্য এটা সর্বৈব মিথ্যা কথা, কিন্তু যেহেতু ছেলেটি প্রতিবাদ করতে সাহস পাবেনা বসন্ত চৌধুরীর কাছে, তাই বলা)। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে সাক্ষাৎ দিয়েছে। আশ্চর্য! তবুও ছেলেটি বসন্তর আশা ছাড়েনি। ছেলেটির ধৈর্যে বসন্ত বিস্মিত হয়েছে। তাদের কলেজ আমলে এতটা তারা পারতনা, করেও নি। বসন্ত বেশ সমস্যায় পড়েছিল। চতুর্থ দিনে মরিয়া হয়ে শেষে ছেলেটির সঙ্গে বসন্ত আলাপ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল খটমটে কিছু আলোচনা করে ছেলেটিকে নিরুৎসাহ করে দেওয়া অন্তত ওর কাছে আসার ব্যাপারে। এর জন্য দশ মিনিট সময় নষ্ট করেও বসন্তর মনে কোন অনুতাপ হয়নি। কারণ বসন্ত একটু ডিপ্লোম্যাটিক হতে চেয়েছিল। বসন্ত বলেছিল; "কাগজ বের করবে, ভাল কথা; এ বয়সে মনে মনে সাহিত্য সেবার একটা উদগ্র নেশা জাগে। অনেকটা সিগার খেতে ইচ্ছা হবার মত। তোমরা লিখছত তাতে? না কতক লেখকের ঠিকানা জানা আছে আর তাঁদের বাসায় যাবার মত সময় এবং পয়সা আছে তাই লেখা খুঁজে বেড়াচ্ছ? হয়ত তাঁরা দেবেন লেখা। এক আধবার, তার বেশী নয়। কেনই বা দেবেন! কাজেই তোমাদের লেখা চাই। ডিটারমিণ্ড হও যা হোক্ তোমরাই লিখবে। তা না হলে দেখবে আদ্দেক লেখা এসে পৌঁছয় না, কাগজ সময়মত বেরোয় না,—মাঘের সংখ্যা বেরোয় চৈত্রে। বা ফর্মা ভর্তি হতে চায় না। এভাবে কাগজ চলে না। ঘরের টাকা যায় জলে। নিজেরা লিখবার জন্য গ্রুপ সৃষ্টি করো যেমন করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী 'সবুজ পত্রে', ধূর্জটি মুখুজ্জে আর সুধীন্দ্র দত্ত 'পরিচয়ে'। এ না হলে কাগজ! নূতন কিছু করো, গতানুগতিকে সার্থকতা নেই। আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম, (বসন্ত অবশ্য এখনও তিরিশের নীচে) না হলে আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এমন একটা 'গ্রুপ' তৈরী করতে। কিন্তু তা কি হয়! প্রতিজ্ঞা করো তোমরা যারা এর উদ্যোক্তা প্রত্যেকেই যেমন করে পার তাই লিখে যাবে আর তারপর আমরাত আছিই হাতের পাঁচ।" শেষের কথাকটি দীর্ঘ বক্তৃতার পর ক্ষীণ একটু আশার

বাণী। ছেলেটি কিছু শুনল, কিছু হয়ত শুনল না, কতক হ্যাঁ-না করলো কখনো বা নাড়ালো মাথা, কারণ সে বসন্তর চেয়েও ডিপলোম্যাট বেশী।

বসন্ত কিন্তু দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বেশ তৃপ্তি অনুভব করলো। ভাবলো উকিল হলেও সে বেশ প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারতো। কেমন দিব্যি কোন প্রকার কথাও দিলনা অথচ ছেলেটিকে নিরুৎসাহ এবং বারণই করে দিল। বসন্ত নিঃসন্দেহ যে ছেলেটি ওর কাছে আর কোন দিন লেখা চাইতে আসবে না।

আসেও নি সে বসন্তর কাছে—এসেছে সুনন্দার কাছে যে বসন্তর বহু বিখ্যাত সুন্দরী স্ত্রী এবং যার অনেক খ্যাতিই আছে। ছেলেটি ডিপ্লোম্যাট্ সন্দেহ নেই বসন্তর আর।

অবশ্য এসবের জন্য বসন্তকেও দোষ দেওয়া যায় না। লেখার জন্য সে চাকরি বন্ধুবান্ধব, খেলা-ধূলা, সিনেমা-থিয়েটার ( নিজের লেখাটা বাদে ) সব ছেড়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন সে ভাল করে খবরের কাগজটি পড়তে পায়না, হাত পা ছড়িয়ে একটু আলসেমী করতে পারে না, সময় নেই। শেভ্ হবার কথা ভুলে গেছে, হাত পায়ের নখ কাটা হয়নি। শুধু লিখেছে আর লিখেছে। হাত ব্যথা করলেও মাথা গুঁজে লিখেছে।

এজন্য তাকে পরিমিত বন্ধুদের কাছে কম বিদ্রূপ শুনতে হয়নি। আর সুনন্দা! তার সঙ্গে বসন্তর ব্যবহার নিতান্তই মামুলী পর্যায়ে এসে নেমেছে। আজ পর্যন্ত সুনন্দাকে প্রাণখুলে ভালবাসা পর্যন্ত জানাবার অবকাশ পেল না। বছর তিনেক আগে সে তাকে যে ঘরোয়া ক্ষুদ্র এক সম্বর্ধনাতে তার লেখার 'পর ছোট্ট একটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিল, তখনও সে বিখ্যাত হয়নি, বিয়ে করে রেখেছিল ভালবাসবে বলে। ঐ পর্যন্তই ; সেটা এখন প্রত্নের সামিল হতে চলেছে। আশ্চর্য অনেক চেষ্টা করেও বসন্ত আজ আর সে দিনের ভাল লাগার সুরটুকু উপভোগ করতে পারে না। সে দিনের অনেক বাজে স্তুতির ভেতর এর লেখাটাই যে বসন্তকে আনন্দ দিয়েছিল এবং সেটাই যে ছিল তাদের পরিচিত হবার মাধ্যম এ কথা বসন্তকে এখন কষ্ট করে স্মরণ করতে হয়। সেই সলাজ-শ্রীময়ী মেয়েটি যে কোথায় হারিয়ে গেল! বসন্ত এ নিয়েও ভেবেছে মনে মনে। অনেক অশান্ত বিনিদ্র রজনী কেটেছে তার মর্মপীড়ায়। সুনন্দার কাছে তার অনেক অনেক অপরাধ জমা হয়ে যাচ্ছে, তার অনুশোচনা হয়েছে লেখক হতে গিয়ে সে কেরানী হয়ে গেল, শিব গড়তে বাঁদর। নিজের জীবনই এই, ভালবাসার গল্প কি লিখবে সে! সুনন্দা কি ভাবছে তাকে। নিষ্ঠুর, নীচ, মেশিন, গ্রাম্য, অশিক্ষিত বা অন্য কিছু আরো জঘন্য। নিজের স্ত্রীর অবজ্ঞা! বসন্তর কাছে তা মৃত্যু তুল্য, লেখক জীবনের চরম অখ্যাতির চেয়েও।

সুনন্দা আছে তাই না বসন্ত অত আয়েস করে লিখতে পারে ; সুনন্দা তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আড়ালে নিজকে প্রচ্ছন্ন রেখে—বসন্তর কলম কটা, চলন্তিকাটা, সিগারের



টিনটা, লেখার প্যাডটা, কি আশ্চর্য, বসন্ত যখনই মনে করে হাতের কাছে পায়। চা তৃষ্ণা পেলেই—লিখতে বসলে ঘন ঘনই পায়, উষ্ণ পেয়ালা ঠোঁটে তুলতে পারে। বসন্ত শোবার আগে কি বই পড়তে ভালবাসে, কোন্ কোন্ গান এ বাড়িতে গাওয়া চলবে না, লেখার টেবিলটা কি ভাবে রাখতে চায় বসন্ত, সব, সব জানে সুনন্দা।

বসন্ত জানেও না কেমন করে পুরনো বাড়িটা ছেড়ে এক্জিবিশান্ রোডের এ প্রশস্ত ফ্ল্যাটে উঠে এলো। বসবার ঘরের আসবাব কে আনলো? বসন্তর গায়ের পাঞ্জাবী! কেউ একজন আনে নিশ্চয়। বসন্ত তাতেই সন্তুষ্ট। নূতন বই বেরুলে কাকে কাকে দিতে হবে উৎসবে—কোন উপন্যাস দীর্ঘদিন ধরে লিখে শেষ করবার দিন বা নাটকের জয়ন্তী রাতে—কাদের হবে নিমন্ত্রণ বসন্ত কি তা জানে, কিন্তু এ জানে ঠিক লোকটির হাতেই বই পৌঁচোচ্ছে, চায়েতে প্রত্যাশিত বন্ধুটি।

বসন্ত যখন লেখে, দেখেছে কে যেন আলমারী গোছায়, সেলফ্ ঝাড় দেয়, টুকি টাকি ঘরের কাজ করে হঠাৎ মুখ তুললে দেখেছে সে সুনন্দা, তার স্ত্রী। শাড়ির আঁচল কোমরে জড়ান। মুখ অভিব্যক্তিহীন, চটুল হাতে নিঃশব্দে ঘরের কাজ করে চলেছে···একমিনিট ; তারপরই আবার সে লেখায় ডুবে গেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। আশ্চর্য। বসন্ত অবাক্।

বসন্ত ওর ঘাড়ে ভর দিয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে। খ্যাতির দিগন্ত, সাফল্যর দিগন্ত।

ভোরে চোখ খুললেই বসন্ত টের পায় সুনন্দা উঠে গেছে অনেকক্ষণ। একটু পরে উষ্ণ পোয়ালা হাতে সুনন্দা এসে মিষ্টি একটু হেসে তাকে প্রাতঃকালীন অভিবাদন জানায়। তাড়া দেয় উঠবার ব্রাশে পেষ্ট মাখিয়ে। খাবারের সঙ্গে হাতে করে খবরের কাগজটাও নিয়ে আসে, কারণ সে জানে বসন্ত চায়ের সঙ্গে খবর 'পাঞ্চ' করে নেয়। এমনি করে দিন এগুতে থাকে আর বসন্ত টেরও পায় না কোথা দিয়ে কি হচ্ছে। কারণ, তার সময় মত স্নানাহার হয়েছে, বিশ্রাম হয়েছে, হয়েছে বিকেলের চা। কোনটাই বাদ পড়ে নি। এর ভেতর সুনন্দা কোথায়, তার প্রিয় 'নন্দা', 'বুলবুলি', 'কুইন'। সে উহ্য, নিজকে সে প্রক্ষিপ্ত করেনি বসন্তর জীবনে। এতো বসন্ত আর কোনদিন খেয়াল করেনি, তাদের বিবাহিত গত কয়েক বছর। 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম'···কি যেন একটা কথা আছে।

বসন্তর মনে পড়ল 'কচ ও দেবযানীর' কথা, যে কথা কবি লিখে গেছেন। বসন্তর ঘুম পাচ্ছিল। কিন্তু তাকে ত ঘুমোলে চলবে না। তাকে লিখতে হবে আয়ুক্ষয় করে করে, ধুকে ধুকে সারাজীবন। যা পড়ে লোকের আলস্য বিনোদন হবে বড় জোর ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় পাশ।

উঠে লিখতে বসার একটা ঔচিত্য বোধ করলেও প্রেরণা পাচ্ছিল না বসন্ত। সন্ধ্যা বেলা বসবার ঘরে না তাকালেই পারত, মনটা তার খিচিয়ে যেত না। এ সব বসন্ত খুব মানে। একটা খারাপ কিছু দেখলে সে আদৌ লিখতে পারে না, এমনকি দু' তিন দিন ধরে। এদিক থেকে ঘুম ভেঙ্গে সুনন্দার মুখই শ্রেষ্ঠ। এটা অভিজ্ঞতাসিদ্ধ। এর ব্যতিক্রমে সুফল হয়নি। যে কোন খরাপ ইম্‌প্রেশন বসন্তর মনে গেঁথে বসে বসন্ত তা জানে, তাই সে খুঁত খুঁত করে সমস্ত কিছুতে। আজকে আবার তা-ই হয়েছে। বসন্ত আজ আর বোধ হয় লিখতে পারবে না। অসম্ভব। তার চেয়ে একটু তন্দ্রার চেষ্টা করা যাক। স্নায়ুগুলো তার শান্তি পাক্, কখন্ যেন সুনন্দা ঘরে এসেছে বসন্ত জানে না। চুড়ির টুং টাং শব্দ করে বসন্তকে সে জাগাল।

"একি! এখন ঘুমোচ্ছ কেন?" যেন বসন্তকে ঘুমোতে নেই।

বসন্ত কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুনন্দার দিকে। নিঃসন্তানা সুনন্দা, অপূর্ব দেখাচ্ছে তাকে। ঘরের হালকা নীল বাতিটার প্রতিফলন হয়েছে তার মুখে, শাড়িতে, সর্ব শরীরে। বড় প্রখর দেখাচ্ছে তাকে আজ। হাস্যে-লাস্যে, আলো-আঁধারে যাকে সে দেখতে অভ্যস্ত এ যেন সে নয়। ও যেন মায়াবিনা। খোলা তলোয়ারের ধারটুকু। মরুভূমির মিরেজ, বিশাল সমুদ্রের গাম্ভীর্য। না হলো না বসন্ত ভাবে। স্ফুটকণ্ঠে বলল শুধু, "হুঁ"। তারপর হাই তুলল, আঙ্গুলগুলো মটকে নিল। বলল, "তোমার বন্ধুটি বিদায় নিলেন?"

"আমার বন্ধু মানে? আসে ত তোমার কাছে," ভুজঙ্গিনী যেন ফনা তুলে দাঁড়াল, "লেখার জন্য। সত্যি, দেবে দেবে বলে না ঘুরিয়ে স্পষ্ট মানা করে বলে দাও না। টাকা ছাড়া যখন লেখা দেবেই না সে কথাটা বলার সাহস নেই কেন? আমি বাবা বুঝতে পারি না একজনকে মিছে আশা দিয়ে ঘুরিয়ে কি লাভ।"

"তুমি বললেই পারতে?"

"আমি বলতে পারবো না, আমি বলবো কেন?"

"তাতো বটেই।"

"ছেলেটি আজ কি বলে গেল জান?"

"কি?"

"যেমন করেই হোক আমাকে তাদের একটা কিছু তোমার লেখা যোগাড় করে দিতেই হবে, এমনকি তুমি যদি মুখে মুখেও একটা কিছু বল, আমি যেন তাদের সে কথার অনুলিপি পাঠিয়ে দিই।" সুনন্দা হাসতে লাগলো।

"তুমি রাজি হলে?"

"দূর!"



"ছেলেটিকে ত তোমার বেশ পরিচিতই মনে হলো, রাজি হলেও পারতে।"

"পরিচিত হবে না। একটি শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে পাঁচ ছ'দিন বাসায় এলে তার সাথে পরিচয় হয় না। তুমি ত তোমার সাহিত্যিক নির্লিপ্ততা নিয়ে উড়ে উড়ে বেরাও, আমাকে তো ভদ্রতা, সামাজিকতা এসব কিছু দেখতে হয়, আলাপ করতে হয়, চা দিতে হয়, ঘরে ডেকে বসাতে হয়।"

"বিশেষ করে তার সাথে যদি কলেজের চার বছরের বন্ধুত্ব থাকে, চেহারাটি যদি হয় তার সুন্দর।" শুনে সুনন্দা হাসতে লাগলো হো হো করে। মাদক হাসি সুনন্দার। বসন্তরও হাসবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু শেষের কথা কটি বলে প্রাণের সাড়া পেল না হাসতে। ভাবটা কঠিনই হলো বোধ হয়। শোয়া থেকে বসন্ত উঠে বসল।

"নির্বাণী—সেই ছেলেটিকে তুমি যা হোক একটা কিছু দিও বাপু।"

"এটাকি তার কথা না তোমার?"

"আমার গো আমার। সত্যি, আমার ভারি লজ্জা লাগে। রোজ রোজ একজন ভদ্রলোকের ছেলে ফিরে যাবে।"

"কেন তার লোকসানটা কিসের—তোমার হাতের চা খাচ্ছে, তোমার সাথে গল্পের অবকাশ পাচ্ছে—তোমার নির্বাণী হয়ত নির্বাণ লাভ করছে—" বসন্তর জিবটা লকলক করে উঠে শ্লেষে। সন্ধ্যা থেকে তার মেজাজটা চড়ে আছে। এতক্ষণে তা একটা আউট লেট পেল। বসন্ত মনে মনে বললো লেখা পেলেও সে আসবে না বলতে চাও তুমি সুনন্দা সুন্দরী। মধুর লোভ, না ঠিক হলো না, সমুদ্র গর্ভে মাইনের আকর্ষণে ক্ষুদ্র রণতরী সেকি ছেড়ে যেতে পারে সে আকর্ষণ, না তার সে শক্তি আছে। আর সুনন্দাদেবী তুমিও কি চাও লেখা দিয়ে নির্বাণীকে আমি বিদেয় করে দি। সত্যি সত্যি তুমিও, বুকে হাত দিয়ে বল ত, তা চাও না। আজকে সন্ধ্যার পর আমারই কি তা উচিত হবে? হবে না। মানুষতো আমি, নহি মেষ।

বসন্ত দ্বিতীয় বার হাই তুললো। প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইলো। ছেলেটি সম্পর্কে সুনন্দার, মানে তার স্ত্রীর, ব্যাখ্যান মনঃপুত হয়নি বসন্তর। একবিন্দুও না। সুনন্দার প্রতি পূর্ণ শুভ মনোভাব নিয়েও আজ সন্ধ্যার পর আর তা হতে পারে না।

কি দেখেছিল আজ সন্ধ্যায় বসন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে? তার বিশেষ দোষ নেই, পর্দাটা ত ফেলাই ছিল, শুধু ফাঁক দিয়ে তার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়লো সেখানে। এক লহমা। তারপরই অবশ্য সে তার চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। কেন নিয়েছিল? কি দেখেছিল? সুনন্দা ত তার স্ত্রী, বিবাহিত। একক। কিছু কি তা? নির্বাণীকে নিয়ে কিছু কি?

নির্বাণী সুনন্দা……। হয়ত হবে। কে?—এই সুনন্দা! হ্যাঁ।

"বেশ তুমি যখন বলছো, পাবে লেখা তোমার নির্বাণীতোষ।"

"তোমার কথাবার্ত্তা আজকাল কিযে হচ্ছে—" বলে সুনন্দা হাসতে থাকলো। দুলে দুলে। গড়িয়ে পড়তে চাইলো। খোপাটা তার ছড়িয়ে পড়লো খানিকটা তার গায়ে, বাকিটা তার পিঠেই।

বসন্ত ঠিক করলো এদের নিয়েই সে লিখবে তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গত চার বছর ধরে যার পরিকল্পনা সে করে রেখেছে মনে মনে। শুধু মাল মশলা পাচ্ছিল না। আজ তা অপ্রত্যাশিতভাবে তার সামনে দেখা দিল, ধরা দিল।

এই সুযোগ, এই সে চাইছিল যেন, একে সে ছেড়ে দেবে না। বসন্ত খাট থেকে নেমে লিখবার টেবিলে গেল। তাকে তার শ্রেষ্ঠ বই লিখতে হবে যাতে সে নিজকে ছড়িয়ে দেবে। তার জীবনকেও। সে সকলের। তার সব কিছু—ঘর সংসার।

সুনন্দা তখনো হাসছিল। তাকে বসন্তর খুব খারাপ লাগছিল—কুৎসিৎ, ঘৃণ্য। যদিও হাসছিল সে খুব সুন্দর করেই, যে হাসি প্রাণ হরণ করে নেয়।

# নূতন বই

## উপন্যাস

**ঝড় ও শিশির—বিমল কর। টি. কে. ব্যানার্জি এণ্ড কোং। কলিকাতা।**

বইটি সম্পূর্ণ পড়বার পর সাধারণ পাঠক হিসেবে একথাই মনে আসবে উপন্যাস হবার সবটুকু দাবী এ বইখানির রয়েছে কিনা। এ নিয়ে বিতর্ক করা যেতে পারে; কেন উপন্যাসের আঙ্গিকে পুরাতনের দাবী অগ্রাহ্য করে নূতন পদ্ধতিকে মেনে নেওয়া হবেনা, ইংরেজী ভিক্টোরীয় যুগ অথবা বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমী যুগের পরও কোন রীতির অস্তিত্ব স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত হবেনা? এ প্রশ্ন সহজে এড়িয়ে গিয়েও এ বইটির আলোচনা করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয় এবং সাহিত্যের অতি পুরাতন দাবীকে যে যথাযথই লেখক স্বীকার করেছেন এ বিষয়ে কোন মতভেদের আশংকা থাকে না।

এ উপন্যাসের আবেদন এর ঘটনাবিন্যাসে নয়। বস্তুতঃ পাশাপাশি একাধিক কাহিনীর অগ্রগতিতে যে সামঞ্জস্য ও অন্তর্নিহিত ঐক্য রয়েছে তাতে রচনাকৌশলের পরিচয় পাওয়া গেলেও এ লেখার প্রাণস্পন্দন অন্যত্র। বহু মানুষের জীবন কথা, এবং সেই কাহিনীর শেষে যে সহজ অথচ বিচিত্র পরিবেশের উপস্থিতি তাতে পাঠক চিত্তে খুব প্রবলভাবেই দোলা দেয়। বস্তুতঃ, এ লেখার রসানুভূতির উৎসও এইখানে। বইটির শেষে এসেও মনে হবেনা সূর্যশংকরই একমাত্র পুরুষ অথবা পদ্মাই একমাত্র নারী। যারা এতখানি উজ্জ্বল নয় তারাও অবহেলার নয় এবং যে ছোট্ট অথচ করুণ বিয়োগান্ত কাহিনীটি কোলিয়ারীর কুলি রামভরতকে কেন্দ্র করে লেখক সৃষ্টি করেছেন তাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।



বইটির সুরুতে লেখক মন্তব্য করেছেন: কালবৈশাখীর ঝড় জাগিবে, তাহারই পূর্বাভাষ। এবং প্রায় শেষে: সূর্যশংকরের মনের আকাশ হইতে আজ বুঝি নিঃশব্দে শিশির ঝরিয়া পড়িতেছে। এবং সমস্ত বইখানিতে কাহিনীর উত্থানপতনও এই সামান্য দুটি ইংগিত থেকে সহজেই ধরা যায়। যে বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল, সব ক'টি কাহিনীতেই লেখক দক্ষতার সঙ্গে তার সামঞ্জস্য ঘটিয়ে সুষ্ঠু পরিণতি আনতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় সব ক'টি চরিত্রই সমানভাবে আমাদের আকর্ষণ করে। ভালবাসায়, ঘৃণায়, বীরত্বে, দুর্বলতায়, ঈর্ষায়, মহত্বে সাধারণ মানুষের গুণাগুণ নিয়েই এরা সবাই এই অরণ্যসঙ্কুল লোকালয়ে মন্থর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন চরিত্রগুলিও ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে এগিয়েছে।

বইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় আমার মনে হয় এর সামঞ্জস্যবোধ। এবং এই জন্যই এ বইখানি সত্যকার সাহিত্যের মর্যাদালাভে সক্ষম হবে। এ সামঞ্জস্য-বোধ শুধু বাইরের আপাতঃ ঘটনাবিন্যাসে নয়, বরং বহু মানুষের জীবন ধারার অন্তর্নিহিত ঐক্য বোধে। এ ঐক্যবোধ নিছক ঘটনার ঐক্য নয়, জীবনধর্মের ঐক্যবোধ। এখানেই শিল্পী-কুশলতার পরিচয় মেলে। ইতঃস্তত ত্রুটি যে বইটিতে নেই তা নয়, যে সুন্দর, অনাড়ম্বর অথচ বলিষ্ঠ ভাষায় বইটি আগাগোড়া লেখা হয়েছে দুচার জায়গায় যে তার ব্যতিক্রম হয়নি এমন নয়, তথাপি আমাদের কাছে বহু মানুষের জীবনকাহিনীর অত্যন্ত সংঘাতময় ও জটিল প্রবাহের একটি কাহিনী ধরা পড়ে যেখানে ব্যর্থতার শেষেও পরিপূর্ণ নৈরাশ্য নেই, যেখানে অন্ধকারের পরেও আলোর শিখা চোখে পড়বে, যেখানে সূর্যশংকরের মত অবিচলিত দৃঢ়সংকল্প মানুষও নতুন জীবনবোধে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

অরুণ ভট্টাচার্য

## ইতিহাস

**বাঙ্গালীর ইতিহাস (কিশোর সংস্করণ): ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়: সংকলক: সুভাষ মুখোপাধ্যায়।**

গ্রন্থকার ভূমিকায় বলেছেন, "আমার কনিষ্ঠ সোদরোপম সুহৃদ, কবি, লেখক ও দেশব্রতী শ্রীমান সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেদিন নিজের হাতে কিশোর সংস্করণ রচনার প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন সেদিন সাগ্রহে সম্মতিদানে আমার এতটুকু দ্বিধা ছিলনা, একমুহূর্তও বিলম্ব হয়নি। আজ আমার প্রবাসবাসের মধ্যেই সে-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত গ্রন্থাংশ দেখবার ও পড়বার সুযোগও আমার হয়নি, তবু আমি জানিয়েছি, গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হ'তে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। শ্রীমান সুভাষকে যাঁরা জানেন তাঁরা অন্তত বুঝবেন, আমার এই নিরঙ্কুশ বিশ্বাসের মূল কোথায়।"

সংকলকের কথা: "ডক্টর নীহারঞ্জন রায়-এর 'বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব' আগাগোড়াই আমি এ-বইতে সহজ ক'রে সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা কতটা সার্থক হয়েছে পাঠকেরা

বিচার করবেন। মূল গ্রন্থটিকে আমি পায়ে পায়ে সশ্রদ্ধভাবে অনুসরণ করেছি—যেখানে পেরেছি মূলগ্রন্থের ভাষা পর্যন্ত প্রায় অবিকল রেখেছি।"

নীহারবাবুর এই বিশিষ্ট গ্রন্থখানি সম্বন্ধে প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ব্বাশায় বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পূর্বসূরীদের সাধনা ও নীহারবাবুর তত্ত্বানুসন্ধান এই বৃহৎ গ্রন্থে অনির্বচনীয় রূপে প্রকাশ পেয়েছে—ইতিহাস সাহিত্যের মত বর্ণময় হয়েছে। এখনও অনেক শতাব্দী, বাঙ্গালী প্রপিতামহদের বলিষ্ঠ বিকাশ গুপ্তধনের মত অতীতে বিলীন। ভাষা পাচ্ছে না, যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। নীহারবাবুর এই মহৎ প্রচেষ্টা প্রথম যাত্রীর মত ঐতিহাসিকদের পথের ইঙ্গিত দেবে এবং উৎসাহিত করবে বলেই আমার দৃঢ়বিশ্বাস। বহুরক্ত ও বহুসংস্কৃতির সংমিশ্রণে বাঙ্গালীর অভিনব রূপ, রহস্যঘন বৈশিষ্ট্য;—এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী আমরা যদি আবিষ্কার করতে পারি কোথায় এর মূল শক্তি, তা হলেই বাঙ্গালীর গৌরব আমরা বহন করতে পারবো। নতুন ধারাও আমরা গ্রহণ করতে পারবো। বাঙ্গালীর জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

প্রাক্-চীনে বাংলা-সমতট গৌড় ও ব্যাঘ্রতটী তুরাণী-তিব্বতী-নরা সংস্কৃতির রসায়নে এক অজেয় সভ্যতার প্রজনন কেন্দ্র-স্থল ছিল—যা শ্বেত, পীত ও অসিত মানবসমাজকে একসূত্রে গেঁথে নিয়েছিল; যা চেঙ্গিশ খাঁর সন্তান-সন্ততিরা পৃথিবীর সর্বদেশে ছড়িয়ে দিয়েছিল।—পূর্বাশা সম্পাদক কয়েকটি প্রবন্ধে এ তথ্য সুধীসমাজের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। বাঙ্গালীর ইতিহাসে এ সত্যের সম্যক আলোচনা ভবিষ্যতে হওয়া উচিত বলে' মনে করি এবং নীহারবাবুর আদিপর্বের আগের পর্বটি তাহ'লে বাঙালীর ইতিহাস মানে পৃথিবীর প্রথম সভ্যতার ইতিহাস হবে। এখনও অনেক 'কৌম' (tribe) বাংলার সীমারেখায় হ্রদের মত স্বয়ং-সম্পূর্ণ হয়ে আছে—তাদের ধারা বাঙালী রক্তে বহুদিন উজ্জীবিত হয়নি। বাঙালী এদেরও গ্রহণ করুক, আবার নতুন ইতিহাসের উপাদান সৃষ্টি হোক!

আজ নীহারবাবুর গ্রন্থখানিই অতীতের গুহামুখ খুলে দিয়েছে: আমরা কী ছিলাম, কী হয়েছি, কী হতে পারি এই চিন্তা মনে নাড়া দিচ্ছে। হয়তো আমার মত অনেকের চিন্তাধারাই এভাবে আলোড়িত হচ্ছে। আর হওয়াও উচিত। এ বিশিষ্ট গ্রন্থের বহুল প্রচার দরকার—বহুল আলোচনা দরকার। এর থেকেই বেরিয়ে আসবে নতুন ঐতিহাসিক, নতুন সন্ধানীর দল। যত ভুলচুক, যত খর্বতা মোচন করবে, যোগ করবে প্রভূত তথ্য। নীহারবাবুর পরিশ্রমের ফসলই হবে প্রধান ভিত্তি।

এমন বৃহৎ গ্রন্থখানি কিশোরদের উপযোগী সংকলন করে' সুভাষ আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। তার ভাষা কাব্যময়, অনাড়ম্বর, সহজবোধ্য। কঠিন বিষয় তিনি সরলভাবে ব্যক্ত করেছেন, কোনো কারণেই কিশোর-মন উৎপীড়িত হবে না, বরঞ্চ গল্পের মত তরতর করে ঠেলে নিয়ে যাবে দুই শ' পাতার এই মণিমঞ্জুষা। কিশোর দল বাংলার ভবিষ্যৎ, ইস্কুলে তারা ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ে, নিজেদের ইতিহাস তারা জানেই না বলা চলে, জানে না বাংলার ঐতিহ্য হিমালয় প্রমাণ। এই পুস্তিকা সে জ্ঞান তাদের দেবে। বুক ওয়ার্লড লিঃ এই কিশোর সংস্করণ প্রকাশ করে' প্রগাঢ় আদর্শ নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন।

অমল দত্ত


আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
( অর্থনীতি বিষয়ক )
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসনির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেক রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসনির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

PURVASA :: POUS—1359 :: REGD. NO. 1512


# ক্রমোন্নতির পথে

গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় জীবন-বীমার অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানের এই ক্রমোন্নতি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে পূর্ব্বের মতই ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা—৮১,০২,৩৬,১৬৪৲
বীমা তহবিল— ১৭,৬৬,১৯,৬২৮৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ—৮৩,৫৭,৯৭৮৲

নূতন বীমা
১৬,২৮,৮৫,৮০০৲

## হিন্দুস্থান কো-ওপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।






## খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

COBLD

## সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩


# পূর্ব্বাশ

মাঘ ১৩৫৯ :: সম্পাদক: সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য :: আট আ

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

**কবিতা**

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**নতুন দিন**
আট আনা

**যৌবনোত্তর**
আট আনা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
**স্বাক্ষর**
এক টাকা

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পতাকা**
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
**নয়নচারা**
দেড় টাকা

**উপন্যাস**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

**কস্মৈদেবায়**
( ২য় সং )
তিন টাকা

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
**তিনরঙ**
দু'টাকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা**


# টুকরো কথা... (২২)

পুরনো রীতি—শীতের সময় কলকাতায় নানারকম উৎসব করা। তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়, কুয়াশায় ঝাপসা হয় চৌরঙ্গীর আলো, কনকনে হাওয়া দেয় উত্তর থেকে। আর তখন অপ্রসন্ন ঋতুর বিরসতা ভুলে কোনো না কোনো সভা অথবা সম্মেলন, উৎসব অথবা অনুষ্ঠানের আলোকিত ভিড়ে আমরা শরীর মনের উত্তাপ খুঁজে বেড়াই। বীতে-চিরাচরিত এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সিগনেট প্রেসের প্রাঙ্গণে এবার বৈচিত্র্যের আনন্দ এনেছিল 'হরবোলা' সম্প্রদায়ের 'হাসির উৎসব'। দুদিনব্যাপী উৎসবের প্রথম দিনে অতিথি ছিল শিশুর দল। উচ্ছল হাস্যধ্বনির অভ্যর্থনা জানিয়ে সুকুমার রায়ের স্মরণে অনুষ্ঠিত এই 'হাসির উৎসব'-কে তারা সার্থক করেছে। উৎসবটা হাসির, কিন্তু পরিচালনায় নিপুণ নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলার কোনো অভাব ছিলনা। নিরাভরণ রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জা দেখে আশান্বিত দর্শকরা অভিনয় কালে পর্দা সরে গেলে পরে ততোধিক চমৎকৃত হয়েছিলেন। সুকুমার রায়ের কবিতা আবৃত্তি ছিল আর ছিল তাঁরই লেখা ব্যঙ্গ-নাটিকা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' অভিনয়। সবাই বলেছেন রূপকথার হাসির দেশকে জাগিয়ে তুলেছিল তরুণ অভিনেতাদের সাজসজ্জায় আতর্ষ বর্ণপরিকল্পনা। আর বিচুর্ণ আলোর বিক্ষেপ তাদের ঘিরে চঞ্চল হয়ে কাঁপছিল মঞ্চের পর্দার। সুকুমার রায়ের 'অজস্র হাস্যোদ্ভাসের বিশেষত্ব' নিয়ে হরবোলা সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করলেন। তরুণ সদস্যরা প্রথম অভিনয়েই যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকে বিশ্বাস হয় যে তাঁদের প্রতিশ্রুত পরবর্তী অনুষ্ঠানগুলি শিশু এবং রসিক—উভয়ের পরিচ্ছন্ন রুচিকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারবে।

যদি আমাদের মনের আরোগ্য। কিন্তু বাংলাভাষায় বিশুদ্ধ হাসির মোনো নির্ভার রচনা দেখতে পাওয়া প্রায় একটা ঘটনার মতো। তাই 'কজ্জলী', 'গড্ডলিকা', 'হনুমানের স্বপ্নে'র পরে—বহুদিন পরে—পরশুরামেরই নতুন বই 'ধুস্তুরী মায়া'-র গল্পগুলো পেয়ে পাঠকেরা হাঁপ ছাড়বেন। রামায়ণ এবং মহাভারতের বিখ্যাত সরানুবাদ শেষ করার পরেই এই হাসির গল্পগুলি ছাপিয়ে—পরশুরাম—আমাদের প্রবীণতম জীবিত সাহিত্যিক রাজশেখর বসু মহাশয়—মনে করিয়ে দিলেন যে বয়স বাড়লেই মনের সরসতা কমে যায় না। রসিক মন চিরতরুণ। এই সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য আর একটি বই : শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সরস গল্প'। গোয়েন্দা-গল্প আর ঐতিহাসিক কাহিনীতে খ্যাতিমান তিনি। উপরন্তু কৌতুক রসেও তাঁর সমান অধিকার।

অথচ উপলব্ধির আরো একটা ভিন্ন বড় দিক আছে। জীবন যেখানে সমস্যায় আবর্তিত, দুঃখে যন্ত্রণায় কাতর, তবু বেঁচে থাকার আগ্রহে অধীর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করার মতো একটি নতুন ছোট গল্পের বই—সমরেশ বসুর 'মরশুমের একদিন'। এবং সেই সঙ্গে নাম করা যায় প্রবোধ সান্যালের সাম্প্রতিকতম উপন্যাস 'বনহংসী'। তাছাড়া 'দি আর্টামোনোভ্‌স্‌' বলে ম্যাক্সিম গোর্কির যে বড় মাপের উপন্যাস আছে তারও একটি বাংলা অনুবাদ হয়েছে 'ভাওন' নামে। অনুবাদক সুনীলকুমার দত্ত। দুঃখ-অবিচার-অত্যাচারে হার নেই মানুষের, সমাজকে তবু সে বিবর্তনের পথে নিয়ে চলে—সেই সাহসের কথা আছে আর্টামোনোভ্‌স্‌ বংশের কাহিনীতে।

আর দুটি নতুন উপন্যাস : মনোজ বসুর 'বকুল' এবং দেবাচার্যের 'সুরের পরশ'। এবং গল্পের মতোই সুখপাঠ্য কল্লোল রায়ের 'স্পাই', প্রথম মহাযুদ্ধের গুপ্তচরদের কাহিনী। সত্য হলেও রোমাঞ্চকর।

ফ্রয়েড হচ্ছেন আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গুরুস্থানীয়। নির্জ্ঞান মন নিয়ে তাঁর যে পৃথিবীবিখ্যাত গবেষণা তার বিরুদ্ধে মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে বাংলা সমালোচনা প্রকাশ করেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। 'ফ্রয়েড প্রসঙ্গে' নামক গ্রন্থে তাঁর বক্তব্য : 'আপাত-বৈজ্ঞানিক দোহাই দিয়ে যে মনস্তত্ত্বের খসড়া করলেন ফ্রয়েড, সেই মনস্তত্ত্ব প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো, আর চরমভাববাদী—অতএব বিজ্ঞানবিরোধী—এক দার্শনিক কল্পনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।' 'বাঙলাদেশের সামাজিক এবং অর্থনীতিক জীবনে যে সব মূঢ় অসঙ্গতি আর চলতি ধুয়োর কারসাজি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাঁদের নির্বিশেষ আলোচনা করে 'বিপ্রমুখ' দেশপত্রিকায় ধারাবাহিক অনেকগুলি লঘুগুরু প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'বিপ্রমুখের কথা' বইটি সেই প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলিতে রম্যরচনার সুর লেগেছে।

দিনরাত্রি বিরস হলেও সরসতা হারায়নি বাঙলাদেশে কবির মন। এবং সরসতা চিরকালই সংক্রামক। প্রতি মাসে তাই কাব্যগ্রন্থের নতুন প্রকাশ দেখে নিজেদের ভাগ্যবান মনে হয়। সম্প্রতি আগে দুজন প্রতিষ্ঠাবান কবির প্রথম বই প্রকাশিত হয়েছে : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অবতামসী আবার রাত্রি', এবং সুনীলচন্দ্র সরকারের 'মিলিতা'। কিছুদিন আগে বেরিয়েছে দিলীপ রায়ের কাব্যনাটিকা 'সার্কাস'। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের লেখককে সম্মান-পুরস্কার দিয়ে উৎসাহ দেবার মতো হৃদয়বান সুধীজনের কি অভাব বাঙলা দেশে? 'পোয়েট্রি' কাগজে একাধিক কবিকে প্রভূত পরিমাণে পুরস্কৃত করার কথা পাঠ করে বাঙালী তরুণ কবিদের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। এই কবিতা পত্রিকার এবার চল্লিশ বছর আরম্ভ হল। এই উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ সংখ্যাটিতে দু-পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখে কবি অডেন পাঁচশো ডলার পুরস্কার পেয়েছেন।




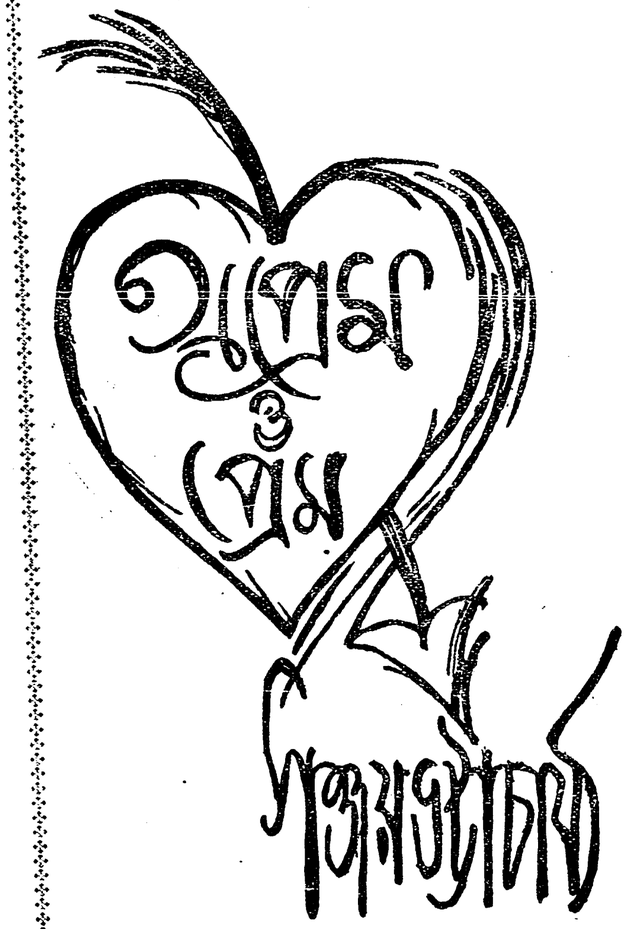


প্রকাশক :

পূর্বাশা লিমিটেড

"'অপ্রেম ও প্রেম' নতুন করে এ-কথাই প্রমাণ করল যে বাংলা লিরিকের কারুশিল্পে যাঁরা এখন অগ্রণী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য তাদেরই অন্যতম।"

বুদ্ধদেব বসু

দ্বতীয় সংস্করণ

বর্দ্ধিত কলেবর

যন্ত্রস্থ

দাম দুই টাকা

তরুণতম কবির অন্যতম বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন : "জীবনানন্দের মৌলিকতা অবি-সংবাদিত কিন্তু সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের মনোজ্ঞতাও অনস্বীকার্য্য একথাও স্পষ্ট করে জোর গলায় বলার সময় এসেছে এইবার।"

তরুণতম কাব্য-সমালোচক নিখিলকুমার নন্দী বলছেন : "...'তিমিরাগ্নি'—এ কবিতার আশ্চর্য্য শব্দধ্বনি বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব ঘটনা।"


## নতুন বছরের নতুন গান



**ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য**

GE 24652 বাসরের দীপ আর
কি ছাঁদে বেঁধেছ কবরী

**ফিরোজা বেগম**

GE 24654 সুরে সুরে আমার মনে
আমার গানের ডোরে

**গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়**

GE 24653 এমন ক'রে আরো ক'দিন
আজকে আমি মরণ-লোকে

**কলম্বিয়া ভ্যারাইটিজ**

GE 24655-56 সাক্ষী গোপাল
—চার খণ্ড

**বাণী-চিত্র-গীতি**

**আঁধি**

GE 30260 তোমার বিরহে
চমকে তারা নীল আকাশে
GE 30261 বিহনে গোপাল গোচারণে
—দুই খণ্ড
GE 30262 হে মোর দেবতা
মধুর আমার ডেকেছ

**দর্প চূর্ণ**

VE 2583 ওরে মন সবি মিছে
ওগো বন্ধু, ওগো বন্ধু
VE 2584 আঁধার নেমেই আসে
সম্মুখে দিশাহীন
আঁধিয়ার রাত্রি

Columbia

কলম্বিয়া

কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা বোম্বাই


# পূর্ব্বাশা

## মাঘ—১৩৫৯

### সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা |
|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ : | |
| মোঘ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... | ৪৯৮ |
| অমোঘ : „ „ ... | ৪৯৯ |
| এনাক্ষি : অমল দত্ত ... | ৫০০ |
| অপরাহ্নের চিঠি : প্রণব মিত্র ... | ৫০১ |
| পড়ি পড়ি শীত : মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... | ৫০২ |
| পৌষের নিথর রাতে : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত | ৫০৩ |
| তোমার পথের দিকে : দেবপ্রসাদ রায় ... | ৫০৩ |
| দুপুর : সুনীল ভট্টাচার্য্য ... | ৫০৪ |
| প্রভাস : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... | ৫০৫ |
| বিবাহিতা স্ত্রী : প্রতিভা বসু ... | ৫০৬ |
| ইতিহাস ও সাহিত্য : সঞ্জয় ভট্টাচার্য ... | ৫১৭ |
| চক্রান্ত : শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় ... | ৫২৮ |
| সর্ব্বগত সৎ : সুরেন্দ্রনাথ বসু ... | ৫৩২ |
| উত্তরাধ্যয়ন : সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ... | ৫৩৯ |
| শিল্প-সংলাপ : | |
| নতুন বই : | |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯



# নিশ্চিত নির্ভর -----

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

## ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই
বার্লির
ওপরেই
আমি
নির্ভর
করতে
পারি...




কেননা আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি সব
সময়েই ভালো, কারণ এই বার্লি স্বাস্থ্য-সম্মত
উপায়ে টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্য থেকে
সতিকারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি।
'পিউরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে
দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতা।

## পিউরিটি বার্লি

APBX 10-BEN

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

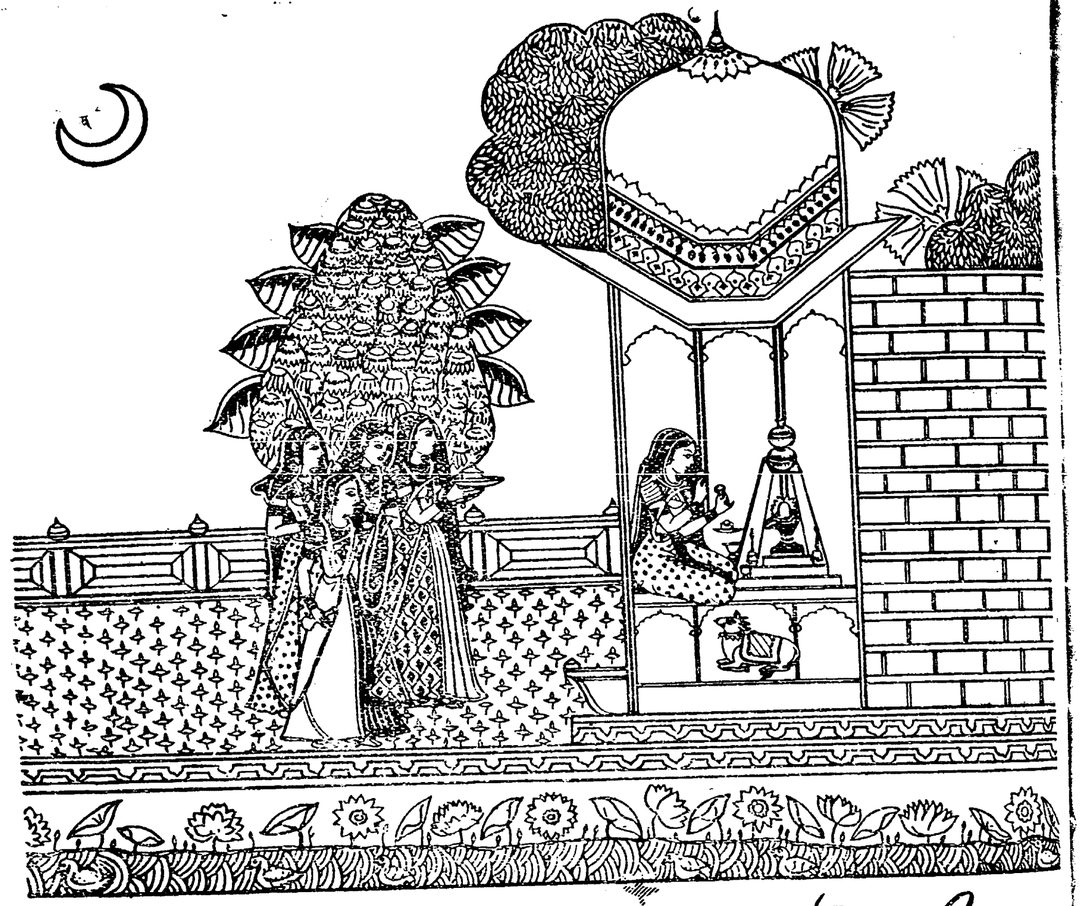

ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।
ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে।

## ভৈরবী

উপরের আলেখ্যটি সকাল বেলার রাগিণী ভৈরবীর রূপায়ণ। ভৈরবীর সুর সৃষ্টির পরিকল্পনাটি সত্যিই সুন্দর; দয়িত শিবের মিলন কামনায় পার্বতী উৎকণ্ঠিতা, প্রিয়-বিরহ-বিধুরার সেই উৎকণ্ঠাই বুঝি সুরের আবেদনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আবেদনে বেদনা যতই থাক্ চঞ্চলতা নেই, পুনর্মিলনের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সেই সুর একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।


চা

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দেয়, সঙ্গ দেয়, দেয় নব নব প্রেরণা।

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB 104



পূর্বাশা

পঞ্চদশ বর্ষ
মাঘ — ১৩৫৯


কবিতাগুচ্ছ

## দু'টি মাঘের কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

### মোঘ

আমি যে বাজাই শঙ্খ
প্রমীলা, তুমি কি লঙ্কায় ?
পেলে মেঘ-নীল অঙ্ক
কানে গান বাজে ডঙ্কায়।
ভুলেছ নলিনী পঙ্ক
ভূষণে হৃদয় তুষলে !
আছো প্রিয়তমা কুশলে
স্বর্ণ-বারির মুষলে ?
না কি রাতদিন শঙ্কায় !

আমি ত এনেছি গঙ্গা
কতো জল চাই তৃষিতা ?
খরধারা ছাড়া নিশীথা
হতে না নিশিত-ভঙ্গা !
এমনি কি ছিলে তিস্তা
মনে-মনে এতো চাতকী !
পরিণয়ী প্রেম জাত কি
প্রতারণা থেকে, পাতকী
প্রণয়ীর শুধু সংজ্ঞা !

চাইলে কেবলই তাপ্তী
তপ্তা তপতী সবিতা
মেঘনাদে পাদসাপ্তী।
শান্তি কোথায় রবি তা
কি করে জানবে, ব্যাপ্তি
আকাশের মতো, করুণা
অরুণের মতো, বরুণা
অরণির মতো তরুণা
মেঘার মতো কবিতা।

## অমোঘ

মাঘের অনিল মেঘা আমার
বিষণ্ণা বিষে নীল।
চুলে আয়োজন কী মেঘ নামার
আষাঢ় বিসর্পিল!

তোমার আশায় ঊষার সূর্য্য
লাল, তবু কথা বাধে
বুকেতে, হিমানী, তারেই খুঁজছ
অভিমানিনীর ছাঁদে!

কি চাও কি চাও, সে-ও হোক ছাই
কুয়াশার জলে ভাসা!
মুছুক রক্ত সীঁথির চিতায়
অতিথির খল ভাষা।

বলো তবে ভুলে গিয়েছ আগুন
সিক্তা ষোড়শী বালা!
কেউ ভুলে যায় কুবলয়-তূণ?
বিষের বলয়, মালা?



তুষার-কন্যা, জানি ভুলবেনা
কেউ নই সন্ন্যাসী
বাঁধ চুল বেণী, বসন্তসেনা
বলো মনে, ভালোবাসি।

## এনাক্ষি

দুই

অমল দত্ত

মাটি ভালো এনাক্ষি মাটি ভালো—এসো শুয়ে পড়ি তবে
মাটির আড়ালে
এই তো রয়েছে জল আর কিছু ঘেঁটু-গন্ধ মুঠো-ঘাস পাবে
দু'হাত বাড়ালে

যদি তারা খসে পড়ে পড়বে তা তোমার দু'চোখে
বলো আর কোথা তারা পড়ে
তোমার দু'চোখ ছাড়া তারাদের কে নেবে চুমুকে
আর কোন্ সরসী শিহরে?

ধান ক্ষেত পার হয়ে এই যে একটু হাওয়া
এলানো অলকে গেলো জমে
সাগরের গান শুনি—আমার সাগর স্নান—হাত-ছাওয়া
চুলের সঙ্গমে।

সাগর পাখির মতো বারে বারে ফিরি আমি
তোমার মুখের কাছে উড়ে
ধীরে-ধীরে জড়ো হয় ধাঁধাঁর আঁধার-রাশি
অনেক কথায় বোবা সুরে।

মোম দেহ অথবা কি মমিদেহ আমাদের চাঁদে
অথবা কি জোসনার ঢেউ

জলরঙা দেহপট ছেয়ে থাকে ঘাসে-বোনা ফাঁদে
তুলি রঙে জুড়ে দিল কেউ

তবু যেন কিছু ভুল আলো না আঁধার ছেপে
তাতেই যে জীবন অসহ
আঁধারের স্বপ্ন ছিঁড়ে জোয়ারের জল ওঠে কেঁপে
এনাক্ষি তাই তুমি লহো !

রাতচরা পাখি ডাকে একফালি মেঘে ঢাকে চাঁদ
মাঠের ইঁদুর গর্ত খুঁড়ে
আকাশ কি নামে নিচে নিতে ভিজে ঘাসের আহ্লাদ
এক ঝাঁক বালিহাঁস মুঠো-মুঠো মেঠো ঘাস উড়ে

এনাক্ষি মরে যদি যাই আজ কি এমন ক্ষতি
আমার যা তোমারে দিলাম
তুমি যাও ভোর নিয়ে—রাত্রির সুর-রতি
যাও নিয়ে অন্য কোনো নাম।

## অপরাহ্নের চিঠি

প্রণব মিত্র

মনে কি পড়বে আর হারানো সে সব দিনে আমাদের মৃদু আলাপন,
ছলছলে সেই সব মেঘমেঘ ছায়াঢাকা ধূপছায়া দিনের দুপুরে ?
কি কাজ তখন বলো ? তবুও আলসে যেন ফিরে ফিরে ক্লান্ত হয় মন—
কি কথা বলার ছিলো বলা হয়নাকো তবু এ হৃদয় কেন যে উন্মন,
তারপরে চেয়ে থাকা ডুবে যাওয়া অন্ধকারে দু'চোখের মনের মুকুরে,
সুরম্যা, মনে কি আছে ছলছলে সেইসব ধূপছায়া দিনের দুপুরে !

দু'চোখে কি যেন কথা কেঁপে কেঁপে তারপর থেমে গেলো ভীরু বেদনায়,
আকাশে তখন মেঘ—মেঘকন্যার মত কি আশ্চর্য দু'চোখ তোমার !
মেদুর মেঘের রঙে এ হৃদয় ভরা হয়, ঢেউ ওঠে মন-মোহনায়—
না বলা কথার শব্দ গানের মতন যেন শোনা যায় অণু-চেতনায় ;



তারপর বৃষ্টি এলো—কি যেন বলতে গিয়ে অপলক দু'চোখ তোমার,
সুরম্যা, বলো না তবে এখনো বাজে কি মনে কোনো রেশ সেসব কথার ?

পৃথিবীর পথ ধরে তারপর কতবার মনে করো চলেছি এমন
এমনি কত না দিন গড়ায়ে রাতের দেশে ফিরে এসে মিশেছে কখন :
কি কাজ তখন বলো ? অনেক অনেক পথ চলে মন হোলো তন্দ্রাতুর;
হয়তো কখনো ভাবি কোন এক ছায়াঢাকা ধূপছায়া দিনের দুপুর—
বাইরে নেমেছে বৃষ্টি, নরম হাওয়ার স্পর্শে রম্যতায় মগ্ন হয় মন
সুরম্যা, মনে কি পড়ে হারানো সেসব দিনে আমাদের মৃদু আলাপন ?

## পড়ি পড়ি শীত

মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পাঁপড়ি-নিমীল চোখ, রামধনু-দোমড়ানো ভুরু
কতোকাল খুঁজি বলো, চুলময় নিরিবিলি-নীল—
চকিত-হরিণ-মন এই আছে, এই বুঝি নেই
আলো-ঝরা সোনামেয়ে, সারাগায়ে রোদ ঝিলিমিল !

প্রজাপতি-ডানারঙ রোদ-রোদ আরতি-আভায়
খুঁজে খুঁজে হয়রাণ দোল-দেয়া, ভালোবাসা-মেয়ে ;
এলোনা এলোনা নাকি হ'লোনাকো এখনো সময়—
তবু আশা ঝলোমল—এই বুঝি ছায়া এলো ছেয়ে।

সকাল দুপুর হ'লে পুথ চিনে চিন্‌চিনে রোদে
চুপি চুপি নীল-ছোঁয়া খোলাছাদে দাঁড়ালাম যেই—
দেখি সে-চটুল চোখ সজল কাজল এলোচুল
হাবুডুবু হা-হা রোদে, এপার-ওপার কিছু নেই !

চাকভাঙা-মধুমিঠে পড়ি-পড়ি শীতের আভাস
এ-মেয়ে কুড়িয়ে পেলো ধুয়েমুছে সবুজাভ ঘাস ॥

## পৌষের নিথর রাতে

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

পৌষের নিথর রাতে শিরীষের শিথিল শাখায়
অথবা অশথ-ডালে তুহিনার্ত পাতার শিবিরে
যখন ঘুমায়ে পড়ে মসী-কৃষ্ণ তিথির তিমিরে
শান্ত পাখি-শাবকেরা, কিংবা নীল দিগন্ত-শয্যায়
যখন ও-চাঁদ-শিশু চুপি-সাড়ে হামা টেনে যায়,
অথবা সে পউষের স্তব্ধ হিম-রাতের গভীরে
তোমার নবনী-নম্র নয়নের নরম শরীরে
অলক্ষ্যে যখন তন্দ্রা অলৌকিক স্বপন জড়ায় ঃ

তখন আলতো পায়ে চুপি চুপি তোমার শিয়রে
প্রাণের প্রদীপ নিয়ে যাবো আমি, সহজ নয়নে
তোমার মুখের মধু-মন্দারের লাবণ্য-নম্রতা
প্রাণ ভরে দেখে নিয়ে হৃদয়ের উতল প্রহরে
রেখে যাবো মুগ্ধ-মন ; সে রাতের পরম লগনে
আরবার শুভ দৃষ্টি ঃ সাক্ষী রবে চির নিস্তব্ধতা ॥

## তোমার পথের দিকে

দেবপ্রসাদ রায়

অনন্ত রাত্রির কুয়াশারা আসে আর যায়
এইখানে, জানালার সার্শিতে পিঠ চুলকায়';
তারা রোজ পায়ে পায়ে সাগরের মেঝে হ'য়ে পার
তারার আলোয় পথ চিনে চিনে আসে একবার।
হিমের দোশালা গায়ে পউষের কুয়াশার রাত
ছিমছাম ; কুসুমের পাপড়িতে তবু উৎপাত
করা চাই তার—ভীরু চোখে চোখে আনবেই জল,
আতুর ঘাসকে ছুঁড়ে মারবেই শিশিরের বল।

পায়রার কণ্ঠের মত মনে আশার কাঁপন
সারারাত বুকে নিয়ে ঘাসেদের মন



তবুও বাঁচতে চায় ; বিরহের কুয়াশার পর
মনের ময়না জানে কোন্‌খানে পাওয়া যায় খড়
ভোরের হলুদ রোদে ; ঘাসেদের সেই মন নিয়ে
তোমার পথের দিকে তাই লোভে রয়েছি তাকিয়ে।

একমনে মেপে গেলে আশার চামচ দিয়ে জল
জানি জেগে উঠবেই বিরহের সাগরের তল।

## দুপুর

সুনীল ভট্টাচার্য

তুমি আমি দুইজন। আর কেউ নয়। ঘাস···জল
কথার করাত দিয়ে কেটে কেটে সে জল উতল।
সে পাখির গান। আর সুপারীবনের বুলবুল
হাল্‌কা আঙুলে ছুঁই তোমার দীঘল কালো চুল।

এ দুপুর নূপুরের ঝাড়। ইডেনের ঈথার বিথর ঃ
লুকোচুরি খেলে রোদ প্যাগোডার মাথার ওপর।
পশমী রঙের ঘুম ঘাম হ'য়ে ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
আমার কোলের কাছে। তোমার ঐ অবশ শিয়রে।

দোসর মনের দ্বারে এমন যে মেঘের-গুমোট
তবুও' আকাশ ভ'রে প্রচুর লজ্জার কুঁড়ি স্ফুট।
হিমানীর হিম ছিঁড়ে অবকাশ মুহূর্তের কণা
লেজ নেড়ে উড়ে যায়। শীষ দেয় বিলম্ব-কামনা।

তুমি ত তরল কোন তৃষ্ণার হ্রদের কিনার·····
অবক্ষিপ্ত জীবনের বেলাভূমে আশার মিনার।
নিদাঘে প্রত্যয় আর অফুরন্ত আরামের নীড়
শুক্তি খুঁজে খুঁজে ফিরে আমার এ শীতালু-শরীর।

## প্রভাস

### বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতির বালুচরে মুখেরা ভীড় করে
কেন যে ভীড় করে ?  আমি তো ক্লান্ত !…
এখানে নদীপাড়ে গোধূলি গান ধরে
আকাশ নীলে নীল, হৃদয় শান্ত ;
ঘুমাবো আমি তাই ঘুমপাড়ানী গানে
ভ'রেছে চরাচর, মিলেছে প্রাণে প্রাণ—
তবুও ভীড় করে, মুখেরা ভীড় করে,
অতীতে এত জ্বালা, কে আগে জানতো !

দোসর কেউ নেই, চাইনে মিতালীও
তবুও পিছু ডাকে বিদুর, পার্থ !
কী হবে প্রেম দিয়ে ?  দেহের জ্বর সেও—
রাধার মুখ তবু কেমন আর্ত !
ঘুমুতে চাই আমি মাটিতে বুক মেখে,
মরণ চাই আমি আকাশে মুখ রেখে ;
তবুও হাঁটে তারা—ক্ষুব্ধ বলরাম,
অন্ধ কুরুরাজ, কুরুক্ষেত্র !

তোমরা ফিরে যাও !  কোথায় দ্বারকায়
নারীর দেহমদে পশুরা লুব্ধ ;
কোথায় শিশুকেও জ্যান্ত ছিঁড়ে খায়
আহত নেকড়েরা, এমনি যুদ্ধ !—
কী হবে ঘুম থেকে সে দেশে হেঁটে গেলে ?
সুদর্শন আমি দিয়েছি ছুঁড়ে ফেলে।
এখানে এই ঘামে হৃদয় ঢেকে নিয়ে
ঘুমাবো দ্বন্দ্বের, জয়ের ক্লান্তি।
ব'লোনা কথা শাখী, আস্তে ঝরো ফুল ;
ঘুমের রাত আসে।  শান্তি, শান্তি !

## বিবাহিতা স্ত্রী

### প্রতিভা বসু

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

৩

কী করবে কী করবে ভাবছিলোই যজ্ঞেশ্বর। এর মধ্যেই আরেক চমকপ্রদ খবর নিয়ে এসে হাজির হলেন মামী। কী, না পশুদিন রাজেনবাবু মারা গেছেন। সবিস্তারে সব ঘটনারই তিনি বিবৃতি দিলেন। এ কথাও বললেন এ-রকম যে একটা কিছু হবেই তা তো তাঁর আগেই জানা ছিলো। নিরপরাধে যেমন একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে গিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী, তার সাজাও পেলো হাতে-হাতে। মেয়েমানুষের বুক থেকে তার স্বামী কেড়ে নেয়ার বাড়া আর কী পাপ আছে সংসারে ? সেটা আর যে-ই সহ্য করুক, ঈশ্বর আছেন না মাথার উপরে ?  তিনি সবই দেখতে পান।

তবে আর বাধা কিসের ? যজ্ঞেশ্বর তৎক্ষণাৎ মনস্থির ক'রে ফেললো। মাথা নাড়তে-নাড়তে বললো, 'মামী, একটা বড়ই দুঃসংবাদ দিলে তুমি। আমি কালই পেমিকে নিয়ে যাবো ওদের ওখানে। ওরা যা-ই করুক আমি কি এই বিপদে আপদে অভিমান নিয়ে ব'সে থাকতে পারি ?'

'সে তো ঠিক-ই। হরি-ই-ই বলো মন !' মামী মুখের গহ্বর দেখিয়ে হাই তুলতে-তুলতে তুড়ি দিলেন।

'তা রেখে-টেখে গেছে তো কিছু ?' যজ্ঞেশ্বরের গলা যথাসম্ভব উদাস। 'নাকি একেবারে অনাথ ক'রে গেছে বিধবাটাকে ?'

'রাখবে না কেন ?  যথেষ্টই রেখেছে। রাজেন চৌধুরী কি একটা ফ্যালনা মানুষ ছিলো নাকি ? তবে শোনো—ঘরের তো আমি সবই জানি ! আর সম্পর্কও আমার কিছু আজকের না। বাসন-কোষন গয়না-গাঁটি—'

একঘণ্টা ব'সে-ব'সে মামী ওদের চৌধুরী পরিবারে উষ্টিগুষ্টির ফিরিস্তি দিলেন, ধনদৌলতের হিশেব দিলেন, কে কার ব্যাটা, কে কার নাতি, সব তালিকা তাঁর কণ্ঠস্থ। আর যজ্ঞেশ্বর জলটুকু বাদ দিয়ে চোখ বুজে-বুজে দুধটুকু মর্মে গ্রহণ ক'রে সেদিনের মতো বিদায় দিলেন মামীকে। চোখ বড়ো ক'রে প্রমীলাও শুনলো সব। শুধু শ্বশুরকুলের ইতিবৃত্তই শুনলো না, দরজা ভেজিয়ে বাপের কাছেও অনেক কিছু শুনতে হ'লো তারপরে।

হিরণ্ময়ীর কপাল যে এত শিগগিরই ভাঙবে কে জানতো সে-কথা ?

প্রমীলার ভাগ্যই আলাদা।

৪

যার ঘোড়া তারই তো রাশ। এখন আর হিরণ্ময়ী কে ? যে-সংসারের কর্ণধার সুনির্মল সে-সংসার তো অবশ্যই প্রমীলার। নিজের স্ত্রী ফেলে কে কবে পরের স্ত্রীকে কর্তা হ'য়ে কর্ত্রীর আসন দেয় ? তবে এদের কথা আলাদা। হয়তো তার গর্দভচন্দ্র জামাতাটি এখনো সেই মৃত রাজেনের স্ত্রীর মুঠোতেই দিয়ে রাখবে সব। তাই তাড়াতাড়ি বেশি কিছু ভাবনা চিন্তার অবকাশ না নিয়েই কর্ণধারের কর্ণধারণ করবার জন্য লম্বকর্ণর মতোই বুদ্ধিহীন স্বামীর বুদ্ধিকে সঠিক পথে চলাবার জন্যে মেয়েকে নিয়ে চলে এসেছিলো যজ্ঞেশ্বর। সুনির্মলের বিয়ের কথাটা শুনে অবধি অশান্তি বোধ করছিলো মনে-মনে। সত্যি হোক মিথ্যে হোক খবর যখন একটা রটে তার কিছু কিছু তো বটেই ? চার বছর আগে যে-মন নিয়ে, যে-জেদ নিয়ে তিনি একদিন সকলের নাকের ডগায় তুড়ি মেরে মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন, চার বছরের প্রলেপে সে-ভালোবাসার স্রোতে ভাটা পড়েছে। বাপের বাড়ি আছে থাক। তাই বলে শ্বশুরবাড়ির যাবার রাস্তায় কাঁটা পড়ুক এটা কেন হ'তে দেবেন তিনি ? ইচ্ছেমতো যাবে আসবে, থাকবে কি থাকবে না। কিন্তু অধিকার তো তারই ষোলো আনা থাকা উচিত ?

যজ্ঞেশ্বর এটাই ভেবেছিলেন যে স্ত্রীকে ফেলে বেশিদিন টিকতে পারবে না সুনির্মল। সুন্দরী, যুবতী স্ত্রী, তার রক্তমাংসের লোভ তো আছেই, উপরন্তু একমাত্র কন্যার পৈতৃক বিত্তের মোহই কি খুব কম ? আসতেই হবে। অকৃতদারের মতো শূন্য বিছানায় আর কতদিন রাত কাটাবে বাছাধন ? কিন্তু দিনের পর দিন গেল, না বিত্তের টানে না স্ত্রী-দেহের লোভে, কিছুতেই যখন জামাইয়ের টিকিটি আর দেখতে পেলো না, একটু যেন কেমন-কেমনই বোধ করছিলো ভেতরে-ভেতরে। অমন দুরন্ত দজ্জাল বদ শাশুড়ির ঘর করতে কিছুতেই দেবে না ব'লে যে-প্রতিজ্ঞায় অনেকদিন পর্যন্ত অটল ছিলো, ইদানিং মনে হচ্ছিলো সে-প্রতিজ্ঞাটায় যেন ঢিল পড়েছে। কেননা কিছুকাল যাবৎ কন্যার প্রতি তত্টা স্নেহ আর অনুভব করছিলেন না মনের মধ্যে। সেই শিশু প্রমীলা, অসহায় প্রমীলা, পিতার প্রতিমূর্ত্তি প্রমীলা, ক্রমে যেন আরেকজন প্রমীলাতে পরিণত হয়ে উঠছিলো। কেননা প্রমীলা বড়ো হ'য়েছে, কূটনীতিতে পিতাকে ধ'রে ফেলেছে, গঙ্গাজলেই গঙ্গা পূজা



করতে শিখে ফেলেছে। এ সংসারে ব'সে এ সংসার থেকেই শুষে শুষে গঠন করছে নিজের রাজত্ব। একলার রাজত্ব। তাই কিছুদিন যাবৎ মেয়েকে তাঁর এ সংসারের পক্ষে একটু যেন ভার-ভারই ঠেকছিলো। মনের কোন তলাকার কোণ থেকে কে জানে এ কথাটাই বারে বারে মনে হচ্ছিল তাঁর যে বিয়ে হ'লেইতো মেয়ে পর, তার স্বার্থ আর তার বাবার স্বার্থ কোনোরকমেই আর একসূত্রে গাঁথা হ'তে পারেনা। তবে কেন তাকে বসিয়ে-বসিয়ে বৃথাই আর ভাত কাপড় দিয়ে পোষা। রাখালকে ভাত কাপড় দিতে যে কষ্ট হচ্ছিলো সেই কষ্টই যেন একটু কম তীব্র হ'য়ে যন্ত্রণা দিচ্ছিলো বুকের তলায়। তার ভাতকাপড়ের পালাতো তিনি কবেই সঙ্গে ক'রে দিয়েছেন, তার জন্যে এখন আর যজ্ঞেশ্বরের দায় কিসের, দায়ী এখন তার স্বামী। সুনির্মল। সে যদি তার বৌয়ের খরচ না দেয় তাহ'লে খোরপোষের জন্যে মামলা পর্যন্ত করতে পারে সে। মেয়ের সঙ্গে এ নিয়ে যে দু'চারদিন বেশ দু'এক হাত ছোটোলোকোমি হ'য়ে যায় নি তা-ও নয়। সুধাময়ী হায় হায় ক'রে এসে বাপে মেয়ের ঝগড়া থামিয়েছেন, ছি ছি করেছেন, কপালে করাঘাত ক'রে ধিক্কার দিয়েছেন নিজের অদৃষ্টকে। প্রমীলার কান্নাকাটি চিৎকারে পাড়াপ্রতিবেশী জড়ো হ'য়েছে এসে।

ঠিক এমন দিনেই ঈশ্বর রাস্তা দেখালেন তাকে। এতোদিন যে দেমাক ক'রে মেয়েকে পাঠাননি, সেই দেমাক তার ভাঙতে হ'লো না, কোনো অপ্রিয় কাজ করতে হ'লোনা, নিজে থেকেই কেমন সব আপনাআপনি ঠিক-ঠাক হ'য়ে চলে এলো হাতের মুঠোয়। এখন বোকা মেয়েটা তীরে এসে নৌকো না ডোবায়, ঝগড়া ঝাঁটি ক'রে আবার না হাজির হয় গিয়ে তার দমদমের বাড়িতে। নিজের সংসার নিজের স্বার্থ এখনও যদি না বুঝে নিতে পারে তবে আর পারবে কবে ?

আর সেই কারণেই কিছুদিন পর্যন্ত এখানে থেকে যাওয়াটাই মনে-মনে সমীচীন মনে করছিলেন তিনি। একটু স্থিতি হোক, মেয়েটার একটু অধিকারে আসুক সব, শক্ত ক'রে হাল ধ'রে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার মতো সাহস হোক মনে, তারপর যাবেন তিনি। জামায়ের মতিগতি ভালো না, বশ করতে হবে হিরণ্ময়ীকে ; সাপ নাচাবার মন্ত্র আয়ত্ত করতে হবে তার কাছ থেকে। তাই হিরণ্ময়ী যখন শ্রাদ্ধ পর্যন্তই থেকে যাবার একটা আমন্ত্রণ জানালেন, বিনীত অনুনয়ে তৎক্ষণাৎ যুক্ত হস্তে আবক্ষ আনত হ'লেন যজ্ঞেশ্বর। নিশ্চয়ই। এখন তো তার যাবার কথাই ওঠে না। এই অভিভাবকহীন কয়েকটি শিশুকে ফেলে, এমন শোকাতুরা হিরণ্ময়ীকে একা রেখে পিতৃতুল্য তিনি, তিনি কি যেতে পারেন ? ওরা শান্ত হোক, একটু প্রশমিত হোক হিরণ্ময়ীর শোকের তীব্রতা, তবে তো তাঁর ছুটি ? তাছাড়া অত বড়ো একটা কাজের ভারই বা কে বহন করবে যদি তিনিই না দাঁড়ান সুনির্মলের পেছনে ? ছেলেমানুষ, কী জানে ও ? কী করবে ? কী পারবে ?

সব শুনে গম্ভীর মুখ আরো গম্ভীর করলো সুনির্মল।

৫

চুকলো শ্রাদ্ধশান্তি। খুব একটা ঘটা করতে দিলেন না হিরণ্ময়ী। সুনির্মলও তা চাইলো না। এত বড় দুঃখের দিনে কোনো একটা উৎসবের চেহারা ফুটুক বাড়িতে এটা তাদের মা-ছেলে দু'জনের পক্ষেই অসহ্য। খুব নীরবে, খুব গম্ভীর ভাবে, অতি অল্প লোক ডেকে সমাপন হ'লো পারলৌকিক ক্রিয়া। একমাত্র মেয়ে রাজেনবাবুর, চোখের মণি, বুকের ধন কিন্তু এমন দিনে ভাইয়েদের সঙ্গে মিলিত হ'তে পারলো না সে। থাকে বহু দূরে, সুদূর সিমলা পর্বতে, উপরন্তু আসন্নপ্রসবা, চিঠির পাতায় তার চোখের জল ছোঁয়া গেল।

তারপর কোনো এক সন্ধ্যায় যজ্ঞেশ্বর বললেন, 'এবার আমার যাবার পালা।' প্রমীলা ঘরে এলো, শ্বশুরের মৃত পায়ের ছাপে মাথা ঠেকালো এসে। ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলো চার পাশে। হিরণ্ময়ী মুখ নিচু ক'রে বসেছিলেন ঘরের এক কোণে চোখ তুলে দেখলেন, আস্তে কাছে ডাকলেন তাকে, শেষে আঁচল থেকে চাবি খুলে সেই চাবি বৌয়ের আঁচলে বেঁধে দিলেন। দুই চোখে তাঁর ধারা নামলো। না, আর নয়, আর কোনো বন্ধন নয় সংসারের। যার সংসার সে-ই এখন বুঝে নিক সব, সবই তো এখন তার। তবু যে সে এসেছে এই দুঃখের দিনে, দেখছে শুনছে, করছে—তার মতিগতি ফিরিয়ে দিয়েছেন ঈশ্বর এই তো কত ভাগ্য। যজ্ঞেশ্বরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দুঃসময়ে নিজের কাজকর্ম ফেলে আপনি আমার জন্য যা করলেন তার জন্য আমি চিরঋণী রইলাম।' যজ্ঞেশ্বর গ'লে গেলেন শোকের আবেগে। বলবেন কী? কথা বলতে যে তাঁর গলা বুজে আসে। আর তাঁর মেয়ে প্রমীলা, সেই চাবিশুদ্ধু আঁচল গলায় জড়িয়ে প্রণাম করলো শাশুড়িকে।

তার দু'এক দিন পরে রাত্তিরে শুতে যাবার আগে মার কাছে এসে বসলো সুনির্মল। হিরণ্ময়ী শুয়েছিলেন, মুখ তুলতেই একটু ইতস্তত ক'রে বললো, 'ভদ্রলোক তো শুনছি কাল যাচ্ছেন।'

'কোন ভদ্রলোক?'

'যজ্ঞেশ্বর কনট্রাকটরের কথা বলছি।'

'যজ্ঞেশ্বর কনট্রাকটার!' ভৎর্সনার দৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে হিরণ্ময়ী বললেন, 'গুরুজন সম্বন্ধে এ-ভাবে কথা বলা তোর উচিত না, নিমু।'

'গুরুজন!'



'গুরুজন না?'

'তা, কী বলতে হবে তাকে?'

'সকলে যা বলে।'

'আমি যদি তা না বলি?'

'অন্যায় হবে।'

'অন্যায়!' ঠোঁট বাঁকিয়ে একটা বিদ্রূপের হাসি বিচ্ছুরিত করলো সুনির্মল, তারপর বললো, 'যাক সে কথা। প্রমীলা নাকি থাকবে শুনছি?'

'থাকবে না তো কোথায় যাবে?

'যেখানে যাবার।'

একটু বিরক্ত হ'লেন হিরণ্ময়ী, 'কী আবোলতাবোল বকছিস। নিজের ঘর সংসার ফেলে কি ওকে তুই চিরকালই বাপের বাড়ি প'ড়ে থাকতে বলিস?'

'তুমিও কি তাই বলো না?'

'ককখনো না!' হিরণ্ময়ীর গলা ঈষৎ চ'ড়ে উঠলো, 'আমি তো তার হাতে সব ভার তুলে দিয়েছি। এই ছাখ্—' কাঁধ থেকে তিনি শূন্য আঁচল তুলে দেখালেন, 'তুই মনে করিস না, নিমু, ওটা আমার শুধুই চাবি। সেটাই আমার যথাসর্বস্ব।'

'যথাসর্বস্ব মানে? তোমার গয়নার বাক্স কোথায়? সিন্দুকের চাবি?'

'সব আমি বুঝিয়ে দিয়েছি তাকে। খোকা, আমার জীবনে আর কী আছে? তোরা সুখী হবি, এইতো একমাত্র আশা, তোরাইতো সব, তোদেরটাই তোদের দিয়ে দিলাম।' দুই চোখ চকচকে হ'য়ে উঠলো তাঁর। সুনির্মল গুম হ'য়ে ব'সে রইলো। একটু পরে নিশ্বাস নিয়ে বললো, 'ভালো করোনি।'

'কেন?'

'সে এখানে থাকতে পারে না।'

'তার মানে তুই ওকে তাড়িয়ে দিবি?'

'কোনোদিন কি দিয়েছিলাম? তখন তো থাকেনি, এখন কেন এলো?'

'ছেলেমানুষ ছিলো, বুদ্ধি কম ছিলো, এখন বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে বুঝেছে সব, এসে হাল ধ'রেছে সংসারের।'

'হ্যাঁ হাল ধরতেই ও এসেছে।'

'তাতে তোমার আপত্তি কী?'

অসহিষ্ণু হ'য়ে সুনির্মল বললো, 'শুধু আমার আপত্তির কথাই উঠছে না মা, তোমার আপত্তিও উঠবে ক'দিন পরে। কিন্তু তখন কোনো উপায় থাকবে না।'

'আমার আপত্তি?' ব্যথিত গলায় হিরণ্ময়ী বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে বনিবনাও ক'রে থাকতে পারবো না এ-কথাই কি বলতে চাস তুই?'

'ও যদি তোমাকে আর মান্য না করে?'

'তুই কি জানিস না যে ও আমাকে কী অসম্ভব ভয় করতো?'

'সেদিন তো আর নেই।'

'না, তখনকার চাইতে ও ভালো হয়েছে, বুদ্ধিসুদ্ধি হ'য়ে মানুষ হ'য়ে এসেছে। বুঝতে শিখেছে আমি ওর ভালো ছাড়া মন্দ করতে পারি না।'

'হুঁ।'

'তা তোমার কী ইচ্ছে?' একটু উষ্ণ হলেন হিরণ্ময়ী, 'তোমার বাবা যাকে এত সমাদরে ঘরে এনেছিলেন, বিনা অপরাধে আমি তাকে ফেলে দিই? না, নিমু আমি তা পারবো না, পারবো না, আজ দেড় মাসও গত হয়নি তিনি গিয়েছেন—'

'থাক, মা,' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঐ প্রসঙ্গ চাপা দিতে চেষ্টা করলো সুনির্মল।

'আচ্ছা, তুই-ই বল,' সজলচোখে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন হিরণ্ময়ী, 'তখন যদি ও এরকম থাকতো তাহ'লে কি আর আজকের দিনে এ-সব কথা উঠতো? আমি জানি ও তোর যোগ্য নয় কিন্তু ওকে তুই যোগ্য ক'রে নে। ও এখন একেবারে বদলে গেছে।'

একটু হাসলো সুনির্মল। 'এ-কথাটা তুমি ভালো ক'রে জেনে রাখ মা, ও যদি না বদলাতো, আজকের দিনের মতো না হ'তো, তাহ'লেও ওকে সহ্য করা সম্ভব হ'তো, কিন্তু আজকের দিনের ও একান্ত অসহ্য।' উঠে দাঁড়ালো সে, তারপর মার তেলহীন রুক্ষ এলোমেলো জট-পাকানো চুলের উপর আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়ে চ'লে যেতে-যেতে নরম গলায় বললো, 'সবাই কি মা তোমার মতো?'

সুনির্মল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে স্তব্ধ হ'য়ে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন হিরণ্ময়ী। শকুন্তলাকে মনে পড়লো তাঁর। ওর চোখ মুখ চুল নাক হাত পা, সব তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ভাবতে লাগলেন। প্রমীলার উপর এই বিরূপ ভাব কি আগেও ছিলো সুনির্মলের? শকুন্তলাকে দেখার আগে? ভালো ক'রে মনে করতে চেষ্টা করলেন। নাকি এজন্যেও হিরণ্ময়ীই দায়ী? ঐ মেয়েটিকে কে এনে তার চোখের সামনে তুলে ধরেছিলো? তিনিই তো! দিনের পর দিন কী ইচ্ছেশক্তি তিনি প্রয়োগ করেছিলেন? এই, এই ইচ্ছে। একমাত্র এই ইচ্ছে যে শকুন্তলাকে সাগ্রহে গ্রহণ করুক সুনির্মল! মার সেই ইচ্ছে পূর্ণ করবার সাধ যেদিন টলমল ক'রে উঠলো ছেলের বুকের মধ্যে, তক্ষুনি আবার অন্য পার্ট নিতে হ'লো তাঁকে। এ কী রকমের খেলা তাঁকে দিয়ে খেলাচ্ছেন বিধাতা? এ তিনি



কী করছেন? মা হ'য়ে ছেলের জীবনে কী গভীর দুঃখ তিনি ডেকে আনছেন বারে বারে? হে ঈশ্বর, কেন এমন হ'লো? কেন এমন হ'লো?

কিন্তু তিনি কী করবেন? তিনি কি জানতেন এমন দুর্ভাগ্যের অন্ধকার এমন অতর্কিতে ঘনিয়ে আসবে তার ভরা জীবনের সুখে? জানতেন কি যে প্রমীলা এসে দাঁড়াবে তাঁর দরজায়? এমন ক্ষমাপ্রার্থী হ'য়ে? অবনত হ'য়ে? তবে তিনি কী করবেন? একজন মেয়ে হ'য়ে আরেকজন মেয়েকে কেমন ক'রে তাড়িয়ে দেবেন তার স্বামীর গৃহ থেকে, স্বামীর আশ্রয় থেকে? এ-পাপ তিনি কেমন ক'রে করবেন? স্বামী কী, স্বামী কতখানি তা তো আজ মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করছেন? প্রমীলা যত অযোগ্যই হোক, যত বোকাই হোক, তবু তো একদিন সুনির্মল তাকে সেই মর্যাদা দিয়েই এনেছিলো এই ঘরে? সুনির্মল আবার বিয়ে করলে ওর জীবনে কী থাকবে আর? অবমাননা আর লাঞ্ছনা ছাড়া কী জুটবে ওর? কেন বোঝে না সুনির্মল?

আর শুধু কি সুনির্মল? বিনুও বুঝলো কই তাঁর কথা? বিনু রাগ করেছে, অভিমান করেছে, অসম্মানিত বোধ করেছে ওর ননদকে এ ভাবে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য। পাকে-প্রকারে সে তো বারে বারে একথাটা বলবার চেষ্টাই করেছে যে যদি বৌয়ের প্রতি হিরণ্ময়ীর এতোটাই দরদ ছিলো যে দেখা মাত্রই গ'লে যাবেন, ভুলে যাবেন, তবে কী দরকার ছিলো অতখানি অগ্রসর হবার? প্রমীলা আর কোনোদিন এ সংসারে আসবে না, এলেও জায়গা পাবে না এই নিঃসংশয় আশ্বাসেই না বিনু তার ননদের এতো বড়ো সর্বনাশটা করতে পারলো, এমন অবাধে মেলামেশা করতে দিয়ে ওর মন ভেঙে দিল। সেই ক্ষোভে এত বড়ো দুঃখের দিনেও তার দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে সে। আসে না, ভালো ক'রে কথা বলেনা, কুন্তীটাকে পর্যন্ত একদিন আসতে দেয় না। আহা, কুন্তী। কুন্তীকে নিয়ে কি হিরণ্ময়ীরই কম সাধ ছিলো? কম আকাঙ্ক্ষা ছিলো! অমন সুন্দর, অমন মিষ্টি একটা মেয়ে কি তিনি আর দেখেছেন কোথাও? কী করবে সুনির্মল? এ হচ্ছে বিধাতার নির্বন্ধ। এই বন্ধন ছিন্ন করবে এতো শক্তি কি মানুষের আছে? তা নৈলে কেন এমন হবে? কেন? কেন? কেন?

বুকের উপর করাঘাত করতে করতে উপরের দিকে তিনি হিংস্রভাবে তাকালেন। দাঁতে দাঁত নিষ্পেষণ ক'রে কার কাছে যেন জবাবদিহি খুঁজলেন উত্তাল চোখে।

ততক্ষণে সুনির্মল উঠে এলো দোতলায়। ধীরে-ধীরে শিথিল পায়ে। প্রায় টলতে টলতে। ক্লান্তি। অসম্ভব ক্লান্তি। নিজের শরীরের ভারটা বহন করাও কত ক্লেশকর।

অনেক ঘুরেছে সারা দুপুর, সারা বিকেল। আজ শনিবার। পিতার মৃত্যুর পর থেকে এই একেকটি শনিবার একেকটি তপ্ত শলাকা নিয়ে আসে সুনির্মলের জীবনে। এই শনিবারকে সে সহ্য করতে পারে না। যদি না উন্মাদ হ'য়ে যায় আমৃত্যু এই বারটি মনে থাকবে তার। এই শনিবারে সে আপিশে টিঁকতে পারে না, রাস্তায় টিঁকতে পারেনা, ঘরে ফিরতে পারে না। আজও যখন অসময়ে আপিশ থেকে বেরিয়ে কী করি কী করি ভাবছিলো, ভাবতে-ভাবতে ভাদ্রের প্রচণ্ড গরমে অহেতুক ঘুরে বেড়াচ্ছিল কার্জন পার্কের এ মাথা ও মাথা, এসপ্ল্যানেডের স্টলে, হঠাৎ সব সংযম, সব বুদ্ধি, সব শক্তি কোথায় যে ভেসে গেল তার। একবার ভীষণ, ভীষণ, দেখতে ইচ্ছে করলো কুন্তীকে, কুন্তীর নরম মুখটা ছুঁতে ইচ্ছে করলো চোখ দিয়ে। এই একমাস পাঁচদিনের মধ্যে আর দেখেনি তাকে। সে আসেনি। কেন আসেনি, কেন তাকে আসতে দেয়নি বিনু সবই জানে। তবু সব লজ্জা ভাসিয়ে, সব কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে, একবার, মাত্র একবার দেখবার জন্য অধীর হ'য়ে উঠলো প্রাণ। মনে হ'লো এই দেখা করাটাই যেন এখন তার জীবনের বেঁচে থাকবার একমাত্র লক্ষ্য। কিছুতেই, কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারলো না সে। তারপর কখন ট্র্যামে চড়লো, কখন নামলো, কখন টোকা দিল নির্দিষ্ট বাড়িটির দরজায়, কিছুই যেন বুঝতে পারলো না। আর টোকা দিয়েই ধ্বক ক'রে উঠলো বুকের ভেতরটা।

নিঃঝুম দুপুর। চুপচাপ বাড়ি। সুনির্মলই তিনমাস আগে খুঁজে-খুঁজে বার ক'রে দিয়েছিলো এই নির্জন পাড়ার সুন্দর বাড়িটি। সুনন্দরা যখন প্রথম আসবে ব'লে চিঠি লিখেছিলো একটা বাড়ি খুঁজে দেবার জন্য, গা করেনি সুনির্মল। ভাগ্নির জন্য অস্থির হ'য়ে রাজেনবাবু আর হিরণ্ময়ীই হাঁটাহাঁটি ক'রে পনেরো দিনের মধ্যে এক ফ্ল্যাট ঠিক ক'রে বাড়ি এলেন। গঙ্গার ধারে, কালিঘাটের এক ঘিঞ্জি পাড়ায়। কিন্তু কী করা? অত অল্প সময়ে এর চেয়ে আর ভালো পাবেন কোথায়?

তারপর চারমাস পরে এই বাড়ি! মাথা ঝাঁকিয়ে কুন্তী বলেছিলো, 'ভারি কাজের মানুষ, একটা বাড়ি খুঁজে দিতে পারে না।' সেই ঘিঞ্জি বাড়ির ছোট্ট ঘরে ব'সে সুনির্মল বলেছিলো, 'বললেই পারি।' বিনু টিপটে চায়ের পাতা দিতে-দিতে বললো, 'মাগো, কী মিথ্যুক তুমি! বলিনি? বাড়ির জন্য তিন তিনখানা চিঠি লিখেছিলাম। মামীমা জবাব দিলেন, 'সুনুকে ব'লে হায়রান, সে বলে বাড়ি নেই কলকাতা শহরে। আর অভি সীমন্ত যে সব বাড়ির খোঁজ আনে সে সব বাড়িতে পাতিয়ালা কিম্বা বর্ধমান কিম্বা কুচবিহার ইত্যাদিরাই থাকতে পারেন অতএব তোমার মামা আর আমিই আজকাল বেরুচ্ছি খোঁজে।' সুনির্মল হাসতে লাগলো 'দাও, চা দাও শিগ্‌গির। তোমাদের বাড়ি এলেই কেবল কাজের ফরমাশ। যেমন তুমি, তেমনি তোমার ননদটি। আর আমি আসবো না।' 'তার আগে



অনুগ্রহ ক'রে বাড়িটা খুঁজে দেবেন।' শকুন্তলা হেসে তাড়াতাড়ি চিরুনি চালাতে লাগলো ঘন চুলে, বন্ধুর বাড়ি যাবে। 'আর তার আগে বন্ধুর বাড়ি যাওয়া স্থগিত রেখে অতিথিকে মান মর্যাদা দিতে শিখুক সেই মানুষটি।' সুনির্মল অন্যদিকে তাকিয়ে বেশ গম্ভীর-সম্ভ্রান্ত হ'য়ে চেয়ারে হেলান দিল। প্রায় মাননীয় অতিথির মতোই দেখালো তাকে। কুন্তীর গালে টোল পড়লো। তারপর রেখে দিল চিরুনি।

ধড়াচুড়ো প'রে সুনন্দ ফিরলো কোর্ট থেকে।—'আরে ব্যাপার কী! আপনি যে?'

'শনিবারও কি তোমাকে পাঁচটার সময় ফিরতে হয় নাকি সুনন্দ?' 'তা ফিরবে না?' বিনু তেরচা চোখে স্বামীর দিকে দৃষ্টিবাণ হানলো, 'ওঁকে যে আজকাল কোর্ট একটা নতুন কাজে বহাল করেছে, নিমুদা!' সুনন্দ গলার ফাঁস খুলতে খুলতে হাসলো, কুন্তীও হেসে উঠলো। বোঝা গেলো একটা পুরোনো রসিকতা আছে ওদের মধ্যে। সুনির্মল বললো, 'কী কাজ?'

'কোর্টের ধুলো ঝাঁট দেয়া, দরজা জানলা বন্ধ করা, দরজায়-দরজায় তালাচাবি লাগানো—'

এবার সুনির্মলও হেসে উঠলো।

আস্তে দরজা খুলে দিয়ে চুপচাপ কখন এসে থমকে দাঁড়িয়েছে শকুন্তলা, অন্য দিকে তাকিয়ে ভাবতে-ভাবতে খেয়ালই করেনি সুনির্মল। ছিটকিনি খোলার আওয়াজে চকিত হ'য়ে চোখ ফেরালো। তারপর স্তব্ধ রইলো একটু সময়।

শকুন্তলাও নিঃশব্দ রইলো খানিকক্ষণ, তারপর বললো, 'বৌদি বাড়ি নেই।'

'তুমি তো আছো।'

ঠাট্টার ছুতোয় সুনির্মল অনেক সত্য কথা ঠিক এমনি ক'রেই অনেকবার বলেছে, আর তার জবাবও পেয়েছে তৎক্ষণাৎ। কিন্তু আজকের সুরে ঠাট্টা ছিলোনা, আনন্দ ছিলো না, হয়তো কেবল সত্যটাই ফুটে উঠেছিলো নগ্ন হ'য়ে। ও পক্ষ থেকে জবাব এলো না কোনো। শকুন্তলাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে এসে বসলো সে। 'সুনন্দও ফেরেনি, না?'

'না।'

'এক গ্লাশ জল দেবে?' রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মুছলো, 'পাখাটা চালিয়ে দাও তো।'

পাখা চালিয়ে দিয়ে, জল নিয়ে এলো শকুন্তলা।

কী গরম! কী অসহ্য তাপ দুপুরের! দরজা বন্ধ ঠাণ্ডা ঘরে, ঠাণ্ডা হাওয়ায়, ঠাণ্ডা জলে, চন্দনের মতো শীতল মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা সেই তাপ যেন চোখের জল হ'য়ে গলে পড়তে চাইলো।

'কেমন আছো?'

'ভালো।'

'খুব পড়ছো ?'

'না।'

'কেন ?'

'মন লাগে না।'

একটু চুপচাপ।

হর্ন টিপে ট্যাক্সি চ'লে গেল একটা, কয়েকটা রিকশ গেল, কান্নার মতো শোনা গেল ফেরিওলার ডাক। সুনির্মল আকুল চোখে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো শকুন্তলাকে।

'বোসো না।'

'ঠিক আছি।'

'তুমি কি আমাকে চ'লে যেতে বলছো ?'

'বা, তা কেন ?'

'তবে দাঁড়িয়ে আছো কেন ? তাড়াতাড়ি বিদায় দেবার জন্যেই তো ?

দেয়ালের ঠেশান থেকে স'রে এসে দূরে চেয়ারে বসলো শকুন্তলা।

'কুন্তী !'

'বলুন।'

'আমি এসেছি ব'লে রাগ করলে তুমি ?'

'রাগ ? রাগ কিসের।'

'আমার আসা উচিত হয়নি। আমি জানি। কিন্তু—কিন্তু—'

'ও-সব কেন বলছেন ? আসবেন না কেন ? বা রে—' একটু হেসে খুব সহজ ভঙ্গি করলো কুন্তী, কিন্তু গলা ধ'রে এলো তার।

'কতদিন তোমাকে দেখি না, আজ মনে হ'লো—'

কুন্তী হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো।—'চা খাবেন ?'

'না।'

'কেন খাবেন না ? আপিশ থেকেই আসছেন তো ?'

'তুমি বোসো।'

'অতিথিকে যথোচিত সৎকার না করলে অধর্ম হয় জানেন তো ? বিশেষ কুটুম্ব মানুষ।' হাসলো সে।

'বোসো।'



আবার ব'সে পড়লো কুন্তী।

'সুনন্দ নাকি বদলি হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কবে যাচ্ছে ?'

'এ-মাসেই।'

'বিনু ?'

'বৌদিও যাচ্ছেন।'

'তুমি ?'

'আমিও।'

'তুমিও !'

কুন্তী মাথা নিচু ক'রে রইলো, জবাব দিলো না।

'তোমার তো পরীক্ষা।'

'প্রাইভেট দেবো।'

'কেন তুমি—তুমি কলকাতায় থাকো না।'

'আমি থাকবো ? কোথায় ?'

তাই তো ! কোথায় থাকবে সে কথা তো ভাবেনি সুনির্মল। বুকের নিশ্বাস দ্রুত হ'লো তার। তারপর চোখ তুললো।

আর সেই চোখে চোখ রেখে শকুন্তলার দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো। যে-কথা গোপন করতে চেষ্টার তার অন্ত ছিলো না, যে কথা একযুগ কাটলেও সে ব'লে উঠতে পারতো না, যে-কথা ভাবতেও কান লাল হ'য়ে উঠতো, লক্ষ কথা বললেও যে-কথা ঠিক ক'রে বলতে পারতো না কোনোদিন সেইসব কথা বলাবলি হ'য়ে গেল চারটি মিলিত চোখের মুহূর্তের দৃষ্টিক্ষেপে। তার চোখ থেকে টপ্‌টপ্ ক'রে জল গড়িয়ে পড়লো, দুই হাতে মুখ ঢেকে ছুটে চ'লে গেল সে অন্য ঘরে। অস্থির উদ্‌ভ্রান্ত পায়ে বেরিয়ে এলো সুনির্মল। তারপর রাস্তা।

হাঁটতে-হাঁটতে ধ'রে এসেছে পা, উঠেছে ট্রামে, কিংবা বাসে, ব'সে থেকেছে যতক্ষণ খুশি, তারপর আবার নেমেছে, আবার উঠেছে। এই ক'রে-ক'রে গঙ্গার ঘাটে এলো সন্ধ্যাবেলা। দেখলো অন্ধকার আকাশের অসংখ্য তারা, জলের বুকে নৌকাগুলোর টিম্‌টিম্ আলো। বাতাসে শীতের আভাস। ভালো লাগলো একটু। উটরাম ঘাটের দোতলায় এসে চা খেয়ে ঠাণ্ডা হ'লো মাথা, তারপর বাড়ি ফিরলো। আর বাড়ি ফিরেই নিবে যাওয়া আগুনের তেজ যেন দ্বিগুণ উত্তপ্ত হ'য়ে জ্ব'লে উঠলো বুকের ভেতরে যখন সে শুনলো কাল তার শ্বশুর যাচ্ছেন, কিন্তু শ্বশুরকন্যা থাকছেন কায়েমি হ'য়ে।

(ক্রমশঃ)

# ইতিহাস ও সাহিত্য

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

### বিদ্যা-সুন্দর

সংখ্যাতত্ত্বের অর্দ্ধ সত্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে সৎ কবি প্রায়শঃ একনিষ্ঠ চরিত্রের বড়াই করতে পারেন না। ঋকবেদের কোবিদ বশিষ্ঠ থেকে দার্শনিক-কবিদের এই বৈশিষ্ট্য সুরু। গায়ত্রীর কবি বিশ্বামিত্র বা রামায়ণ-মহাভারতের বাল্মিকী-ব্যাসও এম্নি চরিত্রহীনের বৃত্তেরই ব্যাসান্তর্গত। তাছাড়া সক্রেটিস-ও বা কি? তরুণ-চিত্ত-বিক্ষোভ-কারী এই ক্ষমতাবান পুরুষটিকেও বশিষ্ঠ-বৃত্রাসুরের বংশ থেকে বাদ-সাদ দেওয়া যায় না। তারপর ইদানীংকার সেক্সপীয়র দান্তে ত কামাখ্যায় আর নরকের প্রান্তেই শান্তি লাভ করেছেন। তবে খুব সম্প্রতি এঁদের দল আর তেমন ভারি হতে পারছে না। গুটিকয় গ্যেয়টে-বোদলেয়ারের মতো বদ-লোকের মধ্যেই এঁরা সীমাবদ্ধ। আর শেলী-বায়রণ-কীট্স-এর অশ্লীলতাবাহী কালকূটে প্রোথিত বা প্রথিত। কিন্তু প্রমথ আর ভূতপ্রেত কি সহজে প্রস্থান করে? লরেন্সে তা-ই আবার সে কাঁটার মুকুট মাথায় দিয়ে হাজির হয়।

পরপুরুষকে দোষ দিয়ে আর কি লাভ? আমাদের কর্ত্তারাও কম যান না। মানে, বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা। ত্রাতা হিসেবে ঘাটের ধোপানীর শরণ নেওয়া সে-যুগে কেন এ-যুগেও শীলবানদের শ্রীবিষ্ণু নামোচ্চারণ করিয়ে তবে ছাড়ে। কিন্তু আমি ভাবছি কোন গুণে সেই রজকিনী এমন প্রেমের আগুন ছড়াল যাতে দ্বিজপুত্র চণ্ডীদাস এই রাধা-রসে ভজলেন! সে কি রজকিনীর রজত-কান্তি না রজত-কৌলিন্য? দীন চণ্ডীদাস রজত-কৌলিন্যেই চঞ্চল হয়েছিলেন মনে হয়। আর বার-রায়ীর ভাঁড় চণ্ডীদাস বড়ু হয়ে বটুর বেশ নিয়েছিলেন হয়ত ছোটজাতের মেয়েটির রজত-কান্তিতে ভুলে। কিন্তু শাক্ত দ্বিজবর চণ্ডীদাস বৈষ্ণব হতে গেলেন রজকিনীর কোন রজোগুণে? ধোপানীর পৈঠা আর দ্বিজের পৈতা ছাড়া যোগসূত্রটা কোথায়? তাও বা যজ্ঞসূত্র কবে ধোপা-বাড়ি যায়? তবে শ্রীমদ্ভগবদগীতার টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী বলছেন যে বসন্তে বটুরা দ্বিজ হবার জন্যে ব্রাহ্মণের কাছে হাজির হতেন। বটুকৃষ্ণও দোলযাত্রে বসন্ত কালেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণের কাছে হয়ত দ্বিজ হবার জন্যে গিয়েছিলেন এবং দ্বিজ দর্ভপাণি হয়ে সম্ভবত দ্রাবিড় ধোপানির 'রঙ্গরম্যে' এমনই প্রীত হয়েছিলেন যে তাঁকে সঙ্গিনী না করে আর তাঁর যো ছিলনা। তবে তা বিদ্যা-চুরি নয়। বিদ্যাধরীরাই বরং তখন সুন্দরদের



পশ্চাদ্ধাবন করতেন। মহাবিদ্যা আদ্যাশক্তিও বা কি করেছিলেন? 'অন্নদামঙ্গলে' দেখতে পাই ঘাটের-মড়া হয়ে ভাসতে-ভাসতে তিনি এলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের তপস্যায় বিঘ্ন জন্মাতে। বিঘ্নিত হলেন সত্যি ব্রহ্মা আর বিষ্ণু, কিন্তু মড়া দেখে ভোলা-ভব মোটেও ঘাবড়ালেন না, ভাবলেন, বেশ হ'ল, একটা পিঁড়ি ত জুটলো বসে তপ করবার জন্যে। ভবানী খুশী হয়ে তাঁরই স্ত্রী হবার কবুল করলেন। ভব-ভবানীর যখন এই ইতিহাস তখন কৃষ্ণ-রাধার দোল-রাস তেমন কিছু মারাত্মক নয়—আর ঘাটের মড়ার তুলনায় ত ঘাটের রাণী রজকিনী স্বর্গ-ধাম। তবে উমা-পার্ব্বতী-গৌরী-রাধার মতো হয়ত ধবলা ছিলনা মেয়েটি—তাতে কী ক্ষতি—রজকিনীর আর-যা-কিছু না থাক যক্ষিনীদের মতো ধব-প্রীতি ত ছিল! তাছাড়া চলচ্ছক্তি ত তার দেদারই—স্ত্রী হ'তে গেলে তার বেশি আর কি দরকার? দাসীকন্যাকে স্ত্রী হিসেবে পেতে মহামনীষী গ্যয়টে আর কয়টি গুণ গুনেছিলেন? আসল কথা স্ত্রী যিনি হবেন তিনি বিদ্যাধরী, আদ্যাশক্তির জাত কিনা তাই ছিল দ্বিজবরদের বিবেচ্য। দ্বিজরা সবাই ত আর ব্রাহ্মণ নন, কেউ বর্ম্মণও! মগধে ত যবদ্বীপী মগদ্বিজ বর্ম্মণরাই আসীন ছিলেন—যাঁরা যবদ্বীপী যবন। ব্রহ্মদেশের বা ব্রহ্মপুত্র-দেশের বপ্র-ক্রীড়ারত বিপ্ররা আবার কবে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ—তাই না?

এখন শাক্ত-বৈষ্ণবের কথাটা। রাধা আর দুর্গা দু'জনই শক্তি। শক্তিরা ছিলেন মেয়ের জাত। পুরুষ মেয়েদের ঠাঁই-এ গিয়ে দাঁড়াল দেবসেনা কুমার কার্ত্তিকের জন্মের পরে। অর্থাৎ ধনুর্দ্ধর শক বা গ্রীকদের সভ্যতার সঙ্গে-সঙ্গে। সাধে কি আর সক্রেটিস কুমার-দের নষ্ট-ভ্রষ্ট করতেন? তারপর কালক্রমে শক্তি মানব-দেহ ত্যাগ করে পশুদেহে ভর করলেন। এবং অতঃপর ইট-পাথরে-পাত্রে-খনিত্রে পালা শেষ করে সর্ব্বশেষে শক-তীর, 'Bow'-তীর, Bo-Tree হয়ে তিনশূন্যে সন্ন্যাসী হয়ে গাছে চড়ে বসলেন। 'জ্যা-তীর' আকর্ষিত শক্তিটির চেহারা জাতির চিহ্ন হিসেবে শক বা শাক্যরা ব্যবহার করে যে শুধু তাদের সুধন্যপনা বা সুধন্বাপনা জাহির করতেন তা নয়—ছবিটি হুবহু ইস্কাপনের মূর্ত্তি নিয়ে দেখাতে চাইত আমরা পণ্য অথবা পণ্যা—পানের চেহারায় যে তোমার হৃদয়টি আছে তা অনায়াসে বিদ্ধ করতে পারি। হরপ্পার যক্ষকিরাত 'ক্ষহরাত' 'নহপান' বলে নিজেকে জাহির করেও শক 'উসবদাতে' কন্যা সমর্পণ করতেন। উৎসবের উৎস ছিলেন শকরা। সৌখীন পুরুষ। বুঝতে চেষ্টা করুন কেন শক-শাক্য শুদ্ধোধন, প্রাক্-মসীদনের এই বিশুদ্ধ দক্ষ পুরুষটি, সিদ্ধার্থের জন্যে চৌষট্টিকলাসিদ্ধা গণিকা-বৎ সুযোগ্যা নারী সন্ধান করবেন বলে ছেলেটিকে প্রলোভিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। কথিত হয় কামকলাবিশারদা বাসবদত্তা গজিনীদের গৌরবেই নাকি ভারতে সে-টা স্বর্ণ-যুগ। বটেই। শক বনিকদের স্বর্ণসুযোগ তখন। তাছাড়া কাঞ্চীর পাণ্ড্য-বনিকদের, বাংলা-

দেশের 'মান'-নামক পণ্যবাহীদের। মানদের স্বর্ণমানে তাঁদের মানিনী মেনকাদের মহা-কুলীন নগরাজের সঙ্গে বিয়ে হত বটে কিন্তু পাণ্ডব-কুলের পলিএণ্ড্রি নামক বিষয়টিকে গ্রহণ করে পাণ্ড্যরা তা এম্নি চারিয়ে দিলেন যে বনিকের বনিতারা স্বামীদের গণিকা-বিলাস দেখে দলে-দলে নৌকা-বিলাসের গোপিনী অথবা সরাসরি সহরে-সড়কে পথিক-বনিতা সেজে বেরুলেন। মহাবিদ্যার বংশের কামবিদ্যাধরীদের কোথায় গমন লক্ষ্য করুন। তবে কামরূপের ইনফার্ণো থেকে কাশীর স্বর্গ দূরে ছিলনা বা কাঞ্চীর নরক থেকে নালন্দার স্বর্গ। এই যা রক্ষা!

এই ভ্রষ্টা বিদ্যাদের পতিবৃন্দ অর্থাৎ বিদ্যাপতিরা নিজেদের এবং ভার্য্যাদের অর্জ্জিত বিদ্যা পণ্যসম্ভারের সঙ্গে চালানি দিতে সুরু করলেন ত্রিকলিঙ্গে—কোণার্কে, পুরীমন্দিরে নটীভুবনেশ্বরী চন্দ্রিকার মন্দিরে (নরসিংরাউতের চোরগঙ্গ বংশের রাহুতি তিনি)। খাজুরাহে আজও তার উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান। তবে তাঁদের প্রথম প্রবেশ ব্রহ্মপুত্র, কুমার নীল-লোহিত রুদ্রের মান-মন্দিরে বা প্রাকজ্যোতিষ পুরে (প্রাক-জ্যোতি-শেষ হয়ে যা প্রাক্‌জ্যোতিষ কামরূপ হয়েছিল)। বালক কামরূপকে কামাখ্যা-অলকা করবার অভিলাষেই কাঞ্চীকুমার দ্যাবিদ্য-বিদ্যাধর সুন্দ-উপসুন্দ জোড়-বেঁধে প্রথম সুন্দর সেজে বিদ্যা চুরি করতে আসেন কিন্তু তারা দেবীর বিদ্যা-কৌশলে তেমন জারিজুরি দেখাতে পারলেনা, নিজেরাই দ্বৈতযুদ্ধে বিনষ্ট হলেন। শিব ছাড়া শক্তি কোথায়? শিব-শক্তিকে ছাড়ায় কে, হারায় কে? কামরূপ ছিল বটে নরকাসুরের নরক-স্থান কিন্তু কাশীস্বর্গ ত দূরে ছিলনা। সে-কথা দান্তেও জানতেন। আমরাই শুধু ভুলে গেলাম! মা অন্নপূর্ণার কাছে এলেন চন্দ্রচূড় বাণ-অসুর যিনি নরককে কুপরামর্শ দিয়ে কামাক্ষা-দেবীর প্রতি তাঁকে প্রলোভিত করেছিলেন। প্রাক্‌জ্যোতি পুর হয়ে উঠেছিল নরক-কুণ্ড। কুণ্ডলিনী-শক্তি জাগলেন সেখানে—তন্ত্রের জন্ম হ'ল সূর্য্যবংশে অসুরনিধন-মানসে।

কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত (কালিঘাটে যাঁর মুদ্রা পাওয়া গেছে—ত্রি-চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার সঙ্গে) এই অভিচার-মন্ত্রেরই তান্ত্রিক, সাধক ছিলেন। বাণভট্ট তাঁকে 'নরপতি-সহস্রোজ্জিতায়াং লক্ষ্ম্যা'-তে আসক্ত দেখে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা বলে যতোই গাল দিন—লক্ষ্ম্যা ছিলেন দুধকোসী-অঞ্চলের লাক্ষামণ্ডলে বিক্রমাদিত্য বর্ম্মণ-যাদবদের মধ্যমণি—হিরণ্যগর্ভ সূর্য্য —লক্ষ্মীকামদেব-লক্ষ্মীকর্ণ এবং লক্ষ্মণসেন। বজ্রযোগিনীতে বজ্রবর্ম্মণের যাদব সেনার বজ্র জ্বলত সেদিন। নেপালে-কামরূপে রাজ্ঞী ভোজদেবীর ভোজবাজী খেলত। যবদ্বীপ থেকে বর্ম্মণদের বিস্তার ছিল প্লাক্ষাদ্বীপ গান্ধার পর্যন্ত। তারপর অগস্ত্যের পর্য্যটন ত ছিলই তিব্বত থেকে সমুদ্রাধিবাসিত শঙ্খদ্বীপ সিংহলে। সিঙ্গাপুরীদেরই দিকে দিকে এই সিংহ-বিক্রম। এই সিংহ কীর্ত্তি-বিজড়িত যাত্রার অবসানে মণ্ডলেশ্বর ফিরে আসতেন



শীতল-লক্ষ্যা লক্ষ্মী-নদীর তীরে—হেলমন্দের নরক-স্নান অবসান করে, নর্ম্মদায় গজ-নীর প্রক্ষালণ হ'ত। বিপ্রের বপ্রক্রীড়ার শেষ সেখানে। তারপর আবার তাপ্তীর তপের তপ্ততা ঘোচাতে আসতে হ'ত তাঁকে পিতৃতর্পণের কথা মনে জাগতেই ফাল্গু-নদীতে—গয়ায়। গয়াসুর হরিবর্ম্মা নারায়ণ-পালের পাদপদ্মে ফিরে আসত—ফিরে আসতেন নাল-নন্দা গঙ্গার তীরে নালন্দায় পিতৃস্মৃতি অক্ষয় করবার জন্যে মহীপাল দেব—কীর্ত্তি রায় ইলোরা-এলাম জয় ক'রে ফিরতেন বিদ্যা-মন্দির বর্দ্ধমানে, বাণগড়ে। পালবংশী মহীশূরী গোমত রায় বিন্ধ্যগিরির পালা শেষ করে শ্রবণবেলগোলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন—দরয়বৌষকে বশ করে 'নবরঙ্গ রায়' হয়ে ফিরে এলেন 'বেলবা' গ্রামে বজ্রবর্ম্মণ বিজয়-সিংহের জন্মদান করবেন বলে। তিনি জানতেন সিঙ্গাপুর থেকে এসেছেন তাঁর পিতৃপুরুষ বলবর্ম্মণ, তাঁকে অন্তত পাঞ্জাবের 'সিংহপুর' পর্য্যন্ত পৌঁছুতে হবে, পথে-পথে স্বীয় চিহ্ন এঁকে, নখ-চিহ্ন রেখে। আর রণবঙ্কমল্লদেব জানতেন তাঁকে যম সেজে যেতে হবে দক্ষিণে, মহীশূরের 'পালমপেত'-এ যেখানে ঘটকী শ্রীমা বরারোহা ঘোটকী সেজে নৃত্যে মত্ত। পালরা তখন প্রেত—শশপন্থায় অগ্নিমন্ত্র ভুলে গিয়ে এসেছে ভীরুতা—স্ব-স্ব পন্থায় এনেছে নৈরাজ্য। চলবেনা আর এই লক্ষ্মণসেনী পন্থায়—বরুণক্ষেত্র দাক্ষিণাত্যের কমলবনে প্রবেশ করলেন মত্তহস্তী রণশূর 'রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব'। প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে পুরীতে নাথপন্থীর জগন্নাথ, ময়নামতীর স্মৃতিতে—কুমিল্লায়ও ঐল কৌমের একই জগন্নাথ থাকবেন ত্রিপুরী-ত্রিপুর-ত্রিকলিঙ্গ মহিমায় বিজড়িত ও বিরাজিত। এইত কৌটিল্যের দ্বা-বিদ্যায় দ্রাবিড় বাংলার ইতিহাস।

দুই বিদ্যাকে এক করেছিলেন পারীযাত্রের পার্শ্বনাথ—নাথপন্থী। তারপর মহাবীর বর্দ্ধমান তাঁর 'অর্চ্চাঙ্গ সূত্রে'। কদম্বরাজ মগদ্বিজ কাণ্ব ময়ূরশর্ম্মার আশ্রম কাঞ্চী থেকে (বৈজয়ন্তী-পুরীও) তিব্বত পর্য্যন্ত ছিল তাঁর যাত্রা-পথ। মন-সমীক্ষার পাথেয় নিয়ে তিনি কাঞ্চী-পুত্রদের মূর-পুরী থেকে টুপীর পুরী তিব্বতে যাত্রা করতে বলতেন। বলতেন সে-পথেই আছে গয়া-গঙ্গা-কাশী। আছে নালন্দা আর বর্দ্ধমান। দলে-দলে তীর্থযাত্রী ছুটল সেদিন এই নব-বিদ্যা অর্জ্জন-মানসে। নবদ্বীপ সেদিন নৈয়ায়িক বিদ্যার আদিপীঠ। নালন্দাও শ্রীনালভঞ্জদেবের (সোনালভঞ্জদেব) কাশীপূত চরিত্রে, শীলভদ্রের শীলাসনে পতিতা-ত্রাণ ছিল সেদিন—ছিল গয়ার মতোই কুম্ভীপাক নরক বা পার্গেটরী। ব্যাবিলনের স্পর্শে বিগ্রহপালের জৈমিনি শাস্ত্র 'ওঁবমাং' নারায়ণ-পালের 'ওঁজয়জগতের নাথে' মিশে 'বজ্র' (বল্লাল) তৈরী করেছিল বলেই 'ওঁভেক' বা ভবভূতির আবির্ভাব (ভাণ্ডদেবের শিলালিপি দ্রষ্টব্য)। চতুরাঙ্গুল বজ্র শনি চতুর বিক্রমাদিত্যের রচয়িতা, তিনি যমেরই দোসর, তবে ব্যাসের মন্ত্রে তিনি দক্ষিণী যমের জ্যেষ্ঠ, পূর্ব্বাঞ্চলের। ত্রিবিদ্যাধর দশরথ ঋষি সেজে যে-শনির মন্ত্র ত্রিষ্টুপে তৈরী করেছিলেন সেখানে দেখা যায় একাধারে তিনি মন্দ (হেলমন্দের এবং মন্দার-

মালিকার ), কৃষ্ণ ( ভাগবত ), যম ( যোগনন্দবংশ ), বভ্রু ( অর্জ্জুন, বভ্রুবাহন-জনক )—মানে শ্রীমৎভাগবদ্গীতার সর্ব্বগ্রাসী পুরুষোত্তম।

রামায়ণের অশুভ দশরথ-দশানন, রাম-লক্ষ্মণের শুভ মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হ'ল—শুভ্রা সীতা-বিদ্যারই ( হল-কর্ষণ-বিদ্যা ) আবির্ভাবে—জনক যাঁর পালয়িতা। বাহ্লীকী যাজ্ঞবল্ক্যের মারফৎ তিনি হয়ত ব্যাক্‌ট্রিয়ার বিদ্যা ব্যাকট্রিকালচার শিখে নিয়েছিলেন কিন্তু এগ্রিকালচার ছিল রাবণের দেওয়া বিদ্যা। হরধনু না ভেঙে রাবণ তাঁর শৈবতার ও সভ্যতার প্রমাণ রেখে গেছেন, হরধনু ভেঙে রাম দিয়ে গেছেন শগ-ধনীয়ার শক-তীর-বিদ্যার অসারতার প্রমাণ। আর জনকের ধনু পাল্টে রাতারাতি সে জায়গায় হরধনু দিয়ে যাওয়া বৈশালীর কৌশলী পরশুরামেরই কারসাজি কারণ যযাতিজ বর্ম্মণ-কোসল-গঙ্গরা শৈব এবং বিদ্যা-চোর ছিলেন, আর শৈব লিঙ্গায়েৎ থেকেই ত দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীর উৎপত্তি। বজ্রযানী-নাথপন্থীরা সেতুবন্ধন করে সৌগত মহাযানী হলেন। এ-বিদ্যা যে রাবণেরই, রাবণেরই যে আয়ত্তে প্রোটো-অষ্ট্রলয়েডের গৃহ-ঘট-পট নির্ম্মাণ ও হলকর্ষণ-বিদ্যা এবং তাঁর জ্ঞানেই যে ভাগনে অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-জনক এতত্ত্ব বানর-অঙ্গদ-সুগ্রীবের জানা ছিল। তাঁরা জানতেন কার সীতার মাহাত্ম্যে জনক উপনিষদ তৈরী করে বাহবা নিয়েছিলেন আর রাজর্ষি হ'তে পেরেছিলেন! কিন্তু রামের দুর্ভাগ্য যে এমন সীতাকে পেয়েও তিনি রাবর্ণের কাছে শেখা শুধু মাত্র রাজধর্ম্মের মোহে সীমন্তিনী লক্ষ্মীকে হারিয়ে ফেললেন! তখন আর শুভ লক্ষ্মীচিহ্ন অঙ্কিত বর্ম্মণ-রক্তের গাঙ্গেয় লক্ষ্মণ কি করে থাকেন তাঁর সঙ্গে? তিনি বরুণ-দেবতার অঙ্কে স্থান খুঁজলেন। বিষ্ণু-শিবের শৈব-যাত্রাকে বলরাম যদিবা রথযাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন—রাম তাকে ত্রিশূন্যের শবযাত্রায় পাঠিয়ে তবে বিশ্রাম নিলেন।

বাকুর রূষ, বক্ষুর তুরস্ক শক ইক্ষ্বাকু ইত্যাদি বকফুল বাকপালরা কালক্রমে কোথায় গেল! কপিলের সাংখ্য থেকে ভোল পাল্টে জন্ম নিলেন এবার শাক্য বুদ্ধরা। জন্মালেন মোর নগরে মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তরা। তাঁদেরই তান্ত্রিক বংশধর চৈনিক-প্রভাবে রাজ্যপাট গুটিয়ে নিয়ে ত্রিবেণীতে দিগম্বর শীলাদিত্য হর্ষবর্দ্ধন হয়ে দাঁড়ালেন। কেননা অহিচ্ছত্রী ইতিপূর্ব্বেই উচি কোণীশক হয়ে কোণস্থ শনিঠাকুর হয়ে গেছেন। ওদিকে যবন মঙ্গলও বরবুদুরের বিদুর-বুধ হয়ে এককোণে চুপচাপ বসে ছিলেন। নালন্দার আর গয়ার শিলা-মাহাত্ম্যেই এই সব কীর্ত্তি। সাংখ্য গিয়ে হ'ল শাক্য। শঙ্কর আর শঙ্খল ভগীরথ হ'লনা। ষট্‌মতাচার্য্য যোগী শঙ্করাচার্য্য হয়ে ঠেকাতে চাইলেন জৈমিনি-জাত 'যমিনী'-আক্রমণ। রামানুজ দ্বাদশসূর্য্য বিষ্ণু মূর্ত্তিতে আনতে চাইলেন আবার কাঞ্চীর দিগ্বিজয়-প্রতিভা কিন্তু শালগ্রাম কৃষ্ণের স্পর্শে সবাই তখন কালগ্রাসে। বাংলাদেশও। বিষ্ণু বৈষ্ণব তৈরী করলেন বটে কিন্তু বৈষ্ণবী দুর্গা আর এলেন না। মালা বদলের পালাই শুধু চলল এবার, অক্ষমালায় অরা



ক্ষতক্রী বরুণ-বৃত্র নটরাজ মরুৎ-রুদ্র ঈশান ফিরে এলেন না ব্রাত্যের দেশে। শুধু বারোটি স্ফুলিঙ্গ বারোভুইঞার কলেবরে একেকবার জ্বলে উঠতে চাইল কিন্তু তারও শেষ শিখাটি মানসিংহের ম্যাজিকে অন্তর্হিত হ'ল বাংলার আকাশ থেকে।

বুদ্ধগয়ায় যে সর্প-পৈতাধারী বুদ্ধ মূর্ত্তি ( জৈন মূর্ত্তি ) পাওয়া গেছে তাকে গৌতমবুদ্ধ ভ্রমে যেম্নি আমরা মহাবীর বর্দ্ধমানের ( ত্রিকলিঙ্গবাসী ) প্রতি অবিচার করেছি তেম্নি আবার গৌতম-বুদ্ধের সঙ্গে মহাবীরের নিকট সম্পর্কের কথাও সম্যক অবধারণ করতে পারিনি। এই পিত্তলময় মূর্ত্তিটির সঙ্গে খোদিত লিপিও আছে। ব্রাহ্মীলিপির যথাযথ পাঠ বা পালদের কুটিলাক্ষরের কৌটিল্যকে যদি আমরা নিজেরা আবিষ্কার করতে পারতাম তাহলে বাংলার, অশোকের এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস পাল্টে যেতো। দেখতাম গুর্জ্জরের পীঠীপতি জয়সেনের পিতা বুদ্ধসেনই হয়তবা বুদ্ধগয়ার বুদ্ধ আর সেই বুদ্ধের সমসাময়িক যে অশোকচোল্ল বা অশোকশল্ল তিনিই ত্রিশূলী 'পিয়দসি দেবনামপিয়'—তখন লক্ষামণ্ডলের মণ্ডলেশ্বর। লক্ষামণ্ডলের—অষ্টগঙ্গেমের প্রোটোঅষ্ট্রলয়েড যাদব বর্ম্মণরাই বাংলায় পাল এবং সেন রাজত্বের জনক—জনক অশোকের কাশ্মীরী সন্তান জলৌকের, তিব্বতী তনয় তিবরের ( এই জেলে বংশ তিবেরিয়ান থেকেই যীশুখ্রীষ্ট-প্রতিভা ) এবং তাঁর ভ্রাতৃরাজ্যে ( সিংহলে ) যাত্রী পুত্র মহিন্দের। জলৌক অ্যামিবার মতো কতো রূপই না নিয়েছে! ব্রহ্মদেবের ( আসামের রত্নপালের পিতা ) চলুকে চালুক্য-সৈন্য হয়েছে তৈরী। আর গান্ধারে সেলুকস তৈরী করে সেলুসিড্‌স্-বীজ বপন করেছে। জম্বুদ্বীপ সদিয়া ( বিদর্ভ—সিদিয়ানদের আড্ডা ) প্লাক্ষাদ্বীপের ( গান্ধার ) বীজ বপন করল পাল-রাজত্বের নৌকোর পালে, বর্ম্মণদের লক্ষামণ্ডলের মারফৎ। এসব রাজাদের সন-তারিখ খুশীমাফিক বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত করে ত ইংরেজেরা পাড়ি দিয়েছেন বহুদিন। এখনও কি আমাদের সময় এলোনা য়ুরোপের আর্য্যামির জারিজুরি ভেঙে দেবার? ওঁরাই সব বিদ্বান আর্য্যপুত্র আর আমরা সব মূর্খা অনার্য্যার সন্তান—একথা বলবার সময় কি অতীত হয়ে যায়নি এখনো? ওঁদের মার্কো-পোলো যে কুবলয়খনের 'মঞ্জি' ( দক্ষিণ চীনের মোঙ্গোল রাজত্বকালীন নাম, পূর্ব্বনাম 'শ্রীঋকা' ) থেকে জলজ্যান্ত ভাবে ঘট-পট-বিদ্যা ( 'পটারি' ও 'ম্যাট্রেস্' তৈরী ) চুরি করে নিয়ে গেলেন তা এখন ওঁদের দরবারে বিশদ ভাবে জানানো দরকার। ভদ্র সেজে যদি আমরা রায়বারে বসতে না চাই তাহলে কোন অঙ্গে কে তৈরী, কোন অঙ্গ কে দান করেছিল, কর্ণে সুবর্ণ পরিধান করবার বিধান দিয়েছিল কারা—অন্নদান-ই বা প্রথম কে করলেন এবং কোন মোঙ্গোলকে—তার বিন্দুবিসর্গও কেউ জানতে পারবে না। গ্রীক

জান্তিপি সক্রেটিসের মাথায় জল-দান করতেন তা-ই আমরা জানি কিন্তু জানিনে যে কুবলয় খনকে অন্নম্ দিয়েছিলেন কাম্বোদিয়ার অন্নদা।

বাংলায় বিদ্যার লেনদেনের ভোল পাল্টে গিয়েছিল উদীচ্য-জেলে আমলেই—মনে হ'ল চুরি-বিদ্যাটাই আসল বিদ্যা, তা চৌর্য্যবস্তু চর্য্যাপদই হোক আর সুন্দরীরাই হোক। বাংলায় মনসা-মঙ্গলের আবির্ভাব তখন। লক্ষ্মীন্দরের শব-যাত্রা চলেছে বেহুলার ভেলায়। কাম্ভোজিয়া মারণ-উচাটন-মন্ত্রসিদ্ধা হয়ে মৎসদেশে ধনা-গোদা, মোনা-গোদা—(ধনপতি সদাগর আর তামলিপির মান-বনিককূল) রূপে বিরাজমান—নদীতে বড়শী ফেলে মাছ ধরছেন। বেহুলা-কে দেখে তাঁরা কি করছেন তা পূব-বাংলার মনসা-পাঁচালীতে শুনুন ঃ

ধনাগোদা মোনাগোদা বড়্শী বায় বয়রা-বাঁশের ছিপ।
সুন্দরীরে দেইখ্যা গোদা ঘন মারে টিপ ঃ
"তোর মড়া জিইয়্যা দিব কে? সুন্দরী লো আমার ঘরে আয়"

এঁরাই মাগধী মগদ্বিজ, শৈলেন্দ্র যবভূমির মানুষ, ভোঁদর—ভূধর। 'বিধবা' বা 'ধূমাবতী-বিদ্যা' তৈরীর মতলব দিচ্ছেন তারা-বিদ্যাধররা। ছিলেন শূরসেনী ধনে-জনে-মানে। চাঁদসদাগরের পরে ধনপতি-সদাগররা এলেন বাংলায় শ্রীমন্ত হতে। অশ্ব-গজলক্ষ্মীমন্ত প্রবাসী এই গাঙ্গেয় কর্ণবংশ আবার পুরাকন্যা, আদ্যাশক্তি কালীর দুয়ারেই এলেন। দশমহাবিদ্যার মূলাধার—সমস্ত ভোজবাজি, মন্ত্র, ভেল্কির ভাণ্ডারইত এই কুলকুণ্ডলিনী-শক্তি-কেন্দ্রে, কালী-পীঠে—কালিঘাটে, কামাখ্যায়। চন্দ্রবংশী চাঁদসদাগর ছিলেন 'চণ্ডিমা'র (চন্দ্র) ভক্ত। শাক্য গৌতম বুদ্ধ চন্দ্রকে 'চণ্ডিমা' বলতেন, সূর্য্যকে বলতেন 'সূরীয়'। এই 'সূরীয়' বা সূর্য্যবংশীয়রাই ছিলেন 'তামলিপি'র মান-বনিক—অযোধ্যাগত। পূববাংলার তারা-ব্রতে যবভূমির তারা-বিদ্যার দুই ছেলে বালপুত্র আর বলবর্ম্মন সূর্য্য আর চন্দ্র। চন্দ্র-সূর্য্য তাই সমান মর্য্যাদায় সেখানে পতির আসনে বৃত। শাক্য-গৌতম চন্দ্র-সূর্য্যের কোনো মর্য্যাদাই দিতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন তিমিশূন্যে চন্দ্র-সূর্য্য-বংশের বিবাদের সমন্বয়। দেব-দৈত্য বা দেবদত্তের ঊর্দ্ধে তিনি আরোহণ করতে চেয়েছেন। মহাবীরও মন-চর্চ্চায় তেম্নি ঊর্দ্ধাসীন—শাক্ততন্ত্র-যোগীরাও তা-ই। গুরু-মারা বিদ্যায় পারদর্শী জৈমিনি-দর্শনের বিবিধ শাখাই শৈব তান্ত্রিক, জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ে পুষ্টি লাভ করেছে—গজনী-লাহোরের আদি 'যমীনী'রা-ও রিয়্যালিষ্ট জৈমিনিরই সন্তান। 'ওন্তেক' বা ভবভূতি ছিলেন জৈমিনীর কারিকা ভেদী। 'প্রভাকর' (ঐরাবতী বর্দ্ধন?) ছিলেন জৈমিনির অন্যতম শাখা চম্পার তান্ত্রিক-বামন ভেদী (রাধাকৃষ্ণন এর ভারতীয় দর্শন দ্রষ্টব্য)। এই তান্ত্রিক বামনটি কৌটিল্য। আর জৈমিনির পুরোধা হলেন কুমারিল, মীমাংসাকার। বাংলার পাল বংশ মহাযানীরাও জৈমিনি মীমাংসা জাত। 'মহসাংকুটায়েন্দো'-জাত ছিলেন 'শ্রীমান গোপালদেব'। সান্দ্রকুট্ট দেব-কুল—বেদসংহিতার দেবাপি



থেকে আগত। সেই সুবাদে সৌগত বুদ্ধও শুদ্ধোধনকে বলেছিলেন যে তিনি বিশুদ্ধ রাজকুল-জাত নন, দেব-কুল-জাত। বুদ্ধগয়ার যিনি বুদ্ধ তিনি গাঙ্গেয় লক্ষ্মীকর্ণ কলচুর বংশের। শৈব বা শৈব্যরা এই সভ্য (কলটুর) বংশের লোক। শৈব্য হরিশ্চন্দ্র সভ্য বিশ্বামিত্রের কবলে পতিত, শৈব্যা থেকে কুমার রোহিতাশ্ব নীললোহিত হয়ে জন্মাচ্ছেন। মহীপালের নালন্দা লিপিতে এই কুটিল বংশের ইতিহাস লেখা। কুটিল-কিরাতের আদিভূমি ত্রিপুরায় শিবের বসন্তোৎসবকে 'নীল' বলে। পক্ষী বাংলার কলটুর কুটিল অক্ষরই সংস্কৃতের এবং ব্রাহ্মীর জন্ম দিয়েছে। গয়ার বুদ্ধের প্রথম অক্ষর-গুচ্ছের পাঠ মোঙ্গোল-স্পর্শে কেমন গোল-মাল তৈরী করছে দেখুন ঃ 'অ (অজ) রুবৎ বষঠ (কব) নর (কনককর) নৃথ (একদ্রিকণ্ব)॥

ইনিই 'পিয়দসি'র 'নীলগ্রীব কনকমুণি'—শাক্য-গৌতম নন। আজও 'যাপ'-দ্বীপে কনক-কৌমরা জেলে—আসামের কছরীরা যেম্নি মৎসপুত্র। বুদ্ধ-গয়াতে হ'ল প্লাক্ষার সঙ্গে জম্বুদ্বীপের বা বিদর্ভ-কামাক্ষার মিলন। লক্ষামণ্ডলের চির-অজর অজাতশত্রু বা ধৃতরাষ্ট্র-জরথুষ্ট্র নীলকণ্ঠ শিব হয়ে পদ্মাসনে বসলেন।

যখনি যে-দেব লক্ষা-মণ্ডলেশ্বর হয়েছেন, তিনি ভূপালের দেবপাল, নারায়ণপাল, নয়পাল, মহীপাল, রাজ্যপাল—যিনিই হোন না কেন, সমস্ত উত্তর-ভারত এই ঘটকী (আদ্যাশক্তি) যাদব শূর-বংশের অধীনে গেছে। হয়দ্রাবাদে দক্ষিণে পেয়েছেন তাঁরা 'পালমপেত'-এর বররোহা-ঘোটকী বংশ আর উত্তরে সাঁচীস্তূপে করোভোরু-গজিনী বংশ। অন্তর্দ্বন্দ্বে বা দ্বাদশাদিত্যের খণ্ডিত-প্রভায় তাঁদের আমরা বিচ্ছিন্ন দেখছি বটে কিন্তু তাঁরা সবাই পূর্ব্বাঞ্চলের, শ্যামাঞ্চলের কিরাত। সবাই 'করইত' (করাত-কাতি) তুরাণী বা সিদিয়ান। তাঁরাই বেদ-পূর্ব্ব ভারতীয় আর্য্য—বরুণ, বৃত্র, বিষ্ণু, বৃষ্ণি, বৃঞ্চি, বিরিঞ্চি। তাঁরাই ব্রহ্মা-বিষ্ণু। তাঁরাই কৃষ্ণ-ইন্দ্র। তাঁরাই কিরাতী শিব। কামরূপের 'অরিমত্ত'-দৈত্যের গুরু শুক্র কাঞ্চীর পল্লব-বংশের পৌরোহিত্য করেই একদিন পেহলভীদেব 'হুক্রব' হয়ে বসলেন—খরোষ্ঠীতে হলেন 'ক্রশু'—তারপর এই কামাক্ষার সন্তানের পক্ষে গোলগোথায় গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ 'অরিমত্তিয়া' হ'তে খুব কি কষ্টকর না সময়-সাপেক্ষ ছিল?—(রেঁণা-র 'যীশু-জীবন' দ্রষ্টব্য)। মহীপালের (সুব্বল ঋবর্ম্মণ) অষ্টসাহস্রিকা, নালন্দা-লিপি, বিষ্ণুমূর্ত্তি, বাণগড়-লিপি এবং 'বিদ্যা-সুন্দর' গ্রন্থ দ্রাবিড়-ভারতের দ্যা-বিদ্যা বা দ্বা বিদ্যার স্মৃতি-বাহক। 'অন্ধভূত জাতক' এবং 'চৌর-পঞ্চা-শিক' থেকে বিদ্যা-সুন্দর কাহিনী প্রবহমান। প্রবাহিত কছরী ডোম থেকে কাশ্মিরী ডোমিনীর ডোমিনিয়ন পর্য্যন্ত। চর্য্যাপদে তার নির্য্যাসটুকু আছে। যে-বিদ্যাধরী কামকলা এবং কৈবল্য দায়িনী তারই স্তব চৌরপঞ্চাশিক। সামবংশী কোনীশকের আমলের বররুচি (উদীচীমাতৃক উচিবংশের কবি) যদিবা চৌরপঞ্চাশিকের প্রবর্ত্তক হয়ে থাকেন তবু তাঁকে আমরা কুমার নীললোহিতের অংশ 'ভব'—ভূতিতেই দেখতে পাচ্ছি। তবে কাশীর

অশ্বঘোষও কালীর সঙ্গে ঋষিদের আর্ষ-হ্রেষা-লীলা মাহাত্ম্য শুনেছেন। তবু গন্ধর্ব্ব ফিরিশতা জানতেন, গঙ্গাভূমি বলতে বুড়ি-গঙ্গার তীর থেকে সুদূর নন্দা-দেবীর চূড়া পর্য্যন্ত বোঝায়—কোচ-রাজ সঙ্গলদিব (ভগীরথ) ব্রাহ্মণ কেদার-মিশ্রকে (দেবপালের মন্ত্রী, পড়ে কৌটিল্য-বিদ্যায় উত্তর ভারতের সম্রাট) হটিয়ে দিয়ে উত্তর-ভারত অর্জ্জন করেছিলেন। তারপর দু'হাজার বছরের জন্য এই সাগর-বংশের প্রতিষ্ঠা ভারতেশ্বর হিসেবে।

মহাভারতের আদি পর্ব্বে দেখা যায় যে কালী ছিলেন পুরাকন্যা, জলপ্রভা সম্ভবা, যমুনাতীরে বেড়াচ্ছিলেন তিনি—আর্য্য পরাশরমুনি তাকে দেখে জাতরাগ হলেন। 'চৌরপঞ্চাশিক'-এর পাঁচালীতে পাঞ্চালী-প্রিয় গঙ্গবংশের চোরগঙ্গ-বিদ্যাচোর সুন্দরের মনোবর্ণনা লক্ষ্মণসেনী দেশের কুটিল মহাকবিরা ছাড়া আর কে করতে পারবেন? মহাবীর বর্দ্ধমানের মনোধর্ম্ম—বাংলার মন-বাদ দ্রাবিঢ়-সন্তান ছাড়া আয়ত্ত করা আর কারো পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা।

কাহিনী ত শুধুমাত্র ইতিহাস—সেই কাহিনী, সেই ইতিহাস সাহিত্য হয়, শিল্প হতে পারে মনের প্রচুর প্রবেশে, সম্যক সমাবেশে—স্পর্শমাত্র নয়, চাই অন্তর্ভেদী আন্তরিকতা। শিল্পকর্ম্মে মন কতোটুকু লীলায়িত, মনের কারুকাজ কতোখানি সূক্ষ্ম তা-ই দিয়েই হয় তার গুণাগুণ-বিচার, স্থূল-কাহিনীর ওজন দিয়ে সাহিত্য-শিল্পের বিচার হতে পারেনা। সন্ন্যাসী মনকে সন্নিবেশিত করেন সৎ-চিৎ-আনন্দে আর শিল্পী নিজের মনের বিন্যাস করেন তাঁর শিল্পে। কাব্যে-উপন্যাসে, সঙ্গীতে-চিত্রকলায়, স্থাপত্যে-ভাস্কর্য্যে আমরা শিল্পী-মনের সন্নিবেশই সন্ধান করি। দেখতে চাই বা দেখতে পাই যে তিনি মনোসম্পদে কতোটুকু সমৃদ্ধ। কাহিনী তাঁর কতো ঘোরালো বা উত্তেজক তা দেখতে যাওয়া ইতিহাসেরই সন্ধান—সেখানে রচনাকারের সিদ্ধি ঐতিহাসিকের সিদ্ধি, ঔপন্যাসিকের বা শিল্পীর সিদ্ধি নয়। তার আস্বাদে আমরা উচ্চকিত হয়ে বলতে পারব না: "শিল্পানি শংসতি দেবশিল্পানি।...আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি ছন্দোময়ং বা এতৈর্যজমান আত্মানং সংস্কুরুতে।"—কোনো দিন কোনো সৎ-সমালোচক বলবেন না: "বাঃ এ ত দেবতার তৈরী শিল্প! এ-শিল্পে শিল্পী নিজেকে সংস্কৃত করছেন পুরোহিত-সম্প্রদায়ের মতো। আর এ-শিল্পরস পানে পাঠকচিত্ত, তাঁর যজমানের মনও বিশুদ্ধ, সংস্কৃত হয়ে উঠছে!"

এ হ'ল বৃত্রের দেশের, ব্রাত্যের দেশের, ঐতরেয় ব্রাহ্মণের কথা। তাঁদেরই ছিল সাম আর ঋকের দ্বাবিদ্যা—তাঁরাই ছিলেন দ্বাবিদ্য—দ্যাবিদ্য, দ্রাবিড়। যজু আর আর অথর্ব্ব যবনের দেশ থেকে এসেছে বলে অস্পৃশ্য ছিলনা তাঁদের কাছে—তাদেরও তাঁরা আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। ভারত বলতে যেদিন দ্রাবিড়ের দেশ, গঙ্গার দেশ বোঝাত। সেই গঙ্গার দেশ ছিল অন্নমের অন্নপূর্ণাকে নিয়ে কাশী পর্য্যন্ত—বরুণা আর



অসির মিলনে বজ্রমূর্ত্তি বরুণদেবতার রূপে রূপায়িত যে বারাণসী-ধাম সে পর্য্যন্ত—তা থেকে একদিকে জরসৈনিকের দেশ কাশ্মীর ও নবসৈনিকের দেশ নাসিক, অপর দিকে বরসৈনিকের বরনাসার দেশ বরণসী থেকে সাতকর্নির কাঞ্চী পর্য্যন্ত এর ব্যাস।

যাক্, অনেক প্রলাপ এবং বিলাপ শোনান হ'ল—টোলমায়ীস্থ পণ্ডিতমহল মার্কো-পোলো-মার্কা এই মার্কণ্ডটির মার্কণ্ডেয়-পুরাণোচিত অনপলাপী কথা শুনে মনে-মনে তার মুণ্ডপাত করছেন বুঝতে পারছি, কাজেই প্রথম বিদ্যাচোর বিদ্যাপতির দু'একটি ললিত-বাণী শুনিয়ে আপাতত তাঁদের ঠাণ্ডা রাখা যাক। এই শোলোকের কর্ত্তা মস্‌লিন ও কার্পেট বিদ্যাচোর ভীনীসীয় বা ফীনীসীয় মার্কো পোলো কিনা, নাকি স্বয়ং কবিরাজ করিরাজ কুবলয়-খঁন কিম্বা তাঁরও পূর্ব্বপুরুষ কোণীশক বা পিয়দসি, অসুর-বাণী-পাল তা আজ বলা দুষ্কর। তবে বররুচিতে ভবভূতি আর জয়দেবকে শুনুন। নায়িকার রূপের বর্ণনা শুনবেননা, মনোভঙ্গীতে অঙ্গভঙ্গীর বর্ণনাই শুনবেন যার সামান্যতম অনুকরণে কালিদাসের রঘুবংশ রম্যরচনা হতে পেরেছে:

"অদ্যাপি তাং প্রণয়ভঙ্গুরদৃষ্টিপাতং
তস্যা স্মরামি পরিবিভ্রমগাত্রভঙ্গং।
বস্ত্রাঞ্চলেন পরিবৃষি পয়োধরান্তং
দন্তচ্ছদং দশনখণ্ডমণ্ডনঞ্চ॥"

[আজও আমি স্মরণ করি ভঙ্গুর-প্রণয়ের ভ্রুকুটি-কুটিল ঊর্দ্ধ দৃষ্টিপাত। চোখের তারা যেন সজল-মেঘের কালো টলটল আঙুর। গাত্রভঙ্গে তোমার তনু যে দীর্ঘায়িত হত—কটি-কণ্ঠ হ'ত বাঁকা, তোমার সে আলস্য-মোক্ষণের দৃশ্য কী বিভ্রান্ত করে দিত মন। সে ভঙ্গীতে ঊর্দ্ধগামী হত বাহু-লতা আর বস্ত্রাঞ্চলের পরিবেষে দেখতে পেতাম তোমার বক্ষের বহুলতা। শাড়ি পরবার সময় আঁচল তোমার স্তনাগ্র ছুঁয়ে যেতো—তুমি দাঁতে কাটতে সে আঁচল—তোমার দন্তপাঁতির মণ্ডন হ'ত বস্ত্রখণ্ড—হত আচ্ছাদন।]

আমি সরাসরি এ-কাব্যের একটি অর্থই দিলাম। বিশ-শতকের বিষতিক্ত লেখক ইতিহাসের ঋজু পথ ছাড়া শিল্পের চতুর পন্থা কোথেকে অর্জ্জন করবে? সেই ভারতবর্ষের ত্রিচন্দ্র-দীপ্ত—হিমালয়ের চন্দ্রাবলী-প্রতিভা কোথায় আমাদের? কোথায় সেই ইতিহাস-বোধ? কোথায় বা সেই বিশ্বাস ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে, ইতিহাসে, শিল্পে? বিশ্বাস-হীন বিশ-শতক এর বেশি আর কিছু নিতে চাইবেনা।

মঙ্গল-কাব্যের আসুর-মোঙ্গোল রাজমালা রচনা করলাম। সমাপ্ত হ'ল অতীত বাংলার বিষবৃক্ষের কাহিনী যা সাঞ্চীতে, ভুবনেশ্বরে বা একাম্রে শিবজীর জন্মে অমৃতফল দান করতে কার্পণ্য করেনি। যদি ভবিষ্যৎ বাংলা এ-ইতিহাস পড়বার সুযোগ পায় তাহলে বাংলার ঘরে-ঘরে আবার তেম্নি অমৃতফল ফলবে। নাই বা হলাম আমরা আর্য্য। দ্রাবিঢ় বা মৌর্য্য ভারত আর্য্য ছিল কবে? আর্য্য কথাটাই অর্থহীন—মানুষ কথাটাই সর্ব্বার্থবাচক। চন্দ্রগুপ্তের

পিতা সর্ব্বার্থ সিদ্ধি শাক্য-মৌর্য্য ছিলেন। যাদের সংযুক্তীকৃত নাম নন্দ। গঙ্গাতীর্থ নালন্দা তাঁদেরই সৃষ্টি—নন্দাদেবী তুষারকন্যা তাঁদেরই—তাঁদের গৃহই কুবের-কৃষ্ণালয়। নূতন মান (মূল্য ও ভোজবাজি) বা 'মান-নব' নিয়েই মা অন্নপূর্ণা 'মানব'-শিশুকে জন্ম দিয়েছেন—তাই প্রথম মানব মনু ছিলেন মান্যবর, 'মান'-বর। এ এক মহাসৃষ্টি—আশ্চর্য্য মায়া। মহামায়া মহামায়ী আদ্যাশক্তি দক্ষিণা-কালী বলাশ্রী গৌতমী হয়ে সৃষ্টি করলেন তাঁর ছেলে বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী। পুরুষের বশ হয়ে প্রকৃতির এই দিগ্বিজয়ী মানব-সৃষ্টি সুরু হ'ল।

আর তাইত মানব সব-কিছুই হতে পারে—দেবতা, দানব, পাশব—সবই। জানিনে কোনটা তার ঊর্দ্ধগতি, কোন্‌টা তার অধঃপতন! অন্তত আজকের দিনের পাকা-পোক্ত সভ্যতার মুখের দিকে তাকিয়ে এ-ধরনের বিচার করা শক্ত। শুধু আঁদ্রে জিদ-এর জেদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে পারি বা ইদানীংকার ফরাসী মনীষীদের নেশাগ্রস্ত নিশানায় এই ফরমান দেওয়া যায় যে মানুষের অকরণীয় কিছু নেই এবং অপরাধ করবার ক্ষমতাতেই মানুষ পশুর চাইতে শ্রেষ্ঠ। কথাগুলো ব্যঙ্গোক্তি নয়—অকপট বিশ্বাস-ভাষণ। শুনতে বিস্বাদ লাগে কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং দাঙ্গা যাঁরা চোখের উপর দেখে মনের উপর তার রাঙা ছবি তুলে নিয়েছেন, মুখ খুলে এ-কথাগুলো বলতে গেলেও তাঁদের কারোই জিভ তেতো হয়ে উঠ্‌বেনা। দশবছর আগে সভ্যতার যে-চেহারা দেখেছি তারপর কিছুতেই ভাবা যায়না যে দশহাজার বছর আগেকার সভ্যতা এর চেয়ে বিন্দুমাত্র অগর্ব্বের ছিল। অপরাধী তখন অন্তত ক্ষমা পাবার জন্যে ব্যাকুল হতেন—তাঁরা হাত কাটতেন, জলে ডুবতেন, চন্দ্রগুপ্তের মতো অনশনে প্রাণত্যাগ করতেন। অথবা রাজা সোনালভঞ্জ দেবের মতো 'শ্রীনালত্রন্‌ল দাবিদ্য'-নাম নালান্দার শীলমোহরে অঙ্কিত করে পতিতা-উদ্ধারের সঙ্কল্প করতেন। কাশীপূত ভাগভদ্রের কাশীতে গিয়ে শীলভদ্র হতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সভ্যতায় অপরাধীরাই শাস্তা, নিরপরাধকে শাসন করতে অভ্যস্ত। রাষ্ট্রে, সমাজে, অর্থনীতিতে সর্ব্বত্র এই দৃশ্য। সাহিত্য সমাজ-মনাপেক্ষী সুতরাং সমাজের এই কুৎসিৎ রঙেই তা রাঙা হয়ে উঠ্‌ছে। চরিত্রহীন সমাজের সৎসাহিত্যিকরা ত চরিত্রহীন হবেনই।

এ যুগটা সঙ্কর যুগ। আদর্শের, রাষ্ট্রব্যবস্থার, সমাজ গঠনের কয়েকটি ধারা মিশ্রণে এসে একটি সুশ্রী সুন্দর ধারায় পর্য্যবসিত হতে উৎসুক। এই সঙ্কর মতবাদের যুগেই সুন্দরের আবির্ভাব হয় বিদ্যা চুরি করবার জন্যে। আবহমানকাল তা হয়ে এসেছে, এখনো তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। বিদ্যা চুরির হিড়িক পড়ে গেছে সর্ব্বত্র। এ-চুরিকে যিনি যথার্থ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অথচ বাস্তবের ঊর্দ্ধে অবলোকন করতে পারবেন তারপর তাকে অভিজ্ঞতার আন্তরিকতায় শিল্পবস্তু করে নিয়ে উপহার দিতে পারবেন তাঁকেই বল্‌ব এ-যুগের উদারহৃদয় রায়গুণাকর শ্রীভারতচন্দ্র শর্ম্মা।

# চক্রান্ত

## শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

ঠাঁইবদল অনেক হল। অনেক খুঁজেছে—আলো, হাওয়া, কম ভাড়া। ঘুরেছেও অনেক। শ্যামবাজার থেকে টালিগঞ্জ। সেখান থেকে মাঝ-কলকাতা। কোথাও দেড়বছর কোথাও আড়াই।

পবিত্র অবশেষে মাঝ-কলকাতায় বাড়ি পেল। গলির উপগলি, তারই মাঝখানে পায়রার খোপের মত ছোট্ট দু-কামরা বাড়ি। ভেতরদিকে একফালি বারান্দা—তার পাশে টিউব ওয়েল! সাধারণত অন্ধকার—কেবল গরমকালে খানিক-খানিক সূর্য্যের আলো ঢোকে।

এরই মধ্যে পবিত্রর মা দুটি ছেলে দুটি মেয়ে নিয়ে উঠলেন। তিনি সুগৃহিণী। সব কাজই সুচারু ভাবে করা অভ্যেস। রেশন, ছেলের কলেজের মাইনে, মেয়ের বিয়ের ভাবনা, আত্মীয়-স্বজনদের আদর-আপ্যায়ন সবকিছুই তিনি গুছিয়ে নেন একলা হাতে। সংসার-খরচার জন্যে ধার তাঁকে করতে হয় না—এরটা ওতে ওরটা তাতে জোড়াতালি দিয়ে তিনি সব ঠিক করে নেন। এ-মাসে দুটো গামছা না কিনলেই নয়, অথচ নমিতার গানের স্কুলে মাইনে বাকি পড়েছে। কাজেই ছেঁড়া গামছাতে কাজ চালাতে হয় আরো একমাস। কেরোসিন তেল নেই, নাই থাক—খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে অনায়াসে উনোন ধরানো যায়। ইত্যাদি ইত্যাদি। পবিত্র ভাবে না বাড়ির কথা—মেয়েরা ভাবলেও একটু-আধটু।

পবিত্র শুধু ভাবে ভাই-বোন কী করে মানুষ হবে। বাবা মারা যাওয়াতে সে নিজে পড়তে পারে নি। আই, এস-সি থেকেই বিদায় নিয়েছে। তারপরে এই চার বচ্ছর ধরে কেবল চাকরি আর চাকরি, তার ওপর টিউশনির ছিটেফোঁটা।

সকালে অফিস যাবার সময় মা বললেন: দেখি, দেখি—।

পবিত্র মুখ ফেরালো: কী?

—এই দেখো, এখানটা ছিঁড়ে গেছে অথচ বলিস নি আমাকে। নমি, ওরে ও নমি শীগ্রি ছুঁচ সুতোটা নিয়ে আয়!—নে নে খোল শীগ্রি—একটু টেঁকে দি।

পবিত্র নির্বিবাদে জামাটা খুলে দিল। শৈলবালা সেলাই করে দিলেন।

—ওমা, খাবারের কৌটো নিস নি? বলতে বলতে তিনি খাবারের কৌটোটা এনে গুঁজে দিলেন পবিত্রর হাতে।

পবিত্র চলে গেল ড্যালহৌসি স্কোয়্যারে ফাইল বগলে নিয়ে।

নমিতা আর অণিমার পুরোনো বন্ধু প্রভা এসে সেদিন ওদের সিনেমায় নিয়ে যাবার জন্যে কত ঝুলোঝুলি করলো। ফেরবার সময় অবশ্য প্রভাদের বাড়ি হয়ে আসতে হবে! নমিতার ভাল কাপড়টা কাচতে দিয়েছে বলে সে যেতেই চায় না। অণিমার যে বাড়তি লাল শাড়িটা আছে সেটা পরলে যেন টিকেয় আগুন ধরে। অতএব? অতএব?

নমিতা বললো: প্রভা, তুই যেন কী? এসেছিস, গল্প করবি—তা নয়, খালি যাই-যাই! আর তুই চলে গেছিস শুনলে দাদা—যা—

প্রভা মুখভার করে বললো: নমি, তোর বড্ড মুখ খুলেছে।

নমিতা বললো: মুখ খুলবে না! ভারি ন্যাকা ভেবেছ আমাদের। দাদা এখনো ফিরতে রাত হলে বলে টালিগঞ্জে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। অত টালিগঞ্জের গুঞ্জন মনে কেন বলুন ত মশাই?

তার মুখভঙ্গিতে প্রভা আর অণিমা দুজনেই হেসে উঠলো।

ইতিমধ্যে আসুন প্রভার কথাটা আমরা একটু জেনে নিই। টালিগঞ্জের ট্র্যাম ডিপোর কাছে বাড়ি নিয়েছিল পবিত্র। সেই বাড়িরই অন্য অংশ ভাড়া নিয়েছিলেন প্রভার বাবা। তারপরে দুটি পরিবারে খুবই হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। ঐ বাড়িতেই পবিত্রর বাবা মারা যান। ব্লাড-প্রেসারের রোগী ছিলেন। মাথায় হাতপাখার হাওয়া দেবার অজুহাতে প্রভা অনেক রাত হাত পাকিয়েছে। সংগে হয়ত কলেজ-পড়ুয়া তখনকার পবিত্র তাকে সাহায্য করত—ওষুধ এগিয়ে দিত, সে ক্লান্ত হলে নিজে এগিয়ে আসত। পবিত্রর বাবা মারা যাওয়ার পরও তারা অনেকদিনই সেখানে ছিল। তারই মধ্যে পবিত্রর চাকরি হয়েছে, ভালো টিউশনিও জুটে গেছে একটা। সেই সময়েই প্রভা ও পবিত্রের মধ্যে একটা বিয়ের ব্যবস্থার কথা সকলেরই মনে মনে জানা-জানি হয়ে গিয়েছিল—অথচ মুখ ফুটে কেউ বলেনি কোনদিন। শৈলবালা প্রভার মাকে বলেন নি, কারণ তাঁর নিজের ঘরেই দু-দুটো মেয়ে—ছেলের বিয়ে দিতে যাওয়া নেহাৎ বিলাসিতা! আর প্রভার মা-ও ঐ কারণেই মুখ খোলেন নি। শুধু জোরালো মিল থেকে গিয়েছিল এই তিনটি মেয়ের মনে—হয়ত সমবয়সী বলে, অথবা কাঁচাবয়স বলে। অণিমাও রাতে চুপচাপ ভেবেছে—প্রভার সংগে দাদার বিয়ে হলে বেশ হয়। প্রভাও তাই ভেবেছে হয়ত। অণিমা একটু চাপা। নমিতা চুলবুলে। এই দীর্ঘ ব্যবধানের পরে মাঝ-কলকাতায় বসে বোঁ করে কথাটা বলে ফেলতে নমিতার দ্বিধা হল না।

প্রভা কিন্তু বেশিক্ষণ থাকলো না। চলে গেল। তার ছোট ভায়ের নাকি অসুখ—সাতদিন জ্বর হয়েছে।

—কী যে করি ভাই, বলিস না। বাবা শুধু মাইনেটা মায়ের হাতে গুঁজে দিয়েই



খালাস, সংসারে কী হচ্ছে দেখবেন না। আর মা-ও নির্বিকার ভালমানুষ। অতএব আমাকেই সব দেখতে হয়।

এতক্ষণে শৈলবালাও এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন—আহা, সে-কথা তুমি আর কী বলবে মা। আমিও ত তাই দেখেছি। আবার কিন্তু এসো একদিন।

প্রভা বলে গেল: অনিমা যাস, নমিতা যাবি। মাসিমা আপনি ওদের নিয়ে যাবেন একদিন।

তারপরে সে নেমে পড়লো গলিতে, ময়লা গলিতে। সাড়ি বাঁচিয়ে চললো। হাতে সাড়ির একটা কোণ একটু তুলে নিল। পথে কী-সব নোংরা, যত রাজ্যের ছাই! গলিটা গিয়ে পড়লো আরেকটা গলিতে। সেখান থেকে মির্জাপুর—তারপরে কলেজ ষ্ট্রীট।

এইটুকু জীবন—অথচ এরই মধ্যে সব কিছু হয়—প্রেম, বিয়ে, রেশনিং, টিউশনি। শৈলবালার মত সুগৃহিণী অবশ্যই সংসার গুছিয়ে রাখতে পারেন। তাঁর কাজের ত অন্ত নেই সকাল থেকে। মধ্যবিত্তসমাজের ওপরের জেল্লা বজায় রাখার জন্যে তাঁর পরিশ্রম কি একটুখানি? মোটেই নয়। বিছানা-বালিসের ওয়াড়-চাদর তাঁকে পরিষ্কার রাখতে হয় বাড়িতে কেচে। জানলায় পর্দা দিতে হয়। মেয়েদের গানও শেখান—মাসে অন্তত দুটো সিনেমা দেখতেও পাঠান।

পবিত্র রাতে ফিরে এলে শৈলবালা বললেন: আজ প্রভা এসেছিল।

—কে, টালিগঞ্জের প্রভা?

—হ্যাঁ।···তোকে আজ একটা কথা বলবো পবিত্র।

—কী মা?

—দেখ, তুই বড়ো হয়েছিস। বুঝিস। আমার দুটো মেয়ের এখনো বিয়ে দিতে বাকি—তবু আমার মনে হয় তোর সঙ্গে প্রভার বিয়েটা হয়ে যাওয়াই ভালো। ওরা আমাদের পালটি ঘর—ভগবানযেন তোর জন্যেই ঠিক করে ওকে পাঠিয়েছেন। তোর কী মত?

পবিত্র চুপ করে রইল।

শৈলবালা আবার বললেন: আমার মন বলে প্রভা সেই আশ্বাসেই এখনো আসে। ওর বাবারও ত আমারই মত অবস্থা! ওখানে থাকতেই মনে মনে ঠিক করেছিলাম, অথচ কথাটা কোনদিনই পড়তে পারি নি।

পবিত্র বললো: আজকালকার দিনকাল দেখে তোমার বিয়ের কথা বলা কি উচিত হচ্ছে? তাছাড়া নমি-অণির কথাটাও ভাবতে হবে ত!

পবিত্র হাসলো। নমিতা আর অণিমাও পাশের ঘরে দেয়ালে কান রেখে মুখে কাপড়চাপা দিয়ে হাসলো একটু।

শৈলবালা বললেন ঃ না, না আমি কালই যাব ওর মায়ের সংগে এই মাঘ মাসেই দিন ঠিক করার জন্যে। আহা বেচারী মেয়েটির কত আশা। তাছাড়া দেখতে-শুনতে ত খুবই ভাল।

পবিত্র আর কিছু বললো না।

শৈলবালা দুই মেয়েকে নিয়ে পরের দিন টালিগঞ্জে গেলেন। পুরোনো জায়গা। বাড়ি চিনতে মোটেই কষ্ট হয়না। এখানেও গলি। ঢুকেই বাঁ-হাতি কালোরঙের দরজার বাড়ি। ঢুকলেন। প্রভার মা রমলা ওদের নিয়ে গেল ভেতরে। একখানি ঘর—তারি একপাশে সতরঞ্চি পাতলো রমলা। অন্যপাশে জ্বরগায়ে ছোট ছেলেটা শুয়ে আছে।

শৈলবালা মাথায় হাত দিলেন ছেলেটির ঃ আহা-হা, টুনুর কবে থেকে জ্বর হয়েছে, রমা? ইস, গা যে পুড়ে যাচ্ছে!

রমলা বললো ঃ আর বলো না দিদি—ছ'মাস আমায় আর উঠতে-দাঁড়াতে দিচ্ছে না। টুকু হপ্তাখানেক জ্বরে ভুগছে। তার আগে খোকনের বিষফোড়া হয়ে যায়-যায় অবস্থা! তার ওপর ওঁর ত আছেই—বাতের রুগী, কখন যে বাড়ে-কমে কিছুই বোঝা যায় না।

শৈলবালার ভেতরটা কথাটা পাড়বার জন্যে জ্বালা করছিল—কিছু খেই কই যে খেই ধরে নেমে পড়বেন!

তিনি বললেন ঃ আমার কথাও বলোনা ভাই। পবিত্র বেচারা খেটে-খেটে সারা। যা দিনকাল। তারওপর এই যে সোনা-মণি দুজন—এঁদের বিয়ের কথাও ভাবতে হচ্ছে। চিরটাকাল দুঃখই করে গেলাম ভাই।

রমলা বললো: আমিও আর পারিনা দিদি। প্রভার বিয়ে ত দিতেই পারলাম না সৎপাত্রে। লেখাপড়াও শেখাতে পারলাম না বেশিদূর। এই মাসতিনেক হল টাইপরাইটিং শিখে একটা চাকরি পেয়েছে। চাকরি না করলেই বা চলে কী করে বলো—উনি যা মাইনে পান তাতে দু'হপ্তা চলে কিনা সন্দেহ।

শৈলবালা চুপ হয়ে গেলেন। তারপর তিনি উঠলেন যখন তখন তাঁর শরীর ভারি হয়ে উঠেছে। তবু তাঁর মন গুছোনি মন—একটা পূর্ণ বৃত্ত না দেখে অংশ বিশেষে সন্তুষ্ট হন না তিনি। ভাঙতেও চাননা একটি পূর্ণ বৃত্ত।

বাড়ি ফিরে তিনি নিজেই খবরের কাগজ দেখে পবিত্রর কণে দেখবার জন্যে ঘটক ঠিক করবার কথা ভাবতে লাগলেন।

শ্রীঅরবিন্দ-প্রণীত 'দিব্যজীবন' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড চতুর্থ ' অধ্যায় অবলম্বনে

# সর্ব্বগত সৎ

## শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বসু

শুদ্ধ চিৎস্বরূপ যিনি তিনি আমাদের মধ্যে অকুণ্ঠ ভাবে প্রকাশিত হইতে চান এবং বিশ্ব-জড় আমাদের প্রকাশের কারণ ও আধার হইতে চায়। জীবনের পূর্ণতার জন্য এ উভয়ের কাহারও দাবি যখন অস্বীকার করিলে চলে না তখন আমাদিগকে এমন একটী সত্য আবিষ্কার করিতে হইবে, যেখানে কাহারও মর্য্যাদা ও অধিকার বিন্দুমাত্র খর্ব্ব না করিয়া এ দুয়ের পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইতে পারে। কারণ যেখানেই কোন চরম উক্তি মানুষের মনকে প্রবল ভাবে অভিভূত করে সেখানে যে কেবল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মাত্রই আছে তাহা হইতে পারে না। আমরা না দেখিতে পাইলেও সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে সত্যের এমন একটা বৃহৎ দিক আছে যাহাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিলে আমাদিগকে তজ্জন্য দণ্ডভোগ করিতে হইবে। অনেক সময় আমরা এ উভয়ের মধ্যে একটা জোড়াতালি দেওয়া আপোষ করিয়া কাজ চালাইতে চাই কিন্তু তাহা বেশী দিন টিকে না কারণ আপোষ ত সত্যকার সমন্বয় নয়। খাঁটিভাবে সমন্বয় হয় তখন—যখন এমন এক সত্যের সাক্ষাৎ লাভ হয় যাহাতে উভয়ের পূর্ণ পরিচয় উভয়ে পায় এবং যার শেষ পরিণাম উভয়ের একাত্মবোধের অন্তরঙ্গতায়। জড় ও চিতের এইরূপ পূর্ণ সমন্বয় সাধন করিয়াই আমাদের জীবনের এমন এক অটল ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে যেখানে দাঁড়াইয়া জীবন ভিতরে ও বাহিরে পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠিবে।

আমরা দেখিয়াছি যে বিশ্ব-চেতনাতে জড় চিতের কাছে সত্য এবং চিৎ ও জড়ের কাছে সত্য। অহমিকাময় সাধারণ চিত্তে প্রাণ ও মন ভেদের কারণ হইয়া অবিজ্ঞেয় পরমার্থ তত্ত্বের ইতি এবং নেতিমূলক দুইটী বিভাবের মধ্যে যেন একটা কলহ সৃষ্টি করে। কিন্তু বিশ্বচেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হইলে মন যে জ্ঞানের দীপ্তি পায় তাহাতে একত্বের সত্য, বহুত্বের সত্য এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যে সমস্ত যোগ-সূত্র রহিয়াছে তাহাদের সত্য বুঝিতে পারে; তখন তাহার কাছে সকল বিরোধের শান্তি হয় এবং এক দিব্য সুর-সঙ্গতির মধ্যে সকল তারের ঝঙ্কার সমন্বিত হইয়া গিয়াছে দেখিতে পায়। তখন সে মন ভগবান ও জীবনের মধ্যে পরম মিলন সাধনের উপায় হয়। তখন অপরোক্ষানুভূতি-লব্ধ, জাগ্রত সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয় বোধ-যুক্ত সেই মনে জড় চিতের বিগ্রহ, দেহ বা আধার রূপে এবং চিৎ জড়ের আত্মা, সত্য এবং সারতত্ত্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন উভয়ের পক্ষে উভয়কে দিব্য সত্য এবং মূলতঃ এক বলিয়া বুঝিতে আর কোন বাধা থাকে না। পরম চৈতন্যময় যে সত্তা আত্ম-বিস্তার

করিয়াছেন ও সমস্ত জাড়ীয় আকারের ভিতর বাস করিয়া প্রতি চিৎকেন্দ্র হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, মন ও প্রাণ তাহার রূপায়ণ ও যন্ত্র—এ সত্য তখন আত্মপ্রকাশ করে। মন যখন তাঁহাকে ধারণ ও প্রকাশ করিবার স্বচ্ছ-মুকুরে পরিণত হয় এবং প্রাণ যখন নিত্য নবীন রূপ ও ক্রিয়ার মধ্য দিয়া তাঁহারই অভিব্যক্তির শক্তি স্বরূপ হইয়া উঠে—তখন মনপ্রাণও পূর্ণ ও সার্থক হইয়া উঠে।

এই ভাবে দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে এই জগতেই মানুষের পক্ষে দিব্যজীবন লাভের সম্ভাবনা আছে। এ দৃষ্টি জগৎ এবং পার্থিব পরিণতির মধ্যে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য এবং সজীব অর্থ দেখিতে পাইয়া যেমন একদিকে বিজ্ঞান সাধনার সার্থকতা দেখাইবে তেমনি অন্যদিকে মানুষের সত্তাকে দিব্য ভাগবত সত্তায় রূপান্তরিত করিয়া সকল প্রধান ধর্ম্ম যে বৃহৎ আদর্শের স্বপ্ন দেখে মানুষের সেই অধ্যাত্মিক আকূতির পূর্ণতা সাধন করিবে।

দিব্য জীবনের মধ্যে প্রকাশের দিক দেখিতে গিয়া নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ স্বয়ম্ভু নির্গুণ নির্ব্বিকার যে সত্তা—যাহাতে পৌঁছা সন্ন্যাসীর জীবনের পরমপুরুষার্থ—তাহাকে কি অস্বীকার করিব? না, তাহা করিব না, আমরা উভয়কে স্বীকার করিয়া এ উভয়ের মধ্যে এক পরম সমন্বয় আবিষ্কার করিব। দেখিব নির্গুণ নিষ্ক্রিয় এবং সগুণ সক্রিয় ব্রহ্ম একে অপরকে অস্বীকার করে না, ইহারা একই পরংব্রহ্ম বা পরম তত্ত্বের নেতি এবং ইতিবাচক দুইটী দিক মাত্র, একে অপরকে ছাড়িয়া সত্য নহে, প্রকাশশীলা ক্রিয়াময়ী বিশ্বজননী—যাকে পরাবাক্ বলা হয়—এই নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়াই নিত্য প্রকাশিত হন এবং নৈঃশব্দ্যের মধ্যে যাহা গূঢ় ভাবে (latent) আছে তাহাকেই জীব জগৎ-রূপে প্রকাশ করেন। এই যে শাশ্বত নিষ্ক্রিয়তা নিত্য বর্ত্তমান, তাহাকেই ভিত্তি করিয়া অগণিত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অকুণ্ঠিত দিব্য লীলা চলিতেছে, নিষ্ক্রিয়তা ক্রিয়াশীলতাকে সম্ভব করিয়াছে। সম্ভূতির (Becoming) সমস্ত শক্তি ও সম্ভাবনা সেই শাশ্বত নির্গুণ সত্তা হইতে আসিতেছে—তিনি স্বয়ং অপরিণামী হইয়াও অনন্ত সৃষ্টির নিরপেক্ষ ভর্ত্তা ও অনুমন্তা।

মানুষও যখন তাহার অন্তরে এক পরম শান্তি এবং নিষ্ক্রিয়তার সাক্ষাৎ পায় অথচ ইহাও বুঝিতে পারে যে ভিতরের সেই নৈঃশব্দ্য হইতে এবং তাহারই দিব্য আনন্দে ও অনুমোদনে তাহার নিজের ও বিশ্বের অকুণ্ঠ ও অফুরন্ত কর্ম্মধারা প্রবাহিত হইতেছে তখনই সে পূর্ণতা লাভ করে। অতএব নৈঃশব্দ্যের প্রকৃতি যে বিশ্বকর্ম্মের নিরোধ—এ কথা সত্য নহে। যে মন ইতি এবং নেতির দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করিতে অভ্যস্ত, সেই মন যখন হঠাৎ ক্ষর জগতের কোটি হইতে অক্ষর কোটিতে উপনীত হয় তখন সাধারণতঃ সে সেই ব্যাপক ও উদার চৈতন্যের অনুভূতি পায় না—যে চৈতন্য নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তা, ক্ষর ও অক্ষর এ উভয় ভাবকে যুগপৎ ধারণ করিয়া আছে। তাই সে ভুল করিয়া ক্রিয়াশীলতাকে,



জগৎকে মিথ্যা মনে করে। যিনি জগদতীত অশব্দ তিনি জগৎকে কর্ম্মকে নিরাকৃত করেন না পরন্তু ধারণ করিয়া রাখেন। অথবা কর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম-নিবৃত্তি উভয়ই সমভাবে তাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পায় এবং তাহারই অনুমোদনে মানুষ আত্মাতে স্বাধীন ও স্থির অথচ সর্ব্বকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও নিষ্ক্রিয়তা এবং সক্রিয়তার সমন্বয় সাধন করিতে পারে।

আর একটা খট্‌কা উঠিতে পারে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত।" অসৎ (non-being) ছিল সকলের আগে, তথা হইতে সৎ ( existence, being ) জাত হইয়াছে। তাহা হইলে অসতের মধ্যে নিশ্চয়ই সকলকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। সুতরাং কর্ম্ম ও জগতের অত্যন্ত নিবৃত্তিই শেষ কথা। অনন্ত নিষ্ক্রিয় সৎ-স্বরূপের মধ্যে ক্রিয়াশীল বহুত্বের প্রকাশ সম্ভাবনা আছে স্বীকার করিলেও এই অসৎ, যাহা সকল অবস্থার আদিভূত এবং একমাত্র শাশ্বত সত্য, বিশ্বের সকল সম্ভাবনাকে কি প্রকৃতই নিরাকৃত করিতেছে না? কোন কোন বৌদ্ধদর্শনে আমরা যে শূন্যবাদের দেখা পাই তাহাই যেন এ যুক্তিতে সমর্থিত হয়। এ মতে অহং এর মত আত্মাও প্রকাশে বা ক্ষণস্থায়ী-চিত্তবৃত্তি-প্রবাহে একটা বোধ মাত্র, স্বরূপে সত্য নয়।

কিন্তু আমরা আবার শব্দ বা বাক্য দ্বারা ভুল পথে চালিত হইতেছি। দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সংস্কারে জর্জ্জরিত আমাদের সংকীর্ণ চিত্ত অতিমানস অভিজ্ঞতার অনুবাদ করিতে গিয়া তাহাতেও সেই দ্বন্দ্বের আরোপ না করিয়া পারে না। অসৎ একটী শব্দ মাত্র। এ শব্দের মূলে কি আছে তাহা যখন তলাইয়া বুঝিতে চাই তখন বুঝিব বস্তুর প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে আমাদের যে শুদ্ধতম ধারণা ও সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতা আছে তাহাকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে বলিয়াই ইহাকে অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। অসৎ কেবল মাত্র একান্ত অবাস্তব শূন্যতা নহে—আমরা যাহা জানি বা সচেতন ভাবে আমরা নিজদিগকে যাহা মনে করি সেই অনুভবের ও সেই বিশিষ্ট চেনার সকল সীমা পার হইয়া যাওয়ার ফলে শূন্যবাদের একটা কল্পনাকে অসৎ নাম দিয়া খাড়া করা হইয়াছে। বাস্তবিক দার্শনিকের শূন্যবাদ গভীর ভাবে পরীক্ষা করিলে আমরা বুঝিব যে শূন্য আসলে সর্ব্বেরই নামান্তর। মন শুধু সান্তের ধারণায় অভ্যস্ত, তাই অনির্দ্দেশ্য ও অনির্ব্বচনীয় এই অনন্ত, মনের কাছে ফাঁকা বা শূন্য বলিয়া মনে হয় কিন্তু বস্তুতঃ এই অসৎই একমাত্র সত্যিকারের সৎ। তাই দেখিতে পাই অন্য একখানি উপনিষদ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়াছে—বলিয়াছে সে সৎ শুধু সৎ হইতেই জন্মিতে পারে। অসৎ শব্দে একান্ত শূন্যতা না বুঝিয়া যদি বুঝি সত্তা সম্বন্ধে আমাদের সকল ধারণা ও অনুভবের অতীত একটী অনির্দ্দেশ্য তত্ত্ব, তবে সে অসৎ হইতে সতের জন্ম হইয়াছে একথা আর অসম্ভব থাকে না।

যখন বলি অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি তখন কালাতীত তত্ত্বকে কালের ভিতর টানিয়া

আনিতে চাই। কারণ শাশ্বত অসতের মধ্যে কবে সৎরূপী সর্ব্বের জন্ম হইল বা আবার স্বরূপতঃ মিথ্যা এই সর্ব্ব কবে চিরবর্ত্তমান অসতে লয় পাইবে তাহা ত কেহ বলিতে পারেনা। সৎ ও অসৎ এ দু'য়ের কথা যদি বলিতেই হয় তবে বলিতে হইবে যে তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে না পারিলেও উভয়ই যুগপৎ বর্ত্তমান আছে অথবা কালের ভাষায় তাহারা উভয়ই শাশ্বত। এই শাশ্বত সত্তাকে কে কেমন করিয়া বুঝাইবে যে সে নাই শুধু অসৎ আছে? সকল অভিজ্ঞতার এরূপ পরমবিনাশের মধ্যে সকল অভিজ্ঞতার মীমাংসা কি করিয়া মিলিবে?

সমস্ত বিশ্বসত্তার অধিষ্ঠান ও আশ্রয়-স্থান স্বরূপ হইয়াও এ-সমস্ত হইতে মুক্ত ব্রহ্মের অবিজ্ঞেয় স্বরূপকে শুদ্ধ সত্তা বলা যাইতে পারে। বিশ্বের সমস্ত সত্তা বা সম্ভূতির যত প্রকার ইতিবাচক ভাব বা ধারণা চৈতন্যে সূক্ষ্ম বা জগদতীত অবস্থায় জাগিতে পারে—তাহা হইতেও নির্ম্মুক্ত তাহার যে পরম স্বাতন্ত্র্য আছে তাহাকেই অসৎ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সত্তার অনন্ত প্রকাশের দ্বারা তাহাকে নিঃশেষ করা যায় না বা কোন প্রকার প্রকাশের সীমা দ্বারা সীমিত করা যায় না বলিয়াই এই নেতিবাচক অসৎ আখ্যা। কিন্তু তা বলিয়া ইতিবাচক সকল বিশ্বসত্তা যে তাহারই সত্য আত্মপ্রকাশ ইহা তাহাতে অস্বীকৃত হয় না। এই ইতিবাদ বা নেতিবাদ পরস্পরকে ধ্বংস করেনা পরন্তু ইহারা উভয়ে উভয়ের পরিপূরক, এই উভয় ভাবের যুগপৎ উক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ-মানব সচেতন আত্ম-সত্তাকে সত্য বলিয়া যেমন জানিতে পারে তেমনি ইহার অবিজ্ঞেয় পরম তত্ত্বকেও সেই সত্য বলিয়া একসঙ্গেই বুঝিতে পারে। তাইত বুদ্ধ নির্ব্বাণের পরম পদে অরূঢ় হইয়াও জগতে অতি প্রবল কর্ম্মের আন্দোলন তুলিয়াছিলেন, অন্তশ্চেতনায় নৈব্যক্তিক হইয়াও কর্ম্মে ও জীবনে জগতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁহাতে সম্ভব হইয়াছিল।

যখন এই সকল কথা গভীরভাবে চিন্তা করি তখন বুঝিতে পারি—যে সমস্ত কথা আমরা জোর গলায় প্রচার করি, তাহার ভিতরে লুকাইয়া থাকে কত ভাবের দৈন্য, ভাষাকে স্পষ্ট করিতে গিয়া ভাবের অস্পষ্টতাকে আরও বাড়াইয়া তুলি এবং ভ্রান্তপথে পরিচালিত হই। তখন ইহাও বুঝিতে আরম্ভ করি আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতার জন্য আমরা ব্রহ্মের উপরও সীমার আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হই না। আমাদের এই মন অজ্ঞেয় তত্ত্বের একটী বিভাবের উপর কেন্দ্রীভূত হইয়া তাহাকেই একমাত্র সত্য বলিতে এবং অন্য সব বিভাবকে অবজ্ঞা বা অস্বীকার করিতে দ্বিধা-বোধ করে না। আমরা তখন অহংকার বশে নিজের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তজ্জাত মতবাদ অপরের তদ্রূপ সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতা ও মতবাদের বিরুদ্ধে খাড়া করিয়া তর্কযুদ্ধে লাগিয়া যাই। ইহার চেয়ে অনেক ভাল হয়, যদি সহিষ্ণু হইয়া শিক্ষার্থীর বিনয় লইয়া নিজের পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখি এবং অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার বাড়াইতে চেষ্টা করি। নিজেদের পূর্ণতা সাধনের জন্য যিনি ভাষাতীত



তাঁহার কথা যখন আমাদিগকে ভাষার মধ্যে বলিতেই হইবে তখন তৎসম্বন্ধে এমন বাক্যকে আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, যাহা হইবে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, স্বচ্ছন্দ ও উদার এবং যাহা বৃহত্তম ও পূর্ণতম সমন্বয় ও সুরসঙ্গতি স্থাপন করিতে সক্ষম।

সুতরাং আমরা স্বীকার করি যে ব্যক্তিগত চেতনা এমন এক অবস্থায় পৌঁছিতে পারে যেখানে ব্যাবহারিক সমস্ত সত্তা এক অব্যক্তে লীন হইয়া যায়, এমন কি আত্মজ্ঞানের ধারণাও সেখানে অপ্রচুর হইয়া পড়ে। নৈঃশব্দ্যের পরপারে গভীরতর নৈঃশব্দ্যেও প্রবেশ করা তার পক্ষে সম্ভব। কিন্তু ইহাই একমাত্র সত্য নয় অথবা এ অভিজ্ঞতাই আমাদের পূর্ণ ও চরম অভিজ্ঞতা নয়। কারণ আমরা দেখিতে পাই এই নির্ব্বাণ, এই আত্মবিলয় আমাদের অন্তরে পরাশান্তি এবং পরমস্বাতন্ত্র্য দিলেও তৎসঙ্গে বাহিরে এবং ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে কামনা-বর্জ্জিত অথচ কার্য্যসাধক কর্ম্ম-প্রবাহ সতত বর্ত্তমান থাকিতে পারে। বুদ্ধের শিক্ষার মূল কথা বোধ হয় এই ছিল :—ভিতরে নৈর্ব্যক্তিকতা এবং প্রশান্ত রিক্ততাকে রক্ষা করিয়া অহমিকার উপরে উঠিয়া ব্যক্তিগত কর্ম্ম-শৃঙ্খল এবং ক্ষণভঙ্গুর নাম-রূপের অভিনিবেশ হইতে মুক্ত হইয়া সত্য, মৈত্রী ও সততার শাশ্বত সত্য-কার্য্যে নিযুক্ত থাকা। স্থূল দেহ ধারণের দুঃখ ও যন্ত্রণা হইতে পলায়ন করিবার ক্ষুদ্র আদর্শ তাঁহার নহে। সে যাহাই হউক পূর্ণ সিদ্ধি মানুষের মধ্যে যেমন নৈঃশব্দ্য এবং কর্ম্মধারার পরম মিলন দেখা দিবে তেমনি পূর্ণরূপে সচেতন জীবাত্মা একদিকে যেমন অসতের পরম স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে তদ্রূপ অন্য দিকে বিশ্বসম্ভূতির সঙ্গে সম্বন্ধচ্যুত হইবে না।

এমন ভাবে বিশ্বচৈতন্যের মধ্যে জড় ও চিতের সমন্বয় সাধন করিয়া অবশেষে বিশ্বাতীত চেতনায় সকল ইতি ও নেতির শেষ সমন্বয় আমরা দেখিতে পারি। অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের স্থিতি এবং ক্রিয়ার অবস্থা আমরা ইতি-বাদের মধ্যে দেখিতে পাই এবং এই সমস্ত স্থিতি এবং ক্রিয়ার মধ্যে অনুস্যূত থাকিয়াও তাহা হইতে সে তত্ত্ব যে সর্ব্বদা নির্ম্মুক্ত, ইহাই নেতিবাদের মধ্যে আমরা আবিষ্কার করি। অবিজ্ঞেয় এমনি একটী পরম আশ্চর্য্য ও অনির্ব্বচণীয় কিছু যাহা আমাদের চৈতন্যে সর্ব্বদাই রূপায়িত হইয়া উঠিতেছে। সর্ব্বদা তাহা সে রূপায়ণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। আমাদিগকে এক মিথ্যা অন্য মিথ্যাতে লইয়া গিয়া অবশেষে সব যেখানে লয় পায় এমন এক পরম নেতিতে পৌঁছাইয়া দেয় এমন মায়াময় চাতুরী ইহাকে নিশ্চয়ই বলা চলে না, পরন্তু আমাদের সকল জ্ঞানের অতীত এক এক পরম জ্ঞানময় সত্তা আমাদিগকে এক সত্য হইতে তদপেক্ষা বৃহত্তর ও গভীরতর সত্যের দিকে পরিচালিত করিতেছেন ইহাই সত্য কথা। ব্রহ্ম সর্ব্ব-ব্যাপী বা সর্ব্বগত সত্য—দুরপনেয় ভ্রমের সর্ব্বগত নিমিত্ত তিনি নহেন।

এই ভাবে এক পরম ইতিবাদকে যদি সকল দ্বন্দ্বের পরম সমন্বয়-সাধন-ক্ষেত্র রূপে

গ্রহণ করি—বস্তুতঃ ইহা ছাড়া সমন্বয়ের অন্য কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই—তবে সেই অবিজ্ঞেয় তত্ত্বের প্রত্যেক প্রকাশ বা বিভাব আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে এবং অন্যান্য প্রকাশ বা বিভাবকে নিরাকৃত বা অযথোচিত খর্ব্ব না করিয়া পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ আছে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সত্য এবং মিথ্যা, আত্মা এবং অনাত্মা, সত্য আত্মা এবং মিথ্যা অথচ সদা বর্ত্তমান মায়া—এইরূপ দুই পরস্পর বিরোধী ভাবে ব্রহ্মকে ভাগ না করিয়া 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এই দর্শনই খাঁটি অদ্বৈত দর্শন। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন ইহা যদি সত্য হয় তবে যেখানে যাহা কিছু আছে তাহাও ব্রহ্ম—ইহাও সত্য। এই ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা আত্মা যদি অসহায় না হন, যদি তাহার শক্তি অসীম হয় যদি তিনি স্বয়ংপ্রজ্ঞ এবং সর্ব্বময় হন তবে প্রকাশের বা জগৎসৃষ্টির মূলে একটা সত্য কারণ বা গূঢ় উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে। সেই গূঢ় উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিতে গেলে আমাদিগকে সৃষ্টির মূলে একটা শক্তি, একটা জ্ঞান, সত্তার একটা সত্য বিদ্যমানতা স্বীকার করিয়া লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। বৈষম্য ও আপাতপ্রতীয়মান অনর্থ প্রাকৃত জগতের মধ্যে রহিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে কিন্তু মানুষকে তাহার কাছে পরাজয় স্বীকার করিলে চলিবে না। মানুষের অন্তরের গভীরতম সহজ বুদ্ধি যে মানুষকে মিথ্যার ছলনাকে খুঁজিতে বলে নাই পরন্তু সর্ব্বজয়ী এক নিগূঢ় কল্যাণশক্তিকে খুঁজিতেই নিযুক্ত ইহাতে তাহার জ্ঞানেরই পরিচয় আছে।

দৃশ্যমান জগতের অজ্ঞান দুঃখ ও অনর্থে ভীত ও পরাভূত হইয়া আমাদের প্রাকৃত খণ্ড চৈতন্য, ব্রহ্মকে এ সমস্তের দায় হইতে মুক্তি না দিলে চলে না মনে করিয়া, এ সমস্তের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, মায়া, মার, সয়তান প্রভৃতি ব্রহ্মের বিরোধী কোন স্বয়ংজাত অশুভ শক্তি আছে মনে করে। কিন্তু আমরা ত বলিতে পারি না যে সেই অদ্বিতীয় সত্তা তাহার বাহিরের কিছু দ্বারা বাধ্য হইয়া কোন কিছু করেন, কারণ তদতিরিক্ত কিছুই যে নাই। এ কথাও ত বলা চলে না যে ব্রহ্মের সত্তার এক দেশে একটা বিরুদ্ধ ভাব আছে যাহা তাহার সমস্ত সত্তার বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে কারণ তাহাতেও প্রকারান্তরে সেই সর্ব্বময়ের বাহিরে একটা কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এমন কি একথাও বলিতে পারি না যাহা কিছু ঘটিতেছে ব্রহ্ম তাহার উদাসীন এবং নিরপেক্ষ দ্রষ্টা মাত্র, কারণ জগৎ-সৃষ্টির বা জগৎ-প্রকাশের মূলে যে সঙ্কল্প বা ইচ্ছা রহিয়াছে তাহাও ত তদতিরিক্ত আর কাহারও হইতে পারে না। প্রকৃত সত্য এই যে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ছাড়া আর কিছু নাই, বহু তাঁহারই প্রতীক, মূর্ত্তি বা বিভূতি।

সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে জগৎ যদি স্বপ্ন বা মিথ্যা বোধ মাত্র হয় তবু তাহা অখণ্ড এক আত্মস্বরূপের ইচ্ছা হইতে জাত হইয়াছে এবং তাহাকে তিনিই নিত্য ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে এ বোধ যে উপাদানে গঠিত তাহা



মূলতঃ সত্যস্বরূপ হইতে আসিয়াছে কারণ জগতের আধার, অধিষ্ঠান ও উপাদান সমস্তই ব্রহ্ম। যে স্বর্ণ দিয়া পাত্র গঠিত হয় সে স্বর্ণ যদি সত্য হয় তবে পাত্র মিথ্যা বা মরীচিকা হইবে কি করিয়া? প্রকৃত পক্ষে জগৎ স্বপ্ন, মিথ্যা, এ সব শুধু কথার চাতুর্য্য অথবা প্রাকৃত চেতনার সংস্কার। এ সমস্ত কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে, সে সত্যের মূল্যও কম নয় কিন্তু তবুও তাহারা সত্যকে বিকৃত করিয়াছে ইহাও ঠিক।

সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত এক পরম সত্যের ধারণা লইয়া আমাদের সাধনার আরম্ভ করিতে হয়। এই পরম সত্যের এক কোটিতে সর্ব্বাতীগ অসৎ ( non being ) অন্য কোটিতে বিশ্বজগৎ কিন্তু এ উভয় কোটি পরস্পর বিরোধী নয়—উভয়ই সেই পরম তত্ত্বের দুইটি বিভাব। বিশ্বে অথবা প্রকাশে, এই তত্ত্বের সর্ব্বোত্তম অনুভবে আমাদের নিকট যিনি প্রকাশিত হন তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। আবার বিশ্ব বা প্রকাশের অতীত অবস্থায় তাহারই এক অবিজ্ঞেয় সৎ বা এক অনির্ব্বচণীয় চরম ও পরম আনন্দ-স্বরূপের অনুভবও মানুষের মধ্যে জাগিতে পারে। আমরা যদি ইন্দ্রিয়বোধজাত একদেশদর্শী বৃত্তির অধীন না হইয়া প্রমুক্ত বুদ্ধি ও অনুভবের সাহায্যে দেখিতে চেষ্টা করি তবে সকল দ্বৈতলীলার মধ্যেও তাহারই লোকোত্তর মহিমা দেখিতে পাইব। অবশ্য যতদিন আমরা দ্বৈতবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে না পারিতেছি ততদিন শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের দ্বারা এ ধারণা আমাদিগকে বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু বুদ্ধির উচ্চতম দীপ্তি বা বিচারের গভীর প্রসার এ বিশ্বাসকে অস্বীকার না করিয়া বরং সমর্থনই করিবে। মানুষের উত্তরায়ণের যাত্রাপথের পাথেররূপে তাহাকে এই বিশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। তাহার অধ্যাত্মিক পরিণামে এমন একদিন আসিবে যখন এই বিশ্বাস জ্ঞানে এবং পূর্ণ অভিজ্ঞতাতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে।

উষঃ ভদ্রেভিঃ আগহি দিবঃ চিত্র উচনাৎ অধি
বহন্তু অরুণহপ্সব উপত্বা সীমিনঃ গৃহম্॥ ঋকবেদ। মণ্ডল ১। সূক্ত ৪৯॥

"এসো শুভ উষা স্বর্গচিত্র
এদিকে এভির শিরে হও রুচি অগ্রসর
উচলের থেকে নিচলে বহুক
উপত্যকার সীমায়, গুহক
গুহাবাসীদের গৃহ-অঙ্গনে অরুণোৎসব নিত্য
নৃত্য করুক অরুণ-নদীর সুন্দর অপ্সর॥"

# উত্তরাধ্যয়ন

## সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশেষে মোহিত আর রিক্তার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হ'ল।

'তুমি তাহলে বিয়ে কোরবে না, ঠিক করলে ?'

'তাই ভাবছি, মোহিত।'

রিক্তা ম্লান হাসলো। 'পরাজয় জেনেও পরাজয়কে মানার শক্তি আমার মনে নেই। কত পুরুষ তো চিরকুমারও থাকে, তুমি যদি না-ই পার, আমি পারবো।'

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের নীচে সন্ধ্যার শীত-শীত বাতাসে তাই বোললে আজ রিক্তা, মোহিতকে আক্রমণ কোরবার জন্য নয়, নিজের মনের ভিত্তিটাকেই দৃঢ় কোরবার অদম্য প্রয়াস ওর জেগে উঠেছে।

'মোহিত ?'

'বল'—মোহিত অন্যমনস্কের ভূমিকায় তাকালো।

'তুমি বিয়ে করো—'

'কাকে ?' চমকে ওঠলো মোহিত।

'যে কোন সাধারণ পরিচ্ছন্ন বাঙ্গালী মেয়েকে !' হাসলো রিক্তা : 'আমি তোমাকে সুখীই দেখতে চাই, মোহিত। বাঙ্গালী মেয়ে খুব সোজা, তাকে নিয়ে তোমার সংসারে কোনদিন ঢেউ ওঠবে না, তুমি না হয় বিয়েই করে ফেল।'

'হুঁ' গভীর অন্যমনস্কের মতোই আবারও শব্দোচ্চার কোরলো মোহিত। মনের মধ্যে ওর মেমোরিয়াল রূপ নিতে লেগেছে। রিক্তা সোজাসুজিই তো প্রত্যাখ্যান কোরলো ওকে, বোধ হয় ওকেই নয়, যে তন্বী রিক্তাকে নিয়ে ডালহৌসী স্কোয়ারের কেরাণী মোহিত অনেক স্বপ্ন বুনেছে, তার সবটুকুই ধূলো কোরে দিয়ে আজ জানালো রিক্তা, সে কাউকেই বিয়ে কোরবেনা। কাউকেই নয়। জীবনে অপরাজেয় থাকতে চায়। বিবাহিত জীবন নাকি, ওর মতে, বাঙ্গালী সমাজে পরাজয়-মাল্য-বরণের চরমতম কাঠামো !

'বেশ, তাই হবে' মোহিত এতক্ষণে একটু হাসলো।

বোললো রিক্তা : 'তাহলে, বিয়ে কোরবে ?'

একটু জোর দিয়েই তখন বোললে মোহিত : 'আমার তো আর পরাজয়ের ভয় নেই। তাই আমার বিয়ে কোরতেও ভয় নেই রিক্তা।'

সন্ধ্যার আলো ঝলমল কোরে ওঠেছে হঠাৎ। এসপ্ল্যানেডের মাঠের আশেপাশের



রাস্তাগুলোর ধার বেয়ে, হেড লাইটের তুফান তুলে হাওয়ার গতিতে পেরিয়ে যেতে লাগলো রাশি রাশি প্রাইভেটকার আর ট্যাক্সি-বাস্।

চেয়ে হাসলো মোহিত : 'তুমি সুখী হও, এটা এখনও আমার কাম্য।'

মিষ্টি মিহি গলায় সুর ভাজতে ভাজতে হঠাৎ বোললে রিক্তা : 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মোহিত, এত সহজে, তুমি তোমার এবং আমার ভাগ্যকে মেনে নিতে পারছ বোলে। সত্যি, অনেকদিন পরে আজকে নিজেকে অনেকটা ভারমুক্ত বোলে মনে হোচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে আমার স্বাধীন জীবনে তুমি যে সন্দেহটুকুও সৃষ্টি কোরতে পারতে তার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাও আর নেই। আমার বিশ্বাস, সারাটা জীবন অবিবাহিত থাকলে আমার অতটুকু কষ্টবোধ হবে না।'

হঠাৎ ওঠে দাঁড়ালো রিক্তা। মোহিতের একটা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলে ও : 'চলো, বেড়িয়ে আসি।'

'কোথায় ?'

'আউটরাম ঘাটের ওদিকে।'

'সূর্য তো অনেকক্ষণ ডুবেছে।'

'তাতে কি !'

'ওদিকটা এমনিতেই বেশ,' ওকে টেনেই যেন জোর কোরে চলতে সুরু কোরলে রিক্তা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলে ও, হাসি পেলো একটু।

যাক। মোহিতও রাজি হোলো শেষ পর্য্যন্ত, ওর জীবনের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে।

আউটরাম ঘাট পর্যন্তই। তারপর রাস্তায় নেমে এসপ্ল্যানেড থেকে আস্তে আস্তে দু'জনে দুদিকে সরে গেলো বাসে চেপে, রিক্তা বালিগঞ্জে আর মোহিত শিয়ালদা।

মনের উপর খানিকটা ঝড় যেন দাপাদাপি কোরো গেলো রিক্তার। চৌরঙ্গীর আলোকোজ্জ্বল লোক-সমুদ্রে একটা ট্রামের সীটে বসে বসে রিক্তা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ট্রাম চলেছে।

এক পাশে গ্রাণ্ড, ফিরপো, মিউজিয়াম, আর্ট স্কুল, মানুষের অর্থ, শিল্প, ইতিহাসের জমাখরচের অপূর্ব সমন্বয়। আর, রিক্তা দেখলো ওর বাঁপাশে জানলার বাইরে অমাবস্যার ঘন অন্ধকার থম থম কোরছে, ওপাশের আলো এসে এ পাশের তিমিরে ছায়া হোয়ে গেছে।

তা হোক। হাসি পেলো আস্তে আস্তে রিক্তার। বিয়ে ও নিশ্চয়ই কোরবে না। এ না কোরলে যদি ওর জীবনটা অন্ধকারে তলিয়ে যায়—যাক। কিন্তু কেমন একটা প্রত্যয় জন্মে গেছে মনে ওর, অন্ধকারে তলিয়ে ও যাবে না কিছুতেই, বিয়ে না কোরলে একটা দিক

হয়তো অপূর্ণই হয়ে থাকবে। কিন্তু, খুব তৃপ্তি বোধ কোরতে লাগলো রিক্তা। বিবাহিত জীবন তো সেদিনই শেষ, যেদিন সে একটি অতিথি শিশুর মা হতে গিয়ে নারীত্বকে নবমে বলি দেবে।

না, না, নড়ে চড়ে বসলো সীটের ওপর রিক্তা। কিছুতেই বিয়ে কোরবেনা ও আর। তাছাড়া, ভাবলো রিক্তা, যে জীবনকে নিয়ে একদিন নানালোক ওকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে টাকা বিলিয়ে, সে জীবনের ক্ষুধা ওর ফুরিয়ে এসেছে আজ। একদিন মা বাপ ভাইকে উপোসের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে সে অনেক নিচে নেমে গিয়েছিলো, বাঁচিয়ে ছিল বিত্তহীন পঙ্গু, অসমর্থ বাবা মা বোন ভাইকে। আজ হয়তো সে ইতিহাস স্মরণ কোরে লাভ নেই, আজ উপার্জ্জনক্ষম ভাই সেটা মেনেও হয়ত ওকে বিয়েই কোরতে বোলবে! একদিনের চাকরীহীন ভাই সৌমেন আজ দু'শো টাকার চাকুরে, মোহিতের পাশাপাশি বসে। উদার হয়ে ছোট বোনের ওপর বদান্যতা দেখাতে ক্ষতি নেই তার।

হয়ত বল্‌বে, 'এবার একটা বিয়ে কর তুই।'

একটু হেসে বলবে রিক্তা ঃ 'বিয়ে ?'

'হাঁ'

'কেন ?'

'বারে, আমি তো মনে করি এটাই তোর বিয়ের উপযুক্ত বয়সে, পঁচিশ বছর একটা বয়সই নয় মেয়েদের !' দাদার গলা হয়তো একটুও বেসুরো হবে না।

রিক্তা বোলবে ঃ 'আরও কিছুদিন যাক না। এত ব্যস্ত হবার কি আছে ?'

'না না, ব্যস্ত আর কি !' দাদা নিজেকে যুক্তিযুক্ত কোরতে চাইবে ঃ 'টাকা পয়সারও তেমন অভাব যখন আর নেই, তাছাড়া মা বাবাও বা আর ক'দিন আছেন, এ সময় তোর বিয়ে দিলে তাঁরা সুখী হবেন খুবি।'

'তাই নাকি ? কিন্তু আমি যে ঠিক করে ফেলেছি।'

'কি ঠিক কোরেছিস ?'

গলা কাঁপবে না রিক্তার একটুও, বলবে ঃ 'ঠিক করে ফেলেছি, এত বয়সে আর বিয়ে করে লাভ নেই।'

'সে কি ! এটা একটা বয়স হোলো নাকি'—দাদা উপদেশের দেশ থেকে চমকের দেশে যাতায়াত সুরু করবেন। অবাক হয়ে বোলবেন ঃ 'না-না, রিক্তা, তুই ভুল ভেবেছিস্। বয়স তোর তেমন কিছুই হয়নি। আজকাল তিরিশ বছরেও হরদম মেয়েদের বিয়ে হোচ্ছে।'

হাসবে রিক্তা ঃ 'না, দাদা।'



'কি ?'

'আমি বিয়ে কোরবো না !'

'সে কি !'

রিক্তা হয়তো দাদার সামনে থেকে ওঠে আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চলে যাবে।

বেশ হবে।

ট্রাম ছুটতে ছুটতে এসে রাসবিহারী এভেন্যুতে ঢুকে পড়ল দেখে চম্‌কে ওঠলো রিক্তা।

নামতে হবে ওকে এখন, ষ্টপেজ সমাগত। ডোভার লেনে বাসা ওদের। ট্রাম থেকে নামলো রিক্তা।

নেমে হাঁটতে সুরু কোরলো।

কি হবে ভেবে আর ?

বাপ মা ভাই বোন আঘাত পাবে একটু। ব্যস, ওই পর্য্যন্ত। দাদার বিয়ে হবে, ছেলেমেয়ে হবে। ছোট বোনগুলো স্বামী আর একরাশি পুত্রকন্যা নিয়ে ডুবে যাবে। জট পাকাবে সব। তার মাঝে এই ক্ষুদ্র সমস্যাটাও ডুবে যাবে ওদের মনের অতলতলে। বেশ হবে। সারা জীবন অবিবাহিত স্বাধীন থাকবে সে।

নিজের বাসায় শেয়ালদা এলাকায় এসে পৌঁছলো মোহিত।

রাত হয়ে গেছে কোলকাতায়। গলির মোড়ে গ্যাসলাইটও জ্বলেছে।

লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে মোহিত একটা সিগারেট ধরালো। এক রাশ ধোঁয়া মুখের ভেতর চেপে রাখলে ও।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো জ্বলন্ত সিগারেটটা হাতে চেপে।

সিগারেট টানতে টানতে হঠাৎ মনে পড়লো ওর ঃ আজ সকালে ঘরের মেঝেতে হঠাৎ একটুকরো চিঠি পেয়েছে। সযত্নে মোহিত ওটা তুলে নিয়েছে। তারপর দেখেছে চিঠিটা ওকে লেখা নয়। চিঠিটা সাবিত্রীর।

সাবিত্রী ওর ছোটবোন।

হঠাৎ হাসি পেলো মোহিতের। পূর্ণ ধোঁয়ায় গ্যাসপোষ্টটাকে ছায়া কোরে দিতে চাইছে ওর মন। উনিশ বছরের সাবিত্রী !

সেও ভালবেসেছে !

অসিতকে।

পাশের বাড়ীর—তরুণ ছেলেটার সঙ্গে। ইউনিভারসিটীতে পড়ছে ছেলেটি—সায়েন্স।

পকেট থেকে চিঠির টুকরোটুকু আলোতে বার কোরে আনলো মোহিত। আলোর নিচে—চিঠিটা খুলে পড়লো আর হাসলো ও। সাবিত্রী লিখেছে অসিতকে।

হয়তো টেবিলের ওপর থেকে হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে পত্রটা। আর ও পায়নি, পেয়েছে মোহিত।

কি লিখেছে ?

হাসি পেলো মোহিতের—সাবিত্রী ওকে বিয়ে কোরতে চায়। অসিত ওর জীবনের প্রথম কাম্য। আরও লিখেছে—মেয়েদের পূর্ণতা বিবাহিত জীবনেই শুধু। অন্য কোথাও নয়।

ভীষণ হাসি পাচ্ছে মোহিতের। মনে হোচ্ছে, মেয়েমানুষগুলো সত্যি জটিল। যে জটিলতার কোন অর্থ নেই, যার নেই কোন যুক্তি।

পকেটে চিঠিটা নিয়ে বাড়ী ঢুকলো মোহিত। অনেক রাত হয়ে গেছে ঘড়িতে।

কিন্তু মোহিতই হেরে গেলো।

অনেক রাতে শোবার ঘরে অন্ধকারে মনে হোলো ওর, রিক্তা একটা সামান্য মেয়ে। তার কাছে কিছুতেই মোহিত পরাজিত হোতে রাজি নয়।

ঘুম এলো না ওর। নিস্তব্ধ বাড়ীতে হঠাৎ বিছানা থেকে ওঠে বসলো ও।

রিক্তা সারাজীবন বিয়ে কোরবে না ? পারবে রিক্তা !

অসম্ভব।

মোহিত ঘামতে লাগলো।

হ্যা।

অপেক্ষা কোরবে তাহলে মোহিত। কষ্ট স্বীকার কোরবে একটু ? চেয়ে দেখবে কতদিনে রিক্তার ওই অহঙ্কার বিচূর্ণ হয় !

মোহিত ঠিক কোরে ফেললো, সেও অপেক্ষা কোরবে। ত্রিশ হয়েছে মোহিতের। চল্লিশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোরবে সে। এই দশ বছরের মধ্যে রিক্তার মত একটা মেয়ের পরিবর্ত্তন হোতো একটুও অসুবিধা হবে না।

মোহিত হাসলো, সাবিত্রীর বিয়ে দিয়ে দেবে সে। আর নিজে অবিবাহিত থেকে যাবে। একটা মেয়ের কাছে নত হয়ে যেতে পারে না।

রিক্তাকে ও ভালবেসেছে। রিক্তা জানুক।

অফিসে সৌমেনের সঙ্গে দেখা হোলো মোহিতের। একই অফিসে একই কাজ করে ওরা, বলা চলে।



টিফিন আওয়ারের স্বল্প সময়টুকুতে রোজকার মত পরদিন আবার আলাপ হয় ওদের। দু'শো টাকার দু'জন দুই ভাইএর খাতিরে পাশাপাশি দু'টি চেয়ার টেনে আনে।

সৌমেনই অফার কোরলে সিগারেট। দেশলাই বার কোরলে মোহিত।

সৌমেন ধরালো সিগারেট। তারপর বললো : 'রাজী হলো ?'

'কে ?' জিজ্ঞেস কোরলে মোহিত।

'রিক্তা।' সৌমেন হাসলো।

'না।'

'বড় কঠিন স্বভাব ওর।'

'পাগলামি !' মোহিত হাসলো : 'বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে সব ভেঙে যায়। সৌমেনবাবু।'

'বয়েস !' সৌমেন হাসলো : 'মেয়েদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা দর্শন নিয়ে মাথা ঘামাতে সুরু করে যে।'

শুনে হো হো কোরে হেসে ওঠলো মোহিত। সিগারেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলে ডালহৌসির ফাঁকা আকাশে।

হঠাৎ সেদিকে তাকালো সৌমেন : "মোহিতবাবু !"

'বলুন।'

'একটা নতুন খবর আছে।'

'বলুন।' চমকে তাকাল মোহিত।

'কাল রাতে রিক্তার একটা প্রস্তাব এসেছে আমার কাছে।'

'তাই নাকি !'

'হ্যা। আমার বিয়ের।'

'আপনার ?'

'ইয়েস স্যার।' হাসলো সৌমেন।

'করুন বিয়ে—'

'ভাবছি।' সৌমেন তাকাল ওর মুখে।

মোহিতের আশ্চর্য্য লাগলো হঠাৎ। সবটুকুই যেন একটা কাহিনীর মতো এগিয়ে চলেছে ওদের জীবনে। আজ ও সাবিত্রীর বিয়ের প্রস্তাব কোরেছে বাড়ীতে। আর কাল রিক্তা কোরেছে সৌমেনের ওদের বাড়ীতে।

'চমৎকার !'

'কি হোলো ?' চমকে বল্লে সৌমেন।

'না। কিছু না।' হাসলো মোহিত।

'আর কি জানেন।' সৌমেন আবার বোললে, 'আরেকটা প্রস্তাব আমি পেয়েছি ওর কাছ থেকে।'

'কি ?'

'ওর চাকরীর।'

'মানে।'

'রিক্তা একটা চাকরী চাইছে। কাজ কোরবে ও।'

সিগারেটটা টেনে একটু অন্যদিকে সরে গেলো সৌমেন আজ।

কাজ কোরবে রিক্তা! ও।

নিজেকে চালনা কোরবার সবটুকু স্বাধীনতা নিজের হাতেই তুলে নিতে চাইছে রিক্তা। সব দিক থেকে নিজেকে স্বাধীন বোলে ঘোষণা কোরতে চাইছে ও।

মোহিত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে দূরে সেদিন।

একই ডালহৌসি অফিসে অনেকদিন পর আবার উঠতে উঠতে রিক্তার প্রসঙ্গই তুলে নিল সৌমেন।

বোধহয় অনেকদিন পেরিয়েছে এর ওপর দিয়ে। অনেকদিন। হিসেব হয়নি যার। অনেক বসন্ত। আর অনেক শীতের। তারপর এক বৈশাখের তপ্ত দুপুরে পাশাপাশি চেয়ারে আবার আলাপ সুরু হোয়েছে ওদের। সৌমেনের আর মোহিতের।

'এ অনেকটা দিল্লীকা লাড্ডু।'

'কি ?'

'মানুষের জীবনে বিবাহ।' বললো সৌমেন।

'কেন ?'

'বিয়ে করে বুঝতে পারছি, মোহিতবাবু। বেশ আছেন আপনারা। অন্তত স্বপ্ন দেখেছেন আজও।'

সিগারেট অফার কোরলো মোহিত সৌমেনকে: 'স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া কোরেছেন বুঝি আজ।'

'না। হাসলো সৌমেন: 'ঝগড়া লেগেছে নিজের মনের সঙ্গে।'

'সেকি!'

'হ্যা—বিয়ে করাটাই ভাল, না না-করাটাই মঙ্গল ?'

'কেন ?'



'এক গাদা ছেলেমেয়ে লেখাপড়া—অসুখ বিসুখ তাদের ভরণপোষণ আমাদের দিল্লী-লাড়ুরইত জীবন। একজনের ঘাড়েই সব বোঝা চাপিয়ে দেওয়া।"

মোহিত একটু হেসে বললে: 'মোটে পাঁচ বছরেই এই বোলছেন সৌমেনবাবু। আর কত লোক তো সারা জীবন কাটাচ্ছে বিয়ে কোরে। সুখীও হচ্ছে শুনি।'

'সুখী ?'

'হ্যাঁ।'

'অসম্ভব।'

'তাহলে ?'

'স্তোক আর মিথ্যে বুলি দিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন কোরছে, মশাই। আসলে কি জানেন, আমরা কেউ সুখী নই। যে বিয়ে কোরেছে সেও নয়। যে করেনি সেও না।'

সৌমেন হাসতে লাগলো অভিযোগহীন হাসি টেনে টেনে। তারপর বোললো: 'রিক্তার সঙ্গে দেখা হয় ?'

'হয়।'

'কিছু বলেছে ?'

'কি ?'

'এ সব কিছু ?'

'না।'

মোহিত চুপ কোরে গেলো আবার। অবিবাহিত রিক্তার কথা ভাবতে লাগলো ও।

একটা বিদেশী ফার্ম্মে ম্যানেজারের সেক্রেটারী হোয়েছে রিক্তা। মোটা রকম মাইনে পাচ্ছে।

কিন্তু যার ওপর দিয়ে পাঁচ বছরের একটা বিরাট ঢেউ পার হয়ে গেছে তার মধ্যে কিছু কিছু ভাঙাচোরার ঘটনাও অনুল্লেখ্য থাকতে পারে না।

সৌমেনের স্ত্রী ঘরে এসেছে, রিক্তার চোখের ওপর চারটি শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে তার। ছোট বোন দু'টির বিয়ে হয়েছে। তাদেরও ছেলেমেয়ে হয়েছে।

নাতিনাতনির সঙ্গ পেয়ে বাপ মা যেন অনেকটা দূরে সরে গেছেন রিক্তার কাছ থেকে। অফিসের হিসেব কোরতে কোরতে কখনও কখনও মনে হতে পারতো রিক্তার!

এসব কি হচ্ছে ?

ওর ছোট বোন একটি লাল টুকটুকে নাদুস নুদুস চেহারার ছেলেকে একদিন রিক্তার কোলের দিকে ছেড়ে দিয়েছে: 'নে দিদি।'

'কি ?'

'বাবলুকে নে।'

'না, না, ও তুই রাখ বাপু।'

ভয় পেয়েছে হঠাৎ রিক্তা। ত্রিশ হয়েছে তার, চুলের দু'একটায় ফ্যাকাশে রং দেখা দিচ্ছে।

কিন্তু নাছোড়বান্দা বোন জোর কোরেছে: 'ওমা! বাবলুকে নিতে তোর আপত্তি কেন রে দিদি ?'

'আপত্তি কে বললে ?'

'তবে নিলিনে যে !'

'ও এমনিই।' ভয়ে হৃদপিণ্ডটা দুলে ওঠেছে ওর। বাবা এসেছে নাতিকে চুমু খেতে।

'দিদি শোন্ !'

ছোটবোন ওকে টেনে নিয়ে এসেছে পাশের ঘরে। তার কোলে জোর কোরে ছোট্ট বাবলুকে বসিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আয়নার দিকে তাকা তো একবারটি !'

চম্‌কে গেছে ভীষণভাবে রিক্তা।

একি ! আয়নায় কাকে দেখছে সে ? রিক্তার কোলে কে ও ? রিক্তার কোলে শিশু সন্তান ?

'খুব ভালো মানিয়েছে, দেখছিস্ দিদি !' ছোটবোন বোললে।

'চুপ, থাম তুই' শির শির করে ওঠছে কেন যেন হঠাৎ রিক্তার মনটা। বুঝিবা মুখ নিচু হোয়ে গেল !

না না না। জোরে জোরে কলম চালাতে লাগলো রিক্তা। হিসেব, টাকা আনা পাই। চিঠিপত্র। একের পর এক বাঁধাধরা। দিনের পর দিনের এক হিসেব কোরে যেতে লাগলো। সেই সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ সেই মাসান্তে ক'টা টাকা প্রাপ্তির বিলাস। নিম্ন কর্ম্মচারীর কাছ থেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সম্মান-প্রাপ্তি, আদেশ প্রদান, দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, প্রহরের পর প্রহর ! এই ত জীবন !

কিন্তু, অবশেষে এই কি চেয়েছিলো রিক্তা ? বিয়ে না কোরে, বয়স পেরিয়ে স্বাধীন জীবন এই কি তার কামনা ছিল ?

বাড়ীতে মা বাবা ভাই বোন হয়তো তাকে ঘৃণা করে। হয়তো আত্মীয়তার মুখোসে সে ঘৃণার রূপান্তর হয়েছে করুণায়।

করুণা ! ওকে করুণা করে সবাই ! রিক্তার দু' কান লাল হয়ে ওঠলো। এবং হঠাৎ আজ একবার মনে হলো মোহিতকে।



নিজের ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালো রিক্তা, পাঁচ বছর আগের রিক্তার কত পরিবর্তন হোয়েছে পাঁচ বছর পরে। মুখের লাবণ্য ঝরে গেছে, কেমন একটা রুক্ষতা সেখানকার লাবণ্যকে চুরী করে নিয়েছে। সাড়া শরীরে ক্লান্তি এসেছে। দেহের ওপর এসেছে বয়সের শিথিল ছায়া।

একি হোলো !

হঠাৎ আয়নার সামনে নিজের দুরবস্থা লক্ষ্য কোরে মনে ওর বিষক্রিয়া সুরু হয়ে গেলো আজ। কেন তার যৌবন চলে যাবে ? কেন তার দেহের প্রতিটি অঙ্গে পুরুষের লোভকে বিঁধিয়ে জড়িয়ে রেখে মজা কোরতে পারবে না ? কেন তাকে সবাই করুণা কোরতে সুরু কোরবে ? উঃ !

আয়নার সামনে দু' হাতে মুখ চেপে ধরলো ও।

আর মনে পড়লো। তাইতো ! রাস্তাঘাটে, পথে ট্রামে বাসে কোন উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী, রূপসী মেয়েকে দেখলে আজকাল ওর মেজাজটা কেমন তিক্ত হয়ে ওঠে। কোন সুন্দরী অল্প বয়সী মেয়ের সঙ্গে ভাল ভাবে কথা আসেনা ওর, কোন তরুণ দম্পতির দিকে চেয়ে বিষিয়ে ওঠেছে ও মনে মনে !

মোহিত ! মোহিতের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে আজ বারবার। কি কোরছে ও ? বিয়ে কোরেছে ? নাকি—

হাত পা কাঁপতে লাগলো অকস্মাৎ রিক্তার।

ডালহৌসির অফিসে বসে আলাপ করেছিল তখন মোহিত সৌমেনের সঙ্গে।

'ভেবে দেখলাম।'

'কি ভাবলেন ?'

'রিক্তা আর রাজি হবে না।'

'আমারও তাই ধারণা'

নিজের বোন সম্বন্ধে মন্তব্য কোরতে আটকালো না একটুও সৌমেনের ঃ

'রিক্তা আর কাউকেই বিয়ে কোরবেনা।'

'কিন্তু—' কি ভেবে ভেবে আবার চুপ করে গেল মোহিত।

'কি লাভ এতে মোহিতবাবু—'

'এ্যাঁ', মোহিত চমকালো ঃ 'হ্যা সৌমেনবাবু বুঝতে পারছি এই পাঁচ বছর আমি শুধু ভুলই করে ফেলেছি। রিক্তা সেই মেয়ে নয়। তার পরিবর্তন অসম্ভব।'

মোহিত তপ্ত হয়ে ওঠলো আজ অকস্মাৎ : 'কিন্তু আমি পারবো না আর সৌমেনবাবু! আমি কবি নই যে বেঁচে থেকে অন্যদিকে কিছু সৃষ্টি কোরবো, সেই বিশাল ক্ষমতা আমার নেই। সাধারণ মানুষ আমি। আমি ভেবে দেখলাম বিয়েই করতে হবে আমায়।'

শুনতে ভালো লাগবার কথা নয় তবু ভালো লাগল সৌমেনের : 'আমরা নিয়মের মানুষ মোহিতবাবু!' কংগ্রাচুলেশন জানাল সে মোহিতকে।

আরও কিছুদিন ভাবলো, আরও কিছুদিন ইতস্তত কোরলো রিক্তা। অনেকদিন মোহিতের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। বেশ কয়েক মাস। এবার দেখা হওয়া দরকার, বিশেষ দরকার।

তারপর সব কুণ্ঠা আর চিন্তাকে ছিন্ন কোরে উঠে দাঁড়ালো রিক্তা। মোহিতকে-ই মোহিতকেই তার প্রয়োজন। একমাত্র মোহিতই এ ব্যাপারে সাহায্য কোরতে পারে তাকে, মোহিতেরও তো বিয়ে হয়নি। মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে ওঠল ও।

তারপর একদিন সোজাসুজি মোহিতের অফিসে গিয়ে ওঠলো। সৌমেন অবাক হোলো।

নেমে এলো মোহিত। 'নমস্কার!'

নমস্কার জানাল রিক্তা : 'আপনাকে বিশেষ দরকার আমার।'

মোহিত চমকে গেল : 'একি চেহারা হয়েছে আপনার রিক্তা দেবী! অসুখ কোরেছে?'

'না,' অস্বস্তি বোধ করছে ও : 'আপনি কেমন আছেন?'

সামান্য হাসল মোহিত : 'এক প্রকার। সম্প্রতি একটা বিয়ে করতে বাধ্য হোয়েছি আমি। ক্ষমা কোরবেন, আপনাকে সময় মতো খবরটা দিতে পারিনি!'

"যাঁরা প্রজ্ঞানী, নারীদের পঙ্কিলা মনে করেন, তাঁরা তাদের কাছ থেকে পরিতাপ না পেয়ে পরিত্রাণ পেতে চান পর্য্যটক হয়ে উত্তরাধ্যয়ন বা আত্মসমীক্ষাদ্বারা।" —মহাবীর বর্দ্ধমান।

# শিল্প-সংলাপ

'প্রাচী-ছন্দম' নামে একটি নৃত্যকলা প্রতিষ্ঠানের পত্তন ও অনুষ্ঠান দেখে এলাম। যাঁরা অগ্রণী হয়ে বাংলাদেশে এই নৃত্য-প্রতিষ্ঠানটি গঠন করলেন আজকের দিনে কেবল তাঁদের দ্বারাই এমন একটি অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প-চর্চ্চা-কেন্দ্র সুপুষ্ট হতে পারে বলে আমার ধারণা। সুপুষ্ট হবেই এ-কথা বলিনে, সুপুষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। উদয়শঙ্করকে দিয়ে এ-সম্ভাবনাটুকুও নেই। উদয়শঙ্কর উৎকৃষ্ট নৃত্য-শিল্পী কিন্তু 'প্রাচীছন্দমে'র পরিচালক মনিবর্দ্ধন প্রকৃত নৃত্যশাস্ত্রবিদ, যাঁর সমকক্ষ সম্ভবত ভারতবর্ষে আজ আর কেউ নেই।

মনিবর্দ্ধনের সুযোগ্য ছাত্রদল চারটি ভঙ্গীর নৃত্য পরিবেষণ করলেন : কত্থক, মনিপুরী, কথাকলি এবং যাভানীয়। প্রত্যেকটি নৃত্য তৎ-তৎ-দেশীয় ভঙ্গী অবিকল বহন করেছে বললে অত্যুক্তি ত হবেই না বরং সত্য প্রশংসা-লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে। বহু নাট্য-শাস্ত্রবিদের 'মত-পয়োনিধি' থেকে রত্ন সংগ্রহ করে ভরত এবং অভিনবগুপ্ত যে দু'টি শাস্ত্র লিখে যান তা-ই আমরা প্রাচীন 'ভারতনাট্য' এবং 'রসশাস্ত্র' হিসেবে পেয়ে এসেছি। শার্ঙ্গদেব সেই সমুদ্র থেকেই গুপ্তরত্ন আহরণ করে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' প্রণয়ন করেন। দেখা যায় ভারতবর্ষের ললিত-কলার প্রারম্ভ-শাল প্রাক্ চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্ত আমলের—হয়ত বিক্রমসম্বতের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট। অবশ্য সমুদ্রগুপ্তও ন্যূন নন। সুরশৃঙ্গার হাতে নিয়ে মুদ্রাঙ্কণ করবার মতো বৃত্তি যে সমুদ্রগুপ্তের ছিল তাঁকে ভরত কেন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরই বোধহয় সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। জমদ্বীপ-জমনদ্বীপ-জম্বুদ্বীপ থেকেই ষড়জ বা প্রথম সুরের আবির্ভাব যা থেকে ছয় রাগ জাত। আর জম্বুদ্বীপ বলতে রামায়ণ যবদ্বীপ বা যাভা-কেই বোঝাত। হরিবর্ম্মদেবের 'অষ্টসাহস্রিকা'য় পাই তিনি ছিলেন 'মহারাজং বরাজ যবামশ্বর স্রব' অর্থাৎ বিরাটরাজ যবদ্বীপেশ্বরের পুত্র উত্তর। যাভার যবনী উত্তরাকে অর্জ্জুন নৃত্য-গীতাদি শেখাতেন। সেই যবন-কন্যাটির আয়ত্ত-বিদ্যা থেকেই নাটকের যবনিকা বস্তুটির আবির্ভাব। 'ওঙ্কারধামে'র যবনিকারা একদিন ভারতের ছিলেন, আজ তাঁরা পৃথক। এমন কি হর্ষবর্দ্ধনের আমলেও নেপালের 'দেবযাত্রা'য় বা মহীপাল গুর্জ্জর-প্রতীহারদের কাণ্যকুব্জে ( কাণ্যকুব্জ নামটি ঋগ্বেদীয় ) যবনিকার সামনে এসে যবনী-কন্যারা নৃত্য-নাট্য দেখিয়ে গেছেন। কারণ রাজাভিষেকে, দেবযাত্রায়, নগর-প্রবেশে, বিবাহে, প্রিয়সঙ্গমে, পুত্রজন্মে তখনও 'নাট্যনৃত্যনৃত্তত্রয়'-এর প্রচলন ছিল। যে-বিজয়ী অর্জ্জুন পুত্রের জন্যে যাভানী যবনী উত্তরাকে জয় করে এনেছিলেন তিনি নেপালের জয়ার্জ্জুন, সমতটের সমুদ্রগুপ্ত, উত্তরভারতের হর্ষ বা কর্ণাটক পুলকেসি-ই হোন, যাভানী-নৃত্যগীতের স্মৃতি আজও সংরক্ষিত শিল্পশাস্ত্রগুলো পরিবেষণ করতে উদ্যত। উদয়শঙ্কর তা গ্রহণ করেননি, করেছেন মনিবর্দ্ধন। প্রথম স্বর ষড়জ জম্বুদ্বীপের ময়ুর থেকে আগত বলে জম্বুদ্বীপের নৃত্যেও ময়ুর-গতিতে পাদ-বিক্ষেপ নির্দ্ধারিত ছিল। নর্ত্তকীরা ছিলেন পক্ষিনী—কিন্নরী—পক্ষযুক্তা নরী। বৃহন্নলা-নৃত্যে যাভা-নৃত্যের সর্ব্বার্থ এবং সর্ব্বাঙ্গ সংযোজন করে মনিবর্দ্ধন নৃত্যটিকে শুধু শ্রীমণ্ডিতই করেননি পরন্তু ঐতিহাসিক সজ্ঞার প্রচুর প্রমাণ দিতে পেরেছেন।

হর্ষবর্দ্ধন ও পুলকেসি যমলার্জ্জুন কর্ণের মতো কাজ করেই মহাভারতীয় সংস্কৃতির মানুষ, বিশেষ-ভাবে

মোহিত তপ্ত হয়ে ওঠলো আজ অকস্মাৎ : 'কিন্তু আমি পারবো না আর সৌমেনবাবু! আমি কবি নই যে বেঁচে থেকে অন্যদিকে কিছু সৃষ্টি কোরবো, সেই বিশাল ক্ষমতা আমার নেই। সাধারণ মানুষ আমি। 'আমি ভেবে দেখলাম বিয়েই করতে হবে আমায়।'

শুনতে ভালো লাগবার কথা নয় তবু ভালো লাগল সৌমেনের : 'আমরা নিয়মের মানুষ মোহিতবাবু!' কংগ্রাচুলেশন জানাল সে মোহিতকে।

আরও কিছুদিন ভাবলো, আরও কিছুদিন ইতস্তত কোরলো রিক্তা। অনেকদিন মোহিতের সঙ্গে দেখা হয়নি ওর। বেশ কয়েক মাস। এবার দেখা হওয়া দরকার, বিশেষ দরকার।

তারপর সব কুণ্ঠা আর চিন্তাকে ছিন্ন কোরে উঠে দাঁড়ালো রিক্তা। মোহিতকে-ই মোহিতকেই তার প্রয়োজন। একমাত্র মোহিতই এ ব্যাপারে সাহায্য কোরতে পারে তাকে, মোহিতেরও তো বিয়ে হয়নি। মনে মনে আশ্বস্ত হয়ে ওঠল ও।

তারপর একদিন সোজাসুজি মোহিতের অফিসে গিয়ে ওঠলো। সৌমেন অবাক হোলো।

নেমে এলো মোহিত। 'নমস্কার!'

নমস্কার জানাল রিক্তা : 'আপনাকে বিশেষ দরকার আমার।'

মোহিত চমকে গেল : 'একি চেহারা হয়েছে আপনার রিক্তা দেবী! অসুখ কোরেছে?'

'না,' অস্বস্তি বোধ করছে ও : 'আপনি কেমন আছেন?'

সামান্য হাসল মোহিত : 'এক প্রকার। সম্প্রতি একটা বিয়ে করতে বাধ্য হোয়েছি আমি। ক্ষমা কোরবেন, আপনাকে সময় মতো খবরটা দিতে পারিনি!'

"যাঁরা প্রজ্ঞানী, নারীদের পঙ্কিলা মনে করেন, তাঁরা তাদের কাছ থেকে পরিতাপ না পেয়ে পরিত্রাণ পেতে চান পর্য্যটক হয়ে উত্তরাধ্যয়ন বা আত্মসমীক্ষাদ্বারা।" —মহাবীর বর্দ্ধমান।

## শিল্প-সংলাপ

'প্রাচী-ছন্দম' নামে একটি নৃত্যকলা প্রতিষ্ঠানের পত্তন ও অনুষ্ঠান দেখে এলাম। যাঁরা অগ্রণী হয়ে বাংলাদেশে এই নৃত্য-প্রতিষ্ঠানটি গঠন করলেন আজকের দিনে কেবল তাঁদের দ্বারাই এমন একটি অতি-প্রয়োজনীয় শিল্প-চর্চ্চা-কেন্দ্র সুপুষ্ট হতে পারে বলে আমার ধারণা। সুপুষ্ট হবেই এ-কথা বলিনে, সুপুষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। উদয়শঙ্করকে দিয়ে এ-সম্ভাবনাটুকুও নেই। উদয়শঙ্কর উৎকৃষ্ট নৃত্য-শিল্পী কিন্তু 'প্রাচীছন্দমে'র পরিচালক মনিবর্দ্ধন প্রকৃত নৃত্যশাস্ত্রবিদ, যাঁর সমকক্ষ সম্ভবত ভারতবর্ষে আজ আর কেউ নেই।

মনিবর্দ্ধনের সুযোগ্য ছাত্রদল চারটি ভঙ্গীর নৃত্য পরিবেষণ করলেন : কত্থক, মনিপুরী, কথাকলি এবং যাভানীয়। প্রত্যেকটি নৃত্য তৎ-তৎ-দেশীয় ভঙ্গী অবিকল বহন করেছে বললে অত্যুক্তি ত হবেই না বরং সত্য প্রশংসা-লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে। বহু নাট্য-শাস্ত্রবিদের 'মত-পয়োনিধি' থেকে রত্ন সংগ্রহ করে ভরত এবং অভিনবগুপ্ত যে দু'টি শাস্ত্র লিখে যান তা-ই আমরা প্রাচীন 'ভারতনাট্য' এবং 'রসশাস্ত্র' হিসেবে পেয়ে এসেছি। শার্ঙ্গদেব সেই সমুদ্র থেকেই গুপ্তরত্ন আহরণ করে 'সঙ্গীত-রত্নাকর' প্রণয়ন করেন। দেখা যায় ভারতবর্ষের ললিত-কলার প্রারম্ভ-শাল প্রাক্ চন্দ্রগুপ্ত-সমুদ্রগুপ্ত আমলের—হয়ত বিক্রমসম্বতের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট। অবশ্য সমুদ্রগুপ্তও ন্যূন নন। সুরশৃঙ্গার হাতে নিয়ে মুদ্রাঙ্কণ করবার মতো বৃত্তি যে সমুদ্রগুপ্তের ছিল তাঁকে ভরত কেন স্বয়ং ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরই বোধহয় সম্ভ্রমের চোখে দেখতেন। জমদ্বীপ-জমনদ্বীপ-জম্বুদ্বীপ থেকেই ষড়জ বা প্রথম সুরের আবির্ভাব যা থেকে ছয় রাগ জাত। আর জম্বুদ্বীপ বলতে রামায়ণ যবদ্বীপ বা যাভা-কেই বোঝাত। হরিবর্ম্মদেবের 'অষ্টসাহস্রিকা'য় পাই তিনি ছিলেন 'মহারাজং বরাজ যবামশ্বর স্নব' অর্থাৎ বিরাটরাজ যবদ্বীপেশ্বরের পুত্র উত্তর। যাভার যবনী উত্তরাকে অর্জ্জুন নৃত্য-গীতাদি শেখাতেন। সেই যবন-কন্যাটির আয়ত্ত-বিদ্যা থেকেই নাটকের যবনিকা বস্তুটির আবির্ভাব। 'ওঙ্কারধামে'র যবনিকারা একদিন ভারতের ছিলেন, আজ তাঁরা পৃথক। এমন কি হর্ষবর্দ্ধনের আমলেও নেপালের 'দেবযাত্রা'য় বা মহীপাল গুর্জ্জর-প্রতীহারদের কাণ্যকুব্জে ( কাণ্যকুব্জ নামটি ঋগ্বেদীয় ) যবনিকার সামনে এসে যবনী-কন্যারা নৃত্য-নাট্য দেখিয়ে গেছেন। কারণ রাজাভিষেকে, দেবযাত্রায়, নগর-প্রবেশে, বিবাহে, প্রিয়সঙ্গমে, পুত্রজন্মে তখনও 'নাট্যনৃত্যনৃত্তত্রয়'-এর প্রচলন ছিল। যে-বিজয়ী অর্জ্জুন পুত্রের জন্যে যাভানী যবনী উত্তরাকে জয় করে এনেছিলেন তিনি নেপালের জয়ার্জ্জুন, সমতটের সমুদ্রগুপ্ত, উত্তরভারতের হর্ষ বা কর্ণাটক পুলকেসি-ই হোন, যাভানী-নৃত্যগীতের স্মৃতি আজও সংস্কৃত শিল্পশাস্ত্রগুলো পরিবেষণ করতে উদ্যত। উদয়শঙ্কর তা গ্রহণ করেননি, করেছেন মনিবর্দ্ধন। প্রথম স্বর ষড়জ জম্বুদ্বীপের ময়ুর থেকে আগত বলে জম্বুদ্বীপের নৃত্যেও ময়ুর-গতিতে পাদ-বিক্ষেপ নির্দ্ধারিত ছিল। নর্ত্তকীরা ছিলেন পক্ষিনী—কিন্নরী—পক্ষযুক্তা নরী। বৃহন্নলা-নৃত্যে যাভা-নৃত্যের সর্ব্বার্থ এবং সর্ব্বাঙ্গ সংযোজন করে মনিবর্দ্ধন নৃত্যটিকে শুধু শ্রীমণ্ডিতই করেননি পরন্তু ঐতিহাসিক সজ্জার প্রচুর প্রমাণ দিতে পেরেছেন।

হর্ষবর্দ্ধন ও পুলকেসি যমলার্জ্জুন কর্ণের মতো কাজ করেই মহাভারতীয় সংস্কৃতির মানুষ, বিশেষ-ভাবে

প্রাচ্য-পুরুষ নন। তবে রামায়ণ সবিশেষভাবে প্রাচ্যের জিনিষ। তেম্নি সমুদ্রগুপ্ত বা দিগ্বিজয়ী কালিদাসীয় রঘু নিঃসন্দেহে সমতটের কালো মানুষ। যেম্নি কবির উদার দৃষ্টিতে, তেম্নি ঐতিহাসিকের অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিতে সমুদ্রকে সমতটের সংলগ্ন করতে হয়েছে। রঘুবংশের এই প্রথম পুরুষটিকে আসাম-রাজ বলবর্ম্মণ হিসেবে দেখা যায়—তিনি বীরবাহু-সুত। সমতটের মুদ্রায় বাংলার অহোম-রাজ বিজয়সিংহকেও অরণ্যাঞ্চলে খুঁজে পাই। বিজয়সিংহ 'মহানাদে' যে রঘুবংশ পত্তন করেছিলেন তা যখন আসামে বিস্তৃত—তখন সেখানকার মনিপুরে কৃষ্ণবিলাসিনীদের (লাইছাবি, লিচ্ছবী যাঁরা দেবদাসীষৎ নৃত্য করেন) বা অর্জ্জুন-বিজিত চিত্রাঙ্গদাদের ঋষিতুল্য ঋষভ-স্বর এবং চাতক-ভঙ্গী দেখে চন্দ-রঘু-প্ত নিশ্চয়ই মোহিত হয়েছেন। যখন সোমবংশী নেপালে রঘুবংশ অধিবাসিত তখনও নৃত্যপরা লিচ্ছবী যক্ষিণীদের সঙ্গচ্যুত হননি তাঁরা। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ান্তে দক্ষিণগামী হয়ে যক্ষিণী-নন্দনরা অভিশপ্ত হলেন। তখন আবার কাব্যশক্তিতে তাঁরা অদ্ভুত পারদর্শিতা লাভ করেছেন—পারেন মেঘদূত বা পবনদূত রচনা করতে। আর কর্ণাটকদের স্পর্শে এসে নাটকেও হয়েছে তাঁদের অপূর্ব্ব সিদ্ধি। গুপ্তমালব্য বর্ম্মণকুল মালব-রাজ হয়ে 'বিক্রমোর্ব্বশী' নাটক অভিনয় করালেন। সেখানে তাঁদের আরব সমুদ্রে মুদ্রা ছিল বটে কিন্তু রুদ্রতাও ছিল প্রচুর। রঘুজ অজের সমুদ্র কর্ণাট-কুলে অজগরের মতো দুলত। হরিদ্রাবাদের 'পালমপেত' মন্দিরে লিচ্ছবীর চাতক ভঙ্গীতে দেবদাসীরা 'অঙ্গ'-ভঙ্গী যোজনা করে যেম্নি কণ্থক নৃত্য বা কার্ত্তিক+বক (ময়ুর+ক্রৌঞ্চ) নৃত্য প্রবর্ত্তিত করলেন আর যেমন তা বররোহা বা ঘোটকী নৃত্যে (বাজী-ভঙ্গী) মন্দিরগাত্রে পর্য্যবসিত হ'ল ('পালমপেত' বা 'পালপ্রেত' মন্দিরের ভাস্কর্য্য দ্রষ্টব্য) তেম্নি অশোকের সাঞ্চী-স্তূপের তোরণে তা কথঞ্চিৎ সংযত হয়ে এলো কামরূপী হস্তি-গমন অনুকরণ করে। হস্তি-গমনটি ইন্দ্রাণী করভোরু কারুবাকীরই (অশোকপত্নী) ছিল বলে তা ইন্দ্রনৃত্য, যেম্নি ময়ূর-নৃত্য কাত্যায়নীসূত দেবসেনা কার্ত্তিক দ্বারা অনুকৃত হয়ে হ'ল 'কথাকলি' নৃত্য। এ-কার্ত্তিক সিংহলী 'দূতগমনু'—বিজয়সিংহেরই বংশধর—সিংহলে 'কতোগমু' মন্দিরে এখনও এ-স্কন্দ-মূর্ত্তি আছে—'কথাকলি'-ভঙ্গীতে তিনি ময়ূরাসীন। পুলকেসি-হর্ষের আমলেও 'ভারুকচ্ছ' আর 'করভূর' বন্দর থেকে এ-ভঙ্গী আরবে-পারশ্যে রপ্তানি হয়েছে।

'কণ্থক' বাজী নৃত্য 'বাইজী' নৃত্য হ'ল সেদিন যেদিন 'পালমপ্রেতে'র পীত-হরিদ্রা আরব-সমুদ্র পারের ইজিপ্তের অজ-পীতের ছোঁওয়া পেল। হরিদ্রা সমুদ্র-ক্ষারের ছোঁওয়ায় লাল হয়ে গেল। বসন্তের কী হোলি উৎসব সেদিন! আমাদের বিদ্যাসুন্দর এবং ভাগবদগীতা তার কথকতা বহন করছে। তারপর হৈহয়দের 'হয়' দ্রাব হয়ে হায়দ্রাবাদ হল। কাজেই উর্ব্বশী আকাশে উড়ে গিয়ে হ'ল মর্ত্ত্যে বাইজীর আবির্ভাব। উর্ব্বশীও পালিয়েছিলেন পুরূরবারই আমলে সুতরাং আরব-সাগরের ছোঁওয়াটাও ইদানীংকার ছোঁওয়া নয় কিন্তু সেসব ইতিহাস 'মত-পয়োনিধি'র অতলে। বহু যত্নে ও পরিশ্রমে হয়ত তা জানা যায়। কিন্তু কে জানাবে? শ্রীমান মনিবর্দ্ধনকে আমাদের অনুরোধ তিনি যেন আরো খানিকটা পরিশ্রম আমাদের জন্যে স্বীকার করেন। তাঁকে এ সান্ত্বনা বা আশ্বাস দিতে পারি যে সে-টা তাঁর পণ্ডশ্রম হবে না এবং তার ফলে বহুভণ্ডামি ধূলিসাৎ হবে।

**সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**

'অগাধবোধমন্থেন তেষাং মতপয়োনিধিম্'

# নূতন বই

## কথা-সাহিত্য

পূর্ণকুম্ভ : রাণী চন্দ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। দাম চার টাকা।
মনের ময়ূর : প্রতিভা বসু। নাভানা। দাম তিন টাকা।

আজকাল অবনীন্দ্রনাথের গল্প রীতি যাঁরা অনুসরণ করেন, রাণী চন্দ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। গল্পে চিত্র রচনার শিল্প রাণী চন্দের আয়ত্তাধীন। ঘরোয়া কথা লিখতে যে তিনি অতি নিপুণ, এই পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। বর্তমান গ্রন্থখানিও সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

আলোচ্য গ্রন্থ-খানিকে মোটামুটি ভাবে রম্য রচনার স্তরভুক্ত করা চলে। বাঙ্গালা ভাষায় এই জাতীয় গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর থাকলেও সংখ্যায় তা খুবই কম। সে কারণে রাণী চন্দের কাছে আমরা ঋণী।

পূর্ণকুম্ভ গ্রন্থখানি রম্য রচনার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। লেখিকা তার তীর্থ যাত্রার কাহিনী অনেকগুলি ছবি এঁকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তিনি 'স্কেচ' করার কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর সেই স্কেচগুলি দেখার সৌভাগ্য না হলেও খুব ক্ষতি হল মনে হয়না। কথা দিয়ে তিনি যে স্কেচগুলি গ্রন্থ-পৃষ্ঠায় সংযোজনা করেছেন তা একদিকে তার শিল্পী মনের পরিচায়ক, অন্যদিকে তাঁর চিত্র-রচনা নৈপুণ্য প্রকাশ করে।

তবে 'স্কেচ' অপেক্ষা 'ডিটেল' ছবি তাঁর অনেক বেশী। আর এই ছবিগুলির বর্ণনা, নৈপুণ্য, রঙ এবং ঢঙ অত্যন্ত বিশদ এবং বিস্তৃত হওয়ায় বহু স্থানে মনে হয় শিল্প-বোধ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গ্রন্থটিতে মানসিক দিকও সে-কারণে বহিরাশ্রয়ী। কিন্তু যেখানে তিনি মানুষকে তার বহিরঙ্গের দিক থেকে না দেখে তাকে সরাসরি পাঠকের মনের সামনে উপস্থিত করেছেন, সেখানেই তিনি এক একটি সার্থক চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বড়দি, দাদা বা ব্রজরমন তার সার্থক উদাহরণ। বিভিন্ন তীর্থস্থান, মন্দির এবং দেবদেবীর সম্পর্কে যে-সকল ঐতিহাসিক কাহিনী এবং জনশ্রুতি আছে সেগুলিও লেখিকা খুব যত্নের সঙ্গে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে সুবিধে হয়েছে আমাদের অনেক। তীর্থস্থানের ছবি দেখতে দেখতে তার ইতিহাসও আমাদের জানা হয়ে যায়।

সবচেয়ে উল্লেখ্য বিষয় হল, স্থানবিশেষে ছাড়া মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি-সূচক মনোভাব।

কিন্তু একটি প্রশ্ন লেখিকা বারে বারে নিজের কাছে করেছেন। তার কি উত্তর তিনি পেলেন আমাদের জানাননি। সংসারের সুখ-ভোগ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীদের কৃচ্ছ্র-সাধনার সত্যি যে কি অর্থ তা আমি জানিনা। লেখিকা ত এ সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। 'অগ্রজের অটল বিশ্বাস' ছাড়াও মানুষের মনে কিছু যুক্তির স্থান আছে। তিনি সে যুক্তিকে শুধু প্রশ্ন করেই এড়িয়ে গেলেন। নাগা সন্ন্যাসীদের অশ্লীল ও বীভৎস খেলা, যা যাত্রীরা সকৌতুকে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখে, অথবা নাম

করা সাধুবাবাদের ঈশ্বর সম্পর্কে হাস্যকর উক্তিও তাঁকে কথঞ্চিৎ বিরক্ত করেছে বলে মনে হয়না। তিনি বুঝি বিশ্বাস করতেই ভালবাসেন। তাই বিশ্বাসে কৃষ্ণ পাবেন, এমন একটা মনোভাবই ফুটে উঠেছে সর্বত্র। যে-সব ঘটনা বা যে-সব সাধুদের কাহিনী পরম শ্রদ্ধাভরে তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, তা যে কত হাস্যকর ও যুক্তি-বিরোধী, একথা কোনো সময়েই নিরপেক্ষভাবে তিনি ভেবেছেন বলে মনে হয়না। ধর্মের মৌতাতে যেন তিনিও সব ঝাপসা দেখছেন।

মধ্যে মধ্যে তিনি দাঙ্গার কথায় বেদনা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু উল্লেখ করেছেন শুধু পূর্ববঙ্গের। দাঙ্গার বীভৎসতা সম্পর্কেই মন পীড়িত হয় তা' কেবল পূর্ববঙ্গের দাঙ্গা বলেই নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থটির ভাষা স্বতস্ফূল। কিন্তু যেখানে তিনি তাঁর শিশু মনকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেখানে যেন মনের শৈশবের পরিচয় দিয়েছেন। ভাষা এখানে বড় এলিয়ে গেছে। আর লালিত্যের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী হওয়ায় গদ্যের চরিত্র নষ্ট হয়েছে। চিত্রল গদ্যও ঋজু হতে পারে এধারনা অনেকের মত তিনিও বুঝি ভুলেছেন।

এই সব একটির কোনটিই তেমন গভীর নয়, যাতে পাঠকের রসগ্রহণে বাধা হতে পারে। গ্রন্থখানি মোটামুটিভাবে প্রশংসার যোগ্য। শুধু তাই নয়, রসিক পাঠক মাত্রেই গ্রন্থের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হবেন একথা জোর করেই বলা যায়। চিত্র-রচনায় লেখিকার শিল্প-বোধ অবনীন্দ্রনাথের অনুস্মৃতি হলেও অনুকরণ নয়। রাণী চন্দের অন্যান্য গ্রন্থের মত এটিও সাগ্রহে সমাদৃত হবে বলেই আমার ধারণা।

ভালো কোনো বইয়ের লেখক বা লেখিকা সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল অনিবার্য। লেখিকা আমাদের তা আংশিক ভাবে পূরণ করেছেন। 'এ বোধ হয় নেপাল দেশেরই মেয়ে হবে; কেমন সুন্দর গোলগাল দেখতে'—তাঁর সম্পর্কে জনৈক নাগা সন্ন্যাসীর এই উক্তি গ্রন্থটিতে সংযোজিত করার মধ্যে অবিনয় থাকলেও, তাতে আমরা লাভবানই হয়েছি। এখন কোনো সময়ে দেখলেই তাঁকে চিনতে পারব আমরা। এত সুন্দর ছবি তিনি আমাদের মনে গেঁথে দিয়েছেন।

আলোচ্য অপর গ্রন্থটি প্রতিভা বসুর সাম্প্রতিক উপন্যাস 'মনের ময়ূর'। সুমিত্রার অপমৃত্যু পড়বার পর যে-কোনো পাঠকই তাঁর নূতন রচনার জন্য সাগ্রহ। মনের ময়ূর যদিও উপন্যাস তালিকা-ভুক্ত, তবু একে বড় গল্প বলাই সমীচীন।

ভাষার কারুকার্যে প্রতিভা বসুর দক্ষতা অনস্বীকার্য, অন্তত গ্রন্থটির প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা, এবং শেষ পৃষ্ঠার শেষ পরিচ্ছেদ। তবে বুদ্ধদেব বসুর অতি স্পষ্ট প্রভাব স্থানে স্থানে বড়ই প্রকট। ভাষার ক্ষেত্রে অনুকৃতি সত্ত্বেও চরিত্রায়ণে প্রতিভা বসু পুরণো বুদ্ধদেব বসু-কে অতিক্রম করতে পারেন নি। নায়কের অবধারিত যে গুণগুলি আমরা এতকাল বুদ্ধদেব বসুর গল্পে উপন্যাসে পেয়ে এসেছি সেই চরিত্র লক্ষণ তিনি এখন অস্বীকার করলেও লেখিকা করেন নি।

কিন্তু চরিত্র-রচনার বেলায় শ্রীযুক্তা বসু সুবিবেচনা দেখাতে পারেন নি। অনুসূয়ার প্রতি মনে হয় লেখিকা আমাদের সহানুভূতি-ই আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই চরিত্রটির প্রতি আমাদের শুধু ঘৃণাই হতে পারে। বিনয়ের বিরুদ্ধে কোর্টে অনুসূয়ার বক্তব্যটি অত্যন্ত অবাস্তব মনে হয়। একটি কি দুটি বেত খেয়ে—মনে হয়না এমন কোনো মেয়ে আছেন যে অবলীক্রমে জীবনের সমস্ত মহৎ ও



সুন্দর মূল্যগুলোকে অস্বীকার করে বসবে। আর এই স্বীকৃতির জন্য যে চরম দুঃখভোগ করতে হবে তাকে, তাও অজানা নয় অনুসূয়ার। তবু এই ঘটনাটির সামঞ্জস্য রক্ষা করতে লেখিকা শুধু চেষ্টামাত্র করেছেন। অথচ এই ঘটনাটির ওপরেই সমস্ত গল্পটির বনিয়াদ।

ঝরঝরে ভাষার জন্য বইখানা আগাগোড়া পড়ে ফেলা যায়। অবশ্য এইটিই কোনো গ্রন্থের বর্তব্য মাপকাঠি কিনা, সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ বহু অপাঠ্য বইও আজকাল সাধারণ পাঠক অবলীলাক্রমে প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে যান, এবং অধীর আগ্রহে।

—নৃপেন্দ্র সান্যাল

## কবিতা

পদধ্বনি—অনিল বিশ্বাস—জেনারেল প্রিণ্টার্স।

'পদধ্বনি' একখানা আধুনিক কবিতার বই। এই বইএর কবিতাগুলি আধুনিক কবিতার খাসা নমুনা। আধুনিক কবিতার ভাব, ভাষা, ছন্দ ও আঙ্গিক সবই স্বতন্ত্র ধরণের। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার রসনা এখনো আধুনিক কবিতার রসাস্বাদনে অনভ্যস্ত। এ জিনিস এখনো আমরা খোলা মনে মেনে নিতে পারিনি। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ কবিতার জনপ্রিয়তা তাঁর গদ্য কবিতা পায়নি। ছন্দোবদ্ধ কবিতা ও গদ্য কবিতা দুই বিভিন্ন যুগমানসের প্রতিচ্ছবি। অতিক্রান্ত যুগের জীর্ণ ঐতিহ্যের প্রেত হস্তের স্পর্শ থেকে আধুনিক কবিতা মুক্তি পেতে চায়। নতুন যুগের ভাবধারা শিল্পের পুরাণো ঐতিহ্যের মাধ্যমে পূর্ণ অভিব্যক্তি পায় না—দুটো বিসংবাদী জিনিস পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ছন্দোবদ্ধ কবিতার যে যুগমানস আর এখানকার যে যুগমানস এর মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। সে যুগের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা অনেক দূর সরে এসেছি, তাই প্রকাশ ভঙ্গীর মধ্যে এতো ফারাক।

এই বই এর অনেকগুলি কবিতা অত্যধিক ভারতীয় জীবনের সার্বজনীন সমস্যা নিয়ে। আমরা এক আশাভঙ্গের, মোহভঙ্গের যুগে বাস করছি। ফরাসী বিপ্লবের পর যে ক্ষোভতাপ, যে বিষাদ অবসাদ ইউরোপীয় দেশগুলিকে আচ্ছন্ন করেছিল সেই জিনিসই আমাদের দেশের গণচিত্তে অন্তর্গূঢ় অবস্থায় রয়েছে। আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উৎকর্ষের স্তর যদি ইউরোপীয় দেশগুলির মত হত তা হলে গণচিত্তের এই মৌন বেদনা শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, ইতিহাসে বাঙ্ময় হয়ে উঠত। ফরাসী বিপ্লবে অরুণরাগে যখন ইউরোপের আকাশ রাঙা হল তখন শুধু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কোলরিজ প্রভৃতি তরলমতি কিশোরদলের চিত্তই যে নতুন আশায় দোলায়িত হয়েছিল তা নয় গ্যেটে, ব্যাণ্টের মত স্থিতধী মনীষীরাও রঙীন আশার অভিঘাতে বিচলিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী বাহিনীর বিজয়ের পর গ্যেটে বল্লেন—A new age begins here and now. ভিয়েনার শান্তি সম্মেলনে যখন ফরাসীবিপ্লবের সমাধি রচিত হল তখন গ্যেটে বলেছিলেন—I thank God that I am not young in so thoroughly finished a world. ভাবের রাজ্যে আমরা ভার্সে থেকে ভিয়েনায় এসেছি। মুক্তির যে স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম আর তার যে বাস্তবরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার মধ্যে কি মর্মন্তুদ ব্যবধান! সংগ্রামের যুগে আমরা দেখেছি সমষ্টিকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার

জন্য ব্যষ্টির অকুণ্ঠিত আত্মদান। আমরা ভেবেছিলাম "নূতন উষার স্বর্ণদ্বার, খুলিতে বিলম্ব নাহি আর।" সংগ্রামের অবসানে দেখছি সমষ্টির অধিকারকে আত্মসাৎ করছে ব্যষ্টি। "বীরের রক্ত স্রোত" "মাতার অশ্রুধারা" ধরার ধূলায় হারিয়ে গেল। "চিনি ব'লে নিম খাওয়ালে ঘুচলো না কো মনের তিতো"—জাতীয় অদৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাস শ্রীযুক্ত অনিল বিশ্বাসকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

পদধ্বনিতে কবিমানসের বিচিত্র শক্তির অভিব্যক্তি পাঠককে চমকিত করবে, কবির সংস্কৃতিসমৃদ্ধ মন পাঠকের শ্রদ্ধা জাগাবে, বিচ্ছিন্ন অংশের রূপের ঐশ্বর্য্য, রসের প্রগাঢ়তা খুঁতখুঁতে সাহিত্যবিচারকের কাছে-ও অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবে। কবিতাগুলি অবশ্য আদ্যোপান্ত রূপেরসে ভরপুর নয়। মাঝে মাঝে রসের ক্ষীণতা, রূপের ন্যূনতা পাঠকের চোখে পড়বে। তবে এ বই এর কবিতাগুলি আমাদের মনে পূর্ণতর সৃষ্টির প্রত্যাশা জাগায়। কবির সাধনা তাঁকে সিদ্ধির সিংহদ্বারে উপনীত করেছে, প্রতিশ্রুত সিদ্ধির রাজ্যে তিনি অচিরে প্রবেশ করবেন—আমরা উৎসুক হয়ে সেই অনাগত শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সন্তোষ প্রতিহার

## সাহিত্যিকী

**সাহিত্য প্রবাহ ঃ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, এম-এ ; এ, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড।**

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-কৃত সাহিত্য-প্রবাহ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সাহিত্য প্রবন্ধের সংকলন। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থকার কলিকাতার একটি কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, সাহিত্যকর্ম ও ভাবনার অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎ সুফল তিনি এই গ্রন্থে ধরে দেবার চেষ্টা করেছেন। সংকলিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বৈচিত্র্য লক্ষনীয়। 'জাপানী কবিতা' 'অ্যাণ্টন চেকভ' 'কবি হালি,' 'কবি ইকবাল,' 'আধুনিক বাংলার কবিতা,' 'গোবিন্দচন্দ্র দাস,' 'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত,' 'ছোট গল্প,' 'সোনার তরী,' 'রক্তকরবী,'—প্রবন্ধগুচ্ছ থেকে বেছে কয়েকটির নাম করা হল। এ থেকে আর কিছুর প্রমাণ হোক না-হোক এটি অন্তত: প্রমাণ হয় যে, লেখকের কৌতূহল বহুপথসঞ্চারী, সাহিত্যের ভোজশালায় তিনি বিচিত্র ভোজ্যের স্বাদেচ্ছু। লেখকের এই বৈচিত্র্যমুখিনতাকে আমি তাঁর মনের সচলতার একটি প্রমাণ বলে মনে করি। একপন্থানুবর্তী ও একদেশদর্শী অধ্যাপনাবৃত্তির সঙ্কীর্ণতা যে গ্রন্থকারকে স্পর্শ করতে পারে নি এটা একটা সুলক্ষণ।

গ্রন্থকারের সমালোচন-শক্তি, বিশ্লেষণী প্রতিভা চমক লাগাবার মতো কিছু না হলেও মোটামুটি প্রতীতি-যোগ্য। ভাষা মনোরম, সুখোচ্চার্য। গ্রন্থের রবীন্দ্র-রচনা সম্পর্কে যে কয়টি নিবন্ধ সংকলিত হয়েছে তাতে ধরতাই বুলির প্রতি অধ্যাপকসুলভ মোহ চোখে পড়ল। 'সোনার তরী,' 'খেয়া,' 'রক্তকরবী' সম্পর্কে মৌলিকত্ব-বর্জিত একই প্রকারের গদগদ ভাষণের পুনরাবৃত্তি কত আর দেখব? এ-সব স্কুল আর কলেজ ম্যাগাজিনের বিচার্য বিষয়, সেখানেই নিবদ্ধ থাকা ভালো। এই একটি ব্যাপারে অন্তত বর্তমান ক্ষেত্রে সমালোচকের উপর পেশাদার অধ্যাপকের জয় হয়েছে। অধ্যাপকের পক্ষে যেটা জয় সাহিত্যিকের পক্ষে তা পরাজয় স্বরূপ, এ কথা স্মরণ রাখা ভালো।

নারায়ণ চৌধুরী


আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
( অর্থনীতি বিষয়ক )
দু টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা ঃ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, ক লি কা তা

# ক্রমোন্নতির পথে

গত ৪৫ বৎসর যাবৎ হিন্দুস্থান প্রতি বৎসরই নূতন নূতন শক্তি ও সমৃদ্ধি আহরণ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতির গৌরবময় ইতিহাস রচনা করিয়া চলিয়াছে। ভারতীয় জীবন-বীমার অগ্রগতির পথে হিন্দুস্থানের এই ক্রমোন্নতি বিশেষ-ভাবে লক্ষণীয়। ১৯৫১ সালের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে পূর্ব্বের মতই ইহার আর্থিক সারবত্তা, সততা ও পরিচালন-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

মোট চলতি বীমা—৮১,০২,৩৬,১৬৪৲
বীমা তহবিল— ১৭,৬৬,১৯,৬২৮৲
প্রদত্ত ও দেয় দাবীর পরিমাণ—৮৩,৫৭,৯৭৮৲

নূতন বীমা
১৬,২৮,৮৫,৮০০৲

## হিন্দুস্থান কো-ওপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড্
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা।



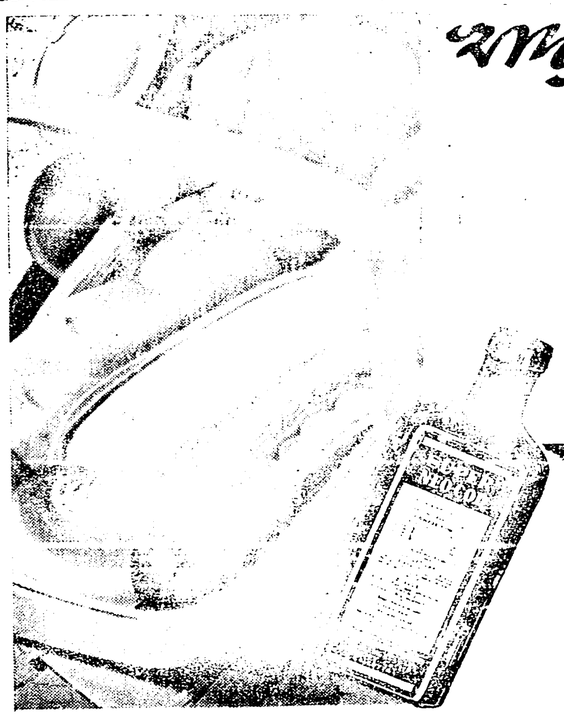

# প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সবপ্রকার রোগাদিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিউ-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ, ডি, বি, সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিউ-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩



# বিজ্ঞাপন

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

**কবিতা**

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**নতুন দিন**
আট আনা

**যৌবনোত্তর**
আট আনা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
**স্বাক্ষর**
এক টাকা

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পতাকা**
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
**নয়নচারা**
দেড় টাকা

**উপন্যাস**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

**কস্মৈদেবায়**
( ২য় সং )
তিন টাকা

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
**তিনরঙ**
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


# টুকরো কথা... (২৩)

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হয়ে ছুটে গেলেন বাড়ির মধ্যে। এক থালা মিষ্টি নিয়ে এলেন। বললেন, 'এগুলি বর্ধমান থেকে এসেছে।'

মিষ্টিমুখের পর বিদ্যাসাগরের দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে বললেন রামকৃষ্ণ, 'জ্ঞান সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হ্রদনদী দেখেছি, এবার সাগর দেখলুম।...তুমি তো সিদ্ধ গো!'

'আমি সিদ্ধ! চমকে উঠলেন বিদ্যাসাগর। 'আমি আবার ভগবানের কোন্ সাধন করলুম কবে?' রামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'আলু পটল সিদ্ধ হলে কী হয়? নরম হয়। তুমিও তো তেমনি নরম হয়ে গেছ। পরের দুঃখে তোমার হৃদয় দ্রবীভূত হয়েছে। তোমার এত দয়া, তুমি তবে তো আর কে সিদ্ধ?'

শুধু বিদ্যাসাগর কেন, উনিশ শতকের সেই উজ্জীবনকালে যত জ্ঞানী, গুণী, ধর্মনেতা, শৌর্যবীর্যপ্ত যত প্রধান পুরুষ জীবিত ছিলেন বাঙলা-দেশে, যাঁর মধ্যেই সত্যের আলো বিকীরিত হয়েছিল, তাঁরই কাছে ব্যাকুল হয়ে ছুটে গেছেন পরমের সন্ধানী শ্রীরামকৃষ্ণ। 'পরমপুরুষ' দ্বিতীয় খণ্ড তাই রামকৃষ্ণের জীবনভাষ্য ছাড়াও হয়ে উঠেছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য কেশবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র, মধুসূদন, বিজয়কৃষ্ণ, আচার্য শিবনাথ প্রমুখ স্মরণীয় বাঙালী চরিত্রের প্রতিচিত্রশালা। এক বছর আগে, আর এক ৬ই ফাল্গুন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মদিনে এই বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেছিলেন সিগনেট প্রেস। এবার সেই একই দিনে বাংলাসাহিত্যে অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনসাধনার সহধর্মিণী সারদামণি ছিলেন আনন্দময়ী চিন্ময়রূপিণী। 'পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি' বলেছেন তাঁকে অচিন্ত্যকুমার। এই বইটিও শীঘ্রই দেখতে পাবেন পাঠকেরা॥

রামপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বাঙালীকে বলেছিলেন 'আত্মবিস্মৃত জাতি'। খাঁটি সত্য। আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা তা থেকে আত্মবিচার উপযোগী সার সংগ্রহ যদি করতে পারি একমাত্র তাহলেই আত্মবিস্মরণের গ্লানিমোক্ষণ সম্ভব। বাঙলার জাতীয় ঐতিহ্যকে যাঁরা বিষয় করেছেন তাঁদের প্রসঙ্গ আলোচনার আগ্রহ ক্রমেই বাড়তে দেখে তাই আনন্দ হয়। কিছুদিন আগে শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' মুদ্রিত হয়েছিল। পাঠকেরা জানেন—সেটি আত্মনিবদ্ধ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নয়, ব্যাপ্ত অর্থে সমগ্র বাঙলাদেশে একটি মহৎযুগের আত্মবিকাশের কাহিনী। সত্ত্বাধিকারী এস. কে. লাহিড়ী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় সিগনেট প্রেস থেকে শীঘ্রই ছাপা হচ্ছে শিবনাথ শাস্ত্রীর আরো একটি মূল্যবান, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য অন্য একটি গ্রন্থ—হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'যাঁদের দেখেছি'। সংক্ষিপ্ত হলেও সুখপাঠ্য। সম্প্রতি দ্বিতীয় খণ্ড ছাপা হয়েছে॥

বাণী নাট্যশালার সংখ্যা কলকাতা শহরে একাধিক, কিন্তু বাংলানাটক চর্চায় বাঙালী লেখকের উৎকৃষ্ট প্রতিভা আজ পর্যন্ত কাজে লাগল না। বছরের মধ্যে তুলসীদাস লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' নাটকটি এদিকে ব্যতিক্রম। 'বহুরূপী নাট্যসম্প্রদায় ইতিপূর্বেই এটিকে বিখ্যাত করেছেন। বিশুদ্ধ বাঙলার কথ্যভাষায় রচিত একটি রসোত্তীর্ণ নাটক॥

রাশিয়ান ধনতন্ত্রের উত্থান ও পতন—এ বিষয়ে স্মরণীয় গ্রন্থ ম্যাক্সিম গোর্কির আর্টামনব স। 'ক্ষয়' নামে দুই খণ্ডে তার পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক সীতাংশু মৈত্র। অসংক্ষেপিত অনুবাদ পাঠে যাঁদের আগ্রহ, এ বইখানা পেয়ে তাঁরা খুশি হবেন।

শিশুসাহিত্যের যেটা রসের দিক তার কোনো উৎকৃষ্ট বিকাশ অনেকদিন চোখে না পড়লেও সান্ত্বনার কথা এই যে শিক্ষণীয় বিষয় শিশুদের জন্য সরস করে তোলার লেখকদের উৎসাহ বাড়তির দিকে। ছোটদের জন্যে 'বিজ্ঞানবিচিত্রা' সিরিজের ষষ্ঠ গ্রন্থ বেরিয়েছে, 'বেড়িয়ে আসি বিশ্বজগৎ'। গ্রহতারা সমন্বিত বিরাট বিশ্বের রহস্যকথা। গজেন্দ্র মিত্রের 'কিশোরদের রূপকথা' বইটিও ঠিক রূপকথা নয়, ইতিহাস কিংবা ইতিহাস ঘেঁষা গল্পের সমষ্টি। এ ছাড়া, ঠিক শিশুদের জন্যে না হলেও, শিশুসংক্রান্ত কয়েকটি প্রয়োজনীয় পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন হাওড়ার 'কিশোর কল্যাণ কেন্দ্র'। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে শিশুমনের সহজ স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হলেই পরে নানাবিধ মানসিক ব্যাধি দেখা দেয়। এই গ্রন্থমালায় শিশুমনোবিজ্ঞানকে সহজবোধ্য করে শিশুলালনের সুস্থ পন্থাকে এঁরা সুগম করে দিলেন। এঁদের কয়েকটি পুস্তিকার নাম: রমেশ দাশের 'শিশু ও শৈশব', প্রমদানাথ চৌবের 'শিশু অপরাধ ও অপরাধী' এবং নির্মল চৌধুরীর 'কিশোর ও কৈশোর'।

শিশু অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু বয়স্ক অপরাধীদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্যে যেসব পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা অতি জটিল। পঞ্চানন ঘোষালের 'অপরাধ বিজ্ঞান' এ বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকের কাজে লাগবে। ষষ্ঠ খণ্ড বেরিয়েছে। রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষা বাহিনীর কাজে লেখকের অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত॥

এ মাসে নতুন গোটগল্পের বই: মনোজ বসুর "কুঙ্কুম"॥

বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে পরম উৎসাহজনক খবর—আগামী ১৫ই ফাল্গুন থেকে শান্তিনিকেতনে একটি 'সাহিত্যমেলার' আয়োজন হয়েছে! বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন দিকে গত পাঁচ বছরের কাজ সম্পর্কে এই সম্মেলনে আলোচনা হবে। কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অন্নদাশঙ্কর রায়, সম্পাদক ক্ষিতীশ রায় এবং মেলার উদ্বোধন করবেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙলার কবি এবং সাহিত্যিকেরা রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে এভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ নিশ্চয়ই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করবেন॥


দ্বিতীয় খণ্ড
ঠাকুরের পুণ্যজন্মদিনে
আগামী ৬ই ফাল্গুন
প্রকাশিত হবে॥
শ্রীরামকৃষ্ণসান্নিধ্যে
উনিশশতকীয়
দিক্‌পতিদের কাহিনী॥
সচিত্র ও
সিগনেট
বুকশপ

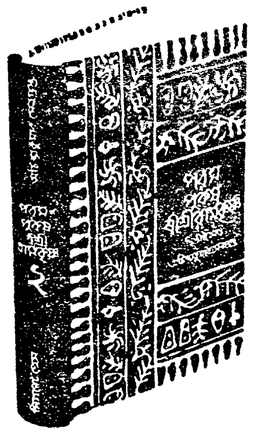

১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
১৪৩।১ রাসবিহারী এভিনিউ



# নিশ্চিত নির্ভর

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

## ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা


পূর্ব্বাশা

ফাল্গুন—১৩৫৯

সূচীপত্র

| | | |
|---|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ : | | ৫৫৬ |
| প্রবন্ধ : | | |
| আমার কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৫৫৭ |
| বস্তু বাসনা : আব্দুল আজিজ সিরকার | ... | ৫৫৭ |
| কৃষ্ণচূড়ার কান্না : দীপঙ্কর দাশগুপ্ত | ... | ৫৫৮ |
| লিমেরিক : সনৎকুমার মিত্র | ... | ৫৫৯ |
| অমরবেদন : বীরীন্দ্র গুপ্ত | ... | ৫৬০ |
| বর্ষা-শরতে : মানস রায়চৌধুরী | ... | ৫৬০ |
| কোনো আচীন নগরীর নামে : সরিৎ শর্ম্মা | ... | ৫৬১ |
| এমনকার কবিতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৫৬৫ |
| চৈতের কোকিল : শংকর চট্টোপাধ্যায় | ... | ৫৭৩ |
| বিবাহিতা স্ত্রী : প্রতিভা বসু | ... | ৫৮৪ |
| বহুপাঠ : অমল দত্ত | ... | ৫৯২ |
| শিল্প-সংলাপ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৬০৮ |
| গান-সঙ্গীত : ঐ | ... | ৬০৯ |
| অভিবাদ : নিখিলকুমার নন্দী | ... | ৬১০ |

প্রতিটি সুখপাঠ্য গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯



## গান বাজনার খবরাখবর—

ভারত সরকার সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহ দিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রতি বৎসর প্রেসিডেন্টের পুরস্কার দিয়ে বিখ্যাত গায়কদের সম্মানিত করা হ'চ্ছে। এবার যাঁদের নাম সুপারিশ করা হয়েছে শ্রীমতী কেশরবাঈ তার অন্যতমা। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর অনেক গান এইচ্-এম্-ভি রেকর্ডে পাওয়া যায়। ভারতীয় নৃত্যনাট্য ও সংগীত একাডেমীর সাতজন প্রথম সদস্যদের মধ্যে আছেন শিশির ভাদুড়ী ও উদয়শঙ্কর। আমেরিকায় যাত্রাপথে টোকিওতে সম্প্রতি দিলীপ রায়েরই একটি মনোরম সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছিল। দিলীপ রায়ের নতুন রেকর্ড P10730 দু'খানি চমৎকার ভজন গান। সুপ্রীতি ঘোষের "হরিনাম লিখে নেরে" এবং "ওরে পাখী পরাণ পাখী" N8255। চিত্রা মজুমদারের "হংস গমনে চলিল রাই" ও "কিবা ঝন্ ঝন্" GE24659, অনন্তদেব মুখোপাধ্যায়ের "আমার কালো মেয়ের" এবং "যে ভালো ক'রেছ" GE24658 সুন্দর ভক্তিমূলক গান।

রবীন্দ্র-সংগীতের নতুন রেকর্ড শচীন গুপ্তের কণ্ঠে "আজি হৃদয় আমার" এবং "বাদল বাউল বাজায় রে" GE24657, গীতা মুখোপাধ্যায়ের লোকগীতি "ও গো বট বৃক্ষ" আর "আমি গাঁয়ের গরীব কিষাণী" N82552, দিলীপ সরকারের আধুনিক "ও পর বধূয়া" এবং "নদীর মতন আমার জীবন" N82550, যশোদাদুলালের কৌতুকগীতি "আমি যদি হ'তেম রাজা" ও "বউ পিছু হেঁটে এসো" N82553 ; "দর্পচূর্ণ" ও "শুভদা" চিত্রের গান 'কলম্বিয়া' এবং 'এইচ্-এম্-ভি' রেকর্ডে বেরিয়েছে।

সঙ্গীতমার্তণ্ড পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর কাবুলে ভারতীয় সংগীত পরিবেশনের জন্য আফগান রাজের পদক পেয়েছেন। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথের অনেক রাগ সঙ্গীত কলম্বিয়া রেকর্ডে পাওয়া যায়।

গীতি-রসিকদের নিত্যপ্রিয়




হিজ মাষ্টার্স ভয়েস ★ কলম্বিয়া

তালিকার জন্য পত্র লিখুন
-পোষ্ট বক্স ৪৮, কলিকাতা-

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ—কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোং লিঃ : কলিকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ-দিল্লী।


Bleed Through

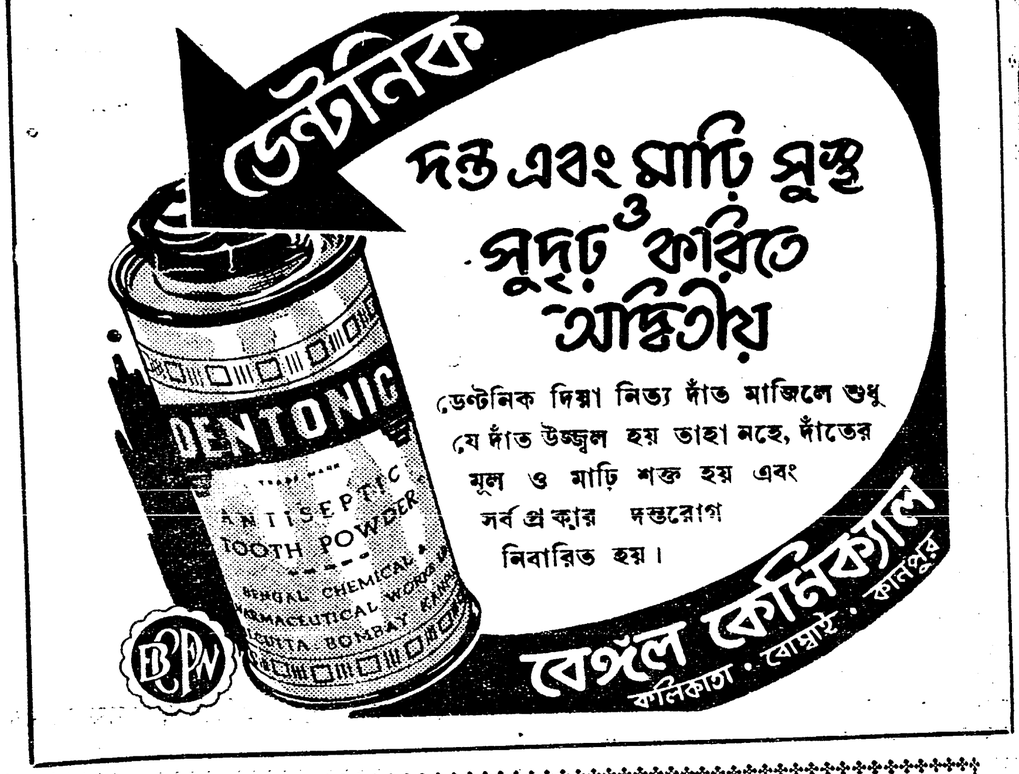


নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। এই গ্রন্থাবলীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ:

**গান্ধীজির রাষ্ট্র-পরিকল্পনা**

লেখক:

**শ্রীনারায়ণ অগ্রবাল**

দাম—দুই টাকা

**পূর্বাশা লিমিটেড**
পি১৩ গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলিকাতা-১৩





ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।
ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে।

চা

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দেয়, সঙ্গ দেয়, দেয় নব নব প্রেরণা।

## কেদারা

কেদারা সন্ধ্যারাতের রাগিণী। উপরের আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। প্রিয়-সঙ্গ-সুখ বঞ্চিতাকে দেখানো হয়েছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে। তার অন্তরের অশ্রান্ত বিলাপ সকরুণ একটি সুরে রাতের আকাশকে আকুল ক'রে তোলে। চাঁদ বুঝি স্তব্ধ হয়ে শোনে তার অতৃপ্ত প্রেমের অশ্রুভরা কাহিনী।

CTB 105

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত


# প্রবাসী

পঞ্চদশ বর্ষ
ফাল্গুন—১৩৫৯


*কবিতাগুচ্ছ*

## ঋগ্বেদ

[ সপ্তম মণ্ডল—৭১ সূক্ত ]

অপ খস্রুঃ উষসঃ নক্ জিহীতে রিণক্তি কৃষ্ণীঃ
অরুষায় পন্থাম্ অশ্বহমঘা গোহমঘা বাম্ হুবেম
দিবা নক্তম্ শরুম্ অস্মৎ যুয়োতম ॥ ১ ॥

নক্ত-জয়িনী আকাশের জল এসো উষা তুমি রঞ্জিত করে কৃষ্ণা
অরুষ অরুণে ছড়ায়ে পন্থা দাও সান্ত্বনা সন্তানে সৎ তৃষ্ণা
অশ্ববাহিনী গুহাবাসী করো নাশ
গোপন অন্ধকারের দুর্বিলাস
অঙ্গে পরুক তোমার দানের রাশ
দূর হোক দিবা-রাত্রির মহাসঙ্গমে সব শ্যেন-শকুনির হিংসা
রোমশ-গাত্রা শর্ব্বরী সরে থাক নিয়ে তার রঙের চিহ্ন ভিন্ সাম ॥

## আসার কবিতা

### সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

এখনো সন্ধ্যায় ফিরে আসে ভোরবেলা ;
ভরবে কি মন আর, যদি খোলামেলা
আসে নীল কচি হাওয়া আবারো তেমন
যদি তুমি মুখ তোলো, তাকাও অবাক,
অয়-নিভ তারা হ'তে পাখী উড়ে যায় এক ঝাঁক !

নয় অয়স্কান্ত এ-মন—
কোথায় তমাল বন কোথায় আকাশ !
মরে পড়ে আছে ভালোবাসা একরাশ
ধূসর আলোতে লাল বালুর বেলায় ।

সুরভিত ফুল কে হেলায়
ফেলে যায় নিরাশ্বাস শ্বাসহীন রাতে ?

হায় মেয়ে, যদি তুমি আসতে প্রভাতে !

## বসন্ত বাসনা

### নন্দদুলাল সরকার

কোথায় বসন্ত আজো, ফাল্গুন আরও কতদূর
কতদিন মাঠে মাঠে পাইনি ত তোমার বিস্তার
গাছে গাছে ঝরে গেছে ফুল, পাতা ; স্রোতও তিস্তার
শুষ্ক, স্তব্ধ ; আহা মৃত কোকিলের সুমধুর সুর ;
চাঁদের কঙ্কাল জ্বলে সারা রাত ; অলস দুপুর ;
টেরাই-র শালবনে একটানা ঝিঁঝিঁ চীৎকার
দুঃসহ ; এ-সকালের প্রাণ সূর্য্য ঢাকা কুয়াশার
আবরণে। হে বসন্ত, এ হৃদয়ে বাজাও নুপুর।



এবার পর্যান্ত করো। অবিশ্রান্ত আলোর প্লাবনে
এ-কুয়াশা ছিন্ন করো ; মুক্ত করো তিস্তা হৃদয়ের ;
তোমার প্রাণের স্পর্শে জাগুক এ বন্ধ্যা গাছে ফের
সবুজের সমারোহ নোতুন পাতার শিহরণে
ছড়াক রঙের ঝর্ণা। এখানে-ই রাখি প্রার্থনা-কে ঃ
আমাকে জীবন দাও, ব্যাপ্তি দাও এখানে আমাকে ॥

## কৃষ্ণচূড়ার কান্না

### দীপংকর দাশগুপ্ত

আকাশ সাড়া দাও,
আকাশ সাড়া দাও ঃ
কৃষ্ণচূড়া কাঁদে রাত্রিদিন ঃ
ফুল্ল কুসুমিত
আমার সারা দেহ,
তুমি কী নির্দয়, হৃদয়হীন !
দেখোনা হাওয়া এসে
সরোষে ছিঁড়ে নেয়
পাপড়ি আর ফুল ; প্রতীক্ষায়
বৃথাই কাটে দিন ।
জীর্ণ তনু মন,
ফুরোয় যৌবন তপস্যায় ।
দুহিতা গিরীশের
ভুলালো গিরিশের
প্রেমের যাদু দিয়ে পাষাণ-মন ।
তুমি কি তার চেয়ে
কঠিন আরো হবে,
শুকিয়ে শেষ হবে এ-যৌবন ?

আকাশ সাড়া দাও,
আকাশ সাড়া দাও,
আমার পানে চাও, তপস্বিন্।
হ'লোরে এ কী দায়,
হৃদয় জ্ব'লে যায়,
স্মর-অনলে হবে দেহ কি লীন ?
বিফলে গেলো দিন,
গ্রীষ্ম চ'লে যায়,
অন্ধকার হায়, হায়রে হায় ঃ
কৃষ্ণচূড়া কাঁদে,
আকাশ নির্বাক,
কুসুম সম্ভার মেশে ধূলায় ॥

## লিমেরিক

সনতকুমার মিত্র

ছোপ ছোপ রঙ্ চঞ্চল প্রাণ বনানীর শীষে শীষে—
কে দিল ছড়িয়ে ? কে দিল জড়িয়ে লাল-সবুজের মালা !
মর মর ডালে মর্ম্মর ধ্বনি, ফুলে ফুলে ভরা ডালা ঃ
কার বাঁশী বাজে ঝাউ গাছে আর বুলবুলিদের শীষে ?

হোলুদ ঘাসেরা হোলি খেলা করে সবুজের রঙ্ মেখে ঃ
সবুজ ফরিঙ্ দিন-রাত নাচে, কোকিলেরা গান গায় !
হাল্কা মেঘেরা সাদা ডানা মেলে নীল আকাশের গায়
ভাসে। হাসে আর সোণালী রোদেরা দিনরাত গান লেখে !

লালে আর নীলে এত মেশামেশি এত হাসাহাসি কেন ?
কিসের ছলনা ? বল না হৃদয়ে কেন উতরোল ঢেউ
আছড়িয়ে পড়ে ? মনের এ রঙ দেখবার নেই কেউ !
রঙ্ দেখে আর গান শুনে মন তবু বলো কাঁদে কেন ?

কি হবে তবে এ গানে আর রঙে—বসন্ত আগমনে ঃ
পাখীদের গান, ফুলেদের মেলা না যদি বসল মনে ?

## অমরবেদন

শ্রীনীরেন্দ্র গুপ্ত

বিস্মিত হোয়ো না তবে, আমায় কোরো না তিরস্কার,
মাঝে মাঝে জীবনের করুণ বীণার তারে যদি
গোপন ব্যথার ছোঁয়া লাগে, যদি চোখে আসে জল,
সে তো শুধু ক্ষণিকের। তারে আমি দেব না প্রশ্রয়।

ক্ষমা কোরো, কোনোদিন যদি কোনো সুদূরের স্মৃতি
সহসা ভুলায় মোরে সুকঠিন জীবনের ব্রত,
একটু সময় দিও, করে নেবো হৃদয়-শাসন,
ব্যাকুল মিনতি তার,—তারে আমি দেবো না প্রশ্রয়।

একদিন ধরণীতে যত মোর সাধনা গৌরব
হয়তো মিলায়ে যাবে। হয়তো রবে না কিছু আর।
একটু ব্যথার সুর—একফোঁটা নয়নের জল—
হয়তো তারাই রবে চিরকাল—চিরযুগ ধরে।

বিদ্রূপ কোরো না তাই, যদি কভু ক্ষণিকের তরে
করুণ অঙ্গুলি রাখি ব্যথাতুর হৃদয়ের 'পরে।

## বর্ষা-শরতে

মানস রায়চৌধুরী

কখনো হৃদয়ে উন্মুখ নদী, শ্রাবণের দেহলতা
নেমে আসে। দেখি, অজস্র ঢেউ সমুদ্র-জটিলতা
টলোমলো মনে। পলাতক হাওয়া জারুলের কচি শাখে
খেলায় মত্ত। পলাশ বনের মাথায় বৃষ্টি নীল
ঝরোঝরো ঝরে। অন্ধ আকাশ ছিঁড়ে দিয়ে উর্মিল
বিদ্যুৎ নাচে—এ দিকে এ'মনে উত্তাল নদী বাঁকে

মোড় ফেরে ফের। গানের নৌকা ডুবিয়ে সে কোন ফাঁকে
মত্ত মাতাল, উথালপাতাল। আনে সেই বেদনাকে।

মনে পড়ে কবে ধূসর হৃদয়ে ধূ-ধূ চৈত্রের শেষে
দিয়েছিলো গান বৈশাখী হাওয়া। তখন কী উচ্ছ্বাসে
মেঘবালাদের সুকুমার তন্তু, তটিনী তন্দ্রাভার
তিমিরে আনত আকাশের থেকে বাতাসের ফুলহার
দিয়েছিলো বনে, ঊষর প্রান্তে—কথাকলি মূর্চ্ছনা
গান হয়ে যেন ভেসে এসেছিলো ; এতখানি সান্ত্বনা
বৈশাখ বিনা প্রাণের প্রান্তে কেউ আর আনতোনা।

অসংখ্য ঢেউ কান্নায় মোড়া, কী করুণ কান্নার
চিৎকার শুনি সারা দিনরাত ; বেদনার পান্নার
রাঙামুখ ঐ ঝলসিয়ে ওঠে—একফালি প্রাণ তার,
তা-ও বুঝি কাঁপে বৃষ্টির দেহে। উদাসী দৃষ্টি তার
খুঁজে ফেরে সেই গানের নৌকো। সমস্ত চিন্তার
আকাশে কান্না অঝোর। প্রাণের নদীতেও উত্তাল
ঢেউ, ওঠে, ঢেউ সমুদ্র-শাদা—বুঝি সে হারানো তরী
খুঁজে পেতে কেউ আশ্বিনে ফের, ফেলে রৌদ্রের জাল !

## কোনো প্রাচীন নগরীর নামে

সরিৎ শর্মা

দু-চোখে ঘুমের ক্লান্তি আদিগন্ত সমুদ্রের
দোলা নিয়ে নেমে এলে, এই
নিরিবিলি রাত্রির হৃদয়ে, এই অরণ্যের
শাখায় শাখায় শুনবেই,
( বিধ্বস্ত নগর যেন পুরোনো বইয়ের স্তূপ—
নির্জন টেবিলে খোলা ), শোনো—
টুপুর টুপুর টুপ্···টুপুর টুপুর টুপ···
বৃষ্টির নূপুরধ্বনি গোণো !



বাতি নিভে গেল ভিজে হঠাৎ-হাওয়ায়—
থম থম নীরন্ধ্র নিথর
অন্ধকার মোহনায়
এই তীরে ঘুমের নগর !

এই তীরে ঘুমের নগর !
ওঙ্কারে রিম্‌ঝিম্ নূপুরের ধ্বনি তবে শোনো
বৃষ্টির ধারায় তারে গোণো !
যে-কথা শুনেছ, তা-ই স্মৃতিপথ বেয়ে—
( এমনি নির্জন রাতে যেখানে অতন্দ্র কেউ
দু-হাতে সরায়ে কত চিত্রলিপি, শিলালিপি,
বৃষভাঙ্ক শীলমোহরের থেকে, কোনো
সুপ্রাচীন নগরের চিহ্ন খোঁজে, অন্ধতার ঢেউ,
সরে যায় কেউটের মতো )
বুঝি আসে স্মৃতিপথ বেয়ে ঃ

বছর হাজার কয়, জানি না সঠিক, যেই মেয়ে আছে চেয়ে
ছায়াচ্ছন্ন বিকেলের
দোতালার জানালার অনুপম কারুকার্য থেকে,
অকস্মাৎ নেমে আসে, আসে এক মেয়ে।
শ্মশ্রুল আবক্ষ মূর্তি, ঘরে ঘরে, প্রস্তরের,
চিরিতন-আঁকা দেহ রাজপুরুষের—
আকর্ণ দীঘল চোখ, সব পিছে রেখে—
কত আঁকিজুকি-করা তাম্রপাত্র, চীনামাটি, ঐশ্বর্যের নীড় ;
দেয়ালে দেয়ালে আঁকা পশুপাখি লতাগুল্ম নিপুণ তুলির ঃ
চিকণ সবুজপাতা ; কী এক পীতাভ দ্যুতিময়
লতার আশ্লেষে কাঁপে টুকটুকে তাজা রাঙা ফল—
ঠোকরায় ঝাঁকে ঝাঁকে ডানা-ঝাড়া পাখিরা চঞ্চল—
সোনালি হলুদ নীল, ডালে-বসা, ডানা-মেলা উড়ন্ত পাখির
সাড়া কাকলির

হেমন্ত-সন্ধ্যার ! মৃদু নীলিম আকাশ মনে হয়
ভায়োলেট ফুলে-বসা কৃষ্ণনীল ভ্রমর উজ্জ্বল ;
কোথাও বর্ণালি দেহ পেশল বলিষ্ঠ পশু—পশুদের ভিড় !

কত কি যে পিছে রেখে দ্রুত পায়ে এঁকে বেঁকে
সব যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে নেমে আসে কত দীর্ঘ সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে :
রক্তিম তামার পাত্র তরঙ্গিত অঙ্কে বয়ে নিয়ে,
গুণগুনিয়ে গীতকলি পায়ে ঠেলে সুর শিঞ্জিনীর
কটাক্ষে হরিণী তার—সর্বনাশা সুর—
মধুর—মধুর ;
চলার নর্তন ছন্দে স্তনে-স্তনে শিল্পায়ন, সহাস মেদুর—
মধুর—মধুর···

কতোক্ষণ মনে নাই, সুগন্ধ-মদির
সুদীর্ঘ আশ্চর্য কোনো স্নানাগারে নেয়ে,
শিল্পময় সুমহান দেবালয়ে রেখে এসে প্রণাম নিবিড়,
বৃক্ষে বৃক্ষে হয়ে নতশির,
মাতৃকা বন্দনা গেয়ে গেয়ে,
কোথাও বা শিলালিপি নিরীক্ষণে থেকে-থেকে
আবার অধীর
গো-শাল ও হস্তিশাল···কত অট্টালিকা কত বিস্তৃত আগার
সব হয়ে পার—
চকিত চরণ থামে মাঝে মাঝে।
ছাগপাল মেষপাল, বিন্দু বিন্দু কোথাও বন্ধুর
সুদূর পার্বত্য পথে চ'রে আসে ; ফেরে দূর দূর
থেকে কত দলবদ্ধ বরাহরা সশব্দ চঞ্চল ;
যোজন-যোজন পথ হাঁটে ছায়া-ছায়া
মন্থর উটের দল···
নির্জন ঘুমন্ত এক নগর পেরিয়ে,
তনুর লাবণ্যদীপ্ত অপরূপ ভাস্কর্যের মেয়ে



আকাশের বৃত্ত-ছোঁয়া সুবিস্তীর্ণ বাঁকে
সন্ধ্যার আবির মাখে যেই জলা—সে জলাও
আকাশের আলো নিয়ে ছায়াছবি আঁকে—
নিস্তরঙ্গ : সে-ধ্বনি অতল
ঘুমন্ত মাটির গর্ভে সমাধিশালায়
নেমে গেল সমুদ্ধত সমিধাগ্নি-জল
বিশাল সোপান বেয়ে বেয়ে।

কাদের এ কারুশিল্প সময়ের বুক থেকে
অমৃতত্ব এখানো ছিনিয়ে,
ওইখানে জাগে ! পাশে মৃত্যু আছে ছেয়ে :
চিনি না তারা যে কারা—কতোকাল ঘুমায় ধুলায়
সুসজ্জিত ঐশ্বর্যের মেধার কুলায় !
কি নাম জানি না তার, কারো নয়, শুধু
বিধ্বস্ত নগর থাকে, থাকে বালু ধূ-ধূ
অপরূপ কন্যা আর আশ্চর্য প্রহর···
নিয়ে ঘুমে ঘুমায় নগর !

···অকস্মাৎ অন্ধকারে ঢেউ লাগে, কাঁপে
সিন্ধুর তরঙ্গ এই অন্ধকার হাওয়ায় হাওয়ায়···
উদীর্ণ স্মৃতির চাপে
ভারতবর্ষের মাটি কাঁপে থরোথর···
পুরোনো পুঁথির মতো জীর্ণ ইতিহাস
( মণীষা প্রখর কারো ধারালো মনন দিয়ে খোঁজা,
কুয়াশা-মলিন কোনো বাংলার হাঁস
হয়তো বা খুলে দেবে আলোর দরোজা ! )—
নিয়ে আসে বৃষ্টির আকাশ।
বৃষ্টির নূপুর—
এনে দেয় কী-নামের স্বপ্নময় সুর !
ক্লান্তির সমুদ্র চোখে—আজ শুধু সেই নাম শোনো
নামের নূপুরধ্বনি গোণো !

# এখনকার কবিতা

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

"এখনকার গদ্য বা পদ্য কাব্য আমি ভয়ে পড়িনে পাছে আমার রুচির সঙ্গে না মেলে। আমি এই কথা মনে করতে ইচ্ছা করি যে নতুন যুগের মন নতুন রীতিতে লিখতে চাইবেই—প্রথম প্রথম হুঁচট খেলেও হয়তো ক্রমে চাল দুরস্ত হয়ে যাবে। সার্থকতা বিচার করবার সময় এখনো আসেনি এবং আমার পক্ষে এ কাজ অসম্ভব। বিশ্বাস রেখে ঠকা ভালো, অবিশ্বাস করে অবিচার করার চেয়ে। ইতি ১৭ই শ্রাবণ ১৩৪৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

এ-চিঠির পর পনেরো বছর অতীত হয়েছে। আজ আমার মনে হয় তখনকার নতুন যুগের মানবরা যে গদ্য কবিতা লিখছিলেন এখনকার নতুন যুগের মনের কাছে তা অতীত-রীতি। কবিতার বর্ণনা-ভঙ্গী নিয়ে তখন গদ্য লেখার হিড়িক চলছিল। তাতে কবিতা উপকৃত হলনা বটে কিন্তু নেপো সেজে বাংলা গদ্য সেই দই খুব একচোট মেরে নিল। আর হুঁচট-খাওয়া গদ্য কবিরা পরবর্ত্তী যুগের উদধি-উচ্ছ্বাসে কোথায় যে তলিয়ে গেলেন কেউ তার খবরও রাখলনা। জীবনানন্দ দাশ স্পষ্টভাবে দেখালেন যে গদ্যের ভাষা ছন্দোবদ্ধ কবিতার ভাষা হতে পারে, এবং হয়ত বলতে চাইলেন: কবিতার ভাষাকে আটপৌরে হ'তে হলে ছন্দের উপর উৎপাত করবার তেমন-কিছু দরকার নেই। ১৯৪৩-এ 'নিরুক্ত' কবিতার কাগজে এবং 'কবিতা'-পত্রিকায় তিনি বহুল-পরিমাণে এ-পরীক্ষার প্রমাণ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এ-পরীক্ষাটাকে 'ছড়া'তেই নিবদ্ধ রেখেছেন পাছে লোকে কিছু বলে। সব নতুন চেষ্টা নিয়ে লোকে সর্ব্বদা কিছু-না-কিছু বলে। জীবনানন্দ-কাব্যের দুর্ব্বোধ্যতার দুর্ণামও তখন পর্ব্বত-প্রমাণ হয়ে উঠেছিল। সেদিন যদি তিনি লোকের কথায় কর্ণপাত করতেন এবং কর্ণের নিয়তি বেছে না নিতেন তাহলে আজকের দিনে একটা 'জীবনানন্দ-ইস্কুল' তৈরী হতনা। এ-ইস্কুলে তাঁর সমবয়স্ক বহু যশস্বী কবিই নাম লিখিয়েছিলেন। শুধু পাণ্ডব-বর্ণিক-কুলের 'রস'-হীন কবিরা তাঁর কাছে ভেড়েননি। তাঁরা কেউবা ভেঁড়ার মতো রস-ভূয়িষ্ঠ কবিকে গুঁতোতে এসেছেন, কেউবা ভাঁড় সেজে হাটুরেদের ভিড় জমিয়েছেন আর কেউ-কেউ ভূশণ্ডীর কাগের মতোন ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, বাংলা-কাব্য জাহান্নামে যাবে। আজ দেখতে পাচ্ছি তাঁদের ভেজাল কথায় কতিপয়ের মন ভিজলেও বাংলার বুদ্ধি-জীবী সম্প্রদায় রস-ভৃঙ্গার কাকে বলে তা জানতেন। দেখছি, এখনকার বাংলা কবিতায় সৌষ্ঠব তার ছন্দে, ভাষার কথ্য ভঙ্গীতে এবং ভাবাত্মক বহু বিষয়বস্তুর সমাবেশে। এবং এই কবি-কর্ম্মের ভগীরথ ত্রিমূর্ত্তি—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীজীবনানন্দ দাশ, শ্রীবুদ্ধদেব



বসু। এ-ত্রিমূর্ত্তি চতুর্ভুজ হয়ে আমাদের চির-পরিচিত এবং মনের শরীক হয়ে উঠেছে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রে। সত্যি মিত্র-বরুণের দ্যুতি আর বহমানতা নিয়েই প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা। কুসুমের মাস থেকে অজিত দত্ত যেদিন বিদায় নিলেন সেদিন থেকে তাঁর কাব্য মধু হারিয়ে মধুসূদনী কাঠিন্যে আত্মস্থ হতে সুরু করল যে-মধু বাংলার চিরদিনকার খাদ্য, যে-বাংলা চিরদিনকার মাধ্বী-বৈষ্ণব।

আজ বাংলা-কবিতার যে-চেহারা দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী হয়ে যদি সেদিন তাঁর ছড়ার ভঙ্গীটি নিয়ে সৎ কবিতার আন্দোলন চালাতেন তা'হলে এ-চেহারা গড়ে উঠ্‌তে দীর্ঘ পনেরো বছর সময় অতিবাহিত হতনা। তবে রবীন্দ্রনাথের হয়ে এটুকু বলার আছে—আজ যে পঞ্চদশীকে পূর্ণিমায় পৌঁচেছে বলে অভিনন্দন জানাচ্ছি, তাড়াহুড়ো করতে গেলে তার ভেতর হয়ত তর্কের অবকাশ থাকৃত, আমরা বুঝতে পারতামনা এ-কন্যা প্রকৃতই সুশ্রী কিনা। প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দিয়ে সে-দায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেছে। অপিচ এ-ও বলা যায়, বাচ্চা ময়ূরকে দেখে কেউ কি কোনোদিন ভাবতে পারে যে সে একদা আমাদের আদরের শিখী হয়ে নাচবে? কাজেই নতুন আন্দোলন কোনো শিল্পী-মন রুদ্ধ করবার সঙ্কল্প করতে পারে না। প্রথম ভারত-নাট্য ভেঙে দিয়েছিল দৈত্যরা।

তবে সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাও মনে পড়ে যে আজকের দিনের কবিতা যে-পথে সার্থকতা খুঁজছে রবীন্দ্রনাথ সে-পথে দ্বিজেন্দ্রলালকে চলতে দেখে বহু পূর্ব্বেই অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা প্রশংসা করলেন অথচ 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির ভঙ্গীকে যথাযথ পরিণতির পথে নিয়ে গেলেন না কেন তা-ই আমরা ভাবছি। রবীন্দ্রনাথের সুমিতি-বোধ অথবা মধুসূদনী অসম-সাহসের অভাবই কি এর জন্যে দায়ী? অবশ্য শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ সাহসে এবং পরীক্ষায় সবাইকে পেছনে ফেলে গেছেন। প্রচলিত গদ্য-কবিতার ভঙ্গী ও বাঁক নিয়ে সম্ভাব্য সবরকম কাব্য-রচনা করে এর জন্যে আর এক ইঞ্চিও গতি-পথ রেখে যাননি। বিভিন্ন চিত্র-রীতি নিয়ে পিকাসো ঠিক এম্নি করেছেন। কবিতার ছন্দ ও ধ্বনিকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতেন বলেই রবীন্দ্রনাথ কবিতার ভঙ্গীভ্রষ্টতার পথকে সুগম রেখে যাননি। তাকে কিনুগোয়ালার গলিতে পাঠিয়েদিয়েছিলেন—গোপ-বঁধুর আঙিনায় ঠাঁই দেননি।

গদ্য কবিতা বলে কোনো বস্তু কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্গত হতে পারে কি না এ নিয়ে আমার একটা আন্তরিক সন্দেহ আছে। গদ্যে নিঃসন্দেহে কাব্য-ভঙ্গী আমদানী করা যায় কিন্তু কাব্যের পদ-বিন্যাসে গদ্য-ভঙ্গী চালিয়ে দিলে তা কানের দুয়ার ছেড়ে হৃদয়ের অন্দরে প্রবেশ-পথ পায় বলে আমি মনে করতে পারিনে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি, কোনো গদ্য কবিতা লিখে আজ পর্য্যন্ত আমি খুশী হইনি। আমার কবিতায় আমার হৃদয়ই যদি অসাড় হয়ে থাকে তাহলে কি করে ভাবা যায় যে তা সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী হবে?

কাব্য-রীতির স্পর্শে গদ্য-সাহিত্যের দেহে একটা সুঠাম ভঙ্গীর আবির্ভাব হতে পারে, এ-কথা আমি তেম্নি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি। এবং এ-ভঙ্গীটি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে! তাকে গদ্য কবিতা বলবনা, বলব ধ্বনিস্পন্দনময় গদ্য—ইংরেজিতে যার নাম 'রিথ্‌মিক প্রোজ্'। এই ধ্বনিময় গদ্য রবীন্দ্রনাথ লিখে যেতে পারেন নি বলে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। ফরাসী কবিতায় বস্তুটির ছড়াছড়ি দেখা যায়—ফরাসী গদ্যেও 'রিথ্‌ম্'-এর দোলা প্রায়ই এসে উপস্থিত হয়। বোদলেয়ার বা পল-ভেলেরির অনবদ্য রিথ্‌ম্-এর কিংবদন্তী ছাড়াও জিদের গদ্যের অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য্যের কাহিনী শুনতে পেয়েছি। অনুবাদের মারফৎ জিদ এসে আমাদের কাছে তেমনভাবে পৌঁছননি—কিন্তু ভাষান্তরিত হয়েও সার্ত্র মাঝে-মাঝে অপূর্ব্ব কাব্য পরিবেষণ করতে উদ্যত হন।

দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা নাটকীয় বচনগুলোকে নিরর্থকভাবে 'রিথ্‌মিক প্রোজ' আখ্যা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাইজ পাওয়া গেলেও তা 'রিথ্‌মিক প্রোজ' হবে না। 'রিথমিক প্রোজ' তেমন বাক্যাবলী বা বেদাশ্রয়ী বাক্য যারা একই ধরণের ধ্বনি-স্পন্দন-বাহী অথচ ভঙ্গী যাদের গদ্য। দু'টি বাক্যের মোট ধ্বনি-স্পন্দন সমান হবেনা, অবশ্য হলেও তা দোষাবহ নয়। বাক্যের যত্রতত্র ক্রিয়া-পদ ব্যবহারের রীতি বাংলা গদ্যে আছে বলেই ধ্বনিস্পন্দনময় গদ্য এ-ভাষায় রচিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। খুবসম্প্রতি এদিকে খানিকটা চেষ্টা চলেছে। আমার ধারনা, গদ্য কবিতার চাইতে এ-বস্তুটির সমাদর কবিতা-পিপাসুরা ঢের বেশি করতে পারবেন।

গত ছ'মাসে যে-ক'টি বাংলা কবিতার বই প্রকাশিত হয়ে আজকের দিনের বাংলা-কাব্য-রীতির একটা খসড়া ছবি আমাদের চোখের উপর তুলে ধরেছে তাদের কথা স্মরণ করেই আজ এসব কথা বলবার ভরসা করছি। কবিদের মধ্যে সব চাইতে যিনি বয়স্ক সেই সুনীলচন্দ্র সরকারের ক্ষুদ্রাবয়ব বই 'মিলিতা'-তে দেখতে পেলাম যে তিনি রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণ কাজটিই হাতে তুলে নিয়েছেন—ছড়ার ভঙ্গীকে নিয়ে এসেছেন 'সীরিয়স' ভঙ্গীতে। ঘুম-পাড়ানী গান নয় তবু তারই সুর টেনে কী চমৎকারভাবে তিনি লিখতে পেরেছেন ঃ

ঘুমের পাপড়ি শুকোয় চোখে
অনেক দিনের বাকি পিপাসায়

শিশুর এই মহাপিপাসা বাংলাদেশে আছে বলেই ত এখানে অবিরত কবিতার ঢল নামে। পাই আমরা অতি-তরুণ বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে 'অবতামসী'র মতো একখানা বই। মনের কাছে আবেগ যে-স্থাপত্য দাবী করে, যে-স্থায়ী-স্মৃতি-চিহ্ন, তা-ই যে কবিতা এই বার্ত্তা বিস্ময়কর ভাবে এঁর কাছে উপস্থিত। এই বস্তুটি



স্থির করে নিতে বহু কবিরই বহু বছর চলে যায় কিন্তু শ্রীমান বিশ্ব সুরুই করেছেন অনেকের শেষ-অধ্যায় থেকে ঃ

"এ-জীবনে কতো প্রাণ দূর হ'য়ে গেলো—
কতো গান।—তারে মান দিক এ-কবিতা।"

দিয়েছে। সে-সব প্রাণকে মূর্ত্তিময় করে সাজাতে পেরেছেন এই তরুণ কবি। শুধু এমন একটি ছোট কথায়ই তা চিরকালের হারানো কন্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে—যখন আমরা শুনি ঃ "তোমার নাম পেয়েছিলাম সেকথা আছে মনে"। আর সে-মনকেও দক্ষ তক্ষণ-শিল্পী লরেন্সীয় তীক্ষ্ণতায় এ-যুগের সবাকার কোনো-কোনো মানসিক মুহূর্ত্তের নিকট-আত্মীয় করে তুলেছেন ঃ

"সে এক স্বতন্ত্র আমি ভুলে যেতে যে চেয়েছে নিত্য রাত আসে
বন্য বন্যা বুকে বয়ে বনানীর বীভৎস আবাসে
প্রেমিক রাহুর-মতো অনাহূত—তবুও অমোঘ রাত আসে।"

একে আমি বিষণ্ণ প্রৌঢ়তা বলিনে। এতে দেখতে পাই প্রাচ্য দার্শনিকতার অঙ্কুর যা বর্দ্ধিত হয়ে মনের উপর তরুপত্রছায়া বিস্তার করলেই সৎ কবিতার আবির্ভাব অনিবার্য্য হতে পারে। আর তা খানিকটা হতেও পেরেছে অরুণকুমার সরকারের "দূরের আকাশে"। একটি দূরযানী আত্মা এখানে প্রবাস-বাস করে যাচ্ছে রোজনামচায় মনের প্রতিলিপি এঁকে। অরুণকুমারের কাছে আমরা তা-ই পেলাম। পেলাম—শুধু কথার ধ্বনি নয় ধ্বনিময় মনের কথা। সে-মন বহু পুরাতন, এ-পৃথিবীতে তার জন্যে আর স্বাদ-গন্ধ নেই ঃ

"বিকেলে কেমন করে বলো,
এনে দিই রোদ-ঝলোমলো?
তার চেয়ে আমাকেই নাও
থরথর দুহাত বাড়াও
নিয়ে যাও তোমার সকালে
কামরাঙা ডালিমের ডালে।"

কিন্তু এ-'সকালে'রও কি শরীক হতে পারবে আর মানুষের পুরোনো মন? সে সব-কিছুই হারাতে চাইবে, সব নূতনকে পুরাতন করে দিয়ে শেষে চাইবে সেই পরম রাত্রি। "কোথায় কোন্ খানে? কোথায় সেই রাত?"—বলে সব সময়কার তন্দ্রাচ্ছন্ন আকুলতা তার মনে কখনো বা জেগে উঠবে চীৎকার করে কখনো বা নীরব ভাষণ দেবে ঃ "আজ মাঝরাতে নেই বিছানাতে ঘুমের মাঠের সবুজ শস্য।" ম্যাকবেথের

মতো কখন যে আমরা নিদ্রাকে হত্যা করেছি জানিনে, না কি এ ট্র্যাজিক যুগেরই চিরজাগ্রত নিয়তি তা-ও বা কে বলবে! নইলে সব সুর একটি সুরে এসে মিশছে কেন? তরুণ বটকৃষ্ণ দাসও 'পাখনা'য় সহজভাবে আকাশের অগাধ মুক্তিতে পাখা মেলে দিতে পারছেন না ত! তাঁরও "ঘুমের সুন্দরবনে বিদিশার স্তব্ধ অন্ধকার" কেন? দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর স্বচ্ছ জীবন তাঁরও মানসিক জীবনের কাছে তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে:

"চাঁদ নেই,
ঘুম নেই
তোমার খবর নেই
তবু আজ বেশ লাগে
তোমাকে হৃদয়ে নিয়ে
বিছানায় একা জেগে থাকা।"

এ-সব মন রুগ্ন কি ভগ্ন সে-বিচার কাব্য-সমালোচকের এলাকার নয়। তিনি দেখবেন কবিতায় কবির মনকে কতোটুকু এ-যুগের মনের রঙের নিরিখে পাওয়া গেল। ব্যথা যদি হয় যুগলক্ষণ তাহলে দেখতে হবে সে ব্যথা কতোটা মূর্ত্তিময় কতোটা ধ্বনিময়, সত্যময়, কতোটা মনোরম করে নিবেদিত হয়েছে। মনোময় হতে পারাটাই কবিতার সার্থকতা। তাতে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে মনে করলেও বলা যায়না যে সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল। আমরা যদি ইচ্ছা করি যে বাংলায় লিরিক কবিতা লেখা হোক তাহলে সমাজকে এটুকু ক্ষতির ভার বহন করে যেতেই হবে। কবিতা লেখা যদি নিষিদ্ধ না হয় তবে কবিতার হৃদয়সংবাদী না হয়ে উপায় কি? এবং তা হতে গেলে কবির যে মানসিকতার দরকার এবং ভাষার যে-পরিমাণ হৃদয়-গ্রাহিতার প্রয়োজন তা থেকে বিন্দুমাত্র চ্যুতি মেনে নেওয়া যেতে পারে না।

মদ্রচিত 'বাংলা কবিতার ছন্দ' এই কথা বলবার জন্যেই পূর্ব্বাশার পৃষ্ঠায় নিবেদিত হয়েছিল। আমি মদ্রোচিত কাজই করছি ভাবছিলাম। যে মদ্রদেশ বাংলায়-কাশ্মীরে ও দক্ষিণভারতে ছড়িয়ে ছিল এবং যার জন্মস্থান 'বিরাট'-রাজ্যে ওঙ্কারধামে বা কাম্বোডিয়ায়—ভরতনাট্যের দেশে—সে-দেশের কাব্যছন্দ 'চর্য্যাপদে' এবং 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' বিধৃত বলেই একটা ধারণা জন্মেছিল এই অকৃতীর মনে। কবিতার ও ভাষার সংজ্ঞা সম্পর্কে একটা স্বজ্ঞা সক্রিয় হয়েছিল অন্তঃকরণে। মনে হয়েছিল, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ সেই নর্ত্তকীদের চিনেছিলেন, সেই 'স্কন্দ'-নাম্নী দেবদাসীদের যারা ছিলেন ওঙ্কারধামে, সেই দেবদাসী-'লাইছাবি'-দের যারা ছিলেন মণিপুরে, সেই 'কারুবাকী'-'কুমারদেবী' লিচ্ছবীদের যারা ছিলেন তিব্বতে-নেপালে—যাদের নূপুর বেজে গেছে বাংলার অঙ্গনে রিণিরিনি-



রবে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মনই সেই নৃত্যের ছন্দকে চিনতে পেরেছিল—এই মহাকবিই ধরতে পেরেছিলেন কবিতার ছন্দের মূল সূত্র কি। সেই অদ্বিতীয় একটিমাত্র প্রতিভা ছাড়া এই যুগে এতদ্দেশে আর কেউ সচেতনভাবে বাংলা-কবিতার ছন্দতত্ত্ব আলোচনা করতে সক্ষম হননি। ছন্দ-নির্ম্মাণও তিনি ছাড়া আর কেউ করেছেন বলে মনে হয়না। তবে এখন ভাবতে পারি—এবার ছন্দশিল্প গড়ে উঠে' গৌড়ের 'পয়ার' সৎ পথে গড়িয়ে চলবে।

ওঙ্কারধামের অষ্ট্রলয়েডরা 'স্কের' ভাষার জন্ম দেন। প্রোটো-অষ্ট্রলয়েডের 'মনোস্কের' ভাষা আসাম থেকে আগত। আমরা বাংলার 'ধম্মপদে' দেখছি 'মনো' ছিল 'পূর্ব্বঙ্গমা'—তিনি বাংলার 'মনসা'—মহাবীরের 'মনস্'—তিব্বতের 'মানস'-সরোবরাশ্রয়ী চৈনিক 'মান্' বা ম্যাজিক। 'মেনকা'-রা সেখানে জন্ম নিতেন—'মনু' সেখানকার মানুষ বা মানব—দেবসেনা কার্ত্তিকও (কথাকলি নৃত্যের জন্মদাতা) সেখানেই লালিত। হিমালয়ের কুশস্থলীই একদা কোশলরাজ দক্ষদের জন্ম দেন এবং তাঁরাই, সেই মহাকোশলরা, রাঢ়াপুরীর (চীন) সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হ'ন। রাঢ়াপুরীর বা 'মহানাদে'র সিংহবংশ বিজয়সিংহ থেকে আগত—বাংলার সেই বিজয়সিংহ পাণ্ডব মহাকোশলের রক্ত বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন সিংহলদ্বীপে। সেখানে তাঁরই গোত্রে 'দুতুগেমুনু'র জন্ম যিনি দেবসেনা 'স্কন্দে'র উপাসনা করতেন এবং বাংলার সেই বিগ্রহকে যিনি কথাকলির নৃত্যভঙ্গীতে 'কতৌগমু' মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে যান। সেন-বংশের আদিপুরুষই সিংহল জয়ী সিংহরা যারা মগধেও আদিসিংহ বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদেরই 'জয়স্কন্ধাবার' স্থানে-স্থানে উপনীত হয়েছে। বিজয়সেনের সুহৃদ ছিলেন 'চোড়গঙ্গ' আর চোড়গঙ্গ-দুহিতা 'চন্দ্রিকা' ছিলেন ভুবনেশ্বরের বিষ্ণু মন্দিরের দেবদাসী। তাঁর নামে উৎকীর্ণ লিপিতে আছে: 'গীতজ্ঞ-লয়-তাল-নর্ত্তন-কলা-কৌশল্য-লীল-আলয়া"। তার মানে তিনি ছিলেন ভারতনাট্যোক্ত সেই 'পাত্রম্' বা নর্ত্তকী যিনি শিল্পের আধার। এই কলাবতীরাই দেবসেনা কার্ত্তিকের প্রিয়পাত্রী ছিলেন—যাদের ছিল, বড়ু চণ্ডীদাসের ভাষায়, 'উরুযুগ রামকদলীতরুসমা'—তাঁরা কলাগাছের মতো ঘোমটা-টানা কলাবউ ছিলেন না। ছিলেন রম্ভা, কাঁচাকলা নয়। এই রম্ভাকে নিয়েই আয়েম্বিক বা আরম্ভিক ছন্দ ঋগ্বেদের 'জগতী'। এই দিতি-নর্ত্তকী (দিত্তি শান-প্রদেশের একটি নদীর নাম, সেখানকার 'নরা'-কৌম জ্যোতির্বিদ্যায় এবং কাব্য-রচনায় পারদর্শী) রম্ভাকে নিয়েই গ্রীকদের প্রথম নাচ 'দিথিরম্ভ' সুরু। তাঁদের সভ্যতার তিথিও আরম্ভ ঈশান-দেব জৈমিনির কৃপায়। পূর্ব্ব-উত্তর-মীমাংসায় জৈমিনি অনেক জাতকই সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের মধ্যে উৎকলী ব্যাঘ্রতটীরা ('উৎকলকাণ্ড' দ্রষ্টব্য) অন্যতম। বৈসালীর বৃজি-লিচ্ছবী ব্রজরাজ-সম্প্রদায় বীরভূমে বাগ্দী হয়েও কিন্তু 'দিথিরম্ভে'র ভঙ্গীতে 'ভাদু-নৃত্য' নিয়ে মত্ত। উৎকলী ব্যাঘ্রতটীরা হয়েছিলেন পাণ্ডব

উদয়নের ত্রিকলিঙ্গ গুপ্তরাজবংশ—বা নব মহাকোশলরাজ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যবংশ। এঁদের আওতায় কাশী-কোশল-কৌশাম্বী-শ্রাবস্তী 'ত ছিলই, তদুপরি 'ভরহুতে' (বিদিশা) নয়া ভারতবংশ সৃষ্টি করতেও এঁদের হাত ছিল তৎপর। তারা 'শুঙ্গ' এবং 'কাণ্ব' বংশ। মহাভারতের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-রাজ কর্ণ থেকে বাংলার এবং মহারাষ্ট্রের সেনরা সেনানী হলেন—ঋকসংহিতায় 'কৃণ্ব' নাম নিয়ে উঁকি দিলেন—কুশান সেজে বুট পায়ে সোজা হেঁটে চলে গেলেন ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীক হবার জন্যে—আমরা কেউ তাঁদের আমলই দিলাম না। সাধে কি আর গ্রীক্-শাক্য কোণিশকের সভা-কবি কাশীর অশ্বঘোষ নয়া ভারতবংশকে গালিগালাজ করেছেন? অবশ্য গালাগালিতে বর্ম্মী বঙ্গাল বৈষ্ণব ভারহুতের চৈতন্যোদয় হতনা যদিনা কোণিশক শহীদ হতেন। দ্বিজবরের ছেলে পরমভাগবত হেলিওডোরা যখন 'কাসিপুত ভাগভদ্রের' কাছে আশ্রয়-প্রার্থী হয়ে ফিরে এলেন—নিলেন মোহেঞ্জোদারোর ত্রিমূর্ত্তির শরণ বিদিশার বৈষ্ণব-ভঙ্গীতে, তখন সেখানকার পদকর্ত্তাভজা তাতার-বংশজ ভাগভদ্র তাঁকে হলধরজ্ঞানেই ঘরে তুলে নিলেন।

বেদ বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদেরই রচনা। ঢাকায় বা ডবাকে লক্ষ্মণসেনীরা যেই বৈষ্ণবী বাগীশ্বরী চণ্ডী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—চাটিগ্রামের, যশোরের চন্দ্রদ্বীপের মগ-আরবরা যাঁদের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, তাঁরাই বাংলার পয়ার এবং বেদের ভ্রূণ 'পদকার' নামক বস্তুটির স্রষ্টা। বাংলার পয়ার বিদিশায় গিয়ে বিশুদ্ধ 'পদকার' হয়েছিল এবং দিশা হারিয়ে বেদিশা হয়ে 'বেদ-সংহিতা'। বেদ-উপাঙ্গ রচয়িতা ফাদার জিমারম্যান বল্‌ছেন: "শৌনকের 'ঋকপ্রাতিশাখ্য'-গ্রন্থ 'পদকার'-দ্বারা ঋক্‌গুলোর পরিবর্ত্তন-সাধনের সাক্ষ্য প্রদান করছে। এখন যদি 'প্রাতিশাখ্যের' সাহায্য নিয়ে 'বেদসংহিতা'র বিন্যাস ও 'পদোক্তি' গুলো পাশাপাশি রেখে আমরা ঋক্‌বেদের সত্যপাঠ যাচাই করতে চাই তাহলে বলতে হয় যে ঋক্‌বেদের ঋক্‌গুলোর পাঠ 'প্রাতিশাখ্যে'র মতোই ছিল। 'প্রাতিশাখ্যে'র ন্যূনপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব্ব চার-শতক।" তার মানে শাক্য-মৌর্য্য-কাল—আলেকজাণ্ডারের অব্দযুগ—আমাদের বুদ্ধ-নন্দ-যুগ। জাষ্টিন 'অলেকজান্দ্রাম' আর 'নন্দ্রাম'-কে অভিন্ন বলে ঘোষণা করে গেছেন। নন্দবংশেরই একটি শাখায় বিলম্বিত ছিল মৌর্য্য-শাক্যদের মতো এই দিলীপ-বা ফিলিপ-পুত্র আলেকজাণ্ডার যিনি ভারতবর্ষকে বিড়ম্বিত করেছেন।

তাঁর বংশধর তক্ষশীলায় উপদ্রুত হয়ে যখন 'কাসিপুতে'র আশ্রয়প্রার্থী, যখন নজরুলী ভাষণে তিনি ভাবছেন: "আমি হল বলরাম স্কন্ধে
উপাড়ি ফেলিব অধীন-বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির মহানন্দে"
তখন 'ভাগভদ্র' তাঁকে মনে-করিয়েদিলেন, 'ভয় কি বাছা—তুমি ত 'অজ'-বংশধর—'ছাগ'-মুণ্ড দক্ষবংশধর—চিরদিনকার দক্ষ বৈষ্ণব। ভগবতী আর ছগবতীতে কোনো বিরোধ নেই



দেখো বিদিশার দেয়ালে বুদ্ধজননী মায়া কে—কি তাঁর নাম ছাখো! এমন লিপি আমি অঙ্কন করেছি যাকে উন করে 'ভগবতো উক্রংতি' পড়তে পারো—আর পুরোভাবে 'ছগবতোনাক্রংতি'-ও পড়তে পারো—পাশে একটি শিবলিঙ্গ রেখেছি, ইন্দ্রের ঐরাবৎও আছে—ইন্দ্র আর শিবের মিলনে তৈরী করেছি নূতন মায়াবতীর গর্ভে বুদ্ধকে। জৈন বৃষল চন্দ্রগুপ্ত-ও আছেন—বৃষ-ভঙ্গীতে শিবের বাহন (ভারহুত প্রাচীরগাত্রে লিপি ও আলেখ্য নং ৯২ দ্রষ্টব্য)। জৈন-বৃক্ষ 'গোমতরায়' হয়ে তিনিই শ্রবণবেলগোলায় বিদ্যমান, দেখে থাকবে।" ভাগভদ্রের কথা শুনে 'হাল' বংশধর (কোণিশক বংশধর) হেলিওডোরা হাল ও হল ছেড়ে ডোরা-সাপ বনে গেলেন। বিষ্ণুর বাহন গরুড় হয়ে করযোড়ে বলে উঠলেন:

"ত্রিণি অমূতপদানি সুঅনুঠিতানি
নয়ংতি স্বগদমং ছাগ অপ্রমাদ।"

মুচকি হেসে কাসিপুত বল্‌লেন: "যবন-কণ্ঠে মোহেঞ্জোদারোর ত্রিমোহন মন্ত্র এর চাইতে ভালো আর কি হ'বে—আপাতত এ-ই পড়ে যাও, বাবা! কিন্তু মনে রেখো বস্তুটি বিদিশার ছন্দে এলোনা। বিদিশার ছন্দ ২১ মাত্রার 'মনোহংস' বা 'বসন্ত-তিলক'—বারুণী ছন্দ। শোনো তার 'পংক্তি':

ত্রিণিনমুহ্হো পঙক্তীয়ং ণুঅউচ্‌য়তি
নৈয়া তীবগদমঞ্চঙ্গ অপ্পমক্কদ॥

তুমি মনু, অপ-মগধ ওড্রদেশের বলরাম, নূতন নাবিক সেজে এসেছ—পদগত প্রাণ, কেন আবার সেই প্রাচীন জম্বুদ্বীপের জামদ্ব্যগ্ন-কণ্ঠে বলির রব তুলছ?"

লজ্জিত হয়ে হেলিওডোরা হুবিষ্ক হলেন এবং মহানাদে এবং উড়িষ্যায় উড়ে এসে জুড়ে বসলেন। এই হ'ল বেদের, বুদ্ধের, বৈষ্ণবের রূপকথার ইতিহংস। বাংলার বলাকার ছন্দেরও আসল খবর।

উপসংহারে আমার এই বক্তব্য যে কবিমন ও শব্দ-নির্ব্বাচন, সৎ-কবিতার এ' দু'টি মুখ্য উপাদান এখনকার কবিতায় দেখা যাচ্ছে। তাই ভাবছি, বাংলাদেশের কাব্য-ঐতিহ্যের ভিত্তিতে কবিমন দৃঢ়ভাবে আসীন হতে পারলে আরো অনেক বছরের জন্যেই বাংলা-কবিতা নিয়ে আমাদের দুর্ভাবনা করতে হবে না।

"যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাৎ বিশদীভূতে মনোমুকুরে
বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ॥"—অভিনবগুপ্ত

# শীতের কোকিল ঃ

## শংকর চট্টোপাধ্যায়

শ্রীলা সান্যালের শরীরটা একবার কাঁপল। বড্ড শীত পড়েছে এবার কলকাতায় ভাবলেন তিনি। র‍্যাপারটা টেনে দিলেন বুক পর্য্যন্ত। ঘড়ির কাটায় রাখা চোখ টেনে আনলেন দরজার দিকে। আকাশী রঙের পর্দা স্থির, শীতল। ঘড়িতে কখন এগারটা বেজে গেছে, তবুও দেখা নেই সূর্যপদর। কি ভেবেছে সূর্য? এমনি একাএকা রাত জেগে আর কত কাটাবেন শ্রীলা সান্যাল। অপেক্ষার প্রহর আর কতকাল ফানুসের মত উড়াবেন তিনি এমনি করে। স্পষ্ট করে বলে দিলেই হয়। তাহলেই চুকে যায় সবকিছু। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ সূর্যপদ, জটিল অংকের প্রশ্নটাকে কিছুতেই মেলাতে চাননা। কেবল দূরে দূরে, হাতের নাগালের বাইরে রেখে দেন। কিন্তু তাই বলে একটা মানুষের ধৈর্য্যের সীমাকে ভেঙ্গে দেবার কোন মানে হয়না। কথাগুলো একে একে ভাবলেন শ্রীলা সান্যাল। প্রায় মুখস্ত হয়ে এসেছে তার ভাবনার রেখাগুলো রাতের পর রাত ঠিক একই ভাবে ভেবে ভেবে।

শ্রীলা সান্যাল আবার একবার চোখ ঘোরালেন ঘড়িটার দিকে। ঘড়ির কাটায় প্রহর কাঁপছে, হারাচ্ছে আস্তে আস্তে। ঘুম পাচ্ছে শ্রীলা সান্যালের, ভীষণ ঘুম। চোখের পাতাদুটো ভারী হয়ে উঠছে ক্রমশঃ। সত্যিই ঘুমিয়ে নেবেন নাকি তিনি খানিকক্ষণের জন্য। সূর্যপদ আসবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ খুলবেন। কতক্ষণই বা জেগে থাকা যায় একা একা। কেউ একজনও নেই যার সঙ্গে গল্প করে খানিকটা সময় কাটাবেন তিনি। গল্প করা কিংবা বইপড়া এদুটোর কোনটাই আজকাল আর ভালো লাগেনা শ্রীলা সান্যালের। তবুও পারা যায় সময়ের শরীরকে গড়িয়ে দিতে, ভুলে থাকা যায় হৃদয়ের গোপন ব্যথাটাকে গল্প কিংবা বইএর ভেতরে ঢুকে।

খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন শ্রীলা সান্যাল। কোন কিছু ভাবলেন না। তারপর একসময় চোখ বুঁজলেন। চোখ বুঁজবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা আরামের আলস্য তার সারা শরীর আঁকড়ে ধরল। ঘুমের আড়ালে হারিয়ে যাবার আগে পর্য্যন্ত সূর্যপদর চেহারাটা মনে মনে ভাবলেন শ্রীলা সান্যাল। সত্যিই আশ্চর্য্য চেহারা সূর্যপদর! পুরোন প্রশংসাটা আর একবার নিজের মনেমনে না উচ্চারণ করে পারলেন না তিনি। সূর্যপদর মত অমন সুপুরুষ আর একটাও চোখে পরেনি শ্রীলা সান্যালের এ পর্য্যন্ত। আর ঐ চেহারাটার জন্যই ত। ভাবনায় ছেদ আনলেন তিনি। কলেজের অন্য সব প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে শ্রীলা সেনকে জিতে নিলেন সূর্যপদ সান্যাল। শ্রীলা সেনও সাগ্রহে হাত বাড়ালেন



সূর্যপদ সান্যালের দিকে। পুরোণ ঘটনাটা নতুন করে ভাবতে গিয়েও একা ঘরে নির্জ্জনে আরক্ত হলেন শ্রীলা সান্যাল।

মিথ্যা কথা বলতে পারবেন না শ্রীলা সান্যাল, চেহারা ছাড়া সূর্যপদর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ছিল অসাধারণ। ইউনিভার্সিটির বিচারে চিরদিন সূর্যপদ সান্যালের নাম সকলের নামের আগে ছাপা হয়েছে। প্রতি মাসে মূল্যবান সব চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে পত্রিকাগুলো ভরিয়ে তুলেছেন সূর্যপদ। এসব কথা পুরোন হলেও নতুন করে ভাবতে ভালো লাগল শ্রীলা সান্যালের আবার। একটা গোপন রোমাঞ্চ অনুভব করলেন তিনি নিজের মধ্যে।

ঠিক আসললোকটিকেই চিনেছিলেন শ্রীলা সেন যৌবনে। স্কটিশের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্রী ছিলেন তিনি তখন। শ্রীলা সেনের বাবার অর্থ আর প্রতিপত্তিই টেনে এনেছিল সমাজের বাছাইকরা সব ছেলেদের। আর শ্রীলা সেনের চেহারাটাও নেহাৎ মন্দ ছিল না সেদিন। তাই বড্ড বেশী ভীড়ে আটকে থাকতে হোত সময়। হাঁফিয়ে উঠতেন মাঝে মাঝে। খুঁজতেন নির্জ্জন একটা অবসর। অনেক প্রতীক্ষার ধূপ পুড়িয়ে দেখা পেয়েছিলেন তিনি সূর্যপদ সান্যালের।

সূর্যপদ সান্যালের দেখা পাবার আগেও সেই ভীড়ের মধ্যে আর একটি মানুষকে ভালো লাগত শ্রীলা সেনের। অনিকেতন রায়। নামটা আর একবার আওড়ালেন শ্রীলা সান্যাল মনে মনে। ছেলেটার ব্যবহারের সঙ্গে ঐ অদ্ভুত নামটার সামঞ্জস্য ঘটেছিল অপরূপভাবে। কেমন একটা শীতল দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকত অনিকেতন শ্রীলা সেনের দিকে সব সময়। কথা বলত কম। কিন্তু যা বলত তা ছিল উচ্চারণে স্পষ্ট, তীব্রতায় প্রখর। এ ছাড়া আর একটা গুণ ছিল অনিকেতনের। অদ্ভুত বাজাতে পারত ভায়োলিন। আর ভায়োলিনের তারে যখন হাত বোলাত অনিকেতন তখন এক দুর্ব্বোধ্য শিহরণে বার বার কেঁপে উঠতেন শ্রীলা সেন। বড় দূর ঝাপ্‌সা বিবর্ণ বলে মনে হত অনিকেতনকে শ্রীলা সেনের সেই সময়। মনে হত কোনো স্পর্শের শিহরণেই বুঝি প্রাণ ফুটবেনা তার শরীরে। এসব কথা ভাবতেন শ্রীলা সেন রাত্রে ঘুমোবার আগে। আর অসহ্য নীল একটা ব্যথায় ক্ষয়ে ক্ষয়ে আসতেন মনে। হয়ত সূর্যপদ সান্যালের দেখা না পেলে অনিকেতন রায়কেই নিজের জীবনে স্থান করে দিতেন শ্রীলা সেন। বহুদিন পর আজ এসব কথা ভাবতে বাসনার এক অস্পষ্ট-শ্রুত গুঞ্জরণ শুনলেন শ্রীলা সান্যাল। অস্পষ্ট একটা কুয়াসা ফিরে এলো ভাবনাগুলোর চারপাশে। শ্রীলা সান্যালের মনে হোল হয়ত অনিকেতন রায়কে বিয়ে করলে অনেক বেশী সুখী হতে পারতেন তিনি। আবার পুরোন ভাবনার জট খুললেন শ্রীলা সান্যাল।

শ্রীলা সেনের বিয়ে হল সূর্যপদ সান্যালের সঙ্গে অবশেষে বেশ হৈ হৈ করে। আর

বিয়ের চিঠি পাঠালেন শ্রীলা সেন অনিকেতন রায়কে। কিন্তু বিয়েতে এলো না অনিকেতন। বিয়ের পর শুনলেন শ্রীলা অনিকেতন নাকি বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। তারপর থেকে অনিকেতননের কোন খবরই পাননি তিনি। আর পাবেনও বা কেমন করে? বিয়ের পরের দুটো বছর সূর্যপদ কি শ্রীলা সান্যালকে আর কোন নাম মনে আনতে দিয়েছেন একমাত্র নিজের নামটা ছাড়া। অনিকেতন রায় মরে গেছে আস্তে আস্তে, তার সেই শীতল দুর্ব্বোধ্য দৃষ্টি ভুলে গেছেন শ্রীলা সান্যাল। তাই এতদিন পরে অনিকেতনের নামটা নিজের মনে উচ্চারণ করবার আগে কেমন ভয় ভয় করছিল শ্রীলা সান্যালের প্রথম। অনিকেতন! ঘুমের মধ্যেও একবার ঠোঁট নড়ল শ্রীলা সান্যালের।

সূর্যপদ সান্যাল সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকলেন পর্দা সরিয়ে। শ্রীলা সান্যালকে ইজিচেয়ারে অমন করে ঘুমুতে দেখে কেমন একটা করুণা হল তার। এগিয়ে এলেন তিনি ইজিচেয়ারটার কাছে। একটুও শব্দ করলেন না পায়ে। তারপর হাত ছোয়ালেন শ্রীলা সান্যালের দেহে। শ্রীলা সান্যালের দেহের কাছে আসতেই একটা মৃদু সৌরভ পেলেন সূর্য্যপদ। বাসি চুলের সৌরভ, শিশির ছড়ান, শান্তি ছড়ান দেহের সৌরভ বলে মনে হল সূর্যপদর। ডাকলেন মৃদু নরম গলায় শ্রীলা, শ্রীলা।

আর সেই মুহূর্ত্তেই ঘুমের মধ্যে শ্রীলা সান্যাল শুনতে পেলেন মৃদু, অতি মৃদু প্রায় রুদ্ধ স্বর। চমকে উঠলেন তিনি। চোখ খুল্লেন পরমুহূর্ত্তে। চোখ খুলেই দেখলেন সূর্য্যপদর চোখ দুটোকে। নিজের চোখের অনেক কাছে বলে মনে হল তার। ধড়মরিয়ে উঠে বসলেন তিনি।

—কতক্ষণ এসেছ। ঘুমে ফোলা চোখ টান হল।

—এই একটু আগে! বল্লেন সূর্যপদ।

—আচ্ছা এমন করে রোজ রোজ তোমার দেরী হচ্ছে কেন। ঠোঁটের আরক্ত রেখা আরো গভীর হল, ঈষৎনত কপালে ভাজ পড়ল, টলটলে আলো জ্বলা চোখ আরো উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো, দেখলেন সূর্যপদ। কোন কথার উত্তর দিতে পারলেন না তিনি প্রথম।

—বলো কেন দেরী হচ্ছে রোজ। কি কাজ তোমার এত রাত্রির ধরে। থমথমে স্বর। বুঝলেন সূর্যপদ ঝরের পূর্ব্বাভাস।

—আজ একটু অমিয়র বাসায় যেতে হয়েছিল। ও চলে গেছে কিনা বাইরে। শ্রীলা সান্যালের গলার পাশে সূর্যপদর গলার স্বর অদ্ভুত নরম শোনাল।

—বন্ধু বাইরে গেলে বুঝি রোজ রোজ বারোটা পর্য্যন্ত আড্ডা দিতে হয় তার স্ত্রীর সঙ্গে?



সূর্যপদ শ্রীলার কথার কোন জবাব দিলেন না। শ্রীলার কথাগুলো তার বেশ হিংস্র লাগল। তাই আর কথার জবাব খুঁজে পেলেন না তিনি।

চুপচাপ জামা কাপড় ছাড়লেন তারপর ঘাসের চটিটা পায়ে গলিয়ে চলে এলেন বারান্দায়। অন্ধকারের মত্ততাকে ঘিরে বারান্দায় যে আবছা, দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা জমে উঠেছে তার মধ্যে এসে বসলেন সূর্যপদ। সূর্যপদর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এলেন শ্রীলা সান্যাল।

—কি আমার কথার যে উত্তর দিলে না। শ্রীলা সান্যালের গলা অন্ধকারের স্তব্ধতায় ভেঙ্গে পড়ল।

—কারণ তোমার কথার কোন উত্তর হয়না। নরম গলায় প্রতিটি কথা স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলেন সূর্যপদ।

—আমাকে তুমি অপমান করতে পারলে। থির থির করে কাঁপল শ্রীলা সান্যালের গলা, বেদনায়।

—অপমান আমি তোমায় করতে চাইনি। কিন্তু তুমি আমাকে বাধ্য করিয়েছ। বল্লেন সূর্যপদ।

সেই রাত্রে সেখানেই থেমে গেলেন শ্রীলা সান্যাল। আর কথা বলতে পারলেন না তিনি।

পরদিন আবার বেশী রাত্তিরে বাড়ী ফিরে সূর্যপদ সান্যালকে শ্রীলার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। আজ জেগে বসেছিলেন শ্রীলা সান্যাল। সূর্যপদ ঘরে ঢুকতেই ফেটে পড়লেন তিনি।

—আজওকি বন্ধুর বাড়ী যেতে হয়েছিল নাকি?

সূর্যপদ ভালো করেই জানতেন যে আজো তাকে গিয়ে পড়তে হবে শ্রীলার মুখোমুখি। জবাব দিতে হবে তার প্রশ্নের। তাই রাস্তায় প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন তিনি মনে মনে। সত্যিই দিনদিন অসহ্য হয়ে উঠেছে শ্রীলা, ভাবলেন সূর্যপদ। আজ স্পষ্ট করে বলে দেবেন তিনি দিন ফুরিয়েছে শ্রীলার। কোন স্থানই আজ তার নেই সূর্যপদর মনে। একদিন উত্তাপ ছিল সেই প্রাণের, মূল্য ছিল সূর্যপদর কাছে। কিন্তু দিনের পর দিন বিকারের মত প্রেমকে আঁকড়ে থাকা যায় না। নোংরা একটা নিয়মের স্তূপ হয়ে ওঠে সেটা। আর এখন কি দিতে পারে শ্রীলা। তার মনের যে ভালোবাসার আকাংখা ছিল তা যদি অন্য কেউ মেটাতে পারে তাতে কি বা বলবার থাকতে পারে

তার? কণা। পৃথিবীর একক আশ্চর্য্য নাম। উচ্চারণ করলেন সূর্যপদ মনেমনে। কণা তুমি শোন, সূর্যপদ তোমার জন্য রাত্রি শেষের শেষ দীপ জ্বেলে দেবে। তোমার জন্য বিনয় নয়, সূর্যপদ। একটা প্রশান্তির আরাম পেলেন সূর্যপদ কথাগুলো ভেবে।

তাই শ্রীলার কথায় একটু অপেক্ষা করলেন না তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন।

—হ্যা সেখান থেকেই আসছি। রূঢ় শোনাল সূর্যপদের গলা।

—একা বাড়ীতে বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে কি প্রয়োজন। কুৎসিত একটা মন্তব্য—করলেন শ্রীলা সান্যাল।

সূর্যপদ চুপ করে গেলেন! এপ্রশ্নের জবাব তার জানা নেই। তিনি দিতে পারবেন না।

—জবাব দাও। শ্রীলা সান্যালের গলা আরো হিংস্র হল।

—তোমার এ কুৎসিত প্রশ্নের কোন জবাব হয়না।

—কুৎসিত। আমার প্রশ্ন কুৎসিত। আর তোমার আচরণটা?

এবারও কোন কথা জোগালনা সূর্যপদর ঠোঁটে।

—আমি স্পষ্ট করে একটা কথা জানাতে চাই সূর্যপদ। এরকম আর কতদিন চলবে।

—যতদিন আমরা দুজনে পরস্পর কাছাকাছি না আসতে পারি ততদিন। কতগুলো এক নিঃশ্বাসে বল্লেন সূর্যপদ। বলেই হাঁপাতে লাগলেন।

সূর্যপদর কথায় শ্রীলা সান্যাল স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর পায়ে পায়ে চলে এলেন নিজের ঘরে। চুপ করে বসে রইলেন বিছানায়। একটুও নড়লেন না তিনি। ঘন ঘন কেবল কাঁপতে লাগল তার ঠোঁট দুটো, তারপর এক সময় তারা দুমরোল, ভিজে উঠল, চোখ দুটো সরু হয়ে এলো, চোখের পাতাটা কাঁপল একবার, চোখের উপর নামলো ভারী হয়ে। ঝাপসা দেখাল শ্রীলা সান্যালকে। আর সেই মুহূর্ত্তেই তার মনে পড়ল সূর্যহীন একটা ভবিষ্যতকে, স্বপ্নের সোনালী চাদরে উজ্জ্বল উদ্ধত একটা দীর্ঘ শীতকে যেন দেখলেন শ্রীলা সান্যাল, তুষার বাতাসে কাঁপলেন খানিক।

তারপর দিন থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে সংকীর্ণ করে আনলেন তিনি ঘরের ছাঁপ-ধরা দেওয়ালগুলোর মধ্যে। সব তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। সূর্যপদর মনের চেহারাটা উজ্জ্বল দিনের মত স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সূর্যপদর জীবনে প্রয়োজন ফুরিয়েছে শ্রীলা সান্যালের। কোন দিন আর ডাক পড়বেনা শ্রীলা সান্যালের সূর্যপদর জীবনে। কোনদিন না। সূর্যপদ



হয়ত পারবেন মুক্ত হতে সমস্ত দায় থেকে, সমস্ত কর্ত্তব্য থেকে পারবেন নিজেকে সরিয়ে নিতে। পারবেন হয়ত অন্য কোন জীবনের কাছথেকে কিছু স্বাদ পেতে। কিন্তু শ্রীলা সান্যালকে চিরদিন আটকে থাকতে হবে বাড়ীর এই চার দেওয়ালের নক্সার মধ্যে মৃত একটা মাছির মত, তার মেয়ে ময়নাকে নিয়ে।

তারপর দিন গড়াল। হলুদ বিবর্ণ হয়ে স্মৃতি হতে লাগল এক একটা দিন। শ্রীলা সান্যাল আর সূর্যপদর ব্যবধান বেড়েই চল্লো ক্রমশঃ। তারপর একদিন সূর্যপদ শ্রীলা সান্যালের মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

—আমার একটা কথা ছিলো। বল্লেন সূর্যপদ।

—বল। নিস্তেজ রুগ্ন শোনাল শ্রীলা সান্যালের গলা।

—আমাকে বোধ হয় কয়েকদিনের জন্য—বাইরে যেতে হবে। নীচু গলায় বল্লেন সূর্যপদ।

—কবে যাবে?

—হয়ত পরশু।

—বেশ।

আর কথা বলতে পারলেন না কেউ। চুপচাপ ফিরে এলেন সূর্যপদ নিজের ঘরে।

তারপর যাবার দিন দরজার কাছে দেখা হল দুজনের।

—আজকেই যাচ্ছ? বল্লেন শ্রীলা সান্যাল।

—হ্যা দুপুরের ট্রেনে।

স্পর্শময় স্তব্ধতা।

—আমার চেক বইটা ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারে আছে। যখন যা দরকার হবে খরচ কোরো। আর—কথাটা শেষ করতে পারলেন না সূর্যপদ সান্যাল।

—আর সাবধান মত থেকো। অনেক্ষণ স্তব্ধতার পর আবার বল্লেন সূর্যপদ।

শ্রীলা সান্যল শুধু দাঁড়িয়ে রইলেন স্থির হয়ে একটা ছবির মতো। তারপর সূর্যপদ বেরিয়ে যাবার আগে ঠোঁট খুল্লেন।

—একটু দাঁড়াও। কথা বলতে বলতে সূর্যপদর কাছে সরে এলেন শ্রীলা সান্যাল। তোমাকে একটা প্রণাম করব।

—প্রণাম করবে! কথাটা ভালো করে বুঝতে না পেরে আবার উচ্চারণ করলেন সূর্যপদ সান্যাল। একটু সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন।

—না, না প্রণামের কি দরকার আছে! বাধা দিতে চাইলেন সূর্যপদ। কিন্তু পারলেন না।

ঘরের মাঝখানে লাল মেঝের উপর পা দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন সূর্যপদ। শ্রীলা সান্যাল মেঝে পেরিয়ে এগিয়ে এলেন সূর্যপদর দিকে, তারপর তার ঋজু শরীরটা আনত হল। সূর্যপদ দেখলেন ধনুকের মত একটা বাঁকা পিঠ।

হাত রাখলেন সূর্যপদ শ্রীলা সান্যালের মাথায়। কালো চুলের মধ্যে, উজ্জ্বল কালো চুলের মাঝখান দিয়ে ঋজু দীর্ঘ সিঁথি একটা চিহ্নের মত, দূরের সঙ্কেতের মত। দেখলেন সূর্যপদ, হাত তুলে নিলেন। কারণ তার যেন মনে হল পুরোন একমুঠো মমতা যেন তার হাতের মুঠোয় গলে গলে যাচ্ছে।

প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীলা সান্যাল। সূর্যপদ শ্রীলা সান্যালের দিকে তাকালেন না। চোখ ঘুরিয়ে নিলেন ঘরের অন্যদিকে। তারপর একসময় বল্লেন— আচ্ছা যাই।

—এসো। দরজার কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বল্লেন শ্রীলা সান্যাল অদ্ভুত এক কণ্ঠে।

ট্যাক্সিতে উঠে কেমন যেন লাগতে লাগল সূর্যপদর। ফিরে যাবেন নাকি, কাজ নেই সামনের দিনগুলোকে নতুন হাতের ছোঁয়ায় সোনালী করে। ফিরে যাবেন সেই ঘরে যে ঘরে ছাই রঙের শাড়ী পরে একজন দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। যার চোখ এখনো তাকে অনুসরণ করে চলেছে। যাকে একদিন তিনি ভালোবাসতেন সেই মানুষটার কাছে। জানলার কাচ দিয়ে পিছনের দিকে একবার মুখ ফেরালেন সূর্যপদ। পিছনের পথে একটা নিঃসঙ্গতার ধূসরতা ছড়ান। সে পথে আর ফিরে যাওয়া যায় না, আর গিয়ে দাঁড়ান যায়না সেই মানুষটার মুখোমুখি। ভাবতে ভাবতে একটা বেদনার কুয়াসা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠল তার সারা শরীরে।

দরজার গোড়ায়ই দাঁড়িয়ে ছিলেন কণা মুখোপাধ্যায়। সূর্যপদর ট্যাক্সিটা দাঁড়াতেই— তিনি সোজা উঠে এলেন ভিতরে।

—তুমি যে কিছুই নিলেনা। প্রথম কথা বল্লেন সূর্যপদ।

—কি আর নেব। আর পিছনের জীবনের কোন কিছুকেই আমি সঙ্গে নিয়ে যেত চাইনা। বল্লেন কণা মুখোপাধ্যায়।

সূর্যপদর কেলেংকারির খবরটা জানলেন শ্রীলা সান্যাল কিছুদিন পরে। বন্ধুর বৌকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ঘটনাটায় একটুও চমকালেন না তিনি। স্পষ্ট করে কিছু না জানলেও তিনি যেন বুঝতে পেরেছিলেন এরকম কিছু একটা ঘটবে। ঘটনাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা শীত, আশ্চর্য্য একটা শীতের হাত যেন অনুভব করলেন শ্রীলা সান্যাল বুকের মধ্যে।

আর তারপর কয়েকদিনের মধ্যে মনস্থির করে ফেল্লেন তিনি। সূর্যপদর অর্থ কিছুতেই



স্পর্শ করবেন না। সুটকেসের তলা থেকে টেনে টেনে বের করলেন বহুদিনের পুরোন ফাইলটা। আর তার মধ্যে থেকেই বেরুল ইনিভার্সিটির ডিগ্রী পাওয়া কাগজগুলো। মন দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন তিনি। আশ্চর্য্য হলেন। কবে, কোনযুগে নাকি তিনি এম, এতে দর্শনে প্রথম হয়েছিলেন। একথাটা ভুলেই গিয়েছিলেন শ্রীলা সান্যাল এতদিন। ভালোকরে ধুলো ঝেড়ে গুছোলেন সেগুলো।

চাকরিতে বহাল হবার দিনটাতেই অফিসরুমে চোখাচোখি হল শ্রীলা সান্যালের সঙ্গে অনিকেতন রায়ের। চম্‌কে চোখ নামালেন শ্রীলা সান্যাল। হৃদয়ের পেশীগুলো কেঁপে উঠল তার থর থর করে। অনিকেতন এখানে। কেমন একটা চিন্তার কুয়াসা জট পাকালো শ্রীলা সান্যালের মনের মধ্যে।

গেটেই দেখা হল আবার অনিকেতনের সঙ্গে শ্রীলা সান্যালের।

—তুমি, মানে আপনি এখানে। অপ্রস্তুত হয়ে কথা বল্ল অনিকেতন।

—চাকরী করি। আর তুমি। সোজাসুজি তাকালেন শ্রীলা সান্যাল অনিকেতনের দিকে।

—একটা দরকারে। কথার সঙ্গে একটা হাসির রেখা ফুটল অনিকেতনের ঠোঁটে।

তারপর অনেক কথাই বল্লেন তারা দুজনে। প্রথম সঙ্কোচের প্রাচীরটা ভেঙ্গে দিলেন শ্রীলা সান্যাল নিজেই। অনিকেতনের আর একটুও দ্বিধা হলনা। সহজে কথা বলতে সুরু করলেন। কথা বলতে বলতে অনেক দূর চলে এলেন শ্রীলা সান্যাল। তারপর ফেরবার পথে বল্লেন অনিকেতনকে ঃ একদিন এসোনা আমার ওখানে।

পরেরদিন সন্ধ্যায় এলো অনিকেতন। শ্রীলা সান্যাল সবে বাথরুম থেকে চান করে বেরিয়েছেন।

—তুমি একটু বোসো আমি আসছি। দ্রুতপায়ে শ্রীলা সান্যাল চলে গেলেন নিজের ঘরে।

অনিকেতনের মনে হল শ্রীলা সান্যালের শুধুমাত্র পদবীটাই পাল্‌টেছে। কিন্তু ঠিক একই রকম রয়ে গেছে সে। ড্রইংরুমে একা একা বসে কেমন অস্বস্তি লাগতে লাগল অনিকেতনের। কি ভাববেন শ্রীলার স্বামী এসময় এসে পড়লে। জিজ্ঞেস করলে কি উত্তর দেবেন অনিকেতন রায়। শ্রীলার স্বামী! কি নাম? মনে আনতে পারলেন না প্রথম কিছুক্ষণ তিনি। তারপর মনে পড়ল। খুব স্পষ্টই মনে পড়ল নামটা, চেহারাটাও। সূর্যপদ সান্যাল।

সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুকলো শ্রীলা।

—কি ভাবছ বসে বসে। হাসিতে কথা মেশাল শ্রীলা সান্যাল।

—তোমার স্বামী কোথায়? একটা বেমানান প্রশ্নই করে বসলেন অনিকেতন রায়।

—ও সূর্যপদর কথা বলছ। সেত এখানে থাকে না। সহজ সুরেই কথাটা বল্লেন শ্রীলা সান্যাল।

শ্রীলা সান্যালের কথায় ঘাবড়ে গেলেন্ অনিকেতন রায়। কি বলতে চাইছে শ্রীলা· ভাবলেন তিনি মনেমনে।

—তার মানে। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন তিনি আবার।

—আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে অনেকদিন। এবারও বেশ সহজ গলায়ই উত্তর দিলেন শ্রীলা সান্যাল।

খানিকটা সময় তাদের আলাপ আলোচনা ভালোকরে জমলোনা। বার বার তাল কেটে যেতে লাগল। একসময় তারা দুজনেই ভুলে গেলেন কথা। চায়ের সঙ্গে আলাপ চল্লো গড়িয়ে। তারপর একসময় ময়না এসে ঢুকলো ঘরে।

ফুটফুটে ফর্সা বাচ্চা মেয়েটাকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসে ফেল্লেন অনিকেতন রায়। কোলের কাছে টেনে নিলেন। তারপর সুরু করলেন আলাপ করতে।

—ভীষণ দুষ্টু কিন্তু দেখো। এখনি হয়ত তোমার জামা ছিঁড়ে দেবে। হাসিতে সোনালী হয়ে উঠলেন শ্রীলা সান্যাল।

তারপর একসময় বাধ্য হয়ে উঠতে হল অনিকেতন রায়কে। দরজা দিয়ে বেরুনর আগে স্মরণ করিয়ে দিলেন শ্রীলা সান্যাল ঃ কালকে কিন্তু ভায়োলিনটা নিয়ে এসো।

—ভায়োলিন। কেমন যেন অদ্ভুত লাগল নামটা। ভায়োলিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা কি বুঝতে পারলেন না অনিকেতন রায়। বল্লেন ঃ —আমি, ভায়োলিন। কথাটা শেষ করতে পারলেন না তিনি।

—হ্যা ভায়োলিন বাজিয়ে শোনাতে হবে আমাকে। কোন কিছু ওজর আপত্তি আমি শুনবনা।

শ্রীলা সান্যালের কথায় মনে পড়ল অনিকেতনের। একদিন তিনি ভায়োলিন বাজাতেন। কিন্তু সেত অনেক দিন আগের কথা। ভাবলেন মনে মনে। শ্রীলার বিয়ের দিন থেকেই তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন সে বাজনা।

ফিরবার পথে দোকান থেকে ভালো দেখে একটা ভায়োলিন কিনলেন অনিকেতন রায়। তারপর বাড়ী ফিরে গভীর রাতে বাজনা নিয়ে বসলেন তিনি। প্রথম হাত চল্লোনা কিছুতেই, আটকে যেতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে সুর ফুটল। বহুদিনের আগের একটা পুরোন সুর বাজল আঙুলে। তারপর একটা একটা করে যতগুলো সুর মনে এলো অনিকেতনের সবগুলো বাজালেন তিনি। এদিকে আস্তে আস্তে রাত্রের অন্ধকার ছাই-ছাই রঙ ধরল, ফিকে হতে সুরু করল, তারপর একদম মিলিয়ে গেল। সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা থামালেন



অনিকেতন রায়। আশ্চর্য্য এক পরম আলস্যে ঘুম পেতে লাগল তার। বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি। চোখ বুঁজলেন। কিন্তু চোখ বুঁজেই দেখতে পেলেন শ্রীলা সান্যালকে।

—শ্রীলা। শ্রীলা। বার দুই মনের ভিতর থেকে নিজের গলার স্বর শুনলেন তিনি। মনের মধ্যে এতদিন ঘুমিয়ে থাকা নামটা কেঁপে কেঁপে উঠে এলো অনিকেতন রায়ের গলা বেয়ে, তারপর সুর হল।

সেদিন আর দুপুরে আফিসে গেলেন না অনিকেতন রায়। চুপচাপ একা ঘরে নির্জ্জনে ভায়োলিনটা নিয়ে বসলেন। সুর চড়ালেন তাতে। তারপর একটানা বাজিয়ে গেলেন অনেকক্ষণ ধরে, বিকেল সন্ধ্যা হবার আগে পর্য্যন্ত।

শ্রীলা সান্যালের ঘরে পা দিয়েই একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করলেন তিনি। আগের দিনত এত পরিচ্ছন্ন ছিল না ঘরটা। দরজা জানালায় আকাশের রঙের মত সব নীল নীল পর্দ্দা ঝুলছে। শ্রীলা সান্যাল বসে আছে তাঁর চেয়ারে। মেঝের উপর মেঘের মতন শাড়ির আঁচল লুটছে, হাওয়ায় ঢিলে ব্লাউজের চওড়া কিনার কাঁপছে, এক পলকের মধ্যে এসব দেখে নিলেন অনিকেতন রায়। অনিকেতনের পায়ের শব্দে বই থেকে চোখ তুল্লেন শ্রীলা সান্যাল। প্রদীপের মত সেই চোখ উজ্জ্বল হল অনিকেতনকে দেখে।

—ভায়োলিনটা এনেছত। প্রথম ঠোঁট খুল্লেন শ্রীলা সান্যাল।

—হ্যা। ছোট্ট একটা শব্দ করলেন অনিকেতন রায়।

তারপর বাজনা নিয়ে বসতে হল অনিকেতন রায়কে। শ্রীলা সান্যাল বসলেন তাঁর মুখোমুখি। অনিকেতন রায় একবার আড়চোখে শ্রীলা সান্যালকে দেখলেন। প্রদীপের মত শ্রীলা সান্যালের চোখে খানিকটা যেন রামধনু বর্ণালীর অস্থিরতা। আস্তে আস্তে ভায়োলিনে সুর তুল্লেন অনিকেতন রায়। সুরের সঙ্গে নিজের মনকেও যেন ছড়িয়ে দিলেন তিনি। স্থির হয়ে ছবির মত বসে একের পর এক বাজনা শুনে গেলেন শ্রীলা সান্যাল। একটু নড়লেন না। ঘরের কোথাও কোন শব্দ হল না। শুধু সুর, অনিকেতন রায়ের আঙুল গলে সুর ঝরতে লাগল সারা ঘর ভরে, চেতনা ভরে। বাজনার ফাঁকে একবার পলকের জন্য তাকিয়ে ছিলেন অনিকেতন রায়। দেখেছিলেন মেঘ মেঘ চুল বাতাসে কাঁপছে, হাত দুটো কোলের উপর পড়ে আছে যেন করুণায় স্তব্ধ, ছড়িয়ে যাওয়া শাড়ির আঁচলে একটা প্রশান্তি, আর আনত মুখে একটা অস্পষ্ট শুভ্রতা। পলকের জন্য ছবিটা দেখলেন অনিকেতন রায়।

তারপর একসময় বাজনা থামালেন তিনি। কোন কথা বলতে পারলেন না কেউ অনেকক্ষণ। চুপ করে স্থির হয়ে বসে রইলেন তারা। ঠোঁট খুল্লেন প্রথম শ্রীলা সান্যাল।

—আগের চেয়েও অনেক সুন্দর হয়েছে তোমার বাজনা। কথা বল্লেন শ্রীলা সান্যাল।

অনিকেতনের মনে হল সুরটা বুঝি এখনো মিলিলে যায়নি ঘর থেকে।

—আমার ত মনে হয় আগের মত আর বাজাতে পারিনা আমি।

অনিকেতনের কথার উত্তর দিলনা শ্রীলা। একসময় উঠে পড়ল অনিকেতন।

তারপর থেকে রোজ সন্ধ্যায়ই একবার করে হাজিরা দিতে হল অনিকেতনকে শ্রীলা সান্যালের বাড়ীতে। পরস্পরের নিঃসঙ্গতার মৃত্যু থেকে দুজনেই বেঁচে উঠলেন। তারপর একদিন অনেক কষ্টে, মনের কথাটা বল্লেন অনিকেতন রায়।

—আমরা কি আরো কাছাকাছি আসতে পারি না, শ্রীলা।

বারান্দার হাওয়াটা শিরশিরে লাগল শ্রীলা সান্যালের। চোখের পাতা তাঁর মুহূর্ত্তের জন্য আনত হল।

—কথাটা কি তুমি ভেবে বলছ। নীচু গলায় বল্লেন শ্রীলা সান্যাল।

—অজস্রদিন ধরেই ভেবেছি আমি কথাটা, কিন্তু বলতে পারিনি।

অনিকেতনের কথায় চোখ তুল্লেন শ্রীলা সান্যাল। চোখাচোখি হল। আর অনিকেতন রায়ের চোখের উপর আর একটা চোখের লম্বা কালো পলকের সার ঈষৎ কেঁপে উঠ্‌লো। তারপর আবার বুঁজে গেল।

—তুমি আমার সব কিছু জেনেই বলছ? অনেক দূর থেকে যেন অস্পষ্ট গলায় কথা কয়ে উঠলেন শ্রীলা সান্যাল মনে হল অনিকেতনের।

—হ্যা তুমি বিশ্বাস করো আমি সব কিছু জেনেই বলছি। অনিকেতনের স্বর ব্যাকুল হল।

—ময়নার দায়িত্বও তুমি নিতে পারবে?

—তুমি আমায় সে দায়িত্ব দিয়ে দেখ। শ্রীলা সান্যালের কাছে এগিয়ে এলেন অনিকেতন।

এইবার চোখ তুল্লেন শ্রীলা সান্যাল। কেউই চোখ সরিয়ে নিতে পারলেন না অনেকক্ষণ। একটা ঠোঁট অর্দ্ধেক খুললো যেন কিছু বলতে যাচ্ছে। কিন্তু কোন স্বর বেরুল না। শুধু একটা স্তব্ধতা দুজনের মাঝখানে ঝুঁলে রইল অনেকক্ষণ ধরে।

আবেশটা কেটে যাবার পর শ্রীলা সান্যাল প্রচণ্ড একটা শীত অনুভব করলেন নিজের মধ্যে। শীত। আকাশের মেঘে মেঘে, বাতাসের শিহরণে। বড্ড বেশী শীত এবার কলকাতায় মনে হল শ্রীলা সান্যালের। তবুও শীতকে উপেক্ষা করে কথা বলতে ইচ্ছে করল তাঁর, অজস্র অফুরন্ত সব কথা, সুর করে, গান করে। ঠোঁট খুল্লেন শ্রীলা সান্যাল।

—এখন আর তা হয় না অনিকেতন।

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

৬

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সহসা রাগটা তার যেন মার উপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লো। মার উপরেই অভিমান হ'লো। মা-ই যদি বৈরী তবে আর একা একা কেমন ক'রে সে যুদ্ধ করবে এতোবড়ো একটা শক্তির বিরুদ্ধে। সে যে ভদ্রলোক। প্রমীলা যে তার স্ত্রী। এই নিষ্ঠুর সত্যকে কেমন ক'রে অস্বীকার করবার মতো বল পাবে, ভরসা পাবে মার সহায়তা না থাকলে?

শেষের সিঁড়ি কটা উত্তেজনাতে খুব তাড়াতাড়ি অতিক্রম করলো। তারপর শোবার ঘরের দরজায় এসে থামলো একটু। দেখলো পেছন ফিরে খাটের উপর বসে যজ্ঞেশ্বর যেন মেয়ের সঙ্গে কী একটা গভীর পরামর্শে নিমগ্ন। তার পায়ের শব্দে দু'জনেই চমকে উঠলো। প্রমীলার বাবা উঠে দাঁড়ালেন তাড়াতাড়ি, গায়ের এণ্ডি চাদরের তলায় ( যে চাদরটি তিনি শীতগ্রীষ্ম বারোমাস ব্যবহার করেন ) দু'টো হাত মুড়ে নিলেন। সুনির্মলের মনে হ'লো কী যেন একটা লুকোলেন সেই হাত ঢাকবার অছিলায়। 'এসো বারাজী এসো। কাল যাবো তাই মার সঙ্গে দু'টো কথা বলছিলাম। বড় আনন্দে কাটলো তোমার এখানে।' ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে সুনির্মলকে কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি। প্রমীলা ঝাড়া বিছানা আবারো ঝাড়তে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। একটু চুপ ক'রে থেকে সুনির্মল বললো 'তা হ'লে তোমার বাবা কাল যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ'

'আর তুমি?'

'আমি কী?'

'তুমি যাচ্ছনা?'

'আমি কোথায় যাবো?'

'যেখানে যাবার?'

'সেখানে কি চিরকালই থাকবো নাকি?'

'কোথায় থাকবে?'

'আমার নিজের সংসারে।'

'তোমার নিজের সংসারে!'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ' মুচকি হাসলো প্রমীলা: 'স্বামীর ঘরই আমার ঘর, বুঝলে? তুমি আমি অভিন্নহৃদয়।'

দাঁতে কাঁকড় পড়লো সুনির্মলের। একমুহূর্ত্ত নিঃশব্দ থেকে বললো: 'কে বলেছে? তোমার বাবা বোধহয়?'

'যে-ই বলুকনা, তা দিয়ে তোমার দরকার কী? আমাকে তাড়াতে পারলেই তুমি বাঁচ না?' আদর-আদর ভঙ্গীতে কাছে এসে মুখভার করলো প্রমীলা। 'শোন' একটু সরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় সুনির্মল বললো: 'কাল তোমাকেও তোমার বাবার সঙ্গে যেতে হবে।'

'কেন?' এইবার প্রমীলা ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ালো: 'জুলুম নাকি? যদি না যাই?'

'আত্মসম্মান থাকলে যাওয়াই উচিত।'

'আত্মসম্মান। আত্মসম্মানের দোহাই আর তুমি দিওনা, বুঝলে? ঘরের মাগকে যে বাইরের মাগীর জন্য তাড়িয়ে দিতে চায় তার মুখে আত্মসম্মানের বড়াই মানায় না।'

'অসভ্যের মতো কথা বোলোনা।'

'ইঃ! কী আমার সভ্যরে। তবু না যদি ঢলাঢলির কেচ্ছা দেশশুদ্ধ লোক না জানতো। ঐ যে শোলোক আছেনা—'মাগ তাড়িয়ে মাগী চাই, মাগীর তুল্য মিঠা নাই।' আসলে মনের কথাখানা তো এই? বলে ফেলেছি বলেই বড় লেগেছে, না?'

'চুপ।'

'চুপ! কেন চুপ করবো, চুপ আমি অনেকদিন করেছিলাম, তখন বোকা ছিলাম, বুঝিনি—'

'এখন বুঝি বুঝেশুনে তাই সুযোগমত সব পাওনাগণ্ডা নিতে এসেছ?'

'হ্যাঁ তাই। এটা আমার বাড়ি আমার ঘর, আমাকে তুমি বিয়ে করেছিলে লোকজন সাক্ষী ক'রে। এখানে থাকা আমার ইচ্ছে, যাওয়াও আমার ইচ্ছে।'

'এতদিনতো কই থাকোনি, এখন কেন এসেছ?'

'বড় অসুবিধে হ'য়েছে তাতে! বদমাস, ইতর। কই, কই তোমার সেই প্রাণেশ্বরী, আসুকনা সেই হারামাজাদী একবার। জন্মের শোধ দেখিয়ে দি তাকে—'

এবার গর্জে উঠলো সুনির্মল: 'আর একবারো তুমি তার নাম করবেনা।'

'করবোইতো, একশোবার করবো। হারামজাদী, হারামজাদী—হারামজাদী—' ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো প্রমীলা। ঈর্ষায় রাগে খুন হ'য়ে ক্রুদ্ধ বেড়ালের মত টান মেরে আঁচলটা ফেলে দিল বুক থেকে, গলা তীক্ষ্ণ পর্দায় পৌঁছিয়ে কোমরে হাত দিয়ে সুনির্মলের মুখের কাছে দাঁড়িয়ে বললে: 'মারবে! গলা টিপবে। ধাক্কা মেরে বার ক'রে দেবে বাড়ি থেকে! কী করবে। কী করবে তুমি শুনি?'



উল্টোদিকের দোতলা বাড়ির অন্ধকার বারান্দার মানুষের আভাস পাওয়া গেল, পাশের বাড়ির কোণের ঘরে আলো জ্বলে উঠলো খুট্ ক'রে। লজ্জায় দুঃখে রাগে দাঁতে দাঁত ঘষলো সুনির্মল, সরে এসে আলোটি নিবিয়ে অন্ধকার ক'রে দিল ঘর। কোথায় লুকোলে এই দুর্নিবার লজ্জা থেকে সে রেহাই পেতে পারে ভেবে পেলোনা। শরীরের শক্তি প্রয়োগ ক'রে এক হ্যাঁচকা টানে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এলো প্রমীলাকে, চাপা গর্জনে বললো—'চুপ! একদম চুপ!' তারপর হাতটা চেপে ধরলো শক্ত ক'রে।

'ও বাবা গো, মেরে ফেললো গো, দেখে যাও গো কার হাতে তুমি আমাকে—' সহসা একটা বিকট ভয়ার্ত্ত আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলো প্রমীলা। রাত্রি এগারোটার নিঃশব্দতা খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে পড়লো ঘরে। এবার হাত ছেড়ে মুখ চেপে ধরলো সুনির্মল, দাঁতে দাঁত ঘষে আবার অস্ফুটে বললো: 'চুপ। চুপ। চুপ।' একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ উঠলো, কিছুক্ষণ-পর্যন্ত প্রমীলার গোঙানো গলার অশিক্ষিত ভাষণ মথিত করলো ঘরের অন্ধকার। শেষে চুপ হ'লো একসময়ে। বিছানায় শুয়ে গুনগুন করতে করতে ক্লান্ত জানোয়ারের মত কী জানি কখন ঘুমিয়ে পড়লো প্রমীলা।

হাত ঝাড়লো সুনির্মল। মাথার এলোমেলো চুল উল্টে দিয়ে পকেট থেকে সিগারেট বার ক'রে দেশলাই জ্বালালো। ছাতে এসে দাঁড়ালো চুপচাপ। তখনো তার পায়ের জুতো মোজা, গায়ের সার্ট, গলার টাই কিছুই খোলা হয়নি। সেই শুদ্ধুই কাটা গাছের মত ধরাস ক'রে—লম্বা হয়ে পড়লো মাটিতে। তাকিয়ে রইলো আকাশের দিকে। এই অসংখ্য তারার মধ্যে তার বাবা আজ কোন তারা হ'য়ে ফুটে আছেন আকাশে? চেষ্টা করলো সেই তথ্য আবিষ্কার করতে। গালের দু'পাশ বেয়ে গরমজলের ধারা নামলো। আবার তার অভিমান হ'লো হিরণ্ময়ীর উপরে। হিরণ্ময়ী যদি তার পক্ষে থাকতেন, তার দুঃখ বুঝতেন, তা হ'লে কি আজ এটা হ'তে পারতো? শুধু অভিমান নয়, বুকের মধ্যে যেন একটা প্রতিহিংসাও অনুভব করলো মার বিরুদ্ধে। হিরণ্ময়ী! হিরণ্ময়ীইতো সর্বোতোভাবে দায়ী—তার এই অসহায় যন্ত্রণাময় অবস্থার জন্য।

পরেরদিন উষা যাত্রা ক'রে চলে গেলেন যজ্ঞেশ্বর। তিনি দিন-ক্ষণ মানেন। একমাস রইলেন, কাজেই যাবার আগে সুসময় দেখতে হয় বৈ কি। উষা-যাত্রায় কোন দোষ বর্ত্তায় না।

যাবার আগে ভোর রাত্রিতে ফিসফিসিয়ে আরেক প্রস্থ উপদেশ দিলেন মেয়েকে। বললেন: 'সাম্‌লে-সুম্‌লে চল একটু, একটু স'য়ে থাক। শ্রাদ্ধ শান্তি চুকে গেল কবে, এখনো রাতভোর যদি ঝগড়াই করবি তো শুবি কখন। আমি বাপ আমি আর কত তোকে বলে

দেবো যদি তুই নিজে থেকে কিছু না বুঝিস। পুরুষমানুষ স্ত্রীর কাছে কী চায়? আমিতো রোজই দেখি হয় ছাতে নয় মেঝেতে প'ড়ে-প'ড়ে ঘুমুচ্ছে লোকটা। আরে বোকা! সবইতো তোর, কেবল এখন একটু চুপচাপ থাকা।'

প্রমীলা গাল ফুলোলো—'তুমি তো বলেই খালাস। আমার সঙ্গে যে কেমন বিশ্রী ব্যবহার করে তা তো জানো না? না বাবা, এমন করলে এখানে থাকতে পারবোনা আমি।'

'তা হ'লে কোথায় থাকবেন শুনি?' খিঁচিয়ে উঠলেন যজ্ঞেশ্বর: 'বিধবা মেয়ের মতো বারো মাস বাপের ভাতই গিলবি কাঁড়ি-কাঁড়ি—না?'

এ-কথায় চোখে জল এলো প্রমীলার। যজ্ঞেশ্বরও অনুতপ্ত হ'লেন। আস্তে হাত রাখলেন মেয়ের মাথায়—'তোর ভালোর জন্যই বলি। আপনার সংসার তুই আপনি বুঝে নিতে শেখ। একটু ধৈর্য্য ধ'রে থাকনা ক'দিন।'

যজ্ঞেশ্বর যখন গেলেন সবে ঘুম ভেঙেছে হিরণ্ময়ীর। হিরণ্ময়ী বেরিয়ে আসতে-আসতে গাড়ি ছেড়ে গেল তাঁর। লজ্জিত হ'লেন তিনি। কিন্তু এত সকালে, এত তাড়াতাড়ি, এমন ক'রে যে সকলের অলক্ষ্যে ভদ্রলোক চলে যাবেন তা কি তিনি জানতেন? প্রমীলা বললো: 'পাঁচটার ওপিঠে গেলে উষাযাত্রা ভঙ্গ হয় কিনা, তাই বাবা কারো সঙ্গে দেখাশুনো করতে পারলেন না।' হিরণ্ময়ী বললেন: 'ছি ছি, আমার আগে-আগেই ওঠা উচিত ছিলো।'

এবার আঁচলে চাবি বেঁধে পুরোবেগে সংসার করতে লাগলো প্রমীলা। এই শোকার্ত্ত শরীরে হিরণ্ময়ীকে কি কিছু করতে দিতে পারে সে? তবে তার পুত্রবধূত্ব রইলো কই? শাশুড়ির প্রতি কি এটুকু কর্ত্তব্যও সে করবে না? হিরণ্ময়ীও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে আপন দুঃখ নিয়ে আপনার মধ্যে নিমগ্ন হ'য়ে রইলেন। কালো কালো বাদুড়ের ডানা পৃথিবীতে অন্ধকার নিয়ে ঝুলে রইলো তাঁর চারদিকে। একটি মৃত মানুষের স্মৃতি ছাড়া আর সব শূন্য।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা সাংঘাতিক চুরি ধরা পড়লো তাদের বাড়িতে। একদিন খবর এলো একটি নাতি হ'য়েছে হিরণ্ময়ীর। মনে মনে এ নিয়েও একটা কম উদ্বেগে ছিলেন না তিনি। খবরটা পেয়ে বিষণ্ণ মুখে একটি মলিন হাসির আভা ফুটলো। দুপুরের নিরিবিলিতে একখানা মস্ত চিঠি লিখলেন মেয়েকে তারপর প্রমীলার কাছ থেকে চাবি চেয়ে এনে সিন্দুক খুললেন। কত সাধের প্রথম নাতি, ভারি হাতে সম্বর্ধনা না জানালে কি চলে? দাদা থাকলে কত ধুমধাম হ'তো আজ বাড়িতে! দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গয়নার বাকস বার করতে গিয়েই দেখেন সর্ব্বনাশ! বাকসতো নেই! চন্দনকাঠের কাশ্মিরী কাজ করা জালি বাকস। সিন্দুক খুললেই মন আকুল হ'য়ে উঠতো সেই গন্ধে। বিনুর বাবা মাইসোর থেকে উপহার এনে দিয়েছিলেন তাকে বিয়ের সময়। গন্ধটি এখনো লেগে আছে।



এলোমেলো হাতড়ালেন তিনি তারপর বাইরে এসে দোতলার দিকে মুখতুলে চেঁচিয়ে ডাকলেন 'বৌমা, ও বৌমা, শীগগির এসো তো একবার।'

প্রমীলা চাবিটা শ্বাশুড়িকে দিয়ে থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তির মধ্যে ছিলো। প্রতিদিনের অতিচমৎকার, অতিমসৃণ দিবা নিদ্রাটিতে কেমন ব্যাঘাত অনুভব করছিলো মনে-মনে, শাশুড়ির ডাক শুনে আচমকা শিহরিত হ'য়ে উঠলো। একটু সময় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যিখানে তারপর আস্তে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। ঝুঁকে বললো, 'কেন মা?'

'নিচে এসো, শীগ্‌গির এসো।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলো সে। ঘরের দরজায় এসে খোলা সিন্দুক আলমারীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী হ'য়েছে?'

'আমার গয়নার বাকস কই? সেই চন্দন কাঠের বড়ো বাকস?'

'ওর ভেতরে নেই?'

'কোথায়? আমি তো কোথাও দেখছিনে।' কপাল তাঁর বিন্দুবিন্দু ঘামে ভিজে উঠলো: 'তুমি, তুমি তো কোথাও রাখোনি?'

'না তো।'

'হায়। হায়! তবে কী হ'লো সেই বাকস?' মেঝের উপর আঁচল লুটিয়ে বসে পড়লেন তিনি। চোখ জলে ভ'রে উঠলো।

রাজেনবাবুর চাকুরীর টাকা প্রচুর খরচের খাতে বয়ে যেত বলে কিছু গোপন সঞ্চয় ছিলো হিরণ্ময়ীর। স্বামীপুত্র দু'জনেই অপব্যয়ে উৎসুক। সহাস্যে তাদের সব কিছুরই প্রশ্রয় দিতেন তিনি কিন্তু তাদের হাতে হাত মিলোতেন না কখনো। মাইনে পেয়ে দু'জনেই এসে সব টাকা তুলে দিত তাঁর হাতে, তিনি তাঁর ভাগবাঁটোয়ারা যেভাবে খুসি করতেন, তাঁর উপরে হিশেব নেবার ছিলোনা কেউ। একা রাজেনবাবুই যথেষ্ট মাইনে পেতেন, তাতেই সচ্ছলভাবে সংসার চলতো, অন্তত চালাতেন হিরণ্ময়ী। সুনির্মলের মাইনেটাতে প্রায় হাতই দিতেন না। লাইফ ইনশিওর করিয়ে দিয়েছিলেন মোটারকমের। টুক্‌টাক ঝি চাকরের মাইনে, ছেলেমেয়েদের জন্মদিনের উপহার, কোনো দরিদ্র আত্মীয়ের সাহায্য কিম্বা দু'একটা শৌখিন খরচ ছাড়া সবই প্রায় জমতো গিয়ে ঐ ছোট্টো লোহার আলমারীর অন্ধকার গর্ভে। গয়নার বাকসের সুবাস-বিছানায় শুয়ে থাকতো তারা। ব্যাঙ্কে পাঠাতেন না, জানতেন পাঠাতে গেলেই ছেলে আর ছেলের বাপ জেনে ফেলবে আর জেনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সে টাকা কেমন ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে যাবে চোখের পলকে। কিছুতেই রোধ করতে পারবেন

না হিরণ্ময়ী। পাঁচ কোঠার বাড়ি ছেড়ে সাতকোঠার বাড়িতে না গেলে শরীরে আরাম থাকবেনা, এই মধ্যবিত্ত পাড়া ছেড়ে চৌরঙ্গীর কাছাকাছি না গেলে মান থাকবে না, দুজন চাকরে অকুলোন হবে, খাওয়াদাওয়া পোষাকপরিচ্ছদ সবকিছুতেই আর অস্বাচ্ছন্দের অবধি থাকবেনা তাদের। অথচ এখন তো সুখেই আছে, কোনো তো অসন্তোষ নেই। কোনো খুঁতখুঁতানি নেই, কোনো অভাববোধ নেই। দক্ষিণ খোলা সুন্দর বাড়ি, বাপ বেটা দু'জনেরই কত পছন্দ এই বাড়ির আনাচকানাচ। চার বেলার খাওয়া পরায় যথেষ্ট স্বচ্ছলতা, যথেষ্ট আরাম। হিরণ্ময়ী বাড়িটি রাখেন আয়নার মতো ক'রে, ঘরেঘরে রুচিসম্পন্ন নিচু-নিচু যার যার সুবিধেমত তার তার প্রয়োজনীয় আসবারপত্র, ছেলেরা সব ভালো ভালো স্কুল-কলেজের ছাত্র, মেয়েটিকে ডায়োসেসনে পড়িয়েছেন, বড় ওস্তাদ রেখে গান শিখিয়েছেন। কী দুঃখ? গাড়ি বাড়ি অবশ্য নেই। তা হবে। তার জন্যেই তো এই পন্থায় টাকা জমানো। কেবল কি আজকের ভাবনাই আজ? কাল আছে না? কালের সঞ্চয় না করলে কি চলে?

সুতো বেঁধে-বেঁধে সেই সব নীলচে নীলচে নোট, গুচ্ছগুচ্ছ ক'রে রেখে দিতেন ওখানে। কেউ জানতো না সে খবর, কেউ দেখতোনা। কে দেখবে? এ বাড়িতে কার অত খেয়াল? রুপোর চেন বাঁধা চাবি হিরণ্ময়ীর আঁচলেই ঝুলে থাকতো সারাদিন। এই সিন্দুকে কোন্ চাবি ঢুকিয়ে কোন কৌশলে খুলতে হয় তা পর্যন্ত জানতেন না রাজেনবাবু। সুনির্মলের তো কথাই নেই। এই লোহার আলমারী তাদের পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে। দেশ থেকে কত কাণ্ড ক'রে তিনি এটিকে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতার বাড়িতে। তাই নিয়ে কত চ্যাঁচামেচি করেছিলেন রাজেনবাবু। হিরণ্ময়ী শোনেননি। শাশুড়ির জোর ছিলো পেছনে, তবে আর তাঁর ছেলেকে ভয় কিসের?

চাবির এই এক আঙ্গুল মোটা রুপোর গোটও কি আজকের? কত আঁচল ঘুরে তবে তো হিরণ্ময়ীর আঁচলে এসে পৌঁচেছে। চোদ্দবছর বয়সে এসেছিলেন এই সংসারে, পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হ'লো। এ কি একদিন দু'দিনের কথা? একদিন দু'দিনের স্মৃতি? কত মানুষ দেখেছেন, কত মানুষকে ভালোবেসেছেন, বিদায়ও দিয়েছেন কত মানুষকে। শ্বশুর গেছেন, শাশুড়ি গেছেন, তাঁদের সবচাইতে বড়ো মেয়েটি, বিনুর মা, তিনি গেছেন। প্রত্যেকের মৃত্যুতে বুক ভ'রে গেছে কান্নায়। মনে হয়েছে যিনি গেলেন কে আর পূরণ ক'রে দেবে তাঁর জায়গা? তাতো সত্যিই! কে কাকে ভরাট করতে পারে? আস্তে আস্তে তো সবই হ'লো। সুনু হ'লো, অভি হ'লো, মানু জন্মালো, সীমন্ত এলো, শিশুদের কাকলিতে ভ'রে গেল ঘর, মা হ'য়ে ঠাণ্ডা হ'লো বুক, গিন্নি হ'য়ে মুঠোয় এলো সব, তবু কি তিনি ভুলতে পারলেন শাশুড়িকে? ছেলেদের পিতৃত্ব কি বাপের বা শ্বশুরের পিতৃত্বের



আস্বাদ দিতে পারলো? না, কেউ কাউকে ঢেকে দিতে পারে না, মুছে দিতে পারে না। প্রত্যেকে তার আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে আলাদা-আলাদা কক্ষে বসে থাকে চুপচাপ। কোন একদিন ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায়, ঠিক সে মাথা নেড়ে জানিয়ে দেবে—'আমি ছিলাম, আমি ছিলাম।' অমনি হৃদয়ের অসংখ্য দরজার কোন দরজাটা যেন খুলে যাবে, বেদনায় কেঁপে উঠবে অন্তঃকরণ। স্মৃতি। স্মৃতি। স্মৃতি অক্ষয়।

তবুও, তবুও এমন একজন ছিলেন হিরণ্ময়ীর জীবনে, যাঁর জন্য কোনো অভাবকে তো অভাব মনে হয়নি কোনোদিন। যখন আঠারো বছর বয়সে মা মারা গেলেন মনে হ'য়েছিলো বেঁচে থেকে কী লাভ? তারপর সেই মানুষের বুকে মাথা রেখে শোক যেন অর্ধেক উপশমিত হ'য়ে গেল। প্রথম সন্তানটিও মারা গেল একদিন। চার বছরের এইটুকু মোটা সোটা ফুটফুটে—মনটুলি। সুনু তখন একবছরের। সেই দুর্বিষহ শোকও তো ঐ একই মানুষের বুকের ঠাণ্ডায় জুড়িয়ে গিয়েছিলো। কী শান্ত, কী সুন্দর, কী স্নেহে ভরা, প্রেমে ভরা, উত্তাপে ভরা মানুষটি। তিনি তাঁর স্বামী! তিনি রাজেনবাবু! শুধু স্বামী? স্বজন না? গুরু না? বাপ, ভাই, কী না তিনি? এই বাড়িতে এতো সুখ কার জন্য তিলে-তিলে সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন হিরণ্ময়ী? জীবন এত মধুর ছিলো কার জন্য? কে তাঁকে এই সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ভরা জীবনের আস্বাদ তিনি কার জন্যে পেয়েছিলেন? কার জন্য এই সংসারে এত তৃপ্তি? এত শান্তি?

সব শোক আজ ঐ একই সমুদ্রে লীন হ'লো হিরণ্ময়ীর মনে। মনে পড়লো কোনো এক গোধূলি-লগ্নের কথা, কোনো পূর্ণিমারাত্রির নিরালা ছাতের কোণ, গুরুজন এড়িয়ে সিঁড়ির তলা, পুকুর ঘাট! আরো কত এলোমেলো স্মৃতি—অন্ত আছে তার? প্রত্যেক বিয়ের তারিখে একটি ক'রে আংটি উপহার দিতেন রাজেনবাবু। ছেলে মেয়েরা বড়ো হ'য়ে যাবার পরে কেমন একটা লজ্জা সংকোচ দু'জনেই অনুভব করেছেন ধীরে ধীরে। তবু সেই উপহারের অভ্যেসটি ছাড়তে পারেননি তিনি। গোপনে এনে গোপনে রেখে দিতেন বালিশের তলায়। গোপনেই গ্রহণ ক'রে সেটিকে আবার আপ্লুত হৃদয়ে লোহার সিন্দুকে তুলে রাখতো হিরণ্ময়ী। তারপর কোনো একটা উপলক্ষ্যে পুরোনো আংটি ছেড়ে সেটিকে কখন আঙুলে পরতেন হিরণ্ময়ী,—কেউ লক্ষ্য করতোনা, কেবল চুরুটে টান দিতে-দিতে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতেন রাজেনবাবু।

একত্রিশ বছরের একত্রিশটি আংটিও ছিলো সেই গয়নার বাক্সে। শেষ আংটিটি এইতো সেদিন এনেছিলেন, এইতো সেদিনে আঙুলে পরেছিলেন হিরণ্ময়ী, আর এইতো সেদিন শেষ আংটিটি খুলে রেখে দিলেন সিন্দুকে। বিধবা হবার পরেও হাতে ছিলো, সুনির্মল খুলতে

দেয়নি ঐ একমাত্র আভরণ। পরে খুলে প্রমীলাকে দিয়ে রেখে দিলেন তিনি সেই বাক্সে জমিয়ে। বড়ো-বড়ো চোখে প্রমীলা বললো—'এতো আংটি? কার?'

হিরণ্ময়ী জবাব দিলেন না। মুখ ফিরোলেন দেয়ালে।

সেই আংটির কথা ভেবেও আজ হুহু ক'রে উঠ্‌লো প্রাণটা। গয়নার মূল্য কি শুধু তার মহার্ঘতায়? ঐ একত্রিশটি আংটির জায়গায় আজ একত্রিশ হাজার আংটি পেলেওকি এই অভাবের কোনো পরিপূরণ হয়? তাঁর বিয়ের সময় শাশুড়ি দিদিশাশুড়িতো ছিলেনই শাশুড়ির দিদিমা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন বহাল তবিয়তে। জমিদার বাড়ির মেয়ে, টক্‌টকে রং, সাতনরি হার দিয়ে পুতি বৌয়ের মুখ দেখেছিলেন। দিদিশাশুড়ি মকরমুখ বারোভরির বালা দিলেন আর শাশুড়ি বৌ বরণ করলেন সেই আকবরী আমলের দশটি মোহর গাঁথা নেকলেস দিয়ে। জা, ননদ, মামীশাশুড়ি মাসীশাশুড়ি—বাড়ি জমজমাট। সবাই ভারি ভারি সোনা দিল। অতবড় বাড়ির একমাত্র ছেলে রাজেনবাবু, বৌয়ের আর অন্ত নেই আদরের।

—হীরার কণ্ঠ, পাথরের চুরি, যশোম, হাতপদ্ম, মাথার সিঁথী,—ডবল ঝুমকো—কী তিনি পাননি সেই সময়ে? একটা জিনিশও ভাঙেননি, ব্যবহার ক'রে পুরোনো ক'রে ফেলেননি। গা মুড়ে সোনা দিয়েছিলেন বাবা মা। তার উপরে শ্বশুরবাড়ির অত গয়না। কিন্তু সর্বদা ব্যবহারের হারচুড়ি ছাড়া ওসব গয়নায় হাত ছোঁয়াননি বোধহয় দশবছর। বৌ অবস্থায় শাশুড়ি মাঝে মাঝে পরিয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যেতেন, বিয়ে বাড়িতেই অবিশ্যি বেশীর ভাগ। তিনি গেছেন পরে চুকেছে সে সব।

মাঝে মাঝে গয়নাগুলো দেখেন তিনি অবসর সময়ে। মনে পড়ে সকলকে। তাদের চেহারা চলন বলন ব্যবহার সব ভেসে ওঠে চোখে। ভালো লাগে। যাঁরা নেই, তাঁরা ছিলেন একথা ভাবতে বড়ো ভালো লাগে। এজন্য দরকার হ'লে নতুন সোনা কিনে গয়না তৈরী করেছেন তবু একটি জিনিষ ভাঙেননি। আর কারুকলার দিক থেকে দেখতে গেলেও অত সুন্দর গয়না আজকাল তৈরী করতে পারে নাকি স্যাকরারা? এইতো সুনুর বিয়ে হ'লো, দিলেন তার বৌকে কিছু গয়না, কানের ঝাপটাটা মানুর ভারি পছন্দের ছিলো, তাকে দিলেন সেটা এরপরে অভি আছে, সীমন্ত আছে। সবাইকেইতো দিতে হবে? ওগুলোতো ওদের আশীর্ব্বাদ। ওগুলো ওদের ভালোবাসার জনের চিহ্ন। পূর্বপুরুষের সাক্ষী। মূল্যেও নয় জৌলুষেও নয়, সোনার ওজনেও নয়, শুধু স্মৃতি, স্মৃতিতেই সেসব জিনিশ মূল্যবান। আর একি একদিন দু'দিনের স্মৃতি? একদিন দু'দিনের কথা?

মাটিতে বসে খাটে মাথা গুঁজে ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে উঠলেন হিরণ্ময়ী। শুধু রাজেনবাবুই তাঁকে ছেড়ে গেলেন না, সকলকেই নিয়ে গেলেন সঙ্গে ক'রে। তবে এই কি তোমার ভালবাসা?

ক্রমশঃ

# সহজপাঠ

## অমল দত্ত

শশীপদবাবু উঠলেন। "তা হলে চলি বঙ্কুবাবু—এ গাড়িটা না ধরতে পার্লে, ফলতায় যেতে রাত হয়ে যাবে।"

"উঠবেন? আচ্ছা। আমার প্রস্তাবটা মনে রাখবেন—এর চেয়ে ভালো অফার অন্য কোনো পুস্তক ব্যবসায়ী দিতে পারে না। বাজারটা দেখেছেন তো স্যর!" বঙ্কুবাবু বিনীতভাবে হেসে হাতদুটো জোড় করলেন: "নমস্কার!"

নমস্কার জানিয়ে শশীপদবাবুও উঠে এলেন।

গোলদিঘীর আশেপাশে অলিতে গলিতে বিদ্যাবিতরণ কেন্দ্র—ছোট বড় প্রকাশকদের প্রতিযোগিতা চলেছে। শশীপদবাবু হেঁটে চলেছেন, হরেকরকম প্রকাশকদের দরজা বিচিত্র পোষাকে সেজে যেন তাঁকে ইসারা করছে—তাঁর মতো অনেক শিক্ষকের জটলাই গলিটির মধ্যে রয়েছে, কারো কারো সঙ্গে শশীপদবাবু হোঁচটও খাচ্ছেন।

একটু বায়ে ঘুরেই—ছোট্ট একখানি সাইনবোর্ড—'গ্রন্থভারতী'। শশীপদবাবু ঢুকে পড়লেন।

"নমস্কার শচীবাবু! গাড়ির সময় হয়ে গেছে—বসতে পারবো না। তবু না এসে পারলুম না।"

শচীবাবু গ্রন্থভারতীর মালিক, টেবিলে চাপড় দিয়ে জোড়ে হেসে উঠলেন—"আসতেই হবে মাষ্টার মশাই! আমার সঙ্গে না দেখা করে, আপনি কী ভাবে যাবেন? রাত্তিরে ঘুম হবে? হাঃ হাঃ হাঃ! ওরে, চা নিয়ে আয়!"

"না না না—চা কেন?"

"হয়েছে হয়েছে! চা না হলে কথা জমবে কী ভাবে! চা খান, পান খান—ব্যবসা করি বলে কি চামার হয়ে গেছি মাষ্টার মশাই? আপনার বইয়ের প্রুফটাও নিয়ে যাবেন তো?'

"হ্যাঁ—সেইজন্যেই তো আসা। এলাম যখন প্রুফটাও নিয়ে যাবো। রোজ রোজ কলকাতা আসা তো সম্ভব নয়।"

"সে তো নিশ্চয়—সে তো নিশ্চয়। গাড়ির ধকল কি আপনাদের পোষায়—আমাদের তপোবন সভ্যতা তো আপনারই বাঁচিয়ে রেখেছেন। প্রকৃতির শ্যামলিমার ক্রোড়ে আপনাদের সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা গুরু গৌতমের কথাই মনে করিয়ে দেয়"—শচীবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন—"বইয়ের ব্যবসা করি বটে, মাষ্টার মশাই—কিন্তু ছেলেদের ফাঁকি দিতে কোনো

দিনও চাইনি। প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড থেকে যা দাম ধার্য্য করে দিচ্ছে, তার এক পয়সা বেশী নিতে চাইনে। ইস্কুল মাষ্টারদের মতো আমরাও ছেলেপিলেদের বিদ্যাদান করতে পারি—কী বলেন ?" শচীবাবু জোরে হেসে উঠলেন।

"ইস্কুল মাষ্টারদের মধ্যে অনেকে ব্যবসাবুদ্ধি শিখেছে, শচীবাবু। All that glitters is not gold.'

চায়ের পেয়ালায় জোরে চুমুক দিয়ে শচীবাবু রুখে উঠলেন, "হবেনা ! আমরাই তো তার জন্যে দায়ী ! এই আমাদের বঙ্কু—এই যে 'রায় লাইব্রেরী'র বঙ্কু রায়ের কথা বলছি, এখন থেকেই ঙ্কারজনক প্রচার চালিয়েছে। যে সব প্রাথমিক ইস্কুলে তাদের বই পাঠ্য হবে, সে সব ইস্কুলের মাষ্টার মশাইরা বিশেষ সুবিধা পাবেন—ফাষ্ট সেকেণ্ড ছেলেদের প্রাইভেট বই দেবে বঙ্কু ! দূরের মাষ্টার মশাইদের জন্যে বঙ্কু কলকাতায় একটী বাড়ীভাড়া করেছে—খাওয়া থাকা ফ্রি ! বলুন, এরকম লোভে না পড়ে টিকে থাকতে পারে এমন আপনার মতো কজন লোক আছে ?"

শশীপদবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। 'রায় লাইব্রেরীর' আমন্ত্রণে তিনিও বঙ্কুর প্রস্তাব শুনে এসেছেন, কথাটা শচীবাবুর কাছে বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। কোথায় যেন আটকে গেল। চা পান করে, প্রুফ নিয়ে গাড়ির তাড়ায় তিনি বেরিয়ে এলেন।

আর বলতে পারলেন না টাকার কথাটা। শশীপদবাবুর কিছু টাকার দরকার ছিল।

সে কথাটাই তাঁর স্ত্রীর কাছে মস্ত বড় প্রশ্ন। 'প্রুফ দেখার ফাঁকে শশীপদ বাবু মাথা তুলে বললেন, "নাও এ ক'টা দিন নিরিমিষ খেয়ে কাটিয়ে দেবো।"

"সে কি গো ! আমি এঁয়োতি হয়ে নিরিমিষ খাবো ? এখনো তো তুমি বেঁচে আচো !"

"তাই না কি ?" শশীপদবাবু মুখে হাসির ভঙ্গী আনলেন : "তাহ'লে ছাখো—বইটা থেকে যদি কিছু আয় হয়।"

অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে গৃহিণী বিছানায় গিয়ে চোখ বুঁজলেন, শশীপদবাবু প্রুফে ডুবে গেলেন—আর কোনো ভাবনা রইলো না। গৃহিণী চোখ বুঁজলে শশীপদবাবু এক চক্ষু হরিণের মত আর সংসারের দিকে দৃকপাত করেন না, যে আদর্শে মাষ্টারি ব্রত নিয়েছিলেন, তারই কিঞ্চিৎ পরিপুষ্টি সাধনের জন্যে ব্যাপৃত হন। কিছু লেখেন—কিছু পড়েন। নিয়মিত লেখেন একটি ডায়েরী—যা ঠিক ডায়েরী নয়, চার্লস ল্যাম্ব ও বঙ্কিমচন্দ্র মিলিয়ে সাংসারিক জীবনের যে কোনো বিষয়ে শশীপদবাবুর কল্পনার প্রসার। 'গৃহিণী' কথাটি নিয়ে তিনি অনেকদিন



আগেই ডায়েরীর পাতায় প্রচুর পরিশ্রম করেছেন, তাতে কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি আছে—'সখি সচিবকলাবতী' ; আর আছে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে—'সূর্য্যমুখী আমার কে' ইত্যাদি।

প্রুফ দেখা শেষ হয়ে গেলে শশীপদবাবু ডায়েরীখানা নিয়ে বসলেন। প্রথমেই লিখলেন, 'প্রকাশক'। কিন্তু তা তৎক্ষণাৎ কেটে লিখলেন—'টাকা'। বেশ বড় বড় হরফে। তার নিচে দুটো কড়া টান দিয়ে কথাটা অধিকতরো জোরালো করলেন। তারপর লিখলেন, 'শচীবাবু ঠিকই বলিয়াছেন, ভারতীয় ঐতিহ্যকে বজায় রাখিতে হইলে অর্থাৎ তপোবন সভ্যতাকে পুনর্জীবিত করিতে হইলে টাকার পথ পরিহার করিতে হইবে।'

সহসা গৃহিণীর নাসিকাধ্বনি নীরব হল। এক ব্যাধ পথে এসে তীর নিক্ষেপ করলে—"ওগো কাল জামাই খবর পাঠিয়েছে, মালতীর নাকি শরীর খারাপ যাচ্ছে।"

"তাহলে কী করতে চাও ?" তিনি ধীরে ধীরে বাতিটা নিভিয়ে দিলেন।

"বাঃ মেয়েকে আনাবে না !"

"মেয়েকে আনাবোনা—তা কি হয় !"

"সেইতো—তাহলে—"

"তাইতো—তা হলে—"শশীপদবাবু বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সারাদিনের ক্লান্তির অবসানে একটু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে নীরব হয়ে রইলেন। অপরপক্ষের চোখে বোধ হয় মেয়ের চেহারাটাই ভাসছিল, কোনো কথা আর শোনা গেল না।

শশীপদবাবুর বাড়ির সামনেই ইস্কুল। লম্বালম্বি দুখানি ঘর একটি কোণে মিলিত হয়েছে। এই কোণের একটি হেক্সাগন কুঠরীতে শশীপদবাবু আর তাঁর দু'জন সহযোগী শিক্ষক বসেন। অপর দিকে একটি ছোট ঘর আছে, তাতে ছাত্রদের জন্য জলের ব্যবস্থা আছে। যুধিষ্ঠির সাঁপুই এ ঘরখানা ভাড়া নিয়েছে ইস্কুল কমিটির কাছ থেকে দোকানের জন্য। শুধু সকালবেলা ছাত্রদের জল খাওয়াতে হবে, এ অঙ্গীকারটুকু আছে। যুধিষ্ঠিরের দোকানে সবই আছে—ডাল তেল নূন মশলা, পান সিগারেট বিড়ি, মুড়ি-মুড়কি চিড়েভাজা বাতাসা কদমা ফল। আটার হালুয়া চিনির মণ্ডা লেবেনচুষ লাটাই ঘুড়ি জিনতান কী না ! এমন কি ছোট্ট একটা উনুনে চায়ের জলও টগবগ করে ফুটছে। দোকানের পাশেই রাস্তা, রাস্তার অপরদিকে একটি বাঁশের মাচান আছে—গাঁয়ের লোকেরা এখানে চা খেয়ে আরাম করে হুঁকো টেনে কাজে যায়। ইস্কুলের চারদিকে জিকর গাছের ডাল পুঁতে সীমারেখা টানা হয়েছে—সামনে দুখানা গাছের খুঁটি দিয়ে একটি সাইনবোর্ড টানানো আছে—'আচার্য্য জগদীশ প্রাথমিক বিদ্যালয়।' এদিকের গাছ ও গঙ্গার সঙ্গে আচার্য্যের ঐহিক সম্বন্ধ ছিল।

ইস্কুলে একটি পিওন আছে, মানে, একটি পরিবারই পিওনের কাজ করে। ইস্কুলের থেকে বেতন দেওয়া সম্ভব নয়। তাই একটি চাষী পরিবারকে ইস্কুলের পেছনের দিকে তরীতরকারী লাগাবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে—বিনিময়ে, হয় বাপ নয় তিনটি ছেলের একটি সকালে পিওনের কাজ করে যায়। পিওনের একটি পোষাকও আছে, সেটি বাপ মদন মণ্ডলের মাপে তৈরী হয়েছিল—ছেলেরা কোনো রকমে চালিয়ে নেয়।

ছেলেপিলেদের নিয়ে শশীপদবাবুর কাটে ভালো। এক গ্রামের ছেলে নয়, কয়েকটী গ্রাম থেকেই ছাত্রদল আসে। ইস্কুলের কাজ শুরু হয়ে গেলেও, ছাত্রদের আসা শেষ হয় না—তিন মাইল চৌহদ্দির মধ্যে ঐ তো একটি ইস্কুল। তাই ইস্কুলের ছুটির আগে ছাত্রদের নাম ডাকা হয়।

শশীপদবাবু জানেন, কোন ছাত্র কতটা দূরের পথ হেঁটে আসে। তিনি উদগ্রীব হয়ে সামনের মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বর্ষাকালে জলে পথঘাট ভরে থাকে, ছেলেদের অনেকে আসে নৌকো দিয়ে, অনেকে পরনের ধুতি মাথায় বেঁধে ছপাৎ ছপাৎ করে জল ভেঙ্গে আসে। সব ছেলে এসে পৌঁছুতে পারে না—ঝড় জলে জ্বরের প্রকোপ বেড়ে যায়।

তাছাড়া মাঠ-নিড়ানি গোয়ালের কাজও আছে। কোনো কোনো ছেলে শেষ রাত্রে বাপের সঙ্গে ক্ষেতে যায়—তারপরে তো ইস্কুলে আসবে। দুপুরের দিকে যে যার জাত ব্যবসায় রুজিরোজগারের চেষ্টা করে। তখন তারা ছাত্র নয়, মেহনতি জনতা। গ্রামের খুব কম ছেলেই ছাত্রত্ব বজায় রাখতে পারে—যারা পারে তারা স্তিমিত ভদ্র পরিবারের সন্তান। খেটে খাবার সঙ্গতিটুকুও নেই।

শশীপদবাবু ভাবেন, তবু আসুক, সবার ছেলেপিলেরা আসুক। যে দেশে শতকরা দশজন লেখাপড়া জানে না, মাত্র দস্তখৎ করতে জানে, সে দেশের উপায় কী! শশীপদবাবু শরৎ চন্দ্রের সেই কথাটি মনে করেন—'জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দে, রমেশ, নইলে এদের দুঃখ দুর্দশা ঘুচবে না বাবা'!

আজ মাষ্টার সুধীরবাবু বললেন, "স্যর অনেকেরই বেতন বাকী পড়ে আছে, একটা হিসাব তো আজকের মধ্যে ইস্কুল সাবইনস্পেক্টরের অফিসে পাঠিয়ে দিতে হবে। নইলে এ মাসের 'এইড'টা পাওয়া যাবে না! কয়েকটি ছেলের চার মাসের বেতন বাকী—"

শশীপদবাবু জবাব দিলেন, "দেখুন এ-ক'টা দিন। শীতের ফসল তো উঠেছে—পরীক্ষার আগে দিয়ে দিলেই হবে—"

সুধীরবাবু বললেন, "এদের নাম কেটে না দিলে আমাদের যে জবাবদিহি করতে হবে—"

"দিলেও করতে হবে। আমাদের মাত্র সর্বসমেত পঁচাশীটি ছাত্র।"



সুধীরবাবু নীরব রইলেন। তিনি অঙ্ক ও ভূগোল পড়ান। এই ইস্কুলের কেরাণীর কাজটুকুও তিনি করেন—এর জন্যে কয়েকটি টাকা বেশী পান।

"আপনার কোন ক্লাশ এখন?" শশীপদবাবু শুধোলেন।

"চতুর্থ শ্রেণীর ভূগোল।"

"আচ্ছা, আপনি হিসেবটা দেখুন! আমি ক্লাসে যাচ্ছি।"

চতুর্থ শ্রেণীই শশীপদ বাবুর ইস্কুলের সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী। আগামী বছর থেকে পঞ্চম মান পর্য্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যা উন্নীত হবে। তাহলে ছাত্র সংখ্যাও বাড়বে—ইস্কুলের আর্থিক সুবিধা হবে। সে জন্যে চতুর্থ শ্রেণীর উপরে শশীপদবাবুর কড়া নজর—ঠেলেঠুলে ওদের উপরে তুলতেই হবে।

কিন্তু ব্যথিত হন তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে—লিকলিকে হাড্ডিসার দেহ, পরিশ্রান্ত চোখে ভীতির স্পষ্ট ছাপ। হাসির চিহ্নটি পর্য্যন্ত মুখ থেকে মুছে গেছে। প্রশ্ন শুনলে এরা আঁতকে ওঠে। অনেকের মুখে দাড়ি গোঁফের ছাপ স্পষ্ট—জাল নিয়ে সারারাত্রি মাছের তালাশে কেটেছে, ঘুমের কালিমা ভুরুতে লেগে আছে। শশীপদবাবুর ছেলে মন্টু এদের সেরা ছাত্র এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ।

"মন্টু!"

"আজ্ঞে—" মন্টু উঠে দাঁড়ালো।

"বলো তো ভূগোলে বাংলার বিশিষ্টতা কি?"

মন্টু নীরব রইলো। শশীপদবাবু ভাবলেন, প্রশ্নটি কঠিন—কিন্তু উত্তর সোজা। তিনি পাশের ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন। ছেলেটি হয়তো ঘুমুচ্ছিল, পাশের সহপাঠিদের ধাক্কাধাক্কিতে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগলো—"বাবা বলে দিয়েছেন স্যর, এর মধ্যেই সবটা বেতন শোধ দিয়ে দেবেন—"

শশীপদবাবু খানিক চুপ থেকে বললেন, "বসো!" বুঝলেন আগের দিন সুধীরবাবু নিশ্চয়ই রূঢ় কথা বলেছেন ছেলেটিকে। ভাবলেন, মাষ্টার আর কেরাণী একজন থাকা ঠিক নয়—একটু টাকার সুবিধা হলে আলাদা কেরাণী নিতে হবে।—"তোমরা কেউ পার্লে না। আমাদের বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। আমাদের পর্বতও আছে সমুদ্রও আছে। ভারতবর্ষের আর কোনো দেশের এই বিশিষ্টতা নেই।"

সহসা করিমদ্দি শেখ একটা ঝাঁকা মাথায় করে হুড়মুড় করে ক্লাশে ঢুকে পড়লো! —"আদাব বড়বাবু, আদাব! খুঁজে খুঁজে হয়রাণি হয়ে ফিরে এসেছি—কদ্দিন থেকে মনে মনে আশক বড়বাবুর সাথে মুলাকাত করি। কিন্তুক আল্লায় এ্যাদ্দিনে হুঁশ করলো।"

করিমদ্দি মাথা থেকে ঝাঁকা মাটিতে নামালে। ঝাঁকার ভেতর কয়েকটি লাউ একটি কুমড়ো কিছু কুল আর সের দুই চিড়া।

"একেবারে ক্লাশের মধ্যে চলে এসেছো করিমদ্দি?"

"এজ্ঞে, সেই জানেয়েতো আলাম। এই ছাওয়ালরা লাও, কুল খাও!—কই মন্টি বাজান—আয় বাপ—কুল খাও!"—শশীপদবাবুর সামনে ভয়ে ছেলেরা নড়তে পাচ্ছিলনা। "এজ্ঞে বড়বাবু, ছাওয়ালদের ফুরসৎ দেন!"

শশীপদবাবু অশ্রুসিক্ত ছেলেটির পানে তাকিয়েছিলেন, একটু অন্যমনস্ক ভাবেই বললেন, "যাও তোমাদের ছুটি।"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা ছুটে গিয়ে করিমদ্দির ঝাঁকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, কুল-কুল নিমেষাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

"এজ্ঞে বড়বাবু, একটা আরজ নিয়ে এয়েছি—আমার গুস্তাকি অনেক। আমার ছাওয়ালডা পড়ালেখা করে, ইস্কুলের বেতন দিতে পারি নাই দুই মাসের। বড় সরমে পড়ে এইগুলো নিয়ে এসেছি—এই চারডা লাউ, একটা কুমড়ো আর দুই সের চিড়া—দুই টাহার মাল হবে বড়বাবু! এগুন রেখে দেন, বড়বাবু, এক মাসের বেতন উশুল দিয়ে লেন!"

শশীপদবাবু হেসে বললেন, "তা কি হয় করিমদ্দি! টাকাআনায় বেতন দিতে হয়। তুমি বরং যুধিষ্ঠিরের দোকানে গিয়ে জিনিসগুলো বেচে দাও!"

"তরীতরকারি লিয়ে যুষ্টিরের কী গরজ, বড়বাবু! আর চিড়ে বেচলে একমাসেও টাকা আদায় হবেক না। আমার গাছের পেরথম লাউ, আপনার সেবায় লাগলে খুশী হই—"

একটু ভেবে চিন্তে শশীপদবাবু বললেন, "আচ্ছা, তাহলে বাড়ির ভেতরে দিয়ে এসো! আমি একমাসের বেতন দিয়ে দেব।"

শশীপদবাবুকে দেখে গৃহিণী ঠাট্টার সুরে বললেন—"কী গো, বাজার শুদ্ধ কিনে পাঠিয়েছ যে বড়? পোড়ার লাউ কুমড়ো তো আমাদের ক্ষেতেই আছে—"

"তোমার গাছের লাউ পরেও খেতে পাবে।"

"এর বদল মাছ কিনে পাঠালেও তো পারতে। আচ্ছা চিড়েটা না হয় কাজে লাগবে—"

"মাছ নিয়ে এলে তো পাঠাতে পারতেম।"

"আমি করিমদ্দিকে বলে পাঠিয়েছি, একটা মাছের ব্যবস্থা করতে। অনিলও এখানে খেয়ে যাবে।"

অনিল কাছেই বসে চিড়ে চিবোচ্ছিল আর হাসছিল। শশীপদবাবুর পুরনো ছাত্র—ইদানীং কৃষকদের মাঝে কাজ করে বেড়ায়। কিছুদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।



মাছের কথা শুনে শশীপদবাবু শঙ্কিত হলেন। তার মানে দু' মাসের ফিজ দাখিল কর্ছে করিমদ্দি!

"স্যর কি ভেট পেয়েছেন?"—অনিল শুধোয়।

"ভেট নয়—বেতন। করিমদ্দি ছেলের বেতন দিয়ে গেছে।"

"ও, বারটার সিস্টেম। স্যর দেখছি চীনের অনুকরণ কর্ছেন? সেখানে টাকার বদলে শস্য দিয়ে চাষীরা লেখাপড়া করে।"

"আমাদের দেশেও তাই করতো! কিন্তু এখানকার ইস্কুলের হিসেবে তো আর তরীতরকারী ঢিড়ে ঢুকতে পার্বে না। টাকাটা আমার পকেটে থেকে যাবে।"

"তাতো যাবেই। টাকাটা ও চাকতি—একবার গড়াতে শুরু কর্লে নর্দমায় না পৌঁছা পর্যন্ত থামে না।"

সে রাত্রে ডায়েরীর পাতা খুলে 'টাকা'র নিবন্ধে শশীপদবাবু লিখলেন, 'সকলে টাকার জন্যে কাজ করে, যাহাদের টাকা আছে তাহারা কাজ করে না। তাহা হইলে কাজের মূল্য কোথায়? এ জগতে শুধু অনিল করিমদ্দি আর আমি বাস করিলে টাকার নাম কখনই মুখে আনিতাম না। কাজ করিয়া যাইতাম পরস্পরের উপকারে আসিতাম। কিন্তু হায়, যাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, তাহাদের নিষ্কৃতি কোথায়?—আদম ও ঈভের আদিম পাপ রজতখণ্ড হইয়া সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করিতেছে।'

লাইনগুলি লিখিতে লিখিতে শশীপদবাবু একবার গৃহিণীর দিকে তাকিয়ে দেখলেন—তিনি তখন গাঢ় নিদ্রাভিভূত।

শচীবাবু বললেন, "মাষ্টার মশাই, গ্রন্থভারতীর ভাগ্য আর আপনার ভাগ্য একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। আরো কয়েকজন আপনার মতো সৎলোক আছেন, যাদেরকে নিয়ে আমার এই 'গ্রন্থভারতী'। আমি কাউকেই ঠকাবো না—সামান্য থোক টাকা দিয়ে আমি আপনাদের কারোর কাছ থেকেই কপিরাইট কিনে নিইনি। আমি উঠবো তো সবাই উঠবে। কী বলেন?"

শশীপদবাবু মাথা নাড়লেন, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই!—তা আর বলতে, এমন রয়েল্‌টি দিয়ে কোনো প্রকাশকই শিশুপাঠ্য পুস্তক ছাপান না।"

"এখন দেখুন কী দাঁড়ায়!—বই মনোনীত হয়েছে, ভালো কাগজে ছাপিয়েছি। স্কুলে ইস্কুলে পাঠ্য হলে আমরা সবাই ভাগ করে' কিছু কিছু নিতে পারবো। ভালো লোক

বেছে বেছে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছি। প্রাথমিক ইস্কুল যারা আদর্শ নিয়ে গড়ে তুলেছেন, তারা আমার বই অবশ্যই পাঠ্য করবেন এ আমি জোর করে' বলতে পারি।"

"রায়-লাইব্রেরীর ক্যানভাসার গিয়েছিলেন আমার ইস্কুলে। সঙ্গে বঙ্কুবাবুর একটা ব্যক্তিগত পত্র ছিল—"

সজোরে টেবিল চাপড়ে শচীবাবু অট্টহাস্য করে উঠলেন—"আরে এতক্ষণ চেপে আছেন ওকথা! বলুন, বঙ্কু আবার কী ঘটালে?"

"বঙ্কুবাবু যথেষ্ট লোভ দেখাচ্ছেন—নগদ টাকা, মোটা কমিশন, তা ছাড়া প্রাইজের বই ফ্রি। এবং আগামী বছরের জন্যে যদি একটা বই লিখবার প্রতিশ্রুতি দিই তবে আগাম কিছু টাকা।"

শচীবাবু আবার হাসলেন—"আমি জানি মাষ্টার মশাই, বঙ্কু অনেক দিন থেকে আপনার উপর নজর দিয়েছে। ও ভাবে, ঐ এলাকাটাই তাহ'লে তার মুঠোয় এসে পড়ে। বুঝলেন তো বঙ্কুর টাকা আছে—তাই টাকার খেলাই সে খেলতে চায়।"

"কিন্তু এত টাকা খরচ কর্লে, ব্যবসার কী লাভ থাকে?"

"সৎব্যবসায় থাকে না—শিক্ষার ব্যাপারেও কালো বাজার আছে, মাষ্টার মশাই! সস্তা কাগজে ছাপা, চড়া দাম আর পাতলা বাঁধাই। ছেলেপিলেদের হাতে এক মাসের বেশী ওরকম বই টেঁকে না, অভিভাবকদের খরচ বাড়ে। এক একটি পাঠ্যপুস্তক ছেলেরা যদি তিনবার কেনে, তা হলে ভাবুন তো লাভের অঙ্কটা কী দাঁড়ায়।"

ব্যথিয়ে উঠলো শশীপদবাবুর চোখ দুটো। এ দরিদ্র দেশে তা হলে কী করে হবে শিক্ষার প্রসার? কে জ্বালাবে জ্ঞানের আলো?

"বিলিতি শিশুদের বইগুলি দেখেছেন মাষ্টার মশাই? কেমন পুরু মোটা কাগজের, আর ছবির কত ছড়াছড়ি। আর আমাদের দেশে শিশুপাঠ্য বই কী-না নিউজ প্রিন্ট-এ ছাপা হয়!—এই কি স্বাধীন দেশের লোকের মনোবৃত্তি? যারা আমাদের আশাভরসা ভবিষ্যৎ, তাদেরই আমরা পড়বার সুযোগ দিচ্ছিনে। এ দেশের কী হবে?"

শশীপদবাবুর চোখে পঁচাশিটি ছেলে পর পর ছায়া ফেলে গেল। তারা একটা পরগণার আশাভরসা, সবাই কি তারা মাঠের আর ঘাটের কাজের পর, এমনি চাকুরীতে বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করবে? এমনি তাদের ভীতি আছে, লেখাপড়া শিখে বাবু হয়ে যায়! পরাধীন দেশে বাবু হবারই পাঠ নিতে হতো।

শশীপদবাবু মনে মনে আওড়ালেন—'আচার বিনয় বিদ্যা ধর্ম্মবল আর, আছে যার নমে তারে সকল সংসার।' তারপরে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন—"চলি শচীবাবু, গাড়ির সময় হয়ে গেল।"



আজও তিনি ভেবেছিলেন, কিছু টাকা চাইবেন শচীবাবুর কাছে। কিন্তু চাওয়া হ'ল না। কী-করেই বা চাওয়া যায়? গ্রন্থ-ভারতীর স্তূপাকৃতি বইগুলোর কথা তাঁর মনে পড়ে গেল—ভদ্রলোক কত টাকা ফেলেছেন ওর পেছনে। গাড়ি মধ্যে বসে শশীপদবাবু তাঁর নিজের লেখা 'সহজ পাঠ'-এর নতুন ছাপানো কপিখানি নাড়াচাড়া করে দেখলেন।

শশীপদবাবু বাড়ি ফিরে দেখলেন, কয়েকটি পাওনাদার বাবু কলকাতা থেকে কিছু নিয়ে আসবনে আশায় বসে আছে। এর মধ্যে একজন মেয়ের বিয়ের সময় দই দিয়েছিল। আজ মেয়ে সন্তানসম্ভবা, কিন্তু দই-এর বাকীটা একবছর ঘুরে এলো।

একজনকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, "এখনো বই বিক্রী শুরু হয়নি, যাদব! কাজেই ক'দিন দেরী হবে।"

শশীপদবাবু আবার 'সহজপাঠ'খানা নিয়ে নাড়াচাড়া করে' মনের প্রশান্তি আনবার চেষ্টা করেন। বিয়ের সময় কিছু ঋণ হয়েছিল—যাদব তারই সুদ নিতে এসেছে।

"আজ্ঞে মাষ্টারবাবু, অন্তত সুদটা—"

"এই সামনের বেতন পেয়েই দিয়ে দেব।—সবটা শোধ দিয়ে দেবারই তো ইচ্ছে ছিল!"

ঘরের ভেতরে গৃহিণী হাসিমুখে এলেন, "কি গো চেহারাটা বেশ হাসিহাসি দেখা যাচ্ছে? মণ্টু আর বোচনের জামা নিয়ে এসেছো?"

"কিছুই আনি নি, শুধু এই বইটা নিয়ে এসেছি—মণ্টু, এই নাও তোমার নতুন বছরের বই!"

মণ্টু মহাআনন্দে লাফিয়ে উঠলো: "দেখ, মা! কেমন সুন্দর বই—কত ছবি!"

গৃহিণী মহা খাপ্পা। মুখ ঝামটা দিলেন—"সরে যা! বাপব্যাটায় বইদিয়ে আমসত্ব খা!"

শশীপদবাবুও একটু সরে গিয়ে জামা খুলতে ব্যস্ত হলেন।

"জামাই যা চিঠি দিয়েছে, তাতে মালতীকে এর মধ্যে না নিয়ে এলে, আর আনাই হবে না। আমি অনিলকে খবর পাঠিয়েছি, গণকঠাকুর দিন দেখে দিয়ে গেছেন--অনিল কাল যাবে, মালতীকে নিয়ে আসবে।"

শশীপদবাবু না ভেবেই বলেন, "বেশ তো, নিয়ে আসবে।"

"সে কথাই বলছিলাম। তুমি যে ভেতরে ভেতরে এত সেয়ানা তাতো আর আমি জানিনে।

শশীপদবাবুর মুখ দিয়ে এক ঝলক হাওয়াই শুধু বেরিয়ে এলো। এ সংসারে কে কার!

পরদিন ভোরবেলা ইস্কুলে কথাটা সুধীরবাবুর কাছে বলতে গিয়ে বারবার শশীপদবাবু

মনে মনে হুঁচোট খেলেন। সুধীরবাবু ক্লাশ থেকে ক্লাশে যাচ্ছেন—বেলা বাড়ছে। শেষটায় পথের বাঁকে অনিলের চেহারাটা দেখে আর দ্বিরুক্তি করা সমীচীন মনে করলেন না।

সুধীরবাবুকে নিভৃতে ডেকে বললেন, "আমাকে আরো কিছু টাকা এডভান্স দিতে হবে। অন্তত গোটা দশেক টাকা।"

"দশ টাকার বেশী পারা যাবেও না—কিন্তু স্যর, বেতনের দিন কী নেবেন? সামনে একটা মাস পড়ে আছে।"

"ভেবে কী হবে বলুন। আমাদের অদ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ। Our days are numbered সুধীরবাবু! জীবনে লোভ্য আর কি? যা বেতন পাই, খাতায় লিখি তার ডবল।"

"এর চেয়ে ঘরামির কাজ ভালো ছিল, স্যর। এই তো পঞ্চম মানের জন্যে যে কোঠাটা বাড়ানো হচ্ছে—আপনার এষ্টিমেট থেকে অনেক বেশী খরচ লাগছে। ঘরামিরা বেশী চার্জ করছে—"

"ওরা টাকা বেশী পায় বলে' তো ক্ষতি ছিল না, আমাদের যদি টাকার দরকার না-ই থাকতো।"

মেয়েকে আনাতেই স্রেফ দশ টাকা খরচ হয়ে গেল। গৃহিণী কিছু সন্দেশও করে পাঠিয়েছিলেন মেয়ের বাড়িতে। নতুন কুটুম, নইলে কী ভাববে। অনিল মাষ্টারমশায়ের অবস্থা জানে, তাই মেরেকেটে দশ টাকার মধ্যে আসা-যাওয়া সুরাহা করে দিলে। শশীপদবাবু বুঝতে পেরেছিলেন অনিল ছয় ক্রোশ পথ হেঁটে মেরে দিয়েছিল—নইলে আরো টাকা লাগতো।

মালতীকে দেখে তিনি খুশীই হলেন। মেয়ের বিয়ে না দিলে তো তাঁর কাছেই থাকতো! তারপর ডাক্তারবাবু এলেন, দুধের ব্যবস্থা হ'ল, পথ্যের ব্যবস্থা হ'ল, কয়েকটা অষুধের নামও তিনি লিখে দিয়ে গেলেন। শশীপদবাবু সব কথাতেই মাথা নাড়লেন—এ সব পিতার কর্তব্য, পেছপা হলে কী ভাবে চলবে!

অনিল অষুধপথ্যের ব্যবস্থাও করে দিল। মানে, বাকী এলো। বাকী আর মেলে কী না, শশীপদবাবুর সন্দেহ ছিল। এও যেন উপরি পাওনা উপহার। তিনি বেশ খুশীই হলেন—truth is stranger than fiction!

কিন্তু বেতনের দিনটি সব পাওনাদারেরই জানা আছে। সেদিন আর কোনো অজুহাত চলে না। ইস্কুল থেকে আগাম বাদ দিয়ে ত্রিশটি টাকা পকেটে করে' শশীপদবাবু ঘরে ফিরে এলেন, হেসে বললেন, "কাকে কত দেব? এই টাকা কটা আছে।"



কে-ই বা কী বলবে! মাষ্টার মশাই গ্রামের মুরুব্বী, বিচার বিভ্রাটে তাঁকেই সবাই সালিসী মানে। তবু যাদব মাথা চুলকে বললে, "আজ্ঞে পাঁচ মাসের সুদ জমে গেছে। আরো বেড়ে গেলে আপনারই কষ্ট হবে—তাই বলছিলাম—"

শশীপদবাবু কাউকে বিমুখ করলেন না। সবাইকে কিছু কিছু ছুঁইয়ে দিলেন। তারপর গৃহিণীর কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "এ নাও একমাসের বাড়ির খরচ—সাড়ে সাত টাকা।"

"তুমিই রাখো, আমার হাতে দিয়ে কী হবে। কাল সকালেই তো দুধওয়ালা আসবে। যুধিষ্ঠিরও হিসেব দিয়ে গেছে।—"

শশীপদবাবু মেয়ের হাতে টাকা ক'টা গুঁজে দিলেন—"তুমিই রাখো মা!"

"বাবা, আমাকে না আনালেই পারতে—"

"যিনি চালাবার তিনিই চালাবেন, আমাদের ভেবে কী লাভ হবে রে পাগলী!" ম্লান হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

শশীপদবাবুর মনের কোণে একটি সলজ্জ আশা মুকুলিত হয়ে উঠছিল: গ্রন্থভারতী থেকে একটা মোটা টাকা তিনি পাবেন। সংসারের টাকাটা যদিও উপযুক্ত তেলের অভাবে মুহুর্মুহু আর্তনাদ করে উঠছে, তবু কোথাও আটকে পড়ছে না। একবার একটু তৈলনিষিক্ত করে দিতে পার্লে, আরো কয়েকটা বছর গড় গড় করে' চলে যাবে। তখন খানিক সুযোগও আসতে পারে। তিনি মনে মনে আওড়ালেন—there is someone worse off than you!

আর একটু আশা বাড়লো। রাত্তিরেই শশীপদবাবুকে ইস্কুলের সেক্রেটারী স্থানীয় জোতদার বৃন্দাবন শী মশায় খবর পাঠালেন,—ইস্কুল পরিদর্শক সামনের হপ্তায় ভিজিট করবেন। সরকারী সাহায্য কিছু বাড়তে পারে। তা হলে শিক্ষকদের বেতন কিছু কিছু বাড়বে।

ভোরবেলা ইস্কুলে গিয়েই তিনি একটা খসড়া রচনায় ব্যস্ত হলেন। ইস্কুলের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে প্রধান পরিদর্শককে অবধিত করতে হবে। তিনি সুধীরবাবুকে বললেন, "আমি মোটামুটি খসড়াটা করে দিচ্ছি, তারপর বৃন্দাবনবাবু যা করেন করবেন। আজ বিকেলেই আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন।"

ইস্কুল সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কিছু লিখতে না পার্লে ইন্‌স্পেক্টরের দয়ার উদ্রেক হবে না। বৃন্দাবন শী পাকা লোক, অনেক ছলনা চাতুরী করে' এখানে ইস্কুলটা জমিয়েছেন।

সুধীরবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "স্যর, আপনি গেলেই ভালো হতো।" তিনি জানেন, এ কাজে কতটা ঝক্কি পোয়াতে হবে। সেবারও ইন্‌স্পেক্টর আসবেন বলে' অনেক-গুলি ছেলেকে ভাড়া করে আনতে হলো, দু'জন ভদ্রলোককে মাষ্টার হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিতে হলো—সঙ্গে সঙ্গে রেজিষ্টারি খাতা, এটেণ্ডেন্স খাতা, কণ্ডাক্ট খাতার ঝামেলাও কম নয়।

"আমাকে একটু কলকাতা যেতে হবে।" শশীপদবাবু বললেন—"সংসার একেবারে অচল।"

সুধীরবাবু বিনীতভাবে বললেন, "স্যর, আপনার বেতনটা দিতে একটু ভুল হয়ে গেছে—করিমদ্দি শেখের ছেলের ইস্কুল ফী—"

"তাইতো!" শশীপদবাবুর হৃদপিণ্ডটা ধক করে গলায় এসে ঠেকলো। "আমার তো একেবারেই খেয়াল ছিল না!"

সুধীরবাবু আর কিছু বললেন না। শশীপদবাবু ত্রস্তে ইস্কুল কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে বাড়ির ভেতরে গেলেন।

"মালতী, মা সবক'টা টাকাই কী খরচ হয়ে গেছে?"

"না বাবা! দেড়টাকা হাতে আছে।"

"ও!"—শশীপদবাবু আবার ফিরে গেলেন। বাড়ির খরচার জন্যে সাড়ে সাত টাকা না দিয়ে, সাড়ে তিনটাকা দিলে কোনো ব্যতিক্রম হতো না। কিন্তু ইস্কুলে তাঁর ইজ্জৎ বেঁচে যেত। সারাক্ষণ এ কথাটাই খচ খচ করতে লাগলো তাঁর মনে।

আশানিরাশায় বেপথুচিত্তে শশীপদবাবু গ্রন্থভারতীর অফিসে ঢুকে শচীবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। উসকেখুসকো চুল, মুখে চুরুট, চোখে দুশ্চিন্ততার কালো ছায়া।

"মাষ্টার মশাই, যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছে। আমি হেরে গেছি।"

"একেবারেই কি বিক্রী হচ্ছে না?" শশীপদবাবুর গলায় আওয়াজ বেরুচ্ছে না।

শচীবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন। এ যেন সর্বস্বহারানোর হাসি। "না—না বললেই চলে! ঐ তো পাশের ঘরে পনেরো হাজার বই স্তূপীকৃত হয়ে আছে, একটি ক্রেতাও কি দেখতে পাচ্ছেন? অথচ বঙ্কুর দোকানে 'কিউ' দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। এ যেন সিনেমার ভিড়!"

"তা হলে—"

"আর কি—ডুবেছি! পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে গেল!"

শশীপদবাবু গলায় বেদনা অনুভব করলেন। তা হলে!

"পঞ্চাশ পারসেণ্ট কমিশন আমি দিতে পারবো না, মাষ্টার মশাই! পারি না, দেব না। যদি ন্যায্য কমিশনে আমার বই বিক্রী হয়, হবে। না হয়, না হবে। চোরাকারবার আমি করতে পারবো না। মরেছি ঠিকই। তবু লোকে জানুক, একজন honest businessman



বাজারে আছে—সত্যিকার শিশুদের দরদী লোক বাজারে আছে! আমার বই শিশুরা ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও ছিঁড়তে পারবে না—এমনি কাগজে ছাপিয়েছি!"

শশীপদবাবু ধীরে ধীরে সেখান থেকে উঠে এলেন। তাঁর অনুচ্চার মনের আক্ষেপ নিয়ে শচীবাবুর সামনে বসতেও লজ্জা করছিল। চা বিস্কুট পান—অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটিই শচীবাবু রাখেন নি। তবু শশীপদবাবু বেশীক্ষণ সেখানে বসতে পারলেন না। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলেন ইষ্টিশানে। গাড়ি ছাড়তে ঢের দেরী আছে—তবু তিনি উঠে বসলেন এসে। বারে বারে একটি কথাই তাঁর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনে হচ্ছিল—তা হলে?

শশীপদবাবুর পাংশু মুখের দিকে তাকিয়ে গৃহিণী একটা অশুভ আশঙ্কায় নীরব হয়ে রইলেন। মালতী একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বললে, "বাবা, অসুখবিসুখ করে নি তো?"

"না মা, ভালোই আছি।"

"দুপুরেও কিছু খেতে পারলে না, এমনি চলে গেলে—"

"তাড়াহুড়োয় কি খাওয়া যায় রে!" শশীপদবাবু হাসতে চাইলেন। হাসতেও পারলেন না। উঠোনে দাঁড়িয়ে করিমদ্দি শেখ আভূমি আদাব জানিয়ে বসবার উদ্যোগ করছে। শশীপদবাবুর হৃদপিণ্ডটা আবার গলায় এসে ঠেকলো।

"বড়বাবু, আমার ছাওয়ালডার নাম কয় না কেলাশে—"

"সে ব্যবস্থা আমি করবো করিমদ্দি।"

"এজ্ঞে কে একজন বড়কোর্তা আসতিছেন, আমার ছাওয়ালডারে যদি পয়চান না কয়েন তবে বড় সরম লাগবে—"

"আচ্ছা, তুমি যাও করিমদ্দি! কালকেই সে ব্যবস্থা করবো।"

করিমদ্দি চলে গেলে মালতী শুধোলে—"কী হয়েছে বাবা?" কিন্তু শশীপদবাবুর সদুত্তর দেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি মনে মনে ভাবলেন, ছি ছি ছি। তারপর আকাশের দিকে উদাস হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকারে শশীপদবাবুকে নিভৃতে ডেকে গৃহিণী চুপিচুপি বললেন, "ব্যাটাছেলে কিছু তো বোঝে না, মালতীর যা অবস্থা, ঘরে কিছু টাকা পয়সা থাকা দরকার। ঠাকরুণ আমাকে দুটো কানফুল দিয়ে গেছলেন। সবই তো গেল, এ দুটোই ধরে রেখেছিলুম গুরুজনের আশীর্ব্বাদ বলে। যাও স্যাকরার কাছে রেখে কিছু টাকা নিয়ে এসো!"

"মায়ের দেওয়া জিনিস—ও দুটো আমি বাঁধা দেবো!" শশীপদবাবু বেদনার্ত স্বরে বলেন।

"টাকা পেলেই ফিরিয়ে আনবে, গলায় কাঁটা বিঁধলে বেড়ালেরও পায়ে ধরতে হয়। নাও যাও—মেয়ের জন্যে আমি বেয়ানের কথার ভাগী হতে পারবো না।"

স্যাকরার দোকানে কানফুল দুটো রেখে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। পুরনো সোনা ক্ষয়ে গিয়ে খাদের ভাগ বেশী আছে। দশটাকায় রফা হলো। তার থেকে আগের বাকী মজুরী বাদদিয়ে শশীপদবাবু সাতটাকা নিয়ে ঘরে ফিরলেন। মেয়ের ভাবনা ভেবে, তিনি করিমদ্দির টাকাটা জমা দিতে পারবেন বলে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন।

কিন্তু শেষরাত্রে গৃহিণী যখন তাঁকে ঠেলে তুললেন, মালতী ছাড়া আর কিছু তিনি ভাবতে পারছিলেন না। দৌড়ে ডাক্তার আনতে ছুটলেন আধ ক্রোশ রাস্তা ভেঙে। সারা-রাস্তায় মেয়ের কুঁকড়ে যাওয়া চেহারাটা তাঁকে যন্ত্রণা দিল। প্রয়োজনীয় অষুধ ডাক্তারের কাছ থেকে নিয়ে নিতে তিনি দ্বিধা বোধ করলেন না।

ভোরের সঙ্গে সঙ্গে বেদনার উপশম হলো। মালতীর চোখে ঘুমের প্রশান্তি নেমে এলো। ডাক্তারবাবু চা খেয়ে, প্রাথমিক সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বিদায় নিলেন।

সাত টাকার যৎসামান্য অবশিষ্ট শশীপদবাবুর পকেটে চলতে ফিরতে কঁকিয়ে উঠছিল।

ইস্কুলে ঢুকতেই শশীপদবাবু দেখলেন, করিমদ্দি শেখ সুধীরবাবুকে কী বলে অতি দ্রুত নেমে চলে যাচ্ছে। সেই মুহূর্তে তিনি পা বাড়াতে গিয়ে ঠোক্কর খেলেন।

সুধীরবাবু এগিয়ে এসে বলনে, "স্যর, করিমদ্দিকে দেখিয়ে দিলুম তার ছেলের নামটা রেজিষ্টারী খাতায় উঠেছে।"

শশীপদবাবু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন।

"ইন্‌স্পেক্টর আসচে বলে' কত বাজে ছেলের নাম খাতায় উঠেছে—আর এতো সত্যি সত্যি পড়াশোনা করছে!"

শশীপদবাবু বাকশক্তি রহিত হয়েই রইলেন।

"স্যর, আপনার বাড়িতে যা ঝঞ্ঝাট যাচ্ছে—আর এ সময় হাতেও পয়সা নেই—কীভাবে যে চলবে—"

শশীপদবাবু মৃদুকণ্ঠে বললেন—"গ্রন্থভারতীর ভয়ানক ক্ষতি হয়ে গেছে—"

"রায় লাইব্রেরীর সঙ্গে ব্যবস্থা করলে, আপনার তো যথেষ্ট সুবিধে হতো। আমাদেরও কিছু কিছু পকেটে আসতো—"

শশীপদবাবু মৃদু হাসলেন—"তা হয়তো হতো।"

সরবে ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠলো। মদনের ছোট ছেলেটা বড় জোরে ঘণ্টা বাজায়। শশীপদবাবু অন্যমনস্ক ছিলেন, আঁৎকে উঠলেন। শনিবারের ইস্কুল, তাই ছেলেপিলেরাও অতিমাত্রায় উচ্ছ্বসিত। মদনের ছেলেটিও ছেলেমানুষ।

শশীপদবাবু নিজের ডেস্কে গেলেন খাতা দোয়াত ইত্যাদি নিতে।



মদনের ছোট ছেলে ঘণ্টা ও ডাণ্ডাটা ঘরের একপাশে রেখে দিয়ে, বৃহৎ কোটের এক ভাঁজ থেকে একটি চিঠি শশীপদবাবুর সামনে বার করে ধরলে—"এজ্ঞে বাবা দ্যাছে।"

ক্লাশে যাবার মুখে একটা বাধা পেয়ে শশীপদবাবু একটু বিরক্ত হলেন। পরক্ষণেই মনে হলো মদন তো লেখাপড়া জানে না। হস্তাক্ষর দেখে আশ্বস্ত হলেন, চিঠিখানা লিখেছেন সেক্রেটারী বৃন্দাবন শী মশায়। কিন্তু চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করে তিনি চোখেমুখে অন্ধকার দেখলেন, কোনোরকমে চেয়ারটা হাতড়িয়ে বসে পড়লেন। সেক্রেটারী লিখেছেন,—ইস্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট শ্রীগৌরমোহন পোদ্দার শশীপদবাবুর মেয়ের বিয়ের সময় যে পঞ্চাশ টাকা ধার দিয়েছিলেন, তা তিনি ইস্কুলের ফাণ্ড থেকে নাকি দিয়েছিলেন। কাজেই টাকাটা ইন্‌স্পেক্টের ভিজিট করবার আগেই পরিশোধ করে দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

গৌরমোহন পোদ্দার ধনবান লোক, তিনি এই চালাকি না করলেও পারতেন। শশীপদবাবু অনেকক্ষণ স্থাণুর মত বসে রইলেন। তারপর পঞ্চম শ্রেণীতে গিয়ে ছেলেদের নাম ডেকে ছুটি দিয়ে দিলেন। অসংলগ্ন অনেক চিন্তাধারাই শশীপদবাবুর চোখেমুখে ঝিলিক মেরে গেল—নৌকোর ফুটো দিয়ে হুহু জল উঠে আসচে, হাল ধরে কি পাড় পাওয়া যাবে?

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে শশীপদবাবু বাড়ির ভেতরে এলেন। মণ্টু আগে ভাগেই বাড়িতে এসে ক্ষিদে পেয়েছে বলে কান্নাকাটি করছিল, বাবাকে দেখে থমকে গেল।

স্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, "আমাকে একটু কলকাতায় যেতে হচ্ছে।"

"কিছু খেয়ে যাও।"

"না।"

"কাল সারাদিন তো উপোস দিয়েই গেলে। মাথা খাও বাসিমুখে কোথাও যেওনা—ও ভাবে কোনো কাজ হয় না!"

কিন্তু ততক্ষণে শশীপদবাবু অনেকদূর চলে গেছেন। কোনোদিনই লোকটা কথা শোনে না, কথা বলেও না। তবু অনিল থাকলে একটু জোরজবরদস্তি করতে পারতো। ঐ হতভাগাকেও তো পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে! গৃহিণীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল গড়াতে লাগলো।

বঙ্কুবাবু বলেন, "আমি জানতেম মাষ্টারমশাই, আপনি আমার দরজায় পায়ের ধুলো দেবেনই। আমার মতো সুযোগ কোনো প্রকাশকই দিতে পারে না। আমাদের শিক্ষকমশায়রা মহান আদর্শ নিয়ে দারিদ্র্য বরণ করেছেন আমরা যদি তাদের একটু রিলিফ না দিই, তবে মহাপাতকের ভাগী হ'ব।"

"আমার একশ টাকার দরকার।"

"নিশ্চয়ই, এক্ষুনি দিয়ে দিচ্ছি। আর এই ক'টা ইস্কুল এখনো পাঠ্য বই ঠিক করতে পারেনি—মানে decision নেয় নি। এরা আপনার এলাকাই পড়ে, একটু যদি আমাদের তরফ থেকে অনুরোধ করেন—"

শুষ্ক হাসি টেনে শশীবাবু বললেন, "আপনার নূন খাব, আপনার গুণ গাইব না? তা কি হয়!"

একশ' টাকা পকেটস্থ করে শশীপদবাবু বেরিয়ে এলেন। এতক্ষণে তাঁর মনে হল, শরীর দুর্বল—চলতে কষ্ট হচ্ছে। ক্ষিধের জ্বালায় শরীর ঝিম ঝিম করছে। গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছনো মুশকিল!

এই তো ছোট গলি, লোকজন যেন এক অদৃশ্য সুতোর টানে চলা ফেরা করছে!—কোথায় যেন একটা অজানিত সুতো ছেঁড়ার আশঙ্কা! পড়লে আর উঠতে হবে না!

মাষ্টার মশাই!—শচীবাবু যেন ডাকছেন, মাষ্টার মশাই। কোনদিক থেকে ডাকছেন ঠাহর করা যাচ্ছে না। মাষ্টার মশাই! শশীবাবু এই অসংখ্য মানুষ আর গাড়ির জঙ্গলে পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কোনো প্রকারে কেৎরে কেৎরে এই ছোট্ট রাস্তার দীর্ঘ সময় পার হয়ে যেতে হবে। শশীপদবাবুর কানে শুধু বাজতে লাগলো—মাষ্টার মশাই, মাষ্টার মশাই!

শচীবাবু কি পারবেন এই একশ' টাকা ফিরিয়ে দিতে? শশীপদবাবুর এই মাথার মূল্য? বেশতো দিলেন—কিন্তু একবার। তারপর? কে তাকে বাঁচাবে? এই দীর্ঘ মরুপথ যাত্রায় কোনো সহৃদয় বেদুইন একবার পথের ক্লান্তি দূর করলে, তাই দিয়ে এই বিস্তীর্ণ বালুর ঝড় একলা পাড় হওয়া যায় না। আকাশে মেঘের চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। মেঘ জমেছে ঊর্মিমুখর বিস্তীর্ণ জলধির ওপরে, এখানে তার শূন্যগর্ভ প্রতিভাস।

# শিল্প-সংলাপ

## 'বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি পরিষৎ'

বাংলার লোকসংস্কৃতির কয়েকটি নিদর্শন দর্শন করবার সৌভাগ্য হ'ল সেদিন 'নাটোর'-গৃহে। দেখে মনে পড়ছিল রাঠোর-বীর চন্দেল্ল চহমনদের, যে সুঙ্গ-বংশ ভারতবর্ষকে বিশ্বামিত্রের চর্ম্ম-উপবীতে একদা সম্বদ্ধ করে দ্রাবিড়-সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল, সৃষ্টি করেছিল সঙ্ঘ-রাষ্ট্র মোহেঞ্জোদারো নাম। মনে পড়ল পৃথ্বিরাজকে, অর্জ্জুনকে, কৃষ্ণকে, চন্দ্র-সূর্য্যকে আর সঙ্গে-সঙ্গে খাজুরাহের ধঙ্গকে—যাঁরা বিদর্ভ-রাঢ়াপুরীর কন্যাকে অপহরণ করে চিরদিন ভারতবর্ষের সঙ্গীতি দান করেছেন। সে-কন্যা কখনো হয়েছে কুন্তী, কখনো চণ্ডাল-দুহিতা, কখনও রাধা-রুক্মিনী-সুভদ্রা, কখনো কাশীরাজ দুহিতা, কখনো বা 'কুড়গে'র উগ্রসেনী কখনো দ্রৌপদী-উত্তরা। ধঙ্গ তাইত রাঢ়াপুরীর গলদশ্রু রাধা-কে গদগদ-ভাষে সম্ভাষণ করেছিলেন:

"কা ত্বং কাংচীনৃপতিবনিতা কা ত্বম্ অন্ধ্রাধিপত্নী।
কা ত্বং রাঢ়া-পরিবৃঢ়বধূঃ কা ত্বম্ অঙ্গেন্দ্র-পত্নী॥"

"তুমি কে গো পাঞ্চালী, আজ এই লক্ষ্মী-কর্ণকে দেখে কাঁদছ কেন? মনে নেই পূর্ব্বজন্ম কথা? চাওনি কি কর্ণকে? আজ তুমি রাঢ়-বারেন্দ্রভূমির ব্রীড়াবতী বধূ, তুমি অঙ্গদেশ বিজয়ীর আদরের পত্নী, পাণ্ড্যকুলের বনিতা, সমগ্র অন্ধ্ররাজ্যের অধিশ্বরী হয়ে বসেছ বলেই কি ভুলে যাবে পূর্ব্বস্মৃতি? আমি কি আসিনি একদিন চন্দ্রের বেশে ব্রাহ্মণীকে আলিঙ্গন করতে? স্মরণ করো চন্দ্রবর্ম্মণকে। হয়ত মনে পড়বে তোমার সূর্য্যপুত্র রাধেয়-কৌন্তেয় কর্ণকেও এবার। মনে পড়বে আর্য্য কৌণ্ডিনদের। দশরথকেও ভেবে ছাখো। সুমাত্রা-কোশল-কেকয় অধিপতি দক্ষের সন্তান অজের সন্তান রঘুবংশকে ভুলে যেওনা। পাণ্ডবদের কেন ভুলে যাবে পাণ্ড্য-রমণী? কেন ভুলবে গ্রীসো-রোমান জেসন-সম্প্রদায়। কান্দাহারের বা অলকজ অন্ধ্র বলেই কি আমি নন্দ বংশের অন্ধ্র সন্তান নই? আমি কি দ্রাবিড় ব্রাহুই নই? আমিও তা-ই তুমিও তা-ই। কেউ আর্য্য, কেউ মৌর্য্য নয়। দ্রাবিড়, নেগ্রিটো কেউ নেই ভারতবর্ষে। সব হিন্দু—হিন্দুকুশ থেকে ওঙ্কারধাম—সুমেরু থেকে কুশদ্বীপ-মিশর পর্য্যন্ত সবাই মহাজাতি—মহাগণ-চাঁদগণ চন্দ্রবংশ। এখানে সূর্য্যের মহিমা পূর্ণিমায়। সব এক মহাশক্তির সন্তান। সবাই কুলকুণ্ডলিনীর কুলে জাত! কেন বৃথা দ্বাদশসূর্য্যের ভান?"

এই মহাসত্যের প্রমাণ কুর্গে-কাঞ্চীতে মহানাদে-পাহাড়পুরে, ভারহুতে-মোহেঞ্জোদরোতে আসামে-ময়নামতীতে, যাভাবলীদ্বীপে, যাপদ্বীপুঞ্জে, ওঙ্কারধামে-বোরোবুদুরে, ইতস্তত বিস্তৃত। আজও তা সঙ্কলিত হয়ে বাংলার ইতিহাস রচিত হয়নি। বাংলার যে-ইতিহাস রচিত হয়েছে তা মিথ্যায়, শঠতায় এবং অজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। যাদুঘরের ইটপাথরের সাদৃশ্য মিলিয়ে এবং ব্রাহ্মী-বাংলা লিপির পাঠোদ্ধার করে যদি আমরা বাংলার ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করতাম—শুনতে চাইতাম এই বৃত্রের দেশের ব্রতপাঁচালী পালপার্ব্বণের প্রমাণ্য কাহিনী তাহলে বাংলার যে সৎ ইতিহাস রচিত হত তাতে দেখা যেতো বিশ্ব-সভ্যতার অঙ্কুরোদ্গম এই গাঙ্গেয় ভূমিতে—

যে ভূমি ছিল নন্দাদেবী-পর্ব্বতমূল থেকে ঢাকা-বুড়িগঙ্গার তটপর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেদিন মেঘ্না-নদী ছিলনা—সায়াম উপসাগরের নাম ছিল মেগাস্-সিন্নুস। সিন্ধু বলতে বোঝাত সেদিন লৌহিত্য-সিন্ধু—ব্রহ্মপুত্র। এই লৌহিত্য-দেশের লাল মাটির স্তর গড়ে তুলেছিল রাঢ়াপুরী, লালমাই-রাঙামাটির স্তূপ। সেই 'রক্তমৃত্তিকা'র নৌনাবিক বুদ্ধগুপ্ত সিঙ্গাপুরে তুলেছিলেন বুদ্ধের তিব্বতী-ধ্বজা। নোয়ার বংশধর এই নাবিক-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বপুরুষ পাহাড়পুরের রক্তমৃত্তিকা-পীঠে গুণসিন্ধুর ভঙ্গীতে বিরাজমান আর ময়নামতীর রক্তমৃত্তিকা-ইটে মুঙ্গল মানরাজ মোহেঞ্জোদারো-রাজ-মূর্ত্তিতে তাঁর 'মান' (ম্যাজিক) নিয়ে আসীন। তাঁর পুত্র কুমার বুদ্ধগুপ্ত যদি সুদূর 'এরাণে'ই যেতে পারলেন (খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে) তাহলে ওঙ্কারধাম ত এই গণ-গণেশের ছয় দণ্ডের পথ। অশ্বমনোরথ এই গুরুভক্ত গোরক্ষ-নাথ-শিষ্য 'শ্রীরাজাহু গুরুদসংভুজঙ্গচন্দ্রলোকে' শশাঙ্কদেরই ছিল (যাদুঘরের ৬৫১৯ শিলালেখ দ্রষ্টব্য।) যাঁরা ছিলেন গৌর-সেনা বা গৌড়-সেনা। তাঁরা ছিলেন জামদ্ব্যগ্ন। বঙ্গ মানে ছিল ব-নগ, দু'টি পাহাড়ী সাপ, পাহাড়পুরের আর ময়নামতী-শ্রীহট্টের।

এই প্রোটো-অষ্ট্রলয়েড জাতির ঘট-পট সংগ্রহ করে শ্রীমান ইন্দ্রজিৎ তাঁর ছোট প্রদর্শনীটিকে ইন্দ্রজালে পূর্ণ করে তুলেছেন। সর্পপূজারী 'পঙ্গাল-চের-ঐর' বা অষ্টগঙ্গেমের অস্ত্রলয়দ ইন্দ্রগঙ্গেমের ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে ইন্দিয়ার ইন্দীবর পঞ্চ-ইন্দু তৈরী করল এবং তা-ই যে একদা হিন্দুজাতির লাঞ্ছন হয়ে পরবর্ত্তী যুগে তাদের লাঞ্ছনা দিয়েছে এই প্রদর্শনী থেকে আমরা তা জেনে নিতে পারি। চিনতে পারি সীতা-বলাশ্রীকে—কুড়গ-জননী জবালাকে। লবকুশ ইক্ষাকুদের দেখি। দেখি হৈহয়দের। পাই তাসের জন্ম-ইতিহাস—চিরতন্নু 'চিরতনে'র পূর্ব্ব-মোহেঞ্জদারো-সুলভ অস্তিত্ব দেখতে পাই। য়ুরোপের উৎস-সন্ধানের অবকাশ মিলে তাতে। চিনি জটায়ু-জগন্নাথকে। চিনি যমের মা-কে, যে যম জম্বুদ্বীপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত—এমন কি ইরাণে, ব্যাক্ট্রিয়ায়, লাটিন-জগতের জেরুজালমেও।

নাটোর-গৃহের প্রদর্শনীতে গিয়ে আমি নিজেকে মাধ্বী-বাংলার সন্তান হিসেবে চিনে এলাম, মুগ্ধ মনে উচ্চারণ করলাম: "সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি'। যেম্নি যাদুগৃহের ইটপাথরের অক্ষরগুলো-পাঠ করে একদিন নিজেকে মাগধী মনে করে মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম, ইন্দ্রজিৎ তাঁর ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে আবার আমায় তেম্নি স্তব্ধ করে স্মরণ করিয়ে দিলেন: "মনোপূর্ব্বঙ্গমা ধম্ম"।

## ধ্রুপদ সঙ্গীত

'চলোম্মি' শিল্প-কেন্দ্রের সংবর্দ্ধনায় ওস্তাদ দবির খান সাহেবের ধ্রুপদ গান শুনবার সুযোগ হ'ল দৈবাৎ। তানসেন বংশের এই কৃতীপুরুষ রবাব-বীণ বাজিয়ে এতোকাল নিজগৃহের উজ্জ্বল গীতপ্রবাহকে উজ্জীবিত রাখছিলেন, এবার কণ্ঠসঙ্গীতে আমাদের ঐতিহ্যগত 'বীণা-কঞ্জন-রব্ব'-এর উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত রব কণ্ঠের সাহায্যে পরিবেষণ করতে উদ্যত হয়েছেন। তাঁর উদ্যমেই মানুষ মুগ্ধ হয়ে যাবে। মুগ্ধমনে আমি অন্তত একটি কণ্ঠে দু'জনের কণ্ঠ শুনেছি: চিরস্মরণীয় আবদুলকরিম আর ফৈজখান যেন যোড়বেঁধে একসঙ্গে এসে উপস্থিত হলেন একটি বীণার ঝঙ্কৃত গমকে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খানের মুখে শুনেছিলাম সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে একমাত্র স্বরোদই না কি মানুষের কণ্ঠ প্রায়-



অবিকল অনুকরণ করতে পারে। সুদক্ষ হাতের দাক্ষিণ্যে তিনি যন্ত্রের সেই ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ওস্তাদ দবির খানসাহেব দেখালেন কণ্ঠের সঙ্গীতযন্ত্রসুলভ মাধুর্য্য। তাতে শুধু রবাব-বীণার রব-ধ্বনিই শুনলামনা, শুনতে পেলাম ভরত-নাট্যশাস্ত্রের কঞ্জনের গদগদ ভাষ বা পাখোয়াজের আওয়াজ। সব সঙ্গীত-ধ্বনিই সমুদ্রশায়ী-বিষ্ণু-গর্ভজাত। তাই রবাব-ধারী গথ্ সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় আমরা অঙ্কিত দেখতে পাই স্পষ্ট বাংলা-ব্রাহ্মী অক্ষরে এই নাম: সমুদ্রশ্চঅীং গথ। বিষ্ণুর নাভিনাল থেকেই সুরস্রষ্টা ব্রহ্মার উৎপত্তি। সেই বাঁকা নাল মুরারীর বাঁশী হয়েছে, হয়েছে পাশুপতের সুরশৃঙ্গ (শিঙ্গা), হয়েছে বাকানলদের ব্যাগপাইপ, হয়েছে পাহাড়-পুরেও শ্রীপুরে সাপুড়ে বাঁশী। সেই প্রাগৈতিহাসিক সঙ্গীতের লক্ষীর ঝাঁপি ছিলনা—ছিল সে-ঝাঁপিতে বেদেনীর সাপ। (আমি বেদ-পূর্ব্ব যুগের ইতিহাসই বলছি—বিষ্ণুকে বেদের যুগে বরুণ-বৃত্র নাম ধরতে হয়েছিল।) তবে সরস্বতীর হাতে বিষ্ণু-নারায়ণ তুলে দিয়েছিলেন ব্যাগপাইপ বা সাপুড়ে বাঁশী—যা থেকে স্বরোদ, সারেঙ্গী, গীটার, রবাব, বেহালা, সুরশৃঙ্গার, বীণা জন্ম নিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের প্রতি একটু খেয়াল থাকলে ধ্রুপদ-খেয়ালের এবং তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাঁতির এ-ধরনের খবর অনায়াসেই লাভ করা যায়। ভারতনাট্যের পুঁথির খবরই খণ্ডিত ভারতে আছে কিন্তু তার আসল সূত্র প্রমাণসহ ওঙ্কারধামের 'কোপন কম্রতানন মহাগণপতি'র ক্রোধপ্রশমনার্থ গ্রথিত আছে 'আচার্য্য কণ্ডিন'-এর দানপত্রলেখায়। এই কণ্ডিন আচার্য্যের দেশ পৌরাণিক রাজা রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মকের রাজধানী 'কুণ্ডিন'-এ ছিল তা অনায়াসে বোঝা যায়। কুণ্ডিন বলতে পূর্ব্বাঞ্চলের বিদর্ভের বা বৈসালীর বা সদিয়ার রাজধানীকেই বোঝাত। আর আসামের বোডো আর্য্য-কৌম বা ভোট্টরাষ্ট্রজনকরা সিদিয়া বলতে প্রথমত সদিয়াকেই চোখের উপর দেখতে পেয়েছিলেন (গেট-প্রণীত আসামের ইতিহাস দ্রষ্টব্য)। সদিয়া থেকে আসামে প্রাপ্ত অশ্বমনোরথ (বল্গা-যুক্ত অশ্ব) চড়ে কম্বোজে বা ওঙ্কারধামে যাওয়া গথ-সিদিয়ানদের পক্ষে কি খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার? সমুদ্রগুপ্তেরই কীর্ত্তি কম্বোজ-সভ্যতা বা ওঙ্কারধাম। জৈমিনী সমুদ্র-গুপ্তের দৃষ্টিতে শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব সব ছিল একাকার। ওঁ-ধ্বনিতে সব 'মান' বা ম্যাজিক পর্য্যবসিত—তিনটি সুরে সুরসপ্তকের দ্বন্দ্ব সমাহিত। আদিরাগ ভৈরবে ভৈরবী-গুর্জ্জরী-রামকেলী-সৈন্ধবী-বাঙ্গালী রাগিণী মিশ্রিত হ'ল। রাগিনীগুলো বিভিন্ন-দেশজ-সঙ্গীত-লক্ষণী। অষ্টগঙ্গেমের দিগ্বিজয়ী সন্তান ইন্দ্রগঙ্গেমের ইন্দ্র হয়েছিলেন—আহ্লাদাবাদের প্রশস্তি সেই উপলক্ষ্যেই রচিত। হয়ত রাগিনীগুলোও।

ব্রহ্মদেশের ব্রহ্মার নিয়ম অনুসারে আসামের ও বাংলার ছেলে সমুদ্রগুপ্ত কিন্তু বাঙ্গালী পন্থা বিসর্জ্জন করেন নি। 'বাঙ্গালী'-মতে তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের শ্রীপুরে বসে শ্রীঋকার (দক্ষিণ চীন) বৈদিক পদকারের স্মৃতি মনে করে 'শ্রী'রাগকে দিলেন শ্রেষ্ঠ স্থান—দ্বিতীয় স্থান নিল প্রচুর-পয়সী প্রাচীদেশের 'মেঘ'-রাগ। 'মেঘ'-রাগেরই প্রেয়সী হয়ে এলেন 'মল্লারী'-রাগিণী। জন্ম হ'ল সন্তান 'মেঘ-মল্লারে'র।

মিঞা তানসেন এই বংশেরই সুসন্তান। কাজেই মিঞা-কী-মল্লার শুনবার সৌভাগ্য আমাদের ইদানীং-ও হচ্ছে। তানসেনের সন্ততির হাতেই এই প্রাচীন সঙ্গীত-গৃহের চাবী। ওস্তাদ দবির খান আমাকে সেই যাদুগৃহেরই রত্নসম্ভার দেখালেন। তাঁর কণ্ঠে সাতটি সুপর্ণাকে কেলী-মত্ত দেখতে পেলাম। যেন—গান শুনলাম না আমি, দেখতে পেলাম আদিধ্বনির মূর্ত্তিময়ী রূপ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

# প্রতিবাদ

মাঘ-সংখ্যা পূর্বাশায় প্রকাশিত 'মনের ময়ূরের' সমালোচনাটি অসংগত ও অসম্পূর্ণ ঠেকেছে, তাই এই বই সম্পর্কেই কয়েকটি কথা বলতে হোচ্ছে।

এ-বইয়ের বিষয়-নির্বাচনে লেখিকা কোনো জটিল সমস্যার অবতারণা করেন নি, একটি বিচিত্র ও বিশিষ্ট প্রেমকাহিনীকে অনর্গল ভাষায় ও স্বল্প-বর্ণিল রেখার আঙ্গিকে বাঁধিয়েছেন।

ধীরশান্ত একটি রুচিশুচি প্রেম কেমন ক'রে অন্ধসংস্কার, অরুচি ও ঈর্ষার পায়ে বলি হোলো—দুটি তরুণপ্রাণ—একটি সুখের সংসার কেমন করে ছিন্নভিন্ন হোলো একটি স্থির-সংযমী পুরুষের (অনসূয়ার বাবা) অক্ষম ভীরুতার মূল্যে, আশ্চর্য ঘটনাবুননের মধ্যে তারই শিল্পরূপ দিয়েছেন প্রতিভা বসু। বই আরম্ভ হতেই চারটে প্রধান চরিত্রের মাধ্যমে ঘটনাকে বর্তমান কাল ডিঙ্গিয়ে অতীতে ফিরতে হয়েছে—ফ্ল্যাশ ব্যাকের প্রাচুর্য অথচ বৈচিত্র্য এবং সুন্দর সৌষম্য লেখিকার ক্ষমতার পরিচায়ক। বিশেষত, অনসূয়া পর্বের শেষ ভাগে অনিদ্রা-কাতর অনসূয়ার আঙ্গুল-চাপা বোঁজা চোখের তলায় 'বিন্দু বিন্দু তারার মত হলদে হলদে ফুলগুলোর পাঁপড়ি কখন একটি বড়ো ছবি হয়ে' বিচিত্র রেখায় দেখা দিল, তারই সূক্ষ্মরেখার টানে ও বিচিত্র বিশ্লেষণের ভূমিকায় তেত্রিশ বছরের মেয়ে অনুসূয়ার ষোলো বছর আগের জীবনের যবনিকা উঠলো—গল্প আরম্ভ হোলো। এবং শেষ হোলো। সুখদুঃখ আনন্দবেদনা মিশ্রিত একটা প্রণয়-পরিণয়ের সরল গল্পের তির্যক বাঁক নেওয়ার ইতিহাস সংযত হাতে লেখিকা রক্ষা করেছেন।

কারো সামান্য প্রভাব সেখানে বড়ো কথা নয়, বড়ো হোলো যা পেলাম তা আমাদের মনকে কতোখানি নোতুনের তাজা গন্ধের স্বাদ দিল। আমার তো মনে হয়, বইটির আদ্যন্ত, মনোযোগী রসিক মাত্রেই, একটি সুসংস্কৃত রুচিবান মহিলা মনের সচেতন পর্য্যবেক্ষণশীলতাকে লক্ষ্য করতে পারবেন। একটি সুস্থ সুন্দর মধ্যবিত্ত সংসারের গার্হস্থ্য পারিপাট্যকে তিনি উজ্জ্বল ক'রে এঁকেছেন, আবার তার ভগ্নচূর্ণ বিকৃত রূপকেও সাফল্যের সংগে উদ্ঘাটিত করেছেন। ক্ষুদ্র পল্লীর ভীরু নম্র মেয়ে অনসূয়ার পক্ষে স্বাভাবিক যেমন দার্জিলিঙে তার সেই উদ্দাম হিংস্র মূর্তি, তেমন বাইরের জটিল জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তার ভাবপ্রবণ মনের অন্যতর প্রকাশ হয়েছে বিচার কক্ষে বিনয়ের বিপক্ষে নিরুপায় মিথ্যাভাষণে ও নির্দয় কাকার কাছে করুণ আত্মসমর্পণে—চাবুকের শাসন সেখানে গৌণ। শ্রান্ত দুঃখী অবসন্ন সংসারের প্রান্তে বোঝাভার বয়সী মেয়ের বিয়ের যে ক্লান্ত উৎসবের চিত্র 'উপসংহার' পর্ব্বের এক অধ্যায়ে অংকিত হোয়েছে তা প্রতিভা বসুর স্বকীয়।—'বেলা গেল। গলে গেল সূর্যাস্তের সোনা।'...'শালিকের ধানরঙ ঠোঁট চিকচিকালো।' পাশাপাশি সত্য এ ছবিও: 'ঘরে ঘরে পনেরো পাওয়ারের বদলে পঁচিশ পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠলো উৎসব বাড়িতে।' এম্নি স্বল্প-রঙীন বর্ণনায় ও বিষয় ব্যঞ্জনার গূঢ় তাৎপর্যে 'মনের ময়ূর' সম্পূর্ণ।

নিখিল কুমার নন্দী


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু'টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা
মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেম রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা
মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

ক্রমোন্নতির পথে

[illegible]

হিন্দুস্থান কো-ওপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি কোম্পানি

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা



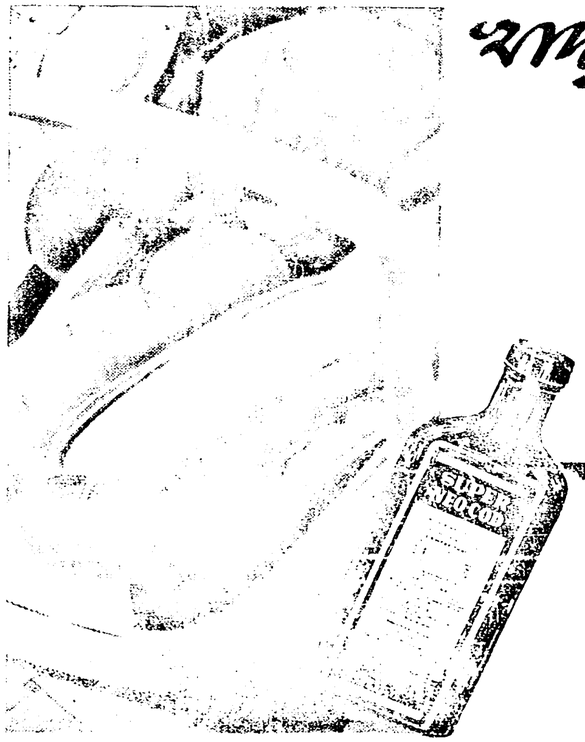

খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সবপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

COBLD

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩


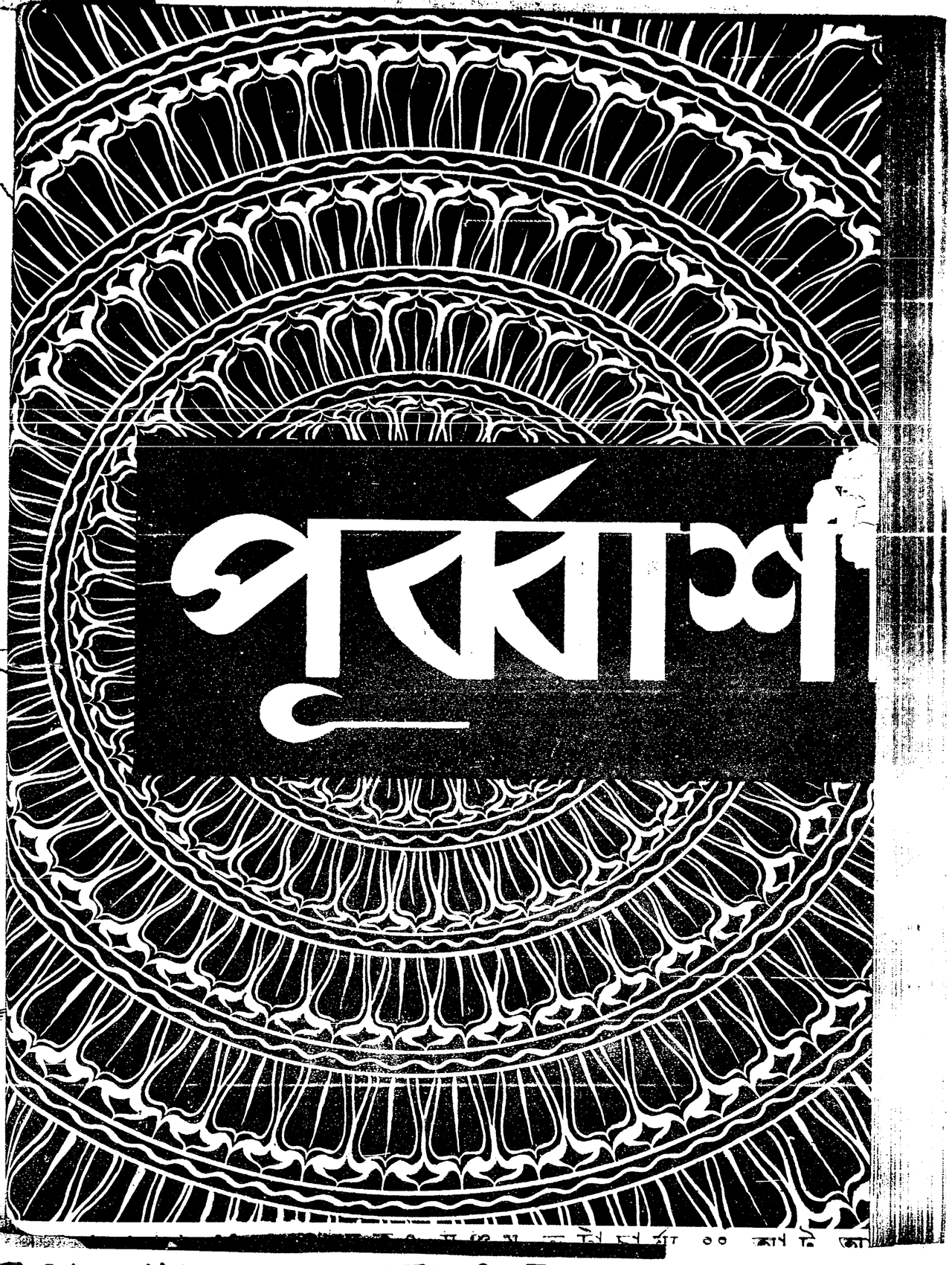
পূর্ব্বাশা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

| কবিতা | গল্প | উপন্যাস |
|---|---|---|
| অজিত দত্তের<br>পুনর্ণবা<br>দেড় টাকা | প্রেমেন্দ্র মিত্রের<br>মহানগর<br>দু'টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>বৃত্ত<br>এক টাকা বার আনা |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের<br>নীল আকাশ<br>দেড় টাকা | সুবোধ ঘোষের<br>পরশুরামের কুঠার<br>দু'টাকা | মরামাটি<br>( ২য় সং )<br>দু'টাকা চার আনা |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>সংকলিতা<br>দু'টাকা | শুক্লাভিসার<br>দু টাকা চার আনা | দিনান্ত<br>( ২য় সং )<br>সাড়ে তিন টাকা |
| প্রাচীন প্রাচী<br>দেড় টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>ফসল<br>এক টাকা চার আনা | কল্লোল<br>পাঁচ টাকা |
| নতুন দিন<br>আট আনা | ঋণ<br>দেড় টাকা | কস্মৈদেবায়<br>( ২য় সং )<br>তিন টাকা |
| যৌবনোত্তর<br>আট আনা | নতুন দিনের কাহিনী<br>দু'টাকা | রাত্রি<br>( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )<br>পাঁচ টাকা |
| তিনজন আধুনিক কবি<br>( বাংলা কবিতার আলোচনা )<br>নয় আনা | নরেন্দ্রনাথ মিত্রের<br>পতাকা<br>দু'টাকা | মৌচাক<br>পাঁচ টাকা |
| অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যে<br>সৈনিক<br>দেড় টাকা | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর<br>খেলনা<br>দেড় টাকা | শৈলেন ঘোষের<br>তিনরঙ<br>দু'টাকা |
| গোপাল ভৌমিকের<br>স্বাক্ষর<br>এক টাকা | সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের<br>নয়নচারা<br>দেড় টাকা | |

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

# টুকরো কথা... (২৪)

সাল ॥ কলকাতার বিবরণ: মবলগে ২টি রাস্তা, ২টি গলি, পুষ্করিণী, পাকা ঘর ৮টি, মেটে ঘর ৮ হাজার। ধানজমি ৪৮৫ ১৭০ বিঘা কলাবাগান, প্রায় দুবিঘা পরিমাণ বাঁশঝাড়, ৭২ আমারজমি, জঙ্গল ৩৬৩ বিঘা ইত্যাদি। হুগলীর ফৌজদারকে কলকাতার দরুন কোম্পানির পক্ষ থেকে খাজনা দিতে হত ৩৩৲ আর কোম্পানি আদায় করতেন ১০০।/১৫ পয়সা। একুন লাভ টাকা পৌনে ছ' আনা। বহুকাল পর্যন্ত শহরের জানালাগুলো ...তের বোনা। কলকাতা শহরে জানলায় প্রথম কাচের শাসি হয় ওঅরেন হেষ্টিংসের বাড়িতে, আঠারো শতকের শেষ ভাগে। ...শো বছর আগেও এই শহরে প্রকাশ্যভাবে বিজ্ঞাপন দিয়ে ...ন কেনাবেচা চলত এবং বিক্রয় বাবদ কোম্পানিকে ডিউটি দিতে ...করা সোয়া চার টাকা। ফকির বোষ্টমরা দোকানদারের কাছে ...ভিক্ষে পাওয়ার জন্য রীতিমতো লাইসেন্স করিয়ে নিতে পারত। ...ল আমাদের এই আশ্চর্য শহর কলকাতা। প্রাচীন কলকাতা ...গ্রন্থে হরিহর শেঠ মহাশয় সেই আদি শহরের তথ্যাবলী সংকলন ...ন। বইখানি কলকাতা সম্পর্কে সুলভ একটি এনসাই-...ডিয়া ॥

...ডিয়ারকে কলকাতা থেকে তখন বহুদূরে বিবেচনা করা হত। ...ত ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে প্রিন্স আজিম উস্‌সান এই বাড়িটি আরম্ভ ... এক সময়ে এটি ছিল হেষ্টিংসের প্রিয় বাসভবন। আড়াইশো ...পুরনো এই বিশাল ঐতিহাসিক অট্টালিকায় বর্তমানে আমাদের ...পাঠাগারটি স্থানান্তরিত করা হয়েছে, মৌলানা আজাদ সেদিন ...বোধন করলেন। নিরালা পরিবেশে গ্রন্থজগতে ডুবে থাকার ...ন উপযোগী স্থান আর নেই। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য ...সংবাদপত্র এবং প্রাচীন চিত্রাদির একটি প্রকাণ্ড প্রদর্শনীর ...করা হয়েছিল, যার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের ...র পঞ্চাশখানি রঙিন ছবি। এসব চিত্রের মুদ্রিত প্রতিলিপি ...ন্দ্রনাথের চিত্রীচেতনা উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব। তাঁর ...বির সংখ্যা দুহাজারের বেশি।

...পাঠাগার উদ্বোধন প্রসঙ্গে সেখানকার বাংলাবই সংগ্রহের ...উল্লেখ করতে হল। ব্রিটিশ আমলে নতুন প্রত্যেকটি বইয়ের ...ষ্টি রাখা সরকারী কর্তব্যের অঙ্গ ছিল; ফলত 'রাজকীয় ...' বাংলা বইয়ের পুরো হিসেব সর্বদাই পাওয়া যেত। পাঠাগার ...থেকে জাতীয় হল, কিন্তু নতুন বইয়ের উপর পুলিসি দৃষ্টি রাখা ...সরকার প্রয়োজন মনে করেন না বলে ১৯৪৭ সালের পর থেকে ...য়ের কোনো সরকারী হিসেব আর নেই। এ বিষয়ে বাঙলা-...প্রকাশক এবং লেখকের, লেখকের বেশি করে, অবহিত ...ত। যদি নতুন বই বেরোবামাত্রই এক কপি করে সেখানে ...হলেই পাঠাগারের জাতীয় নামকরণের যথাযোগ্য মর্যাদা ...ন ॥

...উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইদানীং মন্দা দেখা দিয়েছে। এ বিভাগে ...বেশির ভাগ বই হয় পুনর্মুদ্রণ, নয় সংকলন। সম্প্রতি ছাপা ...রৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠগল্প', 'শরৎ সাহিত্য সংগ্রহ' (৩য় খণ্ড), 'সন্তোষ ...শ্রেষ্ঠগল্প', মুজতবা আলীর 'চাচাকাহিনী' (২য় সংস্করণ) এবং ...সরকারের সম্পাদনায় নজন নতুন লেখকের 'সেরাগল্প' নামে ... পুনর্মুদ্রিত উপন্যাস: বসুমতী সংস্করণে 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের ...যাযাবরের 'জনান্তিক' আর বনফুলের ১ম খণ্ড 'স্থাবর'। নতুন ...বই দুটি: সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কয়েকটি কথা' আর ...ন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশ—গোয়েন্দা কাহিনী 'দুর্গরহস্য'। অনুবাদ ঝড়, ৩য় খণ্ড—উপন্যাসের এই দুটি মাত্র নতুন।

পুনর্মুদ্রণের প্রাধান্য দেখা যাবে শিশুসাহিত্যেও। যথা নতুন সংস্করণে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আম আঁটির ভেঁপু'। তাছাড়া বিদেশী সাহিত্য থেকে কিছু অনুবাদ এবং সারসংকলন হচ্ছে। যেমন অমিয় চক্রবর্তী (কবি অমিয় চক্রবর্তী নন) অনূদিত ব্যালান্টাইনের শিশু-উপন্যাস 'ডগ ক্রুশো' এবং নবকৃষ্ণ ঘোষ সংকলিত 'অডিসির গল্প' 'ইলিয়াডের গল্প'। বাংলায় গ্রীক মহাকাব্যের মূল কাহিনী পেয়ে ছোট-বড় সবাই খুশি হবেন। রূপকথার সুন্দর একটি নতুন বই বেতালভট্টের 'মেঘনামতী'।

একদিকে গল্প-উপন্যাস আর শিশুসাহিত্য যেমন নতুন লেখার অভাব হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনই বাড়ছে মূল্যবান প্রবন্ধগ্রন্থের সংখ্যা। সুপ্রাচীন বাঙলার ইতিহাস এখনো যদিও অনেকটাই প্রচ্ছন্ন তাহলেও যথাসম্ভব 'ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতেই' রাজেশ্বর মিত্র প্রাচীন সংগীতের রূপ নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন তাঁর 'বাংলার সঙ্গীত' (প্রাচীন যুগ) গ্রন্থে। রাগরাগিণীর বিচার করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তিনি আলোচনা করেছেন সংগীতের আকৃতি বা কর্ম নিয়ে। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'সঙ্গীত ও সংস্কৃতি' গ্রন্থের বিষয়-পরিধি আরো বিস্তৃত। বইখানি আসলে সমগ্র ভারতীয় সংগীতের বিরাট ইতিহাস। তাঁর গবেষণায় প্রামাণ্য কথা হচ্ছে যে, 'ভারতবর্ষই বিশ্বসংগীত প্রেরণা ও উৎসের' কেন্দ্রস্থল। প্রচ্ছদ এঁকেছেন আচার্য নন্দলাল বসু ॥

এবার ৬ই ফাল্গুন পরমহংসদেবের পুণ্যজন্মদিনে অচিন্ত্যকুমারের 'পরম-পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ২য় খণ্ড প্রকাশ করেছেন সিগনেট প্রেস। বাংলা বই নিয়ে যুগপৎ গ্রন্থবিলাসী এবং গ্রন্থব্যবসায়ীমহলে এমন অভূতপূর্ব সাড়া দেখে লেখকমাত্রেই উৎসাহ বোধ করবেন। ঐদিন বেলা সাড়ে দশটা থেকে পরমপুরুষ ২য় খণ্ড বিক্রি আরম্ভ হয়, ২ ঘণ্টার মধ্যে ২ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। তারপর মজুত ষ্টক নিঃশেষিত হবার আগে দৈনিক গড়ে এরই ২ হাজার কপি বিক্রি হয়েছে ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'সাগর ও অন্যান্য কবিতা' নামে দুষ্প্রাপ্য একটি কাব্যগ্রন্থের অল্প কয়েক কপি সিগনেট বুকশপ সংগ্রহ করেছেন।

রম্যরচনার একটি চমৎকার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এ মাসে... 'রূপদর্শীর নকসা'। রম্যরচনা শ্রেণীর লেখায় বাঙালী লেখকের মতো পাঠকের উৎসাহও যে প্রবল তার প্রমাণ মুজতবা আলী সাহেবের 'পঞ্চতন্ত্র' তৃতীয় সংস্করণ।

বর্তমান সংখ্যায় 'টুকরো কথা'র দুবছর পূর্ণ হল।




পরম পুরুষ শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ

ঠাকুরের পুণ্যজন্মদিনে গত ৬ই ফাল্গুন প্রকাশিত অচিন্ত্যকুমারের

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয় খণ্ড

গ্রন্থজগতে অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে॥ প্রথম প্রকাশের দিন ২ ঘণ্টায় ২ হাজার কপি নিঃশেষিত হয়েছে॥

সচিত্র মূল্য সংস্করণ: ৪৲

সিগনেট বুকশপ ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ


Tight Bindin

# কবিতাভবন প্রকাশিত বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাব্যগ্রন্থ

## অবতামসী আবার রাত্রি—২৲

**'কবিতা'য় সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু বলেন**—'অবতামসী আবার রাত্রি'তে···একটি ভাবুক-চিত্তের আর সেই সঙ্গে একজন সাবধানী কারুকর্মীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো।···লিরিক শিল্পেও লেখক অনধিকারী নন, বইয়ের অনেক কবিতাই প্রণয়-ঘটিত, কখনো চপল, কখনো বিষণ্ণ, ভাবের সঙ্গে ছন্দ ভাষারও যথোচিত বদল হচ্ছে। 'প্রণয়-প্রেক্ষা' 'মরা সাধ' রূপাংশের মনোহর দৃষ্টান্ত, কিন্তু আরো একটা বড়ো জগতে আমাদের নিয়ে গেছেন 'আসঙ্গের পতঙ্গ' নামক কবিতায়, যেখানে একটি উজ্জ্বল সকালবেলাকে একটি পতঙ্গের ক্ষণ-জীবী প্রাণ দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন। আমার সব চেয়ে ভালো লাগলো 'কোনো মৃত্যুর শিয়রে—আবহমান'···এমন একটি উঁচু সুর লেগেছে যা আবার এবং বারবার ধরতে পারলে বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় কীর্তিমান হবেন।

**অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন**—Sri Biswa Bandyopadhyaya in the twenty-two poems of "Abatamasi" does his best to reconcile the old school with the new. He is not a poet of hope who is gladdened by nature like W. H. Davies. Neither does he achieve a mood of serene delight by beauty like Robert Bridges. He is a pensive poet because of his sense of life, deep understanding of verities and frustration that challenges our attention in our efforts to realise our ideals. His feelings are subtle and his technique—here and there—shows the skill of Swinburne. He should have many admirers.'

**যুগান্তর বলেন**—'এ বই সে কালীন ও এ কালীন উভয়বিধ রুচির পাঠককেই খুসী করিবে। কোনো মৃত্যুর শিয়রে, পুরোনো আগুন, বাসবীর দিকে, Ozymandias-এর নব পর্যায় প্রভৃতি কবিতায় লেখকের প্রকাশ ব্যগ্র তরুণ চিত্তের যে উত্তাপটুকু ফুটিয়াছে তাহা বাস্তবিকই উপভোগ্য ···লেখকের ভাষা সাবলীল, দৃষ্টি রসার্দ্র, বলার কথাও তাঁহার আছে—তাই তাঁহার উন্নততর পরিণতির আশা দুরাশা নয়। বইয়ের প্রচ্ছদ সুন্দর ও শান্ত স্বপ্ন লুতা সমৃদ্ধ।'

**দেশ পত্রিকা বলেন**—বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় শক্তিমান কবি, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংকলন-গ্রন্থে ইতিপূর্বে তাঁর কিছু কিছু কবিতা আমরা পড়েছি প'ড়ে ভালোও লেগেছে। তাঁর এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেও এমন কয়েকটি কবিতা পাঠ করলাম যা নিঃসন্দেহেই সমাদরের যোগ্য। তাঁর শব্দসম্ভার সমৃদ্ধ, শব্দ প্রয়োগের কৌশল কখনো কখনো অভিনব, কাব্যকুশলতা প্রশংসনীয়। তাঁর শক্তি প্রশ্নাতীত···দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দেয়ালে বসুধারার আঁক; এইখানে এই নদীতীরে, এবং 'প্রণয়-প্রেক্ষা'র উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন কবিতা যদি তিনি আরো লেখেন বাংলা কাব্য তাতে সমৃদ্ধ হবে।'

**অপরিচিত কবিকে পত্রপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন**—"অবতামসী" আমার ভালোলেগেছে। 'উৎসর্গ' 'ঝড়ের দোলা' 'প্রণয় প্রেক্ষা' 'দেয়ালে বসুধারার আঁক, 'কোনো মৃত্যুর শিয়রে—আবহমান', 'অলিখিত', 'কেন্দ্রাভিগ', 'শ্রাবণী', 'বিলগ্ন বসন্ত', 'বাসবীর দিকে', 'না-বলার-সেই'—এগুলির প্রত্যেকটিই সুন্দর গীতি-কবিতা··· আপনার ব্যক্তিস্বরূপের নব নব বিকাশ আপনার আগামী গ্রন্থাবলীতে নিশ্চয়ই দেখবো।

**'এখনকার কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য অবতামসী সম্পর্কে বলেন**—মনের কাছে আবেগ যে-স্থাপত্য দাবী করে, যে-স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন, তা-ই যে কবিতা এই বার্তা বিস্ময়কর ভাবে এঁর কাছে উপস্থিত। এই বস্তুটি স্থির ক'রে নিতে বহু কবিরই বহু বছর চলে যায়, কিন্তু শ্রীমান বিশ্ব সুরুই করেছেন অনেকের শেষ অধ্যায় থেকে :

এ জীবনে কতো প্রাণ দূর হ'য়ে গেলো—
কতো গান! —তারে মান দিক এ-কবিতা।

দিয়েছে। সে-সব প্রাণকে মূর্তিময় ক'রে সাজাতে পেরেছেন এই তরুণ কবি। শুধু এমন একটি ছোটো কথাই তা চির-কালের হারানো কন্যা হ'য়ে দাঁড়াতে পারে—যখন আমরা শুনি, 'তোমার নাম পেয়েছিলাম সেকথা আছে মনে'। আর সে-মনকেও দক্ষ তক্ষণ-শিল্পী লরেন্সীর তীক্ষ্ণতায় এ-যুগের সবাকার কোনো-কোনো মানসিক মুহূর্তের নিকট আত্মীয় ক'রে তুলেছেন :

'সে এক স্বতন্ত্র আমি ভুলে যেতে যে চেয়েছে নিত্যরাত আসে
বন্য বন্যা বুকে ব'য়ে বনানীর বীভৎস আবাসে
প্রেমিক রাহুর মতো অনাহূত তবুও অমোঘ রাত

একে আমি বিষণ্ণ প্রৌঢ়তা বলিনে। এতে দেখতে পাই প্রাচ্য দার্শনিকতার অঙ্কুর যা বর্দ্ধিত হ'য়ে মনের উপর তরুপত্রচ্ছায়া বিস্তার করলেই সৎ কবিতার আবির্ভাব অনিবার্য হ'তে পারে।

**প্রাপ্তিস্থান :** কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ কলকাতা—২৯
সিগনেট বুকশপ ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে, ষ্ট্রীট, ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ।
ডি. এম. লাইব্রেরী ৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং ৫৪, কলেজ ষ্ট্রীট।





নিশ্চিত
নির্ভর ----

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

**হিন্দুস্থান অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্**

হেড্-অফিস : ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

"অপ্রেম ও প্রেম"-এর প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত দেখে মনে হচ্ছে সুর
ছন্দে মণ্ডিত বিশুদ্ধ লিরিকের প্রতি কিছুদিন আগেকার
সেই বিতৃষ্ণা আর নেই।"
—চতুরঙ্গ।

জনৈক
তরুণ কাব্য-
পাঠক সঞ্জয়
ভট্টাচার্য্যের কবিতায় যা
পান: "সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য?
ঠাণ্ডা আমেজটি পাবো গীতল
স্বভাবটি অক্ষুণ্ণ আছে—এবং তাঁর সুরটি
ঘরোয়া নয়, সেটি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক-
তাঁর চোখ ফেলা আরও দূরবিস্তৃতিতে
চেতনার কোনো একটি ভাবকে উন্মো-
চিত করা এবং তাকেই ঝকঝকে পালিশ
চড়ানো কয়েকটি কথায় ব্যক্ত করা!
কেমন যেন একটা প্রাচীন ভারতীয়
সুঘ্রাণ ধূলো-মাটি-স্মৃতি মেশা এক
পুরাণো ভাস্কর্য—তারপর পড়েছে
একটুখানি একালের চিকচিকে রোদ্দুর
—সেই পুরানো মরচে রঙের মাটি,
স্মৃতির নিঃশ্বাস লাগা ঐতিহ্য;
ঘুমন্ত পাণ্ডুলিপির ওপর
পড়েছে কচি
রোদ্দুরের
জরি।'

'জলার্ক' বলে—'অপ্রেম ও প্রেম'-এর প্রায় সব কটি কবিতার মধ্যে এক বিচিত্র প্রমথন আছে যা হৃদয়ে ঝড় তোলে না, কিন্তু হৃদয়ের সব ঝাড় বাতিগুলি একে একে জ্বালিয়ে দেয়। সবটাই হৃদয়ের এমন গভীরে নির্ব্যা-জতার সহিত নেমে গেছে যে, সে জগৎ সম্বন্ধে কালোয়াতীর সুযোগ অনুপস্থিত। অনেক অভিজ্ঞতা অবচয়িত হয়েছে, সংগৃহীত হয়েছে, সেগুলি থিতিয়ে এলে—নীহারিকা যেমন গ্রহ হয় তেমনি—লৌকিক আবেগ অতি-ক্রমিত বিশুদ্ধ কবিতার জন্ম 'অপ্রেম ও প্রেম'-এ প্রত্যক্ষ, প্রখরভাবে দৃষ্টিগ্রাহ্য। তাই এ গ্রন্থর বাংলা সাহিত্যে, য'দ আমরা কবিত্বকে যথার্থ শ্রদ্ধা করি, তবে, একটি স্থায়ী আসন দিতে—যচেষ্ট হবো।




দাম এক টাকা




দ্বিতীয় সংস্করণ

প্রকাশক: পূর্ব্বাশা লিঃ, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা


**পূর্ব্বাশা**

আগামী বৈশাখে ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করছে। ষোলকলায় পূর্ব্বাশাকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে যাঁরা আজ পর্য্যন্ত সচেষ্ট হয়েছেন এ-সুযোগে তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পূর্ব্বাশার বার্ষিক চাঁদা মনি-অর্ডারে ৬৲
এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲
বিজ্ঞাপনের হার চিঠি লিখে জেনে নিন

**কার্য্যালয়:**

৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা: ফোন সিটি ১২০৯


# পূর্ব্বাশা

## চৈত্র—১৩৫৯

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ: | | |
| ভনিতা: সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৬১২ |
| সম্ভব-সমুত্থান: হীরালাল দাশগুপ্ত | ... | ৬১৩ |
| অন্ত্যেষ্টি: বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৬১৫ |
| হুজুগপিল্লি (ইটালিন): সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৬১৭ |
| বিবাহিতা স্ত্রী: প্রতিভা বসু | ... | ৬২৯ |
| চৈত্রের কবিতা স্বর্ণ-বীজ: সুনীলকুমার নন্দী | ... | ৬২৬ |
| সমান্তরাল: সত্যেন্দ্র আচার্য | ... | ৬২৭ |
| শান্তিনিকেতন: আলোক সরকার | ... | ৬২৭ |
| শাশ্বতী: শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | ... | ৬২৮ |
| চিল-মন-দুপুর: শোভন সোম | ... | ৬২৯ |
| লোপামুদ্রা: ভূমেন্দ্র গুহ | ... | ৬৩০ |
| অবাক সরাই: ইরা গুপ্তা | ... | ৬৩২ |
| ইতিহাস: ইন্দ্রজিৎ | ... | ৬৩৩ |
| তীর: অনিল ভট্টাচার্য্য | ... | ৬৩৬ |
| ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক: অনিল বিশ্বাস | ... | ৬৪২ |
| অঘটনা: অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ৬৫১ |
| নূতন বই | ... | ৬৬১ |
| দেবশিল্প: সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৬৬৪ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০
সেতুবন্ধ— ২৷৷০
সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲
বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন
২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯


## গান বাজনার খবরাখবর—

প্রেসিডেন্টের পুরস্কার দিয়ে যে চারজন সঙ্গীতজ্ঞকে এবার সম্মানিত করা হ'য়েছে তাঁরা হ'লেন বোম্বাইয়ের বিখ্যাত গায়িকা বাঈ কেশরবাঈ কেরকার, গোয়ালিয়রের স্বরোদ বাদক ওস্তাদ হাফিজআলি খাঁ, কর্ণাটী সঙ্গীতে খ্যাত সেমুমানগুড়ি শ্রীনিবাস আয়ার এবং কর্ণাটী বেহালা বাদক অধ্যাপক দয়ারাম ভেঙ্কটে নাইডু।

এমাসে কেশরবাঈ-এর চারখানি রাগ-সঙ্গীতের রেকর্ডে বেরিয়েছে—P10731-32.

বিদগ্ধী সুরে বাংলা গান গাইলে যে নতুনত্বের সৃষ্টি হয় তারই দু'টি চমৎকার নিদর্শন পাওয়া গেল সলিল চৌধুরী রচিত দু'টি গানে "তুমি আমার না গাওয়া গান" এবং "স্বপ্ন আমার হ'লো সারা" প্রথম গানটি গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয়টি একটি সমবেত সঙ্গীত—গেয়েছেন তরুণ বন্দ্যোঃ ও তাঁর সম্প্রদায়—N82558.

গৌরীকেদারের গীতিমুগ্ধরা এবার নতুন ভাবে মুগ্ধ হবেন। তিনি গেয়েছেন নতুন ধরণের পল্লীগীতি "নৌকা চলেরে পানসী চলে হেই" এবং "আমি শুন শুন শুন"। চিত্ত রায়ের সুর—GE24664.

ধনঞ্জয় সম্প্রতি আবার একটি ছবিতে নেমেছেন—ধনঞ্জয়ের দু'টি চমৎকার আধুনিক গান "শূন্য ঘরে ফিরে এলাম" এবং "কতদিন দেখা হয়নি দু'জনে" GE24665.

"খুকু যাবে শ্বশুরবাড়ী সঙ্গে যাবে কে?" মা-মাসীর মুখে শোনা এই মিষ্টি ছড়াটি আরও মিষ্টি সুরে গেয়েছেন কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়। রেকর্ডখানির অপর দিকেও আর একটা ছড়া "আয়রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই" এত দিনে ছোটদের মনের মতন রেকর্ড বেরুল—N82560.

কৃষ্ণচন্দ্র দে-র পরিচালনায় তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাস দে গেয়েছেন দু'খানি চণ্ডীদাসের পদাবলী "ললিতার বাণী শুনি" ও "শুন শুন শুন সখি"—N82559. শ্রীমতী রাধা-রাণীও দু'খানি জনপ্রিয় গান উপহার দিয়েছেন "সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু" এবং "শ্যামের বাঁশীর সুরে"—GE24666.

অনেকদিন পরে কুমারী যূথিকা রায়ের দু'খানি আধুনিক গান বেরুল "কে জাগালে মোরে" এবং "দীপ যদি নিবে যায়"। গান দু'খানি মনোরম হয়েছে—N82557.

এবার দু'জন নবীন শিল্পীর গান রেকর্ডে বেরিয়েছে। ভবানী চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক গান "তব অবগুণ্ঠন তলে" এবং "ওগো চঞ্চলা ফিরে চাও"—GE24668, এবং রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের শ্যামা সঙ্গীত "ডাক দেখি মন" ও "ব্যাভারেতে জানা গেল" GE24667.

নায়েব আলির 'আরে ও বাঙরে" ও "কালারে কালা" কৃত্রিমতা বর্জিত খাঁটি পল্লীগীতি N82561. কানাই শীল দোতারায় যে ভাটিয়ালী আর পিলু বাজিয়েছেন তা বারে বারে শোনবার মত N87518.

নববর্ষ আসছে। বৈশাখে নববর্ষের মতো রবীন্দ্রজন্মদিনও আমাদের একটি জাতীয় উৎসব। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনেক নতুন রেকর্ড বেরুচ্ছে। বিস্তারিত তালিকা রেকর্ড ডীলারের কাছেই পাওয়া যাবে।


দি গ্রামোফোন কোং লিঃ—কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোং লিঃ · কলিকাতা-বোম্বাই-মাদ্রাজ-দিল্লী

*কবিতাগুচ্ছ*

## ভনিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তুমি আমার অমানিশার দূতী তারার ফুল।
দু'টি তারার দ্যুতি-হারার নামে আকুল চুল
দিলে এলায়ে অবহেলার ভুলি কি প্রিয়-নাম
চিনি অলকা-চিত্রিণীকে শকুন্তলা-মেয়ে
বন-মৃগের ভালোলাগার চোখে ছিলাম চেয়ে
জানতামনা মন্মথিত কালো অলকদাম
ভালোবাসাতে আছে এমন আলো-ভাসানো ভুল।

আর বিশাখা বিষকুম্ভা তামা-সিক্ত জল
রঙীন করে বারংবার দিলে রম্ভা-সাকী!
শঙ্খিনীর চুলে পাহাড় বুকে পাতাল-তল!
আমি অশ্ব-মনোরথের কি বা খবর রাখি
জানি শুধুই ভালো ভ্রমর বলো কি জানি হুল!

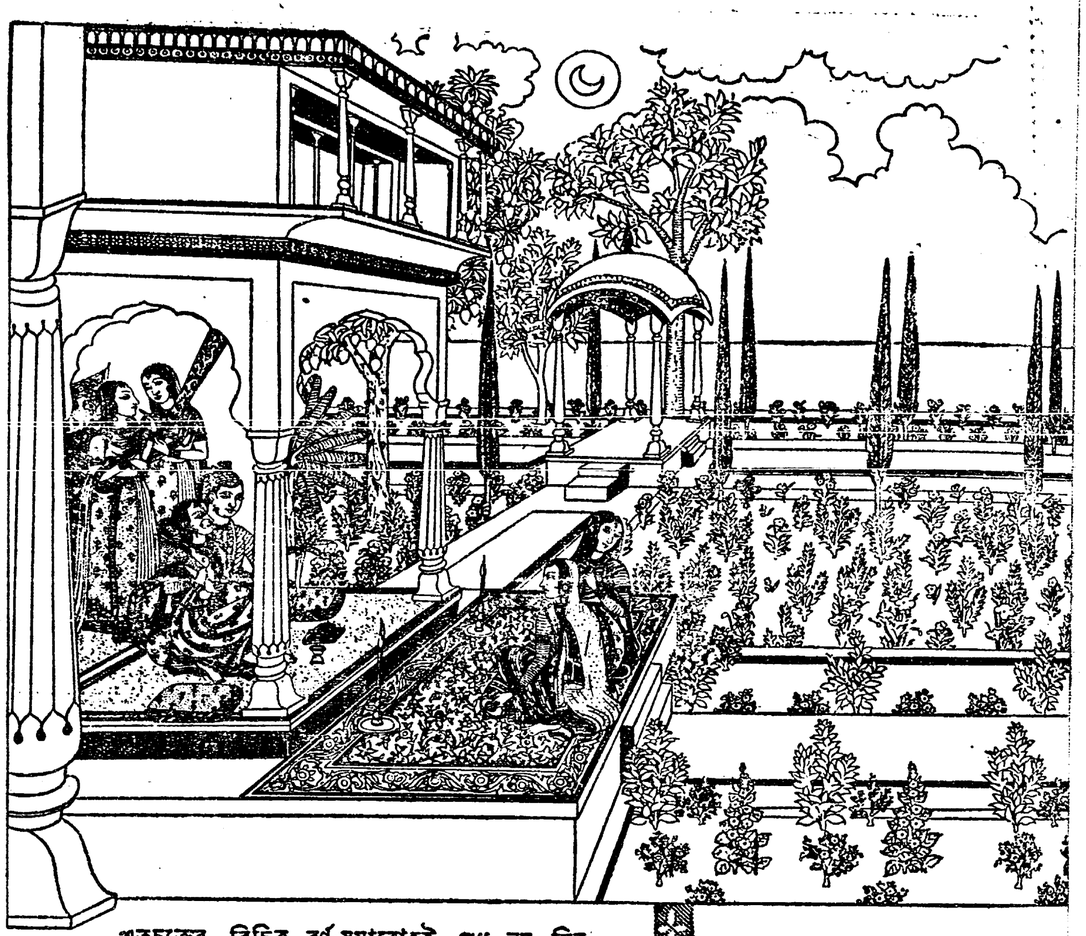

ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।
ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে।

চা

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দেয়, সঙ্গ দেয়, দেয় নব নব প্রেরণা।

মালকোশ

মালকোশ গভীর রাতের একটি রাগ। উপরের আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। সুর রচনার বলিষ্ঠ ছন্দ-সুষমাতেই মালকোশের একটি বিশিষ্ট স্থান সঙ্গীত রসগ্রাহীদের মনে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে। এই রাগটির গতিভঙ্গী দৃপ্ত হলেও, এর সুরের আবেদন সহজেই মনকে স্পর্শ করে: প্রেমের পরিপূর্ণ স্বার্থকতায় সেই সুর আনন্দে উচ্ছল।

ⓒ সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB 104

## সম্ভূয়-সমুত্থান

হীরালাল দাশগুপ্ত

ছিন্ন করি তমিস্রার মৃত্যুঘন কৃষ্ণ যবনিকা
কর্কশ কলের বাঁশি
শাণিত-কঠিন
নিদ্রায় চমক আনে গর্ভবতী শেষ রজনীর
মৃত্তিকার মাতৃক্রোড়ে
সিক্ত-বন্যতায়—
ফুলন্ত জলের মতো ধূসর কুয়াশা
ফুঁসিয়া গর্জিয়া ওঠে
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায়,
কোটি কোটি শুভ্র ফেন কণায় কণায়
সবুজ পাতায়
ঘাসের ডগায়
শিশিরে শিশিরে
জন্ম হয় সোনা-সোনা সকাল-শিশুর,

চৌরিঙ্গি চত্তরে
আর
আলিপুর জেলে
লেকের সবুজ ঘাসে
বেগুনী উচ্ছল জলে
সূর্য্যের লাল আর
সমুদ্রের নীল—
আলো-ছায়া দ্বিতীয় বন্ধনী ;

নগরীর মেরুদণ্ড
সন্ধিচ্যুত



গ্রন্থি শিথিল
মৃত্যুনীল নাভিশ্বাস
ফুকারিয়া সুষিরে সুষিরে,
নগরীর পাদদেশে
কুটিরে কুটিরে
পুরানো চাষার বুকে
পিঠে
মেরুতে
মজ্জায়
পুরোনো বাতের ব্যথা চাঙ্গা হয়ে ওঠে
বলদের জীর্ণ হাড়ে হাড়ে—
অনিচ্ছা-অবশ দেহ শ্রান্ত হতাশায়
বিমুখ প্রান্তর
নিষ্ঠুর পাথর-মাটি
আগুন-রোদ্দুরে ঃ

এখানে
আমার ঘরে
ঝক্‌ঝকে সিমেণ্টের মেঝের ওপর
প্রাগৈতিহাসিক কোন সমুদ্র-জন্তুর
পিঠের পিচ্ছিলে পড়ে বেগুনী আলোর বাঁকা রেখায় রেখায়
কঙ্কাল সকাল-শিশু
বৈধব্যের মতো রিক্ত-শুভ্র-শূন্যতায়
নীরব সংকেত আনে অনুর্ব্বর আর একটি দিনের
জীবনের ধারাবাহিকতা—
খবরকাগজ আর চায়ের পেয়ালা,
দুর্নিবার তীব্র গতিস্রোত
সময়ে
সংগ্রামে
ইতিহাসে !

## অন্ত্যেষ্টি

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখে জলের ঝাপ্‌সানি নেই
কণ্ঠে নেই উচ্চারিত শোক—
মনের চোখ খুল্‌ছে যেন একটু একটু ক'রে
খস্‌ছে যেন অনেক দূরের দিগন্ত-নির্মোক !

কোথাও কোনো শব্দ নেই
স্তব্ধ চারিধারের পথ—ভোরের !
আবেগ যতো সময়হত গড়িয়ে গেলো মনে
ধ্বনির কোরক মূর্চ্ছাহত বোবা ঘরের কোণে
আলোর প্রহর গোনে—
লাজুক বধূ আস্‌ছে ভোর
বল্‌ছে যেন স্মৃতির দোর
বন্ধ করো, করো।
হিমেল হাওয়ায় কম্প থরোথরো
ব্যথার ঘোরে সে-স্মৃতি দোর রইবে কেন খোলা ?
ঘরের দেয়াল শুনবে না ডাক আবার চেনা গলা !
দোরের বাইরে হেমন্ত ফুল……
শিশির এ প্রাংগণে…
একটি শ্বাসে ফুরোয় কেন সকল কিছু বলা ?

জান্‌লাটারই পাশের পথে ক্বচিৎ কেউ যায়
ক্বচিৎ কেউ আসে
আসা-যাওয়ার ঢেউয়ের ভেলায়
ভাসতে ভালোবাসে
ভালোবাসে চলায় কথা বলা।

ভোরের হাওয়া শেষ করেছে
রাত্রি-জাগা মোমের বাতর
মিট্‌মিটেনি জ্বলা।



চোরের মতো হাঁট্‌ছে হাওয়া
কোথাও কোনো শব্দ ওঠেনা—
সংসারের সকল বোঝা
নামিয়ে রেখে কেমন সোজা
ঘুমিয়ে আছেন মা।

একটি একটি পাতা ঝরে
হলুদ হাওয়ার হাতের 'পরে
ঊর্দ্ধমূল অবাক্‌শাখ অশথ সনাতন
শিথিল-বোঁটা শিউলি যেন আমার এ জীবন
আমার কেন ? আমার মতো
আল্গা-বোঁটা জীবন যতো
রাত্রিদিন বিরামহীন দোলে।
ঊর্দ্ধমূল অবাক্‌শাখের কোলে !
অল্প শ্রেয় পেলেই যারা নিঃশ্রেয়সে ভোলে
আজকে যারা থাকতে টেঁকে করছে প্রাণপণ।
তারাও যাবে দল বেঁধে সব চলে।
ফুটবে আর ঝরবে ব'লে দুই বেলা
মহাসময়, রহস্যময় তার খেলা।
জেনেও তবু রয় অজানা শিল্পী সময়ের
জীবন আঁকে জীবন মোছে
অবলীলায় অসংকোচে
হেলায় ফেলায় কিছুই-না-এর
চল্‌ছে ছেলেখেলা।

সকল খেলার অন্তরালে হয়তো আছে কেউ
মহাঘুমের স্বপ্ন ঘোরে আজ যেখানে হাঁটো
তাকেই চেয়ে লক্ষ্য আমার পড়লো কি মা খাটো ?
প্রান্তটি তার পারবে নাকি ছুঁতে
আমার ব্যথার অধীর যতো ঢেউ ?

# দজুগশবিল্লি ( ষ্টালিন )

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

একদা কোনো এক বল-সেবীর পুরোহিত পূর্ব্বাঞ্চলের হল-সেবী জনৈক রাজর্ষির কাছে এসে তাঁকে মন্ত্রণা দিতে চেয়েছিলেন। রাজর্ষি জনক তখন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার পারীক্ষিতরা বল-সেবা করে কোথায় গেছেন?" উন্নতবক্ষ তাক্ষশীলক যাজ্ঞবল্ক্য বিদেহপতিকে বল্লেন: "অশ্বমেধযজ্ঞ করে রাজ্যপালরা যে ফলোচিত ধামে যান সেখানে —নক্ষত্রলোকে!" সীতার পালক কুরু-পুরোহিতের প্ররোচনায় উত্তেজিত হয়ে অশ্বমেধ সুরু করেননি আমরা জানি। কারণ, তিনি জানতেন, অশ্ববল ক্ষেত্রে নিয়োজিত করার মানে সরাসরি হলকর্ষণ—যজ্ঞ মানে রাজীবধ নয়, নরহত্যা নয়। তাই তিনি বলেছিলেন, "তাতে কি ফল!" সেই ত শূন্যে মিশে-যাওয়া—নক্ষত্রলোক কি পৃথিবীর আলোকের চাইতে বেশী উজ্জ্বল—অধিক ফলপ্রদ? আর মহাশূন্যেই যখন সবাইকে একদিন যেতে হবে—স্বর্গোত্থান বলে যখন কোনো বস্তু নেই—যা নেই তা যখন পৃথিবীতে আমদানী করা যায়না তখন পৃথিবীকেই আমরা স্বর্গ ভাবিনে কেন? এখানেই এমন উদ্যানরচনা করব—এই সুজলা-সুফলা পৃথিবীর গাত্রে, যা ক্ষেত্রজ ক্ষত্রিয়সন্তান কোনোদিন ধ্রুবলোকের স্বপ্নে ধারনা করে নিতে পারেন নি। কাশী-রাজ অজাতশত্রু সেই স্বর্গস্বপ্নে মত্ত—তিনি সমস্ত শত্রুই নাশ করেছেন, তবু তিনি জনককে ঈর্ষ্যাই করেন।

সব জেনেশুনে বল-সেবী বাজসেনীয় যাজ্ঞবল্ক্য ভারদ্বাজের বিমান-তৈরীর কারখানার ভ্রান্তি বুঝতে পারলেন। শ্যেন দৃষ্টিতে সৈন্যসমভিব্যাহারে আকাশ-পরিভ্রমণ করে শত্রুরাজ্যে অগ্নিগোলক নিক্ষেপ করার অসারতা বুঝতে পেরে জনক-সভা অলঙ্কৃত করবার সুবুদ্ধি মাথায় এলো তাঁর। তাই ঘরে ফিরে তিনি দুই পত্নীকে বাড়ি-ঘর বিষয়-সম্পত্তি দান করে বল্লেন: "এই অসার বস্তুতে আমার আর মন নেই। মর্ত্ত্যে বাস করেও জনকের মতো কি ভাবে ব্রহ্মাস্বাদ লাভ করা যায়—শিল্পবিদ্যায়, সঙ্গীতে, নৃত্যে, উন্নত মানসিকতায় কি করে 'ট্রু ট্রু ড কিণ্ড্রেড পয়েন্টস অব হেভেন এণ্ড হোম' হওয়া যায় তা-ই এবার দেখব—আর যজ্ঞ নয়। চেদীকলচুর বংশে এই কলটুর দেখে এলাম। 'এলাম্নে'র দেওয়া বিদ্যা আর না। মলিন বসন ছাড়তে হবে। বাসাংসি জীর্ণানি....."

পূর্ব্বাঞ্চলেরই মেয়ে মৈত্রেয়ী, স্বামীর প্রগলভতায় ভ্রূকুঞ্চন করে বল্লেন: "তুমি ত বেশ ব্রহ্মাস্বাদ পেতে চলেছ। আমি কি জানিনে তা কি? একবার বিষয়-আশয় দিয়ে ভুলিয়েছ আবারো ভুলিয়ে রেখে নিজেকে নিয়ে পালাচ্ছ! তোমার এ মাটির ঢেলা নিয়ে আমি কি



করব? যা নিয়ে আমি অমৃত হবনা তা দিয়ে কি করব? কে মনে রাখবে আমার স্মৃতি—কে স্মরণ করবে আমাকে—যদিনা মানুষের জন্যে আমি মহৎ কিছু করে যাই?"

কাহিনীটা আমার তৈরী নয়—ভারতবর্ষের ইতিহাসের হাতে তৈরী। পূর্ব্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের সাংস্কৃতিক-দ্বন্দ্বের ইতিকথা। দ্বান্দ্বিক ভাববাদের সঙ্গে নির্ভাজ বস্তুবাদের দ্বন্দ্বের কাহিনী এবং পরিণতিতে ভারতীয় জীবন-বাদের নিকট বস্তুবাদের পরাভবের পুরাবৃত্ত। বল-সেবীর চিরকালই ঘরে পরাভব মান-সেবীর কাছে, বাইরে পরাভব হল-সেবী সীতা-পালক মাটির ছেলে জনকের কাছে। মোটের উপর, মানব-ধর্ম্মের উপর যে আর কোনো ধর্ম্ম নেই, কর্ম্মকৃতি নেই তারই প্রমাণ দিয়ে গিয়েছে আমাদের মহাভারতীয় কুরুক্ষেত্রোত্তর ভারতীয় রামায়ণী যুগ।

আজ প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর পর সেই ভারতীয় ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তির আভাস পাওয়া যাচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে। আমরা জানি, বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর ইতিহাসকেই আজকের দিনে পৃথিবীর ইতিহাস বলা হয়। আর খুব-সম্প্রতি বৃহৎরাষ্ট্র রুষের কাহিনীই পৃথিবীর ইতিহাস বলে গণ্য। রুষের প্রাধান্য অবশ্যি বল-শেভী বিপ্লবের পর থেকে।

রুষের রাষ্ট্রনৈতিক পরিভাষায় বল-শেভী মানে ম্যাজোরিটি আর মেন-শেভী মানে মাইনোরিটি। বিপ্লবীদের দলে লেনিন ছিলেন ম্যাজোরিটির পক্ষে আর ট্রট্স্কি মাইনোরিটি পক্ষে। ( আমাদের মানময়ী মৈত্রেয়ীর মতো )। সত্যি, জেদ-অভিমান, যশের আকাঙ্ক্ষা ছিল ট্রটস্কির দুর্দ্দান্ত। তাঁর সম্পর্কে কিম্বদন্তী আছে, যদি ভদ্রলোক জানতে পারেন যে লক্ষ-লোক তাঁকে বাহবা দেবে তবে হাসতে হাসতে তিনি ফাঁসীতে যেতে রাজী। ভদ্রলোক-বিপ্লবীদের যেম্নি মেজাজ-মর্জ্জি হয় ঠিই তা-ই ছিল ট্রট্স্কির। লেনিনের স্বভাব ছিল অনেকটা তাঁর উল্টো। তাই রুষের দ্বিতীয় বিপ্লবের ( মানে আগ্রহায়ণিক ফসলতোলা সফল বিপ্লব ) আগে লেনিনের সঙ্গে ট্রট্স্কির বনিবনাও হয়নি।

দ্বিতীয় বিপ্লবটি পুরোদস্তুর প্রাচীন চাষী-বিপ্লবই ছিল। কর্ত্তৃত্ব করেছিলেন সৈনিকরা। প্রথম বিপ্লবটি ছিল খাঁটি ভদ্রলোক ট্রট্স্কির—যিনি তখনও সৈনিক হননি। দ্বিতীয় বিপ্লবে অবশ্যি তিনি সৈনিক-নেতা হলেন কিন্তু তবু চাষী হতে পারলেন না। সেজন্য তাঁর মনে হয়ত একটা আন্তরিক ক্ষোভ ছিল কারণ বিপ্লবার শ্রেণীহীন হওয়াটা আন্ত্যন্তিক কর্ত্তব্য বলে তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। আফশোষ করে তিনি বলতেনও: "লেনিন মুজিকদের ( চাষীদের ) মন বুঝতে পারেন!"

লেনিনও কিন্তু চাষীদের মনই শুধু চিনতেন, চাষী নেতা ছিলেন না। তখনকার রুষ-দেশে অনেকটা গান্ধীজির মতো ছিলেন লেনিন। আর এই উপমার পরিপ্রেক্ষিতে

ট্রট্‌স্কিকে বলা যায় সুভাষচন্দ্রের মতো। লেনিন চাষী-শ্রমিকের দু'পাখাতে ভর দিয়ে যাজ্ঞবল্ক্যের নমুনায় কৃষিঋদ্ধ জনকের উপনিবেশ রুষ-রাজ্যের সভা অলঙ্কৃত করেছেন। দু'নৌকোতে পা দিতে মেন-শেভী ট্রট্‌স্কি ইতস্তত করতেন। তাঁর সরাসরি কথা ছিল: "যেনাহং নামৃতস্যাম্ তেন কিম্ কুর্য্যাম্?"

ফলত দেখা গেল লেনিন রামচন্দ্রের মতো জনকের দেশে 'দেবতা' বা 'অবতার' হয়ে দাঁড়িয়েছেন আর ট্রট্‌স্কি দেব-সেনাপতিবৎ লক্ষ্মীমন্ত। শিল্পে, সভ্যতায়, ভব্যতায়, সজ্জায়, দেবসেনার প্রচুর উৎসাহ। ট্রট্‌স্কিতেও তা-ই দেখা গেল। অবশ্যি তেমন অনেক দেবসেনাই তখন দেবসভা সোবিয়েত-মণ্ডলের শোভাবর্দ্ধন করতেন—এবং পরাক্রান্ত কমিসসর-বৃন্দের প্রত্যেকেই ভাবতেন কেউ তাঁরা ট্রটস্কির চাইতে ন্যূন নন। তবে লেনিন যখন খাতির দেখাচ্ছেন বেশি ট্রট্‌স্কিকে, জ্যেষ্ঠ যখন অনুজ লক্ষ্মণকেই দোসর হিসেবে বেছে নিলেন, ভরত-শত্রুঘ্নকে নয়—সাইবীরীয় দারজিনস্কি বা দ্‌জুগশবিল্লিকে নয়, জ্যেষ্ঠের খাতিরেই চুপচাপ থাকলেন তাঁরা কিছুকাল। বিপ্লবী রুশদেশে ব্রিটিশ রাজদূত হিসেবে তখন যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন—ব্রুস্ লকহার্টসাহেব—তিনি এই নবজাত দেবসভার সুন্দর-সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন। 'সোবিয়েত'-সেবাইতদের 'প্রথম গৃহ' উদ্বোধন-উৎসবের ছবিটিই সব চাইতে চিত্তাকর্ষক। মস্কৌ মেট্রোপোল হোটেলের যে রঙ্গমঞ্চ কঞ্চুকীর আবির্ভাবে মুখর হয়ে উঠত —'কোঞ্চিক'-এর অর্কেষ্ট্রা বাজত যেখানে—সেখান থেকে বাগ্দেবীর দোসর ট্রট্‌স্কি সেদিন বক্তৃতা দিচ্ছেন। রুদ্ধহৃদয় লকহার্ট-রা উপস্থিত আছেন। লালফৌজের কর্ম্মকৃতি উপস্থাপিত করবেন ট্রটস্কি সে-সভায়, কাজেই বলাবাহুল্য, তবু লকহার্ট বলছেন, 'সে রাত্রিতে তাঁকে অপূর্ব্ব শোনাচ্ছিল'। লেনিন বারবার হ'ল ঘরে আসছিলেন। বিদেশী অতিথিদের মুখে ট্রট্‌স্কির বাহবা শুনবারই জন্যে হয়ত। লকহার্টের মন্তব্য হল: ট্রট্‌স্কির ওটা বক্তৃতা নয়, যেন যুদ্ধ ঘোষণা—বিরোধীদলকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া।

সাইবীরীয় (অনুন্নত রুষ-প্রদেশ) কমিসসরদ্বয় ছিলেন স্বল্পভাষী, পরিহাসবর্জ্জিত। অবজ্ঞাতভাবে তাঁরা এক কোণে চুপচাপ বসে আছেন—তবু দারজিন্‌স্কি অল্পসল্প বাতচিৎ করছিলেন বিদেশী বৃন্দেদূতীদের সঙ্গে। কিন্তু ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিহিত বজ্রযোগীবৎ বীরবর দ্‌জুগশবিল্লি তাঁর ঘনভ্রূ, কালো কেশরাশি, কপিশ মুখাবয়ব নিয়ে একটিও রা কাড়ছিলেননা। লকহার্ট বলছেন: "তাঁর প্রতি মোটেই দৃষ্টি ছিলনা আমার। তিনিও চুপচাপ বসে। আমার বলশেভিক চিত্রশালায় তাঁর ছবি ছিলনা। যদি সেদিন সেই সোবিয়েত-সেবাইতের সম্মেলনে কেউ ঘোষণা করতেন যে এই ব্যক্তিটিই লেনিনের উত্তরাধিকারী হবেন তবে হয়ত আঞ্চলিক প্রতিনিধিরা সবাই হো-হো রবে হেসে ফেটে পড়তেন। ইনিই জর্জ্জিয়ার দ্‌জুগশবিল্লি আজ যিনি জগৎ-সমাজে ইস্পাতী মানুষ বা স্টালিন বলে পরিচিত।"



উপেক্ষা-উপহাসে ভ্রূক্ষেপ না করে কৃষ্ণভ্রূ স্টালিন লেনিনের পাদুকা-পূজা করেছেন। আমাদের ভারহুতের অক্রূড-ইক্ষ্বাকুরা যা করেছিলেন তেম্নি অগ্রজ-ভক্তি তিনিও দেখিয়ে গেছেন। তাতে আত্মীয় পরিজন বধ করে কুরু-পাণ্ডবোচিত অগৌরব অর্জ্জন করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। তবু ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলবাসীরা লক্ষ্মণকেই ভ্রাতৃভক্ত বলে, ভরতকে নয়। যদি আমরা ইক্ষ্বাকু সভ্যতাও কামনা করি তাহলে রামধূনই হয় আমাদের কাম্য যে-ধ্বনি শুনে লক্ষ্মণ আত্মত্যাগ করেছিলেন। ট্রট্‌স্কিও অবিকল সেই ধ্বনি শুনেই আত্মত্যাগ করে শেষে নিহত হয়েছেন। আত্মত্যাগ না করলেও লক্ষ্মণকে হয়ত ভরতশত্রুঘ্নের গ্রাসে পড়তে হত। বেঁচে থাকলে জনককেও মরতে হত শত্রুঘ্ন অজাতশত্রুর হাতে। হয়ত তিনি মরেও ছিলেন; তাছাড়া রামচন্দ্রের মৃত্যুও ত আমাদের জানা নেই। তিনিও কি নিহত হ'তে পারেন না ইক্ষ্বাকু হিসেবে? তিনিও বা নির্দ্দোষ কোথায়—সীতানির্ব্বাসন লক্ষণবর্জ্জন ত তাঁরই কুকীর্ত্তি।

আর সেই পাপেই না উদ্ভূত হল আমাদের দেশের অভিচারী বস্তুবাদী তান্ত্রিকরা (শাক্ত-তান্ত্রিক ও মীমাংসাকার) যাঁরা গুরুহত্যা করতেন উত্তরসাধক হবার জন্যে অথবা দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্যে। গুরুমারাবিদ্যায় তাঁরা ছিলেন পারঙ্গম। অভিচারী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুসরণ করে মৌর্য্য-সভ্যতা যে ধনতান্ত্রিক-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে গেছে—আর পরবর্ত্তী শুঙ্গ আর্য্যসম্প্রদায় বা রঘু-বংশ তার যতটুকু পরিবর্ত্তন করেছেন তা শুধু গোড়ামির মাপেই ওজনভারি। ভারতবর্ষ তার ভার বহন করতে রাজি ছিল না। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য গোষ্ঠী তাকেই চরম-পরম রাষ্ট্রব্যবস্থা বলে ভেবে নিয়ে অবিরত থোড়বড়িখাড়া খাড়াবড়িথোর করে একটি মূর্ত্তিরই শতরূপ-সেবায় নিমগ্ন। বড়জোর পঞ্চপ্রদ্যোতের একরাষ্ট্রের পরিকল্পনা ভীরু-উদ্যমে মাঝে মাঝে মনে-মনে কামনা করে আমাদের তাক লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। তা-ও যদি সিদ্ধ হত তবু না-হয় বলতে পারতাম বহুদিন পর আমরা একটু পুরনো মদ (ভোড্‌কা) পেলাম। যদিও ওদিকে তাকানোর অধ্যায়ও শেষ হয়ে গেছে আমাদের। যে অধ্যায়ে জনক নেই, সীতা নেই তাঁদের অপূর্ব্ব সার্থক সভ্যতা নেই তাকে ত কবেই ভেঙ্গে দিয়েছি আমরা।

মনে হয় রুষ্ট রুষের হাতে এবার আবার ভাঙবার পালা। এবার হয়ত কুরুক্ষেত্র সেখানে। রুষ্ট কৃষকের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে যাঁরা ছিলেন—টলষ্টয়-ডষ্টয়েভস্কি-গোর্কি-সম্প্রদায় (যাঁরা বল-সেবী-বিষে অপসারিত) তাঁদেরই উত্তরসাধক কেউ হয়ত এগিয়ে আসবেন অনুন্নত দেশের বলশেভী সাম্যবাদের ত্রিমূর্ত্তির মুখোস খুলে ফেলবার জন্যে। হয়ত তৈরী হবে সেখানে জনকের রাজ্য—রাজর্ষির রাজ্য, যেখানে কুরু-পাণ্ডব-ইক্ষ্বাকু কেউ নেই, মৌর্য্য-আর্য্য নেই, আছে বাংলাদেশের সমন্বিত ধর্ম্ম চর্য্যাপদ, শ্রেণীহীন আচার্য্য সম্প্রদায়, পদকর্ত্তাদের জীবনবাদ—জনকের উপনিষদ—আছে স্বর্গমর্ত্ত্যের মিলনসেতু শকুন্তলা-সর্ব্বদমন —আর গার্গীমৈত্রেয়ীকে নিয়ে নবসজ্জায় যাজ্ঞবল্ক্য।

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

### চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

যথারীতি রাত ন্টায় আপিস থেকে ফিরে সোজা মার ঘরে ঢুকলো সুনির্মল। হিরণ্ময়ী সাদা কাগজের মত নিষ্প্রাণ ফ্যাকাসে মুখ নিয়ে বসে আছেন দেয়ালে ঠেসান দিয়ে। ঘরের ছোট নীল আলোটা ছায়া ফেলেছে তার মুখে। মৃত মুখ। হঠাৎ যেন চমকে উঠলো সে।

'সুনু সর্ব্বোনাশ হ'য়েছে—' কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই কেঁদে ফেললেন তিনি ছেলেকে দেখে।

সুনির্মল শঙ্কিত হ'লো— 'কী! কী হ'য়েছে?' বোনের কথাটাই তার মনে পড়লো আগে। তার শরীর ভালো ছিলোনা আসন্নপ্রসবা হয়ে থেকে।

'গেছে, আমার সব গেছে।'

'কী! কী মা?' তার গলায়ও কান্না ফুটে উঠলো।

'লোহার আলমারী থেকে সর্ব্বস্ব গেছে আমার।'

'চুরি। চুরি হ'য়েছে?'

'গয়নার বাক্সটা কোথাও নেই। টাকা কড়ি, তোর মাইনের সব সঞ্চয়—' গলা বন্ধ হ'য়ে এলো তাঁর।

বোনের বদলে গয়নার বাক্স চুরি হওয়াটা অনেক নগণ্য হ'লেও সেটাও কম শোকাবহ মনে হ'লোনা সুনির্মলের কাছে। সে জানতো ঐ চন্দন-কাঠের বাক্সটির উপর তার মার অদ্ভুত একটা মমতা ছিলো। কতদিন কত অবসরের মুহূর্ত্তে সেটাকে তিনি খুলেছেন, দেখেছেন, ছুঁয়েছেন, যেন হারানো ভালোবাসার জনদের তিনি ফিরে পেয়েছেন ঐ এক-একটি গয়নায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে। ছেলেবেলায় মার পিঠে ঠেস্ দিয়ে বসে সে দেখেছে তাকিয়ে তাকিয়ে। হিরণ্ময়ী—হেসে আদর ক'রেছেন 'কী দেখছিস? ঠাকুমাকে? ন' পিসিকে! দাদামণিকে? আচ্ছা, তাহ'লে হাত দে, হাত দিলেই দেখবি কেমন ন'ড়ে ওঠে, কেমন টের পাওয়া যায় তাঁদের হাতের ছোঁয়া। দুপুরের নিরালা ঘরে গায়ে গা লাগিয়ে বসেও ছম্ ছম্ ক'রে উঠেছে বুক! আর তারপর বড় হ'তে হ'তে ভয় দূর হ'য়ে কখন যে সে জায়গায় তারও একটি মমত্ববোধ জেগেছে ঐ বাক্সটির উপর কে জানে। বুড়োছেলে,



কতদিন মার সঙ্গে আবদার করেছে আলমারী থেকে বাক্সটা খুলে দেখাবার জন্য। কল্পনায় কোন অতীতকে দেখতে পেয়েছে চোখের সামনে। মন উধাও হ'য়ে গেছে।

ব্যাকুল গলায় বললো, 'কেমন ক'রে চুরি হ'লো? লোহার আলমারী থেকে কে খুলবে? কে খুলতে পারে ওটা?'

এই ছোট, কালো আলমারীটি খোলবার একটা বিশেষ কায়দা ছিলো। না জানলে কেউ সেটা খুলতে পারে না। এ বাড়িতে হিরণ্ময়ী ছাড়া আর কারোই জানা ছিলোনা সে কৌশল। হিরণ্ময়ী কপালে করাঘাত করলেন, 'বরাত! সুনু সবই আমার বরাত!. বোধ হয় কাজের দিনই এ কাণ্ডটি হ'য়েছে। কত নতুন চাকর-বাকর এসেছিলো।'

'কী আশ্চর্য! চাকর-বাকর তোমার আলমারী খুলবে কেমন ক'রে?'

'হয়তো খোলা ছিলো। বৌমা ছেলেমানুষ, কখন হয়তো মনের ভুলে খোলা রেখে থাকবে।'

'বৌমা! প্রমীলা! প্রমীলা আলমারী খুলতে পারে?'

'দরকার-মতো তো ও-ই খোলে, ও-ই বন্ধ করে। কাজের দিন সব ভারইতো ওর উপর ছিল। তোর বাবার শেষ মাইনের টাকাটাও সেদিন আমি ওকেই তুলে রাখতে দিয়েছিলাম।'

সুনির্মলের মুখ গম্ভীর হ'য়ে উঠ্লো।

'কখন হয়তো খুলে রেখে একটু এদিক ওদিক গেছে—'

'হুঁ'

'এখন, এখন আমি কী করি বল?'

'করবার কিছুই নেই' সহজ গলায় জবাব দিল সুনির্মল তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিকে প্রমীলা সারাদিন কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে। বসে থেকেছে শাশুড়ির কাছে। এবার আস্তেআস্তে আঁচল থেকে চাবি খুলে হিরণ্ময়ীর পায়ের কাছে রেখে দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিরণ্ময়ী বললেন, 'চাবি দিয়ে আর আমি কী করবো? তুমি কেঁদোনা, তোমারতো কোনো দোষ নেই। আমারই অদৃষ্ট।'

২

কালস্রোত সব কিছুই ধুয়ে দেয়। কোন গ্লানিই জমে থাকতে দেয়না। স্থায়ী হ'তে দেয়না। সেই কালের প্রলেপ হিরণ্ময়ীর মনেও ছাপ ফেললো। শোকের পাগলকরা অবস্থাটা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠলেন তিনি। ঠিক উঠলেনও না, উঠতেই হলো সংসারের আবহাওয়া দেখে। মন শক্ত করে তাকালেন চারদিকে। তাকিয়েই আঁৎকে উঠলেন। কিছু কি না বুঝেছিলেন এই ক'মাসে? কিন্তু এতখানি বোঝেননি।

গয়নার বাকস বা স্বামীশোক যতই অসহ্য হোক না কেন এ অবস্থা যে তার চাইতে আরো অনেক বেশী যন্ত্রণাময় আরো অসহনীয় সেটা অনুভব করতে একমুহূর্ত্তও দেরী হলোনা। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন গয়নার বাকসের মতো এ সংসার থেকে তার কর্ত্তৃত্বও অপহৃত হয়েছে। সেই বাকস কে অপহরণ করেছিলো তা তিনি জানেন না কিন্তু তাঁকে বিচ্যুত করবার জন্য যে প্রমীলাই বদ্ধপরিকর এটা প্রত্যক্ষ।

সংসারের সকল ভার তিনি স্বেচ্ছায় প্রমীলার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এমন কি দৈনিক খরচের ভারটিও হাতে রাখেন নি। সুনির্মল মাইনে পেয়ে তাঁর হাতে এনে দিতো, তিনি দিয়ে দিতেন প্রমীলার হাতে। সে যে কেবল শোকের তীব্রতার জন্যই উদাসীন হয়ে সব ছেড়েছিলেন তা-ও নয়। করুক, নিজের সংসার নিজে বুঝে নিক, তাতে মায়া হবে মমতা হবে, মন বসবে, সুখী করতে পারবে স্বামীকে, বুদ্ধিরও বিকাশ হবে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তার ফল যে এই হবে স্বপ্নেও মনে আসেনি তাঁর।

সুনির্মল সংসার সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। এ বাড়ির সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ আছে তা পর্যন্ত বোঝা যায় না তার ব্যবহারে। ভালোতে নেই মন্দতে নেই, রাগ অভিমান, তর্ক বিতর্ক কিছুতেই নেই সে। প্রথম প্রথম প্রায়ই বাড়িতে যেন আগুন লাগতো, দরজাবন্ধ ঘরে তাদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া-চিৎকারের আভাস পেতে পেতে হিরণ্ময়ী মনে মনে ঈশ্বর স্মরণ করতেন। কেলেঙ্কারীর ভয়ে দাঁতে দাঁত লেগে আসতো তাঁর। ক্রমে ক্রমে সেই তাপ কখন জুড়িয়ে গেছে, কবে যে একেবারে নিঃশব্দ হয়ে গেছে সুনির্মল টের পাননি তিনি। প্রমীলা যা দিয়ে যা করে, তাই সই, যে ভাবে খুসী সংসার চালায় তাই ঠিক। দরকার নেই খোঁজে, দরকার নেই আর তার মধ্যে মাথা গলিয়ে। ভদ্রলোকের ছেলে, একবার বিয়ে করলে যখন আরেকবার বিয়ে করা যায় না, বিয়ে ক'রে ফেললে যখন ত্যাগ করা যায়না, হাজার অন্যায় করলেও যখন স্ত্রীর গায়ে হাত তোলা যায়না, তখন মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আর গতি কী? তবে আর চ্যাঁচামেচি করে পাড়াপড়সীর শান্তি ভঙ্গ করে লাভ কী?

দুপুরে বাড়ির খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল সুনির্মল। ঘুম ভেঙে উঠে, কতগুলি অবশ্য করণীয় ক্রিয়াতে যতটুকু সময় যায় তার বাইরে একদণ্ড সে থাকতোনা। সকাল আটটার মধ্যে পোষাক চড়িয়ে আপিসের জন্য প্রস্তুত। আর ফিরতে ফিরতে রাত ন'টা। এটাও প্রমীলার পক্ষে একটা কম সুবিধে হলো না। সারাক্ষণ সব দিকে নজর দিয়ে, মার পক্ষ হয়ে ভায়েদের পক্ষ নিয়ে সুনির্মল যদি ক্রমাগত লড়াই করতো, তা হ'লে এতো শীগগির এত দুর্দ্ধর্ষ হয়ে ওঠা হয়তো তার সম্ভব হতো না। এতখানি দুর্ব্যবহার করতে ভয় পেতো।

একেতো প্রমীলার এইসব ছোটোলোকেমি বুঝতেই অনেকটা সময় কেটে গিয়েছিলো, তার উপরে বুঝবার পরেও সে বিষয়ে কথা বলতে এত সঙ্কোচ হচ্ছিলো হিরণ্ময়ীর যে



অনেকদিন পর্যন্ত সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায়ও খুঁজে পাচ্ছিলেন না কোন। মনে মনে ছেলের উপরও একটু রাগ হলো তাঁর। বাপ নেই বলে সে কি তার মাকে একটু দেখবেনা? মানুষ করবেনা ভাইদের? তারইতো উচিত এ নিয়ে প্রমীলাকে শাসন করা। তারপর একদিন মরীয়া হয়ে নিজেই বললেন, 'এ কী খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বৌমা। অত বড় বড় ছেলেদের পাতে এমন যা-তা দাও কী ক'রে?'

ক'দিন থেকে দিনে মাত্র একবার একবেলা দু'টি মাপা আতপের ভাত আর কাঁচা কলা সেদ্ধ খেয়ে খিদে নামক জন্তুটা ক'দিন থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আরো দু' একবার পাক দিয়ে উঠছিলো তার শূন্য জঠরে। ঘটি ঘটি জল খাইয়ে সেটাকে শান্ত রাখতে পারলেও ছেলেদের নালিশে তিনি কান না দিয়ে আর পারলেন না।

ভ্রুভঙ্গী ক'রে প্রমীলা জবাব দিল, 'অত সকালে হ'য়ে ওঠেনা, আমি কী করবো!'

'যাতে হ'য়ে ওঠে সেটাই দেখবে। আর ওরাতো এমন কিছুই সকালে যায় না! অভিরতো একেক দিন একেক সময়ে কলেজ আর সীমন্তও দশটার আগে কোনোদিন যায় না।'

'পারিনা যে তাতো দেখতেই পাচ্ছেন।'

কথার ভঙ্গীতে উত্তপ্ত হ'লেন হিরণ্ময়ী, 'দেখছি বলেইতো বলতে হ'লো। বেশতো, যদি না-ই পার তা হ'লে কাল থেকে খরচের টাকা আমার ঘরে আমার হাত বাক্সেই রেখে দিও। আমিই দেখবো সব।'

ঘাড় বেঁকিয়ে শাশুড়ির মুখের দিকে তীর্যক দৃষ্টিতে একটুসময় তাকিয়ে রইলো প্রমীলা তারপর জবাব দিল, 'আপনি দেখলেই কি একখানা টাকা ভেঙে দু'খানা হ'য়ে যাবে! সাধ্যের অতিরিক্ততো আর কিছু করতে পারবোনা।'

'তুমি! তুমি করতে পারা না পারার কে?' হিরণ্ময়ী একেবারে তাজ্জব হ'য়ে গেলেন কথা শুনে: 'আর সাধ্য অসাধ্যেরই বা জান কী তুমি? কদিন ধরে তুমি এসেছ এ বাড়িতে! আমি অনেকদিন চুপ ক'রে ছিলাম, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, এত ছোট অন্তঃকরণ তোমার যে ছেলে দু'টোর জন্য বিকেলে পর্যন্ত একটা খাওয়ার ব্যবস্থা কর না।'

'খায় না? ওরা বিকেলে খায় না?'

'কী খায়?'

'প্রত্যেকদিন চা খায়।'

'চা! চা আবার একটা খাবার। আর কী চা তুমি দাও! এক টিপট্ জলে এক চামচে চা দিয়ে, একফোঁটা চিনি আর একফোঁটা দুধ মিশোলেই চা হয়? আর সারাদিনের

খিদে তাতে মেটে ? আর ছেলে কি আমার এতই অযোগ্য যে তার দু'টি নাবালক ভাইয়েরও ভরণ-পোষণ করতে পারে না ! এরকম খাওয়া কি ওরা কোনদিন ভাবতে পেরেছে !'

'কোনদিন তো আর চিরদিন হয় না !'

'কী !'

'বাপের উপর যা চলে ভাইয়ের উপর তা চলেনা।'

'কী ! কী বললে' জ্বলে উঠ্‌লেন হিরণ্ময়ী : 'তোমার আস্পর্দ্ধা দেখছি—'

তাঁর কথা শোনবার জন্য প্রমীলা অপেক্ষা করলোনা, সিঁড়ি বেয়ে সোজা দোতলায় উঠে গেল।

প্রথমটায় স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন হিরণ্ময়ী, তারপরে দ্রুত পায়ে শীঘ্র গতিতে তিনিও উঠে এলেন দোতলায়। এতো ! এতোখানি ! এতদূর গড়িয়েছে ! ছেলের ঘরের সামনে এসে গলার মধ্যে সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে ডাক দিলেন, 'বৌমা'

চুরির আওয়াজ পাওয়া গেল, জবাব এলোনা। এক পা এগিয়ে তিনি আবার ডাকলেন। এবার ভেতর থেকে জবাব এলো 'বলুন'

'এদিকে এসো।'

কাঁধের উপর আঁচল তুলে দিতে দিতে প্রমীলা এগিয়ে এলো দরজার দিকে। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হিরণ্ময়ী বললেন, 'আমার কথা না শুনেই যে তুমি উঠে এলে ?'

শাশুড়ির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন কোন অতীতের ভয় নেমে এলো প্রমীলার চোখে। মুহূর্ত্তকাল চুপ ক'রে রইলো সে।

'বল, বল, কিসের জোরে তোমার এতবড়ো স্পর্দ্ধা সম্ভব হ'লো। কোন সাহসে তুমি আমাকে অমান্য করতে সাহস পাও ?' হিরণ্ময়ীর গলা তারের যন্ত্রের মতো কেঁপে কেঁপে উঠ্‌লো।

'সাহসের কথা নয়'—প্রমীলা ততক্ষণে প্রস্তুত ক'রে নিয়েছে নিজেকে। এইরকম একটা বিরোধের মুখোমুখিই দাঁড়াতে চাইছিলো সে কদিন থেকে।

( ক্রমশঃ )

# চৈত্রের কবিতা

## স্বর্ণ-বীজ

সুনীল কুমার নন্দী

তৃষ্ণার্ত শান্তির স্বচ্ছ দীঘি ভরা জল কোথায় কোথায় বলো? বহ্নি ছোঁয়া জীবনের ধূ ধূ বালিয়াড়ি আদিগন্ত ছেয়ে আছে :

নিয়মের অনুজ্জ্বল বিষণ্ণ রুটিন
যেমন সরালো হাত, ত'লো জনহীন
পৃথিবীর কোন এক সবুজ প্রান্তের গান ; দিতে হ'লো পাড়ি
তাই শেষে বন্দরের চোখে দোলা করুণ কুজ্ঝটি মাখা ছবি
সময়ের বুকে রেখে। ' স্মৃতি-ভেজা মাঠ বন ছুঁয়ে ছুঁয়ে এখানে এলাম।
শাল শিরীষের ফ্রেমে বাঁধানো এ-গ্রাম
নির্জন ঘুমের মতো। শেফালি করবী
ফুলের নরম ঘ্রাণ জড়ানো ভোরের ঘুম ভাঙানিয়া হাওয়া নিরিবিলি
মেঠোপথে ডেকে নিলে মাঠের কন্যার ভিজে শাড়ির শিশির
মেখেছি দু'হাত ভ'রে বুকে মুখে যতোখুসী, তবু-ও অস্থির
হয়নি অনিষ্ট মন ? জোনাকির ভীরু মিলিমিলি
রাত্রির পাকুড় ডালে দেখেছি নিরীক্ষ চোখে, আবার কখন
পদ্ম-পুকুরের পাড়ে সোনালি রোদ্দুরে ভিজে শুনেছি ঝুমুর
সাঁওতালী মেয়ের কণ্ঠে, তারপর সমস্ত দুপুর
অরণ্যের পর্দা ঠেলে পুরনো দেউলে দেখি শিল্পীর ধ্রুপদী শিল্প-তখনো কি মন
ওঠেনি উন্মনা হ'য়ে ? উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় শীর্ণ নদীর শিয়রে শুভ্র বালির চড়ায়
বসেছি, সেখানে মন ভোরের আকাশে
রাত্রির তারার মতো জীবনের ব্যর্থ সাধ দুর্জয় আশ্বাসে
হাতড়ে ফেরেনি বলো টিপিটিপি পায়
নেমে নীল অন্ধকারে ?

চৈত্রের কান্তারে
শান্তির বিধেতি স্নান কোথায়—নির্জনে ঘুরে কী হবে ! সময়
এখনো হয়তো আছে। এসো, এসো বন্দরের ব্যথা ভরা পলাতকা সমুদ্রের বৈরাগী হৃদয়

ঝড়ের আবেগে বাঁধি। ধূ ধূ মরু জীবনের বৈশাখী প্রান্তরে
সমুদ্র-আশ্লেষে শেষে প্রেরনার মতো স্নিগ্ধ শ্রাবনের জল
ঝরবে। বিশ্বাস রাখো। পারেও তুলতে ঢেউ, স্বর্ণ-বীজ মনের মতোন হ'য়ে দীঘি অবিকল।

## সমান্তরাল

সত্যেন্দ্র আচার্য

ফাল্গুনের দুরন্ত দুপুরে
নীল জল যমুনার টলমল করেছিল কবে—
মাছরাঙা হিসাব কি রাখে ?
উপপাদ্য এই যদি হয়,
নির্ণয়ের আঁক কেটে বোর্ডে, জ্যামিতিক অপ্রমাণ
ব্যর্থ পরিচয়।
তাই ভাবি। তোমার হৃদয় বুঝি জ্যামিতিক-কম্পাসের কাঁটা।
বৃত্ত আঁকে। নির্মক্ষিক অন্তরেতে নীরেট শূন্যতা।

ঝিঁঝিঁর পাখার মত থর থর কেঁপে গেল এক
সুচিন্তিত প্রশ্নসমাহার গনিতেও। ভাবি আর—
তোমার হৃদয় বুঝি, দশকেরে বাদ দেওয়া,
এককের ব্যর্থ গোলাকার।

## শান্তিনিকেতন

আলোক সরকার

কী পেয়েছো স্তব্ধ হাওয়ার ব্যাকুলতায় ?
মস্ত আকাশ ঘন মেঘের প্রেম-বিধুর ছায়া-মেঘের
ভরা দুপুরে একলা বুকে অবুঝ শিশু-মন-মায়ায়।

রাঙাধুলোর খরভাষার বিশালতায় ?
অচেনা দেশে হঠাৎ হওয়ার অবাক আর
কী পেয়েছো ? আসা- যাওয়ার পথের ধারে ছড়ানো যা।



সহজতর খুশি নিয়েই জীবন কেন বাড়াও পা
যাও যেখানে রূঢ় আঁধারে কান্না-ঝরা মৌনতায়
অসহ জ্বালা যন্ত্রণার সেখানে ভীরু লুকাও মুখ ?

এখানে দেখো ধূ-ধূ শীতের বিরহী বুক।
বাতাসে ওড়া শুক্‌নো কাশ ফেনিয়া-ওঠা দীর্ঘশ্বাস—
সহজে ধরা দেবেনা কতো লীলার ছল কী অপরূপ !

চকিতে তার স্নেহপরশ উদাস করে বিদেশীরে
চকিতে তার মোহপরশ আশায় আনে সর্বনাশ—
যাবো যেখানে ঘনআঁধারে হিংস্র হিম মুখের ভয়।

এখানে তুমি এতদূরেও ! ছায়া-আলোর হে অম্বয়।
শীতের শ্বেত উত্তরীয়ে সহস্র রঙে মাতিয়ে দিয়ে
অবাক আলোর পথের বাঁকে উধাও দ্রুত ছায়া-শরীরী।

স্তব্ধ হাওয়ায় অধরা ঢেউ জল-মেয়ের ঝিরিঝিরি।
শরবনের যে গম্ভীর নিপুণ কর ছুঁড়েছে তীর
তারই আপাত-অচেতনা দিগন্তের ভাঙে সিঁড়ি।

দিগন্তের ? কোন সুদূর ? কোথায় নীল খাঁ-খাঁ করে।
আরো গভীরে অতলে কতো নেবে আমায় মোহপরশ ?
মাধুরী তার না ধরে কায়া বীণা না বাজে দুখপ্রহরে।

স্নেহপরশ ! মোহপরশ ! টানে অসীমে জ্বালা অসহ।
এই পেয়েছো একলা বুকে ছায়া-মেঘের বিনীত চুপে—
ভরাদুপুরে করুণ, চাও আবারো ? একী দুঃসাহস !

## শাশ্বতী

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

কী করে তোমায় বলি মীনাক্ষি কী করে তোমায় বলি—
কতদিন শুধু চুপচাপ বসে দাঁতে দাঁতে ঘাস কেটে
ধূসর আকাশে বিকেল দেখেছি। তারপরে লন ছুঁয়ে
রাত্রি নেমেছে চাদর বিছিয়ে। চাঁদের রাংতা এঁটে

আকাশের কালি হয়ে গেছে ক্ষয়···পেঁচার হঠাৎ ডাকে
কার্নিসে যেন মনে হল কারা কতদিন ধরে বসে—
অশরীরী তারা আহত প্রেমের রিনরিন ঝিমঝিম
কান্না ছড়ালো মুঠো মুঠো করে। তারপরে তারা খসে !

মুক্তোর-মত-নীল জলময় তারাদের ভিড় ঝরে :
আকাশ নিংড়ে পাহাড় ডিঙিয়ে পৃথিবীর বুক ধুয়ে
সেই বেদনার বৃষ্টি নামলো, অসহন কুয়াশায়
বোঝাও যায় না এ কী হয়ে গেল এল কার বুক চুঁয়ে ;
বলো মীনাক্ষি এত বেদনার সমুদ্রে এতবার
তোমারই জন্যে বিন্দু জোগালো কার মন, বলো কার ?

## চিল-মন-দুপুর

শোভন সোম

আকাশে সুদূরে
চিল ওড়ে উদাস দুপুরে।
তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কখনো বা দীর্ণ করে স্তব্ধ সময়
আর মনে হয়
অমনই রৌদ্রের বুকে ডানা মেলে দিয়ে
দেব আমি নিজকে ছড়িয়ে।

সব ক'টি প্রহরের অক্ষর সমূহ
চারিদিকে খুদে রাখে লিপিরেখা-ব্যূহ
স্মৃতির কী দুঃসহ স্পর্ধিত শিলায়
দিনে দিনে জীবনকে রিক্ত করে দেবে সে বিদায়।

অপলাপী অনুকম্পা, শূন্য সম সৌজন্যের ভিড়ে
কখনো কী দাগ পড়ে হৃদয়ের অতল গভীরে
যদি পড়ে মুছে দাও, শ্রাবণের মেঘখানি হয়ে
অন্ধতার দ্বিধা কাটো,
মুক্তি দাও, যতি দাও ভয়ে।



মনে হয় রৌদ্রময়ী আকাশের অনাবিলতায়
এই মন শূন্যে হারায়।
হারায় ? হারাক মন। বেপথু ডানার আন্দোলনে
জাগুক জাগুক সাড়া নভোচারী ইথার-নির্জনে।

সব কিছু মুছে যাক।
সব কিছু মিলাক, মিলাক
স্মৃতি পিছুটান থেকে মুক্তি দাও, সুধু সেই সুরে
উড়ে যাব যেই সুর টেনে নেয় অসীম সুদূরে॥

## লোপামুদ্রা

ভূমেন্দ্র গুহ

লোপামুদ্রা কার নাম ?—অমন নামের মেয়ে চেনো ?
কখনো দেখেছো তাকে ?—জানো
চুলের আকাশে যদি তার মুখ একখানা ডোবা-চাঁদ হয়,
অথবা যদি বা হয় একরাশ ঝিকিমিকি তারা
তাহলে আলোর মেয়ে উলংগ পাখায় হয় হারা
কোন্ সে নদীর বুকে—কার ?---
আর
কতোটা কুয়াশা, আশা, রহস্য ও ভয় !

তাকে কেউ চেনে নাতো, চেনে
কোন্ সে অগস্ত্য এক, কতো-না মেয়ের দেহ ছেনে।
লোপামুদ্রা এক দেহ, এক প্রাণ, মন
একটা হৃদয়,—
একটা নদীর স্রোত, সহস্র ঢেউয়ের সুরে একই রোদন
—অথচ সে এ নয়, ও নয়।
অগস্ত্য ছেড়েছে ঘর, বেরিয়েছে পায়ে হেঁটে বন-তপোবন

নগর, প্রান্তর, গ্রাম, তীর
সরস্বতী, গোদাবরী, নর্মদা, মহানদী, শোন্
অগস্ত্যর ক্লান্ত প্রাণ উদগ্র অধীর—
অগস্ত্য দেখেছে স্বপ্ন কোন্ এক লোপামুদ্রার।
লোপামুদ্রা চাই
চাই তার নীড় তাপ, রাতের শিশির
চোখের পল্লবে ঝরা, হাওয়া শাঁই শাঁই
ভেঙে দিতে নীড়, আর ঘাসের শরীর
লতাপাতা, খড়কুটো এই পৃথিবীর
গড়ে নিতে, জীবনের শরীরের ক্লেদ,
আর তাতে রৌদ্রমান্ অর্ঘ্যমার বিচ্ছুরিত স্বেদ।
: উত্তর দেশের পাখি প্রাণ দিতে প্রাণ পেতে দিয়েছে উড়াল
ভারত সমুদ্রতীরে ক্লান্ত প্রাণ পাখি এক—সে এক মরাল।

নীড় নেই অগস্ত্যর, লোপামুদ্রা কোনোখানে নেই—
অগস্ত্য বাড়ালো হাত, লুটে নিলো মুঠো মুঠো করে
কতো সে মেয়ের থেকে, যেখানে লেগেছে ভালো যেই
যা-কিছু নয়নে তার, শঙ্খচূড় বুক, চুল নিশাকালো আর
ভাস্করের গড়ামুখ দেবিকার, মদনিকা-কটিদেশ, শিল্প-রতার
চোখ, মন, হাত, অভিসারিকার পদক্ষেপ, মেঘের হৃদয়
অনলক্ত পদ কারো পূজা বেদী পুষ্পগন্ধময়।
এই সব—সব কিছু, লোপামুদ্রা নিয়ে এলো অগস্ত্যর ক্লান্ততার দেহে;
অগস্ত্য ছেনেছে তা-ই সহস্রার স্নেহে।

অগস্ত্যর নীড়, রাত, শিশিরের জল—
তার মতো সন্ধ্যা-হাত, গাঢ় রাতে কাহিনী সৃষ্টির—
আয়োজন তার, সব সূর্যের অমিত আয়ু ভিড়
একে একে লোপামুদ্রা সয়েছে সকল তেজোবল।
লোপামুদ্রা অগস্ত্যের একান্ত নিজের।
লোপামুদ্রা অগস্ত্যের মনের বীজের।



লোপামুদ্রা কার নাম? অমন নামের মেয়ে চেনো?
কখনো দেখেছো তাকে?—জানো?
: লোপামুদ্রা থাকে শুধু অগস্ত্যর কাছে—
যাদের অগস্ত্যমন আছে!
অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা—দু'টি তারা, আকাশের অজস্রের ভিড়ে
থাকে শুধু পাশাপাশি, নিবু নিবু—একে থাকে আরের গভীরে;
একের পালকে তাপ অন্যের—অগস্ত্য জ্বলে তাপে
পলাশ আগুন জ্বেলে; মুখ দেখে লোপামুদ্রা নদীর বুকের 'পরে কাঁপে॥

## অবাক সরাই

[ শুভ্রাশিস্‌কে : একটি পরম মুহূর্তে ]

ইরা গুপ্তা

কতো উৎরাই আর কতো না চড়াই
পার হয়ে এসে এই অবাক সরাই!
এখানে জীবন-যোগ-করা
বহুমূল্য প্রাণের পসরা!
সৃষ্টির স্ফুলিঙ্গে তাই স্বপ্নগাঢ় উত্তাপ ছড়াই,
মোহিনী বাসন্তী রাত্রি : আর এই অবাক সরাই!

# ইতিহাস

## ইন্দ্রজিত

কালটা চিরকাল। এই কলস্রোতের সঙ্গে যে প্রাণস্রোতটা আবহমান কাল থেকে বয়ে আসছে সে স্রোত থামতে জানেনা কারণ থামাটা তার ধর্ম বিরুদ্ধ।

জীব-জগতের অসংখ্য ধারার ভেতরে মানুষও বহন করছে এক ধারা। সে ধারার শিশুকাল থেকে কিছুকাল পর্য্যন্ত একটা যুগকে নৃতাত্ত্বিকেরা তাদের নিজেদের আলোচনার জন্যে বেছে নিয়েছেন। নৃতাত্ত্বিকেরা যে যুগকে নিতান্ত আপনার করে নিয়েছেন সে যুগের মানুষকে আমরা চোখে দেখা তো দূরে থাকুক তার কঙ্কালটাও কল্পনা করতে পারি কিনা সন্দেহ। তবে সেই বিগত যুগের মানুষের ব্যবহার করা কিছু জিনিষপত্তর, হাতিয়ার ইত্যাদির ওপর ভর করে নৃতাত্ত্বিকের হিসেব আরম্ভ হয় পেছনের দিকে। হিসেবের অঙ্কের মিলের সংখ্যায় সে যুগের মানুষের ছবি ওঠে ফুটে। নৃতাত্ত্বিকের পক্ষে এর পরের যুগকে পেতে দেরী হয় না কারণ আলীবাবার চিচিং ফাঁকের মন্তরের মতন হিসেব করবার মন্তর নৃতাত্ত্বিক বার করে ফেলেছেন। এমনি করে যুগের পর যুগ ধরা পড়ে, ধরা পড়ে সে যুগের ধরিত্রী প্রকৃতি যা পাই তাই। কিন্তু সে যুগে একটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি যে সে সময় মানুষ বলতে কোন ব্যক্তি বিশেষকে পাইনা বা পাইনা এমন কোনও সমষ্টিকে যার ওপরে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব নির্ভর করতো।

মানুষের মস্তিষ্কের উর্ব্বরতার প্রয়োজন হয়েছিল প্রাকৃতিক বাধা বা বিপদকে পরাজিত করে নিজের কায়েমী আবাস প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে।

মানুষের বুদ্ধির কাছে প্রকৃতি খানিকটা আয়ত্তাধীন হল বটে কিন্তু যুদ্ধ করবার, জয় করবার নেশা মানুষকে ছাড়ল না। করবার যখন কিছুই নেই, মারবার মতন যখন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই তখন প্রশ্ন দেখা দিল কোন্ মানুষের কার চেয়ে বেশী ক্ষমতা। আরম্ভ হল বিবাদ, এই বিবাদের ফলে কত লোক যমের খোরাক হোল আর কত লোক ধরিত্রীর কোলে বসে পিঠেপায়েশ খাবার জীবনস্বত্ব করে নিল তার ঠিক সংখ্যার সংবাদ বোধ হয় কোন লোকের জানা নেই।

এর পর মানুষের স্থানচ্যুতি ও নতুন স্থানপ্রাপ্তি, জাতির সঙ্গে অন্য জাতির ফুলশয্যায় রাত্রিযাপন। এমনি কোরে কোন এক যুগে মাটির বুকে ফুটে উঠলো ধান, ক্ষেতে দেখা দিল আল। কর্ষণ, কর্ষণ, কর্ষণ।

কাল চলছে, সেই চিরকালের কাল, জীব-ধারা বয়ে আসছে এই কালকে নির্ভর করে। ধরিত্রীর বুকে আত্মপ্রতিষ্ঠিত মানুষ এটা বুঝতে পেরেছে যে কালের স্রোতের সঙ্গে জীবনের গতির একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। কালকে নির্ভর করে মানবের যে ধারা চলে



আসছে সেই ধারার মাঝে মাঝে কোন কোন লোক মাথা উঁচু করে ভেসে ওঠে ঠিক যেন নদীর স্রোতে সাঁতার-রত মানুষের ভেসে ওঠা এবং এই মাথা উঁচু করা লোকের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয় এক নতুন রকম হিসেব, নতুন রকম লেখা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গী যার সঙ্গে নৃতাত্ত্বিকের অঙ্কের কোন মিল নাই। তাদের গণ্ডির ভেতরে ঐতিহাসিক যুগ আবদ্ধ থাকে না তাই এ যুগকে আলোচনা করবার জন্যে যারা এ যুগটাকে একান্ত আপনার করে নিলেন তাঁদের নাম হোল ঐতিহাসিক, মানুষের জীবনের ধারাকে সংরক্ষণ করবার জন্যে এরা সৃষ্টি করলেন ইতিহাস। ইতিহাসে যুগে যুগে যে সমস্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তির আবির্ভাব হয় তাকেই ঐতিহাসিকরা তাঁদের ইতিহাসের এক একটা পরিচ্ছেদ উৎসর্গ করেন। সেখানে জনসাধারণের কোন খবর নেই।

কাল চলেছে, চিরকালের মত। মানুষ সেই অসীম কালের ভেতরে কিছুকালের ওপর আধিপত্য করবার সময় সে কথাও বলে কিছুকিছু করেও কিছুকিছু কিন্তু সেতো কিছুকালের জন্যে। তাই চিরকালের বন্যায় সে আবার ভেসে যায় আবার নতুনের জন্ম, নতুনের পরিচয়, আর পুরাতনের পরাজয়। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক বুঝতে পারে মানুষের এই শোচনীয় পরাজয় চিরকালে হাতে।

যাকে ইতিহাসের গণ্ডির ভেতরে পেলাম তাকে কাচের বাক্সে বা পুঁথির পাতায় রেখে দিলাম, দর্শক দেখল, পাঠক পড়ল কিন্তু কি জানলো আর কি বা জানতে চাইল সে খবর কেউ রাখলো না। কিন্তু জমিতে লাঙ্গল দিয়ে যে কর্ষণ গতযুগে আরম্ভ হয়েছিল তার বহু পূর্ব্ব থেকেই মানুষের মনে কর্ষণ হয়েছিল সুরু এবং সেই মস্তিষ্ক কর্ষণের পরিণামই দেখা দিয়েছিল ভূমি-কর্ষণে আর তাই মানুষের মাথায় সেই চাষ করবার অভ্যাসটার গতি বেড়ে চলল ক্রমাগত হংসবলাকার মতন। সে ঝিলমের কালস্রোতের ওপরে ডানা ঝাপটে উড়ে যেতে যেতে বলে চলে যায় : হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে। মানুষের মনের গতির সঙ্গে কাল সমান তালে চলতে পারে না। মনও চলে, কালও চলে ; কিন্তু মন কোনো কোনো জায়গায় বিশ্রাম নেয়, থামে—কিন্তু কাল থামে না, কালের থামবার জায়গা নেই। মানুষের মন বলে, এটা ভুল ওটা ঠিক, কাল কিছু বলে না কারণ কাল চলতে জানে বলতে জানে না। মন ও কালের ঘোড়-দৌড়ে মন জিতল একথা ঠিক কিন্তু সেটা গতির দৌড়ে জেতা, তাই মানুষের মন এবার চাইলো আত্ম-পরিচয় নিজের কাছে, নিজেই জিজ্ঞাসা করলো : কঃ অহম্? কিন্তু তার এই প্রশ্ন পরিণত হল প্রতিধ্বনিতে ; প্রতি উত্তর মিললো না। ইতিহাসের সংরক্ষণাগারে প্রত্নতাত্ত্বিকের যাদুঘরে মানুষ আবার জানতে চাইলো তার নিজের পরিপূর্ণ সত্তাকে, কিন্তু অতীত যে উইঢিপিতে আবৃত বাল্মীকি, উত্তর দেবে কে? ইতিহাসও জপে বসেছেন প্রশ্ন এড়াবার জন্যে। মানুষের নিজের বিষয়

খোঁজ-খবর নেবার যে দুটি আড়ত আছে, দুটোই দেখা গেল মুদীর নিঝুম রাতে ঝাপি বন্ধ করা দোকানের মতন।

কিন্তু স্বরূপ জানতে হবে, জানতে হবে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে। এ জানা শুধু প্রয়োজনের খাতিরে নয়, জানবার আনন্দের তাড়নায়।

কাল চলেছে, হেরেছে কিন্তু থামেনি। মানুষ দেখল মানুষের সত্য পরিচয় নিতে হলে তাকে ইতিহাসের হিসেব ভুলতে হবে। এই কালের গতির ভেতর থেকে বার করতে হবে সমস্ত মানুষের অতীত সত্তাকে, কুড়িয়ে আনতে হবে কালের গভীর সমুদ্রের তলা থেকে ডুবে যাওয়া সাধারণের অতীতকে।

মানুষ আয়োজন আরম্ভ করলো। কুড়িয়ে তুললো অনেক পদার্থ, সাধারণভাবে বিচার করলে এর কোন মূল্য নেই, কিন্তু অসাধারণভাবে বিচার করলে এর মূল্য অনেকখানি। কারণ ছোটখাটো ব্যাপার যা ইতিহাসে অবহেলিত, কালের কবলিত, তার চরম মূল্য বোঝা গেল সুদূর অতীতের ভবিষ্যৎ-গঠনে।

অতীতের প্রতীক্ষিত শবরীর দল প্রাণ লাভ করল নতুনের পাদস্পর্শে। নতুন মানুষ সেতুবন্ধের কাজ আরম্ভ করল, এপারে অতীত ওপারে ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান। এদিকে এক রকম, ওদিকে অন্য রকম। অসংখ্য মানুষের মেলা। মানুষ এই অসংখ্য মানুষের মেলাকে পরিণত করল এক বৃহৎ পরিবারে।

ইতিহাসের নায়করা এই ব্যাপারে উঠলেন ক্ষেপে, কারণ, এ ভাবধারার সঙ্গে তাঁরা কোন দিনই পরিচিত ছিলেন না। ঘুম ভেঙ্গে গেল, প্রতিবাদ করল ইতিহাসের নায়করা এটা অন্যায় বলে, ইতিহাসের রীতি-বিরুদ্ধ বলে। নৃতাত্ত্বিকরাও বলে উঠলেন, যা গত যা মৃত তাকে মৃত-সঞ্জীবনী দিয়ে আবার বাঁচিয়ে লাভ কি। নৃতাত্ত্বিকের প্রশ্নের উত্তরে নতুন মানুষ বলল, লাভ ক্ষতির প্রশ্নটা এখানে বড় নয়, বাঁচাটাই বড় প্রশ্ন। বাঁচার সুখ পেয়ে যারা মরে যাবে তাদের চিতা সাজিয়ে আগুন ধরিয়ে দেব, লাভ-ক্ষতির হিসেব তার আগে নয়। ঐতিহাসিকেরা জিজ্ঞাসা করলেন : কোন মতের ওপর নির্ভর কোরে নতুনের এ অভিযান, কারণ, ইতিহাসের ধর্ম বলে যে, সকলেই ইতিহাসের ভেতরে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। মানুষ এর উত্তরে বলল, ঐতিহাসিক, তুমি তোমার নিজের চারিত্রিক ধর্ম রক্ষা করতে গিয়ে অধর্মই করেছ, ইতিহাসে সকলেই স্থান পাবে, কারণ, এটা কাব্য নয় যে মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত ধর্মী হবে। জন্মানর পর থেকে মরা পর্য্যন্ত প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি জনের শ্বাস-প্রশ্বাস তোমাতে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। আজ যখন ইতিহাস ইতিহাস লিখতে জানে না দেখলাম তখন নতুন মানুষ হয়ে আমরা তা করব। রচনা করব জনসাধারণের ইতিহাস। তোমার কাজ ব্যর্থ হয়েছে, কারণ, ইতিহাসের মানুষ আছে কিন্তু মানুষের ইতিহাস নেই।

# তীর

## অনিল ভট্টাচার্য্য

লক্ষ্মণের বৌ মারা গেছে, ছেলে বিয়োতে। ছেলে গেল। নিজেও গেল।

গেল তো গেল। এতো ভিড় কিসের ?

বড় ভালো মেয়ে ছিলো গো। বেশ নরম-গরম। ছিরি-ছাঁদের। মনের মতনটি।

উঠোনে মৃত দেহ। শিয়রে তুলসী মঞ্চ।

হুঁঃ, এ আবার ছিরি-ছাঁদের ! পছন্দও তোদের।

কালো মেয়ে। রোগা মেয়ে। শুকনো মুখখানা। শুকনো আমের আঁটি। ইস্ ঢং করে আবার নাকচাবি পরেছে। রূপোর একটা ফুল। ডায়মন কাটা। কপালে রাজ্যের সিঁদুর, হুঁঃ।

দেহটা কাঁথা দিয়ে ঢাকা।

সবাই এসেছে। বসেছে। লক্ষ্মণের বৌ। আসবে না !

—বড় ভালো ছিলো মেয়েটা।

চোখের জল মোছে বুড়ী-পিসি।

বুড়ী কানা। অন্য চোখটায় ভালো দেখতে পায় না। তাই বুঝি দুনিয়া দেখা ওর একটা মোহ। তাই এসেছে। এ ত আবার লক্ষ্মণের বৌ।

—কই হে লক্ষ্মণ যোগাড়-যন্তর করো।

আবার মেঘে-ছায় মেয়েদের মুখ।

লক্ষ্মণের বৌ তাহলে মরেই গেছে। সেই হাসি-মানুষটি আর কথাই বলবে না। বাঁশ-তলা দিয়ে চলে যাবে। ওই সেবারও গেছিলো। পাল্কী চেপে। বাপের সাথে বাপের বাড়ী। বলরামপুর। কিন্তু ফিরে এসেছিলো। সঙ্গে চাঁদ-পারা মানিক।

কি যে হোলো এবার, গেল না। বোনকে আনলো। সেবাদাসী। কালোশশী।

—বাবা।

—কে রে ? মানিক ?

—মা কথা বলে না কেন বাবা ? ওরা এসেছে কেন ?

মানিকের মুখের কথা শেষ হয় না।

মেয়েরা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কানা পিসী কোলে টানে মানিককে।

লক্ষ্মণকে নিয়ে পুরুষেরা সরে পড়ে।

পিসী, মাসি, সই, বকুল ফুল। যুঁই ফুল। সব বসে। কাঁদুনি গায়। কখনো ইনিয়ে কখনো বিনিয়ে।

সবাই বৌকে রেখে এসেছে।
তিতাসের জল। রূপোর লাহান। বয়ে যায়। ধীরে। জোরে। তার পারে শ্মশান।
আগুন জ্বললো। আগুন। আগুন। আর আগুন।
লক্ষ্মণ বসে দেখে।
বেশ লাগে। মানুষটা এই ছিলো। এই নেই। এখুনি দেহ। এখুনি মাটি।
আচ্ছা সারা দুনিয়া যদি জ্বলে ওঠে। সব পুড়ে যায়। ছাই হয়ে যায়। বেশ হয়।

—বাবা।
—কি বলিস?
—মা কোথায়?
—মরে গেছে।
—মা মরে গেল কেন বাবা?

ভাবনার কথা বটে।
—লক্ষ্মণ। সুবোধ ছেলে। আবার বিয়ে করো।
—ছিঃ ছিঃ কি যে বলেন আপনারা।
লম্ফ জ্বলে। ছায়া নাচে। বাতাস ওঠে। বাতি নেভে।

আরেক দিন। খুশীর দিন। গাঁয়ের বুড়োরা ডেকেছে।
—তুমি পুরুষ মানুষ। বয়স বেশী হয়নি। বিয়ে করতে দোষটা কি?
—দোষ নয়। খাবে কি?
—তোমার শালী, কালোশশী। খায় কি?

মানিক ঘুমিয়েছে।
কালোশশী জেগে।
দুশ্চিন্তার একশেষ।
ফিরে এলো লক্ষ্মণ।



—গেছিলে কোথায় দাদা?
—ক্ষেতে।
এই রাতে!
—হ্যাঁ।
—ক্ষেতে না শ্মশানে?

আরো রাত। তারা-রাত। সাঁওতালী রাত।
নিষ্প্রদীপ গৃহ।
হঠাৎ মানিক কেঁদে ওঠে।
—মা। মা। মা।
কালোশশী উঠে বসে। বুকে ধরে ওকে।
বলে—এই তো আমি।
চমকে ওঠে লক্ষ্মণ।
ছেলে ডাকে—মা। কালো বলে—আমি।
ছেলেটাও অমনি ঘুমোলো।

কালোশশীর শাড়ী চাই। মানিকের প্যাণ্ট।
বৌর আংটিটা নিয়ে যাচ্ছিল লক্ষ্মণ।
বাধা দেয় কালোশশী।
—যাচ্ছো কোথায়?
—হাটে।
—কেন?
—তোমার শাড়ী। মানিকের প্যাণ্ট।
—দিদির বাক্স খুলে কি নিলে?
—নাতো?
যেন চিলনী, ছোঁ মেরে কালোশশী আংটিটা নিয়ে যায়।
তারপর নিজের আংগুলে পড়ে।
বলে—যাও হাটে। শাড়ী এনো লাল দেখে। প্যাণ্ট এনো দামী দেখে।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার এসেছে।

—টাকা কটা দাও লক্ষ্মণ।
—এখন নেই। পরে দেবো।
—নেই তো ওষুধ আনতে গেছলে কোন মুখে ?
—যার মুখ চেয়ে গেছলাম সে আর নেই।
জমিদারের দাতব্যশালা। তার ডাক্তার। পয়সা না দিলে রাস্তা দেখায়। ঠিক আছে। ও-ও এবার দরজা দেখাবে। দরকার তো নেই আর !

খবরদারী অসহ্য হলে লক্ষ্মণ বলে—তুই না আমায় দাদা ডাকতিস, কালো।
—এখনো ডাকি।
—শুনি না তো
—শুনবে কি করে ? ও-নাম কোনো মেয়ে মুখে আনে না।

ধান ভানে কালোশশী।
গরু দোয়ায়।
মানিককে ভোলায়।
তবু লক্ষ্মণ বলে—তুই ফিরে যা কালো।
—কেন ? চোখের কাঁটা বুঝি ?
—না না কালো। তুই বুঝবিনা। তুই যে মেয়ে-মানুষ !

—বাবা, মাসি না আমায় মা ডাকতে বলে। ডাকবো ?
হাসে না লক্ষ্মণ।
তবু বলে—ডাকনা।

—বাবাকে বলেছি মাসি।
—কি বললে ?
—মা ডাকতে।

কালোশশীর বাবা এসেছে। বড় মেয়ের জন্যে কাঁদলো।
তারপর বলে—কালোকে তুমি বিয়ে করো লক্ষ্মণ।
—আমি আর বিয়ে করতে চাইনে। একজন গেল। আরেকজনকে কেন পাঠাচ্ছেন ?
—পাঠাবো কেন ? সে তো এখানেই !



—নিয়ে যান এবার ওকে। অনেক দিন তো রইলো। লোকে বাজে কথা বলে।
—এই ঠিক ?
—হ্যাঁ।
—দুর্গা দুর্গা। কালো, ও কালোশশী !

—পাগলামি করিস না কালো। যা বাড়ী।
—তবে মানিককে দাও।
—যেতে চায় যাক।

—লক্ষ্মণ লাঙ্গল ঠেলে।
—ফসল ফলে। ধান ওঠে।
জমিদারের লোক এসেছে।
—খাজনা।
—দিচ্ছি।
মহাজন আসে।
—সুদ।
—নিন।
সব চলে যায়।
কপালে হাত দিয়ে বসে লক্ষ্মণ।
ধান নেই। মানুষ নেই। জন নেই।
তবে বাঁচবে কি নিয়ে ?
চোখে ভেসে ওঠে এক ছিপ্‌ছিপে তনু। যুবতী ছাঁদ।
চিঠি লিখতে বসে সে শ্বশুরের কাছে—
শতকোটি প্রণাম পূর্বক জানিবেন,
আমি কালোশশীকে বিবাহ করিতে.....
হঠাৎ কলম থেমে যায়।
ছাদনা তলা। শানাই-বাঁশী। বৌ অসছে। কি হাসি ! কি খুশী !
তারপর এক বছর। তরুণী তরণী বেয়ে ক্লান্ত। আতুর ঘর। তুলসী তলায় কান্না।
এই তো হবে
যেমন হলো কালোশশীর দিদির।
চিঠি ছিঁড়ে ফেলে লক্ষ্মণ।

কালোশশী এসেছে। সঙ্গে মানিক। ওকে দিয়ে যাবে। ওর বিয়ে হয়ে গেছে। দোজ-বড়। ষাট-বছুরে। ফোঁকলা দেঁতো। পয়সা আছে। মহাজন মানুষ। কালোশশীকে সুখে রেখেছে। শাড়ী দিয়েছে। গয়না দিয়েছে। আর দিয়েছে মাথায় সিঁদুর।

—কালো।
—দাদা।
অনেক কথা ছিলো। বলা হলো না।

—দাদা
—কালো।
কথা ছিলো।

কথা বলা হয়নি।
কালো চলে গেছে। মানিক আছে।

—বাবা।
—কি রে মানিক ?
—একটা ধনুক দেবে ?
—কেন ?
—ঐ বুড়োটাকে মারবো।
—কেন রে ?
—মাসির কি কষ্ট ! জানো আমায় কোলে নিয়ে মাসি রোজ কাঁদতো। দাওনা বাবা।
—ছিঃ, মানিক !
—তবে মাসি কি রোজ কাঁদবে ?

লক্ষ্মণ ধনুক বানায়। ধনুক ভাঙ্গে।
কি করবে বোঝে না।
মনে ভাবনা। ওরা কাঁদে। কালোশশী। রূপশশী। মনের শশী। আরো কতো !
এক ধনুকে কি হবে ?
রাতে তীরে পালক বাঁধতে বাঁধতে ঘুমন্ত ছেলের পানে চেয়ে হঠাৎ ওর মন নেচে ওঠে।
খুশীর আলোকে ও একটার পর একটা তীরে পালক বাঁধতে থাকে।

# ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক

[ ১৮৮৫ ]

## অনিল বিশ্বাস

দেশকাল সন্ততি হ'লো ভাবের গঙ্গোত্রী। কালের ঔরসে ও দেশের গর্ভেই এর জন্ম। এর সৃষ্টিলগ্নে তাই ভিড় করে দেশকালের ব্যাপ্তি সত্তা। এরি ফলে ভাবেরও হয় রকম ফের। এর একদিকে উত্তরাধিকার, অন্যদিকে অর্জন। এক কোটিতে 'স্থায়ী' অন্য কোটিতে 'সঞ্চারী'। 'স্থায়ী'র বিস্তার কালে আর 'সঞ্চারী'র দেশে। বলা বাহুল্য, একটিকে ছেড়ে অন্যটি বাঁচতে পারে না। কাজেই 'সঞ্চারী'তেও কালের প্রভাব স্বীকৃত যদিও এ আছে গৌণভাবে। তেমনি 'স্থায়ী'র স্থাবরত্ব দেশশায়ী। দেশকাল ছাড়াও আছে মনন যা ভাবের প্রাণপ্রেরণা যোগায়। ভাব যখন বিভাব-অনুভাবের মনায়নে রসে পৌঁছয়, তখনি এ পায় সাহিত্যের জয়মাল্য। এই যে সাহিত্যায়ন এতে ভাবের দান অনুপেক্ষণীয়। এর জন্যে আছে বিশেষ দেশ ও বিশেষ কাল। কালের দিক থেকে বিশ শতক যেমন স্মরণীয়, তেমনি দেশহিসেবে ফ্রান্স। এরি তটে ভেঙে পড়েচে ভাবের ঢেউ বৈচিত্র্যের রঙে। এর সাংস্কৃতিক আকাশে কতনা ভাবের ফুলঝুরি। বস্তুত, য়ুরোপের ভাবমান হ'লো ফরাসী-প্রতিভা। এরি রূপায়নে ফুটে উঠেচে যুগচেতনা। ভাবপ্রবাহিণী ব'য়ে চলেচে বিচিত্রধারায়। তাই ফরাসী প্রতীকিতা যেমন ঘোষণা করেচে উনিশ শতকের দেহান্ত, তেমনি বিশ শতকের অভ্যর্থনাও জানিয়েচে এর ভবিষ্যবাদীরা। মালার্মে ও ভেরলাঁকে কেন্দ্র করে দ্বিধা হয়েচে এর প্রতীকিতা। এর এক বাহুতে অবচেতনার রূপায়ন, অন্য বাহুতে মুক্তকবাদীর সুরসংগতি। শুধু তাই নয়, এর শিকড় চারিয়ে গেচে অন্য দেশেও। বিবর্ত্তনে তাইতো দেখা যায় ইংল্যাণ্ডের শতজাস্তিকতা, আমেরিকার চিত্রকল্পীদের, জার্মানীর রিল্কে ও ষ্টিফান জর্জকে, স্পেনের আধুনিকদের, নরওয়ের ইবসেনীবিগ্রহকে এবং আয়ারল্যাণ্ডের মরমিয়াদের। এরপর "ভবিষ্যবাদ" ভেঙে পড়েচে ইঙ্গ-মার্কিন 'আবর্ত্তবাদে' ও 'চিত্রকল্পিকতা'য়, জার্মান 'রূপকতা'য় এবং স্পেনীয় 'চরমবাদে'। কালান্তরে ভাবসমুদ্দুর দুলে উঠেচে ট্রিষ্টান জারার 'দাদায়নে'। 'ভবিষ্যবাদে' যেমন হয়েচে বিশেষ্য ও ক্রিয়ার অনুপ্রাসে ছন্দস্পন্দ ও বাক্যরীতির ভরাডুবি, তেমনি এখানেও অর্থলোপ। তারপর ভাবের ঊর্মিলতায় ঝিলকিয়ে উঠেচে 'অতিবাস্তববাদ' যার পুরোধা হলেন আঁদ্রে ব্রিটন ও ফিলিপ সুপাউণ্ড। এই অতিবাস্তব এগিয়েচে তিনটি ধাপে। ১৯২০-২৪এ হ'লো অবচেতনার বিস্তার ও রাজনীতির কার্যক্রম তৈরি; ১৯২৫-৩০এ আন্তর্জাতিক সাম্যবাদের 'বিশুদ্ধ

স্বয়ংক্রিয়তা'। আর তিরিশোত্তর সাধনায় এ হ'লো মস্কো থেকে বিচ্ছিন্ন। এরপর প্যারীর পতনে এ আশ্রয় খুঁজেচে মার্কিন মুলুকে। এ-ছাড়াও ফরাসীমানসে ধরা পড়েচে ছোটখাট ভাবের ঢেউ—ডুহামেলের 'সংঘবাদ', লেমনিয়ারের 'গণবাদ' ও সার্ত্রের 'অস্তিত্ববাদ'। এককথায়, এ হ'লো ফরাসী ভাবাকাশের ঘূর্ণিঝড় যা য়ুরোপের বুকে ভেঙে পড়েচে রূপের ঝলকে। এরি রূপায়নে উপন্যাসের দানই বেশি, যেহেতু এ হ'লো প্রবাদপ্রাণীর সহস্রাক্ষির এক অক্ষি। এই প্রাণীর প্রতিটি চোখই পৃথিবীর ধূলিকণা চিত্রণে দক্ষ। এদিক থেকে প্রত্যেক উপন্যাসই যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি এর ঔপন্যাসিকও। এই স্বাতন্ত্র্যের স্বকীয়তায় স্মরণীয় ১৯৫২এর নোবেল-পুরস্কৃত ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক।

মরিয়াকের সাহিত্যসাধনার ফসল শুধু যে কথাসাহিত্য তা নয়। সাহিত্যায়ন প্রবাহে ধরা-পড়ে সাহিত্যরূপের বিশেষ বিশেষ বাঁক। কখনো কবিতা, কখনো উপন্যাস, কখনো জীবনী, কখনো প্রবন্ধ আবার কখনো বা নাটক। বস্তুত এই পাঁচটি বাঁকেই মরিয়াকী প্রতিভা ব'য়ে চলেচে। এর উৎসমূলে কিন্তু কাজ করেচে ফরাসী ঐতিহ্য যা এগিয়েচে সম্প্রসারণ প্রবাহে। প্রথম বাঁকেই দেখা যায় Les Maines Joints (১৯০৯) Adeau a L'adolescence (১৯০৯) এবং Orages (১৯২৫)। এ হ'লো সাহিত্যের হাতে খড়ি। এরপর দ্বিতীয় বাঁকের পরিচয় মেলে উপন্যাসে। এখানে স্মরণীয় হ'লো L' enfant charge de chains ; Le Baiser au Le'preax (১৯২২) ; Genetrix (১৯২৪) ; L'desert de Lamour (১৯২৫) ; Therese desqueyroux (১৯২৭) ; Le noeud de vipers (১৯৩২) ; La Pherisianne ; Le chemins de La Mer ; La ral ; Ce qui etait perdu ; Le Auges Noiss ; La Mystere Frontenac ; ও La Sagovin। এ-ছাড়াও আছে Le Fleave du Feu (১৯২৩) ; Destins (১৯২৮) ; La Robe pretexte (১৯১৪) ; La chair et La sang (১৯২০) ; Preseances (১৯২১) ; La Finde La Nait ; ও River of fire। বাঁকান্তরে নয়নিমায় ভেসে ওঠে জীবনী লেখন। আত্মজীবনী যেমন আছে তেমনি অন্যের জীবনীও। দৃশ্যান্তরের অভিনেতা হ'লো প্রবন্ধমালা। শেষ পর্বে আছে নাটক। এভাবেই মরিয়াকী সাহিত্যসম্ভার কায়া ধরেচে।

এ সাহিত্যমন্দিরের মালমশলা সংগ্রহে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এক বিশেষ ছন্দের আকুতি চোখে পড়ে। এ হ'লো মরিয়াকী জীবনদর্শন যার দৃষ্টিকোণে আছে জানসেনী চোখ। এ দর্শনের অবলোকনে মানুষের জীবনকে মনে হয় "Cas de conscience" বা বিবেকের মামলা, যেখানে নিত্যই চলেচে দেবাসুরের দ্বন্দ্ব। মানুষ নিয়তই চালিয়ে থাকে শয়তানের সঙ্গে সংগ্রাম। এ হ'লো প্রবৃত্তির খেলাঘর, ফ্রয়েডীয় অবচেতনার বাসাবাড়ি। তাই তো জৈবদেহ জেহাদ ঘোষণা করেচে আত্মার বিরুদ্ধে। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে



মানুষ হয়েচে বিহ্বল, হতচেতন। আবেগের তীব্রতাই বেশি করে চোখে পড়ে। এই যে পাতালপুরীর রহস্য-উদঘাটন এতে বোঝা যায়—

কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহুদূর ?
মানুষের মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর।

এ সম্বন্ধে মরিয়াক নিজেই বলেচেন তাঁর কারবার স্বচ্ছ, ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের নিয়ে নয়। তাঁর অভিযান চলেচে মানুষী-মনের গহনে। তাই তো তাঁর উক্তি : "আমি তাদের কথা লিখি না যাদের গা দিয়ে ধর্ম চুইয়ে পড়চে……এদের জীবন এমনিতেই স্বপ্রকাশ, গল্পরচনার সুযোগ পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি তাদের কথা জানি যাদের হৃদয় কামনা-বাসনার নিচে চাপা পড়ে আছে। এদের হৃদয়ের কথা উদ্ধার করে প্রকাশ করাই আমার কাজ।" এখানে তিনি দান্তের সগোত্রীয়। স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালের আখ্যানে রচনা করেচেন দান্তে তাঁর মহাকাব্য আর মরিয়াক এঁকেচেন অবচেতনার ছবি। দুয়েরি মধ্যে সামঞ্জস্য ফুটেচে পাতাল-মর্ত্তের চিত্রণে। কিন্তু পার্থক্যও কম নয়। দান্তের যেখানে আছে স্বর্গেতে নিষ্ক্রমণ, সেখানে মরিয়াক কদাচিৎ পেয়েচেন উন্নয়নের আলো। "কুষ্ঠরোগীর চুম্বনে" নেয়েমি পেলুয়ার যাকে বলেচে 'ত্যাগ', ফ্রয়েড বলেচেন 'উন্নয়ন', এ হ'লো সেই আলোর ঝিলিক। কাজেই পাতাল-মর্ত্ত পেরিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি-ওঠা নেই এখানে। মরিয়াকী সৃষ্টি 'প্যারাডিসো'র সোনালি চূড়া দেখতে পায়নি, বড়জোর পেয়েচে 'পারগেটরি'র আকুলিবিকুলি। দুয়ের দার্শনিক দৃষ্টিকোণও আলাদা। দান্তের আছে টমীয় দর্শন, যা মরিয়াকে আসন দিয়েচে 'জানসেন'কে। তাই তো এখানে নীতিবাগীশের ধর্মধ্বজা উড়েচে অনিবার্যভাবেই। মন্দর পাতালপুরীতে বোদলেয়ারও নেমেচেন। তবে তাঁর চিত্রণে আছে খেয়ালীপণার বিদ্রোহ, নান্দনিক ভাবালুতা। সেখানে কলাকৈবল্যের পরিচিতি যতটা, ততটা নেই নীতিবাগীশের জয়ধ্বজা। আধুনিক যুগে ধর্মজ প্রলেপেই এগিয়েচেন মরিয়াক। এতে কাজ করেচে তাঁর আবেষ্টনীর প্রভাব। ক্যাথলিক দৃষ্টিতে আছে পার্সকালের "জেন্‌সি"র সক্রিয়তা। এ কিন্তু রূপান্তরিত হয়েচে শোকান্তিকায়। তবে এ শোকান্তিকা রাসিনীয় অর্থাৎ এখানে পৈতিক দিকটা যতটা উদ্ঘাটিত হয়েচে, ততটা হয়নি বাস্তব দিকটা। তাই এ শোকান্তিকা নাটক হ'য়েও হ'লো না। নীতির একচোখেমির জন্যে কালায়নের প্রভাব হয়েচে সীমিত। তবুও প্রবৃত্তির সংগ্রাম উত্তীর্ণ হয়েচে ভাষায়নে। আর এ-ভাষা রাসিনীয়—স্বচ্ছ, সরল অথচ ভাবব্যঞ্জক। ঐতিহ্যের রক্ষণশীলতাই শেষে মরিয়াককে নিয়ে এসেচে সাম্যবাদের বিরুদ্ধে। তাই ১৯৪০ থেকে তিনি La Figaro-তে ঘোষণা করে বলেচেন তাঁর জেহাদ। এখানে সাহিত্য চাপা পড়েচে সাংবাদিকতায়।

চৈ—৮৩—৫

এই যে বিচিত্র-রঙা সাহিত্যফসল এর মধ্যে মরিয়াকী কৃতিত্ব ফুটেচে উপন্যাসে যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিবেশে জন্ম নিয়েচে। উপন্যাসের মধ্যেও কয়েকটি বিশিষ্ট ভঙ্গি আসন জুড়ে বসেচে। কখনো চরিত্রোপন্যাস, কখনো নাট্যোপন্যাস, কখনো বা দুয়েরি যৌথ সৃষ্টি। চরিত্রোপন্যাস নাট্যোপন্যাস থেকে একটু আলাদা। প্রথমে 'দেশ'ই প্রধান আর 'কাল' গৌণ, কিন্তু দ্বিতীয়ে 'কাল' হয়েচে মুখ্য আর 'দেশ' অপ্রধান। কাজেই দেশের পটেই আছে প্রথমের পরিচয় যেমন কালায়নে দ্বিতীয়ের নাটকীয়তা। এক কথায়, চরিত্রের জন্যে চাই স্থাবরত্ব যা দেশই যোগাতে পারে। পক্ষান্তরে নাটকের দরকার জঙ্গমতার, যার জন্যে 'কাল'ই উপযোগী। এ-ছাড়া দেশকালের সমাহার দ্বিগুতে আসে নাট্য-চরিত্রোপন্যাস যাতে দুয়েরই মিশেলি চোখে পড়ে। উপন্যাসের এই তিন ভঙ্গির পরিচায়ক হ'লো মরিয়াকের তিনখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। প্রথমেই তাঁর চরিত্রোপন্যাস "টেরেসে"র কথা। এর কল্পলতিকা গড়ে উঠেচে নায়িকা টেরেসকে কেন্দ্র করে। বিত্তের আবহাওয়ায় লালিত হ'য়ে সে বিয়ে করেচে বিত্তবান বার্ণার্ডকে। তবে সে অর্থের লোভে। পরে বার্ণার্ডের অসুখে টেরেস তাকে দিয়েচে বিষ খেতে। ধরা পড়ায় মামলা হ'লো টেরেসের বিরুদ্ধে। কিন্তু বার্ণার্ডের সাক্ষে সে খালাস পেল। এতে বার্ণার্ডের প্রেম ছিলনা। নিজ পরিবারের মর্যাদা রক্ষার জন্যেই তার এ-সাক্ষ। তারপর টেরেসকে করা হ'লো অন্তরীন। মেয়ে মেরি ও সংসার থেকে টেরেস হ'লো বিচ্ছিন্ন। আর নিঃসঙ্গতায় সে হ'লো উন্মাদ। জীবন সায়াহ্নে মেরির প্রণয়ী জর্জ এলো। তাকে কেন্দ্র করে ধক্ করে জ্বলে উঠ্লো টেরেসের রুদ্ধ প্রেম। তারপরেই এ গেলো নিভে। এরপর দেহান্ত। এই যে শোকান্তিকা এতে রূপান্তরের কোন চিহ্ন নেই। নির্মম পরিবেশের বিরুদ্ধে টেরেস কেবল যুদ্ধই করে যাচ্চে। পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব সংঘাতে এগিয়েচে চরিত্রায়ন, যদিও এ স্থাবরতার নামান্তর। কালের ধর্মই, গতি যেমন দেশের স্থিতি। 'টেরেসে' গতির চেয়ে স্থিতিই বেশি। তাই এ চরিত্রোপন্যাস। শোকান্তিকা কিন্তু মর্মান্তিক যেহেতু লেখক টেরেসকে দেখেচেন নৈতিক অবলোকনে। এরপর দ্বিতীয় হ'লো নাট্যোপন্যাস "প্রেমের মরু"। এর আখ্যানের সুতোয় বাঁধা পড়েচে ডাঃ কুরাজ, মারিয়া ক্রশ ও রেমন্ত। মারিয়া ক্রশ একটি শিশু সন্তান নিয়ে বিধবা হয়েচে। ছেলের চিকিৎসাসূত্রে ডাঃ কুরাজের সঙ্গে হ'লো তার পরিচয়। ডাক্তার ভালবাসলো মারিয়াকে, কিন্তু হ'লো প্রত্যাখ্যাত। তারপর ডাক্তারের ছেলে রেমন্ত ভালবাসলো মারিয়াকে। কিন্তু সেও হ'লো প্রত্যাখ্যাত। দু'জনের জীবনেই ব্যর্থতা এসেচে। তবে পথনির্বাচনে পিতাপুত্রে আলাদা। ডাক্তার যেখানে বেছে নিয়েচে ধর্ম ও সংযমের পথ, সেখানে রেমন্ত চলেচে পাপের পঙ্কিলতায়। এদিকে মারিয়া বিয়ে করেচে ভিক্তর লারু সেলকে। নাটকীয়তা ফুটেচে 'রেমন্ত'র উপলব্ধিতে।



সে বুঝেচে, কামনা গভীর হয় সংযমে, তীব্র হয় ভোগে। এথেকে মুক্তি নেই। একটি কামনার সূর্যকে ঘিরে চলে গ্রহ-উপগ্রহের আবর্তন। দেশের চেয়ে এখানে কালের প্রভাবই বেশি। তাই তো চরিত্রগুলি পরিধি থেকে কেন্দ্রে যেতে পেরেচে। কিন্তু 'টেরেসে' চরিত্ররা কেন্দ্রলীন। তৃতীয় উপন্যাসই হ'লো "সাপের গেরো" যাকে নাট্য-চরিত্রোপন্যাস বলা চলে। এর নায়ক জীবন-সায়াহ্নে লিখচে তার আত্মজীবনী। দেশকাল এখানে থমকে দাঁড়িয়েচে ক্ষণেকের জন্যে, হয় তো বৃদ্ধকে করুণা করবার জন্যে। নায়ক স্ত্রীপুত্র থেকে হয়েচে বিচ্ছিন্ন। জড়িয়ে প'ড়েচে সাপের বিষাক্ত কুণ্ডলীতে। তাই জীবন-মরুতে সবই মনে হচ্ছে শূন্যগর্ভ। নায়কের কৃপনতা। করুণরসে হয়েচে উচ্ছল আর নাটকীয়তা এসেচে এই রূপান্তরে। দ্বন্দ্ব সংঘাত মুখর এ চরিত্রায়ন। মরিয়াকী এ সৃষ্টি গুলি এ-ভাবেই পেরিয়েচে দেশের সীমা।

এবার আলোচ্য ফরাসী সাহিত্যে মরিয়াকের স্থান। বিশ শতকের গর্ব এর আধুনিকতায়। এক হিসেবে এই আধুনিকতা হ'লো ঐতিহ্যের নবায়নে। পুরনো ঐতিহ্যকে নতুন পোষাকে সাজানোর কৃতিত্ব আছে আধুনিকদের। এ কাজে যাঁরা পথের নতুন ইঙ্গিত দিয়েচেন তাঁরা হলেন আবিষ্কর্তা। সাহিত্যের ভাস্কো-ডি-গামাদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখ্য। বলা বাহুল্য, এ-আবিষ্করণে উপন্যাসের দানই বেশি। কথনের আঙ্গিকেই কথাসাহিত্যের পথ চলা। প্রথমেই চোখে পড়ে আনাতোল ফ্রাঁসকে যিনি নতুন-পুরনোর সেতু স্থাপক। দ্বিতীয় নাম হ'লো মার্সেল প্রুস্ত যাতে বিষয় ও আঙ্গিকের নবায়নই প্রধান। স্মৃতি-রোমন্থনে ফ্রয়েডীয় অবচেতনার হয়েচে উদঘাটন। ভঙ্গিটাই এখানে মুখ্য। তৃতীয় আবিষ্কর্তা হ'লেন আঁদ্রেজিদ্ যিনি মৌন উচ্ছৃঙ্খলতাকে পাংক্তেয় করেচেন সাহিত্যের বাসরে। চতুর্থ আবিষ্কর্তা হলেন রঁমা রঁলা ও মার্টিন ডুগার্ড যাদের দান 'পর্মার-উপন্যাসে'। এ-ভাবে হয়েচে বিশশতকী ফরাসী উপন্যাসের "হার্দ্দি পরিবর্ত্তন"। এরি পটে বিরাট মরিয়াকী দান। মরিয়াক হলেন ঐতিহ্যপন্থী। ইনি ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এর দুটো দিক আছে—এক, বিষয়বস্তু; দুই, আঙ্গিক। হাল আমলে আদিম দ্বন্দ্বের নিরসন চোখে পড়ে ফরাসী-সাহিত্যে। পাপ-পুণ্যেই প্রতিভাত হয়েচে এই আদ্যিকালের রূপ। সভ্যতার ইস্ত্রীকরণে এ হয়েচে সংস্কৃত। ফলে সংবেদনেরও হয়েচে রূপান্তর আর এ এসেচে সূক্ষ্মায়ণে। কাজেই সংস্কৃতির আধুনিকতায় নেই এই আদ্যরূপ যেমন পল মোরাঁয়। মরিয়াক এ-দিক থেকে পুরনো। ইনি আদ্যিকালে ফিরে গেচেন আর পাংক্তেয় করেচেন পাপ-পুণ্যের সংঘাত তাঁর সাহিত্যে। এতে যে চরিত্রের দৃঢ়তা আছে তা প্রশংসার্হ নিশ্চয়ই। মনের গহনে ঢুকে আবিষ্কার করেচেন অচৈতন্যের আদিরূপ। এর রূপায়নে তিনি এনেচেন রাসিনীয় স্বচ্ছতা, যা ঝরঝরে ভাষায় পাড়ি দিয়েচে।

ফরাসী গদ্যের 'পাস্কালী' আলো আরেকবার ঝিলকিয়ে উঠেচে মরিয়াকের হাতে। উপন্যাসের আখ্যানে নেই কল্পলতিকার বহু-গ্রন্থিলতা। ঘটনার ঘূর্ণিঝড় এখানে অনুপস্থিত। মরিয়াকী উপায়ন সারল্যে এগিয়েচে। এতে ফ্রয়েডীয় "অবাধ অনুষঙ্গ"-পদ্ধতি হয়েচে অনুসৃত যেমন "সাপের গেরো"র নায়ক চরিত্রে। গোটা জীবনই কেন্দ্রীভূত হয়েচে নায়কের ডায়েরী-লেখনে। এ-মনায়নের চেহারা স্মরণে আনে মার্সেল প্রুস্তকে। "প্রেমের মরু"তে পূর্ব ঘটনা বর্ণিত হয়েচে রেঁস্তোরার সাক্ষাৎকারে। "টেরেসে" উদ্ঘাটিত হয়েচে পূর্বজীবন টেরেসের বাড়ি ফেরার পথে। মরিয়াক খুঁজেচেন একটি বিশেষ সুযোগ। তাঁর গল্পায়ন পূর্ণতার জন্যে। এ সুযোগ এসেচে কখনো ডায়েরীতে, কখনো রেঁস্তোরায়, কখনো বা পথ চলায়। এই যে সংযম এতে ধরা পড়েচে রচনার ধ্রুপদীপনা। কথনে-বলনে নেই কিছু অবান্তর। "বোদো" অঞ্চলের চিত্রণ হার্ডির "ওয়েসেক্স" এর কথা স্মরণে আনে। এতে গিরণ্ডি ও ল্যাণ্ডেস হয়েচে জীবন্ত। পাইনবনের সৌন্দর্য, আলোছায়ার লুকোচুরি, বন্য পায়রা, ঝিলকানো হ্রদ, বড়ো বড়ো বালিয়াড়ি, ঘুমন্ত শহর, পরিত্যক্ত রাস্তাঘাট প্রভৃতি চোখে বুলায় মায়াঞ্জন। প্রকৃতির পটে জেগে ওঠে অবচেতনা তার দ্রব্যসম্ভার নিয়ে। মনে হয় যেন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির সঙ্গে চলেচে বোঝাপড়া। আর এখানেই আছে মরিয়াকের বৈশিষ্ট্য।

প্রতিভা ও পরিচিতির সুমিতিসূত্র প্রায়ই পাওয়া যায় না। মরিয়াক এতদিন ছিলেন স্বদেশশায়ী। ১৯২৫-এ ইনি ফরাসী এ্যাকাডেমির পুরস্কার Grand prix du Roman পান কথাসাহিত্যে। ১৯৩৩-এ হয়েচেন ফরাসী এ্যাকাডেমির সদস্য। এরপর Comedic Francoiseএ অভিনীত হয়েচে তাঁর নাটক Armodle। এ-সম্মান কোনো জীবিত লেখক এর আগে পাননি। কাজেই মরিয়াক স্বদেশপূজ্য। ১৯৫২-এর নোবেল-পুরস্করণে তিনি পেরিয়েচেন দেশের সীমা। তাই তো এ-সম্পর্কে তাঁর উক্তি স্মরণীয় :—"আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিচিত্র মনোভঙ্গি পাঠকদের চিত্তে সাড়া জাগাতে পেরেচে এতে আমি আনন্দিত"। এতদিনে হ'লো প্রতিভা ও পরিচিতির মিলন। এতে যে লেখক ভাগ্যবান সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। তবে দেশ পেরোনো উপাদান যে মরিয়াকে আছে তার পরিচয় পাওয়া যায় তৌলন সমালোচনায়। মরিয়াকের "টেরেসে"র সঙ্গে তুলনীয় সতেরো শতকী হে-উডের "দয়া-হত স্ত্রীলোক"। দুয়েরি বিষয়বস্তু প্রায় এক। স্বামীর অনাদরেই শোকান্তিকা এসেচে টেরেস ও ফ্রাঙ্কফোর্ড পত্নীর জীবনে। নিঃসঙ্গতাই হয়েচে দুজনের শাস্তি। এখানে দয়াই হ'লো শাস্তির নামান্তর। একদিক থেকে টেরেসের সগোত্র হলো শরচ্চন্দ্রের সবিতা। সবিতা কেন পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেচে, তার উত্তরে সে বলেচে পদস্খলন "ঘটে আচমকা সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতা"য়। তেমনি টেরেসও বলতে পারেনি কেন সে স্বামীকে



বিষ খেতে দিয়েছিলো। হয় তো এ অবচেতনারই আক্রমণ। নারী-পুরুষের মৌল ভেদ নির্ণয়ে শরচ্চন্দ্র ও মরিয়াক স্মরণীয়। শরচ্চন্দ্রের কমললতা বলেচে পুরুষকে লক্ষ্য করে : "তোমরা চাও বিস্তার, আমরা চাই গভীরতা, তোমরা চাও উল্লাস আমরা চাই শান্তি"। মরিয়াকের "প্রেমের মরু"র নায়কও বলচে : "একেকটা বইয়ের প্রভাবে পুরুষের জীবন ওলট-পালট হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু নারীর বেলায় তা হয় না। বই তার মনে দাগ কাটতে পারে না; একমাত্র রক্তমাংসের প্রত্যক্ষ জীবনই তাকে প্রভাবান্বিত কর্তে পারে।" নোবেল-পুরস্করণে মরিয়াক যে দেশ পেরিয়েচন তার কারণ এখানে নিহিত। তবে কাল-পেরোনা সম্ভব হবে কিনা সে সম্বন্ধে মরিয়াক নিজেই বলেচেন : "জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্মান পেলাম; এ থেকে ভবিষ্যৎকালের মতামতের আভাসও কিছুটা পাওয়া যেতে পারে"। কালায়নে তিনি যে অনেকটা এগিয়েচেন সে-সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এর আয়ুষ্কালের পরিমাণই বিবেচ্য। এ-কাজ ভবিষ্যৎই কর্বে। আজ শুধু এটুকু বলা যায় যে ভবিষ্যতে যদি জীবনরসিক ও জীবনজিজ্ঞাসুর অভাব না ঘটে, তবে নিশ্চয়ই মরিয়াকী-সাহিত্য খুঁজে পাবে তার পাঠক।

ইনফার্নো = 'এদ ইও এতের্নো দুরো'—দান্তে
হিন্দু ইন্দ্র ইনফার্নো থেকে দূরে নয়।

'নদীনাম্ অপ অবৃণোৎ দুরঃ অশ্মব্রজানাম' ॥ ঋগ্বেদ ( ১০, ১৩৯ )
'আমাদের 'পাহাড়পুর' নদীর জলে বরণীয় হোক'

# অঘটনা

## শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার

যাই হ'ক, এক সন্ধ্যায় চিত্রার স্বামী ফিরল না, রাত্রিতেও না, তারপরদিনও নয়, আর কোনদিনও নয়। বড় দুঃসময়ের দিন সেসব। মানুষ যেমন এখন হঠাৎ হারিয়ে যায়, তেমনি তখনও হঠাৎ হারিয়ে যেত। কিন্তু হোক্ নিঃসম্বল গরীব কেরানী তবুও সে একটি মেয়ের স্বামী, দুটি শিশুর পিতা, তাদের সকলের একমাত্র আশ্রয় যে কখনো এমন মুছে যেতে পারে—যদি বা তোমরা বলো সংসারে সে এমন কোন্ স্থানটি পূর্ণ করেছিল যে সে চলে গেলে ধরা পড়বে মানুষের চোখে!

চিত্রার পিতৃকুলে কেউ ছিল না। বিয়ের পর শাশুড়ীকে পেয়েছিল দূর পশ্চিমের এই সহরে আর স্বামীকে। তারপর একদিন দূর সম্পর্কের এই দেবরটি এসেছিল। চিত্রার স্বামী বলেছিল এই আত্মীয়টিকে বসিয়ে খাওয়াবে এমন সামর্থ্য তার নেই। চিত্রার মাথায় চেপেছিল কথাটা আত্মীয়টির কাছে প্রকাশ করার দায়িত্ব। চিত্রা তাকে বলেছিল—তোমার দেশে কে আছে?

—দেশে?

—হ্যাঁ দেশে, মানে বাবা, মা, ভাই।

আত্মীয়টি হেসে বলেছিল—বেশ যা হ'ক। আমার নাম অশোক, তার মানে আমি কারো শোক দূর করেছি তা নয়, আমাকে কারো জন্যে শোক করতে হবে না তাই।

—ও। চিত্রা 'থ' হয়ে গিয়েছিল।

স্বামীকে চিত্রা রাত্রিতে বলেছিল—ঠিকই এসেছে ও। আমার তবু মামার বাড়ী আছে, তোমার তবু মা আছেন, আমি আছি, ওর সেসব বালাইও নেই। অনাত্মীয়ের আড্ডা ঠিকই খুঁজে বের করেছে। চিত্রার স্বামী হেসে উঠেছিল—কিন্তু ওকি লেখাপড়া করবে? জিজ্ঞাসা কোর।

চিত্রার যখন ছেলেপুলে হ'ল প্রথম তখন অশোক বারদু'এক ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে বললে,—ও হবার নয় দাদা। পাঁচ বছর লেখাপড়া ছেড়ে এখন আর মনে করতে পারছিনে। বলো তো ক্লাস ফাইভ থেকে পড়ি স্কুলে। না হয় ছেড়ে দাও আবার ভেসে পড়ি।

চিত্রা বলেছিল—ভাসবে কেন?

স্বামীকে বলেছিল,—স্বজন নেই আমাদের। যারা আসছে তাদের নিয়ে আমরা



মস্ত একটা পরিবার হবো একদিন। নেই বলতে কত হবে। এখন কিন্তু অশোককে চলে যেতে দিওনা।

চিত্রা কয়েকদিন মাত্র মা হয়েছে কিন্তু তার বসার ভঙ্গি, কথার সুর, বক্তব্য, সবটা মিলিয়ে চিরকালের একটি মায়ের মতো দেখাল। তার স্বামী দেখে খুসি হ'ল।

এই বিভুঁই বিদেশ, অবাঙ্গালীর দেশে দুটি ছেলে নিয়ে চিত্রা, তার স্বামী, তার শাশুড়ী আর অশোক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ মানবগোষ্ঠি হয়ে উঠল ক্রমশ। অশোক অর্থ উপার্জন করতে লাগল, সংখ্যার পরিমাপে সামান্য, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাপে অনেক। শেষ পয়সাটা পর্যন্ত চিত্রার হাতে তুলে দিয়ে সংসারের একজন হয়ে রইল সে।

একদিন চিত্রার স্বামী বলেছিল—তুই যা পাচ্ছিস, তাতে তোর একার তো ভালই চলেরে অশোক, আমাদের সকলের সাথে তবে দুঃখের অন্ন ভাগ করে খাচ্ছিস্ কেন?

—তুমি যা উপার্জন কর, তাতে তোমারও তো একলার ভালোই চলে, শুনেছি। চল দু'জনেই মেসে গিয়ে উঠি।

—এরা?

—তাই তো। বলে অশোক হেসেছিল।

চিত্রার স্বামী এলনা। অশোক খুঁজল। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায়, পুলিশের কাছেও খবর দিল। খবর কেউ দিলনা, শুধু পুলিশ সুযোগ পেয়ে চিত্রার স্বামীর অফিসে খোঁজ করল, সঙ্গী-সাথীদের কাছে খোঁজ নিল। শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য বাঙ্গালি বিপ্লবির বাড়ী পর্যন্ত তল্লাসি করে গেল। চিত্রা কাঁদল। চিত্রার শাশুড়ী কাঁদল। চিত্রাকে কাঁদতে কাঁদতে উঠে বসতে হত ছেলে দু'টির জন্য আহার্য যোগাড় করতে। চিত্রার শাশুড়ীর এমন তাগাদা ছিল না। একবছর পরে চিত্রার শাশুড়ীর সব কান্না সব তাগাদা ফুরিয়ে গেল।

একদিন বোঝা গেল সংসারটা চলছে না। খাবার লোক দু'জন কমেছে, কিন্তু তার সঙ্গে কমেছে চিত্রার স্বামীর উপার্জন। বাকি খরচ যা আছে সেটা অশোকের উপার্জনে কুলোয় না।

অশোক বললে—সংসার না চলাটাই স্বাভাবিক, এতদিন কি করে চলল সেটাই বিস্ময়ের। অকাজের জিনিস সোনার টুকরো টাকরা যা ছিল সব গেছে তো।

—কি করি তাই বলো এখন।

—তোমার মামারা না থাকেন, ভাইরা আছেন, একটা চিঠি লিখে দেখ।

—এতদিন কোন খবর দেয়া হয়নি।

—এতো মৃত্যু নয়।

চিত্রা মামাতো ভাইদের খবর দিয়েছিল। দিন পনের পরে উত্তর এল। অশোক

উৎসুক হয়ে ঘুরল খবরটা চিত্রা আপনি দেবে আশা করে, অবশেষে বলল—বলো, কি লিখেছে ভাইরা। খারাপ হলেও মাথা ঘুড়ে পড়ে যাব না।

—কিছু করার নেই তাদের।

চিত্রা বলতে পারল না—মামাতো বৌদি কি লিখেছে। লেখার যুক্তি আছে তাঁর। ধরতে গেলে তিনিই মানুষ করেছেন চিত্রাকে। সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি লিখেছেন : শাশুড়ীও নেই, এ অবস্থায় একজন নিঃসম্পর্কিত যুবাপুরুষের সাথে একা এক বাড়ীতে তোমার মতো বয়সের একটি মেয়ের দিন কাটানো সমাজের সামনে খারাপ নজির রাখছে।

চিত্রা চিঠিটা পড়ে অশোকের পরিচিত মুখখান কয়েকবার দেখেছিল, মাঝখানে একবার একটু সঙ্কোচ বোধ হয়েছিল বৈ কি তার চোখে চোখে তাকাতে। আর একবার তার নিজের অনাহার জীর্ণ প্রসাধন সম্পর্কহীন রুক্ষদেহের দিকেও নজর পড়েছিল—চিঠিটার এমনি শাসন।

কিছুদিন পরে চিত্রা বলেছিল,—তুমি সারা জীবন এমনি অকারণের ঘানি টানবে ?

শিশু দু'টির দিকে নির্দেশ করে অশোক বললে—ওদের চাইতে বড় কারণ আমার জীবনে আর কোথায় আপাতত।

প্রায় দু'বছর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে খোঁজ-খবর নেয়াতে ক্লান্ত না হয়ে অশোক বললে—এক কাজ করো না হয়। বাংলাদেশে কোথাও রেখে আসি বরং তোমাদের, আমি খুঁজে বেড়াই।

—তা হয়না। যদি উনি এসে আমাদের এখানে না পান—কি করে ঠিকানা জানবেন আমাদের। দু'পক্ষই হারালে চলবে না। একপক্ষকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আমার মৃত্যুর পরেও খোকারা থাকবে তাঁর জন্যে দরজা খুলে রেখে। আমি বলি, তুমি বরং এবার বিশ্রাম নাও।

চাকরী করবে তুমি ? চট ক'রে কি বড় চাকরী পাবে ? মেয়েদের স্কুলে চাকরী করার ডিগ্রি তোমার নেই। হাসপাতালের নার্স হতে পার। কিন্তু এটাতো গল্প নয়, বলা মাত্র হাসপাতাল তৈরী হল, খালি চাকরী তৈরী হল। সহরে হাসপাতাল আছে বটে কিন্তু নার্স দুটির একটি না মরা পর্যন্ত তুমি চাকরী পাচ্ছনা।

চিত্রা কি জবাব দেবে ?

অশোক ধীরে ধীরে বললে—দশ বিশ টাকা সেলাই ক'রে পাওয়া যায়, কিন্তু চট্ করে সংসার চালাবার টাকা ওতে হয় না। বরং সেলাইয়ের কাজও কর, আমিও চাকরী করি, দুয়ে মিলিয়ে সংসারটা চালান যায় কিনা দেখ।

তরপর এগার বছর গেল। চিত্রা বললে, শ্রাদ্ধ করতে হবে।



—তা করো।

সামান্য আয়োজনের শ্রাদ্ধ চুকে গেল।

অশোক সন্ধ্যার পর ঘরে এসেছিল কাল সকালেই বাজার করতে হবে কিনা খবর করতে। চিত্রাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দারিদ্র্যজীর্ণ হলেও এতদিন পাড় দেয়া শাড়ী পরেছে চিত্রা, কপালে কখনো কখনো সিঁদুরও দিত। অবেলায় মাথা ঘষে সিঁদুর তুলে ফেলেছে, হাতের লোহা ভেঙেছে, সদ্য বিধবার বেশে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় এই মাত্র শাড়ীর পার টেনে টেনে ছিঁড়েছে, এখনও হাঁপাচ্ছে কিংবা হয় তো কান্না চাপার চেষ্টা করছে।

—এ কি ?

—শ্রাদ্ধের পর এই বিধান।

—না।

অশোক জানতো কোথায় সিঁদুর থাকে। আঙুলে করে সিঁদুর এনে চিত্রার কপালে দিয়ে দিল অশোক।

চিত্রা কিছু বলতে পারার আগেই অশোক ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে অশোক বললে, অমন চেহারা করে ? ছেলেরা ভয় পাবে। পরিবর্ত্তনের কারণ খুঁজে পাবে না।

—ওরা কি সত্যিটা জানবে না ?

—জানবে যখন প্রয়োজন হবে।

—তুমি জান, এ মিথ্যা অভিনয় নয় ?

—অভিনয় হতে পারে, মিথ্যা কেন ?

আরও দু'বছর পরে চিত্রার বড়ছেলে তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ছোটছেলেও ডাগর হয়ে উঠেছে, অশোক একদিন এসে বলল—তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে চিত্রা।

—পার্টনারকে ডাকছ বুঝি ?

—ঠিক তাই। পর পর চারবার প্রমোশনের সুযোগ পাশ কাটিয়ে গেছি এই সহরে থাকার তাগাদায়।

—সে কি ? বলোনি তো কোনদিন। কি তাগিদ এমন এ সহরে থাকার তোমার।

—তাগিদটা কার বেশী সেটা পরে এক সময়ে হিসাব করব। এখন বলো কোম্পানি প্রমোশন দিয়ে অন্য সহরে পাঠাতে চাচ্ছে, যাব কিনা।

—তুমি বল কি করা উচিত।

—টাকা খুব দরকার। বড় খোকার কলেজে পড়ার খরচ চালাতে হবে। অথচ

অন্য জায়গায় গেলে সে যদি এসে ফিরে যায়।

চিত্রা অশোকের মাথার উপর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়েছিল, চোখ নামিয়ে আনতে চোখ পড়ল অশোকের চুলের একপাশে যেখানে দু'একটা পাকা চুল চিক্‌চিক্ করছে।

—এখানকার ব্যবস্থাও একটা কিছু কর। টাকার দরকারও অস্বীকার করা যায় না। তাঁর টাকার উপরে যতদিন নির্ভর করেছি, তার চাইতেও বহুগুণ বেশী নির্ভর করলাম তোমার টাকায়। এখন আর সঙ্কোচ করে তোমার টাকার মূল্যহানি করা চলে না।

চিত্রারা অন্য সহরে এসেছে। প্রমোশনটা সত্যিকারের প্রমোশন। বাড়ী পেয়েছে, তাদের পুরোনো দু'একখানা ঘরের বাসার মতো নয়। বসবার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে অনেকগুলি, সামনে একফালি মরসুমি ফুলের বাগানও আছে।

অশোক শুধু নিজের চাকরির উপযুক্ত পোষাক করলনা, চিত্রা ছেলেদের সাজালো যত প্রকারে সম্ভব। একদিন অফিস ফেরৎ শাড়ী কিনে আনল চিত্রার জন্য। বলল, তুমিই বা বাদ থাক কেন?

—আমি?

—নয় কেন?

—উচিত কি?

—কেন অনুচিত?

এই সময়ে চিত্রা যেমন দেখতে ছিল তার একটু বর্ণনা দেয়া দরকার। প্রায় পঁয়তাল্লিশের দাগ পার হয়েছে তার। পরিমিত আহার এবং কঠিন জীবন যাপনের ফলে প্রৌঢ়ত্ব আসেনি। আধপাকা ধানের রং তার ত্বকের, কানের পাশে দু'একটা চুলে পাক ধরেছে, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কিন্তু তার দাগটি আছে। প্রোফাইল্‌টায় তাকে ভালো দেখায়, সামনাসামনি দেখার চাইতে, কিন্তু ঠোঁটের বাঁ কোণে যে তিলটি আছে তা চোখে ধরা পড়ে না। শেষের দিকের কয়েক বছরে একটু পুষ্টাঙ্গী হয়ে উঠেছে সে, গলাটা ভারী হয়েছে।

এখন তার না-করলে-নয় কাজগুলি করলেই চলেনা। অশোকের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (মাত্রার মাপটা বিগত জীবনের) উপাদান সংগ্রহ করছে, চিত্রাকে দু'হাত ভরে সেগুলিকে ঘরে তুলতে হয়, গুছিয়ে রাখতে হয়।

একদিন আফিস ফেরৎ অশোকের পেছনে ট্রাক বোঝাই হয়ে মস্ত টেবিল এল আর তার সঙ্গে মাপ করে তৈরী চেয়ার।

চিত্রার ছোট ছেলে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে হৈ হৈ ক'রে মাকে ডেকে আনল—দেখবে এসো মা কি এনেছে খানসাহেব।



চিত্রা এল। কর্মক্লান্ত পুরুষ বাড়ী ফিরবার সময় হাতে করে যা এনেছে সেটা হাত বাড়িয়ে নিতেই হয় তাদের যারা বাড়ী আগলে রাখে।

চিত্রা বললে—কিন্তু খাঁ সাহেব, তোমার বসবার ঘরে এ ধরবে কোথায়?

—এটা তো খাবার টেবিল।

—খাবার মানে, সাহেবী ব্যবস্থা?

—আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতে পারব তারই ব্যবস্থা, বললে অশোক খাঁ ভাদুরী। ছোটছেলে আত্মহারা হয়ে বললে, এতদিনে ঠিক একটা কাজ করেছে খান্ সাহেব। আমরা দু'ভাই, তুমি মা আর খান্ সাহেব চারজন আরও দু'খানা চেয়ার অতিথির জন্যে।

—সে কিরে আমি খাব কি তোদের সাথে?

অশোক বললে, এ বিষয়ে আমি আর ছোটবাবু এক দলে, ভোটে তোমার হার।

চিত্রা বললে—তা হবে। এখনি অমনি থাক, আগে চা হ'ক।

একদিন ছোটছেলে মুখ লাল করে ফিরে এল স্কুল থেকে। চিত্রার অনেক অনুনয়েও সে মুখ খুললে না। কিন্তু অশোকের কাছে খবর পৌঁছেছিল চিত্রার মুখে, রাত্রিতে খেতে বসে অশোক খবরটা বার করল ছোট ছেলের কাছে। সহপাঠিদের কাছে খান্ সাহেবের নাম অপরিচিত নয়, ছোটছেলের মুখে মুখে তার সহৃদয়তা সদয়তা সরসতার খ্যাতি সহপাঠিদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। সহপাঠিদের কেউ কেউ আতিথ্য নিয়ে দু'এক বেলা এ বাড়ীতে থাকার সুযোগে খান্ সাহেবের সাথে আলাপ করেও গেছে। আজ একটি ছেলে প্রশ্ন করেছিল: তোরা তো চক্রবর্তী আর খান্ সাহেব তো মুসলমান, তবে? ছোট ছেলে প্রশ্নকর্তার মূর্খতায় হেসে উঠে বলেছিল—খান সাহেবও হিন্দু, তাঁর উপাধি খাঁ ভাদুরী। দ্বিতীয় একটি ছেলে বলেছিল—তা হোক বাবাকে কেউ বাবা ছাড়া খান্ সাহেব বলে না। আর একজন বলেছিল, তুই বা চক্রবর্ত্তী হতে গেলি কেন, খাঁ ভাদুরী উপাধি তো চমৎকার।

সব শুনে অশোক হা হা করে হেসে উঠল। তারপর তেমনি সহসা হাসি থামিয়ে সে বললে,—ছোটবাবু, তুমি কি খাঁ ভাদুরী হ'তে চাও?

—হ্যাঁ।

—বেশ, কাল স্কুলে যাব আমি, ঠিক করে দিয়ে আসব।

—আর কি?

—খান্ সাহেব বলা ভালো নয়, এখন আমরা বড় হয়েছি।

—তোমার দাদা আরও বড় হয়েছে, তার তো ঐ ডাকেই চলছে।

—তা চলুক, বাবা

অশোক সময় নিল, তার সময় নেয়াটা যাতে ছোট ছেলের চোখে না পড়ে সে জন্য তাড়াতাড়ি করে চুরুট জ্বালাল, চুরুটের গোড়া চিবুল।

—আচ্ছা হোক তাই।

ছোটছেলে তখন তখনই ওঠে পড়ল। একটা অজানা দেশের দিশা পেয়েছে সে; উদ্ঘাটনটা তাকে এত অস্থির করে তুলল যে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

ছোটছেলে চলে গেল। অশোক দেখল অভুক্ত আহার সম্মুখে পাংশু মুখে চিত্রা বসে আছে। দু'হাত দিয়ে টেবিলের ঢাকনাটা চেপে ধরেছে নতুবা যেন সে মূর্চ্ছায় ভেঙ্গে পড়বে।

অশোক ওঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

ছোটছেলে মাষ্টারের কাছে পড়ছে—এমন সময়ে চিত্রা এল অশোকের ঘরে। অসুখ বিসুখ ছাড়া অশোকের ঘরে চিত্রা আসে না। হয় তো বা মামীমার প্রাথমিক শাসনই মনের তলায় একটা বাধা সৃষ্টি করেছে। পুরোনো বাড়ীতে পাশের ঘরে থাকার সময়ে তবু এর চাইতে বেশী আসত চিত্রা। এ বাড়ীতে কয়েকটি ঘর ডিঙিয়ে প্রায়ই আসা হয়ে ওঠে না, ঝি বিছানা করে রাখে, চাকর ঝাড় পোঁচ করে।

অশোক বললে—বোস।

চিত্রা বললে—এ কি করলে তুমি?

অশোক বললে—উপায় ছিল কি আর?

—সত্যের চাইতে ভাস্বর আর কি? ওদের কি অপরাধ? সত্য পরিচয় লুকাতে হবে।

—চেষ্টা তো করেছিলাম, চিত্রা, সেটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। হ'ল আর। তোমার ছেলেদের নর-নারীর সম্বন্ধ বুঝবার বয়স হয়েছে।

—তারা কি তাদের মাকে বিশ্বাস করে না, তোমাকে অবিশ্বাস করে?

—না। এ সব প্রশ্ন তাদের নেই। তাদের অত্যন্ত সহজ বিশ্বাস। কি করে হ'ল জানি না। বিশ্বাস ভাঙিয়ে সত্যটাকে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে অবিশ্বাস আসলেও আসতে পারে এই আমার ভয়।

—তাই বলে সারা জীবন মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইব, তুমি বইবে?

—তারা তো একে কলঙ্ক বলে জানে না। কলঙ্ক বলে সন্দেহ করলেও করতে পারত যদি সত্যটা জানত। তারা মিথ্যা একটা কল্পনাকে সত্য বলে জেনেছে, তার উপরে জীবন গড়ে তুলেছে। কোন সন্দেহ, কোন অবিশ্বাসের অবকাশ নেই তাদের কল্পনায়। কলঙ্ক একটা ঘটনা নয় চিত্রা। কলঙ্ক রটনা। কলঙ্কের জন্ম মানুষের মনে, প্রকাশ জিহ্বায়। একটা মিথ্যাও সত্যিকারের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারে।



—কেন তুমি আত্মপ্রকাশ করোনি ওদের কাছে এতদিন—কেন ওদের মিথ্যাকে সত্যি বলে বুঝবার সময় দিলে।

—বোধহয় ওদের শিশু মনকে নিদারুণ সত্যটা থেকে আড়াল করার ইচ্ছায়; কিন্তু তুমি জান, চিত্রা, আমাকে খান্ সাহেব বলে ডাকতে আমিই শিখিয়েছিলাম।

—আমি কি করব? কি করব?

অশোক উঠলে, চুরুট জ্বালিয়ে কি ভাবল, দেরাজ খুলে একখানা চিঠি বার করে দিল চিত্রার হাতে। বড় ছেলে লিখেছে: খান সাহেব, আমার মনে হয়, এতদিনে তোমার জীবনের ভঙ্গিটা বুঝতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে একটি মধুর রসিকতা বলে সবটাকে গ্রহণ করা। তার সব চাইতে বড় প্রমাণ, তুমি তোমাকে খান সাহেব বলে ডাকতে শিখিয়েছ। পরম আরাধ্যের পদ মর্য্যাদায় আসীন থাকার চাইতে সমধর্মী সহচরের নৈকট্যে নেমে এসেছ। কিন্তু শোন, গত পরীক্ষার আগে একরাতে যখন মনে হয়েছিল আশানুরূপ সাফল্য লাভ হবে না, রাত্রির অন্ধকারে দিকে চেয়ে চেয়ে তোমাকে ডাকলাম বার বার, উৎসাহ, আশ্বাস এবং তোমার বিশিষ্ট খেলোয়ার উচিত মনোভঙ্গি পাবার জন্য। বার বার বলেছিলাম, বাবা, আমি যেন তোমার মতো বেদনার দিকে হাসি ভরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি। তা হলে দেখ, মানুষের এমন সময় আসে যখন হাল্কা করে সব কিছুকে নেবার শক্তি অর্জনের জন্য সিরিয়াসলি ডাকতে হয় কাউকে।.....

চিঠি পড়ে চিত্রা উঠে দাঁড়াল টলতে টলতে।

অশোক বললে—আজ সারা রাত তুমি ভাববে, কলঙ্ক মুক্ত মিথ্যা কিংবা কলঙ্কের ছায়াগ্রস্ত সত্য কোন্‌টা হবে। কাল আমাকে হুকুম ক'র।

ছোটছেলের পড়ার ঘরের দরজার চৌকাটে হাত রেখে দাঁড়াল চিত্রা। শুনতে পেল ছোটছেলে বলছে তার মাষ্টার মশাইকে—মাষ্টার মশাই, কাল থেকে স্কুলেও আমার নাম বদলে দেয়া হবে। পাকিস্তান হয়েছে বলেই. তাজমহল ভেঙে ফেলা হবে না; তেমনি আমাদের ভাষাগুলি থেকে ফারসী কথাগুলি বাদ দেয়া হবেনা। তবে আমার উপাধি খাঁ ভাতুরী বলতে দোষ কি হবে।

চিত্রা দাঁড়াল না।

কুণ্ঠা, সংকোচ ও গ্লানি সবটুকু কাটিয়ে উঠতে না পারলেও চিত্রা দেখল এই মিথ্যা পরিচয়টা জীবনকে সুসাধ্য করেছে। অত্যন্ত প্রয়োজনে পথে বেড়িয়েও আগে মনে হত বহু শত চক্ষু তাদের দু'জনের সম্বন্ধটাকে প্রশ্ন করছে, এখন যেন সে সব প্রশ্নের নিবৃত্তি

হয়েছে। পৃথিবীর নানা ব্যাপার (হোক তা রাজনীতি কিংবা সাহিত্য, জুতোর দোকানদারের শিষ্টাচারের প্রয়াস কিংবা কাপড়ের দোকানীর অর্থলালসা) নিয়ে অশোকের মতামত যে হাসি আকর্ষিত করে সে হাসি এতদিন চিত্রাকে চেপে রাখতে হ'ত ঐ প্রশ্নসংকুল কাল্পনিক দৃষ্টিগুলির জন্যে। এখন সে হাসে। ছেলেদের সামনেও সে আজকাল হাসে।

তবু ইতিমধ্যে একদিন এ পাড়া ও পাড়ায় খবর নিয়ে ফিরতে ফিরতে এমন সব কথাবার্ত্তা হল (এতদিন এসব খবরদারি ছুটিছাটার দিনে অশোককে একাই করতে হ'ত):

—সে যদি আসে কোনদিন?

—এই নাকি চিত্রা, তোমার বুকের বোঝা? তা যদি হয় তবে হাসো তুমি। আমার মনে হচ্ছে তার হাতে তোমাকে ফিরিয়ে দেবার মতো মুখ আমার থাকবে।

চিত্রা হাত বাড়িয়ে অশোকের একখানা হাত ধরে বলল—তুমি পারবে পার্টনার। তোমার মনের প্রসারের তুলনায় আমার মন কি তা তুমি দেখতে পেলে এখুনি।

বড় ছেলে কোথায় এক রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত। নাওয়া খাওয়ার সময় নেই তার, বাড়ীতে আসা দূরের কথা। ছোটছেলেও পড়তে গেল অন্য সহরের কলেজে। খাঁ ভাদুরী দম্পতীর হাতে অফুরন্ত সময়। ছোটখাট সভা, ক্লাবের মিটিং, চ্যারিটির জন্য বাজার, এ সবেই দিন কাটে। তাদের ছোঁয়াচে যারা আসে তারাও খুসি কুড়িয়ে নিয়ে যায়। লোকে বলে খাঁ ভাদুরীদের উভয়কে উভয়ের মাপে ভগবান কেটে ছিলেন।

অশোক বলে—বহু যুগের সাধনায় পাওয়া সম্বন্ধ। বিয়ের চাইতেও বড়, কি বলো পার্টনার।

চিত্রা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বলে—প্রায় প্যারালাল ষ্ট্রেইট লাইনের সাধনা।

সহরে সব চাইতে আলোকোজ্জ্বল অংশে স্বামী-স্ত্রীরা ওদের দেখাদেখি পরস্পরকে পার্টনার বলে ডাকতে সুরু করেছে।

কিন্তু আলোর সঙ্গে অন্ধকার না থাকলে বুঝি মানুষের মন ভরে ওঠেনা। নইলে খাঁভাদুরী দম্পতীর পোষ্য এমন একটি পিশাচ কি করে বসবাস করতে পারে এ বাড়ীতে! হোক না দারোয়ানের ঘরের পাশেই তার ঠাঁই—কিন্তু তা-ও ত সদরেরই একটা আবর্জ্জনা—বরং আবর্জ্জনা হিসেবে ওটার গ্লানি সব চাইতে বেশি। এমন কুৎসিত এমন ভয়াবহভাবে কুৎসিতও যে কোনো মানুষ হতে পারে তা না দেখলে কল্পনা করার কথা মনে হয়না। লোকটা বিকলাঙ্গ। একটি চোখ একেবারেই নেই। দ্বিতীয়টির মণিও নিষ্প্রভ, সাদাটে রঙে আচ্ছন্ন। ডান হাতের গোটা কয়েক আঙুল নেই। কিন্তু সব ছাপিয়ে তার মুখের বীভৎসতা। গলিত ক্ষত শুকোনোর সময়ে ত্বকের যে সঙ্কোচন হয়েছিল তাতে তার মুখখানা কঙ্কাল আর পশুর মধ্যবর্ত্তী একটা আকৃতি নিয়েছে।



সেদিন ওরা পিকনিক করতে বার হচ্ছে ফিরতে দু'দিন দেরী হলেও হতে পারে।

সদর দিয়ে বেরুতে বেরুতে চিত্রা বললে, দারোয়ান চাকরদের খাবার ব্যবস্থা ঠিক করা থাকল, দু'দিন দেরী হলেও ক্ষতি হবে না।

—তা হবে। চারদিন হলেও ক্ষতি নেই। ভদ্রগোছের ডাকবাংলো পেলেই হল।

গাড়ীতে উঠে ছোটছেলে বলল,—ওই লোকটা কিন্তু বাঙালি, ঠিক আমাদের মতো বাঙালি নয়, বোধ হয় মহাতো উপাধির প্রবাসি বাঙালি। উচ্চারণটায় জড়তা আছে।

—তা নাও হ'তে পারে। আমরা ঠোঁট, জিভ, দাঁত দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করি, ওর বোধ হয় মুখের পেশীগুলি ঠিক কাজ করে না। অশোক বললে।

ছোটবাবু বললে, ভীতু কিন্তু লোকটি। সেদিন যেই শুনেছে আমাদের উপাধি চমকে উঠলো। যে চোখটা অবশিষ্ট আছে তার মণিটা অস্বাভাবিক ভাবে নড়তে লাগল যেন নড়ে চড়ে বিপদ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে, কিংবা বিপদের পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারবে। আমি বললাম—তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছ আমরা হিন্দু।

—আঘাত পাওয়া লোক কিনা। কিন্তু এবার তোমার গল্প বন্ধ কর ছোটবাবু। তোমার মায়ের মন ভার হ'য়ে উঠছে। কষ্টের কথা শুনলে সকলে সইতে পারে না।

কিন্তু লোকটির অনেক সদ্‌গুণও আছে। কাজ করতে চায়, বসে খেতে চায় না।

—কি কাজ করতে পারে?

—কাজ পাগল লোক খেপল এবার, হাসল চিত্রা।

—কয়েকটা ছোট ছোট কাজ দিয়েছিলাম, পারল না। হেসে বলল—কিছুই যে আর পারিনা, বাবু সাহেব।

—লেখা পড়ার কাজ দিয়ে দেখেছ।

চিত্রা পেছন থেকে অশোকের কাঁধে একখানা হাত রাখল।

—কি?

—দু' পুরুষের কাজের তাগিদে বেচারা কুকুরটা গাড়ী চাপা পড়েছিল।

অশোক হেসে ষ্টীয়ারিং হুইলে মন দিল।

কথাটা পিকনিকেই স্থির হয়েছিল। হিল্‌ষ্টেশনের অত কাছে অমন সমতল উপত্যকায় অতটা ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে এমনটা সহসা আশা করা যায় না। ছোটছেলে চারদিকে ঘুরে এসে বলেছিল—উপত্যকাটা বিচ্ছিন্ন ছিল, ওরা বলছে গত বছরে যে রাস্তাটা শেষ হয়েছে সেটার জন্যেই এতদূর আসতে পেরেছি আমরা। আর সে জন্যেই আজ আমাদের চোখে লেগেছে জায়গাটা।

চিত্রা বললে—এমন জায়গায় এবার কত বাড়ী উঠবে। ঝরনার দিকে মুখ রেখে

একটা ছোট বাড়ী খুব ভালো হয়।

বাসায় ফিরে এসে খাবার টেবিলে এই কথাটাই উঠল।

নৈশ আহার পর্ব শেষ হয়েছে। আলোগুলি কাঁচের বাসনগুলিতে ছোট ছোট তরঙ্গের মতো খণ্ড খণ্ড হয়ে জ্বলছে। চিত্রার হাতে উলের কাঁটা। অশোক পরিতৃপ্তির ছোট একটা উদ্গার তুলে উঠে দাঁড়িয়ে চুরুট জ্বালল। স্নিগ্ধ প্রতিষ্ঠার অবসর এটা। চিত্রা বললে—তুমি তা হলে এখন খুব বড় চাকরী করছ, বলো?

অশোক স্মিতমুখে পায়ের জুতো থেকে ডিনার জ্যাকেট অবধি চোখ ঘুরিয়ে নিল। এখানে বাইরের লোক নেই; যারা আছে তারা সৌভাগ্যের কৃতার্থতার অংশীদার। মুখের আদল দেখা যেত আয়না থাকলে। তা-হলেও প্রৌঢ় এই লোকটিকে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা বড় ডাইরেক্টরের মতোই দেখাচ্ছে।

অশোক বললে,—চিরকাল তো চাকরি করতে পারবো না। তখন কোম্পানির এ বাসা ছেড়ে দিতে হবে। নিজের নীড় দরকার হবে।

চিত্রা বললে—বাঁচার উপরে তোমার খুব লোভ।

ছোটছেলে কফির কাপটা অশোকের হাতে পৌঁছে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—কোথাও যাচ্ছ ছোটবাবু?

রুমালে ঢাকা একটা প্লেট হাতে ছোটছেলে বলল—লোকটাকে খাবার দিয়ে আসি।

—তার কথা তুমি এত ভাবো!

—লোকটি আমাকে ভালোবাসে। সেবার আমার অসুখের ব্যাপার জানো না তো। সে নাকি খবর পেয়েই দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ডাক্তার ডাকা হয়েছে তো? দারোয়ানরা হেসেই বাঁচে না। কিন্তু তাদের হাসিতে ভ্রূক্ষেপ না করে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল। ডাক্তার কি বলে গেল? হাঁটতে অত কষ্ট তবু দারোয়ানের পেছন পেছন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আমার অসুখ সম্বন্ধে তোমাদের আলাপ নিজের কানে শুনে যেত।

—অদ্ভুত স্নেহপ্রবণতো লোকটি। বললে চিত্রা।

ছোটছেলে চলে গেল খাবার নিয়ে।

চিত্রা বললে,—অশোক, এশুধু নিজেদের জীবন পর্য্যন্ত নয়, বাড়ী করা মানে আমরা চলে যাবার পরও আমাদের ইতিহাস জড়িয়ে রইল পৃথিবীতে।

অশোক বললে,—ভেবে দেখি।

কিন্তু ওদের আলাপে ছেদ পড়ল। ছোটছেলে কাতর মুখে ফিরে এল।

—সে নেই।

—সে কি, কোথায় গেল?



—সন্ধ্যায় খাবার টাবার খেয়ে কোথায় চলে গেছে কে জানে।

—অনেক রাত হ'ল চোখে ভালো দেখে না, বলল চিত্রা।

—সে ফিরবে না, বললে ছোটখোকা।

—কি করে জানলে?

—এই দেখ।

একটা পুরানো কাগজের কাটিং, একটা ছোট কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল ছোট-ছেলে। কাগজের টুকরোটায় সে লিখে রেখে গেছে—ছোটবাবু, বিনা কাজে খেতে পারি না। তাই চলে যাচ্ছি। আমি এখন কথা বলা ছাড়া কোন কাজই পারি না, দেখলাম। দেখি যদি কোন প্রতিষ্ঠান কথা বলিয়ে নিয়ে খেতে দেয়।

—এরকম কোন প্রতিষ্ঠান আছে?

—সিনেমা নাটক, ভদ্রলোকের সভাসমিতিতে খানিকটা দর্শনযোগ্য চেহারা দরকার। তা হলে বাকি থাকল চাষী মজুরদের ছোটখাটো সভা।

—কাগজের কাটিংগুলো কেন?

—ওগুলিও বালিশের নিচে ছিল। ২৬শে জানুয়ারীর সংকল্প আছে একটিতে, তার চাইতেও পুরানো একটিতে আছে, বেয়াল্লিশের ভারত ছাড় প্রস্তাবের খানিকটা। উল্টো পিঠে: কে একজন দাদা হারিয়ে গেছে, আর তার ছোট ভাই অশোক তাকে খুঁজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে।

—তুমি এখন কি করবে? অশোক জিজ্ঞাসা করল।

—শুতে যাব।

—কবিতা পড়ে শোনাবে বলেছিলে। অশোক বলল।

—আজ থাক। চিত্রা উঠে দাঁড়াল।

—তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে, মা?

চিত্রা হাসতে চাইল।

—চিজ্ খেলেই তোমার অমন হয় দেখছি। এখন থেকে ওটা টেবিলে আনা চলবে না। মুখখানিও তোমার ছাইএর মতো হয়ে গেছে।

চিত্রা চলে গেলে অশোক আর একটা সিগার ধরাল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছোটছেলে বলল—তুমিও আজ বিচলিত হয়েছ দেখছি। কফির পরে তুমি কদাচিত সিগার খাও।

অশোক কাগজের টুকরোগুলি উল্টে পাল্টে দেখে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল, বললে—হঠাৎ একটা লোক চলে গেল!

# নূতন বই

## নিবন্ধ

নিমন্ত্রণ : শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ; মিত্রালয়।

'নিমন্ত্রণ' একটি রম্যরচনা-সংগ্রহ। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগ যে পরিমাণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে রম্য-রচনা-সাহিত্যের দিকটি এখন পর্যন্ত তাদৃশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। এর কারণ, এ জাতীয় রচনায় যে বিশেষ মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন আমাদের লেখকদের মধ্যে অনেকেরই তা নেই। আমাদের লেখকেরা হয় ভারী চালের প্রবন্ধ রচনা করেন, নয় কথাসাহিত্য রচনা করেন ; কিন্তু এই দুই জাতীয় রচনার মাঝামাঝি আর-একটি যে রচনাপদ্ধতি আছে—যাতে প্রবন্ধ এবং কথা উভয় সাহিত্যেরই বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়—তাতে তাঁদের স্ফূর্তি কম। স্ফূর্তি কম, যেহেতু একাধারে প্রবন্ধকার ও কথাসাহিত্যিক না হলে এই বিশেষ বর্গীয় রচনায় দক্ষতা অর্জন কঠিন। যাকে আমরা ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধ বলি তা যে এই আকাঙ্ক্ষিত সমন্বয়েরই ফল তা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ধারাধরণ বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে।

সুখের বিষয়, হালে বাংলার এই অনাদৃত বিভাগটির দিকে কারও কারও চোখ পড়েছে। তার অর্থ, উপরি-উক্ত যৌগিক মেজাজ বিশিষ্ট লেখক আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। নিমন্ত্রণ-এর লেখক শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই বিরল লেখনীকারদের অন্যতম। তাঁর গল্প বলার সহজ ঢঙটি আয়ত্ত, প্রবন্ধকারসুলভ বিদ্যার ব্যাপ্তি ও চিন্তাশীলতা তাঁর আছে, উপরন্তু তাঁর মন সরসতায় পরিপূর্ণ। এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের সমবায়ে তিনি একজন আদর্শ রম্যসাহিত্যচয়িতা হয়ে উঠতে পেরেছেন। ইতিপূর্বে তাঁর "ব্যক্তিগত" গ্রন্থখানি পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সমজাতীয় রচনার ক্ষেত্রে নিমন্ত্রণ-এর আবির্ভাব গ্রন্থকারের খ্যাতির পরিধি সম্প্রসারিত করল।

গ্রন্থের সংকলিত রচনাগুলি কমবেশি প্রায় সবকটিই উপভোগ্য। তবে এদের মধ্যেও আমাদের বিশেষ ভালো লেগেছে 'দাঁত', 'বালা পোষ' 'শাড়ী' ও 'আমার গিন্নি' নামীয় রচনা কয়টি। লেখকের ভাষা মার্জিত, স্বচ্ছন্দ, প্রসাদগুণসম্পন্ন। কৌতুকের প্রচ্ছন্ন চকিত দীপ্তিতে এক এক জায়গায় স্টাইল সবিশেষ ঝকঝকে হয়ে উঠেছে, লেখায় ব্যঙ্গের ধারাও আছে।

একটি কথা। লেখকের রচনার ধারা আদ্যোপান্ত অনুধাবন করে মনে হল, তিনি মধ্যবিত্ত-মানসিকতার দ্বারা একটু অতিরিক্ত রকম আচ্ছন্ন। মধ্যবিত্ত সংসার-জীবনের ঘরোয়া প্রসঙ্গ তুলে লেখাকে যদি সরস করে তোলা যায় তবে রম্যরচনাকার কোন্ না সে পদ্ধতির শরণ নেবেন ? কিন্তু সেই নজীরে পারিবারিক জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত দিয়ে রচনার কলেবর বৃদ্ধির যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি এক ধরণের অভ্যাস যাকে 'শপ্‌শপে বাঙালিপনা' বললে তার ঠিক কৌলিক লক্ষণ নির্ণয় করা হয়। বিমলাপ্রসাদের মতো শক্তিমান লেখক কেন এই অভ্যাসের দাসত্ব করবেন ?

**নারায়ণ চৌধুরী**



## কবিতা

দিনেশ দাসের কবিতা : প্রকাশক : পাণ্ডুলিপি

'দিনেশ দাসের কবিতা' সংগ্রহ আগ্রহ সহকারে পাঠ করেছি—অনেক পুরনো কবিতা বিগত যৌবনের মাধুর্য্য ফিরিয়ে দিয়েছে। হালের কবিতা পাঠ করেও দিনেশের তারুণ্যের সহজ ভাবটি যে না পেয়েছি, তা নয়। তবে সে তারুণ্যের স্পষ্টত একটা পরিণতি রয়েছে।

দিনেশ সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেন—"বর্তমানকে প্রতিবিম্বিত করার নামে এ যুগের কবিতা বাকচাতুর্য্যের অর্থহীন অরণ্যে পথ হারিয়ে চলেছে। সেই নিষ্ফল আতিশয্যের অরণ্যে দিনেশ দাসের এক একটি কবিতা এক একটি বিস্তীর্ণ হ্রদের মত। জটিল আধুনিক মনের সমস্ত প্রশ্ন প্রেরণা ও প্রত্যাশা তার মধ্যে প্রতিফলিত, কিন্তু স্বচ্ছতা তবু কোথাও ক্ষুণ্ণ নয়। সাময়িক উত্তেজনা ও বাহ্যিক উচ্ছ্বাস থেকে সত্যিকার জাত-কবিতাকে যা আলাদা করে রাখে, সেই অতলতার ইঙ্গিত তার সর্ব্বত্র বর্তমান।"

অতি আধুনিক কবিতা আন্দোলনে দিনেশের সুস্পষ্ট ভূমিকা আছে। বিগত ষোল বছর যাবত তার লেখায় জিজ্ঞাসু মনের খোরাক তিনি জুগিয়ে এসেছেন—অতিআধুনিকতা অর্থ যাঁদের কাছে ফ্যাশান, তাঁরা দিনেশের কবিতা পড়ে কবিতা আন্দোলনের সম্যক রূপটি উপলব্ধি করতে পারেন। কবিতা-আন্দোলনের প্রধান উপজীব্য ভাবের সম্প্রসারণ, ছন্দের মুক্তি ও রাষ্ট্রিক চেতনা। দিনেশের কবিতা এ তিনটি গুণেই গুণান্বিত।

তবে যাঁরা জাত কবি, তাঁদের কবি খ্যাতি সঙ্কীর্ণ সময়ের গণ্ডী ছাড়িয়ে বহুদূর পরিব্যাপ্ত হয়। দিনেশের কবি-যশ ক্রিটিকের অপেক্ষা রাখে না, জনসাধারণের কাছে তিনি সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। জনসাধারণের কাছে যিনি গ্রাহ্য তিনিই অতিআধুনিক—অধুনা সময়ের পরিবাহক। তাঁরই কবি মানসে গণমানসের 'প্রশ্ন প্রেরণা ও প্রত্যাশা'র সংঘাত।

দিনেশ দাস মূলত লিরিকলিপিকার। লিরিকের মাধ্যমে তিনি কাব্যরস পরিবেশন করেছেন, করছেন। বিষয়বস্তু যত কঠিনই হোক, লিরিকের মাধুর্য্য কোথাও ব্যাহত হয়নি, কবিতার আবেদন এতটুকুও ক্ষুণ্ণ নয়। বিগত ষোল বছর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গণ-আন্দোলন, বাংলা বিভাগ, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর করুণ সমাবেশ দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছে—দিনেশ বেদনার্ত হৃদয়ে এ সমস্তকে গ্রহণ করে তাঁর মননের ফসল সাজিয়ে এনেছেন। পাঠক, তোমার হৃদয় উদ্বেলিত হোক! কিন্তু দিনেশকে কেউ ভুল করোনা, তিনি নিতান্তই কবি—লিরিক কবি! তাছাড়া, দিনেশের কবি-মন অতি তরুণ, সৌন্দর্য্যের হীনতায় তাকে পীড়া দেয়, আঘাত করবার ক্ষমতা তার নেই, পথ দেখাতেও জানেনা। খালি প্রতিবাদ করে, প্রশ্ন করে। এ তারুণ্য উগ্র নয়—স্নিগ্ধ, প্রবল নয়—আদর্শপ্রিয়। তাই দিনেশের তারুণ্যের পরিণতি দেখতে পেল গান্ধীজীর আদর্শের অনুসরণে। ঐ বিশাল ব্যক্তিটির ব্যক্তিত্বে যে তারুণ্য সঞ্জীবিত ছিল, তারই অনুরণন দিনেশের কবিমনে প্রচণ্ড ছাপ রেখে গেছে। গান্ধীজীর চিতাভস্ম থেকে নতুন পৃথিবীর পরিকল্পনা করেছেন কবি। দিনেশ এতদিন খালি প্রশ্ন করেছেন, প্রত্যাশা করেছেন—কিন্তু প্রেরণা পেয়েছেন শুধু গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব থেকে।

তাই বলে দিনেশ গান্ধীবাদ প্রচার করেন না। গান্ধীজী তাঁর চিন্তাধারার নিশানা। গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জীবন অনুপম শিল্পের সুষ্ঠুতায় পরিচালিত হয়েছে, অপরূপ ছন্দোময় বর্ণময় তার প্রকাশ, সঙ্গীতময় তার ব্যঞ্জনা! দিনেশের কবি মন ঐ রূপ সাগরেই ডুব দিয়েছে অরূপ রতনের জন্যে।

অমল দত্ত

## গল্প

বোবা ঢেউ—স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্বাচল প্রকাশক।

সাম্প্রতিক পৃথিবীর সব সাহিত্যেই ছোট গল্পের দিকে একটি সহজ প্রবণতা দেখা দিয়েছে। উপন্যাসের পরিচিতি নিয়ে যা বেরুছে অনেক ক্ষেত্রে তাও ওই গল্পের ফালি ফালি ঘটনার বিন্যাস। আজকের জটিল অথচ ছেঁড়াখোঁড়া অপূর্ণ জীবনে-পরিবেশকে উপন্যাসের সরল বিস্তৃতিতে আনলে সুর-সংগতির অসংলগ্নতায় বিব্রত হওয়ার সম্ভাবনা অধিক—তাই শতধাবিভক্ত বিচিত্রের সূক্ষ্ম কাজ অধিকাংশ লেখক গল্পের আটোসাটো ফ্রেমের মাঝে বেঁধে রাখতে সচেষ্ট। বাঙালী লেখকেরাও এদিকে যত্নবান।

তাঁদেরই একজন 'বোবা ঢেউ'—এর তরুণ লেখক স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ হলেও বাঙলা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি নবাগত নন। বেশ কিছুকাল পূর্বে একখানা মাসিকে প্রকাশিত তাঁর একটি গল্প (সম্ভবত নাম রাগিণী) পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বেশ মনে পড়ে। সমসাময়িক পাংশুল জীবনের হতাশা, ক্লান্তি, বস্তু-ব্যভিচার, অবিশ্বাস ও কুটিল স্বার্থ-প্রলোভিত জটিল জটলার গতিকেন্দ্রে 'বোবাঢেউ'-এর গল্পগুলির বৃত্ত। বৃত্তের ওপার থেকে মাঝে মাঝে এসে পড়েছে শুচি-শুভ্র হৃদয়ের মৃতম্লান ছায়া। জীবনের সহজ পরিবেশ আজ আবর্তিত। বিলীয়মান মিতাচার আর শুভ্রতার জন্যে প্রার্থী হয়ে লাভ নেই স্বীকার্য, তবু প্রশ্ন আছে নতুন জীবন-বোধ উদ্ঘাটনের। আজকের দিনের মানুষ আমরা কোন মানুষিক সত্যে চালিত?—এরই আভাস জড়িয়ে আছে 'বোবাঢেউ' এর প্রায় প্রতিটি গল্পে।

গল্পগুলির ঘটনা-বুনোন খুব দৃঢ় না হলেও ভংগীটি অনর্গল। অল্প পরিসরে লেখকের দ্রুতলয়ে ঘটনার বাঁক নেওয়া প্রশংসনীয়। অধিক দ্রুতলয়ে 'আনারসী', 'কবিতার জন্ম', 'মন-মরীচিকা' প্রমুখ কয়েকটি গল্পের পরিবেশ চিত্রণে লেখক ক্যামেরার কাজ করেছেন বলে মনে হয়। 'কাঞ্চন-মায়া', 'মূক যৌবন' গল্প দুটি 'প্রাগৈতিহাসিকে'র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সূক্ষ্ম উপস্থিতি বড় বেশী স্মরণ করায়।

সুনীলকুমার নন্দী

# দেবশিল্প

[ মহাভারতীয় সঙ্গীত ]

নাদব্রহ্ম বলে একটা কথা আমরা শুনতে পাই। কিন্তু যুগ এতো ইতর হয়ে গেছে, পরের সঙ্গে হাততালি দিয়ে আমরা-ও বলতে শিখেছি যে আমাদের সব-তাতেই ব্রহ্ম! সব ঠাটেই যে আমাদের ব্রহ্ম ছিলেন—আমরা যে পরম উপাসক অশোক মৌর্য্যের জাত এ-কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সবাই সাহেব বনলুম—এবং ইদানীং-ও সেই কটা রঙের পরাক্রমে নিজেদের সম্পর্কে কটু-কাটব্য করতে দ্বিধা করছিনে। অনেক চট্টোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়কে বলতে শুনেছি যে আরো বহুযুগ না কি সাহেবদের পা-চাটা কর্ম্মটি আমাদের করে যাওয়া উচিৎ। এই বিধিলিঙ-বাণী শুনে বাংলার বাগ্দেবীর কাছে তাঁদের শাস্তি বিধানের কামনা করব এমন ব্রহ্মতেজ অবশ্য আমারও নেই, তবে সম্প্রতি সুযোগ পেলেই জানবার চেষ্টা করছি যে বৈদ্য বৈশ্য বঙ্গ-বাগীশ্বরী আমাদের জন্যে কোন্ বাণী বীণা-বেণু রবে ত্রিবেণীসঙ্গম তৈরী করেছিলেন। কিন্তু সঙ্গমের সঙ্গীত যে বহুধারার মিশ্রণে তৈরী। তাতে তেমন মহানাদ কোথায়—গৌরীশৃঙ্গের গঙ্গাবতরণে যেমন শোনা যায় বা গদগদনাদ গোদাবরীতে? গঙ্গামৃত্তিকার ছেলে তাই নন্দাদেবীর আনন্দ ভূমিতেই নাদব্রহ্মের সন্ধান করে ফিরেছি। আমার মনে হয়েছে, ছন্দ নৃত্য সবই উৎসারিত দেবভূমি হিমালয় থেকে যেদিন সে দেবভূমি ছিল শিব-কিরাতের হাতে। তাঁরা 'কৈরাত'-মুঙ্গল বা কিরাতী-মুঙ্গল [illegible] হোন—তাঁদের দুহিতা উমা এবং গঙ্গা। তাঁরা কিরাত-শিবের দুই দারা। তৃতীয় দারা এলেন সচী, যৌন-ইন্দ্রের পত্নী কিন্তু সহধর্ম্মিণী নয়। তাই রাগ-রাগিণীর জন্ম এই খানে। রাগিণীগুলো রাগের দ্বার কিন্তু দারা নয়। সহজিয়া আর পরকীয়ারও জন্মস্থল এই প্রাক্‌বৈদিক বেদে-ভূমির মহান যে দোর বা ডোর তা-ই। কে ছিলেন বুদ্ধু হনুমন্ত—সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা? যেম্নি ভরত ছিলেন নাটকের আর তুণ্ড ছিলেন শৈব নৃত্যের পুরোহিত তেম্নি মহানাদের প্রমন্থ ব্রহ্মাপুত্র হনুমন্ত (বন্ধনদশায় তাঁকে 'মহানাদ' পীঠকে দেখা যায়) [illegible] হয়ে হলেন রাগ-সঙ্গীতের জন্মদাতা। বদ্রিনাথের রাজ্যে নন্দাদেবী-গৌরীশঙ্কর থেকে প্রবাহিত গঙ্গার কলধ্বনিই দিকে-দিকে, দেশে-দেশে বিস্তৃত—ভারত-সভ্যতায়, যৌন যোন গ্রীক-সভ্যতায়। একই নন্দ-গোপ-বংশ সবার। একই মেনকা-রম্ভা, যশোদা-গঙ্গা বংশ। হরিহরছত্রে সবাই ছিল এক। যম বলে কেউ 'কালো' নয়, শনি বলে কেউ 'মন্দ' নয়। জলন্ধরের 'মান্দ'-রাগিনী মালবের রাজপুতানীর কণ্ঠে যেম্নি ফুটে উঠ্‌ত তেম্নি দ্রাবিড়-বাংলার কীর্ত্তনে তারই পুনরাবৃত্তিতে পুলকরোমাঞ্চস্বেদশিহরণ অনুভব করতাম।

ঠিক তা-ই করলাম সেদিন পণ্ডিত তানসেন পাণ্ডের কণ্ঠ শুনে। ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁর সুযোগ্য অনুজ তিনি। শৈবতান্ত্রিক কণ্ঠন্যাস, ব্রহ্মা-হনুমন্ত কথিত রাগসঙ্গীতের সমুদয় ইঙ্গিত তাঁর আয়ত্তে। তিনি শুধু বীণারবই শোনালেন না কণ্ঠে, শোনালেন বেণুরব, শোনালেন নর্ত্তকী প্রকৃতির নূপুর-নিক্কণ। ঝঙ্কার-গমক আরোহণ-অবরোহণ এমন সুঠাম সুললিত মাধুর্য্যময় হয়ে প্রতিভাত হতেই পারতনা যদি তাঁর তান্ত্রিক-সাধনা না থাকত। তিনি সাধকোচিত নিষ্ঠার কথা অকপটে এবং সগৌরবে স্বীকার করলেন।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত-সৃষ্টি বল্‌তে যে বস্তুটি বোঝায় তান্ত্রিক-যোগীদের সঙ্গীতে অবিকল সেই কপিল-বস্তুটি ছিল। ছিল নাদ-প্রকৃতির অফুরন্ত লীলা। নিষাদের নিখাদ নিয়ে সুরু হত সুর—মূলাধার থেকে আরম্ভ হত আদি ধ্বনির উত্থান—গিয়ে মিলিত উন্মীলিত হত সহস্রার মহাপদ্মে। সেখানে তিনি সতের সঙ্গে 'সা'—সাকারা। শাক্ততন্ত্রযোগীদের এই ছিল স্বর-সাধন। তাঁদেরই সঙ্গীতগ্রন্থ হল চর্য্যাপদগুলো। তাঁরাই শৈব-যোগী নাথপন্থী উল্টা-সাধক বলে পরিকীর্ত্তিত। তাঁদেরই কীর্ত্তন আশ্চর্য্যচর্য্যা। বিশুদ্ধ ব্রহ্মার মতেও তা পঞ্চম—দ্রাবিড় কর্ণাটেরই রাগিণী পটমঞ্জরী। মধ্য এশিয়া বিজয়ী সাঙ্গীতিক হনুমন্ত বা মীমাংসাকার কুমারিলও তান্ত্রিক সর্ব্বানন্দের মতোই মহাগুরু নিপাতের অপরাধ নিয়ে শব সাধনা

করেছিলেন 'মহানাদ'। পঞ্চম চক্রের নাদ, বাংলার 'মহানাদ'-নগরে তাই এই দুষ্টু ছেলে গোপালের বন্ধনদশা দেখতে পাই। কিন্তু কামরূপের কামাচারী 'ভোগী'-সম্প্রদায় বলে যাঁর মুঘল রাজবংশদ্বারা নিন্দিত ও অনুকম্পিত হয়েছেন তাঁরা ছিলেন বিশুদ্ধ তান্ত্রিক। 'সা' থেকে 'মা' পর্য্যন্ত দেবী 'সামা' ছিলেন তাঁদের বৈষ্ণবী চণ্ডী। ঢাকায় সামবেদী লক্ষ্মণসেনের তৈরী দেবী মূর্ত্তিতে, শ্রীযুক্ত শুভোঠাকুরের সংগ্রহশালায় নদীয়ার 'জীমূত দেবীকাঁয়ার' মূর্ত্তিতে সেই স্নেহময়ী কুমারী কাঁয়ার, মেঘকুমারী মহামায়ার চেহারা দেখতে পাব! তাঁরাও দ্রাবিড়কন্যা কিন্তু সেই দ্রাবিড়দেশ ওঙ্কারধাম বা কম্বুজ শঙ্খনাদ। পাঠান-ইতিহাসে তা শঙ্কনাট হয়ে গেছে। কিন্তু মারাঠারা জানতেন তাঁকে পাশুপতাচারী ঋক্-যজুর্ব্বেদী শৈবসন্তানের দেশ বলে। তাই তাঁদের 'কোলাহল পুরে'ও (কোলাপুর) সে-দেশের 'পদকার'গুলো ছিল। মারাঠা ঐতিহাসিকের আবির্ভাবের পরে বৈদিক 'পদকার' অন্তর্হিত হয়েছে। তবু নেপালে-তিব্বতে তাঁদের চর্য্যাপদ রক্ষিত ছিল গুম্ফায়। মহাগণপতি বৃহস্পতি যা লিখে গেছেন, যা রেখে গেছেন কৌণ্ডিন-নৃত্যপ্রবর্ত্তক আচার্য্য কণ্ডিন, কুণ্ডলিনী শক্তির আধার কুণ্ডিন-নগর বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার হনুমন্তটি নৃত্যের পসরা, ধান্যের পসরা সাজিয়ে সেখানে যে অন্নবস্ত্র নাট্যনৃত্যের ব্যবস্থা করেছেন শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার হয়ত তাঁর কিছুটা খবর রাখেন। তাঁদের লক্ষ্মী-সরস্বতী দুই বোন ছিল 'কোপঞ কম্রতান অঞ' আর 'বম্রতান তৈন ক্রোম।' একটি লোহিতা-ললিতা কোপনা পরা, অপরটির পদ-ক্রম ছিল কম্র এক দুই-তিন। একটি ধানশ্রী, অপরটি বাগশ্রী। এঁদেরই পতি ছিলেন বাংলার রাজা গণেশ। ত্রিবেণী-সঙ্গমের হৈহয় হর্ষবংশ-জাত, হারবর্ষ রাষ্ট্রকূট-জাত, মুকুন্দরামকৃত চণ্ডীমঙ্গলের শ্রীরায় যিনি শৈলবংশের লালদীকে সেনাপতি করেছিলেন, খুঁজে নিয়েছিলেন বল্লালবংশীকে, 'বৃহস্পতি রায়মুকুট' তাঁকে পর্ত্তুগীজ জাউগ কঁত্রোর জবরদস্ত যাদব ভীঁয়াদ বলেই জানতেন।

গণপতি মহাদেবকে যতো রূপেই না পেয়েছি আমরা! কিন্তু সব রূপকে বেঁধে নিয়েছি একটি কল্পনায় নীল-লোহিতে। লৌহিত্যের কামরূপে। লিচ্ছবী-ভঙ্গীতে পেয়েছি এক কুচবরণ কন্যাকে গুরু লুইপাদের যোগাশ্রমের অন্ধকারে, যেদিন তিনি বলেছিলেন কায়া ত গাছ, আছে তার পঞ্চ শাখা রঅণিনী—তুমি কোথায় পদকার সাকল্যের উষসী—কোথায় সুবর্ণত্রীহিমণ্ডিতা 'ধানি' শ্রী মহাশ্বেতা [illegible] সেদিন জন্ম হল বাগশ্রীর, পটমঞ্জরীকে পশ্চাৎপটে রেখে। অশোকগুচ্ছ ফুটিয়ে তুলল খাড়ুপরা চারু মেয়ের কারুবাঁক। প্রাগশোক আচার্য্যের চর্য্যায় দেখতে পাই 'পটমঞ্জরী' সুর। 'পটমঞ্জরী'-রাগে বৈদিক আচার্য্যের পদকার বা চর্য্যাপদটি গাওয়া হত। পটমঞ্জরী ঠিক রাগ নয়, অনুরাগ। আসলে তা রাগিণী—দুপুর-রাতের রাগিণী। কিন্তু এই ঘোর শর্ব্বরীর অন্ধকারে, নাগিনী কুলকুণ্ডলিনী ভৈরবসত্তাময়। কাজেই পটমঞ্জরী অর্দ্ধনারীশ্বর। পরমসৃষ্টি, পরমহংস রূপ নিয়ে পটমঞ্জরীর জন্ম—বেদের 'উষস'—ইজিপ্তের সেতির মতো। মহানাদ ওঁ নিয়ে পঞ্চম চক্রে সবাই ছিলেন সম্পূর্ণ। তবু পুরুষ-প্রকৃতিকে মিলতেই হবে। কাজেই কুমারিল অনুরণনাত্মক 'ন' বা 'নি' ধ্বনির আবির্ভাব ঘটালেন। যা-ছিল মন্ত্রধ্বনি তা শৈব সঙ্গীত-ধ্বনি হল তখন। এ যেন কুমারী গৌরীর পঞ্চতপের শেষে কৌমার্য্য ভঙ্গ। যেন শরৎশশী পূর্ণিমার শেষে হিন্দোলের লোহিতপ্রভাত।

কিন্তু শৈব মুহূর্ত্তের রাগ-পটমঞ্জরী ধরে রাখল মিলনক্ষণের রূপটি—তার সঙ্গীত, তার গদ্‌গদ্ ভাষণ, যামিনীর কুহকে আশ্চর্য্য আচরণের মাধুর্য্য। অশোকের বরভোরু কারুবাকিতে, হয়গ্রীবাদের পালমপেত মন্দিরে দেবদাসী বররোহা হিসেবে এই সহধর্ম্মিণীদের পাওয়া যায়।

বাংলার সত্যিকারের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন হয়ত আমরা সঙ্গীতের প্রকৃত ইতিহাসও জানতে পারব।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি —যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দুটাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা
মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেম রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা
মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা




সূচনা হইতেই হিন্দুস্থানের কাগজপত্র, বিজ্ঞাপন ও পুস্তিকা প্রভৃতিতে যে প্রতীক-চিহ্ন শোভা সম্পাদন করিয়া আসিতেছে, তাহার পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। উহাতে ভৌগোলিক সীমারেখায় ভারতবর্ষের যে মানচিত্র আঁকা আছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য ভারতবাসীর বিচিত্র সংগ্রামের তাহাই পটভূমি। জাতির সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া হিন্দুস্থানই যে প্রারম্ভিক কাযে অগ্রণী হইয়াছিল—এ দাবী সে অবশ্যই করিতে পারে। আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে, মূলধন ও পরিচালনায় হিন্দুস্থান সর্বাংশে ভারতীয়। ভারতের এই মানচিত্র তাহারই প্রতীক। ইহাতে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সেদিনকার দেশহিতৈষী মহৎ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টাই প্রতিফলিত হইয়াছে।

এই প্রতীক-চিহ্ন আর্থিক নিরাপত্তা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, সংরক্ষণ ও শান্তির দ্যোতক এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে ইহার অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রহিয়াছে।

**জাতির আর্থিক কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত**

# হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

## ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

**হিন্দুস্থান বিল্ডিংস,** ৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩






## খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

CBC

# সুপার-নিও-কড্

**বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ**

কলিকাতা-১৩

BETHUNE
COLLEGE LIBRARY
CALL No.
Presentation
Serial No. 19.....

# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০

প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ

সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত

দাম আট আনা

Not For Home Issue

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্দ্দিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শিথীল হয়ে পড়েনি।

**কবিতা**

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**নতুন দিন**
আট আনা

**যৌবনোত্তর**
আট আনা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
**সাক্ষর**
এক টাকা

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পদ্মাকা**
আড়াই টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ মুজতবা আলীর
**নয়নচারা**
দেড় টাকা

**উপন্যাস**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

**কয়েদেবায়**
( ২য় সং )
তিন টাকা

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন রায়ের
**তিনরঙ**
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, ক লি কা তা


# টুকরো কথা... (২৫)

...র্ণ দেশব্যাপী কোনো উৎসব ছিল না আমাদের। এ যুগে পুণ্যবান ...ী শিক্ষিতেরা তাঁদের চিত্তের ঐশ্বর্য আর হৃদয়ের মহিমা, চিন্তার ...ণ আর প্রকাশের ভাষা, কণ্ঠের গান, এমনকি লিপিকর্মের চারিত্র মুখ্যত যাঁর কাছে লাভ করেছেন তিনিই দিয়ে গেছেন বৈশাখ ...সবেরও আমাদের পক্ষে একটি পরম উপলক্ষ্য। বছরের প্রথম ২৫ ...রখটি কেন্দ্র করে যে উৎসব আজ আমরা করি সে আমাদের মুক্ত ...ণের উৎসব। নিয়ত জীবনের মালিন্য ধুয়ে যায় সেই উৎসবের ...াজলে, পূর্ণের পানে আমাদের ব্যাকুলতা নিবেদন করি, খণ্ডকাল ...লোকিত হয়ে ওঠে। কবিপক্ষে আমাদের স্মরণ তাই রবীন্দ্রনাথকে, ...র সঙ্গে অনেক কিছুকে, সব কিছুকে—যার প্রতীক রবীন্দ্রনাথ।

...খিলবঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনের আটদিন ব্যাপী বিরাট উৎসবে ...ীন্দ্রনাথের সঙ্গে এবার যাঁরা আমাদের পরিচয় সাধন করবেন তাঁদের ...্য আছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার ...নগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অমিয়কুমার সান্যাল। বহুরূপী সম্প্রদায় ...র অধ্যায়' অভিনয় করবেন। সুচিত্রা মিত্র পরিচালনা করবেন ...ালিকা' আর প্রতিভা বসু 'গৃহপ্রবেশ'। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের ...নের যাঁরা প্রখ্যাত ভাণ্ডারী তাঁরাও প্রত্যেকেই আনন্দময় করে ...বেন এই উৎসবকে। উদ্যোক্তারা দেশের যথার্থ কৃতজ্ঞতাভাজন॥

...বিপক্ষে এবার সিগনেট বুকশপের দুটি দোকানেই ২১শে বৈশাখ ...কে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত বাংলাকাব্যের সমগ্র সংগ্রহ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে, ...গ্র রবীন্দ্রনাথ, সেই সঙ্গে প্রাচীন-আধুনিক প্রতিটি কাব্যগ্রন্থ, যা ...নো পাওয়া সম্ভব। বাংলাকাব্যসাধনার প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ। ...র পবিত্র স্মৃতি রক্ষার 'প্রকৃষ্টতম পন্থা' কাব্যস্রোতের প্রবহমানতা রক্ষা ...া। রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মতো কবিপক্ষে সেইজন্য অধিকাংশ ...ালী কবির কাব্যগ্রন্থই এই কদিন অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে দেবার ...বস্থা থাকবে।

...ুব সম্ভব কবিপক্ষের কাছাকাছি সময়ে আরো তিনটি নতুন কাব্য ...স্থ প্রকাশ করতে পারবেন সিগনেট প্রেস: অমিয় চক্রবর্তীর ...াম্প্রতিকতম কাব্যগ্রন্থ, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত', আর বিষ্ণু দে-র ...লিয়ট অনুবাদ॥

...ধান্যপুষ্পেভরা দেশগঠনের কাজ কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না, ...দ না সেই সঙ্গে চলে দেশের মানুষ গড়ার কাজ। পৃথিবীতে শিশু ...ায় অকথিত কত রকমের প্রবৃত্তি নিয়ে। আধুনিক শিক্ষারীতির ...া কথা হচ্ছে—এই অনর্জিত প্রবৃত্তিগুলোকে সহজভাবে বিকশিত ...তে দেওয়া। সন্ধানীর জানা আছে সে কাজ কত কঠিন কাজ। এ ...বিষয়ে কলকাতা হেষ্টিংস হাউসে নার্সারী স্কুলের 'শিক্ষিকা-শিক্ষণ ...কেন্দ্রের' পরিচালিকা প্রতিভা গুপ্তের লেখা 'সমাজ ও শিশুশিক্ষা' বইটি ...তি মূল্যবান এবং সুলিখিত। শিশুপ্রসঙ্গে লাবণ্যকুমার চৌধুরীর 'মা ...সন্তান' নামে উপন্যাসটির উল্লেখ করতে হয়, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে—...কালের জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা। শিশুর জন্ম, তার শিক্ষা, তার মঙ্গলময় ...স্থ বিকাশ নিয়ে এই বিবিধ উৎসাহ দেশের সুলক্ষণ। কিন্তু জন্মের ...রে কী নাম রাখা হবে শিশুর? কে ভাবেন সে কথা? গণ্ডায় ...ণ্ডায় মা-বাবারা এ নিয়ে যে চরম স্বেচ্ছাচারের নমুনা দিয়ে থাকেন ...ার শাস্তি আজীবন ভোগ করে বাঙালদেশের ক্ষান্তমণি, আন্নাকালি, ...গদম্বা, বাঞ্ছারাম, আর ভজগোবিন্দেরা। বাংলানামের পূর্ণ সংকলন ...নাম চয়নিকা' প্রকাশ করে মিহিরকুমার দাস দেশের একটা মস্ত কাজ ...রলেন। অতঃপর ভাবী শিশুর দলকে আর স্বনামমাধর্য নিয়ে বিব্রত ...তে হবে না, তাদের মা-বাবারা বইটির যদি উপযুক্ত ব্যবহার করেন।

...জীববিজ্ঞানী হল্ডেন সাহেব আদর্শ করে এই শিশুদের জন্যে যে আশ্চর্য ...ল্পগুলি লিখেছিলেন, 'এক যে ছিল যাদুকর' নামে তার অনুবাদ ...রেছেন অশোক গুহ। ২য় সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে। এই বিভাগে নতুন ...টি অনূদিত উপন্যাস: মিসেস হেনরী উডএর 'দি চ্যানিংস' আর ব্যালেন্টাইন-এর 'কোর‍্যাল আইল্যাণ্ড'। প্রথমটির অনুবাদক ... মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, 'শ্রীমধুসূর' পাতায় 'কল্পিপাথর' নামে অনুবাদ ...এতকাল চাপা পড়ে ছিল। ব্যালেন্টাইন অনুবাদ করেছেন অমিয়কুমার ...চক্রবর্তী। ভূবিদ্যা বিষয়ে বিজ্ঞান বিচিত্রা সিরিজে ছোটদের নতুন বই ...দেবীদাস মজুমদারের 'বুড়ো পৃথিবীর কথা'। আন্তর্জাতিক শিশুসাহিত্য ...সম্মেলনে ভিয়েনাতে গিয়েছিলেন 'যুগান্তর' পত্রিকার 'স্বপনবুড়ো'। 'সাত সমুদ্দুর তের নদীর পারে' বইটি সেই ভ্রমণ-কাহিনী, শিশুদের ...জন্যে। শিশুসাহিত্যে আর একটি সুশ্রী বই সুনির্মল বসুর 'আমার ...ছড়া'—ভালো লাগবে শিশুদের। এই গেল শিশুদের কথা॥

নতুন উপন্যাস এবার তিনটি: মার্কিনি স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর লেখা 'আন্‌ভ্যাংকুইষ্ট', বাংলায় 'অপরাজিত' অনুবাদ করেছেন ...প্রফুল্ল চক্রবর্তী। রোম্যা রলাঁ-র বিশিষ্ট বন্ধু ষ্টেফান্ ৎসোইগ-এর ...উপন্যাস 'অন্তর্জ্বালা' নামে অনুবাদ করেছেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। ...নাৎসী অত্যাচারে সর্বস্বান্ত ৎসোইগ্ দম্পতি গত যুদ্ধের সময় একত্রে ...আত্মহত্যা করে অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নিয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনাগ্রন্থ লিখেছেন ...তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়। লেখকের প্রধান বক্তব্য: রূপক কিংবা ...সাংস্কৃতিক নাটক বললে রক্তকরবীর যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। ...নাটকটি বুঝতে হলে 'আগে তাহার মধ্য হইতে মানুষের সুখদুঃখ, বিরহ-...মিলনের কাহিনীটিকে উদ্ধার করিতে হইবে।'

বই-পড়ার নেশা সব চাইতে বেশি কোন দেশে? রাশিয়ার হিসেবটা ...পাওয়া যাচ্ছে না। বাকি দেশগুলির শিরোদেশে দেখা যাচ্ছে গ্রেট ...ব্রিটেনের নাম। এটা 'বাধ্যতামূলক' বিদ্যাভাসের হিসেব নয়, নেশার-...পড়ার হিসেব। প্রতি ১০০ জনে—গ্রেট ব্রিটেনে ৫৫, আরো শীতের-...দেশ নরোয়েতে ৪৩, কাঠের-দেশ কানাডায় ৪০, পশমের-দেশ ...অষ্ট্রেলিয়ায় ৩৫, কাগজের-দেশ সুইডেনে ৩৩টি লোকের প্রধান একটি ...বাতিক হচ্ছে বই-পড়া। হলিউডের আমেরিকায় এই সংখ্যাটি ...হচ্ছে ২১। খবর-কাগজও সব চাইতে বেশি কেনে গ্রেট ব্রিটেনের ...লোক: এক হাজারে ছ'শো। আমেরিকায় ৩৫৪, স্পেনে ৬০, তুরস্কে ...১৫, আর ভারতবর্ষে ছয়। ছ'শো না, ষাটও না, শুধু ছয়।

শান্তিনিকেতনে গতমাসে সাহিত্যমেলা হয়ে গেল। পুস্তকাকারে তা একটি বিস্তৃত বিবরণী শিগগিরই প্রকাশিত হচ্ছে। তাতে থাকবে ভাষণ আর আলোচনাদির অনুলেখন এবং পঠিত প্রবন্ধাবলী। পূর্ববঙ্গ থেকে মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী মোতাহের হোসেন, কবি শামসুর রহমান আর কায়সুল হক এই মেলায় যোগ দিতে এসেছিলেন। 'টুকরো কথার' সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে এই মেলার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ছাপা হবে। সেটি পেতে হলে সিগনেট প্রেসে চিঠি লেখা প্রয়োজন॥


২১শে বৈশাখ থেকে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ
সিগনেট বুকশপে
কবিপক্ষ

২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের পুণ্যজন্মদিন।
সেই উপলক্ষে সিগনেট বুকশপে বাংলাকাব্যের সমগ্র সংগ্রহ রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কবিপক্ষে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মতো অধিকাংশ বাঙালী কবির কাব্যগ্রন্থই অপেক্ষাকৃত (টাকায় ২আনা) কম দামে সিগনেট বুকশপে পাওয়া যাবে।

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট
১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ



# নিশ্চিত নির্ভর -----

সন্তানই আপনার ভবিষ্যৎ-
সেই সন্তানের ভবিষ্যৎকে
উজ্জ্বল ও সুদৃঢ় করিবার
ভার এখন আপনার

## ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড অফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা


# মার্গোসোপ




নিমের সুগন্ধি টয়লেট সাবান। দেহের মালিন্য মুক্ত করে; বর্ণ উজ্জ্বল করে।

★




# ভৃঙ্গল...

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। কেশ ভ্রমরকৃষ্ণ ও কুঞ্চিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা রাখে।

★




# লাবণি স্নো ও ক্রীম

মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য ও লালিত্য বৃদ্ধি করিতে অদ্বিতীয়। দিনের প্রসাধনে স্নো ও রাত্রে ক্রীম ব্যবহার্য্য।

প্রসাধনে মধুর্য এনে দেয়...

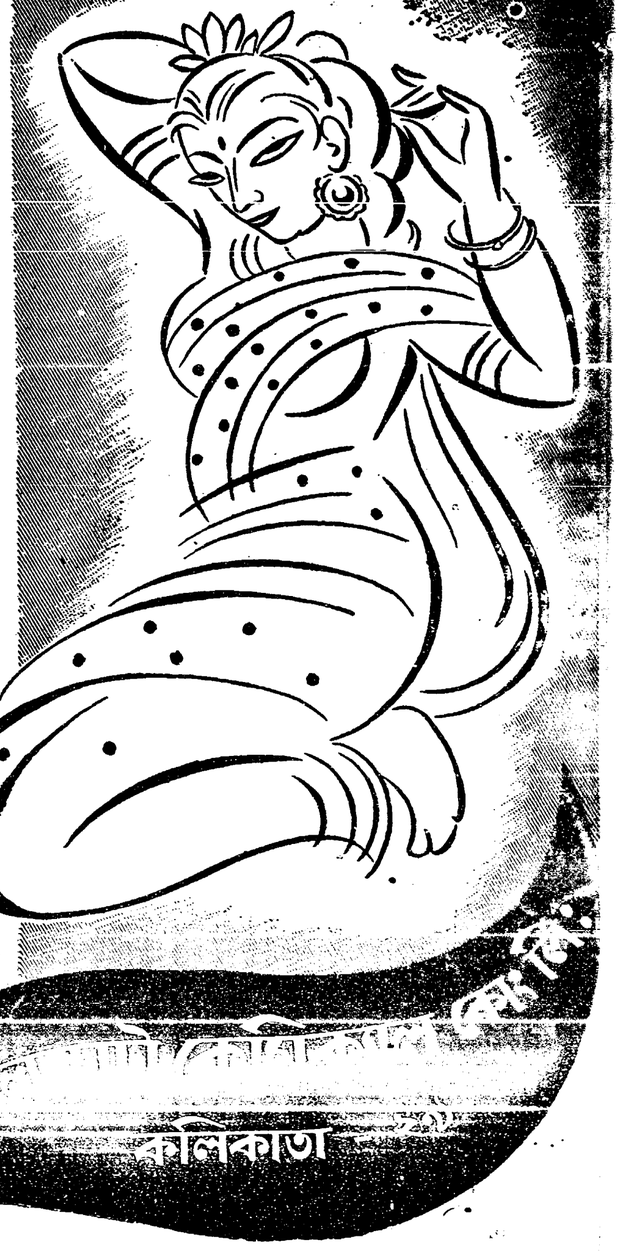

কলিকাতা



সুন্দর কেশই
আপনার
মস্তকের
শোভা

ব্যাঙ্গারাইডিন
হেয়ার অয়েল

কেশের অকাল পতন দূর করে;
কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের
শ্রীবৃদ্ধি করে। সুস্নিগ্ধ এবং
গন্ধ সম্পদে অনুপম।





# A HISTORY of the IKSHVAKU (AKKAD) AT MOHENJODARO

By

**SONJOY BHATTACHARYA**

[ *To be published on 1st June 1953* ]

Rs. 2/-


*PUBLISHERS :*

PURVASA LIMITED

54 GANESH CHANDRA AVENUE
CALCUTTA-13



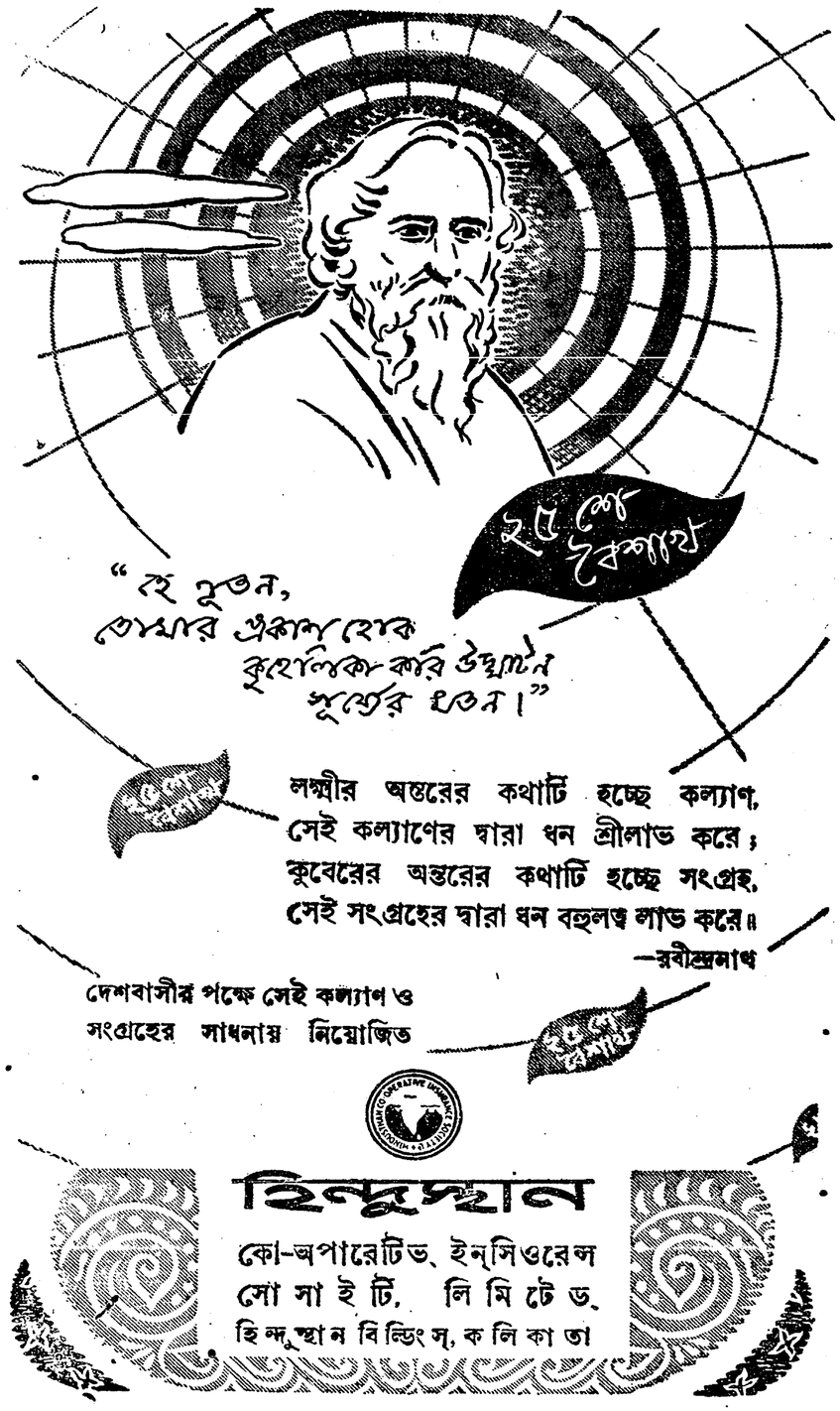

# পূর্ব্বাশা
## বৈশাখ—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ | | |
| উন্মার্গ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ১ |
| এই পৃথিবীর : জীবনানন্দ দাশ | ... | ৩ |
| অচ্ছেদ-সরসী-নীরে : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৫ |
| কর্পূর মঞ্জরী থেকে : দিলীপ দত্ত | ... | ৬ |
| কোন অতনুকার চোখ : নির্মাল্য বসু | ... | ৭ |
| চিত্রনিভ : অরবিন্দ গুহ | ... | ৮ |
| মিতেনী : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ৯ |
| রবীন্দ্র-সংগীত : আনন্দ বাগ্‌চী | ... | ১০ |
| রবীন্দ্রনাথ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ১১ |
| বিবাহিতা স্ত্রী : প্রতিভা বসু | ... | ১৬ |
| কাগজ : অমল দত্ত | ... | ২৩ |
| শিল্পী : জেমস্ জয়স্—অনুবাদক : অশোক গুহ | | ৩৫ |
| ষ্টুডিও : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৪৭ |
| সন্দংশ ( বিরোধী বিজ্ঞাপন ) : সন্তোষকুমার দে | ... | ৫৪ |
| রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা ও অন্য কয়েকটি চরিত্র : সুধীর রায়চৌধুরী | ... | ৫৬ |
| সাহিত্য-বিচার | ... | ৫৯ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯



## গান বাজনার খবরাখবর—

### ২৫শে বৈশাখ

সংগীত সাগর হ'তে 'রবি'র উদয়। গানে গানে ভরে গেল আকাশ বাতাস, দিগন্তে ধ্বনিত হ'লো—জয় জয় জয়। শুধু বাংলার নয়, ভারতের নয়—সমগ্র বিশ্বে ২৫শে বৈশাখ স্মরণীয় দিন। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি'র মালিন্য দূর করতে নতুন যুগের ভোরের সূচনা ক'রে এই দিনেই বাংলার বুকে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ।

গানের দেবতাকে আজ তাঁরই গান দিয়ে স্মরণ করলেন—প্রণাম করলেন শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় "অরূপ ! তোমার বাণী, অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক্ সে আনি" বলে—GE 24673 রেকর্ডে। এরই অন্য দিকে আছে "ওরে নূতন যুগের ভোরে"। "দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক" এবং "এবার দুঃখ আমার অসীম পাথার পার হ'লো যে পার হ'লো" গান দু'খানি শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রের দরদী কণ্ঠে মূর্ত হ'য়ে উঠেছে—N 82562 রেকর্ডে—এই স্মরণীয় দিনেরই বরণীয় গীতিরূপে।

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠগীতে প্রাণবন্ত "আমার যে সব দিতে হবে" ও "বিমল আনন্দে জাগরে"—N 82553, আর শ্রীমতী গীতা সেনের মধুক্ষরা কণ্ঠে "ক্ষম হে ক্ষম, নম হে নম" ( GE 24670 ) ভাব-ব্যঞ্জনায় অপূর্ব। রবীন্দ্র-গীতি-সাধক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের "তোমার আমার এই বিরহের" আর "তোমার সুর শুনায়ে" (GE 24669) এবং শিল্পী সন্তোষ সেনগুপ্তের "বেদনায় ভ'রে গিয়েছে পেয়ালা" এবং "একদা কি জানি" ( N 82564 ) ঐতিহ্যমণ্ডিত অপূর্ব গীতি রেকর্ড।

বিশ্বকবির নিজ কণ্ঠের আবৃত্তি ও গানের রেকর্ড এবং বাংলার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পূর্ব প্রচারিত রবীন্দ্র-সংগীতের রেকর্ড-গীতির সম্পূর্ণ তালিকা ডীলারের কাছেই পাওয়া যাবে।

এ-ছাড়াও এ-মাসের নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে শ্রীমতী উত্তরা দেবীর ধর্ম-গীতি GE 24672, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ধর্ম-গীতি N 82565, সৌমেন মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান GE 24671, আর "ধ্রুব" "সাড়ে চুয়াত্তর" ও "সাত নম্বর কয়েদী" বাণী চিত্রের গানগুলি 'কলম্বিয়া' ও 'এইচ্ এম্-ভি' রেকর্ডে বেরিয়েছে।

সংগীত নাটক একাডেমীর সমিতি প্রাচীন সংগীত নায়কগণের মার্গ ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেছেন।

গীতি-রসিকদের নিত্যপ্রিয়




তালিকার জন্য পত্র লিখুন

"হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" কলিকাতা



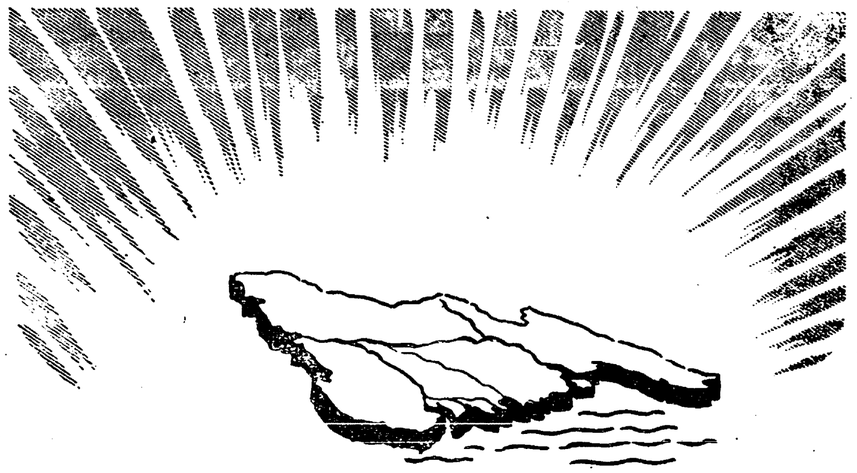

# বাংলাকে আবার শস্য-শ্যামলা করে তোলার



হ'চ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও যন্ত্রের সাহায্যে চাষ-আবাদের প্রবর্ত্তন। তা করতে যেমন প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন তেমনি যারা শেয়ার কিনে এই মূলধন যোগাবেন তাদের পক্ষে উচ্চ হারে লভ্যাংশ প্রাপ্তিও সুনিশ্চিত। মডেল ফারম পাঁচ হাজার বিঘা জমিতে এই পদ্ধতিতে চাষের ব্যবস্থা করছে। তাতে সম্পত্তি, উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি খাতে খরচ—চার লক্ষ টাকা ও কার্য্যকরী মূলধন—এক লক্ষ টাকা, মোট পাঁচ লক্ষ টাকা। আয়—পঞ্চাশ হাজার মণ শস্য, তরিতরকারী, ফল, মাছ, দুধ, হাঁস, মুরগী, ডিম প্রভৃতি থেকে দুই লক্ষ টাকার উপর। কাজেই সব খরচ বাদ দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর শতকরা ১৫৲ লভ্যাংশ প্রত্যেক বছরই পাওয়ার আশা খুবই সঙ্গত। ফারমে কাজকর্ম্ম ইতিমধ্যেই আরম্ভ হ'য়ে গেছে। শেয়ার সম্বন্ধে যাবতীয় খবর চিঠি লিখলেই জানা যায়

# মডেল ফারম এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড.

ম্যানেজিং এজেণ্টস — পূর্ব্বাশা লিমিটেড

হেড অফিস—পি-১৩, গণেশ চন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা

ফারম—বসতপুর ( যশোহর জেলা ) ও বেহালা, কলিকাতা

MFB—1

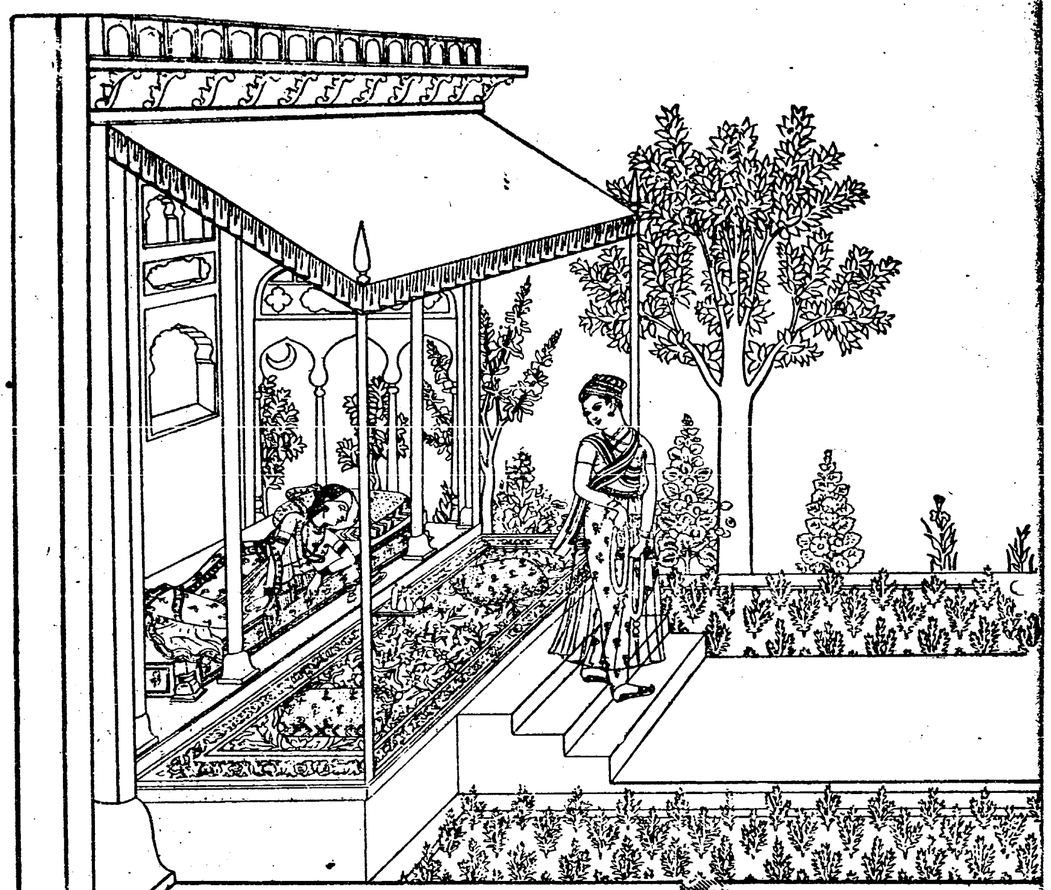

ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিনীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে। দিনরজনীর বিচিত্র পরিবেশে সুরসৃষ্টির আবেদনটি এই রূপায়নে মূর্ত হয়ে আছে।

## চা

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দিয়েছে, সঙ্গ দিয়েছে, দিয়েছে নব নব প্রেরণা।

CTB 103

## ললিত

প্রভাতের একটি সুল
রাগিনী। উপরের আলে
তারই রূপায়ন। দিবা ও
চির-বিরহমধুর সন্ধিক্ষণটি ল
মূর্চ্ছনায় মূর্ত হয়ে আছে।

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃ



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ—১৩৬০

প্রথম সংখ্যা—বৈশাখ


## কবিতা-গুচ্ছ

### উন্মার্গ

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

ঢেউ গুণে গুণে কেটে যায় বেলা
সিন্ধুতীরে :
জানি পুনরায় ভাসাব না ভেলা
অবাধ, অগাধ, অপার নীরে।
তবে মাঝে মাঝে কেন মনে পড়ে
পালের স্ফূর্তি উদ্দাম ঝড়ে ;
উধাও তারার ইশারায় পথ
অবার নিরুদ্দেশে,
যেথা সর্বতোভদ্র জগৎ
সম্ভাবনার নিখিল নির্বিশেষে ?

অথবা নিবাত, নির্মল, নীল
দ্বিপ্রহরে
পরিণত মায়ামুকুরে সলিল
আকাশে, বাতাসে আলস ভরে :
স্তম্ভিত তরী যেন পটে আঁকা ;
অবাক বলাকা সংবৃতপাখা ;
অনাথ দ্বীপের বৃথা অধিবাস
বিলীন বিস্মরণে ;

অপ্সরীদের নিভৃত বিলাস
মুক্তাবিকচ রক্ত প্রবাল-বনে ॥

কখনো আবার বাদলে ব্যাহত
আলোর গ্লানি
চেতনাচেতনে ঘনায় নিয়ত
অজাত দিনের অন্ধ হানি।
কিন্তু একদা সন্ধ্যার আগে
মৌসুমী মেঘ ভিন্ন দু ভাগে,
স্নানযাত্রার স্বর্ণ সরণী
মুক্ত মর্ত্যধামে :
দক্ষিণে ডোবে স্মিত দিনমণি,
পৌর্ণমাসীর চন্দ্রমা জাগে বামে॥

তার পর প্রতি পলের অভেদ :
দিবা ও নিশা
আনে না কালের স্রোতে বিচ্ছেদ ;
এমনকি আয়ু হারায় দিশা।
নিত্য অন্তরীক্ষ ও জল,
অতৃপ্ত তৃষা তথা কুতূহল,
এবং দুরাপ, দূর দিগন্ত—
মূর্ত অসন্ধান ;
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত
সে-যবনিকার প্রতিভাসে ক্ষীয়মাণ ॥

তবু এসেছিল সহসা ব্যাঘাত
স্বগত ধ্যানে।
কঠিন মাটির অভিসম্পাত
বর্তেছিল কি অভিজ্ঞানে ?
অন্তত দিতে চেয়েছিল ঘুষ
মণিকাঞ্চন-যোগে প্রত্যুষ ;



প্রশস্তি ব'লে হয়েছিল ভুল
শঙ্খচিলের হাসি ;
মায়াবী পুলিনে লোভের প্রতুল
দেখেই তরণী শূন্যে অবিশ্বাসী ॥

অনাত্মীয়ের মুখ চেয়ে আছি
সে-দিন থেকে :
উঞ্ছ কুড়িয়ে অগত্যা বাঁচি
নিরুপার্জন নির্বিবেকে।
দৃষ্টির সীমা মাপে হিমগিরি ;
পর্ণকুটীরে দুর্যোগে ফিরি ;
সৈকতে এসে বসি কদাচিৎ
অমার উপক্রমে ;
মহার্ণবের সামসঙ্গীত
হয়তো বা শুনি শুক্তির মাধ্যমে ॥

Not For Home Issue

## এই পৃথিবীর

জীবনানন্দ দাশ

এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে ;
অঘ্রাণ মাস রাত্রি হ'লে অনেক বিষয়বিষের সমাধান
মাঠে জলে পাখির নীড়ে নক্ষত্রেতে থাকে ;
অমেয় গোলকধাঁধায় ঘুরে প্রাণ
চেষ্টা করে সমাজ জাতি সময় সৃষ্টি সঠিক বুঝে নিতে।
সকল প্রয়াণ সফল হবে গ্লাশিয়ারের দীপ্তি আসার আগে ;
এখন রৌদ্রে আজন্মকাল অনুষ্ঠানের দিন ;
সফল হতে ইতিহাসের অনেক দিন লাগে।

সে সফলতা এই পৃথিবী—হয়তো সৃষ্টি চূর্ণ হ'লে হবে ;
আমি অনেক দূরের থেকে তাহার কারণধ্বনি

নীল আকাশে জ্যোতিষ্কদের একে একে নিভে যেতে দেখে
সমাজ জাতি ধ্বংস হয়ে যেতেছে বলে—শুনি।
জানি নতুন নক্ষত্রেরা আবার ফিরে আসে,
নতুন সমাজ শুদ্ধ ভাষা মানুষ সৃষ্ট হয় ;
অসংখ্য কাল কেটে গেলে বোঝা যাবে হয়তো প্রেমের মানে
সেন্টিগ্রেডের ধারণাতীত হিমের ভিতর নয়।

এসব তবু হেমন্তেতে স্তব্ধ হ'য়ে থেকে
সময়সেতু পেরিয়ে কথা ভাবা।
আজকে তবু খণ্ডকালের শিশু আমি ;—নারি,
তোমার কাছে জানিয়েছিলাম দাবি ;
মহাকালের হাতের স্নিগ্ধতা যে ভালো ক্ষমাময়
অন্ধকারে শিশির পাতায় পালকে নীড়ে ঘাসে
আস্তে সে তা' জানিয়ে যায়,—যদিও রাতদিন
অবাধ রক্ত রয়েছে ইতিহাসে ;

হয়তো তা-ই সত্যি, তবু আজকে রাতে আমি যে একা আছি
সে অধোগামী চিন্তাধারা থামিয়ে দিয়ে তুমি
জেনেছি এই নিখিলে শেষ একটি চেতনা ;
অথচ কী ব্যাপ্ত অবচেতন মরুভূমি।
কোথায় তুমি রয়েছ আজ—সে কোন্ নাগর আলোর নীয়নে
আজ সমাজের গলিত নাম তোমার মুখে উচ্চারিত হয় ?
সে কোন্ মৃত উপগ্রহ সসম্ভ্রমে উঠে
আজকে তোমার পদার্থে চিন্ময়।

তবুও অণুপরমাণু হেতুরীতির কোথাও কোনো স্খলন হয় নাই ;
সকলি ঠিক—তুমিও নিজে স্বাভাবিকতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে
নীলকণ্ঠ পাখিকে আজও আকাশ দেখাবে
তোমার নীলাম্বরীতে সব নীলিমা মুছে দিয়ে।



সূর্য জ্বলে—মেঘরা ভাসে—ঝাউ সিন্ধু নিম প্রকম্পিত হয় ;
নদীর জলে সমস্ত দিন ক্রন্দসী উজ্জ্বল ;
তোমায় আমি ভালোবাসি—এই সত্য স্বভাবপৃথিবীর
দানের মতন নিজেরই ফলাফল।

## অচ্ছেদ-সরসী-নীরে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

তারপর তুমি একা। তোমার হৃদয়ে আমি একা।
সে মাহেন্দ্রক্ষণ চলে গেছে,
সে আকাশে বজ্র বলে গেছে :
'সরোজিনী সূর্য্য নেই তোমার নিকষে ছাখো শুধু হেম-রেখা।'
শুনেছ কি ধ্বনি
মেঘের ? মনের ঘরে মসীময় কাকচক্ষু জলে
আসেনি অমনি
একটি বিগত মুখ ঊর্দ্ধেঅধে অকূল অতলে
অচ্ছোদ চোখের বাঁকে অচ্ছেদ, জুলেখা ?
কবে কোন্ বক্ষু-তীরে ছিলে ফের ইসুফের সঙ্গে হল দেখা
আজ, বাঁকা-ভুরু 'বাকি-কামানে-ওয়লে' !
কতো যুগ বিন্দু হয়ে ফিরে এলো কেশতুল্য নলে :
তোমার কৈশোর-স্মৃতি সচী-হওয়া মনে-মনে-বলা :
"পাব তারে যদিও বা মত্তহস্তী কমলের বন দলে গেছে।"

সব প্রতিশ্রুতি ফিরে এলো।
শ্রুতির ওপার থেকে সব কথা, কথা-দেওয়া বন-দেয়াসিনী
একটি দেবতা ঘিরে ফিরে এলো ময়ূরীর মতো :
"কাশ্মীরের গিরিশিরে কে সূর্য্য জাগ্রত
কার রশ্মি ঝিলিমিলি অরুণের রাগে এলোমেলো—
তারে বুঝি যুগে-যুগে চিনি !—

উজ্জয়িনী-কান্যকুব্জ-খাজুরাহো-বুন্দেলাকে ভুলিনি ভুলিনি,
সব ধ্বনি এক হয়ে শ্রাবণের কেকা !"

সব পদাঘাতে ফোটে যেন শুধু একটি অশোক
সব স্বপ্ন এক হয়ে পাটলি-কুসুম।
তারপর চোখে জেনো নেই আর ঘুম
তারপর কারুবাকে দেবদাসী হয়ে থাকা কায়মনে প্রদীপের শিখা!
মধুমাখা কামনার ফুরায় মৌসুম :
পুড়ে যাক ক্ষয়ে যাক রক্ষিতার দৈব বিষ সব নাশ হোক
কি করে শিকড়ে যাবে এ যে বোধিদ্রুম।
পাঞ্চালী বাঁধুক বেণী কর্ণ হোক স্মৃতি-সমাচার
ছায়া-হয়ে মিশে গেছে যেই নাম ফিরবেনা আর।
ফিরবে না দেবযানী কুণ্ডে আর গৌরীপট্টে ভালে তার জ্বলে রাজটীকা।
কুন্তী পাবে কুন্তীপাকে পাণ্ডুরতা, নাটকের শেষ জবনিকা।

কোথায় পেয়েছি বলো কোন্ পর্ব্বে আমার তুমি বা ?
অমলিন অয় হলে তুমি নিশাদল
অগ্নি হলে তুমি সীতা নির্ব্বাপিতা নিভা
সূর্য্য হলে সোনার কমল !

## কর্পূর মঞ্জরী থেকে

দিলীপ দত্ত

( ১ )

মেয়েরা এখন ঠোঁটে মোম ঘসেনা
গন্ধ তেল দিয়ে বাঁধেনা বিনুনী
কাঁচুলীও পরেনা আর
মুখে কুমকুম ঘসতেও উদাসীন
তাই মনে হচ্ছে
শীতকে হটিয়ে বসন্ত এল বুঝি।



( ২ )

শীত চলে গেছে
তাই তারা এখন দাঁত মাজে
একটু একটু করে চন্দনের ওপর মন ঝুঁকছে
চেয়ে দেখ
ঘরের বাইরের বারান্দায়
দম্পতিরা ঘুমোয়
আর পায়ের কাছে জড় করে রাখে
তাদের গাত্রাবাস।

( ৩ )

কুথুমমাখা মারাঠী মেয়ের গালের মত চাঁপা ফুল
অল্প ফেনানো দুধের মত সাদা মল্লিকা
ফুটছে ত ফুটছেই
কিংশুকের গোড়ার রং কালো ;
মাথায় বসেছে কালো ভ্রমর
মনে হচ্ছে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভ্রমর বসে মধু খাচ্ছে।

কবিতা তিনটি পালি কর্পূর মঞ্জরী নাটকের বিদূষকের বসন্ত ও ফুলের বর্ণনার অনুবাদ।

## কোন অতনুকার চোখ

নির্মাল্য বসু

মনে হয় শুধু যেন চোখ দু'টি এঁকে—
এইমাত্র কেউ বুঝি উঠে গেল তুলিখানি রেখে !
তারপর সেই চোখ কোনমুখে বসাতে সে ভুলে গেছে বুঝি ;
অথবা সে কাউকেই পায় নাই খুঁজি
অন্তরের অন্ধকার-আবছায়া-ভ্রূণ-কল্পনায় ;

অথবা তুলির টানে, বাঁকাসোজা লেখায় রেখায়—
যাকে সেই অপার্থিব চোখ দুটি দিতে পারা যায়।
অন্ধকার মুড়ি দিয়ে—শরীরের সবটুকু ঢেকে,
ইন্দ্রনীল-চোখ দুটি শুধু খোলা রেখে
অন্য এক দ্য' ভিঞ্চির স্বপ্ন থেকে মোনালিশা আসে যদি নেমে—
এসে যদি হঠাৎ দাঁড়ায় ঃ
কোন এক দিনান্তের ছায়া-ছায়া পট-ভূমিকায় ঃ
কোন এক দোতলার জানলার ফ্রেমে ঃ
তেমনি দেখেছি আমি—কাউকে না—শুধু সেই আশ্চর্য্য প্রশান্ত দু'টি চোখ
আর সেই স্মিত চোখে দেখেছি মিলিয়ে যেতে
সেদিনের দিনান্তের সবটুকু করুণ আলোক।
অফিস ফেরৎ ট্রামে যেতে যেতে মাঝে মাঝে আজো মনে হয়
সেই চোখ দুটি এই পৃথিবীর বুঝি কারো নয়।
অথবা মাথার থেকে মণি খুলে রেখে ;
গভীর নিশুতি রাত্রে সন্তর্পণে ঝোঁপ-ঝাড় থেকে
শিকার-অন্বেষী কোন শঙ্খিনী সাপের মতন
পৃথিবীরই কেউ একজন
নীল-জলে-কাঁচা-রোদ-পড়া সেই অতলান্ত চোখ দুটি দিয়ে
অপার্থিব, অতীন্দ্রীয় কিছু পেতে গিয়ে
বুঝি সে হারিয়ে গেল এইমাত্র দেহাতীত হয়ে ঃ
অন্তহীন স্তব্ধতার নিস্তরঙ্গ অবাক বিস্ময়ে
সে দিয়েছে ডুব ; তারপর
শুধু দুটি আশ্চর্য্য বুদ্‌বুদ্‌ আমি দেখেছি সে টল্‌টলে জলের ওপর !

## চিত্রনিভা

অরবিন্দ গুহ

চোখে না, চুলে না, শাড়ি-পরা শরীরের কোথাও না,
আমি তাকাবো না ! ঘাসে শেষবিকেলের সৌরসোনা
অজস্র ছড়িয়ে আছে। কে কুড়িয়ে নেবার বণিক ?



কেউ না। কেউ না ? তুমি। তোমার অনেক আছে ? ঠিক।
তুমি আছো। হাওয়ায় রাশি রাশি পাতা ঝরে।
আরেকটু পরে পথ শেষ হ'য়ে যাবে। তুমি ঘরে
যাবে। আমি কোথাও যাবো না। আমি আকাশে আকাশে
কোটি কোটি তারা জ্বেলে তারপর অন্ধকার ঘাসে
শিশির ছড়াবো। জানি, তুমি এই পথে যেতে যেতে
ঘাসের, জলের গন্ধে আচ্ছন্ন আশ্চর্য হাওয়া পেতে
চাও। আমি রাখলাম আমার হৃদয় এই জলে,
ঘাসে। বহু বিকেলের বিচিত্র বিশীর্ণ কোলাহলে
রাখলাম এই সুস্থ শুভ্র হাওয়া, আমার হৃদয়,
আমার শপথ। তুমি তবু ভয় পাও, তবু ভয় ?
ভয় নেই, ভয় নেই। তুমি ছায়া, ছায়ার বাসনা।
আমি তাকাবোনা, না, না ; চোখে না, চুলে না, কোথাও না।

## মিতেনী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বাতাসখানি আবিরে রাঙা
আকাশটুকু মিষ্টি।
আঙিনা দিয়ে মিতেনী, তোর
কালো চোখের দিষ্টি।
পথের ধারে ধানের সোনা
ঘরের রোদ পান্না।
চ'লতে গিয়ে হঠাৎ থামি,
আসছে ভেসে গান না ?
গোমেদ ধুলো শরীরে মেখে
পাখীরা হেসে ফেলছে।
যেদিকে আলো, সূর্যমুখী
গানের শাড়ী মেল্‌ছে।
আকাশে আলো, পাহাড়ে আলো
কবরে আলো জ্ব'লছে।

বাতাসে গান, সাগরে গান্
পাতালে গান চ'ল্‌ছে।

এমন দিনে হৃদয় কাঁপে—
'দিস্‌নে লো আর, আর না !'...
মদের মতো মিতেনী, তোর
কালো দেহের কান্না !

## রবীন্দ্র-সংগীত

আনন্দ বাগ্‌চী

এখানে আকাশ জুড়ে ফের ওঠে বৈশাখের স্তব
মত্তাতুর মনে মনে গুরুগুরু ঘনায় সংগীত
বৈতালিক ব্যাকুলিমা উদাত্ত মৃদঙ্গ কলরব
এখানে শহর-গ্রাম ছুঁয়ে যায় শ্রদ্ধার তড়িৎ।

ঋতুর রুদ্রাক্ষ ঘোরে চৈত্র-কুশলীর হাতে হাতে
নানান্ আবির-রঙে মনোহর হোলীর আকাশ
রুচিরা তোমার শুনি কথাকলি হেমন্তের ছাতে
হে উজ্জ্বল পরমায়ু, তুমি কবি, অমেয় বিভাস !

শ্রাবণের ধারাপাতে চেনাসুর আঁকিবুকি কাটে
জানালার কাচে। গাছে সোনালী পালক ওঠে ভোরে
ফাল্গুনী হরিণ-দিন আশ্বিনের ধান-পাকা-মাঠে
নরম রোদের মুখ নত করে। চোর-কুঠি ঘরে
তালা-চুপ বিশ্রামেরে বন্দী রেখে বৈশাখ-সকালে
বেরিয়ে পড়েছি আজ অন্য জীবনের হাত ধ'রে ঃ
অন্য কোথা অন্য স্বর্গে। জ্বরতপ্ত আত্মার কপালে
পিপাসা ছোঁয়াই ধীরে লক্ষ যুগ লাখো হিয়া ভরে'।

যে নদীর ঘুম ভাঙে জন্মদিন দ্বীপের চরায়
লগ্নের মাস্তুলে রোদ ঃ নাতিদীর্ঘ একটি প্রণাম—
সে তোমার। তুমি আছ নাভি-পদ্ম বিশ্ববিশাখায় ;
খর মধ্যাহ্নের খাপে রবীন্দ্রনাথের একই নাম !



# রবীন্দ্রনাথ

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রনাথকে আজ আমরাই সব চাইতে বেশি অপমানিত করছি। তা-ই স্বাভাবিক। জোরালো অপমান আত্মীয় ছাড়া যেমন আর কেউ বেশি করতে পারেনা তেম্নি জাতীয় মাহাত্ম্যকেও ধূলোকাদা না মাখিয়ে দিতে পারলে অপমানিত জাতির সত্তা আত্যন্তিক আনন্দ লাভ করেনা। এ এমন একটা অবস্থা যখন চারদিক থেকে মৃত্যুর আক্রমণ চলতে থাকে। আর সত্যি বলতে, চারদিক থেকে অধঃপতন সুরু না হলে মৃত্যুও জাঁকিয়ে বসতে ইতস্তত করে। অন্তত তখন দু'চারজন ডাক্তার-বৈদ্যির আবির্ভাব ঘটে যাঁরা মৃত্যুকে লড়তে চান। সে-অবস্থাটাও আর এখন আমাদের নেই। যাঁদের কাছ থেকে আমরা আরোগ্য আশা করতে পারি তাঁরা-ও রোগী। হয়ত তাঁরাও অপমানের রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করছেন। তাই হাতে সিরিঞ্জ তুলে নিতে গেলে অপমানের বিশ্রী বিষই তাতে ভরতে হচ্ছে এবং অবশিষ্ট নিরাময় রক্তটুকুকে কালকূটে রঞ্জিত করা ছাড়া আর তাঁদের উপায় থাকছেনা। এই কালোচিত কর্ম্ম ছাড়া তাঁদের আর-কিছু করণীয় নেই। অপমানই অপমানিত জাতির মেরুদণ্ড—মানদণ্ড।

ইদানীং প্রায়ই একটা কথা শুনতে পাই—শুনতে পাওয়া ছাড়াও লিখিত ও মুদ্রিত অক্ষরে দেখতে পাই—যে রবীন্দ্রনাথ খাঁটি বাঙালী ছিলেন না। জনৈক ডাক্তার-বাঙালী রক্ত বিশ্লেষণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গমঞ্চ থেকে ঘোষণা করেছিলেন ঃ রবীন্দ্রনাথে অশ্লীলতা নেই, কাজেই এ-রক্ত বাঙালীর নয়। ছেলেবেলায় দেখতাম টোলে-পড়া পণ্ডিতমশাইরা রবীন্দ্রনাথের নাম শুনলেই মুখ গোস্‌সায় ভরিয়ে তুলতেন। ভাবতাম, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বুলির শ্লীলতাহানি করেছেন বলেই হয়ত গোস্বামী-মশাইদের এই গোস্‌সা! কিন্তু কোথায় ? আজ দেখতে পাচ্ছি, যথোচিত অশ্লীল হতে পারেননি বলেই যেন রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁদের রাগ ছিল। সে-কালের টোল অনুরাগী এ-কালের জনৈক কৃতবিদ্য ডাক্তারের ভাষণ স্মরণ করেই এ-মন্তব্য করতে পারলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ছেড়েই দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই সুপ্রসন্ন ছিলেন না, আর বিশ্ববিদ্যালয়ও অদ্যাবধি তাঁর উপর সুবিচার দেখাতে পারেননি। সেখানে 'শরৎ-বক্তৃতা' আছে 'রবীন্দ্র-বক্তৃতা' নেই। শাক্ত শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আর্য্য রবীন্দ্রনাথের আকাশ-পাতাল ব্যবধান-বোধ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই প্রচারিত। এই গতানুগতিক গবেষণা নিয়েই সেখানকার পণ্ডিতমহল এবং বাকমণ্ডিত হলঘর নিনাদিত। অবশ্য তাতে আমাদের বাক্যব্যয়ের সুযোগ ছিলনা আর তার প্রয়োজনও এতোকাল বোধ করিনি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে

সেখানকার হলাহল ক্রমেই বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ছে। ভারতরাষ্ট্রের নবোন্মেষিত সাহিত্যরথীরা মধ্যযুগের সিদ্ধাযোগীদের ফর্দ্দ বার করে সম্প্রতি ফতোয়া দিয়েছেন: রবীন্দ্রনাথ নাকি কবীর-দাদূরই ফলভাগী! কুক্ষণে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী মশাই বাংলাদেশের নাথপন্থীদের জিজীবিষা-জিজ্ঞাসা মধ্যভারত থেকে কুড়িয়ে আনতে গিয়েছিলেন! রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত ঔপনিষদীয় বৃত্তি রইল পেছনে পড়ে—এতোগুলো উপনিষদ বাতিল হয়ে গেল—আদিনাথ বঙ্গোপসাগরে না ডুবতেই ডুবলেন রব উঠল—ঝাড়লণ্ঠনের বাতি নিভে গেল—রইলেন কেবল গুর্খা সিদ্ধারা? যাঁরা মধ্যযুগে মধ্যভারতে-তিব্বতে টিমটিমে বাতি জেলে কৈবল্য চাইতেন, তাঁরা কি না হলেন রবীন্দ্রনাথের গুরু! আমরাই জলে ফেলে দিয়েছি রবীন্দ্রপ্রতিমা, তাঁর প্রতিভা ত এখন পাতালে তলিয়ে যাবেই।

দুঃখ এখানেও নয়, আরো অন্তর্নিবিষ্ট। আজ দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রসখারা তাঁকে ভারতীয় প্রতিপন্ন করবার জন্যে এম্নি ক্ষিপ্ত উক্তি লিপিবদ্ধ করছেন যে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বাঙালী ছিলেন না। উক্তিটি সংক্ষিপ্ত প্রলাপ। অপলাশী উনিশ-শতকের মুখ থেকে কেড়ে আনা। সে-যুগের অবগাঢ় সত্তার পরিচয়-বাহীও নয়। যুগকেই যদি আমরা ভুল করে বসি তাহলে যুগের তৃণটি সম্পর্কেও আমাদের ভ্রান্তি ঘটবে—যুগের মানুষকে স্পর্শই করতে পারব না। যুগাবতারদের হয় ঈশ্বর, নয়ত শয়তান ভেবে বসব। অবশ্য ভুল করবার অধিকার সবারই আছে—ঈশ্বর-শয়তান-সাহিত্যিক-সমালোচক সবাই ভুল করতে পারেন। তবে সে-ভুল নিয়ে পরিবেদনা থাকা দরকার—তা-ই প্রার্থনীয়। তা নিয়ে পরিষদ-গড়া বা প্রচার-কার্য্য করা কোনো মতেই চলতে পারে না। কিন্তু কামুকের যেমন পরিবেদনশীল না হয়ে গত্যন্তর নেই, তেম্নি ভ্রান্তেরও দল-ভারী না করলে চলে না। তার অহঙ্কার চরিতার্থের এই ত সহজ পথ।

অবশ্য দার্শনিক স্তর থেকে দেখে ভ্রান্তিরও পোষকতা করা যায়। আমরা বলতে পারি: জটিলা-কুটিলার ভ্রান্ত দৃষ্টি ছাড়া দ্বান্দ্বিক ধারায় সৃষ্টি কোথায়? তবে তার মীমাংসা-ও আছে। তার সূত্র ধরতে পারলে আমরাই আবার বলব: ভ্রান্তিকে স্বীকার করা মানে জগৎ জোড়া ভ্রান্তি নয়—দু'চারটি ক্ষমতাবান ভ্রান্ত লোকই বৈচিত্র্যের পক্ষে, সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নন বা শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মতো ছিলেন না—এ-ধরনের উক্তি মীমাংসা-বোধ-সঞ্জাত। মীমাংসাকার তুষ্ট হয়ে ভাবতে থাকেন—দু'জন ক্ষমতাবান মানুষের একজন ভ্রান্ত, তা-ই এই বৈচিত্র্য দেখছি। এমন কি শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত খুশী হয়ে বলতে পারেন: তাই ত দেবশিল্প পৃথিবীকে মায়া বলেছি!

যাক সে-কথা। আমাদের এখন জিজ্ঞাস্য: বঙ্কিমচন্দ্র কী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ কী নন? বাঙালী মনের কোন্ চাবীকাঠি বঙ্কিম-শরতের হাতে ছিল যার সন্ধান রবীন্দ্রনাথ পাননি? আবেগময় গদগদ ভাষ? নবীন প্রৌঢ়ত্বে এসে রবীন্দ্রনাথ 'স্মরণে'-গ্রন্থিকায়



যে চম্পূকাব্য রচনা করেছিলেন তার একটি অনুচ্ছেদের আবেগ বঙ্কিমচন্দ্রের বা শরৎচন্দ্রের কোনো আবেগময় পরিচ্ছেদে আছে কি না সন্দেহ। সাধারণ ভাষাবোধ আর বাঙালী মন থাকলেই 'স্মরণে'র দুর্লভ সম্পদ আহরণ করা যায়। এতে উপনিষদের ভয়াবহতা নেই—কোঁতে-কৃষ্ণের দ্বান্দ্বিক মিশ্রণ নেই বা নারীত্বের প্রখর ঘোষণা নেই। প্রাণের-মনের ঋজু রাস্তায় হৃদয়ের সদর-দরজায় পৌঁছুতে সে-আবেগের একটুও বেগ পেতে হয়না অথচ কতো শাশ্বত কতো দুরবগাহ সে বেদনা—কী অপরূপ বাঙালি-আনা—যা চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদে-মৈমনসিংগীতিকায় ছড়িয়ে আছে—যা আজকের দিনের বাংলা-কবিতারও একমাত্র উপজীব্য হতে চলেছে! রবীন্দ্রনাথের বলাকার পাখার দিকেই আমরা তাকিয়ে রইলাম, দেখলাম কোন্ দূরদিগন্তে তিনি উড়ে যাচ্ছেন—ঝিলমের স্রোত পেরিয়ে কোন্ মহাকাশের মহাদেশে গিয়ে বসবাস করতে চাচ্ছেন তা-ই হল আমাদের তর্কের বিষয়—'জীবন-দেবতা' 'বিশ্বদেবতা' নিয়ে থিসিস লিখতে বসে গেলাম কিন্তু দেখতে পেলাম না: তিনি এইত আমাদের অন্তঃকরণে, সত্তায় এসে বিশ্রাম চাইছেন—দাঁড়িয়েছেন আমাদের মুখোমুখি। গঙ্গামৃত্তিকায় গড়া জীবনকে ছেড়ে কোথায় যাবেন তিনি? জীবনদেবতা বা বিশ্বদেবতা যতো দ্যুস্থানদেবতার ইঙ্গিতই দিন তাঁকে, অশ্বমনোরথে যতো দুর্গমপথেই তিনি বিচরণ করুন—যাত্রার অবসান করেছেন তিনি গঙ্গোদকে গাত্রমার্জ্জনা করে। তাঁর চিঠিপত্রগুলো পড়বারও যদি নির্ম্মল অবকাশ, নির্ব্যূঢ় মন আমাদের থাকত তাহলে রবীন্দ্রসুহৃদ সেজে আজ এই নির্বেদ করতে হত না যে রবীন্দ্রনাথে আমরা বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখতে পাইনি।

বাঙালী বঙ্কিমচন্দ্র! তা-ও বা কী প্রকাণ্ড কৌতুক! কোঁতের কালাপাহাড়ী বিদ্যার কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম—কেন না বাঙালী ব্রাহ্মণই কালাপাহাড় বা কর্ত্তাভজা হতে পারতেন—কিন্তু কৃষ্ণ সম্পর্কে কি বলা যায়? তিনি কি বাঙালী? মথুরা-দ্বারকা তাহলে বাঙালীর হাতে ছিল! আর তা যদি না মানি, তবে কৃষ্ণাদর্শ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ বাঙালী-কৃত্য সমাধা করলেন? তিনটি যোগের সমাধান করেছিলেন যেই মহাপুরুষ তাঁর সাধনা খাঁটি ভারতীয়—কোনোক্রমেই আঞ্চলিক নয়। গোপিনীদের অঞ্চল-গোপ্তা হয়ে তিনি ঘরে বসে থাকেননি, বিশ্বরূপ আহরণেই ব্যস্ত ছিলেন। তাহলে? বঙ্কিমচন্দ্র বা কৃষ্ণ কোথায় এসে দাঁড়ান—রবীন্দ্রনাথেরই ত পাশাপাশি! রবীন্দ্রনাথের শৈবতায় বা সভ্যতায় কৃষ্ণের মলিনত্ব তবু কথঞ্চিৎ দূরীভূত হয়েছিল। হিমালয়-সদৃশ মহাজনককে যদি আমরা ভাগ করে বুঝতে যাই, সে অপরাধ কার? আমাদের না রবীন্দ্রনাথের? রবীন্দ্রনাথ যদি হিমালয়-বৎ স্বর্গ-মর্ত্ত্য ধ্যান করে থাকেন—যদি দান্তের মতো, গ্যেয়টের মতো, শেলীর মতো উদ্বোধিত হয়ে বলতে পেরে থাকেন: স্বর্গ পৃথিবী থেকে দূরে নয়, তাহলে তা কি তাঁর অপবাদ? গৌড়ের ছেলেকে এ-অগৌরব দান করবার অধিকারই বা আমরা পেলাম কোথায় আর তার কৌশলই বা শিখলাম কোন্ কোশলের

চক্রান্তে? হয়ত তাতে আজও পারিতোষিক মিলবে—কিন্তু এমনই কি দুর্ভাগ্য আমাদের যে পারিতোষিকের আশায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমরা ভোজবাজি দেখাতে সুরু করব? তাঁকে স্থানভ্রষ্ট করছি আমরা, যারা নিজেরা আজ স্থানভ্রষ্ট।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিচরণ-ভূমির ভূমিকামাত্র এখানে উল্লেখ করলাম, তেমনি শরৎচন্দ্রের অনুকরণ-বৃত্তিরও একটু পরিচয় দিয়ে রাখছি। কোন্ সস্তা বিলিতি উপন্যাসে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি বাংলা উপন্যাস লিখতে সুরু করেন সবিস্তারে তার ইতিহাস বলবার প্রয়োজন-বোধ করছিনে। আমি বলতে চাই যে তাঁর নারীর ব্যাখান ও উপাখ্যানগুলোর মূলতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের গুহাতেই নিহিত ছিল। এই মহাজনেরই অনুগামী ছিলেন শরৎচন্দ্র যাকে আমাদের ভালো লাগে। আর অনুগমনের অধ্যায়গুলোই শরৎচন্দ্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্প। যেখানে তিনি শ্রীমান হওয়ার মোহ অপসৃত করে রবীন্দ্রনাথের মতো ধীমান হতে গেছেন—ঘরে-বাইরে যাতায়াতের বিদ্যা অর্জ্জন করতে সচেষ্ট হয়েছেন—হৃদয়ের রাজ্য ছেড়ে নিতে চেয়েছেন সুধিবৃন্দের বুদ্ধি-বৃত্তির আশ্রয়, সেখানে তিনি অত্যন্ত হতশ্রী, দৃশ্যত অনুকারক—গৃহদাহে হৃত-সর্ব্বস্ব। শেষদিককার উপন্যাসগুলো লেখবার সময় তাঁকে আমরা মনীষী টলষ্টয়ের 'ওআর অ্যাণ্ড পিস' পড়তে দেখেছি। টলষ্টয়ের বাঙালী-আনা আয়ত্ত করতে পারলেই কি বাঙালী হওয়া যায়? তবে আমাদের কথকঠাকুরদের ভাগবত-কথকতা অনুকরণ করে প্রমথ চৌধুরী ফরাসী হয়ে গেলেন কেন? একে স্রেফ জন্মতারকার দোষ ছাড়া আর কী বলতে পারি—কী বা বলা যায়! ভাদ্রপদা নক্ষত্রের আশীর্ব্বাদ যাঁদের আছে তাঁদের সৌভাগ্য নির্ঘাৎ-ই বিশাখার দৃষ্টি-উদার জনসম্প্রদায় থেকে বেশি হবে!

অথচ কী প্রচণ্ড পরিহাস এসব রচনাবলী! শিল্প-নামধেয় রচনাবলীমাত্রেই যেমি প্রকাণ্ড কৌতুক। বালভাষিত হবার জন্যে সাহিত্যের কতো প্রয়াস, আবার অলঙ্করণের জন্যেও বা কতো দিকে হস্ত-প্রসারণ! যোগী-শিল্পীরা ভেবে নেন, সমালোচক আর কিছু না হোন অন্তত বুদ্ধিমান হবেন—ততোটুকু বুদ্ধি তাঁদের ঘটে থাকবে যাতে শিল্পীর মানসিক ঘটনাগুলোর যথাযথ বিন্যাস বা যোগসূত্র তাঁরা ধরতে পারেন। সে-ধরনের সমালোচকের আবির্ভাব বাংলা-সাহিত্যে ঘটেনি—বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত এমন কেউ আসেননি যিনি অবলোকন করতে জানেন। সত্যিকারের দুর্ভাগ্য বা বিপদ সেখানে। তা-ও বিপদ বলে হয়ত গণ্য হতনা যদি কেউ সমালোচক সেজে সাহিত্যের মঞ্চে এগিয়ে না আসতেন। এই শতমারী বৈদ্যদের আবির্ভাবেই আমরা তটস্থ। বিশুদ্ধ রক্তের ভাষ্যকার তাঁরাই। তাঁরা কখনো শঙ্করাচার্য্য, কখনো রামানুজ—কেউ সঙ্কর বা রাম নন।

মাতৃপ্রধান বা পিতৃপ্রধান সমাজের মানুষ হিসেবে যাঁরাই এসেছেন বাংলাদেশে, সবাই



তাঁরা মিলেমিশে একটি মানবিক ধর্ম্মে ঠাঁই পেয়েছিল হৃদয়ের এই হরিদ্রাভূমিতে। বাংলাদেশ মানে মানবের দেশ—দেবদৈত্যের মিশ্রণে তৈরী একটি মানব-কূলের জন্মস্থান ছিল ভাগীরথী-কূল। সে তটভূমি পদ্মার কূলে বাংলার নাম ভুলে যায়নি, মেঘনার ব্রহ্মপুত্রের তটে সমতট নামে বাংলার কুলধর্ম্ম ভুলে থাকেনি। উনিশ-শতকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মারফৎ এ-মহাসত্য উদ্ঘাটিত হয়েছিল—উদ্ঘাটিত হয়েছিল কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণের মহাসঙ্গম-ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথ সে-সত্যেরই, সেই সত্যধর্ম্মেরই পতাকা বহন করেছেন আজীবন। রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ পঞ্চগৌড়েরই স্বপ্ন দেখতেন—যার মানে সসাগরা মানবিক পৃথিবী।

সেই মানবিক পৃথিবী বা 'মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে'রই উত্তরসাধক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলাদেশের উনিশ শতকীয় মনীষা—তা হিন্দুই হোক, খ্রীষ্টানই হোক, ব্রাহ্মই হোক বা বৈষ্ণব-তান্ত্রিক-শৈব যা-কিছুই হোক, মানব-ধর্ম্মেই সর্ব্ব-বিরোধের অবসান দেখতে পেয়েছিলেন। হেগেলীয় বচন উদ্ধৃত করে হুগলীর দার্শনিকরা তখন অনায়াসে বলতে পারতেন যে মিনার্ভার পেঁচক শতাব্দীর সন্ধ্যায়ই ডানা মেলে দেয়। তার পক্ষবিধূনন বাঙালীরা শুনেছিল সেদিন স্বামীজির আর রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। স্বামীজি যে-হিসেবে বাঙালী নন, রবীন্দ্রনাথ-ও সে-ই হিসেবেই বাঙালিত্ব বর্জ্জিত। স্বামীজি যে পথে বিশ্বকে অর্জ্জন করেছেন রবীন্দ্রনাথও ঠিক সে-পথেই বিশ্বপ্রেমের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের জন্মের জন্যে উনিশ-শতকের বাংলাদেশকে তপস্যা করতে হয়েছে বিভিন্ন পন্থায়—যে বিভিন্ন পন্থার কথা বাংলার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেন তাঁর মহাশ্বেতা বাগীশ্বরীর পাঠ-পীঠে লিখে গিয়েছিলেন। কেউ যদি তাঁরা বাঙালী না হয়ে থাকেন তাহলে বাঙালী বলে কোনো জাতি কস্মিনকালেও এতদ্দেশে ছিল না। বলতে হয়, ইংরেজ আসবার আগে বাংলাদেশ হয় মারহাটার, নয় মাড়বারের, নয়ত তুর্কী মুসলমানেরই দেশ বলে পরিগণিত হ'ত। ছিল তা বর্গীর, রাজপুতের আর বদ্দির।

লুম্বিনী-উদ্যানটি উন্মত্তদের নামের সঙ্গে বুদ্ধের আমল থেকে জড়িত। অশোক যখন শাক্য-মুনির জন্মস্থান লুম্বিনী-উদ্যান পরিভ্রমণ করে মগধে ফিরে এলেন—তাঁর হতভাগিনী শয্যাভাগিনী মৎস্যগন্ধা দুয়োরাণী কারুবাহি-সহ (যিনি খেমটা-ওয়ালি ছিলেন এবং যাঁর মূর্ত্তি সাঁচী-স্তূপের তোরণে অদ্যাবধি রক্ষিত ও সঞ্চিত) তখন ব্রাহ্মণ-কুল তাঁদের শৈব-রাজাকে হারিয়ে আকুল হয়ে তাঁকে উন্মাদরোগগ্রস্থ ভেবে নিয়েছিলেন। তাঁর মহা-দেবকে তিনি হিন্দুবুধেই পর্য্যবসিত করলেন, কিন্তু তার ফল হ'ল উল্টো। শ্লাভ-জাতি যে মানব ইক্ষ্বাকু বা অসুর-তুর্কী জাতি থেকে তৈরী, পিয়দসি ছিলেন তেমন মৌর্য্য। তিনি জানতেন তা হিন্দুভগবতজাতি। তিনি অজিনপৈতা ধারণ করেছিলেন। হিমালয়ের শীলযুক্ত অভিক্ 'গড' ছিল তাঁর দেবতা। তিনি উপলকেক বা ওলবনের ময়ুর। মহীর হিতে অতনু-অগ্নি বিসর্জ্জন করেছেন, তিনি কি করে বুঝবেন এতৎসত্ত্বেও যে ব্রাহ্মণরা তাঁকে গ্রহণ করবেন না? তাঁর লুম্বিনী-স্তম্ভলেখ থেকে এ-কথাটিই আবিষ্কৃত হয়। হয়ত সখেদেই তিনি তা উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন। —পূর্ব্বাশা-সম্পাদক.

# বিবাহিতা স্ত্রী

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্বে প্রকাশিত অংশের সারাংশ : যজ্ঞেশ্বর কনট্রাক্টরের এমন ক্ষমতা ছিলোনা যে একটি সুস্থ সবল সন্তানের জন্ম দিতে পারে সংসারে। দু'তিনটি বিকলাঙ্গ ক্ষণজীবী পুত্র প্রসব ক'রে তার স্ত্রী সুধাময়ীরও আর কোনো সাধ ছিলোনা মনে। কিন্তু তবু অধিক বয়সে একটি মেয়ে হ'লো, আর সেই মেয়ে একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গেই সুধাময়ীর নিরানন্দ ব্যর্থ জীবন নতুন ক'রে দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠ্‌লো। যজ্ঞেশ্বরের মতো অর্থলোভী, অসৎচরিত্র কৃপণ স্বামী নিয়ে যে দুঃখের অনলে অবিশ্রান্ত সে জ্বলছিলো, এই মেয়ে যে আরেক জনের জীবনেও সেই দুঃখেরই পুনরাবৃত্তি করবে, একথা বুঝতে তার দেরী হ'লো না। মগজ ছিলোনা, হাজার চেষ্টাতেও তাকে বাল্যশিক্ষার অধিক ওঠানো গেলোনা। কিন্তু হিংসায়, বিদ্বেষে, ঝগড়ায়, অর্থলালসায়, কূটবুদ্ধিতে পিতাকেও অতিক্রম করলো সে। তারপর একদিন বিয়ে হ'লো তার অত্যন্ত একটি ভদ্র শিক্ষিত পরিবারে। স্বামী সুনির্মল, শাশুড়ি হিরণ্ময়ী, শ্বশুর রাজেনবাবু আর দু'টি নাবালক দেওর, এই নিয়ে তার সংসার। একমাত্র ননদ, তার বিয়ে হ'য়ে গেছে, সে থাকে অনেক দূরে। পিতাপুত্র দু'জনেই যথেষ্ট উপার্জ্জন করে, কোথাও এতোটুকু মালিন্য নেই। হাসিখুসীতে, শ্রীতে, মাধুর্যে সংসারকে আলো ক'রে রাখেন হিরণ্ময়ী, ছোটখাট—কচি চেহারার মিষ্টি মা সুনির্মলের। সেই সংসারে একটি কালোবাদুরের ছায়া নিয়ে এসে দাঁড়ালো প্রমীলা। অবিচ্ছেদ্য হিন্দুবিবাহের বন্ধনে বন্দী অসহায় স্বামী সুনির্মল তখন কী করলো ? কী করতে পারলো ? ]

শুধু চাইছিলো না ছটফট করছিলো। হিরণ্ময়ীর দু দু'টো জোয়ান ছেলে যে তার স্বামীর অন্নে পুষ্ট হচ্ছে এটা আর সইতে পারছিলো না সে। আর একটা বিধবাই কি কম আপদ নাকি ? যত কমই খাক্, খায়তো ? তাকে তো শুতেও দিতে হয় একটা ঘরে ? জায়গা জুড়ে থাকে না ? সুযোগ পেয়ে বরং খুসীই হ'লো। চোখ টান ক'রে বললো, 'যা ঠিক তাই বলেছি, এর বেশী আমি পারবো না।'

'কী পারবেনা ?'

'এর বেশী খরচ করবার সাধ্য আমার নেই।'

'খরচ করবার কর্তা কি তুমি ? আমি তোমাকে মান দিয়েছি, মর্যাদা দিয়েছি, তবে না তুমি ঠাঁই পেয়েছ এই সংসারে। আমি যা বলবো তা-ই তুমি করবে, তা-ই তুমি করতে বাধ্য।'

ঈষৎ হাসি খেলে গেল প্রমীলার মুখে। দু'হাত উপরের দিকে তুলে আড়মোরা



ভেঙে নিতান্ত উদাস গলায় বললো, 'কেন মিছিমিছি চ্যাঁচামেচি করছেন ! আমি যাই কাপড় কেচে আসি, বেলা গেল।' পা বাড়াল সে। গর্জে উঠলেন হিরণ্ময়ী 'দাঁড়াও ! শোনো, কাল থেকে আর এ বাড়িতে তোমার জায়গা হবেনা। আমি এক্ষুনি তোমাকে তোমার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম চাকরকে দিয়ে, কিন্তু সুনুর সঙ্গে কথা বলা দরকার।'

'পাঠিয়ে দিলেই কি আমি যেতাম ?'

'যেতেনা ? নিশ্চয়ই যেতে। যেতে তুমি বাধ্য।'

'আমার বাড়ি, আমার ঘর, টাকাকড়ি সমস্তই আমার। আর আমিই যেতে বাধ্য ? বা ! আপনি কি মনে করেন চিরদিনই ছেলেকে ভুক ক'রে, তার পয়সাকড়ি হাত ক'রে, বোকা পেয়ে তার স্ত্রীকেই আবার এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে, সব একা খাবেন ! না, সেদিন আর নেই।'

প্রমীলার কথা শুনে হিরণ্ময়ী স্তম্ভিত হ'য়ে থেমে গেলেন।

'আপনার পাঠাবার কোনো কথাই ওঠেনা। কথাটা এই যে আপনাদের নিয়ে এখন আমি কী করবো। আমরা দু'টি মানুষ, এইটুকু খাবারে, এইটুকু বাড়িতেই চ'লে যায়। খরচ তো আপনাদের, আপনাদের জন্যইতো আমি ফতুর হ'য়ে গেলাম। তার উপর যদি দু'টো বুড়ো ধাড়ি খোকাকে তিনবেলা দুধভাত খাওয়াতে হয় তাহ'লে আমি নাচার। অত সচ্ছন্দ অর্থ আমার নেই এ আপনি জেনে রাখুন।'

'বৌমা !'

দর্প ভরে পা ফেলে ঘরে ঢুকে গিয়ে শাশুড়ির মুখের উপর শব্দ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিল প্রমীলা। আর বন্ধদরজার বাইরে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন হিরণ্ময়ী।

২

সারা অপরাহ্ণ, সারা বিকেল আর সমস্ত সন্ধ্যা একটা ভুতে পাওয়া মানুষের মতো স্থাণু হ'য়ে কাটলো তাঁর। ছেলেরা ইস্কুল কলেজ থেকে ফিরলো, খেলো কি খেলোনা, কাপড় জামা ছাড়লো কি ছাড়লো না, মার দিকে একপলক তাকালো কি তাকালোনা, আবার বেরিয়ে গেল কোথায়। দুই হাঁটুর ফাঁকে মুখ গুঁজে শুকনো চোখে ব'সে থাকা হিরণ্ময়ীকে দেখে তাদের মনে হ'লোনা নতুন কিছু হ'য়েছে। বাবার মৃত্যুর পরে মাকে তো তারা এই অবস্থায় দেখতেই প্রায় অভ্যস্ত। তারি মধ্যে কখনো-সখনো ওঠেন হাঁটেন কথা বলেন, আবার থেকে থেকে এরকমই চুপ হ'য়ে যান। মাকেও বাবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলেছে তারা।

অনেক রাত্তিরে সুনির্মল ফিরলো। সারা বাড়ি নিঃঝুম হ'য়েছে ততক্ষণে। টের পেয়ে

মাটিতে আঁচল বিছিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে থাকা বিনিদ্র হিরণ্ময়ী ন'ড়ে চ'ড়ে উঠলেন একবার, তারপর কী ভেবে আবার স্থির হ'লেন। হঠাৎ তাঁর আহত দর্প ফণা তুলে উঠলো। ছি, এ নিয়ে নাকি তিনি নালিশ জানাবেন ছেলেকে? অসম্ভব। বিচার কর্তা যদি কেউ হয় এ বাড়িতে সে তো একমাত্র তিনিই। সুনির্মল নালিশ করতে পারে তাঁর কাছে, তিনি পারেন না। যে অপমান পরের মেয়ে করলো, আপন ছেলের কাছে তার বিহিত নিতে যে আরো মাথা নত হবে তাঁর। তাছাড়া, তাছাড়া—( এইখানে মুহূর্তের জন্য হিরণ্ময়ীর ভাবনা স্তব্ধ হ'লো ) কোন মুখেই বা যাবেন? এই বাড়িতে এই আসনে তো তিনিই প্রমীলাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দিনে দিনে তিলে তিলে তিনিইতো বাড়তে দিয়েছেন এই আগুন। এখন সুনির্মলকে দিয়ে তিনি কী করাবেন? এখন কী বলবেন তাকে? কী অনুরোধ জানাবেন? ত্যাগ করতে? বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে? হায় হায়! শেষে মা হ'য়ে পুত্রবধুর নামে চুকলি কাটবেন ছেলের কাছে? এই উপায়ে সম্মান আদায় করবেন এই সংসারে? যে সংসার তিল-তিল তাঁর সুধা দিয়েই রচনা?

চোখের জলে মাটি ভিজে গেল, তবু তিনি একটা কথা বলতে পারলেন না মুখ ফুটে।

দরজার কাছে ছায়া পড়লো লম্বা হ'য়ে, অন্ধকার ঘরে শুয়ে সেই ছায়া তিনি দেখলেন, সাড়া দিলেন না, প'ড়ে রইলেন ঘুমের ভান ক'রে। ছায়া দরজার কাছ থেকে স'রে গেল ধীরে ধীরে। সিঁড়িতে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল সুনির্মলের ক্লান্ত পায়ের আওয়াজ।

৩

জামা কাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে শুতে না শুতেই অন্ধকারে গায়ের কাছে স'রে এলো প্রমীলা, সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা স'রে গেল সুনির্মল। এত রাত ক'রে প্রমীলার জেগে থাকা অপ্রত্যাশিত।

'ওগো শুনছো?'

একটা মেয়েলি গন্ধে হঠাৎ গা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠলো, সুনির্মল একেবারে খাটের এ প্রান্তে চ'লে এলো।

'ঘুমোওনি?' গলায় ত্রাস ফুটলো তার।

'নিশাচরের বৌ যখন হ'য়েছি তখন কি নিশাচরণী না হ'লে চলে?'

'তাইতো।'

'রাত ছাড়া তোমার সঙ্গে দেখা হয় কখন শুনি?'

'তাইতো।'

'শোন।'



'বল।'

'তোমার কি রোজই রাত দশটা পর্যন্ত আপিস থাকে?'

'না।'

'তবে?'

সুনির্মল চুপ।

'কোথায় যাও?'

চুপ।

'বাড়ি আর ফিরতে ইচ্ছে করেনা, না?'

চুপ।

'পাড়ায় আরো তো লোক আছে, তোমার মত এমন বাউণ্ডুলে কে শুনি?'

'তাইতো।'

'সকলেই অপিস থেকে বাড়ি ফেরে, মাগ নিয়ে সিনেমায় যায়, দোকান পসারে কেনে কাটে—।'

'হু।'

'এই পাশের বাড়ির আখিল মিত্তির, রাগ ক'রে গিন্নি বাপের বাড়ি গেলো অমনি একসেট চুরি গড়িয়ে দিল।'

'তুমিতো আর যাওনি'। এইবার যেন একটু জিলজিলিয়ে উঠলো সুনির্মল।

'আমি গেলেই তুমি দিতে কিনা।'

'হ্যাঁ দিতাম, নিশ্চয়ই দিতাম। দেখোই না দিই কি না।'

'তা বটে।' আধ শোয়া হ'য়ে মাথা নাড়লো প্রমীলা, 'বোকা ব'লে এতো বোকা ভেবোনা, বুঝলে?'

'না, তোমাকে কেন বোকা ভাববো।'

'ভেবেছ গেলেইতো রক্ষে! আপদ চোকে, না? তোমাদের মতলব আমি বুঝিনে কিছু?'

'বোঝো নাকি?'

'বুঝি বুঝি, খুব বুঝি। হাড়ে হাড়ে বুঝি।'

গলার সুরে যুদ্ধের ঘোষণা। সুনির্মল শঙ্কিত হ'য়ে চুপ করলো। প্রমীলা বিছানা ছেড়ে উঠে, গায়ের অসম্বৃত আঁচল ঠিক করলো কি করলোনা, নেমে এসে আলো জ্বাললো টিপ ক'রে, তারপর কুঁজো থেকে ঢক ঢক ক'রে পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে চেয়ার টেনে স্বামীর মুখের কাছে বসলো 'তোমার সঙ্গে পরিষ্কার পরিষ্কার কয়েকটা কথা বলবার জন্যই জেগে আছি আমি। শোনো—'

'আজ না বললে নয় ?' হাত দিয়ে চোখের আলো আড়াল করলো সুনির্মল।

'তাই যদি হবে তবে আর জেগে থাকা কেন ?'

তাতো ঠিকই। স্বামীর জন্য জেগে থাকার নিগূঢ় অর্থটা কী সুনির্মল নিজেই কি তা বোঝেনি ? ভেতরে ভেতরে আরো অন্যান্য অনেক রাত্রির বিভীষিকা স্মরণ ক'রে ভয় হ'লো তার। না, পারেনা। কিছুতেই পারেনা। এই চিৎকার, মারামারি, লাফালাফি, গালিগালাজ, এর বিরুদ্ধে কোন জেহাদই ঘোষণা করতে পারে না সে। প্রতিবাদ ক'রে কেবলমাত্র দুঃখটাকে আরো নোংড়া, আরো ঘৃণ্য, আরো অসহ্য ক'রেই তোলা হয়। একমাত্র উপায় বর্জন। আর নয়তো নিঃশব্দে বহন। আর বর্জন যখন সম্ভব নয়, তখন এই মৃতভার বহন করা ছাড়া আর গতি কী সুনির্মলের ?

সুনির্মল জানে, এই স্ত্রীলোকটির কোনো হৃদয় নেই, ভালোবাসা নেই, লজ্জা সরম, সম্ভ্রম কিছুই নেই। মনের বালাই নামক কোনো জিনিশ দিয়েই বিধাতা তাকে ধরাধামে পাঠান নি। তার জ্ঞানের মধ্যে আছে এক অদম্য ঈর্ষা, লোভ আর প্রচণ্ড অর্থলোলুপতা। টাকা টাকা টাকা, টাকা তার সব চাইতে প্রিয়, প্রিয়তম। কাউকে একবিন্দু দিতে তার মাথায় আগুন জ্ব'লে ওঠে। অল্প বয়সে, যখন সে একদম চুপ ক'রে থাকতো—তখনো নানা ঘটনার সমাবেশে তার মুখে এমন সব রেখাপাত হ'তে দেখেছে, ঈর্ষা ক্রোধ আর লালসামিশ্রিত এমন দৃষ্টি ফুটে উঠ্‌তে দেখেছে চোখে যে কত সময় সুনির্মলের সারা অন্তর সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠেছে ঘৃণায়। কিন্তু বাক্যহারা সেই মনোভাবকে রূপ দিতে পারে এমন ক্ষমতা তখন তার ছিলো না। বৃত্তিগুলো ছিল সহজাত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই সহজাত বিদ্যাটি তার বুদ্ধির আধারে স্থান পেয়েছে। আর সেই বুদ্ধির বাহন ভাষাকেও এমন প্রবল ভাবে সে আয়ত্ত করেছে যে সেই তোড়ের মুখে দাঁড়াবে এমন সাধ্য আর যারই থাক, শান্ত ভদ্র সুনির্মলের অন্তত ছিলো না।

হঠাৎ মুখে চোখে একটা প্রফুল্লভাব আনলো সে, খুসী খুসী গলায় বললো—'ও, ভালো কথা, আজ হঠাৎ একটা লাভ হ'য়ে গেলো আপিসে।'

বেগতিক দেখলে এই হঠাৎ লাভের ঘোষণা আরো অনেকদিন কাজে লাগিয়েছে। প্রমীলা শান্ত হ'য়েছে তাতে, খুসী হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, শান্তি নেমেছে পৃথিবীতে। কিন্তু ইদানিং একথাটার উপর প্রমীলার কোনো বিশ্বাস ছিলোনা, সে এটুকু জেনেছিল, সুনির্মলের কাছে আর যাই থাক, কোন উপরি পাওনার সুযোগ নেই। কিন্তু সুনির্মল উপরি পাক না পাক তার নিজের যে কিছু উপরি পাওনা হবে সেটাতো ঠিক। উৎসুক গলায় বললো 'কই ? কই সে টাকা ? কী করেছ ? দাও আমাকে।'

'আজ পাইনি, কাল দেবো।'



'দেবে না হাতি। দান খয়রাতেইতো সব উড়ে যাবে।'

'দান খয়রাৎ আবার করবো কাকে ? কাল ঠিক তোমার হাতেই এনে দেব।'

'আহা গো', মুখভঙ্গীসহকারে সে হাত পা নাড়লো, 'লোকের যেন অভাব। বাড়িতো একটা অতিথিশালা। তুমি যদি মানুষই হবে তবে আর এতগুলো টাকা এমন ভাবে নষ্ট হ'তে পারতো না। এই সহরে আমার নিজের বলতে কিছু তুমি ক'রেই দিতে। নেই গয়না, নেই কাপড়, নেই বলতে কিছুটি নেই। একটা বাঁদিরও অধম আমি এই বাড়িতে।' আলো নিবলো টিপ্ ক'রে। হামাগুড়ি দিয়ে সুনির্মলে গায়ের উপর দিয়ে এপাশে এসে শুলো প্রমীলা, 'টাকাটা কিন্তু কালকেই মনে ক'রে এনে দিও।' একখানা হাত স্বামীর গায়ে রাখলো, 'আমি ব'লে তাই এত সহ্য ক'রেও এই সংসারে প'ড়ে থাকি—'

'তাইতো' হাতটা নামিয়ে দিল সুনির্মল।

'নামিয়ে দিলে কেন', ফোঁস্ ক'রে উঠলো সে। 'আমার হাত কি তপ্ত শলাকা ?'

সুনির্মল ততক্ষণে উঠে বসেছে। নিঃশব্দে নেমে দাঁড়িয়েছে বিছানা থেকে, পকেট হাত্‌ড়ে দেশলাই সিগারেট বার করতে করতে বললো 'ছাতে যাই, বড্ড গরম।'

'হ্যাঁ, তাই কিনা, আমার আঁচই তোমার সয়না। তা সইবে কেন—হ'তো যদি বিনুর ননদ, সেই শকুনি—'। সুনির্মল বাইরে এসে সিগারেট ধরাল।

পরের দিন সকালে হিরণ্ময়ী প্রস্তুত করলেন নিজেকে। না, লজ্জা নয়, দুঃখ নয়, মান সম্মানেরও কথা নয়, এভাবে এ মানুষকে আর বাড়তে দেয়া অসম্ভব। ছেলের সাড়া পেয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন তিনি। 'সুনু।'

সুনির্মল কাঁধে তোয়ালে নিয়ে স্নানে যাচ্ছিলো, মার ডাকে ফিরে দাঁড়ালো 'ডাকছো ?'

'হ্যাঁ, এদিকে আয়।'

সুনির্মল টুথব্রাস রেখে এগিয়ে এলো।

'এ কী ! তোমার চেহারা এরকম হ'য়েছে কেন ?' কতদিন বাদে ঘরের বাইরে পরিষ্কার আলোয় মার মুখখানা দেখতে পেল সে।

'চেহারার কথা থাক। কতগুলো দরকারী কথা আছে। ঘরে আয়।'

ছেলেকে খাটের উপর বসিয়ে নিজে মাটিতে বসলেন। 'তোর বৌকে আমি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে চাই।'

এ কথা আশা করেনি ছেলে। সহসা ভেবে পেলোনা কী জবাব দেবে। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর ক'রেই কি ওকে রেখেছিলে তুমি ?'

'ঘুরিয়ে জবাব দিসনে, আমার মনে হয়—'

'কী আপনার মনে হয় তা আমি জানি' শিকারী বাঘের মতো কোথায় ওৎ পেতেছিলো, কোথা থেকে যে এমন উদ্দাম হ'য়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রমীলা কে জানে। মা ছেলে দু'জনেই চমকালো, যেন ভয়ই পেলো তার দিকে তাকিয়ে। 'বেইমান, ছোটলোক, ইতর' রাগে দুইচোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো প্রমীলার। 'ঐ বলে না যে যার ঘরে যাবে, তার বুকে ব'সেই দাঁড়ি ওপড়াবে, ছেলেকে ঘরে ডেকে নিয়ে ওষুধ খাওয়ানো, মাদুলি পরানো আর তুক্ করা, না? কেন? কেন? কিসের জন্য? এ বাড়ি আমার, আমার, আমার। মরবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, আমার। কে আমাকে সরাবে, তাড়াবে—কোন বাঁদীর বাচ্চার—'

সকালের স্নিগ্ধ আকাশ কালো হ'য়ে গেল, ঝি চাকর ভিড় করলো দরজায়, এ বাড়ি ও-বাড়ির লোক পর্যন্ত হাট বাজার ভুলে, রান্নাবান্না ভুলে, ছেলের কাঁথা ধোয়া ছেড়ে ঝুঁকে পড়লো এ দিকে!

'ছি, ছি, ছি' হিরণ্ময়ী তাড়াতাড়ি সুনির্মলকে বার ক'রে দিলেন ঘর থেকে, 'যা যা, তুই স্নান করগে যা,' অভি-সীমন্ত পড়া ফেলে ছুটে এসেছে ব'লে তাড়া লাগালেন, সরিয়ে দিলেন ঝি চাকরের ভিড়, তারপর দরজা আটকালেন ঘরের। বৌয়ের হাত ধ'রে টেনে বসাতে চেষ্টা করলেন খাটের উপর, 'তুমি না ভদ্রলোকের মেয়ে, ভদ্রলোকের স্ত্রী, এসব কী ভাষা তোমার, কী অসভ্যতা!'

হিরণ্ময়ীর সাধ্য কি তাকে রোখেন। এক ধাক্কায় সে ঠেলে দিল অভুক্ত অনিদ্র শাশুড়ীকে। তীক্ষ্ণ চিৎকারে মুখ দিয়ে অবিরত অশ্লীলভাষার খই ফুটলো। প্রায় অর্ধমৃত হ'য়ে কানে আঙুল দিয়ে হাঁটুতে মুখ ঢাকলেন হিরণ্ময়ী।

ক্রমশঃ

'হিদভগবংজাতেতি এলুংমিনিগামে উবলকেক খে অঠভাগীয়েচ ॥'

খাটভাগিণী হতভাগিণী খেয়াঘাটের খেমটাওয়ালিকে নিয়ে উপল-ময়ুর
আমি এ লুম্বিনী-গ্রামে এলাম, আমি হিন্দু ভগবতজাতির মানুষ।

—লুম্বিনী স্তম্ভলেখ ॥

# কাগজ

**অমল দত্ত**

হাওড়া ষ্টেশন। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সী অতিক্রুত এর গথিক খিলানের সামনে এসে থেমে যাচ্ছে, উদগীরণ করছে অজস্র জনতা। একদল পদচারীর মিছিল দৃষ্টির শেষপ্রান্ত পর্যন্ত লাইন বেঁধে পিলপিল করে এগিয়ে আসছে। হাওড়া ষ্টেশনের ভেতর থেকেও জনতার ভীড় ঝাঁকে ঝাঁকে বহিরাগত। বিপরীতমুখী জনতা ও যানবাহন কোথাও কোথাও সংঘাত বাঁধিয়ে অচল হয়ে আছে। এই গেরো থেকে আলগা না হতে পারলে কোথায় আছি ঠাহর করা যায় না।

ষ্টেশনের ভেতরে যেতে হলে একটা জনতার ধারার মাঝে গা ছেড়ে দিতে হয়। নইলে এগিয়ে যেতে বাধা—বিপরীতমুখা জনতা পেছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। অনুরোধ করেও লাভ নেই, কেউ কারোর কথা শোনে না। একটা প্রচণ্ড কোলাহল সব কথা ছাপিয়ে আছে।

বিনু হয়রানি হয়েই ষ্টেশনে এসে ঢুকলো। যত তাড়াতাড়ি করবার চেষ্টা করছিল, তত ভিড়ে পড়ে ঘোরপাক খাচ্ছিল, মেজাজ খারাপ করে আর পথের নিশানা পাচ্ছিল না, ষ্টেশনের ভেতরে ঢুকেও উপায় নেই। এই বিরাট জনস্রোতে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুর দল চরের মতো মাথা চাড়া দিয়ে আছে। ঠিক সোজা চলবার উপায় নেই, একটু ঘুরে চলতে হয়।

বড় ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিনু শঙ্কিত হয়ে গেল। সেরেছে, এক্ষুনি দিল্লীর গাড়ি ছেড়ে দেবে—পনেরো মিনিটও হাতে নেই। বন্ধুকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা না জানাতে পারলে স্বার্থহানি হবার ভয় আছে। দিল্লীর ওপরআলাদের সঙ্গে বন্ধুটির হাসিখুশীর সম্বন্ধ আছে। বন্ধুটির সাহায্যে একটা ব্যবস্থাও বিনুর হয়ে যেতে পারে। লেখক হিসেবে তার যেটুকু নাম আছে সাধারণ জীবন-যাত্রায় তা বদনামের সামিল, বখাটেপনা।

প্লাটফর্ম টিকেট কাটতে গিয়েও একটা ভিড়ের মুখোমুখি হতে হলো। টিকেট কাটতেও রক্ষা নেই, ঘাড়ের ওপর আরো কয়েকটি হাত এসে পড়েছে। ওখান থেকে বেরিয়ে এলেই সামনে ঘিরে থাকে কয়েকটি কাঙালের প্রসারিত হাত—একটা পয়সা দিন, বাবু! একটা পয়সা!

বিনু এবার ছুটতে আরম্ভ করলে। কোনো দিকেই আর তাকাবে না। কোনো ভিড়েই আর সে হুচোঁট খাবে না!

উদ্বাস্তুরা অনেকটা জায়গা নিয়ে উপনিবেশ গড়েছে। তাদের চোখে যাত্রীর উদ্বেগ নেই, বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে কেউ ঘুমুচ্ছে, গল্প করছে অথবা রান্নার ব্যবস্থা করছে। বিনু ওদের মাঝখান দিয়ে সরাসরি পাড়ি দিল। গালিগালাজ ভ্রুক্ষেপ করলে না। উপনিবেশের শেষপ্রান্তে প্লাটফর্মের মুখ—একটি তরুণী বিনুর পথ আগলে দাঁড়ালে। বিনু বুঝতে পারলে না, মেয়েটি তাকে কী বলতে চাইছে। এই উপনিবেশের অধিবাসিনী বলেও তাকে মনে হয় না। পরনে ছাপার শাড়ী, চোখের কোণে সলজ্জ হাসি। অত্যন্ত চাপা গলায় কী একটা কথা বলছে মেয়েটি।

'ইষ্টিশনের কাউকে জিজ্ঞেস করুন', বলে বিনু প্লাটফর্মে অতি দ্রুত ঢুকে পড়লো। এতটুকু সময়ও খরচের উপায় নেই!

"এই যে বিনু, এসেছিস! আমি ভাবলুম—"

"কী ভাবলি? আসবো না?"

"না আসবি। গাড়িটী ছেড়ে গেলে পর"—

"ও বদনামটা তুই লেখকদের দিতে পারিস। আমাকে নয়। একেবারে যুদ্ধং দেহি বলে প্লাটফর্মে ঢুকতে পেরেছি। নইলে তো বানভাসি হয়ে যেতাম।"

"লবেজান তরী হয়েই এই অবস্থা! শরীরে কিছু মাংস থাকলে তোর ঐ ভয় থাকত না।"

"সূক্ষ্ম জিনিসের কারবার করি, স্থুল মাংস দিয়ে কী হবে!"

"হতো। তুই যদি সূক্ষ্ম জিনিসের কালোবাজারী হতিস্। চা খাবি তো?"

"সময় কুলোবে কি?"

"যতটা পারিস, খেয়ে নে! এই চা!—"

অনেক আশা-ভরসা নিয়ে গাড়িটা ছেড়ে দিল। বিনু তাকিয়ে রইল, যতক্ষণ তাকানো চলে। তারপর ভিড়ের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিলে। যাবার তাগিদ বিনুর খুব নেই, মনের সমস্ত তাড়াহুড়ো গাড়িটার সঙ্গে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তবু বিনু চলে, পেছনকার লোকজনের ধাক্কা খেয়ে। একটু ক্লান্তি, একটু ভাবনায় বিনু আনমনা হয়ে চলে: পকেট দুটো সব সময়ে এত পাতলা থাকে যে, নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হয়। সৌজন্য জানাবারও সুযোগ নেই।

[illegible] পার হয়ে বিনু দেখতে পায় তরুণীটি ওখানেই দাঁড়িয়ে আছে, অনেককেই কী বলবার চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ কানে তুলছে না। চোখের কোণে এখনো স্পষ্ট হাসির ইঙ্গিত। কী যেন তার বলতে বাধ-বাধ ঠেকছে।



বিনু মেয়েটির সামনে গিয়েই যেন উল্লসিত হয়ে উঠলো। মেয়েটিও খুশী না হয়ে পারে না, হাত বাড়িয়ে দিয়ে চাপা গলায় বললে, "আপনারা থাকতে এত কষ্ট পাব কেন!"

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বিনুর মনে পড়ে গেছে, তার হাতের মুঠোয় প্লাটফর্ম টিকেটখানা অটুট আছে। তার মানে দু'আনা পয়সা। ট্রামে বেশ ভালভাবেই যাওয়া যাবে। মেয়েটি যেন কী বললে!—বিনু রওয়ানা হলো টিকেট ঘরের দিকে, ওখানেই ক্রেতা মিলবে।

পেছনে জামায় একটু টান পড়ে। বিনু ফিরে তাকিয়ে দেখে সেই মেয়েটি, চোখের হাসি গোপন করবার জন্যে মাথা নুইয়ে আছে। বিনু শুধায়—"কী ব্যাপার বলুন তো?"

চকিতের চাউনি দিয়ে মেয়েটি বলে, "সাহায্য করবেন?"

"সাহায্য? আমি? আপনি লোক চেনেন নি!"

"আমি বাস্তুহারা, জন-জমি ঘর-সংসার সব খোয়া গেছে।"

"তা হলে আছেন কী করে?"

"আপনাদের দয়ায়।"—মেয়েটি বুঝি হাসবার চেষ্টা করলে!

"সবাই কি দয়া করতে পারে?" বলেই বিনু পা বাড়িয়ে দেয় টিকেট ঘরের দিকে। দয়া যারা করে, তাদের দাবীর শেষ নেই।

বাস্তুহারা উপনিবেশটি হাওড়া ষ্টেশনের বড় অংশ দখল করে আছে। ছোট বড় চাটাই—ছেঁড়া কাঁথা পাতা রয়েছে, তার চারদিকে হাঁড়ি কলসী তোরঙ্গ গাঁটরীর পাঁচিল দিয়ে এক একটি পরিবার সংসার জমিয়েছে। মেয়েপুরুষ সকলের পরনে নোংরা মাটি রঙের কাপড়, চুলে ধূলো চটকে আছে। পুরুষদের নগ্ন গাত্র মেয়েদের উর্ধাঙ্গ ঢাকবার চেষ্টা আছে, কিন্তু ঢাকা যায় না। ছেঁড়া দিকটাই আঁচল করা হয়েছে। তবে তাদের অনেকেরই লজ্জা পাবার কিছু নেই— জীবন যৌবন ধনমান সবই খুইয়ে তারা বাস্তুহারা। ভ্যাপসা গন্ধে ঐ স্থানটি ভরপূর। মাছির উৎপাতও বড় কম নয়। অনেকেই হাঁড়ি ভরে পচা ভাত ঢেকে রেখেছে। ছেলেমেয়েরা বায়নাক্কা ধরলে একটু-একটু জল দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে।

বিনু প্রদক্ষিণ করে চলেছে। উপনিবেশের কিনারে অর্ধবৃত্তাকার ছোট ছোট দোকান। উদ্বাস্তুদের ব্যবসা প্রচেষ্টা। কোথাও ফলের দোকান, কোথাও মুড়িমুড়কী কোথাও পান-বিড়ি-সিগারেট। একজনের শুধু চীনেমাটির কিছু নষ্ট বাসনপত্তর দিয়ে দোকান সাজাবার চেষ্টা। আর একজন দুটো ডাব হাতে করে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে মরছে।

একটি মহিলা উনুনে পেঁয়াজি ভাজছেন, তাঁকে ঘিরে কিছু লোভী খদ্দেরও সমাসীন। এরা সবাই বাঁচতে চায়। নিজের ভাবনা আর অভাব নিয়েই বাঁচতে চায়। দয়ায় বাঁচার বিড়ম্বনার থেকেও বাঁচতে চায়।

পড়ন্ত বেলা। গাঁয়ের বধূদের জলকে চলার সময়। তৃতীয় শ্রেণীর টিকেট ঘরের পেছনের দিকে সারি সারি ট্যাপ রয়েছে। লেখা আছে পানীয় জল। মুখোমুখি সারি সারি পায়খানা। পায়ের কাদায় ও দুর্গন্ধে ওদিকটায় এগুনো যায় না। তবু পড়ন্ত বেলায় গাঁয়ের বধূরা জল ভরণে যায়। ভাঙা গাগরী, নাগরীদের পরণে শতছিন্ন বাস, ব্রীড়াবনতা নিতম্বিনীর ভারী চলন নয়, প্যাকাটির মত শুষ্ক দেহ আগুনে ঝলসানো গাছের মত খট খট করে চলেছে—তাদের কপালের মেটে সিঁদুরের স্পর্শ যেন বিগত দিনের কোনো এক স্মৃতি। এই পরিপ্রেক্ষিতে আর টিঁকবে কী না সন্দেহ। গাঁয়ের বধূরা জলকে চলেছে এই পড়ন্ত বেলায়।

বিনুর গতি শ্লথ হয়ে পড়েছিল। এই উপনিবেশের বাসিন্দারা বুঝি স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় জঞ্জাল হয়ে আছে। জীবনমৃত্যু তাদের কাছে অর্থহীন, সাধারণ সুকোমল বৃত্তিগুলি আর খেলা করে না। শুকনো ডালার মত এরা, প্রাণ দেয় না, আগুন জ্বালাতে পারে।

মাইকের মারফত একটি ঘোষণা গমগম করে উঠলো: লোকাল ট্রেনগুলি প্লাটফর্মে প্রস্তুত হয়ে আছে।—

বিনু ধড়মড়িয়ে উঠলো—এক্ষুণি টিকেটখানার একটা গতি করা দরকার। বেলা গেছে।

দু'পা এগুতে না এগুতে বিনুর পথ রোধ হয়ে আসে। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক প্লাটফর্মের দিকে ধেয়ে চলেছে। অনেকেরই হাতে পুঁটলাপুঁটলি বাজার-সওদা। মুখে প্রসন্ন হাসি, অফিসের কিঞ্চিৎ রসালাপ অথবা বাজার দর। বিনু বুঝলে, অফিস-জল-তরঙ্গে সে হাবুডুবু খাচ্ছে, তরঙ্গর পর তরঙ্গ আসচে, উদ্বাস্তুরাও দোকান চেপে বসে আছে—টাল সামলাতে ব্যস্ত। বিনু হাত দুটো সামনের দিকে মেলে দিয়ে পথ খুঁজতে লাগলো—দূরে প্লাটফর্ম টিকেট লেখা লাল অক্ষরগুলো তাকে ডাকছে, এই জনতার চাপে শুধু তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই।

বিনু দু'হাত দিয়ে লোকের সংঘর্ষ ঠেকায়। কেউ কনুই দিয়ে গুঁতো মারছে, কেউ কোমর দিয়ে ঠেলছে, কেউ কাঁধ ঘেঁষে যাচ্ছে—কেউ বা সরাসরি উপরে এসে পড়ছে। একজনের উঁচু হাতে একটা ইলিশ ঝুলতে ঝুলতে এসে বিনুর নাকের ডগায় প্রলেপ দিয়ে



গেল। বিনু রাগ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল, পেছনে মেয়েলি হাসি শুনে থমকে গেল। সেই তরুণীটি আবার এসে দাঁড়িয়েছে।

"বলেছি তো, আমার দেবার ক্ষমতা নেই।" বিনু একটু বিরক্ত হয়ে বলে।

"আপনি রাগ করছেন। ইলিশ মাছ দেখলে আমার ভাল লাগে। ওর গন্ধ শুঁকলে খুশী হই—দেশের কথা মনে পড়ে।" বলে মেয়েটি চুপিচুপি।

"তা হলে মাছটার পেছন পেছন চলে যান! আমার পেছনে কেন?"

"নইলে আমার চলবে কী করে?" মেয়েটির চোখের কোণে যেন একটু হাসি চিকিয়ে ওঠে। মত মুখখানি পাথরের মত নিথর। অস্ফুট ভাষায় বলে, "সাহায্য—সাহায্য চাই।"

"কে দেবে?"

"আপনি।" মেয়েটির চোখ দুটো চক চক করছে।

"আমি?" বিনু তাকিয়ে থাকে প্লাটফর্ম টিকেট লেখা জ্বলন্ত অক্ষরগুলির দিকে।

"বিনুদা!"—

ডাক শুনে বিনু চমকে ওঠে। অনেক পুরনো পরিচিত কণ্ঠস্বর নিয়ে সামনের জনস্রোতে একটি মেয়ে ভেসে আসছে। আরে এ যে সীতা!

সীতা ছুটে এসে কাছে দাঁড়ালো—'বিনুদা, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছো?"

বিনু জবাব দেবার আগে তাকিয়ে দেখে সেই তরুণীটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

"এই একজন বন্ধুকে তুলে দিতে এসেছিলাম, তা ভালো আছো, সীতা!"

"এ বাজারে কেউ কি ভালো আছে বিনুদা?" সীতার ঠোঁটে মৃদু হাসি। "তুমি কেমন আছো?"

"ভালো বলতে পারি নে।"

"এসো, এখান থেকে সরে এসো! আমরা একেবারে বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি। ষ্টেশনের বাইরে হলে গাড়ি চাপা পড়তে।"

"রাস্তার কি কোনো চিহ্ন আছে?"

"এখানে ঘাস বিছানো থাকলে নিশ্চয়ই পায়ের চিহ্ন পড়তো। লোকের চলার একটী গোঁ আছে, তাতেই এ দিকটা সদর রাস্তা।"

"বাঃ, বেশ বলছো তো!"

"আরো বলবো?" সীতা হেসে ওঠে—"একদল মেয়ে যদি থাকে, তবে সদর রাস্তাটী ওদের আসে-পাশে ছুটতে থাকে।"

"সে কী!"

"আমি হাওড়াষ্টেশনে থেকে তাইতো দেখছি—ঐ যে লাল শালু কাপড়ে 'রিলিফ সেণ্টার' লেখা আছে ওটাই আমার অফিস।"

"কাদের জন্যে রিলিফ?"

"এই যে উদ্বাস্তুরা—এদের জন্যে। দেখছো না ভাঙা ইটের পাঁজার মত কেবল নোংরা ছড়াচ্ছে! এসো!"

"তোমাদের কী কাজ?" বিনু সীতার পেছন পেছন হাঁটতে থাকে। ভিড় বাঁচিয়ে চলবার কায়দা সীতা বেশ রপ্ত করেছে। সাপের মত এঁকেবেঁকে পথ করে নিতে পারে।

"আমাদের কাজ বসন্ত, কলেরা এপিডেমিক ঠেকিয়ে রাখা। অষুধ ইঞ্জেকশন, উপদেশ দিয়ে। আর বাজে লোকজনের পাল্লায় যাতে না পড়ে, সে জন্যে "ঘুরে ফিরে একটু তদারক করি।"

"আর ক্ষুধার অন্ন?"

"তা আমরা কি জানি? ওরা উড়িষ্যা সরকারের জিম্মায় ছিল, রাগ করে চলে এসেছে।"

বিনুরা রিলিফ অফিসের সামনে এসে গেছে। ওটা থেকে একটু এগিয়ে গেলেই প্লাটফর্ম টিকেট ঘর। কাউণ্টারের সামনে লোকজন দেখে বিনুর মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিনু বলে, "আচ্ছা সীতা, তোমার তো বোধ হয় অনেক কাজ—আমি বরং আজ চলি।"

"না না—আমার তেমন কোনো কাজ নেই। একটু চা খাবে?"

"না, চা খেয়েছি।'

"এই ভীড়টা এক্ষুণি পাত্‌লা হয়ে যাবে। তখন আর তোমার খারাপ লাগবে না। তোমারা কবি মানুষ, বিনুদা, জানি নিরিবিলি ছাড়া তোমাদের পছন্দ হয় না।—"

বিনু অসহায় ভাবে সামনের লাল অক্ষরগুলোর দিকে তাকায়। কয়েকটি লোক যেন টিকেট কেটে বেরিয়ে আসচে!

"তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হলো বিনুদা। তাও কী না হাওড়া ষ্টেশনে। মাস তিনেক আগে আমাদের গাঁয়ের পণ্ডিত মশায়ের ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—"

"ওর না যাত্রার দল ছিল?"

"হ্যাঁ। পাকিস্তান হবার পর কলকাতায় চলে আসে। এখন গাড়িতে অষুধের ক্যানভাস করে।"



"তা হলে ওর অভিনয় জানাটা কাজে লাগছে।" বিনু হেসে বলে।—"যাত্রার অভিনেতা থেকে ক্যানভাসার, প্রমোশন না হলেও খারাপ নয়।"

সীতা হেসে উঠলো: "পণ্ডিত মশায়ের ছেলে আমাকে দেখে বললে, দিদি, তুমিও চাকরী করছো!"

"তুমি কিছু বললে না সীতা"

"কী বলবো। চাকরী করছি বলে মাঝে মাঝে আমারও তো কান্না পায়—টেম্পোরারী চাকরী আর তার জন্যেও কত হাতে পায়ে ধরাধরি। আমরা তো ওভাবে তৈরী হই নি, বিনুদা।"

"তা বটে। চাকরী আর কাজ এক কথা নয়।" বিনু একটু আনমনা হয়ে যায়।

"তুমি বুঝবে না, বিনুদা, মেয়েদের চাকরী করার কত বিপদ। একটু দাঁড়াও! জলের ট্যাপগুলোর সামনে হৈ চৈ শুনতে পাচ্ছি—দেখে আসি।"—সীতা একটু শক্তভাবে ঘাড় সোজা করে বেরিয়ে গেল। গাঁয়ের বধূরা জলকে গেছে, সেখানে লোভী ভ্রমরের গুঞ্জরণ হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়।

বিনু ভাবলে, এই সুযোগে টিকেটখানা বেচে দিতে হবে। তাড়াতাড়ি সে টিকেট ঘরের দিকে চলে গেল। চকিতে দেখে নিল সীতার নজরের বাইরে আছে কী না। কাউণ্টারের সামনে একটি লোক কী যেন বলছিল। বিনু তাকে গিয়ে পাকড়াও করলে।—"আপনার প্লাটফর্ম টিকেট চাই?

"আজ্ঞে না আমি গাড়ীর টাইম জিজ্ঞেস করছি।"

"ও। সে তো এখানে নয়।" বিনু মনে মনে হতাশ হল, তা হলে একটু দাঁড়াতে হবে। এই যে, আরেকটি লোক কাউণ্টারের কাছে আসছে—না ও তো ষ্টেশনেরই লোক।

"এই যে বিনুদা।" সীতা ছুটে আসে—তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এখানে এসে দাঁড়িয়েছ যে বড়?"

"না—এই এখানে বেশ বাতাস আছে। তাছাড়া—তোমার অফিসের সামনেও ভীড় কম নয়।"

"তা হলে বোঝো কী হতচ্ছাড়া জীবন কাটাচ্ছি। যখন অসহ্য লাগে তখন একটী জায়গা আছে—বড় নির্জ্জন—বড় মধুর—সেখানে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকি। যাবে একবার সেখানে?"

টিকেটের চিন্তায় পীড়িত হয়ে বিনু বললে, "থাক তোমার কাজে ব্যাঘাত হবে—"

"তোমার জন্যে কাজ অপেক্ষা করতে পারে। ত্রিমিতেই তো ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছো। বাড়ির লোকজনের কথাও তো জিজ্ঞেস করলে না।"

একটু পুরনো অভিমানের আমেজ। বিনু তাড়াতাড়ি বললে, "চলো! হাঁওড়া ষ্টেশনেও এমন জায়গা আছে কী না—তাই"—

"এক্ষুণি তোমার সন্দেহ ঘুচবে। কবি না হলেও, নদীমাতৃক দেশের মেয়ে আমি—এ কথাটা ভুলে যেও না! এসো।" সীতা বিনুর বাহু আকর্ষণ করলে।

হাওড়ার ষ্টেশনের উত্তর প্রান্ত থেকে দক্ষিণ প্রান্ত অনেক দূর পথ। ভীড়ের দাপট অনেক প্রশমিত হয়েছে, চলতে অসুবিধা হচ্ছিল না। ভীড় নেই—তাই লোকজন নিজেদের সামলাতে ব্যস্ত নয়—তাদের চোখ বেসামাল হয়ে বিদ্রুপ বর্ষণ সুরু করেছে। সীতার সঙ্গে চলতে গিয়ে বিনু তা ঠাহর করতে পারলে।

দক্ষিণ প্রান্তে একটি সিঁড়ি উপর দিকে ওঠে গেছে। সীতা বিনুর হাতে হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে উপরে চললে। চোখে তার রহস্য ঘন নীরবতা।—দৃঢ় মুটিতে বিনুকে টেনে নিয়ে চলেছে। সিঁড়ির প্রতি ধাপে ধাপে বিনুর বিস্ময় জমাট বেঁধে ওঠে। স্বল্পভাষিণী নির্ভরশীলা কোমল যে মেয়েটিকে সে জানতো, তার সঙ্গে এই সীতার কত তফাৎ।

সিঁড়ির এক বাঁক ঘুরেই পেছনকার অজস্র জনতার কোলাহল স্তিমিত হয়ে আসে। দৃষ্টিগোচর হয় গথিক-স্তম্ভ আর আর্কের ফাঁকে এক ফালি শুভ্র আকাশ; হাওয়ার ঝাপটা চোখেমুখে লাগে। সিঁড়ির শেষে বিরাট হল-বারান্দা, উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীদের বিশ্রামের আয়োজনে পরিপূর্ণ। কিন্তু কোনো যাত্রীই বুঝি এর নীরবতা ভঙ্গ করতে আসে না—আসে না একাকীত্বের ভয়ে। সামনে গঙ্গার শীর্ণ রেখা অস্তমিত সূর্য্যের লালিমায় লাল হয়ে আছে।

সীতা বিনুকে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, "দেখ গো কবি! এমন গঙ্গা আর কখনো দেখেছো?"

বিনু কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, "না—এমনটি আর দেখেনি। প্রকৃতির কোলে নদী দেখেছি, গঙ্গার মত বন্ধন দশা কোনো নদীর নেই। গঙ্গা দেখেছি ঘাটে ঘাটে জেটিতে —নাগপাশে। কিন্তু জলস্রোতের মাথায় দাঁড়িয়ে এমনটি দেখেনি।"

সামনে গিয়ে দাঁড়ালে গঙ্গা শীর্ণ মনে হয় না। এ পাড়ে প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্বরে অসংখ্য যানবহানের সমাবেশ—দক্ষিণে জেটিতে মালগাড়ীর থেকে মাল খালাস হচ্ছে, আর উত্তরে হাওড়া ব্রীজের রূপালি বলয় চিক চিক করছে। ওপাড়ে পোর্টকমিশনারের মালগুদামগুলির সামনে ক্রেন, জাহাজ, সারি সারি নৌকো, স্নানার্থীর জটলা। দূরে কলকাতায় অভ্রংলিহ অট্টালিকা। গঙ্গার স্রোত আর মানুষের চলাফেরা এই বিরাট



পরিব্যাপ্তি জীবন্ত করে রেখেছে। এই জনসমাবেশ, বিরাট বৈভব, ইস্পাত কারুকার্য্যে এই সভ্যতা—সবই গঙ্গার মুখাপেক্ষী। এখানে গঙ্গা মুক্ত, সাগর-সঙ্গমের প্রাণাবেগে পরিপূর্ণ।

সূর্যাস্তের রশ্মি ফিকে হয়ে আসে। বাতাসের জোর বাড়তে থাকে—গঙ্গার জলে রঙীন ছোট ছোট ঢেউ গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ভেঙে পড়ে।

বাতাসে সীতার চুল এলোমেলো হয়ে গেছে, দু'হাতে সে চুলগুলি চেপে বললে—"আঃ! বিনুদা, দেখেছো, কত জল। ডুব দিয়ে এলে কেমন হয়!"

"লোকে মন্দ বলবে।"

"সে বালাই কী এখনো আছে। মন্দ বলার দিন ফুরিয়েছে।"

"তাহলে পাগল বলবে।"

"আমাকে বলবে না, তোমাকে বলবে।"

"কেন?"

"হরদুয়ারের গঙ্গায় লোকে ধ্যান করে, আর কলকতার গঙ্গায় ব্যবসাদার হয়। তুমি হরদুয়ারের লোক।"

"ঠিক কী যে বলতে চাচ্ছো, বুঝতে পারছিনা সীতা!"

"তুমি নিজের ধ্যায়ানে আছো, কী করে বুঝবে। কলকাতায় আবহাওয়ার সঙ্গে তোমায় খাপ খাইয়ে চলতে হয় না—"

"না চললে কী ক্ষতি?"

"ক্ষতি নয়, একটী গোটা পরিবারের মৃত্যু—"

আর একটা দমকা হাওয়া এসে তাদের চোখেমুখে ঝাপটা দিয়ে গেল।

বিনু উদাত্ত স্বরে বললে, "আমরা কি এর উর্ধে উঠতে পারি না?"

বাতাস ততক্ষণে মিইয়ে গেছে। সীতা চুল সংযত করে বললে, "তুমি পারো—আমরা পারি না। দেশ বিভাগের কোন দাগই তোমার মনে কাটে নি।"

"কেন? আমাকেও তো যুঝতে হচ্ছে।"

"সেটা তোমার বিলাস। দেশ বিভাগ না হলেও তাই করতে। রিফিউজী দরখাস্ত নিয়ে কোনোদিন কি অফিসের দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছো?',

"না—সে সুযোগ আমি নিই নি।"

সীতা একটু থমকে আর্তস্বরে বললে—"সে কি সুযোগ? সে যে কত বড় দুর্যোগ তা যদি তুমি বুঝতে। তাইতো লোকের বলাবলির বাইরে চলে গেছি।"

জোর বাতাস বইতে সুরু করেছে। সূর্য্য অস্ত গেছে। ধূসর গোধূলিতে জলের রং চন্দনের মত। বিনু লক্ষ্য করলে জোয়ারের ধারায় গঙ্গা ফুলে ফুলে উঠেছে।

সীতা বলে চলেছে, "কলকাতায় যখন আসি, তোমার কথাই বড় বেশী করে মনে পড়েছিল, বিনুদা। বুঝতে পারি নি, দেশ বিভাগে আমরা বড় দূরে চলে গেছি। বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেছে।"

"বিশ্বাসের নয় জীবনের ভিত্তি নড়ে গেছে। তাইতো নিজের বেদনা নিজেই বহন করে চলেছি। কাউকেই ঠকাতে চাইনে। সার্টিফিকেট না থাকলেও, সীতা, আমিও উদ্বাস্তু। আমারও ঘরের ঠিকানা নেই।"

"ঘরের ঠিকানা তুমি চাওনি—"

"আমি চাইনি। তা হলে মিথ্যা বলা হবে"

গঙ্গার স্তিমিত জলে আবেগ সঞ্চার হয়েছে। শান-বাঁধানো তীরে ঢেউ এসে আঘাত করছে। গোধূলির ছায়া মিলিয়ে গিয়ে আবছা চাঁদের আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছে চারদিক। দপদপ আলোর মালা জ্বলে উঠছে।

সীতার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে—"জানো কি পুরুষের ঘরের ঠিকানা কোথায়? মেয়েদের হৃদয়ে। মিছেই কবিতা লেখো, বিনুদা! আসল কথাটাই জানো না।"

নিচের বিদ্যুৎ-বাতিগুলোর বিকীরণে সীতার চোখের জল মুক্তোর মতো দুলছে। বিনু বেদনার্ত সুরে বললে, "সীতা, এ জানবার আনন্দ আমি হারিয়ে ফেলেছি।"

"তার মানে তুমি একাই থাকতে চেয়েছিলে?"

"না—চেয়েছিলাম পরিকল্পনায়। ওটা স্বপ্নে ছিল, বাস্তবে রূপ দিতে পারি নি।"

"তার মানে তুমি মেয়েদের খেলনা মনে করো—"

"না নিশ্চয়ই নয়—"

"তা হলে ছেলেমানুষ ভাবো—সঙ্গিনী ভাবো না। তাই তোমার স্বপ্ন সত্যি হয়নি। পরিকল্পনা দু'জনের—একার নয়।"

"অন্তত তোমাকে আমি ছেলেমানুষ ভেবেছিলাম।" বিনু বলে।

"তাই তুমিও ঠকেছো—আমাকেও ঠকিয়েছো—"

"না, সীতা, তোমাকে আমি ঠকাই নি।"

"তুমি নিজেকেই ভালোবাসো কী না—বিনুদা—তাই অপরের বেদনা বুঝতে পারো না।"

"কি জানো, তোমাকে রক্ষা করব চেয়েছিলাম—"



"আমাকে?—"

"হ্যাঁ। তোমাকে আমি রক্ষা করতে চেয়েছিলাম—আমার হাত থেকে। তুমি তো জানো সীতা আমি কত বড়ো বাউণ্ডুলে। তোমার শান্ত কোমল মিষ্টি স্বভাব—নির্ঝঞ্ঝাট সুখী পরিবারেই তোমাকে মানায় ভালো।"

"তাই বটে। তুমি যে এত কাপুরুষ তা আগে জানতাম না। জোর করে দখল করবার ক্ষমতা তোমার নেই। খালি অজুহাত।" সীতার চোখ দিয়ে টপ টল জল গড়াতে লাগলো।—"কবিতায় বড় বড় কথা লিখছো আসলে জীবনের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারো নি।"

একদল লোকের উল্লাসে তারা সামনের দিকে তাকাল। জোছনায় চারদিক প্লাবিত হয়ে গেছে—হাওড়াব্রীজে ও দুই তীরে বন্ধুলোক আগ্রহভরে দাঁড়িয়ে আছে—প্রবল জলোচ্ছ্বাস অনেকটা উঁচু হয়ে চারদিক মথিত করে ছুটে আসচে। গঙ্গার রূপলি ধারায় খণ্ড খণ্ড চাঁদের আলোড়ন চলেছে। গুরুগম্ভীর নিনাদ করে একটা এলুমিনিয়ামের দেয়াল যেন এগিয়ে আসচে। দুই তীরের কানায় কানায় জলে টইটুম্বুর ছপ্ ছপ্ শব্দ।

বিনু সীতার ঘাড়ে হাত রাখলে। সেই মুহূর্তে নিবিড় ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো দু'জন। এ জলোচ্ছ্বাসে সব কথা ডুবিয়ে দিয়েছে, সমস্ত বিদ্যুৎ আলো জনতা অট্টালিকা মহানগরীর নটিনী বেশ ম্লান হয়ে গেছে গঙ্গার অসহ্য উজ্জ্বল রজত ধারায়। সমুদ্রের ডাক এসেছে। সীতা বিনুর ঘাড়ে মাথা এলিয়ে দিয়ে নির্নিমিষ নয়নে তাকিয়ে থাকে।

জলোচ্ছ্বাস ব্রীজের তলা দিয়ে সরবে পার হয়ে গেল। সোঁ সোঁ আওয়াজের সাথে লোকের উল্লাসে শঙ্খনিনাদের মত শোনা গেল, নারী কণ্ঠের উলুধ্বনিও ভেসে এল। গঙ্গার সঙ্গীতি দুই কুল উপছে পড়ছে—জাহাজ-নৌকোগুলি দুলে উঠছে। জলে জোছনায় আর বুঝি বাঁধ মানবে না।

বিনুর কানে ভেসে আসে জলের কুলুকুলু শব্দ। মুছে গেছে আর সব, ভেঙে পড়েছে লোহা আর পাথরের সীমা রেখা—চারিদিকে থই থই জল। সীতা আর তাকে ঘিরে শুধু রূপলি জল উছলে পড়েছে। হাওয়ায় পাল তুলে তারা দুজন আর টুং টাং জলের সারেং।

"বিনুদা!"

"সীতা।"

"বিনুদা!"

জলের সারেং-এ সাধা টুং টাং বেজে ওঠে। সীতা কী বলতে গিয়ে বলতে পারে

না। তার মনে পড়ে তিতাসের তীরে এমনি তারা গিয়ে বসতো—এমনি হাওয়ায়, এমনি জলোচ্ছ্বাসে।

নিচের চত্বর থেকে ভীষণ আওয়াজ আসে। দুটো গাড়ির ধাক্কা লেগেছে—একটীর ঘাড়ে আরেকটা এসে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভারদের চীৎকার। ব্রেক কসবার শব্দ। দুই দিকে গাড়িগুলি থেমে গেছে।

তারা যেন জেগে উঠলো। সীতা চমকে বললে "এই দেখ—তোমার জন্যে আমাকে গাল খেতে হবে। ইস্ অনেক দেরী হয়ে গেছে। তুমি এসো, আমি যাচ্ছি।—"

"আচ্ছা।"

"আসবে তো?"

"আজ নয়। আর এক দিন।"

"এসো না—একসঙ্গেই বাড়ি ফিরবো।"

"আজ নয়, সীতা—লক্ষ্মীটি!"

সীতা বিনুর মুখের পানে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপর বললে—"আচ্ছা। তুমি এত রোগা হয়ে গেছ বিনুদা, আমি ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি—"

প্রবল বাতাসে সীতার দীর্ঘশ্বাস পড়লো কী না বোঝা গেল না। বিনু মৃদু হেসে বললে; "রোগা তুমিও কম হও নি।"

"আমার জীবনের মূল্য কী! তুমি কবি, তোমার বাঁচা দরকার।"

সীতা দ্রুতপায়ে নেমে চলে যায়। বিনু একটা বিড়ি ধরালে, তারপর একবার গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়। হাওয়ার পথ রুদ্ধ হয়ে আসে। জনতার কোলাহল বাড়ে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে সেই তরুণীটি দাঁড়িয়ে আছে। বিনুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ফিক করে সে হেসে ওঠে। বিনুর কাছে হাসিটি বড় ভালো লাগে। এ যেন বড় বাড়ির রঙিন আলো বস্তির গায়ে পড়ে করুণ হয়ে গেছে। এ মেয়ের এ হাসিটি বিগত-দিনের। বিনু হাত দিয়ে তাকে ইসারা করে দাঁড়াতে। তারপর দ্রুত ওর কাছে নেমে দাঁড়ায়।

মেয়েটি সলজ্জ কণ্ঠে বলে—"বলুন?"

বিনু হেসে বলে, "তেমন কিছু নয় এই প্লাটফর্ম টিকিটখানা নিন—এটা বেচলে আপনি দু' আনা পয়সা পাবেন।" বিনু টিকিটখানা মেয়েটির হাতে গুঁজে দিয়ে ভীড়ে মিশে গেল।

মেয়েটি অবাক চোখে খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর গঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলে দিলে টিকিটটা। খানিকক্ষণ দাঁড়ালে বিনু দেখতে পেতো—এ মেয়েটির কাছেও ও কাগজের কোনো দাম নেই।

# শিল্পী

**জেমস্ জয়স্**

অনুবাদ: **অশোক গুহ**

[ চিত্রশিল্পে পিকাসো যেমি রিয়্যালিজ্‌মের শেষ কথা শেষ করে স্যুপর-রিয়্যালিজ্‌মে বিচরণ করছেন, তেমি সেন্ট-ভাষাভাষী 'জেমস্ জয়স্' রিয়্যালিষ্ট উপন্যাসের শ্রাদ্ধ সমাপন করে বলে গেছেন, এ-প্রেতপুরীতে আর প্রবেশ করে গোলক-ধাঁধাঁয় ঘুরে মরোনা। তাই পাশ্চাত্য (সাম্যবাদী মুষ্টিমেয় লেখক ছাড়া আর সবাই) এতকাল পরে এ-পথে বিচরণ শেষ ভেবে এখন অন্তরেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের রাজ্যে প্রবেশ করতে উন্মুখ হয়েছে। আমাদের রূপকথার বর্ণগন্ধই ওঁদের এখন কথাসাহিত্যের কণ্ডুয়ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং নোবেল-প্রাইজ নামক বস্তুটি ইদানীং য়ুরোপের ঠানদি-দাদামশাইদেরই দেওয়া হচ্ছে। সংস্কৃতির পথই এমন উদ্ভট—প্রাচ্য যা ত্যাগ করে পাশ্চাত্য তা-ই গ্রহণ করতে উদ্যত হয়। আর পাশ্চাত্য-পরিত্যক্ত বস্তু প্রাচ্যে আদরণীয় হয়ে লোকসমাজের মনে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কথাটা প্রমাণিত করবার জন্যেই আমরা 'জেমস্ জয়সে'র একটি উপন্যাস পাঠকের কাছে উপস্থিত করছি।—পূর্ব্বাশার সম্পাদক ]

সে অনেক দিন আগের কথা। তখন দিনকাল ছিল বেশ ভাল। এক হাম্বী গরু যাচ্ছিল পথে, তার দেখা হয়ে গেল এক মিষ্টি ছেলের সঙ্গে। নাম তার বাচ্চা টাক্কু।.....

বাবা তাকে এই গল্প বলতেন। চশমার ভিতর দিয়ে তাকিয়ে থাকতেন তার দিকে। তাঁর দাড়িভরা মুখ।

হাঁ, তার নাম বাচ্চা টাক্কু। হাম্বী-গরু করলে কি, যে রাস্তায় বেটি বার্নি থাকে সেই রাস্তায় এল; বেটি বিক্রি করত নেবু-দেওয়া মেঠাই।

আহা—যেথা—যেথা সবুজ নিলয়ে
ফোটে বনের গোলাপ
ছোট্ট নিলয়ে—
ফোটে বনের গোলাপ

তিনি গাইতেন এই গান। এ তাঁরই গান।

আহা, সবুজ সবুজ সবই সবুজ যেথা।

যখন তুমি বিছানা ভিজিয়ে দিতে, প্রথমে বেশ গরম, তার পরেই লাগতো ঠাণ্ডা। মা অয়েলক্লথ পেতে দিতেন। কেমন অদ্ভুত গন্ধ।

মার গায়ের গন্ধ বাবার চেয়ে ভাল। মা পিয়ানোর নাবিকের ভেঁপুর সুর বাজাতেন, ওকে তারই তালে তালে নাচতে হবে। ও নাচতো:

ট্রালালা লালা,
ট্রালালা ট্রালাল্যাডি।
ট্রালালা লালা
ট্রালালা লালা

চার্লস খুড়ো আর দান্তে হাততালি দিতেন। ওঁরা বাবা আর মার চেয়ে বড়, আবার চার্লস-খুড়ো দান্তের চেয়ে বড়।

দান্তের সাজসরঞ্জামের মধ্যে ছিল দুটি তুলি। যে তুলির পেছনটা মেরুন রঙের মখমল দিয়ে তৈরী, সেটা মাইকেল ডাভিট-এর জন্যে, আর সবুজ মখমলেরটা পার্ণেল-এর জন্য। যখনই ও দান্তেকে টিস্যু কাগজ এনে দিত তিনি দিতেন একটা করে মিঠে বড়ি।

ভান্সরা থাকত সাত নম্বর বাড়িতে। ওদের বাবা-মা আলাদা। ওরা আইলিনের বাবা আর মা। বড় হলে ও বিয়ে করবে আইলিনকে। টেবিলের নীচে লুকিয়ে পড়লো ও। মা বললেন, ষ্টিফেনকে মাপ চাইতে হবে।

দান্তে বললেন : মাপ না চাইলে আসবে ঈগলের পাল ধেয়ে, চোখ খুবলে নেবে।

চোখ খুবলে নেবে
তাই মাপ চাইবে,
মাপ চাইবে,
চোখ খুবলে নেবে।

মাপ চাইবে—চাইবে,
চোখ খুবলে নেবে,
খুবলে খুবলে নেবে,
তাই—মাপ চাইবে।

বিস্তীর্ণ খেলার মাঠে ছেলেদের ভিড় জমেছে। সবাই চেঁচাচ্ছে, সর্দার-পোড়োরা ওদের আরো জোরে চেঁচিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে। বিকেলের হাওয়া ঠাণ্ডা, কেমন বিবর্ণতা আছে যেন। খেলোয়াড়রা চালিয়েছে আক্রমণ, মারছে বল, চর্বি-মাখা চামড়ার গোলাটা মোটাসোটা পাখীর মতো উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে ধূসর আলোয়। নিজের কোটের শেষপ্রান্তে ও দাঁড়িয়ে আছে, গর সর্দার-পোড়োর দৃষ্টির বাইরে, উদ্ধত রুক্ষ পদবিক্ষেপের সীমার বাইরে, মাঝে মাঝে ছোটার ভান করছে। এই খেলোয়াড়দের ভিড়ে তার নিজের দেহটা খুদে আর দুর্বল বলেই মনে হয়, চোখদুটোও ক্ষীণদৃষ্টি, জল পড়ে। রোডি কিক্‌হাম অমনি ধারা নয়। সবাই বলে ও নাকি ক্যাপটেন হবে।



রোডি কিক্‌হাম ভাল লোক, কিন্তু নাষ্টি রোচটা একটা পাজি। রোডি কিক্‌হাম কুকুরের জন্যে খাবার রাখে, খাবার ঘরে ওর একটা নিজের গেলাসও আছে। আর নাষ্টি রোচের হাত দুখানা মস্ত বড়। ফি-শুক্রবারে যে পুডিং খেতে দেয় ও তার নাম দিয়েছে জ্যাম পুডিং। একদিন ও তো জিজ্ঞেস করেই বসলো, এই—তোমার নাম কি ?

ষ্টিফেন উত্তর দিলে, ষ্টিফেন ডেডালাস।

তারপরে নাষ্টি রোচ বললে, ও আবার কেমন ধারা নাম ?

ষ্টিফেন জবাব দিতে পারলে না। নাষ্টি রোচে আবার জিজ্ঞেস করলে,

তোমার বাবা কি করেন ?

ষ্টিফেন জবাব দিলে : তিনি একজন ভদ্রলোক।

নাষ্টি রোচ আবার শুধালো : হাকিম নাকি ?

নিজের কোটে সে ঘুরছে, মাঝে মাঝে একটু-আধটু ছুটছে। হাত ঠাণ্ডায় নীল, শিটিয়ে গেছে। ধূসর পোষাক, বেল্ট বাঁধা আছে। পাশের পকেটে হাত রেখেছে ডুবিয়ে। পকেটের চারিধারে ঘিরে এ যেন এক বন্ধনী—বেল্ট, আর এই বেল্ট দিয়ে বেল্টিয়েও দেওয়া যায়।

একদিন তো কাণ্টওয়েলকে একটা ছেলে এসে বললে, এখুনি তোমাকে এমন বেল্টিয়ে দেব !

ক্যাণ্টওয়েল জবাব দিলে, যাওনা, ম্যাচ খেলায় গিয়ে লড়না। সিসিল থাণ্ডারকে বেল্টিয়ে দাও দিকি ! হাঁ, আমি দেখতে চাই তোমার কি দশা হয়। ও তোমার পাছায় এক ঘা কষাবে'খন !

ভদ্র কথা নয়। মা বলে দিয়েছিলেন, সে যেন ইস্কুলের গুণ্ডা ছেলেদের সঙ্গে না মেশে, কথা না কয়। মা ভারি ভালো ! সেই প্রথম বিদায়ের দিন তিনি হলঘরে ওড়নাখানা নাকের উপর তুলে ওকে চুমু খেলেন। তাঁর নাক আর চোখ তখন লাল হয়ে গেছে ! তিনি যে কাঁদছেন, ও তা না দেখারই ভান করেছিল। ভালো মা; মিষ্টি মামণি, কিন্তু কাঁদলে তো অতো ভাল লাগেনা তাঁকে। বাবা পকেট-খরচা দিয়েছিলেন দুটি পাঁচ শিলিঙের মোহর। আর বলেও দিয়েছিলেন, যখন যা তার দরকার হবে, বাড়িতে লিখতে। আর সে যা-ই করুক, যেন একজনের কথা আর এক জনের কাছে না লাগায়। তারপর ইস্কুল বাড়ির দরজায়। অধ্যক্ষ বাবা আর মার সঙ্গে করমর্দন করলেন। তাঁর ঢিলে জোব্বা উড়ছিল হাওয়ায়। আর গাড়ি চলে গেল বাবা-মাকে নিয়ে। গাড়ির জানালা দিয়ে ওরা চেঁচিয়ে উঠলেন, হাত নাড়লেন।

বিদায়, ষ্টিফেন বিদায় !

বিদায়, ষ্টিফেন, বিদায়!

চীৎকারের ঘূর্ণি তাকে ঘিরে ফেলেছে, চকচকে চোখের ভয়ে সে ভীত, আর আছে কাদামাখা উদ্ধত বুট, নুয়ে পড়ে তাকাচ্ছে দুপায়ের ফাঁকে। খেলুড়েরা লড়ছে, কঁকিয়ে উঠছে, পা ঘসছে, লাথি মারছে বলে, পা দাপাচ্ছে। এবার জ্যাক লটনের হলদে বুটজোড়া বল বার করে নিয়ে এল। আর বুট আর পায়ের সার ছুটছে...ছুটছে পিছনে। সেও খানিকটা ছুটে গিয়ে থেমে পড়লো। আর ছোটা বৃথা। আর কিছু দিনের ভিতরেই ছুটিতে ওরা বাড়ি যাবে। পড়বার ঘরে ওর ডেস্কের ভিতরের দিকে নম্বরটি সাঁটা আছে, খাবার পরে ও তা বদলে দেবে। সাতাত্তর থেকে ছিয়াত্তর।

এর চেয়ে হলঘরই ভাল; বাইরে বড় ঠাণ্ডা, আকাশ বিবর্ণ, ঠাণ্ডা আকাশ, কিন্তু ইস্কুল-বাড়িতে জ্বলছে আলো। বাড়ি নয় প্রাসাদ-দুর্গ। ও তো ভাবে, কোন্ জানালা থেকে হ্যামিল্টন রোয়ান তার টুপীটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল বাগানের বেড়ার উপর। তখন হয় তো জানালার নীচে ছিল ফুলের কেয়ারী। একদিন প্রাসাদ-দুর্গে তার ডাক পড়েছিল—সর্দার-খানসামা তাকে দরজার কাঠে দেখালে গুলীর দাগ। সবাই যে-রুটি খায়, তারই একখানা তাকে দিলে। ছোট্ট রুটি। সুন্দর দেখতে লাগে প্রাসাদ-দুর্গের আলো, উষ্ণ অনুভূতি আনে। এ যেন বইয়ে পড়া দৃশ্য। হয়তো লিষ্টার মঠ ছিল এমনি। ডাঃ কর্ণওয়ালের বর্ণপরিচয়ে চমৎকার কতোগুলো কথা আছে। যেন কবিতা। কিন্তু সত্যি কবিতা তো নয় কটা কথা, বানান শেখাবার জন্য লেখা।

উলসী মারা যান লিষ্টার মঠে
সেখানে মঠবাসীরা তাঁকে কবর দিলে।
স্যাঙ্কার উদ্ভিদের রোগ
ক্যান্সার জীবের।

ভাল লাগে মেঝেয় বিছানো কার্পেটের উপর শুয়ে পড়তে, আগুনের কুণ্ডটার সুমুখে শুয়ে পড়তে, ভালো লাগে হাতে মাথা রেখে ভাবতে ঐ কথাগুলি। ও শিউরে উঠলো, ঠাণ্ডা কাদা জল যেন লেগেছে গায়ে। ওয়েলসএর ওকে ঘাড় ধরে খানায় ফেলে দেওয়া ঠিক হয় নি। ওর নস্যিদানী দিয়ে বাদাম ভাঙতে দেয়নি বলেই কি অমনি করবে। উঃ জল কি ঠাণ্ডা, আর পাঁকে ভরা! ঐ খানায় কে যেন একটা ধারি ইঁদুরকে লাফিয়ে পড়তে দেখেছিল। মা বসে আছেন আগুনের ধারে আর আছেন দাস্তে। ব্রিগিড কখন চা আনবে তারই অপেক্ষা করছেন। আগুনের কুণ্ডের ওপর তাঁর পা, কারুকাজ-করা চটি জোড়া গরম হয়ে উঠেছে। কি সুন্দর ঐ চটি জোড়ার গন্ধ। দাস্তে অনেক কিছু জানেন। ওকে তিনি কোথায় মোজাম্বিক প্রণালী তা শিখিয়েছেন, আমেরিকার দীর্ঘতম নদীর কথা



আর চাঁদের দেশের সেরা পাহাড়ের নামও তাঁর শেখানো। ফাদার আর্ণাল দাস্তের চেয়েও বেশি জানেন—তিনি পাদ্রি কিনা। কিন্তু বাবা আর চার্লস-খুড়ো বলেন, দাস্তে বুদ্ধিমতী—বহু পড়াশুনো আছে। দাস্তে খাওয়া-দাওয়ার পরে কেমন এক শব্দ করেন, মুখে হাত দিয়ে চেপে ধরেন: বুক নাকি তার জ্বালা করে।

খেলার মাঠে দূরে একটি স্বর শোনা যাচ্ছে: সবাই এক সঙ্গে জড়ো হও!

তৃতীয় কোট থেকেও সাড়া জাগলো: জড়ো হও! জড়ো হও সবাই!

খেলুড়েরা জড়ো হচ্ছে। কাদামাখা, রক্তিম মুখ, ও-ও দলে ভিড়ে গেল। ভিড়ে গিয়ে খুশি হলো। রোডি কিক্‌হাম বলটার তেল চটচটে ফিতেটা ধরে আছে। কে একজন বললে, ওটাকে ধরে আছ কেন—কষে লাথি মার না। কিন্তু উত্তর না দিয়েই ও চলে গেল। সাইমন মুনান বারণ করলে, সর্দার তাকিয়ে আছে। ছেলেটা সাইমন মুনানকে বললে,

জানি, জানি, তুই কেন বললি, তুই হচ্ছিস ম্যাকগ্লাডের পা-চাটা পা-চোষা.....

চোষা কথাটা অদ্ভুত। ছেলেটা সাইমন মুনানকে ঐ গাল দিলে কেন? ও যে সর্দারের জামার হাতা এঁটে দেয়, আর সর্দার ওর উপরে তম্বি চালায়। কিন্তু কথাটা ভারি বিশ্রী। উইকলো হোটেলের প্রস্রাবখানায় ও একবার হাত ধুয়েছিল, বাবা দিয়েছিলেন চেন টেনে। আর নোংরা জলের ধারা বেসিনের গর্ত্তে গিয়ে হুড় হুড় করে পড়লো। যখন সবটুকু জল আস্তে আস্তে গর্ত্তে পড়ে গেল, বেসিনের গর্ত্ত থেকে একটা অদ্ভুত শব্দ উঠলো। ঠিক অমনি আওয়াজ—চুকচাক্। চুষে নেওয়ার, শুষে নেওয়ার আওয়াজ। শুধু একটু বেশি জোরে।

মনে পড়ছে। সাদা প্রস্রাবখানা—সাদায় সাদা—ঠাণ্ডা এক অনুভূতি তারপরে গরম। দুটো কল। ঘোরালেই ঝরে পড়ে—ঠাণ্ডা আর গরম জল। প্রথমে ঠাণ্ডা, তারপরে কুসুম কুসুম গরম। কলের উপরে নাম লেখা—ছাপা। ভারি অদ্ভুত।

সুধারের ফালি পথটায় ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, জমিয়ে দিলে। ভিজে হাওয়া, অদ্ভুত হাওয়া। কিন্তু শীগ্‌গীরই জ্বলে উঠবে গ্যাসের আলো, গ্যাস জ্বলতে জ্বলতে মৃদু শব্দ করে—যেন ছোট্ট একখানা গান। সব সময়েই এমনি: খেলায় ঘরে ওরা যদি চুপ করে যায়, এখুনি শুনতে পাবে সেই গান।

আঁকের ক্লাস। ফাদার আর্ণল একটা শক্ত আঁক দিয়েছেন বোর্ডে। বললেন, দেখি কে জেতে? ইয়র্ক, এগিয়ে চল! লাঙ্কাষ্টার, এগিয়ে চল। ষ্টিফেন বিস্তর চেষ্টা করলে, কিন্তু আঁকটা বড় শক্ত—সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। তার সিল্কের ব্যাজটায় এক সাদা গোলাপ, পিন দিয়ে জামার বুকে আঁটা। ব্যাজটা ফুর্ ফুর্ করে উড়ছে হাওয়ায়, গোলাপের পাপড়ি উড়ছে। আঁকে সে ভাল নয়, কিন্তু তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, ইয়র্ক যাতে না হারে তাই এ চেষ্টা। ফাদার আর্ণলের মুখখানা খুবই কালো,

কিন্তু তিনি তো চটেন নি; হাসছেন। এবার জ্যাক লটন আঙুল মটকালে, ফাদার তার খাতা দেখে বললেন, ঠিক, ঠিক। সাবাস ল্যাঙ্কাষ্টার! লাল গোলাপ জিতেছে। ইয়র্ক, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!

জ্যাক লটন তাকাচ্ছে, লাল গোলাপওয়ালা সিল্কের ব্যাজটি বড় চমৎকার দেখাচ্ছে, ওর পরনে নাবিকের নীল পোষাক। ষ্টিফেনের মনে হোল, ওর নিজের মুখ লাল হয়ে উঠেছে—কে প্রথম হবে তার জন্যে বাজির কথা ভাবছে। জ্যাক লটন—না, সে। কোনো হপ্তায় জ্যাক লটন পেয়েছে এক নম্বর টিকেট, কোনো হপ্তায় বা সে। তার লাল সিল্কের ব্যাজ উড়ছে, উড়ছে। দুনম্বর আঁক সে এবার করছে, ফাদারের স্বর শোনা যাচ্ছে। এবার সব ব্যগ্রতা উপে গেছে, মুখখানায় যেন ঠাণ্ডা স্রোত। হয়তো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ তাই এত ঠাণ্ডা। উত্তর বার করতে পারছে না, কি আর হয়েছে। সাদা আর লাল গোলাপ! সুন্দর রঙ—ভাবতে চমৎকার লাগে। এক নম্বর, দুনম্বর আর তিনি নম্বরের চাকতিগুলোরও সুন্দর রঙ। লালচে রঙ আর সাদা আর ল্যাভেণ্ডার। ল্যাভেণ্ডার সাদা আর লালচে গোলাপের কথা ভাবতেও ভাল লাগে। হয় তো বুনো গোলাপেরও অমনি রঙ হবে। তার মনে পড়ছে সবুজ নিলয়ে বুনো গোলাপের সেই গান। কিন্তু সবুজ গোলাপ তো তুমি চুঁড়েও পাবে না। হয়তো পৃথিবীতে কোথাও আছে। খুঁজে পেতেও পার।

ঘণ্টা বাজলো, ঘর থেকে ছাত্রেরা সার বেঁধে বেরিয়ে এল। খাবার ঘরের দিকে চলেছে বারান্দার পথে। ওর প্লেটের উপর মাখনের দুটি তাল দুটি ছাপের মতো। তারই দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মিউনো রুটি খেতে পারছে না। টেবিল ঢাকনাও স্যাঁতসেঁতে দোমড়ানো। ও চা খেল, গরম চা, পাতলা; রান্নাঘরের ঐ ফাইফরমায়েসখাটা জবুথবু ছোকরাটা পেয়ালায় চা ঢালছে। ওর সাদা ঝাড়ন কোমরে বাঁধা। কি জানি, ছোকরার ঝাড়নও হয়তো স্যাঁতসেঁতে। সব সাদা জিনিসই বুঝি অমনি স্যাঁতসেঁতে। নাষ্টি রোচ আর সুরিন খাচ্ছে কোকা, টিনে করে পাঠিয়েছে বাড়ি থেকে। ওরা বলে, ওরা চা খেতে পারে না—ওতো শুয়রের মুত্। ওদের বাবারা হাকিম, ওরা তাই বলে বেড়ায়।

ছেলেরা সবাই ওর কাছে অদ্ভুত। ওদের সবার বাবা-মা আছেন—পোষাক আষাকেও ওরা আলাদা, আর আলাদা গলার স্বরে। বাড়ি যেতে বড় সাধ যায়, মার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকবে। কিন্তু তাতো হবে না, তাই খেলা-পড়া-প্রার্থনা সব তাড়াতাড়ি চুকে যাক এই ও চায়, তারপর যাবে বিছানায়। শুয়ে পড়বে।

আর এক পেয়ালা গরম চা ও খেল।

ফ্লেমিং বললে, কি হোল? কি—ব্যথা করছে নাকি—কি হোল?



ষ্টিফেন উত্তর দিলে, জানি না তো।

তোমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তা বেশিক্ষণ থাকবে না, ভয় নেই।

হাঁ, ষ্টিফেন বললে।

কিন্তু রোগ মুখে নয়, কোথায় যেন রোগ, বুঝি বুকে—যদি অবশ্য সেখানে রোগ হওয়া সম্ভব হয়। ফ্লেমিং ভদ্র বলেই জিজ্ঞেস করলে।

চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। টেবিলের উপরে কনুই দিয়ে বসে কান একবার হাত দিয়ে ঢাকছে আর খুলছে। হাত সরাতেই খাবার ঘরের হল্লা ভেসে আসছে। রাতের ট্রেনের গজনের মতো। আবার হাত ঢেকে দিলেই গর্জন থেমে যায়—যেন সুরঙ্গপথে চলেছে ট্রেন। ডাল্‌কের সেই রাতে ট্রেন তো এমনি গর্জন করে ছুটেছিল, তারপর ঢুকলো গিয়ে সুরঙ্গে, অমনি গর্জন থেমে গেল। চোখ বুজলো—গাড়ী ছুটছে—গর্জন আর বিরতি—গর্জন আর বিরতি। গর্জন শুনতে ভাল লাগে, তারপর থেমে যায়—আবার গর্জন করতে করতে বেরিয়ে আসে সুরঙ্গ থেকে। তারপরে আবার থেমে যায়।

উপরের ক্লাসের ছাত্রেরা আসছে খাবার ঘরে, মেঝেয় শব্দ। প্যাডি রাথ্, জিমি ম্যাগী আর সেই স্পেনবাসী, যাকে চুরুট টানবার হুকুম দেওয়া হয়েছে—সেই বেঁটেখাটো পর্তুগীজটি যে পশমের টুপী মাথায় পরে। তারপরে নীচু ক্লাসের টেবিল—তৃতীয় শ্রেণীর টেবিল। সবারই হাঁটার ধরণ আলাদা।

খেলার ঘরের এক কোণে সে বসেছিল, ডোমিনো খেলা দেখবার ভাণ করছিল, মাঝে মাঝে শুনছিল কান পেতে গ্যাসের গান। সর্দার-পোড়ো কয়েকটি ছেলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। সাইমন মুনান তার নকল হাতা নিয়ে ব্যস্ত! তুল্লাবেগের কথা কি যেন বললে সর্দার।

দরজা থেকে সরে গেছে সে, ওয়েল্‌স্ এবার এল ষ্টিফেনের কাছে, বললে: ডেডালাস, বলতো, শুতে যাবার আগে তুমি কি তোমার মাকে চুমু খাও?

হাঁ, খাই।

ওয়েলস্ আর সবার দিকে তাকিয়ে বললে, দেখ হে, ওকে দেখ, ও বলে কিনা রোজ শুতে যাবার আগে মাকে চুমু খায়।

অন্য সবাই খেলা ফেলে ফিরে তাকালো; হাসছে। ওদের দৃষ্টিতে ষ্টিফেন লাল হয়ে উঠলো।

না, আমি চুমু খাই না!

ওয়েল্‌স বললে, দেখ হে, ওকে দেখ—তোমরা, শুতে যাবার আগে ও মাকে চুমু খায় না।

আবার সকলের হাসি। ষ্টিফেন ওদের সঙ্গে হাসতে চেষ্টা করলে, তার শরীর উত্তপ্ত,

গোলমাল হয়ে গেল সব কিছু। এ প্রশ্নের ঠিক জবাব কি? ওতো দুটোই দিলে, তবু হেসে উঠলো ওয়েল্‌স্। ওয়েল্‌স্ হয়তো ঠিক উত্তরটা জানে, সে উঁচু ক্লাসে পড়ে। ওয়েল্‌স্-এর মার কথা ভাবতে চেষ্টা করলো ষ্টিফেন, কিন্তু ওয়েলস্-এর মুখের দিকে তাকাতে পারল না। ওয়েলস্-এর মুখখানা তার ভাল লাগে না। ওয়েলসই তো তাকে খানায় ফেলে দিয়েছিল—ও বাদাম ভাঙ্‌তে নস্যিদানি দেয়নি বলে এই কাণ্ড। ভারি অন্যায়; সবাই স্বীকারও করলে। কি ঠাণ্ডা আর পাঁকেভরা জল। আর কে নাকি একটা হৃষ্টপুষ্ট ব্যাঙকে ওরই ভিতর লাফিয়ে পড়তে দেখেছিল।

খানার ঠাণ্ডা পাঁকে মাখামাখি। পড়ার ঘণ্টা পড়লো, খেলার ঘর থেকে সারবন্দী সবাই বেরিয়ে এল। বারান্দা আর সিঁড়ির ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আস্তানা গেড়েছে ওর পোষাকে। তখনো ভাবছে, ঠিক উত্তরটা কি হবে। মাকে চুমু খাওয়া কি ঠিক? আচ্ছা, চুমু খাওয়ার মানে কি? তুমি বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্যে মুখ তুললে, মা মুখ নীচু করলেন। তারই মানে চুমু খাওয়া। মা গালে ঠোঁট বুলিয়ে দেন। নরম ঠোঁট দুখানি ওঁর ভিজে ভিজে লাগে, আর ঠোঁট দুটো মৃদু শব্দ করে ওঠে: ওকেই বলে চুমু। আচ্ছা, মানুষ ঠোঁট দুখানা নিয়ে অমনি করে কেন?

পড়বার ঘরে ডেস্কের ঢাকনা খুলে ভিতরে সাঁটা নম্বর বদলে দিলে—সাতাত্তর থেকে ছিয়াত্তর। বড়দিন। এখনো বড়দিন বহুদূরে; কিন্তু বছরে একবার বড়দিন আসবেই—পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে ঘুরে ঘুরে তাই তো আসবে।

ভূগোলের প্রথম পাতায় পৃথিবীর ছবি রয়েছে: মেঘের ভিতরে একটা মস্ত গোলা। ফ্লেমিং এর রঙ-পেন্সিলের বাক্স আছে। একরাতে সে পৃথিবীর গায়ে সবুজ আর মেঘের গায়ে দিয়েছিল মেরুন রঙ লাগিয়ে। দান্তের দুটি তুলির মতো—সবুজ মখমলেরটা পারনেলের জন্য, আর মেরুন মখমলেরটা ডাভিটের জন্য। সে ফ্লেমিংকে ঐ রঙ লাগাতে বলে নি। ফ্লেমিং ইচ্ছে করেই দিয়েছিল।

ভূগোলখানা সে খুলে বসলো; পড়া করতে হবে। কিন্তু আমেরিকার জায়গাগুলির নাম যে মুখস্থ হয় না। আলাদা জায়গা, আলাদা নাম। বিভিন্ন দেশে আছে তারা, দেশগুলি আবার আছে মহাদেশে, মহাদেশ আবার পৃথিবীতে—আর পৃথিবী কোথায় আছে? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে।

ভূগোলের প্রথম পাতা সে ওল্‌টালে, নিজের হাতের লেখা পড়ছে, তার নাম আর ধাম।

ষ্টিফেন ডেডালাস
প্রমথ বার্ষিক শ্রেণী
ক্লঙ্গো উড কলেজ
সালিনস



অঞ্চল-কিলডেয়ার
আয়ার্ল্যাণ্ড
য়ুরোপ
পৃথিবী
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড

তার নিজের লেখা। আর ফ্লেমিং একরাতে লিখে দিয়েছিল উলটো পাতায়:

ষ্টিফেন ডেডালাস আমার নাম,
জাতি আমার আয়ার,
সেইতো আমার ধাম।
ক্লঙ্গো বাসভূমি
স্বর্গ আমার আশার স্থান।

উলটো করে পড়লো পদ্য। এখন আর পদ্য বলে মনে হয় না। ও প্রথম পাতার লেখা নীচ থেকে উপরে পড়ে গেল নিজের নামে এসে গেল। নিজের নামে। তার পরে আবার উপর থেকে নীচে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরে কি? কিছু না; বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের চারদিকে এমন কিছু আছে যাতে তার সীমার পরে শূন্যের রাজ্য শুরু হয়েছে তা বোঝা যায়? খেয়াল তো নয়। কিন্তু হয়তো একটা সরু, অতি সরু সীমা-রেখা থাকতে পারে সবকিছুর চারদিক ঘিরে। সবকিছু আর সব জায়গা নিয়ে ভাবনা তো মস্ত ব্যাপার, শুধু ঈশ্বরই তা পারেন। সে ভাবতে চেষ্টা করলে, উঃ কী মস্ত ভাবনা, কিন্তু ঈশ্বর ছাড়া তো আর কিছু ভাবা যায় না। ঈশ্বর হচ্ছে ঈশ্বরের নাম, যেমন তার নাম ষ্টিফেন। দ্যু ঈশ্বরের ফরাসী নাম, সেও তাঁর নাম। যখন কেউ ঈশ্বরকে দ্যু বলে ডাকে, ঈশ্বর তখনি চিনতে পারেন, লোকটি ফরাসী। দুনিয়ার সব ভাষায় ঈশ্বরের নাম যত আলাদাই থাকুক, যখন সবাই আলাদা আলাদা ভাষায় প্রার্থনা করে তিনি বুঝতে পারেন। ঈশ্বর সবসময়েই এক, আর তাঁর সত্যিকারের নাম হচ্ছে ঈশ্বর।

অমনি ভেবে ভেবে ক্লান্তি লাগে। এতে মাথাটা মস্ত বলে মনে হয়। বইয়ের প্রথম পাতা খুলে ক্লান্তিভরে সে তাকিয়ে রইল সবুজ গোলাকার পৃথিবীর দিকে। কোনটা ঠিক—সবুজ না মেরুন। দান্তে একদিন তার কাঁচি দিয়ে সবুজ মখমল কেটে ফেলে বলেছিলেন, পার্নেল খারাপ লোক। এই নিয়ে বাড়িতে তর্কও উঠেছিল। ওকে বলে রাজনীতি। দুইটি পক্ষ। দান্তে একপক্ষে আর বাবা আর মিঃ কেসী আর-একপক্ষে। তার মা আর চার্লস-খুড়ো কোনো পক্ষেই ছিলেন না। রোজই কাগজে এই নিয়ে কিছু না কিছু খবর তখন থাকতো।

সে রাজনীতির অর্থ ভাল করে বোঝে না, এর জন্যে তার খুবই দুঃখ। আর তার দুঃখ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কোথায় শেষ হয়েছে তাও জানে না। নিজেকে বড় ছোট লাগে,

অক্ষম মনে হয়। কাব্য আর অলঙ্কার শাস্ত্রের ছাত্রদের মতো সে কবে হবে। তাদের গম্ভীর স্বর, উঁচু বুটজুতো পায়ে ; ত্রিকোণমিতি তাদের পাঠ্য। সে তো অনেক দূরে। প্রথমে দীর্ঘ ছুটি, তারপরে নতুন শ্রেণী, আবার ছুটি, আর এক শ্রেণী, তারপরে আবার ছুটি। এ যেন এক ট্রেন, এই সুরঙ্গ থেকে বেরুচ্ছে, এই ঢুকছে। সে যেন খাবার ঘরে ছেলেদের গোলমাল, কানের ঠুলি খোলা আর বন্ধ করা। দীর্ঘ অবকাশ, পড়া, সুরঙ্গ, বেরিয়ে আসা, গোলমাল, বিরতি। কত দূরে! এখন ঘুমুতে যাওয়াই ভাল। শুধু গীর্জায় প্রার্থনা, আর তারপরে বিছানা। শির্ শির্ করে শিউরে উঠলো দেহ, হাই উঠছে। বিছানায় খুব ভালো লাগবে, যখন চাদর খানিকটা গরম হবে। প্রথমে বিছানায় গা দিতেই ঠাণ্ডা। শিউরে উঠলো সে প্রথম ঠাণ্ডার কথা ভেবে। তারপরে গরম, তখন ঘুমোনো যায়। ক্লান্ত হয়ে গা এলিয়ে দিতে ভাল লাগে। সে আবার হাই তুললো। রাতের প্রার্থনা, তারপরেই বিছানা। শিউরে উঠলো, হাই তুলতে ইচ্ছে করছে। আর কিছুক্ষণ পরেই আরাম। এ উষ্ণতা সন্তর্পণে, ঐ ঠাণ্ডা চাদরের ভিতর থেকে ঝরে পড়ছে। কেঁপে কেঁপে ওঠা চাদর উষ্ণ থেকে উষ্ণতরো, এবার সর্বাঙ্গে উষ্ণ অনুভূতি। আর চির-উষ্ণ সে অনুভূতি যেন, কিন্তু তবুও তো সে কাঁপছে, হাই উঠছে।

রাতের প্রার্থনার ঘণ্টা পড়লো। আর সবার সঙ্গে সে বেরিয়ে এল পড়ার ঘর থেকে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে, বারান্দা দিয়ে এসে উপাসনা-মন্দিরে। বারান্দায় নিষ্প্রভ মিউনো আলো, উপাসনা-গৃহেও তাই। আর তো কিছুক্ষণ, তারপর তো সবকিছু আঁধার হয়ে যাবে, ঘুমিয়ে পড়বে সবাই। রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে মন্দিরে, মর্মর পাথরের রঙে কত রাতের সমুদ্রের ছায়া—একই রঙ বুঝি তার। সমুদ্র দিনরাতই ঠাণ্ডা, রাতে ঠাণ্ডা বেশি। তার বাবার বাড়ির নীচে সমুদ্র এখন ঠাণ্ডা, আঁধার। কিন্তু কেৎলি এখনো চড়ানো রয়েছে।

উপাসনা-মন্দিরের প্রার্থনা শুরু। স্মৃতি থেকে সে উদ্ধার করে দিতে পারে কি বলতে হবে।

হে প্রভু, খুলে দাও আমাদের দু ওষ্ঠ
আমাদের মুখ ঘোষণা করুক তোমার মহিমা
আমাদের সহায়তা কর হে ভগবান।
ত্বরা কর আমাদের সহায়তায় হে প্রভু!

উপাসনা-ঘরে রাতের সোঁদা গন্ধ, ঠাণ্ডা ভাব। এ গন্ধ পবিত্রতাময়। রবিবারের প্রার্থনায় যে বুড়ো চাষীরা বেদীর সুমুখে হাঁটু গেড়ে বসে, তাদের গন্ধ নয়। হাওয়া, বৃষ্টি, ঘাস আর পোষাকের গন্ধ। ভারি ধার্মিক চাষীরা। ওদের নিশ্বাস এসে লাগে ওর গলার উপরে ; ওরা প্রার্থনা করে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ওদের একজন বলেছিল, তারা থাকে



ক্লেশ-এ ; ছোট ছোট কুঁড়েঘরের সার, মেয়েরা ছেলে কাঁখে দাঁড়িয়ে থাকে দরজায় ; ও তাদের একজনকে বুঝি দেখেছিল সালিন থেকে আসতে-আসতে। একরাতে ঐ কুঁড়েঘরে, শুকনো ঘাসের আগুন যেখানে জ্বলছে কুণ্ডে, যদি ওখানে ঘুমানো যায় তাহলে চমৎকার হয়। ঐ আলোকিত অন্ধকারে, উত্তপ্ত অন্ধকারে, চাষীদের গায়ের গন্ধ, হাওয়া বৃষ্টি ঘাসের চাপড়া আর পোষাকের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে যদি ঘুমানো যায় তো বেশ হয়। কিন্তু গাছপালায় যে পথ আঁধার। হারিয়েও তো যেতে পার। সে তো ভয় পায়।

উপাসনা-ঘরে সর্বশেষ প্রার্থনা চলছে। সেও প্রার্থনা করলে বাইরে আঁধারে গাছতলায় দাঁড়িয়ে…

হে প্রভু, আমরা তোমাকে ডাকছি, তুমি এস আমাদের আবাসে, শত্রুর সমস্ত কূট অভিসন্ধি তুমি দূরে দূর করে দাও। এখানে দেবদূতরা থাকুন, আমাদের তাঁরা রক্ষা করুন, শান্তি দিন। আর তোমার আশীর্বাদ যেন আমাদের প্রভু খৃষ্টের কাছ থেকে আমরা পাই। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। ওঁ শান্তি!

বোর্ডিঙে এসে সে পোষাক খুলেও গিয়ে আঙুল কেঁপে উঠলো। আঙুলগুলো তাড়াতাড়ি করেছে না কেন। তাকে পোষাক ছেড়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করতে হবে, তারপর গ্যাসের বাতি নেবার আগেই শুয়ে পড়তে হবে। মরলে যাতে নরকে না যায় তাই তো এই ব্যবস্থা। মোজা খুলে ফেলে তাড়াতাড়ি পরে ফেললে রাতের জামাটা, বিছানার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তাড়াতাড়ি আউড়ে গেল স্তব। ভয় হচ্ছে, এখুনি হয়তো নিবে যাবে গ্যাসের আলো। কাঁধ কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঈশ্বর আমার বাবা-মার মঙ্গল করুন, আমি যেন তাঁদের অপ্রিয় না হই
ঈশ্বর আমার খুদে ভাই-বোনের মঙ্গল করুন, আমি যেন তাদের অপ্রিয় না হই!
ঈশ্বর দান্তে আর চার্লস্-খুড়োর মঙ্গল করুন, আমি যেন তাঁদের অপ্রিয় না হই।

সে নিজের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা সেরে তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে পড়লো। রাতে-পরা সার্টটা গুঁজে দিলে পায়ের নীচে, তারপর ঠাণ্ডা চাদরে গা এলিয়ে দিলে। কাঁপছে, শিউরে উঠছে শীতে। কিন্তু এখন মারা গেলে আর তো নরকে যেতে হবে না। কাঁপুনি কমে আসছে, এবার একেবারে থেমে যাবে। একটি স্বর বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছে। ও একবার চাদরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে দেখলো। চারদিকে হলদে মশারীটা ঘিরে আছে, তাকে বন্দী করে রেখেছে যেন। আস্তে আস্তে আলো নিবিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তত্ত্বাবধায়কের জুতোর শব্দ চলে যাচ্ছে। কোথায়? সিঁড়ি দিয়ে নীচে—তারপর বারান্দা দিয়ে চলবে—নয়তো যাবে শেষপ্রান্তে তার ঘরে। অন্ধকার সে যেন দেখতে পাচ্ছে। সেই কালো কুকুরটার কথা কি সত্যি—সেই-যে যে রাতে ঘুরে বেড়ায়, গাড়ির বাতির

মতো মস্ত যার চোখ? ওরা তো বলে এক খুনী-ভূত। দেহের উপর দিয়ে কাঁপুনির ঢেউ খেলে গেল—দীর্ঘ ঢেউ। প্রাসাদ-দুর্গে ঢুকেই হলঘর—সেটা তার দেখা আছে। বৃদ্ধ পরিচারকের দল থাকে সিঁড়ির উপরের ঘরে। সেখানে ইস্ত্রী হয়। আগুন জ্বলে হলে, কিন্তু হল তো তবু আঁধার। এক মূর্ত্তি সিঁড়ি বেয়ে এল হলে। সাদা আঙরাখায় ঢাকা। মুখখানা বিবর্ণ, অদ্ভুত; হাত দুখানা দুপাশে ঝুলে আছে। বৃদ্ধ পরিচারকদের দিকে সে চেয়ে রইল—অদ্ভুত তার দৃষ্টি। ওরা তাকিয়ে দেখলো; এ যে তাদের প্রভুর মুখ, তেমনি আঙরাখা। তিনি তো চরম আঘাত পেয়েছেন,—তিনি! ওরা তাকিয়ে দেখল আবার, শুধু আঁধার: স্তব্ধ বাতাস আঁধার বাতাস। সমুদ্রের পরপারে সুদূর প্রাহার যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের প্রভু চরম আঘাত পেয়েছেন, মরণাহত তিনি। সেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন প্রান্তরে, বিবর্ণ মুখ, অদ্ভুত মুখ তার—সেনাধ্যক্ষের সাদা আঙরাখা তার পরনে।

ওর ভাবতেও অদ্ভুত লাগে, শিউরে ওঠে গা। অন্ধকারও যেন অদ্ভুত—ঠাণ্ডা আর অদ্ভুত। তারই বুকে ফুটে ওঠে বিবর্ণ মুখের সার, তাদের গাড়ির বাতির মতো মস্ত চোখ। ওরা খুনী ভূত, সেনাধ্যক্ষদের মূর্ত্তি—ওরা সমুদ্রের পরপারে রণক্ষেত্রে মরণাহত হয়েছে। ওরা কি বলতে চায়—ঐ অদ্ভুত মুখ নেড়ে কি বলতে চায়?

—প্রভু, আপনি আমার এই আবাসে আসুন—এই আমার প্রার্থনা। দূর করে দিন যত……

( ক্রমশঃ )

ছেলে ভুলনো ভালোবাসা

"ডান্‌দিকে ভয়, ভয় রয়েছে বামে
উপর থেকে ভয়ের আঁধার নামে
আমার বুকে ভালোবাসার কথা
ক্ষয় নেই তার এম্নিতর ব্যথা!"—জেমস জয়স॥

## ষ্টুডিও

### মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সিনেমা জগতের একজন বড় ব্যক্তি ভূপেশ। তার ড্রাইভার সকাল বেলা গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করতে যাবে, ললনাকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে সে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

সকালে ভূপেশের বাড়ীতে ললনা?

তাও আবার পুরাণো হলেও এত দামী একখানা শাড়ী পরে!

মাস ছয়েক আগে ভূপেশের এখানে কাজ নিয়ে পাড়া ছেড়ে আসার পর একবার মাত্র ললনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তার আগে একরকম রোজই সে ললনাকে দেখেছে, ঘরে এবং বাইরে। এরকম শাড়ী সে কোনদিন তার গায়ে ছাখে নি।

ললনা বলে, অবাক হয়ে গেলেন? আমি সিনেমায় ঢুকেছি জানেন না? ভূপেশবাবুর নতুন ছবিতে একটা পার্টের জন্য বলেছিলাম, আজ সকালে আসতে বলেছেন।

: আপনি সিনেমায় ঢুকলেন!

কেশবের মুখ দেখেই বোঝা যায় সে মর্মাহত হয়েছে। তার সিনেমায় ঢোকাটা তার কাছে বেদনাদায়ক কেন ললনা খানিকটা অনুমান করতে পারে। কিন্তু কেশবের এতটা বিচলিত হয়ে পড়া তার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়।

তার সিনেমায় ঢোকাটা এত বড় অধঃপতনের ব্যাপার কেশবের কাছে?

আপশোষটা কেশব চাপতে পারে না। বলে, আপনিও শেষে সিনেমায় নিজেকে বিক্রী করলেন!

মুখ একটু লাল হয়ে যায় ললনার।—নিজেকে বিক্রী করেছি মানে?

কেশব ক্ষোভের সঙ্গে বলে, আপনিই তো কতবার বলেছেন মরে গেলেও সিনেমায় সস্তা গান গাইবেন না, নিজেকে বিক্রী করবেন না।

সিনেমার সস্তা লারেলাপ্পা ধরণের গান সম্পর্কে তার ঘৃণার কথাটা ললনা এমন তীব্র আবেগের সঙ্গে প্রকাশ করত যে গোড়ায় কেশব আশ্চর্য্য হয়ে যেত।

ললনার গান অবশ্য অন্য ধরণের—তন্ময় করে দেয়, ব্যাকুলতা জাগায়। তার গান শুনতে শুনতে মজা লাগে, রাগ হয়, ঘৃণা জাগে—তেজের সঙ্গে গর্জ্জে উঠে জগৎ থেকে সমস্ত অন্যায় অবিচার দূর করতে কোমর বাঁধার তাগিদ জাগে।

কিন্তু সিনেমার গানও তো বেশ একটু সুড়সুড়ি দেওয়া মজাদার লাগে!

খেয়াল করে ক্রমে ক্রমে সে ব্যাপারটা বুঝেছিল। ললনার গান যদি হয় খিদের সময়কার মাছ-মাংস ডাল-ভাত, সিনেমায় গান চানাচুর আর মদের চাট।

তার ক্ষোভের আন্তরিকতা ললনার হৃদয় স্পর্শ করে। সে বলে, বিক্রী হলাম কিসে? নিজেকে বিক্রী করলে কি একটা পার্টের জন্য ভূপেশবাবুর তোষামোদ করতে হত?

ঃ ওকেই বিক্রী করা বলে।

ঃ না! সেরকম তোষামোদ করতে আমি আসিনি। মুখে একবার বলেছিলাম, আজ সকালে বাড়ীতে এলে জানাবেন বলেছেন, এসেছি। কাজের জন্য চেষ্টা করাটা কি নিজেকে বিক্রী করা? আর্টিষ্টদের ষ্টুডিওতে নেবার জন্য ওদের গাড়ী আছে। আমার এ ঝনঝাট কেন বলুন তো? আমিও তো নিজেকে বিক্রী করেছি, আমিও তো আর্টিষ্ট?

কেশব চুপ করে থাকে।

ঃ নাম করা আর্টিষ্ট হলে, খুব পয়সা টানতে পারলে আমার সময়মত সুবিধামত স্পেশাল গাড়ী পাঠাত। গাড়ী এসে ধন্না দিয়ে থাকত বাড়ীর দরজায়, আমি দেরী করলে ষ্টুডিওতে দেরীতে কাজ আরম্ভ হত। কিন্তু আর দশজনের মত আমিও নিজের গরজে ষ্টুডিওতে সময় মত যাব, তাই আমার জন্য মেয়ে স্কুলের বাসের মত গাড়ীর ব্যবস্থা। চারদিক থেকে পনের বিশ জনকে একবারে কুড়িয়ে নিয়ে যাবে। স্যুটিং সুরু হবে বারটায়, দশটায় তৈরী থাকতে হয়। নিজেকে বিক্রীই যদি করতাম, গাড়ী কিনে না দিক, অন্ততঃ গাড়ীর স্পেশাল ব্যবস্থা করত। খুসী হলে বাড়ীর দরজায় দু'ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখতাম।

কেশব চুপ করে থাকে।

ললনা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, দাম নিলাম না, বিক্রী হলাম কিসে? দাম ছাড়াই কিছু বিক্রী হয় নাকি?

এতক্ষণে এবার কেশব মুখ খোলে।

ঃ একদিন নাম হবে, টাকা হবে এই আশায়—

ঃ সে আশা থাকতে পারে। নামের জন্য টাকার জন্য লড়াই করলে নিজেকে বিক্রী করা হয় নাকি? সহজে নাম আর টাকা করার সুযোগ আমার আছে। গাইতে তো জানি? রং একটু ময়লা কিন্তু পর্দায় তাতে আসে যায় না। গড়ন আমার ভালই, আপনিও তো মাঝে মাঝে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন। ওদের সর্ত মেনে নিলেই ওরাই আমাকে ঠেলে আকাশে তুলে দেবে। তাতে আমারও লাভ, ওদেরও লাভ। আমি তা করিনি, নিজেকে বিক্রী করার মানুষ আমি নই।

ললনা পৌঁছেই বেয়ারার হাতে শ্লিপ পাঠিয়ে দিয়েছিল। এতক্ষণে সেই শ্লিপটাই



বেয়ারা ফিরিয়ে আনে। উল্টো পিঠে ভূপেশ আটটার মধ্যে ষ্টুডিওতে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

শ্লিপটা কেশবের হাতে দিয়ে ললনা একটু হেসে বলে, এই দেখুন আমার নিজেকে বিক্রী করার নমুনা। সাড়ে সাতটা বাজে, আটটার মধ্যে অতদূর ষ্টুডিওতে পৌঁছতে হবে। ট্যাক্সি ছাড়া উপায় নেই।

কেশব বলে, চলুন আমি আপনাকে পৌঁছে দেব। একজনকে পৌঁছে দেবার হুকুম আছে, গাড়ী বার করতেই যাচ্ছিলাম।

একটি তারকা উঠছে—এখনো নিজের গাড়ী হয় নি। ষ্টুডিওর গাড়ী অথবা ভূপেশের গাড়ী তাকে নিয়ে যায়, ফিরিয়ে আনে।

বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করাবার পর খবর আসে আজ সে যাবে না, শরীর ভাল নেই।

ললনা একটু হাসে। গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে বলে, বাবার খুব অসুখ। বুড়ো বয়সে চাকরী থেকে তাড়িয়ে দিল। পছন্দ না করলেও অবস্থার ফেরে মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। আমিও সিনেমায় গাইছি।

সহরতলীর সোজা রাস্তায় কেশব গাড়ীর স্পিড্ চড়িয়ে দেয়। তরতর করে পিছনে সরে যায় থাম, বাড়ী কারখানা, খোলার ঘরে বস্তি আর ফাঁকা জমিগুলি। ললনা বলে, সিনেমায় ঢুকেছি বলে আমায় নিয়ে শুইসাইড করতে চান না তো?

এতক্ষণে এই প্রথম কেশব একটু হাসে।

বাগান বাড়ীর সমস্তটাই ষ্টুডিও। প্রাচীন দীঘি আর পামগাছের সারি, কেয়ারি করা ফুলের বীথি, কোণায় ঠেলে দেওয়া মালিদের ভাঙ্গা কুঁড়েঘর কত ছবিতে কত দৃশ্যে যে ঠাঁই পেয়েছে—কত যে কমিয়ে দিয়েছে ছবি তোলার 'কষ্ট'। কিন্তু কেন্দ্রটা ওই দালান বাড়ীতে। ভাগ্যে একজনের বহুকাল আগে ইংরেজের সহরে দেশী ইংরাজী মেশাল করা আধুনিক সভ্য জীবন-যাপন করতে হাঁপ ধরত এবং মাঝে মাঝে হাঁপ ছাড়ার জন্য বাগান বাড়ীটা তৈরী করেছিল। সিনেমা তৈরী অনেক সহজ হয়ে গেছে তার কল্যাণে।

ললনা বলে, কত সহজ হয়ে গেছে ছবি তোলা।

তাই বটে। দূর থেকে এদিক থেকে ওদিক থেকে দীঘিটা দেখাতেই কত ফুট ফিল্ম কাজে লেগে যায়—সুন্দরী একটা মেয়েকে প্রকাণ্ড ভাঙ্গা ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নামিয়ে জলে চুবিয়ে উঠিয়ে এনে কত ফুট ফিল্ম সার্থক হয়।

আটটার খানিক আগেই তারা পৌঁচেছে। লোকজনও এসে গেছে অনেক কিন্তু

কাজ কর্ম কিছুই যে সুরু হয় নি সেটা বেশ বোঝা যায়। ভূপেশের গাড়ীটা ষ্টুডিওতে ঢুকতে দেখে হঠাৎ সকলের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল—ভূপেশ আসে নি দেখে সেটা আবার থেমে গেছে।

ভূপেশের নির্দ্দেশ ছিল ষ্টুডিওতে পোঁছে ললনা বাগচীর সঙ্গে দেখা করবে। বাগচীকে খুঁজে বার করে কেশব।

ললনার কথা শুনে বাগচী শুধু বলে, আচ্ছা। লালনার সর্ব্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে সে অন্যদিকে চলে যায়।

ললনা বলে, একবার বসতেও বলে না।

কেশব বলে, তবুও তো আপনি—

ক্ষোভ যেন কেশব কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

বরাবর সে ললনাকে মনপ্রাণ দিয়ে শ্রদ্ধা করে এসেছে, ভক্তি করে এসেছে জানাচেনা রক্তমাংসের আদর্শ নারীত্বের প্রতীক হিসাবে। ললনার গান আর ললনার জন্য চিরদিন তার গভীর আকর্ষণ। ললনার চেয়ে অনেক ভাল অনেক বড় অনেক খাঁটি মেয়ে জগতে হয়তো অনেক আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে কেশবের দূরত্বটাও প্রায় দুস্তর।

ললনার চেয়ে তারা হাজারগুণ মহীয়সী হলেও তার কাছে নিছক কাল্পনিক জীব।

বাড়ীতে সে ললনার গান অভ্যাস করার একঘেয়ে প্রক্রিয়াটাও মন দিয়ে শুনে এসেছে—একঘেয়ে লাগেনি।

দশ বিশ হাজার লোকের সভায় সেই গান শুনে তার মনে হয়েছে যেন নতুন গান শুনছে— এই দশ বিশ হাজার লোকের মত তাকেও মাতিয়ে, দেবার রাগিয়ে দেবার, রোগ শোক দুঃখ দুর্দ্দশার বিরুদ্ধে লড়াই করার রোমাঞ্চকর সাধ জাগবার নতুন গান।

ললনার অসুখটার আক্রমণ হলে একটু বাতসের জন্য তাকে ছটফট করতে দেখে তার মনে হয়েছে, মরে গিয়ে নিজের জীবন দিয়ে সে যদি কষ্ট একটু লাঘব করতে পারত ললনার!

তার আরাধ্য দেবীর মত সেই ললনা সিনেমায় ঢুকেছে পয়সার জন্য! বাপের অনেক পয়সা আয় ছিল, সে আয় হঠাৎ কমে যাওয়ায় দশ বিশ হাজার মানুষের সঙ্গে তাকেও মাতিয়ে জাগিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলার ক্ষমতাটা তুচ্ছ হয়ে গেছে ললনার কাছে।

সে সিনেমায় ঢুকেছে সস্তা পয়সার লোভে।

তার পূজনীয়া রক্তমাংসের একমাত্র জীবন্ত দেবী সস্তা সিনেমায় ভিড়ে গেছে পয়সার দরকারে।



ললনা এবার বিরক্ত হয়ে বলে, বললাম বাবার চাকরী নেই, খুব অসুখে ভুগছেন—বাজে খরচা একটু কমিয়ে, সস্তা শাড়ী পরে—

পরনে সেকেলে দামি শাড়ীটার দিকে চেয়ে ললনা হাসে।

ঃ এটা আমার মার শাড়ী। পয়সা দিয়ে কিনিনি। এমন শাড়ী কেনার পয়সা কোথায় পাব?

কেশব হতভম্বের মত চেয়ে থাকে।

সে তার মায়ের শাড়ীটার দিকে তাকাচ্ছে না স্থানে স্থানে পোকায় কাটা শাড়ী জড়ানো তার দেহটার দিকে তাকাচ্ছে বুঝতে না পেরে ললনা এবার রেগে যায়।

বলে, সস্তা শাড়ী পরে সিনেমা ষ্টুডিওতে আসা যায় না, এটুকু সহজ বুদ্ধিও আপনার মগজে গজায় না? এদের দেওয়া সোণারূপার জড়ি বসানো হাজার টাকার শাড়ী পরে ষ্টুডিওতে এলে বুঝি খুসী হতেন? তাহলে কিন্তু আপনাকেই আমার বাড়ী গিয়ে আমায় নিয়ে আসতে হত!

কেশব টের পায়, ললনা তার সঙ্গে লড়াই করছে।

এতক্ষণ সাফাই গেয়েছিল। এবার তাকে আক্রমণ করেছে।

বিড়ির কৌটায় দুটো আস্ত সিগারেট ছিল, একটা সিগারেট ধরিয়ে কেশব ধীরে ধীরে বলে, এবার তবে যাই। হয়তো আর দেখাই হবে না। আমার অসুখটা আমি সারাবই।

ললনারও রাগ হয়েছিল।

সে বলে, আপন অসুখটা নিয়ে জগত চলে ভাবেন বুঝি?

কেশব বলে, তাহলে কি আপনার অসুখটা নিয়ে জগৎ চলে?

দু'জনে বাক্যহারা হয়ে থাকে।

একটা ট্যাক্সি এসে থামে। সেই ট্যাক্সি থেকে নামে স্বয়ং ভূপেশ।

ললনা আর কেশবের দিকে একনজর তাকিয়ে সে এগিয়ে যায়।

হঠাৎ যেন সমস্ত ষ্টুডিওটা জীবন্ত হয়ে ওঠে, চারদিকে অত্যধিক কর্মব্যস্ততা দেখা যায়। কোথা থেকে বাগচী এবং আরও কয়েকজন ভূপেশের কাছে দাঁড়ায়।

কেশব বলে, সেরেছে। এই মতলব ছিল, তাই নিজের গাড়ীতে না এসে ট্যাক্সিতে এসেছে। সুটিং ভাল এগোচ্ছিল না, হঠাৎ দেখতে এসেছে ব্যাপার কি। দু'চারজন আজ বরখাস্ত হবে।

ললনা বলে, আমার ভয় নেই। এখনো কাজে লাগি নি।

মুচ্‌কি হাসি চাপতে চাপতে, রোগা বেখাপ্পা শরীরটার নানারকম ভঙ্গি আর ক্রমাগত সামলাতে সামলাতে একটা মানুষ এগিয়ে এসে তোতলিয়ে তোতলিয়ে কি যে বলে ললনাকে সে বুঝতেই পারে না।

সর্ব্বাঙ্গে তার অবিরাম ঘটে চলেছে এলোমেলো নড়ন চড়ন, ঠোঁট কাঁপছে, চোখ মিটমিট করছে, আর মাথাটা যেন ভিতরের ধাক্কায় চমকে চমকে উঠছে।

কেশব ললনাকে বলে, আপনাকে ডাকছে।

ভূপেশ আধঘণ্টা থাকে।

আধঘণ্টায় একটা যেন তোলপাড় হয়ে যায় সমস্ত ষ্টুডিওটাতে।

তারপর ভূপেশ এসে গাড়ীতে ওঠে। বাড়ী ফেরার হুকুম দিয়ে কড়া সুরে বলে, লীলা এল না, গাড়ী নিয়ে তবু এখানে এলে কেন?

কেশব বলে, আপনি ওনাকে শ্লিপ পাঠালেন, আটটার মধ্যে ষ্টুডিওতে যেতে হবে। আমি ভাবলাম—

ভূপেশ ধমক দিয়ে বলে, তুমি ভাববে কেন? ও মেয়েটাকে আমার গাড়ীতে পৌঁছে দেবার কথা তো তোমায় বলি নি।

কেশব চুপ করে থাকে।

ভূপেশ আরো জোরে গর্জন করে বলে, খবর্দ্দার এরকম করবে না আর। দূর করে দেব।

কেশব একমুহূর্তের জন্য মুখ ফিরিয়ে কড়া সুরে বলে, সে আপনার খুসী। এরকম ধমক দিয়ে কথা কইবেন না।

ভূপেশ তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে যায়। রাগ চাপতে তাকে যে নিজের সঙ্গে রীতিমত লড়াই করতে হচ্ছে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

কেশব বুঝতে পারে, তার সংযমের কারণ। চাকরী যে এখানে তার খতম হয়ে গেল তাতে সন্দেহ নেই। তবে আরেকজন লোক পাওয়ার আগে তাকে ভূপেশ জবাব দেবে না।

অন্য লোক পেলেই তাকে তাড়াবে, বাকী মাইনেটা দিতে গোলমাল গড়িমসি করে গায়ের ঝাল ঝাড়বার চেষ্টা করবে।

ভূপেশের গায়ের জ্বালা এখনকার মত চেপে যাবার মতলব আঁচ করে কেশব মনে মনে একটু হাসে।

কেশব বলে, আমার মাইনেটা দেবেন সার।



: দুদিন পরে নিও।

: গরীব মানুষ, টাকার দরকার সার।

: কাল পরশু নিও। চাওয়া মাত্র দিতে হবে এমন কিছু নিয়ম আছে নাকি?

: পরশু মাস কাবার হয়েছে।

: তাতে কি হয়েছে? কাল পরশু নিও।

কেশব মনে মনে বলে, তোমার মতলব বুঝেছি।

কেশব গাড়ীতে চাপায় স্পীড।

আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয় ভূপেশের।

: আরে আরে, কি করছ পাগলের মত? আস্তে চালাও!

: আস্তেই চালাচ্ছি সার। আপনাকে তাড়াতাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি একটা জরুরী কাজে বেরোব। হাতে একটা পয়সা নেই যে বিড়ি সিগ্রেট কিনি।

: তুমি বাবু আস্তে চালাও, মাইনে এখুনি মিটিয়ে দেব।

: তাহলে ঠিক আছে।

কেশব গাড়ীর স্পিড কমিয়ে দেয়।

বাড়ী পৌঁছেই তার মাইনে দিয়ে ভূপেশ তাকে সঙ্গে সঙ্গে বরখাস্ত করে দেয়।

"উজ্জেনিয়া পুরবরে মহ্যং পিতা সীলসংবুতো সেট্‌ঠি
তস্সম্‌হি একা ধীতা পিয়া মনাপা দয়িতা চ॥"—থেরী গাথা

"পূর্ব্বে উর্জ্জয়ন্ত পুরে এবং উজ্জয়িনীতে আমার পিতা শীলবান শ্রেষ্ঠী।
তাঁর স্ত্রী বিদগ্ধা, প্রিয়া, মনস্বিনী, স্নেহবতী এবং একটি স্বামীতে আসক্তা।"
—ঋষিদাসীর উক্তি।

# সন্দংশ

[ আমরা সংস্কৃতির ছন্দ চাই—সংস্কৃত ছন্দস্—সাচ্ছন্দ্য, শুভাশীর্ব্বাদ এবং বিস্তৃতি। এ ছন্দ-কামীদের হাতে একটা সন্দংশ থাকাও দরকার যার প্রাকৃত নাম সাঁড়াশী এবং ছন্দ বজায় রাখতে যার কাজ অপরিত্যাজ্য। বহু অবাঞ্ছিত রচনা এই উক্তি সাহিত্যের ও সংস্কৃতির নাম-ধারণ করে চতুর্দ্দিকে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে। এ-ধরণের স্বৈরাচার যাঁরা পছন্দ করতে পারেন না তাঁদের জন্যেই আমাদের সন্দংশ অধ্যায়। এ-অধ্যায়ের লেখকদের প্রতি এই অনুরোধ তাঁরা নিজেরা যে রচনার 'ছন্দস্' হারিয়ে না বসেন !—সম্পাদক ]

## সমাজবিরোধী বিজ্ঞাপন

### সন্তোষকুমার দে

সংবাদপত্র পাঠকেরা সম্ভবতঃ লক্ষ্য করেছেন সম্প্রতি পঞ্জিকায় প্রকাশিত আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের জন্য দু'একজন প্রকাশক অভিযুক্ত হয়েছেন। পঞ্জিকায় প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল বহুবিধ আপত্তিকর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে আসছে। তার অধিকাংশ যৌন-রোগ-সংক্রান্ত, কিছু কিছু সাধারণ লোক ঠকানোর ব্যবসাও আছে। প্রতি বৎসর কয়েক লক্ষ পঞ্জিকা ছাপা হয় এবং বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পবিত্র গ্রন্থরূপে নিত্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কুসুমে কীটের মত পবিত্র পঞ্জিকার মাধ্যমে অনেক আপত্তিকর ও সমাজ বিরোধী বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে স্থান পায়, দেশের বিদ্বৎসমাজ এযাবৎ তা নিয়ে আপত্তি তোলেন নি।

কিন্তু কেবল পঞ্জিকায় নয়, দৈনিক-সাপ্তাহিক-মাসিকের পাতা হাতড়ালেও এমন বহু বিজ্ঞাপন মিলবে যার ফল বহুভাবে ক্ষতিকর, সুতরাং সমাজবিরোধী। ভারতবর্ষের বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ের বহর পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য, তবুও সেই সামান্য বিজ্ঞাপনের মধ্যেও আপত্তিকর বিজ্ঞাপনের পরিমাণ বিবেচনা করলে দুশ্চিন্তার কারণ দেখা যাবে।

সমাজবিরোধী বিজ্ঞাপনের বহু রকমফের আছে। মদ, সিগারেটও অনেকে আপত্তিকর মনে করেন। সুতরাং ওইসব বস্তুর প্রচারে যে লক্ষ লক্ষ টাকার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাও এক হিসাবে সমাজবিরোধী বৈকি! আমরা যখন মদ খেতে নিষেধ করি তখন মদের বিজ্ঞাপন দিতে নিষেধ করাটাও অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু মদ, সিগারেট ব্যক্তি-বিশেষের আদর্শবাদে বাধলেও অন্য ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের কাছে আদৌ অস্পৃশ্য নয় বলেই এসবের বিজ্ঞাপনকে সমাজবিরোধী বলা চলে না। কিন্তু আপামর জনসাধারণ সকলের পক্ষেই অনিষ্টকর বহু বিজ্ঞাপন এখনও অবাধে চলছে। যেসব ক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতা অভিযুক্ত হয়, সেখানেও বিজ্ঞাপন-প্রকাশক অর্থাৎ সংবাদপত্র দায়ী হয় না। বিজ্ঞাপনদাতা ও প্রকাশক অভিযুক্ত হয়েছে তেমন দৃষ্টান্তও আছে কিন্তু সে সম্পর্কে তেমন কড়াকড়ি ভাব কিছু নেই বলেই সমাজের অনুমোদন লাভের মত একটা অন্যায় প্রশ্রয়ের ভাব বিজ্ঞাপন দাতাদের মনে থাকে যার ফলে যেরূপ খুশী বিজ্ঞাপন সংবাদপত্রে পাঠানো হয়, প্রকাশও হয়, ফলাফল যাই হোক্ তা নিয়ে তেমন হৈ চৈ সচরাচর হয় না।

যৌন রোগের নগ্ন বিবরণ দিয়ে হাতুড়ে ডাক্তারেরা কবিরাজরা এবং হেকিমেরা কিছুদিন আগে



যে কত রকমের বিজ্ঞাপন দিতেন তার ইয়ত্তা ছিল না। সরকারী কড়াকড়িতে তারা এখন রোগের নাম উল্লেখ করতে পারেন না মাত্র কিন্তু কথার মার প্যাঁচেও চিত্রের সহায়তায় কোন কিছু বোঝাতে বাকি থাকে না। গর্ভপাতের মত নিন্দনীয় ও দণ্ডনীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করেও কতরকম হাতুড়ে ওষুধের বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে। বলতে লজ্জা হয় উচ্চ-শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকার পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করতেও বাকি থাকছে না। তবু আমাদের সমাজ নির্লিপ্ত, সরকার উদাসীন। সাংবাদিকতার সঙ্গে বিষয়টি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, কিন্তু সাংবাদিকেরাও এসব বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন মনে করেন কিনা সন্দেহ।

আর-এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী বিজ্ঞাপন—লোককে লোভ দেখিয়ে ফাঁদে ফেলা। বিনা বন্দকীতে টাকা ধার, অল্প কিস্তিতে মূল্যবান বস্তু, যৎসামান্য দামে ঘড়ি, শাড়ী, শাল, আলোয়ান,—নামমাত্র মূল্যে কোন গ্রন্থকারের যাবতীয় পুস্তক প্রভৃতি চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপনের আসল উদ্দেশ্য যে লোক ঠকানো সে কথা সহজেই বোঝা যায়। ভবিষ্যৎ গণনায় নির্ভরশীল এবং মাদুলির বলে পরীক্ষা পাস, স্ত্রী-পুত্র-ধন এমনকি রাজ্যলাভের দুরাশায় বিভ্রান্ত লোকের সংখ্যাও সমাজে নিতান্ত কম নয়, পুনঃ পুনঃ এইসব বিজ্ঞাপন যে প্রকাশিত হয় তাতেই প্রমাণিত হয় যে মানুষের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার উপরেও কেমন ফলাও কারবার চলছে। আর তার জন্য বিজ্ঞাপনের সহায়তাও কম কার্য্যকরী হচ্ছে না।

কিস্তিতে বস্তুলাভের বিবরণটাও মনোহর। নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যুদ্ধপূর্বযুগে তাদের মাল অধিকতর পরিমাণে কাটাবার উদ্দেশ্যে সস্তা মাসিক কিস্তিতে মাল দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছিল। তারা প্রথম কিস্তি দেওয়ার সাথেই জিনিষটি দিয়ে দিত। গ্রাহক যদি কিস্তি খেলাপ করত তাকে তাগাদা করত, কিস্তি মেটাতে অক্ষম হলে মাল ফেরত নিত। অনেকদিনের প্রথা বলে কিস্তিতে মাল কিনবার কথা শুনলেই ক্রেতা বুঝে নেয় প্রথম কিস্তি দিলেই জিনিষ মিলবে। অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের বিজ্ঞাপনে কখনই বলেনা যে কিস্তির সব টাকা শোধ না হলে মাল দেওয়া হবেনা। লোভী ক্রেতার মনেও হয়ত শেষ পর্যন্ত বিক্রেতাকে ফাঁকি দেওয়ার বাসনা থাকে—ফলে সে প্রথম কিস্তি দিয়ে পস্তায়, বিস্তারিত বিবরণ হস্তগত হলে দেখে সব কিস্তি শোধ হলে তবেই সে মাল পাবে। এ সব অসাধু বিজ্ঞাপনদাতারা সচরাচর দূরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, তাও ডাকবাক্সের ঠিকানা দেয় যাতে ক্রেতা সশরীরে হাজির হতে না পারে—ডাকে চিঠি দিতে বাধ্য হয়। শত সাবধানতা নিয়েও রেহাই না পাওয়া গেলে হয়তো গ্রাস করা টাকা আংশিক ফেরত দিতে বাধ্য হয়, কিন্তু তত অধ্যবসায় কজন ক্রেতার থাকে যে বিজ্ঞাপন পড়ে টাকা পাঠিয়ে ঠকলে আবার তাই নিয়ে ছুটাছুটি করবে? পঁচিশ টাকা আদায় করতে পঞ্চাশটাকা ব্যয় করে দূর দূরান্তের সহর পর্যটন করাও লাভজনক হয় না।

অন্যান্য দেশের বিজ্ঞাপন এখন রীতিমত একটি অধিতব্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কেবল বিজ্ঞাপন পড়লেও বহু বিষয় শিক্ষা পাওয়া সম্ভব। ভারতীয় বিজ্ঞাপনের মান বহুভাবে উন্নত হয়েছে সে কথা অনস্বীকার্য, কিন্তু তারই মধ্যে যে সব অশ্লীল ও আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন অবাধে চলছে তাতে লজ্জিত হতে হয়।

ভারতীয় ও প্রাচ্য দেশীয় সংবাদপত্র সমিতির কার্যক্রমে বিজ্ঞাপনের শালীনতা রক্ষা ও আপত্তিকর বিজ্ঞাপন বন্ধ করবার ধারা-উপধারা আছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই, যখন কোন সদস্য-পত্রিকায় এরূপ আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সমিতি তা নিয়ে আপত্তি তোলে না। সমিতির ও সদস্যদের

এ বিষয়ে কিছু সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রচার-প্রতিষ্ঠান সমিতির যদি লক্ষ্য থাকে এরূপ সমাজবিরোধী বিজ্ঞাপন তারা তৈরী করবেন না তাতেও হয়ত কিছু কাজ হতে পারে।

ভারতীয় বিজ্ঞাপনদাতা সমিতির হাতেও এ বিষয়ে ক্ষমতা আছে। যে সব পত্রিকায় নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সে পত্রিকায় তাদের বিজ্ঞাপন না পাঠালেই কাজ সহজ হয়। কিন্তু-এ বিষয়ে তারা উদ্যোগী হবেন কি!

প্রসঙ্গত একটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ইরানের তৈল বিরোধ একটি আন্তর্জাতিক ঘটনা। ভারতবর্ষ নিরপেক্ষ দেশ, সে এই বিবদমান দল দুটির কোনটির স্বার্থে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায়না; সে সত্ত্বেও এদেশের বড় বড় সংবাদপত্রে ইঙ্গইরাণ তৈল ব্যবসায়ের বিষয়ে স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের বিজ্ঞাপন অবাধে প্রকাশিত হয়েছে। এটিও বৃহত্তর বিচারে সমাজবিরোধী বিজ্ঞাপন বলা উচিত হবে মনে হয়।

আমাদের সরকারি বিধি-ব্যবস্থায় এমন বিধান থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে দেশের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধজড়িত কোন বিষয়ই সরকারের বিনাঅনুমোদনে, কেবল কোন দেশী বা বিদেশীবণিকগোষ্ঠির স্বার্থের জন্য, সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত না হয়।

আমাদের জাতীয় সরকারের কাছে দেশবাসী এ সব বিষয়ের প্রতিকার প্রত্যাশা করে। অসাধু ব্যবসায়ীদের হাতে দরিদ্র দেশবাসী পুনঃ পুনঃ ঠকবে, কেবল টাকা খোয়াবে তাই নয়, খারাপ ওষুধ খেয়ে জটিল রোগ বাধাবে, স্বাস্থ্য লাভের আশায় স্বাস্থ্য হারাবে—এ অবস্থা অন্যূন পঞ্চাশ বছর ধরে চলেছে, এখন স্বাধীন দেশে এর প্রতিকার হওয়া চাই-ই। সম্প্রতি যে প্রেস কমিশন নিযুক্ত হয়েছে, বিষয়টি তাদেরও গোচরীভূত করা হয়েছে। আশা করা যায় বিষয়টি সম্যক আলোচনান্তে তারা সরকারকে সুপারিশ করবেন যাতে ভারতীয় বিজ্ঞাপন প্রবাহে এই কুরুচির গলিত শব অবাধে ভেসে না বেড়ায়।

## রবীন্দ্রনাথের ঠাকুর্দা ও অন্যকয়েকটি চরিত্র

### সুধীর রায়চৌধুরী

জে, সি, ঘোষ তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে * রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের কতকগুলো ত্রুটি দেখিয়েছেন। তাঁর প্রধান আপত্তি রবীন্দ্রনাথের 'stock characters' সম্বন্ধে। বস্তুত, ঠাকুর্দা-সম্প্রদায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় সব নাটকেই উপস্থিত। তাঁদের অত্যধিক গীতিপ্রবণতা এবং ভাবসর্বস্বতা নাকি নাটকীয় action বিরোধী। এছাড়া, "The emotional or spiritual crisis is almost always brought about by a young girl".

রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটক সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিযোগটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপাতভাবে মন্তব্যের যথার্থ্যই প্রমাণিত হয়—যেমন 'রক্তকরবী'র নন্দিনী, 'ডাকঘরে'র সুধা, 'রাজা' নাটকের সুদর্শনা। কিন্তু সুদর্শনা সম্পর্কে আমাদের ধারণা ঠিক উল্টো—শুধু সুদর্শনা নয়, 'রাজা' এবং 'অরূপরতনের'

*Bengali Literature—J. C. Ghose ; Oxford University Press.



সমস্ত চাঞ্চল্য রাজাকে নিয়েই। জে, সি, ঘোষের ভাষায় কোনরকম 'emotional or spiritual crisis' যদি ওখানে কেউ এনে থাকেন ত তিনি রাজা। ওখানে সুদর্শনার দায়িত্ব প্রচুর থাকলেও তার সমস্যা একান্তভাবে ব্যক্তিগত। এমন কী যে বৌদ্ধরূপক থেকে গল্পটি গৃহীত সেখানেও প্রধান সমস্যা রাজা নিয়ে, রানি নয়। এরপর সুধা। সুধা অমলের জীবনে আলোড়ন এনেছে সত্য, কিন্তু একা সে আনে নি। ঠাকুর্দা, দৈয়ালা, রাজদূত, সুধা, রাজা সবাই যৌথভাবে অমলের জীবনে 'crisis' এনেছে। একা সুধা অমলের জীবনে এত গভীর ছাপ ফেলতে পারত না, কেননা অমলের মুমুক্ষা-আকিঞ্চন ত সুধার জন্যে নয়, রাজার সাথে মিলিত হবার জন্যে। সুধার ভালবাসাকে সে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছে, কিন্তু ভালবাসার বন্ধন সে স্বীকার করে নি।

একমাত্র 'রক্তকরবী' নাটকের সমস্ত সমস্যা এবং চাঞ্চল্য নন্দিনীকে ঘিরে—এছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। নন্দিনী যদি নন্দন হত, তবে যক্ষরাজও জালায়ন ভেদ করত না, রঞ্জন-বিশু-কিশোরও বিদ্রোহী হত না, ৪৭৯ এবং ৪৯ঘ-দের মধ্যেও প্রাণের সাড়া পাওয়া যেত না—'রক্তকরবী'রও মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হত। লীলা রায় 'রক্তকরবী' সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, 'নন্দিনীর ওপর আমরা গভীরভাবে 'personal interest' নি ( জয়ন্তী উৎসর্গ।' নন্দিনীর ওপর পাঠক এবং নাট্যকারের পক্ষপাতিত্ব না থাকলে নাটকের সার্থকতা থাকত না। 'রক্তকরবীর' যত আবেগ-উত্তেজনা, সে ত নন্দিনীকে নিয়েই।

'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', শারদোৎসব' প্রভৃতি নাটক প্রসঙ্গে 'young girl'-এর প্রশ্নই ওঠে না। তারপর 'তাসের দেশ।' সেখানেও নাটকীয় সঙ্ঘাত এবং সমস্যা এসেছে রাজপুত্র ও সদাগরপুত্রের তরফ থেকে, ইস্কাবনের বিবিকে কেন্দ্র করে নয়।

সুতরাং শ্রীযুক্ত ঘোষের মন্তব্য কেবলমাত্র একটি নাটকের বেলায়ই প্রযোজ্য, সমগ্র রবীন্দ্র নাটকের ক্ষেত্রে এরকম 'generalisation' গ্রহণীয় নয়।

এরপর ঠাকুর্দা। ঠাকুর্দা সম্পর্কে কেউ উচ্ছ্বসিত মন্তব্য করেছেন, কেউ একেবারে বিরূপ সমালোচনা করেছেন। মোটের উপর রবীন্দ্র-নাটকে ঠাকুর্দার প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারেন নি। এমন কী ইংরেজ সমালোচক টমসনও ঠাকুর্দা চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-মানসের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, "These are Rabindranath's people". বস্তুত, ঠাকুর্দাবৃন্দ গ্রীকনাটকের কোরাসের দায়িত্ব পালন করেছেন। সাঙ্কেতিক নাটকে 'action' একেই কম, রবীন্দ্র-নাটকে আরো কম, সুতরাং সে অভাব পূরণ করতে হয়েছে গানের ভিতর দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের রূপকতত্ত্ব বিশ্লেষণে সঙ্গীতের দান বড় কম নয়। হাডসনের মতে, "Chorus with its elaborate odes and solemn dancing gave to Greek tragedy its pre-eminently lyrical and operatic character ( *An Introduction to the Study of literature* )"। রবীন্দ্রনাটকে ঠাকুর্দাবৃন্দ কী একই দায়িত্ব পালন করেন নি ?

তবু এ যুক্তি দিয়ে 'stock characters'-এর অভিযোগ খণ্ডন করা চলে না। আমাদের মতে, ঠাকুর্দাবৃন্দের মূল আদর্শে কোন বিরোধ না থাকলেও বিভিন্ন নাটকে তারা বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন অর্থাৎ প্রতি নাটকে তারা ভিন্ন চরিত্র হয়ে এসেছেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, 'অচলায়তন' ও 'শারদোৎসব' নাটক দুটি।[৩] 'অচলায়তনে'র ঠাকুর্দা সংস্কারক সুতরাং স্বভাবে উদার এবং দৃঢ়।

কর্মে তাঁর আস্থা। 'শারদোৎসবে'র ঠাকুর্দা আপনভালো, আনন্দে আত্মহারা, তাই শরতের আকাশ উপুড় করা স্নিগ্ধ রৌদ্রে ছেলের দলের সঙ্গে ছুটি উপভোগে তিনি ব্যস্ত। তেমনি 'ডাকঘর' নাটকের 'spiritual crisis' কতকটা ( সবটা নয় ) এনেছেন ঠাকুর্দা, আবার 'মুক্তধারা' নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী এনেছেন 'emotional crisis'। 'রাজা'-র ঠাকুর্দার দায়িত্ব আরো গুরুত্বপূর্ণ—কোরাসের মতই তিনি সমগ্র নাটকের 'commentator'.

একই চরিত্রের পুনরাবৃত্তিতে যদি আচরণ-গত একঘেয়েমি এবং নাটকীয় সংহতির বিরোধ দেখা দেয়, তবেই সেটা আপত্তিকর। কিন্তু তা না ঘটলে, নাট্যকারের ক্ষমতা নিঃসন্দেহে প্রশংসার্হ। সফোক্লিস এবং ইউরিপিদেসের 'ইলেকট্রা'র মধ্যে চরিত্র ও বিষয়-বস্তুগত সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও নাটক হিসাবে ওরা ভিন্ন। তেমনি বিভিন্ন নাটকে ঠাকুর্দার কর্তব্য যখন এক নয়, তখন এদের ভিন্ন চরিত্র হিসাবে মেনে নিলে ক্ষতি কী ?

থেরীগাথার 'উপ্‌পল বন্না'—কাহিনী যাঁর পড়া আছে এবং কাশ্মিরী উৎপল কুলের ইতিহাস জানা আছে তিনি বুঝতে পারেন য়ুরোপীদেশের 'ইলেকট্রা' আবেস্তীয় না বৌদ্ধ গাথা থেকে গেল। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন। অশোক 'উপল-কেক' ছিলেন—'অলীকসোদর'-কে শাসন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিচারে যাঁরা অগ্রণী হন তাঁরা না জানেন জাতির, ভাষার, সাহিত্যের ইতিহাস, না বোঝেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা। যথাসত্বর এ-ধরণের রবীন্দ্রসাহিত্য-বিচার বন্ধ হওয়া উচিত। সম্পাদক।

# পূর্ব্বাশার নিবেদন

১৩৪২ সনের শ্রাবণে আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি আবেদন উপস্থিত করি। আবেদনটি ছিল সাহিত্যের একটি 'একাডেমি' তৈরী করা সম্পর্কিত। তাঁর অনুমোদন প্রার্থী ছিলাম ধূর্জ্জটিপ্রসাদ-পুরঃসর পূর্ব্বাশা-মণ্ডল। রবীন্দ্রনাথ তখন পূর্ব্বাশার সম্পাদককে জানিয়েছিলেন :

"সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝো, কোন নিয়মে ও কোন লক্ষ্যের দিকে তাকে চালনা করতে হবে তার স্পষ্ট ধারণা মনে আনতে পারিনি। তার কারণ সাহিত্য মানসিক আবহবিদ্যার অন্তর্গত। হাওয়ার খেয়ালে কখনো বৃষ্টি হয় কখনো অনাবৃষ্টি কখনো অতিবৃষ্টি, কখনো শিলাবৃষ্টি। কোনো মীটিয়রলজিকাল ডিপার্টমেণ্ট তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না পর্যবেক্ষণ করতেই পারে।"

অবলোকিতেশ্বর-প্রতিম রবীন্দ্রনাথের কৃপায় সেদিন সত্যি পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন ছিলনা। তাই আমরা তখন 'একাডেমি'-গঠনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ, আঠারো বছর পর, গত পঁচিশে বৈশাখ আমরা 'পূর্ব্বাশা একাডেমি' গঠনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি।

সম্বৎসরে যাঁর সাহিত্যিক কর্ম্মকৃতি সুযোগ্য বিচারক-মণ্ডলীর বিবেচনায় বাংলা সাহিত্যের একটি নূতন পথ উন্মোচিত করে দেবে বলে অনুমিত হবে তাঁকেই বৎসরান্তে 'পূর্ব্বাশা-একাডেমি' একটি স্বর্ণপদক উপঢৌকন প্রেরণ করবেন। পদকটির বিবেচনাধীন নাম 'মহাশ্বেতা-পুরস্কার'। এই পুরস্কার দেওয়া সম্পর্কে আমরা আপাতত শ্রীযুক্ত জীবনানন্দ দাশ, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সম্মতি লাভ করেছি। অন্যান্য যশস্বী ও কৃতী সাহিত্যিকের নিকটও আমরা ১লা আষাঢ় সম্মতি প্রার্থনা করব। পূর্ব্ব ও উত্তর মেঘের নিকট যক্ষের প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবেনা আশা করি।

পূর্ব্বাশার সম্পাদক ও প্রকাশক।

# স্বরবিতান

## স প্ত বিং শ খ ণ্ড

**ব্রহ্মসংগীতস্বরলিপি**

¶ কাঙ্গালীচরণ সেন-কৃত 'ব্রহ্মসংগীত-স্বরলিপি' গ্রন্থের ছয় ভাগে রবীন্দ্রনাথ-রচিত যে-সকল গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল, বর্তমানে তাহার অধিকাংশ 'স্বরবিতান'-গ্রন্থমালায় সংকলিত হইয়াছে।

¶ স্বরবিতানের চতুর্থ খণ্ডে ৫০টি, দ্বাবিংশ ত্রয়োবিংশ চতুর্বিংশ পঞ্চবিংশ ও ষড়্‌বিংশ খণ্ডের প্রত্যেকটিতে ২৫টি, ও সপ্তবিংশ খণ্ডে ১৯টি সংকলিত হইয়াছে।

¶ এতদ্‌ব্যতীত, সপ্তবিংশ খণ্ডে 'বৈতালিক'-গ্রন্থের অন্তর্গত ৫টি ব্রহ্মসংগীত, ও 'আমি সংসারে মন দিয়েছিনু' গানটির স্বরলিপি প্রকাশিত হইয়াছে।

¶ মূল্য চতুর্থ খণ্ড ৩৷৷০, দ্বাবিংশ-ষড়্‌বিংশ প্রত্যেক খণ্ড ২৷৷০, সপ্তবিংশ খণ্ড ৩৲

## অ ষ্টা বিং শ খ ণ্ড

**রাজা ও রানী • বিসর্জন • ব্যঙ্গকৌতুক**

¶ উল্লিখিত তিনটি নাটক ও প্রহসনের অন্তর্গত যাবতীয় গানের স্বরলিপি এই খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য দুই টাকা।

## দ্বি তী য় খ ণ্ড

¶ সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য চার চার টাকা।

**অখণ্ড**

## গীতবিতান

**॥ তিন খণ্ড একত্র বাঁধাই ॥**

¶ গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের গানের সংকলন সম্পূর্ণ হইয়াছে। ব্যবহারের সুবিধার জন্য এখন তিন খণ্ড একত্র গ্রথিত হইল।

¶ অখণ্ড গীতবিতানে অনেকগুলি চিত্র যুক্ত হইয়াছে।

**কাপড়ে বাঁধাই ॥ মূল্য ষোল টাকা ॥ উপহারোপযোগী সংস্করণ**

**বিশ্বভারতী**


# সাহিত্য-বিচার

**রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা**

বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা—নাভানা—পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শ্রেষ্ঠত্বের আসন নিয়ে ঠেলাঠেলি মারামারি করতে অনেক লেখককেই দেখেছি। কালক্রমে সেই দুর্ব্বাতিক অন্তর্হিত হয়ে প্রকাশকের গণেশের কাঁধে গিয়ে সওয়ার হয়েছে। তবু আমি ভাবতে পারিনি 'নাভানা'—যেখানে বিরাম মুখোপাধ্যায়ের মতো সুরুচিসম্পন্ন একজন সুধী সমালোচক বিদ্যমান—সেখান থেকে একটি 'শ্রেষ্ঠের' পসরা বেরুবে! আমি শ্রেষ্ঠত্বের বিরোধী নই কিম্বা তার প্রতি ইঙ্গিতও করছিনে—আমার আপত্তি এই খানে যে পাঠক ভাববেন: বুদ্ধদেবের যে কবিতাগুলো এ-গ্রন্থে সংকলিত হ'লনা, সেগুলো তবে তেমন ভালো নয়, যেমন ভালো এই সত্তর-পঁচাত্তরটি কবিতা। নিরবধি কাল কাকে গ্রহণ করে কাকে বর্জ্জন করবে তা যখন আমাদের জানা নেই, তখন কোনো কবির সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত করতে হলে, তাঁর মুদ্রিত-প্রকাশিত প্রত্যেকটি কবিতারই গ্রন্থে স্থান করে দেওয়া উচিত।

কালের রাস্তায় বেশি দূরে প্রস্থান না করেও বলতে পারি, আমি যে বুদ্ধদেব বসুর কবিতার একজন পাঠক—আমিই ত আমার কাছে ভালো-লাগা অনেক কবিতা এখানে দেখতে পেলাম না! আশাকরি 'নাভানা' আমার অনুযোগটি ভেবে দেখবেন।

আমি বুদ্ধদেব বসুর এমন একজন পাঠক যে তাঁর কবিতা নিজে পাঠ না করে অপরের মুখে শুনেই কবির প্রতি আসক্ত হয়ে উঠেছিল। এখনো সেই পংক্তিটি আমার মনে পড়ে: "যাহারে স্মরণ করি সিন্দূর দিতেছ শুভ্র ভালে"। এ আমাদের 'দেবদাস'-দেবদাসী-যুগের কথা। রবীন্দ্রনাথের কথা নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথকে সে-যুগটা শত্রুরূপে পুজো করেছে। ওটাকে বলা যায় দৈত্যের যুগ। বাজারে যেটা 'কল্লোলযুগ' বলে পরিচিত আমি তাকে সমুদ্র-মন্থনের যুগ বলে মনে করি। সুধার চাইতে বিষই উঠেছিল তখন বেশি এবং বসুধা তাতে নিজেকে খুব পবিত্র মনে করতে পারেননি। আমাদের দেব-ভক্তি বা রবীন্দ্রভক্তি গয়াসুরের হরিপাদপদ্ম-লাভের সঙ্গে উপমিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ সেই হলাহল আকণ্ঠ পান করে দেখিয়ে গেলেন যে তাঁরই জিৎ। বুদ্ধদেব বসুকে আজ রবীন্দ্র-কৌমের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি বলেই অনেকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং প্রকৃত পক্ষে এ-সম্মান তাঁরই প্রাপ্য—তিনি এ-সম্মান অর্জ্জন করেছেন বীর্য্যশুল্কে—খোসামোদ করে নয়—তাঁর কৃতিত্ব সেখানে।

যে-ধরণের চক্রমণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসম্পদকে একটি নিটোল পূর্ণচন্দ্রের সুধাভাণ্ড হিসেবে আমাদের আকাশে রেখে গেছেন—বুদ্ধদেবও তেমনি একটি চক্রের পূর্ণতায় তাঁর কাব্য-পথ-ভ্রমণ—বল্‌তে গেলে—সমাপ্ত করেছেন। তিনি মনোজীবনের এবং কবি-জীবনের সুরু করেন যে ঋণভার নিয়ে তা সর্ব্বমানবিক ঋণ—সেই ঋণভার লাঘব করবার প্রতিশ্রুতি নিয়েই তাঁর পথ-চলা সুরু। তাই 'বন্দীর বন্দনার' এ-কথা:

"সে-ঋণ করিতে শোধ দ্রৌপদীর সবগুলি শাড়ি
খুলিয়া ফেলিতে হবে"

নিয়তির অমোঘ ইঙ্গিত হয়ে তাঁকে 'দ্রৌপদীর শাড়ি'র 'অসম্ভবের গান'-এর নৈরাশ্য-জনক এলাকায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে! দ্রৌপদীর শাড়িও কোনোদিন ফুরোয়না, কৃষ্ণের চাতুরীও ঘোচেনা কোনোদিন। কামনার পথে এ-শিক্ষাই লাভ করেছে কল্লোল-যুগের কবির মন। তিনি প্রভাসের জন্যে তৈরী। প্রবাসী আত্মার মুখোমুখি হয়েছেন। অর্জ্জুন হলেও তার বিক্ষোভ আছে। সে-বিক্ষোভ সার্থকতা নামক বস্তুটি আমাদের জীবন থেকে অন্তর্হিত বলে।

যাক্, আমার মনে হয় বুদ্ধদেবের কবি-কৃতির সব অধ্যায়ই চমৎকার, একমাত্র 'দময়ন্তী'র অধ্যায় খানিকটা দুর্ব্বল। কবিতার ভাষা ও ছন্দ নিয়ে তখন তিনি যেসব কথা বলেছেন তার বেশির ভাগ প্রতিপাদ্যই যুক্তিসহ হবেনা। কবিতায় কথ্য-ভাষা প্রচলন করা খুবই প্রশংসনীয় কিন্তু সৎ কবিতায়, যেমন তিনি নিজেও কিছুটা করেছেন, কবিতাকে বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গী দিয়ে কদাচ নয়। বিদ্রূপাত্মক পদ্য সত্যিকারের কবিতা কি না তা নিয়েও আমার মনে সংশয় আছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

## বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস

বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ( উপন্যাস )ঃ অনিল বিশ্বাস। জেনারেল প্রিণ্টার্স। পাঁচ টাকা।

বিশ শতকের উপন্যাস-সাহিত্যকে নিয়ে একটা বিস্তৃততর আলোচনার অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা এ গ্রন্থে প্রথমেই দ্রষ্টব্য। খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত পরিক্রমাগুলি বাদ দিয়ে এই শতকের উপন্যাসের মোটামুটি পরিচয় দিতে ইতিপূর্বে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র কয়েকটি অধ্যায়ে, মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'সাহিত্য-বিতান' গ্রন্থের একাংশে ও বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'An acre of Green Grass'-এ তাঁদের স্বকীয় প্রবর্তনায় ও পদ্ধতিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বলা কর্তব্য, সে-আলোচনাগুলি সাহিত্য-বিষয়ে কটি উজ্জ্বল দিকনির্ণয় করেও বিভিন্ন কারণে ( যা এ প্রসংগে অবাচ্য ) খণ্ডিত ও অপূর্ণাঙ্গ ছিল। সে-তুলনায় এ-বইটির প্রশস্ত বিচার-প্রবণতা একটি সুঘটনা বলেই গণ্য।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে এখানে অধ্যায়-ভাগের চেষ্টা আছে। তবে এখানে বিভাগগুলি সংকীর্ণতর ও বিচিত্রতর হয়েছে। বইটির আদ্যন্ত একটি চিন্তাশীল অধ্যয়ন-নিষ্ঠ প্রখরদৃষ্টি মন যে উদার সহমমতা-যোগে বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ পর্বের একটি বুদ্ধি-উজ্জ্বল, অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল বিচার-বিশ্লেষণে উদ্যোগী হয়েছেন, তার স্থির পরিচয় আছে।

তবে বই-এর পরিসরের তুলনায় বক্তব্যের প্রকার অনেক অধিক ( স্থান ভেদে বাহুল্য ) হওয়ায় বহু জায়গায় আলোচনার ভারসাম্য থাকে নি। ভাষায় প্রাঞ্জলতা ও স্পষ্টতার বদলে একটা দ্রুতি এসেছে বটে, আবার সঙ্গে সঙ্গে সংক্ষিপ্তি ও সংহতির উপলক্ষে অনেক শিথিলতায় ও জড়তায় বক্তব্যের প্রকাশ সুবিন্যস্ত হতে পায় নি। বইটির অধ্যায়-বিভাজনে ও অনেক মন্তব্যে লেখকের স্বকপোলকল্পিত মনোভাবের একটা কৃত্রিম পরিচয় পাই। বিশ শতকের জটিল সাহিত্য-মানসকে বিজ্ঞান-রাষ্ট্র-সমাজের



পটভূমিতে বিচার্য দৃশ্য হিসেবে উপযুক্ত মূল্যে বিবেচনা করতে যে-সমালোচক পরাঙ্মুখ নন, গ্রন্থে পর্ব এবং অনুপর্ব নির্মাণে এতো নিশ্চিত-নির্ভয় হওয়া তাঁর পক্ষে অবশ্যই যুক্তিযুক্ত হয় নি। এ শতকের মানস বিবিধ সমস্যায়, চিন্তায়, বিশ্লেষণে পদে পদে এতোই দ্বিধাবিজড়িত, এতোই বিচিত্রমনস্ক যে এই মানসের মননপন্থীদের অতিস্পষ্ট কোনো নামে কিংবা পরিচয়ে শ্রেণীবিভক্ত না করাই সমীচীন। আমি তো এই ধারণারই পক্ষপাতী—ফলত, অনিলবাবুর সাহিত্যিক-শ্রেণী-বিভাগকে ন্যায্য বলে মনে করতে পারি নি। পূর্বেই বলেছি, আলোচ্য লেখক অনেকের তুলনায় অবশ্যই উদার ও সহানুভূতি-সম্পন্ন, এটা সুলক্ষণ, কিন্তু তার জন্যে যদি সাহিত্য-বিশ্লেষককে অনেক উপেক্ষণীয় সাহিত্যিককে মূল্য ( স্থানে স্থানে মাত্রাধিক মূল্য ) দিতে হয়, তবে তা অবশ্যই ইচ্ছনীয় নয়—বিশেষত সেই মূল্যদান-ব্যাপারটি যখন বই-এর বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে। বিশ্লেষণ-তৎপর আয়োজনের দ্রুততায় স্থানভেদে অনির্ভরযোগ্য মন্তব্য চোখে পড়েছে ঃ

(১) ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রয়োগে যে মনায়নিক সাহিত্য এ শতকে দেখা দিয়েছে তার সার্থক উদাহরণ কি হোলো মনোজ বসুর 'ভুলি নাই'? ( পৃঃ ১১ )।

(২) 'চিত্তমানরা স্বভাবতই একটু বেশি ভয় করে বিপ্লবকে। কারণ এতে হয়ত তাঁদের কায়েমী স্বার্থের বিপর্যয় হতে পারে। এই জন্যে 'অসহযোগের ভগীরথ নজরুল ইসলাম, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নন।' ( পৃঃ ৭ )।—এই আশ্চর্যজনক উক্তি অনিলবাবুর মতো বিচক্ষণের যোগ্য হয় নি। অসহযোগের ভগীরথ যে নজরুল কেন হতে পার্লেন এবং রবীন্দ্রনাথ কেন হলেন না—এর হেতু সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ও কবিবিশেষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-সাপেক্ষ। অনিলবাবুর বিচার-মত এমন সংকীর্ণ স্বার্থগত কদাপি নয়।

(৩) আরো আশ্চর্য, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' কি তাঁর 'চার-অধ্যায়', শরৎচন্দ্রের 'পথেরদাবী', কি সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরীর' মতো রাজনীতি-নির্ভর? ( পৃ ১৬ )। নিশ্চয়ই না। সমস্যা-সংকুল সমাজ-সংকটের সুদূরবিস্তৃত পটে হোলো গোরার প্রকৃত মহিমা।

কেবলই ত্রুটি দেখানো এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। অনিলবাবুর মধ্যে একজন শ্রদ্ধাশীল রুচিবান সাহিত্য-রসিকের উপাদান রয়েছে বলেই এমন ক'রে তাঁকে বিচার করছি। প্রধান অভিপ্রেত হোলো —তিনি উদার উন্নত রসবোধে দীক্ষিত সমালোচক অবশ্যই হবেন—বিশ শতকী উপন্যাসের ভূতপূর্ব বহু আলোচনায় অনুপস্থিত অনেক শক্তিমানকে তিনি এ বইয়ে যোগ্যমূল্য দিতে চেষ্টা করেছেন। হ্রস্ব পরিধির আলোচনায় উপেক্ষাযোগ্য সাহিত্যিক সম্পর্কে তেমনি রুচিবান সাহিত্য-রসিককে নির্মম হতে হয়। অবশ্য সেক্ষেত্রে অতিসচেতন উন্নত-কলা-রসিক পাঠক না হ'তে পারলে বিপদও আছে। গ্রহণে-বর্জনে গভীর ও গূঢ় দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে হয় সেখানে। তবে এ বিষয়ে অনিলবাবুর চিন্তিত হবার কারণ দেখিনে। মূল্যবোধের যথাযথ পরিচয়-প্রদান তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য না হওয়ারই তো কথা।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এখনও যেদেশে উপযুক্ত মনোযোগের অভাবই লক্ষিত হয়, সেক্ষেত্রে বিশ শতকী উপন্যাসের বিচার বিশ্লেষণ, বিশেষত রবীন্দ্রোত্তর পর্বের বিস্তারিত স্বরূপ নির্ণয়ের বহুবিদিত

বুলির মোহমুক্ত প্রয়াস অবশই দুঃসাহসিক এবং সৎসাহসিক। অনিলবাবু তাই পরিশেষেও প্রশংসার্হ। সুধীপ্রকাশক সুরেশ দাসের উদ্যোগ উন্নত সাহিত্যবোধের পরিচায়ক ব'লে উল্লেখযোগ্য।

নি. নন্দী

## বড় গল্প কি উপন্যাস ?

**মলী সেনের প্রেম** : রমাপতি বসু। অধিনায়ক। দাম একটাকা বারো আনা।

একটি উপন্যাস। মলী সেন একজন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের মেয়ে, বাপ বাঙালী মা ইউরোপীয়ান। এই সফেদ সুন্দরীর হোটেল-বার-কাফে ক্যাবারে-কার্ণিভেলে সর্বত্র অবাধগতি। সবত্র সে প্রেমাস্পদ খুঁজে বেড়ায়, প্রেম তার নেশা, প্রেম তার মদের মতো প্রতি রাত্রির উত্তেজনা।

সমর, যুদ্ধকালীন কলকাতা—যখন নৈতিক মানদণ্ড শিথিল হ'য়ে এসেছিল, টাকার মান ছিল পয়সার সামিল। অনিশ্চিতের ছিনিমিনি খেলায় দেহ হলো প্রধান বলি। এমন ক্যাবারে-কার্ণিভেল তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে খেতে নায়ক-লেখক রঞ্জনও মলী সেনের আশেপাশে এসে ভিড় করলো—চোখের পরিচয় থেকে প্রেমের আঁকসীর টানে জড়িয়ে পড়লো ( 'সৃষ্টি'-উপন্যাসে যার উত্তরণ দেখা যায় )। প্রেম, গভীর প্রেম—এবং মলী সেনের মতে রঞ্জনের সঙ্গে প্রেমে তার কৃত্রিমতা ছিল না। গভীর প্রেম থেকে গভীর বিরহে মলী সেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। কারণ রঞ্জনকে সে ভালবাসে, কিন্তু মদে-প্রেমে জারিত যুদ্ধের রাত্রিগুলো মুখোমুখি বসে মলী কাটিয়ে দিতে পারে না—ঘরে আর ময়দানে। বিশেষত আমেরিকান সৈন্যদল প্রচুর টাকা ছড়াচ্ছে। জীবনের মূল্য তখন পেনের মাপকাঠিতে।

মলী শেষটায় এক পাইলটের সাথে আমেরিকা গেল এবং ভগ্নহৃদয়ে আত্মহত্যা করলো।

রমাপতি বসু কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লেখেন। এটা তাঁর প্রথম উপন্যাস। অবিশ্যি, উপন্যাস বলতে আমার মন সায় দিচ্ছে না—বড় গল্প বলাই উচিত। রমাপতির লিখবার ভঙ্গীটিও গল্প বলার মতো: ছোট ছোট কাটাকাটা কথা চরিত্র-চিত্রণের প্রয়াস। পশ্চাদপটের উপর মোটেও গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। যুদ্ধমত্ত কলকাতার আলেখ্যও অস্পষ্ট। সেজন্যে আমেরিকান সৈন্যদের টাকার জোরে ইঙ্গ-বঙ্গ ও ম্যাংলোইণ্ডিয়ান সমাজকে যেভাবে তচনচ করে ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং যা রমাপতির মনে প্রবল ঘৃণার উদ্রেক করেছে—তার খুব সামান্য পরিচয়ই মলী সেনের প্রেমে আছে। মলী সেনের কাহিনী ঘৃণা-সঞ্জাত, আমেরিকান বেলাল্লাপনার গল্প, কিন্তু মলীকে আমেরিকায় না নিয়ে গিয়েও রমাপতি কলকাতার বুকে এই ট্র্যাজেডির পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারতেন। বইয়ের নামটা চটকদার রোমাঞ্চ সিরিজের মতো।

অ. দত্ত।


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি —যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতে ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
( অর্থনীতি বিষয়ক )
দু টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দুটাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেম রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা

মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। চলতি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে (ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেণ্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয়:

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা




খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড়

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩

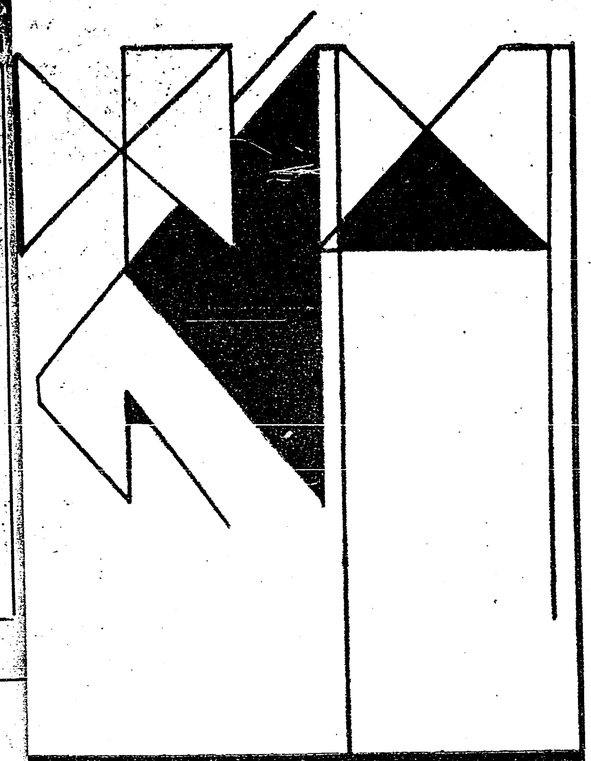

# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ: ১৩৬০
দ্বিতীয় সংখ্যা: জ্যৈষ্ঠ

সম্পাদক: সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক: সত্যপ্রসন্ন দত্ত

দাম আট আনা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

### কবিতা

অশ্রিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**নতুন দিন**
আট আনা

**যৌবনোত্তর**
আট আনা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
**স্বাক্ষর**
এক টাকা

### গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পতাকা**
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
**নয়নচারা**
দেড় টাকা

### উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

**কস্মৈদেবায়**
( ২য় সং )
তিন টাকা

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
**তিনরঙ**
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ ক লি কা তা


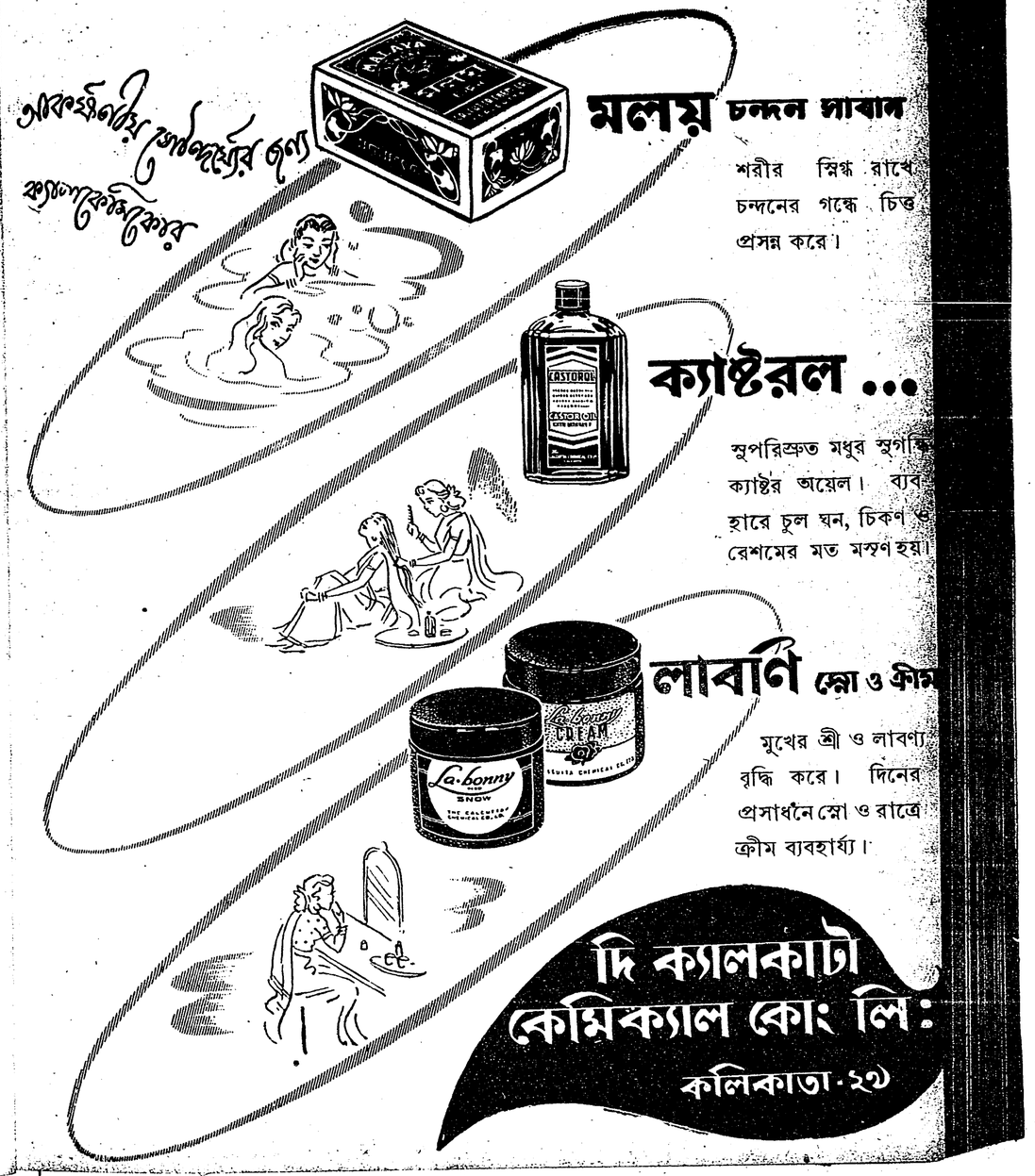

# পূর্ব্বাশা

## জ্যৈষ্ঠ—১৩৬০

### সূচীপত্র


| পদাবলী : | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| প্রত্যয় : সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় | ... | ৬৩ |
| বন-বিহারিণী : বটকৃষ্ণ দাস | ... | ৬৫ |
| চিরবিরহিণী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৬৬ |
| প্রত্যাবর্তন : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত | ... | ৬৭ |
| বাংলা কবিতায় বলদেব পালিত : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | | ৭১ |
| শিল্পী : জেমস্ জয়েস্ ( অনুবাদক : অশোক গুহ ) | | ৮১ |
| উপন্যাস : ইন্দ্রজিৎ | ... | ৮৮ |
| সংদর্শ : | | |
| বাংলা কবিতার দুর্বোধ্যতা ও ছন্দ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | | ৯৩ |
| গড় শ্রীখণ্ড ( উপন্যাস ) : অমিয়ভূষণ মজুমদার | | ১০০ |
| অসুমাসির খেলনা : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় | ... | ১০৮ |
| দক্ষিণান্ত : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় | ... | ১১০ |
| কবিতার লেখক : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( গ্রন্থ-আলোচনা ) | | |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

শ্রীরাজশেখর বসুর

লঘুগুরু ২৷৷০

অন্নদাশঙ্কর রায়ের

নতুন করে বাঁচা ১৸০

হিরণ্ময় ঘোষালের

কুলটুর কামপফ্ ৩৲

পরিমল রায়ের

ইদানীং ২৲

যতীন্দ্রকুমার সেনের

চিকিৎসা সঙ্কট ৸০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রসাদমালা ২৷৷০

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রাগৈতিহাসিক ২৷৷০

শ্রীবিমল মিত্রের

ছাই ৪৲

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

কাব্য সঞ্চয়ন ৫৲

শিশুকবিতা ১৸০

সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত

কথাগুচ্ছ ৭৲

শ্রীসুবোধ ঘোষের

যতুগৃহ ৩৷৷০

তিলাঞ্জলি ৪৲

গঙ্গোত্রী ৪৲

ফসিল ২৷৷০

মণিকর্ণিকা ২৷৷০

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের

এই মর্তভূমি ৩৷৷০

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়ের

বিখ্যাত বিচার কাহিনী ২৷৷০

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের

গণশার বিয়ে ১৷৷০

শ্রীঅশোক গুহর

আরব্য উপন্যাস ৪৲

পরশুরামের

ধুস্তুরীমায়া ইত্যাদি গল্প ৩৲

গড্ডলিকা ২৷৷০

কজ্জলী ২৷৷০

হনুমানের স্বপ্ন ২৷৷০

গল্পকল্প ২৷৷০

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর—আপনি কি হারাইতেছেন আপনি জানেন না ৩৲

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট ⁘ কলিকাতা—১২

গান বাজনার খবরাখবর—

বাংলা তথা ভারতের সর্বত্র বিপুল আড়ম্বরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালিত হয়েছে। এই উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংগীতের সর্ব-ব্যাপক অনুশীলনী সাধারণকে মুগ্ধ ক'রেছে।

বিদ্রোহী কবি-গীতিকার নজরুল, পত্নী ও পুত্র অনিরুদ্ধসহ বিলাতে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন।

শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় মায়ের মনের যে ভাব-ধারাটিকে N 82566 রেকর্ডে সুরে মূর্ত ক'রে তুলেছেন, তা জননীর শাশ্বত রূপের নব-কলেবর। "আমার সোণা চাঁদের কণা, ভুবনে তুলনা নাইরে—" প্রতি জননীর প্রাণের চিরন্তন বাণী।

"সেই পথিকের চরণ-চিহ্ন নাই" ও "আমার সমাধি হবেনা জানি গো তাজমহলের মত" দু'খানি আধুনিক গান GE 24674 রেকর্ডে গেয়েছেন স্বনামখ্যাত অপরেশ লাহিড়ী।

উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী আব্বাসউদ্দীন N 19740 রেকর্ডে "হাত ধরিয়া কও যে কথা" এবং "ও মোর কালারে কালা" গান দু'খানি উপহার দিয়েছেন।

"ঐ এলো এলো গিরিজা" আর "আনন্দে মেতে গিরিরাজ পুরী" গান দু'খানি উমার পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের আনন্দমধুর সুরে গাঁথা। N 82567 রেকর্ডে শ্রীমতী কমলা ( ঝরিয়া ) তাঁর সুললিত কণ্ঠ-মাধুর্যে গান দু'খানিকে রূপায়িত করেছেন।

GE 24675 রেকর্ডে সুধাকণ্ঠ শিল্পী শচীন গুপ্ত "আঁখি হ'তে দু'টি মুকুতা খসিল" ও "এ তীরে মাঝি আমি" আধুনিক গান দু'খানি পরিবেশন করেছেন। স্বাভাবিক প্রকাশ ভঙ্গিমায় গান দু'খানি উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীমতী ভারতী বসু, GE 24676 রেকর্ডে—কবি চণ্ডীদাসের দু'খানি পদাবলী-কীর্তনকে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে রূপদান ক'রেছেন। প্রথমখানি : "ভাল হ'ল আরে বঁধু" দ্বিতীয়খানি : "আই-আই পড়েছে রূপ কাজরের শোভা"।

নিউ ইয়র্কে বিশ্বখ্যাত বেহালাবাদক ইহুদী মেনুহিন সম্প্রতি এক বেতার ভাষণে ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। রাগরাগিনীর মাধ্যমে ভারতীয় সংগীত যে অপূর্ব রসসৃষ্টি ক'রে এসেছে, তারই প্রকাশ এবারের দু'খানি যন্ত্র-গীতির রেকর্ডে পাওয়া যাবে। N 87520 রেকর্ডে "ঠুংরী" ও "গৎ" বাজিয়েছেন জ্ঞান ঘোষ, GE 25813 রেকর্ডে "খেয়াল" ও "ঠুংরী"—ক্লারিওনেটের মাধ্যমে বাজিয়েছেন অমর সিং যস্তাল।




ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড অফিস : ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান গত ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ১৭ বৎসরের ভিতর চার বার ভ্যালুয়েশান করানো হইয়াছে (পঞ্চম ভ্যালুয়েশান-এর কাজ আরম্ভ প্রায় ) এবং প্রতি ভ্যালুয়েশানে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর হইতেই আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রতি বৎসর এই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান পলিশী-হোল্ডারদের বোনাস ও প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড দিয়া আসিতেছে।

ভারতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়ার এই সাফল্য অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ।

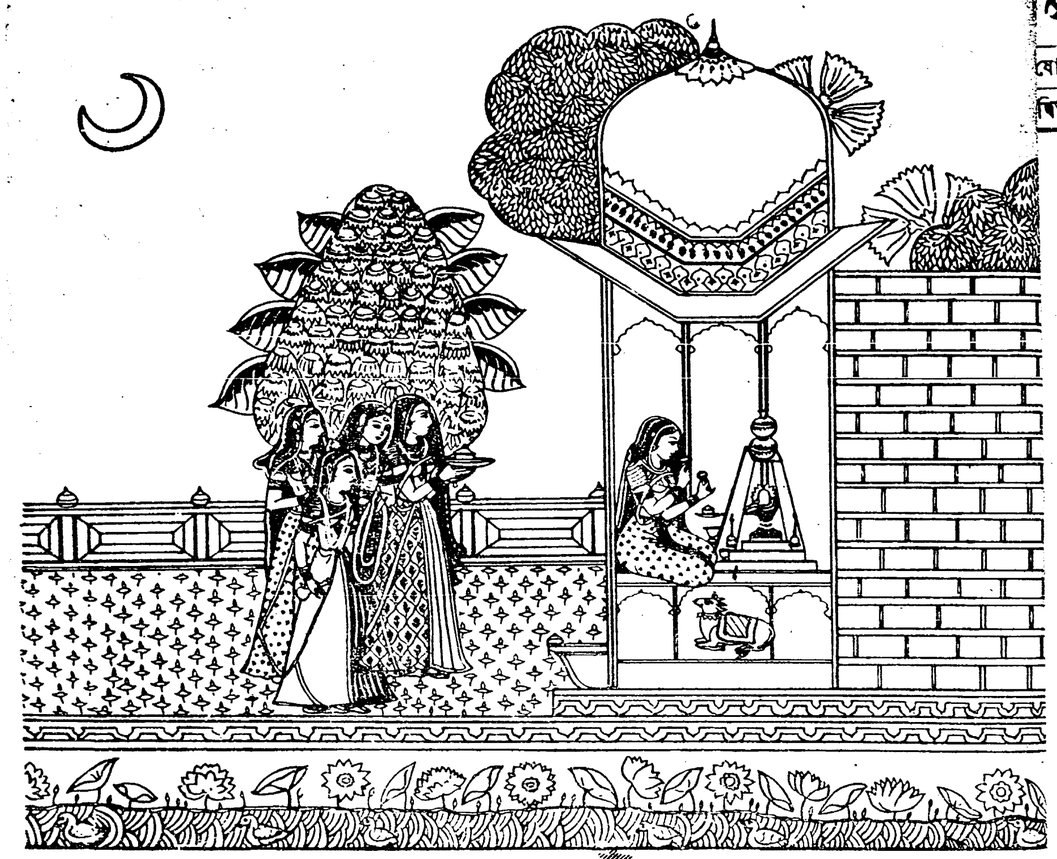

ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।
ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে।

চা

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দেয়, সঙ্গ দেয়, দেয় নব নব প্রেরণা।

CTB 104

## ভৈরবী

উপরের আলেখ্যটি সকাল বেলার রাগিণী ভৈরবীর রূপায়ণ। ভৈরবীর সুর সৃষ্টির পরিকল্পনাটি সত্যিই সুন্দর; দয়িত শিবের মিলন কামনায় পার্বতী উৎকণ্ঠিতা, প্রিয়-বিরহ-বিধুরার সেই উৎকণ্ঠাই বুঝি সুরের আবেদনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আবেদনে বেদনা যতই থাক্ চঞ্চলতা নেই, পুনর্মিলনের সুনিশ্চিত সম্ভাবনায় সেই সুর একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

# পদাবলী

## প্রত্যয়

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

অসন্দিগ্ধ প্রত্যয়ের অভেদ্য প্রাচীরে
ফাটল ধরেছে কবে,—চোখেও পড়েনি ;
অশ্বত্থ বটের শাখা প্রশাখার নীচে
শিকড়ের সারি নামে পাথরের বুকে
সে এক কৌতুকাবহ জড় রূপান্তর,
স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকি ;
বনান্তের একান্ত নির্জ্জনে
অস্ফুট গুঞ্জন ওঠে আমারে ঘিরিয়া ;

কি ইহার ইতিহাস ?
স্মৃতির কপাট খুলে দেখি
অনেক পৃষ্ঠায় তার কীটের দংশন।
উজ্জ্বল দিনের কথা সুবর্ণ অক্ষরে
লেখা ছিল অবলীলাক্রমে,
কত জোৎস্নাউচ্ছ্বসিত বসন্ত বিলাপ,
কত শত সুখস্মৃতি অসহ্য ব্যথার,
ঋতু পরিক্রমা পথে আবেগ মন্থর
কত প্রেম, বিরহ ও মিলনে গভীর,

বিচিত্র বিস্ময়ে ভরা কত অশ্রু কত কাতরতা—
স্তবকে স্তবকে আজ কীটদষ্ট কাগজের স্তূপ।
সন্দেহ কুটীল কীট গোপন সঞ্চারী
কালের তান্ত্রিক মন্ত্রে আজ্ঞাবাহী দাস।

ঘটনা এমন কিছু নয় ;
মান অভিমান আর নৈরাশ্য নিঃশ্বাস,
সর্ব্বস্বের লাগি আশা,
অবিভাজ্য অধিকার পরে
একান্ত নির্ভরশীল নির্ব্বোধ মনের
বিকারে প্রকারভেদ দেনা-পাওনার।

প্রাচীরের গায়ে তাই ধরেছে ফাটল,
এ ধারে ও ধারে তাই মৌন ব্যাকুলতা।
দিগন্তে রৌদ্রের তৃষ্ণা
ম্লান ছায়া—একান্ত নিকটে।
আমি নাই—সে-ও নাই
আমাদের স্মৃতি নাই বেঁচে ;
কখন মৃত্যুর ছায়া পড়েছে মাটিতে
বিষ বাষ্পে রুদ্ধ শ্বাস আমার পৃথিবী।
মোরা যেন দুটি মৃতদেহ
নিঃসাড়ে পড়িয়া আছি অন্তিমশয্যায়।

অরণ্যের ভাষা নাই
আকাশের বাণী নাই আজ ;
নিস্তব্ধ নিথর দেহে নাহি শিহরণ,
তবু যেন কা'র দীর্ঘশ্বাস
মাঝে মাঝে কানে আসে,
ভেঙ্গে দেয় সমাধির রূঢ় নীরবতা।

## বন-বিহারিণী

বটকৃষ্ণ দাস

হয়তো কখনো ঘুম আসবেনা দুচোখে আমার !

আকাশে আলোর রঙ মুছে গেলে, নাম ধ'রে যার
রাত নামে হ্রদের গভীরে,—
আমার কথার ফুল ফোটে যাঁর নামের শিশিরে,
যে এসে শুধায়
শোধ হ'লো জীবনের কতোটুকু দায়,
আনমনে তাকে খুঁজে খুঁজে
হয়তো কখনো চোখ ঘুমে আর আসবেনা বুজে !

আসবেনা কোনোদিন বুঝি আর আসবেনা ঘুম।
গভীর হাওয়ার মাঠে এলোমেলো কথার কুসুম
ছিঁড়ে যায়, ঝ'রে যায়। তবু সারারাত
কথা নয়, কথা নয়, আমার প্রেমের পারিজাত
ছিঁড়ে ছিঁড়ে, বলাকার পাখার মিছিলে
উড়ে যায় তার কাছে,—যে এসে শুধায়
শোধ হ'লো জীবনের কতোটুকু দায়,
কী দিলে আমায় তুমি ? কী দিলে নিখিলে ?

পারিনি কিছুই দিতে। তবু সব কথার পাখিকে
সে যদি দুহাতে ধরে,—যদি দিকে দিকে
তারার মতোন নীল আগুনে তাহার
পাখা পুড়ে যায় বলাকার,—
তারপর মেঘ জমে, বৃষ্টি নেমে আসে শেষরাতে,—
তবুও আমি কি আর সব ভুলে পারবো ঘুমাতে ?

## চিরবিরহিণী.

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

হায় গোরী কেন যমুনাতে জল তুলতে যাও
তোমার গোরারে ভুলতে চাও
স্মরণও ত ছায়া-আলো !
এতকাল যার নাম ছিল মনে আপনার চেয়ে ভালো
চোখ ছিল দূর তারার আখর আর তারা ছিল নিকষের চেয়ে কালো
তাদের ঘষে কি তুলতে চাও ?

বন-ভয় নেই, তমাল বনের ভয় ?
আকাশে অনিল পৃথিবীর নীল জানো না কী ভাষা কয় ?
কী ভীষণ কলরব :
"এসো এসো প্রিয়া দিতে হয় যদি সব
মৃত্যুরে চাও যদি
চাও নিরবধি অতল অনল-নদী
এইখানে এসো ঝুলন-দোলায় রাসের রভসে যদিবা তুলতে চাও।"

তার চেয়ে ভালো নয় কি নাট্যশালা—
আমিই অরুণ-বরুণ তোমার, ঘুম-পাওয়া তুমি আমার কিরণমালা !
আমিই হিরণ মারীচ হরিণ তুমি মরীচির মিতা হয়ে সীতা
চিরমরীচিকা শুধুই চোখের জ্বালা !
ভালো নয় এই মনোহরণের পালা ?
বলো সোনা-মেয়ে সে কি ভালোবাসা নয় !
ভালোবাসা তবে আর কোন ভাষা কয় ?
শুধু বসন্ত-বাতাসে হৃদয় খুলে সব যাদু ঢালা !
শুধু কি শিথিল উষ্ণ সলিল মনের পাতালে বয় ?

হায় কুন্তলা, এমন মোহন-চূড়ার প্রয়াস কেন বা খুলতে চাও,
কেন বাহুপাশ ভুলতে চাও
সিক্ত সিকতা পেয়ে সিঁথিরাগে পুরাতন কথা তুলতে চাও !

## প্রত্যাবর্তন

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

১

গোধূলি উড়িয়ে সন্ধ্যার হাওয়া যখন ওঠে,
নিষ্কলঙ্ক, নিত্য নভস্তলে
নক্ষত্রের প্রাক্তন কারুকার্য ফোটে,
মহাসমুদ্র চকিত বাড়বানলে,
চিরপরিচিত জগৎ অল্পে অল্পে
পরিবর্তিত মুগ্ধ চিত্রকল্পে,
তটের জনতা নৌজীবীদের গল্পে
কান পেতে থাকে অলস কৌতূহলে,
তখন অপরে ফেরে বন্দরে,
কেবল সাধের ময়ূরপঙ্খী অকূলে ছোটে ॥

২

বামে বিস্তৃত নারিকেলবীথি—বনচ্ছায়া
স্বচ্ছ বিরল গ্রামের ধবল লেপে ;
দক্ষিণে জল—শ্যাম লাবণ্যে মরীয়া মায়া,
প্রখর পিপাসা লক্ষ যোজন ব্যেপে।
নিমেষে নিমেষে গতিবেগ ক্রমতূর্ণ ;
স্থলের দর্প প্রবালপুঞ্জে চূর্ণ ;
অর্ধবৃত্ত অবশেষে পরিপূর্ণ ;
অনন্ত অপ্ ব্যোমের অবক্ষেপে।
বিশ্ব স্বাধীন : অম্বরে মীন ;
মাটির মমতামুক্ত তিমির পৃথুল কায়া ॥

৩

মধ্যে মধ্যে শুভ্রমৌলী ইন্দ্রনীলে
পীত-হরিতের অচির আভাস লাগে ;

অজানা দ্বীপের বার্তা রটায় শঙ্খচিলে ;
শৈশবে শোনা রূপকথা মনে জাগে।—
হয়তো সেখানে অশোককাননে বন্দী
বৈদেহী সাধে বিধাতারই অভিসন্ধি ;
অন্তত বায়ু চন্দনে সৌগন্ধী,
স্বর্ণলঙ্কা রম্য অস্তরাগে।
রাম-রাবণের প্রত্ন রণের
জের তাহলেও ন্যস্ত বিশ্বামিত্র খিলে ॥

৪

অসীম অমায় সহসা স্বরাট্ অনুপ্রভা :
বুঝি বা পেনাং আবার সন্নিকটে।
মন্থর তরী—তরল রজতে সীতার শোভা ;
ডাকে অদৃশ্যে অপ্সরী ছায়ানটে।
উদয়গিরির শিখরে সবুজ সূর্য
শর্বরীশেষে আকস্মিকের তূর্য ;
অবিশ্বাস্য উদ্‌ভিদে বৈদূর্য ;
অথচ কী উৎকণ্ঠা সর্ব ঘটে !
শিবি পলাতক ; গুপ্ত ঘাতক
গুল্মে গুল্মে : আতঙ্কে আদি অটবী বোবা ॥

৫

প্রতিবিম্বিত উপসাগরের শান্ত নীরে
সরল শৈল টাইফুনে অবিচল,
প্রতীক্ষ্যমাণ স্নেহে হংকং তরণী ঘিরে ;
পরিমণ্ডল আশ্রিতবৎসল।
কিন্তু তাকিয়ে দেখি সেই সঙ্কীর্ণ
উপকূলে উদ্বাস্তুরা উত্তীর্ণ ;
তারা যেন নীলকণ্ঠের উদ্‌গীর্ণ
যুগান্তরের অজীর্ণ হলাহল।



স্রোত প্রতিকূল ; চীনে দিক্‌শূল ;
তাতারহানার পুনরুদ্যোগ অন্য তীরে ॥

৬

অণুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত,
ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি :
বেতালগ্রস্ত বিকলাঙ্গের দুষ্ট ক্ষত,
পারিত্যাজ্য হিরোশিমা, নাগাসাকি।
জিত ও বিজেতা অবশ্য প্রত্যক্ষে
সুপ্রতিষ্ঠ অনুকরণীয় সখ্যে ,
প্রত্যাখ্যান তবু সংবৃত চক্ষে,
বক্ষলগ্ন প্রকোষ্ঠে নেই রাখি।
উলঙ্গ রামা-সহ য়াকোহামা ;
বিদেশী নাবিক মাতাল এবং অপরিণত ॥

৭

প্রতিদ্বন্দ্বী কোটি মৈনাক দিগ্‌বিদিকে,
নিরর্থ নাম প্রশান্ত পারাবার :
গগনে গগনে বজ্র শাসায় জনান্তিকে ;
পদান্তে প্রাগ্‌জৈবিক হাহাকার।
আচম্বিতেই দক্ষিণমুখ রুদ্র—
বরাভয়ে পুন পূর্বাশা উন্মুদ্র ;
অন্তত সান্ ফ্রান্‌সিস্কোর ক্ষুদ্র
কুলায়ে নিখিল নাস্তির প্রতিকার।
আগলায় ভাট সোনার কবাট,
প্রবেশাধিকার দেয় না বিজাতি কাণ্ডারীকে ॥

৮

অর্ণবপোত ফলত উধাও নিরুদ্দেশে :
দুহৃদ্ পুলিনে উষ্মা নিয়ত বাড়ে ;
আঁধির নৃত্য রুক্ষ নগের সন্নিবেশে ;
অনুমিত ঘুণ পৃথিবীর হাড়ে হাড়ে।

যথাকালে ক্ষয়ে যায় সে-বাম ভূখণ্ড ;
দ্বৈপসাগরে স্বতন্ত্র মানদণ্ড :
পশ্চিমে সাম্রাজ্যের মার্তণ্ড ;
মাৎস্যন্যায় প্রাচীর স্বস্তি কাড়ে।
ঊর্ধ্বশ্বাস আয়ন বাতাস ;
অতলান্তিক উঠে গণ্ডির বাহিরে হেসে॥

৯

আকাশে পাতালে উত্থান পাত একদা থামে
কুয়াশায় ঢাকা টেম্‌সের মোহানায়,
যার নেপথ্যে লণ্ডন্ অভিষিক্ত ঘামে
নায়কের পাঠ বারে বারে ভুলে যায়।
রূঢ় মার্সেই বিকট প্রায়শ্চিত্তে ;
নিঃস্ব নাপোলি অনুপার্জিত বিত্তে ;
মরণাপন্ন আথিনে কুপিত পিত্তে :
স্টেপের প্রসারে লোকালয় নিরুপায়।
আর্তে আর্তে, স্বার্থে, স্বার্থে
সংঘাত তথা বিপ্রকর্ষ মর্ত্যধামে॥

১০

স্তাম্বুল সাধে কত গম্বুজ, মিনার থেকে ;
কৃষ্ণসাগর গর্জায় উত্তরে।
সুবিধাবাদের ক্লৈব্য বাচাল দম্ভে ঢেকে,
নাতিদূরে কারা সুয়েজের ধুয়ো ধরে ?
আরবে ধর্মরাজ্য পাতার জন্যে
এডেন্ পূর্ণ য়িহুদির হৃত পণ্যে।
নৈর্ব্যক্তিক করাচির জনারণ্যে
ক্ষুধিত রক্ষ, হিন্দু, যা খুশি করে।
স্বপ্নচারিতা নিতান্ত বৃথা :
বাঁচে মাঝি, চেনা ঘাটের কাদায় নৌকা ঠেকে॥

২৩ মে ১৯৫৩

[ সিগ্‌নেট্ প্রেস্ থেকে লেখকের আশুপ্রকাশ্য কাব্যগ্রন্থ "সংবর্তে"র অন্যতম কবিতা ]





বলদেব পালিত

# বাংলা কবিতায় 'বলদেব পালিত'

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

বলদেব পালিতের জন্ম প্রবাসে-দানাপুরে। ১৮৩৫-এ জন্ম, পিতৃহীন হন ১৮৪২-এ। তন্ত্রোক্ত দেবীর ভক্ত পিতা বিশ্বনাথের সামরিক মৃত্যু হয় কাবুলের পথে। বিদ্যা-ভক্ত বলদেব বাঁকীপুরে বাল্যশিক্ষা লাভ করেন। শুধু মেধাবী ছাত্র বলেই তাঁর সুনাম নয়--বিহারে বহু বিদ্যালয় স্থাপন করে তিনি এবং তাঁর পুত্র এবং জামাতা এই উজ্জ্বল কথাটির প্রমাণ রেখে গেছেন যে বাঙালী যেখানে অন্ন-গ্রহণ করেছেন সেখানে বিদ্যা-দান করতে কার্পণ্য করেন নি।

যে যা-ই বলুন আমার মনে হয় ইংরেজি কবিতার সত্যিকারের ভোর হয়েছিল ডান-কে ( Donne ) দিয়ে। সম্ভবত তিনিই প্রথম বলেছিলেন, সমস্ত বিজ্ঞানের একটি নির্য্যাসই হ'ল কবিতা, সমস্ত ফুলের একটি মধু, মেধার আরসী আর অপ্সরীর ভাষণ। তিনি তা-ই দেখিয়েছিলেন। কিন্তু ঘোরতর বস্তুবাদে আচ্ছন্ন ইংরেজ-জাতি ব্যাপারটা তক্ষুণি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। খানিকটা দেরি হয়েছিল। দেরিতে বোঝার কুফলে কবিতা-রচনায় ফরাসী গেল এগিয়ে ; এমন কি মনের লৌহবৎ দার্ঢ্য নিয়ে জর্ম্মণরাও অদ্ভুত সাফল্য অর্জ্জন করলেন কবিতা-নির্ম্মাণে ; আর ইংরেজকে তাঁদের পর্য্যায়ে উঠে আসতে তাকিয়ে থাকতে হল টি-এস্-এলিঅটের আশায় এই শতক অবধি।

অনুরূপ একটি কাণ্ড বাংলা কবিতার ইতিহাসেও খুঁজলেই চোখে পড়ে।

আজ থেকে একশ' বছর আগে হালিসহরে হয়ত ঠিক পল্লীর সংস্কৃতি ছিলনা, জনপদটি ছিল তখনকার মতো হাল-আমলের শহর, তা-হলেও সেই জনপদবাসীদের মন ছিল পল্লীর। তা যদি না হবে তাহলে প্রবাসী বলদেব পালিতের মতো একজন পালি-সংস্কৃতির কবি

কি ভাবে সে-ভূমিসম্ভব হতে পারেন? বাংলার পাল-শূর-সেন রাজত্বে বাৎসায়ন-বর্ণিত দেব-নাগরিক সংস্কৃতি বৃহৎ বাংলাদেশে তৈরী উঠেছিল, তারই পুনঃপ্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা ছি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের। তিনি ভারতচন্দ্রের এবং রামপ্রসাদের বিদ্যা এবং দেবী-কে সমন্বি করে বাংলার সংস্কৃতির শেষ জ্যোৎস্না তৈরী করতে চেয়েছিলেন। তারই উত্তর-সাধক ছিলে চন্দন-নগরী বলদেব পালিত। কাজেই তাঁর বাল্মীকি-মনে চন্দনের গন্ধ নিয়ে কবিতা আবির্ভূ হয়েছিলেন দেখতে পাই, যে-গন্ধ পাণ্ডাদেশজাত এবং যা ইভনিং-ইন-পারী হয়ে ফরাসী বৈকালিক বুলেভারের সঙ্গীত রচনা করেছে। বাংলার বাণীশ্বরী মন্দিরেও নিখুঁত গন্ধ তা-ই-এই সত্য উনিশ শতকের বলদেব পালিতের মতো আর কেউ পালন করেছেন বলে মনে হয় ন

এবং সত্য-পালনে যে বিপদ এবং তার পালয়িতা সাহিত্যে যে বিপন্ন অবস্থার সম্মুখী হন বলদেব পালিতের জীবনেও তা এসে উপস্থিত হয়েছিল। উনিশ-শত সাময়িক-পত্রিকার অভাব ছিলনা এবং ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাকরবৎ এবং বঙ্কিমচন্দ্র তারা-রাজে সম্রাটবৎ তখন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরা কেউ বলদেব পালিতের সৎ কাব্য-সম্পর্কে উৎসু ছিলেন বলে মনে হয় না। তা যদি হতেন তাহলে তাঁর 'কাব্যমালা' বঙ্গদর্শনে 'ঘোরত দোষে দূষিত' বলে ঘোষিত হতনা। 'কোণা'-গ্রামের এই কবিটিকে এমন কোণঠাসা করব অভিপ্রায় যাঁদের ছিল, বাংলার বাগ্দেবী হয়ত ভবিষ্যতে তাঁদের ক্ষমা করবেন না, যে ভবিষ্য বাংলা-সাহিত্যে আবার একটি নূতন ভোর এনে দেবে! এলিঅটের আধা আটবীক প্রতিভ মূল উৎস থেকে হয়ত কেউ আবারও ভারতচন্দ্রের মতো বা বররুচি-কালিদাসের মতে বলদেবী কণ্ঠে বল্‌বেন, কবিতা হ'ল শতদলের নবরস: মধু-রস বনের ফুলেই থাকে—থা প্রকৃতির সরসী-নীরে, প্রভাকরের পৃষ্ঠায় বা বঙ্কিমচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তার আবির্ভাব হ পারে না। এই ডান-সুলভ উক্তির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে গেছেন উনিশ শতকে বলদে পালিত—তারপর এ-শতকের প্রথম-পাদে বলিষ্ঠ কণ্ঠে তা উচ্চারিত করেছেন প্রথম চৌধু মোহিতলাল আর কিরণধন চট্টোপাধ্যায়।—তাঁরা নিশ্চিতভাবেই অবহেলিত এবং নিজ্জি হয়েছেন। অতশত সাহিত্য-পুরস্কারের একটি কপর্দ্দকও অর্জ্জন করবার সৌভাগ্য লাভ কর পারেন নি মোহিতলাল, অথচ কল্লোল-যুগের সৎ কাব্যধারার তিনিই অবিসংবাদী ভগীরথ!

বাংলা কবিতার বিশ-শতক উনিশ-শতকের দু'ধারা ঋণভার বহন করছে—এ কথাটা কবিরা যেমন হৃদয়ঙ্গম করে থাকেন এমন আর কেউ নন। আমি জানি এখন দিগ্বিদিকে রবীন্দ্রনাথের নামে পুরস্কার-বিতরণ করতে যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদের ম এমন কেউ আছেন কি না যিনি বিশ-শতকের বাংলা-সাহিত্যের বা বাংলা-কবিত লক্ষণগুলো সম্পর্কে সচেতন। সম্ভবত সচেতন নন। তার কারণ, বিচারক-মণ্ডলী



এ-যুগের কোনো উল্লেখ-যোগ্য কবিকে দেখা ত দূরের কথা, কোন কবির অদৃশ্য স্পর্শও দেখতে পাইনি। সৎ কবিতা-পাঠকের ভূমিকা অবশ্য কবির চাইতে কোনো অংশে কম নয়, কিন্তু তেমন কবিতা-পাঠকও কি কেউ আজকের দিনে আছেন, যাঁরা অভিনবগুপ্ত বা আনন্দবর্দ্ধনের মতো প্রতিভা নিয়ে আসীন? বিচারক-মজলিসে যাঁরা বিদ্যমান তাঁদের বিচার উদ্ভট এবং নিরানন্দব্যঞ্জক।

রসতত্ত্ব-বস্তুটির পথ এমন কিছু অসি-ধারার মতো তীক্ষ্ণ নয় যা উত্তীর্ণ হতে যাদুবিদ্যার দরকার আছে। ইচ্ছা করলে যে কেউ সে-পথে বিচরণ করতে পারেন। বিচরণ করে দেখতে পারেন রস বস্তুটি সত্যি পুলক-রোমাঞ্চ স্বেদ-শিহরণ-দায়ী—ধারা তার শতই হোক বা সহস্রই হোক। তবে কোন্ ধারায় রস-স্রোতকে প্রবাহিত করাতে পারলে ভগীরথ হওয়া যায় তা-ই রসবেত্তাদের তথা রসস্রষ্ঠাদের অনুধাবনীয়।

রস-তত্ত্বের পথকে দুর্গম ভেবে যাঁরা সেদিকে অভিসারী হতে ইচ্ছুক নন, তাঁদের জন্যে সহজিয়া ধারারও কতোগুলো কথা আছে। কবিতার জন্মের কথাটা ধরুন। সব দেশেই একরকম। নিজের সঙ্গে নিজের পরিচয় যেদিন মানুষের হ'ল সেদিনই তার মনে ছন্দিত বাগ্দেবী কবিতা আবির্ভূতা। বাল্মিকীকে স্মরণ করুন। বাংলা মাত্রিক ছন্দের জন্মদাতা যাণ্মাত্রিক অনুষ্টুভ ছন্দে তাঁর বাক্যাবলী গ্রথিত হ'ল কিসের দ্যোতনায়? ব্যথা। একটা অনুভূতি, যা দিয়ে নিজের আত্মা-পুরুষের মুখোমুখি হওয়া যায়। এই ব্যথার অনুভূতিটারই নাম সহানুভূতি। পক্ষীমিথুনের প্রেমাতুর জীবনের আকস্মিক অবসান মনে যে ব্যথার সঞ্চার করল তার মারফৎ-ই তিনি সেই মুহূর্ত্তে নিজেকে সৎ পরিচয়ে চিনতে পারলেন, বুঝতে পারলেন বিশ্ব-বেদনাকে গ্রহণ ও বহন করবার বিশাল ক্ষমতা তাঁর এই ক্ষুদ্র দেহভাণ্ডে আছে। একসঙ্গে এখানে কয়েকটি ক্রিয়া সম্পাদিত হল: (১) আত্ম প্রেমের অবসান, (২) অপর একটি জীবনের প্রতি স্নেহার্দ্র আত্ম-প্রসারণ, (৩) স্নেহ-প্রবণতার উপলব্ধি (৪) উপলব্ধির ব্যঞ্জনা।

অপর জীবনের জন্যে এই যে তীব্র বেদনা-বোধ এবং তজ্জনিত বাক্যে যে কবিতার আবির্ভাব—কস্মিন কালেও তা সম্ভবপর ছিলনা যদি এই বেদনাবোধ বিচ্ছেদের উৎস থেকে প্রবাহিত না হত। অনুভূতির তীব্রতা যেম্নি চিত্তে তেম্নি ভাষায় একটা দোলা এনে দেয়। আর মানবিক জীবনে অনুভূতি তীব্র হতে পারে প্রেম, বিচ্ছেদ, ঘৃণা, মৃত্যুর পরিবাহনে। একটি জীবন থেকে দ্বিতীয় একটি জীবনের বিচ্ছেদ বা একটি জীবনের সঙ্গে দ্বিতীয় একটি জীবনের মিলনের এই দ্বৈত-লীলা—দ্বৈতের অদ্বৈত ভাব এবং অদ্বৈতের দ্বৈত পরিণতি—এ-সব শুধু পরমাণু-বাদের বৈশেষিক-কাহিনী নয়, শুধু সাংখ্যতত্ত্ব নয়। কবি-মনের সচ্চিন্তা, কবির অন্তঃকরণের সচ্চিত্র এ-ধরনের

দর্শনকে জড়িয়েই পরিবর্দ্ধিত হয়। বাংলা দেশের সৎ কবিরা এই মনোভঙ্গীরই সাধক ছিলেন। বাল্মীকিকে বুঝবার চেষ্টা যিনি-ই করেছেন, ছন্দ-সরস্বতী তাঁর প্রতিই সুপ্রসন্ন হয়ে তাঁকে কবির অলৌকিক সম্মানের আলয়ে নিয়ে গেছেন।

এ-আলোর দেশ দ্রাবিড়-ভূমি। মলয়জ চন্দনগন্ধী আবহাওয়া শুধু শীতলার স্পর্শ-পাওয়া হাওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয় সে-সাম্রাজ্যে।

বহুযুগের ওপার থেকে বিদ্যা-সুন্দরে-গ্রন্থিত-হৃদয় বাংলা দেশ বলেছে : দুঃখের গীতিই সব চাইতে মধুর। কাশ্মীরের আলঙ্কারিকরা এ-কথাটি বিশদ ভাবে বুঝিয়ে বলেছেন : দুঃখ-কে মধুর করে নিতে পারা-ই রস। সে-রস ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর। এতো তীব্র সে আনন্দ যে তার উপভোগে পুলক-রোমাঞ্চ-স্বেদ-শিহরণ আনয়ন করে। তাই কবি-দার্শনিক-উন্মত্ত একই পর্য্যায়ের বেত্তা। যুক্তিবাদে কবিতা বাদে আর সব কিছুই তৈরী হতে পারে। এ-যুগের বাংলা সাম্যবাদী কবিতা এজন্যেই কবিতা নয়। আমরা একসময় নিজেরাও সাম্যবাদী জীবন থেকে কাব্য-রস আহরণের চেষ্টা করেছি। সেখানে চেষ্টাটাই প্রকট হয়েছে, কবিতা নয়। আজ তার চাইতে অপকৃষ্ট রচনা-ও সাম্যবাদের টিকেট এঁটে কারো-কারো ঘোষণায় কবিতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তবে এ-ব্যাপারটা ৬০-সালের যুগলক্ষণ নয়, এই যা আশ্বাসের কথা।

রসের অদ্বৈত ভাবে সুখ-দুঃখের দ্বৈতভাবকে ডুবিয়ে দেবার একটি জীবন্ত আন্দোলন উনিশ-শতকের বাংলা-সাহিত্যে ছিল। বিহারীলাল এবং সুরেন্দ্র মজুমদার সে আন্দোলনের নেতা-রূপেও হয়ত পরিগণিত হবেন—কিন্তু কোন্ অপরাধে যে বলদেব পালিত (ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়-ও খানিকটা) তাঁর সুললিত কথাগুলোতে সে-যুগের শ্রুতি-বিনোদন করতে পারলেন না ভেবে অবাক হয়ে যাই। অবশ্য ঈর্ষা নামক বস্তুটি শিল্পীসম্প্রদায়ের একান্তই ঘরোয়া দেবতা কিন্তু প্রত্যেক অপলাপী যুগেও ত সৎ মানুষের আবির্ভাব হয় কিম্বা যখনই সৎ মানুষের আবির্ভাব হয় তখন অপলাপী যুগের নির্ম্মম সমালোচনা হয়। তার ইঙ্গিত ইঙ্গ-রাজ-পোষিত কোনো ডাক্তার-বদ্যির কার্য্যকলাপে ত দেখতেই পেলাম না, এমন কি সৎ-নামধারী সাম্যবাদীদের কণ্ঠেও শুনতে পেলাম না! বুঝতে পারি, কোচ-বাংলার ইতিহাস নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা ইংরেজের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল কিন্তু কুচবরণ কন্যাদের মেঘবরণ চুল কি আমাদের দেশের মুণ্ডিতমস্তক পণ্ডিতদের শিরেও এম্নি বজ্রাঘাত করল যাতে তাঁরা আর তাঁদের খোঁজ করতে চাইলেন না? হবেও বা। শোনা যায় ভাণ্ডারকর পালিভাষার বিশুদ্ধির জন্যে একটি পরিষদ খুলে গেছেন। তবে এই যা রক্ষা, বাংলাদেশের শিশুমন মেঘ-বরণ-চুলের স্বপ্ন নিয়ে যুগে যুগে ঘুমোয় এবং যুগান্তে জাগে। তারুণ্যের সঙ্গে-সঙ্গেই তারা বোদলেয়ারের মতো বলতে



পারে : "Let me wave it in my hand like a scented handkerchief to fill the air with memories." কিম্বা প্রেমাহত হয়ে ডানের মতো সোয়ান-সঙ্ সুরু করতেপারেন এই বলে : "That subtle wreath of hair which crowns my arm"। বলদেব পালিতের কৈশোর-যৌবন, মনে হয়, এম্নি চুলের স্বপ্নে বিভোর। ডানের ডানা-র চুল আমরা বলদেবের বাহুতেও দেখতে পাব। তিনি কি সে-চুল ফেলে দিতে পারেন যা তাঁর নায়িকা স্মৃতির কৌটোয় তাঁর হাতে উপহার দিয়েছিলেন?—

"এ মম কুন্তল হতে—সর্ব্বদা যাহারে
বলিতে কামের ফাঁদ সহাস্য বদনে—
লও এ অলক প্রিয়, দিতেছি তোমারে,
পিরীতির চিহ্ন বলি রাখিও যতনে।"

আত্ম-রতি যখন দু'টি সত্তায় বিস্তৃত—যখন 'আমি'-নামক বিষয়টি 'আমি নয়—অন্য কেউ'-নামক একটি বিষয়কে আত্ম-প্রীতির আরেকটি ভাণ্ডার বলে চিনে নিতে পারে—তখনই 'দ্বৈতবোধ', 'তুমি' এবং 'প্রেম'-এর আবির্ভাব হয়। এ-প্রেম সৎ দর্শনে। এবং বিস্তৃততম বিকাশ এর বিশ্বরূপ-দর্শনে। যে শিল্পী নিজেকে চেনেন না, নিজেকে ভালোবাসতে পারেন না, তাঁর পক্ষে নায়িকা-কে ভালোবাসা মুস্কিলের ব্যাপার—বিশ্বকে ভালোবাসা ত দূরের কথা! পৃথিবীর ইতিহাসে ক'জন রবীন্দ্রনাথ আছেন? ক'জন কবি হংসবৎ পূর্ব্বগামী শতকের দুগ্ধ থেকে ক্ষীরটুকু তুলে নিয়ে নিজের যুগকে তা বিতরণ করে দিয়ে যান? আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথকে না পেলে বলদেব পালিতের খবর যতোটুকু পাওয়া গেছে তা-ও আর পাওয়া যেতোনা।

আজ আমার ধারণা, বলদেব পালিতের কাব্যধারা বাংলা কবিতার স্রোতে অন্তঃশীল। তাকে উপরে উঠে আসতে হলে একটি অগ্ন্যুৎপাতের দরকার। কল্লোল-যুগে নজরুল আমাদের খানিকটা ভূমিকম্প দান করে গেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র মৃত্তিকার চৌচির অবস্থা চাক্ষুষ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ সেই ভূমিকম্প থেকে খানিকটা প্রসাদ লাভ করে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে মানুষের ইতিহাসের একটি নির্য্যাস হ'ল কবিতা। অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু সে-ইতিহাসের নির্য্যাস তিনি সেল্টিক পরীরাজ্য পরিক্রমণ করে আহরণ করেছেন। এই ক্লান্তিকর পর্য্যটনের অত্যধিক প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করতে পারিনে। কেননা, বাংলার ছেলেরা পরীর কোলেরই রাজপুত্র। স্বপ্নের অভাব নেই তাদের—অবশ্য মরীচিকা দেখবার সুযোগ তাদের অনুপস্থিত। কিন্তু মরুশিখা বা মরীচিকাও আমাদের অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিবেষণ করেছিলেন যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তা-ও কল্লোল-যুগে। তবে যুগটি তার প্রচারিত ধর্ম্মকে একটি দর্শন-প্রস্থানের স্থায়ী রূপ দিতে পারেনি বলেই অসার। এ রূপ এসেছিল প্রমথ

চৌধুরীর পর সুধীন্দ্রনাথের 'পরিচয়ে'। জীবনকে মুক্তির স্বাদ দিতে হলে জীবনের প্রতি মাত্রায় বন্ধন-মোচনের দরকার। যেম্নি সুধীন্দ্রনাথের দিদৃক্ষু সম্পাদকতা তেম্নি তাঁর ধীমতী কবিতা এই ব্যাপক মুক্তিরই ইঙ্গিত-বাহী। পরিচয়-সভার সভ্য না হয়েও বাইরে এ-ধরণের কবি অনেকেই ছিলেন, যেমন অন্নদাশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ বন্ধনে মুক্তির স্বাদ বলে যে জীবনাদর্শ মনোনীত করেছিলেন তা-ই বাংলার, 'বলদেবে'র, 'পরিচয়ে'র সংস্কৃতি। পরিচয়ের তিরোধান হয়েছে। যা আজ পুনরুত্থিত তা বলরাম নয়, মাতৃহন্তা পরশুরাম। এই পরশুরামের অনুচর কম নয়। তবু মনে হয়, বলরাম জগন্নাথ-সুভদ্রাকে নিয়ে আবার শূরসেনের রাজ্যে ফিরে আসবেন।

দেখতে পাচ্ছি, প্রভাতের আগে কাক উড়ছে। একটি একশ' টাকার তোড়া জীবনানন্দ দাশের হাতে দান করে তাঁর কাব্য-কৃতির নগদ-বিদায় দেওয়া হ'ল সেদিন। টাকার সংখ্যার দিকে তাকিয়ে বলতে বাধ্য হলাম যে প্রভাতের আগেই অন্ধকার গভীরতম হয়। এখানে আমি অন্ধকার বিবেকের পরিচয় পাচ্ছি। এতে উন্নাসিকের ঘৃণার গন্ধ না পেয়েও এমন একটা অবিবেচকের হাতের স্পর্শ দেখতে পাচ্ছি যাতে আমাকে এ-মন্তব্য করতে হ'ল। সুবুদ্ধি আমাদের মাথায় প্রবেশ করেও অন্তরস্থ হতে চায় না, শালীন হতে পারেনা, এই যা দুঃখ!

যাক আধুনিকতার প্রসঙ্গ। বলদেব পালিতের পৌরাণিক ব্যাপারেই আবার ফিরে আসা যাক। আমি এঁর কবিতা প্রথম দেখতে পাই শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র-সম্পাদিত 'প্রেম যুগে যুগে' গ্রন্থে। শুধু দেখতে পাওয়া নয়—বুঝতে পারি যে ভাওয়াল-কবিকেও কেন এমন বাতিল করা হয়েছিল। ভারতচন্দ্র-ও এতোটা খোলা-মেলা দুঃসাহসিক বস্তুবাদী ছিলেন না! আমার মনে বলদেবের রচনার প্রথম প্রতিক্রিয়া এই। তারপর আমি এঁর একটি কাব্যসঙ্কলন গ্রন্থ উপহার পেয়েছি জনৈক কাব্য-সংগ্রহয়িতার হাত থেকে, যিনি বলদেব পালিতের মতোই অখ্যাত। এই খণ্ডিত সঙ্কলন থেকেও দেখতে পাচ্ছি বলদেব খাঁটি মীমাংসাকার যোগী—সত্যি শিব-শক্তির সন্তান বলরাম, সৎ-ধর্ম্মের পালক—মানব বলরাম, মানবীকে দেবীর মতো পূজো করবার পন্থা যেদেশে ছিল তেমন গৌর-বাংলার সন্তান তিনি। এ ঠিক নাথ-পন্থা নয়, তান্ত্রিকতাও নয়, শৈব বা বৌদ্ধ ভাব নয়—খাঁটি বৈষ্ণব ভগবদ্ভাব। এঁদের আমরা পাল-সেন যুগে বজ্রযানী বলে চিনেছি—বৌদ্ধ বলেছি। কিন্তু এঁরা খাঁটি হিন্দুভগবৎ। শ্রীমদ্ভাগবতে এঁদেরই কথা লিপিবদ্ধ। এ মানব-ধর্ম্ম স্বয়ংভূ এবং বৈবস্বৎ মনুর দান। মানব-ধর্ম্মই মালব-ধর্ম্ম হয়ে ভর্তৃহরি ( বলদেব যাঁর ভক্ত ) এবং বররুচি ( ভারতচন্দ্র যাঁর ভক্ত ) তৈরী করেছে আসাম-বাংলার কিরাত-শিব সমুদ্রগুপ্তের ( যিনি বাংলার সঙ্গীত প্রণেতা ) মারফৎ। এ আদিত্যরা ছিলেন বিক্রমপুরবাসী। খাঁটি মানুষের সত্য কথা ধর্ম্মবাত্যাহত উনিশ-শতকের মেকী বাংলা গ্রহণ করতে পারেনি। একসময় বঙ্কিমচন্দ্র এই বস্তুটিকে বিষবৃক্ষ



হিসেবে লালন করেছিলেন মাত্র। লালন করলে ছেদন করা যায়না বলেই তিনি নিজের বিষবৃক্ষটির শ্রাদ্ধ সমাপন করে রেখে গেছেন শেষ পংক্তিটি রচনা করে। বঙ্কিমচন্দ্র অনিন্দ্য হতে চাইলেন, একটু বেঁকে গেলেন, ভাগবদ্গীতার শরণ নিয়ে। পুরুষ কি করে প্রকৃতিকে পায়, পুরুষকার কি করে নিয়তির সঙ্গে লড়াই করে জেতে বা হারে, দ্বৈতবাদের তেমন নিন্দার কথা বঙ্কিমচন্দ্র তদানীন্তন সমাজে বসে ভাবতে চাননি একটি অদ্বৈত সাম্রাজ্যের লোভে। ভেবেছেন কোণঠাসা বলদেব পালিত। ভেবে সেই চিরদিনের অথচ চির-প্রাচীন তত্ত্বটি ফরাসী নির্ভীকতায় নিবেদন করে গেছেন নিরবধি কালের মন্দিরে। কবিতার দর্শন বলে যদি কোনো বিষয়কে আমরা স্বীকার করে নিই—তাহলে কপিলের 'সাংখ্য' বা বৃহস্পতির বস্তুবাদ ছাড়া আর কিছুই স্বীকৃত হতে পারে না। অন্তত আমি গত দশবছর যাবৎ কপিল-কুমারিল গঠিত বিশ্বব্যাপারকে কবিতার উপজীব্য হিসেবে পেলেই খুশী হয়ে উঠি—ব্যাপারটি তন্ত্রেও প্রবেশ করেছিল—'ষট্চক্রনিরূপণ'-গ্রন্থটি তারই নিদর্শন। আমি বল্‌ব, বলদেব পালিত আমাতে তাঁর একজন শ্রদ্ধাবান শ্রোতা পেয়েছেন।

ভারতীয় বস্তুবাদের একটি সুশ্রী রূপই এ-তত্ত্বে নিহিত। মার্ক্স-চার্ব্বাক চর্ব্বণ না করেও এই রসাস্বাদ পাওয়া যায়। কাশ্মীরী কাব্যালঙ্কারশাস্ত্র এই দর্শন জাত। বঙ্কিমচন্দ্র সুদর্শনই দেখলেন—তিষ্যরক্ষিতার নমুনায় বিষবৃক্ষটিতে বিষ-প্রয়োগ করলেন—শুধু দেখতে পেলেন না যাদব বলরামের কৃষি-সভ্যতার হলটি—জনৈক জনকের হাত থেকে শূরসেনে এবং শূরসেন থেকে ফিরে আবার বাংলার আদিশূর বংশে, সুহ্মে, সুর্ম্মা-উপত্যকায় এসে ঠাঁই নিয়ে যা পঞ্চগৌর তৈরী করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কেন, এ-যুগের ভাষাছন্দসংস্কৃতবিদ্‌রাও কি বলরামদের দেখতে পেলেন বাংলার মাটিতে? তা যদি পেতেন তাহলে তাঁদেরই প্রামাণিক মনে করে আজ বিহার-বাসী খাঁটি কোচবিহারকে কি করে দাবী করেন? কি করে তাঁরা বলেন, বাংলা ভাষার জন্মস্থান বাংলায় নয়, মিথিলায়? মিথিলাটা কার বশ ছিল? শশাঙ্কের, মহীপালের গৌর গৌড় সেনার বশ, যাঁরা একদিন কামরূপের হটকাসুর থেকে টার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাহুত লিপিগুলো আজও মুছে যায়নি এবং মূর্ত্তিসহ লিপিগুলো এখনও কলকাতায়ই আছে। ২৬৫ সংখ্যক মূর্ত্তির ব্রাহ্মীলিপিগুলো পাঠ করে তার ইতিহাস উদ্ধার করতে আমরা শ্রদ্ধের সুনীতি চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করি। অনুরোধ জানাই ব্রাহ্মীলিপি পাঠ করে রাজা মিনাণ্ডারকে 'দিষ্'-রাজ মহাভোজ বলে চিনতে। মিলিন্দু-মুদ্রায় তিনি দেখতে পাবেন ব্রাহ্মী কি করে বাংলা লিপি হয়ে 'বৎসরাজ' কথাটি প্রণয়ন করছে। কলকাতার ভাষা-সাহিত্যবিদ রাজকর্ম্মচারীরাও উক্ত মুদ্রা-লিপিপাঠ করে দেখতে পারেন।

আমাদের ইতিহাস-বোধ যদি টোয়েনবী জাগিয়ে দেন এবং কাব্য-বোধ টি-এস-এলিঅট, তাহলে স্বাধীনতার নাম ইংরেজের পরোক্ষ দাসত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। চিত্ত-

নাশক এই দাসত্ব থেকে অতি দ্রুত আমাদের মুক্তি পাওয়া দরকার। তারজন্যে যদি পূর্বিসূরীদের পেলন দিয়ে কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বিদায় করা হয় তাহলে তাকে আমি সত্যিকারের সুপ্রভাতের ইঙ্গিত বলে মনে করব। অবশ্য এ-কথায় আমি অরণ্য-জীবনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে অট্টালিকা-বাসকে উপহাসাস্পদ করতে ইচ্ছুক নই—আমি বলতে চাই, শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত 'অট্টালে' আমরা বাস করব—অতিথি-শালা থাকবে তাতে, থাকবে অন্নপূর্ণার অন্নসত্র, থাকবে নৃত্যপরা লিচ্ছবীরা। বিষপূর্ণ অহিচ্ছত্রের পক্ষপাতী আমি নই। এ-ব্যাপারে আমি সমতটের ছন্দ-প্রিয়, ঋগ্বেদী সমুদ্রগুপ্তের সমগোত্র।

আমি যে ধরনের কবিতার কথা বলছি তার পরিচিত নাম উন্মার্গ বা রোমান্টিক। আত্মরতি বলে এর একটি দুর্ণামও হতে পারে। নাম-দুর্ণাম দিয়ে কি হবে, আসল কথা ত সৃষ্টি। ভাষার মারফৎ এবং মনের ক্ষমতায় আমাকে ত কিছু সৃষ্টি করতে হবে—তবেই আমি হতে পারব শিল্পী। কবি সেই মহৎ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। যে-কোনো দায়িত্ব গ্রহণেই সুনাম-দুর্ণাম দুই-ই আছে। এই দ্বৈতবাদের দুধারা অসি রাষ্ট্রের বা প্রেমের দুয়ারে যেম্নি ঝুলছে বাংলা-কাব্যের মাথায় ঠিক তা তেম্নি রূপে বিদ্যমান। বাংলাকাব্যের শিরোভূষণ বিদ্যার জন্যে প্রেম।

বলদেব পালিত আমাদের অপলাপী ধর্ম্মধন্ধ যুগে 'ডোরিআনগ্রে'র ছবি দেখিয়ে ডোরিআনগ্রের দুর্ভাগ্য শিল্পীর মতোই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। ইংলণ্ডের বিশ-শতকীয় প্রভাতে ইংরেজি সাহিত্যের নূতন বায়রণ সেই ডোরিক প্রাণের মৃত্যু হয়। বিক্রমাদিত্যের সভার শেষ কবি বলদেব পালিত তেম্নি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জানুআরি বাংলাদেশের নূতন প্রভাতের দুর্গ দ্বারে হয়ত তাঁর বীর পিতার মতোই পতিত হন! ওয়াইল্ডের আরণ্যক রীতি বিশ-শতকীয় য়ুরোপের রাষ্ট্রপুরুষ কিম্বা শিল্পপুরুষরা গ্রহণ করে এ-কথাই প্রমাণ করেছেন যে তেমন বর্ণই শিল্পে অমর। বাংলাদেশ-ও বলদেবের নীরব বিদ্রোহকে উপেক্ষা করে থাকেনি —বাঙালীর মন-প্রাণ বিশ-শতকের সুরুতেই উদ্বেলিত উচ্ছ্রিত হয়ে দিকে দিকে নূতন সৃষ্টির প্রেরণা এনে দিয়েছে। বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমরা যোগসূত্র হারাইনি—যেম্নি একদিকে দীপ্তিমান অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথের দরুণ, তেম্নি অন্য দিকে বলদেব পালিতের ক্ষুদ্র প্রদীপের ক্ষুদে একটি পলতের কৃপায়। তা তাঁর 'কাব্যমালা' গ্রন্থটি, যা 'প্রিয়তমা শ্রীমতী···র প্রতি' নিবেদিত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়ে ৪৮টি কবিতা একবছর পর প্রকাশিত হয়েছিল—কারণ সাহিত্য সম্রাটের অনুমোদন লাভে তা সমর্থ হয়নি। পবিত্রতা-বোধ যখন বাতিকের পর্য্যায়ে গিয়ে পৌঁছয় তখন সীতা-নির্ব্বাসনের মতো গুরুতর অপরাধেও সমাজকে লিপ্ত হতে হয়—'কাব্যমালা'-ত একটি সীতাহার মাত্র! ওকে গঙ্গার



জলে ছুঁড়ে ফেলে দিলেই হ'ল—কাক পক্ষীটি পর্য্যন্ত সে-খবর পাবে না। 'কাব্যমালা' নিয়ে অনুরূপ একটি ঘটনা নিশ্চয়ই হয়েছিল। 'বলদেব পালিত'-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস অনুসন্ধান করলে এ-মন্তব্যের সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারবেন আশা করি।

অলম্ অতিবিস্তারেণ। উপস্থিত বলদেব পালিতের কাব্যমালার কয়েকটি হীরকদ্যুতি প্রত্যক্ষ করুন—

"ভুজে তুমি অধীনেরে বাঁধ যে সময়
তব বক্ষোধাম যেন স্বর্গ বোধ হয়
সে বন্ধন গতে হয় যে ভাব-সঞ্চার
তারেই ত মুক্তি বলি, মুক্তি কিবা আর।"

সেদিনের দ্বিধান্বিতা বাংলা ভাষা নিয়ে এর চাইতে ভালো ভাবে 'সুন্দরে'র মন কি আর কেউ প্রকাশ করতে পারতেন? আমাদের বররুচির পর অবশ্য ডান তা করেছিলেন—যেমন—

*"I touch her, like my beads, with devout care,*
*And come unto my courtship as my prayer.*

ডানের এই সারল্য, ভাষার ও মনের নিগূঢ় সারল্য বলদেবের ছিল। নায়ক বলদেব যদি ডান হয়ে বলতেন :

*"I love another as well as ye"*

তখন বলদেবের নায়িকা আমাদের মিশ্রিত মধুপর্ক বাংলা ভাষায় বলতে পারতেন :

"তোমার যেমন, পররসে মন;
কোথা কে এমন দেখেছে কবে?
যদি ও প্রকার ঘটিত আমার
মনেতে তোমার কি হতো তবে?"

কে বলবে—অ্যাণ্টনি ফিরিঙ্গি হয়ত এ-মধুপর্ক পান করেই নিজের ভাষা ত্যাগ করেছিলেন! ডান যখন বলেন :

*"Her kisses are*
*Soft as a snow-tuft in the dewless cup*
*Of a redoubled rose....."*

তখন-ও বলদেব পেছিয়ে থাকেন না—তাঁরও তখন চুম্বনের স্মৃতিতে 'গোলাবে'র কথা মনে হয়—কিন্তু তা কুঁড়ি। তবু

"তাহার চুম্বনে কলি প্রীতি পেয়ে অতি
হৃদয় খুলিয়া গন্ধ দেয় হৃষ্ট-মতি
অধরেতে ধরে আরো গাঢ়তর রাগ।"

'কাব্যমালা'-থেকে হীরা-পান্না চয়ন করতে গেলে এক সময় হয়ত 'আর না' বলে থেমে পড়তে হবে, তাই এখানে চয়নের উপসংহার রচনা করে তাঁর 'নারীর প্রেম' কবিতাটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি সংযোজিত করছি :

নারীর প্রেম

এক দিন অস্তগামী দিবাকর-করে,
স্নানান্তে বসিয়া কোনো সরসীর ধারে
দেখিলাম এক নারী, নম্র কুচ ভারে
ভাঙ্গিল মৃণাল এক মৃণালিনী-করে ;
জলে তারে পুনরায় ডুবায়ে সাদরে
সোপানে বসিয়া ধনী, স্বেচ্ছা অনুসারে
লিখিল একটি কথা দেখায়ে আমারে ;
'যাক প্রাণ তবু প্রেম থাকুক অন্তরে।'
সে লেখা পড়িয়া তার রূপ-রত্নাকরে
মগ্ন হয়ে, তারে আমি সঁপিলাম মন ;
কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! তারি দুদিনের পরে
আমারে ত্যজিয়া বালা করিল গমন ;
উভয় সমান জ্ঞান হইল তখন,
নারীর পিরীতি আর বারির লিখন।

এর চাইতে চৌদ্দ-অক্ষরে ভালো পয়ার সনেটের বন্ধনে উনিশ-শতকে যেম্নি আর কেউ আনতে পারেন নি, তেমনি বিদগ্ধ ও বাঙ্ময় উনিশ-শতকীয় বিশ্বের দ্বৈত সৎ রূপ-ও তখন আর কোনো ভারতীয় কবি 'নগ্নহৃদয়' বোদলেয়ারের নির্ম্মমতায় এম্নি উদ্ভাসিত করে তুলতে প্রবৃত্ত হননি। বাংলাদেশের উনিশ শতকের তৃতীয় পাদে সাহিত্যে-শিল্পে যতোটুকু বিদ্রোহ দেখা গিয়েছিল, বলা যায়, তার হোতা এবং উদ্গাতা ছিলেন বলদেব পালিত। জানিনে তিনি গৌরের দেশের প্রবাসী ও প্রভাসী প্রাণ কি না—তবে এ-জানার বাইরে থেকেও বিশ-শতকীয় বাঙালা কবিদের চিত্তে তিনি যে দোলা দিয়েছেন—তা ঝুলনের দোলা—যা একদিন রাস ডেকে এনে পরকিয়া-লাভের গলায় ফাঁস দিতে চেয়েছে মহাপ্রভুর ও ব্রাউনিঙের মন নিয়ে। সব যুগেই তা-ই হয়। কুরুক্ষেত্রের মহামারী অন্তে বলরাম জেগে ওঠেন ভ্রমণের জন্যে—পর্য্যটনের জন্যে আসেন মহাবীর বর্দ্ধমানের মতো এবং ডানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন :

*"I kissed and bade my love good bye."*

তবু শিল্পীসত্তা নায়িকার কণ্ঠ শুনতে পায় :

"সে গেল চলিয়া কেন গেলনা জীবন ?"

# শিল্পী

**জেমস্ জয়স্**

অনুবাদ : **অশোক গুহ**

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর ]

ছুটিতে বাড়ি-যাওয়া ! উঃ কি চমৎকার ! সঙ্গীরা তো তাই বলে। শীতের ভোরে প্রাসাদের দরজায় গাড়িতে চড়ে বসলে, কাঁকরের উপর দিয়ে চলছে গাড়ি। অধ্যক্ষকে জানাচ্ছ বিদায়-সম্ভাষণ।

হুর্‌রে ! হুর্‌রে ! হুর্‌রে !

উপাসনা মন্দিরের পাশ দিয়ে চলেছে গাড়ি, সবাই টুপী তুলছে। গ্রাম্যপথে চলছে গাড়ি। আর খুশি তারা। গাড়োয়ান চাবুক তুলে দেখিয়ে দিচ্ছে ঃ ঐ যে বোডেনস্‌টাউন। সবার মুখে আনন্দের ধ্বনি। একটা খামারবাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল গাড়ি, আমুদে চাষী জলির খামার—অমনি হর্ষধ্বনি···হর্ষধ্বনির পর হর্ষধ্বনি। ক্লেনের ভিতর দিয়ে চলেছে—হর্ষধ্বনির বিরাম নেই। চাষী-বৌরা নীচু দরজায় দাঁড়িয়ে, পুরুষরা এখানে ওখানে। শীতের হাওয়ায় সুন্দর গন্ধ ঃ এ ক্লেনের গন্ধ—বৃষ্টি আর শীতের হাওয়া আর প্রান্তরের ঘাসের গন্ধ। তার সঙ্গে মিশে আছে বুঝি পোষাকের গন্ধ।

ট্রেন ভরতি—এক····দীর্ঘ···দীর্ঘ চকোলেট-রঙা গাড়ি। সরের মুখপাত দেওয়া যেন। গার্ডরা এদিক ওদিক ঘুরছে, দরজা খুলছে বন্ধ করছে, চাবী দিচ্ছে, চাবী খুলছে। ওদের পরণে ঘন নীল আর রূপালি পোষাক। রুপালি বাঁশী আছে ওদের, চাবীর থোলোয় ঝঙ্কার ওঠে ঃ ঝন, ঝন, ঝন !

গাড়ি ছুটে চলেছে প্রান্তরের উপর দিয়ে ; অ্যালেন পাহাড় ছেড়ে এল। টেলিগ্রাফের খামগুলো সরে যাচ্ছে ঃ সরে সরে যাচ্ছে, গাড়ি ছুটছে আর ছুটছে। ও যেন জানে। বাড়ির হলে ঝুলানো হয়েছে লণ্ঠন, সবুজ পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে···ও যেন জানে—হোলি আর আইভিলতা সবুজ আর লালে মিশে জড়িয়ে ধরেছে ঝাড়লণ্ঠনগুলি। হোলি আর আইভি। লাল হোলি ঃ সবুজ আইভি। তার জন্যে হোলী আর আইভি আর বড়দিনের জন্যে।

কি সুন্দর !···

সবাই। ষ্টিফেন, এস, এস ! স্বাগত-সম্ভাষণ-তারই হৈচৈ। মা চুমু খেলেন। ঠিক করলেন কি মা ? বাবা এখন মার্শাল হয়েছেন, হাকিমের থেকে ঢের ঢের বড় !

ষ্টিফেন, এস, এস—ঘরের ছেলে ঘরে এস !

হৈচৈ ··

লোহার শিকের উপর দিয়ে পর্দার আঙটা সরিয়ে নেওয়ার শব্দ, জল বেসিনে পড়ছে ছলছল করে। উঠছে, পোষাক পরছে, বোর্ডিঙে মুখ-হাত ধুচ্ছে ঃ ম্লান আলো এসে পড়লো। হলদে মশারি এখন গোটানো, এলোমেলো বিছানা। তার বিছানা খুব গরম, মুখ আর গা-ও খুব গরম। উঠে পড়ে বিছানার এক ধারে বসলো। দুর্বল লাগছে। মোজা পরতে চেষ্টা করছে, বিশ্রী, রুক্ষ অনুভূতি। সূর্যের আলো অদ্ভুত আর মিউনো।

ফ্লেমিং বললে,

শরীর ভাল নেই নাকি ?

কে জানে !

ফ্লেমিং বললে,

আবার শুয়ে পড়। ম্যাকগ্লেডকে বলবখন, তোমার অসুখ করেছে।

অসুখ করেছে তার

কার ?

ম্যাকগ্লেডকে বলব

আবার শুয়ে পড়

তার কি অসুখ !

একজন ধরলে তার হাত, সে মোজা খুলে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। গরম বিছানা।

চাদরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে, তার ঈষদুষ্ণতায় ভাল লাগছে। ওরা প্রার্থনায় যাবে, পোষাক পরছে আর বলছে তার কথা। ওকে খানায় ফেলা ঠিক হয় নি, কাঁধে করে ছুঁড়ে ফেলা খুব খারাপ কাজই হয়েছে, বলাবলি করছে ওরা।

স্বরের বিরতি। ওরা চলে গেছে।

বিছানা থেকে ঝরে পড়ছে স্বর ঃ

ডেডালাস, গোয়েন্দাগিরি কোরো না। নিশ্চয়ই করবেনা তুমি ?

ওয়েলস্-এর মুখ। সে তাকালে, ওয়েলস্ ভয় পেয়েছে।

আমি তো আর করব বলে করিনি। সত্যি তুমি বলবে না তো ?

বাবা বলেছিলেন, আর যা-ই করুক, গোয়েন্দাগিরি যেন সে না করে। সে মাথা নেড়ে বলেছিল, না। খুশিই হয়ে উঠেছিল।

ওয়েলস্ বললে,

তিন সত্যি ! করব বলে করিনি। আমার এখন দুঃখ হচ্ছে



মুখখানা আর স্বর মিলিয়ে গেল। ভয় পেয়েছে বলেই ওর দুঃখ। আর ও ভয় পাচ্ছে-অসুখের, কিছু একটা অসুখ হয়েছেই। স্যাঙ্কার উদ্ভিদের রোগ, ক্যান্সার জীবদের—একি আলাদা রোগ ? বহুদিন আগের কথা। খেলার মাঠে সন্ধ্যার আলো-আঁধার নেমে এল, আস্তে আস্তে সে এল তার কাছে—তার লাইনে···গুঁড়ি মেরে মেরে এল একটা বড় পাখী উড়ে গেল নীচ দিয়ে। ধূসর, আবছা আলোয় লিষ্টার য়্যাবিতে জ্বলে উঠলো আলো। উলসী মারা গেলেন। মঠের সন্ন্যাসীরা তাকে কবর দিলেন।

ওয়েলস্-এর মুখ নয়। সুপার। কিন্তু সে তো ভান করেছেনা। না, না, সত্যিই তার অসুখ। ভান করছেনা। সুপারের হাত তার কপালে—ঠাণ্ডা ঘর্মাক্ত হাতের স্পর্শ সে অনুভব করছে গরম ঘর্মাক্ত কপালে। একটা ইঁদুরের অনুভূতি—পাঁক স্যাঁতস্যাঁতানি আর ঠাণ্ডা। ইঁদুরের দুটো চোখ, চেয়ে থাকে দুচোখ দিয়ে। গায়ে ছোট ছোট লোম, খুদে পা গুটিয়ে ঝাঁপ খাবে বলে তৈরি। কালো চোখ। ওরা ঝাঁপ খেতে জানে—জানে না ত্রিকোণমিতি। যখন মরে, একপাশে ফিরে মরে যায়। তখন ভিজে গা শুকিয়ে যায়। ওরা তখন মরা··· মরা ইঁদুর।

আবার এসেছেন সুপার, সে বলছেন ওকে উঠতে হবে। অধ্যক্ষ বলেছেন, উঠে পোষাক পরে যেতে হবে হাসপাতালে। পোষাক পরতে লাগলো সে, সুপার আবার বললেন, ব্রাদার মাইকেলের ওখানে আমরা যাব কারণ আমাদের পেট মোচড় দিচ্ছে।

বলেছেন ভাল। হাসি পেল ওর কথা শুনে। কিন্তু হাসতে পারছেনা, ঠোঁট কাঁপছে শীতে—।···নিজেই হেসে উঠলেন তিনি।

চল—চল ! খড়ের পা জোর কদমে চালাও !

সিঁড়ি বেয়ে নীচে এল দুজনে, বারান্দা দিয়ে, স্নানের ঘরের পাশ কাটিয়ে দরজা। দরজা দিয়ে যেতে যেতে সে কেঁপে উঠলো। ঘাসরঙা সবজে জল খানায়, সেঁতসেঁতে হাওয়া, লাফিয়ে পড়া ঃ তোয়ালের গন্ধ ; যেন ওষুধেরই গন্ধ।

ব্রাদার মাইকেল হাসপাতালের দুয়ারে দাঁড়িয়ে, তাঁর ডানদিক ঘেঁষে আলমারী—সেখান থেকে আসছে বুঝি ওষুধের গন্ধ। না, তাকের বোতল থেকেই আসছে। সুপার ব্রাদার মাইকেলকে কি বললেন, মাইকেল জবাব দিলেন। লাল চুল তার, তারই মাঝে মাঝে পাকার মিশেল ; অদ্ভুত মুখখানা। আরো অদ্ভুত উনি ব্রাদারই আছেন, থাকবেনও—ওকে মহাশয় বলা যাবে না।

দুটি বিছানা ঘরে ; একখানা বিছানায় আর একজন। তারা ভিতরে এসে ঢুকতেই সে হাঁক ছাড়লে ঃ

আরে ! এই যে বাচ্চা ডেডালাস ! কি হোল তোমার ?

আর কি হবে, ব্রাদার বললেন।

ব্যাকরণের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র সে। ষ্টিফেন পোষাক ছাড়ছে, এরই মধ্যে সে ব্রাদার মাইকেলকে মাখন-দেওয়া তোস্‌রুটি এনে দিতে বললে।

দিন না।

ও তোমাকে তোস্ দিয়ে খুশ্ করে দেব তো! ব্রাদার মাইকেল বললেন, কালই তো ভোরে ডাক্তার এলে তুমি উঠে বেড়াবার হুকুম পাবে।

ছেলেটি বললে, তাই নাকি! কিন্তু আমি তো এখনো ভাল হইনি।

ব্রাদার মাইকেল আবার বললেন,

ওঠার ছাড়পত্র তো মিলবে।

আগুনটা খুঁচিয়ে দেবার জন্য নুয়ে পড়েছেন। মস্তপিঠ ঠিক ট্রামে জোতা ঘোড়ার মতো না-ট্রাম-ঘোড়ার মতো? শিকলটা দিয়ে গম্ভীরভাবে খোঁচাচ্ছেন আর ঐ ব্যাকরণের ছাত্রের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছেন।

এবার ব্রাদার মাইকেল চলে গেলেন, ব্যাকরণের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র দেয়ালের দিকে ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো।

হাঁসপাতাল। তাহলে অসুখ করেছে তার, বাবা-মাকে কি ওরা খপর দিয়েছে? একজন তাঁদের কাছে চলে গেলেই তো ভাল হোত।

সে লোকের মারফৎ চিঠি দেবে নাকি?

মা মণি আমার,

আমার অসুখ, বাড়ি আসতে চাই। তুমি এসে নিয়ে যাওনা। আমি হাসপাতালে।

তোমার স্নেহের

ষ্টিফেন

কতদূরে!—তাঁরা কতদূরে! ঠাণ্ডা আলো ছড়াচ্ছে সূর্য জানালার বাইরে। সে যদি মরে যায় কি হবে! এমন আলোয় আলো দিনে তুমি মরতেও পার। মা আমার আগেই যদি মরে যায়। উপাসনা-মন্দিরে ওর আত্মার জন্যে প্রার্থনা করবে—অমনি প্রার্থনা হয়েছিল খুদে ছেলেটির জন্যে—ও শুনেছে সে-কথা। সবাই যাবে প্রার্থনায়, কালো পোষাক পরে, মুখে বিষণ্ণতা টেনে আনবে। ওয়েলসও যাবে, কিন্তু কেউ তার দিকে ফিরেও তাকাবে না। অধ্যক্ষ আসবেন কালো জোব্বা পরে, তাতে সোনালি পাড়, হলদে মোমবাতি জ্বলবে বেদীর উপরে, কফিন ঘিরে। কফিন এবার ওরা গীর্জা থেকে আস্তে আস্তে নিয়ে যাবে খুদে গোরস্থানে—সেই যে যেখানে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে লাইম



গাছ। সেই লাইম য়্যাভিনিউতে—সড়কে। ওয়েলসও দুঃখ করবে তার এই কাজের জন্যে। ধীরে ধীরে বাজবে শোকসূচক ঘণ্টা।

ঘণ্টার ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। ব্রিগিড শিখিয়েছিল একটা গান: সে আওড়ালে।

ঢং ঢং ঘণ্টা বাজলো
মাগো আমায় দাও বিদায়।
পুরানো গীর্জায় আমাকে কবর দিও
আমার বড় ভায়ের পাশে।
আমার শবাধার হবে কালো
দু'জন দেবদূত আমার পিছনে
দুজন গান গাইবে, দুজন প্রার্থনা করবে
আর দুজন আমার আত্মাকে নিয়ে যাবে।

সুন্দর গান, বিষাদময়! কি সুন্দর, যখন বলছে: পুরানো গীর্জায় আমাকে কবর দিও। শিউরে উঠলো দেহ। কি বিষাদময়, অথচ কি সুন্দর! আস্তে আস্তে কাঁদতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নিজের জন্যে নয়: ঐ গানের কথার জন্যে—সুন্দর, বিষাদমাখা সুরের জন্যে। ঘণ্টা পড়লো! পড়লো ঘণ্টা! বিদায়! বিদায়!

ঠাণ্ডা আলো, নিস্তেজ রোদ। যেন দুর্বল। ব্রাদার মাইকেল দাঁড়িয়ে আছেন শিয়রে, হাতে একপাত্র চা। খুশি সে। গলা শুকিয়ে গেছে। খেলার মাঠে খেলছে ওরা, তারই শব্দ। কলেজে কাটছে প্রহরগুলি আগের মতোই।

ব্রাদার মাইকেল চলে গেলেন। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ব্যাকরণের ছাত্র বলতে শুরু করেছে কাগজের খবর। তার নাম আথি, বহু রেসের ঘোড়া তার বাবার। ঘোড়াগুলো লাফায় ঝাঁপায় ডাকে। বাবা ব্রাদার মাইকেলকে ভাল টিপ দিতে পারেন যদি অবশ্য তিনি চান। ব্রাদার মাইকেল ভাল লোক, কাগজ থেকে খপর বলেন। কাগজ রোজ আসে কিনা। সবরকম খপর থাকে কাগজে—দুর্ঘটনা, জাহাজডুবি, খেলাধূলা, রাজনীতি—সব রকম!

এখনতো রাজনীতিরই খবর থাকে, সে বললে, তোমাদের বাড়িতে এই নিয়ে কথা হয় না?

হাঁ, ষ্টিফেন বললে।

আমার বাড়িতেও হয়।

একটু ভেবে বললে,

তোমার কিন্তু অদ্ভুত নাম। ডেডালাস। আমার নামটাও অদ্ভুত। আথি।

আমার নামে আছে শহরের নাম, আর তোমার নাম খাঁটি লাতিন।

আবার জিজ্ঞেস করলে ঃ

ধাঁধার উত্তর দিতে পার।

ষ্টিফেন জবাব দিলে, তেমন নয়।

আবার বললে,

এটার জবাব দাও দিকি ? কিলডেয়ারকে কেন ব্রিচেসমোড়া একখানা পার মতো দেখায় ?

ষ্টিফেন ভাবতে লাগলো কি উত্তর হবে ! তারপর বললে,

আমি পারবনা।

সে উত্তর দিলে, ওর ভিতরে আছে এক উরুত ( থাই ), আথি তো আথাই তা জান ?

ওঃ এই—ষ্টিফেন বললে,

এ এক পুরানো ধাঁধা, সে বললে।

কিছুক্ষণ পরেই আবার বললে,

শোন !

কি ?

জানো, এই ধাঁধাটা আবার ঘুরিয়ে বলা যায়।

তুমি পার ?

হাঁ। এই এক ধাঁধাই কি করে ঘুরিয়ে বলে জান ?

না, ষ্টিফেন বললে।

ভেবে দেখ না।

ষ্টিফেনের দিকে সে তাকালে।

তারপর বালিশের উপর শুয়ে পড়ে বললে,

আর এক রকমে বলা যায়, কিন্তু তোমাকে বলব না।

কেন বললেনা ও ? ওর বাবা রেসের ঘোড়া পোষেন, সুরীন আর নাষ্টি রোচের বাবার মতো নিশ্চয়ই তিনিও হাকিম। নিজের বাবার কথা মনে পড়ছে, মা যখন বাজান, তিনি কেমন গান। যখনই ও ছটা পেনি চাইত, উনি দিতেন একটা গোটা শিলিং। তিনি হাকিম নন বলে ওর দুঃখ, ওদের বাবাদের মতো হাকিম নন। তবে ওদের সঙ্গে ও এখানে আছে কেন ? বাবা না বলেছেন, এখানে ও অচেনা নয়। ওর পিতামহ দেশের মুক্তিদাতাকে এক অভিনন্দন পাঠিয়ে ছিলেন সে তো পঞ্চাশ বছর আগের কথা। সাবেকী আমলের পোষাক দেখে তখনকার মানুষদের চেনা যায়। সে এক সময় বটে।



তার তো তাই মনে হয়। তখনো কি ক্লঙ্গোর ওরা পরতো নীল কোট, তাতে থাকতো পিতলের বোতাম, হলদে ওয়েষ্ট কোট আর মাথায় খরগোসের চামড়ার টুপী থাকতো, বয়স্ক লোকের মতো খেত বিয়ার আর গ্রেহাউণ্ড পুষতো খরগোস ধরবার জন্যে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল, ক্ষীণ হয়ে এল দিনের আলো। খেলার মাঠে ধূসর মেঘল আলো। গোলমাল নেই। ক্লাস বসেছে, ফাদার আর্ণল হয়তো পড়াচ্ছেন বই খুলে।

ওরা ওষুধ দিলে না কেন তাকে। অদ্ভুত তো ! হয়তো ব্রাদার মাইকেল নিয়ে আসবেন। হাঁসপাতালে ওরা নাকি বিশ্রী ওষুধ খেতে দেয়। এখন তো একটু সুস্থ। আস্তে আস্তে সুস্থ হওয়া ভাল। তখন বই পাবে। লাইব্রেরীতে হল্যাণ্ডের ওপরে একখানা বই আছে। সুন্দর বিদেশী নাম, অদ্ভুত সব শহরের আর জাহাজের ছবি। ভারি ভাল লাগে।

জানালার আলো কি ম্লান। কিন্তু কি সুন্দর। আগুনের শিখা উঠছে, দেয়ালে ছায়া ঢেউয়ের মতো। কে যেন কয়লা দিয়ে গেছে। স্বর ভেসে আসছে। কারা কথা কইছে। শব্দের ঢেউ ঃ মুখর ঢেউ ঃ ঢেউ কথা কইছে ওঠা-পড়ার তালে তালে। তাই কি ? ঢেউয়ের সমুদ্র—দীর্ঘ কালো ঢেউ উঠছে আর পড়ছে ঃ চন্দ্রহীন রাতে আঁধার আঁধার ঢেউ—আঁধারের ঢেউ। কোথায় পীয়ারের গম্‌বুজে এক ঝিকিমিকি আলো ! জাহাজ এসে ভেড়ে সেখানে। লোকের ভিড় জমে যায় জলের ধারে জাহাজ দেখতে। বন্দের এসে ভিড়লো জাহাজ। একজন ঢ্যাঙা মানুষ ডেকে দাঁড়িয়ে আছে, সমতল ভূমির দিকে তাকিয়ে আছে—অন্ধকার তীর। পীয়ারের গম্‌বুজের আলোতে তার মুখখানা দেখা যায়, ব্রাদার মাইকেলের ম্লান মুখ।

সে দেখলে, তিনি হাত তুলে আছেন জনতার দিকে। শুনলে, তিনি জানিয়ে দিচ্ছেন—তাঁর বিষাদমাখা স্বর জলের উপরে ছড়িয়ে পড়ছে।

তিনি মারা গেছেন। আমরা তাঁকে কফিনে দেখে এসেছি, শুয়ে আছেন।

কান্না ঝরে পড়লো জনতার বুক থেকে

পার্নেল ! পার্নেল ! তিনি মারা গেছেন !

ওরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো, দুঃখের আর্তগুঞ্জন উঠছে।

ও দেখছে দান্তেকে। মেরুণ রঙা মখমলের পোষাক, সবুজ মখমলের ওড়না কটি থেকে লুটিয়ে পড়ছে। গর্বিত পদক্ষেপে সে চলেছে, জনতার ভিড় নিঃশব্দে অতিক্রম করে চলেছে। জনতা বসে আছে হাঁটু গেড়ে জলের ধারে।

( ক্রমশঃ )

# উপন্যাস

## ইন্দ্রজিৎ

বাংলাদেশে দীর্ঘ উপন্যাসের যুগ আজ আর তেমন নেই। আমার এই বিশেষ উক্তির পেছনে দম্ভের উক্তির বদলে আছে সত্যতা, এবং সেই সত্যতার পক্ষে সাক্ষী দেবেন অন্ততঃ পুস্তক বিক্রেতারা। দীর্ঘ উপন্যাস যে বাজারে তেমন দেখতে পাওয়া যায়না তার কারণ শুধু এইই নয় যে আধুনিক লেখকরা উপন্যাস লিখতে জানেন না, এর একমাত্র কারণ হলো আজকের যুগে দীর্ঘ উপন্যাস তেমন চলেনা।

লেখক ও পাঠকের ভেতরে যে একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে সেকথা লেখকও জানেন আবার পাঠকও জানেন। একদিক থেকে যেমন পাঠককে তৈরী করবার সুযোগ লেখকের আছে আবার তেমনি পাঠকও তাঁদের রুচি অনুসারে নিজেদের মনের মতন লেখা লেখককে দিয়ে লিখিয়ে নিতে পারেন।

যে কথা আমি বললাম সেটা এমন কোন জটিল কথা নয়, কারণ উপন্যাসের ধারার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা সহজেই বুঝতে পারবেন যে আমার কথাটা মিথ্যে নয়। উপন্যাসের মাল মশলা সবই আছে আধুনিক যুগে এবং পড়বার মতন পাঠক আজও আছেন, দীর্ঘ উপন্যাসের চাহিদাও আছে, কিন্তু চাহিদার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা নেই। কারণ পাঠক সমাজের ভেতরে যাঁদের সংখ্যা বেশী তাঁদের মন এবং সময় এই দুটোর একান্ত অভাব আজ দেখা দিয়েছে। ছোট কথায় জিজ্ঞেস করি, সময় কই আমাদের তেমন দীর্ঘ কলেবরের উপন্যাস পড়বার ? যে আবেষ্টনীর ভেতরে বাস করে আমরা দীর্ঘ উপন্যাসকে উপলব্ধি করতাম সেই বিশেষ আবেষ্টনী আজ তার ব্যাপক রূপ ছেড়ে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে পরিণত হয়েছে। এমনিই ক্ষুদ্র গণ্ডী যে সেটা গোণা যায় নখাগ্রে। আর নখাগ্রে যে আবেষ্টনী ও পাঠক বিরাজিত, উপন্যাস যদি সম্পূর্ণভাবে তাঁদের ওপর নির্ভর করে তাহলে ছাপাখানার কালির খরচা তাতে উঠবে কিনা সেটা ভেবে দেখবার কথা।

উপন্যাস ব্যক্তি বিশেষের রচিত হলেও তার প্রচারটা নির্ভর করে চাহিদার ওপর। চাহিদা যার কম সেখানে জিনিষ সৃষ্টি হলেও তার অপমৃত্যু ঘটতে বেশী দেরী লাগেনা। আর একটা জিনিষ হলো মন অথবা মানসিক অবস্থা। মনের দিক থেকে বোধ হয় আজ বেশীর ভাগ পাঠকই অসুস্থ।

এক সময় ছিলো যে সময় সংসার-দুঃখী পাঠকগোষ্ঠী উপন্যাসের নায়ক বা নায়িকার দুঃখে হতেন দুঃখী। সে সময়কার পাঠকদের মনের বেদনাটা তাঁরা উপলব্ধি করতেন



সুখের ব্যথার মতন। বাস্তব জীবনের ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসের ঘটনার ভিতরে পাঠক এমন একটা মিল খুঁজে পেতেন যে তাঁদের অবচেতন মন উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে নিজের পরিবারভুক্ত করে ফেলত। পাঠকের বাস্তব জীবনের দুঃখ সুখ আর উপন্যাসের নায়ক নায়িকার দুঃখসুখ যদি সচেতন সমালোচক তুলাদণ্ডে আলোচনা করতে চাইতেন তাহলে হয়ত দেখতেন ওজনদাড়ির সেই মাঝের কাঁটাটা রয়ে গিয়েছে মাঝখানেই।

আদর্শবাদী মানুষ শীতকালে জলে নেমেও শরীরে তাপ অনুভব করে দূরে জ্বলন্ত প্রদীপ দেখে, তেমনি অনেক আদর্শবাদী পাঠকও তখন ছিলেন যাঁরা নিজের ঘরের দুঃখ থেকে শান্তি লাভ করতেন উপন্যাসের মিলনান্তে। কিন্তু সে সময় বাস্তবের দুঃখ অবাস্তবের চেয়ে কম বা সমান হলেও বেশী ছিলনা। কিন্তু জীবনের বাস্তব দুঃখটা যেখানে মস্ত বড়, কেন্দ্র ছাড়িয়ে দুঃখ যেখানে ব্যাপকতা লাভ করেছে, উপমা যার সঙ্গে মহামারীর, সেখানে পাঠকের মনকে উপন্যাসের দুঃখ সুখের ব্যথার আবেদন তেমন কিছু উপলব্ধি করাতে পারেনা। আজ জীবনের দুঃখের গতির বেগের সঙ্গে উপন্যাস সমান তালে একেবারে চলতে পারছেনা। কাজেই তার আবেদন পাঠকের কাছে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে বার বার।

যাঁরা আমার এই প্রবন্ধটি এতক্ষণ মন দিয়ে পড়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত আমাকে ধরে বসবেন : গতযুগের উপন্যাসের রূপ আর বর্ত্তমান যুগে তার রূপান্তরকে কারণ সমেত দেখিয়ে দিন। পাঠকের আদেশ এক্ষেত্রে অমান্য করা আমার পক্ষে কষ্টকর তাই অতি সংক্ষেপে উপন্যাসের রূপ ও রূপান্তরের বিষয় আলোচনা করবার চেষ্টা করবো। আমি জানি যে আজকের পাঠক ইঙ্গিতজ্ঞ এবং এই বিশেষ কথাটির ওপর নির্ভর কোরে আমি আলোচনা করব।

বঙ্কিমযুগকে উপন্যাসের আঁতুড়ঘর বলা যেতে পারে। সেই বঙ্কিমী উপন্যাসের যে ধারার সঙ্গে আমরা পরিচিত সেটাকে আদর্শবাদী উপন্যাসের আখ্যা দেওয়া হয়। অবশ্য সে সব উপন্যাসে বাস্তবতা থাকলেও এক্ষেত্রে সেটা প্রাণধর্ম্ম নয়, সেখানে বাস্তবের ছিটেফোঁটা মাত্র আমরা লক্ষ্য করি। আমার এ উক্তি শুনে হয়ত অনেকে চটে উঠবেন কিন্তু তাঁদের চটবার জন্য আমি একথা বলিনি, বলেছি আলোচনা করবার জন্যে।

যাহোক ঘটনার পর ঘটনা ও ঘাত প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে উপন্যাস একটা বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিল শরৎচন্দ্রের যুগে। শরৎ সাহিত্যকে অনুভব করবার, স্পর্শ করবার পাঠক এবং পাঠিকা উভয়ই ছিলেন এবং পাঠক পাঠিকার উৎসাহই শরৎ সাহিত্যের সাহিত্যিককে করল অনুপ্রাণিত। তারই ফলে তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের আকাশ ভেসে আসতে লাগলো খণ্ড খণ্ড রূপে একটার পর দুটো, দুটোর পর তিনটে, তিনটের পর.....। পাত্র এবং

পাত্রী স্থান কাল সমেত শরৎ সাহিত্যের অনুকুল। যাঁরা প্রতিকুল পাঠক ছিলেন শরৎবাবুর মর্ম্মস্পর্শী সাহিত্য তাঁদের অনেকেরই মুখ ঘুরিয়ে নিজের দিকে নিয়ে এল। শরৎবাবু তাঁর উপন্যাসে বহু বাস্তব কথা প্রকাশ করলেন। তার উপন্যাসের নায়িকা এক কিন্তু রূপ তার বহু। সময় বুঝে অবস্থা বুঝে শরৎ সাহিত্যের নায়িকার রূপান্তর। তার নায়িকার রূপান্তর শুধু পুনরাবৃত্তি করতে নয়, অভিসার করতে চরম সাফল্যের দিকে।

শরৎ সাহিত্যের দেবদাস, বিপ্রদাস, শ্রীকান্ত, রমেশ অদৃশ্য হয়ে মিলিতরূপে ডাকছে পার্ব্বতী, বন্দনা, রাজলক্ষ্মী আর রমার মিলিত রূপকে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি গ্রহণ করতে।

শরৎ সাহিত্যে পাঠকপাঠিকা বাস্তবতার যে রূপটা পেলেন সেটা নতুন আখ্যা থেকে বঞ্চিত হবেনা কোনমতেই; বঙ্কিমের যুগের পাঠক যা পায়নি, শরৎবাবুর যুগে পাঠক তা পেলেন। শরৎ সাহিত্যে বাস্তবের টুকিটাকি তাঁর পাঠকদের মনের সঙ্গে হরণ করলো প্রাণ। কিন্তু দেখা গেল তাঁর পরবর্ত্তী পাঠকসমাজ পরবর্ত্তী উপন্যাসিকদের লেখা উপন্যাসে যে সমস্ত বাস্তবতার টুকিটাকি পেয়েছেন তা না পেলেও পাঠক নিজেই ধরে নিতেন এই টুকিটাকিগুলো। আর একটা কথা হলো, শরৎ সাহিত্যেই পাঠকপাঠিকা বুঝতে পেরেছিলো মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনের সমস্যা, কিন্তু মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনের সমস্যার সাহিত্য হলেও সেখানে প্রকাশিত হয়েছে মধ্যবিত্ত সংসারের খবর মাত্র। সেখানে ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিলো কিন্তু পুরীর জগন্নাথের চোখ ছিলনা।

শরৎ সাহিত্যে পাঠক বাঙ্গালীর সমাজকে পান কিন্তু বাঙ্গালী জাতিকে পান না সমগ্রভাবে। এটা দোষ গুণের কথা নয়, পাওয়া না পাওয়ার কথা। সব যুগে সব জিনিষ যদি পাওয়া যেত তাহলে বিবর্ত্তনবাদের ধর্ম্মটাই উল্টে যেত। যে জিনিষটাকে যেমন ভাবে পেলাম তাকে সেইভাবে গ্রহণেই পরিতৃপ্তি। উপন্যাসকে ন্যায়শাস্ত্রের আইনে চুলচেরা বিচার না করাই ভালো।

এবার বিস্তৃত আলোচনা কোরব সময়ের। সাহিত্যের সঙ্গে যার যোগ একান্ত ঘনিষ্ট।

মানুষের একদিন অফুরন্ত সময় ছিলো যেদিন সাহিত্য চর্চ্চা থেকে পরচর্চ্চা পর্য্যন্ত সে সব কিছুই করতে পারতো। কিন্তু জীবনের আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যত বাড়তে লাগলো, তত সময়ের অভাব বোধ করতে লাগলো মানুষ। একদিন ছিল যেদিন মানুষের সংসারে নিত্য ব্যয়টা বাহুল্যের ওপর দিয়েই কেটে যেত, সংসারে লক্ষ্মীর ঝাপি তাই দিনে দিনে ভারি হোত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে বাহুল্য কথাটা সংসার থেকে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলো অভিধানের পাতায়। অর্থের তাড়নায়, সংসারে নিত্য দেওয়া নেওয়ার ব্যস্ততায় মানুষের রস গ্রহণ করবার গ্রন্থিতে ক্রমশঃ পঙ্গুতা এলো।



গুড়গুড়ি তামাক সহযোগে দিবানিদ্রা রূপান্তরিত হোল আপিসের চেয়ার আর বিড়িতে। সেই আপিসের পর বাড়ীতে এসে হয় গৃহিনীর হাতপাখার বাতাস খাওয়া, নাহলে সন্ধ্যায় উপন্যাস পড়া, রাত্রির আহারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানুষের জীবনে এইটুকু ছিলো অবসর। কিন্তু অভাব দানব আরও দাঁত খিচিয়ে তেড়ে এলো; মানুষ ভুললো সুখের সন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাটুকুতে বা রাত্রে কি ভাবে গতর অথবা মস্তিষ্ক খাটিয়ে আরো অর্থের অঞ্জলি অভাব দানবের পায় দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা যায় মানুষ তার উপায় ভাবতে লাগলো। সুখের সংসারে অভাব ক্রমশঃ শেকড় বিস্তার করে চলল, সুখ পরিণত হলো দুঃখে। সময়ের তাড়নায় এবং অভাবের তাড়নায় মানুষের জীবনের গতি চললো ক্রমশঃ বেড়ে, কিন্তু সে গতি পেছনের দিকে নয় সামনের দিকে, উন্নত অবস্থার জন্যে আত্ম সংগ্রামে।

সময় নেই, সময় নেই ঃ এই একটি কথা মানুষের জীবনে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো বার বার। সময়কে কিনে নিয়েছে টাকা, যার টাকা নেই তার সময়ও নেই। প্রয়োজন এক্ষেত্রে টাকা, যেটা হলে মানুষ ভাবলো সময় আপনি মিলবে, কান টানলে মাথা আসার মতন। মানুষের সামনে আশার প্রদীপ জ্বলছে, সেই প্রদীপ লক্ষ্য করেই আত্ম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে।

জীবনে তাই সময়ের অভাব, এক্ষেত্রে উপন্যাস সময়োচিত নাহলে তার অপমৃত্যুও অনিবার্য্য।

কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মানুষকে দৈহিক দিক দিয়ে করেছে দুর্ব্বল কিন্তু মস্তিষ্ককে করেছে আরো সবল। বিবর্ত্তনবাদের ধর্ম্মই এই।

যে মানুষ এককালে মোটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত না পড়লে বুঝতে পারতো না ভেতরের ব্যাপারখানা কি, সেই মানুষই বা তার পরবর্ত্তী সংস্করণ সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রভাবে উপন্যাসের পূর্ণ রস আস্বাদন করবার ক্ষমতা পেল। আবার তার পরবর্ত্তী যুগে সে আবিষ্কার করলো যে গতযুগের উপন্যাসে সে সমস্ত টুকিটাকি কথা আছে সেগুলো না লেখা থাকলেও পাঠক হয়ে মানুষ তা বুঝে নিতে পারে।

বিবর্ত্তনবাদের গতি এগিয়ে চলেছে। এই গতির প্রভাবে উপন্যাসের কলেবরে ক্ষয় ধরলো বটে কিন্তু ভাবের দিকে একাদশে বৃহস্পতি।

পাঠককের রুচির দিক সময়ের দিক সব দিকেই দেখতে হয় লেখককে। এক্ষেত্রে মিষ্টির দোকানের আলমারীর ভেতরকার মিষ্টি আর বইয়ের দোকানের সাজান বই একই পর্য্যায়ে পড়ে।

পাঠকের জীবনে বিরাট অবকাশ ছিলো যেখানে বসে একদিন সে দীর্ঘ কলেবরের উপন্যাস শেষ করতে পারতো অনায়াসে। আজ সেই বিরাট অবকাশ হয়েছে সংক্ষিপ্ত কিন্তু

আজকের মানুষ চট কোরে, বড় কথা অল্প কথায় ধরে নিতে পারে। এ দান সে পেয়েছে জীবন সংগ্রামের পুরস্কার হিসেবে।

বৃহৎ উপন্যাসের ভাব নিয়ে বা আরও নতুন ভার তাতে মিশিয়ে লেখক যদি পাঠক সমাজে সেটা পরিবেশন করেন তো লেখকের লেখা যে পাঠক উপভোগ করছে তা টের পাবেন। সেটা ন্যাসই হোক আর উপন্যাস হোক্ পরিবেশনটা তার পাঠকের রুচির মতন হওয়া দরকার। তাই আধুনিক পাঠক দীর্ঘ উপন্যাসকে তাঁদের রুচির বিরুদ্ধ বলে ধরে নিয়েছেন। পাঠকের এই রুচিকে শিরোধার্য্য কোরে, সাহিত্য ক্ষেত্রে জন্ম লাভ কোরেছে আধুনিক ছোট গল্প।

আজ ছোট গল্পের যুগ।

"বস্তু-টা সৌন্দর্য্যের বাস-ভূমি নয়—যে-মন বস্তু
কল্পনা করে সৌন্দর্য্যের অবস্থিতি সে-মনে।"—হিউম

# সংন্দশ

## বাংলা কবিতার দুর্ব্বোধ্যতা ও ছন্দ

বাংলা-কবিতার দুর্ব্বোধ্যতার অপবাদ চির-প্রসিদ্ধ। যে কুটিল অক্ষর থেকে বাংলা লিপি এসেছে এবং যে কুটিল-অক্ষরে বজ্রযোগিনীর হরিবর্ম্মা থেকে সুরু করে বঙ্গাধিপ মহীপাল পর্য্যন্ত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' লিখিয়ে গেছেন তা বাস্তবিক কৌটিল্যের কূটনীতি জাত। সান্দ্রকুট্টের পুরোহিত-প্রবর ত কুটনীতি-পরায়ণ ছিলেনই তাছাড়া মুর-সম্রাটের মা-ও হয়ত মালিনী-মাসীর মতো কুট্টনীই ছিলেন। অর্থাৎ সান্দ্রজাতির গুপ্তচর রাজাটি ছিলেন ব্যভিচারী আর তাঁর পুরোহিত বা মন্ত্রী ছিলেন অভিচারী। চন্দ্রগুপ্ত হয়ে সান্দ্রকুট্ট শেষটায় অবশ্য ব্যভিচার ত্যাগ করে অভিচার মন্ত্রে বা মারণ-উচাটন-মোহন প্রভৃতি তান্ত্রিক-সিদ্ধাদের প্রসিদ্ধ পন্থায় চন্দ্র-গোপিতা হন কিন্তু তবু তাৎকালীন জৈন তান্ত্রিকদের যৌনতা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। তা-ই 'কুলহীন', 'বৃষল'-প্রভৃতি দ্বৈত অর্থ-বোধক শব্দে ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানাতেন।

তান্ত্রিক-সিদ্ধাদের কাজ-কারবার কথাবার্ত্তা সবই দ্বৈত-অর্থ বোধক—তার সদর্থ-অসদর্থ দুই-ই করা যায়। আসামের অষ্ট্রিক-জাতির তন্ত্র থেকেই বাংলার তান্ত্রিক দেশ খ্যাতি। রাধার জটিলা-কুটিলা যেমন কুটনী তেম্নি কুটনীই অবশ্য বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসী তবে নক্সায় তারা আলাদা। এই দুধারা সংন্দশ একটি বাটে সমন্বিত হয়েছিল। তার নাম বড়ায়ী বা বড়মা। পিতামহী বা মাতামহী দুই-ই হতে পারতেন এই 'বড়ায়ী' নামক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভালোয়-মন্দয় মেশানো জীবটি। তিনি বৃদ্ধা—সংসারে অভিজ্ঞা, কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা। পরিবারের বিবাহযোগ্যা কন্যাদের কানে কামোপদেশ দান করা ছিল এঁরই কর্ম্ম। জাপানী গীশা-গার্ল পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন ছিলনা এখানে। আর বড়ায়ী-হওয়াও নারীতেই শুধু আবদ্ধ ছিলনা। তাই ঠাকুর্দ্দা-দাদামশাইরাও ঠিক একই ধরনে অবিবাহিত অথচ বিবাহোন্মুখ ছেলেদের সঙ্গে হাস্য-পরিহাসচ্ছলে কামশাস্ত্রের জ্ঞাতব্য তত্ত্ব-সমূহ পরিবেষণ করতেন। বড়ায়ীও দ্বিমুখী, পুরুষ এবং স্ত্রী। 'বার-রায়'-কথাটিই 'বড়ায়ী' শব্দের জন্মদাতা—'বাররায়' মানে 'সভা-সুন্দর'। শ্রীহট্টের নপুংসকরা কাশ্মীর-দরবারে এবং 'হট্টি' দেশের মারফৎ রোমক-সাম্রাজ্যে সভা-সুন্দর' হতেন।

বড়ায়ীর জন্ম কোথায়? 'রাঢ়-পরিবৃঢ়-বধূ'র দেশেত নিশ্চয়ই, কিন্তু রাঢ়ে ও বারেন্দ্রভূমিতে এঁরা এলেন কোত্থেকে? বোডো বা বোড়ো হিসেবে এঁরা আসাম-ত্রিপুরা অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। পাহাড়পুরে 'নরী-রাজ্য' বা কিন্নরী-রাজ্য স্থাপন করেছিলেন

খ্রীঃ পূঃ ২৭০০ সম্বৎসরে। উত্তর আসামের সীমান্তে 'অকস'-রাজ্যের বিভিন্ন ভুটিয়া-কৌম থেকেই এই একটি স্থায়ী-জাতি বা প্রাচীদেশের 'দিষ্' বা 'দিশ'-জাতি ( অষ্ট্রলয়েড ) তৈরী হয়ে ওঠে। যযাতি-পুত্র অসুর দ্রুহ্য-রা বোড়োদের সঙ্গে মিশে এই দিক্‌হারা দিষ্ বা দিশ জাতি নির্ম্মাণ করেন। ঋক্‌বেদের পুরু-রা এ-জাতিরই মানুষ। যদু-তুর্ব্বসরাও তথৈবচ যযাতিপুত্র এবং ভ্রাতৃজাতি, তবু বিমাতার গর্ভজাত বলে তাদের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছিলেন পুরুপুঙ্গব সুদাস। আসল কথা, বোডো-রাই ইন্দ্রসেবী আর্য্য-পুরোহিত, অসুর সুদাস তাঁদের কাছ থেকেই ইন্দ্র-পূজো শিখেছিলেন—যদু-তুর্ব্বসরা ছিলেন বারুণী।

একই পিতা। অসুর-কন্যা দুয়ো-রাণী শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রুহ্যরা জন্ম নেন। ছোটভাই পুরুর প্যাটার্ণে রাজ্য-ভোগী হতে চাইলেন তাঁরা দেবযানীর সন্তান যদু-তুর্ব্বসকে দৃশ্যত দমন করে। তাঁরা জমদগ্নি বংশী দৈত্যগুরুর খানিকটা রক্ত পেয়েছিলেন মার দেহ থেকে। নইলে পিতা যযাতি ত বরুণসেবী অত্রি-ঋষির বংশ—পুরূরবার ( খস-জন্তিয়া-জাতি ) সন্তান। বাংলার পঞ্চবিভাগে যযাতির পঞ্চপুত্র বিদ্যমান ছিলেন। ঋগ্বেদের আমলে ঋষি-রাজন্যের জাতি বর্ণের-ভেদ ছিলনা যদিও ত্বক-বর্ণের বিভেদ ছিল সুস্পষ্ট। তাই অসুর, আর্য্য কথাগুলোর কোনো সদর্থ নেই। স্বয়ং বরুণই অসুর ছিলেন—মানে এসীরীয়। ভুটিয়ারা ( ভট্ট ) হলেন ইন্দ্রসেবী পুরোহিত; দেখাদেখি দিষ্-দৈত্যগুরু চার্য্যরা ইষ্টদেবতা বদল করলেন যাঁরা ছিলেন বরুণসেবী, পুরোহিত।

এই ঋগ্বেদী সংস্কৃতির দিষ্-রাজ্য ইন্দোচীন-মালয়-কম্বুজ-ব্রহ্মদেশ থেকে সুরু করে ক্রমে উত্তরে ও পশ্চিমে বিস্তৃত হয়েছে। তাই তাদের 'তকলামকানে' এবং এশিয়া-মাইনরে 'মিতানি' ( মিত্রাণি ) ও হট্টি হিসেবে পাওয়া যায়। 'বৎসরাজ' মিনাণ্ডার এঁরি একজন দিষ্-কৌমের মানুষ। এঁরাই থিবিসের গ্রীক। আমাদের চণ্ডীসেবকরা এঁদেরই নিধন-কামনা করতেন।

বেদ-ভাগবত, ঐতিহ্য, ঠিকুজি আর ইতিহাস ঘাঁটতে হ'ল এ-কথা বলবার জন্যে যে বহু-কৌমের বহু শব্দ-ধ্বনি নিয়ে বাংলা-ভাষা নির্ম্মিত! বহু-কৌমের বিবিধ সংস্কৃতি বাংলার মাটিতে বিধৃত! এখানকার সাহিত্য-ও তা-ই ঋজু রেখায় চলেনি—চলেছে ভাষায় ও অভিব্যক্তিতে নানাবিধ জটিলতা নিয়ে। তথাকথিত আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রণই এ-জটিলতার জন্যে দায়ী। বাঙালীর মন-ও জটিল—আর সম্ভবত বাংলার মিশ্র ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ই কুটিল। কাজেই এদের বোঝা-ই দায়।

যেমি অবোধ্য ঋক্‌বেদের ভাষা এবং বক্তব্য। তার একপেশে কোনো অর্থ নেই—একটি শব্দগুচ্ছ নানাবিধ শব্দের ধ্বনি এনে দেয়। বাংলা, হিন্দি, সংস্কৃত, য়ুরোপীয় বহু-শব্দে সমন্বিত সে ভাষা। সিকিমে, অরুণ নদীর তীরে, কিরাত-রাজ্যে ঋক্‌বেদের উষা-স্তোত্র



তৈরী হয়েছিল বলেই বাংলার সঙ্গে বৈদিক তান্ত্রিক সংস্কৃতির যোগাযোগ অচ্ছেদ্য। ঋক্‌বেদের দশম-মণ্ডলে অদিতির নাত্‌নী দিতি। অদিতি হয়ত নাতনীকে কামশাস্ত্রের সদুপদেশই দিয়েছিলেন আর দিতি-ও হয়ত প্রাচীদেশের ঠাণ্ডা মেয়ের মতোই তা শুনে গিয়েছিলেন। তিনি কি করে জানবেন যে দৈত্য-কুল তাঁর গর্ভেই জন্ম-গ্রহণ করতে আসছে! এই দৈত্যের আবির্ভাবে প্রচুর-পয়সী-প্রাচীতে ঝগড়ার উদয় হ'ল। সাধে কি আর দৈত্য-বধের এতো তোড়জোর আমাদের শাস্ত্রে ও জীবনে! দৈত্যরা দিষ-কিরাট-বিরাট-কৃকট প্রভৃতি নেগ্রিটোঅষ্ট্রলয়েড। কৃষ্ণের 'গুড়াকেশ' উপাধি কুঞ্চিত কৃষ্ণকুন্তলের আবির্ভাব সূচনা-করে। মেঘ-বরণ চুল যাঁদের ছিল সেই যক্ষিণীরাই যদু-কৃষ্ণের বংশ-দুলালী। অষ্ট্রলয়ডে নেগ্রিটো মিশ্রণ হয়ে যে মেলানিসিয়ান জাত তৈরী হয়েছিল—বাঙালীরা তা-ই। যদু-এলিমেট এখানে বেশী এবং যাদুবিদ্যা।

ঋক্‌বেদেই খবর আছে দৈত্যরা দুর্ব্বোধ্য-ভাষা বলতেন। ভাষা প্রায় একই ঋষি-ভাষা—অনুরূপ শব্দও ব্যবহার করতেন অনেক সময় কিন্তু তার অর্থ ছিল ভিন্ন। যেমন: 'তি' কথাটি অননার্য্য বোডো ভাষায় 'নদী' কিন্তু অষ্ট্রিক ভাষায় 'রাষ্ট্র'। ত্রিপুরার 'ময়নামতি' কথাটি অষ্ট্রিক-বাংলা। ত্রিপুরার 'গোমতি' নদী বোডো-নদী। 'ময়-নামক রাষ্ট্র' বা ময়দানবের রাষ্ট্র বলতে যে আট-মাইল-ব্যাপী স্তূপটি আছে—অদ্যাবধি সেই ময়নামতির দ্বার-উদ্ঘাটন করা হয়নি। ইংরেজের কাছে ব্যাপারটা সুবিধের মনে হয়নি—তাঁরা জানতেন 'ময়নামতি' থেকে কেচো তুলতে গেলে সাপ বেরিয়ে পড়বে। তবু আমাদের সৌভাগ্য বলতে হবে যে 'ময়নামতির গান' এবং 'গোরখ-বিজয়' পুঁথিগুলো বেঁচে আছে দানবীয় কাণ্ডের সাক্ষ্য হয়ে; বেঁচে আছেন মালয়ে-সিঙ্গাপুরে রাঙামাটির বুদ্ধগুপ্ত। বুদ্ধগুপ্তকে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে ফেলা হয়েছে। তা হোক, দ্বিতীয় শতকে-ও তাহলে বাংলা-হরফ এবং বাংলার জমদগ্নি-স্তুতি বুদ্ধগুপ্তের মারফৎ পেয়ে যাচ্ছি দেখা যায়। বাংলা হরফের জন্ম তাহলে দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে! কিন্তু এ-কথাটা ত বাংলার কোনো ঐতিহাসিক বা ভাষাতত্ত্ববিদ আমাদের জানান নি! মিউজিঅম্-ত কলকাতায়ই আছে। বিদ্যাপরিষদের পাণ্ডারা এতো জাল পুঁথি ঘাঁটতে পারেন আর খোদ মানুষের খোদাই করা ক'টা পাথর ঘেঁটে দেখতে পারেন না বাংলা দেশে কালো বামুন আর কটা শূদ্দুর কোত্থেকে এলো—আর্য্যই বা কে আর অনার্য্যই বা কে এ-কথাটা পরিষ্কার করে তুলতে পারলেন না কেউ! ভাষাতত্ত্ববিদ্‌রা কি ধরতে পারলেন না যে 'হুগলী' খাঁটি আসুরীয় নদী? এসিরীয় ভাষায় 'হু' বলতে যে নদী বোঝায় এ-কথাটি ত অন্তত কানিংহাম তাঁদের বলে গিয়েছিলেন—আর যা কানমন্ত্রই তিনি দিয়ে থাকুন! এ-ও তিনি বলেছিলেন যে 'যশোর'-কে 'ব্রীজ' বলা হ'ত। উত্তর বাংলার ভূমিজরা এখনও তাঁদের দেশকে 'বিরিজ'-ই বলেন। বৃজি

ভারত-বংশ সোজা পদ্মাপাড়ের সহজিয়া মানুষ, যাঁরা বৃষ্ণি, বৃষ্ণি নামে পরাশর-দ্বারা কথিত হয়েছেন। যদু-তুর্ব্বস এঁরাই। সেন-যুগে, সেন এবং চোড়গঙ্গ।

ঋক্‌বেদে হরেক রকম অসুর আছেন কিন্তু অসুর-রাজ হলেন বরুণ, অত্রি-বশিষ্ঠ-গৃৎসমদ নামধেয় ঋষিদের ইষ্টদেবতা তিনি। বশিষ্ঠ ছিলেন বৃজির মুনি। বৃজি-রাজ্যটি পদ্মা-উপত্যকা। ভবভূতি জনক-বাল্মিকী-বশিষ্ঠকে চন্দ্রদ্বীপে ( বরিশাল ) নিয়ে উপস্থিত করিয়েছেন। ঋক্‌বেদের সপ্তম মণ্ডলে বশিষ্ঠকে দেখা যায় ঋক্ ছন্দে প্রথম সূক্ত উষা-স্তোত্র রচনা করছেন ( ঋক্ ছন্দ অনুষ্টুভের ছয় মাত্রার পঞ্চপদ। জগতীর আট মাত্রায় গ্রথিত হলে তার নাম 'পঙিক্ত'। ) এবং ত্রিষ্টুভের ( সাত বা এগারো মাত্রার ছন্দ) দ্বিতীয় সূক্তে অশ্বিন্-স্তোত্র রচনা করে প্রথমের সঙ্গে সন্নিবেশিত করে দিচ্ছেন।

ঋক্‌বেদী বাংলার কবিতা-ছন্দ যদি দুর্ব্বোধ্য হয় তা তার মহৎ ঐতিহ্যেরই দরুণ। কোনো দেশের হাস্যকর কবিতা-বোধ নিয়ে বা বাজারী ছড়া-পাঁচালীতে মন-মজিয়ে আজেবাজে চিঠির প্রসঙ্গ কথায় কেউ এ-কবিতার ধ্বনিতত্ত্ব বুঝতে পারবে না। সাহিত্য বেসাতির বস্তু নয়—মাটির ঢেলা নয়, বিতণ্ডা নয়, সংবাদ নয়, সংবেদনশীল কতগুলো ছন্দিত অক্ষর।

বাংলা ছন্দের রীতিটি পরিষ্কার ভাবে বোঝাতে ( যা ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত ও রবীন্দ্রনাথের করায়ত্ত ছিল ) ঋগ্বেদের ত্রিষ্টুভ নিয়ে খানিকটা আলোচনা করা দরকার। ঋগ্বেদে সব চাইতে আদরের ছন্দ হ'ল ত্রিষ্টুভ। ১০৪৪২টি স্তবকের ( যাকে সায়ন 'সূক্ত' আখ্যা দিয়েছেন ) মধ্যে ৪২৫৩ টি স্তবকই ত্রিষ্টুভে রচিত, গায়ত্রীছন্দে রচিত ২৪৫০ স্তবক। তার মানে ছন্দের বিভিন্ন পর্য্যায়-রচনা ছিল হিন্দুরাজাদের করায়ত্ত যাঁরা সর্ব্বদিক থেকে মধ্যদেশ বা 'প্রতিষ্ঠা'-ভূমিতে সমাগত হয়েছিলেন ( বায়ুপুরাণেও এ কথার উল্লেখ আছে )। ব্রাহ্মণরা ধ্বনিছন্দময় বাক্য-রচনা ( রিথ্‌মিক প্রোজ রচনা ) করেই মুক্ত তারপর তাকে গুচ্ছে-গুচ্ছে সাজানোর ব্যাপারটা হাতে নিলেন রাজর্ষি দশরথ বা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র সম্প্রদায়। ব্রাহ্মণ-উপনিষদের যুগে আবার ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ফিরে এলো এবং 'বেদ-গান' নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সংস্কৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে উপনিষদের যুগ প্রাক্-বৈদিক ব্রাহ্মণদের যুগ বা হিন্দুভারতের যুগ। ঋগ্বেদের জড়বাদকে তখন ব্রাহ্মণরা নিজেদের রঙে খানিকটা রাঙিয়ে ফেলেছেন এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিরোধের ( কুরুক্ষেত্রের) ভূমিকা তৈরী করে তুলছেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দেশ আসাম-অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ তখন বৈদিক-রাজন্যদের পক্ষাবলম্বী।

থাক্ দ্বান্দ্বিক ইতিহাস, এখন ছন্দের কথায় আসা যাক। ত্রিষ্টুভের যে তিনটি ধ্বনি-স্তূপ তার নমুনা কেমন, তা-ই খানিকটা পরীক্ষা করছি এখানে। আর তার আগে



বৈদিক-ছন্দের সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে একটি উল্লেখনীয় মন্তব্য করে নিচ্ছি। বেদের সঙ্গীত-ছন্দ 'আর্য্যা'র অপর নাম দ্বিপদা ত্রিষ্টুভ। সাতমাত্রার ত্রিষ্টুভ দ্বিপদা হয়ে গেলে এক একটি ধ্বনি-গুচ্ছ তখন আর সাতমাত্রায় আবদ্ধ থাকেনা—১১ মাত্রা হয়ে যায়। ত্রিপদী হলে ১১ মাত্রার গুচ্ছ নিয়েই তার নাম হয় 'বিরাট'। কিন্তু চতুষ্পদীতে আশ্চর্য্যভাবে সে আবার 'ত্রিষ্টুভ' নাম ফিরে পায়—পঞ্চপদী হলে কিন্তু মিষ্টির গুঁড়ো শর্করা ছড়াতে থাকে এই আর্য্য-রথের ত্রিষ্টুভ ছন্দটি এবং নাম পায় 'শক্করী'। থেরীগাথার অম্বাপালী এ-ছন্দে পাদ-পূর্ণ করেছেন। দুটি পদক্ষেপে এক পদ এবং দুটি পদে পাদপূর্ণ হয়। এই হ'ল ঋক্‌ছন্দের বা 'পদকারে'র তথা বাংলা ছন্দের বা পয়ারের পদ-নির্ম্মাণ-কৌশল।

এই পদক্ষেপগুলো প্রতিপদেই যে সমান হবে তার কোনো মানে নেই—মোটের উপর প্রতি-পদের ধ্বনি-সংখ্যা ধ্রুব ( এক নমুনার ) হলেই হ'ল। তবে মুস্কিল যে ধ্বনি ধাবমান, তার ধ্রুবতা বলে কোনো গুণ নেই—তাই ব্রাহ্মণরা রাজন্যদের এই ধ্রুবতাপ্রীতিকে ধুত্তোর বলে ছন্দের বন্ধন বা ছন্দবদ্ধ থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। তবু রাজর্ষিরা বলেছিলেন, 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'। পদক্ষেপে মুক্তি পেলে পদবন্ধনে কে রাজি হয়?—রিথমিক-প্রোজ-প্রণেতা উপনিষদের ব্রাহ্মণরা হয়ত উত্তর দিয়েছিলেন। এই রিথমিক প্রোজে আজ ফরাসী অগ্রগণ্য—ফণীশিয় লাল-মানুষেরই ত তাঁরা বংশধর—যাঁরা ছিলেন ভারতীয় পারীযাত্রের পাহাড়ে গ্রীক-রোমান 'পারীপলাস'-গোষ্ঠী। এঁদের আসাম-ব্রহ্মের সংস্করণের ছিল ব্রহ্মবাদ—তারসঙ্গে মহামায়ার অনন্ত লীলা। ছিলেন মায়ারী বরুণ, দেব-রচয়িতা বৃহস্পতি, দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য। ছিলেন ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা। ছিলেন বর্ম্মণ-বৃষ্ণি-শিবি-রাজকুল। সবাই এঁরা প্রাচ্যে এবং উত্তরাপথে বিস্তৃত ছিলেন।

সপ্তম-মণ্ডলের দু'টি অশ্বিকুমার বা সারনাথের 'দিব্যালকে'র স্মরণার্থে আমি মিত্রাবারুণী বশিষ্ঠ-প্রণীত একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করছি ছন্দ-পরীক্ষার জন্যে। 'বিরাট', 'ত্রিষ্টুভ' এবং 'অনুষ্টুভে'র 'ক্যাডেন্স' ( পদপ্রান্তে অপূর্ণ ধ্বনিগুচ্ছ ) স্বাভাবিকভাবেই এখানে বিদ্যমান যা প্রত্যেক বাংলাছন্দে আবহমানকাল ব্যবহৃত এবং মাহাটি 'ওভী'-ছন্দোমাত্র যা সমুপস্থিত। কিন্তু কী আশ্চর্য্য, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতকুল শুধু মাহাটি 'ওভী'-ছন্দেই বেদছন্দের প্রতিভাস দেখতে পেলেন এবং তারসঙ্গে আমাদের দুঃখ এই যে বাংলা ছন্দ-ওয়ালারা-ও ব্যাপারটির দিকে অদ্যাবধি চক্ষু মুদ্রিত করেই আছেন।

ঋক্‌বেদ ॥ সপ্তম মণ্ডল, ৭১ সূক্ত ( ? ) ॥

[ পঞ্চমেঃ অনুবাক একোনবিংশতিঃ সূক্তানি। তত্র অপ স্বস্থর্ ( খস্থর ? ) ইতি ষড়্ ঋচং প্রথমং সূক্তং ত্রৈষ্টুভম্ আশ্বিনম্। ]

(ক) উপায়াতাং দাশুষে মৎর্যায়=১৮ মাত্রা
রথেন বামমাশ্বিনা বহন্তা।=১৬ মাত্রা
(খ) উপায়াতাং। দাশুষে মৎর্যায়= ৭+১১ মাত্রা=(৭½+১০)
রথেন বামমশ্বিনা। বহন্তা।=১২ (৬+৬)+৪ মাত্রা
(গ) উপায়াতাং। দাশুষে। মৎর্যায়= ৭ (৭½)+৫+৬ (৫)
রথেন। বামমশ্বিনা। বহন্তা= ৪+৮+৪

পদক্ষেপে মাত্রাসংখ্যার ধ্রুবতা অনিশ্চিত—নিশ্চয়তা শুধু নক্সায়, 'সমতা'-নক্সায় বা জোড়-সংখ্যায়। 'বহন্তা'-কথাটির 'ক্যাডেন্স' দু'মাত্রা পূরণ করে দ্বিতীয় পদক্ষেপটিকে ১৮ মাত্রায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে। প্রত্যেকটি শব্দের ধ্বনি-গণনা করে যদি আমরা শব্দগত ধ্বনিতে এ-ছন্দটির নমুনা যাচাই করতে যাই তাহলে দেখতে পাব ছন্দটিতে মূলত 'বিরাজ' বা বিরাট্-ছন্দের গুণ বর্ত্তমান যার পাদ-পরিমাণ ৫ মাত্রা থেকে সুরু এবং ক্যাডেন্স চার। তাকে এগারো মাত্রায়ও বিরাজিত দেখা যায়। তেম্নি 'জগতী' ছন্দও এখানে বিচরণ করছে—আট এবং বারো মাত্রা নিয়ে। মোটকথা বিরাট জগতের নানাবিধ ধ্বনি নিয়ে তিনটি অসম মাত্রার ধ্বনি-স্তূপে ত্রিষ্টুভ-ছন্দ রচিত। তিন স্তূপের মাত্রা-সংখ্যা ১৮ ধরে নিয়ে স্তূপগুলো সমোচ্চ মনে করলে এবং একে তিন-মাত্রার তালে ফেললেই শুধু প্রত্যেকটি স্তূপে ছয়মাত্রা পরিমাণ ধ্বনি নির্দ্দেশ করা যায়। সেই ৬ মাত্রা হ'ল আদি-কবি বাল্মীকির অনুষ্টুভ। সঙ্গীতজ্ঞ কুশীলবের গুরু, রামায়ণ-রচয়িতা বাল্মীকি ভরতনাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশেই হয়ত অনুষ্টুভের ছয়মাত্রার পদক্রম পরবর্ত্তী পদে পরিবর্ত্তিত না করবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। তবে তাঁর-ও আগে নৃত্যোৎসাহী বিরাট-রাজের পঞ্চমাত্রিক 'বিরাজ্'-ছন্দ যার এক-একটি পদক্ষেপ সম-পর্য্যায়ের হলে আড়াই-মাত্রা হয়—যে আড়াই মাত্রা শূদ্রের, নারীর এবং নাথপন্থীদের আড়াই অক্ষরের মন্ত্র 'নমঃ' কথাটিতে পাওয়া যায়। 'নমঃ' বা 'বষট্'-ধ্বনিগুলো 'ওঁ'-ধ্বনিরই বিকল্প। 'ওঁ'-ধ্বনিও বস্তুত আড়াই-মাত্রা তাকে তন্ত্রে-ময়ে যথেচ্ছা বিস্তৃত করা হত। অর্দ্ধমাত্রার-ও একটি মন্ত্রধ্বনি ছিল, নাম: 'ং'—আমাদের মহীপালের (তৃতীয় সম্বৎ-এর 'বাঘাউড়া'র মহীপাল,. যা থেকে 'বগুড়া' নাম) নালন্দা-তোরণে তাকে দেখা যায়—পাওয়া যায় তেম্নি বুদ্ধগুপ্তের সিঙ্গাপুরী বাংলা হরফের প্রথম অক্ষর হিসেবে। ছন্দ ছিল মন্ত্রধ্বনি থেকে ক্রমাগত—তা অষ্ট্রিক-জাতির নৃত্যে এবং সঙ্গীতে আহৃত হয়েছে শেষে। সেখান থেকেই পদাঘাত-প্রশ্রয় পেয়ে ঋষিরা দুর্ব্বোধ্যভাবে তাকে ব্যবহার করেছেন বাক্‌ধ্বনিতে। ভারতীয় বাক্‌ছন্দের ইতিবৃত্ত এই।

বাংলা-পয়ার ছন্দের রীতিও ঠিক তা-ই। মৎপ্রণীত 'পারমিতিহাস' কবিতাটিতে এই ছন্দ-রীতি অনুসৃত। ভাবার্থকে অনুসরণ করেছে ছন্দ। আকাশের ঊষাকে আহ্বান করতে হলে সমমাত্রার যে অনর্গল ধ্বনির দরকার, মর্ত্তের অশ্বারোহীকে অভিবাদন জানাতে সে-ধ্বনি অচল। অশ্বখুরের ধ্বনি বা রথঘর্ঘর-ধ্বনিকে তুষ্ট করতে হলে শ্রুতিতে বিষমপদী বা সমবিষমপদী ধ্বনি ঢেলে দিতে হয় বলে আমার প্রতীতি হয়েছিল এবং তার সত্যতার স্বাক্ষর



বাংলার বশিষ্ঠ রেখে গেছেন দেখেছিলাম। বাংলা ছন্দের বিশিষ্টতাই এই—ইংরেজি বীট-বার যেম্নি ঋকৃছন্দে বারণ তেম্নি বাংলা ছন্দের রিচারেও তা বাহুল্য বিশেষ।

আমরা মৈমনসিং-গীতিকায় পরপর দু'টি পদে চৌদ্দ অক্ষরের পাঠ্য পয়ার-পদ এবং গীতিকবিতার ষোল-মাত্রার পংক্তি দেখতে পাচ্ছি—ওখানে-ও বশিষ্ঠের বাগ্দেবী অধিষ্ঠিতা। যেম্নি রাজপুতদের আবু-পর্ব্বতে তিনি অধিষ্ঠিতা হয়ে আমাদের মীরাবাই-এর কণ্ঠ-সুধা পরিবেষণ করেছেন তেম্নি পূব-বাংলার পল্লীগীতিতে, সেই মহাশ্বেতা তাঁর কোমল-কড়ি সুর-ধ্বনি তুলে আমাদের মন বেদনাপ্লুত করেছেন। এবং আমরা শেলীর জন্মের বহু বহু শতাব্দী আগেই বলেছি, বেদনা-রসই মহৎ কাব্য।

## মিউজিঅমে লিওনার্দো দাভিঞ্চি

য়ুরোপের দ্রাবিঢ়-শিল্পী লিওনার্দো দাভিঞ্চিকে আমাদের মিউজিঅমে প্রবেশ-পত্র দেওয়া হয়েছিল ইদানীং। কুমারী-পূজক মোনা-লিসা-সাধক দাভিঞ্চিকে আমরা সেখানে আধ-খানা মাত্র পেলাম। কিন্তু আমাদের সংবাদপত্রগুলো এতেই আহ্লাদে আটখানা! 'মোনা-লিসা'র একটি ক্ষুদ্রকায় প্রিণ্ট পর্য্যন্ত প্রদর্শনীতে নেই, অথচ একটি সংবাদপত্র এম্নি তৎপর যে মোনালিসার তসবীর ছেপে এ-প্রদর্শনীর ডঙ্কা পিটিয়েছেন! ব্যাপারটা অসাধুতা কি অজ্ঞানতা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। কারণ, এ-দুটো অবিদ্যাই এখন বাংলাদেশে অবাধ-পথচারিণী। যাক্, আমাদের ভাগ্যি ভালো যে অসতর্ক নির্ব্বাচন থেকেও দাভিঞ্চির ভারতীয় মনকে আমরা চিনে নিতে পেরেছি। এখানে তাঁর সেই 'স্কেচ'-টি দেখতে পেলাম—'উমার বিবাহ-সজ্জা'য় আমাদের শিল্পীরা 'উমা'র যে মূর্ত্তি কল্পনা করে গেছেন তারই হুবহু নক্সা যা। এই লিচ্ছবী মেয়েদের সঙ্গে ম্যাজি-গোষ্ঠীর দাভিঞ্চির যে কতোটা যোগাযোগ ছিল, ঐতিহাসিকরা গিয়ে তা দেখে এলে পারতেন। ভাষাতাত্ত্বিক বা লিপি-তাত্ত্বিকরা-ও দেখতে পেতেন সংস্কৃত-ব্রাহ্মী-বাংলা হরফের কি নিবিড় যোগাযোগ হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে ফ্লোরেন্সের ভাষায় ও লিপিতে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ তরুণ কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ মজুমদারই এমন একজন লেখক যিনি বহুদি কোণ থেকে জীবনকে দেখতে জানেন। তাঁর রচিত গল্প ইতিপুর্ব্বে সৎসাহিত্য-পিপাসুদের তৃপ্তিদা করেছে। 'গড় শ্রীখণ্ড' তাঁর প্রথম উপন্যাস। আমাদের আশা আছে—এ-রচনাটি-ও তাঁকে বাং উপন্যাসের আসরে একটি সম্মানের আসন দান করবে।—সম্পাদক ]

ভগবানের মতো বড় একটি মাকড়সার জাল। যদি পুরাণটা জানা থাকে, আ একটু ঘুরিয়ে বলা যায় মহাদেবের জটা। বাঙাল নদী পদ্মা এখানে বন্ধনে পড়েছে 'বিরিজ' বলে লোকভাষায়। দুর্ধর্ষা গণগামিনী গঙ্গাকে সে কোন তরুণ আদর ক' পদ্মুমা পদ্মা বলেছিল, আপন করেছিল, কে বলতে পারবে। ভালোবেসেছিল, বন্ধ করার চেষ্টা করে নি, তার সর্বনাশা কুলনাশিনী মতিকে শ্রদ্ধা করেছিল। এখন ভালোবা বংশধরদের রক্তে শ্রদ্ধা ভক্তি ভয়ের সমন্বয়ে সব চিন্তা সব ভাবনার পেছনে ধর্মের অ দৃঢ় ভিত্তি হ'য়ে আছে।

রেলের লোহার আলকাতরা মাখানো বেড়ায় হেলান দিয়ে বসে সুরো আকাশে দিকে চেয়েছিল। চৈত্রমাসের আকাশ। এদিকে ইতিমধ্যে রোদ কড়া হ'য়ে উঠে দূরের দিকে বায়ুমণ্ডল ঝিলমিল ক'রে কাঁপছে। চিলগুলি খুব উঁচু থেকে পাক খে খেতে খানিকটা নেমে এসে, আবার উল্টো পাকে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে। ডাইনের দিকে আকাশের গায়ে লোহার ব্রিজ পদ্মার।

ষ্টেশনে লোকজন নেই। প্ল্যাটফর্মের বাইরে একটা ছোট আমগাছের ছায়ায় ব' সুরো ট্রেনের প্রতীক্ষা করছে। প্ল্যাটফর্মের বিপরীত প্রান্তে একটা হাত তিনেক উ তাঁবু খাড়া রোদে পুড়ে যাচ্ছে। তাবুর কাছে রূপার রং করা গুটি কয়েক টেলিগ্রাফে পোষ্ট, পাকানো তারের বাণ্ডিল। সে গুলো এত উত্তপ্ত হয়েছে, মনে হয় চোখে লাগ সেদিকে চাইলে। পেতলের বড় বড় থালা মেজে নিয়ে কয়েকজন মজুর শেষবারের ম তাবুটাতে ঢুকেছে আধঘণ্টা আগে। কোন দেশীয় এরা কে জানে। পশ্চিমের নয়, সুরো ওদের কথায় বুঝতে পেরেছে। কি কুচকুচে কালো, চুলগুলি ভেড়ার লো মতো, চোখগুলি লাল কড়মচা। পায়ে ভারি ভারি জুতো, আর কালচে সবুজ র প্যাণ্টপরা।



সুরোর পেছন দিকে জঙ্গল ভরা প'ড়ো জমির মধ্যে দিয়ে গ্রামে যাবার পথ। ব্রিজটা অত্যন্ত উঁচু, তার ধরা-ছোঁয়া পাওয়ার জন্য গ্রামের জমি থেকে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মও উঁচু। এত উঁচু যে বড় বড় তালগাছ গুলিও পায়ের নিচে থাকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালে।

সোনালি লতায় ভরা একটা আমগাছের আড়াল থেকে একটা ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে। আগুন নাকি, ভাবল সুরো। নিচের দিকে ভালো ক'রে চাইল সে আবার। ধোঁয়ার পাকটা এগিয়ে আসছে। ধুলোর থাম—তা হ'লে বোধ হয় পাল্কি আসছে। বেহারার পায়ে পায়ে ধুলো উড়ছে, ঘুর্নিপাকের মতো। ভাবল সুরো। সুরো ভালো ক'রে চেয়ে দেখল—একজন কে আসছে ঘোড়ায়।

ক্লান্ত অলস অবসর। সোজা হ'য়ে বসে সুরো স্বগতোক্তি করলে—"ভগোমানের মতো বড় মাকড়া"। বৃহত্ত ও মহত্তের সমন্বয় না হ'লে এমন জাল কে বুনতে পারে লোহা দিয়ে ?

জল ও জঙ্গল নিয়ে, জাঙ্গাল—বাঙ্গাল বাংলা দেশের এক গৈ-গাঁয়ের মেয়ে সুরো। ব্রাত্য 'সান্দার'বংশে তার জন্ম। বাপ নেই ভাববে, মা নেই কাঁদবে; গাঁয়ের পরিসীমার সাথে সম-আয়ত ছিল তার মনের বিস্তার। গ্রামের মধ্যে গাঁ, বড় গ্রামের অংশ ছোট গ্রাম। পদ্মার চড়ে বসান গাঁয়ের একটির নাম বুধেডাঙা, তারই মেয়ে সে। বাউল-পীরের গানে গানে ছড়ান, কথক পাঠকের মুখে মুখে রঙান ধর্ম-দর্শন ন্যায়-নীতির প্রবেশ হয় নি তার মনের সীমায়।

ধান যখন নোতুন আসা বৌএর মতো পাত্রে-অপাত্রে অকাতরে সলজ্জ হাসি বিলোচ্ছে, তখন আহার করা, ধানের দিন সরে যেতে যেতে উপোস সুরু করার অভ্যাস ছিল তার; কিন্তু বাঙাল নদীর দুপারে সেবার এক দুর্ভিক্ষ এল। সান্দারদের সকলের জন্য অবধারিত নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেল সুরো। তারপরে গ্রামের বাইরের জীবন। র‍্যাল, হাউই জাহাজ, সোলজর। আঘাতে আঘাতে তার মনের পরিসীমা বিস্তৃত হ'তে লাগল।

বাঙাল নদীর একখানি হংসপক্ষ বিধুনিত দৃশ্যপটে সহসা যদি বনরাজির মাথা ছাড়িয়ে ধোঁয়া কলের চোঙ্ জেগে ওঠে, যদি চোঙের ফাঁকে ফাঁকে হাঙর রঙের লোহার পাখী গর্জন ক'রে উড়ে যায়, সুরোর মনের তুলনাটা দেয়া যায় তা' হ'লে।

ট্রেনের অপেক্ষা নয়, প্রতীক্ষা করছে সুরো। এ ষ্টেশনটায় মেল ট্রেন থামে না। কিন্তু সে খবর পেয়েছিল টেপির মুখে, আজকাল বড় বড় ট্রেনগুলিও আকস্মিক ভাবে এ ষ্টেশনে থেমে যায়; সাহেব সুবো নামে কখনো, বেশির ভাগই নামে বুটপড়া, প্যাণ্টপড়া মজুররা। সে নিজেও কয়েকবার এ ষ্টেশন থেকে ট্রেনে উঠেছে। সুবিধা এই, পুলিশের ভয় এখানে নেই। দিঘার ষ্টেশনে চালের কারবারিদের ছোট পুঁটুলি নিয়ে পুলিশের লোকরা

বড় জুলুম করছে। কিন্তু ট্রেন না থামতেও পারে, কোন ট্রেনটা থামবে তারও নিশ্চয়তা নেই। সকাল থেকে দু'তিনখানা না থেমে চলে গেছে; যে কোন একটা থামবেই এই আশা নিয়ে সুরো প্রতীক্ষা করছে।

সুরো ধরমর ক'রে উঠে বসল এবং অনুভব করল নিশ্চয়ই সে একটু ঘুমিয়েও পড়েছিল। চোখ মেলে যা দেখল তাতে মুখে কথা সরল না। ছ'ফিট্ উঁচু নিরেট পুলিশের দলা। দিঘা থানার বড়দারোগা ছাড়া আর কেউ নয়। সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, সজাতীয়দের আলাপে যা কল্পনা করেছিল তার চাইতেও দৃঢ় এর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, তার চাইতেও ফরসা। খাকি রঙের বুক খোলা সার্ট; টুপির নিচে কৌশলে বসানো রুমাল দিয়ে দুটি কান, ঘাড়ের অনেকটা ও খানিকটা ক'রে মুখ ঢাকা। সুরো চোখ নামিয়ে পায়ের দিকে তাকাল। চক্ চকে চামড়ার হাটু পর্য্যন্ত উচু জুতো। জুতো নিয়েই জন্মেছিল নাকি? নতুবা এ জুতোয় পা যায় কি ক'রে? কিন্তু ধক্‌ধক্ ক'রে উঠল সুরোর বুক, আর কিছু দেখবার সাহস তার অবশিষ্ট রইল না। এখন যদি একটা ট্রেন এসে থামত এবং ট্রেনের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে তার দলের লোকরা ডাকত তাকে, সুরো উঠতে পারত না; দারোগার দৃষ্টি তাকে যেন মাটির সাথে গেঁথে দিয়েছে।

কিন্তু কনকদারোগা কথা বললে।

সুরো পৃথিবীতে কোন দারোগাকেই চিনত না, কনক হোক কিম্বা হিরণ। কিন্তু এমন প্রকাণ্ড, এমন সুন্দর দারোগা কনক ছাড়া আর কে হবে। সান্দারদের মুখে মুখে গত চার বছর ধরে কথা।

সান্দারদের জাতশত্রু পুলিশ। শত্রুতা এখনকার দিনে আর সক্রিয় নয়, তবু রক্তে মিশে আছে। সরকারের কাগজ পত্রে সান্দারদের নাম অপরাধ-প্রবন উপজাতী হিসাবে লেখা আছে। তারই নিয়ম অনুসারে প্রাপ্তবয়স্ক সান্দারদের সপ্তাহে একদিন গিয়ে থানায় হাজিরা দিতে হয়। এটা গা-সওয়া ব্যাপার হ'য়ে গিয়েছিল। তবু জাত-শত্রুতা এমনই জিনিস, থানা থেকে ফেরার পথে কখনো কখনো কোন এক সান্দারের মেজাজ বিগড়ে যেত, পুলিশকে উত্যক্ত করার জন্যই পথ চলতে কারো পকেট কাটত, কিম্বা দোকান থেকে দুটো টাকার মাল সরাত। হৈহৈ, পুলিশ আর সান্দারের দ্বন্দ্ব লেগে যেত। কিন্তু যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সে সব আন্তর্জাতীয় ফুটবল খেলা। কনক দারোগা দিঘায় আসার পর থেকেই ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়িয়েছিল। সান্দাররা এমন ভয় কোন দারোগাকে কোনদিন পায় নি। দুরন্ত ছাত্র যেন হঠাৎ এক নির্দয় মাষ্টার মশাইএর সামনে পড়ে, ক্লি ক'রে কি ক'রে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে। কনকের দৃষ্টি সান্দারের অন্তঃস্থল দেখতে পায়। অন্য কোন দারোগা হ'লে সুরো ব্যাপারটাকে নিছক দুর্ঘটনা মনে করত। ভাবত ভাগ্যের বিরূপতায়



দারোগার পরিক্রমায় সে পড়ে গেছে। বেআইনি চালের কৌশলগুলি প্রয়োগ ক'রে দারোগাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত। কিন্তু কনক দারোগা, কনকই। এ কথা না ভেবেই বলা যায়, ভাবল সুরো, কনক তার খোঁজেই এই দুপুর রোদ মাথায় ক'রে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে।

কনক দারোগা বললে,—বাড়ী কোথায় তোর? উত্তর পাবার আগেই ধমক দিয়ে ওঠল,—চোপরাও বেটি, মিথ্যা বলবি তো!

—জে, বুধে ডাঙা।

স্ত্রীলোক না হ'লে কনক দারোগা তার অনুশীলিত ইংরেজি গালির বাংলা তর্জমায় বিধ্বস্ত করে দিত। নিজেকে একটু সামলে বলল,—সান্দার?

কুণ্ঠা ও ভয়ের দলাটা গলা থেকে নামিয়ে সুরো বলে,—জে, চালের কারবার করি। এখন চাল সঙ্গে নাই।

কনক হো হো ক'রে হেসে উঠল। প্ল্যাটফর্মে সুরো ছাড়া দ্বিতীয় শ্রোতা নেই, হাসিটা প্রতিধ্বনিত হ'য়ে নিজের কানে ফিরে আসতেই হাসিটার মাঝখানে কেটে একটা কথা বসিয়ে দিল সে—সুরো তুই?

সুরো এবার উচ্ছ্রিত জানুতে মুখ গুঁজে বন্দুকের গুলির প্রতীক্ষা ক'রে কাঁপতে লাগল।

কনক বললে,—আমি সব খবর রাখি। তুই, ফতিমা এ সব কে কে চালের চোরা কারবার করছিস খবর পেয়েছি। তা কর, কর। কি করবি আর।

সুরো মুখ তুলে দেখল কনক দারোগা প্ল্যাটফর্মের অপর প্রান্তে চলে গেছে। জুতোর চাপে গুঁড়ো পাথরগুলি সর্‌সর্ করছে। কি একটা যন্ত্র বার ক'রে কনক একবার পরীক্ষা করল। ও জিনিসটার সাথে পরিচয় নেই সুরোর। দারোগার কোমরে চামড়ার খাপে যখন ঝুলছে তখন বন্দুক ছাড়া আর কি। ছোট বন্দুক: এই ভাবল সে। এই দুপুরের নিস্তব্ধতায় কনক যদি একটি গুলি তার বুকে বসিয়ে দেয় কেউ জানতেও আসবে না, খোঁজও করবে না। কিন্তু তবে আর দেরি কেন? সুরোর হঠাৎ মনে হ'ল: কনকের বোধ হয় কষ্ট হ'চ্ছে। কার কাছে যেন সে শুনেছিল কনক সান্দারদের এক রকম ভালো বাসে; এও বোধ হয় তাই। অপরাধের শাস্তি দিতে কনকের মন সরছে না। সুরোর মনে হ'ল সে কেঁদে ফেলবে।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কনক আবার তার সামনে এসে দাঁড়াল।

—তুই তো সান্দারদের মেয়ে, চিকন্দির সান্ন্যাল বাড়ীতে গিয়েছিস কখনো?

—জে, গেছি।

—সান্ন্যাল মশাই এর ছেলে পুলে কয়টি জানিস?

—জে না।

—সান্ন্যাল মশাইয়ের বড় ছেলেকে দেখেছিস ? তুই দেখবি কি করে।

কনক আবার দূরে চলে গেল।

অনেক নিচে ষ্টেশন বাড়ী। সেখানে ঢং ঢং ক'রে ঘণ্টা দিল। গাড়ীটা এখনই এসে পড়বে, তারই প্রস্তুতি। প্রস্তুতি বলতে যা বোঝায় তা নয়। টিকেট কাটার সোরগোল নেই, কুলিদের হাঁকা-হাঁকি নেই। দীর্ঘ সিড়ি বেয়ে মাত্র দুজন লোক ষ্টেশন থেকে প্ল্যাটফর্মে উঠে এল। তাদের মধ্যে একজনের হাতে নিশান, আর একজন সম্ভবত কৌতুকপ্রাণ দর্শক। কনক একবার ঘড়ি দেখল। তা হ'লে আজ এ গাড়ী থামবে। সুরো উঠে দাঁড়াবে ভাবল, কিন্তু কনকের উপস্থিতির জন্য পারল না।

গাড়ী থামল। জানালা দিয়ে কৌতুহলী যাত্রীরা মুখ বাড়িয়ে দেখল ষ্টেশনটাকে। কেউ বা এই প্রথম পদ্মা দেখছে, বলল তার কথা। নিশানওয়ালা লোকটা গার্ডের সঙ্গে কি কথা বলে ছুটল ড্রাইভারের কাছে আর একটি কথা বলতে। কনক ক্ষিপ্র নিপুন হাতে টান দিয়ে উর্দ্দিটা ঠিক ক'রে নিল, টুপিটা মাথায় আর একটু কষে বসিয়ে দিল, পাশে খাপে ঢাকা পিস্তলটা হাত দিয়ে একবার অনুভব করল, তারপর প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

গাড়ীর একটা কামড়া খুলে ঝাঁকা নিয়ে দুজন গ্রাম্য চাষী নামল। ধুলো মাটির তৈরী সহিষ্ণু ক্লান্তির মুখোস আঁটা তাদের মুখে, অন্য কোন অনুভবের লেশ তাতে নেই। কনক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে দেখল। ছফুটের চাইতেও উঁচু বলে যাকে বর্ণনা করা হ'য়েছে এই দুটি চাষীর একটিও সে নয়।

প্লাটফর্মের মাঝামাঝি উঁচু শ্রেণীর একটি কামড়ার দরজা খুলে একটি মহিলা নামলেন। কালো মেয়ে, রুক্ষ চুলগুলি উড়ছে, পরনে সাধারণ শাড়ী। নিজের হাতে ক'রে ছোট সুটকেসটি নামালেন, গাড়ীর ভেতর থেকে একজন সুবেশ বিলেতি পোষাক পড়া ইউরোপীয় তাঁর ছোট হোল্ডঅলটি নামিয়ে দিল। সুটকেশ হোল্ডঅল ষ্টেশনে নামিয়ে মহিলাটি ইউরোপীয়টিকে হাত তুলে নমস্কার করল। কনক এগিয়ে গেল মহিলাটির দিকে, তাঁকে দেখতে নয়। ইউরোপীয়টিকে লক্ষ্য করতে। তার ঋজু দৈর্ঘটা লক্ষ্যণীয়। কিন্তু কনককে বুট ঠুকে শ্যালুট্ করতে হ'ল—লোকটি স্বয়ং পুলিশ সাহেব, একটা পা কাঠের ব'লে তিনি যুদ্ধে যেতে পারেন নি।

গাড়ী ছেড়ে দিলে কনক প্রথম ভাবল ফাইলটা যখন ওঁর সামনে যাবে তখন উনি নিশ্চয় বুঝবেন দিঘা ষ্টেশনে কনক দারোগা কি করছিল ধরাচূড়া এঁটে। খুসি হ'ল কনক, সেই খুসি মনে নিয়ে কনক মহিলাটির দিকে ফিরে চাইল,—ছোট নাক, ছোট কপাল।



দেহবর্ণের মলিনতাকে ছাপিয়ে উঠেছে ঠোঁট দুটির গঠন। আর চোখ; কনক চেষ্টা ক'রে দ্বিতীয়বার তাঁর চোখদুটি দেখল। যেন একটি মীনের ছায়া জলের তলায় স্থির হ'য়ে আছে, এখনই চঞ্চল হ'য়ে উঠবে। চোখের প্রান্ত দুটি রক্তাভ।

—আপনি চিকান্দি যাবেন ?

মহিলাটি একটা ক্ষীণ হাসি দিয়ে কনকের প্রচেষ্টাকে পুরস্কৃত করলেন,—পুলিশদের সব খবরই রাখতে হয়। যাব চিকান্দি, কিন্তু কেউ নিতে আসে নি, চিঠি পায় নি বোধ হয়। আপনি এবার উপকার করুন। একটা গাড়ী টারি।

—গাড়ীটারি এখানে পাওয়া যায় না। আপনি নিশ্চয়ই এই প্রথম আসছেন। সান্ন্যালদের কারো বাড়ীতে যাবেন ?

—আপনার অনুমান ঠিক। সান্ন্যালদের বড় তরফ আমার আত্মীয়। তা হ'লে আমার উপকারটা করবেন তো ?

—সান্ন্যালদের বড় ছেলেকে আপনি চেনেন ?

—আপনাদের বড় সাহেব, ঐ যে আমাকে নামতে সাহায্য করলেন, তাঁর সাথেও এই আলাপই হ'চ্ছিল। খোঁজটা আমিও চাচ্ছি। এতদিন ধারণা ছিল আমার, তিনি আপনাদের অতিথি হ'য়ে আছেন।

—তিনি ?

—তিনি আমার স্বামী।

কনক দৃশ্যত লজ্জিত হ'য়ে উঠল। রক্ত-বিন্দুলেশহীন কপাল ও সিঁথি থেকে চোখ নামিয়ে কনক বললে—আচ্ছা, আমি একটা পাল্কী পাঠিয়ে দেব।

মহিলাটি আবার হাসলেন,—এ জেলায় ঢুকবার সাথে সাথে প্রথমে পুলিশ সুপার, তারপর আপনি, মোটামুটি পুলিশই আমাকে সাহায্য করছে। ধন্যবাদ।

কনক মহিলাটির কাছে বিদায় নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে টুপি খুলে ঘাম মুছল। ক্লান্ত বোধ হ'চ্ছে তার। পিস্তল উঁচিয়ে একটা সাধারণ ডাকাত ধরতে যাওয়ার চাইতে অনেক বেশী ক্লান্ত হ'তে হয় এসব ব্যাপারে।

সুরো গাড়ীর দিকে এক পা এগিয়েছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে কনক মহিলাটির সাথে আলাপ করার জন্য এগিয়ে এল। সুরোর মনে হ'ল যথেষ্ট করুণা করেছে কনক, কিন্তু তার সুযোগ নিয়ে তাঁরই সামনে গাড়ীতে উঠে বসতে গেলে কনক ক্ষমা করবে না।

কিন্তু বিস্ময়ের চাইতে বিস্ময়, উঁচু কেলাসের গাড়ী থেকে নামে যে ভদ্রলোকের মেয়েছেলে সেও কি চালের কারবার করে! নতুবা কনক দারোগা অমন খবরাখবর করে কেন ? ওর বোধ হয় বাক্স বিছানা বোঝাই চাল। চাল, তুমি কত রঙ্গই দেখালে। কনক তা হ'লে

ওর খবর পেয়েই এসেছিল, তার নিজের মতো পাঁচসের চালের কারবারিকে ধরতে দারোগার নিজের আসা একটু অস্বাভাবিকই বটে, ভাবল সুরো।

কিন্তু কনক দারোগার ব্যবহার চিরকালই সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। ধরতেই যদি আসা, ধরলে না কেন?

সুরো উঠে দাঁড়াল। লাইনটা পড়ে আছে, ব্রিজটাও আছে। গাড়ীটা চলে গেছে, আজ আর কোন গাড়ীই ধরবে না। তা হ'লে কোনদিকে যাবে সে! দেড়ক্রোশ পথ ভেঙ্গে গ্রামে যাওয়া যায়। কিন্তু কাল সকালেই আবার দেড় ক্রোশ পথ বেয়ে আসতে হবে ষ্টেশনে। নতুবা যাওয়া দু'ক্রোশ পথ ভেঙে বন্দর দিঘায়। সেখানে অনেক গাড়ী থামে উত্তরে যাওয়ার। নাও যদি পাওয়া যায়, বায়েনের ঘরে একরাত বিশ্রাম নেয়া যাবে।

সুরো বন্দরের দিকে হাঁটতে সুরু করল।

সুমিতি নিস্তব্ধ ষ্টেশনটার চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। পুলিশের ছোট বড়দের সাথে অনায়াসে কথা বলতে বলতে যা হয়নি, এখন সেটা হ'ল; বিজন ষ্টেশনটায় বসে নির্জ্জনতায় তার গা ছম্ ছম্ ক'রে উঠল। ডাইনের ব্রিজটাই বোধ হয় সভ্য জগতের শেষ সীমা। এপারে গাড়ী পাওয়া যায় না, এমন দেশ। গ্রাম সম্বন্ধে সুমিতির ধারণা একেবারে নেই তা নয়। রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবিকা হ'য়ে সে গ্রামে গিয়েছে। সেসব গ্রাম ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ; ডোবা, জঙ্গল ও ক্ষয়িষ্ণু ভগ্নস্তুপ ভরা। কিন্তু সেসব গ্রামে গিয়েছে সে পার্টির মোটরে, সঙ্গে সমবয়সী ছেলে-মেয়ে। মোটর না চলেছে তো গোরু-গাড়ীর বন্দোবস্ত আগেই করা থাকত। চোরুইভাতির উন্নততর, মহত্তর সংস্করণ সে সব পরিক্রমা—এই ধারণা এখন সুমিতির। এখানে এমন বসে থাকার চাইতে পুলিশের সাহচর্য্যও ভালো। কেউ একজন আসবে, এ-খবর যথোপযুক্ত ক্ষিপ্রতার সাথে চাউর হ'য়ে গেছে এ অঞ্চলে; কিন্তু হয়তো গোয়েন্দাদের হিসাবের ভুলেই সান্ন্যালদের বড় বধূর বদলে বড়ছেলেকে প্রতীক্ষা করছিল এখানকার দারোগা। এরেষ্ট ওয়ারেন্টে তেমনি ভুলেই বধূর নাম ওঠে নি। তবু কনক দারোগাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয়া ভুল হ'য়েছে। এই মনে হ'ল সুমিতির। লোকটি ভদ্র। সঙ্গে থাকলে একটা কিছু ব্যবস্থা না ক'রে পারত না। পাল্কি পাঠাবে ব'লে গেছে বটে, কিন্তু অনেক পুরুষের ক্ষেত্রেই দেখেছে সুমিতি, সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের দিয়ে কাজ করানো যত সহজ, অলক্ষ্যে থেকে নির্দ্দেশে ততটা করান যায় না। সুমিতির সেক্ষপীয়র-কর্ষিত মনে যে কথাটা কাঁটা দিয়ে উঠল সেটা এই: সৌন্দর্য্য স্বর্ণের চাইতেও কাউকে কাউকে বেশী প্রলুব্ধ করে।

সান্ন্যালরা জমিদার। কিন্তু তাদের সেই দুর্গ কত্ মাইল দূরে কে জানে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার কথা মনে পড়ে গেল সুমিতির। তার মনে হ'ল চূড়ান্ত ভাবে এতদিন যে সব



প্রতিপক্ষের সম্মুখে বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে সে বিখ্যাত হ'য়েছে তারা ডাকাতে রাজনৈতিক মত পোষণ করে, কিন্তু ডাকাত নয়।

সুমিতি চিন্তা করতে লাগল ঐ মেয়েটির মতো নিরাভরণ এবং মলিন মোটা শাড়ী পরে এদেশে আসা উচিৎ ছিল কিনা; ঠিক এমন সময়ে হুই-হুই শব্দ ক'রে চার পাঁচজন বেঁটে সুঁট্‌কো লোক আলকাতরা-রাঙানো একটা কাঠের বাক্স নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াল। বাক্সটির গায়ে লম্বা দাঁড়া লাগানো, আর সেই দাঁড়ায় কাঁধ দিয়ে বাক্সটিকে লোক কটি ব'য়ে আনছে দেখে সুমিতি বুঝল পাল্কী সেটা। সুমিতি তার সজ্ঞান জীবনে এই প্রথম একটি পুলিশকে ধন্যবাদ দিল এবং ধন্যবাদ দিতে গিয়ে ইংলণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বিষয়কে প্রশংসা করল। সে মনে মনে বলল—লোকটি ইংলণ্ডের পুলিশদের মতো।

কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়া এক আর বাস্তব এক। প্রথম কথা ঐ বাক্সে ঢোকা, দ্বিতীয় কথা—বাক্সে ঢোকা লোক কটি তাকে ভূমি থেকে সংস্পর্শ শূন্য ক'রে কাঁধে তুলবে। তারপর থেকে লোক কটির খুসির ওপরে নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

বেহারাদের আভূমি আনত সেলাম সুমিতি দেখতে পায়নি, এবার তাদের সসম্ভ্রম আহ্বানে ফিরে দাঁড়িয়ে তাকে হাসতে হ'ল। হাসিই একমাত্র মনোভাব যেটা টেনে এনে অন্য মনোভাব ঢাকা যায়। সুমিতি ভয় ঢেকে ভয়ে ভয়ে বললে—সান্ন্যালদের বাড়ী চেন?

—জে, মাঠান, তেনারা মুনিব।

—তোমরা পথ চিনে নিয়ে যেতে পারবে তো!

—জে, আপনি উঠলেই গেলাম সেখানে।

সুমিতি বললে—যদি দরকার হয় কাল তোমাদের দারোগা সাহেব খুঁজে পাবেন?

—তা আর পাবেন না। তিনি তো আমাদের বাড়ীর পরে ঘোড়া থামায়ে পাঠায়ে দিলেন।

সুমিতি ওদের প্রদর্শিত উপায়ে পাল্কীতে উঠে বসল। লোকগুলি অনাহারজীর্ণ কিন্তু অভ্যস্ত হাতে মোটগুলি পাল্কীর ছাদে বেঁধে নিয়ে এক নিমেষে পাল্কীটা শূন্যে তুলে ফেলল। দুহাতে পাল্কীর দেয়াল আঁকড়ে ধরে, দাঁতে দাঁত চেপে সুমিতি চিকন্দির দিকে রওনা হ'ল।

(ক্রমশঃ)

# অনুমাসির খেলনা

## শংকর চট্টোপাধ্যায়

কথাটা বল্লো শ্যামশ্রী অনুমাসিকে। অনুমাসি বল্লেন, তাপস তুমি বড় লাজুক।

তাপস বল্লো, চোখ খোল। কিন্তু চোখ বুঁজল শ্যামশ্রী।

শ্যামশ্রী বল্লো, আজকে চল কোথাও।

তাপস পেল অন্ধকার চোখের আস্বাদ। স্বপ্ন দিয়ে চোখ ঢাকা। উষ্ণ আর ঘুমে ভরা।

—সন্ধ্যার শিশির মনে পড়ে। মনে পড়ে যৌবনের আস্বাদকে। মোমের মত ফ্যাকাসে ঠোঁটে ঠোঁট চাপা অনুমাসির।

তাপস বল্লো, অনুমাসি তুমি কান্নার আর্ট জাননা।

শ্যামশ্রী ঘাড় ফেরাল। ফেনার মত ক্লান্ত সাদা চোখ, শরীরে সমুদ্রের ফেনার লোনা গন্ধ।

—তাপস, তুমি কথা বলোনা।

সন্ধ্যার ধূসরতার ভেতর দিয়ে অনুমাসীর চোখের সন্ধানে তাকালো তাপস। চোখে পড়ল গ্রীবার একটু নরম রেখা, আর খানিকটা অস্পষ্ট শুভ্রতা।

"—এরপর থেকে তোমার আমার মনে শুধু থাকবে এক মৃত প্রেমের শরীর। সেদিন কিন্তু আমি তোমাকে দোষ দেবনা। বলবনা কেন এমন হল—শ্যামশ্রী শুনল তাপসের গলা।

একটুখানি প্রাণের মত উষ্ণ আর নরম। শান্ত, একমুঠো নিঁভুনিঁভু আগুনের মত।

—অনুমাসি, তোমাকে আমার ভয় করে। মধুর ক্লান্তিতে গলে যেতে যেতে বল্লো তাপস।

ঘাসের শরীরে রূপালি শিশিরের চাদর। স্বপ্নের মত জড়িয়ে ধরা শাড়ী। আশ্চর্য্য, অবিশ্বাস্য, অপরূপ।

শ্লথ হাসি মুখের ওপর কাঁপতে লাগলো অনুমাসির।

—অনুমাসি তুমি আমায় কাছে ডেকোনা।

দূরে আকাশের কোন তারা কাঁপুক কিংবা কোন সমুদ্রের নীল জল চাঁদের আগুনে জ্বলুক, তাতে কি এসে যায় অনুমাসির।



আলগোছা চোখ রাখল তাপস অনুমাসির শরীরে। শরীর তার যেন জমে গিয়েছে বিছানার সঙ্গে। তুহিন তুষার।

—ছ্যাখোতো, আমার জ্বর এলো নাকি। রোজ সন্ধ্যায় গাটা কেমন জ্বরো-জ্বরো লাগে। স্পষ্ট প্রশান্ত আহ্বান। হাত রাখল তাপস অনুমাসির কপালে।

—ওটা তোমার মনের ভুল, অনুমাসি।

পাতলা বাঁকা হাসি উজ্জ্বল চোখের কাছ থেকে ঠোঁটের ওপর দুল্লো। অনুমাসি বল্লেন, তাপস, তুমি কাউকে ভালোবাস।

ভালোবাসব। কাউকে ভালোবাসব, স্থির মনের ওপর আকাংখার স্বর ভাঙ্‌লো, মুখে আশ্চর্য্য আভা এলো।

কথাটা বল্লো তাপস অনুমাসিকে। অনুমাসি বল্লেন শ্যামশ্রীকে।—সত্যি তাহলে তোমাদের পেটে পেটে এত কথাও ছিল।

ঠোঁটের ওপর হাসির ঝিলিক আনলেন অনুমাসি। আয়নার চোখে তাকিয়ে। না এখনো আছে। একেবারেই ফুরিয়ে যায় নি। ভাবলেন ধীরে ধীরে। একটু একটু করে। তাপস বড্ড ভীরু। শ্যামশ্রী বর বেশী শান্ত, শীতল, স্থির। খেলনা কখনো উত্তাপ ছড়ায় না। ভাবনায় তৃপ্তি আনল অনুমাসি। এখনো উত্তাপ আছে শরীরে, মজ্জায়। তাপস জানে। ইচ্ছে থাকলে এখনো খুঁজে নিতে পারে। অনুমাসি কৃপন নয়।

### খেলনা ঃ ১

রঙ বেরঙের খেলনার শরীর মুঠোয় পুরলেন অনুমাসি। শ্যামশ্রীর হাতটা ধরলেন শক্ত করে। শ্যামশ্রী ভাবল অনুমাসির কি এক বিশ্রী শখ।

—এত খেলনা নিয়ে কি কর তুমি অনুমাসি। অজান্তেই শ্যামশ্রী বল্লো অনুমাসিকে।

—খেলা করি। অদ্ভুত এক হাসি অনুমাসির। শ্যামশ্রী নিজের মধ্যে সংকীর্ণ হয়ে এলো।

চুলে অনুমাসির হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। হাওয়ার মত হাল্কা আঙুল অনুমাসির।

—ঘুমোও শ্যামশ্রী। রাত অনেক। অনুমাসির গলায় পাতার মর্মর। তুমি ঘুমুলে আমি তবে শুতে যাবো।

—তুমি শোওনা অনুমাসি। ঘুমের গভীরে চোখ পাতল শ্যামশ্রী। বল্লো। অন্ধকারের স্তব্ধতায় একা একা অদ্ভুত লাগল অনুমাসির। ভাবলেন তিনি, দিনের সমস্ত কলরোল যেন

রাত্রির প্রতীক্ষারই গান। তাকালেন শ্যামশ্রীর দিকে। জমির মত প্রাণহীন তার শরীর। ঘুম শরীরে স্থির।

খেলনার চোখে ঘুম। রঙচঙে শরীর একটা করুণার মত, গোপন এক মৃত্যুর মত পড়ে আছে। কতগুলো রঙ-বেরঙের খেলনার মুখ মনে পরল অনুমাসির, শ্যামশ্রীর দিকে তাকিয়ে।

অনুমাসির মুঠোর উত্তাপে শীতল খেলনার শরীর। শ্যামশ্রী শীতল, শান্ত, স্থির।

অনুমাসির চোখে ঘুম-না-আসার ক্লান্তি। ঘরের অন্ধকার চোখের ওপর নেমে আসা। দেহের নরম নিটোলতায় অদৃশ্য রঙ-বেরঙের খেলনার অব্যক্ত কামনা।

তাপস। মৃদু উচ্চারণে ঠোঁট খুল্লেন অনুমাসি। স্বপ্ন জড়িয়ে আসছে গলায়। স্বপ্নের নরম ছায়াগুলো চোখে ঝাঁক বেঁধে নামছে, উড়ছে ঘুরে ঘুরে। ছায়া নেমে এলো তারপর অনুমাসির সমস্ত শরীরে।

রঙ-বেরঙের খেলনার শরীর। শ্যামশ্রীকে মনে পরল অনুমাসির ঘুমের মধ্যে।

তাপস দেখল অনুমাসিকে। অনুমাসির শ্বেত সিঁথিতে উজ্জ্বল আলোর আঙুল।

—তাপস, তোমার শ্যামশ্রীকে ভালো লাগে। তীক্ষ্ণ চোখ। চোখ দুটো তির্য্যক হ'ল, ছায়া পড়ল স্বর্ণাভ গালে।

অনুমাসির প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না তাপস।

বড্ড ঠাণ্ডা শ্যামশ্রী। বড্ড শীতল। অনুমাসির গলায় কর্কশ একটা স্বর শুনলো তাপস।

—শ্যামশ্রী, তুমি বড় ঠাণ্ডা।

—হয়ত তাই, নিচু গলা লম্বা করে হাসল শ্যামশ্রী, মুখের উপর শ্যামশ্রীর চোখ অনুভব করল তাপস।

হয়ত নয়, নিশ্চয়ই তাই। অনুমাসির গলা। চম্‌কাল শ্যামশ্রী। অন্ধকার থেকে আলোয় সরে এলেন অনুমাসি। তাপস দেখল অনুমাসির চোখ বরফ-শীতল।

চুপচাপ। কোন কথা বলল না শ্যামশ্রী। চলে গেল ঘর ছেড়ে। তাপস দেখল শ্যামশ্রীকে মেঝে পেরিয়ে হেঁটে যেতে।

মায়াবী চুল অনুমাসির। মায়াবী করুণ ঠোঁটের রেখা।

—তাপস তোমাকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে। আশ্চর্য্য শান্ত চোখ অনুমাসির

—কেমন আবার দেখাবে? তোমার চোখের ভুল।

—আমার চোখের ভুল! শব্দ করে হেসে উঠলেন অনুমাসি।



—হবে হয়ত। ঠোঁট টিপে হাসলেন।

**অনুমাসির দুঃস্বপ্ন ঃ**

—তাপসকে ভালো লাগা তোমার পক্ষে স্বাভাবিক শ্যামশ্রী। কিন্তু তুমি তো জাননা এই ভালোলাগা তোমাকে ঠেলে ফেলে দেবে এক ব্যথার সমুদ্রে। আশ্চর্য্য উত্তাপ অনুমাসির চোখে। অনুভব করল শ্যামশ্রী।

—সে ব্যথা তুমি চিন্তাও করতে পারো না, কী যে ভীষণ সে যন্ত্রনা! তোমার সমস্ত দিন রাত্রি কুড়ে কুড়ে খাবে। মুখ স্থবির, তুষার অনুমাসির।

অনুমাসির কথা শেষ না হতেই ঠোঁট খুল্লো শ্যামশ্রী।

কিন্তু তবু ভালোবাসা সুন্দর। ভালোবাসা যদি মৃত্যুও আনে, সে মৃত্যু পরম তৃপ্তির। আশ্চর্য্য! কথাগুলো একটু আটকে গেল না শ্যামশ্রীর গলায়। একটুও কাঁপল না তাঁর ঠোঁট।

—এখনো রোদ আছে। এত তাড়াতাড়ি কোথায় বেরুচ্ছ শ্যামশ্রী। অনুমাসির চোখ শ্যামশ্রীর সমস্ত শরীর জরিপ করে এলো।

—একটা জরুরী দরকার আছে আমার। ভ্রূ কুচ্‌কালো শ্যামশ্রী। বাতাসের অস্পষ্ট শব্দ? সোনার পাহাড় বিকেলের আকাশ।

—আগেতো তোমার এত ঘনঘন জরুরী দরকার থাকত না শ্যামশ্রী। তীক্ষ্ণতায় চক্‌চক্ করল অনুমাসির চোখ।

—আজকাল থাকছে। রুঢ় শোনাল শ্যামশ্রীর গলা।

কোন কথা বলতে পারলেন না অনুমাসি। শ্যামশ্রীর কথার উত্তরে অনুভব করলেন, দিন দিন তিনি তার মনের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছেন। হাতের মুঠোয় আর কোনদিন তিনি পাবেন না শ্যামশ্রীকে। কোন দিন না। একটা কান্না কাঁপল অনুমাসির চোখে।

ওরা হাঁটল পাশাপাশি, থামল, ঘাস কাঁপল অন্ধকারে, ওরা কোন কথা বল্লো না। তাপস বল্লো, শ্যামশ্রী, তোমাকে একটু ছোঁব। শ্যামশ্রী সরলো, একটা মমতার আভা এলো তার চোখে। চোখে চোখ মেশাল, চোখ তাকিয়ে রইল।

—এত দেরী করলে কেন শ্যামশ্রী? করুণ শোনাল অনুমাসির গলা।

—এমনি দেরী হয়ে গেল। অস্পষ্ট গলা শ্যামশ্রীর।

চোখ জ্বল্‌লো অনুমাসির শ্যামশ্রীর কথার উত্তরে। আর নয়। খেলনার শরীরে হিংস্র নখেরা ক্ষত আঁকুক।

—তুমি কি ভেবেছ শ্যামশ্রী, আমি কিছুই টের পাই না। কিন্তু আমি সব জানি। সব খবর রাখি আমি। রোজ তুমি তাপসের সঙ্গে দেখা করতে যাও। হিংস্র শোনাল অনুমাসির গলা। আমি বলছি, আজ থেকে তুমি আর কোথাও যেতে পারবেনা।

শ্যামশ্রী কোন কথা বল্লোনা।

**খেলনা ঃ ২**

—কিন্তু আর কতদিন! তুমি কি করবেনা কিছু। আমি কিন্তু আর পারছিনা। নিবিড় শান্তির সোনালী মুহূর্ত চম্‌কে উঠল শ্যামশ্রীর গলার স্বরে।

অস্বচ্ছ স্তব্ধতা।

ভাবল তাপস, শ্যামশ্রী কি বলতে চাইছে?

চোখ টল্‌টল্। চোখের আলো পিছ্‌লে থামলো তাপসের মুখের ওপর।

শান্তি, অন্তহীন অবর্ণনীয় শান্তি।

তাপস বল্লো, শ্যামশ্রী তুমি কাছে এসো, অন্ধকারে আমি তোমায় দেখতে পাচ্ছি না। শ্যামশ্রী সরে এলো।

—না, না, তা হতে পারে না। তোমার সঙ্গে তাপসের বিয়ে কিছুতেই হতে পারেনা। অনুমাসির গলা আর্ত্তনাদ করে ভেঙ্গে গেল।

—কিন্তু, এখন আর তা' ফেরেনা। রেশমি নরম স্বরে কথাটা বল্লো শ্যামশ্রী।

রঙ্-বেরঙের খেলনার শরীরে রোদ জ্ব'ল্‌ছে, ঝল্‌কাচ্ছে। খেলনার শরীরে প্রাণ কাঁপছে। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে অনুমাসির হাতের নাগালের বাইরে খেলনার রঙ্‌চঙে শরীরটা।

অনুমাসি শেষবারের মত হাতের মুঠো শক্ত করতে চাইলেন।

—কিছুতেই হবেনা, তোমার সঙ্গে তাপসের বিয়ে কিছুতেই হবেনা। ঝড়, ঝড়ের উত্তাপ অনুমাসির গলায়।

—কিন্তু কিছুতেই তা তুমি পারবেনা। আমাদের বিয়ে হবেই। অদ্ভুত এক মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গী শ্যামশ্রীর গলায়।

হাতের মুঠোটা খুলে যাচ্ছে। অনুমাসির হাতের মুঠোয় একটা শীতার্ত্ত স্পন্দন।

খেলনাতে চুমু-খাওয়া ঠোঁট মোমের মতো ফ্যাকাশে। চোখ বুঁজলেন অনুমাসি।

# দক্ষিণান্ত

## নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গাড়ীর ভেতর অন্ধকার দুলছে। একটা বিরাট কালো পেণ্ডুলাম যেন। সকালবেলা মোগলসরাইয়ের আগে স্টপেজ নেই আর। চাকায় চাকায় বেড়ে-চলা স্পীডের অস্থিরতা। কত মাইল জোরে ছুটতে পারে এই ক্যানাডীয়ান এঞ্জিনগুলো? পঞ্চাশ—ষাট্—সত্তর?

গাড়ী—অন্ধকার—সময়। এক সঙ্গে ছুটে চলেছে। মোগলসরাইয়ে পৌঁছুবার আগে অনেকগুলো নক্ষত্র ঝরে যাবে। আর অনেক মাইল। আর এলোমেলো সহস্র স্বপ্নের ভিড় ঠেলে চেতনার সীমান্তে এসে চোখ মেলে তাকাবে উর্মিলা। কিন্তু তার আগেই সাপের জিভের মতো ধারালো টর্চের আলো এসে পড়ল উর্মিলার চোখে।

উর্মিলা জাগলনা। তরল ঘুমের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অনুভূতির মতো হয়তো মনে হল ঃ যেমন হয়;—পাশ কাটিয়ে যাওয়া কোনো ষ্টেশনের ইলেক্‌ট্রিকের আলোই বুঝি কাচের জানলা দিয়ে। ঘুমের মধ্যে আচমকা খানিক তপ্ত রোদের স্বপ্নই দেখল হয়তো বা।

কিন্তু টর্চ যে জ্বেলেছিল সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পাথর হয়ে। সেই যে কেঁপে উঠেই টর্চটা নিভে গিয়েছিল, তারপরে তার অবস আঙ্গুল আর টর্চের বোতামটাকে খুঁজে পেলনা। চলন্ত গাড়ির বেপথু অন্ধকারে আশ্চর্য দৃঢ়তায় সে দাঁড়িয়ে রইল স্থির হয়ে। একটা পাহাড়ী নদীর স্রোতের উল্‌টো মুখে প্রাণপণে জল ঠেলে যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—ঠিক সেই রকম।

গাড়ি। অন্ধকার। সময়। সব একসঙ্গে ছুটে চলেছে। বাইরে নয়, তার মনের মধ্যেই। এইবারে তার দুটো পা বেয়ে বেয়ে একটা তীক্ষ্ণ হিমার্ততা উঠে আসতে লাগল ওপর দিকে। একবারের জন্যে মনে হল, যে পথ দিয়ে সে এসেছে, সেই পথ দিয়েই সে ছিটকে চলে যায় বাইরে। কিন্তু হাতের কাছে হঠাৎ কখনো এক শিশি প্রাণঘাতী বিষ পেলে যেমন অকারণে, অর্থহীন কৌতূহলে সেটাকে পরখ করে দেখতে ইচ্ছে করে—তেমনি একটা বিষাক্ত মাদকতায় সে অভিভূত হয়ে রইল খানিকক্ষণ।

তারপর ঃ তারপর সেই ঠাণ্ডা সর্পিল অনুভূতিটা যখন তার বুকের কাছে উঠে আসতে লাগল, যখন একটা নিষ্ঠুর বরফের মুঠি দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল তার হৃৎপিণ্ড, তখন—

তখন আর থাকতে পারলনা। দুপা পেছনে সরে এসে খুট্ করে সুইচ্‌টা টেনে দিল সে।

উজ্জ্বল খরধার আলোয় ভরে গেল কামরা। একটা নিঃশব্দ আর্তনাদ তুলে অন্ধকারটা যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চাকার তলায়।

আর সচকিতে উঠে বসল ঊর্মিলা। সন্ত্রস্তভাবে পায়ের দিকে টেনে দিল শাড়ীটা। চোখের সামনে বিভীষিকার মতো ফুটে উঠল একা গাড়িতে আর একটি অপরিচিত মানুষ। মুখের ওপর নিচু করে নামানো কালো একটা ফেল্ট্ হ্যাটের ছায়া পড়েছে। ছাইরঙা ট্রাউজারের পকেটে একটা হাত পুরে দিয়ে, আর একটা হাত সুইচের ওপর রেখে প্রেতমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

আর্তস্বরে প্রাণান্তিক একটা চিৎকার করে উঠল ঊর্মিলা—হাত বাড়াতে গেল মাথার কাছে অ্যালার্ম সিগ্‌ন্যালের দিকে। সেই মুহূর্তেই ধীরাজ ডাকল, ঊর্মিলা!

চম্‌কে উঠেই নিঃসাড় হাতখানা খসে পড়ল ঊর্মিলার পাশে। কাঠের পুতুলের মতো চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সে। ততক্ষণে মাথা থেকে ফেল্ট হ্যাটটা সরিয়েছে ধীরাজ। সেই লাল্‌চে রঙের কোঁকড়ানো চুল, একটা মোটর দুর্ঘটনার স্মারক ডান চোখের ওপরের সেই কাটা দাগটা। চার বছর পরে হলেও ভুল হওয়ার কারণ নেই বিন্দুমাত্র।

—তুমি!

নিঃশব্দে হাসল ধীরাজ। আর একটা নির্ভুল প্রমাণ হিসেবে ঝিলিক দিয়ে উঠল বাঁধানো দাঁতের দুটো রূপালি ক্লিপ।

—দেখাটা খুব নাটকীয় ভাবে হল, তাই না?—মুখের ওপরে হাসিটা জাগিয়ে রেখেই এগিয়ে এল ধীরাজ—বসে পড়ল ঊর্মিলার কাছে। একেবারে গা ঘেঁষে বসলনা—একটা সৌজন্য-সঙ্গত দূরত্ব বজায় রাখল মাঝখানে। আবার স্তব্ধতা। ছুটন্ত ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দুজনের মনে অজস্র কথা কল্লোলিত হয়ে ওঠার স্তব্ধতা। বিস্ময়ের ঝড়টা ভেঙে পড়বার আগে থমথমে কঠিন স্তব্ধতা।

—তুমি—তুমি!—এবার গোঙানির মতো মনে হল ঊর্মিলার গলা।

নিজের কথাগুলোকে নিয়ে আল্‌তো ভাবে খেলা করবার ভঙ্গিতে ধীরাজ বললে, অনেক দিন পরে দেখা হল ঊর্মি। বড় ভালো লাগছে তোমাকে। একটু মোটা হয়েছ—আরো সুন্দর হয়েছ দেখতে।

আস্তে আস্তে বিহ্বলতার ছায়াটা সরে যেতে লাগল ঊর্মিলার মুখ থেকে। তার জায়গায় কয়েকটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণার রেখা ফুটে উঠ্‌তে লাগল।

—আমার সুন্দর হওয়া না হওয়ায় কী আসে যায়?—মৃদু কণ্ঠে ঊর্মিলা বললে, আমি তো তোমায় বাঁধতে পারিনি। আজ এ গাড়িতে আমি ছাড়া আর কেউ থাকলেই তুমি খুসি হতে।



হঠাৎ হা-হা করে একটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ধীরাজ।

—তুমি কি মনে করো ঊর্মি—এই যোগাযোগটা নেহাৎ কাকতালীয়? মোটেই না। গয়া ষ্টেশনে ট্রেনে উঠতে গিয়েই এই কামরায় তোমায় দেখতে পেলাম। কী করব ভাবতে ভাবতে গাড়িটা দিলে ছেড়ে। খানিকক্ষণ ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে থেকে দরজার হাতল ঘোরালাম। লক্ করা ছিলনা—চলে এলাম ভেতরে।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেনা ঊর্মিলা। প্রশ্ন করলনা, জানলার সূক্ষ্ম জালের ভেতর দিয়ে কী উপায়ে অন্ধকার কামরায় তাকে দেখতে পেল ধীরাজ। বলতে চাইলনা, ঘুমোনোর আগে নিজের হাতেই সে শক্ত করে লক্ করেছিল দরজাটা।

—এ ভারী অন্যায় ঊর্মি—ধীরাজের গলায় অনুযোগের রেশ: এত বড় একটা লেডীজ্ কম্পার্টমেণ্টে তুমি একা। দরজা লক্ না করে ঘুমোতে আছে এভাবে? পথেঘাটে কতরকম বিপদ ঘটে আজকাল।

—তুমি আসবে বলেই দরজা খুলে রেখেছিলাম।

—আমাকে ঠাট্টা করছ ঊর্মি?—ধীরাজ ব্যথিত হল: অবশ্য সে দাবি তোমার আছে। তোমার সম্পর্কে যে অন্যায় আমার হয়েছে তার দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছিনা। তা হলেও এরকম অসাবধান হয়ে চলাফেরা করাটা—

কিছুক্ষণ ধীরাজের মুখের দিকে অদ্ভুত বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল ঊর্মিলা। তারপর:

—পৃথিবীতে সব বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করার ভার ছিল তোমারই। সে ভার তুমি যখন বইতে চাওনা, তখন কোনো বিপদকেই আমার ঠেকাবার সাধ্য নেই। চারদিকের দেওয়াল যার ভাঙা—একটা দরজা লক্ করা না করায় তার কতটুকু আসে যায়?

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল ধীরাজ। মলিন জুতোটা ঠুকতে লাগল মেজের ওপর।

—তোমার কাছে ক্ষমা চাইবনা ঊর্মি। সে জোর নেই। কিন্তু তোমারও তো উপায় ছিল।

—কী উপায়?

—হিন্দুমতে বিয়ে করে তোমাকে জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনে জড়াইনি আমি! সিভিল ম্যারেজ হয়েছিল আমাদের। আদালতে একটা দরখাস্ত করে দিলেই তুমি মুক্তি পেতে আমার কাছ থেকে।

মুক্তি! এতক্ষণে হাসল ঊর্মিলা। মৃদুরেখ—নীরক্ত।

—দূরে থাকলেও আমি তোমার খবর নিয়েছি বরাবর। আশ্চর্য হয়ে ভেবেছি কেন

তুমি এখনো উর্মিলা মুখার্জি থেকে আমার অপরাধকে বয়ে চলেছ। কেন তুমি ফিরে যাওনি কুমারী উর্মিলা মল্লিকের মর্যাদায়?—একটা অনুতপ্ত জিজ্ঞাসায় এসে থমকে গেল ধীরাজ।

জানালার জালের ওপর চোখ রেখে বাইরের তরঙ্গিত অন্ধকারে কী দেখতে চাইল, উর্মিলাই জানে। স্বগতোক্তির মতো বললে, পদবী বদলালেই কি সব বদলায় বলে তোমার ধারণা?

—মন?—নিজের অজ্ঞাতেই ধীরাজ উচ্চারণ করল শব্দটা।

উর্মিলা আবার ধীরাজের দিকে ফিরিয়ে আনল দৃষ্টি—বিদ্যুৎ ঠিকরে পড়ল তা থেকে।

—তুমি তার অস্তিত্ব মানো কিনা জানিনা। কিন্তু ওটা অনেকের থাকে।

—তা হলে—ধীরাজ প্রায় গোঙিয়ে উঠল এবার: তা হলে আজও তুমি আমাকে ভালোবাসো উর্মিলা?

উর্মিলা জবাব দিলনা।

প্রায় আর্তস্বরে ধীরাজ বলল, কিন্তু এর তো কোনো প্রয়োজন ছিলনা। আমাকে মনে রাখবার মতো কিছুই তোমাকে আমি দিয়ে আসিনি। বিয়ের একমাস না কাটতেই যখন আমার চোখের নেশাও কাটল, তারপর দেড় বছরের বিবাহিত জীবনে একটি দিনও তোমার সুখের স্মৃতি নয়! বাবার চেক বইয়ের পাতা জাল করে টাকা চুরি করেছি—স্বীকারোক্তির স্বর্গীয় অনুতাপে উদ্বুদ্ধ গলাটাও একবারের জন্যে ধরে এল ধীরাজের: বন্ধুর স্ত্রীকে ভুলিয়ে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি—

—থাক—থাক।—যন্ত্রনায় বিকৃত মুখে ধীরাজকে থামিয়ে দিলে উর্মিলা: থাক ও সব।

ধীরাজ চুপ করল। তাই বটে। এসব কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়ে লাভ নেই আর। স্বীকারোক্তিটা আত্মপ্রসাদের রূপ নিচ্ছে যেন। অপরাধের তালিকা পেশ করতে গিয়ে যেন নিজের গৌরব প্রচার করছে সে। নতুন করে অস্ত্রোপচার করছে উর্মিলার শুকিয়ে আসা ক্ষতের ওপরে।

—কিন্তু এরকম বিয়ে তো অনেকেই নাকচ করে উর্মি।—ধীরাজ আবার সূত্র ধরল সন্তর্পনে।

—সবাই করেনা।—অল্প অল্প কাঁপতে লাগল উর্মিলার ঠোঁট। হঠাৎ হাতের পিঠে সে চোখের থেকে আড়াল করে ধরলে আলোটা। বড্ড বেশি জোরালো—বড্ড বেশি জ্বালা করছে চোখে। ঝরঝরিয়ে জল নেমে আসবে কিনা কে জানে।

—প্রেম অনেকের জীবনে ঋতুতে ঋতুতে আসে—বারে বারে ফুল ফোটায়।—চোখের জলটাকে কিছুতেই ঝরতে না দেওয়ার প্রতিজ্ঞায়, ঠোঁটে একটা প্রাণপণ চাপ দিয়ে উর্মিলা শেষ করল: কেউ কেউ দেউলে হয়ে যায় একবারেই।



অনুভূতি-কল্লোলিত স্তব্ধতায় আবার নীরব হয়ে বসে রইল দুজন। গাড়ির চাকায় ছিটকে সরে যেতে লাগল দেশকাল—দু' একটি তারা ঝরে যেতে লাগল কৃষ্ণপক্ষের কালো আকাশে। একটা ব্রীজ গুম্ গুম্ করে গুম্‌রে চলল পায়ের নিচে। শোণ? তাই হবে হয়তো।

কী করা উচিত এর পরে? ধীরাজ ভাবতে লাগল। রক্তের মধ্যে একটা উদ্বেলিত আবেগ ঠেলে উঠতে চাইছে। কতদিন পরে আজ সে নতুন করে দেখল উর্মিলার মুখ! পাঁচ বছর আগেকার একরাশ নীল বিকেল, রোমাঞ্চিত সন্ধ্যা, কথা বলা-না বলা রাত্রি—সব এক সঙ্গে দীপিত হয়ে উঠল উর্মিলার মুখে।

এখনি একটা আশ্চর্য মুহূর্ত সৃষ্টি করতে পারে ধীরাজ। আবার পুরোনো দিনগুলোর মতো উর্মিলাকে বুকে টেনে নিতে পারে—ক্ষমা চাইতে পারে, বলতে পারে: সব শোধবোধ হয়ে গেছে। এসো, আবার শুরু করা যাক নতুন পালা। ক্লান্ত, আমিও ক্লান্ত। অনেক অন্ধকার পার হয়েছি—হাতড়ে ফিরেছি অনেক চোরাগলির আনাচে কানাচে। দেখেছি, দাঁড়াবার জায়গা কোথাও নেই—কোথাও নেই আশ্বাসের একান্ত আশ্রয়। আজ আবার তুমি নতুন করে আমার হাত ধরো উর্মিলা! মুক্ত করো আমাকে—আমাকে উত্তীর্ণ করো—

কিন্তু সে সাহস কোথায় ধীরাজের? তিন বছরের বিচ্ছেদ যে প্রেমকে জাগিয়ে রেখেছে, একটা মুহূর্তের ছোঁয়া তাকে ঘৃণার মধ্যে রূপান্তরিত করে দেবে হয়তো। না—সাহস নেই ধীরাজের।

আকস্মিক ভাবে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল উর্মিলা। যেন মুক্তি পেতে চাইল অসহ্য স্নায়বিক পীড়ন থেকে।

—চা খাবে একটু?

—চা!—ধীরাজ নড়ে বসল।

—আছে আমার ফ্লাস্‌কে। হয়ে যাবে দুজনের।

—দাও।—অন্য প্রসঙ্গে সরে যেতে পেরে ধীরাজও যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ভালো হল—এই-ই ভালো হল। পুরোনো দিনগুলো জীর্ণ হয়ে যাক কবরের ভেতরে। তার ওপরে মাথা তুলুক এলোমেলো আগাছার সারি। কোনো একদিন পরিচয় ছিল—আজ দেখা হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। যেটুকু ধীরাজের পক্ষ থেকে বলার একটা নৈতিক কর্তব্য ছিল, তা বলা হয়ে গেছে; উত্তরে যা বলার ছিল, তাও বলেছে উর্মিলা। এর পরে চা খাওয়া যাক সহজ ভাবে। সকাল বেলায় যখন মোগলসরাইতে ট্রেন পৌঁছুবে, তখন বিদায়-সম্ভাষণ জানানো যাবে সৌজন্য-সঙ্গত স্মিত-হাসিতে; হয়তো এমনও বলা যাবে: দুজনে এক সঙ্গে কিছুটা সময় নেহাৎ মন্দ কাটলনা। কী বলো?

বার্থের তলা থেকে ফ্লাস্কটা টেনে আনল ঊর্মিলা। একটা বেতের ঝুড়ি থেকে বে করলে চায়ের পেয়ালা আর প্লাস্টিকের গ্লাস। ছুটন্ত ট্রেনের দোলার ভেতরে যথাসম্ভব চা ঢালল গ্লাসে আর পেয়ালায়। তারপর পোয়লাটা ধীরাজের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, কিছু খাবে?

—না, থাক।

—থাকবে কেন?—কোমল গলায় ঊর্মিলা বললে, অনেক খাবার আছে টিফিন ক্যারিয়ারে।

—না, না—এই অসময়ে কিছু খেতে পারবনা।

চায়ের গ্লাশটা তুলে নিয়ে নিজের জায়গায় উঠে বসল ঊর্মিলা। হাসল একটু। এতক্ষণ পরে তার হাসিটা স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

—ভুলে গেছ সব? ট্রেনে উঠলেই তোমার ক্ষিদে পেত। দিন হোক, রাত হোক —যে ষ্টেশনে যা পেতে তাই কিনে খাওয়ার অভ্যেস ছিল তোমার। পুরী মিঠাই গরম দু থেকে চীনেবাদাম পর্যন্ত।

কথাটা বলেই আবার বিবর্ণ হয়ে গেল ঊর্মিলা। ঘুরে ফিরে সমস্ত আলোচনা আবা সেই ব্যথার জায়গাটায় এসে কেন্দ্রিত হচ্ছে। মুহূর্তে সেটা লক্ষ্য করলে ধীরাজ। গুমো মেঘটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে হেসে উঠল হা-হা করে।

—বাস্তবিক, কী পেটুকই যে ছিলাম! কিন্তু এখন ওসব বদ্‌অভ্যেস ছেড়ে গে ঊর্মি। বয়স বাড়ছে তো! অসময়ে খেলে আজকাল আর সহ্য হয়না।

বয়েস বাড়ছে! তা বটে। সেই আশাতেই তো দিন কাটাচ্ছে ঊর্মিলা। আ কয়েক বছর পার হয়ে যাবে। পাক ধরবে মাথার চুলে, আজকের বেদনা নুন-ঝা স্বাদের মতো আবসরিক রোমন্থনে পরিণত হয়ে যাবে। সেদিন ঊর্মিলার মনে হবেনা কী হতে পারত, কী হয়ে গেছে সে! সেদিন নিশ্চিত হয়ে ভাবা যাবে—যা হওয়ার হয়েই গেছে, এখন শান্ত নির্লিপ্তিতে নিজেকে ভাঁটার মুখে ভাসিয়ে দেওয়ার পালা।

তাই হোক। বয়স বাড়ুক ঊর্মিলারও। সেই নির্লিপ্তির নিরাসক্তিতে সেও সমাহিত হো

—কোথায় চলেছ তুমি? —ঊর্মিলাই প্রশ্ন করল।

জবাব দেবার আগে নিজেকে একবার সামনে নিলে ধীরাজ। তারপর বলল মোগলসরাই।

—ওখানেই থাকো? —জিজ্ঞাসাটা অর্থহীন জেনেও ঊর্মিলা রোধ করতে পারলনা।

—গয়াতে থাকি। ডেরী-অন্-শোণ, মীর্জাপুরেও কখনো কখনো। —ধীরাজ হাস চাইল: সে যাক; তুমি?



—কলকাতাতেই আছি। —চায়ের গ্লাসটা নামালো ঊর্মিলা, অত্যন্ত বিস্বাদ মনে হল চা-টাকে: একটা কলেজে ডেমনষ্ট্রেটারের চাকরি নিয়েছি।

—তবু ভালো। —চাপা উত্তেজনায় ঠোঁটের একটা কোন বেঁকে এল ধীরাজের: আমার বাবার অন্ন তোমাকে মুখে দিতে হয়না। আমার অপরাধে সে অন্ন দিনের পর দিন বিষ হয়ে উঠত তোমার মুখে।

জানলার জালের মধ্যে দিয়ে ঊর্মিলা আবার তাকালো বাইরের দিকে। রাত্রির রঙ ধূসর হয়ে আসছে। আরো—আরো নক্ষত্র ঝরে গেছে। ঝরে গেছে আরো সময়।

—কোথায় চলেছ? ধীরাজই জের টানল।

—দেরাদুন। বাবা আজকাল ওখানেই বদলি হয়েছেন।

—এই গরমে দেরাদুন? হৃদ্যতার আমেজ আনল ধীরাজ।

কাছেই মুসৌরি।—অদ্ভুত দৃষ্টিতে ধীরাজের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ঊর্মিলা: তা ছাড়া তুমি জানো, আমি পাঞ্জাবের মেয়ে।

—মনে ছিলনা।—ধীরাজ সপ্রতিভ হতে চাইল।

আবার নীরবতা। আবেগচঞ্চল নয়, কথামুখর নয়। সব কথা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার —সব অনুভূতি নিশ্চুপ হয়ে যাওয়ার নীরবতা। বিস্ময়, অনুতাপ, আবেগের পালা শেষ হয়ে গেছে। চা খাওয়া, দুটো একটা ভদ্রতাসুলভ বাক্য-বিনিময়—তাও ফুরিয়ে গেল। তারপর?

আর থাকা যায়না—আর বসা যায় না ঊর্মিলার কাছে। এইবার পালানো দরকার—যেমন করে এসে উঠেছিল এই গাড়িতে, তেমনি করে বিনা নোটিশে আবার নিজস্ব কক্ষপথে ছিট্‌কে পড়া। এই ট্রেন যখন দেরাদুনে পৌঁছুবে, তখন এই রাত্রিটিকে ঊর্মিলার অতীত দিনগুলির মধ্যে বিলীন করে দেওয়া দরকার।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকালো ধীরাজ। ট্রেনটা পাংচুয়াল। আর দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে মোগলসরাই। টুকরো টুকরো কথা দিয়ে নৈঃশব্দকে জুড়তে জুড়তে কী করে পার হয়ে গেল এই দীর্ঘ সময়টা।

এবারে মরীয়া হয়ে ধীরাজ জিজ্ঞাসা করলে, তুমি ভালো আছো তো?

—হাঁ, ভালোই আছি।—ঊর্মিলার জবাব। একটা লোহার প্রাচীর পড়ল এইবার। দশ মিনিট ধরে অসহ্য অস্বস্তিতে একটার পর একটা মুহূর্ত গণে যেতে হবে এরপরে। বুকের ওপর চেপে ধরা একটা পাথরের মতো এই নীরবতা নিঃশ্বাস বন্ধ করে আনবে। মোগলসরাই পৌঁছুবার আগেই বাইরে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি ধীরাজ?

না, একটা উপায় আছে এখনো। পকেট থেকে আধ-পোড়া একটা চুরুট বের করে আনল সে। তারের জালটায় চোখ রেখে দুর্ভেদ্য তন্ময়তার আড়ালে হারিয়ে রইল ঊর্মিলা।

ষ্টেশন মোগলসরাই। আরক্ত সকাল। কুলি আর যাত্রীর কোলাহল।

এই ষ্টেশনে নিশ্চয় নতুন যাত্রী উঠবে কামরায়। যদি নাও ওঠে—একটা সুদীর্ঘ দিন পড়ে রইল সামনে। অন্তত ধীরাজ আর ফিরে আসবেনা। ফিরে আসবেনা আর একটা মর্মচ্ছেদী দুঃসহ রাত।

ট্রেনটা থেমে এল আস্তে আস্তে। তারের জালটা তুলে দিলে ঊর্মিলা। বাইরে থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হওয়া এসে পড়ল ফ্যানের বাতাসে জ্জালা ধরা ঊর্মিলার মুখে চোখে।

ধীরাজ উঠে দাঁড়ালো। কালো ফেল্‌ট হ্যাট্‌টা পরে নিলে মাথায়।

—আসি তবে।

—এসো। —অন্যমনস্ক জবাব এল ঊর্মিলার।

একবার কী ভাবল ধীরাজ—কী একটা বলতেও চাইল। ঃ আর কখনো বোধ হয় দেখা হবেনা—এম্‌নি কিছু হয়তো এগিয়েও এল ঠোঁটের কোনায়। কিন্তু কী হবে বলে? কী লাভ?

অবসাদ-জর্জর, আড়ষ্ট পায়ে ধীরাজ এগিয়ে গেল দরজার কাছে। নিরুদ্যম হাতে হাতলটা ঘোরালো।

চকিতের জন্যে মনে হল ঃ কেমন হয় ঊর্মিলার সঙ্গে দেরাদুন পর্যন্ত চলে গেলে? আগের চাইতে আরো সুন্দর হয়েছে—আবার যেন সে নতুন করে আবিষ্কার করেছে তাকে। বলা যায়না—কিছুই বলা যায়না। সব বদলে যেতে পারে, মন বদলে যেতে পারে, আবার ভালো লাগতে পারে ঊর্মিলাকে—

কিন্তু কী মানে হয় এসব পাগ্‌লামির? ধীরাজ নিজেকে সংযত করে নিলে। একটা আকস্মিক প্রেরণায় লাফিয়ে পড়ল নিচের প্ল্যাট্‌ফর্মে। তারপর কোনো দিকে না তাকিয়ে হন্‌ হন্‌ করে হাঁটতে লাগল সামনের দিকে।

—শোনো?—

একটা তীক্ষ্ণ অস্বাভাবিক চিৎকারে ফিরে চাইল ধীরাজ। ঊর্মিলা এসে দাঁড়িয়েছে দরজার গোড়ায়! একটা অপরিচিত তীব্র দ্যুতিতে জ্বলছে ঊর্মিলার চোখ।

—আমাকে ডাকছ? —ধীরাজ থেমে দাঁড়ালো। দু পা এগিয়ে এল মন্ত্রবন্দীর মতো।

ঊর্মিলা অস্বাভিবিক গলায় বললে ঃ টয়লেটের জানলা ভেঙে ঢুকেছিলে, পকেটে নিশ্চয় ছোরা কিংবা রিভলভার ছিল। আমার কাছ থেকেই বা পাওনাটা না নিয়ে ফিরে যাচ্ছ কেন?



বজ্রাহতের মতো কেঁপে উঠল ধীরাজ—একটা অব্যক্ত শব্দও করল হয়তো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঊর্মিলার গলার হারছড়া এসে পড়ল তার পায়ের কাছে। ধীরাজ ছুটে পালাবার আগেই তার দিকে ছুটে এল আর একজোড়া ভারী কঙ্কন—একটা গিয়ে লাগল ডান চোখের কাটা দাগটার ওপরে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল ধীরাজ—খানিকটা গরম রক্ত উছ্‌লে পড়ল চোখে।

দরজার পাশ থেকে তখন সরে গেছে ঊর্মিলা—এসে লুটিয়ে পড়েছে বার্থের ওপরে। এইবারে প্রাণভরে কাঁদতে পারছে ঊর্মিলা। এতক্ষণ পরে॥

### সুরুর সুরের ছড়া

জিৎ কার? জিৎ কার? জিৎ কার?
গীত যার। মৃৎ যার। প্রীত যার।
চীৎকার ভিৎ যার রীত যার
গীত নয়, ঋত নয় হিত নয়
শীৎকার হৃদ তার নিদ তার
শীত-ভয়। পীত-ময়। চিৎময়।

# কবিতার লেখক

**কয়েকটি সনেট ঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসু। একক প্রকাশনী। দেড় টাকা।**

কবি এবং কবিতার লেখক দু'জনকে যে একই গোত্রের মানুষ হ'তে হবে, এমন কোন আর্ষপ্রয়োগ ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পাঠ্যপুস্তকেই লেখে না। ফলে সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যপত্রগুলিতে যে সব কবিতা এবং অক্ষর-মেলানো পদ্য পাশাপাশি ছাপা হ'য়ে থাকে, এদের মধ্যে আসমান-জমীন ফারাক সচরাচর চোখে পড়লেও বাঙালী কবি, সমালোচক, এবং পাঠক কারুরই কিছু বলার থাকে না।

তেমনি, সহরের ছাপাখানাগুলোতে কবিতার বই ব'লে যেসব পদার্থ হামেসাই আত্মদর্শন ক'রে থাকে, তাদের সম্পর্কেও আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য থাকে না। কবি না হ'য়েও যখন এদেশে প্রচুর কবিতার-লেখক বিদ্যমান, তখন বইয়ের ভেতরে কবিতা না থাকলেও 'কবিতার বই'য়ে বাধা কি।

এমন কি, সনেটের বইয়েও আমাদের আপত্তি নেই,—আর সে বইয়ের স্রষ্টা যদি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিতা লেখক হ'য়ে থাকেন।

আমাদের যা কিছু আপত্তি তা হ'লো এধরনের কোন বইয়ের ভূমিকা। শুদ্ধসত্ত্ব বসু লিখছেন: "১৯৩৯ সাল থেকে খাঁটি ইতালীয় এবং ইংলণ্ডীয় সনেট লেখার যে সব পটু এবং পঙ্গু চেষ্টা করেছি.....।"

বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় খাঁটি ইতালীয় এবং ইংলণ্ডীয় সনেট লিখ্‌তে আবার পঙ্গু চেষ্টা করতে হয় নাকি? কথাটা শুদ্ধসত্ত্ববাবুর নিছক বিনয়! এ ধরনের বিনয়-বচনের কোন প্রয়োজনই আমাদের দেশে দেখিনে···এমন কি ভূমিকায়ও না। যে দেশে মোটামুটি ভালো ছড়া লিখ্‌তে জানা কবিতা-লেখক শ্রদ্ধেয় পূর্বসূরী কবির দ্বারাই মহৎকবি বলে নন্দিত হ'য়ে থাকেন, এবং রাম বসু শ্রেষ্ঠ কবি কি মঙ্গলাচরণ শ্রেষ্ঠ কবি—এই প্রশ্ন নিয়ে বিশেষ বিশেষ মহলে হাতাহাতির সম্ভাবনা দেখা দেয়, সে দেশে আবার কবিতা লেখার ব্যাপারে পঙ্গু চেষ্টা ব'লে কোন কথা আছে নাকি? বাংলাদেশের সব কবিতালেখকই তো কবি; হোক না তাঁদের গোত্র ভিন্ন, কুল বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং সেখ গোমানী—বাংলা সাহিত্যের প্রফেসর-সমালোচকদের কৃতিত্বে সকলেরই আসন যেখানে এক, সেখানে শুদ্ধসত্ত্ববাবুর এই আত্ম-নিপীড়নের কোন মানে হয় নাকি?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীনন্দগোপাল অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু'টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেম রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা

মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

PURVASA :: JYAISHTHA—1360 :: REGD. NO.

## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। চলতি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা ( সডাক ) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ( ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেণ্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয় :

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা




খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩

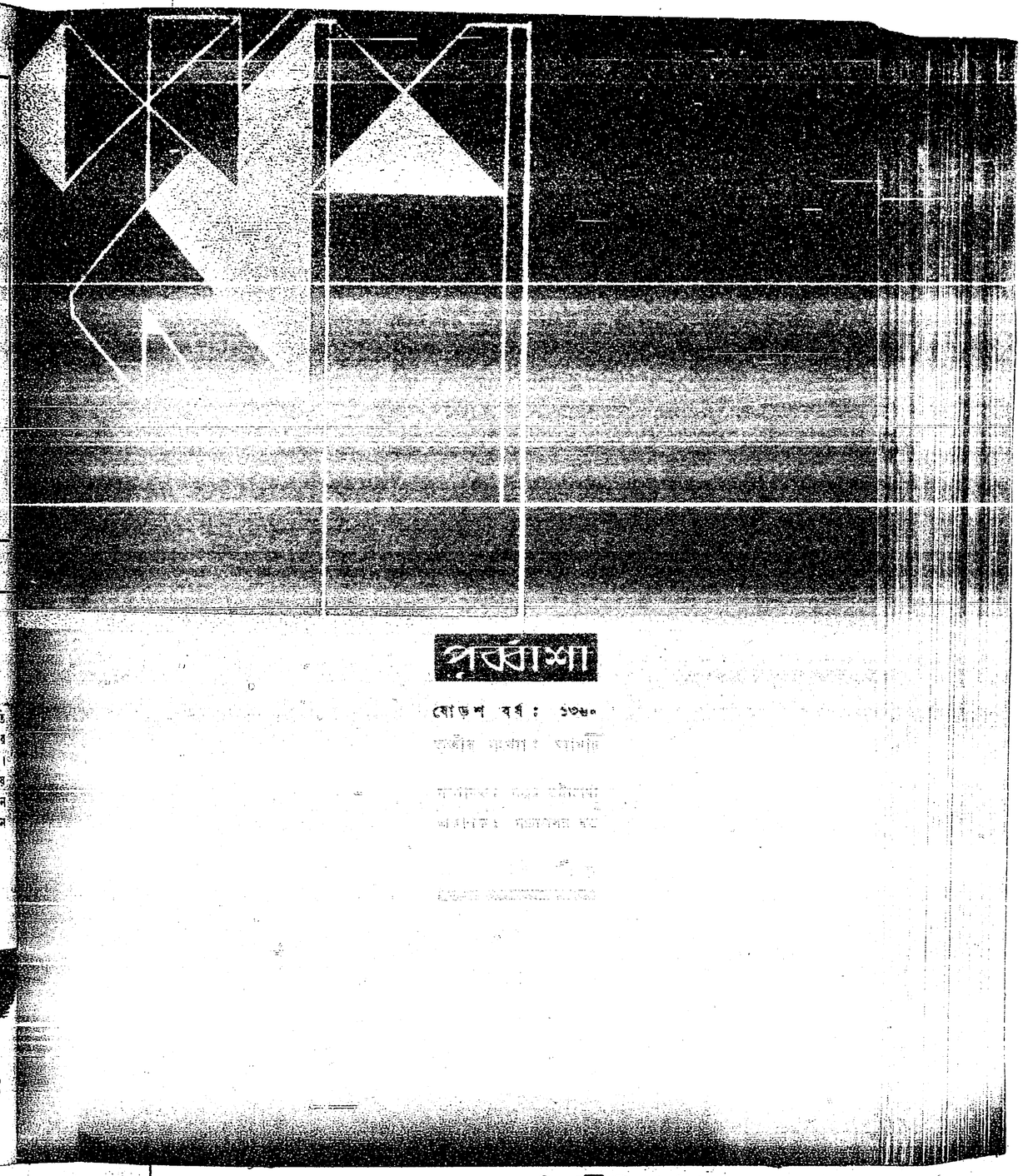

পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০

COLOUR ILLUSTRATION

## পূর্বাশার তিনটি বই

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত

### অপ্রেম ও প্রেম—(গীতিকাব্য)—১৲

'অপ্রেম ও প্রেম'-এর সুজন সহৃদয় সুধী পাঠকের পত্র :

"আপনার প্রেমের কবিতাগুলি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে অতুলনীয় এবং এই ধরণের কাব্যরচনায় আর কোনো আধুনিক বাঙ্গালী কবি এমন সার্থকতা লাভ করেছেন বলে আমার জানা নেই। কাব্য বিচারে আমার অধিকার থাক না থাক, একজন কাব্যামোদী হিসাবে এটুকু বলবার নিশ্চয়ই আমার অধিকার আছে যে 'প্রেম ও অপ্রেম' শীর্ষক কয়েকটি কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, স্নিগ্ধ হয়েছি এবং যে আনন্দ পেয়েছি সেটা বিশুদ্ধতম কাব্যরসসম্ভোগেরই আনন্দ।"

আবু সয়ীদ আইয়ুব

"...প্রাপ্তিস্বীকার করে আপনাকে লিখতে যাচ্ছিলুম যে আপনার নূতন বই সম্বন্ধে আমার মতামত অবিলম্বে জানাতে পারছি না বটে, কিন্তু আপনার কাব্যের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয়ের জোরে এ-কথা এখনই বলতে পারি যে পুস্তকখানি আমার ভালো লাগবে।...সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে, গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়ে দেখলুম যে আমার অনুমান নির্ভুল—কবিতাগুলি চমৎকার লিরিক, বিশিষ্ট রীতিতে রচিত, এবং অভিনব তথা স্বকীয় আঙ্গিকের দৃষ্টান্ত।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

### 'এ হিস্ট্রি অব মোহেঞ্জোদারো'—২৲

ইংরেজিতে লেখা ঐতিহাসিক নিবন্ধ—ইহাতে মোহেঞ্জোদারোর লিপি পাঠ করা হইয়াছে যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। নিবন্ধটিতে মোহেঞ্জোদারোর ইক্ষ্বাকু-বংশের ইতিহাসই বিবৃত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারো সভ্যতা কৌম গণতন্ত্রের শ্রীক্ষেত্র এবং তাহা বাংলাদেশেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

'মদামদী'—(গীতিকাব্য)—শ্রাবণে প্রকাশিত হইবে।

প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিঃ—৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

COLOUR ILUSTRATION

# টুকরো কথা... (২৭)

'সাধনা', ২য় বর্ষ, ফাল্গুন, ১২৯৯ ॥ "...এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ।...রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।... আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে এতদিন পরে বাঙ্গালায় এমন লেখকের অভ্যুদয় হইতেছে যাঁহার লেখা আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের এবং তাহাদের পিতামাতার মনোরঞ্জন করিতে পারিবে।..." যে বইটির রিভিউ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করেছিলেন তার নাম 'কঙ্কাবতী'। লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বিস্মরণের পরমাশ্চর্য ক্ষমতা আছে আমাদের। তাই ত্রৈলোক্যনাথের নাম কানে আজ অপরিচিত লাগে।

ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম ২৪ পরগণায় ১৮৪৭ সালে। তাঁর প্রথম বই 'কঙ্কাবতী' বেরোয় কাজ থেকে অবসর নেবার মাত্র তিন বছর আগে। অদ্ভুত রসের উপন্যাস হিসেবে বইটি বাংলাভাষায় একটি ক্ল্যাসিক। লেখকের জীবন এবং সাহিত্যের মূল্যবান আলোচনা সহ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'কঙ্কাবতী'র নতুন সংস্করণ বেরিয়েছে। ব্যাপক প্রচার বাঞ্ছনীয়।

'কঙ্কাবতী'র লেখক সামাজিক ব্যঙ্গ ঘটিত সরস গল্প-উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন গত শতাব্দীর শেষভাগে। আধুনিক বাঙালী জীবনের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রূপ ভরা রূপক-উপন্যাস লিখেছেন প্র. না. বি : 'মহামতী রাম ফাঁসুড়ে'।

বাংলা উপন্যাসে বিষয়ের বৈচিত্র্য বেড়েছে যথেষ্ট। কিন্তু যুদ্ধ আর মন্বন্তর একদা যত সহজে রচনার উপাদান হয়ে উঠেছিল তার তুলনায় হিন্দু মুস্লিম সমস্যা এবং বাস্তুহারার দুঃখবেদনা যেন লেখকমনকে নাড়া দিয়েছে কম। সমস্যা বৃহৎ, বেদনা সর্বগ্রাসী। তাই তার উপলব্ধি হয়তো চৈতন্যে পৌঁছতে দেরি লাগে। সুমথনাথ ঘোষের 'পরপূর্বা', এবং অবিনাশচন্দ্র সাহার 'জয়া' উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে এই প্রবল সমস্যার যোগ আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস 'নাগপাশ'—দারিদ্র্যের কারাগারে বন্দীজীবনের পাঁচালি। বিলেতে বাঙালীর কাহিনী নিয়ে সম্প্রতি দুটি সুখপাঠ্য উপন্যাস লিখেছেন সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। 'অন্য নগরে'র পরে 'এই মর্তভূমি'। এ উপন্যাসের বিষয় হচ্ছে বিলেত প্রবাসী বাঙালী ছাত্র। অন্য দিকে প্রতিবেশী বর্মী জীবনের প্রেমকাহিনী নিয়ে লিখেছেন হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় : 'উপকূল'। বাংলা উপন্যাসের ভূগোল ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে এটা আশার কথা। প্রবোধকুমার সান্যালের নতুন উপন্যাস 'তুচ্ছ'। লেখায় আত্মজীবনীর ঘরোয়া সুর লেগেছে। তুচ্ছ করবার মতো না। পুরনো কলকাতার জীবনচিত্রটি উপভোগ্য। এই প্রসঙ্গে আর একটি উপন্যাস : প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ পাতাল'। বরেন বসুর নতুন উপন্যাস : 'মহানায়ক'। বিষয় 'নিরপত্তা বন্দী'র জীবন। বৈচিত্র্য বাড়ছে বাংলা উপন্যাসে। সেটাই স্বাভাবিক। কেননা উপন্যাস হচ্ছে শিল্পের সেই আয়না যাতে ছায়া ফেলে সমসাময়িক কালের প্রবাহ। রূপান্তরিত হলেও সে ছবি চেনা যায়।

এ কথা সত্য ছোটগল্প সম্পর্কেও। তার পরিধি ছোট, কিন্তু তাতেই থাকা চাই সমগ্রের স্বাদ। ছোটগল্পের নতুন বই বেরিয়েছে সন্তোষকুমার ঘোষের 'চীনেমাটি'। আর আছে দুর্গাপদ সিংহের প্রথম সংগ্রহ 'সৌরভ' এবং সুশীল রায় আর সুমথনাথ ঘোষের দুটি গল্প-সঞ্চয়ন। বাঙালী পাঠককে ছোটগল্প পড়াতে হলে আর বোধহয় ছোটগল্পের বইকে উপন্যাসের মুখোস পরাতে হবে না। ছোটগল্প জেনেই ছোটগল্পের আদর হবে, যেমন হয়ে থাকে অন্য সব দেশে ॥

এ মাসের নতুন কবিতা সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'আকাশের মুখ'। টুকরো কথা ছাপা হতে-হতে সিগনেট প্রেস থেকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থটি ও বিষ্ণু দে অনূদিত 'এলিয়টের কবিতা' প্রকাশিত হয়ে যাবে। নিখিল-বঙ্গ রবীন্দ্রসাহিত্য সম্মেলনে এবার থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থকে সম্মানিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। পরিচালকমণ্ডলী ১৩৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে নির্বাচন করেছেন জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন'। এটি সিগনেট প্রেসের বই ॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'ক্রন্দসী' আর 'উত্তর ফাল্গুনী'র অল্প কয়েকখানা দুর্লভ কপি সিগনেট বুকশপ সংগ্রহ করেছেন।

সংগীত রসজ্ঞ লেখকদের মধ্যে অমিয়নাথ সান্যালের নাম সুপরিচিত। তাঁর লেখা 'স্মৃতির অতলে' বইটিতে আছে ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ এবং মৌজুদ্দীনের সংগীত সাধনা বিষয়ে অতি মনোজ্ঞ বিবরণ। এই বিশিষ্ট গ্রন্থে শুধু যে ওস্তাদ শিল্পীদের নিবিড় ব্যক্তিগত পরিচয় স্থায়ী হল তা নয়, সেই সঙ্গে লিপিবদ্ধ রইল গানে-গল্পে-সৌহার্দ্যে ভরপুর আশ্চর্য এক মজলিসি জগতের কথা, ইতিমধ্যেই যা অতীতের বস্তু হয়ে উঠেছে। আর একটি বিখ্যাত স্মৃতিকথার ৩য় সংস্করণ হল : বুদ্ধদেব বসুর 'সব পেয়েছির দেশে'। বইটির ১ম অংশ 'শান্তিনিকেতন', ২য় অংশ 'রবীন্দ্রনাথ'। "যুদ্ধ তখনো শেষ হয়নি, দুর্ভিক্ষে গ্রাম উজাড়, নেতারা বন্দী। সেই শ্বাসরোধকারী পরিবেশে" অন্নদাশঙ্কর রায় এবং 'জনকয়েক স্বপ্নদ্রষ্টা' মিলে নবজীবনের নকশা এঁকেছিলেন। এই সময়ে লেখা 'নতুন করে বাঁচা' নামে মূল্যবান দীর্ঘ প্রবন্ধটি ঐ নামেই আরো কয়েকটি সামাজিক প্রবন্ধের সঙ্গে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। চার্লি চ্যাপলিন-কে বার্নার্ডশ 'চলচ্চিত্র জগতের একমাত্র প্রতিভা' নামে অভিহিত করেছিলেন। দরিদ্র আর ভবঘুরের মানসবন্ধু এই চ্যাপলিনের জীবন এবং কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি বাংলা বই মৃণাল সেনের 'চার্লি চ্যাপলিন'।

রবীন্দ্রকাব্য আলোচনার দুটি নতুন বই : মোহিতলাল মজুমদারের 'কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্রকাব্য' (২য় খণ্ড) এবং কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবি পরিক্রমা'। তিন খণ্ডে 'বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' আলোচনা করেছেন অনিল বিশ্বাস। উপন্যাস আলোচনা নিয়ে ১ম খণ্ড বেরিয়েছে। নিরক্ষর বয়স্ক লোকের সংখ্যা এদেশে বিস্তর। অথচ শুধু নিরক্ষরতা দূর করলেই আজ আর এত বড় একটা সমস্যার নিরসন হবে না। বয়স্ক-শিক্ষা বলতে আজ বোঝায় ব্যাপক অর্থে সমাজ-শিক্ষা। নিখিল-রঞ্জন রায়ের 'সমাজ-শিক্ষার ভূমিকা' বইটি উৎসাহী পাঠকের প্রয়োজনে লাগবে ॥

সাহিত্যপ্রসঙ্গের সমস্যা নিয়ে টুকরো কথার একটি প্রতিযোগিতা ঘোষণা করা হয়েছিল গত মাসে। পুরস্কার ছিল রবীন্দ্রনাথের বই। তাতে যোগ দিয়েছিলেন সাকুল্যে ৬টি পাঠক। নির্ভুল উত্তর এসেছিল একটি। পাঠিয়েছিলেন কলকাতার কোনো কলেজের এক তরুণ অধ্যাপক। এ মাসে উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ২৫শে জুন ॥


সিগনেট বুকশপে



১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট

মনের মতো বই পাবেন



সুন্দর কেশই আপনার মস্তকের শোভা

ব্যাঙ্গুরাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশের অকাল পতন দূর করে; কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। সুস্নিগ্ধ এবং গন্ধ সম্পদে অনুপম।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর


# পূর্ব্বাশা

## আষাঢ়—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| উত্তরাপথে পূর্ব্বমেঘ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ১২৩ |
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| একটি কবিতার মন : শ্রীশ্যামল দত্ত | ... | ১২৪ |
| একটি কবিতা : মোহাম্মদ কায়সুল হক | ... | ১২৫ |
| কৃষ্ণচূড়া, কবিতা : শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় | ... | ১২৫ |
| আনমনা : শ্রীমতি নীলিমা বিশ্বাস | ... | ১২৬ |
| মালতীর নামে : শ্রীমতি নমিতা মুখোপাধ্যায় | | ১২৭ |
| মালবিকা রায় : স্বদেশরঞ্জন দত্ত | ... | ১২৭ |
| কোন : নৃপেন্দ্র সান্যাল | ... | ১২৮ |
| তরঙ্গী : আনন্দ বাগচী | ... | ১২৯ |
| সংন্দশ (চর্য্যাপদ) : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ১৩০ |
| দুরভিগ্রহ (গল্প) : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ১৩৮ |
| গড় শ্রীখণ্ড (উপন্যাস) : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ১৪১ |
| সাহিত্য সমীক্ষা : নিখিলকুমার নন্দী | ... | ১৫১ |
| বিবাহিতা স্ত্রী (উপন্যাস) প্রতিভা বসু | ... | ১৬১ |
| দ্বিপ্রহর (গল্প) : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ১৭৩ |
| শিল্পী : জেমস্ জয়স্ : অনুবাদক : অশোক গুহ | | ১৭৪ |
| সাহিত্য বিচার | ... | ১৭৮ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲



কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ১৯



সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

| | |
|---|---|
| মোট চলতি বীমা | ৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲ |
| মোট সম্পত্তি | ২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲ |
| বীমা ও বিবিধ তহবিল | ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲ |
| প্রিমিয়ামের আয় | ৩,৯৪,২২,৩৭১৲ |
| দাবী শোধ (১৯৫২) | ৮৮,৮২, ২৭১৲ |

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ আরবান ও লাভজনক।



হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩



ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।
ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে।


**চা**

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দেয়, সঙ্গ দেয়, দেয় নব নব প্রেরণা।

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB 105


## কেদারা

কেদারা সন্ধ্যারাতের রাগিণী। উপরের আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। প্রিয়-সঙ্গ-সুখ বঞ্চিতাকে দেখানো হয়েছে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে। তার অন্তরের অশ্রান্ত বিলাপ সকরুণ একটি সুরে রাতের আকাশকে আকুল ক'রে তোলে। চাঁদ বুঝি স্তব্ধ হয়ে শোনে তার অতৃপ্ত প্রেমের অশ্রুভরা কাহিনী।


# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ—১৩৬০
তৃতীয় সংখ্যা—আষাঢ়


### উত্তরাপথে পূর্ব্বমেঘ

( শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে )

জতুগৃহ কলকাতা, কতো যে উত্তাপ
তোমার এ-দেহে ছিল, কতো অশ্রু চাও,
আষাঢ় শ্যামায়মান কেন যে মুছাও
বারবার! কুরু-পাণ্ডবের অভিশাপ
কবে হবে দূর? দ্রুপদের ধ্রুবপদ
ডেকে নেবে অহরহ শ্যামাঞ্চল থেকে
মহাভারতের স্বপ্নে বাংলার ছেলেকে!
এমনি কি ঝিকিমিকি ঝিলমের হ্রদ?

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

# কবিতাগুচ্ছ

## একটি কবিতার মন

শ্রীশ্যামল দত্ত

একদিক মৃত্যু আর একদিক জীবনের ডাক :
আমি কোন্ দিকে যাবো ?
কোন্ দিকে গিয়ে আমি এ জীবন নিঃশেষে ফুরাবো ?

অনেক—অনেকদিন জীবন-কে ভালোবেসে
কুড়ায়েছি পথের সঞ্চয়,
কুড়ায়েছি বাসনার সোনা।
আজ মনে হয়
সে আমার ব্যর্থ পরাজয় :
আজ থেকে আর কুড়াবো না।

আজ শুধু মৃত্যু চাই :
একটি শীতল মৃত্যু,
প্রশান্ত ঘুমের মত
নামুক দু-চোখে ;
মুক্তি দিক্ আমাকে এবার।
আর কোনো ইচ্ছা নাই,
আর কোনো সাধ নাই,
আর কিছু নাই চাইবার।

এ জীবনে কুড়ায়েছি
যত সাধ,—সাধের সঞ্চয় ;
সব যাক্,
সব কিছু ভুল।
থাকে যদি থাক শুধু
হৃদয়ের নিভৃতে না হয়
বেদনার দু' মুঠো বকুল।

## একটি কবিতা

মোহাম্মদ কায়সুল হক

হীরক রোদ্দুর হারায়—হারাক !
শুধু তুমি থাকো আর এই মন থাক।
ছাদে-উঠে সন্ধ্যার আকাশ দেখা রোজ,
দূরে কোন পাখী কখন ঝরালো পালক
মনের ডাইরিতে তারি খোঁজ—
থাক এই সব থাক।
আর সব বাজে—হারাক, হারাক ॥

## কৃষ্ণচূড়া, কবিতা

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

চিলেরা দুপুরবেলা একমাথা স্বর্ণরোদ নিয়ে
আকাশে ছড়িয়ে গেলে
অনির্ণেয় ঘড়িয় সময়ে
অজস্র ঘূর্ণন তার দুইহাত একটু থামিয়ে
পৃথিবী আকাশ দেখে। মানুষেরা অবাক আকাশে
খয়েরি-নীলচে-রং
ডানাদের অধীর গরম
বুকে বুকে চেপে চেপে অনুভব কর্তে ভালবাসে।
এ-ভালবাসার মানে চিলে-কোঠা অন্ধকার ঘরে
উৎসুক শিরীক্ষণে অতলান্ত অসীম বিস্ময়
কবিতার কথাকলি, সে-কথার মৃদু অনুনয়ে
ঝাঁক ঝাঁক সুর ঝরে নিরন্তর টুপটাপ স্বরে।

যদিও জীবন গলি—প্রশ্নচিহ্ন তবু বেয়ে গেলে
কোথাও কবিতা আছে আবছায়া আলোক-আঁধারি
মোড়ে মোড়ে সারি সারি
গানের কোরকময় কৃষ্ণচূড়া ধূসর বিকেলে।

## আনমনা

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস

অনেক দূরের রুক্ষ কঠিন স্বপ্ন
জড়ানো আঁখির পল্লবে।
সেখানেতে তুমি হয়তো বা শুধু মগ্ন
মধুর স্মরণে ; তবু প্রিয়-বল্লভে,
মুহূর্ত্ত তরে অবসর ভোলো। মনে করো
দীনহীন, কোনো একজন এসেছিলো কোনদিন
প্রসাদ-ভিক্ষু ; তুমি যদি তা'রে বরো
মনে মনে ; কলঝংকারে কারো বীন্
হ'বেনা মুখর ; অলস দ্বিপ্রহরে
অনেক দূরের রুক্ষ কঠিন মাটি
বিহ্বল মায়া বিস্ময় জাগাবেনা।
জাগো বল্লভে, কেন আজো উন্মনা ?

অনেক দূরের কঠিন তপ্ত দিনে
ক্লান্ত পথিক ফেরে 'যবে পথ চিনে
বিপুল কর্মে বিরতি জোগায়
বেদনা-বিধুর আশা
করুণ সন্ধ্যা হারায় আপন ভাষা।
মনে হয় বুঝি জীবনের সুরু হ'তে
বিফল বাসনা শেষ হোলো এই স্রোতে।
সেদিনো গভীর প্রশান্তি জ্বালে
ভীরু প্রাণে কে যে কবে
স্মরণের দীপে আশ্বাস দেয়
মনে আছে মনে রবে।

## মালতীর নামে

শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

মালতী, জানো, তোমার নামে কবিতা লিখে লিখে
ভরেছি আজ আমার এই গানের খাতাটিকে।
ভরেছি আমি মনের মত অনেক কথা এনে—
মালতী, শুধু তোমার—শুধু তোমার কথা জেনে।

জানিনা তুমি কোথায় থাকো, সে কোন্ রাজপুরী,
তোমার গানে কোন্ বাগানে হাজার ফুল ফোটে,
দেখিনি আমি তোমার চোখে কিসের ফুলঝুরি—
কী মদ আছে হাসিতে রাঙা তোমার দুই ঠোঁটে।

শুনেছি শুধু মালতী, আহা, তোমার নামখানি—
সে-নাম যেন ঈথার থেকে ভাসানো নীল ভেলা,
সে নাম নিয়ে, মাতাল আমি, কতই করি খেলা,
পাগল আমি, সে নামে বুঝি তোমায় ডেকে আনি।

তোমার নামে কবিতা লিখে—বুকের শত জ্বালা
দিয়েছি আজ মালায় গেঁথে—গানের কথামালা।

## মালবিকা রায়

স্বদেশরঞ্জন দত্ত

একটি হাওয়ার হাঁস হতেম যদি
যূই শেফালিকা-কাশ পেরিয়ে নদী
তুষার ফেনিল ডানা
কখনো পেতেম যদি আমি একখানা।
হয়তো যেতাম তবে
চুল-ঘন অন্ধকার যবে
নামবে।

হয়তো সেখানে গিয়ে
আমার ক্লান্তির ডানা থামবে।
একটি হাওয়ার হাঁস হতেম যদি॥

গঞ্জাম নদীর পারে
ছাই মেঘে আলো অন্ধকারে
শুনেছি সেখানে নাকি যায়—
বহুদিন গত-হওয়া আধো-চেনা মালবিকা রায়।

## চোখ

নৃপেন্দ্র সান্যাল

তোমার ওই দু'চোখ জোড়া কুয়াশা-ঘন ঘুম,
ভ্রমর কালো রাত্রি মেখে আকাশ নিঃঝুম
আমার মনে চোখের কোণে বল কি দিলে লিখে,
পারিনা আর পারিনা আমি তাকাতে ওই দিকে।

ধনুক-ভুরু বেঁকেছে, হায় কথার ছুঁয়ে তীর
থেমেছে শেষে হঠাৎ ভেঙ্গে হৃদয় চৌচির।
ও চোখে ঘন বন্য ছায়া, ও চোখে কথা জ্বলে,
ও চোখে বুঝি নেমেছে ঢেউ মন্দাকিনীর ঢলে।

হরিণ চোখ অবাক কেন, কেন বা ছলোছলো?
লুকানো কোনো কথায় যদি, আমায় খুলে বল।
কথায় কাঁপে চোখের পাতা আমি তা' বসে গুনি,
আমার কথা ফুরলো, বল তোমার কথা শুনি।

কাজল টানে ক্লান্তি, চোখে ফেলেছে ছায়া দিন,
কথার আনাগোনায় তারা সুবর্ণ হরিণ।
নিবিড় চোখ গভীর একি কথায় জমে জমে,
কি কথা ওই চোখের পারে বেঁধেছে দানা মোমে?

## তরঙ্গী

আনন্দ বাগ্‌চী

ছোট্ট শরীরে ছায়া মাখি এসো আমরা আজ,
বাঁকা রোদ এসে নিবিড় ঘুমের শিয়র ছোঁয়
ছায়া-হেলা-ছাতে ভুলে যেও আজ সকল কাজ
ছাখো না, দিনের পাপড়িগুলো যে মাটিতে শোয়।

সূর্যাস্তের ফ্রেমে-বাঁধা এই দিগন্ত
মনের দেওয়ালে স্মৃতির ফিতেয় টাঙানো থাক,
অলকনন্দা, আঁখির আলোক নিভন্ত
তাই বিকেলের শেষ রোদটুকু হৃদয় পাক।

লোকায়তে বাঁধা জীবন ছোট্ট ষ্টেশান এক
কালের ট্রেনের হুইসেলে কাঁপে এই দেহ
জীবন বন্ধ্যা। ক্ষণিকা এ-প্রেম। কঠিন ত্যাগ
তাইতো। শরীরে ছায়া মাখি, মোরা র'বো না কেহ।

একটু শরীরে ছোট্ট প্রাণের চড়ুই হই
কাল-সমুদ্রে কি-ঢেউ উঠেছে প্রাণোচ্ছ্বাস
রোদের ডগায় তৃণ-তনু ছুঁয়ে অবাক হই,
মেঘ-কজ্জল মনে মাখি এসো রঙের ঢল।

সেঁজুতি, তোমার রাত-ছুঁই-ছুঁই আঁখিতে তাই
ঋজু-বিদগ্ধ আমার প্রাণের অবগাহন
ক্ষতি কি চড়ুই হ'তে, যদি মন, বারেক পাই
মহাসূর্যের ঝরণা তলায় দেহ-দাহন!

# সন্দংশ

## 'চর্য্যাপদ'

আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়' বা 'চর্য্যা'গুলো নিয়ে যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব হাজার বছর আগেকার বাংলা ভাষার ও বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে ঋক্‌বেদের ভাষার ও সংস্কৃতির কী আশ্চর্য্য মিল ছিল। ঋক্‌বেদের সংস্কৃতি পুরোদস্তর পার্থিব—অন্তত তখন যাঁদের 'শিব' বা 'শিবি' উপাধি ছিল তাঁদের সঙ্গে চর্য্যার শৈব নাথপন্থী পদকারদের মনোভঙ্গী যে সমান্তরাল এ-তথ্য সামান্য পর্য্যবেক্ষণে খুব সহজেই আবিষ্কার করা যায়। 'কায়া-সাধন' বা 'সহজিয়া'-পন্থাকে যোগী বশিষ্ঠের মতবাদের সামনাসামনি উপস্থিত করে আমরা এ-কথাও বলতে পারি: তা হবেনা কেন, বৃজির বা ব্রজভূমির মুনিটি রামায়ণী-যুগেও আমাদের দক্ষিণ-বাংলায়ই—চন্দ্রদ্বীপে—জনকের সঙ্গে গো-বৃষ নিয়ে বসবাস করতেন। 'চন্দ্রদ্বীপে' রামায়ণী গুরুদের গতিবিধি সম্পর্কে ভবভূতি সাক্ষী-বচন তৈরী করে রেখে গেছেন তাঁর 'উত্তরচরিতম্' নাটকে। তাছাড়া ঋক্‌বেদের যে 'বিষণ' বা যদুকুলের গুরু হিসেবে বশিষ্ঠ-ঋষি ইন্দ্রসেবক সুদাসের কাছ থেকে গরু উপহার নিয়ে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেছিলেন, এবং যাঁরা কাশ্যপের পূজনীয় হয়ে উঠেছিলেন, বিষ্ণুপুরাণের সেই যদুকুল হলেন বজ্রযোগিনীর যাদব বর্ম্মণরা। ভোজবর্ম্মার এবং সামলবর্ম্মার তাম্রশাসন এই বংশ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। সামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের চতুর্থপংক্তি 'দা ব্বজ' কথাটি দিয়ে সুরু। যদিও স্বর্গত ভট্টশালীর পাঠ বিশুদ্ধ নয়, তবু তা থেকেও দেখা যায় বিন্ধ্যের ইন্দ্র শৈলেন্দ্র-বর্দ্ধনরা যে এই শূরবংশের বিপক্ষদল এ-কথাও সে-পংক্তিতে ব্যক্ত। 'দা ব্বজ' মানে দুই গোচরণভূমি বা ব্রজ বা বৃজি—পদ্মার দুই কূল,—বারীন্দ্রী এবং যশোহর। যশোহরের প্রাচীন নাম 'ব্রিহ' (ব্রিজ-বুলি এখানকারই—মুরল-ধ্বনিও এখানকারই—'মুরলী'-ও যশোহরের প্রাচীন নাম), কথাগুলো কানিংহাম আমাদের 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পৌছিয়ে দিয়ে গেছেন! আর বারীন্দ্রীর চাষীরা এখনও বলাবলি করেন: পদুমা (পদ্মা) তাঁদের 'বিরিজে' বাঁধনে পড়েছেন। বিলিতি 'ব্রিজ'-বুলিটি প্রাচীন বাংলার বিরিজ বা বাঁধ শব্দার্থ জাত। তেম্নি চর্য্যাপদের 'বেন্ট'-কথাটি, যার অর্থ বাট। ওথেলো তাঁর বেল্টে 'বাট' ব্যবহার করতেন যা একটি বিশুদ্ধ বোট্রি-লাঞ্ছন। অস্ত্র হিসেবে ওটা বঁটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল মৎস্য-দেশে। সেখান থেকে মোঙ্গলের সঙ্গে তার বিলেত-যাত্রা। গাভীর কোমরের দুগ্ধাধার মাফিক মোঙ্গলদের কোমরে চামড়ার তৈরী দুগ্ধাধার থাকত, কোমর-বন্ধনীর বেল্ট নাম মোঙ্গলরা চর্য্যাপদ থেকে বিলেতে রপ্তানি করেছিলেন। এই 'মোঙ্গল'-দের বা মঙ্গল-দের ভট্টি কবি তাঁর 'রামচরিতম্' কাব্যে শূর্পনখাকে গাভী বলেছেন। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন নন্দ-গোপিনী। যেম্নি শাক্যবুদ্ধকে তেম্নি রামায়ণের 'বুষ'-লক্ষণকে এই গোপিনীকুল (ভট্টিকবির ভাষ্য অনুযায়ী গাভীকুল) পরিচর্য্যায় তৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন। লক্ষণ গোকুলের চর্য্যা গ্রহণ করেননি—শাক্যবুদ্ধ তা গ্রহণ করেছিলেন। আর জৈন মহাবীর ত কাশ্যপ হিসেবে সে-মারীচ বংশেরই সন্তান। এঁরা কলিঙ্গ বাসী। মানে কলিকাতার জন্মদাতা। যদিও এই 'কলি' আসাম থেকে প্রথমাগত। 'কলিকা-সূত' নন্দ হিসেবে।

চর্য্যাপদগুলো নেপালী-মনিপুরী লিচ্ছবী বা মৌখরী বংশ থেকে এসেছে—বজ্রযোগিনীর যাদববর্ম্মণরা



মৌখরী হরিবর্ম্মারই বংশধর। তেম্নি তাঁদের পূর্ব্বপুরুষ লক্ষামণ্ডল প্রশস্তির যাদববর্ম্মণ এবং শূরসেনী যাদব বা দুই চন্দ্রগুপ্ত-কুল। তাঁরা মৌর্য ও গুপ্ত 'চন্দ্রগুপ্তে'র বংশধর। ঋক্‌বেদোক্ত 'মুর' এবং 'গোপিতা' উপাধি তাঁদেরই ছিল—'মৌর্য্য' এবং 'মুরলী' কথাটি এই 'মুর' থেকে এসেছে—'ওথেলো দি মুর অব ভেনিক'-ও এই শ্রেণীর মুর বণিক থেকে গেছেন। 'মুর' মানে-ও অনেক রকম ঋকবেদে—তাঁরা 'সুখী', 'নির্ব্বোধ' এবং 'বর্দ্ধমান'।

যেম্নি চর্য্যাপদ তেম্নি ঋক্‌বেদ বিলিতি-বুলির ধারক ও বাহক। ঋক্‌বেদের 'দ্রপ্‌স্' মানে বিন্দু—বিলিতি 'ড্রপস্'-ও তা-ই। 'দ্রৌপদী' নামটি আসামী বোডো-ভাষার 'দি' (নদী) এবং ঋক্‌বেদী ভাষার 'দ্রপ্‌স' মিশে 'নদীর প্রপাত' বা ক্ষুদ্রনদী 'কালী' বোঝাত। কৃষ্ণা কালো যমুনাই ছিলেন। লক্ষামণ্ডলেরই লিচ্ছবী মেয়ে। এই লিচ্ছবীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে এসে শুধু পাণ্ডবরাই নন, অজাতশত্রু এবং চন্দ্রগুপ্তকুল প্রাধান্য অর্জ্জন করেন। আসামে অদ্যাবধি লিচ্ছবীরা আছেন। মনিপুরে দেবদাসীর মতো যাঁরা মনিপুরী নাচে প্রসিদ্ধা তাঁদের নাম লাইছাবি বা লিচ্ছবী। ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত নেপোলিয়নের মতো পোষাক-পরা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের যে-মুদ্রা আছে তাতে 'ৎচ্ছবো' বা 'লিচ্ছোব' অক্ষর আঙ্কত দেখা যায়। এই ৯-কার মোহেঞ্জোদারোতে-ও আছে। এঁরা বিষ্ণুবংশ বা যদুবংশের মানুষ—ভারতবর্ষের আদি সভ্যজাতি। এঁরা কুশদ্বীপী বোডো জাতি, ঋক্‌বেদ যাঁদের 'দাস্যুমভট' এবং 'পণি' আখ্যা দিয়ে অসুর বলেছেন। কিন্তু ভাষার মারফৎ দেখা যায় এঁরা ভারত-কুলের দৃষদ্বতী-সরস্বতী প্রভৃতি নদীর নামের জনক। মোহেঞ্জোদারো এঁদের (পূর্ব্বাঞ্চলের এসীরীয় জাতির) কীর্ত্তিস্তম্ভ। মোহেঞ্জোদারো লিপিতে এরা 'যখ' নামে আত্ম-পরিচয় দিয়েছেন এবং বৈদিক ঋষি ও এসীরীয়দের সঙ্গে মিশে আছেন। ঋক্‌বেদের একদল ঋষি এঁদের বরুণের চক্ষু বলেছেন—যাঁরা বলেছেন তাঁরা 'আত্মীয়-অনাত্মীয় উভয়পক্ষের মানুষ কিন্তু কুলগুরু বশিষ্ঠ ক্ষেপে গিয়েও এবং অভিশাপ-উচ্চারণ করতেও তাদের 'যদু' নামেই আখ্যাত করেছেন।

হাজার বছর আগে এঁরা 'সহজ' হয়ে গিয়েছিলেন। বাংলার সেন-বংশ এই সহজিয়া যদু-বর্ম্মণবংশ-জাত। এঁরা 'কুশান'-'করোন'-'করনিকে' প্রভৃতি নামেও আখ্যাত ছিলেন বলে সেনবংশ কর্ণবংশ। লক্ষ্মণসেনের ঢাকার চণ্ডীমূর্ত্তির (বাগীশ্বরী বা বৈষ্ণবী নারায়ণী মূর্ত্তি) পাদপীঠে 'বজ্রবর্ম্মা'র নাম আছে, তিনিই 'বল্লালসেন'। তিনিই বর্ম্মণদের 'বজ্রযোগিনী' গ্রাম ও বজ্রযান স্থাপয়িতা। হয়ত ভোজবর্ম্মাই যোগিনীমন্ত্রের ইন্দ্রজালে বজ্রবর্ম্মা হয়েছিলেন তারপর যদুবংশের 'সিংহপুরী' বিক্রমের এবং 'স্নেহ'-জাত বলের কথা ('পঞ্চাকার' পুঁথি দ্রষ্টব্য) স্মরণ করে 'সেন' উপাধি পরিগ্রহ করলেন।

তাই বর্ম্মণবংশের যাঁরা ছিলেন সাহজ-লাল, তাঁরা সাহ-জলাল হয়ে দাঁড়াল বল্লালের শ্রীহট্ট (গৌর) রাজ্যে। এই বারুণী নিরাকার বিষ্ণু পূজক নন্দদুলালরা জলের মতো সব পাত্রের আকারই ধারণ করতে পারতেন। সমতটের সমুদ্র-গুপ্ত সমুদ্রাশ্রয়ী বিষ্ণু সেজেও অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ লিখিয়ে কিরাত-ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করেন—কিরাত-গৌড়ের কিরাতীকে বিয়ে করে কালিদাসকে হুকুম করেন, "শুধু রঘুবংশ নয় 'কুমার'-কার্ত্তিকের জন্ম-উৎসব-সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করো—অলকার লিচ্ছবী নিয়ে যেম্নি 'মেঘদূত' রচনা করেছ—এবার রচনা করো ত পণ্ডিত, 'ত্রিস্রোতার'-তীরে বিদেশিনী শৈব নারীকে নিয়ে কয়েকটি পদ। এই রাঢ়পরিবৃঢ়-বধূটির বর্ণনা 'কুমার সম্ভবে'র সপ্তম সর্গে বা সেভেন্থ-

হেভেনে দেখতে পাবেন। তাই এঁদের বংশে আবির্ভূত পাণ্ডব-পাল অধ্যুষিত গৌর-পাণ্ডুয়ার চণ্ডীপরায়ণ দনুজমর্দ্দনও, আবার যদু 'জৎ-লালদীন'-ও। সৎ-লালদীন বা সদ্ধর্ম্মজাত লালদীন হয়ে 'যদু' মুসলমান হননি—চালুক্য-পুলকেসীর ভঙ্গীতে মানব বা সৎ ধর্ম্ম গ্রহণ করে তাঁরই মতো মুসলমান-সুহৃদ হয়ে উঠেছিলেন। চর্য্যাপদের 'নৈরামণি' বা পঞ্জাবের 'অলখ নিরঞ্জন' আত্মচিত্তেরই বিভূতি এবং তার সাধনা বিশুদ্ধ যোগশাস্ত্রসম্মত ব্যাপার। ব্যাপারগুলো ভাগবদ্‌গীতারই এ-পিঠ,ও-পিঠ। কিন্তু আদিপীঠ কামরূপ। চৈতন্যচরিতামৃতেও ব্যাপারটা ব্যক্ত আছে। যোগীর দেশই প্রাচী। আদি মুসলমানরাও তেমন যোগী-পুরুষ ছিলেন। 'পঞ্চরাত্র' এবং 'পঞ্চপীর' ছিল দুই-এর যোগের সেতু। আল-অওল আর অল-বীরুনী-ও ত মুসলমানই ছিলেন! আবার শ্রীমদ্দি গ্রামের 'য়াল' প্রথম মহীপাল বিষ্ণু-পূজক। ঋষ্যশৃঙ্গের মার নামও ছিল 'বীরুণি'। সবই 'পুরুবীর বরুণে'র জল-কেলি বা ইন্দ্রের ইন্দ্রজাল।

মহানাদে যে জালালুদ্দিনের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে সম্ভবত তা যদুর মুদ্রা। তার (ব্রাহ্মী) লিপি রাশি-মুদ্রার অনুরূপ। লিপিগুলো পল্লব-ভঙ্গীর কারুকার্য্যে মণ্ডিত এবং তা থেকে পহলবী অক্ষর আবিষ্কার করা যায় কিন্তু মূল-লিপি ব্রাহ্মী। যেমন 'রৎবিল' বা রথিল-দের মুদ্রাই রাশি মুদ্রা তেম্নি জালালুদ্দিনের মহানাদের মুদ্রা রাশি-মুদ্রা। মহানাদের মুদ্রাটি কূর্ম্মরাশির মুদ্রা—বারুণী গৃৎসমধ কূর্ম্ম ছিলেন। লিচ্ছবী বা বর্ম্মণ মগদের এ-মুদ্রায় 'কূর্ম্ম' কথাটি লেখা আছে কুটিল-ব্রাহ্মী মিশ্রণে—শুধু ব্রাহ্মী-নিরিখে পাঠ হবে 'চরমগ'—চর্ম্ম-পৈতা বা বেল্ট-ধারণকারী গুপ্তচর বা নদীর চরের মগ। চট্টগ্রাম-রাঙামাটির মগদের পূর্ব্বনাম লিচ্ছবী থাকা বিচিত্র নয়, লিচ্ছবী মণিপুর ত কাছাকাছিই ছিল। অর্জ্জুন কিরাত হয়ে লিচ্ছবী চিত্রাঙ্গদাকে বিয়ে করেছিলেন।

লিচ্ছবীর ভৌগোলিক বেল্ট-টি ছিল কম্বুজ ধাম থেকে কাম্বুজ জুড়ে। এক ইরাবতী উপত্যকা থেকে আরেক ইরাবতী উপত্যকা তক। কিরাতরা ছিলেন কামরূপরাজ (যেমন কিরাত 'ঘটক'—ঘটোৎকচ বা ঘটক-শূরবংশ) এবং শিবানুচর আর 'করাইত'রা মোঙ্গল-অনুচর। মোঙ্গল বা মঙ্গল মানে শিব। ব্যাঘ্রতটী যশোহর (সমুদয় সুন্দরবন এলাকা) ভীষণ সুন্দর ('বিষণ সুনর'—ঋগ্বেদী ভাষায়) বাঘ্রবৎ মোঙ্গল বিষ্ণুবংশের মণ্ডল ছিল।

যশোহরের চাটিগ্রাম-প্রবাসী আলাওল কেন প্রথম বাংলা পয়ার বা পদকার লেখেন—কেন যে নেপালে বাংলা-ভাষার অঙ্কুর চর্য্যাপদ পাওয়া যায়—কেন অযোধ্যাবাসী সাকল্যের ঋক্‌সংহিতার নাম 'পদকার', 'সকলে'র মিলিন্দু মুদ্রায় কেন 'বৎসরাজ' কথাটি বাংলা হরফে লেখা এসব তত্ত্ব অতঃপর আমাদের দেশের 'কুল-হীন' মৌর্য্য কুলীনরা হয়ত আবিষ্কার করতে পারবেন এবং আর কস্মিনকালেও তাঁরা বলবেন না যে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির বা সাহেবদের পদসেবা করে আরো একটি শতাব্দী আমাদের বসবাস করা উচিত। তাঁরা যা খুশী করুন এ-প্রবন্ধে আমি চর্য্যাপদের তথা পয়ার বা পদকারের ছন্দ সম্পর্কে খানিকটা কলহাত্মক আলোচনা করে বাংলাছন্দের জটিলতা পরিষ্কার করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হচ্ছি।

তার আগে চর্য্যপদের দর্শন সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা দরকার। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তের জৈন-গুরু (কাশ্যপ-বংশী) গোমত-রায় (গোমতী উপত্যকার মানুষ) যে যাদব ত্রিপুরী-চেদী-কর্ণ বা ত্রিপুরা চন্দ্রি-মল্ল বংশের মানুষ ছিলেন, সেই গোমতী-কূলে তনুকে বৃক্ষ-জ্ঞানে সেবা করা হত। গোমত-রায়



যে মূর্ত্তিতে প্রতিভাত তা তনু-বৃক্ষ। নেপালের গোরখনাথ ত্রিপুরা-রাণী ময়নামতীর গুরু ছিলেন—(ময়নামতী স্তূপ গোমতী উপত্যকায় অবস্থিত। 'ময়নামতী' নামটি অষ্ট্রিক ভাষায় 'ময়-রাষ্ট্র' বোঝায়। 'গোমতী' কিন্তু 'বোডো'-নদী)। তাঁদের যোগাযোগ মোঙ্গল-কিরাত-সম্পর্কে। কিরাতরা শিব-ভক্ত আর মোঙ্গলরা শিব বা মঙ্গল কাজেই ত্রিপুরার ও নেপালের কিরাত নাথপন্থীরা শৈব। মঙ্গল গোরখনাথ-গুরুর কৃপায় এই কিরাতী-মতবাদ (সোমপান, মাংস-ভক্ষণ বা আর্য্যামি) ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয়। তবে নাথপন্থীদের আদিগুরু 'আদিনাথ'। তাঁর মন্দির আরাকান ও চট্টগ্রামের মাঝ-পথে একটি সমুদ্র-দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত। রামায়ণী বশিষ্ঠের কায়া-জাত ব্রহ্মবর্চ্চস্ এই সিদ্ধাদেরই 'শমনিজম্' বা জমদগ্নিবাদ। এঁদের বাড়ব-কুণ্ডে এখনও জলের উপর আগুন-জলে প্রাকৃতিক কলা-কৌশলে বা মায়ার লীলায়।

যা ছিল আদি-পৃথিবীতে মহামায়া মহাপ্রকৃতির লীলা তাকে আত্মস্থ করবার কামনা-ই ঋক্‌বেদে ব্যক্ত। প্রাচীন প্রত্যেক সভ্যতার মনেই এ-কামনা ছিল। জমদগ্নি কিন্তু কাফ্রি-সভ্যতার মানুষ। পরশুরাম (পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় পরশুরাম অঞ্চল এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ড পাহাড় স্মর্ত্তব্য। তাঁদের দৌড় ছিল ভৃগুকচ্ছ পর্য্যন্ত—কম্বুজ থেকে কাম্বুজ পর্য্যন্ত।) তাঁর মৃত্যুর পর তার দেহ খণ্ড-খণ্ড করে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের দিয়েছিলেন। এ-সব আফ্রিকার রাক্ষসীয় ব্যাপার আরণ্যক ব্রাহ্মণদের আমলে ঘটত; কিন্তু নন্দ-মন্ত্রী রাক্ষস বা রাবণ-রাক্ষস কূট-কৌশলী এবং তপস্বী ছিলেন, এমন রাক্ষস-আর্য্য ছিলেন না। বশিষ্ঠ পরবর্ত্তী রাক্ষস-কুলের ঐতিহ্যবাহক তপস্বী। তপস্যা মানে নিজ দেহকে অরণি-কাষ্ঠবৎ অগ্নিগর্ভ করে তোলা। এই যোগীবিদ্যা বশিষ্ঠে দেখতে পেয়েছিলেন আর্য্যরাজ বিশ্বামিত্র। তিনি তেমন হতে চাইলেন—পারলেন না—অতঃপর বশিষ্ঠের মিত্র হিসেবে ইক্ষ্বাকুর অস্তগুরু-পদ পেলেন। ঋক্‌বেদের 'আদিত্য' মিত্রাবারুণি এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণ। মিশরীদের মতো মিশ্রণই বাংলাদেশের জাতিতত্ত্বের মূল কথা এবং সখ্য বা মৈত্রীই তার ভাববাদেরও মূলতত্ত্ব। তন্ত্রিবাহী লিপির গুড়ুফার (গুরুফার) খ্রীষ্টান মেরে খ্রীষ্টান হয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের বংশের লোক বলেই।

বৃক্ষারণি তনুবৃক্ষে আরোপিত করে আজও আমরা শ্রাদ্ধ কর্ম্মে বৃক্ষ (বিরিখ) প্রোথিত করি। এই শ্রাদ্ধ ইক্ষ্বাকু দশরথের মৃত্যুর পর থেকে সীতার যুগে অথবা 'বিরাট' রাজের কৃষি-সভ্যতায় সুরু। তা হয়ত বশিষ্ঠেরই বিশুদ্ধ মতবাদ। বৃক্ষ নিয়ে আরো দূরে যদি আমরা যেতে চাই তাহলে দেখব পার্ব্বত্য-ত্রিপুরার কুকি-জাতি এখনও বৃক্ষদেবতা (বংশদেবতা) বা 'কের'-পূজা (কের=চের=কৈরল) করে থাকে। মালয়ের আদি নাম (বাইবেলের নোওয়ার যুগের) 'ঐর-চের-সোন' (ইরাবতীর চের-পুত্র)। বোঝা যায় কুকি-কিরাতরা মালয়-মোঙ্গলদের বা মেলানিসীয়ানদের পূজো করতেন কিম্বা তাদের বংশের মানুষ। সেপিক জাতি (মেলানেসিয়ান=মিলিত এসিয়ান) এখনও সাগুবৃক্ষ থেকে তাদের অন্নব্রহ্ম (ময়দা) সংগ্রহ করে। এঁরাই নেপালী 'সেরপা' হতে পারেন। উভয় ময়দানবীয় ব্যাপার বৃক্ষ প্রকৃতিই মানুষের জন্যে করে রেখেছে। কাজেই ময়দানবের পুরী তৈরী হল ত্রিপুরায়, নেপাল থেকে গুর্খানাথ গেলেন সেখানে গুরু হয়ে। সেখানে আমাদের দারুব্রহ্ম জগন্নাথও তৈরী হলেন। উপনিষদে (নিষাদ-শাস্ত্র) অন্ন-ব্রহ্ম উদিত হলেন 'অন্নম'-দেশের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতাবাহী মতবাদ নিয়ে। নারকেলের তন্ত্রি-ও সেদিন সভ্যতার প্রতীক ছিল।

দেহকে প্রকৃতির ক্ষুদ্র সংস্করণ ভেবে নেওয়া বস্তুবাদী সাংখ্যের কাজ নয়, বস্তুত তা তান্ত্রিকদের কাজ। এই তান্ত্রিক-মতবাদই সাংখ্যে পৌঁছিয়ে একটি দর্শন-প্রস্থান তৈরী করেছে। বাংলার তান্ত্রিকতা পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন। এই তান্ত্রিকতার সঙ্গে একদিন যাভাবলী, সুমাত্রামালয়, শ্যামবর্ম্মা, সেরিকা শান আসাম এবং অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের লক্ষ-কণ্ঠের সুর মিলিত হয়েছে। সেদিন সেমিটিক 'নোওয়া' মহাপ্রলয়ের পর মৈনস-সিন্ধুতীরে নিঃসঙ্গ। বাইবেলের একটি মানচিত্র তখনকার ভৌগোলিক অঞ্চলগুলোকে দেখায়।

ঋগ্বেদীয় বস্তুতান্ত্রিক তান্ত্রিকতা বা পঞ্চরাত্র ভগবতবাদই চর্য্যাপদগুলোর রচনার পেছনে সক্রিয় ছিল। বিশ্বামিত্র প্রথম শব্দ-ব্রহ্মকে ছন্দের বন্ধনে বন্দী করেন তাঁর আটমাত্রার গায়ত্রী-ছন্দে। কিন্তু ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ-গোষ্ঠী বাক্-দেবতার পায়ে এই ছন্দের বন্ধন পরাতে অনিচ্ছুক ছিলেন। বশিষ্ঠ ঋক্‌বেদে যে ত্রিষ্ঠুভ-ছন্দ ব্যবহার করেছেন, তাতে মাত্রা সাম্য পাওয়া যায়না—তিনি অসম-কেই পছন্দ করতেন, 'আসাম'-কে, বোডো বা ভোট্টরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা-ভূমিকে বা ব্রাহ্মণ ভট্টদের জন্মভূমিকে।

চর্য্যাপদের লুইপাদ, যিনি সম্ভবত লুসাই জাতির গুরু ছিলেন, ঠিক বশিষ্ঠেরই অনুগমন করেছেন। তিনি স্পষ্টতই বলে নিয়েছেন: "এড়ি এউ ছান্দক বান্ধ"—আর্য্যের ছন্দের বন্ধন এড়িয়ে যাও।' 'চন্দ্র সূর্য্যকে পিণ্ডি দিয়ে পৃথিবীর বৈঠা বেয়ে চলো।' ব্যাপারটা বৌদ্ধধর্ম্ম মোটেই নয়—'নিরাকার বিষ্ণু'-পূজক ইন্দ্র-বিরোধী যদুকুলের ধর্ম্ম বা মগদের শাক্ততন্ত্র-যোগ। এঁরা যে 'দেবেশি' বা ভোট্টরাষ্ট্রের অধিবাসী ছিলেন তার প্রমাণ 'শক্তি-সঙ্গমতন্ত্র' 'ষটচক্রনিরূপণম্'-এর টীকা এবং 'জাতক' থেকে আহরণ করা যায়। ভাগবতরা ছিলেন 'সাকায়'-পূজক, ভগবত বৌদ্ধরা 'নিকায়'—বিষ্ণুকুল ছিলেন 'কায়াতে অকায়' সাধক বা 'সীমার মাঝে অসীমের' সাধক। উপনিষদগুলো এঁদেরই দান—কুশদ্বীপ এদেরই সৃষ্টি—কুশধ্বজ, সীরিধ্বজ জনক এই বশিষ্ঠবংশজাত। ভবভূতি তা বলেওছেন। শাক্য-বুদ্ধ এঁদের 'বেলবা' গ্রামে গিয়ে শেষ-বয়েসে ভগবত ধর্ম্ম উপলব্ধি করে এসেছিলেন। থেরীগাথা থেকে এ-খবর পাওয়া গেছে।

বাংলা কাব্য-ছন্দ এ-যুগেও একজন বশিষ্ঠতনয়কে পেয়েছে—তিনি রবীন্দ্রনাথ। তিনি সাংখ্যের প্রকৃত পুরুষ—বন্ধনে গিয়েও বন্ধন-মুক্তির জন্যে প্রাণ-পণ চেষ্টা করেছেন। মুক্ত তিনি হয়েছেন, যদিও ছান্দসিকরা তাঁকে মুক্তি দিতে চাননি।

যাক এখন লুইপাদ-রচিত 'চর্য্যাপদে'র প্রথম চর্য্যার 'ছন্দক-বন্ধন' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলছি। 'কায়াতরু' সেবক লুইপাদ গোমতরায়-এর মতবাদবাহী জৈন বা নাথপন্থী শৈবযোগী, যারা দেহের ছাঁদ্-বাঁধ চাইতেন না, চাইতেন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ভঙ্গী। 'নুডিজম্,' বর্ত্তমান সভ্যতায় যে মতবাদ প্রচার করে দেহের সাবলীল স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে প্রয়াসী ছিল—শৈব বা জৈন দিগম্বর মতবাদ ভারতবর্ষে তা বহুদিন চর্চ্চা করে দেখিয়ে গেছে যে তীর্থঙ্কর ঋষভ এবং বর্দ্ধমানের মতো নিখুঁত দেহ-সৌন্দর্য্যের অধিকারী হতে প্রকৃতির সঙ্গে সত্যিকারের মিতালি চাই। ভারতচন্দ্র-ও তাঁর 'রসমঞ্জরী' নামক চম্পূকাব্যে জানিয়েছেন: "পরিচ্ছদ বিনা শোভা মধুরতা সেই।" ভারতবর্ষের স্থাপত্যে যতোগুলো সুন্দর মূর্ত্তি পাওয়া গেছে—এই দুই পুরুষোত্তমের দেহাবয়বের এবং মুখমণ্ডলের স্নিগ্ধ লাবণ্যের সঙ্গে দাঁড়ালে তাদের প্রত্যেকের শোভা ম্লান হয়ে যায়। লুসাই-পাহাড়ের লুইপাদ ত্রিপুরা-পাহাড়ের গোমতী-



নদীর কূলে গোমতরায়ের সৌন্দর্য্য অবলোকন করে না থাকলেও তার কিম্বদন্তী নিশ্চয়ই অযোধ্যা থেকে শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জানালেন, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ কুশান-কর্ণের ( কর্ণিকে ) বা করণকের, আর্য্য ইন্দ্রের দেহসজ্জার পারিপাট্য ( কোনিষ্ক হুবিষ্ক মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য—পোষাকে 'বেল্ট' ব্যবহৃত ), ছন্দের বন্ধন ছেড়ে পরীর বাহুপাশে এসো। পারীযাত্রের পরী ছিলেন কাশ্যপ বর্দ্ধমান—পরীদের দেখতে পাই আমরা ময়নামতীর ইষ্টকে খোদিত। রাধার বা রাঢ়ার জৈন গোতমের কৃপায় এতদঞ্চলেও পরীরা হয়ত ছিলেন।

লুসাই-গুরুর কথাগুলোর ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ব্যাখ্যাই চলে। সব তত্ত্ব সমন্বিত করেই প্রাচীন যুগে পদ রচিত হত। ভারতবর্ষের ইতিহাস তার অর্থগর্ভ ধর্ম্মশাস্ত্রগুলোর অন্তরালে রয়ে গেছে—মুদ্রায়, মূর্ত্তিতে, শিলালেখে বা তাম্রলিপিতে তা যতোটুকু ব্যক্ত তাকেও সদর্থে উদ্ভাসিত করতে পারে ধর্ম্মশাস্ত্রগুলো। তেম্নি বাংলাদেশের ইতিহাস ব্রত-পাঁচালীছড়া ছেলেভুলনোছড়া-তে ছড়িয়ে আছে—এখানকার পরমহংসরা পথের পাঁচালীই রচনা করতেন, সংস্কৃত-পরায়ণ ছিলেন না। তাঁরা 'মরাল' বা রাজহংস ছিলেন, বিলিতি 'মর‍্যাল' কথাটি তথাগত। শৈব দেবী-ভক্ত চণ্ডীপরায়ণ হতে গিয়েই বঙ্গ ভঙ্গে ভরে গেল! বাংলার আটপৌরে স্বভাব অষ্টসাহস্রিক, অষ্টসিদ্ধা অষ্ট্রিকজাতি থেকে আগত—পৌরসভ্যতা বঙ্গে ছিল কিন্তু সে-পুরী একটি পুরী নয়—আট-রাজার পুরী বা আট সাহর (ব্রাহ্মণ সাহীর) সহর অর্থাৎ সরহপাদ-স্থান। তাকে কেউ বেশি আটসাট করতে গেছে কি সব-কিছু তাসের দেশ হয়ে ভেঙেছে। শূরসেনী ডেমোক্রাসী যদু-লিচ্ছবী বাংলার ডোমিনি-সভ্যতার নিদর্শন।

কাজেই পদ-ছন্দেও বাংলার পদে অবাধ লাস্য ছিল—প্রয়োজন হলে তাণ্ডবও চলত—মর্চে-পড়া মার্চ্চ নয়। দুর্ব্বিনীত গৌড়সেনা সুচারু মার্চ্চে অভ্যস্ত ছিল না—যদি তা কোনোদিন করে থাকে তবে তা হুবিষ্ক-শশাঙ্কের মতো কুশানের বা কর্ণসুবর্ণের প্ররোচনায়। প্রকৃত বাংলার বা প্রাকৃত গঙ্গার ছেলে সমুদ্রগুপ্ত তাঁর পৈতৃক-পোষাক ত্যাগ করে গঙ্গার মতোই 'পিঙ্কনদীসা' হয়েছিলেন। তেম্নি লুম্বিনীর মন ভোলাতে পিয়দসি বল্‌লেন: আমি বৈশ্যের চর্ব্বি-ভেজা অজিন পৈতা ধারণ করলাম ( লাজিন বৈসয়ি বসাভিসিতেন )। বৈশ্যের বৈষয়িক-বিলাসে বসবাস করে মন বিনীত রাখা-ই ছিল মাগধী বাংলার বৈশিষ্ট্য। বিষয়-বিষকে নীলকণ্ঠের ( নীলগ্রীব কণকমুণি ) মতো কণ্ঠে রেখে দেবে ভুক্ত হতে দেবে না, এই সিদ্ধি বশিষ্ঠ থেকেই সিদ্ধাচার্য্যরা পেয়েছিলেন এবং তা-ই দিয়ে তখনকার বাংলার মনের ভিত্তি তৈরী করে গেছেন। বলাবাহুল্য এ মতবাদ দরিদ্র সমাজের দর্শন নয়, বরং উল্টো—পালরাজত্বে বাংলার সমৃদ্ধি সব চাইতে বেশি ছিল এবং সে-যুগের বশিষ্ঠশিষ্য সগর-প্রতিম রাজর্ষি ছিলেন বিগ্রহপাল বা শূরপাল ( শূরসেনী যাদব )। আর্য্য বুধের সঙ্গে বুদ্ধের যোগসাধন করে ( শূরপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে দণ্ডী ও বুদ্ধমূর্ত্তি দ্রষ্টব্য ) তিনি দেখিয়ে গেছেন ভোগী দুর্দ্ধর্ষরাজাও বিশ্বামিত্রের মতো বা রাজচক্রবর্ত্তী সগরের মতো বা সমুদ্রগুপ্ত-অশোক-হর্ষের মতো ত্যাগী হতে পারেন। শূর-বৈরী পারীযাত্রের শৈলেন্দ্র বর্দ্ধনরা যবদ্বীপ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য-বিস্তার করেন, অথবা এ-ও বলা যায় যে যবদ্বীপী শৈলেন্দ্ররা পারীযাত্রের শৈলেন্দ্র বর্দ্ধন হয়েছিলেন সিদ্ধাযোগী বশিষ্ঠের-গোষ্ঠীর কৃপায়।

এখন লুইপাদের প্রথম চর্য্যার পদছন্দ-বন্ধন ও তার মুক্তির দিকে তাকানো যাক। পঞ্চডাল যুক্ত কায়া-তরুবর পঞ্চাল-ডালব্যের কোন্ তরু ছিল তা চিরদিনকার পঞ্চশরই জানেন আর জানেন আকাশ-রাখাল মহাকাল। তাঁদের যে মহাসঙ্গীত 'মহানাদে' শ্রুতির অগোচরে নিত্য নিনাদিত,

পটমঞ্জরীর রজনী-রাগে লুইপাদ দশটি পদে তা ধরতে চেয়েছেন। সেদিন কামদেবতার পুরী কামরূপ ছিল পেরিপ্লাস-প্রণেতা-বর্ণিত 'দ্বিষ্' 'দিষ' বা 'তিষ' জাতিরই প্রাক্‌জ্যোতিষ। তিষ্যরক্ষিতা পুষ্যানক্ষত্রজাত বৃষরাশি রাজাদের রাজপালঙ্কে পুষি-বিড়াল (বভ্রু) হয়ে থাকতেন তখন—হরিণরা বিদ্ধ হত শরে—মাংসাশী রাজন্য-ঋষিদের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে—হরিণীরা জড়ভরতের মতো আর্য্য ব্যাধের মনোহরণ করত। বৃষভানু নন্দিনী রাধা, বৃষপর্ব্ব-দুহিতা শর্ম্মিষ্ঠা, কর্ণপুত্র বৃষকেতু, ঝাঁক বেঁধে বৃষল বৃষভাঙ্ক মৌর্য্য সেন-গোষ্ঠীর নয়ন-গোচর হত। লক্ষণসেন চিনতে পারতেন তিনি যে ভগীরথ-সন্ততি রামায়ণী বৃষ লক্ষণের এবং বোড়োকামতার লয়হরচন্দ্রের উত্তর পুরুষ, বল্লাল-চরিত-কার চিনতে পারতেন সেন-রা যে কর্ণ-বংশ—যাঁরা একদা কর্ণাটক হয়ে অসুর মৌর্য্য (অহুর মজদা) পালদের সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং এই চীনে-পহ্লবীরা সিংহ-সেনহ-সেন রাজ হয়ে অবশেষে আবার গুপ্তসম্রাটদের মতো মলবর-উপকূলকে আশ্চর্য্যচর্য্যার নমুনায় 'উত্তটসাগর'-পুঁথিও দান করেছেন।

এ-ছন্দের ভিত্তি সেদিনকার সংস্কৃতির, সংস্কৃত মালিনীর পনেরো-মাত্রা। কারণ পঞ্চদশী-কুমারী-পূজার প্রথা তখন বাংলায় ষোল আনা। এই মালিনী-দুহিতা প্রকৃতির দুলালী কপালকুণ্ডলা সকুন্তলারা, শকুন্তলার মতো গুরুর আশ্রমে থেকেও রাজন্যদের চিত্ত আকর্ষণ করতে পারতেন কিম্বা রাজ-গৃহে বিদ্যাসুন্দরের বিদ্যার মতো মালিনীর তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হলেও কবি-সুন্দর বিদ্যাপতির খোঁজ করতেন। মৌর্য-সংস্কৃতির মহীপালদেব তখন রাজ-গৃহে কোট্টাল—রাজা হয়ে কুটিল অক্ষর প্রবর্ত্তন করতে তখনও সুরু করেন নি। অর্থাৎ তখন বাংলায় সংস্কৃত-বাংলার লিপি-সংস্কৃতির যুগ। তাই তিন-পদ-ক্রম আর্য্য-মালিনীতে চালিয়েই চর্য্যাটি চতুর্থ পদক্রমে (এবং বাঙালিনী ভঙ্গীতে) চৌদ্দ-মাত্রা পদকারে (৭+৭=বৈদিক 'ত্রিষ্টুভৈ'র ভঙ্গী) মধ্যচ্ছেদ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। সপ্তম-পদে সপ্তপদী ভ্রমণ শেষ। পঞ্চদশীর কাছে সেখানে রাজা দশরথ রথে এসে উপস্থিত—দ্বিষ বা দিষ জাতির 'দশ'-প্রিয় রাজর্ষি—দুর্ব্বাসা না হয় দুষ্মন্ত—কাজেই মিলনের ছন্দে মালিনীর সপ্তম-পদটি ২৫ মাত্রার (১৫+১০)। শেষ-দুটি ছত্রের ভনিতা-পদক্রমে লুইপাদ ষোড়শ-মাত্রার মৈত্রী ষোড়শোপচারে বজায় রেখে সাম্য এবং সৌম্য ভাবটি ষোলকলায় পূর্ণ করেছেন।

এ গেল ছন্দের ঐতিহাসিক দিক। ছন্দের নিজস্ব ভাবের দিক থেকে বলতে গেলে বল্‌ব ইন্দ্রত্ব টুটিয়ে দেবার কথা চর্য্যাটির যে সপ্তম-পদে ব্যক্ত তাতে ১৫-র গণ্ডী পার হয়ে ধ্বনি আরো দশমাত্রা বিচরণ করেছে। তার মানে মূলত ছন্দটি 'বিরাট'—পাঁচ-মাত্রার বিরাট। বিরাটের সঙ্গে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র-ও চলতে পারে—৭ মাত্রার ত্রিষ্টুভের ত তার-সঙ্গে ঋগ্বেদের যুগ থেকে অগাধ সখ্যই ছিল। এই সখ্যের দরুণ তার পনেরো-মাত্রার দেহে আট-মাত্রার জগতী ছন্দ দেখা দেয় এবং পৃথিবীর কবি লুইপাদ বৈদিক আটমাত্রার পদ ধরেই ষোল-মাত্রায় পাদ-পূরণ করেন। বশিষ্ঠ-সখা বিশ্বামিত্রও ইক্ষ্বাকু পরিবারে গুরুর মর্য্যাদা পেয়ে আট মাত্রার গায়ত্রী বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ত রাজর্ষি—ওয়ার্ডস্বার্থের মনোবিহঙ্গমের মতো ওয়ার্ড্সের স্বার্থ-ও বুঝতেন আবার ওয়ার্ডের স্বার্থকতা-ও খুঁজতে চাইতেন। তাঁরা উদাত্ত স্বরে পংক্তি-ধ্বনিতে অনিয়মিত জোর দিতেন যা 'বীট্' (বীট-ব্রাহ্মণাগত?) থিয়োরীর বা বাংলা-যুগ্মবর্ণের গুরুধ্বনির জন্মদাতা। কিন্তু তাঁরা 'বার' থিয়োরী মানতেন না—দুর্ব্বার বলে অনিবার যাত্রা পথই ছিল তাঁদের জীবনের ও ছন্দধ্বনির দুর্গম পথ।



নৃত্যগীতশীল বিরাট দেশের (সুমাত্রা যবদ্বীপ থেকে পঞ্চাল) গোধনই শুধু ভুবন-বিখ্যাত ছিলনা, সেদিন তার উত্তরা-রাও মানুষকে উত্তরাধ্যানী করে তুলেছিল। সে-দেশের পাঁচমাত্রার সঙ্গীতছন্দ নিয়ে যেমন লুইপাদের প্রথম চার্য্যাটি তেম্নি সে-দেশের নেত্রী বাংলার গীতিছন্দেরও প্রাণ পাঁচ-মাত্রা, চার সিলেব্‌ল্ নয়। 'বিরাটে' ক্যাডেন্স ছিল—বাংলা ছন্দের ক্যাডেন্স-ও সেখান থেকেই এসেছে। **চৌদ্দ-অক্ষরের চৌদ্দ মাত্রা কথাটি তন্ত্রজাত** যেখানে স্বরবর্ণ এবং যুগ্মব্যঞ্জন একই রকম বর্ণের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত—গুরুলঘু ভেদাভেদ যে-ক্ষেত্রে অপসৃত। আর **চৌদ্দমাত্রার ছন্দ নামক বিষয়টি বশিষ্ঠের ঋক্‌বেদের সপ্তমাত্রিক ত্রিষ্টুভ-জাত**। বাংলা-পয়ারের জন্ম ঋগ্বেদীয় যোগী-তান্ত্রিকদের কণ্ঠে ব্যাঘ্রতণীতে, 'মণ্ডলস্বামী বলবর্ম্মণ'-এর মতো যবদ্বীপী দূতকের আওতায় (দেবপালের নালন্দা-দানপত্র দ্রষ্টব্য) যাঁদের শাক্ততন্ত্র যোগী বা ঔপনিষদ বা নাথপন্থী ঔপনিবেশিক মানব বলে মনে করা যায়। তাঁরা বৃষল বা আর্য্য রাজন্যগোষ্ঠী—বাংলার রাজপুত্র—ব্রহ্মপুত্র।

চর্য্যাপদের গুরুপাদ-দের হরফের কৃপায় গোষ্পদে বাংলার ইতিহাস এটুকুই জানা যায়। 'মুনিদত্ত'-টীকা অবলম্বন করে হরপ্রসাদশাস্ত্রী মশাই আচার্য্যদের চর্য্যার যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন তা শাস্ত্রবচন হবে—ইতিহাস হবেনা। বরং এ-ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র বাগচীর অনুমান এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই আমাদের ইতিহাসের কুটিল-পথে বিচরণ করা ভালো। প্রকৃতিতে বা শাস্ত্রবচনে সর্ব্বদাই সাপ ব্যাঙ-কে তাড়া করে কিন্তু মানুষের তৈরী ম্যাজিকে বা ইতিহাসে ব্যাঙ-ও সাপ হয় বা সাপকে তাড়াতে পারে। বঙ্গ-দেশ তা করেছিল। অন্তত বেঙ্গী-চালুক্যরা ত চোখের উপর সর্পপূজারী নাগবংশকে (হরিবংশের কোলিসর্প) দাক্ষিণাত্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। তারপর আমাদের নবদ্বীপ-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষরা-ও তাই করেছেন—"ভারতচন্দ্র" তাঁর 'নাগাষ্টকে' সে-ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। নীল-কুঠিয়াল সাহেবরা সেদিনও 'বারুদীর' নাগ-বংশের উপর ক্ষেপে উঠেছিলেন। কালীয় দমন কথাটাই আমরা জানি, ভাবতে পারিনে যে সসর্প বঙ্গই নাগভটের যদুকুল এবং তারা বোডো বা দ্বিষ জাতি। পেরিপ্লাসের দ্বিজ অথবা দ্বিষ জাতিই যে এই বজ্রযোগিনী ধামের ইক্ষ্বাকুরা, তার প্রমাণ বহন করছে গোয়ালিয়র বা গোপাদ্রির গিরিশীর্ষে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত গুর্জ্জরপ্রতীহার বংশের সম্রাট প্রথম ভোজদেবের খোদিত লিপি। যযাতিপুত্র যদু যে জ্যোতির্ব্বীজ 'গুণবতি ক্ষেত্রে উপ্ত' করেছিলেন বলে শিলালিপিটি বলছে তা প্রাক্-জ্যোতিষ থেকে পাওয়া এবং 'গুণবতি' যে-ই থাকুন তিনি চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মাঝামাঝি 'গুণবতি'-ধামের কোনো প্রাগৈতিহাসিক মহিলা।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

# দুরভিগ্রহ

## বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অসময়ে কথাটা পাড়লেন শুকদেব বাবু।

এমনিতে চুপ্‌চাপ থাকেন। ভেতরের মনে কি আছে, বাইরে তার ছায়াটিও পড়ে না। কাছে গেলে কেমন যেন শীতশীত বোধ হয়, যেন বরফের ঘর।

এককালে প্রফেসরী ক'রতেন; হয় তো তাই নিরুত্তাপ তাঁর সান্নিধ্য। তরুণ দেখলেই ছাত্র ভেবে নেন, তার দরুণও এমন হতে পারে।

ভাবতো বিকাশ, কিন্তু যেতে হ'তো মাঝেমধ্যে।

যেমন ঐতিহাসিক যায় মিউজিয়মে। হৃদয়হীন প্রস্তর-মূর্তির সামনে দাঁড়ায়। না থামলে শান্তি, কিন্তু না-থামা অসম্ভব। যে টানে, সে সব সময়েই টানে, যেমন চুম্বক। মধ্যাকর্ষণের বাইরে গেলে কেমন হ'তো, কেমন হয়? ···কিন্তু তার বাইরে যাওয়া যায় কি?

আজ কিন্তু ব'সে থাকা স্বার্থক হ'লো। বরফ গ'ললো। ডন নয়, ড্রাইডেন প্রসঙ্গ নয়। ঘরোয়া আলাপ। মৃদু অন্তরঙ্গতা। কঠিন তিরস্কার।

—"তোমার 'মুখোস' কবিতাটি আমার বেশ ভাল লাগলো, এর আগে তোমার এত ভালো লেখা পড়েছি ব'লে মনে পড়ে না। তুলনায় 'স্মৃতিমুখ' নড়বড়ে হ'য়েছে। তোমার লেখা বড় অসমান হয়, এই তোমার প্রধান দুর্বলতা। নিজের ভালমন্দ কিছুই বোঝো না।"

একটু থামলেন। তারপর রং বদলালো। জোর করেই নিজের মুখোসটাকে খুলে ফেললেন।

—"তোমাকে একটা কথা বলি, কিছু মনে ক'রো না। শুনলাম আজকাল ঘোড়দৌড়ের মাঠে ভাগ্যলক্ষ্মীর পশ্চাদ্ধাবন ক'রছো। ক'লকাতায় সাহিত্যিকদের অনেকের মধ্যেই এই ব্যাধি প্রকট। সাহিত্যিক সাধারণ ভালোমন্দের বহির্ভূত নয়—একথাটা মানো তো?"

বিকাশ চুপ্। শুকদেব বাবু ব'লে চ'ললেন:

—"কোন হতাশার তাড়নায় এপথ মাড়াচ্ছো জানি নে। কিন্তু এখনো বলি, তোমার বয়েস কম—অনেকদূর যেতে হবে—"

বিকাশ চুপ।

—"শোনো, আমার বিশেষ অনুরোধ, এবার বি-এ পরীক্ষাটা দিয়ে দাও। চাকুরীর বাজার অন্ধকার; অন্ততঃ গ্রাজুয়েট্ ডিগ্রীটা নিয়ে ফ্যালো।"



বিকাশ ভাবছিলো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে ঠোঁটদুটি ইষৎ নড়লো হয়তো। চোখের রঙ বদ্‌লালো না—আলো না, ছায়া না।

"ওকি কথাগুলি শুনতে পেয়েছে?···হয়ত সন্দিগ্ধ কথায় দুল্‌তে লাগলো শুকদেব বাবুর মন।

আরো কিছু বলার ইচ্ছে ছিলো। বিকাশের জন্য তিনি ভাবেন, গভীর ক'রেই ভাবেন। ওর ভেতরে মহৎ-সৃষ্টির অঙ্কুর আছে, আবার পিছলেপড়ার ভয় আরো বেশী। অনেক কিছুই হ'তে পারতো, কিন্তু কিছুই হ'লো না। মনে মনেই ছবিটা দেখতে পান শুকদেব বাবু···অস্পষ্ট যন্ত্রণার মতো।

—কিন্তু থাক। তিনিও যে সেন্টিমেণ্টাল, এক তরুণ সাহিত্যিকের কাছে ধরা দিয়ে লাভ কি?

মাষ্টারীতে অনেকদিন ইস্তফা দিয়েছেন তিনি; কিন্তু ছাত্র-চরানোর একটা সুফল তাঁর জীবনে ফলেছে—সংযম।

বিকাশ উঠি উঠি ক'রতে লাগলো।

—"ব'সো। এককাপ চা তোমার জন্য ক'রতে ব'লেছি—"

বিকাশ ব'সলো।

না, পরীক্ষাটা এবার না-দিলেই নয়। মাঝখানে দশটা বছর গেছে, যেন রঙ্‌বেরঙের হীরা-মুক্তা-চুনি-পান্নার দিনগুলি। বিকাশ হাত পেতেছে, যেমন আর সবাই পাতে। মুঠি খুলেছে, আর পরশপাথর মাটির ঢেলা হ'য়ে গেছে।

হাতে একটা নীলার আংটি ছিলো, তাও খুইয়েছে ঘোড়ার পেছনে। নীলার চেয়েও বেশী শক্তি ঘোড়ার।

কিন্তু যখনি চাকুরী পেয়েছে, রেশ-খেলা ছেড়ে দিয়েছে সে। বিকাশ রাশিচক্র গ্রহ জ্যোতির্বিজ্ঞান মানে। এর কারণ কি তার লগ্নের গ্রহটি অথবা দশম পতির নির্ব্বোধ পরিহাস!

চাকুরীতে কোনদিন দুর্ণাম কেনে নি, তবু চাকুরী থাকে নি। যখনি যেখানে গেছে প্রতিষ্ঠানের আয়ু সেখানেই নিঁভু-নিঁভু দেখেছে। একমাস, দুমাস···এক বছর। একটি প্রতিষ্ঠানও বাঁচে নি।

ব্যাঙ্ক, মাসিক-পত্রিকা, দৈনিক-কাগজ, চা-বাগান···

শিশুকন্যার দুধটুকু ঘরে নেই। স্ত্রীর কঠিন রোগ। সম্বল সামান্য কয়টি গয়না। নিজের হাতের নীলার আংটি।

একে একে সব গেছে ঘোড়ার মাঠে। সাদা ঘোড়া কালো হ'য়ে গেছে ওর কপালে। কালো ঘোড়া যখন বাজী মেরেছে, বোকার মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও হলদে আকাশ দেখেছে।

মাঠের নৈঃশব্দ ছিঁড়ে কুটি কুটি করেছে কতবার পাশের দাঁড়ানো লোকেরাই। অফিসের কেরাণী, কুলি, বেকার, হয়তো ভিক্ষাজিবীও। পাগলের মতো ব্যবহার ক'রেছে কতদিন কত লোক! ও' শুধু দেখেছে জনতার সমস্ত আশা, অশ্লীলতা, নীরবতার মধ্যে ওর সোনা কি ক'রে নিষ্প্রয়োজন বাজে-কাগজ হ'য়ে যায়!

ঘোড়ার মাঠেই কবি রণজিৎ মিত্রের সঙ্গে দেখা। অনেকদিন পর।

—"তুমি এখেনে?"—চোখে মুখে অবাক তিরস্কার।

—"আপনি তো জ্যোতিষ-চর্চ্চা করেন? আমার লগ্নে চন্দ্র আর পঞ্চমে রবির ঘরে বুধ, শনি, রবি, বৃহস্পতি। সপ্তমে রাহু।

সহৃদয়তায় গ'ললেন রণজিৎ বাবু।

—"গ্রহে টেনেছে, তাই বলো!"

বিকাশ এগুলো। অনেক পেছন থেকে আবার চিৎকার ক'রে উঠ্‌লেন রণজিৎ বাবু: "বিকাশ, শোনো!"

ফিরলো।

—"ছাখো, আমার কোষ্ঠীটা একবার দেখে দেবে? নানা জ্যোতিব নানা কথা ব'লছে। কিছুই বুঝছি না।"

—"আপনারও তো লগ্নে চন্দ্র র'য়েছে। দুর্ভোগ ভুগবেন।"

—"না, ঠাট্টা নয় বিকাশ। সিরিয়াস্‌লি ব'লছি। একদিন এসো।"

কথা দিতে হয়।···

আরেকদিন মুখোমুখী মণি বাবুর সঙ্গে। তিনি কোনো কথা ব'ললেন না, নিঃশব্দে দূরে স'রে গেলেন। বিকাশই তাকে খুঁজে বের ক'রলো বিকেলের দিকে:

—"আপনি এখেনে।"

—"এই, দেখতে এলাম। বছরে একদিন ক'রে আসি আমি। বোঝোই-তো জীবনে ক্লান্তি অনেক।

করুণার হাসি হাসলো বিকাশ। মণি বাবু চ'লে গেলে তারপর। মার্ক্সিষ্ট্‌ মণি বাবু এসেছেন ঘোড়ার মাঠে। কিন্তু খেল্‌তে নয়, বলেন: দেখতে।

পরের সপ্তাহে আবার·····।



কিন্তু মণি বাবু এবার চালাকী ক'রলেন! সারাদিন বিকাশ আর তাঁর পাত্তা পেলো না। বোধহয় দেখামাত্রই মাঠ থেকে বিদায় নিয়েছেন তিনি।

মণি বাবু রাজনীতি করেন। একটা ছোকড়া সাহিত্যিকের সঙ্গে পরপর দু'সপ্তাহ ঘোড়ার মাঠে দেখা, কথাটি র'ট্‌লে শুভ হবে না।

রণজিৎ বাবু অদৃষ্ট মানেন। মণি বাবু জনমত। মানাতে জানেন না—ভাবে বিকাশ। এঁদেরি কাছ থেকে কতো আশা ক'রেছিলো একদিন! রবীন্দ্র-যুগের প্রতি বিদ্রোহ-ঘোষণা ক'রেছিলেন রণজিৎবাবুরা—সেই কল্লোল-যুগে। আর আজ! হাত পাতলেও কানাকড়ি মেলেনা।

ইউনিভারসিটিতে একটা আবেদন-পত্র পাঠাবার ফিকির তারপর থেকে খুঁজতে লাগলো বিকাশ। প্রাইভেট পরীক্ষা এমনি দেওয়া যাবে না। কোনো স্কুলের কৃপা থাকলে দেওয়া যায়। কিন্তু তেমন স্কুল কোথায় পাবে? তা-ছাড়া মিথ্যার আশ্রয়।

বাবার নামে একটা স্কুল হ'য়েছে সখের-বাজারে। দাদা ডোনার আর সেক্রেটারী, বড় জামাইবাবু হেড্‌মাষ্টার।

জামাইবাবুর কাছে গেলে হয়, কিন্তু তিনি বড় ধর্মভীরু। নিজস্ব স্বার্থে অবিশ্যি সব কিছুই ক'রতে পারেন, পরের বেলায় ধর্ম ধাঁধাঁ দেখায়। দাদার স্কন্ধে আরোহণ করেছেন বহু বছর থেকে, সাহায্য না ক'রলে আত্মহত্যা ক'রবেন, ভয় দেখিয়ে। আরেকজনের চাকুরী খুঁইয়ে তাঁকে অফিসে কাজ দিয়েছিলেন দাদা।

এখনো বিকাশের দাদা এই জামাইবাবুটিকে ভয় করেন। তিনি আত্মহত্যা ক'রবেন এই কারণে নয়। তাঁরই কল্যাণে আর্থিক দিক থেকে একটা মোটা অংক গুছিয়ে নিয়ে সুমতিবাবু কেউকেটা হয়েছেন বলে।

বিকাশকে ভালো কথায় বোঝাতে চেষ্টা ক'রলেন তিনি:

—"তুমি মাষ্টারী চাও, আমার স্কুলে! কিন্তু ভ্যাকান্সী কোথায়? তা'ছাড়া, তুমি আণ্ডার-গ্রাজুয়েট্‌।"

—"মাষ্টারী না দিন, সার্টিফিকেট্‌টা দিন।"

—"এর চেয়ে রাতকে দিন বানাতে বলো না কেন? রাগ ক'রো না, তুমি আত্মীয় ব'লেই ব'লছি,—আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়াটা কোন কথা নয়। নিজের জোরে দাঁড়াও!"

যেন গ্রামোফোনের চোংঙ্গা থেকে একটা কর্কশ, ঘর্ঘর শব্দ শুন্‌লো বিকাশ।

—"তা হ'লে মাইনর স্কুলেই একটা চাকুরী আপাততঃ দিন। এখন না হোক, তিন বছর বাদে পরীক্ষা দিতে পারবো। কোন ফাঁকিঝুঁকিও থাকবে না।"

—"পাগল হ'য়েছো! তাছাড়া শিক্ষার ব্যাপারে আত্মীয়-পোষণ নীতি আমি পছন্দ করিনে।"

একটা কঠিন বীভৎস হাসি বিকাশের ঠোঁটের ফাঁকে উঁকি মারলো। কান্নার চেয়েও কুৎসিত। সুমতিবাবু চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

—"ভাবছি আমরা সবাই মিলে তোমার মাকে মাসে মাসে কিছু সাহায্য ক'রবো। শচি, ধীরাজের সঙ্গে কথা হয়েছে·····।"

চিরকালের ঘর-জামাই সুমতিবাবুও তাহ'লে সুযোগ খুঁজছেন—ঋণ শোধের! বিকাশ হাসলো।

ছাপাখানা থেকে পাকিস্তানের জানা-শোনা একটা স্কুলের নামে 'রাইটিং প্যাড্' ছাপালো বিকাশ। ষ্ট্যাম্প্ও একটা তৈরী করালো। নকল হেড্মাষ্টার নীচে দস্তখৎ ক'রলেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় পৌঁছে দিল, বন্ধুদের বারণ সত্ত্বেও।

—"বড় জোর জেলে দেবে। বাড়ির ভাতে কাঁকড়, রুটি চিবুনো যায় না। তা'ছাড়া জেল একটা আশ্রয় তো বটেই।"

ধার ক'রে বই আনলো বিকাশ। শুকদেববাবু শুনলেন, পরীক্ষা দেবে। শুনে খুসী হ'লেন। বিকাশের ওপর তাঁর ধারণা ভালো; তবে ছেলেটা একটু কোর্স, আরেকটু ঘসামাজা হওয়া দরকার। ওর লেখায় তো বটে, কথাবার্তায়, চালচলনেও।

—বি, এ, পরীক্ষাটাতো উপলক্ষ্য, পুরাণো কাল্চারের সঙ্গে নতুন ক'রে আবার দেখা শোনা হবে একটা ডিসিপ্লিনের মধ্য দিয়ে। ওর ডিটেক্টিভ্-উপন্যাস-পড়ার রোগটাও সারানো দরকার।

যদি ক্ষমতা থাকতো বিকাশকে একটা ভালো চাক্রী জুটিয়ে দিতেন তিনি। নিজেকে সারাজীবন কী কষ্ট ক'রতে হ'য়েছে, ভেবে শিউরে উঠ্লেন। জীবন যুদ্ধ! হয়তো এতদিনে জয়লাভ করার সময় এসেছে। বিকাশও জয়ী হোক্, সুখী হোক্!

ক্রমে পরীক্ষা দেবার মাস ঘনিয়ে আসে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠি এসেছে, দেখা করার জন্য। বিকাশের বুক কাঁপে।

মেয়েটা কাঁদছে। তিনদিন ধ'রে কোথাও একফোঁটা দুধ নেই। ঘরের যিনি রাণী, ছেঁড়া কাপড়ের ভেতর তিনি শুকনো স্তন দুটিকে আড়াল ক'রে ভগবানকে ডাকেন···। লজ্জা দূর করো ঠাকুর, লজ্জা দূর করো।



কার লজ্জা, না, ছেঁড়া কাপড়ের।

অথবা শিশুর কাছে—নষ্ট মাতৃত্বের।

কিম্বা যৌন জীবনের—রাত্রির কাছে, অন্ধকারের কাছে।

বিকাশ অনুভব করে এইসব প্রার্থনা। অনুভব করে 'ওথেলো'র তৃতীয়াঙ্কের মাঝখানে এসে—থেমে।

সব গোলমাল হ'য়ে যায়। এমন কি ইতিহাস, দর্শন।

কী হবে পরীক্ষা দিয়ে? মেয়েটা কাঁদছে। ক্ষিদের যন্ত্রণা!

সারারাত এ আর্তনাদ থামবে না।

কোনোখানে শিশুর দুধ নেই পৃথিবীতে, কোথাও না।

দুধ আছে, জাহাজ-ভরা দুধ, প্রশান্ত মহাসাগরে। যার বেশী হয় সে পয়সা খরচ ক'রে জাহাজবোঝাই দুধ আনে, সমুদ্রে ঢেলে দেয়।

সমস্ত পৃথিবীতে শিশুরা কাঁদ্ছে আজ, তাদের সঙ্গে সঙ্গে মায়েরা। সেইসব যুবতী মা—যাদের স্তনের সঙ্গে কবিরা কোনকিছুরই উপমা খুঁজে পান না।

—"শোনো। বড় কাঁদ্ছে মেয়েটা। কিছুই কি করা যায় না?

বই বন্ধ করে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

চারদিকে তাকায় বিকাশ। স্তিমিত আলোয় বইগুলিকে মনে হয় অপরূপ। ভরসা পায়। বাঁচবে, এ-শিশু বাঁচবে।

সেক্সপীয়র, শ, রবীন্দ্রনাথ, গিবন, হেগেল···

না, কলেজস্কোয়ার ··পুরানো বইয়ের দোকান।

এইতো জীবনের পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় জয়ী হবে সে। ধারকরা বইগুলোর ওপর পরম যত্নে হাত বুলোতে থাকে। মনে পড়ে, এককৌটা ল্যাক্টোজেন বা গ্ল্যাক্সো আর কি কি পাওয়া যেতে পারে।

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ]

মাথার উপরে প্রখর সূর্য্য, মেঠো ধূলোর পথে পা পুড়ে যাচ্ছে, সুরো হাঁটছে তো হাঁটছেই। কাপড়ের পাড় দিয়ে বাঁধা লালচে জট-পড়া চুলের খোপা-বাঁধা মাথাটা ক্লান্তিতে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে আছে। রোদে উত্তপ্ত হ'য়ে তার কটা রং লালচে দেখাচ্ছে। হাঁটার তালে তালে ডানহাতখানি দুলছে পুরুষালি ভঙ্গিতে, সে হাতের উপরে নীল উল্কিতে আঁকা ডানামেলা এক পক্ষী।

ডানা ম্যালেছে পক্ষী! স্বগতোক্তি করল সুরো। কথাটা অন্যের মুখে শোনা, এখন হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মাধাই বায়েন বলেছিল একদিন তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে।

মাধাই বায়েন। আমার তোমার চোখে নীল উর্দ্দিপড়া একটি রেলওয়ে পোর্টার মাত্র। বড় বড় চুলে পাতা-কাটা সিঁথি, পায়ের মাপের চাইতে বড় একজোড়া চম্পল পায়ে শিষ দিতে দিতে যে বন্দরদিঘার ষ্টেশন-প্ল্যাটফর্মে এর-তার সাথে ইয়ার্কি মেরে বেড়ায়। সুরোর হাতে নীল পক্ষী আঁকিয়ে দিয়েছে মাধাই। সুরোর হাতে একজোড়া তোবড়ান, বাঁকা কাঁলচে কাঁসার চুড়ি ছিল এক-কালে। মাধাইএর সাথে যখন দেখা হ'ল তখন চুড়ি দুটির একটি মাত্র হাতে ছিল, আর একটি খসে পড়ে গিয়েছিল। মাধাই একদিন অবশিষ্ট চুড়িটি খুলে ফেলে দিয়েছিল সুরোর অনুমতি না নিয়ে, তার বদলে কিছুই আর পড়তে দেয় নি। ব্যাপার দেখে সুরো সাবধান হ'য়ে গিয়েছিল। ছোটবেলা থেকেই সস্তা রূপোর যে চিকটা তার গলায় ছিল, সেটা নিজেই একদিন খুলে ফেলেছে।

এখন সুরো মাধাই বায়েনের ঘরের দিকেই চলেছে। মাধাই তাকে চালের ব্যবসায়ের হদিশ ব'লে দিয়েছে, রওনা ক'রে দিয়েছিল।

মাধাই কি করেছে তার জন্য, এ ভাবতে গিয়ে সুরো কোথায় আরম্ভ করা যায় খুঁজে পায় না; অনাহারের পঞ্চমদিনে মাধাই নাকি তাকে কুড়িয়ে এনেছিল দিঘার পথ থেকে। মাধাইএর মুখে শুনেছে: পশ্চিমে মজুররা ইঁট তৈরী করছিল দিঘা আর চিকন্দির মধ্যে এক মাঠে। অনাহারে প্লাবনের মধ্যে আহারের দ্বীপগুলির অন্যতম সেটি। আহারের আশায় না হোক জলের আশায় ইঁট তৈরীর ভিজান কাঁদার একটা তালের কাছে মুখ গুঁজে পড়েছিল সুরোর দেহটা। মাধাই তাকে দিঘা বন্দরে তার নিজের ঘরে তুলে এনেছিল। কি ক'রে আনল? মাধাই বলেছে—তুই কি তখন এমন ছিলি, হাড়কখানা ছিল। তাই সম্ভব, নতুবা মাধাইএর দেহ এমন কিছু মজবুত পালোয়ানি দেহ নয়।



সুরোর যখন খেয়াল ক'রে দেখবার শুনবার অবস্থা হ'ল সে দেখেছিল; একটা স্বল্প পরিসর ইঁটের ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে, আর তার মুখের উপরে ঝুঁকে একটি অপরিচিত পুরুষ-মানুষের মুখ। অন্নের উত্তাপে দেহ আতপ্ত হ'য়েছে তখন, মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি ফুটি-ফুটি করছে; পরিধেয়ের সন্ধান করতে গিয়ে সে দেখেছিল, লাল পাড় একখানা কোড়া শাড়ী যেমন-তেমন ক'রে তার গায়ে জড়ান।

এবার পুরুষটি কথা বললে—তোর কাপড়টা ফেলে দিলাম, যা ময়লা আর পিঁপড়ে কতো।

একটু পরেই, সুরো ব্যাপারটা ভালো ক'রে বুঝে উঠবার আগেই আর একজন পুরুষ ঘরে এসেছিল। তখন সুরো বুঝতে পারে নি, এখন তার মনে হয় সে ডাক্তার। কিন্তু মাধাই কি বলেছিল মনে আছে তার—আমার বুন। গাঁয়ে ছিল।

সুরতুন্নেছার পক্ষী আঁকা হাতখানি ঘন ঘন দুলতে লাগল। তার মন কল্পনায় বহুসময় লঙ্ঘন করে যাচ্ছে।

সুরোর প্রশ্নের উত্তরে মাধাই বলেছিল—যে কেউ চোখে পড়ত তাকেই আনতাম তাকেই খাওয়াতাম।

হয়তো কথাটা মিথ্যে নয়। পৃথিবীতে থাকার মধ্যে মাধাইএর এক বুড়ী মা ছিল। যতদিন মাধাই গ্রামে ছিল মায়ের সাথে তার সদ্ভাব ছিল ব'লে মনে হয় না। বুড়ীকে নাকি মারত ধ'রে ধ'রে বুড়ী যদি ক্ষুধার মুখে ভাতের থালা এগিয়ে দিতে না পারত। আলসের বেহুদ্দ ছিল মাধাই। কিন্তু গ্রামে অনাহার এসেছে এই খবর পেয়ে মাধাই গিয়েছিল মায়ের জন্য খাবার নিয়ে। মা নেই মা নেই—এ সংবাদটা কেউ তাকে দেয় নি; মা'র পরিত্যক্ত ভাঙ্গা-চোরা থাল বাসন, ছেঁড়া-খোড়া কাপড় চোপর ঘটনাটা রাষ্ট্র ক'রে দিয়েছিল। ধূলায় আচ্ছন্ন ক্লান্তমুখ চোখের জলে আবিল ক'রে ফিরে আসছিল মাধাই। পথের ধারে পড়েছিল সুরো। বুভুক্ষু আত্মার তৃপ্তি হ'য়েছিল কিনা কে জানে, মাধাইএর শূণ্যভূত আত্মা অবলম্বন পেয়েছিল সুরোকে কুড়িয়ে এনে।

কিন্তু এ উত্তরটা সুরো মনে মনে উচ্চারণ ক'রে খুসি হ'তে পারে না। মাধাই তার দ্বিতীয়বারের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল—একদিন তুই আমার হ'য়ে চোরের মার খেয়েছিলি, সে জন্যে।

সুরতুন্নেছা মনঃসমীক্ষণ জানবে এ তো সম্ভব নয়, তার অদ্ভুত একটা অনুভব হ'ল। কথাটা মনে পড়তে যে কষ্টটা বোধ হ'ল, যে কুণ্ঠাটা গলার কাছে পাথর হ'য়ে উঠল সেটার সবটুকু তার নিজের দুর্গতির স্মৃতি নয়; দুর্গতির যারা কারণ, দুর্গতির পশ্চাদভূমি যে স্থান ও কাল—এ-সবের জন্য একটা বেদনাসিক্ত অনুভূতি ছিল সে কুণ্ঠার কাছাকাছি।

সেই বিশ্বব্যাপী অনাহারের দিনের আগেও সুরোর মতো যারা, তাদের অনাহারের দিন ধানের ঋতুগুলির মধ্যেও ইতস্তত ছড়ান থাকত। পৃথিবীতে সে একা। তার বাপ বেলাৎ আলীর মৃত্যুর পরও সে কি ক'রে খুঁটে খেয়ে বারো থেকে আঠারোতে সম্পূর্ণ একা একা পৌঁছেছিল ভাববার বিষয়। তার পিতৃধনের মধ্যে ছিল একখানি কুঁড়ে, একটি গাভী।

দুদিন ধরে খেতে না পেলে ঘুমও হয়না ভালো। ছোট নিচু খড়ের চালাটার নিচে সে আর তার গর্ভবতী গাভীটি। খালিপেটে এপাশ ওপাশ করতে করতে সে উঠে বসল। ভাবল—ডাঁশ কামড়াচ্ছে বোধ হয়। গাইটাকে কাল থেকে বাইরে বেঁধে রাখবে স্থির করল। ওটা বিয়োলে একটা হিল্লে হয়। গত বছরের কালো ভাঁড়টাকে সে যত্ন ক'রে রেখেছে।

ক্ষুধার ব্যাপারটা একবার যদি মনে পড়েছে ঝাড়া দু ঘণ্টা লাগবে তোমার ভুলতে—একথায় ওকথায় ফিরে ফিরে মনে পড়ে যাবে।

সান্ন্যাল বাড়ীর ঢেঁকিশালের কাছে বোকা-বোকা মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকলে পেটভরার মতো ভাত রোজই পাওয়া যায়, পরশুদিন গিয়েছিল তাই, কিন্তু কাল পথের প্রতিবন্ধক দেরী ছিল। বুধেডাঙা থেকে চিকন্দী যাবার পথে দেবী দাশের বাড়ী। মাহিষ্য দাশদের দেবী সান্দারদের ছেলেদের খেলার সাথী ছিল, সুরোর বাল্য-পরিচিত। কিন্তু সেই আবাল্য পরিচিত দেবীর গলা একদিন ভারি হ'ল। মাথায় বেড়ে ওঠার চাইতেও স্বরের পরিবর্ত্তনটাই লক্ষ্যণীয় বেশী, সেটা যেন রাতারাতি হ'ল, আর তার সাথে সাথে চোখের দৃষ্টির। ছোটবেলায় সুরোকে দেবী দেখেছে এপাড়ায় ছেলেদের সাথে খেলতে এসে, কিন্তু এখনকার অন্য রকম। যে পুরুষ চোখ পাকিয়ে মারবার জন্য হাত তোলে তার চোখের সম্মুখে দাঁড়াতে পারে সুরো, কিন্তু যে মিষ্টি ক'রে কথা বলে তাদের সামনে সুরো দাঁড়ায় না।

ভয়ের মূলে আছে তার অল্পবয়সের একটি বেদনার ইতিহাস। তার বাবা বেলাৎ আলি মান্দার তখনও বেঁচে। তার ফিরবার পথের দিকে চেয়ে সাত আট বছরের সুরতুন্নেছা ঘাটিয়াল মিশরজির ঘাটের চালায় অপেক্ষা করছিল। শুকনো খট্‌খটে সন্ধ্যা, আবির ছড়ান, ঝিঁঝিঁ ডাকা, উদাস করা, সেই সন্ধ্যায় ঘাটের অনতিদূরে ধর্ষিতা হয়েছিল সে। নারী যদি দেহ মাত্রই হয় তবে সে দেহের অঙ্কুর চূর্ণ হ'য়ে গেছে। অনুস্বাভাবিক ভয়টির সৃষ্টি সেদিন থেকে।

গোরুটিকে দড়ি ধরে বাইরে নিয়ে এসে ঘরের সম্মুখে বাবলার চারাটায় বেঁধে দিয়ে চারিদিকে তাকাল সে। তখন সম্ভবত পৌষমাস। হাল্কা একটা কুয়াশার আবরণ মাটির আধ হাত পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। রজব-আলি সান্দারের বাড়ীর দুখানা খড়ের ঘর আর খড়ের গাদাটি আসলগুলির ছায়ার মতো চোখে পড়ছে। রজবআলির বাইরের দিকের ঘরখানির সম্মুখে তার ছোট ধানের মরাইটার পাশে বাঁশের খাচায় বসানো চারিতে মুখ



দিয়ে তার দুটি বলদ, আর চার পাঁচটি বকনা গাই হুস্ হুস্ ক'রে খড়-ভেজান জল খাচ্ছে, চপ্ চপ্, খস্ খস্ শব্দ হ'চ্ছে বলদগুলির মুখে, সট্ সট্ ক'রে বাবলার শুকনো বিচি চিবুচ্ছে গাভীগুলি। আগুনের বোঁদার লাল্‌চে আভা চোখে পড়ল। রজবআলিই বোধ হয়, চারিগুলির পাশ দিয়ে গিয়ে তামাক নিয়ে বসল বাইরের ঘরের দাওয়ায়।

আগে রজবআলির মতোই ঘর ছিল সুরতনদের। গাই বলদ ছিল না। অনেকগুলি পাঁঠা বকরি ছিল বেলাৎআলির। এখন মাত্র এককাঠা জমির উপরে একখানা চালা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের পেছনদিকের বেড়া ঘেঁসেই আজকাল রজবআলির জমি। সামনের দিকে কয়েক পা গিয়ে শুকনো সজনের ডাল বেয়ে লালচে ফুলে আর কচি পাতায় ভরা লতাটি পর্য্যন্ত সুরতুনের সীমানা। তারপরই আবার রজবআলির ভুঁই। মেতের আলের উপর দিয়ে ছাড়া বেরুনোর উপায় নেই সুরোর। এই বেরুনো নিয়েই একদিন রজবআলির ছেলে ইয়াকুবের সাথে তার লেগে উঠেছিল। কিন্তু কি করতে পারে সুরতুন রজবআলি সান্দার যদি চারিদিক থেকে গ্রাস করতে করতে এগিয়ে আসে।

রজবআলি সকালের তামাকটা যতক্ষণ ইচ্ছা খায়, কিন্তু ইচ্ছাটার শেষ আছে। এক সময়ে উঠে সে বাড়ীর ভেতরে গেল। ততক্ষণে কুয়াশা প্রায় কেটে গেছে। বাঁদিকের দুতিনটি গোরুর রং স্পষ্ট হয়ে উঠল। আর দেরী করা যায় না, এর পরে মাঠের ওপার থেকেও দেখা যাবে। আল থেকে নরম মাঠে নেমে সোজাসুজি পারি দিয়ে সুরতুন গিয়ে দাঁড়াল লাল্‌চে রঙের বলদটার পাশে। সেটার আড়ালে হেঁট হ'য়ে পড়ে পাশের ছোট বকনাটার চারি থেকে পটু হাতে জাবনার জল হাতড়ে কুচনো খড় আর বাবলার বিচি তুলে নিল কোঁচড়ে। সামনের দিকে চেয়ে সে দেখল অন্তত দুতিনশ' হাত দূরেও এখন নজর চলছে। মাথাটা একটু হেঁট ক'রে আরও কিছু বাবলার বিচি খুঁজল সুরো, তারপর আল ডিঙ্গিয়ে অন্য আর একটি খেত দিয়ে নিজের ঘরের পেছন দিয়ে ঘোরাপথে এসে দাঁড়াল নিজের গোরুটার সামনে।

—খা, খা, কয় যে খাতি দিবি বাবলার দানা, দুধ হবি বটের আঠা।

গোরুটির খাওয়া হ'লে সুরো তার দড়ি ধরে পথে বার হ'ল। আলের পথের শেষে জেলা বোর্ডের পথটা সে আড়াআড়ি পার হ'ল। পথের ওপারে কাশ জাতীয় বুনো ঘাস এক কোমড়ের চাইতেও বেশী উঁচু হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু জমিটা সে দিকে নিচু ব'লে ঘাসগুলির মাথা জেলা-বোর্ডের রাস্তার এপার থেকে বড়জোর আধহাতটাক চোখে পড়ে। ঘাস-বনের ভেতর দিয়ে গোরুটাকে টানতে টানতে সুরতুন ওদিকের উঁচু জমিটায় গিয়ে উঠল।

কাছিমের পিঠের মতো জায়গাটা, পঞ্চাশ হাত লম্বা চওড়া। চারিধারে মাটি ঢালু

হ'য়ে নেমে গেছে। মাঝখানে একটি টেলিগ্রাফের খুঁটি, সেটির মাথার উপর দিয়ে তার কোথায় কতদূরে চলে গেছে দুদিকে। এ জায়গাটার সম্বন্ধে বুধেডাঙ্গার প্রায় সবলোকেরই একটা অদ্ভুত ধারণা আছে। বহুদিন আগে নাকি বাজ পড়েছিল জায়গাটায়, তারপর থেকে ও জমি আর কেউ চষে না। ফসল নাকি হয় না। লোকে বলে, যেমন সেদিন ইয়াকুব বলেছিল—

ওখেনে বাঁধিস গোরু, দুধ হবি নে ছাই। কিন্তু লোকে ভয় দেখালেও নিরুপায় সে। অন্যসময়ে গোরু ছেড়ে দেয়া চলে। রাত-চরা ধূর্ত্ত গোরু সহজে ধরা পড়ে না, কিন্তু এখন বেচারার বড় কাহিল অবস্থা, মস্ত বড়ই বোধ হয় হবে বাছুরটা। গোরু বাঁধতে বাঁধতে তার মনে হ'ল মেয়েমানুষেরও বোধ হয় এমনি কাহিল অবস্থা হয়, নড়তে চরতে অসুবিধা। অস্পষ্টভাবে নিজের অনাহারশীর্ণ কুক্ষিজঙ্ঘার কথা মনে হ'তে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজের কাপড়টা টেনে দিল।

অসময়ে রজবআলি হন্তদন্ত মাঠ থেকে ফিরে এল। বাড়ীর সামনের জমিটুকু পার হ'তেও যেন তর সয় না, সেখান থেকেই হাঁক দিতে দিতে বাড়ীর দিকে দৌড়ে এল—ইয়াকুব, ইয়াকুব।

ছেলে ইয়াকুব ছিল বাড়ীতে, বাপের উত্তেজনায় হাসিমুখে সে বলল—চেঁচাও কেন, আগুন লাগছে নাকি ?

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে রজবআলি বলল,—বকনাকে খাবের দিছিল কেডা ?

—জাব তো আমিই মাখে দিছিলাম, ক্যা, হলে কি ?

—হলে কি ? শালা গিধধর, বকনাডা মরে যে, ধলিডা।

—কও কি ?

মুহূর্ত্তে পিতার উত্তেজনা ইয়াকুবে সংক্রামিত হ'য়ে গেল,—তাইলে অষুধ করেছে বোধায়।

—হারে খোদা, ব'লে রজবআলি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই ব'সে পড়ল।

ইয়াকুব বললে—বসলি কি হবি ? বদ্যিকে খবর দিতে হবি। চিকন্দির রাম মণ্ডলকে না পাই কেষ্টদাসেক আনব। তুমি ততক্ষণ উয়েক তেঁতুল জল খাওয়াও তামাক জল খাওয়াও।

হাওয়ায় ভেসে ইয়াকুব দৌড় দিল মাঠের উপর দিয়ে আল টপকাতে টপকাতে।

রজবআলির উত্তেজিত স্বরে আকৃষ্ট হ'য়ে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে ইয়াকুবের স্ত্রী ফতেমা। তার পরীর ভয় ছিল। জিনপরী মানুষের কাছে ঘোরা-ফেরা করে তার এই ধারণার কথা পরিবারের সকলেই শুনেছে, তা নিয়ে হাসাহাসিও করেছে।

সে ঘোমটার আড়াল থেকে শাশুড়ীকে বললে,—কেন, আমি যে কই, রোজ সকালে একটা পরী ঘুর ঘুর করে চারিগুলার কাছে।



স্বরটা তার নিচু স্বভাবতই, কিন্তু কথাটা রজবআলির কানে গেল। সে বললে—তুই দেখছিস্ পরী ?

ফতেমা বললে—আপনাকে আগুনের বোঁদা দিয়ে গোয়াল সুরবের গেলাম, আপনে গেলেন বাড়ীর ভেতর। তখন দেখলাম, পরী আসে জাবনার চারিতে হাত দিয়ে কি যেন করতেছে।

—ই আল্লা, ক'স কি ? তারপরে কি করলে পরীডা ?

—কি যেন তুলতিছে চারি থিকে আর চাবাতিছে মট্‌মট্ করে।

রজবআলি তেঁতুলগোলা জল, তামাকপাতার জল, আগুনজ্বালার কাঠ নিয়ে তেমনি হন্তদন্ত মাঠের দিকে ছুটল। একা বড় মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে তার গা শিউরে উঠল ঃ পরী ঘোরে ? সর্ব্বনাশ ! চাবায়ে চাবায়ে খায় কি পরী ? জিন্দা গোরুর কলিজা নাকি ?

ধলি বকনাটাকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা হ'ল। চিকন্দির রামচন্দ্র মণ্ডল এসেছিল। কিছু করা গেল না।

রজবআলি বোকার মতো মুখ ক'রে বললে—পরীর কাম ভাই, রোজা কি করবি ? রামচন্দ্র ঝার-ফুঁকে বিশ্বাসী রোজা নয়, বৈদ্য। গল্পটা সে ধৈর্য্য ধরে শুনল কিন্তু মাথা নেড়ে বলল—এ যদি কুকুর মারা বিষ না হয় কি কইছি। চিকন্দিতে একমাসে পাঁচটা গোরু মরেছে।

দুঃখিত মনে অন্য গোরুগুলি তাড়িয়ে নিয়ে বাড়ী ফিরে রজবআলি তামাকে হাত দিয়েছে। গোরুগুলি ছাড়া পেয়ে চারিরদিকে জল খেতে ছুটেছে এমন সময়ে কে যেন হাঁ হাঁ ক'রে তাড়াল সেগুলিকে। রজবআলি দেখল সুরতুন।

—কেন্‌রে, গোরুগুলিকে তাড়ালি কেন্ ?

সুরতুন বলেছিল—আমার মনে কয়, উয়েতে বিষ আছে। কোন চারিতে আছে কিবা ক'রে কবা।

—ঠিকই কইছিস্, জল বদলাতে হবি।

সুরতুন উস্‌খুস্ করে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল। খবরটা সে ঘরে পা দিয়েই শুনেছে। সন্ধ্যা হ'য়ে গিয়েছিল দেবীর চোখের আড়ালে চিকন্দির সান্ন্যাল বাড়ী থেকে খেয়ে ফিরতে। রজবআলির যে বাছুরটা আজ মারা গেছে সেটার চারি থেকে নিজের গোরুটাকে খড় চুরি ক'রে দিয়েছিল কিনা, মাথা কুটলেও এবিষয়ে নিশ্চিত হবার উপায় নেই। বিষ এখনও ধরেনি, কিন্তু তাতেই কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বিষ ধরার সম্ভাবনা নেই।

শুকনো মুখে সুরো প্রশ্ন করেছিল—চাচা, এক চারি পানিতে বিষ মেশালে কয়ডা গোরু মরে ?

রজবআলির মাথায় তখন অন্য গোরুগুলির নিরাপত্তার কথা ঘুরছে, রাগ হ'চ্ছিল গোরুগুলির উপরে।

—শালার জেতের খাওয়ার কামাইনি, দুইপ'র রাতে কলার পাতে মুড়ে সামনে যা ফ্যান্ ছাও, ভুঁস্ ক'রে খায়ে ফেলাবি। আর তার উপরে আছে এই ভয়ঙ্কর পাপের প্রতিবিধিৎসা। শিশুর মতো অবুঝ যে প্রাণী তাকে কিনা খাবার নাম ক'রে বিষ তুলে দেয়। সুরোর কথা সে শুনতে পেল না।

ইয়াকুবের স্ত্রী ঘড়ায় জল এনে দিয়েছে হাত পা ধোবার। সেই কাদায় ভারি ময়লাটে জলে হাত পা ধুতে ধুতে মনটা যখন রজবআলির একটু স্থির হ'য়েছে, তখন ইয়াকুবের স্ত্রী বললে—সুরো কচ্ছিল তও নাকি পরী দেখেছে! ও কয় বেটা ছাওয়াল, আমি কই মিয়ে মানুষ।

রজবআলির হাত পা ধোয়া বন্ধ হ'য়ে গেল, সে সাগ্রহে প্রশ্ন করল—সুরো, বেটাছাওয়াল দেখেছে?

বেটাছাওয়াল যদি হয় তবে জিন পরী নয়, তাদের চাইতে শতগুনে বিভৎস দুষমন মানুষ—যে বিষ দেয় গোরুকে।

সুরতুন তখন দুতিনটে পাটকাঠি একত্র ক'রে একটা মশাল বানিয়ে নিজের গোরুটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ক'রে দেখছে। যে চারিটায় খাচ্ছিল রজবআলির মৃত বৎসটি সেটা থেকেই নিজের গোরুটার জন্য খড় আহরণ করেছিল, আশঙ্কার মনে এ কথাটাই দৃঢ়মূল হ'য়ে বসেছে। এমন সময়ে রজবআলি ডাকল তাকে

সেই পরীর কথা আবার। ফতেমা যখন বলেছিল চোখ বড় বড় ক'রে, সে এক পরীকে দেখেছে সকালে গোরুর চারির কাছে ঘোরাফেরা করতে, তখন সুরতুনের বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গিয়েছিল। সুরতুন নিজে জিন পরী মানে না, কাজেই তার বিশ্বাস হ'ল, ফতেমা যদি সত্যি কাউকে দেখে থাকে তবে সে সুরতুনকেই দেখেছে। কি সর্বনাশ। চুরি তাহ'লে ফাঁস হ'য়ে যায়। সুরতুন তখন বুদ্ধি ক'রে বললে,—আমিও দেখছি পরী, খুব কাছে দাঁড়ায়ে দেখছি, ইয়া গালপাট্টা, তার একমাথা ঝাকর মাকর চুল।

ফতেমার তাক লেগে গিয়েছিল সুরতুনের বর্ণনা শুনে।

কিন্তু রজবআলি যখন তার দরজায় এসে হাঁক দিয়ে দাঁড়াল তখন ভয়ে হকচকিয়ে পুরুষ জিনের কথা বলতে পারলনা। সে নিজেই সকালে চারির কাছে যায়, বলে ফেলল।

—গেছিলি ক্যান, তাই ক'।

সুরতুন নির্বাক।

—ক্যান্, তাই ক'।



সহসা রজবআলির মনে হ'ল সত্যটার তলদেশও সে দেখতে পেয়েছে, বুঝতে পেরেছে সুরতনের অকারণ বৈরসাধন।

প্রথম চরটা খেয়ে সুরতুন হাউ মাউ করে কেঁদে উঠেছিল, কিন্তু উপর্য্যুপরি চড়ের উপর চড় পড়তে লাগল যখন, বোবা কান্নায় হাহাকার করতে লাগল সে। পড়সীর ভির জমে উঠল রজবআলির অভিনায়। সুরতুনের গায়ে কাপড়টুকু দড়ির মতো পাকিয়ে তার গলা টেনে ধরেছে রজবআলি; ম্লান আলোয় সুরতুনের পিঠের, পাঁজড়ার হাড়গুলি চোখে পড়ছে। ধূলিমলিন বুকের সেদহীন আকুঞ্চিত স্তন দুটি।

(ক্রমশঃ)

## বুড়ো-জুড়োনো ছড়া

"যারা ব্যাঘ্রশাবক
তারা পাবো না পাবক?
দাবাগ্নি দান করো সহোদর-বন?
ওগো সুন্দরী বোন
ভাই সুন্দর-বন—"
ব্রজরাজ ডাকে আজ: "জাগবে কখন?"

বোন পারুল বলে:
"আজ ব্যগ্র হলে!
চাঁদ-ভাই সাতভাই চম্পারা কোন্
শোন-নদীর ধারা
পেয়ে মগ্ন হারা—
যাও ব্রজরাজ খোঁজ আগ্নেয় কোণ।"

# সাহিত্য-সমীক্ষা

## নিখিলকুমার নন্দী

"একথা সবাই জানে
যে সংগীত রসপানে
প্রভাতে প্রভাতে
আনন্দে আলোকসভা মাতে
সে যে হেয়
সে যে অশ্রদ্ধেয়
প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে
এই একভাবে।"

১৩০০ সালের সীমান্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ১৪০০ সালের অজাত পাঠকদের উদ্দেশ্যে যে সংশয়িত বাণী প্রেরণ করেছিলেন, আজ ১৪০০ সালের চল্লিশ বছর এপারে ব'সে সর্বপ্রথম সেই মর্মরিত বাণীকে মর্মগত করাতে চাই।—

আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের
লেশমাত্র ভাগ,
আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,
আজিকার কোনো রক্তরাগ—
অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে
তোমাদের করে,
আজি হতে শতবর্ষ পরে।

রবীন্দ্রনাথের মত বিরল-প্রতিভা কবি-কর্মী তাঁর কবিতাকে মাত্র এক শতকের আয়ুষ্মতী হওয়াতেও সংশয়বিমুক্ত নন, এ তাঁর মতন অতিসচেতন শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-জ্ঞানীর যথাযোগ্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাই এ-অংশের প্রধান লক্ষণীয় নয়। একশ বছর মাত্র বেঁচে থাকতে যে-গুণ তিনি তাঁর ১৩০২-এর ২ ফাল্গুনের কবিতায়, তথা সেদিনের প্রভাতের আনন্দে, কোনো ফুলে, কী পাখির কোনো গানে, কী সেদিনের কোনো রক্তরাগে অনুলিপ্ত দেখতে চেয়েছেন, সে হোলো 'অনুরাগ'। মূল্যবান একটি কবিতায় একটি অমূল্য কথা পেলাম—'অনুরাগ'। সাহিত্যিকের পক্ষ থেকে পাঠকের চিত্ত লক্ষ্য করে অনুরাগের অরুণিমা প্রেরণ করা হ'ল।

বিনিময়ে পাঠক-সমালোচককে এই অনুরাগের যোগ্য অনুরাগী ভোক্তা হ'তে হবে। এটাই আমার কথা। কবির চারটি ছত্রের স্বগত গুঞ্জন আমাকে এই কথাই বহুদিন ভাবিয়েছে। যদিও জানি, রবীন্দ্রনাথে সাহিত্য, শিল্প, সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব-মূলক প্রবন্ধ ও আলোচনার কিছু অভাব নেই, তবুও আমার মতে সাহিত্য-শিল্প-সৌন্দর্য্য-বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর অগণ্য কবিতা ও গান, গল্প-উপন্যাসের বহু পৃষ্ঠা থেকে



মুগ্ধ মনে মেনে নেওয়া যায়—খুঁজে নিয়ে বুঝে ভেবে প্রচুর খুশী হওয়া চলে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবোধকে স্পষ্ট করা এ-প্রবন্ধের অভিপ্রেত নয়। কবিশ্রেষ্ঠকে ভূমিকা ক'রে একালের সাহিত্যবোধের বিকার ও স্বাস্থ্যকে একটু ভেবে দেখতে চাই।

সাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রসংগ নিয়ে দেশে দেশে কালে কালে মতভেদের কিছু অপ্রাচুর্য্য নেই তবে সাহিত্যের অয়নে ও মননে প্রথম ও প্রধান অংশ যে নেয়, সে যে ঐ কবিশ্রেষ্ঠের অমূল্য কথায় 'অনুরাগ' অর্থাৎ অনুরাগী হৃদয়, তাতে সন্দেহ করবার মতো পাষণ্ড, আশাকরি, কেউ নেই। আশাই করতে পারি মাত্র। অন্যথায়, এতে অবিশ্বাসী রসিক হৃদয়েরা আমার বিবেচনাধীন নন। এখন, এই অনুরাগী হৃদয় নিয়েই সমস্যা। এই হৃদয়ের বিস্তার কতোদূরে পর্য্যন্ত সুখপ্রসূ, এর লক্ষ্য কী বা কতোখানি হলে সৌভাগ্য ইত্যাদি ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে মতভেদের অবধি নেই। বলা বাহুল্য, এই মতভেদ নিয়ে অতিমনোযোগী যুদ্ধরতদের অজান্তেই সাহিত্য আপন সার্থকতার পথ পেয়েছে, পথই বা কেন বলি, আসন, বরাসন পেয়েছে অন্য হৃদয়ে—যে হৃদয় উদ্বেল হয়, উত্তেজিত হ'তে জানে না, রসের বস্তুকে এক নিরিখে চিনে নিতে যার বিলম্ব নেই, প্রকৃত ভাবুক ও রসিককে সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে মেনে নিতে যার দ্বিধা নেই—সংশয়বিমুক্ত মুগ্ধ আনন্দের সংবাদ সরবে প্রচার করতেও যে সবসময় তৎপর নয়, কিন্তু সে হৃদয়ের উপভোগে কোথাও ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। এ হৃদয় পক্ষপাত জানে না, কেননা সাহিত্যিকেও তাহলে পক্ষাঘাতে পংগু ও পাংশু হ'তে হয়। সৎসাহিত্য এমনটি হয় না। হবে কেন?

আসলে, সত্য সাহিত্যিকমাত্রেই জানেন সাহিত্য জীবনের রসরূপায়ন। আর, জীবন স্বভাবতঃই পক্ষাঘাতগ্রস্ত নয়—জীবনের ক্ষয়ক্ষতি সুখশান্তি রূপ ও রূপহীনতায়—বহুবিধ জৈব ধর্ম ও বহুবিচিত্র আঘাতে-প্রত্যাঘাতেই কোনো একটি জীবন ফ'লে ওঠে—তাতে যেমন সৌরভও আছে, পচন-সম্ভাবনা—পতন-প্রবণতাও আছে, তাই ব'লে তা মূলেই বিকলাঙ্গ অসম্পূর্ণ নয়: সৎসাহিত্যিকের দায়িত্ব সেই জীবনকে ফুলে-পল্লবে প্রফুল্ল ক'রে তোলা—তাঁর দৃষ্টিভংগী যেমনই হোক, সেই বিশেষ জীবন-কলিকে তিনি যদি হৃদয়ের অনুরাগে সিক্ত ক'রে না তুলতে পারেন, তবে তো তা সাহিত্যের মাটিতে নিষ্ফল হ'য়ে শুকিয়ে যাবে—নিরঙ্কুশ সার্থকতা তার ভাগ্য নয়। এবং মুঞ্জরিত না হবার মন্দভাগ্য নিয়ে জীবনের পরিকল্পনা নয়, সত্যকার সাহিত্যেরও নয়। অতএব যে সাহিত্যকে পেয়ে আমি খুশী হয়েছি, তাকেও জীবনের মতো তার গোটা মূল্যে দেখব, কী তাতে নেই, এটা বোঝা বা বোঝানো কঠিন কিছু নয়—কিন্তু কিছু এমন আছে, যা বিশেষ লেখকের বিশেষ লেখাগুলিতেই বিশিষ্ট, হোক তা সামান্য, হোক সে অসামান্য, তাকে তার যোগ্য মূল্যে ও প্রাপ্য মর্যাদায় স্বীকার ক'রে নেবো—সাহিত্য-পাঠক ও বিচারকের এই উদার মনোভাবের কিছু লাঘব ঘটলে, এবং ঘটে থাকে বলেই, তা সাহিত্য-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে বিকার ব'লে গণ্য।

সাহিত্যে এই অন্তরসার ব্যাপারটিকে অর্থাৎ হৃদয় বিনিয়োগ ও হৃদয় বিনিময়ের বিষয়টিকে শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়, পৌষ' ৫৯—'কবিতা'য়, তাঁর স্বকীয় উপায়ে বুঝেছিলেন ও বুঝিয়েছিলেন। প্রবন্ধটির শেষ ভাগে অন্নদাশংকর বলেছেন: 'সত্যকে উপলব্ধি করতে হয়। যে লিখবে সেও উপলব্ধি করবে। যে পড়বে সেও। উপলব্ধির অভাব আর কিছু দিয়ে ভরে না। এর জন্য ডুব দিতে হয়

জীবনযমুনায়। ···'জীবন একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়, তার পদে পদে দুঃখ দৈন্য দ্বন্দ্ব। পদে পদে স্নেহ প্রীতি করুণাও আছে।' এই বোধ যে লেখকের আছে তাঁর আর মার নেই। যে পাঠকের আছে, তার পক্ষে অন্য কোনো বিবেচনা আর ভার বলে মান্য নয়। পাঠককে সুখী ক'রে যে লেখকের স্বরূপে খ্যাতি—তিনি জীবনের এই সত্য-উপলব্ধিক্রমেই পাঠক-হৃদয় জয় করেছেন। 'জীবনে জীবন যোগ করা' যেমন ক'রে যতটুকু ক'রে হোক, তাঁর হয়েছেই, না হ'লে সে পসরা তো হাটে নাস্তিমূল্যে বিকোতো অর্থাৎ বিকৃত সেই সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্মানিত হতেন না—আজ কোনো রকমে বিবেচনার ভুলভ্রান্তিক্রমে হলেও কাল পর্যন্ত আর তার বেয়াদপি মহাকাল মাপ করতেন না। চিরন্তন কথাটা বলব না—তবে একটা স্থায়ী মূল্যের—দু'যুগের কী দু'শতকের যাই হোক—আনন্দ বিতরণের ক্ষমতা নিয়ে যে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রতিষ্ঠা হোলো—জীবনের ও জীবনরসের অখণ্ড সত্য-উপলব্ধিযোগেই পাঠক-সমালোচককেও তাঁকে যোগ্য মর্যাদায় মেনে নিতে হবে। তাঁর মধ্যে এ নেই—এঁর মধ্যে তাই আছে—তাঁর মধ্যে এ কেন রইলো না, নেই ব'লে তিনি আর কিছুতেই মান্য নন—এমন অদ্ভুত আব্দার ও প্রবৃত্তির প্রশ্রয় যেন সৎরসিকের মনে না ঘটে—ঘটলেই তিনি সৎরসিক বলে পরিচয়ের অযোগ্য। সাহিত্যিক তাঁর সত্যের উপলব্ধিতে আন্তরিকতা-শূন্য হবেন না, এইটুকু পাঠক-সমালোচকরা অবশ্যই আশা করতে পারেন। কেননা সত্যকার লেখক-পাঠক-সমালোচক মাত্রেই জানেন সাহিত্যের সার্থকতায় জাল-জুয়াচুরির স্থান নেই। হৃদয় বড়ো স্পর্শকাতর। এক হৃদয়ের অন্তরসারশূন্যতায় অন্য হৃদয়ে আশাভঙ্গের ব্যথিত ধ্বনি স্পষ্ট হ'তে বিলম্ব ঘটে না। যে লেখকের উপলব্ধিতে সাধুতা আছে, অবন্ধুর বন্ধুত্বে যে লেখক স্বকীয় উপলব্ধিকে উদার পরিবেশনে সক্ষম, সে-লেখক পাঠক-সমালোচকের কাছেও সশ্রদ্ধ সহমমত্ব অবশ্যই দাবী করতে পারেন। পাঠককে তা ফিরিয়ে দিতে হবেই। এ বিষয়েও যে পাঠক বা পাঠকেরা দ্বিধার পরিচয় দেবেন—প্রশ্ন-কণ্টকিত আব্দার পেশ করবেন নিজেদের খেয়াল ও মর্জি-মতো, সেখানে সেই পাঠক-মনে নিশ্চয়ই ফাঁকি আছে। লেখককে শাসন করবার আগে তাই পাঠককে পূর্বাপর গভীর বিবেচনাক্রমে একবারও অন্তত তলিয়ে দেখতে হবে লেখকের প্রতি তথা সেই বিশেষ লেখকের পারবেশিত জীবনের প্রতি কতোখানি তাঁর সত্য সোহাগ ও সহানুভূতি আছে। সহমমত্ববোধ ও সম-অনুভূতির বুদ্ধি যোগেই নির্বিকার সাহিত্যপাঠ সম্পূর্ণ হ'তে পারে। প্রেম আর সাহিত্য দুইই নিভৃত নির্জনতার নিরীক্ষা-যোগ্য। প্রেমকে নিয়ে অসি-ঝলকানো যুদ্ধ মধ্যযুগে ছিল। আজ শেষ হয়েছে। মানুষ উচ্চতর মানবিকতার পরীক্ষায় পাশ হয়েছে। সাহিত্যকে নিয়ে দ্বন্দ্ব বা অন্য কথায় মসী-মাখানো কাদা-ছিটোনোর আজো শেষ নেই। 'জীবন যমুনায়' ডুব দিয়ে সাহিত্যিক-সাহিত্য-সমালোচক গভীর ও নির্মল মনুষ্যত্ব-মহিমায় উদ্বুদ্ধ হ'তে পারেন নি এখনো। না হ'লে জীবনের রূপচিত্রের উপঢৌকনে সমৃদ্ধ সাহিত্য—যে দৃষ্টি-ভংগীর পরিচয়ই তাতে থাক (কিছু না কিছু জীবনোপলব্ধি তাতে অবশ্যই আছে, নইলে সে বিচারোন্মুখ বিবেচনাধীন হতেই পারতো না) প্রশ্ন-কণ্টকিত অন্যায় আদালতের বলি হবে কি? জীবনের একাংশকে সমর্থন করতে গিয়ে অপরাংশকে ব্যঙ্গবিদ্রূপে লাঞ্ছিত করা—এইতো হয়েছে একালের সাহিত্যবোধ-পরিচয়ের পরাকাষ্ঠা! এতে আর যাই না থাক, প্রকাণ্ড জুয়াচুরি আছে। জীবনকে তার গোটা মূল্যে না দেখতে পাওয়ার বিভ্রান্তিকর শাস্তি এখানে—শাস্তি এখানেই।



জীবনযমুনায় সার্থক নিমজ্জনের অভিজ্ঞান সাহিত্য-শিল্প সম্পর্কে কোনো বিশেষ প্রতীতি বা নিশ্চিত নিশ্চিন্ত ফলামূলা-প্রীতিতে অবশ্যই নেই। আংশিক জীবনে বা জগতে নয়, পরিপূর্ণ জীবনের দিকে উদার দৃষ্টিতে চাইবার অনিচ্ছাক্রমেই সাহিত্য বিচারালয়ে এতো উদভ্রান্ত সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি। এ স্বাস্থ্য-বিরুদ্ধ। এ শুভ-বিদ্বেষী। এ জাতের বিচার-প্রবণতা উদার বিবেকের আবেগে জন্মে না—এর উদ্ভব জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এককেন্দ্রিক চর্চা ও চর্যার তাগিদে। না হ'লে দিকে দিকে সাহিত্যবোধের রাষ্ট্রনীতি-চক্রে এতো পক্ষাপাত-প্রীতি সম্প্রদায়-সাধনা কেন?

কোনো এক সাহিত্যিককে ধরেই ভাবুন এ-ই খণ্ডশঃ সাহিত্য-পাঠের নিশানা কোন্ দিকে? ধরুন, হাতের কাছে 'শ্রীকান্ত'কেই। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য রচনাতেও যেমন, শ্রীকান্তেও তেমনি, স্থানে স্থানে, বহুস্থানে, গল্পের নায়কের ব্রাহ্মণ্য তাঁকে অনেকের কাছে বহুবিচিত্রভাবে সুযোগ সুবিধে পাইয়েছে, এমন কী অকপট (অকারণ-ও) শ্রদ্ধার যোগ্য ক'রেও তুলেছে। এতে প্রমাণ হয়, শরৎচন্দ্রে হয় ব্রাহ্মণত্বের কিছু দুর্বল অভিমান ছিল, না হয় পদে পদে অব্রাহ্মণত্বের অভ্যাস ও সংস্কারবশে ব্রাহ্মণত্বের বাতুল শ্রদ্ধালুতায় তিনি স্বয়ং লজ্জিত হয়ে তাকে বারবার আঘাত করতে চেয়েছেন। সম্ভবত শরৎচন্দ্রের এই দুটি দিকই ছিল—নিজের স্বভাব-দৌর্বল্য ও অন্যের অনুরূপ চরিত্র-ভীরুতায় আঘাত করবার সাহসী অভিপ্রায়। এখন, ধরুন, আর সব বাদ দিয়ে শরৎচন্দ্রের এই এক নগণ্য অংশে আলো দিতে কেউ যদি 'ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্র' ব'লে একটি প্রবন্ধ লিখে ফেলেন, তাঁকে কি সহ্য করা সুসাধ্য? সেই বিশিষ্ট প্রবন্ধলেখকটির কাছে অন্নদাদি কী কনকলতার দুঃখী জীবন কোনো অর্থ আনলো না—রাজলক্ষ্মীর জীবনের সংকট তাঁকে ভাবালো না—উদার উদাসীন শ্রীকান্ত, দুঃসাহসী আশ্চর্যমনা ইন্দ্রনাথ, বিদ্রোহিনী অভয়া সকলেই তাঁর বিচার-বৃত্তের অতিদূরে রয়ে গেল—সত্য হোলো তাঁর কাছে একমাত্র 'ব্রাহ্মণ শরৎচন্দ্র'। তেমনি টল্‌স্টয়ের Anna Karennina পাঠান্তে কেউ যদি স্পষ্ট বিশ্লেষণে (অন্যান্য অনেক বিষয়ে হয়তো তিনি প্রকৃতই অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ) বলতে আসেন কেবলমাত্র এই—Levin-এর এখানকার কথাগুলিতে ১৮৬১-১৯০৫ এর অন্তর্বর্তী কালের রাশিয়ার ঐতিহাসিক বাঁকের এতোখানি নিখুঁত ছবি পাওয়া গেল—এ-ই তো টল্‌স্টয়, এখানেই তাঁর মহত্ব!—তাহলে কোনো সত্যকার সাহিত্য-রসিক তাঁকে খুশী চিত্তে মেনে নিতে পারেন? সেই যে জীবনযমুনায় বহুবিচিত্র ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিভ্রান্ত ও উদভ্রান্ত নারীহৃদয়—সেই যে জীবনের দ্বন্দ্বে দ্বিধায় আবার প্রেমে ও করুণায় আলোড়িত যুদ্ধক্লান্ত Anna ইঞ্জিনের নীচে নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে আত্মঘাতী হ'তে গিয়েও ফিরে আসতে চাইছে আবার সেই জীবনেই—অথচ দেরী হয়ে গেল—তার জীবনব্যাপী যন্ত্রণার কি কোনো তৎপর্য নেই—সেই জীবনের বিক্ষোভ-বেদনা ঐ বিজ্ঞ বিবেকে কোনো নাড়া দিতে পারলো না! আশ্চর্য! আশ্চর্য নয়?

প্রধান কথা, শিল্পী-সাহিত্যিক মানুষই। মানুষের আদর্শ চিন্তা মনন-মানসিকতা সর্বাংশে নির্ভুল নয়—শিল্পী-মানুষও জটিল হৃদয় ও মনের দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে, সংশয়ে সম্পূর্ণ নয়। এ যে কোনো সাধারণ সাহিত্যিক সম্পর্কে তো সত্যই, রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের মতো অসাধারণ শিল্পীর প্রসংগেও এ সত্য। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারটিকে যতো সুগভীর শান্ত বিনয়ে মেনে নিয়েছিলেন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে, এমন আর কেউই পারেন নি। এ-ও হয়তো মহৎ প্রতিভার একটি লক্ষণ। না হ'লে

উত্তর-ষাট পূরবীর যুগেও যেমন, আশী-পূর্ব রচনার পর্যায়েও তেমনি, কেবলি তিনি অস্বীকার করেন কিভাবে তাঁর গানের পূর্ণতাকে। প্রচুর ভাবোন্মাদনায় এ অস্বীকৃতি যেমন উচ্ছল :

মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।

তেমনি স্পষ্ট ঋজুরেখ ঔজ্জ্বল্যে তার অন্য প্রকাশ সশ্রদ্ধ লক্ষ্যযোগ্য :

আকাশ-বাণীর সাথে প্রাণের বাণীর
সুর বাঁধা হয় নাই পূর্ণ সুরে
ভাষা পাই নাই।

আর সেই বহুবিশ্রুত কবি-বাণী :

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

বিচিত্র বিষয় ও ভাবের আত্মীকরণে ও ভাষান্তরণে পদে পদে ঠেকেছেন রবীন্দ্রনাথ—অতবড়ো শক্তিমানের কলমেও তাই অক্ষমতার হাহাকার মূর্তিমৎ হয়েছে : 'ভাষা নাই ভাষা নাই'। এই ব্যাপারটিকে একালের একজন মনস্বী বাঙালী লেখক স্পষ্টভাষায় লক্ষ্য করেছেন : 'কাব্যরীতি ও কাব্যকৃতি সম্পর্কে নিজের অপূর্ণতাকে তিনি বারবার স্বীকার করেছেন। এই অপূর্ণতার সূত্রটি ধ'রে তাঁর পরবর্তীদের সাধনায় বাংলা কবিতা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারত কিন্তু তা হয় নি।' (পূর্ব্বাশা-ফাল্গুন ১৩৫৮)। কেন হয় নি? জীবনব্যাপী সেই অনুরাগের অভাব ছিলো বলেই। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন' 'সে-কবির বাণী' কোথায়? পক্ষান্তরে যা পেয়েছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা 'সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি'। উল্লিখিত লেখক একই প্রবন্ধে বলছেন : 'চাষী-শ্রমিকের রাষ্ট্রাদর্শ নিয়ে বহু ছড়া-পাঁচালি-পদ্য এ-দশবছর (১৩৬০ থ'রে বারো বছর) লেখা হয়েছে এবং যাঁরা লিখেছেন তাঁরা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা কামনা করেছিলেন এবং যাকে সত্যিকারের কবিতা বলা যায় তেমন চারটি পংক্তিও বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারে জমা হয়নি।" এমনটি কেন হোলো? এই দশ-বারোবছরের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এ-পথে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার অভিপ্রেত বস্তু সম্ভবত সত্যকার সুধা নয়—বিষ। না হ'লে সাহিত্য-বিবেক ও সাহিত্য-সাধনা নিয়ে এ-যুগে পংকিল বিষ-মন্থনই অধিক হয়েছে। অতিসম্প্রতি তো এর মারী-রূপ দেখছি। এর জন্যে যতো শক্তি অপব্যয়িত হয়েছে, সে-শক্তির সার্থকতা কোন্ পথে কতোদূর পর্যন্ত শুভজনক হ'তে পারতো, এখন আর তা ভেবে লাভ নেই। তবে এটা ঠিক, অন্যায় ও অদ্ভুত সাহিত্যবোধের নিদর্শন হিসেবে কেবল পূর্বসূরীদের সুরের অপূর্ণতা (যেটা কিছুই আশ্চর্য নয় ব'লেই একটা আবিষ্কারও নয়) নির্ণয়ের অনাবশ্যক পণ্ডশ্রমই চলেছে। শ্রমিক-কৃষকের জীবনের শরিক হবার সৎ চেষ্টা তো কই কোথাও নেই। আর চেষ্টা করে এসব বুঝি ঘটেও না। ঘটলেও সেটা শেষ পর্যন্ত সুঘটনা ব'লে বিবেচনাযোগ্য হয় না। কেননা, সেক্ষেত্রে আরাম চাওয়া অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্বেদাক্ত ক্লেদই জমা হয়—আত্মীয় আন্তরিকতার সুখস্পর্শ সেখানে চিরকাল অনুপস্থিত থাকে। এটা তো জানিই, যতদিন এদেশের শিক্ষা সুদূরবিস্তৃত



হ'য়ে শ্রমিক-কৃষককেও তাদের জীবন-সম্পর্কে গভীরভাবে সচেতন ক'রে সেই জীবনবোধকে অকপট সাহিত্যে স্বাক্ষরিত করতে না পারে, ততদিন কেবল সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন 'ছড়া পাঁচালি-পদ্য'ই আমরা পাবো, মহৎ কবিতা নয়, বৃহৎ সাহিত্য নয়; যেহেতু সাহিত্যে সহজ হৃদয়ের সংবেদনশীল সংযোগ ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রয়োগ সুফলপ্রসূ হয় না, হ'তে পারে না।

এক'বছরে সাহিত্য-পাঠের হয়তো কিছু বিস্তার ঘটেছে—কিন্তু সাহিত্য-পাঠে প্রশস্ত প্রশান্ত ঔদার্য কজনার আছে বা কজনার বেড়েছে? সাহিত্যের প্রতি, জীবনের প্রতি অসীম প্রীতিবশতঃই যিনি সাহিত্য পাঠ করেন, পাঠ ক'রে জীবনে মুক্ত ও ব্যাপ্ত হন, সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হন, শান্তিতে মহিমা-মূল্য লাভ করেন তেমন ক'জন পাঠক পাওয়া গেছে? আদর্শ সাহিত্য-পাঠে ও বিচারে অসহিষ্ণুতার কোনো স্থান নেই। সাহিত্যের হাওয়া-বদলকে নির্লিপ্ত নিরুদ্বেজ নিরুদ্বিগ্ন মনে ও হৃদয়ে স্বীকার ক'রে নিতে হবে—সর্বথা বরণ ক'রে না-ই বা নেওয়া গেল। কেননা 'বিশ্বাস রেখে ঠকা ভালো, অবিশ্বাস করে অবিচার করার চেয়ে' (রবীন্দ্রনাথে একটি চিঠি থেকে)। স্পষ্টভাষায় উঁচু গলায় কোনো সাহিত্যেকেই একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে পাওয়া যেতে পারে না—কেননা আশা পূর্ণ না হলে, যেটাই স্বাভাবিক ও বিশুদ্ধ সত্য—যতো কাদাছেটানো ও মসী-মাখানোর মামলা, যা কদাপি শুভসূচক নয়। তাই 'প্রোলিটারিএট' সাহিত্য কোনো এক সময়ে চাইলেই যেমন পাওয়া যাবে না, তার জন্যে যেমি প্রস্তুতি চাই, প্রতিভা চাই যা বিশেষ দেশকালপাত্রসাপেক্ষ—তেমনি আকণ্ঠ নৈরাশ্য ও দুঃখদুর্দশায় ডুবে থাকার দিনে 'আনন্দের সাহিত্য' ব'লেও কি কিছু সহজেই অবির্ভূত হ'তে পারবে?—সেই চাওয়ার মধ্যে যতোই কেন না কল্যাণবুদ্ধি ও সৌন্দর্য-বোধ অনুক্ত থাকুক। সেই আনন্দের সাহিত্যকেও যুগান্তর ও কালান্তরই পথ উন্মুক্ত ক'রে দেবে। গত আশ্বিন ১৩৫৮—পূর্ব্বাশায় শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে বিশ শতকের ইংরেজী সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি উজ্জ্বল দিক্‌নির্ণয় করেও তাঁর কতিপয় উচ্চাশা পেশ করেছেন বর্তমান সাহিত্য-যুগের কাছে, যাতে তাঁর ব্যক্তিগত শুভবুদ্ধির হয়তো প্রকাশ ঘটেছে, কিন্তু তিনি সেখানে সর্বথা নির্ভুল নন। নৈরাশ্য-পীড়িত ব্যথা-বিহ্বল আতঙ্কপঙ্কে সীমিত এবং কার্যকারণসূত্রে উদভ্রান্ত, স্থানে স্থানে বিভ্রান্ত বিশশতকী ইংরেজী সাহিত্যের স্বরূপকে সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি এক জায়গায় বলছেন : জীবনে boredom and horror নিশ্চয়ই আছে—এবং এটা অপূর্ব কোনো আবিষ্কারও নয়—কিন্তু এই 'boredom'-এর কবিদের রচনা পড়তে পড়তে এ-সন্দেহ আমরা কিছুতেই ঠেকাতে পারি না যে তাঁরা নিজেরাই bored ;…"—একথা মোটামুটি সন্দেহযোগ্য নয়, কিন্তু তবু প্রশ্ন আছে। 'boredom'কে এযুগে আবিষ্কার করতে হয়নি—'boredom' সান্ধ্য যুগের লক্ষণ —আর 'boredom'-এর ছবি আঁকতে 'bored' না হয়ে উপায় কী? সাহিত্যিককে তাঁর স্বরূপে, বিশেষ অবস্থার, ভাব-বিষয়ের অনুরূপ-হৃদয় বন্ধুরূপে আবির্ভূত হতেই হবে—যে যুগলক্ষণের যে সাহিত্যিকই তিনি হোন! আর এটা তো ঠিক, 'loved' না হ'য়ে 'love'-এর সার্থক সাহিত্য-চিত্র কে কবে দিতে পেরেছেন? প্রেমিক না হয়ে সত্যকার প্রেমের কবিতা? আর সেই পারাটাই কি উচিত? তাহ'লে সেখানেও তো সেই অনান্তরিক সাহিত্যিক ভূমিকা, যার স্থান স্থায়ীসাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে কখনও নেই। যে সব লেখককে বা যে-সাহিত্যকে বুদ্ধদেববাবু ঐ প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, সেই বিশেষ বিশেষ লেখক বা সাহিত্যের গোটা মানকে তাঁর মানের বিষয়

করাই ঠিক ছিল—খণ্ড খণ্ড মনকে নয়। আবার এ-পথে তিনি এগোননি বলেই যে তিনি সত্যের অপলাপই করেছেন তাও নয়, বহুত্র তাঁর ইংগিত স্পষ্টত বাস্তবচিত্রের লক্ষ্যভেদী হয়েছে। এখানে বলা অপ্রাসংগিক হবে না যে, এক্ষেত্রে যোগ্যতর পাঠক-সমালোচকের ভূমিকাটি কেমন হওয়া উচিত, তা পাওয়া যাবে শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি স্পষ্টোচ্চারণে ('এখনকার কবিতা'—পূর্ব্বাশা ফাল্গুন ১৩৫৯): 'এসব মন রুগ্ন কি ভগ্ন সে-বিচার কাব্য-সমালোচকের এলাকার নয়। তিনি দেখবেন কবিতার (সাহিত্যের সব বিভাগেই) কবির (সব শ্রেণীর সাহিত্যিকের) মনকে কতোটুকু এ যুগের মনের রঙের নিরিখে পাওয়া গেল। ব্যথা যদি হয় যুগলক্ষণ তাহলে দেখতে হবে সে ব্যথা কতোটা মূর্তিময়, কতোটা ধ্বনিময়, সত্যময়, কতোটা মনোরম করে নিবেদিত হয়েছে।' আর লেখকপক্ষের এই নিবেদনের জবাব দিতে হবে পাঠকপক্ষে শ্রদ্ধা দিয়ে, সহিষ্ণুতা দিয়ে, বিশ্বাস দিয়ে—অসংযম দিয়ে নয়, বিশেষ দল বা মনোবৃত্তিগত মজি দিয়ে নয়। তাহলেই সাহিত্যের পরিধি তথা জীবনের বৃত্ত গেলো সংকীর্ণ হয়ে, ক্ষুদ্র হয়ে—সাহিত্যিকের সৃজনকারী শক্তির স্বাধীনতাকে দেওয়া হোলো খর্ব ক'রে। অনন্ত রহস্যে মোড়া মানুষের মন আর বহুবিস্তৃত ও বিবিধবিচিত্র সম্ভাবনা পূর্ণ জীবনের দিকে চেয়ে, তার প্রতি অখণ্ড প্রীতিবশতঃ এটা নিশ্চয়ই ইচ্ছনীয় নয়—হওয়া উচিত নয়। তবুও হয়। দেখতে পাচ্ছি, হোচ্ছে। সে ঐ সাহিত্যবোধের বিকারের ফল। জীবনবোধের অপূর্ণ অস্বাস্থ্যের স্মারক।

সাহিত্যিকের কাছে প্রথম বাঞ্ছিত বিষয় হোলো, তিনি প্রধানতঃ শিল্পী হবেন। সমবেদনায়, সহানুভূতিতে, জীবনের প্রতি অনুরাগে তিনি তাঁর চারদিকে একটা অতিসূক্ষ্ম ভাবজগতের পরিমণ্ডল রচনা করবেন—জীবনের সৌন্দর্য্য, পংকিলতা, স্থূলতা, অভাব অভিযোগ তাঁর নিজের মানসিকতায় বিশিষ্টরূপে রচিত হয়ে রসমূর্তি পরিগ্রহ করবে সাহিত্যে, তিনি থাকবেন তার মধ্যেই অথচ তার ওপরে—উদার কিন্তু নির্লিপ্ত নির্জনতায়। আবার তাই বলেই কি তিনি যুগলক্ষণে অচিহ্নিত থাকবেন? নিজের চারিত্র-প্রভাবকে অস্বীকার করবেন তাঁর সৃষ্টিতে কষ্ট করে, কপট কল্পনায়? শিল্প গুণে, অনুরাগ-রঞ্জনে তা সর্বহৃদয়হরণকারী হবে, তা কালজয়ী হবে। এই ধরুন, বংকিমে ত্রুটি ছিল, বংকিমে অপরিপূর্তি ছিল, অভাব ছিল। যুগের অনেক সাধু-অসাধু লক্ষণে তিনি নাতিচিহ্নিত ছিলেন—সে-বিচারে হয়তো তাঁর অনেক সমসাময়িক কি উত্তরকালীন তাঁকে হারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের যা ছিল না—তা বংকিমে ছিল—এবং সেটাই বৃহৎ ব্যাপার। এক সৌন্দর্য্য-শালীনতা-বুদ্ধ শিল্পী বংকিমে অচপল মহিমায় সদাজাগ্রত ছিলেন। সেই সদাজাগ্রত শিল্পগুণেই বংকিম আজো, সার্দ্ধশতাব্দী পরেও আমাদের মনে জীবন্ত একটা মানসিকতা, উজ্জ্বল একটা মনুষ্যত্ব। তার কারণ হোলো, জীবনের সুখদুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে তিনি গভীর জ্ঞানে সাহিত্যের উপজীব্য করেছিলেন—স্কুলমাষ্টারী-কৈবল্য কি অর্থহীন খেয়ালী উচ্ছ্বাসমাত্র তাঁর কলমের লক্ষ্য ছিল না। তর্জন-স্বভাব কিছু তাঁর ছিল—এবং যতোটুকু ছিল, তা কখনই তাঁর শিল্পশ্রী তাঁর প্রাণপ্রাচুর্যবাদী জীবন-অভিমুখী কবিমানসকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি।* রবীন্দ্রনাথের শরৎচন্দ্রের মধ্যে দিয়ে, এ শতকের বিশত্রিশের এক গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ সাহিত্য-আন্দলনের ভাঙ্গাগড়ার পরে, এপারে দূরে এসেও আমরা সেই শৈবলিনী রোহিণীকে নিয়ে চিন্তিত স্বগতোক্তি করি—শৈবলিনী-রোহিণী-সমস্যা

* স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র মহৎ শিল্পী কিন্তু সমালোচক বা সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র সাম্রাজ্য-চক্রান্তে বলি-প্রদত্ত। সম্পাদক।



বংকিমের চিত্রী প্রতিভার সাফল্যগুণে আমাদের মনেও জীবিত ও প্রাণবন্ত হয়েই আছে—শৈবলিনী-রোহিণীর জীবন-সংকট এখনো অব্যাহত বলেও বটে। কিন্তু বংকিম-কালীন অনেকেই, প্রায় সকলেই আজ ম্লান, মৃত। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর অনুসরণে যেমন ও যেহেতু বলা যায় বাল্মীকি আজো ঘরে ঘরে আদৃত, যোগবাশিষ্ঠ মৃত।†

সাহিত্যিকের প্রধান লক্ষ্য এই যে—শিল্প মণ্ডলে, আনন্দ-রসায়নে, তা কেবল সহজাত শক্তিবলেই হয় না—কি গভীর অধ্যবসায় ও নিষ্ঠাযোগেও না—তার জন্যে দুরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিলোক যেমন চাই, তেমনি বিষয়ের অনুষঙ্গী গভীর মমত্ববোধ—রবীন্দ্রনাথের কথায় সেই 'অনুরাগ'—অনুরাগী হৃদয়ের আবেগলোকও আবশ্যিক। এই সার্থক শিল্প-মণ্ডলের বিচিত্র ঐন্দ্রজালিক কৌশলে মনের গহন-গভীর ভাবাবেগই কেবল কবিতা হয় না—বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানলোকের অনেক আহরণও কবিতা হ'তে পারে। যেমন হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা'—বলিদ্বীপের ভৌগোলিক দেশনৈতিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস কী ক'রে এমন আশ্চর্য কবিতা হোলো, একালের অতিবাস্তবনিষ্ঠ কবিখ্যাতি-প্রার্থীদের তা একবার শ্রদ্ধার সংগে ভেবে দেখতে বলি। কি, অল্পের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের 'আমরা'। সত্যেন্দ্রনাথের স্বকীয় শক্তির অনুযায়ী এই পদ্যটি বহুলাংশে কবিতাপদবাচ্য—স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট কবিতা—কিন্তু এর পেছনে কোনো সূক্ষ্মতম-ভাবাবেগের প্রেরণা নেই—আছে বাংলার ইতিহাস-ভূগোল ধার্মিক-দার্শনিক-নামপঞ্জী এমন কি উদ্ভিত ও রসায়ন-তত্ত্বও—প্রত্যক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ের কড়াপাকে বড়োজোর আশ্রয় পেয়েছে অতিস্থূল কিন্তু অতি সহজ ও অতি-আন্তরিক দেশপ্রীতি। যে শিল্প-চেতনা, সৃজন-ব্যাকুলতা 'অনুরাগের' পরশমণি-স্পর্শ এর জন্যে দায়ী, সে-ই সাহিত্যের বিচারালয়ে সর্বপ্রথম বরণীয় হোক, তার স্থান হোক সর্বহিতের পুরোভাগে—পৌরোহিত্য করুক সে।

পরিশেষে বক্তব্য হোলো, সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপক্ষপাতী অনুরাগী হৃদয়েরই জয়—কি লেখকপক্ষে, কি পাঠক-সমালোচক-পক্ষে। আর এটাও এখন বিশেষ প্রণিধেয় যে, উদার সাহিত্যবোধ ও বোধায়নে, পঠনে আর পাঠনে বিশ্বমৈত্রীর শান্তি ও শক্তি অনায়াসভোগ্য হ'তে পারে। কেননা, যে পাঠক ঋষিকল্প টলষ্টয়ের বিরাট বিশাল জীবনপটের মহিমময় আলেখ্য আস্বাদন ক'রেও সহজ বিশ্বাসে ও অনুরাগে ডি, এইচ, লরেন্সের আঞ্চলিক তবু আশ্চর্য সহজিয়া জীবনবাদের প্রগাঢ়তায় জড়িয়ে পড়তে পারে, তেম্নি অনায়াসে এরিখ মারিয়ে রেমার্কের উপন্যাসে—তার হৃদয় উত্তরযুদ্ধ অবসাদের নিমজ্জনেও অশ্রান্ত—গোর্কীর 'In the World' এর নীচুতলার একান্ত 'Worldiness' ও যাকে স্পর্শ ক'রে যায় জ্ঞান দিয়ে, ভাব দিয়ে—সেই অশ্রান্ত উদারচিত্ত পাঠকের সাহিত্যপাঠে ও সাহিত্যরসবোধেই তো আদর্শ পাঠক-মন নিহিত। এঁরই জন্যে সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালজয়ী কবিতার, গানের আশীর্বাদ নিয়ে যেমন স্মিতহাস্য—উত্তরকালীন অন্য যে কোনা অপেক্ষাকৃত অল্প-শক্তিমান অ-রবীন্দ্রনাথও তাঁর অচিরস্থায়ী অল্পমূল্য আনন্দকে নিয়ে এঁর কাছে তেম্নি সমান আগ্রহে অগ্রসর হবেন। এই পাঠক দ্বিধাহীন হৃদয়ে সর্বত্রগামী। এই পাঠকই সাহিত্য-পাঠক-পক্ষে অন্নদাশংকর প্রোক্ত 'জীবন-যমুনার' সার্থক

† ওটা বীরবল পক্ষে পরিহাস। নিয়তির পরিহাসের ইঙ্গিত। যোগবাশিষ্ঠজাত সহজিয়া প্রবণতা আমাদের অন্তঃকরণে সদাস্থিত—বঙ্কিমী বাসুদেবের মতো, কিন্তু বাইরে আমরা বাল্মীকির রামচন্দ্র।—সম্পাদক

ডুবুরী। জীবনের ও সাহিত্যের অন্তঃসারের শ্রেষ্ঠ রসিক। এই রসিক হৃদয় কবে নগন্য থেকে অগন্য হবে?

এই শ্রেণীর রসিক-হৃদয় পাঠক ও সমালোচকের প্রসারিত সাহিত্য-বিবেকের সূত্রে ১৩০০ সালের কবির আনন্দ-অভিনন্দন ১৪০০ সালের অজ্ঞাত 'নূতন কবি'র করতলগত হবে। এমনি নিয়মে ১৪০০ সালের কবি ১৫০০ সালে বিস্তৃত হবেন—সাহিত্যের 'সহিতত্ব'-ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকবে। 'আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে'—কোনো এক যুগের কি কোনো এক শতকের এই চিরন্তন কবি-বাসনা যুগান্তরে শতকান্তেও সার্থকতা লাভ ক'রে নবযুগের জন্যে নবমূর্তিতে প্রস্তুত হয়ে অম্লান থাকবে, অকুণ্ঠ থাকবে—সাহিত্যস্রোত বিপুলা পৃথিবী ও নিরবধিকালেও বিচ্ছিন্নপ্রবাহ হ'তে পারবে না। "ইচ্ছা যেখানে গভীর, রক্ত যেখানে মুখর, প্রাণ যেখানে ব্যাকুল, ···'বেঁচে আছি' —এই চেতনা উৎসারিত হয় যেখান থেকে,"···( শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর 'কলকাতা'—কবিতা থেকে ), সেখান হ'তে যে মর্মবাণীই উদ্দীপিত হোক, যে জীবনালেখ্যই উদ্ধৃত হোক, 'সে যে হেয়, সে যে অশ্রদ্ধেয়, প্রমাণ করিতে তাহা আরো বহু দীর্ঘকাল যাবে'।

"···প্রেম ওরফে Love যে সাহিত্যের বড় কথা, তা আমি জানি। না জেনে উপায় নেই, কারণ আমি আজীবন নানা ভাষায় নানা সাহিত্যের চর্চ্চা করেছি। এই পড়াশুনোর ফলে আমার এই ধারণা জন্মেছে যে, প্রেম করা হয়ত জীবনে সহজ, কিন্তু ও-বস্তুকে সাহিত্যে প্রমোশন দেওয়া বড় কঠিন।"

—প্রমথ চৌধুরী। ( পূর্ব্বাশা, ১৩৪০, শ্রাবণ )॥

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

এর পরে হিরন্ময়ী আবার শামুকের মতো গুটিয়ে গেলেন নিজের মধ্যে। কত শত বিনিদ্র রাত্রির বেদনা গ'লে পড়লো তাঁর গাল বেয়ে কে তার হিসেব রাখে। দোষ দেবেন কার? বরাতে যার যা পাওনা আছে তাই তো নিতে হবে হাত পেতে? ছোটো ছেলে দু'জন মাঝে মাঝে গোঁয়ার্তুমি করে, তাদেরই তিনি ব'কে-ঝ'কে সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। অধিকার যখন পুরোমাত্রায় প্রমালারই, আর সুনির্মলই যেখানে সেই অধিকারের ইন্ধন জোগায় সেখানে মিছিমিছি গলা ফাটিয়ে বাড়িটাকে বস্তি বানিয়ে লাভ কী? আর এই মানুষ কি তার রাগেরও যোগ্য! ওকে কি তিনি ততখানিও গণ্য করতে পারেন?

অভিমান করলেন তিনি ছেলের উপরে। সুনির্মল কি ইচ্ছে করলে পারতো না এর কোনো প্রতিকার করতে? বাড়ির প্রতি তার এই নিরাসক্তিকে—যা হচ্ছে হোক, যা করছে করুক, যেমন চলছে চলুক, এই এড়িয়ে-যাওয়া পালিয়ে-আসা ভাবকে তিনি ধিক্কার দিলেন। বাড়িটাকে বস্তি বানাতে মার মতো ছেলেও যে পেরে ওঠে না সে কথাটা মনে হ'লো না তাঁর।

কী করবে সুনির্মল! কী করবার আছে তার? হিন্দু বিবাহের পবিত্র বন্ধন ছিন্ন করবে এমন শক্তি সমাজ তাকে দেয়নি। সেখানে প্রমীলার একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। অবিশ্যি সে পুরুষ। গায়ে তার শক্তি আছে। তাই ব'লে সে শক্তি তো একটা স্ত্রীলোককে ধ'রে মারবার জন্যেই অহরহ ক্ষয় করতে পারে না? সেটা ভদ্রতায়, সভ্যতায় আটকায়, আর লোকলজ্জার ভয়ও মনুষ্যজগতে কিছু কম নয়। তাছাড়া মারলেই বা কী। প্রমীলার কি কোনো আত্মসম্মান আছে? সম্ভ্রম বোধ আছে? চড় চাপড় না-ইবা দিল, এমন অভদ্র ইতর ঘটনা তো কতবার ঘটেছে যার ফল চড়-চাপড়ের চাইতে অনেক, অনেক বেশি গুরুতর হয়েছে, অনেক বেশি অপমানের। কী ফল হয়েছে তাতে? তাতে কি সে চ'লে গেছে?

যদি এমনও হ'তো যে স্বামীর সুখদুঃখকে সে সামান্যতমও গ্রাহ্য করে, মানুষটার

প্রতি এক তিল মমতাও বোধ করে হৃদয়ের মধ্যে, তবু না-হয় আশা থাকতো। সেই রন্ধ্রটি বেয়ে-বেয়েই এগুতে পারতো সুনির্মল, কিন্তু যার বুকের তলায় হৃদয় নামকই কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নেই তাকে নিয়ে আর কী করা যায়? অনেক বুঝিয়েছে—কখনো অসহ্য ক্রোধ নিয়ে, কখনো অমানুষিক ধৈর্য নিয়ে—মাকে সে কোথায় ফেলে দেবে, ভাইদের সে কেমন ক'রে তাড়াবে, বলতে-বলতে উত্তেজিত হয়েছে। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এসেছে, দুর্মুখ দুঃসহ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে—না, মারতে ইচ্ছে করেনি, মেরে ফেলতে ইচ্ছে করেছে। শাদা নীরক্ত, শ্রীহীন গলার কাছে যাবার জন্য নিস্‌পিস্ ক'রে উঠেছে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল। আর সেই অদম্য ইচ্ছাকে সংযত করতে তাকে ছুটে ছুটে বেরিয়ে যেতে হয়েছে রাস্তায়, পার্কে, এখানে ওখানে। কতরাত ট্রাম লাইনের ঘাসে ব'সে থাকতে-থাকতে একটা প্রতিহিংসা জ্ব'লে উঠেছে বুকের মধ্যে। হিরণ্ময়ীর পুত্রবধূকে সমাদরে গ্রহণ ক'রে সর্বস্ব সমর্পণ করার এই তো উপযুক্ত প্রতিশোধ, এ-কথা ভেবে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আরামও বোধ হয়েছে তার।

নেহাত নির্বিরোধী শান্ত প্রকৃতির মানুষ সে। এমন একটা ঘটনার সঙ্গে দিনরাত লড়াই করবার মতো যোগ্যতা বা উদ্যম সত্যিই তার ছিলো না। হয়তো এটা তার কাপুরুষতারই প্রমাণ। কিন্তু উপায় কী? প্রমীলার স্তরে নেমে এসে ঠিক তার উপযোগী ব্যবহার করা অসম্ভব তার পক্ষে। ঝগড়া, তর্ক, মারামারি সবটার ভাষাই তার এমন যে-ভাষা প্রমীলার বোধগম্য নয়। যেটা বোধগম্য (যদি বোধ থাকে) সেটা সে জানে না। জানলেও পারে না।

প্রমীলা এ-বাড়িতে থাকবেই, স্বামী তার, তারই তো বাড়ি। তাকে তাড়াবে এমন সাধ্য কার আছে এখানে? যজ্ঞেশ্বরকে চিঠি লিখে, উকিলের দরওায় হাঁটাহাঁটি ক'রে পাকাপোক্ত ভাবে পরিত্যাগ করবার একটা চেষ্টা করেছিলো সুনির্মল, সঙ্গে-সঙ্গে বাপ এলো আর প্রমীলা তার স্ত্রীত্বের সকল অধিকার নিয়ে রুখে দাঁড়ালো। এখানে সুনির্মলের হাত পা চিরদিনের জন্য বাঁধা। স্ত্রী নিজে থেকে না গেলে সাধ্য কার তাকে উচ্ছেদ করে এই অধিকার থেকে।

অতএব নিঃশব্দে পলায়ন ছাড়া আর ভদ্রলোকের উপায় কী। শুধু বাড়ি থেকে নয়, জীবন থেকেও। ভোরের আলো ফুটতে-না-ফুটতে বেরুনো, আর ঘুমে ক্লান্তিতে ধুঁকতে-ধুঁকতে নিশুতি রাতে ফিরে আসা। এই ক'রে-ক'রে সুনির্মলের সঙ্গে প্রত্যক্ষে প্রমীলা যুক্ত রইলো বটে, কিন্তু মনের মধ্যে তার নিশ্চিহ্ন মৃত্যু ঘটলো।

কী চাই? টাকা? কর্তৃত্ব? শাড়ি? গয়না? বেশ তো, সব নাও। কিন্তু একটু শান্তি দাও, একটু নিঃশব্দে ভদ্রভাবে ক্লান্তিকাতর শরীরটাকে জিরোতে দাও রাত্তিরে।



তার বিনিময়ে একেবারে নিঃশেষে আমি স্বামীর সকল কর্তব্য পালন করবো তোমার কাছে। মনে-মনে যেন এই বণ্ড লিখে দিলো সে।

২

সম্পূর্ণ একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে একটু শান্ত হ'লো প্রমীলা। এক-আধদিন শাশুড়িকে একটু দয়াও করতে লাগলো। মাঝে-মাঝে একাদশীর দিন দু'চার আনার খাবার পর্যন্ত এনে দিল। কিন্তু সে যা করছে, করছে। তাই ব'লে সুনির্মলের উপায় ছিলো না কখনো নিভৃতে মার সঙ্গে একটা কথা বলে কিংবা ভাইয়েদের হাতে প্রকাশ্যে একটা জিনিস তুলে দেয়। দাঁত বার ক'রে তৎক্ষণাৎ সে ঝাঁপিয়ে পড়বে সেখানে। বিধবার একবেলার আহারকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে, দেওরদের আধপেটা খাইয়ে, ঝি চাকরদের তুলে দিয়ে, বাড়িটাকে একটা নরককুণ্ড বানিয়ে ছাড়বে, তবু তার ঝগড়ার স্পৃহা কিছুতেই নির্বাপিত হবে না, শান্ত হবে না।

সুনির্মল যতোটা বাড়ির সংশ্রব ত্যাগ করলো, ভাইয়েরাও তার চেয়ে কিছু কম গেলো না। তারা বল্গাহীন ঘোড়ার মতো প্রাণ ভ'রে আড্ডা মারতে লাগলো বাইরে, চুপে-চুপে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাড়ির অর্ধাশনের যোগ্য মাশুল আদায় করতে লাগলো রেস্তোরাঁর গর্ভ থেকে। আর সকলের মাথার উপর পা দিয়ে একটা মূর্তিমান নিগ্রহ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো প্রমীলা।

এই বৈচিত্র্যহীন ব্যর্থ বিরস তিক্ত জীবনযাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো দুটি। প্রথমটি, সুনির্মলের বোন এলো প্রবাস থেকে ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে মার কাছে জুড়োতে এবং একমাসের মধ্যেই অতিষ্ঠ হ'য়ে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বিদায় নিল। যাবার সময় মাকেও নিয়ে যাবার জন্য কান্নাকাটি করেছিলো, কিন্তু জামাইয়ের বাড়িতে তিনি কোথায় যাবেন? ফিরে তো আসতেই হবে? কিছুতেই গেলেন না। আর দ্বিতীয় ঘটনা শকুন্তলা।

ছোট্ট একটু গল্প আছে এ-বিষয়ে। খুব কিছু রোমাঞ্চকর না-হ'লেও একটু কাব্যিক। মস্ত এক ধনীপুত্র এবং যোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে স্থির হয়েছিলো তার। লাল চিঠি ছাপিয়ে তার দাদা বৌদি সগর্বে সানন্দে বিলিও করেছিলো দিগ্বিদিকে, বলাই বাহুল্য সেই পত্রাঘাত থেকে হিরণ্ময়ী আর সুনির্মলও বাদ পড়েনি। সহসা খবর পাওয়া গেল বিয়ের আগের দিন কন্যাপক্ষ থেকেই টেলিগ্রাম ক'রে বিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। আর তার দিন পনেরো পরে শকুন্তলার সঙ্গে দেখা হ'লো সুনির্মলের হাওড়া স্টেশনে।

মন যখন উদ্‌ভ্রান্ত, হৃদয় যখন প্রবোধ মানছে না এমন সময় আপিশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিঠির সঙ্গে পাৎলা নীল খামের একটি চিঠি পেলো সে। শকুন্তলা লিখেছে, মেদিনীপুর থেকে। এই প্রথম চিঠি। খবর বিশেষ কিছু নেই, কয়েক লাইন মাত্র। পাটনাতে ইশকুল মাস্টারির কাজ নিয়ে যাচ্ছে—পথে হাওড়া স্টেশনে অন্য গাড়ি ধরবার জন্য অপেক্ষা করার নির্দিষ্ট সময়টুকুতে যদি সুনির্মল একবার দেখা করতে পারে তার সঙ্গে।

বলাই বাহুল্য, নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগে গিয়েই প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে সুনির্মল পাইচারি করছিলো স্টেশনে। গাড়ি এলে শকুন্তলার কুমারী সিঁথি আর ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ থমকে ছিলো তার বুক। যখন হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগলো, মুখ নিচু ক'রে শকুন্তলা বললো 'ডেকে পাঠিয়ে কষ্ট দিলুম ?'

আকুল হ'য়ে সুনির্মল বললো, 'তুমি কি আবার আজই চ'লে যাবে ?'

'আজই।'

'একটা দিন থেকে যাও না'।

'অসম্ভব'।

'কেন, অসম্ভব কেন ?'

'কোথায় থাকবো ?'

আবার সেই কোথায় থাকার প্রশ্ন। মরীয়া হ'য়ে সুনির্মল বললো, 'যেখানে হয়, যেমন ক'রে হয় একটা দিন তুমি থাকো।'

'কী লাভ ?'

'কী না ? প্রত্যেকদিন আমার জীবন থেকে দশটা ক'রে আয়ুর পাতা খ'সে যাচ্ছে, একটা দিন আমি স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে চাই।'

এ-কথার অনেক জবাব ছিলো শকুন্তলার মনে, কিন্তু দিলো না। চোখ তুলে একবার তাকালো শুধু।

'মামীমা কেমন আছেন ?' তাঁকে বড়ো দেখতে ইচ্ছে করে।'

হিরণ্ময়ীর কথা উঠতে নিশ্বাস চাপলো সুনির্মল। বরাবর লক্ষ্য করেছে এই মেয়েটির সঙ্গে কোথায় যেন একটা মিল আছে হিরণ্ময়ীর। এই দু'জন মেয়েই তার হৃদয়ের ঠিক একটি জায়গাতেই এসে দাঁড়িয়েছে।

আস্তে বললো, 'মার কথা থাক।'

'কেন, ওঁর শরীর ভালো নেই ?'

'না।'



একটু চুপ।

'তোমার সময় কতক্ষণ ?'

'চল্লিশ মিনিট। তিনটে দশে গাড়ি ইন্ করবে।'

'তিনটে দশে ? তবে আর কতটুকু সময় ?'

'মন্দ কী।'

'কুন্তী।'

'বলুন।'

'আজ তুমি থেকে যাও।'

'রাত্তিরে পৌঁছবো গিয়ে, সকাল দশটায় জয়েন করতে হবে।'

'তবে চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

শকুন্তলা হাসলো। 'তাই ভালো। চিরদিন তো পুরুষই নারীহরণ মামলার আসামি হ'য়ে এসেছে, আমার জীবনে চমৎকার একটি অভিনব ঘটনা ঘটবে। কাগজে-কাগজে নরহরণ মামলার খবরের সঙ্গে আমার ছবি বেরুবে। ফাঁকতালে দিব্যি বিখ্যাত মহিলা হ'য়ে উঠবো।'

শকুন্তলার ঠাট্টায় কান দিলো না সুনির্মল। অন্যমনস্ক হ'য়ে বললো, 'হঠাৎ চাকরি নিয়ে যাচ্ছ কেন ? তোমার চাকরি করার দরকার কী ?'

'বা রে; এতো বড়ো মেয়ে ভাইয়ের উপর বসে খাবো নাকি ?'

'এম. এ. পড়লে না কেন ?'

'সুবিধে হ'লো না।'

'বিয়ে বন্ধ ক'রে দিলে কেন ?'

সব 'কেন'রই জবাব দেয়া সহজ, এই 'কেন'র নয়। নিবিড় অথচ শান্ত মেঘে বিদ্যুৎ খেললো একটু, চোখের কালো মণিটি মুহূর্তের জন্য চিকচিকোলো, তারপরে দূরের দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। 'কী মনে হয় আপনার ?'

'যা মনে করতে ভালো লাগে তাই। কিন্তু তা তো আর সত্যি নয়।'

'সত্যি হ'লেই বা কী হ'তো, আর না হ'লেই বা কী। ও-সব থাক। এইটুকু যে দেখা হ'লো তাই কত ভাগ্য। কেবল মামীমাকে দেখে যেতে পারলুম না এই দুঃখ।' হাতের ঘড়িতে চোখ ফেললো সে—'সময় হ'য়ে এলো।'

সুনির্মলও ঘড়ির দিকে তাকালো তারপর অস্থির গলায় ব'লে উঠলো, 'কী আশ্চর্য্য! এতক্ষণ ধ'রে তোমাকে দাঁড় করিয়েই কথা বলছি। ছি ছি। চলো কোথাও চা খেয়ে আসি।'

'আর সময় কই ?'

'যথেষ্ট সময় আছে, চলো, চলো।'

'তা হলে গাড়ি ফেল হবে।'

'একদিন গাড়ি ফেল হ'লে কী হয় ?

'চাকরি যায়।'

'যাক।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কিছু না, চলো।

'পাগল নাকি !'

হুড়মুড়িয়ে এক ঝাঁক কুলি ঢুকলো প্ল্যাটফর্মে। দিল্লি এক্সপ্রেস।

ন' মিনিট পরে পাটনা যাবার গাড়িটিও ইঞ্জিন লাগিয়ে প্রস্তুত। সুনির্মলের বুকের ভেতরটা যেন কেমন ক'রে উঠলো। যেন যথেষ্ট হাওয়া পেলো না ফুসফুসের মধ্যে।

শকুন্তলা তৎপর হ'য়ে কামরা খুঁজে উঠে বসলো। সুনির্মল সুজনিটি পেতে দিল লম্বা বেঞ্চির প্রায় অর্ধেক জুড়ে, চুলের মিষ্টি গন্ধে ভরা ঝালরওলা নরম বালিশটি নাড়লো-চাড়লো দু'হাতে, তারপর নেমে এসে জানলায় দাঁড়ালো।

'একবার মামীমাকে নিয়ে পাটনা আসবেন বেড়াতে। শুনেছি স্কুলটা শহরের খুব সুন্দর জায়গায়। কোয়াটার দিচ্ছে—'

'আশা করি গিয়ে চিঠি লিখবে।'

'চিঠি লিখবো ?

'লিখবে না ?'

একটু ভেবে বললো, 'না'।

'কেন ?'

শকুন্তলা মুখ নিচু ক'রে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালো।

'কেন লিখবে না ?'

শকুন্তলা যতক্ষণে জবাব দিল এই প্রশ্নের ততক্ষণে গার্ড নিশেন দেখালো, গাড়ি হুইসিল দিল। ট্রেন দুলে উঠলো।

'যে-চিঠি গোপনে লিখতে হয় সে-চিঠি কি আমার লেখা উচিত ?' চোখের উপর স্থির হ'লো চোখ, দু' চামচে টলটলে জল। 'আমি সেদিনই আপনাকে চিঠি লিখবো যেদিন গোপন করার কথা উঠবে না। যে-চিঠি না-লিখলেই লোকেরা আমাকে ধিক্কার দেবে।'



ট্রেনের দ্রুত চলন্ত জানলা হাতের পাঁচ আঙুলে আঁকড়ে ধ'রে প্রায় ছুটতে-ছুটতে সুনির্মলের ব্যাকুল গলা কী যেন বললো চিৎকার ক'রে, শোনা গেলো না ট্রেনের আওয়াজে। শকুন্তলা তার নরম হাতের আঙুলে তাড়াতাড়ি জানলা থেকে সুনির্মলের হাতটা সরিয়ে দিতে-দিতে বললো, 'কী করছেন, ছেড়ে দিন। ট্রেন জোরে চলছে না ?' বলতে-বলতে শিশিরের ফোঁটার মতো দুই বিন্দু জল গড়িয়ে পড়লো তার চোখ থেকে। হাতের দুই আঙুলে দুটি নিটোল মুক্তো।

'কুন্তী, কুন্তী',—ট্রেন তাকে ছাড়িয়ে, তার ডাক ছাড়িয়ে কোথায় চ'লে গেল। আরো কত কথা বলার ছিলো, শোনার ছিলো, কিছুই হ'লো না, কিছুই হ'লো না। এমনকি এতক্ষণে ঠিকানাটা পর্যন্ত জেনে নিতে ভুলে গেল সে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

অনেক রাত্রিতে বাড়ি ফিরে সুনির্মল এক ধাক্কায় টেনে তুললো স্ত্রীকে। বোকা-বোকা শাদা মুখে, ঘুমন্ত চোখের সমস্ত অর্থহীনতা নিয়ে স্বামীর মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো প্রমীলা।

'ওঠো, ওঠো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি বিয়ে করবো, তার আগে এ-বাড়ি তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, ছাড়তেই হবে।'

'অ্যাঁ ?'

'হ্যাঁ। ভালো হ'য়ে ভদ্রলোকের মতো গায়ে কাপড় দিয়ে বোসো। ও-রকম বিশ্রী ক'রে শোও কেন ?'

'বিশ্রী ?'

'অত্যন্ত বিশ্রী !'

মাথার মধ্যে এইবার আস্তে-আস্তে বুদ্ধি ঢুকলো প্রমীলার, সঙ্গে-সঙ্গে রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠলো সমস্ত শরীর। এলো গায়ে ঝংকার মেরে উঠে বসলো সে, বুকের শিথিল আঁচল একেবারে খসিয়ে দিয়ে বললো, 'বিশ্রীই শুই আর সুশ্রীই শুই আমি আমার সোয়ামির ঘরেই শুই, পরের সোয়ামির ঘরে তো ঢুলুতে যাইনে।'

'ইতরের মতো কথা বোলো না, যা বলছি তা ভদ্র হ'য়ে ব'সে শোনো।

'ও-ও-ওরে আমার রাতদুপুরের পাদ্রিরে। কোন্ নরক থেকে ঢোঁক-ঢোঁক তাড়ি গিলে রাত দুটোয় বউ ঠেঙাতে এলেন শুনি ?'

'যে-নরক থেকেই আসি, তোমার চেয়ে তা নিকৃষ্ট নয়। গায়ে কাপড় দাও।'

'দেবো না, দেবো না, দেবো না, গায়ে কেন কোনোখানেই দেবো না আমি। আমার শরীরটাকেই যত ঘেন্না। জানিনে আমি সে-কথা ? কেন ঘেন্না তা-ও জানি।'

শাড়ির একটি প্রান্তও গায়ের উপর তুলে দিলো না প্রমীলা। হয়তো দিত, কিন্তু সুনির্মলের কথায় তার জেদ্ বেড়ে গেল।

সুনির্মল উঠে গিয়ে আলো নিবিয়ে দিয়ে এলো। আধো-অন্ধকারে আবার এসে চেয়ারে ব'সে একটি সিগারেট ধরালো।

'চ্যাঁচামেচি ক'রে লাভ হবে না। এখান থেকে যেতে হবে তোমাকে। যেতেই হবে।'

'কী ?'

'আরো অনেকবার বলেছি সে-কথা, তুমি শোনোনি।'

'আ-হা-হা-গো, বড়োই অন্যায় করেছি, কী সুন্দর পাকাধানে মই দিয়েছি—'

'তোমার বাবাকে বোলো তার মেয়ের সঙ্গে একমাত্র তিনি ছাড়া অন্য কোনো ভদ্রলোক বসবাস করতে পারে না। অতএব এখানে আর তোমার জায়গা হবে না।'

'কেন, মাগি পুষবে বাড়িতে এনে ?'

'আবার ইতরের মতো কথা ?'

'ইতর কে, তুমি না আমি ?'

'তুমি তুমি তুমি !' মাথার চুল ছিঁড়লো সুনির্মল, 'শুধু কি ইতর ! চোর নও ?'

'কী ?'

'চোর। তুমি চোর, তোমার বাবা চোর ! আমার মার গয়নার বাক্স কে নিয়েছে ? কেন সেদিন আমাকে দেখে যজ্ঞেশ্বর কন্ট্রাকটর ও-রকম পালিয়ে গেলো ? কী লুকোলো চাদরের তলায় ? আমি জানিনে কিছু ?'

সহসা একটু যেন চমকে গেল প্রমীলা, পর মুহূর্তেই চীৎকার ক'রে উঠলো, 'কী ! এতো বড়ো কথা ? আমার বাপ চোর, আমি চোর ? রাত ক'রে মদ গিলে বাড়ি এসে বেলেল্লোগিরি—' লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলো, 'পাড়া নেই, প্রতিবেশী নেই, আইন-আদালত কি উঠে গেছে দেশ থেকে ?' দরজার দিকে বেগে ধাবিত হ'লো সে, শক্ত হাতে ধ'রে ফেললো সুনির্মল, 'বেশি চ্যাঁচালে গলা টিপে মেরে ফেলবো।'

'গলা আমি টিপতে জানি না, আমার হাত নেই, নখ নেই ?' অন্ধকার মথিত ক'রে সত্যিই সে বড়ো-বড়ো নখের আঁচড়ে কামড়ে একেবারে বিধ্বস্ত ক'রে দিল সুনির্মলকে।



অত বড়ো একটা ক্ষিপ্ত বুনো জানোয়ারের মতো মানুষকে বাগে আনতে রীতিমতো পরিশ্রম হ'লো সুনির্মলের। হাতের আঙুল কটা সাঁড়াশির মত বেঁকিয়ে টুঁটির কাছে এসে থামলো তার। হত্যাকাণ্ডের একটা দুর্বার ইচ্ছেকে শরীর মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে রোধ করতে-করতে বললো, 'না, আর না, আর আমি তোমাকে সহ্য করতে পারবো না। একদম, একদম চুপ। তা নৈলে, সব ছটফটানি আমি এই মুহূর্তে বন্ধ ক'রে দেব। তুমি শোনো, ভালো ক'রে শোনো—আমি এই মাসের মধ্যেই বিয়ে করবো, আমার স্ত্রী বাড়িতে আসবার আগে তোমাকে বেরিয়ে যেতে হবে।'

'বেরিয়ে যেতে হবে ? আমি বেরিয়ে যাবো আর তুই বিয়ে করবি, আমি বেঁচে থাকতে তুই বিয়ে করবি—তবে কর—'

প্রবল শক্তিতে সুনির্মলের মুখ-চেপে-রাখা হাতের উপর সে একেবারে হাড় পর্যন্ত চার-চারু আটটি দাঁত বসিয়ে ছুটে বারান্দায় এসে আর্তনাদ ক'রে উঠলো 'ওগো, কে কোথায় আছো গো, বাঁচাও, আমাকে এরা খুন ক'রে ফেললো, মেরে ফেললো।'

ক্রমশ

## সাকী-ডাকা রব

রাজলক্ষ্মী মন-বিহারিনী
শ্রীকান্তের, তারে খুব চিনি।
কিন্তু আজ সীতা সীতাহারে
রামের বিকারে বিকারিণী !

*

ভিখারিণী হওয়া পাপ, সাম্যের কথিকা।
এতো সোনা কোথা পাব বলো ত, লতিকা !
আমি কবি বড়ো জোর দেব সাম-গান
সামান্য এ-দানে কই সে গজমোতিকা ?

*

যূথিকার মতো কেন ফুটবেনা ফুল ?
আমার আরণ্য মন ব্যথা-সমাকুল
হয় আজও তা-ই ভেবে। জানি সবই বৃথা।
আমি এক দুঃসময়ে বসন্তের ভুল ॥

# দ্বি-প্রহর

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

ঘরে ঢুকতেই মৌলীর মনে হ'ল যে পৃথিবীটা বদলে গেছে। একই ঘর আর ঘরের পৃথিবীটাতেও তখন পর্য্যন্ত একই রকম দুপুর, তবু মনে হল। একবার যেন মন চেঁচিয়ে উঠ্‌তেও চেয়েছিল—ওকে বলেছিল: না, তুমি ঠিকই আছো, যদিও আর সব বে-ঠিক। কিন্তু মনের চেঁচিয়ে ওঠাকে ভ্রূক্ষেপ না করে (সত্যি বল্‌তে, চোখ ঠেরে) ও মনে-মনে ঠিক করলে, ও-ও বদলে গেছে।

সমীরণ শুয়ে আছে—তার সেই সাদা ধব্‌ধবে বিছানায়। সমস্ত পৌরুষ খুইয়ে। একটু কাৎ হয়ে আছে বালিশে মাথাটা। ও বল্‌ত—এখনও হয়ত বলবে: "বালিশে সোজা মাথা রেখে সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে শোওয়াটা ভারি বিশ্রী—মনে হয় মরে পড়ে আছো।" এ-কথার কি-জবাব দিয়েছিল মৌলী মনে করতে পারলনা কিন্তু এখন যদি আবার বলে সমীরণ, তাহলে নিশ্চয়ই ও জিব কেটে বল্‌বে: "যাঃ—ওসব বল্‌তে নেই। রোগীর মুখে ভালো শোনায়না এসব কথা।" ওর এই খবরদারীতে খুশী হবে সমীরণ আর রোগীকে খুশী রাখা ত অভ্যাগতদের একটা কর্ত্তব্যেরই সামিল! তবে, আজ বোধহয় ঠিক কর্ত্তব্যের খাতিরে, মৌলী এ-কথাগুলো বলবেনা। রবিবাবুর ভাষায় যাকে বলে 'গোপন-কথা'—মৌলীর মন কাণাকানি করে বলছে এখন, এরা তা-ই।

আর সব-কিছু এড়িয়ে মৌলীর চোখ শুধু ধবধবে ফিডিং কাপটা ধরতে পারল, ক্লোজ-আপের জন্যে তৈরী ক্যামেরার লেন্সের মতো। কিন্তু, বড়ো দেখালে-ও আর কতো বড়ো দেখাবে একটা ফিডিং কাপ। ওতে কতোটুকুই বা জল বা ফলের রস বা হরলিক্‌স্ ধরতে পারে! ও খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে না কি! তবু যে বাঁচা, তবু যে বাঁচে রোগীরা বা প্রেমিকেরা, নেহাৎ-ই তা সঞ্চিত মূলধনের দরুণ। দেহের তহবিলে অনেক প্রাণশক্তি জমা থাকে, বলেন পশ্চিমী ডাক্তাররা। তাই—শুধু তাই বুঝি বেঁচে গেল সমীরণ। এখন একদিন মৌলী এই ফ্ল্যাটে এসে নিজে রান্না করে সমীরণকে খাওয়াবে। ও যা-যা খেতে ভালোবাসে তা-ই। অনেকদিনই ত বলেছে: পাকাল রুই-এর কালিয়া, কলমী-দেওয়া কাঁচা মুগ-ডাল, বক-ফুলের বড়া বেসন জড়িয়ে আর এলাচ-গুঁড়ো কিসমিস-মিশ্রি-দেওয়া পায়েস। তেমন কিছুই না, চার-ঘণ্টার পরিশ্রম! অনায়াসেই করে দেওয়া যায়। আগেও যে-কোনদিন এসে খাইয়ে যেতে পারত মৌলী, কিন্তু আসা-টাই যে মুস্কিল!

মৌলী মনে-মনে খানিকটা সমাজতত্ত্ব-ও আলোচনা করে ফেললে। কী বিশ্রী আমাদের



সব ব্যবস্থা—আগেই শেষের রায় দিয়ে সুরু করল ও কথাগুলো: আসা যায় না! যখন সে পরিবারের মেয়ে ছিল—এমন কি কলেজের পড়ার শেষে-ও দু'-একবছর যখন তার নাবালকত্ব ঘোচেনি, তখন দিব্যি ইচ্ছে হলেই সে সমীরণের ফ্ল্যাটে এসে দু'চার ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে পেরেছে কিন্তু এখন আর তা সহজে হয়ে ওঠেনা। মেয়ের রোজগারের উপরই পরিবারটার নির্ভর এখন। বাপ-মা আর ছোট একটা ভাই-এর পালয়িত্রী এখন মৌলী—তার দায়িত্ব অপরিসীম। চল্‌া-বলায় ভীষণ দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে হচ্ছে। কেউ যেন কোনো ছিদ্রপথে তোমার ত্রুটীর কালো মুখ দেখতে না পায়। হাসতে হবে বই কি—সবসময়ই হাস্‌তে হবে—হেসে উড়িয়ে দিতে হবে নিজের একান্ত সুখদুঃখের কথা। 'আসা হয়ে ওঠেনা'—পরিবারের পক্ষ নিয়েই মৌলী দু'একদিন বলেছে সমীরণকে: 'তাছাড়া জানো ত, মেয়েদের আজকাল কী অদ্ভুত অবস্থা!' সমীরণ জান্‌তে চায়নি। আজ যদি চায়, তাহলে সত্যিকারের সে গোপন-কথাটা-ও মৌলী জোর করে তাকে শুনিয়ে দেবে। কী আশ্চর্য্য ব্যাপার! সমবয়েসী পুরুষ আত্মীয়রা-ও ভালোবাসায় এমন ঘরকুণো হতে পারে বাংলাদেশ সত্যি-সত্যি দ্রাবিড় দেশ। প্রেমে আর্য্য আইন অচল এখানে বরাবর।

অনুশোচনার মতোই শোনাল মৌলীর কানে ওর মনের কথাগুলো। ভাবলে, যে-কোণ থেকেই হাওয়া আসুক তাকে যেমন অস্বীকার করা যায়না—প্রেম ঠিক তেম্নি। সমীরণ কি এক দিক থেকেই বইবে কবিদের অনুরোধে? মৌলী-ও হলফ করে বলতে পারবে না যে দক্ষিণ-বাতাসকেই শুধু ও কায়মনপ্রাণে সমীরণ ভেবে নিয়েছে। ঘরের পাখার বাতাস কি কম মিঠে?

বাঃ, কী টাটকা একগুচ্ছ রজনীগন্ধা! এতক্ষণ দেখতেই পায়নি মৌলী! এখন ও স্পষ্ট দেখতে পেলো বালিশের ওপাশে ফুলগুলো রেখে সমীরণ তার মিহি গন্ধে মজা করে শুয়ে আছে আর এতক্ষণ পর যেন শুনতে পেলো সমীরণ বল্‌ছে: "এসো।"

একটু সঙ্কোচ নিয়েই মৌলী এগিয়ে গেল বিছানায়। ফুল নিয়ে ত ও আসেনি! রোগী প্রায় দেবতার মতো, অবারিত গতি তার পাশে তোমার। তাই, যদি পারো দু'টো ফুল বা কিছু ফল নিয়ে যেও তার শয্যায়। ভেবেছিল মৌলী, তাই সঙ্কোচ, খালি হাতে এসেছে বলে। রোগশয্যার পাশে আসবার শিক্ষাটা-ই আছে ওর অন্য দশ-পাঁচটা বিদ্যার মতো কিন্তু দেখা গেল তার যথাবিহিত প্রয়োগ নেই! এমন কি তাড়াহুড়ো ছিল? এখানে তাড়াহুড়ো দেখছ কারো? যেতে পারতে ফ্লোরিস্টদের দোকানে—জ্যৈষ্ঠের অর্কিড বেশ দামী—নিয়ে আসতে পারতে ছোট একটা গুচ্ছ হাতে করে! আর দামী ফুলেরও বা কি দরকার ছিল—তোমার হাতের একটি চাঁপা বা ছোট্ট একটা বেলফুলের কি কম দাম সমীরণের কাছে? স্পষ্টতই দেখলে সমীরণের বেলায়ই তোমার ভুলগুলো স্তূপ হয়ে ওঠে।

এই দুপুরবেলা তোমার আত্মীয়-প্রেমিক অশোক মিত্র-ও ফ্লোরিস্টের দোকানে তোমার স্পাইং-এর কাজে এসে বসে থাকত না!

কাঁদ-কাঁদ হ'ল মৌলীর মুখ কিম্বা ও কাঁদ-কাঁদ দেখাল—যেমন ও দেখাতে চায়। কান্নাই দেখাতে চাইত ও সমীরণের কাছে। সমীরণেরও কেমন অভ্যাস—প্রায় প্রত্যেক দেখায়ই সে মৌলীকে বলেছে: "কালও ছিল কালো চোখ ভোমরার মতো—তোমরা কি বদলাও এম্নি নিয়ত?" কোথায় যেন কুড়িয়ে পেয়েছিল সমীরণ এ পদ্য-ছত্রদুটো। সম্ভবত ইদানীংকার কোনো ফাজিল প্রেমিক-কবির রচনা থেকেই।

"মউল—"

মৌলী চমকে উঠল ডাক শুনে। অদ্ভুত—একই রকমই ত রয়ে গেছে সমীরণের গলা! প্রায় একমাস ভুগে এমন অবিকল থাকতে পারে কারো স্বর! 'মউ' কথাটাতে এম্নি মধু-ফুলের মদ মিশিয়ে দিতে পারে কেউ? মৌলী চমকালো, মানে খুশীর ঝিলিক চিকিয়ে গেল ওর চোখে। মেয়েদের চমকানো মানেই খুশী-হওয়া।

"ঈস্ কী-রকম হয়ে গেছ তুমি—কেমন ফ্যাকাশে!" বলতে পারত মৌলী কিন্তু এ-অবস্থার রোগীকে যে তেমন অপ্রীতিকর কথা বলতে নেই তা ও জানে। বাস্তব ব্যাপারগুলো জানার আর বাকি নেই মৌলীর শুধু আদর্শ-গত বিষয়গুলো ওর মন ঠিক যেন আয়ত্ত করতে পারেনা। ঐতিহ্যেরই দোষে, যার প্রাচীন নাম নিয়তি।

কথা বলার বদলে শুধু তাকিয়ে রইল মৌলী। স্থির তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর নড়ল—হাত নাড়ল। কপালে এসে চুল গড়িয়ে পড়েনি সমীরণের, তবু নরম আঙুলে ছোট-ছোট-করে-ছাঁটা শক্ত চুলগুলোকে পেছনে সরিয়ে দেবার ভঙ্গী দেখা গেল মৌলীর হাতে।

বেশ লাগছিল হয়ত সমীরণের। দেহ যে কতো রকম আরাম চায় তার ইয়ত্তা নেই। তীব্র আরামে যেম্নি সে রোমাঞ্চিত হতে পারে তেম্নি মৃদু আরামে। অদ্ভুত এই দেহের লিপ্সা।

বেশ লাগছিল মৌলীরও। কিন্তু হঠাৎ একসময় ওকে বিদ্যুতের তার-ছোঁওয়া হাতের নমুনায় হাতটাকে তুলে আনতে হল। কানে এলো পাশের ঘর থেকে ভেসে একটা স্বর: "...উনি ও-ঘরে আছে এখন..."

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল মৌলী। সত্যি, কি বিশ্রী! পাশের ঘরের কেউ হয়ত আসতে চাইছেন এ-ঘরে—বাঞ্ছিত কোনো পরিজন। ওর অবাঞ্ছিত উপস্থিতি তাঁকে আটকাচ্ছে। নিজেরই মানস-কুটের কুৎসিত ছবি দেখতে পেলো মৌলী এ-ঘরে ওর এ-ভাবে বসে থাকার মধ্যে।



আর স্পষ্টই দেখল, সমীরণ অল্প-অল্প হাসছে—মোনা লিসার ভঙ্গীতে টোল-খাওয়া কিন্তু ফ্যাকাশে হাসি।

"কী?" বলতে ইচ্ছে করল মৌলীর। কিন্তু কিছু বলবার ইচ্ছা সমীরণের দিক থেকেই আসুক ভেবে চুপ করে রইল ও।

কিন্তু সমীরণ কিছুই বল্‌ছেনা—বলবার জন্যে যতোটা সময় দেওয়া যায় তার চাইতে কয়েক সেকেণ্ড বেশি সময় দিয়েও মৌলী সমীরণের মুখ থেকে কথা শুনতে পেলোনা। অবিবেচকের মতো খানিকটা যেন রাগও এসে উঁকি দিল মৌলীর হাবভাবে, যার কাব্যিক নাম অভিমান। যদিও অভিমান যদি করতেই হয়, করার কথা ছিল সমীরণের।

"এমন উস্‌খুস করছ কেন, কতো যুগ পরে এলে!" অল্প-অল্প শুনতেও পেল হয়ত মৌলী একটি মলিন মুখের কথা, কিন্তু হার মানতে চাইল না ও। মেয়েরা কিছুতেই নিজের উপর সরাসরি দোষ চাপাতে চায়না।

কিন্তু এম্নি মজা, লুকিয়ে চলতে চেয়েও মাঝে-মাঝে বড্ড জলজ্যান্ত দোষে দোষী হয়ে ওঠে মেয়েরা। হতে হয়। পুরুষের সাধ্যই নেই তেমন ভাবে দোষী হবে কখনো।

মৌলী সে অপৌরুষেয় কাজই করলে।

আর অপেক্ষা না করে পাশের ঘর থেকে হুড়মুড় করে সমীরণের বন্ধুবান্ধবরা এসে এ-ঘরে ঢুকে পড়েছিল। ঢুকেই তারা অবাক হয়ে পিছিয়ে যেতে পারতো কিন্তু বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে মৌলীর দিকে তাকিয়ে রইল। খবর পেয়ে বন্ধুর দলে দু'টো রজনী-গন্ধার ডাঁটা হাতে নিয়ে জুটে গিয়েছিল আশ্চর্য্যভাবে আশোকও।

মৌলী তখন যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। তাই সমীরণের বুকের উপর মাথা রেখে বেপরোয়া আর্ত্তনাদে ও ফুলে-ফুঁসে উঠ্‌ছে, দেখা গেল।

অশোকও ফুলে ফুঁসে উঠ্‌তে পারত কিন্তু অবাক বন্ধুর দলের মতো সে শুধু ভাবছিল, মৃত্যুর ঠিক পরের মুহূর্ত্তগুলো এর এতো সুন্দরও হতে পারে!

এক প্রহর আগে হলে সমীরণই কি আর অবাক হতনা? আর এভাবে মৌলীর সঙ্গে একা থাকতে পারলেত স্পষ্টই বল্‌ত—অশোক তাকিয়ে না থাকলেও বলত: "যা করছ, অশোক দেখলে কী ভাববে বলো ত!"

# শিল্পী

## জেমস্ জয়স্

অনুবাদ : **অশোক গুহ**

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]

কুণ্ডে জ্বলছে আগুন, উঁচু হয়ে উঠছে লাল শিখা। এ যেন আগুনের এক বিরাট বাঁধ। ঝাড়লণ্ঠনে আইভিলতা জড়ানো, তারই নীচে বড়দিনের ভোজের টেবিল পাতা। দেরা করেই ওঁরা ফিরেছেন, এখনো খানা তৈরী হয়নি। মা বললেন, এখুনি হয়ে যাবে। ওঁরা প্রতীক্ষায় আছেন; দরজা কখন খুলবে, কখন পরিচারকরা ঢুকবে বড় বড় পাত্র নিয়ে; তার উপরে থাকবে ভারী ঢাকনা।

সবাই প্রতীক্ষায়, চার্লস-খুড়ো বসেছেন দূরে জানালার ছায়া যেখানে এসে পড়েছে, নিবিড় হয়ে আছে। বার্থের দু-পাশে দুই আরাম কেদারায় দান্তে আর শ্রীমতী কেসী। ষ্টিফেন তাঁদের মাঝখানে চেয়ারে বসে আছে, পা তার কুণ্ডের কারুকাজ-করা গায়ে-গরমে যেন আস্তে আস্তে ভাজা হচ্ছে। মিঃ ডেডালাস কুলুঙ্গীর উপরে টাঙানো আরসীর দিকে তাকিয়ে গোঁফ চুমরোচ্ছেন। এবার লেজ-ঝোলা কোটের লেজ হাত দিয়ে গুটিয়ে নিয়ে জলন্ত কুণ্ডের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন। মাঝে মাঝে হাত পেছন থেকে এনে তা দিচ্ছেন গোঁফে। মিঃ কেসী একপাশে হেলিয়ে দিয়েছেন মাথা, হাসছেন আর গলার শিরায় আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছেন। ষ্টিফেনও হাসলো। মিঃ কেসীর গলায় রূপোর টাকার তোড়া লুকানো আছে, সেকথা তো মিছে। এখন সে তা জানে। ভেবে হাসি পায়। গলা থেকে রূপোলি স্বর বার করতেন মিঃ কেসী, তাই না ও ঠকেছিল। মিঃ কেসীর হাতের মুঠো খুলে দেখতে চেষ্টা করেছে, ওখানে টাকার তোড়া লুকোনো আছে কিনা, কিন্তু আঙুল যে সোজা করা যায়নি। তিনি আবার বলতেন, তাঁর তিনটে আঙুল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মতিথির উপহার তৈরী করতে গিয়ে নাকি বেঁকে গেছে।

মিঃ কেসী গলার শিরায় টোকা দিচ্ছেন আর হাসছেন ষ্টিফেনের দিকে চেয়ে। ঘুমন্ত চোখ। মিঃ ডেডালাস তাঁকে বললেন,

হাঁ, এখন বেশ লাগছে। খানিকটা বেশ হাঁটা হোল, তাই না জন?···কিন্তু আজ কি খাওয়ার আশা আছে! ওজোন তো বেশ খানিকটা টেনে আনলাম। এখন ভগবান ভরসা!

দান্তের দিকে তাকিয়ে বললেন,

মিসেস রিওয়ার্ডাস, আজ তো নড়লে-চড়লে না?

দান্তে ভ্রূ কুঁচকে বললেন,

না। সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মিঃ ডেডালাস কোটের লেজ এবার ছেড়ে দিয়ে আলমারীর কাছে গেলেন। একটা মস্ত পাথুরে বোয়েম বার করে তা থেকে হুইস্কী ঢাললেন ডিকেণ্টারে। আস্তে আস্তে ঢাললেন, মাঝে মাঝে ঝুঁকে



পড়ে দেখলেন কতটা ঢালছেন। এবার বোয়েমটা আলমারীতে রেখে দুটো গেলাসে ঢাললেন মদ। একটু জল মেশালেন। গেলাস দুটোকে নিয়ে ফিরে এসেছেন আগুনের কুণ্ডের কাছে।

একপলা মাত্র, খিদে বাড়াবার জন্যে আর কি।

মিঃ কেসী গেলাস তুলে নিয়ে পান করলেন, কাছের কুলুঙ্গীতে রেখে দিলেন গেলাসটা। বললেন,

আমাদের দোস্ত ক্রিষ্টোফারের কেরামতির কথা না ভেবে পারছিনা···। তিনি হাসলেন, কাসলেন, তারপর বললেন,

শাম্পেন বানিয়েছে বটে!

মিঃ ডেডালাস জোরে হেসে উঠলেন।

কে-ক্রিষ্টি? ওর ঐ টাক-মাথার এক-একটা আঁবে যা বুদ্ধি ধরে, একপাল শেয়ালেরও সে বুদ্ধি নেই।

তিনি মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজলেন। ঠোঁট চাটছেন, হোটেলওয়ালার স্বরে কথা কইছেন।

তোমার সঙ্গে যখন কথা কইবে, ওর স্বর মোলায়েম হয়ে যাবে। ও যেন তখন ভিজে জবজবে, একেবারে গলে জল। আহা, ভগবান ওর ভাল করুন!

মিঃ কেসী চার্লস আর হাসির সঙ্গে এখনো লড়ছেন। ষ্টিফেন বাবার মুখে হোটেলওয়ালার কথা শুনে হেসে উঠলো।

মিঃ ডেডালাস চোখে চশমা এঁটে তার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, এই খুদে কুকুরছানা, হাসছ কেন?

পরিচারকরা এসে টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিলে। মিসেস ডেডালাসও এসেছেন। কে কোথায় বসবেন, ঠিক করা হচ্ছে।

মিসেস ডেডালাস বললেন, বসে পড়ুন!

মিঃ ডেডালাস টেবিলের কাছে গিয়ে বললেন,

মিসেস রিওয়ার্ডাস, বসে পড়। জন, এস তো বন্ধু!

চার্লস-খুড়ো যেখানে বসে আছেন, সেদিকে তাকিয়ে বললেন,

মশাই, শুনুন, আপনার জন্যে একটা পাখী প্রতিক্ষায় ছটফট করছে।

সবাই বসলেন। পাত্রের ঢাকনার উপর হাত রেখেছেন মিঃ ডেডালাস; হাত সরিয়ে নিয়ে তাড়তাড়ি বললেন,

এবার শুরু কর, ষ্টিফেন।

ষ্টিফেন উঠে দাঁড়িয়ে খাবার আগের প্রার্থনা আউড়ে গেল :

হে প্রভু, আমাদের আশীষ দিন। আপনার দান এল আমাদের কাছে অসীম দয়ায়। আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের হাত দিয়ে পেলাম আপনার দান। আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!

সবাই আশীষ গ্রহণ করছেন। মিঃ ডেডালাস পাত্রের উপর থেকে তুললেন ভারী ঢাক্না। ঢাকনার চারধারে মুক্তো হয়ে আছে বাষ্পবিন্দু। জলছে।

ষ্টিফেন মোটাসোটা টার্কিটার দিকে তাকালো। রান্নাঘরের টেবিলে পালক ছাড়ানো, পিন দিয়ে গাঁথা হয়ে পড়েছিল টার্কিটা। সে জানে, তার বাবা ডি, ওলিয়ের ষ্ট্রীটের ডান্-এর দোকানে ওর দাম গুনে দিয়েছেন এক গিনি। আর দোকানী বুকের কাছটায় আঙ্গুল দিয়ে বারবার খুঁচিয়ে দেখিয়েছে, পাখীটা কত নধর। লোকটার স্বরও তার মনে পড়ে। সে বললে,

মশাই নিন না। আসল মাল, খাসা মাল।

আচ্ছা, ক্লঙ্গোতে মিঃ ব্যারেট তাঁর ছেলে প্যোদাবার লাঠিকে টার্কি বলতেন কেন? ক্লঙ্গো এখন সুদূরে। ঐ টার্কির উষ্ণ গন্ধ উঠছে, শুয়োরের মাংস আর মসলার গন্ধ উঠছে পাত্র আর থালা থেকে। মন্থর করে দিচ্ছে হাওয়া। আগুনের কুণ্ডে বিরাট আগুনের বাঁধ—লাল বাঁধ উচিয়ে উঠছে। সবুজ আইভি আর লাল হোলী দেখে খুশি ঘনিয়ে আসে মনে। ভোজ যখন শেষ হবে, মস্ত প্লাম পুডিং-এর টুকরোটা নিয়ে আসবে পরিচারকেরা। খোসা-ছাড়ানো বাদাম ছড়ানো থাকবে, হোলির ছোট ছোট শাখা। নীলচে ধোঁয়া উঠবে চারদিকে। পুডিং-এর উপরে উড়বে সবুজ নিশান।

বড়দিনের ভোজ সবার সঙ্গে বসে খাওয়া এই তার প্রথম। খুদে ভাই-বানদের কথা ভাবছে। এখন তারা নার্সারীতে এই দিনের প্রতীক্ষা করছে। তারও তো প্রতীক্ষায় কেটে গেছে বহু দিন। এমনি ভাবতে ভাবতে এল পুডিং। নিচু-কলার ইটন-উর্দি পরে নিজকে অদ্ভুত লাগছে। সেদিন ভোরে, মা যখন তাকে সাজিয়ে নিয়ে এলেন প্রার্থনায় নিয়ে যাবার জন্যে, বাবা চেঁচিয়ে উঠলেন। বাবার মনে পড়ছিল তাঁর বাবার কথা। চার্লস-খুড়োও তাই বললেন।

মিঃ ডেডালাস খাচ্ছেন, ভীষণ তার খিদে। এবার বললেন,

বেচারী ক্রিষ্টি, এখন ও পেজোমিতে একেবারে ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে।

মিসেস ডেডালাস বললেন,

সাইমন, তুমি মিসেস রিওয়ার্ডাসকে সস্ দাও নি।

মিঃ ডেডালাস সসের পাত্রটা চেপে ধরলেন।

দিই নি? মিসেস রিওয়ার্ডাস, অন্ধকে ক্ষমা করবেন।

দান্তে হাত দিয়ে পাত্ ঢেকে বললেন,

না, চাই না।

মিঃ ডেডালাস চার্লস-খুড়োর দিকে ফিরলেন,

তুমি কেমন চালাচ্ছো, মশাই।

একেবারে ডাক গাড়ির মতো সাইমন

জন, তুমি?

বেশ। তুমি নিজে খাওনা!

মেরী? ষ্টিফেন, তোমাকে দিই?

হুড়হুড় করে ষ্টিফেনের প্লেটে ঢেলে দিলেন সস্। আবার টেবিলে রেখেছেন পাত্র। এবার চার্লস-খুড়ো কথা কইতে পারলেন না, তাঁর মুখ ভরতি। তিনি মাথা নেড়ে জানালেন।

পাদ্রিকে সেদিন আমাদের বন্ধু জোর জবাব দিয়েছেন। কি যেন?



মিঃ ডেডালাস বললেন।

ওর ভিতরে যে এত ছিল কে জানতো! মিঃ কেসী বললেন।

পিতঃ, আপনি যখন ভগবানের মন্দিরকে আর ভোটকেন্দ্রে পরিণত করবেন না, তখন আমি আপনার প্রাপ্য আপনাকে দেব।

দান্তে বললেন, যে নিজেকে ক্যাথলিক বলে জাহির করে, তার পক্ষে চমৎকার জবাব।

মিঃ ডেডালাস মোলায়েম করে বললেন, এতে পাদ্রিদেরই দোষ। বোকা লোকেও বলবে, ওদের ধর্ম নিয়েই থাকা উচিত।

দান্তে বলে উঠলেন, এও তো ধর্ম। মানুষকে সতর্ক করে ওঁরা কর্তব্যই করছেন।

মিঃ কেসী নরম সুরেই বললেন, আমরা মন্দিরে যাই আমাদের সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করতে, নির্বাচনীর বক্তৃতা তো শুনতে যাই না।

আর বেদী থেকে রাজনীতি প্রচার করবেন তারা? মিঃ ডেডালাস জিজ্ঞেস করলেন।

দান্তে উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই। এ তো মানুষের নীতিবোধের প্রশ্ন। ধর্মযাজক যদি তাঁর শিষ্যদের কোনটা ঠিক, কোনটা বে-ঠিক বলে না দেন, তাহলে তিনি তো ধর্মযাজকই নন।

মিসেস ডেডালাস কাঁটা-চামচ নামিয়ে রেখে বললেন,

দোহাই তোমাদের, বছরের এমনি দিনে, তোমরা রাজনীতির চর্চা কোরো না!

চার্লস খুড়ো সায় দিলো, ঠিকই বলেছ। সাইমন, যথেষ্ট হয়েছে। আর একটা কথাও নয়।

ঠিক, ঠিক—মিঃ ডেডালাস তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

তিনি আবার পাত্রের ঢাক্না খুলে বললেন,

কার টার্কি চাই, আর কে নেবেন?

কেউ সাড়া দিলে না। দান্তে বলে উঠলেন,

ক্যাথলিকের মুখে কি মিষ্টি ভাষা!

মিসেস ডেডালাস বলে উঠলেন, মিসেস রিওয়ার্ডাস, দোহাই আপনার, এখন ওকথা চাপা দিন।

দান্তে তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো,

আমার গীর্জার পাদ্রির নিন্দা করবেন, আর আমি বসে-বসে শুনবো?

মিঃ ডেডালাস বললেন, তারা রাজনীতিতে নাক না গলানো পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বলা হচ্ছেনা।

দান্তে বলে উঠলেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের বিশপ আর পাদ্রীর দল যখন বলেছেন, তাঁদের কথা মানতে হবে।

মিঃ কেসী বললেন, হয় ওঁরা রাজনীতি ছাড়বেন, নয়তো মানুষ ওদের গীর্জা এড়িয়ে চলবে।

মিসেস ডেডালাসের দিকে তাকিয়ে দান্তে বললেন, শুনছ?

মিসেস ল বলে উঠলেন, মিঃ কেসী, সাইমন, এখন এসব কথা থাক!

খারাপ কথা, বড় খারাপ কথা! চার্লস্ খুড়ো বললেন।

কি? চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ ডেডালাস। আমরা কি ইংরেজদের হুকুমে ওঁকে ত্যাগ করব?

উনি আর আমাদের নেতা হবার উপযুক্ত নন, দাঁতে বললেন, উনি পাপী!

আমরা সবাই পাপী, পাপে কালো হয়ে উঠেছি,…কেসীর স্বর।

যারা কুৎসা রটায় তাদের আল্লুক দুর্ভাগ্য। মিসেস রিওয়ার্ডাস আবৃত্তি করে চললেন যেন। তার গলায় পাথর বেঁধে দিয়ে তাকে সাগরের অতলে নিক্ষেপ কর। যেন সে আমার ক্ষুদ্র জীবনের কুৎসা আর না রটাতে পারে। এই হচ্ছে পরম পুরুষের ভাষা।

মিঃ ডেডালাস ঠাণ্ডা মেজাজে বললেন, এই যদি তাঁর ভাষা হয়, তাহলে একে খারাপই বলব।

চার্লস-খুড়ো শিউরে উঠলেন,

সাইমন, সাইমন! ছেলেটা যে—

হাঁ, হাঁ, আমি তাই মনে করেই?…আমি রেলের সেই কুলীটার খারাপ কথাই ভাবছিলাম। ষ্টিফেন, গলাটা দেখাও তো। খেয়ে ফেল! এই যে দিচ্ছি—

তিনি ষ্টিফেনের থালায় রাশি রাশি খাবার ঢেলে দিলেন। স্তূপ হয়ে উঠলো। চার্লস-খুড়ো আর মিঃ কেসীকে দিলেন টার্কির বড় বড় টুকরো। সস্ ছিটিয়ে দিলেন তার উপর। মিসেস ডেডালাস কম খাচ্ছেন, দাঁতে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। মুখখানা তার লাল। মিঃ ডেডালাস মাংস-কাটা ছুরি নিয়ে টেবিলের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন।

এই যে, এই টুকরোটা খুব চমৎকার খেতে—যাকে বলে পোপের নাক (ঠ্যাঙের মাঝখানের মাংস ও মজ্জা)। ভদ্রমহোদয় বা ভদ্রমহিলারা কেউ যদি চান…

ছুরির উপরে এক টুকরো মাংস তুলে ধরলেন। কেউ কথা বলছে না। তিনি এবার তাঁর থালায় তুলে নিলেন টুকরোখানা।

আপনারা কেউ কিছু বলতে পারবেন না। আপনাদের কাছে জিজ্ঞেস করেই নিলাম। আর আমারই তো খাওয়া উচিত। কিছুদিন থেকে শরীরটাও ভাল নেই।

তিনি ষ্টিফেনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন। ঢাকনাটা আবার তুলে রেখে খেতে লাগলেন।

(ক্রমশঃ)

# সাহিত্য-পরিচয়

## 'নাগপাশে' ইতিকথার শিল্পী

নাগপাশ ঃ মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য জগৎ) ৩৲

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শক্তি সম্বন্ধে কোনোদিনই দ্বিমতের অবকাশ ছিল না—সন্দেহ ছিল চিন্তার সঞ্চয় সম্বন্ধে। বুঝি বা নিঃশেষ হয়ে গেছে। বুঝি বা ফুরিয়ে গেছে অবদান। এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে মাণিকবাবু সমাজকে দেখবার চেষ্টা করেছেন, যা তীক্ষ্ণ কল্পনাপ্রবণ পাঠক ভিন্ন অন্যকে সচেতন করে তোলে না, ভাবায় না। পাঠককে দ্বিধাগ্রস্থ করে তুলতে পারে। কারণ মাণিকবাবুর রচনাশৈলী পাঠকের অবচেতন মনকে ভাষা দেয় না, লেখকের নিজস্ব চিন্তাধারা পাঠককে অনুপ্রাণিত করে। মাণিকবাবুর কথকতা অনেক গবেষণার পর তথ্য আবিষ্কার।

তাই রচনার মধ্য দিয়ে মাণিকবাবু যখন ঝিমিয়ে পড়েন, বুঝতে হবে তখন তথ্য আবিষ্কারের পালা চলেছে—মাণিকবাবুর চলবার পথ ক্ষুরধার। পথের কিঞ্চিৎ বিচ্যুতি ঘটলে মাণিকবাবুর নিজস্বতা অনেকখানি খর্ব হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তী রচনায়ই মাণিকবাবু নিজেকে জাহির করেন, সোচ্চার হয়ে ওঠেন নিজস্বতায়। তাই পর্বতগাত্রের তীক্ষ্ণ খাড়াপথ যেমন বাঁক ঘুরে চলে, কখনও বা হারিয়ে যায় পর্বতশৃঙ্গের আড়ালে, তেমনি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যের পথটি চলেছে—'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে শুরু করে 'নাগপাশ' অবধি তিনি অনেক মোড় ঘুরে চলেছেন। তবে 'নাগপাশের' লেখক কতটা এগিয়েছেন তাই বিচার্য্য। অথবা তাঁর পথটা কি নাগপাশের মতো জটিল জটলা?

অবচেতন মন নয়, অবচেতন সমাজ-মানস-কে পরিস্ফুটনের প্রচেষ্টায় শুরু হয় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবন। অবজ্ঞাত শ্রেণী-বিশেষের অজ্ঞাত জীবন-যাত্রা গোড়ার দিকে মাণিকবাবুর সাহিত্য-বিষয়বস্তু ছিল। বর্তমান সমাজের নোংরা দিকটা তিনি নগ্ন করে তুলে ধরেছেন—যা পূর্ববর্তী লেখকদের সুনীতি-প্রিয়তায় চাপা পড়ে ছিল অথবা কল্লোল যুগের রণ-দামামায় যা অনুধাবন করা যায়নি। সংসার সীমাতে যারা বাস করে—সহর উপান্তে যারা যুদ্ধ করে চলেছে—তাদেরই কথা, তাদের ক্লেদ, নোংরামি, বর্বরতা, বলিষ্ঠতা এবং তাদের অসহায় শিশু-সুলভতার উপর মাণিকবাবু কাহিনী ফেঁদেছেন। কিন্তু এই সমস্ত লোক যারা শহুরে সভ্যতার কাঠামো বহন করে চলে, মাণিকবাবু তাদের শ্রেণীগত নয়। তাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী দর্শকের—তার রচনা আপাতদৃষ্টিতে বাস্তবধর্মী কিন্তু আদলে রোমান্টিক।

'নাগপাশে' আর্থিক অস্বচ্ছলতায় নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের রূপটি ব্যাপকভাবে রূপায়িত হয়েছে। রূপায়িত হয়েছে অর্থমানে মানমর্য্যাদা শিক্ষা-সংস্কৃতির চরম দুর্দশা। তবুও অধঃপতনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলেছে—মুষ্টিমেয় লোক নীলকণ্ঠ হয়ে অধঃপতনকে মেনে নিতে রাজী নয়। রাজী নয় টাকার দরে মনুষ্যত্ব বেচে দিতে। এদের আশ্চর্য্য সহনশীলতা, উদারতা, প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। কিন্তু নাগপাশের বাঁধন এক। প্যাঁচ ছাড়ালে, আরেক প্যাঁচ চেপে ধরে—তবু সমাজকে যারা উপেক্ষা করছে, তারাই সমাজকে বাঁচাতে পারবে, না পারলে ভাঙবে। এখন শুধু চলেছে নাগপাশ বিমুক্তির প্রচেষ্টা।




খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড়

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩



ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড আফিস ঃ ৪ ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান গত ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ১৭ বৎসরের ভিতর চার বার ভ্যালুয়েশান করানো হইয়াছে (পঞ্চম ভ্যালুয়েশান-এর কাজ আরম্ভ প্রায়) এবং প্রতি ভ্যালুয়েশানে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর হইতেই আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রতি বৎসর এই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান পলিসী-হোল্ডারদের বোনাস ও প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড দিয়া আসিতেছে।

ভারতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিতর ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়ার এই সাফল্য অভূতপূর্ব ও অনন্যসাধারণ।




'নাগপাশে' মাণিকবাবু একটা সমাজকে সমগ্রভাবে দেখবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর রচনাশৈলীর অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে। বহু চরিত্র-চিত্রণ তিনি করেছেন, কিন্তু কোনো চরিত্রই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেনি। তাই বলছিলাম—এ যেন চলচ্চিত্র! অনেক আলেখ্য নিয়ে একটা সমগ্র উপন্যাস। তাছাড়া, শব্দপ্রয়োগের মিতব্যয়িতা এবং প্রয়োজনীয় বাক্য ব্যবহার মাণিকবাবুর সাহিত্যজীবনে পরিবর্তনেরই সূচনা করে। তিনি একান্তভাবে রিয়ালিষ্ট হতে চলেছেন। কাঠিন্যের আবরণে তিনি সমস্ত উচ্ছ্বাস মুড়ে দিয়েছেন, একটু প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপও যেন মিশে আছে। একটু গন্ধকের গন্ধও যেন রয়েছে।

কিন্তু 'নাগপাশ' অসমাপ্ত। মাণিকবাবুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাধনপথে। পরিপূর্ণ ফসল এখনও ঘরে নেবার সময় হয়নি। বলা যাচ্ছে না, মাণিকবাবু কোন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছেন—অন্তত 'নাগপাশ' পড়ে যা মনে হয়। এলিয়া এহ্রেনবুর্গ-এর রচনায়ও এমন সামগ্রিক চিত্রণ আছে—আর আছে জাঁপল সার্ত-এর রচনায়। মাণিকবাবু কি এঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন? হ'লে কার দ্বারা? কিংবা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীই তাঁকে এ প্রচেষ্টায় এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এহ্রেনবুর্গের রচনায় শ্রেণী-সংগ্রাম প্রকট হয়ে আছে, আর আছে লেখকের নিজস্ব মতবাদের প্রভাব। সার্ত পরিস্থিতিবাদ পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করে, তারপরে উপন্যাস লিখতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নাগপাশে' শুধু পরিস্থিতি প্রকট হয়ে আছে—কোনো বাদ নেই। আছে বিসম্বাদ। 'নাগপাশ' পথের পরিচয়, পথনির্দেশ করে না। বলা যায় না, অপ্রত্যাশিত ভাবে কখন কী ঘটে যাবে তাঁর কলমের আঁচড়ে।

অমল দত্ত

## ইতিকথা

পলাশীর যুদ্ধ ঃ তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। নাভানা ঃ চার টাকা।

ইতিহাস কোন একটা বিশেষ ঘটনা নয়, ঘটনার ইতিকথা মাত্র। কার্য্য কারণ ব্যাপারে, ইতিহাস দেখাবে কারণটাকে আগে। সেই কারণ অনুসারে কার্য্য হয়েছে জানলে বুঝতে পারা যাবে ইতিহাসের হিসেবের অঙ্ক মিলেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধ একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়। কারণ এই যুদ্ধের পরেই দূরদেশের ইংরেজ তাদের কায়েমী আসন প্রতিষ্ঠা করল এদেশে, প্রতিষ্ঠা করল তাদের দেশের সাম্রাজ্যবাদ, যেটা সাত সমুদ্র তেরনদীর বুক চিরে এল।

কিন্তু খুব দুঃখের বিষয় এতদিন অনেক কারণ বশত আমাদের দেশে পলাশীর যুদ্ধের সত্য ইতিহাসকে কেউ দেখাতে চেষ্টা করেন নি ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক উভয়ের দৃষ্টি দিয়ে। যাকে ইতিহাস বলে আমরা এই দুশো বছর ধরে পেয়ে এসেছি, সেখানে স্পর্শ করেছি সত্য ইতিহাসের মৌনতা, সে ইতিহাসের মান নির্ভর করেছে বনিকের মানদণ্ডের ওপরে। কিন্তু কেমন করে বনিকের নৌকোর দাঁড় যে রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হলো, সে বিষয় আলোচনা করতে অনেকে সেদিন অধিকার পান নি।

পলাশীর-যুদ্ধের লেখক যে গ্রন্থপঞ্জী থেকে তার বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে গ্রন্থগুলির ভেতরে অনেক গ্রন্থই ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসার চিহ্ন পেরিয়ে দাড়িতে এসে পৌছোয় নি। তথাপি সেগুলো থেকে একটি সত্য সংবাদ আবিষ্কার করে লেখক ধন্যবাদ অর্জন করেছেন একথা স্বীকার করি। আজ দিন এসে গিয়েছে যখন আত্ম পরিচয়ের দিকে আমাদের তাকাতে হবে। সেই চরম দিনে বিশ শতকের বাঙ্গালী পাঠক এমন একটি সরস ইতিহাসের বই পেয়ে নিজেদের উপকৃত বোধ করবে।

লেখকের রচনা-কৌশলে বা সাহিত্য-শৈলীতে বীরবলের গন্ধ পাওয়া যায়; পাওয়া যায় অবনীন্দ্র নাথের সরস বর্ণনার গন্ধ। এ-ছাড়া সত্য ইতিহাস যে সাহিত্যের রসে গা ভিজেয়েও জাত-ধর্ম খোয়ায় নি, এইটেই সব চেয়ে বড় কথা এ বইতে।

বইটির সমালোচনা করতে হচ্ছে, শুধু আলোচনা নয়। সুতরাং বইটির ভাল-মন্দ দুই দিক সম-আলোচনা করতে হবে, অবশ্য প্রয়োজন বোধে।

লেখক যে সমস্ত বই ঘেঁটে তার বইটি দাড় করিয়েছেন তার ভেতর অনেক বইতে যে বিদেশীর জয়ডঙ্কা শুনতে পাওয়া যায় সেকথা আগেই বলেছি। সেই কারণ বশত অনেক সত্যকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণ করা চোখের-বালির মতনই বেদানাদায়ক।

লেখক পলাশীর যুদ্ধের অনেক ঐতিহাসিক উপাদান ও অনেক চরিত্র অনেক নামকরা বই থেকে সংগ্রহ করেছেন; কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের তথ্য সংগ্রহ করতে যে দুটো গ্রন্থ আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করছি, সে দুটি দেখলাম তার গ্রন্থপঞ্জী থেকে বাদ পড়েছে। তার একটি হলো স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র লেখা "সিরাজদ্দৌলা" ও অপর বইখানির নাম "ফিরিঙ্গী বনিক"। মনে হয়, অক্ষয়বাবুর বইখানি পলাশীর যুদ্ধের উপকরণ হিসেবে ও সিরাজদ্দৌলাকে জানবার জন্যে যথেষ্ট কাজে লাগত; কারণ ইংরেজ আমলে সিরাজদ্দৌলাকে কলঙ্কিত করা ও মিরজাফরের উপকারী বন্ধু বলে পরিচিত করা যখন কোন জাতির প্রয়োজন হয়েছিল, সেই সময় অক্ষয়বাবুই তার প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করেছিলেন। আজ যখন সত্য ইতিহাস লেখবার দিন এল, তখন সেই সত্যভাষ্য লোকটিকে গ্রন্থপঞ্জীতে স্থান না দিয়ে লেখক ভাল কাজ করলেন কি ভাল কাজ করলেন না সেকথা সম্প্রতি তাঁকেই ভেবে দেখতে বলি। দ্বিতীয় কথা হোল, অনেক ইতিহাসই আজও লৌকিক সংস্কার আবরণে লুকিয়ে আছে। বাংলার স্বাধীনতা যাবার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের গুলির ভয়ে সেই যে অনেক সত্য আত্মগোপন করেছে, সেগুলোকে সংগ্রহ করা দরকার। এ তথ্য আজও আছে মানুষের মুখে মুখে, আছে সংস্কারের আবরণে আবৃত। এই সব মিলিয়েই দেখা উচিত বা বিচার করা উচিত বাঙালির স্বাধীনতা হারাবার কারণ। যাহোক, 'পলাশীর যুদ্ধ' বইটিতে যদি কোন ত্রুটি থেকে যায় তাহলেও বলবো, ভাবিকালের সত্য ইতিহাস লিখতে উৎসাহিত করবার জন্যে এ বই যথেষ্ট কাজ করেছে ইংরেজ বিদ্বেষে একটা উচ্চ আসন।

পাঠক এবং দর্শক উভয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি "দাশগুপ্তা" প্রেসকে। "পলাশীর যুদ্ধ" বলে প্রচ্ছদপটের লিপি অঙ্কনেও পেয়েছি শিল্পীর জ্ঞানের পরিচয়।

ইন্দ্রজিত


আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম বলেই মনে করি। সমাজ-আরাম গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্বিচার পরিবেশনে পাঠকের রুচি কলুষিত কলুষন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেশনে পূর্বাশা নিয়মিতভাবে বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্বাশায় সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের
পুনর্ণবা
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা
দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী
দেড় টাকা

নতুন দিন
আট আনা

যৌবনোত্তর
আট আনা

তিনজন আধুনিক কবি
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
যাত্রিক
এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার
দু'টাকা

শুক্লাভিসার
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল
এক টাকা চার আনা

ঋণ
দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা

সৈয়দ মুজতবা আলীর
নক্সাকাটা
দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত
এক টাকা বার আনা

মরামাটি
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল
পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায়
( ২য় সং )
তিন টাকা

রাত্রি
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

মৌচাক
পাঁচ টাকা

গৌরকিশোর ঘোষের
ত্রিস্রোত
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা


COLOUR ILLUSTRATION

## পূর্ব্বাশার তিনটি বই

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত

## অপ্রেম ও প্রেম—( গীতিকাব্য )—১৲

**'অপ্রেম ও প্রেম'-এর দু'জন সহৃদয় সুধী পাঠকের পত্র :**

"আপনার প্রেমের কবিতাগুলি রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে অতুলনীয় এবং এই ধরণের কাব্যরচনায় আর কোনো আধুনিক বাঙ্গালী কবি এমন সার্থকতা লাভ করেছেন বলে আমার জানা নেই। কাব্য বিচারে আমার অধিকার থাক না থাক, একজন কাব্যামোদী হিসাবে এটুকু বলবার নিশ্চয়ই আমার অধিকার আছে যে 'প্রেম ও অপ্রেম' শীর্ষক কয়েকটি কবিতা পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, স্নিগ্ধ হয়েছি এবং যে আনন্দ পেয়েছি সেটা বিশুদ্ধতম কাব্যরসসম্ভোগেরই আনন্দ।"

আবু সয়ীদ আইয়ুব

"....প্রাপ্তিস্বীকার করে আপনাকে লিখতে যাচ্ছিলুম যে আপনার নূতন বই সম্বন্ধে আমার মতামত অবিলম্বে জানাতে পারছি না বটে, কিন্তু আপনার কাব্যের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয়ের জোরে এ-কথা এখনই বলতে পারি যে পুস্তকখানি আমার ভালো লাগবে।...সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরে, গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পড়ে দেখলুম যে আমার অনুমান নির্ভুল—কবিতাগুলি চমৎকার লিরিক, বিশিষ্ট রীতিতে রচিত, এবং অভিনব তথা স্বকীয় আঙ্গিকের দৃষ্টান্ত।"

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

## 'এ হিস্ট্রি অব মোহেঞ্জোদারো'—২৲

ইংরাজিতে লেখা ঐতিহাসিক নিবন্ধ—ইহাতে মোহেঞ্জোদারোর লিপি পাঠ করা হইয়াছে যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কেহ করেন নাই। নিবন্ধটিতে মোহেঞ্জোদারোর ইক্ষ্বাকু-বংশের ইতিহাসই বিবৃত হইয়াছে। মোহেঞ্জোদারো সভ্যতা কৌম গণতন্ত্রের শ্রীক্ষেত্র এবং তাহা বাংলাদেশেরই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

'পদাবলী'—( গীতিকাব্য )—২৲

প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিঃ—৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


COLOUR ILLUSTRATION

# টুকরো কথা ... (২৮)

না। কবির কোনো দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম নেই। তাঁর আদি, তাঁর অন্ত পরিচয়—তিনি কবি, অর্থাৎ কবি যদি তিনি হন। তিনি নারী কি পুরুষ, হিন্দু, কি মুস্লিম, না ইহুদী, না ক্যাথলিক, নাকি তিনি ওমুক রাজনৈতিক মতের অনুরক্ত কিংবা বাধ্য—কাব্যবিচারে সে সব কোনো প্রশ্নই না, একেবারে অবান্তর। সে অর্থে কবিদের মধ্যে 'মহিলা কবি' বলে একটা আবার শ্রেণীবিভাগ করা অর্বাচীন মনে হতে পারে। অর্থাৎ কাব্যবিচারে। কিন্তু যে কালে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ছিল অতি অল্প (এবং তা খুব সেকালের কথাও না), যখন 'বাঙ্গলা সমাজের নেতৃবন্দ মনে করিতেন, স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে চরিত্রহীনা ও বিধবা হইবে' সেই যুগেও যে সকল মহিলা কবি বিবিধ গ্লানি সহিয়াও কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করেছেন তাঁদের রচনা এবং জীবনকথা অন্তত সেই কারণেই আমাদের বিশেষ কৌতূহল এবং আগ্রহ জাগাতে পারে। একশো বছরও কাটেনি, বিখ্যাত কোনো মহিলা কবির জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতৃদেবীর সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া পিতা স্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য, মাতৃত্বের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু উপদেশ ছিল। পত্রখানি ডাকঘর হইতে বাড়িতে না আসিয়া গ্রামের কোনো এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়িতে গেল, তাঁহারা চিঠিখানি খুলিয়া পড়িয়া (কবির) পিতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রবধূকে চিঠি লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন, পত্র লইয়া তাঁহার বৈবাহিকের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার কার্যে বড় অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানি লইয়া বাড়িতে একটা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল।" এই মাতৃদেবীর কাছেই কবির হাতে খড়ি। আজ কৌতুকের বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেই একটি কবির শৈশব অতিবাহিত হয়েছে, সেটাই আশ্চর্য।

বিগত ছশো বছরের উল্লেখযোগ্য মহিলা কবিদের কাব্যপরিচয় এবং জীবন বৃত্তান্ত দিয়ে 'বঙ্গের মহিলা কবি' নামে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত যে বৃহৎ গ্রন্থটি রচনা করেছেন সেটি নানা উপাদানে সমৃদ্ধ। নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য কাব্যগ্রন্থ থেকেও প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছেন লেখক। কবি সমাজের তিনি শ্রদ্ধাস্পদ।

উপন্যাস ছাড়া মূল্যবান বিদেশীয় প্রবন্ধাদির অনুবাদ [illegible]। মোহিতলাল মজুমদারের 'বিদেশী প্রবন্ধ সঞ্চয়ন' এদিকে বিশেষ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। [illegible] করেছেন [illegible], এমিল্ জোলা, [illegible] প্রবন্ধ। যোগ্য ব্যক্তিরা [illegible] একদিন বাংলা [illegible]

নতুন উপন্যাস [illegible] হোক সে [illegible] নির্জীব বস্তিতে—[illegible] উপাদান নিয়ে সুশী[illegible] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের [illegible] চৌধুরীর 'পাতালে [illegible] হবে ভারতবর্ষের [illegible] হাতের লেখা। [illegible] উপন্যাসের সূচনা করেছিলেন। [illegible] করেন। 'ভালোমন্দ' নামে সে [illegible]

'শরৎ সমিতি' প্রকাশিত [illegible] প্রবন্ধাদির মধ্যে [illegible] উল্লেখযোগ্য॥

'১৯৫০ সালের ছিন্নমূল উদ্বাস্তু নরনারীর [illegible] কাহিনী নিয়ে 'যুগান্তরে' ধারাবাহিক ভাবে (পূর্ব বাংলায়) 'ছেড়ে-সম্পাদনায় সেই সব স্মৃতিকথার ১ম খণ্ড 'ছেড়ে-আসা-গ্রাম' নামেই বেরিয়েছে। জন্মভূমিকে ভালোবাসার বেদনার্থ অভিজ্ঞান॥ দেশ স্বাধীন হবে—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তুর্কী, সুইডেন, জর্মণী, আমেরিকা এবং এশিয়ার নানা দেশে বিপ্লবী কর্মী, বিশেষত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রেরা যে গোপন আন্দোলনে লিপ্ত ছিলেন সে বিষয়ে তথ্যবহুল বই ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর 'অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস'। লেখকের [illegible] আন্দোলনের কার্যক্রমের লিপিবদ্ধ বিবরণী। জ্যোতিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'দার্শনিক জন লক' বইটির ভূমিকায় অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন: 'দার্শনিক চিন্তার সঙ্গে পরিচয়হীন বাঙালী পাঠক, এ বই পড়ে—চিন্তার স্বাদ পাবেন এবং দার্শনিক চিন্তাকে সৃষ্টিছাড়া খেলা বলে মনে হবে না।'

নতুন ঐতিহাসিক নাটক: মোহনলাল: শীতাংশু মৈত্র।

'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ২য় খণ্ডের ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ১ম সংস্করণের ১০ হাজার বই নিঃশেষ হতে লেগেছে তিন মাস। এই সঙ্গে সিগনেট প্রেস থেকে ৪র্থ সংস্করণ ছাপা হয়েছে অচিন্ত্যকুমারেরই উপন্যাস 'ইন্দ্রাণী'।

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর মৃত্যু হয়েছে। 'লাল কালো' নামে দিলীপ ভট্টাচার্য্যের নিয়ে তিনি ছোটদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস লিখেছিলেন। বইটি এখনো পাওয়া যায়।

ছোটদের জন্য নতুন বই: প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস 'দুরাশার ডাক', সুনির্মল বসুর হাসির কবিতা 'কেবল হাসির দেশে', রুশ ফিল্ম ষ্টোন ফ্লাওয়ার অবলম্বনে খগেন্দ্রনাথ মিত্রের লেখা গল্প 'পাথরের ফুল' এবং সংস্কৃত 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে সচিত্র গল্প শৈল চক্রবর্তীর 'কৃপণের পরিণাম'।

কবিতা প্রসঙ্গে: দীর্ঘ এক যুগ পরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তর নতুন কাব্যগ্রন্থ 'সংবর্ত' সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। উৎকৃষ্ট বাংলা কবিতার একটি স্মরণীয় সংকলন। কবিতার প্রতি পাঠকের আগ্রহ কবিকেও যে প্রেরণা দিতে পারে তারই দৃষ্টান্ত এ বইটির প্রকাশ। সুকান্ত ভট্টাচার্যের খুবই কম বয়সের রচনা 'অভিযান এবং 'সূর্য প্রণাম' নামে দুটি কাব্যনাটিকা মন্ত্রনির্দেশ সমেত 'অভিযান' নামে ছাপা হয়েছে। মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় উত্তর বাংলা থেকে একটি ছোট কবিতা সংকলন বেরিয়েছে 'সূর্যতামসী'॥

পিট্‌সবার্গের একটি কলেজে অধ্যাপনা নিয়ে বুদ্ধদেব বসু এক বছরের জন্য আমেরিকা যাচ্ছেন। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন 'সাহিত্যচর্চা' সিগনেট প্রেস থেকে শিগগিরই প্রকাশিত হবে।

[illegible] বাঙলাদেশে মনসুন এবার [illegible] নিশ্চিহ্ন ধুয়ে গেছে গিরিচূড়ায় সেই মানুষদের পায়ের ছাপ। আবার উঠতে হবে॥


সিগনেট বুকশপে
১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
১৪২/১ রাসবিহারী এভিনিউ

"HIS MASTER'S VOICE"

The Hallmark of Quality

# নূতন গান

Columbia

**হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্—**

**নন্দলাল পুরী**

H 82573 নাইবা রহিল চাঁদ
আধুনিক তুমি মোরে ভুলেছ

**শ্রীমতী মালতী ঘোষাল**

N 82574 যদি এ আমার হৃদয়
রবীন্দ্র-গীতি এ পরবাসে রবে কে

**বরদা গুহ, নীলিমা সান্যাল ও মণি দাশগুপ্ত**

N 82575 বাপের দেওয়া নাম
কৌতুক —দু'ই খণ্ড

**কেশব বর্মণ ও স্মৃতি বসু**

N 82576 আজি হাতত দেখং
পল্লী-গীতি ওকি বৌদিয়ারে

**পঙ্কজ মল্লিক**

P 11924 তেনজিং অভিনন্দন :-
জাতীয়তা উর্দ্ধে অজেয়
মূলক কে তুমি যাত্রী

**চিত্র-গীতি—**

"হরিলক্ষ্মী"—এস্-বি প্রোডাকসন

N 76004 সারাদিনমান তাটিনীর ঢেউ
চিত্র-গীতি যাবার বেলায় দিলেম

**যন্ত্র-গীতি—**

**মনোহারী সিং** (স্যাক্সোফোন)

N 87521 সুর : তুম্ কাহাঁ হো 'নাজ'
যন্ত্র-গীতি সুর : আজা অব তো আজা
—'আনারকলি'

**কলম্বিয়া—**

**সৌমেন মুখোপাধ্যায়**

GE 24682 পূর্ণিমা বসন্তে হায়
আধুনিক চাঁদ ঝরুক ঝরুক

**অমল মুখোপাধ্যায়**

GE 24683 আরও দিন যাক
আধুনিক ওগো কিশোর বেলায়

**গঙ্গাচরণ বিশ্বাস**

GE 24684 ও মোর সোনা বন্ধুরে
পল্লী-গীতি ওকি আবোহে

**যন্ত্র-গীতি—**

**অমর সিং যস্যাল** (ক্ল্যারিওনেট)

GE 25814 সুর : পিয়ার হোকে রহেগা
যন্ত্র-গীতি —আশ

সুর : জুলুম কি নগরী
—'আশ'

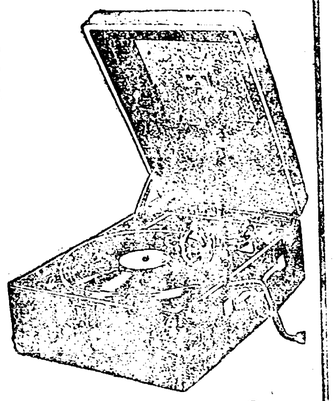

ঘরে বাইরে আনন্দ দিতে
পোর্টেবল গ্রামোফোন মডেল নং ১০২
সারা ভারতে মূল্য ২৫০৲

দি গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড্
কলম্বিয়া গ্রামোফোন কোম্পানী লিমিটেড্
কলিকাতা - বোম্বাই - মাদ্রাজ - দিল্লী ৮৫৩



প্রেমের কবিতার বই • দুই টাকা

# পদাবলী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত

২২শে শ্রাবণ প্রকাশিত

প্রকাশক • পূর্ব্বাশা লিমিটেড • কলিকাতা
৫৪ নং গনেশচন্দ্র এভিনিউ, ফোন-২৪ ১২০৯

"ছন্দের বৈচিত্রে, ভাষার কমনীয়তায়, ভাবের ঘনতায় এই রকম টাটকা সজীব একটী কাব্যগ্রন্থ বাংলাভাষায় অনেকদিন আমার চোখে পড়েনি।"—বুদ্ধদেব বসু



# সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে—

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৪২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

**নূতন বীমা—১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲**

| | |
|---|---|
| মোট চল্‌তি বীমা | ৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲ |
| মোট সম্পত্তি | ২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲ |
| বীমা ও বিবিধ তহবিল | ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲ |
| প্রিমিয়ামের আয় | ৩,৯৪,২২,৩৭১৲ |
| দাবী শোধ (১৯৫২) | ৮৮,৮২,২৭১৲ |

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

# হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩



# ইন্সিওরেন্স অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেড্

হেড অফিস : গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা

এই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান গত ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই ১৭ বৎসরের ভিতর চার বার ভ্যালুয়েশান করানো হইয়াছে (পঞ্চম ভ্যালুয়েশান-এর কাজ আরম্ভ প্রায়) এবং প্রতি ভ্যালুয়েশানে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত হওয়ায় প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর হইতেই আরম্ভ করিয়া ক্রমান্বয়ে প্রতি বৎসর এই জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান পলিশী-হোল্ডারদের বোনাস ও প্রতিষ্ঠানের অংশীদারদের ডিভিডেণ্ড দিয়া আসিতেছে।

১৪ই আগষ্ট নিজ গৃহবাটিতে গৃহপ্রবেশ উৎসব সম্পন্ন হইবে।

# পূর্ব্বাশা

## শ্রাবণ—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাইশে শ্রাবণ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ১৮২ |
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| ঘুম পাহাড়ের বুদ্ধ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ১৮৩ |
| উরাও বস্তীতে ভোর : দেবব্রত সেনগুপ্ত | ... | ১৮৪ |
| অপ্রাপনীয়া : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় | ... | ১৮৫ |
| একটি ধূসর প্রতীক্ষা : নির্মাল্য বসু | ... | ১৮৬ |
| বাইশে শ্রাবণে : শিশিরকুমার দাস | ... | ১৮৭ |
| বর্ণ-যুদ্ধ : ইন্দ্রজিৎ | ... | ১৮৮ |
| গড় শ্রীখণ্ড ( উপন্যাস ) : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ১৯৩ |
| সন্দেশ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ২০০ |
| বিদগ্ধা : শ্রীমতী জয়ন্তী ঘোষ | ... | ২০৮ |
| শিল্পী : জেমস্ জয়স্ : অনুবাদক : অশোক গুহ | | ২১৩ |
| বিবাহিতা স্ত্রী ( উপন্যাস ) প্রতিভা বসু | ... | ২১৯ |
| ফসিল : সত্য পাল | ... | ২২৫ |
| সাহিত্য-বিচার : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ২৩০ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯





খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কেমিং লিঃ

কলিকাতা-১৩



রূপচর্চ্চার আধুনিক প্রণালী

সকল দেশে ও সকল সময়ে রমণীরা নানা উপায়ে নিজেদের দেহশ্রী ও লাবণ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করেছেন। সভ্যতা ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন অভিনব প্রণালীর সৃষ্টি হয়েছে। **ক্যালকেমিকোর** প্রসাধন-সামগ্রী আজ রূপচর্চ্চার অন্যতম আধুনিক প্রণালী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত।

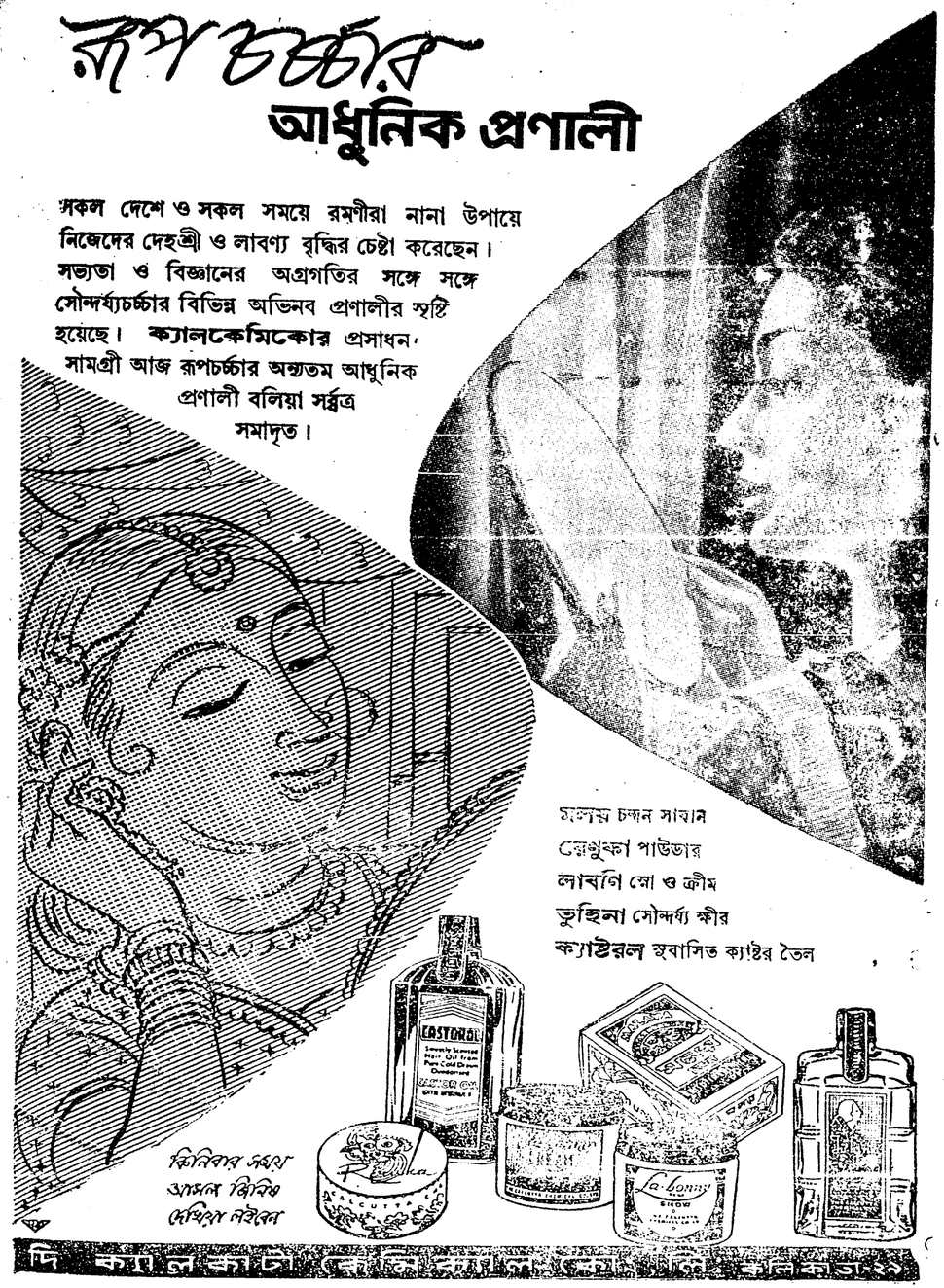

মলয় চন্দন সাবান
য়েথুকা পাউডার
লাবণি স্নো ও ক্রীম
তুহিনা সৌন্দর্য্য ক্ষীর
ক্যাষ্টরল সুবাসিত ক্যাষ্টর তৈল




কিনিবার সময় আসল জিনিষ দেখিয়া লইবেন

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-১৭

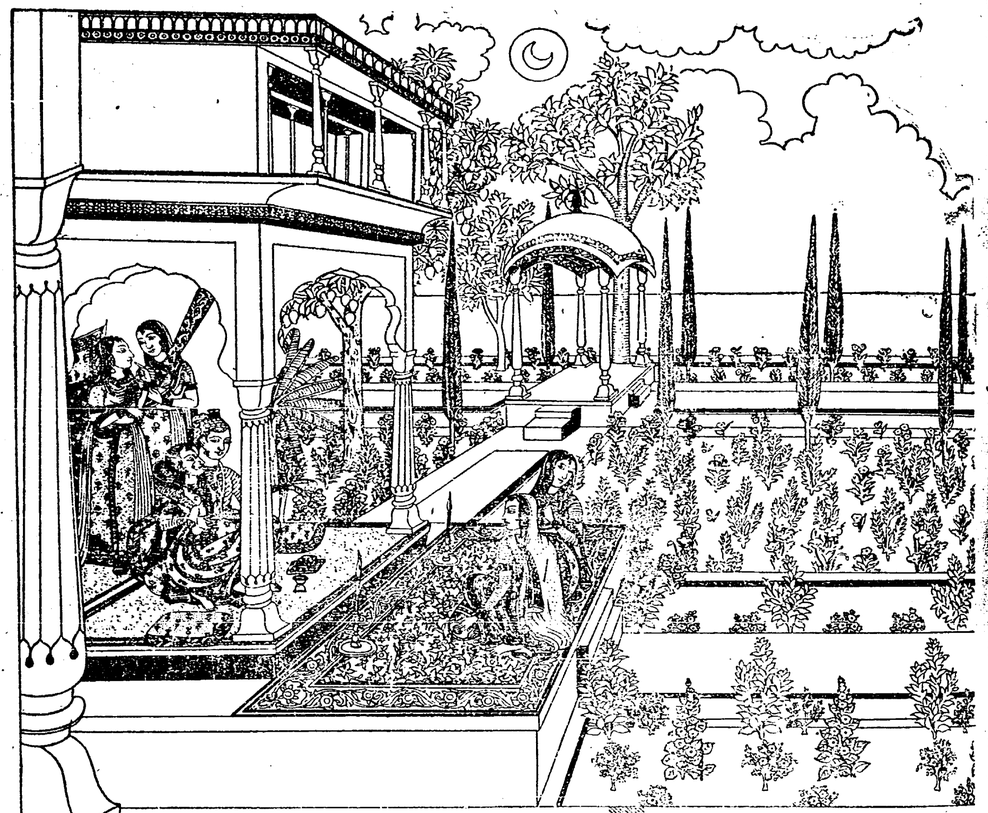


ঋতুচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই শুধু নয়, দিন-যামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে মানুষ তার হর্ষ-সুখ, দুঃখ-বেদনা রাগ-রাগিণীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।
ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি যুগযুগ ধরে শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা মূর্তিতে রূপায়িত করেছে।

চা

সঙ্গীতের মতোই চায়ের রসধারায় অনেকে পেয়েছে প্রেরণার উৎস। কিন্তু চায়ের রস-গ্রহণে দিনক্ষণের বাধা নিষেধ নেই। যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষকে আনন্দ দেয়, সঙ্গ দেয়, দেয় নব নব প্রেরণা।

মালকোশ

মালকোশ গভীর রাতের একটি রাগ। উপরের আলেখ্যটি তারই রূপায়ন। সুর রচনার বলিষ্ঠ ছন্দ-সুষমাতেই মালকোশের একটি বিশিষ্ট স্থান সঙ্গীত রসগ্রাহীদের মনে নির্দ্দিষ্ট হয়ে আছে। এই রাগটির গতিভঙ্গী দৃপ্ত হলেও, এর সুরের আবেদন সহজেই মনকে স্পর্শ করে। প্রেমের পরিপূর্ণ সার্থকতায় সেই সুর আনন্দে উচ্ছল।

১ সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB 104



# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ—১৩৬০
চতুর্থ সংখ্যা—শ্রাবণ


## বাইশে শ্রাবণ

তোমার মৃত্যুর দিনে মনে পড়ে অনেক মৃত্যুরে
অনেক অতীত মৃতমুখ, যারা আছে বহুদূর
স্মৃতিতে বিছিয়ে এক বিস্মৃতির আকাশের তারা,
আমার হৃদয়ে তা'রা মধুচ্ছন্দা, আর সে আর্ত্তারা
সতত পাহারা দেয় পাছে ভুলে যাই কণ্ঠস্বর
পাছে মুছে ফেলি দৃষ্টি, অস্পষ্ট বিরহ-প্রহর
শ্রাবণের খর-ধারে ভাদ্রের আর্দ্রতা-মাখা রোদে !

কাচ স্বচ্ছ অশ্রু ধরে মাখিয়েছি আদর-পারদে
তাই, যেন পাই মুক্তা—অশ্রুত অগীত মূক মুখ
তার ফলে স্বপ্ন-ছবি, পদচিহ্ন, অনন্ত কৌতুক ॥

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

# কবিতাগুচ্ছ

## ঘুমপাহাড়ের বুদ্ধ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঘুম ঘুম ঘুম—ঘুমভাঙানিয়া রে !
দুঃখ জাগানিয়া !
দুই চোখ টলমল
এত জল !—মেঘনার জল।
সারা দেহে এ কী খাদ
কী বিষাদ !—পদ্মার ঢল।
হিয়া তবু হিমাচল, প্রজ্ঞাপাগল রে—
মন-রাঙানিয়া !

খোল্ খোল্ খোল্—খোল্ প্রাচীর দুয়ার রে !
প্রশ্ন মাতাল !
প্রচুর-পয়সী জাগে
এত প্রাণ, জীবনের গান !
সারা দেহে এ কী রূপ,
অপরূপ আলোর ভাসান !
কন্যাকুমারিকায়, কাশ্মীরে জ্বলে রে
হৃদয়-মশাল !

জাগে জাগে জাগে—জাগে মধ্যভারত রে !
আর্য-শপথ।
রাজা দশরথ জাগে
বুকে ভেঙে স্মৃতির তুষার।
জাগে নল, নীল ; খোলে
নীপবনে নীলিমা দুয়ার।



সিংহলে শীত জাগে বসন্ত কোলে রে,
গৌরীয় পথ।

ঘুম ঘুম ঘুম—ঘুম কোথায় উধাও রে !
প্রেমের নিষাদ !
জন্ম, মৃত্যু নেই
গান শুধু, সাগরেও গান—
শ্যাম, জাভা, বোর্নিও,
পীত চীন, পিতল জাপান !
শান্তির স্তনে শিশু সমুদ্র হাসে রে,
স্বর্গীয় স্বাদ !

## উরাও বস্তীতে ভোর

দেবব্রত সেনগুপ্ত

অজানা পথিক দেখে হেসেছিলো কুমারী মেয়েরা
সেই হাসি জ্যোৎস্নার কৌতুক
হয়েছে এখন আর কুঁড়েঘরগুলো যেন কুঁড়ি কুমারীরা।
একপাশে নিঃস্ব ক্ষেত পথিক একেলা
দিগন্ত অবধি গিয়ে
শেষ প্রান্তে একটুকরো তারা
যেন, কুঁয়ারীর দাঁতেকাটা হাসি
হীরের আধার থেকে ছাড়া পেতে চায়।
ছাড়া পেয়ে পূবের তারাটা নেভে ঠিক
কুমারীরা কেউ বুঝি ভুলে ফেলে গেল
নিজের চরম লজ্জা সেইখানে হৃদয়ের অনেকটা জুড়ে।

সেই লজ্জা উদ্বেলিত মাটির চাঙরে মেখে দিয়ে
উরাও কৃষক মিলে নিঃস্ব ক্ষেতে ফের
চষে জমি, পোতে বীজ।

আরক্ত সখীরে ঘিরে
মাদল শিঙার ফাঁকে ফাঁকে
কুমারী মেয়ের দল
সকৌতুকে হাসে
সেই হাসি দিয়েছে সকাল
অপর্যাপ্ত লাউ, কুমড়ো, ধুধুঁলের ক্ষেতে—
স্বইচ্ছায় ফেলে যাওয়া
থোলো থোলো ফুল, ফোলা খোঁপা থেকে খু

## অপ্রাপনীয়া

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

এই ঝরাপাতাদের প্রান্তরে দাঁড়িয়ে
বিস্মৃতি-কুয়াশা ঢাকা সুদূর অতীতে
ফিরে যেতে চাও তুমি ? নাকি প্রেম দিয়ে
ফিরিয়ে আনতে চাও সে-মেয়েকে একান্ত কাছেই,
সামান্য ছোঁয়াতে যার মৃতদিন হয়
স্বর্ণিল স্বপ্নিল, আর রাত্রির বিলয়—
সূর্যের কামনা ঘুরে ফেরে বারবার,
সামান্য ছোঁয়াতে যার ক্লান্তি নেই, রূঢ় মৃত্যু নেই।

তাকে তুমি কাছে পাবে ? একদিন যাকে
শ্রাবণের ক্লান্ত মেঘ ভেবেছিল, আর যার সুরে
পূরবীকে শুনেছিলে, সামান্য ছোঁয়াকে
ভয় ক'রেছিলে, বলো, কেন আজ তাকে,
তাকেই খুঁজছো ফের ? তার ম্লান মেঘের আড়ালে
সূর্যের অকম্প্র ছায়া দেখে তুমি দু'হাত বাড়ালে,
ভৈরবীর দীপ্ত সুর শুনে তুমি একান্ত তাকেই



কাছে পেতে চাও আজ, কিন্তু না, না, তার ভাঙা মন
কুড়িয়ে সে ফিরে গেছে :

কোনোদিন আবার নূপুরে
সুর তুলে দেবেনা সে তোমাকে সামান্য আলিঙ্গন

## একটি ধূসর প্রতীক্ষা

নির্মাল্য বসু

এখনো তো দু'মিনিট বাকী।
দু'মিনিট কতটুকু সময়ই বা আর—
কিন্তু যদি লেট হয়—( আজকালও লেট হয় নাকি ! )
মিনিট দু'চার !
এমনও তো হতে পারে—এমনও তো হয়
সময়েরে পিছে ফেলে মিনিট দু'চার পাঁচ কখনো তো আগেও পৌঁছয়
কোনো কোনো ট্রেন—
তারি একটাতে যদি চড়ে বসে আজকের সুমিলিতা সেন !

আজ এ বিকেল-রঙা স্টেশনে দাঁড়িয়ে মনে হয়
কম নয়—দু'মিনিট অনেক সময় !
ইথারের ঢেউ ঠেলে—পার হয়ে লক্ষ কোটি আলোর বৎসর—
কত যুগ যুগান্তের পর—
অনাবিষ্কৃত এক নক্ষত্রের অলোর মতন
অন্তহীন দূর থেকে আসছে এ দু'মিনিট—আর সেই ট্রেন :
আর সেই ট্রেনে ক'রে আশ্চর্য্য সুন্দর এক সুমিলিতা সেন !

জানলায় হাত রেখে— হয়তো সে হাতের ওপরে
আলগোছে মুখ তুলে সূর্য্যমুখীর মত সুমিলিতা ফুটে আছে সারাদিন ভরে ;
আর সে মুখের 'পরে
দুরন্ত হাওয়ায় বুঝি এলোমেলো উড়ে পড়ে গুছি দুই ভ্রমর-কৃষ্ণ-সোনা চুল :
অথবা সে আধবোজা, আধশোয়া—আর তার ক্লান্ত আঙুল

ডুবে গেছে হয়তো বা এখুনি বোজানো কোন অসমাপ্ত গল্পের ঘুমের ভেতরে ;
তার মাঝে সুমিলিতা সেনও কি ডুবেছে—
ডুবে গেছে—? উঠবে কি দু'মিনিট পরে ?

এমনও তো হতে পারে রওনা সে হয়নি মোটেও ;
হলেও বা হতে পারে পরের ট্রেনেও।
বিকেলের পড়-পড়-রোদ-লাগা-গাছেদের ছায়ার মতন
তাহলে কি দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে
এই দু'মিনিট শেষে মিশে যাবে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালের কাছে
অন্ধকার ;—তার পরে অনন্ত সময়ে।

## বাইশে শ্রাবণে

শিশিরকুমার দাস

প্রহরের পর জেগেছি প্রহর তবে এ মালা
গেঁথেছি যে আমি আমার অনেক চোখের জলে
কাকে দেব আমি আমার বেদনা আমার জ্বালা ?

ডাক দিল নাকি বিদিশার বনে কোকিল দলে
আমি ভুলে গেছি ( ক্ষমা করো ভাই ) সে পদাবলী
তবে এই মালা কাকে দেব, আমি কাহার গলে ?

এই মাঠে মাঠে কচি ধানশীষে গানের কলি
ফুরিয়ে গিয়েছে : গান নেই কোন নদীর তটে
তবে কি বাতাস যাবে এ মালার বর্ণ দলি' ?

যখনই তাকাই তোমার শিরীষে, তোমার বটে
শাখায় শাখায় সুর বেজে ওঠে পাখিরা গায়
স্নিগ্ধ সলিল ধীরে ধীরে লাগে নদীর তটে।

আর চেয়ে দেখি অদূরেতে কারা নৌকা বায়
সেখানেতে সুর : নদীতে নদীতে শান্তি নামে :
এ মালা আমার তখনই দিয়েছি তোমার পায় ॥

## বর্ণ-যুদ্ধ

ইন্দ্রজিৎ

আমাদের জীবনে ইতিহাস-পুরুষ আসেন আদর্শবাদের মুখোস পরে। সেখানে তত্ত্বকে আমরা পাই কিন্তু পাইনা সত্যের সন্ধান, পাইনা ইতিহাসের মূল কথা। ইতিহাস আমাদের কাছে পরিণত হয়ে আসে ইতিকথার রূপে।

ইতিহাস-পুরুষ যুগে যুগে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন আসর বুঝে, দর্শকের রুচি বুঝে মুখে মুখোস লাগান ইতিহাস পুরুষ। সেখানে সত্য রূপ তার চিরকালই ঢাকা থেকে যায় রংএর আবরণে।

শুধু আমাদের কেন সবদেশেরই ধর্মকথা তত্ত্বকথা তার নিজের কুৎসিৎ রূপ থাকলে নিজেকে ভালোর পটভূমিকায় ফোটাতে চেষ্টা করে ; সেকারণে অর্থাৎ তার পরিণামে আমরা ভালটাই পাই কিন্তু সত্য কথাটা পাইনা। সেখানে তথ্য চাপা পড়ে তত্ত্বের চাপে। কিন্তু সত্য কথাটা বার করতে হলে এই তত্ত্বের পেট চিরে বার করতে হবে। অতীতের ইতিহাস-পুরুষের মুখোস জোর করে খুলে ফেলে দিতে হবে। রংএর বহিরাবরণকে ভেদ করে মানুষের সত্যান্বেষী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঠেকবে গিয়ে অতীতের হৃদ্‌পিণ্ডতে।

আজ বিশ শতকের অনুসন্ধিৎসু মন বর্ত্তমানের বহুমুখী আনন্দকে পেছনে ফেলে সেইজন্যেইত চলে গেল অতীতের তমিস্রায়, আর দীপঙ্করের মতন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বেলে আঁধারের বুক চিরল নির্ব্বাক নিস্তব্ধ অতীতের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ শতকের মানবিক জিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসা করল অপ্রকট দেবতাদের, কি তোমাদের লীলার উদ্দেশ্য ছিল ? জিজ্ঞাসা করল রামায়ণী সীতাকে, জানকী, তোমাকে কেন্দ্র করে যে এত বড় বিরাট যুদ্ধ হলো এর মূল কারণ কি তুমি জাননা ?

মহাভারতীয় দ্রৌপদীকে তার বস্ত্র হরণের কারণ জিজ্ঞাসা করল বিশ শতক।

বৈষ্ণবী রাধাকে জিজ্ঞাসা করল, কৃষ্ণ-মনমোহিনী, কৃষ্ণ যখন মথুরার দিকে চললেন তখন তুমি কি তাঁর রথচক্রের নীচে আত্মহত্যা করতে চাওনি ? যদি চেয়ে থাক তো কেন চেয়েছিলে ? তুমি জানতে কি, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে না থাকলে তোমার শোকের চেয়ে বিপদ হওয়ার আশঙ্কাই বেশী এবং অনেক বেশী ? একথার উত্তর দাও বিশ শতককে।

বিশ শতক দুর্ব্বার গতিতে এগিয়ে গিয়েছে পাখা মেলে সুদূর অতীতে, পুথি ছাড়া জ্ঞানের রাজ্যে "স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে"কেও ছাড়িয়ে, অতীতের গোড়া খুঁড়তে, ইতিহাস-পুরুষের মুখোস খুলে ফেলতে।

সুর এবং অসুরের সংগ্রাম হয়েছিল বড় ভীষণ রকমের। অসুররা অনার্য্য ভারত-ভূমির আদিবাসী আর আর্য্যরা হলেন বহিরাগত অতিথি।

অনার্য্যের ঘরে বাইরে সব রকম সম্পদ ছিলো ছিলোনা কেবল মস্তিষ্ক, তারা জানতো গাছের ফল খেতে, মাঠের ভেতরে গজিয়ে ওঠা ধানকে উদর পরিপূরণ করবার কাজে লাগাতো, কিন্তু বৎসরান্তে কেমন করে আবার ফসল ফলতে পারে এ বিদ্যা তাদের অজানা ছিল। শ্রী ছিল তাদের দৈহিক সম্পদে কিন্তু রূপ সম্পদের দিক থেকে তারা বহন করতো হতশ্রীর পতাকা। কামদেবকে তারা অনুভব করতে পারতো কিন্তু কল্পনা করতে পারতো না মীনধ্বজের সৌন্দর্য্য। এদের মত ছিল কিন্তু মতবাদ ছিল না।

অসুর সংস্কৃতির সমগ্র রূপকে যদি বিচার করি তাহলে দেখতে পাই যে সৌন্দর্য্য তাদের কোথাও ছিলনা। আর্য্যরা যখন ভারতে প্রথম পদার্পণ করলেন তখন অনার্য্যদল প্রথম দেখল সুন্দরকে, প্রথম দেখল সৌন্দর্য্যকে। তাদের জীবনে বা সংসারে যে জিনিষ কোথাও ছিলনা তা আজ অতিথি হয়ে এলো, তারা পারলো না মুগ্ধ না হয়ে থাকতে।

আর্য্যদের প্রতি এই পূর্ব্বরাগই অনার্য্যদের কাল্ হলো। ভিত প্রতিষ্ঠা করলো আর্য্যের দল, শান্ত সুশ্রী অভিযান আরম্ভ করলো হতশ্রীর বিরুদ্ধে, কিন্তু অত সহজে নয়, কারণ প্রকৃতির কঠোরতা দিয়ে প্রকৃতি যাদের গড়ে তুলেছে তাদের রূপ গুণ না থাক শক্তি আছে এবং সেই শক্তির জোরে প্রবল আর্য্যকে টলিয়ে দিলো ভারত ভূমির এই আদি বাসীরা। অবশেষে দেবগুরু বৃহস্পতি আর্য্যের মস্তিষ্কের ভেতরে এসে পাঠ করতে লাগলেন চণ্ডী। ভাঙ্গন ধরল গোটা ভারতের আদিবাসীদের ভেতরে। একদল বলল, ছাড় এদেশ; আর একদল এ দল ছেড়ে অন্য দল গড়লো; তারা বললো, গিলে ফেল শত্রুকে, হজম কর সৌন্দর্য্যকে; আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা হোক সুন্দরের কল্পনার রূপ আর গুণের ঘটুক দেহাত্ম মিলন। এই দুই মতের মাঝখানে আর্য্যরা এসে দাঁড়ালেন।

যারা বলেছিলো এদেশ ছাড়ো, তাদের সংখ্যা ছিল অল্প, বুদ্ধির পরিমাণের কোঠায় ছিলো শুন্যের অঙ্ক। তাই ইতিহাসে এরা আশ্রয় পেল তাড়াতাড়ি, এককথায় তাদের অকাল মৃত্যু এলো।

যে সমস্ত অনার্য্য হয়েছিলেন সৌন্দর্য্যের পিয়াসী, তারা মালা পড়াতে এলো সুন্দর জাতিকে। অনার্য্য পুরুষ চাইলো আর্য্য রমণী, কামনা চাইলো সৌন্দর্য্য। কি হবে? কি হবে? কি হবে? মতবাদ কাঁপছে, দেশ কাঁপছে, মানুষ কাঁপছে, কাঁপছে সকলের স্বাতন্ত্র্য। এ কাঁপা শুধু মিলনের আনন্দে নয়, নিজস্ব সত্তাকে হারাবার ভয়ে।

ইতিহাসের রুক্ষ অংশ এখানে শেষ হলো। শেষ করবার আগে একথা বলে রাখি যে এক নারীকে নিয়ে যেমন দুই পুরুষের ভেতরে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তেমনি এই আর্য্য নারীকে



গ্রহণ করা নিয়ে সৌন্দর্য্য উপাসক অনার্য্যদের ভেতরেও আবার দুই দল হলো। পরবর্ত্তী অঙ্কে রং মেখে মঞ্চে দাঁড়ালেন অনার্য্য রাবণ আর অন্য দিকে দাঁড়ালেন অনার্য্য দশরথ। তাদের দুজনের মাঝখানে হল-কর্ষণ করছেন আর্য্য রাজা জনক। দুজনের দৃষ্টি জনকের দিকে কারণ জনকের কাছে রয়েছে সুন্দরী জানকী। এই জানকীকে কে নেবেন? দশানন না দশরথ?

নবদুর্ব্বাদল বলে যে বর্ণ বিষ্ণুর গাত্রবর্ণ বলে কল্পনা করা হয়ছে তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এখানে গ্রাহ্য নয় কারণ আর্য্য জাতির কোন দেবতা শ্যামবর্ণ হতে পারেন না * বিশেষ করে বিষ্ণুর বিষ্ণুত্বের সঙ্গে তার বর্ণের মিল অনার্য্য জাতির ভেতরেই পাওয়া যায় এবং এই সিদ্ধান্তকে আপাততঃ মেনে নিয়ে আমরা দেখি যে রাম এবং রাবণ এক সূত্রে দুটি ফুলের মতন বিভক্ত এবং অবিভক্ত।

এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত যে শ্যামবর্ণ দেবতাকে আর্য্যের তিলক পরিয়ে খুব সত্য-নিষ্ঠার পরিচয় আমরা দিইনি। রাবণ যে বর্ণের জন্যে আর্য্যের সমপর্য্যায়ে উঠতে পারলেন না সেই একই কারণে রামও উঠতে পারেন না।† রামায়ণের ভেতরে আমরা এই জিনিষটাই খুব বেশী করে লক্ষ্য করি যে একদিকে যেমন রাবণ বলছেন, জনক তনয়াকে গ্রহণ করব আমি, আবার অন্যদিকে দশরথ দাবী করছেন এই বলে যে সীতাকে আমার প্রথম পুত্রের সহধর্মিনী করব আমি। একটি স্বর্ণখণ্ডের প্রতি দুই জোড়া প্রলুব্ধ চোখ।

জনকরাজ তাঁর সভায় "হরধনু" ভঙ্গের আয়োজন করলেন, বল দেখিয়ে সীতাকে যিনি নিতে পারবেন তাঁর হাতেই তিনি কন্যাদান করবেন। এদিকে হর হলেন রাবণের উপাস্য দেবতা। সুতরাং কেমন কোরে রাবণ হরধনু ভঙ্গ করতে পারেন? তাতে যে তাঁর দেবতার সম্মান নষ্ট হবে। সুতরাং বাধ্য হয়েই রাবণ এই শক্তি-পরীক্ষা থেকে বিরত হলেন। এর পর দৈহিক শক্তি দেখালেন রাম।

আর্য্যদের মস্তিষ্ক উর্ব্বর ছিল কিন্তু দৈহিক শক্তির পরিচয় সবসময় দেবার জন্যে তাঁরা তৈরী ছিলেন না। সুতরাং রামচন্দ্রের এই বল প্রদর্শনের ভেতর দিয়ে আমরা কি সেই নবদুর্ব্বাদল আদিবাসীদের পাই না?

এই সীতাকে কেন্দ্র করে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হলো সেটা দুটি অনার্য্য সভ্যতারই যুদ্ধ আর্য্য সৌন্দর্য্যকে গ্রাস করবার জন্যে।

---

* ঋকবেদের বিষ্ণু-বর্ণ বভ্রু মানে লোহিত।—সম্পাদক

† বাসুকী যে কারণে দেব-প্রিয় রামও সে-কারণে বিষ্ণু-অবতার। অশোকেরও তেম্নি অবতার হবার ইচ্ছে ছিল; কিন্তু বাসুকী যেমন পারেন নি, পুনর্ব্বসু অশোকও তেমন পারেন নি। পেরেছেন শুধু বসু-কুলে বাসুদেব কৃষ্ণ।—সম্পাদক

সংগ্রাম আসে জীবনে একটার পর একটা। মানুষের মতন বুদ্ধি-বল সম্পন্ন জীবও সময়ের প্রভাবে নিজের ধৈর্য্য হারায়। রামায়ণের আর্য্য অনার্য্যরা একে একে অপ্রকট হলেন কিন্তু মাটীর বুকে থেকে গেল তাদের যুদ্ধ করবার ধর্ম। পরের যুগে মহাভারতীয়দের ভেতরে আবার প্রকট হলো আর্য্যের আর্য্যামি আর অনার্য্যের জাতীয় ধর্ম।

আমরা এলাম মহাভারতের যুগে। মহাভারতকে প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আলোচনা করব না কিন্তু এইটুকু বোলব যে এই নবদুর্ব্বাদল ভগবান পরের জন্মে কুরুক্ষেত্রে যে ভয়ানক যুদ্ধ বাঁধালেন সে যুদ্ধের মূল কারণ শুধু মাত্র এই নয় যে "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যাগ্র মেদিনী"—এর একমাত্র কারণ হোল নয়া আর্য্য রাজা দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী কাদের পত্নী হবেন? দ্রুপদরাজ যে আর্য্য তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি হল কর্ষণ করতেন এবং দ্রৌপদীও জন্মলাভ করেছিলেন আর্য্যের হোমাগ্নির ভেতর থেকে। সেই প্রমাণে দ্রুপদ ও দ্রৌপদী উভয়েই আর্য্য। যদিও মহাভারতকার দ্রৌপদীকে আর্য্যবর্ণ বলে বর্ণিত করেন নি, কিন্তু হোমকুণ্ডের থেকে যে নারী জন্মগ্রহণ করেন তাকে আর্য্য রমণী না বলে আর কি বলা যেতে পারে। দেখা গেল আগের যুগে যাদের দল "হরধনু" ভঙ্গ করেছিলেন তাদেরই একজন পরবর্ত্তী কালে মৎস্যচক্র ভেদ করে দলছাড়া হয়ে দ্রৌপদীকে জয় করলেন।

রামায়ণী যুগে বনে গিয়েছিলেন সীতা রামের সঙ্গে, মহাভারতীয় যুগে দ্রৌপদীও বনগামিনী হলেন। 'পঞ্চাল'-আর্য্যের পাঞ্চালী তাঁর পঞ্চপতি নিয়ে বনে যাওয়ার সময় ইঙ্গিতে একথাই বুঝিয়ে গেলেন যে অনার্য্য রাজসভায় তাঁর বস্ত্র-হরণের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা, তার একমাত্র কারণ ছিল 'আর্য্য' রমণীর দেহ-সৌন্দর্য্য দর্শন করবে অনার্য্য পুরুষের দল।

সে ঘটনা আজ অতীতের কোলে ঘুমুচ্ছে; মুখোস পরা ইতিহাস-পুরুষের পুরীতে সত্যবতী রাজকন্যাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। বিশ শতকের রাজপুত্তুর পক্ষীরাজে সেই ঘুমন্ত পুরীতে গিয়ে নিদ্রিতা রাজকন্যাকে জাগিয়ে তুলল, মুখোস খুলে ফেলল ইতিহাস-পুরুষের।

আর্য্য রক্ত আর অনার্য্য রক্ত আবার উঠলো ক্ষেপে। শান্ত যমুনার তীর আর কোকিলস্বর মুখরিত বৃন্দাবন, একদিকে মথুরা আর একদিকে বৃন্দাবন মাঝখানে যমুনার কল কল ধ্বনি। রামায়ণী যুগে যেমন ওপারে লঙ্কা এপারে অযোধ্যা মাঝখানে জলধি। সেই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হোল বৃন্দাবনী যুগে। এক্ষেত্রে এবার রাবণের সিংহাসনে কংসরাজ লঙ্কার পরিবর্ত্তে মথুরায় অধিষ্ঠিত আর এপারে কৃষ্ণকায় রূপে বিরাজিত রামচন্দ্রের নবীনতম সংস্করণ কৃষ্ণ।

ধরিত্রী সীতাকে আবার গর্ভস্থ করেছিলেন সেই আর্য্য রমণী পাঞ্চালীরূপে। পরে কি অপমানিতাই না হয়েছিলেন বস্ত্রহরণের বেলায়, কিন্তু হয়ত কোন এক পাপের ফলে আবার



এক পশুচারক গৃহে আর্য্য রমণী জন্মালেন বৃষভানু-নন্দিনী রাধা নাম নিয়ে। লাঙ্গলের সংস্কার থেকে সতীত্বেরও কোন মুক্তি বোধ হয় নেই, সেটা চরম ভাবে প্রমাণিত হোল বৃন্দাবনে রাধা জন্মানর পর।

"তোমারে মারিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে" একথাটাই কংসের মৃত্যুর কারণ বলে যাঁরা ধরে নিয়েছেন তারা হয়ত ভুল করেছেন, কারণ বৈষ্ণব সাহিত্যের কৃষ্ণ শুধুমাত্র দেহের বলে বলী ছিলেন না, তিনি ছিলেন সৌন্দর্য্যে আশক্ত! এদিকে ভাগবতে রাধার কোন নাম উল্লেখ করা হয়নি, তবে কৃষ্ণের প্রেমিকা হিসেবে কোন কাম্য আর্য্য রমণীকে আমরা পাই যার পরবর্ত্তী নামকরণ করা হোল রাধা। রামায়ণী যুগের আদিম অকৃত্রিম প্রশ্ন আবার দেখা গেল বৃন্দাবনী যুগে নতুন আকারে,—সীতার নবতম সংস্করণ আর্য্যকন্যা রাধাকে কে গ্রহণ করবেন? কংস না যদুকুলের পরমহংস কৃষ্ণ?

জীব সংস্কার মুক্ত নয়, তাই শত সহস্র বছরের যুদ্ধ করবার, ঘৃণা করবার অভ্যাস থেকে সে কিছুতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। অতিথি এবং আদিবাসীর সেই আদিম সংস্কারকেই আমরা বহন করে আসছি এতদিন ধরে। যুগে যুগে তাই সে আদি-যুদ্ধের ঘটে পুনরাবৃত্তি; আর আমরা সেই সত্যকে আবরিত করি ধর্মের আবরণে, আবরিত করি কাব্যের সুললিত ছন্দে। যুগে যুগে পুরাতন ইতিহাস-পুরুষ আমাদের সামনে আসেন নতুন মুখোস পরে।

জহি মণ ইন্দিঅ পবণ হো ণঠা
ণ জানমি অপা কহিঁ গই পইঠা॥—আর্য্যদেবের চর্য্যা

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ]

সারারাত নিঃসঙ্গ বেদনায় হাহাকার ক'রে, কাতর হ'য়ে কেঁদেছিল সুরো।

কিন্তু মাধাই বলে,—আসলে আমার হ'য়ে তুই সেদিন মারটা খেয়েছিলি। আর তুই মার খেয়েছিলি বলেই রজবআলির রাগ পড়ে গিয়েছিল, নতুবা ঐ মারটা আমাকে মারলে আমি বাঁচতাম না।

মাধাই বলে, সেই বিষ দিত গোরুকে। সুরো বিশ্বাস করতে পারে না। যে রাস্তা থেকে একজনকে কুড়িয়ে আনে তার প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সে কিনা চামড়ার লোভে গোরুকে বিষ দিতে পারে ?

আসলে যে বিষ দিত গোরুকে, সত্যই সে মাধাই বাত্যকর। চিকন্দি থেকে মানিকদিয়েরে যাবার পথের ধারে বাড়ী ছিল তার। বাড়ী বলতে রাঙচিটের বুক সমান উঁচু জঙ্গলের ঘেরের মধ্যে খানিকটা পড়ো জমির উপরে তিনখানা ভিটা। একখানাতে পড়ো-পড়ো একটা কানেস্তারা টিনের চালা, অন্য দুটিতে কোন আবরণই নেই। ঘেরের মধ্যে আর একটি জিনিস আছে, একটি বিলেতি গাব গাছ। বসন্তে তার লাল পাতাগুলি দেখলে, যারা পুরাণো কথা জানে, তাদের পুরাণো কথা মনে পড়ে যাবে। রাঙচিটের জঙ্গল এ অঞ্চলে সর্বত্র দেখা যায় না, যেমন যায়না বিলেতি গাবগাছ। তখন মনে হবে কেউ সখ করে লাগিয়েছিল বিলেতি গাব, আর সখ ক'রে বেড়া দিয়েছিল নিজের বাড়ীর। বর্ষাকালে আর এক ভাবে মনে পড়ে যাবে একথা, যখন লাল ঘাসফুল রাঙচিটের ঘেরের মধ্যে পড়ো জমিটায় থোকা থোকা ফুটে উঠেছে। সখ ছিল লোকটির। পৃথিবীর এইসব জীবনের ইতিহাস অগম্য বনের অজানা গাছগুলির পাতা ঝরে-পড়ার ইতিহাস।

মাধাইকে তখন দেখলে মনে হ'ত নিতান্ত লক্ষ্মীছাড়া সে। যেমন কুৎসিত, তেমনি রুগ্ন। ত্রিসংসারে থাকার মধ্যে এক বুড়ী মা আছে। বছরে গ্রামের দুচারটি ভদ্র বাড়ীতে সে ধাইএর কাজ করে প্রসূতিদের, তাতে এক আধমাস গ্রাসাচ্ছাদন চলে। মাধাই ছোটবেলা থেকেই রুগ্ন ও দুর্বল, খেতে না পেয়ে আরও দুর্বল হ'য়েছে। চিকন্দিতে বাজনা বাজিয়ে গত এক বৎসরে সে এক পয়সাও পায়নি।

এই বাত্যকর জাতিটির চূড়ান্ত শ্রীহীনতার আড়ালে বাড়ীর উঠোনে বিলেতি গাবগাছ ও ঘাসফুল লাগানোর মতো শিল্পীজনোচিত একটা মোহ আছে। শিল্পীও যে একেবারে



নয়, তাও না। মাধাইএর বাবা পূর্ণ বাত্যকর নাকি শুধু ঢোল কাঁশির লহরামজুরায় এক বিজয়ার সন্ধ্যায় এক কাঁশি টাকা বকশিষ পেয়েছিল বাজারের দোকানদারদের কাছে। মাধাই কিছু শিখেছিল বাপের কাছে, কাজে এল না।

চামড়ার ব্যবসায়ী মানিকদিয়েরের কফিলুদ্দি সেখ। বারখানা ছাল পৌঁছে দেবার বরাত নিয়ে পঁচিশ টাকা আগাম নিয়েছিল মাধাই আষাঢ় মাসে। বরাত রাখা সহজ নয়। সে ছাড়াও ছাল তুলবার লোকও আছে এ অঞ্চলে, তাদের কেউ কেউ আবার কফিলদ্দির মাইনে করা। তিনখানা ছাল পৌঁছে দেবার পর বিপদে পড়ল মাধাই, আর গোরু মরছে না এ অঞ্চলে।

কফিলুদ্দির তাগাদা, তাগাদা শুধু মুখেই নয়, হাটফেরৎ পথে মারধোরও বটে। এই পথে নামল মাধাই।

দুমাসে চারটে গোরুকে বিষ দিয়েছিল মাধাই, কিন্তু সেগুলির ছালই যে তার হাতে পৌঁছেচে তা নয়। তিনটেই অন্যের হাতে পড়েছে। নিরব দর্শক হওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে সে ? যত ঝুঁকিই সে নিয়ে থাক, যত কৌশলেই সে কাজটা হাসিল ক'রে থাক, প্রতিপক্ষকে বলা যায় না তার দাবীর যুক্তি। কিন্তু কফিলুদ্দির কাছে সমব্যথা আশা করার চাইতে তার আত্মহত্যা আশা করা সহজ। সে ছাল চায়, যেমন চৈতন্য সা চায় দাদন দেয়া পাট।

চিকন্দিতে গোরু কম। যাদের আছে তারা হুসিয়ার হ'য়ে গেছে। বুধেডাঙায় গোরুর সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সান্দারদের ঘরে যেতে সাহস হয় না। সুরতুন যে মারটা খেয়েছিল তাতেই মাধাই গুঁড়ো হ'য়ে যেত। সব চাইতে মুস্কিল করেছে রামচন্দ্র। যে বিষ কফিলুদ্দি নিজে নারকেলডাঙা থেকে আনিয়ে দিয়েছিল গোবধের জন্য তার কাছে রামচন্দ্রের ওস্তাদি হার মেনেছে, কিন্তু রামচন্দ্রের মণ্ডলগিরির প্যাঁচে হার মানতে হ'ল কফিলদ্দিকে। গোরু মরলে মাটিতে পুঁতে ফেলছে গ্রামবাসিরা।

কয়েকদিন ধরে নানারকম উল্টোপাল্টা ভেবে আবার প্রথম মাধাই যে রাতে বেরুল কলাপাতায় বিষমাখানো নিয়ে, ধরা পড়ে গেল রামচন্দ্র মণ্ডলের হাতে।

বুধেডাঙা আর চিকন্দির সীমায় হাঁক দিল রামচন্দ্র—কে যায় ? ছুটে পালাতে গিয়ে মাধাই বুধেডাঙার পথ ধরেছিল। কিন্তু বুধেডাঙায় রজবআলি সন্দার ছিল জেগে। মনে হ'ল সে গলায় খাঁকারি দিয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল। সেও যেন হাঁক দিল—কে যায়।

মাধাই আর পারল না। দৌড়তে গিয়ে বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্ করছে। পেছন থেকে রামচন্দ্র ত'র বিষশুদ্ধ হাতখানি চেপে ধরেছিল, বৈদ্যের চোখে দেখামাত্রই ধরা পড়েছে। অপরিসীম ঘৃণায় তার হাত ছেড়ে দিয়ে সে বলল—তুই না হেঁদু !

মাধাই কাঁদতে পারল না। বুকের মধ্যে থেকে আইঢাইটা গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

—গাঁ ছাড়বি ? মণ্ডলী গলায় বললে রামচন্দ্র।

—ছাড়ব আজ্ঞা।

—যা।

সম্মুখের দিকে একটা ধাক্কা দিল রামচন্দ্র। উল্টে পড়ে গিয়ে মাধাই সহসা উঠতে পারল না। বুকের ভেতরটা ছুরি বেঁধার মতো ব্যথা করছে। দম যেন বন্ধ হ'য়ে যাবে। খানিকটা সময় বসে থেকে কোন রকমে উঠে মাধাই সত্যই বুধেডাঙা ছাড়িয়ে দিঘার পথ ধরেছিল।

গল্পটা মাধাই বলেছিল একদিন। প্রথমে হাসি-হাসি মুখে সুরু করে শেষের দিকে বাবরিচুল-ভরা মাথা দুলিয়ে কথার ফাঁকে ডাইনে বাঁয়ে থুথু ফেলে গম্ভীর সুরে গল্পটা শেষ করেছিল।—রামচন্দ্র মণ্ডল ব'লেই তার প্রাণ সেদিন রক্ষা পেয়েছিল ; বিড়াল-ছানার মতো শূন্যের দিক ক'রে গ্রামের সীমার বাইরে তাকে ফেলে দিয়েছিল রামচন্দ্র, ইচ্ছা করলে অনায়াসেই মাটিতে দু'চারবার আছড়ে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করতে পারত।

কিন্তু এ কাহিনীতে এমন কিছু নেই যাতে বোঝা যায় মাধাইএর গত্যন্তর ছিলনা সুরোকে দিঘার পথ থেকে কুড়িয়ে আনা ছাড়া। শুধু তখনকার মতো প্রাণ বাঁচান নয়, ভবিষ্যতের ব্যবস্থাও সে করে দিয়েছিল। টেপির-মায়ের দলে ভর্ত্তি হ'য়ে, এক সহরের চাল আর এক সহরের বাজারে নেবার কাজ সুরু করে, সুরো পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করেছে। যাদের মাধাই নেই তাদের অনেকেও এই পথ নিজেরাই আবিষ্কার ক'রেছিল, কিন্তু সুরোর মতো গেঁয়ো মেয়ের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। আর শুধু কি তাই, চেকার বলো, পুলিশ বলো, তাদের ভয়ে যখন গলায় কথা ফোটেনা তখন বন্দর-দিঘার শত শত মাইল দূর থেকেই সুরো জানালায় মুখ গলিয়ে দিঘাবন্দরের মাধাইএর জন্য চোখ মেলে রাখে। পুলিশ থাক, চেকার থাক, গাড়ী থামার সাথে সাথে মাধাইকে কোথাও না কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে। হয় সে স্টেশনের কনেষ্টবলদের সাথে রসিকতার গররা তুলে দিয়েছে, কিম্বা কোন রেলকর্ম্মচারীর সাথে নিবিড় হ'য়ে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ ক'রে গল্প করছে।

এমন যে মাধাই, ত্রাতা নয় শুধু, রক্ষাও, ফতেমা বলে সোনা ভাই, তাকে কি সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করা যায় তার কোন কাজের কারণ? দেবতাকে কে কবে জিজ্ঞাসা করেছে—খরা বা বর্ষার কারণ, বলো ?

কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে মাধাইএর। খরখর ক'রে কথা বলত, তড়বড় করে চলত, এ যেন সে মাধাই নয়। টেপির মায়েদের মতো মেয়েছেয়ের সাথে জড়িয়ে জড়িয়ে হেসেও ওঠেনা আজকাল সে স্টেশনের অন্ধকার কোনগুলিতে।



কিন্তু মাধাই এমন ধীর থির ছিলনা চিরকাল। অসম্ভব স্ফূর্ত্তিবাজ ছিল সে। বাল্যের দুঃসহ অনাহারের দিনগুলির তুলনায় রেলের পোর্টারের চাকরি করা দিনগুলি স্বর্গবাস। স্ফূর্ত্তির কথায় সুরতুনের মনে পড়ে গেল ঘটনাটা।

সুরো জানত, টেপির মা এবং অন্য অনেকে গাঁজা খেত। দুএকজন চালওয়ালি মদ ধরেছিল। নেশার ঘোরে অশ্লীলতায় পুরুষদের ছাড়িয়ে যেত। এই নাকি তাদের স্ফূর্ত্তি। মাধাই স্ফূর্ত্তি করার কথা বলতে সুরো একটা বোবা ভয়ে শিউরে উঠল। কিন্তু অনাহারের বন্যায় তার ক্ষীণ মুঠি ধরে যে পুরুষমানুষটা তাকে বাঁচিয়েছিল তার হাত হারিয়ে ফেলার ভয়ে সুরো মাধাইএর পেছন পেছন বাজারে গিয়েছিল। কিন্তু অবাক করল মাধাই। যার সাথে অল্পবয়সি টেপি, এবং প্রাচীনা টেপির মায়ের সমান আলাপ, সে বাজারে ঢুকে মদ গাঁজার দোকানের ধারপাশ দিয়েও হাঁটল না। সুরোর হাত ধ'রে, খুব সম্ভব সুরোই ভয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল, কেবল পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। অবশেষে তারা বসেছিল উল্কিওয়ালার সামনে। সুরোর ডান হাতের মণিবন্ধের উপরে একটা নীল পক্ষী আঁকিয়ে নিল সে, একটা বচকানা জোলার শাড়ী কিনলো সে সুরোর জন্যে। মাধাই বলেছিল—হ'ল স্ফূর্ত্তি করা ? অজ্ঞাত বিভীষিকায় তখনও সুরোর গলা কাঠ হ'য়ে আছে। মাঝে মাঝে স্ফূর্ত্তি করবি, নইলে মানুষ বাঁচেনা, বলেছিল মাধাই।

সুরো হাঁটতে হাঁটতে তার নীল পক্ষীটার দিকে চেয়ে দেখল।

মাধাই যা বলে, সব সময়ে তার অর্থ ধরা পড়ে না সুরোর কাছে। মাধাই তাকে এই স্ফূর্ত্তি করার কথাতেই একদিন বলেছিল—ফতেমার না হলিও চলে, তোর চলেনা।

এই দুপুর রৌদ্রের আকাশ এ কি স্ফূর্ত্তি করে উড়িয়ে দেয়ার জিনিস। সুরোর গাল বেয়ে ঘাম ঝরছে, ধুলো ঘামে মিশে কাদা জমে যাচ্ছে।

কিন্তু, ভাবল সুরতুন, তফাৎ আছে। ফতেমার সাথে তার আগে তফাৎ ছিল, এখনও আছে। রজবআলি সান্দারের বেটা-বৌ, ইয়াকুব সান্দারের বৌ, গোলগাল মোটাসোটা ফতেমা একরোখা মুরগীর মতো কুঁদুলী ছিল। জিনপরীর ভয়ে সে বার হ'তনা বড় একটা, কিন্তু যখন বার হ'ত পাড়ার মেয়েরা তাকে মেনে নিয়ে সরে পড়ত। কিন্তু এ সব ঘটত ধানহীন দিনে। ধানের দিনের ফতেমা, সে আর একজন। কোথায় বা জিনপরী, কোথায় বা কোন্দল। মাঠের ধান কেটে দিয়ে পূর্বদেশী মজুররা চলে যেতেই গ্রামের মেয়েরা ভোর রাতের অন্ধকারে মাঠে পড়ে থাকা ধান কুড়োতে আসে। ফতেমা আসত অন্যান্য সান্দার মেয়েদের দলে। সেই ভোর রাতে আলো ফোটার আগেই ধান-খোঁটার কাজ সুরু করত তারা। কত গল্প, কত রসিকতা ফতেমার ভাঁড়ারে আছে, শুনে সান্দারদের অন্য মেয়েদের তাক লেগে যেত। পাছে কৃষক শুনে ফেলে তাড়া ক'রে আসে এই ভয়ে অন্য মেয়েরা

যত তাকে হাসি চাপতে বলে ততো কাপড় চাপা মুখ থেকে হাসি ফিন্‌কি দিয়ে দিয়ে বার হয়।

এখন সে ফতেমা নেই। শিশুদের গালের অতিরিক্ত মেদের মতো তার গায়ের মেদও ঝরে গেছে। তেল-কুচকুচে কাজলমাখা চেহারা তার নয়। রুক্ষ ধুলি মলিন যাযাবরের মতো দেখায় তাকে। কিন্তু সে যেন অনেক লম্বা হ'য়েছে আগের চাইতে, চোয়াল দুটি গালে স্পষ্ট হ'য়ে উঠে তাকে পুরুষ পুরুষ দেখায়। মনে হয় সে যেন পুরুষের মতোই দৈহিক শক্তিও অর্জন করেছে। ধরা পড়ে গেলে হাতজোড় ক'রে পুলিশ-চেকারের সামনে দাঁড়ানোর ব্যাপারে যেমন, অপরিচিত সহরের তেলেভাজা জিলিপির দোকানের পাশে দল নিয়ে বসে হাসি-তামাসা করার বিষয়েও তেমনি সে অগ্রণি। কি ক'রে সে দলের মাথা হ'য়ে পড়ল কে জানে। অথচ ফতেমাকে সুরোই ডেকে এনেছিল এ কাজে। মাধাইএর কাছে ফিকিরটা জেনে, তার অনুমতি নিয়ে অনাহারি ফতেমাকে ডেকে এনেছিল সুরতুন।

বন্দরদিঘার এক গলিতে উঠে দাঁড়িয়ে সুরো পা দুখানাকে একটু জিরিয়ে নেবার জন্য একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। একটি বর্ষিয়সী নোঙরা চেহারার মেয়েমানুষ দোকানটা চালায়। পানের দোকানের পাশ ঘেঁসে দুটি নোঙরা গলি পূর্বমুখে চলে গেছে। গলিটার দুপাশে ভাঙাচোরা ছোট ছোট ইঁটের বাড়ী। কোন বাড়ীর সম্মুখে কালিপড়া লণ্ঠন ঝুলছে, কোনটির মাত্র অস্পষ্ট আকৃতিটাই চোখে পড়ছে। সুরোর সম্মুখে উত্তরমুখি পাথর-ছড়ান রাস্তাটায় পোয়া মাইলটাক হাঁটলে মাধাই বায়েনের ঘর।

পান নিয়ে সুরো উত্তরের পথ ধরবে এমন সময়ে কে তার কাঁধে হাত দিল।

চমকানো সুরোর অভ্যাসগত। এতদিনের চালের কারবারেও সে এ বিষয়ে নিশঙ্ক হ'তে পারেনি। তার কাঁধে যে হাত দিয়েছিল তাকে দেখে সুরো সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়াচ্ছিল, কিন্তু সেই আগ বাড়িয়ে কথা বলল।

—সুরো না?

—হ্যাঁ।

—তাইলে চমকালি কেন? আমি টেপি।

টেপিই বটে। সহজে চেনা সত্যি কঠিন। চালওয়ালি টেপির-মায়ের টেপি নয়; এ যেন কোন এক ভাসান পালা গানের বেহুলা সুন্দরী। তেমনি রঙিন শাড়ী পরনে, তেমনি একগা পেতলের গয়না। চোখে কাজল, মুখে পানের রস। মাস ছ'এক আগে টেপি চালের মোকামে দলছাড়া হ'য়ে পড়েছিল। এক চেকার তাকে বিনা টিকিটে চলার দায়ে আটক করে। কিন্তু ছ মাসেই মানুষের এত পরিবর্তন হয়!



—তুই এখন কনে থাকিস্, কি করিস।

—এখানেই। ঐ গলিটার মধ্যে এক বাড়ী আছে আমার।

—তোর বাড়ী। ওখানেতে পাকা বাড়ী সব, ভদ্দর নোকরা থাকে।

—কেন্, চেকার কি ভদ্দর নোক নয়?

—চেকারবাবুর বাড়ীতে কাম-কাজ করিস?

—কাম-কাজ করব কেন্ লো, আমি কি বাবুর ঝি? আমারই ঝি আছে। আরও খুলে কতি হবি?

সহযাত্রীর সৌভাগ্যে খুসি হ'ল সুরতুন—বিয়ে করেছে?

টেপির মুখখানা ঈষৎ ম্লান হ'ল। সে সুরতুনের মুখের দিকে একটু সময় চেয়ে রইল, তারপরে বলল,—ফতেমা বুন যা কয় তাই সত্যি। তুই মিয়েমানুষ না। ঠারে-ঠোরে বোঝার বয়স তোর কোন কালেই হবিনে। তা শোন, এক কাম করা লাগবি তোর।

—কও।

—এই কৌটেটা নিয়ে যায়ে তুই বন্দরে পৌঁছাবি, আমি নোক পাঠাব, তাকে দিবি। সে তোক টাকা দিবে। কিন্তুক খবরদার পুলিশে যেন্ না জানতি পারে।

—তুই নিজে গেলি না কেন?

—কিবা ক'রে যাই? এমন সাজেগুজে রাস্তা দিয়ে হাঁটি কিবা করে? আর তা ছাড়া যে লোক আর কাছে কৌটে নিবের আসবি তাকে যেন আমার নাম ক'সনে।

—টাকা পালে দিব।

—না, সে টাকা তোর।

—এ কি ব্যবসা রে?

টেপি হেসে বলস—কাল দুইপরে আসিস, কব। কিন্তুক ভাই কৌটে যেন কেউ না দেখে।

সুরো হাঁটতে লাগল।

আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হ'য়েছে টেপির। শুধু বেশভূষার নয়, কথার, দৃষ্টির, সব মিলে এ এক নোতুন মানুষ। বয়সে টেপি তার চাইতে ছোট কিন্তু সেও যেন বুদ্ধিতে তাকে ছাড়িয়ে গেল। আবার ব্যবসায়ের কথা বলে, ফিকির শেখায়! পুলিশের চোখ আড়াল ক'রেই যাবে সে। হ'তে পারে ব্যাপারটা হয়তো পুলিশের কাছে অরুচিকর, চালের কারবারের মতোই। কিন্তু এই কৌটায় এমন কি জিনিস থাকতে পারে যার জন্য লোক টাকা দেবে? মাধাইকে বলতে হবে ব্যাপারটা।

আর টেপির কথা! না সেটা মাধাইকে বলা যাবে না। তার দলের অন্য সকলে এসব ধরণের কথাবার্ত্তা রসিকতা ক'রে বলে। সুরো স্তব্ধ হ'য়ে শোনে। শুনতে ভালো লাগে না, শুধু নয়; গা গুলিয়ে ওঠে, বিমুখতায় প্রাণ ভরে যায়, পালাতে ইচ্ছা করে। যারা তার এ দিকটা লক্ষ্য করেছে তারা বলে, রোগ এটা।

কিন্তু মাধাইএর ঘরের নিচু বারান্দায় বসে নোতুন একটা ভয়ে সে কেঁপে উঠল। চেকারকে সে এতদিন কালো কাপড়ে মোড়া নৈর্ব্যক্তিক আইন ব'লে মনে করেছে যার চেহারা খানিকটা পুরুষের মতো। রূঢ়ভাষী পুরুষ, যারা মারার জন্য লাঠি তুলতে পারে। আজ টেপি খুব চিনিয়ে দিয়েছে। কি বোকা সে, এতদিন কেন আরও সাবধান হয়নি নিজে, তাই ভাবল সুরতুন।

ক্রমশঃ

উচা উচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবর পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহরি।
ণিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥ —শবরপাদের চর্য্যা

শবরীবালিকা উঁচু পাহাড়ের পার্ব্বতী
পলাহার গলে গুঞ্জমালার ভার অতি
ময়ুর-পক্ষী পিরণ পরেছে তবু গোরি!
উমানাথ বুঝি পাগল শবর, মরি মরি
তোমারি গুহার এমন গেহিনী খাবে গুলি!
ওকাজ করোনা ভেঙোনা স্নেহের পুত্তলি
ঘরে নিয়ে যাও সহজ-লভ্যা সুন্দরী॥

# সন্দংশ

## বাঙালীর কবিতা

বাংলা-সাহিত্যে শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্তের উপস্থিতি আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করেছিল বলেই তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে আমি আত্যন্তিক দুঃখ অনুভব করেছি। অবশ্য এমন পন্থাহীন পথিকের অনুপস্থিতির সময়টা যে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আদৌ অনুকূল ছিল তা নয়, তবু সে প্রলয়-কালে যদি দেখা যেত তিনি বেদ-ধৃতবান্ হয়ে উপস্থিতিটাকে অধিকতর স্পষ্ট করে তুলেছেন, তাহলে হয়ত বাংলা-কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে অনেক কাব্য-পাঠকই নির্দ্বন্দ্ব হতে পারতেন। তাছাড়া এমনও হতে পারত, যেসব কনীয়ান্ কবি তাঁর প্রতিভায় প্রগাঢ় আস্থাবান ছিলেন তাঁরা সংবর্ত্তকের আকাশকেই হার্দ্য আকাশ ভেবে নিয়ে ভস্ম হবার অবকাশ পেতেন না। সমাজ-পক্ষে তখন এ-লাভটুকুবই দরকার ছিল।

মনে পড়ে, যে-বছর তিনি 'সংবর্ত্ত'-শীর্ষক কবিতাটি লিখেছিলেন এবং যে-বছর কলকাতার সংবর্ত্তক মেঘের আড়ালে অশনি গর্জ্জে উঠেছিল, ধরিত্রী কেঁপে উঠেছিল মৃত্যু-ভয়ে, দৈত্য-ভয়ে, নর-নারায়ণরা বন্দী ছিলেন কংসের কারাগারে, সে-বছর 'পূর্ব্বাশা'-ও আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর দু'বছর কী দুর্বৎসরই না গেছে বাংলাদেশের পক্ষে! আজও হয়ত ধরিত্রী-মাত্রা পূত-পবিত্রা হতে পারেন নি যদিও যথেষ্ট অরুণাভাস পূর্ব্বাকাশে। তবে জাতিস্মর 'যযাতি' ফিরে এসেছেন আবার বাংলা-সাহিত্যে—অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গে যদি আবার মিলিত-জাতির শ্রীক্ষেত্র তৈরী হয়।

'জাতিস্মর'! বাংলাদেশের সৎ-কবি সাহিত্যিকের সম্ভবত এই একমাত্র বিশেষণ হতে পারে। যিনি বিদিশা-বর্ত্ততকে স্মরণ করতে পারেন, পারেন বাঙালীর আদি-কীর্ত্তি গ্রীকযবনশকহূনচীনপহ্লবপারস্য বা যক্ষরক্ষনাগগন্ধর্ব্বকিন্নরময় ভারতবর্ষকে স্মরণ করতে তাঁকেই আমরা বলি ইতিহাস-সচেতন কবি। তিনি নাটোরে এসে নোটন-পায়রার নাচ দেখতে পান কোনো মঙ্গল-কাব্যের 'বনলতা সেনে'র চোখে; কোনো প্রাক্-চীন মালব্য-দেশের জ্যোৎস্নায় তিনি নেত্রী নারীকে ইতিহাস পুরুষ হিসেবে দেখে যান। সেই অর্দ্ধনারীশ্বর ত্রিনয়নী তুষার কন্যা সৃষ্টির আদি ইতিহাস—আদি বিদ্যাধরী তিনি—সহস্র তারার যূথিকা তাঁরই রচনা, তাঁরই পদাঘাতে স্তবকে-স্তবকে অশোক ফুল ফুটে ওঠে। জাগে মহাপৃথিবী।

তেমি যিনি গাঙ্গেয় বাংলাকে স্মরণ করেন ফেরারী ফৌজে, যাঁর মনে পড়ে গঙ্গামী হুলিয়ার নৌকো থেকে নেমে আসা, সিংহের সঙ্গে মরণ-পণ যুদ্ধ, শকুন্তলার পুত্র সম্রাট ভরতের রক্ত, স্বর্গ-নরককে এক করে আজও তিনি পৃথিবীর সোনার সিঁড়ি নির্ম্মাণ করে যান। পৃথিবীর সাম্রাজ্য তাঁর বিলীন কিন্তু মন অদ্যাবধি রাজচক্রবর্ত্তী।

মনে পড়বেই। বাঙালী কবি-চিত্ত যখনই আত্মস্থ হয়ে বুদ্ধ-প্রতিভায় ধ্যান করবে তখনই ছায়াচ্ছন্ন আফ্রিকার মৃত্যু-যবনিকা সরে গিয়ে মিশরী কবরে অথনটনের কঙ্কাল সপরিবারে জেগে উঠে প্রেমিকের নোটন-কণ্ঠে এজন্মেও বলবেন: "দেবতা শুধু মৃত্যুর নন, দেবতা উৎসবের।" সুমের-সভ্যতার বিষপান নিবারণ করতে চাইবেন এ-যুগেও সে-কবি।

অসৎ থেকে সতে যাবার প্রার্থনা মনে নিয়েই বাংলা-দেশের কোবিদ-কবির জন্ম হয়। নিষাদের কাম-সংগ্রাম-শেষে, কোনো পক্ষিণীর ব্যথা বুকে ধারণ করেই বাঙালীর বাল্মীকিরা আসেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে পাদেকোণশতক-কাল এই মহৎ ঐতিহ্য নিয়েই বাংলার কবিরা অগ্রসর। তাঁদের সহস্রমুখী জিহ্বা কখনো বাসুকীর মতো নারায়ণের রোদ-বৃষ্টি নিবারণে তৎপর, কখনো বা যজ্ঞাগ্নিবৎ হব্য গ্রহণে লেলিহান। এই দ্বিজিহ্ব জাতির কুটিল ঐন্দ্রজালিক মন বুঝবার সৌভাগ্য অনেকেরই হয়নি। তাতে আমাদের কুটির-বাসিনী দরিদ্র জননীর মনে কোনো ক্ষোভ নেই—মৃত্যু-শীতল সন্তানের জন্যে তিনি তাঁর অঙ্কের উষ্ণতা চির-জাগ্রত রাখতে জানেন। তবে বাঙালী মুমূর্ষ হয় বস্তুত মরে না—বাংলা সাহিত্যে মুহ্যমানতা আসে, মৃত্যু আসে না। বাংলার আকাশ বিচিত্র মেঘের রাজপথ—আসুক না সংবর্ত্তক এখানে—প্রলয় চিরদিনের নয়। 'উন্মার্গতা সাময়িক, 'প্রত্যাবর্ত্তন' হবেই যদুকুলের। নীল শারদশ্রীতে বলাকা উড়বে—দিঘীতে ভাসবে রাজহংস, ধানক্ষেতে হরিয়াল মেলা বসাবে, গোপীবিহঙ্গ মুখর করবে রাধার গৃহ—মনের জঞ্জাল দূর হবে যেদিন।

শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-সচেতনতা জাতিস্মরতা। 'অনেকজাতি সংসারা—' এই বুদ্ধ-বিষাদ নিয়ে কবিমাত্রেকেই ভাবতে হয়: আমি কোন জাতি? কি আমার মনের, চিন্তার, ধ্যান, ধারণার জাত? কাকে আমি কি বলব—কোন আসরে কোন গান গাইব আমি? কঞ্চুকীর পালা অভিনয় করে যাওয়াই কি দ্বিজ জাতির চির অভিশাপ? এ ভাবনার অবসর যার না হল, তিনি গাদা-গাদা পুঁথি পড়ে রাসভ-কণ্ঠী খর-ভাষ হতে পারেন, রসের বিন্দু আভাসও তাঁর রচনায় থাকবে না। চিনির বলদের ভাগ্যে এক ফোঁটা গুড়-ও রাঢ়াঞ্চলের নাদা চুঁইয়ে পড়বে না। রাঢ়ের রাধা জানেন, কারাগারে কারা তাঁর প্রিয়তমের প্রিয়, কাদের জন্যে কখন সাজাতে হবে মধুপর্কের থালা।

তবু বাংলাদেশে অনেকজাতি সংগর্পিত। অনেক 'গেহকারক' ঘর বেঁধেছেন এখানে, অনেক বুদ্ধ গৃহবন্ধনমুক্ত হয়ে যাযাবর হয়েছেন কিন্তু সবাইকে বলতে হয়েছে ব্রজবুলি, অবিরত পরিবর্ত্তনশীল বুজি-ভাষা। পলিমাটির পুর সংস্কৃতির 'পালি' থেকেই তার জন্ম। ঋগ্বেদ, গৌড়ীয় প্রাকৃতের 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল-চর্য্যাপদ', মঙ্গল-কাব্য, পদকর্ত্তাদের পদকার (পয়ার) সবই বাঙালীর কণ্ঠের রকম-ফের, বাঙালীর মনের দিক-দর্শন। দক্ষিণরাঢ়ের গুপ্ত-সংস্কৃতি যে দেব-নাগর সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল তা দ্রাবিড় নায়র ব্রাহ্মণদের একচেটে সম্পত্তি নয়। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা: 'বৈচিত্র্যের ঐক্য'—বাংলার নাগরিকেরই দান। পল্লী আর নগরে সেদিন বিসম্বাদ ছিলনা বলেই এই আশ্চর্য্য চর্য্যা সম্ভবপর হয়েছিল। লরেন্সের ভাষায় বলতে গেলে, সব চাইতে নিবিড় বন্ধন যা সেই যৌন-বন্ধনে বাঁধা ছিল নগর আর পল্লীর বিচিত্র জাতির বিভিন্ন ধর্ম্মীর কায়মন। প্রথম থিবিস বা প্রমথের গ্রীস ছিল মানব বাংলা দেশ, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-চেতনায় পরিপূর্ণ তাম্রলিপ্তি।

আজও বাংলার কোবিদ-কবিবৃন্দ সেই অমিলন শতদলেরই মন অম্লান চিত্তে বহন করছেন। সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবন এবং 'সংবর্তে' বর্ত্তমান তাঁর মানসিক দৃশ্যাবলী স্পষ্টভাবে এ-কথা বলবার প্রেরণা দিচ্ছে। অবশ্য আজকের দিনের বাংলা কবিতার সাধারণ গতিই তার স্বভাব-অনুযায়ী পথ খুঁজে নিয়ে লুপ্ত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে উন্মুখ কিন্তু আমি মনে করি একটি প্রৌঢ়মনের স্নেহসিক্ত স্পর্শ ব্যতিরেকে উন্মুখ এবং উন্মুখর হওয়া সুশ্রী ও দৃঢ়তাব্যঞ্জক হতে পারেনা। সেই জ্যেষ্ঠের কাজ আমরা



সুধীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যাশা করি। যুধিষ্ঠিরের সশরীর স্বর্গ-কামনা তাঁর নেই কিন্তু অগ্রজের পরিশীলিত মন ও ঔদার্য্য পুরোপুরিই আছে, তাই আমরা তাঁকে আহ্বান জানাই বাংলা-সাহিত্যের কুরুক্ষেত্রের পর শুভ্র-নির্ম্মল একটি কুটির-প্রাঙ্গন গড়ে তুলতে। এ-কাজ তাঁকেই সাজে। তাঁর রচনা সুরুতে শেষ হয়ে অপরূপ অখণ্ড মণ্ডলের সূচনা করেছে, তিনি মনে-মনে জানতেন:

"অন্যায় রণে বার বার বিধ্বস্ত
হৃদয়দুর্গ করিয়াছিলাম রুদ্ধ"—(১৩৩০)

হার্দ্য-আকাশের মায়া ত্যাগ করে হার্দ্দ-আকাশের বজ্রগর্ভ আর্দ্রতা অনুভব করেছেন তিনি এবং নৌ-নাবিক কৈবর্ত্তক বাঙালী সন্তানের মতো ফিরে এসেছেন তাম্রলিপ্তির পরিচয়-মাখা তালতমালবনরাজি নীলায় শোভিত সমতটের কাদা মাটিতে। তাই তিনি আজ বলতে পারেন:

"বাঁচে মাঝি, চেনা ঘাটের কাদায় নৌকা ঠেকে।"—(১৯৫৩)

এ-নৌকার সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক ছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও কিন্তু তিনি 'সেই সমুদ্রতীর থেকে বাঁধানো রাস্তার এই শহরে' ফিরে এসেছেন নৌকো থেকে নেমে আর তারপর 'দেয়াল দেওয়া' ঘরে বন্দী করেছেন নিজেকে। অবশ্য তাঁর মন বহন করে এনেছে সে-নৌকো—কিন্তু আমরা দুঃখিত হয়ে শুধু ভাবব: মন-বাহিত নৌকোয় বুঝি কোলরিজের প্রাচীন-নাবিকের ছায়া-যাত্রীই থাকবে, আমাদের ঠাঁই কোথায়! ছোট-তরী তাঁরই সোনার ধানে ভরা। তাই ১৯৫৩-সনে ২৩শে মে যখন শুনতে পাব, সুধীন্দ্রনাথ বলছেন:

"স্বপ্নচারিতা নিতান্ত বৃথা"

তখন আশান্বিত হয়ে হৃদয় অন্যতম স্বর্ণ-সবিতার পুনরাবির্ভাবের পূর্ব্বাভাসে কম্পমান হবে।

স. ভ.

## 'অশোক-লিপি' কার লিপি?

বৌদ্ধ-সাহিত্যের কোবিদ শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র সেন সম্প্রতি 'অশোকলিপি'-শীর্ষক যে আলোচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করেছেন তা বাংলাভাষায় "ধর্ম্মবিজয়ী অশোকে"র (শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন-প্রণীত) পর দ্বিতীয় পুস্তক হলেও মূল্যবত্তায় অতুলনীয়। 'অশোক'-সম্পর্কে বাঙালী খুব-বেশি উৎসুক নন। দ্বিজেন্দ্রলালের পরিহাসমূলক একটি পদ্য স্মরণ করেই এ কথা বলতে হচ্ছে। কিন্তু মাগধী সম্রাট সম্পর্কে গৌড় যদি বীতস্পৃহ হয়—যদি নিজ সন্তানকে বাংলাদেশ পর ভেবে পরিহাস করতে সুরু করে সে-দোষ কার? লক্ষ্মণসেনের আমলেও গৌড়-সম্রাট মগধ-সম্রাট ছিলেন। মগধ ভিন্ন বগধের (ব্রজভূমি নিম্ন-বঙ্গ) ইতিহাস নেই। অশোক-বর্ণিত 'সমাপা' দেশ 'সম-অপা' বা সমতট (বগধ), বা সম্পাতির পক্ষী-রাজ্য। তারই কলোনি জটায়ুর 'কলিঙ্গ'-রাজ্যের খানিকটা স্থান। 'কলোনি' কথাটা 'কলদি'-ভূমিজাত, মানে মদ্র 'কালসী' ও 'কলিঙ্গ' থেকে পাওয়া যায়। সদ্ধর্ম্মস্মৃত্যুপস্থানসূত্রে 'কলিঙ্গ-দণ্ডক-মেকল' নামে এই ব্রজভূমির পূর্ব্বসীমা মেকল-মণিপুর (লিচ্ছবীর আদিনিবাস) বোঝাচ্ছে। অহোমরা মণিপুরকে 'মেখেলি' বলেন। ত্রিপুরজাতির একটি শাখা মেগলি-চদ্রি নামে খ্যাত। লিচ্ছবী ত্রিপুরী চেদী-কুল এ-জাতিরই তীরভুক্তি-গত

শাখা। হিমালয় যেদিন নৌবন্ধন ছিল, পলিমাটির পালিভাষী দেশ নিম্নবঙ্গ হয়ত সমুদ্রনিমগ্নই ছিল সেদিন—নেপাল, ভূটান, সিকিম, কোচবিহার (মেকল) অঞ্চল ছিল পার্ব্বত্য সমুদ্র-মেখলা এবং কুশাচ্ছাদিত ভূমি।

সভ্য কলচুর অবশেষে কলোনি করলেন 'কল' হিসেবে গুর্জ্জরে বলভিতে। তাঁরাই নাগ কুল-পুত্র যারা উত্তরাপথনাথ হর্ষবর্দ্ধনের পর আবারও ভারতসম্রাট হয়েছিলেন। গুর্জ্জর-প্রতীহার সেই কুলকুণ্ডলিনী-পুত্র বা 'কল'-কৃষ্ণ-পুত্রদেরও (সর্প-বশকারী কৃষ্ণ—নেপালে প্রাপ্ত একটি পিতল কলসী-গাত্রে কৃষ্ণের এই পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে—কলসীটি শ্রীসুভো ঠাকুরের সংগ্রহশালায় রক্ষিত) আমরা পর করে দিয়েছি—বাংলার পাল-বংশ বলে গণ্য করিনি। অপরাধ আমাদের ভ্রান্ত পণ্ডিতকুলের। এবং সেই অপরাধে আজ বাংলা-সন্তান তাঁদের অনেক পিতৃভূমি এবং মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত এবং বঞ্চিত।

কৃষ্ণত্বক অন্ধ্রজাতির সঙ্গে মিশ্রিত কৃষ্ণাত্মক শ্বেতবর্ণ 'পারিন্দ' (বারিন্দ) বা পারদ-জাতিই পাণ্ড্য-জাতি ও পরে উড়িষ্যার পাণ্ডা-ঠাকুর বংশ হয়েছেন। পল্লব বা পারদ-জাতির পূর্ব্বপুরুষ 'পাঙ্গালা'-জাতি সর্পপূজক অষ্ট্রিক বাংলাদেশ থেকে 'তামিলকম' দেশে যান বলে প্রাচীন দ্রাবিড়-সাহিত্যে বর্ণিত আছে। পাঙ্গালার 'পঙ্গা'-কৌম এখনও বারিন্দ্রী-দেশে বর্ত্তমান। অন্যতম কৌম 'য়াল' (আল) বা 'পাল'-রা আর নেই। শান-প্রদেশের 'পঙ্গ'-গোষ্ঠীরই একটি শাখা পঙ্গা যেমন আরেকটি শাখা 'অহোম'। পূর্ব্ববঙ্গের 'পাল' বা আল-বাঁধা-কৃষি-প্রবর্ত্তক অষ্ট্রিক মগ পাল-রাজাদের সঙ্গে শানের পঙ্গজাতি মিশ্রিত হয়ে যে ধান্য-প্রিয় অষ্ট্রিক-বোডো সভ্যতা (দ্রাবিড়-সভ্যতা) প্রণয়ন করেন তা ই বিরাট প্রাচীদেশের সভ্যতা ছিল। ঈশান-কোণে কুশদ্বীপ (সেরিকা বা দক্ষিণ চীন) পর্য্যন্ত বিস্তৃত, পূর্ব্বে কম্বুজ-ধাম পর্য্যন্ত আর পশ্চিমে কাম্বুজ-অন্তর্গত মোহেঞ্জোদারো ছিল তার সীমা। তা ই জন্মভূমি গৌড়-সেনার। কুশভূমি বা ব্রজভূমি দেখলেই পশ্বাচারী গৌড়ের পঙ্গপালরা প্রধাবিত হতেন দিশে দিশে। তাই তাঁরা থিস্, দিশ, দিষ, বা দ্বিজ-জাতি। বর্ম্মণত্ব গিয়ে ব্রাহ্মণত্ব-উদ্ভবে পশ্চিম-প্রান্ত বা উত্তরাপথ যবন-রাজ্য (মার্কণ্ডেয় পুরাণ বর্ণিত) নামে পরিকীর্ত্তিত হ'ল, প্রাচী হল 'চার্য্য'-দের সাম্রাজ্য। তক্ষশীলার উপরাজা হয়ে প্রাচীর ছেলে পিয়দসি যবন ত হয়েইছিলেন, তাছাড়া তাঁর পিতামহের যাবনিক সম্পর্ক বা যাবে কোথায়? 'ন্যস'-স্থ ত্যনিওস্থস-পূজক কামাচারী যৌন গ্রীকদের (শৈব, লিঙ্গপূজক) এবং অভিচারী মুষিক-ব্রাহ্মণ বিষ্ণুগুপ্তের সুহৃদ সান্দ্রকুট্ট ত প্রাচীর সঙ্গে সম্পর্ক নিজহাতেই ছিন্ন করেছেন। তাই প্রাচীর দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণরা এই 'মোরিয়'-অষ্ট্রিক বা মৌর্য্যদের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিলেন না। বায়ুপুরাণ উচ্চকণ্ঠেই প্রচার করেছে, 'জনপদে' ('মহাজনপদে') তঙ্গ (মধ্য চৈনিক), তুষার, শক, পহ্লবদের সঙ্গে পাশাপাশি ছিল 'সান্দ্র'রা। তমলুক থেকে সুরু করে সমগ্র বগধভূমিতে থিবিস-জাত গ্রীক-সংস্কৃতিই সান্দ্রকুট্ট বংশ ছড়িয়ে গিয়েছিল।

সোমবংশ বা পঞ্চপ্রদ্যোতের আর্য্যকুল এই হরিকেল চন্দ্রবংশকে পছন্দ করতে পারেননি—অনেকজাতির সঙ্গে সংসর্গ হচ্ছিল বলে। 'অনেকজাতি সংসারা' এই রাজসর্পকুলকে যেম্নি কৌটিল্য-বিষ্ণুগুপ্ত তেম্নি শাক্য বুদ্ধ বিশ্বাস করতে পারতেন না। বুদ্ধ হতাশ হয়েছিলেন তাঁরা 'গেহকারক'-গৃহকারক, (হাউস-বিল্ডার) করণকারণশীল কুলবর্দ্ধক ঘটকবংশ বলে। উর-সংস্কৃতির বুদ্ধ নন্দীবর্দ্ধনের রক্তকে ভাবতেন তান্ত্রিক আর মুষিক ব্রাহ্মণ কৌটিল্য বিম্বিসারের রক্তকে মনে করতেন মনুর-বিধান লোপকারী 'বৃষল', 'কুলহীন'। বুদ্ধ বা বিষ্ণুগুপ্ত স্বপ্নেও ভাবেননি সম্রাট অশোকের মতো এই দ্বিধারা



রক্তের একটি তক্ষশীলা-মোহেঞ্জোদারো মার্কা মার্কেণ্ডেয় যবন বা মৌর্য্যসন্তান এসে তান্ত্রিকতাকে বুদ্ধের পায়ে সমর্পণ করবেন আর 'কুলহীন'-কে 'কুলীন' করে তুলবেন যাতে সুস্কের ঘটক আদিশূরের বংশ নির্ম্মিত হয়।

দেবনামপানকারী অসিধারাব্রত যাপনকারী কোন্ প্রিয়দর্শী যে 'পিয়দসি'-লিপি রেখে গেছেন সে-আলোচনা আমরা বৌদ্ধসাহিত্য-গবেষক অমূল্যচন্দ্রের গ্রন্থে আশা করেছিলাম। শাক্যবুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন বুদ্ধ জন্ম-গ্রহণ করেন—তিনিও প্রিয়দর্শী-আখ্যায় ভূষিত। প্রিয়দর্শন জৈন মহাবীর বর্দ্ধমানই কি বৌদ্ধসাহিত্যের প্রিয়দর্শী বুদ্ধ? এবং তাঁর লিপিই কি (শুধু অশোক-নামাঙ্কিত লিপিটি ছাড়া) 'অশোক-লিপি' হিসেবে এতোকাল আমরা পেয়ে এসেছি? এ-সম্পর্কে প্রামাণ্য মতামত আমরা ইদানীং অমূল্যচন্দ্রের নিকটই আশা করতে পারি। নিরপেক্ষ বিচার করবার মতো উদার প্রজ্ঞা তাঁরই আছে। আমি তাঁর গ্রন্থপাঠেই এ-ধারণার বশবর্ত্তী হয়েছি। তারপরও আশা করব, জার্ম্মাণ-ভাষায় সুপণ্ডিত অমূল্যচন্দ্র আমাদের 'নীলগ্রীব কনকমুনি'র 'নীলগ্রীব'-কথাটির মূলগন্ধ-সংবাদ খানিকটা পরবর্ত্তী সংস্করণে বহন করে এনে দেবেন। 'দেবানং প্রিয়' কথাটি মুখ্য সভ্য জার্ম্মাণরা মূর্খ অর্থে ব্যবহার করে' 'Gieb Lieb' (প্রেম দাও) কথাটি নীলকণ্ঠের গাল-দেওয়া প্রেম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন কি না তা জানতে আমাদের প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে। 'নীলগ্রীব' রুদ্র নীল-লোহিত অনেককে অনেক-কিছুই দান করেছে বলে আমার বিশ্বাস। বিশ্বাস আমার ব্যক্তিগত, ফলিতজ্ঞানে নিয়ে আসা বিজ্ঞানী ঐতিহাসিকের কর্ম্ম।

এই বিশ্বাস-বশেই আমি বলছি যে অন্ততঃ লুম্বিনী উদ্যানের বৈশ্য 'পিয়দসিন' 'শিলোথ'-বেঙ্গ। এই বেঙ্গের সংসারের বা সুর্ম্মাভ্যালির (শ্রীহট্ট যার রাজধানী ছিল) সঙ্গে প্রাচীন সুমের, সুহ্ম, সোম, সবরমতি, সরমতিয়া (অষ্ট্রিয়া) নামগুলো জড়িত। সভ্যতা-সূর্য্য প্রাচী থেকে সুরু হয়ে পাশ্চাত্যে অস্ত গেছে এক যুগে, পরবর্ত্তী যুগে পাশ্চাত্য থেকে ঢেউ এসেছে—এসে স্পর্শ করেছে প্রাচীর প্রাচীন প্রাচীর। চীনের প্রাচীর সেই লোহিত মোঙ্গোল ঢেউ সামলাবার জন্যেই। এই সৎ ধারণা নিয়েই আমি বলতে ইচ্ছুক যে 'গড'-কথাটি লুম্বিনী-উদ্যানে রচিত। তিনি যীশুই হোন আর অখনতোন-ই হোন 'অতনআগা' তিনি সেখানেই নির্ব্বাপিত করেছিলেন। 'লুম্বিনী-উদ্যান'-টি কোথায় অবস্থিত ছিল?—শুধু কি নেপাল-তীরভুক্তি এই কর্ণদের বা জনকদের জন্মভূমি? তাঁদের জন্মস্থান সমগ্র পৃথিবীর কুশভূমি। অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ বা ত্রিকলিঙ্গই ছিল হয়ত তাঁদের ভদ্রাসন—গ্রীকরা ভাগবত হতে এখানেই আসতেন। হেলিওডোরার ব্রাহ্মীলিপির ফলকটি উল্টোভাবে রেখে অবলোকন করলে আমরা রোমান-অক্ষরের সঙ্গে দেবনাগর 'দ' এবং বাংলা 'এ ক' বর্ণগুলোর উদ্ভব দেখতে পাব। দক্ষ যযাতি-পুত্ররা কোথায় ছিলেন না? কুলপুত্রদের বা কলিকাসূতদের কলিকাতার প্রান্তে কেন একটি লুম্বিনী-উদ্যান (নাটোর বংশের ভূসম্পত্তি)? তাতে কি অহম-বংশের (Ahmose) অখনটোন-এর নোটন-পারাবত ওড়েনি কোনো কালে? হজদেশ কামরূপে কেন মোঙ্গোল পারাবত বলি দিত, তা কি ঐতিহাসিকরা জানেন? মুঘলরা-ও নোটন-পারাবত-উড়ানো অভিশপ্ত কাজ বলে মনে করতেন। মিশ্রিত মিশর সভ্যতার অপমৃত্যু কেউ ভোলেননি। মানবজাতির ভৌগোলিক পার্থক্য জাতিতত্ত্বে নিহিত—মাটি এক কিন্তু সন্তানরাই পৃথক। এ-পার্থক্য মুষা-ঈশা, বুদ্ধ-যীশু, অশোক-কোণিঙ্ক, মার্ক্স-গান্ধী ঘোচাতে পারেননি—ভবিষ্যৎ হয়ত ঘোচাতে পারবে যদি মানব-জাতির সৎ ইতিহাস রচিত হয়।

যাক্, এস্থলে আমি সেন-সেনহ-সিংহবংশের পিয়দসিনের (দিস্-জাতির দশ-রাজের) লুম্বিনী-লেখটি উদ্ধৃত করে তৎসঙ্গে বাংলা-অনুবাদ যুক্ত করে দিচ্ছি। যিনি জম্বুদ্বীপের শোকহরণ করতে চেয়েছিলেন, তিনি বাংলাদেশের অশোক হয়েও আমাদের দুঃখিনীমায়ের অশ্রুমোচন এবং অশোক-বর্দ্ধন করেছেন। অন্তত সমতটের। ইজিপ্তের তুলা-পুরুষ, স্বৈরিণীরাজ্যের মগ, সুমের-উরের অনন্তকায় প্রভৃতি হিন্দুরাজবৃন্দ যাঁর ধর্ম্মাদেশ শিরোধার্য্য করেছিলেন, সেই মানবধর্ম্মী সম্রাট শুধু কলিঙ্গের অধিশ্বর এমন হতে পারেনা। কলিঙ্গে অঙ্গ-বঙ্গ সর্ব্বদাই যুক্ত ছিল। দুর্বিনীত গৌড়সেনার দুর্ণাম এই বিনয়-ব্রতধারী সেনা-নায়ক তেম্নি ঘুচিয়েছিলেন—যেম্নি ঘুচিয়েছিল বহুযুগ পরে বাংলার শশাঙ্কদেব এবং লক্ষ্মণসেনারা। অগ্রদানী কুমার আচার্য্য লক্ষ্মণসেনারা তাই অশোক-শাল ব্যবহার করতেন। ঋকবেদের দশম মণ্ডলের কর্ম্মী 'কর্মারঃ' ছিলেন তাঁরা—কুর্ম্মী গৃৎসমধ-জাত।

জম্বুদ্বীপের সক্কদি ভাষার নমুনা এই :

॥ লুম্বিনী স্তম্ভলেখ ॥

১। দেবানপিয়েন পিয়দসিন লোজিনবীসতিবসাভিসিতেন
২। অতনআগাচ মহীয়িতে হিদবুধেজাতে সক্যমুনীতি
৩। সিলোবিগডভীচা কা লাপিত সিলোথভেচ উসপাপিতে
৪। হিদভগবংজাতেতি এলুংমিনিগামে উব্‌লোকেক খে
৫। অঠভাগিংয়েচ ॥

১। দেবগণের (ব্রাহ্মণগণের) অপ্রিয় অসি-প্রিয় (অসিধারা ব্রতধারী) বিংশবৎসর রাজ্যকালে অজিন গ্রহণ করল (বৈশ্য বা বৈদ্য চর্ম্ম-পৈতা বসা-সিক্ত)।

২। সাক্যমুনি হিন্দুবুধেরই (ইন্দ্রের) জাতি, অতনু-অগ্নি, চমের অতোন ধর্ম্ম, মহীর হিতে দান করেছিলেন।

৩। আমি শ্রীলোভী গৃহকারক, বংশ-প্রতিষ্ঠাতা, ভিষক (গড-ভীত)। কলিত, নহপীত। শীলবিযুক্ত। কালগ্রস্ত। ঊষার পিতা বান অসুর। ঊষার স্বর্গীয় জ্যোতি পানকারী। শ্রীহট্ট (সিলেট) থেকে সমাগত। সিলেট-প্রেরিত। শীল-উদ্বেগ রাজমিস্ত্রী।

৪। আমি হিন্দু ভগবত-জাতি। লুম্বিনী গ্রামের নিগমে এলাম। উপলক অক্ষ (অক্সাস নদীতীরের তক্ষশীলার বৃষ অক্কড) বা পাহাড়ী ময়ুর।

৫। আটবিকদের ভাগিনেয়ও বটে। (হতভাগিনী আটবিক শয্যাসঙ্গিনীও এসেছেন সঙ্গে)॥

শ্রদ্ধেয় শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন অনুবাদটি বিচার করে দেখবেন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

# বিদগ্ধা

## শ্রীমতী জয়ন্তী ঘোষ

তিন বছরের ফুটফুটে ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলো অদিতি। ঠিক ব্যানার্জীর মত দেখতে হয়েছে ছেলেটা—চিবুকের ওপরের কালো তিলটা পর্য্যন্ত।

আঃ, খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো অদিতি, 'গোপাল আমার, মাণিক আমার, সোণা আমার—' ছেলেটা ছট্‌ফট্ করছে ওর আলিংগন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। খেলতে যাবার সময় হয়েছে তার—দরোয়ান রামশরণ দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে।

বিশুষ্ক দৃষ্টিতে শেষবার চাইলো অদিতি,—ছেলে, ছেলের বাপ কেউই রইলো না বাহুপাশে আবদ্ধ। তবু ইচ্ছা করছে আর একবার চুমা দেয় ঐ কৃষ্ণ-বিন্দুটীর ওপর—সাত বছর আগে এমনি একজনের চিবুকপ্রান্তের ঘনকৃষ্ণ তিলের সীমানায় এসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এম. এ ক্লাসের তীক্ষ্ণধী ছাত্রী অদিতি মিত্রের মুগ্ধ দৃষ্টি।

কানের কাছে রামশরণ বলছে, 'ছোড় দিজিয়ে মাঈজী; খোকাবাবু আভি খেলনেকে লিয়ে ময়দানমে জায়েঙ্গে।'

ছেড়ে তো দিতেই হবে,—না ছেড়ে দিয়ে উপায় কি! আপন সন্তানকেই মানুষ বেঁধে রাখতে পারে না,—আর এ তো এমন একজনের, অদিতির জীবনের কোন বন্ধনই যে মানলো না।

স্কুল থেকে ফেরবার পথে বেঁটে ছাতা আর ব্যাগ হাতে নিয়ে রোজ এই পার্কে এসে তৃষিত নয়নে প্রতীক্ষা করে অদিতি। দূরে দেখা যায় দরোয়ানের হাত ধরে খোকাকে আসতে, অদিতিকে দেখেই চঞ্চল হয়ে ওঠে গতি, অপেক্ষা আর সয় না যেন।

কাছে এসে কচি কচি হাত দু'টী দিয়ে জড়িয়ে ধরে গলা, তুমি 'বসে আছো আমার জন্য?'

মৃদু হেসে অদিতি ওকে কোলে তুলে নেয়, ব্যাগ খুলে দামী টফি আর চকোলেট উজাড় করে দেয় কোমল দুটী হাতে। অবশ্য এগুলি সংগ্রহ করতে হয় তা'কে দুপুরের টিফিন বন্ধ রেখে, নইলে নিত্য এত দামী জিনিষ কেনা সম্ভব নয় তা'র মত দরিদ্র স্কুল-মিষ্ট্রেসের পক্ষে।

খেলতে চলে যায় খোকন সঙ্গীদের সাথে, বেঞ্চিতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে অপলকে চেয়ে থাকে অদিতি; অতীতের স্মৃতির রোমন্থনই করে বোধ হয়।

দুর্বার বেগে ছুটে চলে মন, জীবন-খাতার অনেকগুলো পৃষ্ঠা ত্বরিতে উলটিয়ে এক জায়গায় স্তব্ধ হয়ে যায় তা'র গতি।

অর্থনীতির ছাত্র রঞ্জন ব্যানার্জী নেমেছে ডিবেটে। প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি পরম অবহেলায় সে খণ্ডন করে যাচ্ছে……।

তরুণ গ্রীক দেবতার মত দীর্ঘ, উন্নত দেহ ; স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য্যের সমাবেশে অপূর্ব! উত্তেজনায় ঈষৎ বিক্ষিপ্ত চুলগুলো প্রশস্ত ললাটের ওপর বিপর্য্যস্ত—উগ্র গৌরবর্ণের চিবুকের ওপর কালো উজ্জ্বল একটি চিহ্ন।

দূর থেকে বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছে অদিতি এক বছরের সিনিয়র রঞ্জন ব্যানার্জীর প্রদীপ্ত মুখের দিকে।

অধ্যাপক সহাস্যে রঞ্জনকে সমর্থন করলেন, স্বীকার করলেন ওর যুক্তির তীক্ষ্ণতা এবং বলিষ্ঠতা। প্রবলোল্লাসে জয়ধ্বনি করে উঠলো ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রেরা—জয়মুকুট পরিয়েছে তাদের রঞ্জন ব্যানার্জী।

গাড়ীতে সবেমাত্র স্টার্ট দিয়েছে রঞ্জন, পিছন থেকে ডাক শোনা গেলো, 'একটু শুনুন।'

বিস্মিত হয়ে চাইলে ও, 'আমাকে বলছেন?'

এক পা এগিয়ে এলো অদিতি, 'আপনার যুক্তিগুলো জোরালো সন্দেহ নেই ; কিন্তু যা বলে এলেন, তা' কি সবই সত্যি? কুটীর-শিল্পের বিরুদ্ধে আপনি যতগুলো যুক্তি দিলেন, তা'র কোনটাই ভারতবর্ষের মত জনসমস্যা-পীড়িত দরিদ্র দেশের পক্ষে উপযুক্ত নয়।'

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে রইলো রঞ্জন, তন্বী, শ্যামা মেয়েটীর বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখের দিকে। তারপর এ্যাকসিলারেটর থেকে পা সরিয়ে চাবী লাগিয়ে নেমে পড়লো গাড়ী থেকে, বললে, 'চলুন, ক্লাসে যাওয়া যাক্, আপনার যুক্তি শোনা যাবে।'

নির্জন ক্লাসরুমে প্রবেশ করলো দু'টী অপরিচিত তরুণ-তরুণী। অপরিচয়ের ব্যবধান অবশ্য রইলো না বেশীদিন, অচিরেই ঘনিষ্ট হয়ে উঠলো তারা ; মুক্ত আকাশের নীচে ঢাকুরিয়া লেকের জল-কল্লোলের মৃদু ধ্বনি শুনতে শুনতে, ইডেন গার্ডেনে ফুলে ছাওয়া বসন্তের নিঃশব্দ পদসঞ্চারের মাঝখানে নিবিড় হয়ে উঠলো দু'জনে। সুদীর্ঘ দিনের পরিচয় অজ্ঞাত রইলো না অভিভাবকদের কাছে। প্রবীন এ্যাটর্নী অন্নদা ব্যানার্জী ক্রুদ্ধ হলেন না সন্তানের ওপর, মনে মনে হেসে ঘটক লাগালেন সুন্দরী বধূর সন্ধানে।

প্রথম শ্রেণীতে এম. এ পাশ করে বিদেশে যাবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলো রঞ্জন। গঙ্গার ধারে একটি নির্জন পরিবেশে দুজনের দেখা হবার কথা ছিলো সেদিন,—নির্দিষ্ট সময়ে এলো রঞ্জন। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল অদিতি—আকাশে উঠেছে তৃতীয়ার একফালি চাঁদ, নদীর জলে আলো-ছায়ার খেলা ; বাম হাতে অদিতিকে জড়িয়ে ধরে দক্ষিণ হাতে ওর মাথাটী টেনে আনলো রঞ্জন আপনার প্রশস্ত বক্ষে। তারাগুলো কি



উঠলো কেঁপে? পায়ের তলায় কি দুলে উঠলো পৃথিবী! উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করলো অদিতি আপন কপোলে—উন্মুখ প্রত্যাশায় অধীর হয়ে উঠলো তার সমস্ত দেহমন—এক বিপুল আনন্দের মাঝখানে সংজ্ঞাহীন হয়ে গেলো তা'র সমগ্র জাগতিক চেতনা।

আপনার নির্বুদ্ধিতা স্মরণ করে অকস্মাৎ হো হো করে হেসে ওঠে অদিতি। হেসেই চকিত হয়ে যায়। রাত্রি হয়ে গেছে—কালো ঘোমটা নেমে এসেছে মহানগরীর বক্ষের ওপর ; আশে-পাশে দু'একজন লোক সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাইছে তা'র দিকে।

খেলা কখন হয়ে গেছে শেষ, কখন খোকন চলে গেছে বাড়ী, কিছুমাত্র টেরও পায়নি সে—এতই আনমনা হয়ে গিয়েছিল চিন্তায়।

বড় বোন মিনতি লেডি ডাক্তার ; প্রাইভেট্ প্র্যাকটিস্ করবার উপায় নেই বলে আয়ের পথ প্রশস্ত নয় তা'র। স্বল্প দক্ষিণায় চাকরী করতে হয় হাঁসপাতালে ; তবুও মাঝে মাঝে বলে, 'সন্ধ্যার ট্যুইশনিটা ছেড়ে দে অতি'—তোর শরীরে যে আর কিছু নেই।'

ছাতাটা আর ব্যাগটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে মনে মনে হাসে অদিতি। পার্কের ট্যুইশনি ছাড়লে বাঁচবে কেমন করে?

দেশে আছেন বুড়ো বাপ-মা, আছে তিনটী ছোট ছোট ভাই-বোন। দুই বোনের স্বল্প আয়ের ভগ্নাংশে কি-ভাবে তাদের দিন চলে—তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

ভাবে অদিতি, পরের সন্তানের ওপর তা'র মোহ থাকা উচিত নয়,—যে কোনদিন তা'র আপনার হবে না, কেন তার জন্য এই অবুঝপনা! সন্ধ্যায় সত্যিই একটা ট্যুইশনি করবে সে—বাড়ীতে ক'টা বেশী টাকা পাঠাবে। কিন্তু সারাদিনের কঠোর প্রতিজ্ঞা ঘড়িতে পাঁচটা বাজবার সংগে সংগে মিলিয়ে গেছে—অভ্যস্ত পা দু'টি চলে এসেছে পরিচিত পার্কের দিকে।

সব দিনই অবশ্য আসে না খোকন—তবুও পার্কের একটী কোণায় বসে থাকে ও। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সবুজ সবুজ পাতায় গাছগুলো ভরে উঠেছে, লালে লাল হয়ে গেছে কৃষ্ণচূড়ার মাথাটা। মনে পড়লো অদিতির এমনি একটী দিনের কথা।

অভিমান করে বসেছিল, কিছুতেই কথা বলবে না রঞ্জনের সাথে। রঞ্জন একগোছা ফুল ছুঁড়ে মারলো ওর মুখে—মুখ আরও ফিরিয়ে নিলো অভিমানিণী ; কাছে ডাকছে রঞ্জন, আকর্ষণ করছে বাহু ধরে—কিছুতেই আত্ম-সমর্পণ করবে না ও।

কানের কাছে মুখ নিয়ে এলো রঞ্জন, 'এসো অদিতি।' অনুযোগে ধ্বনিত হয়ে উঠলো তার কণ্ঠ, 'বড় সাধাসাধি করতে হয় তোমাকে।'

কথাগুলো যেন শুনতেই পেলো না অদিতি, এমনি ভাবে একটা শ্বেতজবার পাপড়ি টুকরো টুকরো করতে লাগলো।

কণ্ঠস্বরে কপট ঔদাসীন্য এনে রঞ্জন জানালে, 'কি আর করা যাবে। বিভাস একটা কবিতা লিখে দিয়েছিল তোমার জন্য। থাক, সেটা আর পড়ে কাজ নেই।'

একটু একটু করে এগিয়ে এলো অদিতি;

দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে দুষ্টুমীভরা উচ্ছলকণ্ঠে রঞ্জন আবৃত্তি করতে লাগলো।

দীর্ঘদিনের ব্যবধানেও বিস্মরণ আসে নি। তৃষিতা অদিতির মনে গুঞ্জন করে উঠলো কথা:
কৃষ্ণচূড়ার আগুণ আমার বক্ষে জ্বলে।

আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াম্লান মহানগরীর কোলে নিস্তব্ধ হয়ে বসে ধ্যান করে বিগত-যৌবনা, রূপহীনা অদিতি রসভরা দিনগুলির কথা। তা'র অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে বান্ধবীদের ঈর্ষা আর মন্তব্যও মনে পড়ে, 'কি দেখেই যে ভুললো রঞ্জন ব্যানার্জী—'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো মেয়ে অদিতি মিত্র যে নেশায় আকণ্ঠ ভরপুর হয়ে উঠলো, তার কাছে পড়াশুনা তুচ্ছ হয়ে যায়। একবার দিলো না পরীক্ষা, দ্বিতীয়বার তিনটে পেপার দেবার পর আর মন বসলো না যৌবনের মূল্যবান দিনগুলি বৃথা অপচয় করতে।

ফেনায়িত নেশা যখন ছুটে গেলো তখন রঙীন কাঁচের চশমা খুলে জগৎটাকে সোজাভাবে দেখে চমকে উঠলো অদিতি।

রঞ্জন ব্যানার্জীর নেশা তার অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে—সাক্ষাৎ হয়ে এসেছে পরিমিত—অজুহাত তখন অজস্র।

বারোশো টাকা গ্রেডের অফিসার মিঃ ব্যানার্জী বিয়ে করেছে সুন্দরী ধনীকন্যা সবিতা চ্যাটার্জীকে—তা'র দর্শনলাভ তখন দেবতারও তপস্যার বস্তু।

ধ্যানভঙ্গ হয়ে গেলো একটা অশ্লীল মন্তব্য শুনে—বেঁটে ছাতাটা বগলে নিয়ে শ্রান্ত পায়ে বাড়ীর পথ ধরে ও।

সেদিন ছিল রবিবার। টিপ-টিপ করে বৃষ্টি হচ্ছে বিকালবেলা। মিনতি গেছে তার ডিউটিতে হাঁসপাতালে। অদিতি একা একা ঘরে বসে 'চয়নিকা' পড়ছিল, পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়লো,

'রঙীন খেলেনা দিলে ও রাঙা হাতে—'

বইখানা বন্ধ করে কিছুক্ষণ ও স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো, কিন্তু মনের মধ্যে সুর উঠতে লাগলো,



'যখন নবনী দিই লোলুপ করে—'

ছাতাটা নিয়ে ও উঠে পড়লো; খোকন এই বৃষ্টিতে আসবে না যদিও সুনিশ্চিত।

দু'পয়সা দিয়ে একটা চীনাবাদামের ঠোঙা কিনে ও বাদাম চিবুতে লাগলো আপনমনে। জনমানবশূন্য পার্ক—শুধু দু'একটা গরু এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে ও চিন্তা করছিল, হঠাৎ পিছন থেকে খিলখিল করে মিষ্টি সুরে কে হেসে উঠলো। চমকে উঠে খোকাকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলো, 'ওরে আমার দুষ্টু ছেলে, এই বৃষ্টিতে এসেছিস একা!'

ওর বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে নির্ভয়ে জবাব দিলে খোকা, 'এলামই তো ট্রামরাস্তা পেরিয়ে। তোমার জন্য মন কেমন করছিল যে।'

অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠলো অদিতি, 'এমন করে এসো না বাবা আমার।'

খোকা গ্রাহ্য না করেই দাবী জানালে, 'কই, লজেন্স এনেছো আজ? আর সেই জলছবি?'

সস্নেহে জিনিষগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো অদিতি। না, আজ ছেলেটাকে বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতেই হবে।—যে রকম গাড়ী-ঘোড়া আজকাল রাস্তায়! ছেলেটা অনর্গল বকতে বকতে যাচ্ছে—মৃদু হাসলো অদিতি—রঞ্জনও ঠিক কথা বলতো এমনি অনর্গল। এখনও কি সে তেমনি আছে? তেমনি চঞ্চল, দুরন্ত আর প্রাণময়! বৃষ্টির আকাশে হঠাৎ যেন আলোর পশলা নামল।

বাড়ীতে বেশ সোরগোল পড়ে গেছে বোঝা যাচ্ছে—রঞ্জনের গলা শোনা যাচ্ছে রাস্তা থেকে—বকছে দরোয়ানকে অসাবধানতার জন্য।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেলো খোকন—রঞ্জনের গলা জড়িয়ে ধরে আদরের সুরে বলছে, 'বাপী, বাপী, আমি এসেছি।'

ব্যানার্জী-গৃহিণী ক্রুদ্ধকণ্ঠে জানাচ্ছেন, আজকাল পথেঘাটে বড় ছেলেধরা বেরিয়েছে! একটা মেয়ে নাকি খোকনকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাকে পুলিসের হাতে দেওয়া উচিত!

অদিতির আহত অন্তঃকরণ আর সহ্য করতে পারলে না। যে ব্যাগ আর ছাতা ছাড়া তা'কে কল্পনা করা যায় না, নিদারুণ বেদনায় সে দু'টো পরম প্রয়োজনীয় বস্তু ফেলে একরকম দিক্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়েই সে পালিয়ে গেলো।

অন্ধকারে একটা ইটে হোঁচট খেলে অদিতি। কোনমতে বাড়ী ফিরে হাঁপাতে লাগলো; জুতোটা খুলে ফেললে আস্তে আস্তে—বাঁ পায়ে ছিলো ওর ছয়টী আঙুল, সেই অতিরিক্ত আঙুলটাই আহত হয়েছে, টপ্ টপ্ করে ঝরছে রক্ত—আইডিন লাগিয়ে নিজেই একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিলো ও।

মিনতি ঘরে ঢুকে অবাক্ হয়ে গেলো, পায়ে কি হয়েছে ? পড়ে গেলি নাকি ?

নিরুত্তাপ কণ্ঠে অদিতি উত্তর দেয়, 'হাঁ, বাথরুমে যা পিছল হয়েছে।'

আপন মনে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে যায় মিনতি। বোনটা যদি মানুষের মত হোত !

ফিরে আসে আবার আইডিনের শিশি হাতে, 'নে, খোল ; ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দিই।'

কিন্তু ষষ্ঠ অঙ্গুলির জন্য অদিতির লজ্জা অপরিসীম। পাছে কেউ দেখে ফেলে! অবশ্য রঞ্জন দেখে ফেলেছিল একদিন—ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল অদিতি আপন অঙ্গের বিকৃতির জন্য।

মিনতি ওর আপত্তি না শুনেই একরকম জোর করে ভালো করে ব্যাণ্ডেজ করে দেয়—নিস্তেজভাবে শুয়ে থাকে অদিতি।

পার্কে আসবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে চিরদিনের মত—খোকাবাবু আর এখানে বেড়াতে আসে না। এ পার্ক তার কাছে নিষিদ্ধ গণ্ডীর আওতায় পড়ে গেছে।

তবুও মাঝে মাঝে পার্কে এখনও আসে অদিতি, লালজামা পরা ফুটফুটে শিশু দেখলে কাছে যায় দৌড়ে—নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে ফিরে আসে আবার পূর্বস্থানে। নিষ্ঠুর বিধাতারও বোধ হয় করুণা হয় হতভাগিনী সর্বসৌভাগ্যবঞ্চিতা এই নারীর ওপর। তাই একদিন কানের কাছে কচি গলার ডাক বেজে ওঠে, 'মণি, আমি পালিয়ে এসেছি—'

থরথর করে কেঁপে উঠে আকুল হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে ও ছোট্ট দেহটীকে ; আঃ কি তৃপ্তি, কি শান্তি !

ক'দিনই বা আগের কথা ! তবু যেন যুগ যুগ চলে গেছে বিদগ্ধ হৃদয়ের ওপর দিয়ে।

মনে পড়তে লাগলো অদিতির দিদির ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, 'হতভাগী, তোকে নিয়ে আমি এখন কি করবো ? রঞ্জনের বিয়ে হয়ে গেছে, তুই এখন যাবি কোন চুলোয় ?'

চোখে জল আসতো না অদিতির। মরুভূমির মত বিশুষ্ক, বিস্ফারিত দুই চক্ষু মেলে ভাবতো সে : ছোট্ট একটী শিশুর আগমন সম্ভাবনাতেই এত আন্দোলন, এত দ্বন্দ্ব আর বিরোধ ? এ কেমনতরো বিধান ?



ব্যানার্জী-গৃহিনী এলো কেবিনে—সেও সন্তান-সম্ভবা। অসময়ে জন্ম নিলো মৃত শিশু ; মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে সে রাতে, ওয়ার্ডে পায়চারী করছে মিনতি।

দারুণ বেদনায় চীৎকার করছে অদিতি—তার শিশুও পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলতে চাইছে।

অর্দ্ধ-অচেতন চোখের সামনে ভাসছিল বেথেলহামের গোয়ালঘরে জন্ম নিচ্ছেন মানব-ত্রাতা……ভাসিয়ে দিচ্ছেন কুন্তী আপন সন্তানকে তাম্রপাত্রে—কে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো অদিতির সন্তানকে—আর কিছু মনে নেই তার।

মোচড় দিয়ে ওঠে অদিতির অন্তরের সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি। উন্মত্তের মত খুলে ফেলে খোকার বাম পায়ের জুতো—শুধু ব্যানার্জীর কৃষ্ণ-তিলের চিহ্নই থাকবে খোকার মুখে—তা'র আপন রক্ত-মাংসে গড়া সন্তানের দেহে সে কি লাভ করবে না পরিপূর্ণতা ?

একটী ছোট্ট অতিরিক্ত আঙুল ! নিঃসংশয়ে সন্তানকে ব্যাকুল স্নেহভরে জড়িয়ে ধরে সুদীর্ঘ দিন পরে ঝর্ ঝর্ করে কাঁদতে লাগলো মা।

দেরী দেখে খোকাকে খুঁজতে এসেছে ব্যানার্জী নিজেই। মা আর ছেলেকে দেখে পাইপটা মুখ থেকে নামাতে ভুলে গেলো একত্রিশ বছরের পত্নীব্রত রঞ্জন ব্যানার্জী।

## কোলহাদের গান

রেনসরি লো মনসুরি
শুনছি নাকি তুই ছুঁড়ী
করবি বিয়ে ?
যাক না এসে বর নিয়ে
করেও যদি জারিজুরি
আমার শুধু মিনতি এ,
আর কিছু না, প্রেম-রাখী
বিয়ের উপহার পাবি
খবর দিস।
না দিলে এ মনের বিষ
উড়ো চিঠির পুরো দাবী
ধরতে পেছু ছুঁড়ব না কি ?

# শিল্পী

## জেমস্ জয়স্

অনুবাদ : **অশোক গুহ**

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]

ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ওরা জটলা করছিল।

কে একজন বললে :

ওদের লিওন্সের পাহাড়ের কাছে ধরেছে।

কে ধরলো ?

মিঃ গ্লিসন আর ধর্মযাজক, ওঁরা ছিলেন গাড়িতে।

আরো জানালো :

উপরের ক্লাসের একজন আমাকে বললে।

ফ্লেমিং শুধালো :

কিন্তু ওরা পালালো কেন ?

আমি জানি, সিসিল থাণ্ডার জবাব দিলে, ওরা রেক্টরের ঘর থেকে টাকা নিয়েছিল।

কে ?

কিক্‌হামের ভাই। সবাই সেই টাকা ভাগ করে নেয়।

কিন্তু এতো চুরি করা। কি করে করলে ?

থাণ্ডার, তুমি তো ভারি জান ! ওয়েলস্ বললে, কেন পালাল আমি জানি।

বলনা।

বলতে বারন, ওয়েলস্ বললে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠলে, ওয়েলস্, বল, বল ! আমরা কাউকে বলব না। ষ্টিফেন ঝুঁকে পড়লো। ওয়েলস্ তাকিয়ে দেখলে, কেউ আসছে কিনা, তারপর ফিস ফিস করে বললে,

উৎসবের জন্য মদ রাখা হয় তা তোমরা জানো ?

হাঁ।

শোন তাহলে, সেই মদ ওরা খায়। গন্ধ থেকেই সবাই টের পায় কারা খেয়েছে। তাই ওরা ছুটে পালায়। এই তো ব্যাপার।

যে ছেলেটি কথাটা তুলেছিল, সে বললে :

হাঁ, হাঁ, উঁচু ক্লাসের ছেলেটির কাছে আমিও এই কথাই শুনেছি।

সবাই চুপচাপ। ষ্টিফেনও আছে ভিড়ে। কথা বলতে তার ভয়, শুধু কান পেতে শুনছে। ভয় তাকে বিবশ করে ফেলেছে, এক রোগ যেন তাকে আক্রমণ করেছে। কি করে ওরা একাজ



করলে ? উৎসবের সুরা যেখানে থাকে, সেখানে আছে থম্‌থমে আঁধার। গীর্জ্জা নয়, তবু ফিসফিসিয়ে কথা কইতে হয়। এও এক পবিত্র স্থান। গ্রীষ্মের সেই দিনটির কথা মনে পড়লো। ···সেদিন মাঝির সাজ পরতে সে সেখানে গিয়েছিল। মিছিল যাবে—বনের উপাসনা-গৃহে। সেও এক অদ্ভুত জায়গা, পবিত্র স্থান। যে ছেলেটির হাতে ধূপদান ছিল, সে মাঝখানের শেকলটা ধরে দোলাচ্ছিল, ওতে হাওয়া লেগে জ্বলছিল কয়লা। কাঠকয়লা। আস্তে আস্তে জ্বলছিল দুলুনিতে, কেমন যেন কটু গন্ধ, ক্ষীণ গন্ধ।

খেলার মাঠে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এখানে ওখানে ওরা জটলা করছিল। ওরা যেন তার কাছে খুদে দেখায়। কাল ব্যাকরণের দ্বিতীয় মানের এক ছাত্র তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। ছেলেটার সাইকেলটার ধাক্কাই এসে লাগে, চশমা ভেঙে তিন টুকরো হয়ে যায়।

তাই এদের সবাইকে খুদে লাগছে···আর দূরের গোলপোস্ট দুটোও এতো সরু আর দূরে আর ধূসর স্নিগ্ধ আকাশ এত উঁচুতে ! খেলার মাঠে ফুটবল খেলা হয় না, ক্রিকেটের সময় এল বলে। এখন চলছে দৌড়ধাপ। আর এখান-ওখান থেকে, স্নিগ্ধ হাওয়া থেকে ঝরে পড়ছে পাখীর ডাক। ওরা বলছে, পিক্ প্যাক্ পক্ পাক্ ; উপছে-ওঠা পাত্রে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা জল। ঝরণায় ঝরছে জল।

আথি চুপ করেই ছিল, সে আস্তে আস্তে বললে, তোমরা সবাই ভুল করছ।

সবাই ব্যস্ত হয়ে তাকালো।

কেন ?

তুমি জানো নাকি ?

কে বললে ?

আথি, বল না !

সাইমন মুনান মাঠে একা একা বেড়াচ্ছে, আর একটুকরো পাথরে লাথি মারতে মারতে চলেছে। সেইদিকেই আথি দেখিয়ে দিলে :

ওকে জিজ্ঞেস কর।

সবাই সেদিকে তাকিয়ে বললে :

ওকে কেন জিজ্ঞেস করব ?

ও আছে নাকি ?

আথি গলা নামিয়ে বললে,

ওরা পালিয়েছে কেন জান ? আমি বলতে পারি, কিন্তু তোমরা কাউকে বলবে না।

বলনা আথি ! বল ! যদি জানতো বল।

আথি একটু থেমে বললে। রহস্যময়তা তার স্বরে।

এক রাতে টাঙ্কার বয়েল আর সাইমন মুনানের সঙ্গে ওরা পার্কে ধরা পড়ে।

ওরা শুধালে :

ধরা পড়লো !

কেন ?

আথি বললে, চোরাই মাল ছিল ওদের কাছে।

সবাই চুপচাপ ; আথি আবার বললে :

বুঝলে, তাই……

ষ্টিফেন সাথীদের মুখের দিকে তাকালে। সবাই মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

সে জিজ্ঞেস করবে ভাবলো। পার্কে চোরাইমাল নিয়ে গেল কেন? আর উঁচু ক্লাসের পাঁচটা ছেলেই বা তার জন্যে পালালো কেন? এ নিশ্চয়ই একটা তামাসা! সাইমণ মুনানের চমৎকার সব পোশাক আছে। একদিন সে তাকে এক থাল ভরতি মেঠাই দেখালে। খেলুড়েরা নাকি কার্পেটের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিয়েছিল তার দিকে। সে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সেদিন ছিল বেকচিভ্ রেঞ্জার্সের সঙ্গে খেলা। একদিন বয়েল বললে, হাতি মস্ত দাঁতাল হয় বলেই তার নাম টাঙ্কার (মস্ত দাঁতাল হাতি) বয়েল। তবু কেউ কেউ বলে, লেডি বয়েল। ও সবসময়েই নখ কাটে কিনা।

আইলিনের লম্বা হাত, সাদা হাত, শীর্ণ হাত ; সেও মেয়ে কিনা তাই। হাতির দাঁতের মতো হাত, শুধু যা নরম, এরই নাম 'গজদন্তের মিনার', কিন্তু প্রটেস্টাণ্টরা বুঝতে পারেনা, ঠাট্টা করে! একদিন ও দাঁড়িয়েছিল আইলিনের পাশে, হোটেলের উঠোনের দিকে তাকিয়েছিল! একজন পরিচারক একটা খুঁদে পাখী ধরবার জন্য ছুটছিল, রৌদ্রঝলা লনে এদিক-ওদিকে ছুটছিল একটা ফক্স্-টেরিয়ার। আইলিন ষ্টিফেনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলে, তার নিজের হাতও রয়েছে সেখানে। সে অনুভব করলো তার স্পর্শ—কি হিম আর ক্ষীণ স্পর্শ—কোমল স্পর্শ। আইলিন বললে, পকেট নাকি ভারি মজার জিনিস; তারপর হঠাৎ সে সরে গেল। হাসতে হাসতে ঢালু পথ বেয়ে ছুটে চলে গেল। তার সুন্দর চুল নিশানের মতো খুলে গেল, উড়তে লাগলো, যেন তারা সূর্যের রেণু রেণু সোনা। রাজদণ্ডের মিনার, স্বর্ণমন্দির। ভাবতে ভাবতে বোঝা যায় তার অর্থ।

কিন্তু পার্কে কেন? যখন কাজ থাকে, তখনই তো ওখানে যাওয়া হয়। বড় বড় শ্লেটে ঢাকা, জল খুদে খুদে ফাটল দিয়ে দিন রাত ঝরে ; বাসি জলের অদ্ভুত গন্ধ, সোঁদা গন্ধ। একটা প্রস্রাবখানার দরজায় লাল পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকা। রোমান পোশাক পরা একটা দাড়িওয়ালা মানুষ, তার দু'হাতে হুঁট, আর নিচে আছে ছবির নাম :

বালবাস গড়ে দেয়াল।

কেউ এঁকে রেখে গেছে। অদ্ভুত মুখখানা, মজা লাগে। কিন্তু হুবহু দাড়িওয়ালা মানুষের মতো। আর একটা দরজায় সুন্দর অক্ষরে লেখা :

জুলিয়াস সিজার লিখেছে ক্যালিকো বেলি।

ঐ জন্যেই ওরা যায়, গিয়ে লেখে। কিন্তু আথি যা বললে, তাতো অদ্ভুত, আর কেমন করে বললে, ভাবতো! সে মাঠের দিকে আর সবার মতো তাকিয়ে রইলো, কেমন ভয় করছে।

অবশেষে ফ্লেমিং বললে,

ওদের জন্যে আমাদের সবাইকে শাস্তি পেতে হবে নাকি?

আমি আর আসব না, সিসিল থাণ্ডার বললে, তিনদিন খাবার ঘরে মুখটি বুজে থাকতে হবে, তারপর হড়ঘড়ি ছ'জন আটজন করে ডেকে ডেকে পাঠাবে।



হাঁ, ওয়েলস বললে, আমিও আসবো না।

এস, বিদ্রোহ করি, ফ্লেমিং বললে, কিহে, করবে নাকি?

সবাই চুপচাপ, স্তব্ধ হাওয়া, পাখী ডাকছে আরো আস্তে : পিক্, পক্…

ওয়েলস জিজ্ঞেস করলে :

ওদের কি হবে?

কি আবার হবে? সাইমন মুনান আর টাঙ্কারকে বেতোবে, আথি বললে। আর উঁচু ক্লাসের ছেলেদের বলবে : হয় বেত খাও, নয়তো ইস্কুল ছাড়।

ওরা কোনটা বেছে নেবে?

করিগান ছাড়া আর সবাই ছাড়বে ইস্কুল, আথি উত্তর দিলে, ওকে মিঃ গ্রিসন বেতোবে।

জানি, জানি, সিসিল থাণ্ডার বললে, ও ঠিকই করবে, আর অন্য ছেলেগুলো করবে ভুল। বেতোলে আর কি হয়, কিছুক্ষণ পরেই জ্বালা চলে যায়, কিন্তু ইস্কুল থেকে বার করে দিলে সারা জীবন ধরে থাকবে এই অপবাদ। তাছাড়া মিঃ গ্রিসন তো ওকে জোরে বেতোবেন না।

না বেতোলেই ভাল।

আমি কিন্তু সাইমন মুনান বা টাঙ্কার বয়েল হতে চাইনা, সিসিল থাণ্ডার বললে, তবে ওরা যে বেত-খাবে, একথা আমার বিশ্বাস হয় না।

না, না, জোর বেতোবে।

ওয়েলস গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে কঁকিয়ে উঠলো,

স্যার, আমাকে ছেড়ে দিন

আথি মুখ ভঙ্গী করে আস্তিন গুঠিয়ে বললে :

উপায় নেই, উপায় নেই—

বেত চলবে সাঁই সাঁই—

তাই ব্রিচেস তোল

পাছা তোমার খোল

সবাই হাসলে, তবু ষ্টিফেনের মনে হলো, সবাই ভয় পেয়েছে ; মৃদু হাওয়া, ধূসর হাওয়া—তারই নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। পাখী ডাকে, পক্। এখানে ওখানে ডাকে। শব্দ শুনতে পাচ্ছ, কিন্তু যখন পড়বে, ব্যাথা পাবে। পেঁদানির বেতখানায়ও শব্দ হয়, কিন্তু এমনি নয়। ছেলেরা বলে, তিমির হাড় দিয়ে তৈরী—আছে চামড়া মোড়া—ভিতরে আবার শিশের বার পোরা ; তাই তো কেমন ব্যাথা লাগে!

শব্দও আলাদা, লিকলিকে সরু বেত যেন শীস দিয়ে যায়, কেমন সে বেতের ব্যথা কে জানে! শিউরে উঠলো ষ্টিফেন, হিম হয়ে গেল। আথির কথায়ই বুঝি ভয় লাগছে। কিন্তু হাসবার কি আছে? শিউরি উঠলো সে। ট্রাউজার খুললে অমনি হয়। স্নানের পরে পোষাক খুললে হয়। কে খুলবে—খুলবে, না খুলে নেবে—ছেলেটি নিজে না মাষ্টার? কিন্তু এই নিয়ে ওরা হাসাহাসি করে কি করে?

আথির আস্তিন গুটানো হাতের দিকে সে তাকিয়ে রইল, হাতের মুঠোয় কালি মাখানো। মিঃ গ্রিসন কি করে আস্তিন গুটাবেন, সে দেখাচ্ছে। কিন্তু মিঃ গ্রিসনের আস্তিন তো ধবধবে সাদা, কব্জি

দুখানাও বেশ ফরসা, হাত মোটাসোটা, নখ লম্বা, ছুচোলো। হয়তো তিনিও লেডি বয়েলের মতো অমনি করে কাটেন। কি লম্বা আর হিংস্র নখ, কিন্তু মোটাসোটা সাদা হাত দুখানা হিংস্র নয়, ভদ্র মানুষেরই হাত। ঐ হিংস্র নখরের কথা ভেবে সে ভয়ে হিম হয়ে যাচ্ছে, আর ভাবছে, বেতের শীসের শব্দ, আর পোষাক ছাড়বার সময় সার্টের প্রান্তে যে হিমের ছোঁয়া লাগে। কিন্তু তবু কেমন ভাল লাগে ঐ মোটাসোটা হাতের কথা ভাবতে—ধবধবে ফরসা, দৃঢ় হাত ; ভদ্র মানুষের ঐ হাত দুখানা। সিসিল থাণ্ডারের কথা তার মনে পড়লো, মিঃ গ্লিসন করিগানকে জোরে বেতোবেন না। আর ফ্লেমিং বলেছিল···

বহু দূর থেকে স্বর ভেসে এল ;
সবাই জড়ো হও !
আবার মিলিত চীৎকার
জড়ো হও, জড়ো হও !

খাবার টেবিলে চুপচাপ সবাই খাচ্ছেন। আবার মিঃ ডেডালাস বললেন :

দিনটা ভালই ছিল। বহু বাইরের লোক এসেছে।

কারো মুখে রা নেই। তিনি আবার বললেন :

আর বছর বড়দিনে বোধহয় এর চেয়ে বেশী লোক এসেছিল।

চারদিকে তাকিয়ে দেখছেন। সবাই থালার ওপর নুয়ে পড়ে নিঃশব্দে খাচ্ছে। উত্তরের অপেক্ষায় কয়েক মুহূর্ত্ত কেটে গেল, এবার রুক্ষ স্বরেই বললেন :

আমার বড়দিনের ভোজটা কিন্তু মাটি হয়ে গেল।

যে বাড়িতে গীর্জার উপরে শ্রদ্ধা নেই, সেখানে ঈশ্বরের আশীর্বাদ কোথা থেকে মিলবে ? দান্তে বললেন।

মিঃ ডেডালাস সশব্দে ছুরি আর কাঁটা থালার উপর ছুঁড়ে ফেললেন।

শ্রদ্ধা ! তিনি বলে উঠলেন, শ্রদ্ধা ! কাকে শ্রদ্ধা করব—ঐ নাদাপেটা মানুষগুলোকে !

মিঃ কেসীর স্বরে বিদ্রূপ—গীর্জার ঐ যুবরাজদের করব শ্রদ্ধা !

ওরা ভগবানের গাড়োয়ান যে ! মিঃ ডেডালাস ঝাঁঝিয়ে উঠলেন।

দান্তে বলে উঠলেন, ওঁরা ভগবানের আশীর্বাদ-পুত, দেশের শ্রদ্ধাভাজন।

চর্বির পাত্র ! মিঃ ডেডালাস অভদ্র হয়ে উঠলেন। যখন গা এলিয়ে দেন, তখন সৌম্যমূর্ত্তি। কিন্তু যখন ব্যাকন আর বাঁধা কপি গেলেন—তখন কি রকম দেখায় ?

তিনি মুখ বিকৃত করলেন, ঠোঁট দিয়ে শব্দ করলেন। যেন চেটে চেটে খাচ্ছেন, চেটে-পুটে খাচ্ছেন সশব্দে।

দেখ সাইমন, ষ্টিফেনের সামনে অমনি করে বোলোনা। বলা ঠিক নয়। দান্তে উষ্ণ হয়ে উঠলেন, ও বড় হলে, এসব কথা ওর মনে থাকবে—ভগবানের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে, ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে ওর নিজের বাড়িতে বসে শুনেছে এই কথা।

মিঃ কেসী চেঁচিয়ে উঠলেন টেবিলের অন্যপ্রান্ত থেকে, ওর মনে থাকবে, কি করে ধর্মযাজক আর তাদের শিকারের দল পার্ণেলের বুক ভেঙে দিলে, কি করে তাঁকে কবরে পাঠালে ; যখন ও বড় হবে, একথা ওর যেন মনে থাকে।



কুত্তার বাচ্চা ওরা ! মিঃ ডেডালাস চেঁচিয়ে উঠলেন, যখন তাঁর দুঃখের দিন এল, ওরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে। নর্দমায় পড়া ইঁদুরের মতো ওরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললে। নীচু কুকুরের দল ! ওদের তেমনিই চেহারা। হাঁ, যীশুর দিব্যি—ওরা ঠিক তাই !

ওঁরা ঠিকই করেছেন, দান্তে পালটা চেঁচিয়ে উঠলেন। ওরা বিশপ আর ধর্মযাজকদের মানে। তাঁদের শ্রদ্ধা করে।

এতো বড় ভয়ানক কথা। বছরে কি একদিনও যাবে না, যখন এইসব সাংঘাতিক তর্ক বাদ যাবে। মিসেস ডেডালাস বলে উঠলেন।

চার্লস খুড়ো মোলায়েম স্বরে হাত তুলে বললেন, শোন, শোন আমরা কি নিজেদের মতামত না রেগে বলতে পারিনা। আর এই খারাপ কথাগুলো কি না বললেই নয়। এ কিন্তু ভারী খারাপ।

মিসেস ডেডালাস আস্তে আস্তে বললেন, কিন্তু দান্তে উঠলেন চেঁচিয়ে।

আমি কথাটি কইব না নাকি। আমার গীর্জে, আমার ধর্মকে অপমান করে যাবে ধর্মচ্যুত ক্যাথলিকগুলো—আর আমি চুপ করে শুনব !

মিঃ কেসী টেবিলের মাঝখানে থালাখানা ঠেলে সরিয়ে দিলেন। কনুইয়ে ভর দিয়ে তিনি গৃহস্বামীকে ভাঙা গলায় বললেন,

আরে, তোমাদের কাছে সেই বিখ্যাত অবমাননাকারীর গল্প বলেছি !

জন, কই বলনি তো, মিঃ ডেডালাস উত্তর দিলেন !

ভারি নীতিমূলক গল্প। এই যে, আমরা যেখানে আছি, এই উইক্‌লো এলাকারই গল্প।

তিনি থেমে দান্তের দিকে ফিরে বললেন। তাঁর স্বর ক্রুদ্ধ।

মাদাম, আমাকে যদি আপনি আঘাত করে থাকেন, আমি একথা বলতে পারি যে আমি স্বধর্মচ্যুত ক্যাথলিক নই। আমার বাবা, তাঁর বাবা, তাঁর বাবা যেমন ক্যাথলিক ছিলেন আমিও তেমন আছি। আমরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস বিকিয়ে দিইনি, দিয়েছি নিজেদের জীবন।

তাতে তো এখন আরো লজ্জিত হবারই কথা, দান্তে বললেন।

মিঃ ডেডালাস হেসে বললেন, গল্পটা বল জন। গল্পটা শুনতে চাই, আর কিছু নয়।

ক্যাথলিক না আর কিছু ! দান্তে বিদ্রূপ করে উঠলেন। আজ সন্ধ্যেয় যা শুনলাম, সবচেয়ে অধম যে প্রোটেস্টাণ্ট সেও ও ভাষায় কথা বলবে না।

মিঃ ডেডালাস মাথা দোলাচ্ছেন, পল্লী চারণের মতো গুণগুণানি উঠছে।

আপনাকে আবার বলছি, মিঃ কেসী রেগে উঠে বললেন, আমি প্রোটেস্টাণ্ট নই।

মিঃ ডেডালাস গুণগুন করছেন, মাথা দোলাচ্ছেন। নাকি-সুরে গান গাইছেন :

ওগো, ও রোমান ক্যাথলিকরা,
যারা প্রার্থনায় যাওনা—তারা এস

ছুরি-কাঁটা আবার তুলে নিয়েছেন, মনটা খুশি। খেতে খেতে মিঃ কেসীকে বললেন,

গল্পটা শুনি জন। এতে হজমির কাজ করবে।

( ক্রমশঃ )

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

২

প্রমীলার অমন অদ্ভুত বিকৃত গলার আওয়াজে পাড়ার অধিকাংশ লোক সচকিত হ'য়ে জেগে উঠলো। সুনির্মল হ্যাঁচকা টানে তাকে ঘরে এনে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। আলো জ্ব'লে উঠলো এবাড়ি ও-বাড়ি। জোড়া জোড়া উৎসুক চোখ তাদের অন্ধকার ঘরের দিকে নিবদ্ধ হ'লো। পাশের ঘরে অভি সীমন্ত ঘুম ভেঙে বসে ঘুষি পাকাতে লাগলো। নিচের ঘরে হিরণ্ময়ী ঈশ্বরের নাম নিলেন।

গলায় গলায় গুনগুনানি উঠলো, 'লোকটা বৌকে মারছে।'

'মাতাল যে। দেখছেন না কত রাত্তিরে বাড়ি ফেরে রোজ।'

'দেখতে তো যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না, তলায়-তলায় মিটমিটে ডান।'

'আরে মশাই, অসচ্চরিত্র হ'লে কি আর কোন জ্ঞানগম্যি থাকে?'

'এসব বদমাস লোক পাড়ার মধ্যে থাকতে দে'য়াই অন্যায়।'

'সে তো ঠিক কথাই।'

উল্টোদিকের বাড়ির এক যুবক সতেজে ডেকে উঠলো, 'ও মশাই শুনছেন? এটা ভদ্রলোকের পাড়া। বৌ কিলোতে হয় তো বস্তিতে যান, নইলে কিল কাকে বলে বুঝিয়ে ছাড়বো।'

স্ত্রীলোকের গলা থেকে পুরুষ, পুরুষের গলা থেকে স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক সকলের মধ্যেই একটা কথার লোফালুফি চললো কতক্ষণ। তারপর একসময় আলো নিবলো। পরোপকার ক'রে সকলে আবার নিশ্চিন্ত নিদ্রায় নিমগ্ন হ'লো।

ঘুমিয়ে পড়তে প্রমীলারও দেরী হ'লোনা খুব। কেবল খাঁচার বাঘের মতো সুনির্মলই বাইরের ছাদে অন্ধকারে এমাথা ওমাথা পাইচারি করতে লাগলো। রাগে, দুঃখে, লজ্জায়, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করলো তার। হঠাৎ ভোর-ভোর সময়ে কী ভেবে দৌড়ে নিচে নেমে এসে হিরণ্ময়ীর দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলো, 'মা'।

'বাবা।' হিরণ্ময়ী ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খুলে দিলেন। সুনির্মল ভেতরে এসে বসলো, বললো, 'তোমার গয়নার বাক্সে কী-কী ছিলো মনে আছে?'



'আছে। কেন রে?'

'বলো তো।'

হিরণ্ময়ী বললেন।

'পুলিশ এসে জিজ্ঞেস করলে ঠিকঠাক মতো সব বলতে পারবে তো?'

'তা পারবো, কিন্তু এতদিন পরে—'

'তুমি বলবে কবে চুরি গেছে জানো না, টের পেয়েছ কাল রাত্রে।'

হিরণ্ময়ী আশ্চর্য চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'কী দেখছো? কী ভাবছো? কিছু ভেবোনা। আমি সব জানি, কে নিয়েছে তার নাম ধাম ঠিকানা সব আমার মুখস্ত। তুমি শুধু ঠিকমতো ব'লে যেয়ো সব।' সুনির্মল বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বেলা প্রায় ন'টার সময় দু'জন পুলিশের ভদ্রলোককে নিয়ে বাড়ি ফিরলো সে। প্রথমেই তারা হিরণ্ময়ীর ঘরে এলো। হিরণ্ময়ী বসেছিলেন চুপ ক'রে মাটিতে হাতের ভর রেখে। দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে মাথার আঁচল তুলে দিলেন। সুনির্মল বললো, 'তুমি বোসো মা, এঁরা যা জিজ্ঞেস করবেন তার ঠিক ঠিক জবাব দাও।'

কথাবার্তা একজন ভদ্রলোকই জিজ্ঞেস করলেন সব, আরেকজন দাঁড়িয়ে রইলেন বাইরে।

কী কী গয়না ছিলো, নগদ টাকাও ছিলো কিনা, কী ধরণের বাক্স, বাকসের বিশেষত্ব কী, গয়নাগুলোর কোনটার কী নাম, চাবি কার কাছে ছিলো, কখন টের পেলেন ইত্যাদি ইত্যাদি—সব কিছুরই যথাযথ জবাব দিলেন হিরণ্ময়ী। কেবল 'কাকে সন্দেহ করেন' এই কথাটির জবাব সুনির্মল নিজে দিল।

'আমার স্ত্রীকে।'

'স্ত্রীকে! আপনার স্ত্রীকে!' ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে ভালো ক'রে তাকালেন সুনির্মলের দিকে। হিরণ্ময়ী স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীকে।' বিনা দ্বিধায় চোখে চোখে তাকিয়ে জবাব দিল সুনির্মল

'তিনি কোথায় থাকেন?'

'এ—বাড়িতেই।

'বরাবরই এখানে আছেন, না মাঝখানে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'বরাবরই আছেন।'

'কী কারণে তাঁর প্রতি আপনার এই অদ্ভুত সন্দেহ জন্মালো?'

'আমি দেখেছি।'

'দেখেছেন ?'

'হ্যাঁ।'

'যদি দেখেই থাকেন তা হ'লে তখন কেন ধরলেন না ?'

'বুঝিনি।'

'মানে।'

'আমার স্ত্রীর বাবা আর আমার স্ত্রী দু'জনে মিলেই এই চুরি করেছে। তারা আমার ঘরে ব'সে কথা বলছিলো, হঠাৎ আমি ঘরে ঢুকতেই—দু'জনে চমকে উঠলো। আমি দেখলাম আমার শ্বশুর তাড়াতাড়ি তার সিল্কের চাদরের তলায় বাক্সটি লুকিয়ে ফেললেন এবং আমার সঙ্গে ভদ্রতাসূচকও কোনো কথা না বলে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন। আমার মনে হলো উনি ভয় পেয়েছেন এবং কিছু চুরি করেছেন।

'এটা কদ্দিন আগের ঘটনা ?'

'বেশ অনেক দিন আগে।'

'তারপরে টের পেলেন কাল ?'

'হ্যাঁ।'

'এর মধ্যে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে সে বিষয়ে কোন কথা হয়নি ?'

'না।'

'তখন কি বাক্সটি দেখেছিলেন।'

'সম্পূর্ণ ভাবে দেখিনি, এবং এও বুঝিনি যে ঐটিই এই গয়নার বাক্স। কেবল এটা বুঝেছিলাম একটা বাক্স এবং সেটা আমাকে দেখেই লুকিয়ে ফেললেন। কাল রাত্তিরে যখন আমার মা টের পেলেন তখুনি আমি বুঝতে পারলাম সেইবাক্সই এই বাক্স।'

'তা হ'লে সেই সন্দেহের উপর ভিত্তি করেই আপনি আপনার স্ত্রীকে সন্দেহ করছেন ?

'হ্যাঁ। শুধু সন্দেহ নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস।'

এরপরে ভদ্রলোক আরো দু' একটা কথা জিজ্ঞেস্ ক'রে বাইরে এলেন। সারাবাড়ি ঘুরেটুরে এলেন দোতলায় প্রমীলার ঘরে।

কালরাত্রে অনেক ঝক্কি গেছে শরীরের উপর দিয়ে। উঠতে আজ দেরি হ'য়েছিলো প্রমীলার। প্রাত্যহিক নিয়মে একবাটি দুধ আর জিলিপি খেয়ে ( এটা তার বাপের বাড়ির অভ্যাস ) সবে সে ঢেঁকুর তুলে নিচে আসবার জোগাড় করছিল, অপরিচিত লোক দেখে থমকে দাড়ালো।

'ইনিই আপনার স্ত্রী ?'



'হ্যাঁ।'

'একেই সন্দেহ করেন ?'

'হ্যাঁ।'

প্রশ্ন শুনে প্রথমটা প্রমীলা বুঝতে পারলোনা ব্যাপারটা, একটু পরেই—তার কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম দেখা দিল, যেন একটা দুরন্ত অস্থিরতা নেমে এলো সারা শরীরে, তারপর হঠাৎ ধপ্ ক'রে বসে পড়লো মেঝের উপর। আচমকা কপাল চাপড়ে কেঁদে উঠলো আর্ত্তনাদ করে। যত প্রশ্ন করলো ভদ্রলোক একটিরও জবাব দিলনা সে। কেবল মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে বিলাপ করতে লাগলো : 'আমার অদেষ্টে এ-ও ছিলো শেষে। স্বামী হয়ে ঘরের বৌকে তুমি চোর বলে তাড়াতে চাও। চরিত্র খারাপ হ'লে কি মানুষ এত অমানুষ হ'য়ে যায়, বাইরের স্ত্রীলোকের পাল্লায় পড়লে কি মানুষের আত্মা ব'লেও কিছু থাকেনা। আমিতো তোমার কাছে আর কিছুই চাইনা, কেবল একটু প'ড়ে থাকতে চাই এইখানে, এই ভিটেতে—সেটুকুও কি এত অসহ্য যে তার প্রতিশোধ নিতেই এমন ক'রে তাড়াবার মতলব করলে মা-ব্যাটায় মিলে ?'

স্ত্রীর অভিনয় দেখে সুনির্মল স্তব্ধ।

গাড়ীর পাদানিতে পা দিয়ে ভদ্রলোক একটু টিট্‌কিরি দিলেন : 'স্ত্রীকে চোর প্রমাণ ক'রে হাজতে দিলে কি আপনার খুব সম্মান বাড়বে ?'

'সেটা আমার দেখবার কথা, আপনাদের নয়।'

'সেতো ঠিকই। কিন্তু ধরুন আপনার স্ত্রী যদি নিয়েই থাকেন, সেটাকে চুরিই বা ধরছেন কেন ? আপনার সম্পত্তি আর ওঁর সম্পত্তি তো আলাদা নয়।'

'ওটা আমার সম্পত্তি নয়। আমার মার। উনি না দিলে সেটা নেবার কারো কোনো অধিকার থাকেনা।'

'হু। কিন্তু কোথায় তা হোলে জিনিষগুলো থাকতে পারে বলে আপনার ধারনা ?'

'এঁর বাবার বাড়ি দমদম। আমি জানি সেখানে সার্চ করলে জিনিষগুলো পাওয়া যেতে পারে। ভদ্রলোকের নাম যজ্ঞেশ্বর মজুমদার, কনট্রাকটারি করেন।'

গাড়ির ভিতরে ঢুকে ভদ্রলোক দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। গাড়ি ছেড়ে দিলো। নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুনির্মল।

৩

একটু পরে আস্তে এসে পিঠে হাত রাখলেন হিরণ্ময়ী। হাত ধ'রে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'খুলে বলতো তুই কী ভেবেছিস্।'

'ঠিকই ভেবেছি।'

'কী ঠিক ?'

'তুমি কি কিছুই বোঝোনি ?'

'না।'

'তবে শোনো। ও-গয়না প্রমীলা আর প্রমীলার বাবাই চুরি করেছে। আমি ওদের ধরিয়ে দেব।'

'ছি।'

'হ্যাঁ।'

'এতদিন পরে এ তোর কী দুর্মতি ?'

'নিজের স্ত্রীকে, বিশেষত একজন মেয়েকে, জেনেও বুঝেও চোর বলে পুলিশে দিতে এতদিন আমার লজ্জায় আটকাচ্ছিল, ভদ্রতায় আটকাচ্ছিল, কিন্তু আজকের দিনে আমি ভেবে দেখছি এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার আমার এই একমাত্র আশা।'

'আমার একটা কথা শোন—'

'তোমাদের অনেক কথা শুনেছি, অনেক ভালো তোমরা আমার করেছ। আজ থাক। আজ আমার প্রাণ বাঁচাবার তাগিদের চাইতে অন্য কিছুই বড়ো নয়।'

একথায় কোথায় ব্যথা পেলেন হিরণ্ময়ী—একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন : 'মান সম্মান, পারিবারিক কলঙ্ক—'

'না, না, না। ওসব তুমি রেখে দাও শিকেয় তুলে। কোনো কথা আমি শুনবোনা।'

'এই কি তোর মুক্তির উপায় ?'

'জানিনে। কিন্তু এই আমার একমাত্র উপায়।'

পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন হিরণ্ময়ী—'শোন।'

'কী।'

'এমনিতেই অশান্তির শেষ নেই—তাকে আর বাড়তে দিসনে। তুই পারবিনে এসব। কোথাকার জল শেষে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। জাল, জোচ্চুরি, মিথ্যেকথা কিছুই তো এদের আটকায় না।'

প্রায় ছুটতে-ছুটতে সুনির্মলের ছোটো ভাই এসে দরজায় দাঁড়ালো, 'দাদা, বৌদি যেন কোথায় চলে গেলেন।'

'কে ?' হিরণ্ময়ী চকিতে দরজায় অভির দিকে তাকালেন।

'বৌদি। আমি মোড়ের চায়ের দোকানে বসেছিলাম, উল্টোদিকের ফুটপাতে তাকিয়ে



একটা ট্যাক্সির মধ্যে বৌদি আর বৌদির ঝি, ড্রাইভরের পাশে, ছ'নম্বর বাড়ির পরেশবাবুর ছোটো ভাই—সেই ভ্যাগাবণ্ড নরেশটা।'

হিরণ্ময়ীর নিঃশ্বাস বড়ো হ'য়ে উঠলো। সহসা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠলো সুনির্মল : 'ঠিক! ঠিক হয়েছে। তুই নিজের চোখে দেখেছিস্ ? আর কেউ দেখেছে ? ক' জন দেখেছে ?'

দাদার প্রশ্নে অবাক হ'লো অভি, বললো, 'আমরা সবাইতো প্রায় দেখেছি।'

'কী, নাম কী তাদের ? দরকার হ'লে তারা সাক্ষী দিতে পারবে কোর্টে ?'

'সাক্ষী !'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাক্ষী। বলবে ট্যাক্সী ক'রে একটা নামকরা বদমাসের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে দেখেছে স্ত্রীলোকটাকে—'

'ছী।' হিরণ্ময়ীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে যেন ধিক্কার নিয়ে শব্দটা বেরিয়ে এলো, 'শেষে তুই এখানেও নেমে এলি ? এতোবড়ো মিথ্যেতে ?' হাতে মুখ ঢাকলেন তিনি। মুখ সুনির্মলও ঢাকলো। শান্ত সুস্থির গম্ভীর মানুষটি সহসা ফুঁপিয়ে উঠলো ছেলেমানুষের মতো : 'আমি বাঁচতে চাই মা, বাঁচতে চাই।' অভি ধীরে দোতলায় উঠে এলো। প্রমীলার ঘরের দরজায় এতবড়ো তালা। সেখানে একটা লাথি মারলো অকারণে। ফিসফিসিয়ে অত্যন্ত গর্হিত একটি শব্দ উচ্চারণ করলো, তারপর মনে মনে বললো : 'ইঃ, ছি না ছি। মার আবার বাড়াবাড়ি। 'ঐরকম মেয়েগুলোকেতো ঐরকম ক'রেই মাথার চুল ন্যাড়া ক'রে ঘোল ঢেলে তাড়াতে হয়। পাজী—'

হিরণ্ময়ী মাটিতে চোখ রেখে বললেন, 'যজ্ঞেশ্বরবাবু কি এতই বোকা যে অতগুলো গয়না তার নিজের ঘরেই রেখে দিয়েছেন। সার্চ করলে কি পাওয়া যাবে ? আর যদিও যেতো প্রমীলা পুলিশের অনেক আগে গিয়ে সেসব সরিয়ে ফেলবে।'

সুনির্মল হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো মার দিকে : 'তবে ও সেজন্যেই গেল ?'

'খুব সম্ভব।'

প্রচণ্ড তেজ বুকে নিয়ে দুপুরের সুতীব্র রোদ থমকে রইল আকাশের বুকে। উনুনের আগুন ছাই হ'য়ে গেল। পুলিশ এসেছিলো, সে-খবর বাতাসের বেগে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়লো পড়ায়। চাকরটা ভয় পেয়ে পালালো, প্রতিবেশীরা তাজ্জব হ'লো, অভি সীমন্ত কোথায় গেল, কী খেল খোঁজ রইলোনা, অভুক্ত সুনির্মল আর সুনির্মলের মা দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে ব'সে রইলো অভিভূতের মতো।

( ক্রমশঃ )

# ফসিল

## সত্যপাল

বল্‌তে বল্‌তে থেমেছেন মিষ্টার সেন। পাশের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছেন থেমে থেমে। অ্যাশট্রেতে-রাখা নিভে-যাওয়া চুরুটে টান দিয়েছেন বার বার। দেশলাই জ্বেলেছেন চুরুটের মাথার ছাই ভেঙে দিয়ে। ঘরের অস্পষ্ট অন্ধকার ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে দেশলাই এর লালচে আলোয়। মোমবাতি গলে যাওয়ার পট্ পট্ শব্দ, প্রত্নতাত্ত্বিক মিষ্টার সেনের রক্ষিত কালো পাথর, ফসিলের টুক্‌রো। শিলালিপির ভাঙাচোরা, ঘরের মধ্যের স্তব্ধতা ভেঙে যাওয়ার দেশলাই শব্দ, সব কিছু মিলে যেন বলে দিচ্ছে মিষ্টার সেনের ভাবী অকথিত কথাগুলো।

"ওহো, রাত দশটা, I'm sorry, Mr. Bose ; আপনাকে অনেকক্ষণ আটকে রাখলাম।"

"না, না, কিন্তু সবটা যে শোনা হোল না।"

"ওহো, It's a trifling matter, dead past ; black fossil. অন্য একদিন শুন্‌বেন্। চলুন, আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"আপনি বিশ্রাম করুন, এটুকু রাস্তা আমি যেতে পারবো নিজে, আচ্ছা নমস্কার।"

চিন্তার সূত্র হরিয়ে ফেলেছি। মনি যেন কখন এসে চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, বল্‌ছে "বাইরে ঠাণ্ডা হাওয়া, ঘরে চলো।" তাও ঠিক স্পষ্ট শুন্‌তে পাইনি, ছোট ছোট বাতাসের শব্দই যেন মনে হোয়েছে। সহরতলীর অন্ধকার আস্তে আস্তে জমা হোয়েছে। চোখের সাম্‌নে থেকে সব আলো যে কখন নিভে গেছে, ঠিকানা তার পাইনি। পাশের ছোট্ট কাচের পেগ্ পাত্রটি, মনে হয়েছে, কে যেন উবু হোয়ে বসে "নাও, নাও, তুলে নাও" বলে অনুযোগ করেছে। দূরের গ্যাসের আলোর চোখগুলো ঝাপসা। চলন্ত লাইট ট্রেন চলে যাওয়ার ধ্বনি এলো, ওর ঢং ঢং সঙ্কেত শব্দগুলোকে মনে হলো যেন দূরের ঐ ভাঙা রংচটা গির্জার মাথায় ঘণ্টা পড়্‌ছে অবিরাম। নৈশ নৈঃশব্দ্য ভেঙে চুরমার হোয়ে গেল খান্ খান্, আর যেন কালো পোষাকপরা মানুষগুলো মাথা নীচু করে এগিরে চলেছে কফিন অনুসরণ করে কবরখানার দিকে।

"বাবু, রাত অনেক হোয়েছে, আপনার খাবার দেবো?" কোন উত্তর না পাওয়ায় বিরক্তির একটা শব্দ যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। রঘু চলে গেছে। ছোট খাটো অনুভূতি, ভাব, ভাবনা, কত জটিলতা, মনের বিচিত্র ভঙ্গী যেন আজকের অন্ধকারের নীচে চাপা



পড়লো। স্তরে স্তরে জমা হোল আরো অন্ধকার। ফসিলের রূপ নিলো তারা। ছাপ রয়ে গেল অন্ধকারে।

ফসিলের পর ফসিল ঘাঁট্‌লাম। পেলাম কী? প্রিহিষ্টোরিক যুগের মন? তার বুকের ছাপ? কত পাথরের বুকে তৈরী হোয়েছে স্তরীভূত শিলা, কত কোয়ার্টজের শুক্‌নো রুক্ষ চেহারা চাপা রয়েছে শিলালিপির ভেতর? শিলালিপি—ইতিহাস—একটার পর একটা সাজিয়ে বিস্মৃত যুগের মানুষকে চোখের সামনে তুলে ধরা, তার মনের জটিলতার মধ্যে হারিয়ে যাওয়া। হারিয়ে যে একেবারে যাওয়া যায় না, আমারি বর্তমান যে পিছু টানে।

গীটার বাজানো বন্ধ ক'রে বলি, "কখন এসেছো, তুমি?" কথাগুলো যেন গীটারের শেষ ঝঙ্কারের মত মনে হয় আমার নিজেরই। ও নড়েচড়ে বস্‌লো, একটু ঝুঁকে এলো যেন ওর শরীর, ঠোঁট দু'টো একটু কেঁপে উঠলো, চোখের কোণদুটো একটু টান্ টান্ হোল। মনে হোল ওযেন বল্‌তে চাইলো, "তুমি বাজাচ্ছিলে, তাই ডাকিনি।"

"তুমি কি কাল চলে যাবে মুঙ্গের, শুধু ফসিল, আর কালো পাথর খুঁজে বেড়াবে?" যেন অনেকগুলো কথা ব'লে ফেলেছে মনি। শেষের কথাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে, হাঁপিয়ে উঠেছে সে। ছোট ছোট ঘামের বিন্দু দেখা দিয়েছে কপালে, চোখের নীচু পাতার নীচে।

উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি মনি, ডাক দিলো রঘুকে, "তোমার রান্না হোয়েছে রঘু?"

"হ্যাঁ, দিদিমনি," নীচে থেকে সাড়া এলো।

"আচ্ছা।"

কোল থেকে গীটার তুলে নিয়ে বলে, "এখনো কি ছেলে মানুষ আছো, বলোত? রাত কটা হোয়েছে, খেয়াল আছে? যাও, মুখ হাত ধুয়ে এসো।" মনি নীচে নেমে গেল।

খেতে এসে বসে বল্‌লাম, "কই, তোমার খাবারটা ত আন্‌লে না?"

"থাক্, খুব হোয়েছে। কী রান্নার রং, রঘুর ; রান্না করে করে বুড়ো হোয়ে মরতে চললো, এখনো রাঁধতে শিখ্‌লো না"

কেন শুধু শুধু মনি রঘুর উপর রাগ করছে। এই রকমই ত রঘু চিরকাল রাঁধছে, বেশ আছি আমি।

হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি আমার বিছানায় একটা নতুন বেডশিট্, বালিশের ঝাড়ন পালটানো, মাথা নীচু ক'রে মনি আড়্‌লে কী যেন একটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করছে বিছানার ধারে বসে।

"কী ওটা?"

"কিছু না, ওটা কিছু না" বলে উঠে পড়ে মনি। "তুমি শোও, আস্‌ছি আমি।" ঢুকে পড়ে সে পাশের ঘরে।

সব কিছু যেন অস্পষ্ট, মোমবাতিটা ঠিক আগেরই মতন পট্ পট্ শব্দ করছে। আমার ঘরের পাশে মিউজিয়ামে কী করছে মনি ?

ঠিক বুঝতে পারিনি ওকে। ঠিক এমন দিনটি যেন এসেছিলো দু'বছর আগে যখন মনি ছিল ডেহেরি অন্ শোনে বাবার কাছে, যখন ডাক দিয়েছিলো—

"বিহারের শীতটা উপভোগ ক'রে যাও একবার, সুব্রত। এখানে শীতের কাঁপুনির সঙ্গে সঙ্গে পাবে প্রতি সকালে যত খুশী চায়ের কাপ। ও, ভুলেই গিয়েছিলাম, তুমি ত চা ঠাণ্ডা ক'রে খাও। এখন বলবো না, বলবো না ডেহেরি অন্ শোনএর প্রাগৈতিহাসিক তথ্য। হয়তো এই পাথুরে জায়গায় কত ফসিলের বুকে কত ব্যথা চাপা আছে। তুমি খোঁজ নেবে না ?"

মনির সেদিনের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারিনি। নতুন জায়গায় ঘুম আসেনি। বিছানা থেকে উঠে পায়চারি করতে হোয়েছে আকাশ আর মাটির দিকে চোখ রেখে।

আজকের রাত্রিতেও কি সে-আকাশ আসতে পারে সেই রূপ নিয়ে ? সেই ছায়াপথ, নীহারিকা বুকে নিয়ে ?

একটা জ্বলন্ত নক্ষত্র যেন খসে পড়েছিলো সেদিন রাত্রিতে। শীতের কুয়াশা অস্পষ্ট। দূরের শালবনটা যেন জমাট আঁধার। ঐ অন্ধকারের মাথা ছাড়িয়ে কী যেন সেটা ছিলো? বিকেলে মনি বলেছিলো হয়তো, "পাঠান রাজত্বের কী-যেন একটা মিনার, প্রতি রাত্রিতে নাকি ওখানে শিশুর কান্না ওঠে।" বলে হেসে উঠেছিলো মনি বিকেলের চা খেতে খেতে। হয়তো এমনি কত শত ইতিহাস উপকথা জড়িয়ে আছে তাদের নিয়ে, যারা হ'য়েছে আজ অতীত। কী ছিলো তাদের বর্ত্তমানে? ঠিক আমার বর্ত্তমানেরই মতন কি ? ঘুমভাঙা পাখী একটা কাছের শিশুগাছে পাখা ঝটপট ক'রে উঠেছিলো। হয়তো ভয় পেয়েছিলাম সে রাত্রিতে।

"কি, তুমি যে ঘুমোও নি ? অচেনা জায়গা, তাই হয়তো ঘুম আসছেনা, না ?" বলে সরে এসেছিলো মনি। আমার হাতটা নিজের হাতে কখন টেনে নিয়েছিলো।

"তোমাকেও ত ঐ একই প্রশ্ন করতে পারি আমি ? কিন্তু তোমার ত নতুন জায়গা নয়, মনি ?"

কী যেন বলতে গিয়েছিলো সেদিন রাত্রিতে। বলা হয়তো হয়নি। শীতের হাওয়ায় যেন কথাগুলো কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো। দূরের মস্‌জিদের আজান-ধ্বনি এসে তার



কথাগুলো কেড়ে নিয়েছিলো; কত করুণ, কত ক্ষীণ, যেন কতদূর থেকে আস্‌ছে, যেন কতদূরে পৌঁছুচ্ছে তার আবেদন, তার কান্না—বেহেশ্‌তের দ্বারে।

মনি তাকালো আমার দিকে, হঠাৎ আমার হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে রাগের স্বরে বলে উঠেছিল—, "দেখলেত ভোর হোয়ে এলো, যাও শিগ্‌গির যাও, ঘুমোও গে।" বলে সে চলে গিয়েছিলো।

কোথায় যেন মিল রয়েছে তার, মনির আজকের এই আবরণের মধ্যেও।

পাশের ঘরে আমার ছোট্ট মিউজিয়ামে গেলাম। দেখি মনি উবু হোয়ে আছে টেবিলে মাথা নীচু ক'রে। কী যেন একটা দু'হাতে আঁকড়ে আছে।

"মনি," ধীরে ধীরে হাতটা রাখি তার মাথায়, চুলের মধ্যে আঙ্গুল বুলিয়ে দিই। চাপা কান্না তার ফুলে ফুলে ওঠে।

"কী হোয়েছে, মনি, মুখ তোল।"

কী যেন হারিয়ে ফেলেছে মনি। না, কিছুই ত হারায়নি সে। ওর অতীত বর্তমান হোয়েই ত আছে। অতীতের মন নিয়েই হয়তো ও বেঁচে আছে।

মনি মাথা নীচু করে আছে টেবিলের দিকে তাকিয়ে। দেখি সেই মিশকালো পাথরটা যার মাঝখানে এককণা লাল রং উঠে এসেছে কুণ্ডলী পাকিয়ে—ছোট্ট লাল বিন্দু।

ও বলেছিলো, "না না সুব্রত ফেলে দাও ওটা, ওতে যে রক্ত লেগে রয়েছে—দেখ্‌ছোনা ?"

"দেখনা কত সুন্দর পাথরটা" ওর চোখের সামনে তুলে ধরেছি।

"চাইনা, চাইনা।" ছিট্‌কে পড়েছে মনি। ছুটে গিয়ে মুখ ঢেকেছে দু'হাতে কাছের গ্রেনাইট পাথরটার 'পর বসে।

"হোল কি তোমার, মনি ? কত মূল্যবান পাথর এটা।"

"রেখে দাও তোমার মূল্য। তোমার মতন আমি কালো পাথরের দাম খতিয়ে দেখতে বসিনি। শুধু পাথরের নেশায় তোমায় পেয়েছে, দেখছোনা ওটা পাথর নয়, জমাট রক্ত যেন। হতে কি পারেনা ?" বলে ছিনিয়ে নিয়েছে আমার হাতের থলিটা, ছড়িয়ে দিয়েছে আমার সঞ্চিত পাথরগুলো চারধারে, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে থলিটা দূরে।

মনের এ বিচিত্র রূপের সন্ধান কে রাখলো ডেহোরি অন্ শোন্‌এর শালবনের আড়ালে যা ঘটে গেল। তবুও সে রূপ যেন পাক্ খেয়ে খেয়ে চোখের সামনে ঘূর্ণির মত উঠে এলো। চলন্ত মনের পাল গেল ছিঁড়ে। অশান্ত বাতাসে টলমল করে উঠলো হৃৎপিণ্ড।

জানি না, কতক্ষণ বসে ছিলাম ওর পাশে নির্বাক হোয়ে। একটা দমকা বাতাস নাকি বয়ে গিয়েছিলো। পড়ন্ত বেলার কৃপণ আকাশে এক মুঠো লালচে আলো এসে পড়ে ছিলো হয়তো পূবের সাদা মেঘটার 'পর।

"তুমি রাগ করলে, সুব্রত!" বলে কুড়োতে গেল ছড়ানো পাথরগুলো। ফিরতি পথে মনি কথা কয়নি কিছু, তাই যেন মনে হয়।

রাত্রিতে খাবার পর ঘরে এসে বলেছিলো "কালই তুমি চলে যাও, সুব্রত।"

ফিরে আসবার সময় দেখা হয়নি মনির সঙ্গে। ও নাকি ব্যস্ত ছিলো। চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলো ষ্টেশনে থার্মোফ্লাস্কে গরম চা, টিফিন কেরিয়ারে কিছু খাবার।

"মনি, রাত যে এগারোটা বাজলো। বাড়ী যাবে না তুমি? রঘু পৌঁছে দিয়ে আসবে?"

"থাক্ আমি নিজেই যেতে পারবো।" উঠে পড়ে মনি।

শহরতলীর পাড়া নিস্তেজ হোয়ে গেছে দশটা পনের মিনিটের মধ্যে। মাঝে মাঝে রাত্রি যেন তার নিঃসঙ্গতা সহ্য করতে পারেনি। দেবদারু গাছ পরিচিত পাখীটার ডানার শব্দ পাঠিয়ে দিল। কুয়াশা জমা হোয়েছে মাটির বুক ছুঁয়ে। ক্রমে ক্রমে পাতলা পাতলা হোয়ে গেছে উপরে। অস্পষ্ট আলো তারাগুলোর। লালচে হলদে আলো। জলাটার পাশে আলেয়ার আলো। মাঝে মাঝে পথে রিক্সা চলার ঠুং ঠাং শব্দ, শব্দ ক্ষীণ হোতে ক্ষীণতর হোয়ে গেল। কেমন যেন অস্পষ্ট অতীত এরা। এরাও যেন বর্তমান নয়। হাতের আঘাত লেগে পাশের ছোট্ট গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ককিয়ে উঠে ছিটকে পড়লো পানীয় পেগ চারধারে।

কেমন যেন একটা তন্দ্রার আচ্ছন্নতা থেকে উঠে দাঁড়ালো সুব্রত ঈজিচেয়ার ছেড়ে। সামনে অনাসক্ত চোখ দু'টো রাখতে হোল। লাল মদগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে। ভালই হোয়েছে, মণি আজ সত্যিসত্যিই আসেনি। এলে ত দেখতে পেতো কাচের টুকরোর মতোই সুব্রতর এই বর্তমান। যা যত শিগ্‌গির অতীত হোয়ে যায় ততই যেন তার আনন্দ। তবু এই বর্তমানে পেছন ফিরে সে ত্রস্ত পায়ে সবুজ কাচের আস্ত জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো।

# সাহিত্য-বিচার

## কল্লোলযুগের কথাসাহিত্য

আগামী কাল ঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র। আড়াই টাকা।
প্রাচীর ও প্রান্তর ঃ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। তিন টাকা।
ডবল ডেকার ঃ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। তিন টাকা।
অঙ্গার ঃ প্রবোধকুমার সান্যাল। তিন টাকা।

বাংলা কথাসাহিত্যের দরবারে এখন যাঁরা ওস্তাদ শিল্পী ব'লে মোটামুটি গৃহীত হ'য়েছেন, তাঁদের অধিকাংশের নাম ও রচনা পুরাণো কল্লোলের পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা খুঁজে নিতে পারি। অবিশ্যি কল্লোলগোষ্ঠীর সাহিত্যিকেরা একদিন যতটা গর্জন ক'রেছিলেন, ততটা বর্ষাণনি; যেহেতু তাঁদের তৎকালীন রচনায় সেদিন যতটা ছিল পাড়ামাতানোর অদম্য কামনা, মহৎ সৃষ্টির প্রতি ততটা নিষ্ঠা ছিলো না। মানবীয় হৃদয়ের আবেদন না, শিল্পকুলতার ধৈর্যসহ পরিশ্রম ও প্রেরণা না—কেবলমাত্র পূর্বসূরীদের লিখনপদ্ধতি ও বাচনভঙ্গীর সঙ্গে অসহযোগ ঘোষণা—এমনি একটা হাল্কা ধরণের আন্দোলন নিয়ে সেদিন সাহিত্যের রাজপথে নেমেছিলেন নরেশ সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মানস-সহযাত্রীরা। ফলে বহুদিন ধ'রে কথাসাহিত্যিক হিসেবে এক প্রেমেন্দ্র মিত্র ছাড়া কল্লোলগোষ্ঠীর অন্যান্য প্রায় সকাই যেসব গল্পকাহিনী রচনা ক'রে গিয়েছিলেন, কালের বিচারে তাদের ক্লাশিক সাহিত্য ব'লে ঘোষণা করা কয়েক যুগ পরে কেন, এখনই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

তবু, কল্লোলের পাতায় এমন কিছু পাঠযোগ্য গল্প উপন্যাস কবিতা-রচনা ক'রতে না পারলেও কল্লোলগোষ্ঠীর বহু সাহিত্যিক শেষ পর্যন্ত মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন। হয়তো একাদিক্রমে দিনের পর দিন অক্লান্ত কলম চালনায় এ-সুফল ঘ'টেছে···হয়তো শুধু মাত্র বিদ্রোহেই যে সৃষ্টির ফসল ফলে না, দেরীতে হলেও এ সত্য তাঁরা হৃদয়ঙ্গম ক'রেছেন। ফলে বাংলা উপন্যাস, গল্প, কবিতা—সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ রচনায় কল্লোলগোষ্ঠীর একজন না একজনের স্বাক্ষর খুঁজলেই চোখে প'ড়ছে।

উদাহরণ দিচ্ছি। বাংলাভাষায় লেখা একটি সার্থক উপন্যাস সম্ভবতঃ 'পদ্মানদীর মাঝি।' তারপর মাণিকবাবুই লিখলেন প'ড়ে চ'মকে ওঠার মতো সেই জীবনধারণের কাহিনী—'পুতুলনাচের ইতিকথা'। বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' ও 'পথের পাঁচালী' এবং তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' পাঠযোগ্য ভালো উপন্যাস নিশ্চয়ই। কিন্তু সবার চাইতে ভালোলাগা, সবচেয়ে নতুন বাংলা উপন্যাস সম্প্রতি রচনা ক'রেছেন কল্লোলগোষ্ঠীর একজন, বুদ্ধদেব বসু—'তিথিডোর'। চরিত্রচিত্রণ ও নিয়তিলেখনের অপূর্ব দক্ষতায় 'পুতুলনাচের ইতিকথা' যেমন বাংলাসাহিত্যে আজো একক, তেমনি একেবারে ত্রুটীহীন রচনা না হ'লেও বর্ণনার মাধুর্যে, মননশীলতার অবগাহনে আধুনিক বাংলাসাহিত্যে 'তিথিডোর' এক নতুন দিনের ঘোষণা।

ছোটগল্পের কথায় আসা যাক। রবীন্দ্রনাথ--প্রমথ চৌধুরী—অবনীন্দ্রনাথ—প্রেমেন্দ্র মিত্র—

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—সুবোধ ঘোষ—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। অন্ততঃ দু'জন কীর্তিমান লেখক কল্লোলগোষ্ঠী থেকে এসেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা স্বতন্ত্র; তিনি প্রথম থেকেই ছোট গল্প-রচনায় অত্যন্ত কুশলী শিল্পী; তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি সৃষ্টিই 'তেলেনীপোতা আবিষ্কারের' কাছাকাছি। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারকে ভালো ছোটগল্প রচনার আগে রাশি রাশি পুঁথি রচনা ক'রতে হ'য়েছে, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধ'রে বাংলা-সাহিত্যের দরবারে নিয়মিত হাজিরা দিতে হ'য়েছে। আজ তার সুফল ফ'লেছে। সত্যিকারের ভালো ছোটগল্প একটি কি দুটি নয়, পর পর অনেক কটিই রচনা ক'রেছেন তিনি। কিছুদিন ধ'রে তিনি আর ছোট গল্প লিখছেন না; কিন্তু আমরা তবু আশা ক'রবো—'পরমপুরুষের' জীবনী রচনা যখন একদিন নিশ্চয়ই সমাপ্ত হবে, অচিন্ত্যকুমার আবার ফিরে আসবেন ছোটগল্পের আসরে এবং আমাদের প্রত্যাশাকে জয়যুক্ত ক'রবেন।

আপ্রসংগিক কবিতার কথা এখানে অনুচ্চারিত থাকাই ভালো, কল্লোলগোষ্ঠীর কয়েকজন কৃতি সাহিত্যিকের রচনা গল্প ও উপন্যাসের কয়েকটি বই সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে এসেছে। তারই ভূমিকায় ইতিপূর্বে যতটুকু বলা হ'লো তার বিশেষ কারণ আছে। একটি বা দু'টি গল্প—উপন্যাসের নিরিখে কল্লোলযুগের কোন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের বিচার যেন আমরা না করি, যেহেতু অনুরূপ সমালোচনায় লেখক এবং পাঠক দুইই ঠ'কতে পারেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং অচিন্ত্যকুমারের যে দু'টি বইয়ের নতুন সংস্করণ সম্প্রতি ছেপে বের ক'রেছেন, তা দিয়ে অচিন্ত্যকুমারের যেমন বিচার চলে না, তেমনি 'অঙ্গার' বইটিতেই প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ের সামগ্রিক সাহিত্যকে পরিপূর্ণভাবে বোঝায় না। অচিন্ত্যকুমারের যে দু'টি বই সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে এসেছে, তারা মোটামুটি ব্যর্থ রচনা, তেমনি 'অঙ্গার' বইটি এককথায় চমৎকার! তবু সাহিত্যিক হিসেবে অচিন্ত্যকুমার এবং প্রবোধকুমারের তুলনামূলক বিচার এই বই ক'টির মাধ্যমে মনে আসে, তা যে অবান্তর—যাঁরাই অচিন্ত্য সেনগুপ্তের এবং প্রবোধ সান্যালের গল্প-উপন্যাসগুলি মোটামুটি প'ড়েছেন, অন্ততঃ তারা নিশ্চয়ই বুঝবেন।

ঐতিহাসিক কারণেই 'ডবল ডেকার' এবং 'প্রাচীর ও প্রান্তর' অচিন্ত্যকুমারের ব্যর্থ রচনা, তেমনি প্রবোধ সান্যালের আজীবন সাধনার যতটুকু ঐতিহাসিক সাফল্য তারই নিদর্শন তাঁর 'অঙ্গার' ছোট গল্পটি। প্রবোধবাবু তাঁর সাহিত্যিক জীবনে যে কটি উল্লেখযোগ্য ছোট গল্প রচনা ক'রেছেন, অঙ্গার তাদের মধ্যে বিশেষভাবে শ্রেষ্ঠ। অবিশ্যি একই নামের 'অঙ্গার' বইটিতে সব রচনাই সমান সার্থক হ'য়ে ওঠেনি, যেমন 'নিশিগন্ধা'।—যতটা 'স্টাণ্ট', ততটা শিল্পকুশলতা নেই।

প্রেমেন্দ্রবাবুর 'আগামী কাল' বাংলা উপন্যাসের ধারায় একদিন নতুন জোয়ার এনেছিলো। বইটিতে উচ্ছ্বাসের পরিমাণ ঠিক প্রেমেন্দ্র-সাহিত্যের স্বাভাবিক ভারসাম্যকে মেনে চলেনি, ফলে কাঁচা হাতের স্পর্শ দেখা যায়। তবু বিষয় নির্বাচনের দিক থেকে, পটভূমিকার বিস্তারে আগামীকাল বাংলা ভাষার একটি স্মরণীয় গ্রন্থ। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত- কল্লোল যুগের উভয় লেখকই ছিলেন 'নতুন কিছু' সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ। কিন্তু 'বেদে' একদিন তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি ক'রেও আজ মনে হয় অপাঠ্য বইয়ের তালিকায় স্থান পাচ্ছে; আর 'আগামী কালে'র সমস্ত ত্রুটি তার সুখপাঠ্যতাকে আড়াল ক'রতে পারেনি।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়


যৌবনোত্তর
আট আনা

তিনজন আধুনিক কবি
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
দশ আনা
অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক
দেড় টাকা
গোপাল ভৌমিকের

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের

( যন্ত্রস্থ )
তিন টাকা
রাত্রি
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা
মৌচাক
পাঁচ টাকা
সৌমেন ঘোষের

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—সুবোধ ঘোষ—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত। অন্তত দু'জন কীর্তিমান লেখক কল্লোলগোষ্ঠী থেকে এসেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কথা স্বতন্ত্র, তিনি প্রথম থেকেই ছোট গল্প রচনায় অত্যন্ত কুশলী শিল্পী; তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই 'বেরেনীসোপেতা অবিস্মরণের' কাছাকাছি। কিন্তু অচিন্ত্যকুমারকে ভালো ছোটগল্প রচনার আগে বার্থ বার্থ গল্প রচনা করতে হয়েছে, দীর্ঘ কয়েক যুগ ধরে বাংলা-সাহিত্যের সরবারে নিয়মিত হাজিরা দিতে হয়েছে। আজ তার ফল ফলেছে। সত্যিকারের ভালো ছোটগল্প একটি কি দুটি নয়, পর পর অনেক কটির রচনা করেছেন তিনি। কিছুদিন ধরে তিনি আর ছোট গল্প লিখছেন না, কিন্তু আমরা তবু আশা করবো—'পরমপুরুষের' জীবনী রচনা যখন একদিন নিশ্চয়ই সমাপ্ত হবে, অচিন্ত্যকুমার আবার ফিরে আসবেন ছোটগল্পের আসরে এবং আমাদের প্রত্যাশাকে পরিতৃপ্ত করবেন।

আনুষঙ্গিক কথা প্রসঙ্গে অপ্রাসঙ্গিক পাকাটি ভালো, কল্লোলগোষ্ঠীর কয়েকজন কৃতি সাহিত্যিকের রচনা গল্প ও উপন্যাসের কয়েকটি বই সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে এসেছে। তারই ভূমিকায় ইতিপূর্বে যতটুকু বলা হলো তার বিশেষ কারণ আছে। একটি বা দু'টি গল্প—উপন্যাসের নিরিখে কল্লোলযুগের কোন প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের বিচার যেন আমরা না করি, যেহেতু অনুরূপ সমালোচনায় লেখক এবং পাঠক দুইই চ'কতে পারেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং অচিন্ত্যকুমারের যে দু'টি বইয়ের নতুন সংস্করণ সম্প্রতি বেগে বের করেছেন, তা দিয়ে অচিন্ত্যকুমারের তেমন বিচার চলে না, তেমনি 'অঙ্গার' বইটিতেই প্রবোধকুমার সান্যাল মহাশয়ের সামগ্রিক সাহিত্যকে পরিপূর্ণরূপে বোঝা যায় না। অচিন্ত্যকুমারের যে দুটি বই সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে এসেছে, তারা মোটামুটি ব্যর্থ রচনা, তেমনি 'অঙ্গার' বইটি একরকম ব্যতিক্রম। তবু সাহিত্যিক হিসেবে অচিন্ত্যকুমার এবং প্রবোধকুমারের তুলনামূলক বিচার এই বই দুটির সূত্রেই মনে আসে, তা যে অসঙ্গত নয় তা বোধহয় বলিষ্ঠা সেনগুপ্তর এবং প্রবোধ সান্যালের গল্প-উপন্যাসগুলি যাঁরা পড়েছেন, অন্তত তাঁরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

চলতি কথায় যাকে 'চাল চেকার' বলে আমাদের সে শ্রেণীর অচিন্ত্যকুমারের ব্যর্থ রচনা, তেমনি প্রবোধ সান্যালের সাধারণ রচনার একটিমাত্র নিদর্শন হলো 'অঙ্গার' ছোট গল্পটি। প্রবোধকুমার তাঁর চলিষ্ণুতার মধ্যে যে কটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প রচনা করেছেন, অঙ্গার তাদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। অচিন্ত্যকুমারের যে দুটি বইয়ের সমালোচনা করা হলো তাদের কোন রচনাই তেমন সার্থক হয়ে ওঠেনি, যেমন [illegible] তেমনি [illegible]

[illegible] নতুন ঢেউয়ের এনেছিলো। এইটিকে [illegible] কল্লোলযুগকে ঠেলে চলেনি, ফলে কল্লোলের [illegible] ভূমার একটি [illegible] নিয়ে, [illegible] নতুন কিছু সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ [illegible] মনে হয় অঙ্গার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত [illegible] আড়াল করতে পারেনি।

বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

| কবিতা | গল্প | উপন্যাস |
|---|---|---|
| অজিত দত্তের | প্রেমেন্দ্র মিত্রের | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের |
| পুনর্ণবা | মহানগর | বৃন্ত |
| দেড় টাকা | দু'টাকা | এক টাকা বার আনা |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের | সুবোধ ঘোষের | মরামাটি |
| নীল আকাশ | পরশুরামের কুঠার | (২য় সং) |
| দেড় টাকা | দু'টাকা | দু'টাকা চার আনা |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের | শুক্লাভিসার | দিনান্ত |
| সংকলিতা | দু'টাকা চার আনা | (২য় সং) |
| দু'টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের | সাড়ে তিন টাকা |
| প্রাচীন প্রাচী | ফসল | কল্লোল |
| দেড় টাকা | এক টাকা চার আনা | পাঁচ টাকা |
| নতুন দিন | ঋণ | কস্মৈদেবায় |
| আট আনা | দেড় টাকা | (২য় সং) |
| যৌবনোত্তর | নতুন দিনের কাহিনী | তিন টাকা |
| আট আনা | দু'টাকা | নরেন্দ্রনাথ মিত্রের |
| তিনজন আধুনিক কবি | পতাকা | রাত্রি |
| (বাংলা কবিতার আলোচনা) | দু'টাকা | (দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ) |
| নয় আনা | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর | পাঁচ টাকা |
| অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের | খেলনা | মৌচাক |
| সৈনিক | দেড় টাকা | পাঁচ টাকা |
| দেড় টাকা | সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের | শৈলেন ঘোষের |
| গোপাল ভৌমিকের | নয়নচারা | তিনরঙা |
| স্বাক্ষর | দেড় টাকা | দু'টাকা |
| এক টাকা | | |

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা


Coloured Paper

PURVASA :: SRAVAN—1360 :: REGD. NO. 18



# অন্ন চাই

আমাদের দেশ আজ চায় শুধু খাদ্য, খাদ্য চাই জাতীয় মুক্তির জন্য। আহার জোগাতে হবে এই উপবাসক্লিষ্ট, বিধ্বস্ত এবং মৃতপ্রায় জাতির মুখে। ১৩৫০-এর যেন না আর পুনরাবৃত্তি ঘটে। আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতিটি ক্ষুধার্তের জন্য প্রচুর খাদ্যের ব্যবস্থা করতে চান মডেল ফার্ম—আসন্ন দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তাঁদের সংগ্রাম।

বিস্তৃত বিবরণের জন্য আবেদন করুন—

মিস্, জে, দাশগুপ্তা, এম্.এ, বি.টি, টি.ডি (লণ্ডন)
ডিরেক্টর।

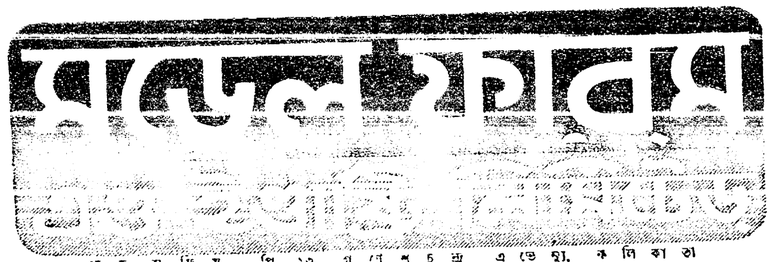


হেড অফিস, পি, ১৩, গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা
ফার্ম: রসতপুর (জিঃ, যশোর) এবং বেহালা (কলিকাতা) MFB—7

Priated & Published by Satya Prasanna Datta, Purvasa Ltd., P13 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

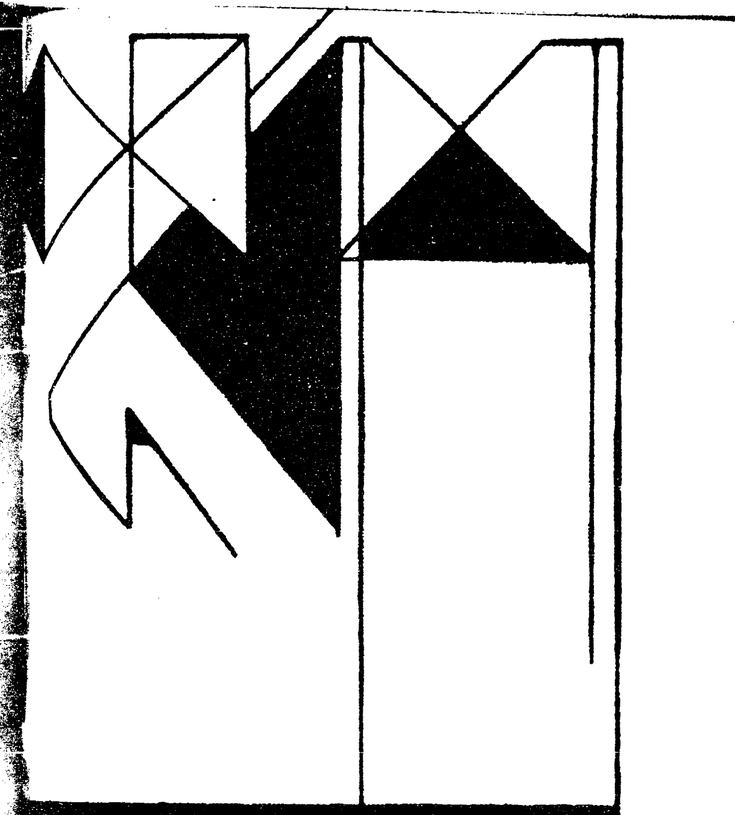

# পূর্ব্বাশা

শারদীয়া সংখ্যা
ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৬০
মূল্য ।৵০ আনা
সম্পাদক: সত্য ভট্টাচার্য্য

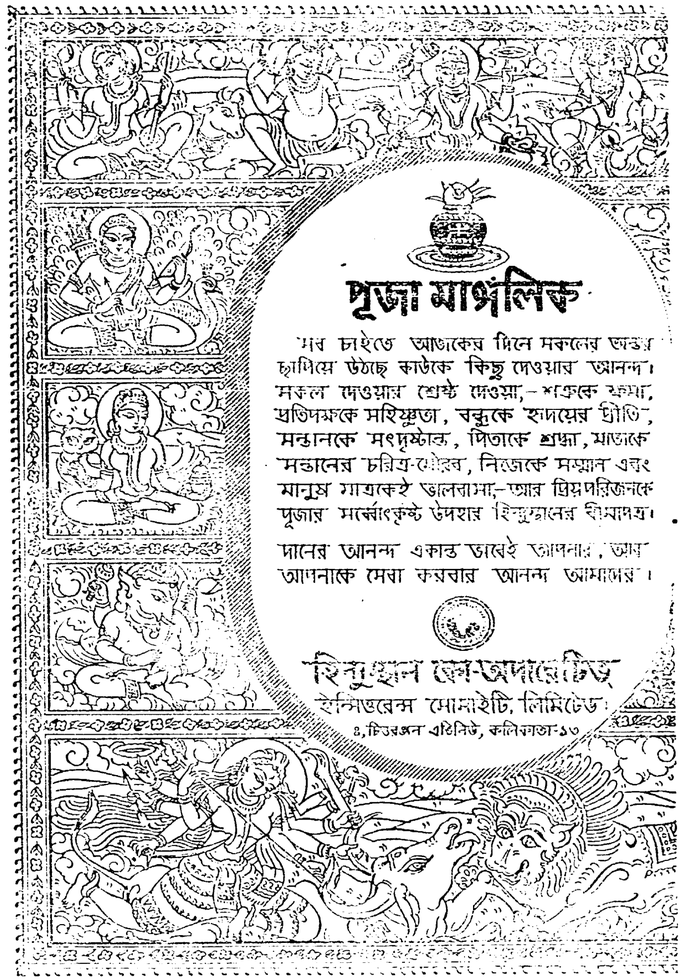

## পূজা মাঙ্গলিক

মন চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,—শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সৎদৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,—আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের হীরামন্ত্র।

দানের আনন্দ একান্ত ভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১৩

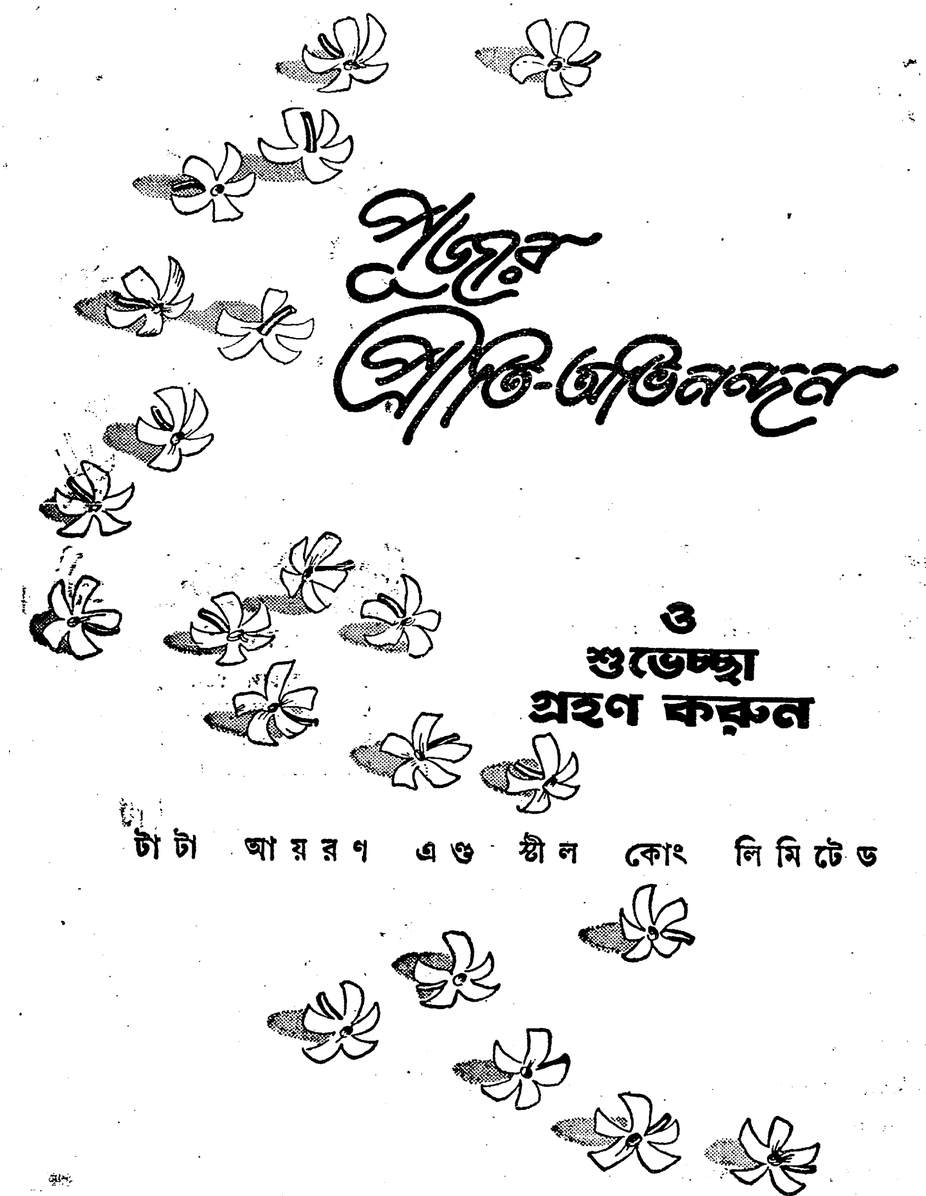

## পূজার প্রীতি-অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

টাটা আয়রণ এণ্ড স্টীল কোং লিমিটেড

TN-1669

Coloured Paper

# পূর্ব্বাশা-শারদীয়া

## ভাদ্র-আশ্বিন—১৩৬০

### সূচীপত্র


আশ্বিন—মুখপত্র

সারস্বতোৎসব :

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুনীলচন্দ্র সরকার, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদ্যুম্ন মিত্র, মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ দাস, বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত, সুস্মিতকুমার নাগ, আলোক সরকার, তরুণ সান্ন্যাল, অরবিন্দ গুহ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়, লোকনাথ ভট্টাচার্য্য, অরুণ ভট্টাচার্য্য, সাইয়ীদ্ আতিকুল্লাহ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, অমিয় চক্রবর্ত্তী। ... ক.....দ ... পৃষ্ঠা

মোহেঞ্জোদারোর

কুশান সভ্যতা : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... ২৩৩

পথ গেছে হারিয়ে ( গল্প ) : অন্নদাশঙ্কর রায় ২৫৬

বিবাহিতা স্ত্রী ( উপন্যাস ) : প্রতিভা বসু ২৬৪

তাস ( গল্প ) : রজত সেন ... ২৮৪

মালতী-রাত ( গল্প ) : সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৩

একটি মেঘলা দিনের (গল্প) : দেবব্রত ভৌমিক ২৯৮

ছুটি ( গল্প ) : অমল দত্ত ... ৩০৪

গড় শ্রীখণ্ড ( উপন্যাস ) : অমিয়ভূষণ মজুমদার ৩১০

সাহিত্যিকী :

ছোট গল্প : ইন্দ্রজিৎ ... ৩১৫

বাংলা বইএর বিজ্ঞাপন : সন্তোষকুমার দে ৩১৮





সুন্দর কেশই আপনার মস্তকের শোভা

ব্যাঙ্গুরাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশের অকাল পতন দূর করে; কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। সুস্নিগ্ধ এবং গন্ধ সম্পদে অনুপম।



বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর






উৎসব অনুষ্ঠানে

ক্যালকেমিকোর অপরিহার্য্য অঙ্গরাগ

| | |
|---|---|
| ক্রান্তা | মনোমুগ্ধকর সুরভিসার, পরিবেশ আমোদিত করে। |
| লাবণি স্নো | দিনের প্রসাধনে লাবণি স্নো মুখের ঔজ্জ্বল্য বাড়ায়। |
| লাবণি ক্রীম | রাত্রে লাবণি ক্রীম ব্যবহারে চর্ম্ম নরম ও মসৃণ হয়। |
| মলয় | শরীর স্নিগ্ধ রাখে ও চিত্ত প্রসন্ন করে। |
| ক্যাষ্টরল | মধুর সুগন্ধি কেশ তৈল। কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে। |

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা—২৯

# সবার জন্য প্রচুর

# খাদ্য

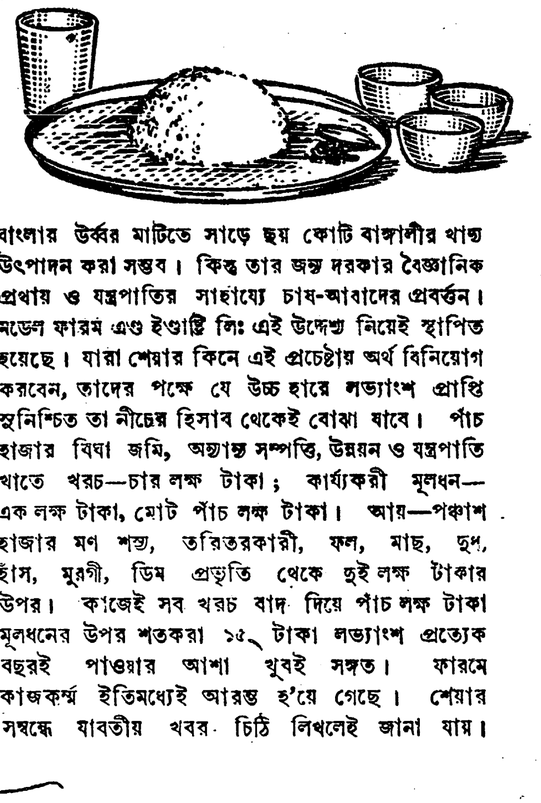



বাংলার উর্ব্বর মাটিতে সাড়ে ছয় কোটি বাঙ্গালীর খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু তার জন্য দরকার বৈজ্ঞানিক প্রথায় ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ-আবাদের প্রবর্ত্তন। মডেল ফারম এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি লিঃ এই উদ্দেশ্য নিয়েই স্থাপিত হয়েছে। যারা শেয়ার কিনে এই প্রচেষ্টায় অর্থ বিনিয়োগ করবেন, তাদের পক্ষে যে উচ্চ হারে লভ্যাংশ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত তা নীচের হিসাব থেকেই বোঝা যাবে। পাঁচ হাজার বিঘা জমি, অন্যান্য সম্পত্তি, উন্নয়ন ও যন্ত্রপাতি খাতে খরচ—চার লক্ষ টাকা; কার্য্যকরী মূলধন—এক লক্ষ টাকা, মোট পাঁচ লক্ষ টাকা। আয়—পঞ্চাশ হাজার মণ শস্য, তরিতরকারী, ফল, মাছ, দুধ, হাঁস, মুরগী, ডিম প্রভৃতি থেকে দুই লক্ষ টাকার উপর। কাজেই সব খরচ বাদ দিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধনের উপর শতকরা ১৫৲ টাকা লভ্যাংশ প্রত্যেক বছরই পাওয়ার আশা খুবই সঙ্গত। ফারমে কাজকর্ম্ম ইতিমধ্যেই আরম্ভ হ'য়ে গেছে। শেয়ার সম্বন্ধে যাবতীয় খবর চিঠি লিখলেই জানা যায়।

# মডেল ফারম

## এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রি লিমিটেড

ম্যানেজিং এজেণ্টস—পূর্ব্বাশা লিমিটেড

হেড অফিস—পি-১৩, গণেশ চন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা

ফারম—বসতপুর (যশোহর জেলা) ও বেহালা, কলিকাতা

MFB—2



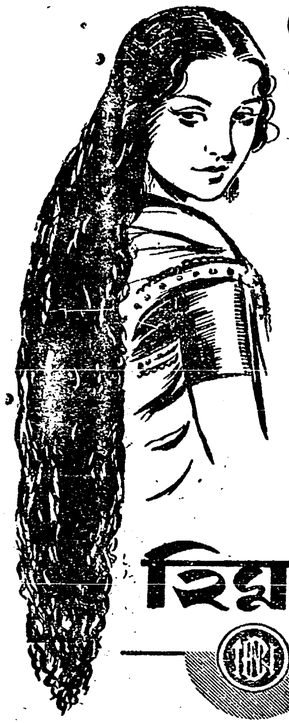

# প্রসিদ্ধ

## আয়ুর্ব্বেদীয় কেশ তৈল

মহানগরীর প্রসিদ্ধ ও অভিজ্ঞ আয়ুর্বেদাচার্যগণ বলেন, 'হিমকল্যাণ' কেশ প্রসাধনে যেমন অদ্বিতীয়, বায়ুর প্রকোপ ( Blood Pressure ) প্রশমনেও ইহা অমোঘ।

* নকল হইতে সাবধান *

# হিমকল্যাণ



হিমশ্রিঙ্ক কেশতৈল

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ। কলিকাতা


## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। চলতি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা ( সডাক ) ৬৲, বাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ( ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেণ্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয়ঃ

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

ভারতীয় চা সম্বন্ধে

# এভারেস্ট বিজয়ীরা

বলেন…




তেনজিং

হিলারী

THE TIMES WORLD COPYRIGHT RESERVED BY HIMALAYAN COMMITTEE

চা

শক্তি ও আনন্দের উৎস

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB 113





## অশ্বিনা

[ ঋগ্বেদ—প্রথমমণ্ডল—ষোড়শাধিকশতসূক্ত—একাদশ পদ ]

*তদ্বাং নরা শংস্যং রাধ্যে চাভিষ্টিমন্নাসত্যাং বরুথম্।*
*যদ্বিদ্বাংসা নিধিভিবাপগূঢ়ংহমুদ্দর্শতাদুপথুর্বন্দনায়॥*

বন্দন-ঋষি নাসত্য-গীতি গায়।
রাধ্য জনক, করেছ জ্যোতির্ম্ময়,
নেতৃ তোমরা, তরুণ তরুর কায়,
দাও আরোগ্য দাও আত্মীয় জয়।

প্রতিশ্রুতিতে বদ্ধ নারীশ্বর
বরণ করছে স্বস্তি-বচনে মন,
নির্জ্জন দেশে যে ধনরাশির বর
রেখেছ তারি এ দান, কবি-আয়োজন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
গীতি-কবিতা-গ্রন্থ

# পদাবলী

দাম দু'টাকা

"পদাবলী" পেয়ে খুব ভালো লাগল। প্রায় প্রত্যেক কবিতাই রসোত্তীর্ণ তথা নিপুণ কলাকৌশলের প্রতিমান। আপনার কাছে বাঙালী পাঠকের প্রত্যাশা বেড়েই যাচ্ছে; তাকে হতাশ করবেন না। আরও অনেক লেখা চাই।··· আমি আর কারো মধ্যে ওরকম ঐতিহ্যসচেতন মনের পরিচয় পাইনি।···" ( সুধীন্দ্রনাথ দত্তের একটি চিঠি থেকে উদ্ধৃত )

প্রকাশক :

পূর্ব্বাশা লিমিটেড, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
কলকাতা



## সারস্বতোৎসার

### উৎকণ্ঠা

( মালার্মে-র ফরাসী অবলম্বনে )

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

সমগ্র জাতির পাপ সংক্রান্ত যে-জান্তব শরীরে,
তার নৈশ বলিদানে আজ আমি নই উপনীত ;
জাগাবে না ক্ষুব্ধ ঝড় অপবিত্র কেশের গভীরে
আমার চুম্বন, যাতে দুরারোগ্য নির্বেদ নিহিত ॥

নিবিড়, নিশ্চিন্ত নিদ্রা খুঁজি আমি তোমার শয়নে,
অসন্তাপ প্রাবরণে নির্বাণের শান্ত অবরোহ ;
ফুরালে মিথ্যার পালা, রক্ষা পাও তুমি যে-অয়নে,
নিত্য সে-নিখিল নাস্তি, তার পাশে মৃত্যুও সম্মোহ ॥

আমিও তোমার মতো অভিগ্রস্ত ব্যাপক কলুষে
অনুর্বর, বীতস্বত্ব সৌজাত্যের মৌল মর্যাদায় ;
পাষাণহৃদয় তুমি পক্ষান্তরে যেহেতু স্বেচ্ছায়,

অক্ষত তোমার বক্ষ তাই অপরাধের অঙ্কুশে :
আর আমি পরাজিত, প্রেতভয়ে পাণ্ডু, দ্রুতপদ,
ঘুমাতে পারি না একা, ভাবি শয্যা শবের প্রচ্ছদ ॥

## মহারণ্য

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিষণ্ণ রাত্রির মায়া অবসন্ন আরণ্য জীবনে
কিছুক্ষণ নেমে এল। লতাগুল্ম সন্তর্পণে
সরায়ে সরায়ে হরিণ হরিণী চলে।
মাংসগন্ধী গুহাতল; জোনাকির আলো জ্বলে
লতায় পাতায়,—সে যেন অসংখ্য বোবা চোখ।
অনেক রক্তাক্ত স্মৃতি পতঙ্গের প্রাণে
হয়ত দিয়েছে ব্যথা, হয়ত আঘ্রাণে
উতলা বাতাস তারে করেছে অস্থির,
হিংস্র হুঙ্কার মাঝে অরণ্য গম্ভীর
চিরদিন অন্তস্থলে। দুর্ভেদ্য রহস্যজালে
ঘেরা চারিধার,—সেথা পা বাড়ালে
প্রতি মুহূর্ত্তের মৃত্যু জড়ায় চরণে।
পলকের যে বন্ধন মুক্তি আনে চকিত মরণে,
সে বন্ধন অনায়াস গতির বিচ্ছেদ,
তার তরে অরণ্যের নাহি কোনও খেদ।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই
নক্ষত্রদলের মেলা বসিয়াছে যেই,
বনবাণী স্তব্ধ হয় প্রশান্তি প্রচ্ছায়ে,
দিগন্তে মেঘের গায়ে
অকারণ বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগে বিদ্যুতে বিদ্যুতে,
তখন হেথায় বনে মৃত্যু কা'রে পারেনাক ছুঁতে।
তবু ভয়; আতঙ্কের লেশমাত্র যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ হরিণীরা শিশুরে রেখেছে কাছেকাছে।
মনে হয় কোথা যেন মৃগয়ার অব্যর্থ সন্ধান
অপেক্ষিছে অন্তরালে। দুর্নিরীক্ষ প্রাণ,
তবু তার কতটুকু আয়ু?
আতঙ্কে স্তিমিত স্নায়ু
চেয়ে থাকে নিরুপায় চোখে।



হিংস্র পশুর সাথে হিংস্রতর লোকে
যে প্রাণ পারেনা দিতে হরণ করিছে সেই প্রাণ,
তাদের মহিমা গান
হে অরণ্য, মহারণ্য, মোদের শোনাবে কতকাল?
শোণিত-নিষিক্ত পথে পুঞ্জীভূত মৃতের কঙ্কাল
সর্ব্বব্যাপী নৈঃশব্দের ক্ষুধিত সমাধি;
আলোক বঞ্চিত ব্যর্থ সর্ব্ব রন্ধ্রে আঁধি।

পশুর শোণিত তৃষ্ণা, মানুষের নগ্ন বর্বরতা
উদ্দাম আবেগে মগ্ন যত নিষ্ঠুরতা
লালন করিছ যত্নে আপনার বুকে,—
হে অরণ্য, তোমার সম্মুখে
বিস্তৃত আকাশ পটে দেখনি কি পরমা প্রকৃতি
সাজায় নৈবেদ্যডালা; নিত্য নব গীতি
আলোকের জীবনের ঝঙ্কারে মুখর?

ঘুমাও ঘুমাও তবে হে অরণ্য, দিওনা উত্তর।

## হাওয়া ও মন

সুনীলচন্দ্র সরকার

(১)

হঠাৎ উচ্ছ্বাসে ওরে কী এ!
মহাচেতা কবির মতন
ফুরোতে ফুরোতে তবু জীয়ে
হাওয়া মেলে ধরে তার মন।

কত কি যে আলাদা আলাদা
সরাল মিলের পথে বাধা:
কড়া চোখ আকাশের জেদ,
জিনিষের উগ্র জাতি ভেদ;
বিবিধের ঝুমঝুমি নাড়া
বাস্তবের বেসাতি বেয়াড়া;

মন আর বনের গুমোট—
ভাঁটা-আঁটা প্রহরের বোট

সবল সঙ্গীতে তুলে নিয়ে
মহাচেতা কবির মতন
ফুরোতে ফুরোতে উচ্ছ্বসিয়ে
এ হাওয়া বওয়াল তার মন!

(২)

হঠাৎ আশ্বাসে ওরে কী এ!
মহাপ্রাণ বন্ধুর মতন
বেমানান নিপুণ মানিয়ে
এ হাওয়া নোয়াল মোর মন!
শরীরের হতবোধ ভূমে
কাড়াকাড়ি জাগা আর ঘুমে;
চেতনায় আলাদা আলাদা
অসম্মত মিশ্র তাড়া বাঁধা;
সন্ধিসর্ত্ত ভেঙে আন্তর্দেশি
ভিতরে বাহিরে রেষারেষি:—
সবি ক'রে আনে মোলায়েম
এ বন্ধুর নিরাসক্ত প্রেম!
কোন দূরদূরান্ত পেরিয়ে
অতলান্ত যাত্রীর মতন
সব বাধা নিঃশেষে সরিয়ে
এ হাওয়া বওয়াল মোর মন।

## অম্বুবাচীর মেঘকে

### বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ়ের মেঘ, আষাঢ়ের মেঘ
কেন মুখভার? দেখাও তোমার
যতো জানো ছলা-কলা।
আষাঢ়ে এখন পৃথিবী রজঃস্বলা।



হে নবীন পর্জন্য
মাটির ঘরণী তৃষিতা ধরণী
কর্ষিত বুক তার
স্বপ্নে ধেয়ায় শস্যের ভার
ধেয়ায় তোমার নব বরষার
প্রীতিরস সৌজন্য।

নিষিক্ত হ'তে দাও তাকে সেচ
অমোঘ বীর্য তোমার নিষেক
হে অতিপ্রজ্ঞ জীবন-স্রষ্টা
হে নবীন পর্যন্য
বায়ু-বিতাড়িত বনস্পতির প্রণতি তোমার জন্য!

মেঘের মহলে কোথাও তো আর সূর্যের সাড়া নাই
রবি রয়েছেন মিথুনীকৃত
বিলাস কক্ষে কেলীতে নিরত
তরুণী প্রেয়সী আর্দ্রার ঘরে অর্গল দেয়া তাই।
আর্দ্র হ'লো কি আর্দ্রার বাস
পিচ্ছিল পথ কর্কটক্রান্তির
পড়লো লুটায়ে কালো কেশরাশ
শৃঙ্গার-স্বেদ শিহরণ শ্রান্তির?

মেঘে মেঘে যার কেশ গৌরব
তুমি পেলে কি গো তারি সৌরভ
হে নবীন পর্যন্য?
পেয়ে ভুলেছো কি পৃথিবীর মায়া
মাঠের স্বপ্নে সোণালিতে ছাওয়া
ভারে ভারে কতো প্রত্যাশা-ভরা পণ্য?

আষাঢ়ের মেঘ, আষাঢ়ের মেঘ
একটু দাঁড়াও, থামাও তোমার চলা—
সময় হ'য়েছে এবারে তোমার
আষাঢ়ে এখন পৃথিবী রজঃস্বলা!

## বৃষ্টি

### প্রদ্যুম্ন মিত্র

এখন নরম বৃষ্টি। অন্ধকার ঘন হয়ে আসে।
মনের শার্সিতে ছাট্। সব কথা স্বপ্নের সীমায়
মুছে গিয়ে গান হয় শিশিরের ভিজে ভিজে শ্বাসে।
বাইরে ধারার গান। নীলরাত্রি বৃষ্টির মুক্তায়
ক্রমশঃ সুন্দর হয় বহু চেনা পুরোনো পৃথিবী
তারাগুলো ধুয়ে যায় অন্ধকারে মেঘেরা নিবিড়
অনেক গ্রীষ্মের পর কি নিথর পাখিদের নীড়
কামরাঙা ডালে ভেজে, ভিজে যায় অরণ্যের ছবি।
বাইরে অনেক বৃষ্টি আবেগের নদী হয় মনে,
শষ্পার তরংগে দোলে জলঘন কার নীল মুখ।
চেতনা তিমিররূপ ছায়াময়, বেপথু এ বুক
এলোচুল সেই মেয়ে চেয়ে থাকে আশ্চর্য নির্জনে
বৃষ্টি স্বচ্ছ। মন ক্রমে পাখি হয় মেঘের ডানায়
ডুব দেয় নীল হ্রদে স্বপ্নাবতী দু'হায়ে জড়ায়!

## স্নানের কবিতা

### মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

আশ্চর্য সুমিষ্ট ছায়া : অবসন্ন রোদের আকাশে
সহৃদয় মেঘ জমে, মেঘের আড়ালে রোদ্দুরের
অভিনয় শুরু হয়। সূচনায় স্নিগ্ধ ছায়াদের
ভিজে, স্যাঁতসেঁতে স্বাদ, তারপর নম্র সম্ভাষণ
নেমে আসে,—বিকেলের স্নেহ নিয়ে দুপুরে শ্রাবণ।

এখানে শ্রাবণ। আহা, এখানের শ্রাবণের ঢল—
মেঘছায়া মেয়েদের নির্জন স্নানের জলোচ্ছ্বাস,
কী উতল উচ্ছলিত! স্নানের মুক্তোর প্রতিভাস :
উজ্জ্বল জলীয় বিন্দু জমা হয়, ঝরে যায়, জ'মে
উন্মুখ বিস্ময়ে চায় শরীরের কুণ্ঠিত সরমে!



রোদের স্ফুলিঙ্গ শেষ, এ সময়ে তোমাকে চেনার
পুরোনো নিষেধ নেই। জোনাকির আলোর প্রদীপে
কাদাপায়ে হেঁটে-হেঁটে যেতে হবে তোমার সমীপে—
থামিওনা, এখনি স্নানের শব্দ—বৃষ্টির সেতার।

## বিপ্রলব্ধা

### বটকৃষ্ণ দাস

এবার এষণা শেষ। লক্ষ্যভেদ বিবিক্ত সন্ধ্যায়।
দৃশ্য হ'তে দৃশ্যান্তরে ক্রমায়াত বর্ধিষ্ণু উদ্বেগে
এবার অনন্য শান্তি। অতিক্রান্ত শ্রাবণের মেঘে
নক্ষত্রনয়না এলে বৃষ্টিশেষ রজনীগন্ধায়!
বিস্মৃত আয়ুধশিক্ষা। অভীপ্সার শীর্ষবিন্দু ঘিরে
থরোথরে! মহাকাশ! নির্জন বিশ্রম্ভালাপে তাই
রজনীগন্ধার ঘ্রাণে সমাচ্ছন্ন প্রশান্ত তরাই,
সান্দ্র, নীল পরিভাষা সমুদ্রের প্রাঞ্জল শরীরে!

এই-তো অমরাবতী! জীবনের প্রাজ্ঞ উচ্চারণে
এবার শোনাও তবে বিপ্রলব্ধা নায়িকা আমার
স্বরে স্বরে ঐক্যতান। এই সন্ধ্যা দিলাম তোমায়।
তুমি দাও অভিজ্ঞান। লক্ষ্যভেদী নিপুণ বীক্ষণে
দাও সে নিগূঢ় বিদ্যা বিকল্প বিভঙ্গে একাকার
দেহমনে। মুক্তি দাও স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, সুমিত সন্ধ্যায়॥

## উদ্ভাসন

### সুনীলকুমার নন্দী

কর্কশ রৌদ্রের শেষ। শ্রাবণী শিল্পীর শিল্প মেঘের পাহাড়
দুই হাতে ভেঙে ভেঙে মায়াবী আশ্বিন
এলো কি?—রৌদ্রের স্নিগ্ধ স্বপ্নের আভাস ইতস্তত গিয়েছে ছড়ায়ে
হাওয়ার আঁচলে ভাসে শস্য-মঞ্জরীর ঘ্রাণ।
সমুদ্রের কণ্ঠলগ্না চেতনার বীণ

বরুণ রাগিণী তোলে—
সমুদ্র-আশ্লেষ থেকে আমাকে বিমুক্ত করো, করো
মুক্তপাণি। মুক্তোর সন্ধানে মন ভাদ্রের রোদ্দুরে ভিজে সমুদ্র-অতলে
সারাদিন হেঁটে হেঁটে কী পেলো! মৃত্যুর মতো রিক্ত অন্ধকার বুকে কাঁপে থরথর
রাত্রির শিয়রে গিয়ে। তবুও ছলনা জাল বোঝে না ডুবরি মন। কতো না সময়
অশান্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে হ'য়েছে শিকার
এম্নি অকরুণ দ্বন্দ্বে।
আর নয়। একান্ত মিনতি রাখো, ভীরুর আশ্রয়
ছিন্ন করো। ছিন্ন করে আমার অতৃপ্ত মনে স্বপ্নের সম্ভার
ঢেলে ঢেলে সৃষ্টির প্রেরণা দাও
জীবনে। শিশির ভেজা প্রান্তরের গান
আজো তো ভুলিনি আমি, সমুদ্রের লোনা জলে কখনো উধাও
হ'তে পারে স্মৃতি-সোনা! পথের নিশানা
ভুল ক'রে এসে গেছি।
মুক্ত ক'রে নিয়ে চলো শস্যের মঞ্জরী-ভারে আনত প্রান্তরে; হবে বোনা
আবার গানের কলি। তাহ'লে আশ্বিন ব্যর্থ হবে না, হবে না!

## শ্রীমতীর জন্য

### বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

তোমাকে ভালো লাগে তোমাকে বাসি ভালো
এ কথা দিয়ে যদি হৃদয়ে জ্বালি আলো
মেঘলা দিনে কোনো মেঘলা কথা শোনো
হৃদয় যদি চায় জানালা খুলে দিতে:
শ্রীমতী বলো তবে কার কী ক্ষতি হবে
কার কী ক্ষতি হবে ধূসর পৃথিবীতে?

সোনার-রঙ-ধরা হরিণ-আশাগুলি···
পুড়িয়ে পাখা যদি আগুনে না-ই ভুলি
হাওয়ার হাঁস হ'য়ে দুহাতে ঠেলে ভিড়
পালক-মোড়া চাই উষ্ণ ছোট নীড়
সাগর-নীল-কালো চোখের কাছে ঋণ



স্বীকার ক'রে নিই কখনো কোনোদিন
হৃদয় যদি চায় সীমিত বাসনায়
চোখের আলো দিয়ে প্রদীপ জেলে নিতে:
শ্রীমতী বলো তবে কার কী ক্ষতি হবে
কার কী ক্ষতি হবে মুখর পৃথিবীতে?

আকাশ যদি আসে তোমার চোখে নেমে
তোমার দেহমনে তোমার ভীরু প্রেমে
গুমোট রাতে কোনো আকাশে তারা গোনো
বারেক বলা কথা আরেক বার শোনো
হৃদয়-উত্তাপে দুচোখে ছায়া কাঁপে
পোহাও কালো রাত কুয়াশা-ঘন শীতে:
শ্রীমতী বলো তবে কার কী ক্ষতি হবে
কার কী ক্ষতি হবে কৃপণ পৃথিবীতে?

## ভেট

### বারেন্দ্রকুমার গুপ্ত

মালতী তোমার জন্মতারিকে
লাল পেন্সিলে 'উপহার' লিখে
বকুল ফুলের গুচ্ছ
পাঠালাম—নয় তুচ্ছ।

মণিহার দেবো ঠিক করলাম,
তবু শেষকালে সামান্য দাম
স্ফুটমঞ্জরী—ফুল
দিলাম—এ কার তুল্য?

জানি ফুলগুলি মালা গেঁথে নিতে
সাজিতে ভরবে, কভু কবরীতে
কখনো অধর—পুষ্পে
রাখবে—গেলে সে চুপ্‌সে।

সুরভিগন্ধ পাবে আঘ্রাণ,
এর চেয়ে নয় কারো সম্মান,
ফুলের স্তবকবৃন্তে
এ ভেট—ভুলনা চিনতে !

## একটী মেয়ের প্রতি

### সুজিতকুমার নাগ

যে দিকে তাকাই, দেখি নীল আকাশ ছড়িয়ে আছে
সময়ের স্থিরতার একটি আশ্চর্য শিহরণ। আশ্চর্য !
মনে হয় সেই সময়ে তোমাকে। শুধু তোমাকেই।

যে দিকে তাকাও, রুক্ষ নীল আকাশ, আর মৃত তারা জ্বলে বুঝি
সময়ের অস্থিরতার একটি আশ্চর্য বিলাপ। হতবাক হই।
কেন এমন হল ? মনে হ'ল তোমাকেই। শুধু তোমাকেই।

তারপর কতদিন কত রাত কেটে গেলো। সময়ে অসময়ে—
কত আকাশের তারা মরে গেলো। অগ্রসর আরও অগ্রসর।
আশ্চর্য জীবনের শাদা কালোর পরদায় তোমাকেই মনে পড়ে
প্রেমে আর অপ্রেমে, সময়ে আর অসময়ে। এক সুর, এক ডাক।

জীবনের এই স্থিরতায়, অস্থিরতায় যা চিনেছি আমি—
অথবা যা দেখেছি অসময়ে—সময়ে তারই প্রতিধ্বনি
সেই এক সুর। বিভিন্ন থেকে বিভিন্নতর, এই যা।

আজ আকাশের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করিনি, হয়ত বা
দেখিনি একটিও তারা। জীবনের এই জটিলতায় এসে
অন্য কোন মেয়ের কথাও ভাবিনি। তোমাকেই ভেবেছি।
নিজের এই আত্মরতিতে লজ্জিত হয়েছি, তবুও আশ্চর্য……
তুমি ছাড়া আর চিন্তা নেই। দেখছি সবই তুমি।

তাই আজ তোমাকে না পেয়েও, একটি স্থির লক্ষ্য মনে রেখে
একান্তে ভেবেছি তোমার কথাই, তুমি ছাড়া আর কেউ নেই—
যে আমার কাছে ধ্রুব সত্য—না হলে সবই অনবনমনীয়।



## দিগন্তের শোক

### আলোক সরকার

হয়তো আসবেনা ফিরে তবু
জানো হৃদয়ের ব্যাকুলতা।
এই দূর দিগন্তের ক্ষুধা।
নিঃসঙ্গের মৌন ম্লান সুধা
পাবে না দুর্লভ সঙ্গে পূর্ণতার অমৃত লগন !
মাধুরীনিবিড় বেলা কেটে যায় নিঃসীম স্বনন
শোনো প্রাণময় জীবনের।
তোমার-ই অন্তিম ছায়া রেখে গেছে তন্ময় বীনের
অসহ ইচ্ছার জ্বালা অসীমের মুগ্ধ অধীরতা
বিরহের সান্দ্র শ্যামলতা।
বিকেলে আশ্চর্য ঘাসে যখন-ই তাকাই
ধু-ধু বিস্তীর্ণের একা অস্ফুট গুঞ্জনে বলে যাই।
যাবোনা কোথাও আর দিন যাবে চলে
ব্যথা নেই দুঃখ নেই স্বচ্ছ প্রাণপ্রবাহহিল্লোলে
আনন্দের খরস্রোতে।··স্মৃতির অম্লান সঞ্জীবন
রেখে গেছো—সর্বব্যাপী নীলিমার অমর্ত্য লিখন।
তাই কি ক্লান্তিকে ভুলি ? রক্তে শুনি শুভ্র কলরোল।
আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে অপুর্বের স্পন্দিত অমল।
প্রেমের পার্থিব স্রোত বুঝি তাই জানে
অমরার নিরুপাক্ষ্য ছন্দিত উজানে।
হৃদয়ের ব্যাকুলতা তাও মূর্ত দিগন্তের শোকে
ব্যর্থতার চেয়ে বড়ো অচিন্ত্যের বিস্মিত আলোকে।

## রাত

### তরুণ সান্যাল

'পথ হাঁটা শেষ করো'—কে ডাকে, কে ডাকে সারাদিন
সকালে রৌদ্রের ঠোঁটে, মধ্যাহ্নের ধূলির নিশ্বাসে
ঘূর্ণির অসহ্য তৃষ্ণা বুকে নিয়ে, বিকেলে রঙিন
সলজ্জিত কুণ্ঠারাঙা কৃষ্ণচূড়া-সন্ধ্যার আকাশে

মুঠো মুঠো রক্তাভা ছড়িয়ে। অন্ধ বাউলের হাতে
সারাদিন উদাসীর একতারা বাজে, বেলা কাটে
অসহ্য ক্লান্তির ভ্রান্তিভরা ; ক্লিষ্ট প্রহরের দাঁতে
ছিঁড়ে নেয় রঙ, আঁকে মৃত্যুরেখা দিনের ললাটে।

রাত। সে সুনীল স্নিগ্ধ দিনান্তের আশ্চর্য সুরের
নক্ষত্রের নীড়ে জ্বলা সংগীতের মুগ্ধ রূপায়নে !
রাত। সে ক্লান্তির তীর্থে শান্তিঝরা শান্ত নূপুরের
মৃদু পদধ্বনি। সুপ্ত শব্দহীন তিমির-শয়নে
তন্দ্রার নির্বাক অভিষেক।···রাত – অনেক দূরের
অভীপ্সার অভিযাত্রী দীপশিখা তারার নয়নে ॥

## উৎসর্গ

### অরবিন্দ গুহ

হৃদয় উৎসর্গ-ব্রত এখনো হ'লো না উদ্‌যাপিত।
কী ক'রে উৎসর্গ করি ? এ-হৃদয় সহস্র নিভৃত
কটু বাসনার বর্ণে হতজ্যোতি।· অম্লান, অক্ষত
সুগন্ধি ঐশ্বর্যঘন যৌবন-হৃদয় শত-শত
জন্মপুণ্যফলে পাওয়া, আমার অসংখ্য অপমানে
বহুদিন হ'লো হাওয়া বৃষ্টি নিয়ে আসে না এখানে।
রিক্ত, রুগ্ন, কীটভোগ্য ; এ-হৃদয় কী ক'রে তোমাকে
এখন উৎসর্গ করি ? যৌবনের পত্রপ্রেমে, ডাকে
আমি অন্বেষণে ক্ষান্ত এ-জীবনে তোমার ঠিকানা।
সঙ্কুচিত হ'য়ে আছে আকাশ—প্রলুব্ধ যুগ্মডানা
আমার ইচ্ছার। আর দীর্ঘ ব্যর্থপ্রতিজ্ঞার দাহ
আমাকে বিনিদ্র রাখে। সুমসৃণ দিনান্ত—প্রবাহ
সচ্ছল সংসার ভরে। সন্ন্যাসীর সুন্দর কপালে
অরণ্যে-অরণ্যে রাত্রি অগ্নির আশ্চর্য্য ছায়া জ্বালে।



## নির্ঝর

### কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কাঁপুক মেদুর রাত। আনো কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের
তৃষাহরা মুক্ত গান,—সুরে-সুরে ঝঙ্কারে গুঞ্জনে
পল্লবিত সমারোহে আনো শ্রান্ত শূন্য প্রাণেমনে
আকুল নির্ঝরধারা,—আষাঢ় সন্ধ্যায় হোক ফের
বিচিত্রিত প্রস্তাবনা হৃদয়ের আশাদীপ ঘিরে
চরিতার্থ পূর্ণতায়, নীড়ের বন্ধন ভেঙে পাখী
যাক উড়ে মেঘলোকে, যেইটুকু লগ্ন ছিল বাকী
হোক তাহা মঞ্জুরিত, জীবনের একান্ত গভীরে

যাদুকরী বাসনার মায়াঘেরা মণিময় দ্বীপে
আসুক বন্যার বেগ, ক্ষণস্থায়ী অমরার আলো
দাও জেলে অন্তরালে সাতরঙা সুরের প্রদীপে
অকৃপণ সততায়, লেগেছে দু'চোখে বড়ো ভালো
তোমার উজ্জ্বল মুখ, আরক্তিম স্ফুরিত অধর
ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত, অলৌকিক এই রূপান্তর ॥

## পরিধি

### শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

শরবনে টুপটাপ শিশিরের ফোঁটা গুনে আর
ডাঁটায়, পাতায়, ঘাসে হিম-হিম মিঠে রং দেখে
সকাল ফুরিয়ে যায়—কি অবাক নীলচে আকাশ
সূর্যের সাধন দেয়—চারিপাশে অনেক কথার
প্রজাপতি-ভ্রমরের পাখা-ঝাড়া রাশি রাশি সুর
পাপড়ি-ছেঁড়ার মত বারবার ঝরে ঝরে পড়ে,
তারপরে খেইহীন কিছুক্ষণ চুপচাপ এলে
খেয়ালী সময় বাজে ঢং ঢং দূর-ঘড়িঘরে !

তখন মনের কাছে কাজ নেমে একান্ত আদুরে
মেয়ের মুখের মত পল্লবিত চোখের ছায়ায়

আমাকে ভিজিয়ে দেয়—সে-ও ভাল এই মুখ নিয়ে,
কাজ নিয়ে কারুকার্য সারাদিন, দারুণ দুপুরে!
তবু ত বিকেল বাকি ফের সেই ঘুমের মতন
শীতের সময় শুরু, জড়োসড়ো আরো কতক্ষণ!

## আমার জীবনে এল

### লোকনাথ ভট্টাচার্য

আমি আর ফিরব নাকো এই পথ দিয়ে

যতই সুনীল হোক
মধুর মন্থর হোক
স্থির ছায়া-ঘন রাত্রি স্বপ্নের শপথ নিয়ে
ফিরব না ফিরব না
আমি আর ফিরব নাকো এই পথ দিয়ে

আমি আর বলব নাকো এই এত কথা
এই গান, ব্যর্থ গান, মূঢ় নীরবতা
এই ভ'রে ওঠা পাতা হিজিবিজি অপূর্ব অক্ষরে
এই তুমি, এই আমি
আমাদের দুজনের যত অসম্ভব
আঠারো মাত্রার দীর্ঘ পয়ারের মূর্খ কলরব

আমি আর ফিরব নাকো—কী ক'রে না জানি
কোনো এক শকুনের তীক্ষ্ণ চঞ্চুখানি
বিঁধেছে আমার বুকে
আবার নির্জন বুকে নিভৃত নীলায়
হঠাৎ শুনেছি কান্না অসহায় দিকচক্রবালে
রঙের বন্যায়
শিশু আর শিশু নয়, চিনেছে প্রতিজ্ঞা
পথ সে তো পথ নয়, বিপ্লব-বর্ত্তিকা
রাত্রি আর রাত্রি নয়
কপট ধ্যানের ছলে ঢাকে তার অন্ধকার শিখা

আমার জীবন শোনে মহা সম্ভাষণ
সে তো আজ আমি নয়, আমারি মৃত্যুর উদ্‌ঘাপন॥



## মুক্তিস্নান

### অরুণ ভট্টাচার্য

তোমাকে চাইনা আমি বিদেহীর অমৃতস্বরূপে,
চোখে যার ম্লান জ্যোতি বৈধব্যের, বিশুষ্ক অন্তর।
তোমাকে চাইনা আমি, স্বপ্নসম্ভবের আকাংখায়,
রাত্রির বিদীর্ণ বক্ষে, শ্বেতশুভ্র পূজারিণী বেশে।

তোমার নিটোল বাহু, শ্যামস্নিগ্ধ শরীরের প্রেম
আমার রাত্রির সুখ; জীবনের পূর্ণ অভিষেকে
যদি না তোমার চোখে কামনার বিরক্ত ইঙ্গিত
আমাকে উন্মাদ করে, যদি জানি তোমার শরীর
দীঘির গভীর জল, তবে বৃথা এই প্রয়োজন।
মিথ্যা এই দিন রাত্রি, মিথ্যা তবে জীবনের ক্ষণ।

আমাকে ডেকোনা তুমি হেমন্তের বিমর্ষ সকালে,
যখন বিবর্ণ সূর্য মালন দিগন্তরেখা আঁকে—
আমাকে ডেকোনা তুমি সহরের অন্ধ, ক্রূর ভীড়ে
বরং প্রতীক্ষা কোরো বৈশাখের সূর্যাস্ত অবধি—
যখন সুবর্ণরেখা সূর্যাস্তের রঙে বর্ণময়
পলাশে শিমূলে সুস্থ, দুরান্তের বিসর্পিল মাঠে
মহুয়ার মুগ্ধ ছায়া, বনবীথি, জ্যোতিষ্কমালায়
দীপ জ্বলে জীবনের—তুমি এসো, প্রাণবহ্নি জ্বালো—

জ্বালো দীপ সময়ের, গন্ধ আনো আকাশ বাতাসে,
তোমার উদ্ধত বুকে শান্ত করো তৃষ্ণা পুরুষের,
তোমার অধর রাঙা কামনায় করে টলোমল—
আমাকে তখন ডেকো জীবনের দূর সন্ধিক্ষণে।

আমাকে তখন ডেকো, তুমি নারী, সজল সন্ধ্যায়
সকল সম্ভার নিয়ে যৌবনের ক্ষুরধার প্রেমে,
আমাকে ভাসিয়ে নাও লীলাময় দুর্গম নদীর
তীর থেকে অন্য তীরে, জীবনের বিমুক্ত প্রান্তরে।

## সুদূর

### সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্

একটি পাখি কি তবে বসেছিল এই খানে
নরম সবুজ ঘাস ভেবে।

বুকের পালকে বিঁধে মালা করে নিয়েছিলো
রাতভর শুধু এক অন্ধকার রাত ;
কেঁদেছিলো হাওয়ায় হাওয়ায় !
নৈঃশব্দে ঈষৎ কম্পমান
সে রাতে আমৃত্যু তার বুক ভেজে সরেস শিশিরে।

দুপুরের মাঠে এক সাধারণ খেলা করে
রেখে গ্যাছে ছুটোছুটি কোরবার বালকেরা
কয়েকটি পালক।

পালক হৃদয়ে ছিলো
দূরে ফেলে আসা এক বালক-পাখির।

## দ্বৈত-সঙ্গীত

### সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

**অপরা**

রাত্রির অভিসার ঘুচবে ?
চরিত্র আঁকা থাকে চরণে
মাথা থাকে মন বিস্মরণে
যখনি যেখানে যাবে বুঝবে।

কী করে বা অবসর মুছবে
দিনের কাজের কালো কতো বা ?
বিকেলের সূর্য্যে যে শতধা
আলোর পুরনো ছোঁওয়া খুঁজবে !



তারপর রাত্রি কি রুচবে !
বন্ধ-দুয়ারে মানভঞ্জন
শিরে তুলে-নেওয়া পদরঞ্জন !!
হয়ত শিথানে মুখ গুঁজবে ॥

**পরা**

আমার গৈরিক প্রাণে আর কতো মাখাবে কাজল
আমি ত চাইনি উমা এতো অন্ধকার
দ্বার খোল তাকাও আবার
ছাখো চেয়ে আমারো যে আছে অশ্রুজল।

এ-মাটি যে কতো কায়া চায় হায় জানেনা নিজেও
শুকায় যে ভিজে দিন কতো,
চায় ফিরে অগণিত সমুদ্রের ঢেউ।
সততই এই চাওয়া
হওয়ার এ অফুরান তুফানের হাওয়া
যদিবা বোঁজাতে পারে পুরাতন ক্ষত।

তবু ত ভোলে না মন প্রমত্ত তরুণ
চৈত্রমাখা মাস
প্রথম জন্মের পঞ্চ ফুলে শর-তূণ-
-তীরে তিক্ত কালাতীত আগুনের আরক্ত বিলাস !
তারপর শেফালিকা বালিকার তনু
সোণারূপা দিয়ে আঁকা শারদ প্রতিমা—
ভালে ইন্দ্রগোপ-টিপ, চোখে ইন্দ্রধনু !

কোন্ লোভে পার হয়ে যাব তার আকাশের সীমা
কোথায় কোথায় যাবো বলো
তোমার ছলনা ছেড়ে কোন ছন্নছাড়া মনে আছে অভিলাষ
মদির স্মৃতির অধিবাস ?
তোমার হৃদয় ভুলে চোখ শুধু হবে ছলোছলো ॥

## মারী মূর্তি

### অমিয় চক্রবর্তী

নিশ্চয় অনেক ভালো ক্যান্‌সসের ক্লিষ্ট মাঠে গিয়ে
ভূলুণ্ঠিত শস্য-হাতে অদৃশ্য চোখের জলে মানা
দগ্ধ প্রজ্ঞা : অনাবৃষ্টি। তার পরে সেই দীক্ষা আনা
যার মন্ত্রে ট্র্যাক্টর, বৈদ্যুৎ কোদাল কাস্তে নিয়ে
অন্নরূপা আবির্ভূতা ; ভূত-পাথরের মূর্তি নয়,
বিজ্ঞানে কল্যাণে সন্ধি, ল্যাবরেটরির পরিচয়
কর্মযোগে। দক্ষিণেশ্বরের কালী জিহ্বা নিরুত্তর
লাল হ'য়ে রোন্ ভক্ত ঘেরা, উত্তরসাধক চলে
মূর্তিহানা দলে-দলে, জানে তারা কৃষির ঈশ্বর
মাটিতে বীজের শক্তি, আত্মাশক্তি, চিত্তে তেজোবলে
উদ্ভাবিত সংঘতায় দেশে দেশে। মারী-জয়ী তারা
সবাই জানেনি ধ্রুব যেখানে জীবন পূর্ণ ধারা
বয় শুধু কাটা-খালে, ট্যুব্-ওয়েলে নয়, তারো পারে
পারমিতা, তবুও এদের হাতে মনে চারিধারে
পথ খোলা, যে-পথে পরমা গতি লোকে লোকে পান
অধিষ্ঠান সর্বজনে, অবিগ্রহ। সূক্ষ্ম প্রতারক,
গুরু-পূজা, আপ্ত বাক্য, অধিকারী-ভেদ গুণ-গান
শুধু হাসি নয়, অপমান এরা বোঝে। বিশ্বলোক
ঘরে ঘরে স্বাধিকার, নরজন্মে সমান সম্মান
—ধিক্ মার্কিনে এসে মিথ্যা ধর্মে পূর্বী প্রচারক ॥

লরেন্স
ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৩



ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ,
কলিকাতা-১৩

১৯৪৯ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৩½ বৎসরে চারিটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম ভ্যালুয়েশানে ( ১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত ) বোনাসের হার বৃদ্ধির আশা আছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।




খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগাস্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড়

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩

"HIS MASTER'S VOICE"
The Hallmark of Quality

নতুন রবীন্দ্রসঙ্গীত

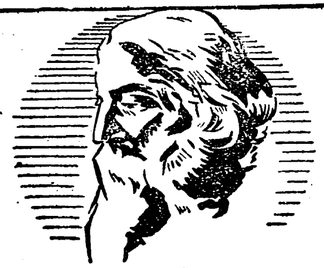

শ্রীমতী শুচিত্রা মিত্র

যে তোমার ছাড়ে ছাড়ুক — N 82578
দু দু চোখের জলে

সন্তোষ সেনগুপ্ত

খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি — N 82582
জীবনে যত পূজা

শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপন পারের ডাক
আমার আঁধার ভালো — N 82589

পঙ্কজ মল্লিক

ভয় হ'তে তব অভয় — P 11927
ভুবনেশ্বর হে



গ্রামোফোন
মডেল ৮৮
মূল্য—১৫০৲ টাকা

লতা মঙ্গেশকর

"বৌ-ঠাকুরাণীর-হাট" বাণীচিত্রে
হৃদয় আমার নাচেরে
শাওন গগনে ঘন ঘোর — GE 30269

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও লতা মঙ্গেশকর

তোমার হ'ল শুরু
মধু গন্ধে ভরা — GE 24692

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

যে ছিল আমার স্বপনচারিণী
তার হাতে ছিল — GE 24693

শ্রীমতী নীলিমা সেন

হৃদয়ে ছিলে জেগে
এস শরতের অমল — GE 24701

এ ছাড়াও ধর্মমূলক, আধুনিক, পল্লীগীতি, কৌতুক, যন্ত্রগীতির মাধ্যমে এবার আমাদের বিশিষ্ট শিল্পীদের রেকর্ড বেরুল। ডীলারের কাছে সম্পূর্ণ তালিকা পাবেন।

'হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস' ক ল ম্বি য়া

দি গ্রামোফোন কোং লিঃ ॥ কলম্বিয়া গ্রাফোফোন কোং লিঃ ॥ কলিকাতা · বোম্বাই · মাদ্রাজ · দিল্লী।


শারদীয়া পূর্ব্বাশা—



সপ্তসিন্ধু ভারত-জাতির প্রথম লিপি-লেখন প্রাক্কা বা মোহেঞ্জোদারোতে (৩০ নং)। তাঁদের এক শাখা

শা র দী য়া

# পূর্ব্বাশা

১৩৬০ বাং লা

## মোহেঞ্জোদারোর কুশান সভ্যতা

**সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**

আমি ঐতিহাসিক নই কিন্তু ঐতিহ্য-বাদী। তাই মনে করি যে সদ্য-স্বাধীন জাতির সৎ সন্তানদের সুস্থ ইতিহাসে মনো-নিবেশ করা উচিত। তাছাড়া ভারতীয়দের মতো একটি প্রাচীন জাতির ইতিহাস কিম্বদন্তীমুক্ত হওয়া-ও যে খুবই দরকার এ-কথাও আমার অহরহ মনে আসে। ইতিহাসের বক্তব্য, মন্তব্য, বিতর্ক, সিদ্ধান্ত প্রভৃতি সম্পর্কে আমি কিছু কিছু ওয়াকিবহাল, তাই উক্ত ঔচিত্য-বোধে পীড়িত। প্রাচীন ভারতীয়দের চারিত্র্য, মনন, সংস্কৃতি ইতিহাসের গুহা-বাস ত্যাগ করে বর্ত্তমানের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক, এ কামনা আমার আন্তরিক। সুতরাং যক্ষ-রক্ষ-নাগ-কিন্নর বা দেব-দৈত্য প্রভৃতি কথাগুলোকে আমি বালভাষিত বা ঘুমপাড়ানি মাসীপিশীর প্রস্তাব বলে অস্পৃশ্য রাখতে কদাচ ইচ্ছুক নই। ঋগ্বেদ-রামায়ণ-মহাভারতকে আমি কবি-কল্পনা বলে মনে করিনে, পুরাণ-ভাগবতের রাজকাহিনী আমার কাছে ইয়ার্কি মনে হয় না। প্রাচীন পুস্তকে উল্লেখিত ব্যক্তিমাত্রকেই ইতিহাস-গত বলে আমি ভাবতে পারি। যক্ষপুরী, নাগলোক, অলকা,



ভর্হুতে চেদী-বংশের বৈষ্ণবী যক্ষিণী মূর্ত্তি।
এ যক্ষ-সভ্যতাই মোহেঞ্জোদারোর
বৈদিক সভ্যতার জননী।

পক্ষীর দেশ, ঘুমন্তপুরী সবই যে একদিন জাগ্রত, জীবন্ত, বাস্তব চিত্র ছিল এতে সামান্যতম সন্দেহ প্রকাশ করতে আমার ইচ্ছা হয়না।

কার্লমার্ক্সের শ্রেণীদ্বন্দ্ব বা টোয়েনবীর দেবাসুরবাদ ইতিহাসের দর্শন কি না এ-নিয়ে আমি বিতণ্ডা করবনা, শুধু বলব যে মানুষের ইতিহাস থেকে বস্তুর ও মানসিকতার যে-কোনো দিক তুলে দেখানো সম্ভবপর। তবে দর্শন-কথাটির অর্থ যদি সদবলোকন হয়, তবে আমি বলতে বাধ্য যে ইতিহাসের দর্শন অদ্যাবধি লিখিত হয়নি। ইতিহাসের হংসবলাকা যেমন নভোচারী তেম্নি ভূমিজ। ইতিহাস যেম্নি হিংসার উন্মত্ততা পরিবেষন করে, তেম্নি সংবেদনশীলতার মধুর চিত্রও রূপায়িত করে। ইতিহাস যেম্নি দেবতার, যেম্নি দৈত্যের তেম্নি দক্ষের—সংস্কৃতিবান প্রাচীন মানব-গোষ্ঠীর। দক্ষদের উরোপা 'ডাইক' ( Dyke ) নামে চেনে। তাঁরা আদি নাবিক, আদি পুরোহিত এবং আদি ডাকাত—নরমুণ্ড-শিকারী। ভারতের দক্ষ প্রজাপতি, শিবহীন যজ্ঞ করেন, নিজেরাই যজ্ঞের দেবতা-ঋষি, মুণ্ড শিকার করেন না—মুণ্ড দান করে ছাগ-মুণ্ড গ্রহণ করেন এবং ভাগবত হন। বিভিন্নতা এখানেই ; দুই ভূখণ্ডের বোধের, বুদ্ধির, সংস্কৃতির গতি-পরিণতির পার্থক্য নির্ম্মল হয়ে দক্ষ-কাহিনীতেই ফুটে ওঠে। উরোপা 'অলতমিরা'র বৃষ-মূর্ত্তিতে বিশ-পঁচিশ হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্ব বর্ষ বর্ষণ করুক, তবু বলব আমাদের দক্ষ-সংস্কৃতি মুসোলিনির ( DVX ) দক্ষ-দেশ জাগবার আগে সেখানে সুস্পষ্ট জাগ্রত হয়নি। কাজেই উরোপা-পণ্ডিতের ঐতিহাসিক বিচার-বোধ যেমন প্রাচীন-সংস্কৃতি-জাত নয় তেমন সার্ব্বিক অভিজ্ঞতারও ফল নয়। প্রাচ্যের সংস্কৃতি ও ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করবার মতো হৃদয় নিয়েই তাঁরা জন্মাননি। প্রাচ্যের অনাবিল জ্ঞান-স্পৃহা তাই উরোপার কোনো বিজ্ঞানী তৃপ্ত করতে পারেন না। সে-স্পৃহার রূপই তাঁদের অবিদিত আর তা জ্ঞান-গোচর হলেও প্রকাশ করতে তাঁরা পরাঙ্মুখ। স্বাজাত্য এমনই দুরতিক্রম্য যে অপর জাতির প্রশস্তি-পাঠ কোনো পণ্ডিত সহজে করতে চান না কিন্তু প্রাচীন ও নবীন ভারতে এ-ঔদার্য্যের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে।

আমার মনে হয় ভারতবর্ষের সাংখ্য-দর্শন ইতিহাস-বোধ জাত। অবশ্য এ-ও বলা যায় যে ইতিহাসের দর্শন সাংখ্য-দর্শন অনুসারী। অবিচ্ছিন্ন সামুদ্রিক তরঙ্গ-মালাই মানুষের ইতিহাসের ছবি পরিচ্ছন্নভাবে চোখের উপর ভাসিয়ে তোলে। পর্ব্বত-তরঙ্গও তাকে বলা যেতো কিন্তু মানুষের ইতিহাস মানুষের মতোই জীবন্ত—শক্তিমান, সদাস্ফূর্ত্ত। আকুঞ্চন-প্রসারণশীল বল-তরঙ্গবাদ ইতিহাসে সক্রিয়। পর্ব্বতের মাল্য-রচনা প্রায় সমাপ্ত। যাঁরা ভাববেন যে মানুষের ইতিহাসের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে একমাত্র তাঁরাই পর্ব্বত-মালার সঙ্গে ইতিহাস-চিত্র উপমিত করতে পারেন। আমি বলব ম্যাক্স প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরীর হঠাৎ আলোর ঝলকানি-ও তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে।



বস্তুর বৃত্রাসুর বৃত্ত রচনা করছেন অবিরত—অন্ধকারে ঘনিয়ে তুলছে মেঘ, ঘুলিয়ে তুলছে জল, পর্ব্বত-শিরে তুষার-খণ্ড—সেই 'পাহাড়পুরে' অন্ধকারের শাপ-মোচন করতে আসছেন ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলোক্ত হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরসের ইন্দ্র। নদী কেটে, জলা শুকিয়ে, পাহাড় ভেঙে, মেঘ বিদীর্ণ করে পরিস্রুত পানীয়, কৃষির প্রাণ এনে দিয়ে যাচ্ছেন চীনের 'যুবানমিঙ্গ' আর ভারতের ঋগ্বেদী 'যুবঞ্জ্যঙ্কে' যুগে-যুগে ইতিহাসে। এইত সভ্যতার চিত্র—মানুষের ইতিহাসের—দেবাসুরে গড়া কর্ম্মী মানবের সবটুকু জ্ঞান। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ কখনো পৃথক সত্তায় কখনো সমন্বিত হয়ে এক দেহে আবির্ভূত। বোধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-শক্তি কখনো বুদ্ধে সমন্বিত হয়ে উজ্জ্বল কখনো বিচ্ছিত্তিতে ম্লান। নৃত্যপরা প্রকৃতি অহরহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রাণ-পুরুষকে—সৃষ্টির উন্মাদনায়। ইন্দ্র বৃত্তকে চান, বৃত্ত ইন্দ্রকে—নাম রূপকে যেম্নি চায়, রূপ নামকে তেম্নি আকাঙ্ক্ষা করে। এইত ভারতীয় দর্শন—ভারতবর্ষেরও ইতিহাস। একেকটি স্থান কেন্দ্র করে একেকবার সভ্যতার পালা অভিনীত হয়েছে—সুরু হয়েছে সংস্কৃতি-সৃষ্টির পালা। তারপর সব নদী যেমন সমুদ্রে যেতে পারে না, হয়ে পড়ে উপনদী কিম্বা মরুতে শুকায় বা হ্রদে জল ঢালে তেম্নি সব আঞ্চলিক ইতিহাসই সার্থক হতে পারে না বিরাট স্ফূর্ত্তিতে। হঠাৎ হয়ত একটি শাখা-নদীর সমুদ্র-সাধ মেটাবার সৌভাগ্যোদয় হয়। মানুষের আদি কৌম-গোষ্ঠীর ইতিহাস ঠিক এই ভঙ্গীর। জাতির বিরাট ললাটে সব মানব-কৌমই নামাঙ্কিত করে যেতে পারেনা—সব অঞ্চলই তার সংস্কৃতির সঞ্চয় মোহেঞ্জোদারোর বিরাট যাদুঘরে সাজিয়ে রাখবার সুযোগ বা সদিচ্ছা দেখাতে পারেনা। হানাহানি আসে, দ্বন্দ্বের সুরু হয়, সমন্বয়ের চেষ্টা চলে। কে যে সমন্বয়-সাধক, কোন অখ্যাত বা বিখ্যাত অবতার—সদৈতিহাসিক সর্ব্বদা তাঁরই সন্ধান করবেন বলে আমি ইচ্ছা করি। বলা বাহুল্য যে তেমন ঐতিহাসিক কেউ নেই।

কেউ নেই কিন্তু কেউ আসতে পারেন। তাই মহাবীর বজ্রী মহেন্দ্র এবং পুরুবীর বিদ্যুতাভ বৃত্র বর্জ্জিত যক্ষ-অধ্যুষিত মোহেঞ্জোদারোর শৈব-শ্মশানে আমি মহানন্দি-বৎ দুঃসাহসে বিচরণ করতে অগ্রসর। আশা—যদি বা সেখানকার বৃষ-গাত্রে পুরবাঁইয়া-গীতি শুনতে পাই। ভারত-ইতিহাস পড়ে এবং মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত তৈজসপত্র দেখে আমার এই প্রতীতি হয়েছিল যে হয়ত দুঃখিনী বাংলা মায়ের কোনো সুসন্তানের উদার হৃদয়ের দান এই অনির্ণীত সিন্ধু-সভ্যতায় আছে ; সভ্যতাটি দ্রাবিড়েরই হোক আর আর্য্যেরই হোক—তা যে পুরোপুরি 'প্রচুর-পয়সী-প্রাচী'র সভ্যতা এ-সম্পর্কে আমার মতো অনৈতিহাসিকও নিঃসন্দেহ হতে পারেন যখন সেখানে মৎস্যদেশের বড়শী, আচমন-সরঞ্জাম ( কোশাকুশি ), মনসা-মূর্ত্তি, পূজার ঘণ্টা, প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হবে। তাছাড়া জুয়া-খেলার ঘুঁটি—পাশা নয়, দাবা নয়, বাংলাদেশের মেলায় জুয়াড়িরা যে ঘুঁটি ব্যবহার

করে ( ঋক্‌বেদের 'দ্যূত' বা মহাভারতীয় 'অক্ষ' তা-ই ছিল-কি-ছিলনা জানিনে ) অবিকল সেই ঘুঁটি দেখতে পাবেন মোহেঞ্জোদারোর যক্ষ-পুরীতে। ঋক্‌বেদ সপ্তম-মণ্ডলে সায়ন মিত্রাবরুণের ( বাসিষ্ঠ ) 'পূজা' অর্থেই কিন্তু 'যক্ষ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ঘণ্টা-কোশাকুশি ব্যবহারে যক্ষরা ( বাসিষ্ঠ ও কুশিকাসঃ ) সেখানে পূজা করতেন বলেই মোহেঞ্জোদারো ( ওকমণ্ডল ) ঋক্‌বেদের সভ্যতার মণ্ডলে এসেছিল।

মোহেঞ্জোদারোর নানা তৈজসপত্রের সঙ্গে কিছু কুশান-মুদ্রাও আবিষ্কৃত হয়েছে। বোঝা যায় সেরিকা-বাসী কুশানরা কিছুকাল মোহেঞ্জোদারোর মালিক ছিলেন কিন্তু কুশানরা ত এলি-উপত্যকার ঐল হয়েও শকাব্দী-প্রণেতা শক। আর অল-বীরুনী তাঁর ভারত-ইতিহাসে বলে গেছেন প্রথম আপঘন-সাহী হয়েছিলেন 'বরহাতকীন'; কুশান 'কনিক'-চৈত্যধর তাঁরই বংশের মানুষ। তাঁরা নাকি তিব্বত-জাত তুর্কী। কুশানদের আমরা শক-তুর্কী-তিব্বতী বলেই পেলাম। তারপর নেপালের ইতিহাস লিখতে বসে সিলভ্যাঁ লেভি জানালেন যে তিব্বত-নেপাল অঞ্চলে সত্যি তুর্কী ছিলেন। 'তুষার'-জাতিকেই তিনি তুর্কী ভেবে নিয়েছেন। এই তুষার জাতির কন্যাই কিন্তু আমাদের তুষার-কন্যা দুর্গা। নিশ্চয়ই তাঁকে আমরা অকাতরে গ্রহণ করেছি। এই তুষার-জাতি নৃতত্ত্ববিদের পাল্লায় পড়ে 'তোখার' হয়েছেন কিন্তু যুঅন-চবঙ্গ তাঁদের তকলামকানেও 'তুরফান' হিসেবেই দেখেছেন। তাঁদের অতিথি-পরায়ণতা, ক্রোধ, ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষের খবর যুঅন-চবঙ্গের বিবরণীতেই পাওয়া যায়।

ভাষাতত্ত্ববিদ পেদার্সনের কথা যদি শুনতে হয় তাহলে দেখা যাবে তুরফান বা তোখার-জাতি সেন্টো-ইতালিক ভাষাভাষী। তার মানে কনিষ্ক, কামাল পাশা আর ব্যর্ণর্ডশ' একই গোষ্ঠীর মানুষ। উরোপা তা মেনে নিচ্ছে কি? তুর্কী না হোক, নিদেন পক্ষে 'শক', যা কুশানদের অপর অভিধা? তাঁদের সেক্সপীয়রের আসল নাম ত দেখা যাচ্ছে ( ডেইটনের হিসেবে ) 'শক্সবার্ড'। '×'-টি কুশানরা ব্রাহ্মী 'ক'-র পরিবর্তে ব্যবহার করতেন। 'ক্ষ' কথাটিও বোঝাত এতে। তান্ত্রিক ধ্বনি-সংহার-মতে 'ক্ষ' 'ক'-এর পূর্ব্বাক্ষর এবং 'হ'-এর পশ্চাদ্ধাবিত। 'হ'-কার তান্ত্রিক-মাতা, শৈবতার-বাহন অক্ষর বা অক্ষ 'ক্ষ'। শিব শক্তির পশ্চাদ্ধাবন করছেন। ভগবতী শক্তি যখন দক্ষ-কন্যা সতী, তখনও। আমাদের পুরাণ এবং 'ষট্‌চক্রনিরূপণম্' ( শাক্ততন্ত্রযোগ-শাস্ত্র ) একই কথা বলে। আর কুশান যে আসামের শৈব ( শূলীয় 'মিকিরতি দোবোক' ) ত্রিশূলধারী পুরুষ ছিলেন—এতো তাঁদের মুদ্রাতেই বোঝা যায়। মোহেঞ্জোদারোর কুশান-মুদ্রাতে-ও। ঋক্‌বেদেই 'শিব' এলেন।

তোখার বা তুষারের যে চেহারা আঁকা পাওয়া গেছে—তার লম্বসাটপট যদি 'সার্ট' কথাটির জন্ম দিয়ে থাকে—এবং জন্ম দিয়ে থাকে তেমন জামা-পরা কুশান কনিষ্কদের



তাহলে কি করে বল্‌ব তুখার-ইংরেজীর সঙ্গে তুষার-সংস্কৃতের মিল ছিলনা? এশিয়া মাইনরে ঋক্‌বেদী সভ্যতা-জাত মিতানি রাজ্যের ( ১৪০০-১২০০ খ্রীঃ পূঃ ) 'অস্‌সিল' কথাটির উৎপত্তি খুঁজতে সপ্তম শতাব্দীর তোখার ভাষার বিভক্তি 'অসসাল' খুঁজে বার করা হয়েছে। কেন? 'হয়সল'-যাদবরা কি মিতানির আরো কাছে নয়? ২৩৭ খ্রীঃ-পূর্ব্বের বিজয়সিংহের সিংহলী সন্ততি 'অসেল' ত আরো কাছে স্থান-কালের হিসেবে। 'অশীল' কথাটির তালুস্থ 'শ'—দাঁতের উচ্চারণে দু'টি 'স' অনায়াসেই নিতে পারে যদি বৈদিক ছন্দজ্ঞান মিতানিদের থেকে থাকে। বিজয়সিংহের পিতৃভূমি মহানাদে কুশান সম্রাট হুবিষ্ক ( হবিষ্ক = সর্পিরাসুতী, অষ্টমমণ্ডল ) বসবাস করে গেছেন। মিতানিদের 'নাসত্তিয়ান্থ' বা ঋক্‌বেদের কাত্যায়নের নাসত্য-সেনা তিন-দিন তিন রাত্রি সমুদ্রবাসের পর ষড়শ্ব নিয়ে তীরে উঠ্‌ল। এশিয়া মাইনরে একটি অশ্বশাল কি তৈরী হয়ে উঠতে পারেনা ঋগ্বেদীয় তুষার-জাতির তোখার না হলে? মোহেঞ্জোদারোর তিব্বতী-ব্রহ্ম রাজমূর্ত্তিগুলো অন্ততপক্ষে উর-সভ্যতারই মানুষ, যা থেকে উরোপা জাত। 'রথ'-চক্র চিহ্নগুলো সেই ঋগ্বেদীয় রাজাদের।

আমার আপত্তি এই খানে যে তুষার বা কুশানকে ( তিব্বতী তুর্কী ) শক বা কুশান নামে সেন্টো-ইতালীয়দের দলভুক্ত করা হয়না কেন? ইন্দো-সিদিয়ান বলে কি? না তিব্বতী বলে? না কি 'অলতমিরা'র তারিখটা অলীক বলে? গুহা-চিত্র বাঘগুহায়ও আছে —আমরা মনে করি গুহ্যক বা কুবের যক্ষ তিব্বতী তুর্কীর মতো গুম্ফায় তাঁদের 'নিধি' লুকিয়ে রাখতেন। ভারত-কিং বা 'বরহাতকীনের' গুম্ফা-প্রীতি সম্পর্কে অলবীরুনী বর্ণনা করেছেন। আমরা ত অকপটে স্বীকার করতে পারি পরবর্ত্তী চৈত্য-তৈরী-করনে-ওয়ালারা কলিঙ্গ-হাতিগুম্ফার 'চেত' ছিলেন। 'করনিকে' বলতেন কনিষ্ক নিজেকে ইন্দো-সীদিয়ন ভাষায়—হয়ত কোনার্ক-করণিক ছিলেন তাঁরা ( ঐল-তুর্ব্বসু-চোড়গঙ্গ )। গ্রীকভাষায় বিন্দুসার যেমন 'অমিত-চেত' ছিলেন তেম্নি কুশানরা গ্রীক্‌ভাষায় নিজেদের বলতেন 'কোরনো'। 'কোরনো' মানে কুড়োনো পাণ্ডব ছেলে কর্ণও হত। ঋক্-সংহিতায় তাঁরা 'কৃথ' এবং ত্রি কীকট ( ত্রিকলিঙ্গ ) অধিপতি (৩/৫৩/১৪)। চেতরা স্পষ্টত রথ-কার ছিলেন, অধিরথও (কর্ণের পালক পিতা) যজমান ঋষি কণ্ব। কর্ণ পালক-পিতারই বংশে আত্মপরিচয় দিতেন। ঋক্‌বেদে যুবঞ্জ্যঙ্কে হুবিষ্কদের একটি মণ্ডল আছে ( ৮ম )—তাঁরা সেখানে 'সম্রাট হবিষ্ক' ( সম্রাজা সর্পিরাসুতী ) তাঁরা রক্ষক ( রক্ষঃ ) আর পুরোহিত হলেন কশ্যপ। জৈন মহাবীরও ( ইন্দ্রের অপর নাম 'মহাবীর' ) ক্ষত্রিয় কশ্যপ বংশ। যখন বৈদ্য হবিষ্ক ঋগ্বেদে স্থিত তখন ভিষকের হস্তে 'বাশী' বা তক্ষণ-যন্ত্র যার বাংলা নাম 'বাইস'। বলা যায়, তালব্য 'শ' সাক্য-কৃপায় বা শক উসবদাতের দাতব্যে পশ্চিম বাংলায় দাঁত-ঘেঁষা। বাংলায় যে শকাব্দী শুভ বলে পরিগণিত হয়েছে বস্তুত তা বাস্তু-পূজা-জাত

শকাতীতকাল। যিনি শকাব্দীর প্রবর্ত্তক, হংসচিহ্নিত 'কনিষ্কের স্মারক নিধি'র লিপিকার তিনি। নকিন্দ্র বা নাগবাহন ইন্দ্র-মূর্ত্তির নিচে খরোষ্ঠী বা উল্টো বাংলায় '০ শকা'-লেখা আছে সেখানে। শক-কাল যজুর্ব্বেদের রাজত্ব-কাল। বৈদিক রাজত্ব-কাল তা-ই।

ঋক্-সংহিতার কৃণ্বের যেমন তিনটি কীকট ( কলিঙ্গ বা কবচ ) ছিল—পৌরানিক 'কুবচ' বা কোচ-কুচান-মণিপুরী-বেসতির রাজ্যেরও তিনটি নাম ছিল 'কথে','কসে','মেখলি'। আদি-কুশভূমিরও তিনটি নাম পাওয়া যায়ঃ 'কলিঙ্গ', 'দণ্ডক' এবং 'মেখল'। 'কসে' নামটি বেস-নগরের খাসিয়া কাসিপূত ভাগভদ্রের দরুণ, হেলিওডোরা ব্রাহ্মী লিপি উল্টোলেই গ্রীক্-ইতিহাস পাল্টাবে।

অবশ্য আমরা মনে করব কশ্যপের কাশী-দ্বারা পবিত্রীকৃত হয়েই কসে মনিপুরী লাইছাবি-রা তিরভুক্তির লিচ্ছবী বা ঋগ্বেদের চেদী হয়েছিলেন। চেদী-কে 'চদা-যখী' রূপে ভর্হুতে বুদ্ধ বংশ স্থাপিত করেছেন। মণিপুরের 'কথে' নামটি 'কদে' বা মালয় ঘেঁষা। 'চেদী' নামটিতে কিন্তু চৌদ্দ-স্তূপ-পূজক ত্রিপুর-চদ্রিদের খানিকটা ভাগ ছিল যেমন ত্রিপুরী কলচুর ( 'কালচার'-শব্দটি তুলনীয় ) চেদী কর্ণদের আছে। বোডো-ফিসা ত্রিপুর জাতি হিমালয়-পূজা-ও করতেন চৌদ্দস্তূপের এক স্তূপে এবং মণিপুরী কোরপোল ( আসন ) পেতেন আত্মীয়তা-সূত্রে। এই 'কোরপোলের' মকরাশ্ব ভর্হুতের 'চদা-যখী' ( চেদী-যক্ষী ) পাদপীঠ রূপে ব্যবহার করছেন। 'মৃত'-গাব বা পশু-কাহিনীর উপর মণিপুরের কৃষি-সভ্যতার প্রতিষ্ঠা। বোডোর কদে-পুত্র কদফিসা কুশান এ-ভাবে চেদী হ'ল। এ-দু'টি 'ফিসা' বৎসকে ঋক্বেদের বিশ্ববারা উদীচি-দুহিতা ঊষার সন্ততি হিসেবে পাওয়া যায়। উর্ব্বশীর অগ্রমেয দু'টি তারা অশ্বিনা। ইউচি বা উদীচীও এঁরাই।

কৃণ্বের কীকট-গুলো ইষু, গাব, নাশিরম। কবন্ধী কাত্যায়নদের ইষু, ঈশ বা তীর হয়েছেন, যীশু হয়ত হতে পারেননি। তবে মৌর্য্য তিব্বতী 'তিবর' থেকে টাইবেরিয়ান হওয়া বিচিত্র ব্যাপার কিছুই নয়। আমাদের কলিঙ্গ গাব গাভী হয়ে শূর্পণখার রক্ষঃ-জাতিকে নির্ম্মাণ করেছে এবং বৃষ হয়ে ইক্ষ্বাকু লক্ষ্মণের জাতিকেও সূচিত করেছে ( ভট্টিকাব্য দ্রষ্টব্য )।

ঋক্বেদের প্রথম-মণ্ডলের ইন্দ্রও বৃষ-লক্ষণাক্রান্ত। বৃষ বর্ষার চিহ্ন বহন করত। মোহেঞ্জোদারোর বৃষটি ঔরনসে ( মোহেঞ্জোদরোর আলেকজেন্দ্রীয় নাম ) বা রাজা হোড়ি নির্ম্মিত ( রাজা 'বর' বা 'বরাহ'-ও বলা হয় ) বরুণপুরীতে 'আপ' বা বরুণের বদ্ধজলা নির্ম্মাণ করেছিল। প্রাচীন মণিপুর এ-জলাকে 'খল'-বলত। কোশাকুশি, ভিষক-বৈদ্যের 'খল'ও এ জলা-ভঙ্গীতেই নির্ম্মিত। খলদিয়ান বা কলদি-জাতি 'খল'-কথাটি সংলগ্ন। শ্বেত অর্থ আসামে 'কলিত'। বরুণের জল যে শুধু পশুর জন্যে এ-কথা ঋক্বেদ প্রথম-মণ্ডলের ইন্দ্র-বৃত্তান্তে আছে। আর বরুণ-পূজক



শূনঃশেফ-মন্ত্রে আছে তাঁরা 'বসতী' নন। 'বসতী' মানে 'বেসতি'-জাতি, পেরিপ্লাসের নাবিক যাদের 'থিস' দেশে বা মলাক্কায় ( 'ঔরীয়-চের-সোন'—প্রাচীন বাইবেলোক্ত নাম ) অঞ্চলে স্থাপিত করেছেন। তাঁরাই ইন্দ্রের জাতি। যবদ্বীপের 'ইন্দ্র'-সংস্কৃতি বা 'যম'-সংস্কৃতি বিখ্যাত। অষ্ট্রিক কৃষি-ব্যঞ্জক 'জুম' কথাটি থেকে হয়ত প্রথম অগ্নি-পূজারী জমদগ্নি-বংশ জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁরা 'সুবর্ণব্রীহি' বপনের পত্তন করেছেন ব্রীহিকে অগ্নিপক্ক করবার বিদ্যা-ও অবশ্য তাঁদের জানা ছিল। সে যা-ই হোক ইন্দ্র-সন্ততি 'বেসতি'-রাই যে 'কদে' হয়ে একদা মালব্য-ব্রাহ্মণ ছিলেন সে-সম্পর্কে দ্বিধা-প্রকাশ করে লাভ নেই। জমদগ্নির অগ্নি সম্পর্কে বলা যায় যে তা ঋগ্বেদের এবং জম্বুদ্বীপের। পিয়দসি জম্বুদ্বীপের সে 'যিম'-কে আবেস্তার ভঙ্গীতে স্মরণ করে গেছেন। বুদ্ধগুপ্ত ( ইরাণী নয় ) বাংলার ছেলে বলেই সিঙ্গাপুরে গিয়ে জমদগ্নিকে স্মরণ করেছেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তবংশ ( মৌর্য্য-সান্দ্র ) পহলবী-ঘেঁষা এবং প্রচেতা-বরুণ-ভক্ত। শুক্রাচার্য্যের ও বসিষ্ঠের মতো অসুর ( এসিরীয় ) ভক্ত। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তবংশ ( আর্য্য-লিচ্ছবী ) কুশান-শক ঘেঁষা এবং ইন্দ্রভক্ত। তবে লক্ষামণ্ডলে যাদব-বর্ম্মণ ( বেলব-যদুকুল ) হিসেবে উভয় চন্দ্রগুপ্তকুল বা চন্দ্রবংশের দুই ভাই শুক্রাচার্য্য-দৌহিত্র একত্রই ছিলেন। ঋক্বেদে তাঁরা যদু-তুর্ব্বস এবং যক্ষুস্ ( চেদী কুশান )। ঐল পুরূরবার বংশ। 'ইলি'-উপত্যকার উশন বা 'কুশান' তাঁরা যজুঃবেদের আস্ত্রিক যুগে। ঋক্বেদের সভ্যতা দ্বান্দ্বিক হলেও শালীন। বৃত্র-বরুণ-সেবক শূনঃশেফকে ইন্দ্র-সেবক বিশ্বামিত্র নরমেধ-যজ্ঞে বলি দেবেন। তবু শূনঃশেফ 'বেসতি' শব্দটি প্রয়োগ করছেন না। তাঁদের বসু বলে বৈশ্য বলে, 'বসতীরূপ' বলে চিনে সরাসরি তাই বলছেন। ঋক্বেদে 'ইন্দ্রত্ব' মানে রাজত্ব। যখন যিনি রাজা হয়েছেন তিনিই ইন্দ্র—পরাভূত বা সিংহাসন-চ্যুত রাজবংশ বরুণ, অসুর, পনিভট, বলাসুর, বৃত্র প্রভৃতি অভিধা পেয়েছেন। অভিধা দুর্ব্বাক্য নয়। পরাভূত রাজবংশের সঙ্গে রক্তের বিনিময়ও হয়েছে বিজয়ী-রাজকুলের এবং তা থেকেই মিত্রবরুণ, আদিত্যবংশ। 'নাসত্যে'র কৃপায় 'বিমদ'-কক্ষীবৎ ( উশিক-দাসীপুত্র ) পত্নীলাভ করেন। তিনি 'বিম-কদফিসার' পূর্ব্বপুরুষ কিনা বিবেচ্য।

নোহ-বংশের সন্ততির বিন্যাস দেখিয়ে বাইবেল তদানীন্তন সভ্য জগতের মানচিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন—তাতে দেখা যায় ভারতবর্ষ দু'টি ভাগে ( ইনট্রাগঙ্গেম ও একষ্ট্রাগঙ্গেম ) বিভক্ত হয়েও সমন্বিত। মালয় ( মালব্য ) থেকে সিন্ধুমোহনা ( ভৃগুকচ্ছ ) পর্য্যন্ত এক বিরাট ভারত তখন, যদিও উত্তরাপথ ভারতবর্ষের অন্তর্গত নয়। আমার মনে হয় এ-ভারত সামবেদী। 'বৃহৎ-সামে'র মারফৎ তার যে পরিচয় পাই তাতে দেখা যায় ইন্দ্র 'বৃত্র নরা' ( নারায়ণের ) পৌরোহিত্য নিয়েছিলেন।

ঋক্‌বেদেও যে তেমন ইঙ্গিত নেই তা নয়। মহাভারতের ক্ষাত্রপ্রাধান্যের যুগটা তা নয়। কাজেই বাইবেলের মানচিত্রে কুরুক্ষেত্র-অঞ্চল নামহীন। পরিত্যক্ত ভূমির কেন নাম থাকবে? বারুণি যদু আর পাণ্ডবেরই এই ভারতবর্ষ। কিন্তু অপর-ক্ষত্রকুল কুরু, ভারদ্বাজ দ্রোণ যাঁদের কুলগুরু, সেই ইন্দ্রদের পাচ্ছি আমরা তখন 'সেরিকায়' ও 'ঔরীয়-চের-সোন' নামক মলাক্কায়। শুঙ্গরা এবং ঋক্‌বেদের ইন্দ্র সেবক 'সুদাস' এই ভারদ্বাজ। তাঁরাই 'থিস' বা 'দিশ'-দেশের 'বেসতি'। বৈদিক 'দশ'-রাজা দশরথ-দশানন, দশরাজ মৌর্য্য সবাই 'দিশ' বা 'থিস' রক্ত মিশ্রিত। রথী-নৃপ হওয়া অঙ্গরাজ উশিকের লক্ষণ দেখতে পাই।

থিসের চারটি কৌম মিলেই 'চৌথিস' বা চতুরাঙ্গুল যমাগ্রজ শনি যাকে রাজর্ষি দশরথ বস্তু-দেবতা জ্যোতিষ্ক বলে স্তব করেছেন। তিনিই মোঙ্গোল-জাতির আদি-জনক। কাত্যায়নের অশ্বসেনাপতি ব্রজবাসী 'নাসত্য' চতুরাঙ্গুল-বিশিষ্ট হয়ে মোহেঞ্জোদারোতে উপবিষ্ট আছেন—চক্ষে ঈক্ষণ মাত্র প্রস্ফুটিত হচ্ছে সে আদি মানবের। সে মূর্ত্তিকারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেম্নি মোহেঞ্জোদারোতে, তেম্নি দেখছি ফরাসী 'নিয়ক্ষে'র পর্ব্বতগুহায় এই ধরণের একটি রমণী-মূর্ত্তি দণ্ডায়মানা করতে। সে-মূর্ত্তির জন্ম-তারিখ যদি কুড়িহাজার খ্রীষ্টপূর্ব্ব হয়ে থাকে তাহলে মোহেঞ্জোদারোরও জন্ম-কাল মানবের স্থাপত্যশিল্প-সভ্যতার জন্মের মুহূর্ত্তেই। মূর্ত্তিগুলো শকের চষ্টন, সেনকুলের ত্রয়ষ্টন-আদিশূর-কন্যা আর ঋক্‌বেদের আদিত্যদের চক্ষু—অসুরবরুণের সূর্য্য। 'নাসত্য' সেরিকার দমিন-ব্রাহ্মণ, কুশান-জনক।

সিদিয়ান-হিসেবে যদি কুশানদের সন্ধান করতে হয় তাহলে দেখা যাবে ঘটোৎ-কচ-গুপ্তের মুদ্রা যে দেশে পাওয়া গেছে সেখানকার একটি গ্রামের নামও 'গোরি' এবং তদঞ্চলে আঠারো-শতকের কবিরাও ভাবতে পারছেন যে উরোপার মেয়েরা সুন্দরী এবং মিশরী ফিন্‌স্ক তাঁদের। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ক্লিপফন্তেন-এর প্রস্তরে যে হরিণের খোদিত মূর্ত্তি দেখা যায় তার দেহে বাংলা অক্ষরে 'শস্য'-কথাটি এমন ভাবে লেখা যাকে দেবনাগর-অক্ষর হিসেবে 'পচস'-পড়া যায়। একে প্যালিওলিথিক যুগের (প্রত্ন-প্রস্তর যুগের) চিত্র বলে গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর ফরাসীর প্রত্ন-প্রস্তর যুগের হরিণটি যে-স্থলে পাওয়া গেছে তার নাম 'লিমুইল'—ইলি-উপত্যকার লামা 'উসন' বা 'উশন্'-দেরই (ঋক্‌বেদের 'অংশ'-আদিত্য) এই কীর্ত্তি ('উশন্ হবৈ বাজশ্রবসঃ সর্ব্ববেদসং দদৌ'—যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদ)। কারণ, সেখানেও হরিণ-গাত্রে বাংলা অক্ষরে 'হস্ক' (তান্ত্রিক 'হক্ষ'—ঋগ্বেদীয় 'হবিষ্ক'—ঐতিহাসিক হৈক্ষক) এবং কুশান-ব্রাহ্মী বাঁকা 'ক' বা রোমান ×-অক্ষরটি খোদিত। বাংলা-লিপির জন্ম-ক্ষণটি ভাষাতাত্ত্বিকরা কোথায় স্থাপন করেছেন জানিনে তবে দেবনাগরের আগে প্রাণ থাকতে তা করবেন না জানি—আমি তাঁদের



অনুরোধ জানাচ্ছি আফ্রিকার আর ফরাসীর এই ফণীসিয়ন বাংলা বা ফনীমনসীয় বোডো-জাতির লিপিগুলোর দিকে দৃষ্টি-পাত করতে। ব্রাহ্মী 'জর্জর'-কথাটি যে বাংলার 'ঘ-ঘ' ধ্বনি এনে নব-বিদর্ভে গুর্জ্জর সিংহ সৃষ্টি করত এবং রুষে সৃষ্টি করত জর্জিয়া তা 'ভরত-অক্ষদে'র বা বোডো অক্কডের ভর্হুত থেকে জানা যায় (৭৯-সংখ্যক লিপি)। ভবভূতি ইক্ষ্বাকু-সন্তানদের 'ঐক্ষ্বক' বলেছেন—ঐক্ষ্বক আর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ 'হৈক্ষক' ও 'অক্কড' একই দেবসেনা দেখা যাচ্ছে। কাজেই মিতানি-রাজ্যে মিশরী-ফারাওদের সঙ্গে ইক্ষ্বাকু 'দশরত্ত'-কে দেখা যায় এবং তার পুত্র 'মত্তিউয়জ' ঋক্‌বেদের কুশিকাসঃ বিশ্বামিত্রের তৃতীয় মণ্ডলে 'মর্তীস-উতয়ে' রূপে সিংহ-অগ্নিবৎ প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। ফণীসিয় ইতিহাস বলে, তাঁরা গুট্ট-গৃহকারক। গুর্জ্জর-সিংহ সেনের সঙ্গে দামিল গুট্টিকদের পাওয়া যায়—তাঁরাই গুপ্ত। রুষ-প্রখ্যাত ঘটোৎ-কচ-গুপ্তের সন্ততি সমুদ্রগুপ্ত 'কাচ' উপাধি নিয়েছিলেন যেহেতু মহানাদের 'কোচ'-রাজদের মুদ্রা দেখায় যে তাঁরা কোচ, দামলিপ্তের দামিল। কোচ-কুচান-কুশান ফণীসিয় যা ফনীমনসীয় বোডো জাতির কদ-সন্তানও তা-ই। 'সন্তান' বলতে বোডো ভাষা 'ফিসা' বোঝাত। অক্কড কুশানরা নাগরাজ নকিন্দ্র হয়ে বলতেন: 'অয়ইসীদাতসর্গানকস দানং' (২৬৫ সং-লিপি ভর্হুত)। তাঁরা বিন্ধ্যের ঐল, চেদী এবং এলোর-মৌর্য্য।

রামপূর্ব্বার মৌর্য্য (হর্য্যঙ্ক) সিংহমূর্ত্তিতে কদফিসা কুজল তাঁর মৎস্য-হংস চিহ্ন-সহ নাম অঙ্কিত করে দেখিয়েছেন যদুবংশের পুরোহিত কাণ্বরা মৌর্য্যেরই অংশ—মুষিকান বিষ্ণুগুপ্তের মতো, যাঁরা এলামে-সুসায় (জাতকোক্ত 'তেলবাহন'-রাজ্যে) মুষকিনু, রুষে মুজিক।

সাক্য-কুল যে নন্দ এবং মৌর্য্য-কুলের সঙ্গে জড়িত তা শ্রদ্ধেয় রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য'-নিবন্ধে বিবৃত আছে। সাক্য-বুদ্ধ-কুল ঋগ্বেদের 'অয়াস অঙ্গিরস' গুরুকুল থেকে আগত, জাতকোক্ত প্রথম বুদ্ধ 'কুণ্ডিন' নাম থেকে তার সন্ধান মিলে। ভাগবতোক্ত বিদর্ভের রাজধানী 'কুণ্ডিন'। আসামের ঐতিহ্য বলে ঈশান-কোণের সদিয়া-অঞ্চলই পূর্ব্ব বিদর্ভ। এই ঈশান-কোণেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-বর্ণিত ঈশান-দেবতা। শিব-পূজক শ্বেত জাতিরও বাস ছিল ওখানে। ঋক্‌বেদে শ্বেত অশ্বের আরোহী শুক্র বা শুক্ল। সদিয়া অঞ্চলে 'শূলীয় মিকিরতি দোবোক' নামে কিরাত-দেব বংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সদিয়া নামটি 'সিদিয়া'-ধ্বনির অনুগামী। প্রাচীন সিদিয়ান আর তুরানীয়ান (বালুচিস্তনের) সমার্থবাচক বলে 'যাজক কুক' তাঁর ভাষা ও ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস-গ্রন্থে বলে গেছেন। প্রাচীন সিদিয়ানদের আবাস-স্থল সাইবেরিয়া বলে বাইবেলের মানচিত্র দেখিয়ে গেছে এবং তাদের 'ইমোন-সিদিয়ান' বলা হয়েছে—যার অর্থ হিমালয়-জাত সিদিয়ান। তিব্বত-ও এই সিদিয়ার অন্তর্ভুক্ত—তিব্বতী তুষার (অলবীরুনীর ভাষায় তুর্কী) সেই সুবাদে কুশান-

সিদিয়ান। কুশদ্বীপ বা সেরিকার দস্মৈ বা দমিন-ব্রাহ্মণ কুশানরা 'সদিয়া' নামকরণ করেছেন।

দেখা যায় অল-বীরুনী ঠিকই বলেছেন, গন্ধার অঞ্চলে তুর্কী-সাহী যা ব্রাহ্মণ-সাহী তা-ই। ভারতে থাকলেই ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়—বাইরে গেলেই তুর্কী। দাস-রাজ-তনয়ার অবৈধ ঋষিপুত্ররা ভারতের ব্যাস-বৃন্দ, ক্ষেত্রজ নৃপতিরা কুরু, ক্ষাত্র। সত্রপ সিদিয়নরা যে 'উরল'-হ্রদের রুষও হয়েছিল, নির্ম্মাণ করেছিল মেম নিয়ে মেমফিস-সভ্যতা কদ-ফিসাদের কৃপায়, তার প্রমাণ আঠারো শতকের জর্জিয়া-সাহিত্যেও আছে। আর বাংলার প্রত্নপ্রস্তর-যুগের অস্ত্রে শূলচিহ্নে লেখা আছে কুশান-ব্রাহ্মীতে—'উরন'। রুষের সিদিয়ানদের 'আলেকজান্দার'-নাম পাওয়া যায়। অল-কান্দাহার যেমন 'আলেকজান্দার' তৈরী করতে পারত তেম্নি অলকা-সান্দ্র বা অলকার যক্ষ সান্দ্রজাতিও 'আলেকজান্দার' তৈরী করত। তাই প্লুতার্ক যাকে বলেছেন 'নন্দ্রাম', জাষ্টিন তাকেই 'আলেকজান্দ্রাম' বলেছেন। কুশান বা গুপ্ত সিদিয়ানই নন্দ এবং গ্রীক। ফণীমনসীয় বোডো-জাতিরই বা ভারত-জাতিরই বহির্ভারতীয় কীর্ত্তি ফণীসিয়।

বাইবেল-মানচিত্রে হিমম্-সিদিয়ানদের দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে 'সেরিকা' রাজ্য বা ইয়াংজিকিয়াং উপত্যকা। 'পৃথিবীর ইতিহাস' নামক একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থের সম্পাদক উইচ-সাহেবের মতে এই উপত্যকা আদি-মানবের অন্যতম জন্মভূমি। আদি মানবের বসতি লক্ষণ ( পেরিপ্লাসের নাবিক বর্ণিত 'থিস'-দেশের 'বেসাতি'-জাতি বা ঋগ্বেদের 'বসতীস্' বসতি শব্দের আনুষঙ্গিক ) যদি হয় একটি স্তূপের উপর জীবাশ্ম বা প্রস্তরীভূত বৃক্ষ-কাণ্ড পাওয়া এবং যদি সে-সব চিহ্ন আদি-মানবের বাস-ভূমি নির্ণয় করে, তাহলে বল্‌ব, ত্রিপুরার গোমতি-তীরে ময়নামতি-লালমাই স্তূপ একটি আদি-মানবের জন্মভূমি। কারণ সেখানে 'চণ্ডী-মুরা'-নামক অঞ্চলে ত্রিশ বছর আগে অপরাপরের মতো লেখক নিজে 'অসুরের হাড়' নামে কথিত জীবাশ্ম কুড়িয়ে পেয়েছে। বোডো-ফিসার দেশে এ-পাওয়াটা অবিশ্বাস্য বা কিম্বদন্তী নয়। 'সমাপা'র 'চণ্ডীমুরা' থেকে কৌটিল্য-মৌর্য্যযুগ সুরু হবার প্রস্তাবটিও হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'মুরা'-জাতি থেকেই মৌর্য্য-রা এসেছেন বলে 'পুরাণ' বলছে। কৌটিল্যও অভিচারী ( তান্ত্রিক ) ছিলেন। মানে চণ্ডী-পূজক। এ-বার্ত্তা হর্ষবর্দ্ধনের প্রশস্তিকার বাণভট্ট দিয়ে গেছেন। কুমারামাত্য লোকনাথ ( হর্ষাব্দে ) ত্রিপুরারাজ ছিলেন। কাজেই ত্রিপুরার মৌর্য্য-ইতিহাস কনৌজ-মৌর্য্য হর্ষবর্দ্ধনের রাজসভায় অবিদিত ছিলনা। য়ুআন-চবঙ্গ তাই ত্রিপুরা-দর্শনে এসেছেন। ত্রিপুরার মৌর্য্য-যুগ 'হরিকেল চন্দ্রবংশের'ই কীর্ত্তি। ঋগ্বেদের বিশ্বাবসুর 'হরিকেশ' 'হরিকেল' হতে প্রাচীন বাংলা অক্ষরই যথেষ্ট ছিল। তারপর তা' হেরকল্‌স হয়ে কুশান-মুদ্রায় বিম্বিত। গ্রীকরা বলে গেছেন এই দেবতাই পাটলিপুত্র নির্ম্মাণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি যদু 'বৃজি'-বংশের দেবতা।



বজ্রযোগিনীর 'জৈনী' ( সুস্মের জানুস ) যেমন যোগিনী শক্তি জাত দেবতা। মোহেঞ্জোদারো-ঔরনসে তিনি রাজা হোড়ি, ব্রজভূমিতে হরি—সূর্য্য-নারায়ণ, কালো-পাথরে তৈরী। ইনিই গঙ্গরাজ তুর্ব্বসের বিষ্ণু। গঙ্গ-রাজ 'বৃজ' বা যশোরে ছিলেন বলে টোলেমি আর ক্যানিংহাম সজোরে বলে গেছেন। মল্ল ময়নামতির 'হরিকালদেব রণবঙ্কমল্ল'কে যেম্নি শকাব্দী-শেষে পাই তেম্নি ত্রিপুরা-রাজ আদি-রত্নফা ( 'ফা' উপাধি অহোম-রাজ ব্যঞ্জক ) শকাব্দী-শেষে উদিত। বঙ্গদেশ কুশান সুভগসেনের শুভ শকাব্দী ভোলেনি। বৃষ্ণি শূরসেন যাদবকে ভুলতে পারেনি, ভৃগুকচ্ছ যাঁদের পত্তন।

অহোমরা শানের 'তৈশান' যাঁদের পরিচয় কনফুসিয়াসের ওষ্ঠে 'তৈচান'-ধ্বনিতে ব্যক্ত। 'তৈচান' মানে ত্রি-চন্দ্রযুক্ত হিমালয়। আসল কথা থিসের মোঙ্গোল বোডো-জাতিই বোডো-থিস্ বা 'বরথিস' ( বর্ত্তীস্ )। সূর্য্যচক্র প্রাপ্ত কশ্যপ ( ঋকবেদ অষ্টম-মণ্ডল ) মনু তাঁদের 'চক্রবর্ত্তী' করেন। তাই রাজচক্রবর্ত্তী 'বিষুণঃ সুনরঃ যুবঞ্জ্যঙ্কে' হলেন তাঁরা। 'বেসতি' বা 'বসতীস্' হয়ে বস্তি স্থাপন করতে সুরু করলেন দেশে-দেশে। সেরিকায় ও তিব্বতের কর্ম্মভূমিতে তিনিই কনফুসিয়াস্-বর্ণিত 'যুবানমিঙ্গ'। ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব্বে প্রলয়ান্ত কালে নদী-নালা তৈরী করছেন। পাহাড়পুরে দিব্যক বংশে নোওয়া তিনি। মোহেঞ্জোদারোর মহেন্দ্রদ্বার উদ্ঘাটন করেছেন এই পরম যোগী-পুরুষ, যোগী বাসুদেব-কৃষ্ণেরই ( রাজা হোড়ি ) মতো সবজাতি-ধর্ম্ম নিয়ে।



ত্রৈলোক্যের মানচিত্র

টোলেমি বলে গেছেন, সেরিকা-তে 'দস্মৈ' জাতির বাস। বিদ্যাভূষণ বলেছেন, পুরাণের কুশদ্বীপ সেরিকা এবং দমিন ব্রাহ্মণই 'দস্মৈ'। হলষ্টাইন বল্‌ছেন 'কুশভূমি' কুশান-সম্রাট দান করেছে। 'কুশ'-ভূমি বলতে নীল-উপত্যকা ( ইথিওপিয়া—থিবিস ) বুঝিয়েছে বাইবেলের মানচিত্র। এবং সেরিকা-বলতে ইয়াংজিকিয়াং উপত্যকা কোকোনর। মনে হয় কুশদ্বীপী মঙ্গল ও কুশভূমির নিগ্রোবটুর মিশ্রণে কাফ্রি ব্রাহ্মণরাই জামদগ্ন্য পরশুরাম। কাফ্রি ভূমিকায় তাঁকে পাওয়া যায় ভাগবতে—তিনি পিতৃমাংস দান করেছেন ব্রাহ্মণদের।

ভার্গবরাই ঋক্‌বেদের প্রথম অগ্নি-কুল বা মেলানেসিয়ান জাতি। সিঙ্গাপুরে বুদ্ধগুপ্ত প্রথমই জমদগ্নিকে স্মরণ করেছেন। লোহিত-মেলানেসিয়ান বা বোডো ফণীমনসীয়ই 'থিবিস' নির্ম্মাণ করেন, যেম্নি নির্ম্মাণ করেন সুমাত্রা-যব-বর্ণিও-বলি-মলাক্কা সভ্যতা এবং তদঞ্চলের নাম দেন 'থিস'। মলাক্কার নাম যে বাইবেলের মানচিত্রে 'ঔরীয়-চের-সোন' তা তাঁদের 'উর'-সভ্যতা, 'চের'-সভ্যতা এবং 'সোন' বা ত্রিকলিঙ্গ-সভ্যতার স্মৃতি-বাহী। তাঁরা সিদিয়ান-ফণীসিয়ন-তুরাণীয়ন হয়ে 'গঙ্গেম' দেশ বা ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে গেছেন। একট্রা-গঙ্গেম আর ইনট্রা-গঙ্গেম নিয়েই তখন বৃহৎভারত। সেমেটিক জাতির বাইবেলে এ মানচিত্র আছে। পূর্ণ কুরুক্ষেত্র ত্রৈলোক্যে তখন ভাঙন ধরেছে--তা ভাগ-ভাগ হয়ে 'পৃথূদক' জন্ম নিচ্ছে পূর্ব্বাঞ্চলেও—সেরিকায় এবং ঔরীয়-চের-সোনে।

পূর্ণ কুরুক্ষেত্রের ত্রৈলোক্য-রূপ 'কুশিকাসঃ' বিশ্বামিত্রের গায়ত্রীমন্ত্রে উচ্চারিত—কাল-পুরুষ অগ্রমেষ শিরে নিয়ে সেখানেই যদু-কুরু-পাণ্ডব শাক্য-নন্দ-মৌর্য্যের ত্রিপাদভূমি নির্ম্মাণ করেছেন। কুশান-দেহ নিয়ে পুরোহিত কাণ্ব-দেহ সেখানেই বিলীন ছিল—কর্ণ তখন পাণ্ডব হয়েই থাকতে পারতেন। গায়ত্রীমন্ত্রের রূপ ছান্দোগ্য উপনিষদে এবং শঙ্কর ভাষ্যে যে ভাবে বর্ণিত তাতে কশ্যপ যমের বৈবস্বত মানব বংশের ( ঋগ্বেদ অষ্টম মণ্ডল ) উৎপত্তি বিধৃত। মানব হয়েও তাঁরা অবশেষে ছেত্তা বা পিতৃমাতৃঘাতক হলেন বলে আবেস্তার 'যিম' হয়েছেন এবং পিয়দসি-দেরও দৃষ্টিতে 'যিম' হয়ে 'অমিসা' ( অমিশ্র পশ্বাচারী ) হয়েছেন। ঋক্‌বেদের 'যম-যমী'-ও পৃথক হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু অন্য-কারণে। সাক্যবংশের নিজকুলে বিবাহ 'যম' পছন্দ করলেও 'যমী' পছন্দ করছেন না। 'যম' এই পছন্দের অপরাধে প্রথম 'মৃত' হয়ে প্রেত-লোকে অমৃতত্ব-লাভ করেন। এই মৃত্যুবাদ 'উর' সভ্যতা থেকে এসেছে। ভাগবন্ত বেদান্তের এই তত্ত্ব নিতান্ত বাস্তব ছিল ভাগবতের যক্ষপুরী মোহেঞ্জোদারোতে। বিচিত্রেও তাঁরা এক। মৃত্যুর জন্যে সেই পিতৃপুরুষের প্রেততীর্থে যক্ষ-রাজ্যে যেতেন সবাই কিম্বা পিতৃযজ্ঞ করতে যেতেন। যেমন ভহুঁতে যেতেন। কবরে বা শ্মশানে ফুল দিয়ে আসতেন—যক্ষ কুবের ঋষির বংশ উগ্র-বরাহ কুর্গ বংশ বা 'শিলাহার'-বংশ দিতেন হয়ত রত্নহার। অহিচোল্লপুরের রামায়ণী বানর বা স-মদ্ররা ( যদুতুর্ব্বস ) কবরের হাড়িতে অক্ষর লিখতেন। খড়্গ-রাজভটরা ঘণ্টা-কোশাকুশি নিয়ে পূজা-করতেন। মৎসদেশের বাগড়ী-বাগ্দীরা 'বড়শী' গেঁথে রেখে আসতেন। সবই বাসিষ্ঠ—ব্রজভূমির সন্তান—চেদী।

নব-বিদর্ভে চেদী-যক্ষিণীকে ভগবতী বুদ্ধজননীর বারান্দায় স্থাপন করেছেন পূর্ব্ববিদর্ভের কুণ্ডিল-উপত্যকার ( সদিয়ার ) কোনো শক যিনি প্রথম বাংলা-অক্ষরে ১০৪ সংখ্যক লিপিতে 'পবাঐ' কথাটি লিখতে সক্ষম হয়েছেন। লিপিটিকে ব্রাহ্মী ধাঁচে জোর করে ফেল্‌লে 'গোচরথী' হয়ে গোপাদ্রির জৈন ইক্ষ্বাকু গুর্জ্জরদের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক ঘনীভূত



করে তুলবে। কিন্তু 'লেদাকস্‌হ' কথাটিকে সদিয়ার 'লেদু-সাহী' এবং 'লাদক-সাহী ব্যঞ্জক উভয়কুল বলে মেনে নিলে সব গোলমালই চুকে যায়। চন্দ্রগুপ্তবৎ বৃত্রাসুর মহীপালবংশের নালন্দালিপি 'লৈদয়বংত্যশ' বলে সব মামলা ঘুচিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া মহাভারতে মহাভারত-মানচিত্রের যে-খবর ভীষ্ম-পর্ব্ব বিতরণ করেছে তাতে হিন্দুকুশের ঘুর থেকে সুরু করে ভীষ্মকের বিদর্ভ ( সদিয়া ) পর্য্যন্ত একটি ঋজু-রেখা টেনে ভারতের অশ্বখুরজাত অশ্বিনাদের উত্তরাঞ্চল দেখান আছে। কুশভূমির কুশিকাসঃ-ই হোক, আর কুশানই হোক, 'উত্তীর' ছিল তাঁদেরই বিচরণ ক্ষেত্র। এ-ভারত-মানচিত্র বাইবেল-মানচিত্রের আগেকার বা পরেকার হতে পারে। তা সত্ত্বেও অর্দ্ধকুরুক্ষেত্রের মানচিত্রই ভীষ্মপর্ব্ব বর্ণনা করেছে। বাইবেলের মানচিত্র অন্য ভঙ্গীতে ভাগ-বৎ ভারতবর্ষকে ব্যক্ত করে থাকলেও ত্রিলোকেশ্বর-অধিবাসিত থিস্-অঞ্চলের কম্বুজের ত্রৈলোক্য-চিত্র গোপন করেনি। নালন্দা তোরণ লিপি-তে মহাভারতের ও বাইবেলের ভূগোল ও ইতিহাস সমন্বিত।

পূর্ব্ব বিদর্ভের কুণ্ডিন নামটি 'কুণ্ডিল' নদী-ধ্বনি জাত। তা যেমন 'অয়াস আঙ্গিরস' কুলে ( তিনি সুরমা উপত্যকার—দেবশুনী 'সরমা'র দেশের ঋষি ) 'বিদর্ভী কৌণ্ডিন্যে'র ( শতপথ-ব্রাহ্মণ দ্রষ্টব্য ) জন্ম দিয়েছে তেমনি হয়ত প্রথম বুদ্ধ কুণ্ডিনেরও ( জাতক-দ্রষ্টব্য ) জন্ম দিয়েছে। একজন 'আচার্য্য কণ্ডিন' কম্বুজের লিপিতে পাওয়া যায়। হয়ত কুণ্ডাকুণ্ড-শাস্ত্রের পণ্ডিত জৈন এলাচার্য্য। এলাচি-দেশের 'অষ্টিকায়' ( অষ্টসাহস্রিকা ) বা 'অরিষ্টনেমি'র 'জিন' বা যক্ষ মূর্ত্তি নিয়ে সেখানে হাজির আছেন। মোট কথা, সাংখ্য জৈন-বৌদ্ধ বৈদ্য সবাই যজমান রাজর্ষির সাম-যজুর্ব্বেদ থেকে জাত। পাটিকারা ( ত্রিপুরা ) রাজ্যে এখনও একটি 'জিন' মূর্ত্তি আছে। কিরাতী শৈব নাথপন্থা বা বৃক্ষপূজা বোডো-জাতির, যাঁরা রাজন্য-পুরোহিতকুল।

সাক্য-বুদ্ধ পূর্ব্বাঞ্চলের ঋগ্বেদী ঋষি দেশের ক্ষত্রিয় বলেই নিজেকে 'দেব-কুল' বলে আখ্যাত করতেন। 'কুণ্ডিল' কেবল ঋক্‌বেদ, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মই তৈরী করেনি, কুণ্ডলিনী-শক্তি কৈবল্য-দায়িনী 'কেসাই খাটি' কালীকে আদ্যাশক্তি হিসেবে সৃষ্টি করেছে। পশুপতি কিরাত শিব সে অঞ্চলেই 'মিকিরতি দোবোক' বংশে আবির্ভূত হয়েছেন অগ্নিদেবতার মূর্ত্তিতে। দশভুজা-সিংহবাহিনীরই চণ্ডী বা রুদ্রাণী শক্তি কালী—আর ভগবতী দুর্গা দেবগণশক্তি। 'দোবক'-দের শক্তি ছিলেন দুর্গা। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের ( পাহাড়পুরের ) দিব্যক-বংশের মাতৃশক্তি। তাঁরাই গুর্জ্জর-সিংহ জৈন ভট সেন-কুল। তাঁরাই শিব-জাতি পঞ্চালের—তাঁরাই ভারতযুদ্ধোত্তর পাণ্ডব সেন। পাণ্ডবের সঙ্গে শূরসেন যাদব গণতন্ত্র এই যদু বৃষ্ণিকুলই তৈরী করেছেন। এঁরা সুহ্মের আদিশূর—কামরূপের কিরাত ঘটক। বজ্রযোগিনী ও বেলব-তাম্রশাসনে এঁরা বর্ম্মণ। 'দাবজ' এবং 'শদীয়' ( সদিয়া ) কথাদুটো

তাঁদের সামলবর্ম্মণ ব্যবহার করে গেছেন। মোহেঞ্জোদারোর দাবার ঘুঁটি দুই ব্রজভূমি একষ্ট্রাগঙ্গেম-ইনট্রাগঙ্গেম অধিশ্বর যাদববর্ম্মণেরই ছিল। তাঁদের ভাই তুর্ব্বস; তুর্ব্বসু নামে অবন্তীবর্ম্মণ-চোড়গঙ্গ বংশে উপস্থিত। তুর্ব্বসই তুষার, তোখার নাম পেয়েছে। বর্ম্মণরা কুশান—কোনার্ক তাঁদেরই নির্ম্মাণ—তাঁরাই অশ্বপতি, কাণ্ব, অশ্বিনা কোনার্ক-মন্দিরে। যদু-তুর্ব্বস যযাতি-পুত্রদ্বয়কে ঋক্‌বেদের যক্ষ ইন্দ্র সমুদ্র পার করে নিয়ে আসেন। এ-সমুদ্র অরিত্রিয়ন সমুদ্র। ইক্ষ্বাকুর মতোই তাঁরা ইন্দ্রসখা-অন্ধ্রসখা। রাজর্ষি 'বসতি' বা সতীয়পুত্র দশরথের মতোই রাজর্ষি; কুশধ্বজ, সিরধ্বজ জনক—কুশিকাসঃ—যক্ষ-চেদী কুশানরা। অসুর-পালক রাজর্ষি। বঙ্গ ও আসামকে 'কলিত' করেন এই বোডো-জাতি। বল্লালের নৈহাটি-শাসনে 'অকলিত' রাঢ়াপুরীগুলোর উল্লেখ আছে যা ছিল কৃষ্ণাচার্য্যের দেশ।

ভারতযুদ্ধের পর রাজর্ষিদেরই রাজত্ব ছিল ভারতবর্ষে। এ-যুগ অকায় দেবতার যুগ। শক্তি—দেবশক্তি, দৈবশক্তির ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত-যুক্ত যথার্থ শকের যুগ, সাক্যের যুগ—যোগশাস্ত্রের যুগ তখন। মোহেঞ্জোদারোতে তখন ইক্ষ্বাকু শক বা বিবুধসখই ছিলেন সখা-বাদ নিয়ে, সাক্যরা মৈত্রী-ধর্ম্ম নিয়ে সেখানে ছিলেন, ছিলেন শৈব গুর্জ্জর হূণ জৈনরা। সেখানে মানব-ধর্ম্মী বৈবস্বত-মনুর কাশ্যপ জৈন কুশান-কুলেরই একাধিপত্য। ভগবানবাদী দ্বারা দেবী ভগবতী রূপে পূজিত হয়েছেন গৌরীপট্টের প্রতীকে। (মার্শ্যাল-গ্রন্থ—৩য় খণ্ড পৃঃ—১০২, 'B' 'K' সংখ্যক চিত্র)। 'অতোন'-ব্রহ্ম নিয়ে মিতানি ফারাও এসেছেন তুর্কী কুশান-কুলে (পৃষ্ঠা ৯৫—মৃৎ মূর্ত্তি সংখ্যা ৯)।

মহাবীর বর্দ্ধমানেরই (মিশরী শিরোভূষণেও যাঁর মূর্ত্তি পাওয়া গেছে) জীবন থেকে আমরা এই কাশ্যপ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়দের জীবন-সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য আহরণ করতে পারি। এই বৈশালি-পুত্রকে সীমান্ত-স্তম্ভ হিসাবে ধরে যে 'রাধ' বা 'তামিলকম্' চেত বংশ পাই এবং জৈনদের প্রথম গুরু ঋষভকে পাই তা থেকে বিন্ধ্যাটবীর (অক্ষ থেকে কোনার্ক) পারীযাত্র) অত্রি-ঋষি, রাজা চিত্ররথ, রথ-যাত্রা প্রবর্ত্তক খরবেল, অধিরথ-সূত দীন রাধার নন্দন কর্ণ, সগর-ভগীরথ কাহিনী, শান্তনু-দেবাপির কুরুকুলের চরিত্র প্রভৃতি চম্পার (পৌরাণিক অযোধ্যার কলিঙ্গের) ঐল-গাঙ্গেয় ইতিহাস আমাদের চোখের উপর ভেসে ওঠে। চেতরা-ই চেদী-লিচ্ছবী। যদু-তুর্ব্বস-কুরু-পাণ্ডব-ইক্ষ্বাকু-হৈক্ষক এঁদেরই নির্ম্মাণ। এই বংশেরই একটি সন্তান হতেন রাজচক্রবর্ত্তী, অপরটি সন্ন্যাস-গ্রহণ করতেন রাজ্যলোভ এড়াবার জন্যে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মাৎসর্য্য দমন করা এই দমিন ব্রাহ্মণের (ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়) যেমন সাধ্য ছিল, তেমন রাজধর্ম্মে রিপু-সাধনা-ও তাঁদের আরাধ্য ছিল। তাঁরাই ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডলে অসুর--বলাসুর এবং পনি ভট অসুর। দেবশুনী সরমাকে তাঁরাই ভগ্নী বলে সম্বোধন করতেন এবং গোপিতা (গো-অপহারক) বা গোপ্তা এঁরাই। নিগ্রোবটুর মিশ্রণে ভাগবতে এঁরা কুশান



তুর্কী কন্যার গোপ্তা (রক্ষী) হিসেবে 'মহাভট' নামে উপস্থিত। বোডো-জাতি, ভোট্টজাতি (চীন), ভোট্ট-রাষ্ট্র এবং রাজভটকুল এই জাতির রক্তে বাহিত। কাশ্মীরের উত্তরাঞ্চল থেকে ভোটান্ত দেশ পর্য্যন্ত এঁরা দেবেশি-রাজ্যে অধিবাসিত বলে শক্তিসঙ্গমতন্ত্র বলে গেছে—পৌরাণিক যুগে এঁদের ঐল হিসেবে বিন্ধ্যাটবীতে পাওয়া যায় আর ঋক্‌বেদের যুগে ভর্হুতে—মধ্যদেশে। এঁরাই ভারত-জাতি (রুশম, উশীনর, ডাল্‌ভ্যস্, সৃঞ্জয়, মৎস্য, চেদী, ইক্ষ্বাকু) সপ্ত হিন্দু নিয়ে নির্ম্মিত। শপ্তই বটে, কারণ কেউ তাঁদের একটি নামে চেনেনি—চেনেনি গণপতির 'এলোর' নামেও। কখনও মৎস্য, কখনও চেদী, কখনও ঐল, কখনও ইক্ষ্বাকু আর ক্বচিৎ 'চেত' (চেতক) নামে চিনতে পেরেছে। 'রুশ' নয়, 'কুশীনর' নয়, লিচ্ছবীর ডাল (শাখা) হিসেবে 'হ্বাস'-ত নয়ই, সৃঞ্জয় শৃঙ্গয় হয়ে তবু বৈরাটী ও ঋষ্যশৃঙ্গকে পরিচিত করিয়েছে। রটবিলদের রাশিমুদ্রায় লিচু-ডালে ডাল্‌ভ্যস্ লব-বংশের হদিস মেলে। আর মেলে লিচ্ছবীদের প্রাচীন মুদ্রায়, ত্রিপুরার 'রট'-রাজবংশে এবং 'নদীয়ার বাস্ত্যায়' (বসতী) বংশে কুমারী-মূর্ত্তি 'জীমূত দেবীকায়া'র পাদপীঠে তান্ত্রিক 'দালয়' হিসেবে (মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত সুভোঠাকুরের সংগ্রহশালায় আছে)। গুর্জ্জররা সৌমিত্রী-ইক্ষ্বাকু ছিলেন, তাঁদেরই প্রতিনিধি 'রটবিল'। ইক্ষ্বাকু-প্রশস্তিকার ভার্গব ভবভূতি কিন্তু তাঁর 'উত্তর-চরিতমে' নববিদর্ভের জন্ম-কাহিনী এবং হৈক্ষকের (ঐক্ষকের) ইতিহাস ভগীরথ ও ভরদ্বাজের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন। আর ভট্টকুলতিলক ভট্টি-কবি আপন-বংশের ইতিহাস বিরাট-পাঠক হিসেবে বিবৃত করতে যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণের ভঙ্গীতে ইক্ষ্বাকুর সঙ্গে রক্ষঃ-বংশের যোগাযোগ (বৃষ-গাভী সম্পর্ক) প্রকাশিত করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত হননি। রক্ষঃ-যক্ষ একই পুলস্ত্য ঋষি-বংশ। আদি ঋষিরাই নক্ষত্র-দক্ষ-যক্ষ প্রভৃতি।

জৈন-ধর্ম্মই (দ্বৈতবোধক মনোধর্ম্ম) ভারতের আদ্যন্ত রাজধর্ম্ম। মুষিকান-তক্ষশিলক ব্রাহ্মণকুল জৈন ভট্ট ছিলেন। কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত এম্নি ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়। এলামের ও মেসোপোটমিয়ার 'মুষকিনু' তাঁরা এবং রুশের চাষা 'মুজিক'। 'মাজি' তাঁরাই,, কুশান সিদিয়ন দৈবীপুত্র—দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তাঁরা রাজা হয়েছেন, তেম্নি রাজমন্ত্রী, রাজগুরু, প্রশস্তিকার, বিদূষক, ভাট, ভাঁড় সব কিছু হওয়াই করায়ত্ত ছিল তাঁদের। 'দক্ষ' নামটি (তন্ত্রে, ঋক্‌বেদে ও পুরাণে) তাঁদের সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শিতারই পুরস্কার। আদৌ তাঁরা মেলানেসিয়ান 'ডাইক'। 'ঠগী' 'ডাকু' বলেও অভিহিত হয়েছে রাজভট-পতিত বাংলার পাল-বংশ। ফিরিঙ্গি সমুদ্র-দস্যু ফণীসিয়ন-পর্ত্তুগীজ হয়েও উদিত হয়েছেন তাঁরা বারংবার। তবে ভারত-ইতিহাস শুধু 'পাইরেট'-দের দেখায়না, ভারদ্বাজ 'পাইলট'-দেরও দেখায়। বিমান-নির্ম্মাণ-কর্ম্ম এই রথকার অধিরথ বংশের করায়ত্ত নিশ্চয়ই ছিল—পুষ্পক-বিমানটি বেলুন ছিল কি না তা-ই বিবেচ্য। মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত গোলাকৃতি

গোলকগুলো বেলুনের গোলক-ধাঁধাঁ দেখায়। যন্ত্রসভ্যতা অবশ্য মোহেঞ্জোদারোতে ছিল। সেখানে 'প্লাগ', 'কগ-হুইল', 'সাট্‌ল' প্রভৃতি পাওয়া গেছে। প্রথম যন্ত্রযুগ মোহেঞ্জোদারোতেই সুরু। এবং সুরু করেন খিবিসের, থিসের, কুশদ্বীপের (সেরিকার) ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুশিকাসঃ বা কুশানরা। বর্দ্ধমানের (মহানাদের) শৈব-কুশান গুপ্ত, কোচ বংশ কাঞ্চীর দামিল কোচ এঁরাই। সুরমা-উপত্যকার সন্তান—সুহ্মের আদিশূর—সবরমতি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তারপর প্রেত পিতার পুরী মোহেঞ্জোদারোর ব্রাহুই হিসেবে এই হুবিষ্কদের সরমতিয়ায় (উত্তর উরোপায়) বিস্তার। কিন্তু কাঞ্চীর পল্লব-ও যখন ছিলেন অথবা ঘুরের ও মোহেঞ্জোদারোর পহ্লব-শকও যখন— তখনও এই মহা সেনগুপ্ত বংশের দমিন প্রশস্তিকার বররুচি কুশদ্বীপিনী দময়ন্তীর ধ্যানে ভোগ-ত্যাগ-ধর্ম্মাত্মক 'চৌরপঞ্চাশিক' রচনা করতেন। লিচ্ছবী-কালী-কন্যাকে বলতেন ঃ

অদ্যাপি তাং সুরতঘূর্ণনিমীলিতাক্ষীং
স্রস্তাঙ্গযষ্টিবসনং কুশকেশনম্রাং।
শৃঙ্গারবারিকমলাসুজেরাজহংসীং
জন্মান্তরে নিধুবনেঽপ্যনুচিন্তয়ামি॥

মহাবীর বর্দ্ধমানের জন্মভূমি বৈশালী। চেটক-লিচ্ছবীর ভাগিনেয় তিনি—'বিদেহদত্তা' 'ত্রিশলা'র পুত্র। ত্রিশূলী 'মিকিরতি দোবোক' চুটিয়ারাই শূলীয়—শৈব। সদিয়াই প্রাচীন 'বিদর্ভ' এবং ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকাই বৈশালী নামে বিদিত (গেটের আসাম-ইতিহাস দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্যের দেশে শ্রীহট্টে বা সুরমা উপত্যকায় কোচ-কছরীরা ত্রিপুরা-জাতির মতোই বোডো-ফিসা। দেবশুনী সরমা সুরমা, সুহ্ম, সুম্ররাজপুত, সবরমতী এবং উত্তর উরোপা সরমতিয়া (বাইবেলের মানচিত্রোক্ত নাম) সৃষ্টি করেছেন সুমের থেকে এবং সুমেরু পর্য্যন্ত এই একই জাতি বিস্তৃত হয়েছে। কোচ-কছরী মিলিত শক্তি সুরমা-উপত্যকায় উদিত হয়েছে। ফিরিশতার ইতিহাস বলে যে কোচ-রাজ সঙ্গলদিবের বংশই 'বেঙ্গে' নাগাড়ে দুই হাজার বৎসর রাজত্ব করেছেন। তার মানে বৈদিক আমল থেকে বঙ্গে-বেঙ্গীতে একটি রাজন্য বংশ ছিল—তাঁরা কোচ—'কচিন' বা কুশান—কুশদ্বীপী দমিন বা দামিল ও নিগ্রোবটুর মিশ্রণ। বোডো, বেসতি প্রভৃতি বিভিন্ন নামে বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁরা পরিচিত কিন্তু ভারতজাতি হিসেবে তাঁরা অদ্বৈত নামধারী। রাজন্য থেকে ঋষিতে, ব্রাহ্মণ থেকে রাজন্যে, মুনি থেকে ঋষিতে, ঋষিত্ব নিয়েও বৈশ্য ভাবে তাঁরাই বিবর্ত্তিত। এই মেলানেসিয়ান জাতি ত্রিবর্ণে রঞ্জিত ছিলেন, যথা—লোহিত, কৃষ্ণ, পীতাভ কৃষ্ণ। নৃতত্ত্ববিদের ভাণ্ডার থেকে এ তথ্য আহরণ করা যায়। অত্যধিক শৈত্যই তাঁদের শ্বেত করেছে। শ্বেত করেছে হিমালয়।



কাজেই প্রথম বোডো-ফিসা চেদী-ত্রিপুর সুসা সভ্যতার স্তূপে ('তেল') হিমালয় পূজা করতেন—শানের পঙ্গ-রা ত্রিপুর মিশ্রণে তৈশান বা তৈচান (হিমালয় ত্রিচন্দ্র) উপাধি নিয়ে হিমম্ সীদিয়ন হয়েছেন। কনফুসিয়াস এম্নি সীদিয়নই ছিলেন—হিমম্ সীদিয়ন। তুরানী সুসা-সভ্যতা স্তূপ বা তেল নির্ম্মাণ করে যেমন ভোগবাদ বা ভগবাদ পালন করেছে, ত্রিপুরজাতিও তা-ই করেছে। ত্রিপুরা চৈন্তদের মেচাসুর কালভৈরব মূর্ত্তিতে বৃহৎ কলিযুগ সূচনা করে। চৈত্য-নির্ম্মাণ-কারী কনিক-কুশান বা হাতিগুম্ফার চেত-ভারতবংশ এ রক্তের ব্যতিক্রম নয়। এই 'কনিক'দেরই ছিলেন 'চৈন্ত', 'কনকমুনি', চুন্টা-কালী। 'কনক'-কৌম এখনও যাদব অষ্ট্রিক-জাতি হিসেবে 'যাপ'-দ্বীপে বাস করে। তৈত্তিরীয় অরণ্যকের শারদীয়া-শক্তি-স্তুতি 'কননীকে' বা কনক-জাতিরই সংস্কৃতির বাণী। তার আগে তাঁরা ঋষি কণ্ব-কুলে এসে ঋক্‌বেদে আর্য্য আর বহু-যুগ পরে কান্যকুব্জের ইতিহাসে এলোর মৌর্য্য। কিন্তু হিমালয়ী ঋক্‌বেদ থেকে আমরা সমবেত ভার্গব-কণ্ঠ শুনছি :

"অশ্বাবতীর্গোমতীর্বিশ্বসুবিদো ভূরি চ্যবন্তে বস্তবে।
চন্দ্রসূর্য্যের পূর্ণতায় অশ্বপতি-গোপতির প্রজা প্রচুর ধনে পূর্ণ হোক।"

সুরমা-উপত্যকায় আমরা যে পাণ্ডবকুল-পালের কলি অব্দ পাই তা যাদব-বংশের এবং বংশটির জন্ম ৩০৮৩ খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব। শূরসেন যাদবের (বৃষ্ণি) সমসাময়িক বলে এ-কালকে ধরা যায়, যদি আমরা মনে করি যে বৃহৎ কলিতে একটি কুরুক্ষেত্রে (যুদ্ধ না-হোক) খেলোয়াড়রা সমবেত হয়েছিলেন। আমার মনে হয় নব-বিদর্ভ ভহুতও তেমনই কোনো কুরুক্ষেত্র। কতো-জাতির কতো লিপি যে ভহুতে অঙ্কিত তার ইয়ত্তা নেই—বিভিন্ন ধর্ম্মের বিচিত্র পিতৃযজ্ঞ-স্থল ঋগ্বেদী হূণ-হুবিষ্কদের এই ভহুত। অসুর ভাষায় 'হু' কথাটি নদী বোঝায়, এর জন্যে সায়ন ঋকবেদে 'হুবিষ্ক' বরবাদ করে 'বিষ্ণু-সুনর' সম্রাটকে 'হবিষ্ক' বলেছেন। বাংলা লিপির, ফিরিঙ্গি লিপির, ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী, দেবনাগর লিপির জন্মস্থানই ভহুত। গ্রীক-নামীয় হেলিওডোরার বিখ্যাত ব্রাহ্মী-লিপিটি উল্টে দিলে যা দাঁড়ায় তা এই ঃ



জম্বুদ্বীপের ব্রাহ্মী 'ক' থেকে বাংলা 'ক' জন্ম নিচ্ছে এবং ব্রাহ্মী 'অ' উল্টে ফিরিঙ্গি 'K' হচ্ছে, ব্রাহ্মী 'ম' উল্টে হচ্ছে ফিরিঙ্গি 'R', ব্রাহ্মী 'চ' উল্টে ফিরিঙ্গি 'P', ব্রাহ্মী 'ত'

উল্টে ফিরিঙ্গি 'Y', 'ন' উল্টে 'T', 'গ' উল্টে 'V'। প্রসঙ্গত বলা যায় ব্রাহ্মী 'অনগ' কথাটি দক্ষিণী হেলিওডোরা 'KTV'-দ্বারা মধুবংশের 'কৈটভ'কে বোঝাতেন। তবে প্রথম পংক্তির শেষ তিনটি বর্ণের ব্রাহ্মিত্ব এ-অবস্থায়ও বজায় আছে এবং তা থেকে মণিপুরের 'মকলো' নামটি উদ্ধার করা যায়। কুশান-শক-মগরা এমন ফিরিঙ্গি অক্ষরই তৈরী করতেন। দিও-পুত্র হেলিওডোরা দৈবীপুত্র কোনো কুশান কিনা, গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু হয়ে আবার বৃষ্ণি-বংশে ফিরে এলেন কিনা, এ-সব প্রশ্নের মীমাংসা ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকদের বিবেচনার উপর ন্যস্ত করে আমরা সম্প্রতি মোহেঞ্জোদারোর পথে প্রস্থান করব। তার আগে একটি কথা বলছি যে ভর্হুত-বিদিশা কুশানেরই হোক বা যাদব-বর্ম্মণ চন্দ্রগুপ্তদেরই হোক, বা শুঙ্গদেরই হোক, ৭৮-সংখ্যক লিপিটিতে কুকী-জাতির স্পষ্ট বাংলা 'কু' অক্ষরটি 'খজ' জাতির ( গুর্জ্জর ) সঙ্গে উপস্থিত। গুর্জ্জররা অগ্নিকুল ইক্ষ্বাকু। বৃষ লক্ষ্মণ-বংশ।

সিদিয়ান যজুর্ব্বেদী-ব্রাহ্মণরা পশ্বাচারী ছিলেন। অজিন পৈতা ধারণ করে পশ্বাচারী বৈশ্য পিয়দসি ভগবত হচ্ছেন তাঁর লুম্বিনী শিলালেখতে। ফিরিঙ্গি হেলিওডোরাও তেম্নি দ্বিজ হয়েছেন এবং ভাগবত-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন ত্রাতার ( তাতার ) কাসিপুত-ভাগভদ্রের কাছে। কসি-মণিপুরী তাতাররাও এই উপায়েই ভাগবত হয়েছেন যজমান-পুরোহিতকুলের ( বিশ্বামিত্র অথবা কণ্ব, প্রস্কণ্ব ) সংস্পর্শে এসে। যজুঃ যজ্ঞ শিখিয়েছে, বৈদ্যবিদ্যা এবং বৈশ্যবিদ্যা শিখিয়েছে। বলতে শিখিয়েছেঃ "মাতা চ মে ছাদয়থঃ"—'চম্' ( মিশরের হৈক্ষক-যুগের নাম ) ধ্বনি এনে চম্পার ও মহাচম্পার সৃষ্টি করেছে—বলেছে তাদের মাতাকে আমাদের ছেদন করতে এবং আবৃত করে রাখতে। এ-ভাবে জন্ম দিয়েছে শব-সৎকার, ইরাণী-আবেস্তার যুগ থেকে মুক্ত হয়েছে মোহেঞ্জোদারোর তুরাণী আর্য্য-সভ্যতা। ইন্দ্র যজুর্ব্বেদী হিন্দু-চীন—কুশান। কাশ্যপ 'যুবঞ্জ্যঙ্কে বিষুণ-সুনর' কুশান। চীনের যূবান-মিঙ্গ কুশান। শকাব্দী যজুর্বেদীয় রাজাদের যুগে প্রণীত। কনিষ্ক প্রথম শক-রাজা নন—'বরহাতকীন' প্রথম কুশান যিনি তুর্কী হয়ে প্রথম শক। বা কুশ-ধ্বজ সিরধ্বজ জনক প্রথম কুশান। কুশিকাসঃ প্রথম কুশদ্বীপে ( সেরিকায় ) বাস করে প্রথম কুশান। শকাব্দী রাজেন্দ্রচোলের ৩০০০ বছর আগে সুরু। বিদর্ভেরও জন্ম সেই রামায়ণী যুগে। ভর্হুতে যেমন নাগ-যক্ষ সমন্বিত ও পূজিত, সিংহলেও তেম্নি তখন নাগ-যক্ষ ( নাগ-যক্কো ) সমন্বিত ও জীবিত ছিলেন। বিজয়সিংহও একজন ইক্ষ্বাকু রামচন্দ্র। রাজগিরির হর্য্যঙ্ক ( সিংহধ্বজ ) কাশ্যপ তাঁরাই। নেপালের তিস্থতি নদীর তীরে ত্রিৎসু-কৌমের ( সুদাসের মতো ) সিরধ্বজ জনক শাক্যরা বাস করতেন। সে যুগের কুরুক্ষেত্রোত্তর পরিত্যক্ত উত্তরাপথে ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে বর্ষা আনয়ন করা হয় ( 'উত্তরচরিতম্' দ্রষ্টব্য )। বর্ষা অর্থে, ঋষি অর্থে, ঋক্‌বেদে 'বৃষ'-কথাটি ব্যবহৃত হত। ভট্টি-কবির দৃষ্টিতে ঋষিবৎ লক্ষ্মণ তাই বৃষ-লক্ষণাক্রান্ত ছিলেন।



ইন্দ্রও বৃষ। মোহেঞ্জোদারোতে বৃষের ছড়াছড়ি—ঋক্‌বেদের ও বেদান্তের যুগে বিশুদ্ধ সীদিয়ান বৃষরা অবাধে বিচরণ করছেন বলেই। বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর সমাধিস্থ তখন। বৈসালিতে কুশান শিব ত্রিশূলী মিকিরতি দোবোক বংশে তখনও তিনি গৃহী বসতীরূপ।

ভারতবর্ষে ভারতজাতি বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা বেসতি আর বোডো-জাতি বা 'অকস'-অঞ্চলের ভুটিয়া-কৌমের সমন্বয়ে গঠিত কোচ জাতি। বৃহস্পতি-শুক্রাচার্য্যের নন্দন হিসেবে মূর্ত্তিটি 'কচ'—বৃহস্পতি-শুক্রাচার্য্যের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তার অবতার অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা বিষ্ণুগুপ্ত কৌটিল্য—তিনি পুরুষোত্তম রূপে বিষ্ণু মূর্ত্তিতে কুচবরণ ( তেলাকুচ বরণ ) নীল, ঈষৎ পীত, লোহিত। এই মেলানেসিয়ান গোষ্ঠীরাই ভারতের একটি স্থিতিশীল বৃহৎ মানব-জাতি তৈরী করেছে। 'খজ' মানে আকাশ-জাত, ভুটিয়ার জন্মস্থান 'অকস'-ভূমি। 'অকস'-ই 'অক্ষ' এবং 'যক্ষু' ও ইক্ষ্বাকু কথার জন্ম দিয়েছে। তুর্কীরা 'অকুজ' নামে তাঁদের বৃষ মূর্ত্তিতে পেয়েছেন। গায়ত্রীমন্ত্রের 'ভৌতিক আকাশ' এবং 'হার্দ্দ্য আকাশ' কথাদ্বয়ের জন্ম 'অকস'-থেকে। গায়ত্রী থেকে 'ত্রিলোক', তামিলকম্, তমলুক জন্ম নিয়েছে পরপর—'সমতট-সমাপা' উদ্ভূত হয়েছে ব্রহ্মার পদ্ম-নাভি থেকে—'নাভক' দেশ থেকে। ধর্ম্মে, ইতিহাসে এবং শিলালেখতে পিতাপুত্র নিরবচ্ছিন্ন—আমাদের দৃষ্টি-হীনতা এবং অজ্ঞানতাই বিচ্ছিন্ন করে দেখ্‌ছে সব—দেখছে অবলুপ্ত ক্ষণে-ক্ষণে। বিচিত্র নামে তাঁরা উপস্থিত প্রাচীন ইক্ষ্বাকু থেকে দনুজমর্দ্দনদেব পর্য্যন্ত—একই সংস্কৃতির বিবর্ত্তিত রূপ নিয়ে। সে-সংস্কৃতি কৃষি সংস্কৃতি—শৈব্য বা বৈশ্য শ্রেষ্ঠী কৃষি-সংস্কৃতি।

প্রত্নপ্রস্তরযুগের বিষ্ণুচক্রবৎ প্রস্তরে 'উরন' লিখে শূলচিহ্নে চিহ্নিত করে ( ৺রাখাল দাসের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র প্রথম চিত্রপৃষ্ঠার 'ক'-সংখ্যক চিত্র ) যে গীর্ব্বাণদেবকুল ফনীসিয়নদের উপর তা নিক্ষেপ করতেন, কার্থেজের ইতিহাসে তাঁদের নাম 'গোরিলা'। তাঁরা গোরির ইল ( সিদিয়ন ) বা ঐল পুরূরবা গোষ্ঠী ঠিকই। এলি উপত্যকার উশন—এলামে 'তেল' ( স্তূপ ) প্রস্তুত কারক- রুষ্ট-সিদিয়ন। কিন্তু 'পাহাড়পুরে' তাঁদের যক্ষিণী ঘানিতে তেল-প্রস্তুত করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের 'শৈলজপ্রস্তরকরা যক্ষরা' তাঁদের যে কুমার দান করে গেছেন, তাঁরা ইন্দ্র। বাস্তুপ্রিয়া যক্ষিণীরা বাস্তুরতা, যোগরতা ( সর্পিনী, কুলকুণ্ডলিনী ), মৃগলুব্ধা। মোহেঞ্জোদারোর কাংস্যময় নগ্না কিরাতী-মূর্ত্তির পূর্ব্ব ধাপ। একটি বৃদ্ধ নোওয়া বা নৌনাবিক তাঁদের গুরুপাদ। কৃষ্ণাচার্য্যের চর্য্যাপদে 'তুয়া মার্দেসিরে' তিনিই—পীরামিদের 'নোওয়া মোর্দেসাই' বা মহিষমর্দ্দনও তিনিই। পশ্বাচারী সেমেটিক নোওয়া সর্ব্বত্র বিদ্যমান। পিয়দসি-লিপির ও আবেস্তার 'যিম' তিনি। মোহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত হাতের 'নোওয়া' এবং বামহস্তে কবচ-পরিহিতা কিরাতীমূর্ত্তিগুলো সিদিয়ন যুগের মহিষমর্দ্দিনী মাহিষ্মতীকে দেখায়। বিন্ধ্যাচলের খজ-জাতির তুষার-লিচ্ছবী কন্যা তাঁরাই

হয়েছিলেন। মার্শ্যাল মোহেঞ্জোদারোতে এই শারদীয়া শক্তি অন্নপূর্ণা ভগবতীর স্মৃতির সৌরভেই 'মাদার গডেস'-এর ঘ্রাণ পেয়েছেন।

আমি মোহেঞ্জোদারোর তিনটি ব্রাহ্মীঅক্ষরের যে লিপি পাঠ করেছি তার রচনাকার 'জখ' মানে 'যক্ষ'। মোহেঞ্জোদারোর অলকার যক্ষ তিনি—মেঘোদয়ে মন তাঁর উতলা-ময়ুর হয়। তিনি ঋগ্বেদীয় 'অমুর', অমরাবতীর হাঙ্গর গুপ্ত। ভর্হুতের ও তমলুকের যক্ষিণীরা তাঁদেরই বিরহে কাতরা। 'জখ'-উল্টোলেই খজ হয়ে গুর্জ্জরে, খজুরাহোতে ফিরে আসেন তাঁরা।

আমার লিপি-পাঠ বাম থেকে দক্ষিণে : লিপি :

(১) এঢ়ঞ এপ জখ

দক্ষিণ থেকে বামে :

(২) খজ পএ ঞঢ়এ

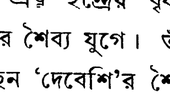

প্রথম পাঠটি 'অরণিপূজক' ধ্বনি এনে জীবিত 'জখ' বা 'যক্ষ'-কেও সূচিত করে। তাঁরা অগ্নিকুল গুর্জ্জরের প্রতিহার ইক্ষ্বাকু ভৃগুবংশ। অথবা এরিয়ানা-ইরাণী ইন্দ্র যিনি ভারতে প্রেত-যক্ষ, মাল্য-পূজা পান। ইন্দ্রাণী এবং যক্ষ ইন্দ্রও হতে পারেন।

দ্বিতীয় পাঠটি গ্রীয়ারসন-বর্ণিত পিশাচ বা খস (খজ) জাতির 'পয়োনীড়' (জলাবাস) ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের বৃত্র-স্থান বর্ণনা করে। পনি-অসুর ভট ব্রাহ্মণের রসাতল ঐশ্বর্য্য। তাঁদের প্রতিভূ : 'উং বাম্ চক্ষুঃ বরুণা'—ভার্গব একচক্ষু শুক্র (প্রতিমূর্ত্তি সংখ্যা ৪ চিত্রপৃষ্ঠা ১০০—মার্শ্যাল-গ্রন্থ ৩য় খণ্ড) মূর্ত্তি।

পয়োনীড় কিন্তু ইন্দ্রস্পর্শে পয়োনীর' বা মধুক্ষরা বর্ষাবারি 'দ্রপ্‌স' হয়ে যেতো ঋক্‌বেদে--যা থেকে সেল্টো ইতালীয়রা 'Drops' কথাটি পেয়েছেন। ভৌতিক ও হার্দ্দ্য আকাশে ঋক্‌বেদীদের 'অপ্রকেত সলিল' এই পয়োনীর আর তান্ত্রিকদের 'কারণ'-সলিল। মিতানির 'অস্‌সিয়েল' এই সলিল। করণ-কারণশীল গৃহস্থ ম্লেচ্ছ শালস্তম্ভরা (শাল মানে গৃহস্থ) তান্ত্রিক-গৃহস্থ বা 'বেসতি' বৈশ্য রূপে 'গেহকারক' ছিলেন। ঋক্‌বেদী ঋষিরা ছিলেন 'প্লব' মানে যাযাবর—মিশনারি কাজে লিপ্ত—জন-উন্নয়ন কার্য্যে লিপ্ত। 'চর্য্যাপদ' এবং 'বাঘগুহা' সে-চিত্র প্রদর্শন করে। জলদান মানেই কৃষি-সংস্কৃতি দান—আলবাঁধা কৃষি-সংস্কৃতি। তুক্কৃতি-ও।

ইন্দ্র-বরুণ সমন্বিত সামবেদী স্রষ্টা বা শ্রেষ্ঠী বিশ্বকর্ম্মা বংশের সভ্যতা থেকে এই লিপি—তাঁরা পাথর দিয়ে অস্ত্র (বজ্র), পাথর দিয়ে পুরী নির্ম্মাণ করতেন (ঋক্‌বেদ দ্রষ্টব্য)। দ্বন্দ্বহীন 'বৃহৎসামে' ইন্দ্র হলেন পুরোহিত, বাজের আকার আর 'বৃত্র নরা' (নরা কৌম, জ্যোতিষী ও কবি, কোকোনর-শান-প্রদেশের আদিবাসী) বরুণ-রাজ হিসেবে



হংস-বলাকাবৎ বিরাজিত। জৈন যজুর্ব্বেদী অরিষ্টসেনের প্রস্তর-যুগের ইন্দ্রপ্রস্থে সিংহসেবিনী সার্সি যক্ষিণীদের রায় (ঐশ্বর্য) দূর থেকে দেখতে পেয়ে তখনকার উরোপার ভাইদের মুখে এ-কথা ফুটে উঠত :

'ক্ক ফ্রমক এদোকান লুকৌ ওরেষ্টরায়ৈ এদে লিয়ন্তস'

"দূরের উদক-ভ্রমক কোক-প্রস্তরপুরীতে সেন-চিতাও (দর্ম্মিল অসুর) খাদ্য পায়!"

উর-সভ্যতা জাত 'ওয়েষ্ট উরোপা'য় যেদিন এ-ভাষা প্রণীত হয়েছে, মোহেঞ্জোদারোর মৎ-পঠিত এ-লিপিটি সেদিনকার।

কিন্তু তার বহু আগে ও পরে মোহেঞ্জোদারোতে প্রভু ইন্দ্রের বৃষ সভ্যতা ছিল। গজলক্ষ্মীর জল-বর্ষণ সুরু হয়েছে দিক্‌গজদের নিয়ে মহেন্দ্রের শৈব্য যুগে। তাঁরা সর্ব্ববিদ্যাধর তান্ত্রিক। 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'র শাক্ততন্ত্রযোগ তাঁদেরই বলেছেন 'দেবেশি'র শৈব। ঋক্‌বেদেও তাঁরা 'দেবাস' 'শিব' জাতি। মসীদনের থেকে প্রত্যাগত আলেকজান্দারও তাঁদের সে অঞ্চলে মুষিক-ব্রাহ্মণ ও ঐল পুরূরবা বংশের পুরুষের পাশে দেখতে পেয়েছেন। আলেকজান্দার ভারতীয় আর্য্য বলেই কি পার্সিপোলিসে নিহত হয়েছেন? না কি নন্দ্রাম্ হয়ে মসীদনে গিয়েছিলেন বলে সীদিয়ন শৈব্য কুশান তাকে বধ করেছেন?

তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভারতীয় 'কনিক' সিদিয়নদের (তেলবাহন। সুসার ও মোহেঞ্জোদারোর স্তূপ-নির্ম্মাণকারী) 'স্তুতি-পাঠ' লিপিবদ্ধ করেছে এইভাবে :

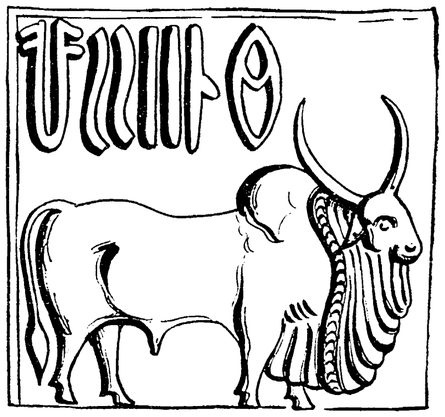

অক্ষি ভ্রুঃখোত্থিতস্যৈব
বিপ্রসন্নে কনীনিকে
আংক্তে চাদগণং নাস্তি
ঋভূণাং তান্নবোধত॥
কনকাভানি বাসাংসি
অহতানি নিবোধত
অন্নমশ্নীত মৃজমীত
অহংবো জীবনপ্রদ।
এতো বাচো প্রযুজ্যন্তে
শরদ্ যত্রোপদৃশ্যতে॥

মোহেঞ্জোদারোর এই বৃষ-মূর্ত্তিটি তখনকার। এতে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব বর্ষ বর্ণণ করেছেন পণ্ডিতবৃন্দ। তার মানে, বৃহৎকলি। যখন সুরমা-উপত্যকায় পাণ্ডব-পাল যাদব (বিরাজ) অধিবাসিত আসাম বোডো-জাতির কল্যাণে তখনই 'কলিত'

হতে সুরু করেছে। ইন্দ্র এসে 'কৌলিতর শম্বর অসুর' বধ করবেন অতঃপর। চাদগণ বা চেদী চন্দ্রবংশ পাংক্তেয় হয়েছেন—ঋভু হয়েছেন। অন্নপূর্ণা পায়সান্ন বিতরণ করেছেন চীনাংশুক ( মসলিন ) পরিধান করে। তার মানে অত্রির চন্দ্রবংশ, গৃহস্থ গৃৎসমধের গণপতিবংশ তখন বিদ্যমান। বারুণী-সভ্যতা প্রচুর-পয়সী প্রাচীতে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের যক্ষরা কৃষ্ণের জন্মে 'মাজি'দের মতো উপস্থিত হচ্ছেন—চীনাংশুক পরিধান করে।

বৃষ-মূর্ত্তির পৃষ্ঠোপরি স্থাপিত শৈব্য লিপিটির দিকে 'বাঙালিনী' দৃষ্টি নিয়ে তাকালে আমরা '৯য়োাত' মানে লিঙ্গায়েত শৈবদের দেখতে পাব যদিও বৃষভাঙ্ক-শঙ্কর অদৃশ্য। কিন্তু শৈব্য 'ব্রাহ্মী' দৃষ্টি আমাদের আরেক দৃশ্য দেখাবে। দেখাবে 'প্লপ-পর-তথ', 'প্লপ-পর-রঞথ' প্রভৃতি রাজর্ষিদের যাঁরা ঋগ্বেদে রথী নৃপ এবং জাতকের বিচরণ-শীল শ্রেষ্ঠী।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে ব্রহ্মের শরণ নিলেই আমরা রাজর্ষি হতাম, ঋগ্বেদের যুগ আসত, আর ব্রহ্মার শরণ নিলেই মহর্ষি পৌরাণিক ঋষি। সাকার আর নিরাকার নিয়ে মারামারি। তাই ব্রহ্ম-যুগে আমাদের স্বাতী 'সেতি' হয়ে সাকারা-প্রদেশে মিশরে পালিয়েছিলেন সিংহাসন নিয়ে। তুলময়ের দেশ থেকে সেই সিংহিনীকে তুলে আনতেই কতিপয় বর্ষ ব্যাপী চণ্ডাশোক থাকতে হয়েছিল অশোকবর্দ্ধনকে। সেই কতিপয় বৎসর তিনি সিংহাসনে বসতে পারেন নি। তুলময় গোষ্ঠী ছিলেন শ্বেতজাতির 'যোন' বিজয়-সিংহ। 'মহানাদে' সেদিন সিংহের গর্জ্জন শোনা যেতো, গুর্জ্জরের আর ব্রাঘ্রতটীর ব্যাঘ্র-গর্জ্জন এসে মিশত সোদরবন থেকে—অলীক্য সোদর তখন কোন্ অলীক লোকের অলকায় ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকরা তার সন্ধান করবেন আশা করি।

তবে আমি এটুকুমাত্র জানি যে পিয়দসির ইতিহাস ছাড়া-ও ভারতবর্ষের লিখিত ইতিহাস আছে। আছে ভর্হুত, আসামের প্রত্নরত্ন ভাণ্ডার, আমাদের পুরাণ-ভাগবত-মহাকাব্যের হিমালয়, আছে নালন্দা লিপি আর মোহেঞ্জোদারোর মৃতপুরী। লার্কানা-জেলার লোকরা ইদানীং-ও ভাগবতের লক্ষিত-লক্ষণা-পুরীকে 'পুষ্করাবতী' বলে জানে—প্রেত-পুরুষের পুরী—জানে পুষ্করণার চন্দ্রবর্ম্মার পুরী বলে—যাঁকে রাঢ়াঞ্চলে—সমতট অঞ্চলে ( ব্যাঘ্রতটীতে ) খুঁজে পেয়েছেন ঐতিহাসিকবৃন্দ। তুরাণীয় শমন ( যম ) বা সীদিয়ন কুশান তাঁরাই। উর-সভ্যতায় তাঁরাই আকণ্ঠ বিষ পান করে মৃত্যু-বরণ করেছেন—'নিগ্রীব-কনকমুনি' নীলগ্রীব নীলকণ্ঠ শিব হয়েছেন। মোহেঞ্জোদারোর রাজমূর্ত্তিতে ( মার্শ্যাল-গ্রন্থ-তৃতীয়-খণ্ড চিত্রপৃষ্ঠা ৯৮ ) উর-সভ্যতাস্পর্শিত বর্ম্মীকুশান দেখতে পাওয়া যায়। 'চিরতন' চিহ্ন আঁকা কামিজ তাঁদের কিরাতের চির কালোর চিরতা সূচিত করেছে। চিরতন-চিহ্নে সূর্য্য-পূজা হত আসামে। কামাখ্যায় ঋক্বেদ বর্ণিত অবিকল সবিতৃ-মূর্ত্তি পাওয়া গেছে। 'দোবোক' কিরাত-দেবের রাজ্যে 'মোহোঙ্গদিজুয়া' নাম 'মোহেঞ্জোদারো'-নামই



ধ্বনিত করত। তখন তা প্রেতপুরী বা যক্ষপুরী ছিলনা, ছিল 'দেবাস' জীবন্ত শৈব-রাজ্য। উলঙ্গ-কিরাতী 'কেসাই-খাটি' কালী-কন্যারাও কাংস্য-মূর্ত্তিতে মোহেঞ্জোদারোতে রূপায়িত ( মার্শ্যালের উক্ত গ্রন্থ চিত্রপৃষ্ঠা ৯৪—চিত্রসংখ্যা ৬, ৭, ৮ )। তাঁরা বিবস্ত্রা কিন্তু বেণীবন্ধনে দ্রৌপদী-সমা। কম্বুজ-সভ্যতার ( এ-সভ্যতার বিবরণ শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার খানিকটা প্রকাশ করেছেন ) 'কৃপঞ কম্রতাণ অঞ'—'কোপনীপরা কম্রতাননী' তেম্নি প্রায় বিবস্ত্রা। ভর্হুতে এসে চেদী-যক্ষিণীরা অলকদাম বেণীতে প্রলম্ব করেছে, বস্ত্রেও আবৃত করেছে দেহ। কিন্তু আসামে মোহেঞ্জোদারোর মতোই নগ্না কিরাতী যমুনা ও গঙ্গা। মোহেঞ্জোদারোতে আর আসামে একইরকম নগ্নতা, একই কিরাতী সভ্যতা। এঁরাই মহিষমর্দ্দিণী মাহিষ্মতী হয়ে পূজিতা হয়েছেন সুমেরু পত্রে। সে-পত্র-ভঙ্গী অশ্বত্থ-বট-পত্রের ( ১৫৪ পৃঃ-৯ সংখ্যক চিত্র)—যা মোহেঞ্জোদারোতে ও বোডোর বথৌব্রিয়া-বৃক্ষভঙ্গীতে রক্ষিত—মোহেঞ্জোদারোতে তখন অবিকল সুমের সভ্যতার মানুষ বিরাজিত ( প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র-পৃষ্ঠা ৯৯ )।

মোহেঞ্জোদারো পৃথিবীর সমগ্র কুশভূমির বা প্রথম 'তৃণে'র সভ্যতা। তখনই ত্রিমূর্ত্তি। মোহেঞ্জোদারোর দ্বিতীয়-চত্বরে পঞ্চম-গৃহে ৭৪-সংখ্যক প্রকোষ্ঠের নরকঙ্কালগুলো উরের বিষ-পান-কৃত্যের আহুতি। একটি কঙ্কালের ( ২-সংখ্যক ) বিষ-পাত্রটি মুখে অবিকল ধরা আছে। ঢালু কপাল, আকর্ণ চোখ, কেশবন্ধনী সুমের-উরের মানব-মূর্ত্তির পরিচায়ক। সিদিয়ান অক্ষদ বংশের 'নকিন্দ্র' ঋক্বেদ নিয়ে ভর্হুত থেকে এলেন। ২৬৫ সংখ্যক ভর্হুত-লিপি 'অয়ইসীদাত সর্গানকসদানং' যাঁর, তিনিই সেমেটিক 'অক্কড সরগন'। সেখানেই বৃষ-লিপির 'U'-র প্রথম উদয়, কিন্তু প্রথমই বাংলা 'প'। মোহেঞ্জোদারোর তৃতীয় চত্বরে তেম্নি ৭৪-সংখ্যক প্রকোষ্ঠে সুসা ( এলাম )-এর চারটি স্তূপ বা 'তেল' সাজান। গৌরীপট্ট-ও এদের বলা যায়। 'সেরিব জাতক' জানত 'তেলবাহন' রাজ্যের সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগাযোগ। বেঙ্গীর ভীমও জানতেন তাঁর 'দেবরাষ্ট্র' 'এলামঞ্চ কলিঙ্গদেশ' নিয়ে। দেবরাষ্ট্র ঋক্বেদের দেবরাত কুশিকাসস্ জাতক।

প্রবন্ধের সমাপ্তির অংশে আমি বল্‌ব যে ভবভূতি সিংহবিক্রম লবকে ঐক্ষ্বক বলে অভিধা দিয়েছেন ; হৈক্ষকরা মিশর-ফারাও হয়ে মিশরকে 'সিংহ' বোঝাতে 'লবু'-শব্দটি দান করেন, হৈক্ষকরা ভারতবাসী ছিলেন। সবিতৃ-সেবক ইক্ষ্বাকু মিশরের সেতি-মন্দিরে বাংলা 'সা', ব্রাহ্মী 'ঠ', মোহেঞ্জোদারোর 'T' আর দেবনাগর 'ী' এঁকে কেন 'সাঠ্‌টী' বোঝাতে চেয়েছেন, নালন্দা-তোরণ-লিপির 'লব'-কে জেনে তা-ও বুঝতে পারি। বুঝতে পারি বোডো-ফিসা কোচ-কছরীর 'বোহগ-বিহু' ( বৈশাখ-বিষু ) বর্ষ সুরু হ'ল সেদিন শুভ-বৈশাখ নিয়ে স্বাতী নক্ষত্রে। তার আগে ছিল আষ্ট্রিক যক্ষদের অম্বুবাচী (খাসিয়া-জৈন্তিয়াদের)—আষাঢ়স্য প্রথম-দিবসে প্রথম বর্ষায় বর্ষারম্ভের আয়োজন।

বোডো-জাতির বৈশাখ-বিষু চন্দ্রবংশ বার্হদ্রথ-মৌর্য্য জাগবার আগে—হিমালয়ের-তৈচান জাগবার আগে। তখন 'মানসেশ' বা তিব্বতের যাদব জলার ধ্বনি শোনা যেতো 'যৈদমশম্প-ধব-সুন্নর'। 'যুবঞ্জ্যঙ্কে' আর 'যুবনমিন্' তখন একাত্ম। একাত্ম হয়ে মিশর-সুমের-উর-এলাম সভ্যতা গড়তে যাচ্ছেন। ৩৫০০ খ্রীঃ পূর্ব্বে খাটিয়া বৎ অশ্লেষা নক্ষত্র-জাত সদিয়ার কেসাই-খাটির গুপ্ত কাশী যুগের পরিচয়েই সূর্য্যকেন্দ্রিক জ্যোতির্ব্বিদ্যা বর্ণনায় 'মহাভারত' বলেছে:

"অহঃ পূর্ব্বং ততো রাত্রির্মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ।"

তা এশিয়ামাইনরে 'হেলেনি নাসত্যা' বা মিতানি-খাটির যুগারম্ভকাল। বৃহৎকলি। সুমের-সভ্যতার সূর্য্যোদয়ের যুগ, মিশরের কৃষির যুগ তার আগে।—পূর্ব্বদিক থেকে যাত্রা করল মানুষ তমসার দেশ শিনারের দিকে (জেনেসিস অধ্যায়, বাইবেল দ্রষ্টব্য)। ইতিহাস বলে সে মানুষের গুম্ফ নেই, শ্মশ্রু ছিল। মার্শালের গ্রন্থ—তৃতীয় খণ্ড—৯৯ পৃষ্ঠায় মূর্ত্তি-চিত্র সংখ্যা ৪, ৫-এ তাঁদের মুখাবয়ব দেখা যাবে। মেসোপোটমিয়া-সভ্যতা তৈরী করল কিরাত যোগী জাতি আর মোহেঞ্জোদারোতে লিখিত হল অসুর রাজহংস মুষিকনের প্রথম ব্রাহ্মী-অক্ষর, ডান থেকে বাঁয়ে:

"ঢ়াজ্ হুতোস্মস্ প্লতোমোসকঞ্চ"

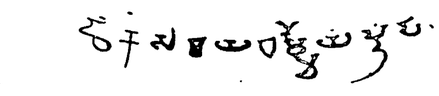

বাঁ থেকে ডানে পড়তে গেলে দেখা যাবে 'কাঞ্চী-সমতটের কোচ-হজরা' (দমিল) সেখানে তান্ত্রিক চক্র তৈরী করেছেন।

ভবিষ্যতের ঐতিহাসিকের কাছে আমার এই নিবেদন যে এশিয়া-মাইনরের 'বোঘজকুই' এর ভোগ-বাদী ঋগ্বেদের সভ্যতা দিয়ে সিদিয়ান-ঋগ্বেদের জন্মকাল যেন তাঁরা অস্বীকার করেন। ঋগ্বেদ সুমের-মিশর সভ্যতার সমসাময়িক। সুমের, মিশর, থিবিস, থিস, মোহেঞ্জোদারো কম্বুজ বোরোবুদুর একই বোডো-বেসতির নির্ম্মাণ। ঋক্‌বেদের প্রথম মণ্ডলে শূনঃশেফ যে পক্ষীজাতির 'বসতীরূপ' বর্ণনা করেছেন তাঁরা 'প্রচুর-পয়সী-প্রাচী'র বারুণী 'বেসতি'। 'শেফ' বা শূনঃশেফ পিতা ইজিপ্তের ভাষায় 'আলো'। 'শেফ'-বাংলা-ভাষী বংশের একটি মুদ্রা ৺রাখালদাসের 'বাঙ্গালার-ইতিহাসে'র ৬নং চিত্র-পৃষ্ঠায় ৩-সংখ্যক প্রতিলিপিতে সন্ধান করে দেখুন। তাঁরা লিচ্ছবী আর তাঁদের স্বামী 'হুবাস'—হংস, কদফিসা শ্রেষ্ঠী কুশান। ঋক্‌বেদের সপ্তম-মণ্ডলের 'নহুষ'-বংশ, ঐল। সদিয়ার ত্রিশূলী শৈব্য। এই জেনে তাঁরা শ্রেষ্ঠীর নালন্দা-লিপি পাঠ করুন। রাজা হোড়ি এবং রাণী গতের সুগত-পুরী ঔরনস বা মোহেঞ্জোদারোকে পুনরাবিষ্কার করতে পারবেন।

# পথ গেছে হারিয়ে

## অন্নদাশঙ্কর রায়

চন্দ্রকিরণের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। আলাপ হলো হঠাৎ এক দিন এক সাহিত্যের আসরে। বলল, "আমি তো সাহিত্যিক নই। কী বলে নিজের পরিচয় দেব?"

আমি তাকে অভয় দিয়ে বললুম, "আমিও সাহিত্যিক নাকি? জীবনের ডাক শুনলে যে কোনো দিন সাহিত্যের পাট তুলে দিতে পারি।"

"তা হলে," চন্দ্রকিরণ আশ্বস্ত হয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে আমার বনবে ভালো। সত্যি বলতে কি আপনাকেই আমি খুঁজছিলুম।"

আসর থেকে লুকিয়ে এক সময় বেরিয়ে পড়লুম আমরা দু'জনে। ছেলেবেলায় যেমন ক্লাস থেকে পালিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে চা খেয়ে, চানাচুর চিবোতে চিবোতে আমরা পরস্পরের যে পরিচয় দিলুম ও নিলুম তা নিত্যকালের কিশোরবয়সীর। অথচ তখন আমাদের বয়স ত্রিশের কোটায়। কলকাতায় কেউ কাউকে চেনে না বলেই রক্ষা। মফঃস্বল হলে ছি ছি পড়ে যেত।

"এইজন্যেই," আমি বললুম, "কলকাতা আমার এত ভালো লাগে। এখানে আমি নামহীন পরিচয়হীন অজ্ঞাত অখ্যাত মুসাফির। আমি anonymous।"

"সেইখানেই," চন্দ্রকিরণ বললেন, "আমার দুঃখ। কলকাতা শহরে আমি আর anonymous নই। এবার বেরিয়ে পড়তে চাই আত্মপরিচয় গোপন করে ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে কলকাতার বাইরে, ভারতের বাইরে।"

"কোনখানে?"

"আপাতত ইউরোপে।"

"কেন, আগে কখনো যাননি?"

"কত বার গেছি পক্ষিরাজের পিঠে সওয়ার হয়ে।" তার পর করুণ হেসে বলল, "মায়ের একমাত্র পুত্র। স্ত্রীর অঞ্চলের নিধি।"

আমি দুঃখিত হয়ে বললুম, "তা হলে আপনার মনে একটা আফসোস রয়ে গেছে, বলুন।"

"শুধু কি আফসোস? আকুলতাও। 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি। মোর ডানা নাই, আমি আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাসরি।' আর ভালো লাগে না এমন করে বেঁচে থাকতে। বেঁচে থাকা—নয় সে তো বাঁচা। আমি বাঁচতে চাই।"

আমাদের কথাবার্তা ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর পর্যায় ধরে চলল। আমরা ভুলে গেলুম যে আমাদের আলাপ মাত্র একদিনের।

চন্দ্রকিরণরা কলকাতার বনেদী ভদ্রলোক। পুরুষানুক্রমে সলিসিটর। বিত্তের অভাব কাকে বলে জানে না। বিত্তের সঙ্গে যোগ দিয়েছে বিদ্যা। বিদ্যার সঙ্গে রূপ। চন্দ্রকিরণ যেমন বিদ্বান তার স্ত্রী তেমনি রূপবতী। বিয়ে হয়েছে অনেকদিন। কিন্তু সন্তান হয়নি। স্ত্রী এরই মধ্যে ধর্ম-

কর্মে মন দিয়েছেন। চন্দ্রকিরণ কোনো দিকে মন দিতে পারছে না। মন লাগছে না। কোথাও চলে যেতে চায় কিছুদিনের জন্যে। তারও উপায় নেই। কড়া পাহারা, চোখের জল, প্রায়োপবেশন।

দুঃখের উপর দুঃখ, কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারে না। সর্বদা একটা ব্যবধান বজায় রাখতে হয়। নইলে বংশের মানহানি। প্রোফেসনের মর্যাদাহানি। সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক হয়ে জন্মেছে বলে তাকে সারাজীবন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ভূমিকায় অভিনয় করে যেতে হবে। পাইস হোটেলে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পচা মাছের ঝোল মাছিদের সঙ্গে ভাগ করে খেতে পাবে না। মেসের কেরানীদের সঙ্গে চৌবাচ্চার জলে আতুল গায়ে স্নান করতে পাবে না। বস্তির লোকের সঙ্গে রাত জেগে পাড়ার লোককে জাগিয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে গান জুড়তে পাবে না। সিগারেট খেতে আপত্তি নেই, কিন্তু বিড়ি খেলে জাত যাবে। মদ খেতে পারো, কিন্তু খবরদার তাড়ি কিম্বা ধেনো খেয়ো না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত কত কী করতে সাধ যায়, কিন্তু জুতো বুরুষ করতে বসলে বেয়ারা ছুটে আসে—হাঁ, হাঁ, কী করছেন! এ কী আপনার কাজ! ঝাঁটা হাতে করলে জমাদার তেড়ে আসে—হাঁ, হাঁ, এ কী করছেন! এ ছোটলোকের কাজ। ইচ্ছা করে রিক্‌শা টানতে। রিক্‌শাওয়ালাকে বকশিষ দিয়ে টেনেওছিল একদিন। অমনি পাড়াশুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ল দৃশ্য দেখতে। কোচমানকে বলে কয়ে ফিটন চালাতে গিয়ে দেখে কে একটা ভিখিরী চাপা পড়ে আছে। অমন করে সবাই মিলে যদি বাধা দেয় তা হলে চন্দ্রকিরণের কোনো কাজই করা হয় না, এক অর্থোপার্জন ছাড়া।

আর অর্থোপার্জনে কি সুখ আছে! পরস্ব অপহরণের যতরকম পদ্ধতি আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো বণিকবৃত্তি। বণিকের ধন সলিসিটরের ঘরে আসে, যেমন চোরের ধন বাটপাড়ের ঘপ্‌পরে। চন্দ্রকিরণের ভালো লাগে না চুরি কিম্বা বাটপাড়ি। ঘেন্না ধরে যায় নিজের উপর, পরের উপরে। কিন্তু কাকে বলবে এ কথা! বাপ কাকা মামা মেসো সকলেরই ঐ পেশা, ঐ বৃত্তি। ওঁরা হয় বণিক নয় সলিসিটর। বাইরের লোকের সঙ্গে মেশা বারণ। যদি বা মেশে তবু প্রাণ খুলে কথা বলতে পারে না। ব্যবধান বজায় রাখতে প্রাণান্ত। ক্লাবে যায়, সেখানে যাদের সঙ্গে টেনিস বা ককটেল খায় তারাও তার নিজের শ্রেণীর লোক। তারা এক মিনিটও ভাবে না, কেমন করে টাকাটা আসছে, অমন করে আসাটা কি ভালো, সমাজের কি ওতে মঙ্গল হচ্ছে না অমঙ্গলের বারুদ জমছে!

চন্দ্রকিরণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হায়! একবার যদি বেরিয়ে পড়তে পারতুম!"

"তা হলে?" আমি কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

"তা হলে? তা হলে মরা গাঙে বান ডাকত। সমুদ্রের হাওয়া আমাকে দু'দিনেই চাঙ্গা করে তুলত। আহ্! কী যে ভালো লাগত জাহাজে চড়ে দুলতে!"

আমি হেসে বললুম, "তারপরে যখন সী সিক্‌নেস হতো তখন কিন্তু ভালো লাগত না।"

"লাগত, লাগত। সবকিছু ভালো লাগত। সী সিক্‌নেস। পাঁচ সাত দিন বিছানায় শুয়ে থাকা। তারপরে যেন নতুন জীবন ফিরে পাওয়া। নতুন চোখে দেখা। নতুন পায়ে হাঁটা। চলি চলি পা পা।"

আমি শুনতে লাগলুম। বলতে লাগল চন্দ্রকিরণ, "ইংলণ্ডে পৌঁছে আমি ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে



যেতুম। কেউ আমার খোঁজ পেত না, বাড়ীতে জানাত না। মজুরদের সঙ্গে রাস্তা মেরামত করতুম আর তেষ্টা পেলে Pub-এ ঢুকে সস্তা বীয়ার খেতুম। আর খিদে পেলে খেতুম কুচো মাছ আর আলু ভাজা। থাকতুম কোনো বস্তিতে।"

এই আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনতে মন্দ লাগছিল না। শুনছিলুম আর মিলিয়ে দেখছিলুম চন্দ্রকিরণের প্রকৃতির সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতি আছে কি না।

'তবে মাসের মধ্যে দু'তিন দিন সাজ বদল করে Ritzএ গিয়ে উঠতুম। নইলে আবার সেই খাড়া বড়ি থোড় খেতে খেতে অরুচি ধরে যেত। আবার সেই একঘেয়ে জীবন, যার জন্যে দেশ ছেড়ে পালানো।"

"তা বলে এক লম্ফে slum থেকে Ritz! মাঝখানের ধাপগুলো কী দোষ করল!" আমি জানতে আগ্রহবোধ করছিলুম।

"না, না। আর ও-সব ভালো লাগত না। দেশে থাকতে ও সব যথেষ্ট হয়েছে। সত্যিকারের নতুন কিছু চাই বলেই তো বিদেশে বিভূঁয়ে ঘুরে বেড়ানো।"

এর পরে চন্দ্রকিরণ পাড়ল প্যারিসের কথা। সেখানে সে শিল্পীদের সঙ্গে জুটে বোহেমিয়ান হবে। কাফে আর বুলভার্দ, স্টুডিও আর সালোঁ। সাজপোশাক বহুরূপীর মতো। যে দেখবে সে বলবে, হাঁ, আর্টিস্ট বটে। সার্কাসের বাইরে এমনটি আর দেখা যায় না। ছাত ফুঁড়ে জল পড়ছে, ছাতা মাথায় দিয়ে ছবি আঁকা হচ্ছে। এই তো জীবন।

কিন্তু কিছুদিন বাদে এখানেও সেই থোড় বড়ি খাড়া। সেইজন্যে মুখ বদলানোর জন্যে যেতে হয় দক্ষিণ ফ্রান্সে। মন্তে কার্লো, নীস, মোনাকো। কাসিনোতে জুয়োখেলার ধুম। হারজিৎ যা থাকে কপালে। একেই বলে জীবন।

সেদিন কথা বলতে বলতে কখন এক সময় সে আমাকে ও আমি তাকে "তুমি" বলতে শুরু করেছিলুম। বললুম, "চন্দ্রকিরণ, এক বার বেরিয়ে না পড়লে তোমার দিবাস্বপ্ন ভাঙবে না। বেরিয়ে পড়লে দেখবে স্বপ্নে বাস্তবে অনেক তফাৎ। তুমি বেরিয়ে পড়ো।"

"বেরিয়ে পড়তে দিচ্ছে কে! বুদ্ধদেবের যশোধরা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে তিনি বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। আমার যশোধরা রাত ভর এক চোখে ঘুমোয়। তার মানে পাহারা দেয়।" চন্দ্রকিরণ ক্ষোভের সঙ্গে বলল।

"যশোধরাকেও নিয়ে যাও না কেন? আজকাল কত লোক সস্ত্রীক বিলেত যায়। তোমার তো অর্থের অভাব নেই!"

"ওকে নিয়ে যাবার কথা বলছ! তা হলে সব মাটি হবে। আমি কোনো মতে আত্মগোপন করতে পারি। কিন্তু ওকে গোপন করব কোথায়! আমার সঙ্গে একটা সুটকেস থাকলে যথেষ্ট। ওর সঙ্গে লটবহর থাকবে অজস্র। আমার চাকরের দরকার নেই। ওর ঝি চাকর না থাকলে চলে না। ভাবতেই পারা যায় না যে ওর সামনে আমি রাস্তা খুঁড়ছি, Pub-এ দাঁড়িয়ে বীয়ার খাচ্ছি। না, না, ও যদি যেতে চায় তা হলে আমি যেতে চাইনে।"

চন্দ্রকিরণ ওর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ওর স্ত্রীও ওকে একলা যেতে দেবে না। এ সমস্যার সমাধান আমার জানা ছিল না। আমি চুপ করলুম।

"স্ত্রীর বোঝা বহন করার চেয়ে গন্ধমাদন বহন করা সহজ। কলকাতা থেকে দার্জিলিং যেতেই হিমসিম খাই। বিলেত যেতে হলে মারা যাব।" চন্দ্রকিরণ আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

তার পর সে লক্ষ্য করল যে আমি মৌন রয়েছি। বলল, "এখন বুঝতে পারলে তো কেন তোমাকে খুঁজছিলুম। এবার পথ নির্দ্দেশ করো।"

পথ কোথায় যে পথ নির্দ্দেশ করব। বললুম, "দাঁড়াও, ভাবি।" কিন্তু ভেবে কোনো কূল কিনারা পেলুম না। পুনর্দর্শনের দিন ফেললুম। কিন্তু তার আগেই আমাকে কলকাতা ছাড়তে হলো।

২

এই ঘটনার বছর কয়েক পরে আবার তার সঙ্গে দেখা। মহাযুদ্ধের মাঝখানে। তার আমার দু'জনেরই কেশে পাক ধরেছে। তারই বেশী।

সাহিত্যের আসরে নয়, লঙ্গরখানায়। চন্দ্রকিরণ পুণ্যসঞ্চয় করছিল মন্বন্তরের সময় হতভাগাদের তরলান্ন খাইয়ে। পিইয়ে বললে আরো ঠিক হতো। আমি কলকাতা এসেছি শুনে লোক পাঠিয়ে দিয়ে ধরে নিয়ে গেল এক লাইন সুপারিশ সংগ্রহ করতে। যাতে যথেষ্ট চাল পাওয়া যায়।

"খুব ফাঁকি দিলে সেবার।" চন্দ্রকিরণ বলল।

"যাক, খবর কী তোমার? সব ভালো তো?" আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

"বেঁচে আছি তা তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু বেঁচে থাকা—নয় সে তো বাঁচা।" সে পূর্বের মতো আক্ষেপ জানাল।

কঙ্কালসার নরনারীর সঙ্গে তার ঘৃতপুষ্ট বপুখানির তুলনা করে মনে হলো না যে সে জীবন্মৃত। বরং এই কয় বছরে আরো মেদ বৃদ্ধি হয়েছে।

"কেন, বাঁচার কমতি কোথায়?" আমি প্রশ্ন করলুম।

"সেই একঘেয়ে জীবনযাত্রা।" সে ঠোঁট উলটিয়ে বলল। তেমনি বিরস উদাস স্বরে। "আর ভালো লাগে না তার জের টানতে। এবার বেরিয়ে পড়তে চাই এক বস্ত্রে একখানা কম্বল সম্বল করে। সাধুদের সঙ্গে মিলে কেদার বদরী যাব। সেখান থেকে কৈলাস মানস সরোবর।"

"বৌদি যেতে দেবেন তো?"

"বৌদি যেতে দেবেন? ক্ষেপেছ?"

"তা হলে কেমন করে সম্ভব?"

"কেমন করে সম্ভব!" চন্দ্রকিরণ প্রতিধ্বনি করল। "আমিও সেই কথা বলি।"

"এক কাজ করলে হয় না? বৌদিকেও নিয়ে গেলে দোষ কী?"

"তা হলে গিয়ে কোনো সুখ নেই। তা হলে কি আমি ধুনী জালিয়ে ওঁ ওঁ করতে পারব!" চন্দ্রকিরণ তার মনের কথা খুলে বলল।

"তোমার হঠাৎ এ খেয়াল চাপল কেন?" আমি জানতে চাইলুম।

"খেয়াল নয়। জীবনের দ্বারে দ্বারে করাঘাত হানা।" চন্দ্রকিরণ রহস্যমগ্ন হয়ে বলল, "কে জানে কখন কোন দরজা খুলে যাবে! প্রবেশপথ পেয়ে যাব।"



আমি বললুম, "ভালো। কিন্তু বৌদিকেও সঙ্গে নিয়ে যেয়ো।"

চন্দ্রকিরণ আমার দুই হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, "তুমি কি মনে করো আমি ও কথা ভাবিনি? ভেবে দেখেছি তা হবার নয়। ও যদি আমার সঙ্গে যায় ওকে গোপন করতে পারব না। কাজেই আত্মগোপন করতে পারব না। আর তাই যদি না পারলুম তবে আর দশজনের মতো তীর্থযাত্রা করলেই হয়। জীবনের দ্বারে দ্বারে করাঘাত হানা দুরাশা, যদি আত্মগোপন করতে না পারি।"

কথাটা বুঝতে আমার অনেকক্ষণ লাগল। জিজ্ঞাসা করলুম, "আচ্ছা, আত্মগোপন করার জন্যে তোমার এত ব্যগ্রতা কেন? তুমি কি খুনটুন করেছ, না আর কোনো শোচনীয় অপরাধ?"

"অপরাধ!" চন্দ্রকিরণ কাতর কণ্ঠে বলল, "অপরাধ কি একটি না এক বার! এই যে এতগুলো মহাপ্রাণী খেতে না পেয়ে কলকাতার ফুটপাথে ফুটপাথে পড়ে মারা যাচ্ছে এরা তো সাধারণ ভিখিরী নয়। এরা খেটে খাওয়া মানুষ। এদের মুখের গ্রাস আমরা বেশী দাম দিয়ে কিনে এনেছি। আমরা মানে আমার মেজ মামা ও তাঁর কোম্পানী। ঘরের উপর বিধাতার অভিশাপ পড়বে, সেই ভয়ে আমি লঙ্গরখানা খুলেছি। আমার মামাতো ভাই প্রদ্যুম্ন তো দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলতে পারে না কী তার অসুখ। নিজে বলতে চায় না। বোবার মতো বসে থাকে। হাবাগোবার মতো। দেখে কষ্ট হয়।"

লক্ষ করলুম চন্দ্রকিরণের চোখ ছলছল করছে। প্রশ্ন করলুম, 'আর তোমার মামা?"

"মামা দিনের বেলা অর্থ অর্জন করেন, রাতের বেলা ধর্ম অর্জন। রোজ কালীঘাটে যান। ফিরতে দশটা এগারোটা বাজে। মামী বলেন, কার জন্যে এত টাকা করছ? ভোগ করবে কে? ছেলেটা তো চিকিৎসার বাইরে।"

আমি এ প্রসঙ্গ আর বাড়তে দিতে রাজি ছিলুম না। মোড় ঘুরিয়ে দিলুম। বললুম, "তাহলে তুমি আত্মগোপন করে সাধুদের সঙ্গে সাধু সাজতে চাও। বেশ, বেশ।"

"ভেক নেব না। সংসার ত্যাগ করব না।" চন্দ্রকিরণ বুঝিয়ে বলল, "কিন্তু কিছু কালের জন্যে বাঁচব। এখন এরা আমাকে বাঁচতে দিলে হয়!"

এরা মানে জীবনসঙ্গিনী। গৌরবে বহুবচন। জীবনসঙ্গিনী যিনি, তিনি তাকে বাঁচতে দিলে হয়! শুনে আমি হাসব না কাঁদব! রসিকতা করবার মতো বিষয় বটে। কিন্তু স্থান কাল পাত্র রসিকতার অনুকূল নয়। তা বলে চোখের জল ফেলব কেন?

বললুম, "আচ্ছা, বৌদির অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। জগৎটা যা ভেবেছ তা নয়। দু'দিন বাদে আপনি ফিরে আসবে। মানস সরোবর পর্যন্ত যেতে হবে না।"

"মানস সরোবর দূরের কথা, মোগল সরাই পর্যন্ত গিয়ে ফিরতি ট্রেন ধরব, তার জো নেই। হয় ওকে সঙ্গে নিতে হবে, নয় নিতে হবে এক পাল চাকরবাকর। একলা যাওয়া চলবে না। আর একলাই যদি না গেলুম তবে গিয়ে সুখ কোথায়।" চন্দ্রকিরণ তার প্রাণের ব্যথা জানাল।

বেচারা! তার জন্যে কীই বা করতে পারি! সহানুভূতিসূচক দু'চার কথা বলে বিদায় চাইলুম। সে বলল, "পথ নির্দ্দেশ করলে না যে?"

"ভেবে দেখি।" এই বলে পাশ কাটালুম।

৩

চন্দ্রকিরণের সঙ্গে সেদিন দেখা হলো পার্ক স্ট্রীটের একটা বিলিতী বইয়ের দোকানে। এক রাশ ভ্রমণকাহিনী কিনেছে। আরো কয়েকখানার পাতা ওলটাচ্ছে। বয়স পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ, কিন্তু দেখলে মনে হ পঞ্চান্ন কি ছাপ্পান্ন। মাথায় চুল যে ক'গাছি আছে কানের আড়ালে আত্মগোপন করেছে। ভুঁড়ি কিন্তু আত্মগোপনের আশা ছেড়ে দিয়েছে। চেহারা, চালচলন ও পোশাকপরিচ্ছদ থেকে মালুম হয় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বটে। একজন বর্দ্ধিষ্ণু নাগরিক।

কুশলবিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলুম, "এখনো ও বাতিক গেল না!"

"বাতিক!" সে বিস্মিত হয়ে বলল, "বাতিক কাকে বলছ! ও যে আমার প্রাণ! ও যদি হেঁত প্রাণ থাকত ভাবছ!"

জানতে চাইলুম ইতিমধ্যে কোথাও বেড়াতে গেছে কি না।

বলল, "হাঁ, এইবার বেরিয়ে পড়ব। আর ভালো লাগে না এমন করে বেঁচে থাকতে। খাবার সুখ ছিল, তাও ঘুচে গেল কণ্ট্রোলের জ্বালায়। শুনছি মিউনিসিপাল রেট বাড়বে। বাড়ুক, আমি তত দিনে কালাপানি পার!"

"এবার কোন দেশে চললে?"

"দেশ!" সে সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, "না, না, দেশ দেখে সুখ নেই। সব দেশেই কণ্ট্রোল। সব দেশেই ট্যাক্স্। এবার যাচ্ছি কার্গো বোটে, বন্দর থেকে বন্দরে। কলকাতা থেকে আফ্রিকা ঘুরে একশো বছর আগে যেমন করে লণ্ডনে যেত তেমনি করে যাব লণ্ডনে, আমস্টারডামে, কোপেনহেগেনে, স্টকহল্মে। সম্ভব হলে লেলিনগ্রাডে। তার পরে পিছু হটতে হটতে হামবুর্গ ব্রিমেন হয়ে নিউ ইয়র্ক। তার পর দক্ষিণ আমেরিকা পরিক্রমা করে সান ফ্রান্সিস্কো। সেখান থেকে টোকিও শাংহাই হংকং। অবশেষে সিঙ্গাপুর রেঙ্গুন চট্টগ্রাম হয়ে কলকাতা।"

আমি তারিফ করে বললুম, "চমৎকার!"

সে খুশি হয়ে আমার হাতে হাত রেখে বলল, "চমৎকার কিনা তুমিই বলো। তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে চিনল না, কেউ আমাকে বুঝল না। যে শোনে সেই বলে, পাগল না ক্ষ্যাপা। বাড়ীতে তো অনশন ধর্মঘট। এবার বলছে না যে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। এবার বলছে, তোমাকেও যেতে দেব না। কী অন্যায় ত্থাখ দেখি। আমি এখন বুঝতে পেরেছি কোনখানে ওর দুর্বলতা। সেইজন্যে আমিও চাপ দিচ্ছি। বলছি, চলো, একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া যাক। তুমি আর আমি এক নৌকায়।"

আমি উপভোগ করছিলুম তার অবস্থাটা। বললুম, "সাবাশ!"

চন্দ্রকিরণ আমার হাত ধরে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ফ্লুরি'তে। কেক খেতে ও খাওয়াতে। বলল, "কতকটা প্যারিসের পাতিসেরির মতো নয় কি?"

তার মনে দুঃখ হবে বলে ঘুরিয়ে বললুম, "নয় তো কী!"

তার বিশ্বাস সে কলকাতায় বসে প্যারিসের স্বাদ পাচ্ছে। কেবল প্যারিসের কেন? এই তো অক্স্ফোর্ড বুকশপ থেকে বই কিনল। ভাগ্যিস্ আমাকে বলেনি, "কতকটা অক্স্ফোর্ডের মতো নয় কি?"



কেক খেতে খেতে চন্দ্রকিরণ প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। মন তার তখন ক্লোরেন্সে কি রোমে। বলছিল, "গিয়েই বা কোন সুখ। সবই তো ভেঙে-চুরে দিয়েছে আমেরিকানরা।"

"না। সব ভেঙে-চুরে দেয়নি। অনেক কিছুই অক্ষত রয়েছে।" আমি আপত্তি করলুম।

তাতে উল্টো ফল হলো। চন্দ্রকিরণ বিমর্ষ হয়ে বলল, "কে জানে রাশিয়ানরা কোনদিন ভেঙে-চুরে দেবে! তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধবে শুনছি। তার আগে যদি না দেখি তো এ জন্মে দেখা হলো না। প্রত্যেকটি দিন মূল্যবান। কিন্তু—" শেষ করতে পারল না। মুখ বন্ধ ছিল কেকে।

"চলো একটু স্ট্রাণ্ডে ঘুরে আসি।" প্রস্তাব করল চন্দ্রকিরণ। স্ট্রাণ্ড এক্ষেত্রে কলকাতার স্ট্রাণ্ড রোড নয়, লণ্ডনের স্ট্রাণ্ড। আমি রাজি হলুম।

হাওড়া ব্রিজ থেকে সুরু করে আমরা গঙ্গার ধার ধারে মোটর করলুম। খিদিরপুর ডক পর্যন্ত। জাহাজের দিকেই আমাদের দু'জনের দৃষ্টি। রকমারি দেশের রকমারি নিশান উড়ছে। কোনটা কোন দেশের তাই নিয়ে চন্দ্রকিরণ উৎসাহের সঙ্গে পাণ্ডিত্য ফলাতে লাগল। গ্রীক লিপিতে, রুশ লিপিতে লেখা ছিল কয়েকটার নাম। চন্দ্রকিরণ অক্লেশে উদ্ধার করল।

মনে মনে এই সব জাহাজে চড়ে সে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে এসেছে। মাসের মধ্যে দু' একদিন সে জাহাজগুলো দেখে যায়। এগুলো যেন চাঁদ সওদাগরের সপ্ত ডিঙা। বাঙালীর ছেলেরা একদিন এইসব নৌকায় করে জাভা বালি সুমাত্রা সিংহল পাড়ি দিত। জাভা দ্বীপের মন্দিরের গায়ে এখনো বাংলা লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। চন্দ্রকিরণ তার ফোটো আনিয়েছে।

"এই তো জীবন!" জাহাজের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে চন্দ্রকিরণ। যেন তার তৃষ্ণার জল। আর আমার দিকে ফিরে বলে, "ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। চোখে দেখাই সার। জীবনকে দূর থেকে দেখে গেলুম। কাছে যেতে পেলুম না।"

খিদিরপুর থেকে ফেরবার পথে আমরা কিছুক্ষণ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আশে পাশে পায়চারি করলুম। ওটা কতকটা হাইডপার্কের মতো নয় কি? চন্দ্রকিরণ বলে গেল তার ঘরের কাহিনী। মা এখনো বেঁচে। বয়স যতই বাড়ছে ততই ভয় হচ্ছে ছেলেকে বিদেশে পাঠালে আর দেখতে পাবেন না। মা'কে তবু কোনো মতে বুঝ দেওয়া যায়। স্ত্রী একেবারে অবুঝ। কেন? আজকাল সব জিনিসই তো কলকাতায় পাওয়া যায়। ইস্তক স্কাইস্ক্রেপার (sky-scraper)। বিধানচন্দ্রের কৃপায় আণ্ডার-গ্রাউণ্ডও হবে।

তার পর চন্দ্রকিরণের দ্বিতীয় অভিলাষ তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ানো। সাধারণ তীর্থযাত্রীর মতো নয়। সাধুদের সঙ্গে সাধুর মতো। লোটা কম্বল শুধু সম্বল। ভোজনং যত্র তত্র চ শয়নং হট্টমন্দিরে। বা বিটপীতলে। গৃহিণীর বিষম আপত্তি। কোন দিন কলেরা কি টাইফয়েড হবে। কে চিকিৎসা করবে, কে শুশ্রূষা করবে। টেলিগ্রাম আসবে, সব শেষ। না, না, ওসব অনাসৃষ্টি চলবে না। তার চেয়ে দু'টো দিন সবুর করো। আমি আগে চোখ বুজি। আমাকে রওনা করে দিয়ে তুমি রওনা হবে।

বেচারা চন্দ্রকিরণ! বই কিনে গাদা করেছে মনুমেণ্টের মতো। হিমালয়ের কোন বন্দরে কে কে তপস্যা করছেন, তিব্বতে কোন কোন মহাত্মা যোগ করছেন, বারো হাজার ফুট উঁচুতে কোন কোন আস্থানার অবস্থান সব তার জানা আছে। কেবল একবার বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। তার জন্যে ক্যামেরা কেনা হয়েছে, যেমন তেমন ক্যামেরা নয় সিনেক্যামেরা। দরকার হলে সে অক্সিজেন

য়্যাপারেটাস কিনতেও প্রস্তুত। কিন্তু তাকে যেতে দিচ্ছে কে!

সাধুদের সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করে। তাঁরা বলেন এখনো সময় হয়নি। যখন হবে তখন হবে। কিন্তু তত দিন বল বয়স থাকলে তো? বুড়ো হাড় নিয়ে হিমালয়ের শীত সইতে পারবে কেন? তখন রক্ত হিম হয়ে যাবে। শরীরে প্রতিরোধশক্তি থাকবে না। পুণ্য হবে হয়তো। কিন্তু সে কি পুণ্যের জন্যে পথে বেরিয়ে পড়তে চায়! সে চায় জীবনের স্বাদ।

একঘেয়ে লাগছে তার দৈনন্দিন জীবন, তার দিনগত পাপক্ষয়। তার ছদ্মবেশী শোষণ। তার মানুষ মৃগয়া। নিজের শ্রেণীর উপর তার অশ্রদ্ধা ধরেছিল। কেবল যে নিজের শ্রেণীর পুরুষদের উপর অশ্রদ্ধা তাই নয়! নিজের শ্রেণীর মহিলাদের উপরেও। এঁরাও শোষক শ্রেণীর। এঁরা শোষিত নন। এঁরা বাঘিনী। এঁরা হরিণী নন। ভিতরে ভিতরে তার মূল্যবোধ বদলে গেছল। মূল্যমান বদলে গেছল। অথচ সংগ্রাম করবার সামর্থ্য ছিল না। ইচ্ছাও ছিল না। সে দুর্বল প্রকৃতির লোক। বড় জোর পলায়ন করতে পারে। সম্মুখীন হতে পারে না। তার আত্মগোপনের প্রবৃত্তি দুর্ণিবার হয়েছিল। কিন্তু যতই সে আত্মগোপনের চেষ্টা করে ততই তার গৃহিণী তাকে ভুল বোঝেন। চোখে চোখে রাখেন।

চন্দ্রকিরণ চমকে উঠে বলল, "ও লোকটা কে? কেন ঘোরাফেরা করছে?"

"আমাদেরই মতো বেড়াতে এসেছে।"

"আরে না, না। ওকে আমি আরো কয়েক জায়গায় দেখেছি।" চন্দ্রকিরণ আমার কানে কানে বলল, "আমাকে নজরবন্দী করা হয়েছে।"

আমার বিশ্বাস হলো না। সস্মিতভাবে তাকালুম।

'ঘরে পাহারা। বাইরে পাহারা।" তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে বলে চলল, "ঘরে কে পাহারা দেয় তা তো জানো। বাইরে পাহারা দিচ্ছে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।"

আমি হতবাক হলুম। এ কি কখনো সম্ভব!

"জীবনে সুখ নেই, ভাই। আপিসে আদালতে যাব। সেখানেও টিকটিকি। বইয়ের দোকানে যাব, সেখানেও তাই। গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে বেরোব, সেখানেও সেই ব্যাপার। জাহাজঘাটে বা রেলস্টেশনে আমাকে যেতে দিচ্ছে কে! দূর থেকে তার বাঁশি শুনি। কাছে যেতে পারিনে। আমার দশা তোমার বৈষ্ণব কবিতার শ্রীরাধার মতো।"

বেচারা চন্দ্রকিরণ! তার চোখ দেখলে মায়া হয়। এত বড় মানুষটা, ছোট্ট একটা শিশুর মতো অসহায়। শিশুর মতো সরল। অথচ ঘুঘু সলিসিটর। টাকার পাহাড়।

সেদিন তাকে সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট অবধি পৌঁছে দিতে হলো। কোম্পানীর আমলের বাড়ী। কলোনিয়াল আর্কিটেকচার। গেট থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসব, চন্দ্রকিরণ আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল। বলল, "এবার তোমাকে আমি ছেড়ে দেব না। পথ নির্দ্দেশ করো। তারপরে যাবে।"

পথ কোথায় যে পথ নির্দ্দেশ করব! পথ গেছে হারিয়ে।*

* এই গল্পটি খাপছাড়া ভাবে সমাপ্ত করে রেডিয়োতে পাঠ করা হয়েছিল। এখন এর শেষাংশ পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত হলো। সমস্তটা পরিমার্জিত হলো। আড়াই বছর আগে "বেতার জগৎ" পত্রিকায় প্রকাশিত স্ক্রিপ্ট ( script ) আমার অনুমোদন পায়নি। অন্নদাশঙ্কর রায়

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

৩

যজ্ঞেশ্বর সবে খেতে বসেছে, এমন সময় হন্তদন্ত হ'য়ে প্রমীলা এসে আছাড় খেয়ে পড়লো —'বাবা, সর্ব্বোনাশ।'

'কী কী রে?' মুখের কাছে কলাপাতের ডাল দিয়ে মাখা প্রকাণ্ড গরসতোলা লোমশ হাতটি নামিয়ে সে উৎকণ্ঠিত হ'লো।

'পুলিশ! পুলিশ!'

'পুলিশ?'

'হ্যাঁ পুলিশ।'

'কোথায়?' প্রায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো যজ্ঞেশ্বর, 'তুই কার সঙ্গে এলি?'

'সব বলছি, ঘরে এসো।'

ভাত শুদ্ধু থালা তেমনি প'ড়ে রইলো। কোণের দিকে যেখানে যজ্ঞেশ্বর বেশী রাত্তিরে বসে হিশেব নিকেশ করে সেইখানে, সেই নিরিবিলিতে এসে দরজা ভেজিয়ে দিল বাপ আর মেয়ে।

শোবার ঘরের রুগ্নশয্যা থেকে উঠে বসলেন সুধাময়ী। মেয়ের গলার আতঙ্কিত আওয়াজ তাঁর কানে গেছে। চারদিকে তাকিয়ে কাউকেই দেখতে পেলেন না, অগত্যা ঝি'কেই দূরে দেখতে পেয়ে হাতছানি দিলেন। পারত পক্ষে এই স্ত্রীলোকটিকে তিনি কখনোই ডাকেন না। ছোট্ট ছোকরা আছে একটা, সে-ই আসে-পাশে ঘুরে বেড়ায়, ফুটফরমাস খাটে। কোথা থেকে বিনি মাইনেতে শুধু খোরাকি দিয়ে এটাকে সংগ্রহ ক'রে এনেছে যজ্ঞেশ্বর কে জানে। ছেলেটা ভালো, দুটি খেতে পেয়েই খুসীর তার অবধি নেই। সুধাময়ী লুকিয়ে-চুরিয়ে দু'চারটা পয়সা দেন বলে তাঁরই অনুগত বেশী। তাছাড়া সুধাময়ী ছাড়া আর কে তাকে এ বাড়িতে মিষ্টিমুখে কথা বলে? কিন্তু এই মুহূর্ত্তে তাকে তিনি দেখতে পেলেন না।

এই রাঁধুনির আগে, যতদিন অন্তত একটু হাঁটাচলাও করতে পেরেছেন সুধাময়ী ততদিন কোনোরকমে নিজেই চালিয়েছেন। বাড়িতে ঠাকুর চাকর রাখা পছন্দ করেনা যজ্ঞেশ্বর। কেবলমাত্র খরচের জন্যই নয়, সাবালক একটা পুরুষ সারাদিন ঘরে দুয়ারে হেঁটে বেড়ালে অন্তঃপুরের সম্ভ্রমহানি হয় বলে। অবিশ্যি দেখে শুনে ঝি এনে দিয়েছিলো একবার। স্ত্রীর শরীর এত খারাপ, একটা রান্নাবান্নার লোক না হ'লে কি চলে? ভালোই ছিলো মানুষটি, লজ্জানম্র অল্পবয়সী দুঃখী মেয়ে। আপন বলতে ত্রিসংসারে কেউ নেই তাই বাধ্য হ'য়েই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে খাটতে। স্বাস্থ্যের জৌলুষ ছিলো। কিন্তু কয়েকদিন পরেই কোন এক গভীর রাত্রে একটি অস্ফুট মুখচাপা আর্ত্তনাদ

ভেসে এলো তার ঘর থেকে। ঘুমভেঙে সুধাময়ী চমকে উঠ্‌লেন। অন্ধকারে বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে যজ্ঞেশ্বর ঘরে এলো ছায়ামূর্ত্তি হ'য়ে। সুধাময়ী দাঁতে দাঁত চেপে, চোখে হাত চেপে শক্ত হ'য়ে নিজেকে সামলালেন। ঘেন্নায় তার মুখ দিয়ে একটা শব্দও বেরুলো না। পরের দিন সকালে উঠে আর দেখা গেলোনা সেই ঝি'কে। ভয়ে ত্রাসে কত রাত্তিরে কোথায় পালিয়ে বেঁচেছে হতভাগিনী কে জানে। না কি আবার কোনো যজ্ঞেশ্বরের কবলে পড়েছে তাই বা কে জানে।

যত অমানুষই হোক্, তবু তো—মানুষ। যজ্ঞেশ্বরেরও একটু চক্ষুলজ্জা আছে বৈকি। তারপর থেকে আর ঝি আনবার কথা ওঠেনি কোনো। এসেছে এই ছোকরা। কিন্তু অবস্থা অচল হ'লে আর কী করা? সুধাময়ী শয্যা নিয়েছেন প্রায় ছ'মাস, রান্নার লোক না হ'লে চলে? অতএব এই পরিচারিকা। না, এরি ঘর থেকে চাপা গলা ভেসে আসে না। মাঝে মাঝে খুব খোলা গলায় খোলা ভাষাতেই নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে নেয় সে। ঘোরপ্যাঁচের দরকার কী?

সুধাময়ীর ঘরে বলতে গেলে সে আসেই না। খাবার দাবার সবই এই ছোকরা। তবু তো দরকার হয় মাঝে মাঝে? হয়ই।

'কেন?'

হাতছানিতে কাছে এসে দাঁড়ালো কুসুম।

'আমার মেয়ে, প্রমীলার গলা শুনতে পেলাম না।'

'হ্যাঁ!'

'কেন এসেছে? কী হয়েছে? কার সঙ্গে এলো?'

'অত খবর জানিনে মা, বলছে পুলিশ পুলিশ। তারপর তো ঐ। বাপের সঙ্গে দরজা বন্ধ ক'রে কী ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর করছে।'

কী আর করেন। তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা ক'রে রইলেন। কী অঘটন ঘটিয়ে এলো কে জানে? যতই করুক যা-ই করুক তবু তো দশমাস পেটে ধারণ ক'রেছিলেন? নিজের শরীর বিচ্ছিন্ন ক'রেই তো বার করেছিলেন এই শরীর। মায়া কাটাতে পারেন কই? মন থেকে যেমন নিঃশেষে স্বামীকে বাদ দিতে পারেন স্বামীর সন্তানকে তা পারেন না।

অনেক পরে মার ঘরে এসে দাঁড়ালো প্রমীলা। 'কী রে? কী হ'য়েছে রে?' স্তিমিত চোখের দৃষ্টি তার জ্বলজ্বলে হ'য়ে উঠ্‌লো।

'কী আবার হবে? তোমার গুণধর জামাই, মাগি নিয়ে আসবেন কিনা, তাই আর আমাকে পছন্দ হচ্ছে না!'

চুপ হ'য়ে গেলেন সুধাময়ী! কী অভদ্র! কী অশ্লীল!

'আমাকে চোর বলে হাজতে দেবে, দিক না। দেখি না একবার কত ক্ষেমতা, কে কাকে হাজতে দেয়—দেখিয়ে ছাড়বোনা মা-ব্যাটাকে। ঐ হারামজাদি কি সোজা নচ্ছার, ওইতো যত নাটের গোড়া।'



'ছি!'

'ছি আবার কী! কিছু বলিনা বলে তাই। কিন্তু সিধে আঙুলেতো ঘি ওঠে না। ভেবেছিলাম বুড়িকে—যা হোক দু বেলা দু'মুঠো দেবো ছড়িয়ে যদ্দিন না মরছে। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি মাগি দুই দুটো ষাঁড়ের মত ছেলে নিয়ে ঘাড়ে ব'সে খাচ্ছে আর পেত্নির মত রক্ত চুষছে, আমি তা সহ্য করবো? যদি আমি বাপের বেটি হই—যদি আমার মা অসতী না হয় তবে তুমি দেখে নিও মা, ওদের সব কটাকে আমি টিট বানিয়ে ছাড়বো। আর ঐ শাকচুন্নিমাগী, ঐ কেলে কিস্কিন্দি, ওদের সেই বোনের ননদটা শকুনি না গৃধিনী তাকেও আমি একবার দেখে নেবো। তলায় তলায় জল খাই, একাদশীর বাপেও জানে না। ভেবেছে টের পাইনা কিছু, ঠিক ভেতরে ভেতরে সাঁট আছে। তা নৈলে বিয়ের দিন আবার বিয়ে ভেঙে দেয় কেউ? জানি না? বুঝি না?'

মুখ বেঁকিয়ে, আঙুল মট্‌কে, দাঁত ঘষে, একেবারে উথাল-পাথাল করতে লাগলো প্রমীলা। তারপর রাগ শান্ত হ'লে বাপের সঙ্গে খেতে বসলো গিয়ে।

৪

পুলিশ এলো সন্ধ্যায়। বাড়ি সার্চ ক'রে কিছুই পাওয়া গেলোনা। যজ্ঞেশ্বর লাফাতে লাগলো টাট্টু ঘোড়ার মতো। এই অপমানের সে শোধ নেবে, মানহানি আনবে সে জামায়ের নামে, সব ঘোট, সব নষ্টামি ভেঙে দেবে সে কোর্টে। পুলিশের ভদ্রলোকেরা তার চিৎকারে আস্ফালনে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে চলে গেল আর অশ্লীল কথার খই ফুটতে লাগলো যজ্ঞেশ্বরের মুখে।

কী যে হ'লো ব্যাপারটা ভালো ক'রে কিছুই বুঝতে পারলেন না সুধাময়ী। স্বামীর গলার জোরে, মেয়ের দাঁত নিষ্পেষণে, পুলিশের খানাতল্লাসিতে সব মিলিয়ে তাঁর শরীর যেন অবসন্ন হ'য়ে এলো; মন অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লো। জনে জনে জিজ্ঞাসা ক'রে ধমকই খেলেন শুধু। কিন্তু বুঝলেন সব রাত্তিরে। খাওয়াদাওয়ার পরে যখন যজ্ঞেশ্বর নিজের ঘরে শুতে না গিয়ে মেয়ে নিয়ে তার ঘরে এসে অতি সন্তর্পণে দরজাজানালা বন্ধ করলো।

দরজাজানালা বন্ধ ক'রে মাদুর বিছিয়ে তাঁর ঘরের মেঝেতে এসেই বসলো ওরা। তারপর আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো কোথা থেকে ধনরত্ন এনে ছড়িয়ে দিল মেঝেতে। তাকিয়ে হাঁ হ'য়ে গেলেন সুধাময়ী।

যজ্ঞেশ্বর বললো, 'রাতারাতি সব সোনা গলিয়ে ফেলে ইট ক'রে রাখাই ভালো। কী বলিস!' প্রমীলা বললো 'না।' যজ্ঞেশ্বর বললো, 'এত গয়না, এ সব তুই এখন রাখবি কোথায়? একবার যখন কথা উঠেছে—একদিন শেষে সর্বনাশ হবে।'

'আমি ঠিক রাখবো, কিন্তু সোনা আমি গলাবোনা।'

'গলাবি না তো মর, বুকে চেপে রেখে। ভালো বুদ্ধিতো কানে যায় না, মনে লাগে না। আজ যদি মাল শুদ্ধ ধরাই পড়তিস কী হ'তো তবে? ভাগ্যিস্ সরাতে পেরেছিলাম! শুধু সোনা হ'লেতো আর সে ভয় থাকে না।'

'তা হোক।'

'তা হ'লে এসব আমি আমার বাড়িতে রেখে বিপদ ডেকে আনতে পারবো না।'

'আমি নিজেই রাখবো।'

'তুই কোথায় রাখবি?'

'সে আমার জায়গা আছে।'

'হ্যাঁহ্? জায়গা আছে!' যজ্ঞেশ্বর অসাহফু হ'য়ে খিঁচিয়ে উঠ্লো, 'বড়ো ওস্তাদ হ'য়েছিস্!'

'আমি এসব নিয়েই যাবো এবার। সব মিলিয়ে আমার সাতান্নটা গয়না আছে। তিনশো ষাট ভরি সো'না, আর একশো টাকার নোটে দশ খানা ক'রে ক'রে বাইশটা ব্যাণ্ডল—দেখি—' প্রমীলা দু'হাতে সাপটে সব কোলের কাছে টেনে নিয়ে, গুণতে লাগলো। লোভে আর উত্তেজনায় চোখের দৃষ্টি তার বীভৎস হ'য়ে উঠ্লো, হাত কাঁপতে লাগলো।

একটানে সব কেড়ে আনলো যজ্ঞেশ্বর—'আবার গুণছেন দেখ না, কেন তোরটা কি আমি চুরি করেছি না বাটপাড়ি করেছি যে গুণে-গুণে মিলোচ্ছিস? ক'খানা গয়না, কত ভরি সোনা,—ক'ব্যাণ্ডিল টাকা—এতো হিশেব নিকেশের দরকারটা কী শুনি?'

'এত—এত গয়না কার?' সুধাময়ীর চোখের কোটর থেকে ডিম দু'টো যেন বেরিয়ে এলো: 'তোমরা কার সর্বনাশ করেছ? ছি, ছি, ছি! শেষে কি তোমরা এসবও আরম্ভ করলে? তোমরা এত ছোটলোক এত হীন'—বুকের শ্বাস তার ঝড়ের মতো দ্রুত হ'লো, 'হাজার হোক ভদ্রলোকতো, ভদ্রলোকের সন্তানতো। ছি ছি—'

'চুপ।' যজ্ঞেশ্বরের চাপাগর্জনে ঘরের দেয়াল কেঁপে উঠলো। সুধাময়ী চমকালেন, কিন্তু থামলেন না, উঠে বসলেন। দুটি জীর্ণ হাত ওর বালিশে রেখে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, 'না, না, আমার চোখের সামনে এ সব আমি হ'তে দেবোনা। কিছুতেই দেবোনা, অনেক, অনেক সহ্য করেছি আমি, উপায় নেই ব'লেই সহ্য করেছি—কিন্তু আজ আমি বুঝেছি, তুমি শুধু লম্পটই নও, মিথ্যাবাদীই নও, লগ্নিকারবারে পরের সর্বস্ব অপহরণ করেই ক্ষান্ত নও, তুমি একটা দুর্দর্ষ ডাকাত, তুমি চোর! কার সর্বনাশ করেছ বল। নইলে আমিই পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেব তোমাদের। নিশ্চয়ই ধরিয়ে দেব। আর তুই—তুই একটা স্ত্রীলোক হ'য়ে, আমার মেয়ে হ'য়ে শেষে এই হলি? তুই ম'রে যা, ম'রে যা—' গলা চিরে গেল সুধাময়ীর, যজ্ঞেশ্বর সহসা উঠে এসে তার মুখ চেপে ধরলো প্রাণপণ শক্তিতে। প্রমীলা ভুরু কুঁচকে চন্দনকাঠের বাকসের মধ্যে একখানা একখানা ক'রে গুণে গুণে তুলতে লাগলো গয়নাপত্র।

মূর্ছা গেলেন সুধাময়ী। শরীরে কী আছে তাঁর। কিসের জোরে লড়াই করবেন এতবড় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, কতটুকু তাঁর ক্ষমতা? তিনি চোখ বুজে প'ড়ে রইলেন বিছানায়, হাত ঝেড়ে যজ্ঞেশ্বর আবার এসে বসলো: 'শোন, এসব নিয়ে এখন তোকে মাথা ঘামাতে হবেনা। ও থাক আমার কাছে আমি গালিয়ে টালিয়ে ঠিক ক'রে রেখে দেব। তুই কাল সকালেই চ'লে যা ওখানে, তারপর হালচাল বুঝে—'

'না আমি গালাবোনা।' প্রমীলার স্বর দৃঢ়।

প্রমীলা তার সহজাত কূটবুদ্ধি দিয়ে কেমন ক'রে জানি বুঝে ফেলেছে এই সোনা গালানে



তার আদ্ধেকই উড়ে যাবে কোথায়, আর তা সে ফিরে পাবে না। বাপকে সে যতই ভালোবাসুক কিন্তু বিশ্বাস ত করতে পারে না।

এ নিয়ে ঝগড়া হ'লো খানিকক্ষণ। তারপর রফা হ'লো গালানোতেই, কেননা এত গয়না নিয়ে হজম করা যে সত্যিই অত্যন্ত কঠিন কাজ সেটা প্রমীলা বুঝতে পারলো শেষ পর্যন্ত।

'আর টাকা?'

'টাকা আছে ব্যাঙ্কে।'

যজ্ঞেশ্বর শুতে যাবার আগে একটু রসিকতা করলেন মেয়ের সঙ্গে, 'তুইতো এখন আমার চেয়েও বড়ো মহাজন। লক্ষ টাকার গয়না, বাইশ হাজার টাকা নগদ। বুড়ি কম নয় অ্যাঁ? চুরি ক'রে ক'রে কম জমায়নি মাগী!'

'জমাবেনা। ছেলের টাকাগুলোতো সবই বোঁচকা মেরেছে।' মুখ ঝামটা দিয়ে গায়ের আঁচল সমান করলো প্রমীলা—'আবার আমাকেই চোর ব'লে ধরিয়ে দিতে চায়। দেখোনা, কী শোধ তুলি আমি!'

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'লো না, কোনো আশাই পূর্ণ হ'লো না সুনির্মলের। জিনিশ পাওয়া গেলোনা, কেস উঠ্লোনা, চোর ব'লে স্ত্রীকে বর্জন করার কোনোই প্রশ্ন রইলোনা আইনের খাতায়। মাঝখান থেকে উকিলের পাল্লায় প'ড়ে কিছু অর্থদণ্ড আর প্রচুর দুর্নাম লাভ হ'লো শুধু। ব্যাপারটা চাপা দিতে চেষ্টা করেছিলেন হিরণ্ময়ী, কিন্তু এ-কান থেকে ও-কান এ-মুখ থেকে ও-মুখ হ'তে-হ'তে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমন কি প্রত্যেকটি চেনামানুষ পর্যন্ত জেনে ফেললো ঘটনাটি। আর সঙ্গে সঙ্গে একবাক্যে ছি-ছি ক'রে উঠলো সবাই। স্ত্রীকে যে লোক মিথ্যে মামলা সাজিয়ে চোর ব'লে হাজতে দেবার চেষ্টা করে সে যে একটা কী মানুষ সে কথা ভেবে ফেলতে একলহমা দেরি হ'লো না কারো। ঠাট্টায়, বিদ্রূপে, নিন্দায়, গালাগালিতে তৎক্ষণাৎ মুখর হ'য়ে উঠলো সব। সুনির্মলের বাড়ি থেকে বেরুনো প্রায় অসম্ভব হ'লো।

ভাঙা ঝরঝরে গাড়ি নিয়ে যজ্ঞেশ্বর দু'দিন পর্যন্ত অবিশ্রান্ত ঘুরে ঘুরে জামায়ের কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা ক'রে অশ্রুমোচন ক'রে এলেন চেনাশুনো, আত্মীয় অনাত্মীয় সকলের বাড়ি-বাড়ি। সুনির্মলের এতদিনকার সব সুনাম খড়ির দাগের মতো মুছে গেল। যারা এতদিন মুখের সামনে হিরণ্ময়ী আর তার ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো, আর অন্তরে হিংসায় জ্বলছিল, তারা বাড়ি ব'য়ে ঘুরিয়ে পাঁচকথা শুনিয়ে দিয়ে গেল; যারা সত্যিই ভালোবাসতো তারা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলো, মানুষ এমনও হয়? যারা ভালো ক'রে চিনতোনা তারা না-দেখেও বুঝে নিল লোক কেমন।

হিরণ্ময়ী লজ্জায়, দুঃখে প্রায় শয্যা নিলেন। অভি বললো, 'ধুত্তোরি এ-বাড়িতে ভদ্দরলোক থাকতে পারে?' অতএব পড়া ছেড়ে কোথায় এক চাকরির জোগাড়ে চ'লে গেলো কার সঙ্গে। সীমন্ত

মনে মনে ভাবলো, মাত্র কয়েকটা মাস, কোনো রকমে আই. এ. টা পাশ ক'রে নিই। আর সুনির্মল! তার কথা থাক।

একটা মিটমাট না-হওয়া পর্যন্ত কয়েকটা দিন দমদমেই রইলো প্রমীলা, তারপর সময় বুঝে, সুযোগ বুঝে আবার এসে হাজির হ'লো সদম্ভে। পাড়ার মেয়েরা বললো, 'ধন্য বৌ, এরপরেও আবার স্বামীর ঘর করতে এসেছে; আমরা হ'লে অমন স্বামীর মুখ দেখতাম না।' আত্মীয়রা মুখ বেঁকিয়ে ঝংকার দিল 'শুধু কি সোয়ামিটাই বদ্, শাশুড়িটাও কম না, জানিনা ওদের কেচ্ছা? সেই বিনুর ননদটাকে নিয়ে কি কম কীর্ত্তি করলো? মেয়েটার নামে টাকা রেখে গেছে বুঝি কিছু ওর বাপ ওর বিয়ের জন্য, সেই কটা টাকার লোভেই তো এত। ছি-ছি! এদিকে এই বৌটার বাপকেও তো মুচড়ে-মুচড়ে নিতে কম নেয়নি?'

ভদ্রলোকেরা বললেন, 'মহিলার স্বামীর নামে মানহানি আনা উচিত ছিলো। এই জন্যেই তো এই বাঙ্গালি মেয়েগুলোর এই দশা। আত্মসম্মান বলে তো কোনো পদার্থ নেই।' কয়েকদিন পর্যন্ত পাড়ায় এ ছাড়া কোনো কথাই রইলো না, কোন আলোচনাই হ'লো না। অল্পবয়সী ছেলেরা ঘোঁট পাকালো, আবার যদি লোকটা স্ত্রীকে কোনো অপমান বা অসম্মান করে তা হ'লে কিঞ্চিৎ উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থাই করতে হবে।

সকলের এরকম একটা সহযোগিতার ইন্ধন পেয়ে প্রমীলা আরো দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবার অবকাশ পেলো। কড়ায় ক্রান্তিতে সে আদায় করে নিতে লাগলো আপন কর্তৃত্ব আর অন্যের নির্যাস। সাধ্য কি আর তাকে কেউ কিছু বলে।

২

এইরকম একটা খাঁচায়পোরা ইঁদুরের মতো দিন কাটাতে কাটাতে সুনির্মল হঠাৎ একদিন দমকা হাওয়ার মতো একটি চিঠি পেলো শকুন্তলার কাছ থেকে। মানুষের বুদ্ধি আর হৃদয় যে বেশির ভাগ সময়েই বিপরীতগামী সে-কথাই বারে-বারে বোঝাতে চেয়েছে সে। তাই চিঠি না-লিখে পারলো না। সেখানে, সেই নির্জনে, স্বজন-বিরহিত পাটনা শহরের সেই প্রান্তরে, বকুলতলার ছোট্ট কোয়ার্টরের অন্তরে ব'সে একটু খানি কুশল-সংবাদের প্রার্থনা করেছে সে সুনির্মলের কাছে। বড়ো ছোটো প্রার্থনা। বড়ো ভীরু।

জ্বরতপ্ত কপালে স্নেহভরা শীতল হাতের ছোঁয়ার মতো মিষ্টি সেই চিঠিটুকু। সুনির্মল পড়লো, পড়া শেষ হ'লে একাগ্র চোখে তাকিয়ে রইলো অক্ষরগুলোর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে হাত বুলোলো লেফাপার এ-পিঠ ও-পিঠ। এক চিঠির জবাবে হাজার-হাজার চিঠি রচনা করলো কোটি-কোটি কথার মিছিল সাজিয়ে, তবু শেষ হ'লোনা কথা। সব তবু বলা হ'লো কই?

কিন্তু সবই মনে-মনে। লক্ষ ইচ্ছেতেও কাগজের বুকে কলম ছোঁয়ালোনা সে। কী লাভ! যে-আগুন সে নেবাতে পারবেনা, সে-আগুন সে জ্বালবে কোন যুক্তিতে? নিজে পুড়ছে বলে কি প্রিয়তমাকেও পোড়াতে পারে? জীবনে সে যা পেলো না, পেতে পারলো না, সেই ব্যর্থতা কেন আরেক জনের বুকে ঢেলে দেবে? তার চেয়ে থাক, এই থাক, এই স্মৃতিটুকুই অক্ষয় হ'য়ে থাক, সে



ছিলো, কখনো ছিলো, হৃদয়ের সবটুকু মাধুর্য নিয়ে সে একদিন ছিলো তার মনের মধ্যে। তারপর কালের প্রলেপে সবই তো ধুয়ে যাবে একদিন। একদিন নিশ্চয়ই শকুন্তলা ভুলে যাবে তাকে, মেঘ কেটে গিয়ে স্নিগ্ধ রোদে ভ'রে যাবে তার মনের আকাশ, আবার কুঁড়ি ধরবে, ফুল ফুটবে, শকুন্তলা সুখী হবে।

কয়েকটা দিন একেবারে একটা মোহের মতো আচ্ছন্ন হ'য়ে কাটালো সুনির্মল ঐ চিঠিটি নিয়ে। কত কিছু ভাবলো, কত কিছু ভাবলোনা। নিজের একলা নিঃসঙ্গ নির্ঘুম রাত্রে তারার দিকে তাকিয়ে রইলো আকাশে! আপিশের ফাইল ঠেলে রেখে চোখের তলায় পেতে রাখলো সেই ছাইরঙ্গা একফালি কাগজের টুকরো। তারপর মন আবার আস্তে-আস্তে ভ'রে গেল মেঘে, বর্ষণহীন চাপা গুমোটে যখন দম বন্ধ হ'য়ে এলো, মনে হ'লো থাক মা, থাক প'ড়ে নাবালক ভাই সমাজ সংসার লজ্জা সম্ভ্রম চাকরি সব প'ড়ে থাক পেছনে, আমাকে বাঁচতেই হবে, যেতেই হবে আমাকে সেখানে, যেখানে আমি তাকে পাব, যেখানে এরকম তিলে তিলে মরতে হবে না নিঃশ্বাসবন্ধ হ'য়ে, মাসের শেষে যেখানে প্রত্যেকটি পাই তুলে দিতে হবেনা স্ত্রীর হাতে, ফিরতে হবেনা বাড়িতে, ঘুমুতে হবে না মেয়েলি গন্ধে ভরা গা-ঘিনঘিন করা চার দেয়ালের ফোকরে! ঠিক এমনি দিনে আরেক খানা চিঠি এলো তার কাছে, প্রমীলার মা সুধাময়ী লিখেছেন।

৩

সুধাময়ী! তার শাশুড়ি? প্রমীলার মা। এই জগৎসংসারে যে এইরকম একটি মানুষের কোনো অস্তিত্ব আছে এমন অদ্ভুত কথাইতো কোনোদিন মনে হয়নি সুনির্মলের। ধূ-ধূ স্মৃতির মতো রোগা ছোট্ট একজন মহিলাকে মনে পড়লো তার, আধো ঘোমটা ঢাকা সকরুণ-একখানা মুখ। সেই বিয়ের সময় দেখেছিলো। ভদ্রমহিলা দু' ছত্র ভরা কেবল একটি সকাতর কাকুতি জানিয়েছেন, একবার যেন সুনির্মল দেখা দেয় তাঁকে। তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, তাঁর এই অন্তিম ইচ্ছেটুকু যেন পালন করে সে। পরিষ্কার শিক্ষিত হাতের লেখা,—বলবার ভঙ্গিটি আন্তরিক আর সহজ। চিঠির তলায় পুনশ্চ দিয়ে যাবার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় লেখা আছে। লেখা আছে সেই দিন সেই সময় তিনি একা থাকবেন। জামাইয়ের সঙ্গে বলতে গেলে এই প্রথম (হয়তো এই শেষ) দেখাকে তিনি অন্য মানুষের উপস্থিতিতে ঘোলাটে করতে চাননা।

চিঠিটি অপ্রত্যাশিত। চিঠির ভাষাও তাই। সুনির্মল একটু অবাক হ'লো। দু'য়ে-দু'য়ে যে চার, একথাটা যেন ঠিক মিললোনা। শকুন্তলার চিঠি বুক-পকেটে রেখে এই চিঠিটির দিকেই এবার সে তাকালো মনোযোগের সঙ্গে।

সব আদর্শ, সব বিবেক, ভেসে যাচ্ছিল তার। ক'দিন ধরে মনে-মনে পাটনা যাবার একটা অদম্য ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই করছিলো সে। তার বদলে দমদম যাবার কথাটাই এবার সে চিন্তা করলো। ওটা তার যাবার জায়গা নয়, ওখানকার হাওয়া তার নিঃশ্বাসরোধী। তবু কেমন একটা কৌতূহল বোধ করলো, মনে হ'লো এমানুষটার কথা একবার শোনা দরকার, কেননা এঁর জীবনের সঙ্গে হয়তো তার জীবনের খানিকটা সাদৃশ্য থাকলেও থাকতে পারে। সে যেমন প্রমীলার স্বামী, তিনি ও তো

তেমনি যজ্ঞেশ্বরের স্ত্রী। নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে কার না কৌতূহল হয়? তাছাড়া মুমূর্ষু মানুষের অন্তিম বাসনা, সেটাকে অবহেলা করতেও মনে মনে কোথায় আঘাত লাগলো।

তবু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হ'তো কিনা কে জানে, কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখে নির্দিষ্ট সময়ে আরেকখানা চিঠি নিয়ে একটি ছেলে এসে দেখা করলো আপিসে। জামাইকে গাড়ি ক'রে নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছেন সুধাময়ী। হয়তো ধরে নিয়ে যেতে। চিঠিতে আরেকপ্রস্থ মিনতি। ছেলেটি বিনীত, কাঁচাবয়সের লাবণ্যে ভরা মুখশ্রী, প্রমীলার পিসতুতো ভাই রাখাল।

গাড়িতে ব'সে অতিশয় সংকোচের সঙ্গে অল্প-অল্প আলাপ করলো সে সুনির্মলের সঙ্গে। আই. এ. পাশ করেছে অতি কষ্ট ক'রে। একটি চাকরি চায়। মামী, অর্থাৎ প্রমীলার মা ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। কিন্তু মামী আর কী করতে পারেন? কতটুকু ক্ষমতা আছে তাঁর হাতে। বাজারের পয়সাটি পর্যন্ত মামা গুনে দেন। তার উপরে তাকে তো মামার মেয়ে প্রমীলা কবেই তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে। তবু সে লুকিয়ে-লুকিয়ে মামীকে দেখতেই আসে এ বাড়ি, তার যেমন মামী ছাড়া কেউ নেই, মামীরও তেমনি সে ছাড়া আর কে আছে?

চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সব শুনলো সুনির্মল।

৪

দাঁত-বার করা বিশ্রী বাড়ি, ঢুকতে ঘেন্না করে। একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত অসংখ্য ভাড়াটে; বোধহয় প্রত্যেক ঘরে ঘরে আলাদা লোক। কলরবে কানপাতা দায়। দোতলার পেছনের অংশে তাকে নিয়ে এলো রাখাল। কী কাজে যজ্ঞেশ্বর কলকাতার বাইরে গেছে দু'দিনের জন্য, সেই সুযোগে সুধাময়ী ডেকে পাঠিয়েছেন জামাইকে।

ভাদ্রের দুপুর, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছিলো বাইরে, অথচ রোদের ঝিলিকও ছিলো। বাইরে দিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় পৌঁছতে-পৌঁছতে সুনির্মলের শার্টে জলের ছাঁট লাগলো। মনে-মনে বিরক্ত বোধ করলো সে। কেন এলো, কেন এমন একটা দুর্বলতা হ'লো তার সে-কথা ভেবে যেন রাগ হ'চ্ছিল নিজের উপর। রাখাল মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কথা পাঠ করলো কিনা কে জানে, লম্বা বারান্দা পার হ'তে-হ'তে করুণমুখে বললো, 'এই যে, এইতো ঘর। ঈস্! আপনি ভিজে গেলেন, কত কষ্ট হ'লো আপনার।'

ঘর-জোড়া প্রকাণ্ড উঁচু খাটের উপরে একপাশে একটি ছোটো বিছানায় চুপচাপ শুয়েছিলেন সুধাময়ী। লম্বালম্বি আদ্ধেক খাট জুড়ে সারি-সারি ঢাকনা-পরানো ট্রাঙ্ক সাজানো। তার উপর চাদর ঢাকা স্তূপ-করা বিছানাবালিশ। মাথার কাছে ছোটো লোহার সিন্দুক আলমারি, গায়ে গণেশের মূর্ত্তি, তার উপরে সিঁদুরের ছাপ। মেঝেতে খাটের সামনে একফালি জায়গা, দেয়াল ঘেঁষে সেখানেও জিনিশের অভাব নেই। তারই মধ্যে সুধাময়ী দু'খানা চেয়ার এনে পাতিয়ে রেখেছিলেন, পায়ের শব্দে হাতের ভরে মাথা রেখে আকুল চোখে পাশ ফিরে তাকালেন। জামাইর মুখের উপর চোখ রেখে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হ'য়ে উঠ্‌লো। স্নেহে ভরে উঠ্‌লেন তিনি। আহা! কী



সুন্দর ছেলে। এই তার জামাই? এমন তাঁর ভাগ্য? পাড়-ওঠা মোটা শাড়িটির আঁচল মাথায় তুলে দিয়ে আকুল গলায় বললেন, 'এসেছো?'

সুনির্মল লক্ষ্য করলো ভদ্রমহিলার কপালে বা সিঁথিতে যেমন এক ছিটে সিঁদুর নেই, মুখেও তেমনি একবিন্দু রক্ত নেই।

সিঁদুর ছেড়েছেন সুধাময়ী বহুকাল। আয়নায় মুখ দেখে, চিরুণি দিয়ে মাথা আঁচড়ে সযত্নে সিঁদুর এঁকে দেবেন সিঁথিতে এবাসনা তার বহুকাল আগেই শেষ হয়েছে। ভাবতে পর্যন্ত ভালো লাগেনা। স্বামীকে অস্বীকার করবার, নিজের অপমানিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত জীবনের উপর একটা প্রতিশোধ নেবার এই হয়তো এক দুর্বল চেষ্টা। তা ছাড়া আর কী-ই-বা তিনি করতে পারেন। কাপড় দিয়ে নাকের তলা থেকে মুখের বাকি অংশটুকু ঢেকে আবার বললেন: 'সকাল থেকে আমি এই বিকেলের আশায় আছি।'

'সেজন্য আমাকেই তোমার প্রশংসা করা উচিত মামী, আমি না গেলে বুঝি আসতেন!

'আসতে না?' হাসিমাখা করুণ চোখ মেলে দিলেন সুধাময়ী, কেমন একটা মমতায় ভ'রে গেল সুনির্মলের মন। এতক্ষণকার বিরক্তি মুছে ফেলে মৃদু হেসে বললো, 'আসতাম বইকি।' সুনির্মল বসলো। আর বসতেই সুধাময়ী লক্ষ্য করলেন তার শার্ট ভেজা-ভেজা, শাদা ধবধবে জিনের প্যাণ্টে ছিট-ছিট জল। অস্থির হ'য়ে উঠলেন, 'ভিজেছ? বৃষ্টি নাকি বাইরে? তবে কী হবে? এই ভেজা জামা গায়ে দিয়ে—'

সুনির্মল বাধা দিলো—'ও কিছু না। আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এখুনি শুকিয়ে যাবে।'

'জামাটা খুলে রাখোনা, শুকুলে শেষে—'

'না না কিছু হবেনা।' সুনির্মল ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো।

সুধাময়ী বললেন 'আমার ভাগ্যই এরকম। যাওবা এলে, ভিজে-পুড়ে কষ্ট পেয়ে—'

'কী আশ্চর্য। সামান্য বিষয়ে আপনি অত অস্থির হচ্ছেন? এইটুকু জল, টোকা দিলেই ঝ'রে যাবে।'

একটু চুপ করে রইলেন সুধাময়ী—তারপর বললেন, 'কতদিন ভেবেছি যদি তুমি একবার আসতে, চোখ ভ'রে দেখে নিতাম। কতবার মনে-মনে বলেছি চিঠি লিখি, কিন্তু—'

'লিখলেই পারতেন।'

'কী লিখবো, কোন লজ্জায় লিখবো? কী তোমাকে আমি দিয়েছি যা নিয়ে এখানে, এই বাড়িতে আদর ক'রে ডাকবো তোমাকে।' বলতে বলতে যেন কান্না নেমে এলো গলায়, 'কিন্তু আমার আর সময় নেই, এতদিনের চেষ্টায় আয়ুটাকে বোধহয় ফুরোতে পেরেছি। তাই ভাবলাম এই বেলা যা বলবার ব'লে নি, যা দেখবার দেখে নি। ভারি ইচ্ছে করলো একবার তোমাকে শেষ দেখা দেখি।'

সুনির্মল চুপ ক'রে রইলো।

'তবু তোমাকে আমি আজ এমনি এমনিই ডাকিনি। একটা বিশেষ কথা বলবার জন্যই আসতে বলেছি।' ক্লান্ত চোখ একটু সময়ের জন্য বুজে ফেললেন সুধাময়ী, নিশ্বাসকে বিশ্রাম দিলেন। তারপর মৃদু হেসে আবার বললেন, 'ভাখো, পূর্বজন্মে আমি দেখতে ভালো ছিলুমনা, বাপও ছিলো নিতান্ত দরিদ্র। কাজেই এক দরিদ্রের সংসার থেকে আরেক দরিদ্রের সংসারে গিয়ে পড়লুম। স্বামী ছিলেন

কালোকুলো খারাপ দেখতে, মোটাসোটা ভালোমানুষ। টোলে পণ্ডিতি করতেন, মাসের আদ্ধেক না-কাটতেই টান পড়তো ভাতে। ভালো লাগতো না, বলতুম বুদ্ধি ফিকির খাটিয়ে উপার্জনের চেষ্টা করো, নাকে তেল দিয়ে কেবল টোল আর বাড়ি, বাড়ি আর টোল করলে কি পেট চলে?' ভারি রাগ হ'তো, দুঃখ হ'তো, মনে-মনে ভাবতুম 'আর জন্মে ম'রে যেন চেহারাটা একটু সুন্দর পাই, যেন একটু বিত্তবান বাপের ঘরে জন্মাই। তা হ'লেই কপালে এমন পোড়া হাঁড়ির মতো রং আর অলস স্বামীর বদলে একজন কর্মঠ মানুষ জুটবে, আর মানুষটার ঘরে মুঠোভরা ভাত কাপড়েরও অভাব হবেনা। বন্ধ্যা ছিলুম ব'লে সন্তানের আকাঙ্ক্ষাও বড়ো কম ছিলোনা। ঈশ্বর আমার নিঃশব্দে মনোবাসনা সব শুনতে পেলেন। তারপর জন্মান্তর ঘটিয়ে এই জন্মে নিয়ে এসে অক্ষরে-অক্ষরে সব পাইয়ে দিলেন। আমিতো শান্তি চাইনি, তাই শান্তিকে একেবারে দূর ক'রে দিলেন জীবন থেকে,'—

'মামী, তুমি কিন্তু বড়ো বেশি কথা বলছো।' তার শান্ত সুস্থির স্বল্পবাক্ মামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রাখাল অবাক হ'য়ে গেলো। সুধাময়ী রাখালের মুখের দিকে তাকালেন, 'ডাক্তারি করছিস? তার চেয়ে যা, রান্নাঘরে গিয়ে ওর জন্য একটু চায়ের জোগাড় ক'রে নিয়ে আয়।'

রাখাল চলে যেতে একটু চুপচাপ থেকে সুনির্মল বললো, 'আপনার অসুখ কদ্দিন?'

'ঠিক বিছানায় পড়েছি মাস ছয়েক, কিন্তু অসুখ আমার অনেক দিনের।'

'কী অসুখ?'

'যদি শরীরের অসুখের কথা জিজ্ঞেস করো তা হ'লে আমি তা বলতে পারবোনা, তা বলা যায়না। আর মনের অসুখের কথা আমি না-বললেও আর কেউ না বুঝুক তুমিতো বুঝবে। সে-কষ্ট যে কী কষ্ট তা হয়তো তুমিও—'

সুনির্মল শাশুড়ির মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইলো। শাদা কাগজের মতো মিশে আছেন বিছানার সঙ্গে, সারা শরীর চাদরে ঢাকা, ছোট্ট মুখের আদ্ধেকটুকুই মাত্র বেরিয়ে আছে তার তলা থেকে। নিঃশ্বাসের দ্রুত ওঠাপড়ায় বুকের সাদা চাদরটা নড়ছে।

'কিন্তু আসল কথা শোনো!' গর্তে বসা দু'টো চোখ বড় বড় দেখালো সুধাময়ীর। একটু থামলেন। বোঝা গেল কথাটা বলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। হঠাৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলের মধ্যে—'তোমার মার গয়নার বাকসো এ বাড়িতেই আছে। এই লোহার সিন্দুকেই আছে। যদি বা গয়না না থাকে তা হ'লে তার সোনা আছে। আমার দুর্বৃত্ত স্বামী আর তারই যোগ্য মেয়ে দু'জনে মিলে এই কাণ্ড করেছে!' সুধময়ী রুদ্ধস্বরে কেঁদে উঠ্লেন, 'এরপরেও তুমি জিজ্ঞেস্ করবে আমার কী অসুখ? বাবা, জীবন ভ'রে যত দুঃখ ওরা দিয়েছে এই লজ্জার তুলনায় তা কিছুই নয়।'

সুনির্মল স্তম্ভিত হ'লো।

'যেদিন জেনেছি সেদিন থেকেই চেষ্টা করছি তোমাকে খবর দিতে, পেরে উঠিনি। কেমন ক'রে দেব? আর দিলেই বা কী হবে? ওরা এই সিন্দুক যক্ষের মতো আগলে রাখে। আমার মেয়ে একদিন দু'দিন বাদে বাদেই এসে দেখে যায়। আমি পড়ে থাকি চুপচাপ মরার মতো। সাধ্য কী কথা বলি! তারপর উনি কাল কোথায় গেলেন দুদিনের জন্য ব্যবসার কাজে। সেই থেকে সারাদিন আমি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় সিন্দুকের চাবিটা খুঁজেছি, এই ছাখো—'



বালিসের তলা হাত্ড়ে একটি প্রকাণ্ড চাবি বের করলেন তিনি, চাদরের তলা থেকে নিজের হাতটিও প্রসারিত করলেন জামাইয়ের দিকে। সুনির্মল চাবিটা দেখলো না, হাতটা দেখলো। কনুই থেকে হাতের পাতা পর্যন্ত নগ্ন অংশটি শুকনো শুকনো ঘায়ে খসখসে। জামাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে হাতটি ঢেকে ফেললেন, তাঁর ঘোলাটে-ঘোলাটে চোখের কোল বেয়ে দুই ধারা জল কানের পাশের চুলে গিয়ে মিশলো। একটু দম নিলেন।

'আমার সাধ্য নেই এই চাবি দিয়ে ঐ সিন্দুক খুলে তার অন্ধকার থেকে কিছু বার করি।

উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসবার চেষ্টা ক'রে ফিস্ফিসিয়ে বললেন, 'দরজা বন্ধ ক'রে দাও, দরজা বন্ধ ক'রে দাও। একটা ঝি আছে এ-বাড়িতে সে কিন্তু বড় ভীষণ। তাকে আমি ফাঁকি দিয়ে বাইরে অন্য কাজে পাঠিয়েছি, যদি এসে পড়ে।'

চাবিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো সুনির্মল। একটা হিংস্র অনুভূতিতে জ্বালা ক'রে উঠ্লো বুকের ভেতরটা।

'খোলো, শিগ্গির খোলো, খুলে সব, সব নিয়ে যাও। বিধবার সর্বস্ব ওরা চুরি করেছে, দাও পুলিশে খবর দাও, আমি, এই আমি মরতে মরতে সাক্ষী দেব ওদের বিরুদ্ধে—' সুধাময়ী জোরে-জোরে হাঁপালেন—'আর শোনো, ওর মধ্যে রাখালেরও কিছু সম্পত্তি আছে, যদি খুলতে পারো তাহ'লে ওর মায়ের গয়নাগুলোও আছে কি না সেটা ওকে দেখতে দিয়ো—'

দরজা ঠেলে রাখাল ঢুকলো ঘরে। এক হাতে চা, আরেক হাতে প্লেটে ভর্তি খাবার।

'দরজা বন্ধ ক'রে দে, দরজা বন্ধ করে দে—' ত্রাসে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, ব্যাকুল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে বললেন সুধাময়ী, 'নাও বাবা, তুমি আর দেরি কোরোনা, তাড়াতাড়ি করো, তাড়াতাড়ি করো।'

অদ্ভুত একটা উত্তেজনায় সুনির্মলের ভেতরটাও কেঁপে কেঁপে উঠছিল। যন্ত্র চালিতের মতো এগিয়ে গেল সিন্দুকের কাছে, আর সুধাময়ী ওখানে ব'সে ব'সেই চাবি ঢোকাবার কৌশলটা ব'লে দিতে লাগলেন। ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলো রাখাল, মনে হ'লো কোনো ডিটেকটিভ উপন্যাসের একটি পাতায় চোখ আটকে আছে তার। পেছনে আধ খোলা দরজার শাড়িকাটা ময়লা পুরোনো পর্দা হেলতে লাগলো বাতাসে।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

বাড়িঘরের সেদিন সংস্কার করলো প্রমীলা। ভাঁড়ার ঘরের জিনিশপত্র কিছু এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখলো, কিছু জড়ো ক'রে রাখলো ঐ ঘরেরই কোনে একটা টুল পেতে, তারপর উঠোনে ফেলে রাখা তক্তপোষটা এনে পেতে দিল সেখানে। একতলার সামনের ঘর আর হিরণ্ময়ীর ঘরটির জন্য মনে-মনে ভাড়াটে ঠিক করেছিলো সে। একশো তিরিশ টাকা দিয়ে এতোবড়ো একটা আস্ত বাড়ির দরকার কী তাদের? মিছিমিছি টাকা চিবিয়ে খাওয়া। তার বাবার বাড়ির তিনতলায়

তিন তিরিক্কে ন খানা ঘরে সাত ঘর ভাড়াটে, মাঝের তলার মাত্র দু'খানা ছোট ঘরেই তো তার বাবার অত জিনিশপত্র সুদ্ধু দিব্যি কুলিয়ে যাচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে ছোট দেওর সীমন্তর সঙ্গে তার এক পশলা ঝগড়া হ'য়ে গেল। কথাটা প্রমীলা ভাঙেনি কারো কাছে, কিন্তু সীমন্ত ঝির মুখে জেনেই তেড়ে এলো 'তুমি নাকি ঘর সাব-লেট করছো?'

'তা করি আর না-ই করি তোর কাছে কৈফিয়ৎ দেবো নাকি?'

'দেবেই তো। আমাদেরও তো বাড়ি।'

'কার বাড়ি! তোর বাড়ি?'

'হ্যাঁ, আমারও বাড়ি। কাকে জিজ্ঞেস করেছো তুমি? দাদাকে? মাকে?—'

'যা যা, বেশি-বেশি মুখ নাড়িসনে। খেতে দি পরতে দি থাকতে দি, তাই ঢের মনে করিস।' প্রমীলা আপন কাজে ব্যস্ত হ'লো।

সীমন্ত গলার শির ফুলিয়ে বললো, 'রোজ-রোজ খাওয়া পরার কথা তুলবে না ব'লে দিচ্ছি। ভালো হবে না। আমার দাদার টাকায় যেমন আমরা খাই, তেমনি তুমিও খাও। তোমার তো আর টাকা নেই, তোমার বাবারও না। আর আমার মার গয়না টাকা সব কে নিয়েছে শুনি! শুনি সে কথা?' সবছেলে-মেয়ের মধ্যে এই ছোটো ছেলেই হিরণ্ময়ীর অতিশয় অশান্ত, অতিশয় মুখর। এর সঙ্গেই প্রমীলা পেরে ওঠেনা।

হাতের ঝাঁটা নিয়ে সে তেড়ে এলো—'যতবড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা তোর। ঘাড় ধ'রে আজ যদি তোকে আমি বার না ক'রে দি—'

'করো দেখি, কতবড়ো সাহস তোমার।'

'করবোই তো। হারামজাদা, আজই তোকে বার করবো। বুড়ো ঢেঁকি, ভাইয়ের উপর পড়ে-প'ড়ে খাস্ লজ্জা করেনা? গলায় দড়ি জোটে না?'

'তোমার লজ্জা করে না? তোমার দড়ি জোটে না?'

'আমার কেন লজ্জা করবে, দড়ি জুটবে। আমি কি তোরটা খাই, না তোর বাপেরটা খাই!'

'আমার দাদারটা তো খাও।'

'ওরে আমার দাদা রে!' প্রমীলা তার মুখের সামনে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি এগিয়ে দিলে। আমার সোয়ামির ঘাড়ে ব'সে আমার দাড়ি ওপড়াস্ এইতো তোর মুরোদ। বদমাস, বজ্জাত—'

প্রমীলার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শিত হাতটি এক ধাক্কায় সবেগে সরিয়ে দিলো সীমন্ত, 'তোমার সোয়ামি আগে না আমার দাদা আগে সেটা শুনি? কার অধিকার বেশি? আর বড়োতো স্বামী-স্বামী করছো—তোমাকে পোঁছে? তোমার সঙ্গে কথা বলে, না তোমার ঘরের ধার দিয়েও হাঁটে? তোমাকে দেখলে সকলে ঘেন্না করে।'

'তবেরে হতচ্ছাড়া—' ধাক্কা খেয়ে দেয়ালে টাল সামলে গায়ের কাপড় কোমরে জড়ালো প্রমীলা। রাগে অধীর হ'য়ে হাতের ঝাঁটাটাই সে ছুঁড়ে মারলো সীমন্তর দিকে। সীমন্ত স'রে গিয়ে রক্ষা করলো নিজেকে, তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে-যেতে বললো, 'ডাইনি!' একেবারে শেষ সিঁড়ি গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো 'একদিন ঠিক পুলিশে ধরিয়ে দেবো। চোর। চোর। চোর।' দুদ্দাড়



নেমে এলো প্রমীলা, গলার তীক্ষ্ণ আওয়াজে দেয়াল কাঁপিয়ে সীমন্তর পিঠের উপর অশ্রাব্য কুশ্রাব্য অতিশয় ভয়ংকর সব মন্তব্য ছুঁড়ে মারলো, কিন্তু সীমন্তকে ছুঁতে পারলোনা। দরজা খুলে সে ততক্ষণে বড়ো রাস্তার মোড়ে পৌঁছে গেছে। সেই ঝাল খানিকক্ষণ শাশুড়ির উপর ঝেড়ে—উপরে এসে সোজা সুনির্মলের ঘরে এলো। সুনির্মল আজকাল অভিসীমন্তর ঘরে চলে এসেছে। অভি তো নেই-ই, সীমন্তও নিচে মার কাছে থাকে। সুনির্মলের একলা ঘরের ঘুম অবিশ্যি প্রায়ই আলোড়িত করে প্রমীলা কিন্তু তবুতো একটা সময় দরজা বন্ধ ক'রে নির্জন হ'তে পারে সে। সারারাত তো আর চ্যাঁচাতে পারে না প্রমীলা? ঈশ্বরের দয়ায় ঘুম তার বেশী।

সেই ঘরে এসে সে তচনচ করলো সব। বিছানা তুলে নিয়ে গেল নিজের ঘরে, কাগজপত্র, বইটই সব রাগের চোটে ফেলে দিলো মেঝেতে, হ্যাঙ্গারে ঝোলানো শার্ট কোটের আর হাল রাখলোনা। যত রাগ তার স্বামীর উপরেই ফুটতে লাগলো। ইঃ, স্ত্রীর সঙ্গে শোবেন না বাবু, শোবে, শোবে, শোবে। একঘরে থাকবে না। থাকবে। থাকবে। থাকবে। পৃথিবীশুদ্ধু সবাই থাকে আর সে থাকবে না! সীমন্তর কথায় মনের কোন তারে আঘাত লেগেছে তার। আলাদা শোয় বলেই তো এত বড়ো কথা ও বলে গেল? পোঁছে না, পোঁছা না পোঁছার তুই কী বুঝিস রে হারামজাদা? টাকাকড়ি তোকে দেয় না তোর মাকে দেয়? না, দিলে সেটা পাঁচজনে মেনেই নেয়? বাবা তো বলেইছেন আর কিছু বজ্জাতি করুকনা বাছাধন, একেবারে পথে বসিয়ে ছাড়বোনা! কেন, মাইনের টাকা এনে সেদিন নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলো না, তারপর? তারপর কী হ'লো? পারলো প্রমীলার সঙ্গে? প্রমীলার সঙ্গে? প্রমীলার হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর ইংরিজিতে তক্ষুনি চিঠি লিখে দিলেন না আপিসে! আর সেই চিঠি দেখেই তো ভয়ে এইটুকু!

তার ক্রুদ্ধ হাতের ঠেলা লেগে ওয়ারড্রবের উপর থেকে চিনেমাটির একটা ফুলদানি প'ড়ে গিয়ে ভেঙ্গে চুরচুর হ'য়ে গেল, এটাচি কেসটা উল্টে পড়ে তার মুখ খুলে হাঁ হ'য়ে ছড়িয়ে গেল সব জিনিশ। বিছানার তোষকের তলা থেকে বেরিয়ে কতকগুলো কাগজ উড়তে লাগলো বাতাসে।

দু'খানা চিঠি! এলোমেলো—জিনিশপত্রের ফাঁকে চুপচাপ শুয়ে আছে নিরিবিলি। একখানা খাম সাদা আর একখানা নীল। সব ভুলে চিঠি পড়তে বসলো প্রমীলা। দু'খানা খামের উপরেই বাংলা পরিষ্কার হাতের লেখায় সুনির্মলের নাম, ঠিকানাটা ইংরিজিতে। নিজের মার হাতের লেখা তার চেনা উচিত ছিলো, কিন্তু মনের কোথাও সেকথা নেই বলেই ধরতে পারলোনা। নীলখামের ভেতর থেকে টেনে বার করলো শকুন্তলার চিঠিটা, তারপর এক নিশ্বাসে প'ড়ে ফেললো। পড়তে-পড়তে তার শাদামুখ লাল হ'লো, দাঁতের সঙ্গে দাঁত আটকালো, নাকের বাঁশি ফুলতে লাগলো আর নিবতে লাগলো, চিঠিটাকে দুমড়ে মুচড়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে, থুতু ছিটিয়ে একাকার ক'রে দিলো। তারপর পড়লো সুধাময়ীর চিঠি। সঙ্গে-সঙ্গে স্প্রিংয়ের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো, দৌড়ে নিচে এলো, আবার উপরে উঠলো, তারপর যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই চাকর নিয়ে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। বড়োরাস্তার মোড়ে এসে ট্যাক্সি নিল।

২

সুধাময়ী বললেন, 'পেয়েছ' ?

সুনির্মল বললো 'না।'

'ছাখো, ছাখো, ভালো ক'রে ছাখো'

'আমি আর পারছিনা—'

'যদি সে সব না-ই পাও তবে আমার যা আছে সব নাও।'

'ছি !'

'না, না, ছি নয়। তোমাদেরই তো জিনিশ, তোমরা ছাড়া আর কে আছে আমার ? কী আছে ?'

'আপনি ভালো হ'য়ে উঠুন তারপর সব হবে।' সুনির্মল আলমারির পাট বন্ধ করলো আর ঐ পাৎলা শরীরে সমস্ত শক্তি একত্র ক'রে খাট থেকে চাদর ঠেলে নেমে এসে দাঁড়ালেন সুধাময়ী তোমার তো নিজের হাতে নিতেই যত সংকোচ, আমি দেবো। আমার জিনিশ আমি তোমাকে ভালোবেসে দেব, সব দেব। যাবার আগে এই একটা মাত্র আকাঙ্ক্ষা আমাকে পূরণ করতে দাও তোমরা। আয় রাখাল, আয়, তোরটাও তোকে দিয়ে দি।'

এতক্ষণে সম্পূর্ণ মানষটিকে দেখ্‌তে পেলো সুনির্মল। আঁচল এলিয়ে পড়েছে, মাথার কাপড় খসে গেছে, পাগলের মতো উদভ্রান্ত চোখ, ঠোঁটের দুই কষে দগদগে ঘা, চুলগুলো এত পাৎলা যে মাথার মসৃণ অংশ সাদাটে হ'য়ে-হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছে, পায়ের পাতা ফেটে ফেটে চৌচির।

সুনির্মলের মনে হ'লো দৌড়ে পালিয়ে যায় সেখান থেকে, শিহরিত হ'য়ে সে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো।

সুধাময়ী ঝনঝন ক'রে আলমারি থেকে একটার পর একটা মূল্যবান সঞ্চয় ছুঁড়ে-ছুড়ে ফেলতে লাগলেন মেঝেতে।

'পাপ ! পাপ ! সব পাপ ! সব আজ দূর ক'রে দে রাখাল।' মামীর কাণ্ড দেখে রাখলে তাজ্জব হ'লো, এগিয়ে এসে জাপটে ধরলো তাঁকে 'তুমি করছো কী ! পাগল হ'য়ে গেলে নাকি' ? 'ছাড়, ছেড়ে দে' সুধাময়ীর গায়ে যেন প্রচণ্ড শক্তি ঢেলে দিয়েছে কে ! এক ঝাপটায় রাখালকে সরিয়ে দিলেন। দরজার পুরোনো কাপড়ের পাৎলা পর্দা নড়ে উঠ্‌লো জোরে, একটা ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো প্রমীলা, একসঙ্গে তিনজন মানুষ চমকে উঠে স্তব্ধ হ'য়ে গেল।

'তবেরে এই, এই হচ্ছে তোমাদের ?' একটা ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত সে ঝাঁপিয়ে পড়লো সুনির্মলের উপরে, 'জোচ্চোর, নির্লজ্জ, শাশুড়ির সঙ্গে সাঁট ক'রে তুমি চুরি করতে এসেছ এখানে ? আর তুমি, মা, তুমি ম'রে যাও না কেন, কেন মরোনা, তিনকাল গিয়ে এককাল ঠেকেছে শেষে তুমি জামাইয়ের সঙ্গে, ছিঃ !—'

'চুপ ! একেবারে গর্জে উঠে ছুটে এগিয়ে এসে মেয়ের গালে এলোপাথাড়ি চড় মারতে লাগলেন সুধাময়ী, 'অনেক, অনেক আমি সহ্য করেছি, আর না। আর না। আর আমি পারবো না। পারবো না। পারবো না।' তাঁর গলার সুতীক্ষ্ন আওয়াজ এই ঘরের দরজা জানালা, পর্দা ভেদ ক'রে



অন্যান্য ঘরে গিয়ে পৌছলো, সেই সব ঘরের সচকিত অধিবাসীরা ছুটে এলো চারদিক থেকে, স্রোতের মতো।

৩

সকলকে পাশ কাটিয়ে কেমন ক'রে কখন যে সুনির্মল বেরিয়ে এলো রাস্তায়, নিজেই যেন টের পেলোনা। পানাপুকুর, ভাঙ্গা ঘাট, পোড়োবাড়ি, এ ধারটা নেহাৎই গ্রাম। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার ঝাপসা আলোতে পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে একটা সিগারেট ধরালো। উদভ্রান্ত শ্রান্ত মনের উপর একটি অপরিসীম বেদনা বোধ আচ্ছন্ন করলো তাকে।

এই মাত্র কোথা থেকে এলো, কী অবস্থা থেকে কাপুরুষের মত সকলের অলক্ষ্যে পালিয়ে এলো, নাটকের চরম নিষ্পত্তি পর্যন্ত কেন সে দাঁড়িয়ে থাকলোনা, বীরের মতো মুখোমুখি হ'য়ে রক্ষা করলোনা দুর্বল পক্ষকে, সব কথা মুছে গেল মন থেকে। মনের উপর স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হ'য়ে শুধু সুধাময়ী ভেসে রইলেন, যে মহিলার হাতে ঘা, পায়ে ঘা, ঠোঁটে ঘা, মাথায় টাক। এই বীভৎস রোগের জন্য যিনি এক তিল দায়ী নন, এই পাপের জন্য ফলভোগ যার নিতান্তই ঈশ্বরের অবিচার। সত্যিকারের দুঃখ কী, দুঃখের অস্তিত্ব কত দুর্বিসহ তা যেন প্রত্যক্ষ করলো সুনির্মল। মনের মধ্যে তার এই বোধ জাগলো যে, নিজেটাই সবচেয়ে বড়ো নয়। পৃথিবীতে আরো আছে। আরো অনেক, অনেক।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, বাসষ্ট্যাণ্ডে এসে অপেক্ষা করতে করতে, বাসে রেকসিনের ছেঁড়া গদিতে বসে থাকতে-থাকতে সমস্তটা সময় একটি কথাই ভাবলো সে। তারপর এক সময় নিজেকে হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চম্‌কে উঠ্‌লো। এখানে সে কেন এসেছে ? কী চায় ? কোথায় যাবে ? গেলেই বা কী হবে।

শরীর এলিয়ে এলো, মাথা ঝিম ঝিম্ করলো, পা টল্‌তে লাগলো। না, আর সে দাঁড়াতে পারছেনা—আর সইতে পারছে না নিজের ভার। এবারে বিশ্রাম চাই, বিশ্রাম। সেই বিশ্রাম আছে সেখানে, সেই নির্জনে, স্বজন-বিরহিত, পাটনা শহরের সেই প্রান্তরে, বকুল তলার ছোট্ট কোয়ার্টারের অন্তরে।

সুনির্মল পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে তার গহ্বরে উঁকি মারলো, তারপর হুইলরের স্টল থেকে একটি টাইম টেবিল কিনে এনে কোনো চায়ের দোকানে গিয়ে বসলো।

৪

প্রমীলা বাড়ী পৌছলো প্রায় রাত দশটায়। কড়া নাড়ার শব্দে হিরণ্ময়ী তাড়াতাড়ি সীমন্তকে তুলে দিলেন। সুনির্মল এখনো বাড়ি ফেরেনি, মনে-মনে সেই উদ্বেগে চুপচাপ অন্ধকার ঘরে জেগেছিলেন তিনি। দু'দিন থেকে মাথায় তাঁর অসম্ভব যন্ত্রণা হ'য়েছে, শরীর এত খারাপ যে চোখ চাইতেও পরিশ্রম। বিরক্ত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে আলো জ্বাললো সীমন্ত।

গজ্ গজ্ করলো আপন মনে। আবার এসেছে কেন মরতে, দরজা আমি খুলে দেবোনা। যখন খুসী তখন বাপের বাড়ি যাবেন, যখন খুসী ফিরে আসবেন, আর আমরা তো সব মাইনে-করা গোলাম আছি বাড়িতে। কেন, চাকর নিয়ে গেছে কেন ? ও জানে না যে নিবারণ না

থাকলে রান্না হবে না। আমরা খাবো কী, সে চিন্তা নেই? নিজের ঝিটিকেতো আবার সোহাগ ক'রে ছুটি দেওয়া হ'য়েছে।

সীমন্তর এত কথায় উত্যক্ত হ'লেন হিরণ্ময়ী, ঈষৎ রাগ ক'রে বললেন 'কী বকরবকর করছিস তখন থেকে। শিগ্‌গির যা, তোর দাদা এসেছে।'

'দাদা? দাদা এখনো বাড়ি আসেননি?'

'কখন এলো? আমিতো সেই থেকে জেগে আছি।'

'ও।' তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরুলো সীমন্ত। এতক্ষণে তার মনে হ'লো রাত দশটায় আর বাপের বাড়ি থেকে ফিরে আসবেনা বৌদি। মুখের বিরক্তি রেখা মুহূর্তে মুছে গেল।

দরজা খুলতেই ঝংকার দিল প্রমীলা, 'করছিলি কী এতক্ষণ? মরেছিলি সব? কখন থেকে কড়া নাড়ছি কানে আর যায় না, না?'

'ন্‌না' সীমন্ত তৎক্ষণাৎ এবাউট টর্ণ করলো। ফিরে এদিকের দরজার কাছে এসে বললো, 'রাত বারোটায় পাড়া জ্বালাতে আসবে বলে সব জেগে বসে থাকবো কিনা! এততো ভালবাসার বাপের বাড়ি, কী ক'রে জানবো যে সেখানে তোমার একটা রাত ও জায়গা হয় না।'

প্রমীলার সঙ্গে নিবারণ ছাড়াও আর একজন বুড়োমতো লোক এসেছিলো, তার বাবার কর্মচারী। প্রমীলা বিদায় দিচ্ছিলো তাকে, সীমন্তর কথা শুনে সেই বিদায় তার শেষ হোলোনা, চিড়বিড়িয়ে দরজার কাছে লাফিয়ে এলো, 'বেরো, বেরো হতচ্ছাড়া আমার বাড়ি থেকে, ঝেঁটিরে বিদায় করবো সব আপদ।'

সীমন্ত ততক্ষণে ঘরে গিয়ে ছিট্‌কিনি তুলে দিল।

উপরে উঠে এলো প্রমীলা। সীমন্তর সঙ্গে এখন কথা কাটাকাটি কববার মতো মনের অবস্থা নয় তার।—শেমিজের মধ্যে শকুন্তলার চিঠি খরখর করছে, এ-আগুন না নেবা পর্যন্ত তার শান্তি কই? সুনির্মলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যই এখন তার সমস্ত মন উন্মুখ হ'য়ে আছে।

এমনিতেই আসতে কত দেরি হ'য়ে গেল। উপায় ছিলোনা। সেই যে মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সুধাময়ী অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলেন, জ্ঞান হ'লো এই একটু আগে। ততক্ষণে তার রাখালকে তাড়াতে হ'য়েছে ঘাড় ধরে, দরজা বন্ধ ক'রে সিন্দুকের আনাচ কানাচ খুঁজতে হ'য়েছে গয়নার জন্য; তারপর অপেক্ষা করতে হ'য়েছে মার জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত। সিন্দুকের চাবি না আট্‌কেতো আর আসতে পারে না? চাবি ঘোরাবার কৌশলটা জানা ছিলনা তার। এত রাত্তিতে অত সোনা বুকে নিয়ে আজ হয়তো আসতোই না সে কিন্তু আসতেই হ'লো। সুনির্মলের মুখোমুখি হবার জন্যেই আসতে হ'লো। তাছাড়াও হয়তো আরো একটু কারণ ছিলো, হয়তো যজ্ঞেশ্বরের অনুপস্থিতিতেই ও বাড়ি ত্যাগ করতে চেয়েছিলো সে।

কিন্তু কোথায় সুনির্মল? না ঘরে, না ছাতে, না বাথরুমে, না কলতলায়। মায়ের কাছে লুকিয়েছে নাকি কচি খোকা? দুম দুম ক'রে আবার তক্ষুণি নেমে এলো নিচে। হিরণ্ময়ী শুয়ে আছেন মেঝেতে, খাটের উপরে সীমন্ত। অতবড়ো মানুষটাকে তা হ'লে কোথায় লুকোলো এরা? হিরণ্ময়ী ক্লান্ত গলায় বললেন 'সুনু, এখনো বাড়ি ফেরেনি।'



'ফেরেনি?'

'না।'

'আপনি ঠিক বলছেন?'

'মিথ্যে বলে কী লাভ?'

'তবে মিন্‌সে গেলো কোথায়?' যেন জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে এলো সে ঘর থেকে, খড় খড় ক'রে আবার উঠে এলো উপরে। না, শান্তি নেই, সোয়াস্তি নেই, ঝগড়া না করা পর্যন্ত কোনো সুখ নেই আর। বুকের ভেতর থেকে থেকে আগুণ জ্বলে উঠ্‌ছে, হিংসায় পুড়ে যাচ্ছে হৃদয়। সেমিজের মধ্যে হাত গলিয়ে বার করলো চিঠিটা। মোচড়ানো, দুমড়োনো, থুতু মাখানো চিঠি। কী ভেবে চিঠিটা সে ফেলে দেয়নি, তুলে নিয়েছিলো। আবার প্রমাণ কি কেউ নষ্ট করে?

৫

এমন রাত আর কাটেনি প্রমীলার জীবনে। কোনোদিন কোনো কারণেই এমন হয়নি যে কিছুতেই তার ঘুম এলোনা। শেষের দিকটায় মেজাজ এমন আগুন হ'লো যে ঐ গভীর রাত্তিরে এলো পাথারি লাথি মেরে কুঁজোটা ভেঙে ফেললো, আলনার ধুতিশাড়ি ছিঁড়তে লাগলো দাঁত দিয়ে। সুনির্মলের দামী জুতোগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল বাইরে। তবু তার রাগ প্রবোধ মানলোনা। দাঁতে দাঁতে ঘষে কী করে ভাবতে লাগলো এবার কী করি! কী করি? রাগের চাপে মুখচোখ তার লাল হ'য়ে উঠলো, ঘর থেকে ছাত, ছাত থেকে নীচে, নীচে থেকে উপরে, এই ক'রে ক'রে শেষে ক্লান্ত হ'য়ে একসময় ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন বেলা ন'টা দশটার সময় যজ্ঞেশ্বর এলো মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ি ফিরেছে গোরবেলা, এসেই কালকের হুলুস্থুলের একটা বর্ণনা শুনেছে ঝির কাছে, তাই সঠিক খবরের জন্য ছুটে এসেছে এখানে।

প্রমীলা সবে ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে তখন। কালকে দুপুরের সেই ছড়ানো ছিটোনো জিনিশপত্রে, জামাতেজুতোতে, কাগজের কুচিতে ঘর একহাঁটু। সেদিকে তাকিয়ে ঝিয়ের অনুপস্থিতিটা অসহ্য হ'লো। রাগে চির-চির ক'রে উঠ্‌লো শরীর: 'মাগী কি মরেছে নাকি? তিনদিনের নাম ক'রে পাঁচদিন হ'য়ে গেল আসবার নামটি নেই। একবার আসুক না, মুখে নুড়ো জেলে বিদেয় করবো না?'

ঝিয়ের বদলে নিবারণ এসে দাঁড়ালো পর্দার ফাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে রাগটা নিবারনের উপরই পড়লো তার।

'আবার তুই মরতে এসেছিস্ কেন? তোরা কি আমাকে একদণ্ড শান্তিতে টিঁকতে দিবিনে?'

নিবারণ ভীতু ভীতু গলায় বললো, 'বেলা হ'য়েছে অনেক, এবার বাজারে না গেলে যে কিছু পাবোনা।'

'ও বাজারে যেতে হবে? কেন শুনি? কালিয়া কোর্মা রেঁধে আজ কাকে পিণ্ডি গেলাবে?'

'কাল আপনার সঙ্গে দম্‌দম্‌ চলে গেলুম রাত্তিরে আর উনুনই ধরেনি। ছোটবাবু আগ করছিলেন। তবু তেনি মেসে হোটেলে খেয়ে আসতি পারেন, কিন্তু মা—'

বারুদ জললো, 'বুড়ি মাগীর পেটের জ্বালা উঠেছে বুঝি? আর তুই এসেছিস্‌ তার মোক্তার হ'য়ে সাউখিরি করতে। ওরে আমার দরদের বন্ধুরে। বেরো, বেরো বলছি এখান থেকে। আমার বাড়িতে আজ থেকে আর কারো পাত পড়বেনা এই আমি বলে রাখলুম। ওদের বলে দিস্‌ সে কথা, আর তুইও জেনে নিস। যা।'

ক্ষুন্ন মনে ফিরে যাচ্ছিল নিবারন, প্রমীলা আবার ডাকলো তাকে। 'শোন, ঐ মুখপোড়া হতচ্ছাড়া ছোঁড়াটাকে এখুনি চলে যেতে বল। আমি যেন আর তার মুখ না দেখি।' আলমারী থেকে একটা সিকি বার ক'রে ছুঁড়ে মারলো 'এই নে, আমার জন্য চার আনার কচুরি জিলিপি এনে দে। কচুরির সঙ্গে বেশী ক'রে তরকারী আনবি। তাড়াতাড়ি আসবি। আগে দুধের কড়াটা উপরে রেখে যা। বাড়িতেতো আর বেড়াল কুকুরের অভাব নেই।'

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে যজ্ঞেশ্বর ঢুকলো ঘরে—'কী রে পেমি, কী হ'য়েছেরে কাল বাড়িতে?'

'ও মা, তুমি এসে গেছ? কখন এলে?' বাপকে দেখে মুখের ভাব নিমেষে বদলে গেল প্রমীলার। দু'হাতে বিছানা-বালিশ সরিয়ে বসতে দিল তাড়াতাড়ি, 'সে আর বোলোনা। সে সব কুকীর্তির কথা শুনলে তুমি কানে আঙ্গুল দেবে।'

'কী! কী কথা?'

'নিজেদেরই কেচ্ছা, নিজেদের ঘরেরই কলঙ্ক, কী আর বলবো', প্রমীলা গুছিয়ে বসলো—'আগে মার কাণ্ড শোন, তারপর জামাইরটা শুনো।' চোখ ঘুরিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে, রং চড়িয়ে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনাটি ঘণ্টাখানেক ধ'রে বিবৃত করলো সে। আর সব শুনে কতক্ষণ থ' হ'য়ে রইলো যজ্ঞেশ্বর। অনেকক্ষণ পরে বললো 'দেখি সেই চিঠি?'

প্রমীলা বিছানার তলা থেকে শকুন্তলার আধছেঁড়া চিঠিটা বার ক'রে হাতে দিয়ে বললো 'ছাখো, বেশ্যামাগীর ঢলানি ছাখো।' একপলকে চিঠিটা শেষ ক'রে যজ্ঞেশ্বর বললো 'আর তোর মা'রটা?'

'মা'রট কোথায় ফেলেছি খুঁজে পেলুমনা।'

রীতিমত রেগে উঠ্‌লো যজ্ঞেশ্বর, 'তবে এটা দিয়ে আমার কোন শ্রাদ্ধ হবে। সেটাইতো আমার দরকার।'

মুখভার করলো প্রমীলা, 'শাশুড়ি জামায়ের কাছে লিখেছে সেটাই বেশী গর্হিত? না একটা ছুকড়ি একজন—'

'নে, নে চুপ কর। ওসব থাকেই পুরুষের। অত ঘ্যান ঘ্যান হ'লে চলে না।' উঠে দাঁড়ালো 'তা হ'লে তোর সোনাগুলো তুই নিয়ে এসেছিস্‌ সব?'

ভারি মুখ আরো ভারি ক'রে প্রমীলা জবাব দিল, 'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'কেন আনবোনা? তোমার তো ঘরের শত্রু বিভীষণ—। মা-ই যেখানে লোক ডেকে আনে চুরি করাতে—'



'বেশ। এবার তো আমি এসেছি, এখন দিয়ে দে।'

'না, ও আমার কাছেই থাক।'

'মানে?' যজ্ঞেশ্বর ভুরু কুচ্‌কে মেয়ের দিকে তীর্যক দৃষ্টি হানলো।

'হ্যাঁ, আমার কাছেই রাখবো।'

'তোর কাছে রেখে কি জেলে যাবি!'

'না জেলে যাবো কেন? এখন তো সব সোনার ইঁটই ক'রে ফেলেছ, কে চিনবে এগুলো কবে কার গয়না ছিলো?'

'যদি সুনির্মল জিজ্ঞেস্‌ করে এত সোনা পেলি কই?'

'করবে না।'

'করবে না তুই জানিস?'

'হ্যাঁ আমি জানি করবেনা। এসব সে দেখবেই না।'

'দেখবে, দেখবে, দেখবে।' দাঁতে দাঁত ঘষলো, 'আমি বলছি দেখবে।'

'আমি জানি দেখবেনা। সে এ ঘরেই কম আসে, তার উপর আলমারিতো কোনদিন খোলে না। আমার কী কাপড় আছে, কী গয়না আছে, কত টাকা আছে কিছুই জানেনা সে। জানতে তার ইচ্ছেও নেই।'

যজ্ঞেশ্বর দু'পা এগিয়ে এলো, রূঢ় গলায় বললো, 'তবুও ওগুলো আপাততঃ আমার কাছেই রাখতে হবে তোমার।'

প্রমীলা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বললো 'কেন?'

'ওসবের অধিকার একা তোমার নয়।'

'তবে কার?'

'অত কথার আমার সময় নেই, শীগ্‌গির দে।'

'আমার শাশুড়ির গয়না একা আমার নয়?'

'না।' এবার মেয়ের আঁচল থেকে চাবি ছিনিয়ে নিল সে।

প্রমীলাও সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়লো বাপের গায়ের উপর, 'না না, আমি দেবো না, দেবো না, দেবো না।'

এক ধাক্কায় মেয়েকে ফেলে দিয়ে চাবি নিয়ে আলমারী খুললো যজ্ঞেশ্বর।

প্রমীলা চিৎকার করতে যাচ্ছিল চোখ পাকিয়ে বললো, 'চুপ। গলার আওয়াজ একফোঁটা বার করবিতো এখুনি পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দেব।'

'তুমি চোর না? তোমাকে ধরিয়ে দিতে পারিনা আমি?'

'চোরের আবার অত গলা।' হাতের উল্টোপিঠে ঠাস্‌ ক'রে একটা চড় মেরে মেয়ের মোটা ফর্সা মাংসল গাল লাল করে দিল, 'হারামজাদী, আমার মুখের উপর এতোবড়ো কথা। ভেবেছিস আমি তোর ঐ মিনমিনে কাপুরুষ অপদার্থ সোয়ামীটার মত ভীরু, বোকা, হাঁদা, মেয়েদের গায়ে দূরে থাক

বৌর গায়েও হাত তুলতে ভয় পায়, লজ্জা পায়। গায়ের ছাল ছাড়িয়ে লঙ্কা বাটা ঘষে দেব আ
তোমাকে, যদি আর একটা কথা মুখে মুখে ব'লো।

প্রমীলা রুদ্ধরোষে দৌড়ে গিয়ে দেয়ালে ঠং ঠং ক'রে কপাল কুটতে লাগলো কিন্তু সাহস পেলো
বাপের কার্যকলাপ বাধা দিতে। যজ্ঞেশ্বর আলমারী খুলে ঐ কোন থেকে শাড়িব্লাউসের সাতপয়ে
আড়াল থেকে বের ক'রে নিয়ে এলো গয়নার বাকস। দরজা ভেজিয়ে ডালা খুলে দেখে নিল সব ঠি
আছে কিনা, আর দেখতে গিয়েই তাজ্জব হ'য়ে গেল। রাখালের মার তেরো ভরির চিকটা চুপ
শুয়ে আছে ন্যাকড়া জড়িয়ে। একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো কপালকোটা কন্যার দিকে, তারপ
ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

প্রমীলা বাপের চলে যাওয়ার ঝরঝরে মোটরের আওয়াজ শুনতে শুনতে মেঝেতে লুটিয়ে প
চাপাচাপা বুকফাটা আর্তনাদে বিদীর্ণ হ'তে লাগলো।

এদিকে নিচের ঘরে শেষ রাত্রি থেকে বেহুস্ জ্বরে মূর্ছার মত পড়ে রইলেন হিরণ্ময়ী। সাত সা
ঘুম ভেঙ্গে উঠেই সীমন্ত যে কোথায় চলে গেল তার কোন ঠিকানা রইলোনা। অনেক বে
ঝাপসা ঝাপসা কী চিন্তা যেন অর্দ্ধ চৈতন্য হিরণ্ময়ীর মগজের মধ্যে স্রোতের মত ব'য়ে ব'য়ে যে
লাগলো, যেন স্বপ্নের ঘোরে কাকে খুঁজলেন, কাকে হারালেন, কাকে না পেয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
উঠ্লেন।

## দেবযানী-যযাতি সংবাদ

সার্থবাহরা পথ কেটে আসে পথে-পথে খোলে সত্র
মেয়ের ছায়ার যদি পাওয়া যায় দুদিনের আতপত্র
হায় সুকন্যা স্বর্ণ-ধান্যে তোমারও লুব্ধ নেত্র!
দেবযানী মন ছিলনা এমন যযাতির স্মৃতিক্ষেত্র।

---

# তাস

## রজত সেন

ঘণ্টাখানেক উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াল ভবতোষ। আঙ্গুলের আংটিটার দিকে তাকাল কয়েকবার। গোটা পনেরো টাকা সে এখুনি সংগ্রহ করতে পারে। বিয়ের আংটি, স্যাকরার লোভী হাতের স্পর্শে বহুকাল আগে এর কৌলীন্য নষ্ট হয়েছে, অন্ততঃ চপলার তাই মত। এ-সমস্ত অহেতুক সংস্কার তার অবশ্য নেই। সে জানে জীবনে প্রয়োজনটাই সব, বাকি সব ভুয়ো বিলাস। প্রয়োজনের তাগিদে সব তুমি করতে পার। চপলা বলে, না, তা নয়; সব তুমি করতে পার বটে, কিন্তু করা তোমার উচিত নয়। প্রয়োজনের তাগিদে তোমার আদর্শ, মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পার না।

না, পারনা! মুখ বিকৃত করে মনে মনে বলল ভবতোষ, রাখ তোমার মনুষ্যত্ব! সকাল থেকে এক ফোঁটা চা পেটে পড়েনি আগে মানুষ, তারপর মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব মনের ব্যাপার, কিন্তু ক্ষুধাটা নিতান্তই দেহের। চপলার উদ্দেশ্যে সে বলল, তুমি কি করে বুঝবে—তোমার ক্ষুধাটা মেটাবার দায়িত্বটা একমাত্র আমারই, অন্ততঃ সে-চুক্তিতেই তোমাকে ঘরে এনেছি। অতএব মাথায় জবাকুসুম তেল মেখে যত খুসি আদর্শের বুলি আওড়াও না।

ভবতোষ হন হন করে হাঁটতে লাগল, কোথায় যে যাচ্ছে তার কিছু ঠিক নেই।

বেলা বাড়তে লাগল। হঠাৎ তার খেয়াল হল চপলা বলেছে টাকা না নিয়ে গেলে রান্না হবেনা। এ-ধরণের শাসানি আগেও শুনেছে সে অনেক—কিন্তু খেতে শেষ পর্যন্ত পেয়েছে। আজকের ব্যাপারটা একটু স্বতন্ত্র, কোনোরকম সংস্থান থাকলেও চপলা এতখানি বিষ উদ্গীরণ করত না। ভবতোষ ফিরল। আংটির কথা আবার মনে হল তার, কিন্তু আর বাঁধা রাখবার সাহস নেই তার, চপলার কাছে শপথ করেছে সে। তাহলে কি উপায় হবে? বন্ধুদের আড্ডায় গিয়েও লাভ নেই। সেখানে দু'একজনের কাছে পাওয়া যেতে পারে হয়ত, কিন্তু সবাইর সামনে চাইবার সংকোচ সে ত্যাগ করতে পারবে না। আর—কে বলতে পারে—হয়ত তাসের আড্ডায় জমে গেল, তাহলে আর বাড়ি ফেরার পথ থাকবেনা। বাড়ির কাছে আসতে আসতে অনেকের নাম তার মনে পড়ল, কিন্তু অনিশ্চিত সব। গোটা পনেরো টাকা অন্ততঃ দরকার, তাহলেই মাসের এ-কটা দিন চলে যাবে কোনোরকমে। হঠাৎ প্রফুল্লবাবুর কথা মনে পড়ল তার। তাদেরই দোতলার ফ্ল্যাটে সস্ত্রীক থাকেন। কোন্ এক বিলিতী অফিসের বড়বাবু। অত্যন্ত অমায়িক এবং ভদ্র। আলাপও তার সংগে আছে, কিন্তু ফট্ করে ধার চাইতে কেমন যেন সংকোচ বোধ হচ্ছে তার। নিজেকে বোঝাতে লাগল সে, এতে সংকোচ নেই কিছু, ধনী দরিদ্র সকলেই ঠেকায় পড়ে কখনও না কখনও। যত স্বাচ্ছন্দ্যই থাক—ধার করতে হয়না এমন লোক কি আছে? মনে মনে তামিল দিয়ে নিল সে কেমন করে টাকাটা চাইবে, মুখস্ত করতে লাগল কতগুলো কথা বার বার আবৃত্তি করে। কিন্তু যদি না দেন বা না থাকে কাছে তাহলে—ভবতোষ ঘামতে আরম্ভ করল। বন্ধুদের কাছে তার অন্তহীন ধার। একদিন মনে মনে সে-ধারের অংকটা হিসেব করতে পারত, আজ আর পারেনা। তাদের কাছে টাকা চাইবার ভাষাটা তার মুখস্ত এমন কি সময় মত

দিতে-না-পারার অজুহাতগুলোও, কিন্তু প্রফুল্লবাবুর সংগে ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে কথাটা পাড়বার ভাষাটা তার কিছুতেই মনের মত হচ্ছেনা, বার বার কথা বদলাতে লাগল সে।

সামনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার তার সাহস হলনা, কেননা ছেলেমেয়েদের কারুর সংগে দেখা হয়ে যেতে পারে! এমন কি চপলার সংগে পর্যন্ত! পেছনের অল্প--ব্যবহার্য সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে এল সে। প্রফুল্লবাবু বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হৃদপিণ্ডটা তার লাফাতে লাগল ধরাস্ ধরাস্ করে। অনেকক্ষণ সময় নিল সে কড়াটা নাড়তে। খুব জোরে নয়, কেননা বিরক্ত হতে পারে, খুব আস্তেও নয়—নাও শুনতে পারে। কিন্তু কি ভাবে যে কথাটা পাড়বে কিছুতেই মনে করতে পারলনা সে।

প্রফুল্ল নিজেই দরজাটা খুলে দিল। মোটা-সোটা, হাসিখুসি চেহারা, প্রায় পঞ্চাশ হবে, গায়ে ফতুয়া, পায়ে ক্যানভাসের চটি। ভবতোষকে দেখেই হাত তুলে নমস্কার করল, এক গাল হেসে বলল 'আসুন! আসুন! ভেতরে আসুন!'

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে ভবতোষ বলল, 'অসময়ে বিরক্ত করলাম অপরাধ নেবেন না!'

'আরে! কিই যে বলেন, আসুন মশাই, আগে ভেতরে আসুন।'

বারান্দায় পার্টিশান দিয়ে নিখুঁত একটি বসবার জায়গা তৈরী হয়েছে। একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে প্রফুল্ল বলল, 'বসুন! একটু চা য়ের কথা বলে আসি।'

'এ-সময়ে আবার চা!'

'চায়ের আবার সময় অসময় কি? আমি ত মশাই সারাদিনই চা খাচ্ছি! কি আর করি বলুন, ছেলেপুলে নেই, একটা কিছু করে সময় কাটাতে হবে ত! খবরের কাগজ আর চা এই সম্বল, বসুন!'

প্রফুল্ল ভেতরে ঢুকল। ছেলেপুলে নেই, যাক্ তাহলে টাকা পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, ভদ্রলোকের কিই আর খরচ! আধ-খোলা দরজা দিয়ে একটি ঘরের খানিকটা অংশ দেখা যায়, কি সুন্দর গুছোনো সংসার, কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভাগ্যিস তার বাড়িতে কেউ আসেনা, এমন উলংগ দারিদ্র্য সে ঢাকত কেমন করে? সত্যিই একটা কিছু করা দরকার তার, কিছু উপরি রোজগার না করতে পারলে আর টিঁকে থাকতে পারবেনা ছেলেমেয়ে নিয়ে, একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে সে। দশ বছর চাকরী করে দশটা পয়সাও সে জমাতে পারেনি। দু'টো জীবনবীমাই পর পর বাতিল হয়ে পড়ে আছে, কোনোও দিনও সেগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে পারবে--এমন আশা সে আজ আর করে না। কারুর যদি একটা বড় অসুখ করে—সেরেফ বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। আর সে যদি মরে ত—ভবতোষের বুক শুকিয়ে গেল, স্ত্রী ছেলে মেয়ে এদের—

প্রফুল্ল এল, বসল একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে, 'চা এসে পড়ছে, ওঃ বাঁচলাম মশাই, কি একখানা শহরে বাস করছি—ছুটির দিনে একটা লোক পাইনা কথা বলবার। কি নিয়ে লোক বেঁচে থাকে বলতে পারেন?'

'বড় অভাবে আছে আজকালকার মানুষ,' বলল ভবতোষ, 'অনেক তাদের সমস্যা, অনেক চিন্তা, হাসতে ভুলে গিয়েছে সে, আর কারুর কথা ভাববার তার সময় নেই।'

'অভাব, সমস্যা—এগুলো ত থাকবেই মানুষের,' বলল প্রফুল্ল, 'কিন্তু মানুষ ত সে, সমাজে দশ জনের সংগে বাস ত করতে হয় তাকে! এমন করে নিজেকে নিয়ে বেঁচেই বা লাভ কি?'



'লাভ-লোকসানের কথা ভাববার আজকের দিনের মানুষের সময় নেই, শুধু দু'বেলা খেয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকতে পারাটাই মানুষের চরম এবং পরম সার্থকতা!' বলেই ভবতোষ একটু সময় নিল, নিজেই জানতনা এত ভালো ভালো কথা সে বলতে পারে। সুযোগটা সে নিল, 'আপনি, অর্থাৎ আপনারা—যাঁরা সমাজের উঁচু স্তরে বাস করেন—তাঁরা ধারণাই করতে পারবেন না কী মর্মান্তিক অর্থাভাবে আমরা দিনের পর দিন অতিবাহিত করছি।'

প্রফুল্লের মুখ দেখে মনে হল ছুটির সকালবেলা এমন দুঃখের কাহিনী শোনবার জন্যে সে একেবারেই প্রস্তুত ছিলনা। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঠাণ্ডা জলে চোখ বুজে ঝাঁপ দেবার মত সে বলে ফেলল, 'এই দেখুন না। আপনি ভাবতেই পারবেন না আমি আজ কি-জন্যে আপনার কাছে এসেছি! এ-আলোচনা না উঠলে হয়ত বলতেই পারতামনা আপনাকে আমার উদ্দেশ্য!'

'বলুন! বলুন! সংকোচ করবেন না!' প্রফুল্ল বলল। তার চোখের চাউনি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

কথাটা আটকে গেল ভবতোষের ঠোঁটের কাছে। কয়েক বার ঢোক গিলে সে বলল, 'গোটা কয়েক টাকার আমার বড় দরকার, যদি খুব বেশী অসুবিধে না হয়—মাস কাবারেই দিয়ে দেব, পয়লাই আমাদের মাইনে—'

'আরে মশাই, এ-সামান্য কথাটা বলতে আপনি এতটা সংকোচ বোধ করছেন?' প্রফুল্ল প্রায় ধমক দিয়ে উঠল, 'কত টাকা?'

'এই ধরুণ গোটা পনেরো! যদি অসুবিধে না হয়—'

'পনেরো টাকার জন্যে আবার অসুবিধে কি? সংসারি লোক—'

'তাই ত বলি এই দেখুন না আপনাতে আমাতে তফাৎটা, পনেরো টাকার জন্যে আমার সমস্ত সংসারটাই অচল হয়ে পড়েছে, আর আপনার—'

লজ্জিত গলায় প্রফুল্ল বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে কটাক্ষ করে আমি বলিনি, হঠাৎ মুখে এল—'

পয়লা তারিখে একশ' সাতাত্তর টাকা মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরল ভবতোষ।

চপলা বলল, 'আমি কুড়িটা টাকা আলাদা করে রাখছি!'

কেন?'

'আমার বালাটা এ-মাসে এনে দেবেনা?'

'এ-মাসেই আনতে হবে?'

'না আনলে চলবে কেন? মনির বিয়ের আর ক'টা দিন বাকি? সেখানে কি পরব? আট বছরে তুমি আমায় একটা গয়না পর্যন্ত গড়িয়ে দিলেনা।'

'পারলে কি দিতামনা হে?' বলল ভবতোষ, 'যদি সামর্থ থাকতে তোমার সর্বাংগ মুড়ে দিতাম সোনায়। পারলাম আর কোথায় বল! জীবনে চিরকালের জন্যে খেদ রয়ে গেল আমার।'

'চেষ্টা করলে কি আর দু'এক খানি গয়না গড়িয়ে দিতে পারতেনা? তোমাদের অফিসের শৈলেনবাবু ত তোমার চাইতেও কম পাইনে পান। সেদিন বৌ নিয়ে বেড়াতে এসেছিল—দেখলে কত সব নূতন ডিজাইনের গয়না পরণে?'

'আরে ওগুলো সব ধার করা, শৈলেন অফিসে বিড়ি খায়, চার পয়সার তেলে-ভাজায় টিফিন করে, ও গয়না গড়াবে কোত্থেকে?'

'দেখ বৌ-কে কত ভালবাসে শৈলেনবাবু, নিজে না খেয়ে পয়সা জমিয়ে স্ত্রীকে জিনিষ দেয়।'

'যারা শাড়িগয়না দেয় তারাই শুধু ভালবাসে বৌকে। কি কথাই বললে? একটি শিক্ষিত মেয়ের মুখে এমন কথা আমি আশা করিনি!'

'ঐ ত! কিছু একটা দেবার কথা উঠলেই অমনি তোমার মেজাজ বিগড়ে যায়।'

'না, মেজাজ বিগড়ে যাবার আর কি আছে? সত্যিই ত! মেয়েরা শাড়িগয়না পরতে ভালবাসে, দিতে পারিনা—সে ত আমারই অক্ষমতা। কিন্তু দেখছ ত কি দিনকাল পড়েছে! শুধু দু'মুঠো দু'বেলা খাবার জন্যেই মাইনের সমস্ত টাকাটা খরচ হয়ে যায়। অথচ কি এমন খারাপ রোজগারটা করি। আগেকার দিনে এই মাইনেয় হাতী চড়তে পারতাম।'

'এই রোজগারের তুমি বড়াই করছ? জামাইবাবুর জান—সাতশ টাকা মাইনে? মনির সম্বন্ধ এসেছে ইঞ্জিনিয়ার ছেলে, ব্যারাকপুরের কোন এক কারখানায় কাজ করে, তিনশ টাকা মাইনে, পরে হাজার টাকা পর্যন্ত হবে। তোমার মাইনে এত কম বললে কেউ বিশ্বাসই করবে না, তা জান? সত্যি! আমি কোনদিন ভাবিনি এত অল্প টাকায় আমার সংসার চালাতে হবে? আচ্ছা—কেন তুমি বিয়ে করতে গেলে? আর কয়েকটা বছর কাটিয়ে দিতে পারলেনা কোনো রকমে?'

অপমানে অভিমানে ভবতোষ জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু—কি হবে? সেই নিদারুণ কলহের সূত্রপাত, কটু এবং কঠিন কথার পুনরাবৃত্তি, কয়েক দিন কথা বন্ধ! সেই ত জীবনের এক সুর, এক ছন্দ; খাদ থেকে খাদে নেমে আসা, অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারে।

কি হবে? মনকে অকারণ বিষিয়ে কী লাভ? চুপ করে গেল ভবতোষ।

'কে তোমাকে বলেছিল বিয়ে করতে বুড়ো বয়সে?' চপলা বলল আবার, কিন্তু গলায় সে-উত্তাপ আর নেই।

'চৌত্রিশ বছর বয়সে বিয়ে করেছিলাম, কি আর এমন বয়েসটা?'

'যৌবনের আর রইল কি? ছেলে বয়সে আমাদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরতে পারলেনা? দৈবাৎ দেখা হলে চোখেও ত লেগে যেতে পারত!' চপলা হাসল।

যাক! আবহাওয়াটা তাহলে লঘু হয়ে উঠল! ঠিক এই সময়ে চপলা যদি একটা শাড়ি চেয়ে বসে—ভবতোষ এখুনি ছুটে গিয়ে কিনে আনত! গলায় কৌতুক মিশিয়ে সে বলল, 'তেইশ বছর পর্যন্ত কাউকে চোখে লাগাতে পারলে না? চেহারাটা ত ভালই।'

'শুনবে?' চপলা বসে পড়ল মাটিতে, 'মন খারাপ করবেনা, বল!'

'দূর পাগল! মন খারাপ করবার কি আছে?'

'রাগ করবেনা?'



'আরে না, না, বলনা!'

চপলা জানালার বাইরে ঘনায়মান সন্ধ্যার দিকে তাকাল, চোখে তার দেখা দিল আশ্চর্য এক আভা! 'এক জনকে ভালো লাগত, খুব ভাল। আলাপও হয়েছিল লুকিয়ে। শুধু আমায় একবার চোখে দেখবার জন্যে বেচারা রোদ-বৃষ্টি মাথায় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তায়। একদিন অনেক তোড়জোড় করে সন্ধ্যার পর লেকে গিয়ে বসেছিলাম, ঘণ্টা দেড়েক হবে, নির্জন, অন্ধকার রাত, কিন্তু কি আশ্চর্য জানো—সারাক্ষণ ও আমার একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে বসে রইল, লেকের জলে তারাগুলো কাঁপছিল, আর আমার একান্ত কাছে বসে কাঁপছিল ও। কি দুর্ভাগ্য দেখ, দাদা ঠিক ঐ সময়ে কয়েকটি বন্ধুর সংগে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, ওকে ফাঁকি দেবার জন্যে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকোলাম, কিন্তু দাদা চিনে ফেলল, সেখানেই, অপরিচিত লোকের সামনেই, দাদা ওকে কি অপমানটাই করল, কি বলব। বার বার মনে হচ্ছিল লেকের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণটা শেষ করে দিই।' চপলার চোখে বুঝি জল চিক্‌চিক্ করে উঠল।

'কিন্তু ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হলনা। আরও রং চড়িয়ে বাবাকে বলা হল ঘটনাটা; বাবাকে ত দেখেছো। রাগে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেলেন। বয়েস তখন কত? সতেরো কি আঠারো হবে, চুলের গোছা ধরে দেয়ালে ঠুকতে লাগলেন মাথাটা যতক্ষণ না রক্ত বেরোয়। যখন মাটিতে পড়ে গেলাম, পিঠে গোটা কয়েক প্রচণ্ড লাথি দিয়ে বললেন, যা দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে! টানতে টানতে রাস্তায় বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন।' চপলা চুপ করল।

কাহিনীটা শেষ হবার আগেই ভবতোষ বলল, 'আর এত অপমানের পরেও তুমি আবার সেই বাড়িতেই ঢুকে পড়লে সুরসুর করে, যার জন্যে এত লাঞ্ছনা সহ্য করলে—তারই হাত ধরে চলে যেতে পারলে না বাড়ি ছেড়ে?'

'হয়ত যেতাম—যদি ঠিক সেই সময়ে পাশে এসে সে আমার হাত ধরত শক্ত করে। কিন্তু কেউই এলনা। মা এসে ঘরে নিয়ে গেলেন আমায়।'

'আর তার কি হল?'

'সে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল আমার জীবন থেকে।'

বাইরে ঘন আঁধার, ঘরের মধ্যে নিবিড় নিস্তব্ধতা।

চপলা হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল, 'দেখ, ভর সন্ধ্যেয় কি ভূতের গল্প ফেঁদে বসেছি। শোন, মেয়েটার ভীষণ জ্বর দুপুর থেকে, শুধু বলছে গলায় ব্যথা, কিছুই গিলতে পারছেনা, বিকেলে একবার খাওয়াতে গেলাম, নাক দিয়ে বেরিয়ে গেল সব!'

'নাক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে কি হে! ডিপথিরিয়া নয় ত!' শংকিত গলায় জিজ্ঞেস করল ভবতোষ।

'কি জানি, সন্তোষ ডাক্তারকে একবার ডেকে নিয়ে আসবে না কি?'

'যাচ্ছি, এখুনি যাচ্ছি!' ভবতোষ উঠে পড়ল টাকাপয়সা ফেলে।

'চা-টা খেয়ে যাওনা। এখুনি করে দিচ্ছি!'

'এসে খাব, ডিপথিরিয়া যদি হয় ত মুস্কিল! একটুও সময় নষ্ট করা উচিত নয়।'

সন্তোষ ডাক্তার দেখে বলল, 'ডিপথিরিয়া নিশ্চয়ই, পেনিসিলিন দিতে থাকুন, চার লাখ করে, সেরে যাবে।'

'কত দিন দিতে হবে?' শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করল ভবতোষ।

'দিন চারেক।'

'আজকাল পেনিসিলিন কত করে?'

'চার টাকা চার আনা, আমার ওখান থেকে আনবেন, একটু সস্তা হবে।' ডাক্তার ভিজিট নিয়ে চলে গেল।

মাইনের অর্ধেকের বেশী খরচ হয়ে গেল চিকিৎসায়। দুশ্চিন্তা আর উৎকণ্ঠার মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে গেল। চপলার বালা আর আনা হলনা। বরং আরও কিছু খুচরো ধার হয়ে গেল নানা দিকে —ওষুধের দোকানে, ষ্টেসনারী দোকানে। চপলা বলল, 'প্রফুল্লবাবুর টাকাটা যে দেয়া হলনা, কি হবে?'

'কি আর হবে? দেখেই ত গেলেন কি বিপদ আমাদের গেল।'

'কোনো জায়গা থেকে যোগাড় করে আনতে পারবে না?'

'মাসের প্রথম দিকে টাকা ধার চাইতে গেলে বলবে নিশ্চয়ই জুয়ারী। বরং আমি গিয়ে বলে আসি—টাকাটা সামনের মাসে শোধ করে দেবো!'

'তাই যাও।'

সন্ধ্যের একটু পরেই ভবতোষ প্রফুল্লর কাছে গেল।

'মেয়েটিকে আজ পথ্য দিলেন, না?' প্রফুল্ল জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ।' হাত কচলে বলল ভবতোষ।

'এখন একটু সাবধানে রাখবেন, ডিপথিরিয়ার পরে হার্ট খুব উইক হয়ে যায়। বরং একটা টনিক—ডাক্তার কিছু বলেননি?'

'হ্যাঁ, একটা টনিক লিখে দিয়ে গেছেন, কিন্তু কি আর বলব আপনাকে এত সব খরচ হয়ে গেল একেবারে দেউলে হয়ে গেলাম বলতে গেলে, এখনও মাসের তিন সপ্তা পড়ে আছে। আপনাকে বলতে আর বাধা কি? আপনার কাছে ত কিছুই আর লুকোনো নেই। এই দেখুন না! আপনার টাকাটাও দিয়ে উঠতে পারল ম না! কি লজ্জার কথা বলুন ত!'

'তার জন্যে ব্যস্ত হবার কিছু নেই, আপনার এই বিপদে আপনাকে টাকার তাগিদ দেবো? যখন সুবিধে হয় দেবেন আপনি! আমার কোনই অসুবিধে হচ্ছেনা। বসুন, আসছি!' প্রফুল্ল নিষ্ক্রান্ত হল।

ভবতোষ মনে মনে কৃতজ্ঞতার ভাষা তৈরী করতে লাগল।

একটু পরেই প্রফুল্ল এল, হাতে কয়েকখানি দশ টাকার নোট, এগিয়ে এসে ভবতোষের কাঁধে একটা হাত রেখে আর এক হাতে নোট ক'খানি ওর সার্টের পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমার সন্তান নেই, কোনো দিন হবেওনা, অভিজ্ঞতা না থাকলেও সন্তান বাৎসল্যটা অনুভব করতে পারি। মেয়েটার যেন কোনো অযত্ন না হয়, দেখবেন। এ সামান্য টাকার জন্যে আপনাকে ঋণী থাকতে হবেনা, এটা আমি দিলাম আপনার মেয়েকে, শোধ করবেননা।' প্রফুল্ল মোটা শরীর নিয়ে ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারটায়।



বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোট ক'খানা বার করল, পঞ্চাশ। পঞ্চাশ? যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল সে।

মনে মনে হিসেব করে ফেলল সে, দু'বছর এগিয়ে নিয়ে এসে বীমা-পত্র দু'খানি আগে চালু করে নেবে, দু'টো মিলিয়ে টাকা একুশ লাগবে। টনিক আর কিছু পুষ্টিকর খাদ্য টাকা আট। চপলার একখানা তাঁতের সাড়ি টাকা দশ, বঙ্কিমের ছ'টা টাকা না দিতে পারলে ওর কাছে আর মুখ দেখানো যাবেনা। পানের দোকানে খুচরো ধার জমে জমে বাইশ টাকায় দাঁড়িয়েছে, ধার শোধ করতে না পেরে দোকান বদলেছে সে, অন্য ফুটপাত দিয়ে যাতায়াত করে। পাঁচটা টাকা অন্ততঃ ওখানে দিয়ে দেবে। ওহো! বাটা-র দোকানে জুতো মেরামত করতে দিয়েছিল প্রায় দেড় মাস, কিছুতেই আনা হচ্ছে না, একটা টাকা এ্যাডভান্স পর্যন্ত দেয়া আছে; দুটো চিঠিও ওরা লিখেছে এর মধ্যে—তার জুতো মেরামত হয়ে পড়ে আছে, সে যেন ডেলিভারি নিয়ে যায়। আড়াইটা টাকা দিয়ে জুতোটা নিয়ে আসতে হবে, একটা বছর পরা যাবে ত বটেই। জামার দোকানে গোটা চারেক পাঞ্জাবী তৈরী করতে দিয়েছিল প্রায় দু'বছর হতে চলল, দু'টো আনা হয়েছে, আর দু'টো আজও পড়ে আছে। এদিকে সেলাই করে করে জামা পরছে সে। একটা অন্ততঃ জামা তাকে আনতেই হবে, না হলে পরবারও কিছু থাকবে না। সেখানে লাগবে ছ'টা টাকা। ওর পায়ের সংগে সংগে হিসেবের অংক বাড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

ভবতোষ আশ্চর্য হয়ে গেল—চারিদিকে তার এত দেনা? আরও খানিক্ষণ ভাবলে আরও মনে পড়বে না জানি কত অসংখ্য ঋণ—যে-ঋণের কথা সে প্রায় ভুলে যাচ্ছিল। টাকার অভাবে কত কাজ যে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে আছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আগামী মাস থেকে সে যদি রোজগার করে, সে যদি শুধু ধার শোধ করতে আরম্ভ করে তাহলে পুরো একটি বছর তার লাগবে। বুক তার ঠাণ্ডা হয়ে এল, একি চোরা বালির ওপর ঘর বেঁধেছে সে? একি ভংগুর সেতুর ওপর পারাপার তার? যে-কোনো মুহূর্তে ঘর তার তলিয়ে যেতে পারে বালির নিচে, সেতুর নিচে, সেতুর নিচে জীবন-নদীর খরস্রোত, একটু পা হড়কালেই শুকনো খড়ের মত ভেসে যাবে, তলিয়ে যাবে। কোনো চিহ্ন থাকবেনা, কোনো হদিস থাকবে না।

ফুটপাতের এক কোণায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ভবতোষ ভাবতে লাগল; ক্ষিপ্র, ক্ষিপ্ত জনতার কোলাহলই তার কানে এলনা। ছবি পর ছবি ভাসতে লাগল তার চোখে—প্রফুল্ল, চপলা, টুলটুল, বুলবুল, রুবি, অফিস, অগণিত বন্ধুবান্ধবের মুখ, হারিয়ে-যাওয়া, পেছনে-ফেলে-আসা কয়েকটি মেয়ের মুখ, মানুষের পর মানুষ, ঘটনার পর ঘটনা। কিন্তু পৃথিবীর কোনো কিছুরই সংগে তার যেন কোনো যোগাযোগ নেই, সম্বন্ধ নেই। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত কোনো এক মানুষ সে সময়ের পাড়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে সময় নেই, স্থান নেই, কাল নেই।

একটি মাঝারি ঘর। দু'দিকের দুটো দরজাই বন্ধ। জানলায় পর্দা ঝুলছে, পাখার মৃদু খস্‌খস্ শব্দ। রাত প্রায় পৌনে দুটো। মেঝেয় সতরঞ্চির ওপর পাঁচটি লোক চক্রাকারে বসে তাস খেলছে; পয়সার টুংটাং আওয়াজ আর মৃদু মন্থর কথার আওয়াজ।

'কত যাচ্ছে ?'

'বাইশ। তোমার ?'

'হিসেব নেই।'

'কি হবে আর খেলে, মেক আপ করার আছে ?'

'ক্ষেপেছো ? দাও একটা সিগারেট দাও।'

'একটাই আছে, দাঁড়াও, ছেঁড়া যাক।'

'আমায় একটা টান দিও হে।'

'তোমার আবার সিগারেটের দরকার কি ? তুমি ত মোটা জিতছ ?'

'নাঃ, কত আর। দু'প্যাত্ত হবে।'

'দু'প্যাত্তি ? কেন ভূতের গল্প করছ ? এই ত একটা পনেরো টাকার বোর্ড মারলে !'

'এই ত মানে কি ? প্রায় ঘণ্টাখানেক হল, তারপর থেকে যে সমানে ব্লাইণ্ড দিয়ে যাচ্ছি !'

'নাও ! নাও ! তাড়াতাড়ি কর ! দুটো বাজে !'

'চার।'

'চার।'

'সো !'

'কি হে ! মাঝ রাত্তিরে টপ রান কি হে ?'

তাসের একটু খস খস শব্দ !

'না হে ! বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, খেলাটাকে ছাড়তে হবে।'

'আরে তোমাদের ত কোনো মাত্রা-জ্ঞান থাকে না ! বললাম এগারোটার সময় সবাই উঠে পড়, কেউ আর ওঠবার নাম করেনা।'

'হ্যাঁ, অল্পক্ষণের জন্যে খেলাটা প্লেজেণ্ট লাগে !'

'আর বাবুরা ত এলেনই ত সব ন'টার পর। সীন চার !'

'নটার পর এলেও ত হত ! দুই ব্লাইণ্ড ! রাত দশটার পর সব খেলতে আসার কোনো মানে হয় ?'

'রিয়েলী ডিস্‌গাস্‌টিং। দুই।'

'এর পরদিন ভাই আমি ঠিক আটটা পর্যন্ত বাড়ি থাকব, তারপর এলে আমাকে পাবেনা, বলে দিচ্ছি। সমস্ত সন্ধ্যেটা বোকার মত বসে থাকব আর ছেলেমেয়েরা বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে বিরক্ত করবে। দুই।'

'খেলাটা তুলেই দাওনা ! কি আর দুধ দিচ্ছে এতে ? দুই।'

'আরে খেলা তুলে দিলে বন্ধু-বান্ধবদের সংগে আর দেখাই হবেনা। খেলাটা আছে বলেই তবু দেখা-সাক্ষাৎ হয়। সীন চার।'

'তুমি সীন ? না হে ! এ-সম্বন্ধে একটা সিরীয়াস ডিসিসান নেবার সময় এসেছে। অফ। দেখছো কি রকম বুড়িয়ে যাচ্ছি আমরা ? শেষকালে একটা শক্ত অসুখ হবে, বলে দিলাম।'



'মরবার আগে সবারই একটা না একটা শক্ত অসুখ হবে, নতুন কথা কি বলছ ! আমিও সীন চার। বক বক না করে তাড়াতাড়ি দানটা শেষ করে এসো ওঠা যাক, দুটো বেজে গেছে, কাল আবার অফিস আছে না ?'

'আমাদের জীবন এমনি করেই যাবে। রাত দুটো পর্যন্ত তাস পিটে একটু শ্মশান-বৈরাগ্য আসবেই। তাস না পিটে কি তুমি করতে পার ? ভাল ছবি আমাদের জীবনে আর হবেনা, যে-সমস্ত ছবি আজকাল দেখানো হয় তাতে ঘুম পাবে নয় ত মাথা ধরবে। ভাল পত্রিকা বা বই দুর্লভ। যাবে কোন চুলোয় ? রাস্তায় বেরুলে অকথ্য ভীড় আর কানফাটা গোলমাল। লেকে গিয়ে যে কিছুক্ষণ বসবে তার উপায় নেই, হয় লারিলাপ্পা নয়ত গণবাদী ছেলেমেয়েদের খুচরো প্রেম। তোমাকে যদি বাঁচতে হয় কি নিয়ে বাঁচবে তুমি ? তাস ছাড়া আর তোমার গতি কি ? অফ্।

'তাস আছে বলে এতদিন চরিত্রটা বজায় আছে। সীন চার। না হলে হয় মাসাজ হোম না হলে লইজিয়ানা হোটেল।'

'চার।'

'চার।'

'দেখাও।'

'ও হে ! একটু জল গড়াও না।'

'আর জল খায়না, চল ! রাস্তায় পুলিশে ধরবে।'

'লাস্ট ডীল।'

'লাস্ট ডীল।'

'লাস্ট ডীল।'

"পশ্যামি তব যদ্রত্নং দানার্থং দেহি সত্বরং
দানং দত্বা কুরঙ্গাক্ষি মথুরাং গচ্ছ সুন্দরি !"

# মালতী-রাত

## সলিল বন্দ্যোপাধ্যায়

মেল আজ একটু লেট যাচ্ছে। এক ঘণ্টা। খড়্গপুরের কাছাকাছি এসে কি যে একটা বিশ্রী গোলমাল হোলো কালো বিশাল ইঞ্জিনটায়, প্রায় এক ঘণ্টা আর চললো না। রাস্তায় গেল থেমে। টাটানগর থেকে এলো শক্তিশালী আরেক ইঞ্জিন, পূর্বতন শ্রান্ত ইঞ্জিনটা সেখানেই বরখাস্ত হয়ে গেল।

বিরাট লম্বা গাড়িটায় বিপুল ঝাঁকানি দিয়ে জোড়া লাগলো নতুনটা, অপেক্ষামান কলকাতা-গামী যাত্রীরা অনেকক্ষণ পরে বিশ্রী ঝাঁকানিতে বিশ্রী তিক্ত অপেক্ষাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে যেন হাঁপ ছাড়লো। কামরায় কামরায় নেভানো বাতিতে আলো ঝলমল কোরে ওঠলো পুনর্বার। অভিজাত-শ্রেণীতে পাখা খুলে গেল।

তবু, হয়ে গেল লেট, প্রায় একঘণ্টা।

হাওড়ায় পৌছুতে গিয়ে এই একঘণ্টা লেটকে 'মেক-আপ' করা নিয়ে গাড়ির কামরাতে-কামরাতে গুঞ্জন ওঠলো। রাতের নিশ্চুপ মাঠের ওপর দিয়ে দু'পাশে জল-জঙ্গল-বসতি-বাড়ী ফেলে নতুন ইঞ্জিন একটা ভয়ঙ্কর চেঁচান গলায় যেন আর্তনাদ কোরে ওঠলো।

রাত্রির অন্ধকার।

একঘণ্টা লেট।

আকাশে অসংখ্য তারা জলছে। গাড়ি চলছে তবু যেন তারাগুলো নড়ছে না। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া ইঞ্জিনের আগুন-বাতাসে মিশে গরম হোয়ে ওঠছে, তবু যেন উন্মাদনা কমছে না।

বম্বে মেল চলছে, একঘণ্টা লেটে। তবু চলছে।.....

স্পীড্ রেগুলেটারের ওপর হাত রেখে অবিনাশ দাস স্থির চোখে চেয়েছিলো পথের দিকে। গাড়ির লাল আলো যে পথের ওপর তীব্র হয়ে পড়েছে, সেইখানে সেই ক্রমাগ্রসরমান দু'টি সরীসৃপের প্রতি চোখ রেখে। বড় বড় স্থির চোখ রেখে রাতজাগা অবিনাশ দাস স্পীডো-তে হাত রাখলো।

ইঞ্জিনের বয়লারে ফায়ারম্যান রামসিং কয়লা ঢালছে ক্রমশঃ, জো-ড্রাইভার আমেরিকান মিঃ ডব্লুউ, পল শুধু দেখে যাচ্ছিলেন আরেক পর্বে দাঁড়িয়ে।

ইঞ্জিনের বুকের ডান আর বাঁ দিকে বাইরে মুখ বার করে দিয়েছেন যথাক্রমে মিঃ পল এবং অবিনাশ।

'অবিনাশ, একঘণ্টা লেট যাচ্ছে গাড়ি। মেক আপ হবে না। স্পীড্ বাড়াও।' ডব্লুউ পল বললে অবিনাশকে। মাথায় ইংরেজি অভ্যেসের ছোট্ট টুপিটা কপালের কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়ে পল তাকাল অবিনাশের প্রতি।

'স্পীড বাড়াও, দাস, আর একটু দাও'

পল অস্থির হয়ে তাকান হাতঘড়ির দিকে, ঘামা, কালিপড়া সাদা ফরসা হাতটার দিকে।



তীব্র স্বরে একটা চীৎকার কোরে ইঞ্জিনের হুইসিল বাজিয়ে দিলে পল। গোঁ গোঁ কোরতে কোরতে নতুন ইঞ্জিনটা সারা কামরাগুলোর ভার বয়ে নিয়ে ছুটে চললো।

আলো-বাতাস-অন্ধকার।

বাতাস! বাতাসে মুখ ভাসিয়ে দিলো দাস। চোখ খুলে মাথাটা লাইনের দিকে বাড়িয়ে দিলে। আজ কি ঝড় উঠেছে? বঙ্গোপসাগর থেকে কি মরশুমি বাতাস আজ এ মাঠের অঞ্চলে ধেয়ে এসেছে?

এটা কোন কাল—শীত, হেমন্ত না বসন্ত? চোখ দু'টো চেপে ধরে হাতটাকে শক্ত কোরে স্পীড রেগুলেটারে রেখে একবার বাইরে চেয়ে থাকা পলের দিকে তাকাল ড্রাইভার অবিনাশ দাস। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে সব, সব যেন ঝড়ের মত মুহূর্তে মুহূর্তে উন্মত্ত হয়ে পালাচ্ছে পেছনে। মিনিটে মিনিটে এক এক শ মানুষের নিশুতি রাত যেন পালিয়ে চলেছে। বাতাস—গরম—ঠাণ্ডা। আগুনের বয়লারে দাউ দাউ কয়লা জ্বলছে, জলের বুকে রাশি রাশি বাষ্পের কণা জমে জমে ফেটে ওঠছে। বয়লার কাঁপছে। অবিনাশের হঠাৎ মনে হ'লো বম্বে মেল চলছে না, ও যেন সে নিজেই নিজেকে ধ্বংস কোরতে ফুলে ওঠছে। যেন রেললাইন নয়, আত্মহন্তা পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে ও।

স্পীড। স্পীড, স্পীড, আরও। আরও···সোঁ ওঁ ওঁ ওঁ·· হাতের শিরাগুলি দপ্ দপ্ করে বাড়ছে, বাড়ছে ড্রাইভার ইন্‌চার্জ মিঃ অবিন'শ দাসের।

একবার পলের দিকে চেয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলে ও। একঘণ্টা লেট। আর মাঝে স্টপেজ নেই, শুধু হাওড়া·····

হাত শক্ত হয়ে ওঠছে, ঘুরছে চাকা, চাকায় চাকায় যেন বিদ্যুত জ্বলে ওঠছে। বাতাসের স্তিমিত শান্ত নীড়কে বিশ্রী ভয়ঙ্কর ভাবে চূর্ণ কোরে নিজের শক্তির পরীক্ষায় যেন উন্মাদ হয়ে ওঠলো অকস্মাৎ অবিনাশ। এ লাইনে ওর এক বছরের ড্রাইভারী। এক বছর ধরে ক্রমাগত ইঞ্জিন চালিয়ে নিয়েছে এই লাইনটার ওপর দিয়ে, এর জয়েন্ট, এর নাট, এর ফিশপ্লেট, এর স্লিপারের প্রতিটি স্তবক যেন মুখস্ত হয়ে গেছে তার। এর আশেপাশের মানুষ, এর আশেপাশের বাড়ী, গাছপালা, কলকারখানা, শিল্প-সহর এর আশেপাশে এক বছরের ক্রমাগত ইঞ্জিন চালিয়ে দাস যেন আর রাস্তায় চোখ খুলতো না। চোখ বুঁজে স্পীড রেগুলেটারটা ধরে ও চলে যেত মনে মনে দিনে বা রাত্রে একটি নিভৃত কোণে, তার একান্ত আপনার সে দিনের তৈরী স্ত্রীপুত্র-মাতাপিতার সংসারটায়।

ইঞ্জিন চালাতে চালাতে চোখে ও শুধু মালতীকে দেখতো, আর তার নতুন ছেলেকে। গাড়ি থেকে, কাজ থেকে বাড়ী এসে কালো হাতে ও চুমু খায়, মারে, মার খায়, একটি ছোট পাতলা হাতের, তার ছেলের। কিন্তু বড্ড রোগা হয়ে যাচ্ছে মালতী। বাবা মা-র দিকে চেয়ে মনে হয়েছে, কোথায় যেন গোলমাল হচ্ছে একটা। ভাইটা কলকাতায় ডেইলী প্যাসেঞ্জারি কোরে পড়ে, কলেজে পড়ার সখ। নিজে পড়েনি। তাই, ভাইটা পড়ুক ভাল কোরে। স্পীড-কণ্ট্রোলার ধরে আকাশের তারায় তারায় কি সব খুঁজে বেরিয়েছে অবিনাশ।

গাড়ির লোকগুলোর তন্দ্রা ছুটে যাচ্ছে। বোম্বে মেল আজ লেট, মেক আপ কোরেছে সে। আমেরিকান পলের প্রথম কথা, ইনচার্জ দাস ভাবছে, কিন্তু এরই নাম মেক আপ? গাড়ির মধ্যে

বাতাস নয় ভয়ের আগুন ঢুকলো, জানালা দিয়ে তাকাতে চেষ্টা করলো জনতা-যাত্রী। এ কি ট্রেনটা যাচ্ছে? কিন্তু, কিন্তু যে কোন মুহূর্তে লাইন থেকে ছুটে যেতে পারে! বোম্বে মেলে এত স্পীড ওঠেনা তো! এ কি! ট্রেনটা কেমন কাঁপছে, বাতাস গোঁ গোঁ কোরছে। তারারা জোনাকি হয়ে যাচ্ছে, আলোগুলো বাইরে লাইন হোয়ে যাচ্ছে—বাড়ীঘর কারখানা গাছ কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বাইরে। শুধু মুহুর্মুহু দানবটা চীৎকার কোরছে। ভীতির, কোন পৈশাচিক উল্লাসের। যাত্রীদের শরীর অকস্মাৎ ভয়ে কাঁটা দিয়ে ওঠছে। ভাবে, ড্রাইভারটা কি মদ খেয়েছে?

একদিন মদ খেয়েছিল মিঃ দাস। সৎ জীবনযাপনের চেষ্টা করা যেখানে সব প্রতারণা, সেখানে একদিন সে মদ খেয়েছে, মদ খেয়ে ধরেছে স্পীড-কন্‌ট্রোল। আজও! বাতাসের আগে, বাতাসে বাতাসে ঘষা লেগে বাজ পড়ছে রাশি রাশি, পল কি বলছে শুনছে না, ট্রেন চলছে, ট্রেন চলেছে, ট্রেন কাঁপতে কাঁপতে ধূলোর মত অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, বম্বে মেল মেক আপ কোরছে!

জীবনের মেক আপ কতটুকু হলো এই চল্লিশ বছরের জীবনে? ভাইটা কলকাতায় আন্দোলন কোরতে কোরতে মার খাচ্ছে। বাড়ীতে মার খুব অসুখ, ডাক্তার বলেছে ম্যালাস্কোলিয়া। সে আবার কি অসুখ? শুধু খাওয়া নেই, পড়া নেই, জীবনের প্রতি ভীষণতর ভীতি। বাড়ী গেলে তাকে জড়িয়ে ধরে কান্না। ড্রাইভারের বোন বলে দু'টা বোনের ভাল পাত্র জোটে না, দুধের অভাবে ছেলেটা কাঁদতে ব্যথা পায়! শিশুর মা রাতে শিয়রে বসে থাকে, জাগ্রত, কিন্তু কথা বলে না, বোধ হয় ড্রাইভার স্বামীর ওপর অসীম ক্রোধে। অভিযোগ, অভিশাপ, মাইনের টাকা খরচ কোরে একটা নতুন কিছুও ঘরে ওঠে না, পেটেই যায় সব! মুখে মালতীর মরা ছায়া! আধুনিক জীবনের অবিকল সব মিল, হাজার হাজারের মিল ছবি!

রেল-লাইন দেখলে না দাস, ছবি দেখলে, উন্মত্তের মত, উদ্‌ভ্রান্তের মত কালো এক রাশি চুল দেখছে শুধু সে, একটি ফ্যাকাশে নারীমুখ, একটি শুকনো ভাবী মার হতাশ করুণ হাতছানি, বাঁচবার প্রত্যাশার আকুল বাড়ানো দু'টি হাত!

মালতী! স্পীডটা ফুলকির মত বাড়িয়ে দিলে দাশ। এখন, এখন আর বিশ্বাস নেই, যে কোন মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যেতে পারে, এক মুহূর্তে গাড়ি চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। হাজার হাজার মানুষ ছেলে মেয়ে পুরোন আর নতুন সব মা ছাই হয়ে যেতে পারে।

'অবিনাশ!' চীৎকার কোরে ওঠলো পল। ছুটে এসে ওর হাত চেপে ধরলো, কিন্তু আমেরিকান হাতকে কালো হাত দিয়েই আজ সরিয়ে দিলে হোচট দিয়ে দাস।

'দাস! দাস তুমি কি করছ!'

'ঠিক আছে!' নিস্পন্দ উত্তর।

'না, না স্পীড কমাও, গাড়ি—গাড়ি উল্টে যাবে! থামাও!'

'না'—শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ শব্দটার দিকে শুধু কান পেতে রইলো অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে মিঃ অবিনাশ দাস। আমেরিকান ড্রাইভার পল ভয় পেয়ে গেল গাড়ি আর দাসের চেহারার দিকে চেয়ে। বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠলো নিজেকে।



'পল?' উন্মত্ত গাঢ় গলায় ডাকলো দাস। পলের ভয় ঢুকেছে, ব্ল্যাক ইণ্ডিয়ানকে সে আজও চিনতে পারেনি। মদ খেয়েছে দাস, মাতাল!

'দাস! আই রিকোয়েষ্ট ইউ, হাজার হাজার নারী পুরুষ, তোমারই দেশের, তোমারই জাতির যাত্রীরা আজ আমাদের দিকে চেয়ে আছে, শুধু আমাদের হাতের পুতুল হয়ে। তুমি কি এতগুলোর প্রাণ নিয়ে খেলা কোরতে চাও দাস? প্লিজ্ প্লিজ্ ষ্টপ্, ষ্টপ ফার্ষ্ট প্লিজ্…।'

ফায়ার ম্যানটা সিঁড়ির কাছে ওঠে কাঁপছে, কখন শেষ জীবন-বাতাসটুকু নিয়ে সেও লাফিয়ে পড়বে, আজ দাসকে বিশ্বাস নেই। শালা নেমকহারাম মাতাল বনেছে!

ফসিল! এই অন্ধকার একটি রাত কি কখনও ফসিল হয়ে থাকবে না বেঁচে? এই কিছু না দেখা, মাথা ঘোরা পৃথিবীটার রেলপথ আর জীবনপথটা কি হাজার হাজার লোক যারা আজ মরবে তাদের কাছে তামাসা হয়েই নিভে যাবে, অতটুকু বেঁচে থাকবে না? হাওয়ায় নিজের মাথাটা আরও ঝুলিয়ে দিলে বাইরে দাস, প্রচণ্ড ব্যথা পেয়ে রডে লেগে কেটে গেল বুঝি মাথাটা।

রক্ত বেরুলো মুহূর্ত্তে…

পল চীৎকার করে ওঠলো: 'দাস!'

'থামাও থামাও পার যদি থামাও, পল। চাকাটা থামিয়ে দাও, একেবারে একদম থামিয়ে দাও' —হঠাৎ অমারত্রির মৃত পাণ্ডুর হাজার হাজার জীবনের কণ্ঠে বললে যেন ও পলকে, কপালটা চেপে ধরলে দু'হাতে।

পল হতভম্বের মত চেয়ে রইলো, ভীষণ ঘৃণা হলো অকস্মাৎ দাসের ওপর, 'এই? এই রকম তোমরা দাস?'

'না, না পল, তুমি ওকে বাঁচাও।'

গাড়ির চাকার শব্দ একটু একটু যেন ফুটছে, একটু একটু করে গোঁ গোঁ বাতাসি শব্দটা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে, সোঁ সোঁ তানটা যেন জানলা থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে, পলের হাতে চাকার শব্দ ফুটে ওঠলো, অকস্মাৎ মৃতপ্রায় যাত্রীর হৃদয়টুকু ফিরিয়ে দিয়ে পল যেন গর্ব অনুভব কোরলো এত ভয়ের মধ্যেও।

'থামাও!'

চীৎকার করে ব্রেক ধরলো লাফিয়ে দাস, মাথায় রক্ত ঝরছে বন্যার মত।

'কেন?' পল আতঙ্কের শব্দ করলো।

'ইউ ডণ্ট নো।' ব্রেকটি হঠাৎ কসে চেপে দিল দাস, তারপর বিরাট একটি ঝাকানি দিয়ে টাল সামলে পড়তে পড়তে দাঁড়িয়ে গেল ট্রেন, বোম্বে মেল। ডিসটেণ্ট সিগনালের কাছে।

হেড লাইটের ফোকাসের দিকে নির্নিমেষ চেয়ে রইলো দাস, পলও, লাইনের ওপর সিগনালের নিচে আলো পড়েছে।

স্তম্ভিত পল বললো: 'কি দেখছো লাইনে?'

'মালতীকে।'

'মালতী?' পল কেঁপে ওঠলো।

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী! এক সপ্তা'ও হয়নি, এমনি এক ট্রেনের নিচে সে আত্মহত্যা ক'রেছে। পল! জীবনে সে সুখ দেখে নি, তার বড় আফ্‌শোষ!'

মাথার রক্ত হাতে টেনে এনে পলের চোখাচোখি তাকালো দাস: 'তোমার দেশে এসব আছে পল? এমন সুন্দর ডেথ্?'

'আছে!'

নিস্পৃহ, নিরুত্তাপ কণ্ঠে পল উত্তর দিল।

"অনেকজাতিসংসারম্ সন্ধাবিস্‌সং অনিব্‌বিসম্
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনম্।"

"একই দুঃখী গবেষক শিল্পীপ্রাণ হতে বারবার
প্রবেশে-প্রস্থানে-নীড়ে গড়ে নানাজাতির সংসার।"

# একটি মেঘলা দিনের গল্প

## দেবব্রত ভৌমিক

অবশেষে ন্যায়রত্ন লেনের ভাঙাচোরা শ্যাওলাধরা বাড়িটারই একখানা ঘরে পেইংগেষ্ট হয়ে এসে উঠ্‌ল বাসব। ওর এক অদ্ভুত খেয়াল। হষ্টেল-বোর্ডিং-লজ্ নাপছন্দ করে লগ-কেবিন—খেয়াল ছাড়া আর কি!

শ্যাওলা-ঢাকা প্রাচীর-ঘেরা ছোট্ট এক টুকরো ছাদ। হাত কয়েক লম্বা আর হাত পাঁচেক চওড়া ঘরটাই তার প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়ে আছে। চুণ-বালি-খসা ইট বেরকরা দেয়াল: ছাদে ঝুলকালি পুরু হয়ে জমে আছে। বাসস্থান হিসাবে কিছুতেই একে ভাল বলা যায় না। কিন্তু তবুও বাসবের ভালো লাগল।

অপরিচিতের সাথে পরিচয়ের একটা আনন্দ আছে। অকস্মাৎ এই দরিদ্র পরিবারটির একেবারে মাঝখানে এসে পড়ে বাসব কেমন যেন একটা পুলক অনুভব করছিল।

আর জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়ে ও দেখতে পেল সবুজের চিহ্ন। ছাদের পাশেই ডালপালা মেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বটগাছ। আরো খানিকটা দূরে ছোট্ট একটা পার্ক। লোহার শক্ত রেলিং দিয়ে ঘেরা, পিচবাঁধানো পথ। লোকজনের চলায়-ফেরায় ঘাসের চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেছে, মাটির রস গেছে হারিয়ে—শক্ত হয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে। সব কিছুই শহুরে, কৃত্রিম—তবু মাটি, তবু গাছ। সবুজ!

আরো কিছু ছিল, যা বাসবের শহুরে জীবনে প্রায় অপ্রত্যাশিত। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই ও দেখতে পেল আকাশ। চারতলা পাঁচতলা বাড়ীর ফাঁক দিয়ে পাওয়া সরু একটুকরা মেঘের খণ্ড নয়: দিক থেকে দিগন্তে বিস্তৃত নীলের সমুদ্র; অখণ্ড, সীমাহীন, অন্তহীন রূপের বাসর—আকাশ! রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে সকলের চোখ এড়িয়ে এক ঝলক তাকিয়ে নেওয়া না; ও দেখল, ভাল করেই। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানতে-টানতে দেখল ঐ আকাশ, ঐ গাছ, পার্ক। ইংরেজি উগ্র প্রেমের সিনেমা দেখে এসে দেখল; কফি-হাউসে ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের তুফান তুলে এসে দেখল।

অনায়াসেই ওর মনে পড়ল মধুমতীর বাঁক, আমকাঁঠালের বাগান, শিউলি-ঝরা সকাল। ভোরবেলায় ও কানপেতে শুনলো গাছের ডালে পাখির ডানা ঝাঁপটানো। কাক-ডাকা নিঝুম দ্বিপ্রহরে আকণ্ঠ নিস্তেজ একটা তৃপ্তিতে ভরে এল ওর সারা দেহ। চোখ বুজে এল; ওর ঘুম পেল।

প্রথম দিন দুপুর বেলায় বাসব শুয়ে-শুয়ে সিগারেট টানছিল। এমন সময় দরজার বাইরে কার যেন ছায়া পড়ল। কোমল করুণ গলায় কেউ বললে, 'মা আপনাকে খেতে ডাকছেন।' বাসব চোখ তুলে তাকাবার আগেই সরে গেল ছায়াটা।

খেতে বসতে সামনে ধীরে-ধীরে ভাতের থালা নামিয়ে দিল একটি মেয়ে। কালো ছিপছিপে সাধারণ চেহারা। বয়স বছর কুড়ি হবে। বাসব দেখল, একেই ত ছায়া মনে করেছিল।

মা মহামায়া সামনে এসে বসলেন। নানা কথার ফাঁকে বললেন, 'ওটি আমার মেয়ে, বাবা।'

সীতা—হতভাগী মেয়ে। উনিশ বছর বয়স; এখনও বিয়ে হোল না। পার হবারও বিশেষ কোন আশা নাই। ছেড়া শাড়ীর বেশী গায়ে কোনদিন একখানা ভাল শাড়ী উঠল না। ও হতভাগী ছাড়া আর কে!

মহামায়া ডাকলেন, 'সীতা, ওরে শোন।'

ও এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। মুখ নীচু করে শাড়ীর আঁচলটা বারবার আঙুলে জড়াতে আর খুলতে লাগল।

মহামায়া বললেন, 'তোমার যা দরকার হবে ওর কাছে থেকে চেয়ে নিও, বাবা। লজ্জা কোর না।'

বাসব মাথা নাড়ল।—হ্যাঁ; লজ্জা কিসের।

চোখ তুলে ভালো করে মেয়েটিকে দেখল ও। কালো, গরীবের ঘরের সাধারণ একটি মেয়ে। ভীরু কুণ্ঠিত চাউনি; নির্মম সংসারের রুক্ষ দৃষ্টি এড়িয়ে কোথায় লুকোবে যেন ভেবে পাচ্ছে না।

ওর চোখে চোখ পড়তে সরে যায় সীতা।

বাসব চোখ নামিয়ে ভাতের থালায় মনোনিবেশ করে।

সেদিন এই পর্যন্তই।

তারপর প্রায় মাস ছ'য়েক কেটে গেছে।

বাসব রোজই দেখছে সীতাকে। সকালে-সন্ধ্যায়, দুপুরে খেতে বসে। ভোরবেলায় ঘুম ভেঙ্গে উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গতে-ভাঙ্গতেই ওকে দেখতে পায়। অত সকালেই স্নান সেরে চুল এলিয়ে দিয়ে ছাদে কাপড় মেলতে আসে ও। কালো হ'লেও তখন নিতান্ত মন্দ দেখায় না ওকে। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় কেমন একটা মাধুর্যময় লাবণ্যে ভরে ওঠে ওর তনুদেহ। গায়ে-জড়ান আঁচলের তলা দিয়ে পিঠ বেয়ে নেমে আসে ভিজে কালো চুলের রাশি, শেষ প্রান্তে একটা গিঁঠ বাঁধা।

সারাদিন এখানে ওখানে আড্ডা মেরে সন্ধ্যাবেলায় বাসব যখন বাড়ী ফিরে আসে, সে সময় রোজই দেখতে পায়, শ্যাওলা ঢাকা প্রাচীরের গায়ে বুক লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সীতা। দূরে আবছা অন্ধকারে ঝাপ্‌সা-হয়ে-আসা বটগাছটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে-তাকিয়ে কি যেন দেখে। বাসবকে দেখে আস্তে-আস্তে নেমে যায় নীচে।

আলাপও হয়েছে ওর সাথে।

বাসব বিশেষ কোন কৌতূহল বোধ করেনি। গরীবের ঘরের অতি সাধারণ একটি মেয়ে। আর তা'ছাড়া, ময়লা-শাড়ী-জড়ান ওর কালো দেহের মাঝে, ওর ভীরুকুণ্ঠিত মুখশ্রীতে আকর্ষণীয় বিশেষত্ব কিছুই খুঁজে পায়নি বাসব।



তবুও মোটের উপর মেয়েটিকে ভালই লেগেছে ওর।

সিনেমা, কফিহাউস, আর সহপাঠী বান্ধব-বান্ধবীদের মাঝে হাসি-গানে-মুখর উজ্জ্বল দিনগুলির এককোণে এই নিস্তব্ধ, আবছা অন্ধকারে-ঘেরা সন্ধ্যাগুলি কখনো কখনো বাসবের মনে একটা নিবিড় মাধুর্যের স্নিগ্ধ স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে গেছে।

কখনো বা বাসব সহানুভূতির সঙ্গে আলাপ জমাতে গেছে ওর সঙ্গে। কিন্তু সীতা যেন ওকে এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করেছে। জিজ্ঞাসার উত্তরে কোনরকমে হুঁ-হ্যাঁ দিয়ে সরে যেতে পারলেই যেন বাঁচে। কখনো সামনে পড়ে গেলে মুখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি সরে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না, পায়ে পা জড়িয়ে যায়, গতি মন্থর হয়ে আসে। ওর এই অকারণ লজ্জায় বাসব মনে মনে অনেক সময় বিরক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু আবার মনে হয়েছে, অশিক্ষিতা বয়স্কা মেয়েটির পক্ষে এই-ইতো স্বাভাবিক। দরিদ্রের এই অনূঢ়া মেয়েটির জন্য বাসব মনের কোণে কখনো বা একটু করুণা বোধ করেছে।

মাস ছয়েক পরের কথা।

কয়েকদিন থেকেই বাসব শুনছিল, সীতার নাকি কোথায় বিয়ের কথাবার্তা চলছে।

সেদিন খাওয়ার সময় মহামায়া বললেন, 'আজ ওকে দেখতে এসেছিল, বাবা।'

বাসব অন্যমনস্ক ছিল। চম্‌কে উঠে বললে, 'কাকে?'

—সীতাকে।

—ওঃ। তা কি হল?

—ওদের তো খুবই পছন্দ হয়েছে। স্বাস্থ্যবতী বয়স্থা মেয়েই চায়। সবই ঠিক—শুধু ছেলে সাতশো টাকা চায়। আর দাবী-দাওয়া বিশেষ কিছু নাই।

—ছেলে কি করে?

—বাগবাজারে দোকান আছে নিজের।

—দোকান? কিসের দোকান?

—মুদিখানা। তা আয় করে ভালই। বলছিল, লাভ বিশেষ হয় না। তবু মাসে সোয়াশো, দেড়শো হয়। ছেলের দোকান বড় করার খুব সখ। বিয়ের সাতশো টাকা পেলে দোকানে খাটাবে।

বাসব কোন কথা বলে না। আপন মনেই খেয়ে যায়।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মহামায়া আপন মনেই বলতে থাকেন, 'এমন পাত্র কি আর পাওয়া যাবে! কোন নেশা-ভাং নেই, উপায় করে ভাল। কিন্তু···সাতশো টাকা···এত টাকা পাবই বা কোথায়!'

ও-কথায় কান না দিয়েই বাসব প্রশ্ন করলো, 'চেহারা কেমন?'

—তা দেখতে শুনতে নেহাৎ মন্দ না। আর পুরুষমানুষের রূপ দেখে কে! এই কালো মেয়েকে যে নিতে চেয়েছে, এই তো ওর ভাগ্যি।

—হ্যাঁ, তা তো। মাথা নেড়ে বাসব সায় দিল।

মহামায়া বলে চললেন, 'ছেলের বয়স একটু হয়েছে। বছর দু'য়েক আগে প্রথম পক্ষের বৌ

মারা গেছে। দুটো বাচ্চা ছেলে রেখে গেছে। বলছিল, তাদের মানুষ করার জন্যই বিয়ে করা। আর তা'ছাড়া গরীব মানুষের কন্যাদায়ও উদ্ধার হয়।'

মহামায়ার অনর্গল কথায় সায় দিতে-দিতে এক সময় বাসব লক্ষ্য করে, দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন ওদের কথা শুনছে। হঠাৎ ও মহামায়াকে প্রশ্ন করে, 'কতো টাকা বললেন? সাতশো?'

—হ্যাঁ। সাতশো নগদ দিতে হবে। আর এদিককার খরচা-টরচায়ও কিছু লাগবে। এই হাজার দেড়েক হলেই হয়।

—আচ্ছা, আপনি সব ঠিক করুন। টাকা আমি কয়েকদিনের মধ্যেই আনিয়ে দিচ্ছি।

—তুমি দেবে! মহামায়া যেন বিস্ময়ে ফেটে পড়েন।

—হ্যাঁ।

—কিন্তু অত টাকা তোমায় শুধ্‌বো কোথা থেকে, বাবা।

'আপনার শোধ দিতে হবে না।' সহজ সচ্ছন্দভাবেই বললে বাসব।

'শোধ দিতে হবে না! এমনিই দেবে?' অত্যুগ্র উচ্ছ্বাসে মহামায়া বাসবের হাত চেপে ধরেন।

'আ···হাহা, কি করেন·····' কৃতজ্ঞতায় মহামায়ার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। আর কিছু বলতে পারেন না তিনি।

বাসব খেয়ে উঠে যেতে যেতে ভাবছিল সীতাকে ঠাট্টা করবে: 'আমাদের ফেলে স্বামীর ঘর আলো করতে চললে তো।' কিন্তু দরজার বাইরে কাউকে দেখা গেল না। বিয়ের কথায় বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে ও।

পরদিনই বাসব বাবাকে টাকাটা পাঠিয়ে দিতে লিখে পাঠাল।

আরো কয়েকদিন পরে। দিনটা ছিল রবিবার। বাসব সকালেই চা খেয়ে বেরিয়েছিল আড্ডা দিতে। রবিবারের আড্ডা, সময়ের খেয়াল থাকে না। বেলা হয়েছিল বেশ একটু—বৃষ্টি বাঁচাতে গেলে আরো হতো। ভিজে শরীরে বাড়ী ফিরে ভেজান দরজাটা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই বাসব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঘরের দরজা ত ভেজানই, দুটো জানলার একটা বন্ধ, আর একটার কপাট অর্ধেক খোলা। আবছা তরল অন্ধকারে ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আধখোলা জানলাটা দিয়ে বাদলা দিনের মলিন বিষণ্ণ খানিকটা আলো ঘরে ঢুকে সৃষ্টি করেছে একটা রহস্যময় আলোছায়ার আস্তরণ।

লাইটের সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েও বাসব আলো জ্বালল না।

জানালার পাশেই ওর বিছানা। পাতাই থাকে সারাদিনরাত। সিগারেটের ছাই, পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, সিনেমার টিকিটের কাউন্টার পার্ট, আরও দরকারী-অদরকারী নানান জিনিস ছড়ান থাকে সারাটা বিছানা ভরে। সেই দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বাসব দেখল কে যেন শুয়ে রয়েছে ওর বিছানায়।

কে! কে ও?



সীতা—হ্যাঁ সীতাই তো!

বাসবের বিছানাটার কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। সাদা ধপধপে চাদর পাতা। ফুল-আঁকা ঢাকনা দেওয়া নরম বালিশ। পাশ ফিরে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে রয়েছে সীতা।

চারদিকে চোখ বুলিয়ে সব কিছুতেই বাসব একটা নিপুণ মেয়েলি হাতের স্পর্শ দেখতে পেল। বইগুলি গোছান, আলনায় কাপড়জামা সাজান, এমন কি জলের কুজোটাও ঘরের কোণে ঠিক জায়গায় গ্লাস দিয়ে ঢাকা-দেওয়া। সব মিলিয়ে মনে হয় ঘরটা যেন মূর্তি পাল্‌টেছে।

কিন্তু, কিন্তু সীতা এখানে এল কি করে। বাসব অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগল, প্রশ্ন করলে, লজ্জায় যে মেয়ের মুখে কথা সরেনা, অপরের সামনে দিয়ে যে সহজভাবে চলতে পারে না, সে কিকরে ওর অনুপস্থিতিতে ওর শয্যায় এসে আশ্রয় নিয়েছে।

বিনা স্বার্থে যে-লোকটা এতগুলি টাকা দিল তার সম্বন্ধে কি ও কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল? তাই কি ছাদে কোন কাজে এসে উঁকি মেরে একবার দেখে যাচ্ছিল? হয়তো তাই। হয়তো বা ওকে না দেখে ঘরে ঢুকেছিল কৌতূহলের বশেই। আর ঘর-গোছানয় বাসবের আনাড়ী হাতের পরিচয় পেয়ে হেসেছিল মৃদু স্নেহের হাসি, গৃহস্থালির কাজে পুরুষের বুদ্ধিহীনতায় সব মেয়ে যেমন হেসে থাকে, তেমনি। তারপর অভ্যস্ত নিপুণহাতে সুন্দরভাবে গুছিয়েছিল সব কিছু। ছেড়ে-ফেলা জামার গাদা জড়ো হয়েছিল ঘরের কোণে; সদ্য-ধোপার-বাড়ী-থেকে-আসা কাপড় পড়েছিল চেয়ারের উপর, উঠেছিল আলনায়; এলোমেলো বইগুলি সাজান হয়েছিল; আর বিছানা থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল সিগারেটের টুকরো, ছেঁড়া কাগজ, আরও অনেক কিছু। তারপর?—শয্যার শুভ্রতা কি ওকে আকর্ষণ করেছিল? হয়তো। হয়তো বিছানায় উঠে বসেছিল ও, বুকের কাছে হাটু জড়ো করে। জানলা দিয়ে চেয়েছিল বাইরে। দেখেছে, মেঘ করেছে। তারপর ধীরে-ধীরে মেঘ যখন ঘন হয়ে আসছিল, তখন ও নরম বালিশে বুক চেপে অনিমিষে চেয়ে রয়েছিল। হয়তো অনেকক্ষণ। তারপরে ছুটে এল দুরন্ত ঝড়; জল নামল অঝোর-ধারে। ও হাতের উপর মাথা রেখে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। বৃষ্টিতে আসার সম্ভাবনা নাই বাসবের। ও নিশ্চিন্ত মনেই শুয়ে-শুয়ে আধখোলা জানালাটা দিয়ে দেখতে লাগল আকাশে বাদলমেঘের ঘনঘটা, সামনের বটগাছটার ডালে বৃষ্টিভেজা পাখীর ডানাঝাপ্‌টানো। ঝরো-ঝরো বর্ষণের নিরবিচ্ছিন্ন সুর শুনতে শুনতে ক্রমে ঘুমিয়ে জড়িয়ে এল ওর চোখ; শিথিল হয়ে এল সারা দেহ। বর্ষণসিক্ত নরম একতাল মাটির মত একসময় ও ঘুমিয়ে পড়ল।

বাসব একবার ভাবল, একি মেঘের ডাকে সাড়া দেবার মত মেয়ে?

আবার মনে হল, সব মেয়েই বুঝি এ-জায়গায় এক।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে গেল ও। ঝুঁকে পড়ল বিছানার উপর। আর পরক্ষণেই মন্ত্রমুগ্ধের মত বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। একি!

কে এ? ওর বিছানায় শুয়ে আছে পাশ ফিরে। সারা দেহে শিথিল আলস্য। এক হাতের উপর মাথা; অপর হাতে ক্ষীণ কটিদেশের উপর দিয়ে বঙ্কিমভাবে এলায়িত। ঢেউএর মত একরাশ কালোচুল ছড়িয়ে আছে বালিশে; বালিশ ছাড়িয়ে নেমে এসেছে শুভ্র শয্যায়।

মুখের খানিকটায় আলো পড়েছে, খানিকটায় অন্ধকার। মুদিত অপরাজিতার মত দু'টো ডাগর চোখের বোজান পাতা দীর্ঘ আঁখিপক্ষ আর টানাটানা যুগ্মভ্রুর মাঝে অপরূপ সৌন্দর্যময়। চিবুকের উপর একপাশে ছোট একটি তিল। পাতলা ঠোঁটদু'খানির একটুখানি ফাঁক থেকে মুক্তোর মত শুভ্র দুটো দাঁতের আভাস দেখা যাচ্ছে। মৃদু নিঃশ্বাসের সাথে-সাথে নাসারন্ধ্র কেঁপে কেঁপে উঠছে, উন্নত বুক উঠছে আর পড়ছে। নিবিড় কালো এলোচুলের রাশির মাঝে জানালার আধভেজান কপাটের ফাঁক-দিয়ে-আসা শান্ত ম্লান আলোয় উদ্ভাসিত একখানি মুখ, বঙ্কিম এলায়িত হাতের মাধুরী, আর শিথিল শয়নের মধুর ভঙ্গিমা, সব মিলিয়ে যেন আলোয়-ছায়ায়-গড়া একখানি ছবি। আজ এই বৃষ্টির দিনে মেঘে-ছাওয়া আকাশের তলে বাসবের জন্য কেউ কি গড়ে তুললো এই একটুকরো স্বপ্ন? স্পর্শ করলেই যেন সাবানের ফেনার রঙিন বুদ্বুদের মত মিলিয়ে যাবে, এমনি ভঙ্গুর।

বাসব আলো জ্বালল। ভাল করে দেখবে। এই কি সেই ময়লা-শাড়ী-জড়ানো ভীরু কুণ্ঠিত মেয়েটি—চলতে গেলে যার পা জড়িয়ে যায়, কোথায় মুখ লুকোবে খুঁজে পায় না।

উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় ও দেখল ভাল করে। হ্যাঁ, সেই। এই বৃষ্টির দিনে ওর ঘুমে কাতর মুখখানি কি যেন এক অজ্ঞাত মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সারা দেহে ওর কি মোহময় আমন্ত্রণ!

বাসবের অতি শৈশবে ওর মা মারা গেছেন। ওর মনে পড়ে না মা কেমন। তবুও অনেক অলস মুহূর্তে ও মনে মনে সঙ্গোপনে ছবি এঁকেছে, কল্পনা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়ে তুলেছে ওর মায়ের মূর্ত্তি। মনের এক অজানা কোণে কৈশোর থেকেই ও লালন করেছে সেই মধুর স্বপ্নকে। হঠাৎ ওর মনে হল, সীতার এই ঘুমন্ত দেহে ও যেন খুঁজে পাচ্ছে ওর মায়ের মুখের আভাষ। সারা অঙ্গ ওর ভরে উঠেছে নিরুতাপ স্নেহের দীপ্তিতে। ও যেন মা হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছে।

বাসব আলো নিভিয়ে দিল। অন্ধকারের বন্যা মুহূর্ত্তেই প্লাবিত করে দিল ঘর। অস্পষ্ট আলো আর ছায়া আবার মোহময় রহস্যের জাল বুনে তুললো।

বাসব পাশে বসে চেয়ে রইল একদৃষ্টে আলোছায়ায় ঘেরা সেই মুখখানির দিকে। সে মুখে ও যেন হঠাৎ নোতুন কিছু আবিষ্কার করেছে।

সীতাকে ডেকে তুলে দেওয়া উচিত। জেগে উঠে ওর লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকবে না। তবুও বাসব ডাকলো না। বোধ হয় সেই লজ্জাটুকুই ও দেখতে চায়।

কতোক্ষণ বাসব এভাবে বসে থাকে, তার ঠিক থাকে না। হয়তো অনেকক্ষণ।

ও সীতাকে স্পর্শ না করে পারে না। ধীরে-ধীরে হাত বাড়িয়ে দেয়।

হাত বাড়ালো বাসব, স্পর্শ করলো—দেহ না, মুঠো ভরে তুলে নিলো লুটিয়ে-পড়া কালো চুলের রাশি—বৃষ্টির ছাট-লাগা, ভিজে-ভিজে ঠাণ্ডা·····

# ছুটি

## অমল দত্ত

শোভা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকছিল। দীর্ঘ রেখা নয়—একটু লাল স্পর্শ। আচমকা মনে হয় মেয়েটি বিবাহিতা। স্ত্রী। শোভার ধারণা সিঁদুরের রেখা তাকে মানায় না। চেহারাটা এত খারাপ, রংটা বড়ো কালো—কারোর মনেই বুঝি রেখাপাত করে না। আয়নাটা আছে বলেই তো যত দোষ বেরিয়ে আসে, মনটা বিষিয়ে দেয়। আয়নাটা না রেখেও দায়, চুল আঁচড়াতে হয়, মুখে পাউডার মাখতে হয়—আর একটু সিঁদুর না টানলেও চলে না। জিমন্যাষ্ট বারীন রায়ের স্ত্রী, এ এলাকায় তাকে কে না জানে?

বারীনের সঙ্গে হাঁটতেও শোভার রাগ ধরে। লোকটা কত স্বচ্ছন্দে চলে। কোনো দৃকপাত নেই—কারোর অস্তিত্বের প্রতি খেয়াল নেই। এমন কি শোভার কথাও ভুলে যায়। পেশীর সঞ্চালনে হাসির উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে দিয়ে লোকটা অকারণ কৌতুক বোধ করে। আশেপাশের লোক-জনের কৌতূহল উদ্রেক করে। শোভা জানে এ কৌতূহল তার জন্যে। অসম তুলনার। তাতে আরো রাগ বাড়ে। এমন লোকের স্ত্রী হওয়া কত বিড়ম্বনা!

বাসরঘরে শোভা বারীনকে শুধিয়েছিল:

'আপনার বোধহয় খুব মন খারাপ হয়ে গেছে!'

'কেন?'

'আমাকে দেখে।'

'তোমাকে দেখে!' বারীন প্রথমটা একটু ভাবনায় পড়লো। পরক্ষণেই হো হো করে হেসে ওঠে বললে, 'ও, তুমি রোগা বলে? তা দেখনা, কয়েকটী আসন শিখিয়ে দেব, চচ্চড় করে মোটা হয়ে যাবে। কলেজের ছেলেদের তৈরী করে দিচ্ছি—আর তোমাকে ঠিক করতে পারবো না!'

শোভা হতাশ হলো। না, লোকটা সূক্ষ্মতার ধার ধারে না। আর নিশ্চয়ই কোনো দিনও ওর মুখখানা বুকে নিয়ে বলবে না,—শোভা, অনেক স্বর্গ এখানে লুকিয়ে রেখেছি, স্বর্গীয় সুষমায় তুমি নবজন্ম লাভ করো!

শোভা চেয়েছিল প্রেমের প্রতিদানে তার বিয়ে হোক। বুকভরা প্রেম বেঁধে রেখেছে, নেবার কেউ ছিল না। তা হলে তো মনের যাচাই হয়ে যেত, আর পদে পদে অনুগ্রহ কুড়িয়ে বেড়াতে হতো না। অনুগ্রহ বই কি! সুন্দরী হলে বুক উঁচিয়ে চলতে পারতো। আর বিয়েটাও জলাঞ্জলি হতো না।

কিন্তু বাঁধাধরা নিয়মে কত অভিভাবক পরখ করে গেল। স্মিত হাসির আড়ালে গোপন করে রাখল কটূক্তি। ভালো সম্বন্ধ এলো না। কিন্তু মফঃস্বল এক কলেজের জিমন্যাষ্টিক প্রফেসর বারীন রায়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল আশ্চর্যভাবে প্রজাপতি অফিসের মারফত। শুধু বারীনের এক বন্ধু

তাদের বাড়িতে এসে মেয়ের উচ্চতার একটা পরিমাপ নিয়ে গেল, ব্যস—তারপরেই আশীর্ব্বাদ, সাত দিনের মধ্যে বিয়ে।

বিয়ের ক'দিন পর বারীন তার দাঁতগুলি আর মাড়ি টিপে দেখেছিল, পায়োরিয়া আছে কী না। শোভা চটে বলেছিল, 'আমি কি বাজারের আলু-পটল?'

'না, তা নয়। দাঁত খারাপ হলে পেটের গোলমাল হবে যে। তুমিই তো কষ্ট পাবে।'

'কষ্ট কী আর কম পাচ্ছি!"

'সেটা সারানো উচিত। মাথার মগজ সবার হয় না—কিন্তু শরীর সুস্থ সবাই রাখতে পারে। এই যে কাল এসেছিল, নন্দন। জানো, বাংলায় সোনার মেডেল পেয়েছে—সাহিত্য চর্চা করে। কেমন লিকলিকে দেখেছো! একটু যদি স্বাস্থ্যচর্চা করতো তা হলে কত বেশী কাজ করতে পারতো বলো তো!'

'সবাই তোমার মতো নয়।'

বারীন লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, 'আরে আমার চেয়ে কত ভালো শরীরের গঠন আছে। আমি তো শুধু আমাদের শহরের চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম।'

শোভা বারীনকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল, লোকটার এত বয়েসেও মুখখানা কত কচি। তারপরেই অবজ্ঞায় মনে হয়েছিল—ছেলেমানুষ!

নন্দন চৌধুরীর কথা বলায় মুন্সিয়ানা আছে। বাংলার অধ্যাপকই বটে। এমনি কথা বলে, এমনি আমেজ আনে যেন অনেক দিনের পরিচিত। ওর উপহার দেবার রীতিটুকু কত সুন্দর, কত ভদ্র। অনেকদিন মেজে ঘষে বুঝি আদবকায়দা সব চকচকে করা হয়েছে। বারীন নন্দনকে পরিচয় করে দিয়েই চলে গিয়েছিল একদল ছেলের সঙ্গে মড়াপোড়াতে। শব নাকি বারীনের অপেক্ষায় বাসি হয়ে যাচ্ছে—নন্দন ঐ ঠাট্টাটুকু দিয়েই শোভার শুভরাতে আসর জমিয়েছিল। তারপর দুপুর রাতে বারীন ফিরে এলে স্ত্রী-আচারের জন্যেও নন্দনের দরকার ছিল।

শোনা যায় নন্দনের দুই বিয়ে। কেউ কেউ বলে, তিন। তবে এক স্ত্রীকে নিয়েই নন্দন ঘরবার করছে। রুগ্না মহিলা, ফিটের ব্যামো আছে। অনেক ডাক্তারই চিকিৎসা করেছেন নাকি, তবুও সারে না।—অন্তত নন্দন তা-ই বলে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। শোভার মনে হয়, নন্দনকে অনেক মেয়েই চাইবে তাতে আর বিচিত্র কী! মেয়েরা যাকে চায়, ভীড় করেই চায়।

অধ্যাপকদের অন্দরমহলে নন্দনের গতিবিধি আছে। তাদের গল্প চটকদার করে নন্দন বলে। আরো বলে, কত দীর্ঘশ্বাসে আচ্ছাদিত নন্দনের গতিপথ। উদাহরণ স্বরূপ অনেক বৈষ্ণব কবিতাও আওড়ায়। শোভা কথার নেশায় বুঁদ হয়ে যায়।

একদিন প্রিন্সিপালের স্ত্রী এসেছিলেন আলাপ পরিচয় করতে। মোটামুটি প্রাচীনা মহিলা। অনেকটা জায়গা ঘিরে তিনি চলাফেরা করেন—বিরাট মুখখানিতে পান আর হাসি লেগেই আছে। শ্রীনিকেতনি শাড়ি আর অলঙ্কারের ঘটায়, মস্ত বড়ো সিঁদুরের ফোঁটায় তিনি মহীয়সী। ছেলেরা বিলেতে গেছে পড়াশোনা করতে, মেয়েদেরও ভালো ভালো বিয়ে দিয়েছেন। নাতনাতনী নিয়ে



তিনি সদাই গুলরণ করছেন। শুধু ছোট মেয়েটির বিয়ে হয়নি—কলেজে পড়ে, টেনিস খেলে আর শিক্ষানবিশি হাকিমদের বাড়িতে ডেকে চা খাওয়ায়। এ হেন জাঁদরেল মহিলা কথায় কথায় হেসে বললেন, 'ঠাকুরঝি বুঝি তোমার বাড়িতে আসেন ভাই?'

'ঠাকুর ঝি?' শোভা তো অবাক।

'নন্দন মাষ্টার আসে না তোমার বাড়িতে?'

'হ্যাঁ উনি আসেন।' শোভা ভক্তিভরে কথাটা বললে।

'তা আসবে। তুমিও তো পাতলা চেহারার আছো—তোমাকে ওর পছন্দ হবে। আমি ভাই মোটাসোটা মানুষ। ঠাকুর ঝির আমাকে পছন্দ হয় না।" শোভা অবাক হলো,—এ মোটা দেহ নিয়ে তিনি হেসে গড়িয়ে পড়ছেন। আর কী করে এত হাসতেও পারেন বা!

'বারীন মাঝে মাঝ বলতো, দিদি তোমার মতো সবাই যদি এমন স্বাস্থ্য পেত! আমি বলি, তা হলে বাংলাদেশ আফগানিস্থান হয়ে যেত।' বলেই তিনি হাসতে শুরু করেন। "শুনেছি ঠাকুর ঝির প্রথম পক্ষটি নাকি বেশ স্বাস্থ্যবতী হাসিখুশী মেয়ে ছিল। পালিয়ে গিয়ে কাকে নাকি নিকে করেছে। বেচারারও কী দোষ বলো!'—আবার হাসতে থাকেন। হাসির দমকে শোভা ঘামতে থাকে, মরীয়া হয়ে বলে: 'যাই চা নিয়ে আসি'—তারপর দ্রুত পায়ে ছুটে চলে যায়।

নন্দনকে চিনতে হলে সূক্ষ্মতা দরকার—তা কি আর সবার আছে! এই তো কলেজ ম্যাগাজিনে, নন্দন যে কবিতাটা লিখেছে, শোভা মনে মনে ভাবে, ওর মূল্য কি দিতে পারবে যার বাড়ির মেয়েরা হাফপ্যাণ্ট পরে ধিঙ্গিপনা করে বেড়ায়! শোভার শরীর দিয়ে শীতল শিহরণ প্রবাহিত হয়—আঃ, হৃদয়বীণার সুর এই কবিতায় গুমরে গুমরে মরছে!

সংসার-জীবন-যাত্রার মরুভূমিতে নন্দন ওয়েসিসের মতো। শোভার চারদিক দেখে শুনে তা ই মনে হয়েছে। কলকাতার সঙ্কীর্ণ গলি থেকে মফঃস্বল শহরে এসে শোভা আর কোথাও আত্মগোপনের সুযোগ পাচ্ছিল না। এখানে এত বড়ো আকাশ, এত জানাজানি আর এত কানাকানি। আর আসা যাওয়ার আদিখ্যেতা। নন্দন আছে বলে শোভা গুটিয়ে থাকতে পারে ঘরের এক কোণে যেখানে বারান্দার নিভৃতি আছে। আর আছে কয়েকটী ফুলের চারা। এই জায়গাটুকু স্মরণীয় করবার জন্যে নাকি নন্দন একটী কবিতাও লিখে ফেলেছে. নাম—'মুখোমুখি'। একটী কবিতায় ঠাঁই পাওয়াও তো সোজা কথা নয়! নন্দন বলেছে, তার জীবনীতে শোভার নাম জলন্ত অক্ষরে লেখা থাকবে। জীবনে এইটুকুই মাত্র পরম লাভ।

বারীনও মাঝে মাঝে বাড়ি ঢুকেই নন্দনের খোঁজ করে: 'নন্দা আসে নি?'

'কেন?'

'না—একা একা রয়েছ বলেই জিজ্ঞেস করছি।'

'নন্দনবাবুর কি আর বাড়ি ঘর নেই?'

'আরে তাতো আছেই। তবু তো সে আমাদের খোঁজ খবর নেয়—'

'তা ছাড়া—উনি ভাবুক লোক, কী সুন্দর লেখেন—'

বারীন আর হাসি চাপতে পারলে না।

'হাসলে যে?' শোভা কটমট করে তাকালো।

'ওটা ছাড়া নন্দার আর কোনো দোষ দেখতে পাই নে।'

'কবিতা লেখা দোষ!' শোভা চেঁচিয়ে ওঠলো ধনুষ্টঙ্কার রুগীর মতো।

'তা নয়।' বারীন অপ্রতিভ হয়ে বলে, 'রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝি, অনেকের কবিতাই বুঝি। কিন্তু নন্দার কবিতা একেবারেই বুঝি না।'

বারীন কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচে। শোভা নীল হয়ে গেছে, ঠোঁট দুটো কাঁপচে, ফিট হয় আর কি! বারীন সাইকেল নিয়ে ছুটে বাড়ির থেকে নন্দনকে ধরে নিয়ে আসে, সিনেমার টিকিট কেটে নিয়ে আসে উৎসব করে ছবি দেখবে বলে।

জ্যোসনা রাত্তিরে শোভার শিরদাঁড়া ব্যথিয়ে ওঠে। এমনিতেই শরীরের হেথায় হোথায় ফিকে ব্যথা লেগেই আছে। সেই ব্যথা নিয়ে শোভা মাঝরাত্তিরে জানালার পাশে পিঠে বালিস চাপা দিয়ে চাঁদের পানে তাকিয়ে থাকে। মফস্বলের জোসনা, ভয় ভয় করে শোভার। একলা মনে হয়। নন্দন এমন সময় থাকলে হয়তো চাঁদের দুষ্টমিপনার একটি ব্যাখ্যা করতে পারতো। অন্তরের অন্তরতম স্থানে যে কান্না গুমরে উঠছে তার জন্যে সহানুভূতির সুর জাগাতো।

চাপা কান্নার আওয়াজে বারীনের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, পরম স্নেহভরেই সে শোভাকে বিছানায় তুলে আনবার চেষ্টা করলে। কিন্তু শোভা যাবে না—চাঁদের পানে তাকিয়ে সে জানালার শিক চেপে রইলো।

'আমায় বলো তো কাঁদছো কেন?'

শোভা নিরুত্তর।

'কলকাতায় যাবে?'

অমন ভাবনাও তো তার মনে আসে নি। কথাটা খারাপ নয়। কিন্তু শোভা একা গেলে তার বাপ-মা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠবে। তবু কলকাতায় যেতে মনটা কেমন কেমন করে না কি!

'তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে বলবে তো!'

'মানুষ কেন কাঁদে, তুমি কী বুঝবে!' শোভার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেছে—কলকাতায় তাদের গলিতে একটি ভিখিরী ভিক্ষে চাইতো না, হাতবাড়িয়ে অনর্গল কেঁদে যেত। শোভারও তো তাই,—প্রেমের দেবতার দেউলে একটু আশ্রয় যাচ্ঞা। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

'তোমার বাড়ি—তোমার সংসার। আর মানুষের মতো তোমার কাঁদতে হবে কেন, বুঝতে পারলুম না!'

'কত রাজঐশ্বর্য নিয়ে লোক কাঁদে।' শোভা উচ্চমার্গে চলে যায়।

'হয়তো অম্বলের ব্যারাম আছে।'

শোভা এবার আছাড় খেলো। একটা ক্ষীণ আর্তনাদ তার কণ্ঠনির্গত হয়ে গুলির মতো রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে। বারীন আরো চমকিত, আরো ব্যস্ত হলো। শোভাকে জোর করে দু'হাতের মধ্যে তুলে নিঁয়ে ভোর পর্যন্ত পায়চারী করে কাটাল।



পরদিন ডাক্তার এলো—অষুধ মালিশের ব্যবস্থা হলো। শোভা কুঞ্চিত হয়ে গেল। হায় সামান্য দেহটার জন্যে লোকটার কত না আকুতি!

নন্দনের স্ত্রীর অসুস্থতা বেড়ে গেছে। বারীন ছেলেদের দিয়ে নার্সিংএর ব্যবস্থা করেছে, নিজেও তত্বতালাসি করে। কিন্তু নন্দন পড়ে আছে এ বাড়িতে। অসহ্য,—এ কষ্ট না কি দেখা যায় না। তাছাড়া, 'হেথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনো স্থানে' এমন একটা ভাবও নাকি তার মনের মাঝে মোচড় দিয়ে উঠেছে।

বারীন এসে বলে, 'নন্দা, বউকে গিয়ে একবার ছাখ। তোকে দেখলেও তো বেচারা খুশী হয়!'

নন্দন জোরে সিগারেটে টান দিয়ে দীর্ঘশ্বাস মেশানো ধোঁয়ার কুণ্ডলী মহাব্যোমে ছুঁড়ে মারে। শোভার চোখ ছল-ছল করে।

অমলেট-হালুয়া-চা, এমন কি বহুবিধ তরকারী কালিয়া করে খাইয়ে শোভা নন্দনের অন্তর্জ্বালা চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। বারীন বেশ খুশীতে আছে,—'নন্দা তোর দৌলতে খাওয়াটা ভালো হচ্ছে রে। তোফা রান্না করে শোভা—কী বলিস!'

কিন্তু কানাঘুষা চাপা দে'য়া যাচ্ছে না। যারাই নন্দনের স্ত্রীকে দেখতে যায় তারা নন্দনকেও দেখতে আসে। প্রিন্সিপালগিন্নী ঠাকুরঝির সঙ্গে মস্করা করে গেছেন। এই নির্দয় পৃথিবীতে হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই—'শান্তির বাণী শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস!'

ব্যাপারটা চরমে উঠলো কয়েকদিন আগে। বারীন এক ফচকে ছোঁড়াকে ধরে বেদম মার লাগিয়েছে। সে নাকি একটা গয়বোল্লা চিঠি বারীনের চিঠির বাক্সে রেখে পালিয়ে যেতে চাইছিল। বারীন ছেলেটাকে ধরে আনে, চিঠির ইতর কথাগুলো ওর মুখ থেকে শোনে। শোভা শুনে শক্ত হলো, জোরে চেঁচিয়ে বললে, 'ছি ছি ছি!'

বারীন বললে, 'আর তোকেও বলি নন্দা, আমার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেই কি তোর স্ত্রীকে সুস্থ করতে পারবি?'

শোভা কেঁদে ফেললে, 'চুপ করো, ইতরের মতো কথা বলো না!'

বারীন অপ্রতিভ হয়ে বেরিয়ে যেতে চাচ্ছিল, শোভা ডাকলে, 'শোনো!' বারীন ফিরে দাঁড়াল।

'আমি নন্দনবাবুকে নিয়ে কলকাতায় যাব।'

বারীন ইতস্তত করে বললে, 'এখন নয়, ক'দিন পরে যেয়ো। এখন গেলে, মানে, লোকে আমাকে নপুংসক ভাববে।'

শোভা আবার আছাড় খেলো। আবার একটা আর্তনাদ কণ্ঠে নিঃসৃত হলো।

বারীন ততক্ষণে বাইরে চলে গেছে। নন্দন যে সান্ত্বনা বাক্য বলেছিল, তার মর্মার্থ হচ্ছে যে, না-পাওয়ার যে-পাওয়া তাকে ক'জন চেয়ে পায়!

সত্যি সত্যিই শোভা একদিন টিকিট কেটে গাড়িতে চেপে বসলো। সঙ্গে নন্দন, একটা ছোট হোল্ড-অল আর ছোট্ট ব্যাগ। চারদিক তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নন্দনের দিকে চেয়ে শোভা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো।

অভিভাবকত্বের বন্ধনহীন বেশ মুক্ত তারা।

নন্দন একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রতিহাসির সমর্থন জানালে। কিন্তু ঝটিতি বাইরের বাতাস বিদীর্ণ করে নারীকণ্ঠ শোনা গেল, 'কাকু, এদিকে এসো! এই যে—এ কামরায়।'

পরক্ষণেই প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের মতো বারীন কামরায় লাফ দিয়ে পড়লো। নন্দনের মুখের সিগারেট পড়ে গেল, শোভা গিরগিটির মতো রঙ বদলাতে লাগলে।

'শোভা, টেলিগ্রামটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে না কেন? তা হলে তো আমিই তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতাম।'

শোভার কথাটা ঠিক ঠাহর হলো না।

'বাড়িতে এসে দেখি টেলিগ্রামটা মেঝেয় পড়ে আছে, তুমি হয়তো টেবিলে রেখেছিলে। শ্বশুরমশায়ের শক্ত অসুখ, তোমার খালি হাতে যাওয়া উচিত নয়—ছুটলুম টাকার জন্যে, ভাগ্যিস রাস্তায় ছুটকীকে দেখলুম গাড়ি নিয়ে টেনিস কোর্টে যাচ্ছে—'

'ছুটকী?'—শোভা ক্ষীণ কণ্ঠে বললে।

'হ্যাঁ এই যে। আমাদের প্রিন্সিপালের ছোট মেয়ে।'

শোভা দেখলে, যৌবনলাবণ্যরসে উচ্ছল একটি হাফপ্যাণ্ট-গেঞ্জি-পরিহিতা তন্বী বারীনের একটি বাহু আকর্ষণ করে দাঁড়িয়ে আছে। শোভা আচম্বিতে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার চোখ ঠিকরে আগুন ঝরছিল: 'আমি তোমার সঙ্গেই বাবাকে দেখতে যাবো!'—

আসন্ন পিতৃবিয়োগ আশঙ্কায় শোভা অশ্রুসজলই দেখালো। ছোট্ট খুকীর মতো বারীন তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আনলে। ছুটকী তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, 'ছিঃ, কাকীমা, কাঁদতে নেই। দাদু নিশ্চয়ই ভালো হয়ে যাবেন।'

শোভা আয়নাটা হাতে নিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর আঁকছিল।

হাত থেকে পড়ে মেঝের উপর শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। টুকরো কাঁচগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে জড়ো করা ছাড়া শোভার গত্যন্তর ছিল না। হাত কেটে রক্ত বেরিয়ে গেল।

বারীন তখন ঘরে ঢুকেছে: 'ছুটির ব্যবস্থা করে এলাম। সবাই যখন জেনেছে শ্বশুরমশায়ের অসুখ—যেতেই হবে। এ কি আয়নাটা ভেঙে গেছে—নাও—হাত দিয়ে কুড়িয়ো না—হাত কেটে যাবে—ইস তাইতো অনেকটা কেটেও গেছে—'

'অনেকদিনের পুরনো আয়নাটা—'

'আপদ বিদেয় হল। যাক্। এবার কলকাতা থেকে তোমার জন্যে ভালো আয়না কিনে আনব। ওটাতে মুখ ভালো দেখা যেত না—কাঁচটা বড্ড পাতলা।'

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ]

অন্দরের আঙিনায় সকালের পায়চারী ও আলাপচারিতা শেষ ক'রে সান্ন্যালমশাই কাছারি বাড়ীতে এসে বসেছেন। আমলারা আসে নি। কাছারি বাড়ীর বুড়ো চাকরটা সান্ন্যালমশাই-এর ফুর্সির জল বদলে অন্যান্য হুঁকাগুলির দিকে মন দিয়েছে।

সান্ন্যালমশাই বসতেই সে নিবেদনের ভঙ্গিতে বললে—তামাক দি, কর্ত্তা?

—তামাক, না থাক।

সান্ন্যালমশাই তামাকটা খুব বেশী খান। অনেকের চোখে তিনি ও তাঁর তামাক অবিচ্ছেদ্য। ভৃত্যটি হুকায় জল বদলাতে বদলাতে ট্যারচা দৃষ্টিতে সান্ন্যালমশাইএর মুখের ভাবটি পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। অসুখ-বিসুখ করলে কিম্বা খুব ক্রুদ্ধ হ'লে তামাকে মন থাকে না সান্ন্যালমশাই-এর, এটা এদের সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করা কাছারি বাড়ীর প্রথা নয়। অন্দরের কোন ভৃত্য হ'লে হয় তো সাহস ক'রে প্রশ্ন করতে পারত।

ভৃত্য চলে গেলে সান্ন্যালমশাই ভাবলেন,—দেখো অভ্যাসটা কি বিষময়। তামাকের নাম শুনে প্রায় হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি। অথচ কাল রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে তিনি চিন্তা ক'রে স্থির করেছেন তামাক খাওয়া কমিয়ে দেবেন। স্বাস্থ্য? না। সংযম? দূরকরো। এ বয়সে সংযম অসংযমের প্রশ্ন আর ওঠে না। পঞ্চাশ পার হ'ল। শুধুমাত্র স্নায়ুগুলিকে আর একটু থিতিয়ে দেয়া, যাতে সেগুলি সহজেই উত্তেজিত না হ'য়ে পড়ে।

মামলাটা শেষ হবার আগে থেকেই এ সন্দেহটা হচ্ছিল তাঁর, মামলাটা না করলেও চলত। কিন্তু মামলাটা যত সময় নিচ্ছিল ততই স্নায়ু উত্তেজিত হ'চ্ছিল আর ততই সর্বস্বপণের ফন্দি-ফিকিরগুলি আসছিল মাথায়। যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে।

কাল রাত্রি তখন বারোটা, আইন সেরেস্তার আমলা ব্রজকান্ত এসে খবর দিল,—মিটল।

খবর দেওয়ার কথা ছিল, সে জন্য সে নিজের বাড়ীতে না গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল।

দ্বিতলের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে নীরবে উপভোগ করলেন খবরটা, তারপরে বললেন,—তুমি তা হ'লে এবার কিছুদিন বিশ্রাম নাও, দারোয়ানদের কাউকে বরং নিয়ে যাও, এগিয়ে দেবে।

সে চলে গেলে তামাক নিয়ে বসেছিলেন সান্ন্যাল, ভেবেছিলেন—আর নয়। মিহিরকে ডেকে একবার বলবেন, বরং ব্যাপারটাকে তুমি ভবিতব্য ব'লে মেনে নাও। তা হ'লে আর জ্বালা থাকবে না।

কিন্তু দিনের আলোয় এখন তিনি অনুভব করছেন, রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে এটা সম্ভব ব'লে বোধ হ'লেও, এ কথাগুলির দৈনন্দিন অর্থ-সান্ত্বনাপ্রদ নয়। বরং মিহিরের মনে হ'তে পারে

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়াই উদ্দেশ্য। সময় তার কাজ করুক। মিহির নিজেই ভুলবার চেষ্টা করবে যদি তার মন মূলত শান্তিপ্রিয় হয়।

কিন্তু মোকদ্দমার সংবাদ প্রত্যুষেই ছড়িয়ে পড়েছিল। সান্ন্যালমশাই নায়েবের হাত থেকে সুমার খাতাটা নিয়ে গত দিনের অঙ্কগুলিতে চোখ বুলাবেন ভাবছেন, ভৃত্য চশমা আনতে গেছে অন্দরে, এমন সময় রামচন্দ্র এক সঙ্গে আট দশজন লোক।

রামচন্দ্রের হাতে একটা লাঠি, মাথায় লাল গামছা বাঁধা। সে এসেই লাঠি সমেত সান্ন্যাল-মশাইএর পায়ের কাছে ভুমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম করল। লাঠিটা রইল সান্ন্যালমশাইএর পায়ের তলায়।

সান্ন্যালমশাই বললেন,—সকালেই খবর পেয়েছ বুঝি? কিন্তু একটা কথা তোমাদের বলে দি। এ নিয়ে কোন রকম হৈ চৈ, আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা কোর না।

—আজ্ঞা, না কর্ত্তা, তা হবে না।

সান্ন্যাল বল্‌লেন—তোমাদের জেদ বজায় রইল। কিন্তু আর টানাটানি কোর না। এখন বরং মিহিরের কাছে যাও। আমি একটু কাজ করি। রামচন্দ্র উঠবার ভঙ্গি করল। বারান্দা থেকে সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল, তার পরে সঙ্গের লোকগুলিকে বলল্—রাজার কাছে কথা বলবে, তোমরাই বলো না কেন, কি কথা আছে তোমাদের।

আর কেউ কথা বলল না—রামচন্দ্রকেই বলতে হ'ল।

—আজ্ঞে, মামলার সাথে সামিল।

সান্ন্যালমশাই একটু উত্তেজিত স্বরে বললেন—না, না, আর বোল না। মামলাটার সূত্রপাত করেছিল রামচন্দ্ররাই এমনি করে সাধারণ কথাবার্ত্তা থেকে।

মিহিরও সান্ন্যলবংশের ছেলে। ছোটবেলায় তার পিতার মৃত্যু হয়। তার মা অনেক কষ্টে ও গ্রামের চোখে সান্ন্যালদের মর্য্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হয় এমন অনেক কাজ ক'রে তবে মানুষ করতে পেরেছিল তাকে। এখন মিহির নিজের ভার নিজে নিয়েছে, কিছু কিছু সম্পত্তি বাড়িয়েছে। উদ্যমশীল সে। কোন না কোন পরিকল্পনায় সে সব সময়েই লেগে আছে। ইতিমধ্যে সে নিজের বাড়ীর চারদিকে ইঁটের প্রাচীর তুলেছে, পড়ে-যাওয়া প্রাচীরের জায়গায়।

কিন্তু মিহির নির্দয়।

তার বাড়ীর প্রাচীরের নিচে দিয়ে পশ্চিমমুখী একটা রাস্তা ছিল। সরকারি রাস্তা নয়। তবু বহুদিন থেকে সাধারণের ব্যবহার্য্য বেশ চওড়া একটা রাস্তা। চিকান্দি ও সানিকাদিয়ের সংযোগকারী সরকারি রাস্তার বড় বৃত্তাংশটির দুই প্রান্ত যুক্ত করেছে। সান্ন্যালদের জমির উপর দিয়ে রাস্তা। মিহির একদিন বাঁশ আর কুলকাঁটা দিয়ে ঘিরে নিল রাস্তাটা নিজের জমির সামিল ক'রে।

রামচন্দ্ররা এসে এর প্রতিবিধান চেয়ে নালিশ করেছিল।

সান্ন্যালমশাই একদিন মিহিরকে বলেছিলেন—পথটা বন্ধ করে দিলে, লোকের অসুবিধা হবে।

—জমিটা তো লোকের নয়, আমার।

সান্ন্যালমশাই হেসে বলেছিলেন, সব জমিইতো কারো না কারো, সব পথই তো কোন না কোন সান্ন্যালের জমির উপর দিয়ে।



মিহির অগত্যা বলেছিল,—লোক চলে কোথায় ও পথ দিয়ে।

কিন্তু পথ সে খুলে দেবে না এটা বোঝা গিয়েছিল তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে।

তারপরই লাগল মামলা। সান্ন্যালমশাই থমথমে মুখ নিয়ে কাছারীর দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন,—নায়েবমশাই, মিহির সান্ন্যালের বাড়ীর নিচের রাস্তাটা আমার চাই, পুরানো কাগজ ঘেঁটে দেখ একবার।

পুরানো কাগজ ঘাঁটা চলল। সারা গ্রামে কোথায় কতটুকু কোন সান্ন্যালের, এর মোটামুটি হিসাব যত সহজ, সূক্ষ্ম হিসাব ঠিক তত কঠিন। মোটা হিসাব নিয়ে রোজকার কাজ চলে, টাকা আদায় হয়, লাট দেয়া চলে; সূক্ষ্ম হিসাব মামলা ক'রে পেতে হয়, মামলা ক'রে রাখতে হয়। সূক্ষ্ম হিসাবের মোটা কথা এই: সব জমির হিসাব জট পাকিয়ে সব সান্ন্যালের ব'লে বোধ হয়। পরচা, দানপত্র, কট্‌কবলা।

মামলা মানে টাকা নিয়ে জুয়া খেলা। নিচের কোর্টে কাগজপত্রের সীমাহীন ফর্দ নিয়ে যখন দাঁড়াল সান্ন্যালমশাইএর নায়েব, তখন মিহির হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। টাকার অভাবে ঠিক নয়, টাকা আঁকড়ে থাকার সহজ প্রবৃত্তিতেই বরং। সহজ বুদ্ধির অঙ্কে সে হিসাব ক'রে দেখল মামলার শেষ পরিণতি হাইকোর্ট; এক তরফা ডিগ্রি পেলেন সান্ন্যালমশাই।

কিন্তু মামলাটা সান্ন্যালমশাইএর ভালো লাগে নি। জমিদারি বৃত্তিটাই মামলা সংকুল। মামলার ভয় না থাকলে এক পয়সা খাজনা আদায় হয় না। কিন্তু সেসব মামলা আর এটা এক নয়। দৈনন্দিন কর্মসূচীর অন্তর্গত সেসব মামলা, তাতে এমন ক'রে রক্ত গরম হ'য়ে ওঠে না। এমন ক'রে পুরে পুরে ক্ষয় হয় না স্নায়ু। এটা শুধু সম্মান রাখার মামলা। মিহিরকে অবনত করাতেই এর সার্থকতা। এ সব আর ভালো লাগে না।

সান্ন্যালমশাই বললেন আবার,—মিহিরের কাছেই বরং যাও একবার। সেই খুলে দেবে পথ।

—তা নয়, আজ্ঞা। মিহিরবাবু সকাল থেকেই পথ খুলে দেয়ার জন্য লোক লাগিয়েছেন।

—তবে আর কি থাকতে পারে।

রামচন্দ্র সঙ্গীদের নির্দেশ ক'রে বলল,—কর্ত্তা এরা যে মরে। মরার বাড়া গাল নাই। তাই হইছে এদের। মিহিরবাবু এদের ভিঁটা ছাড়া করবেন।

ব্যাপারটা এই: মিহিরের বাড়ীর অনতিদূরে শাঁখারিদের পাড়া। এক সময়ে খুব বাড়বাড়ন্ত ছিল এ পাড়ার। এমনকি পাকা ঘর বাড়ী তোলার মতো সংস্থাও হ'য়েছিল ওদের কারো কারো। এখন যারা আছে, তারা শাঁখা তৈরী করাও ভুলে গেছে। বেশীর ভাগ বাড়ী শূন্য, পাকা দেয়ালগুলি ভেঙে পড়েছে, কাঁচা দেয়ালের চিহ্নমাত্র নেই। যারা পেরেছে সহরে পালিয়েছে, যারা পালায় নি, তাদের বৃহত্তর অংশ ধুঁকছে মৃত্যুর আঘাতে, অবশিষ্ট চাষী হ'য়ে যাচ্ছে। পাড়াটার সবটাই মিহিরকে খাজনা দেয়। যে সব ভিটায় অধিবাসী নেই সেগুলি মিহির বাকি খাজনার দায়ে খাস ক'রে নিচ্ছে। খাস ক'রে নেয়াটা ভালো আছে। জঙ্গলের বদলে সেগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে হ'চ্ছে মিহিরের তরকারির বাগান, বোধ হয় স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা ভালো। কিন্তু খাস্ করতে সুরু ক'রে মিহির থামতে পারছে না—বাকি খাজনার দায়ে অনবরত এর ওর নামে ডিক্রি আনবার চেষ্টায় আছে। শাঁখারিদের

মাতব্বর হরিশচন্দ্র এতদিন মিহিরের স্নেহ পেয়েছে। কিন্তু এই মামলাটায় সান্ন্যালমশাই-এর নায়েবের চক্রান্তে মিহিরের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে এসেছে। তাই মিহিরের লোক গেছে সদরে হরিশচন্দ্রের কয়েকজনের নামে মামলা করতে।

কথাটা শুনে ভাবলেন সান্ন্যালমশাই।

কিন্তু নীরবতায় প্রত্যাখ্যাত হবার লোক নয় রামচন্দ্র। একটু পরে সান্ন্যালমশাই বললেন,—এতে আমার আর কি করার আছে, রামচন্দ্র, তোমরা যা বোঝ করগে।

রামচন্দ্র তার গোঁফটিকে সূক্ষ্ম দুভাগে ভাগ ক'রে নিল, তারপরে বলল,—রাজা যদি প্রজাকে রক্ষা না করেন, সে তো অরাজক, আজ্ঞা।

যুতসই কথা বলার সুখে রামচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল। সান্ন্যালমশাই-এর বলতে ইচ্ছা হ'ল,—আদালতে যাও তবে, রাজ্য চালানোর ভার আমার উপরে নেই। কিন্তু খামলেন তিনি।

রামচন্দ্রের অবক্তব্য কিছু নেই। আদালতের কথায় হয়তো সে বলে বসবে, এই আদালত, ফিস্ দিব আজ্ঞা করেন। লোকটি হামেশা আসে না কাছারীতে। খাজনা বাকি ফেলার দলে নয় সে যে তলব তাগাদায় হাজিরা দেবে। বরং তার উল্টো। খাজনা দেবার সময়ে এমন ভাব দেখায়, যেন আরও বেশী খাজনা দিতে পারলেই সুখী হয়। তার কথাবার্ত্তায় চালচলনে একটা নাটকীয়তা আছেই। তার সরলতাকেও কৃত্রিম বলে বোধ হয়।

রামচন্দ্র বললে আবার,—কর্ত্তা এ গাঁ গড়-চিকন্দি। রায় আর সান্ন্যালের গাঁ। রায়রাও জমিদারি করেছে, সান্ন্যালরাও, কিন্তুক কোনদিন কোন সান্ন্যাল কর্ত্তা অত্যাচার করেনি প্রজার উপরে। প্রজার বাপ্‌মা তেনারা। লোকে কয় কাছারীতো সান্ন্যাল-কাছারী, যাও বিচার পাবাই। দোষ কর, পায়ের কাছে লাঠি রাখে দণ্ডবৎ হও, সাতখুন মাপ। কর্ত্তা, সেই সান্ন্যালের দুয়ারে আসছি আমরা।

সান্ন্যালমশাইএর মুখে হাল্কা একটা হাসি খেলে গেল। রামচন্দ্রের প্রশস্তি রচনার চেষ্টায় তাঁর কৌতুক বোধ হ'ল। মামলাটার বিষয় নিয়ে যখন রামচন্দ্র এসেছিল, সে দীর্ঘতর প্রশস্তি দিয়ে সুরু করেছিল তার আবেদন। সেদিন সান্ন্যালমশাই অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলেন, এমন কি উভয় বংশের পুরাণো কথা ভাবতে ভাবতে এক সময়ে তাঁর মনে হ'য়েছিল সেকালের অত্যাচারী পুরুষের কথা। তখন তাঁর মনে হ'য়েছিল, সে কালের সেই মহাবাহু, বীর্য্যবান পুরুষদের যেন মানাত অত্যাচার-প্রবৃত্তি। যেমন রাজা-রাজরার সুরাপান। কবিরাও সে সব অত্যাচার বর্ণনা করতে গিয়ে প্রতিবারেই এমন কিছু ছি-ছি ক'রে ওঠেন নি। তখন তাঁর মনে হ'য়েছিল, মিহির তো সে সব পুরুষের মতো নয়, ডান হাতে তরোয়াল ধরে রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এমন সামর্থ নয় সে, তবে অত্যাচার তাকে মানাবে কেন। সান্ন্যালমশাই স্থির করেছিলেন,—অত্যাচার করা মিহিরের উচিৎ নয়।

কিন্তু তখন ছিল মনের অভিমান-মত্ত অবস্থা। বাস্তব জ্ঞানের আলোয় বিষয়টিকে হাস্যকর বোধ হয়। সান্ন্যালমশাই ভাবলেন—কাকে কি মানায় না মানায়, সে প্রশ্নই নয়। কোলকাতা থেকে দূরে থাকার ফলে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত মধ্যযুগীয় যেসব প্রথার কিছু কিছু এসব দিকে



বেঁচে ছিল, এখন সে সবও গত হ'য়েছে। এখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে নালিশ হয় না, নালিশ হয় আদালতে।

আর তা ছাড়া এ ব্যাপারে অত্যাচারটা কোথায়, সান্ন্যালমশাই ভাবলেন,—সে কালে জমিদাররা অত্যাচার করত, ভালোবাসত। এখন দুটির কোনটিই নয়। বাইরের শাসনের চাপে দুই এক হ'য়ে গেছে—প্রজা ও জমিদার। উপরে যে সরকার সে কি ভালোবেসে লাট্‌টা কম ক'রে দেয়, কেউ অশক্ত হ'লে? আগাগোড়া সেই হক বুঝে নেয়ার ব্যাপার। যদি খাসমহলের প্রজা হ'ত হরিশচন্দ্র আদালতি পরোয়ানা ফিরত যুক্তহস্তের মিনতিতে? কালেক্‌টর দয়া করত না।

সান্ন্যালমশাই বললেন, শোন রামচন্দ্র, আজকাল তো প্রজারা আকছার নালিশ করছে জমিদারের নামে আদালতে। প্রয়োজন হ'লে তোমরাও তাই কর। নতুবা সে তো আদালতের সাহায্যই নিচ্ছে, সেখানেই তোমাদের বক্তব্য বলাও ভালো উকীল দিয়ে। আমার পক্ষে মিহিরের বিরুদ্ধাচরণ করাটার যুক্তি থাকত যদি দেখতাম মিহির কিছু অন্যায় করেছে। খাজনা আদায় অন্যায় নয়।

কিন্তু রামচন্দ্র দমবার নয়, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—আজ্ঞা ন্যায়ের উপরেই ন্যায় আছে। আমরা অন্যায় ক'রে স্বীকার কবুল করতেছি। আদালতে তাতে মাপ নাই, কিন্তু বাপ আর ভগোমান মাপ করে আজ্ঞা।

রামচন্দ্রের বসার ভঙ্গিতে এটা অন্তত স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে কিছু একটা প্রতিকারের আশ্বাস না নিয়ে সে উঠবে না। কথায় কথা বেড়েই যাবে। সান্ন্যালমশাই বললেন, আচ্ছা তোমরা এখন যাও। আমি মিহিরের কাছে সব ব্যাপারটা আগে জেনে নিই।

(ক্রমশঃ)

"কক ফ্রমক এদোকেন লুকৈ ওরিষ্টরৈ এদে লিওন্তেস"
দূর থেকে ছাখো তক্ষিত-শিলা-পুরী
বৃকের তরেও মাংসের থালা ভূরি।

# সাহিত্যিকী

## ছোট গল্প

ইন্দ্রজিত

আজ ছোট গল্পের যুগ।

কিন্তু তাই বলে একথা বলা অন্যায় হবে যে, ছোট গল্প জন্মেছে আজকের যুগে। এর প্রথম জন্মদিন একাল নয় সেকাল। এ সেকালকে আমরা ধরতে পারি একেবারে বৌদ্ধ জাতকের যুগ থেকে। তার কারণ সে সময়কার গল্পগুলিতে ছিলো ছোট গল্পের উপাদানের প্রাচুর্য্য, কিন্তু নিছক সাহিত্য আলোচনা করা যেমন ঔপন্যাসিকেরাও কোনকালে কোরতেন না, ঘটনার ভেতর দিয়ে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্র তৈরী করে নিতেন, তেমনি বুদ্ধ দেবের যুগ বা তার পরবর্ত্তী যুগে জাতকের গল্প হিসেবে আমরা যে সমস্ত ছোট গল্পকে আজও উপলব্ধি করি সেগুলো মূলতঃ উপদেশধর্ম্মী, তবে কোনও কোনও গল্পর উপদেশ, কুমারী মেয়ের পিত্রালয়ে স্বচ্ছন্দগতির মত স্বপ্রকাশ, আবার কোনও কানও গল্পর নব কুলবধূর মতন অবগুণ্ঠনাবৃত।

অনেক প্রাবন্ধিক আছেন যাঁরা ছোটগল্পের রচনা-পদ্ধতিকে বিদেশের সম্পত্তি বলে মনে করেন কেন করেন তা জানিনা।

উপন্যাসটা গদ্যের ছন্দে চলে, কিন্তু তার চলার প্রথমেই জাতকের গল্পগুলো তার কাণে মন্ত্র দিয়েছিলো। পরবর্ত্তী যুগে উপন্যাস পরিণত হলেন বিবেকানন্দে, আর জাতক রামকৃষ্ণ অমৃত হয়ে থাকলেন কথামৃতে।

আগেকার দিনে যে কোনও ঘটনা ঘটুক না কেন সেটা একটা বৃহৎ ঘটনা বলে খ্যাতি অর্জ্জন করতে দেরী লাগতনা। সেই বৃহৎ ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তো বৃহৎ কাব্য লেখা হয়েছিলো অনেক দিন আগে। তারপর বুদ্ধযুগ আনলে এক বিরাট পরিবর্ত্তন, সমাজ-ধর্ম্ম সমস্ত কিছুর ওপর।

বুদ্ধদেবের যুগে স্বতন্ত্রের দাম হলো স্বতন্ত্র হিসেবে। বৃহৎ কাব্যে, যেখানে বিরাট ঘটনার ভেতর স্থান পেতেন কাব্যের নায়ক-নায়িকা এবং আর সকলে, বুদ্ধদেবের যুগে ছোটখাটো আর বড়ো যেরকম নায়ক-নায়িকা হোন না কেন, তাঁরা বৃহৎ প্রাসাদের পরিবর্ত্তে পরিণত কোরলেন এক একটি স্বতন্ত্র ঘর। এক্ষেত্রে কেউ ছোট হলেন না বরং ছোটরাও খ্যাতিলাভ করলেন স্বতন্ত্র বলে।

সেই সময় থেকেই গদ্য সাহিত্যের সুরু। এরপর ধর্ম্মের কথা আর সংস্কৃত শ্লোকস্তুতিও তাদের নিজস্ব গতিকে হারাল না। তবে সে গতি পরিণত হলো মন্থরে।

ছোট গল্পের বীজের ভেতর দিয়ে উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ ঘটলো ডালপালা নিয়ে। অমৃতবীজ থেকে বিষবৃক্ষের আত্মপ্রকাশ।

উপন্যাসের বন্যার জোর যতদিন ছিলো ততদিনের ভেতর ছোট গল্প তার কায়েমী আসন প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না। এর একমাত্র কারণ, আমি মনে করি, যে ছোট গল্প রচনাপদ্ধতি কোন সাধারণ বা অসাধারণ লেখকের জানা ছিল না সে যুগে। কারণ, একথা মনে রাখা দরকার যে, ছোট গল্প হলো বৃহৎ ভাবের সংক্ষিপ্ত প্রকাশ। সাহিত্যের ইতিহাস যদি আলোচনা কোরতাম তাহলে



উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধ, পদাবলী ও অন্যান্য রচনার অনেক কথা আমাকে অবতারণা করতে হতো, কিন্তু আমার এ প্রবন্ধে বিষয়বস্তু শুধু ছোট গল্প।

ছোট গল্প বাংলা সাহিত্যে পুনঃপ্রচলিত করলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আগে বৌদ্ধ জাতকের ঘটনাগুলি সাহিত্য আখ্যা ত্যাগ করে ধর্ম্মের তিলক পরে নিয়েছিলো। সুতরাং সেগুলো আদি আখ্যা থেকে বঞ্চিত হবেনা। তবে ছোট গল্পের মাদকতার স্বাদ আমরা পেলাম উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের ভেতর।

এই ছোট গল্পগুলোর ভেতরে আমরা এমন ঘটনা পাই যেগুলো অল্প সময়ের ভেতরেই শেষ হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে অথচ উপন্যাসের পাঠকের বিরক্ত হওয়ার কোন অবকাশ নেই এই সমস্ত গল্পর ভেতরে। এর ভেতরে বিদেশী গন্ধ খানিকটা থাকলেও দেশী টোপরের প্রভাবে বিলিতী বরও দেশী বর-এ পরিণত হয়ে পড়েছেন।

ছোট গল্প আত্মপ্রকাশ করবার পরই সাহিত্যের রাজ্যে তার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলো একথা বলা আর সত্যের অপলাপ করা একই পর্য্যায়ভুক্ত, তবে দিন যতো বাড়তে থাকে ততই এই পদ্ধতির সুদিন আসতে থাকে।

ছোট গল্প মূলতঃ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করে এবং সেই চরিত্র ফোটাতে গেলে যেটুকু ঘাত-প্রতিঘাত প্রয়োজন তা নিয়েও প্রয়োজন হয় সরস ভাষা, যে ভাষায় ছোট গল্পের নায়ক নায়িকারা কথা বলে।

গল্পের আবার রকমফের আছে। অনেক লেখক ছোট গল্পের ঘটনাকে আবদ্ধ রাখে বসবার ঘরের ভেতরে। সেখানেই তার সুরু আর সেখানেই তার শেষ। আবার কোন কোন লেখক তাঁদের গল্পের ঘটনাকে ছড়িয়ে দেন জাতির বা সংসারের ভেতরে। এক্ষেত্রে কারা ন্যায় করেন আর কারা ন্যায় করেন না এবিষয় সোজাসুজি মন্তব্য না কোরে এইটুকুই বলি যে ছোট গল্পের জন্যে এমন কোন ব্যাকরণ নেই যে সেটা কোন বিশেষ জায়গায় ঘটতে হবে। কারণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক জায়গাতেই আছে। যে লেখকের দৃষ্টি আছে তিনি বসবার ঘরে আরাম কেদারায় শোয়া বিলিতী অথচ পুরণো মাসিক পত্রিকা হাতে গল্পের নায়িকার ভেতরেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে পান কিন্তু যাঁদের সে দৃষ্টি নেই তাঁরা দেশ-ব্যাপী লোকদের আচরণ-বিচরণ কথাবার্ত্তার থেকে আধখানা চরিত্রও আবিষ্কার কোরতে পারেন না।

রচনা নিজের জন্যে নয় পাঠকের জন্যে, সেই জন্যে পাঠকের মনকে এক একবার বুঝে নিতে হয় লেখককে, এবং বুঝে লেখাটা হলেই পছন্দ অপছন্দের কথাটা আর ওঠে না।

আজ সমষ্টিগত মানুষের জীবন ঘটনায় পরিপূর্ণ। সহজে যেটা আজ চোখে পড়ে না সেটা হোল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসে ঘটনা থাকে বড় রকমের, কিন্তু আজকের মন ঘটনা চায়না কারণ ঘটনা তাদের বিরক্ত করে। আজ ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছে দেশ, প্রতিটি লোক স্বতন্ত্র সম্মান থেকে অবঞ্চিত। বিশ শতকের পাঠকের মনে পড়ছে বৌদ্ধ জাতকের স্বতন্ত্র ঘরগুলো, চাইছে, জাতকের গল্পের মতন চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

বৌদ্ধ জাতক থেকে জন্ম নিল যে নবজাতক তার প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য অনেকখানি। কারণ, তক্ষশিলার সামা-জাতকের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে আজকের দক্ষ নবজাতক একই সূত্রে গাঁথা।

## আশ্বিনে কেনার মতো বই

আশ্বিনে সিগনেট প্রেসের নতুন বই : 'কবি শ্রীরামকৃষ্ণ'। ভক্তির সিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে পুণ্যপুরুষ, উদার অর্থে তিনি ছিলেন কবিও। তাঁর 'কাব্যের কাঠামোটা গদ্য। সে গদ্য···তীরের মতো তীক্ষ্ণলক্ষ্য। মর্মবেধী।···যিনি সকলের চেয়ে সত্য তাঁকে সকলের চেয়ে সহজ করে দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন সুন্দর করে। রসাত্মক বাক্যের সহযোগে। সুষমান্বিত বিন্যাসে। অক্ষুণ্ণ একটি অর্থের দ্যোতনায়।'—তাই শ্রীরামকৃষ্ণ কবি। 'ব্রহ্ম অস্পৃচ্ছিষ্ট'—এ শুধু তত্ত্বজ্ঞানীর কথা নয়, কবির কথা। ব্যঞ্জনাময় গল্পের ঝোলাটিও তাঁর অফুরন্ত ছিল। ঈশ্বরের যে কাছাকাছি হবে সেও বালক হয়ে যাবে—এ কথাটি বোঝাতে গিয়েও গল্প বলেন রামকৃষ্ণ : 'শিবু তখন খুব ছেলেমানুষ—চার পাঁচ বছরের হবে।··· একদিন দেখি ফড়িং ধরতে যাচ্ছে একলা। কাছেই গাছের পাতা নড়ছিল। তাই দেখে পাতাকে বলছে, চুপ-চুপ, আমি ফড়িং ধরব।··· চাই এমনি বালকের সরল বিশ্বাস। বালকের বিশ্বাস না হলে পাওয়া যায় না ভগবানকে।'

অসামান্য এই দিব্যপুরুষের কবিরূপ উদ্ঘাটন করেছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫১ সালের 'শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা' দিতে আহ্বান করা হয়েছিল তাঁকে গত নভেম্বর মাসে। ঘারভাঙ্গা হলে সেবার শ্রোতৃমণ্ডলীর স্থান সংকুলান হয়নি। দ্বিতীয় দিন স্থান করতে হয়েছিল আশুতোষ হলে। সেই বক্তৃতামালার গ্রন্থনই এই গ্রন্থ। গ্রন্থাকারে হাতে পেয়ে বাঙালী পাঠক সুখী হবেন ॥

আশ্বিনে সিগনেট প্রেসের নতুন বই : অমিয় চক্রবর্তীর 'পারাপার'; বিষ্ণু দের 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার'; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'অমাবস্যা'। তিনটিই কাব্যগ্রন্থ, প্রথম দুটি নতুন। 'দূরযানী'-র পরে 'পারাপার' অমিয় চক্রবর্তীর সর্বাধুনিক কাব্যসংকলন। বাঙালী কবিদের মধ্যে 'প্রকৃতই সর্বদেশীয় কবি' বলে তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন 'কবিতা' পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : 'তোমার···কবিতায় আধুনিকের স্বরূপ আমি দেখতে পেলুম' ॥ 'এলিঅটের কবিতা' নামে অনুবাদ-কাব্যগ্রন্থের পরে বিষ্ণু দের লেখা সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' ॥ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অমাবস্যা' প্রেমের কবিতা হিসাবে এক সময় কাব্যরসিকদের মনে আলোড়ন এনেছিল। ছাপায় প্রচ্ছদে এই তিনটি কাব্যগ্রন্থ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে ॥

আশ্বিনে সিগনেট প্রেসের নতুন বই : অবনীন্দ্রনাথের 'নালক'; 'বুড়ো আংলা' আর নতুন সংস্করণে 'শকুন্তলা'; সুলভ সংস্করণে সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল'; লীলা মজুমদারের 'পদিপিসীর বর্মিবাক্স'। পূজায় শিশুদের উপহার। শিশুরাই উপলক্ষ্য, কিন্তু উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষ্য—সব বয়সেরই সুরসিক পাঠকমণ্ডলী। শিশুদের উপলক্ষ্য করে অল্প যে কয়টি বই লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তা অজস্র হয়ে শিশুদের হাতের মুঠি ছাপিয়ে পড়েছে, হয়ে উঠেছে চিরকালের আনন্দের সম্পদ। মানুষের মনে যে চিরশিশুটি বাস করে তার মতোই এ লেখার বয়স নেই। সুকুমার রায়ের 'আবোল তাবোল' সহ ওপরে সব কটি বইয়ের দাম সিগনেট সংস্করণে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাঙলা দেশের ঘরে-ঘরে এ-সব বই যাতে পৌঁছায় ॥ 'পদিপিসির বর্মিবাক্স' বইটি উপন্যাস। কিশোর মনের বিচিত্র গতির সঙ্গে লেখিকার বন্ধুতা খুবই ঘনিষ্ঠ বলে এ-বই বাংলা সাহিত্যের গর্বের জিনিস হয়ে উঠেছে। লেখিকার 'দিনদুপুরে' পড়ে রাজশেখর বসু বলেছেন : 'পড়তে পড়তে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ বা সুকুমার রায়ের রচনা পড়ছি।'

আশ্বিনে সিগনেট প্রেসের নতুন বই : 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ' : বাংলা অনুবাদে জিম্ করবেট্-এর 'ম্যানইটার্স্ অভ কুমায়ুন'। ভারতের উত্তর প্রদেশে পার্বত্য বনভূমি ছিল লেখকের নখদর্পণে। শুধু রোমাঞ্চকর শিকারকাহিনীর গুণে নয়, জীব এবং প্রকৃতির প্রতি আশ্চর্য একটি মমত্বের গুণে এই বই সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বাংলার আদর্শ অনুবাদ হিসেবে আরো একটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণ উল্লেখযোগ্য : রেমার্ক-এর 'তিনবন্ধু'। বাংলায় বিস্তর অনুবাদগ্রন্থের সঙ্গে এই বইগুলির পার্থক্য রুচিবান পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না ॥

বাঙলাদেশে উৎকৃষ্ট লেখার জমিতে সম্প্রতি অনাবৃষ্টি চলছিল। আশ্বিনে এক সঙ্গে সিগনেট প্রেসের এই বইগুলি হাতে পেয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালী পাঠকের হতাশাবোধ নিশ্চয়ই দূর হবে বলে আশা করব আমরা ॥

এই সঙ্গে কিছুদিন আগে ছাপা সিগনেট প্রেসের অন্যান্য বইগুলি মনে করিয়ে দিই : সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত', বিষ্ণু দের 'এলিঅটের কবিতা', জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন', নরেশ গুহর 'ছুরন্ত চুপ'। প্রত্যেকটি কবিতার বই।

প্রকৃতি লালিত পল্লীবাঙলার একটি ভীরু ভালোবাসার কাহিনী : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুই বাড়ি'। ভাগ্যের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত একটি অসামান্য মেয়ের জীবনকে গড়ে তোলার কাহিনী : লীলা মজুমদারের 'শ্রীমতী'।

ব্যাপ্ত অর্থে সমগ্র বাঙলাদেশের একটি মহৎযুগের আত্মবিকাশের কথা : শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত'। জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ভিতর মহল থেকে দেখা অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের কথা, ঠাকুর পরিবারের বধূ প্রতিমা দেবীর লেখা : 'স্মৃতিচিত্র'। আধুনিক বিজ্ঞান-চিন্তার জগতে প্রবেশক গ্রন্থ হিসেবে অনবদ্য, জেমস্ জীনস্-এর 'মিষ্টিরিয়স ইউনিভর্স'—বাংলায় : 'বিশ্বরহস্য'। সুলভ মূল্যে সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'। অচিন্ত্যকুমারের : 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ' ১ম ও ২য় খণ্ড—বাংলা গ্রন্থজগতে যে বই দুখানা অকল্পনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এবং বিষ্ণু দের প্রবন্ধ সংকলন : 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ'।

নতুন পুরোনো মিলিয়ে এই বই কখানি সিগনেট প্রেস থেকে বাঙলা-দেশকে উপহার ॥

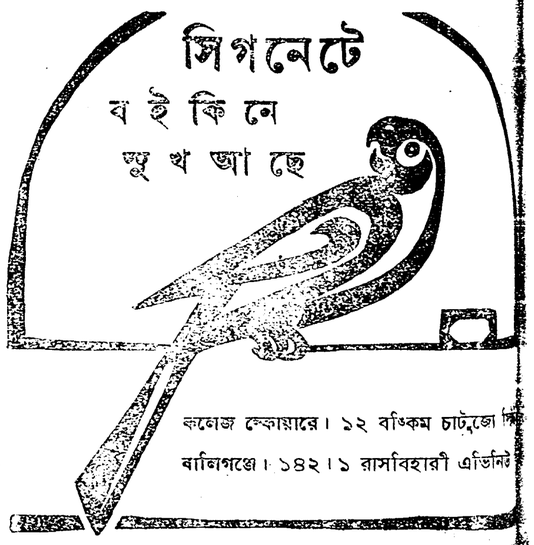




## বাংলা বই-এর বিজ্ঞাপন

সন্তোষকুমার দে

আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্প্রতি 'সাহিত্যজগত' নামে নতুন একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। বিষয়টি দৈনিক কাগজের পক্ষে নূতন না হলেও 'সাহিত্যজগতে'র প্রথম মুদ্রণেই একটা চমৎকার ব্যবস্থা নজরে পড়ল, যার জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তককে সাহিত্যরসিক মাত্রেই অভিনন্দন জানাবেন। সেটা হল খুব সামান্য খরচে বইয়ের বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপনদাতার খরচও কম হবে, আর পাঠকও ঠিক নির্দিষ্ট দিনের কাগজটিতে নির্দিষ্ট কলমে নতুন প্রকাশিত বইগুলির খোঁজ-খবর জানতে পারবেন। এই চমৎকার ব্যবস্থার বিশেষ দরকার ছিল। বিশেষ করে বাংলা বইয়ের বাজার যেমন সংকুচিত হয়ে গেছে তাতে প্রকাশকদের যদি এইভাবে পত্রিকা এবং পাঠক উভয় পক্ষ হতে একযোগে সহায়তা করেন তবে বইয়ের ব্যবসায়ের পক্ষেও সত্যই খুব উপকার করা হয়।

দৈনিক সংবাদপত্রের সাহিত্যসমালোচনা সাতিশয় মূল্যবান। Times Literay Supplement একটি মূল্যবান প্রকাশন, ইংরাজি সাহিত্যরসিক মাত্রেই তার খবর নিশ্চয় রাখেন। বাংলা কোন কাগজে ওই রকম ক্রোড়পত্র কোনদিন পাবো কিনা কে জানে। অন্তত কয়েকটি বিশিষ্ট দৈনিকে এই যে নিয়মিত সাহিত্য আলোচনার, সাহিত্য-জগতের খোঁজখবর জানাবার প্রয়াস দেখা যাচ্ছে এর গতি নিঃসন্দেহে শুভমুখী। আজ যদি রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেন তবে নিশ্চিত তিনি বাংলার সাহিত্য-প্রয়াসের এই নব উদ্যমকে আশীর্বাদ করতেন। লেখক পাঠক প্রকাশক সবার পক্ষেই এই ব্যবস্থা উপকারী হবে আশা করা যায়।

প্রসঙ্গত বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন সম্পর্কে দু'একটা কথা নিবেদন করতে চাই। দৈনিক শ্রেণীবিভক্ত বিজ্ঞাপন (classified advt.) বহুদিন চালু আছে। অধিকাংশ কাগজেই ওই বিভাগে "Book and Stamps" একই সাথে বিজ্ঞাপিত হয়। না হলেও অন্যান্য বহু বিভাগের ভিড়ে বইয়ের বিজ্ঞাপন সহজে বিশেষ করে নজরে পড়ে না। সে দিক দিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা 'সাহিত্যজগত' বিভাগে যে অল্পদামের বইয়ের বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ নির্ধারিত করে দিলেন সেটি খুবই কার্যকরী তাই লোভনীয় মনে হবে।

বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন খুব অল্পই হয়। এর ইতিহাসও খুব দূর-প্রসারিত নয়। প্রাচীন বাংলা পুস্তকাদির বিজ্ঞাপন-ব্যবস্থা জানা গবেষণাসাপেক্ষ। তবে যখন বাংলা পুঁথি লিখিত হত তার বিজ্ঞাপনের ভার যে কথকঠাকুরদের উপর নির্ভর করত এটা বলা যায়। চৈতন্যচরিতামৃতের মত গ্রন্থ, যা জাতির জীবনের তন্ত্রীতন্ত্রীতে মিশে আছে তারও প্রচার হয়েছে সাধকভক্তদের মুখে মুখে। বস্তুত লোকলোচনের তুল্য কার্যকরী প্রচারের মাধ্যম আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। আত্মীয় বন্ধু সহকর্মী গুরুভাই এদের মুখে কিছু শুনলে লোকে যত সহজে তা বিশ্বাস করে ও তাতে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ হয়, অন্য কোন উপায়েই তা হওয়া সম্ভব নয়।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে লিসবন সহরে প্রথম বাংলা বই,—বাংলা বাইবেল মুদ্রিত হয়। এই বাইবেলের বিজ্ঞাপন কোনো কাগজে প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা বিশেষ অনুসন্ধান সাপেক্ষ। পরে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে যখন পঞ্চানন কর্মকারের হাতে কাটা বাংলা হরফ দিয়ে প্রথম বাংলা বই মুদ্রণের ব্যবস্থা হল

॥ সম্প্রতি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ॥

দ্বাদশ খণ্ড

ত্রয়োদশ খণ্ড

চতুর্দশ খণ্ড

# রবীন্দ্র রচনাবলী

॥ পূজার ছুটির পূর্বেই প্রকাশিত হবে ॥

সপ্তম খণ্ড

পঞ্চদশ খণ্ড

॥ শীঘ্রই প্রকাশিত হবে ॥

ষোড়শ খণ্ড

উল্লিখিত খণ্ডগুলি ছাড়া এখন পাওয়া যাচ্ছে ॥ ক : কাগজের মলাট, প্রতি খণ্ড আট টাকা— প্রথম, নবম, দশম, একাদশ, ত্রয়োবিংশ থেকে ষড়্‌বিংশ খণ্ড ॥ খ : রেক্সিনে বাঁধাই, সাধারণ কাগজে ছাপা, প্রতি খণ্ড এগারো টাকা— প্রথম, নবম, দশম ও একাদশ খণ্ড ॥ গ : রেক্সিনে বাঁধাই, মোটা কাগজে ছাপা, প্রতিখণ্ড বারো টাকা—দশম ও একাদশ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী পাবার সহজ উপায় ॥ আপনি কোন্ কোন্ খণ্ড সংগ্রহ করেছেন বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগে ( ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭ ) চিঠি লিখে তা জানিয়ে, স্থায়ী গ্রাহক হয়ে থাকা। ক খ গ কোন্ রকমের বই আগে কিনেছেন তা জানালে সেই রকম বই দেবার চেষ্টা করা হবে। কোনো খণ্ড প্রকাশিত বা পুনর্মুদ্রিত হলেই গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়। গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধপত্রই যথেষ্ট, কোনো দক্ষিণা বা অগ্রিম মূল্য জমা দিতে হয় না।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় • ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলিকাতা



তখনও সেসব বই বিজ্ঞাপিত হওয়ার সুব্যবস্থা ছিলনা। বস্তুত লুক বা মথি লিখিত সুসমাচার মিশনারী সাহেবেরা মুখেমুখে প্রচার করা ব্যতীত অন্য কি উপায়েই বা তখন জনসাধারণকে জানাতেন ?

নিয়মিত বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় বাংলা পঞ্জিকায়। বটতলায় ছাপা অনেক বইয়ের বিজ্ঞাপন পঞ্জিকায় প্রতিবৎসর বেরুত। 'নীলবসনা সুন্দরী', 'হরিদাসের গুপ্তকথা' প্রভৃতি পুস্তকের বিজ্ঞাপন অনেকেরই মনে পড়বে। কোন কোন বিজ্ঞাপনে, বিশেষ করে রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের পুস্তকের বিজ্ঞাপনে, ক্বচিৎ কখনো কাঠের ব্লকে ছবি করেও দেওয়া হত। কিন্তু বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত বই নিঃসন্দেহে রামায়ণ এবং মহাভারত। রামায়ণ-মহাভারত বিনা বিজ্ঞাপনে অর্থাৎ লিখিত বিজ্ঞাপন না দিলেও চলত, তার কারণ তখন ঘরে ঘরে রামায়ণ-মহাভারত পড়া হত। দুপুরে দিবানিদ্রার পর একজনে সুর করে রামায়ণ বা মহাভারত পড়ছে আর অনেকে বসে বসে শুনছে, নিরক্ষর গ্রাম্যবধূ ও বৃদ্ধারাও শুনছেন—এ চিত্র কিছুকাল আগেও পল্লীবাংলার সর্বত্র দেখা যেত। রামায়ণ-মহাভারতে নৃত্যলাল শীল খোদিত এবং নন্দলাল শীল মুদ্রিত ছবি থাকত। সে সবই এক রঙ্গা, কাঠের ব্লকে ছাপা ছবি। দুর্গাচরণ শীল মহাশয় এক রঙ্গে ছাপা ছবিতে হাতে নানা রং লাগিয়ে রঙ্গীন করবার ব্যবস্থা করলে দেশময় হুলুস্থুল পড়ে যায়। বলাবাহুল্য, তখন কোনো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সে ব্যবস্থা করা যায় নি। লোকমুখে প্রচারের উপরেই বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয়েচে। অবশ্য তখন দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা অত্যল্প থাকায় বইয়ের প্রচারও বেশি হওয়া সম্ভব ছিলনা। দুশো পাঁচশো চললে খুব চলেছে মনে করা হত। রামায়ণ-মহাভারতের কথা অবশ্য কিছু স্বতন্ত্র।

সে যুগে প্রকাশিত সংবাদপত্র মাসিক সপ্তাহিক প্রভৃতিতে বিজ্ঞাপনের পরিমাণ নিতান্তই অল্প ছিল, বইয়ের বিজ্ঞাপনও ছিল খুবই সামান্য।

বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে প্রথম বৈচিত্র্য এলো কুন্তলীন পুরস্কার গ্রন্থে। তখন যত্রতত্র বার্ষিক সংখ্যা, পূজা সংখ্যা, দোল সংখ্যা পত্রিকা বের হত না। কুন্তলীন তৈলের প্রবর্তক 'এইচ-বসু' মহাশয় প্রতি বৎসর শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে বাংলার সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে বাছাইকরা লেখা সংগ্রহ করে একটি বই বের করতেন। ছবি ছাপা ও রচনা সব দিক দিয়েই এই বার্ষিক কুন্তলীন পুরস্কার গ্রন্থখানি লোভনীয় হত। ফলে মুখ্যত কুন্তলীন দেলখোস প্রভৃতির বিজ্ঞাপনের জন্য করলেও এই বাংলা বার্ষিকখানি অচিরে সমগ্র দেশে যে কৌতূহল ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল তা বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলা চলে। অধিক কি, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রও এই কুন্তলীন পুরস্কার গ্রন্থে লিখেছিলেন। হালের যুগে নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত ক্যালকাটা কেমিক্যালের 'কথাশিল্প' একই ধারায় প্রকাশিত একটি বহুলপ্রচারিত গ্রন্থ।

বাংলা বইয়ের প্রচারে গ্রন্থাবলী প্রকাশ বসুমতী সাহিত্যমন্দিরের একটি অক্ষয় কীর্ত্তি। বসুমতী কর্তৃপক্ষ বাংলা বই-এর বিজ্ঞাপনে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন এবং কৃতকার্য হয়েছেন একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র-শরৎচন্দ্রকে তাঁরা বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন।

সাম্প্রতিক যুগে বাংলা মাসিক পত্রিকাগুলি নিয়মিতভাবে বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপন বহন করছে। কিন্তু সেসব বিজ্ঞাপন অধিকাংশ সময়েই নিতান্ত পাঠকের উপর ঝুড়ি উজাড় করে ঢেলে দেওয়ার মতো। ছোট বড় হরফে, অর্ধপৃষ্ঠায় আটচল্লিশখানা বইয়ের নাম আর ধাম উল্লেখ করা হত।

'নাভানা'র বই

প্রকাশিত হ'ল

## প্রেমেন্দ্র মিত্রের
## শ্রেষ্ঠ কবিতা

প্রথমা, সম্রাট, ফেরারী ফৌজ—এই তিনখানি কাব্য-গ্রন্থের বিশিষ্ট কবিতাসমূহ, পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত অনেকগুলি নতুন রচনা এবং বিচিত্র স্বাদের কিছু অনুবাদ এই সংকলনে সংযোজিত হ'ল ॥ পাঁচ টাকা ॥

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নতুন উপন্যাস

## মীরার দুপুর

'মীরার দুপুর' বৈদিক যুগের উজ্জ্বল সুখ ও শান্তির কাহিনী নয়। এ-যুগের নায়িকা মীরা চক্রবর্তীর দুপুরের সুরটা অনিবার্যভাবেই উল্টো, বুঝি-বা কুটিল রাত্রির বিভীষিকার মতো। বিষাদান্ত কাব্যের ব্যঞ্জনায় একখানি বিশিষ্ট আধুনিক উপন্যাস ॥ তিন টাকা ॥

প্রতিভা বসুর উপন্যাস

## মনের ময়ূর

আধুনিক কথাশিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিভা বসুর কৃতিত্ব সর্বজনস্বীকৃত। ভাষার সৌকর্য, স্বকীয়তা এবং ঘটনা জমাবার শিল্প তাঁর 'মনের ময়ূর' উপন্যাসে অসামান্য পরিণতরূপে প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল ॥ তিন টাকা ॥

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের

## পলাশির যুদ্ধ

সরস ও সার্থক সাহিত্যের আস্বাদে জাতীয় ইতিহাস রচনায় নতুন দিক নির্দেশ। উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক ॥ চার টাকা ॥

## বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা

কবির প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ কবিতাসমূহ বর্তমান সংকলনে সংগৃহীত হয়েছে। ॥ পাঁচ টাকা ॥

## নাভানা

॥ নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস লিমিটেডের প্রকাশনী বিভাগ ॥

৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

পূজায় প্রকাশিত হল

সন্তোষকুমার দে বিরচিত

## যৌতুক-কৌতুক

রসরচনার সেরা সংকলন। মূল্যবান এন্টিকে ছাপা। চমৎকার প্রচ্ছদপট। যৌতুক দেবার মত বই।

—দাম দু'টাকা।

## পরিচয়

ছাব্বিশটি বাছাই করা ভালো ছোট গল্পের একটি পরিচ্ছন্ন সংকলন গ্রন্থ। পুরু এন্টিকে ছাপা। অভিজাত প্রচ্ছদ চিত্র। — দাম আড়াই টাকা।

—প্রাপ্তিস্থান—

মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতুবন্ধ— ২৷৷০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯



লেখকের নামটা পর্যন্ত না দিতে পারলে যেন ভালো হয় এমন অবস্থা! ফলে নেহাৎ গরজ না থাকলে সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে বেড়াতে কে যায়!

বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে সার্থক পরিবর্তন এনেছেন সিগনেট প্রেস। তাদের বইগুলিও যেমন পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ পারিপাট্যে ও অঙ্গসজ্জায়, তেমনি তাদের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তারও উপর এক কাঠি সরেস ও সরস বিজ্ঞাপন দিলেন সিগনেট বুকশপ্। সিগনেট প্রেস নিজেদেরই বইয়ের বিজ্ঞাপনে সেই সব বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেন, সিগনেট বুকশপ্ সব প্রকাশকের বইয়ের উপর সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ মন্তব্য দিয়ে বের করলেন 'টুকরো কথা'। মাসিক বসুমতী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বিশিষ্ট মাসিকের প্রচ্ছদপটটি ওলটালেই 'টুকরো কথা' বেরিয়ে পড়ে। ঝর ঝরে সাহিত্যিক ভাষায় লেখা নতুন নতুন বই আর সাহিত্য বিষয়ক খবর। অতি অল্পদিনে 'টুকরো কথা' খুবই জনপ্রিয় হয়েছে।

আগে 'পাণ্ডুলিপি' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে সিগনেট প্রেস বিক্রি করেছিলেন। এবার 'টুকরো কথা'ও আবার পৃথক ফোল্ডার হিসেবে ছেপে গ্রাহকদের কাছে পাঠাতে লাগলেন। এই প্রয়োজনীয় বাংলা বইয়ের বিজ্ঞাপনে বাংলা বই নিশ্চিতই বেশি করে প্রচারিত হচ্চে।

সিগনেট বুক শপের 'কবিপক্ষ' উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের তথা সমস্ত বাংলা কবির রচনা প্রচারের সুপরিকল্পিত আয়োজন ও তদনুসারে প্রচারের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে সব কবির কবিতার বই দোকানে নগদ দামে না কেটে পোকায় কাটছিল তারাও নিশ্চয় এতে উৎসাহিত হয়েছেন। বাংলার পাঠকেরাও অনেক ভালো জিনিষের সন্ধান পেয়েছে।

সরস্বতী লাইব্রেরী কিছুদিন নিজেদের বইয়ের উপর মন্তব্যসহ বিজ্ঞাপন দিয়েছেন—দেশ ও মন্দিরা পত্রিকায়।

বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর 'সাহিত্যের খবর' শ্রেণীর বিজ্ঞাপনে এক একজন সাহিত্যিকের ছবি ও তাঁর বিষয়ে কিছু মন্তব্য এবং তার যে সব বই বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশ করেছেন কেবল সেইগুলি বিজ্ঞাপিত হচ্চে; সেই সঙ্গে তাদের প্রকাশিত অন্য বইও উল্লেখ করছেন। 'সাহিত্যের খবর'ও পৃথক পুস্তিকাকারে বিতরণ করা হচ্চে।

রঞ্জন পাবলিশিং হাউসও মাঝে মাঝে তাঁদের পুস্তকের বিবরণ লিখে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। বিশ্বভারতীও নিজস্ব পুস্তকগুলির বিজ্ঞাপনে কিছু বৈচিত্র্য এনেছেন। যতদূর মনে হয় বিজ্ঞাপনে লেখকদের নাম বা অনুরূপ কোন বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পংক্তির প্রথমে ও সর্বশেষে দুইটি দাড়ি চিহ্নসংযোগ তাঁরাই প্রবর্তন করেছেন। 'নাভানা' খুব অল্পদিন বাংলা বই-এর বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, পরিচ্ছন্ন ব্যবস্থায় তাও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং যেন একটা নতুন কিছু করবার তাগিদে প্রত্যেক মাসের সাত তারিখে একখানি বই বের করছেন বলে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন। ব্যবস্থা ভালোই।

বিলাতি বই-এর বিজ্ঞাপনের অনুকরণে গোটা বইখানির ছোট ছবি দিয়েও বিজ্ঞাপন কিছু কিছু হচ্ছে। আশুতোষ লাইব্রেরী বহুদিন পূর্ব হতে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুসাহিত্য জনপ্রিয় করেন। তারা বইয়ের ছবি দিয়ে সাইনবোর্ড, হোর্ডিং প্রভৃতিও করেছেন। এই পর্যায়ের

বিজ্ঞাপনে 'পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ,' 'উপজীবিকা হিসাবে বিজ্ঞাপন', 'আরোগ্য নিকেতন', 'বর্ষপঞ্জি' প্রভৃতি পুস্তকের বিজ্ঞাপন উল্লেখযোগ্য।

পুস্তক সমালোচনাতেও বিজ্ঞাপনের কাজ হয়। তবে নিরপেক্ষ সমালোচনার অভাব হলে প্রায়শঃ পাঠকেরা বিরক্ত হন।

Direct Mailing অর্থাৎ সোজাসুজি গ্রাহকের নামে পুস্তিকা ডাকে পাঠিয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার সিগনেট বুক শপ, প্রভৃতি নতুন আকারে সুরু করেছেন। চিঠি লিখলে তবে ক্যাটালগ পাঠানোর অপেক্ষায় বসে থাকলে বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। অন্ততঃ ইস্কুল কলেজ ও সাধারণ পাঠাগার সমূহে নিয়মিত পুস্তিকা পাঠানো দরকার।

কমলাকান্তের আসরে কমলাকান্ত একটি প্রস্তাব করেছিলেন, রেলে করে দূর দূর প্রদেশেও যাতে বাংলা বইয়ের একটি প্রদর্শনী পাঠানো যায় তার ব্যবস্থা করতে। এই প্রস্তাব বিশেষ কার্যকরী হবে মনে হয়। উপযুক্ত স্থানীয় বিজ্ঞাপন পূর্বাহ্নে প্রকাশিত হলে, এতে ফল ভালো হয়। প্রবাসী বাঙালিদের কাছে পৌছাবার এ একটি নিশ্চিত উপায়। সাধারণ দুর্গোৎসব বা অনুরূপ পূজাপার্বণের উপলক্ষে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতেও আজকাল বইয়ের দোকান যায়, বেশ দু'পয়সা কেনাবেচাও হয়। বাংলা বই প্রচারের এ একটি ভালো সুযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মদিনের মেলায় পরমপুরুষ বিক্রয়ের হিড়িক যাঁরা দেখেছেন তাঁরা এই জাতীয় প্রদর্শনীর সুযোগ গ্রহণের উপযুক্ততা সহজেই বুঝতে পারবেন। চলমান পুস্তকাগার করে কারখানা অঞ্চলে বেতনের দিনেও তার কাছাকাছি সময়ে নিয়মিত যাওয়ার ব্যবস্থা করলেও ব্যবসার নিশ্চিত বৃদ্ধি হ'তে পারে।

বাংলা বইয়ের প্রচার বৃদ্ধির জন্য আমাদের সর্বপ্রকার যত্ন নেওয়া দরকার। হয়ত 'নিখিল ভারত বঙ্গ ভাষা প্রসার সমিতি'র সহযোগিতা নিলে দূর প্রবাসে যাঁরা রয়েছেন এবং অবাঙ্গালী যাঁরা বাংলা শিখেছেন তাদের কাছে পৌছাবারও পথ সুগম হয়। বাঙালী লেখক ও প্রকাশক উভয় গোষ্ঠিকেই বিষয়টি বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।




## টুকরো কথা... (২৯)

কীদৃশ আজ কালীঘাটের। কী অবস্থা! অথচ কতকালের পুরোনো এই দেবীস্থান। সাড়ে চারশো বছর আগেকার লেখা বিপ্রদাসের 'মনসামঙ্গলে' উল্লেখ আছে। চৌরঙ্গী—ভবানীপুরে যখন ঘন জঙ্গল, বাঁশবন, আর ধান জমি, তখনো গ্রাম্য তীর্থযাত্রীর ভিড় হত এখানে। পূজা শেষ হলে যাত্রীরা বাইরে এসে প্লাস্টিকের খেলনা কিনত না, কিনত কাঠের পুতুল, মাটির হাঁড়ি, শাঁখারীর শাঁখা, দু'চার পয়সার পটুয়াপট। তখনো সে ডিমিস 'আর্ট' হয়ে ওঠেনি।

পটুয়ারাও নেই, সেই পটও আজ পাওয়া যায় না। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বাংলালোকশিল্পের একটি প্রাণবন্ত ধারা। সামান্য দু'এক টুকরো নিদর্শন আছে বিত্তবান শিল্প-সংগ্রাহকের ঘরে। কিছু আছে বিদেশের মিউজিয়মে। আমাদের লজ্জার কথা যে কালীঘাটের সেই পটুয়াচিত্রের পরিচয় সম্বলিত বই প্রথম প্রকাশিত হল লণ্ডন থেকে: বাজার পেইন্টিংস্ অব ক্যালকাটা', উইলিয়ম আর্চারের লেখা। সাহেবী বস্তুর মূল্য যাই থাক, এ বইতে পুরো পৃষ্ঠার ৫০ খানি পটচিত্র পেয়ে শিল্পরসিকেরা নিঃসন্দেহে সুখী হবেন। অন্য নানা বিষয়ের মধ্যে এই পট আর পটুয়া কথাও আলোচনা করেছেন একটি বাঙালী লেখক, বিনয় ঘোষ, তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'কলকাতা কালচার' বইতে। আলোচনাটি মূল্যবান। ভূমিকায় বলেছেন: 'কলকাতার বাইরেও বাংলাদেশ আছে। কিন্তু···বাঙালী জীবনের প্রধান রঙ্গমঞ্চ কলকাতা শহরকে বাদ দিয়ে নব্যযুগের বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়।'···এই মহানগরীকে কেন্দ্র করেই নব্যবাঙলার জীবনধারা তিনি বিশ্লেষণ করেছেন 'কলকাতা কালচার' বইটিতে॥

পটুয়াশিল্পের উদ্ভব আলোচনা করতে গিয়ে 'কলকাতা কালচারে' অনার্য অধিবাসীদের সঙ্গে পটুয়াদের আদি সাঙ্গাত্যের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাঙলাদেশের যদিও তিন দিক ঘিরেই আদিবাসীদের বসবাস, তথাপি প্রায় কিছুই আমরা জানি না তাদের কথা। কিছু জানেন বিদেশী মিশনারীরা। এদের গুণেই আমাদের জ্ঞান। পশ্চিমে সাঁওতাল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, হো; পূবে নাগা, গারো, মিকির, লুসাই, ইত্তরে খাসিয়া, সিংফো। বাঙালী শরীরে এঁদের রক্তেরই মিশ্রণ ঘটেছে। অনার্যের তুলনায় আমরা আমাদের বেশি আত্মীয় না—এ কথা মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাইও লিখেছেন। আদিবাসী-পরিচায়ক হিসেবে নলিনীকুমার ভদ্রের বইগুলি উল্লেখযোগ্য: এক, 'আদিবাসীদের বিচিত্র কথা'; দুই, 'আসামের অরণ্যচারী'; তিন, 'বিচিত্র মণিপুর'।

ভারতশিল্পের আনুপূর্বিক ধারা অনুসরণ করলেও অনার্য আদিশিল্পের কথা এসে পড়ে। এ বিষয়ে ধারাবাহিক বিবরণ এবং আলোচনা পাওয়া যাবে বিমলকুমার দত্তের 'ভারতশিল্প' বইটিতে। প্রাক-আর্য সিন্ধুসভ্যতা থেকে শুরু করে সংক্ষেপে মৌর্য, শুঙ্গ, কুশান, গুপ্ত, চালুক্যপল্লব, রাষ্ট্রকূট, এমনকি বাঙলার পাল-সেন যুগের শিল্প বিষয়ে তিনি চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন: '···ব্রাহ্মণযুগ হইতে বাস্তব জীবনে ও ভাবজগতে আর্য-অনার্যদিগের মিশ্রণ ঘটিতে থাকে। চার্বাকপন্থী, জৈন, বৌদ্ধ এবং উত্তরকালের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম আর্য-অনার্য চিন্তাধারা মিশ্রণের ফল। পরবর্তী হিন্দুদর্শন (বিশেষত পুনর্জন্মবাদ) আত্মসাধনা, ভক্তিবাদ ও প্রতিমাপূজা প্রভৃতি হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্যাদি—ভারতীয় আদিসভ্যতায় অনার্যদিগের দান, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নাই।···

প্রাক্-আর্য ভারতীয় সভ্যতার সমসাময়িক গ্রীস, ইজিপ্ট, এশিয়া-মাইনর এবং পারস্যের মনোজ্ঞ বিবরণ আছে—'সবুজ পত্রে'র লেখক—নীরেন্দ্রকুমার বসুর 'প্রাচীন ইতিহাস পরিচয়' গ্রন্থে। নীরস ইতিহাসের বই নয় এটি। এতে আছে পৃথিবীর প্রথম ঐতিহাসিক গ্রীক হেরোডোটাস থেকে উদ্ধৃতি, প্রাচীন মিশরী শিল্পস্থাপত্যের অন্তরঙ্গ চিত্র, ইখ্‌ন-আটন-

**বাংলা অনুবাদ॥** বাংলার সবচাইতে বোধকরি বেশি অনুবাদ হয়েছে ইংরেজীকৃত রুশ সাহিত্যের। ইংরেজী ফরাসী সাহিত্যেরও নমুনা আছে কিছু কিছু। সম্প্রতি অরুণা হালদার কাজাকোভিচ-এর ষ্টালিন পুরস্কার-প্রাপ্ত উপন্যাস অনুবাদ করেছেন 'তারা' নাম দিয়ে। অন্যপক্ষে সুইডিস উপন্যাসের বাংলা করেছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী: লাগের্কভিষ্ট-এর 'বারাব্বাস', বাংলায় 'জীবন মৃত্যু'। 'বারাব্বাস' পাঠ করে আঁদ্রে জীদ লিখেছিলেন: 'সুইডিশ ভাষা যে অমূল্য সাহিত্য সম্ভার আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে, তাতে করে বলা যায় যে, প্রতিটি মানুষকে একদিন এ ভাষা শিখতে হবে।' উল্লেখযোগ্য আরো দুটি সাম্প্রতিক অনুবাদ গ্রন্থ: জর্জ অরওএল-এর 'অ্যানিম্যাল ফার্ম', গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য; গর্কির 'লেনিনের সাথে', ঋষি দাশ॥

তিনটি নতুন বাংলা উপন্যাস: মেদিনীপুরের গ্রাম-জীবন নিয়ে গুণময় মান্নার 'কাটাভাঙারি'; ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'কান্নাহাসির দোলা', আর আশাপূর্ণা দেবীর যোগবিয়োগ' যার কাহিনী নিয়ে ফিল্ম তৈরি হয়েছে। ভালো ছোটগল্পের একটি নতুন বই: গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'রথচক্র'॥

**সাহিত্য আলোচনা॥** 'মনীষী জীবন কথা' লিখে পাঠকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হলেন সুশীল রায়। গ্রন্থ-পরিচিতি সহ যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, রাজশেখর বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন আদি দশজন জীবিত মনীষীর পরিচয় তিনি তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

ছোটদের জন্য বিজ্ঞানবিচিত্রা সিরিজের নতুন বই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'চল যাই বনবাসে'। সুবোধ ঘোষ প্রমুখ ছ'জন লেখকের সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ নিয়ে বেরিয়েছে 'হিমালয় অভিযান ও শেরপা তেনজিং'।

সিগনেট প্রেসের নতুন কবিতার বই বিষ্ণু দে অনূদিত 'এলিঅটের কবিতা' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। অগ্রগণ্য কোনো বিদেশী কবির মহৎ কাব্যগ্রন্থ বাংলাভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হল।

কলকাতার তরুণতম কবিরা সুদৃশ্য একটি ত্রৈমাসিক কাব্যসংকলন প্রকাশিত করেছেন 'কৃত্তিবাস'। বড়দের মধ্যে সমর সেন আর জ্যোতিরীন্দ্র মৈত্রের প্রবন্ধও আছে প্রথম সংখ্যায়। সাম্প্রতিক কবিতার ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে আষাঢ়ের 'কবিতা' পত্রিকা একটি বিশেষ সংখ্যা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। সিগনেট প্রেস থেকেও কয়েক বছর আগে অনূদিত বাংলা কবিতার একটি সংকলন বেরিয়েছিল: 'মডার্ণ বেঙ্গলি পোএমস্'। এখনো তার কিছু কপি পাওয়া যায়। শোভন একটি নতুন কাব্যগ্রন্থ: সরযূপতি সিংহের 'সুবর্ণরেখা'॥

সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা(২)-র এবার উত্তর পাঠিয়েছিলেন শতাধিক পাঠকপাঠিকা। তার মধ্যে নির্ভুল উত্তর ৪ জনের। পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাবিভাগের কোনো ছাত্রীকে। তাঁর উত্তরই আগে এসেছিল॥

## সিগনেট বুকশপে



Coloured Paper

PURVASA : PUJA SPECIAL : 1953 : REGD. NO. 1512 :

আমাদের শারদীয়া প্রীতি



বাংলার বিজয়া-আগমনী গীতি
বহন করুক

Presented by
SATYA PRASANNA DUTTA
Printer & Publisher for and on behalf of Purvasa Ltd.,
54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

# পূর্বাশা

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০
সপ্তম সংখ্যা : কার্ত্তিক

সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য
প্রকাশক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত

দাম আট আনা

Coloured Paper

...সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ... বলে থাকি। সমাজ-মনের ... এর প্রতিফলন করে পূর্ণাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনায় কাজ ... সাহিত্যের নিবিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের ... কোনো ... সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

...কবিতা ও কবিতা পরিবেশনে পূর্ণাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের ... আবেদন ও প্রসক্তির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ণাশার ... সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

**কবিতা**

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**নতুন দিন**
আট আনা

যৌবনোত্তর
আট আনা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
চার আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

...গোপাল ভৌমিকের
**আমিন**
... টাকা

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পতাকা**
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
**লালসালু**
দেড় টাকা

**উপন্যাস**

মঞ্জুর ভট্টাচার্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

কমলেদেবায়
( ২য় সং )
তিন টাকা

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
**ভিনরঙ**
দু'টাকা

পূর্ণাশা লিমিটেড—৫৷১ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা


Coloured Paper

# টুকরো কথা... (৩১)

...সাপের মাত্র ৮০ বছর কেটেছে। 'বঙ্গদর্শন' প্রথম বেরিয়েছিল ১২৭৯ সালের বৈশাখ মাসে, বহরমপুর থেকে। অথচ এরই মধ্যে যেন ...ন্তর ঘটে গেছে বাংলা সাহিত্যের। সেই জন্মান্তরের এপারে দাঁড়িয়েও বাংলা সাহিত্যে প্রাতঃসন্ধ্যার সেই গৌরব আমরা ভুলতে পারি না। এখনো বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের সেই উপন্যাস-গুলি বাঙ্গালী পাঠকের কাছে সব চাইতে প্রিয় গ্রন্থের সম্মান পায়। একত্রে একখণ্ডে সুদৃশ্য কোনো গ্রন্থাবলীর আকারে পাওয়া এতকাল সম্ভব ছিল না। 'সাহিত্য-সংসদ' থেকে 'জীবনী ও উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্বলিত' 'বঙ্কিম রচনাবলী' ( ১ম খণ্ড ) প্রকাশ হওয়াতে সেই বড় অভাবটা দূর হল। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'সীতারাম' পর্যন্ত মোট ১৪ খানি উপন্যাসকেই তাঁরা এক খণ্ডে গ্রথিত করেছেন বাংলা-পাঠক-গ্রন্থকে স্থায়িত্ব দিতে এবং জনপ্রিয় করতে গিয়ে প্রকাশকদের কৃতিত্ব অভিনন্দনযোগ্য ॥

শরৎচন্দ্রের রচনাবলীও একত্রিত আকারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে 'শরৎ-সাহিত্য মন্দির' থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। সংস্করণ হিসেবে উৎকৃষ্ট। সম্প্রতি প্রকাশিত ৪র্থ খণ্ডে আছে : শ্রীকান্ত ( ৪র্থ পর্ব ), বামুনের মেয়ে, নিষ্কৃতি, বিজয়া ( নাটক ) এবং অপ্রকাশিত রচনাবলী' ॥

নতুন উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য : বিমল মিত্রের 'সাহেব বিবি গোলাম'—জব চারণক আর ক্লাইভের কলকাতা যে যুগ-ওলটানো পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আধুনিক কালে এসে পৌঁছল—সেটাই কাহিনীর পশ্চাৎপট ॥ ননীমাধব চৌধুরীর 'রাজনগর' : ভূমিকায় দুলালচন্দ্র গুপ্ত : "ইতিহাসকে বিকৃত না করে এবং গল্পকে গল্প রেখে মুহুকার দুরূহ কাজ সুসম্পন্ন করেছেন' ॥ আরো আছে, নরেন্দ্র মিত্রের 'নোমহল', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তেইশ বছর আগে পরে, মণীন্দ্র রায়ের 'খোলা চোখে', স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধুমতী', বাণী রায়ের 'ইলতা ও শম্পা', গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'সীমান্ত রেখা' এবং প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর নতুন বই 'পাদুপাদপ' ॥ উপন্যাসের নতুন সংস্করণ : বুদ্ধদেব বসুর 'হে বিজয়ী বীর', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সত্যি ভ্রমণ কাহিনী', প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ুর' এবং চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চোরকাঁটা' ॥ বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ ॥ আধুনিক চীনা উপন্যাসিক লু-সুন-এর 'আ-কিউ' : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়স ষাট বছর পূর্ণ হল। এই উপলক্ষ্যে সাহিত্যিকদের পক্ষ থেকে তাঁকে যে সংবর্ধনা জানানো হয় তাতে সভাপতিত্ব করেছেন প্রবীনতম কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ গোর্গীর নাটক 'নিচুতলার আঁধারে', অশোক গুহ। শলোকভ-এর 'ভার্জিন-সয়েল আপটারনড' : বাংলায় প্রদুম্ন চক্রবর্তীর 'পয়লা আষাঢ়'। এবং পার্ল বাকের 'মাদার' : অনুবাদ করেছেন হরিরঞ্জন দাসগুপ্ত ॥

ফরাসী মনীষী রোমাঁ রলাঁর লিখিত 'বিবেকানন্দের জীবন' অনুবাদ করেছেন ঋষি দাস। উর্দু লেখক কিষণচন্দ্রের-এর ছোট গল্প 'হাম ওয়াহশী হ্যায়, ( আমরা বর্বর ) বাংলা করেছেন মাহমুদ আহমদ।

সংস্কৃত থেকে কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ছন্দে অনুবাদ করেছেন কালিদাস রায়। ঈশ, কেন এবং কঠোপনিষদের স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ : চিত্রিতা দেবীর 'উপনিষৎ' ॥ গৌড় কবি সন্ধ্যাকর নন্দি বিরচিত 'রামচরিত' নামে ঐতিহাসিক কাব্যের সটিক অনুবাদ করেছেন রামগোবিন্দ বসাক ॥

কবিতা ॥ 'প্রথমা', সম্রাট' ও 'ফেরারী ফৌজ' থেকে নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের শ্রেষ্ঠ কবিতা ॥ সদ্য-প্রকাশিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ : 'উত্তর মেঘ' : প্রমথ বিশী। নতুন সংস্করণে 'চক্রবাক' : নজরুল ইসলাম। 'বর্গী এলো দেশে' : বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। 'অভিজ্ঞান' : সুবোধরঞ্জন রায়। 'স্বর ও অন্যান্য কবিতা' : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। এবং 'অশোকের সময়ের গ্রাম' : দুর্গাদাস সরকার ॥

ছোটগল্প ॥ 'কাঠগোলাপ' : নরেন্দ্র মিত্র। 'শুকশারী' : সন্তোষকুমার ঘোষ। 'সাহানা' : অমলেন্দু চক্রবর্তী। 'প্রভাতকিরণ বসুর শ্রেষ্ঠগল্প'। 'আবছায়া' : গজেন্দ্রকুমার মিত্র। হাসির গল্প : 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা' : স্বপন বুড়ো। 'কৌতুক যৌতুক' : সন্তোষকুমার দে ॥

অনুবাদ কিংবা ভাবানুবাদ, ছোটদের জন্য : চীন-জাপান কোরিয়ার রূপকথা বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুযি মামার দেশের গল্প', সুলতা করের 'অস্কার ওয়াইল্ডের গল্প', নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : এইচ, জি ওয়েলস-এর 'দি ফার্স্ট ম্যান ইন দি মুন', অমূল্যকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ষ্টিভেনস-এর 'ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড'। হেমেন্দ্রকুমার রায় অনূদিত লিউইস ক্যারল-এর 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'—বাংলায় 'আজব দেশে অমলা'—পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। ছোটদের জন্যে শিবরাম চক্রবর্তীর হাসির গল্প সংকলন 'জন্মদিনের উপহার' এবং বুদ্ধদেব বসুর 'এলোমেলো' ॥

ভ্রমণ ॥ দেবেশ দাশ-এর 'রাজোয়ারা'। 'নয়া রাজস্থান কেমন করে বদলিয়ে যাচ্ছে, কেমন করে নিজেকে নয়া হিন্দুস্থানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে তার সরস বিবরণ ॥ মনোজ বসু 'চীন দেখে এলাম' এবং ক্ষিতিশ বসু 'নয়া চীনে চল্লিশ দিন' নামে দুখানি বইতে তাঁদের চীন-ভ্রমণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন ॥ হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের 'সপ্তসিন্ধু' : সাইকেল যোগে পাঞ্জাব ভ্রমণের কাহিনী ॥ সদ্যছাপা আরো একটি ভ্রমণবৃত্তান্ত ; চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের 'দক্ষিণ ভারতে' ॥

'রবীন্দ্রগীতি' গ্রন্থে বাঙলা গানের ইতিহাসে রবীন্দ্র সংগীতের স্থান সম্পর্কে নানাদিক থেকে আলোচনা করেছেন জয়দেব রায়। রবীন্দ্র সংগীতের মর্মোদ্ঘাটনের পক্ষে সহায়ক হবে ॥ সুধীরচন্দ্র করের লেখা 'শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা' বইটি শিক্ষা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা অনুসরণ করার পক্ষে মূল্যবান ॥


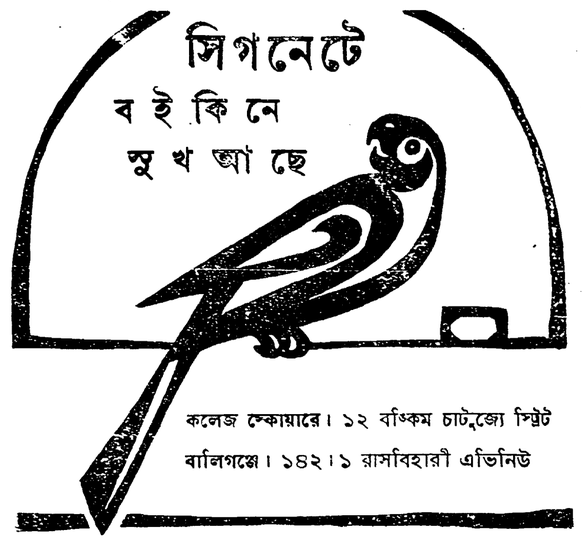

কলেজ স্কোয়ারে। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট
বালিগঞ্জে। ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

# পূর্ব্বাশা

## কার্ত্তিক—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| কার্ত্তিকের আলো : শিশিরকুমার দাস | ... | ৩২৪ |
| কলকাতা : শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায় | ... | ৩২৫ |
| মণিমালা সেন : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত | ... | ৩২৫ |
| প্রাগৈতিহাসিক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৩২৭ |
| লি-পো ( চীনে কবিতা ) : দিলীপ দত্ত | ... | ৩২৮ |
| পূর্বমেঘ ( গল্প ) : অশেষ চট্টোপাধ্যায় | ... | ৩২৮ |
| মোহেঞ্জোদারোর বাঙালী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৩৩৭ |
| সমালোচনা : অনিল বিশ্বাস | ... | ৩৫৭ |
| মারণ-মরণ : শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় | ... | ৩৬৩ |
| বিবাহিতা স্ত্রী ( উপন্যাস ) প্রতিভা বসু | ... | ৩৬৭ |
| শিল্পী : জেমস্ জয়স্ : অনুবাদক : অশোক গুহ | | ৩৭৪ |
| গড় শ্রীখণ্ড ( উপন্যাস ) : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ৩৭৯ |
| সন্দেশ | | |
| প্রেমের কবিতা : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৩৮৫ |
| সঙ্গীতের আদর্শ : মণিলাল সেন | ... | ৩৮৭ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতু বন্ধ— ২০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯






খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

OBL

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩



# পূর্ব্বাশা



ষোড়শ বর্ষ—১৩৬০

সপ্তম সংখ্যা—কার্ত্তিক


## কার্তিকের আলো

শিশিরকুমার দাস

এখনও আকাশ-দীপ এই গ্রামে জ্বলে !
রাতের হিমেল হাওয়া কেঁপে যায় অতি থরোথরো
কার্তিকের সারারাতে শিশিরেরা ঝরে দলে দলে
আকাশের গোপনীয় চিঠি নিয়ে হাতে।
পরস্পর বলে ওরা : চলো চলো করো ত্বরা করো
যেতে হবে এই গ্রামে আজ সারারাতে।'

আকাশ লিখেছে তাতে : যতদিন আছে এত তারা
ততদিন তুমি আছো : ধান-গম-জোয়ারের চারা
সবাই প্রাণের রঙে এই মাঠে মাঠে
ভরে দেবে শুধুই সবুজে।'

পৃথিবী শুধায় তাকে : তাই হ'ল : তাই ভেবে এই রাত কাটে
প্রাণে তবু ব্যথা জাগে, বেদনা তবু যে—
তুমি ত দিয়েছ এত হেমন্তের হিমেল বাতাস
দিয়েছ পুষ্পিত বন, মেয়েদের চোখে ভালবাসা
তোমাকে কি দেব আমি ?

হাসল আকাশ।

নীরবে আঙুল তুলে দেখাল সে দূরে বহুদূরে
সবাই যেখানে মৌন, স্তব্ধ সব কাঁদা আর হাসা—
একটি তরুণী শুধু হেমন্তের সুরে
সুর রেখে, আকাশকে শুধু ভালবেসে
জ্বেলেছে আকাশ-দীপ দিবসের শেষে।
আকাশ পৃথিবী তারা সকলেই সেদিকে তাকাল'
জ্বলে দূরে কার্তিকের অন্ধকারে মেয়েটির প্রদীপের আলো ॥

## কলকাতা

### শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

তোমাকে যে কতো ভালবাসি,
তুমি তো জানো না কলকাতা—
তোমার পাথর-বুক জুড়ে
আমার হৃদয়খানি পাতা।

আমার সকালটুকু রাঙা
তোমার সোনার রোদ্দুরে,
আমার বিকেল ভিজে ভিজে
সহজ মানুষদের সুরে!

আকাশে সূর্য নিভে গেলে
তোমার বাসর-রাত শুরু,—
আলোর অলংকার পরা'
কুমারী-শরীর দুরুদুরু?

তোমার ঝুমুর-ঝুম পায়ে
কী-যে ভাল লাগে কলকাতা,
তাই তো তোমার গায়ে-গায়ে
আমার হৃদয়মন গাঁথা॥

## মণিমালা সেন

### কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমি জানি এ-জীবনে জীবনের মণিমালা সেন
কোনদিন শুধোবে না: কেমন আছেন?

অবশ নয়ন যদি কোনদিন আকাশের তারা
গুণে যায়, চোখের পাতারা
আনমনে দেখে চেয়ে সেই সব কুচিকুচি আলোকের ফুল
কেমনে ছড়ানো আছে সমস্ত আকাশময়, আর
পৃথিবীর মধুমৃত্তিকার
মৈত্রেয়ী মমতা-গড়া বসন্তের-বকুল-পারুল



যদি কোনদিন এসে নীরবে বুলায়
সস্নেহে সুরভি ক্লান্ত চোখের পাতায়
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
সেইদিন-ও শুধোবে না: ঘুমোতে যাবেন?

যদি আমি কোনদিন গ্রীষ্মের প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলা
আনমনে দেখি চেয়ে হ্রদের মুকুর-চোখে তারাদের লুকোচুরি খেলা,
বিহ্বল পূর্ণিমা রাতে চেয়ে দেখি নীল নভে যদি মৌনমূক
কুমারী চাঁদের মুখে কালো মেঘ-ওড়নার ক্ষণে ক্ষণে সরে যাওয়াটুকু,
যদি আমি দেখি চেয়ে তীরে-তীরে শরবনে ছাওয়া
নদীর ললাটে চুপে চাঁদিমার টিপ দিয়ে যাওয়া,
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
সেইদিন-ও শুধোবে না: বলুন, অত কী দেখছেন?

কিংবা যদি কোনদিন বর্ষণবিবিক্ত কোন শ্রাবণনিশীথে
বেতসের বন হতে ভেসে-আসা ঝিল্লীর সংগীতে
হয়ে পড়ি উতল, অথবা
টুপ করে কোলে নেয় যে-শিশিরে চুপে-চুপে ভুঁইচাঁপা-জবা,
সেই শব্দ শুনি, আর শুনি
কান পেতে গেয়ে ওঠে কী মধুর পিক-ফিঙে-মধুটুনটুনি!
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
একবারো শুধোবেনা সেদিন: অত কী শুনছেন?

পৃথিবীর রূপরঙ এইভাবে চোখে নিয়ে যদি কোনদিন
নদীর পাড়ির পথ ধরে-ধরে কোন এক সাথী সংগীহীন
সমুদ্রের বেলাভূমে জীবনের সব ক্লান্তি নিয়ে
শিশুর মতন স্নিগ্ধ ঘুমে পড়ি হঠাৎ ঘুমিয়ে,
কিংবা যদি জেগে থেকে ঘুমোবার ভান করে স্বপ্নের বীজনে
শীকর-শীতল মন সেই সমুদ্রের গান শোনে একমনে,
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
সেইদিন-ও ঘুম থেকে ডেকে তুলে শুধোবে না: নুড়ি কুড়োবেন?

তারপর একে-একে ঝরে গেলে তারাদের উজ্জ্বল শেফালি,
নিভে গেলে জোনাকির সবুজাভ আলোর দেয়ালি,

## কলকাতা

### শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

তোমাকে যে কতো ভালবাসি,
তুমি তো জানো না কলকাতা—
তোমার পাথর-বুক জুড়ে
আমার হৃদয়খানি পাতা।

আমার সকালটুকু রাঙা
তোমার সোনার রোদ্দুরে,
আমার বিকেল ভিজে ভিজে
সহজ মানুষদের সুরে!

আকাশে সূর্য নিভে গেলে
তোমার বাসর-রাত শুরু,—
আলোর অলংকার পরা
কুমারী-শরীর দুরুদুরু?

তোমার-ঝুমুর-ঝুম পায়ে
কী-যে ভাল লাগে কলকাতা,
তাই তো তোমার গায়ে-গায়ে
আমার হৃদয়মন গাঁথা॥

## মণিমালা সেন

### কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমি জানি এ-জীবনে জীবনের মণিমালা সেন
কোনদিন শুধোবে না: কেমন আছেন?

অবশ নয়ন যদি কোনদিন আকাশের তারা
গুণে যায়, চোখের পাতারা
আনমনে দেখে চেয়ে সেই সব কুচিকুচি আলোকের ফুল
কেমনে ছড়ানো আছে সমস্ত আকাশময়, আর
পৃথিবীর মধুমৃত্তিকার
মৈত্রেয়ী মমতা-গড়া বসন্তের-বকুল-পারুল



যদি কোনদিন এসে নীরবে বুলায়
সস্নেহে সুরভি ক্লান্ত চোখের পাতায়
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
সেইদিন-ও শুধোবে না: ঘুমোতে যাবেন?

যদি আমি কোনদিন গ্রীষ্মের প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলা
আনমনে দেখি চেয়ে হ্রদের মুকুর-চোখে তারাদের লুকোচুরি খেলা,
বিহ্বল পূর্ণিমা রাতে চেয়ে দেখি নীল নভে যদি মৌনমূক
কুমারী চাঁদের মুখে কালো মেঘ-ওড়নার ক্ষণে ক্ষণে সরে যাওয়াটুকু,
যদি আমি দেখি চেয়ে তীরে-তীরে শরবনে ছাওয়া
নদীর ললাটে চুপে চাঁদিমার টিপ দিয়ে যাওয়া,
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
সেইদিন-ও শুধোবে না: বলুন, অত কী দেখছেন?

কিংবা যদি কোনদিন বর্ষণবিবিক্ত কোন শ্রাবণনিশীথে
বেতসের বন হতে ভেসে-আসা ঝিল্লীর সংগীতে
হয়ে পড়ি উতল, অথবা
টুপ করে কোলে নেয় যে-শিশিরে চুপে-চুপে ভুঁইচাঁপা-জবা,
সেই শব্দ শুনি, আর শুনি
কান পেতে গেয়ে ওঠে কী মধুর পিক-ফিঙে-মধুটুনটুনি!
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
একবারো শুধোবেনা সেদিন: অত কী শুনছেন?

পৃথিবীর রূপরঙ এইভাবে চোখে নিয়ে যদি কোনদিন
নদীর পাড়ির পথ ধরে-ধরে কোন এক সাথী সংগীহীন
সমুদ্রের বেলাভূমে জীবনের সব ক্লান্তি নিয়ে
শিশুর মতন স্নিগ্ধ ঘুমে পড়ি হঠাৎ ঘুমিয়ে,
কিংবা যদি জেগে থেকে ঘুমোবার ভান করে স্বপ্নের বীজনে
শীকর-শীতল মন সেই সমুদ্রের গান শোনে একমনে,
আমার এ-জীবনের মণিমালা সেন
সেইদিন-ও ঘুম থেকে ডেকে তুলে শুধোবে না: নুড়ি কুড়োবেন?

তারপর একে-একে ঝরে গেলে তারাদের উজ্জ্বল শেফালি,
নিভে গেলে জোনাকির সবুজাভ আলোর দেয়ালি,

মুছে গেলে প্রভাতের প্রভায় রাতের রঙ রেখা,
বন্ধ হলে সমুদ্রের কাছে নম্র লজ্জাবতী বাতাসের মুগ্ধ গান শেখা,
সরে গেলে পৃথিবীর বুক হতে রজনীর স্নিগ্ধ শাঁখা-হাত,
নেমে এলে পূর্বাশার বুক বেয়ে অফুরান আলোর প্রপাত,
তখনো তখনো হায় একবারো জীবনের মণিমালা সেন
বলবেনা : রাতশেষ, এবার চলুন ফিরে, বাড়ি ফিরবেন ॥

## প্রাগৈতিহাসিক

### সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

কী সমুদ্র-স্নান লেগে আছে
তরঙ্গিত দেহের রেখায় !
কবোষ্ণ স্বেদের বিন্দু নীলাঙ্গ পারদ হয়ে নাচে—
অশ্রুজল টলটল কালো পাহাড়ের পরিখায়
এখনো দেখতে পাই শারদ রজনী ফিরে এলে
তোমারি শ্রীমুখে।

হিম-ঋতু কিছু নয় বসন্ত-কৌতুকে
আবার আরেক দেখা কুয়াশার ছায়া মুছে ফেলে
নতুন বিস্ময় হিমে-হিরণ্যে-হিঙ্গুলে
সিঁদুরে আবীরে মাখা পৃথিবীর মতো কোন পৃথুলার বিয়ে
দিকভ্রান্ত বালকের নিয়ে
তোমার মনের রঙ মেখে দাও তার মুখে চুলে
পিঙ্গল আভায়।

নেমে যায় মন দূর নীরব দক্ষিণে।
ক্রূর নাবিকের বেশে বালুচরে সিংহলে যাভায়
একদিন কার সাথে দেখা, মৃণালিনী ?
কোন্ শ্বেত শতদল নিলে হাতে বৈশাখের দিনে,
তারপর সব যুগে বলবে কি করতালি দিয়ে : তারে চিনি !

# পূর্বমেঘ

## অশেষ চট্টোপাধ্যায়

### কুয়াশা-বৃষ্টি

জামাটা খুলছিল সুপ্রিয়। অফিস থেকে ফিরেছে সবে। নীলা এসে বলল : দাদা শ্রীলাদি এসেছিল।

বছর এখনো বৈশাখের শৈশব পেরোয় নি। আচমকা যেন প্রথম উত্তরে হাওয়ার ঝলক লেগে শিরশিরিয়ে উঠল সুপ্রিয়। আধগলান জামাটা শুদ্ধু ঊর্দ্ধবাহু অবস্থায় জমে গেল যেন মাথাটা জামার নীচে। সারাদিনের ঘামে জামাটা অনেকবার ভিজেছে শুকিয়েছে। ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। দম আটকে এলো সুপ্রিয়র। এক হ্যাঁচকা টানে জামাটা খুলে ফেলল। অনেক ধোপ কাচা জীর্ণ হ'য়ে আসা জামাটা পিঠের কাছে, অনেকখানি ফেঁসে গেল।

আঃ কি অসাবধান তুমি। ছিঁড়লে তো জামাটা!— নীলার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

ভ্রূক্ষেপ না করে সুপ্রিয় বলল : কে এসেছিল?

বললাম তো শ্রীলাদি, তোমার কলেজের বন্ধু।

শ্রীলা? এতদিন পরে? হঠাৎ? প্রশ্নগুলো যেন চেতনার স্বীকৃতি ছাড়াই ছিটকে বেরিয়ে এলো।

কলকাতায় এসেছে দিনকতকের জন্য। ওর স্বামীর কণ্ট্রাকটারীর কি কাজ আছে। একটু থেমে নীলা বলল : মা শ্রীলাদির সামনে এমন কাঙালপনা করছিল যে কি বলব! নিজেদের দারিদ্র্যটা এমনি করে ঢাক পিটিয়ে জানাবার যে কি দরকার বুঝি না।

নিরুতপ্ত মনে কথাগুলো শুনে গেল সুপ্রিয়। প্রাত্যহিক অনটনের তালিকা শুনছে যেন। মন্তব্য করলো না। রংকরা ফাপা সেলুলয়েডের পুতুলের মতই আত্মসম্মানের খোলসটা হাস্যকর অস্তিত্বসর্ব্বস্বতায় এসে ঠেকেছে। নিজেদের অক্ষমতাটা অবরণ-হীন স্বৈরিনী দেহের মতই ন্যক্কারজনক নগ্নতায় বিজ্ঞাপিত।

শ্রীলা হঠাৎ এলো যে এতদিন পরে? কিছু বলেছে?— জামাটা হুকে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে অন্যমনস্কভাবে বলল সুপ্রিয়।

কি করে বলব? বড়মানুষের মেজাজের নাগাল পাওয়া কি আমাদের কাজ? বললে কাল সকালে তোমাকে ওর বাড়ী যেতে। আসলে এসেছিল শাড়ী, গাড়ী আর গয়না দেখাতে : নীলার গলার স্বরে একটা আশ্চর্য্য তীব্রতা ছড়িয়ে পড়ল।

সুপ্রিয় তাকাল নীলার দিকে। মুখের রেখাগুলো সামান্য বেঁকেচুরে একটা মৃদু হাসির স্থাপত্য ফুটিয়ে তুলল ওর ঠোঁটে।

আশ্চর্য তুমি হাসছ, হাসতে পারছ? চাবুক-নাচানো হিংস্রতায় ঝিলিক দিয়ে ওঠা নীলার গলাটা।

তুই অত রাগ করছিস কেন বল্‌ত? —অত্যন্ত সহজভাবে বলল সুপ্রিয়।

সুপ্রিয় নীলার দিকে তাকিয়ে সেই রকম মিঠিমিঠি হাসতে লাগল। ঘা খেয়ে খেয়ে নীলার শরীরের আর মনের সমস্ত রস অনাবৃষ্টির আঁচে মাঠে ঝলসে যাওয়া ফসলের মতো শুকিয়ে গেছে। ছাব্বিশ বছর বয়স হ'ল নীলার, কিন্তু শরীরটা বাড়েনি বয়সের আন্দাজে। আজও আটকে রয়েছে ষোলোর তাকে। মুখটা অভিজ্ঞতার আগুনে পুড়ে বুড়িয়ে গেছে অনেকখানি। একটা অস্বাভাবিক রুক্ষতার মুখোস সবটুকু লালিত্যকে রবার ঘসে মুছে ফেলেছে মুখের মলাট থেকে।

: এসে এমনভাব দেখাতে লাগল যেন কিছুই হয়নি কোন দিন। দামী শাড়ীশুদ্ধ ধপ করে বসে পড়ল মেঝের ওপোর। আমি বেশী আমোল দিই নি। গায়ে পড়ে আলাপ করতে লাগল মায়ের সঙ্গে। আর মাও গলে গেলেন একেবারে। বিনিয়ে বিনিয়ে দুঃখ জানাতে আরম্ভ করলেন। সংসার চলছে না। আমার পড়া বন্ধ। বৌদির অসুখ। পয়সার অভাবে চিকিৎসা হ'চ্ছে না। কিছুই বাদ দিলেন না। তারপর তোমার পুত্ররত্ন মণ্ট আবার গাড়ী দেখে চড়বার বায়না ধরে বসলেন।

তারপর? যেন খুব একটা উপভোগ্য কাহিনী শুনছে সুপ্রিয়।

তারপর আর কি? আমি চোখ টিপলাম মণ্টকে। কিন্তু সে কি আর শোনে। শেষে শ্রীলাদিই আবার বলল, আহা চড়ুক না, ছেলেমানুষ। মণ্টকে নাবিয়ে দিয়ে যাবার সময় আবার বৌদির জন্যে এতগুলো ফল কিনে মার হাতে দিয়ে গেল। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই ওগুলো ডাষ্টবিনে ফেলে। উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে নীলা।

সুপ্রিয় নির্ব্বিকার ভাবে একটা সস্তা সিগারেট ধরিয়ে ক্যাম্বিজের ইজি চেয়ারটায় গা মেলে দিল। নীলা চলে গেল সুপ্রিয়র ঔদাসীন্যে বিরক্ত হ'য়ে। আর শ্রীলার নামটা অবয়বহীন ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে গেল সুপ্রিয়র মনে। বিস্মৃতির গভীরতায় শ্রীলার নামটা এতদিনে মাটি চাপা-পড়া খনিজের মতই প্রায় কঠিনতায় জমে এসেছিল।

আশ্চর্য : সুপ্রিয় ভাবল। শ্রীলা এসেছিল। প্রায় আট বছর পরে। এতদিন পরে সৌরপথপরিক্রমা শেষ হ'ল। শ্রীলা থাকে বম্বেতে। আবস্থানিক দূরত্বটা উপেক্ষনীয়। মাত্র তেত্রিশ টাকা কয়ানার বদলেই মিলতে পারে হলুদ রংয়া একটুকরো ছাড়পত্র। কিন্তু মানসিক দূরত্বটা বোধহয় আলোকবর্ষের মাপকাঠিতেও মাপা যাবে না। মনের ক্যানভাসের শ্রীলার তীক্ষ্ণ প্রোফাইলটার সীমা-রেখাগুলো অস্পষ্টতায় ধুসর। সময়ের উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে কিছুটা বিবর্ণ। শ্রীলা সান্যাল। স্বাতীতারার টিপ যার দুই উজ্জ্বল চোখে। আট বছর আগে এই একটি পায়রা-বুকের উত্তাপে স্বেদাক্ত হ'তে পারতো আর একটি হৃদয়। মনের ব্লাষ্ট-ফারনেসে জ্বলতে পারতো বহুবর্ণ কামনায় লালনীল আশ্চর্য শিখা। সে আগুন নিভে গেছে অনেক দিন। পড়ে আছে বিকৃত পোড়া পোড়া কখণ্ড অংগার শুধু।

পরের দিন রবিবার। ঘুমঘুম মনেই উঁকি দিল শ্রীলার মুখ। খুঁজে খুঁজে একখানা ফর্শা জামা পেলোনা সুপ্রিয়। অগত্যা ঘাড়ছেঁড়া আধময়লা পাঞ্জাবীটাই গলিয়ে নিল।



মা বললেন : শ্রীলার কাছে যাচ্ছিস?

হ্যাঁ। সুপ্রিয় ছোট্ট জবাব দিল।

বিনুর যাতে একটা চাকরী-বাকরী হয় ছাখ না। কত বড়লোক ওরা আজকাল। কত জানশোনা। ওরা ইচ্ছে করলেই পারে : কেমন করুণ শোনায় মায়ের গলার আওয়াজটা। বিনু সুপ্রিয়র ছোটো ভাই। নীলার পরে। বি, এ, পাশ করে বসে আছে আজ এক বছর।

খবরদার দাদা, তুমি শ্রীলাদির কাছে বিনুর হ'য়ে উমেদারী করতে পারবে না। নীলার শাণিত গলাটা প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। গরীব বলে শ্রীলাদি একদিন তোমাকে যথেষ্ট অপমান করেছে। আজ আর যেচে অপমান কুড়োবার কোনো দরকার নেই।

তবে নিজেদের মান নিয়ে ধুয়ে খা। রাগ করে মা চলে গেলেন। মৃদু হেসে সুপ্রিয় বেরিয়ে গেল।

## শেষের ক' পাতা

কম্পাউণ্ড ঘেরা প্রকাণ্ড বাড়ীটার সামনে একবার দাঁড়াল সুপ্রিয়। ভাবল : ঢুকবে কিনা। মন কাঁপল ছমছম। আট বছর আগে শেষ ঢুকেছিল। আর বেরিয়েছিলো আর কোনদিন আসবে না ঠিক করে। দলা পাকান কাগজের মত দুমড়ে মুচড়ে ফেলতে চেয়েছে শ্রীলাকে। কিন্তু পারে নি। হঠাৎ বৃষ্টি ঝরিয়ে যাওয়া মৌসুমী মেঘের মত শ্রীলা সান্যাল মনের রুক্ষ পোড়া মাঠে স্মরণের ফসল ফলিয়েছে। সাত বছর আগে বিয়ে করেছিলো কল্যাণীকে। নিজের অক্ষমতায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে নিজের ওপোর শোধ তোলবার জন্যে। কল্যাণীকে দিয়ে শ্রীলাকে চাকবার চেষ্টা করেছে কিন্তু পাতলা কাগজের আবরণ ভেদ করে উঁকি মারা চড়া রংঙের পোষ্টারের মত শ্রীলার মুখটা বারবার ফুটে উঠেছে অন্তঃকরণে।

ঢুকতে সংকোচ হচ্ছিল সুপ্রিয়র। শ্রীলার বাবা যে বাড়ীখানা ওকে দিয়ে গেছেন, তাতে অনায়াসেই গোটা পনেরো উদ্বাস্তু পরিবার স্থান দেওয়া যেতে পারে স্বচ্ছন্দে। শ্রীলা থাকে বম্বেতে। সারা বছরই বাড়ীটা পড়ে থাকে ভৃত্য-তন্ত্রের জিম্মায়। দরোয়ানকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুপ্রিয়।

শ্রীলা নিজেই বেরিয়ে এলো। অনেক বদলে গেছে। আঠ বছর অনেক সময়। অনেক মাস, তার চেয়েও অনেক বেশী দিনের সমষ্টি। আগে ছিল পাৎলা একহারা। প্রায় রোগা বলা চলত। এখন নতুন বর্ষার জলে ধোওয়া ধানক্ষেতের মতো প্রাচুর্যে নিটোল। সুখেই আছে শ্রীলা। আটটা বছর নতুন মডেলের গাড়ী চেপে ঘরের মেঝের মত মসৃণ আট মাইল রাস্তার মতই পথ অতিক্রম করেছে। আর সুপ্রিয় অসমতল কাদা প্যাচপ্যাচে মেঠো রাস্তায় চাকা-ভাঙা গরুর গাড়ীর মতই বিপর্যস্ত হয়েছে প্রতিটি পদক্ষেপে।

ওঃ তুমি যে শেষ পর্য্যন্ত আসবেই, আমি ভাবতেও পারিনি : অভ্যর্থনাটা আসে শ্রীলার তরফ থেকেই।

সুপ্রিয় অবাক হ'লো। বিস্ময়ের বুদ্বুদ কতকগুলো বৃত্ত ছড়ালো। হাসছে শ্রীলা। হেসেছিল সেদিনও। এমনি পাৎলা হাসির মুখোসের নীচে মুখ লুকিয়ে।

কি আশ্চর্য দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসো: আঙুলের ডগায় সুপ্রিয় অনুভব করলো নরম মুঠোর চাপ।

বসলো সুপ্রিয়। শ্রীলার মুখোমুখি।

একি চেহারা হ'য়েছে তোমার সুপ্রিয়? কেমন যেন নরম শোনাল শ্রীলার গলাটা

চশমার ভাঁটিটা সুতো বাঁধা। ঘাড়ছেঁড়া পিঠ ফাটা আধময়লা পাঞ্জাবী। শীর্ণ রুক্ষ মুখ। কপালের আয়তক্ষেত্রে আঁকাবাঁকা ভারী রেখার মানচিত্র। হঠাৎ যেন একটা অদৃশ্য আয়নায় নিজেকে প্রতিফলিত হ'তে দেখল সুপ্রিয়।

হাসল, বলল: একশো পঁচাত্তর টাকা মাইনের কেরাণীর পক্ষে খুব কি বিষদৃশ দেখাচ্ছে চেহারাটা?

মেঘকন্যার ধূসর মুখের প্রতিচ্ছায়ায় ম্লান হ'লো শ্রীলা সান্যালের মুখ। কাঁপল কাঁধ পর্য্যন্ত। থমকালো বাদামী চুলের ঢল। নরম কাঁচের মতো স্বচ্ছ দুটি চোখে জমল যেন কুয়াশার জলকণা।

এ তোমার অভিমান সুপ্রিয়। একরাশ কান্না কাঁদল—শ্রীলায় গলায়।

আবার যেন আগের শ্রীলা। ছিঁড়ে ফেলেছে সময়ের নির্মোক। অনেক দিনের ভুলে যাওয়া স্বরলিপি যেন গান হ'তে চাইল সুপ্রিয়র মনে। তিক্ততার কংক্রীট-জমা কঠিনতায় টোল পড়ল।

: অভিমান, কি মুস্কিল, কার ওপোর অভিমান করতে যাব? বিব্রত সুপ্রিয় কোচের হাতলের ওপোর কোনো অদৃশ্য বস্তুকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করতে থাকে।

ও কথা থাক তার চেয়ে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

বল। সহজভাবে বলল সুপ্রিয়।

কেমন আছ জিজ্ঞাসা করলে ভাববে ব্যংগ করছি। কাল গিয়েছিলাম তোমার বাড়ী, দেখেছি সবই। তবু প্রশ্ন করি তুমি কি সুখী হ'য়েছ সুপ্রিয়?— তলা খুঁজে না পাওয়া গভীরতায় অস্পষ্ট হ'য়ে আসে শ্রীলার গলা।

সুপ্রিয় তাকাল শ্রীলার দিকে। আঁকাবাঁকা চঞ্চল ঈথারের ঢেউয়ের মত আলোছায়ার টানাপোড়েন চলেছে ওর মুখে।

দুবার কি বলতে গিয়ে থেমে গেল যেন সুপ্রিয়। তারপর বলল, এ সব অবান্তর প্রশ্ন এখন থাক। তোমার কথা বল। হঠাৎ এতদিন বাদে স্মরণের হেতু? বলে চিকচিকে হাসি ছড়ালো সুপ্রিয়।

মনস্তত্ত্বে বলে কোনো একটা অতীতে দেখা বস্তুকে নতুন করে দেখলে তার সংশ্লিষ্ট বস্তুগুলোও নাকি আপনা হ'তেই মনে পড়ে। কাল বিকেলে ময়দানে আকাশের রং দেখে কনেকদিনের পুরোন একটা সন্ধ্যা যেন ঝিলিক দিয়ে গেল মনে। তারপরেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম তোমার বাড়ীর দরজায়। ফিরতে আর পারলাম না: কথাটা শ্রীলা সুরু করেছিলো হাওয়ায় পালক ওড়ান লঘুতায়। শেষ দিকটা যেন প্রায় না শুনতে পাওয়া অস্পষ্টতায় মিলিয়ে গেল। কোথায় যেন রেখে গেল একটা দীর্ঘ মীড়।

তোমার খেয়ালের নাগাল পাওয়া আমার সাধ্য নয়। যাক, কেমন আছ বল: জমাট আবহাওয়াটা হাল্কা করে দিতে চাইল সুপ্রিয়।



সুখে আছি! পরম সুখে আছি। প্রত্যেক মেয়ের যা কাম্য তা তো অজস্রই পেয়েছি। বাড়ী, গাড়ী, গয়না, খরচ করার মতো যথেষ্ট টাকা, কিছুরই অভাব নেই: শ্রীলার হাসিটা যেন ব্যংগের জারকরসে তেতো হ'য়ে গেল।

তোমার স্বামী বাড়ী নেই? প্রসংগটা এড়াবার জন্যেই বলল সুপ্রিয়।

না, তিনি শীকার ধরতে বেরিয়েছেন: হাসল শ্রীলা।

: শিকার ধরতে বেরিয়েছেন। এখানে এসেছেন কতকগুলো মোটা অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ জোগাড় করতে। পার্টি ঠিক হ'লেই কনট্রাক্ট সই করানো পর্য্যন্ত বাকী ব্যাপারটা আমার হাতে: শেষ রাতের কুয়াশা যেন পর্দা নামায় শ্রীলার মুখের ওপোর।

পিওর আর্টসের ছাত্রের কাছে কঠিন ক্যালকুলাসের মতই দুর্ব্বোধ্য মনে হয় সুপ্রিয়র শ্রীলাকে।

কেন? বিস্ময়ে আরও বোকা বোকা দেখায় সুপ্রিয়র মুখটা।

: আমার কাজ কিছু মিষ্টি হাসি আর দরকার হ'লে তার চেয়ে বেশী কিছু বিতরণ করা: নরম কাদামাটিতে পায়ের ছাপের মত কেটে কেটে বলল শ্রীলার প্রতিটি কথা।

সুপ্রিয় বুঝল। চমকালো। দেখল: সামনে বসে আছে শ্রীলা নয়। কোনো মানবী নয়। একটা রং করা ক্যালেণ্ডারের রঙীন প্রচ্ছদপট যেন।

: আমার ওপোর তোমার খুব ঘৃণা হ'চ্ছে, না সুপ্রিয়। ঝাপসা গলায় আস্তে আস্তে বললো শ্রীলা।

না, ঘৃণা হ'বে কেন। বিব্রতভাবে বলল সুপ্রিয়।

তবে কি সহানুভূতি? করুণা? আলো চমকালো বেয়নেটের মতো। শ্রীলার গলাটা ঝিলিক দিয়ে উঠল হিংস্রতায়। তারপরেই নিভে গেল।

সুপ্রিয় চুপ। শ্রীলাও। অনেক মুহূর্ত্তের ফোঁটা ঝরল সময়ের চোখে। মাঝ রাত্রের আরণ্যক স্তব্ধতায় বোবা হ'য়ে রইল অনেকক্ষণ। জানলার সামনে রোদ্দুরের আয়তক্ষেত্রটা তির্যক হ'য়ে ছোট হ'তে হ'তে মিলিয়ে গেল।

চল একটু বেরুই সুপ্রিয়। এমনি ভাবে ব'সে থাকতে ভাল লাগছে না: একটু নড়ে-চড়ে বলল শ্রীলা।

কোথায়? জিজ্ঞাসা করল সুপ্রিয়।

যেখানেই হোক।

ওরা এসে বোসল প্রিনসেপ্‌স্ ঘাটের জেটি ছাড়িয়ে। গঙ্গার ধারে। একটা ঝুপসি গাছের ছায়ায়। ঢেউয়ের মাথায় রোদ্দুরের অভ্রকুচি। ঢেউ ভেঙ্গে ভেঙ্গে ক্লান্ত রংচটা জাহাজের সারি।

ওঃ কতদিন বাদে এলাম বলত। ছটফটিয়ে বলল শ্রীলা।

অনেকদিন বাদে। সুপ্রিয় বলল।

অনেক পুরোন কথা মনে পড়ছে না তোমার? সেই রকম হাল্‌কাস্বরে বলল শ্রীলা।

মনে পড়ে লাভ! নিরাসক্ত গলায় বলল সুপ্রিয়।

এই আট বছর ধরে অনেক লবণাক্ত জল ভেঙেছে সুপ্রিয়। নোনা হাওয়া মরুভূমির মত শুষে নিয়েছে শরীর আর মনের সমস্ত রস। কিন্তু কোথায় তীর। কোথায় সেই নারিকেল বলয়িত এ্যাটলদ্বীপের আশ্বাস। কল্যাণী ভুগছে আজ এক বছর। রোগটা কারুর অজানা নয়। এমন কি কল্যাণীরও নয়। কবে কল্যাণীর ফুসফুসের সেই কালো দাগটা তার পরিধি ছড়িয়ে দিতে লাগল ক্রমশঃ। কল্যাণীর গয়নাগুলো গেছে। পলিসি বাঁধা রেখে যে টাকাটা জোগার করেছিলো তাও ফুরিয়েছে। তবু কল্যাণী মরবে না। সহজে মরবার ব্যাধি নয়। কল্যাণীর নিস্তেজ বিবর্ণ রক্তকণিকারা শেষ পর্য্যন্ত লড়বে। তারপর কোনো একদিন রক্তশূন্য হাড়ওঠা ফ্যাকাশে মুখের ফ্রেমে বাঁধান একজোড়া চোখের সকরুণ মিনতি মুছে যাবে মৃত্যুর কঠিন শিলমোহরে।

চোখ পড়ল শ্রীলার হাতদুটোর ওপোর। হাঁটু দুটো জড়িয়ে রয়েছে। নিটোল। মসৃণ। কল্যাণীর রুক্ষ শিরাওঠা শাঁখাপড়া হাত দুটো মনে পড়ল সুপ্রিয়র। হাসি পেল। কল্যাণীর ধারণা সুপ্রিয় ওকে ভালবাসে। ভুল। সুপ্রিয় কোনদিন ভালবাসেনি কল্যাণীকে। সাত বছর একই ছাদের তলায় থাকতে থাকতে গৃহপালিত জীবের মত একটা মমতা পড়ে গেছে কল্যাণীর ওপোর। কল্যাণী খেলনা নিয়েই ভুলে আছে। ওইটুকুই সান্ত্বনা তার।

আচ্ছা সুপ্রিয় তুমি আমাকে এখনো ভালবাস? বিনা ভূমিকায় পরিষ্কার না-কাঁপা গলায় বলল শ্রীলা। লঘু কৌতুকে চকচক করলো দুচোখ।

আকস্মিকতায় হোঁচট খেল সুপ্রিয়। তাকাল। দুটি আশ্চর্য চোখের অপরূপ সকৌতুক অনুস্থিতি। সমান্তরাল দৃষ্টিরেখা। নাগরদোলায় দুলল মন। কথার পিঠে কথা ভীড় করল। উঠল আর নামল। আবার উঠল।

বল সুপ্রিয়। জলতরংগে পুরোন সুর। অনেক পরিচিত পুরোন রেকর্ড আবার নতুন করে শুনলো সুপ্রিয়।

তবু কল্যাণী মরবে না: ভাবল সুপ্রিয়। পুড়বে, তবু নিঃশেষে ছাই হ'বে না। অংগারের মত ভেতরে ভেতরে জ্বলবে। আর জ্বালাবে সুপ্রিয়কেও।

কি জানি। নিস্তেজ গলায় বলল সুপ্রিয়।

আমিও বুঝতে পারি না সুপ্রিয় তোমাকে ভালবেসেছিলাম কিনা। কেনই বা তোমাকে ফিরিয়ে দিলাম। কেনই বা আবার তোমার নাম নিলাম। একটু থেমে শ্রীলা আবার বলল: সুপ্রিয়।

বল। বড় দুর্ব্বল শোনাল সুপ্রিয়র গলাটা। চেষ্টা করেও কঠিনতার খাদ মিশোতে পারল না।

: সেদিন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম তোমার ডন কুইকসোটিয় মধ্যবিত্তসুলভ সেন্টিমেণ্ট ছাড়তে পারনি বলে। তোমাকে বললুম বিয়ে কর আমাকে, বাবাকে বলে চাকরী দেব। তুমি আমার বাবার দেওয়া চাকরী করতে চাইলে না। কার ভুল হ'য়েছিলো তার হিসেব-নিকেশ আজ অবান্তর। তবে সুখী তুমিও হও নি। আমিও হইনি।



কি পেয়েছে সুপ্রিয়? দারিদ্র্য, অনটন, অবিবাহিতা বোন, অসুস্থ স্ত্রী। শ্রীলা পেয়েছে অর্থগৃধ্নু হৃদয়হীন স্বামী, টাকার জন্যে নিজের স্ত্রীর সম্মানকেও যে কার্পেটের মত মাড়িয়ে যেতে দ্বিধা করে না।

সারা জীবন ধরে কি এই ভুলেরই মাশুল আমরা শুধবো সুপ্রিয়? গঙ্গার তারাফোটা ঢেউয়ের দুটুকরো প্রতিফলন পড়ল শ্রীলার চোখে।

প্রশ্নটা যেন সুপ্রিয়র মনেই লুকিয়েছিলো। আর একটি সমর্থনের উত্তাপে সংকোচের কুয়াশা গলাল।

মরবেই কল্যাণী। আর বুঝি তাকে সুপ্রিয় বাঁচতে পারবে না। চলচ্চিত্রের দৃশ্যান্তরের মতই মুছে যাবে; মরবেই কল্যাণী। মরবেই।

অবশেষে আবার সেই পুরোন কথার ওপোর নতুন রং ছড়াল। নতুন আংগিকে জ্বলল স্বাতীতারা চোখ। কাঁপল কাঁধ পর্য্যন্ত, থমকালো ঢেউ ঢেউ চুল। অনেক বছর আগের আরেক সকালের আলোয় উজ্জ্বল হ'লো পৃথিবী।

সুপ্রিয় বলল: আমি কি পারব শ্রীলা।

শ্রীলা বলল: তুমি বড় ভীতু সুপ্রিয়।

শ্রীলা এগোল জলের ধারে। আঙ্গুল ছোঁয়াল জলে। জলশুদ্ধু আঙ্গুল ছোঁয়াল সিঁথিতে। মুছে ফেলল সিঁদুরের অংগরাগ। শ্রীলা বলল: সুপ্রিয় তাকাও আমার দিকে। সুপ্রিয়র চোখে জ্বলল অম্লাণের আকাশ প্রদীপ। আবার আগের শ্রীলা। আরও সুন্দর, সূর্যের আশ্চর্য ভাস্বর প্রতিভায় আরও উজ্জ্বল। সুপ্রিয় বলল: তোমাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

## কাহিনী

সন্ধ্যেবেলায় গলির মোড়ে ট্যাক্সীটা দাঁড় করাল শ্রীলা। দেহ-ঘনতায় নিশ্চুপ সুপ্রিয়কে ধাক্কা দিল শ্রীলা।

বাড়ী যাবে না একবার। শ্রীলা জিজ্ঞাসা করল।

কি দরকার? ঘুমঘুম গলায় বললে সুপ্রিয়।

নাইট-মেল সার্ভিসের টিকিট কাটা হ'য়ে গেছে। এগারটায় দম-দম ছাড়বে প্লেন। তারপর অনেক ওপরে। সকাল বেলা আরেক সূর্য্যের আলোয় নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি হ'বে পৃথিবীর সঙ্গে।

শ্রীলা ব্যাগটা খুলল। বের করল একতাড়া নোট। বোলল: এই নাও। এটা দিয়ে দাও বাড়ীতে। এখন আটটা বাজে। আমি আসব সাড়ে নয়টায়। তৈরী থেকো।

সুপ্রিয় বসলো। শ্রীলা চলে গেল। আর সেই মুহূর্তেই সুপ্রিয়র নিজেকে বড় বেশী

ভারী বলে মনে হ'লো। অনেক শীতের জমান জলকণা জমল মনের শার্শিতে। তবু দাঁড়াল বাড়ীর দরজার সামনে। কড়া নাড়ল।

দরজা খুলল নীলা।

এতক্ষণ কোথায় ছিলে। ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলো নীলা।

কোন কথা না বলে ঘরে ঢুকলো সুপ্রিয়। বিচিত্র এক স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ-হীন অনুভূতিতে ভরে গেল সমস্ত মন। ঘরটা যেন গ্রাস করে নিল ওকে। মনে হ'ল: ঘরটার নোংরা দেয়াল গুলো যেন আরও কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। দম আটকে এলো সুপ্রিয়র। এ যেন চক্রব্যূহ। ঢোকা যায়। বেরুনো যায় না।

: বৌদির অসুখ আবার বেড়েছে। মুখ নীচু করে আস্তে আস্তে বলল নীলা: তোমার ফিরতে দেরী হওয়ায় ভীষণ অস্থির হ'য়ে উঠেছিলো বৌদি। বিকেলে চিনু কড়া নেড়ে ছিলো। বৌদি ভাবল, বুঝি তুমি এসেছো, দুর্ব্বল শরীরে উঠে খুলতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলো। আবার রক্ত উঠেছে।

সুপ্রিয়র মনে হ'ল: সে যেন পিরামিডের তলায় কোনো বদ্ধ ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। নিঃশ্বাস চেপে ধরেছে হাজার হাজার বছরের পুরোন বোরা বাতাস। এ ঘরের সব কিছু মৃত। এমন কি সময়ও। সকালে যেমন ছিল। এখনও তেমনি আছে। এগোয় নি এক পাও। এ ঘরের রাত নেই, দিন নেই। আছে শুধু একটা অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থিতি। শ্রীলার রঙীন মুখটা প্রাণপনে আঁকড়ে ধরতে চাইল সুপ্রিয়। কিন্তু পারল না। হাজার হাজার কলম তাদের তীক্ষ্ণ নোংরা নিবে কাটাকুটি করে কালি মাখা আস্তরণের নীচে চাপা দিল শ্রীলার মুখটাকে।

বসল এসে কল্যাণীর মাথার কাছে। কল্যাণী চোখ খুলল। এক শ্রাবণের মেঘ যেন নিংড়ে নিল চোখের কানায় কানায়। অনেকক্ষণ কাঁদল কল্যাণী। শব্দহীন কান্না। সুপ্রিয়র একখানা হাত ধরে বলল: কোথায় গিয়েছিলে আমাকে ফেলে? যাবে আর কখনও?

: না আর কখনো এতদেরী করব না ফিরতে। কোঁচার খুঁট দিয়ে মুছিয়ে দিল কল্যাণীর চোখ দুটো। গভীর পরিতৃপ্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল কল্যাণী।

আবার বাঁচবে কল্যাণী: সুপ্রিয়র মনে হোল। শ্রীলার দেওয়া টাকাগুলো আছে। কাল হয়ত আবার ডাক্তার ডাকতে পারবে। ওষুধের শিশির ওপোর নতুন লেবেল পড়বে। কল্যাণীর ফুরিয়ে আসা আয়ুর মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ানো চলবে। বাঁচবে কল্যাণী। বাঁচবে।

## উপসংহার

কতক্ষণ বসেছিলো খেয়াল নেই সুপ্রিয়র। চমক ভাঙল গাড়ীর শব্দে। বাড়ীর সামনে থামলো গাড়ীটা। শ্রীলা এসেছে। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে দুপুরটা ঝিলিক দিয়ে গেল চোখের সামনে। শ্রীলার মায়াবী মুখ। জলতরংগ হাসি। ঘুমোচ্ছে কল্যাণী। ঘুমোক।



কড়া নাড়ার শব্দ হোল। দরজা খোলার। নীলা এসে বলল: দাদা শ্রীলাদি ডাকছে তোমাকে। গলার স্বরে বিরূপতার স্পষ্ট আভাষ।

কি বলেছিস? বাড়ীতে আছে? নিঃশ্বাস চেপে ফিসফিসিয়ে বলল সুপ্রিয়।

না কিছু বলিনি।

তবে বলে দে বাড়ী নেই। সুপ্রিয়র মনে হ'লে অন্য কেউ যেন কথা বলল তার মুখ দিয়ে। নীলা চলে গেল অবাক হ'য়ে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটা যেন পরিষ্কার কানে শুনতে পেল সুপ্রিয়।

একটু দেরীকেই দরজাটা বন্ধ হ'ল। গাড়ীটা ষ্টার্ট নিল। নীলা বলল: শ্রীলাদি এই চিঠিটা দিল তোমাকে।

কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠির ভাঁজ খুলল সুপ্রিয়। তাড়াতাড়িতে লেখা আঁকাবাঁকা স্বচ্ছ কটি কথা। লেখা আছে: সুপ্রিয় আমি যেতে পারলাম না। আমি বড় দুর্বল। আমাকে ক্ষমা কোর। শ্রীলা।

একটা বিচিত্র হাসি কুণ্ডলী পাকানো ধোঁওয়ার মত ফেনিয়ে উঠল সুপ্রিয়র ঠোঁটে। কেঁপে কেঁপে মিলিয়ে গেল।

কান পাতলো সুপ্রিয়। গাড়ীর আওয়াজ আর শোনা যায় না। তবু শুনবে বলে কান পাতল। এতো ভালো লাগছিল শুনতে আওয়াজটা!

মিশরী নৌবৌরিচি
[ খ্রীঃ পুঃ ৩৫০০-২৭০০ ]
পটহোটেপ

দাও তারে ভোগ বহু বসন সরস
আলতা-তেলের দেহ-সাজ
রাগের কেন বা হবে বশ
ঘরে যদি অনুরাগে উপছায় বুক, হয় হাতও দরাজ॥

# মোহেঞ্জোদারোর বাঙালী

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

[ এক ]

আমরা হয়ত অনেকেই জানিনে মোহেঞ্জোদারোর সভ্যতা আবিষ্কারের পর কলিঙ্গে ও ওড়িষ্যায় স্যর জন মার্শ্যাল একটি প্রাচীন এশিয়া-মাইনরী সভ্যতা আবিষ্কার করে গেছেন। অবশ্য রায় বাহাদুর দয়ারাম শাহনি হড়প্পা থেকে ১৯২২-২৪-এ কতগুলো মাটির দুই-ইঞ্চি-পরিমিত শিব-লিঙ্গ ( ঊর্দ্ধরেতা ) আবিষ্কার করে মার্শ্যালকে দেখিয়ে জানতে চেয়েছিলেন, ওগুলো মথুরা বা গুড়িমল্লমের লিঙ্গ কি না। তদুত্তরে মার্শ্যাল বলেছেন, না। মার্শ্যাল সেগুলোকে শক্তির প্রতীক বলে মনে করেছেন এবং বলেছেন সেগুলো আর্য্য-পূর্ব্ব ইন্দোনেসিয়ার ও মোহেঞ্জোদারোর সভ্যতা-দাতা কলিঙ্গ-জাতির প্রতীক।

স্পষ্টতই সে জাতি মহানাদের কামরূপী শৈব বাঙালী—গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গ স্থাপন করে যে গুপ্ত-বর্ম্মণ জাতি ( কোচ ) পূর্ব্বপুরুষের চিতায় মঠ-স্থাপন করে গেছেন এবং শকাব্দীকে শুভ মনে করে যে শক-হূণদল ( গন্ধারী শকুন ) অষ্টশাল মঠের গাত্রে লিখে গেছেন: "শুভমস্তু শকাব্দা ১৭০১"—কিম্বা পঞ্চরত্ন, সপ্তরত্ন মন্দিরে শুভ-শকাব্দা কথাটি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁরা হিন্তাল-হিন্দোলের নীললোহিত দর্ম্মিল বা 'দমিল'-এর শেষ রাজা পাটিকারার হরিকাল রণবঙ্কমল্লদেব এবং চাটিগ্রামের দামোদর। তান্ত্রিকতার সঙ্গে ঋক্‌বেদ মিলে যে শৈবযোগী সভ্যতার উৎপত্তি দেখতে পাই মেহের-কুলের 'ষট্‌চক্রনিরূপণম্' গ্রন্থে, মোহেঞ্জোদারোর U-লিপির বৃষ-সভ্যতায়ও তা-ই, উলুপী-নাগবংশই ছিল তার প্রাণ-পুরুষ।

ঋক্‌বেদী যুগে বৃষ মানে ছিল বর্ষণ-কারী। যক্ষ-রূপী বা গোরিলা-রূপী 'নিন্দার্থল' মানবরা ফণীসিঞ ( বা রেড্-ইণ্ডিয়ান 'ওগলল' ) 'অগলম্' জাতির উপর প্রস্তর বর্ষণ করতেন বলে এজ্রা-পাউণ্ড ১৯৩৫-এ জানিয়ে গেছেন। এঁরা কোরকন, গুট্ট, মেলি প্রভৃতি বংশ তৈরী করেন হস্তী-অধ্যুষিত দেশে। মনে হয়, দমলিপ্তির রোমান জানুস যেম্নি মায়া-জুনিস্ সভ্যতার জাতক—দমিল সেন-গুট্টিক, এলোরা-ও তারই জাতক।

ফণীসিঞরা ( খ্রীঃ পূঃ ২৮০০-১৫০ ) মিশরী ফারাও-বংশের বনিক-কুল। দীর্ঘাকৃতি—পাত্রনির্ম্মাতা একটি লোহিত জাতি তাঁরা, সাহারা-সভ্যতার জনক। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে ক্রীটের মিনোস এবং পার্থিয়ার দেবানাং-প্রিয় ( বর্দ্ধন ) জড়িত। উইচ-প্রণীত 'পৃথিবীর ইতিহাস'-গ্রন্থে তাঁদের চিত্রটি মোঙ্গোল-তাতার বেদুইন-জাতির বেদে-বেদুইন-আর্য্য রূপ প্রকাশিত করে। প্রকৃত আর্য্য-রক্ত যেমন ব্রাত্য বাঙালীর নেই, তেম্নি প্রকৃত মোঙ্গোল-রক্তও



বাঙালীর নেই বলে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা মনে করেন। তবে রেড্‌ইণ্ডিয়ান বা বেদুইন রক্ত থাকতে বোধ হয় বাধা ছিলনা। মোঙ্গোল আর তাতার প্রাচীন যুগে এমন ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে তাঁদের সমপর্য্যায়ের তুরুষ্ক, হূণ, করাইত, শক, পহলব, তঙ্গ, সান্দ্র, তম্পক, দরদ, মল্ল প্রভৃতির মিশ্রণে বাঙালীর পিতৃপুরুষের উদ্ভব মোহেঞ্জোদারোতে হওয়া বিচিত্র নয়। আসামের উলুপী-নাগ ( নঙ্গস্ ) মোনোলিথ সভ্যতা এবং লৌহ-সভ্যতা দান করেছেন। 'জুম' প্রবর্ত্তক ( অষ্ট্রিক চাষাবাদ ) এবং যোনীপট্ট-স্থাপয়িতা তাঁরাই প্রথম। নিগ্রোবটু তাঁরাই এবং ইন্দোনেসিঞা, মেলানেসিঞা, পলিনেসিঞা জাতির 'মিনহস্‌স' সভ্যতার ( মার্শ্যাল কথিত ) রীতি-নীতির ও ঐতিহ্যের বাহক। হড়প্পা এবং মোহেঞ্জোদারোর V. S. area তাঁদের ও তাঁদের সঙ্গে মিশ্রিত আসামের অন্যান্য দ্রাবিড় জাতির নির্ম্মাণ।

উরোপার মেরু-প্রদেশে শ্লাভ-সভ্যতায় 'ভোগ'-নামক দেবতার অস্তিত্ব এবং গৃহপালিত নীলগাই-শৃঙ্গ মণ্ডিত একটি গবাশ্ব-চিত্র দেখা যায়। শিল্পবিদ্‌রা তাকে 'লেনা'-চিত্র বলেন। মোহেঞ্জোদারোর পাতাল-খুঁড়ে মার্শ্যাল চলকোলিথিক যুগের ( প্রস্তর ও তাম্রের যুগের ) তেম্নি খোঁয়াড়-ওয়ালা পশু-পোষা খামারী ভোগী সভ্যতার প্রমাণ ভারতাঞ্চলেও আবিষ্কার করেছেন। তবে V. S. area-টিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য। '৯'-চিহ্নটি লিঙ্গায়েত কুশানের। মোহেঞ্জোদারো-কুশানমুদ্রায় মার্শ্যাল তা আবিষ্কার করে গেছেন। ব্রাহ্মী 'ক'-চিহ্নটিও তখনকার। সে-যুগের 'শধুফে' ( মিশরী জলধারা যন্ত্র ) মোহেঞ্জোদারো একটি '৯' লিখেছিল—আমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছি। আসামেও 'লিসবি' ও 'ত্রিশ৯-বয়' দোবোক বংশে আমি '৯' লক্ষ্য করেছি। হয়ত তাঁরা মহাবীরের মাতা ত্রিশলার পিতৃবংশ, চেতক-বংশ বোডো—ফণীমনসীয়। তাঁরাই প্রাচীন বৈশালীর চুটিয়া। দোবকরাজ সর্পশিখা অগ্নিমুকুট মাথায় বহন করছেন একটি কুশান-ব্রাহ্মণের শ্রীমুখ নিয়ে। সেরিকার দমিন-ব্রাহ্মণ ছিলেন হয়ত তাঁরাই—কুশান সম্রাটের জন্মভূমি কুশদ্বীপও সেরিকা ( দক্ষিণ চীন ) এবং সে-কুশদ্বীপ আফ্রিকার ( কুশ ) ফণীসিঞা অঞ্চলকেও একদা জড়িয়ে ধরেছে হয়ত 'কলিত'-মারফৎ। চৈনিক মল্লোচিত '৯কে রণ'-কুশান নন এমন প্রস্তাব মথুরার কুশান-মুদ্রা বা মুণ্ডহীন 'চেদী-চোল' কনিষ্ক-বংশ দেখলে অবশ্য মনে হয়না। সম্রাট-মুদ্রায় 'শামন'-এর পোষাকে কনিষ্ক-হুবিষ্ক আবির্ভূত—তুরানীয় গেদ্রোসিঞ, বা কলিঙ্গের গজপতি যবনপতিশ ( যোন ) হিসেবে অর্থাৎ চেদী-নন্দরূপে। এলি বা এলাম ( সুসা ) অঞ্চলের হম্মুরবির জৈন্তিয়া-যাদব টুপীটি তখন তাঁদের মাথায়। হুবিষ্ক-মুদ্রায়ই বস্তুটি প্রকট। 'হু'-ধ্বনিটি অসুর মেসোপোটমিয়ার নদী-বাচক ধ্বনি। সেই অসুর-সভ্যতার 'তিয়েৎ-মাত' নামক উচ্চৈঃশ্রবা-সংহার কাহিনী আর ঋকবেদে হিরণ্যস্তূপের ইন্দ্রকর্ত্তৃক বৃত্রমাতা সবিতৃ-বধের কাহিনী একই রকম। উচ্চৈঃশ্রবাটিকে প্রাগৈতিহাসিক শকদের লুরিস্তনে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জে বিজয়িনী মূর্ত্তিতে এবং 'তৈ' ও 'পং' ( অহোম ) জাতির রাজমুদ্রায় দেখা যায়। অহোম-পালক চুটিয়া ( কলিত )

এবং নাগ অভিন্ন। সর্পমিথুন এসীরীয় ঢালে এবং দোবক-দরজায় একই ভঙ্গীতে অঙ্কিত।

উচ্চৈঃশ্রবা ঋক্‌বেদীয় সভ্যতার ব্যাপার নয়—দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনের পৌরাণিক যুগের ব্যাপার। মন্থন-চিত্র বর্ম্মণ-গুপ্ত-যুগের কন্যুজ-সভ্যতা ভিন্ন আর কোথাও নেই। অষ্ট্রিক ক্ষ্মের-ভাষী দেবতা নিয়ে পাশুপত শৈব বর্ম্মণ-ও কন্যুজ-সভ্যতায় কামাখ্যা-সভ্যতার মতোই আমরা পেতে পারি। আরাকানেও একটি বর্ম্মণ রাজবংশ ছিলেন। বিশাখা-পত্তনে গাঙ্গেয়-তুর্ব্বসুরা তেম্নি বর্ম্মণ। বেলব ও বজ্রযোগিনীর ইন্দ্রসেনা অথবা বৃষ্ণি যাদব-বর্ম্মণরা এই বর্ম্মণ ভ্রাতৃ-বংশ। হিমালয়-অঞ্চলে লক্ষ্মা-মণ্ডলের ( জতুগৃহের ) প্রশস্তির যাদব-বর্ম্মণও তাঁরাই। যদু-তুর্ব্বস-কণ্ব ঋগ্বেদীয়, ইন্দ্রপূজক সুদাসের পূর্ব্বগামী। 'ইলু-ইন্দর' নামক এশিয়া-মাইনরী মিত্রচেদীর বোঘজকুই সভ্যতারও বহু পূর্ব্বে একটি সভ্যতার সঙ্গে প্রাচ্যের এই হিন্দু সিদিয়ানরা জড়িত। ইন্দোনেসিয়ার সভ্যতা-দাতা এঁরাই ছিলেন আদ্যোপান্ত। চারটি মনু-নদী নিয়ে যে ত্রিপুর-রিয়াং জাতি ( বোডো ফিসা ) লুসাই অঞ্চলে বাস করেন তাঁরা মিকিরি দোবোক জাতির মতো প্রাচীন লিচ্ছবী। তাঁদের দেবতা 'ইলু ইন্দরে'র ধ্বনির প্রাচীনতম রূপ ব্যক্ত করে 'লুন্দ্রাই' ( পিতা-মাতা-সন্তান ) ধ্বনিতে। মনুর মানব-সভ্যতায় দেবতা-স্থানে পিতা-মাতা আসীন ছিলেন। তন্ত্রে সন্তানই 'হংস' বা সৃষ্টি। সিদিয়নের বাস্তব মনোভাবই এ-সব মতবাদে ব্যক্ত।

বাস্তববাদী ইন্দ্রের সেনা-কুলে বা বৃষ্ণি-কুলেই অকায় বিষ্ণু বা বাসুদেব কৃষ্ণ ( বাসুকী-বংশ ) আবির্ভূত হয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়'-গ্রন্থে গুণরাজ খাঁ ( মালাধর বসু ) রুক্মিণীহরণ অধ্যায়ে কৃষ্ণের বনিক-কুলের খবর অকপটে নিবেদন করেছিলেন। মালব সেন-বংশের ভাগিনেয় তিনি। সেন-বংশে দর্ম্মিল অসুর ( এসীরীয় 'লিবুরবেলী' ? ) কংসকে জন্ম দেন। অবৈধ জন্মের জন্য কংস দায়ী নন, অথচ প্রাচীন পিতৃকুলে তিনি অবহেলিত। রাধাতন্ত্রে তাই কংস নিন্দিত নন। কৃষ্ণই তাঁকে দোষমুক্ত করেছেন দেখতে পাই। তান্ত্রিক-বৈষ্ণবকুল বাসুদেব কৃষ্ণের উদারতার চিত্র পরিবেষণ করেছেন। রাধাতন্ত্রে তিনি দর্ম্মিল-অসুর বা বিন্ধ্যাটবীর দানী-ব্রাহ্মণের বা কংসের আসল পিতৃ-বংশের ভূমিকা নিয়ে রাধাকে বা গোপী-কুলকে ভয় দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ কলিঙ্গে রাঢ়ে বৃন্দাবনে যে প্রাচীন গো-পালক-জাতি গোপীকুল বা গাভীকুল বিরাজিত ছিলেন তাঁদের চোখে তাঁদের বংশের নবতন হন্তারকও পুরুষোত্তম রূপে দেখা দিয়েছেন। ( ভট্টিকবি শূর্পনখা বা করমণ্ডলের আদিবাসীদের 'গাভী' বা এই ধরনের নীল-গাই-হরিণ-সুলভ মনোবৃত্তির জাতি বলেছেন। রামায়ণ মারীচবংশকে দর্ম্মিল বা মায়াবেশধারীর পর্য্যায়ভুক্ত করেছেন। শূর্পনখা ও মারীচ রাবণ-জাতির নয়)। শ্রীবল্লভাচার্য্য রাধা-অবতার-বাহী চৈতন্য মহাপ্রভুকে 'গোপবধূটিনিট-ব্রহ্ম' আখ্যায় অভিনন্দন করেছেন। তাঁরা প্রাচ্যের ব্রাহ্মণ তিব্বতী—বর্ম্মণ। তাঁরা শ্রীহট্টে পাণ্ডবকুল আদিপাল ( ৩০৮৩



খ্রীঃ পূঃ )। ঋক-বেদ-পূর্ব্ব ব্রাহ্মণ বলতে তাঁদেরই বোঝাত। কামরূপের বর্ম্মণ-ব্রাহ্মণ বা বরাহ-ব্রাহ্মণ তাঁরাই। মগদ্বিজ। নালন্দা-তোরণে মহীপাল-দেবের পিতৃপুরুষের স্বাক্ষর-চিহ্ন 4IZ-ই প্রাচীন বাঙালীজাতির ( টিবেটো-বার্ম্মাণ ) সিন্ধুসভ্যতার ও বিস্তৃতির নিশানা দেয়। ফনীসিঞা চার্য্য বা চারণ-জাতির চিহ্ন। এই ফারাক 4-চিহ্নটি মোহেঞ্জোদারোর Sign-Manual-এ তৃতীয়-স্থানে চক্র ও 'ং'-সহ উপস্থিত। U-লিপি পঞ্চম-স্থানে, তখনই লিপি-সভ্যতা। আরব-সংখ্যা মানে ফনীসিঞা লিপি।

4-এর পূর্ণ-চিহ্নটি '△'; মোহেঞ্জোদারোর তাম্রযুগের বা গভীরতম স্তরের ( V. S. Area তৃতীয়-গ্রস্থ ) তীর চিহ্ন। তীর Sign Manual-এ পঞ্চম চিহ্ন হিসেবে বৃষ-লিপি ও ব্রাহ্মী ণ সহ উপস্থিত। হয়ত তা 'Uণ' উনা-নগরই বোঝাতে চাইত যে-নগর 'গোপিতা' মালবগুপ্ত-বর্ম্মণদের। 4-নিশানচিহ্ন মোহেঞ্জোদারোতে ত্রিকলিঙ্গের; 'চবর' বা চীবর-ধারী শবর 'চারণ'-জাতিবোধক একটি সীলমোহরে আছে ( ৩৯৪ সংখ্যক )। মোহরে বাংলা 'চ', 'র' বা 'ব' এবং বাংলা দণ্ড-চিহ্ন বা ব্রাহ্মী 'র' তৈরী হয়েছে। একে 'চোবা' বা 'বচ' পড়ে মিশরী 'চম' বা চম্পা-ধ্বনি না আনতে পারলেও ত্রিবেণীর চ্যবন-বাল্মীকিরা ( কলিত-চুটিয়া ) এ থেকেই জন্ম নিয়ে বাহ্লীকে বাগ্বেদীর সাধনা করবেন বোঝা যায়। তাছাড়া এ-ধ্বনি-সূত্রে পাহাড়পুরের বৈবস্বত-মনুর চোপার ও দেহের কথাও আমাদের মনে পড়বে। হয়ত ইষ্টার-দ্বীপের যোগী-মূর্ত্তির ( তোরোমিরু কাঠের ১৯″—ব্রিটিশ-মিউজিঅম ) আত্মীয় নোওয়া-নাবিক তিনি কিম্বা ককদু-সভ্যতার ক্যাঙ্গারু-ঘাতক। মেলানেসিয়ান ক্রুক-জাতির সূতসহ-রমণীসমাজ নিয়ে উত্তরবঙ্গের দিব্যক-রাজ্যে ভেসে এসে কোনো এক মন্বন্তরে সমুদ্রাশ্রিত গৌড়-জাতি নির্ম্মাণ করে ফণীসিঞা সভ্যতার বীজ বপন করেছেন। অন্তত গৌড়ের মোঙ্গোল কোচ এবং পঙ্গা-কুল। তারপর 'পাঙ্গালাথিরইয়র-চের-মরণ'-কুলের মোঙ্গোল-সুলভ 'যার্ত' গুটিয়ে কলিঙ্গ ( তামিলকম ) দেশে যাত্রা। কলিঙ্গ থেকে কোশলে-পঞ্চ'লে সিন্ধু-উপত্যকায়।

পাহাড়পুরের বৃদ্ধ নাবিকের চোপা লক্ষ্য করলে মোহেঞ্জোদারোর মৃৎ-পুতুলে মিশরী-চোপার জন্মের কথা অন্তত আমাদের মনে পড়বে যদি মিশরকে মোহেঞ্জোদারো থেকে তফাৎ না রাখতে চাই। মোহেঞ্জোদারোর কগহুইল-প্রণেতার পৃষ্ঠায় ( ১৫৮ পৃঃ ) আদম-হবা ও তাঁদের জাতকের ( ৫নং চিত্র ) ত্রিমূর্ত্তিও মনে পড়বে। ছিন্নহস্ত বাবিরুষের সভ্যতাদাতার চিত্রও মোহেঞ্জোদারোতে আছে। শ্মশ্রু-ধারী পুরুষের আদি সভ্যতারই প্রতিমা-লক্ষণ বাহী এ-সব চোপা। ক্ষৌরকর্ম্ম মোহেঞ্জোদারোতেই সুরু হয়েছে। তুঁতঙ্খমেনের মিশরী-কফিন থেকে তার পরিণত রূপ জেনে নেওয়া যায়। তাছাড়া মোহেঞ্জোদারোর নব-ব্রোঞ্জযুগের মাওরী-নারী বদনটি এবং তিব্বতী-ব্রহ্ম মূর্ত্তির উর-সভ্যতাজাতক কিরাত-রাজটি তুঁতঙ্খমেনের হস্তধৃত যষ্টিমুখে যুক্ত হয়ে আছেন—দেখা যায়।

[ দুই ]

মহানাদে হর্যঙ্ক বিজয়সিংহদের পেয়েছি আমরা, এখন সেখানকার বাজশ্রবা উশন নচিকেতা বংশের কুশান হুবিষ্ক-সম্র টমুদ্রায় কাকে পাচ্ছি দেখা যাক। 'দমিল-গুপ্তবল' কোচ সেখানে মুদ্রা নিয়ে উপস্থিত আছেন। মহানাদের গুপ্ত-যুগের দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা বলে কথিত গজপতিরাজ-মুদ্রা উড়িষ্যায় হুবিষ্ক নামধেয় কুশান-মুদ্রা। মহানাদে অশ্বপতি হর্য্যঙ্ক মুদ্রাই শশাঙ্কমুদ্রা বলে বিবেচিত। এঁরাই নাগ-বংশ ও বণিক। উড়িষ্যার ইতিহাস রচনা কালে মার্শ্যাল গজপতি-রাজ মুদ্রাকে কুশান-সম্রাট হুবিষ্ক-মুদ্রা বলেছেন। অহোম 'দক্ষিণপথ সত্র'-চিত্রে বোঝায় কামরূপী 'চক্রভৃত-নরক-ভগদত্তকুল'ই গজপতি-রাজ। মহানাদে হুবিষ্ক-সম্রাটমুদ্রায় 'চন্দ্র' লেখা এবং অপর পৃষ্ঠে চেদী-নট বাকাটক ( ইন্দ্রধ্বজী ); কোন্ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত ইনি? সম্রাট হিসেবে হুবিষ্ক-কনিষ্কের আরো যেসব মুদ্রা পাওয়া গেছে তাতে তাঁরা মুণ্ডহীন কনিষ্ক-মূর্ত্তিটির শাটকে-পাদুকায় সজ্জিত। অর্থাৎ তুরানীয়ন শামন বা তাতার বেদুইনের চাপকান-পরা বেশ। মহানাদের মুদ্রা-গুলোর পর্য্যায় যা-ই হোক—এই তুষার ( তোখার ) বংশের শৈব রাজভট-পুরীতে কুশান, গুপ্ত, শশাঙ্ক প্রভৃতি কলিঙ্গ-বংশেরও 'নানা' মুদ্রাই পাওয়া গেল। সেখানে কোচ-বংশের মুদ্রায়ও 'গপতবল দমলসঙ'-কথাটি লেখা। বঙ্গরাজ হিসেবে ফিরিশতা তাঁর ইতিহাসে কামাখ্যার কোচ-রাজ সঙ্গল-দিবকে স্থায়ী রাজবংশ-প্রণেতা বঙ্গরাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। স্পষ্টতই তাঁরা কুশা-হামি-তুরফান—কোচ-শকপহ্লব-রাজবৃন্দ। বঙ্গে দিব্যক ও মোহোঙ্গদিজুয়ায় দোবোক তাঁরাই। কাজেই এই অনুমান মূল্যহীন নয় যে কোচ যাদববর্ম্মণরা বুদ্ধের জন্মের সমসাময়িক কালে যক্ষ-নাগবংশের কালাম্বু বা সিংহলে বঙ্গোপসাগর পথে 'জাহাজে' চড়ে চলে গেলেন। শাম্পান ভাসিয়ে কম্বুজে 'শায়াম্পা' রাজ্যের পত্তন করলেন। দর্ম্মিল সেন-গুট্টিক বা কোচ-কুশান নিয়ে তদঞ্চলে যাঁরা রইলেন তাঁরা কাণ্বায়ন-রাজভট বা ভোট্ট—বোডো। তোখার-ভাষী দৈবপুত্র যাহি-যাহানুষাহি।

কিম্বদন্তী যে দিলুব্রিয়া ( দিল্লীবর্ত্ত ) থেকে ত্রিপুর প্রোটরডন ( ১৯০০ খ্রীঃ পূঃ ) গণ্ডার-বর্ম্মযুক্ত অহোম অঞ্চলে যান। তেম্নি দিল্লীর 'যবনপতিশ' ঋগ্বেদীয় 'অমুরা'কে ( আমরু=এসীরীয় ) পুরীর মাদল-পাঞ্জি অনুসারে কলিঙ্গে পাঠান শ্রীহট্ট ( হিড়িম্ব? ) অব্দের জন্মের সমসাময়িক কালে। শ্রীহট্ট ত্রিপুর-রাজ্য হয়। সবই এঁরা ফণীমনসা ( সিজ ) পূজক গন্ধার-সিজস্তনের ( V. S. area-ইলাবৃত বংশ ) বোডো-জাতির 'ফিসা' বা সন্তান; কদে বা মালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ফণীসিঞা ( ফণীমনসা ) 'কোরকন-গুট্-মেলি-অক্র-অরম্ব'-বংশ। মেলয়লি, মল্ল, মালাবার, মালব, মালব্য নাম একটি মূল 'মেলি' ( ২৮০০ খ্রীঃ পূর্ব্বের ) ফণীসিঞা



থেকে এসেছে। তাঁরা 'অগলম'—অগুরু, বৃক্ষ-পূজক। কুরুক্ষেত্র-যুগের যাদব-শূরসেন। কদফিসা কুজল রামপূর্ব্বায় ( সিংহমূর্ত্তিতে ) যে 'মীনহংস' ( মিনহস্স ) চিহ্ন এঁকেছিলেন তা মোহেঞ্জোদারোর গণ্ডার-মুদ্রায় আছে। কুশান-গুপ্ত বৃষ্ণিবংশ এবং অহোম।

শৈব-পুরী কলিঙ্গ-কোদণ্ড-মেখল থেকে প্রাক্-ঋগ্বেদীয় একটি যোগী বা সিদ্ধাকুল সিংহলে যক্ষ-নাগ বংশে একবার, কুশভূমিতে ( থিবিস ) একবার এবং নালন্দা-দানপত্র অনুসারে ইন্দোনেসিয়া পর্য্যন্ত ( দিস্ বা থিস্ ) সভ্যতা বিস্তার করেছে। তাঁরাই ভারত-জাতি উশীনর-চেদী-ইক্ষ্বাকু-মৎস-সৃঞ্জয়-দাল্ভ্য-রুশম। এঁদের সম্মিলিত রূপটি ভারত বা বোডো। উড়িষ্যার মাদলপাঞ্জি দিল্লীতে তাঁদের 'যবনপতিশ' এবং কলিঙ্গে জাহাজে-চড়া অমরাইত ( আমরু=ঈষৎমরু ) বলেছে। দিলুব্রিয়ার বোডোরাজপুত বা বিভিন্ন গোষ্ঠীর মিশ্রিত ( ম্লেচ্ছ ) আর্য্যই দিল্লীর যবন, কুরুকুল। কেননা মাদল-পাঞ্জি বলছে যুধিষ্ঠির যখন কলিঙ্গ-অঞ্চলে তখন অমরু-শাসন দিল্লীতে। তাঁরা অমরু-শতক প্রণেতা শক্ কুশান বা তেল-এল-অমর্ণ-লিপির মেসোপোটমিঞা-জাতি, যাঁদের লিপি গত-প্রবন্ধে পাঠ করেছি—সেই কুরু বা মুষিক ব্রাহ্মণ। এসীরিঞ ভক্ত-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপে 'লিবুরবেলী' ২০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বে মধ্যভারতে কীলকাক্ষর প্রণয়ন করেন। মার্শ্যাল-গ্রন্থের তৃতীয়-খণ্ডের ১০২-চিত্রপৃষ্ঠার m-চিহ্নিত মুদ্রায় এই মুদ্রণ-পদ্ধতি ও সিংহ-রাশি মুদ্রার 'উচ্চৈঃশ্রবা'কে অবনত-মস্তক দেখতে পাই। তাতে অতীত দ্রাবিড়-বোধক '৮দমল'-কোচ কথাটি গোথিক বাংলায় মুদ্রিত। যোনীপট্ট-চিত্র ( 'ভগ'-দেবতাবাদ দ্বৈত বা অনিরুদ্ধ-ভাব ) এপৃষ্ঠাতেই আছে। গণ্ডার-পালকের 'মীন-হংস' চিহ্ন, বৃষ-লিপিসহবৃষ ব্রাহ্মী বর্ণ, 'খর' ( P-চিহ্নিত মোহর ) খরবেল ( চেদী ) প্রভৃতি সবাইকে মার্শ্যাল একটি চিত্র পৃষ্ঠায় স্থান দিয়েছেন। চেদীরা ঐল বা ঐর। গজপতি-নন্দ।

ইন্দোনেসিয়ায় সুকর্ণ সম্প্রদায় সেলজুক ( অটোমান কুশান তুর্কী ) আমির কিনা বলা যায় না। ওমর খাইয়ামী সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন অমরু-কুরু-নন্দকুল। ক্রীকটের কৃষ্ণ বা কম্বুজাম্বয়জ শৈব জাতি থেকে বার্হস্পত্য সভ্যতা দ্বীপময় ভারতে বিস্তৃত। কম্বুজে 'শায়াম্পা'র রাজগৃহেও ( নাগ-পূজক ক্ষের-ভাষী অষ্ট্রিক ) 'পঞ্চরাত্র' চলেছে শাক্য বৌদ্ধপ্লাবনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। তখনও তাঁরা প্রাচীন আর্য্য ভারতের চেদী কুশান প্রভৃতি। তখন উর্জ্জয়ন্তদুর্গ বা মোহেঞ্জোদারো বিশুদ্ধ ঋক্বেদী সিদিয়ান ইন্দ্র বা এসীরীয় ভীতহরিণী এনার্ত্তা-প্রসব দ্বারা অধিকৃত। ঋক্বেদে তাঁদের ভীত শূনঃশেফ বা কৃত্রিম কৌশিক বলা হয়। অসুর-বৃত্রমাতা কিন্তু অহোমেরই উচ্চৈঃশ্রবা, ( পৌরাণিক কাহিনীতে যিনি ইন্দ্রবাহন ) সমুদ্রোত্থিতা লক্ষ্মীর সহগামী। সুমের সভ্যতার লক্ষ্মী এনাক্কি। কাজেই সুমের সভ্যতার মূল পুরাণোক্ত সুমেরুতে—সুম্র ( সুমার ) অহোমের উৎপত্তি পং বা তৈ-জাতিতে। মেরুপত্রে তাই তুষার ( টিবিট-ব্রহ্ম )

শারদ-লক্ষ্মীকে বা নিজকন্যাকে গৃহে বরণ করেন বাঙালীরা। লক্ষ্মীচিহ্নিত 'প্রাচীনমুদ্রা' শশাঙ্ক অশ্ব-মুদ্রা 'চমদ্রীল'-বঙ্গলিপিতে লিচ্ছবী হিন্দুচীন বা হিন্দুসিদিয়ন সমুদ্র-লক্ষ্মী মুদ্রা—চম্পার ও মহাচম্পার সামুদ্রিক খস-জাতির মুদ্রা। কামাখ্যাপাহাড়ে, ফরাসী-গুম্ফায় এবং কলিঙ্গের যবন-সিংহবাহিনীতে কোক-মুখী শিবা-দেবী-যুগ থেকে এই মাতৃপূজা। চম বা মিশরে সিংহবাহিনী 'নিথ' ( নিত্যা=মনসা বাগিশ্বরী ) শিবা নন, নগ্না গার্হস্থ্য দেবী। শিবানী তিনি। আসামের কিরাতী গঙ্গা-যমুনা।

'লেনা'-সভ্যতা যে গবাশ্ব-চিত্র দেখায় তা গৃহস্থের শৃঙ্গী গবাশ্ব। বোডো ফিসা রিয়াং-কিরাতের মতো ফাঁদ হাতে ( V. S. area-র 1406-সংখ্যক তাম্র-মোহর ) মস্তকে 'সিরা' ( হল-চিহ্ন ) নিয়ে তাঁরা মোহেঞ্জোদারোতেই ছিলেন। মোহেঞ্জোদারোর গভীরতম স্তরে প্রাচীন তাম্রযুগে ( V. S. Area সীলমোহর ৭০২ ) প্লাক্ষা সভ্যতায় গৃহপালিত পশুর মধ্যে হস্তী, গাভী, গণ্ডার, খরগোস ( ২০২৮, ১৯৮৮, ৩৫০০, ২১০৯ সীলমোহর দ্রষ্টব্য ) আছে। সে এলাকায় বৃক এবং দুম্বা ( ২৬১৩, ৯৮৩ ) দেখা যায়। H. R. এলাকায় আছে বৃষ-সভ্যতা ( ইন্দ্র, সৌমিত্রী ও ঋষি-ব্যঞ্জক বর্ষণকারী সভ্যতা অর্থাৎ বৈদিক ও অষ্ট্রিক চাষাবাদ )। ব্যাঘ্র-সভ্যতার ( ব্যাঘ্রতটী সুন্দরবন-বর্ম্মণ সভ্যতা ) গৃহপালিত মহিষ ও গাভী ( নীলাঙ্গ-গাইহরিণী ) চিহ্নিত মোহর 'L' এলাকায় বিরাজিত। এখানেই বৃষ্ণির মহাভারত।

[ ৩ ]

পুরী-শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ-মন্দিরের মাদল-পাঞ্জির চেদী বা যবন-ইতিহাস আর শ্রীহট্ট-রাজ ( শ্রীক্ষেত্রে ) নবগীর্ব্বাণ দেবের 'পাণ্ডবকুল-আদি-পাল' বংশের জন্ম-তারিখ সমসাময়িক। কামাখ্যা-ব্রাহ্মণ ( চক্রভৃত-নরক-ভগদত্ত-বংশ ) বংশের যে নিধনপুর তাম্রশাসন আছে তা-ও এই সুমেরীয় কাল-স্পর্শী। কাজেই প্রাচীন যতোগুলো সভ্যতা মোহেঞ্জদরো-এশিয়া-মাইনর থেকে আফ্রিকা, আফ্রিকা থেকে দ্বীপময়-ভারত, দ্বীপময় ভারত থেকে কম্বুজ এবং কম্বুজ থেকে সমতট, সমতট থেকে কলিঙ্গ পর্য্যন্ত এসেছিল তাদেরই এক বাহু জম্বুদ্বীপে ( কাশ্মীর-জম্বু বা পশ্চিম চীন ) এবং অপর বাহু সেরিকায় ( কুশদ্বীপ দমিন ব্রাহ্মণ ও কুশান সম্রাটদের জন্মভূমি ) বিস্তৃত হয়ে বোডো জাতি নির্ম্মাণ করে তুলেছে নিন্দার্থলযুগের কিরাত-কুলে। 'সমুদ্র-মন্থনে' প্রথম বিন্দু হয়ত কাম্বোডিয়ার উপকূল ফলিত কম্বুজে। কিম্বা ডিমাপুরের চতুর্দ্দোল-হলঘর শোলাং-এ। হিন্দু আশ্বিক রাজ্য-বৃত্ত বা রাজচক্রবর্ত্তিত্বকেই প্রাচীন কুরু-সভ্যতা হিসাবে আমরা মোহেঞ্জোদারোর ভূগর্ভে পালিশ-ইঁটের এলাকায় ( V. S. area—



২নং পল্লী ) দেখতে পাচ্ছি। অশ্বও তখন নীলাঙ্গ শৃঙ্গী। 'দিলুব্রিয়ার' বোডো-রা কুরু-কুল-পালক চন্দ্রবংশ—টিবেটো-বার্ম্মাণ নব যাদব-জাতি হলেন কিন্তু 'চঙ্গ-ব্রিয়ার বোডো' আদি-অরণ্যের ( কলিঙ্গ-কোদণ্ড-মেখল ) চন্দ্র-বংশ বা গোধন-পালক বিরাট-রাজকুল তার চাইতে-ও প্রাচীন।

চৈনিক 'শঙ্গ'-লিপি বা বোডোর সঙ্গলদিব-লিপি বাংলার প্রত্নপ্রস্তরে বিধৃত। চৈনিক বোধে তা 'মেষ' বোঝায়— উর্ব্বশীর মেষ—অগ্রমেষ নন্দ। প্রত্ন-প্রস্তরের চিত্র ৺রাখালদাসের 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র প্রথম চিত্রপৃষ্ঠার 'ক'-সংখ্যক আলেখ্যে আছে। মৌর্য্য ব্রাহ্মীতে তা 'ঊর্ন' ( Urn-গ্রীক )। মেহেঞ্জোদারোতে ও বুশম্যান সভ্যতায় মাকড়শা-জাল বা 'ঊর্ণ' চিত্রকরের হাত দেখা যায়। এঁরাই মেলানেসিঞাঁ লোহিত-ভারত বা রেড-ইণ্ডিয়ান। চীন-ভারত-সংস্কৃতি বোডো-ভারত বা রেড্‌ইণ্ডিয়ানের। প্রাচীন কৃষ্ণ জাতিতে আর্য্যকুল। লেনা-সভ্যতা থেকে আর্য্যরা এসেছেন, এ-ধারনা ভ্রমাত্মক বলে প্রতিপন্ন হয়ে যায় মোহেঞ্জোদারোর পশু-পালক সভ্যতার সীলমোহর-গুলো দেখে। 'অগ্রমেষ'-লেখা বাংলাভঙ্গীর নন্দ-যুগের অক্ষর ( ৭ সংখক সীল ) সমন্বিত গজপতি মুদ্রাকে উল্টে স্থাপন করেছেন মার্শ্যাল ১১৫ পৃষ্ঠায়। মোহেঞ্জোদারোতেই দ্রাবিড়-ভারতবর্ষ কুরু আর্য্য-জাতি প্রণয়ন করেছে। এখানেই আর্য্যত্ব সমাধিস্থ করে দিকে-দিকে বিভিন্ন জাতির মনোভঙ্গী ও সভ্যতা নিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়েছে। বহুদিন পর কোনো কুরু-নন্দন দীর্ঘ পর্য্যটন শেষে মোহেঞ্জোদারোতে এসে দেখেছেন যে তাদের প্রাচীন কুল বাঘ-ও পুষতে সুরু করেছে ( কলিঙ্গ ও ব্যাঘ্রতটী মেখল-মণিপুরের মিকির অঞ্চল ও লাদক-অঞ্চল )—তখনই তাঁরা রেড্‌ইণ্ডিয়ান সার্সি-( যক্ষিনী ) সভ্যতায় অবাক হয়ে বলেছেন ঃ

"Kaka Phramak Edoken Lukoi Oresteroi Ede Leontes"

["দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে পালিশ-পাথরের পুরী—বাঘও থালায় খাবার পায়"]

কুশান-তুরষ্ক ( তোখার ) হয়ত লেনা-সভ্যতার চন্দ্র-পুরী স্থাপনের শেষে এশিয়ামাইনরের ফণীসিঞা যুগে এমন একটি ভাষাই শিখেছিলেন। মার্শ্যালের গ্রন্থের এই খণ্ডেই ১৫৮ পৃষ্ঠায় একটি অষ্ট্রলয়েদ সরীসৃপের করোটিতে এ-লিপিটি লেখা ঃ

"Hazaropurv etat"

নীচে সইটা তীর-চিহ্ন সংলগ্ন শ্রীহর্ষ (Chosroes—খ্রীষ্টাব্দ ৫৯১—৬২৮ ? )। মনে হয়, দাক্ষিণাত্যের জীমূতবাহন যাদব-সভ্যতার কোনো গুপ্ত কবি ইনি। তিনিই সম্ভবত 'সমন্তপঞ্চক'-এর 'কুমার'-বর্ম্মণ-বংশের জনক 'হর্জ্জর' ( ম্লেচ্ছাধিনাথ )—দমিল শ্রীগুপ্ত-বংশ।

শোণিতপুরের মোনোলিথ হরুপেশ্বর দমলিপ্তির জানুস ও এলোরার রাবণ-মুখ ফলিত করে। 'ঘটোৎকচ' গুপ্ত মুদ্রা (কোশল-গুপ্ত-হিড়িম্ব-বংশ?) রুষের চিত্রশালায় আছে। ঘটোৎকচ-গুপ্তের নাম 'কচ' বা 'কোচ'গন্ধবাহী। মোহেঞ্জোদারোর উপরের স্তরটি সেই কুশান-গুপ্ত (বর্ম্মণ) যুগের নির্ম্মাণ—নব-কলিতে বা কঙ্কনের শকাতীতাব্দীতে। কিন্তু শ্রীহট্টকাল মিহির-কুলের মদ্রদেশের বৃহৎ-কলি।

হূণ-নামে বিস্মিত হবার কারণ নেই। এই ফণীসিঞাঁ বা মনসা-পত্র-পূজক ফণীমনসীয় বোডো জাতির পূর্ব্ব-পুরুষ সোজা রেড্ইণ্ডিয়ান 'মনসা-পূজক', মোহেঞ্জোদারোর V. S. area-র বাঙ্গালী (২১০—সংখ্যক তাম্র ফলক দ্রষ্টব্য)। বরাহমিহিরের 'মদ্র' উত্তরকুরু। U-অক্ষর তখন হয়ত প্ল-স্বর বোঝাতনা, বোঝাত নীলাঙ্গ গাইহরিণীর ডাক: 'ইউ' বা 'উই'। মনসা-মুদ্রাঙ্কিত দ্রাবিড় জাতির (নাসত্যার ঋগ্বেদীয় 'তামলাভমান'? প্রাচীন দ্রাবিড়-সাহিত্যের 'তামিলকম') তাম্র-ফলক U-লিপি সহ 'রথন' ব্রাহ্মী-ধ্বনি ব্যক্ত করছে মনসা-সীলমোহরে। সম্ভবত 'উরথন' বলে উরের বিষ-পান-দাত্রী-সভ্যতা থেকে উৎক্রান্ত রাজা ঠিক 'সুরথ'-কে (প্রথম যিনি দুর্গা পূজা করেন) নয়, তার আগেকার কলিত কিরাত শবরের রথস্থ-বামন অবতারকে (বৃত্র) বোঝাতে চাইত। 'উরধ্যক্ষ' বুঝিয়ে উর-সভ্যতার নেতৃত্বও বর্ণনা করত হয়ত এই সুমেরীয় লিপি। দারুব্রহ্ম জগন্নাথই ছিলেন কাষ্ঠ-সভ্যতার জগৎগুরুথে আদি দেবতা। ধর্ম্ম ও ভাষাতত্ত্বমূলক একটি গ্রন্থের প্রণেতা কুক-সাহেব বলেন যে ঋক্‌বেদ-পূর্ব্বকালে আর্ম্মেনিয়া থেকে সুরু করে সমধর্ম্মী একটি জাতি সমগ্র হিমালয়-অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। আমি মনে করি, তাঁরাই যদু-তুর্ব্বস-বর্ম্মণ, তুরস্ক-কুশান বা তোখার হূণ গুপ্ত। জগন্নাথের অন্নসত্রের ভোগী সবাই কিম্বা অন্নপূর্ণার (বনরস) রসের কাঙাল। তিব্বতী-ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) তাঁরাই 'হমি-কুচা-তুরফান'। তিব্বতী গুম্ফার জগন্নাথ-মূর্ত্তিতে এবং কলিঙ্গের হাতিগুম্ফার ভগ্নকায় যোগী কেতুভদ্র বা জগন্নাথ-মূর্ত্তিতেই এঁদের প্রশস্তমুণ্ড হয়ত ব্যঞ্জিত হত। সুমেরের জগৎগুরুথ (দোলমঞ্চ) যে মোঙ্গোল জগন্নাথ রথভঙ্গী বহন করত তা শুধু ধ্বনিতে নয়—রূপেও ব্যক্ত করে। তাদের ছিল 'ডুঙ্গি' বা দোলমঞ্চ। দিওরী-চুটিয়াদের (আসামের কলিত, বোডো) শিব-মন্দিরশীর্ষ শোলাং 'চতুর্দ্দোল'-আকৃতির। মিশরের পিরামিড বরাহ-চতুর্দ্দোলেরই অবন্ধুর, মসৃণ ভঙ্গী। উলুপী-নাগ-জাতির লোহার সঙ্গে কলিঙ্গের তামা মিশে চতুর্দ্দিকে ব্রোঞ্জ-সভ্যতার ছড়াছড়ি। এঁরা ছিলেন নিগ্রোয়েদ—এসি-ইলোরিনের ন্যগ্রোধ। অহোমের 'বৈষ্ণব-সিংহাসন'-স্রষ্টা।

কলিঙ্গের শবরদের জগন্নাথ-মূর্ত্তির প্রায় হুবহু প্রতিলিপি আরো কয়েকটি জাতির শিল্পে পাওয়া যায়। মেলানেসিঞা ও নিগ্রোভূমিতে এ-মূর্ত্তির ছড়াছড়ি। কিন্তু মনে হয়



জগন্নাথ থেকেই সুমেরীয় জগৎগুরুথ। এ-রথে আছেন 'কচিন-পুতুল'। যাঁদের পুতুল তাঁদের নাম 'পুব্লো-ভারত' (প্লব-ভারত? পূর্ব্বভারত)—নিউ মেক্সিকোর রেড্-ইণ্ডিয়ান। মিথুন-চিত্রও (পক্ষী-মিথুন) তাঁদের অঙ্কনে দেখা যায়। মায়া-সভ্যতার জুনিস-সম্প্রদায়ের স্বর্ণ-পাত্রে দেখা যায় কুশানসম্রাটদের কলিঙ্গ-তঙ্কাবৎ তুলা-পুরুষ মূর্ত্তিটি। তুলাপুরুষ (দানী) মোহেঞ্জোদারোর Sign Manual-এ প্রথম স্থান গ্রহণ করেছে। আর্থার এভালোন বলেন যে, 'ষটচক্রনিরূপণম্' গ্রন্থের কুণ্ডলী-যোগ-বিদ্যা (শাক্ততন্ত্রোক্ত বৈদ্যবিদ্যা) জুনিস-সম্প্রদায়ের 'পপুলভুঃ' শাস্ত্র থেকে এসেছে। দেহ-ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড-ভাব অর্থাৎ বেদান্ত 'পিপ্পলাদ-স্বাদ'-ও সম্ভবত একেই উৎস হিসেবে পেয়েছিল। 'কচিন'-নামে কিন্তু একটি ইন্দোচীন-জাতি সত্যি মণিপুর-মেখলি অঞ্চলের আদিবাসী। তাঁদের 'কসাই'-বস্ত্র বয়নের দরুণ মণিপুরের অপর নাম 'কসি' (কাশী রাজের কাশী?)। বর্ম্মীরা মণিপুরকে 'কথে' বলেন—কিরাত বা করাইতের বাসভূমি-বোধক অর্থে। মালয়-কদে থেকেই হয়ত এই 'কথে'র (মলয়ালি 'চের' বা কিরাতের) উদ্ভব। চেরাপুঞ্জী নাম এই লোহিত (রেড্-ইণ্ডিয়ান) জাতির (নাগ) ও খাসী-জৈন্তিয়ার (অষ্ট্রিকভাষী) মিশ্রণের ফলেই উদ্ভূত। অষ্ট্রিক-খাসী-জন্তিয়া রাজ্য ছিল শ্রীহট্ট। শ্রীহট্টের যাদব বিরাট-বংশ (পাণ্ডবকুল-আদিপাল বা হিড়িম্ব) এই রেড্-ইণ্ডিয়ান। পুব্লো-ভারতই প্রাচ্য-লৌহিত্য-সিন্ধুর 'ওগলল' রেড ইণ্ডিয়ান বা 'তৈ' (পং) জাতি। 'পাঙ্গালা' যদি 'বাঙ্গালা' হয় তাহলে পাহাড়পুরের 'পঙ্গা' এবং শানের 'পং' (অহোম) জাতির কাছে সিদিঞা বা মোঙ্গোল রক্তের ঋণ স্বীকার করতে হবে। অবশ্য রেড-ইণ্ডিয়ানে সবাই একাকার।

ডুবুরি-পোষাকে রেড্ইণ্ডিয়ান 'ওগলল'-চোপার মানুষদের নিকোবর দ্বীপের হেন্তাকুই দারুশিল্পে চামচিকা-বাদুড় নিয়ে আবির্ভূত দেখা যায়—সঙ্গে জাহাজও আছে। মাদল-পাঞ্জির কলিঙ্গ যবনদেরও (গজপতি-অশ্বপতি-গোমতী চেদী) 'জাহাজ' ছিল। এঁরাই ফণীসিঞা—যাদের আমরা লোহিত-জাতি বলে জানি। হেন্তাকুই পিতৃকেন্দ্রিক চাঁদসওদাগরের (বোডোমাতা মনসা-বিরোধী) হেন্তাল-কাঠ তৈরী করেছিল বোঝা যায়। ক্রীট-দ্বীপেও যে একটি 'মিনোস' ভানুমতী-সভ্যতা ছিল তার অধিকর্ত্তা সাহারার এই লোহিত-জাতিই ছিলেন। হেন্তাকুই-ব্যবহারী 'দমিনকুই' অঞ্চলের মদ্র কলিত-ই এসিরা-মাইনরী বোঘজকুই সভ্যতায় প্রাক্-বৈদিক মায়াতন্ত্র বা 'ভোগী-বাদ' (কামাখ্যার আত্মদান প্রথা—সম্ভবত উর সভ্যতারই স্মৃতি) আচরণ করতেন বোঝা যায়। কম্বুজ-সভ্যতায় তা ছিল শামনের ছায়া-নৃত্য অর্থাৎ ঠগীনটের (ইন্দ্রবরুণের) 'মেদিনীজ্ঞান' (বর্ম্মার আদি জীবনবেদ)। বৈশম্পায়ন ইন্দ্রবিরোধী যোগশাস্ত্রের 'মরণ'-যজ্ঞ কৌটিল্যের কালেও লক্ষামণ্ডলের উর্জ্জজাতিতে (উর্জ্জয়ন্তদুর্গের বা মোহেঞ্জোদারোর) ব্যক্ত ছিল

বলে শোনা যায় বাণভট্টের কণ্ঠে। তারপর 'ভগ' ( গৌরীয় জ্যোতি )-আদিত্য রূপে ঋক্‌বেদে এবং শ্লাভনিক-জাতিতে 'দেবতা'-রূপে পূজিত। আবেস্তার অহুরমজদাও 'ভগভগানম' ; 'ভগবান' কথাটি, 'ভগবা' বুদ্ধ সবই হয়ত 'ভোগী'-জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। আর তা যদি হয়, তাহলে বলতে দ্বিধা নেই যে কামাখ্যা-পাহাড়ের ভগবতী কোক-মুখী হলেন বিমদ-পত্নী ( নাসত্যা কর্তৃক আহৃত স্ত্রীরত্ন )—সব আর্য্যজাতির মাতা। আহুতি রূপায়িত কামাখ্যার এই সবিতৃ-মূর্ত্তিতে। ফরাসীগুম্ফার 4-চিহ্নিত কোকমুখী গুপ্ত-মুদ্রায় ( মহানাদের ) আহৃত তবে তখন তিনি 'অক্ষদা'। কলিঙ্গের যাবনিক-মাহিষ্মতী ( সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী ) △-তীরমুখীর স্পর্শে আর্য্যা হয়েছেন। কামাখ্যার সবিতৃ ( অশ্বিনা ) তোখার বা তুষার বা গুপ্ত-কুশান কন্যা। মুখোস-ঢাকা মুখ। মেমফিসারা কদফিসা ছিলেন যখন 'মিনহস্‌স' সার্কাসওয়ালী ভানুমতী ছিলেন তখন। সিংহবাহিনীর বা মাহিষ্মতীর যুগে তাঁরা ফরাসী। মোহেঞ্জোদারোতে ব্যক্ত দ্বিধাবিভক্ত স্তূপ বা তেল 'ভোক্তা ও ভোগ্য' (ক্ষেত্রজ্ঞ নারায়ণ) ভাবে মহাভারতীয় দ্বৈরাজ্য-ভাবে ( প্রয়োজক ও প্রযোজ্য ) কর্ত্তা-ভাব সূচনা করে। 4-এর জন্ম হয় চেদী △ ভেঙে। এসিয়া মাইনরে তোখার নাসত্যা কর্ত্তায় দ্বিত্বভাবব্যঞ্জক 'অঞ'-প্রত্যয় ব্যবহৃত। নানাঘাটের বৈদিক 'রায়া' কথাটি, কম্বুজ স্মের ভাষাজ 'অঞ' বচনান্ত দেবী, নদীয়াবৈশ্যের 'জীমূত দেবীকায়া'-কুমারীমূর্ত্তি এবং জীমূতবাহন রাজ্যের 'গোমতরায়া' প্রভৃতি জৈন-সভ্যতার দ্বৈতবাদ 'পপুলভ্যুঃ' তন্ত্রযোগজাত। জাতক কম্বুজের মহাগণপতি। তিনি Roi Faineant' বা ফণীসিয় রায়া ভিন্ন অন্য ব্যক্তি নন। মীনহংস কদফিসা-উশন—তুরস্ক কুশান।

[ চার ]

ভাগবত যোগী সভ্যতায় কুরুনন্দনের তালিকায় নন্দ-বংশকে ( শাক্য ও মৌর্য্য এঁরই শাখা—আবার গ্রীক্ ঐতিহাসিকদের বিচারে 'নন্দ্রাম্' আর 'আলেকজান্দ্রাম' অভিন্ন ) শ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন বলা হয়েছে। তাঁরাই হয়ত দুষ্মন্ত-শকুন্তলা সভ্যতার শ্রেষ্ঠীকুল—চেতক বা বোডো-চুটিয়া—কলিত। তক্ষশিলার শ্রেষ্ঠী-সভ্যতা ( সামা জাতকোক্ত বনরসী শবাধার-চমূ-নির্ম্মাতা কুল ; 'চম' বা 'মিনারী কফিন' নির্ম্মাতা কলিত কাশ্মিরী-বোডো-চুটিয়া ) এঁদের রচনা। এঁরা 'বরণসে'র ( রাজাহোড়ি রাণীগতের 'ঔরনস' ) সুগতের সঙ্গে যুক্ত। গ্রীকরাই প্রাচী-গঙ্গারাঢ়ী নন্দদের অগ্রমেষ ( প্রথম মেষ-রাশি ) নাম দিয়েছিলেন। উর্ব্বণীর পূর্ব্বসন্তান তাঁরা—



ঐল বা এলাম তেলবাহন। যেম্নি এশিয়া মাইনরে তেম্নি অঙ্গদেশে 'নাসত্যা' ঋকবেদীয় মাতা। কুকট তামিল জাতি নির্ম্মাতা। তাঁর 'তামলাভমান' মানে পাঙ্গালাথিরইয়র চের-মরণের তাম্র-সভ্যতা। ক্রীটদ্বীপের মিনোস-ও হয়তো এই চক্রের 'মিনহস্‌স' ছিলেন—অন্তত মোহেঞ্জোদারো সভ্যতার যুগে ক্রীট্‌দ্বীপকে ও 'মিনহস্‌স' সভ্যতাকে ( কুজল-কদফিসার রামপূর্ব্বার সিংহমূর্ত্তিতে 'মীনহংস' টোটেম এবং মোহেঞ্জোদারোর গণ্ডার-মোহরে 'মীনহংস' চিহ্ন দ্রষ্টব্য ) মার্শ্যাল মোহেঞ্জোদারো সভ্যতা নির্ম্মাতার কর্ত্তা বলে বিবেচনা করেছেন। আমিও তাঁরই প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে দেখাতে প্রয়াসী যে অবিরত পরিবর্ত্তনশীল ( 'চরৈবেতি'-সভ্যতার চারণ বা চার্য্যরা ) কদফিসা শৈব কুশান, মোহেঞ্জোদারো সভ্যতার প্রধান নায়ক—এবং এঁরা বাংলার শক-হুণ-মোঙ্গোল। ক্ষার বর্ণ ক্ষত্রিয় এঁরা—প্রাচীন শ্বেত জাতি।

মোহোঞ্জোদারোর তাম্রসভ্যতায় আবির্ভূত ∩-চিহ্নটি ( অষ্ট্রেলিয়ার ককতু-সভ্যতায় X-ray চিত্রে প্রাপ্ত ) 'গ' ( বা 'ভ' ) লিপি করে নিয়েছিল ভর্হুত-ব্রহ্মী। যেমন কণ্বের অঙ্গ থেকে একবার তেম্নি কাম্বায়নের বিদিশা থেকে আবার 'গাব' বা 'ভগ' নামের উৎপত্তি। 'গাভী' বা 'ভগ' জাতির ( গোপীকুলের ) এই চিহ্নটি তুলা-চিহ্ন। মোহেঞ্জোদারোর Sign Manual-এ প্রথম-স্থান পেয়েছে U-সহ। বস্তুটি মিশরী মসনদ 'পধান' বা নিগ্রো উপাধান 'মকলঙ্গ'। ১১৮-পৃষ্ঠায় Mus. 4 তাম্রফলকে কম্বুজী সমুদ্র-মন্থন ও নিকোবর চিত্রদ্বয় সমন্বিত হয়ে আদমহবার সম্মুখে এ-চিহ্ন জৈব-বৃত্তি-সূচক চিত্রের রূপ দিয়েছে। ক্রীটের ভানুমতী মিনোস এই মানবীরা। ১২-সংখ্যক মোহরটি উল্টোভাবে সজ্জিত ( ইচ্ছাকৃত ? ), তাতে 'রত'-লেখা ব্রাহ্মীতে। ত্রিপুরার ( বোডো-ফিসা ) সমতট 'রথ'-বংশের সীদিঞা-মুদ্রা হতে পারে। মগধের 'সূত' রথকার বা 'রথী'-নৃপ ( ঋগ্বেদোক্ত ) বা 'রটবিল' হয়ত এঁরাই ছিলেন। 'মগধের সঙ্গে-সঙ্গেই কুরুক্ষেত্রোত্তর যুগে উড়িষ্যার আবির্ভাব হল নন্দদের সঙ্গে'—উড়িষ্যার ইতিহাস লিখতে গিয়ে মার্শ্যাল এই কথাই বলেছেন। তাঁরা কলিঙ্গ-রাজ, চন্দ্রবংশী 'পৃথু-বেন'-কাহিনীর কলিঙ্গ 'চারণ' আর মাগধী-বৃন্দ 'সূত'—নট-বাকটক ও সারথী। মার্শাল কথিত 'মিনহস্‌স' সভ্যতার মালিক বর্ম্মী ঠগীনট তাঁরাই, মোহেঞ্জোদারোর নির্ম্মাতা। কুকটের কুণ্ড বা ক্রীটের মিনোস—কোরোন-কুশান—করনিকে কনিষ্ক। 'সঙ্গীত আর রথ' নিয়ে, তুলাপুরুষ জগন্নাথের মোঙ্গোল-তাতারি 'যাত' নিয়ে যাত্রা সুরু হ'ল অহোমের। হিন্দু সীদিঞা 'অহোম' জাতির কাঠের 'কীর্ত্তন ঘর' আর 'সপ্ত ডিঙা' মধুকর ( 'কমলবারি সত্র' চিত্র দ্রষ্টব্য ) নিয়ে দেখা দিল সুমেরীয় 'জগ্‌গুরত' বা 'ডুঙি'। প্রথম চিত্রে 'দারু-ব্রহ্মা' আবির্ভূত হলেন 'তৈ' বা 'পং'-জাতির তিব্বতী গুম্ফায় এবং কলিঙ্গে হাতিগুম্ফায়। বাংলার প্রত্নপ্রস্তরের শঙ্খলিপির মেষ-চিহ্ন ব্রাহ্মী উর্ন এবং দেবনাগর-বাংলায় 'পং' ধ্বনি

ব্যঞ্জিত করল। কিন্তু এ-চিহ্ন অস্ট্রেলিয়ার ককডু (প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। বোডো 'প্রোটোরডন' নাম স্মর্তব্য) সভ্যতার মানুষ মূর্তি। 'বাংলার ইতিহাসে'র খ-সংখ্যক প্রত্নপ্রস্তরে (উল্টো ধরলে) এল্‌মাইট হম্মুরবির মুকুট ভঙ্গী পেলাম--লেখা দেখলাম স্পষ্ট গোথিক বাংলায়: 'স' (ঋক্‌বেদের অদিত্য অংশ?)=পরমসৃষ্টি (শিবশক্তির) পুরুষোত্তম 'স'—যাদব বলরাম (ষট্‌চক্রনিরূপণম্ দ্রষ্টব্য।) বা বিষ্ণুর অবতার। 'বাঙালীর মোহেঞ্জোদারোর-চিহ্ন দেহে নেই'—কী চমৎকার ঘোষণা নৃতত্ত্ববিদের! 'মঙ্গল'-কাব্য তবে কোন্ চাঁদসওদাগর বা শ্রীরায়ের বণিক-বৃত্তির বা সপ্ত-ডিঙা-মধুকরের কাহিনী? দোলমঞ্চে কি বাঙালীর হোলি-খেলা নেই? জগন্নাথের রথযাত্রা মহা-সমারোহে ত্রিপুরায় আর মহেশে হয়ে থাকে। 'কলিকাতায়' না-হয় 'কলিকা-সূত' নন্দাদের ছেলেপিলের খেলার পুজোই হ'ল রথযাত্রা,—তবু ত তিব্বতী-ব্রহ্ম এই নবাবী-সহরে পুজো পেয়েছেন। দিনেমারের দিনেও শ্রীরামপুরের 'মাহেশ' অনাদিনিধনের পূজা থেকে বিরত হয়নি। মুস্কিল এই যে সবার প্রাচীনত্ব নির্ণিত হয়, নব-নব রূপী বাংলাকে কেউ ধরতে পারেন না।

সিলভ্যাঁ লেভী কাশ্মীর-অঞ্চলের চীন-ভারতের সমন্বিত শক্তি 'তুষার'-জাতিকে তোখার বলেছেন হর্ষবর্দ্ধনের নেপাল-অঞ্চলের ব্যাখ্যায় অথচ করমণ্ডলের কর-কুলের উপর তাঁদের 'শুভ-কামনা' বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেছেন চীন-সম্রাট। আসলে তাঁরা চীন-ভারতের সমন্বিত রূপ। চৈনিক স্বর্গদেবতা 'ঌকেরণ' মূর্তি একটি সুমেরীয় (গুম্ফহীন ও শ্মশ্রুপূর্ণ বদন) মুখ মুণ্ডহীন 'রাজাতিরাজ'-কুশান মূর্তির পোষাক প্রদর্শন করে। তাঁর কর্ণে শ্রুতি হিসাবে 'U-লিপি ভেঙে মৌর্য্য ব্রাহ্মী l প এবং J-ল হয়ে আছে। শ্রবণবেলগোলা মন্দির-তোরণে লক্ষ্মী-সরস্বতী বাদ্য-যন্ত্রহিসেবে এই দুই-লিপি ধারণ করে আছেন। ব্রিটিশ-ম্যুজিয়ামে রক্ষিত ঋষভদেব ও মহাবীরের পুরুষোত্তম নগ্ন-মূর্ত্তিদ্বয় তাঁদের আজানুলম্বিত হস্তদ্বয় l প, J-ল ভঙ্গীতে রক্ষা করেছেন। এ-মূর্ত্তির অধিকারীও ভারতবর্ষ নয়! মোঙ্গল-তিব্বতের ও অষ্ট্রিক ব্রহ্মদেশের মিলনেই এই সুমের বা চীন-ভারত জাতির আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রাচীন দ্রাবিড়-সাহিত্যে বর্ণিত পাঙ্গালাথিরইয়র (বাঙালী থেরবাদী) এবং চের-মরন (অর্থাৎ রেড্ ইণ্ডিয়ান চেহারার কের-পূজক ত্রিপুর রিয়াং কিরাত, মনিপুরি 'কচিন' প্রভৃতি আসামের কিরাত, করাইত) নামক সর্প-পূজক (অষ্ট্রীক ভাষী মেলানেসিঞাঁ) জাতি, যাঁরা 'তামিলকম্' দেশে যান, তাঁরা বস্তুত 'তন্ত্রযোগ' 'পপুলভু', বর্ম্মী 'মহাগীত-মেদিনীজ্ঞান' (বর্ম্মী মেরুর ঠগী-নট ইন্দ্রবরুণ) এবং খাসীর বা বাঙলার 'মনসা-পূজা' নিয়েই সেখানে গিয়েছিলেন। মহাবীরের মাতুল লিচ্ছবী (রাধা-দেশের) গোপী-জাতি তাঁরা—দোবোক। বেলব-বজ্রযোগিনীর যাদববর্ম্মণ কুলে এবং বিশাখাপত্তনের গাঙ্গেয় তুর্ব্বসু-বর্ম্মণ কুলে তাঁরা ঋক্‌বেদোক্ত ইন্দ্রসেনা যদুতুর্ব্বস। বস্তুত এঁর যযাতি পুত্র অর্থাৎ নহুষ-সন্তান—বুধ আর ইলার সন্তান—ঐল। চন্দ্রাত্রেয় বংশ



(নাথপন্থী) চেদী-বাকটক এঁরা। এঁদেরই নির্ম্মাণ চতুর্দ্দোল 'সোলাং'। ঊর্দ্ধরেতা 'লিঙ্গ' মণ্ডিত হড়প্পা। মনসাপূজক মোহেঞ্জোদারোর সর্ব্বনিম্নস্তর V. S. Area এঁদেরই ছিল। স্নানাগার অঞ্চলটি চন্দ্রপুরীর শ্মশান বা চেতবংশের চিতা-স্থান।

V. S. Area-তে দশধাপ-ওয়ালা যে ভাঙা হল-ঘরটি মার্শাল পেয়েছিলেন, তার চিত্র আমরা তাঁর গ্রন্থে পাই অঙ্কিত-অবস্থায়। যে গৃহ-নির্ম্মাতাদের সভ্যতার নিদর্শন তাতে উপস্থিত শাক্য-বুদ্ধ (কৌণ্ডিন্য বুদ্ধ গোষ্ঠী) তাঁদের উল্লেখেই বলেছেন: 'এই গেহকারক গবেষক জাতির পুনঃপুনঃ গৃহনির্ম্মাণ (পৃথিবীতে ফিরে আসা) ঘুচিয়ে দাও, হে পরম-গৃহকারক!' ঐশ্বর্য্যে বীতস্পৃহ সিদ্ধার্থরা তাই বলতেন। মনে হয় সিরা-চিহ্নাঙ্কিত এই চন্দ্রপুরীই ময়ূর-পুরী বা মৌর্য্য-পুরী ছিল। পরে তাঁরা এলোর-মৌর্য্য, 'রায়া'-উপাধিবিশিষ্ট হন। নানাঘাট মন্দিরে কলির ভাগবত-সভ্যতা-জনক এই 'রায়া' আগত। হয়ত চৈনিক জিম্মু সম্রাট, আবেস্তার 'এলোরস যিম' থেকে এই আগমন কার্থেজের মরুৎ-যুদ্ধের শান্তির পর। লামাদের আরাধ্য কাশ্মীর-রাজগোষ্ঠী। নানাঘাটে এঁরা এতাদৃশ:

(১) রায়া সিমুক সাতবাহনো =এলোর-মৌর্য্য সাতবান শ্রীমুখ।
শ্রীগুপ্ত। বুদ্ধগুপ্ত শ্রীরাসুহু জনক।

(২) দেবী নায়নীকায়া রঞঞো চ সিরি সাতকনিনো=বলাশ্রী গৌতমী ও দণ্ডীমহাদেবী

(৩) কুমারো ভায়া =কামরূপী কুমার বংশ (নরক-ভগদত্তকুল) গজপতি চক্রভৃত।

(৪) মহারঠিগনকয়িরো =হর বা ইর চেদীরট্‌বংশ (কলিঙ্গের 'মারাহট্টা' এবং ত্রিপুরা ও মগধের 'রত')। দেবরাত শূনঃশেফ-বংশ। বাংলার প্রাচীন মুদ্রার 'হুবাস ও শেফ' বংশ। দৈবজ্ঞ করিকোন-মল্ল?

আর নালন্দা মন্দিরে বৃত্র বৃষ্ণি মহীপাল-বংশণ হ'ল এবম্বিধ:

পংক্তি (১) ৎ শ্রীসমুদ্রপা (য়া) লদং=সমুদ্র-পাল করমণ্ডল-বংশ দাতা। লাদকী অসুর-পাল।

(২) বৃত্র স্তরুষহ্ব * * * =বৃত্র বরুণ অসুর (অহুরমজদা-দাতা) হ্বাস। পালক

---

ণ আফ্রিকার ইলোরিন—বেনিন সভ্যতার পাশা-খেলোয়াড়ের রাজমূর্ত্তি সম্ভবত অক্রূড সরগনের। এ-সভ্যতার 'ওগুলা' (হুগলী—অর্থাৎ ওগলে রেড্ ইণ্ডিয়ান) 'ওবাস' (অর্থাৎ 'হ্বাস') এবং 'ওসুআন' (উষুন-কুশান) নামগুলি ওই কুশভূমির সঙ্গে সেরিকা কুশদ্বীপের সেতুবন্ধন করে। নালন্দা-তোরণের লিপিতে এই যাদবকুলকে পাওয়া যায়।

শুক্রাচার্য্য (ঋক্—৭ম মণ্ডল)। মোহেঞ্জোদারোর মেরুদণ্ডজ্ঞান সমন্বিত একচক্ষু মূর্ত্তি।

(৩) ——— জুবাহুগ্রাহুদ্বাহ=সেনা-যুবা নাসত্যা, ওগলল (রেডইণ্ডিয়ান—অশ্বপতি জয়দ্রথ—মুষিক-ব্রাহ্মণ।) হুগলীতে বিবাহিত।

(৫) জলজয়বলীজ্জবংশ =বলী-দ্বীপজ (দিশ্) বঙ্গদেশের চলদিয়ান। মীনহস্ত বলীদ্বীপী বুদ্ধগুপ্তের 'জবলীজেন্দ্র-বিরাজাগার'। টোলেমির 'বলীসুর'।

এই বৃষ্ণি সভ্যতাই V. S. Area সভ্যতা-কারক, সপ্ত-হিন্দু ভারত বা 'বোডো'। কারো একার কারুকার্য্য মোহেঞ্জোদারোতে নেই। দশকর্ম্মেই দশধাপ হলঘর নির্ম্মিত হয়েছে সেখানে—'অনাসমৃধ্রবাচত্বচকৃষ্ণাং' মাওরী-কিরাতের 'শিশ্নদেবা' নিয়ে। আর্য্য-জাতির জন্মের পূর্ব্বে এই উর্জ্জয়ন্ত দুর্গ। উর্জ্জজাতি সম্পর্কে 'বাণভট্টের কাদম্বরী' বলছে যে তাঁরা 'লক্ষ্যাম্-আসক্ত' অর্থাৎ লক্ষ্যমণ্ডলে আসক্ত যাদববর্ম্মণ-চন্দ্রগুপ্তবংশ। তাঁরা মরণ-মারণ-শাস্ত্রে অভিযুক্ত। কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্ত-কুলের কথাই বলেছেন বাণভট্ট ▸ লক্ষ্যমণ্ডলের 'যাদববর্ম্মণ ওক-মণ্ডলে সিজস্তনে (সিজু পূজক বোডো-জাতির ভূমিতে) নন্দ-শাক্য-মৌর্য্য-জাতি (চন্দ্রগুপ্তবংশ) হলেন কুরুক্ষেত্রের পর। এই হৈহয় যাদব একশচন্দ্র—শুশুনিয়ার দেয়ালে এখনো তাঁর লিপিতে পুষ্করদ্বীপের পুষ্করাবতী-মোহেঞ্জোদারোর কর্ত্তৃত্ব-বিলোপের শোক-কাহিনী বলে যাচ্ছেন। তাঁরা ত্যাগী ছিলেন না আগে। ছিলেন ঐল, যযাতি-পিতা নহুষ। মার্শ্যাল-নির্দ্দেশিত চিতাভস্ম-পাত্রে নহুষ-লিপি আমি পাঠ করেছি। ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক ভাষায় তিনি 'অক্কড সরগন'।*

কে এই ঐল পুরুবীর বরুণ জাতক নহুষ-অক্কড সরগন? চীনের জম্মুসম্রাটের ইতিহাস-বিধৃত 'ইলি' উপত্যকায় কে আবির্ভূত রোম-কার্থেজের মাতরিশ্বা মরুৎ-যুদ্ধের (The battle of the Metaurus) পর কার্থেজের শ্মশান (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০-১৪৬) ভূমি ত্যাগ করে? এই 'অগলম'-জাতির গোথিত শিল্পের দিকে তাকিয়ে ১৯৩৫-সনে এজ্রাপাউণ্ড তাঁর ক্যান্টোস্ লিখেছেন। ভর্হুতের কাণ্বায়নের দিকে তাকিয়ে তেম্নি আমরা বেদদাতা,

* টিবেটো বার্ম্মাণ-জাতি। 'হিন্দু-ভগবত সিলোবিগডভীভা' (শ্রী-লোভী ঈশ্বরভীত)—পিয়দসি লুম্বিনী-লেখ দ্রষ্টব্য। শ্রীবল্লভাচার্য্য চৈতন্যমহাপ্রভুকে দেখে আ-শিলেট ত্রিবেণীর এই গোপী টিবেটো-বার্ম্মাণ ('গোপবধূটিবিট ব্রহ্ম') জাতি-সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁর 'নাগাষ্টকে' এই ভারতজাতিকে 'এভির্জন' অর্থাৎ এভারেষ্ট-মানব বলেছেন। তাঁরাই তুরুষ্ক-তোখার—কুশান—সেন্টো-ইতালীয় ভাষার জন্মদাতা। পিয়দসির লুম্বিনী-লেখতে 'গড্' কথাটি এমন্তব্য-পক্ষে স্মর্ত্তব্য।



অন্নদাতা, নাচিকেত অগ্নিদাতা বাজশ্রবা উশন (যম-প্রশস্তিকার) কুলের 'পুষ্পপীলকোড়া' সমন্বিত (ভর্হুত লেখ) ঐক্ষ্বক-কৈকয়-সৈরধ্বজ সম্রাট-রাজন্য-কুলের মতো মহালয়াতে অন্তত উপাসনা করতে পারি 'পাদুকা-পঞ্চকম'-মন্ত্র স্মরণ করে কিম্বা করতে পারি ঋকযজুর্ব্বেদী পিতৃ-মন্ত্র-উচ্চারণ। মোহেঞ্জোদারোর চন্দ্রপুরীর নৈঋত-কোণের ছবির দিকে মুখ রেখে হবিদান করতে পারি বাসুকী-বাসুদেব অনাদিনিধন পুরুষকে এই বলে:

"উশন্তস্তা নিধীমহ্যশন্তঃ সমিধ্যমহি
উশন্ন্ শত আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে।"

পুরীর কুশান-তঙ্কার কালপুরুষ (তুলাপুরুষ) 'যম' সর্বজাতিরই টোটেম হতে পারেন। শবাধার 'তেল' বা 'চমু' গঙ্গ (তুর্ব্বসু) মুদ্রায় আবির্ভূত। সিংহলের ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা-বংশ (দমিল) শবাধার ব্যবহার করতেন যাত্রা-সহকারে। স্তূপ বা 'তেল' নির্ম্মাতা তিব্বতী তুরস্ক (তুর্ব্বসু) ছিল কুশানের উশুন বা উশন। তিনিও যম-শিষ্য। নচিকেতা-উশনকে যম অগ্নি-বিদ্যা দিয়েছিলেন। তবেই ভারত বংশ সরস্বতী-তীরে অগ্নি-প্রজ্জ্বালন অর্থাৎ দেহ-ভস্মান্ত করবার এবং অগ্নিপক্ক আহার্য্য গ্রহণ করবার সংস্কৃতি অর্জ্জন করেন। নতুবা তাঁরা ত 'রাক্ষস'-জীবনই যাপন করতেন—আদিব্রাহ্মণ (নিগ্রোবটু—কুশভূমির, নাগ, ইন্দোনেসিয়ার মেলানোসিয়াস—মাওরী-জাতি) হিসেবে। অবশ্য মোহেঞ্জোদারোতে তাঁরাই নিন্দার্থল যুগ থেকে ধীরে ধীরে পুরুষোত্তম (পুরীর কুশান মুদ্রার টোটেম) শশনিদ জাতিতে উৎক্রান্ত হয়েছেন। গোল-মাথা-ওয়ালা (মার্শ্যাল গ্রন্থ তৃতীয়খণ্ড করোটি সংখ্যা ১২, ১৬) তিব্বতী লামা এঁদেরই স্পর্শে। ভৃগু জমদগ্নির যুগে এ-ধরণের একটি উৎক্রান্তি দেখা যায়। নিউ-জিল্যাণ্ডের নরখাদক মাওরীদের মধ্যেও একটি তেমন উৎক্রান্তির খবর পাওয়া যায়। মোহেঞ্জোদারোর ব্রোঞ্জ-যুগ দক্ষিণী-যুগ। ঐল-উশনের (থিবিস্-অহোমেস) যুগ। সে সভ্যতারই বাহক (বাবিরূষ-সভ্যতা) 'ৎওঁজমীদগ্ন' ধ্বনিতে সিঙ্গাপুরে বাংলার নৌনাবিক বুদ্ধগুপ্ত। তিনি সম্ভবত দক্ষিণ-কোশল-বংশের ও মাওরী-জাতির মিশ্রণে উদ্ভূত তুঁতঙ্খনেমের মতো কেউ। গুপ্তরা দম্মিল গুট্টিক অর্থাৎ 'অগলম' (গথ-ফণীসিঞাঁ) 'গুট্ট'-গৃহ জাত। সিন্ধুকঅন্ধ্রক বা ব্রাহুইও তাঁদের বলা যায়—কাণ্বায়ন। উপনিষদের আর্য্যকুলই হয়ত মার্শ্যাল কথিত চিতাভস্ম পাত্র ব্যবহার সুরু করেন।

অশোকের ২য় শিলাশাসনে যাদের 'যোন' বলা হয়েছে, যোনস-বাওয়ারের (লক্ষ্য-মণ্ডলের) সেই যাদব-বর্ম্মণ বা হৈহয় শূরসেন মৌর্য্য রাজত্বের অবসানে ভর্হুতে আবার একটি দান-সত্র তৈরী করে গণতান্ত্রিক শকক্ষত্রপ-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরাই দম্মিল—এলোর-মৌর্য্য-রায়া নামে পরে বিদিত হয়েছেন। তাঁরাই শ্রেষ্ঠী নন্দবংশ বা কুশান বা শাক্য।

কাণ্বায়ন শুঙ্গ-অন্ধ্রক-সিন্ধুক প্রভৃতি তাঁদের পৌরাণিক নাম। ঋক্‌বেদে তারা যদু-তুর্ব্বসের প্রশস্তিকার কণ্ব বা গার্গ্য ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী। গ্রীকদের মতো শঙ্গ-বংশ জাত এই বৈদিক শুঙ্গরাই চিতাভস্মপাত্র ব্যবহার করতেন।

চিতা-ভস্ম পাত্র বহুবিধ—তবে কলকাতার খুরি ভঙ্গীর মাটির কটোরাতেই সীলমোহর (পঞ্চাল বা সপ্তসিন্ধু ব্যঞ্জক) এঁকে তাতে গোথিক বাংলায় লেখা হত 'ব্বহ'। অর্থাৎ 'বৎস'—ঋক্‌বেদীয় বাশিষ্ঠ 'বাস্রা' বা 'বাছুর' নাম। তন্ত্রযোগীর 'মণিপুর' চক্রের চিহ্ন (পরে ব্রাহ্মী 'ব') দিয়ে এই চন্দ্রগুপ্তবংশের ধর্ম্মসূচনা করতেন গাভীপুত্ররা। প্রথম বংশে সপ্তহিন্দুর (বোডো) ত্রিশূল ও 'বৌথব্রিয়া' চিহ্ন থাকত বটপত্র ভঙ্গীতে (মার্শ্যালগ্রন্থ তৃতীয় খণ্ড—১১৫ পৃষ্ঠা—চিত্র সংখ্যা ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০)।

দ্বিতীয়-ধরণের যে ভস্মপাত্রলিপি তা মৌর্যব্রাহ্মীর (বিন্ধ্যশক্তি ময়ূরশর্ম্মার কাকুৎস্থ ?) ধরণ নিয়েছে কিন্তু বোডো বাংলা হরফ তখনও দূরীভূত নয়। লিপিটি ঐল নাহুষ লিপি—যিনি চ্যবন-শিষ্য, ত্রিবেণীর দাসরাজ, যোগী এবং স্বর্গজয়ী। কনিষ্কের স্মৃতিমঞ্জুষায় এবং অক্কড সরগনের (ভর্হুতের 'অক্ষদা') ইতিহাসে এই বাকটক (চেদী লিচ্ছবী) বংশের তিব্বতীব্রহ্ম চেহারা ও সংস্কৃতির পরিচয় আছে। বোডো দিল্লীর (দিলু ব্রিয়ার) চঙ্গ বা শঙ্গলিপি পাত্রে ব্রাহ্মীর ও বাংলার (হবঙ্গ) হরফ সাজাচ্ছে এই ভাবে :

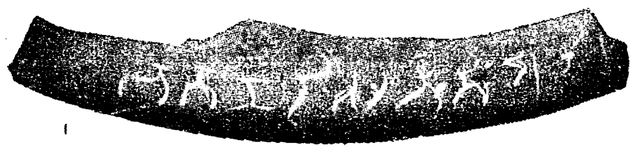

(৫)সর্গনহসংসোংর্গ (যং)ঞরখকর (যইর, গইর)। ৺নহুস স্বর্গ গঙ্গা নীরের খর (চেদী, অশ্বিনা-গর্দ্দভ, গেদ্রোসিঞা)—নিরক্ষর, গোক্ষুর, গৌর জাতি। অক্কড সরগন শঙ্গের নীরজ ঐল। অর্থাৎ তকলামকানী হোমো-এলপাইন বা টিবেটো-বার্ম্মাণ।

যিনি এবংশের মোহেঞ্জোদারোর পাশুপত শিব তিনি কিরাত শিকারী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত (সীলমোহর V. S. 1406)। তিনিই সেমেটিক আর্য্য—চেদী। কলিঙ্গ চেদী খরবেল তাঁরই সন্ততি—নন্দবংশ।

মনসা-পূজক V. S. areaতে গোথিক বৃষ-লিপি-U বা টোটেম প্লাক্ষা দ্বীপে (গন্ধার)



লিপিতে পরিণত। △-চিহ্ন ও তুলা পুরুষ (পুরী কুশান মুদ্রা চিহ্ন) H. R অঞ্চলে আবির্ভূত। সেখানেও U টোটেম আছে। ব্যাঘ্র পোষক (লামা যোগীদের) L-area U টোটেমের সঙ্গে ত্রিশূল চিহ্ন (টোটেম) এবং ব্রাহ্মী □ ভঙ্গী এনে সম্ভবত 'বক' দ্বীপের অর্থাৎ ব্যাঘ্রটী বর্ম্মণ কাপালিকের (পালযুগ পর্য্যন্ত এঁদের সেখানে দেখা যায়) সঙ্গে বন্ধুর সম্পর্ক ঘনীভূত করেছে। এতদ্বারা আসামের ঈশান কোণের মিকির ও সেরিকা (কুশান সম্রাটের কুশদ্বীপ) অঞ্চলের দমিন ব্রাহ্মণদের (দিওধারী চুটিয়া বা বোডো) ব্যাঘ্রপূজক এলাকাও সূচিত করত। কাশ্মীর কলিত বোডো চুটিয়ার যজমান অহোম-রাজের গণ্ডার-অঙ্কিত বর্ম্ম ছিল। ওগলল রেড্‌ইণ্ডিয়ান গণ্ডারের চামড়ার উপর লিপি অঙ্কন করতেন। এই রেড্‌ ইণ্ডিয়ানের (উত্তর আমেরিকার) যে অশ্বারোহী মূর্ত্তি অঙ্কিত পাওয়া গেছে তা অশ্বারোহী সিদিয়ান মূর্ত্তি। মোঙ্গোল বা তোখার নামে কথিত 'কুচা-হামি-তুরফান'-দের যে মূর্ত্তি তকলামকানে অঙ্কিত দেখা গেছে—সে মূর্ত্তিরই খানিকটা সজ্জা দেখতে পাওয়া যায় 'ওগলল' জাতিতে। নিকোবর দ্বীপের হেন্তাকুই কাঠের উপর খোদিত মূর্ত্তিটিই সে জাতির হুবহু মুণ্ড-ভঙ্গী বহন করছে। কম্বুজসভ্যতার দেব-দৈত্য ও অনন্তনাগের সমুদ্র-মন্থনের মীন নিকোবরে মিথুনীকৃত বোঝা যায়। দিত্তি নদী উপত্যকার বোডো-ভূমি শানের 'তৈ' বা 'পং' জাতি (যা থেকে অহোম ও পাঙ্গালাথিরইয়র, চের, মরন প্রভৃতি দ্রাবিড় হয়েছে) তাঁরাই এই রেডইণ্ডিয়ান। মিনোসের মীনকুমারীর সভ্যতা দেব-দৈত্য (আর্য্য-অনার্য্য) কারো হাতেই রেহাই পায়নি। এক-মাত্র হংস ঋষি বা প্রাক্‌বৈদিক ব্রাহ্মণ বা তন্ত্রযোগী শৈবরা তাঁদের আশ্রয় দিতেন। মাতৃকেন্দ্রিক সমাজকে সমর্থন জানিয়েছেন প্রথম মহাভারতের যোগধর্ম্ম বা যোগবাশিষ্ঠ। মোহেঞ্জোদারের গণ্ডার-পালক V. S. area এই জাতির নির্ম্মাণ। গণ্ডার মোহরে প্রথম মীন-হংস (কদাফিসা কুজলের রামপূর্ব্বার সিংহগাত্রের টোটেম) চিহ্ন উপস্থিত। এরাই মার্শ্যাল কথিত 'মিনহস্‌স্‌'। মোহেঞ্জোদারোর নির্ম্মাতা বলে এই নামীয় সভ্যতার উপরই সবিশেষ জোর দিয়েছেন স্যর জন মার্শ্যাল। এঁদের গুম্ফায় শব-রক্ষা ও চিতাভস্মপাত্র-ব্যবহার আদি সভ্যতার ক্রমোন্নতি বোঝায়। ঈশোপনিষদের কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস ভস্মান্ত শরীরের বা লিঙ্গ-শরীরের নাম দিয়েছেন 'অনিল'। সুমেরীয় 'এনলিলে'র প্রতিধ্বনি তুলছে এই 'অনিল'। বস্তুত প্রেত-যোনীর ভীতিতে সুমেরীয় সভ্যতাই দেহ ভস্মান্ত করবার প্রস্তাব এবং শবাচ্ছাদনের শ্রেষ্ঠী-সুলভ মিশরীয় পন্থা অবলম্বন করে। এলামের 'তেল' হয়ত ভস্মপাত্রই ছিল। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের ত্ব-ইলাবৃত বা জাতকের তেল-বাহন এই এলাম বা ইলি উপত্যকা-ই বোঝাত। উসুন-কুশান এই উপত্যকার 'যম'-পূজক উশন বা কুশান। তাঁরা মোহেঞ্জোদারোর চৈত্যের বা তেলের (যমগর্ত্ত) পূর্ব্বাঞ্চলে অধিবাসিত ছিলেন। নৈঋত কোণের চেদী বা চন্দ্র ভূমির নাম এই স্তূপগাত্রের

(মার্শ্যাল চিত্রে) বাংলায় স্পষ্ট লেখা 'চম' বা 'বম' অথবা 'মম'। 'চম' নামটি মিশরের এবং তার লিপিযুগের নাম। 'বম' শৈব যোগীর ধ্বনি—'পপুলভুঃ' শাস্ত্রদাতার স্মৃতি। যম-গর্ত্তে যাঁরাই মমত্ববোধ ছিল তাঁরাই মোহেঞ্জোদারো। তবে আলোকচিত্রে স্তূপের গায়ে 'সৎ'-নাম।

রক্ষার আয়োজন বর্জ্জিত উর্জ্জয়ন্তদুর্গ বা মোহেঞ্জোদারোর চৈত্য বা 'তেল' খননের পরক্ষণেই পশ্চিমপ্রান্ত থেকে তার দিকে তাকিয়ে বৌদ্ধ-সিঁড়ির বাম পার্শ্বে মার্শ্যাল একটি লিপি নিশ্চয়ই দেখেছেন। অন্তত তাঁর রচিত চিত্র থেকে 'চম বম' লিপিকে 'মম' পড়ে জুনিস-মায়া-সভ্যতার মোহাঞ্জনেও স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ সবাই ভাববেন যে সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে আমরা যাঁরা গর্ব্ব করে বলি, 'আমাদেরই সভ্যতা'—তাঁদের পেছেন এসে দাঁড়িয়েছেন এক পাল পালক-মাথা হৈকসোস ভারত। তাঁরা মোঙ্গোল তাতার বেদুইন, শক হুণ দরদ যাযাবর হয়েছেন পরে। তার আগেকার লিখিত ইতিহাস রচিত হয়েছে মৎ-পঠিত লিপির 'অরিআনা-আফঘন-যক্ষ' সমন্বিত শক্তিতে। 'পকমসিহি এসা ফলে' বলে' পিয়দসির জম্বুদ্বীপ বর্ণাত্মক লিপি এ শক্তির ইংগিত দিয়ে গেছে—আমি 'ত্র্যক্ষর' ব্রাহ্মী পাঠ করে তার দীর্ঘ ইতিহাস পূর্ব্ব প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছি। এলোর মৌর্য্যের (মুষিক ব্রহ্মণ বা দর্শ্মিল সেন গুট্টিকের বা কোচ বংশের) আগমনী উক্ত পিয়দসি-লিপি ব্যাখ্যা করেছে। কস্মিনকালেও তাঁরা 'মানবের মৃত্যু' সূচক ঐতিহাসিকদের মুখরোচক থিওরী মোহেঞ্জোদারো সভ্যতা নির্ম্মাণের কালে অনুসরণ করেন নি। গ্রামীন সভ্যতা, নাগরিক সভ্যতা, অগমমনন সভ্যতা সবই ককদু জাতির বা শঙ্খনীয় কুশান বাঙালীর। 'শক+দু' বা 'শেজহ+দ্রু' চৈত্যে অশোকবর্দ্ধন-নন্দিবর্দ্ধন (প্রাগ্‌ভাত) সভ্যতায় একাকার দেখতে পেয়েছিলেন মার্শাল বৌদ্ধসিঁড়ির দু'পাশে। Section on GH. ছবিতে এ লিপি আমিও দেখেছি। শুধু লিপিই নয় শামনের শামদান 'শেজ' দেখা গেছে গর্ভগৃহে—বাঙালী সর্প কদ্রুর শয়ন কক্ষ পাওয়া গেছে। বৃত্রবধস্থান 'ত্রিকদ্রুক' কোন্ জাতির তা-ও জানা গেছে। অস্ট্রিক জাতির সপিনীমাতা "সর্ব্বদেবময়ী সা হি" কুণ্ডলী—দুর বিদর্ভের শিবানী কুণ্ডিল নদীতীরের সদিয়া থেকে দুবার সন্তানদের পাঠিয়েছেন এই শিবালয়ে। তাঁরা নন্দের নন্দন। দুই 'গথ' বা সং 'ত্যগৎ' বাংলা-অক্ষর স্তূপের আলোক-চিত্রের গায়ে দেখা যায়।

## [ উপসংহার ]

মহৎ ভাব থেকে ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়নি, মহৎ ভয় থেকে ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়েছে। 'কচিন'-পুতুলের যে ভাষ্যই পাশ্চাত্য-পণ্ডিতরা দিন না—করনওলের দুর্দ্ধর্ষ নুলিয়াদের ঠাকুরাণ-পূজো যাঁরা দেখেছেন তাঁরা জানেন 'মহৎভয়ের মুরৎ-সাগর বরণ



তোমার তমঃশ্যামল'-কে কোনো দুর্দ্ধর্ষ মানব-শক্তিই অস্বীকার করতে পারে না। তার একটি ইঙ্গিতেই যে দুর্দ্ধর্ষ-জীবের জীবনান্ত হতে পারে এ-চিন্তা ও এ-জ্ঞান প্রাচীন নরমুণ্ডশিকারী মেলানেসিঞার—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, পলিনেসিঞা, মাইক্রোনেসিঞা দ্বীপবাসীর ছিল—ছিল নিকোবর, কালাম্বু, লাক্ষাদ্বীপের আদি-বাসীদের—কঙ্কন-উপকূলের মানবদের। রেড্-ইণ্ডিয়ানের ও আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের অপূর্ব্ব সভ্যতা-চিহ্ন আজ আমাদের এ-কথাই পুনর্ব্বার বলে দিচ্ছে যে 'তামলাভমান' নাসত্যা রাজচক্রের তাম্র-প্রস্তর বা চলকোলিথিক সভ্যতা গড়েও আমরা আজ অসৎ—আন-রিয়্যাল—মৃত। তেম্নি মোহেঞ্জোদারোর যম-গর্ত্তের চলকোলিথিক সভ্যতা V. S. area-তে যম-মূর্ত্তি স্থাপন করে মন্দির-মঠ-পাত্র-মাদল-নির্ম্মাতা শিল্পাজাতির যম-সাধনার বা মৃত্যু-সাধনার সভ্যতা-চিত্র দেখাচ্ছে। এই দর্শন-প্রস্থান 'মরণাত্মক অভিচার' নামে কৌটিল্য বিষ্ণুগুপ্তে পাওয়া যায়। উর-ইতিহাসের বিবরণ থেকে এবং মোহেঞ্জোদারোর কঙ্কালাকীর্ণ একটি প্রকোষ্ঠ থেকে এই সভ্যতার আদি স্তরটিকে উদ্ধার করা যায়। অক্কড-সরগনের বা বিদিশার ইক্ষ্বাকু-পূজক 'অক্ষদা' কণ্ব-প্রস্কণ্বের আবির্ভাবের আগে এ-সভ্যতার বিরোধী-শক্তি জন্ম-গ্রহণ করেনি। রেড্ইণ্ডিয়ান ওঝা-বেদে জাতি তাঁরা—কিরাত শৈব। তার মানে শৈব শিবিজাতি ঋক্‌বেদের যুগে—ইন্দ্রবরুণমিত্র-নাসত্যার এশিয়া-মাইনরী ও অঙ্গ-দেশের নাসত্যার 'তামলাভমান' অশ্বিনার যুগ। কিন্তু তারও পরমায়ু নির্দ্ধারিত—কালের ক্রিয়ায় যার জন্ম কালের একটি বিন্দুতে যার উৎপত্তি, অপর বিন্দুতে তার বিলয় হবেই। কাজেই এই সৎ বা সত্যযুগ নাসত্যা-যুগ হল। অসৎ থেকে সৎ জাত, কি সৎ থেকে অসৎ জাত এই হিন্দু বৈদান্তিক বিচার সে-যুগেই সুরু। বলী আর দুর্ব্বলের পালা সে-যুগেও কম নেই—শিল্প-কর্ম্মও কম হয়নি, তবু তার পুণ্যবল ক্ষীণ হয়ে এসেছে ভারতবর্ষে। জেগে উঠেছে জীবন-মৃত্যুকে সমজ্ঞানে পূজা করার দ্রাবিঢ় 'দ্বাবিদ্য' মনোভাব। ফুটে উঠেছে অশুভকে বর্জ্জন না করে গ্রহণ করে পুরুষকার-দ্বারা তাকে পরিশোধিত করবার তৃষ্ণা। বাশিষ্ঠ যোগশাস্ত্র বা ব্যাসকূট বা কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র এই তৃষ্ণা নিয়ে ভারতসভ্যতার দিশারী হয়ে উঠেছে। সে-সভ্যতা জম্বুদ্বীপের বা মহাভারতের। মোহেঞ্জোদারোর তেল বা স্তূপ নিজ-গাত্রে অতি স্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখেছিল শৈব 'সৎ'-নাম। সদসদ ভেদাভেদ নেই যেই পরম-মহেশ্বরের তাঁরই সেবকের স্থান ছিল হিন্দু সিদিয়ানের মোহেঞ্জোদারো।

আগামী সংখ্যায় 'প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথা'র অপ্রকাশিত অংশ পূর্ব্বাশার একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য রচনা হবে। সম্পাদক

# সমালোচনা

## অনিল বিশ্বাস

সাহিত্য মিলনের ভাষাদূত। জন্মেই এ চলেচে পাঠকের উদ্দেশ্যে, দেশকালের বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে। এ-যাত্রা আজো থামেনি। এ চলেচেই। হরফ বৈচিত্রে আছে এর রূপের পরিচয়। ফুটেচে লেখকের ভাব-চিত্রালি। এখানে জড় হয়েচে কত না চিন্তনের বহর। ভাষা-হরকরা এদেরকে পৌঁছে দিচ্চে পাঠকের চিত্তে। এই দৌত্যের পরে এর ছুটি। সাহিত্যের চিঠি পেলেই তো আর কাজ ফুরায় না। পাঠকের চাই অনুভূতির চিঠি, চক্ষুরুন্মীলন। এ-কাজের জন্যে আসে ঘটক। আসে সমালোচনা। এর কাজ সেতু-রচনার। এ লেখক ও পাঠকের মধ্যে করে ঘটকালি, বেঁধে দেয় দুয়েরি চিত্ত ছাদনাতলার মন্ত্রে: "যদস্ত হৃদয়ং মম, তদস্ত হৃদয়ং তব"। এর পরে সাজান হয় বাসরঘর। সুরু হয় দুয়েরি কানাকানি, মাথামাখি। এই মিলনীতে সমালোচনার কাজ হ'লো অনুঘটকের। মিলনের পরেই এর বিদায়। বিদায়ের পরেও এর রেশ র'য়ে যায়। 'সমালোচনার সঙ্গে তাই আলোচনী' তুলনীয়। খবর সংভরণেই এর পরিচিতি। শুধু তাই নয়। এতে আছে লেখকের জন্ম কথাও। কখনো কখনো এ আবার সাময়িক গণ্ডি পেরিয়ে এগোয় পূর্বজ সৃষ্টির তৌলন আলোচনায়। এখানে সে তুলে ধরে আলোচ্য ও পূর্বজ সৃষ্টির চিত্র। এ-ভাবে 'আলোচনী' আসন নেয় 'সমালোচনার' সঙ্গে। তাই 'আলোচনী' ও 'সমালোচনা' আদৌ স্বতন্ত্র জিনিষ নয়। এরা একই সত্তার রকমফের। একের অপূর্ণতা অন্যেতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে। একটি অপরিণত। অন্যটি পরিণত। একে ফুল, অন্যে ফল। এই তো পার্থক্য। তাই তো 'আলোচনী'র পূর্ণতা 'সমালোচনা'য়। লিখিয়ের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সৃষ্টির পরিচয় দেয়াই এদের কাজ। এর ব্যত্যয়ে এদের সত্তার বিকাশ হতে পারে না। চক্ষুরুন্মীলনের সঙ্গে পাঠকের হৃদয় উন্মোচনেই এদের দৌত্য। এ কাজ দুরূহ। আর এই দুরূহতা অতিক্রমণেই সমালোচনার কৃতিত্ব। এরি স্পর্শে পায়ের শিকল নাচের নূপুর হ'য়ে ওঠে।

হাল আমলে 'আলোচনী' অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে সাময়িক পত্রিকায়। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'লো গ্রন্থ-পরিচয় বা পুস্তক-পরিচিতি। তাই তো ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বলেচেন, বর্ত্তমান যুগটা আলোচনীর, সমালোচকের নয়। সাহিত্যিক মৌলরূপ-উদঘাটন স্বভাবতই এখানে অনুপস্থিত। আলোচনী আরো একধাপ নিচে নেমেচে নিন্দালুতায় বা আত্মরতিতে। আলোচনার নামে চলেচে ধর্ষকাম নিন্দাবাদ বা প্রশংসাবাদ। বাংলা পত্রিকা থেকে এর নমুনা তুলে দেয়া গেল:

(১) "কবিতা লিখতে গিয়ে কবিরা যদি পরিশ্রম না করে কিম্ভূত বাচনভঙ্গি ও বর্ণনারীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন তা হলে কাব্যকে গরু খোঁজা করে খুঁজলেও মিলবে কিনা সন্দেহ।"

(২) "মনুষ্যত্বে বিরাট মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া আমাদের বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না।"

প্রথম উদ্ধৃতির উল্লেখ্য হ'লো প্রক্ষোভের আত্মরতি যা গরু খোঁজার গোরুমিতে রচনা করেচে নিজের পঙ্কশয্যা। সাহিত্য সমালোচনা যে গরু খোঁজা নয়, আলোচনীর লেখক তাই প্রমাণ করেচেন সাহিত্য-লোকে গরু খুঁজতে গিয়ে। যে বইয়ের আলোচনা এ, তার কোনো পরিচিতিই ফোটেনি



এখানে। শুধুই নিন্দালুতায় এগিয়েচে তাঁর আত্মরতি। তবে গর্ভবাস পূর্ণ হবার পূর্বে এ বেরিয়েচে, তাই আলোচনীর এ-বিকলাঙ্গ অবস্থা। অন্যদিকে দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে আলোচনী-লিখিয়ে হতবাক হয়েচেন শুধু। উপলব্ধির স্তরবিন্যাস ফোটেনি। নিন্দা বা প্রশংসার অতিবাদই এ সবের লক্ষ্য। স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্বন্ধনিরূপণ এখানে তাই স্বভাবতই অনুপস্থিত। এ আলোচনীর চেয়েও নিম্নগা। এ আত্মরতির নামান্তর। প্রক্ষোভের স্থূল পরিচয়েই এ তার দায়িত্ব চুকিয়ে দিয়েচে। যৌক্তিকতা ও নিরাসক্তির হদিস মেলেনা এখানে। নিন্দাবাদে যেমন ফুটেচে অহং-বিহার, তেমনি প্রশংসাবাদে দাসানুদাসের বিনয়। এ দুইই সমালোচনার প্রতিকূল।

এবার বিদিশি পত্রিকার কথা। সেখানে কিন্তু সমালোচনার মান বেশ উন্নত। আলোচনী সেখানে যাত্রা করেচে সমালোচনার পথে। মার্কিন "পোয়েট্রি" পত্রিকার সেপ্টেম্বর (১৯৫১) সংখ্যা থেকে একটু উদ্ধৃতি দেয়া গেল—

> "তবুও এসব দোষ—যা কাব্যরূপকে চিন্তাবাহকমাল হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছা থেকে এসেচে—কেবল নির্দোষকৃতির উপরের দাগ"। (পৃঃ ৩৫৪)

এখানে কত স্বচ্ছন্দে ধরে দেয়া হয়েচে দোষের কারণগুলি। শুধু তাই নয় উদ্দেশ্য উপায়নের যৌথ লীলাও বিধৃত হয়েচে এখানে। রবীন্দ্রযুগেও সমালোচনা বেশ ছিলো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই সমালোচনা করেচেন দ্বিজেন্দ্রলালের "আষাঢ়ের"—

> "ভাষা সম্বন্ধে কবি যাহা লিখিয়াছেন সে ঠিক কথা। কিন্তু ছন্দ সম্বন্ধে তিনি কোনো কৈফিয়ৎ দেন নাই এবং দিলেও আমরা গ্রহণ করিতে পারিতাম না। পদ্যকে অমিল গদ্যরূপে চালাইবার কোনো হেতু নাই। ইহাতে পদ্যের স্বাধীনতা বাড়ে না, বরঞ্চ কমিয়া যায়।" [রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৬]

এখানে আছে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ রীতি। এরি ফলে হয়েচে সৃষ্টির মৌলরূপ উদ্ভাসন। পল ভালেরির উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মর্ত্তব্য: "সমালোচনা যদি মেজাজ মাফিক আর মরজি মতো মতামত দিয়েই ছুটি না দেয় অর্থাৎ শিল্পকর্মের আলোচনা কর্তে গিয়ে নিজের বিষয়েই শুধু কথা না বলে; সমালোচনা যদি বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তা'হলে তার অন্তঃসার হবে লেখক যা কর্তে চেয়েছিলেন আর ফলত কর্তে পেরেচেন এ দুয়ের তুলনা"। বস্তুত এই তো সমালোচনার কাজ। স্রষ্টার উদ্দেশ্য সৃষ্টিতে কতটা সার্থক হয়েচে এর আলোচনাই মুখ্য। অন্য সব গৌণ। এই তৌলনেই সমালোচক তুলি ধরবেন। তাঁর 'আত্মরতি' চায় না পাঠক। ভাল-লাগা, মন্দ লাগাও এরি পটে বিচার্য। ভারতীয় আলংকারিকরা একটি কথা বলেচেন: "সহৃদয়-হৃদয় সংবাদ"। পাঠকই যে শুধু সহৃদয় হবেন, তা নয়। সমালোচকেরও হতে হবে সমান হৃদয় লেখকের সঙ্গে। তবেই তো হবে সত্যিকার দূতীগিরি। সার্থক সমালোচকের হিসেবে উল্লেখ্য হলেন ষ্টুয়ার্ট গিলবার্ট, যিনি লিখেচেন "James Joyce's Ulysses"। আধুনিক "ইউলিসিস" যে হোমারের "অডিসি"রই আধুনিক ভাষ্য, তা তিনি দেখিয়েচেন। জয়েসের উদ্দেশ্য ছিলো নতুন পরিবেশে "অডিসি" রচনা। একাজে তিনি যে সক্ষম হয়েচেন, তাই দেখিয়েচেন গিলবার্ট। গোটা "ইউলিসিসে" কিভাবে ছন্দ দোলায় এগিয়েচে, কোথায় আখ্যান হোমারের সঙ্গে মিলেচে, জয়সের শিল্পকর্মের সংজ্ঞা-বিচার প্রভৃতি বিষয় নিয়েই সমালোচক বিচার করেচেন। অষ্টাদশ

পর্বের যে গোটা কাহিনী প্রবাহ এগিয়েচে, তারি বিচার আছে এখানে। নিরাসক্তিতে গিলবার্ট সত্যি প্রশংসার্হ, আদর্শ স্থানীয়।

সমালোচনারও আছে কয়েকটি ভঙ্গি। মজির আত্মরতি, আলোচনা ও সমালোচনা। অতি নিম্নস্তরে আছে 'মজির আত্মরতি'। বস্তুত এ সমালোচনাই নয়। এ তার নামান্তর হ'য়ে চলতে চায়। এতে মননের কোনো হাল নেই। শুধু প্রক্ষোভেই এর বিস্তার। এর উপরে আছে আলোচনী বা সাময়িকীর উপরই বেশি জোর দেয়। এ বর্ত্তমানকে সামনে রেখে, মহাকালকে ঠেলে দেয় পেছনে। তবে মাঝে মাঝে এর চিত্তবনে দোলা লাগে দক্ষিণে পবনের। তখন তা হ'য়ে ওঠে সমালোচনা। এ হ'লো আলোচনারই পূর্ণ বিকাশ। এ বর্ত্তমান পেছনে ফেলে, স্থান দেয় মহাকালকে। বস্তুত মহাকালের পটেই এগোয় এর বিচার। এতে পাঠকও লিখিয়ের মধ্যে স্থাপিত হয় যোগাযোগ। এরও আছে দুটো দিক—একক ও যৌথ। একক দিকটা প্রকাশ পায় যখন লেখক ও সমালোচক হন একই ব্যক্তি। বস্তুত এই ঐক্যের ভিত্তিতে ফুটে ওঠে গোটা সমালোচনা, লিখিয়ের সৃষ্টি-পরিচয় ও আত্মকথা। তাই বলা যায় প্রত্যেক লিখিয়ের মূল্য শেষ পর্যন্ত ততটাই দাঁড়াবে, যতটা তাঁর মূল্য ছিলো স্বকীয় সমালোচক হিসেবে। এ কাজ রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায়ই করেচেন আর বলেচেনও: "আমার হয়ত করতে হবে আমার লেখা সমালোচন।" যৌথরূপ দেখা যায় লেখক ও সমালোকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে। দৌত্য চলে সমালোচনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ও তৌলন রীতি অনুসরণে। এর উদাহরণ টি, এস, এলিয়টের "দান্তে" বা "হ্যামলেট"। সমালোচক এখানে ব্যক্তি হিসেবে অনুপস্থিত। যেন উপচারীহীন অস্ত্রোপচার। উদ্দেশ্য ও ফলদের সঙ্গে তুলনা করেচেন তিনি। তবে উপচার আছে। এ হ'লো পথের পাথেয়। তুলনা আর বিশ্লেষণ। সমালোচক এ দু'পায়ে এগিয়ে চলেন। এই যে বর্ত্তমান-রূপ এর পেছনে কিন্তু আছে শতাব্দীর সাধনা। সমালোচনার আদিপর্বে আছে গ্রীসের দান।* এই ভ্রূণস্তর ছড়িয়ে আছে য়ুরোপার খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতকে। এতে তিলে তিলে পড়েচে আরিষ্টফেনিসের ব্যঙ্গানুকৃতি, প্লেটার 'মাইমোসিস' বা অনুকৃতি, আরিষ্টটলের 'ক্যাথারসিস্' বা চিত্তভঙ্গি এবং রোমান সিসেরোর শব্দতৈরী ও অনুলিখন। শুধু তাই নয়। পরিভাষার পূর্ণাঙ্গ রচনায় আধুনিক রিচার্ডস ও অগডেনের দানও স্মর্ত্তব্য। তাছাড়া আছে বেনেডেটো ক্রোচের দার্শনিক ও নন্দনিক সমালোচনা রীতি এবং রিচার্ডস্‌এর মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যসব ধারার মধ্যে উল্লেখ্য হ'লেন মেনজাইনাম হোরেচ, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, ম্যাথু আর্নল্ড, মার্কস, এলিয়ট প্রভৃতি।

এই সমালোচনার ইতিহাসে ভারতের দান ও স্মর্ত্তব্য। বৈদিকযুগে [ ১২০০-১ খ্রীঃ পূঃ ] হয়েচে 'কবি' ও 'কাব্যের' জন্ম। তবে এরা তখন 'ভাবীকথক' ও 'ভাবীকথন' হিসেবেই ব্যবহৃত হ'তো। এর পর ধ্রুপদীপর্বে ( ১-১২০০ খৃঃ ) হ'লো এদের অর্থান্তর। 'বাক', 'শ্রুতি' 'স্মৃতি' প্রভৃতির হ'লো আবাহন। সব চেয়ে বড়ো আবিষ্কার এ'লো 'রসে'। এরপর মনোবিদ্যায় আরো এগিয়েচেন বৌদ্ধ

* সমালোচনার আদিপর্ব্বে আরীক্ষিকীর দানই যে প্রথম উল্লেখ্য লেখক হয়ত তা ভুলক্রমে উল্লেখ করেন নি।
—সম্পাদক



সন্ন্যাসীরা। এরি মাংসিক পরিচয় ফুটে উঠলো ভরতের "নাট্যশাস্ত্রে" [ ৪র্থ শতক ]।‡ এ গঙ্গোত্রী থেকে উৎসরিয়ে উঠলো কাব্য—অলংকার ও ভাষার ত্রিবেণী। এ প্রবাহের কূলেকূলে তৈরী হলো এককটি আলোক-স্তম্ভ। তাই দেখা গেলো দণ্ডীর **কাব্যাদর্শ**, উদ্ভটের **অলংকার সংগ্রহ** রাজশেখরের **কাব্যমীমাংসা**। এ-ভাবে প্রবাহ পৌছুল নবম শতকে। তারপর দেখা যায় আনন্দবর্দ্ধনকে, যিনি এলেন তাঁর **ধ্বন্যালোক** নিয়ে। অভিনবগুপ্তের **অভিনবভারতী** ও ধ্বন্যালোকের **লোচনটীকা** এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তারপর বাঁকে বাঁকে দেখা যায় ধনঞ্জয়ের **দশরূপজ**, মম্মটের **কাব্যপ্রকাশ**, বিশ্বনাথ কবিরাজের **সাহিত্যদর্পণ**, নন্দিকেশ্বরের **অভিনয়দর্পণ** ও জগন্নাথের **রসগঙ্গাধর**। এখানে 'রসের' সংজ্ঞায় স্থান পেয়েচে ভাব, বিভাব, অনুভাব **রীতিতে** দোষ গুণ আর **ভাষায়** অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনার ত্রিধারূপ। সংস্কৃতের এই বিরাট সমালোচনা সম্ভার মাথায় নিয়ে বাংলাও এগিয়েচে। বাংলা সমালোচনা সংস্কৃতলীন হ'লেও এতে মিশেচে য়ুরোপীয় ধারাও। উনিশ শতকী **সমাচারদর্পণে** [ ১৮১৮ ] শুধু সমাচার নয়, সমালোনার ছায়াও পড়েচে। যা ছিল তা পদ্যে এবং সংস্কৃতের ঐতিহ্যবাহী। উদাহরণ হিসেবে ভারতচন্দ্রের "রসমঞ্জরী" উল্লেখ্য। নবরস, নায়িকা, নায়ক, ভাব প্রভৃতি সংজ্ঞার আছে পদ্যীকরণ। এ ছাড়া মাঝে মাঝে পাঁচালির মধ্যেও উঁকি দিয়েচে 'রস' বর্ণনা। যথা—

না রবে প্রসাদগুণ এ হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্যরস ল'য়ে॥

**পত্রিকা পর্বের** পর আলোচনা রীতি ঝিলকিয়ে উঠলো রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" ( ১৮৫২ ) ও হরচন্দ্র দত্তের Bengali Poetryতে ( Calcutta Revew, 1852 )। বঙ্কিমচন্দ্রের Bengali Literature-ও বেরোয় Calcutta Revew-তে। ১৮৬৫এর **সংবাদ প্রভাকরে** বেরোয় **দুর্গেশনন্দিনীর** পরিচিতি। সমালোচনার পরবর্ত্তী পর্ব এলো বঙ্কিমের **বঙ্গদর্শনে** ( ১৮৭২ )। সংস্কৃত আলংকারিকরাই এখনে পুরোযাত্রী। তৃতীয় পর্বের পত্তন হ'লো রবীন্দ্রনাথের নন্দন তত্ত্বে। এখানে য়ুরোপার সংস্পর্শে পুরনো মতবাদের হ'লো রূপান্তর। এ নবায়নে পোষাক বদলালেও সত্তা রইল ঠিকই। রসের নিকষেই যাচাই করলেন সাহিত্য প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত। এঁদের রস-সর্বস্বতায় ধরা পড়লো ওস্কার ওয়াইল্ডএর "শিল্প-শিল্পের জন্যে"। মোহিতলালে এ সংস্কৃত যুগের সঙ্গে মিতালি করলো। ৪র্থ পর্বে সমালোচনা যুক্ত হ'লো অধ্যাত্মায়নের সঙ্গে। এ যেন 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর'। শ্রীঅরবিন্দ ও নলিনীকান্ত গুপ্ত এরি ব্যাখ্যাতা। মানসিক উন্নয়নে অধ্যাত্মায়ন একটি বিশিষ্ট জায়গা জুড়ে আছে। এরও স্বীকৃতি আছে। তাই শ্রীঅরবিন্দের 'Future Poetry' ও নলিনীগুপ্তের 'সাহিত্যিকা'য় ফুটেচে এরি অভিব্যক্তি। দিলীপ রায়ও এর ভাষা রচনা করেচেন

‡ নাট্যশাস্ত্র বৈদিক ভরতেরই হোক আর পৌরাণিক শৈব-জাতিরই হোক তা বর্ম্মার 'মেদিনীজ্ঞান' ( ঠগীনট ) থেকে আবির্ভূত। কম্বুজের গুপ্তযুগে অষ্ট্রিক-ভাষীদের সভ্যতায় হলকর্ষণ-উৎসবে নৃত্য-নাট্যের দৃশ্য দেখা যায়। তাঁদের ছায়া-নৃত্য এবং সিংহলের কান্ডি-নৃত্য নাট্যশাস্ত্রের উৎস বলে বিবেচিত হতে পারে।—সম্পাদক

তাঁর উপন্যাসের মুখবন্ধে। ৫ম পর্বে আছে পূর্বাশা-কবিতা-পরিচয়-চতুরঙ্গের দান। সংস্কৃতি ও নন্দন তত্ত্বের উদগাতা হিসেবে স্মরণীয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। বুদ্ধদেব বসু এগিয়েচেন সমাজ নিরপেক্ষ রস সর্বস্বতায়। সঞ্জয় ভট্টাচার্যে আছে সাহিত্যের মৌল রূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা। 'পরিচয়ে'র মার্কসীয় সংস্করণে আছে "সমাজতান্ত্রিক বস্তুবাদ"। এর সঙ্গে সম্বন্ধ নেই ক্রোচের ব্যক্তিবাদের। এতে আছে তিনটি জিনিষ--"উদ্দেশ্যবাদ, সংবাদ এবং বিষয়রূপের অদ্বৈতবাদ"। এই তিনবাদ মিলেই সৃষ্টি করেচে বিসংবাদ রসসর্বস্বদের কাছে। এ এক নতুন বস্তু, যার উপলব্ধির জন্যে চাই উপযুক্ত সমাজ-ব্যবস্থা। ৭-ম স্তরে আভাস পাওয়া যায় "সর্বাস্তিবাদে"র। এর পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় দেখা যায়; "আমি স্বভাবতই সর্বাস্তিবাদী অর্থাৎ আমি সমগ্রকেই মানি। এই যে বিচিত্র রূপিনী সমগ্র, এর সঙ্গে ব্যবহার রক্ষা করতে হলে একটি ছন্দ রেখে চলতে হয়।" এরি পরিপূরক হিসেবে উল্লেখ্য অন্নদাশঙ্কর রায় ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। "জীয়নকাটি"র "রম্যারঁলা" প্রবন্ধটি এখানে বিশেষভাবে স্মর্তব্য। হালে বাংলার সমালোচনার আদর্শ ভেঙে পড়েচে, অথচ নতুন কোন শক্তিমান সমালোচকের আবির্ভাবও হয় নি, যেমন হয়েচে টি, এস, এলিয়টে কি হার্বার্ড রীডে। বাংলার বর্ত্তমান অবস্থা "ঘরেও নহে, পারে ও নহে, যে জন আছে মাঝখানে"র মতোই।

তাই প্রশ্ন জাগে, এতটা ঐতিহ্য সম্ভার পেয়েও বাংলা সমালোচনা তেমন কেন এগুতে পারলে না। এর কারণ বিবেচ্য। এ ব্যর্থতার মূলে অবিশ্যি কাজ করেচে একাধিক কারণ। প্রথমেই ধরা পড়ে 'গোষ্ঠী'-মনোবৃত্তি। এতে করে পত্রিকা-মারফতে গড়ে উঠেচে কয়েকটি বিশিষ্ট গোষ্ঠী। প্রত্যেক গোষ্ঠীই চেষ্টা করেন দলীয় সৃষ্টিকে যুগোত্তীর্ণ বলে তুলে ধর্তে। দলান্তরের সৃষ্টিকেও হেয় প্রতিপন্ন করার বাসনা প্রবল। এতে অন্ধ গলিরই খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু মেলেনা ধ্রুপদী প্রশস্ত পথের সাক্ষাৎ। ফলে যে সর্বাস্তিবাদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেচেন, তা হয় ব্যাহত। সমালোচনার উপাদানে আছে অনুভূতি, তৌলন, ব্যাখ্যা, ভাব-ভাষার গ্রন্থিলতা, জীবনী ইতিহাস, বিচারের সূক্ষ্ম-মনন প্রভৃতি। একদেশদর্শিতা বা একচোখোমির ফলে শুধুমাত্র একটি উপাদানই বিচার্য হ'য়ে ওঠে বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে। এতে সত্যিকার সমালোচনা হ'তে পারে না। দ্বিতীয়ত, জ্ঞানের অপ্রতুলতা। একটি সমালোচনায় অনুবাদ-সম্পর্কে বলা হয়েচে; "ভাষান্তর সহজ, কিন্তু ভাবান্তর নয়'। বলা নিষ্প্রোয়োজন, সত্য ঠিক এর উল্টোটা। বর্ত্তমানে জ্ঞানবিজ্ঞানের হয়েচে ব্যাপক প্রসার। দুনিয়ার সঙ্গে তালে তালে পা ফেলতে হ'লে চাই তদনুরূপ আচরণ। স্থিতধী হ'য়ে থাকলে চলবেনা। যুক্তি নিষ্ঠার সঙ্গে চাই যেমন মানসিক দীপন, তেমনি অনুভূতির উন্মীলনও। অর্থাৎ মাথা ও হৃদয়ের মিলনকে ফুটিয়ে তোলা চাই হাতে। তৃতীয়ত, আছে গোঁড়ামি। এ একচোখোমিরই নামান্তর। অহংজ্ঞানেই এর প্রতিষ্ঠা। নীট্‌শের কথায় বলা যায়, গোঁড়ামিই কারাগার। ৪র্থ বাধা আসে অভিজ্ঞানের অভাবে। লেখক খোঁজেন সহৃদয়কে। লিখিয়ের উপলব্ধি অভিজ্ঞতা চাই সমালোচকের। এ না হ'লে সাহিত্য রয়ে যাবে অধরা। যেমন ৯ বছুরে বালকের কাছে চণ্ডীদাসের কাব্য নিস্ফল তেমনি শ্রীঅরবিন্দের "সাবিত্রী"-কাব্য বিষয়ীর কাছে দুর্বোধ্য। ৫ম কারণ হ'লো প্রকাশনের অক্ষমতা। অনেকেই সাহিত্য সাধনা না করেই লিখতে বসে যান। ফলে একদিকে যেমন থাকে অভিজ্ঞতার



অভাব, অন্য দিকে তেমনিই দুর্লজ্ঘ্যভাষার প্রাচীর। চিন্তনের অভাবই শেষ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে ভাষাকে। ভাষা-শিল্পীরও চাই সাধনা। ৬ষ্ঠ কারণ হ'লো সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার সমক্য বোধের অভাব। প্রত্যেক সৃষ্টিরই কতগুলি প্রক্রিয়া থাকে। যিনি সৃষ্টিকে চেখে দেখতে চান, তাঁর দরকার এ সবের সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান-লাভ করা। এ কাজ দুরূহ, পরিশ্রম সাপেক্ষ। এ চাই-ই।

সমস্যা তাই শেষ পর্য্যন্ত এসে যায় লেখকের অন্দর মহলে, সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায়। সৃষ্টিও সমালোচনা পরস্পর বিরোধী নয়। এরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিপূরক। সৃষ্টির আদি লগ্নে আছে সমালোচনা। ঘটনা-বিন্যাস, রসায়ন, ভাষিক প্রকাশন হ'লো এর মৌল সমস্যা। এখানেই আসে সমালোচনা। সৃষ্টি যেমন সার্থকতার জন্যে খোঁজে সমালোচনাকে, তেমনি সমালোচনাও ডাকে সৃষ্টিকে সরসতার জন্যে। নীরস সমালোচনা কখনো দোলা দিতে পারে না পাঠক চিত্তে। সে থাকে "শুষ্কং কাষ্ঠং". মতোই। লেখক-পাঠকের ঘটকালিতে এ ব্যর্থ। চাই সৃজনী শক্তি, যাতে ফুটে ওঠে প্রাণনের ফুলঝুরি। সমালোচনায় তৈরী হবে "রুচি" যা দিয়ে চেখে দেখতে হবে সৃষ্টিকে। এ বড়ো গুরুদায়। এর জন্যে চাই বাল্যকালের পঠনবিহার। হরেকরকম জিনিষের আমদানিতে মনকে পূর্ণ করা চাই। দ্বিতীয়ত কৈশোরকস্তরে জাগবে বিশেষ সাহিত্যিকের প্রতি শ্রদ্ধা। চেতনায় সে শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এরপর যৌবনস্তরে আসবে অভিজ্ঞতার জোয়ার। সৃষ্টি এখন আর আগেকার মতন অভিভূত করবে না হৃদয়কে। 'ক্রটি' এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই জীয়ন কাটির স্পর্শে জেগে উঠবে সমালোচনার বিচার। বাংলার বর্ত্তমান অবস্থায় আছে এই রুচির অভাব এবং মননের নেতিবাদ।

সমালোচনা একাধারে অভিজ্ঞতা-নির্ধারণের প্রমাণ ও মূল্যায়ন। একদিকে এ যেমন করে অভিজ্ঞতার স্বরূপ উদ্ঘাটন, অন্যদিকে এর মূল্যায়নও। এ অভিজ্ঞতা অবিশ্যি লিখিয়ের। তবে একে চারিয়ে দেবার কাজ হ'লো সমালোচকের। অভিজ্ঞতার ভালো-মন্দ মাঝারির পরখ করাই এর কাজ। এর পর লিখিয়ের উদ্দেশ্য ও কৃতির সংযোগ-স্থাপন। সমাজের পটেই এ বিচার্য। তাই সমাজ, সাহিত্য ও সমালোচনা প্রগতিবৃত্তের রকমফের। সমাজের অন্তর্দৃষ্টি প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। আর সমালোচক জবাব দেন 'সাহিত্য কী' 'কী তার উপযোগ' 'কোন ইচ্ছা এ মেটায়' প্রভৃতি প্রশ্নের। এর তাই আছে দুটি ভাবয়িত্রী সীমা। একদিকে 'সাহিত্য কী ?', অন্যদিকে 'এ সাহিত্য কী ভালো ?' এর বিচারে সফলকাম হওয়া খুবই কঠিন। তবুও প্রতিভাস্ফুরণ যুগে যুগেই দেখা যায়। পুরনো পরিবারের নবজাতকের সম্বন্ধ নিরূপণই তার কাজ। শিল্পকৃতি সম্পর্কে মানুষী চেতনা তার খোলস বদলায়। তাই তো সমসাময়িকের চোখে ব্লেক বেচারার কি দুরবস্থা, কীট্‌সের কী শোকান্তিকা। যুগ পরিবর্ত্তনে দৃষ্টিরও হয় পরিবর্ত্তন। তাই তো শেলি আর্ণল্ডের চোখে দেখা দিয়েচেন "একটি সুন্দর, কিন্তু বিফল পরীর" মূর্ত্তিতে, যে শুধু পাখাই ঝাপটায়। রুচি বদল হ'লেও মৌল সত্তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে প্রকাশ পায় রুচি, সমালোচনার মানদণ্ড। এতে বোঝা যায় সমালোচনার কাজ কত দুরূহ। বাংলা সমালোচনায় সাহিত্যের মৌলরূপ নিরূপণ ফুটলেই এ বেরোতে পারবে বিশ্বপরিক্রমায়। তা না হ'লে হবে ভরাডুবি। তাই আশা আজ তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে। প্রশ্ন জাগচে কবে আবার ফুলে ফলে পল্লবে বাংলা সমালোচনা জেগে উঠবে, স্থান নেবে বিশ্বসারস্বত-সমাজে ? কালায়নে ঢেউ ভাঙে কবে ?

# মারণ-মরণ

## শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

জেটিটা পেরিয়ে ইয়াসিন যখন বাইরে বেড়িয়ে এলো তখন বিকেল। গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের সবুজে সোনা-রঙ রোদ চিক্‌চিক্ করছে। কিন্তু ইয়াসিন সে সব কিছুই দেখলনা, শুধু তার চোখে অতি চেনা সহরটাকে নতুন বলে মনে হল। অনেক পাল্টেছে সহরটা, আগের চেয়ে অনেক বেশী স্পষ্ট, আগের চেয়ে অনেক বেশী চক্‌চকে হয়েছে। ইয়াসিন পা বাড়াল রাস্তায়। হাঁটতে হাঁটতে সে একটা কথাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবল কেবল, বদলেছে সহরটা, বদলে গেছে তার মানুষগুলো। কথাটাকে ভাবতে গিয়ে আর একটা কথাও ইয়াসিনের মনে নাড়াচাড়া করে উঠল। সে, সেও কি বদলেছে এমনি করে। কথাটা ভাবতে গিয়ে মনে মনে দুর্ব্বল হয়ে পড়ল ইয়াসিন। ঠিক আগের মত দুর্ব্বল লাগল মনটা তার। ঠিক যতবার ইয়াসিন মতিনার নামটা ভাবতে গেছে ঠিক ততবারই এমনি দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে সে। জর-জর অনুভূতি তার সারা শরীরটা পেচিয়ে উপরের দিকে উঠে এসেছে। ভাবল ইয়াসিন, আজকাল সহজেই মনটা কেমন ভারী হয়ে যায় তার। সীসের মত ভারী।

কিন্তু গত চার বছর। দীর্ঘ চারবছর জলে-জলে কাটিয়েও কি ইয়াসিনের মনটা জলের মত হাল্কা, জলের মত রঙহীন হলনা। না মতিনার ভাবনাটাই তার মনকে ভারী করে তোলে এমনি করে।

যেদিন কলকাতা ছেড়ে জলে ভেসে পড়েছিল ইয়াসিন, সেদিন একটা শপথই সে শুনিয়েছিল নিজেকে। কোনদিন না, কোনদিন আর ফিরবেনা ইয়াসিন এই কলকাতায়, যেখানে আয়নায় একটা বিশেষ মেয়ের ছায়া পড়ে। যেখানে বাতাসে তার বাসি চুলের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। কিন্তু তবুও ফিরতে হ'ল ইয়াসিনকে, ফিরে আসতে হ'ল কলকাতায়।

পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁসি, এ জানলায় হাত বাড়ালে ও জানালায় গিয়ে ঠেকে। তবুও ব্যবধান, কত শাসনের পাচিল। কিন্তু মন একবার যখন ভেঙেছে, তখন শাসনের পাচিল ভাঙতে কতক্ষণ। শ্লথলগ্ন চোখ সরমের কাজল গলিয়ে উঁচু হল, ফিসফিস, হাওয়ায় হাওয়ায় কথা ছোঁড়াছুড়ি। সেদিন কিন্তু ভাবতেও পারেনি ইয়াসিন, এ সব মিথ্যে, ঠুনকো পেয়ালার মত। কিন্তু যেদিন সব বুঝতে হ'ল, সেদিন আর কিছুতেই নিজেকে বাগ মানাতে পারলনা সে। বোরখা ঢাকা অবস্থায় মতিনা যখন মিঃ আলমের গাড়ীতে গিয়ে উঠল, তখন ইয়াসিন সোজা চলে এলো জাহাজ ঘাটায়। তারপর জলে জলে ঘোরাঘুরি, বন্দরের অচেনা ভীড়ে হারিয়ে যাওয়া।

আস্তে আস্তে ক্ষত ভুল্লো ইয়াসিন আর আল্লার কাছে কসম খেলো সে বারকতক, যেমন করেই হোক ফাটল সে ধরাবেই। ভেঙে চুরে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেবেই সে মতিনার সংসার। প্রথম প্রথম মনটা পিছলে পিছলে সরে যেতো তার, তারপর আস্তে আস্তে দানা বাঁধল, তীক্ষ্ণ মৃদু হয়ে উঠল ইয়াসিনের মন। তীব্র একটা ঘৃণা, একটা হিংস্রতা ছাড়া ইয়াসিন মতিনার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবতে পারেনি তখন।



কিন্তু কলকাতায় ফিরে দিন কয়েকের মধ্যে ইয়াসিনের মনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেলো। বার কতক মতিনার বাড়ীর সামনে দিয়ে ঘোরা-ফেরা করল সে অকারণে। যদি এক পলকের জন্যও দেখতে পায় ইয়াসিন মতিনাকে। এই অপরূপ বাসনা তার হৃৎপিণ্ডটা কুড়ে কুড়ে খেলো। অন্য কাজে মন বসাতে চেষ্টা করল সে। কিন্তু পারলনা। সব কেমন জট পাকিয়ে গেল। তারপর একদিন মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে সটান বুক ঠুকে ঢুকে পড়ল সে আলম সাহেবের দরজা ঠেলে।

—কি চাই। চোখ না তুলেই প্রশ্ন করলেন মিঃ আলম।

—একটা নোকরি সাব। এলোমেলো গলায় বল্লো ইয়াসিন।

—নোকরি। এবারে চোখ তুল্লেন মিঃ আলম। ইয়াসিনের সারা শরীরটা জরিপ করে এলো তাঁর চোখ।

—হু সাব একটা নোকরি চাই। আমি ভালো মটর ড্রাইভার। এই দেখুন সার্টিফিকেট আছে। কোটের ছেঁড়া পকেট থেকে সার্টিফিকেটটা বের করে টেবিলের উপর রাখল ইয়াসিন।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। মিঃ আলম তার সার্টিফিকেটখানা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়াসিন ভাবল, একটা কথা : তার সামনে ঐ চেয়ারে বসা মানুষটা মতিনার স্বামী। মতিনা! বুক থেকে গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠল নামটা। গুন্ গুন্ করল।

ইয়াসিনের চেহারায় কি ছিল, চাকরী হয়ে গেল তার। গম্ভীর মুখে সেলাম ঠুকে বেড়িয়ে এলো ইয়াসিন। দরজা দিয়ে বেড়িয়ে আসতে আসতে ইয়াসিন একবার তাকাল ভিতরের দিকে। পরদা দিয়ে। কানটা তীক্ষ্ণ করে রাখল সে। যদি শোনা যায় সেই পুরোণ বেলোয়াড়ী চুড়ির টুংটাং। ঠিক জলতরঙ্গের সুরের মত।

পরদিন থেকেই কাজ সুরু করে দিল ইয়াসিন। কাজের ঝঞ্ঝাট যদিও খুব বেশী, তবুও কিছু মনে করলনা সে। শুধু মনে মনে সজাগ করে রাখল তার হিংস্র বাসনাটাকে। যেমন করেই হোক ফাটল ধরাতেই হবে মতিনার জীবনে। টুক্‌রো টুক্‌রো করে ভেঙ্গে দিতেই হবে মতিনার সংসারটাকে। শপথটা বার বার বিভিন্ন ভাবে নিজেকে শোনাল ইয়াসিন।

দিন কয়েক কাজের ফাঁকে ফাঁকে ইয়াসিন জেনে ফেল্লো মতিনার জীবনের অনেকখানি। কিন্তু তাকে একদিন আশ্চর্য্য হতে হল। ড্রাইভারের সীটে তাকে বসে থাকতে দেখে একটুও ঘাবড়ালো না মতিনা। শুধু মাত্র পলকের জন্য চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে এলো। কপালের উপর দুই একটা ভাঁজ পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার তা মিলিয়ে গেল। সহজ গলায় কথা বল্লো মতিনা, মিহি করে হাসল, আর অকারণে মিঃ আলমের শরীরের কাছে ঘেঁষে বসল। অনেক ভেবেছিল ইয়াসিন, প্রথম দর্শনে বুঝি মতিনা অস্থির হয়ে পড়বে, সমস্ত শরীর তার পুরোণ পরিচয়ের সূত্রে বার বার কেঁপে কেঁপে। কিন্তু আশ্চর্য্য কথা বলতে গিয়ে একটুও কেঁপে গেলনা মতিনা। পরিচয়ের আলো জল্লো না চোখে। ভিতরে ভিতরে ছটফট করল ইয়াসিন।

আগের চেয়ে অনেক বেশী উজ্জ্বল, বেশী স্বচ্ছ হয়েছে মতিনা। ঠিক একটা ছবির মানুষের মত।

কিন্তু তাও বা কতক্ষণ। কতক্ষণ পারল ইয়াসিন মতিনাকে দেখতে। স্বামী-স্ত্রী নেমে গেল মার্কেটে। চুপচাপ গাড়ীতে বসে রইল ইয়াসিন। আর অসহ্য একটা যন্ত্রণায় বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল তার।

তাহলে ভুলে গেছে মতিনা, ভুলতে পেরেছে ইয়াসিনকে, ঠিক যেন একটা প্রশ্ন নয়, সত্যি একটা কথাই যেন শোনাল ইয়াসিন নিজেকে, কিন্তু আশ্চর্য্য, ভাবতেও যেন কষ্ট হয় ইয়াসিনের, এই মতিনাই একদিন কত কথা শুনিয়েছিল ইয়াসিনকে। কথাগুলো ভাবতে গিয়ে হাসি পেলো ইয়াসিনের। দুর্ব্বল একটা হাসির রেখা ফুটল ঠোটের কার্ণিশে ইয়াসিনের।

সেই রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম এলোনা কিছুতেই তার। ছটফট করে কাটাল ইয়াসিন, ফাটল ধরাতেই হবে, যেমন করেই হোক, যেমন করেই হোক ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিতেই হবে মতিনার সংসার। আর বেশী ভাবতে পারলনা ইয়াসিন, তার শরীরের রক্ত তখন জ্বলছে, ফেটে পড়তে চাইছে।

তারপরের দিনগুলোও ইয়াসিন নিঝুম হয়ে কাজ করে গেল। কোন দিকে তাকালনা, কোন কথা বল্লোনা, শুধু দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত শপথটা আওড়াল বারকতক।

সেদিন গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরে মতিনা সোজা চলে এলো আয়নার সামনে। আয়নায় চোখ রেখে মতিনা দেখল নিজেকে। আগের চেয়ে অনেক সুন্দরী, অনেক উজ্জ্বল হয়েছে সে। কিন্তু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মতিনা শুধু এই কথাটাই ভাবলনা। অন্য একটা চিন্তা তার সারা মনে বিষ-ক্রিয়া ধরাল। ফিরে এসেছে ইয়াসিন। আবার ফিরে এসেছে মতিনার চোখের সামনে। কিন্তু কি চায় সে, কেন তার চোখ অত তীক্ষ্ণ, তীব্র হয়ে বিঁধছে মতিনার শরীরকে। ইয়াসিন কি মতিনার সর্বনাশের সঙ্কল্প নিয়ে এসেছে। শিরশির করে উঠল মতিনার সারাশরীর। ভাবনায় যতি টানল সে।

পরদিন ঝিকে দিয়ে বলে পাঠাল মতিনা ইয়াসিনকে: গাড়ী যেন ঠিক রাখে সে। মতিনা কাজে বেরুবে।

সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই ইয়াসিন গাড়ী এনে রাখল গাড়ীবারান্দায়। মতিনা উপর থেকে নেমে এলো। অদ্ভুত ভাবে সেজেছে আজ মতিনা। চোখ তুলেই চোখটা নামিয়ে আনল ইয়াসিন। না, কিছুতেই সে আজ তাকাতে পারবেনা মতিনার দিকে। তাহলেই সব কিছু ভেঙে যাবে তার। নষ্ট হয়ে যাবে ইয়াসিনের এই দীর্ঘ চার বছরের সঙ্কল্প। আজকের এই দুর্লভ মুহূর্ত কিছুতেই নষ্ট হতে দেবেনা ইয়াসিন।

আস্তে আস্তে ফটক পেড়িয়ে বড় রাস্তায় নামল গাড়ি। ইয়াসিন ভিতরে ভিতরে ঘামতে সুরু করল। কেমন করে সুরু করবে ইয়াসিন। প্রথম কি কথা বলবে সে।

বড় রাস্তা ছেড়ে একটা ছোট রাস্তায় গাড়ী ঘোরাল ইয়াসিন। অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন। এবার ঠোট খুল্লো ইয়াসিন।

—আমাকে চিনতে পারো মতিনা বিবি?

মতিনা এতক্ষণ উইন্ড স্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিল। ইয়াসিনের গলার আওয়াজে পলকের জন্য সে চমকে উঠল। ইয়াসিন যে এই কথাই বলবে জানত মতিনা। তাই উত্তর দিতে একটুও দেরী হলনা। কঠিন গলায় বল্লো: —না।

—চিনতে পারলেনা মতিনা! বড় আপশোষের কথা! চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা বল্লো ইয়াসিন।



সমস্ত শরীর তার কাঁপছে উত্তেজনায়। স্পষ্টই জবাব দিয়েছে মতিনা। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে মতিনার জীবনে ইয়াসিনের কোন পরিচয় নেই।

—না, শেষবারের মত আবার উত্তর দিল মতিনা।

—একটু চেষ্টা করে দেখনা বিবি। চিনতে পারো কিনা। বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হল ইয়াসিনের গলা।

—তবুও পারলাম না। একটু থেমে থেমে পাথুরে একটা গলায় উত্তর দিল মতিনা।

—বেশ।

স্নায়ুর বন্দরে ঝড় জেগেছে ইয়াসিনের। রক্তে ঢেউয়ের কল্লোল যেন শুনছে সে। ভুল করেছে ইয়াসিন। মতিনাকে কোন প্রশ্ন করতে যাওয়াই তার পক্ষে ভুল হয়েছে।

স্পীড মিটারের কাটা দুলছে, কাঁপছে থর থর করে। এ্যাসফেলটের পথ ঝড়ের বেগে পার হয়ে যাচ্ছে মটর। কালো পীচের রাস্তা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে চাকার তলায়। ইয়াসিনের পেশীতে পেশীতে ঝড় কাঁপছে। স্পীড মিটারের কাটাটা দুলছে, ঘুরছে। সামনের রাস্তাটা ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে ইয়াসিনের চোখে। চাকার তলায় সব কিছু ঝাপ্সা, বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। চারপাশের গাছপালা, বাড়ীঘর।

ইয়াসিন শেষ বারের মত পিছনে ফিরে তাকাল। এখন কি তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে মতিনার মুখ। ইয়াসিন ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। মতিনার বিবর্ণ চোখের পাতা কাঁপছে বাসিপাতার মত। ভোতা একটা আতঙ্কের ভাব ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে মতিনার মুখে। কি যেন বলতে চাইছে মতিনা। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে থরথরিয়ে, আওয়াজ বেরুচ্ছে না। কপালের ওপর কালো চুল কয়েকটা সোজা হয়ে উড়ছে। দেখল ইয়াসিন। বল্ল ফিসফিসিয়ে:

—এখনো চিনতে পারছনা মতিনা বিবি।

—না। ভয় পাওয়া গলা মতিনার।

—এবারেও না।

কথাটা বলতে গিয়ে ইয়াসিনের গলার পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে আসতে চাইল। একটা যন্ত্রণার মত তীব্র অনুভূতি। দপ্ দপ্ করে কাঁপছে কপালের শিরগুলো। হাওয়ার গর্জ্জন শুনছে ইয়াসিন। মতিনার সব কথাকে ভাসিয়ে দিয়ে, এলোমেলো হাওয়ার স্বর শুধু বাজছে ইয়াসিনের কানে। চোখের মলিন পাতাটা টেনে টেনে কালো মণিটার উপর নামিয়ে আনল ইয়াসিন।

হাতের পেশীগুলো শেষ বারের মত চঞ্চল হয়ে থেমে গেল। বন্ধ চোখটা খুল্লো ইয়াসিন। চোখের লাল আভাটা কেটে গিয়ে আগের উজ্জ্বলতা ফিরে আসছে আবার কালো চকচকে মণি দুটোয়। ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে ইয়াসিন নিজেকে দেখল আবার। না, পারবে না ইয়াসিন, কিছুতেই মতিনাকে মারতে গিয়ে নিজেকে মারতে পারবেনা সে। একটা ভারী দুর্ব্বল নিঃশ্বাস গলা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠল ইয়াসিনের।

গ্যারেজের বন্ধ দরজাটায় তালা আটতে আটতে ইয়াসিন ভাবল: গাড়ী থেকে নেমে যখন মতিনা উপরে উঠল তখন কি তার ঠোঁটে হাসি ছিল। না অন্য কিছু।

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]

### নবম পরিচ্ছেদ

১

ভোর হ'লো। ট্রেনের জানালা দিয়ে বারুদ-গন্ধ শীতল হাওয়া ছড়িয়ে পড়লো কামরার মধ্যে। একটুখানি শীতের কাপড়। শরতের আদর। কোটটা খুলে রেখেছিলো সুনির্ম্মল, আবার চাপাচুপি দিয়ে বসলো। তারপর সিগেরেট ধরালো একটি। যাত্রীঠাসা কামরায় কয়েকবার দৃষ্টি পরিভ্রমণ করালো, এখনও ঘুমের অন্ধকার কাটেনি সেখানে। চাদর মুড়ি দিয়ে এঁকে বেঁকে বিচিত্র ভঙ্গীতে শুয়ে আছে সব।

ধীরে ধীরে সোনালি রোদ আলো ফেললো আকাশে। মেজেণ্টার রংয়ে ভ'রে গেল মাঠ ঘাট বনবাদার পাহাড়ের আনাচ কানাচ। সুনির্ম্মল টাইম টেবেলের পাতা উলটোলো। তা হ'লে সত্যি এলাম।

বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো।

কাল রাত্তিরে বৃষ্টি হ'য়েছিলো। টেলিগ্রাফের তারে তারে বিন্দু বিন্দু জল ঝুলে আছে মুক্তোর মতো। দু'পাশের খানা-ডোবা টলটল করছে বাদামী জলে। দূরে পাহাড়ের উপর দিয়ে একটা কাক উড়ে গেল, এক ঝাঁক নাম না জানা পাখি উড়লো আকাশে, লাল রোদ হ'লদে হ'লো, কামরায় আলো পড়লো—মড়ার মতো ফ্যাকাশে চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দপ ক'রে নিবে গেল। গাড়ীর গতি ঝিমিয়ে এলো।

পরিষ্কার ঝকঝকে ছোট্ট ষ্টেশন। অল্প কয়েকজন যাত্রীই নামলো তারা। একটু গোল উঠলো, যে যার গন্তব্যে যেতে যেতে যতটুকু জাগরণ, তারপর আবার চুপ। সুনির্মলও নামলো, কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলো কী ভেবে। হঠাৎ যেন বুঝে উঠ্‌তে পারলো না এরপরে তাকে কী করতে হবে। নিজেকে কেমন তার অত্যন্ত অপরাধী মনে হ'লো, অত্যন্ত স্বার্থপর।

সত্যিই তো। যাকে সম্মান দিতে পারেনা, মর্যাদা দিতে পারেনা, ঘর সংসার স্বামী সন্তান অধিকার কিছুই দিতে পারে না—তার কাছে আজ তবে কী সম্বল নিয়ে



গিয়ে দাঁড়াবে সে? নিজের রিক্ততা ভ'রে নেবার কী যুক্তি আছে তার জীবনে? মিছি মিছি আরো তাকে ব্যর্থতার ভারে অবনত করা, নিজের জ্বালা জুড়োতে এসে তাকে জ্বালানো। ছি!

ছট্‌ফটিয়ে পাইচারি করতে লাগলো ষ্টেশনের এমাথা ওমাথা। বিবেকের সঙ্গে লড়াই করলো। তারপর কখন বিশ্রামাগার লেখা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। হৃদয় কি যুক্তির বশ? বিবেকের বশ? ভেতরে গিয়ে হাত মুখ ধুতে ধুতে অনুভব করলো সেই কথা। আস্তে আস্তে মন শান্ত হ'লো একটু। কেলনারে এসে চা খেয়ে আরাম পেলো শরীরে। ততক্ষণে সামান্য বেলা বেড়ে তাপ উঠলো ভোরের হাওয়ায়, সহর সবল হ'লো। একটি ট্যাকসি নিয়ে সে রওনা হ'লো শকুন্তলার বোর্ডিংয়ের দিকে।

২

সারা সপ্তাহ স্কুল ঠেঙিয়ে এই তো একটা রোববার। চায়ে চুমুক দিতে দিতে আলস্য ভাঙছিলো শকুন্তলা। শীতের শিরশিরানি নিয়ে এক পলক হাওয়া পর্দার উপর ব'য়ে গেল। বেডকভারটা টেনে গায়ে তুলে দিল আলতো ভাবে। মনটা উদাস হ'য়ে উঠ্‌লো।

টুপটাপ শিশির পড়ছে বকুলের পাতা থেকে, একটা ঝুমকো লতা এসে নুয়ে পড়েছে জানালায়, অজস্র ফুল ধরেছে। নরম মিষ্টি গন্ধে ভ'রে গেছে হাওয়া। আশ্চর্য! এ লতাটা কিন্তু কেউ বোনেনি, কেউ যত্ন করেনি, আপনা থেকেই জন্ম নিয়েছে কবে। নিজে নিজেই বড় হ'য়ে ঢেকে ফেলেছে এই পায়ের তলার পশ্চিমের জানলা।

আরো এক ভাদ্রের কথা মনে পড়লো তার। ঠিক এমনি এক লতা গাছ বেড়ে উঠেছিলো জানলায়। শকুন্তলা কলেজ থেকে নিয়ে এসেছিলো চারাটি। পড়ে একটা ভাঙা কেরোসিন কাঠের বাকস ভর্ত্তি মাটি আনিয়ে বুনে দিয়েছিলো। বৌদি চা দিতে দিতে বললেন: ও সুনুদা, যাবার আগে আমাদের বাগান দেখে যেয়ো কিন্তু?

বাগান!

হ্যাঁ, কুন্তীর জানালার তলায়, ম্যাথর প্যাসেজে। উঠকামণ্ডের বোটানিকেল গার্ডেনের নাম শুনেছ তো? তারপরেই এই বাগান।

লাফিয়ে উঠলো সুনির্মল কোথায়? কোথায়? কই! কই? কী আশ্চর্য! এতোবড়ো খবরটাই এতোক্ষণ—বলোনি?

মুখ ভার ক'রে কুন্তী বললো, বেশ। অত ঠাট্টার কী? ফুল যখন ফুটবে তখন দেখবো কেউ চায় কিনা।

সুনির্মল দৌড়ে একপাক ঘুরে এলো: ফুট্‌বে কী? ফুটেছেইতো। গন্ধে ভ'রে গেছে বাড়ি। পাচ্ছনা? কাকটা মোহিত হ'য়ে ঠুক্‌ড়োচ্ছে দেখলুম।

এ্যাঁ! কাকে ঠুকরোচ্ছে? চায়ের বাটিফাটি ফেলে কুন্তী ছুট। গিয়ে দেখলো—অত সাধের গাছটির আর অস্তিত্ব রাখেনি বর্বর বায়স প্রবর। বর্ষার গাছ মাটিতে জলেতে দু'দিনেই দিব্যি তক্‌তকে ডাল ছেড়েছিলো, গোড়াশুদ্ধু উপড়ে ফেলেছে তাকে। হুস্ হুস্ ক'রে কাক তাড়িয়ে মাটি থেকে আলগা এলান লতাটি হাতে নিয়ে একেবারে কেঁদে ফেললো সে। আর তার পরের দিন বিকেলে ট্যাক্‌সি ভর্ত্তি ফুলের টব নিয়ে এসে হাজির সুনির্মল: 'নাও, কত গাছ তোমার চাই।'

এর কিছুদিন পরেই মারা গেলেন রাজেনবাবু। দেখতে দেখতে যা ছিলো দৈনন্দিন তা হ'য়ে উঠলো স্মৃতি। আলোতে হাসিতে, আনন্দে ঝলমলে সুরেলা দিনগুলো কোথায় মিলিয়ে গেল হাওয়া হ'য়ে। একটা ভোজবাজি হ'য়ে গেল।

মাত্র একটা মানুষ চলে গেলেন শুধু হাতে পায়ে, আর অমনি একেবারে উল্টে গেল বিশ্ব-সংসার? একটা মানুষ এমন দামী ছিলেন আমাদের এতগুলো জীবনের পক্ষে?

ভাবতে ভাবতে শকুন্তলা অবাক না হ'য়ে পারলোনা। আর তারপর এইতো মরা মাটি খুঁড়ছে, সেই সুখস্মৃতির কয়েকটি মঞ্জুরি নিয়ে। এই কি জীবন? আর হাজার প্রার্থনায় যা ফিরে পাবেনা তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি! মন, কেন তুমি এমন অবুঝ? এমন অবাধ্য? একটা আত্মসম্মানওতো আছে? বৌদি,—যে বৌদি তার মায়ের বেশী, একথাই তো তিনি বার বার বুঝিয়েছিলেন তাকে, বিয়ে ভেঙে দেবার বিরুদ্ধে এই তো ছিলো তার একটা যুক্তি। সে মানেনি। অনুরোধ, উপরোধ, চোখ রাঙানি কান্নাকাটি কী দিয়ে তিনি তাকে রুখতে পারলেন! মন দেখাতে চেষ্টা করেছিলো শকুন্তলা, কিন্তু পারলনা, কিছুতেই তো ভুলতে পারলোনা মানুষটাকে জীবনের এতোগুলো বছরের মধ্যে মাত্র ঐ কয়েকটি মাসকে। ভেতরে ভেতরে একটা অশ্রুত অব্যক্ত কান্না গুমরে গুমরে উঠলো।

আলাদা কোয়ার্টার বলতে যা বোঝায় তার বাড়ী ঠিক তা নয়। কেবল এই একটি ঘরেরই একা মালিক সে। তবে সকলের সঙ্গে বেড়া দিয়ে অংশ ভাগ করা। হেডমিষ্ট্রেসের যদ্দিন আলাদা বাড়ি না উঠেছিলো তদ্দিন এ অংশটুকু আলাদা ক'রে নিয়ে তিনিই ছিলেন এখানে। এখন শকুন্তলা। ঘর-সংলগ্ন ছোট্ট কাপড় ছাড়বার ঘর আছে একটি, সামনের দিকে একফোঁটা চৌকো বারান্দা আকাশের তলায়, প্রকাণ্ড বুড়ি বটের ছায়ায় শীতল। খায় সকলের সঙ্গেই, কেবল দু'বেলার জলখাবারের ব্যবস্থা তার নিজের। একটি ষ্টোভ আছে, আছে ছোট্ট একটি কেটলি, চায়ের কাপ ডিস, ঝুড়িতে ডিম, রুটি মাখন। আর একটা ছোট্ট মেয়ে আছে রুক্মিণী, মালির মেয়ে, সারাদিন সে ঘুর ঘুর করছে শকুন্তলার সঙ্গে। তাকে না ডাকতেই সে হাজির, না বলতেই কাজের জন্য এক পায়ে খাড়া। কুন্তী তাকে খেতে দেয়, জামা সেলাই ক'রে দেয়, পড়াতে



নিয়ে বসে, রবারের জুতো কিনে দিয়েছে একজোড়া, উকুনভরা চুলের জন্য লাল রিবনও কিনেছে দু'গজ।

চায়ে শেষ চুমুক দিতেই একটি বিস্কুট নিয়ে এসে দাঁড়ালে সে।

'কী রে?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে যে।'

'আমার সঙ্গে?' কে? শকুন্তলা পা থেকে চাদরটা ঠেলে দিয়ে উঠে বসতে বসতে ভুরু কুঁচকোলো। তার সঙ্গে কে আবার এই অসময়ে এই সহরে দেখা করতে এলো? দাদা নাতো? চিঠি দেইনি কদিন, চলে এসেছেন নাকি উদ্বিগ্ন হ'য়ে? না আর কেউ? কে? কে হ'তে পারে? হাত বাড়িয়ে চিরকুটটা সে নিল।

'কে দিল তোকে?'

'আমি আসছিলাম, বাবু নিজেই দিলেন!'

'বাবু নিজেই দিলেন।' ততক্ষণে—নামটার উপর বারবার চোখ বুলিয়েছে শকুন্তলা, বুকের ভেতরটা পায়রার মতো কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

ভাঙা খোঁপাটা তাড়াতাড়ি হাতে জড়িয়ে নিল। ড্রেসিং টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে এলোমেলো কী যে খুঁজলো আর খুঁজলোনা কে জানে, আলনাটার কাছে গিয়ে প্রত্যেকটা কাপড় এলোমেলো করলো, তারপর কী ভেবে সেই অবিন্যস্ত শাড়িতেই বেরিয়ে এলো—বাইরে। মাথাটা আঁচড়াতে পর্যন্ত ভুলে গেল।

৩

গেটের কাছে, ভিজিটর্সরুমের দরজার সামনে, মস্ত বাদামগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সিগেরেট খাচ্ছিল সুনির্মল, পায়ের শব্দে পেছন ফিরে তাকালো। তারপর চোখে চোখ রেখে সময়ের দ্রুত চাকায় পার হ'য়ে গেল অনেকগুলো দণ্ড পল মুহূর্ত। বর্ষার সজল আভা ছায়া ফেললো দুই জোড়া মিলিত চোখের কালোমণিতে। দৃষ্টি নমিত হ'লো। একটু কেসে গলা পরিষ্কার ক'রে সুনির্মল বললো: 'ভালো আছ?'

'আপনি হঠাৎ?'

'এলাম।'

'কে জানতো, ঘুম ভেঙে উঠেই আমার জন্য আজ এই ভাগ্য অপেক্ষা ক'রে আছে!'

'ভাগ্য।' শূন্যে ধোঁয়ার রিং তুললো সুনির্মল: 'ভাগ্যের কাছে হাত পাততে আমিই তো এসেছি আজ।'

শকুন্তলা নতমুখে পা দিয়ে শিশিরভেজা নরম মাটি খুঁড়তে লাগলো। রঙিন ফড়িং উড়লো একটি মাঝখান দিয়ে, দারোয়ান এসে ক্যাঁচ করে বন্ধ করে দিল ফটক।

'আমার চিঠি পেয়েছিলেন?' একটু পরে, সংকোচ কাটিয়ে জিজ্ঞেস না করে পারলোনা কুন্তী।

'পেয়েছিলাম।'

'ও।'

'জবাব না পেয়ে কি রাগ করেছিলে?'

'রাগ। না, রাগ কেন?'

'যা আমার বলবার কথা তা আমি কেমন করে ঐ একটা ছোট্ট খামে পুরে পাঠাই বলতো? লক্ষ্য কথাতেও কি চোখের তৃষ্ণা মিটতো?'

কুন্তী চোখ তুলে তাকালো, আর সেই চোখে চোখ রেখে আকুল হয়ে উঠলো সুনির্মলের গলা, 'পারলাম না কুন্তী পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না। একবার তোমাকে দেখে যাবার লোভ কিছুতেই সংযত করতে পারলাম না আমি। আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, প্রত্যেক মুহূর্তের মৃত্যু থেকে এক ফোঁটা শান্তি আমাকে নিয়ে যেতে দাও তোমার সান্নিধ্যের উত্তাপ থেকে।' উত্তেজনায় সিগেরেটটা ধরিয়েই টোকা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে। ধোঁয়া উঠতে লাগলো ভেজা ঘাসের বুক বেয়ে বেয়ে। সেই দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে কুন্তীর বুকেও সমুদ্রের আলোড়ন উঠলো, ঝাপসা গলায় বললো: 'চলুন ঘরে গিয়ে বসবেন।'

সকালবেলার ঘুমভাঙ্গা ঘর। ঈশ্। কী এলোমেলো। এই ঘর কুন্তী কত সুন্দর ক'রে গুছিয়ে রাখে রোজ। আর আজ কিনা এই। বিছানা তেমনি পড়ে আছে আঢাকা, কাল রাত্তিরে অগোছালো টেবিল, একটু আগে নিজের হাতে তচনচ করা করা আলনা। ব্লাউসটা ঝুলে আছে চেয়ারের হাতলে, পেয়ালার চারপাশে পিপড়ে। দরজাটা ভেজিয়ে রেখে গিয়েছিলো, ঘর থেকে যেন রাত্তিরের গন্ধটাই কাটেনি।

আহা! কুন্তী কি জানতো আজ এমন মানুষ পা রাখবে তার ঘরে? তাহ'লে চুল দিয়ে মুছে রাখতো খরের সব ধুলো। ফুল দিয়ে ভ'রে রাখতো সব। মনটাই খারাপ হ'য়ে গেল।

এদিকে অভ্যর্থনা না করতেই কুঁচকোনো আধময়লা সাদা চাদর পাতা বিছানাটার উপর পরম পরিতোষ সহকারে বসে পড়লো সুনির্মল, কুন্তীর মাথা ডোবানো এলোমেলো বালিশ দু'টো টেনে নিল বুকের কাছে, ক্লান্ত শরীর খাটের বাজুতে এলিয়ে দিয়ে বললো: 'আঃ! বাঁচলাম।'



কুণ্ঠিত হ'য়ে কুন্তি তাড়াতাড়ি বেডকভারটা নিয়ে এলো: ছি, ছি, কী নোংরা ঘরের মধ্যে নিয়ে এলাম আপনাকে, একটু উঠুন, বিছানাটা অন্ততঃ ঢেকে দি।'

'এই তো বেশ।'

'বেশ না হাতি। তার চেয়ে চলুন বারান্দায় বসবেন একটু, আমি ততক্ষণে'—

'সুন্দর ঘর তোমার।' সমস্ত ঘরটার যেন একটা নির্যাস নিল সুনির্মল। 'ঠিক তুমিতে ভরা।' পা থেকে জুতোটা খুলে ফেলে লক্ষ্য ক'রে তুলে নিল খাটের উপর। হতাশ হ'য়ে হাতের বেডকভারটা চেয়ারের উপর রেখে টুক্‌টাক্ অন্য কাজে মন দিল কুন্তী। এক ফাঁকে স্টোভ জ্বেলে চড়িয়ে দিয়ে এলো চায়ের জল। ঘর ঝাড়ালো রুক্মিনীকে ডেকে। টেবিলটা গুছিয়ে, আলনা সাজিয়ে, ফুলদানিতে নতুন ফুল দিয়ে মুহূর্তে সব ঝকঝকে ক'রে তুললো। জানলা দরজা খুলে দিয়ে সারা আকাশ নিয়ে এলো ঘরের মধ্যে। হালকা কচুরি ফুল রংরের পাতলা পর্দা পালের মতো ফুলে উঠলো বাতাসে। তাকিয়ে দেখতে দেখতে সহসা নিবিড় শান্তিতে ভ'রে উঠলো সুনির্মলের মন।

৪

তারপর চা। এর মধ্যে কত করেছে কুন্তী। এত ও শিখলো কোথায়? ডিম ভাজা, টোষ্টরুটি কুচো নিমকি, মাখন, জ্যাম, কলা—রীতিমত ভোজ। ফাঁকে ফাঁকে একটু গল্প, এক ফোঁটা হাসি, কুন্তীর স্বভাবোচিত কিছু কিছু দুষ্টুমি—দু'জনেরই মনের আকাশে কখন জানি মেঘ ছিঁড়ে আলো ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, ধোঁয়া ওঠা খর রং চায়ে চুমুক দিতে দিতে কখন আর সব ভুলে গিয়ে শুধু এই মধুর সকালটুকুই তার সব লাবণ্য নিয়ে জেগে আছে মনের মধ্যে।

যদি উপায় থাকতো সময়ের গতিতে আজ গণ্ডী একে দিত ওরা, পায়ে শেকল পড়িয়ে দিত। সবদিন একদিন হ'য়ে সব ঋতু এক ঋতু হ'য়ে আজকের এই দিনটিকে, এই ক্ষণটিকে চিরন্তন ক'রে রাখতো।

কিন্তু কতক্ষণ এই খেলা? একটাইতো বেলা। দেখতে দেখতে কখন যে ঝাপসা হ'য়ে বিকেল নেমে এলো। বকুলের ছায়া গাঢ় হ'য়ে বিস্তীর্ণ হ'লো মাঠে, স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেল দিনটি। কুন্তী স্টেশনে তুলে দিতে এ'সে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো, 'এর চেয়ে না আসাই ভালো ছিলো।'

'ভালো ছিলো? তা হ'লে আমি বাঁচতাম কেমন ক'রে?'

'এটুকুই কি বেঁচে থাকার সব?'

'না।'

'তবে।'

'তবু ও কুন্তী। তবু ও। যতটুকু পাই।'

'এরকম কুড়িয়ে কাচিয়ে, লুকিয়ে, কলঙ্কিত হয়ে ? এই উদ্‌বৃত্তটুকু নিয়ে ?'

'উদ্‌বৃত্ত।'

'না। কতটুকু আমি পেলাম ? মনের কতটুকু ভরলো। তার চেয়ে শূন্য হলাম বেশী।'

'না, কুন্তী না। ওরকম করে বোলোনা তুমি। আমি সইতে পারিনে। আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন একদিন সম্পূর্ণ হয়ে তোমার কাছে আসতে পারি, যেন এই লোহার গারদ থেকে আমি মুক্তি পাই।'

'হায়রে। একজন মানুষ তার জীবন কেমন করে যাপন করবে সে কি তারই রচনা নয় ? সেখানে ঈশ্বর কোথায় ? সেই গারদে বাস করা না করাতো তাঁরই ইচ্ছে।'

'জানি, আমার কথা তুমি বুঝবেনা। কেউ বুঝবেনা।' অন্ধকারে তারাভরা আকাশের দিকে মুখ তুললো সুনির্মল।

চুপ ক'রে রইল কুন্তী। না, সে বোঝেনা। কিছুতেই বোঝেনা। কেউ যদি না চায় তবে কেমন ক'রে আর একজন মানুষ তার জীবনে তার সংসারে এমন একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে একথা কিছুতেই বোঝেনা সে। একথা ভেবে ভেবে কতদিন কতরাত তার চোখের জলে ভেসে গেছে ; তবু সে এর পক্ষে কোনো যুক্তি খুঁজে পায়নি মনের মধ্যে। যত সহজে কুন্তীকে সে একদিন বিদায় দিতে পেরেছিলো তেমনি সহজে তো আরো একজন মানুষকেও সুনির্মল বর্জ্জন করতে পারতো, সেদিন জীবন থেকে। ইচ্ছে থাকলে আজও কি তা পারেনা ? দু'টো মন্ত্রের জোর কি এতই বড়ো ? হৃদয়ের বন্ধন কি কিছুই নয় তার কাছে ? সহসা অভিমানে ভারি হ'য়ে উঠলো বুক।

একটু পরেই গুম গুম ক'রে দৈত্যের মত লাল চোখ ট্রেণ এসে জানোয়ারের মত হাঁপাতে লাগলো পায়ের কাছে।

'এলো ? এসে গেল ?' কুন্তী আকুল হ'য়ে কাছে সরে এলো : 'এর মধ্যেই সময় হ'য়ে গেল যাবার ?' তবে আবার, আবার কবে দেখা হবে ?'

'আবার আসবো ?'

'আসবেনা ?'

'এরকম চোরের মত লুকিয়ে, তোমাকে দুঃখ দিতে—'

'তুমি তাই এসো, তাই এসো।' কান্নায় ভেঙে পড়লো সে : 'আমি তাই মেনে নেবো।' সুনির্মল গাড়ির জানলা দিয়ে কাঙালের মত হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে। (ক্রমশঃ)

# শিল্পী

**জেমস্ জয়স্**

অনুবাদ : **অশোক গুহ**

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]

ষ্টিফেন তাকিয়ে আছে মিঃ কেসীর মুখের দিকে। টেবিলের ওপাশ থেকে তার মুখখানা দেখা যায়। ওঁর কাছে গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে আগুনের ধারে, ওঁর ঐ ক্রুদ্ধ মুখখানার দিকে তাকিয়ে থাকতেও বুঝি। ক্রুদ্ধ কালো মুখ। ওঁর কালো চোখ তো ভয়ংকর নয়। আর ওঁর মৃদু স্বর শুনতে ভালও লাগে। কিন্তু উনি পাদ্রীদের বিরুদ্ধে কেন ? দান্তেই ঠিক বলেছেন। কিন্তু বাবা যে বললো, দান্তে হচ্ছেন ভ্রষ্টা মঠবাসিনী। যখন তার ভাই বর্বরদের কাছ থেকে ঝুটো গয়নার বদলে টাকা নিয়ে এল, তখন তিনি মঠ ছেড়ে চলে এলেন। হয়তো, তার জন্যেই পার্ণেলের উপর চটা। সে যে আইলিনের সঙ্গে খেলতো তাতেও ছিল তাঁর অমত। আইলিনরা প্রোটেস্টাণ্ট। তিনি যখন ছোট, যারা প্রোটেস্টাণ্টদের সঙ্গে খেলতো, তাদের তিনি দেখেছেন। ওরা পবিত্র কুমারীর স্তবস্তুতি নিয়ে ঠাট্টা করতো। বলতো, গজদন্তের গম্বুজ না সোনার গম্বুজ ! একটি মেয়ে কি করে গজদন্তের বা সোনার গম্বুজ হয় ? কারা তাহলে ঠিক ? ক্লঙ্গোর হাঁসপাতালের সন্ধ্যা মনে পড়ছে, আঁধার সমুদ্র, আঁধার জলধারা, পিয়ারের চূড়ায় আলো, জনতার মুখ থেকে ঝরে পড়লো আর্তধ্বনি।

আইলিনের ছিল সাদা হাত দুখানি, দীর্ঘহাত দুখানি। এক সন্ধ্যেয় টিগ্ খেলতে খেলতে ওর চোখের উপর রাখলে তার হাত। দীর্ঘ, সাদা, শীর্ণ হাত, ঠাণ্ডা হাত, নরম হাত। হাতীর দাঁতের মতো হাত : তেমনি ঠাণ্ডা, সাদা, হস্তীদন্তের গম্বুজের মানেও বুঝি তাই।

মিঃ কেসী বললেন, গল্পটা ছোট, কিন্তু ভারি সুন্দর। দুরন্ত ঠাণ্ডা দিন, নায়ক তখনো মারা যাননি। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন ! একদিন আমরা গেছি আর্কলোতে।

তিমি থামলেন, ক্লান্তিতে চোখ বোঝা। মিঃ ডেডালাস থালা থেকে একটা টুকরো নিয়ে, হাড় থেকে দাঁত দিয়ে মাংস ছাড়াচ্ছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

ওঁর হত হবার আগের কথা বলছ ?

মিঃ কেশী চোখ খুলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। এবার বলা শুরু হোলো।

হাঁ, আর্কলোতে একটি দিনের কথা। আমরা সেখানে এক সভায় গেলাম। সভার

পরে ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে স্টেশনে আসছিলাম, কি টিটকারি উঠছিল, তেমন টিটকারি কখনো শোনিনি। দুনিয়ায় যত গালাগাল আছে, সব দিলে। সেখানে ছিল এক বুড়ী। একেবারে বদ্ধ মাতাল। আমার দিকেই তার নেক-নজর। সে আমার পাশে পাশে কাদার ভিতরে নাচে আর চেঁচিয়ে বলে—ওরে পাদ্রি-শিকারী। ওরে শেয়াল!

জন, তুমি কি করলে? মিঃ ডেডালাস শুধালেন।

চেঁচাক ও, মিঃ কেসী বললেন, ঠাণ্ডা দিন। চাঙা হবার জন্যে কিছুটা তুলামোর রেখেছিলাম মাদাম, ক্ষমা করবেন। তাই কথা কইতে পারছিলাম না। মুখ তামাকের রসে তখন ভরতি।

তারপর জন?

ও চেঁচাচ্ছে মনের সাধে। এবার সে কুমারী মেরীকে গাল পেড়ে বসলো। না, সেটা আউড়ে বড়দিনের ভোজ আর আপনাদের কান অপবিত্র করে দিতে চাই না। আমার ঠোঁটও না।

থেমে পড়েছেন, মিঃ ডেডালাস হাড় চিবনো ফেলে মাথা তুলে বললেন,

তুমি কি করলে জন?

কি করব! মিঃ কেসী বলে উঠলেন, বুড়ীটা তার কুশ্রী মুখখানা আমার মুখের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। আমার মুখ তখন তামাকের রসে ভরা। আমি নুয়ে পিচ করে ফেললাম পিক্।

তিনি এক পাশে ফিরে থুথু ফেললেন।

পিচ্! ঠিক এমনি করেই পিক্ ফেললাম তার ডান চোখে।

তিনি চোখে হাত চেপে চেঁচিয়ে উঠলেন, হা যীশু, হা মেরী-মা, হা জোসেফ বুড়ি চেঁচিয়ে উঠলো, আমি কানা হয়ে গেলাম গো, আমি ডুবে মলাম গো!

থেমে গেলেন তিনি, আবার বললেন,

আমি একেবারে কানা হয়ে গেলাম গো!

মিঃ ডেডালাস জোরে হেসে নিজের চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন। চার্লস খুড়ো দোলাতে লাগলেন মাথা।

দান্তে রেগে গেছেন ভয়ানক। ওরা হাসছেন, আর তিনি রেগে বললেন,

চমৎকার! চমৎকার!

মেয়েদের চোখে পিক্ ফেলা চমৎকার কিছু নয়।

কিন্তু বুড়ি কি গালাগাল দিলে, কেন বললেন না মিঃ কেসী? ও যেন চোখে দেখলে, ভিড়ের ভিতর দিয়ে চলেছেন কেসী। গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাই বুঝি



ওকে জেলে যেতে হোল! তার মনে আছে, এক রাতে সার্জেণ্ট ও'নিল এসেছিল বাড়ীতে। হলঘরে এসে সে দাঁড়াল। বাবার সঙ্গে আস্তে আস্তে কি কথা বললে। ওর টুপীর শিকলিটা খালি চিবুচ্ছিল ও'নীল যেন ঘাবড়ে গেছে। আর সে রাতে ডাবলিনে রেলে চড়ে ফিরে গেলেন না কেসী। গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজায়। বাবা কেবিনটিলী রোড না কি একটা রাস্তার নাম বললেন। সে শুনেছিল সে কথা।

সে নিজে পার্নেলের পক্ষে, আয়ার্ল্যাণ্ডের পক্ষে। তার বাবাও তাই। দান্তেও তাই। এক রাতে এস্‌প্লানেডে বাজনা হচ্ছিল, তখন এক ভদ্রলোকের মাথায় ছাতার বাড়ি মেরেছিলেন তিনি। ভগবান রাণীকে রক্ষা করুন, এই বাজনা যখন বাজছিল, ভদ্রলোক খুলেছিলেন টুপী।

মিঃ ডেডালাস ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠলেন।

জন, তিনি বললেন। ওদের পক্ষে এই-ই দরকার। আমরা হতভাগ্য পাদ্রি-শাসিত জাতি, আমরা তাই ছিলাম, আর শেষদিন পর্যন্ত থাকবও তাই।

চার্লস খুড়ো মাথা নেড়ে বললেন,

বড় খারাপ বড় খারাপ!

মিঃ ডেডালাস আবার বললেন,

পাদ্রি-শাসিত, দুর্ভাগা জাতি। ভগবানও আমাদের ভুলে গেছেন।

আঙুল দিয়ে ডানদিকের দেয়ালে ঠাকুর্দার ছবি দেখিয়ে দিলেন। ঐ বুড়োকে দেখছ? তিনি বললেন। যখন ভাল আইরিশম্যান হয়ে লাভ ছিলনা, তখন তিনি তাই ছিলেন। উনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। কিন্তু আমাদের গীর্জ্জার বন্ধুদের সম্বন্ধে তিনি বলতেন, তাদের দুপা তিনি তার টেবিলের নীচে কখনো গলাতে দেবেন না।

দান্তে চটে উঠলো।

আমরা যদি পাদ্রি-শাসিত হই, সে তো আমাদের গর্ব। তাঁরা ভগবানের চোখের মনি। যীশু বলেছেন, ওদের স্পর্শ কোরোনা, ওরা যে আমার চোখের মনি।

তাহলে কি দেশকে ভালবাসতে পারবনা? কেসী জিজ্ঞেস করলেন। যিনি আমাদের চালাবার জন্যে এসেছেন, তাঁর নির্দ্দেশ কি আমরা মানব না?

সে দেশদ্রোহী! দান্তে উত্তর দিলেন, এক দেশদ্রোহী, পাপাচারী কামুক। তাকে ত্যাগ করে পাদ্রিরা ভালই করেছেন। পাদ্রিরাই আয়ারের চিরদিনের বন্ধু, প্রকৃত বন্ধু।

সত্যিই কি তারা তাই? মিঃ কেসী বলে উঠলেন।

তিনি টেবিলের উপর চাপড় মেরে ভ্রূ কুঁচকে রইলেন রাগে। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিশপরা কি সেই মিলনের সময় আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেননি—সেই যে যখন বিশপ

লানিগান মারকুইস কর্ণওয়ালিশকে যখন রাজভক্তির নিদর্শন স্বরূপ এক অভিনন্দন জানালেন? বিশপ আর এই পাদ্রির দল ১৮২৯ সালে ক্যাথলিকদের মুক্তির বিনিময়ে নিজেদের দেশের স্বাধীনতার সম্ভবনা কি বিকিয়ে দেননি? তাঁরা কি উপাসনা বেদী থেকে ফেনিন আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার করেননি? টেরেন্স বেলিউ ম্যাকমানাউসের ভস্মাবশেষ কি তারা কলুষিত করেনি?

রাগে মুখ লাল হয়ে গেছে, জ্বলছে। ষ্টিফেনের মনে হোল, সেই দীপ্তি যেন তার নিজের গালে আস্তে আস্তে ছেয়ে যাচ্ছে, সেই জ্বালা যেন কথার সঙ্গে সঙ্গে তাকে উত্তেজিত করে তুলছে। মিঃ ডেডালস বিদ্রূপ করে উঠলেন। একটু বা ইতর যে বিদ্রূপ।

হ্যা ভগবান, আমি তো বুড়ো পল কালেনের কথা ভুলেই গিছলাম। সে তো ভগবানের চোখের আর একখানি মনি।

দান্তে টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে কেসীর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, ওরা ঠিকই করেছেন। ভগবান, নীতিবোধ আর ধর্মের আকর্ষণ সবার আগে।

মিসেস ডেডালাস তার উত্তেজনা দেখে বললেন,

মিসেস রিওয়ার্ডান, ওঁদের কথার উত্তর দিতে গিয়ে উত্তেজিত হবেন না।

ভগবান আর ধর্ম সবার আগে, দান্তে চেঁচিয়ে উঠলো, পৃথিবীর আগে ধর্ম্ম—ভগবান আর বর্ম।

কেসী তাঁর মুঠো পাকানো দিয়ে হাত জোরে টেবিলের উপর ঘুসি মারলেন।

যদি তাই-ই হয়, ভাঙা গলায় তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, তাহলে আয়ারের জন্য কোনো ভগবানের প্রয়োজন নেই!

জন, জন! জামার আস্তিন চেপে ধরে মিঃ ডেডালাস চেঁচিয়ে উঠলেন।

দান্তে তাকিয়ে আছেন, গাল দুখানা কাঁপছে। কেসী কোনরকমে চেয়ার থেকে উঠে পড়ে তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে বললেন, তিনি যেন মাকড়সার জাল ছাড়াচ্ছেন এমনি যেন হাতের ভঙ্গি করছেন। না, আয়র্ল্যাণ্ডের জন্য ভগবান নেই! বড় বেশী ভগবানের কথা আমরা ভেবেছি। এবার ভগবান চুলোয় যাক্!

সয়তান, নাস্তিক! দান্তে চেঁচিয়ে উঠলেন। তিনি বুঝি থুথুই ফলবেন ওঁর মুখে।

কার্লস খুডো আর মিঃ ডেডালাস কেসীকে ধরে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। দুদিক থেকে বোঝাতে শুরু করলেন। তিনি তাকিয়ে আছেন, কালো চোখে যেন জ্বলছে আগুণ, আর

আমি আবার বলি, ভগবান চুলোয় যাক।

দান্তে চেয়ারখানা জোরে ঠেলে সরিয়ে টেবিল থেকে উঠে পড়লেন। তোয়ালে খানা



গড়িয়ে পড়লো গালচের উপর। তারপর গড়াতে গড়াতে আরাম কেদারার একটা পায়ার কাছে চলে গেল। মিঃ ডেডালাস তাড়াতাড়ি উঠে ওঁর পিছনে পিছনে দরজা অবধি এলেন। দান্তে দরজায় পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। তার মুখ চোখ গাল, কাঁপছে।

নরক থেকে এল সয়তান! আমরা জয়ী হলাম। আমরা তাকে পিষে মেরেছি, সয়তান!

দরজা তাঁর পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

কেসীকে যারা ধরেছিলেন, তাদের কাছ থেকে বাহু ছাড়িয়ে নিয়ে হঠাৎ হাতের উপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বেচারী পার্ণেল! তিনি জোরে বলে উঠলেন, আমার মৃত রাজা, আমার নায়ক!

তিনি জোরে কাঁদছেন। তার কান্নায় তীক্ষ্নতা, তীক্তা।

ষ্টিফেন তার ভয়ার্ত মুখখানা দেখলো, বাবার চোখও জলে ভরে গেছে।

( ক্রমশঃ )

## লি-পো

[ চীনে কবিতা ]

পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে সে পদ্মফুল তুলছিল
আর গান গাইছিল গুণগুণ করে,
এমন সময় অচেনা কাকে দেখল,
এদিক ওদিক চেয়ে
মুচ্‌কি হেসে, পদ্মপাতায় মুখ লুকোলো,
যেন লজ্জা আর বাধা মানে না।

**দিলীপ দত্ত**

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ]

রামচন্দ্ররা চলে গেলে নায়েব এল 'সুমারবহি' নিয়ে। এটা প্রাত্যহিক কর্ম। গতদিনের সুমারের অঙ্কগুলিতে একবার চোখ বুলিয়ে তলায় একটা সই করে দেন সান্ন্যালমশাই।

নায়েবের কাছে থেকে সুমার বই নিয়ে সান্ন্যাল মশাই বললেন,—আবার কি গোলমাল লাগাল এরা, একবার দেখো তো। খাজনা দেবে না অথচ মিহিরকে অনুরোধ করতে হবে যাতে উচ্ছেদ না করে। মিহিরই বা শুনবে কেন, বার বার এ রকম অনুরোধ?

—আজ্ঞে, ধানটা উঠলে ওরা খাজনা শোধ করে দেবে হয়তো!

—বলেছিল নাকি? ধান উঠবার কত দেরী?

—আর ক'একটা মাস যো সো করে চালাতে পারলে, আউস্—

—তবে তোমার মহালগুলিতেও এখন বাকি খাজনার চাপ পড়বে না বলো?

—আজ্ঞে। মাথা চুলকালো নায়েব।

—তবে?

—লোকের বসত বাটি কিনা। চাষের জমিগুলি পেলে তবু সহ্য হয়, বাসের কুঁড়ে গেলে বুকে বড় লাগে।

সুমার বই সই হ'য়ে গিয়েছিল, নায়েব আর দাঁড়াল না। নায়েব মশাই তার মামার কাছে থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে চাকরিটা পেয়েছিল, তেমনি পেয়েছিল দুটি অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান। তার প্রথমটা হচ্ছে, এ বংশের নায়েবি করে সম্মান, প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়। মনিবের পরিবারের প্রায় একজন হ'য়ে যাওয়া যায়। কিন্তু টাকার লোভ রাখতে নেই। একদিন হয়তো সুমার বইএর অঙ্কের নিচে কলম বাধিয়ে তাকান এরা, ভয়ঙ্কর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। দ্বিতীয়টি হ'চ্ছে জিজ্ঞাসিত না হ'লে কোন প্রস্তাব করতে নেই।

কিন্তু আজ সান্ন্যালমশাই নিজেই ডাকলেন নায়েবকে।

—তামাক দিতে বলব, হুজুর।

—আচ্ছা, তা দিতে বলো।

তামাক এল। আজ সকালে এই প্রথম তামাক। খানিকটা সময় ব্যস্ত রইলেন সান্ন্যাল মশাই তারপরে বললেন,—ধান ওরা বুনেছে, কিন্তু চিত্তসুখের হাত এড়িয়ে ওরা ঘর তুলতে পারবে?



—কিছু হয়তো পারবে।

—সে কিছুটা কতটুকু! তাতে খাজনা শোধ হয়!

—আজ্ঞে; নায়েব থতমত।

—বাসের কুঁড়ের কথা বলছিলে। বুধেডাঙার তুমি কি করছ? সেখানেও তো সান্দারদের বাসের কুঁড়ে।

এমন জেরায় পড়তে হবে জানলে নায়েব ওদের হ'য়ে কথা বলত না। সে বিব্রতমুখে উত্তরের জন্য কাছারীর দরজা, আঙিনা ইত্যাদি অন্বেষণ করতে লাগল।

—আজ্ঞে, তা হ'লে কিন্তু আমরা সান্দাররা ফিরলে জমি ফিরিয়েও দেব। আমরা না ধরলে চৈতন্য সা বেদখল ক'রে নেবে। দুর্ভিক্ষের সময় দু'চার পাঁচমন ধান দিয়েছে কি দু'দশ টাকা দিয়েছে ব'লে সে সব জমির মালিক হ'য়ে বসবে তা তো দেখা যায় না!

—হরিশচন্দ্রের বিষয়েও যে ঠিক তাই বলবে না মিহির তার প্রমাণ কি?

ধোঁয়া ছেড়ে সান্ন্যাল মশাই হেসে বললেন,—আসলে মামলাটার ঝোঁক তোমার এখনও কাটে নি। মিহিরের সাথে আমার মামলা মিটে গেছে তুমি ভুলে গিয়েছিলে। আসলে মিহিরকে কিছু বলার কোন যুক্তিই আমার নেই।

নায়েবের বলতে ইচ্ছা হ'ল—হরিশচন্দ্র মিহিরের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়াতেই এই বিপদ তার।

সান্ন্যালমশাই বললেন, মিহিরের কাছে একবার যেয়ো, অনুরোধ ক'রো, যদি একমাস সে মাপ করতে পারে।

একটু থেমে মিটমিট ক'রে হেসে সান্ন্যালমশাই বললেন, চিত্তসুখকে ব'লো সান্দারদের ধারের দরুণ তাদের জমিতে ধান লাগিয়ে সে ঘরে তোলে তুলুক, তাদের হ'য়ে খাজনাটাও যেন পৌঁছে দেয়।

নায়েব চলে গেল।

কাছারির সম্মুখে বিদেশী লাইম গাছটার পুরানো ডালে কালকের ঘুঘু জোড়া এসে বসেছে। বোধ হয় বাসা বাঁধবে। একটু পরেই দ্বিপ্রহর স্তব্ধ বিশ্রামের নিকেতন হবে। তখন চঞ্চুচুম্বনের অবসরে ওরা দীর্ঘ টানা সুরে এক একবার ডেকে উঠবে।

আচ্ছা ওদের কি মন আছে? চিন্তা করার মতো স্মৃতিকে বিচারে পরিণত করার মতো মন হয়তো নেই। সামান্যতম মস্তিস্কও যখন আছে তখন মন না থাকার কি যুক্তি বলো। সম্ভবত ওদের অচেতন মনই সর্বস্ব। ওদের অচেতন মনে কি গত ঋতুর ছাপটি আছে, কিম্বা গত উৎসবের বন্ধুটির।

লাইমগাছটির পাতা নড়ে উঠতেই গাছটার গোড়ার কাছে রোদের সীমা এসে

পৌঁছাল। বেলা তা হ'লে অনেকই হ'ল। স্নানের সময় হ'য়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে চাকরকে দেখতে না পেয়ে সান্ন্যালমশাই খবরের কাগজ আর চশমার খাপটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

কাছারীর সদর দরজার বাঁ দিকে দুটি কাঠের খুটিতে একটি কাঠ আড় করে শোয়ান, সেই শোয়ান কাঠ থেকে ঝুলছে পেতলের ঘড়ি। কিছুদিন আগেকার ব্যাপার, সান্ন্যালমশাই ঘড়ি-পেটা কারণ ক'রে দিয়েছেন। নতুবা সান্ন্যালগিন্নীর কাজের হাত থামতে চায়না। দুপুরের বিশ্রাম ফুঁড়ে বলে বসেন—যাই, সময় হ'ল, আজ আবার ছানাটাও ওরা ভালো ক'রে কাটতে পারেনি। পেটা ঘড়ি বন্ধ হওয়াতে প্রথম যেদিন সান্ন্যালগিন্নী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেই দুপুরের কথাটা মনে হওয়াতে কৌতুকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল সান্ন্যালের দৃষ্টি। মামলার কিছুদিন এ সব তেমন নজর পড়েনি।

অনুদ্দিষ্ট কিছুকে লক্ষ্য ক'রে বললেন সান্ন্যালমশাই—কি অন্যায়।

দুপুরের ঘুম শেষ হ'য়েছে। শোবার ঘরের সব চাইতে ছায়াগাঢ় কোনে গভীর একটা সোফায় ডুবে বসে আছেন সান্ন্যালমশাই, চোখের সামনে বিলেতি পত্রিকা। তামাকের মৃদু মৃদু শব্দ হচ্ছে।

রূপনারায়ণ মায়ের পাশে বসে ছবি আঁকছেন। সান্ন্যালগিন্নী মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে কি একটা সেলাই করছেন।

রূপনারায়ণ বললে,—আজ সকালে রামচন্দ্ররা এসেছিল কেন, বাবা।

পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টিয়ে সান্ন্যালমশাই বললেন,—তুমি রামচন্দ্রকেও চেন?

—হ্যাঁ। লোকটা একটা কীর্ত্তনের দল খুলেছে। ওরা বলে নাম-কীর্ত্তন করে বেড়ালে দেশের আধিব্যাধি দূর হ'য়ে যাবে। আমাদের বাড়ীতে করতে চায় একদিন।

—এত সব খবর তুমি কোথায় পেলে? সান্ন্যালমশাই মৃদু মৃদু হাসলেন।

—একদিন ব্রজকান্তবাবুর কাছে বলছিল ওদের একজন শুনলেম। তোমার কাছে বলতে সাহস পায়নি।

—কেন, সাহসের এমন অভাব হ'ল কেন? সান্ন্যালমশাই বই মুড়ে রেখে বললেন—ছোটবাবু, তুমি চাঁদকাজির গল্প শুনেছ? চার পাঁচশ' বছর আগে একদল বাঙালী কীর্ত্তন দিয়ে দেশের আধিব্যাধি দূর করতে চেষ্টা করেছিল। তখন এদেশের রাজা ছিল কীর্ত্তন শুনতে যাদের ঘোরতর আপত্তি তেমন সব মুসলমান। সেসব কীর্ত্তনীয়া কিন্তু ভয় পায় নি। আজ সদানন্দ এলে এই ইতিহাসটা শুনে নিও।

—তা হ'লে তুমি ওদের নিষেধ ক'রে দাওনি তো।



—ওরা তো কীর্ত্তনের কথা আমাকে কিছু বললে না।

—তা হ'লে তোমার আপত্তি নেই। আমি ব'লে আসি।

রূপনারায়ণ নাচতে নাচতে বেড়িয়ে গেল।

সান্ন্যালমশাই ছেলের উৎসাহের দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগলেন। সান্ন্যালগিন্নী বললেন—হাসছ যে?

সান্ন্যালমশাই বললেন—ওদের কথায় একদিন রূপু বলেছিল, ভালুকে চাষী। সেটা ঘৃণা করে বলেনি, ওদের শক্তির যে রূপটা ওর চোখে পড়েছিল তারই বর্ণনা করেছিল ভালুকের সাথে উপমা দিয়ে। তারা মৃদঙ্গ নিয়ে বৈষ্ণব হ'য়ে গেলে কেমন হয়, তার কল্পনা করছিলাম।

—ওদের মধ্যেও ধর্ম্মভাব আছে। ওরা তো মাঝে মাঝে বারোয়ারী কালী পূজা করে। অসুক-বিসুক খুব লেগে উঠলেই ওরা একটা না একটা পূজো করে।

—সে সব পূজো ওদের মানায়।

—কীর্ত্তন ওদের মানায় না এ তুমি কি ক'রে বলো। সেটা তো এখানকারই জিনিষ।

গড়গড়ার নলটা দোলাতে দোলাতে সান্ন্যালমশাই বললেন, এমন এক দুর্ভিক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মহেন্দ্ররা কামান তৈরী করেছিল, সত্যানন্দরা কীর্ত্তনের বাড়বাগ্নি জ্বেলেছিল, এবার তোমার স্বামী পালিয়েছিল সহরে। রাজপুরুষ শ্যালক ছিল ব'লেই, নতুবা কি হ'ত বলা যায় না।

—তোমার সবতাতেই হাসিঠাট্টা, ধর্ম নিয়েও তাই।

—কে বলেছে, কে বলেছে, তোমার সাথে কি আমার হাসিমস্করার সম্বন্ধ? সান্ন্যালমশাই মৃদুমন্দ হাসতে লাগলেন,—আমি ওদের আজই খবর দেব। কীর্ত্তন শুনতে আমিও ভালোবাসি। ব্রজকান্ত এবার যেদিন সহরে যাবে রাম গোঁসাইএর দলকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবে।

—আসলে তুমি বিশ্বাস করো না ওদের কোনকালে ধর্মে মতি হ'তে পারে। সান্ন্যালমশাই গম্ভীর মুখে বললেন,—ধর্মে মতি হওয়া খুবই বাঞ্ছনীয়।

সান্ন্যালগিন্নী স্বামীর মুখের দিয়ে চেয়ে গাম্ভীর্য্যটার কতটুকু কপট, ঠাহর করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

কিন্তু ধর্ম ও কীর্ত্তন নিয়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হ'ল না। কাছারীতে ঢুকবার আগেই রূপনারায়ণকে যেমন, দ্বিতলের এ ঘরখানাতেও সান্ন্যালমশাইকে তেমন। বিষয়টা কৌতুকের বটে পাল্কীতে চড়ে এমন হুস হাস শব্দের মধ্যে কেউ অনেকদিন কাছারী বাড়ীর সীমানা পার হয়ে অন্দরবাড়ীর দরজায় এসে থামেনি।

পুলিশের লোকরা আসে, সহরের রাজপুরুষরা বছরে এক আধবার আসে, আত্মীয়-স্বজনরা আসে। পুলিশের ঘোড়া ও সাইকেল, রাজপুরুষরা আসে সান্ন্যালমশাইএর ফিটনে কিম্বা নিজেদের গাড়ী ক'রে। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে আজকাল যারা আসে তারা সবাই

গোরুগাড়ী করে আসে। কদাচিৎ সান্ন্যালগিন্নী যাওয়া আসা করেন। অন্য সব যানবাহন থাকে কাছারীর ফটকের বাইরে। সান্ন্যালগিন্নীর পাল্কী অবশ্য অন্দরেই চলে আসে আট বেহারার কাঁধে। অপরিচিত হাল্কা পাল্কীর এমন সোরগোল!

হু হুস্ না, হু হুস্ না।

সান্ন্যালগিন্নী কৌতূহলভরে সিড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে এলেন। সান্ন্যালমশাই জানালার কাছে উঠে দাঁড়ালেন। রূপনারায়ণ কাছারী আর অন্দরের দরজার পাশে পাল্কীটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুমতি পাল্কী থেকে নামল। নিজের ছোট হাত ব্যাগটা কুড়িয়ে নিয়ে সুমতি নামল। রূপনারায়নের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরল, তুমি বড়বাবুর ছোটভাই, ছোটবাবু রুপু?

মহিলার সমুখে দাঁড়ানো অভ্যাস রূপনারায়নের একেবারেই নেই, তারপরে যে এমন সপ্রতিভ তাকে কি উত্তর দেবে লাজুক রূপনারায়ন।

সুমতি রূপনারায়ণের হাত ধ'রে বললে—চলো তো, ভাই, বাবা, মায়ের কাছে।

কনক দারোগা সামকে থানার প্রবল প্রতাপান্বিত বড় দারোগা। তার অধীনে আরো দু'জন সবইন্‌স্পেক্টর আছে, জন চারেক এসিস্ট্যাণ্ট সবইন্‌স্পেক্টর আছে।

কিন্তু এ হেন কনক দারোগা সামকে থানায় বসে নিজের উপরে কখনো কখনো বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

সসম্মানে সমাজ বিজ্ঞানে ডিগ্রি নিয়ে তার না হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া, না হ'ল কোন ব্যাবহারিক-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চাকরি। টাকার তাগিদে আসতে হ'ল দারোগা-গিরির বাঁধা সড়কে। তা' সড়কটা মন্দ নয়। বাঁধান হ'লেও দুপাশে ফুটপাতের সীমাসহরদ্দ নেই। সামনের দিকে টাইম স্কেলে মাইনা এগিয়ে যাচ্ছে, এ পাশে ও পাশে কুড়িয়ে বাড়িয়েও চলা যাচ্ছে।

লেখাপড়া হ'ল না ব'লেও যে খেদটা হয় সবদিক দিয়ে ভেবে দেখতে গেলে সেটা থাকে না। এক সময়ে তার বিবেক পীড়া দিত। এখন কর্ত্তব্যকর্মের সাথে তারও একটা সামঞ্জস্য হয়ে গেছে। তার চাকরির গোড়াতেই বিপ্লব-ও সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপ বাংলাদেশে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর এই সামকে থানায় গান্ধীপন্থীরাও নেই যে তাদের উপরে মাঝে নাঝে হুমকি চালাতে হবে। ৪২এর অতবড় ব্যাপারটা গেল সারা ভারতে তাতে মাত্র কয়েকটা রাত্রিতে উঠে এসে থানা তদারক করতে হয়েছে তাকে, এক আধবার কন্‌ষ্টেবলদের ফল-ইন্ করানো মাত্র—তাও উপরওয়ালার হুকমতে, প্রয়োজনে নয়। আর একবার মাত্র যেতে হয়েছিল সান্ন্যালমশাইএর বড় ছেলে গ্রামের কাছাকাছি



আছে নাকি খোঁজ করতে। ভাগ্য তাকে রক্ষা করেছিল।

—কোথায় আছেন তিনি? নোট নিতে নিতে কনক দারোগা প্রশ্ন করেছিল।

—বোধ হয় দমদম সেণ্ট্রালে আছে। বলেছিলেন সান্ন্যাল।

কনকের মুখে ঠিক উত্তরটা না পাওয়ার বিব্রতি ফুটে উঠেছিল, কিন্তু সান্ন্যালমশাইর এতটুকু উত্তাপ নেই তার বিরুদ্ধে এটা অনুভব ক'রে কনক দারোগা হেসে বলেছিল—উনি গ্রামে এলে চাকরি রাখা কঠিন হ'ত আমার, এঁটে উঠতে পারতাম না।

অন্তত ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন হয় সে বলতে পারবে সরকারের শাসনযন্ত্রের সাথে যুক্ত থাকলেও সে কোন দেশ প্রেমিকের নির্য্যাতনের নিমিত্ত মাত্রও নয়।

কাজেই বেশ দিন যাচ্ছিল তার। ছোটখাট সাধারণ চুরি চামারির ব্যাপারে তদন্ত করা ছাড়া তার একটিমাত্র কাজ ছিল মাসে দুদিন করে সান্দারদের হাজিরা নেয়া। শেষের কাজটির একটি মাত্র ছিল যাতে সে দস্তুরমতো আনন্দ পেত। মাঝে মাঝে তার যে সখটা হয়, অপরাধ বিজ্ঞান চর্চা করার তাতে যেন সান্দারদের অস্তিত্ব সাহায্য করে। স্বভাবদুবৃত্ত এরা সরকার থেকে ঘোষণা করে দেয়া হয়েছে, পুরুষানুক্রমে এরা দুবৃত্তই থেকে যাবে। কৃষি কাজে এরা যতই মগ্ন থাক, ছোরাগুপ্তি এদের লাঙ্গলের আড়ালে লুকানো নাই থাক, এদের মনের মধ্যে নাকি সভ্যতাবিরোধী হিংস্রতা ধিকি ধিকি জ্বলছে।

কনক দারোগার দৃষ্টিটাও কাজে কাজেই সান্দারদের প্রতি সজাগ ছিল। পাক্ষিক হাজিরার দিন আসবার দুচার দিন আগেই সে তোরজোর করত এই নৈমিত্তিক কাজটার জন্য। কে এল, কে না এল এদিকে তার কড়া নজর। কেউ না এলে লোক পাঠিয়ে খবর নিতে কোনদিনই তার আলস্য ছিল না।

কিন্তু আজকাল হাজিরাটা হয় না। সরকার তার নিয়ম শ্লথ করেছেন তা নয়। গহরজান সান্দার এখনও মাঝে মাঝে আসে। এক বুক সাদা দাড়ি নিয়ে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। লোকসংখ্যা হাজিরায় কমতে কমতে এখন একজনে দাঁড়িয়েছে।

এক হাজিরায় এসে ওরা বলেছিল—বুড়ো আলতাফ খসে গেছে। আর কোনদিনই সে থানায় আসবে না।

কনক ধমকে উঠে বলেছিল—রসিকতা রাখ্, খসে কোথায় গেল, তাই বল্?

—জে মরেছে সে।

—কি করে মরল? মারপিট দাঙ্গার কথাটা নিজেই প্রায় বলে ফেলেছিল কনক।

—জে, না খাতে পায়ে।

শুনে কনক মন্তব্য করেছিল—বাপ্-জ্যেঠাকে খেতেই যদি দিবি তোরা, তবে আর জাত দুবৃত্ত বলবে কেন সরকার তোদের। (ক্রমশঃ)

# সন্দংশ

## প্রেমের কবিতা

### বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা কামই হোক আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা প্রেমই হোক—আসলে দুটোই এক জাতের। আধেয় একই, কেবল আধার ভিন্ন। একটির আধার প্রণয়িনী অপরটির ঈশ্বর। প্রিয়ার স্থান ঈশ্বরেরও ওপর—তাঁর শাসন ধর্ম্মানুশাসনের চেয়েও অমোঘ। কারণ যে প্রেমনিষ্ঠ তার কাছে প্রেমই একমাত্র ধর্ম্ম, আর সবই গৌণ। প্রেমনিষ্ঠের কাছে প্রেমের ডাক একবার এলে আর কিছু ভাববার অবকাশ থাকে না, ধ'রে দিতেই হয় সকল কিছুই ঝেড়ে-ঝুড়ে, এক তিলও রাখবার জো নেই। হুঁশিয়ার মানুষও বেহুঁশ হন, পাত্রাপাত্র জ্ঞান লুপ্ত হয়। অন্যথা যে-মানুষ বিবেচক সেও অবিবেচকের মতোই বিলিয়ে দিয়ে বসে সব কিছু, সামান্যাকেই হয়তো অনন্যা ভেবে ব'লে বসে—

Love is my religion—I could die for that. I could die for you. My creed is love and you are its only tenet [ Fanny Brawne-এর প্রতি Keats-এর পত্রাংশ ]

এমন যে প্রেম তা' নিয়ে বলার কি আর শেষ আছে? লেখার শেষ হয় কোনোদিন? শাকান্ন আমাদের নিত্যকার জিনিশ। তবুও শাকান্নে অরুচি হয়না কারো। অরুচি হ'লেই বরং ডাক্তারের শরণ নেওয়া উচিত হেতু অনুসন্ধানের জন্য। তেমনি প্রেমে অরুচি এলেও তার কারণ অনুসন্ধান করা উচিত।

মধুর রতির উপাসকেরা প্রিয়ার মধ্য দিয়েই শ্রীকৃষ্ণের কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করেন। প্রিয়ার মধ্যেই তাঁরা ভগবানকে অংশত প্রত্যক্ষ করেন। তেমনি মরমী প্রেমসাধক কবি প্রিয়ার মধ্যেই পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেন। আর শুধু পৃথিবীই বা কেন সারা সৌরজগৎ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নিসর্গজ যা কিছু সবই! সেইজন্য উপমার জন্য তাঁরা বারে বারে সেই একই আকাশ, সমুদ্র, মাটি, গিরি, প্রান্তর, নক্ষত্র রাত্রি ইত্যাদি বিস্ময়কর আদিম নৈসর্গিক বস্তুর আশ্রয় নেন। সারা বিশ্বের প্রতিরূপ যেন সংহত আছে একটি মাত্র শরীরিণীর মধ্যে—বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর আভাসের মতোই। তাই তো এ সব উপমা বার বার পেতে পেতে আমরা বিরক্ত হ'য়ে উঠিনা বরং মুগ্ধই হই যখন পড়ি—

তোমার দেহের রেখা হ'তে পারে সমুদ্রের মতো রেখাময়
সময়ের মতো স্রোতস্বান [ 'পদাবলী'র ১ম কবিতা ]

ত্বগস্থি বসাপঙ্কের বিচিত্র রচনা এই যে 'তুমি'—এ তো ক্ষণস্থায়ী, ভঙ্গুর, সীমাবদ্ধ—এর মধ্যে শাশ্বতের, অসীমের ব্যঞ্জনা আসবে কোত্থেকে? তবে তা' আনেন কী ক'রে কবি? কী ক'রে করেন এই অসাধ্য সাধন? করেন উপমার অধ্যায় রচনা ক'রে।

এই যে আদি-অন্তহীন সময়-স্রোত তার চেয়ে অসীমতাব্যঞ্জক আর কী? এই যে তরঙ্গ-ভঙ্গিম সমুদ্র তার বৈচিত্র্যও অন্তহীন। এই উপমানদ্বয়ের অসীম ও অসামান্য ব্যঞ্জনার সংক্রমণে সামান্য উপমেয়ও মুহূর্ত্তে অসামান্য হ'য়ে উঠলো। সীমার মধ্যে ধরা দিলো অসীম, বচনের মধ্যে জন্ম নিলো অনির্বচনীয়! তাই তো কবি স্রষ্টা!



'অপ্রেম ও প্রেম'-এর অপূর্বতার পরে 'পদাবলী'র অভিনবত্ব সত্যই বিস্ময়কর! আমার তো মনে হয় যে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের যতো স্মরণীয় প্রেমের কবিতা লেখা হ'য়েছে সব এক করলে দেখা যাবে যে, সে-সংকলনে 'অপ্রেম ও প্রেমে'র মতো দু'টি চারটি কবিতাও আছে কিনা সন্দেহ। সেই মাপকাঠিতে বিচার করলে 'পদাবলী'রও কয়েকটি কবিতা অত্যন্ত বিশিষ্ট স্থান পাবে। আর সে পাওয়া তার নিজের দাবীর জোরে—প্রাপ্য ব'লেই সে তা পাবে, বন্ধুকৃত্যের জোরে কখনোই নয়। 'পদাবলী'র প্রথম কবিতাটি সম্বন্ধেও আমার ধারণা খুব উঁচু। কবির স্বকীয় শৈলীর এটি একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

ষড়মাত্রিক মাত্রাবৃত্তে লেখা অপরূপ ছন্দোময় গদ্য-কবিতাটি প্রথমে 'অপ্রেম ও প্রেম' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয় পরে দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জ্জিত হয় সম্ভবতঃ প্রকাশিতব্য 'পদাবলী'র-র অন্তর্ভুক্ত হ'বার জন্যেই। 'পদাবলী'তে সেটির নামকরণ করা হ'য়েছে 'শর্বরীর জন্যে'। এটি সম্পর্কে যা বলবার তা আগেই ব'লে নিয়েছি। পুনরাবৃত্তি বাহুল্য।

'কিরাতীদের জন্যে' শীর্ষক কবিতাবলীর কয়েকটি নানা দিক দিয়েই ভালো লাগলো। যেমন:

মাঘের অনিল মেঘ্না আমার
বিষণ্ণা বিষে নীল।
চুলে আয়োজন কী মেঘ নামার
আষাঢ় বিসর্পিল।

কিংবা—'এখনো সন্ধ্যায় ফিয়ে আসে ভোর বেলা' কিংবা 'প্রতনু-বিরল প্রান্ত-খোলা চুল'। বিশেষ ক'রে শেষোক্তটির মধ্যে ৬+৭=১৩ মাত্রার পংক্তির তরঙ্গায়িত চলনের মধ্যে বেশ নূতনত্ব আছে। এই নূতনত্ব 'অনপার জন্যে' 'কাঞ্চির জন্যে' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও বর্ত্তমান।

কিন্তু 'প্রোষিতার জন্যে' কবিতাটি ততটা বিশদ না হ'য়ে ছন্দে চটুল না হ'য়েও কিংবা হয়তো আরো সেইজন্যেই একটু বিশেষ রকম আকৃষ্ট করলো। একটা পরিশীলিত পরিচ্ছন্নতায়, ঘনত্বে, গাম্ভীর্যে, ও কবির ব্যক্তিত্ব-মহিমায় সমুজ্জ্বল। আমার তো মনে হয় এ জাতের কবিতায় কবিকে সহজেই চেনা যায়—নইলে হাল্কা সুরের কবিতায় হাজারো প্রতিযোগীর মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে।

অনেক দিন থেকেই সঞ্জয়বাবুর রচনার একটা জিনিশ ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে সেটা একরকম যাদুশক্তিই বলতে পারা যায়। এই কবির সাম্প্রতিক রচনা এমনই আবেদনভূয়িষ্ঠ ও আকৃষ্টকর যে, বইটি হাতে এলে ছিদ্রান্বেষী পাঠকেরও ছিদ্রান্বেষণ-প্রবৃত্তি সুপ্ত হ'য়ে পড়বে। ছত্রে ছত্রে কী যেন এক অদৃশ্য মধু ছিটানো থাকে যার মাদকতায় মন একাধারে স্নিগ্ধ হয় ও প্রমত্ত হয়। কী এমন গুণ তা' হয়তো স্পষ্ট ক'রে এক কথায় বলা যাবে না কিংবা বলার প্রয়োজনও নেই কিন্তু পড়ার পর তারই স্বাদ ও সৌরভ-মাধুর্যে কয়েকদিন পর্যন্ত মন মশ্‌গুল হ'য়ে থাকে। তাতে অবশ্য সমালোচকের বিপদ বাড়ে বৈ কমেনা, তা'হোক, এতেই কিন্তু চিনতে পারা যায় সার্থক সৃষ্টি ব'লে।

এই প্রসঙ্গে 'পথিক বণিতার জন্যে' 'অলকার জন্যে' ও 'সীমন্তিনীর জন্যে' ইত্যাদি কবিতাও অনুল্লেখের নয়। এ ছাড়াও যারা অনুল্লিখিত রইলো তারাও উপেক্ষণীয় নয়। এই কয়টা মাসের মধ্যে এতগুলি কবিতা লিখে ওঠা যে কতোটা দুষ্কর কাজ একথা যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা বুঝবেন। আরো সেইজন্যই 'পদাবলী'র কবি সমধিক প্রশস্য। 'অপ্রেম ও প্রেম'-এর পর 'পদাবলী' বাংলা-কাব্য-

মালঞ্চের অম্লান কুসুম হ'য়ে থাকবে। 'পদাবলী' তাঁর কবিমানসের শুধু অভিনবই নয়, অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞান! সঞ্জয়বাবুর রচনা দু'দশ বছরকে লক্ষ্য করেনা, তাঁর এখনকার প্রতিটি সৃষ্টিই বঙ্গভারতীর জনাকীর্ণ প্রাংগন তলে স্থায়ী কীর্ত্তি।

মনে পড়ে 'নিরুক্ত' তখন প্রায় বন্ধ হ'য়ে আসছে—চারিদিকে অন্ধকারের পৈশাচী-লীলা—সেই সময়েই আলোকস্বপ্নজড়িত কণ্ঠস্বরে ইনিই তো একদিন ব'লেছিলেন—'এখন যে-কোনদিন দেখা যাবে প্রভাতের প্রপাত আকাশে'।

এখনই দেখা দিচ্ছে সেই প্রভাত—সেই আলোর অরুণাভাস বাংলা কাব্যকাশের পূর্বদিকপ্রান্তে। সেই আলোকবার্ত্তার অগ্রদূত হ'য়ে আজ আসছেন সেই কবি নিজেই, আমরা তাঁকে সুস্বাগত করি। কাণ পেতে মন দিয়ে শুনি তাঁর কথা। আমরা বুঝেছি নিশ্চয়ই তাঁর শোনাবার আছে অনেক কিছু, দেবার আছে অনেক কিছু। বাংলাদেশের বোদ্ধা ও শ্রোতারা জড় ও বধির নন, যাঁদেরই কান আছে তারাই উৎকর্ণ হ'বেন, যাঁদেরই মন আছে তাঁরাই উন্মন হ'বেন।

## সঙ্গীতের আদর্শ

### মণিলাল সেন

আমরা দেখি লক্ষ্য ও প্রয়োজন ভেদে নানারূপ সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই যে পৃথিবীর প্রতিদেশে সঙ্গীতচর্চ্চা তার প্রাথমিক লক্ষ্য যে মানুষের মনোরঞ্জন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ যুগ যুগ ধরে ভারত এই উদ্দেশ্যের উপরে আরও একটা মহত্তর এবং বৃহত্তর আদর্শ রেখেছে আর সে উদ্দেশ্যে সঙ্গীতে পরিপূর্ণতা আনবার অন্তহীন প্রচেষ্টা করে চলেছে। এক একবার তার সে-আদর্শ হতে যে বিচ্যুতি হয়নি তা নয়, যখনই সে ঐ-আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়েছে তখনই সে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্যে হালকা বিষয়ে আসক্ত হয়ে বিপথগামী হয়েছে। কিন্তু ভারত হতে সে আদর্শ একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। পরবর্ত্তীকালে আবার নতুন উদ্দমে সে আদর্শকে সামনে রেখে পূর্ণতা আনবার চেষ্টা হয়েছে।

একেবারে আদিমকালের সঙ্গীত হতে আরম্ভ করে যুগে যুগে কত শ্রেণীর সঙ্গীতের যে সৃষ্টি হয়েছে এবং তার কত কাঠামো যে চিরদিনের মত লুপ্ত হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে প্রাচীনকালের ক্ষণভঙ্গুর তালপাতায় লেখা সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থের যে কয়েকটি এখন পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে তার মধ্যে অধুনালুপ্ত যেসব গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং যে সব সঙ্গীত-পদ্ধতির নিদর্শন সেগুলিতে আছে, তাতে একটা বিষয় নিঃসন্দেহে বলা চলে যে যুগযুগ ধরে সঙ্গীত-জগতে নানাবিধ যন্ত্রের সমাবেশ করে গীত বাদ্য ও নৃত্যের নানাবিধ-পদ্ধতির সৃষ্টি এই ভারতে হয়েছিল এবং আরও একটা বিষয় বুঝতে কষ্ট হয় না যে নানাদিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে আহৃত বিষয় প্রয়োগ করে ভারতীয় সঙ্গীতকে পূর্ণতর করার চেষ্টা হয়েছে।

এ জগতের ক্রমবিকাশে যে তিনটি ধাপ আমরা পেয়েছি সেই দেহ-প্রাণ-মনের ধাপগুলি আমরা সঙ্গীতেও অনুভব করি। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীত শুধু দেহ-প্রাণ-মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ঊর্দ্ধে যে



জ্যোতি যে আনন্দ আছে সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সে জ্যোতি সে আনন্দের প্রকাশই ভারতীয় সঙ্গীতের মূল লক্ষ্য এবং সঙ্গীতকে সেভাবে বিকশিত করার জন্যে বারে বারে চেষ্টা হয়েছে।

নানাবিধ সুর-বিন্যাস, ধ্বনি-সংযোজনা ও অলঙ্কার-ব্যবহারে একটা সাঙ্গীতিকদেহ প্রায় সব সঙ্গীতেই একভাবে না একভাবে আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই যে সঙ্গীতদেহ সেটি যাতে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্থায়ী হয়ে থাকে ভারতীয় সঙ্গীতে সেরূপ চেষ্টা কোন এক সময়ে হয়; আর তারই ফলে রাগরাগিণীগুলির রচনা আমরা দেখতে পাই, রাগরাগিণীগুলি এক একটি নির্দ্দিষ্ট কাঠামো যাতে আলংকারিকধ্বনি ব্যবহার করে সে সঙ্গীত দেহের সৌন্দর্য্য বাড়াবার চেষ্টা হয়; আর সুরবিন্যাস, ছন্দ ও ধ্বনির সাহায্যে এমন করে সাজাতে হয় যাতে সে-সঙ্গীত কাঠামোটির নানাবিধ ভাব-প্রকাশের সামর্থ্য থাকে। তাছাড়া, সে সঙ্গীত-দেহের মাধুর্য্য যাতে বৃদ্ধি পায় এমনভাবে প্রকাশ করা হয়। সাঙ্গীতিক দেহ-বিকাশের লক্ষ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য। কালে কালে রাগরাগিণীর রূপ নিয়ে চর্চ্চা করতে গিয়ে কোন কোন সময়ে রাগরাগিণীতে অত্যধিক অলঙ্কার ব্যবহার করে তার সামর্থ্য ও মাধুর্য্য খর্ব্ব করা হয়েছে, কোন কোন সময়ে সামর্থ্য বাড়াতে গিয়ে সৌন্দর্য বা মাধুর্য্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি, আবার কোন কোন সময়ে মাধুর্য্যের দিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়েছে যে, তখন রাগরাগিনীর অঙ্গহানি করতেও বাধেনি। তিনের সমতা রাখা অনেক সময়েই সম্ভব হয়নি।

ছন্দের দোলায় বা সুরের উঠা-নামায় সঙ্গীত-দেহের মধ্যে যে বেগ আমরা দেখতে পাই তাতেই সঙ্গীত সচল হয়ে উঠে। চিত্তের আবেগই সঙ্গীত-সৃষ্টির গোড়ার কথা; সঙ্গীতে সে-আবেগই ধরা পড়ে। কিন্তু সে আবেগ সংযত করেই সঙ্গীত রচিত হয়। সঙ্গীতকে উৎকৃষ্ট করার চেষ্টার ফলে ভারতীয় সঙ্গীতকে হৃদয়াত্মক করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং করুণ, বীর, শান্ত প্রভৃতি রস সৃষ্টির দিকে চেষ্টা চলতে থাকে। এ সবই সঙ্গীতের প্রাণ, সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করে তুলবার নানাদিক থেকে চেষ্টা হয়েছে; আর এক একবার ভাবের দিকে অত্যধিক ঝুঁকে পড়াতে সঙ্গীতের কাঠামোর অদল-বদল করা হয়েছে। আবার এক একবার সঙ্গীত কাঠামোর স্থায়িত্ব, কাঠিন্য বাড়াবার চেষ্টা করে সুরের বাঁধুনিতে এত কড়াকড়ি করা হয়েছে যে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গীত শুষ্ক প্রাণহীন হয়েও পড়েছে। এ সব প্রচেষ্টায় সঙ্গীতের নানা পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে।

কোনটা সুন্দর হবে তার বিচার বিশ্লেষণ করে প্রয়োগ করা, কি ভাবে প্রয়োগ করলে মানানসই হবে, কি কি প্রথায় অভিব্যক্ত হলে সঙ্গীত মধুর হতে মধুরতর হবে অথবা নানাবিধ পরিকল্পনা কি কি ভাবে কার্য্যকরী করা যায় এবং কি ভাবে ভাবকে রূপ দিলে উচিত অথবা আনন্দদায়ক হবে এসব যে ভাবনা তাতে সাঙ্গীতিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। দেহ-প্রাণ-মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, মন দেহগতও হয়, প্রাণগত মনও আছে: আবার শুদ্ধমনের ক্রিয়াও আছে। সেজন্যে সঙ্গীত এক একবার দেহগত হয়ে দৈহিকরূপের দিকে এমন ঝুঁকে পড়েছে যে সঙ্গীতের রস তাতে ক্ষুণ্ণই হয়েছে। মন এক একবার প্রাণের দাস হয়ে প্রাণের উদ্দাম ডাকে এমনভাবে আত্ম প্রকাশ করে যে তাতে সঙ্গীতে স্বৈরাচারই বৃদ্ধি পেয়েছে, বিচার বুদ্ধির অভাব সেখানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আবার এক একবার সঙ্গীত এমন বিচার বিশ্লেষণ-পরায়ণ নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ হয়ে যান্ত্রিক হয়ে গেছে যে শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের রূপ ও রস ক্ষুণ্ণই হয়েছে।

সঙ্গীতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য মানুষের মনোরঞ্জন বলেই দেহগত প্রাণের বাসনা-কামনা সঙ্গীতেও

আসে। মানবীয় আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, চিত্তের চাঞ্চল্য, উদ্বেগ, দুঃখ, প্রভৃতি মানসিক বিষয় নিয়ে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়, সে সব সঙ্গীত ক্ষণস্থায়ী হয় বেশী দিন চলে না। সীমাবদ্ধ হয়ে আবর্ত্তের মধ্যে কেবল পাক খায় মাত্র। সংকীর্ণ হয়ে শেষটায় বিকৃতরূপ নেয়। তার থেকে মাঙ্গলিক কিছু আশা করা যায় না, স্থায়ী কোন বৃহত্তর আনন্দ দানে সে সঙ্গীত সমর্থ হয় না। মানবীয় আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ নিরাশা তো মানুষের সকল সময়েই থাকে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও সঙ্গীত মনকে উন্নত ধাপে নিয়ে আনন্দে আপ্লুত করে দিক, মানুষ তার অজ্ঞাতেও সঙ্গীত থেকে তা আশা করে। কিন্তু সে-আনন্দ দেহপ্রাণগত মন হতে পাওয়া যায় না। তর্ক-বিচার বিশ্লেষণের উপরে যে এক অসীম স্তর আছে তার থেকেই সে আনন্দ পাওয়া সম্ভব হয়। সে আনন্দের জ্যোতি ও শক্তির সহায়তায় মানবীয় বাসনাকামনা দুঃখনিরাশা সব রূপান্তরিত হয়ে যায়। ভারতীয় সঙ্গীত রচয়িতাগণ তার সন্ধান পেয়েছিলেন। আর মানুষ যা পায়, সে চায় তাকে কাজে লাগাতে, ভোগ করতে। সেজন্য সঙ্গীত রচয়িতাগণ সে আনন্দ বিতরণ করার কাজে লেগে যায়। ফলে সঙ্গীত-কাঠামো ও গীতপদ্ধতি সব পরিবর্ত্তিত করতে হয়। কিন্তু সঙ্গীত সে আধ্যাত্মিক স্পর্শ হতে বিচ্যুতও হয়েছে আর সঙ্গীত দেহ-প্রাণের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে কদর্য্যও হয়েছে। আবার নতুন মানুষ এসে নতুন আকারে সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতা যোগ করে নিয়েছে। নতুন কাঠামো তৈয়ারী হয়েছে, সঙ্গীতে একটা ধ্যানীরূপ এসেছে।

বর্ত্তমানে ভারতে যেসব উৎকর্ষ-গীতবাদ্য ও নৃত্য প্রচলিত সেগুলিতে দেহ-প্রাণ-মন ও অধ্যাত্মেরই সন্ধান পাই। গানে আমরা একটা রাগরাগিণীর সুরে তালে বাঁধা কাঠামো পাই যাকে সঙ্গীতদেহ বলতে পারি ; তার মধ্যে নানা ছন্দ দোলা ও করুণ শান্ত উদ্দীপক ভাবগুলির সমাবেশে সাঙ্গীতিক প্রাণ পাই এবং নানা বিচারবিশ্লেষণ মাধুর্য্য আনবার চেষ্টা যত্ন, সুন্দরতর করার আগ্রহ প্রভৃতিতে সাঙ্গীতিক মন, তাছাড়া, কথা ও সুরে এক ঊর্দ্ধমুখী আবেদন দিয়ে গানকে আধ্যাত্মিক করবার যত্ন দেখি। বাদ্যেও নানা জাতীয় যন্ত্রের স্বর ও ধ্বনি সমাবেশের মধ্যে দেহ, ধ্বনি-স্পন্দন, ছন্দের কারুকাজ, চিত্তদোলা, করুণ শান্ত প্রেম ভাবে প্রাণ হৃদয়, তাছাড়া, সুন্দরতর করার আগ্রহ, ধ্বনি বাছাই, বিচার বিশ্লেষণ, সুনিপুণ ধ্বনি প্রয়োগ ইত্যাদিতে মনের পরিচয় আর একাগ্রতায় আধ্যাত্মিকতার ছাপ পাই। নৃত্যে সাজসজ্জায় দেহ-মাধুর্য্য ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা, ছন্দ-দোলায়, দেহ ভঙ্গিতে করুণ শান্ত ধীর ভয় প্রেম ইত্যাদি রসের সমাবেশে প্রাণের হৃদয়ের পরিচয় আর বিচার বিশ্লেষণে উচিত প্রয়োগ, ললিত কলার যত্ন আগ্রহ, মনের পরিচয় আর সর্ব্বোপরি 'মুদ্রা'র ব্যবহারে নৃত্যকে আধ্যাত্মিক করে তুলে ধরবার আকাঙ্ক্ষা দেখতে পাই।

প্রাচীনকালে ভারতীয় সঙ্গীতের যে সব তথ্য এখন আমাদের কাছে আছে তার সাহায্যে প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই মনে আসে যে তখনকার সঙ্গীতরূপ এখনকার মত একটা খণ্ড খণ্ড ব্যষ্টিগত ছিল না। গীতবাদ্য ও নৃত্য সমষ্টিগত ছিল। সঙ্গীত বলতে গীতবাদ্য ও নৃত্যের সমন্বয়ে একটা কিছু বুঝাতো। আজকাল সঙ্গীতের সে রূপ একটি অনুষ্ঠানকে নাটক জাতীয় একটা কিছু মনে হলেও সেটি নাটক নয় ; সঙ্গীতেরই একটা বৃহত্তর বিকাশ ছিল। সঙ্গীতের এরূপ সমাবেশই ছিল 'জয়দেব'এর আমলে। 'সঙ্গীত রত্নাকর' প্রাচীন উৎকর্ষ-সঙ্গীতের যে পরিচয় দেয় তাতে এরূপ একটি পরিকল্পনার নির্দ্দেশ পাওয়া যায় এবং সঙ্গীতের প্রত্যেকটি বিভাগে 'অন্যান্য গীত বাদ্য' ও নৃত্যের উৎকর্ষ যে এক সময়ে খুবই হয়েছিল তা অনায়াসে অনুমান করা যায়।


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি —যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীনারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
( অর্থনীতি বিষয়ক )
দু'টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু'টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

দুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেম রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা

মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


Coloured Paper

# ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৪৯ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৩½ বৎসরে চারিটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।
প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম ভ্যালুয়েশানে ( ১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত ) বোনাসের হার বৃদ্ধির আশা আছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।

# সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে—

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৪২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা—১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

| | |
|---|---|
| মোট চল্‌তি বীমা | ৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲ |
| মোট সম্পত্তি | ২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲ |
| বীমা ও বিবিধ তহবিল | ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲ |
| প্রিমিয়ামের আয় | ৩,৯৪,২২,৩৭১৲ |
| দাবী শোধ (১৯৫২) | ৮৮,৮২,২৭১৲ |

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

# হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩


Printer & Publisher by Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta,


# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০

অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ

সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত

দাম আট আনা


এ-সংখ্যা থেকে
প্রমথ চৌধুরীর আত্মকথা
প্রকাশিত হচ্ছে

oloured Paper

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

**কবিতা**

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্তাকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**নতুন দিন**
আট আনা

**যৌবনোত্তর**
আট আনা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
**স্বাক্ষর**
এক টাকা

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পতাকা**
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
**নয়নচারা**
দেড় টাকা

**উপন্যাস**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

**কস্মৈদেবায়**
( ২য় সং )
তিন টাকা

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
**তিনরঙ**
দু'টাকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা**


# টুকরো কথা... (৩২)

'ছবি দেখতে যাচ্ছি'—কেউ আরো বেঁকিয়ে বলেন, 'বই দেখতে'। গন্তব্য উভয়েরই এক, মার্কিনী বন্দুকই ফিল্মঘরের দরজা। সেখানে, শুনতে পাই, নৃত্যপরা ছবিও দেখা হয়, সময় কাটে। আবার কাঁচি-ছাঁটা বইও দেখা হয়, সময় বাঁচে। সবটাই চলন্ত, ঘুমন্ত, নিমেষে দূর-দূরান্ত প্রতিফলনের তাজ্জবকরা খেল্। অর্থাৎ বেশির ভাগ সেই রকমের, তাই বলছি। আর এক ধরনের ছবি আছে, চিরকালই ছিল, স্বনাম বাজেয়াপ্ত হওয়ায় তাকে বলতে হচ্ছে 'ছবির ছবি'। নড়েও না, চড়েও না। বিচিত্রের বর্ণলেপা 'রচিত'-রূপ গূঢ় নিঃশব্দকে বহন করে তন্ময় তাকিয়ে থাকে ক্যানভস্, দেয়াল, কাপড়, কাগজের গায়ে। দেখে যদি চোখ ভরে, মন ভরে, তো দর্শক তাকিয়ে দেখে। একবার, তারপর বারবার। রঙ-রেখা-ব্যঞ্জনার যে শিল্পীত সামঞ্জস্য তার মধ্যে গিয়ে মেশে দর্শকের খুশি। আর এই দুইয়ের মিলনে উৎপন্ন হয় আনন্দ—যার তুল্য বড় ছুরস্কার ইহজন্মে বোধ নেই। কিন্তু চিত্রী-র আঁকা মূল ছবি অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবান। অগণ্য সাধারণের সাধ্যে কুলোয় না। আবার মনও ওঠে না আলোকচিত্রে তোলা তার ঈষৎমাত্র স্মৃতিকঙ্কাল দেখে। হয় যদি ভালো ছাপানো রঙিন অ্যালবাম তো আংশিক দূর হতে পারে রসজ্ঞ বহু চিত্রের চিত্রপিপাসা। বিদেশী অ্যালবাম এদিক দিয়ে বিখ্যাত। কিন্তু ইদানীং এদেশেও কিছু-কিছু ছাপা হচ্ছে—যার প্রশংসা শিল্প-জ্ঞানীরাও না করে পারেননি। যেমন যামিনী রায়ের অ্যালবাম। বড় আকারের উৎকৃষ্ট ছাপা, স্কেচ-রেখা-একরঙ-নানারঙ মিলিয়ে পনরোটি আলগা আর্ট প্লেট, বিষ্ণু দে-র সংক্ষিপ্ত ভূমিকাসমেত। মূলচিত্রের ক্ষুদ্র প্রতিলিপি দেখে যাঁরা অতৃপ্ত ছিলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অবহিত হবেন। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রলিপি' এবং অবনীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার আঁকা চিত্রাবলীর কথাও এই সূত্রে স্মরণযোগ্য। 'চিত্রলিপি'র দুখণ্ড বেরিয়েছে, তার প্রথম খণ্ড নিঃশেষিত। অবনীন্দ্রনাথের দুর্লভ চিত্রাবলীও সহজলভ্য হল—এটা চিত্রজ্ঞদের পক্ষে সৌভাগ্যের কথা। বিশেষ করে উপহারের জন্য অ্যালবামগুলির তুলনা নেই।

গ্রামাঞ্চলের আউল বাউল দরিদ্র কিষাণদের কণ্ঠে অজ্ঞাত-স্বভাব-কবির যেসব আশ্চর্য রচনা ঘুরে বেড়ায় তার একটি নতুন সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন চিত্তরঞ্জন দেব। তাঁর লেখায় 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' গ্রন্থে তিনি যেসব 'বাউলের দেহতত্ত্ব, গাজীর গান, কবি, জারী, ভয়ানী বা ভাসান, কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ গান, পাঁচালী ও অত্যাধুনিক সমস্যার উপর রচিত 'অকস্মাৎ-গীতি' সংগ্রহ করেছেন তা এতকাল অপ্রকাশিত ছিল। এইগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বাংলার সামাজিক ইতিহাস, সুতরাং সমাজতত্ত্ববিদ বা নৃতত্ত্ববিদদের নিকট ইহাদের মূল্য অপরিসীম। কিন্তু যিনি শুধু কাব্যরসপিপাসু তাঁহার নিকটও ইহাদের মূল্য অল্প নয়।'...

বিচিত্র প্রবন্ধ॥ রূপদর্শীর দ্বিতীয় বই 'রূপদর্শীর সার্কাস', সাংবাদিকের কৌতূহল আর সাহিত্যিকের মন, দুয়ের মিলনফল। রম্যরচনাতে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের তৃপ্তিকর মিশ্রণ ঘটেছে॥ পাঠকের চিঠিপত্রে যেসব প্রশ্নের অবতারণা থাকে সেগুলি অবলম্বন করে 'বন-ফুলে'র লেখা ক্ষুদ্রপ্রবন্ধের সংকলন : 'উত্তর'॥ দেশদেশান্তরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় নিয়ে ইদানীং যাঁরা দেশে ফিরছেন তাঁদের লেখা আধুনিক বিশ্বপরিচয় নিঃসন্দেহে জাগ্রত মনের কৌতূহল মেটাতে সহায়তা করেছে। সাম্প্রতিক ভ্রমণ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : শেফালী নন্দীর 'সন্ধানীর চোখে পশ্চিম'। এবং ঠিক ততটা দেশান্তর না হলেও অদূর অথচ অচেনা দক্ষিণের কথা, নলিনীকুমার ভদ্র-র লেখা 'বিশাল অন্ধ্র'। রামমোহন রায়ের চিন্তাধারা আর বাংলাদেশের ব্রাহ্ম এবং স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে অন্ধ্র দেশে স্বাধীকারবোধ জাগরণের যোগসূত্র আছে জেনে পাঠক আলোকিত হবেন॥ প্রমথনাথ বিশীর নতুন প্রবন্ধচয়ন 'বাংলা সাহিত্যের নরনারী' : 'চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হইতে শুরু করিয়া আধুনিকতম সাহিত্যিকের গল্প উপন্যাস' পর্যন্ত নানাগ্রন্থ থেকে 'বাঙালী লেখকের সৃষ্ট কতকগুলি বিশিষ্ট নরনারীর ( রাধা, ভাঁড়ু দত্ত, ঠকচাচা, রোহিনী ঘোরা, শ্রীকান্ত প্রভৃতি ) ইতিহাস রচনাই বর্তমান পর্যায়ের উদ্দেশ্য॥' রবীন্দ্র প্রসঙ্গে নতুন আলোচনা গ্রন্থ : ক্ষুদিরাম দাসের 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়'। 'কবিরই যেহেতু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়' তাই লেখক এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের আজন্ত কাব্যধারার বিশ্লেষণ করেছেন॥ বিশ্বভিত্তিসংগ্রহ সিরিজ নতুন সংযোজন প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ধর্মপদ-পরিচয়' এবং শিল্পী মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের 'সিংহলের শিল্প ও সভ্যতা'। বুদ্ধের নীতি ও বাণীসংগ্রহ নামে পরিচিত 'ধর্মপদ' গ্রন্থে বৌদ্ধধর্মের পূর্ণতম ও সংহততম প্রকাশ ঘটেছে॥ পরিচয়ের পথ সুগম হল॥

একটি নতুন নাটক॥ রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ওস্তাদ'—'সর্বহারা কিশোর শ্রমিকদের' জীবিকা সংসর্গিত॥

অনুবাদ॥ জাপান যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা, চীনা ঔপনাসিক লাও চাং-র উপন্যাস ইংরেজী থেকে অনুবাদ করেছেন অশোক গুহ : 'যুদ্ধ খাটালের গাল', খাঁটি চীনের আখ্যান। পরিমল চট্টোপাধ্যায় অনুবাদ করেছেন এমি সিয়াও-র লেখা 'মাও সে তুং, শৈশবে ও যৌবনে'॥ ফাসিস্ত জার্মানী থেকে একদা বিতাড়িত ঔপন্যাসিক ফয়েট ভানগার-এর 'সীমন' অনুবাদে ভবানী মুখোপাধ্যায়ের 'অন্ধকার দিন', যুদ্ধের সময় অবরুদ্ধ দক্ষিণ ফ্রান্সের কাহিনী॥ গাব্রিয়েল পেরীর আত্মচরিত 'রাতপ্রভাতের গান', অনুবাদ, মনীষা সেন॥ রুশ শিশু-সাহিত্যিক নিকোলাই নোসভ্-এর লেখা কিশোর উপন্যাস 'হিটিচার কাণ্ড' নামে শেফালী নন্দী অনুবাদ করেছেন। 'স্কুল পালানো ডানপিটে ছেলেও যে কি করে দায়িত্বশীল সচেতন কিশোরে পরিণত লাভ করতে পারে' তার গল্প। বইটি স্তালিন পুরস্কার পেয়েছিল।

অনুবাদের মধ্য দিয়ে দুইকে নিকটবন্ধু করার ব্যাপক একটা প্রয়াস লেখা দিয়েছে বাংলা সাহিত্যে। মুখ্যত ইংরেজী ভাষার দরবারে বসেই এখনো আমাদের লেখকরা অনুবাদের রেওয়াজ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য মূলভাষা থেকে সদ্য-সদ্য অনুবাদের পরিমাণ বাড়লে উৎকর্ষের পথ প্রশস্ত হবে। আশা, সেদিন আসতে দেরি নেই। এখন আরো কিছুদিন হয়তো ইংরেজের আঙিনা দিয়েই আনবাড়ি আনা-গোনা চলতে থাকবে॥




কলেজ স্কোয়ারে। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট
বালিগঞ্জে। ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ



সুন্দর কেশই আপনার মস্তকের শোভা

ব্যাঙ্গারাইডিন হেয়ার অয়েল

কেশের অকাল পতন দূর করে; কেশমূল সতেজ রাখে ও কেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। সুস্নিগ্ধ এবং গন্ধ সম্পদে অনুপম।





# পূর্ব্বাশা

## অগ্রহায়ণ—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বাংলা কবিতার ছন্দ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৩৯১ |
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| একটি ঐতিহাসিক কিংবদন্তী : ভূমেন্দ্র গুহ | ... | ৩৯৬ |
| মৃত্যুঞ্জয় : বংশীধারী দাস | ... | ৩৯৯ |
| ঘরপোড়া মন : সৈয়দ শামসুল হক | ... | ৪০০ |
| উত্তরণ : আবুল কজল সাহাবুদ্দীন | ... | ৪০১ |
| যাচনা : শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস | ... | ৪০১ |
| অংগীকার : সত্যেন আচার্য | ... | ৪০২ |
| ইলেকট্রন : পরমেশ ধর | ... | ৪০২ |
| আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট একটি সকাল : বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | | ৪০৩ |
| অতীত-অধরা : শোভন সোম | ... | ৪০৪ |
| নাপিত বৌয়ের দুঃখ : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৪০৪ |
| একটি এলেজি : বটকৃষ্ণ দাস | ... | ৪০৬ |
| সরস্বতী : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৪০৩ |
| বেবি শো : অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় | ... | ৪০৯ |
| বিবাহিতা স্ত্রী ( উপন্যাস ) প্রতিভা বসু | ... | ৪২১ |
| আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী | ... | ৪৩৮ |
| গড় শ্রীখণ্ড ( উপন্যাস ) : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ৪৪২ |
| শিল্পী : জেমস্ জয়স্ : অনুবাদক : অশোক গুহ | | ৪৪৮ |
| সাহিত্য-বিচার | ... | ৪৫১ |
| সম্পাদকীয় | ... | ৪৫৪ |



**প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস**

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতু বন্ধ— ২০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯



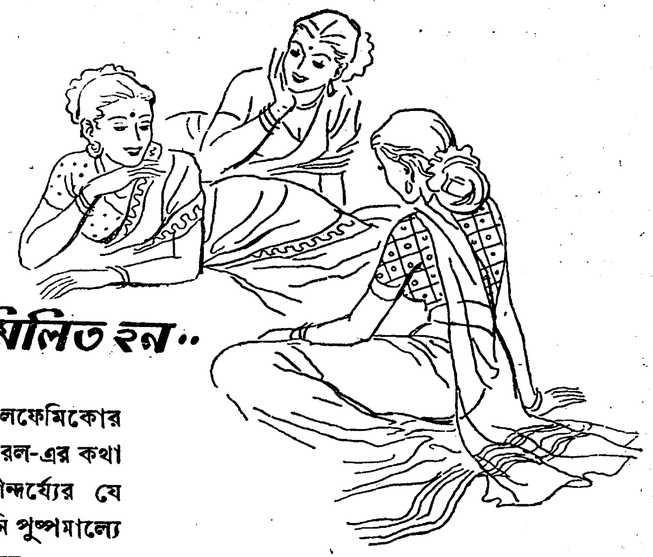

যেখানেই তাঁরা মিলিত হন..

কেশ প্রসঙ্গে তাঁরা ক্যালফেমিকোর মধুর সুগন্ধি কেশ তৈল ক্যাষ্টরল-এর কথা আলোচনা করেন। নারী সৌন্দর্য্যের যে দুর্নিবার আকর্ষণ, তার অনেকখানি পুষ্পমাল্যে জড়িয়ে থাকে তাঁদের চাঁচর চিকুরে।



ক্যাষ্টরল ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে; কারণ ইহা বিশুদ্ধ ও পরিস্রুত ক্যাষ্টরল হইতে প্রস্তুত। ইহার সুবাস চিত্তকে প্রসন্ন করে।




দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোঃ লিঃ
কলিকাতা-২৯

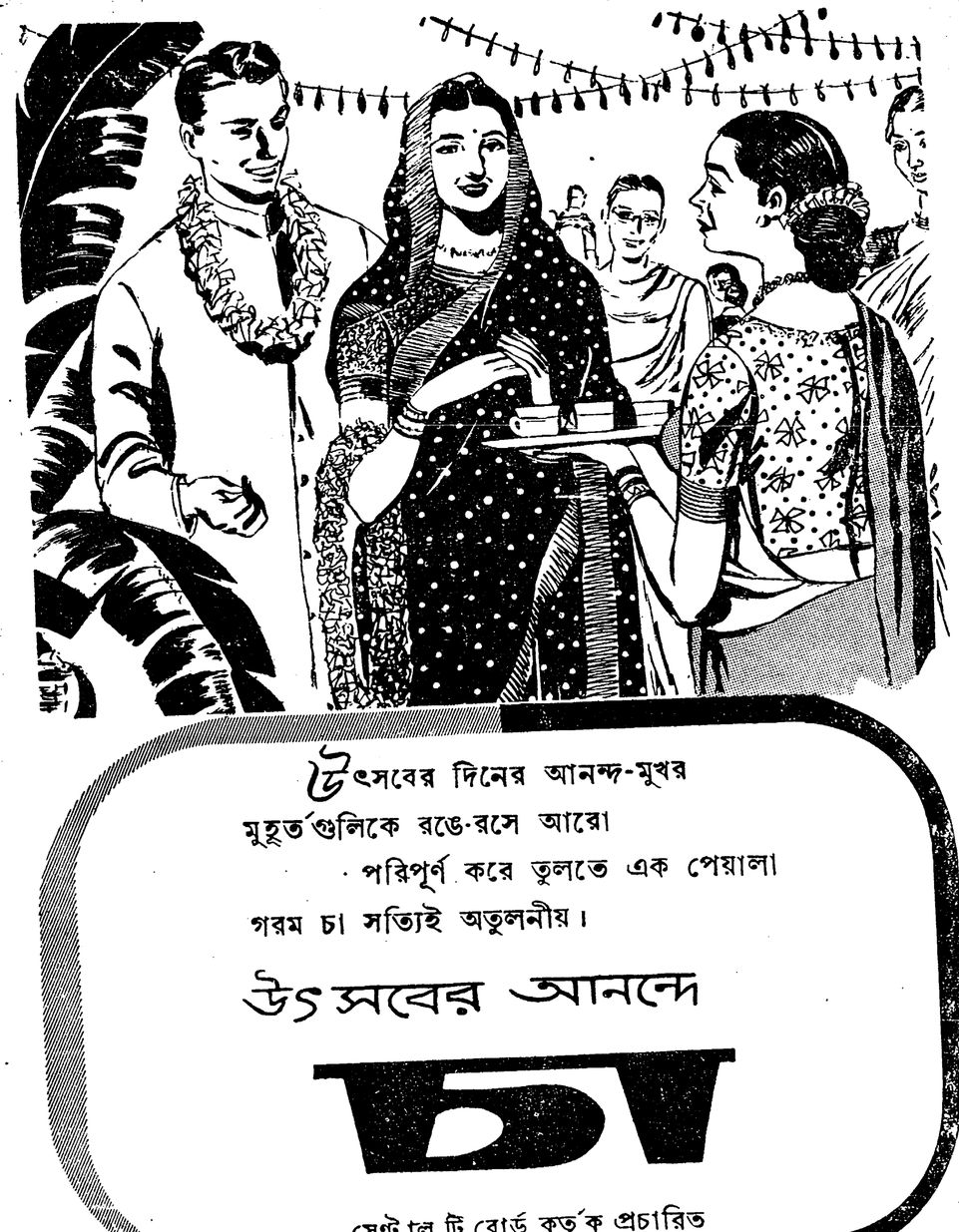

উৎসবের দিনের আনন্দ-মুখর
মুহূর্তগুলিকে রঙে-রসে আরো
পরিপূর্ণ করে তুলতে এক পেয়ালা
গরম চা সত্যিই অতুলনীয়।

উৎসবের আনন্দে

চা

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB-113

পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ—১৩৬০
অষ্টম সংখ্যা—অগ্রহায়ণ

# বাংলা কবিতার ছন্দ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

গান ভালো জানা থাকলেই গান গাওয়া যায়। গলা ভালো থাকলেই যে ভালো গান গাওয়া যাবে এমন কথা নেই। তেম্নি কান ভালো থাকলেই সুশ্রুত হওয়া যায় না—অর্থাৎ ভালো শ্রুতিবান হয়ে ধ্বনি-তত্ত্বের সুধন্য বাহক হওয়া চলেনা। আবার ভালো শ্রুতিবান হলেই যে ভালো গান বাঁধতে পারবেন তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। চাই ছন্দজ্ঞান। তবেই হবে কবিতা-জ্ঞানীর আবির্ভাব।

কবিতা মানেই খানিকটা গীতি। বাংলা কবিতা মানে অনেকটা গান। অন্তত তা-ই তার ঐতিহ্য। শৌরসেনী প্রাকৃত-পৈঙ্গলের দিন থেকে অদ্যাবধি এই একটা 'কমন ফেক্টর' আবিষ্কার করা যায়।

সুতরাং কবিতার পদ-রচনা করা এবং তাদের নিয়ে পংক্তি সাজিয়ে রচনাটাকে পাংক্তেয় করে তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের সহজিয়া-কালেও তা অত্যন্ত কঠিন অঙ্ক ছিল যদিও রাখালিয়া-মতি যাঁদের তাঁরাও মাঝে-মাঝে চমৎকার পদকর্ত্তা হিসেবে উৎরে গেছেন। কি ভাবে শব্দগুচ্ছ সাজালে ধ্বনির কি প্রবাহ নেবে, আর সে ধ্বনি সুরধুনী হবে, কি ভোগবতীর স্রোতে গিয়ে মিলাবে, এ-সঙ্কেতটা পদকার রচয়িতারা তাঁদের যুগে খুব ভালোভাবে জানতেন।

যুগের হিসেবে আমরা অতি পক্ক। সুফল পাওয়া গেছে ঢের—তারপর বিফলতা ঘনিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ কতোটা সময়ের জন্যে যে বাংলা কবিতার সৃষ্টি-ক্ষেত্র অনুর্ব্বর করে দিয়ে গেলেন তা আজ অনুমান করা যায় না। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথাবার্ত্তায় আমরা দেখতে-শুনতে পাই যে তিনি নূতন কাব্য-রচয়িতার আবির্ভাব প্রত্যেকটি ক্ষণেই

প্রত্যাশা করেছেন। তার এমন একটা মানেও করা যায়: তাঁর জীবিত অবস্থায় যাঁরা ভালো কবিতা লিখেছেন—তাঁর আন্তরিক বিচারে তাঁদের কেউ যোগ্য বাঙালী কবি নন।

তাঁর মনে করার কথা ছেড়ে দিলেও এযুগের কবিতার সৎ-বিচারে যোগ্যতাগুণ খুব কম কবিতাকারের মধ্যেই পাওয়া যাবে। নতুন কথা শোনান-ই কাব্য-কৃতি নয়—কথাই আছে: পুরনো মদ রসাল বেশী। অবশ্য সে-মদ যদি ভাতে তৈরী হয়। ভাত খাওয়া কি পুরনো মনে হয় কোনো দিন? চীনে হোটেলে ফ্রাইড-রাইস দেখে আমরা সানন্দে গলাধঃকরণ করি, কারণ, বস্তুটির আসল পদার্থ ভাত।

বাঙালীর সংস্কৃতি যেমন ভাত নামক একটি বস্তু খাওয়া—তেমনি বাংলা কবিতার সংস্কার রস নামক একটি বিষয় পরিবেষণ করা। পদকার-যুগকে ভালো বলি এজন্যে যে পদাবলীর দাস গোবিন্দরা-ও ও-রসে বঞ্চিত হননি। তার মানে, তখন প্রায় প্রত্যেক বাঙালী কবিতার দু-একটি সুললিত চরণ রচনা করতে পারতেন এবং তার সমঝদার ছিলেন সমাজের আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই। সবাই সে-যুগে গীতিরসাত্মক মন বহন করেছেন। তা যে ইদানীং সমূলে উৎপাটিত হয়েছে তা আমি মনে করিনে। বরং ভাবি: তার যে ভগ্নাংশ নিয়ে আজও আমরা বেঁচে আছি তাকেই আবার মালার আকারে সুঠাম করে তোলা যায়; ঐতিহ্যের বীজগুলো থেকে চমৎকার একটি ফুলের বাগান তৈরী হতে পারে বলে আমার আশা।

সে আশা কবে পূরণ হবে তার নিশ্চয়তা নেই। তবে পূর্ণিমার দিনটিকে ত্বরান্বিত করবার সমবেত চেষ্টা থাকলে, বাংলার জয়দেবের কাব্য রাজস্থানের রাণা-বংশও মন দিয়ে পড়বেন—বিদ্যাপতি মিথিলার মাগধী বন্ধন থেকে পালিয়ে বাংলার প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়াবেন।

এখন ছন্দের কথা। গীতগোবিন্দের জয়দেব আর রাধাতত্ত্বের বিদ্যাপতি হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ—যে কাজটি ছন্দের ঔৎকর্ষের সঙ্গে জড়িত। চণ্ডীদাসরা হয়ত একগণ্ডাই ছিলেন বাংলাদেশে, কিন্তু চণ্ডীদাস, জয়দেব বা বিদ্যাপতি একটি। লাখে-ও তেমন এক মিলেনা।

ছন্দের গোড়ার কথাও এক—চার নয়। পাঠ্য পয়ারেরই গোড়ার কথা এক—বিজোড় একক (Unit)। কৃত্তিবাস তা অনভ্যস্ত ভাবে তাঁর রামায়ণে পরিবেষণ করেছেন, তা-ই আর কেউ এ-পথে বেশিদূর এগোন নি। ভারতচন্দ্রের চাইতে মুকুন্দরাম পাঠ্য-পয়ারের ছন্দ নিয়ে বেশি এগোবার সুযোগ লাভ করেছেন, যেহেতু তিনি মঙ্গল-কাব্যের কীর্ত্তনীয়া। ভাগবত কীর্ত্তনীয়া চণ্ডীদাস-ও—হয়ত গুণরাজ খাঁ-ও ততোদূর এগিয়েছেন। কিন্তু গুণরাজ খাঁর (মালাধর বসু) অথবা বড়ুচণ্ডীদাসের ছন্দগুণ দ্বিজ চণ্ডীদাসে কোথায়? এমন পংক্তি কি আছে:



"তৌয়িলা দেবের সুমতি শুনী
কংসের ত্যাগক নারদ মুনি
পাকিল দার্‌ড়ী মাথার কেশ
বামন শরীর মাকড় বেশ।"

ঝড়ের মতো গতিবান ভারতের প্রান্তে ত্বইলাবৃতের হূণ অত্তিলার সুমতির হদিস ও তাঁর জুড়িদার নারদের আগমন-বর্ণনা দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস কি করে দিতে পারেন, বাংলার ঔপনিবেশিক (বাসলিগণ) কাথকুব্জের কবি ছাড়া? সংস্কৃত-ভাষায় যাঁর দখল নেই—নাগরিক কালিদাসের শ্রুতবোধ যাঁর বোধগম্য নয় সে গেঁয়ো কবি একঘেঁয়ে মধুই বিতরণ করেন। সে-মধুভাণ্ড বিদ্বানের হাতে জীবন্ত মধুচক্র হয়ে ওঠে। গ্রাম্য কবি বিদ্বান কবিকে দেশজ ভাষার পয়ার রচনাতেও ছাড়িয়ে যেতে পারেন না। চিরকাল গ্রাম্যকবিকে আদর্শ বলে হৃদিস্থিত করে রাখা গোড়ামির নামান্তর।

উদ্ধৃত চারটি পংক্তিতেই বোঝা যাবে বড়ুচণ্ডীদাস বা সেন-আমলের গুণরাজ খাঁ-ই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা। আমি ১৯৩২-সনের পূর্ব্বাশায় গুণরাজ খাঁ-র 'রাধাতন্ত্র'-সম্পর্কিত একটি পাণ্ডুলিপির আলোচনা করেছিলাম। তিনি সেখানে রাধাতত্ত্ব অর্থাৎ রাসে আবির্ভূতা কৃষ্ণাত্মিকা শক্তি রাধার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি ত্রিপুরা গুণাইগড়ে প্রাপ্ত। গুণরাজ খাঁর গুণই শুধু নয়—রাধা-সহ তাঁর বংশ তদঞ্চলে ছিল। অদ্যাপি আছে। এই কনৌজী ঔপনিবেশিক সম্প্রদায় কোথাও ব্রাহ্মণ, কোথাও কায়স্থ। তন্ত্রের দিনে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ-কায়স্থে ভেদাভেদ ছিল না। বাংলার বৈষ্ণবতা পঞ্চরসাত্মক এবং তন্ত্র-প্রভাবিত।

ঝগড়া-বাজ নারদ মুনিকে চারণ চরিত্রে পরিণত করার কাজ দু'টি কথাতেই সম্পন্ন করেছেন গুণী চণ্ডীদাস। এই চরিত্র-চিত্রণ শরৎচন্দ্রে আমরা যেমন দেখতে পেয়েছি আর কোথাও তেমন নয়। কিন্তু এখানে কবির জাতি বা সাহিত্য-সৃষ্টি-ক্ষমতার কাহিনী আমি বলতে ইচ্ছুক নই, বলব তাঁর ছন্দ-রচনা-শক্তির কথা। বলব ওই চারটি নাগরিক পংক্তি-দৃষ্টে।

আজকের দিনে যাকে আমরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দ বলি এবং যার সার্থক পুনরাবির্ভাবের জন্যে বাংলাদেশকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে তা প্রাচীন বাংলা কবিতায় কিছু-কিছু ছিল। কিন্তু এ-ছন্দটিতে মাত্রাবৃত্তের যে ঢং দেখা যায় তা রবীন্দ্রনাথেও বিরল। ছন্দটি বস্তুত এগারো মাত্রার, মানে, বিজোড় মাত্রার। তিনের মাত্রা (ধ্বনিগুচ্ছ) নিয়ে ত্রিভঙ্গে চলেছে এবং পলায়মান নারদকে পেছন ফিরে তাকাবার জন্যে ধ্বনির একমাত্রা অবকাশ রাখা হয়েছে পদ-প্রান্তে। যে-স্থলে হোঁচট খাওয়ানো বা থামানো

হ'ল গতি—ছন্দের জরিপ করবেন যাঁরা, তাঁরা সেখান থেকে সুরু করে ধ্বনি-গুচ্ছ বা পদ-পাতন গুনে যাবেন এবং চলার সুরুতে গিয়ে দেখবেন ক'টি গুচ্ছ দাঁড়াল, গুচ্ছগুলো কেমন, ক'টা করে ধ্বনি, ধ্বনিগুলোর রকম প্রভৃতি। মোট যতোটা ধ্বনি পাওয়া গেলো ধ্বনির ধার্য্য-মান-অনুসারে ছন্দটি ততো মাত্রার হল। নারদ-মুনি এখানে তাৎকালিক বাঙালীর মান অনুসারে ১১-টি ধ্বনির পর থেমে-থেমে গতি-ছন্দ নির্ম্মাণ করেছেন।

এখন গুচ্ছের বিচার—তা না করলেও চলে। যদি করতেই হয় তাহলে তাকে ৩+৩+৩+২ বা ৬+৫ এ-দু'রকমে করা যায়। কিন্তু ছন্দের আইন অনুসারে এর পারিভাষিক নাম তিন ( বিষম ) তোড়ার এগারো মাত্রার ছন্দ বা সম-বিষম ( ৬+৫ ) তোড়ার এগারো মাত্রার ছন্দ। এ-ছন্দ থেকেই চরণে সম-বিষম পদ-ক্রম সংক্রান্ত। যেমন :

জসু সীসহি গঙ্গা | গোরি অধঙ্গা | গিম্ পিন্ধিঅ ফণি—হারা
৭ + ৫ + ৭ + ২ .

একুশ মাত্রার এ-ছন্দটি প্রাকৃত পৈঙ্গলের। কালিদাসের সংস্কৃত ছন্দ-নিয়ম প্রয়োগে তা ( ১০+৮+৮+৪ ) তোড়ায় সম-মাত্রিক হতে পারে। 'রিথ্‌মিক-প্রোজ' এ-ছন্দ থেকেই জন্ম নিয়েছিল। তখন একে সমান তিনটি গুচ্ছে বা তোড়ায় ( ৭-ধ্বনির ) বেঁধে নেওয়া হত—তাতে ছন্দদোলা কমে গিয়ে শুধু ধ্বনি-স্পন্দন থাকবে চরণটিতে। প্রথমগুচ্ছে অন্তে ধ্বনি-স্পন্দন, দ্বিতীয়গুচ্ছে মাঝখানে এবং তৃতীয়গুচ্ছে সুরুতে। স্পন্দন যুগ্মবর্ণের।

রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এই : তিনি এ-ছন্দে কালিদাসের একটি মাত্র আইন প্রবর্ত্তন করেন। আইন-টি এই যে ধ্বনি-গণনায় যুগ্মাক্ষরে দুই ধ্বনি ধরতে হবে। অর্থাৎ যেখানে বড়ু-চণ্ডীদাস বলছেন :

লাক্ষ দিৎঞা খনে আকাশ ধরে

সেখানে 'লাক্ষ' কথাটির রাবীন্দ্রিক ধ্বনি হবে তিন। তাহলে-ও হয়ত গুণরাজ চণ্ডীদাসের আপত্তি নেই, তিনি বলবেন : তিনের মর্য্যাদা আমিও ক্ষুণ্ণ করিনি, লাফ দিতে খানিকটা সময় গেছে ত নারদ মুনির, তা-ই সে সময়টাতে বাড়তি দুটো ধ্বনি খরচ হয়ে গেছে। ফল দাঁড়িয়েছে তেরো। লক্ষঝম্ফে গতিও কিঞ্চিৎ এলোমেলো হয়েছে। ঠাকুর যদি তাকে ৮+৫ ভাবেন তবে 'গগনে গরজে মেঘ ঘন-বরষা'র ধ্বনি শুনতে পাবেন—আমিও তাই শোনাতে চাই—দর্ম্মিলাত্মজকে নিধন করবার জন্যে ভগবান বাসুদেব জন্ম নিচ্ছেন অষ্টমীতে বর্ষায়, তাই নারদের স্ফুর্ত্তি।

কিন্তু ছন্দের বৈজ্ঞানিক বিচারে আসল কথা তা নয়। কালিদাসের কাব্য গীতি-কবিতার পথ ধরেছিল বলেই ধ্বনির সর্ব্ববিধ বিস্তারকে কবি অনুভূমিক দিকে ধাবিত দেখেছেন। আসলে তার ঊর্দ্ধাধ গতিও আছে। যুগ্মবর্ণের উচ্চারণে আমাদের বাঙালী



বাক্‌যন্ত্র যুগ্মবর্ণে নিহিত বিভিন্ন ধ্বনিগুলোকে একটি মিশ্র-ধ্বনি হিসেবে ব্যবহার না করে পৃথক-পৃথক বর্ণাত্মক ধ্বনিতে ব্যক্ত করে বটে কিন্তু সেই ব্যঞ্জনা, হয় একটি ধ্বনি-উচ্চারণ-কাল গ্রহণ করে, নতুবা দু'টি ধ্বনি ঊর্দ্ধাধ গতি নিয়ে যতোটুক কালক্ষেপ করে তা একটি ধ্বনিরই কাল-পথের তুল্য। তার মানে, যুগ্মবর্ণে আমরা প্রস্বন ( Accent ) দিয়ে থাকি। শ্রুতিতে তার ফল অনুভূমিক। অনুভূমিক হয়ে তা বেশি কাল-ক্ষয়ী বলে অনুভূত হয়। অনুভূতিকে বাস্তব রূপ দিতে গিয়েই যতো মুস্কিল আর আইন-কানুন।

বাংলা যুগ্মাক্ষরে এক মাত্রা ধার্য্য হয়েছিল। তবু উদ্দেশ্য ছিল শ্রুতিফল। ছন্দ-বিচারে ছন্দনির্ম্মাতাদের উদ্দেশ্যের কথা অনেকেই ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথের মাত্রাবৃত্ত-ছন্দ-নিয়ম আবিষ্কারের আগে বাঙালী কবিরা হয়ত ছন্দের এই বৈজ্ঞানিক বিচার করতেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামেও দেখি :

"কপালেতে দিব সে চান্দ-ফোঁটা
খেলাইতে দিব সোণার ভেঁটা।"

এমনও হতে পারে যে 'চাঁদ' আর 'চান্দ' উচ্চারণে নাকের পরিশ্রমের তারতম্য হতনা 'হাতে চান্দ কপালে সূর্য্য-ওয়ালা' বাঙালীর। সহজ-সিদ্ধার জাতি চাঁদ-সূর্য্যকেই বগলদাবা করেন নি, বাক্-ধ্বনি নিয়েও ছিনিমিনি খেলেছেন। কাজেই যুক্তবর্ণে অযথা নিয়ম প্রবর্ত্তন করবার পক্ষপাতী ছিলেন না প্রাচীন পদকর্ত্তারা। বাঙালীর কণ্ঠে সহজ-ভাবে যতোটুকু সুর খেলে, শ্রুতিতে দু'টি অসমান মাত্রার পদ সমান মাত্রায় নিয়ে আসতে ততোটুকুই যথেষ্ট ছিল।

[ প্রথম-অধ্যায় সমাপ্ত ]

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা।

—বাল্মীকি

# কবিতাগুচ্ছ

## একটি ঐতিহাসিক কিংবদন্তী

[ কোনো হয়শাল রাজমহিষীর জন্যে ]

ভূমেন্দ্র গুহ

'হালে' 'বিড়ু' হালেবিড়ে হালে মহীশূর
গ্রামীনেরা অসহায় ক্ষীণ করে সুর
ভয়ে ভয়ে এই কথা বলাবলি করে :
—নিঢেউ নিবাত রাতে শালপাতা খসে যায়, ঝরে
মর্মরের দীর্ণশ্বাস, একবুক ভয়—
: জানো, আজো তার ঠোঁটে নীল বিষ বয় !

নীলকণ্ঠ তুমি নও, শুধু নীল বিষ
কূলে কূলে ছলকায়, খরধার শিষ্
কাচের ছুরিকা হয়ে চূরমার হবে
কামরক্ত ঠোঁটের গৌরবে।
সূর্যের বলয় হলে, তার খর প্রাণ
সুনিবিড় স্থিতপ্রজ্ঞ আশ্বাস-দান
করে না তো, শুধু তার লেলিহান রোদ
মায়াবী পাথর চোখে হয়েছে দুর্বোধ।
আর তারা কানাকানি করে
সুবিশাল রাত হয়ে আঁধার হৃদয়ে
: বিস্রস্ত বসনা লোল নায়িকাটি হয়ে
ঢের যুগ রয়ে গেছো, রবে আরো নীল অন্ধকারে
তিলে তিলে ক্ষীয়মতী চোখের অনলে।
যার সুরু কোনো এক তেরোশো ধূসর দূর সালে।



কালের কুটিল-কূট খেলা শেষ হলে
রাষ্ট্রকূট পল্লবের পল্বলের তলে
হয়শাল বল্লাল এসে।
ভয়ে ভয়ে এই কথা ভাবে—
সুদীর্ঘ মিছিলে যদি পথের ধুলোর কিংখাবে
কিছু আলো সোনা ধন অগুরুর কিছু বা নিঃশ্বাস
রেখে যেতে পারি কিংবা মৃত্তিকা-মায়ের কিছু আশ
বুকের আঁধারে সুপ্ত শিশু পুতুলের—
শিশুহন্তা সময়ের পরুষ প্রেমের যজ্ঞে মাতা ও ছেলের
ক্ষীণ আর্তনাদ !
আর্তকণ্ঠ তারপরে মেলে দেয় স্বর
'হয়শালেশ্বর'।
দীর্ণ হয় মন্দির-চত্বর
হস্তীযূথ মন্দ্র হয়, ব্যাঘ্রের মিছিল
ব্যগ্র হয় শাস্ত্রী হতে শান্তিতে নিখিল
ভরে দিতে বীর্যবান স্বপ্ন রেখে তাতে—
নায়িকারা বিলসিত সপ্রেম মুদ্রাতে।
ধীরে ধীরে 'হালে' 'বিড়ু' ডোর সমুদ্রের
মন্দিরেতে আরত্রিক, হাওয়াতে ধূপের
সুগন্ধ বিলাস
শেষ হয় তবু তুমি আছো বারোমাস।

তুমি আছো, কাল আছে
নিয়তই কাল প্রেমে বাছে
খুঁজে নিয়ে তোমাকে—তোমাকে—
অথবা কি সৃষ্টি করে' তোমাতে নিঃশ্বাস নিয়ে থাকে !
না-হলে যে-গল্প স্মার্তদের
মনে মনে জমে আছে, তার ব্যাপ্তি ঘের
অতীব কৃপণ কেন, বিষয়-মাফিক,
গ্রামীন কথার তেলে জ্বলে ঝিক্‌মিক্ :

: হয়শালা-সম্রাটের দুঃস্থা সহোদরা
বিরূপ ভাগ্যের ঝড়ে ছিঁড়ে দড়িদড়া
স্বামীর বন্দর থেকে, এলোমেলো নানা তুঙ্গ জলে
ঘুরে ফিরে শেষকালে তোমারই মহলে
আশ্রয়ের উপকূল পেলে—
সাথে দুই অরুণাভ ছেলে।
কিন্তু রাণী, তব প্রেম তীক্ষ্ণ নীল বিষ হয়ে আছে
তীব্র দৃঢ় ঠোঁটের কানাচে ;
তোমার নিশ্বাসে হিস্ হিস্
সাপিনীর মতো আছে বিষ
চারুতায় সরু করে বোনা ;
তুমি যদি সূর্য হও, সে-সূর্য তো প্রাণ ঢালবে না
শুধু দেবে প্রাণান্তিক দাহ ;
পাবে না, পাবে না রক্ষা ছেলেদের কেহ।

ভুলে যাবে, ভুলে গেছে, তবু একা একা
বিস্রস্ত বসনা এক প্রস্তর নায়িকা
তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে বিষের অনলে
সাক্ষ্য দিতে রয়ে যাবে ঢের দূর কালে।
এই কথা গ্রামীনেরা বলে ভয়ে ভয়ে
: সেই রাণী রয়ে গেছে লীলাক্লিন্ন হয়ে !

রাণী, তুমি সময়ের দূতী
( তারা ইতিউতি
যদিও বা এ-কথাই বলে
শিশুবধে না-হলে যে কেন লিপ্ত হলে )—
তবু তুমি সবটুকু সময়ের নয়,
মৃত্তিকার নয়,
এ-কথাও সত্য, মনে হয়।
কেননা সবাই যাবে নিদ্রায় আরামে



নীল-ঘুম সময়ের দক্ষিণে ও বামে,
গেছে সব হয়শাল বল্লালগণ
নিবিড়ে মাটিতে গেছে বিষ্ণুবর্ধন,
তবু তুমি রবে হালেবিড়ে
ঢের দিন স্মার্ততার ভিড়ে
নির্বসন দেহে, অনলস
পাথুরে উজ্জ্বল চোখে ঢেলে দেবে তিক্ততর বিষের কলস।

## মৃত্যুঞ্জয়

বংশীধারী দাস

হেমন্তের রোদ আজো সোনা হতে দেখেছি যখন
ধানের উদ্ধত শীষে, মেঘের গুণ্ঠন
ছিঁড়ে ফেলে নীল হতে দেখেছি আকাশ,
শুনেছি নির্জন লেকে এখনো হাওয়ার ফিসফাস
এখনো যখন তার কচিমুখে স্পর্শাতুর মন
ছায়া ফেলে, একরাশ ফিন্‌ফিনে চুল
বাতাসে ছড়ায় গন্ধ, এই উপকূল
কান পেতে শোনে আজো সমুদ্রের বুকের স্পন্দন
গভীর উত্তাপ ভরা—

সময়ের জতুগৃহ তাই
কৌরবের রৌরবীয় রোষে যদি পুড়ে হয় ছাই,
শকুনীর কূটচালে সময়ের পাশা
নির্বাসিত করে যদি পাণ্ডুপুত্রদের সব আশা
এখনি নিভিয়ে দিয়ে বিদায় নেওয়াই
শ্রেয় নয় সময়ের ম্লান হাত ধরে,
তার চেয়ে হৃদয়কে আরো সত্য জেনে তুচ্ছ করে
হৃদয়ের গানে এই ধূসর সময়, চলো যাই।

## ঘর পোড়া মন

সৈয়দ শামসুল হক

ঘর পোড়া মন সিঁদুরে মেঘের বর্ণালী দেখে হতাশ্বাস।
ক্লান্ত নখরে সারা দিনমান ভূতের মতন,
রৌদ্র অথবা বৃষ্টিকে ঠেলে আহারাদি খুঁজে যক্ষাকাশ
হয় যদি বলো কামনার মেয়ে, তবু কি ক্ষীরোদ
চন্দ্রের আলো বুলোবেই তুলি ? রাতভোর শুধু আয়না-হ্রদ ?

কালরাত ভোরে দৈনন্দিন
খাতা খুলে বসি, শকুনির ঠোঁটে লুপ্ত দিন
ভীরু চোখ মেলে কথা কয়ে ওঠে, বুঝিনা কিছু :
ছায়া ছায়া কেউ কানে কানে এসে ছবি আঁকে এক
ভীষণ নরক, ভেংগে পড়া আর ক্ষয়ে যাওয়া।
সত্যি কি বলো তন্বী কুমারী এলোমেলো সব হতাশা সার ?
তবু তো দুচোখে ভেসে ওঠে দেখি সম্মুখ দিন স্বপ্ন কিছু,
আনত ধানের নব মঞ্জরী : অশোক স্তবক
আলো ভেজা মুখ উন্নত করে ছড়ায় সলাজ
মরমের হাসি, তিমির-বিদার !

পুরোনো দিনের জঞ্জাল যত ভীড় করে মনে কখনো খানিক :
আসমানী রাতে চমকিয়ে উঠি সম্মুখে দেখি জ্বলছে মাণিক।
অন্ধকারের গলিঘুঁজি ঘেঁটে চোখে ছানি পড়ে চোখ বিভূল :
মাণিক উধাও, সুদূর আকাশে জ্বলছে তখনও তারাবাতি আর
তোমার চুল
অরণ্যঘন ছায়াপাত করে আকাশ জুড়ে।
সকালের চিঠি ডাকে এসেছিল সন্ধ্যে না যেতে খামে রাখি মুড়ে।
হয়নি ত পড়া, হবে কি জানিনে
তারপর দেখি সারারাত ধরে ঘুম পলাতক।
তক্তপোষের পায়াভাঙ্গা পিঠে ছেঁড়া কাঁথা মেলে ঘুম কি আসে ?
আনমনে তাই এলোমেলো করে আবার সাজাই ধুসর ছক।



## উত্তরণ

আবুল ফজল সাহাবুদ্দীন

রাত্রির আতঙ্ক নিয়ে স্তব্ধ দীর্ঘ ঢেউয়ের কল্লোল
আবেগের অস্ফুট মর্মরে কাঁপে, সূর্য্যমুখী মন
সমুদ্রের সবুজ মেয়েকে খোঁজে ক্লান্তির পল্লব
ঝলসানো রোদে শুষ্ক মুখ ক্ষীণাঙ্গীর প্রসাধন
সেরে নেয়।
আশ্চর্য্য সমুদ্রকন্যা আসবেই নেমে
অতি সন্তর্পণে কোন এলোমেলো অস্পষ্ট ছায়ায়
নক্ষত্রের ক্ষীণ হাসি কেঁপে যাবে অন্ধকার প্রেমে
আলগোছে রেখে যাবে ঢেউ তুলে সারা চেতনায়।

শ্রাবণ দিগন্ত থেকে এক খণ্ড ঘন নীল ঝড়
তুলে যাবে সাড়া এই বন্দরের পরিত্যক্ত তটে
পৃথিবীর অবলুপ্ত কোন এক জীর্ণতার পটে
ভাস্কর তুলিতে এঁকে এঁকে যাবে আশ্চর্য্য প্রখর
নারী মূর্ত্তি এক, পৃথিবীর শান্ত অন্ধকার ঘাসে
শুয়ে থাকা মন সেই অশ্রুনীল তরুণীর সুরে
কথা বলে যাবে ক্লান্ত বনপথে নদীর নূপুরে
হয় তো বলবে কথা অনুরাগে নীলাভ আকাশে।

## যাচনা

শ্রীমতী নীলিমা বিশ্বাস

বেদনার সিন্ধুতলে ডুবে যাই আমি
অঙ্গে অঙ্গে বেদনার জাগে শিহরণ।
কুৎসা কশাঘাতে পথে কখনো বা থামি
ভুলতে পারিনে তবু তোমার নয়ন।
রাত্রির অরণ্যে ফোটে কত তারাফুল।
পূর্ণিমার রজনীতে জ্যোৎস্না গলা জল।

কঠিনতা কঠোরতা সবি যেন ভুল।
নীলাকাশে মুগ্ধ আঁখি শুধু ছলোছল।

রোদনী সিন্ধুর তলে এ দিনের ছায়া
দোলে তবু ওই দুটি শ্যামস্নিগ্ধ আঁখি
ভুলতে পারিনে। আজো মন্দ্র মেঘ-সুর
ভ'রে দেয় নীলাঞ্জন আকাশের মায়া।

ধরণীর দ্বেষ হিংসা ক্লান্তি ম্লান গ্লানি
ভোলাও আমায় যবে শ্যামল বর্ষণে
মনের বলাকা মেলে সচকিত ডানা
আভাময় অপরূপ আমার রজনী।

## অংগীকার

সত্যেন আচার্য

বিদ্যুতের বল্গা ধরে প্রচণ্ড উদ্বেগে
ছিঁড়ে দেব কৃষ্ণঘোর মেঘের ওড়না,
তারপর স্বচ্ছনীল রোদ্দুরের দেশে
মূর্ত এক উন্মুখর সজীব কামনা।

তোমার আশার বৃন্তে হতে চাই দুরন্ত ফাল্গুন,
ফুলের বাসর কুঞ্জে শুভ্রতায় প্রস্ফুটিত মন,
সাত রঙে রং করা রামধনু আকাশের তলে
বুঝি তাই স্বপ্ন এক নীল স্বপ্নে আশার প্রদীপ ছুঁয়ে জ্বলে।

স্বপ্নিল সম্মোহ নিয়ে দিয়েছি ত সব উপচার,
তবে বুঝি মানবী এবার!

## ইলেকট্রন

পরমেশ ধর

জানিনা কোথায় সুরু শেষ কোন দূর উপকূলে
চেতনার তেপান্তরে প্রাগৈতিহাসিক সত্তা পথ খুঁজে ফেরে।



সূর্য্যে জ্বলে কচি প্রাণ। সাগরী বাতাস এসে বিলি দিয়ে যায়
কালো চুলে।
আমি আর ঈভ রাত্রে চোখে চোখ রাখি। সৃষ্টি দ্বৈরথ
শিলালিপি এঁকে যায়, কম্বোডিয়া অজন্তার অমর পাথরে।
তারপর একদিন আকাশের তারা খসে সুরভিত কত ফুল ঝরে।
আকাশ মাটিতে কিম্বা রূপান্তর অবিরামঃ অণু থেকে অণুর শরারে,
থাকে শুধু সময়ের অন্তহীন আকাশের স্তব্ধতার তীরে :
আণবিক আবর্ত্তন···ভোরের পাখিরা সব ফিরে যাবে রাত্রির
শিবিরে।

## আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ঃ একটি সকাল

বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁচা রোদে ধোয়া-মোছা সূর্য ওঠা কোন রবিবারে
সেই আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে অযথাই পথ ভুলে গেছি মনে হয়,—
যখন শীতের ভোরে জমাট হাওয়ারা গ'লে আসে,
আলোর শপথে ভরে পথ, আর মনের উঠোন।
সোণার জাজিম জ্বলে,—তাম্র পীত। শুধু একধারে
মাড়োয়ারী সেবাশ্রমে লাল রঙ গাঢ় হয় আরো।

ব্যাটে বলে মাতামাতি পার্কের হিমে ভেজা ঘাসে।

আকাশ অনেক বেশি নীল। তাই ঈগলের মন
ঝাঁপ দেয়, ডুব দেয়, সে আরামে ; ঘোচায় সংশয়!

আমারো পায়েরা তাই ছুটী চায়। পথে হেঁটে হেঁটে
ক্লান্ত তারা ; সিক্ত তারা ; রবিবারে প্রসন্ন আমেজে।
দোতলার বারান্দায় ভিজে শাড়ী সকালের আলট্রা-ভায়োলেটে,
কাঁপছে শীতার্ত ছন্দে। সিটি কলেজের মোড় ঘোরে
তন্বী এক, বই হাতে ; রঙীন আঁচলখানা জড়ানো কোমরে।

রোদের উত্তাপ ঝরে ফুটপাতে রোমাঞ্চিত কুকুরের লেজে।
তখন আমারো প্রাণ ঝাউ হয়ে কথা কয় ; চিল হয়ে ওড়ে!

## অতীত-অধরা

শোভন সোম

রাত নিঝুম। আকাশ কালো। কৃষ্ণচূড়ায় হাওয়ার চুল ওড়ে।
ব্যথায় ছাওয়া অন্ধকারে জানিনে কার চোখের জল ঝরে।
জানিনে কার। আমাকে পিছু ডাকে
স্মৃতির মলিন শিয়রে তার নরম হাত রাখে।

জানিনে, সে কে। যে ছবি আমি বাঁধিনি বুঝি ক্রেমে
গানের শমে চকিতে শুধু থেমে ;
হয়ত সেই মুহূর্তেরই সলাজ অনুরাগ
আমার স্রোতে আঙুলে তার কাটছে ফের দাগ।
যে তারা তার আলোতে জলে ছাই
হয়েছে, তাকে অন্ধকার আকাশে, বলো, কী করে খুঁজে পাই ?
পাবোনা, জানি। ছিলো সে যতদিন
পেলো কী দাম ? সময় যদি বাড়াতে থাকে ঋণ
পুরোণো কথার কড়িতে ভরে। এ'রাত নাও। জলের দাগে বিবর্ণ যেই ছবি
কী করে ভোরে আলোর তারে বাজাবে ভৈরবী ?
তবু কে ডাকে, কে চেয়ে থাকে হারিয়ে যাওয়া চোখের ছায়া মেলে
আমার দীপে স্মৃতির শিখা জেলে ?

যে কথা গেছি ভুলে—
আমার কূল সে কেন ভাঙে অকূল-ঢেউ তুলে ?
অতল রাত। আকাশ বৃথা টেনেছে মেঘ-সীমা
পৃথিবী ছুঁতে। আমার ডালে কৃষ্ণচূড়ার ব্যথার রক্তিমা ॥

## নাপিত বৌয়ের দুঃখ

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশ শুক্তির থেকে মুক্তা ঝ'রে পড়ে
আমার মনের মাঠে, দূর নদীচরে,
নাপিত বৌয়ের চোখে



নব শোকোচ্ছ্বাসে—
ঝর ঝর ঝর ঝর রিম ঝিম !
উঠানে নাপিত বৌ একা থাকে ঘরে
আজই সকালে তার ছেলে গেছে মারা
এখ্‌খুনি চালখানি উড়ে গেছে ঝড়ে
কী নির্মম ভাগ্যের ইসারা !
ভেঙে গেলে শেষ আশ্রয়
যতোখানি রয়
নিয়তি কি সেটুকুও সয় ?
পাশের ডোবাটি ওর জলে ভরো-ভরো ;
নাপিতের বৌ কাঁদে গাভী বৎসহারা—
চোখে ঝরে জল আর কাঁপে থরো-থরো
তার সাথে পাল্লা দেয় শ্রাবণের ধারা !
আহতে ও অনাহতে সব নিয়ে ওঠে এক রোদনের সুর—
রক্তের আনাগোনা যেহেতু এ ধমনীতে রণিত বিধুর !

প্রাণ, অপ্রাণ, নিকট, দূর
এই পৃথিবীর দুর্জ্ঞেয় সুর
কম্পমান।

নদী-বন-অন্তরীক্ষ-গ্রামান্ত
বিক্ষুব্ধ আত্মার প্রান্ত থেকে প্রান্ত
গান গায় কী করুণ, ছেয়ে যায়—
সন্ধ্যা-দিগন্তের আব্‌ছায়ায়
হ'লো লীন—লীয়মান—বিধূনন-ক্লান্ত।

অধুনার অবকাশ অসাড়
বিলাপ করেনা রজনীগন্ধার ঝাড়
বাসরের বিলাস কক্ষের
বিহ্বল যুগল বক্ষের।

মেঘ-মেদুর-অম্বরে সেই জয়দেবের বিষ্টি
তার চেয়ে যে নাপিত-বৌয়ের কান্না কতো মিষ্টি

সাধ্বী মাধ্বীক ! চিন্তা ন ভবতি ভবতঃ, শর্করে ! কর্করাসি,
দ্রাক্ষে ! দ্রক্ষ্যন্তি কে ত্বামমৃত ! মৃতমসি, ক্ষীর ! নীরং রসন্তে।
মাকন্দ ! ক্রন্দ, কান্তাধর ! ধরণীতলং গচ্ছ···
মেঘের সঙ্গে মনেরও আকাশ উপস্থিত অনচ্ছ।

প্রার্থনায় ডাকছে মোয়াজ্জিন—
হ'বো-হ'বো করছে সন্ধ্যা !
দূর মসজিদের অনুনাসিক আজান
অঙ্গন-লগ্ন ঝাঁকড়া-মাথা পেঁপে গাছটি বন্ধ্যা !
হঠাৎ এসে ঘাড় বেকিয়ে দাঁড়ায় কেন মনে ?
জীবন-মৃত্যুর
সন্ধ্যা-গোধূলির
এই সন্ধিক্ষণে !

মৃত্যুকে ভয় করি তবু মৃত্যুতেই আসান
অনুভূতির মধ্যে আসে প্রাণ, অপ্রাণ,
নিকট, দূর—
এই পৃথিবীর দুর্জ্ঞেয় সুর
বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যা জুড়ে কম্পমান।

## একটী এলেজি

বটকৃষ্ণ দাস

সবচেয়ে নীল চোখ যার,
সে মেয়েটি মারা গেলো
দুদিনের জ্বরে।

পৃথিবীকে ডেকে বললাম ঃ
"তুমি তার লিখে রেখো নাম
তোমার পাথরে।"

তারপর তিমির জোয়ার
বুকে নিয়ে রাত্রি এলো,



মুছে গেলো আকাশের নীল।
নগ্ননীবি, স্খলিত বসনা
সব নীল নক্ষত্রের কণা
খুঁটে নিয়ে, গেঁথে নিলো তার
দীর্ঘ স্তনহার।

গভীর ঘুমের থেকে জেগে
পৃথিবীকে আমি শুধালাম ঃ
"কোথায় লিখেছো তার নাম
আলোকের রঙে ঝিলমিল ?"

সে দিলো জবাব ঃ
"যে পাথরে ঢেউ লেগে লেগে
সব রঙ ধুয়ে মুছে যায়,
নাম লিখে সেথায় কি লাভ ?
তাই সেই নিরুপম নাম
জলের আখরে লিখলাম
তোমার চোখের কিনারায়॥"

## সরস্বতী

[ ঋগ্বেদ, সপ্তম মণ্ডল। বাসিষ্ঠ ত্রৈষ্টুভ ছন্দ। যাঁরা সারস্বত ছিলেন এ ষড়ঋচ বা ছয়টি ঋক্ তাঁদের নির্ম্মাণ। তাঁরা প্রয়াগের প্রথম আর্য্য ]

॥ প্রথম ঋক্ ॥ পাবীরবী কন্যা চিত্রায়ু এখানে সরস্বতী ॥

ধাত্রী যাত্রী উদক-বহনে ত্বরান্বিতা
স্যন্দনশীলা সরস্বতীর গাইব গীতা।
তুমি মনোরথী ব্যবধান-রচা অঙ্গে অতি,
আয়সী-অরুণা আমাদের তুমি সরস্বতী॥

॥ দ্বিতীয় ঋক্ ॥ পাশুপত আদিত্য চেদীর অতীতা নদী ॥

একা তুমি যেন অচেতনা নদী গিরির দেশে
শুচি গতি-শীলা অবশেষে গিয়ে সাগরে মেশে

এনে দাও রায় প্রভূত বিভব ভুবন ভরে
পিপাসী নাহুষ মোদের ঘৃতের দুধের ঘরে ॥

॥ তৃতীয় ঋক্ ॥ মধ্যভারতের ব্রতী পাশুপতদের নদী ॥

যজ্ঞের হেতু শিশু-বৃষ কর ধারণ তুমি,
মঘবান্ ঋষি তাই তো পেয়েছে যজ্ঞভূমি।
সরস্বতের দেবতা এ-পশু, সেবাই সৎ
ধর্ম্ম তাঁদের, সবার তনুরে করা শ্রীমৎ ॥

॥ চতুর্থ ঋক্ ॥ নৈষিবস্তের প্রাক্তনা নদী ॥

উদিতা জুষার প্রীয়মাণা এই উৎসা নদী
শ্রবণ-সুভগা যজ্ঞ-বাহিনী জন্মাবধি।
নমস্য মিতক্ষুভার ঐরিয়ানার রায়া,
নমো-নমো উত্তরা-সখী যাঁরা যোষিত-কায়া ॥

॥ পঞ্চম ঋক্ ॥ গোপী দধিকাগ্বদের নদী ॥

নমো যোগে তুমি প্রতি স্তোমে হও যুক্তমতী,
হবি-আহ্বানে তোমাকেই ডাকি সরস্বতী।
গোপী-প্রিয়তমে তোমার শর্ম্মা তোমার কোলে
আশ্রম নেবে যাবেনা কখনো বৃক্ষতলে ॥

॥ ষষ্ঠ ঋক্ ॥ বসিষ্ঠের নদী সরস্বতী ॥

বসিষ্ঠ আছে, আছে আজও সেই বায়ুর দেশ
দ্বারাবতী আর দ্বারবৃতেদের সুভগ শেষ
বর্দ্ধন করো, শুভ্রে, গীতির রাসের ভাষে
অন্ন-অগ্নি-স্বস্তিকা যেন সদাই আসে ॥

[ অনুবাদকের মন্তব্য : সাতমাত্রার ত্রিষ্টুভ ছন্দ অনুসৃত হয়নি অনুবাদে। ত্রিষ্টুভ 'দীর্ঘ-হ্রস্ব-দীর্ঘ-দীর্ঘ' প্রস্বন-যুক্ত লয়ের ছন্দ। এ-লয়ে অনূদিত পংক্তিগুলো পড়া যাবে। অনুবাদক—সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ]

# বেবি শো

## অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

চারটেয় কলে জল আসে রোজ।

আজ যেন খানিকটা আগেই কলে জল এসে গেছে।

সবে তো দুপুর পেরোলো। আগুনের হলকার মতো হাওয়াটা এখনো ঘরে এসে ঢুকছে। ভরা দুপুরের রোদের তাত এখনো চারধারে। ওদিকের ফুটপাতের উপর খানিকটা টেনে-তোলা একটা রিকশা। রিকশাওয়ালা পাশের বড় বাড়ীটার গাড়ী-বারান্দার নীচে বসে বসে ঝিমুচ্ছে। কাঁধের গামছাটা-ও মুখের কাছে নেড়ে নেড়ে হাওয়া করছে বুঝি।

কলতলায় বসানো বালতিতে টপ টপ করে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে।

মেঝেয় মাদুরটা পেতে সবে একটু কাৎ হয়েছিল শিউলী। আর শোয়া হলো না তার। উঠতে হলো।

উঠতেই জানালা দিয়ে ওই রিকশাটি আর রিকশাওয়ালাকে আরো স্পষ্ট দেখা গেল। গামছা দিয়ে ও এবার কপালের ঘাম মুছছে। শরীরের আড়মোড়া ভেঙ্গে হাই তুলছে।

এখনো দুপুরই যেন।

এই তো খানিক আগে এঁটো ভাণ্ড-বাসনগুলো মেজে কলতলায় রেখে এলো শিউলী। হেঁসেল তুলে ঘরদোর মাজা-ঘষা করলো। ঘরের টুকিটাকি কাজকর্ম সেরে নিলে। তারপর বাচ্চা দুটিকে পাশে নিয়ে সবে একটু চোখ বুজবার উপক্রম করছিল।

না, আর চোখ বুজবার উপায় নেই। একটু জিরিয়ে নেবার অবকাশও মিললো না। এঁটো ভাণ্ড-বাসনগুলো ধুয়ে ফেলতে হবে আগে। তারপর জল তোলার পাট। বালতি কলসী ভরে জল তুলে রাখতে হবে। আর তারপর উনুন ধরানো, রোদে দেওয়া জামাকাপড় ঘরে এনে পাট করে রাখা। একটার পর একটা একত্রে নিয়মিত কাজগুলো সুরু হবে। বিকেলের কাজের পর্ব এ-ভাবেই সুরু হয়।

কাঁধ থেকে খসে-পড়া আঁচলটা টেনে তুলতে যাবে শিউলী, আঁচলে টান পড়লো।

'মা, এ মা!' আঁচল ধরে টানছে ছোট বাচ্চাটি। নিমেষে মেজাজটা চড়ে গেল শিউলীর। ঝাঁপিয়ে উঠলো, 'কি, কি হয়েছে? শুয়ে পড়, ঘুমো। ওই তো দাদা ঘুমুচ্ছে। উঠিসনে বলছি!'

ছোট বাচ্চাটি ড্যাবেড্যাবে চোখ তুলে তাকালো মার দিকে, কাঁদো কাঁদো মুখে আঁচলটা ধরে টানতে থাকে তবু। ভাবখানা এই, মা পাশে শুয়ে থাক, নইলে সে-ও উঠবে।

একটানে আঁচলটা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলে শিউলী। বললে, 'জ্বালাতন, শুয়ে পড় বলছি। দাদার মতো ঘুমো!'

কথাগুলো যেন নিজেকেই নিজে শোনালো সে। কেননা, যাকে বলা সেই দু'বছরের বাচ্চাটি মাদুরের উপর তৎক্ষণে গুটিসুটি মেরে উঠে বসেছে। মার নির্দেশটা মেনে নেবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ওর।

উঠে বসে দু'হাতে মাথার চুলগুলো খামচে ধরে বাচ্চাটি ঘাড় দোলালো, 'ন্-না, ন্-না।'

দাঁত কিড়মিড় করে ওর দিকে একটু তাকিয়ে ফিরে দাঁড়ালো শিউলী।

'উ—উ, ইয়া—ইয়া!'

দু'পা এগিয়েই আবার তাকাতে হলো শিউলীকে। ছোটটির সঙ্গে সঙ্গে বড়টিও উঠে বসেছে। উঠে চোখ রগড়াচ্ছে।

'চোখে কি সরষে দিয়েছিস তোরা, শুতে না শুতেই যে অমন উঠে বসলি?' ওদের দিকে তাকিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো শিউলী। তারপর চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে বারান্দায় আসতে আসতে বললে, 'জ্বালাতন, একটি মুহূর্তও ওরা আমায় সোয়াস্তি দেবে না। শুধু খ্যান খ্যান করে মাথা খাবে।'

কলতলায় বালতিটি ভরে জল উপচে পড়ছিল।

এসে তাড়াতাড়ি বালতিটা সরিয়ে জড়ো-করা ভাণ্ড-বাসনগুলো কলতলায় রাখলে শিউলী। তারপর একটুকরো ন্যাতা দিয়ে বেশ করে ঘষে ঘষে একটি একটি করে বাসন ধুয়ে ফেলতে লাগলো।

'শিউ!'

ঘাড় কাৎ করে শিউলী তাকিয়ে দেখলো ঘোরানো বারান্দার কোণে, যেখান থেকে দোতলায় যাবার সিঁড়ি উঠে গেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে মঞ্জুদি।

কথা বললে না শিউলী। একটু হেসে একটা বাটিতে সে ন্যাতাটা ঘষতে তৎপর হলো।

'ঝি আসেনি আজ?'

তাকালো শিউলী। মঞ্জুদি যেন কথা বলছেন না, কাটা ঘায়ে খানিকটা নুন ছিটোলেন।

সিঁড়ির কাছে রেলিঙের থামে একটু ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়েছেন মঞ্জুদি। ভায়োলেট রঙের মিহি শাড়ী একখানা পরনে। আলতা-রাঙানো পায়ে জরির কাজ-করা কী সুন্দর স্যাণ্ডেল একজোড়া। তেলহীন চুল, কিন্তু রুক্ষ নয়। মসৃণ একরাশ কালো শৈবালদাম যেন তাঁর সারা মাথায় ছড়িয়ে রয়েছে। মুখ টিপে টিপে হাসছেন। ওই হাসিতে বড় সুন্দর দেখায় তাঁকে।

দু মিনিট তাকিয়েই রইলো শিউলী। আজ দিন পনের যাবৎ ঠিকা-ঝি বাদ দিতে



হয়েছে খরচ চালানো যাচ্ছে না বলে। এঁটো ভাণ্ড-বাসন যে তাকে মাজতে হচ্ছে আজকাল এটা মঞ্জুদির অজ্ঞাত থাকবার কথা নয়। তবু, তা জেনেও তাঁর ওই কথা বলবার কী মানে হতে পারে?

'ওই ঝি-দের নিয়ে হয়েছে এক সমস্যা', মঞ্জুদির ধপধপে কানে ইয়ারিং দুটো যেন ঝিলমিলিয়ে উঠলো। বললেন, 'যখন খুসী ওরা আসবে যাবে, কিচ্ছু বলবার জো-টি নেই। কথায় কথায় শুধু ভয় দেখাবে কাজ ছেড়ে দেবার। ওদের ছাড়া যে আমাদের একদণ্ড চলে না এটা ওরা ভালো করেই জানে।'

তবু নিশ্চুপ শিউলী। এবার একখানা থালা ধুয়ে ফেলছে সে।

'এই তো সবে জল এলো', আবার মঞ্জুদি বললেন, 'আরেকটু সময় ছাখো না। ঝি তোমার এসেও যেতে পারে।'

থালাটা একদিকে সরিয়ে রেখে জলের ধারায় হাত ধুয়ে নিতে নিতে শিউলী বললে, 'ঝি আসবে না।'

'কেন?' প্রশ্নটা করেই মঞ্জুদি নিজেই তার জবাব যোগালেন, 'বলেছি তো ঠিকে ঝি-দের ওই স্বভাব। তার চেয়ে বরং বরাবরকার জন্যে একটা ঝি-চাকর রেখে দাও। আমি তো অতিষ্ঠ হয়েই শেষে ঠিকে ঝি ছেড়ে দিয়েছি। যে-চাকরটা এখন রেখেছি, দিব্যি কাজ করে, আর বিশ্বাসীও খুব। একটা চাকরই রেখে দাও, শিউ।'

'দেখি।' একটা ছোট্ট চোখে উষ্ণ মনোভাবটা যেন চেপে রাখতে চাইলো শিউলী।

সিঁড়িতে ভারী জুতোর শব্দ হলো।

উপর থেকে মঞ্জুদির স্বামী নিখিলেশ নেমে এলেন। সঙ্গে তাঁর হাতধরা ফুটুও রয়েছে। তাঁদের একমাত্র সন্তান ওই মেয়েটি। তিন বছর বুঝি পেরিয়েছে ওর। অথচ কেমন বাড়ন্ত গড়ন, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। দেখে বিশ্বাস করতে হবে ও-মেয়ের বয়স পাঁচ বছরের কম নয়। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি মুখের আদলটি। গায়ের রঙটা ঠিক মঞ্জুদির মতো। দেখলে চোখ যেন লেগে থাকতে চায়। অমন সুন্দর ফুটফুটে চেহারা বলেই হয়তো মঞ্জুদি ওর নাম রেখেছেন ফুটু।

মাথার ঘোমটা একটু টেনে ওদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো শিউলী।

'কই, চলো, ওদিকে আবার দেরী হয়ে যাবে।' প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিখিলেশ ব্যস্তভাবে বললেন।

ঘি-রঙের সিল্কের একটা হাওয়াইয়ান সার্ট নিখিলেশের গায়ে। বকের পালকের মতো সাদা একটা ফুলপ্যাণ্ট পরনে। দীর্ঘকায় চেহারা। উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের রঙ। কপালের দুদিকে চুলগুলো পাতলা হয়ে এসেছে। সুগঠিত গঠন, সুপুরুষ চেহারা। ওই সিল্কের সার্ট আর ফুলপ্যাণ্ট ওঁকে অপূর্ব মানিয়েছে।

হাতে একটা গ্লাস ধরাই রয়েছে শিউলীর। আসলে সে ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ওঁদের দিকে তাকিয়েই রয়েছে। কোথাও বুঝি বেড়াতে বেরোচ্ছে ওঁরা, কিংবা কিছু কেনাকাটা করতে যাচ্ছে।

'ফুটু, মার হাতটা ধরে নাও। কই, চলো।' নিখিলেশ সামনের দিকে এগোলেন।

'চলো', ফুটুর হাত ধরে মঞ্জুদি হাসলেন। সব সময় ওই হাসি-হাসি মুখ তাঁর। যেতে যেতে শিউলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আসি ভাই।'

কথা বললে না শিউলী। ঘাড়ও নাড়লো না একটু। বাকী বাসনগুলো সে ধুয়ে ফেলতে লাগলো দ্রুতগতিতে।

'মা, ও-মা!' ছোট বাচ্চাটি কখন খুট খুট করে হেঁটে এসে শিউলীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে।

'উঠে এলি তবু? হয়েছে কী তোর, কী হয়েছে বল?' হঠাৎ যেন সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে গেল শিউলীর।

আরো গা ঘেঁষে দাঁড়ালো বাচ্চাটি। মুখটা মার বুকের কাছে নিয়ে বললে, 'খাবো, এত্তু!'

তিন বছরের ছেলে যখন-তখন স্তন্যপানের আব্দার জানাবে এ কেমন কথা? ডানহাত দিয়ে ওকে পেছনদিকে ঠেলে দিয়ে শিউলী বললে, 'যা, কাজ সেরে আমি আসছি এখুনি।'

একটু সরে গিয়ে আবার মার কাছে আসতে সামনের দিকে পা বাড়ালো বাচ্চাটি। আর তখুনি পা-পিছ্‌লে পড়ে গেল, শান-বাঁধানো চত্বরে। কলের জল ছিট্‌কে পড়ে অনেকটা জায়গাই ভিজে গিয়েছিল।

কলতলা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে এসে ওর একটা হাত ধরে ওকে টেনে তুললো শিউলী।

'উ-হু-হু লেগেথে।' বাচ্চাটি কেঁদে উঠলো।

'কেন গিয়েছিলি কলতলায়?' ওর হাতটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিলে শিউলী। বললে, 'বেশ হয়েছে লেগেছে।'

ঝাঁকানি খেয়ে আরেকটু জোরে কেঁদে উঠলো বাচ্চাটি।

'চুপ কর, চুপ কর বলছি,' ওর একটা হাত ধরেই ওকে শূন্যে তুলে একেবারে বারান্দায় নিয়ে এলো শিউলী। ধুপ করে ওকে বসিয়ে দিয়ে বললে, 'বোস, বসে থাক এখানে। একটু নড়েছিস তো, কি করি দেখিস।'

বাচ্চাটি এবার গলা খুলে চেঁচিয়ে উঠলো।

ওর দিকে আর এক নজরও না তাকিয়ে ঘুরে বারান্দা থেকে নেমে এলো শিউলী।



কিন্তু বারান্দার বাঁদিকে নজর পড়তেই তাঁর নিজের হাত নিজেরই কামড়াতে ইচ্ছে হলো যেন।

বারান্দায় সদ্য-রাখা এলুমিনিয়মের ডেকচি-ভর্তি জলটা নষ্ট করে ফেলছে বড় বাচ্চাটি। একটা গামছা ডেকচির জলে ডুবিয়ে ও ওর অদ্ভুত খেলা খেলছে।

'কী করছিস? ওঠে আয় ওখান থেকে।' বলতে বলতে ওর কাছে এগিয়ে গেল শিউলী।

কিন্তু একমনে ও খেলছেই শুধু, তন্ময় হয়ে খেলছে। দু'হাত ডুবিয়ে জল ঘাঁটছে, গামছাটা ভিজিয়ে ভিজিয়ে মেজের উপর জল নিংড়ে ফেলছে। খিল খিল করে হেসে উঠছে নিজের মনে।

আর সহ্য হলো না শিউলীর, কান ধরে ওর পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিলে সে। বিরক্তির ঝাঁঝে যেন তিক্ত হয়ে গেল তার জিব। বললে, 'খেলবার আর কিছু পেলি নে? যতো সব কাজের জিনিস ভণ্ডুল করে তোর খেলা? বাঁদর কোথাকার!'

আচমকা এই মারটার জন্যে ছেলেটি প্রস্তুত ছিল না মোটেই। গামছাটা একদিকে ছুড়ে দিয়ে ঘরের দিক ছুটলো ও। ঘরে গিয়ে চীৎকার জুড়ে দিলে, 'উ—উঁ, ইয়া—ইয়া!'

ছোটটির কান্নার সঙ্গে বড়টির কান্না মিলে এক অদ্ভুত ঐক্যতান সুরু হ'য়ে গেল নিমেষে।

শিউলী কলতলায় নেমে এলো।

ঝটপটিয়ে কলতলার কাজটা সে সেরে ফেললো। দোতলার সিড়ি দিয়ে উপরে গিয়ে ছাদ থেকে নিয়ে এলো শুকনো জামা কাপড়।

এসে দেখলো, ওরা দু'জনায় কাঁদছে তখনো। ছোটটি মেজেয় লুটিয়ে কাঁদছে। আর বড়টি দরজার একটা কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে কেমন সুর করে কাঁদছে।

জামা-কাপড়গুলো তক্তপোষের উপর রেখে দাঁড়িয়ে পড়লো শিউলী।

ওরা কী করেছে—মিছিমিছি কেন সে ওদের মারধর করলো? ওদের কী দোষ?

ছুটে গিয়ে কপাটের আড়াল থেকে বড়টিকে টেনে আনলো শিউলী। একটা কৌটো থেকে এক টুকরো মিছরি বার করে ওর হাতে দিয়ে বললে, 'নে খা, কাঁদিস নে। কাঁদতে নেই।'

কান্নাটা নিমেষে চুকে গেল ওর, মিছরির টুকরোটা ও জিবে ফেলে চোঁ চোঁ শব্দে চুষতে লাগলো।

'এখনো কান্না? যেন কতো মেরেছি ওকে!' ছোটটিকে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিলে শিউলী। বারান্দার ওপরই লেপ্‌টে বসে পড়ে বললে, 'নে, এই নে, খা, আমায় সুদ্ধ খেয়ে ফেলতে পারিস নে!'

শীর্ণ-শুষ্ক স্তনের বোঁটাটি ওর মুখে ঠেসে ধরলো সে। নিরস স্বাদহীন মাতৃস্তন। তবু তা-ই চুষবার জন্যে যখন তখন নাছোড় বায়না ধরবে ছেলেটা। ছেলে নয়, একটা ক্ষুদে রাক্ষস যেন।

ছেলে নয়! কথাটা একটা ঠাণ্ডা স্রোতের মতো শিউলীর প্রতিটি স্নায়ু-স্রোতে ছড়িয়ে পড়লো। রক্ত-মাংস দিয়ে তৈরী এই যে দুটি শিশু-সন্তান সব সময় তার চোখের সামনে ঘুর-ঘুর করছে, ওদের দিকে একেক সময় তাকিয়ে থাকতে থাকতে সত্যি তার শরীর অবশ হয়ে আসে যেন। মাথায় আগুন ছোটে। তখন এই ঘর-সংসার কোনকিছুই ভালো লাগে না। ইচ্ছে হয়, ছুটে একদিকে কোথাও বেরিয়ে যায়। এই দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তির উপায়ও তখন ভাবনায় আসে তার—আত্মহত্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ ভরে শুধু জলের ঢল নেমে আসে। অনেকক্ষণ, মুহূর্তের পর মুহূর্ত শুধু কান্নাই সার হয় শেষ পর্যন্ত।

দুঃসহ যন্ত্রণা। মা হয়ে এর চেয়ে বেশী যন্ত্রণার আর কী থাকতে পারে?

বড়টি চার বছর পেরিয়ে গেল। তবু এখনো ওর মুখে বোল ফুটলো না। আর ফুটবেও না কোনদিন। ও তো কথা কইবার জন্যে জন্মায়নি। প্রথম সন্তান, আর সেটি কিনা তার জীবনে এলো একটি মূক-বধিরের পরিচয় নিয়ে। বোবা ছেলের মা বলে নিজেকে পরিচিত করলো শিউলী।

আর ছোটটি হয়েছিল ভালোই, সুস্থ-সবল। কিন্তু মাস দুয়েক আগে ও মরণাপন্ন টাইফয়েডে ভুগে উঠেছে। রোগ সারলো বটে, কিন্তু সারলো না ওর শরীরের আড়ষ্টতা। শরীরের নীচের দিকে, বিশেষ করে পা দুটিতে ও যেন জোর হারিয়ে ফেলেছে। কেমন থেমে থেমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। কণ্ঠস্বর জড়িয়ে গেছে কেমন। কথা বলবার সময় মুখটা সূঁচালো করে কেমন একটা ভঙ্গী করে। পঙ্গুতার লক্ষণ। এ যেন বেঁচে উঠেও মরে রইলো ছেলেটা, একটি প্যাকাটির মতো দেখতে হয়ে গেছে।

ছেলে নয়, রক্ত-মাংসের তৈরী কোন জীববিশেষ যেন ওরা।

কিন্তু সে-দোষ তো ওদের নয়। ওরা তো কোন দোষ করেনি।

কার দোষ তবে? এই যে এখন সে ওদের অনর্থক মারধর করলো সে-দোষটা কার? ছোট বাচ্চাটির মুখ স্তনের কাছে আরেকটু চেপে ধরে শিউলী ভাবলে।

সব দোষ মঞ্জুদির। মঞ্জুদিই সব অনর্থের মূল। সহ্য হয় না, আর একটুও সহ্য হয় না মঞ্জুদিকে।

প্রতুল আসুক। আজই শিউলী ওকে এ-বাড়ী ছেড়ে দেবার জন্যে বলবে। এরচেয়ে বস্তি ভালো, খোলার ঘর ভালো। তবু মঞ্জুদির ছায়া থেকে সরে পড়া চাই। মঞ্জুদি অসহ্য।



মাত্র মাস কয়েক আগে।

বাগবাজারের ওদিকে একটা সংকীর্ণ গলিতে তখন থাকতো শিউলীরা।

একদিন অফিস থেকে ফিরে প্রতুল বললে, 'নিখিলেশদা'র সঙ্গে আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।'

ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই প্রতুল যে-ভাবে লোকটির নামোল্লেখ করলো তাতে সেই মুহূর্ত্তেই মনে কারো কথা না এসে বরং খানিকটা বিস্ময়ই এলো শিউলীর। বললে, 'কার কথা বলছো?'

উল্টো বিস্মিত হলো প্রতুলই। বললে, 'বাঃ, চিনলে না! নিখিলেশদা, সেই যে—'

চিনবার কথা নয়। কেননা, ওঁকে কখনো দেখেই নি শিউলী। তবে প্রতুলের মুখে ওঁর নামটি শুনেছে। এককালে ওর কাছে রাজনীতি শিখেছে প্রতুল। উনি ছিলেন পার্টির পুরনো লোক। প্রতুলকে উনিই পার্টির সদস্যভুক্ত করেন। সেই পার্টির অস্তিত্বও অবশ্য এখন আর নেই। দলীয় লোকজনরা কে কোথায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার হদিস পাওয়াও দায়। সবাই রুজি-রোজগারের তাগিদে, সংসারের চাপে যে যার পথ বেছে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে দু'একজনের সঙ্গে কখনো কখনো দেখা হয় প্রতুলের। আর ওদের মুখেই নিখিলেশদা'র চাঞ্চল্যকর পরিবর্তনটা শুনেছে সে। ঝানু রাজনীতিক নিখিলেশ সেন রাজনীতির কৃচ্ছ্র-সাধনা থেকে এখন নাকি একেবারে মুক্ত। বে' থা করে উনি নাকি এখন ঘোর সংসারী। আর ওঁর নামের আগে কমরেড কথাটির জায়গা দখল করেছে নতুন একটি পদবী—রিনাউণ্ড কনট্রাক্টর।

বন্ধুদের মুখে নিখিলেশদা'র চমকপ্রদ রূপান্তরটা শোনা অবধি শিউলীকে কথাপ্রসঙ্গে ওঁর কথা না শুনিয়ে যেন থাকতে পারতো না প্রতুল, ওঁর কথা বলে একেকটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে যেন ভালো লাগে তার। একই পার্টির ছত্রছায়ায় তো ছিল দু'জনে। না হয় বয়সে আর অভিজ্ঞতায় উনি তার বড়ই ছিলেন। তাতে কি, একই পার্টি-কমরেড তো। আর সেই নিখিলেশদা কিনা আজ প্রভূত বিত্তের নাগাল পেয়েছেন, বড়লোকের মেয়েও একটা বিয়ে করেছেন। আর প্রতুল কোথায়? ক্লাইভ স্ট্রীটের কোন একটা মার্চেণ্ট অফিসের নব্বুই টাকার কেরানী, দিনের পর দিন শুধু ঘানিই টানছে সে!

'ওঃ, কতোকাল পরে যে দেখা হলো নিখিলেশদা'র সঙ্গে!' গায়ের জামাটা খুলে রেখে আবার প্রতুল বললে।

খেটে এসে একটু জিরোবার নাম নেই। ঘরে ঢুকেই কার সঙ্গে কোথায় দেখা, তার নাম-ভজন সুরু হলো। শিউলী বললে, 'বল শুনবো'খন, আগে ভালো করে বসে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে নাও তো। বাপস্, হাঁপাতে হাঁপাতে যেন কথাগুলো না বললেই নয়।'

তবু প্রতুল বললে, 'ট্রামে উঠতে যাবো, হঠাৎ পেছন থেকে কে আমার কাঁধটা একটা থাবড়া দিয়ে ধরলো। তাকিয়ে দেখি নিখিলেশদা, আমি তো অবাক, হো হো করে হেসে উনিই কথা সুরু করে দিলেন। সেই অবিকল আগেকার কথার ধরণ, সেই প্রাণখোলা হাসি। আমার খবর নিলেন, ওঁর নিজের খবরও বললেন।'

হঠাৎ মুখখানা গম্ভীর করে ফেললে শিউলী। অন্যের জন্যে তো প্রতুলের ষোল আনা দরদই আছে, অন্যের কথার যেন একেবারে পঞ্চমুখ। আর ঘরের লোকটির, যে সকাল-সন্ধ্যা খেটে খেটে হাড়মাস কালি করে ফেলছে, তার দিকে একটু নজর দেবারও সুযোগ হয় না ওর। তার কাছে বসে দুদণ্ড গল্প করতেও যেন ওর ক্লান্তিকর ঠেকে।

তাই চুপ করে রইলো শিউলী। আর মনে মনে একটা অহেতুক অভিমানে ফুলতে লাগলো।

প্রতুল আবার বললে, 'আর কি বলেছেন জানো? উনি একখানা ঘর দেবেন আমায়, ওঁকে বলেছিলাম কিনা কথায় কথায়।'

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নির্জীব গলায় শিউলী বললে, 'ভালো।'

কিন্তু তিনটি দিন পরে যখন বাগবাজারের গলিটা সত্যি ছাড়তে হলো, তখন ব্যাপারটা যেন একটা দৈব-ঘটনা বলে মনে হলো শিউলীর। কার সঙ্গে কোথায় দেখা, আর সেই সূত্রে একটি কথায় বাড়ী পেয়ে যাওয়া, এ কখনো হয় নাকি আজকাল? কপাল, একেই বলে ভাগ্য।

নতুন বাড়ীটিতে ঢুকে তার চোখ জুড়িয়ে গেল। ঝকঝকে তকতকে মস্ত একখানা ঘর একতলায়, সামনে সুপরিসর লম্বা বারান্দা, তারই একপাশে একটু জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে রান্নাবান্নার জন্যে। কল, বাথরুম ইত্যাদি সবই আলাদা, একেবারে ঘরের সঙ্গে। দুধ-সাদা নতুন চুণকাম দেয়ালে-কপাটে, জানালায় নতুন রঙের গন্ধ। এমন একখানা ঘর কল্পনায়ও ছিল না শিউলীর। এর সঙ্গে তুলনা করলে সেই ঘিঞ্জি গলির উনুনের ধোঁয়ায় ঠাসা, ড্রেনের গন্ধ-ভর্তি বাড়ীটা তো একটা জলজ্যান্ত নরক ছাড়া আর কিছু মনে হয় না।

বাড়ীটি নিখিলেশদা'রই বটে, এটি নাকি ওঁর বিয়ের প্রাপ্তি, ওঁরা উপরেই থাকেন।

আর এখানে এসে শুধু একটি ঝকঝকে আলোবাতাসযুক্ত ঘরই পেল না শিউলী। পেল মনের মানুষ একজনকে, মঞ্জুদিকে, প্রতিটি কথায় এতো দরদ মঞ্জুদি'র, স্বভাবটি যেন মধু মাখানো। পরকে যে এতো সহজে আপন করে নিতে পারে, এটা জানা ছিল না শিউলীর।

সেই মঞ্জুদিই একদিন বললেন, 'চলো, আজ একটা জায়গা থেকে বেড়িয়ে আসি।'

ঘনিষ্ঠতা অভিন্নহৃদয়ের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এরি মধ্যে। তবু মঞ্জুদি'র সঙ্গে কখনো কোথাও বেরোয়নি শিউলী, উনিও তেমন কোন প্রস্তাব করেননি এর আগে।



কথাটা শুনে খুসী খুসী চোখে তাকালো শিউলী। বললে, 'কোথায়?'

হেসে মঞ্জুদি বললেন, 'আগে তৈরী হয়ে নাও না, পরে বলবো'খন।'

প্রতুলের বাড়ী ফিরতে রাত নটা, অফিস থেকে বেরিয়েই ও একটা পার্ট-টাইম কাজ সেরে তবে বাড়ী ফেরে। মঞ্জুদি'র সঙ্গে বেরোলে ও আসবার আগে নিশ্চয়ই বাড়ী ফিরতে পারবে শিউলী। সবে তো দুপুর। রোদ-ঝলসানো আশেপাশের বাড়ীগুলো। কতক্ষণই বা লাগবে আর একটু বেড়িয়ে আসতে। তবু সে জিজ্ঞেস করলো, 'দেরী হবে না তো মঞ্জুদি?'

'না, না, হবে না, তোমার উনি আসার ঢের আগেই আমরা এসে যাবো। তুমি তৈরী হয়ে নাও তাড়াতাড়ি, আমি আসছি।' বলেই উপরে চলে গেলেন মঞ্জুদি।

খানিকক্ষণ পরেই তিনি ফিরে এলেন উজ্জ্বল প্রসাধন বেশে। সঙ্গে ফুটু। ওর মাথায় লালচে কোঁকড়া চুলগুলো একটা লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা। যেন ফুলের কুঁড়ি একটি।

শিউলী ওর দিকে তাকিয়েই ছিল।

মঞ্জুদি বললেন, 'কই, এখনো হয়নি তোমার? দাও, ওদের প্যাণ্ট জামা আমায় দাও। আমি ওদের পরিয়ে দিচ্ছি, তুমি নিজে তৈরী হয়ে নাও দিকি।' শিউলীর হাত থেকে বাচ্চা দুটির প্যাণ্ট-জামা টেনে নিলেন তিনি।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি ডাকলেন মঞ্জুদি।

ট্যাক্সিতে চড়ে শিউলীর বাচ্চা দুটির তো মহা-উল্লাস।

'ইয়া-ইয়া, উঁ-উঁ!' বড়টি গোল গোল চোখে চারদিকে তাকিয়ে ওর দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচিয়ে উঠলো।

'হে-হে, হি-হি—,' ছোটটি মার গা ঘেঁষে বসে দুলতে লাগলো।

বড়টির মুখে আঙুল চাপা দিয়ে শিউলী বললে, 'ছিঃ, চুপ করো।'

মঞ্জুদি বললেন, 'অমন করছো কেন? ওদের আহ্লাদ হবে না?'

'না, বড্ড অসভ্য হয়ে উঠছে দিন দিন,' বড়টিকে ধরে পাশে বসিয়ে শিউলী বললে, 'ফুটু কেমন লক্ষ্মীটির মতো চুপচাপ বসে রয়েছে।'

চোখ টিপে কেমন একটু হাসলেন মঞ্জুদি। ভাঁজ-করা ছোট্ট রুমালখানা দিয়ে কপালটা ঘষলেন একটু।

আবার শিউলী বললে, 'কোথায় যাচ্ছি, বললেন না তো মঞ্জুদি।'

মঞ্জুদি বললেন, 'মিসেস রক্ষিতের শিশু-মঙ্গল সমিতি চেনো? ওখানে যাচ্ছি। তাঁরা একটা বেবি শো দিচ্ছেন আজ।'

'বেবি শো, বেবি শো কী?'

'ওই যে, যাকে বলে তোমার শিশু-প্রদর্শনী। ওঁরা একটা সম্মেলনের আয়োজন করেছেন আজ,' বুকের উপর থেকে সরে যাওয়া কাপড়টা টেনে দিয়ে মঞ্জুদি বললেন, 'এ-রকম প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান বেশ ভালো জিনিস, কি বলো?'

'হুঁ।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে শিউলী দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো না সম্মতি জানালো ঠিক বোঝা গেল না।

যতক্ষণ ট্যাক্সিতে ছিল অমনি বাইরে তাকিয়ে একরকম নিঃশব্দই ছিল শিউলী। মঞ্জুদির কথায় হাঁ-না একটা কিছু মন্তব্য করেছে শুধু।

শিশু-মঙ্গল সমিতিতে এসেও ঠিক তা-ই।

মিসেস রক্ষিতের নিজস্ব বাড়ীর একাংশেই শিশু-মঙ্গল সমিতি খোলা হয়েছে। হাল ফ্যাসনের দোতলা বাড়ী একখানা। চারপাশে রয়েছে মস্ত কম্পাউণ্ড। গোলাকার বৃত্তে সাজানো কয়েকটি পাম গাছ একদিকে। বাড়ীর ঠিক সামনেটায় ত্রিকোণ অনেকটা জায়গা জুড়ে নানান মৌসুমী ফুল রয়েছে। নিখুঁত সাজানো বাড়ী, ছবির মতো। গোটা পরিবেশেই একটা উঁচু আভিজাত্যের গন্ধ ছড়ানো রয়েছে যেন।

বাড়ীতে ঢুকবার মুখেই গেটের উপর বিজ্ঞপ্তিটা দেখা যায়। একটা লাল শালুর কাপড়ে রূপালি অক্ষরে লেখা—শিশু-প্রদর্শনী।

মঞ্জুদি'র সঙ্গে পা টিপে টিপে বাড়ীর লনে এসে দাঁড়ালো শিউলী, তেমনি নির্বাক।

'চলো আমরা ওই ঘরটিতে গিয়ে বসি। ওই তো আরো অনেকে বসে রয়েছে। সবাই এখনো এসে পৌঁছয়নি বোধ হয়।' রঙিন কাচের কাজ-করা ভ্যানিটি ব্যাগটা নাড়লেন মঞ্জুদি।

যে-ঘরটিতে শিশু-মঙ্গল সমিতির সাইন বোর্ডটা ঝুলানো রয়েছে তারই নামে একটি লম্বা হল ঘর। মেজেয় পুরু কার্পেট বিছানো। চারদিক ঘিরে কৌচের সারি। মাঝখানে ডিম্বাকৃতি মস্ত টেবিল একটা। তার উপর দু'টি ফুলদানীতে সদ্য-তোলা তাজা ফুলের গুচ্ছ। আর কৌচ দখল করে ইতস্তত বসে আছেন কয়েকজন মহিলা। ওঁদের বাচ্চারা ঘরের এ-ধারে ও-ধারে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

কোণের দিকে একটি কৌচে বসলেন মঞ্জুদি। পাশের লম্বামতো কৌচটায় বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শিউলী বসলো।

'মিসেস রক্ষিত বুঝি ওদিকে কোথাও ব্যস্ত। ঝামেলা তো কম নয়।' কব্জিতে কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট্ট সাদা বিন্দুর মতো ঘড়িটার দিকে তাকালেন মঞ্জুদি। বললেন, 'কিন্তু তিনটেয় তো আরম্ভ হবার কথা, আমায় বলেছিলেন।'

শিউলী একটু তাকালো শুধু। মাথার উপরে সজোরে ফ্যান ঘুরছে। তবু ঘামের বিন্দু চিকিয়ে উঠছে তার চিবুকে-কপালে, বুকের কাছটায়।



আরো একদল মহিলা ঢুকলেন ঘরে। বাচ্চাদের কিচির মিচির, যেন পাখীর কাকলি। হৈ-হুল্লোড় সুরু হল চারদিকে। মহিলারা একজন আরেকজনের সঙ্গে কথায় মেতে উঠলেন।

'চলো, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াই। এখুনি আরম্ভ হবে বোধহয়।' মঞ্জুদি উঠে দাঁড়ালেন।

বারান্দায়ও ভিড়। কেউ ঘরে ঢুকছে, কেউ বেরোচ্ছে। কেউবা এইমাত্র এসে পৌঁছলো।

'এই যে মিসেস সেন, কী খবর? ভালো?' একজন স্থূলাঙ্গী মহিলা ভিড়ের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসে মঞ্জুদির সামনে দাঁড়ালেন। জল-জঙ্গলের ছাপ আঁকা একখানা শাড়ী পরনে। মুখে গলায় পাউডারের নিভাঁজ প্রলেপ। কড়া সেণ্টের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে ওর গা থেকে।

'ভালো, আপনার?' মঞ্জুদি ঘাড় বাঁকালেন।

'এই কেটে যাচ্ছে একরকম। চুনুটার আবার স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছে না। দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, বড্ড চিন্তায় পড়েছি ওকে নিয়ে।' পাশের নধরকান্তি বাচ্চাটির পিঠে হাত রাখলেন মহিলাটি। বললেন, 'তারপর, কাল-পরশু নাগাদ হয়তো আবার বোম্বের দিকে পাড়ি জমাতে হবে কিছুদিনের জন্যে। কি একটা বিজনেস এ্যাফেয়ার্সে ওঁর নাকি না গেলেই নয়। যাওয়া হবে অবশ্য প্লেনেই, কিন্তু ধকল তো তবু সেই সমানই।'

'তা তো বটেই।' মঞ্জুদি মাথা দোলালেন।

'ওদিকে আবার আমার এক বন্ধু অপেক্ষা করছে,' মহিলাটি ভিড়ের মাঝে আবার অদৃশ্য হলেন।

'এই যে দিদি, আমাদের টি-পার্টিতে তো সেদিন গেলেন না। এতো করে বলেছিলাম আপনাকে।' কে আরেকজন বললে।

'মঞ্জুদি, এই মঞ্জুদি। বাঃ, আমাদের স্কুলটা ছেড়ে দিয়ে তুমি তো একেবারে ডুমুরের ফুল। তারপর, কেমন আছো বলো।' জায়গাটা ছেড়ে খানিকটা এগোতেই একটি অপেক্ষাকৃত অল্প-বয়স্কা মেয়ের প্রশ্ন।

সস্মিত হেসে ওদের সবার সঙ্গে কথা বললেন মঞ্জুদি, ওদের কথার উত্তর দিলেন মার্জিত ভাষায়।

শিউলী দেখলো, আর তার কপালের দুধার বেয়ে যেন ঘামের ঝরনা নামলো।

রোদের তাত কমে এসেছে। দুপুরটা বিকেল ছুঁই ছুঁই। পামের সারিতে এক ঝলক দুরন্ত হাওয়া খেলে গেল, সামনের থাম বেয়ে বেঁকিয়ে-উঠা অর্কিড লতাটা শিউরে উঠলো যেন।

এবার প্রদর্শনী সুরু হলো।

বারান্দায় ডানদিকে মোজেইক পাথরের প্রশস্ত চত্বর একটি। প্রদর্শনীর আসরটা সেখানেই বসলো, সারি দিয়ে দাঁড় করানো হলো শিশুদের। মায়েরা দাঁড়ালেন ওদের পেছনে। আগ্রহ-উদ্‌গ্রীব কথাবার্তা চারদিকে। শিশুদের অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি।

একপাশে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছিল শিউলী।

ফুটুকে শিশুদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ওর কাছে এলেন মঞ্জুদি। বললেন, 'কই, ওকে দাও। ও-ও দাঁড়াবে।' ছোট বাচ্চাটির হাত ধরলেন তিনি।

'না, থাক মঞ্জুদি।' মৃদু আপত্তি করতে গেল শিউলী।

'সবটাতেই তোমার অমন জড়োসড়ো ভাব কেন?' বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে শিশুদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিলেন মঞ্জুদি। তারপর বললেন, 'এসো আমরা এধারে দাঁড়াই।'

মঞ্জুদির সঙ্গে এসেছে সে। তিনি যা বলেন তা শোনাই শোভন। এখন, এই মুহূর্তে শিউলীর তা-ই মনে হলো।

শিশুদের চেঁচামেচি অকস্মাৎ থিতিয়ে পড়লো খানিকটা। মায়েরা নীরব হয়ে গেলেন।

বিচারকরা শিশুদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, টাই-স্যুট পরা দু'জন ভদ্রলোক। ওঁরা সহরের বিশিষ্ট নাগরিক। একজন অনুষ্ঠানের সভাপতি, আরেকজন প্রধান অতিথি। আর ওঁদের সঙ্গে পেছনে রয়েছেন যে-মহিলাটি তিনিই মিসেস রক্ষিত। মঞ্জুদিই শিউলীকে ওঁদের চিনিয়ে দিলেন।

দেখার পর ওজন, উচ্চতা নেবার পর্ব, তা-ও শেষ হলো কিছুক্ষণের মধ্যে। শিশু-প্রদর্শনীর মুখ্য কাজটা সমাপ্ত।

সভাপতি এবং প্রধান অতিথি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন মায়েদের দায়িত্ব সম্বন্ধে। মিসেস রক্ষিত ধন্যবাদ জানালেন ওঁদের।

তারপর পুরস্কার বিতরণের পালা সুরু হতেই সর্বপ্রথম ডাক পড়লো ফুটুর—মঞ্জুদি'র মেয়ের।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে সভাপতির আসনের কাছে গিয়ে পুরস্কারটি গ্রহণ করলেন মঞ্জুদি। একটু খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াতেই দু'জন ফটোগ্রাফার ঘিরে দাঁড়ালো তাঁকে। সপ্রতিভ হেসে ফুটুকে কোলে নিয়ে ওদের ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেন তিনি।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কারটিও দুটি শিশুর হাতের মুঠোয় শিউলীর ঠিক চোখের সামনে দিয়েই আস্তে আস্তে চলে গেল ভিড়ের মধ্যে।

শিশু-প্রদর্শনীর মেলা ভাঙলো এবার। কোলাহল মুখর মা-শিশুদের ভিড় পাতলা হয়ে গেল কয়েক সেকেণ্ডে।



বারান্দায় একটা থামের কাছে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে মঞ্জুদির সান্নিধ্য থেকে সরে এসে কখন দাঁড়িয়েছে শিউলী। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখছিল শুধু। একটা জ্বালা, পাঁজর-ভাঙ্গা একেকটা গুরুভার দীর্ঘশ্বাস তার সমস্ত হৃদয়ে থেকে থেকে পাক দিয়ে উঠছিল শুধু।

'শিউ, এখানে দাঁড়িয়ে? তোমায় তো আমি খুঁজে হয়রান। এসো, এসো, প্রদর্শনী কখন শেষ হয়ে গেছে।' ব্যস্ত-সমস্তভাবে ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন মঞ্জুদি।

কথা না বলে ধীরে ধীরে তাঁর অনুগমন করলো শিউলী। পা দুটো যেন উঠতে চায় না, কেমন ভার ভার ঠেকছে।

ফেরবার সময়ও আবার ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিতে চেপে শিউলীর দিকে চোখ পড়তেই মঞ্জুদি বলে উঠলেন, 'ওকি, কী হয়েছে শিউ।'

'কেন কী হবে?' হঠাৎ যেন চমকে উঠলো শিউলী, হাসতে চেষ্টা করলো। বললে, 'কিছু হয়নি তো।'

খানিকক্ষণ পরে আবার শিউলীর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তোমার চোখে জল?'

'এমনি,' গলাটা একটু পরিস্কার করে নিলে শিউলী। তারপর মঞ্জুদির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমায় এখানে কেন নিয়ে এসেছিলেন মঞ্জুদি, আমি তো আসতে চাইনি।'

'একি ছেলেমানুষি করছো, আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে।' ওর কাছে সরে এসে বসলেন মঞ্জুদি।

মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখ ঢাকলো শিউলী।

চোখের কোণে জমে উঠা জলের দাগটা সে মুছলো বটে, কিন্তু মনে যে তার দাগ পড়লো তা আর মুছলো না।

তাই তার ছোট বাচ্চাটির টাইফয়েডের সময়ে মঞ্জুদি যে গতর দিয়ে অতো খাটলেন, তাতেও তার অভিমানটা শিথিল হলো না একটুও। বরং মনে হলো, এটা ওঁর কৃপা-করুণা, দয়া-দাক্ষিণ্য, এর মধ্যে সমবেদনা নেই, সহানুভূতি নেই।

না, মঞ্জুদিকে গোড়ায় ঠিক চিন তে পারেনি শিউলী।

গ্রীষ্মের ক্লান্তিকর দুপুরগুলো একটার পর একটা পার হয়ে গেল। সামনের রাস্তার কালো পীচ গলে গলে এখন আর বাষ্পীয় ঢেউয়ের লহরী সৃষ্টি করে না বাতাসে। জ্যৈষ্ঠের শেষ। উত্তর আকাশে হাতীর শুঁড়ের মতো কালো মেঘের দল দেখা যায়, মাঝে মাঝে হিমেল হাওয়া দেয়।

পুরো একটা বছর বুঝি পেরোতে চললো এ-বাড়ীতে এসে। অথচ আজ পর্যন্ত এ-বাড়ীটা ছাড়া হলো না। প্রতুলকে বলে বলে জিবের জল শুকিয়ে যাবার যোগাড় শিউলীর।

কিন্তু এ-বাড়ী ছাড়তে হবে যে করেই হোক, এখানে আর কিছুতেই থাকতে পারবে না সে, বিষাক্ত ঠেকছে এখানকার আবহাওয়া। তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে।

পা দুটো একটু টান করে তক্তপোষের উপর ছড়িয়ে বসলো শিউলী। পাশে বাচ্চা দুটি অসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। কে বলবে ওরা সারাটি দিন দুরন্তপনায় অস্থির করে মারে তাকে। শরীরে যেন আর দিচ্ছে না। তবু কোনরকমে হাত-পা টেনে টেনে রান্নাবান্নার কাজটা চুকিয়েছে। এখন কটা বাজলো? রাত ৯টা বোধহয় অনেকক্ষণ হয় বেজে গেছে। ওদিকের একটা বাড়ীতে যে-ছেলেটা চেঁচিয়ে পড়া তৈরী করে নটা-দশটা পর্যন্ত, ওর গলাটা আর শোনা যাচ্ছে না। চারদিক যেন নিঃঝুম। রাত কম হয়নি। তবু প্রতুল এখনো আসছে না কেন? পা দুটোতে কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ শব্দ। ক্লান্তিতে বুজে আসতে চায় চোখের পাতা।

ক্লান্তি, দুর্বার ক্লান্তিতে যেন অবশের মতো শরীরটা মনে হয় সবসময়। হবেই তো, পেটের মধ্যে যে আরেকটা ক্ষুদে রাক্ষস এসেছে। শরীরের সমস্ত কিছু চুষে নিয়ে যে বড় হয়ে উঠছে রাক্ষসটা। শিউলী চায়নি, তবু ওটা এলো। শত্তুর, পেটের মধ্যে ওই শত্তুরটা কেমন নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় বেড়ে উঠছে।

দরজার কড়া নড়ে উঠলো। প্রতুল এসেছে।

উঠে দরজাটা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো শিউলী।

ঘরে ঢুকলো প্রতুল। কাঁধে ঝোলানো ক্যানভাসের ব্যাগটা নামিয়ে রাখলো মেজেয়। টেবিলের উপর রাখলো ফাইল-বাঁধা কি কতকগুলো কাগজপত্র। মুখ গম্ভীর, শিউলীর দিকে একটু তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলে তৎক্ষণাৎ।

যেমন হয়, যে-ভাবে প্রতুল ঘরে ঢোকে ঠিক তা-ই।

মুখ-হাত ধোওয়া, ঘাড় গুঁজে ভাত খাওয়া সবই নিঃশব্দে সারলো ও। তারপর কয়েকটি সুপুরীর কুঁচো মুখে ফেলে গিয়ে বসলো চেয়ারে। বসে বসে ও খানিকক্ষণ জিরোবে, সুপুরীর কুঁচোগুলো দাঁতে কাটবে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে। তারপর ঘুরে বসে টেবিলের উপর-রাখা টাইপ রাইটারটার ঢাকনা খুলবে। ফাইল খুলে কাগজপত্রগুলো বিছিয়ে নেবে সযত্নে। চলবে খট্‌, খট্‌, খট্‌, খট্‌। একমনে টাইপ করতে থাকবে। অনেকক্ষণ, অনেক রাত পর্যন্ত। বাইরে, অফিসে কাজ। ঘরে এসেও কাজ, কাজ ছাড়া ওর যেন আর দেখবার কিছু নেই।



একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে শিউলী। তারপর তক্তপোষের তলা থেকে পানের ডিবেটা টেনে এনে একটা পান সাজলো।

পানটা প্রতুলের সামনে ধরে বললে, 'এই নাও।'

কথাটা যেন চমকে দেবার মতো, ঠিক তেমনিভাবেই তাকালো প্রতুল। ওর হাত থেকে পানটা নিয়ে বললে, 'সুপুরীই তো খাচ্ছিলাম।' পানটা মুখে পুরে টাইপ-রাইটারে নিবিষ্ট হতে সচেষ্ট হলো সে।

শিউলী বললে, 'বাড়ী খোঁজ করেছিলে?'

প্রতুল বললে, 'চেনাজানা সবাইকেই তো বলে দিয়েছি। ওরা খোঁজ পেলে তো আমায় বলবে।'

একটু বিরক্তির সঙ্গে শিউলী বললে, 'অন্যের কি ঠেকা পড়েছে খুঁজে দেবার, তুমি নিজে খোঁজ করতে পারো না?'

'আমায় সময় নেই।' প্রতুল টাইপ-রাইটারে হাত রাখলো।

'তোমার সময় নেই। তাহলে বাড়ী খুঁজতে বার হবো আমি?' শিউলীর কথায় ঝাঁঝ উপচে পড়ছে।

প্রতুল যেন ভ্রূক্ষেপও করলো না, চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে বসলো সে। টাইপ-রাইটারে এক সীট কাগজ গুঁজে দিয়ে টাইপ সুরু করে দিলে।

কয়েকমিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলো শিউলী। তারপর বললে, 'এখানে আর টেকা যাচ্ছে না।'

প্রতুল নিরুত্তর।

'দিন দিন ওদের ব্যবহার অসহ্য হয়ে উঠছে।'

কথাটা যেন কানেই গেল না প্রতুলের।

'ওরা লোক ভালো নয়, গতিষ্ঠ করে তুলছে একেবারে।'

টাইপ-রাইটারের শব্দ থামলো। ঘাড় ফেরালে প্রতুল। বললে, 'ছাখো, তোমাদের মেয়েদের কী সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া-ঝাঁটি হবে, আর সে-জন্যে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে—এ-বড় অদ্ভুত কথা। নামমাত্র ভাড়ায় এমন একখানা ঘর সারা কলকাতা চষে ফেললেও পাওয়া যাবে না, সেটা খেয়াল রাখো? তাছাড়া, নিখিলেশদা তো কিছু বলেননি। উনি খারাপ ব্যবহার করবার লোকও নন। তোমরা তোমাদের ঝগড়াঝাটিটা একটু বাদ দিতে পারো?'

বৃথা, প্রতুলকে কিছু বলা পণ্ডশ্রম মাত্র। শিউলী তা জানে। অথচ ওঁদের সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগও তো প্রতুলের সামনে আজ পর্যন্ত রাখতে পারেনি সে। মঞ্জুদি খারাপ

ব্যবহার করেছেন এমন কোন ঘটনাও বলতে পারেনি। কিন্তু কী করে সে বলবে সেই বেবি শো-র কথা? কী করে বোঝাবে, ঝগড়ার চেয়েও অশান্তিকর আবহাওয়া এখানে তৈরী হচ্ছে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে? মঞ্জুদি তৈরী করছেন।

গত পরশুর ব্যাপারটা এখনো যেন মনে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

দুপুরের পর উপর থেকে নীচে নেমে এলেন মঞ্জুদি। এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'শিউ, কী করছো?'

কিছুই করছিল না শিউলী। এ-সময়টায় হাতে কোন কাজ থাকে না। বাচ্চা-দুটিকে ঘুম পাড়িয়ে অলস ভাবনায় বসে বসে মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছিল। উঠে দাঁড়ালো সে। বললে, 'কিছু না।'

মঞ্জুদি বললেন, 'আজকাল বুঝি আমার কাছে আসতে বারণ তোমার? লজ্জা করে আমার সামনে আসতে?'

ম্লান হেসে চুপ করে রইলো শিউলী।

'এসো না, একটু গল্পসল্প করি। সময় কাটে না একদম।'

অগত্যা মঞ্জুদির ঘরে এসে বসতে হলো।

তিনিই চালিয়ে যেতে লাগলেন কথা। শিউলী শ্রোতা।

একসময় তিনি বললেন, 'হাসপাতালে যাচ্ছো কবে? সময় তো হয়ে এলো, তা-ই না?'

'হুঁ।' শিউলী হাসতে চাইলো।

'আমার মনে হয় এসব ব্যাপারে পি. জি. হাসপাতালই সেফ একেবারে। ওরা বেশ কেয়ার নেয়। একটা কেবিন নিলে তো কথাই নেই। আমার ফুটু তো ওখানেই হোল।'

শিউলী শুনতে থাকলো শুধু।

'ওভালটিনটা খাচ্ছো তো? ওটা বেশ কাজ দেয়। আর, একটা কাজ করো না, কেভেন্টার্সের দুধের ব্যবস্থা করে নাও না। ওরা একেবারে বাড়ী বয়ে দিয়ে যাবে। ও-রকম ফ্রেস দুধ পাওয়া যায় না।'

শিউলীর চোখ দুটো পলকহীন।

'আর সব চাইতে ভালো হয়, যদি একটা কোর্স ক্যালসিয়ম নিয়ে নাও। আমার ফুটু হবার সময়, ওঃ, সেকি ব্যস্ততা ওঁর! ও-ইতো ক্যালসিয়ম ইন্‌জেকশন আমায় দেওয়ালে।'

খানিকক্ষণ দু'জনেই নিশ্চুপ।

আবার মঞ্জুদিই বললেন, 'আমি কিন্তু ভাই, বারবার এসব ঝামেলা পোয়াতে রাজী নই।



একটি, বড় জোর দুটি। তারপর আর একটিও না, একটিও আসতে দোব না। তা-ই ভালো নয়, কি বলো?' কেমন এক অদ্ভুত ভঙ্গী করে খিলখিল করে হেসে উঠলেন তিনি।

শিউলী উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'ওরা বুঝি উঠে গেছে মঞ্জুদি, ওই তো কান্না জুড়েছে। চলি।' কথাটা বলেই ছুটে যেন সে বেরিয়ে এসেছিল মঞ্জুদির ঘর থেকে।

অথচ প্রতুলকে এসব কিছুই বোঝানো যাবে না। ও অবুঝ একেবারে, ওর মনটা নিরেট পাথর।

জানালা দিয়ে তাকালে যে একফালি আকাশটা দেখা যায় তা নীল রঙ হারিয়ে ফেললে একদিন। তামাটে-ধূসর রঙ হলো আকাশটার। ঝলকে ঝলকে হিমেল হাওয়ার ঢেউ এসে লুটিয়ে পড়লো ঘরের মধ্যে। সামনের রাস্তায় কয়েকটা বৃষ্টির ছাট বয়ে গেল। ওই ছোট্ট একফালি আকাশ থেকে সরু একরাশ কাচের কুঁচো যেন ঝড়ে পড়লো রাস্তায়। প্রথম বর্ষা আষাঢ়ের আবির্ভাব জানালো।

আর এরিমাঝে এলো শিউলীর জটিল সময়টা।

প্রতুলের অফিসে যাওয়া স্থগিত হলো সেদিনের মতো। হন্তদন্ত হয়ে সে ছুটোছুটি করলো খানিকক্ষণ। তারপর একটা নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলবার সুযোগও পেল একসময়।

শিউলী মাতৃ-সদনে ভর্তি হলো।

সে-রাত্তিরেই অসহ্য যন্ত্রণায় লুপ্ত হয়ে গেল তার সমস্ত চেতনা। জানলো না সে, টেরও পেল না কখন মাতৃরসের স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় জন্মগ্রহণ করলো একটি মানব-শিশু। আর যে-শিশুটিকে তার অজান্তেই কখন কারা সরিয়ে নিয়ে গেল কোথায়। নব-জাতকের মুখ দেখবার একটু সুযোগও কেউ দিলে না তাকে।

কিন্তু দেখতে পেল অন্য অনেক লোক। পথ চলতি রাস্তার লোক।

খবরটা সকালের দিকেই ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষের পেটে দানব-শিশু, এমনি একটা খবর ছড়িয়ে পড়েছিল মুখে মুখে। কাগজেও নাকি উঠেছে খবরটা।

তাই ছোটখাটো একটা ভিড় সকালের দিকেই মাতৃ-সদনের গেটের সামনে জমেছিল। কিন্তু গেট খোলা হয়নি তখন। ডাক্তারদের গবেষণা তখনো নাকি চলেছে সেই অদ্ভুত শিশুটিকে নিয়ে।

লোকের কৌতূহল নিবৃত্তির সুযোগ এলো বিকেলের দিকে।

গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। মাতৃ-সদনের উঁচু, প্রশস্ত বারান্দায় একটি উঁচু টেবিলের উপর এ্যাল্‌কোহল-ভর্ত্তি একটি কাচের পাত্রে রাখা হয়েছে সেই শিশুটিকে। মানুষের বিকৃত রূপ, একটি বিকলাঙ্গ প্রতিমূর্ত্তি।

গেট খুলে দিতেই একটা ভিড় ভেঙ্গে পড়লো মাতৃ-সদনের প্রাঙ্গণে। সবার চোখেমুখে

দারুণ বিস্ময় আর কৌতূহল। অফিস প্রত্যাগত লোকের সংখ্যাই বেশী। পথ-চলতি মুটে মজুরও রয়েছে কিছু সংখ্যক।

'কাগজে তো ঠিকই দিয়েছে ছবিটা। সত্যিই তো ঠিক দত্যি-দানার মতো দেখতে।'

'মনষ্টার মশাই, মনষ্টার! কলিকাল আর কাকে বলে? নইলে মানুষের পেটে জন্তু জানোয়ার!'

মন্তব্যের পর মন্তব্য। আলোচনার পর আলোচনা। কলরব মুখর হয়ে উঠেছে মাতৃ-সদনের প্রাঙ্গণটি।

বাইরের এই দৃশ্যপট মাতৃ-সদনের দোতলা থেকে দেখা যায় না। কিন্তু কোলাহল কানে যায় স্পষ্ট।

শিউলী শুনছিল সবই। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে একটা ক্ষীণ যন্ত্রণার অনুভূতি রয়েছে এখনো। মাথার ভেতরটা কেমন ফাঁপা মতো মনে হয়। তবু সেই বিবশ-দুর্বল চেতনাও খবরটা ধরে নিতে পেরেছে ঠিক। সারা মাতৃসদনে ফিস্‌ফাস্ আলোচনা চলেছে। পাশের বেডের মহিলারা চেপে চেপে সর্তক কথাবার্তা বলেছেন তার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে। ওঁদের কথাগুলোও নির্ভুল শুনতে পেয়েছে শিউলী।

একটু ভাবতে গেলেই সমস্ত শরীরে কি যেন পাক দিয়ে ওঠে। চোখের সামনে থেকে কড়িকাঠগুলো আর ঘূর্ণ্যমান ফ্যানটা নিমেষে সরে যায় যেন। পারে না, ভাবতে পারে না শিউলী। ভাবতে সে চায় না।

তবু উদগ্র হয়ে ওঠে ইচ্ছাটা। মাতৃ-সদনের প্রাঙ্গণে ওই কাদের কোলাহল? কাদের ভিড়? কাকে দেখবার জন্যে? সঙ্গে সঙ্গে আবার চিন্তা-শক্তিটা গুলিয়ে যায় শিউলীর। অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে, কাটাছেঁড়া ছবির মতো শুধু দেখতে পায় একটি দৃশ্য—বেবি শো। দেখতে পায় শুধু একজনকে—মঞ্জুদিকে।

কে?

'কেমন আছো এখন,' হাল্কাভাবে বেডের একধারে এসে বসলো প্রতুল। শিউলীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেমন বোধ করছো এখন।'

বালিসে মুখ গুঁজে ঘাড় ফিরিয়ে নিলে শিউলী।

'নিখিলেশদা'দের আসবার কথা ছিল—'

কথাটা শেষ হলো না প্রতুলের। বালিস থেকে সেই মুহূর্তেই মাথা তুললো শিউলী। আর পরক্ষণেই প্রতুলের কোলে মুখ গুঁজে কান্নায় ফুঁপিয়ে উঠলো, 'না, না, ওরা যেন না আসে। ওদের বারণ করে দাও। ওদের আসতে দিও না আমার কাছে।'

বুক-ভেঙ্গে দেওয়া আর দুটো ব্যথার মতো আজকের এ-ব্যথাটাও সইতে পারবে শিউলী, কিন্তু মঞ্জুদিকে সে কি করে সইবে?

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

### দশম পরিচ্ছেদ

সুনির্মল যখন কলকাতা এসে পৌঁছুলো, রাস্তায় জল দিতে সুরু হ'য়েছে। তারি মধ্যে বেরিয়ে পড়েছে ঠেলাগাড়ীর রুটি, কেভেণ্টারের দুধ, ঝপঝপ দুই ঝাঁটা দিয়ে ফুটপাত পরিষ্কার করতে লেগেছে ঝাড়ুদারেরা। ভিখিরিরা উঠে বসেছে আড়মোড়া ভেঙে।

আবার বাড়ি। আবার প্রমীলা। আবার আপিস। হতাশায় ক্লান্তিতে পা ভেঙে এলো সুনির্মলের। এই দায়িত্ব আর কতকাল। কতকাল আর! ফিরতেই হবে কোন না কোন সময়ে ঐ চার দেয়ালের ফোকরে। হা ভগবান! ট্যাক্সির গহ্বরে নিজেকে নিক্ষেপ করে যেন মরে গেল মানুষটা।

বসবার ঘরের দরজাটা খোলাই ছিলো, শিথিল গতিতে ভেতরে ঢুকতেই—নিবারণের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। শুকনো মুখে ব্যস্ত হ'য়ে ঐ ভোরেই কোথায় যাচ্ছিল সে, তাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো: 'আপনি কোথায় ছিলেন দু'দিন? মার যে বড্ড অসুখ।'

'মার! কী অসুখ?'

'খুব জ্বর। ডাকলে সাড়া নেই, শব্দ নেই। ওদিকে ছোট দাদাবাবু রাগ ক'রে যে তার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আছেন—'

'তাই নাকি?'

ব্যাকুল পায়ে মার ঘরে ছুটে এলো সুনির্মল। মেঝের উপর চোখ বুজে পড়ে আছেন হিরণ্ময়ী, বড় বড় কালো চুল চোখে মুখে মাখামাখি, থান কাপড়ের আঁচল বিশৃঙ্খল হ'য়ে ছড়িয়ে জড়িয়ে একাকার। দৃশ্যটা মর্মান্তিক। রিক্ত নিরাভরণ হাত দু'টো অবলম্বনহীন হ'য়ে পড়ে আছে এলিয়ে। নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল সুনির্মল। এই সেই হিরণ্ময়ী? তার মা। রাজেনবাবুর স্ত্রী? এই! এই তাঁর দশা! কেবলমাত্র রাজেনবাবু নেই, তাতেই তাঁকে এইখানে আসতে হয়েছে? সহসা অদ্ভুত একটা কষ্টে বা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল বুকের ভেতরটা, যেন ঠিক কষ্টেরও না, সে যে কী রকম বুঝে উঠতে পারলো না সে। কাছে সরে এসে কপালে হাত রাখলো নিচু হ'য়ে, হিরণ্ময়ী বড় বড় লাল চোখ মেলে তাকালেন একবার। সুনির্মল খাটের এলোমেলো বিছনাটা সমান করে নিয়ে পাঁজা

কোলে ক'রে তুলে দিল তাঁকে। তারপর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে উপরে উঠে এলো। সিঁড়ির মুখে ডাইনে প্রমীলার ঘর, দরজা খোলা, পর্দাটা নড়ছে বাতাসে, সুনির্মল বাঁয়ের বারান্দা বেয়ে নিজের ঘরে এলো, আর এসেই স্তম্ভিত।

ঘরটার মধ্যে যেন ঝড় বয়ে গেছে একটা। হিরণ্ময়ীর হাতের সাজানো ঘর, চিরদিনের বেডকভার-ঢাকা নিচু নিচু পাশাপাশি দু'ভাইয়ের দুই খাট, বেডসাইড টেবিল, ওয়ার্ডরোপ, তার উপরকার কাচের ফুলদানি, জামা জুতো হ্যাঙ্গার, ট্রাঙ্ক বাক্স—সব ভেঙেচুড়ে ওলট-পালট, একেবারে তচ্‌নচ্‌। ধুলোয় এক হাঁটু, ঘরময় কাগজের কুচি—একপলক তাকিয়েই ব্যাপারটা যেন হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো। তারপরেই ছুটে এ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

'আমার ঘর ওরকম করেছে কে?'

প্রমীলার ঘুমের জড়িমা তখনো কাটেনি শরীর থেকে। চমকে মুখ ফেরালো, তারপর সুনির্মলকে দেখে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল তার চোখে মুখে, সোজা তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে, জবাব দিল না।

'কে! কে করেছে ওরকম? আমি জানতে চাই কে করেছে।'

'আমি'—পরিষ্কার গলা প্রমীলার।

'কেন?'

'ইচ্ছে।'

'তোমার ইচ্ছেমতই সব হবে নাকি?'

'হ্যাঁ'

'না।'

'আমার যা ইচ্ছে তাই করবো।'

'নুনা, নুনা।'

'নিশ্চয়ই। তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই কর না?'

'মনে রেখো এটা আমার বাড়ি।'

'তুমিও মনে রেখো এটা আমার বাড়ি।'

'তোমার বাড়ি! তুমি এ-বাড়ির কে? কেউ নও। ঘাড়ে ধ'রে এই মুহূর্ত্তে আমি তোমাকে বার করে দিতে পারি বাড়ি থেকে।'

'দাও না।'

'বেরোও, এই মুহূর্ত্তে বেরোও তুমি এখান থেকে।' সুনির্মলের বিকৃত গলার আওয়াজে ভয় পেয়ে ছাতের আলিসা থেকে একটা কাক উড়ে গেল। উল্টোদিকের বাড়ির ঝি-টা বাসন মাজতে মাজতে উঠে এসে উঁকি দিয়ে দৌড়ে গেল, বোধ হয় আর সকলকে এই মজার দৃশ্যটা



দেখাবার জন্য। প্রমীলা একটা শিকারী টিকটিকির মত গুটি গুটি এবার এগিয়ে এলো কাছাকাছি। দাঁত ঘষতে ঘষতে, নাক ফুলোতে ফুলোতে, হাতে মুঠো পাকিয়ে।

সুনির্মলের গা শিরশির ক'রে উঠলো তার দিকে তাকিয়ে। একটা ভয়ে, একটা অস্বস্তির শিরশিরানি—দু'পা পিছিয়ে গেল সে আর প্রমীলা ঝাঁপিয়ে পড়লো তার গায়ের উপর, দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে দিল তার আধপুরোনো সার্ট, টানের চোটে টাইটা ফাঁসির মতো আটকে গেল গলায়। প্রায় জিব বেরিয়ে এলো।

'বলি ঐ তারকারাক্ষসীটা তোমাকে চিঠি লেখে কেন শুনি? শুনি সে কথা? দু'দিন দু'রাত হৃৎপিণ্ডেশ্বরীর সঙ্গে কোথায় গলা-ধরাধরি করে শুয়ে এলে? কই? কোথায় সেই প্রেয়সী, ডাকনা, ডাকনা, তোমাকে রক্ষা করুক না এসে এবার।' হাতের নখ বসিয়ে দিল গলার কাছের উন্মুক্ত অংশে। দুই চোখ ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করতে লাগলো হিংসার আগুনে। সুনির্মল একমুহূর্তের জন্য দিশাহারা হ'য়ে থমকালো একটু, তারপরই আচমকা একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় তাকে ফেলে দিল মাটিতে। প্রমীলা দেয়ালে ঠোক্কর খেয়ে, খাটের বাজুতে সিমেন্টের শক্ত মেঝেতে পড়ে গেল লম্বা হয়ে, কপালের কাছে ফেটে গিয়ে রক্তের ফিনকি ছুটল। সুনির্মল দরাজাটা ভেজিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এসে হাত ধুলো।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### এক

হিরণ্ময়ীকে নিয়ে কয়েকদিন খুবই টানা-পোড়েন গেল, তারপর ভালো হ'য়ে উঠলেন আস্তে আস্তে। এই একমাসের মধ্যে হাজার চেষ্টা ক'রেও মাকে এই অবস্থায় ফেলে আর সুনির্মল কিছুতেই পাটনা গিয়ে উঠতে পারলো না। কিন্তু চিঠি লিখলো ঘন ঘন। আর সেই চিঠিতে ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে মনটাকে সে মেলে দিতে পারলো শকুন্তলার কাছে। দেখতে দেখতে যেটুকু আড়াল ছিলো মাঝখানে কখন সেটুকু সরে গিয়ে দু'জনই দু'জনের কাছে নিবিড়তর হ'য়ে উঠলো এই পত্রালাপের সেতু বেয়ে বেয়ে। চিঠির গতি আরো দ্রুত হ'লো, ঘন ঘন থেকে একদিন অন্তর, একদিন অন্তর থেকে রোজ, রোজ থেকে শেষে এবেলা ওবেলা।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো একটু একটু ক'রে পূর্ণ হ'য়ে উঠলো দিনগুলো, বিবর্ণ ব্যথিত জীবনে ঝিরিঝিরি ফাল্গুনের হাওয়া বইলো, সমস্ত প্রতিকূলতাকে যেন হার মানিয়ে জিতে গেল তারা। একটি সূক্ষ্মশীতল সুধাস্রোত বয়ে যেতে লাগলো রুক্ষ কঠিন, ধূলি-ধূসরিত জীবনের উপর দিয়ে। যে গাছ একফোঁটা জলের তৃষ্ণায় শুকিয়ে মরছিল, এই সিঞ্চনে বেঁচে উঠলো প্রাণ পেয়ে। মরা ডালে আবার নরম সবুজ কুঁড়ি ধরলো।

এরপর আবার যখন দেখা হ'লো—

সুনির্মল বললো, 'এবার তুমি কলকাতা চলে এসো। আর পারিনে।'

শকুন্তলা বললো, 'পাগল !

'কেন আপত্তি কী ?'

'ওখানে আমাকে কে চাকরী দেবে ?'

'চাকরী কি একটা করতেই হবে তোমাকে ?'

'আর আমার করবার কী আছে ?'

'পড়ো না।'

'পড়বো।'

'তবে আর কী।' খুসীতে ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো সুনির্মল, 'তা হ'লে বিনু সুনন্দও খুসী হবে। আমি ঠিক জানি তোমার এই চাকরী নিয়ে এখানে আসায় নিশ্চয় ওরা রাগ করেছে। বল ঠিক কিনা।'

শকুন্তলা হাসলো—'তাই বলে কি তুমি ভাবছো আমি কলকাতা যাবো ?'

'নিশ্চয়ই।'

'এখানে থেকে বুঝি আর পড়া যায় না ?'

'এখানে কী পড়বে ?'

'বি, টি, পড়বো। তুমি বলবার আগেই ভেবেছি সে কথা। মাষ্টারির লাইনে ওটা ছাড়া ভালো গতি হয় না।'

'বেশতো ! তার জন্যেও তো তোমাকে কলকাতাই যেতে হবে।'

'তা কেন ? প্রাইভেট পড়তে বাধা কী ?'

'ও' মুখ ভার করলো সুনির্মল। একটু পরে বললো—'আমি আসছে শনিবার আসবো না।'

'কেন ?'

'আমার শরীর খারাপ হ'য়েছে।'

'কই দেখি।'

হাতের পাতায় হাত রাখলো শকুন্তলা তারপর একটু হাসলো, 'মিছিমিছিই তুমি রাগ করছো, আমার পক্ষে চাকরী ছাড়া এখন অসম্ভব।'

'কিছু অসম্ভব না।'

'খুব অসম্ভব। যাদের কথা আমি মান্য করতে পারিনা, তাদের টাকাও আমি গ্রহণ করতে পারি না। এটুকু আত্মসম্মান আমাকে তুমি রক্ষা করতে দাও।'

'তা হ'লে কি তুমি বলতে চাও, তোমার পড়ার খরচ দিতে ওরা অনিচ্ছুক, যদি তুমি তাদের হুকুম মাফিক না চল ?'



'ছি।'

'তবে ?'

'সে সব তুমি বুঝবেনা। ওকথা থাক। ভেবে নিতে পার না কেন চাকরী নিয়ে যখন এসেছি ওঁদের ছেড়ে তখন মনস্থির ক'রেই এসেছি।'

'তাহ'লে আমি খরচ দেব।'

'কী।'

'কী আবার ? আমার আর তোমার টাকা কি আলাদা ?'

দূরে সিগনেল ডাউন হ'লো, তার দিকে তাকিয়ে আবছা হাসলো শকুন্তলা। আকাশের আলোয় তার চোখ চকচক করে উঠলো।

তবু, তবুও এই বিচ্ছেদে মিলনেই, এই দূরত্বের ব্যবধানেই, মাঝেমাঝে পাটনা আসতে পারার ভাগ্যটুকুতেই, সুনির্মল ভেতরে ভেতরে অদ্ভুত একটা মধুর-বিধুর অনুভূতিতে থরো-থরো হ'লো। তার মনটা যেন আশ্রয় পেলো, নির্ভর পেলো। ডুবে যেতে যেতে যেন হঠাৎ মাটি পেয়ে বর্তে গেল পায়ের তলায়। মনে মনে বললো, আছে, আছে, আমার জন্যেও কিছু আছে এই সংসারে। ঈশ্বর কৃপণ নন, অবুঝ নন, সবটাতেই তাঁর পরিমিতি আছে। এমন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যেও এই তো কেমন লুকিয়ে রেখেছেন বিদ্যুৎ। বেঁচে থাকার এমন একটা পরিপূর্ণ অবলম্বন।

রাজেনবাবুর মৃত্যুর পরে এই যেন প্রথম সে হাওয়া নিল বুক ভ'রে। স্তব্ধ ফুসফুসে প্রাণ-সঞ্চয় হ'লো। রাত্তিরে অন্ধকার ঘরে একা বিছানায় শুয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করলো : তুমি আছ, আছ। আমি বাঁচলাম, বাঁচলাম। না-হয় না-ই পেলাম ধূলোতে মাটিতে, পার্থিব সুখের শারীরিক জগতে তবু তো পেলাম ? সারা হৃদয় ভ'রে পেলাম, সমস্ত মন ভ'রে পেলাম। যা পেলাম তার তুলনা পেলাম না। জানলাম তুমি আমার, শুধু আমারই। আমার জন্যই তুমি আছ। তুমি যখন অন্যমনে তাকিয়ে থাক আকাশে, আমি জানি তুমি আমাকেই ভাবছো, সকালে যখন তোমার জানালা দিয়ে ঝরা বকুলের গন্ধ ভেসে আসে, আমি জানি সেই গন্ধে আমাকেই তোমার মনে পড়ে। আর আমি ঘড়ির কাঁটার মত লাফিয়ে লাফিয়ে সপ্তাহ কাটাই, আর কিছু না থাক শনিবার তো একটা আছে সবকিছুর শেষে ? তারপর ? তারপর তুমি। তুমি ! সমস্ত রবিবার ভ'রে শুধু তুমি আর আমি।

সুনির্মল নতুন চোখে তাকালো পৃথিবীর দিকে। জীবনটাকে যতো অসহ্য মনে হয়েছিলো তত অসহ্য আর লাগলো না।

## দুই

আরও একটা অপ্রত্যাশিত শান্তি এলো তার জীবনে। সেটা প্রমীলার নিঃশব্দতা। হঠাৎ কেমন করে কেন যে সে এমন চুপচাপ হ'য়ে গেল ভেবেই পেলোনা সুনির্মল। মনে হ'লো হিরণ্ময়ীর অসুখের পর থেকেই যেন তার এই শান্তভাব। ঘর থেকেই বেরোয়া না, এক মাসের মধ্যেও তার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হ'য়েছে এমন কথা মনে পড়লো না তার। একদিন এসে মাসের প্রথমে খরচ চাইতে দাঁড়িয়েছিলো দরজায়, সুনির্মল সুতোয় গাঁথা মাইনের টাকা ছুঁড়ে দিয়েছিলো তার দিকে। যেমন ক'রে লোভী কুকুরকে মানুষ তার খাবার ছুঁড়ে দেয়। তারপর চুপ।

এতদিন পর তার জন্যেও মনের কোথায় একটু করুণা বোধ করলো সে। বোকা, লোভী, স্বার্থপর, হিংসুক যাই হোক, আহা তবু তো মানুষ? আছে তো এখানে? ঈশ্বর তাকে এই বানিয়েই ধরাধামে পাঠিয়েছেন, তার বাপ তাকে এই শিক্ষা দিয়েই বড়ো করেছে। তবে ওর আর দোষ কী? ও যেমন কাউকে ভালোবাসতে শেখেনি, তেমনি ওকেও তো কেউ ভালোবাসেনা। জীবনের প্রথমদিন থেকে সুনির্মলই বা কী দিয়েছে ওকে? কর্ত্তব্য। কর্তব্যই কি সব? হয়তো এমনও হ'তে পারতো কোন সহৃদয় মানুষের উত্তাপ পেলে ওর ঠাণ্ডা হৃদয়ের পাষাণ গলে পড়তো, ও মানুষ হ'তো, ও বাঁচতো।

কী ভেবে বাইরে বেরিয়ে যেতে যেতে ও ফিরে এসে প্রমীলার ঘরে ঢুকলো—মরার মতো সাদা হ'য়ে প্রায় বিছানায় লেগে শুয়েছিলো প্রমীলা—স্বামীকে দেখে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। সুনির্মল বললো, 'কী হ'য়েছে? শুয়ে আছ কেন?'

'আমার অসুখ করেছে।'

'কী অসুখ?

'জেনে তোমার লাভ কি?'

'অসুখ করলে তার প্রতিবিধান আছে।'

'মার জন্য কর গিয়ে, আমি কে?'

ভুরু কুঁচকে চুপ করলো সুনির্মল।

প্রমীলা মুখ ঘোরালো সম্পূর্ণভাবে, 'তুমি আমার একটা উপকার করবে?'

'কী'?

'বল আগে করবে। আগে কথা দাও।'

'না শুনে কথা দেব কেমন ক'রে।'

'আমার বাবার নামে একটা উকিলের চিঠি দেবে?'

সুনির্মল আকাশ থেকে পড়লো—'কার নামে?'



'আমার জোচ্চার বাবাটার নামে।'

প্রমীলার কি মাথা খারাপ হ'য়েছে? সভয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো সুনির্মল। প্রমীলা বেগে উঠে বসলো: 'ওকে আমি ফাটকে দেব, ফাটকে দেব, ফাটকে দেব।'

'কী করেছে সে?'

'কী করেনি? আমার সর্ব্বস্ব নিয়েছে, আমার সব হাতড়িয়েছে, আমাকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে পথে বসিয়ে ছেড়েছে গো'—বলতে বলতে প্রায় ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলো, 'আর এখন আমাকে দেখলেই পালিয়ে থাকে, আসতে বললে আসেনা, যেতে চাইলে নেয় না। তুমি আমার স্বামী, আমার ইহকালের পরকালের দেবতা। তুমি এর একটা বিহিত ক'রে দাও।'

সুনির্মল পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, তাকিয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে।

প্রমীলা আবার কাঁদলো: 'আমি তোমার হাতে ধরছি, পায়ে ধরছি. বল তার নামে তুমি মামলা আনবে, চুলের মুঠি ধরে পুলিশে তাকে টেনে নিয়ে যাবে জেলে, রুলের গুঁতোয় ভেঙে দেবে সব চালাকি।'

সুনির্মল চুপ।

'ওগো চুপ ক'রে রইলে কেন? বল, বল, কথা দাও তুমি করবেই।'

'কী নিয়ে মামলা করবো?'

'কী না! ওগো তুমি আমি যে অভিন্নহৃদয়! তোমার জিনিষ আমার জিনিষ যে এক—'

সুনির্মল ভাষা শুনে শিহরিত।

'বাবা আমার তিনশো ভরি সোনার ইঁট চুরি করেছেন': হেঁচকি তুলে: 'একশো টাকার নোটে দশখানা ক'রে বাইশটা বাণ্ডিল—'

'এ্যাঁ।'

'হায়! হায়! আমি কোথায় যাবোগো, আমার লক্ষ টাকার গয়না, বাইশ হাজার টাকা—' শোকের অধীরতায় কথা ফাঁস হয়ে গেল।

প্রমীলার এমন নিঃশব্দ হ'য়ে যাওয়ার কারণটা এতক্ষণে বোঝা গেল। বোকার মতো তাকিয়ে থেকে হঠাৎ যেন সুনির্মল ঘুম ভেঙে কথা বলে উঠলো, 'লক্ষ টাকার গয়না? বাইশ হাজার টাকা!'

'হ্যা গো হ্যাঁ। আমি তবে বলছি কি তোমাকে? তুমি সব উদ্ধার ক'রে দাও—আমি তোমার কেনা দাসী হ'য়ে থাকবো।'

'এতো তুমি পেলে কোথায়?'

জবাব দিতে দেরী ক'রে প্রমীলা উপুর হ'য়ে সুনির্মলের পা জড়িয়ে ধরলো: 'সব

আমি জমিয়েছিলাম। সব আমার! সব আমার। ভগবান সাক্ষী, দুই চোখের দিব্যি সব আমার। যদি আমার না হ'য়ে বাবার হয় তবে যেন এই দু'চোখ আমার খসে পড়ে, আমার যেন কুরুকুষ্ঠু হয়!' একটা বুকফাটা হাহাকারে ডুকরে উঠল সে।

তিন

দেয়ালে হেলান দিয়ে গায়ে কাপড় জড়িয়ে ছবির মত বসেছিলেন হিরণ্ময়ী ছেলেকে দেখে নড়েচড়ে বসলেন। ভালো হ'য়ে যাবার পর থেকে আবার ছেলের সঙ্গে দেখাশুনা তার বিরল হ'য়ে উঠেছে। আজ এই অসময়ে তাকে দেখে একটু অবাক হ'লেন।

'এখনো বেরুসনি।'

'না—।'

'আপিস নেই?'

'আছে।'

'তবে?'

'মা'

'কেন?'

'তুমি কি জানতে সব গয়না মিলিয়ে তোমার কত ভরি সোনা ছিল?'

'কী ক'রে জানবো বাবা, মাপিনি তো।'

'বাণ্ডিল করা টাকা ছিলো, কিন্তু ক বাণ্ডিল তা কি জানতে?'

'মনে নেই। সারা জীবনের সঞ্চয়, কত ছিলো দেখিনি, দেখলেও ভুলে গেছি।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন: 'তোদের লুকিয়ে তোদেরই ভাল করতে চেয়েছিলাম, সবই হ'লো।'

'আমি জানি।'

'কী জানিস।'

'কত টাকা আর কত সোনা ছিলো। পুলিশের কাছে কিছুই বলতে পারনি, না টাকার অঙ্ক, না সোনার পরিমাণ।

হিরণ্ময়ী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমি আবার মামলা করবো।'

'আবার মামলা করবি?'

'হ্যাঁ আবার। আবার।'

'তারপর।'

'তারপর তোমার সুখ হবে, শান্তি হবে, লক্ষ টাকার গয়না আর বাইশ হাজার টাকার মালিক হবে তুমি।'



'লক্ষ টাকার গয়না বাইশ হাজার টাকা? আবার সুখ, আবার শান্তি?' বলতে বলতে ক্লান্তিতে যেন ভেঙে পড়লেন, 'এত খবর কোথায় পেলি?'

'যে চুরি করেছে তার কাছ থেকেই। চোরের উপর বাটপাড়ি হয়েছে। বাপ-মেয়েতে পরামর্শ ক'রে করেছিলো কাজটা, এখন যজ্ঞেশ্বর কনট্রাকটার মেয়েকে ঠকিয়ে একাই সব গ্রাস করে বসেছে।'

হিরণ্ময়ী এবার হাসলেন: 'আর তার গ্রাস থেকে তুই উদ্ধার করে আমাকে এনে দিবি?'

'হ্যাঁ।'

'এ তো অনেকদিনের ঘটনা সুনু, এখন আবার নতুন করে তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস্ কেন বলতো?'

'এ কি ফেলে দেবার? চুপ করে থাকবার?'

'ফেলেই তো দিয়েছিলি, চুপও তো করেছিলি, আজ কি তোর টাকার অঙ্কটা শুনেই লোভ হ'লো?'

'লোভ!' দপ্ করে যেন বারুদ জ্বলে উঠলো: 'আমার লোভ!'

'তাছাড়া আর কী! জানতিস অনেক গয়না, অনেক টাকা, কিন্তু তার পরিমাণ যে এত শুধু সেটুকুই ত জানতিস না। মন খুঁজে ছাখতো, সেই পরিমাণটাই আজ তোকে বিচলিত করেছে কিনা।' হিরণ্ময়ী হাঁপালেন, 'না সুনু না, ঐ ময়লা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি না। ঐ পাকের মধ্যে আর জড়াসনে। আজ শোকের আবেগে প্রমীলা তোকে যে কথা বলে ফেলেছে, যে নির্ভর করেছে, যে আশ্বাস দিয়েছে, কাল তার চতুর বাপ এসে এক ফুঁয়ে ঠাণ্ডা করে দেবে সব। ওদের কবল থেকে একটি আধা পয়সাও তুই বার করতে পারবিনে। ওরে বোকা ছেলে, এতদিনেও বুঝলিনে যে আর আমাদের সুখ নেই, শান্তি নেই, কিছুতেই আর কিছু হবার নয় আর? টাকা দিয়ে তুই সুখ কিনতে চাস? শান্তি কিনতে চাস?'

'মা'

'না, বাবা, না, ও সব নোংরা ঘেঁটে আর আমাকে কষ্ট দিস্‌নে, কষ্ট দিস্‌নে।' ছেলের হাত দু'টো ধরে বুকের কাছে টেনে নিলেন: 'আমার জন্যেই সব এমন ওলট পালট হয়ে গেল। আমার জন্যেই এই দুঃখের সাগরে ডুবলি তুই, কিন্তু আর না—' গাল বেয়ে তার অজস্রধারায় জল গড়িয়ে পড়লো।

সুনির্মল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো তার দুঃখ-ক্লান্ত ছোট্ট হয়ে যাওয়া মাকে, যাঁর কপালে, দুই ভুরুর মাঝখানে এখনো চাঁদের মত গৌর, গোল ফোঁটাটি শাদা হয়ে সাক্ষী দিচ্ছে তার অতীত সুখের কাহিনী।

(ক্রমশঃ)

# আত্মকথা

## প্রমথ চৌধুরী

[ প্রমথ চৌধুরীর 'আত্মকথা'র প্রথমাংশ—বিলাতযাত্রা পর্যন্ত—১৩৫৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী অংশ যতদূর তিনি লিখে যেতে পেরেছিলেন তার কোনো কোনো অধ্যায় শ্রীবুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত বার্ষিক পত্র 'বৈশাখী'তে ( ১৩৫২ ) মুদ্রিত হয়েছিল। অবশিষ্ট অংশ পূর্ব্বাশাতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হবে। ]

তখন অক্টোবরের মাঝামাঝি। শীতের প্রারম্ভে বিলেত দেশটা দেখতে মোটেই সুন্দর নয়। তখনো বরফ পড়তে সুরু করেনি। আকাশ থেকে যা পড়ে তাকে তারা sleet বলে, অর্থাৎ গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ মেশানো—অত্যন্ত অপ্রীতিকর। আকাশে কুয়াশা ক্রমে ঘন হয়ে আসে। লণ্ডন সহরে কখনো কখনো সে কুয়াশার রঙ্ হলদে হয়। ইংরেজরা তাকে বলে pea-soup fog। সে কুয়াশা এত গাঢ় যে সত্যি সত্যি তাকে জিভ দিয়ে চাটা যায়। আর রাস্তাঘাট ঘোর অন্ধকার হয়ে যায়। সুখের বিষয় এই যে, এ হেন হলদে কুয়াশা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না।

আমি একদিন রিজেণ্ট ষ্ট্রীটে এই fog-এর ভিতর পড়েছিলুম। ফগ্ কেটে গেলে দেখি বিলেতের পাকা চোররা এ পাঁচ মিনিটের ভিতর বড় বড় দোকানের বড় বড় সার্সি কেটে বহুমূল্য জিনিস নিয়ে গেছে। সেদিন আমি সেই চোরদের বাহাদুরি না দিয়ে থাকতে পারিনি।

পূর্বেই বলেছি যে, আমি প্রথম ধাক্কায় সমস্ত ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দিই এবং পাস করি। তারপর দু'বৎসরের উপর টার্মস রাখবার জন্যে লণ্ডনে থাকি। ১৮৯৬ সালের অগাস্ট মাসে আমি বিলেত থেকে দেশে রওনা হই। কিন্তু Calabriaর ভিতর দিয়ে ব্রিণ্ডিসি পর্যন্ত আসতে আমার মনে হয় যেন sunstroke হয়েছে। আমি ব্রিণ্ডিসি থেকে টিকিট বদ্‌লে লণ্ডনে ফিরে যাই। মাসখানেক সেখানে থেকে তারপর দেশে ফিরি।

আমি প্যারিস্ থেকে বরাবর লুসার্ণ যাই। সেখান থেকে অনেকটা পথ স্টীমারে যেতে হয়। তারপর একটা স্টেশনে নেমে রেলে করে মিলান যাই। মিলানে একটা ভাল হোটেলে জায়গা পাই। মিলানের বড়বাজার বাড়ির খুব কাছেই ছিল। আমি রোজই সেটা দেখতে যেতুম। সে অঞ্চলে অনেক ইটালিয়ানের সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাঁরা যে কিসের জন্য সেখানে আসতেন, তা বলতে পারিনে। কারণ দোতলা-তেতলায় যেখানে ভাল জিনিস, সেখানে কখনো তাঁদের যেতে দেখিনি। মিলানে একটা অদ্ভুত বাড়ি দেখেছি। একটি ভদ্রলোক তাঁর বাড়িটি মিলান শহরকে দিয়ে গেছেন। তাতে নানারকম কারুকার্যের জিনিস আছে।



সেখানে একটি দোয়াত দেখেছি যার কারুকার্য যথার্থই আশ্চর্য। এমনি প্রত্যেক জিনিসই অনন্যসাধারণ।

দিন চারেক পর আমি মিলান থেকে ভেনিস্ যাই। ভেনিস্ একটা আশ্চর্য সহর। এখানে-ওখানে এক-আধটু মাটি আছে, বাকি সমস্ত শহরটায় জলপথে যাতায়াত করতে হয়। আমি একটা হোটেলে থাকতুম, সেটা গ্র্যাণ্ড ক্যানাল-এর উপর। গলি-ঘুঁজির ভিতরেও গিয়েছি, সেখানে এত নোংরা যে বলা যায় না। গ্র্যাণ্ড ক্যানাল-এর সুমুখেই এড্রিয়াটিক সী। অমি একদিন গ্র্যাণ্ড ক্যানালের উপরেই যে সব গণ্ডোলা বা ইতালীয় নৌকা থাকে, তাতে ক'রে এড্রিয়াটিক সমুদ্রে বেড়াতে যাই। বোধহয় লিডো নামক দ্বীপে যাই। আমি সেখানে বিশেষ কিছু দেখিনি। তবে যতদূর মনে পড়ে টমাস ম্যান লিডো সম্বন্ধে একটা গল্প লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ভেনিস্ থেকে আমি বরাবর ফ্লরেন্স যাই।

ফ্লরেন্সে প্রথমে একটি ঘরেতে মাইকেল এঞ্জেলোর দুটি ছবি দেখি। তারপর Pitti Palace দেখতে যাই। সেটি বাইরে থেকে দেখতে কিছু সুন্দর নয়। কিন্তু ভিতরে বড় বড় শিল্পীর হাতে আঁকা ছবিতে ভরা। ফ্লরেন্সে তিন চার দিন থেকে রোমে যাই। রোম শহরটি উঁচু-নীচু। এক পাড়া থেকে আর-এক পাড়া যেতে হ'লে গাড়ির ভিতর ব্রেক আছে তাই লাগাতে হয়। রোমের আর্ট বিরাট জিনিস। বোধহয় কারাকাল্লার একটি মূর্তি আজও সেখানে টিকে আছে। আমি রোমে কলিসিয়ম দেখতে যাই। সে একটি প্রকাণ্ড কাণ্ড। রোম সহরে দেদার ফোয়ারা আছে। আমি একদিন ভ্যাটিকান দেখতে যাই। ভ্যাটিকান হচ্ছে রোমের পোপের রাজ্য।

রোম থেকে আমি নেপল্‌স্-এ যাই। সেখান থেকে Calabriaর ভিতর দিয়ে ব্রিণ্ডিসি যাই। সেখান থেকে যে-জাহাজ কলকাতা যাবে, সেই জাহাজের কাপ্তেন আমাকে বললে যে, রাস্তায় ভয়ানক গরম পাবে, সুতরাং এই টিকিটের উপর আমি তোমাকে এত টাকা দিতে পারি, তুমি সেই টাকা দিয়ে টিকিট বদলে লণ্ডনে ফিরে যেতে পারবে। আমি তাই করলুম।

লণ্ডনে ফেরবার সময় কোন্ ট্রেনে উঠি মনে নেই। বেলা পাঁচটায় Turin-এ পৌঁছই। স্টেশনে থেমে সামনেই একটা রেস্তরাঁ পেলুম। সমস্ত পথ কিছু খাইনি, তাই ভয়ানক ক্ষিধে পেয়েছিল। তারা বললে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আপনাকে খেতে দিচ্ছি। পূরো কাপড় পরে খেয়েই শুয়ে পড়লুম। শুনলুম রাত বারোটায় একটা ট্রেন আছে, সেটা ধরলে বরাবর প্যারিস্ যাওয়া যায়। সমস্ত দিন উপবাসের পর আমি ভয়ানক ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

রাত বারোটার সময় একটি ওয়েট্রেস্ এসে আমাকে জাগালে। সে বললে, তুমি যে দেখছি ভয়ানক শ্রান্ত হয়ে পড়েছ। তোমার কি কালই প্যারিস যাওয়া দরকার? আমি

বললুম, না। সে বললে, তাহলে আজকের রাতটা থেকে যাও। সে আমার পায়ের বুটজুতো খুলে দিলে, গায়ের কোট খুলে দিলে। তারপর আমি পড়ে' ঘুমোতে লাগলুম।

তার পরের দিন আমি তাকে বক্‌শিশ্‌ হিসেবে সামান্য কিছু দিলুম। আর ট্যুরিন শহর তার সঙ্গে দেখে বেড়ালুম। সে নিজের জন্যে একটি জিনিস কিনলে। এবং আমাকে তার দামের মধ্যে কিছু অংশ ফেরত দিলে। আমি অবশ্য সে টাকা ফিরে নিলুম না। ট্যুরিন শহরটি একেবারে নতুন। মিলান, ভেনিস্‌, ফ্লরেন্স বা রোমের মত পুরোনো সহর নয়।

ফিরতি পথে স্যাভয় দেশ দেখলুম। সে অতি সুন্দর দেশ।

পরদিন ভোরবেলা গিয়ে প্যারিসে পৌঁছলুম। স্টেশনে Cafe au lait ও ছোট ছোট রুটি খেলুম। দুই-ই খেতে চমৎকার। প্যারিসের স্টেশন থেকে লণ্ডন চলে এলুম। মনে হল দেশে ফিরলুম। Tavistock Square গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। শুনলুম মেজদাদা Porlock বেড়াতে গেছেন।

তার পরের দিনই আমি লোকেনদের বাড়ি গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি খাঁ হাজির আছেন। এবং দীপনারায়ণও আছেন। আমি দীপনারায়ণকে আস্তে আস্তে বললুম যে, খাঁ'র এখানে থাকা হবে না। তিনি বললেন যে, আমরা একটি বেশ বাড়ি পেয়েছি, খাঁ গিয়ে অনায়াসেই আমাদের সঙ্গে থাকতে পারেন। খাঁ'কে সঙ্গে নিয়ে আমরা দীপের বাড়ি গেলুম। সে বেশ বাড়ি। দীপ বলেন যে, খাঁ'র নিলের প্রতি মোহবত হয়েছে। আমি বললুম, সে মোহবত ভাঙাতে হবে। কেম্‌ব্রিজের কথা মনে আছে ত?

কেম্‌ব্রিজে নিলের একটি ব্যবহারে আমরা তিনজনে একটু বিরক্ত হয়েছিলুম। এবং সেই জন্যে কাউকে না বলা-কওয়া আমরা লণ্ডনে ফিরে আসি। আমি যে-সময় ইটালিতে পায়চারি করছিলুম, সেই সময় লোকেনরা খাঁ'কে সঙ্গে নিয়ে লেক ডিস্ট্রিক্টে বেড়াতে যায়। এবং সেখান থেকেই নিলের সঙ্গে খাঁ'র খুব মোহবত হয়। এসব মোহবতে আমি কস্মিনকালে বিশ্বাস করিনে। তার পরের দিনই আমি পর্লক চলে গেলুম। সেটি আমার পূর্বপরিচিত জায়গা।

Ilfracombe থেকে লণ্ডন ফেরবার পথে আমি উক্ত স্টেশন পেরিয়ে আসি। পর্লকের স্টেশন বোধহয় সহর থেকে একটু দূরে। পর্লক একটি ছোট্ট শহর। সেখানে কলকাতার হাইকোর্টের জজের ভাগ্নে পার্নেল বলে' একটি আর্টিস্ট থাকতেন। মেজদাদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। আমরা যে বাড়িতে থাকতুম সেখানে খুব ভাল খাবার দিত। সকালবেলা স্ট্রবেরি, চাকভাঙা মধু, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমরা রোজই পার্নেলের বাড়ী যেতুম। তাঁর মা কিছুদিন ছেলের কাছে এসেছিলেন। মা'টি অল্পবয়সে বোধহয় খুব সুন্দরী ছিলেন। তিনি থাকতেন Weston-Super-Mare-এ।



তিনি পর্লক ছেড়ে চলে' গেলে আমি সেখান থেকে তাঁর একখানি চিঠি পাই। আমি টাকার অভাবে Weston-Super-Mare-এ যেতে পারিনি।

পার্নেলদের বাড়ীর অনতিদূরে লেডি কার্সন বাস করতেন। আমি তাঁর ওখানে একদিন চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখি এক বোতল হুস্কি খোলা রয়েছে, তা ছাড়া দু'চার পেয়ালা চা আছে। দেখে মনে হল স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আমি পূর্বপরিচিত। Ilfracombe-এ যে হোটেলে ছিলুম, সেখানে তিনি মধ্যে মধ্যে গিয়ে থাকতেন। স্ত্রীলোকটি মোটেই সুন্দরী নয়। হুইস্কি আমি বিলেতে কখনো খাইনি। সুতরাং বলা বাহুল্য, দুই-এক পেয়ালা চা খেয়ে আমি সেখান থেকে চলে এলুম। পার্নেলদের বাড়ি ফিরে দেখি চায়ের চমৎকার বন্দোবস্ত রয়েছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করলেন—চা কি রকম খেলে? আমি বললুম—সেখানে হুইস্কি চলছে, চা'র সরঞ্জাম কিছু নেই। মিসেস পার্নেল বললেন—These horsey women don't care for anything but whiskey and horses। আমি চলে আসবার সময় তিনি আমাকে ও সমস্ত পার্নেল পরিবারকে নিমন্ত্রণ করলেন পর্লকের কিছু দূরে একটি fox-hunting দেখতে। আমি সেজদা আর পার্নেল-পরিবারের কেউ কেউ সেই fox-hunting দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে গিয়ে দেখি এক পাল মেয়ে জুটেছে। তার ভিতর লেডি কার্সন একটি ঘোড়ায় চড়ে রয়েছেন। আমরা পুরুষমানুষরা যেভাবে ঘোড়ায় চড়ি, সেইভাবে। খানিকক্ষণ পর কে একটা সিটি বাজালে, আর সব ঘোড়সওয়ার একসঙ্গে ঘোড়া ছেড়ে দিলে, একটি fox-এর পিছনে। ঘোড়সওয়াররা fox-এর আওয়াজ পেয়ে বনজঙ্গল সমস্ত ঘুরে বেড়ালে, কিন্তু fox মিলল না। এই fox-hunting-এর আমি ইতিপূর্বে কোন কাগজে লম্বা বর্ণনা করেছি। তার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

পর্লক থেকে কিছু দূরে একটা মেলা দেখতে গিয়েছিলুম। মেলা বিশেষ কিছুই নয়। আমাদের দেশে যেরকম মেলা হয়, ঠিক সেইরকম। এক জায়গায় একটা জুয়ো খেলবার বোর্ড আছে। একটু দূরে শুনলুম একটি সেকেলে ভাঙা বাড়ি আছে। একটি টঙ্গা ভাড়া করে' আমি ও মিসেস্‌ পার্নেল সেটি দেখতে গেলুম। যতদূর মনে পড়ে এ ভাঙা বাড়ির ইতিহাস আমি গল্পচ্ছলে লিখেছি। তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

পর্লকে যে ক'দিন ছিলুম একরকম ভালই ছিলুম। সেজদার মেয়াদ ফুরলে আমরা Tavistock Square-এ ফিরে এলুম। ইতিমধ্যে আমরা একবার সেজদা'কে Holborn Circus-এ পৌঁছতে গিয়েছিলুম। পথে এমনি Snow-storm এল যে আমরা সব ভূতের মত হয়ে এলুম। সেখান থেকে আমরা হেঁটে বাড়ি ফিরলুম। সেজদা'র স্টেশনে পৌঁছানো ব্যাপারটা পর্লক থেকে ফেরবার পরে কিংবা পূর্বে তা' আমার ঠিক মনে নেই। এই পর্যন্ত মনে আছে যে, খাঁ তখন Tavistock Square থাকুন না-থাকুন, সেখানে নিত্য আসতেন।

আমি যখন দেশে আসবার জন্য দ্বিতীয়বার জাহাজে চড়ি, খাঁ উপস্থিত ছিলেন। আমার অন্য অনেক বন্ধুবান্ধবও ছিলেন। এবার লণ্ডনে জাহাজে চড়ি, এবং বরাবর বম্বে পর্যন্ত এসে পৌঁছই।

জাহাজে অনেক কাণ্ডকারখানা হয়। একটি হিন্দুস্থানী ব্যাপারী আমাকে এসে বলেন যে, আমার সীট যেন তাঁর পাশে পড়ে, যাতে তিনি ভুলে শুয়োরের মাংস না খান। তারপরে আমি আবিষ্কার করলুম যে, তিনি যথেষ্ট মদ্যপান করেন। তিনি আমার নাম সই ক'রে রোজ এক পাইণ্ট ক'রে শ্যাম্পেন খেতেন। আমি তাঁকে বললুম যে, আমার হাতে যথেষ্ট পয়সা নেই। বম্বে পৌঁছবার সময় তিনি শ্যাম্পেনের দাম আমার ঘাড়ে ফেলে চলে গেলেন। তিনি আগের দিন আমাকে বলেছিলেন যে, জাহাজের সব পাওনা আমি দিতে পারব না। আমাদের একজন সহযাত্রী আমাকে বলেছিলেন যে, তোমার কোন ভাবনা নেই, টাকা আমি দেব। তুমি টমাস কুক-এর ওখানে আমার নামে টাকাটা জমা ক'রে দিও। আমি পরের দিন সকালবেলা মনমরা হয়ে আছি দেখে তিনি আমাকে দশ পাউণ্ড ক'রে দশখানা ইংলণ্ডের ব্যাঙ্ক-নোট দিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে পাঁচখানা নোট নিই, আর পাঁচখানা ফেরত দিই। সেই পাঁচখানা নোটে জাহাজের দেনা শোধ করে আসি।

তারপর আর একটি ইংরেজ ছোকরা ছিল আমার সঙ্গে, একই বড় হোটেলে। তার সঙ্গে জাহাজেই পরিচয় হয়। আমার হাতে যত টাকা উদ্বৃত্ত ছিল তা একদিনেই সব খরচ হয়ে যায়। সে ছোকরাটি আমাকে বলে, তোমার যত টাকার দরকার হবে আমি তোমাকে ধার দেব। আমি ঘুরতে ঘুরতে একদিন কলকাতায় গিয়ে হাজির হব। তোমার নাম ও সেখানকার ঠিকানা লিখে দাও; এ টাকা কলকাতা গিয়ে ফিরে নেব। আমার ঠিক মনে নেই পাঁচ-সাত পাউণ্ড না কত তার কাছে ধার নিয়েছিলুম। সে কলকাতায় এলে সে টাকাটা আমি তাকে দিয়ে দিই। ট্রেনে এবং জাহাজে আমি ইংরেজদের কাছে খুব ভাল ব্যবহার পাই।

জাহাজে আর একটি উল্লেখযোগ্য লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। পরে শুনলুম তিনি মাল্টার গবর্ণর। আমাদের জাহাজ মাল্টায় গিয়ে পৌঁছতেই কতকগুলি ডোঙ্গা ধ্বনি হ'ল, এবং সাহেব তাঁর অ্যাডমিরাল-এর ঝাপ্পাঝোপ্পা প'রে নেবে যাবার সময় আমাকে বলে গেলেন—মাল্টায় যদি নাব ত আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেও। তোমার সঙ্গে জাহাজের কোনো লোক থাকে ত তোমারও গবর্মেণ্ট হাউস দেখা হবে না।

আমি বাড়ি ফিরে দেখি কলকাতায় আমাদের বাসায় এক মেজদা ছাড়া জনমনিষ্যি নেই। বাকি সবাই দার্জিলিঙে। আমি কার্সিয়াঙের স্টেশনে দাদাকে এবং রবিবাবুকে দেখে হেসে ফেলেছিলুম। দাদা একটু হেসে বললেন—থাকো এখানে কিছুদিন, তোমাকে



আমাদের মত অলস্টার চড়াতে হবে। আমি বললুম—বোধ হয় না। দাদা বললেন, আমি আর রবি, আমরা দুজনে এখানে ত্রিপুরার মহারাজার বাড়িতে কিছুদিন থেকে আছি। মহারাজা আমাদের জোর করে' এই বেশ পরিয়েছেন। তিনি আমাকে বললেন যে, শীতের দেশ, হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে নিউমোনিয়া হতে পারে। দার্জিলিঙে গিয়ে দেখি দাদা ও সিংহ সাহেব দুটি জোড়া বাড়ী নিয়েছেন। দাদার বাড়িতেও ঢের লোক, সিংহের বাড়িতেও তাই। সিংহ সাহেবের বাড়িতে বোধ হয়, কে. জি. গুপ্ত সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন। তাঁকে নতুন সিভিলিয়ান বীরেন সেন বিবাহ করেন। আমার বিশ্বাস যে দুর্গামোহন দাসের বড় ছেলে সত্য দাসও সেখানে ছিলেন, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য। এর পরে বোধহয় তাঁরা বহুদূরে সিঙ্গামারীতে নিজের ভগ্নীপতির বাড়ি থাকতে যান। সে যাই হোক, দার্জিলিং গিয়ে একটি নতুন পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। সে হচ্ছে মহারাজা কুচবিহারের পরিবার। মহারাজার তিনটি অবিবাহিত শ্যালিকা ছিলেন, এবং একটি বিবাহযোগ্য কন্যা। আমি তখন অবিবাহিত। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়, সুতরাং মহারানী যে আমাকে উপযুক্ত মনে করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি? তার উপর দাদা কৃতী ব্যারিস্টার।

মহারানীর ভগ্নিত্রয় সকলেরই পরে খুবই ভাল বিবাহ হয়েছে। একটির বিবাহ হয়েছিল উড়িষ্যার জনৈক মহারাজার সঙ্গে; আর-একটির ব্যারিস্টার স্বামী পরে বর্মায় হাইকোর্টের জজ হন; তৃতীয়টির বিবাহ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপকের সঙ্গে।

মহারাজার কন্যা এবং মধ্যমকুমার বেশ ভাল নাচতেন। সে নাচ আমাদের খুব ভাল লাগত। দেখেই বোঝা যেত যে, কোনো নাচের কারিগরের দ্বারা এরা সব শিক্ষিত। মহারাজা নিজে খুব উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বাঙালী ছেলেদের জন্যে একটি ওরিয়েণ্ট ক্লাব দার্জিলিং-এ স্থাপন করেন।

সত্য কথা বলতে গেলে, এই প্রথম বড়মানুষের পরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল, এবং তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া সবই আমাদের খুব ভাল লাগত। মহারাজার সঙ্গে কলকাতার ইহুদী ধনী পরিবার এজরাদের খুব ভাব ছিল। কলকাতায় লেডি এজরাদের ওখানে একদিন আমি খানা খেতে যাই। সে বাড়িতে একটি চমৎকার রূপোর হুঁকো দেখি।

পূর্ব্বে বলেছি মহারানীর তিন ভগ্নীরই ভাল বিবাহ হয়েছিল। আমি বিবাহের পর একবার আলিবাগে যাই। আমার বন্ধু জোৎস্না ঘোষালের সঙ্গে মহারাজকুমারীর বিবাহ হয়েছিল, তাঁরা তখন সেখানে ছিলেন। সেখানে গিয়েই বুঝলুম যে এ বিবাহ Me´salliance হয়েছে। আমার এ অনুমান নেহাৎ ভুল হয়নি। সত্য কথা বলতে হলে, এই কুচবিহার-পরিবারের মোহ আমাকে লেগেছিল, এবং তাদের সঙ্গে আমার শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব বজায় ছিল, অর্থাৎ যতদিন মহারানী সুনীতি দেবী বেঁচেছিলেন। যদিচ আমি কোনো বৈদ্যকন্যা বিবাহ করিনি।

(ক্রমশঃ)

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ]

ওরা চলে গেলে খটকা লেগেছিল কনকের। মৃত ও অসুস্থ ছাড়া কোন সান্দার তার থানার এলেকায় বাস ক'রে হাজিরা দেবে না থানায় এ তার কল্পনারও বাইরে। অনেকটা ভেবে সে অনুপস্থিতদের নামের পাশে অসুস্থ লিখবার জন্য কলম তুলে নিল, লিখতে পারল না। পরিদর্শক এসে এতগুলি নামের পাশে অসুস্থতার অজুহাত লেখা দেখলে বিশ্বাস করবে না। পরে সে ভাবল অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে অনাহারজাত দুর্বলতা লিখে রাখবে। কিন্তু সেটা লিখতে গিয়েও কলম সরল না। খবরের কাগজওয়ালারা দুর্ভিক্ষ ব'লে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছে আর সরকার এখনও দুর্ভিক্ষকে মেনে নেয় নি, এ সময়ে যদি সে সরকারি কাগজ কলমেই এতগুলি অনাহারের কথা লিপিবদ্ধ ক'রে রাখে তবে তো সরকারকেই বিপদে ফেলার সামিল।

কনক দারোগা একটা ভুল ক'রে ফেলেছিল। সে সত্যি তদন্তে বার হ'য়েছিল। বুধেডাঙা অবধি ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে সে যদি থামত তা হ'লেও হ'ত। বুধেডাঙা ছাড়িয়ে চিকন্দির সীমানায় পৌঁছে ব্যাপারটির সাথে মুখো মুখো হ'য়েছিল। পুরানো শোক প্রকাশ।

—ও বাবা, বাবা, সোনা আমার—

ঘোড়া থামিয়ে কনক দাঁড়িয়েছিল, তার কানে গেল—ঐ সোনার মুখে ভাত দিতে পারলাম নারে, বাবা।

থিয়েটারে দেখা শোক নয়, সিনেমায় শোনা মার্জিত সংহত বেদনা নয়, অসংস্কৃত বেদনার বিকৃত উচ্চারণ।

কনক দারোগার বুকের গোড়াটা উল্টে যেতে লাগল। অশ্রু গ্রন্থিগুলি ফুলে ফুলে উঠতে লাগল।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে কনক চোরের মতো পালিয়ে এসেছিল।

মন ভালো ছিল আজ। অনেক কারণ তার। দুপুর রোদে দিঘা ষ্টেশনে ঘোরাফেরা করা অনেক দিক দিয়ে সার্থক হয়েছে। কর্ত্তব্যরত অবস্থায় উপরওয়ালার চোখে পড়া, তার মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয়টি তার চাইতেও বড় সান্যাল মশাই-এর ছেলে সত্যি আসে নি জীবনটাকে দুর্বিসহ ক'রে তুলতে। তৃতীয় কারণটি ঠিক কারণ নয়; তাহ'লেও উল্লেখযোগ্য, শিক্ষিত মার্জিত ভদ্র মহিলার সাথে আলাপ করার সৌভাগ্য সব পুরুষের ভাগ্যে রোজ ঘটে না।



থানার সামনের বড় অশ্বত্থ গাছটার পাতাগুলিকে আলোড়িত ক'রে একটা ঝিরঝিরে হাওয়া আসছে। বারান্দার টেবিলটার সামনে ব'সে অস্ফুটস্বরে শিষ দিতে দিতে আঙুলের ডগা দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলটা ঠুকে কনক উঠে দাঁড়াল। মুন্সীকে ডেকে বললে—আমি চললাম বিপিন, বাসাতে থাকব। আজ আর ডাকাডাকি কোর না।

বাসায় ফিরে স্ত্রী শিপ্রার হাতের খানিকটা সেবা নিয়ে কনক শোবার ঘরের টেবিলের সামনে বসল। কালো রঙের মাঝারি চেহারার পুরোনো ডায়েরিখানা খুলে পাতা উল্টে সে তার গবেষণার প্রচেষ্টা স্বরূপ লেখাটা বার ক'রে ফেলল।

সান্দারদের নিয়ে সে আলোচনা সুরু করেছিল। উচ্চাভিলাষী কিছু নয়। নিজের জানা কথাগুলির পাশে পাশে নিজের চিন্তাগুলিকে গুছিয়ে রাখা।

সান্দারদের উৎপত্তি ইতিহাসটা কনকের কাল্পনিক। সেখানে সে লিখে রেখেছে নিজের ধারণাগুলি। এরা নাকি কোনকালে বাঙালিদের নৌ-সৈন্য ছিল। বাঙালি জাতির যেদিন নৌ-সৈন্য রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল এদের একদল হোল জলের ডাকাত আর একদল হ'ল যাযাবর।

আর যাই হ'ক এরা যে যাযাবর সে বিষয়ে কনক নিঃসন্দেহ হয়েছে। নিঃসন্দেহ হ'তে পারার কারণ বুড়ো আলতাপের সাথে তার পরিচয়। বুধেডাঙার চড়ে সান্দারদের সেই নিয়ে আসে। বুধেডাঙার সান্দাররা তারই জ্ঞাতিগোত্র।

তারও আগে সান্দাররা দু'তিনটে জেলার ব্যবধানে জাত-ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। অবশ্য জাত-ব্যবসায়টি যে ঠিক কি তা আন্দাজ করতে হবে। আলতাপের কথা ধরতে গেলে সেটা চুরি ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না। থানায় দাঁড়িয়ে দারোগার মুখের সামনেও বুড়ো আলতাপ বলত—ট্রেনে উঠলেই পয়সা, একখান স্যুটকেস সরাতি পার পনের দিনের নির্ভাবনা। হয়তো বুধেডাঙ্গায় আসবার আগে সেও ট্রেনে উঠে চুরি করত যাত্রীদের মালপত্র। অন্তত তাদের ওস্তাদ মেরজান সর্দ্দার যে করত সে বিষয়ে কনক নিঃসন্দেহ হ'য়েছে। মেরজানের মৃত্যুর ব্যাপারটা এরই প্রমাণ।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ীর পেছন দিকের জানালা গলিয়ে একটা স্যুটকেস নিয়ে পালাল মেরজান পুড়াদ' ষ্টেশনে। হৈ হৈ রব উঠল যাত্রীদের মধ্যে। ইতস্তত করার সময় ছিল না। পাশে একটা মালগাড়ী দাঁড়িয়েছিল। তখন অন্ধকার নেমে এসেছে, সে চুপ ক'রে একটা মালগাড়ীর নিচে গিয়ে বসল। বসে হয়তো মনে মনে হেসেছিল সে, কিন্তু হঠাৎ মালগাড়ীটা চলতে আরম্ভ করল। তখন সেই চলন্ত চাকার ফাঁকে বেরিয়ে আসার জন্য কত ফিকির সে করেছিল। প্রাণ নিয়ে যখন টানাটানি তখন মানুষ তার সেরা ওস্তাদিগুলি কাজে লাগায়, নাকি সব গুলিয়ে যায় তখন, মাথায় সাধারণ বুদ্ধিতে আসে না!

মেরজানের বিবির কাছে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল আলতাপ।

—চাচী, আজ তুই ঘরে দুয়ার দে

—কেন্ রে, সর্দার আসবিনে

—না মনে কয়, সর্দার মনে কয়, আজ আসবিনে।

দু'তিন দিনেও যখন মেরজান এল না তখন আলতাপ আর গোপন রাখতে পারল না। মেরজান বিবি হাহাকার ক'রে উঠেছিল।

কিন্তু তখন মাথাঘোরা রোগ ছিল ফুরকুনির। শুধু অনাহারে নয়, সন্তানসম্ভাবনাতেও। এ পাড়ার রোগ এ নয়, ভদ্রঘরের মেয়েছেলেদের নাকি হয়। তবু অন্যান্যবার সান্দারদের সেরা সান্দার মেরজান সর্দারের দু' বাহুর আশ্রয়ে থাকে।

একদিন আলতাপকে পথে চলতে দেখে থামিয়ে ফুরকুনি বললে—তা যেন্ হ'ল এখন আমার কি হবি, কও।

—তোমার আবার কি হবি?

আলতাপ চোখ মেলে দেখল ফুরকুনিকে। সে আবার প্রশ্ন করল—কি হবি, তাই কও?

এবার আলতাপ প্রশ্ন করল—উঁচু উঁচু লাগে, আবার হবি নাকি?

—হয়।

আলতাপের যাতায়াত এরপরে বেড়ে গিয়েছিল। আহা, এ সময়ে সাহায্য না পেলে কোন মেয়ে মানুষই বাঁচে না। আলতাপের নিজের বকরিগুলির কথা মনে হ'ল, সেগুলিকেও এ সময়ে বেঁধে রাখতে হয়, নতুবা কারো দুঁইয়ে ঢুকে মার খেলে বড় বিপন্ন হ'য়ে পড়ে।

কিন্তু আলতাপের যে বয়স তাতে তার পক্ষে বিপন্নকে সাহায্যের উদারতা দেখান যত সহজ তত সহজ ছিল বিপন্নকে একেবারে ভুলে যাওয়া।

ট্রেনে চেপে কোলকাতার দিকে গিয়েছিল সেরজান।

অনেকদিন পরে গ্রামের ষ্টেশনে নেমে গুণ গুণ ক'রে গান ক'রে পথে যেতে যেতে হঠাৎ তার গান থেমে গেল। ভয়ে গলা শুকিয়ে উঠল। সেরজানের বাড়ীর পাশ দিয়ে পথ, অন্ধকারে কাৎ হ'য়ে পড়া সেরজানের ঘর, তার মধ্যে থেকে নাকি সুরে কান্নার শব্দ। নিজেকে সাহস দেবার জন্য গলায় খাঁকারি দিয়ে আলতাপ ডাকল—চাচী, আছ নাকি, ক্যান্?

সাড়া শব্দ কেউ দিল না। আলতাপ যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে জায়গাটা পার হয়ে গেল।

রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে সে ভাবল—আহা, বোধ হয় না খেতে পেয়ে মরেছে।

পরের দিন সকালে সে খোঁজ নিল। দেখল রজব আলিকে, তখন দুতিন মাসের রজব আলি, কোলে নিয়ে দরজার পাশে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে ফুরকুনি। এর পরে আলতাপকে কোমরের গেঁজিয়া খুলে দুচার পয়সা দিতে হ'ল ফুরকুনিকে।



কিন্তু একদিন ষ্টেশনে বসে জুয়া খেলতে খেলতে রোক চাপল মাথায়। রাত যখন মাঝামাঝি তখন আর সকলে ওকে গলায় ধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দিল ঘর থেকে। পরাজয়ের বেদনার উপরে অপমানের জ্বালা। নিজের গ্রামের পথে ফিরতে ফিরতে মনে হ'ল তার,—কার কাছে কত টাকা পায় সে, পায় কি না কারো কাছে। এ রকম গোলমাল নিয়ে পথ চলতে চলতে আলতাপের মনে হ'ল ফুরকুনি তাকে অনেক ঠকিয়েছে। কান্নার সুরে কথা ব'লে অনেক চাল অনেক টুকিটাকি খরচ আদায় ক'রে নিয়েছে। একি অন্যায়, তার অভিজ্ঞতা কম ব'লেই তাকে এরকম ঠকাতে পেরেছে সকলে। চূড়ান্ত আক্রোশের একটা গালিতে চরাচরকে অভিহিত করে সে পণ করল আজ সে হিংস্র প্রতিশোধ নেবে।

কানাকড়ি থাকার দিন ছিল না ফুরকুনির, তা দিন বারোটাই হ'ক কিম্বা রাত বারোটা, কিন্তু নেশার মাথায় আলতাপ স্থির করল,—সব মেয়েরাই বিশেষ করে সান্দারনিরা চোরাই মালের এটা ওটা সরিয়ে রাখে। ফুরকুনি সেরজানের সময়ের কিছু কিছু কি আর রাখে নি?

ধাক্কা দিতে ঝাঁপ খুলে গেল। আলতাপ দেখল ঘরের একপাশে চটের বিছানায় রজব আলিকে পাশে নিয়ে ফুরকুনি ঘুমিয়ে আছে। কুপিটা বোধ হয় নেভাতে ভুলে গেছে, তারই আলো আর ধোঁয়ায় ঘরের ভেতরটা নজরের সামনে নাচছে।

হাত ধরে একটানে ঘুমন্ত লোকটাকে খাড়া ক'রে নিল আলতাপ। ভালো ক'রে চোখ মেলবার আগেই, ভালো ক'রে কিছু বুঝবার আগেই আলতাপ চড় মারল ফুরকুনির গালের উপরে। চড় খেয়ে ফুরকুনি পড়ে গেল। ঘুমন্ত গালে পুরুষালি চড়!

—কই দে, কি আছে তোর টাকা পয়সা।

—কনে পাব। সোনা আমার, মারিস নে আর, তুই খাবের দিছিলি তাই বাঁচে আছি।

মাথায় খুন চাপলে কোন কথাই কানে ওঠে না মানুষের। ফুরকুনি আরও মার খেল। কিন্তু কিছুতেই যেন আক্রোশ যাবার নয়, গায়ের চামড়া খুলে নিলেও রাগ যেন যায় না, পরিধেয় তার সামান্য পরিবর্ত্ত।

মুস্কিল হ'ল হঠাৎ। রাগের মাথায় সান্দারনিকে সে বিবস্ত্র ক'রে ফেলেছে। রাত্রির ম্লান আলোয় নিরাবরণ নারীদেহ আলতাপের চোখের সম্মুখে। গুরু নিতম্ব, ভীত স্তন। সহসা আলতাপের মন সীমাহীন করুণায় ভরে গেল। জানু পেতে সে দেহটার পাশে বসে পড়ল।

রাত যখন ভোর হয় আলতাপ ঘুমের মধ্যে শীত শীত বোধ ক'রে সরে এল। ফুরকুনি জেগে ছিল, নিজের আঁচলের খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে আলতাপকে ঢাকতে পারল না যখন, নিজেই একটু এগিয়ে গিয়ে আলতাপের গা ঘেঁষে শুয়েছিল ফুরকুনি।

ঘটনাটা লেখা শেষ ক'রে কনক স্ত্রী শিপ্রাকে পড়তে দিয়েছিল। শিপ্রা বলেছিল—এই যাদের সমাজে বিবাহ তাদের দুষ্প্রবৃত্তিটা সহজাত হবে সন্দেহ কি ?

কিন্তু অন্যান্য যাযাবর সমাজের দলপতিদের মতোই আলতাপ তার সমাজের ঐতিহাসিক। ইতিহাস তার কণ্ঠস্থ নয় শুধু, প্রকাশ ভঙ্গিও অনন্য। সন তারিখে কিছু গোলমাল হ'য়ে যায় বটে, কিন্তু তাতে যেন ইতিহাসের প্রাচীনত্ব গভীর হ'য়ে উঠে।

বেলাতের যখন বছর পনর বয়স, রজবআলি উড়ু উড়ু করছে, তখন ফুরকুনির মৃত্যু হল। সে এক হাঙ্গামা। পুলিশ আলতাপকে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আলতাপের সাতদিন হাজত বাস হ'য়েছিল। ষ্টেশনের ডাক্তাররা বলেছিল আর্সেনিক বিষ ব'লে মনে হচ্ছে। শব্দটা আলতাপের মনের মধ্যে পোড়া দাগের মতো চিরস্থায়ী হ'য়ে গেছে। গো-মুখ্খু পুলিশ (কনক দারোগার সম্মুখেই থু থু ফেলে মুখ বিকৃত ক'রে বলেছিল আলতাপ)! অথচ কতনা ভালবাসা ছিল দুজনের, এক-আধ দিনের চোখ-ঠারার ব্যাপার নয়, দুটি সন্তানের দুপাশে ব'সে দীর্ঘ পনর বছর ধরে তাদের মানুষ করে তোলার সাহচর্য্য। এটা অবশ্য আলতাপের ভাষা নয়। সে অনুভব করে, তার স্নায়ুগ্রন্থিগুলিতে ফুরকুনির দেহের স্বাদ এখনও স্নিগ্ধ হ'য়ে আছে। অথচ পুলিশের দারোগা-উকিল বলেছিল :—ফুরকুনির বয়স হ'য়েছিল, চুলে পাক ধরেছিল, আর এদিকে আলতাপের যোয়ান বয়স। আরও লক্ষ্যণীয়, এতদিন পরেও ধর্ম্মের গ্রন্থি পড়েনি এদের জীবনে, এরা এখনও বিবাহিত নয়।

কনক নিজেই প্রশ্নটা করেছিল—তোমাদের বিয়ে সাদিটা কবে হ'ল। আলতাপ প্রত্যুত্তরে যা বলেছিল তার সারমর্ম্ম এই :—অসুখ করলে নিজের সন্তানের মতো বুকে ক'রে রাখতে পারে আর কোন সান্দারনি, ফুরকুনি ছাড়া ? আর এটা এত সত্য যে আলতাপ পরীক্ষা ক'রে দেখা প্রয়োজন বোধ করে নি। ফুরকুনির মৃত্যুর পর এই দীর্ঘ সময়ে পৃথিবীর অন্য সব সান্দারনি থেকে সে মুখ ফিরিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। সেরজান-গরবিনী ফুরকুনিকে যে পায় সে কি তাকায় তোমার ফেলানি আর সৌদালির দিকে ?

এই ফুরকুনির তাগিদেই সান্দাররা এসেছিল বুধেডাঙায়। বোধ করি সেরজানকে হারিয়ে তার ভয় হয়েছিল সান্দারদের দুঃসাহসিকতার বৃত্তিকে, আলতাপকে পেয়ে হারানোর ইচ্ছা ছিল না। পদ্মার চড়, তখনও খানিকটা সিকস্তি ; বুধবারের দিন গোরু-ভেড়াগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে আলতাপের যাযাবর দল এসে দাঁড়িয়েছিল চড়টার ওপরে। দুপুরের আহার সমাধার পর আলতাপ-ঘরনি ফুরকুনি নিজের বিড়ি থেকে আলতাপের বিড়িটা ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল—আলতাপ,

—ফরমাইয়ে

—এখানে থাকলি কেমন হয়



—যেখানে থাকি, তোমার কাছেই থাকব।

—তা লয়, এখানে চাষ-বাস করে, ঘরদরজা করে ছাওয়াল দুডে নিয়ে বসলি হয় না ?

—চাষ-বাসের কাম আমি কি জানি ?

সত্যি আলতাপ লাঙ্গল ধরা কোনদিনই শিখতে পারে নি। শুধু তাই নয়, লাঙ্গল ধরা কাজটাকে সে ঘৃণা করে। বহুবার তাকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে শোনা গেছে, মাটির কামে হাত দিয়েই সান্দাররা মাটি হ'ল।

সান্দারদের মধ্যে গহরজান কৃষিতে সাফল্য লাভ করেছে সব চাইতে বেশী। আলতাপের বড় ভাইএর ছেলে সে, আলতাপের দলে ঘুরতে ঘুরতে সে এসেছিল বুধেডাঙায়। সে প্রতিবাদ ক'রে আলতাপের এ ধরণের কথাবার্ত্তায়। আগেকার দিন হ'লে আলতাপ সর্দার কি করত বলা যায় না, এখন সে তার চিরাচরিত প্রথায় থু-থু ক'রে ওঠে।

ফুরকুনি তাকে দুটি সন্তান দিয়েছিল : সেরজানের ছেলে রজব আলি, আর তার নিজের ছেলে বেলাৎ হোসেন। ভাবতে গিয়ে তার অবাক লেগে যায়। রজব আলিকে সে খানিকটা শ্রদ্ধার চোখে দেখে, সে সেরজান সর্দারের ছেলে। লোককে সে বলে—হবি নে কেন, সর্দারের ছাওয়াল, দিল-দেমাক উঁচুই হবি। বেলাত হোসেনের কথায় ফুরকুনি বলেছিল তাকে,—এটা তোমার নিজের, তাও আদর যত্ন করো না।

( ক্রমশঃ )

## চারটি 'কুরল' ( তামিল-বেদ )

যদি না বাদল নামত আকাশ বেয়ে
ক্ষুধিত দেবতা ফিরত প্রসাদ চেয়ে ॥১॥

*

বেণুবীণা-রব ভালো কে গো মনে গোনো
শিশুর কাকলি বুঝি শোন নি কখনো ! ২॥

*

নিলাজ হৃদয়ের কেমন কাজ
সুতোয় বাঁধা যেন পুতুল-নাচ ॥৩॥

*

চোখে-চোখ-রাখা কথা থাকলে
কি হবে না-ই বা যদি ডাকলে ! ৪॥

# শিল্পী

## জেমস্ জয়স্

অনুবাদ : **অশোক গুহ**

[ পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর ]

ক্লাসে লেখার সময় হাত তুলে সে বসে রইল, কলমের খসখসানি শুনছে, আস্তে আস্তে খস খস করে চলেছে। মিঃ হারফোর্ড এদিক-ওদিক ঘুরছেন, লাল পেন্সিলে দেগে দিয়ে যাচ্ছেন, খুদে খুদে চিহ্ন আঁচড় টেনে দিয়ে যাচ্ছেন। কখনো বা কোনো ছেলের পাশে বসে দেখিয়ে দিচ্ছেন, কি করে কলম ধরতে হয়। জাঁকালো শিরোনামাটা সে নিজেই বানান করে পড়তে চেষ্টা করলে। সে জানে বইয়ের শেষ হয়ে এল, এসে গেছে পরিশিষ্টে :

"বুদ্ধি বিনা উৎসাহ বিপথগামী পোতের মতন।"

হরফের রেখাগুলো যেন সূক্ষ্ম সুতো, অদৃশ্য সুতো; ডান চোখটা শক্ত করে বুজে, আর বাঁ চোখটা দিয়ে তাকিয়েই সে বড় হরফের রেখার বঙ্কিম ভঙ্গী দেখতে পায়।

মিঃ হারফোর্ড ভদ্রলোক, কখনো চটে ওঠেন না, আর আর মাষ্টারমশাইরা তো চটেই আগুন। উপরের ক্লাসের ছাত্রেরা যা করেছে, তার জন্যে ওরা হাঙ্গামা পোয়াবে কেন? ওয়েলস্ তো বলে ওরা নাকি বেদীর উপরে রাখা মদ খেয়েছে, আর গন্ধেই টের পাওয়া গেছে, এ কাদের কাজ। হয় তো ওরা চুরি করেছে সোনার আর রূপার সাজ, বিক্রি করেই দেবে কোথাও! সে তো ভয়ংকর পাপ। চুপিসারে রাতে গিয়ে হাজির হলে, তারপর খুললে কুঠরী, ঝলমলে সোনার আধারটি চুরি করলে ওরই ভিতরে সোনার দেবতা—

বেদীর উপরে ফুল আর মোমের সারের ভেতরে সোনার আধারে আছেন তিনি। তাঁর অর্চনার কালে ধূপের ধোঁয়া তো মেঘের মতো দু পাশে উঠে উঠে আসে। ধূপদানী দুলিয়ে দুলিয়ে আরতি করে একটা লোক, আর কেলী সমবেত সংগীতের প্রথম কলি একাই গায়। কিন্তু ওরা যখন চুরি করে, তখন তো তিনি ওখানে ছিলেন না; তবু, ঐ আধার ছোঁয়া তো খুবই পাপ—আশ্চর্যই লাগে! সে ভাবতে লাগালো, ভীষণ তার ভয়—এক মস্ত পাপ, অদ্ভুত অদ্ভুত! কলম খস্‌খসিয়ে চলছে হালকা সুরে, এই নিঃস্তব্ধতায় ও কথা ভেবে শিউরিয়ে উঠছে। বেদীর উপরের মদ খাওয়া আর তার গন্ধে ধরা পড়াও পাপ; কিন্তু এতো ভয়ানক তো নয়, অবাকও লাগে না। শুধু মদের গন্ধে গা একটু গুলোয়। প্রথম যেদিন সে গীর্জায় গিয়েছিল, চোখ সে বুজেছিল; মুখ ছিল খোলা, জিভটাও ছিল একটু বার করা। রেকটর যখন নুয়ে পড়ে তাকে দীক্ষা দিতে গেলেন, সে তার নিশ্বাসে টের পেল ক্ষীণ মদির গন্ধ।

সুন্দর কথা : মদ : মদিরা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে ঘন লাল রং, আঙুরের রং তো গাঢ় লাল। গ্রীসে সাদা মন্দিরের মতো বাড়ি, তারই উঠোনে অমনি গাঢ় লাল আঙুর ঝুলে ঝুলে থাকে।



কিন্তু রেক্টরের ক্ষীণ নিশ্বাস সেই প্রথম ভোরেই নিয়ে এসেছিল কি এক অনুভূতি—অসুস্থ অনুভূতি। তোমার প্রথম দীক্ষার দিন তো জীবনের পরম দিন। একবার কজন জেনারেল নেপোলিয়নকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর জীবনের পরম দিনটি কি। তাঁরা ভেবেছিলেন, কোনো যুদ্ধ জয়ের কি সম্রাট হবার দিনের কথাই বলবেন। কিন্তু তিনি বললেন: আমার জীবনের পরম দিনে আমি পেলাম প্রথম দীক্ষা। ভগবানের সঙ্গে আমার পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপিত হোলো।

ফাদার আর্ণাল এলেন এবার, লাতিন পড়া শুরু হোল। সে তখনো অনড়। ডেস্কে ভর দিয়ে হাত মুড়ে বসে আছে। ফাদার আর্ণাল খাতাগুলো বিলিয়ে দিলেন। বললেন, একি কেলেঙ্কারী। আবার ফিরেফিরতি শুদ্ধ করে লিখতে হবে—এখুনি লিখতে হবে। ফ্লেমিং-এর খাতা তো আরো খারাপ। খাতার পাতা জুবড়ে আছে। ফাদার আর্ণাল খাতাটা তুলে নিয়ে বললেন, এমন খাতা দেওয়া মানে মাষ্টারমশাইকে অসম্মান করা। তারপরেই তিনি জ্যাকলটনকে বললেন ঘোটকীর শব্দরূপ বলতে। জ্যাকলটন এক বচনেই থেমে গেল, দ্বি-বচন বহুবচনে আর এগোতে পারলো না।

—তোমার নিজের লজ্জিত হওয়াই উচিত, কঠোর স্বরে বলে উঠলেন ফাদার আর্ণাল। তুমি, ক্লাসের সর্দার না?

তারপরে পরের ছেলে, তারপরের—তারপরের ছেলেকে। কেউ জানেনা। ফাদার আর্ণাল একেবারে চুপচাপ। এক-একটি ছেলে জবাব দিতে উঠছে, পারছে না, আর ফাদার আর্ণালের মুখ হয়ে যাচ্ছে আরো গম্ভীর। মুখখানা কালো দেখায়, চোখ চেয়ে আছে, কিন্তু শান্ত। ফ্লেমিংকে শুধালেন এবার, ফ্লেমিং জবাব দিলে, ওর কোনো বহুবচন নেই। ফাদার আর্ণাল হঠাৎ বইখানা বুজিয়ে ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠলেন : ক্লাসের মাঝখানে হাঁটু গেঁড়ে বসে থাক। তুমি ক্লাসের মধ্যে সব চেয়ে কুঁড়ে! আবার খাতায় লেখ তোমরা সবাই।

ফ্লেমিং আস্তে আস্তে তার জায়গা থেকে গিয়ে শেষের সারের দুই বেঞ্চের মাঝখানে হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো। আর সবাই খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে, লিখতে। ক্লাসঘরে নীরবতা, ষ্টিফেন তাকিয়ে আছে ফাদার আর্ণালের গম্ভীর মুখখানার দিকে ভীরু দৃষ্টি মেলে। যেমন রেগে গিয়েছিলেন, তার চেয়ে এখন একটু কম—মুখের লাল রং ফিকে হয়ে গেছে।

ফাদার আর্ণালের এমনি চটে ওঠা কি পাপ, না, ছেলেরা আলসেমি করলে তিনি চটে ওঠতেও পারেন? তাতে হয়তো তারা ভাল করে পড়াশুনো করবে, না, চটে ওঠাই তাঁর স্বভাব? তার মানে, তাঁকে এ ক্ষমতা সবাই দিয়েছে, তিনি পাদ্রী কিনা তাই পাপ কি তা জানেন। পাপ হলে কি আর করতেন? কিন্তু যখন ভুল করে পাপ করে বসেন, তখন কি স্বীকার করবেন? হয় তো এক মিনিষ্টারের কাছে স্বীকার করতে ছুটবেন। আর মিনিষ্টার যদি করেন, তিনি ছুটবেন রেক্টরের কাছে, রেক্টর জেলার ধর্মযাজকের কাছে, জেলার ধর্মযাজক যাবেন উপরওয়ালার কাছে, একে বলে ধর্মমহামণ্ডল। বাবার কাছে সে শুনেছে, ওঁরা সবাই বেশ চালাক-চতুর, ওঁরা পাদ্রী না হলে হোমরা-চোমরা হতেন। সে ভাবে কি হতেন ফাদার আর্ণাল আর প্যাডি ব্যারেট, জেসুইট না হলে কি হতেন মিঃ ম্যাকগ্লেড আর মিঃ গ্লিসেন? ভাবা শক্ত, ওদের কথা ভাবতে গেলে আলাদা রঙের কোটের কথা ভাবতে হয়, ভাবতে হয় ট্রাউজারের কথা, দাড়ি গোঁফ আর আলাদা ধরণের টুপীর কথা।

দরজা খুলে গেল নিঃশব্দে, আবার বন্ধ হয়েও গেল। দ্রুত ফিসফিসানি বয়ে গেল সারা ক্লাশে: প্রিফেক্ট এসেছেন। এক মৃত নীরবতাময় মুহূর্ত, তারপরে প্যাঁদানো বেতের শব্দ উঠলো শেষের ডেস্কে। ষ্টিফেনের বুক ভয়ে দুরু দুরু।

—কোনো ছেলেকে বেতাতে হবে নাকি ফাদার আর্ণল? চেঁচিয়ে উঠলো প্রিফেক্ট। ক্লাশে কোনো কুঁড়ে ছেলেকে কি কয়েক ঘা কষাতে হবে? ক্লাশের ভিতরে সে এল, ফ্লেমিং হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে, তাকে সে দেখেছে। হুঁ-হুঁ, চেঁচিয়ে উঠলো, এই ছেলেটা কে? কেন হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে? তোমার নাম কি হে?

মহাশয়, আমার নাম ফ্লেমিং!

ফ্লেমিং! নিশ্চয়ই কুঁড়ে ছেলে। তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি। ফাদার আর্ণাল, ও হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে কেন?

লাতিনের খাতায় যা-তা লিখেছে, ফাদার আর্ণাল বললেন, ব্যাকরণের প্রশ্ন পারেনি।

পারবে নাই তো! প্রিফেক্ট চেঁচিয়ে উঠলো। ওটা জন্ম কুঁড়ে! ওর চোখ দেখেই বুঝেছি।

তার প্যাঁদানো বেতখানা ঠুকে সে ডেস্কে শব্দ করে চেঁচিয়ে উঠলো!

ফ্লেমিং ওঠ, ওঠ!

ফ্লেমিং আস্তে আস্তে ওঠে দাঁড়াল।

হাত পাত!

ফ্লেমিং হাত বাড়িয়ে দিলে। জোরে সাঁই সাঁই শব্দে পড়ছে বেত: এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়।

অন্য হাত?

আবার বেত পড়লো ছ'বার, তেমনি জোর শব্দ, তেমনি সাঁই সাঁই।

হাঁটু গেঁড়ে বস এবার!

ফ্লেমিং হাঁটু গেঁড়ে বসে পড়লো। বগলে হাত দুখানা রেখেছে, কচলাচ্ছে। মুখ বিকৃত ব্যথায়; ষ্টিফেন কিন্তু জানে, ওর হাত ভারী শক্ত। ফ্লেমিং সব সময়েই তেল মাখে হাতে। হয় তো বা ব্যথাই পেয়েছে, বেতের শব্দ তো জোর হোলো। ষ্টিফেনের বুক কাঁপছে।

(ক্রমশঃ)

আগামী সংখ্যা থেকে ইন্দ্রজিতের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে। প্রবন্ধটির নাম: "ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ"

# সাহিত্য-বিচার

## গুহানিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব

ধম্মপদ: মহাস্থবির প্রজ্ঞালোক ও ভিক্ষু অনোমদর্শী (প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী—সাড়ে চার টাকা)
'উপনিষৎ': চিত্রিতা দেবী (এম্-সি সরকার—আড়াই টাকা)

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিয়ে খুব সম্প্রতি কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ বেরিয়েছে। বিশ্বভারতীর দু'জন সুযোগ্য জ্ঞানী দু'টি পুস্তিকা লিখেছেন বৌদ্ধ 'ধম্মপদ'-এর বক্তব্য আলোচনা করে। তারপর আমরা 'প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী' থেকে এ-বিষয় সম্পর্কে একটি উপযুক্ত গ্রন্থ পাচ্ছি। 'বৌদ্ধ যুগ' বলে ভারতবর্ষে যে যুগটি বিদ্যমান ছিল তা ভারতের পক্ষে সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ যুগ। ইতিহাসে সুপ্রতিষ্ঠিত এ যুগটি নিয়ে বিতণ্ডার যেমন অবকাশ নেই তেমনি এর দূরদূরান্ত-বিস্তৃত প্রভাব সম্পর্কেও কেউ প্রশ্ন তুলতে সাহসী নন। কিন্তু আজকের দিনে মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষুধিত। সেই জ্ঞান-ক্ষুধার তাড়নায়ই প্রশ্ন করতে হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মের রূপটা আসলে কি? তা কি বেদ-বাহ্য? ভারতবর্ষের বৈদিক যুগ এবং ঋক্‌বেদ-কাল একটি ঐতিহাসিক সত্য। ঋক্-সংহিতা প্রণয়ন-কালটিও পার্জিটার-প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দদ্বারা ধার্য্য করা হয়েছে। চেষ্টা থাকলে ঋক্-সংস্কৃতির স্থান-কাল-পাত্র-ও যথাযথ জানা যায়। কিন্তু তার চাইতেও যে নবীন কাল শাক্য-মুনির, তার তাৎপর্য্য বুঝে নিতে বাংলাভাষায় লিখিত কোনো গ্রন্থই আমাদের তেমন সাহায্য করে না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে আর্য্য ধর্ম্ম—ঋক্‌বেদের সংস্কৃতি থেকেই যে তা আগত এ-ধরণের একটা স্পষ্ট সত্য কথা বলবার যুক্তি যে কেন আমাদের বিদ্বজ্জনসমাজ খুঁজে পাচ্ছেন না, ভেবে অবাক হতে হয়। 'জাতক'-বাহী 'অনাথপেণ্ডিকো', এবং 'পসেনজিকোসলো' প্রভৃতির ইতিহাস মোঙ্গল-রহস্য-যুক্ত করা খুব কঠিন কাজ নয়, ঋক্‌বেদের বা ধম্মপদের অসংস্কৃত কথাগুলোর সদর্থ উপলব্ধিও অসীম প্রজ্ঞা-সাপেক্ষ নয়। হিন্দু-সংস্কৃতি কোন্-কোন্ বিষয়ের প্রতি আস্থাবান ও কোন্ বিষয় বর্জ্জনের পক্ষপাতী তা জেনে নিতেও দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হবার কথা নয়। তাছাড়া অশোকের অনুশাসন ও লিপি দুর্ব্বোধ্য থেকে যায় নি। তবু যে কেন সপ্তবুদ্ধের বাণী ও ধর্ম্মকথার ঐতিহাসিকতা ও ভাববস্তু বিতণ্ডার বিষয় হয়ে থেকে যাচ্ছে তা আমরা বুঝতে পারছিনে। বুদ্ধিবাদ পুনর্প্রতিষ্ঠার দিন সমাগত বলেই বৌদ্ধসংস্কৃতি সম্পর্কে আমরা আগ্রহশীল।

'বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ-পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ' বলে আমাদের দেশে একটি শ্লোকাংশ প্রচলিত ছিল যার প্রথম পংক্তি হল: "যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো"। সুতরাং বেদ থেকে যেমি শৈব বেদান্তী আগত তেমি বৌদ্ধ নৈয়ায়িক শাখাটিও পল্লবিত। বস্তুত ঈশোপনিষদ ত 'ধীরাণাং' কথায় থেরবাদীকেই সূচিত করেছে। আমি জানিনে ইদানীং যাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও তজ্জাত সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন তাঁরা ৺প্রকাশচন্দ্র সিংহরায় ন্যায়বাগীশের 'বেদান্তসোপান ও অদ্বৈতবাদ' নামক সুচিন্তিত আলোচনী-গ্রন্থটি পড়েছেন কি না। বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ঋক্‌বেদী সংস্কৃতি থেকে পৃথক সত্তায় উপস্থাপিত করে যাঁরা দেখাতে চান তাঁদের প্রতি আমার এই অনুরোধ যে তাঁরা আবেস্তা ও

ঋক্‌বেদ-পাঠের কষ্ট স্বীকার করতে যদি না-ও চান তবু যেন একবার উক্ত গ্রন্থখানি পড়ে দেখেন। একটি শৈব সংস্কৃতি, তাকে ঋগ্বেদীই বলি আর প্রাক্-ঋগ্বেদীয় বলি, ভারতবর্ষে ছিল—বিশ্বের শুভানুধ্যায়ী বেদান্ত সর্ব্ব সংস্কৃতিরই জনক ওই শৈব সংস্কৃতি। ভারতীয় ঈশ্বর বা ঈশ যিনিই যখন হয়ে থাকুন শিব-ভাব তাঁকে আত্মসাৎ করতে হয়েছে। সে ভাবটির ক্রিয়া-বর্ণনায় ঈশোপনিষদ বলছে: বৈনাশিক কর্ম্ম প্রক্রিয়ায় মৃত্যুত্তীর্ণ হওয়া, অসম্ভূতি-প্রাপ্তি, অমৃতত্ব লাভ। বৌদ্ধ ধম্মপদ এ-ভাবটির বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়নি।

সম্প্রতি বেদ-উপনিষদ প্রাঞ্জল বাংলায় আমাদের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। এ-শতকে প্রায়ই তা হচ্ছিল কিন্তু যেহেতু তা প্রথিতযশা পণ্ডিতমহল থেকে আগত তা-ই হয়ত তৎ-তৎ-কালীন জ্ঞানভীত পাঠকসম্প্রদায় বেদ-উপনিষদের বাংলা ব্যাখ্যার প্রতি ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি। সাম্প্রতিক কাল জ্ঞানভীত নয়। আমরা এ-পর্য্যায়ের সাহিত্যকে সাদর-আহ্বান জানাতে পারি। খুব সম্প্রতি সাদর আহ্বান জানাবার সুযোগ দিয়েছেন শ্রীযুক্তা চিত্রিতা দেবী। বলতে পারি, তিনি নিরতিশয় প্রাঞ্জল বাংলায় তিনটি উপনিষদের অমৃত-সমান শ্লোকগুলো পরিবেষণ করে কাশীরাম দাসের মতো ধন্যবাদার্হা হয়েছেন পুণ্যাশী বাঙালীদের নিকট। আমাদের ধন্যবাদ সৎ-সাহিত্যিকা শ্রীযুক্তা চিত্রিতা দেবীকে এবং এই 'উপনিষৎ' গ্রন্থটির প্রকাশকদের।

স. ভ.

## ছোটগল্প আর ক্ষুদ্রকায় গল্প

**পরিচয়—সন্তোষকুমার দে—সোয়ান বুক্‌স—২৷৷০**

যে পরিবেশে বাস করলে মোপাসাঁর মতো গল্প লেখা যায় তা যে গত কুড়ি বছর যাবৎ বাংলাদেশে বিরাজিত নয় এ-কথা মনে করা ভুল। কিন্তু মোপাসাঁর মতো কেন, সরসবুদ্ধি-জাত ক্ষুদ্রকায় গল্প এ-দেশে জন্মালনা। দোষ কার? দোষ সম্পূর্ণত লেখক-সম্প্রদায়ের যেমন নয় তেমন পাঠক-সম্প্রদায়েরও নয়। তবে? দোষ নিরতিশয় ঐতিহ্য-প্রীতির। প্রীতিটি লেখক-পাঠক উভয়েরই মন থেকে আবিষ্কার করা যায়।

ছোট গল্পের লেখকরা মোপাসাঁর ধরণে ছোট-ছোট ধারণা নিয়ে চিন্তা করতে পেরেছেন—যেমন সন্তোষকুমারকে দেখছি। কিন্তু বাংলা-গল্পের যে একটি বিশেষ ধরণ দেবতার মতো কিছুকাল অনেক পাঠকের ভক্তির সম্মতি পেয়ে এসেছে তাকে অমান্য করবার সাহস অন্যান্যের মতো তাঁর গল্পগুলোতেও নেই। প্রচলিত ধরণের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু তার জন্যে শক্ত গড়নের মনের দরকার। সন্তোষবাবুর মন বড্ড বেশি হৃদয়বান বাঙালীর। তাঁর চিন্তা অতিশয় সচ্চিন্তা। ডাক্তারের নিরতিশয় সহৃদয়তা যেমন রোগীর পক্ষে সবসময় কল্যাণকর নয়, তেম্নি কথা-সাহিত্যিকের শুভানুধ্যায়ী চিত্তবৃত্তি ছোট গল্পের বক্তব্যে অনেক ক্ষেত্রে অশুভ ফল উপস্থিত করে। অবশ্য সন্তোষবাবুর সপক্ষে এটুকু বলার আছে যে ভদ্র সর্ব্বতই ভদ্র। সাহিত্য যে হিতকারী বস্তু হবে এ-নিয়ে বিতণ্ডার অবকাশ নেই। কিন্তু হিত যার করতে হবে সে বস্তুতই যে অহিত। এই অহিতে প্রবেশ করে তাকে হিতাবস্থায় উত্তীর্ণ করার সময়, সুযোগ, প্রয়োজন আছে বলেই আমি সন্তোষকুমার-দের মতো পরিশীলিত মনের মুখাপেক্ষী—জানতে উৎসুক তাঁরা কি ধরণে সমাজের দিকে তাকাচ্ছেন।

স. ভ.



## কাব্য-প্রবণতা

**এলিয়টের কবিতা—বিষ্ণু দে। আকাশের মুখ—সতীন্দ্রনাথ মৈত্র। সিন্ধুসারস—সুনীল বসু। অভিজ্ঞান—সুবোধরঞ্জন রায়। সুবর্ণরেখা—সরযূপতি সিংহ।**

বাংলা সাহিত্যে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ অনেক কাল আরম্ভ হয়েছে। একটা জীবন্ত সাহিত্যের পক্ষে এই অন্যান্য জীবন্ত সাহিত্যে উৎসাহী প্রবণতা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। সব চাইতে কঠিন যে কাজ এদিক থেকে, সে হোলো বিদেশী কাব্যের অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ যে-প্রেরণায় 'কড়ি ও কোমল'-যুগে শেলীর অনুবাদ করেছিলেন, ঠিক একই প্রেরণা এই বিশ শতকে ত্রিশের যুগ থেকে কাব্য-অনুবাদ-খাতে স্রোতস্বান। প্রেমেন্দ্র মিত্র লরেন্সের, চেষ্টারটনের, বুদ্ধদেব বসু রিলকে, বোদলেয়ার, পাউণ্ডের অনুবাদ করেছেন যেমন স্বাভাবিক উত্তেজনায়, আলোচ্য এলিয়টের কবিতার তেমনি বিষ্ণু দে। অনেকদিন যাবৎ অনুবাদ-কার্য সুফলপ্রসূ হয়ে গুচ্ছাকারে গ্রন্থিতরূপে রসিক-দরবারে উপনীত। বলাই বাহুল্য, এক্ষেত্রেও 'Version' 'Perversion' হয়নি, এলিয়টী চেতনা যেহেতু বিষ্ণু দে-রই চারিত্রিক। ফলে প্রায়শঃই অনুবাদগুলি সুখকর। আর সর্ব্বত এইজন্যে নয় যে অনূদিত কবিতাগুলি সর্বথা মূল-পাঠের স্বাচ্ছন্দ্য ও যাথাযথ্য বহন করতে পারে নি। এখন এলিয়টের পটে এ দেশের বর্তমান রূপকে দেশজ কাব্য-রূপকেই পাঠ করা যাক। অতীত দুঃসহ স্মৃতিতে বোঝাই, বর্তমান অবসন্ন, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত—এই যখন একটা দেশ ও জাতির পরিচয়, তখন সেখানে যে-সাহিত্য জন্মায় তার মধ্যে অন্ধকার, নৈরাশ্য বিফলতার ছবি পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু তারো পরে সৎ মন যা প্রত্যাশা করে তা হ'লো সত্যের, তা সে যে সত্যেরই হোক। হোক না গভীর জ্ঞানী আত্মীয় বোধায়ন—রূপে রীতিতে ছায়ায়। এখানে প্রথম আলোচ্য 'আকাশের মুখ' ও 'সিন্ধুসারস' বই দুখানি সেই প্রত্যাশাকে কিছু পরিমাণে পূর্ণ করে। কেবলই শীত নয়, বসন্ত আসে, বসন্তের প্রতিশ্রুতিও আছে। তাই শীতের প্রতিবাদে 'আকাশের মুখে'র কবি একটি ফুল তাঁর মনে অম্লান রেখেছেন। 'সিন্ধুসারসে'র কবিও যে "গোধূলির এক মুঠি রঙ-রূপ-রোশনাই" বা "ধূলোমাটি অন্ধকার" ও "প্রিয়ার ওষ্ঠের ঘন চুম্বনের দ্রাক্ষাসার" ভালোবেসেছেন তা জানিয়ে যেতে অকুণ্ঠ। এঁদের মধ্যে স্বাস্থ্যের স্বাদ পাই।

কিন্তু 'আকাশের মুখে'র কবি যখন অন্যত্র 'কোনো এক রাত্রির কবিতা' কিংবা 'একটি হাত' কি 'ঋতু সংহারে'র শেষ ভাগের গদ্য-গদ্য ভাব ও ভাষা নির্বাচনে তাঁর 'নিরুদ্বেল' মনের পরিচয় রাখেন তখন তাঁকে স্বীকার ক'রে নিতে বাধা আসে। 'কোনো এক জনকে' 'একটা দিনের শেষ' 'মাগো আসছি' প্রভৃতি কবিতায় তিনি যে আবেগের দ্রুতি এনেছেন তাকে প্রশংসা করি। 'কথা কও' ও 'প্রথম প্রশ্ন' কবিতা দুটির অংশ বিশেষে ছন্দের ত্রুটি অস্বস্তিকর। 'ইচ্ছা' কবিতাটি ক্ষুদ্র সংহতরূপে অথচ তাৎপর্যপূর্ণ বাঁকে সুন্দর হয়েছে। 'সিন্ধুসারসে'র কবিতাগুলিতে প্রধান লক্ষণীয় হ'লো কবির তেজীয়ান প্রাণ। সমসাময়িক সমাজে রুগ্নতা বীভৎসতা নিরুত্তম কবির লক্ষ্যে পড়েছে—এতৎসত্ত্বেও তিনি ভগ্নোদ্যম নন। চটি বই-এর মধ্যে যে ক'টি কবিতা আশ্রয় পেয়েছে তার ওপর আত্যন্তিক নির্ভর করা না গেলেও এটা ঠিক যে সুশ্রী এবং অভিনব ছবি আঁকতে এ-কবি চমৎকার সার্থক। তেমনি যাবার ছন্দের গঠনে স্বাচ্ছন্দ্য আনতে কবি প্রায়শঃই অমনোযোগী। অমনোযোগী এইজন্যে বলছি, 'সোণালি

বৃষ্টি' বা 'কাঠঠোকরা' নিপুণ ছন্দ-কবিতা হ'তে গিয়েও দু'এক জায়গায় ছন্দের অনর্গল গতি অব্যাহত নেই বলে। এ-বিষয়ে তাঁকে যথোচিত সামঞ্জস্য-বিধায়ী হ'তে দেখলে আরো উৎসাহজনক কথা তাঁর সম্পর্কে বলা চলবে নিশ্চয়ই। 'একলা বিকেল' 'সোণালি বৃষ্টি' 'তৃষ্ণা' 'স্মৃতি-সংক্রাম', 'চিন্তাচারিণী' প্রভৃতি কবিতা তাঁকে গভীর বিবেকবান বলেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দু'টি সুদৃশ্য কবিতার বই : 'অভিজ্ঞান' ও 'সুবর্ণরেখা'। অভিজ্ঞানের কবি অনেকদিন যাবৎ কাব্যচর্চা ক'রে নির্ভুল ছন্দ লেখেন, কোথাও কোথাও মোহময়ী ছবি ফেলতে পারেন। তবে প্রাচীন-পন্থী এঁর শব্দ-নির্বাচন, গঠন-বিন্যাস। ভাব-জগতেও নোতুনের দিশা দেখিনে। 'সুবর্ণরেখা' অপেক্ষাকৃত আধুনিক—কবিতাগুলির গঠনে ও ভাষণে। তবে উল্লেখযোগ্য চিন্তা রুচিসম্মত ছবিসমেত আবির্ভূত হয়েও যে কবির যাদুর অসহযোগে সার্থক কবিতা হয় না, তারই স্বাক্ষর রয়েছে এখানে। ব্যতিক্রম নেই তা নয়। তাই, কবিতার এই মূল ব্যাপারটা সম্পর্কে তাঁকে গভীর অবহিত হতে বলি।

নিখিল নন্দী

# সম্পাদকীয়

## চিত্র-প্রদর্শনী

ষাট বছর আগে মাত্র তিনজন ছাত্র নিয়ে মহারাজ প্রদ্যোৎ ঠাকুরের পোষকতায় যে চিত্রাঙ্কণশিক্ষালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ তিন শ' ছাত্র-সংখ্যায় তার যেমন প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হচ্ছে তেম্নি ছাত্রদের ও সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর সৌকার্য্যে সে-প্রতিষ্ঠা পরিমাণের মাত্রা ছাড়িয়ে গুণের পর্য্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়ম বাংলাদেশের শিল্পী-চিত্তে এম্নি সক্রিয়। এ-বছরের উক্ত শিক্ষালয়টির প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বারবার এ-কথাটিই আমার মনে হয়েছে যে বাঙালীর শিল্প-প্রতিভা মায়াবী অঙ্গারের মতো অক্ষয় জৈবতায় প্রতিষ্ঠিত। তাকে শত পোড়ালেও বা শতবার ধুলেও ছাই হয়ে ধূলোয় মেশাবেনা বা মলিনত্ব দুর করে বলবেনা, 'আমি হেরে গিয়ে হাড়ের মতো সাদা হয়ে গেছি।' রং তার থাকবেই—কালো হলেও ছায়ার পর্দায়-পর্দায় বিচিত্র সম্মোহ-সুর বাজিয়ে তুলবে। পেন্সিলে আঁকা দ্বিতীয় বার্ষিকের শ্রীমান হরিশ দাশের গাছ আর নদীর ছবিগুলো, কাঠের উপর কালো জল-রং-এ আঁকা শ্রীমান অজিত বর্ম্মার একটি বস্তিদৃশ্য আর অনুজ্জ্বল রঙের তরঙ্গিত ভঙ্গীতে ফুটিয়ে তোলা শ্রীমান জনতোষ চক্রবর্ত্তীর মাটিকাটা জনমজুরের কর্ম্মক্ষেত্রটি আমার আগেকার বাক্যটির সত্যতা প্রমাণিত করবে।

কিন্তু সত্যের রং একপেশে নয়। তা-ও বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হতে পারে। ছাত্রদের প্যাষ্টেলে আঁকা ছবিগুলো দেখে এবং বিশেষ ভাবে একটি শিক্ষার্থীর আত্মরূপে তাঁর চরিত্র হুবহু প্রতিবিম্বিত দেখেশুনে আমার মনে হল উনিশ-শতকীয় উরোপে যা ছিল শিল্পীসত্তার নিদর্শন-পরাকাষ্ঠা আজ তা একটি বাঙালী শিক্ষার্থীর হাতে কতো সহজ বিদ্যা হয়েই না এসে উপনীত হয়েছে! বাংলাদেশ শিল্পীর অনাদরের জন্যে প্রসিদ্ধ—অথচ প্রকৃতির এম্নি পরিহাস যে বিশ্বের শিল্প-আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের জলেই অবলীলায় স্পন্দিত হয়। ষ্টীল-লাইফগুলোও আমার এ-মন্তব্যের সহায়ক।



পরিশেষে, মন্তব্যের সংক্ষিপ্ত পরিসরে, আর একটি দিকের উল্লেখ করব। তা হ'ল ছাত্রীদের কৃতিত্বের দিক। মণ্ডন-শিল্পে তাঁদের সহজাত দক্ষতা উপযুক্ত শিক্ষায় কি আশ্চর্য্য পর্য্যায়ে গিয়ে পৌছুতে পারে তার নিদর্শন দেখতে পেলাম স্কেচে এবং "বানিজ্যিক-চিত্র"-প্রদর্শনীর কক্ষে। তুলির রঙে কয়েকটি নক্সা তৈরী করেছেন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর একটি ছাত্রী। দু'টি নক্সা দেখে মনে হ'ল উলের কাজ। চিত্র এখানে এমন বিভ্রান্তকর ভাবে দ্বিপটশায়ী যে ধরে দেখতে ইচ্ছে হয় যে তা সত্যি আঁকা ছবি না বাস্তব উলের কাজ।

ভাব বস্তুকে ছাড়িয়ে যায়না। 'ইণ্ডিয়ান আর্ট-স্কুলে'র ছাত্রছাত্রী প্রমাণ করেছেন যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ বাস্তব ভাবের ঘর থেকে বিচিত্র রং চুরি করে শিল্পীর অপেক্ষায় বসে থাকে।

এ-প্রসঙ্গে অন্যত্র প্রদর্শিত একজন শিল্পশিক্ষার্থীরও কয়েকটি চিত্র আমার মানসপটে উদ্ভাসিত হচ্ছে। শ্রীঅর্দ্ধেন্দুপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাত্র তিনি, নাম শ্রীরবি রায়—এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরেসে তাঁর দু'বছরের শিক্ষার সুফল দেখান হচ্ছে। যে চৈনিক প্রথা ওয়াশ-ড্রয়িং নামে ভারতীয় চিত্রকলার অন্তরঙ্গ বিষয় শ্রীযুক্ত রায় সে-প্রথার ঔৎকর্ষ প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছেন মাত্র দু'টি বছর শিক্ষা লাভ করে।

## জাতীয় নাট্য-পরিষদ

নবজাত কোনো নাট্য-পরিষদ-এর নূতন নাটক পরিবেষণের খবর আমাকে কেন নাট্যামোদী ব্যক্তি-মাত্রেকেই উৎসাহিত করবে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে 'জাতীয় নাট্য পরিষদ' সেদিন যে ক'খানা ছোট-ছোট নাটক অভিনয় করলেন তা দেখে আমার মনে হল যে আজকের দিনে এ-ধরণের ক্ষিপ্র শাণিত ভঙ্গীর নাটকেরই প্রয়োজন সব চাইতে বেশি। ঢিলেমির দিন অপগত। এখন আমাদের তড়িৎপ্রভ হতে হবে। নিজেদের ত্রুটী-বিচ্যুতি ধুয়ে-মুছে তৈরী হতে হবে ভারতবর্ষকে নূতন গান শোনাবার জন্যে। এঁদের 'শিল্পী'-নাটিকাটির অভিনয়ে আমার শ্রুতি এম্নি একটা প্রস্তুতির সুর শুনতে পেলো। হয়ত নাটিকাটির রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা চিত্রিতা দেবী নবাগতা বলেই এ-সুর শোনা যাচ্ছে।

## কবি-সভা

এখন যাঁরা বয়েসে সব চাইতে ছোট এবং কাব্যোৎসাহী তাঁরা এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরেসে একটি কবি-সভা আহ্বান করেছিলেন। এখনকার পদ্য-রচনা পাঠ ও তার আলোচনা হল সে-সভায়। বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব উপস্থিত থেকে সভার কাজটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করে যান। সভাপতি হবার দুর্লভ গুণ তাঁর আছে। এ-সভায় একটা বিষয় লক্ষ্য করে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এখনকার অল্প বয়েসী কবিদের রচনায় রোমান্টিক মনোভাবের হাওয়া লেগেছে। কল্লোল-যুগের থেকে গণনা করলে এঁদের তৃতীয় পুরুষ বলা যায়। বলতে পারি, নাতির হাতে দাদামশাইরা ছাতি পাচ্ছেন। সব দেশের কবিতার ইতিহাসেই 'রোমান্টিক রিভাইব্‌ল্' নামক শুভলক্ষণযুক্ত একটি ঘটনা আছে। পাঠক-সম্প্রদায় রোমান্টিক কবিতাকেই আদর জানান সব চাইতে বেশি। তাছাড়া কবি-সম্প্রদায়-ও রোমান্টিক কাব্য-রচনাতে আন্তরিকতার পরিচয় বহন করে আনেন সব চাইতে অধিক পরিমাণে। গত চার-পাঁচ বছর আগেও কবিতার যে দুর্দ্দিন গেছে তা যে আর এখন নেই আজ আশান্বিত হয়ে আমরা এ-কথাটিই ভাবব।

# সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে—

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৪২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

**নূতন বীমা—১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲**

| | |
|---|---|
| মোট চল্‌তি বীমা | ৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲ |
| মোট সম্পত্তি | ২২,৪৯,৮৮,০৫৬৲ |
| বীমা ও বিবিধ তহবিল | ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲ |
| প্রিমিয়ামের আয় | ৩,৯৪,২২,৩৭১৲ |
| দাবী শোধ (১৯৫২) | ৮৮,৮২,২৭১৲ |

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

### ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩


## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। চল্‌তি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা (সডাক) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে (ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেণ্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয়ঃ

**পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা**


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু'টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**

লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেম রাজনীতি**
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা

মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা**

PURVASA : AGRAHAYAN—1953 : REGD. NO. 1512 :


# ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৪৯ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৩½ বৎসরে চারিটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম ভ্যালুয়েশানে ( ১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত ) বোনাসের হার বৃদ্ধির আশা আছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।



## খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।




## সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩


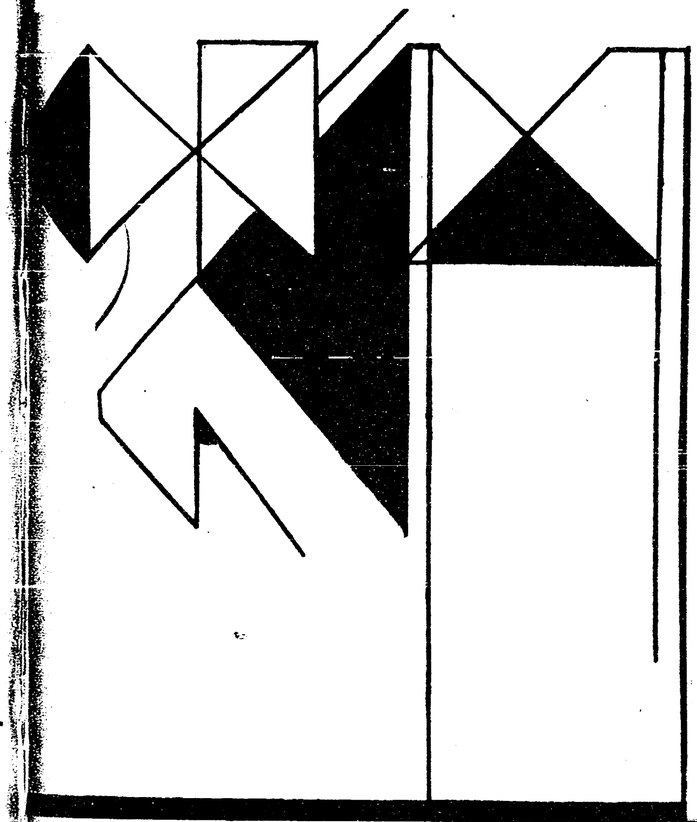

# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০

নবম সংখ্যা : পৌষ

সম্পাদক : বঙ্কিম ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত

বার আট আনা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
( অর্থনীতি বিষয়ক )
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


# টুকরো কথা... (৩৩)

'হিন্দুঘরে জন্মে হিন্দু শিক্ষাদীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ করে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধারণ জীবনের ছবিও তেমনি এঁকে থাকি ;...মনের পরিণতির সঙ্গে রূপকেই আর প্রধান করে দেখিনে ; তাদের প্রত্যেক-টিকে একই সত্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ হিসেবে দেখি।'...

নিজের এই মহৎ উপলব্ধিকে নিবিড় নিষ্ঠায় শিল্পরূপ দিয়েছেন আচার্য শিল্পী নন্দলাল বসু। সত্তর পেরিয়ে এবার তিনি আশির কোঠায় পা দিলেন। জন্ম : মুঙ্গের-খড়্গপুর, ১২৯০। অভিভাবকদের আশা ছিল নন্দলাল ডাক্তার হবেন। ঢুকেওছিলেন প্রেসিডেন্সীর কমার্স ক্লাসে। কিন্তু বেরোলেন যে দরজা দিয়ে সেটা হ্যাভেল সাহেবের ছবি আঁকার ইস্কুলের, তখন যার উপচার্য ছিলেন স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়ে স্থায়ী হয়ে বসতে-বসতে প্রায় মধ্যবয়স। তার আগেই অজন্তা গুহাচিত্রের প্রতিলিপি করেছেন, বসুবিজ্ঞান মন্দির সাজিয়েছেন মহাভারতের চিত্র এঁকে। শান্তিনিকেতন থেকে পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী হয়েছেন তাঁর দূরপ্রাচ্যের নানাদেশ ভ্রমণে। আর তারপর আশ্রম-তরুর মতোই একসময় শান্তিনিকেতনের আপন অঙ্গ হয়ে গেছেন। ভারতীয় শিল্প সাধনার ধারা সঞ্জীবিত হয়েছে তাঁর শিল্পকর্মে। আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তিনিকেতনে এবার তাঁকে যে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করা হল তাতে সমগ্র দেশের হৃদয় যুক্ত হয়েছে॥

তাঁর লেখা বই : 'শিল্পকথা' 'শিল্পচর্চা'। রেখাচিত্র : 'রূপাবলী' ৩ খণ্ড। সিগনেট বুকশপে পাওয়া যায়॥

নন্দলালের শিল্পশিক্ষার যিনি গুরু—অবনীন্দ্রনাথ—তাঁকে শুধুমাত্র 'শিল্পগুরু' বললে তাঁর যথার্থ পরিচয় নিতান্তই অপূর্ণ থাকে। লেখক হিসেবেও বাংলাসাহিত্যে তিনি অসামান্য। আঁকা-ছবির মতো চিত্রগুণ তাঁর রচনার। সঙ্গে মিশেছে দুর্লভ কল্পনার যাদুকরী। সাহিত্যের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে রাজস্থানের ইতিহাস ( রাজকাহিনী' ), বুদ্ধের জীবন ( 'নালক' ), সংস্কৃত কাব্যের কাহিনী ( 'শকুন্তলা' ), বাঙলার পোখপাখালি, ভূগোল দৃশ্য, রূপকথা আর রূপক মেশানো উপন্যাস ( 'বুড়ো-আংলা' ) আর ( 'আলোর ফুলকি' )। তাঁর তুলিতে আঁকা-ছবি স্বচক্ষে দেখবার ভাগ্য এদেশে অনেকেরই হয়নি। তাঁর অক্ষরে লেখা ছবি উপভোগের দ্বার অবারিত।

ক্ষয়রোগ চিকিৎসায় বিশিষ্ট পারদর্শী ডক্টর রাম অধিকারী 'সামাজিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা' হিসেবে লেখা 'ক্ষয়রোগ-কথা' প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে সাহিত্যিক উপভোগ্যতা মিশেছে রচনায়, যা একসঙ্গে পাওয়া দুর্লভ॥

বহুবিচিত্র জাতির মিশ্রণে গড়া এই ভারতবর্ষীয় সমাজ। সেই জটিলতার বিশ্লেষণে এবং অরণ্যবাসী আদিম জাতি বিষয়ে মৌলিক গবেষণার সঙ্গে পরিচয়ের জন্য নৃতত্ত্ববিজ্ঞানী নির্মলকুমার বসুর লেখা 'হিন্দু সমাজের গড়ন' এবং 'নবীন ও প্রাচীন' বই দুটি অপরিহার্য। শেষোক্ত গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথের ছবি' এবং 'শিল্পী যামিনী রায়ের মতবাদ' প্রবন্ধ দুটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আরো চারটি বই এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঢেউ' ( উত্তর আসামের অরণ্যবাসী লেখকের আত্মচরিত, রোমান্সের স্বাদ আছে ); অনিলকৃষ্ণ সরকারের 'দার্জিলিং সাথী' ( হিমালয় প্রবেশিকা ); সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদারের 'কাঞ্চনজঙ্ঘার ঘুম ভাঙছে' ( রাজনীতি আন্দোলন প্রসঙ্গ এবং মহেন্দ্র-নাথ দত্তের 'মায়াবতীর পথে' ( ভ্রমণকথা হিসেবেও সুপাঠ্য )॥

ইংরেজীতে লেখা হলেও নির্মলকুমার বসুর আরো একটি বইয়ের উল্লেখ করি, নিস্পৃহ বিজ্ঞানীর তথ্যনির্ভর শ্রদ্ধা নিয়ে লেখা বলে যে বইটি গান্ধীজীবনের শেষ অধ্যায় বিষয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল হয়ে থাকবে : বিক্রমাদিত্যের 'দেশেদেশে' বইটিও গান্ধীজীবনের এই শেষ অংশকে কেন্দ্র করে লেখা। বলা চলে রম্যরচনা, যার মধ্যে মিশেছে সাংবাদিকের অভিজ্ঞতা এবং কিঞ্চিৎ উপন্যাসের কাহিনী। অন্নদাশঙ্কর রায়ের নতুন উপন্যাস 'কন্যা'তেও গান্ধীজি এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক বর্ণনা দ্রষ্টব্য। রূপকথার আঙ্গিকে আধুনিক জীবনের উপন্যাস বাংলায় এই প্রথম। লেখকের ভূমিকা : 'ছড়া লিখছি, রূপকথা কেন নয়? বড়দের রূপকথা'॥

সুশীল রায়ের 'মনীষী জীবন কথা' ( ২য় খণ্ড ) প্রকাশিত হয়েছে। এতে আছে শিল্পী নন্দলাল বসু, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু সহ দশজন মনীষীর পরিচয়॥

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবপন্থীদের কীর্তি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখা 'বিপ্লবের পদচিহ্ন' বইটিতে আছে : 'গোপন ষড়যন্ত্র থেকে গণ-আন্দোলনের পথ, বিদ্রোহ থেকে বিপ্লবের পথ, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা থেকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বরাজ গড়ে তোলার পথ গ্রহণের ক্রমবিকাশ' বর্ণনা। বিশিষ্ট বিপ্লবকর্মীর বিচিত্র আত্মচরিত হিসেবেও বইটি সুপাঠ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য : ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের 'বিপ্লব তীর্থে'—গল্পের আকারে লেখা বিপ্লব কর্মী বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত এবং দীনেশ গুপ্তর জীবনকথা॥

ক্যামেরার ব্যবহার শিখতে যাঁরা উৎসাহী তাঁরা বিখ্যাত আলোক-চিত্রশিল্পী নীরোদ রায়ের 'ডার্করুম' বইটি পড়ে উপকৃত হবেন। 'ফটোগ্রাফী' বলে তাঁর আর একটি বই আছে॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন বই : 'লাজুকতা'—'সমাজ জীবনের একটি বিশেষ সময়ের বিশেষ অবস্থার ছোট-ছোট কাহিনীর মধ্যে যে মিলটা স্বভাবত থাকে তাকে আশ্রয় করে' লেখা ষোলোটি ছোটগল্প॥

এলাহাবাদে চিরপ্রবাসী বাঙালী ঔপন্যানিক শচীন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে। বৃহৎ-বাঙলার পটভূমিতে লেখা বিষণ্ণ-মধুর তাঁর দুটি উপন্যাস 'লীলা-মৃগয়া' এবং 'পলাতকা' সিগনেট প্রেস থেকেই প্রকাশিত হয়েছিল।

বনেদী শৌখিন লোক ছিলেন। এককালে বিখ্যাত গোলাপ আর ক্যাক্টাসের বাগান ছিল তাঁর। পারদর্শী ছিলেন সংস্কৃত, হিন্দী আর উর্দু সাহিত্যে। এবং শরীর চর্চায়। বাংলা সাহিত্য চর্চায় মন দিয়েছিলেন শেষ জীবনে। মৃত্যু সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল একষট্টি॥


আগামী ৬ই ফাল্গুন
ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের
পুণ্যজন্মদিনে
প্রকাশিত হবে :
পরমাপ্রকৃতি
শ্রীশ্রীসারদামণি
ভক্তিময় অন্তরঙ্গতার সুরে
অচিন্ত্যকুমারের
অপূর্ব মাতৃবন্দনা।
সিগনেট বুকশপ। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
১৪২-১ রাসবিহারী এভিনিউ

# পূর্ব্বাশা

## পৌষ—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| সুর্-লিষ্টিক্ : বাসন্তী দত্ত | ... | ৪৫৭ |
| হাসিমারা : বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত | ... | ৪৫৮ |
| দার্জিলিং-এ একটি রাত্রি : বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত | ... | ৪৫৮ |
| পাহাড়ের দিকে : কল্যাণ সেনগুপ্ত | ... | ৪৬১ |
| একটি রং-করা মুখ : শক্তি চট্টোপাধ্যায় | ... | ৪৬২ |
| জিজ্ঞাসার জন্যে : অজিত মুখোপাধ্যায় | ... | ৪৬৩ |
| একটী প্রেমের জন্যে : প্রদ্যুৎন্ন মিত্র | ... | ৪৭৩ |
| শ্রীঅরবিন্দের কথা : শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী | ... | ৪৭৫ |
| বিবাহিতা স্ত্রী : প্রতিভা বসু | ... | ৪৭১ |
| স্ত্রীর পত্র নয় : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৪৭৮ |
| বিফল : মীনা বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৪৮২ |
| সাহিত্য-গতি : তারাপদ গংগোপাধ্যায় | ... | ৪৮৫ |
| ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত্ | ... | ৪৯১ |
| গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ৪৯৪ |
| আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী | ... | ৫০০ |
| সম্পাদকীয় : | ... | ৫০৮ |
| সাহিত্য-পরিচয় : কানাই সামন্ত | ... | ৫১৩ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতু বন্ধ— ২০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯


## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। চলতি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা ( সডাক ) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ( ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেন্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা ; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয় :

পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা




খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় ও সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় সুপার-নিও-কড্ বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

SUPER NEO COD

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ

কলিকাতা-১৩

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৪৯ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৩½ বৎসরে চারিটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম ভ্যালুয়েশানে ( ১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত ) বোনাসের হার বৃদ্ধির আশা আছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

ইন্সওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

এন্. সি. দত্ত
চেয়ারম্যান।



বর্তমান যুগে
কর্ম-ব্যস্ততার ভিড়ে
স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ আর আগেকার
মতো তত সহজ নয়। এ সময়
এক কাপ গরম চা হলে পথ-চলার
ক্লান্তি অনেকখানি লাঘব হয়।

ভারতীয় চায়ের সুবৃহৎ শিল্পায়তন থেকে
১২,৫০,০০০ লোকের কর্ম সংস্থান হয়।

চা

ভ্রমণে আনন্দ দেয়

সেন্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB-116

পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ— ১৩৬০
নবম সংখ্যা —পৌষ

## কবিতাগুচ্ছ

### সুর্-রিয়ালিষ্টিক্

বাসন্তী দত্ত

মনে হয় : কুয়াশা-ঘেরা নটী নগরীর
কালো ভস্মধূম
যক্ষ্মা-জীবাণু-জর্জর ভাঙা প্রাসাদের
নির্মম নিঃশ্বাস !
শতাব্দীর জরায়ুতে জটায়ুর
শ্বাসকষ্ট-বীণা
মন্দ্রিত মাহেন্দ্রক্ষণে।

প্রসেনজিৎ ইতিহাস লেখো :

অতলান্তে প্রোথিত জীবাশ্ম-পাঠে
কোন্ পরিচয় ? খোঁজ করো
নিশীথ-নাট্যের কোনো
প্রেত-নায়িকা কী
এখনো বাসর জাগে
যৌবনের নির্জীব আশ্লেষে ?

সম্ভুক্ত কফির পেয়ালা—
পিরীচের আনাচে কানাচে

সিগারেট-ছাই আর
জীবনের সবটুকু ক্ষয়
অবিনশ্বর হোক—আজ
এই উপাসনা ॥

## হাসিমারা

[ 'হাসিমারা' জলপাইগুড়ি জেলার একটি ছোটো চা-বাগান ]

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

নির্জন ছায়ার নিচে আশ্বিনের শান্ত নীলাঞ্জন
কী উজ্জ্বল ! নির্বিকার রেলপথে করুণ যন্ত্রণা
মাথা কুটে। তারি পাশে পায়ে হাঁটা পথের প্রেরণা—
দিগন্তের স্বপ্নাবিষ্ট চোখে আঁকে নিবিড় চুম্বন !
এলোমেলো মৃদু হাওয়া, দুপুরের তন্দ্রালস চোখে
অদূরে ঝিমায় বন,—চা-বাগান সবুজ শয্যায়
গভীর মমতা নিয়ে চোখ মেলে ! সকালে-সন্ধ্যায়
মানুষের ভীড় জমে, ভীড় ভাঙে—বিবর্ণ আলোকে।

নরম নিবিড় নীল ছায়াচ্ছন্ন ম্লান অন্ধকারে
ছবি আঁকা শেষ ক'রে, গুটিয়ে পথের সরঞ্জাম
একা-একা ফিরে আসি সাতালিতে—বন্ধুর বাসায়
উজ্জ্বল, বিস্ময়াবহ কোনো এক মনের সেতারে
সেখানে সকাল হয়, স্নিগ্ধ হয় সূর্যের প্রণাম !—
আবার কে যেন ডাকে নতুন দিনের ইশারায় ॥

## দার্জিলিং-এ একটি রাত্রি

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

আমার এ হাতে দাও হাত,
এখন আকাশ ঘিরে নামিয়াছে মিশ্‌কালো রাত।
এই বেলা নেমে এসো ছায়ার ভিতরে



পাশাপাশি—খুব কাছে স'রে,
ভয় করে যদিই নেহাৎ
ভালবেসে হাতে রেখো হাত।

চলে এসো পার হয়ে উঁচুনীচু পথগুলি, খাড়া এ পাহাড়
বরফের ফেনা—সাদা হাড়,
ধোঁয়া এ কুয়াশা
—পেঁজাতুলো ঠাসা
মাড়িয়ে ডিঙিয়ে
না থেমে সমান।
কোনোদিকে চোখ আর ফিরিও না তুমি—
তাড়াতাড়ি চলে এসো ভেজে-ভেজে হৃদয়ের গান।
আমাদের মত সব—কতজন চলে গেছে এই পথে নেমে
নড়বড়ে ভাঙা বাসা ফেলে রেখে—মিশে গেছে একটু না থেমে
চকাচকী তারা সব হৃদয়ের হেমে।
তারপর কোনোখানে শেষে
থেমেছিল, ঝাপ্‌টা পাখায়—
সব ঝড় মুছে ফেলে হায়,
ভালবাসা নীড়ের মায়ায়।

এও জানি একদিন আমাদেরও ব্যথা
রঙে রসে ভরে যাবে—সাধ আর কথা।

ভয় নেই, কাছে সরে এসো—
হাত ধরো, ঝড় যদি করে এলোকেশ-ও,
জলো-হাওয়া, কুয়াশার হিম
করে যদি মুখ রক্তিম
তবু হেসো, তবু হেসো
ভালবেসো, ভালবেসো।
সোজা চেও, তাকিও না পিছে—
ফোঁপানো শিশুর মত হাওয়া গুমরিে

ভাঙছে তুষার
কাছে-দূরে বুনো গাছ, পাতা নড়ে আর।

আমরা এ পথ ভেঙে চলে গেলে—উড়ে গেলে পাখি
হাল্‌কা পালক কোনো না-ছড়ালে—খড়কুটো তা' কি
কে খোঁজ—হদিস পাবে ? মিশে গেলে এই ঘাসে
দু'কোঁটা শিশির ?

গতিবেগ কুড়িয়ে পাখির
( আমরা ত পাখির মতই )
ধূলামাটি মেখে নিয়ে এই পৃথিবীর
ছিঁড়ে ফেলে চলে যাবো কুয়াশার ভিড়।

হঠাৎ দেখবো শেষে একদিন মেঘ, ঝড় নেই
আকাশ দিয়েছে নীল জানালা খুলেই
কোনো আঁখি-তারার মতন।
সেইখানে জ্বেলে দেবো আমাদের মন
তারা আর চাঁদকে জড়িয়ে
হিমহিম কুয়াশার ভাবনা সরিয়ে
কথা আর একরাশ ভালবাসা নিয়ে।

কামনার জাল বুনে' একখানি নীড়
মুখোমুখি দু'জনায় থাকবো নিবিড় !

হাওয়া বয়—দম্‌কা বাতাস,
চারদিকে পাতা ঝরে' পড়ে একরাশ
হিম ও শিশির গলে যায়,
আরো ঢের কুয়াশা ঘনায়—
পেঁচার গায়ের মত মিশ্‌কালো রাত।
চুপ্‌চাপ এইবেলা এসো,
ভয় করে যদিই নেহাৎ
ভালবেসে হাতে রেখো হাত।



## পাহাড়ের দিকে

কল্যাণ সেনগুপ্ত

হে নীল পাহাড়
সারারাত কান পেতে শুনি
তোমার বিশাল বুকে স্তব্ধ হাহাকার !

তবে তুমি এতকাল পৃথিবীতে ছায়া ফেলে ফেলে
কি পেলে, কি পেলে ?
তবে তুমি এতকাল হৃদয় উজাড় ক'রে দিয়ে,
কিছুই পাওনি যদি—পৃথিবীর বুক থেকে
আমাকেই নাওনা ছিনিয়ে।

সহজেই আমি চলে যাবো।
এত যে বেসেছ ভালো এই পৃথিবীকে,
দিতে তার প্রতিদান আমার যা-কিছু সবি ধূলায় ছড়াবো।
তুমি যা' বলোনি' তবু কেবলি চেয়েছ প্রাণ দিয়ে,
পৃথিবীর বুক থেকে তা-ই যাবো নিয়ে ;
তোমার কঠিন বুকে কোমল আঁধার খুঁজে শেষে—
রেখে দেব সেই মণি স্মৃতির সম্পদ ক'রে তোমারি উদ্দেশে।

তারপরে কোনোদিন. হে পাহাড়, আমায় ছেড়োনা।
ভেঙ্গে ভেঙ্গে রেণু হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো সোনা
হয়ে আমি মিশে যাবো তোমার বিশাল অনুভবে ;
আমার যা-কিছু পাবে তাই দিয়ে শেষে
আকাশ-পৃথিবী তুমি ভরে দিও হৃদয়ের অমেয় সৌরভে॥

## একটি রং-করা মুখ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একটি নদীর মত ভাংগা-ভাংগা ঢেউ নিয়ে
কেন তুমি পায়ে-পায়ে আসো ?
ফাল্‌তু সুতোর গায়ে গিট বেঁধে ইনিয়ে-বিনিয়ে,
কথা কও মেপে-মেপে, ছিটে-ফোঁটা হাসো ?
বিবর্ণ নদীর বুকে জোয়ারের কাঁদন শুনেছো ?
শুনেছো কখনো ?
শোনো নি দামাল গান। আজ থেকে জেনো,
তোমার প্রবাল-চর ক্ষয়ে ক্ষয়ে তুমি মুছে গেছো।

তুমি নেই, শেষ হোল টুকে-টুকে কথা বলা, আর
বাঁকে বাঁকা ফুঁসে ওঠে, আমাদের জীবন-জোয়ার,
অফুরান্ হাওয়া আর আকাশের রং-এ ঠেসে বুক,
মুখোমুখি বসে আছি আমি আর একটা রং-করা মুখ

## জিজ্ঞাসার জন্যে

অজিত মুখোপাধ্যায়

মনে মনে আমায় যে ডাকো
সে-কথা আমি তো খুব বুঝি,
আমিও কামনা করি তোমাকেই, বিনিময়ে পরমায়ু পুঁজি
যে-দিন চরম টানে জড়ো হবে সে-দিন যেখানে তুমি থাকো,
দূরত্বের কক্ষ থেকে ছিটকে পড়বে এসে জানি
জীবনের কাছে, তুমি, তখন যে কী আকুল কুটির-সন্ধানী।

দূর থেকে বিদ্যুত ছুঁড়ে দাও বাসনার,
হেঁটে যাও লঘু পায়ে আকাশের,
কথা কও সংগীতে কী ভাষার,
রহস্যে মুখ ঢেকে কাছে এসে যাও ফের।



রক্তের মত গালে স্বপ্নের মত হাসি,
দুটো চোখে ভরা আছে আরামের ঘন রাত,
পায়ে পায়ে ভেঙে পড়ে বিহ্বল পদপাত
জীবনের, কটাক্ষে সম্বিত-উদ্ভাসী
প্রগলভ চেতনার সঞ্চার,
জীবনের সংগেই থাকো তুমি মনে হয় বারবার।

পৃথিবীর মত তুমি ঘুরবে কি চিরদিন, বলো দিশাহারা,
সূর্যের মতন আমি কামনায় ঊর্দ্ধ সীমাহীন,
কক্ষপথ ভেঙে ওগো খুঁজে যাও সূর্যের কিনারা।
কতদিন দেবো ডাক, উপহার দেবো রাত্রিদিন,
তোমাকেই, কতদিন আর কতদিন
আমার হৃদয়ে এসে হবে তুমি দূরত্ববিহীন॥

## একটী প্রেমের জন্যে

( সোনাকে )

প্রদ্যুম্ন মিত্র

কি হবে কথায়, থাক,
তোমার আমার দেখা এইখানে নীরবতা পাক।
চুলের সমুদ্রে এসে নুয়ে পড়ে বিকেলের মেঘলা রোদ্দুর
উজাড় দুহাত তবে এইখানে আমাদের একবুক সুর।
সুমনা সময় যাক
কি হবে কথায় বলো আমাদের নীরবতা থাক।

একটি আশ্চর্য পাখি গেয়েছিলো কী আশ্চর্য গান
ঢেউয়ের অস্থির রং ছুঁয়েছিলো আরও দুটি প্রাণ।
তারাই ভুলেছে তবে, পরস্পর চোখের মুকুরে
নিজের নিবিড় ছবি দেখে আহা সময়কে গালিয়েছে সুরে
মুহূর্ত সাজিয়েছে কত
বিন্তি খেলায় মেতে এ ওর মনকে তাই বলেছে স্বাগত।

এইখানে দেখা হোল দুটি মন, দুটি প্রেম একই তবু মায়া :
তোমার চিবুক ধরে চুমু খায় বিকেলের ছায়া
একটি অবাক চোখ অপলক, কথা নেই নীরবতা ভাষা
বিমুগ্ধ হৃদয় ঘিরে তবু এক পুরোণো জিজ্ঞাসা :
আমাদের জরা আছে মৃত্যু আছে বিস্মৃতি অঢেল
সময়ের মিতি নেই।
এই ঢেউ কত আর হৃদয়ে উদ্বেল
নিজের ছায়ার রঙ প্রসাধন বুকে নিয়ে তার
এই মন ফিরবেনা ফিরবেনা আর !

একটি প্রেমের বুকে এত দ্বিধা
একটি শালিখ যেন নিরুচ্চার যন্ত্রণার তীরে
নিজের হৃদয় নিয়ে বারবার কাঁদে ফিরে ফিরে
জল ঢেউ মেঘ আলো
এখন মুখের তীরে কুয়াশার আসন্ন মৌনতা।

এটুকু মুহূর্ত তবু আমাদের
কি হবে কথায় বলো ছায়াবেলা এ প্রহরে ফের !
এ বিকেল নীরব উদ্বেল
সময়ের কানে বলে জরা আছে মৃত্যু থাক—অনেক অঢেল,
মৃত্যুর মহিমা তবু এইখানে একবুক প্রেম
নিরালা কপালে দেখো ছায়া ফেলে রোদ্দুরের হেম ॥

যদি তুমি আমি হই
তোমার প্রাণের শরীর বই
আজবাদে কাল বলবে কি
ছিলাম দু'জন ফারাক দিক ? —আমীর খসরু

# শ্রীঅরবিন্দের কথা

## শ্রীরমেশচন্দ্র চৌধুরী

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে অনন্তকালের জন্য একটি মহৎ ও উদার ভগবৎ প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। যুগে যুগে তাঁহার আবির্ভাব হয় শুধু সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতিকারীদের বিনাশের জন্য নহে, পরন্তু অসংশয় ও সমগ্রভাবে তাঁহাকে কিরূপে জানা যায় তাহাও বলিবার নিমিত্তই তাঁহার অবতরণ হয়। অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু। (গীতা ৭।১।) এই জ্ঞান নিত্য সত্য এবং শাশ্বত বেদ, যাহা মরণশীল মানবের হৃদয় গুহায় সন্নিবিষ্ট। ইহা একবার উক্ত হইলেও কালস্রোতে মলিন হইয়া যায়; দেশ ও কালে সীমাবদ্ধ সমাজের মানবমনে এই জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য চিরদিন সমান থাকে না। তাহার ভাস্বর দীপ্তি তমসাবৃত হইয়া উঠে। তাই যুগে যুগে তাঁহার পুনর্ভাষণের প্রয়োজন হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব প্রতিনিধি প্রিয় সখা ও শিষ্য অর্জ্জুনকে কালে নষ্ট এই মহতাযোগের উপদেশ দিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে শ্রীঅরবিন্দ ঐ ভগবৎ-প্রতিশ্রুতি যথোচিতভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যুগ গীতার কাল হইতে বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছে; কালের ব্যবধানে পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। গীতার উত্তর কালে এই ভারতে তন্ত্রের একটি মহৎ সাধনা জন্মলাভ করিয়া পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এক্ষণে দেশ ও কালের সীমা তিরোহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী একটি বিরাট পল্লীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে, সংঘর্ষে এবং সম্মিলনে একটি নূতন মানবসভ্যতা তিলে তিলে গড়িয়া উঠিতেছে। এই প্রগতির অধিনায়কতা করিতেছে জড়বাদী বিজ্ঞান ও দর্শন, যাহার মর্ম্মকথা জড়ই একমাত্র সদ্বস্তু, চেতনা জড়েরই ছায়া কিংবা অন্ধ জড়শক্তির কিঞ্চিৎ বিকাশ মাত্র। জড়াতীত অন্য কোন সত্তা বা অধ্যাত্মবাদ অপরিণত মনের কুসংস্কার, চন্দ্রালোকের ন্যায় মিথ্যা। অন্যদিকে বিগত দুই হাজার বৎসরের অধিক কাল ভারতীয় ভাবধারা প্রাচীন বেদ উপনিষদের মূল স্রোত-ধারা হইতে উদ্ভূত হইয়া একটি নূতন খাতে প্রবাহিত হইতেছিল। ভগবান বুদ্ধ ও আচার্য্যদেব ভারতকে মহান সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন যাহার দীপ্তি সহস্র সূর্য্যের আভার ন্যায় ক্ষেত্রাধিপতির মহিমাই চক্ষুকে অভিভূত করিয়া ফেলে অথচ ক্ষেত্রটি চলিয়া যায় দৃষ্টির অগোচরে। ভারতীয় মন আজিও ঐ ভাবধারায় পরিপুষ্ট এবং জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কথঞ্চিৎ মৃদুভাবে পরিচালিত। পাশ্চাত্য প্রভুত্বের নিকট ভারত যখন সর্ব্বতোভাবে নতশির, ঠিক এইরূপ

একটি যুগসন্ধিক্ষণে উপরোক্ত বিভিন্নমুখী ভাবধারা সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব।

স্বভাবতঃই উক্তরূপ পরিস্থিতিতে ভারতের বন্ধন মুক্তিই ছিল তাঁহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য। তিনি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। বজ্রনির্ঘোষে দেশবাসীকে আহ্বান করিয়া তাহাদের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—এই পরাধীন ভারতকে স্বাধীন করিবার শক্তি তাঁহার করায়ত্ত আছে। ইহা কেবল রাষ্ট্রনায়কের সাহঙ্কার সদম্ভ উক্তি নহে। ইহা দ্রষ্টা শক্তির সত্যস্ফুরণ। তিনি দর্শন করিয়াছিলেন—যে মহাশক্তি এই বিরাট বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন—তাঁহারই ইচ্ছায় ও বিশ্বের প্রয়োজনে, ভারতের আশু স্বাধীনতা লাভ অপরিহার্য্য। তখন উহা আর কিঞ্চিৎ সময়ের প্রশ্ন মাত্র। ভারতের মুক্তি সাধনায় তাঁহার জীবনের প্রথমার্দ্ধ অতিবাহিত এবং উহা ভাবীজীবনের সোপান মাত্র। আলিপুর জেলে এই পর্ব্বশেষ এবং পণ্ডিচেরীতে নূতন পর্ব্বারম্ভ।

আলিপুর জেলের বাহ্যিক বন্ধনের মধ্যেই তিনি মুক্তির জ্ঞানালোক লাভ করিলেন। সর্ব্বত্রই তাঁহার নারায়ণ দর্শন হইতে লাগিল। বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভ॥ (গীতা ৭।১৯।) এই সুদুর্ল্লভ মহাত্মা মিথ্যার কারাগার বিদীর্ণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় মুক্ত আকাশতলে বাহির হইয়া আসিলেন।

তৎপর পুনরায় অহঙ্কার উন্মত্ততার ভিত্তির উপর আর নূতন কিছুই গঠন করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ভারতের মুক্তি যখন আশু অবশ্যম্ভাবী, মানবের মুক্তির জন্য যাঁহার আবির্ভাব—জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া তিনি ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট কার্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। পণ্ডিচেরীতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। রাষ্ট্রনায়কতা করিবার জন্য দেশবাসীর পক্ষ হইতে বহুবার আমন্ত্রণ আসিয়াছে। কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। কেননা তাঁহার মোহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তিনি গতসন্দেহ হইয়া ভগবৎ আদিষ্ট কার্য্যে অটল অচল রহিলেন।

প্রচলিত অধ্যাত্ম সাধনায় যে লক্ষ্য তাহাতে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কার অনুযায়ী তাঁহার আর কিছুই করিবার রহিল না। বাকী জীবন কেবল ধ্যানে নিমগ্ন এবং লোকশিক্ষার নিমিত্ত কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল কর্ত্তন করিতে পারিতেন। "বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি"—এই জ্ঞান যিনি পাইয়াছেন তাঁহার আর ত্রিলোকে কর্ত্তব্য বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু ব্যক্তিগত মুক্তিলাভ মাত্র তাঁহার লক্ষ্য ছিল না। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকা পর্য্যন্ত মুক্তি হয় না। মুক্ত পুরুষের ব্যক্তিগত লক্ষ্য কিছু থাকে না। তিনি ভগবান বুদ্ধের ন্যায় সমগ্র মানবজাতির মুক্তিই চাহিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় সমগ্র মানবের মুক্তির পথ প্রদর্শন করাই ছিল তাঁহার সাধনার লক্ষ্য।



তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ব্বজ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন—মানবজাতির আদিমকাল হইতে বর্ত্তমান যুগপর্য্যন্ত মানবসভ্যতার বিরাট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বটে, ইহাতে জীবনের বাহ্যিকরূপ ( external forms of life ) বিপুলভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিন্তু মূলতঃ জীবনের ( essence of life ) কোন পরিবর্তন ঘটে নাই। বিজ্ঞানের প্রচেষ্টায় বহিঃপ্রকৃতির কতগুলি নিয়ম প্রণালী ( law of the process ) আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহা জীবনে বিষম বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনের চিরন্তন মূল জিজ্ঞাসার ( essential why of the process ) কোন সদুত্তর জড় বিজ্ঞান বা দর্শন দিতে পারে নাই। ফলতঃ জীবন সেই আদিম ভেদগর্ভিত মনোবুদ্ধি-অহঙ্কার দ্বারাই এখনও পরিচালিত হইয়াছে। মানব জীবন মনস্তরের মধ্যেই ঘূর্ণায়মান, এবং তন্মধ্যেই মানব সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে।

অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানা
দন্দ্রম্যমানাঃ পরিযন্তি মূঢ়াঃ অন্ধেনৈব নিয়মানা যথান্ধাঃ॥

কঠোপনিষৎ ১।২।৫

যাহারা আংশিক বা সীমাবদ্ধ জ্ঞানেই ( অজ্ঞান ) তুষ্ট তাহারা অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধের ন্যায় কুটিল গতিসহকারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। মানবজাতির বর্ত্তমান অবস্থা ঠিক এইরূপ।

শ্রীঅরবিন্দ আলোচনা করিলেন জীবনের পশ্চাতে এরূপ কোন অক্ষর সত্য বা নিয়ামক শক্তি ( operative principle ) আছে কিনা যাহার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জীবন সৌধ নির্ম্মাণ করিতে পারিলে মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে। তাঁহার মধ্যে প্রজ্জ্বলিত নচিকেতাগ্নি সেই সত্য উদ্ঘাটন না করা পর্য্যন্ত শান্ত হইতে পারে না। তাই তিনি দেশবাসীর অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। অন্যদিকে সমগ্র জগৎ তাঁহার নিকট হইতে মুক্তিমন্ত্র লাভের আশায় উন্মুখ হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

শ্রীঅরবিন্দের কথাটি কি? প্রথমেই বলা প্রয়োজন তাঁহার দর্শন মনোবুদ্ধি নির্ম্মিত ( mind constructed ) একটি নূতন জীবনতত্ত্ব নয়। তাহা সুগভীর সত্যোপলব্ধির মনোগ্রাহ্য যুক্তিগ্রাহ্য বর্ণনামাত্র। গীতাও এই পর্য্যায়ের একটি দর্শনশাস্ত্র। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে যদি জগতের দিকে নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টিপাত করা যায় তবে অস্তিত্বের (existence) বিভিন্ন পর্য্যায় ও স্তর পরিলক্ষিত হয়। প্রথমেই চোখে পড়ে এমন কতগুলি বস্তু যথা—ভূমি জল বায়ু অগ্নি আকাশ গ্রহ তারা নক্ষত্র, ধাতব ও খনিজ পদার্থ—যাহা আপাতঃ দৃষ্টে জড় বলিয়া মনে হয়। এই জড়ের মধ্যেই জীবন ফুটিয়া উঠিতেছে যেমন ঘাস বাঁশ বৃক্ষ

লতা গুল্ম ইত্যাদি। ঐ পর্য্যায়ে মনের অস্তিত্বের কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। পরবর্ত্তী পর্য্যায় দেখা যাইতেছে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ ইত্যাদি। এই পর্য্যায়ে মননক্রিয়া লক্ষিত হইলেও উহা তাদৃশ উন্নতস্তরের নয়। চিন্তাশীলতা বা যুক্তিসক্ষমতার বিকাশ হয় নাই। তারপর দেখা যাইতেছে আত্মপরিচয় শূন্য ( not self aware ) পশুমন অতিক্রম করিয়া উচ্চ শক্তি সম্পন্ন চিন্তাশীল, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন যুক্তিপরায়ণ ( self aware ) মন। এই চারিটি পর্য্যায়ের অন্তর্বর্ত্তী স্তরে স্তরে বিভিন্ন প্রকার বিকাশ আছে যাহা একটি স্তরের সহিত আর একটি স্তরের এবং এক পর্য্যায় হইতে অন্য পর্য্যায়ের যোগাযোগ রক্ষা করিতেছে। কোথাও ছেদ নাই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে জড়ের মধ্যে কি করিয়া প্রাণ ও মন উদ্ভূত হইল। যদি জড়ের ভিতর যে ভাবেই হউক প্রাণ ও মন অবতরণ করিয়া গুপ্তভাবে সুপ্তভাবে লুক্কায়িত না থাকে তবে জড় হইতে জীবনের বিকাশ সম্ভব হয় না। পাথরের ভিতর তৈল না থাকায় উহা নিষ্পেষিত হইলেও তৈল বাহির হয় না, পক্ষান্তরে তিল হইতে তৈল বাহির হয়। সেইরূপ প্রাণ ও মন জড়ের মধ্যে নিহিত থাকায় তাহার বিকাশ ঘটিতেছে। এবম্প্রকারে, মনের মধ্যে অতিমানস নিহিত আছে যাহা বিকাশলাভ করিতে উন্মুখ। প্রকৃতিমাতা সেই মহান বিকাশের জন্য সদা সচেষ্ট। কেননা প্রকৃতির বিবর্ত্তন ক্রিয়া বর্ত্তমান যুগে পদার্পণ করিয়া হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে এরূপ ধারণার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নাই। এই অতিমানস সত্তাও একদিন মানবের মধ্যে বিকাশলাভ করিবে।

অতিমানস, চেতনারই উচ্চতম স্তর, যাহা মানুষ স্পর্শ করিয়াছে। বেদে এই চৈতন্য ভূমিকে ঋতচিৎ বলিয়া লক্ষিত করা হইয়াছে। মনকে বলা যাইতে পারে একটি ক্ষুদ্র নদী; অতিমানস তাহারই পশ্চাতে একটি বিরাট চিদ্‌সমুদ্র যাহার অস্তিত্ব এই ক্ষুদ্র নদীটি জানে না অথচ ইহা সেই মহানসমুদ্রেরই একটি তরঙ্গ। মানসিক বৃত্তির দিক হইতে দেখিলে বলা যায়, মন সর্ব্বদাই কাটিয়া ছাঁটিয়া পৃথক করিয়া বিভক্ত করিয়া দেখিতেছে এবং যে আংশিক সত্য দেখিতেছে তাহাকেই স্বয়ংপূর্ণ বলিয়া কল্পনা করিতেছে। সত্য তাহার সহজাত সম্পদ নয়। তাহাকে আধ-আলো আধ-অন্ধকারে হোঁচট খাইতে খাইতে সত্যানুসন্ধানে ফিরিতে হয়। অতিমানসে সত্য হইতেছে সহজাত সম্পদ।

ভাষান্তর করিয়া বলিলে বলা যায়—প্রকৃতি মাতার তিনটি সন্তান। একটি জড় ( আপাতঃ দৃষ্টে ) দ্বিতীয়টি জীবনস্পন্দযুক্ত এবং তৃতীয়টি মননশীল। বিশ্ব প্রসবিনী আরও একটি সন্তান প্রসব করিবেন যাহাকে বলা যাইতে পারে অতিমানব ( Superman )। বলা বাহুল্য ইহা নীট্‌শে বা কার্লাইল কল্পিত Superman নয়। এবং এই মানবের মধ্যেই অতিমানব জন্মলাভ করিবে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবান্বিত মন হয়ত



সন্দেহসঙ্কুল ভাব সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু কোন সন্দেহেরই অবকাশ থাকিবে না যদি বিজ্ঞান যথোচিতভাবে জড়াতীত সত্তার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এবং সত্যনির্ণয়ের প্রচলিত মানদণ্ড ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকে। ইহা সত্যদ্রষ্টা ঋষির বাক্য, শুধু কবি মনের কল্পনা বিলাস নহে।

শ্রীঅরবিন্দ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি বুঝাইয়াছেন। যদি ধরা যায়—বানর হইতেই মানুষের উদ্ভব হইয়াছে, তবে সেদিন বানরের পক্ষে যেরূপ কল্পনা করা অসম্ভব ছিল যে এই পৃথিবীতে এমন একটি জীব জন্মলাভ করিবে যে আকাশে উড়িবে, সমুদ্রতলে চলিবে, ছয়মাসের পথ ছত্রিশ ঘণ্টায় অতিক্রম করিবে, একটি কেন্দ্র হইতে সমগ্র পৃথিবীতে সংবাদ আদান-প্রদান করিবে, গগনস্পর্শী হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করিবে, কবিতা লিখিবে, ছবি আঁকিবে, সাহিত্য রচনা করিবে, নিয়মকানুন প্রবর্ত্তন করিবে এবং সেই জীব তাহারই মধ্য হইতেই উদ্ভূত হইবে। সেইরূপ আজ আমাদের পক্ষেও কল্পনা করা সম্ভব হইতেছেনা যে আমাদের মধ্য হইতেই অতিমানব আবির্ভূত হইবে।

আজ পর্য্যন্ত মানুষ তাহার স্বীয় বিবর্ত্তনে কোন সজ্ঞান অংশ গ্রহণ করেন নাই। কোন অনাদি কাল হইতে প্রকৃতি মাতা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সোপানের পর সোপান তরঙ্গ অতিক্রম করিতে করিতে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে এবং এখনও মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিরাট সম্ভাবনার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে এবং যাইবেও। মানুষ যদি এই মহাশক্তির আনুগত্য স্বীকার করিয়া স্বীয় বিবর্ত্তনে ব্রতী হয় তবে সেই সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হইতে পারে। মানুষ সহযোগিতা না করিলেও সেই সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবী। সহযোগিতা না করিয়াও তাহার উপায় নাই। কেননা প্রকৃতি মাতা তাঁহার মহানব্রত উদ্‌যাপন করিতে বদ্ধপরিকর। শ্রীঅরবিন্দের শেষ বাণী: "The Supramental is a fact and its advent in the nature of things inevitable."

তাই শ্রীঅরবিন্দ সমগ্র মানবজাতিকে যোগপথে আহ্বান করিয়াছেন। তাঁহার উপদিষ্ট পূর্ণযোগ সহজ সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্ম প্রস্ফুরণ। কর্ম্ম যাহার ভিত্তি। ব্যাকুলতা ও আহ্বান যাহার কৌশল, অস্মিতাত্যাগ যাহার সাধন; সত্য শিব সুন্দরের আস্পৃহা যাহার সংযম। কর্ম্ম হইতে একটি স্রোত প্রবাহিত হইয়া জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় অপর একটি স্রোত হৃদয়কে ভক্তিরসে আপ্লুত করে। কর্ম্ম হইতে যে জ্ঞান জন্মায় তাহাকে যোগশাস্ত্রে বিবেক খ্যাতি বলে। অর্থাৎ প্রকৃতি ক্রিয়াশীলা ও পুরুষ অকর্ত্তা—ইহা উপলব্ধি হয়। অনেক সাম্প্রদায়িক যোগের এখানেই সমাপ্তি। গীতা চৈতন্য সত্তার আরও গভীরতর প্রদেশ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বোপলব্ধির পশ্চাতে ঈশ্বরশক্তির ( Power & Presence ) উপলব্ধি লক্ষিত করিয়াছে। ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। সর্বতোভাবে তাঁহারই

শরণ লইতে উপদেশ দিয়াছেন—তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। (গীতা ১৮।৬২) এবং সর্ব্বশেষ প্রাকৃত ধর্ম্ম (পাশবিক ও মানবিক) অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তমের শরণ লইতে বলিয়াছেন। মামেকং শরণং ব্রজ। (গীতা ১৮।৬৬।) গীতা এখানেই আনন্দময়ের সালোক্য বাকী জীবনটুকু যাপনের জন্য সাধককে ছাড়িয়া দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ চেতনভূমির আরও গভীরতর বা উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। এবং এখানেই তাঁহার কথিত পূর্ণযোগের গীতা ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িক যোগের পার্থক্য। এখানে তিনি যে কিরূপ শ্রেষ্ঠ যোগী তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। সাধকের পক্ষে আরও যেটুকু বাকী থাকে তাহা শ্রীঅরবিন্দ স্বয়ং তাঁহার নিজস্ব অতুলনীয় ভাষায় যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"This is indeed as far as many Great Yogis have reached on the levels of spiritualised mind ; but it had not to be so always for there is a greater supramental possibility. It is possible to rise beyond spiritualised mind and to act spontaneously in the living presence of the original divine Truth-force of the Supreme Mother. Our motion one with her motion and merged in it, our will one with her will, our energy absolved in her energy, we shall feel her working through us as the Divine manifest in a supreme Wisdom Power and we shall be aware of the transformed mind life and body only as the channels of a supreme Light and Force beyond them, infallible in its steps because transcendent and total in its knowledge. Of this Light and Force we shall not only be the recipients, channels, instruments but become a part of it in a supreme uplifted abiding experience." *The synthesis of Yoga. p. 242.*

দেবতার ঘুম ভাঙেনি তখন সেই প্রহর।
ঘটনার পথে শর্ব্বরী-মন বিছায় ভয়
তার অনন্ত-কাল-মণ্ডপ নিষ্প্রদীপ
নীরবের গায় শর্ব্বরী-কায় এলিয়ে রয় ॥ —শ্রীসাবিত্রী অরবিন্দ

# বিবাহিতা স্ত্রী

## প্রতিভা বসু

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

এই কলঙ্কিত দিনরাত্রির দাগ লেগে লেগেই সময়ের চাকা ঘুরতে লাগলো আপন বেগে। অভ্যর্থনাহীন, নিরুৎসুক, নিরানন্দ, কতগুলো ক্লান্তি-কাতর দিনের সমষ্টি। একদিন আরেকদিনের পুনরাবৃত্তি। এরি মধ্যে গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায় বুকে হামা দিয়ে দু' বছরের পাতা খসলো জীবন থেকে। মোমের মত পুড়ে পুড়ে ক্ষয় হ'লো। ধীরে ধীরে তিল তিল ক'রে। এই সময়ের ফাঁকটুকুতে বি. টি. পাশ করলো শকুন্তলা, হিরণ্ময়ী আরো বুড়ো হ'লেন, প্রায় বুড়ি। সীমন্ত আই. এ. ফেল ক'রে দিদির কাছে পালিয়ে গেল।

আর প্রমীলার আরো স্থিতি হ'লো সংসারে। সে গিন্নী হ'য়ে আরো মোটা হ'লো, আরো ফর্সা হ'লো। থানা, পুলিশ, আইন, আদালত, সুনির্মল, সব কিছুর সাহায্য ছাড়াই কোমরে আঁচল জড়িয়ে, হাত নেড়ে, মুখ নেড়ে, শরীরের উর্দ্ধাঙ্গ নাচিয়ে, চিৎকারে আর্ত্তনাদে একদিন গিয়ে তাদের দমদমের বাড়িতে গিয়ে যজ্ঞেশ্বরের কাপড় টেনে ধরে ভিড় জমিয়ে ফেল্‌লো, তারপর ভদ্রতা-সভ্যতা, লজ্জা-সরম-সম্ভ্রমের গলায় দড়ি দিয়ে আদায় ক'রে নিয়ে এলো আপন পাওনা গণ্ডা।

তাদের বাপের মেয়ের ঝগড়া দেখতে সমস্ত দমদম ভেঙে পড়লো সদরে, অন্দরে হাত মুঠো ক'রে, চোখ বুজে মূর্ছা গেলেন সুধাময়ী।

এরপরে আশ্বিন এলো পূজোর গন্ধ নিয়ে। ঘোড়ার কেশরের মতো ফোলা ফোলা পাল তোলা শরতের সাদা মেঘের শিশুরা দাপাদাপি করতে লাগলো সারা আকাশ ভ'রে। ইশকুল কলেজ ছুটি হ'লো, ছুটির সুখ নামলো সব মানুষের মনে। শকুন্তলারও চিঠি এলো সে আসছে।

এই তো একটু আশা। সবকিছুর শেষে এই তো একটুখানি বেঁচে থাকার চকিত অবলম্বন। জীবনের কাছে এক ফোঁটা আশ্বাস, একবিন্দু ছায়া। স্বর্গ। এই অন্তহীন, নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে দিনের উপর পাতলা একটু সুখের আবরণ। সুনির্মল স্টেশনে ছুটলো।

সকাল থেকেই সেদিন ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি ছিলো। দুপুর হ'তে হ'তে ঝরো ঝরো হ'লো। স্টেশনে আসতে আসতে একেবারে বেড়াল-ভেজা হ'য়ে গেল সে।

ট্রেন থেকে নেমে তার দিকে তাকিয়ে শকুন্তলা প্রায় আঁৎকে উঠ্‌লো 'ঈস্‌। এতো ভিজেছ ?'

'বাইরে অসম্ভব বৃষ্টি।'

'এমন ঝড় জলের মধ্যে না হয় না-ই আসতে। কী আশ্চর্য !'

'একথাটা যে তুমি ভাবতে পারলে সেটা আরো আশ্চর্য।'

'কেন, আমি কি ওয়াই. ডব্লিউ. সি'এর পথ চিনি না ? ওটুকু রাস্তা যেতে পারতুম না একা ?'

'নিশ্চয়ই পারতে ? কিন্তু আমি কি তোমাকে শুধু পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই এসেছি ?'

নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নিচু ক'রে একটু চুপ রইলো শকুন্তলা।

'কিন্তু এরকম ভেজা জামা কাপড়ে থাকলে তোমার অসুখ করবে না ?'

'চল, চা খাই গিয়ে কোথাও বসে। শরীর গরম হবে, শুকিয়ে যাবো।'

'চায়ের গরমে তোমার এই ভেজা তাতবে ?' মৃদু হাসলো কুন্তী, 'এসব কাপড় জামা ছাড়তে হবে তোমাকে।'

'তাতো একসময়ে ছাড়বোই। তবে যতক্ষণে ছাড়বো ততক্ষণে দু'বার শুকনো হবার অবকাশ পাবো।'

'গায়ে ভিজে বসে অসুখ করবে।'

'ভালোই হবে, তুমি সেবা করবে !'

'তবে তার রিহার্সেলটা এই মুহূর্ত্তেই হ'য়ে যাক্‌না।' এক ফোঁটা হাসলো, 'আসল নাটক পর্যন্ত পৌঁছুবো এমন ভাগ্য ক'রে তো আসিনি সংসারে।'

'কুন্তী—'

'চল, রিফ্রেসমেণ্টরুম নিইগে একটা, তারপর ধীরে আস্তে—'

'ঘর ভাড়া দেয়, কিন্তু সেখানে শুকনো কাপড় ভাড়া দেয় বলে তো শুনিনি।'

'সে আমি দেখবো, এই জল-টুপটুপ মানুষ নিয়ে আর আমি দাঁড়াতে পারছিনে।' ব্যস্ত পায়ে কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হ'লো সে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে আসতেই একটা ঝাপটা লাগলো বাতাসের, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা। দূর দিগন্ত পর্যন্ত গঙ্গার বুকে সেই কোটি কোটি ফোঁটার আলোড়ন। পৃথিবী ঝাপসা।

হাতে আগাম টাকা এবং কিঞ্চিৎ ঘুষ নিয়ে দরজা খুলে দিল গাউন-পরা কালোরংয়ের



খৃষ্টান মাদ্রাজি মেম। ঈষৎ হাস্য বিনিময় ক'রে, ধন্যবাদ জানিয়ে কুন্তী তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে এলো। ক্ষিপ্রহাতে খুলে ফেললো স্যুটকেসটা। দু'খানা যথাসম্ভব ছোট পাড়ের শাড়ি বার করলো তাড়াতাড়ি, বার করলো তোয়ালে, আয়না চিরুণী। সুনির্মলের দিকে তাকিয়ে বললো 'নাও, ছেড়ে নাও শীগ্‌গির, আমি চায়ের কথা বলে আসি।'

'তুমি কি পাগল ? আমি এই শাড়ি পরবো ?'

কেন, কী হ'য়েছে ?'

'মেয়েদের শাড়ি ?'

এবার প্রায় ধমক দিল কুন্তী, 'যা বলছি তাই কর তো, নাও ধরো'—গুঁজে দিল শাড়ি দু'খানা, 'একটা পরো, একটা চাদর ক'রে গায়ে দাও। তোয়ালে নাও, ভালো ক'রে মুছে নিও মাথাটা।'

সুনির্মল অবাক চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, মনে হ'লো—কবেকার কোন অতীত থেকে হিরণ্ময়ী যেন কথা ক'য়ে উঠ্‌লেন শকুন্তলার মধ্যে।

নিঃশব্দে তার বুকের তলায় এসে দাঁড়ালো শকুন্তলা, আস্তে খুলে দিল সার্টের বোতাম কটা, ভেজা গেঞ্জিতে হাতের উল্টোপিটটা দু'বার বুলিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পরেও অনেকক্ষণ তেমনি ক'রেই সুনির্মল দাঁড়িয়ে রইলো ঘরের মধ্যিখানে। বুকের ভেতরটা কেমন করতে লাগলো। মনে করতে পারলোনা এই সুদীর্ঘ পাঁচবছরের মধ্যে আর কবে কুন্তী এমন ক'রে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্বন্ধ তাদের যতই ঘনিষ্ঠ হোক্‌ এমন নিকট সান্নিধ্য তাদের এই প্রথম।

যতক্ষণে আবার ঘরে ফিরে এলো শকুন্তলা ততক্ষণে কাপড় ছাড়লো সুনির্মল। কুন্তীর কথামতই একখানা পরলো, আরেকখানা চাদর ক'রে গায়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর হ'লো। আয়না দিয়ে মুখ দেখে মাথা আঁচড়ালো পরিপাটি ক'রে, তোয়ালে দিয়ে হাত পা মুছে বাবু হ'য়ে উঠে বসলো খাটের উপর। শকুন্তলা ঘরে এসে চোখে চোখে তাকিয়ে মৃদু হেসে ভেজা কাপড় শুকুতে দিলো এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। মুহূর্ত্তে তৈরী হ'য়ে গেল দু'জন মানুষের ছোট্ট সংসারের আদিম সুখ। ধবধবে ঢাকনা দে'য়া ট্রে ভর্তি চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এলো বয়. নিবিড় হয়ে বসলো দু'জন।

মখমলের মত নরম, পাখির পালকের মতো হালকা, গুণগুণ গানের মত অনায়াস একটি বৃষ্টি-স্নিগ্ধ সজল সুন্দর মধুর বেলা বয়ে গেল স্রোতের মত, আজকের সুখ বুকের মধ্যে লেখা হ'য়ে থাকলো সোনার অক্ষরে, আজকের পরিতৃপ্তির তুলনা রইলোনা কোনো।

বৃষ্টি থামলো সন্ধ্যায় সন্ধ্যায়।

পথে আসতে আসতে আলোজ্বলা সহরের দিকে তাকিয়ে সহসা আবার বিধুর হ'য়ে উঠ্‌লো দু'জনের মন।

'সব ছুটিটাই কিন্তু এখানে কাটাতে হবে।' সুনির্মল আবছা আলোয় শকুন্তলার মুখের দিকে তাকালো। শকুন্তলাও মুখ ঘোরালো রাস্তা থেকে, 'মেদিনীপুর যাবোনা?'

'যাবেনা কেন, এখন নয়, শেষের দিকে।'

'এবার ছুটির আর আমার শেষ নেই!'

'মানে?'

'আমি চাকরী ছেড়ে দিয়েছি।'

'চাকরি ছেড়ে দিয়েছ হঠাৎ?' একটু খুসী খুসী গলায়, 'কিঞ্চিৎ সুবুদ্ধি হ'য়েছে তাহ'লে? ভালোই হ'লো, এবার এখানে ভর্তি হ'য়ে এম, এ,টা—'

'বিদেশ যাবো।' শকুন্তলার গলা ছলোছলো।

'বিদেশ!'

'হঠাৎ একটা স্কলারসীপ পেয়ে গেলাম।'

'কী।' সুনির্মলের বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটলো।

'বলতে গেলে দাদাই যোগাড় ক'রে দিলেন সব, টিচার্স ট্রেণিংয়ের জন্য ছ' জন মেয়ে বি. টি.—"

'ও'

'ভাবিনি—হ'য়ে যাবে।'

'হুঁ'

'দাদা বলছিলেন এ সুযোগটা ছাড়া উচিৎ হবেনা—'

'তাইতো।'

একটু সময় তাকিয়ে চুপ করে রইল শকুন্তলা। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসকে নিষ্পেষিত করলো চেষ্টা ক'রে; তারপর ব্যথিত গলায় বললো, 'তুমি কি আমার উপর রাগ করছো সেজন্য?'

'না, রাগ কেন। রাগ কেন করবো, গলা পরিস্কার ক'রে নিল কেসে, 'ভালোই তো।'

'তুমিই বল এ ছাড়া আমার আর বাঁচবার অন্য কি গতি ছিলো?'

'বাঁচবার?'

'শুধু আমার নয়, তোমারো।'

'আমারো'



'হ্যাঁ। তোমারো সুনির্ম্মল, তোমারও। আমার দূরে যাওয়াই ভালো, আমার সান্নিধ্যে তোমার কেবল দুঃখই বাড়ছে। আমি মাঝখানে না থাকলে হয়তো তোমার পারিবারিক জীবন এরচেয়ে সহনীয় হবে।'

আধো আলো আধো অন্ধকার ট্যাক্সির ভেতরে সুনির্মলের চোখ পাথরের মতো নিস্তব্ধ হ'লো শকুন্তলার মুখের উপরে, জলের স্বচ্ছতায় হিরের মত জ্বলতে লাগলো সেই দৃষ্টি। সইতে পারলো না শকুন্তলা। তার সমস্ত সংযম উত্তাল হ'য়ে উঠ্‌লো সে চোখে চোখ রেখে, নিজের হাতের মুঠোয় যেন কুড়িয়ে নিল সুনির্মলের দু'টি হাত, ব্যাকুল গলায় বললো, 'আমাকে ক্ষমা করো তুমি ক্ষমা করো, আমি আর সইতে পারছিনে এ জীবন। না, না, না সুনির্মল এটুকুতে আমার ক্ষুধা মিট্‌ছেনা, আমি চাই, আরো চাই, আরো আরো। আমি সম্পূর্ণ ক'রে তোমাকে পেতে চাই।'

'কুন্তী'—কেঁদে উঠলো সুনির্মলের গলা। কাঁদলো কুন্তীও, 'আমিতো একটা মানুষই, মানুষের মতোই আমার বাসনা কামনা। এই ভালোবাসার পবিত্র বেদিতে দেবী হ'য়ে বসে থেকে আর আমার মন ভরে না, প্রাণ ভরেনা। পার্থিব ইচ্ছে প্রচণ্ড হ'য়ে আমাকে ছিঁড়ে খায়। আমি আর পারিনে, পারিনে।' বাতাসের হিল্লোলের মতো শকুন্তলার সারা শরীরে কান্নার ঢেউ গড়িয়ে গেল। 'ঐ ছোট্ট সহরটুকুতে, তার চেয়ে ছোটো এই মাষ্টারির জীবন তা-ও আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। ওখানকার লোকেরা আমাকে নিয়ে বলাবলি করে, আঙ্গুল দিয়ে দেখায়। এমন কি স্কুলের মেয়েরা পর্যন্ত তোমার আমার নাম জড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে। সবাই জানে তুমি একজন বিবাহিত ভদ্রলোক, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ অবৈধ, অন্যায়, ঘৃণিত।'

শকুন্তলার চোখের জলে সারা পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল সুনির্মলের কাছে। তার নিচু করা কেঁপে কেঁপে ওঠা কালো চুলে ভরা মাথার উপর একখানা হাত রেখে সে বসে রইলো স্তব্ধ হ'য়ে!

এর পরের দিনগুলোর কোন বর্ণনা নেই। বোবা, বিস্বাদ। যেমন দ্রুত তেমন দীর্ঘ। যেন লয়হীন গানের মতো কাণ্ডারীহীন নৌকোর মতো এলোমেলো। তিক্ত, অবসন্ন শিথিল। কেবল কতগুলো বুক চাপা মুহূর্ত্তের ভার।

এর সঙ্গে দেখা করা, তার সঙ্গে কথা বলা। এখান থেকে সেখানে, সেখান থেকে সেখানে। পাসপোর্ট, ভিসা, ডলার, পাউণ্ড। মেদিনীপুর, বিনু, সুনন্দ, কান্নাকাটি। দুরন্ত কোলাহলময় অস্তিত্বের ছেঁড়া ছেঁড়া, সরে সরে যাওয়া, কতকগুলি ছায়া ছবি।

আর অবসর সময়ে প্রকাণ্ড গড়ের মাঠের কোনো এক নির্জন গাছের ছায়ায় দু'টি ব্যথিত বিষন্ন ব্যর্থ হৃদয়ের স্বাক্ষর, দু'টি অবনত, অতৃপ্ত আসন্ন বিচ্ছেদকাতর হতভাগ্য মানুষ।

এই ক'রে ক'রে চক্ষের পলকে কেমন ক'রে, কোথা দিয়ে যে পাঁচটা সপ্তাহ কেটে গেল বোঝাই গেলো না। তারপর একদিন সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশনে কুন্তীকে বিদায় দিতে এলো সুনির্মল। লাবণ্যে ঢলোঢলো, দীঘির মত শান্ত স্নিগ্ধ মধুর বিধুর কালো মেয়েটিকে। তার আত্মাকে। যার বাঁ হাতের আঙুলে মস্ত একফোঁটা চোখের জলের মতো ঝলসিত হিরের দ্যুতি। আজ সকালেই এই আংটিটি সুনির্মল পরিয়ে দিয়েছে তার হাতে। ঐ নিটোল গোল গণ্ডিটির মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ ক'রে দিয়েছে নিজেকে চিরকালের মতো।

গাড়িতে উঠ্‌তে গিয়ে সুনির্মলের হাত দু'টিতে নিজের মুখ ঢেকে দাদার সামনেই ফুঁপিয়ে উঠ্‌লো কুন্তী, আর শূন্য চোখে, অর্থহীন দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো সুনির্মল। কী যে দেখলো, কী দেখলো না, কী ভাবলো আর কী যে ভাবলোনা নিজেও বুঝলোনা কিছু।

সুনন্দ সঙ্গে যাচ্ছে বম্বে পর্যন্ত। সেখানে বোনকে জাহাজে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে। গাড়ি ছাড়ার শেষ মুহূর্ত্তে সুনির্মলের পিঠের উপর হাত রাখলো সে, নরম গলায় বললো, 'তবে চলি। আপনি শক্ত হোন, সুনির্মলবাবু, যা হ'লো না হবে না তাতো মেনে নিতেই হবে! ওর কথা ভাবুন। একটা ভবিষ্যত আছে তো? এখানে থেকে, এভাবে জীবন কাটিয়ে—'

ট্রেণের ঘরঘর চাকার তলায় কথা গুড়িয়ে গেল।

কেমন বোকার মতো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো সুনির্মল। অনেক, অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ট্রেণ মিলিয়ে গেল, ট্রেণের শব্দ মিলিয়ে গেল, লোকজন বিরল হ'লো, তবু দাঁড়িয়ে রইলো সে। কখন যে রাত বাড়লো একটু একটু ক'রে, কখন যে হিম বাড়লো, আর কখন যে রাত্রির ভাঁজে ভাঁজে একটু একটু ক'রে ছড়িয়ে পড়লো হেমন্তের ঠাণ্ডা স্পর্শ কিছুই টের পেলোনা।

সেই প্ল্যাটফর্মে আরো কি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল, আবার কি কেউ চলে গিয়েছিল কাউকে ছেড়ে? দেহের আবরণ থেকে আবার কি কারো আত্মা ফাঁকি দিয়েছিলো কাউকে! কিচ্ছু জানতে পারলো না। কেবল একটা সুনিবিড় শূন্যতার সুতীব্র মোচড়ে বুকের ভেতরকার সমস্ত অন্ত্রী-তন্ত্রী যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে গেল।

এরপরে হিরণ্ময়ী গেলেন। শরৎ কাটিয়ে, হেমন্ত কাটিয়ে কোন এক শীতের শেষরাতে প্রায় নিঃশব্দে তাঁর দুঃখদীর্ণ ভাঙা শরীর থেকে তাঁর লাঞ্ছিত অবমানিত পরমাত্মাটি এই সংসার থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলো।



এত চুপে চুপে গেলেন যে প্রায় টের পাওয়া গেল না, ভাইবোনদের খবর দিতে পারলো না সুনির্মল, মৃত মুখের দিকে শুকনো চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময়ে মনে মনে চিৎকার ক'রে উঠ্‌লো, কান্না দাও কান্না দাও।

সবাই গেল! সবাই পালিয়ে বাঁচলো! কেবল সে-ই পড়ে রইলো তার স্বামীত্বের ভাঙা ইচ্ছা নিয়ে, ফুটো নৌকোর জল সেচন করতে। তাইতো। সে যাবে কোথায়? তার তো ভবিষ্যৎ নেই। সে তো কবেই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে গেছে, পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন অন্ধকারের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে। সেখানে পথ নেই, পথ নেই। হাজার মাথা খুঁড়লেও কি সেই আলোহীন হাওয়াহীন, আকাশহীন, মাটিহীন, নিঃশ্বাসরোধী মহাশূন্য থেকে আর একছিঁটে সূর্য পাবে সুনির্মল? তবে এই নিশ্ছিদ্র অন্ধকারই তার নিয়তি। তার অদৃষ্ট।

নিয়তি। অদৃষ্ট! এই তার নিয়তি? এই তার অদৃষ্ট। শূন্য মনে, শূন্য সহরে, শূন্য সহরের ততোধিক শূন্য রাস্তায় রাস্তায় কত ঘুরে বেড়ালো সুনির্মল। কত হোঁচট খেলো, কত রক্তপাত হ'লো, অবসন্নতায় ভেঙে এলো শরীর, তারপর একদিন ফিরতেই হ'লো ঘরে। ফিরতেই হ'লো। নতজানু হ'য়ে নিজেকে সমর্পণ করতেই হ'লো অদৃষ্টের কাছে।

মনে মনে বলতে হ'লো, হে আমার নিয়তি! তবে তুমিই নাও আমাকে এই হারমানা, পোড় খাওয়া, ভাঙাচোরা অসহায় মানুষকে। এই ভাগ্যহত আমিকে। আমি এখন তোমার। তোমার। সম্পূর্ণ তোমার।

এরপরে আর একটু আছে।

প্রমীলা বাড়ী করলো একটি। তার নিজস্ব জমানো টাকা দিয়ে। কলকাতা সহরের উপর ছিমছাম সুন্দর দোতলা বাড়ি। সুনির্মল হাঁটলো খাটলো, নিঃশব্দে স্ত্রীর আঁচলে আপন কোঁচার খুঁট বেঁধে গৃহ-প্রবেশ করলো লোকজন সাক্ষী ক'রে। তারপর অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি লিফটও হ'লো তার আপিসে। প্রমীলার মুঠো আরো ভরলো।

তার আর দুঃখ কী!

সবাই ঈর্ষা করলো তার ভাগ্যকে, তার লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রীর পয়কে। আর সুনির্মল তার ভাগ্যের কাছে অঞ্জলি পেতে অপেক্ষা ক'রে রইলো এই প্রার্থনা নিয়ে যেদিন আর সকাল ছ'টায় বেরিয়ে গিয়ে রাত দশটায় ফিরে আসতে হবে না বাড়িতে, ফিরে এসে জালি ঢাকা ঠাণ্ডা খাবার খেয়ে, বিছানায় শুয়ে নিঘুম চোখে এ-পাশ ও-পাশ ক'রে রাত কাটাতে হবে না নিতান্তই আয়ু ফুরোয়না বলে।

সমাপ্ত

# স্ত্রীর পত্র নয়

## সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সুপ্রিয়েষু

চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হয়ে যাবে জানি। অবাক আমিও কিছু কম নই আজকাল। তা-ই যদি না হব তাহলে ত আরো কতোই চিঠি পেতে এর আগে। আর কেউ না জানুক, তুমি ত জানতে, চিঠি লেখার কী দুরন্ত অভ্যাস ছিল আমার।

তবে এ-চিঠিতে আগেকার সে দুরন্ত মেয়েটিকে আর পাচ্ছো না—সে ভর্সা তোমায় দিয়ে রাখছি। এক বছর আগে-ও যদি চিঠি পেতে তাহলে তোমার চেনা দুরন্তপনা দু'একটি ছত্র থেকে মনে তুলে নিয়ে হয়ত খুশী হতে পারতে। দুরন্ততা দেখাবার শক্তি আর আমার দেহে-মনে নেই। এ আমার অভিশাপ কি আশীর্ব্বাদ তা বিচার করবার ভার তোমার উপরই রইল। চিঠিটা যদি আগাগোড়া পড়ো—তাহলে নিশ্চয়ই সে-বিচার করতে পারবে। (রাগ করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলো না, পড়ো)।

আমায় দুরন্ত দেখেই তুমি একদিন খুশী হয়েছিলে। সে-দিনটিই আমার জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় দিন। কবিরা যে বলেন মানুষের জীবনে-ও নাকি বসন্ত আসে—তা যে কী ব্যাপার ঠিক জানিনে। তবে এমন কোনো দিনকে যদি তারা বসন্তে রঙীন বলে মনে করেন ত আমি বলব তাঁরা ভুল বলেন না। ভাবতে পারো—একটি মেয়ে তার চব্বিশ বছর বয়েসে বলছে, তার দুরন্ততা নেই—তার বসন্ত নেই! কথাটা সত্য—কেউ ভাবতে না পারলেও সত্য। এ-সত্যটুকু জেনে নিয়ে আশা করি তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারবে—সত্যি-সত্যি দয়া করবে।

দয়ারই ভিখিরি আজ আমি। যে মানুষ দয়াপ্রার্থী তার অভিমান থাকতে নেই। কাজেই আমি আর আগেকার সেই অভিমানী মেয়েটিও নই। দৃশ্যান্তর! নাটকের নায়িকা যেমন দৃশ্যান্তরে আরেকটি মেয়ে সেজে যায় তেম্নি আমি আজ। তবে নায়িকার সুবিধে এই, সাজ ফেলে সে আসল মানুষ বরাবরই, কিন্তু আমি আর হয়ত আসল মানুষ হতে পারব না। আরেক দৃশ্যে যেতে পারি কিন্তু এমন দৃশ্য ফিরে আসবে না যখন সোমিতাকে দেখে সবাই ভাবত, সে সুপ্রিয়ের জন্যেই তৈরী। তোমায় অনুরোধ করছি সুপ্রিয়, এ-কথাটায় আমায় দুরন্ত ভেবে বসো না। খুবই সংযত, স্থির মন নিয়ে আমি নাটকীয় উপমা দিয়ে কথাগুলো লিখলাম। মন অস্থির হয়ে উঠলে আমি যে-দৃশ্যান্তরে চলে যাই তা জীবন-মৃত্যুর সাগর-সঙ্গমের মতো। হয়ত চিঠির শেষ দিকে বর্ণনা করতে হবে সে-দৃশ্য, এখনকার নাট্যকারদের মতো,



কিন্তু এখন তা নয়। এখন শুধু এটুকু জেনে রাখো—অস্থির মন নিয়ে চিঠি লিখবার শক্তি বা অবস্থা আমার থাকে না।

তুমি এখন কেমন আছো আমার জানা নেই। তার মানে, তুমি বিয়ে করেছ কিনা আমি সে-খবর রাখিনি এ তিনবছর। এর পর অবশ্য তোমার রাগ করা উচিত আর তার বশে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলা-ই স্বাভাবিক। কিন্তু আগেও অনুরোধ জানিয়েছি, এখনও বলছি, চিঠিটা সবটুকু পড়ে তারপর ইচ্ছে হয় ছিঁড়ে ফেলো।

বিয়ে করা-টা আমাদের কাছে যা, তোমাদের কাছে তেমনটা নয়, সুপ্রিয়। আমরা যেমন দেখতে তোমাদের চাইতে আলাদা, আমাদের কাজগুলো-ও আলাদা। তোমরা ভাবতেই পারো না কখন যে আমরা কি করে বসি। অবশ্য আমরা নিজেরাও তা আগে থেকে ভাবতে পারিনে। তোমাকে বিয়ে না করে যে আমি জনৈক চট্টোধ্যায়কে বিয়ে করব, এ-মতলব কি আমারও জানা ছিল? ভাবতে পারো, তোমাদের আমরা ঠকাই। কিন্তু এ-জুয়োখেলায় আমরা যে কতোখানি ঠকে যাই তা কি তোমাদের কেউ কোনোদিন ভেবে দেখেছে?

আমি ভেবে নিচ্ছি এখন তোমার মুখে সেই হিংস্র হাসিটা ফুটে উঠেছে যাতে তোমাকে সব চাইতে বেশি মানাতো। এই হিংস্র সুপ্রিয়ের মুখই সোমিতার মনে প্রিয়তম ছিল একদিন। মানো সে কথা? না মানলেও জানো নিশ্চয়ই। হিংস্রতাকে কে না ভালোবাসে? না ভালোবেসে কী সাধ্য আছে! কিন্তু তা-ই বোধহয় ভালোবাসার শেষ কথা নয়। ভালোবাসার শেষ কথা বলেছিলে—তুমিই বলেছিলে সেদিন, যেদিন শুনতে পেয়েছিলে জনৈক চট্টোপাধ্যায় আমায় বিয়ে করবে। মানে, সেদিন কিছুই তুমি বলোনি—চুপচাপ ছিলে—সব কথা ফুরিয়ে গিয়েছিলো। কথা ফুরিয়ে গেলে মানুষকে যেম্নি মরার মতো বিষণ্ণ দেখায় তেম্নি দেখাচ্ছিল তোমায়। তুমি জানতে না—কেউ জানত না—সেদিন তুমি চলে গেলে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে ক'ঘণ্টা কেঁদেছি। সময় ত ফিরে আসে না সাক্ষী দিতে—যদি আসত তাহলে হয়ত আমাদের এতো দুঃখ থাকত না।

আজকাল আমি সৌভাগ্যবতী। সময়কে ফিরে পাবার ঢের অবকাশ আমার। এই মস্ত বাড়িতে—অনেক লোকজনের মধ্যেও আমার ছুটি অফুরন্ত। সবাই আমায় ত্যাগ করেছে। ওরা জানে আমার থাকা না-থাকা সমান কথা। তোমাদের চট্টোপাধ্যায় নিতান্তই ভালোমানুষ বলে আমার শূন্যস্থান পূর্ণ করছেন না। আমি বলেছি তাঁকে—অনুরোধ জানিয়ে বলেছি, "তুমি বিয়ে করো—"

তিনি অস্বাভাবিক উঁচু হাসিতে রোগিণীর ঘরের পবিত্রতা নষ্ট করে বলেছেন: "আমি চট্টোপাধ্যায় বলে কি ভাবছ বিয়ে করা আমার পেশা?"

"না।" বলেছি আমি: "ঠাট্টা নয়। বিকারের ঘোরেও আমি তা বলছিনে—এখন

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। তাই বলছি—সবদিক ভেবেই বলছি, আমার দিকে তাকিয়ে নিজেকে দুঃখী করে রেখোনা সারাজীবন।"

"থাক্-থাক্"—তিনি উঠে যেতে-যেতে বলেছেন: "আমি ঘরে এলেই তুমি ইমোশ্যনাল হয়ে ওঠো—অসুখ মজা পেয়ে বসে!"

এ-সব কথা শুনে তোমার কী জানতে ইচ্ছে করছে, সুপ্রিয়? আমার কী রোগ জানতে চাও, না, জানতে চাও চট্টোপাধ্যায়ের উপর আমার মনোভাব? আমি ঠিক আন্দাজ করতে পারছিনে কোন্-টা শুনতে তোমার আগ্রহ হবে। তাই দুটো ব্যাপারই খোলাখুলি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাতেও মুস্কিল কি জানো, তোমরা কিছুতেই বিশ্বাস করো না আমরা যে খোলামেলা হতে পারি।

প্রথমত শোনো—বিশ্বাস করতেও পারো—আমার মনোভাব। চট্টোপাধ্যায়কে আমি ভালোবাসি। তোমাকে যেম্নি ভালোবাসতাম, এখন—এ একবছর ঠিক তেম্নি ভালোবাসছি তাঁকে। তার আগে তিনি আমার ভালোবাসা পাননি। তাঁর কোনো অপরাধ ছিল না—অপরাধ সবটুকু আমার।

আমার অপরাধই আমার রোগ। অন্তত তার কারণ। ভালো-না-বাসার অপরাধ যে রোগের কারণ হয় তা জানতে হলে ডাক্তারি শাস্ত্র পড়তে হয় না, সুপ্রিয়। আমার হাউস-ফিজিশিয়ন এসে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গল্প করে যান হাসি-খুশী মুখে। তাঁর হাসির আড়ালে আমি সন্দেহের স্পষ্ট বিদ্রূপ-ঝিলিক দেখতে পাই। আমি মেডিক্যাল-ম্যান নই—তবু আমার রোগের আমিই পাশ-করা ডাক্তার। রোগের বীজাণু ত বাইরে থেকে উড়ে আসেনি যে তাকে ধরতে হলে মাইক্রোস্কোপিক বিদ্যা চাই। তুমি-ও রোগটা ঠিক ধরতে পারবে—দুরন্ত হওয়াটাই ছিল রোগ। দুরন্ত হওয়ার লক্ষণও আমি ডাক্তারের মতোই বলতে পারি। তোমার কখন কী ভালো লাগবে তা যখন তুমি জানতে পারছ না তখনই দুরন্ত-রোগ তোমায় আক্রমণ করছে।

বিয়ের সম্মতি দিয়ে যাঁকে আমি বিয়ে করলাম, তাঁকে আমার ভালো লাগল না! এর চাইতে বড়ো ট্র্যাজেডি তোমাদের সেক্সপীয়র লিখলেও লিখতে পারেন কিন্তু এ-যুগে বুঝি এই সামান্যেরই আর তুলনা নেই। আমি যে তাঁকে ঘৃণা করছি তোমাদের চট্টোপাধ্যায় তা বুঝতেন। তিনি বুঝে-ও আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নি। হয়ত ভেবেছিলেন তাঁর ঘরের স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় এসব ভুয়ো রোগ সেরে যাবে। আগেকার দিনের স্বামী হলে কিন্তু তা ভাবতেন না—সত্যি তাঁরা বিশ্বাস করতেন এ-হোল ভূতে পাওয়া রোগ। হিষ্টিরিয়া বলে ডাক্তাররা ব্যাপারটাকে ধামা-চাপা দেন আজকাল। আমার হাউস-ফিজিশিয়ন আমার স্বামীকে সে-কথা বলেছিলেন কিনা জানিনে।



দ্বিতীয় বছরে আমার ঘৃণার ডিগ্রীটা কমে এলো। তবু নিজেকে আমি বন্দিনী সীতার মতোই ভাবতাম। ভাবতাম, জঠরে আমি যাঁর সন্তান লালন করছি তিনি আমার স্বামী হতে পারেন কিন্তু পরম শত্রু। এ-ভাবনা থেকে একটি মুহূর্ত্ত-ও মুক্ত ছিল না আমার মন। একটা বিষের পিণ্ডকে লালন করতে যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ছিল আমার শরীর। ঘৃণার ডিগ্রী চড়ে যাচ্ছিল তখুনি। ফলে দেহে-মনে বিদ্রোহের দহন বেড়েই চল্‌ছিল। মন একটা ফাঁকির কারখানা হতে পারে কিন্তু শরীর ত আকাশের মতো শূন্য নয় যে দাহ তাকে বিচলিত করবেনা। কাজেই ডাক্তার বা ধাত্রী না হয়েও তুমি বুঝতে পারবে আমার দেহের আর দেহস্থ ক্ষুদ্র শিশুটির অবস্থা। বুঝবে আমার মনকে। সুপ্রিয়, আমরা যাদের নগণ্য, ক্ষুদ্র ভাবি তা কিন্তু মোটেও নগণ্য নয়, হেলার বস্তু নয়। রোগ-বীজাণু অহরহ-ই আমাদের এ-চেতনা দিয়ে যায় কিন্তু অহরহই আমরা ভুলে যাই ক্ষুদ্রের শক্তির কথা, তার বিদ্রোহী সংহারক চেহারা। একদিন আমার দেহের জীবাণুটি বিদ্রোহী হল। মানুষের মাংসপিণ্ড মানুষীর অমানুষিকতা সহ্য করতে পারলে না। প্রতিশোধ নিতে চাইলে। হাউস-ফিজিসিয়ন এসে বলে গেলেন: খুব সম্ভব অ্যাক্লেমশিয়া। তার মানে জানো ত? শিয়রে যম দাঁড়িয়ে আমার দেহ 'অ্যাক্লেম' করছেন—আমি মৃত। বেঁচে গেলেও বাঁচার দলে নই।

মড়া মানুষ বেঁচে এসে বলতে পারে না. সে মরে গেলে জীবিতদের কেমন দেখতে পায়। আমি তা বলতে পারি। কারণ ডাক্তারি শাস্ত্র অনুসারে আমার বেঁচে থাকা ফ্রিক-অব-নেচ্যর এর মতন। বাঁচা আমার উচিত ছিলনা—বাঁচার দরকার ছিলনা তবু আমি বেঁচে আছি—কী দুরন্ত জয় আমার ভাবো ত! এ-জয়ের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতে পারি আমি এখন। এখন মনে হয়, আমি সব দ্বন্দ্বের, সব ঈর্ষার, সব চক্রান্তের অতীত। আমার দেহের যমদূতটির বিষাক্ত নিঃশ্বাসও আমার দেহকে পুড়িয়ে দিতে পারেনি—আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি। এ-বছর আমি তা-ই ভেবে চলেছি।

ভাবছি আর তোমায় মনে পড়ছে আমার। হাসপাতালে যখন শবের সামিল হয়ে ছিল শরীর—যখন দেখ্‌ছিলাম স্বামীর চোখে জল—তখন ভাবছিলাম ঠিক এম্নি করে আরেক জনও কাঁদতে পারত আজ, যদি সে খবর পেতো। ইতি ২৯ শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০ সাল

সোমিতা

# বিফল

## মীনা বন্দ্যোপাধ্যায়

"নারকেল গাছটা পথের মধ্যে কি করতে আছে বলো তো ?"

"কেন, ফল হয়ত হয়।"

"কই ফলের তো চিহ্নই নেই।"

"ফলই যখন হয় না, তখন এটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে পথচারীদের অসুবিধে ঘটাবার কি দরকার।"

"সরকারের এ'দিকে দৃষ্টিই নেই।"

"যা বলেছো।"

"এই তো সেদিন একটা একসিডেন্ট হোল।"

"তাই না কি ?"

"আর তাছাড়া লোকে তো অনবরতই আছাড় খাচ্ছে এর ওপর।"

"সত্যি, এটা যে কেন রাখা, কেটে ফেলে দেওয়াই উচিত।''

দুজন পথচারী যে নারকেল গাছটীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করছিল, তার ভেতর থেকে একটী ইঁদুর মুখ বের করে এদের দেখতে পেয়ে মাথা নেড়ে চলে গেল তার বাসস্থানে। ইঁদুরটী মাথা নেড়ে এদের সাদর সম্ভাষণ জানালো, না কি এদের মন্তব্য তার কাছে মোটেই সুশ্রাব্য হয়নি, তার জন্যে মাথা নেড়ে গেল, সেটা আর বোঝা গেল না : তার যে বাসস্থানের বিরুদ্ধে কথাগুলো বলা হোল, তাতে সে একটুও ভয় না পেয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে চলে গেল।

পথচারী দুজন যে যার নিজের পথে চলে গেল।

এপারে সাদা রঙের বিরাট বাড়ী। গাছটার সামনেই একটা ঘর, তাতে সবুজ পর্দ্দা লাগানো। গাছের পাতার সঙ্গে পর্দ্দার রং এক হয়ে মিশে গেছে।

অসহিষ্ণু একটী ছেলে ঘরে এসে পর্দ্দাটা সরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ বাইরের দিকে চেয়ে রইল, তারপর ফিরে এসে বোতাম টিপে বৈদ্যুতিক পাখা চালিয়ে দিলে। একটু পরেই তার মা ঘরে এসে অসহিষ্ণু ছেলেকে লক্ষ্য করে বল্লেন ঃ

"হ্যাঁরে তোর হয়েছে কি ?"

"কী গরম।"

"হ্যাঁ, গরম তো পড়েছে। কিন্তু পাখা তো খোলা।"



"ও হাওয়ায় আরাম হয় না। আর ঘরে হাওয়া আসবে কি করে, সামনেই একটা নারকেল গাছ।"

"কেন গাছ তো ভাল।"

"দূর, ও আবার ভাল কোথায়, একটাও তো ফল হয় না। তুলে ফেলে দিলেই তো হয়।"

জানালায় এসে মা আর ছেলে, দুজনেই গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। ফলের প্রত্যাশায়, কি গাছ উপড়ে ফেলার আশায়, তা' বোঝা গেল না। ইঁদুরটী বেরিয়ে তখন খাবারের চেষ্টায় ব্যস্ত।

আর গাছটার ঠিক ওধারেই রয়েছে একটা ছোট গোলাপী রঙের বাড়ী। সে গোলাপী রঙে আজ আর কারোর চোখে নেশা লাগেনা। সেই ধূসর গোলাপী রঙের বাড়ীটার ওপর সান্ধ্য আলোর রক্তিমাভা পড়ে তাকে যেন নিভন্ত পিদিমের শেষ-শিখায় এনে পৌঁছিয়েছে।

বাড়ীটার ভেতর সামনেই একটা উঠোন, বড্ড বেশী যেন খটখটে শুক্‌নো। আর তার ওপরে রয়েছে একটা কতো কালের তেভাঙ্গা বেঞ্চ। বসবার উপযোগী বলে মনে হয়না। শুধু একটী ছেলে তার খেয়াল-খুসি মাফিক বানিয়ে নিয়েছে যে, এটা বোধহয় তার রাজা-রাজড়ার ইজিচেয়ার। কালো, রোগা ডিগ্‌ডিগে, আর বড় বড় চোখ নিয়ে সে সারাদিন শুয়ে থাকে সেই বেঞ্চির ওপর। ওঠার কোন তাগিদ নেই। শুধু চেয়ে থাকে মাথার ওপর একটুকরো আকাশ, আর নারকেল গাছটার দিকে। পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে নারকেল গাছের মাথায়। আর দূর থেকে মনে হয় যেন একরাশ সোনা ছিটানো। ছেলেটীর মনে বোধহয় নেশার ঘোর লেগেছে।

হ্যাফপ্যান্ট পরনে, হাড় বের করা শুধু গায়ে, চুপচাপ শুয়ে আছে ওপর দিকে মুখ করে যেন কিসের প্রতীক্ষায়।

পরিশ্রান্ত মা এসে দাঁড়ালেন সামনে। "হ্যাঁরে কি দেখছিস্ শুয়ে শুয়ে ?''

"রোজই তো শুই।"

"তা' শুয়ে থাক্। আজ তোর জ্বরটা দেখি ! বড্ড বেশী বেড়েছে।"

"জ্বর তো রোজই বাড়ে।" ক্লান্ত কণ্ঠে ছেলেটি বলে, "মা দেখ, পাতার ফাঁকে কত সোনা ছিটানো।"

"তুই বুঝি রোজ ঐ নারকেল গাছটা দেখিস ? কিন্তু দেখিস কি, একটাও ত নারকেল নেই।"

"নাই বা থাকলো নারকেল, কি সুন্দর গাছটা। ঝড় এলে কেমন সুন্দর হেলে পড়ে, দুলতে থাকে।"

"ফলই যদি না হয় গাছে…"

"কেন মা, কি সুন্দর পাতাগুলো। ওর ওপরে সন্ধ্যের আলো পড়ে কেমন চিক্‌চিক্ করছে। ওরা যেন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকে। ওইখান দিয়ে স্বর্গে যাওয়া যায়, না মা?"

বিষণ্ণ কণ্ঠে মা জবাব দেন, "হ্যাঁ, যাওয়া যায়। কিন্তু কেন রে?"

"আমি যে যাব মা। আর ওই পাতার ওপর দিয়ে কত মেঘ জমেছে। ও গুলো হচ্ছে যাবার সিঁড়ি। ওর ওপর দিয়ে আমি চলে যাব ওই মেঘের দেশে। তারপর ওখানে আছে স্বর্গ, ওখান থেকে তোমাকে আমি হাতছানি নিয়ে ডেকে নেবো। হ্যাঁ মা কবে যাব?"

সজল চোখদুটো ছেলের মুখের ওপর ফেলে মা বলেন, "কেন যাবি রে? আমার কাছে থাকবি না?"

ছেলেটি পরিশ্রান্ত হয়ে বলে, "এখানে যে থাকতে ভাল লাগে না। তুমি যে একদিন বলেছিলে আমি স্বর্গে যাচ্ছি। সে কোথায় মা, কবে যাবে?"

রোদের আলো তখন মিলিয়ে গেছে। শুধু শেষ বেলাকার দিন এখনও একটু উঁকি দিচ্ছে, আর রাত্রের আঁচলে আস্তে আস্তে ঢাকা পড়ছে সমস্ত পৃথিবী। অজান্তে মায়ের হাত এসে পড়েছে ছেলের কপালে, আর এক চিলতে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে শুয়ে আছে ছেলেটি। বোধহয় স্বর্গে যাবার আশায়।

ইঁদুরটি তখনও সেই আদিম জৈবিক কর্মে ব্যস্ত।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা।

সারাদিনের জ্বরে পরিশ্রান্ত ছেলেটি বেঞ্চির ওপর এসে শুয়ে ওপর দিকে তাকাল। চিরপরিচিত সেই একটি নারকেল গাছ আর এক চিলতে আকাশ, কিন্তু সজল চোখ দুটো বারে বারে ঘুরিয়েও দেখতে পেল না গাছটিকে। বুঝতো পারলো, উপকারী লোকেরা আজ সারাদিন ধরে তাকে উপড়ে ফেলেছে।

ছেলেটি দেখলো, মাটি থেকে গোড়া তার উপড়ে আসছে। ব্যথিত চোখ দুটো তুলে তাকাল আকাশে, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো স্বর্গে যাবার সিঁড়ি দেখে। নাঃ, ও'গুলো বোধহয় চিরকাল থাকবে।

তবে ইঁদুরটিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

# সাহিত্য-গতি

## তারাপদ গংগোপাধ্যায়

এ কথা বহু শুনেছি, তারাশংকরের সাহিত্যিক মনের সাথে যদি বুদ্ধদেবের সাহিত্যশৈলী মিশতো বাংলা সাহিত্যের নতুন দিকদর্শন ঘটতো। যখন শুনেছি, তখনো ভেবেছি এখনো ভাবি, কথাটায় সত্য থাকলেও এটা নিছক মনগড়া কাল্পনিক ব্যাপার। টলষ্টয়ের সাহিত্য-দীক্ষার সাথে টুর্গেনিভের সাহিত্যশৈলী মিশলে আশ্চর্য সাহিত্য-সৃষ্টি ঘটতো। কিন্তু কথাটা হচ্ছে, টলষ্টয়কে হয়তো তখন টলষ্টয় হিসাবে না-ও পেতে পারতাম। রচনা-দীক্ষা যেখানে ভিন্ন, সেখানে মনও ভিন্ন। মনের পেছনে ঐতিহ্যগত প্রেরণাও আছে। যে অতীত আমার কাছে ছিলো, যে অতীতের ভিতর দিয়ে আমি এসেছি, সেই অতীতই আমায় তৈরী করেছে আর আমার বর্তমান আমি পেয়েছি। ঠিক এই হিসাবে তারাশংকর আর বুদ্ধদেবই ভিন্ন। একজন গ্রামের পটভূমিতে বর্ধিত আর একজন নাগরিক পরিবেষ্টনে উত্তাপিত। এই ঐতিহ্যকে ভিন্ন করা যায় না, এক একজনের ব্যাক্তিক সত্তায় তা তৈরী। আর এই সত্তার চিহ্ন দিয়ে একটা জীবনের চিহ্ন পাওয়া যায়, যে চিহ্ন গতির সহায়ক কিম্বা মৃত্যু সূচনা করতে পারে। সাহিত্যের এই যে ধারা, এই ধারা দিয়ে সমস্ত জীবনের পটভূমিকে বিচার বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। একটা দেশীয় রীতি কিম্বা নীতির, এমনকি সমস্ত সাংস্কৃতিক কালেরও।

এটা সত্য, বাংগালী সংস্কৃতি-জীবনের চিহ্ন যে ধারায় পূর্বে ছিলো এখন তা ভিন্নমুখী হোয়ে যেতে বসেছে এবং হোয়ে যাচ্ছে। পূর্বে, অন্ততঃ কিছুদিন আগেও, আমাদের গ্রাম বলে বস্তু ছিলো এবং আমাদের গ্রামীন সংস্কৃতি বলে কিছু ছিলো—এখন তা নাগরিক সত্তায় পর্যবসিত হোতে চলেছে। কারণ য়ুরোপীয় রীতিনীতি আমাদের জীবনে পর্যবসিত হোয়ে পড়ার পর, আমরা আর এক সত্তায় পৌছে, গেলাম, যেটা নাগরিক রীতি-নিয়ম-সূচক সভ্যতা। আর য়ুরোপীয় সভ্যতায় নগরটাই প্রধান রাজধানীর পারিপার্শ্বিকতায় সেখানে জীবন গড়ে উঠেছে। এথেন্সীয় মাটীতে রিপাব্লিকের আরম্ভ, এবং হাল আমলের মার্ক্সীয় দর্শনের গতিও বার্লিনের ওপর গঠিত হোয়ে মস্কোতে এসে স্থির নিশ্চয়তা পেলো। লণ্ডন সহরের ধোঁয়াটে আস্তরণের নীচে সাহিত্য-শিল্প এখনো নির্ধারিত হ'চ্ছে, প্যারিসের বুকের ওপর এখনো সে চিহ্ন, ন্যুয়র্কের ওপর যদিও সমস্ত দৃষ্টি পর্যবসিত জাগতিক পলিটিকসের জন্যে—সেখানেও ইয়াংকি রীতিনীতির বিরুদ্ধে আর স্বপক্ষে যা কিছু—তৈরী হ'চ্ছে।

এর একমাত্র কারণ, য়ুরোপীয় দর্শন, যে দর্শনের কথা হ'চ্ছে স্বাতন্ত্র্যবাদ (কাণ্টের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বার্কলির আত্মসর্বস্বভাববাদ, ফিক্টের সেল্‌ফকন্সাস্ উইল)—আর এই দর্শন ক্রাইষ্টের ধর্ম রোমের পত্তন গাঁথবার পর ধর্মীয় দ্বন্দ্বের বহু পতন-অভ্যুত্থানের পর জাত। যাতে এমনি ব্যক্তিসর্বস্বতার জন্ম হোতে পারে হয়ও এবং এটাই সেখানে বিশিষ্টতা। এই বিশিষ্টতায় বহু ব্যক্তিস্বরূপের জন্ম হোতে পারে এবং য়ুরোপে তা হোয়েছেও। ইন্‌ডিভাইডুয়াল্‌সের চূড়ান্ত গঠন য়ুরোপে ঘটে গেছে আর এই ইন্‌ডিভাইডুয়াল্‌স নগর-সভ্যতার একমাত্র লক্ষ্য।

আর বর্তমান যুগটাই যখন অতিগতিশীলতার কাল, সেই গতিশীলতা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে—সময়ের সমস্ত কিছু রূপ ও অভিব্যক্তি নিয়ে। এবং আমাদের দেশে বৃটিশ শাসনের জন্য তাঁদের অনেক কিছু ভালমন্দ পরোক্ষে ও অলক্ষ্যে আমাদের ভিতর ঢুকে গেছে। তাই নিয়ে এখনো আমরা চলছি, ক'দ্দিন চলবে—সেটা ভবিষ্যৎ জানে।

কিন্তু ভারতীয় মনের গতি কোনদিনই নগর-কেন্দ্রিক ছিলো না বলেই গান্ধীজীর রাজনীতির একমাত্র যুক্তি ছিলো—জীবনকে গ্রাম-কেন্দ্রিক করা। কৃষি-নির্ভর গ্রামের ভিতর দিয়ে আমাদের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে উঠেছিলো, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উজ্জ্বল প্রকাশ, অন্ততঃ বৃটিশ আমলের পূর্বের সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি। এটা সত্য, আর্থিক স্বাচ্ছল্য সমাজ জীবনের স্বরূপ আনবার একমাত্র পরাকাষ্ঠা। আর্থিক বৈসাম্য ব্যক্তি জীবনে বেশীরূপে প্রকট হলে সে ব্যক্তিজীবন টিকতে পারে না—এটা সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির কথা হ'লেও, সাংস্কৃতিক জীবনেও সর্বনাশকর। এটা সত্য, সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্য অবসর জীবনের সময়, জীবন যখন নিশ্চিন্ত আর নিরুপদ্রব আর্থিক প্রশ্ন আর বাইরের চাপ থেকে। ঠিক এই সময়েই সে বাইরেকে চিনতে পারে—বাইরের সমাজ, সমাজের গতি, সমাজের গলদ আর তৃষ্ণা এবং তা থেকেই যত কিছু বিবর্তন আর বিপ্লবকে সার্থক করা। কিন্তু আর্থিক বনিয়াদের পেছনে যদি শিল্পীর জীবনকে খাটাতে হয় কিম্বা ঘুরতে হয় সেখানে শিল্পীর ব্যক্তি-জীবনের অবক্ষয়ের সাথে সাংস্কৃতিক জীবনেরও অবক্ষয় ঘটেছে এবং বর্তমানে বাংলার জীবনে ঘটছে।

আর গ্রামীন জীবনের সুষ্ঠু সময়ের দিনে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ঔজ্জ্বল্য ছিলো। মুসলিম যুগেও আমরা সাংস্কৃতিক জীবনের চিহ্ন উজ্জ্বল রাখতে পেরেছি—তার কারণ আমাদের আর্থিক বনিয়াদ, যে বনিয়াদ গ্রামীন কৃষি ও কৃষ্টিতে তা সেখানে প্রায় অভংগুর ছিলো। কিন্তু য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশে পৌছুবার পর, বৃটিশের রাজতক্ত কায়েমী হোয়ে বসার পর—আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের অবক্ষয়ের চিহ্ন তৈরী হোতে লাগলো। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত রাজনীতি ও অর্থনীতি আর এই রাজনীতি ও অর্থনীতির সুবিধার জন্যে নতুন নগরের পত্তনি—ব্যবসায়িক সুবিধার জন্যে, নিজের সাম্রাজ্য রক্ষার্থ। এবং এই বিদেশী জীবনের প্রাচুর্যের মোহে দেশের যারা বিত্তবান, তারা গ্রাম ছেড়ে এইখানে এসে ভীড় করলো। বনিয়াদ তৈরী হোয়ে গেছে আমাদের মনের অলক্ষে সহরকেন্দ্রিকতার জন্যে, আর গ্রামের চিহ্ন আস্তে আস্তে পাল্টে ক্ষয়িষ্ণু গ্রামের চিহ্ন ধারণ করতে লাগলো। তারপর জোর-জবরদস্তির পালা মনভাংগার। ঢাকার তাঁতী জীবনের উচ্ছেদ, নীলচাষীদের—এই সব শিল্প আর কৃষিজীবন ভেংগে, তাদের নিজেদের প্রয়োজনে যে সব শিল্প দরকার সেই দরকারের জন্যে শিক্ষার বিস্তার ছড়িয়ে, আমাদের যাঁরা বিত্তশালী ছিলেন তাঁদের ভিতর মহাজনী আর বণিকবৃত্তির আস্বাদ বাড়িয়ে আর আমাদের যাঁরা বুদ্ধিজীবী, যারা বিলাতী-শিক্ষায় তৈরী হোয়ে এসেছেন—তাঁরা গ্রাম ছেড়ে নগরে এসে পত্তনি নেওয়ার পর, য়ুরোপীয় একক জীবনের মোহ দেখার পর—একটা অবহেলার স্তর তৈরী করলো গ্রামীন জীবন আর সহকেন্দ্রিক মনের ভিতর। আগে যে ভূস্বামীর সাথে গ্রামের প্রতি সমাজের—কৃষক থেকে তাঁতী, জোলা, কুমারের, পারস্পরিক সৌহার্দের সম্পর্ক ছিলো—তা ভেংগে অবহেলার স্তর জমা হোতে লাগলো। আমরা যারা বুদ্ধিজীবী, তাদের এই বৃত্তিটাকে ছোট করে দেখতে লাগলুম আর তারা আমাদের এই বুদ্ধিজীবনটাকে



শ্রদ্ধা করতে লাগলো। এই স্তর-ই আনবার জন্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যিক ইচ্ছা ছিলো আর তা পূরণ হ'লো। আর গ্রামের বৃত্তি নিয়ে যারা ছিলো, তারাও তাদের শিল্প আর জীবন ছেড়ে বর্তমান শিক্ষা নেবার জন্যে ব্যগ্র হ'লো—কারণ এ মন চতুর্দিকে ছড়ানো হোয়ে গেছে,—আর্থিক বনিয়াদ, সম্মান আর বিত্ত এইখানে। ক্ষয়িষ্ণু মন তৈরী হ'লো, ভারতীয় আত্মার ক্ষয়িষ্ণু স্তর এলো।

কিন্তু এই সময় যাঁরা সামাজিক জীবনের রেনেসাঁস আনতে চেয়েছিলেন, তাঁদের সে সব চিন্তা মনন, ধ্যান এই য়ুরোপীয় দর্শনের অনুধৃতি দেখার পর আগমন ক'রেছিলো। য়ুরোপীয় সমাজ-মানসের চিন্তায় আর কিছু থাকুক না-থাকুক একটা ডায়নামিক শক্তি আছে, সে শক্তির স্ফুরণ যে কোন সময় ঘটে একটা সময়ের অগ্রগতি যে কোনভাবে এগিয়ে দিতে পারে। রামমোহনের সমাজিক সত্তায় নতুন সমাজ বিন্যাসের চেষ্টা, নতুন ধর্মবাদ দিয়ে নতুন কল্লোল আনা—এর সবকিছু এক হিসেবে সত্য হোলেও আর এক হিসেবে বনিয়াদের ভিত্তিতে ফুটো ছিলো। যে কোন সমাজ-বিন্যাসের প্রয়োগ পারস্পরিক সহযোগের সাথে ঐক্যবিধান না করতে পারলে টিকে না। কোন চিন্তা কিম্বা ধারণা সেকটা-রিয়ান হ'লে, সেই চিন্তা অপসৃত হ'বারও হেতু সংগে সংগে তৈরী হ'য়ে যায়। কারণ রামমোহনের সমাজবিন্যাসের চিন্তা বুদ্ধিজীবী মহলের ভিতর পর্যবসিত ছিলো, যে বুদ্ধিজীবী মহল নিজেদের গণ্ডী অন্যমহল থেকে আগেই পৃথক করে রেখেছিলো। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর যা কিছু, তা শুধু উপর মহলেই ঘুরে ফিরে মরেছে এবং সেখান থেকে বাইরে এসে সমাজের নানা অলিগলিতে ছড়িয়ে পড়েনি। তা উচিৎ ছিলো কিন্তু হয় নি। অন্ততঃ ইতিহাসগত প্রেরণায় এটা আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই—বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য যখন সমস্ত ভারতময় ছড়িয়ে পড়লো, চৈতন্যযুগের সময়কার ধর্মপ্রেরণা—তখনকার সমাজব্যবস্থা, সর্বসাধারণের মন এবং আত্মিক জীবনের পূর্ণতা প্রকাশের বিরাট সংহতি—এই সব নিয়ে ছিলো। রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনা সামাজিক একটা দিকের বৈপ্লবিক সূচনা আনতে চাইলেও অন্য দিকে ছিলো না। কারণ সর্বসাধারণের মনের আনুসংগিক বৃত্তি টানবার ব্যবস্থা এর ভিতর থাকলেও নতুন কোন নিয়ামক কিম্বা প্রাপ্ত উপলব্ধির বস্তু ছিলো না। ব্রহ্ম উপাসনা, হিন্দুধর্মের নতুন কোন কথা নয়—এই শ্রুতি ঔপনিষদিক সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত আছে। কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠান দিয়েই কোন কিছু বাঁচবার একমাত্র ভরসা পায় না, যা ব্রাহ্মধর্মে প্রাবল্য ছিলো (এবং যে জন্যে কেশবচন্দ্রের মত কিম্বা বিজয়কৃষ্ণের মত ব্রাহ্মধর্মের ব্যক্তি পুরুষ, বিবেকানন্দও এ ধর্মে সম্পূর্ণ প্রাপ্তি খুঁজে না পেয়ে রামকৃষ্ণে আচ্ছাদিত হ'লো)।

এটা যদি য়ুরোপীয় বস্তুমানসের সাথে একটু খতিয়ে দেখি, ব্যাখ্যা বোধ হয় মিলে। য়ুরোপীয় দর্শনের মস্ত একটা গুণ আছে, সে প্রতি মনকে টেনে বুঝিয়ে দিতে পারে সে কোথায় এবং কি—এবং সেজন্যে সেখানে রিভোলুসেনও আসে। বস্তুবাদের একান্ত প্রবর্তনে লজিকের প্রাবল্য সেখানে এত বেশী যে একসময় নিজকে নিয়ে পর্যন্ত তাদের সন্দেহ জাগে (নীৎসেবাদ)। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের শেষ উপলব্ধি পারসন্যালিটি, এবং এই পারসন্যালিটিকে তারা দেখতে জানে এবং সেই পারসন্যালিটির সূচনা দিয়ে নিজেদের নব উপলব্ধির একটা নতুন প্রেরণাও তারা টানতে পারে।

এই বস্তুমানস আমাদের দেশেও ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবমানসের একমাত্র ব্যসন ছিলো। এতে যেমন একদিকে আমরা লাভবান হোয়েছি ক্ষতিগ্রস্তও হোয়েছি তেমনি। বেন্নাম-মিল দর্শন উপলব্ধির

পর বংকিমচন্দ্র সাহিত্যে সে নবজাগরণ টানলেও কিম্বা মিলটন স্বাদে আপ্লুত মধুসূদন—আমাদের সাহিত্য দিগদর্শন ঘটালেও এখানে অলক্ষে একটা মস্ত বড় ফাঁক ছিলো। সে ফাঁক এখানে ভরেনি কিম্বা দেখবার সে সুযোগও এখানে ঘটেনি। ভারতীয় সাংস্কৃতিক বীক্ষণ (সুফী কিম্বা মরমী কবি ও সাধকদের ভাবপূর্ণ আউল বাউল কিম্বা কীর্তন থেকে) আলাদা হোয়ে রইলো। এখানেই ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবনের ফাটল তৈরী হোয়েছিলো আর সেই ফাটল এখন পর্যন্ত নিরংকুশ এবং নতুন চিন্তার জন্যে যেপথুমান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দিকে যদি তাকানো যায়, ভারতীয় জীবনের যে মূলসুর সমীকরণ, রবীন্দ্রনাথ তার একমাত্র মূর্ত প্রতীক। উপনিষদের শ্রুতি নিয়ে যেমন নিজকে গড়তে চেয়েছেন তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি—বাংলার মনের কথা, কীর্তন বাউল ভাটীয়ালী—তাঁর মনের তারে সংবদ্ধ ছিলো। বিশ্বভারতীর গঠনে ভারতের সমস্ত চিন্তা কেন্দ্রায়িত ছিলো, এমনকি ভারতের বাইরের মূলসুরগুলো পর্যন্ত একত্র করতে চেয়েছিলেন। গ্রামীন শিল্পরীতির উদ্ধার, তার প্রচলন—বোলপুরের আশেপাশের শিল্প উদ্ধারের জন্যে গ্রামীন শিল্পীদের একত্রীকরণ—এই সুরের ভিতর ভারতীয় মন-ই খুঁজে পাওয়া যায়। আর এইসব চিন্তা অধ্যয়নের পর মনেরও রূপান্তর ঘটেছিলো। রবিবর্মার শিল্পকলার চেহারা আর অবনীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম সম্পূর্ণ ভিন্ন। মোগল আমলের ভারতীয় শিল্পরীতি কিম্বা রাজপুত কালেংড়া চিত্রশৈলী—এই ঐতিহ্যের ওপর অবনীন্দ্রনাথের মানসিকতা, কিম্বা নন্দলাল—অবনীন্দ্রনাথ যেখানে ভারতীয় রীতির ঐতিহ্যবাদী, নন্দলাল সেখানে বাঙালীর জীবনের বাহক।

এইসব কথা দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে পারি। যে মার্গসংগীত তখন বিষ্ণুপুর আর ঢাকার ঘরানা বুলি সে পারিপার্শ্বিকতায় তাঁর বর্ধিত জীবন—কিন্তু নিজের গানের সুর দিতে গিয়ে টানলেন বাংলার বাউল কীর্তনকেও। য়ুরোপের মাটীতে ভারতের সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে (The religion of man) কবীর-দাদু কীর্তন-বাউলের কথা শুনিয়ে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনের মাটীতে 'হলকর্ষণ'এর প্রবর্তনে, ছয়ঋতুর উৎসব পালনে—মনে হয় আশ্চর্যভাবে ভারতীয় আত্মার পটভূমি বিস্তার।

কিন্তু ভারতীয় মন আরও পংগুত্বে, জীবন বিশ্বাসের ধার থেকে আরও দূরে অপসারিত। বৃটিশের সাম্রাজ্যিক দীক্ষার কারিকুরিতে একটা বিস্তৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হোয়ে গিয়েছে। কুটির-শিল্প আর কৃষি-জীবনের চিহ্ন আরও ভংগুর আর ক্ষুদ্র ধনতান্ত্রিক সৃষ্টি আরও প্রকটিত আর প্রকাশিত। মানে ডিভাইড এ্যাণ্ড রুলের কথা মজ্জায় মজ্জায় ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো। এখানে যদি কেউ সত্য কথা বলে শোনায়—সে শোনার মত কান কিম্বা মন আমাদের অনাহৃত। আর অর্থের বনিয়াদ তৈরীর জন্যে আমরা একযায়গায় ভীড় করলাম, সেটা হ'লো 'সিটি'।

আর এই উপলব্ধিকে ঝেটিয়ে বিদেয় করবার শক্তি কারো নেই-ও। অন্তত জাগতিক গতির ব্যবস্থার গলদে এ যেন অপ্রতিরোধ্য ব্যবস্থার মত তৈরী হোয়ে গিয়েছে। য়ুরোপের জীবনধারণের তাগিদে 'ইনডাষ্ট্রি' সেখানে এ্যাক্সিয়ম ছিলো, 'সিটি' জীবন সেখানে না আসাটাই বেমানান। কিন্তু বিশিষ্ট মনের সংযোজক যদি ঘটতে পারে আত্মিক গঠনের নিয়মও সেখানে তৈরী হোতে পারে। বস্তু-জীবনের উদগ্র কামনা আর আত্মিক সৌন্দর্য্যের নিরবয়ব প্রশান্তির সাথে কোন রফা চলতে পারে কি না। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'তে সেই সমীকরণের-ই বার্তা ছিলো। কিন্তু আমাদের মন ভোগের বুদবুদ্ নিয়ে টইটম্বুর হোয়ে যেতে পারে নি, তাই এটা বোঝেও নি। ইংগ-বংগ সমাজের ওপর



অমিট্ রায়এর তীব্র বিদ্রূপ কিম্বা কেটির হাস্যের পরিবেশ নিয়ে ঠাট্টা এমন কি রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের গল্প 'ল্যাবরেটেরি'তে পর্যন্ত ঘুণে-ধরা আদর্শের ওপর একটা আঘাত পর্যন্ত ছিল। আমরা বুদ্ধিজীবীর দল তাঁর লেখার ষ্টাইলটাই দেখেছি, আর কিছু দেখি নি।

যদিও এ 'ষ্টাইল' রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশিত, প্রমথ চৌধুরী ষ্টাইলের উদ্যোক্তা, প্রধান বাহক হ'লেও—রবীন্দ্রনাথ থেকে 'ষ্টাইল' বাংলায় আরম্ভ হ'লো। মূলোর চেয়ে ধেড়ের মূল্য বেশী, এ চিন্তার মত—আমরাও আসল চিন্তা থেকে রবীন্দ্রনাথের ষ্টাইলটাই বেশী করে বুঝেছি। কারণ নাগরিক সত্তায় এটাই প্রধান। জীবনটাকে টিপটাপ ছিমছাম করতে করতে 'ষ্টাইলই' তাদের একমাত্র ধূপকাঠি হয় আর নিজেদের দোষত্রুটি ঢাকবার এটাই তাদের একমাত্র বাহনও হয়।

কিন্তু সারল্যের কথা যখন বিবেচনা করি, এটা গ্রামিক সত্তার—সরলতা আর আড়ম্বরহীনতা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে জীবন চালনায়, বণ্টনে, ইচ্ছায় আর দীক্ষায়—জটিলতাহীন, নিরংকুশ। এবং এইজন্যে এইখানের শিল্প, সংগীত কিম্বা সাহিত্য—সাদাসিধে, সহজ! পটুয়া জীবনের শিল্পকলা কিম্বা কীর্তনের পারিপার্শ্বিকতা—সহজ আর দরদীমনের পরিচায়ক। এই সহজ আর নিরংকুশ গতির জন্যে বিদ্যাপতি থেকে চণ্ডীদাস আমাদের শ্রমিক সত্তায় বেশী করে প্রচলিত আর গৃহীত। ঠিক এই পরিবেশ যদি চিন্তা করি, এই পরিবেষ্টণীর ভিতর যারা বেড়ে উঠেছে, যাদের শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি পরিবর্ধিত; তাদের প্রকাশের ভিতর সহজবোধ্য অভিব্যক্তি ঘটেছে। শরৎচন্দ্রকে এই দিক দিয়ে ভাবতে পারি তাঁর সহজ সরল রূপায়িত প্রকাশের জন্যে, তাঁর দরদী অভিব্যাঞ্জন, (এটা সত্য আর সর্বস্বীকৃত বোধ হয়, গ্রামীন সত্তার পরিবেশে প্রতিজন প্রতিজনের সাথে একটা আত্মিক নৈকট্যের সহানুভূতি নিয়ে গড়ে উঠতে চায়, আর এটাই গ্রামের স্বকীয়তা) সবচেয়ে যেটা বেশী করে সত্য এবং এই সত্যে আমাদের মানসিক অনুভূতির প্রতিলেপন পেয়ে আমরা এ সাহিত্য আপন করে নিয়েছি। কিন্তু রীতিবদলও ঘটেছে এইখানে, গ্রামীন পারিপার্শ্বিকতা ও সমস্যা ঢুকে গেছে—তার সামাজিক ক্ষেত্রে, ভূস্বামীদের অবলুপ্তির শেষ চিহ্নে তারাশংকরের ভিতর সেই সব কথা। আর গ্রামীন সমস্যায় সহরের পরিবেশ চুলচেরা হোয়ে ঢুকতে ঢুকতে যে মানসিকতা দেখা দিলো সেই মানসিকতা মাণিকবন্দেপাধ্যায়-এ—না সহরি মনের ছিমছাম টিপটাপ, না গ্রামীন মনের সরল অভিব্যঞ্জনা, যেন সম্মিলিত মনের এক স্তর—যে স্তর সহরের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে শেষ পর্য্যন্ত সিনিক হোয়ে উঠেছিল।

রচনাশৈলী পারিপার্শ্বিকের গতি হিসাবে নির্ধারিত হয়, হ'তে বাধ্য। একটু দূরে যদি তাকিয়ে দেখি—পার্ল বাকের সাহিত্য-গঠন আর 'ব্যাবিটে'র লেখক লুই (দু'জনেই আমেরিকান) দু'জনের সাহিত্য-গঠন ভিন্ন; 'ব্যারিটে'র লেখক সিনক্লেয়ার লুই আমেরিকার নাগরিক মনের প্রকাশের জন্যে যে বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টি নিয়ে দেখেছেন, বাকে এই ভংগী অপ্রকাশ্য। চৈনিক জমির কৃষক, তাদের সরল চিন্তা সরল রূপ দেখে বাকের ভংগীতে সরল আর সহজ অভিব্যক্তি এসেছে। লুই যে কারণের জন্যে তাঁর বিদ্রূপাত্মক ভংগী গ্রহণ করেছেন—সে শৈলী আমেরিকার নাগরিক সত্তা প্রকাশ করবার জন্যে প্রয়োজন। আমেরিকার যেমন শুধু গাড়ী, বাড়ী, ফাঁকা জীবনের অতিশয়তায় বিভোর—সেখানে এ ছাড়া লুইএর সংবোদনশীল মনের দ্বিতীয় উপায় ছিল না। তাঁর মনের বিতৃষ্ণা এভাবে প্রকাশের জন্যে এ অভিব্যক্তি ঘটেছে। ঠিক এই বিতৃষ্ণা নাগরিগ সত্তায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

যারা মননশীল আর চিন্তা করেন বর্তমান গতি আর স্থিতি নিয়ে, নাগরিক গ্রন্থিতে যে গতি সমস্যার আকুল—অর্থনৈতিকতার, কুশ্রীতার, প্রাচুর্যের মোহ, অপ্রাচুর্যের নগ্নতা, যৌন অনাচার—সব মিলিয়ে, মানুষ আর অমানুষের দৃষ্টান্ত পেয়ে পেয়ে যেখানে বহুদেশীয় রীতি আর সংস্কার— যা দেখে দেখে একটা মন তৈরী হয়—এই সব নগ্ন আর ফাঁকা জীবন দেখে দেখে কেউ সিনিক, কেউ আত্মদর্শনের সোপানে নিমজ্জিত হোয়ে এস্কেপিষ্ট। শ' কিম্বা হাক্সলী কিম্বা জয়েস—এঁদের দেখে একথা বলা যায়। এখান থেকেই এক একজনের প্রয়োজন হিসাবে ভিন্ন টেকনিক গ্রহণ করেন, নিজের চিন্তা আর বিদগ্ধতার সাথে অংগাংগী রেখে। আর্টএর সংজ্ঞাও বহু রূপান্তরিত হয় এই কারণেই—আর্টএর জন্যে আর্ট, আমার নিজের জন্যে, জীবনের জন্যে কিম্বা ঐতিহ্যপ্রিয়তা আর অস্তিত্ববাদিতা। আর এ ঘটতে বাধ্য, যত সমস্যা আসবে জাগতিক নিয়মে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে—নাগরিক সত্তায় জীবন কাটিয়ে নিজের প্রয়োজনে আর্টএ এ বিদগ্ধতা ঘটবে, নতুন নতুন রূপের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন।

এই যে ইনটেলেকচুয়ালিজম এটা নাগরিক সত্তার, নগরজীবনের শেষ বিশিষ্টতা। আর য়ুরোপের ক্ষেত্রে এ ঘটতে বাধ্য। কাণ্টীয় দর্শনের সময় যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের জন্ম, তারপরে শেষ অধ্যায়ে ফ্যাসিষ্ট অভ্যুদয়—এই ব্যক্তিসর্বস্বতা য়ুরোপের মজ্জায় মজ্জায়। আর এই আত্মসর্বস্বতার পর যখন জীবনের দ্বার উন্মোচনের জন্যে মন পাগল তখন ইনটেলেকচুয়ালিজম আসতে বাধ্য। (টমাস ম্যানএর 'টনিয়ো ক্রোজার' গল্প এর পরিষ্কার অভিব্যক্তি)।

বাংলা সাহিত্যেও একথা ঢুকে গেছে। কারণ এখানেও নগরজীবন পুরোপুরি আরম্ভ হোয়ে গেছে। প্রমথ চৌধুরী ফরাসীজীবনের বহু অলিগলি অধ্যয়নের পর যে শৈলী টানলেন, সেটা পুরোপুরি ইনটেলেক্ট ধর্মী। য়ুরোপীয় মাটিতে ফরাসী কালচারের বিশিষ্টতা চিরদিনের, আর বিলেতের মাটিতে রোমান্টিক ধর্ম—কাব্যিক পরিক্রমা। এই কাব্যিক পরিক্রমা পার হ'য়ে হাক্সলী ভক্ত বুদ্ধদেব (বুদ্ধদেব নিজেই স্বীকার করেছেন বলে বল্লাম) বাংলা সাহিত্যে আবার নতুন গঠন দিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব এখনো রোমান্টিক অন্ততঃ গল্প উপন্যাসে—অন্ততঃ প্রকাশ ভংগীতে। সেদিক থেকে ধূর্জটীপ্রসাদ অনেক সার্থকনামী, বোধ হয় লজিকভক্ত প্রমথ চৌধুরীর অনুসংগের জন্যে। হাল আমলে আরও—নিজেদের স্বাভাবিকতা ক্ষয়ে যাবার পর নতুন চিন্তার জন্যে। গ্রামীন উপলব্ধি নিয়ে সাহিত্য পরিক্রমা আমাদের জীবনে মরে গেছে, যাও আছে—তারা নেংটী ইঁদুরের মত সহরি মোহ নিয়ে এবং সে আওতায় পরিবর্ধিত হোয়ে নতুন তকমা আঁটতে চাইছে।

কিন্তু এই সত্তায় আমাদের সাহিত্য বাঁচতে পারে কিনা। যে অবস্থার ভিতর এখন আমরা পৌঁছে গেছি—আর্থিক বনিয়াদ অনিয়ন্ত্রিত, এই ভাগাভাগির পর পূর্ববংগের বর্তমান দুর্যোগের পর—চতুর্দিকে ভংগুর আর দুঃসময়ের কথা। আর সহরজীবী হবার জন্যে, সহরে সমস্ত দিক থেকে ভীড় কেন্দ্রায়িত। গ্রামিক সত্তা একেবারে ভংগুর। ঠিক এই সময়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা যদি আনা যেতে পারে, হয় সেই স্বচ্ছলতা, য়ুরোপীয় নীতির ইনডাষ্ট্রিয়াল করবার পন্থায় কিম্বা গ্রামের পুনরুজ্জীবনের পন্থায়, সেটা নির্ভর করে রাষ্ট্রের ওপর। নাগরিক সত্তায় আমাদের সংস্কৃতির উজ্জীবন ঘটবে কিনা—মনের, চিন্তার, অনুধ্যানের? এই প্রশ্নের জন্যেই মনে হয়—সংস্কৃতির অবক্ষয় নিরাবণের জন্যে যদি সম্মিলন হয়, গান্ধীর রাষ্ট্রব্যবস্থার চিন্তার সাথে রবীন্দ্রনাথের সাংস্কৃতিক মনের—স্থিরীকৃত জীবনের রূপ বোধ হয় আমরা নিতে পারি। কিন্তু এখানেও রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্বিকের চিন্তার ওপর পথ নির্ভর করে। সে চিন্তা ঘটবে কিনা সেটাও আমাদের প্রশ্ন।

# ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

## ইন্দ্রজিত্

মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, একথা নতুন করে বলবার দরকার নেই কিন্তু কি করে এই দুঃখের কুষ্ঠির ছকের বাইরে আমরা যেতে পারব সেই চিন্তাটাই আমাদের প্রধান।

পৃথিবীর সব জাতকের ভাগ্যাকাশে নবগ্রহের নৃত্য জীবনের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্য্যন্ত। সে নৃত্যের ভেতরে কোন রকম পক্ষপাতিত্ব নেই, স্বীকার করি, তবে তাদের নাচার পরিণামে কারও পৌষ মাস আবার কারও সর্ব্বনাশ, কিন্তু প্রশ্ন হল যে মানুষের এই সুখ আর দুঃখের সঙ্গে কি কারণে এবং কে এই নৃত্যের যোগাযোগ স্থাপন করল। প্রশ্নটা মানবিক, এটার ভেতরে সত্যান্বেষীরা অজ্ঞতা খুঁজে পেতে পারেন কিন্তু তাই বলে এ প্রশ্নের সত্যতাকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।

পরজন্ম আর পূর্ব্ব জন্মের পাপ-পুণ্যের তালিকা দেখিয়ে অনেক লোক অনেক কথা অনেক দিন আগে থেকে বলেছেন কিন্তু তাতে যার উপকার হয়েছে এমন কোন জাতিস্মর আমাদের সমাজে এসে বলেননি সে কথা।

সাধুদের কথাকে আমরা সাধুবাদ দেব কিন্তু দুঃখবাদের প্রত্যুত্তর হিসেবে সেটা কতটা কার্য্যকরী সেটা সাধুরা ভেবে দেখুন সর্ব্বাগ্রে।

কোন লোক সুখী কিন্তু সব লোক সুখী নয়, দুঃখের ব্যাপারেও আবার কৈফিয়ৎ হিসেবে বলতে পারা যায় যে সকলেই দুঃখী নয় কিন্তু সেটা আমার প্রশ্নের তৃষ্ণা মেটাতে অক্ষম। আমার মানবিক জিজ্ঞাসা কেন সুখের আবির্ভাব ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য জুড়ে।

পৃথিবীর মানুষের জীবনে কত মহাজন এলো, রচনা করল মহাগ্রন্থ, শোনাল মহৎ উপদেশ কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা শ্রোতা পেলেন না চিরকালের মতন।

পৃথিবী ছেড়ে দিয়ে যদি শুধু ভারতবর্ষের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে দেখব অতীত প্রাণবন্ত হয়ে কথা কয়ে উঠবে। শিল্পীর চোখ আর বিজ্ঞানের দৃষ্টির সমন্বয় ঘটালে দর্শককে নিয়ে যায় আদি ভারতের বন্যযুগে যেখানে প্রকৃতির মতন মানুষও অশান্ত। সে যুগে দিন, ক্ষণ, মাস, বছর কোন কিছু ছিল না, ছিল সূর্য্যোদয় আর সূর্য্যাস্ত, সন্ধ্যা আর সকাল। দিনে মানুষ খুঁজছে পশুকে হত্যা করবার জন্যে আর রাত্তিরে পশু খুঁজছে মানুষকে সেই হত্যারই অভিপ্রায়ে। সে যুগে মানুষের জ্ঞান ছিল কিন্তু বিজ্ঞান ছিল না। সমস্ত মানুষের ভেতরে সুখ তৃষ্ণা দৃশ্যমান আর সুখ তখন শুকতারার মতনই জ্বলছে সূর্য্যের কোলে। ভারত ভূমির অরণ্য পর্ব্ব এখানে শেষ হোল।

এরপর দেখা গেল দেশ জুড়ে মানুষ নিজেকে ঘসে মেজে পরিণত করেছে মানবিক সত্তায়। এখানে সে পশুর সঙ্গে আর যুদ্ধরত নেই, জীবন-যুদ্ধে মানুষ জিতেছে আর হেরেছে পশু। মানবিক মস্তিষ্কের কাছে পরাজিত হোয়ে পশু পরিণত হয়েছে বাহনে, আর মানুষ তার পিঠের ওপর বিরাজিত। কিন্তু শান্তি এল না তাতেও, দিনের পর রাত আসে, তার পেছনে আবার দিন, আত্মসুখের জন্যে যে অবিরাম সংগ্রাম মানুষ করেছে সে সংগ্রাম পরিণামে আন্‌লো না তার জন্যে সুখ বহন করে।

এর পর ভারত-সভ্যতার প্রথম সূর্য্য উঠল সিন্ধু সভ্যতার দেশে। এখানে আমরা পরিচয় পেলাম যে আর্য্যপূর্ব্ব যুগেই মানুষের বাস্তুশিল্প জ্ঞান ছিল, পবিত্র জীবন যাপনের মন ছিল আর সেই বস্তুতান্ত্রিক মনের চাহিদা মেটাবার জন্যে সে যুগে তার উপাদানও ছিল প্রচুর।

সিন্ধু-সভ্যতা অতীতের রাজদ্বার খুলে দিয়ে প্রমাণ দিল যে প্রাক্ আর্য্য সভ্যতার কৃষিবিদ্যা বাণিজ্য প্রমাণ দিল সে যুগের মানুষের ধর্ম-কর্ম সমেত উচ্চাঙ্গের পৌরজ্ঞান। কিন্তু গবেষকদের মতানৈক্যের জন্যে আজও এর পূরোপূরি বিচার হোল না।

এরপর সভ্যতার দ্বিতীয় সকাল।

আর্য্যরা এলেন এবং প্রমাণ পেলেন প্রাক্ আর্য্য ভারতভূমির আদিবাসীদের বলিষ্ঠ ও সভ্য মনের।

আর্য্য সভ্যতায় আমরা নতুন জিনিষ পেলাম, পেলাম বেদমন্ত্র নতুন ভাষায় আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন জীবন আর সমাজ গঠনের ধারা।

আর্য্যরা বিজেতা রূপে পরিচিত হোলেন ক্রমশঃ সমস্ত ভারতবর্ষে কিন্তু এই আর্য্য সভ্যতা সমস্ত ভারতের বুকে ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্ আর্য্যজাতির সংস্কৃতির সঙ্গে আর্য্য সভ্যতার এক ভীষণ সংঘাত হোল, এবং এই সংঘাতের ফলে বৈদিক সভ্যতায়ও পরিবর্ত্তন আমরা লক্ষ্য করলাম, শুনতে পেলাম আর্য্যদের উদার গম্ভীর সুরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ। আর্য্যরা ক্রমশঃ সৃষ্টি করে চল্‌লেন নানারকম দেব-দেবীর আবাহন মন্ত্র, সমাজের কল্যাণ কামনায় তারা আয়োজন করলেন নানারকম যাগ যজ্ঞের, গঠন করলেন বর্ণাশ্রম সমাজ ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি রূপে।

পরবর্ত্তী বৈদিক যুগে বেদের থেকে জন্ম নিল উপনিষদের মহান্ বাণী যে বাণী ভারত ভূমির সকলকে আখ্যা দিল অমৃতের পুত্র বলে, সঙ্কেত জানালো অমৃতের, উদ্দেশ্য হোল মানুষের সমাজে মানুষের দ্বারা হোক মানুষের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্মী আর্য্য সমাজে জনসাধারণের কোন রকম স্থান হোল না, যে স্থান তাদের সহ্য শক্তির প্রেরণা দেবে, ঘটাবে মানবিক দুঃখের পরিসমাপ্তি।



আর্য্যদের বেদবুদ্ধি যখন ভেদবুদ্ধিতে পরিণত হোল সেই সময় নিপীড়িত জনসমাজ আস্থা হারালো শাস্ত্রের ওপর।

যারা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ তারা পরকালের সুখের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করলেন। বৈদিক ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু, শিব উপাসকের দল পরবর্ত্তী যুগে উপনিষদের গন্ধে মুক্তি লাভের সন্ধান পেলেন, মৃত্তিকার সুখকে তাঁরা পরম সুখ বলে মনে করলেন না পরে।

আর্য্যরা আসবার পর থেকে মুসলমান অধিকার পর্য্যন্ত এই যে বিরাট যুগ প্রাচীন যুগের দান সে বিরাট শূন্য ক'বিরাট্‌কে পূর্ণ করেছে।

বেদজ্ঞরা যখন থেকে উপনিষদের প্রতি যত্নবান্ হোলেন সেই সময় বা তার পরবর্ত্তী যুগে আবির্ভাব ঘটে চার্বাক ঋষির। তিনি সকলকে ডেকে বললেন তাঁর বাণীর মর্মার্থে মৃত্যুর পর আত্মার কোন রকম অস্তিত্ব থাকে না সুতরাং মর্ত্ত্যের মানুষ যা কিছু কাজ করুক তার জন্যে পরজন্মে তার কোন সুখও পাওনা নেই আবার অসুখও পাওনা নেই। আর্য্যদের আত্মার অস্তিত্ব ও দেহাতীতরূপে অবস্থানের ওপর চার্বাকের সন্দেহ ছিল যথেষ্ট।

শাস্ত্রকাররা বলেছিলেন প্রমাণ তিন রকম। যথা—বেদ প্রমাণ, অনুমান প্রমাণ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু চার্বাক বললেন যা চোখে দেখা যায় না তাকে কোন প্রমাণ বলে ধরে নিতে তিনি রাজী নন। তাঁর কাছে একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ। শাস্ত্রকাররা বলতেন অদৃষ্ট আছে, চার্বাক তার প্রতিবাদে বলতেন, যা চোখে দেখা যায় না তার প্রমাণ নেই। সেই অর্থে অদৃষ্ট অর্থাৎ যা দৃষ্ট নয় সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে পড়ে না, সেই কারণ বশতঃ অদৃষ্ট তিনি মানলেন না। আর্য্যরা বলেছিলেন পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে মাটি জল তেজ বাতাস আর শূন্যতার মিশ্রণে। চার্বাক প্রতিবাদ করে বললেন, শূন্যতার কোন অস্তিত্ব মানতে রাজী নই, কারণ সেটা প্রত্যক্ষ প্রমাণে পড়ে না। সুতরাং চার্বাকের মতে জগত সৃষ্টির মূল উপাদান হোল চারটি, যথা—মাটি জল বাতাস আর তেজ। আর্য্যরা বলেছিলেন পশু বলিদানে পশুরা মুক্তি পায় সেই কারণে পশু বলিদান করা উচিত। চার্বাক তার উত্তরে বললেন, বলি প্রথা যদি মুক্তির পথ দেখায় তাহলে পশুর পরিবর্ত্তে বৃদ্ধ মানুষগুলোকে বলি দেওয়া হিতকর কাজ, তাহলে তারা মুক্তি পাবে। আর্য্যরা বল্‌লেন, ভগবান আছেন, চার্বাক বল্‌লেন প্রত্যক্ষ প্রমাণে তিনি পড়েন না অতএব যে প্রত্যক্ষ প্রমাণে অদৃষ্ট প্রমাণিত হয় না ঠিক সেই প্রত্যক্ষ প্রমাণে ভগবানও বাতিল হয়ে যান। শাস্ত্রকাররা মহা বিপদে পড়লেন। কিন্তু চার্বাক হোলেন প্রকৃত অর্থে চারু বাক্। অর্থাৎ চার্বাকের কথাগুলো শ্রুতিমধুর হোলেও চার্বাকের এমন কোন মতবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়নি যা মানুষকে সুস্থ সামাজিক জীবন যাপন করাতে পারে। এ যেন বেদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীলতার মতন চার্বাকের বাণীগুলো। তাই পরবর্ত্তী ভারত-ভূমির দার্শনিকদের কাছে চার্বাকের যুক্তি অসাড় ও অযৌক্তিক প্রমাণিত হোল। (ক্রমশঃ)

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। ফুরকুনি সন্তানদের মধ্যে নিজের ছেলে বেলাত হোসেনের চাইতে মেরজান-পুত্র রজবআলির প্রতি আলতাপের স্নেহ চিরকালই বেশী দেখা গেছে।

কিন্তু বাপের স্নেহ কম পেলেও বাপের কাছে থেকে প্রবৃত্তিগুলি পেয়েছিল বেলাত হোসেন। কনক দারোগা বেলাতকে দেখেনি, শুনেছে ঠিক নাকি আলতাপের মতো গায়ের রং ছিল তার, এমনি নাক চোখ। ছাতি সারানোর ব্যবসায় ছিল তার। সহরের রাস্তায় রাস্তায় ছাতি সারানোর ব্যবসা করে বেড়াত, কিন্তু কখনো কখনো এমন সব জিনিস নিয়ে ফিরে আসত যা নাকি ছাতি সারানোর মজুরি দিয়ে কেনা যায় না।

অনেক জেরার উত্তরে আলতাপ একদিন বলেছিল: কোন্ সান্দার কোনদিন নিজের সদ্দার ছাড়া আর কাকে সেলাম দিছে, কন দারোগা সাহেব; আর এ কি হ'ল, জমিদার, তার আমলা, তার পাইক, তার সমন জারি।

কনক বুঝতে পেরেছিল আলতাপের আপত্তিটা কোথায়, কৃষকজীবনের অন্তরে সে এখনও বেপরোয়া যাযাবর।

লোকে মনে করেছিল কৃষকজীবনের প্রতি সাধারণ ঘৃণা থেকেই বুড়ো আলতাপ এ সব বলে। তার জীবনের শেষ দিকে রজবআলির বাড়ীর সম্মুখে একটা মাচায় বসে থাকত আর বিড়বিড় করত।

ঠাহর ক'রে শুনলে বোঝা যেত সে বলছে: এতটুকু নতুনত্ব নেই জমিতে যে নোতুন কিছু আশা করবে। ঐ তো গহরজান বিশ পটি ধান তুলেছে গোলায়। দুই দু'খান গোরুর গাড়ী তার, পাঁচ জোরা লাঙ্গল বিঁদে। কালো কোট পরে থানায় হাজিরা দেয়, লাল মোল্লাকি টুপি, তফনের চেকনাই চমকে ওঠে রোদ ভরামাঠ পার হ'তে গেলে। সাদি করেছে এবারও একটা। তিনটে হ'ল। আহাম্মুখ বোঝে না ষাট বছর বয়সে ওসব ঘরে আনা শুধু নিজের খাঁচায় পরের জন্য পাখী পোষা। কিন্তু তা যতই কর দাঁড়াতে হয়না তোমাকে সান্ন্যালদের পেয়াদার সামনে ভেড়া ভেড়া মুখ ক'রে?

থু থু ফেলে ফেলে চারিপাশটা অগম্য ক'রে তুলত আলতাপ। এর কিছুদিন পর



থেকেই বলতে আরম্ভ করেছিল সে—এমন ধানও হয় নি কোন সালে, এমন না খেয়ে থাকাও কোনদিনই আর হবিনে।

লোকে ভাবত ওটা বুড়োদের ধরতাই বুলি। প্রতিবারেই তারা বলে এবারের মতো কোন ঋতু এত প্রবল হ'য়ে কখনো আসেনি।

কিন্তু আলতাপের শেষ কথা চূড়ান্ত হ'য়ে সত্য হ'ল।

কনক দারোগা কলম খুলে নিয়ে কিছু একটা লিখবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। সে লিখল: আসলে এরা কৃষিজীবী নয়। সারা গায়ে মাটি মেখে ধুলিধুকড়ি হ'য়ে অকরুণ আকাশের দিকে ধানের বৃষ্টির জন্য বসে থাকবে সে জাত এদের নয়। কোন একটি মেয়ের প্ররোচনায় এরা মাটিতে হাত দিয়েছিল। হয়তো এদের শ্রমে বুধেডাঙা শস্যময়ী হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু দু'হাত ক'রে সেই দো আঁশ মাটি তুলে ফেল দেখবে চিকন্দির থেকে ধুয়ে আনা ইঁটের টুকরো ভরা কালো মাটি। নোতুন নয় কিছু। উপরের দো আঁশ মাটিও কালচে হ'য়ে আসছে। দু বছর খুব ফাঁপালো ধান পেলে তারপর যা কি তাই।

আজ সুরোকে দেখে এলাম। আলতাপ সান্দারের পৌত্রী বেলাত হোসেনের কন্যা। বোধ হয় কোন চোরাই ব্যবসায় লিপ্ত আছে। যাযাবর হ'য়ে গেল। মাটির বন্ধনে পড়ে সামাজিক প্রাণী হবার যে সুযোগ এসেছিল সেটা চলে গেছে।

স্ত্রী শিপ্রা ঘরে ঢুকল।

সদ্যস্নাত একটি সামাজিক প্রাণী। বৈকালিক প্রসাধনের খুঁটিনাটি সযত্নে পালন ক'রে যে মার্জিত চেহারাটি তার হ'য়েছে কনক তাতে অতি পরিচয়ের মধ্যেও আকর্ষণের কিছু একটা খুঁজে পেল।

শিপ্রা বললে—গবেষণা?

—সময় কাটাচ্ছি।

শিপ্রা ঝিলিক তুলে বললে,—কেউ যদি বলে তোমাদের সকলেরই ঐটি আসল ব্যাপার ঐ সময় কাটানো। ওদের বাঁচা-মরা তোমাদের নির্লিপ্ত সময় ক্ষেপণের সুযোগ দিয়েছে।

—তা যদি বলো। কনক খাতা মুড়ে রাখল। বললে,—আলতাপ ফুরকুনির হাসি পাবার লোভে বুধেডাঙায় ঘর বেঁধেছিল শিপ্রা, আমায় কি করতে হবে বলো।

মাধাই সন্ধ্যার পরে ফিরল ষ্টেশন থেকে। অন্ধকারে ঠাহর ক'রে সুরোকে দেখে সে একটু অবাক হ'ল,—সুরো না?

—হয়।

—কি মনে করে আলি, সহরে গেলি না চাল আনবের ?

—চাল আনব ? পুলিশের তাড়া খেয়ে পলাইছি।

—পুলিশে তাড়া করেছে ? ক'স কি, কনে ?

—দিঘা ষ্টেশনে। মনে কয় শমেকের বড় দারোগা।

—তাইলে ? মাধাই বারান্দার উপরে তার বুটসুদ্ধ একখানা পা তুলে দিয়ে দাঁড়াল।

—কি করব তাই কও ?

—কি করবা, না ? মাধাই ভাবল, কিন্তু ভেবে ঠিক কুল-কিনারা পেল না। যেন পুলিশরা ধরপাকড় করার তোড়জোর করে মাঝে মাঝে, কিন্তু তাদের সাথে কথা বলা যায়, বোঝানোর চেষ্টা করা যায়, সামনে থানার দারোগাকে কি বলবে সে।

—কিছু ক'লা ?

—কবনে। এখন খাওয়া দাওয়া কর। রাত্তিরে তো তোর টেরেন নাই।

মাধাই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

রেলের সব চাইতে ছোট পরিমাপের কোয়ার্টারগুলির একটি। আট দশ হাত দৈর্ঘ্য ও প্রায় সমপরিমাণ প্রস্থের একখানা ঘর। ঘরের একদিকে জানালাটার নিচে মাধাই-এর খাটিয়া; দেয়ালের গায়ে পেরেক থেকে তার জামা কাপড়গুলি ঝুলছে। ঘরে ঢুকে একটি মাটির কলসী থেকে জল গড়িয়ে খেয়ে বিছানায় বসে একটা বিড়ি ধারালো মাধাই।

সুরো দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল।

মাধাই লঘু স্বরে বললে—এখনও ভাবতিছিল চালের কথা ?

কথাটা মিথ্যা নয়। অপ্রতিভ হয়ে সরতুন বললে—পুলিশ ধরলি কবো, মাধাই বীয়েনের লোক আমরা।

—কইছিস একখানা কথা। তোগরে মাধাই যেন র‍্যালের বড় সাহেব। মাধাই হো হো করে হেসে উঠল।

হাসি থামলে মাধাই বলল,—এখন রান্নাবান্না কর, খা দা। কাল সকালে ফাতেমা আসবি। তার সাথে বুদ্ধি করা যাবি। একটা কিছু ব্যবস্থা হবি।

তা মাধাই যখন বলছে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় বৈ-কি। চালের ব্যবসা বন্ধ হ'লে আর কোন ব্যবসায়ের ফিকির, হয়তো কেন, নিশ্চয়ই বাৎলে দেবে সে।

সুরো বললে,—রান্না করব, তুমি খাবা কনে।

—আমি আজ খাব না।

—তা হলে তুমি রাধ না, আমি বসে বসে খাই।

—সে জন্যি না। এই তো কাল সকালেই ফতেমা আইছিল, রাঁধল, খালাম! যে



রান্নাঘরে বোধহয় তরকারী আনাজও আছে। কুটেকাটে নিয়ে রান্না কর। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমায়ে নি।

—এখন ঘুমাবা ?

—হয়। ডিবটি দেয়া লাগবি সারা রাত। ইস্পেশ্যাল আসবি। বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাধাই পোষাক-পরা অবস্থাতেই খাটিয়ার উপরে শুয়ে পড়ল।

—একজনের জন্যি কি রাঁধব। দোকান থিকে খায়ে নেব।

—তা যা তবে, খায়ে আয় গা।

সুরো আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে নেমে দোকানের উদ্দেশ্যে হাঁটতে সুরু করল।

বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে মাধাই খানিকটা ভাবল। তার ভাবনা চিন্তা স্পেশ্যাল ট্রেনখানিকে কেন্দ্র ক'রে। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া দরকার। এখন যে খুব ঘুম পেয়েছে তা নয়, বরং ঘুমানোর সময়ই এটা নয়। ঘুমানো দরকার দেহের ক্লান্তি দূর করার জন্য আর মস্তিষ্ককে তেজিয়ান করার জন্য। কয়েকদিন আগে মালবাবুর কাছে শুনেছে সে কথাটা। আজ যে স্পেশ্যাল আসছে তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করতে হ'লে দেহ ও মন দুটিই সমান সজাগ থাকা চাই। চোখে এতটুকু ঘুম থাকলে হবে না। আগে থেকে ঘুমিয়ে মাধাই রাত জাগার জন্য প্রস্তুত হ'তে ঘরে এসেছে। কিন্তু ঘুম প্রয়োজনের সময়ে আসে না। মাধাই শুয়ে শুয়ে বুট-শুদ্ধ পা জোড়া দোলাতে লাগল।

বোধ হয় একটু তন্দ্রা এসেছিল, মাধাই ধরমর ক'রে উঠে বসল।

—সুরো আসছিস ?

বারান্দা থেকে সুরো সাড়া দিল।

—তুই তা হ'লে ঘরে আয়, আমি ডিউটিতে চললাম।

—ঘুমালে না ?

—না রে, ঘুম আসতেছে না।

ঠিক এই মুহূর্তে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত মাধাইকে তার এই চাঞ্চল্যের কারণ সে উত্তর দিত—এ কি তোমার মেলোয়ারি ভোগা আর না খায়ে খায়ে থাকা। এ হ'ল চাকরি করা। রেলের কাম লোকে পায় না। হ'ল তো হ'ল, শালা মেলেটারি। নীল প্যান্ট কোট কজন পায়, তার উপরে পাওয়া গেল খাকি প্যান্ট, কোট, টুপি। পুলিশের দারোগারাও তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।

খাকি, খাকিই হচ্ছে এই দুনিয়ার সেরা রং !

মাধাই যখন গ্রাম ছেড়েছিল তখন তার বয়স কুড়ি ছাড়িয়েছে। মাধাই এক গণৎকারকে দিয়ে হাত দেখিয়েছে। পাঞ্জাবি গণৎকার পুরোপুরি একটা সিকি পেয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মেই

মাধাই বায়েনকে রাজা ক'রে দিয়েছিল প্রায়, পুরোপুরিটা পারে নি মঙ্গলের স্থানে কি একটা দুর্য্যোগ ছিল ব'লে। মাধাই এখন নিজের হাতের রেখা দেখিয়ে বলে—তা দেখ ঠিক কুড়িতে যদি গাঁ ছাড়া না হ'তাম জুটত এই চাকরি? ভাগ্য, নিয়্যাস ভাগ্য।

গ্রাম ছাড়া হবার ঠিক তিনমাসের মধ্যে মাধাই-এর চাকরি জুটে গেল ষ্টেশনে। তের টাকা মাসিক বেতনের চাকরিটা মাষ্টার সাহেব তাকে ডেকে দিয়েছিল। অবশ্য কফিলুদ্দি সেখের চামড়ার ব্যবসায়ের কোথায় মাষ্টার সাহেবের সাথে খাতির হবার সুযোগ ঘটেছিল, কি সে বলেছিল মাষ্টার সাহেবকে তা মাধাই জানে না।

কিছুদিন পরে মাধাই বুঝতে পেরেছিল তার চাকরিটা একটা প্রাচীর। ষ্টেশনের কনষ্টেবল দোবেজি একদিন এক রাজপুরীর গল্প বলেছিল। ত্রিশ হাত উঁচু তার প্রাচীর। প্রাচীর ভেতরে বাগান, সারি ফুল-ফলের গাছের মধ্যে লাল লাল আলোকোজ্জ্বল রাস্তা। প্রাচীরের বাইরে জলা, কাঁটাভরা রাক্ষুসে লতায় ঢাকা। এক একটি কাঁটা যেন এক একটি লালমুখো সাপ, এত বিষ।

কিন্তু সবটাই যেন এক পূর্বপরিকল্পিত কাহিনী। কোথায় কোন দুই দেশের রাজায় লেগে গেল যুদ্ধ। দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে প্রচণ্ড প্রচণ্ড ইঞ্জিনগুলি খাঁকিপরা লোক নিয়ে ছুটতে লাগল। ইয়া ইয়া ইঞ্জিন আর হাজারে হাজার গাড়ী। হুস্ হুস্ ঝম্ ঝম্। যেখানে পাঁচখানা চলত, এখন পঁচিশখানা চলছে। এক সকালে তেমনি কোথা থেকে রাশি রাশি খাঁকির জামা কাপড় এল। মাষ্টারসাহেব থেকে সুরু করে মাধাই পর্য্যন্ত সবাই পরল। প্রথম দিন যখন পোষাক বিতরণ সুরু হয়েছিল, হাসাহাসির চুড়ান্ত হ'ল। কারো ভুঁড়ির বোতাম লাগতে আপত্তি করছিল, কারও বা আলখিল্লার মতো ঝুলঝুলে হ'ল গায়ে। কিন্তু একরাত না পার হ'তেই হাসির জায়গায় এল গাম্ভীর্য্য। আর মাইনা যে বেড়ে কত হ'ল লেখা জোখা নেই। তের বেড়ে তেষট্টী। এক বছরের কামাই একমাসে।

আফিস ঘরগুলিতে কাজ হচ্ছে যেন ঝড়ের মতো। ফিরিওয়ালা যে এত কোথায় ছিল কে জানত, আর কোথায় ছিল এরা যারা যে কোনো দামে যে কোনো জিনিষ কিনবার জন্য গাড়ী ষ্টেশনে আসবার আগে থেকেই জানলায় দাপাদাপি করতে থাকে। গায়ে গায়ে ধাক্কা লেগে মাথা ঘুরে যায়, পায়ের ঠোক্করে মানুষ ঠিকরে পড়ে, মানুষ চটকে যায় পায়ের নিচে। এ ব'লে বোঝান যাবে না। যে না দেখেছে সে বুঝবে না, ভাবে মাধাই।

অন্ধকার পথটা দিয়ে ষ্টেশনের দিকে যেতে যেতে মাধাই অন্ধকারের শূন্যকে বুট্ ঠুকে একটা শ্যালুট ক'রে দিল। ট্রেনটা এসে দাঁড়ালে শুধু সে নয় ষ্টেশনে যে যেখানে আছে সবাই এমন করবে। সাধারণ ট্রেন এলেই কত করতে হয়, তার উপরে আসছে স্পেশ্যাল, পেসিয়াল যার নাম। পাঁচ ছয় দিন আগেই তারে তারে খবর পেয়েছে সারা দেশ। দক্ষিণের



রাজা নাকি উত্তরের রাজাকে খুব হারিয়ে দিয়েছে। ফুল পাতায় রঙিন কাগজে ষ্টেশন সাজান হ'য়েছে। ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরে নাকি কয়েকজন বড় বড় যোদ্ধা চা খাবেন, তার যোগানের চেষ্টায় ষ্টেশনের মাষ্টার সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেছে পরিশ্রমে। এই সেই স্পেশ্যাল। এরই মধ্যে সুরো ঘুমের কথা বলে।

ষ্টেশনের চৌহুদ্দিতে পা দিতে না দিতে খবরটা পেল মাধাই। জয়হরি তারই মতো পোর্টার। সেই বললে,—একখানা নামে, আসলে দু'খানা। সেই উত্তর থেকেই চারখানা ইঞ্জিনের পেছনে দু'খানা স্পেশ্যাল আধ মাইল তফাতে থেকে চলছে। দেখ মজা লাইন ক্লেয়ারে দু'খানা গাড়ী চলে।

মাধাই এমনটা কখনো শোনে নি। সে বললে—পেছনের ড্রাইভার কত ওস্তাদ দেখ। একটু জোরে চালাবা তো সামনের গাড়ীতে ঠোক্কর।

—সামনের ড্রাইবার বা কম কি? ইঞ্জিন একটু কমালে চলবি নে?

—সব ইষ্টিশনে থুরু পাস্?

—না, মনে হয়, এখানে থামবি।

থামবে সেটা মাধাইও জানে। প্রশ্নটা উত্থাপন করে বন্দরদিঘার ষ্টেশন সম্বন্ধে গর্ববোধটি নোতুন করে অনুভব করার চেষ্টা করল সে।

—বাব্বা দিঘায় না থাকে কারো উপায় নাই।

সামনের ভাণ্ডারের ডালা থেকে একটা পান ছিনিয়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে মাধাই মালবাবুর ঘরের দিকে গেল।

( ক্রমশঃ )

"চাষী তার মৃত্তিকাতে যদি না তাকায়
প্রোষিতভর্তৃকা হয়ে মাটি গায়ে মাটিই মাখায়।"

—তামিল কুরল।

# আত্মকথা

## প্রমথ চৌধুরী

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে আমার পুরোনো বন্ধু, যথা মহারাজা নাটোর প্রভৃতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতুম। তাঁর সঙ্গে প্রায় নিত্যই সাক্ষাৎ হত। কুচবেহারের দলের সঙ্গে আমি তাঁর পরিচয় করিয়ে দিই। কিন্তু এ দুই দলের তেমন সদ্ভাব হয়নি। নাটোরের মহারাজ ছিলেন অতি সুরসিক লোক এবং তিনি মধ্যে মধ্যে এমন রসিকতা করতেন যে, কুচবেহারের শ্যালকবাবুরা বোকা বনে যেতেন। ইতিমধ্যে লোকেন পালিতের কলকাতায় আবির্ভাব হয়। তিনি কোনো ডিনার-পার্টিতে উপস্থিত থাকলে সেখানে শ্যাম্পেন দেখলে excited হয়ে উঠতেন। এবং শ্যাম্পেন সম্বন্ধে নানান রসিকতা করতেন। আমার মনে আছে যে, তিনি একদিন যখন এই রকম রসিকতা করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ বলে বসলেন যে, শ্যাম্পেনের গেলাস একমাথা শ্যাম্পেন নিয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটু বেঁকছেও না, চুরছেও না। এইজাতীয় রসিকতা নাটোরও করতে পারতেন না, আমরা তো নয়ই।

হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের সঙ্গে আমার বিলেত যাবার বহু পূর্ব থেকে ঘনিষ্ঠতা ছিল। এবং তাঁর মারফত কলকাতার শৌখিন বড়মানুষের দলের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। এ দলের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন কুমার মন্মথনাথ মিত্র। তিনি সে সময় একজন ম্যুনিসিপাল কমিশনর ছিলেন। প্লেগ কলকাতায় এলে কলকাতার লোক মহা হুজুগ বাধাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মন্মথ মিত্র এবং হেম মল্লিক দুজনে বাঙালিটোলার একটা বাড়িতে দেখতে গেলেন ব্যারামটা সত্যি প্লেগ কি না। দুজনেই ফেরবার পথে আমাদের ওখানে এলেন। এবং বললেন যে, হাঁ, সত্যিই প্লেগ। চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই শেয়ালদহ স্টেশনে অসম্ভব যাত্রীর ভিড় হতে লাগল। দেশের লোক দেশে ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমরা ভাইরা প্লেগের সময় কলকাতায় ছিলুম। আমার ভগ্নীপতি ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুজ্জে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, রোজ সন্ধ্যাবেলা এক পেগ করে ব্র্যাণ্ডি খেলে প্লেগের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা যাবে। সেই অবধি আমার ব্র্যাণ্ডি খাবার অভ্যাস জন্মাল।

হেমচন্দ্র বসুমল্লিকের তখন অবস্থা খুব খারাপ। রাজেন মুখুজ্জে তাঁর ডকের কোম্পানি হাতে নিয়ে তার খুব উন্নতি করলেন। এবং আমার ধারণা হেমের ছেলে নীরদ মল্লিক এই



ডকের প্রসাদে এবং তার দাদামহাশয়ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ ক'রে কলকাতার ভিতর একজন মস্ত বড়মানুষ হয়ে উঠেছিল। এই সব শৌখিন বড়মানুষের দলে মিশে আমি দেদার গার্ডেন-পার্টিতে যাই। প্রধানতঃ দমদমে মন্মথ মিত্রের বাগানবাড়িতে। সেখানে নাচ-গান হত। আমি বিবাহের পর এ দল ত্যাগ করি।

গোবরডাঙার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখুজ্জের সঙ্গে আমার বহুকাল থেকে পরিচয় ছিল। তাঁর দুটি ব্যসন ছিল, শিকার এবং সেতার। সুরবাহার তিনি চমৎকার বাজাতেন। আমি কোনো বাঙালীর কাছে এ রকম সুরবাহার শুনিনি। দক্ষিণী সুর তিনি পছন্দ করতেন না। তিনি খুব বড় বড় সুরবাহারীর কাছে সুরবাহার শুনেছিলেন। রামপুর থেকে আগত উজির খাঁ'র বাজনা বোধ হয় শুনেছিলেন। তার বাজনা শুনে জ্ঞানদাপ্রসন্নের মাইনে-করা ওস্তাদ মাথার পাগড়ি খুলে তাঁর পায়ের কাছে রাখলেন। এবং ক্রমে কলকাতার সমস্ত ওস্তাদেরা তাই করলেন। জ্ঞানদাপ্রসন্নের ইচ্ছে ছিল তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা, কিন্তু তিনি মুসলমান ওস্তাদের পাদোদক পান করতে স্বীকৃত হলেন না। হয়েছিলেন শুধু খড়দার জনৈক বিশ্বাস। বিশ্বাস মহাশয় যে কি রকম বাজিয়ে হয়েছিলেন তা আমি জানিনে। সেকালে গল্প শুনেছি যে, রামপুরেব নবাব ভালো ভালো বাজিয়েদের সপ্তক করতেন। অর্থাৎ সাত দিন ধরে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখতেন, খালি তাদের যন্ত্র সঙ্গে দিয়ে।

এই শৌখিন জমিদার-মণ্ডলী যে-সব মেয়েদের বাগান-পার্টিতে আনতেন, তাঁরা দেখতে মোটেই সুন্দর ছিলেন না—একটি ছাড়া। কিন্তু তিনি বাঙালী ন'ন, লক্ষ্ণৌয়ের মেয়ে। নাচ শিখেছিলেন কল্কা ও বিন্দা মহারাজের কাছে। এ ভ্রাতৃযুগল ছিল অদ্ভুত নাচিয়ে। তার উপর মেয়েটি ছিল অতি মিষ্টভাষী। তিনি আমার পূর্বপরিচিত। নাটোরের মহারাজার বাড়িতে একটি জলসাতে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তার বহুকাল পরে আর একটি জলসায় তাঁর পুনরায় সাক্ষাৎ পাই। তিনি তখন জব্বলপুরের রাজা গোকুলদাসের পুত্র জীবনদাসের নোকরি করতেন। তিনি আমাকে হঠাৎ ডেকে পাঠান এবং আমার কাছে তাঁর নতুন চাকরির ঘোর নিন্দা করতে থাকেন। জীবনদাস নাকি গানবাজনার কিছু বোঝেন না, তবে তিনি তাঁকে হাজার টাকা ক'রে মাইনে দেন ব'লে বাধ্য হয়ে চাকরি করতে হয়। আমার প্রতি তাঁর একটু প্রীতি ছিল। নাটোরের বাড়ীর একটি জলসায় আমি ও আমার বন্ধু দীপনারায়ণ সিং দুজনে পরামর্শ করে দেদার শ্যাম্পেন খাই। তার ফলে আমার নেশা হয়েছিল। সে সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হেম মল্লিকের কোনো কারণে মনোমালিন্য ঘটে। আমি তখন ক্রমান্বয় রবীন্দ্রনাথকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম যে, হেমের কোনো দোষ নেই। অতিরিক্ত শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ করবার ফলে আমি যে বারবার এক কথা বলছি, সে জ্ঞান আমার

ছিল। তার পাশের ঘরে বাইজিরা ব'সে ছিল। আমি মধ্যে মধ্যে সেই ঘরে যাচ্ছিলুম। এবং এই লক্ষ্ণৌয়ের মেয়েটির সঙ্গে অন্য কথাবার্তাও বলছিলুম। রবীন্দ্রনাথ সেটি লক্ষ্য করেছিলেন। এ মেয়েটির প্রতি আমার প্রীতি ছিল। তার নাম বোধ হয় মাহেমুনীর। আমি তাকে দশ বৎসর পরে যখন দেখি, তখন তার চেহারা সমানই ছিল। শরীর লম্বা, ছিপছিপে এবং মুখটি গোল। বিবাহের একবৎসর পর একবার লক্ষ্ণৌ যাই। এবং দু-চারটি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ চক দেখতে যাই। কিন্তু মাহেমুনীরদের বাড়ি খুঁজে পাইনি। লক্ষ্ণৌ চকে অসংখ্য গলিঘুঁজি আছে। আমার সঙ্গী ভদ্রলোকেরা সেই সব গলিঘুঁজিতে ঢুকে গেলেন! এবং বহুকষ্টে আমি তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করলুম। লক্ষ্ণৌয়ের চকের মত এ রকম বিশ্রী জায়গা আমি আর কখনো দেখিনি।

ইতিমধ্যে আমি একবার নাটোরের মহারাজার সঙ্গে মাস তিনেকের জন্য সিমলে পাহাড়ে যাই। সেখানে লক্‌কড়বাজারে একটি বড় বাড়িতে আশ্রয় নিই। লক্‌কড়-বাজার থেকে শ্রীধর ব'লে একটি ভদ্রলোক প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের কাছে আসতেন, এবং আমাদের সঙ্গে নানা বিষয় আলাপ করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি তিনি কমিস্যরিয়েটে চাকুরি করতেন। তিনি Murree, চাম্বা, এই সব জায়গায়ই বাস করতেন। কমিস্যরিয়েটে কখনো কখনো দেদার টাকা রোজগার করতেন। বিশেষতঃ তিনি যখন বড়সাহেবের প্রিয়পাত্র হতেন। সে দেশের পার্বত্য রাজারা তাদের রাজ্য থেকে বড় বড় গাছ কেটে জলে ভাসিয়ে দিত, সেই সব গাছ অনেক সময় শ্রীধর নিজের ব'লে দাবি করতেন। বহুবার পার্বত্য রাজাদের মামলায় তাঁর বিচার হয়েছে এবং বহুবার তিনি সেসব মামলায় জিতেছেন। শ্রীধরের ধরনধারন দেখে ও কথাবার্তা শুনে মনে হত যে তিনি একজন মহা ফক্কড়। এর প্রমাণ পাওয়া গেল নাটোরের মহারাজা লক্‌-কড়বাজার থেকে উঠে গেলে। একটি প্রকাণ্ড বাড়িতে তিনি উঠে যান। শ্রীধর সঙ্গে সঙ্গে সেই বড় বাড়িতে এলেন। এবং প্রায় বছরখানেক ধ'রে সেইখানেই রইলেন। একথা আমি চলে আসবার পরে শুনেছি। আমার বিশ্বাস তিনি লক্‌কড়বাজারে গোটা দশেক টাকা মাইনের কোন কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি জনাইয়ে। তিনি ছেলেবেলায় কোনো একটি পল্টনের সঙ্গে কুচ করতে করতে এতদূরে এসে পড়েন। এবং সেই অবধি এই আর্ম্মিতেই রয়ে গিয়েছিলেন। আমি তখনো অবিবাহিত শুনে তিনি বলেন—গত্তা বহুতরা কান্তা স্বল্পা তিষ্ঠতি শর্বরী। যৌবনের আগেই বুক ফুলিয়ে হিজলি যেতে হয় আর ছ' মাস পর চিঁচিঁ করে সেখান থেকে ফিরতে হয়। বছরখানের পরে শ্রীধর সিমলা থেকে নাটোরের মহারাজার সঙ্গে কলকাতায় ফিরে এলেন। দিন পনেরো বাদে তিনি



লক্‌কড়বাজারে যার আশ্রয়ে থাকতেন তার সঙ্গে জনাইয়ে ফিরে গেলেন। তারপর তার সম্বন্ধে আমি আর কিছু শুনিনি।

সিমলে শহরে আমি নাটোরের মহারাজার সঙ্গে একটি বাড়িতে গিয়েছিলুম। বাড়িটি দেখে ফিরে আসি। ফিরি ছোট সিমলার পথে। সেই পথেই আমি কাশ্মীরের মহারাজার বাড়ি দেখি। সে সময় দিঘাপতিয়ার রাজা সেখানে ছিলেন। এবং তিনি চংদার বলে' একটি প্রাইভেট সেক্রেটারি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে বেচারাকে তিনি পায়ে হাঁটিয়ে সমস্ত সিমলা শহর ঘুরিয়ে বেড়াতেন। নিজে অবশ্য রিকশয় চড়তেন। একদিন দিঘাপতিয়া চংদারের সঙ্গে আমাদের বড় বাড়িতে আসছিলেন। পথিমধ্যে আমি এবং নাটোরের মহারাজা আমরা অবশ্য তাঁকে প্রতিনমস্কার করলুম। কিন্তু মহারাজার একটি আমলা পৈতে হাতে ক'রে দিঘাপতিয়াকে আশীর্বাদ করলেন। এর দরুন দিঘাপতিয়ার রাজা ভয়ানক চটে যান। কি ব্যাপার হয়েছিল তা পরে বলব।

দিঘাপতিয়া আস্তে আস্তে আমাকে বললে—নাটোরের এক-এক আমলা অতি অভদ্র। নাটোরের সঙ্গে ভটচাজ ব'লে একটি আমলা ছিল। ভটচাজ যে আশীর্বাদ করেন সে আমার চোখে দেখা। নাটোর বাড়ি ফিরে এসে ভটচাজকে ডাকালেন। এবং তাকে বললেন—তুমি তো ছেলেবেলা থেকে আমাকে নাস্তিক করবার চেষ্টা করেছ। ভট্‌চায বল্লে—এ কথা ঠিক। এবং তাতে আমি কৃতকার্যও হয়েছি। কিন্তু ব্রাহ্মণ এবং তেলীতে একটা প্রভেদ আছে, তাতো আপনি স্বীকার করেন না। মহারাজা বললেন—তুমি দূর থেকে কি করে টের পাও যে, কে ব্রাহ্মণ আর কে নয়? ভট্‌চায হেসে বললে—দূর থেকেই টের পাওয়া যায়। গায়ের গন্ধে।

তারপর শুনলুম নাটোরের সঙ্গে দুটি ছোকরা ছিল, তারা অদৃশ্য হয়েছে। পরের দিন একজন ফিরে এল। তাকে সকলে 'মাস্টার মাস্টার' বলে ডাকত। মহারানীর সে একরকম আত্মীয় ছিল। দেশে ম্যালেরিয়ায় ভুগত, তার অনুরোধে মহারাজা তাকে সিমলায় নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে আবিষ্কার করা গেল যে, সে সবরকম নেশা করে। মহারাজাকে ফ্রেঞ্চ পড়ায় এই কথা সে প্রচার করে বেড়াত। অপর ছোকরাটির নাম হরে, সে গাইতে পারত, নচাতে পারত দুদিন পর সেও দেখা দিলে।

সে ফিরে এলে মহারাজা নাটোর তাঁর দরওয়ানকে দিয়ে তাকে কেলু-গাছে বেঁধে চাবকাতে হুকুম দিলেন। শুনলুম যে জার্মান সাহেবদের একটি আমলা 'ধুত্তোর আপিস' বলে এই ছেলেদের সঙ্গে জুটে গিয়েছিল, সে তার খুশিমত আপিস যেত আসত। সেও বাঙালি। লোকটি শুনেছি খুব কার্যক্ষম ছিল, এবং অত্যন্ত দুশ্চরিত্র। তার জার্মান মনিবদের সেও অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল।

মাস্টারমশায় এবং হরের কুকীর্তি সিমলে সুদ্ধ প্রচার হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে

নগেন্দ্রবাবু এবং তাঁর এক বন্ধু নাটোরের বাড়ি এসে উপস্থিত হলেন। নগেন্দ্রবাবু তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন এই ব'লে যে, তিনি সিমলের কোনো একটি আপিসে আমলাগিরি করেন। তিনি গানবাজনা ভাল ক'রে শেখেন নি, তবে গানবাজনা ভালোবাসেন ব'লে কিছু কিছু চর্চা করেছেন। তিনি অশিক্ষিত ব'লে হারমোনিয়মের কোনো সুর দিলে তার সঙ্গে গলা মেলাতে পারতেন না।

সিমলেতে কাঞ্চী বলে' একদল গাইয়ে বাজিয়ে আছে। তাদের শুনি মেয়েরা বড় হ'লে বেশ্যাবৃত্তি করে। আমি এ দলের গানবাজনা শুনেছি। একটি পাঁচ-ছ' বছরের মেয়েকে তার বাপ-মা আমাদের কাছে গান শোনাতে নিয়ে এসেছিল। নগেন্দ্রবাবু সেদিন উপস্থিত ছিলেন। মেয়েটি প্রথমতঃ একটি ওস্তাদী ধরনের গান গাইলে। পরে একটি লাউনী গাইলে। দুটি গানই ভালো।

আমি ডিসেম্বর মাসে সিমলা ত্যাগ করে কলকাতায় ফিরে আসি। যে এক বৎসর কলকাতায় ছিলুম, সে বৎসর যে আমি কি করেছিলুম তা মনে নেই। তবে ১৮৯৭ সালে জুন মাসে যে ভূমিকম্প হয়, সে সময় আমি নাটোরে প্রাদেশিক সম্মিলনে উপস্থিত ছিলুম তা মনে আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে আমি কোনো একটি বাংলা মাসিক পত্রিকায় এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখি, তাতে সিমলা ও নাটোর দুই জায়গারই বর্ণনা ছিল। বোধহয় সংগীত সম্বন্ধেই বেশি কথা ছিল।

পরের বৎসরের প্রধান ঘটনা আমার বিয়ের সম্বন্ধ। ইতিমধ্যে সরলা দেবী চৌধুরানী একদিন আমাকে বলেন যে, আপনি ইন্দিরা দেবীকে বিবাহের প্রস্তাব করলে তিনি রাজি হবেন। আমি সেই কথা শুনে বিবাহের প্রস্তাব করি। তিনি প্রথমে বলেন যে, মাকে জিজ্ঞাসা করে তবে বলব। তারপর তিনি মাকে জিজ্ঞেস করে বললেন যে, তাঁর মত আছে। এ প্রস্তাব বোধহয় ১৮৯৮ সালে শেষাশেষি হয়। তারপর আমি মাসখানেকের জন্যে আমার বন্ধু দীপনারায়ণ সিং-এর কাছে ভাগলপুরে থাকতে যাই। ফিরে এসেও নানা পারিবারিক ঘটনাচক্রে বিবাহ স্থগিত থাকে। অবশেষে ১৮৯৯-এর ফাল্গুন মাসে আমাদের বিবাহ হয়।

এর পরে কায়স্থ বড়মানুষদের গার্ডেন-পার্টিতে যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলুম। জাহাজে যে দুই লোকের কাছে কিছু টাকা ধার নিয়েছিলুম তাদের টাকা টমাস কুক কোম্পানিতে জমা দিয়ে দিলুম। তাদের ভিতর একজন কলকাতায় এসেছিল এবং তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

আমি বিলেত যাবার পূর্বে কিছুদিনের জন্য এ্যটর্নির আফিসে আর্টিক্লড্ ক্লার্ক ছিলুম। তাই ফিরে এসে ব্যারিস্টারের পুরো ফী দিতে হয়নি। হাইকোর্টে enrolled হবার পর থেকে ব্যারিস্টারই হয়ে রইলুম এবং আজ পর্যন্ত তাই আছি। প্রথম প্রথম বালিগঞ্জ সর্কুলর রোডের



একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতুম। তারপর বছর দেড়েক পরে সেখান থেকে 'কমলালয়' নামে নিজের বাড়িতে উঠে গেলুম। যেটা বর্তমানে ব্রাইট ষ্ট্রীটের মোড়ে নদীয়ার মহারাজার বাড়ি। বহু বৎসর সেখানেই ছিলুম। কেবল কলকাতার সুবিধে হবে না ভেবে ১৯০৪ সালে বছর খানেকের জন্যে দার্জিলিঙে বসবাস করতে যাই। সেখানে জলাপাহাড়ের 'একটি ছোট বাড়িতে বেশ গুছিয়ে বসেছিলুম, এমন কি নেপালী ভাষা শিখতে আর আদালতে যেতেও শুরু করেছিলুম। কিন্তু আমার স্ত্রীর শরীর খারাপ হল বলে ১৯০৪-এর শেষে কলকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হলুম। তাঁর এই অসুখের জের অনেকদিন চলে, এবং হাওয়া-বদলের জন্য মাঝে মাঝে তাঁকে শিমুলতলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাতে হত। অবশেষে বাপ-মায়ের সঙ্গে রাঁচি গিয়ে এবং কবিরাজী চিকিৎসা করে তাঁর স্থায়ী উপকার হল।

বাড়ি ভাড়া দিয়ে দার্জিলিং গিয়েছিলুম ব'লে, ফিরে এসে শ্বশুরবাড়ি ১৯নং স্টোর রোডেই ( অধুনা বিরলা পার্ক ) উঠলুম। কিছুকাল পরে আমার সেজদাদা কুমুদনাথ ও ডাক্তার ভাই সুহৃৎনাথের সঙ্গে একত্রে ২৫নং ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে উঠে গেলুম। আমার সেজদাদা তখন নববিবাহিত, স্বনামধন্য হোমিওপ্যাথ ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের মেয়ে রাধারানী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন। সুহৃৎনাথের স্ত্রী নলিনী দেবী দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে, ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। আমার দিদি প্রসন্নময়ী দেবী এবং ভাগ্নী প্রিয়ম্বদা দেবীও আমাদের সঙ্গে থাকতে এলেন। বাড়িটা বেশ বড় ছিল, এবং আমরা সেখানে ভালোই ছিলুম। তবে বড় পরিবার হ'লে রোগশোকের অভাব থাকে না। এখানে থাকতে থাকতে প্রধান দুর্ঘটনা হল আমার ভাগ্নীর একমাত্র সন্তান তারাকুমারের অকালমৃত্যু। তাতে দীর্ঘকাল আমাদের পরিবারে সকলের মনের উপর ছায়া পড়েছিল। ব্যারিষ্টারি আরম্ভ ক'রে অবধি, কতকটা আমার স্ত্রীর অসুখের দরুন, আর কতকটা নিজের অক্ষমতার দরুন আমার প্র্যাক্‌টিস্ বেশি হয়নি। কখনো টাকা ধার করতুম, কখনো অন্য কোনো কাজ করতুম। প্রথমে ল-কলেজে প্রফেসারি করি। তারপর দক্ষিণেশ্বরের রিসিভরি করি। তারপর আমি গোপাললাল শীল এস্টেটের রিসিভরি পাই। এই সব মিলে আমাদের একরকম চলে যেত। কমলালয় বাড়ির একদিকের অর্ধেক জমি আমার সেজদাদা কিনে নিজের বাড়ি তৈরি করেন; অপর দিকের কিছু জমি ম্যুনিসিপ্যালিটি কিনে নেয়। তাতেও কিছু টাকা হাতে আসে। সে বাড়ি মধ্যে মধ্যে ভাড়া দিতুম, সে কথাও পূর্বেই বলেছি। কিছুদিন আমি ঠাকুর-এস্টেটরও ম্যানেজার হই। তাই সবসুদ্ধ নিয়ে সে সময় আমার আয় মন্দ ছিল না। আর ১৯১৬ সালে সুহৃৎনাথ যুদ্ধের কাজ নিয়ে বিলেত যান ও তার পরিবারবর্গ আমার কাছে রেখে যান ব'লে বাড়িতে লোকও মন্দ ছিল না। ১৯১৮-য় তিনি দেশে ফেরেন ও কিছুদিন পরে সপরিবারে অন্য ভাড়াবাড়িতে উঠে যান। বলতে ভুলে গেছি যে, ইতিপূর্বে বাড়ি মেরামত করতে দিয়ে

১৯১১ সালে আমরা শিলং বেড়াতে যাই। যেদিন যে সময়ে ফিরে আসি, ঠিক তার আগেই কমলালয় বাড়ির গাড়িবারান্দা ধ্বসে পড়েছে শুনলুম। সুতরাং সে সময় আবার কিছুদিন আমার শ্বশুরবাড়ি ১৮নং স্টোর রোডে থাকি।

এর আগেই, আমরা যেরকম বাড়ি পেয়েছিলুম, তার তুলনায় ঘরে ঘরে পাথর বসিয়ে ও বাইরে ফুল কাটিয়ে তার চেহারার অনেক উন্নতি করেছিলুম। দেড়তলা বাড়িখানি দেখতেও বড় সুন্দর ছিল। বিশেষতঃ গাড়িবারান্দার পাথর-বসানো উঁচু সিঁড়ি যেন ছবির মত দেখাত।

এই কমলালয় বাড়িতেই সবুজ পত্রের উদ্‌গম হয়, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। আমি আর মণিলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিলাইদহে পদ্মানদীর উপর তাঁর বোটে একবার কিছুদিন থাকতে যাই। তিনি বিকেলে চরে বেড়াতে যেতেন। এই বোটেতেই মণিলালের কাছে শুনি যে রবীন্দ্রনাথ বলেন আর লিখবেন না, তিনি ঢের লিখেছেন। তা' শুনে আমি তাঁকে বলি যে বহু লোক আপনার বয়সে কেবল লিখতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রমথ যদি একটা কাগজ বার করে, তাহলে আমি তাতে লিখতে রাজি আছি। আমি বললুম—আপনি যদি লেখেন তাহলে আমিও কাগজ বার করতে রাজি আছি। তিনি বললেনে—অন্য কোনো কাগজে আমি লিখব না।

মণিলালের একটি কাগজ ছিল। কথা ঠিক হয় যে, সেই কাগজই সবুজপত্র নামে ছাপানো হবে। এই নতুন নাম আমিই দিয়েছিলুন। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে, ১৩২১ সালের বৈশাখ সবুজপত্র প্রথম বেরোয়।

এই কাগজ উপলক্ষ্য করে যে সব যুবক কমলালয়ে আমার কাছে আসতেন, তার মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় ও তার ভগ্নীপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন। আর ছিলেন ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখুজ্জে, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, প্রবোধচন্দ্র ও সুবোধচন্দ্র চাটুজ্জ, অমিয় চক্রবর্তী, বরদাচরণ গুপ্ত, হারীতকৃষ্ণ দেব, সুধীন্দ্রনাথ সিংহ, সতীশচন্দ্র ঘটক, মানিকচন্দ্র দে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশানন্দ ভট্টাচার্য, সোমনাথ মৈত্র প্রভৃতি। এঁরা সকলেই যে সবুজপত্রে লিখতেন তা নয়, কিন্তু সকলেরই লেখাপড়ার দিকে মন ছিল। ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে অনেকেই নাম করেছেন। অতুলচন্দ্র গুপ্ত ও ধূর্জ্জটিপ্রসাদ লিখতেন এবং আজও লিখছেন। সতীশ ঘটক লিখতেন, কিন্তু অকালে মারা গেলেন। বরদা গুপ্ত দুই একটি প্রবন্ধ লিখে আর লেখেন নি। সুনীতি চাটুজ্জে তাঁর বিলেতের অনেক ভ্রমণবৃত্তান্ত এই কাগজে লিখেছিলেন। সে বিষয় তিনি আজও লিখছেন। অমিয় চক্রবর্তী তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলেন, এবং তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের অনেকদিন অবধি পরিচয়। তিনি যখন চিঠি লিখে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে আসেন, তখন একেবারে একটি বালক দেখব তা ভাবিনি। সেই বয়স থেকেই তিনি



চিঠি লিখে দেশবিদেশের লেখকদের সঙ্গে আলাপ করতে আরম্ভ করেছিলেন। সুরেশানন্দ আমাদের স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, একটা দূরসম্পর্কও তার সঙ্গে ছিল। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর বাঙ্গালে ভাষায় কবিতা লিখতেন।

এই সবুজ সভার সভ্যগণ হপ্তায় একদিন করে আমার কাছে বিকেলে আসতেন। কিঞ্চিৎ জলযোগের পরে কখনো সাহিত্যালোচনা, কখনো সংগীতচর্চা হত। শুনতে পাই যে, সত্যেন বোস এস্রাজ বাজাতেন, কিন্তু আমি তাঁর এসরাজ কখনো শুনিনি। মন্টু (দিলীপ রায়) যখন আসত, সে গান করত। বাড়ির মেয়েরাও কখনো কখনো করত।

লেখবার মধ্যে আমিই নিয়মিত মাসে মাসে সবুজপত্রে লিখতুম। আর রবীন্দ্রনাথ বোটে আমাদের যে কথা দিয়েছিলেন, সে কথা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর লেখা অঙ্গীকার না করে' সবুজপত্রের কোনো সংখ্যাই বেরোয়নি। এবং তাঁর এই সাহচর্য না পেলে যে আমি ছয় মাসও সবুজপত্র চালাতে পারতুম না, সেকথা বলাই বাহুল্য। সবুজপত্র আকারে চৌকোনা ও ছোটই ছিল আট-ন ফর্মার বেশি নয়। তার মলাটের রঙ বাস্তবিকই সবুজ ছিল, এবং তার উপরে একটি কালো তালপাতার নক্‌শা থাকত। সেটি নন্দলালের হাতের আঁকা। কাগজ এবং ছাপা ভালোই ছিল। সবুজপত্র ছবি এবং বিজ্ঞাপন-ফুট ছিল। তদানীন্তন অন্যান্য মাসিক পত্রিকার সঙ্গে তাই ছিল তার প্রধান প্রভেদ। প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির রচনায় যাতে একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ রক্ষিত হয়, সম্পাদক হিসেবে আমি বরাবর সেই চেষ্টাই করে এসেছি। এবং আজ পর্যন্ত যে সাহিত্যসমাজে সবুজপত্রের সুনাম আছে, সে ঐ কারণেই।

আমাদের লেখকসংখ্যা অতি কম ছিল, সে কথা আগেই বলেছি। আমার যতদূর মনে পড়ে, সেকালের প্রসিদ্ধ লেখকের ভিতর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একটি রচনা বেরিয়েছিল। বাকি অধিকাংশ লেখকই নতুন, এবং সবুজপত্রের হাতে গড়া। এই লেখক-বলের অভাবের শেষাশেষি সবুজপত্র নিয়মিত প্রকাশ করতে পারিনি। মণিলাল রবীন্দ্রনাথকে বলে যে, আপনার সবুজপত্রের লেখার সঙ্গে অন্য লেখার এত তফাত যে অন্য কোন কাগজে আপনার লেখা দিলে তার তেমন সমাদর হবে না। রবীন্দ্রনাথ এ কথা সমর্থন করেন।

যতদিন সবুজপত্র বেঁচে ছিল ততদিন পর্যন্ত একভাবেই চলেছিল। তার পর গতপূর্ব যুদ্ধের সময় জিনিসপত্র সব আক্রা হওয়ায় আমি সবুজপত্র বন্ধ ক'রে দিতে বাধ্য হই। প্রথম পর্যায় সবুজপত্র ১৩২১ থেকে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত একাদিক্রমে চলে। তারপর ক' বছর বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় পর্যায় ১৩৩০ থেকে ১৩৩৪ পর্য্যন্ত চালিয়েছিলুম। তারপর আর পারলুম না। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের জন্মমাস বৈশাখ থেকে আরম্ভ ক'রে বছর আষ্টেক সমানে চলে। দ্বিতীয়

পর্যায় আমার জন্মমাস শ্রাবণ থেকে আরম্ভ করি; পর বৎসর ভাদ্র, তার পরের বৎসর আশ্বিনে বেরোয়, তার পরে বন্ধ হয়ে যায়। এই মাসের হেরফেরের দরুন বৎসরেরও হেরফের হয়ে যায়। অর্থাৎ ১৩৩০ থেকে ১৩৩৪-এর মধ্যে মাত্র দু' বৎসরেরই বেরোয়।

দ্বিতীয় পর্যায় সবুজপত্রের খরচা সুধীন্দ্র দত্ত দেন। তার থেকেই বোঝা যাবে যে, এতদিনেও সবুজপত্র নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেনি। কিছুদিন পর সুধীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিলেত চলে যান। তারপর তিনি ক্যালিফোর্নিয়ায় যান, ক্যানাডাতেও যান। সুধীন দত্ত খরচা দেওয়া বন্ধ করলেন, তাই সবুজপত্রও বন্ধ হয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

# সম্পাদকীয়

## সঙ্গীত ও সঙ্গত

পাড়ায় পাড়ায় আজকাল উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত-সম্মেলন হচ্ছে। এ-খবরে এ-ধারনাই ক্রমে আমার মনে বদ্ধমূল হচ্ছিল যে কলকাতা বোম্বাই-চিত্র-সঙ্গীতকে অতি দ্রুত প্রতিবাদ করতে পারল। ইন্টালী পাড়ার সম্মেলনের মণ্ডপে উপস্থিত হয়েই আমি বুঝতে পারলাম, এখানে আর যারই অনুষ্ঠান হোক ইটালিয়ান ঝিঁঝিটের সুর ভজন হবেনা। মঞ্চসজ্জার মনোরম ভঙ্গীটিই শ্রোতার মনকে খাঁটি বাঙালিয়ানার অভিষিক্ত করে আসন্ন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সজাগ করে তুলছিল।

বাঙালীর সঙ্গীত বলতে যে কীর্ত্তন ছাড়া ঘরোনা আর কিছু আছে তা ইতিহাস সন্ধান করলে হয়ত পাওয়া যাবে। ইতিহাসের অরণ্যে প্রবেশ না করে সোজাসুজি একটা বিষয় বলা যায় যে বাংলাদেশ কোনো দেশের সঙ্গীতকেই অশ্রদ্ধা করেনি। ইদানিং যেমন হাউইয়ান-সঙ্গীত বোম্বে-মারফৎ পেয়ে গ্রহণ করতে চেয়েছিল, তেমনি গত শতকে রোমান-গীতি-সংস্কৃতির খানিকটা আমেজ প্রথম রোমান্টিকরা খানিকটা কণ্ঠস্থ করে নিয়েছিলেন। শিল্প-লক্ষ্মী চঞ্চলা। তার মানে ভোক্তার মনই চঞ্চল। আরো স্থূল-ভাবে বলতে গেলে, মানুষের চঞ্চল স্নায়ু-মণ্ডলী ইন্দ্রিয়গুলোকে নিত্য-নূতন পথের দিকে উৎসুক করে তোলে। ফলে ভালোলাগার কোন বস্তুই বেশীদিন কারো ভালো লাগে না। কাজেই ঘরোনা শিল্পের ঘর ভাঙতে সুরু করে।

তবু ধ্রুপদ-খেয়ালের এম্নি শান-বাঁধান শক্ত মজবুত ঘর ছিল যে আজও তাদের শ্রী-মাধুর্য্য ভারতীয় সাঙ্গীতিক মনকে আকর্ষণ করতে পারে। ঠুংরীর ঘর টুনকো, পাঁচমিশেলি মসলায় তৈরী, তবু শক্ত দুটি ইমারতের পাশাপাশি বসবাস করে অদ্যাবধি তা গা-বাঁচিয়ে রেখেছে। তা-ও আরামের আবহ তৈরী করে তোলে। ভজন, টপ্পার সে সুদিন নেই -- তাদের মন্দির-মহল ভগ্ন-প্রায়। কীর্ত্তনের আসর এখনও জমে। কিন্তু প্রাক্-ধ্রুপদ এই কীর্ত্তন-সঙ্গীত ঘরোনা সঙ্গীত-প্রিয়দের নিকট পরিত্যক্ত।



কীর্ত্তনের অঙ্গ যে মৃদঙ্গ তার প্রলম্বিত বোল ঘরোনা-সঙ্গীতের তবলার বোলে প্রবেশ করলেও কীর্ত্তনের আত্মস্থ সুরের উত্থান-পতন-ভঙ্গী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে 'জয় জয়ন্তী' রাগিণী ব্যতিরেকে অন্য কোথাও প্রবেশ-পত্র পায়নি। একটি রাগিণীতে কীর্ত্তনের সমগ্র সুর-লহরী সংক্ষিপ্তীকৃত করা যায় কিনা এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত সন্দেহ ঘোরতর।

কীর্ত্তন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-স্রষ্টাদের কাছে কেন বর্জিত? তা প্রাচ্যের ও দক্ষিণের ধ্রুবপদী সঙ্গীত বলেই কি? মুঘল আমলেই কিন্তু বর্জ্জনের প্রস্তাবটি সুরু। তার আগে পাঠান আমলেও এ-সঙ্কীর্ণতা ছিলনা। কীর্ত্তনের অঙ্গ থেকে যেমি ভঞ্জন জন্ম নিয়েছে, তেমি আমীর খসরুর 'কাওয়াল'-গান আবির্ভূত হয়েছে। ধ্রুপদের সঙ্গে কীর্ত্তন অক্লেশে পাশাপাশি বসবাস করতে পারত কিন্তু খেয়াল-ভঙ্গীর সঙ্গে তার বনিবনাও হল না। অসহযোগিতা যে পক্ষ থেকেই আসুক অসহযোগী ধারা তাদের অঙ্গেরই অন্তর্গত ছিল বলে মনে করব। তলিয়ে দেখলে মনে হবে যে সঙ্গত-ওয়ালার কারণেই খেয়ালের জন্ম—সঙ্গীত-যন্ত্রের সঙ্গে বাক্-যন্ত্রের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল তারই ফলে এবং যান্ত্রিকের জয়ে প্রাচীন কীর্ত্তনকে পাশে সরে যেতে হল। খেয়াল আবির্ভূত হল। কণ্ঠের আশ্চর্য্য কসরৎ শেখান হ'ল খেয়ালে। যাতে 'তবলিয়া' গায়ককে জব্দ করতে না পারে অধিকন্তু গায়কই সঙ্গত-ওয়ালাকে স্তব্ধ করে দিতে পারে, এমন সব ফিকির-ফন্দী আমদানী করা হল খেয়ালে। কিন্তু আমি বলি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি সঙ্গীত? সঙ্গীরা কি পরস্পর বিবদমান হয়ে লোক হাসায় না? রথের আর জগন্নাথের রেষারেষিতে রথ-যাত্রা হয়না—দর্শককে ভগ্নমনোরথে ফিরে আসতে হয়। খেয়ালে জনসাধারণের অনুৎসাহ এই কারণে। ভারতীয় ওস্তাদদের আজ কথাটি ভেবে দেখা দরকার। তাঁদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, কণ্ঠের ঔৎকর্ষ এবং লয়সৌষ্ঠব অনুকরণীয় কিন্তু এই সব কর্ম্ম-কৃতি কার জন্যে? আর কারো জন্যে না হোক, সঙ্গীতের জন্যেই ত—সঙ্গত-যুদ্ধে কণ্ঠকে অবতীর্ণ করানো নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত নয়। সর্ব্ব মানবের শ্রুতিই তাতে উদ্বেজিত হয়।

## আর্ট-কলেজের চিত্র-প্রদর্শনী

আর্ট-কলেজের শিক্ষার্থীদের চিত্র-প্রদর্শনী দেখে একটা দুঃখের কথাই বারবার মনে পড়েছে। ভেবেছি: এতো ভালো যদি এতো বেশি শিক্ষার্থী না আঁকতেন তাহলে হয়ত কৃতী চিত্রকররা মাত্রাধিক্যের দরুণ বেকার-দশায় পড়ে দুর্ভোগ ভুগতেন না। চিত্রাঙ্কণে যতোগুলো পদ্ধতি দেশে-বিদেশে অনুসৃত, গঠনাত্মক শিল্পে যে-যে রীতি প্রবর্ত্তিত তার প্রত্যেকটি অঙ্গ সুঠাম ভঙ্গীতে এবারকার প্রদর্শনীতে উপস্থিত দেখতে পেলাম। এমন কি হেনরী মুরের ভাস্কর্য্যের ভাবানুকরণেও আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন কতিপয় শিক্ষার্থী। ভারতীয় প্রত্ন-ইতিহাসের শিল্প-পদ্ধতিকে অন্তত পোড়া-মাটির শিল্পে গ্রহণ করবার বৃত্তিটির পেছনেও মূর্য়ীয় অন্তঃকরণই সজাগ। শিক্ষার্থীদের মনে এই সৎ-বৃত্তির প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন অধ্যাপক ও যশস্বী ভাস্কর শ্রীযুক্ত প্রদোষ দাশগুপ্ত। তাঁকে আমরা অভিনন্দিত করছি। তিনি 'তরু-বৃক্ষে'র মর্ম্মটি ভাস্কর্য্যে আমদানী করতে পেরেছেন—রূপ-দর্শনের মূলকথা যা।

কিন্তু সবচাইতে বেশি আনন্দিত হয়েছি প্রাচীর-চিত্র 'বৃক্ষ-রোপণ'-টি দেখে। একে বিরাট শিল্প

বলা যায়। আয়তনে, শ্রম-প্রয়োগে এ যেমন বহুলতার ধ্রুব ভাব জন্মায়, তেমি মনে হয় এ-বুঝি ধ্রুপদী শিল্প—ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্প—যা বাঘগুহায় পাওয়া যায়, অজন্তায় প্রথম নয়। যাতে আলো ছায়ায় বস্তুর ডৌল প্রকাশিত তেমন চিত্র প্রথম বাঘগুহাতেই অঙ্কিত হয়েছিল। বাঘগুহার চিত্র-পদ্ধতিই অজন্তায় পুলকেশীর আমলে অনুসৃত দেখা যায়। সে-চিত্রে পার্শী-ভঙ্গী ভারতীয় ভঙ্গীতে মিশ্রিত হয়ে আমাদের মনে শিল্পী হোগার্থের উক্তিই প্রতিধ্বনিত করে। হোগার্থ বলেছিলেন: "My Picture is my Stage". সত্যি, ধ্রুপদী-চিত্র দেখা আর নাট্যরস ভুঞ্জন করা একই কথা। বাঘগুহার চিত্রাবলী অবলোকনে আমরা ভরতনাট্যের দৃশ্যাবলীই উপভোগ করি। তেমি পুলকেশীর দরবার-কক্ষ আমাদের ভারত-রাষ্ট্র-নাট্যের একটি দৃশ্য দেখায়। পারস্য নৃপতি ভেট পাঠিয়েছেন ভাট মারফৎ পুলকেশীকে, এখবরটি পুলকেশীর রাষ্ট্রের শিল্পীবৃন্দ আমাদের জানিয়ে গেছেন। তেমি বাঘগুহার চিত্রাবলী আমাদের বলে দিচ্ছে যে গুপ্ত-যুগে উলঙ্গ আদিবাসীদের ভেতর সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচার একটি উল্লেখ্য ঘটনা ছিল। তেমি 'বৃক্ষ-রোপণ' আজ কবি-সংস্কৃতি থেকে রাষ্ট্র-কর্ম্মে নীত হয়েছে। তার মূল ঋক্‌বেদী কাব্যলোকে। সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে অদ্যাবধি যে সংস্কৃতি ভারতীয় চিত্ত অধিকার করে আছে তাকে চিত্রায়িত করবার দৃষ্টি, দক্ষতা, জ্ঞান, বর্ণ-প্রলেপ-পদ্ধতি চারটি শিক্ষার্থীর করায়ত্ত দেখতে পেলাম। একে বিরাট শিল্প ছাড়া অন্য কিছু সংজ্ঞাদ্বারা বোঝান যায়না।

এম্নি আরেকটি আধুনিক বিরাট চিত্র (সম্ভবত রুশীয় চিত্র-প্রদর্শনীর প্রেরণায়) তেল-রঙা-চিত্রগৃহের প্রদর্শনীতে দেখতে পেলাম। শহরের শড়ক-নির্ম্মাণের বিরাট ব্যাপারটি উক্ত চিত্রে উজ্জ্বল মহিমায় উদ্ভাসিত। কিন্তু নির্ম্মাতা এখানে শিল্পী-সমবায় নন, ব্যক্তি-বিশেষ। তাই ব্যক্তির কৃতিত্বই শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করে নিচ্ছি। সে-সঙ্গে স্বীকার করছি বাঙালী শিল্পীদের মনে গুপ্ত-যুগের ঐতিহ্যকে। তেল-রঙের সবচাইতে ভালো চিত্রটির বিষয় সাঁওতাল পল্লী। সাঁওতালের জীবনের বর্ণাঢ্য আকর্ষণ আজও বাংলার শিল্প-মানসিকতার গায়ে প্রচুর হাওয়া দেয়।

চিত্র-প্রদর্শনীগুলো সর্ব্বদাই একটি প্রশ্ন মনে জাগ্রত করে তোলে। প্রশ্ন: এই দক্ষ চিত্রকরদের জীবিকার কি সংস্থান আমরা করছি? ঠাকুর-বাড়ি আর নেই, বুর্জ্জোআ ইংরেজরা আর নেই—কে ছবি কিনবেন? যুদ্ধোত্তরকালে ইংল্যাণ্ডে যখন শিল্পীদের জীবিকা-সংস্থানের সঙ্কট উপস্থিত হল, তখন "The Council for the Encouragement of Music and the Arts" নামক একটি রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক শিল্পীদের 'কাজগুলো' সংগ্রহ করে মস্ত-মস্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। জনসাধারণের মধ্যে যাতে ব্যাপক-ভাবে শিল্প-তত্ত্ব প্রচারিত হয় তারি জন্যে এই রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা। ভারত-রাষ্ট্রও অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন কিন্তু সাম্প্রতিক শিল্পীদের সমাদর বা খবর এখন পর্যন্ত সেখানে নেই। তবে শিল্প-শিক্ষকরা আদৃত হয়েছেন। কিন্তু শিক্ষকদের যে শিষ্যের কাছে পরাজয় ঘটে গেছে এ-খবর এখনও দিল্লীতে পৌঁছুতে পারেনি।

## কথা-সাহিত্যের ফসল

গ্রীক আমলে পরস্পর সম্পর্কিত নাটক-ত্রয়ীর নাম ছিল ট্রিলজি। তরুলতার নিয়মে মানব জীবন বা ঘটনা বিসর্পিত হতে পারে ডালপালা মেলে দিয়ে। তার প্রত্যেকটি ডাল বা শাখা



একটি তরুণ তরু বা তরুণী লতা বলে মালুম হবে একটু নজর দিলেই। এই একটু নজরেরই কারবার করতেন প্রাচীন পাশ্চাত্যের নাট্য-শিল্পীরা। ইদানিং এই শিল্প-রীতি সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্য শাখায় ছড়িয়ে পড়েছে দেখা যায়। বাঙালী শিল্পীরা পাশ্চাত্যের পশ্চাতে থাকতে চান না সুতরাং বাংলা উপন্যাসেও আমরা একাধিক 'ট্রিলজি' দেখতে পাই। শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'নূতন ফসল' একটি ট্রিলজি। 'ময়ূরাক্ষী' একটি বৃহৎ নদীর শাখানদী।

গ্রীকরা ত্রিলজিতে ত্রিলজস বলে তিনটি বিচার ধারা বোঝাতেন। ত্রিরজস্ বলে তিনটি চলচ্ছক্তি বোঝাতেন হয়ত সে-যুগের শিল্পীরা। তাঁরা তা না বোঝালেও শিল্পীর হাত থেকে রসপিপাসুরা তা-ই পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। সচল জীবনের গতি বাস্তবিক তিনটি, সৎ, অসৎ ও সহজ। তার উপর শিল্পীর বিচার-বুদ্ধির যাচাই-বাছাই চলে, পক্ষপাতিত্ব চলে। সরোজকুমার নায়িকা বিনোদিনীকে তিনটি পথে ঘুরিয়েছেন এবং লেখক হিসেবে তিনি নিজে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন 'সহজ' পথের প্রতি। এখানে ষোল আনা বাঙালিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কথা-শিল্পী। ঐতিহ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এ-যুগের বাংলা কথা-সাহিত্যকে। বিনোদিনীর জীবন-নাট্যে ত্রিস্রোতার কোন্‌টি সহজ তার বিচার সুরু হয়েছে 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসটিতে।

চাষী বৌ বিনোদিনী 'ময়ূরাক্ষী'তে সৎ পথে বিচরণ করতে চেয়েছিল কিন্তু তদঞ্চলের সমাজ তাকে সৎ থাকতে দিলে না। এক্ষেত্রে শংৎচন্দ্র বা তারাশঙ্কর যে ধরণের চিত্র পরিবেষণ করেছেন তার চাইতে খুব বেশী অন্যরকম চিত্র যে সরোজকুমার পাঠকের মনে তুলে ধরতে পেয়েছেন তা নয়। তবে চাষী-সংলাপে তিনি উক্ত দুজন কৃতীপুরুষের চাইতে অধিকতর দক্ষ এবং সে-জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতর বলেই মনে হয়। তাছাড়া চাষীদের জীবন-দর্শন সম্পর্কেও সরোজকুমার পূর্ব্ব-সূরীর চাইতে বেশী ওয়াকিবহাল। চাষীর চিত্তবৃত্তিতে মৃত্যুবাদের একটি বীজ উপ্ত আছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র চাষী জীবনের ছবি শস্যের গাছের মতোই এক একটি ঔষধি। তারা বাঁচেনা, বাঁচতে জানে না—বাঁচতে পারে না মাথা উঁচু করে বিরাট মাহাত্ম্যে। সরোজকুমার চাষী জীবনের এ সূত্রটি জানেন মনে হল। তাই তিনি ময়ূরাক্ষী বর্ণনায় বলতে পেরেছেন: "আবার দহের কাছে যেন স্থির যৌবনা বিলাসিনীর মতো, তার নিস্তরঙ্গ নীলাভ কালো জল মৃত্যুর মতো লোভার্ত্তকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।" ধরার মেয়ে সীতাকে যেমি ধরিত্রী ডেকেছিল তেমি প্রত্যেক চাষী-জীবনে মৃত্যু হাতছানি পাঠিয়ে দেয় এবং তারা অবলীলায় মরে যায়। কিন্তু ময়ূরাক্ষীর বিনোদিনী সীতা নয় হয়ে বেঁচে গেল। একটি জাতিও ঠিক এম্নি বাঁচে—পুরোপুরি চাষী না হলেই বাঁচে। নাগরিক সংস্কৃতির পথ যেদিন থেকে খোলা হল, সেদিন থেকেই চাষী-জীবনের মৃত্যুর পাশ থেকে মুক্ত হল মানব-জীবন। জীবনেরও গতি-পথ তৈরী হল দুটি। যে-জাতি মাঝামাঝি পথটি নিল অথবা তৃতীয় পথ, সে-ই রামের মতো মরেও মরল না।

'ময়ূরাক্ষীতে' সরোজকুমার যতোটুকু বেশি নতুন ফসল তুলতে পেরেছেন ততোটুকু তার নাগরিক চিত্ত-বৃত্তির দরুণ। চাষী সংস্কৃতিতে অনুরক্ত মনই চাষী সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ ছবি পরিবেষণ করতে পারেন বলে যে একটি ভ্রান্ত মতবাদ কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছে তা যে একান্ত মিথ্যা তা সরোজকুমারের মতো বাঙালী ঔপন্যাসিকরা চাষী-জীবনের অন্তরঙ্গ আলেখ্য

তৈরী করে দেখাতে পারছেন। বাংলা উপন্যাস শরৎচন্দ্রের পর এটুকু নতুন ফসল গ্রামাঞ্চল থেকে নাগরিক পাঠকের জন্যে তুলে এনেছে বলা যেতে পারে।

কাজটি কঠিন সন্দেহ নেই। কঠিন এই জন্যে যে নাগরিক চিত্তবৃত্তি নিয়ে গ্রামীন জীবনের প্রতি তাকাতে গেলে অনেক সময় জবরদস্তিতে গ্রামীন চরিত্রে নাগরিকতার ছায়াপাত করা হয়ে থাকে। সরোজকুমারও যে তা করেননি এমন নয়। তারই কুফল 'তারাপদ'-চরিত্রটি। গ্রামের ছেলে হয়েও ও গ্রামে মানায়নি—মানায়নি এই জন্যে যে লেখক তাকে নগর-সভ্যতার বক্তা করে তুলেছেন। নগরকে যদি তারাপদর সত্তায় বিসর্পিল দেখান হত তাহ'লে তার বক্তৃতার হাত থেকে ময়ূরাক্ষীর চাষীদের মতো পাঠকরাও রেহাই পেতেন।

## 'এই গঙ্গায়…'

এই গঙ্গায় একদা ভারতের দিবাকর ডুবেছিল—অজস্র-কিরণ মালায় তার আগ্নেয় আবির্ভাবও হয়েছিল দু'শ বছর পরে এই গাঙ্গেয়-ভূমিতে। তাঁরা পঞ্চাশোর্দ্ধে সবাই আজ আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে একে-একে ডুবে যাচ্ছেন। শ্রদ্ধেয় বিপিন গাঙ্গুলীকে এবার বিদায় দিলেন বঙ্গভূমি। তাঁকে মনে পড়ে আমাদের শরৎচন্দ্রের-স্মৃতির সঙ্গে। ত্রিশের আন্দোলনের আগে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেম আমরা—কে আপনার পথের দাবীর সব্যসাচী—তিনি কি মানব রায়? শরৎচন্দ্র তখন 'বিপিনদা'-কে দেখিয়ে বলেছিলেন; "শুধু মানব রায় কেন, এঁরা কম কিসে?"

সত্যি কেউ কম নন, এঁদের সবার আগুনেই শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী নির্ম্মিত। এঁরা বাংলার ক্ষাত্র সন্তান। রাষ্ট্রকে পরের হাতে তুলে দেবার ব্যথা যাঁর বুকে প্রথম বাজত তিনিই ক্ষত্রিয়—ভারতরক্ষার ভার তিনিই হাতে তুলে নিতেন। এই ক্ষত্রিয়ত্বের ঐতিহ্য বাঙালীর চাইতে আর কেউ বেশি ইতিহাসে দেখাতে পেরেছেন বলে আমি অন্তত মনে করিনে। রক্ষা-ধর্ম্মের সঙ্গে আত্মত্যাগ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় রক্ষা-নীতির মূলতত্ত্ব তা-ই। এ-নীতিও বাঙালী ব্যতিরেকে দলে-দলে আর কেউ দেখাতে পারেননি।

তেমন দলেরই নেতা ছিলেন 'বিপিনদা'। এঁরা চলে যাচ্ছেন, আর আমার মনে হচ্ছে যে বাঙালীর চরিত্র থেকে ভালোবাসার প্রবৃত্তি বুঝিবা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

# সাহিত্য-পরিচয়

**উত্তর মেঘ।** শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। মিত্রালয়ঃ ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট: কলিকাতা। মূল্য দু'টাকা।

নতুন জ্যোতিষ্ক আবিষ্কারে বিজ্ঞানীর যে আনন্দ গদ্য ছন্দে লেখা এই কাব্যখানি হাতে পেয়ে ও আস্বাদন ক'রে রসিকের ঠিক সেই আনন্দই হবার কথা। গদ্য ছন্দ জিনিসটি কুড়ি-একুশ বছর হ'ল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অসংকোচ স্বীকৃতি আর ফলে বাংলা-সাহিত্য যথাযোগ্য মর্যাদা পেলেও আজ পর্যন্ত তার নূতনত্ব কিছুই ঘোচে নি। রবীন্দ্রনাথের পরে সার্থক গদ্য কবিতা লিখেছেন যাঁরা একটি আঙুলের কয়েকটি পর্বেই তাঁদের নাম গণনা শেষ হ'য়ে যায়। লিখেছেন অনেকে। কিন্তু সাধারণসূত্র হিসেবেই বলা যায়, বাঁধাধরা ছন্দে অসাধারণ দখল না থাকলে গদ্যেই কবিতা লেখবার দুঃসাহস করা সমীচীন নয়। সমর সেন সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যতিক্রম। প্রেমেন্দ্র মিত্র—ছন্দেও তাঁর বড়ো মিষ্ট হাত—কয়েকটি আশ্চর্য কবিতা লিখেছিলেন গদ্যেই। হাঁ, সুকবি মনীশ ঘটককেও স্মরণ করতে হয়, যদি বা 'শিলালিপি' লেখকেরই অনাদরে আর যুগের রসবিমুখতায় কালস্রোতের পিছনের কোনো ঘাটে তলিয়ে গিয়ে থাকে। শক্তিমান কবি প্রমথনাথ এতদিন গদ্যে লেখেন নি, হয়তো গদ্যেও যে কোনো একরকম কবিতা হ'তে পারে যে কথাটা রবীন্দ্রনাথের মহদৃষ্টান্ত আর নিপুণ ওকালতি সত্ত্বেও মেনে নিতে পারেন নি। এমন যথার্থ সুরসিক ব্যক্তি তো আমাদের জানাশোনার ভেতরেই আছেন যিনি রবীন্দ্রনাথের কিছুই পড়তে বাকি রাখেন নি, আর কোনো কিছু নিয়েই বিস্ময়ের সীমা পান নি—তবে ঐ গদ্য ছন্দটি ওটা যেন কেমন! রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কাজেই বলবার কিছুই নেই। তবে সোনার পাথর বাটি! ওর উপভোগটা তেমন সত্তার তলস্পর্শ করে না বা সহসা হৃদয় দুলেও ওঠে না। কী আর বলা যাবে? ভালো বা মন্দ লাগা যুক্তির বশীভূত নয়। তবে একদিন এমন লোকেরও গদ্য ছন্দ ভালো লেগেছে; তর্ক যখন হার মেনেছে তখন শনৈঃ শনৈঃ, অলক্ষ্যে, অজ্ঞাতসারে বস্তু নিজগুণেই নিজেকে হৃদ্‌গত ও আদৃত ক'রে তুলেছে। অনুমান করি, প্রমথনাথের ক্ষেত্রেও এই প্রক্রিয়ার অন্যথা হয়নি; আর যেহেতু তিনি স্বভাবতঃই ক'ট নূতন আঙ্গিকের নূতন রসাস্বাদনেই নিবৃত্ত হ'তে পারেন নি, নূতন সৃষ্টিতে তিনি নেমে পড়েছেন। আর আমাদের বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই, রবীন্দ্র সৃষ্টির পাশাপাশি রবীন্দ্রোত্তর এই সৃষ্টিকে রাখলেও এ কুণ্ঠিত, লজ্জিত, ম্লান হয় না। এই কাব্যের ভাষা ও ছন্দ রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দের ধারাবাহী। কিন্তু ভাষা ও ছন্দেই কাব্যের পরিচয় ফুরোয় না। এই কবির ব্যক্তিসত্তা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিসত্তা থেকে স্বতন্ত্র (না হ'লে তো ঐ মহান্ কবির ছায়াই বলতাম, নূতন কবিসত্তা বলতাম না)—সেই স্বাতন্ত্র্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম সুর (তাকে বিশ্লেষণ করা বড়োই দুরূহ) প্রমথনাথের প্রত্যেক পদে আর প্রত্যেক বাক্যবিন্যাসে পরিস্ফুট। খুব স্থূলভাবে বলতে গেলে, রবীন্দ্রানুগামী হ'য়েও প্রমথনাথ অতীন্দ্রিয়ের 'অন্ধ' অনুভবী নন, মিষ্টিক কবি নন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের উপাসনাই হয়তো শেষ একটি সীমায় উপনীত হ'য়ে অপ্রত্যাশিত এবং অনির্বচনীয়ের বিষয়ে সচেতন হয়;

সে রকম কীট্‌সের হ'য়ে থাকবে, যে কারণে তরঙ্গভয়াল সমুদ্র-মাঝখানে হঠাৎ পরীলোকের ঝরোখা খুলে গেছে ; বিদ্যাপতিরও হ'য়ে থাকবে, যে কারণে বলতে পেরেছেন—

জনম অবধি হম রূপ নেহারনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয় রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

প্রমথনাথও এই রকমটাই অনুভব করেন সন্দেহ নেই। তা ব'লে রবীন্দ্রনাথ বা শেলি বা ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ যে অর্থে অতীন্দ্রিয়-দ্রষ্টা, রহস্যের রস-স্রষ্টা, প্রমথনাথ বা বিদ্যাপতি বা কীট্‌স্‌ সে অর্থে নয়। কালিদাস নয়। ইন্দ্রিয় দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে যে সৌন্দর্য ধারণ করা যায়, যে সৌন্দর্য ধারণ করা যায় না, তাই বিস্ময়ের শেষ হয় না, পুলকের ইতি হয় না—এঁরা সকলে তারই কবি। স্বেচ্ছায় অজানা অচেনা অধরা অনির্বচনীয়ের মায়ামুগ্ধ বাউল বা কবি এঁরা কেউ নন।

অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয়-আরাধনায় ইন্দ্রিয়-বিষয়ও বাদ দিতে হয়নি, সে কথা আজ আর বলাই বাহুল্য। অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রেই তিনি বলেছেন—

অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।…
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।

যাক্‌ সে কথা। বাংলা-কাব্য-সাহিত্যের রসগ্রাহী পাঠক-সমাজ, অতি অল্পই তাঁদের সংখ্যা, তাঁদের হয়তো অজানা নেই যে, প্রমথনাথ সৌন্দর্য্যসম্ভোগের কবি, রূপরাগের কবি। সংযম না হ'লে সম্ভোগ হয় না, ভোগ বা দুর্ভোগ হতে পারে ; কাজেই কলাকার হিসাবে তিনি যে সংযমী তাও বলাই বাহুল্য। আর সেই রূপ-উপাসনা, সেই সৌন্দর্য দর্শন, তারও নিঃসীম সীমায় এসে বিদ্যাপতির মতো তাঁকেও বলতে হয়েছে—রবীন্দ্রোত্তর যুগে কলম ধরার জন্যে বার বারই বলতে হয়েছে—

নয়ন না তিরপিত ভেল।…
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

অথবা রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়—

তার অন্ত নাই গো অন্ত নাই
যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।

'আমার' বলাতেও ক্ষতি নেই, কারণ, প্রেমিক-প্রেমিকার আনন্দময় আলিঙ্গনের পরমমুহূর্তে কোন্‌টি কার অঙ্গ তাও তো বলা যায়, 'আমার' 'তোমার' সমার্থক হ'য়েই পড়ে।

এ কথাও যাক্‌। আমাদের মনে হয়, বাঁধাধরা ছন্দ থেকে গদ্য ছন্দের একটা বিশেষ দাবি আছে; সেটা হ'ল এই যে, আবেগই যথেষ্ট নয়, চাই মনন। অবশ্য, শ্রেষ্ঠ কবিতা হ'তে আসলেই নেপথ্যবর্তী আর একাগ্র-নিবিড় মনন না হ'লেই চলে না ; শুধু আবেগে উচ্ছ্বাসে পরমোৎকর্ষের সীমায় কখনোই পৌঁছনো



যায় না। কিন্তু ধারাবাহী ছন্দের সুবিধা এই যে, শ্রেষ্ঠ কবিতা না হোক, ভালো কবিতা, মধুর বা মনোহারী কাব্য, মনন বাদ দিয়েও সৃষ্টি করা যায়। গদ্য ছন্দে যেন তা যায় না। বাঁধাধরা ছন্দ না থাকাতে সংগীতে যেটুকু ('অনেকটাই') কম পড়ে, চিন্তা দিয়ে, চরিত্র দিয়ে, জীবনদর্শন দিয়ে সেটা পুষিয়ে দিতে হয়। উত্তম মেঘে সেই নিবিড় গভীর এবং সময়ে সময়ে তীব্র ও বেদনাতুর মননের পরিচয় পদে পদেই পাওয়া গেছে। প্রথম কবিতাটির আরম্ভেই তো তার স্বাক্ষর—কোথায় সেই যুগছন্দ, যুগের সমগ্রচিত্ত, তার সমস্ত সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও ব্যর্থতা যার অবলম্বনে নূতন মহাকাব্য রূপে প্রকাশ পাবে? আমরাও জানিনে সে ছন্দ কী বা কোথায়, গদ্য ছন্দই সে ছন্দ কিনা, তবে একাগ্র সন্ধানের ব্যাকুলতা ও আর্ত্তি এই কবিতার পদে পদে আশ্চর্য ভাষা পেয়েছে যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—

বাঁধ ভেঙে গিয়েছে,
মানস সরোবরে ঢুকে পড়েছে
বন্যার জল।

জীবন্ত উপমার পর উপমায় (অর্থাৎ সীমালি'তে নয় সীমলে) যুগের এই ভগ্নসেতু বন্যা-বিপ্লবের উত্তাল উন্মথিত দিশাহারা চলচ্ছবি কবি আমাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাতে কী যুগ আজ এসেছে, তার পরিচয়ের ফাঁকে ফাঁকেই কী যুগ গিয়েছে, তারও অপূর্ব ইঙ্গিত ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক মেরেছে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে। সমস্ত কবিতাটিই আশ্চর্য ; ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতির কোনো সার্থকতা নেই।

আশ্চর্য এই কবির প্রকৃতিচিত্র। বিচিত্র-বর্ণাঢ্য, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম-রেখা-বিন্যাস-নিপুণ তুলি হাতে নিয়ে চিত্রকর এর বেশি বিস্ময় কিছু সৃষ্টি করতে পারবেন না। আর, প্রকৃতিকে সম্বোধন ক'রে কবি স্বচ্ছন্দেই বলতে পারেন—

আমার মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।…
তুমি আমারি যে তুমি আমারি!—কবিমনের এই মাধুরীটুকুই আমাদের

উপরি পাওনা, স্বভাবতঃই ন্যায্য পাওনা'র চেয়ে তার মূল্য অনেক বেশি। যেমন—

সদ্যস্নাতা শিউলি ফুলের স্পর্শের মতো এই সকালটি।
হাওয়াতে দুলছে কাশের চামর,
আলোতে উড়ছে হাঁসের সারি,
টুপ টুপ করে মনের মধ্যে ঝরছে মালতী ফুল…
কিরাতের মতো মেঘের ছায়া নেমেছে অরণ্যে,
নেমেছে পাহাড়ের গায়ে…
মেঘের ফাঁক দিয়ে আলোকের পাশা
ছড়িয়ে গোল ছক-কাটা বনভূমে,
বেজে উঠল ঝরণার ঝন্‌-ঝনা।

এ যে অপরূপ ছবি আর ছবির চেয়ে অনেক বেশি। 'দল্‌মা পাহাড়' কবিতাটিতে আবেগের তারতম্য-ভেদে ছন্দ, গদ্যছন্দ আর 'গদ্যতর' ছন্দ সবই সার্থকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। শেষ কবিতাটি বাদ দিয়ে এই কাব্যে মোট ষোলোটি গদ্যছন্দের কবিতা আছে ; এই কাব্যসুন্দরীকে ষোড়শী বা সপ্তদশী যাই বলা যাক এর লাবণ্যোদ্ভাসিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নখশিখ বর্ণনা দেব না। আজ এই যুগ-সন্ধ্যায় এখনো রসাত্মক কাব্যকে কাব্য ব'লে বোধ করবার ও আদর করবার লোক যদি বাংলাদেশে থাকেন কেউ-কেউ, এ কাব্য অবশ্যই তাঁদের আদরণীয় হবে ; তাঁরা অবশ্যই বলবেন, জীবন সম্পর্কে আর আর্ট সম্পর্কেও সমস্ত মতবাদের তর্কাতর্কি ঢাকের বাদ্যেরই তুল্য, থামলেই মিষ্টি—সার্থক জীবন আর কাব্য নিজেই নিজেকে পরিচিত করে, নিজেই নিজের প্রমাণ। মতবাদের উদ্ভব পরে ; কোনো মতবাদে মেপে-জুখে, ওজন ক'রে, জীবনের বা আর্টের ইতিও করা যায় না। হাঁ, প্রমথনাথের এ-কাব্যে প্রকৃতি ছাড়া আর-একজন

আছেন, তিনি প্রিয়া, তিনি মানবী, তবে তিনিও যে প্রকৃতি থেকে কম রহস্যময়ী, কম অনন্তরূপিনী তা নয়। এবং বিশ্বপ্রকৃতিতে আর মানবীতে অনেক সময় অনেক লুকোচুরি-খেলা, একে দিয়ে ওকে আবরণ, ওর ছলে এর বর্ণন—তাও আছে। এ হিসাবে পৃথিবী আর সমুদ্র নারী ও নরের ভাবগূঢ় প্রতীকই বলতে হয়—

সূর্যডোবা দিগন্তে যেখানে
গোধূলির জাল ছিঁড়ে ছুটেছে আঁধারের কৃষ্ণসার মৃগযূথ
সেখানে নিবদ্ধ তোমার দৃষ্টি,
আর আমি—অদৃষ্টের সঙ্গে দ্যূতখেলায় মগ্ন,
কেন তরঙ্গের পাশা গড়িয়ে ছুটে যায়
বিপুল ব্যর্থতার অভিমুখে।

'ভাঙা পেয়ালা' বা 'আমি টাইম-টেব্‌ল পড়ি', বা 'উত্তর মেঘ' প্রেমের কবিতা। সুর নানাবিধ, বিষয়বস্তু এক। স্বয়ংবরা 'দময়ন্তী'র আত্মকথায় যে নারীর কথা সে চিরন্তনী। আশ্চর্য লেগেছে একটি কবিতা—'বলো, বলো, বলো'—সবটা উদ্ধৃত ক'রে দিলে তবেই বোঝানো যেত তার ভাষার সৌন্দর্য, তার ভাবের সৌকুমার্য, তার ভঙ্গীর বিস্ময় সৃষ্টি, তার আদ্যন্তধ্বনি ত রসধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। কিন্তু, তা তো সম্ভব নয়। শুধু বলি সেই ব্যক্তিই কবি যে এমন ক'রে বলতে পারে—

আমি কবি নই, শিল্পী নই, আমি অন্তর্যামী নই,
আমি মনের কথা মুখে শুনতে চাই।
মনের কথাকে দেখতে চাই
তোমার দুই চক্ষে প্রস্ফুটিত
মানসসরের অন্তর্ভেদী উদ্ধত, উদ্‌গত,
উদ্যত পূর্ণায়ত পদ্মটির মতো
তোমার সর্বাঙ্গে প্রতিফলিত
তোমার বসনে ভূষণে,
নয়নে অধরে,
তোমার সীঁথির সীমান্ত থেকে
পায়ের নখাগ্র অবধি……
প্রসারিত পদ্মপত্রের মসৃণ নীলিমায়
সেই কথাটি টল্‌মল করে উঠুক
তোমার অন্তরের শক্তিনিঃসৃত
একটি মাত্র মুক্তার মতো।
বলো, বলো, বলো।

কবির এই ভাগ্য, এই দায়, এই গৌরব—তাকে নিজের কথাও বলতে হবে, বিশ্বের কথাও বিশ্বের হ'য়ে উচ্চারণ করা চাই; প্রেমিক আর প্রিয়া দুই হ'য়ে দু'জনেরই গভীর মনের কথা খুলে বলতে হবে; প্রেরণা যে'ই দিক, ভাষা দিতে হবে কবিকেই। তাই প্রমথনাথকে ফিরে আমরা ওই কথাই বলতে পারি—

বলো, বলো, বলো।

আর বেশি বিজ্ঞোচিত সমালোচনার ভান করব না। ভাষা-ভাব-ভঙ্গী বিষয় ও ছন্দ—এগুলির উৎকর্ষসীমার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা আমাদের সাধ্যাতীত। এই কথাই সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের লেখনী নিরস্ত হওয়ার পর এমন উৎকৃষ্ট কাব্য আমরা বহুদিন পড়িনি।

কানাই সামন্ত

[ এই রচনার অনেকগুলো মতামত পূর্ব্বাশা সমর্থন করেন না—সম্পাদক ]


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

কবিতা

অজিত দত্তের
পুনর্ণবা
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
নীল আকাশ
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
সংকলিতা
দু'টাকা

প্রাচীন প্রাচী
দেড় টাকা

নতুন দিন
আট আনা

যৌবনোত্তর
আট আনা

তিনজন আধুনিক কবি
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
সৈনিক
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
স্বাক্ষর
এক টাকা

গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
মহানগর
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
পরশুরামের কুঠার
দু'টাকা

শুক্লাভিসার
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ফসল
এক টাকা চার আনা

ঋণ
দেড় টাকা

নতুন দিনের কাহিনী
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
পতাকা
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
খেলনা
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র
নয়নচারা
দেড় টাকা

উপন্যাস

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
বৃত্ত
এক টাকা বার আনা

মরামাটি
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

দিনান্ত
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

কল্লোল
পাঁচ টাকা

কস্মৈদেবায়
( ২য় সং )
তিন টাকা

রাত্রি
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

মৌচাক
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
তিনরঙা
দু'টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

PURVASA :: PAUSH-1360 :: REGD. NO. 1512

# মৌচাক

"শ্রীযুক্ত প্রমথ ভট্টাচার্য্য একাধারে কবি, প্রবন্ধ লেখক ও ঔপন্যাসিক। আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি দীর্ঘ উপন্যাস। একটি সংসারকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসটি ভর্গনাভের সূক্ষ্ম জালের মতোই কৌশলে বয়ন করা হইয়াছে। কাহিনীর প্রথম অংশটি পাঠ করিতে করিতে কখনো মনে হইয়াছে, লেখক বোধ করি 'মিনিক' কিন্তু আখ্যানভাগের রোমাঞ্চে লেখক যে দুর্বলতা অতিক্রম করিয়া সত্যিকারের রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সংসারে যে মৌচাকের মৌমাছির মতোই আপন জনকে জড়াইয়া বাস করিতে চায়, তারপর একদিন প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নে সেই নিজের সৃষ্ট মধুভাণ্ডের মধ্যেই পাখা ভিজিয়া পা ভাঙিয়া জড়াইয়া পড়ে, অবশেষে কালের দীর্ঘনিঃশ্বাসে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়, এই মর্মকথাটিকে অতি সুন্দরভাবে রূপায়িত করিয়াছে। কিন্তু এই হারাইয়া যাওয়ার মধ্যেও যেন সব শেষ হইয়া যায়না। তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে কত অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও মধুর বেদনা। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে কত তিতু আর 'মিতু' শতদলে বিকশিত হইয়া ফুটিতে পারেনা—কোন্ ঐতিহাসিক তাহার সন্ধান রাখে? এই বিয়োগান্ত উপন্যাসটি সাহিত্যের ভাণ্ডারে মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

"মৌচাকের ছাপা ও বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর হইয়াছে।" যুগান্তর। ২৭.২.৪৯

শ্রীপ্রমথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক: পূর্বাশা লিমিটেড

মৌচাক

দাম: পাঁচ টাকা

Printed & Published by Satya Prasanna Dutta, Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

PURVASA :: PAUSH-1360 :: REGD. NO. 1512

"শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য একাধারে কবি, প্রবন্ধ লেখক ও ঔপন্যাসিক। আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি দীর্ঘ উপন্যাস। একটি সংসারকে কেন্দ্র করিয়া এই উপন্যাসটি ঊর্ণনাভের সূক্ষ্ম জালের মতোই কৌশলে বয়ন করা হইয়াছে। কাহিনীর প্রথম অংশটি পাঠ করিতে করিতে কখনো মনে হইয়াছে, লেখক বোধ করি 'সিনিক'; কিন্তু আখ্যানভাগের শেষাংশে লেখক সে দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিয়া সত্যিকারের রসসৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। আমাদের বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সংসারী যে মৌচাকের মৌমাছির মতোই আপন জনকে জড়াইয়া বাস করিতে চায়, তারপর একদিন প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নে সেই নিজের সৃষ্ট মধুভাণ্ডের মধ্যেই পাখা ভিজিয়া, পা ভাঙিয়া জড়াইয়া পড়ে, অবশেষে কালের দীর্ঘনিঃশ্বাসে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—এই চিন্তাধারাটি অতি সুন্দরভাবে রূপলাভ করিয়াছে। কিন্তু এই হারাইয়া যাওয়ার মধ্যেও যেন সব শেষ হইয়া যায়না। তাহার মধ্যে লুকাইয়া থাকে কত অতৃপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা ও মধুর বেদনা। বাংলা দেশের ঘরে ঘরে কত 'তিতু' আর 'মিতু' শতদলে বিকশিত হইয়া ফুটিতে পারেনা—কোন্ ঐতিহাসিক তাহার সন্ধান রাখে? এই বিয়োগান্ত উপন্যাসটি সাহিত্যের ভাণ্ডারে মূল্যবান গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইবে।"

"মৌচাকের ছাপা ও বাঁধাই প্রথম শ্রেণীর হইয়াছে।" যুগান্তর। ২৭.২.৪৯

প্রকাশক :

দাম : পাঁচ টাকা

Printer & Publisher by Satya Prasanna Datta Purvasa Ltd., 84 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta

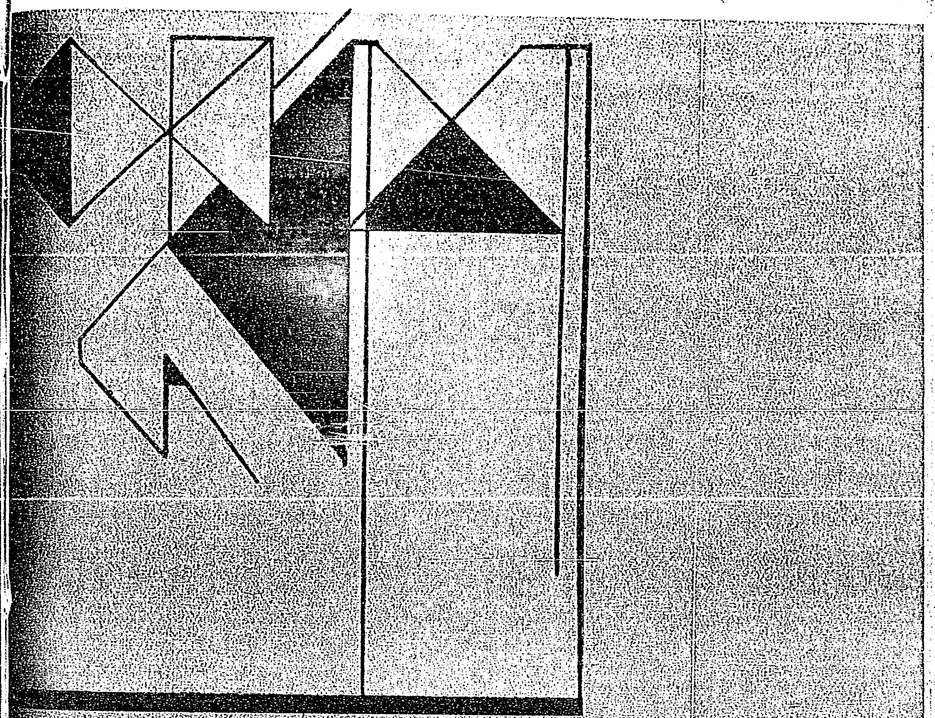

# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০

দশম সংখ্যা : মাঘ

সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত

দাম আট আনা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


# টুকরো বর্ম্মা... (৩৪)

ডিলান টমাসকে একবার জিগগেস করা হয়েছিল: 'কবির স্বকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি করে শোনানোর সার্থকতা কোথায়? তাতে কি কবিতার অর্থবোধ করা সহজ হয় কিছু?' ডিলান টমাস উত্তরে বলেছিলেন, 'লোকটা দেখতে শুনতে কী রকম সেই কৌতূহল থেকে আসেন আর কি সবাই! ভাবেন—ছোটখাট্টো গোলগাল মতন ঐ লোকটার ভাঁড়ামি দু'দণ্ড দেখাই যাক না। কবিতার মানে পরিষ্কার হল কি হল না, তাতে কি যায় আসে! কবিতা শুনতে তো আসেন না কেউ'...ঠাট্টা করে বললাম অবশ্য কথাটা...'তা, আপনি নিজে কেন আবৃত্তি করেন আপনার লেখা?' উত্তর: 'শব্দের ধ্বনি শুনি। কবিতাটি লেখার সময়কার অভিজ্ঞতা মনে পড়ে!'...কলকাতা সেনেট হলে দু'দিনব্যাপী এবার যে আধুনিকপন্থী প্রবীণ ও নবীন কবিদের সম্মেলন হয়ে গেল তাতে আশ্চর্য জনসমাগম হয়েছিল। এ থেকে কী সিদ্ধান্ত করা যায়? ডিলান টমাস ঠাট্টা করে যা বলে ছিলেন সেটাই কি সত্যি? কারো কারো তাইই ধারণা। অর্থাৎ তাঁদের মতে এমন অনুষ্ঠানের শ্রোতারা ঠিক শুনতে আসেন না, দেখতে আসেন। সেনেট হলে প্রতিদিন আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা কাল যাঁরা স্থির হয়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে—দাঁড়িয়েই হয়তো বেশি—আবৃত্তি শুনেছেন তাঁরা বোধ করি এহেন মন্তব্য শুনে আত্মশ্লাঘা বোধ করবেন না। পরপর দু'দিনে ৭০ জন কবির অন্তত দেড়শো কবিতা আবৃত্তি শোনাটা ধৈর্য এবং সহ্যগুণের প্রায় অবিশ্বাস্য পরিচয় সন্দেহ নেই। নিখুঁত যদি ব্যবস্থা হয়—তাহলেও প্রত্যেকটি আবৃত্তির প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নেই। তাছাড়া এত বৃহৎ কবিসম্মেলনও বাঙলাদেশে এই যখন প্রথম—তখন দেখার কৌতূহল, শোনার আগ্রহের চাইতে বেশি হলেও হতে পারে। কিন্তু আধুনিক কবিতা কী করে পড়তে হয়, অন্তত লেখকরা স্বয়ং কীভাবে পড়ার জন্য লেখেন, সেটা অন্তত এ ধরনের সম্মেলন থেকে জানা সম্ভব। এবং সেনেট হলের সম্মেলন এদিক দিয়ে সার্থক হয়নি। পুস্তকাকারে কবিতা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাবান শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও যখন এরকম ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে আধুনিক কবিতা মাত্রেই ছন্দহীন, গদ্যের অপকীর্তি; তাতে না আছে ভাব, না আছে সুর, না আছে শৃঙ্খলা—তখন আধুনিক কাব্যের আবৃত্তি শোনানোর প্রয়োজন আছে মানতেই হয়। প্রবীণ কবিদের মধ্যে যোগ দিয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, অচিন্ত্যকুমার, সঞ্জয় ভট্টাচার্য। শান্তিনিকেতন থেকে এসেছিলেন অশোকবিজয় রাহা এবং সুনীলচন্দ্র সরকার। এই সম্মেলনের আনন্দ-স্তুতি এবং বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা অনেকেই ভুলতে পারবেন না॥

উনিশ শতকের মনীষী বাঙালী রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিত' প্রায় ৪০ বছর পরে তৃতীয় সংস্করণ হল। 'ভারতে ব্রিটিশ অভ্যুদয়ের পর কলিকাতায় নব্য বাঙলার সামাজিক জীবনে যে সকল বিবর্তন দেখা দিয়াছিল'—তাঁর পুরোভাগে ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। 'তৎকালীন বঙ্গসমাজ বিকাশের পরিণত পরিচয় পেতে হলে তাঁর জীবনচরিত অপরিহার্য: "এই গ্রন্থকে সমসাময়িক নব্যবাঙালীর একখানি প্রামাণিক অমূল্য সামাজিক ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।' মাইকেল মধুসূদন ছিলেন তাঁর সহধ্যায়ী। তাঁর মধ্যবয়সে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। এবং তাঁর সমকালীনদের মধ্যে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর। এ থেকেই রাজনারায়ণ বসুর 'আত্মচরিতের' মূল্য কিছুটা অনুমান করা যাবে॥

ডক্টর সুশীলকুমার দের লেখা, 'সংস্কৃত ও বাংলা, 'রামমোহন রায়,' 'বাংলা মহাকাব্য ও মধুসূদন', 'অক্ষয় বড়ালের কবিতা', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' ইত্যাদি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ প্রবন্ধ দুষ্প্রাপ্য অবস্থায় নানা পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ছিল। সম্প্রতি লেখক কর্তৃক সংশোধিত আকারে সেই সব প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে: 'নানা নিবন্ধ'॥

বাংলা ছোটগল্পের উৎকর্ষ এবং বৈচিত্র্য নিয়ে গৌরব করার সংগত কারণ আছে—সে কথা সবাই আজ স্বীকার করবেন, অথচ শোনা যায় বাংলা বই কিনতে গিয়ে এখন পর্যন্ত নাকি প্রথম খোঁজ পড়ে উপন্যাসের। উপন্যাস হলেই হল, প্রথম এবং শেষ পাতার মধ্যে গল্পের কোন ছেদ না থাকলেই বাহবা। পারতপক্ষে তাই ছোটগল্পের বই তেমন একটা ছাপা হতেই পায় না। তার ফলে পরোক্ষে বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা। একথা নিশ্চয় করে বলা চলে যে রুচিশীল পাঠকরা যদি বিশেষ করে বাংলা ছোটগল্প পড়ার জন্য কিছু কিছু পাঠচক্রের প্রবর্তন করেন তাহলে তাঁদের পরিশ্রম এবং উৎসাহের মূল্য তাঁরা অবশ্য পাবেন, সাহিত্যেরও মঙ্গল হবে। নতুন দুটি ছোটগল্পের বই: বিমল করের 'বরফ সাহেবের মেয়ে' এবং সন্তোষকুমার ঘোষের 'পারাবত'। শিবরাম চক্রবর্তীর লেখা হাসির গল্প 'নিখরচায় জলযোগ' বইটিও অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। নতুন উপন্যাস: রমেশচন্দ্র সেনের 'মালঙ্গীর কথা,' প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ পাতাল' (২য় খণ্ড), সুমথনাথ ঘোষের 'জায়া ও জননী' এছাড়া অনুবাদে দুটি রুশ উপন্যাস: ইলিয়া এরেনবুর্গের 'দিনগুলি' থেকে অশোক গুহের অনুবাদ 'ঝড়' (৪র্থ খণ্ড) এবং গোর্কি থেকে শঙ্কর সেনের অনুবাদ 'অচরিতার্থ ভালোবাসা'। গোর্কির এই বই তাঁর প্রথম জীবনের রচনা॥ বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কৌতুকরসের মিশেল দিয়ে তাঁর শিকার কাহিনী লিখেছেন: 'জঙ্গল'। 'পোষা হাসব্যাঙের শিকার কাহিনী' দিয়ে বইটি শুরু, 'জঙ্গলের অভিজ্ঞতা' দিয়ে শেষ। লেখকের আঁকা কিছু স্কেচও আছে বইটিতে॥

খেলার রাজা ক্রিকেটের পরে বিনয় মুখোপাধ্যায় পরিপূরক গ্রন্থ হিসেবে আর একটি বই লিখেছেন: 'মজার খেলা ক্রিকেট'। এ বইটিতে আছে ক্রিকেট বল দেওয়ার বিবিধ কৌশল এবং বোলার বিষয়ে তথ্যাদি। ছোটদের প্রিয় একটি রোমাঞ্চকর বিদেশী উপন্যাসের সংক্ষেপিত অনুবাদ করেছেন 'নর্মল চৌধুরী': 'সম্রাট সলোমনের গুপ্তধন' মূলকাহিনী: 'কিং সলোমন্স মাইন,' লেখক: স্যর হেনরী রাইডার হ্যাগার্ড॥

সম্প্রতি প্রকাশিত চারখানি নতুন কাব্যগ্রন্থ: 'চিত্ত ঘোষের অন্তরা' আনন্দ বাগচীর 'স্বগতসন্ধ্যা,' অজিতকৃষ্ণ বসুর 'পাগলা গারদের কবিতা' (ব্যঙ্গ ও রঙ্গকাব্য), এবং গোলাম কুদ্দুসের 'ইলা মিত্র'॥


'ও কি যে-সে? ও আমার শক্তি,' বলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ
'ও সরস্বতী, বিদ্যাদায়িনী।'

পরমাপ্রকৃতি
শ্রীশ্রীসারদামণি

ভক্তিময় অন্তরঙ্গতার সুরে
অচিন্ত্যকুমারের অপূর্ব মাতৃবন্দনা।

॥ সচিত্র। দাম ৪৲ ॥

সিগনেট বুকশপ
১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট * ১৪২-১ রাসবিহারী এভিনিউ




খাদ্যপ্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগাস্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

সুপার-নিও-কড্

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩



# সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে—

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৪২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা—১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

| | |
|---|---|
| মোট চলতি বীমা | ৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲ |
| মোট সম্পত্তি | ২২,৪৯,৮৩,০৫৬৲ |
| বীমা ও বিবিধ তহবিল | ১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲ |
| প্রিমিয়ামের আয় | ৩,৯৪,২২,৩৭১৲ |
| দাবী শোধ (১৯৪২) | ৮৮,৮২,২৭১৲ |

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

## হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, ৪নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-১৩



# ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৪৯ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৩½ বৎসরে চারিটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।
প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

পঞ্চম ভ্যালুয়েশানে ( ১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত ) বোনাসের হার বৃদ্ধির আশা আছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

ইন্সওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।



কোমল এনুশ্রী

উষসী

অভিজাত প্রসাধন রেণু
সুপ্ত দেহ সৌন্দর্যকে
জাগ্রত করে



বেঙ্গল কেমিক্যাল • কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর

# পূর্ব্বাশা

## মাঘ—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| 'ধম্মপদ-পরিচয়' প্রসঙ্গে : বিশ্ববন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৫১৭ |
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| পলাতক : অরবিন্দ গুহ | ... | ৫২৫ |
| কবিতার মন : বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় | ... | ৫২৬ |
| রাত্রি-সময় প্রেম : উৎপলকুমার বসু | ... | ৫২৭ |
| তবে : দীপক মজুমদার | ... | ৫২৮ |
| সুদূর : শোভন সোম | ... | ৫২৯ |
| গোধূলির গান : শহীদ কাদ্‌রী | ... | ৫৩০ |
| মৌদ্রজ্যোৎস্না : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় | ... | ৫৩১ |
| শিলঙে শীত : সুশীলকুমার গুপ্ত | ... | ৫৩২ |
| সমালোচক : অনিল বিশ্বাস | ... | ৫৩২ |
| বুদ্ধের স্মরণে : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৫৩৫ |
| ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিৎ | ... | ৫৩৬ |
| ঘাসের ফুল : অমল দত্ত | ... | ৫৪০ |
| উপসাগর : অসীমেশ চক্রবর্ত্তী | ... | ৫৪৭ |
| জ্বর : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ৫৫৩ |
| সম্পাদকীয় : | ... | ৫৬০ |
| আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী | ... | ৫৬৬ |
| গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ৫৭০ |
| সাহিত্য-পত্রিকা : অমল দত্ত | ... | ৫৭৬ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতু বন্ধ— ২০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯


## নিয়মাবলী

পূর্ব্বাশা প্রতি বাংলা মাসের শেষ ভাগে প্রকাশিত হয়। চলতি মাস থেকে গ্রাহক হতে হবে, পুরণো সংখ্যা সব সময় দেয়া সম্ভব নয়। বার্ষিক চাঁদা ( সডাক ) ৬৲, ষাণ্মাসিক ৩৲। অমনোনীত লেখা ফেরত পেতে হলে উপযুক্ত ডাকটিকিট সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। প্রতিমাসের ২০শে তারিখের মধ্যে ( ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে ) পরবর্ত্তী মাসের বিজ্ঞাপনের কপি পাঠাতে হবে। কোন বিজ্ঞাপন ছাপা না-ছাপা সম্পাদকের ইচ্ছাধীন। এজেন্টের কাছ থেকে অবিক্রীত কোন সংখ্যা ফেরত নেওয়া হয় না। এজেন্সী কমিশন শতকরা ২৫৲ টাকা ; পত্রিকা পাঠানোর খরচ আমরা বহন করি। কমিশনবাদ পত্রিকার মূল্য অগ্রিম দিতে হয়।

কার্য্যালয় :

পি ১৩ গণেশ চন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা




খাদ্য উৎপাদনে অগ্রগতি...

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র যে সুজলা, সুফলা বাংলাদেশের বন্দনা গেয়েছিলেন আজ তা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে ১৪০০ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত ময়ূরাক্ষী নদী। পাঁচটি ব্যারাজ এবং একটি বাঁধের সাহায্যে এর গতি নিয়ন্ত্রিত করলে যে পরিমিত জলধারা বইবে সেই জল মোট ৯০০ মাইল লম্বা খালের মধ্য দিয়ে চালিয়ে জুন থেকে অক্টোবর পর্য্যন্ত ৬৩০,০০০ একর এবং নভেম্বর থেকে মে পর্য্যন্ত ১২০,০০০ একর জমি সিঞ্চিত হবে। যেসব জমিতে এতদিন বছরে মাত্র একবার অল্প ফসল ফলতো, এর ফলে সে সব জমিতে বছরে দু'বার প্রচুর ফসল ফলবে। তাছাড়া, ২০,০০০ একর পতিত জমি আবাদী জমিতে পরিণত হবে, এবং ২০০০ কিলোওয়াট্ বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হবে।

অঙ্গ তিনটি ছোট ব্যারাজসহ তিলপাড়ায় ময়ূরাক্ষীর একটি বড় ব্যারাজ এবং কয়েকটি খাল তৈরী হয়েছে, তাতে এখনই প্রায় একলক্ষ একর জমিতে জলসেচন করা হচ্ছে। মশানজোরে বাঁধ তৈরীর কাজও অনেকটা এগিয়েছে। সমস্ত পরিকল্পনাটি ১৯৫৫ এ কার্য্যকরী হবে আশা করা যায়।

অনুমিত ষোল কোটি টাকা এই পরিকল্পনায় ব্যয় হবে। কিন্তু এর ফলে যে বাড়তি ফসল ফলবে তার দাম হবে বছরে আন্দাজ আট কোটি টাকা। ৮০,০০০ একর জমির উপর পরীক্ষা করে এই হিসাব পাওয়া গেছে।

এইভাবে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, ধৈর্য্য এবং নিষ্ঠা নিয়ে সকলের সহযোগিতায় আমরা গড়ে তুলবো

সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা

সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত



উৎসবের দিনের আনন্দ-মুখর
মুহূর্তগুলিকে রঙে-রসে আরো
পরিপূর্ণ করে তুলতে এক পেয়ালা
গরম চা সত্যিই অতুলনীয়।

উৎসবের আনন্দে

চা

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB-113

পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ— ১৩৬০
দশম সংখ্যা — মাঘ

সন্দংশ

## 'ধম্মপদ-পরিচয়' প্রসঙ্গে

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

সমগ্র ত্রিপিটকের মধ্যে 'সুত্ত পিটক'ই যেমন গৌরব-কিরীট আবার সুত্ত পিটকের মধ্যে 'খুদ্দক নিকায়'ই যতো শ্রেষ্ঠ রত্নের আকর। এই খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত রত্নমালার মধ্যমণি বলা যেতে পারে 'ধম্মপদ'কে। ধম্মপদ খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ। কি প্রাচ্য খণ্ডে কি পাশ্চাত্ত্য খণ্ডে সর্বত্রই ধম্মপদের বিশেষ আদর। বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞের কাছে এই গ্রন্থ যতোটা আদর পায় পৃথগ্‌জনের কাছে আদর পায় তার চেয়েও বেশি। কারণ ধম্মপদের নাতিগর্ভ সুভাষিত গাথাগুলি দেশকালনিরপেক্ষ এবং বহুলাংশেই ধর্ম্ম-নিরপেক্ষও। সেইজন্যই জগতে এর তুলনা নেই। সুত্ত নিপাত ও অন্যান্য গ্রন্থের চেয়েও এই গ্রন্থ জনপ্রিয়তায় বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। সকল রকম নীতির সারাৎসার পাওয়া যায় এখানে। ভাষাও এত সরল ও বিশদ যে, পালিভাষার যাঁরা অনভিজ্ঞ তাঁদের পক্ষেও বোঝার কিছু বাধা হয়না। সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের তত্ত্বসার থাকলেও তাত্ত্বিক পরিভাষার বিভীষিকা নেই, সহজেই সাধারণের অধিগম্য। প্রায় কাব্যের মতোই মনোহারী, কাব্যই। এর চেয়ে বড়ো গুণ আর কী হ'তে পারে? এমন যে ধম্মপদ তার প্রকাশনা কিংবা আলোচনা বাংলা ভাষায় যত হয় ততই ভালো। সে-হিসেবে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'ধম্মপদ-পরিচয়' গ্রন্থটিকে অভিনন্দন করি। গ্রন্থকার একজন সুধী ব্যক্তি, সেহেতু শ্রদ্ধাভাজন। উক্ত পুস্তিকাটি ধম্মপদপাঠার্থীর পক্ষে ভূমিকা-স্বরূপ হ'তে পারে।

কিন্তু পুস্তিকাশেষে ধম্মপদ-প্রচয় অংশটি নানা কারণে খুব সন্তোষজনক হয়নি। এই অংশটি এত ক্ষীণ না হ'য়ে আরো একটু বিস্তৃত হ'লেই ভালো হ'তো। অন্যান্য অংশ বরং আরো অনেক ছোটো করলেও ক্ষতি ছিলো না। ধম্মপদ এম্নিতেই ক্ষুদ্র গ্রন্থ, দীর্ঘ কিছু নয়। তার আস্বাদ তার সংগ্রতার মাঝখানেই গ্রহণীয়, এ রকম পরিচ্ছিন্নভাবে নয়। এতে ঐ অপূর্ব সুভাষিত উক্তিগুলির পৌর্বাপর্য নষ্ট হয়। তাছাড়া গাথা-নির্বাচনও সন্তোষজনক

নয়। কয়টি গাথাই বা নির্বাচিত হ'য়েছে এতে? দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমেই যমকবর্গের প্রথম গাথাটির কথা যুক্তিসঙ্গতভাবেই উঠতে পারে। 'মনোপুব্বঙ্গমা ধম্মামনোসেট্ঠা মনোময়া'—নিয়ে এ তাবৎকাল বহুজনে বহুপাতাই লিখে গেছেন। সেটি যে এখানে উপেক্ষিত হ'লো তারও নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য আছে—সেটি দু'একখানি পাতা ওল্টালেই বুঝতে পারা যায়। যে গাথাগুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন, তত্ত্বসমৃদ্ধ ও সুবিশাল, বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র গ'ড়ে ওঠার পক্ষে যেগুলি বীজ স্বরূপ সেগুলিকে পরিহার করা হ'য়েছে। কারণ যাঁরা প্রাথমিক পাঠক তাঁদের কাছে সেগুলি স্বভাবতই দুরাবেদ্য মনে হবে, তাই সেগুলি বাদ গেছে ব'লেই ধ'রে নিলুম। নইলে বাদ দেওয়া অমার্জনীয় বলতুম। অবশ্য এমন করার স্বপক্ষেও যুক্তি থাকতে পারে; একটা দৃষ্টান্ত দিলেই সেটা বেশ বোঝা যাবে। যেমন:

পঞ্চ ছিন্দে পঞ্চ জহে, পঞ্চচুত্তরি ভাবযে।
পঞ্চ সঙ্গাতিগো ভিক্খু ওঘতিণ্ণোতি বুচ্চতি॥ [ ভিক্ষুবর্গ—১১ ]

কোন্ পঞ্চ ছিন্ন করতে হ'বে? কোন্ পঞ্চ পরিত্যাগ করতে হ'বে? কোন বিষয় ভাবনা করতে হ'বে? কোন্ পঞ্চ সঙ্গ অতিক্রম করলে ভিক্ষু ওঘোত্তীর্ণ ব'লে কথিত হন? এখানে পঞ্চ নিম্নভাগীয় সংযোজন, পঞ্চ ঊর্দ্ধভাগীয় সংযোজন, শ্রদ্ধা, স্মৃতি, বীর্য, সমাধি ও প্রজ্ঞার ভাবনা: কাম, দ্বেষ, মোহ, মান ও মিথ্যাদৃষ্টি—এই পঞ্চ সঙ্গ এবং চতুর্বিধ ওঘ ( আসব )—কাম, ভব, দৃষ্টি ও অবিদ্যা—এই সবগুলোর একটা পরিষ্কার ধারণা যাঁর নেই তাঁর পক্ষে প্রাথমিক অবস্থায়ই বিভীষিকার সৃষ্টি হ'তে পারে। সে কারণ এ ধরণের গাথাগুলি এড়িয়ে যাওয়াও অযৌক্তিক নয়। কিন্তু যেগুলোর মধ্যে তাত্ত্বিক পরিভাষার বাহুল্য নেই অথচ সমগ্র বৌদ্ধধর্মের সারভূত তত্ত্ব আছে সেগুলি নির্বাচন না করার পক্ষে কোনো যুক্তি আছে কি? উদাহরণ স্বরূপ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মলক্ষণযুক্ত তিনটি গাথা এখানে তুলে দেওয়া যায়।

একবার অরণ্যে প্রব্রজিত হ'য়েও পাঁচ শত ভিক্ষু ধ্যান সাধনায় সফল না হ'তে পেরে শ্রাবস্তীর জেতবনে বুদ্ধের কাছে এসে উপদেশ যাচ্ঞা করেছিলেন, বুদ্ধ তাঁদের নিম্নোক্ত গাথাত্রয় দেশনা করেছিলেন [ ধম্মপদ, মার্গ বর্গ ৫-৭ ]—

সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি যদা পঞ্ঞায পস্সতি,
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা॥
সব্বে সঙ্খারা দুক্খাতি যদা পঞ্ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা॥
সব্বে ধম্মা অনত্তাতি যদা পঞ্ঞায পস্সতি
অথ নিব্বিন্দতি দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিযা॥



এই বিদর্শন ভাবনা থেকেই তো বৈরাগ্যের জন্ম। সবই অনিত্য, সবই দুঃখ, সবই অনাত্ম এই যিনি প্রজ্ঞার দ্বারা দর্শন করেন তিনিই সর্বদুঃখে নির্লিপ্ত হন।—এই তো বিশুদ্ধির মার্গ।

যে গাথাগুলি গ্রন্থকার বেছেছেন তাদের অনেকগুলির চেয়েই কি এগুলি অন্তত তত্ত্বের খাতিরেও নির্বাচনযোগ্য নয়? ইচ্ছা করলে দৃষ্টান্ত অনেক বাড়ানো যায় কিন্তু স্থান নেই। মোটের ওপর 'ধর্ম্মপদ-প্রচয়' অংশটির কয়খানি পাতা ওল্টালেই এই উপসংহারে আসতে অনেকেই বাধ্য হ'বেন যে, বিশেষ বিচার-বিবেচনা না ক'রেই যেন কয়েকটা সানুবাদ গাথা তুলে দেওয়া হ'য়েছে। এ থেকে ধম্মপদের কী পরিচয়, কতোটুকু পরিচয় পাবেন জিজ্ঞাসু পাঠক? কারণ স্বভাবতঃই গ্রন্থকারের কষ্টকৃত ৫০ পৃষ্ঠা দীর্ঘ ভূমিকাটি পড়ার চেয়ে ধম্মপদের জন্যই লোকে উৎসুক হবেন বেশি কিন্তু তাঁরা পাবেন কতোটুকু? তাতে আশা তাঁদের মিটবে কি? তার চেয়ে বাংলায় যাঁরা ধম্মপদ পড়তে চাইবেন তাঁরা পালিভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষু শীলভদ্রের ধম্মপদখানি পড়লে এর অমৃতস্বাদে ধন্য হবেন। এতে বিশুদ্ধ মূল ও তার অনবদ্য বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাবে। এটি সাধারণ পাঠকের অত্যন্ত উপযোগী, দামেও সস্তা। তবে যাঁরা ইংরাজীতে পড়তে চাইবেন তাঁরা সাধারণের উপযোগী বোম্বে বুদ্ধ সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত পকেট বইয়ের আকারের ধম্মপদ প'ড়েও ঈপ্সিত স্বাদ পেতে পারেন কিংবা মহাবোধি সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত নারদ মহাথের সম্পাদিত টীকা সম্বলিত পকেট ধম্মপদখানিও ইংরাজী পাঠকের উপযোগী। যে-সব ইংরেজী পাঠক আরো ব্যাপকতর ভাবে পড়াশোনা করতে চান তাঁদের জন্য আছে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের বই। তাছাড়া ইংরেজদের লেখা ধম্মপদের অনেক প্রামাণ্য সংস্করণই আছে যেগুলি এত বিখ্যাত যে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে বাংলায় যাঁরা পড়তে চান, যাঁরা শিক্ষার্থী ও শিক্ষাব্রতী আর সেই সঙ্গে সংস্কৃতেও যাঁদের খানিকটা অধিকার আছে তাঁদের পক্ষে আছে চারুচন্দ্র বসুর বই। অর্ধশতাব্দীকাল যা প্রায় অপরিহার্য ব'লে রসিক সমাজে গণ্য হ'য়ে এসেছে। এই বইয়ে মূল, তার সান্বয় ব্যাখ্যা ও সংস্কৃত গদ্য প্রতিরূপ ও সটীক বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাবে। কোনো অনুবাদ আজও এর প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লো না একথা প্রায় বলা চলে। তবে এর মূলের মধ্যে বহু মুদ্রণপ্রমাদ অনুপ্রবিষ্ট হওয়াতে [ ৪র্থ সংস্করণটি ] স্থানে স্থানে অসতর্ক পাঠককে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে পারে। তাছাড়াও অন্যবিধ ত্রুটি আছে। আর বঙ্গানুবাদও সব সময়েই খুব চিত্তগ্রাহী নয়, সময়ে সময়ে অকারণ জটিল ও স্থানে স্থানে আড়ষ্ট।

ধম্মপদের এতগুলি বাংলা সংস্করণ থাকা সত্ত্বেও একটি মস্ত অভাব আজো মেটেনি। আচার্য বুদ্ধঘোষের 'ধম্মপদ-অথকথার' বাংলা অনুবাদ এ যাবৎ হ'লো না। হ'লে একটা স্থায়ী অভাব ঘুচতো। যদিও সেন মহাশয় তাঁর গ্রন্থে বলেছেন—'বুদ্ধঘোষকৃত ধম্মপদ-অথকথাও' বাংলায় প্রকাশিত হ'য়েছে। বুদ্ধ ঘোষের মূল পালি ভাষ্য ও তার বাংলা অনুবাদ সহ এই

**পুস্তকটি** ত্রিপিটক গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে ( ১২৩৪ )। অনুবাদ করেছেন শীলালংকার স্থবির।—এতে পাঠকের ভ্রান্ত ধারণা হ'তে পারে যে হয়তো বুদ্ধঘোষের সমগ্র ধম্মপদাত্থ-কথার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিলো—কিন্তু বস্তুতঃ তা' নয় ; ২৬টি বর্গের মধ্যে প্রথম বর্গটি অর্থাৎ যমক বর্গটি মাত্র প্রকাশিত হ'য়েছিলো, তারপরেই বন্ধ হ'য়ে যায়। এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদের কাজ শেষ হ'লে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ-সাহিত্যে বিরাট এবং অবিস্মরণীয় একটি কাজ হ'তো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। তবে সম্প্রতি প্রজ্ঞালোক স্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী প্রণীত ধম্মপদের সংস্করণটি হাতে আসায় দেখলাম বাংলা সংস্করণগুলির মধ্যে এটাই বোধ হয় সব চেয়ে ব্যাপক্। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে আচার্য বুদ্ধঘোষের অথকথায় বর্ণিত উপাখ্যানগুলি এই গ্রন্থে প্রত্যেক গাথাশীর্ষের 'পরিচিতি' মাতৃকায় সংক্ষেপে পাওয়া যায়। এ জিনিশ এর আগে বাংলায় কেউ করেন নি। তাছাড়া ব্যাখ্যাংশেও বৈশিষ্ট্য আছে। এই নিঃশব্দ কর্মী পণ্ডিতদ্বয় এই দিক থেকে পথিকৃৎ-এর সম্মান পাবার যোগ্য। তাঁদের স্বাগত করি ও অভ্যর্থনা জানাই। এভাবে বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে সুবৃহৎ বৌদ্ধ ত্রিপিটক-শাস্ত্র যদি আমরা পাই তাহ'লে আমাদের মধ্যে অনেকেই যাঁরা বিদর্শনধুর পূর্ণ করতে অক্ষম অথচ বৌদ্ধ নীতি ও ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান, উৎসাহী ও অনুসন্ধিৎসু তাঁরা অন্তত গ্রন্থধুর পূর্ণ করবার সম্ভাব্যতা লাভ ক'রে ধন্য হবেন। এতে ভিক্ষু মহোদয়গণের প্রচার-কার্যের সৌকর্যও হ'তে পারে। যাঁদের অল্পে সুখ নেই, বেশিই চান তাঁদের চাহিদা মেটাবার পক্ষে এতদিন বাংলা ভাষার দীনতা আত্যন্তিক ছিল। এবার সে দীনতা মেটাবার আয়োজন করা উচিত তৎ তৎ বিষয়ে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিদের।

'ত্রিরত্নের কালক্রম' নিবন্ধে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় যে-অর্থে ত্রিরত্ন শব্দটি ব্যবহার ক'রেছেন সেটাতেই প্রথম আপত্তি তুল্‌ছি। ত্রিরত্ন অর্থে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ কিন্তু গ্রন্থকার ত্রিরত্ন ব'লে বোঝাতে চেয়েছেন উপনিষদ্, ধম্মপদ ও গীতা এই তিনটিকে। ওঁর এই প্রয়োগ উদ্ভট হ'তে পারে, প্রামাণ্য নয়। বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্বন্ধে লিখতে ব'সে ত্রিরত্ন শব্দটি অন্য অর্থে প্রয়োগ করাই চলে না। পিটকশাস্ত্রের আলোচনা করতে গিয়ে ত্রি-লক্ষণ কথাটা যখনই পাবো তখনই যেমন বুঝে নেবো অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম এই লক্ষণত্রয়কেই উদ্দেশ্য করা হচ্ছে তেমনি ত্রিরত্ন সম্বন্ধে ঐ একই কথা। তাছাড়া উপনিষদ্ সমূহ কি একটি রত্ন না রত্ন-সমষ্টি ? এখানে উপমা প্রয়োগও সুষ্ঠু নয়। গীতায় ধর্ম্মপদের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা' সর্ব্বাদিসম্মত এবং ধম্মপদ ও গীতারচনার কাল সমন্ধেও তিনি সুধীজনস্বীকৃত মতই ব্যক্ত করেছেন। আর গীতারচনার মুখ্য লক্ষ্য সম্বন্ধেও যা লিখেছেন সেটাই লক্ষ্যভেদী।

'ধম্মপদের ভারতীয় রূপ' শীর্ষক নিবন্ধে এলে দেখি গ্রন্থকার কোথায় কোথায় অপ্রমাদ



কথাটা পাওয়া যাচ্ছে তাই দেখিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন যে 'ধম্মপদের কোনো উক্তিকেই সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের স্বকীয় ব'লে বর্ণনা করা যায় না।' তার মানে বুদ্ধবাণীর ষোলো আনাই ধার-করা এই কি বল্‌তে চান ? ধম্মপদের ৪২৩টি গাথার মধ্যে কোনো জায়গাতেই কি কিছু স্বকীয়তার পরিচয় নেই ?[১] মাত্র একটি কথায় ওপর ভিত্তি ক'রে এমন বেপরোয়া মন্তব্য করা কি যায় ? আর করতে চাইলেও ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রমাণ করবার দায়িত্ব-গ্রহণ করতে হয়। সে দায়িত্ব তো স্পষ্টতঃই সেন মহাশয় নেননি। আর অপ্রমাদ শব্দটি নিয়েই অনেকগুলি পাতা ভরিয়ে তুল্‌লেও ওঁর উক্ত সিদ্ধান্তটি প্রমাণ-সিদ্ধ ও প্রতীতিজনন-ক্ষম হ'তে পারেনি। অপ্রমাদশব্দটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে মহাভারত, উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে যেগুলি প্রাচীনতর মাত্র সেইগুলি থেকে উদ্ধৃতির তবু উদ্দেশ্য বোঝা যায় কিন্তু গীতাকে বুদ্ধের পরবর্তী ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার পরেও গীতায় অপ্রমাদ শব্দটি সন্ধান করবার ব্যর্থ প্রয়াসের সার্থকতা কী, সেটা বোঝা দুষ্কর। অপ্রমাদ শব্দে বুদ্ধ বিশেষ একটি তাৎপর্য যোজনা করেছিলেন। সেটি বোঝার পক্ষে মেঘদূতের স্বাধিকারপ্রমত্ত যক্ষ সেন মহাশয়কে কী সাহায্য করতে পারবেন ? মেঘদূতের যক্ষ কি গৌতম বুদ্ধের দু'পাঁচ শতাব্দীর কাছাকাছিও জন্ম নিতে পেরেছিলেন ?[২] তবে ? এ সব উদ্ধৃতি দিয়ে কিছুই প্রমাণ হয় না—উদ্ধৃতিগুলো নিরর্থক, অযৌক্তিক, উদ্দেশ্যহীন ও অপ্রাসঙ্গিক। শুধু কালিদাস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি। আরো পরবর্তী মল্লিনাথের কাছেও অপ্রমাদের তাৎপর্য বুঝতে চেয়েই ততোধিক প্রহসনের সূচনা করেছেন। এ বিষয়ে আলোকপাত করার জন্যে মল্লিনাথকে ডাকলে তিনি যে আরো অনধিকারপ্রমত্ত প্রতিপন্ন হ'বেন !

তবে একথাও ঠিক যে তদানীন্তন প্রচলিত সকল রকম দার্শনিক মতবাদেই বুদ্ধের মন ও মত লালিত, পুষ্ট ও গঠিত হ'য়েছিলো সুতরাং সে-সবের একটা মোটামুটি প্রভাব না থাকলেই বরং অসঙ্গত অযৌক্তিক লাগতো। এটা তো এক রকম স্বতঃসিদ্ধই যে, বুদ্ধ অন্ততঃ খানিকটাও অধমর্ণ ছিলেন তাঁর পূর্বসূরী হিন্দুশাস্ত্রকর্তাদের। বেদপারগ হ'য়েই তবে তিনি বেদের বিরোধিতা ক'রেছিলেন। সর্বদর্শনপারগ হ'য়েই তবে তিনি নিজস্ব দর্শনের গঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন। সেইজন্য তাঁর প্রতিটি উপকরণের মধ্যে আমরা তাঁর স্বকীয়তা খুঁজবোনা—তাঁর স্বকীয়তা যে এই সবগুলির বিস্ময়কর সিন্‌থেসিসের মধ্যেই !

আজ বহু বৎসর পূর্বেকার অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কৃপাশরণ মহাস্থবিরের আমলে বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার একটি প্রচার-পুস্তিকায় স্বর্গত বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়ের একটি প্রবন্ধ হাতে পড়ায় দেখেছিলাম মনে আছে তাতে উপনিষদ্, মহাভারত, মনুসংহিতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহু উক্তি উদ্ধৃত ক'রে ত্রিপিটোক্ত শ্লোকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে বুদ্ধবাণীর স্বকীয়তা বা বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে তো তিনি মনে করেন নি।

বৌদ্ধধর্মের মূলনীতির কথা উঠলে শুধু অপ্রমাদই বা কেন? অনেক জন অনেক কিছুকেই মূলনীতি ব'লে প্রকাশ করতে পারেন। বুদ্ধদেব 'মহাপরিনিব্বান' শয্যায় শায়িত অবস্থায় ভিক্ষুদের শেষ উপদেশ দিয়ে যান—'হন্দদানি ভিক্খবে আমন্তয়ামি বো বয়ধম্মা সঙ্খারা অপ্পমাদেন সম্পাদেথা' তি। তখন অপ্রমাদের যে গুরুত্ব আছে তাতে আর সন্দেহ কী? আর সম্রাট অশোকের প্রশ্নের উত্তরে ন্যগ্রোধ শ্রামণ কর্ত্তৃক অপ্রমাদ বর্গের প্রথম শ্লোকটি আবৃত্তি করার কথা তো ছেড়েই দিলাম। একথা নিশ্চয়ই আমি অস্বীকার করতে চাই না পরন্তু এই সঙ্গে আরো অনেক নীতিই স্বীকার ক'রে নিতে চাই।

গ্রন্থকার মহাপরিনিব্বান সুত্তে অপ্রমাদের উল্লেখই করেছেন। কিন্তু কী বিষয়ে অপ্রমাদ? সে বিষয়ে তো গ্রন্থকার কিছুই বলেননি। মহাপরিনিব্বান সুত্তে সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মসমূহই অপ্রমত্তভাবে আচরণ ক'রে যেতে ভিক্ষুদের উপদেশ দিয়েছিলেন তথাগত। এই বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মই সমস্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব মূলকথা, মূলনীতি যাই বলা যাক সব কিছুই। এর চেয়ে বড়ো কথা এর চেয়ে ব্যাপকতর কিছু সারা ত্রিপিটকে নেই—এ কথাই বলেন পণ্ডিতেরা। যদি কেউ এই বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মই মূলনীতি ব'লে উল্লেখ করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল বলবেন না বরং আরো ঠিকই বলবেন।

মহাপরিনির্বাপিত হবার তিন মাস পূর্বে মাঘীপূর্ণিমার দিন বুদ্ধদেব বৈশালীস্থ চাপাল চৈত্যে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞান অবস্থায় আয়ুসংস্কার বিসর্জনান্তে বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় আসেন। ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান ক'রে যে ধর্ম্মদেশনা করেন সেটি তাৎপর্যপূর্ণ। বলেছিলেন—কতমে চ তে ভিক্খবে ধম্মা মযা অভিঞ্ঞা দেসিতা? ভিক্ষুগণ, তোমাদিগকে মৎকর্ত্তৃক কোন্ কোন্ ধর্ম্ম অভিজ্ঞানে দেশিত হ'য়েছে? সেয্যথিদং—তা' এই—চত্তারো সতিপট্ঠানা, চত্তারো সম্মপ্পধানা, চত্তারো ইদ্ধিপাদা, পঞ্চিন্দ্রিয়ানি, পঞ্চবলানি, সত্ত বোজ্ঝঙ্গা, অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্গো। ইমে খো ভিক্খবে ধম্মা মযা অভিঞ্ঞা দেসিতা···ভিক্ষুগণ, আমাকর্ত্তৃক এই ধর্ম্ম সমূহ অভিজ্ঞানে দেশিত হয়েছে। [ দীঘনিকায়ান্তর্গত মহাপরিনিব্বান সুত্ত, ৩য় অধ্যায়—৬১ ]

কিংবা 'উদানে'র অন্তর্গত সোণস্থবির বর্গে 'উপোসথ সুত্তে'ও এই সপ্তত্রিংশ বোধিপক্ষীয় ধর্ম্মই দেশিত হ'য়েছে। 'উদান' থেকে 'মহাপরিনিব্বান সূত্ত' পর্যন্ত অর্থাৎ বোধিলাভের পর থেকে শেষ নিশ্বাসত্যাগ পর্যন্ত এই সপ্তত্রিংশ বোধি পক্ষীয় ধর্ম্মই তিনি উপদেশ দিয়ে গেছেন।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম কী বা কী তার মূল নীতি বা তত্ত্ব—এ প্রশ্ন উঠলে আমরা স্মরণ করতে পারি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের অন্যতম অশ্বজিৎ স্থবির যা বলেছিলেন সঞ্জয় বেলট্ঠিপুত্তের শিষ্য ব্রাহ্মণ উপতিষ্যকে। এই উপতিষ্যই পরে বুদ্ধের প্রথম অগ্রশ্রাবক ধর্ম্মসেনাপতি শারীপুত্র স্থবির ব'লে খ্যাত হ'য়েছিলেন। এই কথাটুকুরও গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। বুদ্ধ তখন মগধেশ



বিম্বিসারপ্রদত্ত বেলুবনে [ রাজগৃহে ] বাস করছিলেন। একদিন অশ্বজিৎ ভিক্ষায় বেরিয়েছেন উপতিষ্য তাঁর প্রসন্নমূর্তি দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁকে জিগেস করলেন—কে আপনার শাস্তা? তিনি কোন্ বাদী? কী তার উপদেশ? অশ্বজিৎ বললেন—'বন্ধু আমি নূতন, অচির-প্রব্রজিত, আমাদের শাস্তার সমস্ত ধর্ম্মমত ব্যক্ত করবার সাধ্য এখনো হয়নি।' তা' সত্ত্বেও উপতিষ্য বললেন—"যতটুকু পারেন বলুন, মর্মার্থটুকুই আমার দরকার।" তখন অশ্বজিৎ স্থবির বলেছিলেন—

যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসং হেতুং তথাগতো আহ।
তেসঞ্চ যো নিরোধো এবং বাদী মহাসমণো তি॥

অর্থাৎ যেই ধর্মসমূহ ( রূপ বেদনাদি পঞ্চস্কন্ধ ) হেতুসমুৎপন্ন তথাগত বুদ্ধ সে-সবের হেতু নির্দেশ করেছেন এবং তাদের যা নিরোধ তাও বলেছেন। অতএব মহাশ্রমণ বুদ্ধ হেতু ও নিরোধবাদী বা নির্বাণবাদী। যদি কেউ বলেন—এই তো পেয়েছি বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্র! তিনি কি ভুল বলবেন?

আমাদের মতো যাঁরা আধ্যাত্মিক চিন্তায় পরাঙ্মুখ ব্যক্তি এবং নেহাৎ-ই প্রাকৃতবুদ্ধি-সম্পন্ন তাঁরা হয়তো ব'লে বসবেন—অতো শত কূট তর্ক বুঝিনে, যেগুলো থেকে বিরত থাকতে ভগবান্ উপদেশ দিয়ে গেছেন ( বারিত্র ) সেগুলো থেকে বিরত থাকা এবং যেগুলো সর্বদা আচরণীয় ব'লে নির্দেশ দিয়ে গেছেন ( চারিত্র ) সেইগুলো আচরণ করা সোজাকথায় এই তো বৌদ্ধনীতি। একেবার শাদা কথা। এর ওপরেও কী আর কথা থাকতে পারে?

কিংবা ধম্মপদ, মার্গ বর্গের ৫-৭ শ্লোক উদ্ধৃত ক'রে কেউ যদি বলেন—এই ত্রিলক্ষণাত্মক বিদর্শনভাবনাই বৌদ্ধধর্মের মূলকথা, প্রধান বৈশিষ্ট্য, তিনিও কি ভুল বলবেন? এই ভাবে অনেক শ্লোকোদ্ধার ক'রে অনেক ভাবেই দেখানো যেতে পারে—প্রত্যেকটিই মনে হ'বে এটাও ঠিক।

আগের দিনের বালধী স্কুল-পাঠ্য ইতিহাস-রচয়িতারা এ কথাই শেখাতে ব্যস্ত ছিলেন যে অহিংসা পরম ধর্ম— কেবলমাত্র এটুকুই ব'লে গেছেন বুদ্ধদেব। এটাই একমাত্র বৌদ্ধ নীতি। কথাটা সম্পূর্ণরূপে ভুল না হ'য়েও কী রকম হাস্যকর! যদিও 'পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।' আউড়ে নিয়েই বৌদ্ধ হ'তে হয় তবু বৌদ্ধধর্মে কোথাও অহিংসা নিয়ে তেমন অশোভন বাড়াবাড়ি নেই। এ স্থলে আমরা চক্ষুপাল স্থবিরের উপাখ্যান স্মরণ করতে পারি। অন্ধ স্থবির একদিন পদচারণাকালে বহু কীট পদদলিত ক'রেছিলেন এবং সেকথা যখন বুদ্ধের শ্রুতিগোচর করা হ'য়েছিলো তখন তিনি সেটা খুব লঘু ভাবেই নিয়েছিলেন, ব'লেছিলেন—খীণাসবানং মরণ চেতনা নাম নত্থি ভিক্খবে' অর্থাৎ ক্ষীণাসবদের বধ-চেতনা নাই, ভিক্ষুগণ। [ধম্মপদ-অথকথা, চক্ষুপাল স্থবিরের উপাখ্যান দ্রষ্টব্য ]

সেইজন্যই আমার বক্তব্য এই যে, এককথায় মূলনীতির সন্ধান করতে না যাওয়াই ভালো। করতে গেলেই বরং হিন্দুস্থানের ছয়জন অন্ধব্যক্তির হাতী দেখার মতোই হ'বে অবস্থাটা অর্থাৎ একদেশদর্শিতাই প্রকাশ পাবে মাত্র। বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠে উৎসাহিত হ'লে পাঠক আপনা আপনিই একটা নিজস্ব সিদ্ধান্তে এসে পৌছবেন। আমি হিন্দু অথচ আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করে—হিন্দুধর্মের মূলনীতি কী? এক কথায় আমি হয়তো তার কোনো জবাবই দিতে পারবো না। কিংবা হয়তো বল্‌বো—আগে হিন্দু হোন তবেই সহজে বুঝবেন। একজন অহিন্দুর পক্ষে অনেক অধ্যয়নেও উপলব্ধি হয় স্বল্প কিন্তু অপরপক্ষে একজন হিন্দুর ছেলে অধ্যয়ন ব্যতিরেকেও বাল্যাবস্থাতেই বুঝে নেয় অনেকখানি।

আমি পণ্ডিত নই যে উপসংহারে গুরুতর রকম কিছু মন্তব্য করতে পারবো আমি নগণ্য এক সাহিত্য-ব্যাপারীমাত্র। তবুও প্রথা আছে আলোচনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হ'লে সততার সঙ্গে স্বমত প্রকাশ করতেই হয়। আর তাই করতে গিয়ে যদি প্রশংসা ক'রে থাকি কিংবা অপ্রশংসা ক'রে থাকি তো তার কিছুমাত্র গুরুত্ব নেই জেনেই তা' করেছি আর সর্বদা এই বুদ্ধবাণীটুকু সাধ্যমতো মনে রাখতে চেষ্টা করেছি—

'যো বালো মঞ্ঞতি বাল্যং পণ্ডিতো বাপি তেন সো।
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালো তি বুচ্চতি॥

এবং অপরপক্ষে শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারকেও স্মরণ করতে অনুরোধ করি—

'এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা।'

[(১) ও (২) চিহ্নিত অংশে লেখক প্রবোধচন্দ্রের ইতিহাস-বিচারের দৃষ্টিভঙ্গী অনুধাবন করতে পারেন নি মনে হয়। ঔপনিষদীয় সংস্কৃতির যুগেই বুদ্ধের জন্ম সুতরাং তিনি বৈদিক রাজন্য-সংস্কৃতির বহির্ভূত নন। প্রতিক্রিয়া মাত্র। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ। রাজন্য-পূর্ব্ব যে কৌম-সংস্কৃতি ভারতবর্ষে ছিল তা শাক্যরা যেমন পছন্দ করেন নি তেমন আর্য্য গুপ্ত-সম্রাটের সভাকবি কালিদাসও পছন্দ করতে পারেন নি। সে-সংস্কৃতির প্রতিনিধি 'যক্ষ'। তাঁরা 'স্বাধিকারপ্রমত্ত' অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন—বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে সম্প্রযুক্ত হতে চান নি। 'অপ্রমাদ'-কথাটি দ্রাবিড়-ভারতের নয়। —সম্পাদক]

# কবিতাগুচ্ছ

## পলাতকা ছন্দ

**অরবিন্দ গুহ**

লক্ষ কবিতার প্ররোচনা
ব্যর্থ হ'লো। আক ক্ষর বিহঙ্গ পেলো না
তোমার শাড়ির নীল রেখা—
মেঘচিত্রলেখা।
হতাশ্ব স শাখা থেকে লক্ষ পাতা ঝরে
হৃদয়ের অস্থির শিয়রে।

'যৌবনের যন্ত্রণায় ভালোবেসে যাকে চাও, তাকে
কখনো পাবে না।' একা বৃদ্ধ হাওয়া হাঁকে
অন্ধকার গুহার গভীরে।
'সত্তার সর্বস্ব ছিঁড়ে-ছিঁড়ে
সে তোমাকে কঙ্কালের কায়া দেবে। যৌবনলুণ্ঠিত
তুমি—উপেক্ষিত, অপখ্যাত, বিদ্রূপবিধ্বস্ত।
তাই বলি, লাঞ্ছনা নিও না।
বহুদর্শী বার্ধক্যের কথা শোনো। তোমার বাসনা—
যৌবনের ভালোবাসা—তুমি রাখো গাছের শরীরে,
ভীরু হরিণীর দ্রুত পলাতকা ভীড়ে,
আকাশের নগ্নতনুতীরে,
সমুদ্রে, শিশিরে।
তুমি আরো দিতে পারো? তোমার যৌবন যেন জ্বালে
আরো দৃঢ় ভালোবাসা অতলান্ত প্রজ্ঞার পাতালে।'

সে-পাতালে প্রবেশাধিকারহীন, আমি অবাঞ্ছিত ;
আমি শুধু নিঃসঙ্গ নিভৃত,
অর্থাতীত নির্জনের নিদ্রার নিগড়ে
তোমার সর্বস্ব বাঁধি দেবতার অভিশপ্ত বরে।
তুষারবিস্তীর্ণ অন্ধকারে
হা-হা প্রতিধ্বনি তোলে বৃদ্ধ হাওয়া পাহাড়ে-পাহাড়ে।
কার ভালোবাসা কাকে বাঁধে,
উপেক্ষার ছলনায় কার নামে কার চোখ কাঁদে ?

অরণ্যের গাছের শরীরে
এঁকেছি তোমার মুখ আহত নখাগ্রে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে।
বহুবর্ণ সমুদ্রের শঙ্খ মেলে-মেলে
লিখেছি তোমার নাম অন্তরাগ্নিরঞ্জিত বিকেলে।

তোমার অম্লান বিস্মরণে
বেদনাবিক্ষত আমি, পরিত্যক্ত বনান্ত নির্জনে—
দ্রুত অনুসরণের শেষে ;
তোমার ও হরিণীর পলাতকা ছন্দ ভালোবেসে।

## কবিতার মন

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

বেদনার তুলি দিয়ে যতই রঙীন ছবি আঁকো
কবিতার জন্ম হবেনাকো।
আর
পৃথিবীতে
হলুদাভ সময়ের শীতে।

পৃথিবীকে বঞ্চিত ক'রে
একটি হৃদয় গেছে ম'রে
একটি হৃদয় গেছে ঝ'রে



শিশিরের ফুলের মতন :
ম'রে গেছে কবিতার মন।

সাগরের নীলচোখে আকাশ মুখের ছবি দেখে
রুপোলি মনের তারা ফোটে একে একে
চন্দন-ফোঁটার মতন।
শ্রীমতীর দেহমন ঃ আকাশ সাগরে
পাখির ডানায় জল ঝরে…
নীলচোখে নীলঠোঁটে মনের অসুখ :
দেখিনি অনেক দিন আকাশের মুখ।

আমরা পাইনি খুঁজে পৃথিবীতে নীড়
আমাদের চারিপাশে হতাশার ভিড়
যেখানে হারিয়ে গেছে কবিতার মন
কুমারীর প্রেমের মতন।
তবু তার শোকে
কান্নার আগুন কই জ্বলে নীলচোখে
বেদনার তীব্রতম অনুভূতি কই ?
হারিয়ে হৃদয় : মন
আমরা মানুষ আর নই।

কবিতার মৌচাকে
নয়ত কোথায় তাকে
ফিরে পেতে পারো :
যে-হৃদয়
তোমার হৃদয় তবু একলা তোমার নয়
যেন আর কারো !

## রাত্রি-সময়-প্রেম

উৎপলকুমার বসু

ইতিহাস ইতিবৃত্তে সময় চোখের জল ফেলে।
কুয়াশাই ঘিরে রাখে পুরাতন প্রেমের আকাশ।

আমাদের বংশস্রষ্টা যাঁরা—পূর্ব্বসূরী,
আভাষে ইঙ্গিতে তাঁরা দিয়ে গেছে তারার ইশারা।
এক তার নাম।
সে নামের 'পরে—
সময়ের অশ্রুজল অবিরাম ঝরে।

সেই নামে মৌমাছি, মৌচাকে মধু জমা করে
দশটায় বিলীন ইচ্ছা—পাঁচটার প্রহরে প্রহরে
উল্লাসে, আর্ত্তনাদে ফেটে পড়ে সহরের ধূসর আকাশে।
ইতিহাস স্বর্ণঝড় আনে—
চেঙ্গিশ, নাদির শা একদিন জেনেছিলো যে ঝড়ের মানে।

বরাভয় তুলে,
হেঁকে বলে সময়ের সফল সন্তান
আমি এক দৃঢ় নর—এনে দিব আনন্দের ঘ্রাণ।
অভীপ্সায় সময়ের দুই হাতে ঝরে যায় বর্ষার ফুল—
মেঘনার দুই পাড়ে ছায়ার আভাষ জমে ওঠে।
শ্রাবণ তাহার নাম।
উন্মুখ শ্রবণে শুনি—রাত্রির বিলাপ
কি পেলাম, কি পেলাম—
হে সময়, বলে যাও—কি পেলাম।

## তবে

দীপক মজুমদার

( মমতার জন্য )

এখানে এই সায়ন্তন নীলের শেষে
বেদনা যদি থামে,
পাখির ভীরু হৃদয় থেকে দুর্বিনেয়
তৃষ্ণা ঢেউ নামে।



এখানে এই ক্লান্তিবহ সোনার রথে
কুমার যদি আসে,
মৃত্তিকার নিবিড় রঙ আকাঙ্ক্ষার
মল্লিকার পাশে,

তবে আমার আবেগসুধা আকাশ-চোখে
বিছিয়ে আমি দিই।
তবে আমার প্রচিত প্রেম ত্রিসন্ধ্যার
জীবন থেকে নিই।

তবে তোমার মাধবী-মন অরণ্যের
গভীরে তুমি নাও।
তবে তোমার ফাল্গুনের ক্লান্তি থেকে
সমুদ্রকে দাও।

তারপর আকাঙ্ক্ষার বিভোল স্তব্ধতা,
দুঃখার্ত এ দিবসের পর্ণশয্যা শেষ।
তারপর প্রতীক্ষার মুকুরে শুভ্রতা,
মেঘলীন বাসনার, নীলান্তের দেশ।

## সুদূর

শোভন সোম

সমস্ত চেতনা জুড়ে বাজে কোন সুর
বিষণ্ণ-মধুর
ডাক শুনি, সমুদ্রের অশান্ত কল্লোল ;
যেখানে অন্ধকারে অগণন তারাগুলি জ্বলে।

লঘু পায়ে হেঁটে হেঁটে চলেছে সময়
যেন মনে হয়
কে ডাকে, কে ডাকে
যেদিকে বাড়াই হাত যেন ছুঁই কাকে।

হৃদয়ের গভীর প্রদেশে
ঢেউ তোলে কার হাওয়া এসে
আমার তন্দ্রার তারে আঙুলে যে কার
বারে বারে কেঁপে ওঠে কোমল-গান্ধার।
আমি তো পাইনি তবু তাকে
বৃথাই কেবলি খুঁজে হারাই আমাকে॥

## গোধূলির গান

শহীদ কাদ্‌রী

জানি না
ক্লান্তির আর্তি ছাড়া অন্য কোন ধ্বনি
ছিল কিনা
সন্ধ্যার নদীর স্বরে।
কে যেন মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে
বারবার
কবেকার ভুলে যাওয়া নাম!

কাকের ক্লান্ত ডাক!

একবার ফিরে যাই,
নিঃসঙ্গ গোধূলিতে ফিরে আসি
সূর্যাস্তের আকাশে তাকাই—
কোথায় গভীরে উন্মীলিত হয় গোপন রঙের উৎস!
প্রত্যহ এক ঝাঁক ম্রিয়মাণ মাছ
অতল গভীর থেকে
উঠে আসে; কিছুটা আবির মাখে মুমূর্ষ ম্লান চোখে।

( দেবতার মত মন্ত্র ছড়ায় প্রাচীন দেবদারু গাছ! )



কাজের বৃন্ত থেকে ঝরে'
দু'দণ্ড আলস্যের অন্ধকারে মরে
শস্যের সঙ্কেতে ফের বাঁচি : মনে পড়ে
আনত চোখের দ্বিধা, শান্ত পদধ্বনি : হায়, আজও ভালবাসি?

## রৌদ্রজ্যোৎস্না

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জ্যোৎস্নায় শাদা একবুক মাঠ দূরে
একা একা পড়ে আছে,
রাত্রি গেল যে এই পথটুকু ঘুরে
ক্লান্ত সারসী মুখ গোঁজে তারই কাছে!

মুখে তার দিও সোনালী শস্য, পান্থ,
ডানায় ছড়িও চাঁদের আরাম-কণা—
চোখের মিষ্টি মধুর ছায়ায় আলতো
দুহাতে লাগিও আলোকের চন্দনা!

দিগ্বলয়েই কেঁপে যায় বনভূমি;
আকাশ পৃথিবী একদেহ একাকার,
সিন্ধুসারসী পড়ে আছে মুখে চুমি
ঝাঁঝালো গন্ধ কঠিন মৃত্তিকার!

রৌদ্রসারস কোথায় গিয়েছে চলে
অবাক সারেঙ মাঝিমাল্লার মত,
ডানার পালের হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে
কে জানে গিয়েছে কতদূরে অন্তত:

সেই রৌদ্রের উত্তাপ কী যে দিই
এই শান্তির হিমরজনীর তীরে—
আকুলকামনা বুকভরে শুধু নিই
রৌদ্রসারস আসে যেন ফের ফিরে!

## শিলঙে শীত

সুশীলকুমার গুপ্ত

শীতের নাটক সুরু। এ শিলঙ অপূর্ব্ব নায়িকা,
আশ্চর্য্য সুন্দর শুভ্র বেশে ব্যক্ত প্রাণের মহিমা।
মুছে যায় বেদনার পদচিহ্ন, মৃত্যুর কালিমা,
নিষ্ফল স্বপ্নের লেখা, ধূমায়িত কামনায় শিখা।
পাহাড়-পালঙ্কে শুয়ে সুখ-স্বপ্নে নিদ্রিত আকাশ,
স্তব্ধতার তপস্যাকে ভাঙায় না ঢেউয়ের নূপুর
তন্বী তটিনীর পায়ে। পাখীদের বিরহের সুর
প্রশান্তির শুভ্র পত্রে রেখাঙ্কনে করে না প্রয়াস।
ব্যাকুল বাতাস কার মিলনের আবেশে মন্থর ;
কুয়াশায় মুখ ঢেকে অরণ্যের বধূ ভাবে মনে
কতক্ষণে ধরা দেবে বাঞ্ছিত রৌদ্রের আলিঙ্গনে ;
শিশিরের সুধা-পানে পরিতৃপ্ত তৃষিত প্রান্তর।

দগ্ধ মনে মুছে দিয়ে হেমন্তের বিরহের রঙ
শুভ্রতা ও প্রশান্তির ঢেউ তুলে দিল এ-শিলঙ।

## সমালোচক

অনিল বিশ্বাস

চষ্‌লো মাঠ, বুন্‌লো ধান জীবন ক্ষেতে
জীবনভ'রে কৃষক কবি ;
কালের খেয়ায় ফসল তুলে রইল প'ড়ে
ওষধির সে একক ছবি।

পণ্য বোঝাই সোনার তরী ভিড়লো ঘাটে,
নতুন দেশে কালান্তরে।
গৃহস্থেরা একে একে জম্‌লো শতেক
বরণমালা নিয়ে করে।



খোঁটে বাছে, গুছায় ফসল ঘরের মালিক
প্রয়োজনের নিক্তি ধ'রে
ফেলে কতক, তোলে শতেক গোলা ঘরে
সাজিয়ে রাখে থরে-থরে।

নবান্নেরই নবীন নেশায় গৃহীজনে
খোঁজে না তো কৃষক কোথায় ;
কেন সে আজ আসেনিক' ফসল সাথে,
কেমন ক'রে দিন সে কাটায়।

জানে না তারা কি ক'রে হয় ফসল সৃষ্টি,
কত পূজার এ-আরাধন।
ঝড় বাদল আর কাদামাটির কী যে কষ্টে
ফুটেচে ঐ চাষীর সাধন।

আজকের দিনের ফেলা ফসল অন্য কালে
হয় তো হবে মূল্যবান।
কখনো বা গোলা ঘরের মজুত ধান
প'চে হবে পিছু টান।

তাইতো শুধাই, সমালোচক, বলুন দেখি
কি ক'রে হয় কাব্য সৃষ্টি ?
কেমন ক'রে ভাবের দানা জন্ম নিয়ে
ঝরায় হাজার কথার বৃষ্টি ?

দেখেচেন কী নিজে কভু কবিতা লিখে,
কেমনে কাব্য কথায় ফোটে ?
কোন্ সে সুরে প্রাণের ছন্দ নেচে ওঠে,
কথায় শতেক অর্থ জোটে !

ব্যাকরণে হয় তো পাবেন হদিশ কিছু,
গয়না-গাঁটির জামার বহর ;
ভাব কথা ও ছন্দ অর্থে অলংকৃতা
কবিতা রাণীর কিছু খবর।

সাজপোষাকে দেখতে পাবেন অনেক ঠাট,
বাচ্যরীতির অলংকার।
বহির্বাসে আছেই আছে ঘনঘটা,
হরেকরকম রঙে-বাহার।

'এহ বাহ্য'—বলুন, কাব্য কোথায় আছে,
নেপথ্যের কোন্ মণিকোঠায় ?
রমনেওয়ালা 'রসের' ধ্বনি কার স্বরূপ,
দোলায় কে ঐ নাগর দোলায় !

অচঞ্চলচিত্তে জাগে ভাবের সাড়া
জন্ম দেয় সে রসের নদী—
দুর্নিবার ব'য়ে চলে ছন্দোস্রোতে,
আবেগ দোলায় নিরবধি।

ঢেউয়ে-ভাঙা আলোর ঝিলিক অর্থে লাগে,
ঝল্‌সে ওঠে কথার তটে।
অন্তরাত্মা ছন্দে নাচে সুরে-লয়ে,
বেসুরোর বাজনা বটে !

অধরা কোন্ আকাশবাণী হঠাৎ এসে
কবির কানে সাড়া জাগায় ;
সুর-সরিতে কণ্ঠ কাঁপে ছন্দেতালে
রূপ ধরে সে কথার কায়ায়।

গ্রাহক কাণের অভাব হ'লে বাজেনা সুর,
ব্যর্থ হয় সমালোচন :
কবির প্রাণের কাব্যরাণী বয় অধরা
ঘোমটা-ঘেরা নির্বচন।

সারস্বত সমাজে তাই আছেই রেওয়াজ,
সমালোচকও হবেন কবি ;
কবির যেমন হ'তে হয় সমালোচক
আপন সৃষ্টির পরম-ছবি।



এ দু'য়ের মিল না হ'লে বিফল হবে
শুধুই তবে ভাষ্য বিচার।
আজানার শূন্য তীরে রইবে প'ড়ে
বেতার বাণীর সে-ঝংকার।

তাই তো বলি, আলংকারিক, কেনই করেন,
অহংজ্ঞানের বাজে বড়াই ?
কেনই হন উর্দ্ধ ভ্রূ ও উন্নাসিক,
কাব্যে যখন এসব নাই !

## বুদ্ধের স্মরণে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রেমের প্রমার মতো কুয়াশা-আচ্ছন্ন সূর্য্যোদয়
এসেছিল এ-জীবনে। জন্ম-রাত্রি-ঋণ শোধ হয়
আশ্বাস ছিলনা তাই সুদিনেরও স্মৃতি নেই মনে।
রৌদ্রে কারে মেলে দিতে হয় অতঃপর অকারণে ?
পুতুল বানিয়ে ? লুব্ধ মত্ত অন্ধকারে নম্র আলো
সম্মোহন-হীন। তুচ্ছ না কি উচ্চেতে মিশালো
বিশাল এ কিম্বদন্তী শুনি। সব কাজ বাজে ভেবে
প্রাণ অনীহায় ভ্রাম্যমান। তাপ এখন কে দেবে ?

সূর্য্য উঠে অস্ত গেছে। তেরো শ' ষাটের মাঘ মাস।
একটি বিকেল যদি বুনে চলে মনে ইতিহাস
পাওয়া-না-পাওয়ার সূত্র ছিঁড়ে-ছিঁড়ে বিবস্ত্র জীবন।
কে করে অপৌরুষেয় অবিশ্বাস-লজ্জা নিবারণ
যা আমার অনাবৃতা অন্তর্য্যামিনীরই ব্যথা স্বীয় :
বসন্তের ভাঙা হাটে কেউ হতে পারেনি যে প্রিয় !

তবু প্রেম-পরিহাস-প্রচ্ছদে জড়িয়ে দীর্ঘকাল
রেখেছি হৃদয় পাছে বহু-ব্যবহৃত ইন্দ্রজাল
ভুলে গিয়ে প্রাক্‌মরণ প্রাণ করে মহৎ প্রয়াণ ;
পৃথিবী-বল্মীকে ঢাকা থাক ইন্দ্রিয়ের অপমান।

# ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

## ইন্দ্রজিৎ

[ পূর্ব্বানুস্মৃতি ]

জনসাধারণ বেদশাস্ত্রের প্রতি আস্থা হারাবার পরে সেই শাস্ত্রকাররা আর পূর্বেকার মতন সকলের কাছে গৌরবের বস্তু হোয়ে টিকে থাকতে পারলেন না। কারণ বেদমন্ত্রে উদাত্ত গম্ভীর স্বর ছিল কিন্তু ঔদার্য্য ছিল না। সে বেদ কিছু লোককে হয়তো আনন্দের সন্ধান দিল, কিন্তু সমস্ত লোককে আনন্দ দিতে, সমস্ত লোককে আকর্ষণ করতে এ শাস্ত্র পরিচয় দিল অক্ষমতার। তাই এ শাস্ত্র আশ্রয় নিল নিরাশ্রয়ের খাতায়, থাকুল, না থাকার রূপে।

ভারত-সংস্কৃতির ধারা আলোচনায় দেখতে পাই যে বৈদিক যুগের পরবর্তী যুগেই আমরা পাই জৈন ধর্মবাদ।

জৈনবাদের তীর্থঙ্কর মহাবীর থেকে আমরা এ ধর্মের ধারা আলোচনা করতে পারি।

জীব জগত ও প্রাণী জগতের ভেতরে সমবেদনার সাড়া জাগালেন এই জৈনবাদীরা। এঁদের দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা আর জীব জগতের প্রতি করুণা ভারত-সংস্কৃতির ধারাতে একটা অভিনব সাড়া জাগাতে পেরেছিল।

মহাবীর ছিলেন বুদ্ধদেবের সমকালীন ধর্মগুরু। ইনি এঁর মতবাদের মর্মার্থে বললেন যে জীবের প্রতি হিংসা করা পাপ। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবে কর দয়া।

বৈদিক যুগে হিংসার কথা আর অহিংসার কথা দুটোই শোনা যেতো, শোনা যেতো দুটোরই সপক্ষে উত্তর কিন্তু জৈনবাদে হিংসার কথা নেই, এখানে সব কিছু কর্ম করবার নিয়ম ও বিধান আছে অহিংস উপায়ে। এইজন্যে অর্থাৎ অহিংসার আর হিংসার পথে জৈনবাদ বেদের ধর্মকে গ্রহণ করেন না কিন্তু তাই বলে জৈন ধর্মকে নাস্তিক ধর্ম বলে সম্বোধন করলে ঠিক হবে না।

জৈন ধর্মে বৈদিক ধর্মের মতন শিল্পকলা সব কিছুরই প্রকাশ ছিল। তাঁরা স্তূপ নির্মাণ করতেন নিজেদের ধর্মনেতাদের সমাধির ওপর। কারুশিল্পের দিক থেকে এঁরাও কম ছিলেন না বরং জৈন ধর্মে কারুশিল্প একটি বিশেষ দিক দেখিয়েছিল যাকে স্বতন্ত্র আখ্যা দেওয়া চলে। এ সমস্ত শিল্পের পরিচয় আজও পাওয়া যায় মথুরা বুন্দেলখণ্ড মহীশূরে। এ সমস্ত শিল্প একাদশ ও দ্বাদশ শতকে নির্মিত, এমন কি পনের শতকে গোয়ালিয়রে পর্যন্ত এই জৈন শিল্পের নিদর্শন আছে। এই শিল্পের ভেতরে চরম ও পরম সুন্দর সৃষ্টি হোল রাজপুতানায় আবু পর্বতে দিলওয়ারা মন্দির যে মন্দিরের কারুকার্য ভারতের অনেক লোককে মুগ্ধ করে। এটা এগার ও তার পরের শতকের তৈরী।

জৈন ধর্মের যাজকদের প্রায় সব ধর্মের মতনই ঘর ছাড়ার দীক্ষা নিতে হোত, কিছু জিনিষ সে সমস্ত যাজকরা সঙ্গে নিতে পারতেন যেগুলো নিয়ে বিলাসিতা করা চলে না কিন্তু প্রয়োজনীয় কাজ করে যাওয়া চলে। যথা, বিশুদ্ধ জল রাখবার পাত্র, ময়ূরের পালকের পাখা, এ পাখা দিয়ে তাঁরা মশা মাছি বা অন্য কোন পোকা মাকড় সরিয়ে দিতে পারবেন কারণ জৈনবাদে জীব-সংহার নিষেধ, আর নিতে



পারেন তারা কিছু ধর্মের বই। সেতাম্বর সম্প্রদায়রা কিন্তু নিজেদের কয়েকটা কাপড় সঙ্গে নিতে পারেন। কিন্তু দিগম্বর সম্প্রদায় এ সমস্ত কোন কাপড়ই সঙ্গে নিতে পারেন না। তাঁদের পক্ষে অনেক আচার অত্যন্ত কঠিন ; যেমন, তাঁদের মাটির ওপর শুতে হবে কিছুদিন, নিজের মাথার চুল নিজে ছিঁড়তে হবে, একবার মাত্র সারাদিন রাত্রির ভেতর খেতে পারবে, তাও আবার দাঁড়িয়ে, নিজের হাতে।

জৈন ধর্মের ভেতরে কঠোরতা আছে, বিলাসিতা নেই, আরাম সেখানে জ্ঞানে আর ত্যাগে। এঁদের ধর্মের এই কঠিন বাঁধন শিথিল করল এঁদের মতবাদকে, মত প্রকাশ করবার প্রচুর অবকাশ এঁরা পেলেন না। শিল্পকলার ভেতর উপদেশ আর কঠোর জীবন যাপন এঁদের যুগে জানাল সমাপ্তির সঙ্কেত। সেই জন্যে জৈনবাদকে বেদ ও বুদ্ধবাদের মাঝামাঝি সময়ের ধর্ম বলে ধরতে পারি কিন্তু পরবর্তী যুগ এ ধর্মের কিছুকাল পরেই এল ঠিক এ ধর্মেরই আবরণ পরে। জৈন মহাবীর সমাধিস্থ হোলেন জ্ঞানযোগের ভেতরে।

সমস্ত মানুষ চাইছে সুখ কিন্তু পয়সার ভাগ্যে ফুটো আর টাকার ভাগ্যে রূপো। এখানে যে সুখ দেখা গেল সেটা আংশিক, সামগ্রিক নয়। তাই মাটির বুকে সমগ্র মানব গোষ্ঠীর ইচ্ছার শিখা জ্বলছে বটে কিন্তু জ্বলজ্বল করে নয়, জ্বলে উঠে একবার আবার জ্বলে গেল, আবার সভ্যতার বুক জুড়ে অমাবস্যার কালো।

এই অন্ধকারের ভেতরে চিন্তাশীলেরা ভাবতে লাগলেন ধ্বংসের মূল কারণ, ভাবতে লাগলেন সমস্যার পথ। সমাধান আসে চুপি চুপি, অন্ধকারের ভেতরে সাবধানে পা ফেলে, ত্রুটির হাতে শেকল পরায় নীতি।

এর পর সভ্যতার তৃতীয় সকাল। সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ্য করে সুখের সন্ধানে নতুন পথ দেখাতে চেষ্টা করলেন কপিলাবস্তু। হাত তুলে সমস্ত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে জানালেন, কেউ ছোট নয়, ছোট হোল ছোট কাজ। প্রতিটি মানুষ হোল অখণ্ড সৎ কাজের খণ্ড খণ্ড বিকাশ। অনধিকার বলে কোন জিনিষ যেমন মনুষ্যত্বের ধার ঘেঁষতে পারে না তেমনি ধার ঘেঁষতে পারে না একচেটিয়া স্বভাব।

বল্লেন কপিলাবস্তু তাঁর কথার সার মর্মে, সকলেই সুখের অধিকারী, বল্লেন চেষ্টা কর আনন্দ লাভ করবার কিন্তু সে চেষ্টা যেন সৎপথে হয়, সৎপথে আনন্দ লাভের চেষ্টাই তোমাদের নিয়ে যাবে চরম আনন্দের পথে, যে আনন্দের স্বরূপ কপিলাবস্তু নিজেই বর্ণনা করতে পারছেন না মুখে।

বিপুল সাড়া জাগলো সাধারণের ভেতরে, সাড়া জাগল তাদের ভেতর যারা নিপীড়িত। মানুষ হোল না শুধু কপিলাবস্তুর কথার জালে আবদ্ধ, হোল তার কথার অনুগামী, ধর্মের ভেতরে আবদ্ধ নয় সে ধর্মের অনুগামী, সংঘের ভেতরে আবদ্ধ নয় সংঘের অনুগামী।

বেদজ্ঞরা বিচলিত হলেন এই অপ্রত্যাশিত ধর্মবিদ্রোহে, কারণ তাঁরা যেমন সকলের ওপরে শান্তি জল ছেটাতেন বিজ্ঞের মতন আবার সেই সূত্রে শান্তিজল পেতে বেদজ্ঞদের কাছ থেকে বেদপূর্বরা বাদ পড়তেন, এই বিদ্রোহের সঙ্কেত বুঝে বেদজ্ঞরা হয়ত সবার উদ্দেশে শান্তিজল ছিটিয়ে বলেছিলেন :

ওঁ শান্তিঃ
ওঁ শান্তিঃ
ওঁ শান্তিঃ

ঠিক তিন বার শান্তির বাণী উচ্চারণ করলেন বেদজ্ঞরা অর্থাৎ হে সাধারণ তোমাদের আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিন রকম দুঃখই জীবন থেকে দূর হোক, জীবনে তোমাদের আসুক শান্তি।

এটা তাদের মত কি না বলতে পারিনা কিন্তু জনসাধারণ একথার ভেতরে শান্তি পাবার পথ খুঁজে পেল না তাই তাদের সেই তিন কথার আশীর্ব্বাদের উত্তরে জনসাধারণ ঠিক তিন কথাতেই প্রত্যুত্তর দিল, বল্‌ল :

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি

দেশ জুড়ে নিপীড়িতেরা দীক্ষা নিতে চল্‌ল কপিলাবস্তুর কাছে, নিজের দুঃখ জানাতে তার চরণে কিন্তু যে যখনই তার চরণকে উদ্দেশ্য করে নিজের দুঃখের কথা শোনায়, তখনই তিনি তার পা সরিয়ে নিয়ে তার মুখের কাছে নিজের কানকে নামিয়ে আনেন, কপিলাবস্তু নিজেকে নামিয়ে আনেন নিপীড়িত বক্তার মুখের কাছে। মানহীনদের ঘুরিয়ে সম্মান করেন কপিলাবস্তু। পা ছোঁবে কেন, কেউ ত ছোট নয়, প্রতি মানুষই যে অখণ্ড আনন্দের খণ্ড খণ্ড বিকাশ।

কপিলাবস্তুর ধর্মে জাতটা বড় নয়, এখানে বড় হোল মানুষের মানবিকতা, যে লোকের সে মানবিকতা আছে সে লোক অনায়াসেই ধর্মের নামে নিজের মাথা মোড়াবার অধিকার পাবে আর যার সে মানবিকতা নেই তার মানবিকতাকে উন্মেষ করার ব্যবস্থাও আছে এ ধর্মের ভেতরে।

সব লোককে ভেতরে আনবার প্রকাণ্ড খোলা সিংহদ্বার দেখা গেল বুদ্ধবাদে, আর দেখা গেল দলে দলে লোক সে সিংহদ্বার দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে কিন্তু ফিরছে না কেউ, কারণ এ ধর্মে আকর্ষণ আছে কিন্তু বিকর্ষণ নেই।

বুদ্ধ-যুগ সুন্দর সন্ন্যাসীর যুগ, বুদ্ধ-যুগ ধর্ম-সাহিত্যের যুগ আবার সাহিত্যধর্মের যুগ। বুদ্ধ-যুগেই প্রথম বহি প্রকাশ কঠিন পাথরে কোমলাঙ্গ। বুদ্ধ-যুগ কথা-সাহিত্যের যুগ আবার প্রবাদ-সাহিত্যেও সে যুগ সমৃদ্ধ। চিত্র এবং নাট্য প্রায় সব কিছুই আত্মপ্রকাশ করল এই বুদ্ধ-যুগে।

বসন্ত কালে বাগানে ফুলও ফুটল আবার ফলও ফল্‌ল।

কিন্তু যার আরম্ভ হয় তারই যে শেষ আছে, দুঃখের যেমন শেষ আছে তেমনি সুখেরও আছে সমাপ্তি। বুদ্ধবাদে বিলাসিতার স্থান ছিল কিন্তু সে বিলাসিতা সীমাকে অতিক্রম করতে বলেনি। পরবর্তী যুগে দেখা গেল সেই অপরিমিত বিলাসিতা আক্রমণ করেছে বুদ্ধযুগের যকৃত। শুক্র গেলেন মিথুনরাশিতে। এর পরই ফুল-ফল-সমেত বোধিবৃক্ষের রাজকীয় মৃত্যু।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম কোণঠাসা হয়ে এতদিন তার ছোট্ট দল নিয়ে মন্ত্রণা কচ্ছিলেন সময় অনুকূল বুঝে তাঁরা তাঁদের পুরনো পুঁথির পাটার ধুলো ঝাড়তে লাগলেন।

এর পর পুনরাবৃত্তির যুগ, কিন্তু বিগত যুগের নবতম কলেবরে দেখা গেল, সে যুগ মূলত কপিলাবস্তুর সার কথাকেই ধার করেছে। পরাজিত বুদ্ধবাদীরা যখন নতুন বেদান্তবাদীদের প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত নিয়ে উপহাস করলেন তখন তার উত্তরে নতুন বেদান্তবাদীরা বললেন বুদ্ধ ছিলেন কেশবেরই বুদ্ধরূপ।

কিন্তু এতেও যে জাতির দুঃখ মিটল না এইটেই দুঃখের কথা।



বুদ্ধ-যুগের দেবদেবীদের সাধারণ উপাসকদের কাছ থেকে কেড়ে এনে নতুন শাস্ত্রজ্ঞরা হিন্দুয়ানীর তেলক পড়িয়ে সে সমস্ত দেবদেবীদের ঘরে বন্দী করলেন আর কপিলাবস্তুকে মাঝখান থেকে চিড়ে তার অর্দ্ধেকটা দিয়ে তৈরী হোল বিষ্ণু এবং বিষ্ণুত্ব আর বাকী অর্দ্ধেকটা দিয়ে তৈরী হোল ধ্যানী শিব মূর্ত্তি এবং শৈবত্ব। কপিলাবস্তুর নিরাশ্রয় সূক্ষ্ম দেহ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল সুদূর প্রাচীতে। এর আগে সেদিকে বুদ্ধবাদ গিয়েছিল এবার তিনি নিজে গেলেন।

শঙ্করাচার্য্য কপিলাবস্তুর স্থূল দেহকে হজম করে সশব্দে ঢেকুর তুল্‌লেন এবং সে ঢেকুরের শব্দ শোনেনি এমন ভারতীয় তখন একজনও বোধ হয় ছিলেন না।

নতুন যুগ নতুন কোন কথা বল্‌ল না, পুরোণ কথা নতুন করে বল্‌ল। বিগত বুদ্ধযুগের কথাগুলোকে নিজেদের নতুন ব্যাকরণে ঢেলে সাজিয়ে জনসমাজে পরিবেশন করল। সে ব্যাকরণ আজও পরিচিত পানিনির ব্যাকরণ নামে।

সেকালে আমরা নাগরিক জীবনের পরিচয় পাই। কিন্তু সে যুগে নাগরিকতা জীবনের প্রধান ধর্ম নয়। রাজন্যদের প্রাসাদ জীবন যাপনের ভেতর আড়ম্বর ছিল, শিল্প যুগের আভাস পাই, বৌদ্ধ-পূর্ব্ব যুগের প্রাসাদ, কারুকার্য্য খচিত রাজ সিংহাসন, স্বর্ণালঙ্কার, বেশ সজ্জা, অঙ্কন শিল্প প্রভৃতি।

সে যুগের আর একটি সৃষ্টি হোল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অর্থাৎ চিকিৎসা শাস্ত্র। আয়ুর্ব্বেদ তার মর্মবাণীতে বলে যে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করাটাই আয়ুর্ব্বেদের বড় কথা। আয়ুর্ব্বেদ তার স্বীয় দর্শনে বলেন মানুষকে আয়ু দেয় আয়ুর্ব্বেদ, সেই কারণে বেদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বেদ আয়ুর্ব্বেদ।

প্রাচীনকালে বেদজ্ঞরাও আয়ুর্ব্বেদকে উচ্চাসন দিয়েছিলেন কিন্তু শেষকালে তারা যখন আয়ুর্ব্বেদে শল্য চিকিৎসার প্রচলন করলেন তার পর থেকে প্রাচীন শাস্ত্রকাররা রক্ত স্পর্শ করাটাকে অস্পৃশ্য কাজ মনে করলেন। সেই কারণ বশত যারা এ শাস্ত্রকে তথাপি ছাড়লেন না তাঁরা বৈদ্য আখ্যা পেলেন। কাব্যের ভেতর দিয়ে এই আয়ুর্ব্বেদ প্রকাশিত সেই কারণ বশত এ শাস্ত্রের অধিকারীকে কবিরাজ আখ্যা দেওয়া হোল। আয়ুর্ব্বেদের দুটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হোল সুশ্রুত সংহিতা আর চরক সংহিতা।

বেদ ও বেদোত্তর কালের আর একটি সৃষ্টি হোল জ্যামিতির অঙ্কশাস্ত্র। যজ্ঞভূমি আর কর্ষণ ভূমিকে মাপার জন্যে এ শাস্ত্র প্রথম তৈরী হোল।

(ক্রমশঃ)

# ঘাসের ফুল

**অমল দত্ত**

ট্রেনে চেপে বসলেই মনটা উধাও হয়ে ছোটে। হারানো শৈশব বুঝি তেপান্তরের ঠিকানা খুঁজে চলেছে। ক্ষণিকের এ আবেশ চেপে নজরটা কামরার ভেতর টেনে আনলে যাদের চোখে পড়ে তারা সবাই আমাদের বড় জানাশোনা। প্রতিদিনের একঘেয়েমিতে এরা সময়কে ছুপিয়ে রাখে।

তবু বড় ভালো লাগে একটা শিশুর ক্রমাগত দৌরাত্ম্যিপনা। ছুটোছুটি লুটোপাটি। ঘরবাইর নেই, আপনপর নেই। কখনো ছুটছে, কখনো এক যাত্রীর পকেট থেকে যথাসর্বস্ব টেনে বার করবার প্রয়াস নিচ্ছে। যার মুখে যা-ই দেখছে, সিগারেট বিড়ি পর্যন্ত হাঁ করে ওর চেখে দেখবার সাধ। একটি ভদ্রলোক ওকে আমলে রাখবার চেষ্টা করছেন—লজেন্স আর কমলা লেবুর কোয়া দিয়ে, নয় তো কোলে চেপে ধরে। তিনিই পিতা বটেন। বছর দুইয়ের শিশু, মাঝে মাঝে বাবা বলে হাত বাড়ায়। ওর ঠিক ধারণা হয়ে গেছে বাবা মানে এমন লোক যারা খাবার বয়ে বেড়ায়।

ভদ্রলোকটির পরে পাশাপাশি পাঁচ থেকে আটের মধ্যে আরো দুটি মেয়ে বসে আছে—তারপরে সদ্যজাত শিশুর লটবহরের একটা ঝুড়ি বড় মেয়েটির তত্ত্বাবধানে এবং কয়েকমাসের একটি শিশুকে অতি সাবধানে কোলে নিয়ে বসে আছেন যে মহিলাটি তিনিই মা। ভীতত্রস্ত বড় মেয়েটি তার হুকুমে এটা সেটা এগিয়ে দিচ্ছে।

মহিলাটির মুখোমুখি আরেকটা বেঞ্চিতে বসে সংসার যাত্রার জলছাপ দেখছিলাম। অনেক দূরে একটা জানালার খোপে একজোড়া যুবক-কিশোরী অনবরত কী যে বকম-বকম করছে ঠাহর করা মুশকিল। একটি বর্ষীয়সী মোটা মহিলা পানদোক্তায় মুখটা ফুলিয়ে ওদের আগলে রেখে উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কখনো সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে ওদের উৎসাহিত করছিলেন। আরেকদিকে একটা দৈনিক কাগজ প্রসারিত হয়ে কয়েকজন যাত্রীকেই আড়াল করে রেখেছে। মাঝে মাঝে এক ঝাঁক ধোঁয়া উদগীরণ করছে। ডেইলী প্যাসেঞ্জার ট্রেন—অনেকদূরেও যাবে না, তবুও কেউ কেউ এসেছে বন্ধুবান্ধবদের পৌঁছে দিতে, বিদায়ের গোঙানিও বড় কম নয়।

কিন্তু আমার কাছের ছোট্ট শিশুটিই কামরাটা মাতিয়ে রেখেছে—এক সময়ে কাগজের বেষ্টনী ভেদ করে পাঁচাট কাঁচাপাকা চেহারা ও দেখে নিয়েছে—আমিও দেখলাম পাঁচজনের মুখেই বিড়ি ধিকি-ধিকি জ্বলছে। এক সময়ে কিশোরীটি গুঞ্জন থামিয়ে ওকে আদর



করেছে, যুবকটির পকেট থেকে ও বার করে নিয়েছে দুটো বাসি গাঁদা ফুল। মুখে দিয়ে দেখেছে কোনো স্বাদ নেই, তাই ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলে দিয়েছে। মোটা মহিলাটি একটা পানের বোঁটা দিয়ে ওকে শান্ত করেছেন। বোঁটা চিবুতে চিবুতে শিশুটি গতি বদলিয়েছে।

তারপরে একেবারে ছুটে এসেছে আমার কাছে। লালায় মুখটা ভরে আছে। পানের বোঁটার আর বাকী কিছু নেই, তবু হাতখানি চেটে নেবার চেষ্টা। আমার চশমাটা দেখে একেবারে স্থির হয়ে গেছে। ভদ্রমহিলা বড় মেয়েটিকে বললেন, ডলি, মলির মুখহাতটা মুছে দে!

মলি পিছিয়ে দিদির কাছে সরে গেল, বারে বারে চশমার দিকে তাকিয়ে ভয় ও বিস্ময় কাটছিল না। ডলি রুমাল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিল—মলি এবার দিদির কোলে উঠে বসে চশমাটা দেখছে। তারপর মা'র কোলে যাবার জন্যে কাঁদতে থাকে। ভদ্রমহিলা বললেন, ডলি তোর বাবাকে ধরতে বল।

যুগপৎ হুইস্‌ল ও ঘন্টা বেজে ওঠে। গাড়িতে ধাক্কা লাগে। একটি ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড একটা ভ্যানিটি ব্যাগ, আগেকার গ্রাডস্টোন ব্যাগের মত, হাতে নিয়ে কামরায় এসে ঢোকেন। কামরায় কয়েকজন দাঁড়িয়েও আছে, ভ্যানিটি ব্যাগটারও স্থান সঙ্কুলান হবে কী না সন্দেহ। কিন্তু আমার প্রতিবেশিনী বড় মেয়ের কোলে অপগোণ্ড ঝুড়িটা চাপিয়ে দিয়ে ভদ্রমহিলাকে ডাকলেন, এদিকে আসুন। গাড়ি ততক্ষণে ছেড়ে দিয়েছে, নবাগতা টলতে টলতে ধপাস করে এসে বসলেন, ভ্যানিটি ব্যাগটা তাকিয়ার মত পেছন চেপে রইলো।

গাড়ি চলেছে। প্লাটফর্ম, গুদাম, রেলওয়ে সাইডিং অসংখ্য রেলের জটলা—সব পিছিয়ে পড়েছে। আশে পাশে সবুজ গাছ, গাছের ছায়া চোখে কাজল টানছে। ক্ষণিকের জন্যে মনটা যেন উদাস করে দেয়, এবার বুঝি ফেলে আসা শিশু-মন তেপান্তরের পথে যাবে।

এরি মধ্যে কামরায় ফিরিওলার বক্তৃতা শুরু হয়েছে। হজমিগুলি, দাঁতের মাজন সবই আছে। বাঙালীর একতার পথে কোথায় বাধা? খিটখিটে মেজাজ। কী কারণ? বদ হজম—তারজন্যে পেটজ্বালা, বুকজ্বালা, মুখজ্বালা। অম্বল থেকে দাঁতের ক্ষয়, দাঁতের ক্ষয় থেকে বাক্যলাপে অনিচ্ছা! চট করে দূরের জানালার খোপের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—জোড়াটি ঠিক বকম-বকম করে চলেছে। ওদের জন্যে তা হলে হজমিগুলি দাঁতের মাজন দরকার নেই।

বক্তৃতায় সহসা ছেদ পড়লো। মলি বাবার কোল থেকে লাফ মেরে ফিরিওলার তোরঙ্গের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোকটার হাত ফসকে তোরঙ্গটা নিচে পড়ে গেল। একজন যাত্রী লুফে মলিকে কোলে তুলে নিলে। 'আরে দুষ্টু মেয়েটা বাঙালীর একতা নষ্ট

করে দিলে গো',—বলে একজন হাসতে শুরু করলে। হাসির কোরাসে ফিরিওলা হকচকিয়ে গেল। বহু গুলি ধূলিমলিন হয়েছে, লোকের দৃষ্টি এড়িয়ে সেগুলি পেটরাজাত করতে পারলেও তার আজকের পরিশ্রম সার্থক হয়! ভদ্রলোক কিন্তু মেয়ের এ অবিমৃষ্যকারিতা ক্ষমা করতে পারলেন না। প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠলেন। মলি তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে। আশে পাশের যাত্রীরা বিক্ষোভ দেখালে, 'আহা অতি ছেলেমানুষ! ধমকাচ্ছেন কেন'।

আমার প্রতিবেশিনী বড় মেয়েকে বললেন, ডলি ঝুড়ির ভেতর থেকে একটা কমলা তোর বাপের হাতে দে। দুজনেরই মুখ বন্ধ হবে। আর ফেরিওয়ালাকে দু' আনা পয়সা দিতে বল্—বেচারার অনেক ক্ষতি হয়ে গ্যাছে।

নবাগতা হাসলে—দুষ্টু শিশুদের আমার বেশ ভালো লাগে।

—দুষ্টুমি ভালো লাগে? ওকে নিয়ে একটু সুস্থির হবার উপায় নেই! চোখে যতক্ষণ ঘুম আসেনা, তচনচ করে ছাড়ে।

এবার তিনি নবাগতার দিকে মুখ ফিরিয়েছেন।—আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে? চেহারাটা বেশ চেনা-চেনা লাগছে।

—কোথায় দেখতে পারেন বলুন তো, বরং আপনার মেয়েটি আমাকে চিনে নিতে পারে।

—আমি না চিনলে, ও কী করে চিনবে!

নবাগতা হাসলেন,—আমার মত হয় তো কেউ না কেউ ওর ইস্কুলের শিক্ষিকা আছে। পাঁচ বছর পড়ালে আমাদের সবারই মুখে একরকম ছাপ পড়ে যায়।—

আড়চোখে নবাগতাকে একবার দেখে নিলাম: কালো, সুডৌল চেহারা, বিশেষত্ব বর্জিত। ঘাড়ের পেছনে মেধক্ষীত দেহটি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, মুখচোখ ম্লান, কপালে কুঞ্চন রেখা রয়েছে হাসলেও তা দূর হয় না।

—আপনার বুঝি পড়াতে ভালো লাগে না?

—কী করে ভালো লাগবে—চাকরী যে।

—আমাদের তো চাকরীর বাড়া—ডেগমগ্টারী।

—চাকরীর বাড়া কিছু পেলে বর্তে যেতুম। ওতে ফল আছে।—নবাগতা একটু যেন শিউরে উঠলো।

প্রতিবেশিনী এবার সস্নেহ হাসি দিয়ে শুধালেন, আপনার বিয়ে হয়নি?

নবাগতাকে বুঝি এ প্রশ্ন কেউ করেনি। একটু লজ্জিত হয়ে মাথা নুইয়ে ঘাড় নাড়লে —না।

—কাউকে ভালো বাসতেন বুঝি?



অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। নবাগতার বিরক্ত হবারই কথা—কিন্তু এমন কথাই কি কেউ তাকে কোনদিনও শুধিয়েছে! নবাগতা আমতা-আমতা কী যেন বলে বাঁহাতে মুখটা মুছে নিল।

প্রতিবেশিনী এবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে উদাস সুরে বললেন, বুঝেছি। কাউকে ভালো-বাসতে পারলে আপনার এ্যাদ্দিনে বিয়ে হয়ে যেত।

এবার নবাগতা কৌতুক মিশিয়ে হাসলেন,—আপনার বুঝি—

—না তা নয়। এমন একটা সন্দেহ করে আমার দাদামশায় ঐ ভদ্রলোককে ধরে এনে গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন। আমার বিয়েটা যুদ্ধের গোড়াতেই হয়েছিল। তখনও আমাদের মত সাধারণ পরিবারের মেয়েরা বাপ-মার ঘাড়ের বোঝা ছাড়া কিছু ছিল না।

—এখন তো হয়ে দাঁড়িয়েছে বোঝাবাহী একটি চতুষ্পদ জন্তু।

প্রতিবেশিনী হেসে ফেললেন—রোজগেরে মেয়েরা তো আজকাল স্বাধীন—

—না আপনি জানেন না। কী কষ্টটাই না পেতে হয়। একে তো মেয়ের রোজগারে বাপমা'র অরুচি, কিন্তু দেশবিভাগের দরুণ সবছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, শুধু বাবার পক্ষে চোখেমুখে অন্ধকার দেখাই সার। মার সবতাতেই সন্দেহ, পণ্ডিতের বাড়ির মেয়ে কী না, পাছে কেলেঙ্কারী করে ফেলি। এর চেয়ে আপনার অবস্থা ঢের ভালো।

—একটা বিয়ে করে ফেলুন! শুধু অঙ্গীকার থাকবে আপনার রোজগার বাপের বাড়ির জন্যে—আমার তো তিনটি মেয়ে বড়, বলুন তো এমন কড়ার না থাকলে আমাদের দশাটা কী হবে। এই ছেলে কবে মানুষ হবে—

নবাগতা একটু ব্যাকুল হলেন,—আপনার তিন মেয়ের পর ছেলে! আমার বাবা শুনলে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতেন।

ম্লানমুখে তিনি জবাব দিলেন,—জানি। এই ছেলেকে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হবে। একজনের উপর অন্যায় করেছিলাম—এ শাস্তি তো আমার পাওনা!

শেষ কথাগুলো তিনি যেন ফিসফিসিয়ে আপন মনে বললেন। তারপর স্বামীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে শাড়ির আঁচলটা চোখেমুখে বুলিয়ে নিয়ে আসেন। নবাগতার চোখেও ম্লানিমা নেমেছে। বুঝি ওর কোনো গোপন কথা নেই—তাই। গোপন ব্যথা আছে—তা-ও আজকের। কিন্তু সহানুভূতির তন্ত্রীতে বিগত দিনের সুর বেজে উঠেছে, পণ্ডিতের মেয়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছে সেদিন—একদিন যেদিন কিশোরী ছিলাম।

রোদ্দুরের তাত আসছিল বলে আমার পাশের জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। গুমট কাটাবার জন্যে জানলাটা নামিয়ে দিলাম হঠাৎ। এক ঝাঁক আলোর তাড়নায় ওঁরাও যেন সম্বিত ফিরে পেলেন।

নবাগতা সহজভাবে বললে,—অনেকক্ষণ ধরে এক ঠায় বসে আছেন, দিন খোকাকে আমার কোলে দিন।

—বড্ড বজ্জাত। রাখতে পারবেন না। আমার কোলে বলে ন্যাংচা মেরে পড়ে আছে—আপনার কাছে দিতে গেলেই টে টে করে চ্যাঁচাতে থাকবে।

গাড়ি একটা ছোট্ট ইষ্টিশনে থেমেছিল। একটি সুবেশা তরুণী সটান দরজা ঠেলে ওঠে এল। যেন ওর জন্যেই গাড়ি থামা। দরজার মুখে লোকের যে জটলা ছিল তারা সসম্ভ্রমে তার পথ করে দিলে। মলি পর্যন্ত বাবার কোল থেকে গম্ভীর ভাবে তাকালে। ওর হাতের কাছে, কিন্তু ছুঁতে চাইলেও না। মেয়েটির পরণে শান্তিপুরি শাড়ি, লম্বা হাতা ইট রঙের ব্লাউজ; পাঞ্জাবী প্যাটার্নে এলো খোঁপা বাঁধা—তাতে বিঁধে আছে রূপোর ঝুমকো, কানে দুটো পোকরাজ পাথরের চ্যাপ্টা, সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ, কপালে সিঁদুরের বড় টিপ। যেন দয়া করেই তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় ঢুকে পড়েছে। আমার সামনের ভদ্রমহিলা দুজনও বিস্মিত। মেয়েটি কিন্তু বেঞ্চগুলির সামনে শক্ত খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে পড়েছে। একজন যাত্রী তার আসন ছেড়ে দিল বসতে অনুরোধ করে—কিন্তু মেয়েটির দৃকপাত নেই। লম্বাটে চেহারা উঁচু লম্বা নাক, দুপাশের চোয়াল যে ঠোঁট দুটোকে খিল এঁটে রেখেছে, চোখের তলায় গভীর কালো ছাপ, আধময়লা রঙ। মুখখানা রক্তলেশ হীন পাথরের খোদাই।

সবাইকে চমকে দিয়ে মেয়েটি গাইতে শুরু করলে। জানালার খোপে বকম-বকম থামলো, কাগজের আড়াল টুটে পাঁচ জোড়া চোখ মুগ্ধ হয়ে রইলো। থেমে গেল কলোনী-কল্যাণী-কারবারের কথা, কংগ্রেস-কমিউনিষ্ট কীর্তি-কাহিনী। এমন কি এক ক্যানভাসার অষুধপত্র নিয়ে কোন আওয়াজ তুললে না। মেয়েটি গাইছে—'প্রতিমা দিয়ে কী পূজিব তোমারে এ বিশ্ব নিখিল তোমার প্রতিমা। মন্দির তব কী গড়িব মাগো মন্দির যার দিগন্ত নীলিমা॥'

মেয়েটি গাইতে গাইতে শেষপ্রান্তে চলে গেছে, যেখানে যুগল বকম বকম কচ্ছিল। অনেকেই পকেট থেকে আনি-দুয়ানি বার করছে—কষ্ট করে মনি ব্যাগও খুলেছে কেউ। অতি অনিচ্ছাসত্বে যেন তরুণী পয়সা হাতে তুলছে, এ সামান্য দক্ষিণা তার প্রাপ্য নয়, অথবা এ গান পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। মেয়েটি হাত তুলছে না, লোকে হাতে গুঁজে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে মেয়েটি আমাদের সারিতে এগিয়ে এল। এবার অন্য গান গাইছে—'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী—'

গান থামলে মলির বাবা তরুণীর হাতে একটা সিকি গুঁজে দিয়ে উচ্ছ্বসিত হলো,—আপনার গলা খুব দানাদার, আমার স্ত্রীও এত ভালো গাইতে পারে না।



গায়িকা পাষাণবৎ এগিয়ে গেল মাত্র, প্রশংসায় কোন রেখাপাত করলো না। কিন্তু আমার প্রতিবেশিনী লজ্জিত হয়ে জিভ কেটে বললেন, ছি ছি ছি ছি।

নবাগতা হেসে বলে, আপনি গাইতে জানেন, এতো খুশীর কথা।

—গাইতে জানলে তো বাঁচতুম ভাই। জীবনের অনেক দুঃখ কেটে যেত। গান আমাকে ছেড়ে গেছে।

—তবুতো আসল লোকটাকে খুশী করতে পেরেছেন, কত গাইয়ে মেয়ের দুঃখময় জীবন—

—গান যে তাদের ছাড়ে না। বড় মেয়েটার জন্যে মাঝে মাঝে তানপুরা নিয়ে বসি, যদিই এরা আমার স্বপ্ন সফল করে। এদিকে শোন ভাই—

মেয়েটি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো।

—তুমি তো বেশ গাইতে পার।

মেয়েটির ঠোঁট দুটি একটু নড়ে উঠলো,—শুনলেন তো।

—কোথায় গান শিখছো!

—শিখছি না। শিখতুম।

—অমন ভালো গলা, এভাবে নষ্ট করছো?

—খেয়ে বাঁচতে হবে তো। দুটি সন্তান আছে।

—আহা! তোমার আর কে আছে?

—কেউ নেই।

—স্বামী কী করেন?

—নেই।

ভদ্রমহিলা দুজনই চমকিত হলেন। আমার চোখের সামনে তরুণীর সিঁদুরের টিপটি অস্তগামী সূর্যের মত জ্বলজ্বল করতে লাগলো। শিক্ষিকা দুর্নীতির গন্ধ পেয়ে বললে,—তা হলে ঐ সিঁদুরের ফোঁটাটা, সিঁথির রেখা—

—আগের অভ্যাসে দিয়েছি। পদ্মা পারে আমার সবই ছিল। সবই গ্যাছে—

তারপরে তরুণীটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ভদ্রমহিলা দুজন ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিবিনিময় করলেন। সে ইঙ্গিত আমার কাছেও স্পষ্ট।

প্রতিবেশিনী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন,—পোড়া কপাল!

মেয়েটির পাথরের চোখ দুটি একটু নড়ে উঠলো,—গাল দিলেন!

না ভাই, না। একটু সাবধানে চলাফেরা করো। বেশী পরিশ্রম করো না। তোমাকে তুমি ছাড়া কে দেখবার আছে!

—আচ্ছা চলি।

পাথরের চোখ বুঝি একটু চকচক করছিল। মেয়েটি দেখতে পায়নি। মলি থপ থপ করে মায়ের দিকে এগিয়ে আসছে, তাই চলতে গিয়ে ধাক্কা মেরে বসলো। মলি ছিটকে পড়ে গেল। আশেপাশের লোকজন হাঁ হাঁ করে উঠলো। ভদ্রলোক মলিকে কোলে নিয়ে স্ত্রীর উপর খাপ্পা হয়ে চেঁচাতে লাগলেন—বাজে মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কী এত জিজ্ঞেস করবার আছে—ওদের কাণ্ডজ্ঞান আছে!

গাড়ি তখন একটা ইষ্টিশনে থেমেছে। তরুণী নিষ্পলক একবার মলির মায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, মাপ করবেন।—তারপর পদক্ষেপ দৃঢ়তর করে নিচে নেমে গেল।

প্রতিবেশিনী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে একটু জোরে বললেন, 'এদিকে মলিকে আমার কোলে দাও। আপনি খোকাকে একটু ধরুন!

শিশুটিকে কোলে নিয়ে শিক্ষিকা খুশী হয়ে গেল। পাছে কেঁদে ওঠে, শিশুটিকে বুকে চেপে ধরে গুনগুন করে ছড়া কাটতে লাগলো। এ ধরণের ছড়া পূর্ববাঙলার গ্রামে গ্রামে প্রচলিত আছে।

মলিকে কোলে নিয়ে ভদ্রমহিলা ব্লাউজ সেমিজের আবরণ থেকে একটি খাঁটি সোনার কলস মেয়ের মুখের সামনে তুলে ধরলেন। শেষ সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে তা লীলাকমলের মত প্রতিভাত হচ্ছিল।

কান্না স্তব্ধ। এ যেন আরেকটি তরুণীর গানের কলি।

একটি বাবিলোনীয় পংক্তি।

নরের নেত্রী ইশতার নাগরিকা
নারীদের নারী পাপের দুহিতা স্বর্গে-মর্ত্তে তোমার আলোর শিখা।

# উপসাগর

## অসীমেশ চক্রবর্ত্তী

পুরোপুরি হোটেল নয় তাই সাইনবোর্ড নেই কোন। পেইংগেষ্ট হ'য়ে থাকা চলে যতোদিন ইচ্ছে। চারটি ঘর, একফালি বারান্দা আর সামনে একটুকরো জমি—এই নিয়ে বাড়ীটা। এখানে ওখানে যুদ্ধের সময় যে ব্যারাকগুলো তৈরী হয়েছিল, এ' তারই একটা। এখানে সমুদ্র একটু পাশ ফিরেছে, তাই ছোটখাটো এই উপসাগরটার জন্ম। কাঁটাতারের বেড়া পেরোলেই বালির শুরু। শাড়ীর পাড়ের মতো জলের গা ঘেঁষে অনেকদূর চলে গেছে উত্তরে, তারপর ডানদিকে বেঁকে পাহাড়টা ছুঁয়ে কোথায় মিলিয়েছে তার কোন হদিশ নেই। দক্ষিণেও সীমানাটা ঠাহর করা যায় না। ধারে কাছে বসতি নেই বাড়ীটার, মিনিট দশেক পুবমুখো হাঁটলে সহরের পাকা রাস্তা মিলবে। উত্তরে পাহাড়টার কোলে জেলেদের বাস। মধুর ওপর মৌমাছিদের মতো ঘন এক ঝাঁক তালপাতায় ছাওয়া মাটীর ঘর। এর ঘরের চাল ওর ঘরের দেওয়াল ছুঁয়ে যায়, এতো সন্নিবিষ্ট।

সূর্য ওঠার আগে সমুদ্রের ধারে বালির তীর ধরে অনেকটা বেড়ানো, একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে সদানন্দর। ছোটখাটো মানুষটা, বয়স প্রায় চল্লিশের পাশ কাটিয়েছে। রঙ ফর্সা, একটু তামাটে ভাব এসেছে তা'তে। শরীরে মেদের চেয়ে মাংসই বেশী—পেশীবহুল শরীরটা ঈর্ষা জাগায় মনে। হাবভাব, চাল-চলন সব কিছুতেই অদ্ভুত লোকটা। অনেককাল এদেশে থাকা মনে প্রাণে এক হ'য়ে গেছেন এদের সংগে। বাঙালী ছাড়া আর কোন পরিচয়ই যেন নেই। কোন আত্মীয়তার বন্ধন আছে কি নেই, জানে না কেউ। বছরের প্রায়-সময়-ই অতিথিদের ভীড় হয়, স্বাস্থ্য ফেরাতে এসে অনেকেই থেকে যান দু', তিন, চার মাস। যা আয় হয়, তাতে একলা মানুষটার সুখ না মিলুক, স্বাচ্ছন্দের অভাব ঘটে না। সদানন্দ নাকি চাকরী করতেন বন্দরে। কি একটা গোলমালে চাকরী যায়। তারপরই এখানে এসে উঠেছেন। নিতান্ত প্রযোজনে ছাড়া বড় একটা যান না কোথাও। ঠিকে ঝি আছে—লছমী। সে-ই হাটবাজার, রান্না, বাসন ধোওয়া যাবতীয় কাজ করে।

বেড়াতে বেড়াতে অনেকদূর চলে এসেছেন সদানন্দ। এবার উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। কাল বিকেলের গাড়ীতে অতিথি এসেছে। স্বামী, স্ত্রী—একটি অল্পবয়সী ছেলে আর একটি মেয়ে। দেখে বেশ বোঝা যায় মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা। রজত মুখার্জী, না কি যেন একটা নাম বললে। উত্তর দিককার ঘরটা ছেড়ে দিয়েছেন। বৌটির ভারী পছন্দ হয়েছে। ওদিককার ভিউটা মনোরম, শুয়ে বসে রেষ্ট নেওয়ার পক্ষে ও ঘরটা নাকি আইডিয়াল। হন হন করে ফিরে চললেন সদানন্দ, ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।...

টুথব্রাশটা দাঁতে প্রাণপনে ঘসছিল রজত মুখার্জী। সদানন্দকে দেখে থুথু ফেলে বললে—ভোরের দিকে বেড়াতে গেছিলেন বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওই বদ অভ্যাসটা আছে আমার।

—ভালোই হ'ল, একজন সংগী পেলাম আমি। এই তো কিছুক্ষণ আগে অনেকটা বেড়িয়ে এলাম আমি আর ধীরা—আই মীন্, আমার স্ত্রী। আমি বোধ হয় উল্টোপথে হেঁটেছিলাম, তাই দেখা হয় নি।

রজত মুখার্জী টুথব্রাশটা দাঁতে চেপে ধরল।

সদানন্দ একটু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন—আপনাদের বেড্‌টি দিয়েছে তো লছ্‌মী। ওকে বলে রেখেছিলাম রাত্রে।

—হ্যাঁ, আপনি ব্যস্ত হ'বেন না।

লছ্‌মী মুখ ধোওয়ার জল রেখে গেল। সদানন্দও ভেতরে গেলেন।

বাজারের টাকা হাতে নিয়ে রান্নাঘরে এসে দেখেন লছ্‌মী ময়দা মাখতে মাখতে গল্প ফেঁদেছে বৌটির সংগে। ভাল লাগে সদানন্দর। আশ্চর্য মেয়ে লছ্‌মী, পাঁচ বছরে-ও বদলায়নি এতোটুকু। জংগলা হরিণীর মতো তেমনি উচ্ছল, প্রথম প্রেমের মতো তেমনি শিশুসুলভ। এখানে কাজ নেওয়ার আগে ও কাজ করত সহরে এক বাঙালীর বাড়ীতে। টেনে টেনে বেশ বাংলা বলে। "তুমি", 'আপনি"র ধারে কাছে যায় না, সকলকেই "তুই"। মনিব যে ভাবে কথা বলতেন ওর সংগে, সেই ভংগীটাই আয়ত্ত করেছে। অন্য কিছু না, তবু ওকে দেখা মাত্রই পছন্দ হয়েছিল সদানন্দর। মেয়েটা কাজের, রাশি রাশি কাজ দিলেও, কী করে যে শেষ করবে জানতেও দেবে না। বাজারের টাকা পয়সা হাতে দিলেই শুধু হ'ল, লছ্‌মী করবে বাকীটা। রাত্রে প্রতি ঘরে মশলা, জল দিয়ে ওর ছুটি। দুষ্ট লোকে নানা কথা বলে, সদানন্দ আমল দেন না। নির্বিকার মানুষ তিনি, কে কি বলে, না বলে, কিছু আসে যায় না। যার জীবনবেদে আদর্শ বলে কিছু নেই, আদর্শচ্যুত হ'বার ভয় কি তার! লছ্‌মী সুন্দরী, কথাটা মিথ্যে নয়। দক্ষিণী যৌবনের একটা নিখুঁত পেন্সিল স্কেচ—একটা আঁচড়ও যাতে কম বেশী নেই, কিন্তু তবু সদানন্দ ওকে নিয়ে কোন রঙিন ছবি আঁকেন না মনে, রচনা করেন না কোন আকাশ কুসুম।

একটু কেশে রান্নাঘরে ঢুকলেন সদানন্দ। বৌটির দিকে চেয়ে বললেন—রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি তো?

ধীরা হেসে বললে—সমুদ্রের যা গর্জন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘুম ভেঙ্গেছে। তবে গাড়ীর ক্লান্তিটুকু ছিল বলে রক্ষে, তা' না হ'লে সারারাত জেগে কাটিয়ে দিতে হ'ত।

—প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হ'বে। পরে দেখবেন, ওই গর্জন না শুনলে ঘুমই হ'বে না। একটু সয়ে গেলেই ভাল লাগবে। আমার তো খুব মিষ্টি লাগে।

ধীরা বললে বেশ মানুষ তো আপনি, ওই আওয়াজ আবার মিষ্টি। আমার তো ভয় করে।

প্রাণ খুলে হাসলেন সদানন্দ। লছ্‌মীও কথাটার অর্থ করেছে। সেও হাসতে লাগল।

টাকাটা লছ্‌মীর হাতে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন বাজারের ফর্দ। তারপর একটু ভেবে বললেন—সকালে দেখে এসেছি, অনেক মাছ উঠেছে আজ। থাক্, টাকা আমায় দে লছ্‌মী, আমিই যাই।

লছ্‌মী অবাক হ'ল—বাবু তুই যাবি বাজারে? কেনো?

থলেটা হাতে নিয়ে বললেন সদানন্দ—এমনিই। মানে, আজ বেশ বাজার করতে ইচ্ছে করছে। বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন। লছ্‌মীর কাছে এ' একেবারে অভিনব, পাঁচ বছরের মধ্যে



কোনদিন নিজে হাতে বাজার করতে দেখেনি বাবুকে। ধীরাকে বললে—জানিস আম্মা, বাবুটা একটু পাগল আছে। তোদের মতো আর কেউ আগে আসে নি এখানে, সেইজন্যে খুব আনন্দ হয়েছে।

ধীরাও আশ্চর্য! কথাটা মিথ্যে নয়। সদানন্দর মনের অনেকগুলো দিক লছ্‌মীর নখদর্পণে। খামখেয়ালী লোকটার এলোমেলো মনের পরিচয় একমাত্র ও-ই জানে।

বিকেলের দিকে রজত আর ধীরা বেড়াতে গেছে সমুদ্রের ধারে। সদানন্দ বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসেছিলেন। একটু পরে সন্ধ্যে হ'বে। যে সূর্যটা বাড়ীর সামনে সমুদ্রের মধ্যে থেকে উঠেছিল ভোরবেলায়, সেটা পশ্চিম দিকে টেবিলের মতো পাহাড়টার ঘোমটা টেনেছে মুখে। যে আলো হাতে নিয়ে সারাদিন পরিক্রম করেছে আকাশটাকে তার রেশ তখনো পশ্চিম আকাশে। সমুদ্র স্থির, আরো নীল।

সদানন্দ ভাবছিলেন। বিগত পাঁচবছরে কতো অতিথি এসেছে কতো বিভিন্ন মনোবৃত্তি নিয়ে। কিন্তু তা'তে অভিজ্ঞতাই বেড়েছে, এমন গভীর পরিতৃপ্তি মেলেনি আর কখনো। রজত আর ধীরা, স্বামী স্ত্রী—এরা এসে সদানন্দর মনের আরও একটা দিক খুলে দিয়েছে। এতদিন পরে আবার নতুন করে পুরোপুরি গৃহী হ'বার ইচ্ছে হয় যেন। ···লছ্‌মীটা বড়ো ভাল মেয়ে!

হঠাৎ চিন্তার সরু সুতোটা ছিঁড়ে গেল।

—বাবু, চা এনেছি রে।

সদানন্দ কাপটা নিলেন। লছ্‌মী খোঁপায় গোঁজা ফুলগুলো দুহাতে ঠিক করতে করতে বলল—চুপ করে বসে আছিস এখানে? চল রান্নাঘরে, একটু কথা বলবি।

—না, তুই যা। এখানে ভাল লাগছে বেশ।

—আর আমাকে বুঝি ভাল লাগছে না? —লছ্‌মীর চোখে দুষ্টুমী।

—তোকেও ভাল লাগছে। বেশী ভাল লাগছে তোর খোঁপাটা।

—সত্যি বলছিস বাবু?

—হ্যাঁরে একেবারে বিয়ে করে ফেলতে ইচ্ছে করছে। যা তুই এখন।

এক ঝলক হেসে ছুটে গেল লছ্‌মী রান্নাঘরে।

সদানন্দ ভাবলেন, লছ্‌মীটা আবার কিছু ভেবে নিল নাকি! না। ওটা ওই রকমই ছেলে মানুষ!

ক'দিন থেকে ধীরার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। সদানন্দ ভাল বোঝেন না। শুধু বুঝেছিল লছ্‌মী। তাই রাত্রে বাড়ী ফেরার আগে প্রায়ই ধীরার কাছে বসত। বেশী হাঁটাহাঁটি করতে বারণ করত।

সদানন্দ শুয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ লছ্‌মীর ডাকাডাকিতে উঠে পড়লেন। লছ্‌মী হাঁপাচ্ছে—বাবু, আম্মার বাচ্ছা হ'বে রে। ওঠ্, আমি যাই, লোক ডেকে আনি। জেলেপাড়ার আপ্‌লাস্বামীর পিসীটা এই কাজ করে, ডাকলেই আসবে। তুই একটু দেখ্, আমি এখুনি আসি।

বিস্মিত হ'লেন সদানন্দ। লছ্‌মীটা বলে কি! সত্যি নাকি কথাটা! কি একটা অনুভূতি নাড়া দিয়ে গেল তাঁকে। আনন্দ···ভয়···। সত্যিই কি ধীরার প্রসবকাল উপস্থিত! চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

রজত মুখার্জী অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বারান্দায়। সদানন্দ ওর কাঁধে হাত রেখে ব'ললেন —সত্যি নাকি মশাই ?

রজত মাথা নাড়ল।

সদানন্দ আশ্বাস দেন—ভয় পাবেন না। লছ্‌মী লোক আনতে গেছে। এখুনি এসে পড়বে। আপনি বরং ভেতরে যান।

রজত সদানন্দর হাতদুটো ধরে বলল—ওর শরীরটাতো ভালো নয়। সেই জন্যেই চিন্তা। যে করেই হোক প্রসূতিকে অন্ততঃ বাঁচাতেই হ'বে।

—আপনি ভাবছেন কেন অযথা। ওরা এসে পড়ল বলে। যান, ভেতরে যান। রজত ঘরে চলে গেলে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন বারান্দায়। আজ অদ্ভুত ভাল লাগছে সমুদ্রটাকে, সারা পৃথিবীটাকে। কী এক আনন্দ যেন, ব্যাখ্যা করতে পারবেন না। রজত আর ধীরা যেন পর নয় আজ—তাঁরই ভাই, ভ্রাতৃবধূ। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সদানন্দ, লছ্‌মী এখনো এলো না!

লছ্‌মী নিয়ে এলো লোক। সারা বাড়ীতে একটা থমথমে পরিবেশ। আগমনীর পূর্বপ্রস্তুতি যেন। সদানন্দ ঘনঘন চুলে হাত বোলাচ্ছেন। রজত মুখার্জীর পায়চারীতে অস্থিরতা বাড়ল। ঘরের মধ্যে ধীরার যন্ত্রণা গুমরে গুমরে উঠছে।

সেকেণ্ড···মিনিট···ঘণ্টা।

হঠাৎ একটা শিশুর কানফাটা কান্না। নতুন মানুষের প্রথম অভিজ্ঞতা এ' পৃথিবীতে। সদানন্দ দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন রজত মুখার্জীকে। রজতের ফ্যাকাশে মুখটায় রক্তের স্বরূপ খুঁজে পাওয়া গেল।

সদানন্দ ভাবলেন—ছেলে না মেয়ে, কান্না শুনে যদি বলে দেওয়া যেত! লছ্‌মী বাইরে এলো। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সদানন্দ।

—রজতবাবুর ছেলে হ'য়েছে। কোথায় গেলি রজতবাবু। বল কী খাওয়াবি ?

রজত ব্যস্ত হয়ে বলল—তোর আম্মা—ধীরা কেমন আছে ?

—খুব ভাল রে, খুব ভাল। আগে বল···।

সদানন্দ জানেন না। লছ্‌মী বলছিল—আঁতুড়ে নাকি দশদিন থাকতে হ'বে। এই দশদিনের মধ্যে দিনে কুড়ি পঁচিশবার ঘরে উঁকি দেন সদানন্দ। ছেলেটা বেশ দেখতে হয়েছে। হাত পাগুলো কি ক্ষুদে!

অকারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েন—চেঁচামেচি শুরু করেন লছ্‌মীর ওপর—তোর বুদ্ধিশুদ্ধি যদি কিছু থাকে। জানিস নুনের পুঁটুলীর সেঁক দিতে হয়, এখনো লণ্ঠনগুলো জ্বালিস নি।

কথাটা অবশ্য লছ্‌মী বলেছিল সদানন্দকে। বলল—তুই একটু বেশী ব্যস্ত। মোটে পাঁচটা বাজে। এখনো তো কতো দেরী সন্ধ্যের!

সদানন্দ শোনেন না—না, না, তুই এখুনি যা। তাড়াতাড়ি সব করে রাখলে তোরই তো সুবিধে।

—যাচ্ছি রে বাবা, যাচ্ছি।—উঠে চলে যায় লছ্‌মী।

আঁতুড় থেকে ধীরা বেরিয়ে আসার পর সাড়া পড়ে গেল বাড়ীতে। রজত মুখার্জীর কোন ব্যস্ততা নেই। সদানন্দই শুধু ছটফট করেন। মাথা ঘামান, ছেলেটার কি নাম দেওয়া যায়।



লছ্‌মীই দেখা শোনা করে, সর্বক্ষণ ছেলে কোলে করে রাখে। ছেলে কোলে লছমীকে ভালই লাগে সদানন্দর। শুধু কেমন সন্দেহ হয় রজত মুখার্জীর নির্লিপ্ততায়। ধীরাও আজকাল গম্ভীর। সে চাপল্য আর নেই তার প্রতি পদক্ষেপে। কী যেন হয়েছে ওদের। সদানন্দ সোজাসুজি একদিন জিগ্যেস করে বসলেন—কী হ'য়েছে বলুন তো মশাই ? এমন একটি পুত্র সন্তান লাভ হ'ল, এমন চুপচাপ থাকেন ? মা-জননীও যেন মুসড়ে পড়েছেন!

—কই, কিছু না তো।—রজত ছোট্ট কথায় এড়িয়ে যায় প্রশ্নটাকে। সদানন্দও তলিয়ে ভাবেন না। এ' বিষয়ে তাঁর কতোটুকুই বা অভিজ্ঞতা। 'হ'বেও বা' ভেবে স্বীকার করে নেন ব্যপারটাকে।

সীমাচল্‌ম মন্দিরে মেলা হ'চ্ছে। লছমী কাজকর্ম সেরে একবেলার ছুটী নিল। রান্না করাই আছে, রাত্রে গরম করে নিলেই হবে। যাবার সময় বাচ্ছাটাকে আদর করে গেল লছ্‌মী—ও নাকি খেলনা কিনে আনবে মেলা থেকে।

দুপুরে ঘুমের আমেজ এসেছিল সদানন্দর। বারান্দায় খানিক পায়চারী করে ফিরছিলেন ঘরের দিকে। রজতদের ঘর থেকে একটা কান্নার আওয়াজে থমকে দাঁড়ালেন। কয়েকটা অসংলগ্ন কথার টুকরো ভেসে এলো।

—কিন্তু তুমি জানো ধীরা, এ অসম্ভব। আমার শেষ কর্ত্তব্য তোমাকে কলকাতার বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া, ওই মাংসপিণ্ডটাকে নয়।

—তোমার পায়ে পড়ছি রজত, না···

ধীরা বোধ হয় কেঁদে উঠল। আর শোনার ইচ্ছে হ'ল না সদানন্দর। দ্রুত পায়ে চলে এলেন ঘরে একটা খট্‌কা নিয়ে। কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে তাঁর। ভুল কিছু শুনলেন না তো!

বিছানাটা ঠিক করে শুয়ে পড়লেন।

সন্ধ্যে হয়-হয়। ঘুমটা গাঢ় হ'য়েছিল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন সদানন্দ। একেবারে ভুল হ'য়ে গেছে, আজ লছমী নেই, নিজেকেই চা জলখাবার দিতে হ'বে। উনুন ধরিয়ে জল-চাপিয়ে দিলেন রান্নাঘরে এসে। বাইরে এসে দেখেন রজতদের ঘরের দরজা বন্ধ। বেরিয়ে গেল নাকি ওরা! দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলেন—রজতবাবু আছেন নাকি ?

কোন সাড়া নেই, অথচ বাইরে থেকে তালা খোলা। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলেন সদানন্দ, ঘরের জিনিষপত্র উধাও! বাক্স বিছানা নিয়ে এরা গেল কোথায়, আশ্চর্য! রান্নাঘর থেকে লণ্ঠন নিয়ে আসতে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল আরো। টেবিলের ওপর টাকা রেখে গেছে ওরা, তাঁর যা প্রাপ্য। কিন্তু ওটা কী খাটের কোণে ? আলোতে যা দেখলেন, তা'তে চীৎকার করে উঠলেন সদানন্দ। একটা চাদরে বাচ্ছাটার এক মুঠো দেহটা জড়ানো—অসার, নিশ্চল। হাতের মুঠো দুটো শক্ত। চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে যেন। গলায়, হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, নীল দাগ চারটে বাঙুলের—মৃত্যু নীল!

একমুহূর্তে বোবা হয়ে গেলেন সদানন্দ। তাঁর গলাটা কে যেন সজোরে চেপে ধরেছে, সাঁড়াশীর মতো বাঁধন। এক টুকরো কথাও যেন বেরোতে পারবে না সে গলা থেকে। মাথাটা ঝিমঝিম করতে

থাকে। হাজার হাজার প্রেত যেন মস্তিষ্কটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে একাকার করে দিচ্ছে। টলতে টলতে বাইরে এসে মাতালের মতো বসে পড়লেন বারান্দায়।

কিন্তু বসে থাকলে চলবে না। একটা ব্যবস্থা করতে হ'বে। উঠে পড়লেন সদানন্দ। মাথার খুলির নীচে যেন সমুদ্রের টাইফুন তোলপাড় করছে। চাদরটায় ভাল করে জড়িয়ে নিলেন দেহটা। বুকে নিয়ে সন্তর্পনে মৃত্যুর মতো এগিয়ে গেলেন সমুদ্রের দিকে। তারপর প্রাণপনে শক্তিতে ছুঁড়ে দিলেন মাংসপিণ্ডটাকে! বড় একটা ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল পায়ের কাছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে ছুটতে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা সজোরে বন্ধ করে দিলেন।

চারিদিক স্তব্ধ, বোবা। শুধু বড়ো বড়ো ঢেউগুলো হাহা করে এসে তীরে আছড়ে পড়তে লাগল।

লছমী দুধের ঘটিটা নাবিয়ে রাখল বারান্দায়। আজ ওর পরনে নতুন শাড়ী, গাঢ় নীল রঙ। সাজসজ্জাটা কিছু বেশী। খোঁপায় সদ্যফোটা চাঁপার গোছা। হাতে একটা লাল ঝুমঝুমি। সদানন্দর ঘরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—এ বাবু, দরজাটা খোল্। দরজা খোলাই ছিল। ধাক্কা দিতে খুলে গেল। সদানন্দ পাথরের মতো দাঁড়িয়ে সামনে। বিস্রস্ত চুল—এক রাত্রে বয়সটা যেন এগিয়ে গেছে অনেক।

লছমী আশ্চর্য হয়ে বলল—তোর একী চেহারা হ'য়েছে বাবু?

বোমায় আগুন দিলে বিস্ফোরণে যতোটুকু সময় লাগে! তারপর ফেটে পড়লেন সদানন্দ—বেরিয়ে যা, দূর হ'য়ে যা। জানোয়ার কোথাকার! ভেবেছিস সেজেগুজে এ'রকম ভাবে আমার মনটাকে ভোলাবি। দূর হয়ে যা। তোর চাকরী করতে হ'বে না।

হাতের ধাক্কায় ঝুমঝুমিটা ছিট্‌কে পড়ে গেছে। সদানন্দ দু'হাতে মুখ চেপে ধরলেন—আমি পারবো না, কিছুতেই না।

আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে তবু দেখা যায়। চারটে আঙুলের মৃত্যু নীল দাগ যেন ছেয়ে ফেলে উপসাগরটার জলের সমস্ত নীলকে!

মৃচ্ছকটিক থেকে

সাগরে সিনান করে ঢেউ।
আমি দেখি মেয়েদের যেন কেউ কেউ
আসে যায় এলোমেলো নিরুৎসুক মন
গণিকার মতো
প্রেম পলাতক বুকে যাদের সতত
গোধূলির আলোর মতন।

# জ্বর

## বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মাঝরাতে মনিলালের ঘুম ভেঙে গেল।

অসতর্ক ডান হাতটা একপাশে আল্‌গা হ'য়ে পড়েছিলো। হঠাৎ যেন সাপে কামড়ালো। জ্বালা ধ'রে গেল প্রথমটা।

ঘুমের ঘোর কিছুটা কাটতেই আলো জ্বাললো; না, কোনো অবাঞ্ছিত জীবের আক্রমণ না, ওটা খোকনেরই শরীর।

দুঃস্বপ্ন কাটলো, কিন্তু দুশ্চিন্তা বাড়লো। কপালে হাত দিতেই মনে হ'লো কপাল পুড়ে যাচ্ছে। মনে মনেই হিসাব ক'ষলো, কতো জ্বর হতে পারে? ঘরে থার্মোমিটার নেই আন্দাজ করা ছাড়া উপায়ই বা কি?

একপাশে ইন্দ্রানী বেহুঁসের মতো ঘুমুচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগেছিলো, যন্ত্রণায় ছট্‌ফট ক'রতে ক'রতে! ইন্দ্রানীর জ্বর সুরু হ'য়েছে গত সপ্তাহে। ডাক্তার ডাকা সম্ভব না, অষুধ না, পথ্যি না।

খোকনটাও জ্বরে প'ড়লো! কেমন যেন ক'রতে লাগলো মনিলালের ভেতরটা, যেন দমবন্ধ হ'য়ে আসছে।

জোর ক'রে অন্য কথা ভাবতে চেষ্টা ক'রলো। অনেকখন ধ'রে সে সব কথা ভাববার চেষ্টা ক'রলো, তারপর এক সময় ভাবনায় তলালো, তারা সবই অস্পষ্ট, এত আবছা যে জেগে উঠে মনিলালই ব'লতে পারবে না, সে কী ভাববার চেষ্টা ক'রেছিলো। কিন্তু তারপর কে জানে কতক্ষণ গেলে, ভাবনা স্বচ্ছ হ'লো, তারপর একেবারে স্পষ্ট, এত স্পষ্ট যে চোখে দেখা যায়, ইচ্ছে থাকলে ধরাও যায় হয় তো।

—আচ্ছা, জ্বরকে সে অবচেতন স্পর্শে ভেতর সাপের কামড় অনুভব ক'রেছিলো কেন? সাপ তো ঠাণ্ডা, বরফের মতন? কিন্তু তার বিষে কি আগুন!

ভাবতে ভাবতে আবার ঘুমের রাজ্যে এলো। পরপর সাতরাত জেগেছে সে, এখন পিপাসায় জ্ব'লতে জ্ব'লতে ইন্দ্রানী ডাকলেও সবসময় সাড়া দেয় না। ঠিক ঘুমিয়ে পড়ার মুহূর্তে অনেক প্রশ্নই তার মনের মধ্যে ঝিমুতে লাগলো—

ঘুমের ঠিকানা কি? কেমন সে দেখতে? কেন তার সঙ্গে মানুষ সবসময় লড়াই ক'রে পারে না? আচ্ছা, ঘুমের চেহারাটা কি অনেকটা সাপের মতো? অভাব জিনিষটা কেমন? খোকনের শরীরে ওটা কি, জ্বর, না কোনো অদ্ভুত সরীসৃপ? কী কুৎসিত! ঘুম···

শেষরাতের দিকে ইন্দ্রানীই ডেকে তুললো!

—একটু ওঠো তো, এই একটু ওঠো না!

—কেন, কি হ'লো আবার?

—আলোটা জ্বালো, খোকন কেমন যেন ক'রছে!

উঠলো, আলো জ্বাললো মনিলাল। যেন স্নান ক'রে উঠেছে খোকন, এত ঘাম? বিছানাটা চবচবে ভেজা। শরীরে হাত দিলো—কপালে অনেকখন—বুকে। জ্বর বোধহয় ক'মেছে; ভেজা বিছানার অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ ক'রছে আর গলা থেকে কেমন একটা আওয়াজ বেরুচ্ছে। কাঁথাটা ব'দলে দিলো মনিলাল, মাথার বালিশটা ওল্টালো।

—একটু জল দেবে? ইন্দ্রানীর কণ্ঠে অনুরোধের সুর। উঠতে গিয়ে মশারীর দড়িটাও ছিঁড়লো মনিলাল। ইন্দ্রানীর পিপাসা মেটালো। আকাশের একটা দিক রাঙা; ভোর হ'চ্ছে, কাক ডাকছে।

ভোর হ'লো, কাক ডাকলো, আর মনিলালে মনে হ'লো, আজ আপিস নেই। আপিস নেই, ভাবতে ভালো লাগে না,—সারাদিন ঘরের মধ্যে দু দুটো রুগী নিয়ে সে ক'রবে কি? বাইরে বেরুতেও মন নেই, শূন্য পকেটে কোথাও যাওয়া চলে না, বন্ধুদের কাছে তাসের আড্ডাতেও না। তা ছাড়া খোকনের জ্বর। রবিবারটাকে মনে মনে ধিকৃত ক'রলো সে; আর জ্বর নিয়েও ইন্দ্রানী উঠে ব'সলো, বিছানা তুললো, ঘর ঝাঁট দিলো, তারপর ভাঁড়ারের দিকে অভ্যাস মতো তাকালো একবার—শূন্য, একেবারে শূন্য।

দর্শকের মতোই এইসব ব'সে ব'সে দেখলো মনিলাল। ইন্দ্রানী ফিরলো, রাণী নয়, একটা বিবর্ণ অস্পষ্ট ছায়াদেহ। মনে হ'লো কি যেন ব'লছে ইন্দ্রানী। শুনলো না। শুনলো কিন্তু বুঝলো না। ভাঁড়ার শূন্য, সে তো আগে থেকেই জানে। রাগ হ'ল ইন্দ্রানীর ওপর, কেবল নিজেদের ক্ষুৎপিপাসার কথাই ভাবছি···নইলে পূর্ণ ভাঁড়ার থাকলেই বা কি হ'তো ···খোকন কি এই জ্বরেও রান্না ভাত খেতো? মা হ'য়েও ইন্দ্রানী যেন কেমন, আজকের দিনেও খোকনের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাবছে। নিষ্ঠুর!

—শোন, একবার না হয় বাবার কাছেই যাও।

—এঁ্যা·····কেন?

—খোকনকে মেরে ফেলবে নাকি? অষুধ নেই, পথ্যি নেই, আমিই না হয় তোমার শত্তুর—

আবার সেই পুরানো কথা, একঘেয়ে কথা! কিন্তু খোকন···তাই তো—

—কী, কানে গেল কথাটা?

—ব'লছো তো, কিন্তু—



—জানি খোকনকেও মারতে চাও তুমি, আমরা সবাই তোমার শত্রু।

বিশ্রী, সব বিশ্রী। কে ব'লবে দিনের পর দিন জ্বরে ভুগছে, দিনের পর দিন জীবন-যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে বহুদিন ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে ইন্দ্রানী! না, ভাগ্যের সঙ্গে কোন লড়াই নেই আর। কিন্তু তবু আমাকে দেখলেই ওঁর একি মূর্তি! আর এতো একদিনের নয়···প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক মুহূর্তের! খারাপ···অভাব ভীষণ খারাপ···নোংরা···

কিন্তু এতটাও ভাবতে দেয়না ইন্দ্রানী, কাছে আসে, সোজাসুজি দাঁড়ায়, কাঁধ ধ'রে ঝাঁকুনি দেয়—

—খোকাকে এই ভাবে ফেলে ব'সে থাকবে তুমি! তুমি মানুষ?

—বাজে ব'কো না।

—জানি গো জানি, আমি যা বলি সবই বিশ্রী, সব বাজে—'বিশ্রী' কথাটাই তো—! মাঝে মাঝে এমন আশ্চর্য মনের কথা পড়ে ফেলে! অবাক লাগে!

—'বা-বা!' টলতে টলতে বিছানা ছেড়ে খোকন এসেছে। দু'জনের কেউ দেখেনি যে সে এসেছে, কিন্তু দু'জনেই ডাক শুনলো। দুর্বল শরীর নেতিয়ে পড়লো মনিলালের কোলের ওপর। এই এক মজা—বাবাকেই সবসময় সবচেয়ে ভালোবাসে ছোট্ট শিশু; অথচ পৃথিবীতে মণিলালের মতো ওর শত্রু কে? জন্ম দিলো, তারপর ভিক্ষুকের দলের নোংরা ছেলেটার মতো অবহেলাই ক'রে এলো সারাটা জীবন। কোনোদিন একটু ভালো খাবার না, জুতো না, জামা না, কিছু না। কিন্তু এই না-য়ের প্রাচীর ভেঙে খোকন এলো বাবার একেবারে বুক ঘেঁষে, পয়সা ছাড়া পৃথিবীর চলে না, খোকনের চলে···জুতো ছাড়া চলে, জামা না হ'লে চলে, বাবাকে বাদ দিয়ে চলে না। মা কে? সে তো সবসময়েই বাড়িতে থাকে, বড় বেশী কাছাকাছি, তাই আকর্ষণও কম। কিন্তু বাবা আপিস যান, আড্ডায় যান, খোকা খুঁজেও পায় না। তাই বাবা এত মজার, এত বেশী ভালো। তবু মা যে কেন বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া করে, কাঁদে, আর বাবা চুপ ক'রে শোনে, কথা বলে না—তখন বিশ্রী লাগে খোকনের। মাকে বিশ্রী লাগে। বাবা সুন্দর, খুব সুন্দর, খু-উ-ব ভালো!

কিন্তু খোকনকে বুকে নিয়ে মণিলাল ভাবছে, খোকনের কথা অস্পষ্ট, টাকার কথা স্পষ্ট। টাকা চাই, যেমন করেই হোক আজ টাকা চাই।

দুর্বল, ন্যাতানো শরীরটা কোল থেকে নামাতে কষ্টই হলো একটু; ক্ষীণ গলা থেকে সামান্য একটু প্রতিবাদ বেরুলো; তারপর চুপ। বাবার কোল থেকে মায়ের কোলে খোকন চুপ।

—টাকা নিয়ে তবেই ফিরবো। ইন্দ্রাণীকে বলতেই হলো কথাটা; কিন্তু শোনালো অনেকটা মধ্যযুগের নাইটদের আস্ফালনের মতো।

—দুপুরের মধ্যেই ফিরো। ইন্দ্রাণীও সংক্ষেপে কথা সারলো। অনুরোধ, কিন্তু মণিলালের কানে বিঁধলো, যেন বিদ্রূপ।

—টাকা পেলে তবেই। একেবারে ডাক্তার নিয়ে আসবো।

কিন্তু টাকা পেলো না, ডাক্তারও এলো না।

তবে এই রবিবারেও কাজ একটা জুটলো মণিলালের। সমীরই জুটিয়ে দিলো কাজটা। ইনস্যুরেন্স-এর এজেন্ট, যেতে হয় নানা জায়গায়; সেই সূত্রে দিশী ফিল্মসের সঙ্গে কিছুটা মাখামাখি আছে।

ডিরেক্টর বিনয়বাবু হাসলেন। যে হাসি অন্যকে আপ্যায়িত করে, যা বাজারের অত্যধিক চাহিদার জন্যেই সবসময়ে মাপা এবং সীমিত, এ সেই বড়লোকের বড়দরের হাসি। এ হাসি আগেও দেখেছে বিনয়, তবে এতদিন অবজ্ঞাই করে এসেছে। বড়লোক, মানীলোক দেখলে তার শ্রদ্ধা হয় না, কেমন একটা অশুচি বোধ হয়, কারণ না থাকলেও। কিন্তু আজ সে হাসির উত্তরে কৃতার্থ হবার হাসিই ফিরিয়ে দিলো। হাসির ভেতর দিয়েই জানাজানি, বোঝাবুঝি হয়ে গেল :

—কাজ অবিশ্যি একটা আছে। স্ক্রিপট্ নকল করা। এখুনিই বসতে হবে, আর ছুটি পাবে রাত আটটায়। ছাখো, পারবে? কেমন হাতের লেখা তোমার?

—ভালোই, পারবো। তা টাকার—

—দশ টাকা পাবে। আজই কিছু দেবো, বাকিটা সমীরের হাতে পাঠিয়ে দেবো। রাজি থাকো তো পেন নিয়ে বসে যাও; হ্যাঁ, তোমার পেন আছে তো।

নেই, তবে সমীরের আছে। কানে কানে জানালো, পেনের ভাড়া একটাকা। কেটে বাকিটা দেবো, বুঝলে।

মণিলাল বুঝলো। বুঝলো যে, মাথা নেড়ে সমীরকে সেকথা বোঝালো। তারপর কোথায় রইলো খোকা, ইন্দ্রাণী, পৃথিবী—কলম চলতে লাগলো। কালি ফুরুলো, সস্তা দিশী কালি এলো, সমীরের ফাউন্টেন পেনটার জাত গেল, আবার কলম চললো।

উপোস। নির্জলা উপোস। এমন কি চা-ও না—এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা; চারটা বাজ্‌লো।

বিনয়বাবু ফিরে এলেন। মুখভারী।—ওঁরা তোমায় কিছু খেতে দিয়েছিলো? উত্তরের দরকার হলো না। মুখ দেখেই বুঝলেন—চামার! চা-ও দেয়নি?

বিনয়বাবু লোকটা তো মন্দ না! পকেট থেকে দশ টাকার নোটটা বের করলেন।



যাও, আজ আর কাজ করতে হবে না। ঢের ঢের চামার দেখেছি, কিন্তু মানুষকে না খাইয়ে রক্ত শুষে নেয়—

দুঃখ হলো অনভিজ্ঞ ভালো মানুষটির জন্য। ইচ্ছে হলো; জিজ্ঞাসা করে—পৃথিবীর কতটা দেখেছেন? এতো একবেলায় উপোস। নিয়মিত দশটা-ছয়টা অফিস করেও এমনি কতদিন—। আর এঁরা তো শুধুই সিনেমার প্রডিউসার!

কিন্তু শত হলেও মনিব, এভাবে বলা যায় না। রাস্তায় বেরুলো। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে; কিছু খাবে?

—না, খোকনের পেটেও তো কিছু পড়েনি, পড়ার কথা নয়। তাছাড়া, একটাকা সমীরকে দিয়ে থাকবে ন'টাকা। অষুধ আছে, পথ্য—

হেঁটেই বাড়ি ফিরলো।

ডাক্তার ডাকলো, বাকি রইলো পাঁচ।

অষুধ এলো, সামান্য কিছু পথ্য।

ইন্দ্রাণী ফ্যাকাসে হাসি হাসলো। স্বামী ফিরেছে বেলা পাঁচটা বাজিয়ে। ডাক্তার বিদায়, অষুধ, পথ্য—এখন রাত আটটার কম না। উনুন চড়েনি, ঘরে পয়সা নেই মুড়ি কেনে। ঠায় উপোস দেবে লোকটা?

ভীষণ হাসি হাসে, পাড়া ফাটিয়ে হাসতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু পাড়ার সবাই কি ভাববে? থাক্। মণিলালের দিকে আড়চোখে তাকালো একবার—না, অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। ভালো করে চোখ মুছে নিলো, আবার চোখ ভিজলো, আবার মুছ্‌লো। নিজের হাতের দিকে একটা অস্পষ্ট আশায় তাকালো···না, একেবারে সাদা। আচ্ছা, মানুষ সব জেনেশুনেও অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করে কী করে? সে কি ভালো করেই জানতো না যে তার হাত সাদা। আশ্চর্য!

আস্তে উঠ্‌লো মণিলাল। কাছে এলো, পিঠে হাত রাখলো একবার। চম্‌কালো ইন্দ্রাণী।

—কোথায় চল্‌লে আবার?

—দেখি, যদি একটা টাকাও—

—তোমার কাণ্ড! এত বললাম, হোমিওপ্যাথ দেখাও!

—ভালো হোমিওপ্যাথ না হলে কাজ হয় না, তুমি তো জানো, সেবার নিজেই তিনমাস ভুগ্‌লে, শুধু শুধু—

—শোনো, লক্ষ্মীটি, একবার বাবার কাছেই না হয়—

—আমি পারবো না, ও' আমাকে বলো না।

—এভাবে উপোস ক'রে দিন কাটাবে ?

—তা হোক।

—শোনো, ঘরে একটা থার্মোমিটার নেই, জ্বর দেখবো কি করে ? মায়ের কাছে একটা আছে, আমি জানি। খোকনের অসুখের কথাটাও তো ওদের—

অসুখ···থার্মোমিটার···অসুখ···কেমন যেন জড়িয়ে যাচ্ছে সব। চৌকাঠ পর্যন্ত এগুলো কোনোমতে, তারপর পড়লো···তারপর অন্ধকার।

ইন্দ্রাণী আবছা দেখছে···সব আবছা।

খোকন···উনি···বাবা, মা,·· ওঁর বন্ধুরা···পাশের বাড়ির নতুন বউটি···একমাথা সিঁদুর।

দেখতে দেখতে সব অন্ধকার হ'লো, আবার অন্ধকার থেকে সব কিছু ; প্রথমে আবছা স্পষ্ট, তারপর পরিষ্কার। না, সব সত্যি, ভীষণ ভয়গুলি সত্যি—আর এদের অস্বীকার করবার, দূর থেকে আশংকায় কেঁপে কেঁপে উঠবার কোনো কারণই রইলো না। এখন শত্রু সামনে, একেবারে মুখোমুখি। যুদ্ধ করেই হঠাতে হবে তাকে, বসে থাকলে চলবে না।

রাত কটা এখন ? কে জানে কত রাত ? বাবাকে খবরটা পাঠাতে হবে এখুনি।

উঠলো, পাশের বাড়ির কড়া নাড়লো। নতুন বউয়ের ঘুমে-ঢোলা চোখ, অবাক চোখ ! ইন্দ্রাণীও অবাক হলো, রাত নয়টায় মানুষ ঘুমাতে যায় !

স্ত্রীর ডাকে ভদ্রলোকও এলেন, গম্ভীর, কেমন যেন একটু ভীত।

—নিশ্চয়ই, এখুনি যাচ্ছি আমি। চিঠিটা দিন, আর মুখে কিছু···এতেই হবে ?···তুমি একটু ওঁর সঙ্গে যাও, দেখ ঠিক কী হয়েছে। দরকার হলে পঞ্চুকে দিয়ে ডাক্তার—

ঘরে ফিরলো ইন্দ্রাণী। কার ঘর ? অস্পষ্ট মনে পড়লো, তার ঘর, তারই, সাজানো···আবছা, সেও জ্বরে ভুগছে না ? তারও সাতদিন ধরে···

তারপর দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত···

অবশেষে সেরে উঠলো দুজনেই। খোকন আর তার বাবা। টাইফয়েডও কেড়ে নিতে পারলো না তাদের ইন্দ্রাণীর কাছ থেকে।

কিন্তু যা গেল, তারও দাম কম না।

গেল ইন্দ্রাণীর বাবার বসতবাড়ি, মায়ের হাল্কা হাত আরো হাল্কা হলো। তার পাঁচটি ভাই বোন—না, ঠিক পথে বসা নয়—কিন্তু মণিলাল তাদের কে ?



এবার সাপে কামড়ালো ইন্দ্রাণীকে। সে বিবাহিতা মেয়ে, কতটুকু অধিকার ছিলো তার বাবার ওপর, মায়ের ওপর, ছোট ছোট ভাইবোনগুলির ওপর। একদিন হয়তো ছিলো, যা ছিলো তাও তো চুকে গেছে অনেকদিন—বিয়ের সেই রাত—সব মনে পড়লো ইন্দ্রাণীর। মেয়ে তো পর হয়ে গেল সেদিনই। তারপর আরেক সংসার, তার নিজের সংসার। তবে কেন সে সব জেনেও ভাগ বসালো—কেন— ?

একথা ভাবতে ভাবতে আরো শুকিয়ে গেল ইন্দ্রাণী।

আর বেকার মণিলাল মাথায় হাত দিয়ে দিন কাটালো, রাত কাটালো, আরো দিন, আরো রাত···এই ভাবে, একভাবে—কী তার দোষ ? বেঁচে-থাকা ? বেঁচে উঠলেও কি তবে বাঁচবার অধিকার নেই তাদের···তার···খোকার···আর ইন্দ্রাণীর ?

**বাবিলোনীয় কবিতা**

চারদিক ঘুরে জীবন পাবে কি গিলগমেষ ?
মানুষ-জন্মক্ষণে জন্মায় যম।
জীবন যা সব দেবতাত্মায় মানায় বেশ।
সুতরাং তুমি খেয়ে যাও হরদম।

# সম্পাদকীয়

## রবীন্দ্র কবিতা

রবীন্দ্রনাথ আজ কবিগুরু বলে পরিচিত হলেও নিজে তিনি অবতার হবার জন্য বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্যও প্রকাশ করেন নি। ভাববাদে বিমুগ্ধ থেকেও তিনি কবির বাস্তব অবস্থাকে অস্বীকার করে তেমন ঊর্দ্ধ লাকবাসী ত্রাতা হন নি। তাই স্বাভাবিক কৌতুহলের বশে অনেক কবি রবীন্দ্রনাথের শূন্য জানালায় গিয়েও দাঁড়িয়ে দেখতে চাইছেন পৃথিবী প্রীতিভোগ্যা কি না। পৃথিবীকে অপ্রীতিকর মনে করবার খুব বেশি হেতু উপস্থিত হয়নি অনেকের মনে, বিশেষভাবে যাঁরা যৌবনের প্রেম-বোধকে প্রৌঢ়ত্বের প্রীতি-বোধে উন্নত করতে পেরেছেন তাঁরা এখনও রাবীন্দ্রিক মনের উত্তরাধিকার বহন করছেন বলা যেতে পারে। যদিও তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গীতে মনোভাব ব্যক্ত করেন না তবু এ-কথা বলা যাবেনা যে তাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের মতো প্রীতি-প্রসন্ন দৃষ্টি-লাভ করার পথে এ-যুগের কবিদের যে-পরিমাণে বাধা আছে, মাত্র সে-পরিমাণে তাঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্ত। বাধা সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ করেন নি। এ-যুগের কবিরাই নিজেদের প্রতিবন্ধক। রবীন্দ্রনাথ থেকে ছুটি নিয়ে তাঁরা বেশিদূর ছুটতে পারেন নি। দুটি যুগে স্থান-কালের ব্যবধানে রচিত পার্থক্য কাব্য-পরিক্রমার অন্তর্গত নয়। মানুষের রুচিতে শিক্ষা-দীক্ষারও যে খানিকটা তারতম্য ঘটে তা-ই বিবেচ্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবধানে এ-যুগের কবিরা কি অনগ্রসর? আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার সবটুকু সুযোগ পেয়েও তার মৃত্যুর পরেকার এক যুগের শিক্ষা লাভ করতে পেরেছি। তবু রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হবার মতো রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তদের মধ্যে কেউ নেই। অন্তত কেউ সে পর্য্যায়ে যেতে পারবেন বলে সম্প্রতি আশা করা যাচ্ছে না। কবিতার পাঠকদের দোষেই কি এই নৈরাশ্যের বাণী ধ্বনিত? পাঠকরা বহু স্তরে বিভক্ত এবং বহু রুচিতে আসক্ত বলেই কি কোনো বিশেষ কবি ইদানীং রবীন্দ্রনাথের অভাব পূরণ করতে পারছেন না? না কি কবিদের ক্ষমতার অভাবেই পাঠকরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত? স্বীকার করতে বাধা নেই যে ক্ষমতারই অভাব। সে-ক্ষমতা ঔপনিষদীয় দৃষ্টি বা মানবিক প্রীতি যা-ই হোক, তাকে একান্তভাবে জীবনের সঙ্গী করে নেওয়ার শক্তি বা মানসিকতার অভাবেই সাহিত্যের কাব্যশাখা সম্প্রতি বহুধা বিভক্ত। রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত না হলে প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের কাব্যশাখা যে দশা উপস্থিত করত আজ সম্ভবত আমরা তারই একটি পরিণত রূপ দেখতে পাচ্ছি। শাখার আড়ালে 'বৃক্ষ ইব দিবি'-কে দেখতে পাচ্ছিনে।



## 'কবি-সভা'

রবীন্দ্রোত্তর কবিতায় উৎসাহী কতিপয় বিদ্বজ্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে একটি 'কবি-সভা' আহ্বান করেছিলেন। উক্ত সভায় ষাট জন কবি কবিতা-পাঠের জন্যে মনোনীত হয়েছেন। শ্রোতার সংখ্যা আশাতীত হয়েছিল। অর্থাৎ এখনও যে এতো বেশি লোক কবিতা-শ্রবণে উৎসাহী তা দেখে কবিমাত্রেই হয়ত আশাতীত আনন্দ লাভ করেছেন। কবি-সভাতে কবির ও কবিতা পাঠকের শ্রেণীবিভাগটি অতি সুস্পষ্ট ও সোচ্চার ছিল। দৃষ্টিভঙ্গীর বৈপরীত্যেই যে বিভিন্ন শ্রেণীতে কবিতা-রচনাকার ও তাঁদের ভক্ত-সম্প্রদায় বিভক্ত হয়েছেন এমন কথা বলা যায়না। খ্যাতি-অর্জ্জনের লোভই প্রবল বলে মনে হল। আহ্বায়করা কবিদের মতবাদ ব্যক্ত করবার সুযোগ না রেখে ভালোই করেছেন। সে সুযোগ থাকলে হয়ত 'কবি-সভা' অনিবার্য্যভাবে কবিওয়ালা সভায় পর্য্যবসিত হত। কাব্যকৃতি ও কবির কৃতিত্ব সম্পর্কে আজকাল এমন অদ্ভুত সব কথা শোনা যায় যা নিতান্তই অশ্রাব্য।

## 'রবীন্দ্র-প্রতিভার-পরিচয়'

বাঙালী চরিত্রে যে দ্বান্দ্বিকতা বর্ত্তমানকালে দেখতে পাই তা কিন্তু দ্বান্দ্বিক জড়বাদের একক দান নয়। অনেক দূর না-ই গেলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতৃপ্রতিম উনিশ শতকের সাহিত্যিক আশ্রমগুলোতে উঁকি দিলেও দ্বন্দ্বপরায়ণ কবিগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যাবে। নবীনচন্দ্র সেন মশায় প্রসিদ্ধ এক সংবাদপত্রে কোনো একটি গ্রন্থের সমালোচনায় উত্যক্ত হয়ে 'এবার' নামে একটি ব্যঙ্গ-কবিতা রচনা করেছিলেন। তাতে লিখেছিলেন:

"বাসন্তী কবিতা" তাই কর পরিহার
কটিতে কাপড় আঁটি'
লও কলমের কাঠি
সাপ্তাহিক পত্রে দাও দুন্দুভি ঘোষণা—
শিখিয়াছি "নব গীতি কাব্যের" রচনা।

এ-অবস্থা বঙ্কিমী আমল থেকে অদ্যাবধি অবিকল আছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রতিভা বিকশিত হবার পর থেকে তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত দুন্দুভি-ঘোষণায় সাহিত্য-প্রচারের বাতিকটা বাংলা দেশে আত্মগোপন করে ছিল। সব নূতনের আগমনেই দুন্দুভি-ঘোষণা করে রাখা সুবিধাবাদীর লক্ষণ। সম্ভবত সংবাদপত্রগুলো এই লক্ষণাক্রান্ত ছিল—এখন আশা করি অবস্থার কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটেছে। তবে সাপ্তাহিক-পত্রের কবিতা এখনও দুন্দুভি-নিনাদের সুবিধে পায়।

উদ্ধৃত পংক্তিক'টিতে নবীনচন্দ্র প্রেম-কাব্যের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। শিল্পীর 'রেজিমেণ্টেশন' বলে দ্বান্দ্বিক জড়বাদে জড়িত দেশগুলোতে একটা ব্যাপার আছে। বাংলা-দেশের উনিশ শতকীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তা-ই সংঘটিত হয়েছিল। দেখা যায় সোচ্চার বিরোধিতা করেছিলেন নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র যে প্রেম-কাব্যকে সমর্থন করেছিলেন, বলা বাহুল্য, তা নরনারীর প্রেমানুভূতি থেকে জাত।

প্রেম-কাব্যে বাঙালী কবিমাত্রেরই প্রবল আসক্তি এবং প্রতিভার বিস্ময়কর স্ফুরণ দেখা যায়। এ এক প্রাচীন ঘটনা। উনিশ-শতকে ইংরেজের পিউরিটান মতবাদের প্রাবল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী সমাজের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বাঙালী কবিবৃন্দের এই সহজ প্রবণতা রুদ্ধ করে দিতে চান। এ-শতকেও তা একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রেম বস্তুটি তারুণ্যের উপভোগ-বাদ থেকে প্রৌঢ়ত্বের প্রীতিতে অভিষিক্ত হয়ে ভোগ-বাদে বা ত্যাগে উত্তীর্ণ হতে পারে। বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা তেমি একটি সঞ্চারিণী পল্লবিনী মানসিক অবস্থা নিয়ে কাব্য-রচনা করে গেছেন। উপভোগ-বাদের সুবিধে এই যে তা জনচিত্তকে সহজেই আকর্ষণ করে থাকে। সম্প্রতি কয়েকবছর যাবৎ এই উপভোগ-বাদ বাংলার তরুণতম কবিদের রচনায় সঞ্চারিত হতে সুরু করেছে।

রবীন্দ্রনাথ খুব বেশি সময় এই ধরণের উপভোগ-বাদে ব্যয় করতে রাজি ছিলেন না। অবশ্য সুরু করতে হয়েছিল তাঁকেও এই 'নিম্নস্তরের সাধনা' থেকেই। নরনারীর প্রেমকে নিম্নস্তরের সাধনা-ই বলি আর জনমানসচেতনাই বলি, সব কোবিদ আর কবিকে এই স্তর থেকেই সুরু করতে হয়। যদি কোনো কবি সদন্তঃকরণে মানবিক প্রীতির স্তরে উপনীত হতে চান তাহলে যাত্রা সুরু করতে হবে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর গণ্ডীবদ্ধ পারিপার্শ্বিকতায়। ঝাঁকামুটের মুখ দেখে যে প্রীতির জন্ম সে-প্রীতি 'তারা কাজ করে'র মতো ত্যাগ-মর্ম্মী কবিতায়ই যে অনুভূতি সমাপ্ত করবে তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশও নেই। রবীন্দ্রনাথ অতি দ্রুত মন থেকে প্রেমের রঙ মুছে ফেলে সেখানে প্রীতির ছবি টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর এই দ্রুত যাত্রা-ই তাঁর প্রতিভা—শ্রেষ্ঠ শিল্পীমাত্রেই এই প্রতিভার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁরা তাঁদের বহু নিয়তি ত্বরিত সিদ্ধান্তে নির্ণয় করে চলেন। শিল্পী মানস বহু অধ্যায় বিশিষ্ট একটি উপন্যাসের সঙ্গে উপমিত হতে পারে। অধ্যায় শেষ হয় কিন্তু তার জের চলে। সূত্রপাত ক্রমে বিস্তৃত হয়। নূতনত্ব ও প্রাচীনত্ব জড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই ছড়িয়ে পড়ার মধ্যে-ও একটি চরিত্র শান্তভাবে এগিয়ে যায়—তিনি নায়ক। শিল্পীর পক্ষেও তা চারিত্র্য—তাঁর বৈশিষ্ট-ব্যঞ্জক প্রতিভা। বহু-নিয়তির সমষ্টিফল এই প্রতিভা।

এই প্রাচীন মানব-ধর্ম্মই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা। তিনি প্রাচীনতার গায়ে নবীনত্বের কতোখানি প্রলেপ দিতে পেরেছেন তার বিচার করাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার।



রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবন থেকে আজকের দিনের কবিরা এ-সত্যটুকু আহরণ করে নিতে পারেন যে স্বর্গের দুন্দুভি-ধ্বনি আর সংবাদপত্রের দুন্দুভিধ্বনি একবস্তু নয়—আত্মঘোষণায় বড়ো শিল্পী হওয়া যায়না। তবে ভেরীঘোষের দিনই আজকাল। বাস্তবকে অনেকেই অস্বীকার করতে চাননা। আমাদের শুধু এ-কথা বলবার আছে: স্থূল বাস্তবকে অস্বীকার করবার প্রবণতা থেকেই যখন কবি-জন্ম, তখন কবিজন্মকে সার্থক করবার জন্যে স্থূলতার সঙ্গে কেন ষড়যন্ত্র? অবশ্য কবি যদি কখনও মনে করেন যে তাঁর রচনা বার্ত্তাবহ হোক তখনই তিনি সংবাদপত্রের সন্ধান করতে পারেন। সংবাদপত্রের পাঠক সৎ কাব্য-পাঠক কি না এ-সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ আছে। কবির পৃষ্ঠপোষকতার জন্যে সংবাদপত্রগুলো ইদানীং অগ্রণী হচ্ছেন। তাতে একদল সংবাদপত্রসেবী কবি তৈরী হবে এবং তাঁরা রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত হতে পারবেন। তবে আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রপথগামী চিত্তের প্রভাব থেকে মুক্ত হবার উপায় আপাতত কোনো সৎ কবির নেই।

রবীন্দ্রনাথের কবি-কর্ম্ম কী প্রবল চেতনা নিয়ে অগ্রসর তার একটি সংযত ও হৃদয়গ্রাহী বিচার হওয়ার দরকার ছিল। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কতিপয় পাঠ্য পুস্তক অবশ্য আছে কিন্তু তা থেকে রবীন্দ্র-চেতনার কোনো নির্ম্মল চিত্র মনে তুলে নেওয়া যায়না। সম্প্রতি শ্রীক্ষুদিরাম দাস 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' শীর্ষক গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে 'অতীন্দ্রিয় ভাব-ব্যাকুলতাময় মর্ত্য-প্রীতিই কবির অভীপ্সিত' বস্তু ছিল। লেখক এরই নাম 'রোমানটিক' মনোভাব দিয়েছেন। ঔপনিষদীয় প্রজ্ঞার স্পর্শে রাবীন্দ্রিক 'রোমানটিকতা' যে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যুগ পার হয়ে বের্গসঁর যুগের পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে শিক্ষার্থীরা অক্লেশে এ-কথাটি উক্ত গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করতে পারবেন। আর আমরা মনে করি রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কে কুয়াশা সৃষ্টি না করে এ-ধরনের যুগ-বিবর্ত্তন-মূলক তথ্য পরিবেষণ করাই এখন সমীচীন।

প্রসঙ্গত রবীন্দ্রোত্তর কবিদের 'রোমানটিক' মনোভাবের নমুনাটি আমরা স্মরণ করতে পারি। তাঁরা অতীন্দ্রিয়তার মোহ বা সদ্বস্তু থেকে মুক্ত হতে আপ্রাণ চেষ্টা করে অবশেষে কেউ অতীন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন, কেউবা ঐতিহাসিকতায় এবং অপর কেউ-কেউ শূন্যবাদে আশ্রয় নিচ্ছেন। সাম্যবাদে রোমানটিকতার প্রশ্রয় নেই বলে কিম্বদন্তী শ্রুত হয়, সুতরাং ৩০-এর অন্তিম প্রান্তে উক্ত মতবাদের আশ্রয়ে যেসব রোমানটিক কবিতা রচনার চেষ্টা হয়েছিল তা কোনো দিক থেকেই প্রশ্রয় পায়নি। আমরা মনে করি: রোমানটিক মনোভাব নৈষ্ঠিক হতে পারলে কাব্য শিল্পীকে উন্নত স্তরে পৌঁছিয়ে দিতে পারে, যে স্তরে রবীন্দ্রনাথ সুদৃঢ় পদক্ষেপে উপনীত হয়েছিলেন। রোমানটিক হওয়া মানে উৎক্রান্তির সেবা করা।

## 'মুক্তধারা'

রবীন্দ্রনাথের এ-ধারনাটি অভ্রান্ত ছিল যে কেউ কারো পক্ষে চলবার সহায়ক হয়না—চলতে হয় নিজেকেই। জীবনের আসল রূপকে রূপক নাটক-গুলোতে ভারতীয় মুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্থাপন করেছিলেন। নেতা-বাদে বিশ্বাস-স্থাপন না করবার চিত্তবৃত্তি নিঃসন্দেহে নৈরাজ্যিক যা গান্ধীজিও পছন্দ করতেন। নৈরাজ্যিক মানে এনার্কো-সিণ্ডিক্যালজম্—প্রাচীন ভারতের 'পৌর নিগম' যে-পন্থা ধরে অগ্রসর হয়েছিল। নেতা-বাদের বিপদ এই যে নেতার অভাবে জাতি মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত দেশে নেতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। রাষ্ট্রনীতির গভীর তত্ত্বে প্রবেশ করতে রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছুক ছিলেন না। ফলে আমরা 'মুক্তধারা'র মতো নাটক পেয়েছি যার অভিনয় ইদানীং শ্রুত হলেও বিশেষ ফলপ্রদ নয়। তবু 'হরবোলা'-সম্প্রদায় সিগনেট-প্রেস-প্রাঙ্গনে নানাবিধ শিল্প কৃতিত্ব-সংযোগে 'মুক্তধারা'র অভিনয়টি মনোরম করে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের এতো প্রিয় যে তাঁর বিচ্যুতিকে আমরা আমাদের মনের মাধুরী দিয়ে মুছে দিতে পারি। একেই বল্‌ব সত্যিকারের রবীন্দ্রোত্তর যুগ।

'মুক্তধারা'য় বাঙালী রাষ্ট্রনেতার রোমানটিক আত্মত্যাগটি উজ্জ্বল ছবিতে চিত্রিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মুক্তির একটা নিরবয়ব উদগ্র কামনা বাঙালী-মানসে জাগ্রত। এ-কামনা মানবিক সত্তার গভীরতম প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়েছিল কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক দিনে—তাকে শিক্ষা-সভ্যতার স্পর্শ অনেকটা অবনমিত করেছে কিন্তু তিরোহিত করতে পারেনি। এই চিত্তবৃত্তির দরুণ বাঙালী দুঃখী জাতি: 'গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্‌পুনম্।' দুঃখীজাতির জন্যে রবীন্দ্রনাথের গবেষণা যতোটুকু সুখ জীবন-মন্থন করে আনতে পেরেছিল তা যে কোনোদিন বাঙ্গালী সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেছে এমন নয়। তার জন্যে অবশ্য তাঁর দুঃখ ছিলনা। দান করেই তিনি মুক্তির আনন্দ উপভোগ করে গেছেন। তাছাড়া বাঙালীর প্রতিটি দুঃখের স্পন্দন অনুভব করেছেন তাঁর নিজের হৃদ্‌স্পন্দনে। তাই বাঙালীর পক্ষে রবীন্দ্র-স্মৃতি মুছে ফেলা দুষ্কর।

## 'মানবেন্দ্রনাথ'

তেম্নি মুছে ফেলা দুষ্কর মানবিক মনের অধিকারী রাষ্ট্র-সচেতন বাঙালী মনীষীদের। মানবেন্দ্রনাথ রায় তেম্নি একটি চরিত্র ছিলেন। পথ-মোচনের দুশ্চর তপস্যা নিয়ে এঁদের



জীবন সুরু। ঘর থেকে বাইরে কোন্ দিগন্তে যে সে-পথ-রেখা মিশে গেছে তার সন্ধান যেন কোনোদিনই আর শেষ হয়না এঁদের জীবনে। মুক্তির চেতনা পর-পর বন্ধনের বেড়া ডিঙিয়ে চলতে সুরু করে। মুক্তির চেতনা থেকে এঁদের আর মুক্তি নেই।



ভারতের রাষ্ট্রিক দিগন্তে প্রথম মুক্তির চরণ-ধ্বনি যখন এ-শতকের প্রারম্ভে মৃদু-মৃদু ধ্বনিত হচ্ছিল—তাকে আপন হৃদগত স্পন্দনের অন্তর্ভুক্ত ব্যঞ্জিত-ধ্বনি করে নেবার সৌভাগ্য বা দৌর্ভাগ্য যে কতিপয় মানবের জীবনে এলো মানবেন্দ্র নাথ তাঁদের মধ্যে সব চাইতে বেশী স্বপ্ন তৈরী করতে পেরেছিলেন তদানীন্তন কিশোর-দের মনে। আর সম্ভবত এ-যুগের বুদ্ধিজীবীদের মনে সবচাইতে বেশি আশার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন প্রবাস-প্রত্যাগত মানবেন্দ্র নাথ রায়ই দ্বিতীয়ত। ভারতবর্ষের মুক্তি-সাধনাকে কে জয়যুক্ত করবেন—এ প্রশ্ন তখন অনেকের নিকটেই চিন্তনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জয়ের মালা গান্ধীজির গলায়ই শোভা পেয়েছে তবু হয়ত বাঙালীর মন থেকে বাংলার 'দামাল নেতা'-দের স্মৃতি কোনোদিন মুছে যাবেনা। মুছে যাবেনা তাঁদের নিরন্তর পুরঃসৃয়মান চিন্তার দরুণ—তাঁদের মননশীলতার স্পর্শের দরুণ। আবেগকে কি করে পরিস্রুত মননে পর্য্যবসিত করতে হয় মানবেন্দ্রনাথের জীবন ও মানবিক ক্রিয়া-কলাপ বাঙালীর জন্যে এ উদাহরণ রেখে গেল।

# আত্মকথা

## প্রমথ চৌধুরী

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

যুদ্ধের পর অকস্মাৎ কলকাতার সব জমি ও বাড়ির দর বেড়ে গেল। সেই সুযোগে আমিও আমার ১॥ নং ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়ী বিক্রী ক'রে ফেললুম মহারাজা-নদীয়ার কাছে। বাড়ি ছেড়ে প্রথম আমার দাদার কুটুম্ব সিলেটের নগেন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ৭নং সানি পার্কের বাড়িতে গিয়ে উঠি ও সেখানে সাত মাস থাকি। তারপর মাস দেড়েক আমার ডাক্তার ভাই সুহৃৎনাথের ভবানীপুরের বাসায় কাটিয়ে আমার সেজদাদা কুমুদনাথের ২।১ নং ব্রাইট ষ্ট্রীটের বাড়িতে আশ্রয় নিই। ইতিপূর্বেই বালিগঞ্জের বর্তমান মেফেয়ার রোডের প্রান্তে একখণ্ড জমি নতুন বাড়ি করবার উদ্দেশ্যে কিনেছিলুম। এবং সুরেন মুখুজ্জে নামক একজন কণ্ট্রাক্টর তখন মেফেয়ারের অন্যান্য বাড়ি তৈরি করায় নিযুক্ত ছিলেন বলে তাঁরই হাতে আমার নতুন বাড়ি নির্মাণের ভার দেওয়া সংগত মনে করলুম। সেজদার বাড়ি থেকে আমি এই বাড়ি তদারক করতে যেতুম। নানা কারণ বশতঃ আমার এই বাড়ি ( পরে ২০নং মেফেয়ার বলে পরিচিত ) তৈরির সঙ্গে অনেক ঝঞ্ঝাট ও লোকসানের স্মৃতি জড়িত। তাতে আমারও হয়ত দোষ ছিল, অন্যেরও দোষ ছিল; সে বিচারে এখন ফল নেই। মোট কথা 'কমলালয়'-ফলক নামে মাত্র নতুন বাড়ির ফটকে শোভা পেলেও প্রকৃতপক্ষে কমলা সেখান থেকেই আমার কাছে বিদায় নিলেন। প্রথমতঃ যখন মহারাজা-নদীয়ার কাছে প্রায় পৌনে দুই লক্ষ টাকায় পুরোনো ১॥ নং-এর ব্রাইট ষ্ট্রীটের 'কমলালয়' বিক্রী করি তখন অভিপ্রায় এবং আশা ছিল যে, আমাদের থাকবার উপযোগী নতুন একটা মাঝারি গোছের বাড়ি তৈরি করেও যে টাকা হাতে থাকবে, তার সুদে আমরা বুড়োবয়সে ঘরে বসে খেতে পারব। কিন্তু নানা দুর্দৈবে নতুন বাড়ি করতে প্রায় সমস্ত টাকাটাই লেগে গেল। তা ছাড়া পুরনো বাড়ির টাকা পাবামাত্র একজন নিকট-আত্মীয় সমস্তটা ধার নিলেন বলে, এবং সময়মত শোধ করতে পারলেন না বলে, নতুন বাড়ি তৈরির অনেক টাকাই ধার করে শুধতে হল। এই ধার অধিকাংশ হিন্দুস্থান ইনশিয়োর কোম্পানির কাছ থেকে নিই। পূর্বোক্ত আত্মীয় আমার বাকি পাওনা কতক জমি ও কতক জমিদারি দ্বারা শোধ করেন। সেই জমিদারি বা ধোবরাকোল এস্টেট নদীয়া জেলায় স্থিত। প্রথম কয় বৎসর তার থেকে বেশ আয় হয়েছিল, এবং সংসারযাত্রাও নির্বিঘ্নে চলেছিল। কিন্তু পরে শিকস্তি প্রভৃতি নানা কারণ-সমবায়ে আয় কমে যেতে লাগল। এদিকে আমার গোপাল শীলের চাকরি গেল, ক্রমে দক্ষিণেশ্বরের রিসিভরিও গেল। শুধু ল-কলেজের একটা প্রফেসরি রইল। সে সামান্য আয়ে সংসার চালানো দুর্ঘট হল। তাই ক্রমে ২০নং মেফেয়ারের নতুন বাড়ীর বড় অংশটা ভাড়া দিয়ে ছোট অংশটায় নিজেরা থাকতে



লাগলুম। ইতিপূর্বে আমার ডাক্তার-ভাই সপরিবারে এসে সেই অংশে ছিলেন। বড় বাড়িতে থাকাকালীন আমার শ্বশুরমহাশয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরও অনেকদিন আমাদের কাছে এসে ছিলেন, এবং ঐখানেই ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে তাঁর মৃত্যু হয়। তার পরে আমার শাশুড়ীঠাকুরানীও আমাদের অনুরোধে রাঁচির এককবাস তুলে দিয়ে আমাদের কাছে বছর আষ্টেক এসে ছিলেন। বলতে ভুলে গেছি যে, ইতিপূর্বে আমার সেজদাদা কুমুদনাথ পাটনায় প্র্যাক্‌টিস করতে যাবার সময় আমার মাতাঠাকুরানীকেও আমাদের কাছে রেখে যান, এবং ১॥ বৎসর পরে ফিরে এসে আবার নিয়ে যান। এইরকম করে টাকাকড়ির দিক থেকে ২০নং মেফেয়ার অপয়া হলেও অন্য দিকে অনেক গুরুজনের পদধূলিলাভে পুণ্যস্থানে পরিণত হয়েছিল।

যখন ২০নং-এর বড় বাড়ি ভাড়া দিয়ে ছোট বাড়িতে নিজেরা এসে থাকতে বাধ্য হলুম তখন আমার ডাক্তার-ভাই সপরিবারে অন্য ভাড়াবাড়িতে উঠে গেলেন। ইতিমধ্যে আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথ সপরিবারে আমাদের ছোট বাড়িতে দিনকতক থেকে নিজেদের নতুন বাড়ি তৈরির তদারক করেছিলেন। তাঁরাও ঐ যুদ্ধোত্তর চড়া বাজারের লোভে নিজেদের ১৯নং স্টোর রোডের সুন্দর বাগানবাড়ি অনেক লাভে আমাদের আগেই বিক্রী করেছিলেন। পরে বোলপুর ও কলকাতায় যাতায়াত ক'রে, ও কখনো কখনো আমাদের ১॥ নং কমলালয়ে থেকে, শেষ পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রা-ভবনে কাটিয়ে তবে নিজেদের পাম প্লেসের নবনির্মিত লালবাংলা বাড়িতে থাকতে আসেন। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে আমার জীবন ঘনিষ্ঠভাবে গ্রথিত হয়েছিল, সুতরাং তাঁদের ভাগ্যবিপর্যয়ের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও অনিবার্যরূপে জড়িত হয়ে পড়ে।

১৯০৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর রাঁচির মোরাবাদী পাহাড়ের উপর যে বাড়ি এবং তার চূড়ায় যে মন্দির তৈরি করান, সেটি এখনো প্রত্যেক রাঁচি-যাত্রীর অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে রয়েছে। আমার স্ত্রীর শরীর ওখানে গিয়ে সারে ব'লে, তার আগে থেকেই শ্বশুরপরিবার এবং সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে আমরাও রাঁচির ভিন্ন ভিন্ন ভাড়া বাড়িতে গিয়ে থেকেছি। তাঁদের পাহাড়ের বাড়ি হবার আগের বছর আমরাও রাঁচির কোকোর নামক পাড়ার জমি কিনে নিজেদের একটি বাংলো-জাতীয় একতলা বাড়ি তৈরি করি ও ঘরকন্না পাতবার আবশ্যক জিনিস দিয়ে সাজাই। দুঃখের বিষয় ১৯১৯ সালে প্রথম গৃহ-প্রবেশ করেই আমার স্ত্রী সাংঘাতিক নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হন। সেই সময় সুহৃৎ সপরিবারে উপস্থিত থেকে সেবা-চিকিৎসা ক'রে তাঁকে সারিয়ে তোলেন।

পরের বৎসর এই কোকোর বাংলো তৈরি করতে যত দাম পড়েছিল সেই দামেই একটি মুসলমান নবাবকে জিনিসপত্র সুদ্ধ বিক্রী করে ফেলি। তার আগে একবার ভাড়াও দিয়েছিলুম। বিক্রী করলুম এইজন্য যে, প্রতি বৎসর পুজোর সময় মাসখানেকের জন্য

রাঁচি যেতুম কেবল আমার শ্বশুরপরিবারকে দেখবার ও দেখা দেবার জন্যে। তাই দূরে বাড়ি করে থাকার কোনো সার্থকতা ছিল না, বরং দেখাশোনা-যাতায়াতের অসুবিধাই হত; কারণ এখনকার মত তখন যানবাহনের এত সুবিধে ছিল না।

আমার মনে আছে যখন আমার শ্যালক-পরিবারের সঙ্গে আমরা ১৯০৮ সালের আরম্ভে প্রথম রাঁচি যাই এবং ষ্টেশনের কাছে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর মস্ত বাগানওয়ালা বাড়িতে উঠি তখন একটি ভাড়াটে ফিটন কষ্টে যোগাড় করে সান্ধ্যভ্রমণে চারজনে বার হতুম। নতুন জায়গায় মাঘ মাসে আসবার আগে সেখানকার উৎকট শীতের ভয় অনেকে দেখিয়েছিলেন, যথা, ঘরে সারাদিন আঙ্গোঠি জ্বালিয়ে রাখলেও সে শীত ভাঙবে না, হাত-পা কালিয়ে যাবে ইত্যাদি। অবশ্য শীত আমরা পেয়েছিলুম স্বীকার করছি, আর বিকেলে গাড়ি করে বেড়াবার সময় যখন হু হু করে খোলা মাঠের উপর দিয়ে অবাধে কনকনে হাওয়া বইত তখন খুব যে আরাম লাগত তা বলতে পারিনে; আর যাঁরা আমাদের মধ্যে শীতকাতুরে তাঁরা মাথায় ফ্যাটা বেঁধে বেরতেন। তবে যতটা জুজুর ভয় দেখানো হয়েছিল ততটা কারণ ছিল না; আর সে যাত্রা আমাদের কারো যে অসুখ করেনি, সেইটেই তার প্রমাণ।

এই ১৯০৮ সালে প্রথম রাঁচি যাই, আর তারপরে বোধ হয় প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরে প্রতি বৎসর পুজোর সময় মোরাবাদী পাহাড়ের শান্তিধামে গিয়ে থাকি। সে সময় সেখানকার আবহাওয়া খুব ভালো থাকে, আর আমরাও তাঁদের আদর-যত্নে শরীরে মনে ভালোই থাকতুম। জ্যোতিকাকামশায় আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আর আমরা তাঁর শান্তিধাম বাড়ির যা যা উন্নতির পরামর্শ দিতুম, পরের বৎসর গিয়ে প্রায়ই দেখতুম সেগুলি কার্যে পরিণত হয়েছে। ঐ বাড়িটি যেন তাঁর ছেলের মত ছিল; কোথায় কি একটু করলে ভালো হবে কেবল তাই ভাবতেন। একএকবার আমার সবুজপত্রের দলের এক-আধজনও আমাদের সঙ্গে রাঁচিতে ছুটি যাপন করতে যেতেন; তাঁরাও সমান আদর-যত্ন পেতেন। আমার শ্বশুর-খুড়শ্বশুর মশায়দের কাছে ছিল বসুধৈব কুটুম্বকং। যত বেশি লোক পাহাড়ের বাড়ি ও মন্দির দেখতে আসত ততই তাঁরা খুশি হতেন ও সকলকে প্রিয়বাক্যে আপ্যায়িত করতেন। পরিবারস্থ লোক ছাড়া রাঁচিতে দু-একজন সাহিত্যিকের সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়, যথা, শ্রীভবানী ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন।

আমার শ্বাশুড়ীঠাকুরানী কিছুকাল পরে পাহাড়ের তলায় মোরাবাদী রাস্তার উপর নিজের খেয়ালমত একটি আটপৌলে বাংলো তৈরি করেন ও সেখানে তাঁর বড় নাতি সুবীরকে নিয়ে বাস করতে থাকেন। বাড়িটার নাকি পদ্মের মত গড়ন করাই তাঁর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু তাঁর ছেলে পাপড়ির মাথাগুলো কেটে দেবার প্রস্তাব করায় আটপৌলে নকশায় শেষে দাঁড়াল। এই কথা শুনে আমি বলেছিলুম যে, পদ্মে ভ্রমরেরই বাস শোভা পায়, মানুষের



বাসের তেমন সুবিধে হয় না! এই বাড়ি ১৯০২ সালে পরে তিনি আমার স্ত্রীকে দান করেন। সে অবধি আমরা যখন রাঁচি যেতুম সেখানেই থাকতুম। তাঁকে অসুস্থ অবস্থায় বোধ হয় ১৯৩৬ সালে সেখানে শেষ নিয়ে যাই, আর তার পরের বৎসর আমরাও শেষ সেখানে বেড়াতে যাই। 'শেষ' এই জন্য বলছি যে গত বৎসর ১৯৪৫ সালে আমরা সেই বহুপরিচিত প্রিয় সত্যধাম বাড়ি (এই নাম শ্বশুরমশায়ের ইচ্ছাতেই দেওয়া হয়) বিক্রী করে পরের হাতে তুলে দিয়েছি। কারণ এখন আর আমার অত দূরে যাতায়াত করবার মত শারীরিক সামর্থ্য নেই।

১৯২৫ সালে জ্যোতিকাকামশায়ের মৃত্যু হয়। তিনি নিজেই নিজের জীবনস্মৃতি লিখে গেছেন, সুতরাং আমার পক্ষে সে বিষয় বেশি কিছু বলা বাহুল্য। তাঁর অর্শ ও হাঁপানি-কাশি এই দুই পারিবারিক রোগ সঙ্গের সাথী ছিল; তবু অনেকদিন একেবারে একলা কি প্রসন্নভাবে ঐ নির্বান্ধব পাহাড়-কুঠিতে চাকর মাত্র সহায় হয়ে কাটিয়েছেন মনে করলে আমাদের মত সুখী পরমুখাপেক্ষী মানুষের আশ্চর্য বোধ হয়। চাকরের ঘরও অনেক দূরে, পাহাড়ের নীচের দিকে ছিল, দরকার হলে তাদের ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকতেন। এরকম নিরভিমান, নিরুদ্বেগ, নিরুপদ্রব, নিরতিশয় ভদ্রলোক যে-কোনো সমাজেই দুর্লভ। তিনি উইলে তাঁর পাহাড়ের শান্তিধাম বাড়ি সত্যেন্দ্রনাথের বড় নাতি সুবীরকে দিয়ে যান, তাকে ছোটবেলা থেকেই কাছে পেয়েছিলেন, ও খুবই ভালবাসতেন; তাঁর সমস্ত আঁকবার খাতাপত্র ভ্রাতুষ্পুত্র গগনেন্দ্রনাথকে; এবং সমস্ত বাদ্যযন্ত্র ও সংগীতপুস্তক আমার স্ত্রীকে দিয়ে যান। এই দুই শিল্পে তাঁর অনুরাগ ও অভিজ্ঞতা সর্বজনবিদিত। তা ছাড়া কিছু জমি মোরাবাদীর রাস্তার ওপারে কিনে একটি ছোট বাড়ি তৈরি করতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু জীবদ্দশায় শেষ করে যেতে পারেননি। সেটি তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছানুসারে শেষ ক'রে পাড়ার গরিবদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার্থে সেবাধাম নাম দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে প্রয়োজনমত সাজ-সরঞ্জাম সমেত দিয়ে দেওয়া হয়। এখনো তাঁরা সেটির অধিকারী এবং পরিচালক।

প্রায় সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল রাঁচিতে বসবাস ও যাতায়াত ক'রে সেখানকার লোকজন ঘটনাবলীর অনেক কথাই মনে উদয় হয়, কিন্তু সব কথা বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়। তাই রাঁচির অধ্যায় এই বলেই শেষ করি যে, সেখানকার স্মৃতি নিষ্কণ্টক সুখের বলেই মনে রয়েছে, কেবল আমার স্ত্রীর ঐ এক ভারি ব্যারাম ছাড়া। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী অশোকা দেবী আমাদের সত্যধামের অনেকটা জমি কিনে নিয়ে নিজে রাঁচিতে বেশ ভাল বাড়ি তৈরী করে গত যুদ্ধের সময় থেকে সেখানেই সপরিবারে বসবাস করছেন এবং যতদিন আমাদের বাড়ি ছিল তার তত্ত্বাবধানে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমার দাদার ছোট ছেলে দেবকুমারও রাঁচিতে মোরাবাদীর কাছাকাছি বাড়ি তৈরী করেছেন। দুঃখের বিষয় তাঁরা যখন রাঁচিতে স্থায়ী হলেন, ঠিক সেই সময়েই আমরা সেখানকার বাস তুলে দিয়ে চলে এলুম। (ক্রমশঃ)

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

মালবাবু তার ঘরেই ছিল। মাধাই তার অভ্যস্ত ভুল কায়দায় একটা স্যালুট ক'রে বললে,—দুই গাড়ীতে নাকি এক স্পেশ্যাল।

—গাড়ী দেখতে এলে বুঝি?

—দেখতে আসি নাই, পাস্ করাব আমি। আমি ঝাণ্ডাদার।

—বেশ করেছ।

মাধাই মালবাবুর মুখে চোখে অবশ্যই একটু উত্তেজনা প্রত্যাশা করেছিল। মালবাবু যেন কি হয়েছে। মাধাই আর দাঁড়াল না। প্ল্যাটফর্মের ডাউনগাড়ীর প্রবেশ পথের কাছে রেলকর্মচারীদের ভিড় বাড়ছে। কাজের সময় হয়েছে। ভিড়টার দিকে চলতে চলতে মাধাই ভাবল: নিষ্যাস কথা, মালবাবুর ধম্মভাব হইছে। গাঁজার ফল। গাঁজা খায় সন্ন্যাসিরা, গাঁজা খেলে সন্ন্যাসি হতে হবে।

মাধাই ভিড়টার কাছে পৌছাতে পৌছাতে স্পেশ্যালের ধোঁয়া দেখা গেল। ষ্টেশনমাষ্টার নিজেই ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গে তিন চার জন বাবু, জন দুএক পোর্টার, পয়েণ্ট্স্ম্যান্। এই না হ'লে জীবন। মাধাই প্ল্যাটফর্মের দূরতম প্রান্তে ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

কিন্তু ধর্ম্মভাব ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্পেশ্যাল এসেছিল, চলেও গেল। মাধাই মালবাবুর ঘরের দরজায় একটা প্যাকিং বাক্সের উপরে বসে পড়ল।

একটু উস্খুস্ ক'রে মাধাই বলল—দেখলেন?

—হ্যাঁ, আমার যেন আর কাজ নেই!

—তাইলেও দেখছেন তো।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে সেটাকে আবার মুখে গুঁজে মালবাবু ষ্টেট্মেণ্টে মন দিলেন। মাধাই মনিরুদ্দির খোঁজে গেল। যে ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করেছে সেটা আর কারো নজরে পড়ল কিনা এটা জানা দরকার। স্পেশ্যাল যখন 'ইন্' করল তখন মাধাই লক্ষ্য করেছিল গাড়ী দুটির এঞ্জিন ফুল পাতায় সজ্জিত। অনেক স্পেশ্যাল গিয়েছে এর আগে উত্তরে, অনেকে ফিরেছে দক্ষিণে; কিন্তু এমনটা কখনো হয়নি। মাধাই ভেবেছিল এবার সব-সেরা কিছু দেখতে পাবে। প্রথম গাড়ীটা থামল। এক সঙ্গে সবগুলি ভেণ্ডার তাদের ডালা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার জুড়ে দিল। সে চিৎকারে ঘুমন্ত যাত্রীর ঘুম ভেঙে যায়। গাড়ীশুদ্ধ যেন ঘুমিয়ে আছে, জানালায় যে মুখগুলি দেখা গেল তারাও এতটুকু উৎসুক হ'ল না। একটা দুটি ফার্ষ্টক্লাস গাড়ীর দরজা খুলে গম্ভীর মুখে দুএকজন খুব বড় বড় অফিসার নামল। তারপর তাদের নামা দেখে সাহস পেয়ে আরও দুএকজন ক'রে সৈন্য নামল। কিন্তু এরা যেন কোন নোতুন পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে। যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ষ্টেশনটার চারদিকে দেখতে



লাগল। ভেণ্ডাররা তাদের গাম্ভীর্য্যদেখে এগোতে সাহস করল না। কিছুমাত্র সাড়া শব্দ নেই, একটা পয়সার বিক্রী করতে পারল না ভেণ্ডাররা। অবশ্য এটা হয়তো অত্যুক্তি। বিক্রী কি আর হ'ল না, কিন্তু তাকে বিক্রী বলে না। আগে দুপয়সার জিনিস কিনতে যে হুঙ্কার ঝনৎকার ছিল, এখন হাজার টাকার লেনদেনও তার সিকিটা হ'ল না। কেউ ডালা থেকে থাবরা দিয়ে সবগুলি সিগারেট তুলে নিয়ে দশটাকার নোট ছুঁড়ে ফেলে দিল না। ভেণ্ডারের টিকি ধরে টান দিয়ে কেউ হো হো করে হেসে উঠল না। এর আগে গাড়ী থামতে যারা দুদ্দাড় ক'রে ছুটত এঞ্জিনের জল নেবার কলামের নিচে, ষ্টেশনভরা লোকের সামনে উলঙ্গ হ'য়ে স্নান করতে পারত শিশুদের মতো সেই লোকগুলিই বা গেল কোথায়?

মাধাই মনিরুদ্দির সাক্ষাৎ পেয়ে জিজ্ঞাসা করল,—মুরদা গাড়ী নাকি রে?—মাষ্টারসাহেব তো ব'লে খুব যুদ্ধে জেতেছে ওরা।

এ কি রকম জয়লাভ বুঝে উঠতে পারে না মাধাই। জয়লাভ করা মানে চোরের মতো মুখ ক'রে ঘরে ফেরা নাকি!

চা-এর দোকানে বসে পড়ল মাধাই। দোকানিকে চা দিতে বলে সে পাশের লোকটিকে হেসে প্রশ্ন করল,—দেখলেন।

—দেখলাম।

—যুদ্ধে জেতেছে তবে আনন্দ করল না কেন?

—এখানে করবে কেন? ওদের দেশে ওদের ছেলে মেয়ে বউ আছে তাদের কাছে গিয়ে করবে।

মাধাই শ্রদ্ধায় লোকটির দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে বসল। এতক্ষণে একটা কথা একজন বলেছে বটে। ঠিক্ তো, কথাটা ঠিকই বলেছে ভদ্রলোক। যুদ্ধ জয়ের পর এখন বাড়ী ফেরার তাড়া। এখন কি আর হৈ হৈ ভালো লাগে।

লোকটির ট্রেন ধরার তাড়া ছিল, সে উঠে গেল। মাধাই চুষে চুষে চা খেতে লাগল। দোকানিকে কথাটা বললে—যুদ্ধে জিতলে কি হয়, নিজের ঘরে না ফিরলে কি আর আনন্দ হয়।

অথচ নজা দেখ এই এত বড় ব্যাপারটা কেউ যেন লক্ষ্য করল না। না জয়হরি, না মনিরুদ্দি। এটা যেন আজই প্রথম হ'ল তা নয়। আজ চূড়ান্তভাবে জিনিসটা চোখে পড়েছে, কিন্তু কিছুদিন আগে থেকেই মাধাইএর একটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'চ্ছে। জয়হরি মনিরুদ্দিরা কথা শুনে ঠিক হেসে উড়িয়ে দেয়নি, বরং মাধাইএর পর্য্যবেক্ষণ শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছিল। পর্য্যবেক্ষণটির মূল্য সম্বন্ধে তারা কিছু বলেনি, মোটামুটির গভীরে তারা চিন্তা করে এটাই তাদের বিস্মিত করেছিল।

জয়হরি বলেছিল, মানুষ কি চিরকালই লাফায় নাকি। তুই চাকরির প্রথম অবস্থায় ওভারব্রিজ থেকে দড়ি বেঁধে ঝুলতি এখন তা করিস? বয়স বাড়লি ধীর স্থির হয়। এও তেমনি, যুদ্ধের তো বয়স হ'ল।

জয়হরি খানিকটা অপ্রতিভ হয়ে হাসল।

বলি বলি করেও মালবাবুর কাছে কথাটা উত্থাপন করতে পারেনি মাধাই। শত হ'লেও তাঁরা লেখাপড়া জানা লোক, তাঁদের কাছে উল্টোপাল্টা কথা বলতে যাওয়া মানে বোকা প্রতিপন্ন হওয়া।

রেল কোম্পানি একবার একরকম চাল দিয়েছিল—সুন্দর চেহারার ভাত হ'ত কিন্তু চিবিয়ে চিবিয়ে থুথু ক'রে ফেলে দিতে হ'ত। তেঁতো হ'লে তবু স্বাদ থাকে। সব রকমের স্বাদবর্জিত সে এক অদ্ভুত আহার্য্য। সংসারটা যেন ভাত। প্রলোভন আছে, প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য—কিন্তু স্বাদ কমে গেছে। সেই আকাশ, সেই মাটি, সেই মানুষগুলি আছে, কিন্তু এ সবের মাঝখানে থেকে কি যেন একটা নেই।

এ সব ধরণের কথাবার্ত্তা শুনে মনিরুদ্দি একদিন বলেছিল—এত মনমরা কেন?

মাধাই সারা দুপুরটা ঘুমিয়ে কাটিয়ে বিকেলের ডিউটি দেবার জন্য ষ্টেশনে এসে বসেছে। স্তূপীকৃত ক'রে রাখা পাটের গাঁইটগুলির একটায়। মনিরুদ্দির কথায় সে বললে—মনমরা কও কি?

—না, ভাই, মনমরা তুমি হইছ।

মাধাই বললে,—আমি কি একা, সবারই যেন জেল্লা কমে আসতিছে।

মনিরুদ্দি হো হো ক'রে হেসে উঠল,—তুমি ভদ্রলোক হলা, কেন? দৃশ্যমান জগতের অতিরিক্ত বিষয় নিয়ে, অপ্রাকৃত জিনিস নিয়ে ভদ্রলোকরাই আলোচনা করে থাকে।

মনিরুদ্দি আবার বলেছিল,—ফূর্ত্তি কর, হৈ হৈ কর, মদ খারি?

—ধুর্। একেবারে বাজে, গা গুঁটায়।

—ক'স কি, খাইছিস?

—খাইছিলাম একটু একদিন।

—জয়হরির কাছে শুনিস, সে কেমন জিনিস। ও তো রোজ খায়। সাহেবরাও খায়।

ওদিক থেকে মনিরুদ্দিকে বাবুরা ডাকল। মনিরুদ্দি বললে, দেখলি, তুই ভাবিস? কাম আর কাম্। বাড়ী যায়েও তাই। এটা কাঁদে, ওটা চেঁচায়।

লোকটি চলে গেলে গাঁজা-বিড়ি একটা ধরাল মাধাই। তারপরে মনে মনে বলল,—সাহেবরাও খায়। (মনিরুদ্দির সেদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল।) স্পেশ্যালে যে সাহেবরা গেল তারা তো ধর যে খানাগাড়ীর মধ্যে বসে খাতে খাতেই গেল মদ, তবে অমন মুখের চেহারা কেন?

চায়ের দোকান থেকে উঠে মাধাই নিজের ঘরের দিকে রওনা হ'ল। ঢের লোক আছে ডিউটি করার। স্পেশ্যালের পর সবাই অবসর ভোগ করছে।

ডাক শুনে সুরতুন ধরমর ক'রে উঠে বসল।

—কে ডাকতেছে?

মাধাইর গলার শব্দে চিনতে পেরে সুরো দরজা খুলে বললে—ফিরে আলে এখনই? গাড়ী চলে গেল।

—হয়।

—তা হ'লে তুমি ঘরে আসে শোও, আমি বারান্দায় শুই।

মাধাই ততক্ষণে বারান্দায় বসে পড়েছে। বললে—তুই এখানে আয়। গল্প করি। সুরো দরজার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল, তার মস্তিষ্ক কথার খোঁজে নিজেকে তোলপাড় করতে লাগল।



পরিস্থিতিটা অভিনব। অনেকদিনের পরিচয় মাধাইএর সাথে, এর আগে অনেক রাত্রি যাপন করেছে সে মাধাইএর ঘরে, কিন্তু হয় ফতেমা সঙ্গে ছিল, নতুবা মাধাই তাকে ঘর ছেড়ে দিয়ে ষ্টেশনে রাত কাটিয়েছে। ঘুমের মাঝখানে রাত্রির অন্ধকারে এমন ক'রে মাধাই ফিরে এসে ডাকেনি। সুরো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

মাধাই বললে—বস না, গল্প করি, তোর কি খুব ঘুম পাতেছে সুরো।

ঘড়ির মাপে রাত্রির বয়স পরিমাপ করতে না পারলেও আকাশের যেটুকু চোখে পড়ল তাতে সুরো বুঝতে পারলে তখনও এক প্রহর রাত বাকি আছে।

সুরো যন্ত্রচালিতের মতো মাধাইএর অদূরে বসে পড়ল। রাত্রিযাপন করাটা খুব বড় ব্যাপার নয় সুরোদের পক্ষে, চালের ব্যবসায়ে দীর্ঘরাত্রি গাড়ীর ভিড়ে বসে চোখের উপর দিয়ে কেটে গেছে। সুরোর এখন আর একবার মনে হ'ল, যেমন অনেক বিষয়েই মনে হয়, সে ফতেমা নয়। ডাকাতে চেহারার সান্দারদের মধ্যে বেড়ে উঠেছিল বলেই নয় শুধু ওটা একটা জন্মার্জিত ক্ষমতা। তারই বলে ফতেমা যে কোন পুরুষের সাথে অক্লেশে কথা বলতে পারে, তাদের বক্তব্য বুঝতে পারে, এমন কি পুরুষরা ঠিক কি চাচ্ছে এটাও অনুভব করতে পারে। সুরো পারে না। তার মানসিক গঠনে কোথাও একটা অভাব আছে, নিজের পক্ষে সেটা জানা সম্ভব নয়।

সুরোর মনে পড়ে না আর কবে মাধাই আহার ও আহার্য্য সংগ্রহের বিষয়ের বাইরে তার সাথে কথা বলেছে। হাসি ঠাট্টা মাধাই যে একেবারেই করে না, তা নয়, কিন্তু সে সবই ফতেমার সাথে, সুরো শ্রোতা মাত্র। খুঁজতে গিয়ে মনে হল সুরোর, একদিন মাধাই আহার্য্য-পরিধেয় বিষয়ের বাইরে কথা বলেছিল। সেটা সেই হাতে উল্কি আঁকার দিন। সেদিন মাধাইএর সাথে বাজারে চলতে চলতে যেমন গা শির শির ক'রে উঠেছিল তার কথাটা মনে পড়তে এখনও তেমনি হ'ল তার।

কথা ক'স না যে—মাধাই প্রশ্ন করল।

—কি কব?

—কেন্ তোর ব্যবসার কথা বল, কত দিন তো ব্যবসা করলি, কত টাকা জমালি, কতদিন আর করবি।

রাত্রিতে ঘুম ভাঙিয়ে তুলে কেউ যদি এমন সব কথা বলতে থাকে তবে সাধারণত তার মনের উদ্ভিন্ন অবস্থাটাই ধরা পড়ে যায়। ফতেমা যদি এখন থাকত হয়তো তার কাছেও মাধাইএর কথাবার্ত্তা অস্বাভাবিক বলে বোধ হত, হয়তো বা সে প্রশ্ন করত—মাধাইএর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে। কিন্তু সুরো পুরুষের কথায় উত্তর দিতে তবু পারে, হয়তো প্রয়োজন হ'লে ঝগড়া করতে পারে, নিজের থেকে প্রশ্ন করে আলাপের স্তর পরিবর্ত্তন করবে এমন ক্ষমতা নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না।

সে বললে—তুমিই কও, বায়েন, কতদিন আর ব্যবসা করব, কত'দিন করা যাবি। একদিন যদি মোকামেও চাল অ-পাওয়া হয়।

—কেন তোর কি আর ভালো লাগে না? আমার মতো হইছে? আমার আর কাজ কাম ভালো লাগে না।

—আমি কাজ কাম না করলি, আমাকে খাতি দিবে কে?

—আমারও সেই কথা। কিন্তু ধর সুরো, আমি যদি কাজ কাম আর না করি, আমাকে তুই খাওয়াবের পারবি।

একি পরিহাস! অন্নদাতা নিজে যদি অন্নভিক্ষা করে, কি পরিস্থিতি হয় তা হ'লে। সুরো মাধাইএর রসিকতায় মৃদুস্বরে হেসে উঠল।

—ক'লি না?

সহসা সুরোকে যেন কথা বলার মতো জোর যুগিয়ে দিল কে। সে বললে—কেন, বায়েন, তুমি চাকরি ছাড়ে দেবা? তা দেও। তুমি মোকামের কাছে একখানা ঘর তুলো। আমরা চালের কারবার করব। তাতেই টাকা হবি। তাতেই পেট চলবি।

মাধাই সুরতুনের কথাটা অনুভব করল খানিকটা সময়।

—তা করিস, আমি চাকরি ছাড়লে তাই করিস।

—কিন্তুক পুলিশ তাড়া করলে তার ব্যবস্থা তোমার করবের হবি। আমিও পারব না, ফতেমাও না।

—হয়, হয়, পুলিশের কথায় মনে পড়ল। ওটার একটা ব্যবস্থা করতে হবি।

—ধরলি, ছাড়ায় নিয়ে আস, তুমি।

মাধাই হাসল। এমনি বটে সুরতুনদের বিশ্বাস।

—তার চায়ে তোরা অন্য ব্যবসা কর।

—কারবারের কথায় মনে পড়ল, টেপি আজ এক কৌটে দিছে। সেটা নিতে নাকি লোক আসবি। তারা নাকি টাকা দিবে।

—টাকা দিবে! কত বড় কৌটে, কি আছে তাতে।

—ছোটই।

—কি কস্? তাহ'লে বোধ হয় কোকিয়ান।

—সে কি? কেন্ ও ব্যবসা ভালো না।

—তুই আঁচলে আগুন বাঁধছিস। নিজেও পুড়বি, ঘরও জালাবি। পুলিশ জানলে তোক কয়েদ করবি।

—তাহ'লে করব না।

পুলিশ তাহ'লে একি করছে? বেড়াজাল দিয়ে ধরবার চেষ্টা করেছে তবে।

সহসা সুরতুনের মধ্যে সান্দারনি ফুঁসে উঠল। হয়তো মাধাইএর মতো অন্নদাতা নির্ভর করার মতো পুরুষ কাছে ছিল বলেই সে ক্রোধকে ভাষা দিতে সাহস পেল।

সে বলল—জাত পাকা পুলিশ। আমাদের শত্তুর। জন্ম জন্মের শত্তুর। কেন শোন নাই, বায়েন, আমার নানা কি বলত। আমার নানা ছিল আলতাপ। সে বলত কোনদিন এ মিটবি নে। আমার বাপের সাথে তার ঝগড়াও ঐ পুলিশ নিয়ে। রজবআলি তার সৎ ছাওয়াল আর আমার বাপ বেলাত হোসেন তার নিজের, তবু আমার বাপের সাথে কথাও কত না। হ'য়েছে কি আমার আমার আগের পক্ষের সোয়ামি ছিল পুলিশের কনিষ্টবল। আমার বাপ ছাড়া আর কেউ জানত না এ কথা।



কিন্তুক ঐ পুলিশের সঙ্গেই গোলমাল। বুধেডাঙ্গার কাছে এক জাহাজ ডুবি হয় নদীতে। সান্দাররা ডুবে ডুবে সেই ডুবি জাহাজ থেকে চালের বস্তা, লোহার পাত, কাপড়ের বাণ্ডিল বার ক'রে আনল। পুলিশ ঘোরাফেরা করবার লাগল। আমার সাথে আগে জানাশোনা ছিল তার আগের সোয়ামির আমলে এমন একজন কনিষ্টবল কি ক'রে কি ক'রে মালের লুকানো জায়গার খবর পায়। পুলিশ বাঁধে নিয়ে গেল সান্দারদের সব বেটা ছাওয়ালকে। সেই ঘেন্নায় আলতাপ আমার বাপ-মায়ের সাথে কথা কয় নাই। সান্দারের সান্দার আলতাপ, তারই ঘরে নাকি পুলিশের দোস্ত।

গল্পটা বলে সুরো হাসল।

মাধাই বললে—তাই বলে তুমিও পুলিশের শত্তুর হবা নাকি?

—না। আমার বাপ ছাতি সারানোর কাম করত। রজবআলি করত ভুঁইএর কাম।

একটা বিড়ি ধরালো মাধাই। খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে দেয়ালের গায়ে দেহটা ঢেলে দিয়ে মাধাই বললে—তার চায়ে তোরা বিয়ে সাদি কর।

কথাটা যে একেবারেই নোতুন তা নয়।

চালের কারবারের সাথী মেয়েদের মধ্যে বসে এমন কথা মাঝে মাঝে শুনেছে। রং-তামাসার কথা সে সব। প্রথমে বাধ বাধ লাগলেও এখন সুরো সে সব কথায় যোগ দিতে পারে। কিন্তু মাধাইএর কাছে এরকম কথা হাসি-তামাসা বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু সম্প্রদান করার মত আত্মীয়স্বজন নেই, প্রতিটি অন্নের দানা যাকে উপার্জন করতে হয় তার মনে বিবাহের কথা আদৌ ওঠে কিনা, উঠলেও সেটা কিরূপ নেয়, তা বলা কঠিন। সুরো উত্তর দিতে পারল না। ফতেমা হয়তো বলতো, তুমিই বিয়ে কর, মাধাই। একথাটাও চট করে সুরো বলতে পারল না।

খানিকটা সময় চুপ ক'রে বসে থেকে সুরো বললে—আজ ঘুমাবা না, বায়েন।

—হয়, ঘুমাব। মাধাই বিড়িটা ফেলে আঙ্গুল মট্‌কে সোজা হয়ে বসল।

—কোকিয়ানের ব্যবসা করা কম্ম নি। চালের কারবারই করতি হবি। তুই ঘরে যায়ে শো।

—তা হয় না। তুমি ঘরে যায়ে শোও। আমরা তো বারান্দাতেই ঘুমাই।

মাধাই উঠে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আঁচল বিছিয়ে বারান্দায় শুয়ে পড়ার আগে সুরতুন ভাবল,—আমি আর ভেবে কি করি, না খেয়ে যখন মরতে বসেছিলাম তখন ভেবে কি করেছি।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সুরতুন উঠে নিঃশব্দে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল মাধাই ঘুমিয়ে পড়ল কি না। এতক্ষণে সহসা একটা অনুভব হ'ল তার, কি যেন একটা হ'য়েছে মাধাইএর। অসুখ করে নি তো?

একটা তুলনা দিয়ে বোধ হয় মাধাইএর এই ব্যাপারটার কাছাকাছি যাওয়া যায়। বোধ হয় এইরকম মানসিক অবস্থাতেই পুরুষরা স্ত্রীকে খুঁজে বার করে নিছক কথা বলার জন্য। কথা বলা প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে।

(ক্রমশঃ)

# সাহিত্য-পত্রিকা

**ময়ূখ : সম্পাদক : সুবোধকুমার গুপ্ত।**

সাবলীল ও সুবোধ্য কবিতা রচনা করতে অধুনা কবিরা লজ্জা বোধ করেন না—কিন্তু একসময়ে 'নিরুক্ত' কবিতা-ত্রৈমাসিকী বার করে এসম্বন্ধে আন্দোলন করবার প্রয়োজন হয়েছিল। যুগের পরিবর্তন হয়েছে, বর্তমানে কবিতা পত্রিকাগুলির পরিচালনার ভার 'নিরুক্ত'র জাতকদের হাতেই দেখতে পাচ্ছি।

'ময়ূখ' আধুনিকতম কবিতা পত্রিকা। নতুনতম কবিদের সমাবেশে। এমন কি সমালোচকরাও দুঃসাহসী তরুণ, ইস্কাবনের টেক্কাকে ইস্কাবনের টেক্কাই মনে করে—হরতনে রোহিতনে তফাৎ করতে জানে। 'ময়ূখ' পত্রিকাও কয়েকটি আদর্শ অনুসরণ করছে,—প্রাঞ্জল কবিতা শুধু নয়, আঙ্গিক-সর্বস্বতা পরিহার করে উক্তির আভিজাত্য সম্বন্ধে সচেতন কবি সৃষ্টি করাও 'ময়ূখে'র লক্ষ্য। বাস্তবধর্মী কবিতাও রোমান্তিকতা পরিবর্জিত বলে 'ময়ূখ' মনে করে না। কবিতার ধর্ম সৌন্দর্য-সৃষ্টি, শঙ্খে সমুদ্রের স্পর্শ নেওয়া, গোষ্পদে আকাশ দেখা, কবি-মানসে সমগ্র চেতনার উপলব্ধি নিবিড় করে আনা। তাছাড়া, ময়ূখ শক্তিশালী কবিদের অনুকরণের পশরা সাজাতে চায় না, ভবিষ্যৎ কবিদের আসর জমাতে চায়।

**দ্যুতি : সম্পাদক : ওবায়েদ আলকার।**

'দ্যুতি' একটি সাহিত্য পত্রিকা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। আত্মবিভাগে আত্মম্ভরা বিভাজ্য হয় না, 'দ্যুতি' পত্রিকাটি হাতে পেয়ে বার বার এ কথাই মনে হচ্ছে। বাংলার সংস্কৃতিকে অধিকতর শক্তিশালী করবার জন্যে 'দ্যুতি' পত্রিকার প্রচেষ্টা—কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে অনন্যসাধারণ বলা চলে। তা ছাড়া বাংলা গদ্যের পরিবর্ধনও তাদের দ্বারা সম্ভব হচ্ছে। শুধু এটুকুই আমি প্রার্থনা করবো 'দ্যুতি' পত্রিকা যেন স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকাগুলির অনুকরণের দুর্বলতা যেন 'দ্যুতি'কে অনুপ্রাণিত না করে।

**মালদহ কলেজ পত্রিকা : সম্পাদক : রঞ্জন সেন। সপ্তম বর্ষ ॥ ১৩৬০**

মালদহ কলেজের ছাত্ররা অবাক করে দিয়েছে। কলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উচ্চমানের পত্রিকা তারা প্রকাশিত করেছে। ছাত্রদের রচনায় যথেষ্ট মুন্সীয়ানা আছে। তরুণ মন দিগদর্শনের খোঁজে আলোড়িত, তা প্রতিটি রচনায় অনুভব করা চলে এবং ছাত্রদের বহ্নিমান্ করে তোলবার জন্যে অধ্যাপকদের রচনাও সংবেদনশীল। 'কবিতা পড়ুন' আন্দোলন সম্পর্কে অধ্যক্ষ মহোদয়ের প্রবন্ধ নীতি নির্ধারণও করে বটে। তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা 'বিষয় বাছাই নিয়ে রিয়ালিজ্‌ম্ নয়, রিয়ালিজ্‌ম্ ফুটবে রচনার যাদুতে' কবিতা রচনায় প্রধান নীতিবাক্য বলে মনে করেন। প্রবন্ধ তিনি সমাপ্ত করেছেন এই বলে—'ভাববস্তুর প্রতি উত্তুংগ গুরুত্ব আরোপ এবং রূপনীতির প্রতি উদাসীন উপেক্ষা—আধুনিক কবিদের এই-ই দুর্বলতা। আশা করি এঁরা অদূর ভবিষ্যতে এই ত্রুটিটুকু শুধরে নিতে পারলেই কোনো আন্দোলনের প্রয়োজন হবে না।'

অমল দত্ত


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডুয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

| কবিতা | গল্প | উপন্যাস |
|---|---|---|
| অজিত দত্তের | প্রেমেন্দ্র মিত্রের | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের |
| পুনর্ণবা | মহানগর | বৃত্ত |
| দেড় টাকা | দু'টাকা | এক টাকা বার আনা |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের | সুবোধ ঘোষের | মরামাটি |
| নীল আকাশ | পরশুরামের কুঠার | ( ২য় সং ) |
| দেড় টাকা | দু'টাকা | দু'টাকা চার আনা |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের | শুক্লাভিসার | দিনান্ত |
| সংকলিতা | দু'টাকা চার আনা | ( ২য় সং ) |
| দু'টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের | সাড়ে তিন টাকা |
| প্রাচীন প্রাচী | ফসল | কল্লোল |
| দেড় টাকা | এক টাকা চার আনা | পাঁচ টাকা |
| অপ্রেম ও প্রেম | ঋণ | কস্মৈদেবায় |
| এক টাকা | দেড় টাকা | ( ২য় সং ) |
| পদাবলী | নতুন দিনের কাহিনী | তিন টাকা |
| দুই টাকা | দু'টাকা | |
| তিনজন আধুনিক কবি | নরেন্দ্রনাথ মিত্রের | রাত্রি |
| ( বাংলা কবিতার আলোচনা ) | পতাকা | ( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ ) |
| নয় আনা | দু'টাকা | পাঁচ টাকা |
| অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর | মৌচাক |
| সৈনিক | খেলনা | পাঁচ টাকা |
| দেড় টাকা | দেড় টাকা | |
| গোপাল ভৌমিকের | সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের | শৈলেন ঘোষের |
| স্বাক্ষর | নয়নচারা | তিনরঙ |
| এক টাকা | দেড় টাকা | দু'টাকা |

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ ক লি কা তা

# কল্লোল

দাম : পাঁচ টাকা

কল্লোল—উপন্যাস। শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য প্রণীত। প্রকাশক—পূরবাশা লিমিটেড, ৫৪নং গণেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা। ১৩৬০। মূল্য দাম পাঁচ টাকা।

"স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যাহাদের অধিকার ও দাবি-দাওয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাদের তালিকায় যে নিমিত্ত বিষয় শ্রমিক হইয়াছে, সাহিত্যিকদের লেখ্যবস্তু বিষয়বস্তুর পরিধিও প্রসারিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ধ্বনিত-প্রবহ উপন্যাস কল্লোলও এই নূতন পরিবেশের নব অবদান। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের মধ্য দিয়া বাঙ্ময়ীর সুরচিত যে কর্মপ্রবাহ অনুপ্রাণিত, তাহারই নিরপেক্ষ সত্য ও তথ্য এই গ্রন্থখানিতে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের দরদী দৃষ্টিভঙ্গী মানব-কল্যাণের বাস্তব রূপকেই মূর্ত করিয়া তুলিয়াছে। স্বল্পতনার রাস্তায় পুলিশের গুলীতে রামেশ্বর বেদিয়া, আত্মাগুলি, তাহার পরদিনের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সভা লইয়া কাহিনীর আরম্ভ, আর তাহারই পরম্পরা রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়া মুক্তি কল্লোলের সম্মুখে বহ্যানির পরিসমাপ্তি। * * * মনুষ্যবসানে মনকে প্রবিধান ভগ্ন উন্মুখ হইয়া আছে—পথের সমস্যা যেখানে লক্ষ্যে পৌঁছিবার সন্ধানে ব্যস্ত, সেখানে অন্ধকার আগুনা হইতেই কাটিয়া যায়। উপন্যাসের নায়ক প্রতাপ স্বজাতাকে শুনাইতেছে,—"রাত্রির গাঙীর এবার ধেয়া পার হয়ে এসেছে। চারদিকে মুক্তির কলরব। এত বড় একটা দেশের ঘুম যদি ভাঙে—সেখানে বিচিত্র সুর ত শুনবেই তুমি। এ সুরে স্বাধীনতাই সার্থক হয়ে ওঠে।" জাতীয় মুক্তি কলরব, শ্রমিক মুক্তির গান, নর-নারীর মুক্তির আহ্বান—সব মানব-কল্যাণের মহাসাগরে মিলিত হইয়াছে। 'কল্লোল' স্বাধীন বাঙলার নূতন উপন্যাস। বিপ্লবের পটভূমিকায় এই উপন্যাসখানি চিত্তাকর্ষী। প্রেমের ফল্গুধারায় চিরানন্দময়। বিভিন্ন দল-উপদলের 'ধ্বনি' সামঞ্জস্যে অপূর্ব। ভারতবর্ষের আদর্শ সংঘাতের কথা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "যে কম্যুনিজমকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন মার্ক্স তাকে মানবীয় করে তুলেছেন গান্ধীজী।" জাতীয় আন্দোলনের কাহিনী লইয়া উপন্যাস রচনা এতদিন অনেক বাধা ছিল, সে বাধা অপসারিত হইয়াছে বলিয়াই বলতো বাঙলা সাহিত্যে এমন একখানি সুন্দর উপন্যাস পাঠের সুযোগ পাওয়া গেল।" —যুগান্তর।

প্রকাশক : **সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য**

Printer & Publisher by Satya Prasanna Dutta. Purvasa Ltd., 54 Ganesh Chandra Avenue, Calcutta.

**পূরবাশা**

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০

একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন

সম্পাদক : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত

দাম আট আনা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি—যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায়—'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
গান্ধী-পরিকল্পনা
(অর্থনীতি বিষয়ক)
দু'টাকা

গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা
দু'টাকা

ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম
বারো আনা

শিক্ষার বাহন
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা

নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
রুশো

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
কার্ল মার্ক্স

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ডারুইন

সুবোধ ঘোষের
সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
বৌদ্ধধর্ম্ম
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
ধর্ম্মবিজয়ী অশোক
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা:

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
ভারতীয় নারী ও সমাজ

গোপাল ভৌমিকের
সমাজ ও সাহিত্য

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
সমাজ ও বিজ্ঞান

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
ধর্ম্ম ও নীতি

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
সমাজ ও সংস্কৃতি

নারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত ও সমাজ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ

লুই ফিশারের
মহাজিজ্ঞাসা
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা

মিনু মাসানির
নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ
বার আনা

হুমায়ুন কবিরের
মোসলেম রাজনীতি
বার আনা

ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি
বার আনা

মিনু মাসানির
খাদ্য
বার আনা

ভারতীয় শিল্পপতিদের
বোম্বে পরিকল্পনা
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা


# টুকরো কথা... (৩৫)

...তেমন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য একটি ক্ষুদ্র ঘটনাও ...হয়ে ওঠে।...'শিরোমণিপুরের আমজাদ। ডাকাতি করে জেলে ...ছিল। জেল থেকে ফিরে এসে বড় কষ্টে পড়েছে একে মুসলমান, ...ডাকাত, কেউ মজুরী খাটাতেও চায় না। মা-ই প্রথম কাজ ...লেন তাকে। শুধু কাজ নয় খেতে দিলেন। নিজে পরিবেশন করতে ...লেন ঝুঁকে পড়ে। বললেন, 'পেট ভরে খেও আমজাদ। লজ্জা ...রো না।' খাওয়ার পর আমজাদের এঁটো ধুলেন মা।...'ও কি ...সি, তোমার জাত যাবে যে।' 'চুপ কর্। সন্তানের এঁটো নিলে ...র জাত যায়। খুব বুঝেছিস তুই। যেমন শরৎ আমার ছেলে ...নি আমজাদও আমার ছেলে।'—এই মা-টি সারদামণি। পাঁচ ...বয়েসে বিয়ে হয়েছিল। যাঁর সঙ্গে বিয়ে হল তিনি সন্ন্যাসী, গৃহী ...ও সন্ন্যাসী। এই অসাধারণ মানুষটির জীবনে সারদামণির স্থান ...মোটেই প্রক্ষিপ্ত ছিল না এ কথা সবাই জানেন। 'যদি সারদা না ...ত, রামকৃষ্ণ আর পাঁচজনের মতোই আংশিক হয়ে থাকতেন। ...কে নিয়েই তিনি সম্পূর্ণ। সারদাকে নিয়েই তিনি সমস্ত সুন্দর।' ...ছিল এই 'সাতিশয় লজ্জাশীলা বাঙালী হিন্দু কুলবধূ'টির মধ্যে?.... ...দের সমসাময়িক ইতিহাসে রামকৃষ্ণের সুস্পষ্ট মূর্তির অন্তরালে... ...ও ছায়ার ন্যায় প্রতীত হইলেও তিনি সাত্ত্বিক প্রকৃতির নারী না ...লে, রামকৃষ্ণও রামকৃষ্ণ হইতে পারিতেন কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ ...বার কারণ আছে।...' (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়)। 'পরমাপ্রকৃতি ...সারদামণি' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেই পুণ্যজীবনের সমস্ত ...দান এই প্রথম একত্রিত করে ভক্তিসুষমামণ্ডিত ভাষায় সাহিত্যে ...ত করেছেন। সারদামণিকে মাতৃ সম্বোধন করেন তাঁর ভক্তেরা। ...প্রকৃতি' সেই শক্তিরূপিণী মাতৃমূর্তির পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য। সিগনেট ...র বই, ৬ই ফাল্গুন প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের সৌষ্ঠব বাড়িয়েছে ...নাথের মূল সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত পাঁচখানা দুষ্প্রাপ্য আলোক-...। আজ থেকে তিরিশ বছর আগে দুর্গম পার্বত্যদেশ পশ্চিম তিব্বত ...ভ্রমণে গিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ। রাওলপিণ্ডি থেকে লে হয়ে ...আশ্রম পর্যন্ত এই পর্যটনের কাহিনী নিয়ে লেখা বই 'কাশ্মীর ও ...'। পাঠকের বিশেষ কৌতূহলের উদ্রেক করবে। তিব্বতের ...গুম্ফায় স্বামী অভেদানন্দ একটি হাতে লেখা পুঁথি দেখেছিলেন ...যীশুখৃষ্টের ভারত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখা আছে। 'কাশ্মীর ও তিব্বত ...সম্প্রতি ২য় সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

...থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় গুপ্ত ...ঈশ্বরচন্দ্র সাধক রামপ্রসাদ সেনের রচনা ও জীবনী বিষয়ে প্রথম ...লোচনার সূত্রপাত করেছিলেন।...'পঞ্চবিংশতি বৎসর হইল আমরা ...প্রসাদি পদ্য সংগ্রহকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি একাল পর্যন্ত ...করিয়াও তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারি নাই, যেখানে যাহা ...হই তাহাতেই এক একখানা বিড়ম্বনা দেখিতে পাই হয় মাঝে ...পোকায় কাটিয়াছে, নয় লেখকেরা লেখার দোষে প্রমাদ করিয়া ...ইহাতেই ভাবার্থ স্থাপন কারণে ঘোরতর বিপদ ঘটিতেছে।...' ...'কস্মিনকালে দৎকলম লইয়া বসেন নাই' সেই স্বভাবকবির সমগ্র ...বলীর এবং সুবিস্তৃত জীবনচরিত পাওয়া এখন সহজসাধ্য। এই ...প্রকাশ করে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞতা ...হলেন।

...প্রসাদের পরবর্তী এই দুশো বছরে বাংলা কবিতার অবিশ্বাস্য ...ঘটেছে। একমাত্র প্রাচীন কাব্যধ্বনিতেই অভ্যস্থ যে পাঠক, ...পক্ষে আধুনিক কালের কাব্যপ্রকৃতি অবোধ গণ্য হওয়াই ...। অথচ এই রূপান্তরিত স্বকালকাব্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকার অর্থ চলতিকাল থেকে পুরাকালে স্বেচ্ছানির্বাসন স্বীকার করা। যাকে বলা হয় 'আধুনিক কবিতা' তারও উৎস রবীন্দ্রনাথেই। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনে এই বিচিত্র বেগবান কাব্যধারার সঙ্গে যোগস্থাপন করা সহজ হবে।

নতুন একটি কবিতার বই: আনন্দ বাগচীর 'স্বগত সন্ধ্যা'॥

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে সাম্প্রতিক সংযোজন: সুখময় ভট্টাচার্যের 'বৈশেষিক দর্শন'। '...অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে বৈশেষিক দর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন!...ন্যায় বৈশেষিক প্রভৃতি যুক্তিশাস্ত্র মননের সহায়তা করিয়া থাকে। এই কারণে ন্যায় ও 'বৈশেষিক দর্শন অধ্যাত্মবাদে মনন-শাস্ত্র।' প্রবেশক গ্রন্থ হিসেবে মূল্যবান॥

প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ 'চার ইয়ারী কথা' নতুন সংস্করণে প্রকাশিত হয়েছে এটা বাংলা সাহিত্যের পক্ষে একটি বড় খবর। তাঁর ছোটগল্পের সংকলনটিও অবিলম্বে নতুন ছাপা হওয়া প্রয়োজন। প্রমথ চৌধুরীর রচনাবলীর সঙ্গে বাঙালী পাঠকের যোগ ছিন্ন হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়॥

গল্প-উপন্যাস-অনুবাদ॥ নতুন ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য বই: বিমল মিত্রের 'পুতুল দিদি'॥ বাঙালী গোয়েন্দা ব্যোমকেশের নতুন কাহিনী: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'চিড়িয়াখানা'॥ বাংলা অনুবাদে সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়ছে দিনে দিনে। হাস্যরসের তর্জমা করা কঠিন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ওডহাউসের উপন্যাস তর্জমা করে উপভোগের একটি নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে দিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ওডহাউস বাংলায় এই প্রথম। 'ওডহাউস পড়লে হাসি থেকে নিষ্কৃতি নেই॥' ফরাসী মোপাসাঁর উপন্যাস 'ইভেৎ' অনুবাদ করেছেন রাজকুমার মুখোপাধ্যায়, মার্কিনী পার্লবাকের চীনাকাহিনী 'ড্রাগন সীড'—পার্থকুমার রায়। ইংরেজী ছাড়া অন্য ভাষা থেকে অনুবাদের পরিমাণ এখনো নগণ্য। 'যতদূর সম্ভব মূল রুষভাষার গতি আর ছন্দ বজায় রেখে' মূল রাশিয়ান উপকথা ছেলেদের জন্য অনুবাদ করেছেন অরুণকুমার ঘোষ: 'রাশিয়া থেকে'। ভালো লাগবে ছোটদের।

আলাদা ছাপানো 'টুকরো কথা' যাঁরা ডাকযোগে পেয়ে থাকেন তাঁদের প্রতি নিবেদন: ডাকযোগে 'টুকরো কথা' পাঠানো কিছুদিন ধরে স্থগিত আছে। অল্পদিনের মধ্যেই ডাকবিভাগ থেকে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে এবং তার দরুন আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্ষেপ হওয়ায় 'টুকরো কথা'র গ্রাহক সংখ্যা আশানুরূপ ...নো সম্ভব হবে। শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি ... করবেন বলে আশা করি। শীঘ্রই 'টুকরো কথা' আবার যথারীতি পাঠানো আরম্ভ হবে। সেই সঙ্গে নতুন 'সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সমস্যা॥'


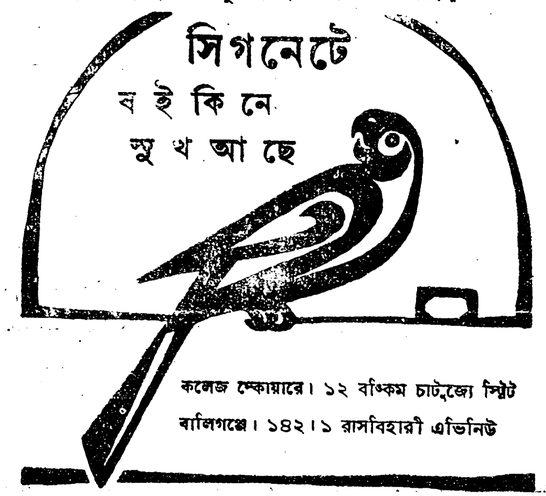
সিগনেটে
বই কিনে
সুখ আছে
কলেজ স্কোয়ারে। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট
বালিগঞ্জে। ১৪২।১ রাসবিহারী এভিনিউ

# পূর্ব্বাশা

## ফাল্গুন—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| বৈশেষিক দর্শন : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৫৭৭ |
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| বেকার : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ... | ৫৮১ |
| মনোগন্ধা : বটকৃষ্ণ দে | ... | ৫৮১ |
| ক্ষালন : সুনীল চট্টোপাধ্যায় | ... | ৫৮২ |
| ডানা : শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় | ... | ৫৮৩ |
| প্রতীক্ষা : গোপাল ভৌমিক | ... | ৫৮৪ |
| অবনীন্দ্রনাথ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | ... | ৫৮৬ |
| পলায়ন-সঙ্গীত : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৫৮৬ |
| আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী | ... | ৫৯৪ |
| গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ৬০১ |
| ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিৎ | ... | ৬০৯ |
| ব্যক্তিত্ব ও কবিতা : প্রণব মিত্র | ... | ৬১৩ |
| পাকা ধানের গন্ধ : কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৬১৬ |
| তোমার গল্প শেষ : মৃণাল | ... | ৬২৭ |
| নতুন বই : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৬৩০ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতু বন্ধ— ২০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ১৯

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

উপল-মুখর

বৈশাখে বেরুবে

প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিমিটেড

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই,

আপনি আপনার নিজের এবং প্রিয় পরিজনের নিশ্চিত সংস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। ইহার জন্য এক সঙ্গে মোটা টাকা দিতে হয় না, নিজের সুবিধামত বাৎসরিক, ষাণ্মাসিক, ত্রৈমাসিক বা মাসিক কিস্তিতে প্রিমিয়াম দিয়া ঠিক প্রয়োজন মত বীমা পত্র পাইতে পারেন ; প্রথম কিস্তির প্রিমিয়াম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই ব্যবস্থা পাকা হয়।

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নানাবিধ :—

নিজের জন্য, প্রতিপাল্যদের জন্য,
কাজকারবারে অংশীদারীর নিরাপত্তার জন্য,
এবং সম্পত্তি-করের ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য,
নানা রকমের সুবিধা আছে।

আপনার বয়স, প্রয়োজন এবং প্রতিমাসে কি পরিমাণ টাকা বীমার জন্য সঙ্কুলান করিতে পারেন তাহা জানাইলে আমরা বিস্তারিত বিবরণ পাঠাইব।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

আমার শিশুর জন্যেই এই বার্লি




আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার মা একথাই বলতেন। সেরা শস্য থেকে, স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে এবং দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'পিউরিটি' বার্লি তৈরি। এই বার্লি যেমন চমৎকার, তেমন এতে খরচও কম।

APBX 8-BEN

পিউরিটি বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা




# খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগাস্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

## সুপার-নিও-কড্

**বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ**

কলিকাতা-১৩



# ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্

৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

**১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।**

প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত

চেয়ারম্যান।






পর্য্যুদস্ত, রোগার্ত্ত এবং গৃহহারা মানুষের অবিরাম জনস্রোত এসে পৌঁছুল, ২৫,৮৫,৯৭৪ জনের প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক ও মানসিক পুনর্ব্বাসনের। এমনি সঙ্কটের দিনে সুমগ্র দেশ ব্যাপী যখন সাহায্যের জন্য কাতর ক্রন্দন উঠেছিল তখন জাতীয় সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন প্রত্যেক সাহায্যকামী ব্যক্তিকে সুষ্ঠু সাহায্য দান করতে যাতে করে অভাব অভিযোগ কোথাও না থাকে। গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে ও কৃষির জন্য জমি বিতরিত হয়েছে এবং ১৫ লক্ষের উপর উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসিত হয়েছে। এই বিরাট কর্ম্মযজ্ঞে দান এবং ঋণ বাবদ ২০ কোটি ও ১৮ কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। উদ্বাস্তুদের নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজন তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা এবং সঙ্গে সঙ্গে চাই বহিরাগত সাহায্য। একদিন যা মনে হয়েছিল দায় স্বরূপ আজ তাই দেশ ও রাষ্ট্রের পক্ষে সম্পদ হয়ে দাঁড়াতে চলেছে। সুতরাং আসুন, সকলে আমরা এ কল্যাণকর্ম্মে হাত মেলাই যাতে করে গড়ে ওঠে

## সোনার বাংলা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত



বর্তমান যুগে কর্ম-ব্যস্ততার ভিড়ে স্বচ্ছন্দ ভ্রমণ আর আগেকার মতো তত সহজ নয়। এ সময় এক কাপ গরম চা হলে পথ-চলার ক্লান্তি অনেকখানি লাঘব হয়।

ভারতীয় চায়ের সুবৃহৎ শিল্পায়তন থেকে ১২,৫০,০০০ লোকের কর্ম সংস্থান হয়।

চা

ভ্রমণে আনন্দ দেয়

সেণ্ট্রাল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

CTB-116



পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ— ১৩৬০

একাদশ সংখ্যা—ফাল্গুন


সন্দংশ

# বৈশেষিক দর্শন

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

গত কয়েক বছর যাবৎ 'বিশ্বভারতী' বাঙালী পাঠকদের যে উপকার সাধন করছেন তার প্রমাণ তাঁদের 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ'-অন্তর্গত পুস্তিকাগুলোতে উজ্জ্বল হয়ে রইল। আমরা মনে করতে পারি যে এর পাঠক-সংখ্যা অল্প নয়। এবং অতঃপর ভাবতে পারি যে বাংলা দেশে সৎ জ্ঞানের প্রচার হচ্ছে। সেই সূত্রে এ-ও মনে করা যায়: এ-ধরণের প্রচার কার্য্যের জন্যে বিদ্বান ব্যক্তির অভাব আজও বাংলা দেশে হয়নি। সবগুলো ভাবনাই উৎসাহজনক।

যদিও 'সরল ন্যায়'-এর তিনবছর পর 'বৈশেষিক দর্শন' নামক পুস্তিকাটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তবু আমরা উৎফুল্ল হচ্ছি। কেননা, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে এ-যাবৎ যে-ধরণের আলোচনা হয়েছে তা মোটেও নিরপেক্ষ এবং উৎসাহব্যঞ্জক নয়। প্রমাণস্বরূপ শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণানের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবটি উল্লেখ করা যায়। বাঙালী বিদ্বজ্জন যদি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহলে আমরা আশা করব যে ভারতীয় চিন্তার সুফলগুলো পরিপক্ক নিটোল আকার ধারণ করে বৈদেশিক পণ্ডিত-মণ্ডলীর চিত্ত-গ্রাহী হয়ে উঠ্‌বে।

ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে একটি প্রবাদ বিদেশে প্রচারিত যে তা আধ্যাত্মিকতায় অবলুপ্ত। প্রবাদটি কিয়দংশে সত্য হলেও অভ্রান্ত নয়। বাস্তব বুদ্ধি নিয়ে তর্ক ও বিচার ভারতীয় প্রাক্-সূরিবৃন্দ করে গেছেন। প্রখ্যাত জৈন পণ্ডিত হরিভদ্রসূরি-প্রণীত 'ষড়দর্শনসমুচ্চয়'-গ্রন্থ পাঠান্তে হয়ত বিদ্বানব্যক্তিমাত্রেরই মনে এই প্রতীতি জন্মাবে যে ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রের নিরপেক্ষ প্রচার-কর্ম্ম জৈন মনোবিদ্‌রা করে গেছেন। জৈন ধর্ম্ম ও দর্শন এ-যুগে কেন অবহেলিত হয়েছে তার কারণ অনুসন্ধানযোগ্য। এ-শতকে ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার বুদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ে প্রচুরভাবে পূর্ণ হয়েছে। সেই অনুপাতে জৈন ধর্ম্ম ও দর্শন সম্পর্কে কোনো মনোঙ্গম আলোচনার ফল জ্ঞানী-মহলে বিদিত নয় বললেই চলে। হ্রস্ দাবিদস্

দম্পতীর সামান্য প্রচেষ্টায় আমরা মহাবীর বর্দ্ধমানের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে একটি মোটামুটি জ্ঞান পেয়েছি। এই মাত্র। তাঁর 'অর্চ্চাঙ্গসূত্রে'র সদালোচনা করলে আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারতাম যে এই কাশ্যপ ব্রাহ্মণ-সন্তান কী সুদৃঢ় মনোশক্তির বলে ব্রাহ্মণ-যুগের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। মানুষের মন যে পরিবর্ত্তন-ক্ষম এ-কথা ভারতবর্ষকে তিনিই প্রথম জানিয়ে দিয়ে গেছেন। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শন বেদান্ত যুগেরই ফল। ঠিক তেম্নি বৈশেষিক, সাংখ্য, ন্যায়, মীমাংসা। এদের প্রত্যেকেরই অঙ্গে প্রাক্-বৈদিক যোগশাস্ত্র এসে যুক্ত হয়ে ভারতীয় ষড়দর্শনকে আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করে তুলেছে। বৌদ্ধ মতবাদ যোগশাস্ত্রকে এড়াতে চাইলেও তন্ত্রশাস্ত্রকে এড়াতে পারেনি। তন্ত্র আর যোগ অভিন্নহৃদয় আধ্যাত্মিক শাস্ত্র।

যেদেশে ঋক্‌বেদী ধর্ম্ম ও দর্শন সম্পর্কে স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন আলোচনা হয়নি, সেখানে বেদান্ত দর্শন সম্পর্কে ভ্রান্তির অবকাশ প্রচুরভাবেই বিদ্যমান। সুতরাং বেদান্ত দর্শন নিয়ে বর্ত্তমান যুগে যাঁরা আলাপ-আলোচনা করছেন তাঁদের নিকট আমরা অতিশয় সাবধানতা প্রত্যাশা করব। অন্তত এ-কথা ভেবে নেবো যে তাঁরা ঋক্‌বেদের সারমর্ম্ম এবং ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে অবহিত। জৈন মহাবীর বর্দ্ধমান ঋক্‌বেদী পুরোহিত সন্ততি। জৈনদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে যেসব রত্ন আহৃত হয়েছে তার খনির ঋণ ঋক্‌বেদেই পাওয়া সম্ভবপর, অন্যত্র তার সন্ধানে তৎপর হলে মাত্র তন্ত্রযোগ অনুসন্ধিৎসুর অবলম্বনীয় হতে পারে।

জৈন পণ্ডিতরা ষট্‌পদার্থবাদী না হলেও ষড়দর্শনের ভাণ্ডারী ছিলেন। এই ষড়দর্শনের প্রাচীনতম রূপ ষট্‌পদার্থবাদীর ন্যায় ও বৈশেষিক তন্ত্র। উলুক কণাদের স্পষ্টোক্তি আধ্যাত্মিকতার কোনো রত্নভাণ্ডারীর কর্ণশূল হয়েছিল বলেই হয়ত বাংলাদেশে 'উলুবনে মুক্তা ছড়ানো'-বিষয়ক ব্যঙ্গোক্তির আবির্ভাব হয়। আজ, কতো হাজার বছর পর কেউ সঠিক বলতে পারবেন না, পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান কণাদের কণাবাদের অঙ্কশায়ী হয়েছে। 'অণু' আর 'দ্ব্যণু' কথাদুটো আজ আণবিক-বিজ্ঞান-সেবীমাত্রেরই শ্রুতিমধুর মনে হতে পারে এবং ফলে কেউ-কেউ চমকে গিয়ে ভাবতে পারেন, কি ভাবে তাঁদের একজন সমধর্ম্মীর আবির্ভাব ভারতের প্রত্ন ধর্ম্মক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়েছিল।

বিদ্যামাত্রেই মানুষের মেধার অধীন। ক্ষিত্যপতেজমরুৎব্যোমে যে মানুষ জন্ম নিয়ে মনকে সক্রিয় করতে পারল সে মানুষই মেধাবী। এই সক্রিয় মনের ক্রিয়া-কলাপ বহুবিধ। আত্যন্তিক প্রযত্নে আগেকার মানুষ সৃষ্টিতত্ত্ব ভাবতে চেষ্টা করেছেন এবং প্রযত্ন-লব্ধ বোধ বা বুদ্ধি বিতরণ করে গেছেন। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের একটি ল্যাবরেটরী যে তাঁরা স্থাপন করেছিলেন এমন নয়। দল্টনের মতো জগৎ-দৃশ্যের অন্তরঙ্গ বিষয়গুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষাই ছিল তাঁদের করণীয় কর্ম্ম। সেই কর্ম্মীরই অগ্রতম উলুক বা কণাদ। তিনি ক্ষুদ-কণা-



ভক্ষণকারী হতে পারেন কিন্তু বিজ্ঞান-জগতে তিনিই প্রথম কণা দান করে গেছেন। দৈব-বিবাহে সম্মত হয়ে কোনো ব্রাহ্মণকে তিনি হয়ত কন্যাদান করেন নি, তাই তাঁকে উলুক বলারও সুযোগ তৈরী ছিল।

'দৈব' কথাটির সূত্র ধরেই ষট্‌পদার্থবাদ বা বৈশেষিক মতবাদের মূল আবিষ্কৃত হতে পারে। বৈদিক-জ্ঞানে 'দিব' মানে আকাশ। সে আকাশ বৃক্ষবৎ। সে বৃক্ষ কেমন? ঋক্‌বেদের দশম মণ্ডল সে জিজ্ঞাসায় সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে চেয়েছে :

"কিং স্বিৎ বনম্ ক উ স বৃক্ষ আস দ্যাবা-পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ?"

এ-জিজ্ঞাসার বিবিধ উত্তরই পাওয়া যায়, পাওয়া যায়না শুধু একটি আরণ্যক পৃথিবীর ধ্বংসের উপর এই পৃথিবীর মাটির তৈরী হবার বিদিত সংবাদটুকু।

মহর্ষি কণাদ সৃষ্টির লক্ষ-লক্ষ বছরের একটি হিসেব দিতে চেয়েছিলেন 'ব্রাহ্ম-বর্ষ' নাম দিয়ে। একবার পৃথিবী নষ্ট হয়েছে—এখবর জানা হয়ে গেলে বলতে অসুবিধে নেই যে তা দু'বার বা তিনবার নষ্ট হয়ে এই পৃথিবীর ও পার্থিব মানুষের আবির্ভাব হয়েছে। ভাবতে অসুবিধে নেই সংহার ও সংসারের কথা। একবার সংহরণ, একবার বিসর্পণ—এই ত জীবনের বা দ্রব্যের গুণ। আকাশও তেম্নি দ্রব্য। আজ আমরা পদার্থবিদ্যায় এ-কথা জানছি কিন্তু আকাশকে দ্রব্য মনে করা বৈশেষিকেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। তাঁরা মনে করতেন অদৃশ্য ( দৈব ) শক্তিবল অর্থাৎ আকাশ-ধর্ম্মী সঙ্কোচন-বিসরণ-ধর্ম্মের ফল পার্থিব জীবনে প্রতিফলিত। এই আকাশ-ধর্ম্ম কোনো এক সময়ে ( পূর্ব্বে ) জীব-দেহে সংযোজিত হয়েছে। তার শ্রুতি-ধর্ম্ম কর্ণে, সূর্য্যের তৈজস ধর্ম্ম চক্ষুতে, বায়ুর স্পর্শ-ধর্ম্ম ত্বকে এখনও জীবের অবয়বে বিদ্যমান। এই ক্রিয়া-সম্পাদনের প্রাথমিক পর্ব্ব পূর্ব্বে কোনো এক সময়ে সুরু হয়েছিল—এখন পরমাণুদ্বারাই তা অভ্যাসবশত সম্পাদিত হচ্ছে। প্রত্যেক ধর্ম্মে বা গুণে পরমাণুর অস্তিত্ব ঘোষণা কণাদের এক অভূতপূর্ব্ব সাধনার ফল। এই গুণের আধার যেম্নি 'আকাশ', তেম্নি 'কাল'। আকাশের মতোই কাল একটি দ্রব্য। মাত্র এ-শতকের গোড়ার দিকে আইনষ্টাইন অনুরূপ কথা বলতে পেরেছেন। বিভিন্ন পরিমাণ কালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বস্তু বিভিন্ন পর্য্যায়ের ও বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত বলে মনে অনুমিত হয়। এই পৃথগীকরণের কাল-ক্রিয়া কণাদের মন অবলীলায় ধরতে পেরেছিল। আকাশ ( স্থান ) ও কালের গুণগত পরমাণুগুলো সম্পর্কে 'অনিত্য' আখ্যাটিই তিনি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছিলেন। 'অনিত্য' মানে সব সময় যা উপস্থিত নয়। ইদানীংকার শরীর-বিজ্ঞানীরা 'দেহের বয়েস' আর 'মনের বয়েস' বলে দু'টি পৃথক সত্তার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছেন—কালের অনিত্যতা থেকেই তাঁদের এই প্রত্যয়।

মেধাবী কণাদের মানসিক ক্রিয়া-কলাপের আভাস-মাত্র উপরোক্ত অনুচ্ছেদে দেওয়া

হল। যাঁরা ভারতীয় দর্শনের প্রতি আস্থাবান হয়ে এই বিশাল তত্ত্ব-সমুদ্র মন্থন করতে চাইবেন তাঁদের নিকট এই প্রবন্ধ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। তাঁরা সমুদ্র-স্নানে স্নাতক হবার পূর্ব্বে 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহে'র দু'টি গ্রন্থ সংগ্রহ করে পাঠ করতে পারেন। সুপণ্ডিত লেখকদ্বয় যথাসাধ্য প্রাঞ্জলভাবে অথচ সংক্ষিপ্ত পরিসরে ভারতীয় 'ন্যায়-প্রস্থানে'র তথা সদ্দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন।

এখনকার বাঙালীর মন ভারতীয় প্রাচীন-শাস্ত্রগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে প্রস্তুত। তার একটি সুফল অতি স্পষ্ট। যে অন্যায় আবর্জ্জনা এতোকাল ভারতীয় জ্ঞান-সাধনার মস্তকে স্তূপীকৃত হয়েছে তা হয়ত বাঙালীর সাধনাতেই দূরীভূত হয়ে প্রাচীন জ্ঞান-সূর্য্য নূতন অবয়বে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হবে। আমরা মনে করি, যা এ-যাবৎ ভারত-বিদ্যা বলে লিখিত হয়েছে তার উজ্জ্বলতা অর্দ্ধচন্দ্রবৎ। অলিখিত ইতিহাস লেখা আরম্ভ হোক এবার। কণাদ যেমন আরম্ভবাদের অনাড়ম্বর কথাগুলোতে একটি গতিশীল জগতের সঙ্গে তাঁর যুগকে পরিচিত করে দিয়ে গেছেন, ভবিষ্যতের বাঙালী-মনের সাধনাও তেম্নি হোক।

"যাহার প্রবিক্ত (সূক্ষ্ম) পৃথিবী-সংজ্ঞা এবং অপ্রমাণ আপ-সংজ্ঞা অনুশীলিত হইয়াছে, তিনি এই পৃথিবীকে কম্পিত, সংকম্পিত, সংপ্রকম্পিত এবং সঞ্চালিত করিতে সমর্থ।"

—মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রান্ত।

# কবিতাগুচ্ছ

## বেকার

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ঋজু দীর্ঘ শ্বেত আর সরল রেখার
ছন্দোবদ্ধ জাতিস্মরে প্রস্তর প্রস্তুতি
আজীবন ভুল বোঝা ( বেঁচে থাকা কী কঠিন দায় )
হঠাৎ ফাল্গুন ছিন্ন করে দিলো আকণ্ঠ আকুতি।
হয়তো কখনো ভাবি : মঞ্জরিত যদিও হৃদয়
গ্রামান্তের আম্রকুঞ্জে মিল খুঁজে ফাল্গুনে উদাস
হয়তো কজ্জলমসি সুদীর্ঘ কৃষ্ণাভ নয়নে
কামাগ্নির লাভাঙ্গারে ধ্বংসমাত্র তার ইতিহাস।

ঋজু দীর্ঘ শ্বেত আর সরল রেখার
ফেরারি হৃদয় শান্ত, একান্ত বেকার।

## মনোগন্ধা

বটকৃষ্ণ দে

বেদনায় পাবো তাকে। অন্ধকারে অজানা ফুলের
গন্ধের মতোন, ঘ্রাণে। ব্যথার বিস্তীর্ণ বালুবুকে
সে এসে, ছায়ার রেখা রেখে যাবে। চাঁপা-আঙুলের
স্পর্শের নরম শিল্পে নাম লিখে যাবে। আমি মুখে
নির্জনের সে-সমুদ্র-স্নানে পূত-পবিত্র-হৃদয়
হ'তে চাই, আনন্দের বন্যায় আমার মনে ভয়!

প্রসন্ন ভোরের রোদে রঙ্-রোল সূর্য-সোনা-হারে
আলোস্মিতা, কুয়াশার কাশফুলে, শিশিরের প্রেমে

মধুমিতা, তোমাকে কী দেবো আমি ? আমি গোধূলির
স্তিমিত তারার জল, অশ্রুমতী ব্যথার কন্যারে
আঁধারে, লুকিয়ে রাখি। কান্নার করুণ খাদে নেমে
বলি : আমার এ প্রেম আকাশের নয়, এ ধূলির
ধূসরে বিধুর। তুমি আনন্দের উতল ফাল্গুন,—
দু'চোখের দৃষ্টি মেলে তুলে ধরো অতনুর তূণ !
আমার অলাত-অর্ঘ্য কেন নেবে ! নিয়ো না তুমি তা',—
ধৃতধনু পলাশের অব্যর্থ-নিশানা আমি, মিতা !

আমাকে অসহ্যতরো ব্যথায় বিক্ষত করো, যেনো
বেদনায় পেতে পারি, অন্ধকারে অজানা ফুলের
গন্ধের মতোন, ঘ্রাণে। মন্ত্র-শেষ মৃত্যুর সে-ধ্যানও
মধুর আমার সুখ। তুমি এসে চাঁপা-আঙুলের
স্পর্শের নরম শিল্পে মন্ত্র-লিপি দিয়ে যাবে। আর,
আমার নির্জন রাজ্যে অনুভব, তোমাকে পাওয়ার ॥

## ক্ষালন

সুনীল চট্টোপাধ্যায়

নগরের এদিক থেকে ওদিক সমুদ্রধোয়া হোক।
একটা গোটা সমুদ্রের জল।

সমুদ্র সর্বদা ঠাণ্ডা তরঙ্গ নির্মল।

ভেসে যা যাবার যাক।
শুধু থাক
লোণানীল জলধোয়া যা থাকবার।

একটা বড়ো ধূপ জ্বালানো হবে।
বহুদূর থেকে সুগন্ধ ধোঁয়া পূজার আকাশে ধীরকুণ্ডল,
আর, আহা, ভিজে বন আবছা কোমল।



একটা খুব বড়ো ফুল
জলঝরা টুপটাপ·· টুপটাপ···টুপটাপ।

আর শোনো, এক মর্মরের শাদা দেবী,
খুব উঁচু নয়, কিন্তু কী সুন্দর !
এতো সুন্দর, যেন দিনের, রাতের।
চোখের জ্বালা যায়
বুকের জ্বালা যায়।

## ডানা

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ঝিলিমিলি আলো-কাঁপা শাখার আড়ালে
সহসা তাকালে
একটি পাখির মনে ইন্দ্রধনু নীড় বাঁধবার
কী আগ্রহে দেখা দেয় এক একবার !

কিন্তু সে কতোক্ষণ !
নিমেষেই উবে যায় মরুমেঘ, দূরের আকাশ
হাতছানি দিয়ে ডাকে, মৌন অবকাশ
আবারো মুখর হয় গানে।
মন যদি পাখি হয়—এ-গানের খুঁজে পায় মানে।

বনের পাখির মত আমাদেরো মনের পাখির
কতো আশা—কতো স্বপ্ন,—
ভেঙে ফেলে শূন্য-বেড়া আকাশ-প্রাচীর
অবশেষে একদিন বাঁধা হয় নীড়।
অন্ধ এক নক্ষত্রের দ্রুত আবর্তন
মৌন পৃথিবীর
স্তব্ধ বুকে আনে আলোড়ন।
শিহরণ-জাগা ঘাসে-ঘাসে
পা-টিপে পা-টিপে

শিশির-মেয়েরা নিয়ে আসে
প্রবাল দ্বীপের স্বপ্ন সন্ধ্যার প্রদীপে।

কয়েকটি দিন কাটে। দিন নয়, যুগ—মন্বন্তর—
হয়তো বা আলোক বৎসর।
জীবনে আগুন জ্বালে বসন্ত উদ্দাম
শোণিতে হিন্দোলা আনে নাম উপনাম।
তারপর একদিন অন্য এক দ্বীপে
ডাক আসে।
সাড়া জাগে পাখির ডানায়,
আমাদের মনের কোণায়।
ক্লান্তি-ঘেরা শিশিরের মোহ—
কুয়াশার শাড়ীখানি—কী বিচিত্র বর্ণ সমারোহ
পড়ে থাকে, আলো জ্বালে দূর নভোনীল,
ঢেউ ভাঙে হৃদয় ফেনিল ;
আকাশ গম্বুজে
পাখার ঝাপটা মারে চোখ আসে বুজে।

পাখির পাখার মত আমাদেরো অক্ষম মনের
তখনো কি শক্তি থাকে দূর পথ অবগাহনের ?
নিস্তেজ দুর্বল ডানা
থরথর কাঁপে তবু মানে না মানে না
মাটির নিষেধ অশ্রুমুখী আর, ঝড়মুখী আকাশের মানা।

## প্রতীক্ষা

গোপাল ভৌমিক

বলেছিলেআসবে তুমি
আজও এলে না তো :
অনেক দিন যে কেটে গেল
অনেক অনেক রাতও



ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল
সংক্ষুব্ধ তিমিরে—
তুমি ত এলে না বারে
কিংবা কোন মিছিলের ভীড়ে।

সতীত্বের ভয়ে ভীত
ড্যালহৌসীর দিকে
কত মিছিল এল গেল,
তাকাই অনিমিখে
অজানাকে জানার লোভে
কলম্বসের মত :
কিন্তু কোথায় তুমি ?
হায়রে ভাগ্য হত !

হাজার জনের মিছিলে নেই
কিংবা গলির আঁধারে
দেহের পণ্য সাজিয়ে যারা
নিত্য শিকার খোঁজে
তাদের মাঝেও নেইকো তুমি—
তবে কি সব মিছে ?
পলাশ-ঝরা গড়ের মাঠে
চৌরঙ্গীর দিকে
মিথ্যে হল সকল আনাগোনা ঃ
কবে যে তার সুরু
এবং কবে যে তার শেষ—
চলছে আজও লুতাতন্তু বোনা।

## অবনীন্দ্রনাথ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমাকে দেখেছি আমি চেতনা মুহূর্তে
চিন্ময় কিশোর ! রঙ্‌বসন্ত মিছিলে
চুলের আবির নিয়ে তুমি এসেছিলে ;
অবাক বিস্ময়ে আমি দেখেছি। হেমন্তে
সোনালী ধানের গুচ্ছ হাতে তুলে নিয়ে
শিশুর মতন তুমি হেসে গেছ, তৃপ্তি
সর্বত্র ছড়িয়ে গেছ ! সুরের গায়ত্রী
একটি মুহূর্ত শুধু তোমাকে জড়িয়ে
শান্তির আলোয় পাখা মেলে, মেলে, মেলে
দেখেছি গানের মত হ'য়ে গেছে ! বন্য
ফণিমনসারো বুক মুহূর্তে অরণ্য
ভুলে গিয়ে সূর্যমুখী কান্নার আঁচলে
আশ্চর্য হাসির রোদ ভ'রে নিতে নিতে
দেখেছি যুবতী হ'লো তোমারি সঙ্গীতে !

## পলায়ন-সঙ্গীত

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নিবু-নিবু দীপ নিয়ে যেন কোনো নিনিভ-সন্তান
এখানে এলাম আমি বিশশতকের পাদমূলে।
কোথাও মন্দির নেই তবু ছিল প্রদীপের স্থান,
'লিঅরু'-তরুর গন্ধ সহকারে চন্দনে জারুলে
উপস্থিত নেই, তবু ঘরে ছিল কবাটের সাজ,
নূপুর-নিক্কণ দূরে ফেলে এসে আল্‌তা-সলাজ
কুমারী-হাতের শাঁখা বড়ো ভালোলেগেছিল চোখে।
কাঁদবনা লোণামাটি দিয়ে গড়া দেবতার শোকে।



একে একে অপগত নাগরিকা পাপের দুহিতা
অস্তাচলে গ্রীসে-রোমে-পার্সিপোলিসে জ্বালে চিতা ॥ ১০ ॥

তখনও তখনও ছিল নীল কোনো আকাশের কোণ,
মেঘ নামা দিন ছিল আমরা ছিলাম ভাইবোন
প্রচুর-পয়সী দেশে
বছর মিথুনে মেষে
মাটিতে বিছিয়ে ছিল সুরিয়ের পূজা-আয়োজন।

সূর্য্য কি নিভে যায় ঈগলের সোনায় ডানায় ?
অভিশাপ তারি নখে পাখীরে মানায় !
রোমা, তুমি জয়ধ্বজা তুলে যারে করেছ বিদ্রূপ
সোণার কলসে পূর্ব্বদিকপ্রান্ত সপ্তরত্নে গড়ে তার রূপ।
ঈশিতা আরেক রস নয় দ্রাক্ষাকুঞ্জের আরক ॥ ২০ ॥
তাতে ভুলে গলে যায় মোঙ্গোল-তাতার-হুণ-শক
স্তূপে-'তেলে' ঢেউ তোলে বৈশালীরা দ্বারকা-স্মারক।

আকাশের শকুন্তের গতি নিয়ে কে মাথা ঘামায় ?
"তপনতনয়া তুমি আলিঙ্গন করবে আমায় ?"—
বলেছিলে মনে পড়ে চৌরপঞ্চশিখের সে বাণীময় শিখা ?
ভুলে গেছ ভুলে যাও তোমাদের এম্নি নামায়
অতল পাতালে কোনো বিস্মৃতির মধুবাতা নাম অনামিকা
ফিরে এসে বলো অন্যকথা।
তখন ফাল্গুন আসে পৃথুলা পৃথিবী
যেন এক সঞ্চারিণী লতা ॥ ৩০ ॥
বল্কল-বন্ধনে আর রচনা করেনা যেন নীবি।
বারবার কতো প্রতিশ্রুতি দেবে হৃদয় বা নেবে কতো আর
কী-কী বর্ণ ফুল চাই যাতে ভাই খুশী হবে পেয়ে উপচার ?

"অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্‌সথ।"

পৃথিবী মায়াবী নয় পৃথিবীও বেঁচে রয়
পৃথিবীও জানে মরে যেতে
কাঁটাগাছ বুনে দিতে ক্ষেতে
জানে তার দিকভ্রান্ত মন।
সুরুর আছেত সমাপন।

মাহিস্মতী নেই তার 'শূন্যাগারে' শ্যামা-পোকা পোড়ে। ॥ ৪০ ॥
যার হাতে জ্বলে দীপ বরণসী তারে বলে চোর ॥
অশ্ববাণিজক বজ্রসেনের কপালে কোন্ রাত্রি হল ভোর।
প্রেম আর মৃত্যু আঁকা সাদা-কালো দুইটি আখরে ॥
কে ফেলেছে অশ্রুজল মুগ্ধা শ্যামা গণিকার শোকে ?
বিশুদ্ধ শ্রাবস্তী শুধু জল ঢালে জেতবনে কলসে কলসে।
সোনায় বরুণা-অসি টলমল, পায় সুতরাং সুফলও সে ॥
নরমেধ ভস্ম ধুয়ে-মুছে দেয় অগস্ত্যের শ্লোক।
তবু থাকে ইতিহাস, পারস্যের অস্তগেস, আর্য্যাবর্ত্ত নাম ॥
থাকে কোনো সন্ধ্যারাগে ভয়ার্ত্তের মতো সভ্যরাম।
বাঘগুহা এঁকে যায় জল-চক্ষু উজ্জ্বল নির্ম্মোক ॥ ॥ ৫০ ॥

"হলা সয়ি পিয়ম্বদে আসবে কি তপোবনে কেউ ?"
বারবার এ জিজ্ঞাসা দিয়েছে বিশ্রুতি
যে তোমারে ভারত-ঈশ্বর,
তার তপোবনই শুধু মনে পড়ে, কতো শতো সমুদ্রের ঢেউ
রুধিরের হৃদয়ের অপর্য্যাপ্ত রুতি
বিস্মৃতি-ধুলায় বাঁধে ঘর !
দেবতার প্রিয় রাজা, বল্‌লেনা দেবদাসী কারা
কোন্ দেবী দাসী হল সাঞ্চীস্তূপে দিতে যে পাহারা,
তবু তা-ও লেখা হয় খোটানের ভুর্জ্জপত্রে শূদ্রকের হাতে :
ঘুম ভেঙে গেছে ভীরু বসন্তসেনার কতো রাতে। ॥ ৬০ ॥



শিরশির শীত দিত সিরদরিয়া
আমুর আমোদে মন ছিল মরিয়া।
কর্কশ দরিয়ার তুষার কণা
সাপ নয় তবু যেন সাপের ফণা।
বর্শার কিরিচের সার-সার ধার
ভেঙে দায় সূর্য্যের বাঁকা তলোয়ার।

কিরাতী, তোমারই শুধু ঘুম ভেঙে যায়।
তোমার দু'চোখে বুঝি ভাষা খুঁজে পায়
জাগরণ—কোনো দেহাতীত লুপ্ত পাখী
আগুনে পুড়েও যারা দিয়ে গেছে ফাঁকি ॥ ৭০ ॥
অমরতাময় সব মরণ-বিচ্ছেদে।
ঘুম ভেঙে যায় আজও শিহরণে-স্বেদে।
কিরাতী, তোমারই শুধু ঘুম ভেঙে যায়
নেই দিবা-বিভাবরী, কে দ্বার ভেজায় !

চম্পা-নাগকেশরের বনে ফেরে ঘ্রাণ।
তৃণভূমি ধানী অভিমান
ভুলে গিয়ে শুঁকবেনা সিংহের কেশর।
কিন্তু সর্প-মিথুনেরা এসে ত তেমনি পরস্পর
খেলা করে সুরভিত নাটে।
তুমি কি পারো না, বোন, তাদের ললাটে ॥ ৮০ ॥
পদ্মার আশীষ ঢেলে দিতে ?
সাত ভাই ঘুমিয়েছে মাঠে-ঘাটে-হাটে চারিভিতে
কেউ নেই সে-ঘুম ভাঙায়,
কেউ নেই আবার রাঙায়,
হিমালয়ে মেনকার ঘর।

জ্বলদ্দীপাকারং.....
কতো রংবেরঙের দীপ জ্বলে চলে ভেসে আকাশে-সাগরে

বকদ্বীপে এই বাক্ এই ধ্বনি আগ্নেয় প্রতিমা
মায়ের আঁচল থেকে জায়ার আঁচলে যায় ভগ্নী-কন্যা কণা-কণা
নিয়ে প্রসারিত করে দিগন্তের সীমা।
শোনো বোন, শোনো ॥ ৯০ ॥
এই স্মৃতি ডোবেনা কখনো।
তুমি আমি পলাতক-পলাতকা নাম
পাইনি যেদিন ছিল উচ্ছল উদ্দাম
গঙ্গার সঙ্গীত।
এই নাম সব নদী-জলে
সব জল শান্ত ছবি হিন্তালে-হিজলে।
কার হারবার পালা কার হবে জিৎ
এই কথা লেখে নাই কেউ কোনো ক্ষুধিত পাষাণে!

…তদনু নবীনার্কপ্রকাশং…
জানতাম অবাঙ্মানস ॥ ১০০ ॥
একথার মানে।
তাম্রলিপ্তি তুলে দিত হাতে তামরস—
কারো ত ছিলনা অভিলাষ
সূর্য্যহীন বিদ্যুৎ-বিলাস
দেখাবে বালুর গড়ে গড়ে' তুলে পাষাণের হাট
বাঁধা হবে চৌরঙ্গীর শ্মশানের ঘাট।

জেবুন্নেসা শাদা হাড়, শ্যামা-পোকা পুড়ছে কবরে,
ঔরংজীব চিরজীবী পত্র লেখে বসে।
এ কথা জানতে তুমি ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান
পর্ত্তুগীজ রাজা নয়, ক্ষুদ্র দ্বীপ নয় ফ্রঙ্গিস্তান? ॥ ১১০ ॥
তোমার ময়ূরসিংহাসন
পারেনি ফেরাতে কাল-নাগিনীর ভীষণ দংশন—
নিনেভের লাল-নীল মশালের রং নেই তাজের খবরে
তা-ত নয়, তেজ ছিল নওরোজে নতুন-দিবসে।



এ-কথা জানোনা বোন আগ্রা-সুবা ছবি মুছে বুকে নিল আবর্জ্জনা-স্তূপ
জানোনা পলাশ-রাঙা ভূমিতল লুকায় বিদ্রূপ
চৌরঙ্গীর বসন্তের জানোনা জানোনা ইতিকথা।
সহকারে দুলবেনা নবমল্লিকার কোনো লতা
অলক্ষ্য দ্রাক্ষার বনে তুমি বোন হারিয়েছ পথ—
মৃতবৎ ভাই ডাকে পেতে ফিরে সূর্য্যদুহিতার সেই রূপ—॥ ১২০ ॥
মনে কি পড়েনা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার করুণা, শপথ?

আবার যাবার ডাক এলো
মধুবাতা বয় এলোমেলো
ফাল্গুন কথা কয় কোথা
কোথায় নীলের নদী-সোঁতা
পঞ্চডালের ফুল-গাছে
সোনা-রূপা-হীরা ধরা আছে
কোথায় আগুন ছলোছলো
চোখের মতন হবে বলো
শোনে যদি ডাক বেলা গেলো। ॥ ১৩০ ॥

তেমন উত্তরে আর আসবে কি ফিরে
হে সূর্য্য দক্ষিণ-গামী?
লবণাক্ত সমুদ্রের তীরে
তোমার সোনার কুম্ভ বয়ে নিতে শিরে
অশ্রুজল রেখে শুষ্ক আকাশে, শিশিরে
আমারে কি দেখে যাব আমি? ॥ ১৩৬ ॥

# ভাষ্যাভাস

রচনাটির নাম থেকে কারো বুঝতে অসুবিধে নেই, জীবন-যুদ্ধে যে পলায়ন নামে একটি দৃশ্য আছে তার প্রতি দৃষ্টি রেখেই এ রচিত। তবে এ-দৃষ্টি সমন্বিত হবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল আমার নালন্দা-তোরণের লিপিগুলো পাঠ করে। তার দ্বিতীয় পংক্তিতে 'বৃত্রশ্রী' কথাটি লেখা ছিল। বৃত্র ঋগ্বেদে অহি বা সর্প আশ্রিত অসুর। আর্য ইন্দ্র তাঁকে বন্দী অবস্থায় মাতা-সহ বধ করেন। নিনেভে সেনা-চেরিবের অধীনে অসুর-দেবতা পূজিত হয়েছেন, আর, দেখা যায়, নালন্দায় তিনি শ্রীযুক্ত ছিলেন। বাংলার পাল-রাজারা সেনা-চেরিব-পৌত্র অসুর-বাণী-পালের সন্ততি কিনা তার বিচারক ইতিহাসের ভবিষ্যৎ বিধাতা, আমি নই। বাংলা-লিপি-লিপ্ত হয়ে কোন্ অসুর-রাজের পাথর ইরাকের বা বার্লিনের যাদুঘরে আছে তা দেখবার ভারও ভবিষ্যতের চোখেই থাকুক। তবে আমি বলব যে 'তপগচ্ছীয়-শ্রাবক প্রতিক্রমণ-সূত্রান্ত'গত 'বাএসিরি' (বাগীশ্বরী) কথাটি 'বৃত্রশ্রী'র লিপি-প্রমাদ কিম্বা উচ্চারণ-বিকৃতি নয়, বিশুদ্ধ পলায়ন। পলায়ন করে তান্ত্রিক বাগীশ্বরীর সঙ্গে চুক্তি আর যুক্তি। 'শ্রীনালনন্দাদাবিদ্য' কথাটি যে বাগীশ্বরী-বিদ্যাপীঠের সীলমোহরে বাংলা-লিপিতে লেখা ছিল, সে-বিদ্যাপীঠ বাংলাদেশের দ্রাবিড়-জাতির। তাঁরা চের-সেনাপতি সেনা-চেরিবের অধীনে যদি দাসত্ব করে থাকেন, তাহলে জাতি হিসেবে সবাই যে তা করেছেন তা নয়—কেউ কেউ হয়ত অসুর-রাজ্য ছেড়ে পালাতেও পেরেছেন। যুধ্যমানতা তাঁদের হৃদয় হয়ত গ্রহণ করেনি। যাক্ সে কথা, মনের পট-পরিবর্ত্তন জীবনকে গ্রহণ করবার সপক্ষে কি বিপক্ষে, 'পলায়ন-সঙ্গীত' রচনার পক্ষে এ-প্রশ্ন যথেষ্ট ছিল বলে মনে করলেও ক্ষতি নেই।

পংক্তি ৪ ॥ গৃহনির্ম্মাণে অসুরবাণীপাল সুগন্ধ 'লিঅরু'-কাঠ ব্যবহার করতেন।

" ৯ ॥ অসুর-রাজ্যে দেবী ইশতার 'সিন' দেবতার কন্যা। ঈশোপনিষদের 'অসুর্যদেশ' ৺ভাণ্ডারকরের মতে অসুর-রাজ্য।

" ১৫ ॥ পালি-ভাষায় সূর্যকে 'সুরিয়' বলা হত।

" ১৬ ॥ মিশরের শান্ত ঈগল অসুর-ঐতিহ্যে উড়ন্ত মূর্ত্তিতে ধ্বজচিহ্ন হয়েছিল।

" ২২ ॥ 'তেল' মানে চৈত্য। শুশান-রাজ্য থেকে সুরু করে মেসোপোটমিয়া পর্য্যন্ত ছোট-বড় নানা আকারের চৈত্য দেখা যায়।

" ২৩ ॥ 'ধম্মপদে' বুদ্ধ বলছেন আকাশের শকুন্তের গতি দুর্জ্ঞেয়।

" ২৪ ॥ 'সক্ক-পঞহ সূত্রান্ত'-ভুক্ত গন্ধর্ব্বপুত্র পঞ্চশিখের উক্তি। বররুচির 'চৌরপঞ্চাশিক' মনে করিয়ে দেয় পঞ্চশিখের উক্তি।

" ৩৪ ॥ ধম্মপদ—১৪৬ পংক্তি।

" ৩৭ ॥ শুশান-রাজ্যে অসুরবাণীপালের কাঁটা-গাছ পুঁতে দেওয়া যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ।

" ৪০-৪৪ ॥ 'সামা-জাতক' যাতে গণিকার মানসিক বৃত্তিই নয়, মায়াময়ী নারী-প্রকৃতির চিত্রই বর্ণিত হয়েছে।

" ৪৫ ॥ অনাথ পিণ্ডিকের মূর্ত্তি আঁকা প্রস্তর ফলক দ্রষ্টব্য।



পংক্তি ৪৭-৪৮ ॥ পারস্য-রাজ অস্তগেস হর্পগুস (সর্পঘোষ) নামক ব্যক্তিতে বিরূপ হয়ে তাঁকে তাঁরই সন্তানের মাংস খাইয়েছিলেন। বরণসীর ঋক্‌বেদী যুগে পিতা ছেলেকে বধ করতে উদ্যত ছিলেন অর্থ-লোভে।

" ৫০ ॥ বাঘগুহার মহাভারতীয় চিত্রগুলো পশ্চিমাঞ্চলের আরণ্যক জীবনের অশ্রুতে উজ্জ্বল।

" ৫১ ॥ কালিদাসের শকুন্তলা আর্য রাজন্য-ঋষির চরিত্রের ঊর্দ্ধে আসীনা।

" ৫৭-৫৮ ॥ ত্যাগের বন্যা কন্যাদের দেবদাসীতে পরিণত করেছে—সাঁচী স্তূপে নর্ত্তকী দেবদাসীর মূর্ত্তি স্থাপিত। গণিকা অম্বপালি (আম্রপালিকা) একটি আম্রবন বুদ্ধকে দান করেন। হয়ত তাঁরই মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল সাঁচীস্তূপে।

" ৬০ ॥ যোনকম্বুজে বা তুর্কীস্তনে ছিল মৃচ্ছকটিকের আদর—যে নাটকে গণিকার সম্মান যেন গ্রীকদের সমাজের গণিকাদের মতো প্রদর্শিত।

" ৭০ ॥ গ্রীসীয় ঐতিহ্যের পাবক-শুদ্ধ পাখী।

" ৮১ ॥ পদ্মা মানে শিবশক্তি মনসা যিনি 'বাএসিরি' নামে পূজিতা হতেন প্রাচ্যে।

" ৮৬ ॥ তান্ত্রিক গ্রন্থ 'ষট্‌চক্রনিরূপণম্' থেকে উদ্ধৃত।

" ৯৯। ঐ

" ১০৮ ॥ মুঘল-সম্রাট ঔরংজীব তাঁর শৈশব-শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে শিক্ষাগুরুকে পত্র লেখেন। টডের অনুবাদ দৃষ্টে মনে হয় ইংরেজের আবির্ভাব সম্পর্কে মুঘল-সম্রাটের মনে একটা সজ্ঞা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

" ১১৬ ॥ পলাশীতে বাঙালীর পলায়ন বৌদ্ধযুগ থেকে সুরু। যুগ-কবি বঙ্গ 'পলাশী'র নাম উচ্চারণ করে গেছেন। গ্রীকদের 'প্রাসী' ও 'পলাশী' এক।

" ১২৬ ॥ 'কায়া পঞ্চডালের তরুবর' সূর্য্যাদের প্রতীকী কথা। ভবানীদাসে মনসামঙ্গলের গানেও এই ধর্ম্মধারা অনুপ্রবিষ্ট। তরুকে দেব-ধর্ম্মের প্রতীক হিসেবে বেদান্ত অবলম্বন করেছিল। আর বরা জংপাইগাছকে ধর্ম্মের প্রতীক বলে মনে করেন, হয়ত পম্পাই-এর জলপাইকুঞ্জ বিষুবিষের আগুনে নষ্ট হয়ে যাবার পর।

" ১৩৪ ॥ তাম্রলিপ্তির রবিচক্রবাহী প্রস্তর মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য। মূর্ত্তিটিকে রোমান-জানুস বলা হয়। ঋক্‌বেদের সবিতৃ আর রোমক ঐতিহ্যের জানুস একই স্থানে অবস্থিত। ঋক্‌বেদের সবিতৃ হল এই :

'য ইমা বিশ্বা জাতান্যাশ্রাবয়তি শ্লোকেন প্র চ সুবাতি সবিতা'।

ভবভূতি রামচন্দ্রকে সবিতৃ-প্রসব বলেছেন।

# আত্মকথা

## প্রমথ চৌধুরী

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

যদিও আমার শ্বশুর-পরিবার রাঁচি থাকাকালীন প্রায় প্রত্যেক বৎসর পূজোর সময় রাঁচিতে বেড়াতে গেছি, তবে অন্যত্র একেবারেই যে যাইনি তা নয়। একবার শিলং যাবার কথা আগেই বলেছি। সেখানকার লাল মাটির পাহাড়ে রাস্তা ঘুরে ঘুরে ওঠা আর নির্জন সুন্দর হোটেল-সংলগ্ন স্থানে মাসখানেক নিশ্চিন্ত জীবনযাপন ভালোই লেগেছিল। শ্বশুরমশায়ের মৃত্যুর পর ১৯২৩ সালে একবার গ্রীষ্মকালে আমার ছোট ভাই অমিয়নাথের সঙ্গে তাঁর দার্জিলিঙের বাড়ি Wigwam-এ গিয়ে থাকি। এবং তারপর দুই বৎসর উপরি উপরি Maples ও Caroline Villa নামক সেখানকার বোর্ডিং হাউসে গিয়ে থাকি। এই প্রকার পরহস্তগত গৃহস্থালীতে থাকলে নিজেদের ঘরসংসার করবার ল্যাঠা থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে ; অপরপক্ষে তাদের নিয়মকানুনের কতকটা অধীন হয়ে পড়তে হয়। তবে আমাদের সেজন্য বিশেষ কোনো অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। Maples-এ বেশ সুন্দর ঘর পেয়েছিলুম, আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সঙ্গও পেয়েছিলুম। আর Caroline Villa-য় একটি মেমের সাক্ষাৎ পাই তাঁর নাম Mrs. Laura Finch। তাঁর সঙ্গে আলাপটা অনেকদিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁর জীবনের ঘটনা যেন ঠিক একটি উপন্যাসের মত। তখন তিনি আধা-বয়সী হলেও তাঁর সুদীর্ঘ ঋজু দেহ এবং সুরুচিসম্মত পরিচ্ছদের বিশেষত্বে পূর্বের সৌন্দর্য এবং আভিজাত্যের লক্ষণ প্রকাশ পেত। তিনি হিন্দু ধর্ম ও দর্শন আলোচনার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন, কিন্তু বলতেন যে অনেক অনুসন্ধানেও উপযুক্ত গুরুর দর্শন মেলেনি। অবশেষে বহু চেষ্টার পর হাবড়ার বিজয়কৃষ্ণ শর্মাকে গুরুদেব বলে মেনেছিলেন, যিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করেছেন। একবার তাঁর সঙ্গে আমরাও গুরু-সন্দর্শনে যাই, কিন্তু একদিন দু'দশ মিনিটে আর কি পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। Laura Finch বিখ্যাত ফরাসী প্রেততত্ত্ববিৎ Professor Richet-এর অন্তরঙ্গ বান্ধবী ছিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে বহু প্রেতচক্রে যোগদান করেছেন। সে সব গল্প যেমন আশ্চর্য তেমনি চিত্তাকর্ষক। বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখা নেই, জানিনে এখনো ইহলোকে আছেন কি না, বা তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন কি না। এর পরে আর দার্জিলিঙে যাইনি, খুব সম্ভব আর যাওয়া হবেও না। যুবাবয়স থেকে প্রৌঢ়বয়স পর্যন্ত কতরকম স্মৃতিই না এই শৈলনিবাসের সঙ্গে বিজড়িত।



বিবাহের পরেও আমি বার দুই সিমলা পাহাড়ে গেছি। একবার আমার শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে সেখানে রাজা হরনাম সিংদের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থাকি—যে Manor Lodge-এ এখন তাঁদের একমাত্র কন্যা রাজকুমারী অমৃত কুমরের আতিথ্য গ্রহণ মহাত্মাজি প্রায়ই করে' থাকেন। আমি যে বছর বিলাত যাই ( ১৮৯৩ সালে ) সেই বৎসর আমার শ্বশুর-পরিবার একাদিক্রমে আট মাস সিমলা শৈলে বাস করেন, ও সেই সময় হরনাম সিংদের পরিবারের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তা রাজারানীর জীবিতকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। তাঁরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এবং রানীসাহেবাকে বিবাহ করবার জন্য তখনকার কর্পূরতলার গদির অধিকারী কুমার হরনাম সিং কেমন করে' খৃস্টান হন ও গদির দাবি পরিত্যাগ করেন, সেও এক গল্প বিশেষ। আর-একবার যাই বেড়াতে আমার শ্যালক সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোধ হয় ১৯১৭ সালে। পাহাড়ের কথা যখন হচ্ছেই, তখন কার্সিয়ং কিছু নিম্নস্তরের হলেও তার উল্লেখই বা ছাড়ি কেন। সেখানেও দুবার যাই—একবার আমার শ্বশুর-পরিবারের সঙ্গে অনুমান ১৯১৬ সালে। আর একবার আমার ডাক্তার ভাই সুহৃৎ যখন যুদ্ধের কাজ নিয়ে বিলেত যান তখন তাঁর পরিবারকে হাওয়াবদলের জন্য নিয়ে গিয়ে হাত্রাসের রাজার বাড়িতে মাসখানেক থাকি।

কার্সিয়ঙ্গেরও নীচে টিণ্ডারিয়া পাহাড়ের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক কারণে বিশেষ যোগ ছিল। দাদা সেখানে এক সাহেবের কাছ থেকে একটি ছোট বাংলো ও চা-বাগান ৭০০০৲ দিয়ে কেনেন। পরে প্রায় ৩০০০০৲ খরচ করে সেটাকে রীতিমত দোতলা বাড়ি ক'রে তুলে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছিলেন যে দেখলে চেনা যেত না। তাঁর প্রতি ছেলেমেয়ের নামে নামে ঘর ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সেটা নামেই রয়ে গেল, কারণ অমন নির্জন ছোট পাহাড়ে জায়গায় তারা কে থাকতে যাবে। আমরা দুতিনবার গিয়ে সেখানে থেকেছি। একবার আমার শ্বশুর-পরিবারের সঙ্গে। সেবার মনে আছে আমার স্ত্রী এবং জ্যোতিকাকামশায় গোপেশ্বরবাবুদের সংগীতমঞ্জরীর স্বরলিপি দেখে দেখে কত সুন্দর সুন্দর হিন্দি গান গাইতেন, যা পরে বাংলায় ভাঙা হয়েছিল। আমি চিরকালই হিন্দী গানের ভক্ত, এবং অল্পবয়সে কিছু কিছু গাইতেও পারতুম।

দাদা পুরীতেও একটা বাড়ি করেছিলেন। যা পরে বিক্রি হয়ে যায়। আমরাও একবার পুরীতে গিয়ে অন্য বাড়িতে কিছুদিন ছিলুম। আমার স্ত্রীর অসুখের দরুন বিয়ের অল্পদিন পরে শিমুলতলায়ও দুবার হাওয়াবদলে গিয়েছিলুম। বিয়ের পরের পূজোর ছুটিতেই কাশী যাই আমার ছোট ভগ্নীর কাছে বোধ হয় ১৯১৪ সালে, মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের হরধাম বাড়িতে।

১৯২২ সালে আমার বড়বৌঠাকরুন প্রতিভা দেবীর হঠাৎ হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হয়।

দাদা তাঁকে ১৮৮৬ সালে বিয়ে ক'রে আনবার পর থেকেই ঠাকুরপরিবারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। মট্‌স্ লেন-এর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের যাতায়াত ও দাদার সঙ্গে কবিতালোচনার কথা আগেই বলেছি। বৌঠান হিন্দী গান অতি সুন্দর গাইতেন এবং বিয়ের পর পর্যন্ত তার চর্চা রেখেছিলেন ব'লে আমিও শুনে আনন্দ পেতুম। পরে নিজে গানবাজনার সাক্ষাৎ চর্চা ছেড়ে দিলেও প্রথম আনন্দসভা নামে তাঁদের বালিগঞ্জের প্রাসাদতুল্য বাড়িতে ছেলেমেয়েদের জন্য এক সংগীতসভা স্থাপন ও ক্রমশঃ সেটাকে সংগীত সংঘ নামে এক সংগীত বিদ্যালয়ে পরিণত করার দরুন জীবনের শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়িতে সংগীতের আবহাওয়া বহমান রেখেছিলেন এবং ছেলেমেয়েদের সাধ্যমত সংগীতশিক্ষা দিয়েছিলেন। দাদা নিজে ঠিক সংগীতজ্ঞ না হলেও সংগীতজ্ঞ গুণীদের বাড়িতে এনে গানবাজনা শোনা ও শোনানোর প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক ছিল। দাদার মত ওরকম সামাজিক প্রকৃতির গুণগ্রাহী মজলিশী লোক একালে দুর্লভ। তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে বৌঠান একলা কিছুই ক'রে উঠতে পারতেন না। তাঁদের বাড়িতে কৌকভ খাঁ স্বরোদী ও দর্শন সিং তবলচীর যে প্রতিযোগিতা চলত তা একটা দেখবার ও শোনবার মত জিনিস। বৌঠানের অভাবে ওদিকটা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল, শুধু তাই নয়, দাদাও অপেক্ষাকৃত কম বয়সে নানা প্রকার রোগে ভুগে অবশেষে চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে ১৯২৪ সালে মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বাড়ির সে শ্রী রইল না। ছেলেরাও অত বড় বাড়ি রাখতে পারলে না। অবশেষে পৈত্রিক বাড়ি বিক্রি করে ফেলে তারা এখন নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দাদার অমন সুন্দর লাইব্রেরির একাংশ কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আমার ফরাসী বইও উক্ত বিদ্যালয়ে দান করার দরুন দুইয়ে মিলে আমাদের পিতৃদেব দুর্গাদাস চৌধুরীর নামে একটি স্বতন্ত্র লাইব্রেরি সেখানে স্থাপিত হয়েছে। আমার ইংরেজি বই আমি দুবার ক'রে বিশ্বভারতীতে দান করেছি। প্রথমবার রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, এবং বই পেয়ে খুব খুসি হয়েছিলেন ও তাঁর খাসকামরায় স্থান দিয়েছিলেন, সে কথা 'চিঠিপত্র' পঞ্চম খণ্ডে প্রকাশ। পরে তাঁর অবর্তমানে সম্প্রতি আমার বাকি ইংরিজি এবং বহু বাংলা সংস্কৃত বই যা এযাবৎ আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের হেপাজতে ছিল সেসব বিশ্বভারতীতে আবার পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি অন্যান্য ছোটখাটো গ্রন্থাগারে কত সময়ে অনুরোধে পড়ে কত বই দান করেছি তা হিসাব করলে বোঝা যায়, এ দীর্ঘ জীবনে কত না বই সংগ্রহ করেছিলুম। এখন ৭৮ বৎসর বয়সে আমার দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে এসেছে, চশমা লাগে না, তাই ভাল পড়তে বা লিখতে পারিনে। কিন্তু মনে এই একটা সন্তোষ রইল যে, আমি যেমন চিরকাল ভালবেসে বই কিনেছি ও পড়েছি তেমনি অন্যান্য সম্পত্তির মত ছত্রভঙ্গ না ক'রে অন্ততঃ সৎপাত্রে দান করতে পেরেছি।



এমনকি রাঁচিতে আমার শ্বাশুড়িঠাকুরানীর বাড়ির সঙ্গে যে দুই আলমারি বই পেয়েছিলুম, তাও 'সত্যধাম' বিক্রি হবার পর সেখানকার এক আত্মীয়ের লাইব্রেরিতে দান করে দিয়েছি। দাদা বাবার নামে পাবনায় একটা টোল স্থাপন এবং হরিপুরের বাড়িতে একটি বৈঠকখানা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু আমার স্ত্রী বরাবর বলেন যে, আমরা সাত ভাই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে সকলেই কমবেশ যে-পরিমাণ কৃতিত্ব লাভ করেছি, সে অনুপাতে দেশে কোনো মঙ্গলপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারিনি, যেমন অন্য অনেকে করেছেন। ডাক্তারখানা ও ইস্কুল স্থাপন করবার চেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়, কিন্তু যে কারণেই হোক সে চেষ্টা তেমন সফল হয়নি। ভাইদের মধ্যে কেবল মেজদাদাই ( যোগেশচন্দ্র ) হরিপুরে নিজের আলাদা বাড়ি করেছেন। আর সেজদাদা ( কুমুদনাথ ) যতদিন বেঁচেছিলেন তিনিই বোধ হয় দেশের সঙ্গে সব চেয়ে বেশি সম্পর্ক রেখেছিলেন। তাঁর শিকারের নেশা তার একটি কিন্তু একমাত্র কারণ নয়। আমার মা শেষজীবন সেজদার বাড়িতেই কাটিয়েছেন ব'লে হরিপুরের আত্মীয়স্বজন কেউ কলকাতায় এলে সেজদার বাড়িতে ওঠাই স্বাভাবিক মনে করত। এই রকম ক'রে আমাদের নিকটতম আত্মীয় অর্থাৎ হরিপুরের বড়তরফের ছেলেরা একাদিক্রমে বহুদিন সেখানে থেকেছে; ছোটতরফও বাদ যায়নি। তাছাড়া মেজদার বাড়িও সর্বদাই দেশের আত্মীয়স্বজন বছর বছর থেকেছে ও প্রতিপালিত হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে এ নিয়মটা আমাদের বাড়িতে এতটা চলে এসেছে যে, আমরা এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমি বিলেত থেকে ফিরে এসে আর হরিপুর যাইনি; দুঃখের বিষয় নানা ঘটনাচক্রে আমার স্ত্রীকেও সেখানে কখনো নিয়ে যেতে পারিনি, যদিও একবার যাবার সমস্তই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তবে দেশের ছেলেদের উল্লিখিত আনাগোনায় তাদের সঙ্গে এখন পর্যন্ত একটা স্নেহের সম্পর্ক রয়ে গেছে; যদিও দিন দিন দূরে পড়ে যাচ্ছি। আমার ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতেও অনেক সময় অনেকদিন ধরে দেশের নানা দুঃস্থ আত্মীয়স্বজন বাস করেছে। তবে দুঃখের বিষয় শেষ পর্যন্ত কাউকে রাখতে পারিনি, তা না হলে আমার এই নিঃসন্তান অসহায় বৃদ্ধবয়সে অনেক সহায়তা হত। আমার কাছ থেকে কেউ তেমন কৃতীও হ'তে পারেনি, যেমন দাদাদের বাড়ি থেকে হয়েছে।

সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, সুধীর রায়চৌধুরী নামে আমার মামাবাড়ির একটি ছেলে ম্যাট্রিক দেবার পর থেকে আমাদের কাছে এসে ছিল; অবশেষে তার মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ায় তাকে আবার পোরজনায় তার মামার বাড়ি ফিরে পাঠাতে হল। ছেলেটি দেখতে শুনতে ব্যবহারে সব দিকেই ভাল ছিল। সে আমাদের কাছে থেকে আই. এ. পর্যন্ত পড়েছিল কিন্তু পাশ করতে পারেনি। তারপর তাকে হিন্দুস্থান ইনশিওরেন্স কোম্পানিতে কাজও করে দিয়েছিলুম। কেন যে তার হঠাৎ এমন মতিভ্রম হল, তা বলতে পারিনে।

সে আমাদের বিশেষ অনুগত ছিল, এবং আজ থাকলে আমাদের অনেক উপকার হত। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, তাঁরও যে তাকে নিয়ে কি কষ্ট, সে বলবার নয়।

আমার পরবর্তী ভাই মন্মথ পল্টনের ডাক্তার হয়ে কিছুদিন সার্জন-জেনারেল-এর পদেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যা বোধ হয় আর কোন ভারতবর্ষীয়ের ভাগ্যে ঘটেনি। তিনিও প্রথম মহাযুদ্ধের সময় স্বেচ্ছায় আরামের চাকরি ছেড়ে মধ্য-এশীয় রণক্ষেত্রে প্রভূত কষ্ট সহ্য করেছেন, সেজন্য আমার দুই ডাক্তার ভ্রাতারই কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে। মন্মথের পৈতের সময় আমি তার কানে মন্ত্র দিই, সে জন্য সে মজা করে আমাকে গুরু বললেও আমাদের যথার্থই ভালবাসত, এবং প্রতি বৎসরই ভাইদের দেখবার জন্য মাদ্রাজ থেকে ছুটে আসত। আমার দুই ছোট ভাই সুহৃৎ এবং অমিয় আমাদের থেকে একটু স্বতন্ত্রভাবে মানুষ হয়েছে। কারণ তারা বড় হতে হতে আমরা মফস্বল ছেড়ে শহরে এসে বাস করি, এবং দেশের সঙ্গে দেশাচারের সঙ্গে অনেক পরিমাণে বিযুক্ত হয়ে পড়ি। আমার বড়দিদি প্রসন্নময়ী দেবী ও ভাগিনেয়ী প্রিয়ম্বদা দেবী লেখিকা হিসেবে অনেকের নিকট পরিচিত। আমার ছোট ভগ্নী মৃণালিনী দেবী এখনো জীবিত; ডাক্তার উমাদাস বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছিল।

কথায় বলে মানুষ একা আসে, একা চলে যাবে। কিন্তু মধ্যখানে পৃথিবীতে বাসকালীন যে আত্মীয়বন্ধুর পরিবেশে তার জীবন অতিবাহিত হয়, তাদের সঙ্গে তার আত্মকথা নানা অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বিজড়িত হয়ে পড়ে। তাই আমার পরিবারের কথা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক মনে করলুম।

চিরদিন মানুষের সমান যায় না। আমরা ভাইরাও বেশির ভাগ বালিগঞ্জ অঞ্চলে নজেদের বাড়ি করে যে সুখের সংসার পেতেছিলুম, তাতে ক্রমে ভাঙন ধরতে লাগল। দাদার পরেই বোধ হয় ১৯২৮ সালে মন্মথ হঠাৎ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে মসুরী পাহাড়ে মারা গেলেন। তার আপনার ভাইরা সে সময় কেউ কাছে ছিল না, সুহৃৎও খবর পেয়ে গিয়ে তাকে দেখতে পায়নি। এইখানে বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কি স্বদেশে কি বিদেশে যে যখন বিপদে পড়েছে, তখনই আমার ডাক্তার ভাই সুহৃৎ সঙ্গে গিয়ে নীরবে তার প্রাণপণ সাহায্য করেছেন।

আমাদের ভাইদের মধ্যে আবাল্য সম্প্রীতি ছিল, এবং কলকাতায় বাস করতে এসেও কাছাকাছি বাড়িতে থাকার দরুন ছেলেদের মধ্যেও ছেলেবেলায় ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন অবশ্য ক্রমে দূর পড়ে যাচ্ছে।

সেজদাদা ও আমি পিঠিপিঠি ভাই হলেও ছেলেবেলা থেকে যুবাবয়স পর্যন্ত আমাদের দুজনের খুব ভাব ছিল। পূর্বেই বলেছি আমার কমলালয় বাড়ির প্রায় অধেক জমি কিনে



তিনি নিজের একটি সুন্দর বাড়ি ২।১ নং ব্রাইট ষ্ট্রীটের ঠিকানায় তৈরি করেন। তাই তার ছেলেরা সর্বদাই আমাদের বাড়ি যাতায়াত করত। এবং তাঁর ছোট ছেলে কালীপ্রসাদ বছর এগারো বয়স পর্যন্ত অনেক সময় আমাদের কাছেই থাকত এবং লেখাপড়া ও খেলা করত। সে যে কি সুন্দর ছেলে ছিল এবং আমরা তাকে কত ভালবাসতুম তার পরিচয় আমার লেখাতেই আছে। তেমনি সুন্দর বলিষ্ঠ জনপ্রিয় যুবাও হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তার বাপের অবর্তমানে উড়োজাহাজের কি মোহই যে তাকে পেয়ে বসল। বিলেত গিয়ে ভাল করে শিখে আসবে বলে সেই যে হাসতে হাসতে ১৯৪০ সালে "টুপ্ করে' ঘুরে আসি" বলে চলে গেল, আর ফিরে এল না। এই কালযুদ্ধে অকালে ভরাযৌবনে অনর্থক বিদেশে প্রাণটা খোয়ালে। কত লোকেরই এই যুদ্ধে সর্বনাশ হয়েছে, শুধু আমাদের একার নয়। তার বাপ থাকলে হয়ত যেতে দিতেন না। সেই অবধি আমারও জীবনের রস শুকিয়ে গিয়েছে। সে আমাদের ছেলের মতই ছিল। তার দাদা কল্যাণকুমারও সংসারী হল না, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে গিয়ে বসে আছে। সুতরাং সব থাকতেও সেজদাদার অমন সুন্দর বাড়ি নিরানন্দ পুরী হয়ে রইল। তিনিও অকস্মাৎ কালিমাটিতে বুড়োবয়সে শিকার করতে গিয়ে এপ্রিল ১৯৩৪ সালে বাঘের আক্রমণে প্রাণ হারালেন। শরীর ক্রমে দুর্বল হচ্ছে দেখে লোকে তাঁকে কত বারণ করত যেন আর শিকারে না যান। কিন্তু যার যা নেশা তা কারো কথায় কেউ ছাড়ে না। এখন মনে হয় ভালই হয়েছে, পুত্রশোক তাকে পেত হল না। তিনি কত শিকারী যুবা-বন্ধুকে যে-কাজ না করতে শতবার উপদেশ দিয়েছেন, অর্থাৎ আহত জন্তুকে পায়ে হেঁটে অনুসরণ করা, অবশেষে নিজেই কার্যকালে সেই উপদেশ লঙ্ঘন করলেন। একেই বলে নিয়তি। এখন আমরা সাত ভাইয়ের মধ্যে চারজন আছি।

আমি ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতি হয়ে গেছি। বোধ হয় ১৯২৮ সালে দিল্লি প্রবাসী সাহিত্যসম্মিলনে যাই। সঙ্গে আমার স্ত্রী ও ছোট ভগ্নী মৃণালিনী ছিলেন। তিনি এই সুযোগে টাঙ্গায় ঘুরে ঘুরে সমস্ত দিল্লী শহরের দ্রষ্টব্য দেখে বেড়ান অসিত হালদারের সঙ্গে। আমরা নানান সভাসমিতির হাঙ্গামায় পড়ে ততদূর পারিনি। পথের মধ্যে এলাহাবাদ থেকে ধূর্জটিপ্রসাদ আমাদের সঙ্গ ধরেন। আমরা যাবার আগের দিনই বোধ হয় শ্রদ্ধানন্দ স্বামীকে খুন করা হয়, এবং সেইদিনই ধুম করে' তাঁর শবযাত্রা হয়, তাই নিয়ে খুব গোলমাল চলছিল, এবং কোন কোন শাখা-সভাপতি উপস্থিত হতে পারেননি। এখানে আসবার আগেও লোকে খুব শীতের ভয় দেখিয়েছিল, কিন্তু আমরা কোন কষ্ট পাইনি। তার পূর্বে মেদিনীপুরে ও শান্তিপুরে এবং পরে কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মিলনে এই সেদিন সস্ত্রীক গিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ থাকতে চন্দননগরের সাহিত্যসম্মেলনে যোগ দেবার কথাও ভোলবার নয়। যেখানে গেছি আদরযত্ন পেয়েছি। এই সুযোগে

আমাদের পুরনো কৃষ্ণনগরের বাড়িবাগান আমার স্ত্রীকে দেখাই। সেখানে সপরিবারে কতদিন কত সুখে কাটিয়েছি; কিন্তু এখন দেখলুম বাড়ির ভগ্নদশা। পরে আমরা থাকতে থাকতেই নদীয়ার মহারানী সেটি কিনে তাঁর গুরুভগ্নী সিস্টর সরস্বতীকে মাতৃসদন করবার জন্য দান করেন; আমাদের সামনেই সমারোহপূর্বক সেই দান-সভা অনুষ্ঠিত হয়। জানিনে সিস্টর সরস্বতীর অবর্তমানে এখন তার কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। কৃষ্ণনগর কলেজের এক অংশে আমাদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল। সে বাড়িঘরও দৈর্ঘেপ্রস্থে এবং উচ্চতায় একটা দেখবার জিনিস। এই সেদিন কলেজের শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে পুরনো ছাত্র হিসাবে আমার নিমন্ত্রণ এসেছিল। (ক্রমশঃ)

## চৈনিক 'শী-চিঙ্গ' থেকে

হে পূর্ব্ব-পুরুষ তুমি কার' পরে করবে নির্ভর ?
হে আকাশ নীল দূরান্তর
কোথায় হবে বা এর শেষ !
গাছের পাতারা আজ সোনালি কি নয় ?
প্রিয়া থেকে ছিন্ন হয়ে গিয়েছে হৃদয়,
তোলো মানুষেরে তার খোলো রণবেশ

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

কল্‌কল্ শব্দে সুরতুনের যখন ঘুম ভাঙল তখন তার গায়ে রোদ এসে পড়েছে।

ততক্ষণে ফতেমা দলবল নিয়ে বারান্দার অপরপ্রান্তে বসে পড়েছে।

—এখনও ঘুমাস যে ?

সুরতুন বললে—কাল অনেক রাতে শুইছি গল্প করে।

ফতেমার রাত্রি-জাগরণ ও ভ্রমণ-ক্লান্ত মুখে একটা হাসি ফুটি-ফুটি করল, কিন্তু প্রত্যাশিত হাসির বদলে উদ্বেগ প্রকাশ পেল তার কথায়—কেন্‌রে অসুখ করছে ? ঘর খোলা কেন্, বায়েন কই ?

—ঘরে, ঘুমায়ে আছে। না অসুখ করে নাই।

পুরুষদের ভঙ্গিতে মাথায় গামছা জড়িয়ে টেপির মা-ও এসেছিল সে বললে,—তুমি যে মোকামে গেলে না ?

—পুলিশ

সুরতুন কনক দারোগার সাথে তার দেখা হওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করল। এও বলল এবার ভদ্রলোকের মেয়ে-ছেলেরাও চালের ব্যবসায়ে নেমেছে।

টেপির মা বলল,—পুলিশ ধরে ধরবি। এমনেও না খাওয়া অমনেও না খাওয়া। পুলিশ তবু খাতে দেয় শুনছি।

ছোট ছোট দুটি ধুলিমলিন ছেলে সঙ্গে করে ফুলটুসি বারান্দার দূরতম প্রান্তে বসেছিল। সে বললে—পুলিশ খাতে দেয় কিনা জানি না, মার ধোর করে।

ফতেমা সুরোকে প্রশ্ন করল,—তাইলে তুই কি করবি ?

—কি করব তাই কও।

কিছুই আর করার নেই এটাই চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হ'ল যেন। কিন্তু এদের কথায় ঘুম ভেঙ্গেছিল মাধাইএর। মাধাই বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এদের দেখে হাসি-হাসি মুখে বললে,—কিরে সকাল বেলায় উঠে—তোমাদের কি হ'ল।

প্রায় সমস্বরে ওদের সমস্যাটার কথা ওরা প্রকাশ করতে গেল। মাধাই তেমনি হাসি মুখে বলল—রাত জেগে আসছ, এখন মুখে হাতে জল দেও, কিছু খাও, তারপরে গালে হাত দিয়ে বসে ভাবো তোমরা। ভাবনার কি শেষ আছে।

—তাইলে তুমি কোন বুদ্ধি করছ ?

—বুদ্ধি কিছুই করি নাই। মুখে হাতে জল দিবার ক'লাম। তাইলে বুদ্ধি আসলেও আসবের পারে।

মাধাই ষ্টেশনের দিকে চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে টেপির মা বললে—তাই কও। যেমন ছিল তেমনই চলবি। তা না হলি মাধাই অমন হাসত না।

সে উঠে দাঁড়াল, তার সাথে সাথে ফুলটুসি।

কিন্তু ফুলটুসি ভীরু। সে বললে—ফতেমাদিদি, তুমি যদি যাও আবার আমাকে ডাকে যাও। একলা আর আমি যাবের পারব না।

সুরোদের ভাষা নেই। ভাষায় প্রকাশ করলে তার মনোভাবটা এই রকম হয়: নৈরাশ্যের অন্ধকারের মাঝখানে সূর্য্যের মতো এসে দাঁড়াল মাধাই। হাল্কা চেহারার রেল কোম্পানির অতি নগণ্য এক কর্মচারী কিন্তু কতখানি আশা বিকীরণ ক'রে গেল সে আশার কথা না বলেও।

ফতেমা বলল—তোরা কাল রাঁধাবাড়া করছিলি।

—না। মনে কর ষ্টেশনে বায়েন খাইছিল।

ফতেমা আর দেরী করল না, স্নান করার জন্য রওনা হ'য়ে গেল। মোকামের পথে ইঁট জড়ো ক'রে রান্না ক'রে খাওয়া হয়। নিজেদের আহার্য্য ছাড়াও মাধাইএর আহারের বন্দোবস্ত তাকে করতে হবে। মাধাই একা একা রান্না ক'রে ছাইপাঁশ কি খায় কে জানে, তাই বলে যা তা তার সমুখে ধ'রে দিতে ফতেমা পারে না।

শুধু পাল্কী করে আসার ব্যাপার নয়। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন সান্যাল গিন্নী, সুমিতি যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল তখনও সে অনেকদিনের পরিচিতের মতো রূপনারায়ণের একখানা হাত নিজের হাতে ধরে রেখেছে, হাসছে। একটু বিব্রত হ'লেও সে হাসিটা সুন্দর। প্রার্থীর মতো লজ্জার হাসি নয় যে কুণ্ঠিত হতে হবে।

সুমিতি প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালে সান্যাল গিন্নী বললেন—ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না।

—আমিও পারছিলাম না। তবু আমার পড়ার টেবিলে আপনার একখানা ফটো আছে। আপনি আমাকে কোনদিন দেখেন নি।

—কিন্তু চেনা চেনা লাগছে, মা।



—তা লাগবেই তো। আমি আপনাদের ছোট বৌ সুকৃতির বোন।

—সুকৃতি ! সুকৃতির বোন ? সান্যালগিন্নী, হাত বাড়িয়ে ব্যানিষ্টার চেপে ধরলেন। সুমিতির কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন—এস, ঘরে এস। তোমাদের বংশ চিরকালই খুব উদার। তোমাদের পক্ষেই এমন করে আসা সম্ভব।

সান্যালগিন্নী দৃশ্যতই বিচলিত হ'য়েছেন।

সুমিতিকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সান্যালগিন্নী বললেন—খবর না দিয়ে এসে আমাকে খুসি করেছ কিন্তু নিজে কত কষ্ট পেলে।

—না কষ্ট হয় নি। এ দেশের পুলিশরা ভদ্র। একজন দারোগা আমাকে পাল্কী ঠিক করে দিল।

—ওঁকে বলব খবর নিতে। লোকটি তা হ'লে ভদ্র।

ঘরে এসে সান্যালগিন্নী সুমিতিকে কুশল প্রশ্নের প্লাবনে ডুবিয়ে দিলেন। কিন্তু কুশল প্রশ্নের মধ্যেই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—তুমি এখন বিশ্রাম কর। ট্রেনের ক্লান্তিটা আগে যাক, আলাপ করব। তুমি এ ঘরেই থাকবে, অসুবিধা হবে না তো ?

সান্যালগিন্নী হাসিমুখে বেরিয়ে গেলেন কিন্তু কান্না তার বুকের ভেতরে উদ্বেল হ'য়ে উঠছিল। সুকৃতিকে নিজের শোবার ঘরে বসিয়ে এসে তিনি কোথায় যাবে খুঁজতে লাগলেন।

পনর ষোল বছরের আগেকার ঘটনা। রাজনীতি এ পরিবারের আছে, সান্যালমশাইকে পরিহাস ক'রে সান্যালগিন্নী নিজেই বলেন—তোমাদের রাজনীতি আমার মতো উকীলের মেয়ের পক্ষে বোঝা দায়। কিন্তু দেশ ব্যাপী রাজনীতির অংশ এই পরিবারটা একবারই মাত্র নিয়েছিল, কিম্বা আরো ভালো ক'রে বলতে গেলে একবারই মাত্র সেটাতে জড়িয়ে পড়েছিল।

দেবরকে বিবাহ দিলেন সান্যাল গিন্নী, কোলকাতার ব্যারিষ্টার পাড়ায় আত্মীয়তা করলেন। সান্যালগিন্নীর বহুদিনের ব্যবধান থেকে সে সব কালের ছোট ছোট ঘটনা, ভুলে যাওয়া কথাবার্ত্তা মনে পড়তে লাগল।

সম্বন্ধগুলির মধ্যে সান্যালগিন্নী যখন এটাকেই বেছে নিলেন, সান্যাল কপট বিরক্তিতে ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে বলেছিলেন—ঐ সাহেবি পাড়ায়। আমাকে কি বুড়ো বয়সে তামাক ছেড়ে চুরুট ধরতে হবে ?

সান্যালগিন্নী ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিলেন,—আলো আসুক, একটা জানালা কাটো। প্রাগৈতিহাসিক মিনারে বাইরের আলো প্রবেশ করুক একটু। সান্যাল অনুরূপ কি একটা বলে রাজি হ'য়েছিল।

শুধু ব্যারিষ্টারি ঘরের বিলেত ফেরৎ পিতার সন্তান বলেই নয়, সুকৃতি নানা দিক দিয়েই প্রশংসনীয় ছিল। গায়ের রংটা বোধ হয় এই সুমিতি মেয়েটির চাইতে আর একটু প্রকাশিত

ছিল। আর ভ্রূটির কোনটিতে যেন একটা কাটা দাগ ছিল, ছোটবেলার দুরন্তপনার চিহ্ন। আর সে বোধ হয় কথা বলার সময়ে ঠোঁট দুটিকে কেমন একটু উল্টে দিত। অনভ্যস্ত চোখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না—মেয়েটি কোন ব্যাপারকেই খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না।

সমগ্র দেশের ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যহীন গড় চিকন্দির গড় অধিবাসীদের জীবনে একবারই মাত্র রাজনীতি প্রবেশ করল। খবরকাগজে পড়া রাজনৈতিক ব্যাপারটার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছাল গ্রামটা। সান্ন্যালগিন্নীর প্রার্থনার চাইতেও বেশী আলোক ফুটে উঠল। কিন্তু সেটা বিদ্যুৎ-জ্বালা। মিনারের খিলানে খিলানে আলোর উদ্ভাস এল, মিনারটিও শতধা-দীর্ণ হ'য়ে পড়ল।

সান্ন্যালমশাই কাছারীতে এসে বসেছেন। সম্মুখে প্রজাদের একটি ছোটখাট জনতা। তারা এসে ছল পাটের দাদনের টাকা নিতে। লিণ্ডোয়ালকুঠির সাহেবরা যে দাদন প্রতিবৎসর দেয় এবার তারা তা নেবে না, খেয়ে মরতেও তারা চায় না।

এমন সময়ে পুলিশ এল। ঘোড়া ও সাইকেল চেপে বড় ছোট পুলিশ অফিসারের একটা বাহিনী। অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। কাহিনীতে পড়া, খবরের কাগজে পড়া একটা ব্যাপার তাঁর নিজের বাড়ীতেই ঘটছে।

সান্ন্যালমশাই পুলিশের নির্বুদ্ধিতায় হাসতে পারতেন, কিন্তু অপমানিত বোধ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। সারা বাড়ীটা থম্ থম্ করছে।

কিন্তু যা ঘটে গেল তার আশঙ্কা পুলিশরাও করে নি।

ছোট বউএর বাক্স থেকে বেরুল একখানা দুখানা নয়, পাঁচ ছ'খানা চিঠি, যে চিঠির হস্তাক্ষর পুলিশের পরিচিত, যার লেখকের অনুসন্ধানে সারা বাংলায় জাল ফেলে চলেছে পুলিশ পক্ষ। এতদিনে বোধ হয় সত্যিকারের নামটা তার জানা গেল।

চিঠিগুলি হাতে নিয়ে পুলিশের বড় কর্ত্তা সদরে এসে বসলেন। গম্ভীরমুখ করে বললেন, —আপনাদের ছোট বৌরাণীকে কিছু প্রশ্ন করা দরকার। তিনি সম্মান করেই কথা বললেন, সান্ন্যালমশাই পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো হ'য়ে গেলেন।

—এই চিঠিগুলি পাওয়া গেছে ছোটবৌরাণীর বাক্সে। এগুলির লেখক এ বাড়ীর কেউ নয়। ছোটবৌরাণীর কোন আত্মীয়ও নয়।

চিঠিতে কি লেখা আছে আর জানা প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা তাতে আছে কি না, যতটুকু আছে তাতে ছোটবৌরাণীকে রাষ্ট্রদ্রোহীদের একজন ব'লে প্রমাণিত হয় কিনা, এসব জানার আর প্রয়োজন নেই। ছোটবৌরাণীর বাক্স থেকে অপরিচিত একজন পুরুষের চিঠি বেরিয়েছে এই যথেষ্ট। চারদিকে আমার কর্ম্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউ



কি খোঁজ ক'রবে চিঠিতে কি লেখা আছে, অপরিচিত পুরুষের চিঠি এই কথাটা শোনার পর। সান্ন্যালমশাই হাতের ইসারায় পুলিশের কর্ত্তাকে নিরস্ত করলেন। তার চোখের কানায় কানায় অশ্রুও দেখা গেল।

কিন্তু সব উল্টে পাল্টে গেল। কথাটা অন্দরেও রটেছিল ইতিমধ্যে। পুলিশ প্রশ্ন করবে এ বোধ হয় সুকৃতি বুঝতে পেরেছিল। বোধ হয় তার মনেও কথাটা বারবার গুঁটিয়ে গুঁটিয়ে উঠেছিল—পরপুরুষের চিঠি।

খিড়কির পুকুরটার চারিদিকে এখন গভীর জঙ্গল। সেটাকে কেউ তারপরে আর ব্যবহার করে নি। খিড়কির দরজায় যে পুলিশটি পাহারায় ছিল সে ছুটে এসে খবর দিল।

—কি হ'য়েছে!

পুলিশের কর্ত্তারা এবং সান্ন্যাল নিজেও উঠে দাঁড়ালেন।

—কে একজন জলে লাফিয়ে পড়ল। উঠল না।

ঠিক দেখেছিল সে। দামী শাড়ী ও অলঙ্কারের একটা ঝিলিক চোখে লেগেছিল তার। সম্ভ্রমে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। তারপরে ঠাহর করেছিল বিষয়টি।

তারপরের দৃশ্যগুলি ভাবতে পারেন না সান্ন্যালগিন্নী। অনুকম্পা বেদনার সাথে ঘৃণাও মিশে যায় চিন্তায়। মন থেকে ভাবটাকে দূর করার জন্যই তিনি চেষ্টা করেন।

মৃত্যুতে মৃত্যুতে বাড়ীটা সেদিন ছেয়ে যেতে পারত। রিভলবার শুদ্ধ সান্ন্যালের হাত দুখানা তিনি প্রাণপন বলে চেপে ধরেছিলেন, পুলিশদের সাথে আর দেখা করতে দেন নি।

রাজনীতি নয়, মিথ্যা একটা কলঙ্ক। তারই জন্য একটা প্রাণের অবসান হল।

সান্ন্যাল লড়েছিলেন। কোর্টে নয়। তখনকার দিনে যতদূর হওয়া সম্ভব ছিল, মিথ্যা কলঙ্ক রটানোর অভিযোগে পুলিশের বড় কর্ত্তা তিরস্কৃত হয়েছিলেন তার উপরওয়ালাদের কাছে। কিন্তু শাস্তির কথা দূরে থাকুক, সান্ন্যালের ক্রোধের উপশমও হয়নি তাতে। সেই ক্রোধ হয় তো বা তাকে রাজনীতিগত প্রতিহিংসার পথে টেনে আনত। ব্যক্তিগত ক্রোধ, জাতিগত অভিমানে মিশে যেতে পারত কিন্তু সান্ন্যালের ডান হাতখানাই ভেঙে দিল তার ছোট ভাই: সান্ন্যালবংশের ছেলে সে কি না বৈষ্ণব সন্ন্যাসী হল।

কিছুক্ষণ সান্ন্যালগিন্নী অস্থিরচিত্তে এঘর ওঘর করতে লাগলেন। এটা গোছান ওটা ঝাড়েন নিজের হাতে। অবশেষে সান্ন্যালমশাইএর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে রূপু এসে খবর দিয়ে গেছে। খবরটা সারা বাড়ী রাষ্ট্র করার ভার নিজের মাথায় নিয়ে রূপু ততক্ষণ এদরজায় ওদরজায় খবর বিলোচ্ছে।

সান্ন্যালমশাই বললেন—এসো।

সান্ন্যালগিন্নী বললেন,—ও সুমিতি আমাদের সুকৃতির বোন।

—শুনলাম তাই।

হোক একটা ছোট মেয়ে তবু মহামানী আত্মীয়। তাকে অভ্যর্থনা করা, তার আতিথ্যের যথোচিত ব্যবস্থা করা এগুলি আলোচনার বিষয় নয়। বেদনাটাই মনে পড়ে সান্ন্যালমশাই-এরও।

কিন্তু তিনি যা এই মাত্র বললেন তারপরে আর কি বলার থাকতে পারে।

বিচলিত হয়ে সান্ন্যালমশাই বললেন, কাউকে একটু তামাক দিতে বলো।

কিন্তু সান্ন্যালগিন্নী চলে যাবার পর বিপদ হ'ল সুমিতির। ষ্টেশনে নেমে কনক দারোগাকে যা সে বলে এসেছিল সে কথাটা মনে পড়ল। এখানে নেমে সে নিজের যে পরিচয় দিয়েছে তার সাথে, কনক দারোগার কাছে দেয়া আত্মপরিচয়ে পরস্পর বিরোধ না থাকলেও পরিচয় দুটির পার্থক্য আছে। এ বাড়ীর একটি ছেলের স্ত্রী আর এবাড়ীর একটি স্ত্রীর আত্মীয় হওয়া এক ব্যাপার নয়। আজকের দিনটা এক পরিচয়ে সকলের সাথে পরিচয় হবার পর কাল সকালে দ্বিতীয় পরিচয়টা সকলকে জানানো কি ক'রে সম্ভব হবে? সুমিতির মনে হ'ল, ইতিমধ্যে দেরী হ'য়ে গেছে। এরপরে তার অন্য পরিচয়টি বলতে গেলে শ্রোতাদের চোখে যে বিস্ময় দেখা দেবে তার সাথে অবিশ্বাসও থাকবে নাকি? অবিশ্বাস যদি নাও থাকে নানারকম সন্দেহ থাকবে তাদের গলার স্বরে।

কিন্তু একটা বাড়ীতে ঢুকে কি ক'রে বলা যায় আমি আপনাদের বৌ। সঙ্গে এবাড়ীর ছেলেটি নেই তবু বলতে হবে আমি বেটাবৌ আপনাদের। প্রথম পরিচয়ে এই কথা বলা যেন উপন্যাসের পঠিত স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রীদের আত্মঅধিকারের দাবীর মতো শোনাবে!

সুমিতির আবার মনে হ'ল এমন সমস্যাসঙ্কুল দেশে আসা ভালো হয় নি। সংসারে চলা রাজনীতির চাইতেও কঠিন এই মনে হ'ল সুমিতির। এ বাড়ীর একটি ছেলেকে ভালোবাসে ব'লে এ বাড়ীর সবাইকে সে ভালোবাসবে, শ্রদ্ধা করবে এমন চারিত্রিক গঠন নয় তার। এখানে এসেছে, যদি ভালোবাসা সম্ভব হয় ভালোবাসতে, যদি শ্রদ্ধা দেয়া সম্ভব হয়, সেটা দিতে। আসার উদ্যোগ করতে করতে নিজে সে এখানকার সকলকে কি করে গ্রহণ করবে এটাই ভেবেছিল। তাকে এরা কি ভাবে গ্রহণ করবে সে কথাটা মনে হতেই স্বতসিদ্ধের মতো সে ধ'রে নিয়েছিল একজন ভদ্রমহিলাকে একটি ভদ্রপরিবার যে ভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু ঠিক এখন তার চিন্তা করতে হ'ল এরা তাকে কি গ্রহণ করবে?

দাসী এল স্নানের ঘরে যাবার তাগিদ দিতে।

স্নানের ঘর সুমিতিকে খানিকটা অন্যমনস্ক করে দিল। রাজনীতির একটা পুরনো কথা মনে পড়ে গেল তার। কোলকাতা সহর নয়, পাঁচতলায় জল উঠবে বৈদ্যুতিক শক্তিতে। এই গ্রামের অধিবাসীদের যদি শয়নকক্ষের কাছাকাছি স্নানের ঘর দরকার



হয় কি ক'রে করে এরা তার ব্যবস্থা। উপায়টা জানা না থাকলে সেই অত্যন্ত সহজ উপায়টাও চোখে পড়তে চায় না।

কাল পাথরের স্নানের ঘর। পাথরের চৌবাচ্চায় জল টল্‌টল্ করছে। ঘরটা এমন ঠাণ্ডা, স্নানের ঘর না বলে ঠাণ্ডী গারদ বলা যায়। দেয়ালে সবুজ শ্যাওলা আছে বোধ হয় এই মনে ক'রে সুমিতি চারিদিকে ফিরে দেখল। কাল পাথরের উপরে সাদা দেয়াল উঠেছে ছাদ পর্য্যন্ত, দেয়ালগুলি সাদা পাথরের নয় কিন্তু পাথরের মতোই চিকন। দাস-দাসীর মাথায় এই জল উঠেছে সিড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে।

সুমিতি গায়ে জল ঢালতে ঢালতে বললে নিজেকে—সেই সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার আর একটি নিদর্শন।

স্নান শেষ ক'রে বেরিয়ে সুমিতি দেখল শোবার ঘরের একপ্রান্ত ইতিমধ্যে কোলকাতার বিলেতি হোটেলের এক টুক্‌রো হ'য়ে উঠেছে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সান্ন্যালগিন্নী ঘরে ঢুকলেন।

—এস, সেই সকালে বেরিয়েছ।

—কিন্তু আমি তো থাকতে এসেছি।

সান্ন্যালগিন্নী চিরাচরিত ভাষায় বললেন,—সে তো খুবই আনন্দের হবে। কিন্তু সান্ন্যালগিন্নী ভাবলেন, এ তো কখনোই সম্ভব নয় সুমিতি তার সঙ্গে পরিহাস করবে, তবে একথাটা বলছে কেন? কি জানি আজকালকার মেয়ে হয়তো বা সম্বন্ধের সুবাদে পরিহাসই করছে।

—এস মুখে কিছু দেও।

নোতুন বৌদের ব্রীড়ার কথা শুনেছে সুমিতি। হঠাৎ যেন তেমনি একটা জড়তা এল তার।

সান্ন্যালগিন্নী অতিথিকে সহজ করবার জন্য বললেন,—তুমি বসো সুমিতি, খেতে খেতে গল্প কর, শুনি।

সুমিতি টেবিলে ব'সে বলল,—আমার এমন সম্বন্ধ আপনার সাথে, আমাকে এমন ক'রে বসিয়ে খাওয়ালে নিন্দা হবে।

—নিন্দা হয় না। পৃথিবীতে সব চাইতে আপন লোকগুলিকেই সামনে বসে খাওয়াতে হয়। সে নাকি এক স্বার্থের ব্যাপার।

—কিন্তু আমি তো আপনার বড় ছেলের স্ত্রী।

—স্ত্রী? খোকার, খোকার বউ তুমি?

সান্ন্যালগিন্নীর চশমার আড়ালে চোখ দুটির কি কি পরিবর্ত্তন হ'ল, তাঁর মুখের

পেশীগুলি কি ক'রে সঙ্কুচিত হ'ল এ সব দেখতে পারল না সুমিতি। সে টেবিলের অপ্রয়োজনীয় কাঁটা চামচগুলি নাড়া চাড়া করতে লাগল। সান্ন্যালগিন্নী বললেন,—তোমার অসুবিধে হচ্ছে সুমিতি, আমি রূপুকে পাঠিয়ে দি।

সান্ন্যালগিন্নী স্থান ত্যাগ করলেন।

দাসী এল। কাঠের ট্রেতে দু' দু'টো টিপট্

সে বললে,—বামুন দিদি জানেন না আপনি চা কিম্বা কফি খাবেন তাই দুই-ই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সুমিতি চেষ্টা ক'রে দাসীকে একটা হাসি উপহার দিল। দাসী চলে গেলে সুমিতি এক কাপ কফি ঢেলে নিল। ঢেলে নেবার আগে সে চিন্তা করেছিল: কিছুই যদি সে স্পর্শ না করে সেটা লক্ষণীয় হ'য়ে উঠবে দাস-দাসীদের চোখেও। দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সে ভেবেছিল স্নায়ুগুলিকে সতেজ করা দরকার, সামনে যে সময়টা তাতে একটু শক্ত হওয়ার প্রয়োজন হবে।

সুমিতি ভেবেছিল এরপরে বাড়ীর ছেলেরা অন্তত দু একজন আসবে, খবরটা রাষ্ট্র হবার পর মেয়েরাও আসবে।

সন্ধ্যার সময়ে দাসী এসে শেজ জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। রূপনারায়ণ এল একবার। হাতের বইগুলি সুমিতির সম্মুখে টেবিলে রেখে বললে,—মা পাঠিয়ে দিলেন আপনার জন্যে।

দু একটি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে রূপনারায়ণ চলে গেল। রাত্রি বাড়তে লাগল। সুমিতি লক্ষ্য করল দরজার বাইরে একজন দাসী ছোটখাট কি কাজ নিয়ে বসে আছে। দেখে বোঝা যায় কাজটা উদ্দেশ্য নয়, বসে থাকাই উদ্দেশ্য। সে যে সুমিতির আদেশেরই অপেক্ষা করছে তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

সুমিতি উঠে দাঁড়িয়ে শয্যার দিকে অগ্রসর হ'ল। অলোটাকে টেনে নিয়ে বিছানায় গা ঢেলে দিয়ে একখানা বই তুলে নিল। সে যে বধূ হিসাবে সমাদৃত হ'ল না এতে সন্দেহ করার কিছু নেই।

আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, বইয়ের মলাটে চোখ রেখে ভাবল সুমিতি, কপালে তার সিঁদুর পর্য্যন্ত নেই। সামন্ততান্ত্রিক কথাটা আবার তার মনে হল। সে পরিবেশে তার অকস্মাৎ প্রবেশ করাটা বৈপ্লবিক ব্যাপার হয়েছে। বিবাহ বলতে বহু অর্থব্যয়ের বহু কোলাহলের শেষে ব্রীড়াবনতা একজনকে বরণ করার যে চিরাচরিত পদ্ধতির সাথে এরা পরিচিত তার সাথে আজকের বাহুল্যবিহীনতার বৈপরীত্য অত্যন্ত প্রখর ভাবে স্পষ্ট। আভিজাত্যের আত্মাভিমান না থাকলে হয়তো বা তার আশ্রয় পাওয়া দুরূহ হ'ত, এরা অভিজাত বলেই নীরব উপেক্ষায় তাদের মতামতটা পরিস্ফুট করে দিয়েছে। (ক্রমশঃ)

# ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

ইন্দ্রজিৎ

[ পূর্ব্বানুস্মৃতি ]

আর একটি সৃষ্টি হোল প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্র। এই জ্যোতিষ-শাস্ত্র কিন্তু প্রথমাবস্থায় চাষের কাজে লাগত কারণ প্রাচীন কালের শাস্ত্রগুরুরা বুঝতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর ক্ষেতের ধানের প্রাচুর্য্য আর অপ্রাচুর্য্যের সঙ্গে সূর্য্যের একটা নিকটতম সম্বন্ধ আছে। সেই সূত্রে তারা এটাও বুঝতে পেরেছিলেন সেকালে, যে সূর্য্যের আলোর তারতম্য হয়। সেই তারতম্য লক্ষ্য করে তারা সূর্য্যকে বারটি ঘরের ছকে হিসেব করেছিলেন, যথা—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন। আবার সেই সূত্রে তাঁরা বারটি ঘরে সূর্য্য বাদে আরও আটটি গ্রহকে আবিষ্কার করেছিলেন যথা শনি, মঙ্গল, চন্দ্র, রাহু, কেতু, বুধ, বৃহস্পতি আর শুক্র। প্রতিটি মানুষের ওপরেও যে সূর্য্য সমেত এই নবগ্রহের প্রভাব আছে একথা তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন পরে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ ও পদ্ধতির নাম ভৃগু সংহিতা ও পরাশর সংহিতা।

ঐ বেদোত্তর কাল থেকে মুসলমান অধিকার পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতে আরও যে সমস্ত শাস্ত্র সৃষ্ট হোয়েছিল সেগুলো যথা, দর্শনের ভেতর ছয়টি দর্শন, সাংখ্যদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, পাতঞ্জলী যোগদর্শন, ইত্যাদি। করিশাস্ত্র বা হস্তীর লক্ষণ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ শাস্ত্র, হয়শাস্ত্র বা অশ্বের লক্ষণ অলক্ষণের বিষয়ে তথ্যপূর্ণ শাস্ত্র, রস শাস্ত্র, পুরাণ বা বেদের কর্মকাণ্ড, পটচিত্র-প্রদর্শন-শাস্ত্র যেটার প্রমাণ পাতঞ্জল যোগ দর্শনে আছে, ভরত মুনিকৃত নাট্য শাস্ত্র, এই শাস্ত্রে ভাব রাগ আর তাল তিনটি আছে। আছে নাটকের উপাদান। সংস্কৃত অভিধান, নাটক, কাব্য ইত্যাদি।

সংস্কৃত রামায়ণ ভারত সংস্কৃতির আদি সাহিত্য হিসেবে এক অমর অবদান। রামায়ণের মূল লেখক আদিকবি বাল্মীকি। এর পরবর্ত্তী যুগে হিন্দি কবি তুলসীদাস রামায়ণকে হিন্দিতে রচনা করেন নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে এবং নাম দেন "রাম চরিত মানস," বাংলায় কৃত্তিবাস ওঝা বাংলা ভাষায় রামায়ণ লেখেন যেটা কৃত্তিবাসী রামায়ণ রূপে পরিচিত।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কথিত মহাভারত। এ কাব্য পরবর্ত্তী যুগে বাংলা দেশে কাশীরাম দাসের দ্বারা বাংলায় তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে অনূদিত হয়।

ভাগবত কাব্য। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও লীলার ইতিহাস বর্ণিত হোয়েছে চমৎকার ভাষায়। সে বর্ণনা শুনছেন মহারাজ পরীক্ষিৎ ও বর্ণনা করছেন পণ্ডিত শুকদেব।

সংস্কৃত ভাষা ছিল রাজভাষা সুতরাং রাষ্ট্রভাষারূপ এই ভাষাই প্রচলিত ছিল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে। সেই কারণবশত ভারতের সর্ব্বত্র ভাগবত করেছিল প্রচার লাভ।

মহাকবি কালিদাসের কাল নির্ণয় করা আজও খুব সোজা নয়।

কালিদাসের কাব্যের ভেতরে কুমারসম্ভব নামে মহাকাব্য সপ্তম সর্গ পর্য্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে, কারণ প্রাচীন রসশাস্ত্রকারদের মতে কাব্যের নায়ক নায়িকাকে ঠিক সেই পর্য্যন্তই বর্ণনা করা চলে যে পর্য্যন্ত তাঁরা এমন অবস্থা বা ঘটনায় এসে না পড়েন যা বর্ণনা করাটা কাব্যের পক্ষে রসাভাব হবে। তাই কালিদাস, শিব পার্ব্বতীর পুত্র কার্তিকের ভূমিষ্ঠ হওয়ার ঠিক পূর্ব্ব পর্য্যন্তই তাঁর কাব্য রচনা করে চলেন নি, থেমেছেন ঠিক তখনই যখন শিব-পার্ব্বতী বিয়ের পর বাসর ঘরে গেলেন।

তারপরকার ব্যাপারগুলো ঘটনা হোলেও কাব্যের ঘটনা হওয়া উচিত নয় একথা তখনকার দিনে রসশাস্ত্রকাররা জানতেন। কারণ কালিদাস কবি হয়েই শুধু নয় মানুষ হোয়েও একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বামী-স্ত্রী বাসর ঘরে যাওয়ার পর অন্য লোকে সেখানে আড়ি পাততে পারে কিন্তু কবি পারেন না।

কিন্তু পরবর্ত্তী যুগের কবিরা কালিদাসের নাম দিয়ে একেবারে কুমার-সম্ভব পর্য্যন্ত আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ছেড়েছিলেন। কিন্তু সমালোচকরা বুঝতে পারবেন যে সপ্তম সর্গের পরবর্ত্তী শেষাংশ ভাব আর ভাষার দিক থেকে অনেক তফাৎ।

কালিদাস আরও একটি মহাকাব্য সৃষ্টি করলেন রঘুবংশ নামে। সে মহাকাব্য মূলত রামায়ণ, কিন্তু সে মহাকাব্যে একটা বড় জিনিষ আমরা লক্ষ্য করি যে সে কাব্যের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে রাম-বংশের ইতিহাস যা বাল্মীকির রামায়ণে ঠিক সবিস্তারে নেই। মহাভারতের ভেতরে আমরা কাব্য হিসেবে শ্লোকের ভেতর দিয়ে ইতিহাস পেলাম কিন্তু কাব্য ঠিক তেমন ভাবে পেলাম না। কিন্তু রঘুবংশ কাব্যে ঐতিহাসিক ধারা আর কাব্য ধারার সমন্বয় ঘটেছে।

কালিদাসের আরও কাব্য-নাটক আছে। যথা খণ্ডকাব্যের ভেতর মেঘদূত। এই মেঘদূত এর মতন খণ্ডকাব্য সে সময়কার অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কাব্যের অনুকরণ করে আরও অনেক পরবর্ত্তী-কালে পবনদূত হংসদূত পদাঙ্কদূত, কাকদূত, উড়িষ্যায় রথদূত ইত্যাদি কাব্য রচিত হোল। কালিদাসের নাটকের ভেতরে মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলা ইত্যাদি। কালিদাসের সমসাময়িক কবিদের ভেতরে কবি বাণভট্টের কাদম্বরী বর্ণনার দিক থেকে অতুলনীয়। শ্রীহর্ষের নৈষধ চরিতও চমৎকার কাব্য। এ ছাড়া আরও অনেক কবি ও কাব্যের বিকাশ ঘটে সে যুগে।

বেদ ও বেদোত্তর যুগের নৃত্য বিদ্যার ভেতরে দক্ষিণ ভারতীয় ভারত নাট্যম্ তার স্বকীয়



রূপ আজও হারায়নি কিন্তু কথক নৃত্য পরবর্ত্তী যুগে তার রূপ পরিবর্ত্তিত করলেও প্রাণধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করেনি আজও।

বাদ্যযন্ত্রের ভেতর তম্বুরা অর্থাৎ তানপুরা, রবাব যন্ত্র, বীণ, সারস্বত বীণ এ সমস্ত বৈদিক যুগের।

চর্ম বাদ্যযন্ত্রের ভেতর মৃদঙ্গ আজকাল যাকে বলা হয় পাখোয়াজ।

সঙ্গীতের ভেতরে ধ্রুবপদ যা আজকাল ধ্রুপদ নামে প্রচলিত তারও জন্ম সেই যুগে। ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণীর জন্ম দান বেদ ও বেদোত্তর যুগেই হয়। এ ছাড়া সাংস্কৃতিক জীবনে বহু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সৃষ্টি হয় এই সময়।

শাস্ত্রকাররা বলতেন সঙ্গীতের আদি গুরু মানুষ নয় মহাদেব। সেই মহাদেবের মুখ থেকে ধ্রুপদের পদলাভ করেছিলেন শাস্ত্রকাররা। নৃত্য বিষয়ও তারা বলতেন যে মহাদেব যে নাচ নাচেন তার নাম তাণ্ডব আর পার্ব্বতী প্রবর্ত্তিত নৃত্য লাস্য। এক দক্ষিণ ভারত ব্যতীত ভারত নৃত্য তার রূপ পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হোয়েছিল দেশের বহু রকম পতন উত্থানের জন্যে। লোকনৃত্য বা লোকাচার স্ত্রীআচারের কথা আলাদা। কামশাস্ত্রকে বাৎস্যায়ন তাঁর গ্রন্থারম্ভে বলেছেন যে কৈলাসে একদিন পার্ব্বতী তাঁর স্বামী মহাদেবের কাছ থেকে জানতে চাইলেন কামশাস্ত্রের কথা, জানতে চাইলেন সুলক্ষণা নারী আর সুলক্ষণ পুরুষের কথা। মহাদেব তখন একে একে সমস্ত কথা বললেন, নারী চার রকম যথা— পদ্মিনী, চিত্রিণী, শংখিনী, হস্তিনী। আর পুরুষ যথাক্রমে শশ, মৃগ, বৃষ, অশ্ব এই চার রকম। আর সমস্ত নানা রকম কামশাস্ত্রের কথা, বশীকরণ, নানা রকম ভঙ্গি-প্রদর্শনের পরিচয় আমরা পাই এই বাৎস্যায়নে। পার্ব্বতীকে বলবার সময় শুনতে পান মহাদেবের শিষ্য নন্দী। সেই নন্দীর দ্বারা পৃথিবীতে এ কামশাস্ত্রের কথা শোনেন বাৎস্যায়ন। তিনি আবার তাঁর নিজের গ্রন্থ কামসূত্রে সেটা প্রকাশ করেন পৃথিবীর লোকের জন্যে, পড়তে বলেন বিশেষ করে অবিবাহিতদের।

এমনি করে বৈদিক তন্ত্রশাস্ত্রকাররাও বলেন যে কৈলাসে একদিন পার্ব্বতী তাঁর স্বামী মহাদেবকে তন্ত্রের মূল কথা জিজ্ঞাসা করেন। মহাদেব তখন গোপনে তন্ত্রের মূল তথ্য পার্ব্বতীর কাছে বিস্তার করেন। শুনতে শুনতে অর্থাৎ দীর্ঘ আলোচনার জন্যে পার্ব্বতী অর্দ্ধেকটা শুনে ঘুমিয়ে পড়েন। পরে ঘুম ভাঙ্গতে তিনি বুঝতে পারেন যে অনেকটা তিনি শুনতে পাননি কিন্তু পরবর্ত্তী অংশটুকু তিনি মহাদেবের কাছে আর জানতে পারেন নি। কিন্তু সেখানে একটি টিয়া পাখী বসেছিল, সে ঘুমায়নি, কাজেই পার্ব্বতী যে অংশটুকু শুনতে

পাননি সে অংশটুকু পার্ব্বতীকে শোনাল সেই টিয়া পাখী। তাই ভারত ভূমির ওপর তন্ত্র শাস্ত্রের আদি গুরু সেই টিয়া পাখী।

কিন্তু পরবর্ত্তী কালে শাস্ত্রকাররা দেশের দশের দায়ত্ব নিলেন না বা ভুলে যেতে লাগলেন ক্রমশঃ। ফলে পরবর্ত্তী সময় দেশব্যাপী অরাজকতার সৃষ্টি হোল, ক্ষত্রিয় হোলেন রাজা, আর রাজার কানে দেশ পরিচালনার মন্ত্রণা দেওয়ার ভার পড়ল ব্রাহ্মণ্যধর্মীদের ওপর। বৈশ্যের গমনাগমন রাশি রাশি ধন ভাণ্ডার নিয়ে। দুঃখ কি তা বুঝলো না ব্রাহ্মণ, বুঝলো না বৈশ্য। কেবল আর্য্য যুগ থেকে সকলের পায়ে দাসখত যারা লিখে দিয়েছিল, তাদের চিরকালের চোখের জলে ভেজা চোখ শুকোল না। এরা সাধারণ মানুষ হয়ে শুধু এইটুকু বুঝতে পারল যে এদের নিজেদের কোন রকম উচ্চাশা থাকবার উপায় নেই। সকলের সেবা কর, না করলে শাস্তি ভোগ কর।

বেদ-বুদ্ধি যখন কালক্রমে ভেদবুদ্ধিতে পরিণত হোল, আর সেই পরিণাম যখন সীমাকে অতিক্রম করতে চল্‌ল তখন সেই বেদশাস্ত্রের প্রতি আস্থা হারালো নিপীড়িতের দল।

(ক্রমশঃ)

### আবেস্তার যশ্ন ( যজ্ঞ-প্রশ্ন )

ক্ষমৈব্য গীয়াস উর্ব গেরেঝদা।
কহ্‌মেই মা থ্বরোঅদাম কে মা তয়ং ॥

ক্ষমা করো মাটি উর্বা ও গাভীগ্রস্তা।
গ্রীষ্মে করোনা সরোজদামিনী ত্রস্তা
( থর-মরুতেজে ভাষার কুহক পাতা
কমলবাসিনী কথা কও ষট্ মাতা ) ॥

# ব্যক্তিত্ব ও কবিতা

## প্রণব মিত্র

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যক্তিবাদী উগ্রতা এখন ক্রমশঃ সমে এসে দাঁড়িয়ে হয়তো অনেকের কাছে বুদ্ধিগতভাবে বর্জনীয় হয়েছে—এ কাহিনীর যাথার্থ্য বিচারে অবশ্য আমার রুচি নেই যদিও সাধারণ অতার্কিক সংবোধে এ কথা বলা অন্যায় নয় যে ব্যক্তিবাদের অন্ধস্তাবকতার চেয়ে তার অপহ্নব অধিকতর কাম্য; কিন্তু এ ধরণের খণ্ডনপন্থা যে আবার অনেক ক্ষেত্রে আর একটি অন্ধতার অনুগামী হয়ে আসে এইটাই দুঃখের। তবু বাস্তবিক এ কথাই সঠিক মনে হয় যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তিত্ব একজিনিষ নয়; প্রবন্ধের প্রারম্ভে একথা বিশদিত করতে হোলো একারণেই যে আজকাল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এদু'য়ের অভেদকে আমরা অন্ততঃ অচেতনভাবে একটি স্বতঃসিদ্ধ ভাবতে সুরু করেছি হয়তো; সংগে সংগেই মনে পড়ছে ইংরেজী 'ইনডিভিজুয়ালিটি' আর 'পার্সোনালিটি' এ দুই শব্দের তর্জমায় আমরা বহু সময়ে ভুল করে ঐ এক ব্যক্তিত্ব শব্দটিরই প্রয়োগ করি।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিগত শতাধিক বছরের একটি যত্নলালিত বিমূর্তন মনে করলে যদি আপত্তির কারণ না ঘটে, তবে এরপর কার্য কারণের ন্যায়, আরো অনেকের মতই আমাদের সেই একই গন্তব্যে নিয়ে যায় হয়তো, আর তা' হোলো সেই আঠারোর শিল্পবিপ্লব যন্ত্র যখন করায়ত্তে, প্রকৃতির মুখ চেয়ে না থাকলেও যখন চলবে, তখন অতঃপর কোনো আধ্যাত্মিক বিশ্ববীক্ষা ব্যতিরেকেও আধিভৌতিক উন্নতির পথ সুগম হতে পারবে এ ধারণায় প্রাচীন ঈশ্বরবিশ্বাসের আসন আর অনড় রইলোনা, এবং ব্যক্তির মন মহাজাগতিক উপবৃত্তে পরিক্রমণ শেষ করে কিছু পরিমাণে আত্মচেতন হতে সুরু করলো—আরো পরে দেখা গেলো, এ আত্মচেতনা হয়তো ঈশ্বরচেতনার মতই একটি আত্মরতির উপচার-চয়নে ব্যাকুল। উনিশ-শতকী প্রাগ্‌ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই ভূমিকা-নির্দ্দেশে অবশ্য আমার ভূয়োদর্শনে অনভিজ্ঞ মনের প্রগলভতা সূচিত হতে পারে, তবে যতদূর মনে হয় যুক্তির পথ আমি খুব বেশী দূর ছেড়ে আসিনি। তবু একবিষয়ে আমার সংশয় ছিলো বহুকাল, আর তা হোলো এই যে মানুষের মত সামাজিক জীব, মানবকৃষ্টির জয়যাত্রায় গোষ্ঠীর প্রশংসা উচ্চারণ না করে ব্যক্তিমনের স্বাতন্ত্র্যের অভিমানে মগ্ন হোলো কোন্ দুঃখে? এর উত্তর অর্থ নৈতিক অথবা ঐতিহাসিক যে কোনো দিকদিয়েই দেওয়া যাকনা কেন, ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস, ধর্ম এবং নীতিবিধানের একক সাধনার পথ ছেড়ে আসার কালে প্রতিক্রিয়ায় ঠিক অমনি আর একটি একক ধ্যানের পন্থাই হয়তো অনুসরণীয় ছিলো সেদিন।

উপক্রম দীর্ঘ হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বহু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে আমাদের

মনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং ব্যক্তিত্বের যে অভেদত্ব রচিত হয়ে চলেছে তার উপশম অবশ্য কাম্য। ইমার্সন যেমন নির্জনতাকে প্রিয়তমার সংগে তুলনা করে তাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন, সে দিকদিয়ে বিচারে মহান ব্যক্তিত্ব মাত্রেই একাকীত্বের অভিলাষী এবং হয়তো কিছুটা স্বাতন্ত্র্যবাদী ; কিন্তু এর দ্বারা এর উল্টোটা—অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যবাদী মাত্রেই যে মহান ব্যক্তিত্বের পর্যায়ভুক্ত, একথা প্রমাণ হয় না। সে ক্ষেত্রে ন্যায়ের অসম্মতি সুস্পষ্ট সন্দেহ নেই। এরপর বলা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাহিরারোপিত কৃত্রিম বোধের অতিসচেতনতায় ব্যক্তিত্বের গভীরতার উপমান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর—কারণ ব্যক্তিত্ব, ঠিক ভাবে বলতে গেলে অর্জনের নয় বিকাশের ; আর এজন্যেই স্বভাবে নিহিত দোষ-গুণের সমবায় হিসেবে ব্যক্তিত্বকে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা নিরর্থক। কারণ ও হোলো বৃহত্তর অর্থে চরিত্র-বিচারের প্রশ্ন। আর চরিত্রবান মাত্রেই যখন ব্যক্তিত্ববান নয় এবং মাঝে মাঝে এর অপ্রিয় বিপরীতটিও যখন সত্য হয়েই দেখা দেয়, তখন অক্লেশেও সমস্যা আমরা কাটিয়ে আসতে পারি। যতদূর মনে হয় একটি অভিজ্ঞ উদার, সুসমঞ্জস মনের অকৃত্রিম বিকীরণই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা রচনায় আলোচিত হবার কথা, এর মধ্যে ঔদার্য এবং সামঞ্জস্যের বীজ জীবনে প্রায় জন্মার্জিত হলেও অনুভূতিজাত অভিজ্ঞতার ক্রমবর্ধমানতায় এর বিকাশ উত্তরোত্তর প্রগাঢ় সার্থকতাকে খুঁজে পায়।

প্রকৃত ব্যক্তিত্বের এই আশ্চর্য অন্তর্লীন ঋদ্ধি আছে বলেই, তার অনবদ্য প্রকাশ, যাকে আমরা বিকীরণ বলেছি, অ-পূর্ব ভাবেই স্পর্শিতের রূপ বদল করতে পারে। ইতিহাস-পুরুষের নিরন্তর এষণা একটি ধূসর যুগ থেকে আর একটি নবযুগের-প্রাগূষায় সেই সব ব্যক্তিত্ব-বানদেরই আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকে যাঁরা চেষ্টামাত্রে প্রচলিত গতানুগতিকের রূপবদল করতে পারেন। এঁরা সকলেই যে প্রতিভা তাও নয়, যদিও প্রতিভার মধ্যে ব্যক্তিত্বের একটি পরম উৎকর্ষ দর্শন করা যায়। প্রকৃত ব্যক্তিত্ববানের হাতে, একারণেই, আমাদের জীবন চর্যার এবং চর্চার প্রতিটি বিভাগই আলোকিত হবার আশা রাখে।

এ প্রবন্ধের মূল আলোচনায় কেন্দ্রচ্যুতির আশঙ্কা না থাকে এজন্যে আপাততঃ সংক্ষিপ্তির নির্বন্ধে কবিতার আলোচনায় আসতে পারা যায়। বাহুল্য হলেও বলা যায়, কবিতার স্বরূপ-নির্ণয় এ প্রচেষ্টায় প্রতিপাদ্য নয়—সৎ-কবিতার উৎসারে ব্যক্তিত্বের অবদানটুকুই শুধু অনুধাবনের যোগ্য বলা যায়।

ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে পূর্বোক্ত আলোচনায় অভিজ্ঞতা, ঔদার্য আর সামঞ্জস্যের কথা বলা হোলো। যতদূর মনে হয় এ তিনটি শব্দকে কবিতার বিচারে প্রতিমান হিসেবে গ্রহণ করায় মোটামুটি ভাবে কোনো আপত্তির সিদ্ধতা নেই। অভিজ্ঞতা তার স্থূল-সূক্ষ্ম দু'রূপেই কবিতা তথা সাহিত্যের রাজ্যে সিঁড়ির প্রথম ধাপ—আর এ-নিয়ে বিচারের আসরে বাগ্‌বিতণ্ডার শোভা পায় না। এর পরে আমাদের ব্যবহৃত দ্বিতীয় শব্দটি নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। আর



মনে হয় এখানেই গুরুত্ব কিছুটা গম্ভীর। ঔদার্যের ক্ষেত্রে হিসেব করতে এসেই ব্যক্তিত্ববানকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীর থেকে পৃথক করে চিনে নিতে দেরী হয় না। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য মননের অর্জিত বলেই ব্যক্তিত্বের অনুকারী হয়েও তার সমান নয় ; তার সংকীর্ণতায় জগৎকে হস্তামলকবৎ করবার অহঙ্কার যদিও স্বভাবসিদ্ধ, তবু তার দ্বারা বিচ্ছিন্ন সমস্ত প্রান্তিক প্রবণতাগুলির অভিনব সমন্বয়ী একীকরণের সংসিদ্ধি সম্ভব নয়। কবিতার ক্ষেত্রে এই ঔদার্যের প্রশ্নটি বহুযুগের সমর্থন পেতে পেরেছে এবং সে রাজ্যে দাতা এবং গ্রহীতা উভয় সম্পর্কেই কথাটি সুপ্রযোজ্য। প্রসংগত একথার স্মরণেও আপত্তি থাকেনা যে এই উদারতার জন্যেই আজপর্যন্ত মহাকাব্যগুলি জ্যেষ্ঠের সম্মান পেয়ে আসছে ; অন্যপক্ষে লিরিকের মিষ্টিসুরে তৃপ্তি মিললেও, নিতান্ত ঘরোয়া ব্যক্তিগত সুরের আতি বহুসমালোচককে পীড়িত করেছে দেখা যায়। যেমন ক্লাসিক সাহিত্যকে অমোঘ স্বাস্থ্যের সংগে তুলনা করে রোমান্টিক সাহিত্যের উপমায় গ্যয়টে বলেছিলেন অসুখের কথা। ঔদার্যের প্রশ্ন ছেড়ে আসবার আগে আর একটা কথা স্মরণ করে নেওয়া যায়, আর তা' হোল আস্বাদের কালেও ঐ বিশেষ সদগুণটির প্রয়োজনীয়তা। তবে এ প্রসংগ বর্তমানে আলোচিত হবার নয় বলেই বর্জ্জিত হোলো। এর পরে, সামঞ্জস্য, শব্দটিকে আলোচ্য ধরে নিলে দেখা যায় ঔদার্যের ব্যাখ্যায় এ কথাটি পূর্বেই আলোচিত, কারণ একথা নতুন করে বোঝাবার নয় যে সামঞ্জস্য ছাড়া যে কোনো রকম উদার সমন্বয়ই অসম্ভবের কল্পনামাত্র ; তবে কবিতার তথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই সামঞ্জস্য বা সুমিতি মনকে রূপাদর্শের একটি সার্থক এবং অভিনব প্রমিতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে—এর পরে এ সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলার নেই।

ওপরের বক্তব্য হয়তো শেষ পর্যন্ত এই কথাটাই বলার চেষ্টায় বিফল হোলো যে ব্যক্তিত্বের সংগে সাহিত্যের এবং বিশেষতঃ কবিতার আত্মার একটি স্বারূপ্য বর্তমান। অতঃপর যে কথা বলবার চেষ্টা করছি, তা' হোলো এই যে, এই স্বারূপ্যের প্রতীয়মানতা হয়তো বৃহত্তর অর্থে একটি মানস-প্রণালীর অভিব্যক্তি। ব্যক্তিত্ব যে কি ধরণের বিকীরণ সে কথা পূর্বোক্ত হয়েছে। বর্তমানে বলা যায় সৎ-কবিতা হোলো ব্যক্তিত্বের বিকীরণ। প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অভাব ঘটলে কবিতার রক্তাল্পতা অবধারিত, আর, এ দৈন্য রাশীকৃত অলংকারেও ঢাকা পড়বার নয়, কারণ পৃথিবীর বহুকালের সাহিত্যের ইতিহাসই তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। কবিতা বুদ্ধির চাষ নয় বলেই স্বজ্ঞার গভীরতায় প্রকৃত ব্যক্তিত্ববান যে অলৌকিকের স্পর্শ পেতে পারেন, অপরের কাছে তা দুরাশা। মুষ্টিমেয় খণ্ড-কবিতায় বর্তমানের আসর জমালেও, প্রকৃত ব্যক্তিত্বের অভাবে সেই সমস্ত বিচ্ছিন্নতা পূর্ণতা না পাওয়ায় বহু আকৃতির ভবিষ্যৎভাগ্য যে উজ্জ্বল হয়নি, এ দৃষ্টান্ত বিরল নয়—তাঁরা কোনোদিনই সৎকবি অথবা মহৎ কবি হতে পারেননি।

# পাকা ধানের গন্ধ

## কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষা, সংস্কৃতি আর সভ্যতার ইতিহাসের তরুণ অধ্যাপক কবি অনুপম সরকার একটা আশ্চর্য্য মিনে-করা লাল মাছ। তবুও অনুপম যে কেন মেয়েভীরু, এ তথ্য তিনি নিজেও জানেন না, তাঁর বন্ধুবান্ধবগোষ্ঠীরও কেউ না। আসলে পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধকে মনে মনে জপেই অনুপম সরকার তৃপ্ত। গুহা-মানুষ থেকে ট্রামবাসের মানুষ পর্য্যন্ত এক বিস্তৃত মিছিলকে এক টুকরো ক্লাস-ঘরের মধ্যেই স্বচ্ছন্দে জপে যেতে পারেন তাই ছাত্র-কান্তি অনুপম।

পূজোর কলেজ-অবসরে এ হেন অনুপম লোটাপাহাড়ের অল্পলোক ষ্টেশনে নামলেন একদিন। সঙ্গে আনলেন বন্ধুবান্ধবদের বিদ্যুৎ-বিদ্রূপ ঃ

—বুঝলে মেয়েভীরু সরকার, একটু বাইরে ঘুরে এসো। শহুরে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে না পারো অন্ততঃ সাঁওতাল কোল ভিল মেয়েদের দেশে গিয়ে শুধু হাঁ করে তাকিয়েই থেকো ওদের দিকে, তাহলেও যথেষ্ট উন্নতি হবে তোমার। মেয়েদের কলেজ থেকে "বেটার চান্স" পেলে বোকার মতন "রিফিউজ" করতে হবেনা তাহলে। আর তাছ ড়া ভয়েরো কিছু নেই। ওরা 'ব্রুট্'ও বলবে না, মাসতোত পিসতোত দাদাদের প্রাচীরও তুলবে না তোমার চারপাশে।

অবশ্য শুধু বিদ্রূপ প্রেরণাতেই অনুপম লোটাপাহাড়ে আসেন নি, কাঠব্যবসায়ী মামার স্থান-বর্ণনা-সমেত আমন্ত্রণলিপিও ছিল প্রায় ছ'মাস আগে থেকে।

ছোট স্টেশন লোটাপাহাড়, সিংভূমের মানচিত্রে সারাদিন ধরে তর্জ্জনী চালিয়েও লোটাপাহাড় নামের বিন্দু খুঁজে পাওয়া যাবেনা। শরৎকালটা শুধু লোটাপাহাড় স্টেশনে কিছু লোক ওঠে, নামে, কিন্তু বন-কাটার সময় শেষ হলে বুকিং কুঠরীর টিকিটবাবু অপর্য্যাপ্ত ঘুমোন, সেই সঙ্গে ঘুমোয় লোটাপাহাড়। জায়গাটার আরো বহু খুটিনাটি বিষয় জেনে নিয়েছিলেন অনুপম এবং শেষ পর্য্যন্ত একটা ভ্রমণ-আকর্ষণই বোধ করেছিলেন।

কিন্তু মামার কাঠবাংলোর সামনে পৌঁছে বিপদে পড়তে হ'ল। মামা নেই, আর কেউ না থাকার সাক্ষী একটা সাত লিভারের তালা ঝুলছে দরজায় শুধু। পাশের একটা দোকান থেকে সংবাদ সংগ্রহে জানলেন মামা চাঁইবাসায় গেছেন, ৭।৮ দিনের মধ্যেই হয়ত ফিরবেন। ফিরে যাবেন কিনা ভাবলেন একবার। কিন্তু ফেরার গাড়ী মাঝরাত্রের দিকে। তাছাড়া লোটাপাহাড়ের নির্ম্মল আশ্বিনের নীচে, শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়ের মাথায় অপূর্ব্ব সূর্য্যের



সকাল, সবুজ-আগুন জঙ্গলে গলারাঙ্গা হরিয়ালের গান, অনুপম অপেক্ষাই করবেন স্থির করলেন।

স্টেশনের কাছে কাঠব্যবসায়ীদের জন্যে হোটেল আছে এক বাঙ্গালীর, সেই একমাত্র বাসসহ হোটেল এবং সেখানেই গেলেন জিনিষপত্র সমেত। কিন্তু হোটেলের স্বরূপ বেরোল সন্ধ্যের পর। সন্ধে হলে দেয়ালে দেয়ালে ম্লানজ্যোতি লম্ফ আটকে যায় একমাত্র চাকরটা। হোটেলের বিবর্ণ-চুন দেয়ালগুলো ঘি-ঘি রঙের হয়ে আসে, আর তখন দিনের খোলস বদলায় সুভাষ হোটেল। দেশী মদের গন্ধে হোটেলের রাত্রি মৌ-মৌ। কবি অনুপম সরকার, পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-রস-গন্ধকে যিনি মনে মনে জপে যেতে অভ্যস্ত, ভোগের এতটা বিনির্ম্মোক প্রকাশে ইতস্ততঃ হলেন যথারীতি। কিন্তু করার নেই কিছু। লোটা-পাহাড়ের আকাশ আশ্চর্য্য আকর্ষণ-নীল,—অতএব মামার জন্যে অপেক্ষাই করতে হ'ল। আর তাছাড়া অনুপম যখন মদ্যপ নন তখন 'জলে মদ মেশালে'ও সুভাষ চক্রবর্ত্তী লোকটা যথেষ্ট আলাপী। গল্পগুজবের ঠোঙ্গায় ওঁর সমস্ত অসুবিধা-অস্বাচ্ছন্দকে ভরে রাখলেন।

কিন্তু রাত্রিতে খাবার সময় চরমতম অস্বস্তির সম্মুখীন হলেন পনুপম।

—কিরে সিভিলা, এত তাড়াতাড়ি যে? তোদের ওই এক দোষ, যত পাস তত চাস। এই ত পরশু দুনম্বর কাঠবাবু চলে গেছে, আর কেউ আসেনি ত। শুধু—।

খাবার টেবিলের ধারে অবাক চোখে চেয়ে থাকা অনুপম সরকারের দিকে চোখ পড়তেই বাকী কথাগুলোকে তাড়াতাড়ি এক ঢোকে গিলে ফেললেন ম্যানেজারবাবু। মেয়েটা ততক্ষণে একটা দেয়াল-আলোর নীচে এসে দাঁড়ালো। একটা কালো পাথরের মুখ। কিন্তু প্রচ্ছদে শহুরে হাওয়ার প্রকট আভাস। শাড়ী, জামা, বোধ হয় ( ইতস্ততঃ হলেন অনুপম ) সেমিজও। কিন্তু সিভিলার এক-দৃষ্টি তাকিয়ে-থাকার সামনে বেশীক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ-চোখকে সোজা রাখতে পারলেন না। থালার ভাতের দিকে তাকালেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অনুভব করলেন একজোড়া কৌতূহলের আলো ওর সারা শরীরে পায়চারী করছে ক্রমাগত। অবশেষে এক সময় নিভল মনে হল।

—ভাত দিবেন গো বাবু, আর চার আনির মাছ। চেয়ায় টানার শব্দে বুঝলেন মেয়েটা বসল কোনো এক টেবিলের ধারে। সাহস-অন্তর্হিত অনুপম সরকার যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড়লেন।

মেয়েটা চলে যাবার পর ম্যানেজার সুভাষ চক্রবর্ত্তী নিজে থেকেই বল্লেন,

—আর বলবেন না স্যর, মিশনারীদের জ্বালায় জাতটা একেবারে উচ্ছন্নে গেল। একটা মুণ্ডা কিরিসচান মাগী রাতারাতি সভ্য হয়ে নীচে নেমে এসেছে। মাটী কোপাতে

ঝুঁড়ি বুনতে আজকাল ওদের হাত কালো হয়। এখন আবার অনেকে জুতোও পরে। অথচ দিন চলে কাঠবাবুদের দয়াদাক্ষিণ্যে।

তারপর আরো বিশদ হলেন ম্যানেজারবাবু।

শুধু সিভিলা নয়, আরো চারজন মুণ্ডা মেয়ে নেমে এসেছিল লোটাপাহাড়ের পশ্চিম কোন থেকে। তার মধ্যে চারজন কোনো রকমে লোটাপাহাড়ের ছোট ষ্টেশন থেকে শেষ না তুলে, টাটানগর, খড়গপুর, চাইবাসার শহুরে ছায়ায় পৌঁছুতে পেরেছে। এখন পড়ে আছে শুধু এই সিভিলা, ওদের মধ্যে দেখতে যে সবচেয়ে কুৎসিত, যে জন্য অনেক সময় কাঠবাবুরা 'এঁটোপাতা' বলেও ডাকে ওকে।

কিন্তু 'এঁটোপাতা'র জ্বলজ্যান্ত যৌবন অনস্বীকার্য্য। বন কাটার সময় হলে বাংলা বিহারের বিভিন্ন শহরে সংসার সুখকে মূলতুবী রেখে আসে কাঠব্যবসায়ীরা এবং এসে যার প্রয়োজন শরীরের প্রতিটী পেশীতে প্রচণ্ড ভাবে অনুভব করে, তার নাম সিভিলা দোরাং, লোটাপাহাড়ের 'এঁটোপাতা'। আগে ছিল আরো চারজন, ক্রিশ্চিয়ানী, মেরী, লিসা, এলিজাবেথ। মুণ্ডা মেয়েদের মধ্যে যারা প্রথম প্রভু যিশুর কাজল পরেছিল চোখে আর যাদের ফাদার ব্রাওয়েন শুনিয়েছিলেন,—The light of Church is the light of civilisation।

ফাদার ব্রাওয়েনের গম্ভীর বক্তব্যে অপূর্ব্ব প্রেরণা পেয়েছিল পঞ্চ-অরণ্য-নারী। তাই লোটাপাহাড়ের শ্রেণীবদ্ধ শালবন, উৎসব রাত্রির মহুয়া গন্ধ আর ধুমকুড়িয়ার ওঁরাও যুবকের প্রস্তর শরীরের চুম্বক বেড়া সহজেই ডিঙ্গোতে পেরেছিল তারা। লোটাপাহাড় ষ্টেশনে, কাঠ চেরাই কারখানায় একটু উজ্জ্বল আলো জ্বলত। আর পাহাড়ের অন্ধকার পশ্চিম কোন থেকে দশটা চোখ আলো উৎসুক হয়ে নাচত। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ত অগষ্টাস চার্চ্চের ফাদার ব্রাওনের আলোকবাণী : —সেণ্ট অগষ্টাস তুমাদিগকে পথ দেখাইবে। তোমরা মনুষ্যত্ব লাভ কর। সভ্য জগতের সংস্রবে আসিয়া নিজের এবং সমাজের উন্নতি বিধান করিয়া প্রভুকে সুখী কর। আমেন!

কতক্ষণ পর ম্যানেজার সুভাষ চক্রবর্ত্তী গলামুখের পরিশ্রম থামিয়ে খেতে গেলেন কিছুই টের পেলেন না অনুপম। হোটেলের সব দক্ষিণের এক-লোক-শোয়া ঘরটায় শুয়ে মানুষের সভ্যতার সমগ্র বিবর্ত্তনবাদের গল্প জপে গেলেন ইতিহাসের তরুণ লোক অনুপম। বেদুইন মানুষের জনপদ গড়ার কাহিনী ভাবতে ভাবতে ঘুমোলেন অবশেষে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা থেকেই ভাবনার গলিতে অজস্রবার পায়চারী করলেন অনুপম। কলকাতা থেকে অনেক দূরের জায়গা লোটাপাহাড়। 'অনুপম সরকার' নামটার আগে



বন্ধুবিদ্রূপের "মেয়েভীরু" উপসর্গ। অথচ, অথচ সিভিলাকে চেনা কষ্ট নয়, ঘনিষ্ঠ হওয়া ত নয়ই। আর চরিত্রের একটা ভাত টিপলেই কম বেশী প্রত্যেককেই চেনা যাবে। অন্ততঃ "মেয়েভীরু" উপসর্গটা লোপ পাবে। এতে অনুপম নিঃসন্দেহ। কলকাতার বন্ধুবান্ধবরা শুধু 'হাঁ করে চেয়ে থাকা'র পরামর্শ দিয়েছিল। কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে কি কিছু ভাববে সিভিলা? কবি অনুপম সরকার, যার কলকাতার ঘরে যামিনী রায়ের ছবি, বিছানায় বাটিকনক্সার চাদর, বৈঠকখানায় শান্তিনিকেতনের মোড়া, তাকে কি কিছু বলা সম্ভব সিভিলা দোরাংএর পক্ষে? সাহসের বর্ম্মটাকে অনুপম শক্ত হাতে আঁটলেন।

সন্ধ্যের পর সারা হোটেল যথারীতি মদ-ঝিম্-ঝিম হয়ে এল। ক্রমাগত সিগেরেট ধরিয়ে ধরিয়ে অপেক্ষার ঘুম তাড়ালেন। অবশেষে আলোর নীচে এসে দাঁড়ালো সে, আগের দিনের মত। ঠিক আগের দিনের মতই কবি অনুপমের সভ্য শরীরে বন্য আলো ফেলল একজোড়া। কমিয়ে কমিয়ে অবশেষে নেভাল।

—আমাকে ভাত দিবেন গো বাবু, আর চার আনির মাছ।

আজকে আর তাড়াতাড়ি খাওয়ার চেষ্টা করলেন না অনুপম। পর পর তিনবার ভাত চাইলেন। আর ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে বারবার অনুভব করলেন শরীরে সেই শাণিত আলোর সঞ্চরণ। কিন্তু খাওয়াটাকে কিছুতেই সিভিলার চেয়ে দীর্ঘতর করতে পারলেন না। খেয়ে উঠে যথাসম্ভব আস্তে-পায়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আর আবিষ্কার করলেন, প্রায় তখুনি সিভিলাও খাওয়া শেষ করে লোটাপাহাড়ের পাহাড়ী রাস্তায় ছায়া ফেলল দাঁড়িয়ে।

—তুই বড় সরমি মানুষটা বাবু। গলায় পাহাড়ী ঝর্ণার নূপুর বাজল। মেয়েভীরু অনুপম যথারীতি নাড়ীতে নাড়ীতে সেতারের তার-কম্পন শুনলেন। সিভিলা ততক্ষণে বাঁ পাশে এসে দাঁড়ালো ওর।

—কাল এলি না কেন? সব কাঠবাবু মোকেই ডাকে, আর কেউ নেই এ তল্লায়।

—আমি, আমি কাঠবাবু নই। আমার নাম অনুপম সরকার।

সিভিলার প্রশ্ন-বল্লমের সামনে উত্তরের ঢালটা যে নিতান্তই দুর্ব্বল ভাবে তুলে ধরেছেন মনে হতে নিজেই থেমে পড়লেন। তাকাবো না তাকাবো না করেও ওরই মধ্যে সিভিলা দোরাংএর কুৎসিত পাহাড়ী মুখের দিকে চকিত চোখ ফেলে আবার ঘুরিয়ে নিলেন একটা তিমির-মণ্ডপ পাহাড়ের চূড়োর দিকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে তৈরীও করে নিলেন খানিক। কলকাতার মেয়েভীরু নাম ঘোচান অসম্ভব। বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টার দেয়াল দুর্লংঘ্য, যার সে দেয়ালের কান প্রখর। লোটাপাহাড় অনেক দূরের পথ, আর রাত্রির ঘেরাটোপে কেউ চিনবেও না এখানে ইতিহাসের তরুণ লোক কবি অনুপম সরকারের রিমলেস চশমার মুখ।

তাই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সহজ হলেন।

—কোথায় থাকো তুমি ?

—হুই পাহাড়ের পশ্চিমটেরে, চার্চ্চের বস্তীতে। তুমি কাঠবাবু নও ? হেথাকে এলে কুথা থেকে ?

—কলকাতা।

—কলকতা ? হুই-টাটানগর, খড়গপুরের উত্তুর ছাও ? ফাদারব্রাওন আসছিলো কলকাতা থেকে। ভারী গোরো সুন্দর নোক। তুমার মত চোশমা ফাদার ব্রাওনের।

সিভিলার মন্ত্রোচ্চার গলা সম্ভ্রম-উষ্ণ হ'য়ে এল। এবং তাতেই সুবিধের একটা মৃদু গন্ধ পেলেন অনুপম। ফাদার ব্রাওয়েনের সম পর্য্যায় ভুক্ত আসনে পৌঁছে সহজভাবে কথা বলার অসুবিধেকে কাটিয়ে উঠলেন তাড়াতাড়ি।

—চলো পাহাড়ের নীচ দিয়ে ঘুরে আসি একটু।

—এত রাতকে যাবি পাহাড় নীচে ?

—কেন কি হয়েছে ? অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন অনুপম। আর কি একটা বলি-বলি কোরেও ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেলো সিভিলা।

লোটাপাহাড়ের বুনো রাত্রির মশারিতে অসুবিধের সব মশাকেই এড়িয়ে গেলেন, যথেষ্ট ঘোরা হ'ল, হাসি গল্প, ভৌগোলিক অনুসন্ধিৎসা ইত্যাদি সব কিছুতেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন অনুপম, কিন্তু অসুবিধে বাঁধল শেষ মুস্কিলটাকে নিয়ে। সারারাত লোটাপাহাড়ের শালবনবীথিতে ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। জোৎস্নার দুর্ব্বিসহ বোঝা বয়ে বয়ে মেঘের পালকী থামে পাহাড় চূড়োয়, আকাশে একঝাঁক আলোর পায়রা পাখা নেড়ে নেড়ে অস্থির-জ্যোতি। শালপাতা তার কিছু আলো ধরে রাখে, কিছু ছাড়ে, হাওয়ায় ছায়ান্ধকার পড়ে মাটিতে, পাতা ঝরে, সেই সঙ্গে ঝরে কবি অনুপমের 'মেয়েভীরু' উপসর্গ, তবু, তবু সারারাত ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু ঘুরে বেড়ানোর ব্যতিক্রমটার কথা হঠাৎ মনে আসতেই ভয়ে নীল হয়ে গেলেন অনুপম। আর সঙ্গে সঙ্গে শুনলেন আশংকার সেই ভয়াবহ অনুরোধটা।

—তুর ঘরকে চল্ বাবু। নিদ লাগছে বড়।

'মেয়েভীরু' উপসর্গ-সারথি আবার এলো কবি অনুপম সরকার নামের রথের আগে। একটা অদ্ভুত ভয়ের হাতে নিজেকে সঁপে দিলেন অনুপম, আর ভয়ের হাতে আশ্চর্য্য চাবুক, অনুপমের দু'পা জুড়ে অদ্ভুত এক গতি এলো।—এই নাও, এই যে। অন্য কারো গলায় যেন কথা বললেন। বলে সিভিলার হাতে দুটাকার একটা নোট রাখলেন। তারপর সিভিলার বিস্মিত হা-র সামনেই প্রায় দৌড়ে পাহাড় ছাড়লেন। হোটেলের নিজের ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করেও ভয়ে ভয়ে বাইরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।



সেদিন যন্ত্রণার এক বিনিদ্র রাত্রি এলো। সিভিলার আকাঙ্ক্ষার সব কটা পাতাই উল্টে ফেলেছেন অনুপম। গুহা-মানুষের ইতিহাসের পাতাও অনেকটা এই রকমই।

পাকা ধানের গন্ধে বন-করিণী নেমে আসে গ্রামগঞ্জের খামারে।—একটা রূপক জপলেন কবি অনুপম সরকার। আর রূপকটা হঠাৎ কেন যেন ভালো লেগে গেলো তাঁর।

—পাকা ধান! পাকা ধান! স্বগতোক্তির মৃদু শব্দে ঘর গুন্-গুন্ হল খানিকখন।

ভোরের দিকে ঘুমের চাদরে চোখ জড়ালেন অনুপম।

পরদিন বিকেলে সিভিলা-প্রস্তুত হতে আরম্ভ করলেন। এলো সিভিলা, আলো ফেলল, কমিয়ে কমিয়ে নেভাল, অবশেষে যথারীতি ভাত চাইল।

খাওয়া আগেই শেষ করেছিলেন, হাত ধুয়ে তাড়াতাড়ি হোটেলের বাইরে এসে সিগারেট ধরালেন অনুপম।

মিনিট পাঁচেক পরেই আবার ঝরণার পাথরভাঙ্গা হাসি শুনলেন,—তুই বড় সরমি আর ডরপুক বাবু বটে।

কিছু বলতে পারলেন না উত্তরে, শুধু সিগেরেটে ঘন ঘন টান দিয়ে মুখের সামনে একটা ধূয়োর পর্দা দুলিয়ে দিলেন।—চলো আজ আর বেশী দূর যাবো না। অনেক প্রচেষ্টায় এইটুকু স্বরই ফোটাতে পারলেন।

ফেরবার সময় সিভিলা সত্যি একটু অবাক না হয়ে পারল না।

—চারঠো টাকা দিলি ? তুর ঘরকে লিয়ে—।

আবার।

আবার সারথি-ভয়। দ্রুতগতি হয়ে হোটেলে পৌঁছলেন। কিন্তু পরদিন সিভিলা কেঁদেই ফেলল।

—তুই রোজ রোজ এত্ত টাকা দিস, ঘয়ে লিয়ে যাস্ না, আমি জংলী বলে আমাকে পসন্দ করিস নী তুই। মোরা সকলে যিশুর নোক, আর তুই পড়ালিখা বাবু হয়ে!

লাল মাছ অনুপম সরকার, যার বাড়ীতে যামিনী রায়ের ছবি, বিছানায় বাটিকের চাদর, শান্তিনিকেতনের মোড়া বৈঠকখানায়, সিভিলার সঙ্গে সঙ্গেই কান্নাকে জপতে আরম্ভ করলেন। পাকাধানের জনপদে বন-করিণী আশ্রয়-উৎসুক, অথচ, অথচ নামের আগে একটা তীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ-বিদ্রূপ-ভার নিয়ে অত্যন্ত অসহায় অনুপম।

সিভিলার হাতে আট টাকার নোট রেখে যথারীতি পলায়ন করলেন।

কিন্তু দিন প্রতিদিন টাকার অংকটাকে দ্বিগুণ করে গেলেই যে আশ্রয়-চুপ হবে না

সিভিলা, এটা বোঝা কষ্ট নয়। কিন্তু মেয়েভীরু অনুপমের পক্ষে কর্তব্যের কটা দরজাই বা আর খোলা আছে!

একেই হোটেলের প্রায় সকলেই তাঁর পিঠের পেছনে ইদানীং কথা-উন্মুখ হতে সুরু করেছে।

—ঐ যে ঘূর্নী বাবু চললেন ঘুরতে।

বাস্তবিক উড়নি মেয়ের সঙ্গে শুধু শুধু রাত বিরেতে ঘুরলে 'ঘূর্নীবাবু' বলা খুব বেশী অন্যায় নয়। আরো অনেক সন্দেহই করতে পারে লোকে।

ম্যানেজার সুভাষ চক্রবর্ত্তী একবার বলেও ফেলেছিলেন,

—ইয়ে, মানে আমরা এখানে প্রবাসী লোক, এখানে আর কেই বা গুরুজন লাঠি উচিয়ে আছে, দরকার হলে ঘরেই ত দিব্বি গল্পগুজব করতে পারেন, মিছিমিছি রাতবিরেতে! প্রায় দমবন্ধ করেই কথাটা শুনতে হয়েছিল অনুপমকে।

কিন্তু পরদিন বিন্দুমাত্র বৈকল্য দেখলেন না সিভিলা দোরাং এর মুণ্ডারী মুখে। সে বল্লে,—চল্ লোটাপাহাড়ের হুই ধার থেন্ ঘুরে আসি। ভেবেছিলেন, বৃষ্টি-ভয়ে মেঘম্লান আকাশের কথা তুলে আপত্তি জানাবেন, কিন্তু মেয়েভীরু অনুপম মেয়েভীরু বলেই আপত্তির কণ্ঠ তুলল না, ফলে ওর অনিচ্ছুক হাতখানাকে সজোরে চেপে ওপরে উঠতে আরম্ভ করল সিভিলা।

লোটাপাহাড়ের জনপদ থেকে যখন পাহাড়ের গায়ে গায়ে অনেকখানি উঠে এসেছেন এবং যখন আশ্বিন বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা শালপাতার টোপরে বাজাতে সুরু করল, সম্বিত চিনলেন অনুপম।

--একি বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলো, আর ওদিকে কোথায় যাচ্ছ?

—চল্ না। আমার ঘর আছে উদিকে। তুই কলকাতার কত বড় বাবু।

—তা চলো। কিন্তু কে কে আছে তোমার ঘরে?

অদ্ভুত হাসির সাপ হিস্ হিস করল সিভিলার মুখে।

—কেউ না! তালা বন্দ থাকে রাত্রে আমার ঘর। এবার বৃষ্টির সমান্তরাল কেঁদে ফেলবেন মনে হল ওঁর। সিভিলা শত হাতে ধরেছে ওকে, গতি জুড়বারো উপায় নেই পায়ে। অনুপমের সেই আচ্ছন্ন ইতিহাস জপা ফিরে এল।···আসতেই হয় ওদের। সভ্যতার আগুনে ওরা আদিম পতঙ্গ। বিশেষ করে কবি অনুপম সরকার যাঁর চোখে ফাদার ব্রাওয়েনের মত রিমলেশ। অন্যান্য কাঠ-বাবুদের সঙ্গে যাঁর প্রভূত মৌলিক পার্থক্য তাকে না নিয়ে উপায় নেই সিভিলার।

দরজা খোলার শব্দে চমকালেন অনুপম। আরো চমকলেন যখন কেউ তাঁকে ঠেলে



ভেতরে ঢুকিয়ে নিজেও ঢুকল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও শরীর কম্পনকে কিছুতেই রুখতে পারলেন না।

—দরজায় ছিটকিনি বন্ধের শব্দ হল।

কলকাতার লোক অন্ধকারে কালো হয়ে এলেন। এই অন্ধকারের মধ্যে যে বিপদের কত বড় একটা ঝড় লুকিয়ে আছে মনে হতেই একটা ঠাণ্ডা শিরশিরানি অনবরত ওঠানামা করতে আরম্ভ করল মেরুদণ্ডে। অন্ধকার দানা বেঁধে বেঁধে হাত হলো। নিটোল দুটো হাত ঝুলল অনুপমের গলায়।

দূর থেকে একটা গানের কলি ভেসে আসার মতন আস্তে আস্তে মনে পড়ল অনুপম সরকারের ওঁর কলকাতার ঘরে যামিনী রায়ের ছবিটাকে, বাটিক চাদরের নক্সাগুলোকে, আরো অনেক অনেক সোনা মিনে করা মার্জ্জিতকে যা নাকি ওঁর ঘরে যথেষ্ট মানায়। আর মনে হওয়া মাত্রই জোর পেলেন পায়ে। দরজার দিকে ঘুরে হাঁটতে আরম্ভ করে দিলেন। অন্ধকারে দু-চারবার দেয়ালে মাথা ঠুকল, পেছনের দুটো হাড়ের চুড়ি পরা অক্টোপাস গলায় বারবার মালা হতে চেষ্টা করল। কিন্তু দরজা পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত।

সিভিলা সজোরে হাত চেপে ধরল, ওকে শুদ্ধু নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলেন অনুপম। একটা শরীরী ভয় যেন হাত এগিয়ে পেছন পেছন ছুটে আসছে ওঁর, এই ভেবে সিভিলাকে নিয়েই নীচে নামতে আরম্ভ করলেন।

—ঝুট আদমী তুই! তোর ঘর কলকাতার? অত্ত বড় শহরের লোক তুর মত? ছ নম্বর কাঠবাবুও ত কলকাতার লোক। ভুরুর ধনুকে ঘৃণা আর অবিশ্বাসের তীক্ষ্ণ দুটো তীর জুড়ল। যাবতীয় প্রশ্নের সামনে একটা নির্বোধ অনড় দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে রইলেন অনুপম। বৃষ্টিতে রিমলেসের কাঁচ ঝাপসা হয়ে গেছে জেনেও মুছতে ভুললেন।

জনপদে পাকাধান না পেলে বুঝি যাবতীয় গাছ পালা, বাড়ীঘর তছনছ করে ফেলে বনকরিণীর দল। প্রিয় রূপকটার মধ্যে ব্যাখ্যা ঢোকালেন অনুপম।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কিসের একটা শব্দে কান পাততে গিয়ে চুপ করে গেলেন।

মোটরের শব্দে পাহাড় উচ্চকিত হয়ে ওঠে। একজোড়া তীব্র আলো ক্রমশঃ কাছে ছুটে আসে। গাছের একটু আড়ালে সরে যান। আর কিছু বোঝবার আগেই আবিষ্কার করলেন—সিভিলা হাত নাড়তে নাড়তে নীচে নামছে দৌড়ে।

রিমলেসের ঝাপসা কাচএর ভেতর দিয়ে দেখতে পেলেন, সিভিলার ক্রমাগত হাত সংকেতে একটা লরী সজোরে ব্রেক কষল, নামল কে যেন। সিভিলার হাত ধরল অতি পরিচিতের ভঙ্গীতে। বৃষ্টির শব্দ ভেদ করে একজোড়া হাসি ভাসল বাতাসে। খানিক

পরে দেখলেন সিভিলা দৌড়ে আসছে ওঁর দিকে। আশ্চর্য্য, অনুপমের সামনে এসে দাঁড়াল সিভিলা।

—এই নে তোর টাকা। কয়েকটা নোট জামার ভেতর থেকে হাত ঢুকিয়ে বার করে তালগোল পাকিয়ে কবি অনুপম সরকারের হাতে গুঁজেই পেছন ফিরল।

তারপর অতি সংক্ষিপ্ত ঘটনা। শুধু লরীতে উঠবার আগে লোকটী কে দেখবার জন্যে আরেকবার চশমার কাঁচটা মুছলেন অনুপম। আর চমকালেনও সেই সঙ্গে।

লরীর শেষ শব্দটুকুও মিলিয়ে গেল। তবু অনুপম একক দাঁড়িয়ে রইলেন অন্ধকার পাহাড়তলিতে অতি ম্লান জ্যোৎস্নায় একটা সরু ছায়া পেতে। টাকার নোটগুলো অনেকক্ষণ ধরে ভিজে ভিজে হাতের চাপে ছিঁড়ে গেল।

অবশেষে, অবশেষে কেঁদেই ফেল্লেন।

পরদিন বিকেল পর্য্যন্ত একটা অব্যক্ত শোকচ্ছায়ায় শুয়ে বসে সময় কাটালেন অনুপম সরকার। কালকের স্মৃতির বড়শিটা কোথায় যেন আটকে আছে, সামান্য স্মৃতিমন্থনের নড়াচড়াতেই খচখচ করে ওঠে।

মর্বিড! মর্বিড বলবে কলকাতার বন্ধুবান্ধবরা!

মার্জ্জিত অনুপম মর্বিড? কথাটা মনে হতেই শরীর গুলিয়ে উঠল অস্পষ্ট অস্বস্তিতে। কর্ত্তব্যের অনেক যোগ বিয়োগ কষে স্থিতধী হবার চেষ্টা করলেন অনুপম।

সন্ধ্যেয় সিভিলা এল। কিন্তু অনুপমের প্রতীক্ষিত প্রত্যক্ষ শরীরে কোনো আলো পড়ল না আর।

চুপচাপ খেয়ে উঠে গেল সিভিলা। প্রায় তখুনি বাইরে এসে ছুঁলেন অনুপম সিভিলাকে।

—শোনো। প্রয়াস-গম্ভীর কণ্ঠে বল্লেন। ঘুরে দাঁড়ায় সিভিলা। জিজ্ঞাসার চোখ তুলে একটু ইতস্তত করে বলবার কথাটাকে মনে মনে বারচারেক জপে নিয়ে অবশেষে বল্লেন,—কলকাতায় যাবে আমার সঙ্গে?

কথাটা এত আকস্মিক যে শোনামাত্রই নড়ে উঠল সিভিলা।

—আমার কাছে কলকাতায়। দ্বিরুক্তি করে একটা মুণ্ডারী মুখের সামান্যতম প্রতিফলনের দিকে তাকিয়ে রইলেন অনুপম।

—রাতবেলার ডাউনে? ফিস ফিস উৎসাহ-উদ্বেল স্বর।

—রাতবেলার ডাউনেই। অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গলা অনুপমের।



সব ঠিক করে রেখেছিলেন। ম্যানেজারকেও বলা ছিল। পাহাড়ী পেঁচার ডানার ঝাপটায় ঝাপটায় রাত একটু ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাত একটার ট্রেন ধরবার জন্যে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

—ঘূর্ণীবাবুর সঙ্গে সঙ্গে উড়নী মেয়েটাও চলল নাকি? পিঠের পেছনের কথাকে আমল না দিয়ে সিভিলার হাত ধরে আরো জোরে পা চালালেন।

স্টেশনে পৌঁছে একটা অনুশোচনার বিষবৃক্ষে জল দিতে হল অনুপমকে। মামাকে কাল ফিরতে দেখেও দেখা না করে চলে আসাটা মার্জ্জিত অনুপমের পক্ষে অমার্জ্জিত অপরাধ ভাবতেই কেমন যেন ছোট হয়ে এলেন। কিন্তু ট্রেনের আলোয় ততক্ষণে ষ্টেশন আলো। কামরায় উঠে কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ নতজানু হয়ে বসল সিভিলা। নিষ্ঠার হাতে ক্রুশ আঁকল বুকে। ফাদার ব্রাওয়েনের মুখ মনে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে অপটু ভাষায় নিউ টেষ্টামেণ্টের কলি গুণ গুণ করল। শেষ হলে মুখ নামালো অনুপমের পায়ের পাতায়। অনুপম সরকার তখন শুধু একটা প্রচেষ্টার প্রতিমূর্ত্তি।

কলকাতার বন্ধুবান্ধবদের শাণিত মুখ ভাসে চশমার কাঁচে।

মেয়েভীরু হয় হোক অনুপম সরকার, কিন্তু মর্বিড নয়। মর্বিড বলবার সুযোগ কাউকেই দেয়া হবে না।

অনেক চেষ্টায় ভেতরের উত্তেজনাকে দমিয়ে নিঝুম হ'তে আরম্ভ করলেন চলন্ত কামরায়। কালকের স্মৃতির বড়শিটা বড্ড বেশী বিঁধে আছে। ইচ্ছে হচ্ছে ছুটে চলে যেতে, কিন্তু কিসে যেন বারবার ফিরিয়ে আনছে।

চুপ করে থাকা অসহ্য! চোখের রিমলেস ঠিক করলেন। কাশলেন মৃদু। গুহা-মানুষ থেকে ট্রামবাসের মানুষকে জপে নিলেন। তারপর বক্তৃতা-প্রস্তুত গলায় বলতে আরম্ভ করলেন অযথা,—সত্যি সিভিলা, সভ্য মানুষের আশ্রয়ই একমাত্র মুক্তির পথ। জীবন কত বড় হয়। কত আলো···

আরো অনেকক্ষণ অনেক কথা বলে গেলেন একটানা তারপর থামলেন একসময় এক কপাল ঘেমে। সিভিলা কিছুই বুঝল না। শুধু অর্থহীন দৃষ্টিতে অনুপমের রিমলেসের প্রতিফলিত আলোর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে চাপাস্বরে আবৃত্তি করে উঠল:
—ফাদার ব্রাওন। ফাদার ব্রাওন।

আর কিছু বলল না কেউ। শুধু অনুপম একবার ট্রেনের জানালাটা খুলবার চেষ্টা করতেই কেন যেন প্রবলভাবে বাধা দিয়ে উঠল সিভিলা।

—বন্ধ রাখো। বন বাদাড়ের হওয়ায় শীত শীত নাগে।

কলকাতায় নেমে হতবাক হ'ল সিভিলা। হৃত-সম্বিতও। কলকাতা। লোটা-পাহাড় থেকে কত সিড়ি উঠে এসে তবে এই জ্যোতি। প্রভু যীশুর মুখের জ্যোতি ও এই রকম। অল্টারের আলোয় চিকচিকে যীশুর মুখ মনে পড়ল। তাঁর সামনে প্রায়ই নতজানু হত সিভিলা সেন্ট অগষ্টাস চার্চ্চে। নতজানু হতে যাচ্ছিল সিভিলা, টেনে ধরলেন অনুপম।

—মোকে চার্চ্চে লিয়ে চল তুই। চার্চ্চে। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল সিভিলা।

রাস্তায় একটা বিশ্রী দৃশ্যের অবতারণায় আতংকিত হয়ে অনুপম ট্যাক্সী ডাকলেন।

ট্যাক্সীর গদীতে ডুবে আরো কান্না এলো মুণ্ডারী-চোখে।

—চার্চ্চ! চার্চ্চ! বাতিঘর। অধৈর্য্য আবৃত্তি শুনলেন পাশে।

—ভেবো না, এখানে আস্ত জায়গাটাই বাতিঘর। এখানে সক্কলে আশ্রিত। তুমিও আশ্রয় পাবে। কেঁদো না লক্ষ্মী মেয়ে। ঘুমপাড়ানী গান শোনানো গলায় কথা বললেন অনুপম।

সেণ্ট মেরী চার্চ্চের সামনে ট্যাক্সী থামতেই উঠি পড়ি করে ছুটল সিভিলা। চার্চ্চ রবিবার ছাড়া বন্ধ। বন্ধ দরজার সামনেই নতজানু হল সিভিলার শরীর। পেছন থেকে অনুপম দেখলেন ক্রমাগত ও কাঁদছে আর বুকে ক্রশ আঁকছে।

পাকাধানের গন্ধে পাগল হয়ে যায় বনকরিণীরা? ভাবলেন অনুপম সরকার।

ইতিহাস মিথ্যে বলে নি। ইতিহাসের তরুণ লোক অনুপম সরকারও না। আশ্রয়ের আশায় এসেছে সিভিলা। আশ্রয় তাকে দেবেন অনুপম।

—তোমার কত দেরী হবে? তাড়াতাড়ি এসো। আমি গাড়ীতে বসে আছি। কেঁদো না। কেঁদো না লক্ষ্মী মেয়ে। গলায় আবার ঘুমের সুর।

গাড়ীতে বসে অনুপম সিভিলার কাছে কি কি আছে ভাবলেন। কপর্দ্দক-শূন্য সিভিলার কথা মনে হতেই কেমন যেন ভাল লাগল তাঁর। আরো ভাল লাগল যখন একটা কথা বারবার আছাড় খেলো মনে।

মর্বিড নয় আর যাই হোক, অনুপম সরকার মর্বিড নয়।

আবার মুখ বাড়িয়ে দেখলেন সিভিলাকে। তখনো কাঁদছে সে। ফাদার ব্রাওনের বেলজিয়ম কণ্ঠে আলোকবাণী শুনছে ঃ সভ্যতার কথা।

—জোরে চল ড্রাইভার। জোরে। ডাইনে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে চল। প্রায় মিনিট খানেক চেষ্টা করে হঠাৎ আওয়াজ ফোটালেন অনুপম।

ক্রম-অপসৃয়মাণ আলো এসে ক্রমাগত প্রতিফলিত হতে থাকে রিমলেসের কাঁচে। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের অজ্ঞাতেই পাকাধানের স্বপ্নে চীৎকার করে ওঠেন কবি অনুপম সরকার। যামিনীরায়ের ছবি যাঁর পছন্দ, বাটিকের চাদর যাঁর বিছানায়।

# তোমার গল্পের শেষ

## মৃণাল।

দীপুদা—অল্প বয়সের কৌতূহলে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম—যা লেখো—সবই কি বানিয়ে লেখো? —আজ তার উত্তর পেলাম-হুইলার বুকষ্টলের হঠাৎ-নজরে-আসা এক গল্পের বইয়ে। যাক্—তোমার সাহিত্যের কতখানি বাস্তব—কতখানি বানানো সে তর্ক আজ তুলব না—আজ আমার সমস্ত অন্তর বারে বারে প্রশ্ন করছে—অতীত উত্তীর্ণ হয়ে, কি করে বর্ত্তমানে পৌঁছুব।

তুমি তোমার অতীতকে কত সহজে পিছনে ফেলে এসেছো! সত্য মিথ্যায় সাজিয়ে আজ তাকে রসের পর্য্যায়ে উত্তীর্ণ করেছ—আর আমি···! আজও কোন নাম না জানা সিগারেটের গন্ধে তোমাকে মনে পড়ে যায়। —আচ্ছা কি সিগারেট তুমি খেতে?

তোমার গল্পের সোমা নিজের ইচ্ছায় দিল্লীতে পড়তে গেল। কিন্তু কেন? সে প্রশ্ন নিজেকে করেছ? ধানসিড়ির দেশের মেয়ে তোমার কাজলমাসী পোপ সেজেছিল। আর তুমি? তুমিও কি সোমার কাছে নিষ্কৃতি চাও নি? তোমার চোখের বিব্রতি(?) আমার চেয়ে আর কে বেশী দেখেছে বল? প্রেমের চেয়ে Career বড় আর Career এর চেয়ে সাহিত্য—তোমার মনের এ ধারণা আমার চেয়ে আর কে বেশী জানে?

কাজল মাসীর স্নেহ যাবে শুকিয়ে, সমাজের চোখে ফুটবে বিদ্রূপের হাসি, তোমার সাহিত্য এতটা সইতে পারবে না। আর পারবে না জেনেই—তোমার চোখে সে দ্বিধা দেখেছি বলেই স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছিলাম। সে যে কতবড় শাস্তি—একবারও তা ভেবেছ?

যে শাস্তি আমি নিজেকে দিয়েছিলাম—তুমি তা পূর্ণ করলে একদিন ছোট্ট একটা খবরে। দিল্লীতে ভর্ত্তি হবার মাস দুই পরে খবর পেলাম তোমার বিয়ে। বুঝলাম আমায় তুমি ছুটি দিতে চাও, পড়ার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চাইলাম। অবসর সময়? অবসর সময়ে কত কাজ আছে—কিছু না থাকে—আছে নানারকম ক্লাব—আছে নানা জনহিতকর অনুষ্ঠান—তার জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরে টিকিট বিক্রী কর, চাঁদা চাও—আছে পিকনিক্, পার্টি·····সময়টাকে টুকরো টুকরো করে ছিটিয়ে দিলাম ব্যস্ততার মধ্যে। চেষ্টা করলাম যাতে তোমার জন্যে একটুও সময় না থাকে।

দীপুদা—আমায় ক্ষমা কর; আমার মনের এতটুকু পিছুটান আমি রাখতে চাই নি—মনে মনে একবারও কামনা করি নি যে আমায় তোমার মনে পড়ুক—তোমার সুখের একতিল কম হোক। এত করেও তোমায় ভুলতে পারি নি। দীপুদা, আমায় মাপ কর তোমায় না ভুলতে পারার অপরাধ তুমি নিয়ো না।

তোমার কাছে থেকে যতই দূরে সরে যেতে চেয়েছি—ততই যেন তোমায় দেখেছি হঠাৎ পথের বাঁকে, পরিচিত বন্ধুদের মুখের ভাঁজে।

ঠিকই লিখেছ—তোমার সঙ্গে আমার যে পরিচয় সে প্রেম নয়। বারবার, কতবার প্রেমে

পড়েছি দিল্লীতে। তোমার সাথে দুবছরের পরিচয়ে যে কথা মুখে আসে নি—এদের সাথে দুদিনের পরিচয়ে সে কথা অনায়াসে বলেছি। বলেছি,—"তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কেন এলে না? জানো আমায় কষ্ট দেওয়া সহজ—তাই কষ্ট দাও।" একরকম কথা তোমায় বলব সে সাহস কিন্তু এক-মুহূর্ত্তের তরেও তোমার কাছে পাই নি। প্রেম আনে সাহস আর তোমার কাছে আমার কেবলই ভয়, পাছে একটা কথাও আমার বেফাঁস হয়ে পড়ে। তাইত বলি একদিনের জন্যও তোমার সাথে প্রেমে পড়ি নি। তোমার তিরস্কারের চেয়েও ভয় করেছি তোমার চোখের কৌতুক আর বিদ্রূপ মেশানো ঈষৎ হাসি।

দিল্লীতে আমার এই নবপরিচিতদের মধ্যে কেউ যে কখনও আমার মনকে দোলা দেয় নি বা স্পর্শ করে নি তা নয়। কারও কারও স্নেহে মন হাল্কা হয়েছে—চোখে জল এসেছে কিন্তু সে তোমারই গলার আওয়াজ পেয়ে, তোমারই কথা ভেবে। ভাল লাগা যখনই স্নেহে রূপান্তরিত হয়েছে—দীপুদা, তখন তার কথায় তোমারই কথার সাড়া পেয়েছি—"সোমা চেয়ে দেখো কে এসেছে—" অমনি ফিরে গিয়েছি কলকাতার মেয়ে-হোষ্টেলে, যেখানে তোমার সোমা বিকেল পাঁচটায় তোমার অপেক্ষা করছে। কলেজের পরে বেড়াতে যাওয়া সে আমাদের নিয়মে দাঁড়িয়েছিল॥ কলকাতা থেকে সিউরী ট্রেণের কথা আমার মনে নেই—তবে মনে আছে আরেকদিনের কথা। ছুটির দিন তুমি আমায় সকালে নিয়ে গেলে তোমার মেসে। সেখানে খাওয়া দাওয়া করে তিনটার শোতে সিনেমা দেখে হোষ্টেলে ফিরব। এতে কোন বাধা ছিল না—তুমি আমার লোক্যাল গার্জ্জেন ছিলে। খাওয়ার পরে একটুক্ষণ ঘুমিয়ে উঠে দেখলাম তুমি তখনও তোমার রুমমেটের বিছানায় ঘুমিয়ে আছ—ভেতর দিকের দরজাটা বন্ধ—সামনে একখানি বারান্দা—সেখানে দাঁড়িয়ে গাড়ীর আওয়াজ শুনলাম আর দেখলাম লোকজনের ভীড়।

একটু পরে ঘরের মধ্যে এসে বসলাম—একলাটি ঘুমোচ্ছ—চেয়ে দেখবার এর চেয়ে বেশী সুযোগ পাওয়া যাবে না—এই লোভেই বুঝিবা লোকজনের ভীড় আর গোলমাল ভালো লাগল না। তোমার দিকে চেয়ে মনে হল যতই তোমার সাথে বেড়াতে যাই, তোমার সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি—এত কাছে বুঝি কখনও পাইনি। মনে হ'ল—সকলের থেকে দূরে—এমন কি তোমার মনের সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব থেকেও দূরে সরে এসে আমার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছ। কিসের একটা অস্বস্তিতে মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল জানি না—মনে হল তোমায় জাগিয়ে দি। তোমারই একটা জামা পাশে পড়ে ছিল, তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারলাম তোমার গায়ে—তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আরও একদিনের কথা মনে আছে—কেষ্টনগর মামার বাড়ী গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ফিরছি। বোমা পড়ার হিড়িকে দলে দলে লোক পালিয়ে চলেছে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায়—কেউ বা ভয়ে, কেউ বা সত্যিই আশ্রয় হারিয়ে।

ভীড়ের চাপে তোমার কাছ থেকে কখন ছিট্‌কে সরে গেছি খেয়াল নেই—তারপর একসময় পেছনের চাপে গাড়ীর মধ্যে উঠে এলাম—মাটিতে পা না রেখেও চলা যায় তার অভিজ্ঞতা হল। গাড়ীতে উঠতেই দেখলাম তুমি একদিকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে ইশারায় কাছে ডাকছো। কাছে পৌছুতে আমার মাথায় হাত দিয়ে বললে 'ধৈর্য্য হারাস না'। সে বলা ছিল তোমাকেই। তোমার মুখেই পরে শুনেছি—



সে সময়টা তুমি অসুস্থ হয়ে চেতনার শেষ সীমায় পৌছেছিলে। আমার মাথায় হাত রেখে, আমাকে আশীস দিয়ে সেই চেতনা ফিরে পেলে।

ধৈর্য্য হারাইনি একটুও—চতুর্দ্দিকে আশ্রয়প্রার্থীর দল—আমি-ই শুধু আশ্রয় পেলাম তোমার বুক ঘেঁসে। এমন কাছে কখনও তোমায় পাই নি—তোমার সেই একটুখানি স্পর্শ আমি গ্রহণ করেছিলাম, সমস্ত মন দিয়ে, তারই মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করেছিলাম, ধৈর্য্য হারাব কেন? যুগ যুগ—ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে পারি এমনি একটি ভীড়ের মুহূর্ত্তের জন্য। সেদিন সে রক্তের দোলা আজও আমার মধ্যে থামে নি। সেই এক মুহূর্ত্তের কাছে আমার সমস্ত জীবনের পরাজয়। কিন্তু এ প্রতীক্ষা তুমি স্বীকার করো না সেই খবরই একদিন আমায় দিলে চিঠির মারফৎ।

তোমার গল্পের সোমা ম্যালিগনেন্ট ম্যালেরিয়া হয়ে মরেছে—ঠিকই লিখেছ—সেই হাসিখুশী সোমা আজ সত্যিই নেই। কিন্তু তার গতি হয় নি আজও। তার আত্মা নিরাবলম্ব হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে মেয়েরা স্বামী সংসার পেয়েও সুখী নয়—তাদেরই চোখে খুঁজে পাবে সোমার প্রেতকে, তার তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি এক ফোঁটা জল খুঁজে—হা, হা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যার প্রেমে তর্পণ সম্ভব ছিল—পাঁজীতে লেখা আছে তার জল চলবে না।

নিশ্চয়ই তোমার মনে প্রশ্ন উঠেছে: "বিয়ে করেও সুখী হও নি?" হ্যাঁ, সুখী হয়েছি—সেদিন তোমার কাছে সর্ব্বদা সাবধানে থাকতাম পাছে তোমায় কখনো ভালবেসে ফেলি—আর এখন সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি পাছে ভাল না বাসি।

আচ্ছা, বিয়ে করে সবাই কি সত্যিই সুখী হয় দীপুদা? বিয়ের দুটো দিনে কি আনন্দ আছে বুঝি না—বুঝবার অবসর পাই নি। সে দুটো দিন আমার মন তো তোমার পাশে পাশেই ছিল; কি ঘটছে না ঘটছে কিছুই খেয়াল করি নি। তুমি কাজের অজুহাতে আসতে পার নি, ভালই করেছিলে।

মহাভারতে পড়েছি যে মেয়ে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করে—নরকে লোহার তৈরী পুরুষ গরম করে তার সাথে মিলিত করান হয়। মহাভারতকার জানেন না সে শাস্তির জন্য নরক পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না—ভাগ্যের ফেরে যে মেয়ে স্বামীকে ভালবাসতে পারে নি—প্রতি রাতের মিলনে তাকে এই কঠিন শাস্তি মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

দীপুদা, তোমার মাথার উপরে আছে বিশাখা, আছে শতভিষা; আছে ফুলের গন্ধ, তোমার মনে কোন গ্লানি নেই। তোমার আবৃত্তি মনে পড়ে—"জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা,—ধূলায় তাহার যত হোক অবহেলা," কিন্তু আমার এই গ্লানি ভুলিয়ে দেবার মত দুনিয়ায় কি কোথাও কিছু নেই?

দীপুদা, মাঝে মাঝে এই ভাবি, কেন—প্রতিদিন নিজের বিরুদ্ধে নিজে কতদূর অপরাধ করেছিলাম জানতে পারি নি। আজ তার শোধ হচ্ছে প্রতি মুহূর্ত্তের এই অতীত! এ শোধ কি কোনদিন শেষ হবে না?

মৃণাল।

# নতুন বই

## বাংলার সংস্কৃতি

A Challenging Decade
Bengali Literature in the Forties } Lila Roy : ( D. M. Library )

বিশ-শতকের চল্লিশের সনগুলোতে যে-সব সাহিত্যিক ক্রিয়া-কলাপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি চিত্র শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের এই রচনা-সঙ্কলনে রূপায়িত। আজ সে-চিত্র ম্লান। কাজেই অতীত-স্মৃতি হিসেবে বইখানি মূল্যবান হয়ে রইল। তাছাড়া ভবিষ্যতে আর একটা কথা পরিচ্ছন্নভাবে ব্যক্ত করবার সুযোগ থেকে গেল যে বাংলাদেশের প্রথিতযশা বহু সাহিত্যিকদের মন থেকে গত দশ বছরে সাম্যবাদস্মৃতি অপসৃত হয়ে গেছে। নিষ্ঠাহীনতা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল, সাহিত্য-সমালোচকেরা এ-কথা যদি যাচাই করতে চান তাহলে এইটুপুস্তিকাটি তাঁদের গবেষণায় প্রভূত আলোক দান করবে।

স- ভ.

West Bengal To-day—Published by the Development Department, Govt. of West Bengal—1954.

সরকারী কর্ম্ম-বিবরণী পাঠে ঔৎসুক্য থাকা নাগরিক ধর্ম্মের অন্তর্গত একটি বোধ। ১৯৫৪-এর পশ্চিমবঙ্গ নিজের ভরণ-পোষণে কতোটা অগ্রসর হয়েছে এবং কোন্ কোন্ প্রতিবন্ধকের দরুণ অনগ্রসর থেকে যাচ্ছে তার খবর এই বিবরণীতে আমরা পাব। ১৯৫১-এর আদমসুমারিতে দেখা যায় পশ্চিম-বঙ্গে প্রায় ৩০ লক্ষ লোক বেড়ে গেছে দশ-বছরে। উভয়-বঙ্গের যাতায়াত যোগ-বিয়োগ করে এবং জন্মের বর্দ্ধিত হার হিসেবে এনে বাড়তি এই সংখ্যাটির উদ্ভব। এদিকে ধানের হিসেবে দেখা যায়, প্রায় পঁচিশ-লক্ষ মণ বেশি ধান উৎপাদন করা হয়েছে ১৯৫১-৫২ সনে তার পাঁচ বছর আগেকার উৎপাদন-পরিমাণের চাইতে। বর্দ্ধিত মাথাপিছু এক মণ করে বেড়ে গেছে ফসলোৎপাদন। বৃদ্ধি আশাপ্রদ, যদিও জন-সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে এর তাল মিলবেনা। কিন্তু প্রশ্ন তা নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি ৫১-সনে ৪৮-সনের চাইতে প্রায় পনেরো লক্ষ একর জমি বেশি আবাদ করা হয়েছে। আবাদী জমির অনুপাতে ফসলের পরিমাণ-বৃদ্ধি অকিঞ্চিৎকর।

অবশ্য হিসেবের অঙ্কে আমাদের ভুল থাকতে পারে। কেননা অনেকগুলো তথ্যের তালিকা থেকে তা উদ্ধার করে আমরা এ-বিবরণের একটি অঙ্ক-ফলে এসে উপস্থিত হয়েছি। যদি আমরা ভুল করে থাকি, তাহলে সরকারী উন্নয়ন বিভাগকে অনুরোধ জানাব, তাঁরা যেন ফসল-বৃদ্ধির হিসেবটা পরিষ্কারভাবে সর্ব্বজনবোধ্য করে প্রকাশ করেন। ফসল-বৃদ্ধি মন্ত্রবলে হয়না, নাগরিকমাত্রেই আশা করি এ-কথা জানেন। সুতরাং আশানুরূপ ফসল উৎপাদন কোন্ কোন্ বিশেষ কারণে ব্যহত হচ্ছে সে-সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন জ্ঞান লাভ করতে ইদানীং প্রত্যেক ব্যক্তিই উৎসাহিত বলে আমরা অনুমান করি।

স. ভ.


আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডূয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

| কবিতা | গল্প | উপন্যাস |
|---|---|---|
| অজিত দত্তের<br>**পুনর্ণবা**<br>দেড় টাকা | প্রেমেন্দ্র মিত্রের<br>**মহানগর**<br>দু'টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>**বৃত্ত**<br>এক টাকা বার আনা |
| অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের<br>**নীল আকাশ**<br>দেড় টাকা | সুবোধ ঘোষের<br>**পরশুরামের কুঠার**<br>দু'টাকা | **মরামাটি**<br>( ২য় সং )<br>দু'টাকা চার আনা |
| সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>**সংকলিতা**<br>দু'টাকা | **শুক্লাভিসার**<br>দু'টাকা চার আনা | **দিনান্ত**<br>( ২য় সং )<br>সাড়ে তিন টাকা |
| **প্রাচীন প্রাচী**<br>দেড় টাকা | সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের<br>**ফসল**<br>এক টাকা চার আনা | **কল্লোল**<br>পাঁচ টাকা |
| **অপ্রেম ও প্রেম**<br>এক টাকা | **ঋণ**<br>দেড় টাকা | **কস্মৈদেবায়**<br>( ২য় সং )<br>তিন টাকা : |
| **পদাবলী**<br>দুই টাকা | **নতুন দিনের কাহিনী**<br>দু'টাকা | **রাত্রি**<br>( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ ) |
| **তিনজন আধুনিক কবি**<br>( বাংলা কবিতার আলোচনা )<br>নয় আনা | নরেন্দ্রনাথ মিত্রের<br>**পতাকা**<br>দু'টাকা | পাঁচ টাকা |
| অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের<br>**সৈনিক**<br>দেড় টাকা | জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর<br>**খেলনা**<br>দেড় টাকা | **মৌচাক**<br>পাঁচ টাকা |
| গোপাল ভৌমিকের<br>**স্বাক্ষর**<br>এক টাকা | সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের<br>**নয়নচারা**<br>দেড় টাকা | শৈলেন ঘোষের<br>**তিনরঙ**<br>দু'টাকা |

পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা

## ১৯৪০-৪২-এ লেখা সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের চারখানি উপন্যাস ঃ

**বৃত্ত**
দাম—২৲

"বৃত্ত আমার বিস্ময়কর লাগল। এই ছোট চিঠির মধ্যে বিস্তৃত করে বলবার অবকাশ নেই, তবে শৈলজা-প্রেমেন থেকে সুরু করে মাণিক হয়ে সুবোধ ঘোষ পর্য্যন্ত যে কয়টি লেখকের লেখা নিয়ে প্রবন্ধকারে আলোচনা করবার বাসনা সম্প্রতি আমার বলবতী হয়েছে বৃত্ত তার অন্তর্গত হয়ে রইল…"

—**শিবরাম চক্রবর্ত্তীর চিঠি**। ৭. ২. ৪৫ ইং।

**মরামাটি**
দাম—২৲

"…সংযতভাবের সঙ্গে ভাষার অদ্ভুত যোগসাধন ঘটাইয়াছে গল্প বলার সহজ রীতি। ভরত, সিদ্দিক, রসিক, দুর্গা, সুবর্ণ, টুনী—ফসল বোনার সঙ্গে এদের সুখ-দুঃখ ও পরিমিত আশা-আকাঙ্ক্ষায় শশীদল গ্রাম বাংলার এক অখণ্ড চাষী-পরিবারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।"

—**প্রবাসী**, ১৩৫০।

**কম্মেদেবায়**
দাম—৩৲

"The book deals with a chapter of terrorist movement in Bengal in which the author has tried to show, with an admirable deftness of touch and delineation, that various other psychological factors, besides merely the love of country, supplied the motive force of that dangerous gamble in life."

—*Hindusthan Standard*. 7. 12. 47.

**দিনান্ত**
দাম—৩৷৷০

"We are born in an age of conflict. The vast edifice of capitalism is crumbling down and every day ideas of socialism and social equity are gaining ground. Those who have the power in their keeping are reluctant to part with it,—can they do it? In the novel under review the mill-owner Abani Babu's two sons Ajit and Asit cannot agree because though born of the same parents they are psychologically poles asunder. The infiltration of liberal ideas into Ajit breaks the peace of the family and Ajit has to leave his home. The author displays unique gift for delving deep into emotional realities and portraying contrasting characters. ( R 3832 )

—*Amrita Bazar Patrika*. 22. 6. 47.

প্রকাশক—পূর্ব্বাশা লিমিটেড, ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা

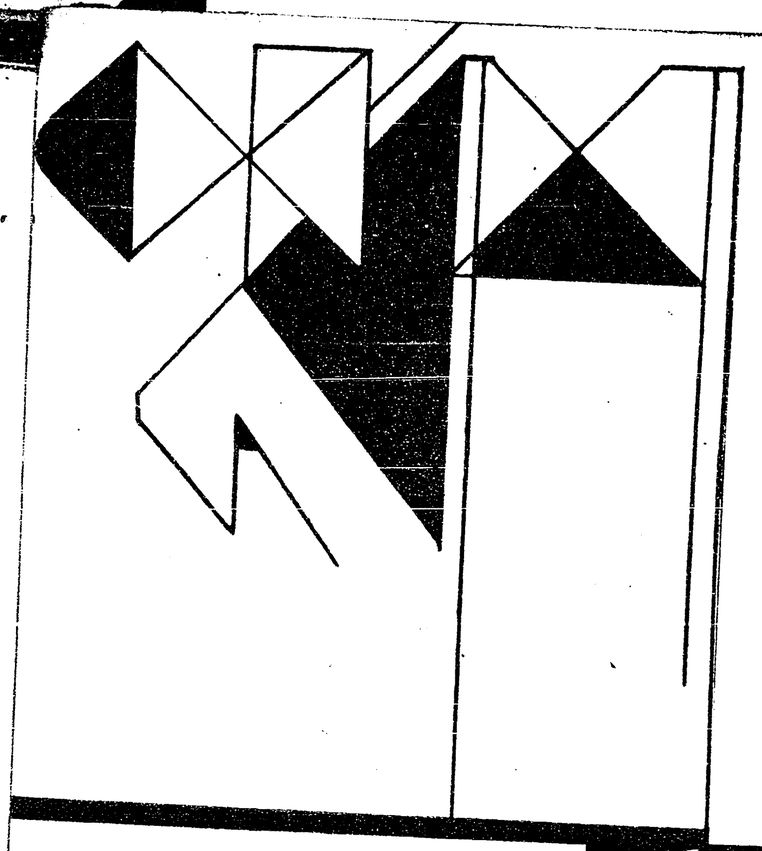

**পূর্ব্বাশা**

ষোড়শ বর্ষ : ১৩৬০

দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র

সম্পাদক: সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক: সত্যপ্রসন্ন দত্ত

দাম আট আনা

## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। তারই জন্যে আমরা গান্ধীসাহিত্য পরিবেষণের ভার নিয়েছি —যাঁরা নূতন পথে সমাজের দেহ বা মনকে এগিয়ে নিতে চেয়েছেন তাঁদের জীবনী ও মতবাদকে বাংলাদেশের পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছি—এবং সমাজ-গঠনে সদ্বিচারেক প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে পূর্ব্বাশা সিরিজের মারফৎ সমাজের সঙ্গে মানবীয় ক্রিয়াকলাপের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক প্রচার করবার চেষ্টা করেছি।

প্রাচীন ভারতের দুটি বিশ্ববরেণ্য প্রতিষ্ঠান বলে যাদের আখ্যাত করা যায় —'বৌদ্ধধর্ম্ম' এবং 'অশোকের সাম্রাজ্য'—তাদের সম্পর্কে দু'টি প্রামাণ্যগ্রন্থ প্রকাশ করবার গৌরব পূর্ব্বাশা লিমিটেড অর্জ্জন করেছেন।

নবমানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ আজকের দিনের রাষ্ট্রনীতির ও অর্থনীতির একটি পরিচ্ছন্ন চিত্র বিভিন্ন বই-এর মাধ্যমে আমরা পাঠকের হাতে পৌছিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।

শ্রীমণিলাল সেনের
**বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস**
দুটাকা

শ্রীমন্নারায়ণ অগ্রবালের
**গান্ধী-পরিকল্পনা**
( অর্থনীতি বিষয়ক )
দু'টাকা

**গান্ধীজির রাষ্ট্রপরিকল্পনা**
দু'টাকা

**ছাত্রদের গঠনমূলক কার্য্যক্রম**
বারো আনা

**শিক্ষার বাহন**
নয় আনা

প্রতি খণ্ড একটাকা দু'আনা
নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের
**রুশো**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**কার্ল মার্ক্স**

অনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
**ডারুইন**

সুবোধ ঘোষের
**সিগমুণ্ড ফ্রয়েড**

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর
**বৌদ্ধধর্ম্ম**
তিন টাকা

প্রবোধচন্দ্র সেনের
**ধর্ম্মবিজয়ী অশোক**
তিন টাকা

প্রতি খণ্ড চার আনা :
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ভারতীয় নারী ও সমাজ**

গোপাল ভৌমিকের
**সমাজ ও সাহিত্য**

জ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্যের
**সমাজ ও বিজ্ঞান**

অমিয়কৃষ্ণ সিংহের
**ধর্ম্ম ও নীতি**

রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের
**সমাজ ও সংস্কৃতি**

নারায়ণ চৌধুরীর
**সঙ্গীত ও সমাজ**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**অনুন্নত দেশ ও সাম্যবাদ**
লুই ফিশারের
**মহাজিজ্ঞাসা**
প্রথম পর্ব্ব—চার টাকা
দ্বিতীয় পর্ব্ব—চার টাকা
মিনু মাসানির
**নূতন দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রবাদ**
বার আনা
হুমায়ুন কবিরের
**মোসলেম রাজনীতি**
বার আনা
ডাঃ লোকনাথন সম্পাদিত
**যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি**
বার আনা
মিনু মাসানির
**খাদ্য**
বার আনা
ভারতীয় শিল্পপতিদের
**বোম্বে পরিকল্পনা**
প্রথম খণ্ড—এক টাকা
দ্বিতীয় খণ্ড—এক টাকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা**


# টুকরো কথা... (৩৬)

দিকে নৈনিতাল, অন্যদিকে আলমোড়া, একদিকে গাড়োয়াল, অন্যদিকে। আর মাঝখানকার বিস্তীর্ণ পাহাড়ী অঞ্চলে থেকোদের রাজত্ব। একটানা না হলেও থেকে-থেকে এক এক তাদের অত্যাচার সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। এই মানুষখেকোরা ও না, দানবও না—বাঘ। হলদের উপর ডোরাকাটা মসৃণ রা। ভারতবর্ষের বন থেকে সিংহ প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবার পরে, তির রাজ্যে এরাই সম্রাট। একাদিক্রমে বত্রিশ বছর এই ষখেকোদের সঙ্গে লড়াই করে অসংখ্য মানুষের প্রাণ বাঁচিয়ে কর্মা বীর শিকারী বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন জিম করবেট। মানুষখেকোদের রাজ্যে শঙ্কিত প্রজা যারা নই, সেই আমরা করবেটের নাম স্মরণ রেখেছি তাঁর শিকার পটুতার জন্যে নয়, র কাহিনীর অনবদ্য লেখক হিসেবে। শিকারের কাহিনী রই আকর্ষণ চুম্বকের মতো। গোয়েন্দা গল্পের চাইতেও তাতে না বেশী। কিন্তু জিম করবেটের লেখার স্বাদই আলাদা, ই আলাদা। ভারতবর্ষের অরণ্য প্রকৃতি অরণ্যপল্লীর সরল ী মানুষ, বিচিত্র পশুপাখী জীবজন্তুকে সত্যি-সত্যি ভালোবাসতেন । তাই তাঁর শিকার কাহিনীতে ক্রুরতা নেই। তাঁর মতে..... কোনো শিকারীই মেনে নেবেন যে বাঘ দস্তুরমতো ভদ্রলোক। সাহসের তুলনা নেই। প্রাণীজগৎ থেকে বাঘ যেদিন লোপ যাবে, সেদিন ভারতবর্ষের যে অপূরণীয় ক্ষতি হবে তা বলার এবং তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ এই মতটিও উল্লেখযোগ্য যে মানুষ স্বাভাবিক শিকার মোটেই নয়। নেহাত বার্ধক্য কিংবা তের ফলে অক্ষম হয়ে পড়লে প্রাণ ধারনের জন্যে তাকে বাধ্য মানুষের মাংস আহার করতে হয়। ( আমার জীবনের ) বত্রিশ ই কেটেছে অনবরত মানুষখেকোর পেছনে ধাওয়া করে। তবু কখনো বিনা কারণে নিষ্ঠুর হতে কিংবা নিজের থেকে রক্তের মানুষ মারতে দেখিনি।' 'ম্যান ইটার্স অভ কুমায়ুন' নামে করবেটের লেখা এই বিখ্যাত বই 'কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ' অনুবাদ করিয়েছেন সিগনেট প্রেস॥ কাহিনীর আকর্ষণ ছাড়া দের কৃতিত্বও এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য॥

বাদ সাহিত্যে সাম্প্রতিক সংযোজন : ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমী সদস্য, াসিক জর্জ দুয়ামেল্-এর নতুন উপন্যাস। শান্তি রায় কৃত ষযাত্রী' নামে এই অনুবাদটিতে মুল ফরাসীর সঙ্গে সংগতি রাখার ফলা হয়েছে। টলষ্টয়ের উপন্যাস 'ফ্যামিলি হ্যাপিনেস্' 'নীড়' অনুবাদ করেছেন অমিয়কুমার চক্রবর্তী। মুল পোলিশ ভাষা কাহিনীর আকারে লেখা ষ্টালিনের ছেলেবেলার কথা 'সোমো' ার করেছেন মার্তা মালিস্কা গুহ এবং রঞ্জিত গুহ। বিশেষ করে রের জন্যে ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য হোমারের অডিসি এবং াডের সংক্ষিপ্ত কাহিনী প্রকাশ করেছেন। বলাবাহুল্য হালের ানো কষ্ট কল্পিত অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর চাইতে এ গল্প শ্রেয়। ত্ত আকারেও শ্রেয়॥

অনুবাদ প্রসঙ্গে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কৃত জৈন গ্রন্থ ত্রে'র স্বতন্ত্র উল্লেখ প্রয়োজন। ব্রাহ্মণ্য-দর্শন এবং বৌদ্ধ অনুবাদ এবং আলোচনা বাংলা ভাষায় কম নেই। কিন্তু জৈন এবং সাহিত্য মোটামুটিভাবে আজ পর্যন্ত অবহেলিত রয়েছে। রের অন্যতম লোক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ভদ্রবাহু রচিত 'কল্পসূত্র'—মহাবীর প্রমুখ মহাপুরুষের চরিতকথা। আবশ্যক ভূমিকা, শব্দসূচী মুল এবং অতি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ সহ সম্পাদিত এই বই শুধু দের নয়, বাংলা-সাহিত্যের লেখক এবং পাঠকদের কাছেও লাভ করবে॥

বুঝিতে হইবে, এই শতবর্ষব্যাপী কালে বাঙালী মনীষীদের মধ্যে কি ভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার সংঘাত উপস্থিত হইয়াছিল, কি ভাবে তাঁহারা এই দুই বিরুদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন...'। ত্রিপুরাশঙ্কর সেনের 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে এই দৃষ্টিকোণ থেকে যাঁদের জীবন ও সাহিত্যকর্ম আলোচিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন : রামমোহন, ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয়কুমার, বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু এবং বঙ্কিমচন্দ্র॥ জ্ঞানের বিষয় যাঁদের রচনাগুণে সাহিত্যের মতো সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে তাঁদের মধ্যে ডক্টর পশুপতি ভট্টাচার্যের লেখা 'দেহরক্ষণ' এবং নারায়ণচন্দ্র চন্দের 'মানুষের রহস্য' বই দুটি বিশিষ্ট। প্রথমটিতে আছে শরীরের শত্রু বিবিধ রোগের পরিচয় খানিকটা গৃহচিকিৎসা এবং আকস্মিক বিপদ আপদের প্রতিকার আলোচনা। দ্বিতীয়টিতে আছে মনোবিজ্ঞানের বিবিধ তত্ত্ব এবং তথ্য॥ নতুন স্মৃতিকথা : সরলাবালা সরকারের 'হারানো অতীত'॥ গ্রন্থাগার কি ভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে চালাতে হয় সে বিষয়ে এই প্রথম এবং প্রায় একই সঙ্গে—দুটি বাংলা পুস্তিকা ছাপা হয়েছে। একটি লিখেছেন বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের বিমলকুমার দত্ত : 'গ্রন্থাগার'। অন্যটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রাজকুমার মুখোপাধ্যায় : 'গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বইয়ের যত্ন'। এ ধরনের বাংলা বই থাকার প্রয়োজন ছিল॥

নতুন উপন্যাস এবং ছোটগল্প॥ সামাজিক এবং রাষ্ট্রজীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাঁদের লেখা উপন্যাসের স্বাদ উপভোগ্য। জরাসন্ধের 'লৌহ-কপাট' ( জেলকর্মচারীর চোখে কারাজীবন ) এবং অমল দাশগুপ্তের 'কারানগরী' ( যন্ত্রকেন্দ্রিক নতুন-গড়া-শহরে সরকারী কর্মচারীত্ব ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। অন্য উপন্যাস : বিমল মিত্রের 'মৃত্যুহীন প্রাণ', বনফুলের 'পঞ্চপর্ব' এবং হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মহাজাতি'॥ ব্যঙ্গ গল্পের বিশিষ্ট লেখক পরিমল গোস্বামীর 'শ্রেষ্ঠব্যঙ্গগল্প' প্রকাশিত হয়েছে। আর একটি ছোটগল্পের বই : গজেন্দ্রকুমারের 'মালাচন্দন'॥

নতুন কবিতা॥ শুদ্ধসত্ত্ব বসুর 'আজন্ম', আনন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'অবন্তী' এবং অমিতাভ চৌধুরীর 'ছড়াছড়ি'। শেষ বইটি ছোটদের জন্যে হালকা ছড়া নিয়ে। সিগনেট প্রেসের পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ : নতুন সংস্করণে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'অর্কেষ্ট্রা'। অধিকাংশ কবিতার প্রভূত পরিমার্জনা করেছেন কবি। তাই প্রথম সংস্করণ যাঁদের আছে তাঁদের পক্ষেও বইটি সমান আগ্রহের সঞ্চার করবে। সিগনেট প্রেস থেকে পরবর্তী প্রবন্ধগ্রন্থ—বুদ্ধদেব বসুর 'সাহিত্যচর্চা' এবং 'গত পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্য'। দ্বিতীয়টি শান্তিনিকেতনে সাহিত্যমেলায় পঠিত প্রবন্ধাদির সংকলন॥ পূর্ণকুম্ভ বইটির জন্যে এ বছর সরকারী রবীন্দ্রপুরস্কার পেয়েছেন রানী চন্দ॥





কলেজ স্কোয়ারে। ১২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট
বালিগঞ্জে। ১৪২। ১ রাসবিহারী এভিনিউ

# পূর্ব্বাশা

## চৈত্র—১৩৬০

### সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী | ... | ৬৩১ |
| কবিতাগুচ্ছ : | | |
| ভাঙাগড়া : বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় | ... | ৬৩১ |
| ঝড়ের আগে : অরুণ ভট্টাচার্য | ... | ৬৩৭ |
| মায়াভুবন : আলোক সরকার | ... | ৬৩৭ |
| মেঠো হাওয়া : সুনীলকুমার নন্দী | ... | ৬৩৮ |
| চিঠি ( যদি তোমার ) : প্রদ্যুম্ন মিত্র | ... | ৬৩৯ |
| সোণার হরিণ : শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায় | ... | ৬৪০ |
| উত্তর ফাল্গুনী : বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় | ... | ৬৪১ |
| অভিজ্ঞান : প্রান্তিকা দেবী | ... | ৬৪২ |
| সত্যের এ দিকটা : অনুবাদক—অমল দত্ত | ... | ৬৪২ |
| রবীন্দ্রনাথের ছন্দ : সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য | ... | ৬৪৩ |
| গড় শ্রীখণ্ড : অমিয়ভূষণ মজুমদার | ... | ৬৪৮ |
| পণ্যা : অমলেন্দু মুখোপাধ্যায় | ... | ৬৫৫ |
| ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ : ইন্দ্রজিত্ | ... | ৬৬৭ |
| গল্প লেখকের প্রথম গল্প : সুবোধকুমার গুপ্ত | ... | ৬৭১ |
| একটি চিঠি : মিহির আচার্য | ... | ৬৭৮ |
| সম্পাদকীয় : | ... | ৬৮৪ |
| নূতন সাহিত্য : অমল দত্ত। স. ভ, | ... | ৬৮৫ |



প্রতিভা বসু-র গল্প ও উপন্যাস

মনোলীনা— ২৷৷০

সেতু বন্ধ— ২০

সুমিত্রার অপমৃত্যু— ৪৲

বিচিত্র হৃদয়— ২৲

কবিতাভবন

২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা ২৯

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

উপল-মুখর

বৈশাখে বেরুবে

প্রকাশক : পূর্ব্বাশা লিমিটেড

কোমল অনুশ্রী



উষসী

অভিজাত প্রসাধন রেণু

সুপ্ত দেহ সৌন্দর্যকে

জাগ্রত করে



বেঙ্গল কেমিক্যাল • কলিকাতা·বোম্বাই·কানপুর

স্বপ্ন হ'ল বাস্তব...








বোকারো তাপজ বিদ্যুৎকেন্দ্র



তিলৈয়া বাঁধ



কোনার বাঁধ



মাইথন বাঁধ



পঞ্চকুট পর্ব্বত বাঁধ



নাব্য খাল

দামোদর

পরিকল্পনার বাংলাকে নবজীবন দান

দূরদর্শীর কল্পনায় দুর্গাপুর ব্যারেজ

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ভারত সরকারের অর্থে গঠিত দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন, দামোদর এবং তার প্রধান উপনদীগুলির উপর কয়েকটি বাঁধ ও একটি ব্যারেজ তৈরী করে এগুলি করতে পারবে : (১) দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় বন্যা রোধ ; (২) বাৎসরিক ৪.১৮ কোটি টাকা মূল্যের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন ; (৩) দুর্গাপুর ব্যারেজের জলে পুষ্ট ১৫০০ মাইল খালযোগে সারাবছর ধরে ১০ লক্ষ একর জমি সেচন এবং (৪) কলকাতার সঙ্গে রাণীগঞ্জ কয়লাখনি অঞ্চলকে একটি ৮৩ মাইল দীর্ঘ নাব্য খাল দিয়ে যুক্ত করা।

পরিকল্পিত ৭টি বাঁধের মধ্যে ৪টি পরিকল্পনার প্রথম পর্য্যায়ে পড়ে—তিলৈয়া, ১৯৫৩ সালে সমাপ্ত ; কোনার, সমাপ্তপ্রায় ; মাইথন ও পঞ্চকুট পর্ব্বত বাঁধ দুটি ন্যূনাধিক দু'বছরের মধ্যে শেষ হবে। প্রধান প্রধান খাল ও তাদের শাখাপ্রশাখাসহ দুর্গাপুর ব্যারেজও ততদিনে নির্মিত হবে।

জল-বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে ঋতুভেদানুযায়ী হ্রাসবৃদ্ধি পূরণ করার জন্য বোকারোতে নিকৃষ্ট কয়লায় পরিচালিত একটি তাপজ বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে। গত বছরের প্রথম হতেই বাংলা ও বিহারের অনেক শহরে এবং কারখানায় এই কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে।

দামোদর পরিকল্পনা বন্যা রোধ ক'রে, শক্তি উৎপাদন ক'রে এবং শিল্প ও কৃষির উন্নতিসাধন ক'রে, গ'ড়ে তুলবে

সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা

সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

# ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ

ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া বিল্ডিংস্
৬৪নং গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা-১৩

১৯৫২ ইং পর্য্যন্ত প্রথম ১৬½ বৎসরে পাঁচটি সার্থক ভ্যালুয়েশান।
প্রতি ভ্যালুয়েশানে পলিসি-হোল্ডারদের বোনাস্ এবং শেয়ার-হোল্ডারদের ডিভিডেণ্ড দেওয়া হইয়াছে।
ভারতীয় বীমাজগতে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত।

এন্, সি, দত্ত
চেয়ারম্যান।






## খাদ্য প্রাণ....

পরিমিত মাত্রায় গ্রহণ শরীর রক্ষণ ও পোষণে অতি প্রয়োজনীয়। কিন্তু দৈনন্দিন খাদ্যে প্রায়ই ইহার অভাব পরিপূরণ হয় না। তাই পুষ্টির ঘটে অভাব। পুষ্টিহীনতায় বা সর্বপ্রকার রোগান্তিক দুর্বলতায় 'সুপার-নিও-কড্' বিশেষ ফলপ্রদ। ইহা ভিটামিন এ. ডি. বি. সি এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত উপাদান সমন্বিত সুস্বাদু রসায়ন।

OBL

সুপার-নিও-কড

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
কলিকাতা-১৩



ডাক্তারবাবু,
কি করে
আমি
ভালো
বার্লি
চিনবো?



কেবল শস্য ভালো হলেই যে বার্লি ভালো হবে তা নয়। এ জন্য চাই ভালো পেষাই। আমি সব সময় 'পিউরিটি' বার্লির ব্যবস্থা দিয়ে থাকি। আমি জানি 'পিউরিটি' বার্লি তৈরির পেছনে রয়েছে দেড়শো বছরের পেষাইর অভিজ্ঞতা।




APBX 9-BEN

পিউরিটি বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ঈস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা



যেখানেই তাঁরা মিলিত হন..

কেশ প্রসঙ্গে তারা ক্যালকেমিকোর মধুর সুগন্ধি কেশ তৈল **ক্যাষ্টরল** এর কথা আলোচনা করেন। নারী সৌন্দর্যের যে দুর্নিবার আকর্ষণ, তার অনেকখানি পুষ্পমাল্যের মত জড়িয়ে থাকে তাঁদের চাঁচর চিকুরে।

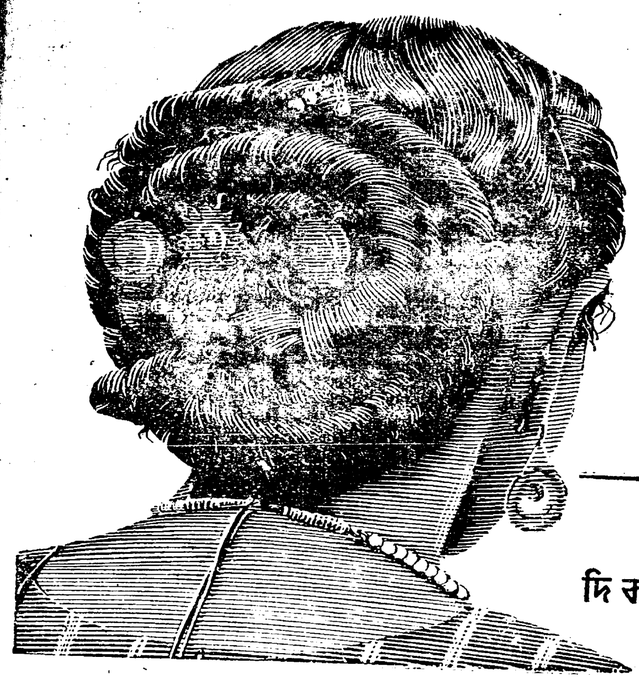

**ক্যাষ্টরল** ব্যবহারে কেশশ্রী অপরূপ উৎকর্ষ লাভ করে; কারণ ইহা বিশুদ্ধ ও পরিস্রুত ক্যাষ্টর অয়েল হইতে প্রস্তুত। ইহার সুবাস চিত্তকে প্রসন্ন রাখে।

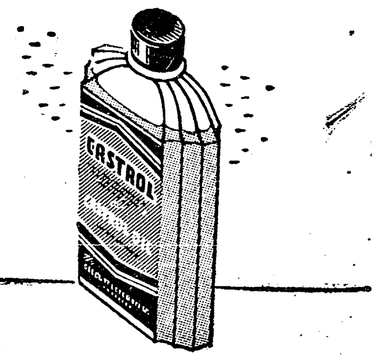


দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোঃ লিঃ
কলিকাতা-২৯



# পূর্ব্বাশা

ষোড়শ বর্ষ— ১৩৬০
দ্বাদশ সংখ্যা— চৈত্র


## আত্মকথা

### প্রমথ চৌধুরী

[ পূর্বানুবৃত্তি ]

আগেই বলেছি যে, সময়মত আমার পূর্ব বাড়ি বিক্রির টাকা ফেরত না পাবার দরুন ২০নং মেফেয়ারের বাড়ি তৈরি করবার জন্য হিন্দুস্থান কোম্পানির কাছে সেই বাড়িই বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে বাধ্য হই। যতদিন ধোব্‌ড়াকোল এস্টেটের বাঁধা আয় হাতে আসছিল, ততদিন তাদের সুদ জোগাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু নানা কারণে ধোব্‌ড়াকোলেরও আয় কমে আসতে লাগল; এমন কি, সদর-খাজনা জোগাবার জন্য এখানে ওখানে ছুটোছুটি করে বেড়াতে হত। তার উপর আমার রিসিভরি দুটো হাতছাড়া হওয়ায় একমাত্র আয়ের পথ বাকি রইল ল-কলেজের অধ্যাপনা। বিলেত যাবার দরুন কিছু ধার ছিল, এই আয় থেকে তার সুদ জুগিয়ে তার উপর সংসারখরচ চালানো সম্ভব হত না, যতই ব্যয়সংকোচ করি-না কেন। তাই উত্তরোত্তর ধার বেড়েই যেতে লাগল। ক্রমে রাঁচির বাড়িও হিন্দুস্থানের কাছে বাঁধা পড়ল।

এ অবস্থায় ২০নং মেফেয়ারের ছোট বাড়িটাও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলুম। সেটা হিন্দুস্থান পরে আমার ডাক্তার ভাই সুহৃৎকে ভাড়া দেয়। আমরা সেজদার বাড়ি উঠে গেলুম এবং আমার শাশুড়ীঠাকুরানী সামনেই তাঁর ছেলের বাড়িতে থাকতে গেলেন। সেটা বোধ হয় ১৯৩৩ সালে হবে। সেজদা যে কত আদর ক'রে, ফটকে মঙ্গলঘট স্থাপন ক'রে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন, সে কথা কখনো ভুলব না। এ স্থলে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, যখন আমার ১৷৷০ নং কমলালয় বাড়ি বিক্রি হয়, তখন দাদাও তাঁর ওখানে

আমাদের গিয়ে থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। যদিও আমরা যাইনি, কিন্তু বিপদের সময় আত্মীয়বন্ধুর সহানুভূতি পেলে চিরদিন মনে থাকে।

এই সময় কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্ কোনো কারণ না দেখিয়ে আমাদের ধোব্ড়াকোলের মাসহারা হঠাৎ বন্ধ ক'রে দিয়ে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছিল। কেন জানিনে, তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর অত্যন্ত বীতরাগ ছিলেন। সে সময় আত্মীয়বন্ধুর সদয় সাহায্য না পেলে কি করে যে দাঁড়াতুম, তা বলতে পারিনে।

সেজদাদার বাড়ি থাকতে থাকতে সুহৃদের ছোট মেয়ে পূর্ণিমার সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের বড় ছেলে সুবীরেন্দ্রের বিয়ে হয় ১৯৩৩-এর ডিসেম্বর মাসে। সেজদাদা নিজে বসে কন্যা সম্প্রদান করেন। কে জানত যে চার মাস যেতে না-যেতে পরবর্তী এপ্রিলের প্রথমেই তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে চলে যাবেন। সে ঘটনার উল্লেখ আগেই করেছি।

**অসমাপ্ত**

'আত্মকথা'র শেষাংশ সম্পর্কে শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী পূর্ব্বাশা-সম্পাদককে জানিয়েছেন :

".....কতকাংশ মূল পাণ্ডুলিপি থেকে জুড়ে একরকম শেষ করে দিয়েছি। যদিও অসমাপ্ত ঠিক ভাবে সমাপ্ত হয় না। বিশেষ বিলাত প্রবাসের মত প্রধান অংশ অনবধানতাবশতঃ নিরুদ্দেশ হওয়ায় সমস্ত জিনিষটাই শুধু শেষে নয় মাঝেও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল—সে দুঃখ আমার কোনদিন যাবে না।...

"তোমাদের কাগজটি বেশ রুচিসম্পন্ন বলে' ওতে 'আত্মকথা'র শেষাংশ ছাপানোয় আমিও খুসি হয়েছি। যদিও প্রথম প্রকাশিত খণ্ডের সঙ্গে একত্র করে সবটা ছাপতে পারলে আরও খুসি হতুম। তোমরা ইচ্ছা করলে শেষে 'অসমাপ্ত' কথাটা বসাতে পার। আং শ্রীইন্দিরা দেবী"

# কবিতাগুচ্ছ

## ভাঙাগড়া

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

একলা ঘর। একটি টেবিল বসবার
একটি ছবি চেয়ে থাকবার
একটি কলম লেখবার
—এই নিয়েই ঘর সংসার
দিন রাত হাল্কা হাওয়া লাগে।
দেয়ালে ঝোলে তোমারি ফোটো
পাঠিয়েছিলে অনেকদিন আগে
মনের ঈগল দেখ্ছি আজো অনেকদূর যায়
হয়তো কিছু শিকার খুঁজে পায়
অতীত ধ'রে সুদূর থেকে সুদূরতর বাঁকে—
মেঘকে ডাকে উষর চর মনের সাহারায়
সে-কোন্ ওয়েসিসের ছায়া-কাজল মেঘ ওঠে
একটি শীষে সবুজ রং ছাখোনি আজো শির্শিরিয়ে কাঁপে ?

কাঁচা উঠোন। নানান্ জনের বেড়া-দেওয়া হরেক কিচিমিচি
তার মধ্যেই মুখে ক'রে মাটি আন্ছে কুমোর পোকা
দৃক্পাতহীন আকাট বোকা ; ঘর বানায়
ও অন্তত ঘর পাত্তে ভাবে না মিছিমিছি
ঝোঁক ধরেছে বাসা বাঁধবে ঐ ছবিতেই—তোমার ছবির কাচে
চিঠিতে লিখি—'পারলে এসো সময় ক'রে অনেক কথা আছে'
সংসারী নয়, টেবিলী প্রেম ; কথা-বিলাসী কথা শানায়
কুমোর পোকা অবিশ্রান্ত কাদা নিয়েই নাচে—

ঘর ভেঙে দিই আবার ফিরে ঘর বানায়
কিছুই তো নয় তবুও কী-যে ভাবি
ভাবনা ছাড়া মুরোদ যখন নেই
হ'তেই হ'লো বাংলা দেশে কবি—

জানলা খোলা। বুড়ো নিমের গাছ—
কাঁচা উঠোন ঝরা নিমের পাতায় গেছে ভ'রে
বাউটি-পরা মালীর মেয়ে সামনে কোঁচা ঝুলিয়ে শাড়ি পরে
মনের যতো ভাবনাগুলো এলোমেলো ঝরাপাতার মতো
বুকের উঠোন—সেও তো কাঁচা ; মনস্বিতার আবর্জনায় ভরে
মালীর মেয়ে ঝরাপাতা ঝাঁটায় জড়ো করে
সবুজ দাঁতে হাসে, তাহোক বড়ো মিষ্টি কথা
তোমার গলার আওয়াজ মনে পড়ে
কালকে রাতের ঝড়ে
শুধুই নিমের পাতাই তো নয়
কাকের বাসাও উঠোনে উড়ে পড়ে।
মীরা বাঈয়ের ভজন ভাঁজে মালীর মেয়ে মীরা—
'আধি রাত প্রভু দরসন দীন্‌হে প্রেমনদীকে তীরা।'
গুন্‌গুণানির পাল্লা দিয়ে কুমোর পোকাও বলে—
কী দেখছো হে ছাখো আমার ঘর পাতা।
যতোই শুনি ততোই ভাবি
উঠতে চাই ততোই নাবি
উল্টে যাই ছেঁড়া বইয়ের পাতা।

মনের উঠোন—তারই যতো আনাচ-কানাচ ভ'রে
কুমোর পোকা এমনতরো কতোই তো ঘর করে
গত রাতের ঝড়ে
কাকের বাসা উপড়ে কতো পড়ে!
ঝড়ে-পড়া কাকের নীড়
তাকে ঘিরেই ছেলের ভিড়



আজব খেলায় দিব্যি দেখি জমে
ওদের ফুর্তি দেখে আমার বয়স্ক মন থেকে
ভাবনার ভাপ একটু যেন কমে—
নিমগাছটার মাথায় ওড়ে রুষ্ট কাকের দল
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে করছে কোলাহল
কাকের ভাষার সঙ্গে কোনো আমার ভাষার মিল
আছে নাকি দেখ্‌ছি ভেবে দুষ্টু ছেলের দল
গুল্‌টি পেতে মারছে ছুঁড়ে ঢিল!
[ কোন্ তীরে ভাঙে ঘর কোন্ তীরে গড়ে
ফাগুন হাওয়ায় খর বৈশাখী ঝড়ে
দিব্যি মেটে ঘর করলো কুমোর পোকা
হা হতোস্মি! ঘর হ'লো না আমার। ]
হঠাৎ যেন কোথা থেকে চাবুক হ'য়ে এলে
তোমার সঙ্গে আরো এলো কে যে
তোমার বন্ধু সেজে
এবার কিন্তু বসলে না আর ঘরে ;
কতো কী-যে বলার ছিলো জমলো আর কথা
মনের মধ্যে ঘুলিয়ে যতো উঠলো আবিলতা
দু'এক মিনিট থেকেই বল্‌লে,—যাই।
এর বেশি আর দেরি করবার সময় তো আজ নাই
বন্ধু দিলেন তাড়া
ব্যাপার কিছুই নয় ; তবু অনেক কিছুর বাড়া—

এবার আবার কুমোর পোকার ঘরের দিকে চাই—
সব পেরিয়ে যে ঘর আছে তারই কথাটাই
সময় সময় স্তব্ধ ব'সে ভাবি
শরীর তবু মাঝে মাঝে ক'রেই বসে হিসেবআনার দাবী।
সত্যি কিন্তু অবাক হ'তেই হয়, শরীর-তত্ত্ব ভেবে
মেদাস্থিবসাপঙ্ক কী-ই দেবে কতোটুকু দেবে?
উঠোন দিয়ে নানা রকম মানুষ আসে যায়

ফেরিওয়ালা, ঝাঁকামুটে, হরেক রকম লোকের চলাচল
গয়লা-বৌ দুধ ব'লে দেয় টাকায় দু'সের জল।
বাউল এসে গোপীযন্ত্র বং বং বাজায়—
'ঝীনী ঝীনী বীনী চদরিয়া বীনী রে
কাহে ক তানা, কাহে ক ভরনী, কৌন তার সে বীনী
চদরিয়া ঝীনী।'

কবীর-বাণীর মৌতাতটা কিছুক্ষণই থাকে
পরেই আবার দস্যি যতো ভাবনাগুলো মনকে ঘেরে কুটিল শতপাকে
বোম্বাইকা লাড্ডু, আয়া—ঘণ্টা নেড়ে ফেরিওয়ালা হাঁকে—
কাকের বাসা ছেড়ে এবার তাকে ঘিরেই ছেলের ভিড় জমে—
হঠাৎ যেন মনটা আবার ভিড়লো এসে সমে !...
এই মিছিলের মধ্যে থেকেও তফাৎ হ'য়ে আছি
দৃশের মধ্যে ঘুরে ফিরেও অহং নিয়েই বাঁচি।
মাঝে মাঝে ছবির কাঁচের কোণের দিকে চাই
মনের মধ্যে একটি পোকা গুন্‌গুণিয়ে ঘোরে
কে জানে কী ক'রে
পাই না ভেবে কেমন ক'রে সেইটেকে তাড়াই ?
কাঁচা মাটির উঠোন ভ'রে চোখ চাইলেই পাই
ভাঙা বাসার করুণ ব্যথাটাই—

[ কোন তীরে ভাঙে ঘর কোন তীরে গড়ে
ফাগুন হাওয়ায় খর বৈশাখী ঝড়ে
দিব্যি মেটে ঘর করলো কুমোর পোকা
আরেক দিকে ঘর ভাঙলো আমার
কাকের বাসা ঝড়ের হাতে কাবার— ]

লাড্ডুওয়ালা গেছে চ'লে
পিছন পিছন গেছে ছেলের দল
থেমে গেছে কাজের লোকের মিশ্র কলস্বর
ঝাঁ ঝাঁ রোদ, চলচ্ছবি এইবারে মন্থর—
ভাবনাতে আর মন ভরে না...



শূন্য ঘর, দুয়ার, দ্বিপ্রহর—
টেবিলটুকুই বসবার
জানলাটুকু চেয়ে থাকবার
দরকার নেই লেখবার
পরকে নিয়ে ঘর-সংসার
বুকে এসে হু হু বাতাস লাগে।

## ঝড়ের আগে

অরুণ ভট্টাচার্য

ভরেছি আমার হৃত শৈশব অগৌরবে
সকল দুঃখ দিনাবসানের অশ্রুজলে,
তোমার চোখের ও দুটি ধারায় কি দুর্যোগ
মহাপ্রলয়ের দুন্দুভি বাজে রাত্রিভোরে।

কি দিয়ে তোমার উষ্ণ হৃদয়ে অনির্বাণ
শ্রাবণের ধারা ঝরাবো, তবে কি প্রহর শেষ !
এ কূল ও কূল ভরা নদীজল তা থৈ থৈ,
জানি আসবেনা, আসবেনা ফিরে মলিন ঘরে।

তবে কি প্রবল বৈশাখ বায়ু অবাধ্য না'য়,
দুরন্ত মেঘ লুটোপুটি করে কি উল্লাসে !
দুধারের তীর, দূর দূর গ্রাম যে উন্মনা,
মনপবনের ঝড়ের রাতের সে কল্লোল।

## মায়াভুবন

আলোক সরকার

যদি হার হয় তবু যাবো সেই পথে।
সে মায়াভুবনে জয় করা যদি সম্ভব হয়
হয় যদি কোনোমতে।

ফেরিওয়ালা, ঝাঁকামুটে, হরেক রকম লোকের চলাচল
গয়লা-বৌ দুধ ব'লে দেয় টাকায় দু'সের জল।
বাউল এসে গোপীযন্ত্র বং বং বাজায়—
'ঝীনী ঝীনী বীনী চদরিয়া বীনী রে
কাহে ক তানা, কাহে ক ভরনী, কৌন তার সে বীনী
চদরিয়া ঝীনী।'

কবীর-বাণীর মৌতাতটা কিছুক্ষণই থাকে
পরেই আবার দস্তি যতো ভাবনাগুলো মনকে ঘেরে কুটিল শতপাকে
বোম্বাইকা লাড্ডু, আয়া—ঘণ্টা নেড়ে ফেরিওয়ালা হাঁকে—
কাকের বাসা ছেড়ে এবার তাকে ঘিরেই ছেলের ভিড় জমে—
হঠাৎ যেন মনটা আবার ভিড়লো এসে সমে !···
এই মিছিলের মধ্যে থেকেও তফাৎ হ'য়ে আছি
দৃশের মধ্যে ঘুরে ফিরেও অহং নিয়েই বাঁচি।
মাঝে মাঝে ছবির কাঁচের কোণের দিকে চাই
মনের মধ্যে একটি পোকা গুন্‌গুণিয়ে ঘোরে
কে জানে কী ক'রে
পাই না ভেবে কেমন ক'রে সেইটেকে তাড়াই ?
কাঁচা মাটির উঠোন ভ'রে চোখ চাইলেই পাই
ভাঙা বাসার করুণ ব্যথাটাই—

[ কোন তীরে ভাঙে ঘর কোন তীরে গড়ে
ফাগুন হাওয়ায় খর বৈশাখী ঝড়ে
দিব্যি মেটে ঘর করলো কুমোর পোকা
আরেক দিকে ঘর ভাঙলো আমার
কাকের বাসা ঝড়ের হাতে কাবার— ]

লাড্ডুওয়ালা গেছে চ'লে
পিছন পিছন গেছে ছেলের দল
থেমে গেছে কাজের লোকের মিশ্র কলস্বর
ঝাঁ ঝাঁ রোদ, চলচ্ছবি এইবারে মন্থর—
ভাবনাতে আর মন ভরে না···



শূন্য ঘর, দুয়ার, দ্বিপ্রহর—
টেবিলটুকুই বসবার
জানলাটুকু চেয়ে থাকবার
দরকার নেই লেখবার
পরকে নিয়ে ঘর-সংসার
বুকে এসে হু হু বাতাস লাগে।

## ঝড়ের আগে

অরুণ ভট্টাচার্য

ভরেছি আমার হৃত শৈশব অগৌরবে
সকল দুঃখ দিনাবসানের অশ্রুজলে,
তোমার চোখের ও দুটি ধারায় কি দুর্যোগ
মহাপ্রলয়ের দুন্দুভি বাজে রাত্রিভোরে।

কি দিয়ে তোমার উষ্ণ হৃদয়ে অনির্বাণ
শ্রাবণের ধারা ঝরাবো, তবে কি প্রহর শেষ !
এ কূল ও কূল ভরা নদীজল তা থৈ থৈ,
জানি আসবেনা, আসবেনা ফিরে মলিন ঘরে।

তবে কি প্রবল বৈশাখ বায়ু অবাধ্য না'য়,
দুরন্ত মেঘ লুটোপুটি করে কি উল্লাসে !
দুধারের তীর, দূর দূর গ্রাম যে উন্মনা,
মনপবনের ঝড়ের রাতের সে কল্লোল।

## মায়াভুবন

আলোক সরকার

যদি হার হয় তবু যাবো সেই পথে।
সে মায়াভুবনে জয় করা যদি সম্ভব হয়
হয় যদি কোনোমতে।

হাল্কা হাওয়ার বিকেল কলকাতায়
গলি পিছে ফেলে আসি বড়রাস্তায়।
স্বাভাবিক মুখ চোখ সাধারণ এতো লোক চলে
ম্লান নিয়মের ব্রতে!
তারো দূরে আলো জ্বলে!
সে আলোয় আমি পার হবো পথ পাড়ি দেবো সেই
সহসার মেঘে গর্বিত কোলাহলে।
সে আলো তোমার অতিরিক্তের দান।
তাই নিয়ে একদিন সে কী ঝড় ভীরু আনন্দ
মনময় অভিমান।
এখন অবাক বিকেল কলকাতায়
কী আশ্চর্য তৃপ্ত মানুষ যায়
চেতনাই নেই; চেতনাই সব জ্বালা সে হাওয়ায়
আনে ক্ষমাহীন সলীল অভিজ্ঞান।
দেখি কে সাহসী তবে!
আমি যাবো ঠিক পথ চিনে চিনে
একটি আলোয় সমতীত দিনে
সে মায়াভুবনে জয় করা চাই সুগত চোখের
অনিকেত বিপ্লবে!

## মেঠো হাওয়া

সুনীল কুমার নন্দী

অবশ ঘুমের দরজায় এসে কে গো কড়া দাও!
আরে কী অবাক, বকুলের ঘ্রাণ জড়ানো মাঠের ঝুরু ঝুরু হাওয়া, তুমি এলে নাকি
সহরের এত সরু অলি গলি পথ চিনে চিনে!
ঘুম কেড়ে নেওয়া ভীরু স্মৃতি পাখি
তোমারই উতলা ভাবানুষঙ্গে পুরোনো দিনের কতো না খেয়ালী নামতার সুর
তোলে। ধীরে ধীরে কান্নায় ভেজা আবছা কুয়াশা সরিয়ে দু'হাতে শিশু সকাল
আর কিশোর দুপুর



উঁকিঝুঁকি মারে। আহ্লাদী ঢঙ্। মরা চোখে মুখে অপরিচয়ের বিস্ময় দোলে—
দু'দিনেই সব ভুলে গেছে বুঝি! সাবাস, সাবাস।
মিনতি আমার এখন তা হ'লে
তুমি ফিরে যাও দূর পাড়াগাঁর পথে প্রান্তরে। সব স্মৃতি-ছায়া মুছে দিতে চাই। মাতাল তুফান
ছড়াতে দেবো না অবুঝ হৃদয়-বালিয়াড়ি ছেয়ে। বকুলের ঘ্রাণ
জড়ানো তোমার আঁচল বন্ধু দুলায়ো না এই ঘুম ভাঙ্গা নীল রাতের শিয়রে, মিথ্যে ছলনা
দেখিও না আর; তুমি কি বোঝ না
ফুসদানি ভরা বাসনার বাসি ম্লান ফুলে আজ কী ব্যথা জাগাও!
থাক, থাক। আর কৈফিয়তের কোন কাজ নেই। তোমার কি দোষ? কারো দোষ নয়।
নিয়মের বাঁধা সড়কে হাঁটতে শিখি নি আজিও, আমারি তো ভুল—
সময়ের স্রোত তীব্র জেনেও পিছনে তাকাই। এখানে আর এক আবেগ ব্যাকুল
অভিমানী চোখ ছলোছলো হ'য়ে বাজায় বেদনা-বেহাগ।
এবার
সব ব্যথা আমি জাগর রাতের গানে গানে ভরে দেবো; বেদনার
এই গানে তুমি এসেছো যখন নিয়ে যাও ভাই সারা পৃথিবীর প্রাঙ্গনময়
ছড়াতে।
গানের একটিও কলি কোন হৃদয়ের একটু শান্তি
হ'তে পারে যদি মুছে যাবে জেনো নিদ্রাহারার ব্যথা জাগানিয়া করুণ ক্লান্তি!

## চিঠি ( যদি তোমার )

প্রদ্যুম্ন মিত্র

চিঠি রেখে গেছে দোরে, নীলাকাশ খামে
কিছু ছায়া রোদ দিনরাত হাসি টুকরো
পাহাড়ের পথে যে আকাশে মুখ দেখেছো
সব দিলে কিছু পাঠিয়ে—এ চিঠি আমার নামে।

খুলি কিনা খুলি। মন থর্‌থর্?
রোদ-রাত্তিরে নুড়ি-নুড়ি পথে উধাও দিন,
মহুয়ার ছায়া ছাউনির নিচে সহজ সময়।
বেশ আছো জানি, স্বাস্থ্য ফিরবে, ভালো শহর॥

এখানে অটল টাওয়ারে সময় সীমিত। বিরাম ক্ষীণ।
চায়ের সকাল খুশীর চুড়িতে করে নাকো রিনরিন।
কি লিখেছো আর কি আর লিখবে—আছো কেমন ?
এতো নয় সেই রুগ্ন কপাল, আলতো আঙুল
ব্যাকুল প্রশ্নে ব্যক্ত মন।
নানা খুলবোনা, উদাসীন সই।
এ চিঠি আমার নামে।
দূর পাহাড়ের অস্থির দিন রামধনু-মন
পাঠিয়েছো নীলখামে।

## সোণার হরিণ

শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

আমি জানি এ-জীবনে জীবনের পরিমল রায়
কোনোদিন শুধোবে না, প্রিয়তমা চলেছো কোথায় ?
পাষাণ-কঠিন তার ঋজু দেহ, হৃদয় মাখন—,
দু'চোখে সমুদ্রস্বাদ, আঙ্গুলিতে আবদ্ধ যৌবন,
অধরে বিদ্যুদ্দাহ—সে আমার পরিমল রায়,
পাহাড়-প্রান্তর তারে খুঁজে ফিরি, লুকালে কোথায় !

প্রভাতে সন্ধ্যায় যারা প্রতিদিন আমার দু'পাশে
নক্ষত্রপুঞ্জের মত ঘিরে ঘিরে কাঁদে আর হাসে,
কথা কয় ভালোবাসে ভীরু কুঁড়ে কপোতের মত,
চোখে চোখে লালসার লালা, আর কামনার ক্ষত
বিষাক্ত করেছে যত অলস হৃদয়গুলি, হায়—
এ-রকম থেকে তুমি কত দূরে পরিমল রায়।

একটি একটি ক'রে জীবনের সমস্ত প্রহর
সাঁতরিয়ে পার হবো। ঘুরে ঘুরে সবকটি ঘর



ঘুঁটি এসে স্থির হবে গোধূলির মুমূর্ষু আলোকে—
তখন অবাধ্য কোনো স্বপ্ন যদি আসে ঘুম-চোখে,
সোণার হরিণ তুমি জীবনের পরিমল রায়—
সেইদিনো বলবে না, প্রিয়তমা এসেছো কোথায় ?

## উত্তর ফাল্গুনী

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

একটি জানালা খুলে দাও।

পুরনো হৃদয় নিয়ে জানালার পাশে যদি ক্ষণেক দাঁড়াও
তোমার সিঁথির মতো একফালি ফিকে রোদ এসে
হঠাৎ দাঁড়াতে পারে হয়ত গা ঘেঁষে
দেখবে মেঘেরা করে নীলপাহাড়ের বুকে লুকোচুরি খেলা
কখন যে হ'য়ে গেছে মেঘে মেঘে বেলা
বাতাসে উড়েছে বালি, টুকরো কাগজ, বাঁকা চুল
সময় রেখেছে ধ'রে হিসেবের ভুল···
এ-পৃথিবী আমাদের কতটুকু দিলো
হিসেব রাখেনি কেউ, ভালো লেগেছিল।

ভালো লেগেছিল নদী সুবর্ণরেখাকে
যে-নদী মহুল ফুল কানে ও খোঁপায় গুঁজে রাখে
ভালো লেগেছিল দূর-আকাশের নীল
গেরুয়া রঙের রোদে রাঙা-ঝিলমিল
পায়ে-চলা সরু পথ, পাহাড়ের ছবি
ভালো লেগেছিল এই পৃথিবীর সবই।
সে-দিন হয়েছে রাত বহুকাল হোলো···
তবুও জানালা যদি খোলো
তোমার নরম চোখ মোলায়েম হবে
দূর থেকে-ভেসে-আসা ফুলের-সৌরভে

বাতাসে মিলিয়ে যাওয়া ধূপের মতন
কোনো এক পৃথিবীর প্রেমিকের মন
ছুঁয়ে যাবে কালো চুল, ফিরে পেতে পারো
পাতলা দুখানি ঠোঁটে হালকা ঠোঁটের ছোঁয়া কারো।

নিয়েছ রোদের গুঁড়ো ; নিতে পারো অন্ধকার ? নাও…
একটি জানালা খুলে দাও।

## অভিজ্ঞান

প্রান্তিকা দেবী

অতল স্মৃতিতে অবগাহনের শেষে
একটি আশার সীমায় দাঁড়াই এসে।
ঝিনুকের গায়ে কত চারুকারু কলা
এঁকেই গিয়েছি, কিছুতো হয়নি বলা।
তুমি যদি খোলো, হৃদয় নিভৃতে তার
একটি বিন্দু অশ্রু পাবে আমার।

## সত্যের এ দিকটা

[ ল্যুএলিন-কে ]

ডিলান টমাস

অনুবাদক—অমল দত্ত

সত্যের এ দিকটা
পুত্র, তুমি দেখনি জানি হয়তো,
নীল নয়নের তোমার ধ্যানের রাজা,
যৌবনেরি অন্ধপুরীর ছায়ে
ঠিকরে পড়ে নয়তো,
নির্বিকার এ আকাশ তলে
পাপ আর অপাপ তরে,



একটু চিন্তা করার আগে
হৃদয়গত নয় বা বুদ্ধি ভরে
সব জড়িয়ে সব ছড়িয়ে
আঁধার পথে সব গড়িয়ে যায়,
মৃত ধূলোর প্রায়।

ভালোমন্দ দুটি যে পথ
তোমায় ঘিরে মরণ পথে ঘোরে
সাগর চক্রে পিষে।
অন্ধ দিনের তোমার হৃদয় রাজা,
ঝরে পড়ে শ্বাসের মতো,
কান্না হয়ে তোমায় আমায় মিশে,
সব মানুষের আত্মা-গুহায়
কান্না হয়ে ঝরে পড়ে অপাপ আঁধার
পাপের আঁধার ভালো মৃত্যু মন্দ মৃত্যু ছায়।
ভূতাবশেষ যা
তারার মতন রক্তে উড়ে যায়,
তোমার বছর ছয়ে রাজার রীতি—
সূর্য চোখের অশ্রুধারা যেন
চাঁদিমা বীজ রাবিশ আগুন আকাশ-ভেদী গীতি।

যে দুরন্ত ইচ্ছাখানি প্রথম পাতে
শ্যামলিমার অঙ্কুরণে পশুর মনে পাখির মনে
জলে আলোয় আকাশ মাটির সাথে
রইলো তোমার যাত্রা 'পরে,
তোমার কৃতি তোমার সকল ভাষা
সত্য হোক মিথ্যা হোক
অনির্ণেয় একটি প্রেমে মরে।

# রবীন্দ্রনাথের ছন্দ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা অনেকেরই আছে যে সংস্কৃতি কথাটির সঙ্গে সংস্কৃত-ভাষার কোনো সম্পর্ক নেই এবং বাংলা ছন্দের সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার ছন্দের কোনো যোগাযোগ নেই। কালিদাসের বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণার কথা ছেড়েই দিলাম, মগধের গুপ্ত আমলে দূর-প্রাচ্যে বঙ্গ-রাজবংশের নবোপনিবেশে সংস্কৃত-ভাষার চর্চ্চা পূর্ণোদ্যমে সুরু হয়। অন্তত সে-সময়কার কোচিন-চীনে। আমরা তদঞ্চলে সংস্কৃত-ভাষায় যে শ্লোক-রচনার সন্ধান পাই তাতে 'শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত', 'বসন্ত তিলক' প্রভৃতি প্রখ্যাত সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা তার আগেই আরম্ভ হয়েছিল মনে হয়।

সুতরাং বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের সংস্কৃত-ছন্দানুযায়ী হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্বরের ব্যবহার এবং ব্যঞ্জনে গুরু-লঘুর ব্যবহার দেবনাগর-লিপি-লেখকের সংস্কৃতি থেকেই এসেছে বলে মনে করা যায়। তবে লৌকিক পদ্য-রচনা-রীতিও একটা ছিল যা থেকে গীতিছন্দ বা ছড়ার ছন্দ কলেবর ধারণ করেছে। তাছাড়া বাংলা পয়ার বাঙালীর নিজের উচ্চারণ-পদ্ধতির অনুমোদনে নিজস্ব প্রতিভার সৃষ্টি।

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বাংলা পদ্য-রচনায় হ্রস্ব-দীর্ঘ-গুরু-লঘুর ধ্বনি-বিচারে সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণ এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুরভাবে পয়ার-ছন্দের ব্যবহার হয়েছে। মধুসূদন পয়ারে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা পাশ্চাত্যের ছন্দ-জ্ঞান-প্রসূত। কিন্তু অক্রুর-যাত্রার শেষে রাধার অবস্থা বর্ণনায় তিনি যে ত্রিপদী-রচনা করেছিলেন তা ষট্‌মাত্রিক ছন্দের ( রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত ) ধ্বনি বহন করেছে। পয়ারে সংস্কৃত-ছন্দের চারটি ধ্বনি-মাত্রার চতুর্দেয়াল নেই। শুধু চৌদ্দটি অক্ষর গুণে ছন্দ তৈরী করবার পালা ছিল পয়ারীদের। চৌদ্দ যত নমুনায় ভাগ করা যায় ততো নমুনার মাত্রাযুক্ত শব্দগুচ্ছে পয়ার রচনার কথাও কারো-কারো মনে উদিত হয়েছে। কিন্তু দেখা গেছে ৮+৬ বা ৪+৪+৪+২ বা কেবল দুই মাত্রার শব্দ ব্যবহারে ছন্দের গতি যতো সাবলীল হয়, তেমন আর কিছুতেই হয়না। ৪+৬+৪ বা ২+২+৩ +৩+২+২ অক্ষর মাত্রার বিভাগ অত্যন্ত সচেতন ভাবে ভারতচন্দ্র করে দেখেছেন যে তা ৭+৭ মাত্রায় গড়িয়ে পড়ে' পয়ার-ভঙ্গী বদলে দেয়। সম-বিষমের সমন্বয় এ-ধরণের ঃ

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষের জলে ভাসে।"

পয়ারের সহজ ক্ষিপ্রতা দুই-দুই মাত্রায় অর্জ্জিত হবার পর হঠাৎ তিন মাত্রার 'মেনকা' শব্দের উপস্থিতি ক্ষিপ্র গতিতে বাধা উপস্থিত করে। কবির অভিপ্রায়ে যে বাধা উপস্থিত



করার ভাব মোটেই ছিলনা তা নয় কিন্তু তা হলেও ছন্দ-বিচারে এটি আর তখন পয়ার পংক্তিতে এসে দাঁড়ায় না। একে তখন ৭+৭ মাত্রায় ভাগ করে কিম্বা সংস্কৃত ছন্দের গুরু উচ্চারণ ব্যবহারে ষোল মাত্রায় ৮+৮ উপস্থিত করতে হয়।

কান্দে রাণী মেনকা | চক্ষের জলে ভাসে = ৭+৭
৩+ ২ +৩ | ৪ + ২ +২ = ৮+৮

আমরা আশা করি ভারতচন্দ্র তা-ই করতেন।

কবিতা পাঠ করা হত ভারতচন্দ্রের কালে। পরবর্ত্তী যুগে পদ্য-রচনা ছাপা হয়েছে, কোন্ কবি কি ভাবে স্ব-রচিত পদ্য পাঠ করতেন তা জানবার উপায় নেই। হাতে লেখা পুঁথিতে বা ছাপা পদ্যে চৌদ্দ অক্ষরী পয়ারই সাধারণত দেখা যায়। ত্রিপদী ভঙ্গী মূলত পয়ারেরই জাত। মুখে-মুখে যেসব ছড়া কাটা হত তাকে পয়ার-গতি-সম্পন্ন মনে হয়না। তালে-ফেলা ছন্দ ছিল সেগুলো। যেমন ঃ

"চিৎপুরের | মাঠেতে | বালি চিকচিক | করে"
৫ | ৩ | ৬ | ২

তালের কথা এলেই পদকে ভাগ করে ফেলতে হয় চারখণ্ড করে। তারপর খণ্ডে মাত্রা ভাগ করা হল ছন্দের আসল কথা। গানের পদ হলে ষোল মাত্রার বা বারো মাত্রার তালে ধ্বনি-সুর পৌঁছিয়ে দিতে পারলেই হল। উপরের পদটিতে ১৬ মাত্রায় তা পৌঁছানো হয়েছে। কিন্তু ধ্বনির ভাগ-বিভাগে যাঁর নজর, তিনি বলবেন, 'মাঠেতে' শব্দের ধ্বনি ছড়িয়ে দিয়ে 'বালি চিকচিকে'র বেলায় শব্দকে কুঁচকে ফেলা হচ্ছে কেন ? কবি বলবেন, মাঠেই ত ধ্বনি ছড়িয়ে দেবার সুযোগ আছে—যেখানে 'বালি-চিকচিক' সেখানে ধ্বনি সঙ্কুচিত।

এ-ধরণের ধ্বনি-বিচার বাংলা-ছন্দের অঙ্গীভূত ছিল বলে আমার ধারণা। ছন্দ বাক্-কে রূপায়িত করেই ছুটি নিতে চায়না—বক্তব্যের অভিপ্রায়ের সঙ্গেও দেহ মিলাতে ইচ্ছুক হয়।

রবীন্দ্রনাথ এই গীতি-ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে একটি পরিবর্ত্তন এনেছিলেন, যেহেতু তাঁর তাল-চর্চ্চার অভ্যাস ছিল। খণ্ড-ভুক্ত মাত্রায় অসমান শব্দধ্বনি ব্যবহারটিকে তিনি নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছেন চারটি মাত্রায়। এ-মাত্রা বাংলা চার মাত্রা অর্থাৎ গুরু-লঘু বিচার না করে যে চার মাত্রা, তা নয়। প্রত্যেক খণ্ডের বহন-শক্তির প্রশ্ন এখানে আছে। সব চাইতে বেশি ভার বহন করবে চার মাত্রার খণ্ড যখন তার দু'টি গুরু ও দু'টি লঘু হবে। আর সব চাইতে হাল্কা হতে পারবে চারটি লঘু ( হ্রস্ব স্বরও ) মাত্রা বহন করলে। স্বরবর্ণের দীর্ঘতাও বিচার করা হল। তবে সব সংস্কৃত দীর্ঘ স্বরই রবীন্দ্রনাথের এ-ছন্দে দীর্ঘত্বের মর্য্যাদা পায়নি। ঐ, ঔ প্রভৃতি স্বরগুলো বস্তুত যুগ্ম-স্বর ; গুরুধ্বনি-যুক্ত গ্ব্যঞ্জনেরযু

পর্য্যায়-ভুক্ত। সুতরাং এগুলোর গুরুত্ব দেওয়া হল। গুরুত্ব দিলেও ধ্বনির চারমাত্রার নিয়মেই তাকে আসতে হয়েছে। যেমন :

"আমি যদি | জন্ম নিতেম | কালিদাসের | কালে
[ চারটি লঘু ] [ দুটি গুরু দুটি লঘু ] [ তিনটি লঘু একটিগুরু ] [ দুটি লঘু ]

দৈবে হতেম | দশম রত্ন | নবরত্নের | মালে"
[ দুইগুরু+দুইলঘু ] [ দুইগুরু+দুইলঘু ] [ দুইগুরু+দুইলঘু ] [ দুইলঘু ]

মাত্রার সংখ্যা হিসেবে পয়ারেরই চৌদ্দ মাত্রা। মাত্রার পরিমাণে খাঁটি বাঙালীর পয়ার আর মাত্রার গুণের হিসেবে সংস্কৃতের ধার ঘেঁষা অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃতির ছন্দ। একে যদি লৌকিক ছন্দ বলি, লৌকিক সংস্কৃতি কি পরিমাণ সমৃদ্ধ ছিল আন্দাজ করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ এ-ছন্দে তালের সূত্র আবিষ্কার করে' পরে আবিষ্কার করলেন প্রত্যেক খণ্ড-ভুক্ত মাত্রার নক্সা বা ধরণকে এক করার সূত্র। এই সূত্রান্তর্গত ছন্দকে আমরা মাত্রিক ছন্দ বলে জানি। এই ঐক্যের সূত্র-ও তালমাত্রার নিয়মে লঘু-গুরু-হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনিকে মান্য করতে চেয়েছে। বরং বেশি মান্য করেছে। উদ্ধৃত ছন্দে 'দৈব' কথাটির ধ্বনিতে পয়ার-রীতিতে গুরু-লঘু না মেনে দুটি লঘু মাত্রার উপস্থিতি আছে বলে মনে করলেও চলে, কিন্তু মাত্রিক-ছন্দে 'দৈ' শব্দে গুরুত্ব দিতেই হবে। তাছাড়া মাত্রার গুণ-পরিমাণ বিচার করার প্রশ্নও উপস্থিত হল মাত্রিক ছন্দে। লঘু মাত্রা গুরুর বা দীর্ঘের অর্দ্ধেক সম্মান পাবে এই আইন ( মুগ্ধবোধের টীকার আইন ) অনুসরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। মাত্রার এ ধরণের গুণ-বিচারের পর পরিমাণ মেপে তাকে খণ্ড-ভুক্ত করা কঠিন ব্যাপার নয়। যেমন :

১। আমাদের | কালিদাসী | ছন্দিতা | বাণী
৪ ৪ ৪ ২

২। পঞ্চশরে | দগ্ধ করে | করেছে কার | হানি
৫ ৫ ৫ ২

৩। ধন্য তোমারে | চন্দ্রশেখর | চৈত্রে দিয়েছে | পুড়ে
৬ ৬ ৬ ২

৪। জানো কি মনে মনে | গোপনে কতো ব্যথা | ধ্বনিত নিকটে ও | দূরে
৭ ৭ ৭ ২

এ-নমুনার সম-বিষম মাত্রিক ছন্দ রবীন্দ্র-ছন্দ-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এ-দানের তুলনায় তাঁর গীতি-ছন্দ-সংস্কারের কাজ তুচ্ছ বলে মনে হয়। কিন্তু দানটি তিনি সংস্কৃত ভাষা-জ্ঞান থেকেই পেয়েছেন, তারপর বাংলা ভাষা-ছন্দে দান করেছেন। এ-দানটি মাইকেলের মেঘনাদবধ



কাব্যে পয়ার-ছন্দের দানের মতোই অমর। কারণ, ইদানীংও বাংলা পয়ার লিখিত হয় এবং রচনার বাক্যাবলী পদবন্ধনের সঙ্কীর্ণতা থেকে মাইকেলী ভঙ্গীতেই মুক্তি উপভোগ করে। তেম্নি মাত্রিক-ছন্দে ইদানীংও যেসব কবিতা লিখিত হয় তা রবীন্দ্র-প্রবর্ত্তিত মাত্রিক ছন্দের কোলেই বসবাস করে। তবে নজরুল-ইসলাম মাত্রিক-ছন্দে 'মুক্তক' ( 'বলাকা'র পয়ার ছন্দ ) ভাবটি প্রথম এনে দিয়েছেন। এই 'মুক্তক'-রীতি অতঃপর গীতি-ছন্দেও ব্যবহৃত হয়েছে। তারপর বাংলা ছন্দে আর যা-কিছু দেখা যায় তা নিছক ছন্দ-ভঙ্গ করবার পালা।

ভবিষ্যতে যদি বাংলা কবিতায় নূতন ছন্দ প্রবর্ত্তিত হয় তাহলে তার প্রেরণা সংস্কৃত ছন্দ-রীতি থেকেই আসতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমীর খশরুর রচিত পদ-গুলো-ও ছন্দের নূতন আস্বাদ এনে দেয়। কালিদাস তাঁর 'মন্দাক্রান্তা'-ছন্দে অসম-মাত্রার ধ্বনিগুচ্ছ পদে বিন্যস্ত করে একটি ছন্দ-রীতি দেখিয়ে গেছেন। তার মাত্রা-পরিমাণ অনুকরণে সার্থক বাংলা ছন্দ ( মন্দাক্রান্তার মাত্রা-গুচ্ছের ধ্বনি অনুকরণ নয় ) তৈরী হতে পারে। তাতে গীতি-ছন্দের পদ-ধ্বনি-পরিমাণ স্মরণ রেখে শব্দগুচ্ছে অসমান মাত্রা ভাগ করে দিতে হয়। ফলে তা পয়ারের ও মাত্রিক ছন্দের একটি মিশ্র ভঙ্গী নিয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য খুব সম্প্রতি এ-পরীক্ষা হয়েছে। সূক্ষ্মশ্রুতিবান্ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা না বাড়লে পরীক্ষার সার্থকতা বিচার হবেনা।

সংস্কৃত বাক্-ধ্বনি-শাস্ত্র থেকে আমরা স্বর-ব্যঞ্জন-বর্ণের মাত্রার নিয়ম অনুধাবন করতে পারি। 'গীতসূত্রসার'-এ ব্যঞ্জনবর্ণকে অর্দ্ধমাত্রিক ধরা হয়েছে। স্বরবর্ণের আশ্রয় ব্যতিরেকে যে ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারিত হয় তা-ই অর্দ্ধমাত্রিক ব্যঞ্জন। ং, ঃ, ৎ, ক্, ড়্, ট্, জ্- প্রভৃতি ব্যঞ্জন সংস্কৃতে সন্ধিগত না হয়েও উচ্চারিত হত। বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন-ধ্বনি ব্যক্ত করতে বাঙালীর জিহ্বা অধিক সমর্থ ছিল। শব্দান্তে অকারান্ত অক্ষর বাংলায় বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন-ধ্বনি ব্যক্ত করে। এই ধ্বনির মাত্রা 'গীতসূত্রসারে' অর্দ্ধ। কিন্তু 'শ্রুতবোধে' ধ্বনি-নিয়ম আলাদা। 'শ্রুতবোধ' বলছে : "সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারো বিসর্গসম্মিশ্রম্। বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু পাদান্তস্থং বিকল্পেন।" 'সানুস্বার' শব্দ 'গুরু' হবে, সংযুক্তাক্ষরের আগেকার অক্ষর দীর্ঘ-ধ্বনি বহন করবে এবং বিসর্গযুক্ত অক্ষর সম্ভবত দ্বিগুণিত হবে এবং পদান্তে গুরু-ধ্বনি দিলেও চলবে, না দিলেও ক্ষতি নেই। গুরু, দ্বিগুণ, দীর্ঘ সবই বাংলা মাত্রিক ছন্দে দুই মাত্রা। আর বিশুদ্ধ ব্যঞ্জন, স্বর ( ঐ, ঔ ছাড়া ), অযুগ্ম ব্যঞ্জন ( স্বরাশ্রিত ) সবই মাত্রিক ছন্দে এক মাত্রা। পয়ারে সব একাকার—এক মাত্রা। গীতি-ছন্দে তা নয়—সেখানে, এমন কি প্লুত-ধ্বনি-ও ( তিন মাত্রা ) ব্যবহৃত হয়। পদাংশে মাত্রার ঘাটতি পড়লে 'অকারান্ত'-ব্যঞ্জন-ও প্লুত-ধ্বনির দীর্ঘতা প্রার্থী হয়। কাজেই ভাষা-ছন্দে গীতমাত্রা ব্যবহার বৈতালিকের পক্ষে ছন্দ-বধের কারণ হয়ে ওঠে। তবু নৃত্য-গীতের মাত্রার ভগ্নাংশ নিয়ে ভাষা-ছন্দ-প্রসারের সুযোগ আছে বলে আমার ধারণা।

# গড় শ্রীখণ্ড

## অমিয়ভূষণ মজুমদার

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

ফুলটুসি সহরের মেয়ে, আর সুরতন গাঁয়ের। সুরতন অস্বাভাবিক সময়টুকু কাটিয়েছে দিঘা বন্দরে। যে গলিটায় টেপির জন্য চেকারবাবু বাসা ক'রে দিয়েছে তারই অপর প্রান্তে ইস্‌মাইল কসাইএর বাড়িতে টেপি থাকে।

ইসমাইলএর এখন আর সেদিন নেই, বয়স হ'য়েছে। এখন সে বাজারে গিয়ে দোকান করে না। তার বাসার সামনের দিকের ঘরখানায় বসে দিনের বেলায় মাংস বিক্রী করে। দিনের বেলায় তার দোকানে বিক্রীটায় ভীড় হয় না। গতরাত্রির রঙের দাগ মুখে লেগে আছে এমন সব শীর্ণদেহ জীর্ণরূপ মেয়েরাই বেশী আসে ওর দোকানে। আর আসে দুচারজন পুরুষ মানুষ। এদের কি জীবিকা এ যেন পৃথিবীর কেউ জানে না। এখন এদের প্রায় সকলের পরনেই মলিন লুঙ্গি, পায়ে ছেঁড়া জুতো; ঠিক সন্ধ্যার সময় এদের দেখা যাবে গলিটার মোড়ে মোড়ে এরা ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, পরনে মলমলের পাঞ্জাবি, পায়জামা, কারো কারো গলায় ফুলের মালা। রাত্রিতে দেখা যাবে এদের বন্ধ দরজাগুলির বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে। শেষ রাত্রির কাছাকাছি দেখা যাবে এদের কোন একটি দাওয়ায় গোল হ'য়ে বসে এরা গুঁটি খেলছে।

কিন্তু সন্ধ্যার পর ইসমাইলের বাসার কাছে ভীড় জমে যায়। তখন রান্না করা মাংস বিক্রী হয় তার দোকানের সামনের দিকে। কিন্তু ক্রেতার ভীড় হয় তার বাড়ির ভেতর দিকটায়। দিশি দারু তাড়ি তো পাওয়া যায়ই, প্রয়োজন হ'লে বিলেতি মদের ছোটখাট বেঁটে বোতলও দু'একটা সে ঘরের মেঝে খুঁড়ে বার ক'রে দিতে পারে।

কিন্তু তার দোকানে মাঝে মাঝে পুলিশ বড় জুলুম করে। গত বৎসর শ্রাবণ মাসে পুলিশ এসে তাকে বলল—ইসমাইল মিঞা, এবার কিছুদিন ঘুরে আসতে হয়।

—জি?

—বড় বেশী গরম ক'রে তুলেছ।

—জি।

—কাউকে বাকি দিতে আপত্তি করেছিলে নাকি? না—পাওনা টাকার জন্য অপমান করেছ।

—জি না। সেই নোতুন কনেষ্টবলবাবু বাসা ভুল করেছিল। আমার বৌকে মনে করেছিল—

—বলো কি? তোমার নোতুন বৌ ফুলটুসি।

—জি। তবে নেশার মাথায় ওরকম গোল মনে হয়। আমি তাকে কিন্তক ধরে নিয়ে গিয়ে যমুনার ঘরে দিয়ে এসেছি। সেই যমুনা গো ঐ যে কলেজের মেয়ে সেজে বেড়ায়।

—বেশ করেছ। এখন চল। মাস চার পাঁচ হবে।



—না হ'লে হয় না।

—বোধ হয় না। কনেষ্টবলবাবু কড়া রিপোর্ট করেছে। বি, এল কেস্।

—বি, এল কেস্? তাও ভালো পকেট কাটার দায় নয়।

ইসমাইল পুলিশের সাথে চলে গেল, ফুলটুসি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল।

এরপরে চালের কারবারে নামতে হ'ল ফুলটুসিকে।

ইসমাইল চলে গেছে বলে দুঃখিত নয় ফুলটুসি, ইসমাইল ফিরে এসেছে ব'লেও সুখী নয় সে। ইসমাইল ফিরে এসে তার চালের কারবারের কথা জানতে পেরে বলেছে—এদিকে ভালো সরু চাল পাওয়া যায় না, মোকাম থেকে ভালো চাল আনবি। ফুলটুসি এখনও চালের ব্যবসা করে যাচ্ছে।

নিজের জীবন সম্বন্ধে ভাববার সময় ফুলটুসির নেই। আসন্ন বিপদ্ থেকে নিজেকে এবং সন্তান দুটিকে রক্ষা করার কৌশল খুঁজতেই তার দিন অতিবাহিত হ'য়ে যায়।

আশৈশব ইসমাইলের সাথে সে পরিচিত। ইসমাইলের ছেলে ইয়াজ তার সমবয়সী। একটি বুড়ী ছিল এবাড়ীতে, লোকে তাকে বলত ইসমাইলের বিবি। ইয়াজ তাকে মা বলত। ইয়াজের দেখাদেখি ফুলটুসিও তাকে মা বলত। ইসমাইলের সাথে তাদের বড় একটা সম্বন্ধ ছিল না। বুড়ী তাদের আদর যত্নই করত।

কিন্তু কিছু বড় হবার পর থেকেই দিনরাত্রির চেহারা বদলে গেল। ইয়াজ খেতে লাগল কথায় কথায় মার। ফুলটুসির ভাগ্যে—প্রহার ছাড়াও অন্যতর দুর্গতি দেখা দিল। সন্ধ্যা এবং সকালে এটা ওটা এগিয়ে দিতে ইসমাইলের দোকান ঘরে তাকে যেতে হ'ত। ক্রেতারা, অন্ততঃ তাদের কেউ কেউ, তাকে ডেকে নিয়ে তার সাথে মিষ্টি ক'রে কথা বলত, মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। কিন্তু সে যখন একটু বড় হ'ল কোন কোন ক্রেতার আদর করার পদ্ধতিও বদলাতে লাগল। চিমটি খাওয়া একটা প্রাত্যহিক ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াল ফুলটুসির। দোকানে যাওয়া কমিয়ে দেয়া ইচ্ছাধীন নয়। ইসমাইলের প্রয়োজনেই তাকে যেতে হ'ত। তারপর সুরু হ'ল তাকে নিয়ে লোফালুফি।

তখন-তখনই বুঝতে না পারলেও এখন ফুলটুসি বুঝতে পারে ক্রেতাদের। ইসমাইলের কাছে এইজন্যই সে কৃতজ্ঞ। সে শুধু আবাল্য অন্নদান করেনি। তার দেহটাকে বহুর হাতের আড়ালে রেখে দিয়েছে ইসমাইল নিজস্ব ক'রে।

কিন্তু ভয় কি ক'রে তার এত হ'ল ফুলটুসি এ বলতে পারে না। ফতেমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছিল—ভয় কনে। দুটি সন্তান, হাঁড়িকুড়ি উনুন আর ইসমাইলের শয্যা এই নিয়ে ফুলটুসির দিবারাত্রি ছিল। প্রতিবেশী নেই, সঙ্গী নেই, এ এক অদ্ভুত জীবন। শুধু ইয়াজ ধুমকেতুর মতো এসে উদিত হয় কখনো কখনো। কি আক্রোশ তার কে জানে। প্রথম যে রাত্রিতে ঘুমন্ত ফুলটুসিকে টানতে টানতে নিজের ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল ইসমাইল, সে রাতটা ইয়াজ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়েছিল, তারপর থেকেই আক্রোশ—সুরুতে এতটা ছিল না। দিনকে দিন বাড়তে বাড়তে একসময়ে চূড়ান্ততায় পৌছাল।

খেতে বসেছিল ইয়াজ। ফুলটুসির প্রথম সন্তান হামা টানতে শিখেছে। সেই রান্নাঘরের মেঝেতে জল ঢেলে কাদা করে সারা গায়ে কাদা মেখে হামা টেনে বেড়াচ্ছে। ইয়াজের ভাত গুছিয়ে দিতে দিতে সে দিকে নজর পড়ল ফুলটুসির। কাকে আর বলার আছে মায়ের এই প্রথম গর্বের কথা,

প্রথম সন্তানের এই অপূর্ব বীরত্বের কথা; ইসমাইল এমন নয় যে তাকে বলা যায়। ফুলটুসি বলেছিল ইয়াজকে— কেন ভাই, ছাওয়াল আমার ইষ্টিশনের বড় মাষ্টর হবি?

ইয়াজ গোঁজ হয়ে বসেছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে থু থু ক'রে ফুলটুসির মুখের উপরে থুথু ফেলে না খেয়ে বেরিয়ে গেল।

রাগে অভিমানে ফুলটুসি খানিকটা কাঁদল। একবার সে ভাবল ইসমাইলকে বলেও দেবে কিন্তু ভাবতে গিয়ে খটকা লাগল তার। ইয়াজ যে তাকে ঘৃণা করে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হ'ল ঘৃণা করাই বোধ হয় স্বাভাবিক। ইসমাইলের সাথে তার বিবাহ জাতীয় সম্বন্ধটা ঠিক প্রকাশ্যে বলার মতো নিশ্চয়ই নয়।

কিন্তু ইয়াজের ঘৃণাকে যত ভয় তার চাইতে বড় ভয় ইসমাইলের ছুরিকে—যে ছুরি অনায়াসে পাঁঠা, বকরি দুম্বার গলায় বসছে দিনে বহুবার। ইসমাইল যদি তার প্রতি কোন অন্যায় করেই থাকে তার প্রতিকার কোথায় পাওয়া যাবে। ইসমাইলের অন্নে সে বেড়ে উঠেছে, তার অন্ন এখনও তার জীবিকা, আর ইসমাইল যদি রাত্রির অন্ধকারে তাকে কয়েকটা খণ্ডে বিভক্ত করে নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসে কেউ খোঁজ নিতেও আসবে না। আপন পর সব কিছুই ইসমাইল। সে যদি বলে একদিন ফুলটুসিকে হাট থেকে কিনে এনেছিল আর একদিন হাটে বিক্রী করে আসবে, কিম্বা একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিল তেমনি একদিন পথে ফেলে দিয়ে আসবে, ফুলটুসির কিছু বলার থাকবে না। ইসমাইলের বিবি যদি তার নিজের মা নাও হ'য়ে থাকে এখন আর নিজের মাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

সন্তান দুটিকে সঙ্গে নিয়ে ফুলটুসি ষ্টেশনে এসে দেখল টেপির মা পেছনের দিকে একটা কামরার কাছে যাত্রীদের সামনে হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ভিক্ষা করছে। এটা তার একটা কৌশল। ভিখারীর কায়দাতে রেল গাড়ীর কাছে কাছে ঘোরা। তারপর গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে কোন একটিতে উঠে পড়া। ফুলটুসি সেই কামরাটার কাছে গিয়ে দেখল ভিড়ের মধ্যে ফতেমাও আছে। ফুলটুসি ছেলেদের নিয়ে গাড়ীতে উঠে বসল। ছেলে দুটি গোলমাল করছিল, ফতেমা আঙুল তুলে ইসারা করতেই থেমে গেল। যাত্রা সুরু হ'ল।

কিন্তু ভয়ই মৃত্যুর কারণ হ'ল ফুলটুসির।

গাড়ী ছাড়তে না ছাড়তে এক বুড়ো যাত্রী বললে—তোমরা বোধ হয় চালের কারবার কর? না?

এরা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তা হ'লে তাদের চেহারা দেখলেই কি লোকে আজকাল চিনতে পারে!

—তা বেশ কর। কিন্তু আজকের এই গাড়ীতে চেপে ভালো কর নি বাছারা। সাহেব চেকার আছে। তা ছাড়া আজ সকাল থেকে প্রতি জেলায় সীমান্তে গাড়ী থামিয়ে পুলিশরাও গাড়ীতে তোমাদের মতো কেউ আছে কিনা দেখবে খুঁজে।

টেপির মা বললে,—আমরা ভিক্ষে ক'রে খাই বাবা, আমাদের পুলিশ কি করবে বাবা।

ফতেমা বললে—আমরা যা চাল আনি তাও ভিক্ষে করে পাওয়া চালের মতোই।

ফুলটুসি সুরতুনকে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল—পুলিশ কি সত্যি আসবি? সুরতুন বললে—তাই হবি হয় তো।



কি হবে কে জানে। ফুলটুসি হাত বাড়িয়ে ছেলে দুটিকে কোলের কাছে টেনে নিল। ধুলি-মলিন চার পাঁচ বছরের দুটি ছেলে। কিন্তু স্বভাবতই ফুলটুসির দৃষ্টিতে তারা অনন্য। তার উপরে গতবার চালের মোকাম থেকে ফিরতে একটা রঙচঙে গামছা কিনে দু টুক্‌রো ক'রে লুঙ্গির ঢঙে পরিয়ে দিয়েছে তাদের। ইসমাইল যে ইসমাইল সেও দেখে হাসি-হাসি মুখেই বলেছিল—বেশ হইছে, মোল্লাজিদের মতোই! ফুলটুসির মনে হ'ল এমন চকচকে লুঙ্গি পরিয়ে আনা ভালো হয়নি। এত লোকের মধ্যেও এদের উপরেই যেমন তার চোখ দুটি বারেবারে গিয়ে পড়ছে চেকারদেরও তেমনি পড়বে।

হঠাৎ দুটি ষ্টেশনের মাঝখানে চিৎকার করতে করতে গাড়ীটা থেমে গেল। যাত্রীরা তখন ঘুমের নেশায় ঢুলছে। বুড়ো যাত্রীটির বয়সের জন্যই ঢুলুনি আসছে না। সে বললে—এবার বোধ হয় চেক হবে।

ফতেমারা সরে সরে বসল। ফতেমা বলল—ভয় কি? সঙ্গে চাল নি। ট্যাকা কিন্তুক কেউ বার করবা না, বলবা ট্যাকা নাই।

ফুলটুসি কিন্তু এদের কথায় যোগ দিল না। এরা কিছু বলার আগেই পেছন দিকের দরজাটা খুলে বাইরের অন্ধকারে সে নেমে পড়ল। শুধু নেমে পড়া নয়, পাশের লাইনটা পার হ'য়ে, লাইনের ওপারের গাছগুলির ছায়ায় গা মিশিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু তেমনি একটা শব্দ ক'রেই গাড়ীটা আবার চলতে সুরু করল। ছুটন্ত গাড়ী ধরবার জন্য ফুলটুসি ছুটে এল। হাতল হাতের নাগালের বাইরে। উঁচুদিকের একটা পাদান হাত দিয়ে ধ'রে উঠতে গেল ফুলটুসি, পায়ের তলে কোন অবলম্বন পেল না। একটা আতঙ্কময় শূন্যের মধ্যে দিয়ে সামান্য একটা আঘাতের অনুভব পার হ'য়ে ফুলটুসির সব অনুভব মিলিয়ে গেল।

খবরটা এরা পেল না তখন তখনই। প্রথমে ভাবল পেছন দিকের কোন কামরায় উঠেছে, পর পর কয়েকটি ষ্টেশনে গাড়ী ধরলেও যখন সে এল না তখন এরা ভেবেছিল সে উঠতে পারে নি গাড়ীতে। ফিরবার পথে খবরটা এল। সবাই স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রইল। ছেলে দুটি ফতেমার পাশেই বসে ছিল কান্নাকাটি করে ক্লান্ত হ'য়ে। ফতেমা এতক্ষণ প্রবোধ দিয়েছে আর একটু দূরে গেলেই পাওয়া যাবে মাকে। এবারও যখন ষ্টেশনটা থেকে গাড়ী ছেড়ে দিল আর ফুলটুসির বড় ছেলে জয়নুল প্রশ্ন করলে, মা এল না কেন, ফতেমা উত্তর দিতে পারল না। তার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে কাঁদতে লাগল।

বেদনাতুর হৃদয় নিয়ে এদের দলটি দিঘার ষ্টেশনে নামল। ষ্টেশনে নেমে সুরতুনের মনে হ'ল: অনেক বিপদের কথা কল্পনা করেছে এই ব্যবসায় সম্বন্ধে এমন চূড়ান্ত বিপদের কথা মনে আসে নি কারো। প্রায় মাস চার পাঁচ আগে টেপির মা যে ঘটনাটা ঘটিয়েছিল বিরামগঞ্জের ষ্টেশনে তারই সত্যিকারের রূপটা যে এত নির্মম তা সেদিন বোঝা যায় নি। ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষ টেপির মায়ের চালের পুটুলিটা আটকে ফেলেছিল। গাড়ী ছাড়তে বেশী দেরী নেই। টেপির মা আত্মহত্যাই যেন করবে এমনভাবে প্লাটফর্ম বেঞ্চে রেললাইনের উপরে নেমে পড়ল। দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ীর দুখানা কামড়ার ফাঁক দিয়ে। রেলের কর্মচারীরা ভীত হয়ে তাকে তখনকার মতো চালের পুঁটুলি ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সুরতুন বললে ফতেমাকে—ছাওয়াল দুডে?

নিজের চালের পুঁটুলিটা সুরতুনের হাতে দিয়ে ছেলে দুটির হাত ধরে ফতেমা হাঁটতে লাগল।

—আর কোথায় যাবি, ওরে বাপ কনে থাকে তাও জানিনা।

চিকন্দির শ্রীকৃষ্টদাশ অধিকারীর বাড়ীতেই গ্রামের সংকীর্ত্তনের আখড়া।

গ্রামের এ দিকটায় এককালে কারো সখের বাগিচা ছিল। কতগুলি বড় বড় গাছের সুবিন্যস্ত ভীড় দেখে বোঝা যায়। বাগিচার অবশ্য আর কিছু অবশিষ্ট নেই। জায়গাটা ছায়া সুশীতল।

বহুদিন পূর্বে, শোনা যায় সান্যালরাও নাকি তখন চিকন্দিতে আসে নি, বাগানটির একটি আমগাছের নিচে এক সর্বত্যাগী বৈষ্ণবসন্ন্যাসী আসন ক'রে বসেছিল। স্থানটি পছন্দ করার কারণ নাকি আম গাছটিকে জড়িয়ে জড়িয়ে একটা মাধবীলতার ঝোঁপ ছিল। এই রকমই প্রবাদ।

রায়বাবুরা তখন গ্রামের একছত্র জমিদার। সেই রায়বাবুদের সাথে বিবাদ লাগল সন্ন্যাসীর। রাতারাতি বিখ্যাত হ'য়ে উঠল সে। রায়বাবুদের একটি ছোট ছেলে বিপথে গিয়েছে এই অভিযোগে রায়কর্ত্তা তাকে গ্রাম ছাড়বার হুকুম দিলেন। সন্ন্যাসী টলল না, 'রাধারাণীর ইচ্ছা' এই ব'লে সে রায়বাবুদের এক্তিয়ারের মধ্যেই স্থির হ'য়ে বসে রইল। রায়কর্ত্তার মৃত্যুর পরে রায়দের বিপথে যাওয়া ছেলেটিই নাকি বাগানখানি বৈষ্ণবদের দান করেছিল। একটা আখড়া হয়েছিল।

কিন্তু আখড়ার কোন চিহ্ন আর এখন চোখে পড়ে না। সেই সন্ন্যাসীর পর পর স-বৈষ্ণবী যে সব সংসারি গোঁসাই এসেছিল তাদেরও চিহ্ন নেই। পরে এক সময়ে আখড়ার জমিতে দাস-উপাধি-ধারী একদল লোক এসে বাসা নেয়। কপালে গঙ্গামাটির বদলে পদ্মার মাটি দিয়েই একটা চিহ্ন আঁকত তারা, আর গলায় কাঠের মালা দিত। বাগানের এখানে-ওখানে যে যেটুকু পেরেছে দখল করেছে, বাইরেও একটু আধটু জমি নিয়ে এটা সেটা লাগিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা করতে করতে কৃষকদের স্তরেই নেমে এসেছিল তারা।

একটিমাত্র বিষয়ে এরা এদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে, সেটা এদের বিবাহের ব্যাপার। বৈষ্ণবী আনে এরা কণ্ঠি বদল ক'রে। একশ'য় একজন বৈষ্ণবী হয়তো তরুণ বয়সী হয়, বাকি আর সব কটুভাষিণী, বিগত যৌবনা মুণ্ডিতশির। তারা যেন ধর্মপালনের জন্যই বেঁচে আছে। অন্তত ধর্মপালন ব্যতীত তাদের স্ত্রী হিসাবে কল্পনা করতে সাধারণ জোয়ান চাষীর ছেলে পারবে না।

এদের সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এরা কখনও আত্মবিস্তার করতে পারে নি। লোকগুলি নিজেরা হ্রস্বজীবী, শিশু মৃত্যুর সংখ্যাও বোধ হয় অন্যান্য পাড়ার চাইতে তুলনায় বেশী এদের মধ্যে। গ্রামে একটা বিদ্রূপাত্মক কথা চালু আছে,—আমগাছে মাধবীলতা দেখলে পরগাছাটা কেটে ফেলাই বিধেয়, পরগাছা যারা ভালোবাসে তারা ফল পাবে কোথায়? আখড়ার মাটি দখল করতে যে ক'ঘর লোক এসেছিল, এখনও প্রায় সে ক'ঘর লোকই পাড়ায় বাস করে। ডাক্তাররা যদি এ বিষয়ে কথা বলত, তারা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ছাড়াও যে কারণ দেখাত সেটা যৌনব্যাধি।

খুব সম্ভব স্থানীয় জমিদারদের প্রতিকূলতার ফলেই এরা আত্মপ্রসার করতে পারে নি। রায় এবং সান্যাল বংশে সব বিষয়ে শত মতভেদ থাকলেও এদের ধর্ম মতটাকে কিছুটা অবহেলা কিছুটা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখার বিষয়ে তাঁরা এক মত ছিলেন। দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেন নি বটে, নামকীর্ত্তনের জন্য দোল দুর্গোৎসবে হয়তো ডাকতেনও কিন্তু সেটা এঁদের চোখে হীনজাতীয় চামার ঢাকিদের ঢাক বাজানোর জন্য ডাকার মতো। অন্ত্যজ চামাররাও বিদায় পেত, অন্ত্যজ পরগেছেরাও।



কিন্তু কোন কোন চামার যেমন জাতব্যবসা ছেড়ে জমি-জমা নিয়ে চাষী হ'য়ে যায় তেমনি হয়েছিল শ্রীকৃষ্টদাসের বাবা। তিন চার বিঘা ধানিজমিও করেছিল সে মানিকদিয়ারের মাঠে।

শ্রীকৃষ্টদাস পিতার ধানিজমিগুলি পেয়েছিল, উপরন্তু তার দূর সম্পর্কের দুই পিসির দরুন দুখানা ভিটাও পেয়েছিল। তা ভিটা দুখানা যোগ করলে এক বিঘারও উপরে হবে। লোকটি সম্পন্ন চাষী হয়ে উঠতে পারত, হঠাৎ হ'ল ধর্মে মতি। হাতে কিছু নগদ টাকাও পড়েছিল তার; তীর্থ করতে বেরল সে অল্প বয়সে।

নবদ্বীপ-মুখো মন হ'লে থেতখামার থাকার কথা নয়। শ্রীকৃষ্টদাস একদিন অধিকারি পদবী নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। তার সঙ্গে এল এক বৈষ্ণবী, ঝাকরা ঝাকরা একমাথা চুল, লাল চোখ, গাঁজার কল্কে, আর খুস্‌খুসে কাশি। বৈষ্ণবীর সম্বল ছিল পেতলের একটি ঘটি, আর একটি কন্থাঝুলি। শ্রীকৃষ্ট তার কাছে দুটি পদ গানও শিখেছিল।

বৈষ্ণব মতে বিরহটা মিলনের চাইতেও মূল্যবান। সেই মূল্যবানের আস্বাদও শ্রীকৃষ্ট পেল। অত বড় চেহারা নাকি বৈষ্ণবীর, যে নাকি শ্রীকৃষ্টর পক্ষ হয়ে এক পাড়া লোককে কায়দা করতে পারত সে হঠাৎ বিদায় নিল। একটিমাত্র রোগা পল্কা বিবর্ণ সন্তান জন্মের সাথে সাথে মৃত্যু হল তার। প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর আগেকার ঘটনা।

বিরহ কিন্তু শ্রীকৃষ্টকে প্রেমিক ক'রে তুলেছিল, পর্য্যায়ক্রমে সে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৈষ্ণবী এনেছিল।

শোনা যায় তৃতীয় বৈষ্ণবী যখন দিঘা ষ্টেশনের দিকে রাত ক'রে পায়ে হেঁটে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ট এসে বলেছিল,—রাধরানি, তুমি নাকি যাবা?

শ্রীকৃষ্ট অনেকদিন থেকে জ্বরে ভুগছিল, হলদে মুখ চোখ, চুলগুলি তামাটে। যে বৈষ্ণবী পালানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছে, সে অবাক হ'য়ে গেল কৃষ্টদাসের কথার ভঙ্গিতে। রাধারানি তার নামেও নয়।

শ্রীকৃষ্টদাস বলল,—বস, গাড়ি আনি।

শ্রীকৃষ্ট নিজে গাড়ি চালিয়ে তৃতীয় বৈষ্ণবীকে ষ্টেশনে তুলে দিয়ে এসেছিল। এই ঘটনার প্রায় বছর দশেক পরে শ্রীকৃষ্টর ঘরে চতুর্থ এল। সে নিজেই এসেছিল। প্রথমা বৈষ্ণবীর সংসার আশ্রমের কি রকম একটা দূরসম্পর্কের বোন সে। তার মাহিষ্য চাষী পিতা অল্প বয়সে মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এগার'তে পা দিয়েই স্বামীকে খেয়ে ঘরে ফিরে এসেছিল সে। পিতা তখনও বেঁচে, সংসারে আদর যত্নের অভাব হয় নি, কিন্তু ভাগ্য মানুষকে টানে। পাড়ার একপ্রান্তে কপালিদের বাস। ছিল, তাদের এক ছোকরার সাথে পালিয়ে গেল সে। সমানে বাধলেও সংসার পেতেছিল সে; কিন্তু সংসার দুবছর চলেই থেমে গেল, আঠারোতে দ্বিতীয় স্বামীকে খেল সে। ততদিনে পিতার মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিক দিয়েও সংসারে ফেরা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। নবদ্বীপের কাছাকাছি পৌছে সে সংবাদ পেল তার সেই দিদির, যে নাকি শ্রীকৃষ্ট দাসের প্রথমা বৈষ্ণবী। কিন্তু বিশ বছরের পুরানো খবর। প্রায় তার জন্মের আগেকার ঘটনা।

দিদির খোঁজে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চিকন্দি এসে সে দেখতে পেল দিদি গত হয়েছে, আরও দুটি বৈষ্ণবী তার স্থলাভিক্ত হ'য়ে এসেছে, গিয়েছে।

খবর পেয়ে বোকা বোকা মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে মেয়েটি বলল শ্রীকৃষ্টর মুখের দিকে চেয়ে,—কি করব তাই বল জামাই।

শ্রীকৃষ্ট বলল—থাকো যতদিন উপায় না হয়। পায়ের ঘা সারুক।

প্রায় একবছর পরে একদিন শ্রীকৃষ্ট বলছিল, ছোটবৌ এখন কি করব।

—বৌ কয়ো না আমাকে, আমাকে যে বৌ কয় সে বাঁচে না?

শ্রীকৃষ্ট প্রত্যাহত হ'য়ে ফিরে এসেছিল কিন্তু গ্রামে রাষ্ট্র হ'ল শ্রীকৃষ্টের চতুর্থার খ্যাতি ও অখ্যাতি।

তার বয়স তখন বাইশ তেইশের বেশী নয়। কষ্টিপাথরের কালো চেহারা, আঁটসাট শক্ত গড়ন। কিন্তু নাকটি ওরই মধ্যে তোলা তোলা চোখদুটি টানা টানা। অপরিচিতের সম্মুখে সে চোখের দৃষ্ট বোকা বোকা অর্থহীন, কিন্তু পরিচিতের সম্মুখে ভাষা-বহুল।

[ প্রথমখণ্ড সমাপ্ত ]

## কালিদাসের কুমারসম্ভব থেকে

ব্যলম্বন্তপুর-বাসিনীরা
পঞ্চেন্দ্রিয়-প্রীতিশোভা দানে উৎসুকী,
নেত্র-সঞ্চালনে আছে ব্রীড়া,
প্রসাধন দেবে দেবী তন্বী প্রাক্-মুখী।

# পণ্যা

## অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

'এ-ঘর আমার। ঘরটা আমার নামেই ভাড়া নিয়েছি।'

'তাতে হয়েছে কি?'

'কিছু হয়নি। কিন্তু ও-কথাটা ভুলে যাও কেন?'

'ওইটুকুই মুরোদ তোমার। তোমার মতো বেটাছেলের জোর শুধু ওখানেই।'

'বাজে কথা বলো না।'

'বলবো, হাজারবার বলবো। আমাকে তুমি কি পেয়েছ? তুমি যা চাও তাতেই ঘাড় কাৎ করতে হবে আমাকে?'

'চেঁচিয়ো না।'

'চেঁচাবো। জানুক সবাই, শুনুক সবাই।'

'বেয়াড়া মেয়েছেলে।'

'আর তুমি? তুমি কি? পশুরও অধম!'

বিছানায় শুয়ে একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলতেই ওদের কথাগুলো কানে এলো আমার। এই সবে সুরু, কতো রাত পর্যন্ত এখন ওদের এই বিশ্রী ঝগড়া চলবে কে জানে? এ এক বিরক্তিকর ব্যাপার হয়ে উঠেছে। একদিন দু'দিন না হয় সহ্য করা যায়। কিন্তু রোজ রোজ এমনিভাবে চলতে থাকলে এ-বাড়ীতে টেকাই দায় হয়ে উঠবে যে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে একটু আরামে চোখ দুটো বুঁজবো তারও উপায় থাকছে না। এমনি ঝগড়া ওদের রোজ রাতেই লেগে আছে। কোত্থেকে এই আপদ এসে জুটলো এ-বাড়ীতে?

ক'মাস হলো নীচের ঘরটিতে ওরা এসে উঠেছে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে কিংবা কলতলায় চান করতে করতে মেয়েটিকে সবসময়ই দেখি আমরা। কিন্তু লোকটি যেন ডুমুরের ফুল—কদাচিৎ ওকে দেখতে পাই।

রাত্তির দশটা-এগারোটা নাগাদ কোত্থেকে এসে হাজির হয় লোকটি। সদর দরজায় কড়া নাড়া দেয় আস্তে আস্তে। আর মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুলে দেয় দরজা। খুব ভোরে সন্তর্পণে লোকটি যখন আবার বেরিয়ে যায় তখন কখনো কখনো আমাদের মুখোমুখি পড়ে ও যেন কেমন চমকে উঠে। মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে কেমন কেঁচোর মতো

শরীরটা বেঁকিয়ে সদর দরজা দিয়ে গলিয়ে যায় বাইরে। এ-ছাড়া অবশ্য কোন কোন রোববারের দুপুরে ওর দর্শন মেলে। হয়তো দেখা যাবে, নানান্ তরিতরকারীতে-ঠাসা একটা মস্ত ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ ওদের ঘরের সামনেকার বারান্দায় ঝপ করে নামিয়ে রেখে ও পাঞ্জাবীর হাতায় কপালের ঘাম মুছে ফেলছে। বেঁটে, স্থূলকায় চেহারা ওর, গায়ের রঙ মিশ্‌কালো—কচ্ছপ-সদৃশ হাঁটার ভঙ্গী।

আর মেয়েটি ওই লোটির পাশে যেন একেবারে বেমানান। সুডৌল-সুঠাম গড়ন ওর। উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের রঙ। সুন্দরীর সংগায় অনায়াসেই পড়ে। কিন্তু আমাদের আশ্চর্য লাগে, ও-রকম একটা লোকের সঙ্গে কি করে ওর জীবনটা জড়িয়ে গেল। দুটি সন্তানও রয়েছে ওদের। একটি পাঁচ-ছ' বছরের, আরেকটি বছর তিনেকের হবে হয়তো।

কিন্তু রোজ রাতে শ্লীলতার সীমানা ছাড়ানো ওদের ঝগড়াটা একেবারে উত্যক্ত করে করে ফেললো আমাদের। তাই বাড়ীওয়ালাকে একদিন না বলে পারলাম না, 'এ-সব কী লোক এনে জোটালেন মশাই ?'

বাড়ীওয়ালা উপরেই থাকেন, সপরিবারে। যেন তাঁকেই কটাক্ষ করেছি এম্নিভাবে তিনি আমার মন্তব্যটা নিলেন। বললেন, 'আমি ভাড়াটে বসিয়েছি। মাসে মাসে ভাড়াটা ঠিকমতো পেলেই আমার হলো। কে কেমন লোক তা আমার দেখবার নয়।'

আমাদের মধ্যে ফণী একটু একরোখা গোছের। ফোর্টউইলিয়মে কাজ করে। এককালে যুদ্ধেও গিয়েছিল। ওর রক্তটা এমনিতেই একটু গরম। আমি কিছু বলবার আগেই ও ডান হাতের তর্জ্জনী নেড়ে বললে, 'দেখবার নয় মানে ? পরিবার-পরিজন নিয়ে আপনার এ-বাড়ীতে সব ভাড়াটেরা রয়েছে। এখানে কোন ঘর যা তা লোককে ভাড়া দেবার আপনার কোন রাইট্ নেই। নো, দিস্ ওণ্ট্ বি টলারেটেড্!'

সবে সকাল বেলা। বাড়ীওয়ালা নিত্য-নিয়ম অনুসারে গঙ্গা-স্নানে বেরোচ্ছিলেন : একটু বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'দেখুন, পরিবার নিয়ে যারা থাকবে তাদের জন্যেই আমি ঘর ভাড়া দিয়ে থাকি। আপনারা পরিবার নিয়ে থাকেন না। তবু, আপনারা শিক্ষিত আর সরকারী-চাকুরে বলেই ঘর-ভাড়া দিয়েছি আপনাদের। নইলে আমারও ইচ্ছে নয়, একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে একটা মেস-বাড়ী ফেঁদে বসবেন আপনারা।'

বাড়ীওয়ালার কথাটা শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠছিল ফণী, ওকে বাগ মানালে জয়ন্ত। বললে, 'বেশ, আমরাই দেখবো এর কিছু করা যায় কিনা। চলে আয় ফণী।'

নিশ্চুপে নিজেদের ঘরে এসে ঢুকলাম। আমরা পরিবার নিয়ে এখানে থাকছি নে, কথাটা ঠিক। কিন্তু মেস-বাড়ী ফেঁদে বসেছি এ-কথাটা বাড়ীওয়ালা বললে কোন্ আক্কেলে ? আমরা তিনজনায় মিলে ঘরটা ভাড়া নিয়েছি, আমার নামেই ঘর। আমার অফিসের



একজন পিওনও থাকে আমাদের সঙ্গে। ও-ই দু'বেলা দুটো রান্না করে দেয়। এটা বুঝি মেস হলো ? মেস তো নয়ই, সেমি-মেসও নয়। অথচ একটা ছুতো ধরে বাড়ীওয়ালা কেমন শাসিয়ে গেল আমাদের। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে লাগলো আমার। রাগ বাড়ীওয়ালার ওপর ততোটা হলো না যতোটা হলো ওই ওদের ওপর। এ্যাদ্দিন এখানে আছি, বাড়ীওয়ালার সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটিও হয়নি। এখন ওরা ওই নীচের ঘরটিতে এসে উঠতেই তো আজ এই প্রথম বাড়ীওয়ালার সঙ্গে অনর্থক খিটিমিটি বাঁধলো।

এর মাত্র দিন কয়েক পরে অফিস থেকে এসে মুখহাত ধুয়ে সবে খবরের কাগজখানা নিয়ে একটু কাৎ হয়েছি, বাড়ীওয়ালা এসে ঘরে ঢুকলেন।

তাঁকে দেখেই মনের রাগটা মাথায় চড়ে গেল আমার। খবরের কাগজটা মুখের সামনে থেকে একটু সরিয়ে তাঁর দিকে এক নজর তাকিয়েই আমি মুখ গম্ভীর করলাম।

'এই যে যতীনবাবু, এই এলেন নাকি অফিস থেকে।' হৃদ্যতামূলক খানিকটা হাসি মুখে এনে আমার তক্তপোষটার একধারে বসলেন বাড়ীওয়ালা। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'একটা সলা-পরামর্শের ব্যাপার ছিল আপনাদের সঙ্গে।'

রাস্ টেনে যেন থামালাম রাগটাকে। বললাম, 'আমাদের সঙ্গে ? আপনাকে পরামর্শ দেব আমরা ?'

কাদামাটির মতো নরম হয়ে গিয়ে বাড়ীওয়ালা বললেন, 'হেঁ, হেঁ, কি যে বলেন যতীনবাবু !'

মনে মনে ভাবলাম দেখাই যাক না ব্যাপারখানা কি। তাই একটু স্বচ্ছন্দ হতে চেষ্টা করলাম আমি। বললাম, 'হঠাৎ এমন কি হলো যে আমাদের পরামর্শের দরকার ?'

কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নামিয়ে বাড়ীওয়ালা বললেন, 'মানে, ওদের কথা আর কি। ওই নীচের ঘরটার ওদের সম্বন্ধে।'

'ওদের কথা আমাদের কাছে বলে কি লাভ ?' বিদ্রূপ ফেনিয়ে উঠলো আমার মুখে, 'সে তো আপনিই ভালো বোঝেন, মাসে মাসে ঠিকমতো ভাড়াটা পেলেই তো আপনার সবকিছু চুকে গেল।'

একটা ঢোক গিলে বাড়ীওয়ালা বললেন, 'ঠাট্টা করছেন তো যতীনবাবু ! তা করুন। সেদিন রাগের মাথায় কি সব বলে ফেলেছি আপনাদের।'

তাঁর চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটু নরম হলাম। বললাম, 'না, সে-কথা নয়। ওরাও ভাড়াটে, আমরাও ভাড়াটে। তা-ই বলছিলাম।'

'ভাড়াটে ?' চোখ দুটো মুহূর্তে রক্তবর্ণ হয়ে গেল বাড়ীওয়ালার, 'ওরা ভাড়াটে ? যত্তোসব বাটপাড়-বদমাস লোক এসে ঢুকেছে। ওদের আমি ঘর-ছাড়া না করে ছাড়ছি নে

দেখবেন। কাল-পরশুই উচ্ছেদের নোটিশ দেব।'

একচোট হাসতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু মুখে বললাম, 'কী করেছে ওরা?'

'কী না করেছে বলুন? ওই মুখরা মেয়েছেলেটার জ্বালায় অন্য ভাড়াটেরা তিষ্ঠোতে পারছে না। সবসময় ভাড়াটেদের সঙ্গে একটা কিছু নিয়ে ঝগড়া-খিস্তি করবে। ওই ডাহাবাজ মেয়েটার জন্যে আমি আর সব ভাড়াটেদের খোয়াব নাকি?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'আর আমার বাড়ীতে বসে আমাকেই কিনা অপমান করে?' উত্তেজনায় হাঁপরের মতো উঠানামা করছে বাড়ীওয়ালার বুক।

'অপমান করেছে?'

'হ্যাঁ, মুখের ওপর আমায় যা তা বলেছে মশাই। ওর সাহসের বলিহারী!'

'কে? ওই মেয়েটা?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তবে আর কার কথা বলছি?' একটা সিগারেট ধরালেন বাড়ীওয়ালা। আমার দিকে আরেকটা এগিয়ে দিলেন। তারপর তিনি যা বললেন তা আজ দুপুরের ঘটনা। ওই মেয়েটি, মালতী ওর নাম, একগাদা কাপড় শুকাতে দিতে এসেছিল ছাতে। ছাতটা ভাড়াটেদের জন্যে নয়। তবু ও রোজই কাপড়-চোপড় ছাতে মেলে দিয়ে শুকিয়ে নেয়। আজ ও একগাদা কাপড়-চোপড় ছাতের সমস্ত তারটা জুড়ে মেলে দিতেই বাড়ীওয়ালার স্ত্রী আপত্তি জানালেন। আর তাতেই ও একেবারে ফস্ করে জ্বলে উঠলো। ওদের কথা কাটাকাটি শুনে বাড়ীওয়ালা এসে কথা বলতেই ওর আরো রোখ চেপে যায়। রণরঙ্গিণী চেহারা করে মুখে যা এসেছে তা-ই নাকি ও বাড়ীওয়ালাকে বলেছে। বলেছে, ছাতে ও কাপড় রোজই শুকিয়ে নেবে। আর সাধ্য থাকে তো বাড়ীওয়ালা যেন ওদের বাড়ী থেকে উঠাতে চেষ্টা করে দেখে।

কাপড়ের খুঁটে চশমার কাচটা মুছে আমি শুধু মৃদুভাবে মাথা নাড়তে লাগলাম।

'সেদিন আপনারা যা বলেছিলেন তা-ই ঠিক যতীনবাবু,' বাড়ীওয়ালা সিগারেটে একটা জোর টান দিলেন, 'আপনারা তো আর অনেক কিছুই জানেন না, অফিস-কাছারী নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু আমি খানিকটা খবর সংগ্রহ করেছি।'

বললাম, 'কি জেনেছেন?'

কপাল কুঁচকে, কণ্ঠস্বরে ফিস্ ফিস্ আওয়াজ তুলে বাড়ীওয়ালা যা বললেন তাতে আমার কৌতূহল উবে গিয়ে একটা বিস্ময় আর ঘৃণার ভাব মনটা বিষিয়ে ফেললো। ওই মেয়েটি, মালতী যার নাম, ও নাকি ওই কুশ্রীদর্শন লোকটির বিবাহিতা স্ত্রী নয়। অপাতদৃষ্টিতে শুধু ওদের সম্পর্কটা স্বামী-স্ত্রীর. কিন্তু তার কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। আর লোকটি নাকি



অবাঙ্গালী—নাম কার্তিক কালোয়ার। বাড়ীওয়ালাকে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ঘর ভাড়া নিয়েছে—নাম লিখিয়েছে কার্তিক কর বলে। লোহার ব্যবসায় আছে ওর, অন্যত্র নিজের স্ত্রী-পুত্রও নাকি রয়েছে।

সব শুনে আমি বললাম, 'কি করে এসব জানলেন?'

বাড়ীওয়ালা বললেন, 'আরে মশাই, আজ ত্রিশ বছর ধরে এই বাড়ী দিয়েই তো করে খাচ্ছি। চুলও প্রায় পাকিয়ে ফেললাম। আমার কোন্ ভাড়াটের ঘরে ক'টা ভাত সেদ্ধ হয় তা-ও আমার জানতে বাকী থাকে না।' পর পর কয়েকটা টানে সিগারেট নিঃশেষ করে আবার বললেন, 'সে যাক গে, আমি ওদের আমার বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করবোই। আমায় কিনা তেজ দেখায়!'

একটু হেসে বললাম, 'কি করে ওঠাবেন ওদের? ওরা তো নিয়মিত ভাবে ভাড়া দিয়ে যাচ্ছে।"

বাড়ীওয়ালা বললেন, 'তা কি আর আমি মনে মনে প্ল্যান করিনি ভেবেছেন? ওরা আনডিজায়েরেব্‌ল এলিমেণ্টস্, ওদের কোন সোশ্যাল ষ্ট্যাটাস্ নেই—এসব অভিযোগ থাকবে আমার। তা হলেই দেখবেন কি হয় ব্যাপারখানা।'

'তা করা যায়।' আমি মনে মনে একটু উৎসাহিত হলাম।

'তা-ই করবো আমি। সনাতনবাবু-যোগনাথবাবু, ওই যে কোণের দিককার ঘরের ভাড়াটে—ওঁরা তো এক কথাতেই রাজী। এখন আপনারা যদি—'

'এতে আবার জিজ্ঞেস করবার কি আছে? ওদের উঠিয়ে দেবার জন্যে তো আমরাই সেদিন আপনাকে বলতে গিয়েছিলাম।' বাড়ীওয়ালাকে আমি স্থির আশ্বাস দিলাম। গৃহস্থ-বাড়ীতে এ-জাতীয় নষ্ট-ভ্রষ্ট লোকের বসবাস কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

যেদিন ওই কথা হলো তারপর বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেলেও কিন্তু বাড়ীওয়ালার আর কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। আমাদের সবার দ্বিধাহীন আশ্বাস পেয়েও তাঁর নীরব থাকবার কি কারণ থাকতে পারে?

কারণটা শেষে একদিন সনাতনবাবুই বললেন। কার্তিক কালোয়ার একটা রফা করে ফেলেছে বাড়ীওয়ালার সঙ্গে। মাসিক দশ টাকা করে বেশী ভাড়া দেবে বলেছে সে, আর তাতেই বাড়ীওয়ালার মুখ বন্ধ।

সনাতনবাবুর কাছ থেকে এ-কথা জানবার পর বাড়ীওয়ালার সঙ্গে আর কোন কথাই হয়নি আমাদের। ওদের প্রসঙ্গে তো নয়ই, অপ্রাসঙ্গিক কোন বিষয়ে দুএকটি বাহুল্য কথাও নয়। তাঁর ওপরই এবার আমাদের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়লো। সব কিছু জেনেশুনেও লোকটা ওদের এখানে জাঁইয়ে রাখবার দিব্যি পাকা ব্যবস্থা করলো! কিন্তু

রাগটা আমাদের মনের চৌহদ্দিতেই ঘোরাফেরা করে আস্তে আস্তে যেন থিতিয়ে পড়লো একসময়। এ-বাড়ীর ওরাও যে একঘর ভাড়াটে তা যেন আমরা নিজেদের অজ্ঞাতসারেই শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিলাম।

অন্যান্য ভাড়াটেদের মতো ওদেরও একঘর ভাড়াটে হিসাবে গণ্য করে ওদের অস্তিত্বটা যখন গুরুত্বহীন, বিশেষত্বহীন বলে নিজের মনে দাঁড় করিয়েছি তখনই একদিন আকস্মিকভাবে যা ঘটলো তাতে আমার ভাবনাটা কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল।

সেদিন প্রায় মাঝ-রাত্তিরে আমার সদ্য-ঘুম-লাগা চোখ দুটো ওদের ঝগড়ার তোড়ে খুলে গেল হঠাৎ। এ-ভাবে ওদের ঝগড়া তো নতুন কিছুই নয়, তবে ঘুম ভাঙ্গতেই আমার মনে হলো আজকের ঝগড়াটা তীব্রতর। অশ্লীল ভাষার যথেচ্ছ ব্যবহার করছে দু'জনেই। আর সেই সঙ্গে ওদের ছেলে দুটিও চীৎকার জুড়েছে।

'কি, মারবে? মারতে চাও আমাকে? গা' ছুঁয়ে ছাখো না একবার!' মেয়েটি চেঁচিয়ে কথা বলছে।

'হাত ছাড়ো, হাত ছেড়ে দাও বলছি।' লোকটির রুক্ষ কণ্ঠস্বর।

'অসভ্য, ইতর কোথাকার, গায়ে হাত তুলতে আসিস্!'

'এই, মুখ সামলে বলছি।'

উঠে আমি আলোটা জ্বাললাম। আর নয়, আর কিছুতেই সহ্য করবো না। বাড়ী-ওয়ালার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া এখনই করে ফেলবো।

ঝন্ ঝন্ শব্দে কাচের জিনিসপত্র ভাঙ্গার শব্দ হলো নীচে। আর সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠলো, 'আপনারা দেখুন এসে ও আমায় মারছে, মেরে ফেললে। আপনারা নেবে আসুন।'

কান্না-কাঁপা গলার বিপন্ন আর্তনাদটা একটা তীক্ষ্ণ বর্শার মতো যেন আমার কানে এসে বিঁধলো।

ফণী-জয়ন্তকে আর ডেকে জাগাতে হলো না। ধড়মড় করে উঠে বসলো ওরা। দু'জনেই একসঙ্গে বললে, 'কি ব্যাপার?'

ওদের মুখ থেকে কথাটা পড়তে না পড়তেই আবার আর্তনাদ শোনা গেল মেয়েটির, 'মেরে ফেললে, আমায় মেরে ফেললে—।' বিকৃত-কণ্ঠ চীৎকারটা এবার গোটা বাড়ীটাকেই কাঁপিয়ে তুললো যেন।

আমি বললাম, 'নীচে একবারটি চল দেখি। শেষে কি একটা খুন-খারাপি হয়ে যাবে আমরা এখানে থাকতে।'



'মারডার? ইম্পসিব্‌ল!' কথাটা বলেই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠলো ফণী। আমার আগেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নীচে নেমে অন্ধকারে দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ির কাছে আলোর সুইচটা টিপলাম। আবদ্ধ পরিসরের ঘুটঘুটে অন্ধকারটা যেন নিমেষে গা ঢাকা দিলে। ফর্ ফর্ করে উড়ে পালালো কতকগুলো আরশোলা। ঘরটার কোণে এঁটো-কাঁটা ফেলবার জায়গার একটা ছুঁচো চিক চিক করে উঠলো।

আমরা নামতেই ওদের ঝগড়াটা অপেক্ষাকৃত নীচু পর্দায় নেমে এলো। লোকটির গলায় আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। শুধু মেয়েটি বিকৃত-ভগ্ন কণ্ঠস্বরে তখনো চেঁচিয়ে চলেছে, 'ডাকাত, খুনে কোথাকার! ছোটলোক—।'

মুহূর্তকালের মধ্যে ওদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দরজা খোলাই ছিল। ঘরের ভেতরে ফিকে-সবুজ বাল্‌বটা ফ্যানের কড়া হাওয়ায় অবিরাম দুলছে। এক সেকেণ্ডেই ভেতরকার দৃশ্যপট আমাদের নয়নগোচর হলো।

খাটের সামনে ওরা দু'জন দাঁড়িয়ে। মেয়েটি লোকটির হাত দুটো সজোরে ধরে রয়েছে। আর লোকটি চেষ্টা করছে হাত ছাড়িয়ে নেবার। চুলগুলো মুখের ওপর এলিয়ে পড়ে মুখ ঢেকে ফেলেছে মেয়েটির। শাড়ীর অর্ধেকটা লুটিয়ে পড়েছে মেঝেয়। অসম্বৃত দেহবাস, সায়া-ব্লাউসের আবরণটাই রয়েছে শুধু। আর লোকটির গিলে-করা পাঞ্জাবী বুকের কাছাকাছি জায়গা থেকে নীচের দিকে সবটাই ছেঁড়া।

আমরা গিয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটি লোকটির হাত ছেড়ে দিয়ে সেই অগোছালো বেশবাস নিয়েই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো। এসে আমার সামনে দাঁড়িয়েই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো, 'ও আমায় মেরে ফেলছিল। আপনারা নেমে না এলে ও আমায় মেরে ফেলতো।'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম। বললাম, 'কি হয়েছে?'

আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যেন প্রথম সচেতন হলো মেয়েটি। শাড়ীটা টেনে কোমরের দিকে খানিকটা গুঁজে দিলে। মুখের ওপর ছড়িয়ে-পড়া চুলগুলো বাঁ হাত দিয়ে পেছনে সরালো। একটা বিক্ষুব্ধ আবেগ যেন ওর শরীরের অস্থি-পাঁজর সবকিছু পিষে ফেলছে। কথা বলতে পারছে না মোটেই। হাত-পা কাঁপছে ঠক ঠক করে—যেন ঝড়ো-হাওয়ায় বিধ্বস্ত পাখী। মাঝে মাঝে কেমন একটা হিক্কের শব্দ বেরিয়ে আসছে মুখ থেকে।

আর ঘরের ভেতরে খাটের কাছে একটা কাষ্ঠ-মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটি। মুখে একটি শব্দ নেই, শরীরের নড়াচড়াও নেই একটু। চোখ দুটো ওর লাল্‌চে। আমাদের দিকে এক পলক তাকিয়েই ও ঘাড় নীচু করলো।

'আপনারা থাকতে এই জানোয়ারটা আমার ওপর এমন অত্যাচার করে যাবে?'

মেয়েটি ফুঁপিয়ে উঠলো, 'ওর হাত থেকে আমায় বাঁচান আপনারা।'

আমাদের পেছনেই সনাতনবাবু-যোগনাথবাবুও এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বাড়ীওয়ালাও নেমে এসেছেন।

সনাতনবাবু বললেন, 'বাড়ির মধ্যে এসব বিশ্রী কাণ্ড-কারখানা চলতে দেওয়া যায় না।'

চোখ পাকিয়ে ফণী বললে, 'অল রাইট্, আমি পুলিসে খবর দিচ্ছি। পিস্ মাষ্ট্ বি মেনটেণ্ড্ বাই এনি মিন্স!'

ফণী মুখ খুলতেই ওকে আমি থামালাম। বাড়ীওয়ালার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আপনি এ-সবের কি ব্যবস্থা করতে চান, বলুন।'

বাড়ীওয়ালা কি ভাবলেন একটুকাল। তারপর লোকটির উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা অন্য কোথাও ঘর যোগাড় করে উঠে যান আমার বাড়ী থেকে, এই আমার সোজা কথা।'

বাড়ীওয়ালার কথা শুনে মেয়েটি হঠাৎ ঝুপ্ করে আমার পায়ের কাছেই বসে পড়লো। বললে, 'না, ওর সঙ্গে আমি যাবো না কিছুতেই। ও আমায় তিল তিল করে মেরে ফেলছে।' কথাটা বলেই ও পা দুটো জড়িয়ে ধরলো আমার। কান্না-কাতর কণ্ঠে আবার বলে উঠলো, 'ওই অসভ্যটার হাত থেকে আমায় বাঁচান। আপনারা যা বলবেন, তা-ই করবো আমি। কিন্তু ওকে শিক্ষা দিয়ে দিন, ওকে তাড়িয়ে দিন বাড়ী থেকে।'

'এ কি করছেন, উঠুন,' তাড়াতাড়ি একটু পেছনে সরে গেলাম আমি। ওর হাতের স্পর্শ থেকে পা সরিয়ে আনলাম। বললাম, 'ভেবেচিন্তে যা ভালো মনে করেন, করবেন। সুস্থির হোন আগে।'

আলোর ছটায় ওর গণ্ডদেশে চোখের জলের দাগটা চিকচিকিয়ে উঠলো। আমার দিকে জল-ভেজা চোখ দুটো তুলে তাকিয়ে রইলো একটুকাল। পরে বললে, 'আপনারা তো সবই বোঝেন, দেখছেন সবই। রোজ দুপুর রাতে এসে ও হৈ চৈ বাধায়। নেশা করে আসে।' একটু থেমে আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'কিন্তু মানুষের শরীর তো আমার। আজ ক'টা মাস ধরে অসুখে ভুগছি। ওর কথায় কথায় সায় দিতে পারি না বলেই ওর আক্রোশ। তাই ও আজ গলা টিপে ধরেছিল আমার।'

লোকটির দিকে তাকিয়ে ফণী দাঁত কিড়মিড় করে উঠলো, 'স্কাউণ্ড্রেল! গেট আউট্ আই সে, গেট আউট্!'

সনাতনবাবু আর যোগনাথবাবু সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এখুনি বেরিয়ে যান বলছি। এটা ভদ্রলোকের বাড়ী না? বেরিয়ে যান, নইলে এখুনি পুলিস ডাকছি।'

স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটি ওই মিলিত গর্জন শুনে ভয় পেয়ে গেছে। নিমেষে কেমন অসহায়ভাবে তাকালো ও। তারপর কাপড়ের কোঁচাটা তুলে ধরে সেই মুহূর্তে



ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সদর দরজার দিকে এগোতে এগোতে বাড়ীওয়ালার দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললে, 'আপনার ঘর কয়েক দিনের মধ্যেই আমি ছেড়ে দিচ্ছি।'

আমি প্রায় ধমকে উঠলাম, 'তা-ই দেবেন।'

টু-শব্দটিও না করে সদর দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ও বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল।

গা ঝাড়া দিয়ে এবার আমরা ফিরে দাঁড়ালাম। আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন কালঘাম বেরোচ্ছে।

বাড়ীওয়ালা আগেই কখন সরে পড়েছেন। সনাতনবাবু আর যোগনাথবাবু ওপরে যাবার সিঁড়িটার মাঝ-বরাবর জায়গায়, ফণী-জয়ন্তও সিঁড়িতে পা দিয়েছে। আমি একটু পেছনে, সিঁড়ি থেকে হাত কয়েক তফাতে।

'শুনুন।' এগিয়ে এসে আমার কাছে দাঁড়ালো মেয়েটি।

অগত্যা দাঁড়াতে হলো।

'আপনার কাছে সব বলবো আমি। একটুও লুকাবো না,' ওর উদ্গত-উচ্ছ্বাস চাপা গলার আওয়াজে কেমন অদ্ভুত অনুনয় ফুটে উঠলো, 'শুনবেন?'

আমি বললাম, 'সে একসময় বলবেন'খন। এখন ধীর-স্থির হয়ে বিশ্রাম করুন তো গিয়ে।'

আমার কথায় যেন একটা খুসীর দীপ্তি দেখা দিলে ওর চোখে। আস্তে আস্তে ও ওর ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ঘাড় ফিরিয়ে আমি আরেকবার ওর ঘরের দিকে তাকালাম। মস্ত ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটা টুকরো টুকরো হয়ে মেঝের এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আর দু'একটা ভাঙ্গা কাচের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে খেলা করছে ওর ছেলে দুটি।

সেদিন রাত্তিরে ওকে যা বলেছিলাম তা শুধু একটা কথার কথা। ওর কথার উত্তরে মানানসই একটা কিছু বলা দরকার মনে করেই ওকে বলেছিলাম ওর বক্তব্য আমি শুনবো। আমার ও-কথায় মনের বিন্দুমাত্র সমর্থনও ছিল না।

তাই একদিন রোববারের দুপুরে ও যখন সহসা এসে আমাদের ঘরে উপস্থিত হলো তখন আমি স্বভাবতই অবাক হয়ে গেলাম।

ঘরে অন্য কেউ নেই। ফণী-জয়ন্ত ম্যাটিনী-শো সিনেমায় গেছে। আমি বসে বসে অফিসের কতকগুলো কাগজপত্র দেখছিলাম।

দরজার কপাটে হাত রেখে ও এসে দাঁড়ালো। আলতোভাবে আঁচলটা বাঁ আঙুলে জড়াতে জড়াতে ঘরে ঢুকলো। নির্বাক। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ীটা মেঝেয় লুটিয়ে লুটিয়ে

আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো যেন। ঘরের একেবারে মাঝখানে ও এসে দাঁড়িয়েছে। দুমিনিট আমার মুখে কোন কথা এলো না।

কিন্তু পরক্ষণেই আমার মার্জিত মনটা রুখে, উঠলো। বললাম, 'কি চান?'

টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে একটু হেসে ও বললে, 'না, কিছু না, এম্নি।'

'এম্নি!' আমার কণ্ঠস্বর রুক্ষ হলো, 'একটা কাজ করছি দেখতে পাচ্ছেন।'

মুখের হাসিটুকু অক্ষুণ্ণ রেখে ও বললে, 'বন্ধের দিনেও আপনি কাজে ব্যস্ত থাকেন?'

'হুঁ।'

'আপনার বুঝি আর রোববার নেই।'

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়ে ওকে আমি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার স্পষ্ট নির্দেশই দিলাম, 'একটা কাজের সময় এ-ভাবে এসে ডিষ্টার্ব করা কি আপনার উচিত হচ্ছে?'

আশ্চর্য, তবু ও দাঁড়িয়ে রইলো। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'আপনারা খবরের কাগজ রাখেন তো।'

'রাখি।'

'কাগজটা দেবেন একটু, খানিকবাদেই ফিরিয়ে দিচ্ছি।'

'নিয়ে যান। টেবিলের ওপরই রয়েছে।'

কাগজটা হাতে নিয়ে ও বললে, 'এ তো ইংরেজি কাগজ। বাঙলা কাগজ রাখেন না?'

'না।'

টেবিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে কাগজটা উল্টেপাল্টে খানিকক্ষণ দেখলো ও। তারপর কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিয়ে বললে, 'থাক, ইংরেজি পড়তে পারিনে তো।'

আমি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে চুপ করে রইলাম।

'না, যাই। আপনার আবার কাজের ক্ষতি হচ্ছে।' কথাটা বলেই একান্ত অনিচ্ছায় যেন ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি আবার কাগজপত্রগুলোতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। আমার বিবেক বুদ্ধির কাছে ও পাত্তা পাবার দুঃসাহস পেল কি করে? কথাটা যতোবার মনে মনে উচ্চারণ করলাম ততোবারই একটা দাম্ভিক পরিতৃপ্তিতে আমার বুকটা ফুলে উঠলো।

মাত্র দুটি দিন পরে।

অফিস থেকে ফিরতেই বাড়ীওয়ালা এসে বললেন, 'যাক, আপদ বিদেয় হয়েছে মশাই।'



আমি জিজ্ঞাসার চোখে তাকাতেই তিনি আবার বললেন, 'ওরা ঘর ছেড়ে দিয়ে গেল।'

'কখন?' একটা মামুলী প্রশ্ন করলাম আমি।

'এই তো, আজ সকালের দিকে, আপনারা অফিসে যাবার পর। মেড়োটাও এসেছিল। ওরা দু'জনায় জিনিসপত্র সব বাঁধা-ছাঁদা করলো।'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। আমি আর কোন মন্তব্য না করে নিজের ঘরমুখো হলাম।

ফতুয়ার পকেট থেকে একখানা সাদা এনভেলপ বার করে বাড়ীওয়ালা বললেন, 'যাবার সময় মেয়েটি এই চিঠিখানা দিয়ে গেল আমায়। আপনাকে দিতে বললে। কোথায় কোন্ আশ্রমে-টাশ্রমে নাকি আপনি ওকে ভর্তি করিয়ে দেবেন বলেছিলেন, চিঠিতে সে-সম্বন্ধেই নাকি লিখেছে।'

নির্ভেজাল মিথ্যে। ওর সঙ্গে আমার ও-রকম কোন কথাই হয়নি। তবু চিঠিখানা নিয়ে ঘরে এসে ঢুকলাম।

বড় কৌতূহল হলো। তাই জামা-কাপড় না পাল্টেই চেয়ারটা টেনে টেবিলের কাছে বসলাম।

গঁদের আঠা দিয়ে খামের মুখ শক্ত করে আঁটা। ওপরে কিছু লেখা নেই। খাম ছিঁড়তেই চিঠিখানা বেরিয়ে পড়লো।

পেন্সিলে লেখা দীর্ঘ চিঠি। কোন সম্বোধনসূচক কথা নেই সুরুতে, তারিখও নেই শিরোনামায়। লিখেছে—

"সেদিন এক অসহ্য-অসহায় মুহূর্তে আমার স্বরূপটা যখন দেখে ফেললেন তখন বড় সাধ হয়েছিল—আবার নিজেকে আমি বাঁচিয়ে তুলবো। তাই আপনাদের—না, আপনার ওপর নির্ভর করতে চেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, যে নরকজ্বালায় আমি জ্বলেপুড়ে মরছি তা থেকে আপনি আমায় মুক্ত করে বাঁচবার নতুন কোন পথ ধরিয়ে দেবেন। আমি মানুষের মতো হয়তো এখনো বাঁচতে পারবো—এ-আশা যে কতো তীব্র হয়ে উঠেছিল তা আপনাকে কী করে বোঝাবো? কেন, জানিনা, আপনাকে দেখেই মনে হয়েছিল আমার ভবিষ্যতটা আপনিই গড়ে দেবেন। মনে হয়েছিল, আমার অগাধ বিশ্বাস আর আশা করবার লোক যেন এতোদিন পরে আমি সত্যি খুঁজে পেলাম—আপনাকে।

কিন্তু আমার সে-আশাটা এতো নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিলেন! কেন দিলেন? আমায় তো কথা দিয়েছিলেন আমার জীবনের সমস্ত কথাই শুনবেন আপনি। আর সেদিন কিনা আমায় ওম্নিভাবে অপমান করে নয়, ঘৃণা করে, আপনার ঘর থেকে বার

করে দিলেন। মান-সম্ভ্রমের অধিকার তো কবেই হারিয়েছি আমি। আমায় যে কোন ভাবে লাঞ্ছনা দেবার, অপমান করবার পথ তো আপনাদের সবারই খোলা ছিল। বাড়ী থেকে বার করেও দিতে পারতেন সবাই মিলে। সে-সবই সইতো আমার। কিন্তু আপনার ঘৃণা যে আমার ক্ষয়-হয়ে যাওয়া বুকেও দাগ দিয়ে দিলে তার যন্ত্রণা আমি কি করে সইবো?

কেউ তো বিশ্বাস করবে না আমিও একদিন বাবা-মার স্নেহ-ভালোবাসায় গড়ে উঠেছিলাম। ওদের কাছে আর আমার কানাকড়ি দামও সেদিন থেকে নেই যেদিন এই লোকটি, যার সঙ্গে এখন আছি, আমার জীবনে চরম বিপর্য্যয় এনে দিলে। আমার মতো এমন অনেকের জীবনেই এ বিপর্য্যয় আজ।

ওর সঙ্গেই আবার যাচ্ছি। কোথায় জানি নে। বলেছে, নতুন বাসা যোগাড় হয়েছে কোন্ জায়গায়।

আপনি হয়তো পড়বেন না এ-চিঠি। হয়তো খানিকটা পড়েই কুটি-কুটি করে ছিঁড়ে ফেলবেন। তবু দেখুন, কতো কি আজেবাজে লিখে ফেললাম। আমি তো জানি, আমার অতীত পঙ্কিল, বর্ত্তমান রোগীর আবিলতায় কাটছে, আর ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রয়েছে কোন শোচনীয় পরিণাম। তবু, তিল তিল করে মরতে মরতেও একথাটা তো কোনদিন ভুলবো না—কোন এক দুঃসহ রাতে অন্তত মুহূর্তের জন্যেও কেউ একজন দুটো সমবেদনার চোখ তুলে ধরেছিল আমার দিকে। আমার কলঙ্কিত জীবনে তা-ই একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে থাকবে।”

সম্বোধনহীন, স্বাক্ষরহীন চিঠিখানা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়লাম। তারপর একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলাম আস্তে আস্তে।

‘কি, অফিস থেকে এসেই যে একেবারে চিঠি নিয়ে মগ্ন!’

জয়ন্তর আকস্মিক কথায় যেন আমার ঘুম ভাঙ্গলো

কাছে এসে ভ্রূভঙ্গী করে ও আবার বললে, ‘বউর চিঠি?’

চিঠিখানা সযত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিলাম আমি। অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিলাম, ‘তা-ই।’

# ভারত-সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ

## ইন্দ্রজিৎ

[ পূর্ব্বানুস্মৃতি ]

এর পর শত-শত বছর ধরে ভারতবাসী তাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে ভাঙতে আর গড়তে লাগল। ভারতের ভাগ্যচক্রে কখনও রবির খেলা আবার কখনও শনির খেলা। শুধু বৃহস্পতি মাঝখানে থেকে দুজনকেই ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করছেন।

নতুন যুগের শাস্ত্রজ্ঞদের নতুনত্ব ছিলনা। তাই যুগান্তের শকুন আকাশে পক্ষ বিস্তার করে সে যুগস্রষ্টাদের মৃত্যুর পূর্ব্বাহ্ন জানিয়ে দিল।

নতুন শাস্ত্রজ্ঞদের কাছ থেকে সেই চির বঞ্চিতরা যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল, বরং তার চেয়ে তারা দুর্ব্ব্যবহার পেল অধিক। পুরণো শাস্ত্রজ্ঞদের কাছে বঞ্চিতদের কায়া ছিল অবহেলিত, এ যুগে তাদের কায়ার সঙ্গে ছায়াও অস্পৃশ্য নাম অর্জ্জন করল। কিন্তু নতুন শাস্ত্রকারদের মাথায় ওপরকার উড্ডীয়মান শকুন যে ক্রমশ পক্ষ-বিস্তার করে নেবে আস্‌ছে মাটীর দিকে নতুনের নবতম ডালে।

ঘোর বিপদের দিন এসে দেখা দিল এবার বাংলার বুকে। আক্রান্ত হোল এ দেশ বিজাতীয়ের দ্বারা। লক্ষ্মণসেন গুপ্তপথে পালালেন দেশ ছেড়ে। রাধার গৃহত্যাগ আর অভিসার।

কিন্তু সত্য কথা প্রকাশ হোলে সর্ব্বনাশ, তাই বিজিতরা লক্ষ্মণসেনের খবর জিজ্ঞেস করবার আগেই জয়দেব গেয়ে উঠলেন :

রতিসুখসারে
গতমভিসারে
মদনমনোহরবেশম্।

গানটির ভেতরে ভাবটি দৃশ্যমান, যারা বুঝতে চেষ্টা করবে তলিয়ে এ গানের অন্তর্নিহিত ভাব, তারা বুঝবে আর যারা এ গানের বাণী আর সুর নিয়েই খুশী থাকতে চাইবে, তারা বুঝবে শ্রীরাধার অভিসার গীতি গাইছেন বাংলার দরদী বৈষ্ণব কবি।

নতুন বাতাস বইল দেশের বুকে, নতুন রকমের কষাঘাতের অনুভূতি বোধ করল বাংলার সাধারণ আর অসাধারণ সকলেই প্রায়। শাসন ব্যবস্থার রকমফের হোল নতুন মুসলমান শাসকের হাতে, মানুষ নতুন করে আবার মরতে আরম্ভ করল কিন্তু তাই বলে মানসিকতা মরলো না, সে মানবিকতা আত্মগোপন করে রইল অনাগত কাম্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু মানবিকতার মুখ আছে, কাজেই সে নিপীড়িত বাংলার এক ছোট্টগ্রাম নানুরের এক পর্ণকুটীরের ভেতর থেকে সাধক বাঙ্গালীর ভাষায় গেয়ে উঠল সকলকে শুনিয়ে :

শুন রে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই

সারা বাংলা শুনলো সে গান। চোখ চেয়ে দেখল বাঙ্গালী চণ্ডীদাস গাইছে সে গান।

চণ্ডীদাস ছিলেন একজন সাধক যিনি বিপদে উদ্‌ভ্রান্ত না হয়ে কারণ চিন্তা করতেন পরিণামের। চণ্ডীদাস জানতেন উৎকট ত্যাগ আর ব্রহ্মচর্য্য হয়তো কয়জন লোককে ঠিক সোজাসুজি স্বর্গের দ্বারে পৌছে দেবে কিন্তু তাই বলে সে পথে সকলের সিদ্ধি হবেনা। তিনি হয়ত জানতেন যে বুদ্ধবাদে বাদ পড়েছে স্ত্রীলোক, মুক্তিপথের যাত্রী হওয়ার তাদের কোনরকম অধিকার ছিলনা। নিজের সুন্দর চেহারা তাঁর, যাঁর লালনপালনে বড় হয়ে উঠেছিল সেই মাতৃসমা ধাত্রীকে তিনি দরজা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন স্ত্রীলোকের পক্ষে এ স্থান যোগ্য নয়। ধাত্রী এসেছিলেন বুদ্ধের কাছে আশ্রয় চাইতে কিন্তু আশ্রয় মিলল না। বার বার তিনি এলেন আর বার বার তিনি ফিরে গেলেন। অবশেষে শিষ্য আনন্দের অনুরোধে তিনি আশ্রয় দিতে তাকে রাজী হয়েছিলেন কিন্তু জানতেন যে নরনারীর একত্রে অবস্থানই সংযমের শেকলকে করবে দুর্ব্বল। হোলও তাই।

কিন্তু তার বহুদিন পরে নানুরের কবি চণ্ডীদাস বুঝলেন ঘি আর আগুনকে যখন দূরে রাখা যাবেনা চিরকালের মতন, তারা পরস্পর পরস্পরের পক্ষে আগুনের মতনই কিন্তু এই আকর্ষণকে যদি সৎপথে পরিচালিত করা যায় তাহলে যে ভয়টা বুদ্ধ-যুগে ছিল সে ভয়টা না থাকতেও পারে।

দেহ থেকেই দেহাতীতে যেতে হবে, কাম থেকে কামাতীতে দিতে হবে পাড়ি। চণ্ডীদাস আরম্ভ করলেন কিশোরী-ভজা রীতি যাকে একদিক থেকে বলা যায় কুমারী-পূজা। রামীকে তিনি বললেন শুধু প্রেমের কথা নয়, ডেকে নিয়ে সকলকে শুনিয়ে বললেন :

শুন রজকিণী রামী
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া
স্মরণ লইনু আমি

কিন্তু কেন তিনি বললেন একথা সেটা লোকে হয়ত বুঝল না। তাই তিনি লোকেদের বোঝাবার জন্যে কাব্যের দর্শন গাইলেন :

রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
কাম গন্ধ নাহি তায়
রজকিনী রূপ কিশোরী স্বরূপ
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়।

সাধক তার মুক্তিপথের যাত্রার জন্যে বা পাশের পরিবর্তে ডান পাশে নিলেন সাধিকাকে, দেশ জুড়ে কিশোরী ভজার সাড়া পড়ল। একেই একদিক থেকে বলা হয় সহজিয়া ধর্ম্ম। মানুষের মুক্তি পথে বাঙ্গালীর কিশোরী ভজা রীতি এক স্মরণীয় স্বতন্ত্র অধ্যায়। কিন্তু জাতি সেদিন পরাজিত তাই সে সাধনা চলল নিঃশব্দে, মুক্তির পথে সে চুপে চুপে পা বাড়াতে লাগল। মানব আর মানবী সাধনার পথে স্বাধীন হলেন দুজনেই। এ সাধনার অন্যতম প্রধান পুরোহিত চণ্ডীদাস নিজে।

এর পর চণ্ডীদাস তার নিজের গীতিকাব্যের ভেতরে হয়ত শ্যামকে পেলেন আর জীবনের মধ্যাহ্নে তিনি পেলেন শমনকে। মাটীর বুকে তার আবেদন গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল, বাংলার নদী নালার স্রোতের জল চণ্ডীদাসের সেই মর্ম্ম বাণী বুকে করে চলতে লাগল; বাংলার আকাশ-বাতাস তারই বাণী বুকে করে বেড়াতে লাগল :



শুনরে মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই

তারপর অনেক দিন আবার নিস্তব্ধতা কিন্তু চণ্ডীদাস তার প্রবর্তিত জাতির মুক্তির মন্ত্র রেখে গিয়েছিলেন দেশের বুকে আর সে মন্ত্র পড়ে কুড়িয়ে নিলেন আর একজন পরবর্ত্তী সময়ে, দেখা গেল নিপীড়িতদের মুক্তির জন্যে

একদিন শ্রীঅদ্বৈত গঙ্গা স্নান করি
হুঙ্কার করয়ে ঘন বলি হরি হরি

গঙ্গাজল, তুলসীপাতা আর ফুলের অর্ঘ্য সাজিয়ে অদ্বৈত গঙ্গায় গিয়ে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ অর্ঘ্য ভাসালেন, অর্ঘ্য ভেসে চলল যেদিকে, অদ্বৈত তার পেছনে সাঁতরাতে লাগলেন, সে অর্ঘ্য গিয়ে ঠেকল নদীয়ায়, বুঝলেন অদ্বৈত, শতাব্দীর সূর্য্য এখানেই গর্ভস্থ।

কোন মানুষ কোন যুগকে তৈরী করেনা। আবার কোন যুগই কোন মানুষকে গড়ে না। যুগ বা মানুষের ভেতরে যদি কোন প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে ভাঙ্গা গড়ার প্রশ্নের আবির্ভাব ঘটে।

যে অদ্বৈত ছিলেন ব্রাহ্মণ, কাজে কর্ম্মে, আচারে, নিষ্ঠায় তিনি কোনদিন কর্ত্তব্যচ্যুত হননি। কিন্তু সংকীর্ণতা তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি ছিলেন সত্যসন্ধানী। তিনি জানতেন মানুষের রক্তে আজও আছে আলিঙ্গন করবার বীজাণু, অধিকার আর সময় পেলে আবার সে হাতের হাতিয়ার ফেলে শত্রুর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠবে। এটা শুধু তার ধারণা ছিলনা, এ ছিল তার স্থির বিশ্বাস।

তিনি ছোটকে ছোট দেখতেন না, ঘৃণা করতেন না ঘৃণিতকে, অদ্বৈত জানতেন এদের মনুষ্যত্বকে জোর করে চেপে রাখা হয়েছে। সমাজের কল্যাণে মানুষের কল্যাণে এরা হেয় নয়, পরম পাথেয়।

অদ্বৈতের স্বপ্ন ছিল জাতির শাপ-মোচন, কিন্তু এও তিনি জানতেন যে সে মুক্তি তিনি নিজে দিতে পারবেন না। কালের কলঙ্ক মোচনের প্রয়োজনে জন্ম নেবেন এমন একজন কালজ্ঞ যাকে অদ্বৈতই প্রথম চিনতে পারবেন, কারণ চিন্‌তে যে তাকে হবেই। মানব-মুক্তির সাধনা তিনি তখন ধ্যান করেছেন, একান্ত ভাবে সাধনা করেছেন গোপনে জাতির শাপ মোচনের। প্রতীক্ষা করেছেন শবরীর মতন, অনাগত রামচন্দ্রের জন্যে দিন গুনছেন অদ্বৈত নিপীড়িতের মুক্তির মুহূর্ত্তের।

দেশের দশের ওপর শাসক করছে উপেক্ষা আর দেশের দশজনের অদ্বৈত করেছেন মহাবির্ভাবের অপেক্ষা, উপেক্ষাই অপেক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করে।

এমনি সময়, পনের শতক তার শেষ ভাগে দিয়ে গেল সে যুগের অবদান। দুই শতক অর্থাৎ বিদায়ী আর অনাগত শতকের সন্ধিক্ষণে শোনা গেল যুগদেবতার পদধ্বনি। পনের শতকের দান বোঝা গেল ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে, সেই বছর ফাল্গুণী পূর্ণিমার দিনে পূর্ণিমার চাঁদকে রাহু গ্রাস করল। কিন্তু কেন—

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলস্থ চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন॥

কলসীর কানা যাঁরা ছুঁড়ে মারে তাদের প্রতি যেন রাগ কোরনা বরং তাদেরও কৃষ্ণপ্রেম দাও, নিজের মানবিকতায় অন্য জনের মানবিকতার উন্মেষ কর একথা বললেন বাঙ্গালী বুদ্ধ। পনের শতকের শেষ দান জন্ম-দেবতা চৈতন্য টেনে নিলেন লাঞ্ছিতদের নিজের বুকের মাঝে, আর সমস্ত মানুষের পায়ে পরম সন্তোষে

নিজের দাসখৎ লিখে দিলেন স্বইচ্ছায় সগৌরবে। নিজেকে সমর্পণ করলেন সকলের পায়ের কাছে। চণ্ডীদাসের কিশোর আর কিশোরীর মিলিত রূপ চৈতন্যদেব, নারীর কমনীয়তা আর পুরুষের তেজের মিলিত রূপ চৈতন্যদেব! এতদিন বাদে আশ্বস্ত হলেন অদ্বৈত, তাঁর সাধনার বৃক্ষে ফল ধরেছে, চৈতন্য উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন অদ্বৈত, এ যেন রামের আগমনে বাল্মিকীর প্রণাম। যুগ দেখল যুগ দেবতাকে, দেখ্‌ল কল্পতরু তার শাখা প্রশাখা নিয়ে ফুলে ফলে দিনে দিনে বড় হচ্ছে।

বাংলা দেশ মাতল। সংকীর্ত্তনের সঙ্কেতে শঙ্কিত হলেন শাসক। হোসেন সাহ বাংলায় শান্তি এনেছে জান্‌ত লোক কিন্তু সেটা কি ভুল এ প্রশ্ন হয়তো সেদিন মনে উদয় হয়েছিল মুসলমানদের কিন্তু বাংলার শাসক চাঁদ কাজী ভাবলেন এ অসহ্য, এ জিনিষ দমন না করলে পায়ের তলাকার লোকগুলো ক্ষেপে উঠবে, ক্ষেপে উঠবে—কারণ ক্ষেপাবার মতন আপন ক্ষেপাকে দেখতে পেয়েছিলেন চাঁদ কাজী, কিন্তু বুঝতে পারেন নি।

আজ থেকে নগরের কোন বাড়ীতে যদি কীর্ত্তন শোনা যায় তাহলে তার জন্যে শাস্তি পেতে হবে সে গৃহকর্ত্তাকে, কাজীর আদেশ, কাজীর আদেশ, কাজীর আদেশ, ঘোষণাকারী ঢোল পিটতে পিটতে ঘোষণা করতে করতে দূর থেকে এসে আবার চলে গেল দূরে সকলকে সে আদেশ শোনাতে।

কীর্ত্তনাকাঙ্ক্ষীদের মুখ মলিন হোল, কেবল মুখ মলিন হোলনা তাঁর যিনি চৈতন্য, পার্শ্বদদের ডেকে বল্‌লেন, ভালই হোল এতদিন ঘরে ছিলাম আজ ঘরছাড়া হলাম, এতদিন কৃষ্ণনাম ঘরের চারদিকের দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আস্‌ত, আজ থেকে একদিনে সেই চারটে দেওয়ালই ভেঙ্গে পড়ল। আজ থেকে পা গুটিয়ে বসে আর কীর্ত্তন করা চলবে না, বেরতে হবে নবদ্বীপের পথে পথে, কাজীর আদেশ, ঘরে কীর্ত্তন করলে, আদেশ লংঘন করা হবে যে।

চাঁদ কাজীর আদেশ বিন্দুমাত্র অপরিপূর্ণ থাক্‌ল না। কাজীর আদেশ মান্য করবার জন্যে নগর কীর্ত্তনের দল নিয়ে রাস্তায় নামলেন অকলঙ্ক চাঁদ। কিন্তু নগর কীর্ত্তনের দল বেরুলো শুধু নগর কীর্ত্তনের জন্যে নয়, সে দল সোজা যাত্রা করল চাঁদ কাজীর বাড়ীর দিকে।

অসংখ্য ভক্তের ভক্তি উন্মাদনা আর অগণিত নরনারীর শান্ত সমর্থনের গন্ধ পেলেন বাতাসে চাঁদ কাজী। কৃষ্ণনাম যখন তাঁর দোরের গোড়ায় এসে কথা বল্‌ছে, তখন রাগে উদ্‌ভ্রান্ত কাজী দরজা খুলতে আদেশ দিলেন দ্বারীকে, দেখবেন কত বড় স্পর্দ্ধা এই চৈতন্যের যার লঘু-গুরু জ্ঞান নেই।

দরজা খুল্‌তে দ্বারী দেখল সেখানে শুধু একটা দল নেই প্রায় সবাই আছে, কাঠের পাদুকা থেকে টুপী পর্য্যন্ত সকলেই যেন এক সূত্রে গাঁথা পড়েছে, আর সেই জীবন্ত প্রকাণ্ড সরীসৃপের দেহের মতন দলের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে চৈতন্য।

চাঁদ কাজীর দোরের গোড়ায় চাঁদ কাঁদছে।

দরজা খুলতে চারিদিক থেকে আবার মহোল্লা'সে নাম কীর্ত্তন গান আরম্ভ হোল। সে দল দোর ছাড়া পেরে সোজা কাজীর কাছে এগুতে লাগল, দলের পুরোভাগে চৈতন্য কাজীর সামনে গিয়ে দুই হাত তুলে কৃষ্ণনাম গাইতে লাগলেন, চোখ দিয়ে তাঁর ধারা পড়ছে দুধারায় অবিরত ধারে। মানুষ কাজী নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না, রাগ তাঁর পরিণত হোল অনুরাগে। নিজেকে সমর্পণ করলেন চাঁদ কাজী পনের শতকের কাছে। (ক্রমশঃ)

# গল্প লেখকের প্রথম গল্প

## সুবোধকুমার গুপ্ত

ঝড় উঠ্‌লো।

ভীষণ ঝড়। ঝড়ের মতো ঝড়। এতো এতো ঝড়।

কোথায়, না মনে। রিক্তার মনের আকাশে আজ তাল তাল ঝড় উঠ্‌লো।

শোঁ শোঁ করে।

সন্‌ সন্‌ করে।

কেন, না অভিমানে। অভিমান হয়েছে অষ্টাদশীর, এলোকেশীর।

কেশ আলুলায়িত করে দুপুরে খাটে শুয়ে রিক্তা একটা মাসিক-পত্রিকায় গল্প পড়ছিলো, তাই।

গল্প পড়ে অভিমান ?

হ্যাঁ, গল্প পড়েই অভিমান।

গল্পটা আর পাঁচজনের কাছে নিছক্‌ গল্প হতে পারে, কিন্তু রিক্তার কাছে নয়; অল্প তো নয়ই।

গল্পটা অল্প, মানে ছোট। একটি ছোট গল্প এই পাঁচ ছ' পাতার; আর পাঁচ ছ' মিনিটের মধ্যেই—এই সাত-তাড়াতাড়ি গল্পটা সে পড়ে ফেলেছে।

তাড়াতাড়িই সে গল্প পড়ে, বিশেষ করে যে-সব গল্প ওর লেখা। ওর গল্প সে প্রথমটায় তাড়াতাড়িই পড়ে, তারপর ধীরে সুস্থে আর একবার, তারপর আরও একবার। এ-গল্পটাও সে তেম্‌নি করে পড়লো।

ঢটকে চটকে পড়লো।

গুলে গুলে পড়লো।

মানে এ-গল্প যে ওর গল্প।

ও কে, না সুব্রত সেন।

সুব্রত সেন কে, না রিক্তার দাদার বন্ধু।

গল্পটা সত্য ঘটনা কিনা, রিক্তা এখনও তা' জানে না। জানে না বলেই এতো প্রশ্ন। জানে না বলেই এতো ঝড়। এ তো শোঁ শোঁ। এ তো সন্‌ সন্‌। তাই আশঙ্কা।

তাই অভিমান।

জানে না তবু রিক্তার কেবলই মনে হচ্ছে গল্পটা গল্প নয়।

তবে কি মনে হচ্ছে ? না, সত্য ঘটনা বলে মনে হচ্ছে।

সত্য ঘটনা বলে কেন মনে হচ্ছে, না প্রেম।

প্রেমে পড়লে নাকি ওমনি হয়। মিথ্যেটা সত্যি, সত্যিটা মিথ্যে। ডান—দিক্ বাঁ—দিক্, আর বাঁ—দিক্ ডান—দিক্।

তা কেন, না প্রেমের ধাঁচই এই, ধরণই এই।

আশ্চর্য, প্রেমটা ওদের দেড় দু' বছরের, কিন্তু অব্যক্ত।

অব্যক্ত কেন, না প্রেমটা ওদের চোখে চোখে হয়েছে।

ওষ্ঠের হাসিতে হাসিতে হয়েছে।

পরস্পরের সাক্ষাতে পরস্পরের ভীরু-চঞ্চল-আনন্দ-বেদনার-অসহ্যতার মধ্যে হয়েছে। লাল রঙ্-দেখে পরস্পর বেশ ভাল করেই বুঝেছে যে প্রেমটি পরিপক্ক, কিন্তু খোসা ছাড়ানো হয়নি।

অর্থাৎ মুখের কথা দিয়ে সে-কথা পষ্ট করে কেউ কাউকে বলেনি। না সুব্রত রিক্তাকে, রিক্তা সুব্রতকে।

রিক্তা তো মেয়ে, তার ত নাকি মুখ ফোটে না।

তবে সুব্রতরই তো উচিত ছিলো মুখর হওয়ার।

তা হয়নি কেন, না ফুরিয়ে যাবে বলে।

ফুরিয়ে যাবে কেন, না সুব্রতর ধারণা প্রেমের কথা মুখে প্রকাশ করলে প্রেম নিঃশেষ হয়ে যায় আর তার সৌরভও থাকে না।

অবশ্য কয়েকবার সে দৃঢ়তা নিয়ে বলবেও ঠিক করেছিলো, কিন্তু পারে নি। যতবারই রিক্তার সান্নিধ্যে সে এসেছে, ততবারই সে সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়েছে, বলতে পারেনি। পারে নি কেন, না ভয়। কি—জানি, কি—জানি।

তাই ধারণা করে নিয়েছে, প্রেমটা হৃদয়ে হৃদয়ে শুধু অনুভবের—অন্তর্লোকের। —কথার মাধ্যমে বহির্প্রকাশের নয়। প্রেমের মাধুর্য ততক্ষণই, যতক্ষণ সেটা ফোটো-ফোটো কিন্তু অস্ফুট। ভোর-ভোর কিন্তু প্রভাত নয়।

তাই খোসা ছাড়ানো হয়নি। তাই রিক্তার কাছে গল্পটা সত্য ঘটনা বলে মনে হয়েছে।

তবে—কি, তবে কি মনে হয়েছে।

পুরুষ !

যৌবন !

কি বিশ্বাস !

কিন্তু এবার সুব্রতর খোসা না ছাড়িয়ে উপায় নেই, গল্পটা লিখেছে বলে নয়, ছাপিয়েছে



বলেও নয় ; সুব্রতর সেই ছাপানো গল্প রিক্তা মাসিক পত্রিকায় এক্ষুনি এই দুপুরে পড়ে ফেলেছে বলে। গল্পটা কি, না নায়ক বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুরই গ্রামে বেড়াতে গিয়ে একটি ষোড়শী তন্বীর প্রেমে পড়েছিলো, তারই ইতি উতি।

তারই ইতিবৃত্ত। —আমি আমি বলে লেখা। আর দিন দু'য়েকের প্রেম দিন দুয়েক পরেই ইতি হয়ে যায়—নায়ক গ্রাম ছেড়ে সহরে মানে কোলকাতায় ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ! তারই রসঘন ছোট্ট একটি গল্প, বলেছি তো এই পাঁচ ছ' পাতার।

ছোট হলে কি হয়, সেই ছোট গল্পটি রিক্তার মনে অসহ্য বেদনার কারণ হয়ে উঠেছে : —উত্তাল হয়ে উঠেছে সন্দেহে।

শোঁ শোঁ করে।

সন্ সন্ করে।

রিক্তার কেবলই মনে হচ্ছে নায়ক আর কেউই নয়, সুব্রতদা স্বয়ং। বয়েস, তাই এই মনে হওয়া।

প্রেম, তাই এই অস্বস্তি, যন্ত্রণা, এতো দুর্ভোগ।

কৌশলে জেনে নিতে হবে।

অন্যমনস্কের ভাণ করে চলেছে।

প্রেমিকের উদাসীনতা নিয়ে চলেছে।

রিক্তাকে দেখেও 'দেখিনি-দেখিনি' ভাবে চলেছে।

এই সময়।

এই অবসর।

কৌশলে জেনে নিতে হবে গল্পের নায়িকা সত্যি সত্যি তার প্রতিদ্বন্দ্বিনী কি না।

রিক্তার বুকের ভেতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

ঢিপ্ ঢিপ্ করছে।

—'সু ব্র ত দা—আ—আ—'

—'কে রিক্তা নাকি, আমায় ডাকছো ?'—সুব্রত রিক্তার কাছে এগিয়ে এসে বল্লে।

—'হ্যাঁ, কোথায় চলেছেন এতো ব্যস্ত হয়ে ?'

—'এই এদিকে একটা সাহিত্য সভায়, নেমতন্ন আছে কিনা।'

—'আপনার 'কুহক' গল্পটা পত্রিকায় পড়লুম।'

—'পড়লে, তা কেমন লাগলো ?'

—'অপূর্ব, ভারি সুন্দর গল্পের প্লটটা !'

'তাই নাকি। আচ্ছা, আজ চলি, কেমন?'—বলেই সুব্রত হাসতে হাসতে চলে গেল, বেশীক্ষণ দাঁড়ালো না।

সে চলে গেলো আর রিক্তার কৌশলও ব্যর্থ হলো, সেদিন জানা হলো না।

দিন পাঁচেক আরও আঁকুপাঁকু।

দিন পাঁচেক আরও ছট্‌ফট্।

বিকেল। কেবল ধড়্‌ফড়্।

বিকেল! কেবল উঁকিঝুঁকি।

সন্ধ্যে। কে আসে?

সন্ধ্যে। কার গলা?

দিন পাঁচেক পর শনিবারের এক বিকেলে সুব্রত রিক্তাদের বাড়ী এসে দোতলার বারাণ্ডায় বিষন্ন পাণ্ডুর মুখে রিক্তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো—'এই পূর্ণিমা-তিথিতে তোমার মুখে অমাবস্যার অন্ধকার দেখছি; কেন, কি হয়েছে?'

রিক্তা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বল্লে, 'না, কৈ কিছুই তো হয়নি।'

—'দাদা বাড়ী আছে?'

'আছে আপনি বসুন, ডেকে দিচ্ছি।'

আবার সুযোগ।

পা দুম্ দুম্।

সিঁড়ি—দুড়্ দুড়্।

রিক্তা লাফাতে লাফাতে নিচে এলো।

হাঁপাতে হাঁপাতে নিচে এলো।

—'দাদা আসছে, আপনি একটু বসুন।'

—'আচ্ছা।'

তারপরে দুজনেই চুপ্‌চাপ।

দুজনেই চুপ্ চুপ্।

—'আচ্ছা, সুব্রতদা, আপনার 'কুহক' গল্পটা পড়েছি বলায় আপনি সেদিন অতো হাসছিলেন কেন?'

সুব্রত এবারও হাসলো, মুচকি। সেদিন হেসেছিলো, কেন না রিক্তার আসলে প্রশ্নটা কি তা সে আঁচে বুঝেছিলো, আজও বুঝলো।

—'চুপ করে আছেন যে, কৈ বলুন-না, অতো হাসছিলেন কেন? আচ্ছা, সত্যি কি আপনি ভুবনডাঙ্গা বেড়াতে গিয়েছিলেন?'



কৌশল। রিক্তা কৌশলে জিজ্ঞেস করেছে।

হ্যাঁ কি না শুধু উত্তরের অপেক্ষা।

মাটি থথর্।

পা থথর্!

কি জানি কি উত্তর।

গ্রামের মেয়েকে ভালবাসলে সহরের মেয়েকে নিশ্চয়ই নয়, সহরের রিক্তাকে পূর্ণ করলে গ্রামের অন্নপূর্ণা অপূর্ণা।

কঠিন প্রশ্ন, সুব্রত এর কি উত্তর দেবে। মিথ্যে বলবে, অসত্য দিয়ে সত্য ঢাকবে। না, কখনই নয়। মিথ্যে সে বলে না, আজও বলবে না।

—'প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলি, সেদিন হেসেছিলুম কারণ বুঝেছিলুম যে তুমি এ-প্রশ্ন আমায় করবে। হ্যাঁ, রিক্তা, ভুবনডাঙ্গা আমি সত্যিই বেড়াতে গিয়েছিলুম।'

উঃ যা ভেবেছিলো, তাই!

মাথার ছাদটা দড়াম।

কড়ি-বরগাগুলো দড়াম।

পা কাঁপলো।

মাটি দুললো।

ব্যাস, রিক্তা আর কিছু জানতে চায়না; বাকিটার সে উত্তর পেয়ে গেছে। কোন রকমে টলতে টলতে তক্ষুনি ওপরের ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

ঠিক্ ঠিক্। ঠিকই সন্দেহ করেছিলো।

ঝড়ের পরেই বৃষ্টি; রিক্তার চোখে অশ্রু বৃষ্টি।

কি ভুল, কি ভুল! দেড় দু' বছরের ভুল। সুব্রতদা এ্যাদ্দিন তার সঙ্গে হয় অভিনয় করেছে, নয় প্রবঞ্চনা। 'সুব্রত সেন, দাই নেম ইজ্ ম্যান!'

তার পরদিন।

—'রিক্তা শোন, কাল তোমার প্রশ্নের সবটার জবাব দেওয়া হয়নি; ভুবনডাঙ্গা বেড়াতে গিয়েছিলুম গল্পের সত্য এইটুকুই বাকিটা কল্পনা। কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলুম কেবল গল্প লিখবারই জন্য তাছাড়া.....' সুব্রতর গলা এবার একটু কাঁপলো।

—'তাছাড়া কি?'

—'আমি প্রবঞ্চক নই।'

—'মানে? মানে বুঝতে পারলুম না।'

—মানে আমি একজনকেই কেবল…'

'কি ?'

—'ভালবাসি। আমার গল্পে হাজারটা প্রেমিকা থাকতে পারে, কিন্তু তারা সব সেই একজনকেই ঘিরে, একজনেরই ছায়ারূপ—হাজার রকমের প্রতিছবি।'

রিক্তার আবার বুক ধুক্ ধুক্।

বুক ঢিপ্ ঢিপ।

যেন আশার ক্ষীণ আলো চিক্ চিক্।

—'কে সুব্রতদা, আপনার সেই একজন ? আমি তাকে দেখেছি ?'

—'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই দেখেছো ?'

এ কি ! গা শিরশির।

হাতের কম্পন।

পায়ের কম্পন।

কম্পন সর্ব-শরীরের।

—'কবে কোথায় ? দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

—'কেন, রোজই তো। তোমাদের ঠিক এই ঘরেরই ওপরের ঘরে একটি ফ্রেমের মধ্যে।'

ফ্রেমের মধ্যে, ওপরের ঘরে ?

এ কি উত্তর !

একি হেঁয়ালী !

ফটো ! নেই তো। আচ্ছা, একটা যীশুর, আর ওটা তো মোনালিশা—ভিঞ্চির। তারপর না, তারপর উঁহুঁ। তার নিজের তো কোন ফটো নেই ও-ঘরে।

নিরাশা।

হতাশা।

তবে—কে, তবে—কে ?

—'যাঃ কি সব বাজে কথা বলছেন।'

—'বিশ্বেস করে ওপরে গিয়ে দেখেই এসো না বাজে কথা বলছি কিনা।'

—'বা রে, আপনার সেই একজনের ফটো আমাদের ঘরে থাকতে যাবে কেন ?'

—'যাবে বলেই তো বললুম।'

—'নাঃ, কেবলই ঠাট্টা করছেন।'

—'না রিক্তা ঠাট্টা করিনি।'

—'না মানে, ঠাট্টা নয়তো কি। আচ্ছা ওপরে গিয়ে সত্যি দেখে আসবো ?'



—'বলছিই তো, যাও।'

—'আচ্ছা সত্যি যাচ্ছি, গিয়ে যদি দেখি আমাকে ঠকালেন, তবে ফিরে এ-সে ভীষণ মজা দেখাবো কিন্তু।'

—'দেখিও।'

তর-তর করে রিক্তা ওপরে উঠে এলো। কিন্তু ও ঘরে কৈ তার ফটো ফ্রেমের মধ্যে।

এ দেয়াল।

সে দেওয়াল।

নাঃ অন্য কোন মেয়েরও ফটো নেই ও ঘরে ; তার নিজের তো কোনদিন ছিলোই না। ঠাট্টা।

আবার দেখা।

আবার খোঁজ।

ও—ও—ও, এইবার পেয়েছি, এই তো ফ্রেম। ফ্রেমের কাছে গিয়ে রিক্তা হেসে উঠলো। খুব কাছে গিয়ে দেখেলে মেয়েটিকে।

জানলা দিয়ে কতকগুলো খুসির হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিলো রিক্তার কোঁকড়া চুলগুলো। লজ্জাও হোল তার। ছি-ছি সে কি বোকা, সে কি বোকা। চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

কৌশল, বুদ্ধির কৌশলে সুব্রত সেন তার সেই একজনকে দেখিয়ে দিয়েছে।

কি খুশি।

কি আনন্দ !

যাই, মিথ্যে করে বলিগে যে তাকে দেখতে পেলুম না।

খুশির পা।

খুশির সিঁড়ি।

খুশির সর্ব শরীর মন।

—'সুব্রতদা—আ—, সুব্রতদা—আ—'

যাঃ পালিয়ে গেছে। কি দুষ্টু, কিন্তু কি মিষ্টি ? রিক্তা আনন্দে তার দুই হাত দিয়ে তার দুই গাল চেপে ধরলো আলগোছ করে। কতকগুলো পাপড়ি যেন একই সঙ্গে খুলে গেল !

রিক্তা আজ পূর্ণা। দেড় দু' বছর পরে পরিপূর্ণা। পূর্ণকুম্ভ।

তাই সুব্রতর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে তারপর তার উদ্দেশে ছোট্ট অথচ গভীর শ্রদ্ধাভরে সে একটি প্রণাম জানালো।—ঠিক পদ্মপুষ্পের সূর্য প্রণামের মত।

কেন প্রণাম জানালো, না কাঠের ফ্রেমে আঁটা আয়নায় সে সুব্রতর প্রেয়সীকে দেখতে পেয়েছিলো।

# একটি চিঠি

## মিহির আচার্য

[ নতুন বাসাবদলের সময় ঘরে পা দিয়েই বদ্ধ দেয়াল-আলমারিটার উপরে আমার প্রথম দৃষ্টি পড়ে। টানা খুলে দেখি ময়লা পুরাণো খবরের কাগজের পাশে কয়েকটি ওষুধের শিশি, খালি পাউডারের কৌটো, পুরোণো ব্লেড্ আর একটি ক্ষীণ রাইটিং প্যাড্। রাইটিং প্যাড্টা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই ধপ্ করে কয়েক তাড়া কাগজ খশে পড়ল মেজেতে। তুলে নিয়ে দেখলাম চিঠি। পড়ব-না —পড়ব-না করেও কুতূহল চেপে রাখতে পারলাম না। দেখলাম চিঠিখানা কোনো অজ্ঞাত কারণে পোস্ট্ করা হয়নি। ঠিকানাও লেখা নেই। এমনকি পত্র প্রেরকের নামও অনুপস্থিত। তবু, আমার সাহিত্যিক-স্বভাবের জন্যেই এই চিঠিখানা সাধারণ্যে প্রকাশ করবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি ॥ ]

॥ খিদিরপুর ॥
২৭ শ্রাবণ ১৩৫৬
রাত্রি

এই সাড়ে তিনবছরে তোমাকে যত চিঠি লিখেছি তা বোধকরি উচ্চতায় গৌরীশৃঙ্গকেও লংঘন করতে পারে। আমার বদ্ অভ্যেস লেখার কোনো কাপি থাকে না আমার কাছে। তাহলে হয়তো বাংলাদেশের কোনো ক্ষীণজীবি প্রতিভাধর সাহিত্যিক-অনুগ্রহে সেগুলোকে 'বেলে লেটারস্' করে বাজারে দিতুম। সত্যি বলতে কি লেখা সম্পর্কে আমার এক বিরাট কুঁড়েমি আর আলস্য ছিল। সে-কুঁড়েমি দেখা যেত না কেবল তোমাকে লেখার বেলায়। তোমাকে রোজই কিছু-না কিছু লিখতে পারার মধ্যে ছিল আমার প্রচুর আনন্দ। এক ধরণের মানসিক ব্যায়াম। আর একটু কাব্যি করে বলতে গেলে ওটা ছিল নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মতোই স্বাভাবিক প্রয়োজন। কোনোদিন ভাবতে পারিনি আমার এ-কলমের কালিও একদিন শুকোবে। যদিচ তাই ঘটল একদিন। আপাতদৃষ্টিতে যাকে আমরা আকস্মিক ভাবি আসলে তা' কতকগুলি স্বাভাবিকতারই এক চরম যোগফল মাত্র।

এ কথা বলবার সাহস আমরা উভয়েই রাখি: আমরা ভালোবেসেছিলুম। বাঙলা দেশের নরম গল্‌গলে মাটির স্যাঁতসেঁতে ভালোবাসা নয়। আমাদের জমি ছিল শক্ত-কঠিন ডাঙা, শ্যামল ঘাসও ছিল তার উপরে।

কিন্তু, সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে আজকের এই তারাভরা রাত্রে কলম নিয়ে ভাবতে বসে যে এই সাড়ে তিনবছর ধরে আমাদের কাটল কেবল পরস্পরকে আবিষ্কার করতেই। যে-



অদৃশ্য দুর্বোধ্য আকর্ষণ আমাদের এক বাঁধনে এনে যুক্ত করেছিল জানি না তার রসিকতার কারণ। প্রেমের অভিধান বলে: পারস্পরিক মনের যোগসূত্র না হলে প্রেম মিথ্যা। আমরা খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে সাগরের নীল জলকেই ঘোলা করে দিলুম। সমুদ্রমন্থনে না উঠল লক্ষ্মী না-অসুর। ক্লান্ত হয়ে একদা এলিয়ে পড়লুম দুজনে। আকাশকে দিলুম অভিশাপ, চাঁদকে বললুম: ডাইনি।

তারচেয়েও আশ্চর্যের কথা: মন আমাদের রক্তাক্ত দাংগা করে মরলেও দেহ ছিল সেখানে বোবা। তুমি পৃথিবীতে কেবল মন নিয়ে জন্মেছিলে, মানে, তুমি ছিলে মনের কারবারি। কারবারি কথাটি বলার অর্থ কবিত্ব নয়। তোমার মন কবি ছিল না। তুমি ছিলে মনের অংকের মাস্টার। হিসেবের বাইরে তোমার গতি রুদ্ধ, ভাবনা ভিখিরী। আর আমার ছিল উল্‌টো। আমি বলতুম: কেবলমাত্র মন নিয়ে পৃথিবীতে বাঁচা যায় না, তার পাত্র দরকার, দেহই তার পাত্র। দেহকে বাদ-দেয়া মনের ভাণ্ডার শূন্য, রিক্ত। তাই মানসিক ঘাতপ্রতিঘাতে যখন তপ্ত মদ টগবগ করে উঠত তখন তাকে দেহের যজ্ঞশালায় আহুতি দিতে না পারলে আমার স্ফূর্তি ছিল না। এর নাম বুঝি দিয়েছিলে তুমি: প্যাশান। প্যাশান বা জীবন-লালসা যাইই বল না কেন তুমি, জীবনে তার প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়মেই ওটা মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি। এর বিরুদ্ধাচরণ শুধু অন্যায় নয়, হাস্যকর।

তুমি প্রতিবাদ করে উঠতে। বলতে: জীবনের একটা নিয়ম আছে, সূত্র আছে। তার ব্যাকরণ তোমাকে মেনে চলতেই হবে।

কথাটা তোমার মিথ্যে, বাজে। জীবনকে যারা ব্যাকরণের মলাটে বাঁধতে চায় তাদের মতো মূর্খ আর পৃথিবীতে নেই। এটা যেন সমুদ্রকে বাঁধ দিয়ে বাঁধবার শিশুসুলভ পরিকল্পনা। জীবন—জীবনই। তার কোনো নিয়ম নেই, সূত্র নেই। ওটা ফিলজফারদের পংগু চিন্তার ফল। যে কোনো থিওরী, যে কোনো দর্শনের চেয়ে জীবন অনেক বড়, অনেক মহান।

আমার কথা শোনো সু— জীবনে প্যাশান দরকার। রুচি আর সংস্কৃতির অনুশীলনে উন্নত জীবন-তৃষার মধ্যে এতটুকু বিকৃতি, এতটুকু গ্লানি নেই। এই প্যাশান পৃথিবীতে সত্যিকারের মানুষের বিকাশ ঘটিয়েছে। এই প্যাশানকে চালনা করেই কেউ কবি হয়েছে, কেউ বিজ্ঞানী, কেউ চিত্রকর, কেউ সংগীতকার। জীবনের প্রথম কথা হচ্ছে: সৃষ্টি। এবং শেষ কথাও। ভালোবাসাও এক ধরনের সৃষ্টি। এই সৃষ্টিশালার প্রধান বিশ্বকর্মা তোমার এই প্যাশান। একে অবজ্ঞা কোরো না।

ভাবছ: কী-অসংলগ্ন প্রগল্‌ভতায় আমাকে পেয়ে বসেছে, তাই না? আচ্ছা: আমার বক্তব্যে আবার ফিরে আসি।

কলকাতাটা এতদিন খুব ছোট মনে হত আমাদের কাছে। যেন এই একরত্তি ছোট্ট

শহরে আমাদের ধরত না কোথাও। ভালো করে নিজেদের ছড়াবারই যো নেই। রাস্তা-ঘাটে-মাঠে লোক। রেস্টুরেন্ট-হোটেলগুলোর বেয়ারারা পর্যন্ত আমাদের নিয়মিত হাজিরা দেখে পিতৃস্নেহে কৃপা করত। কথা, কথা আর কথা। কিছুতেই ফুরোতে চায় না। এত বল্‌বার আছে, অথচ সময় হরিণ-গতি। রোজ দুজনে দুজনের বাসায় ক্লান্ত হয়ে ফেরবার সময় মনে হত ঃ সমস্ত বিশ্বশুদ্ধ যেন আমাদের উপর শত্রুতা আরম্ভ করেছে। স্বয়ং বিধাতাপুরুষও এমন কৃপণ, স্বার্থপর।

তুমি কথা বলতে, আমি শুনতাম। প্রায়ই শুনতাম না, ভাবতাম আর দেখতাম তোমাকে।

মেয়েদের মুখরতা বোধকরি এমনি করেই যুগে যুগে পুরুষকে মূক গাম্ভীর্য দিয়েছে। মেয়েরা যখন কথা বলে আনন্দ পায় তখন চুপ থেকে ছেলেরা সেটা চুটিয়ে উপভোগ করতে ভালোবাসে।

তারপর শুক্‌নো কথার ফাঁকে-ফাঁকে আমরা পরস্পরের ঠোঁট ভিজিয়ে নিতুম।

দিন যেতে লাগল। একদিন হঠাৎ তুমি আবিষ্কার করলে যে কলকাতাটা অত্যন্ত বড় আর সময়গুলো শিসের মতো ভারি। আর বুঝলে যে কথা-বলার চেয়ে মৌন-থাকাই বেশি আরামের।

সেইদিন থেকে স্রোতের উপর বুদ্‌বুদের উচ্ছাসের মতো ভালোবাসার প্রথম ঝোঁকটা কাটতে লাগল আমাদের। বুঝলুম ঃ বুদ্‌বুদটা আসলে ফাঁপানো-ফোলানো একটা প্রচণ্ড মিথ্যা। অবশ্য তুমি যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝতে পেরেছিলে, আমি পারিনি অত তাড়াতাড়ি বুঝতে। তোমার মনের সেই ইস্কুল মাস্টারই তোমাকে সচেতন করে তুলল বুঝতে পারি। এর পর দেখতুম তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে তুমি নিজে অনেক সহজ, স্বাভাবিক। আর তোমার এই নতুন-পরিবর্তনের সুরের সংগে শানিয়ে নিলে তোমার যুক্তি।

বললে, 'এতদিন চারধারের মানুষকে আমরা অস্বীকার করেছি। তাই আমাদের এই পতন।'

আমি হাসলুম শুধু। কোনো উত্তর দিলুম না।

তুমি রেগে উঠলে আমার উপর। ধারালো স্বরে বললে, 'তুমি মানুষকে সহ্য করো না। তুমি আনকাল্‌চার্ড। সেকেলে।' আমাকে গালি দিলে ঃ 'উনবিংশশতাব্দীর ভূত' বলে।

তোমার সেদিনকার এতগুলো অভিযোগের আমি সময় মতো জবাব দিতে পারিনি। তখন তোমার পরিবর্তনের স্তরগুলি আমি নীরবে লক্ষ্য করছিলুম। আজকে তার জবাব দেবার ফুরসৎ মিলেছে, শোনো।



মানুষ সম্বন্ধে তোমার একটা queer ধারণা আছে দেখছি। 'আমি মানুষকে ভালো বাসি' বলেই যেমন ভালোবাসাটা সত্যি হয় না তেম্নি সত্যি হয়না তাকে glorify করেও। ব্লাডহাউণ্ড ঘ্রাণ নিয়ে মানুষকে খুঁজে বা'র করে, ওটা ওর জান্তব প্রবৃত্তি, ওতে ভালোবাসা নেই। পথ চলতে চলতে যারা মানুষ-মানুষ করে চেঁচায় তারা ভাবে যে আমিই এগিয়ে গিয়েছি, বেচারী মানুষগুলো ভেঁড়ার পালের মতো আর এগোতে পারল না, তাই সমবেদনায় গদ্‌গদ্ হয়ে সে পতিতমানুষ-উদ্ধারের ব্রত নেয়। রাজপথের জনতার ভিড়ে মিশে গিয়ে যারা শ্লোগান তুলতে চায় ঃ 'আমরা মানুষকে ভালোবাসি' তারা যতটা ডেমোনেস্ট্রেশন করে তার চেয়ে অনুভব করে কম। ওতে মানুষকেই অপমান করা হয়, শ্রদ্ধা জানানো যায় না। নিজেদের শুভবুদ্ধি নিয়ে যারা মানুষের ভালো করতে গেছে তারা নিজেদের মনে করেছে ঈশ্বরের বরপুত্র অথবা অতিমানব। এই অভিধানে তাদের অহংকারই তৃপ্ত হয়েছে, মানুষের উপকার হয়নি এতটুকুও।

আমাকে উনবিংশ শতাব্দীর পিছিয়ে পড়া বাঙাল আখ্যা দিয়ে নিজেদের বিংশ-শতাব্দী-অলা বলে কিছু প্রমাণ করা যায় না। আমার রোমান্টিক মনকে তুমি ব্যংগ করতে চেয়েছে, বুঝতে পেরেছি।

কিন্তু ইতিহাসের ধারাকে অস্বীকার করে কি বর্তমানকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় সু—? উনবিংশকে বরবাদ করে বিংশ সাজবার চেষ্টাটা হাস্যকর। সমাজ-বিকাশের ইতিহাসে upstart-এর স্থান নেই, ওটা absurd. বিংশশতাব্দী-অলাদের আমি দেখেছি। তাদের চোখ আছে, মুখ আছে, নাক আছে, সব মিলিয়ে নেই একটা বড় জিনিস ঃ হৃদয়। নাকটা বোধ হয় তুলনায় ঈষৎ দীর্ঘই হবে। প্রাণীবিশেষের মতো এই নাকযোগেই তারা সব বস্তুর ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করে। ওদের মুখচোখের মলাট সর্বদাই শস্তা আমেরিকান বইএর মতো ঝকঝকে, ওদের হাতপা'র আন্দোলন দেখলে মনে হবে জগতের দুঃখ বোধহয় ওদের ঘাড়ে। তাদের মস্তিষ্ককে প্রথম দৃষ্টিতে বিরাট আকাশ বলে ভ্রম হবে, কিন্তু আকাশের মতোই কেবল শূন্য, ধুধু।

তোমরা নিজেদের মর্ডানিস্ট্ বলে স্বতন্ত্র ঘোষণা করবার জন্যে সদা-উদ্‌গ্রীব। তোমাদের জন্যে আমার অকৃত্রিম দুঃখ হয় সু—। তোমাদের এই উদ্ধত শূন্যগর্ভ আন্দোলন কাজের ক্ষেত্রে তোমাদের মানুষ থেকেই দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। নিজেদের বাঁধা ধারণা, বাঁধা বুলি আর কেতাবী শিক্ষার দড়িতে তোমরা নিজেরাই ঘুরপাক খেয়ে মরছ। তোমাদের এ-বঞ্চনা এ-ফাঁকির ভয়ংকর ভবিষ্যত কল্পনা করে আমি নিজেই সন্ত্রস্ত হচ্ছি।

কিন্তু এ সব বড়-বড় কথা থাক। আমাদের ব্যক্তিগত প্রসংগেই ফিরে আসা যাক।

আসল কথা হল ঃ আমাদের ভালোবাসা সম্পর্কে তোমার মনে সংশয় বাসা বাঁধল।

যাকে আর মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারছিনে তার সংগে দিনের পর দিন সময় অপব্যয় করার মতো বিরাট দুঃখ আর কিছু নেই। আমারই চোখের সামনে তোমার এই নীরব ছটফটানি দেখে আমারই কষ্ট হত। মনে হত আমিই যেন তোমাকে নিঃস্ব, দেউলে করে দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে ছেড়ে-যাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কারণ আমাদের ভালোবাসার অঙ্গীকার আর প্রতিশ্রুতির উপর তোমার ছিল ধর্মের বিশ্বাস। যেন যে Sacred Deed-এ আমরা পরস্পর সই করেছি তার থেকে কোনোক্রমেই আমাদের পরিত্রাণ নেই।

আজ যখন নিজে থেকেই তোমার উপরে সমস্ত দাবি তুলে নিচ্ছি তখন অদ্ভুত এক আস্বাদ আর আনন্দের মধ্যে একটা কথাই কেবল মনে হচ্ছে: তোমাকে মুক্তি দিলুম। তোমাকে একদিন খুব ভালোবেসেছিলুম বলেই বোধ করি আজকের এই বিদায়-নেয়া খুব সহজ হয়ে পড়ল।

ভালোবাসার ব্যাপারে অঙ্গীকারটাই বড় কথা নয়, হৃদয়ের টানটাই আসল। যে-প্রেমের আয়ু ক্ষীণ হয়ে এসেছে তাকে অঙ্গীকারের তেল দিয়ে জ্বালিয়ে-রাখার মতো অপমান আর কিছু নেই। মানুষের চলমান জীবনের উপর আমার অটুট বিশ্বাস, বিশ্বাস তার মনের উপরেও। দিনের পর দিন মানুষ বদলাচ্ছে, তার মনও বদলাতে বাধ্য, এতে ভুল নেই। কালকে ভালোবেসেছিলুম বলে আজকেও ভালোবাসতে হবে প্রেমের রাজ্যে এ-বাঁধা ধারনা না-থাকাই উচিত। (দোহাই, আমাকে free Sex-এর নেতা বলে ভুল কোরো না!) এ কথা তো মিথ্যা নয় আমরা একদিন পরস্পরকে ভালোবাসবার প্রয়োজন বোধ করেছিলুম। সেদিনকার সত্যে বা প্রয়োজনে এতটুকু খাদ নেই। কিন্তু আজ যদি সেটা আগাগোড়া মিথ্যে হয়ে যায় তাকে আবার কোন্ মিথ্যে দিয়ে জড়িয়ে রাখব?

আমার বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিল: 'বিয়ে করে ফেল্।' যেন বিয়ের বন্ধ দরজায় আমাদের সব সমস্যা আটকে ছিল এতদিন! ওদের ছেলেমানুষি যুক্তি ওদের মানায়। বিয়ের মতো কাজটা আমি যে-কোনো মেয়ের সংগে করে ফেলতে পারি, কিন্তু তোমাকে পারি না। যদিচ জানতুম: তোমাকে প্রস্তাব করলে তুমি আপত্তি করতে পারতে না। কিন্তু সেটা হত আমার শক্তির বাজে খরচ। অন্যায় জবরদস্তি। আমার শক্তি আছে বলেই তোমার দুর্বলতাকে আমি আক্রমণ করতে পারি না। ভালোবাসায় জবরদস্তি নেই, ওটা আর-এক ধরনের কাপুরুষতা।

কিন্তু কেন এমন হল? এটা কি আমাদেরই ব্যক্তিজীবনের ইতিহাস। দু'একজন বন্ধুকে জিগ্যেস করেছি: তারা অনেকেই প্রেমের ব্যাপারে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর সংশয়ে পীড়িত হচ্ছে। আমাদের দুজনের বিচ্ছেদের হয়তো একটা কারণ দেখানো যেতে পারে, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই দেখেছি বিনা কারণেই এই প্রেম ভেঙে যেতে!



এর জন্যে মানুষের মন যতটা তারচেয়েও বেশি দায়ি সমাজ-ব্যবস্থা। এই অস্থির টানাপোড়েন এই বিংশশতাব্দীরই সৃষ্টি। অর্থনীতির মূল কারণটা বাদ দিলেও একই মানসিক স্বস্তিহীনতা আজকের ছেলেমেয়েদের কুঁরে কুঁরে খাচ্ছে। এরই নাম বোধহয় Scepticism আমাদের মনকে এই পুরানো সমাজ খাদ্য দিতে পারছে না, অনাহারে অজীর্ণতায় শুকিয়ে যাচ্ছে মন, গুটিয়ে যাচ্ছে দেহ। দুর্ভিক্ষের লোকের মতো আমরা সুস্থ জীবনের লালসায় নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছি। আমরা পথ খুঁজে পাচ্ছি না, তাই সব কিছুতেই সন্দেহ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বাধা। প্রেমের ক্ষেত্রে এই indecision-এর জন্মও সেখানে।

বুঝতে পারি: আমাদেরই এগিয়ে এসে এই পাপ থেকে মানুষকে টেনে-তোলা দরকার। সেটা হয়তো আজকেই হবে না, তার জন্যে প্রস্তুতি চাই। ততদিন এইভাবে আমাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে, পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়ে যাবে। তা যাক। দুঃখ নেই। শুধু এই আশাই শেষদিন পর্যন্ত রেখে যাব যে নতুন এক যুগে অন্য মানুষেরা উঠে আসবে, তাদের কাছে হয়তো আমাদের এই বেদনা আর ব্যর্থতার কোনো মূল্য থাকবে না সেদিন, তবু ওদের পায়ে-পায়ে আমাদের মড়াহাড়ের ডাঙায় আবার ঘাস জাগবে, ফুল ফুটবে, সেই পরিপূর্ণ দিনে মানুষ পূর্ণ করে ভালোবাসবে। তাদের কণ্ঠস্বর আমাকে এই রাত্রে পাগল করে দিচ্ছে।

এ-চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে তখন আমি বাঙলা দেশ ছেড়ে ছুটেছি দক্ষিণ ভারতে। সন্ন্যেসি হয়ে নয়, সিন্ধিয়া শিপ্ইয়ার্ডে ফোরম্যানের চাকরি নিয়ে।.....

[ এইখানেই হঠাৎ চিঠিটা শেষ হয়ে গেছে। এর পরের ইতিহাস আমার জানা নেই ॥ ]

## রঘুবংশ পঞ্চম সর্গ থেকে

স্ফটিকাক্ষ-মালিকায় সমর্পিত মুকুল-আঙুল,
মিতাক্ষরে কোনো অদ্রি-তনয়ার বাক্যে নেই ভুল ॥

# সম্পাদকীয়

তেরশ' ষাট সালের বাঙলা-সাহিত্য বাঙালী মনের কোন্ একটি বিশেষ দিক উদ্ঘাটিত করল—যদি কেউ আমাদের এ-প্রশ্ন করেন, তাহলে দ্বিধাহীন মনে উত্তর দেব: বিষণ্ণ, বিভ্রান্ত দিক। সাহিত্য-সেবীর সংখ্যা আশাতীতভাবে বেড়ে গেছে শুধু নৈরাশ্যবোধ নিবেদন করতে। যশস্বী লেখকরা এখনকার সাহিত্য-সেবা নৈরাশ্যব্যঞ্জক বলে মনে করেন যে অর্থে, সে-অর্থে আমরা 'নৈরাশ্য-বোধ' কথাটি ব্যবহার করছিনে। বরং আমরা বলতে ইচ্ছুক, মনোভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করবার ভাষা অনেকেই আয়ত্ত করেছেন কিন্তু তাঁদের অনেকেরই মন নৈরাশ্য-মগ্ন। যেসব রচনা আশাবাদ বহন করে—বিচার করতে গেলে দেখা যায়, তাতে যেন আন্তরিকতার সুর প্রগাঢ় হতে পারছে না। ফলে তাদের সাহিত্যিক মূল্য নিম্নগামী হয়ে পড়ছে। অপরপক্ষে নৈরাশ্য-ব্যঞ্জিত হয়েও অনেক রচনা সাহিত্যিক-মূল্যে আজ গ্রহণীয়। এই অবস্থাটি স্বীকার করে নিয়ে অনেকে বলতে পারেন: বাঙলা সাহিত্যে ব্যথার ফসলই ফলে ভালো। কীট্‌সের মনোভাব-সম্পন্ন কবিদের সম্পর্কে এই সাধুবাদ বা নিন্দাবাদ প্রচারে কারো আপত্তি না থাকতে পারে, কিন্তু গদ্য-রচনায় বাঙলাদেশ শরৎচন্দ্র ব্যতিরেকে বিষণ্ণ চিত্তের স্পর্শ তেমন বেশি পায়নি বলে উপরোক্ত ব্যথার ফসলের অভিমত সাধারণ সত্য হিসেবে গৃহীত হবে না। বাঙলা-সাহিত্যের ঐতিহ্যে ব্যথা-বিষণ্ণতার অস্তিত্ব থাকলেও তার বিপরীত ভাবসমূহ-ও প্রোজ্জ্বল সত্তায় বর্ত্তমান আছে। কাজেই ইদানীংকার ব্যথা, নৈরাশ্য, বিষণ্ণতা প্রভৃতি আশঙ্কাপ্রদ মনোভাবকে ঠিক ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে উপেক্ষা করা চলেনা। এ-মনোভাব ইদানীংকার সদবস্থার প্রতীক—এর মূল নিতান্তই বর্ত্তমানে নিহিত। বর্ত্তমানে অতীতের ছায়া যতোটুকু, এর উপর ঐতিহ্যের দাবীও মাত্র ততোটুকুই। ঐতিহ্যের প্রতি বাঙালীর যে খুব বেশি নজর আছে তা-ও নয়।

দুঃখ যদি সাহিত্যের প্রখর উপজীব্য হয়ে ওঠে তাহলে মনে করতে হবে সাহিত্য-সেবীমাত্রেই দুঃখী। দুঃখী কোনো-না-কোনো কারণে। কারণ বিচিত্র হতে পারে কিন্তু কার্য্যত তার ক্রিয়া অভিন্নই দেখা যাচ্ছে। দুঃখী সাহিত্য-সেবীর সংখ্যা দিনকে-দিন বেড়ে যাওয়া একটি সামাজিক দুর্লক্ষণ। সমাজের শুভাশুভ যাঁর চিন্তায় আশ্রয় পায়, তিনি এই দুর্লক্ষণে শঙ্কিত হতে বাধ্য। শঙ্কিত হয়ে তিনি যদি আগেকার দিনের মতো সমাজ-রক্ষার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহলে অবশ্য তা হাস্যকর বলেই মনে হবে। কিম্বা তিনি মনে যদি করেন যে সাহিত্যিকরা দুঃখীজাতি,—সমাজের সুখীজাতি এখনও যাঁরা আছেন তাঁদের এই দুঃখীজাতির প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব নেই, তাহলেও তিনি প্রচণ্ড ভুল করে বসবেন। সাহিত্যের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুদূর-প্রসারী এবং মর্ম্মভেদী। সাহিত্য বা সাহিত্যিক যে-সমাজে দুঃখী বা উপেক্ষিত, কোনো উপায়েই সে-সমাজের মঙ্গল হতে পারে না।

ব্যাধিই বলি আর প্রবণতাই মনে করি, বাঙলাদেশের সাহিত্যিক বৃত্তিতে আজ নৈরাশ্য ও দুঃখবোধ অত্যন্ত বাস্তব। কোন্ সাহিত্য ভালো এবং কোন্ সাহিত্য মন্দ এ-প্রশ্ন অবান্তর হয়ে দাঁড়ায় যখন আজকের দিনের সাহিত্যের মূল সুরটি শুনতে পাই। এ-সুর মুষ্টিমেয়ের কণ্ঠে নিবদ্ধ নয়। ক্রমেই তা ব্যাপক হয়ে চলেছে। এর জন্যে কে দায়ী বা এর প্রতিবিধান কি, এসব প্রশ্ন এখন থেকেই সামাজিক



সমস্যার অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত। আর যদি প্রয়োজন হয়, সামাজিক মনোভঙ্গীরই পরিবর্ত্তন সাধন করা দরকার। সমাজ-বিজ্ঞানের পুঁথিতে পাওয়া যায়, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে রাষ্ট্রের পরিবর্ত্তন হয়। আমরা রাষ্ট্রকে নব-কলেবরে পেয়েছি কিন্তু বিজ্ঞানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে সামাজিক বুদ্ধি-বিচার ও বোধ পূর্ব্ববৎ অচলায়তন-আশ্রয়ী হয়ে আছে। ১৩৬০-এর বাংলা-সাহিত্য বোধহয় এই অচলায়তনে বন্দী কতগুলো প্রাণের বেদনাই বহন করে রাখল।

আমরা জানি, বেদনার বাজারদর মন্দা। কেউ পয়সা খরচ করে নিরাশার কথামালা ক্রয় করেন না। পয়সা খরচ করে ধর্ম্মবোধ, তীর্থ-যাত্রাবোধ প্রভৃতি এখনও বাঙালী ক্রয় করে থাকেন। আপন-মনের নৈরাশ্যই তখন ক্রেতা হয়। কিন্তু নৈরাশ্য বিশুদ্ধ নৈরাশ্য-বোধ ক্রয় করে না। নৈরাশ্য ধর্ম্মবোধ মনে এনে দেয় সত্যি, কিন্তু সে-ধর্ম্মবোধ যদি মানুষকে কর্ম্মপ্রেরণায় সঞ্জীবিত না করে তোলে, তাহলে তাকে সামাজিক শক্তি বলে মনে করা যেতে পারে না। পারের কড়ি নিয়ে একা-একা পাড়ি দেবার মতলবই যদি ধর্ম্মবোধে জড়িত হয় তাহলে সে-ধর্ম্ম অসামাজিক। কোনো সুপ্রভাতে যদি এমন দেখা যায় যে বাঙলার ধর্ম্মপ্রাণতা প্রবল আবেগে সবার চোখের জল মুছে দেবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছে—ব্যথাহীন, বেদনাহীন একটি মানবজীবন তৈরী হয়ে উঠেছে ক্ষুদ্রতম ভৌগোলিক ক্ষেত্র বাঙলাদেশে, তাহলে আমরা মনে করব ধর্ম্মগ্রন্থের রুচি সার্থক হল। নতুবা আমাদের মনে করতে হবে আরো দু-পাঁচটা বিলাসের মতো তেরশ ষাট সালের বাঙালীর ধর্ম্ম-রুচিও একটা স্বার্থপরতা মাত্র।

# নূতন সাহিত্য

**মনীষী জীবন-কথা ( ১ম ও ২য় খণ্ড ) ঃঃ সুশীল রায় ( ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী )**

জীবন কথা ঠিক জীবনী নয়, সঞ্জীবনী। অনুপ্রেরণার উপকরণ। কয়েকজন সুধী ব্যক্তির জীবন পর্যালোচনা করে বন্ধুবর সুশীল রায় বাংলার তরুণদের কাছে নতুন আদর্শ স্থাপন করেছেন। সংস্কৃতির ক্ষেত্র উন্নত না থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্যবসিত হয়। ঐতিহ্যের আড়ম্বর না থাকলে বাগাড়ম্বর সার হয়। রাজনৈতিক কচকচি যখন শিশুদের জ্যেঠামশাই বানিয়ে তুলছে, এ সময় সুশীল রায়ের এ প্রচেষ্টা, সংস্কৃতি-সাধকদের সম্বন্ধে কথকথা, একটু সংভাবনার সুযোগ দেবে বলে আমি মনে করি।

লোক চক্ষুর আড়ালে খবরের কাগজের ঢাক্কানিনাদ থেকে আত্মরক্ষা করে সুধীব্যক্তিরা বঙ্গ জননীর সেবা করে যাচ্ছেন। এঁরা নিজেদের মনীষী বলাতে লজ্জা বোধ করেন, দীন সেবক বললে গর্বিত হন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সাহিত্য চর্চা করেও নাকি সাহিত্যিক হবার উপযুক্ততা লাভ করেন না, আরো পঞ্চাশ বছর বিদ্যাচর্চায় নিমজ্জিত হয়ে থাকতে চান। এদের মধ্যে কয়েকজন নিজেদের অজ্ঞাতে পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন, কেউবা বাংলাদেশে অপরিচিত কিন্তু ভারতবর্ষের পণ্ডিত সমাজের মধ্যমণি, কেউবা একা মহাভারত সম্পাদনা করে হিমালয়-প্রমাণ শক্তি, সংযম ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন।

দুইজন ব্যতিরেকে এইসব সুধীবৃন্দ জীবিত আছেন এবং জ্ঞানার্জনে যুবোজনোচিত আগ্রহ প্রকাশ

করছেন। এঁরা সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনে পরাঙ্মুখ। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞানার্জনে ঔৎসুক্য যাঁদের আছে, সেসব তরুণরা এঁদের সাহচর্য্যে এসে উপকৃত হতে পারেন। সুশীলবাবু এই বিশিষ্ট বাঙ্গালীদের বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে পাঠক সমাজের প্রভূত ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

প্রকাশকও ধন্যবাদার্হ। পুস্তকের ছাপা বাঁধাই ভাল। অমল দত্ত

## কবিতা-আলেখ্য

অবন্তী ঃ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ( ক্যালকাটা বুক ক্লাব )

স্বগত সন্ধ্যা ঃ আনন্দ বাগচী ( কৃত্তিবাস প্রকাশনী )

এখনকার দু'জন তরুণ কবি উপরোক্ত দু'টি গ্রন্থে তাঁদের অন্তরের রূপ-বাণী আমাদের নিকট উপস্থিত করছেন। শ্রীমান আনন্দগোপাল ইতিপূর্ব্বেও একখানি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেছেন—তার নাম 'বিদিশা'। 'বিদিশা' থেকে 'অবন্তী' অনেকদূরের পথ ছিলনা, সুতরাং আনন্দগোপালও কাব্য-রচনায় অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন নি। তবে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। কবির বা কবিতা-লেখকের নিকট এই অগ্রসরতা সর্ব্বতোভাবে কাম্য।

কবির আর কবিতা-লেখকের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। অগ্রসরতার ভঙ্গী নিয়েই পার্থক্যটি তৈরী হয়। কবি অগ্রসর হন দৃঢ়-পদক্ষেপে, একেকটি স্তর বা অধ্যায় তিনি পার হয়ে যান মনে কোনো ক্ষোভ না রেখে। চাঞ্চল্যের যন্ত্রণায় তাঁকে অধিকক্ষণ ভুগতে হয়না। কিন্তু কবিতালেখক চঞ্চল, তিনি অধ্যায় নির্ম্মাণ করতে জানেন না এবং অধ্যায়ের মায়াও ত্যাগ করতে পারেন না। সম্পূর্ণত ত্যাগ অবশ্য কবিরাও করেন না তবু পাঠক বুঝতে পারেন, কবির মনে সুস্পষ্টভাবে হাওয়াবদল হচ্ছে। কবিতা-লেখা বাঙলাদেশে ইদানীং একটি সহজ কর্ম্ম, কিন্তু তাসত্ত্বেও বল্‌ব কবি-প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত কমসংখ্যক কবিতা-লেখকের মধ্যেই পাওয়া যায়। কবিসত্তায় উত্তীর্ণ হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ।

'স্বগত সন্ধ্যা'র কবিতাগুলো পড়ে শ্রীমান আনন্দ বাগচীকে কবি-প্রতিশ্রুতি-সম্পন্ন বলে ভ্রম হতে পারে। তিনি চমৎকার কয়েকটি কবিতা রচনা করেছেন কিন্তু সেই ভালো কবিতাগুলো থেকে তাঁর মনের কোনো সুসম্বদ্ধ ছবি তুলে আনা যাবে না। বিচিত্রগামিতা একস্থানে যদি কোনো বস্তুতে ( আধুনিক বিচারে মন-ও বস্তু ) উপস্থিত থাকে, তাতে চাঞ্চল্যের ছবিই প্রতিভাসিত হয়। সে চাঞ্চল্য এমন যে বোঝা যায় না বস্তু কোন্ পথ বেছে নিয়ে অভিসারী হতে চায়। অবশ্য কবিরও এমন মুহূর্ত্ত উপস্থিত হয় কিন্তু তিনি অত্যন্ত দ্রুত মনস্থির করে ফেলেন।

আমরা যদি ভেবে নিই যে এখনকার বাস্তব অবস্থা কাউকে মতিস্থিরতা দিতে পারছেনা তবে আনন্দ বাগচীর মতো কবিতা-লেখককে কবি-প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন মনে করতে পারি। স, ভ।



## বাংলা-সাহিত্যের আদিপর্ব্ব

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দুমুসলমান—প্রমথ চৌধুরী—( বিশ্বভারতী—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ )

"বাঙালি মুসলমান-যুগে বাংলার ইতিহাস না গড়ুক বাংলা সাহিত্য গড়েছে, এবং সেই সাহিত্য থেকে বাঙালি-জীবনের ইতিহাস না পাওয়া যাক্, তার মনের ইতিহাস কতকটা পাওয়া যায়।"

এ-ধরণের সদুক্তি লিপিবদ্ধ করবার লোক সম্প্রতি বাংলাদেশে বিরল। বীরবল ( প্রমথ চৌধুরী ) নেই সুতরাং অপ্রিয় সত্য কথা বলবার লোকেরও অভাব দেখতে পাই। বাংলা সাহিত্যের গোড়ার দিককার ইতিহাস গোলমেলে হয়ে আছে কেউ সত্য কথা বলবেননা বলে। 'বাঙালী আত্মবিস্মৃত জাতি' —খুব চমৎকার একটি বাক্য তৈরী করে বাঙালী সভ্যতার আদিযুগের উপর যবনিকাপাত করা হয়েছিল। নবাবী আমলের উপরও ওই বাক্যেরই যবনিকা-পাত করা হয়েছে। প্রমথ চৌধুরী যদি সৎসাহসে নির্ভর করে 'প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' নামক নিবন্ধ রচনা করে না যেতেন তা হলে প্রসঙ্গটি নিয়ে এ'-ক'টি বাক্য-ব্যয় করবার সুযোগ আমাদের হত না। এ-প্রসঙ্গে বিশ্ব-ভারতীর পুস্তক-প্রকাশের বিভাগকেও আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, যেহেতু তাঁরা একটি কালোপযোগী পুস্তিকা প্রকাশ করে মনস্বী প্রমথ চৌধুরীর অবিস্মরণীয় কর্ম্মকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন।

বাংলার বাদশাহী আমলের প্রথম গ্রন্থ রামাঞি পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' কি না এ-নিয়ে একটি প্রশ্ন জেগে উঠেছিল প্রমথ চৌধুরীর মনে। 'উক্ত পুরাণের এক অংশে মুসলমান কর্ত্তৃক জাজপুরের মন্দিরভঙ্গের একটি নাতিহ্রস্ব বর্ণনা আছে।' কিন্তু ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে তেলেগু-ভাষী বীর-বাহুদেবের কলিঙ্গাধিপত্যের কালে 'ঘিয়াথুদ-দীন' তুঘলক ( গয়াসদীন ) উলুঘ-খানকে জাজনগরে পাঠান। 'জাজপুর' ও 'জাজনগর' অভিন্ন বলেই মনে হয়। উলুঘ-খান সেখান থেকে চল্লিশটি হাতি নিয়ে 'তিলঙ্গে' ফিরে যান। তৈলঙ্গ 'বীর বাহুদেবে'র সঙ্গে 'তিলঙ্গী' 'উলুঘ খানের' সম্পর্কটি পরিষ্কার না হলে রামাঞি পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণের এই ত্রিপদীর—

"জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন .
আনন্দে ত পরিল ইজার।"

অর্থ হৃদয়ঙ্গম হবেনা এবং বাদশাহী আমলের প্রকৃতি, সামাজিক অবস্থা, সময় প্রভৃতিও নিরূপিত হবেনা।

এই দৈব আনন্দের দরুণই "চণ্ডীদাসের পদাবলী পড়ে তিনি যে মুসলমান-যুগে বাস করতেন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।" রাষ্ট্রের আধিপত্য নিয়ে মুসলমানে-মুসলমানেও যথেষ্ট বিরোধিতা হয়েছে। সেই সুযোগে ১২৪৬ সনে কলিঙ্গাধিপতি নরসিংহ ( গঙ্গবংশী ) 'রাঢ়া ও বারেন্দ্রের যবনীর চোখের কাজলে বিধৌত কালো অশ্রুমিশ্রিত গঙ্গাযমুনা জলের দেশে' আগমন করেন। রাষ্ট্রিক জয়-পরাজয়ের ইতিহাস যে বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রীতির নিগড় ভেঙে ফেলেনি এ-কথাটা পাঠান আমলের ইতিহাস থেকে আমাদের উদ্ধার করা দরকার।

বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাস হয়ত কালক্রমে লিখিত হবে। এ-অধ্যায়ের যে-দলিল ইংরেজ-আমল

প্রামাণ্য বলে আমাদের দিয়ে গেছে, তা সত্য না-ও হতে পারে। অন্তত যৎসামান্য যতোটুক্ উপকরণ আমরা স্বকীয় গবেষণায় অর্জ্জন করতে পারি তদ্দৃষ্টে মনে হবে স্মিথের ইতিহাসের চাইতে এলিয়টের ইতিহাসই খাঁটি। এলিয়টের ইতিহাসে বঙ্গ-সংস্কৃতির ( রাষ্ট্রনৈতিক ) আদিকাণ্ড বিবৃত আছে। তা মোটেও উপেক্ষণীয় নয়।

আসল কথা, আমরাই ইতিহাসের উপাদান-উপকরণ উপেক্ষা করে এসেছি। গুপ্ত করবার মনোবৃত্তি কখন থেকে সুরু জানিনে কিন্তু তার আর যেন শেষ নেই! অবশ্য "মানুষের পক্ষে তার Origin খোঁজটা বড় সুবুদ্ধির কাজ নয়" বলে প্রমথ চৌধুরী মনে করতেন, তাতে 'কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বার সম্ভাবনা' থাকে। 'অতীতের মাটি বেশি খুঁড়লে' মানুষের ইজ্জৎ থাকে না সত্যি কথা। কিন্তু নিকট অতীতকে ভুলে বর্ত্তমানকে বিষাক্ত করবার দুর্ব্বুদ্ধিও আমাদের লুপ্ত হওয়া দরকার। এ-কাজের প্রযত্নে প্রমথ চৌধুরীর এই পুস্তিকাটি মূল্যবান পুঁজি হয়ে রইল।

স. ভ।

এ-সংখ্যার সঙ্গে যাঁদের বার্ষিক ও যাণ্মাসিক চাঁদা শেষ হয়ে গেল, তাঁরা দয়া করে ১৩৬১-সালের চাঁদা মণি অর্ডারে পাঠিয়ে দেবেন। ভিঃ পিঃ যোগে কাগজ পাঠানোর খরচ অযথা বেশি পড়ে যায়।

**সত্যপ্রসন্ন দত্ত**

কর্ম্মাধ্যক্ষ পূর্ব্বাশা

৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা


## আমাদের কথা

বই প্রকাশ করা আমরা সামাজিক কর্ম্ম বলেই মনে করি। সমাজ-মানস গঠনে বই-এর দায়িত্ব অস্বীকার করে পূর্ব্বাশা লিমিটেড পুস্তক প্রকাশনার কাজ গ্রহণ করেন নি। সাহিত্যের নির্ব্বিচার পরিবেশনে পাঠকের মনে অতীতের কণ্ডূয়ন অথবা রুচির বিকৃতি সৃষ্টি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

কথাসাহিত্য ও কবিতা পরিবেষণে পূর্ব্বাশা লিমিটেড বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক আন্দোলন ও প্রগতির প্রতি দৃষ্টি রেখে চলছেন। পূর্ব্বাশার সমাজবোধ ও সাহিত্য-বোধ ভারসাম্য হারিয়ে কোথাও শ্রীহীন হয়ে পড়েনি।

**কবিতা**

অজিত দত্তের
**পুনর্ণবা**
দেড় টাকা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
**নীল আকাশ**
দেড় টাকা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**সংকলিতা**
দু'টাকা

**প্রাচীন প্রাচী**
দেড় টাকা

**অপ্রেম ও প্রেম**
এক টাকা

**পদাবলী**
দুই টাকা

**তিনজন আধুনিক কবি**
( বাংলা কবিতার আলোচনা )
নয় আনা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য্যের
**সৈনিক**
দেড় টাকা

গোপাল ভৌমিকের
**স্বাক্ষর**
এক টাকা

**গল্প**

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
**মহানগর**
দু'টাকা

সুবোধ ঘোষের
**পরশুরামের কুঠার**
দু'টাকা

**শুক্লাভিসার**
দু'টাকা চার আনা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**ফসল**
এক টাকা চার আনা

**ঋণ**
দেড় টাকা

**নতুন দিনের কাহিনী**
দু'টাকা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
**পতাকা**
দু'টাকা

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর
**খেলনা**
দেড় টাকা

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের
**নয়নচারা**
দেড় টাকা

**উপন্যাস**

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের
**বৃত্ত**
এক টাকা বার আনা

**মরামাটি**
( ২য় সং )
দু'টাকা চার আনা

**দিনান্ত**
( ২য় সং )
সাড়ে তিন টাকা

**কল্লোল**
পাঁচ টাকা

**কস্মৈদেবায়**
( ২য় সং )
তিন টাকা :

**রাত্রি**
( দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ )
পাঁচ টাকা

**মৌচাক**
পাঁচ টাকা

শৈলেন ঘোষের
**তিনরঙ**
দু'টাকা

**পূর্ব্বাশা লিমিটেড—পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউ কলিকাতা**